লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

মা

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

১ম সংখ্যা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে—
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁদের হাতের বিজয়-মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি-জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস-রাত্রি ;—
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বক্ষে বাজুক বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

(২)

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে,
পিছিয়ে পড়েছি আমি,—
যাব যে কী ক'য়ে।
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথ-রেখা গেছে মিশি',
সাড়া দাও সাড়া দাও
আঁধারের ঘোরে॥

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই, তত
যাই চ'লে দূরে।
মনে করি আছ কাছে,
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই
কালি নিশি-ভোরে॥

(৩)

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
আপনার আবরণ ?
খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার
আনন্দ-নিকেতন।
মুক্তি না যদি থাকে মনে মনে
আকাশ সেও যে বাঁধে বন্ধনে,
বিষ-নিঃশ্বাসে তাই ভ'রে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ।

ঠেলে দে আড়াল ঘুচিবে আঁধার,
আপনারে ফেল্ দূরে।
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি',
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন॥

(৪)

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।
পরশ-রতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।

যা-কিছু মলিন যা-কিছু কালো
যা কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

(৫)

মরণ-সাগর-পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনার ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক—
জয় হোক্, জয় হোক্, তারি জয় হোক্,
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক—
জয় হোক্, জয় হোক্, তারি জয় হোক্,
তোমাদের স্মরি।

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(৪০)

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill E. C.
London
23rd Jan. 1902.

বন্ধু,

ইতিমধ্যে তোমার ২ খানা চিঠি পাইয়াছি। আমিও আমার চিঠি ও lecture পাঠাইয়াছিলাম পাইয়া থাকিবে। তোমার পত্রের জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকি। তুমি যে আশ্রমের জন্য কার্য্য করিতেছ তাহা হইতে অনেক আশা করি। মানুষ গঠন করিতে যদি পার তাহা হইলে আমাদের অনেক দুর্গতি দূর হইবে। তবে তোমার লেখা সর্ব্বদা দেখিতে চাই। অনেক কাল তোমার স্বর শুনিতে পাই না। আমি বড় শ্রান্ত। গত ৩ মাস যাবৎ একখানা পুস্তক লিখিতেছিলাম—মনে করি নাই এত বড় হইবে। ইহার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। আমি কি করিয়া সে সব ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার পুস্তকে প্রতি ছত্রে সম্পূর্ণ নূতন বিষয় থাকিবে। বিষয়ও বহুপ্রসারী হইয়া পড়িতেছে। আশা করিয়াছিলাম তুমি আসিবে। আমি একাকী বড় বিষণ্ণ থাকি। তুমি সর্ব্বদা পত্র লিখিও।

লোকেনের সুসংবাদ শুনিয়াছ, তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতা তোমার স্মরণ আছে! এখন সে সব কথা উল্টাইয়া বলে আমরা তাহার

ভাব বুঝিতে পারি নাই। তাহার সুব্যবস্থা দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

আমার ছোট বন্ধুটিকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইও; তোমার জামাতার সহিত একদিন দেখা হইয়াছিল, বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আবার আসিতে বলিব। তোমার সহধর্ম্মিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

(৪১)

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill E. C.
12. 2. 1902.

বন্ধু,

অনেক কাল তোমার পত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছ কি? তা নয়, জানি। তুমি হয়ত মনে করিতে পারনা যে, তোমাদের চিঠি পাইলে কত সুখী হই। এখানে কার্য্যভারে ক্লান্ত, তার পর আরও কত বাধা তাহা মনে করিতে পার না। কয়েকজন বিখ্যাতনামা Physiologistএর থিওরি বোধ হয় আর টেকে না, সুতরাং তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বাধা দিবেন। কিন্তু তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি তাহাদের বালির বাঁধন টিকিবে না। তবে সময় চাই। আমার একখানা পুস্তক প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার পূর্ব্ব কার্য্য সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক পত্রে বিশেষ প্রশংসা হইতেছে—সর্ব্বপ্রধান আমেরিকান্ Engineering কাগজে Leaderএ

A field of inquiry of most extraordinary interest has been opened by Dr. J. Chander Bose ইত্যাদি তিন কলম।

এখন আরও যাহা যাহা নূতন পাইতেছি তাহাতে আমাকে নির্ব্বাক্ করিয়াছে—তাহা ভাষা দিয়া বর্ণনা করিতে পারি না।

অদৃশ্য মানবিক তরঙ্গের সংঘাত ও তজ্জনিত বিবিধ অদ্ভুত কাণ্ড—ও সেই সংগ্রামের autographic ইতিহাস! আমি আর কি বলিব, আমি এজীবনে কিছু শেষ করিতে পারিব না।

বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি, ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।

তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

ভালকথা 'হিন্দুস্থান' গানটি চিরকাল থাকিবে।

সুরেন যে remittance পাঠাইয়াছেন তাহা পাইয়াছি, কি করিব বলিও।

তোমার জামাতাকে আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। সর্ব্বদা আসিতে অনুরোধ করিয়াছি।

দেখ আমার ছোট বন্ধুটিকে আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত হস্তান্তর করিও না।

তোমার নূতন লেখা পড়িবার জন্য ব্যস্ত আছি। বঙ্গদর্শন পাই না। মাঝে মাঝে তোমার পত্র পুনঃ পুনঃ পড়ি আর ২।১ খানা কবিতার পুস্তক আছে তাহা পড়ি। কিন্তু যেগুলি সঙ্গে নাই তাহা পড়িবার জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়।

সর্ব্বদা পত্র লিখিও।

তোমার
জগদীশ

(৪২)

1, Birch Grove, Acton
London W.
21st, March, 1902 (?)

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য এখানকার সংগ্রামক্ষেত্র হইতে তোমার শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। অনেক কালের জন্য গভীর শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ

হইল। আমার সমস্ত হৃদয় মন তোমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল। তুমি যাহা করিতেছ তাহাই শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে আগামী বারে অনেক লিখিব। আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে।

তোমরা চিন্তিত হইবে বলিয়া আমি এখানকার সব কথা খুলিয়া লিখি নাই। ইয়োরোপের একজন প্রধান Physiologyতে অগ্রণী, Burden Sandersonএর নাম শুনিয়াছ। Sanderson এবং Waller এই দুইজন Physiologyর উচ্চ সিংহাসন অনেককাল যাবৎ নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাকে দেখাই যে যদি নির্জ্জীব ও জন্তুর responsiveness এর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু that ordinary plants should give electrical response is simply impossible. *It cannot be.* আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use *our* physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নাহে, আর এই সব phenomena এক সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologistএর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy of silence হইল। কারণ আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী; একবার আমি সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এবিষয়ে একেবারে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম। কারণ "whom are we to believe—Physiologists who have grown grey in working out their special subjects—or a young *physicist* who comes all of a sudden to upset all our convictions?" সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতি মধ্যে Linnean Societyর President, Prof. Vinesএর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক Vegetable Physiologistsএর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আর Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society। Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal College of Science) কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃপুনঃ বলিতেছিলেন, "I wish Huxley had been living now, he would have found the dream of his life fulfilled."

তাহার পর Vines, as President of Linnean Society, আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত physiologist-Biologist-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষ-কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি?

একেবারে নিরুত্তর। তাহার পর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন, যে, we have nothing but admiration for this wonderful piece of work. Presidentও অনেক সাধুবাদ করিলেন।

সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আরও এখন অনেক করিবার আছে। আমি কি করিব বুঝিতে পারি না। আমি একান্ত শ্রান্ত, এবং আমার সমস্ত মন এখন নির্জ্জনে যাইবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু আমি যে অগ্নি জ্বালাইয়াছি তাহার ইন্ধন আরও অনেক দিন জোগাইতে হইবে।

তুমি মহারাজাকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি আমার এখানে থাকিবার উপায় না করিতে —তাহা হইলে আমাকে নিস্ফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

বন্ধু, আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা প্রেরণ করিতেছি।

তোমাদের
জগদীশ।

তোমার জন্য John Chinaman পাঠাইতেছি। পড়িয়া দেখিও। আমরা স্বর্ণ ফেলিয়া ইয়োরোপীয় ভস্ম লেপন করিতেছি।

(৪৩)

(শ্রী অবলা বসুর পত্রে)

1, Birch Grove, Acton
London W.
27th March, 1902 (?)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেক সময় আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু সময়াভাবে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

এখানে আপনার বন্ধুর বিষয় যাহা শুনি তাহা আপনাকে অনেক সময় জানাইতে ইচ্ছা হয়। কারণ, আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন জানি।

এতদিন পরে অধ্যাপক মহাশয়ের সমুদয় শ্রম সার্থক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। **Botanist** এবং Biologist রা তাঁহার theory অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, কেবল Physicist রা এখনও অগ্রসর হন নাই, সেজন্য বোধ হয় France ও Germanyতে যাইতে হইবে। ইংরেজরা এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত conservative। আমরা দূর হইতে ইয়োরোপকে সমুদয় সদ্‌গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুই তিন বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যাহা পাওয়া যায় আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific menদের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ তাহা শুনিয়া অবাক্ হই। যাক্ সে সব কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের খবর দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। আজকাল এখানকার বৈজ্ঞানিক যুবক-সম্প্রদায় অধ্যাপক মহাশয়ের theory লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, সেদিন একজন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমার নিকট তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, যেমন Darwin Biologyকে revolutionize করিয়া দিয়াছেন, তেমনই Prof. Bose's theory will revolutionize our whole idea of molecular Physics। লোকটিত একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, if only Prof. Bose will allow us, a dozen of us who thoroughly know our subject are willing to fight for him.

আজ আর সময় নাই।

নিং শ্রীঅবলা বসু

(৪৪)

Hotel Observatorie
Paris
৪ঠা এপ্রিল ১৯০২

বন্ধু,

তুমি যাত্রাকালে তোমার ব্রাহ্মণীর গাঁটরী বোঁচ্‌কা ইত্যাদির কথা লইয়া পরিহাস কর। আমার প্যারিস আগমন কালে যদি দুরবস্থা দেখিতে। মুনিঋষির কমণ্ডলুর কল, কেহ হস্তে কেহ পৃষ্ঠে লইয়া সমস্তক্ষণ [illegible] বোধ

করিয়া এই ৯ ঘণ্টা কাটাইয়াছি, সহযাত্রীদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি।

এখানে ৪ স্থানে বক্তৃতার জন্য আহুত হইয়াছি। গত রাত্রে এক বড় বৈজ্ঞানিক সভার dinnerএ আমি principal guest ছিলাম। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য উৎসুক।

ফল ধীরে জানাইব। তোমার বন্ধুতা আমাকে সর্ব্বদা সঞ্জীব করে। সন্ধ্যার পর ক্লান্তি তোমার আশ্রমের কথা মনে করিয়া ভুলিয়া যাই। কবে আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

তোমার
জগদীশ

(৭৫)

পারিস
৮ই এপ্রিল ১৯০২

বন্ধু,

সারাদিন ঝঞ্ঝাট, দুদণ্ড তোমার সহিত আলাপ করিবার সময় পাই না। সন্ধ্যার পর বাহিরের আঁধারের সহিত অন্তরের আলো জলিয়া উঠে। তখন আমি জন্মভূমির কোলে স্থান পাই।

ছেলে-বেলা ইংরেজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পারিতেছি। পশ্চিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে। তবে পরের দোষ দেখিয়া আমাদের কি লাভ? কি করিয়া আমরা বিলাসের পথ হইতে উদ্ধার পাইব?

সচরাচর শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। একথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করেন নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্য্যের বিজয়-যাত্রা কোন অংশে যুদ্ধযাত্রা অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ একালে কি দেখা যায়?

তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। "আমি" কেহই নই, "যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।"

তিনি বিশ্বকর্ম্মারূপে আমাদের হৃদয় মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না। কিন্তু দুঃখের দিনে একটু জানাইতে পারি। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন, দাস সে স্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি, কিন্তু কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রবাল-পঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে। এই ত আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্য্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই।

তোমার আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এই ভাব লইয়া সমস্ত প্রাণ মন দিয়া নিয়োজিত কার্য্য করিতে পারে। তারপর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

লণ্ডন

আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার তিন জায়গায় বক্তৃতা ছিল, সকল স্থানেই বক্তৃতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং আরও জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এতবড় বিষয়টা ২।৪ দিনে সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ ও প্রচার করিবার আশা করি না। তবে Germany হইতে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে।

তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্ম-সাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের ক্রোড়ে, যেখানে সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শান্তিময়, সেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্বাস হও

তবে আমি একা বুঝিয়া কি করিব? আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকান্‌রা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য, manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এদেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপরে পড়িবে। যদি একে একে উপায় পরহস্তগত হয়, তাহা হইলে নির্লোপ হইবার বেশী দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও। জাপানের সমৃদ্ধি কেন বাড়িতেছে? আমি ত উক্তদেশের অনেককে দেখিয়াছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই! চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে? এতকাল কথা ছিল যে ভারতে বিজ্ঞান অসম্ভব, এখন কথা হইবে দৈবাৎ এক আধটা instance ধর্ত্তব্য নয়। এমন কি Prof. Ramsay আমাকে বলিলেন, your case is an exception, one swallow does not make a summer!

অবশ্য ইচ্ছা করিলে এ সমস্ত ভুলিয়া থাকা যায়। একটা জীবন বইত নয়, আর কত দিনই বা। এ সংসারের শেষ হইলে কি মায়া যায়? এই একটা স্থানবিশেষের জন্য মমতা হয়ত মায়া মাত্র।

তোমাকে আর কি লিখিব?

তোমার জামাতাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে। তাহার দ্বারা তুমি সুখী হইবে। এখানকার ইঙ্গবঙ্গের হাওয়া বাছাকে স্পর্শ করে নাই।

তোমার
জগদীশ

(৪৬)

লণ্ডন
১লা মে ১৯০২

বন্ধু,

তোমার পত্রের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, আজ পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েইত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অচ্ছিন্ন হইয়া যায়?

তুমি ত এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।

৮ই মে।

বন্ধু,

তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও। আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না। এই যে Royal Societyতে গত বৎসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরী করিয়া Waller গত নবেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর paper ছাপা হইবার কথা যখন Councilএ উঠে তখন Wallerএর বন্ধুরা তথায় আমার paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন—এই বলিয়া, যে Waller গত নবেম্বরে একথা publish করিয়াছেন! Councilএর কথা Confidential, সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Societyর paper বাহিরে প্রচার হয় নাই সুতরাং প্রমাণাভাবও বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Institutionএর Lectureএ

একথা ছিল, এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর সেক্রেটারীর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি, যে, আমার কাগজ ছাপা হইবে।

President আমাকে লিখিয়াছেন, "there are many queer things you have yet to learn. But I am glad that you now have had fair-play." তাঁহার নিকট আরও অনেক কথা শুনিলাম। সে সব কথা বলিয়া আর কি হইবে? Ideal ভাঙ্গিয়া গেলে আর কি থাকে! এতদিন এদেশের বিজ্ঞান-সভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি—তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই বূহ্য ভেদ করিতাম—কিন্তু আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি একবার কদিন আসিয়া ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে চাই। তাহার পর যদি পুনরায় আসিতে পারি তবে—ভবিষ্যতের কথা আর ভাবিব না।

তোমার

জগদীশ

(৪৭

লণ্ডন

৩০এ মে, ১৯০২

বন্ধু,

এতকাল কেবল কর্ম্মসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর-সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা—মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে। সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ, অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সে কথা কল্যাণী—তুমি ঠিকই বলিয়াছ একথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।

তুমি নগর হইতে দূরে যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছ, সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি। তারপর তোমার কল্পনার সাহায্যে সেই অতীত সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। আমার নিকট এই বর্ত্তমান ত একেবারে অলীক দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কল্পনারাজ্যেই আমাদের প্রকৃত জীবন।

তোমার এই নূতন স্থান কিরূপ মনে করিতে পারি না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে। আর একবার একত্র তীর্থযাত্রা করিব।

তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে। ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ তাহাতে কি করিবে। কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে।

আমার এখানকার কাজের সংবাদ ভালই। স্রোত বোধ হয় অনুকূলেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেদিন Linnean Societyর বাৎসরিক অধিবেশনে আমার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে। যদি অধিক দিন থাকিতে পারি তাহা হইলে সবই অনুকূল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তবে জয়পরাজয় জোয়ার-ভাটা। Germanyর Bonn Universityতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ আসিয়াছে। তোমাদের প্রতিনিধির উপর একটু সদয় হইও।

তোমাদের নিকট একটু উৎসাহ পাইবার জন্য মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে তাহার কথা লিখিয়াছিলাম, আর অমনি তুমি বলিয়া বসিলে সীজারের নৌকাডুবি কখনও হয় না। একবার সমুদ্রে পড়িলে বুঝা যাইত নৌকাডুবি হয় কিনা। তুমি কি মনে কর যে আমি এক কেষ্ট বিষ্টু হইয়াছি। গলায় পাথর বান্ধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব? দোহাই এরূপ কবি-কল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে

বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি—দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে-ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একবারে অপরিবর্ত্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরী করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির-অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।

তোমার
জগদীশ

(৪৮)

লণ্ডন
৬ই জুন, ১৯০২

বন্ধু,

কেবল একটি সংবাদ জানাইবার জন্য কয় পংক্তি লিখিয়াছি। আজ এক বৎসর পূর্ব্বে রয়াল্ সোসাইটিতে Inorganic Response সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা যে প্রকাশিত হয় নাই তাহা জান। ঠিক এক বৎসর পর আজ জানিলাম আমার জিৎ হইয়াছে। রয়াল্ সোসাইটি আমার সেই আবিষ্কার সম্পূর্ণাকারে অবিলম্বে প্রচার করিবেন।

তুমি এসংবাদে সুখী হইবে মনে করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

তোমার
জগদীশ
(ক্রমশঃ

মেটারলিঙ্কীয় নাটকে বার্ত্তালাপ

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মেটারলিঙ্কীয় ভাবজীবনের বিকাশ ও পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া তাঁহার নাট্যসৃষ্টির মধ্যেও ধরা পড়িয়াছে, দৃশ্য-পরিকল্পনায় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নাটক ত শুধু কতকগুলি পারিপার্শ্বিক দৃশ্যসমষ্টিই নহে, তাহার প্রধান অঙ্গই হইতেছে নাটকীয় চরিত্র ও বার্ত্তালাপ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু তাঁহার নাটকীয় বার্ত্তালাপ-রীতির মধ্য দিয়া ভাবজীবনের প্রভাব কি পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

অভিনব বার্ত্তালাপ-রীতি ও চরিত্রসৃষ্টি

প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে মেটারলিঙ্কীয় নব নাট্য-পদ্ধতির মৌলিকতা বোধ করি সব-চেয়ে বেশী বিকাশলাভ করিয়াছে, তাঁহার অভিনব বার্ত্তালাপ-ভঙ্গীর মধ্যে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এইসব নাটকের লক্ষ্য রহস্যবস্তু বা নিয়তির প্রভাবটিকে দেখান নয়, ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও ভীষণ নিয়তিকেই প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা। অর্থাৎ এখানে নিয়তির নিয়ন্ত্রণে জীবনের পরিণতি দেখান উদ্দেশ্য নহে, জীবনবস্তু এখানে নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। নাটক নাটক বলিয়াই, তাহাকে বাধ্য হইয়া মানব-চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়া এই রহস্যকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। অথচ বিপদ্ এই যে, জীবনের ও জগতের মধ্যে এই গোপন রহস্য-বস্তু তাহার কোনো নিজস্ব বিশেষ রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায় না; উহা ব্যক্তি-জীবনেরই একটা অব্যক্ত অনুভবের মধ্যে আপনাকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যক্তিত্বে প্রবল হইয়া, ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র ও

সুস্পষ্ট হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রহস্য এবং নিয়তিকে অনেকখানি আড়ালে চলিয়া যাইতে হয়। সেক্সপীয়রীয় নাটকে কি নিয়তি নাই, রহস্য নাই,—এই প্রশ্নটি স্বতঃই আমাদের মনে আসিতে পারে। যাঁহারা সেক্সপীয়রীয় নাটকে নিয়তি কোথায় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সেখানে যদিও নাটকে অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে একটা অদৃষ্ট শক্তিকে স্বীকার করা হইয়াছে, তবু সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্রের বিকাশ ও সুস্পষ্টতা এত বেশী যে, তাহার মধ্যে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা হইতেছে মানব-জীবন ও তাহার চরিত্রগত অসম্পূর্ণতা। ফলতঃ সেক্সপীয়রীয় নাটকে মানব-চরিত্রই নিয়তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানব মনের বাহিরে কোথাও একটি স্বতন্ত্র নিয়তি সেক্সপীয়রীয় নাটকে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। ম্যাক্‌বেথের মধ্যে সেক্সপীয়র তাই মাঝে মাঝে ডাকিনীদের ডাকিয়া আনিয়া দর্শকের মনে একটি স্বতন্ত্র নিয়তির বোধ জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, নিয়তি-রহস্যকে প্রকাশ করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক্‌কে চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং যাহাতে চরিত্র বড় হইয়া উঠিয়া নিয়তিকে আড়াল করিয়া না ফেলে, সেইজন্য চরিত্র-সৃষ্টিরও একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেশী না বলিয়া এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি চরিত্রের মধ্যে এই রহস্যবোধকে অত্যন্ত প্রবল করিয়া, তাহাদের জীবনকে রহস্যানুভূতির আব-হাওয়ায় পরিব্যক্ত করিয়াই মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তাহা করিতে গিয়াই মেটারলিঙ্কীয় নাটকের বার্ত্তালাপ একেবারে অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। এই বার্ত্তালাপ-ভঙ্গীই চরিত্র-সৃষ্টির সহায়তা না করিয়া, নাটকীয় আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিয়া জীবনের মধ্যে রহস্য-বিভীষিকাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথমযুগের নাটকে বার্ত্তালাপ-রীতির বিশেষত্ব

প্রথম যুগের নাটক কয়খানির বার্ত্তালাপের দিকে চাহিলেই আমরা তাহার মধ্যে গতির একান্ত অভাব দেখিতে পাই। এইসব নাটকের বার্ত্তালাপ শুনিলেই মনে হয় যেন নাটকীয় চরিত্রগুলি এক অদ্ভুত ঘুমের ঘোরে থাকিয়া থাকিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; ইহারা যেন বড় বেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা যেন কোন্ অজানিত ভয়ে ত্রস্ত-স্তব্ধ হইয়া ইহারা কোনো কথাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং কোন কথা শুনিয়া উঠিতেও পারিতেছে না, কিম্বা অন্তরের কোন্ তপ্ত রুদ্ধ যাতনায় ইহারা যেন একান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, অথবা যেন নিমেষে নিমেষে কোন্ লোকান্তরের অব্যক্ত স্বপ্নকথা ইহাদের মুখে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠিতেছে না। সর্ব্বত্রই ইহাদের বার্ত্তালাপ অসমাপ্ত থাকিয়াই শেষ হইয়া যাইতেছে; কোনো-একটি কথার পুনরুক্তিরও অভাব নাই। বার্ত্তালাপের এই অসমাপ্তি ও পুনরুক্তির মধ্যেই মেটারলিঙ্ক অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা মেটারলিঙ্কের এই নাটকগুলি পাঠ না করিবেন, তাঁহাদিগকে এই অদ্ভুত নাট্যরীতির পরিচয় দেওয়া এক-রকম অসম্ভবই বলিতে হইবে। 'অদ্ভুত' বলার মধ্যে এক বিন্দুও অত্যুক্তি আছে বলিয়া যেন কেহ মনে না ভাবেন। অসমাপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়া অথবা পুনরুক্তির সাহায্যে মেটারলিঙ্ক্ নাটকের সত্যকার অনুচ্চারিত গোপন বার্ত্তালাপটিকে যে ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন ইহাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই নাটকগুলির মধ্যে যতটুকু উচ্চারিত ততটুকু যেন নাটকের প্রধান বস্তুই নহে। এই বার্ত্তালাপের মধ্যে অন্যান্য নাটকের বার্ত্তালাপের মত কোনো বিশেষত্বই নাই—উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই, ভাবোচ্ছল শব্দতরঙ্গ নাই, অথচ অতি সাধারণ বার্ত্তালাপের মধ্য দিয়া মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার অদ্ভুত শিল্প-কৌশলের প্রভাবে এমন একটি অকথিত, অনুচ্চারিত, নিগূঢ় বার্ত্তালাপকে আমাদের অন্তর-গোচর করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।†

† This second unspoken dialogue, which as a matter of fact for our poet is the real one is made possible by various expedients by pauses, gestures and by other indirect means of this nature, most of all, however, by the spoken word itself, and by

বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, এই বার্ত্তালাপের উদ্দেশ্য হইতেছে অসহায় মানবাত্মার বিপুল অন্ধকারাচ্ছন্ন একাকিত্ব ও ভীতিকে, তাহার চতুর্দ্দিকের নিদারুণ নীরবতাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা। বার্ত্তালাপের এই যে অসমাপ্তি ও হঠাৎ থামিয়া যাওয়া, এই যে প্রতি পদে পুনরুক্তি, এইসব অতি আশ্চর্য্যভাবে চারিদিকের একটা অজ্ঞাত বিভীষিকার অস্তিত্বকেই জানাইয়া দেয় না কি? নীরবতা, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বকে সুতীব্র করিয়া তুলিবার অত্যাশ্চর্য্য শিল্পশক্তি মেটারলিঙ্কের নাটকে যে সর্ব্বত্রই সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়; কিন্তু যেখানে তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, সেখানে আবার তাহার তুলনা আছে বলিয়া ত মনে হয় না। নাট্যরীতির ইতিহাসে এই নব বার্ত্তালাপ-রীতির উদ্ভাবক হিসাবে মেটারলিঙ্ক এবং ইব্‌সেনের নাম নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নাটকের নীরবতা

নীরবতাকেও যে নাটকের ভাবকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনো নাট্যকার তেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। "অনাহূতে"র মধ্যে জ্যোৎস্নাস্তব্ধ রাজপথ, দীপনির্ব্বাণ, নাইটিঙ্গেলের গাহিতে গাহিতে চুপ করিয়া যাওয়া, ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়া, তারপর অন্ধকার ঘরে একটি শিশুর আকস্মিক আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া একটি অসহ্য নিঃশব্দতাকে মেটারলিঙ্ক্ কেমন করিয়া মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা পাঠক মাত্রেরই চিরকাল মনে থাকিবে। "দৃষ্টিহারায়" অন্ধকারের স্তব্ধতার মধ্যে শিশুর চীৎকারে, "তিন্তাজিলের মৃত্যু"তে রুদ্ধ কবাটের পরপার্শ্বে তিন্তাজিলের চীৎকারে "পীলিয়াস্-মেলিস্যাণ্ডায়" বালক ও ভৃত্যদের নীরব দৃশ্যে, "এ গ্লাভেন সেলীসেটের" অনেক স্থানেই মেটারলিঙ্ক্ নীরবতাকে একেবারে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার এবং সেই নীরবতার মধ্যে নাটকের ভাবটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।

নীরবতা ও পরিচয়

এই নীরবতা যে শুধু বিভীষিকাকেই প্রকাশ করিবার জন্য মেটারলিঙ্কীয় নাটকে স্থান পাইয়াছে তাহা নয়। "দীনের সম্পদে" মেটারলিঙ্ক্ নীরবতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্রেম আসিয়া মেটারলিঙ্কের অন্তর্জ্জীবনকে যেদিন এক সঙ্গীত-সুষমায় ভরিয়া তুলিল সেইদিন হইতেই নীরবতাও প্রেম-লোকের স্বর্ণদ্বারের চাবি হইয়া উঠিল। গভীরতম জীবনের পরিচয় পাইতে হইলে, একটি অন্তরের সহিত আর-একটি অন্তরের পরিচয় ঘটাইতে হইলে নীরবতার মন্দিরেই যাইতে হইবে। এ কথাটি মেটারলিঙ্ক্ সেই দিনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যেদিন প্রেম-লোকের অশ্রু-আনন্দময় পরিচয়-বার্ত্তা তিনি পাইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রির সুনিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে তারার আলোর ঝিকিমিকির মধ্য দিয়া জীবন-মরণ ও ভালবাসার যে নিবিড় গোপন রহস্য-কথা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, "এ গ্লাভেন্ সেলীসেটে"র নীরবতার মধ্যে সেই রহস্য-কথাটিকে কেমন আশ্চর্য্য ভাবে মেটারলিঙ্ক্ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

তাই "পীলিয়াস-মেলিস্যাণ্ডায়", "এ গ্লাভেন সেলীসেটে", "জয়-জেলে" আমরা যে-নীরবতার আবহাওয়া অনুভব করি তাহা ভীতিস্তব্ধতার নামান্তর মাত্র নয়। এই নাটকগুলির মধ্যে নীরবতার মুহূর্ত্তগুলি, অন্তরাত্মার পরম পরিচয়ের অশ্রু-উদ্ভাসিত মুহূর্ত্ত। পীলিয়াস্-মেলিস্যাণ্ডার আনন্দ-বেদনাবিধুর অশ্রুময় নীরবতা ও দৃষ্টিহারার নীরবতার যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ তাহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।

মেটারলিঙ্কীয় নাটকের প্রথমযুগে বার্ত্তালাপের মধ্যে নীরবতার স্থান অনেকখানি বলিয়াই এপ্রবন্ধে এত কথা বলিতে হইল। বার্ত্তালাপ-রীতির আর-একটি বিশেষত্বের

---

a dialogue which in the whole course of dramatic development hitherto has been employed for the first time by Maeterlinck and beside him by Ibsen. It is a dialogue marked by an unheard-of triviality and banality of the flattest everyday speech, which, however, in the midst of this second inner dialogue, is invested with an undefined magic."

Schlaf's Maeterlinck, p. 31.
Quoted in J. Bithel's Life and Writings of Maeterlinck, p. 35.

কথা এখানে বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বে নাটকীয় দৃশ্য-পরিকল্পনায় এই বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি ; আমি মেটারলিঙ্কের সিম্বলিজমের কথা বলিতেছি।

বার্ত্তালাপে সিম্বলিজম্

যাঁহারা কেবল মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা' 'পীলিয়াস্-মেলিস্যাণ্ডা' এবং 'এ গ্লাভেন সেলীসেটে'র বার্ত্তালাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন তাঁহারই বার্ত্তালাপে সিম্বলিজম্ (গূঢ় ব্যঞ্জনা) কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বুঝিতে পারিবেন এবং সেইসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিবেন যে, মেটারলিঙ্কীয় এই 'সিম্বলিক' বার্ত্তালাপ নাট্যরীতির ইতিহাসে একটা অভিনব আবিষ্কার। বাহিরের দিক্ দিয়া যে-বার্ত্তালাপ অতি সাধারণ, তাহারই মধ্য দিয়া একটি অব্যক্ত ভাবকে ফুটাইয়া তোলা। সাধারণ কয়েকটি শব্দ-সমষ্টিকে অপূর্ব্ব দ্যোতনা-শক্তির দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তোলার এই পদ্ধতিটি যে কি আশ্চর্য্য তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝান অসম্ভব। কোনো শব্দকে শব্দের অতীত অর্থে ভরিয়া তুলিবার ব্যাপারটি মূলতঃ কি তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয়। তবে মেটারলিঙ্কীয় নাটকে সাধারণ বার্ত্তালাপের মধ্যে অব্যক্ত ভাবটিকে প্রকাশ করিবার কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, ঘটনা-সমাবেশ, বার্ত্তালাপের অসমাপ্তি, পুনরুক্তি ও নীরবতার মধ্য দিয়াই অতি সাধারণ কথাগুলিও আব্‌হাওয়ার বিচিত্র অদৃশ্যভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। বার্ত্তালাপের সিম্বলিজম্‌টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিতার ছন্দ ও তাহার বিচিত্র প্রভাবটি যেমন বিশ্লেষণ করিয়া বোঝার কোনো উপায় নাই, তেম্‌নি নাটকের যাহা ছন্দ তাহার প্রভাবটিকেও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সিম্বলিজম্ একটা ছন্দ, এই ছন্দ প্রাণের মতই বিশ্লেষণের অতীত এবং অনুভবের করায়ত্ত বস্তু। প্রাণের সত্য অনুভূতি জীবনের গভীরতর স্তর হইতে আপনিই যে-রূপটিকে লইয়া বাহির হইয়া আসে তাহা একটা সজীব বস্তু; উহার দেহটাকে মাত্র বিশ্লেষণ করিলে, প্রাণের অপরূপ রহস্যময় সত্তাটি বাদ পড়িয়া যাইবেই এবং প্রাণের বিচিত্র স্পন্দন ও অনুভূতি কিছুতেই শুদ্ধ মাত্র দেহ-বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যাইবে না। তাই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া দুটি দৃষ্টান্ত দিয়া মেটারলিঙ্কীয় বার্ত্তালাপের সিম্বলিজম্ কোথায় দেখাইবার চেষ্টা করিব।

পীলিয়াস্-মেলিস্যাণ্ডার প্রথম দৃশ্য হইতেই মেটারলিঙ্ক কি ভাবে সিম্বলিজম্‌এর প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছেন দেখা যাক্। পীলিয়াস ও গোলোড্‌এর বাড়ী একটা অতি প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাকার। তাহার চারিদিকে নিবিড়গহন বনানী। বহুকাল হইয়া গেছে দুর্গদ্বার একটিবারও খোলা হয় নাই। রুদ্ধ দুর্গদ্বারের পশ্চাতে দ্বাররক্ষীর সঙ্গে ভৃত্যদের বার্ত্তালাপ চলিতেছে।

দাসীর দল

খোলো দ্বার! দুয়ার খোলো!

দ্বারপাল

কে? তোরা আমায় কেন জাগাচ্ছিস্ বাপু? যা না, **ছোটো দরজা** দিয়ে বেরিয়ে যা, ছোটো দরজা দিয়ে! **ছোটো দরজা ত অনেক রয়েচে**......

জনৈক দাসী

আমরা দোরের পাথর, দোর, দোরের সিঁড়ি—এসব ধুতে এসেচি; খোলো, খুলে দাও!

অপর দাসী

আজকে একটা **মস্ত ব্যাপার** হবে!

* * *

ভৃত্যবর্গ

খোলো! খোলো!

দ্বারপাল

রাখো, রাখো, বাপু! **খুল্‌তে পারব কি না কে জানে!......এদোর কখনও খোলা হয় না......** দিন হোক্ অপেক্ষা কর।

প্রথম দাসী

বাইরে বেশ আলো হয়েচে; আমি ফাঁক দিয়ে সূর্য্য দেখ্‌তে পাচ্চি......

দ্বারপাল

বড় চাবিগুলো ত এই……ইস্ তালা-হুড়-কো কি ভয়ানক শব্দ করচে……আমায় সাহায্য কর, সাহায্য কর।

সব দাসী

আমরা টান্‌চি, আমরা টান্‌চি।

দ্বিতীয় দাসী

নাঃ, **খুলবে না**……

প্রথম দাসী

এই যে খুলচে, ধীরে ধীরে খুলচে!

দ্বারপাল

ইস্ কি শব্দ কর্‌চে! **সারা বাড়ীর লোককে জাগিয়ে তুলবে**!……

উন্মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আসিয়া

দ্বিতীয় ভৃত্য

বাইরে কি আলো এসে পড়েচে এখনই!

প্রথম দাসী

সমুদ্রের ওপর সূর্য্য উঠচে!

* * *

অপর দাসীরা

জল আনো, জল আনো!

দ্বারপাল!

হাঁ৷ হাঁ৷, জল ঢাল্, জল ঢাল্, বন্যার সব জল এনে ঢাল্, **তোরা এ কিছুতেই পরিষ্কার কর্‌তে পার্‌বি না**!

পাঠক লক্ষ্য করিলেই চিহ্নিত অংশগুলির মধ্যে সাধারণ অর্থটি বাদ দিয়াও আর-একটি গোপন অর্থের দিকে যে-বার্ত্তালাপ কেবলই ইঙ্গিত করিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভৃত্যদেরও অজ্ঞাতে তাহাদের গোপন অন্তরের সত্য বার্ত্তালাপটি যেন তাহাদের সাধারণ কথা-বার্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই উঠিয়াছে। ফলে সমস্ত দৃশ্যটাই একটা 'সিম্বল্' বা প্রতীকের মত হইয়া পড়িয়াছে। পীলিয়াস্ ও গোলোডের অন্তর্জ্জগতের 'রুদ্ধ দুয়ার' আজ উন্মুক্ত হইতেছে, এ দুয়ার দিয়া আজ নিয়তি একটি বিপুল ঘটনার বেশে আসিবে বলিয়া আজ আর ছোট দুয়ারে কাজ চলিবে না; তাই চিররুদ্ধ বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। এ দুয়ার দিয়া আজ তাহাদের নিয়তি, তাহাদের প্রেম আসিতেছে। বহির্জ্জগতের সূর্য্যালোক আজ অন্ধকার জীবনের দুর্গপ্রাকারে প্রবেশ করিতেছে,—এই বার্ত্তাটি সাধারণ কথাবার্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া অতি সুন্দরভাবে এখানে প্রকাশ পায় নাই কি! এবার আমরা এই নাটকেরই আর-একটি দৃশ্যের (অঙ্ক ১ দৃশ্য ৪) সম্মুখে পাঠককে লইয়া যাইতে চাই।

মেলিস্যাণ্ডাকে লইয়া গোলোড্ তাহার দুর্গপ্রাকারে আসিয়াছে। দুর্গের সম্মুখে মেলিস্যাণ্ডা, গোলোডের মাতা জেনেভিয়েভ্‌এর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে শোনা যাক্—

মেলিস্যাণ্ডা

বাগানগুলো কি অন্ধকার! কি বিশাল অরণ্য! প্রাসাদকে ঘিরে কি **বৃহৎ বনানী** রয়েচে!

জেনেভিয়েভ্

হাঁ৷, আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। এ প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। এখানে এমন স্থান রয়েচে যা **কখনও সূর্য্যালোক দেখ্‌তে পায় না**। কিন্তু শিগ্‌গীরই এটা সয়ে যায়।…… কত কাল হ'য়ে গেছে……কত কাল!…… প্রায় চল্লিশ বছর হ'য়ে গেছে, এখানে এসেচি!……এই দিক্‌টায় চেয়ে দেখ, সমুদ্রের আলো দেখ্‌তে পাবে।……

মেলিস্যাণ্ডা

নীচে আমি যেন কিসের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি……

জেনেভিয়েভ্

হাঁ৷, কে যেন আমাদের দিকেই আস্‌চে……ও এ যে পীলিয়াস্……মনে হচ্চে **ও তোমার জন্য এতক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে**…

মেলিস্যাণ্ডা

এখনও সে আমাদের দেখেনি।

জেনেভিয়েভ্

আমার বোধ হচ্চে **ও দেখ্‌তে পেয়েচে, কিন্তু কি যে কর্‌তে হবে তা ঠিক জানে না**…পীলিয়াস্, পীলিয়াস্, তুই না?

পীলিয়াস্

হ্যাঁ…**আমি সমুদ্রের দিকে আস্‌ছিলাম**…

জেনেভিয়েভ্

আমরা ও তাই ; আমরা আলো খুঁজ্‌ছিলাম ; এইখানটা আর আর জায়গার চাইতে আলো, কিন্তু সমুদ্রটা তবু কালো দেখাচ্চে……!

পীলিয়াস্

আজ রা'তে ঝড় হ'বে। কিছুদিন থেকে রোজই রাতে ঝড় হচ্চে, কিন্তু এখন কি শান্ত !…**না জেনে এখন কেউ যাত্রা কর্‌লে আর না'ও ফির্‌তে পারে।**

মেলিস্যাণ্ডা

কি যেন বন্দর ছেড়ে চলেচে……

পীলিয়াস্

নিশ্চয়ই খুব বড় জাহাজ হবে…এর আলোটা খুব উঁচুতে আমরা এখনই ওই আলোর মাঝে একে যেতে দেখ্‌ব……

জেনেভিয়েভ্

দেখ্‌তে পাব ব'লে ত আমার মনে হচ্চে না…… সমুদ্রে এখনও কুয়াসা রয়েচে।

পীলিয়াস্

বোধ হচ্চে কুয়াসাটা ধীরে ধীরে স'রে যাচ্চে……

* * *

পীলিয়াস্

এটা বিদেশী জাহাজ আমাদের সব জাহাজের চাইতে বড় বোধ হচ্চে।

মেলিস্যাণ্ডা

এই জাহাজেই আমি এখানে এসেচি…

পীলিয়াস্

জাহাজ ভরা-পালে চলেচে……

মেলিস্যাণ্ডা

এই জাহাজেই আমি এখানে এসেচি…এর পালগুলো খুব বড়…পাল দেখেই আমি একে চিন্‌তে পার্‌চি…

পীলিয়াস্ মেলিস্যাণ্ডার অন্তর্জ্জগতের পরিব্যাপ্ত নিয়তির অন্ধকার, রহস্য-সমুদ্রে অস্ফুট অস্পষ্ট আলোকে জাহাজের পাল তুলিয়া ঝড়ের মুখে যাত্রা, আলোকের সন্ধান এই বার্ত্তালাপটুকুর মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বোধ করি দেখাইয়া দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। সাধারণ বার্ত্তালাপের অন্তরালে এই যে গোপন-অনুচ্চারিত বার্ত্তালাপ বোধ করি উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই আমরা এখানে নিবৃত্ত হইতে চাই! সেলীসেটের বাড়ীতে এগ্লাভেন্ আসিয়াছে; সেলীসেটের অন্তর্জ্জগতে আজ নিয়তির আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগ্লাভেন্ সেলীসেটের সহিত পরিচিত হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের মধ্যে যে-বার্ত্তালাপ ঘটিয়াছিল তাহারই একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

এগ্লাভেন্

মেজেয় এটা কি পড়েচে! (একটা চাবি উঠাইয়া) ইঃ কি অদ্ভুত এই চাবিটা!……

সেলীসেট

এটা আমার মিনারের চাবি…এ চাবি যে কি উন্মুক্ত করে তা তুমি জান না!

এগ্লাভেন্

এটা ভারী, আর কেমন অদ্ভুত…আমিও একটা **সোনার চাবি** এনেচি ; তোমায় দেখাব'খন…চাবি যে কি খুলে দেখাবে তা না জানা পর্য্যন্ত চাবি একটা সব-চেয়ে সুন্দর বস্তু!…

সেলীসেট্

কালই তুমি জান্‌তে পার্‌বে···আসার বেলা দুর্গ-প্রাকারের ওই দিক্ থেকে তুমি একটা ভাঙ্গা-চোরা পুরানো মিনার দেখ্‌তে পাওনি ?

এগ্লাভেন্

হ্যাঁ, **আকাশের মাঝখানটায় কি একটা যেন ভেঙ্গে পড়্‌চে** দেখেছিলাম, তার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তারাগুলো জ্বল্‌ছিল।

সেলীসেট্

হ্যাঁ, সেইটেই ; ওই আমার মিনার—**পুরানো, পরিত্যক্ত একটা আলোক-স্তম্ভ**। উপরে যেতে কেউ সাহস পায় না। লম্বা একটা বারান্দা দিয়ে সেখানটায় যেতে হয়—তার চাবিটা আমি পাই···কিন্তু আবার সেটা হারিয়ে ফেলি। এখন আর একটা চাবি আমি তৈরী করিয়েছি—শুধু আমিই সেখানে যাই কি না। ইসালীনকেও কখনও কখনও নিয়ে যাই। মিলীয়াণ্ডার শুধু একবার সেখানে গিয়েছিল; তার মাথা ঘুরে উঠেছিল। তুমি দেখো, মিনারটা খুব উঁচু। সমুদ্র তার সাম্‌নে ছড়িয়ে রয়েচে; দুর্গের দিক্‌টা বাদে মিনারের চার-দিকে সমুদ্র ফেনিলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়্‌ছে। **সমুদ্র পক্ষী-গুলো সব এর ফাঁকে ফাঁকে বাসা করেছে,** আমায় দেখে চিন্‌তে পারলেই তারা সব উচ্চস্বরে চীৎকার কর্‌তে থাকে। **শত শত কপোতও সেখানে থাকে। লোকেরা ওদের তাড়াবার চেষ্টা কর্‌চে কিন্তু ওরা মিনারটা ছাড়্‌তে চায় না।** আবার ফিরে আসে।

উদ্ধৃত অংশের লক্ষ্য একটি পারিপার্শ্বিকের বোধ জাগ্রত করিয়া দেওয়া। কিন্তু এই মিনার এবং সমুদ্র, চাবি এবং সেলীসেটের তাহা পাওয়া, বাহ্যতঃ যতটা সত্য হোক্ না হোক্, অন্তরের দিক্ দিয়া ইহারা এত সত্য যে, ইহাদের বাদ দিলে নাটকের অর্থই আমাদের অগোচর থাকিয়া যাইবে। মিনার "বহুকালের প্রাচীন পরিত্যক্ত আলোক-স্তম্ভ"—সেলীসেটের নিকট নিয়তি (Destiny)র সিম্বল্ হিসাবেই বেশী সত্য। সেলীসেট্ যে নিয়তির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, সে যে তাহার অন্তরের নিভৃত রহস্য-সমুদ্রের তীরে নিয়তির সম্মুখীন হইয়াছে এই কথাটিই কি এখানে মেটারলিঙ্ক্ জানাইতেছেন না; বর্ত্তমান যুগের মানব নিয়তির প্রাচীন ধারণার মধ্যে জীবনের অর্থ (আলোক) পাইতেছেন না, কিন্তু এই নিয়তিই যে গ্রীক যুগে—মেটারলিঙ্কেরও জীবনের সর্ব্বপ্রথম—আলোকস্তম্ভের কাজ করিয়াছিল। তাহাই 'পুরানো' 'পরিত্যক্ত' মিনারের বর্ণনায় ইঙ্গিতে জানান হয় নাই কি ?

বার্ত্তালাপ-রীতির উদ্দেশ্যগত ক্রমবিকাশ

'দীনের সম্পদে'র পর হইতে নীরবতা যে বিভীষিকার বেশ ছাড়িয়া অন্তরাত্মার আনন্দ-বেদনাময় পরিচয়ের অশ্রু-মাখা রূপ ধারণ করিয়াছে, এই কথাটি পীলিয়াস্ মেলি-স্যাণ্ডায়ও ততটা ফুটিয়া উঠে নাই, যতটা এগ্লাভেন্ সেলীসেটে ফুটিয়াছে। একই সিম্বলের এই যে অর্থান্তর গ্রহণ ইহার মূলে জীবনের একটা পরিবর্ত্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। মেটারলিঙ্কেরই দেশবাসী কবি ভেরহারেনের লেখায় আমরা তাহার সিম্বল্‌গুলির—যেমন ক্রস্ এর—অর্থান্তর গ্রহণ দেখিতে পাই। প্রেমজীবনের মধ্যে যে মানবাত্মার পরিচয়ের একটি অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ-বেদনাময় ব্যাপার রহিয়াছে মেটারলিঙ্কীয় নাটকে রহস্য-ভীতির অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গে তাহা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং সেইজন্য মেটারলিঙ্ক্ বার্ত্তালাপের মধ্যে রহস্যকে সিম্বলিজমের দ্বারা প্রকাশ করিবার প্রয়াস ছাড়িয়া বিশেষভাবে পুনরুক্তির অবতারণা করিয়া অন্তর্জ্জীবনের বেদনাটিকে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুনরুক্তি শুধু বার্ত্তালাপেই যে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হয় নাই, দৃশ্য পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াও যে ইহা আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা, ম্যাকেল এগ্লাভেন্ সেলীসেটের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এবং রিচার্ড হোভে 'প্রিন্সেস্ ম্যালানে'র ভূমিকায় অতি সুন্দর করিয়াই বলিয়াছেন। এগ্লাভেন্ সেলীসেটে মেটারলিঙ্কের শিল্প-কৌশল এই দিক্ দিয়া যে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা শ্রীযুত বিথেলও স্বীকার করিয়াছেন।

এই বইখানির বার্ত্তালাপে আমরা মেটারলিঙ্কীয় অন্তর্জ্জীবনের পরিবর্ত্তিত অবস্থার স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই। ইহার কথাবার্ত্তার সর্ব্বত্র

আনন্দ-প্রেম ও ভালবাসার সৌন্দর্য্যটি যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; "দীনের সম্পদে"র সঙ্গীত যেন এই নাটকের কথায় ও ছন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, প্রথমকার নাট্যচ্ছন্দের মধ্যে যেমন ভীতি ও বিষাদ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছিল,তেমনি এগ্‌লাভেন হইতে মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকে বিশ্বাস, আনন্দ ও শক্তির বোধই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই।

বার্ত্তালাপ বস্তুটার আলোচনা এমনই ভাবে করা হইয়াছে যেন উহাকে নাটকের চরিত্র এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপার যে, তাহা নয় ইহা আর বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। নাটক একটি অখণ্ড সৃষ্টি, তাহার দৃশ্য, ঘটনা, বার্ত্তালাপ,ভঙ্গী ও চরিত্র সমাবেশ সবই একেবারে অখণ্ড প্রাণসূত্রে বাঁধা। তবে প্রথম যুগের নাটকগুলি আব্‌হাওয়া সৃষ্টিকেই মুখ্য করিয়া সার্থক হইয়াছে বলিয়া উহার বার্ত্তালাপ ও চরিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া নাটকীয় আব্‌হাওয়ার সহিতই বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং এইজন্যই তাহাতে সিম্বলিজমের ও প্রাধান্য ঘটিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী নাটক ভাবজীবনের পরিণতিরই ফলে রহস্যের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিজীবন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেইজন্য বার্ত্তালাপকে বাধ্য হইয়া নাটকীয়-চরিত্র বিকাশের সহায়ক হইতে হইয়াছে। ফলকথা, নাটকে বার্ত্তালাপ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক * ও ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে।

* মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, নাট্যকার মনস্তত্ত্বের কোনো বিশ্লেষণকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। যে-সব রচনায় ঘটনার উপর জোর না দিয়া, অন্তরের নানা অনুভব, চিন্তা ও সঙ্কল্পের পরস্পরকে ঘাতপ্রতিঘাত এবং সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলিই মুখ্য করিয়া তোলা হয় তাহাকেই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক বলিতে চাহিয়াছি।

মেটারলিঙ্কীয় নাটকে বাস্তবতার আবির্ভাব

প্রথমকার নাটকে বার্ত্তালাপ ছিল সঙ্গীতের মত—lyric—একটি মাত্র অনুভূতি বা ভাবের প্রবলতায় পরিপূর্ণ; একটি মাত্র সুরে ও বর্ণে তাহা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী নাটকের বার্ত্তালাপ নাটকেরই মত (dramatic) জীবনের বিচিত্রতাময়, নানা ভাব ও অনুভূতির ঘাতপ্রতিঘাতময়। নাটকীয় ঘটনাসমাবেশেও এই জটিলতার আবির্ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম যুগের লক্ষ্য কোনো একটি ভাবকেই স্থায়ী করিয়া তোলা, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের লক্ষ্য মানব-মনকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করা, তাহাকে তাহার নানা অনুভূতি, চিন্তা ও সঙ্কল্পের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা। বার্ত্তালাপের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা মেটার্‌লিঙ্কের জীবনের এই সত্যকেই পাই যে, তিনি যৌবনে একটা ভাবের দ্বারা অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন (obsessed) হইয়াছিলেন। কিছুতেই এই অবরুদ্ধতা যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না এবং জীবনকে তাই কিছুতেই বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখিতে পারিতেছিলেন না। যেখানে তাঁহার জীবন বদ্ধ হইয়াছিল সেইখানেই জীবনকে ক্ষীণ ও খর্ব্ব করিয়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু জীবনের এই অবরুদ্ধতা হইতে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও আনন্দের মধ্যে জীবনের শক্তি ও বিশ্বাস স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল, স্বপ্নভঙ্গে কারাবদ্ধ নির্ঝর বিশাল বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রয়াণ করিল। ইহারই ফলে তাঁহার কল্পনা অতীতের স্বপ্নময় ক্ষেত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া বাস্তবলোকের দিকে, যে জগৎ আলোকের মধ্য প্রকাশিত তাহার দিকে চাহিতে সক্ষম হইলেন।
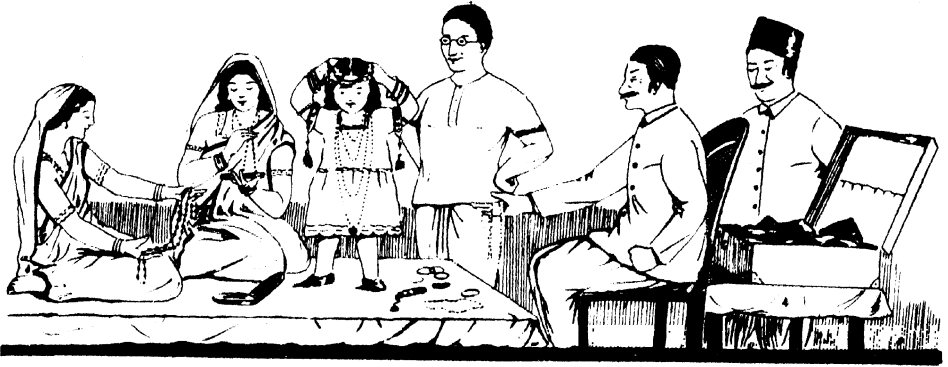
মিনা ও মিনকারি

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস-সি (লণ্ডন)

ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে "Painting the lily" অর্থাৎ পদ্মের উপর রঙ মাখান। স্বভাবতই যে-পদার্থ সুন্দর তাহার সৌন্দর্য্য কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধন করা অসম্ভব, ঐ প্রবাদে এইরূপ বুঝায়। কিন্তু আমরা অনেক স্থলেই এই মতের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। অনেক লোকের মতে, অন্ততঃপক্ষে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মতে বসন ভূষণ অলঙ্কার দ্বারা নরজাতীয় জীব মাত্রেরই সৌন্দর্য্য অল্প-বিস্তর বৃদ্ধি হয়। এখানে প্রশ্ন এই যে, যিনি সুন্দর তাঁহার গহনা-পত্রের কি প্রয়োজন এবং যিনি অ-সুন্দর (কুৎসিৎ কথাটা ভদ্রভাষায় চলে না) তাঁহার পক্ষে বেশভূষা ও সজ্জা দ্বারা সুন্দর হইবার চেষ্টা বৃথা কি না ?

তারযুক্ত "খুড়ি" দ্বারা মিনা চূর্ণ করা
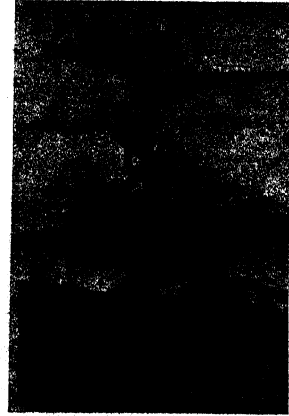
ধাতুদ্রব্য মিনা প্রয়োগের জন্ত পরিষ্কার করা

প্রশ্নের উত্তর দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌ মহাশয়েরা দিবেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এতদূর বলা সম্ভব যে, বেশ-ভূষা ও অলঙ্কার সুরুচিযুক্ত এবং "মানানসই" হইলে, যে চলনসই সেও অতি সচল হয়, সুন্দরীর ত কথাই নাই। তবে সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

গহনার ক্ষেত্রেও আবার ঐ কথাই আসে। স্বর্ণের যথেষ্ট স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে। যদি কেবল মাত্র দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই স্বর্ণের আদর হইত, তাহা হইলে ইরিডিয়ম, প্যালাডিয়ম, প্ল্যাটিনম ইত্যাদি আরও দুষ্প্রাপ্য ধাতুর অধিকতর গহনা হিসাবে চলন থাকিত। রৌপ্য সৌন্দর্য্যে স্বর্ণের পরেই স্থান পায়। কাজেই সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের জন্য এই দুই ধাতুর নির্ম্মিত অলঙ্কারই পৃথিবীময় ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আবার সেই পদ্মের উপর রঙ মাখানর কথা আসে। নহিলে স্বভাব কুলীন, রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ
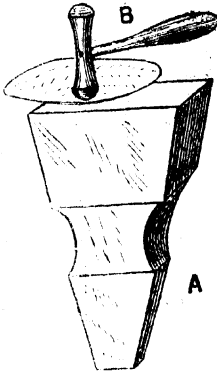
তামার চাদর সমান করিবার শাল ও হাতুড়ি

এমন যে স্বর্ণ, যাহার রূপে ত্রিভুবন মুগ্ধ, যাহার প্রভাব রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতির ক্ষেত্র হইতে "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ" ও "গোল্ড সারসাপারিলা" পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে বিস্তৃত, তাহাকে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে মণিমুক্তা ইত্যাদি অন্য পদার্থের সাহায্য লইতে হয় কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, মানুষ চাহে যাহা অভিনব, যাহা বিচিত্র, যাহা দুর্লভ। সুতরাং যে-গহনা কেবলমাত্র সুন্দর বলিয়াই ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও মানুষ আকারে, কারুকার্য্যে ও বর্ণে নিত্য নূতনত্ব খোঁজে। এই কারণেই অলঙ্কার ও মূল্যবান তৈজস-পত্রে স্বর্ণরৌপ্যের সহিত মণিমাণিক্য এবং মিনার প্রয়োগ প্রচলিত হয়।

মণিমাণিক্য ইত্যাদি স্বভাবতঃই সুন্দর এবং উহার মধ্যে যে-গুলি সুন্দর এবং দুষ্প্রাপ্য সেগুলি অতি মূল্যবান, এবং ঐসকল রত্ন স্বর্ণ-রৌপ্যের সহিত যুক্ত হউক বা না হউক তাহাতে উহাদের মূল্যের বিশেষ তারতম্য হয় না।

মিনা বা এনামেল্ (enamel) কিন্তু ঐরূপ পদার্থ নহে। উহা স্বর্ণ রৌপ্য বা অন্য ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে পরে মূল্যবান হয়। স্বভাবে এবং ধাতু হইতে পৃথক্ অবস্থায় উহার মূল্য অতি সামান্য।

মিনা প্রয়োগের কাঁটা

মিনা বা মিনকারি—যাহাকে ইংরেজীতে (enamel) এনামেল বলে—কাজ অনেকেই দেখিয়াছেন। কোন কোন সোনা বা রূপার গহনার উপর যে নানা বর্ণের উজ্জ্বল ও মসৃণ প্রলেপ দেখা যায় তাহাই মিনার কাজ। এই প্রলেপ সোনা বা রূপার বস্তুর গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। গহনার উপর চিত্রাঙ্কণ করিতে হইলে বা নানা বর্ণের কারুকার্য্য করিতে হইলে মিনা বা নানা বর্ণের মণি-মাণিক্যের ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আবার মণি-মাণিক্যও সকল বর্ণের পাওয়া যায় না। সুতরাং গহনার উপর সকল প্রকার বর্ণ-বিন্যাসের একমাত্র উপায় মিনা।

মিনকারের কর্ণিক

এই মিনা পদার্থটি কি? এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় এই বলিয়া দেওয়া যায় যে, মিনা কাচ-বিশেষ। বস্তুতঃই মিনা বা মিনকারি শিল্প কাচশিল্পেরই অঙ্গবিশেষ এবং উহার উৎপত্তিও কাচশিল্প হইতেই হইয়াছে।

কাচ বলিতে যে কয় প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বা পদার্থসমষ্টি বুঝায়, সে-সকল নিম্নলিখিত কয়টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ম। এক শ্রেণীর একটি বা দুইটি ধাতুক্ষারের সহিত বালুসারের (Silica) রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন পদার্থ যথা:—জলকাচ (Water glass, potassium and

sodium silicate)। ২য়। বিভিন্ন শ্রেণীর একাধিক ধাতু-ভস্ম বা ক্ষারের সহিত বালুসার বা সোহাগার রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন কাচ। যথা:—সোডা, চূণ ও এলুমিনার সহিত বালুসারের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বোতলের কাচ।

৩য়। বর্ণযুক্ত স্বচ্ছ কাচ। সোডা চূণ ও কয়েকটি বিশেষ ধাতু (ক্রোম, কোবল্ট তাম্র) ইত্যাদি। ক্ষারের সহিত বালুসার, বা বালুসার এবং সোহাগার সংযোগে উৎপন্ন পদার্থ।

৪র্থ। অস্বচ্ছ কাচ। সোডা ও চূণের সহিত অস্থি-ভস্ম বা টিন ভস্ম, (tin oxide বঙ্গভস্ম) বা অন্য কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এবং ঐ মিশ্রের সহিত বালুসারের সংযোগে উৎপন্ন কাচ।

৫ম। বর্ণযুক্ত অস্বচ্ছ বা স্বল্প স্বচ্ছ কাচ। সোডা চূণ (কখন কখন সীসকভস্মও ইহাতে মিশ্রিত হয়) ও বালুসারের সহিত অস্থিভস্ম টিনক্ষার বা অন্য কয়েক প্রকার পদার্থ এবং বিভিন্ন বর্ণকারক ধাতুক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন কাচ।

মিনা বলিতে প্রধানতঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পদার্থ বুঝায়।

লৌহ, তাম্র, কাংস্য, পিতল, স্বর্ণ বা রৌপ্যের উপর ঐপ্রকার কাচ জাতীয় পদার্থের দৃঢ়সংযুক্ত প্রলেপ দেওয়াকেই এনামেল্ করা বা মিনার কাজ করা বলে। লৌহ ইত্যাদি হীনধাতুতে এনামেল্ করার বিষয় বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতুর উপর এনামেল বা মিনা করার বিষয় বর্ণিত হইল।

অলঙ্কারাদির উপর যে মিনার কার্য্য করা হয় তাহার প্রধান উপাদান মিনারূপ কাচ বিশেষ। কাচ যেরূপ বিভিন্ন রূপ প্রকৃতি ও বর্ণের হইয়া থাকে সেইরূপ বিভিন্ন বর্ণ, প্রকৃতি ও রূপের মিনাও পাওয়া যায়। লৌহাদির উপর যে মিনা ব্যবহৃত হয় তাহাতেও গহনাতে ব্যবহার্য্য মিনাতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই, কেবলমাত্র শেষোক্ত পদার্থ অতি সযত্নে ও অতি বিশুদ্ধ উপকরণ হইতে প্রস্তুত হয়।

মিনাশিল্পী সাধারণতঃ তাহার প্রয়োজন মত মিনা-খণ্ড বাজার হইতে তৈয়ারী অবস্থায় ক্রয় করে। তাহা কি প্রকারে কি উপাদান হইতে প্রস্তুত সে-সম্বন্ধে শিল্পী কিছু জানে না, শুধু প্রস্তুতকারীর নাম, যশ ও খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে কাজ চালাইতে হয়। এবং ইহার কোনও উপায়ও নাই, কেননা, তাহার পক্ষে মূল উপাদান হইতে নানা প্রকার মিনা প্রস্তুতকরণ অসম্ভব. যেহেতু প্রস্তুত করার উপযুক্ত জ্ঞান, সময় ও অর্থ কোনটাই সাধারণতঃ তাহার থাকে না।

মিনকারের তুলি

বিশুদ্ধ কাচ যেরূপে বিশেষ চুল্লীতে, তাপসহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে প্রস্তুত হয়, মিনাও সেই উপায়ে ও প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে *। কেবল মাত্র ইহাদের উপাদানে কিছু প্রভেদ আছে এবং গহনার জন্য যে-মিনা প্রস্তুত হয় তাহার মূল উপাদানগুলি বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করা হয়, যাহাতে অতি শুদ্ধ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহৃত না হয়।

সাধারণতঃ ধাতুর উপর মিনার প্রলেপ একবারে দেওয়া হয় না। ইহার কারণ এই, যে, মিনা প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে ধাতু-গাত্রে সংযুক্ত করা হয়। ঐরূপ উত্তাপে ধাতু-সকল যেরূপে প্রসারিত, ও পরে শীতল হইলে, যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, কোনও প্রকার মিনা সেরূপে প্রসারিত ও

* গত বৈশাখের প্রবাসীতে কাচ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সঙ্কুচিত, হইতে পারে না। এই অসমান সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ধাতু-সংলগ্ন মিনার স্তর চারিদিকে ফাটিয়া যায়। ইহাতে মিনার উজ্জ্বল ও মস্থণভাব লুপ্ত হওয়ায় বিশেষ সৌন্দর্য্যহানি হয়।

এই কারণে মিনার কাজ ধাতুর উপর পরে পরে কয়েক স্তরে করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম স্তর বা "জমি"র জন্য যে-প্রকার প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহাতে সমভাব বা মস্থণতা মোটেই থাকে না, বরঞ্চ অসমান "ঝামা" ভাব থাকে। এই "জমি"র জন্য বিশেষ প্রকার মিনা প্রযুক্ত হয়। এবং তাহার উপর অন্য প্রকার মিনার প্রলেপ স্তরে স্তরে যুক্ত হইলে পরে শিল্পীর কার্য্যসিদ্ধি হয়।

কাঁটার দ্বারা মিনা প্রয়োগ

কিন্তু অলঙ্কারের কার্য্যে উপযুক্ত মিনা, যথাযথভাবে ব্যবহার করিলে ইচ্ছামত একই স্তর প্রলেপে সমস্ত কার্য্য শেষ করা চলে। তাহা প্রধানতঃ এই কারণে যে, এইরূপ কার্য্যে "কোমল" মিনা (অর্থাৎ যাহা সহজে গলে) ও প্রচুর পরিমাণ গলাইবার মশলা (flux) ব্যবহার করা হয়। নীচে কয়েক প্রকার মিনার যোগ (recipe) দেওয়া গেল।

সাদা মিনা।

দুইভাগ টিন ও একভাগ সীসা পোড়াইয়া সম্পূর্ণভাবে ভস্মে পরিণত কর (অথবা রাসায়নিক অনুপাতে ঐ পরিমাণ টিন ও সীসার ভস্ম মিশ্রিত কর)। ঐ ভস্ম

মিনা প্রয়োগ প্রণালী

মিশ্রের একভাগের সহিত দুই ভাগ "স্ফটিক" কাচ (crystal glass) চূর্ণ মিশাও। পরে অতি অল্প পরিমাণ সোরা বা ম্যাঙ্গানিজ্ ডাইঅক্সাইড্ মিশাইয়া উপযুক্ত তাপসহ মৃৎপাত্রে গলাও। মিশ্র সম্পূর্ণ গলিয়া যাইলে তাহা জলে ঢালিয়া দাও। পরে তাহা শুকাইয়া পুনর্ব্বার গলাইয়া জলে ঢাল। এইরূপ তিন চারবার করিলে ঐ মিনারাশি সম্পূর্ণভাবে "দানা" ও বুদ্বুদশূন্য হইবে। ইহা গুঁড়াইয়া লইলেই কার্য্যোপযোগী হইবে।

"জমি"র মিনা।

তোয়ালের সাহায্যে জলে ঘষণ

বিশুদ্ধ বালি	৩	ভাগ
খড়ি	১	"
সোহাগার খই	৩	"
বা		
স্ফটিক চূর্ণ (Quartz meal)	৬০	ভাগ
ফটকিরি	৩০	"
লবণ	৩৫	"
সীসক-ভস্ম (minium)	১০০	"
ম্যাগ্নেসিয়া (magnesia)	৫	"
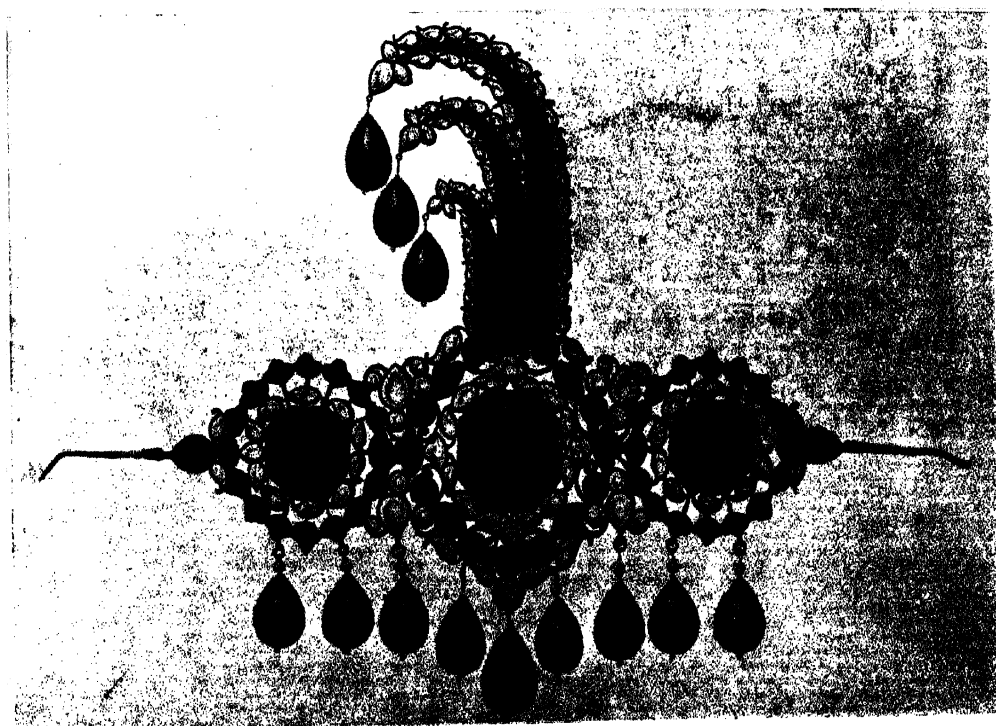
মিনার কাজ

আংশিক স্বচ্ছ রঙীন মিনার (Translucent coloured enamel) জমি।

স্ফটিক চূর্ণ	৯ ভাগ
পটাস্	৩ ”
সোডা	১৪ ”
সীসক-ভস্ম (minium)	৭ ”

এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির মিনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ পাওয়া যায়।
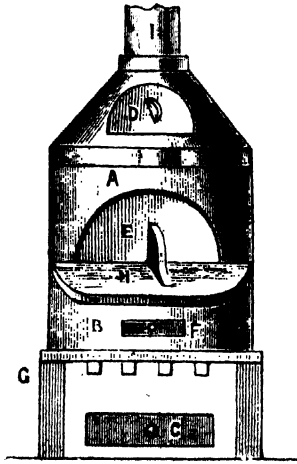
মিনা চুল্লী (কয়লার)

উপরোক্ত উদাহরণ কয়টি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সকল প্রকার মিনাই, সহজে গলান যায় এইরূপ কাচের সহিত আবশ্যক মত উপযুক্ত পরিমাণ বিভিন্ন ধাতুভস্ম ও অন্যান্য পদার্থের (যথা অস্থিভস্ম, ক্রাইয়োলাইট্ cryolite) রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই ধাতু ভস্মাদির সংযোগে ইচ্ছামত বর্ণ ও স্বচ্ছতাযুক্ত মিনা প্রস্তুত করা যায়। যথা :—

স্বচ্ছতার পরিমাণ কমাইবার জন্য বঙ্গভস্ম (Tin oxide Sn O_2) অস্থিভস্ম এবং ক্রাইয়োলাইট্ (cryolite, 3 Na F. Al F_3) ব্যবহৃত হয়।

হরিদ্রাবর্ণ যোগের জন্য। রসাঞ্জন ভস্ম, পটাশ এণ্টিমোনেট, পটাশ এণ্টিমোনাইট, সীসক এণ্টিমোনেট, রৌপ্যভস্ম, লৌহভস্ম (ferric oxide) ক্যাডমিয়ম্ সল্‌ফাইড্, য়ুরেনিয়ম্ অক্সাইড.।

লোহিত বর্ণের জন্য। ফেরিক এলুমিনেট, সোডিয়ম্ গোল্ড ক্লোরাইড, টিন গোল্ড ক্লোরাইড ও কাসিয়স পার্‌পল্।

বাসন্তী বর্ণের জন্য। হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের সংমিশ্রণ।

হরিৎ (সবুজ) বর্ণের জন্য। তাম্রভস্ম (cupric oxide) ক্রোমভস্ম অথবা লৌহভস্ম (ferrous oxide).

মিনা চুল্লী পার্শ্বচ্ছেদ
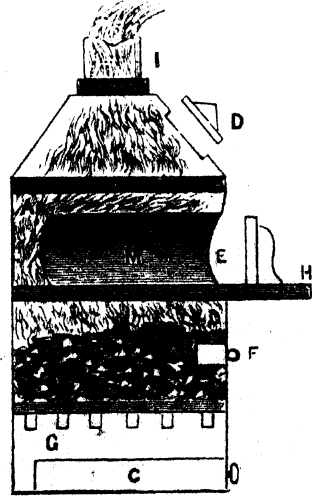
নীলবর্ণের জন্য। কোবল্ট ভস্ম, কোবল্ট সিলিকেট অথবা স্মল্ট জাফর (smalt zaffre)।

"বেগুনি" (violet) বর্ণের জন্য। ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড।

"বাদামী" (brown) বর্ণের জন্য। লৌহভস্ম (ferric oxide)।

কৃষ্ণবর্ণের জন্য। প্রচুর পরিমাণ লৌহভস্ম (ferrous oxide)

ইহা ভিন্ন যাহাতে মিনা সহজে গলে এইজন্য প্রস্তুতকরণ-সময়ে উহাতে সোহাগা, ফ্লুয়োর স্পার (fluor spar, Ca F_2) ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিনাকার স্বয়ং মিনার মূল উপাদান হইতে মিনা প্রস্তুত করে না; সে বাজার হইতে তাহা ক্রয় করিয়া লয়। সুতরাং শিল্পীর পক্ষে এই মাত্র জানা দর্‌কার যে, কোন্ কার্য্যের জন্য কি-প্রকার মিনা ব্যবহার করা উচিত এবং সেই প্রকারের মিনা কোন্ কার্‌খানায় উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হয়।

মিনা বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের ন্যায় তালের আকারে কিম্বা চূর্ণ করা অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যাহা তালের বা পিণ্ডের আকারে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। কেননা, যদিও চূর্ণীকৃত জিনিসে পরিশ্রম কম হয়, কিন্তু তাহাতে ভেজাল ও ময়লা থাকার সম্ভাবনা ঢের বেশী। শিল্পীর পক্ষে উচিত এই যে, তাহার যে কয় প্রকার পদার্থ প্রয়োজন সে-সকল বিশেষ আল্‌মারীতে ভিন্ন ভিন্ন দেরাজে পৃথক্ ভাবে সঞ্চয় করিয়া রাখা, যাহাতে কাজের সময় যাহা প্রয়োজন তাহা পাওয়া যায় এবং একের সঙ্গে আরেকটি মিশিয়া না যায়।

চুল্লীর ভিতরের তাপসহ আধার ( )

মিনকারি কাজের কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ আছে। এবং প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র উপাদান এবং সম্ভব হইলে বিশেষ কারিগর থাকা উচিত; কার্য্যাগারও পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভক্ত হইলে কাজের সুবিধা ও গণ্ডগোলের সম্ভাবনা কম হয়। মিনা বাজারে যে-অবস্থায় (প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়) পাওয়া যায় তাহাতে তাহা দ্বারা ধাতু আচ্ছাদন কার্য্য চলে না।

প্রথমে তাহাকে বেশ মিহি চূর্ণে পরিণত করিতে হয়। ইহার জন্য মনকা-প্রস্তর-নির্ম্মিত খল, নুড়ি (agate pestle and mortar) ব্যবহার করা উচিত। অভাবে পালিশ না করা কঠিন চীনামাটির খলনুড়ি ও ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে তাহাতে বিশুদ্ধ কাজ হওয়া অসম্ভব। খলনুড়ির নুড়িটির উপরের দুই তৃতীয়াংশ একটি কাঠের হাতলে দৃঢ়ভাবে বসান উচিত। কাঠের হাতলের উপরিভাগে ধাতু-নির্ম্মিত (পিত্তল) "ফেরুল" সংযুক্ত থাকা উচিত। মিনা চূর্ণ করিবার পদ্ধতি এইরূপ যথা:

প্রয়োজন পরিমাণ মিনাখণ্ড একটুক্‌রা পরিষ্কার
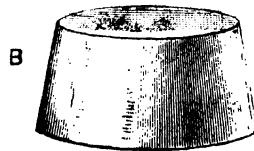
বারকোস ও "পায়া"

কাপড়ে জড়াইয়া হাতের উপর রাখিয়া ছোট হাতুড়ির আঘাতে টুক্‌রা টুক্‌রা (বাদামের মত) করিয়া ভাঙ্গিতে হয়। ঐ টুক্‌রাগুলি খলের মধ্যে রাখিয়া (খলের অর্দ্ধেকের বেশী খালি রাখা উচিত) খলটি মজবুত টেবিলের উপর রাখিবে। খল ও টেবিলের মধ্যে একটুক্‌রা পরিষ্কার কাপড় চার পাঁচ ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিলে খলের উপর নুড়ির আঘাতের বৈষম্য কমিয়া যায়।

খলমধ্যে মিনার টুক্‌রা রাখিয়া তাহার দুই-তৃতীয়াংশ নির্ম্মল জলে পূর্ণ কর। তাহার পর নুড়ির কাঠের হাতল মৃদু অথচ সরল ভাবে বাম হাতে ধরিয়া মিনার টুক্‌রার উপর রাখ। ডান হাতে একটি কাঠের হাতুড়ি লইয়া নুড়ির হাতলের উপরিভাগে আঘাত কর। কয়েক মিনিট দ্রুত আঘাত করিলে মিনার টুক্‌রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "দানায়" পরিণত হইবে ও খলের ভিতরের জল ঘোলা হইয়া উঠিবে। এই ঘোলা জল প্রায় সমস্তই ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি জল ফেলিলে পরে দেখা যায় যে, দুই-একটি বড় টুক্‌রা মিনা রহিয়া গিয়াছে তবে সজোরে নুড়ির চাপ

দিয়া "মাড়িলে" সেগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহার পর খলে অল্প জল ঢালিয়া, ডান হাতে নুড়ি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মিনার "দানা"রাশিকে মাড়িতে থাকিবে। এই কার্য্যের জন্য বিশেষ ভারযুক্ত নুড়ি ব্যবহার করিলে ভাল হয়। মাড়িবার সময় যাহাতে সমস্ত মিনারাশি আলোড়িত হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

মাড়িবার প্রথম দিকে বেশ কিছু চাপ দিয়া ক্রমে তাহা কমাইয়া ফেলিবে। নহিলে অযথা অনেকখানি মিনা কাদায় পরিণত হইবে। প্রতি ছয় সাত মিনিট অন্তর মিনারাশিকে কয়েক বার জলে ধুইয়া ঐরূপ কাদা হইতে মুক্ত করিবে। ধুইবার জন্য খল প্রায় জলে পূর্ণ করিয়া নুড়ি দ্বারা সমস্ত মিনা এক মিনিটকাল আলোড়িত করিবে। তাহার পর মিনা চূর্ণের স্থূল অংশ নীচে পড়িলে উপরের "কাদা ঘোলা" জল ঢালিয়া ফেলিবে। এইরূপে বার-বার ধুইবার পর যখন জলে "কাদা" আর দেখা যাইবে না, তখন বুঝিবে যে আর ধুইবার প্রয়োজন নাই।
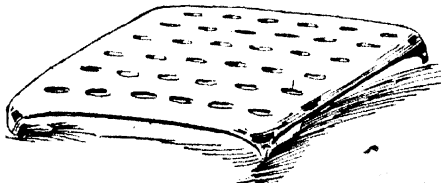
নিকেল-নির্ম্মিত বারকোস

এইরূপে তিন-চারিবার "মাড়া" ও "ধোওয়া" হইলে পর সমস্ত মিনা "মিহি কর্‌করে" বালুকার অবস্থায় পরিণত হইবে। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিলে মিনা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ—বিশেষে অস্বচ্ছ শ্বেত---মিনা আরও সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত করা উচিত।

ইহার পর খল মধ্যে আট-দশ ফোটা বিশুদ্ধ সোরা দ্রাবক (pure nitric acid) ঢালিয়া সমস্ত মিনা মৃদুভাবে (চাপ না দিয়া) নুড়ি দ্বারা তিন-চার মিনিট আন্দোলিত করিবে। তাহার পর ছয়-সাত বার নির্ম্মল জলে ধুইলে পরে মিনা কার্য্যোপযোগী হয়।

এই মিনারাশি কাচ কিম্বা চীনা মাটির—তিন-চতুর্থাংশ জল পূর্ণ-পাত্রে ঢালিয়া সযত্নে ঢাকিয়া রাখা উচিত। পাত্রের উপর কি-প্রকার মিনা ইত্যাদি বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখা উচিত।

অগ্নিসংযোগ—দক্ষিণে গ্যাস ও বামে কোকের চুল্লী

ইহার পর যা ইতিমধ্যে যে ধাতুময় দ্রব্যটি মিনা করা হইবে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করা উচিত। পরিষ্কার করার অর্থ এই যে, ধাতু-পাত্রে ময়লা, কলঙ্ক বা তৈলাক্ত পদার্থের সকল চিহ্ন দূর করা। পরিষ্কার করিবার প্রথা :—

দ্রব্যটি তাপসহ মৃত্তিকানির্ম্মিত টালির (fire clay tile) উপর রাখিয়া সাঁড়াশির দ্বারা চুল্লীমধ্যে রাখ। রাখিবার পর সাঁড়াশির সাহায্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সমভাবে উত্তপ্ত কর। যদি স্বচ্ছ মিনার কাজ করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে দ্রব্যটি অল্প লাল হইলেই চলে, যদি অস্বচ্ছ মিনা-করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে কিছু বেশী লাল (cherry red) করা উচিত। যথোচিত লাল হইলে পরে উত্তপ্ত অবস্থায় দ্রব্যটি দ্রাবক মধ্যে ফেলিবে। দ্রাবক নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিবে।

স্বর্ণ, প্লাটিনম্ তাম্র বা ইহাদের মিশ্রধাতুর জন্য পাঁচপোয়া আন্দাজ জলে ৮০ হইতে ১০০ ফোঁটা গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid)।

রৌপ্য বা রৌপ্য মিশ্র ধাতুর জন্য।

পাঁচপোয়া জলে ৫০ হইতে ৬০ ফোঁটা গন্ধক দ্রাবক। দ্রাবক চীনামাটি বা মৃত্তিকা পাত্রে রাখিবে। ব্যবহার করিলে যেমন দ্রাবকের শক্তি কমিবে সঙ্গে সঙ্গে অল্প-অল্প

গন্ধক দ্রাবক তাহাতে মিশ্রিত করিবে। মিশ্রণ কাচের শলা দ্বারা করিবে।

ধাতুদ্রব্যটি ঐ দ্রাবকে ১৫ মিনিট আন্দাজ ডুবাইয়া রাখিবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্রব্য তাম্রের পাত্রে দ্রাবকে ডুবাইয়া চুল্লীর মুখে রাখিবে। দ্রাবক ফুটিতে আরম্ভ করিলে কার্য্যশেষ হইয়াছে বুঝিবে।
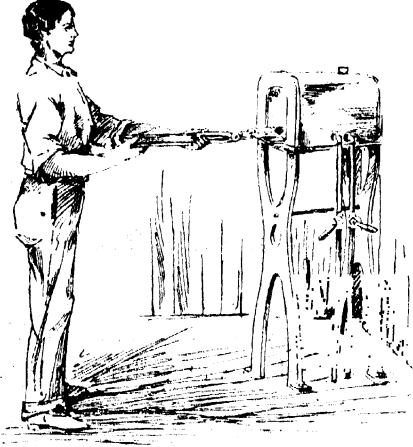
অগ্নিসংযোগ—গ্যাস চুল্লী

দ্রাবকের কার্য্য শেষ হইলে দ্রব্যটি কাষ্ঠের "খন্তী" দ্বারা উঠাইয়া বিশুদ্ধ জলের স্রোতে উত্তমরূপে ধুইবে। তাহার পর শক্ত কুঁচী বুরুশ ও জলমিশ্রিত "পালিশ গুঁড়ার" (pumice powder) সাহায্যে মাজিয়া "চক্‌চকে" করিবে। পাকা (কম খাদ) স্বর্ণ বা রৌপের পদার্থ বিশুদ্ধ জল ও বুরুশ দ্বারা পরিষ্কার করিলেই চলে। বুরুশ করিবার পরেই বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। তাহার পর পুনর্ব্বার তাপসহ টালির উপর বসাইয়া চুল্লীর মুখের নিকট একমিনিট কাল রাখিবে। একমিনিট ধরিয়া ঘুরাইয়া সমভাবে উত্তপ্ত করিবার পর তাহা সরাইয়া রাখিবে।

তাহার পর শীতল হইবা মাত্র দ্রব্যটিতে মিনা প্রয়োগ করিবে।

তাম্রের চাদর মিনা করিতে হইলে কখন কখন তাহাকে প্রথমে ছোট "শালের" (anvil) উপর "গোলমুখ" (round faced) মসৃণ হাতুড়ির আঘাতে সমান করিয়া লইতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রৌপ্যের দ্রব্যাদি চারিভাগ সোরাদ্রাবক ও এক ভাগ জল মিশ্রের মধ্যে ডুবাইয়া ৮০° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তাহার পর জলে ধুইয়া তারের বুরুশ দ্বারা (wire brush) লিকরিস-শিকড় (Liquorice root যষ্টি মধু ?) ও জলের সাহায্যে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

উকাঘর্ষণ ও চক্রে পালিশ

ধাতুদ্রব্যে মিনা লাগাইবার জন্য শিল্পী মোটা-সরু কয়েকটি ইস্পাতের কাঁটা এবং ছোট কর্ণিক (spatula) ব্যবহার করেন। কাঁটাগুলি কাঠের হাতলযুক্ত। "ক্রসে" বুনিবার কাঁটার (crochet needle) একমুখ চ্যাপ্টা করিয়া ও অন্যদিক্ কাষ্ঠের হাতলে আঁটিয়া দিলে ঠিক এই কাজের উপযোগী হয়। শিল্পী সম্মুখে প্রয়োজনমত কয়েকটি কাচের পাত্রে নানা প্রকার মিনাচূর্ণ (জলে ভিজান) লইবে। কাচপাত্রগুলি শিল্পীর দিকে অল্প "কাত" হইয়া থাকা উচিত। হাতের কাছে কয়েকটি পরিষ্কার সাদা নরম তোয়ালে রাখিবে।

ইহার পর ঐ কাঁটার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু করিয়া জলেসিক্ত মিনাচূর্ণ ধাতুগাত্রে লাগাইবে। মিনাবিন্দু ধাতুগাত্রে সংলগ্ন হইলে পরে কাঁটার মুখের দ্বারা সেইগুলি সমান ভাবে বিস্তার করিয়া ধাতুর উপর লেপন করিবে। ধাতুদ্রব্যটিতে পূর্ব্বেই ইচ্ছামত নক্সা করিয়া রাখিলে কাজ সহজ হয়। যদি লেপনের সময় মিনাচূর্ণ

হইতে জল গড়াইতে থাকে তাহা হইলে তোয়ালের কোণ অতি সন্তর্পণে এক পাশে ঠেকাইলে জল শোষিত হইবে।

ক্রমে যখন দ্রব্যটি ইচ্ছামত মিনাচূর্ণে আচ্ছাদিত হইবে তখন ঐ তোয়ালের সাহায্যে ধীরে ধীরে চারিপার্শ্ব হইতে সমস্ত জল নিষ্কাশন করিবে। প্রতিবার তোয়ালের পরিষ্কার ও শুষ্ক অংশ মিনাযুক্ত অংশে স্পর্শ করাইবে। জল নিষ্কাশনের পর যদি মিনাচূর্ণের স্তর অসমান (উঁচুনীচু) হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার কর্ণিক দ্বারা তাহা সমান করিয়া লইবে।
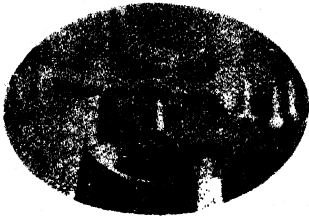
ফেল্ট-আচ্ছাদিত কাষ্ঠফলক দ্বারা পালিশ

অনেকখানি জায়গা মিনা করিতে হইলে চিত্রকরের ন্যায় তুলি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তাহা হইলে মিনা-চূর্ণ শুধু জলের বদলে অল্প গঁদ মিশান জলে ভিজান উচিত। ট্রাগাকান্ত (gum tragacanth) গঁদই এই কার্য্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তুলির প্রলেপ আপনা আপনি শুকাইবে তোয়ালে স্পর্শ দ্বারা নহে।

উত্তম মিনকারি কার্য্য করিতে হইলে মিনার প্রলেপ ক্রমে ক্রমে ৩।৪ টি স্তরে লাগাইতে হয় (প্রথম স্তরে অগ্নিসংযোগ হইলে তাহার উপর আর-এক স্তর এই ভাবে)। একসঙ্গে স্থূল ভাবে প্রলেপ দিলে কাজটি খারাপ হয়।

মিনা প্রয়োগ শেষ হইলে দ্রব্যটি (বা কয়েকটি দ্রব্য এক-সঙ্গে) একটি ছোট নিকেল-নির্ম্মিত বারকোসে (nickel tray) স্থাপন করিয়া বারকোসটি মিনা-চুল্লীর মুখের সম্মুখে অল্প দূরে রাখিবে। রাখিবার পর ক্রমাগত বারকোসটি ঘুরাইয়া সকল দ্রব্যের সকল দিক্ সমান ভাবে উত্তপ্ত করিবে। প্রতি তিন মিনিট অন্তর বার-কোস চুল্লীর দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর করিবে। এইরূপ করিলে ২০-২৫ মিনিটে মিনা প্রযুক্ত দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হইবে।

তৎপরে সাঁড়াশির সাহায্যে বারকোস মিনা-চুল্লীর মধ্যস্থ তাপ সহ মৃত্তিকা আধারে (muffle) স্থাপন করিবে। চুল্লীর তাপ ইতিমধ্যে প্রায় ৮০০° সেণ্টিগ্রেড হওয়া উচিত। কেননা, প্রখর তাপে অল্পক্ষণ অগ্নিপ্রয়োগ ইহাই মিনা-শিল্পী কার্য্যের প্রধান আদর্শ।

বারকোসটি চুল্লীর ভিতর একেবারে প্রবেশ না করাইয়া প্রথমে ঠিক চুল্লীমুখে দুই তিন মিনিট রাখিয়া ঘুরাইয়া

মিনা প্রয়োগের টেবিল্

তাপ সহাইলে ভাল হয়, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মিনা গলিতে আরম্ভ না হয়। তাপ সহা হইলে বার-কোস সম্পূর্ণভাবে চুল্লীমধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। চুল্লীমধ্যে বারকোস রাখিবার জন্য একটি তাপসহ মৃত্তিকার পায়া

মিনা চিত্রাঙ্কণাগার

(fireclay support) থাকে। ইহার উপর সযত্নে রাখিয়া সাঁড়াশির সাহায্যে বারকোসটি অতি সন্তর্পণে

জয়পুরী মিনা কার্য্যপ্রণালী

ঘুরাইবে যাহাতে চারিদিকে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ হয়। এই সময় শিল্পীকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিনকারী দ্রব্যগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমে মিনার প্রলেপ রুক্ষ ভাব (rough appearance) ও গাঢ় বর্ণ দেখাইবে। পরে রুক্ষভাব যাইয়া অল্প মসৃণ ভাব আসিবে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অল্প উজ্জ্বল ও মসৃণ ভাব আসিবে। এই ভাব আসিবার পরমুহূর্ত্তেই বারকোসটি বাহির করা কর্ত্তব্য। বাহির করিয়া প্রথমে চুল্লীমুখে পরে অল্পদূরে রাখিয়া এইরূপে ক্রমে ক্রমে দ্রব্যগুলি শীতল করিবে।

এইখানে বলা দরকার যে, কোন এক স্তরে যে কয় প্রকার মিনা ব্যবহৃত হয় সে-সকলের একই উত্তাপে গলা উচিত নহিলে কোনটি আগে কোনটি পরে গলিলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবার কথা।

শীতল হইলে দেখা যাইবে যে, ধাতু দ্রব্যগুলির অনাচ্ছাদিত অংশে কলঙ্ক ধরিয়াছে। কড়া বুরুশ দ্বারা ঘষিয়া বা দ্রাবকে ডুবাইয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় আর একস্তর মিনা প্রয়োগ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিবে। এইরূপে কয়েক স্তরে মিনার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। শেষের স্তর যতক্ষণে মসৃণ ও সমানভাবে উজ্জ্বল হয় ততক্ষণ অগ্নিসংযোগ করিবে। কখন কখন শেষের স্তর মিনার উপর একস্তর স্বচ্ছ সহজ গলনশীল মিনা (flux enamel crowning) প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করা এবং মিনার উপরিভাগ রক্ষা করা, এই দুই কাজই হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মিনার কার্য্যে, বিশেষতঃ চুল্লীসংক্রান্ত কার্য্যে সর্ব্বদা উপযুক্ত চশমা দ্বারা চক্ষুকে তাপ ও অনিষ্টকারী কিরণ হইতে রক্ষা করিবে। লেখকের চক্ষু ঐরূপ কিরণে পুড়িয়া যাওয়ায় আজ চারি বৎসর নানাপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা চলিতেছে।

মিনার কার্য্য সর্ব্বশেষে "উকা" ঘর্ষণ (filing) এবং পালিশ করিয়া শেষ করিতে হয়।

মিনকারি কাজে সাধারণতঃ এমেরী (emery), কুরুবিন্দ (corundum) বা কার্ব্বরণ্ডাম্ (carborundum) নির্ম্মিত উকা ব্যবহৃত হয়। মাঝারি হইতে খুব মিহি পর্য্যন্ত সকল প্রকারের উকাই ব্যবহৃত হয়। উকা
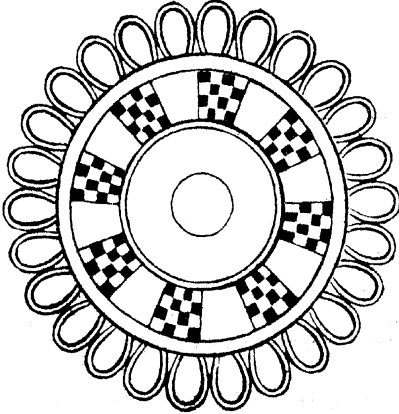
খোদাই-করা (champ leve) মিনার নক্সা

চালাইবার সময় মিনাকরা দ্রব্যটি সমস্তক্ষণ ভিজা রাখা আবশ্যক। ঘর্ষণ শেষ হইবার পর দ্রব্যটি বিশেষ যত্নের সহিত বুরুশ করিয়া এবং ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা উচিত। পালিশ করা সচরাচর পুনর্ব্বার অগ্নিসংযোগ দ্বারা করা হয়। বিশেষ উজ্জ্বল পালিশ করিতে হইলে, ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠ-চক্রে (Polishing lathe with hard wood chuck) "ত্রিপালি" মৃত্তিকা (Tripoli powder) বা ঐরূপ কোন চূর্ণ (যথা মিহি এলণ্ডম—alundum) দ্বারা পালিশ করিতে হয়।

মিনকারি কার্য্য সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে, যথা :—

১। খোদাই-করা (champ leve) এই প্রথায় ধাতু দ্রব্যটির উপর "বুলি" (graver) চালাইয়া স্থানে স্থানে খোদাই করিয়া সেইসকল অংশ মিনায় পূর্ণ করা হয়। ফলে দ্রব্যটি "জড়োয়া" বা পাথর বসান (inlaid) কার্য্যের মত দেখায়।

২। তার ঝালাই বা ক্লোয়াজনে (cloisonne) কার্য্যে ধাতু গাত্রের উপর তার ঝালাই করিয়া নক্সা করা হয়। তার ঝালাইয়ের ফলে ধাতুগাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলি মিনায় পূর্ণ করা হয়।

৩। সংযোজিত (Incrusted)। ধাতু-গাত্রে খোদাই বা "তারঝালাই" দ্বারা প্রকোষ্ঠ বিভাগ না করিয়া, সমতল ধাতুর উপর মিনা প্রয়োগ।
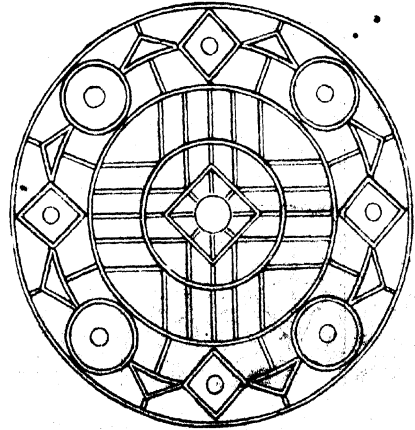
ক্লোয়াজনে (cloisonne তার ঝালাই) কাজের নক্সা

৪। মিনাপূর্ণ তারের কাজ (Plique a jour)। ক্লোয়াজনে প্রথার মত ধাতুগাত্রে "তারঝালাই" না করিয়া কটক বা ঢাকার রূপার তারের কার্য্যের ন্যায় তারের সহিত "তার ঝালাই" করিয়া "ফ্রেম" প্রস্তুত করিয়া তাহা মিনা দ্বারা পরিপূর্ণ করা। জানালায় কাষ্ঠের "ফ্রেমে" নানা বর্ণের কাচের সার্সী লাগানোর অনুরূপ।

৫। মিনার বর্ণদ্বারা চিত্রাঙ্কণ (enamel painting)। চিত্রকরেরা যেরূপ তুলি দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করেন ইহা সেইরূপ পদ্ধতি। কেবলমাত্র বর্ণগুলি নানাবর্ণের মিনা।

এই প্রবন্ধে এইসকল প্রথার বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র মিনা চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা যাইতেছে।

এইরূপ চিত্রাঙ্কণের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বর্ণযুক্ত মিনাচূর্ণ কিনিতে পাওয়া যায়। ১২ হইতে ২৪ প্রকার বর্ণ হইলেই প্রায় সকল কাজ করা যায়। পাঁচ ছয় প্রকার

তুলি, লিথোকারের ক্রেয়ন পেন্সীল (lithographer's crayon) ও দুই চার প্রকার তৈল হইলেই এই কার্য্য চলে।

প্রথমে মিনার বর্ণগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিতে হয়। তাহার পর ধাতু দ্রব্যটির উপর অস্বচ্ছ, শ্বেত বা ঈষৎ বর্ণযুক্ত মিনার আচ্ছাদন দিয়া, অগ্নিসংযোগ করিয়া অঙ্কনের "জমি" প্রস্তুত করা আবশ্যক। জমির উপর প্রথমে লিথোকারের ক্রেয়ন দ্বারা বা "ট্রান্স্ফার" (transfer)

স্থূল ক্লোয়াজনের নক্সা
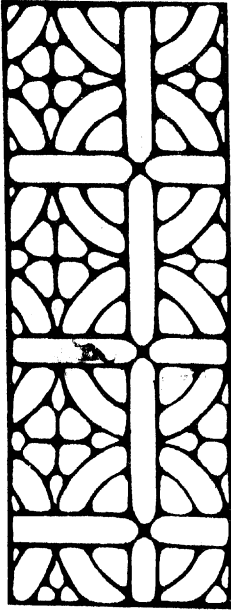
পদ্ধতিতে চিত্রটি "ছকিয়া" লইতে হয়। তাহার পর সাধারণ তৈল চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে আবশ্যক মত অল্প পরিমাণ বর্ণ ছুরীকাফলক দ্বারা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তূলিদ্বারা চিত্রাঙ্কণ হয়। এইরূপ কার্য্যে এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণ মিশ্রিত হইয়া যায় এবং অগ্নির উত্তাপে তাহাদের পরস্পর মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ বর্ণের কিরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমে রেখা চিত্রাঙ্কণই শ্রেয়ঃ। যদি চিত্রাঙ্কণ অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে যে চিত্রটি আঁকিতে হইবে তাহা প্রথমে "চৌকা বিভাগ" করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণে বিভক্ত করিতে হয়। পরে এক-একটি করিয়া ঐ চতুষ্কোনগুলি পরে পর আঁকিলে অনেক সুবিধা হয়।
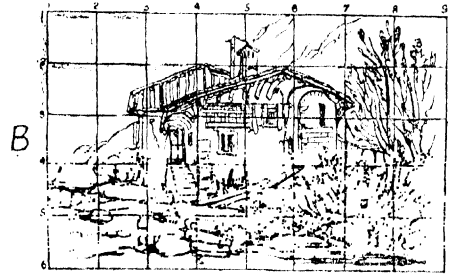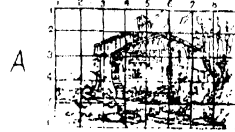
ছবি নকলের 'চৌকাকষা' ("squaring off) প্রথা

অঙ্কন শেষ হইলে দ্রব্যটি একটি তারের জালের বৃহৎ "হাতা"র উপর রাখিয়া অতি সন্তর্পণে 'স্পিরিট ল্যাম্পের" তাপে শুকাইতে হয়। প্রথমে ১৫ সেকেণ্ড উত্তাপ দিয়া সরাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার ১৫ সেকেণ্ড কাল উত্তপ্ত করিয়া কয়েক বারে অল্পে অল্পে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তৈল পুড়িয়া যখন আর ধূম নির্গমন হয় না তখন এককালে দুই তিন মিনিট উত্তাপ দিতে হয়। ইহাতে চিত্রটি

তারের কাজে মিনা (Plique a jour)

সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হয় ও তাহার পর পূর্ব্বে বর্ণিত উপায়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে এক স্তর স্বচ্ছ বর্ণহীন

মিনা (flux) প্রয়োগ করিয়া অগ্নিসংযোগে আচ্ছাদন করিলেই কার্য্য শেষ হয়।

মিনা ও মিনকারি কার্য্যের উৎপত্তি এখনও প্রাচীন কালের অন্ধকারে আবৃত। প্রাচীন মিশর ও থিব্‌সে মিনা-যুক্ত মৃত্তিকার পাত্র ইষ্টক ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাবিলনেও ঐরূপ বহু পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐসকল প্রাচীন জাতি ধাতুর উপর মিনা প্রয়োগ প্রথা জানিত কি না এসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক প্লিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, মিশরবাসিগণ রৌপ্যপাত্রের উপর নানা-বর্ণে চিত্রাঙ্কণ করিত এবং ঐ চিত্রসকল অঙ্কিত, খোদিত নহে। ইহাও শোনা যায় যে, ডুবোয়ো (Dubois) নামক একজন ফরাসীর নিকট এইরূপ দ্রব্যের নিদর্শন আছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা হয় যে, মিশরে এই শিল্পের প্রচলন ছিল। গ্রীক ও রোমক জাতিগণ এই শিল্প জানিত। তাহাদের নিকট হইতে ইয়োরোপীয় অন্য জাতিদের এই কার্য্য শিক্ষা হয়। অন্য মতে আরব বিজেতাগণ স্পেনদেশে এই শিল্পের প্রচলন করেন। স্পেন হইতে ইটালীতে ইহার চলন হয়।

এসিয়া ভূমিখণ্ডে এই শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সুমের আক্কাদিয়, আসিরীয়, এবং পরে সাসানীয় (Akkado Sumerians, Assyrian and Sassanian) জাতিগণের মধ্যে কোন না কোন প্রকার মিনা অতি প্রাচীনকাল হইতে ছিল। সাসানীয়গণের মধ্যে ধাতুর (মুদ্রা) উপর মিনাকার্যের নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহারও প্রমাণ আছে যে, এক ইউএট্‌চি দেশীয় ব্যবসায়ী খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে মিনার প্রচলন করেন।* এই ইউএট্‌চি (Yuetchi) দেশ আধুনিক পারস্যদেশের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী ছিল।

সুতরাং অনেকেই অনুমান করেন যে, আধুনিক ইরাক্ ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী দেশস্থ কোনও প্রাচীন জাতিই মিনা ও কাচ শিল্পের আবিষ্কারক। † কেহ বলেন ফিনিসীয় জাতি কেহ বা

মিনা চিত্রাঙ্কণের সহজ নক্সার উদাহরণ

বলেন হিটাইট জাতি এই আবিষ্কার করে। মিনা শব্দের মূল (মেনস্ বা মনস্— আকাশ) হইতেই এই শিল্পের এখন যে-সকল নাম প্রচলিত আছে (enamel, emaille) সে-সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মিনা শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে তুরাণী জাতি এই দেশে মিনা শিল্প আনয়ন করেন। একথা ঠিক যে শক জাতির মধ্যে

* Panthier, Histoire dela Chine.
† Labarte.

(Scythians) এই শিল্পের প্রাচীন কালেই উৎকর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং বলা হয় যে তাহারাই এই শিল্প এদেশে আনে। কবে আনে সে-সম্বন্ধে কিছু ঠিক হয় নাই, তবে মধ্যযুগের কিছু পূর্ব্বে,অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময় ইহার এদেশে প্রবর্ত্তন হয় এইরূপ শোনা যায়। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ যে, সংস্কৃত ভাষায় মিনার কোনও প্রতিশব্দ নাই এবং পণ্ডিতেরা বলেন যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থে মিনা কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায় না। এখন পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে জয়পুররাজ মানসিংহের রাজদণ্ডই ভারতীয় মিনা শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন। উহা মোগল সম্রাট আকবরের সময় (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে) নির্ম্মিত হয়। তদপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন বা নিদর্শনের অভাবে বিবরণ—ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

ঐসকল মতামত পড়িয়া ও শুনিয়া এই প্রবন্ধ লেখকের মনে সন্দেহ হয় যে, উপরোক্ত মত সকলই ভ্রান্ত। কেননা, এদেশে কাচশিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। শক জাতির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এদেশে কাচশিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল * এবং কাচ ও মিনা এক জাতির পদার্থ।

অন্যদিকে এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য জাতি সকল অতি প্রাচীন পারসীকে আসিরীয় ও সুমেরীয় জাতি যাঁহাদের মধ্যে মিনাশিল্পের প্রচলন ছিল—সকলের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সুতরাং যদিও বা এ কথা সত্য হয়,যে ভারতীয়েরা অন্য কাহারও নিকট মিনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা হইলে ইহাই সম্ভব যে ঐ শিক্ষা প্রাচীন কালে হইয়াছিল, আধুনিক সময়ে নহে।

এই কারণে লেখকের ধারণা হয় যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্চয়ই মিনাশিল্পের বিবরণ আছে, পণ্ডিত মহাশয়েরা (এদেশী ও বিদেশী) অর্থ বোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্য কিছু ভুল অর্থ চালাইতেছেন। সম্ভবতঃ মিনা কার্য্যের প্রতিশব্দও আছে, হয় তাহার অর্থ লোপ হইয়াছে নহিলে বিকৃত অর্থ চলিতেছে।

* এ-বৎসরের প্রবাসীতে লেখকের কাচ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই ধারণায় লেখক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। ফলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—এবং যাইতেছে—যে এদেশে মিনাশিল্প অতি প্রাচীন কালেই চলিত, অন্ততঃপক্ষে জ্ঞাত ছিল। সে-সমুদয় বৃত্তান্ত অন্যত্র প্রকাশিত হইবে। এখানে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।
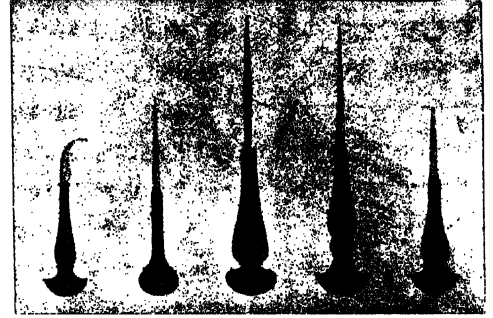
জয়পুরী মিনাকারের "বুলি" (graver)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক (খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০ বৎসর) এবং ইহা বহু অতি প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সঙ্কলন বিশেষ।

অর্থশাস্ত্রের বিশিখায়াং সৌবর্ণিক প্রচারঃ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত অলঙ্কারাদির বিবরণ পাওয়া যায়—

ঘন সুষিরে বা রূপে সুবর্ণমৃন্মালুকা হিঙ্গুলক কল্কো বা তপ্তোঽবতিষ্ঠতে। দৃঢ়বাস্তুকে বা রূপে বালুকামিশ্রং জতুগান্ধার পঙ্কোবা তপ্তোঽবতিষ্ঠতে। তয়োস্তাপনম্—বন্ধংসনং বিশুদ্ধিঃ। সপরিভাণ্ডে বা রূপে লবণমুক্কয়া কটুশর্করয়া তপ্তমবতিষ্ঠতে। তস্য ক্বাথনম্ শুদ্ধিঃ। ভট্টস্বামীর টীকার সাহায্যে ইহার অনুবাদ:—

"স্থূল, স্থানে স্থানে খোদিত (ঘন সুষিরো বা রূপে) অলঙ্কারে, সুবর্ণমৃত্তিকা, বালুকা ও হিঙ্গুলের খাদ (Dross or Regulus) এইসকলের মিশ্র অগ্ন্যুত্তাপ দ্বারা (অলঙ্কারের গাত্রে) দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়।"

"দৃঢ়বাস্তুক অলঙ্কারে ("পেটান নিরেট গহনা") বালুকা-মিশ্র, সীসক খাদ ও জতু (জতু এক অর্থে মোম অন্য অর্থে ফটকিরি লবণ সোডিয়ম সলফেট, চূর্ণ প্রস্তর

ইত্যাদির মিশ্র—যথা শিলাজতু) এইসকলের মিশ্র অগ্নিপ্রয়োগে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়।"

"ইহাদের শোধনের উপায় পুড়াইয়া প্রচণ্ড আঘাতে (হীন পদার্থ হইতে) পৃথক্ করা।"

"সপরিভাণ্ড (মণিযুক্ত জড়োয়া) অলঙ্কারে, লবণ প্রতীত (অশুদ্ধলবণ, পাপ্ড়ি, natron) ও মৃদু প্রস্তর চূর্ণ বালুকা এইসকলের মিশ্র প্রচণ্ড উল্কাসম অগ্নিপ্রয়োগে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। ইহার শোধনের উপায় বদরিকাম্ল (টককুলের রস) যুক্ত, জলে সিদ্ধ করা।"
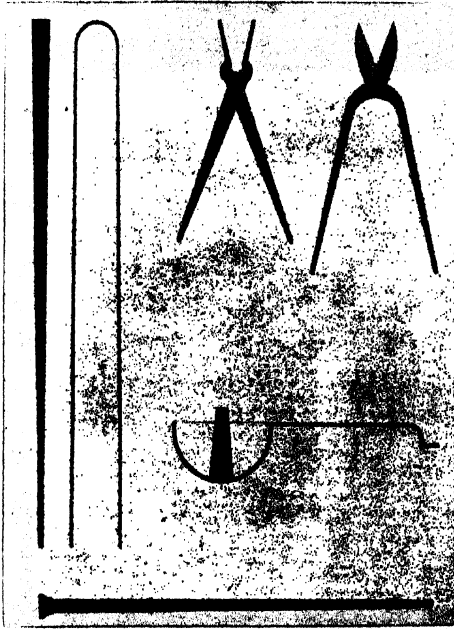
জয়পুরী মিনাকারের যন্ত্রপাতি

এই বিবরণে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকবারে অলঙ্কারের গাত্রে বালুকা, ধাতুক্ষার ইত্যাদি মিনার উপাদান মিশ্রিত ও যুক্ত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করা হইত। লবণ প্রতীত * ও বালুকা সহজে মিনায় পরিণত হয় না সুতরাং ইহার জন্ম প্রচণ্ড উল্কাসম উত্তাপের কথা বলা হইয়াছে। এবং যে সকল পদার্থের মিশ্রের কথা বলা হইয়াছে সে-সকল অগ্নিপ্রয়োগে মিনায় পরিণত না হইলে কেবলমাত্র তাদের সাহায্যে অলঙ্কার গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা যে বিজ্ঞান-সম্মত কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রলেপ যে কত দূর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইত তাহা 'পুড়াইয়া প্রচণ্ড আঘাতে পৃথক্ করা' রূপ শোধন-পদ্ধতিতে দেখা যাইতেছে। সপরিভাণ্ড অলঙ্কারে মণিযুক্ত হওয়ায় দগ্ধ ও প্রচণ্ড আঘাত করা অসম্ভব; কেননা, তাহাতে মণি
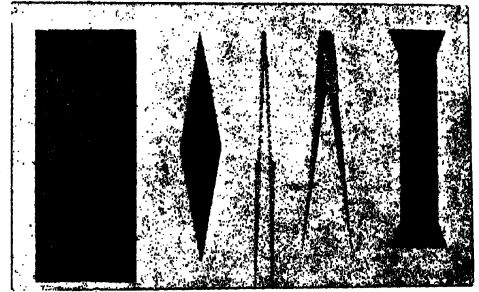
জয়পুরী মিনাকারের যন্ত্রাদি

নষ্ট হইতে পারে। অতএব বদরিকা অম্লে সিদ্ধ করিয়া শোধনের ব্যবস্থা। এই বদরিকাঅম্লে সিদ্ধ করা পদ্ধতি এখনও জয়পুরের মিনকারগণ ব্যবহার করে, অন্ততঃ অল্প-কাল পূর্ব্বে ও করিত * সুতরাং অর্থশাস্ত্র-লেখকের সময় মিনা শিল্প এদেশে প্রচলিত ছিল এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

গ্রিফিথ্ লিখিত অজন্তাগুহা বিবরণীর কয়েকটি চিত্রে (যথা মার কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের পরীক্ষা) এরূপ অলঙ্কার দেখা যায়, যাহা বর্ণে ও আকারে আধুনিক জয়পুরী মিনকারি অলঙ্কারের অবিকল প্রতিকৃতি বলিলেও চলে। যদি চিত্র নকল করিবার সময় কোনওরূপ ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বলা চলে যে, অজন্তাগুহার চিত্রাঙ্কণের সময় মিনার অলঙ্কার এদেশে ব্যবহৃত হইত। যে-সকল অলঙ্কারের চিত্রের কথা বলা হইতেছে, সেগুলি মূল্যবান প্রস্তরযুক্ত অলঙ্কার হইতে পারে না। কেননা, সেরূপ বর্ণ কেবল মাত্র এক-প্রকার দুর্লভ মরকতের হয়।

* লবণ প্রতীত, সোডাধুণ লবণ সোডিয়ম সলফেট্ ইত্যাদি মিশ্র।

* Jeypore Enamels

তৎপরে তাহার কর্ত্তন-পদ্ধতি (যদি তাহাকে কর্ত্তন বলা যায়) অতি অদ্ভুত, যে হেতু তাহার আকৃতি দেখিলে মনে হয় যে, "ছাঁচে ঢালা'—কোণবিহীন অদ্ভুত আকার—হইয়াছে, সেরূপ কর্ত্তন-পদ্ধতির কথা কোনও আধুনিক বা প্রাচীন বিবরণে দেখা যায় নাই। সর্ব্বশেষে 'প্রস্তর'-গুলি আকারে বৃহৎ ও সংখ্যায় অনেক এবং তাহা অতি সুন্দরভাবে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এইরূপে আকার ও আয়তন মাত্রায় বিন্যস্ত (graduated)। অথচ গহনার কারু-কার্য্যের কিছু সামঞ্জস্যের হানি হয় নাই, যাহা প্রস্তরগুলির আয়তন ও আকারের মাত্রা অসমান হইলে (uneven graduation) অবশ্যম্ভাবী হইত।

ঐরূপ বর্ণ ছায়াযুক্ত মরকত (emerald পান্না) দুষ্প্রাপ্য, ঐরূপ কর্ত্তন-পদ্ধতি চিন্তারও অগোচর, অতগুলি বৃহৎ মরকত অতি দুর্ল্লভ, অতগুলি বৃহৎ মরকত—এরূপ সুন্দর ভাবে "মিলান" ও সমান মাত্রায় প্রভেদযুক্ত (matched and evenly graduated)—যে একটি অলঙ্কারে থাকিতে পারে, সে-কথা আরব্যোপন্যাস-লেখকও ভাবিতে পারেন নাই। এবং এতগুলি অস্বাভাবিক বিশেষত্ব এক স্থলে একত্র হওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ পক্ষে… ন্যায়শাস্ত্র (law of Probabilities) তাহাই বলে।

সুতরাং ঐসকল পদার্থ অজন্তা যুগের মিনাশিল্পের নিদর্শন একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না, কেননা মিনাশিল্পে ঐ প্রকার বর্ণ, আয়তন, বিন্যাস ইত্যাদির নিদর্শন সর্ব্বদাই পাওয়া যায়।

কৃতী বাঙালী ছাত্র

শ্রী তারাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত তারাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত বি-এস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি লণ্ডন স্কুল অব্ মাইন্‌স্ হইতে এ-আর-এস্‌-এম্ ডিপ্লোমাও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর কারখানায় প্রায় তিন বৎসর শিক্ষানবীশরূপ কাজ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের সরকারী বৃত্তি লইয়া লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল্ কলেজে ধাতুবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা করিতে যান। তিনি লণ্ডনের কয়েকটি ইস্‌পাতের কারখানায় হাতে-কলমে ধাতু-সম্পর্কিত কাজ শিক্ষা করেন। এই বাঙালী যুবকের কৃতিত্বে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

প্র

ভারতীয় শিল্প ও ময়ূরভঞ্জ

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

গত ১৯২২-২৩ ও ১৯২৩-২৪ সালের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ময়ূরভঞ্জের শিল্পের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ময়ূরভঞ্জে যে শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে তার স্থান কোথায়, এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। ভারতে শিল্পের ইতিহাস যে খুব প্রাচীন, তা বলা বাহুল্য। এদেশে শিল্পের ইতিহাসের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথার শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের নিজের বিশেষত্ব আছে। এই বৈচিত্র্যই ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসকে মনোরম ক'রে তুলেছে। তার ফলে আমরা পাচ্ছি দক্ষিণী প্রথা, গুজরাতী প্রথা, বঙ্গীয় প্রথা ও উড়িষ্যার প্রথা। যদিও আজকাল অনেক শিল্প-রসিক এ-সব ভাগকে কৃত্রিম ব'লে উড়িয়ে দিতে চান, তবু আমরা মোটামুটি এইসব প্রথাগুলোকেই মেনে নেব। বাংলা এবং উড়িষ্যা খুব কাছাকাছি হ'লেও দু' দেশের শিল্প-প্রথার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। উড়িষ্যায় যত পুরানো মন্দির ও মূর্তি পাওয়া যায়, তত বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের মন্দিরের বয়স খুব আধুনিক। উড়িষ্যায় কারুকার্য্যের দক্ষতা বাংলা দেশকে হার মানিয়ে দেয়। উড়িষ্যায় কি ক'রে এত বড় শিল্পের আন্দোলন এসে পড়্‌ল, সেটা অনেকের কাছে খুবই আশ্চর্য্য ঠেকে। যখন উড়িষ্যায় এই রকম নতুন নতুন মন্দির ও মূর্ত্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন তার উপরে এমন কোনো বিদেশীয় প্রভাব পড়েছিল কি না, যার জন্য সে-দেশের শিল্প ততটা উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছিল, সেটা অনুসন্ধানের যোগ্য। ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যারই একটি করদ রাজ্য। উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যের মধ্যে এটি বৃহত্তম। ময়ূরভঞ্জ বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী রাজ্য। দুই দেশের প্রান্তদেশে

১। খড়িয়া দেউল (পরিষ্কারের পরে)
খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

২। চন্দ্রশেখর মন্দির
খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

৩। খড়িয়া দেউল ও চন্দ্রশেখর মন্দিরের আর একটি দৃশ্য

আমরা খিচিংএর কথা ও সেখানকার ভঞ্জরাজাদের কথা উল্লেখ কর্লাম, শুধু এই জন্য যে খিচিং ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী ও সেখানকার রাজারা যে-সব কীর্ত্তি রেখে গেছেন, শিল্প হিসাবে সে-গুলির দাম অনেক। এখানে যে-সব শিল্পের নিদর্শন পাই, তাতে বোঝা যায় এখানকার শিল্প কতটা উন্নতি লাভ করেছিল এবং তার উপর বাংলা বা উড়িষ্যার কতটা প্রভাব আছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এসম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, বাংলা দেশের স্থাপত্য ময়ূরভঞ্জের স্থাপত্যের উপর যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কারণ হচ্ছে এদেশের সঙ্গে বাংলার সান্নিধ্য। থাকায় ময়ূরভঞ্জ দুই দেশ থেকে অনেক কিছু জিনিষ পেয়েছে। সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাসের দিক্ দিয়ে ও-কথা যেমন সত্য, শিল্পের ইতিহাসের দিক্ দিয়েও তেমনি সত্য। ময়ূরভঞ্জের শিল্পের নিদর্শন ভাল ক'রে পরীক্ষা কর্লে, একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপাদা, কিন্তু এর পূর্ব্বে রাজধানী ছিল এখনকার খিচিং গ্রাম। এই পুরাতন রাজধানীর উল্লেখ পাই ১১শ-১২শ শতাব্দীর ময়ূরভঞ্জের এক তাম্রলিপিতে। তাতে খিচিংকে "খিজিঙ্গ" বলা হয়েছে, সেই খিজিঙ্গ ছিল ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ রাজাদের রাজধানী। এখানকার রাজার উপাধি "ভঞ্জ" এবং তিনি সেই প্রাচীন ভঞ্জ রাজাদের বংশধর ব'লে দাবী করেন। এই রাজাদের বংশের ইতিহাস নিয়ে যে বাদানুবাদ আজকাল চল্ছে, তার পুনরুল্লেখের দরকার এখানে নেই।

৪। কারুকার্য্যশোভিত খড়িয়া দেউলের দ্বারদেশ—(গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তিসহ)

৫। মারীচি (খিচিংএ প্রাপ্ত)
বর্ত্তমানে বারিপাদা যাদুঘরে রক্ষিত

এখানকার মন্দিরগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সে-গুলি ঠিক উড়িষ্যার মন্দিরের মত নয়, সে-গুলিতে অনেকটা বাংলার মন্দিরের প্রভাব আছে। ময়ূরভঞ্জের রাজবাড়ীতে যে মন্দির আছে, সেটিত একেবারে বাংলার মন্দিরের ছাঁচে তৈরী।

প্রথমে খিচিংএর কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন J. D. M. Beglar। তিনি কানিংহাম সাহেবের সহকারী ছিলেন। তিনি ১৮৭৪ এবং ১৮৭৬ অব্দে খিচিংএ যান এবং এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন। কানিংহামের রিপোর্টে (Volume XIII, পৃঃ ৭৪-৭৫) খিচিংর বর্ণনা আছে। পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর Archeological Survey of Mayurbhanj এ খিচিং-এর শিল্পসম্পদের কথা বলেন। সম্প্রতি Annual
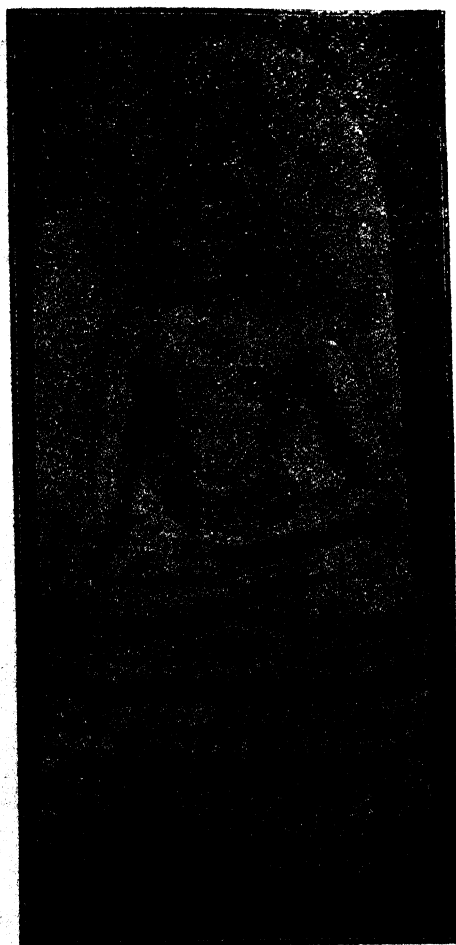
৬। বুদ্ধদেব (ভূমিস্পর্শ মুদ্রা)
খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

Report of the Archeological Survey of Indiaতে ১৯২২-২৩ ও ১৯২৩-২৪ সালে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ময়ূরভঞ্জে খিচিং গ্রামে যে-সব মন্দির আছে, তার মধ্যে ঠাকুরাণীর মন্দিরই লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু অনুমান হয় যে, প্রাচীন ঠাকুরাণীর মন্দিরটি ভেঙে গেলে পর ঠাকুরাণীর মূর্ত্তিটি একটি ইটের ঘরে রক্ষিত হয়। আর ঠিক তারই সম্মুখে বোধ হয় প্রাচীন মন্দিরের স্থানেই

৭। অবলোকিতেশ্বর (খিচিংএ প্রাপ্ত)

খণ্ডিয়া দেউলের দক্ষিণে আর একটি ছোট মন্দির আছে, সেই মন্দিরের নাম—চন্দ্রশেখরের মন্দির (ছবি নং—২)। এই শিব-মন্দিরের দ্বারে দ্বারপালের প্রতিমূর্ত্তি আছে, আর উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি। লক্ষ্মীদেবী ব'সে আছেন আর তাঁর দুই পাশে দুই হাতী তাঁর মাথায় জল বর্ষণ করছে। এইরকমের দৃশ্য ভারতীয়-শিল্পের ইতিহাসে খুব প্রাচীন। সাঁচির কারুকার্য্যের মধ্যেও এইরকম গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আমরা পাই। এ-ছাড়া দ্বারদেশের উপর সুন্দর কারুকার্য্য আছে। ৩নং ছবিতে আমরা খণ্ডিয়া দেউল, ঠাকুরাণীর মন্দির ও চন্দ্রশেখরের মন্দিরের আর একটি দৃশ্য পাচ্ছি।

খণ্ডিয়া দেউলের দ্বারদেশটি সুন্দরভাবে কারুকার্য্য-শোভিত। এখানকার যে-সব শিল্পের নমুনা আমরা পাচ্ছি তার মধ্যে এই দ্বারদেশটি খুব মনোহর। এর তক্ষণকার্য্য খুব পরিপাটী, এবং

আর একটি মন্দির তৈরী করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই মন্দিরটি অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। সেই অসমাপ্ত মন্দিরটিকে এখন লোকেরা "খণ্ডিয়া দেউল" বলে। আমাদের নং—১ ছবিতে খণ্ডিয়া দেউলটি দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঠিক এরই সম্মুখে বর্ত্তমানে ঠাকুরাণীর ইটের মন্দির আছে। ঠাকুরাণী অনেক সময় "কিঞ্চকেশ্বরী" বা "খিজিঙ্গেশ্বরী" নামে কথিত হন। ইনি চামুণ্ডারই এক নামান্তর মাত্র। এখনও ইনি চামুণ্ডা-রূপে পূজিত হন, এবং শুধু যে এখানকার হিন্দুদের নিকট থেকে পূজা পান তা নয়, দূরের ও নিকটের সাঁওতাল, কোল, বাথুড়ী, ভুঁইয়াদের কাছ থেকেও মুরগী পূজা পান।

দেখ্‌লেই মনে হয় যেন গুপ্তযুগের কোনো প্রতিভাবান্‌ শিল্পীর হাতের কাজ। যেখানে লতাপাতা-শোভিত কারুকার্য্য শেষ হয়েছে, সেখানে গঙ্গা ও যমুনার দুটি মনোহর মূর্ত্তি আছে। এ রকম সুশোভন মূর্ত্তি খুব কমই দেখা যায়। দুই মূর্ত্তিরই এক হাতে ঘট ও অপর হাতে ফুল। যমুনার পদতলে তাঁর বাহন কূর্ম্ম ও গঙ্গার পদতলে তাঁর বাহন মকর লক্ষিত হচ্ছে। তাঁদের দুইপাশে দুইজন পরিচারিকা রয়েছে। মূর্ত্তি দু'টির মুখভঙ্গিমা ও গঠনকার্য্য প্রশংসনীয়, এ-দুটিতেও গুপ্তযুগের শিল্পীদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যদিও ঠিক এই মূর্ত্তি দুটিকে আমরা গুপ্তযুগে নিয়ে যেতে পারি না, তবু দেখ্‌লেই মনে হয় যেন শিল্পী গুপ্তযুগের

৮। ভগ্ন শিবমূর্ত্তি, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

ভাবে ও প্রভাবে অনুপ্রাণিত। দ্বারদেশের উপরে এখানেও আমরা একটি গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি পাচ্ছি। লক্ষ্মীদেবী অর্দ্ধপর্য্যঙ্ক অবস্থায় আসীন, তাঁর দুই পাশে দুই পরিচারিকা ও উপরে দু'টি হস্তী তাঁর মস্তকে জলবর্ষণ করছে। চারিপাশে যে লতাপাতা-শোভিত কারুকার্য্য রয়েছে, তাতে এই অজানা শিল্পীর শিল্পদক্ষতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

কিছুকাল আগে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যখন ময়ুরভঞ্জে যান, তখন তিনি সেখানকার শিল্পে ও ধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষচিহ্ন অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেখানকার ধর্ম্মে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনো অবশেষ আছে কি না বলা শক্ত, তবু এ-কথা সহজেই বলা যায় যে, শিল্প-রাজ্যে দু'-একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—মারীচির মূর্ত্তি (ছবি নং—৫)। যদিও এর প্রাপ্তিস্থান খিচিংগ্রামে, এখন এটিকে বারিপাদা যাদুঘরে রক্ষা করা হয়েছে। আর একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি (ছবি নং—৬) এটি বুদ্ধদেবের ভূমিস্পর্শ-মুদ্রার ছবি। ঠাকুরাণীর মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি মন্দির ছিল সেটিকে "ইটামূর্ত্তি" বলে। সম্ভবতঃ সেটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল, কারণ সেখানেই মারীচি ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তারই নিকটে যে বৌদ্ধ বিহার ছিল সেখানে এই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়েছিল। এটির মাপ হচ্ছে—৫'—৫"×৩—৬॥"। অবলোকিতেশ্বরের যে মূর্ত্তি (ছবি নং—৭) পাওয়া গিয়েছে, সেটি ভগ্ন, আর উপরের অংশটি পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তিটির পাদদেশে মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠাতা রায়ভঞ্জের মূর্ত্তিও খোদিত রয়েছে, তিনি তাঁর দেবতার পূজা করছেন। তার নীচে শিলালিপিতে আমরা রায়ভঞ্জের নাম পাই। শিলালিপি দেখে মনে হয়—মূর্ত্তিটি একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরী, সে-সময় রায়ভঞ্জ ময়ুরভঞ্জের রাজা ছিলেন।

এসব বৌদ্ধমূর্ত্তি ছাড়া হিন্দুমূর্ত্তির মধ্যে শিবের মূর্ত্তি (ছবি নং—৮) উল্লেখযোগ্য। এটির নানা অংশ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সেইসব ভিন্ন ভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে মূর্ত্তিটি রাখা হয়েছে। এই মূর্ত্তির মুখ (ছবি নং—৯) বেশ ভাবব্যঞ্জক। যদিও মূর্ত্তিটির মাথায় জটা-মুকুট রয়েছে ও পিছনে নানা-রকম কারুকার্য্য করা রয়েছে, তবু শিবের মুখের যে ভাব সেটি নষ্ট হয়নি, বরং তা সত্ত্বেও সৌন্দর্য্যটি বিশেষ ক'রে দেখা যাচ্ছে। মূর্ত্তিটির মুখের সৌম্য ও শান্তভাব বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

উগ্রচণ্ডা *

শ্রী প্রমথনাথ রায়

(১)

তখনো প্রভাত হয় নাই। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে বিস্তীর্ণ একখণ্ড কুজ্ঝটিকাবরণ নেপলস্ নগরাভিমুখে প্রসারিত হইয়া সমুদ্রতটের তদংশে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদগুলিকে দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র স্থির। কিন্তু সরেন্তোর * শৈলবন্ধুর উচ্চ সৈকতনিম্নে ক্ষুদ্র উপসাগর-মধ্যে নিম্মিত নৌকা-ঘাটে ধীবর স্ত্রী-পুরুষেরা ইহারই মধ্যে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের কেহ বা, পূর্ব্বরাত্রে সমুদ্রে যে সকল জাল পাতিয়া রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে দড়াদড়ির সাহায্যে সেগুলিকে তীরে টানিয়া আনিতেছে; কেহ পাল খাটাইয়া নৌকা প্রস্তুত করিতেছে, কেহ শৈলগাত্রে খোদিত বৃহৎ গুহাভ্যন্তর হইতে পূর্ব্বরাত্রে রক্ষিত যাবতীয় নৌসামগ্রী—দাঁড়, মাস্তল প্রভৃতি—টানিয়া বাহির করিতেছে। মোট কথা, সেখানে কেহ অলসভাবে বসিয়া নাই। এমন কি, নৌকা পরিচালনে অক্ষম বৃদ্ধেরাও শ্রমপরাঙ্মুখ না হইয়া যাহারা জাল টানিয়া আনিতেছিল, তাহাদিগের পংক্তিতে যোগ দিয়াছে। তীরে সমতল গৃহ-ছাতের উপরে এখানে-সেখানে কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক টেকো হাতে দাঁড়াইয়া, স্বামী-সাহায্যে গত কন্যার অনুপস্থিতিতে আপনার নাতিনাতিনীদিগকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

৯। ভগ্নশিবমূর্ত্তির মুখের ছবি

একস্থানে এইরূপ এক বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াইয়া একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা দিদিমার টেকো ঘুরাইতেছিল। বৃদ্ধা অঙ্গুলিদ্বারা নিম্নে সঙ্কেত করিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল —

* Paul Heyse নামক বিখ্যাত জার্ম্মাণ ছোট গল্প লেখকের 'L' Arrabbiata নাম্নীয় গল্পের অনুবাদ। 'L'Arrabbiata একটি ইটালীয় শব্দ, উহার অর্থ cross-patch, spit-fire। বাংলা উগ্রচণ্ডা শব্দ কতকটা ইহার সমানার্থবোধক।

* ইটালীর একটি নগর।

"দেখিয়াছ বাকেলা? ঐ যে আমাদের পাদ্রী এইমাত্র নৌকায় উঠিলেন। আন্তোনিও তাহাকে কাপ্রী* দ্বীপে লইয়া যাইবে। এখনো বেচারীর ঘুমের ঘোর কাটে নাই!"

উপরোক্ত পাদ্রী তখন সবেমাত্র নৌকায় উঠিয়া, গা হইতে কালো জামাটি সযত্নে খুলিয়া বেঞ্চের উপরে বিছাইয়া রাখিয়া, স্বীয় আসন পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কাপ্রী দ্বীপে যাইতে দেখিয়া সকলে যে যার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রসন্নবদনে দক্ষিণে বামে মাথা নাড়িয়া অভিবাদন দান এবং গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

বালিকা প্রশ্ন করিল—"তিনি কাপ্রী যাইতেছেন কেন, দিদিমা? সেখানকার লোকেদের কি কোন পাদ্রী নাই যে, আমাদের পাদ্রীকে ধার করিয়া লইয়া যাইবে?"

বৃদ্ধা উত্তর দিল—"হাবা মেয়ের মত কথা বলিও না। সেখানে অনেক পাদ্রী আছেন, অনেক সুন্দর গির্জ্জা আছে, এমন কি সেখানে একজন সন্ন্যাসীও থাকেন, যা আমাদের এখানে নাই। তিনি যে কাপ্রী যাইতেছেন তার কারণ সেখানে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বাস করেন। পূর্ব্বে অনেক দিন তিনি আমাদের এই সরেন্তোতে ছিলেন। তখন একবার তিনি এমন পীড়িত হন যে লোকে প্রত্যহ মনে করিত হয়ত রাত্রি আর পার হইবে না; সে সময় আমাদের পাদ্রী প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। বিধাতার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া এখন তিনি প্রতিদিন পুনরায় সমুদ্রস্নানের আরাম উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় তিনি এখানকার গির্জ্জাতে এবং গরীব লোকদিগকে বহু অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি কাপ্রী দ্বীপে গেলে আমাদের পাদ্রী সেখানে গিয়া তাঁহার স্বীকারোক্তি শুনিয়া আসিবেন, তাঁহার নিকট হইতে এমন প্রতিশ্রুতি লইয়া তবে নাকি তিনি সেখানে গিয়াছেন। পাদ্রীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এমন পাদ্রী পাইয়াছি।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা নিম্নে প্রয়াণোন্মুখ তরীর দিকে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিল।

"দিনের অবস্থা কেমন হবে মনে হয়?"—পোতবাহকে এই প্রশ্ন করিয়া পুরোহিত নেপল্স্ সহরের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"এখনো সূর্য্য উঠে নাই সত্য, কিন্তু এই কুয়াসা তাহাকে অধিকক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না।"

"উত্তম, তবে নৌকা খুলিয়া দাও, যেন দ্বিপ্রহরের উত্তাপের পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারি।"

আন্তোনিও নৌকার বন্ধন খুলিয়া দাঁড় ধরিয়া টান দিতে যাইবে এমন সময় সহর হইতে নৌকাঘাটের দিকে আগত উন্নত রাস্তাটার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সহসা সে থামিয়া গেল।

সেই পথে একজন নিতান্ত দীনবেশা তন্বী বালিকা রুমাল দ্বারা ইঙ্গিত করিতে করিতে, বগলে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী বহন করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্তর সোপানাবলী অতিক্রমপূর্ব্বক নিম্নে নামিয়া আসিতেছিল। পরিচ্ছদ দীন হইলেও তাহার গ্রীবা-ভঙ্গিমায় একটি অমার্জ্জিত আভিজাত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল এবং ললাটবেষ্টিত বেণী-সংবদ্ধ অসিত অলকভার তাহার মস্তকে কিরীটের মত শোভা পাইতেছিল।

পুরোহিত প্রশ্ন করিলেন—"কি হে, বিলম্ব কেন?"

পোতবাহ উত্তর দিল—"আর এক জন যাত্রী আসিতেছে; সেও কাপ্রী যাইবে। যদি অনুমতি দেন—সে একজন সতের-আঠার বৎসর বয়সের মেয়েমানুষ।"

এমন সময় বালিকা সেই পাষাণবর্ত্মের প্রাচীরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া পুরোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"সরেলা? কাপ্রী দ্বীপে তার কি কাজ?"

আন্তোনিও স্কন্ধ সঙ্কুচিত করিল। বালিকা দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেই ঘাটে উপনীত হইবামাত্র, নব্য নাবিকদিগের ভিতর হইতে কয়েকজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"নমস্কার, উগ্রচণ্ডা।"

পুরোহিতের উপস্থিতি বাধা না দিলে [illegible]

* সরেস্তোর দশমাইল দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

নিশ্চয় আরো-কিছু বলিত। বালিকার অভিবাদন গ্রহণ করিবার গর্ব্বিত নির্ব্বাক্ ভঙ্গী তাহাদিগকে আরো কিছু বলিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছিল।

পুরোহিত বলিলেন—"কেমন আছ, লরেলা? কাপ্রী যাবে নাকি?"

"যদি অনুমতি দেন?"

"আমার অনুমতি কেন? যার নৌকা তাকে জিজ্ঞাসা কর। প্রত্যেকেই নিজের নিজের জিনিষের মালিক। একমাত্র বিধাতা আমাদের সকলের মালিক।"

লরেলা আন্তোনিওর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া বলিল—"আমি আধ কার্লিণ দিতে পারি। যদি হয় লইয়া চল।"

পোতবাহ নিম্নস্বরে উত্তর দিল—"আমার চেয়ে এ অর্থ তোমারই অধিক প্রয়োজনে লাগিতে পারে।"

তারপর কয়েকটি কমলালেবুর ঝুড়ি একপার্শ্বে সরাইয়া নৌকায় তাহার জন্য বসিবার স্থান করিয়া দিল। এই সকল ফল সে কাপ্রী দ্বীপে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল। সেখানে এফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বালিকা বলিল—"বিনা ভাড়ায় আমি যাইতে পারি না।"

পাদ্রী বলিলেন—"আরে এস, এস। ও বড় ভাল ছেলে, তোমার এই সামান্য সম্বল গ্রহণ করিয়া ও বড় লোক হইতে চায় না।" পরে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"ওঠ! এখানে আমার পাশে বস। দেখনা কেন, তোমাকে আরাম দিবার জন্য সে তার জামাটি পর্য্যন্ত পাতিয়া দিয়াছে। আমার ভাগ্য তত ভাল নয়। সেজন্য আমি কাহাকেও দোষী করি না, কেন না যৌবনের ধর্ম্মই এই। দশজন পাদ্রী যে আদর না পাইবে, একজন যুবতীর ভাগ্যে তার অনেক অধিক আদর মিলিবে। ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না, আন্তোনিও, সদৃশে সদৃশে মিল ত বিধিরই বিধান।"

ইতিমধ্যে লরেলা নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক জামাটা একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। মাঝি সেটাকে না উঠাইয়া দাঁতে দাঁতে কি যেন বলিল। তার পর সজোরে বাঁধের বিরুদ্ধে ধাক্কা দিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল।

নবরবিরশ্মিপ্রদীপ্ত সমুদ্রবক্ষে চলিতে চলিতে পুরোহিত বালিকাকে প্রশ্ন করিলেন—"তোমার পুঁটুলীর ভিতর কি?"

"রেশম, সুতা আর রুটী, কাপ্রীতে একজন স্ত্রীলোক ফিতা প্রস্তুত করেন, রেশমগুলি তাঁহার কাছে বিক্রয় করিব; সুতাগুলি আর একজন লইবেন।"

"এগুলি তোমার নিজ হাতে কাটা?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি না ফিতা বানানও শিখিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু মার শরীর দিন দিন খারাপ হইতেছে, সেজন্য আমি ঘরের বাহির হইতে পারি না। অথচ তাঁত কিনিবার মত এত অর্থও নাই।"

"মার শরীর খারাপ হইতেছে? বল কি? ইষ্টারের সময় যখন তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তখন ত তিনি উঠিয়া বসিতে পারিতেন!"

"গ্রীষ্মকাল আসিলেই তাঁর শরীর খারাপ হইতে থাকে। সেই বড় ঝড় আর ভূমিকম্পের পর হইতে তিনি বেদনায় একেবারে শয্যাগত হইয়া আছেন।"

"পরিশ্রম কর আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে থাক, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"আচ্ছা লরেলা, তুমি নৌকা-ঘাটে আসিলে ওরা তোমাকে দেখিয়া 'উগ্রচণ্ডা, নমস্কার।' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল কেন? বিনয় আর নম্রতাই খ্রীষ্টান বালিকার ভূষণ। তাহাদের পক্ষে ত অমন নাম ভাল নয়।"

বালিকার মুখমণ্ডল আরক্ত এবং চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"অন্যদের মত আমি নাচ গান করি না, আর বাচালতার প্রশ্রয় দিই না বলিয়া ওরা আমাকে উপহাস করিয়া ঐ নামে ডাকে। আমি ত কাহারো কোন ক্ষতি করি না, তথাপি কেন ওরা আমার পিছনে লাগে?"

"জীবনযাত্রা যাদের পক্ষে সহজ নাচগান তারাই

করুক, কিন্তু মিষ্ট ব্যবহার, মিষ্ট আলাপ দ্বারা সদ্ভাব ত তুমি সকলের সঙ্গেই রাখিতে পার।"

পাদ্রীর এই কথা শুনিয়া লরেলা যেন তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুইটি লুকাইয়া রাখিবার জন্যই ভ্রূরেখা অধিকতর সঙ্কুচিত করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। চারিদিক এখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তেজে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বিসুবিয়সের পাদদেশ তখন পর্য্যন্ত মেঘে ঢাকা থাকিলেও শিখর ভাগ হইতে ঘনঘোর কাটিয়া গিয়াছে। দূরে সরেন্তোর সমতল ক্ষেত্রে নেবু-বাগানে শ্যামলতার ভিতর ইতস্ততঃ শ্বেতপ্রভ মানবমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

পুরোহিত প্রশ্ন করিলেন—"নেপল্‌স্ সহরের সেই পাণিপ্রার্থী চিত্রকরের আর কোন সংবাদ পাইয়াছ লরেলা?"

লরেলা মাথা নাড়িয়া, জানাইল, 'না'। "সেবার সে তোমার একখানা ছবি আঁকিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তুমি রাজী হও নাই কেন?"

"সে অমন আসিবেই বা কেন? আমার চেয়ে সুন্দরী অনেক মেয়ে আছে। তা ছাড়া—কে জানে তার কি উদ্দেশ্য ছিল। মা বলিতেন, ছবির দ্বারা সে আমাকে যাদু করিয়া আমার আত্মার অনিষ্ট, এমন কি আমার হত্যা-সাধন পর্য্যন্ত করিতে পারিত।"

পুরোহিত ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন—"ছি, ছি, অমন পাপ জিনিষে বিশ্বাস করিও না। মনে রাখিও, যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তোমার মস্তক হইতে এক গাছি চুল পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতে পারে না, সেই জগদীশ্বর তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। একটা সামান্য ছবির বলে কি মানুষ তাঁহার চেয়ে শক্তিমান হইতে পারে? তা ছাড়া—সে ত তোমার হিতার্থীই ছিল। নতুবা কি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিত?"

লরেলা নীরব রহিল।

"তুমি প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? সে ত লোক ভাল শুনি, দেখিতেও সুপুরুষ। সে তোমাদিগকে বর্ত্তমানের দীনাবস্থা অপেক্ষা অধিকতর আরামে রাখিতে পারিত।"

লরেলা বলিল—"একে আমরা গরীব, তার উপর মার শরীর অসুস্থ। তাঁর পক্ষে আমরা গলগ্রহ-স্বরূপ হইতাম মাত্র। তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত মহিলা হইবার যোগ্যতা আমার নাই। আমাকে বিবাহ করিলে বন্ধু-সমাজে তিনি লজ্জিত হইতেন।"

"কি যে বল! আমি বলিতেছি সে চমৎকার লোক। অধিকন্তু ভবিষ্যতে সে সরেন্তোতেই থাকিবে মনে করিয়াছিল। ইহা তোমাদের পক্ষে কম সুবিধার কথা ছিল না। শীঘ্র অমন আর এক জন খুঁজিয়া পাইবে না, বিধাতা স্বয়ং যেন তাহাকে তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।"

অহঙ্কৃত স্বরে, কতকটা যেন স্বগতভাবেই বালিকা বলিল—"খুঁজিয়া পাইবার আবশ্যকতাও নাই; আমি বিবাহই করিব না।"

"কেন, শপথ আছে নাকি? না, সন্ন্যাসিনী হইতে চাও?"

সে মাথা নাড়িল।

"লোকে যে তোমার একরোখামিকে নিন্দা করে তাহাতে আর অন্যায় কি? তুমি ভাবিয়া দেখ না যে পৃথিবীতে তুমি একা নও। তোমার অবিবেচনার ফলে তোমার মাতার জীবন অধিকতর কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, এ ধারণা তোমার আছে কি? এমন কি গুরুতর কারণ থাকিতে পারে, যার জন্য তুমি সকল পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দাও?"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে নিম্নস্বরে সে বলিল—"কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বলিব না।"

"বলিবে না? আমাকেও না? আমি তোমার ধর্ম্মগুরু—যে কদাচ তোমার ইষ্ট ভিন্ন অন্য কামনা করে না,—তার কাছেও না? বল, যদি বুঝি তোমার কথাই ঠিক, আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার মতে মত দিব। কিন্তু এখনো তুমি বালিকা, সংসার-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা, ছেলে-মানুষী করিয়া হাতের সুখ পায়ে ঠেলিও না, পরে অনুতাপ করিতে হইবে।"

লরেলা আন্তোনিওর প্রতি একটি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সে পশ্চাতে বসিয়া পশমের টুপীটা ললাট পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া চিন্তানিবিষ্ট মনে দাঁড় টানিতেছিল। পাদ্রী লরেলার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া উৎসুক শ্রবণেন্দ্রিয় নিকটে আনিলেন।

সে কাণে কাণে বলিল—"আপনি আমার বাবাকে জানিতেন না?"

বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল।

"তোমার বাবা? তাঁহার মৃত্যুকালে তুমি নয় কি দশ বৎসরের ছিলে বোধ করি। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে এ আচরণের কি সম্পর্ক?"

"তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না। আপনি জানেন না যে তিনিই মার অসুখের কারণ।"

"কি করিয়া?"

"মার প্রতি তাঁর ব্যবহার ভাল ছিল না। মাকে তিনি প্রহার করিতেন, পদাঘাত পর্য্যন্ত করিতেন। এখনো আমার সেই সব রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে আছে, যখন তিনি বাড়ী আসিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যাইতেন। মা কোন দিন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতেন না। তথাপি তিনি তাঁহাকে এমন প্রহার করিতেন যে, দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইত। আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া সারারাত কাঁদিয়া কাটাইতাম। প্রহারে অবশাঙ্গ হইয়া মা যখন মাটিতে পড়িয়া যাইতেন, তখন সহসা পিতার মেজাজে পরিবর্ত্তন আসিত, তিনি তাঁহাকে সাদরে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া চুম্বনে-চুম্বনে প্রায় তাঁহার শ্বাস রোধ করিয়া দিতেন। এতসব অত্যাচারের কথা মা কাহাকেও বলিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রহারের ফলে তিনি ক্রমশঃ এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, পিতার মৃত্যুর এতকাল পরেও তিনি পুনরায় সুস্থ হইতে পারেন নি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি অচিরে মার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি জানিব কে তার কারণ।"

বালিকার উক্তি শুনিয়া পুরোহিত কিছু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। তিনি কতদূর তাহার সঙ্গে একমত হইবেন স্থির করিতে না পারিয়া সন্দেহে মস্তক আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"সে-সব দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া তোমার মার মত তুমিও তাকে ক্ষমা কর, লরেলা। বিধাতা নিশ্চয় তোমাদিগকে সুদিন দিবেন।"

বালিকা বলিল—"ভুলিব? কখনো না। জানেন, আমি যে বিবাহ করিব না, তার কারণ আমি কোন পুরুষের অধীন হইয়া থাকিতে চাই না। সে আমাকে তার ক্রীড়া পুতুলের ন্যায় যখন খুসী আদর অনাদর করিবে আমি তা সহ্য করিতে পারিব না। এখন যদি আমাকে কেহ প্রহার করিতে কিংবা চুম্বন দিতে আসে, আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু মার সে ক্ষমতা ছিল না, কারণ তিনি পিতাকে ভালবাসিতেন। আমি কোন দিন ভালবাসিয়া প্রেমাস্পদের জন্য এমন ভাবে পীড়া ভোগ করিতে প্রস্তুত নই।"

"তোমার কথায় তোমার সংসারানভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়, লরেলা। সংসারে সকল পুরুষই কি তোমার পিতার মত খেয়ালী ও ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া স্ত্রীর প্রতি এমন আচরণ করিয়া থাকে? তোমার প্রতিবেশীদিগের ভিতর কি তুমি এমন কোন স্ত্রী-পুরুষ দেখ নাই, যারা মনের মিলে সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবন যাপন করে?"

"সে কথা আর বলিবেন না। আমার পিতামাতাকেও লোকে সুখী দম্পতি মনে করিত। কারণ তারা ভিতরের কথা কিছুই জানিত না। প্রাণ গেলেও মা এ অত্যাচারের করুণ কাহিনী কারো কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতেন না। কেন?—শুধু তাকে ভালবাসিতেন বলিয়া, পিতার প্রতি অন্তরভরা প্রেম তাঁকে বোবা, তাঁকে আত্মরক্ষণে অক্ষম করিয়া দিয়াছিল। এই যদি প্রেমের স্বরূপ হয়, তবে বরং আমি কোন পুরুষকে প্রেমদান করিব না।"

"তুমি বালিকা, সুতরাং কি বল নিজে বুঝিতে পার না। যখন সময় আসিবে তখন হৃদয়ে স্বতঃই ভালবাসা না বাসার প্রশ্ন উত্থিত হইবে। তখন দেখিবে, বাল-মস্তিষ্কের এই সকল ধারণা কোন কাজে লাগিবে না।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"তুমি কি মনে কর সেই চিত্রকর তোমাকে বিবাহ করিলে সে তোমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত?"

"প্রহারের পরে পিতা যখন মাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইতেন, তখন তাঁর চক্ষে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত, চিত্রকরের চক্ষে সেইরূপ দৃষ্টি ছিল। এ দৃষ্টির স্বরূপ আমি ভালরূপে জানি। যে ব্যক্তি নিরপরাধা পত্নীকে

প্রহার করিতে অভ্যস্ত, সেই শুধু অমন ভাবে তাকাইতে পারে।”

এই বলিয়া সে চুপ করিল। পুরোহিতও নীরব রহিলেন। বালিকাকে কি বলা যায় মনে মনে সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পোতবাহের উপস্থিতি তাঁহাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল।

দুই ঘণ্টাকাল সমুদ্রবক্ষে চলিবার পর তাঁহারা কাপ্রী বন্দরে উপনীত হইলেন। তটসমীপে জলের অগভীরতার জন্য নৌকা সম্পূর্ণ তীরলগ্ন হয় নাই। আন্তোনিও পুরোহিতকে ক্রোড়ে করিয়া এই জলভাগ উত্তীর্ণ করিয়া দিল। লরেলা আন্তোনিওর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া দক্ষিণ হস্তে কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় এবং বাম হস্তে পুঁটুলী গ্রহণপূর্ব্বক জলরাশির উপর দিয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিল।

তীরে আসিয়া পুরোহিত বলিলেন—“আজ আমি কাপ্রীতেই থাকিব, সুতরাং আমার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয় কাল সকালের পূর্ব্বে আমি বাড়ী ফিরিব না।”

তার পর লরেলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“বাড়ী ফিরিয়া মাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইও। এই সপ্তাহে একবার তোমাদের ওখানে যাইব। তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবে ত?”

“যদি সুবিধা হয়।”

আন্তোনিও বলিল—“আমাকে ত ফিরিতেই হইবে। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। যদি না আসিতে পার, তাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না।”

পাদ্রী বলিলেন—“নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে, লরেলা। মাকে তুমি রাত্রে একা রাখিতে পার না। তুমি কতদূরে যাইবে?”

“আনা কাপ্রীতে* একটা আঙুর বাগে।”

“আমি কাপ্রীর দিকে চলিলাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।” পরে আন্তোনিওর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—“তোমাকেও রক্ষা করুন, বৎস!”

লরেলা পুরোহিতের হস্ত চুম্বন করিয়া উভয়ের প্রতি বিদায় বাক্য উচ্চারণ করিল। কিন্তু আন্তোনিও টুপী তুলিয়া পাদ্রীকে নমস্কার করিল মাত্র, লরেলার প্রতি ফিরিয়াও তাকাইল না।

অবশেষে উভয়ে পোতবাহের প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইলে সে কিছুক্ষণ বামদিকে শিলাবন্ধুর পথে ক্লিষ্ট পাদবিক্ষেপে গমনশীল পুরোহিতের প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর দক্ষিণে বালিকার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। লরেলা যে-পথে চলিতেছিল তাহা কিছুদূর গিয়া একটা পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। এই স্থানে উপনীত হইয়া লরেলা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য থামিয়া দাঁড়াইল, এবং একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নিম্নে নৌকাঘাট, চারিদিকে বন্ধুর গিরিমালা, দূরে নীলোজ্জ্বল সমুদ্রবক্ষ—লোচনরঞ্জন দৃশ্য বটে। দেখিতে দেখিতে একবার বালিকার দৃষ্টি অতর্কিতে আন্তোনিওর নৌকা এবং তথা হইতে একেবারে তাহার চক্ষুর উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের ভিতর একপ্রকার অপ্রতিভ ভাবদ্যোতক চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিল।—তাহার অর্থ এই, যেন ভুলক্রমে একাজ হইয়া গিয়াছে এবং সেজন্য তাহারা পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অবশেষে বালিকা পুনরায় মুখ কঠিন করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

(২)

বেলা একটা বাজিয়াছে মাত্র। কিন্তু আন্তোনিও ইহারই মধ্যে দুই ঘণ্টা কাল যাবৎ ধীবরদিগের পান্থশালার সম্মুখে একটি বেঞ্চের উপরে বসিয়া আছে। সে যেন কিসের জন্য বড় উতলা। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সে উঠিয়া রৌদ্রে গিয়া রাস্তার দিকে অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে।

অবশেষে সে গৃহকর্ত্রীকে বলিল—“দিনের অবস্থা সুবিধাজনক নয়; এখন দেখিতে পরিষ্কার বটে, কিন্তু আকাশের ও সমুদ্রের বর্ণ দেখিয়া মনে হয় পরিণাম আশঙ্কাজনক। বড় ঝড়ের পূর্ব্বে ঠিক এই প্রকার দেখা গিয়াছিল। আপনার মনে পড়ে না?”

“না।”

* কাপ্রী দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র নগর।

"ঝড় উঠিলে মনে পড়িবে।"

অল্পক্ষণ পরে গৃহকর্ত্রী প্রশ্ন করিল—"সরেন্তোতে কেমন লোকসমাগম হইতেছে?"

"বেশী না। সবে আসা সুরু হইয়াছে মাত্র। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বড় মন্দা সময় গিয়াছে।' যাঁরা স্বাস্থ্যের জন্য আসেন, তাঁরা এবার দেরী করিতেছেন।"

"এবার বসন্তকালও দেরীতে আসিয়াছে। উপার্জ্জন কেমন করিয়াছ, আমাদের চেয়ে বেশী?

"যদি শুধু নৌকার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম তাহা হইলে সপ্তাহে দুইদিন মাক্কারোণি* খাইবার অর্থও জুটিত না। মাঝে মাঝে নেপল্‌স্ সহরে এক আধখানা চিঠি লইয়া যাওয়া, নতুবা, কোন মৎস্যশিকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ান—নৌকার কাজ ত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমার একজন ধনী কাকা আছেন। তিনি বলিয়াছেন—তোনিও, যতদিন আমি আছি তোমার কোন ভাবনা নাই। আহার অভাবেও যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয় সে-ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইব। শীতকাল ত ভগবানের কৃপায় এই প্রকারে কাটাইয়া দিয়াছি।"

"তোমার কাকার সন্তানাদি নাই?"

"না,—তিনি বিবাহ করেন নাই। অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন। এখন তাঁর একটা মাছের কারবার খোলার মতলব আছে। যদি খুলেন, তাহা হইলে আমাকেই সে-ব্যবসায় দেখিতে হইবে।"

"তাহা হইলে ত তোমার সৌভাগ্য নিশ্চিত।" আন্তোনিও গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় রাস্তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

গৃহকর্ত্রী বলিল—"আরেক বোতল আনি না কেন? দাম ত তোমার কাকাই দিবেন।"

"বোতল নয়, বড় জোর এক গ্লাস। আপনাদের এখানে মদ বড় কড়া। আমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে।"

"ভয় নাই, বেশী খাইলেও কিছু হইবে না। ঐ যে আমার স্বামী আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া কিছুক্ষণ আলাপ কর।"

এমন সময় রাজপথে জেলেসরাইয়ের স্বত্বাধিকারীর মূর্ত্তি দেখা দিল। সে পাদ্রীর আহারের জন্য পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাকে মৎস্য সরবরাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। আন্তোনিওকে দেখিবামাত্র সে দূর হইতে প্রসন্নচিত্তে হাত দিয়া অভিবাদন করিল এবং নিকটে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক আলাপ সুরু করিল। গৃহস্বামিনী দ্বিতীয় বোতল প্রকৃত কাপ্রী-সুরা সহ পুনরাগমন করিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বামদিকের সড়কে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সকলে চাহিয়া দেখিল সে দিক হইতে লরেলা আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া বালিকা মাথা হেলাইয়া সকলকে অভিবাদন জানাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে ঈষদ্দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আন্তোনিও গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—"আমি চলিলাম। এই মেয়েটি সরেন্তো হইতে আজ প্রাতে পাদ্রীর সঙ্গে আসিয়াছে। রাত্রের পূর্ব্বেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

ধীবর বলিল—"আরে বস না, রাত্রিরও অনেক দেরী। আর-এক গ্লাস খাবার সময় পাইবে। ওগো, মেয়েটির জন্যও একগ্লাস লইয়া এস।"

"ধন্যবাদ, আমি খাব না।" লরেলা দূর হইতে উত্তর দিল।

"আরে ঢাল, ঢাল; তুমিও যেমন, ও এক অনুরোধ চায় আর কি।"

আন্তোনিও বলিল—"উহাকে বাদ দাও, বড় এক-রোখা মেয়ে, একবার কোন কিছুতে গোঁ ধরিলে, কার বাবার সাধ্য তাহা ভাঙ্গে।"

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিয়া নৌকার দিকে ধাবিত হইল এবং বন্ধন খুলিয়া বালিকার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

লরেলা পুনরায় ধীবর ও তাহার স্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত পাদবিক্ষেপে নৌকাভিমুখে চলিল। কোন সঙ্গী পায় কি না দেখিবার জন্য সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকাঘাট তখন জনশূন্য;

* খাদ্য বিশেষ।

১

জয়পুর মিনকারী
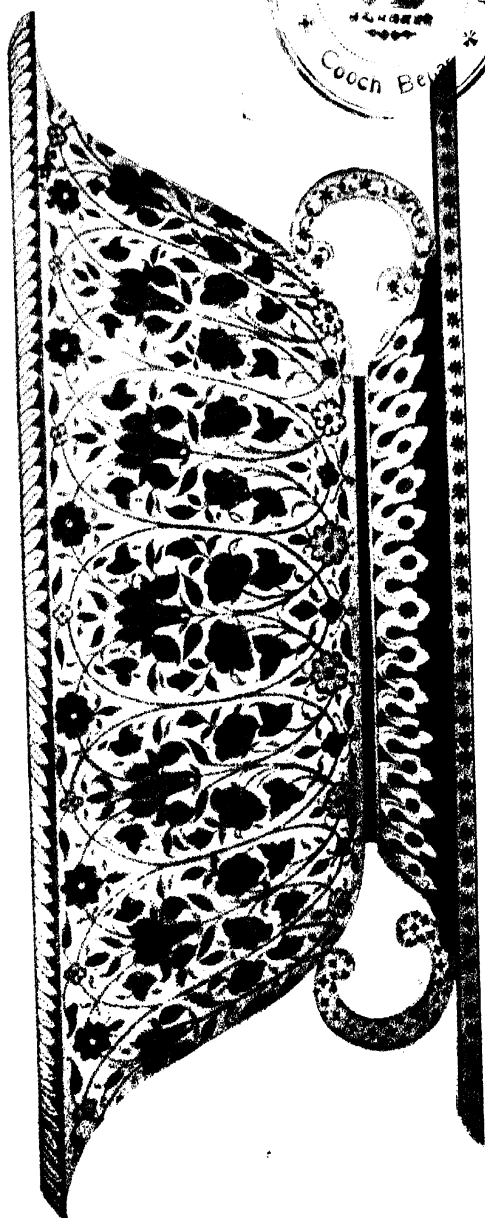
ধীবরেরা কেহ নিদ্রা যাইতেছিল, কেহ বা বাহির সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। কয়েকজন স্ত্রীলোক শিশুসহ দ্বারপ্রান্তে বসিয়া সুতা কাটিতেছিল। প্রাতে যে-সকল আগন্তুক আসিয়াছিল তাহারাও ফিরিবার জন্য অপরাহ্ণ-বেলার অপেক্ষা করিতেছিল। লরেলা অধিকক্ষণ এদিক্ সেদিক্ তাকাইবার অবসর পাইল না। কারণ সে টের পাইয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবার পূর্ব্বেই আন্তোনিও অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া নৌকায় লইয়া গেল। এবং তার পর একলাফে নিজে নৌকা-রোহণপূর্ব্বক ছুইটানে বাহির সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

লরেলা নৌকার সম্মুখে সঙ্গীর দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। আন্তোনিও একপার্শ্ব হইতে তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল মাত্র। সে দেখিল, বালিকার অবয়ব-সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অলকভারে তাহার ক্ষুদ্র ললাটদেশ ঢাকা পড়িয়াছে এবং নাসারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্ব ঔদ্ধত্যে কাঁপিতেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে যাইবার পর রৌদ্রতাপের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিয়া লরেলা রুমাল দিয়া মাথা ঢাকিয়া বসিল এবং পরে প্রাতে গৃহ হইতে আনীত রুটী খাইতে প্রবৃত্ত হইল, কারণ কাপ্রীদ্বীপে এপর্য্যন্ত সে কিছুই আহার করে নাই।

আন্তোনিও আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঝুড়ির ভিতর হইতে দুইটা কমলা বাহির করিয়া বলিল—"ইহা দিয়া রুটীখানা খাও, লরেলা। ভাবিও না তোমার জন্যই আমি এদুইটা রাখিয়া দিয়াছি। শূন্য ঝুড়িগুলি আবার নৌকায় বোঝাই করিবার সময় দেখিতে পাইলাম তলায় দুইটা কমলা পড়িয়া আছে। নিশ্চয়ই প্রাতে ঝুড়ির ভিতর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।"

"তুমিই খাও। আমার রুটীই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"অনেক দূর হাঁটিয়া আসিয়াছ, খাইলে এই গরমে আরাম পাইবে।"

"দরকার নাই। সহরে একগ্লাস জল খাইয়াছিলাম, তাহাতেই যথেষ্ট আরাম পাইতেছি।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা।" এই বলিয়া সে ফল দুইটি ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া দিল।

আবার নিস্তব্ধতা। বীচিবিক্ষোভহীন সমুদ্র দর্পণবৎ মসৃণ। দাঁড়ের আঘাতেও জলরাশি একান্ত শব্দমাত্রহীন। এমন-কি তটগহ্বর-নিবাসী শ্বেতসমুদ্র-পক্ষিগণও নিতান্ত নিঃশব্দ সঞ্চারে শীকার সংগ্রহ করিতেছে।

আন্তোনিও আবার বলিল—"না হয় কমলা দুইটা তোমার মার জন্যই লইয়া যাও।"

"তারও আবশ্যক নাই। বাড়ীতে এখন আছে, যখন না থাকিবে তখন কিনিয়া আনিব।"

"আমি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ দিলাম।"

"তিনি তোমাকে চেনেন না।"

"তুমি আমার পরিচয় দিও।"

"আমিও তোমাকে চিনি না।"

লরেলা এই যে প্রথমবার তাহার পরিচয় অস্বীকার করিল তাহা নহে। এস্থলে পূর্ব্ব ইতিহাস একটু বলা আবশ্যক। এক বৎসর পূর্ব্বে সেই পূর্ব্বোক্ত চিত্রকর সরেন্তো নগরে আসিলে, এক রবিবার আন্তোনিও তাহার সমবয়সী কতিপয় বালকের সঙ্গে রাস্তার অদূরে একটি উন্মুক্ত স্থানে "বোচ্চিয়া" খেলিতেছিল। সেইখানে লরেলার সঙ্গে চিত্রকরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। লরেলা সেদিন মস্তকে জলপাত্র বহন করিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া অলক্ষ্যে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ক্ষণিক দর্শনে লরেলার লাবণ্য চিত্রকরের চিত্তে এমন বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জের মত অনন্যমনে মুগ্ধনেত্রে সে বালিকাকে অবলোকন করিতে লাগিল। এমন সময় একটি কঠিন গোলক আসিয়া পাদদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ভাবনিমগ্ন হইবার এ উপযুক্ত স্থান নহে। অপরাধীর নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা আশা করিয়া সে চক্ষু ফিরাইয়া চাহিল। কিন্তু দেখিল, যে-বালক গোলক নিক্ষেপ করিয়াছিল, ক্ষমা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তৎপরিবর্ত্তে সে গর্ব্বিত ভাবে সঙ্গীদের ভিতরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাক্য-বিনিময় অপেক্ষা প্রস্থান করাই এরূপ স্থলে আত্মসম্মান রক্ষার শ্রেষ্ঠ বিধি মনে করিয়া চিত্রকর ধীরে ধীরে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাটি লোকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিল না। এমন-

কি পরে চিত্রকর প্রকাশ্যে লরেলার প্রণয়ার্থীরূপে বিদিত হইলেও তাহারা ইহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। একদিন চিত্রকর লরেলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি ঐ অভদ্র ছোঁড়াটার খাতিরে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাও?" লরেলা তখন উত্তর দিয়াছিল—"আমি তাকে চিনি না।" কিন্তু লোক-প্রচারিত সমস্ত কথাই তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং তখন হইতে আন্তোনিওকে দেখিলে সে তাহাকে ভাল রূপেই চিনিতে পারিত।

নৌকায় উভয়ে পরম শত্রুর মত পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া। উভয়ের বক্ষস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। আন্তোনিওর অমায়িক মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধে তাহার ওষ্ঠাধর মাঝে-মাঝে কাঁপিতে লাগিল। বালিকা যেন কিছু লক্ষ্য করে নাই, এরূপ ভাণ করিয়া অবিকৃত বদনে, ঈষন্নমিত দেহে হাতের আঙুলগুলি জলে ডুবাইয়া প্রবাহস্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল। তার পর মস্তক হইতে রুমাল খুলিয়া লইয়া অবিন্যস্ত কেশ-গুলি এমন ভাবে পরিপাটি করিতে লাগিল যেন নৌকাতে সে সম্পূর্ণ একা। শুধু ভ্রূরেখার ঈষদকম্পনে তাহার মানসিক চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতেছিল মাত্র।

ক্রমে তাহারা মধ্য সমুদ্রে উপনীত হইল। দূরে অথবা নিকটে কোথাও এখন আর ধবল বস্ত্র উড্ডীন দেখা যায় না। দ্বীপভূমি, অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে, সূর্য্যের আলোয় উপকূলভাগ দূর হইতে একটি চিক্কণ রেখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে মাত্র; সমুদ্র-বক্ষে বিপুল বিজনতা; এসময় সিন্ধু-শকুনেরও গতিবিধি রহিত। আন্তোনিও একবার চারিদিকে তাকাইল। কি-একটা চিন্তা তাহার মনে উদিত হইল। সহসা তাহার কপোল হইতে রক্তিমাভা মিলাইয়া গেল। সে দাঁড় টানা বন্ধ করিল। লরেলা উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ভীতিহীন নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল।

আন্তোনিও বলিয়া উঠিল—"এর একটা শেষ করিতে হইবে। অনেকদিন যাবৎ এরকম চলিয়াছে, এতদিনে একটা বুঝাপড়া হইয়া যাওয়া দরকার ছিল। আমাকে চেন না বলিলে? নিষ্ঠুর, তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার জন্য আমি কেমন প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উন্মত্তের মত তোমার পিছনে ছুটিয়াছি? আর তুমি কিনা আমাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছ।"

বালিকা সংক্ষেপে উত্তর দিল—"আমার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়া কি হইত? তোমাকে আমি—শুধু তোমাকে কেন—কাউকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

"কাউকে না? চিত্রকরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া মনে করিও না চিরদিন এমন কথা বলিতে পারিবে। জীবনে এক সময় এমন দিন আসিবে যখন তুমি অত্যন্ত একা বোধ করিবে; তখন হয়ত যে-কোন পুরুষকে বিবাহ করিয়া বসিবে।"

"ভবিষ্যতের কথা কেহ বলিতে পারে না। হইতে পারে, একদিন আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব। কিন্তু তোমার তাতে কি আসে যায়?"

"আমার তাতে কি আসে যায়?" ক্রোধে সে এমন বেগে গাত্রোত্থান করিল যে, নৌকা কাঁপিয়া উঠিল। "আমার কি আসে যায়? আমার হৃদয় জানিয়াও তুমি এমন প্রশ্ন করিতে পারিলে? নিষ্ঠুর, যদি কোন দিন আর-কোন পুরুষকে তুমি প্রেমদান কর, তবে ভগবান যেন তাহাকে অচিরে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করেন।"

"আমি কি তোমাকে কথা দিয়াছি? তুমি যদি আমার জন্য পাগল হও আমি কি করিতে পারি? আমার উপর তোমার দাবী কি?"

"ওঃ" সে বলিল—"ঠিক কথা, তোমার উপর আমার দাবী কি! আমার ত এসম্বন্ধে উকীলের লিখিত কোন দলিল-দস্তাবেদ নাই। কিন্তু আমি জানি, স্বর্গে মানুষের যে-অধিকার, তোমার উপর আমার সেই অধিকার। তুমি পরস্ত্রী হইবে, আর আমি সকলের বিদ্রূপ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, তুমি কি তাহাই মনে কর?"

"তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। ধমকে ভীত হইবার মেয়ে আমি নই। আমিও যাহা খুসী তাহাই করিব।"

আন্তোনিওর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল—"বলিলাম ত, বেশীদিন আর অমন ভাবে বলিতে হইবে

না। একটা সাধারণ একগুঁয়ে মেয়ের জন্য আজীবন আফ্‌শোষ্‌ করিয়া মরিব, আমার চিত্তও এত দুর্ব্বল নয়। কিন্তু জান, এখন তুমি আমার হাতে, আমি যা খুসী তাহাই করিতে পারি?"

চকিতা বালিকা দীপ্তনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"সাহস থাকে ত হত্যা কর না।"

আন্তোনিও উত্তর দিল—"কোন কাজ অর্দ্ধেক করিয়া রাখিতে নাই। যাহা সুরু করা হইয়াছে তা শেষ করাই কর্ত্তব্য। সমুদ্রে আমাদের দুই জনেরই স্থান হইবে।—এস, এক্ষণি, এই মুহূর্ত্তে দুইজনে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।"

বলিতে বলিতে সহসা সে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্ত পুনরায় পিছন দিকে সরাইয়া আনিয়া দেখিল, বালিকা তাহাকে এমন ভীষণ ভাবে দংশন করিয়াছে যে, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে।

লরেলা তাহাকে প্রবলবেগে ধাক্কা দিয়া বলিল,—"এখন দেখ, আমি তোমার হাতে কি না!"—পরমুহূর্ত্তে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া সে সমুদ্রে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিছুদূর গিয়া সে উপরে ভাসিয়া উঠিল; সিক্ত পরিধেয় বস্ত্র তাহার গাত্রের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল; জলের আঘাতে কবরী-বন্ধন শ্লথ হইয়া আপৃষ্ঠ বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছিল; প্রবল শক্তিতে দুই হস্ত দ্বারা সাঁতার কাটিতে কাটিতে সে ক্রমশঃ নৌকা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। আন্তোনিও প্রথমটা হতভম্ব হইয়া নৌকায় দাঁড়াইয়া আনমিত দেহে, স্থির বিস্মিত নেত্রে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিতেছিল। পরে সে শরীরের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে দাঁড় টানিতে টানিতে বালিকার অনুসরণ করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ যে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে তাহার সে-দিকে লক্ষ্য রহিল না।

বালিকা প্রাণপণ বলে সাঁতার দিতেছিল। তবু অল্পক্ষণের মধ্যেই আন্তোনিও তাহার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। বলিল—"দোহাই তোমার, লরেলা—নৌকায় উঠ। আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম; ঈশ্বর জানেন আমার বিবেক-বুদ্ধি কিসে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রোধে তখন আমার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ছিল না। আমি ক্ষমা করিতে বলি না, লরেলা, কিন্তু নৌকায় উঠিয়া জীবন বাঁচাও।"

বালিকা সাঁতার কাটিয়া চলিল, যেন সে কিছু শুনিতে পায় নাই।

"ডাঙ্গায় পৌছিতে পারিবে না, লরেলা, ডাঙ্গা এখনো দুই মাইল দূরে। তোমার মার কথা ভাবিয়া দেখ; তোমার যদি কিছু হয়, তবে তিনি ভয়েই মারা যাইবেন।"

আন্তোনিওর কথা শুনিয়া লরেলা দৃষ্টি দ্বারা তীরভূমি হইতে দূরত্বের পরিমাপ করিল। তারপর নিরুত্তরে কাছে আসিয়া নৌকার কিনারা ধরিল। আন্তোনিও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। বেঞ্চের উপরে তাহার জামাটা ছিল, বালিকার দেহভারে নৌকা একদিকে কাৎ হইলে সেটা সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। লরেলা নৌকায় উঠিয়া পূর্ব্বস্থান অধিকার করিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখিয়া, আন্তোনিও পুনরায় দাঁড় গ্রহণ করিল। বালিকা বসিয়া আর্দ্রবস্ত্রাদি এবং সিক্তকেশরাশি হইতে জল নিষ্কাশন করিতে লাগিল। অবশেষে একবার তাহার চক্ষু নৌকার তলদেশে পতিত হইবামাত্র আন্তোনিওর হস্তের দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে চমকিত হইয়া উঠিল এবং রুমালখানা আগাইয়া দিয়া বলিল—"এই নাও!" আন্তোনিও অসম্মতি জানাইয়া দাঁড় টানিতে লাগিল। তখন লরেলা উঠিয়া তাহার নিকটে গিয়া ক্ষতস্থান রুমাল দ্বারা বাঁধিয়া দিল এবং একটা দাঁড় তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া সম্মুখে বসিয়া নতনেত্রে তাহা টানিতে লাগিল। উভয়ের আনন শুষ্ক, উভয়ে নিস্তব্ধ। ক্রমে তীরের নিকটে আসিলে বহির্গামী ধীবরদিগের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ধীবরেরা লরেলাকে বিরক্ত করিল, আন্তোনিওকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া গেল। কিন্তু তাহারা চক্ষু তুলিল না কিংবা কোন উত্তর দিল না।

যখন নৌকা ঘাটে উপনীত হইল, সূর্য্য তখন অপরাহ্ণ-কাশে যথেষ্ট উচ্চে বিরাজ করিতেছিল। লরেলার আর্দ্র পরিচ্ছদ আসিতে-আসিতে একরূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া, সে [illegible] তীরে অবতরণ করিল। প্রভাতের [illegible]

এ-সময়ে ছাতে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া উপর হইতে প্রশ্ন করিল—"হাতে কি হইয়াছে, তোনিও ? হা ঈশ্বর ! নৌকা যে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে।"

আন্তোনিও উত্তর দিল—"বিশেষ কিছু হয় নাই। পেরেক লাগিয়া চামড়া একটু ছুলিয়া গিয়াছে মাত্র। কাল সকালেই সারিয়া যাইবে।"

"দাঁড়াও, আমি আসিয়া একটা ওষুধের পাতা লাগাইয়া দিতেছি।"

"আপনার আসার দরকার নাই। আমিই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। কাল প্রাতেই সারিয়া যাইবে।"

"বিদায় !" এই বলিয়া লরেলা পথ চলিতে লাগিল।

আন্তোনিও দৃষ্টি না তুলিয়া উত্তর দিল—"বিদায়।"

তারপর যাবতীয় নৌসামগ্রী এবং ঝুড়িগুলি সহ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া স্বীয় কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

(৩)

আন্তোনিওর প্রকোষ্ঠ দুইটিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। কুটীরে আসিয়া সে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল। জানালা খোলা ছিল, শীতল সমুদ্র-বায়ুপ্রবাহ ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। নির্জ্জনে আন্তোনিও কিছু আরাম অনুভব করিল। দেয়ালে যীশু-জননীর একটি প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সে অনেকক্ষণ তদ্গত-চিত্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোনরূপ প্রার্থনার কথা তাহার মনে উদিত হইল না। অভীষ্টজন যখন আশাতীত হইয়াছে তখন আর প্রার্থনা করিবে কি জন্য ?

দিবাভাগ আজ তাহার কাছে নিরতিশয় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। ব্যাকুলভাবে অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিতে ছিল। ক্ষতস্থানে বেদনা অনুভব করিয়া সে একটা বেঞ্চে উপবেশনপূর্ব্বক হাতের বাঁধন খুলিল। উন্মোচন মাত্র নিরুদ্ধ রক্তস্রোত পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে দেখিল ক্ষতস্থানের চারিদিকে হাতটা বেজায় ফুলিয়াছে। সাবধানে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে জলদ্বারা ইহা ধৌত এবং শীতল করিল। লরেলার দন্তচিহ্নগুলি সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিল। বলিল—"অন্যায় করে নাই। আমার মত পশুর প্রতি ইহাই যোগ্য আচরণ। কাল প্রাতে যোশেফ্‌কে দিয়া রুমালখানা ফিরাইয়া দিতে হইবে। আর আমি তাহাকে মুখ দেখাইতে চাহি না।"—পরে দাঁত এবং বামহস্তের সাহায্যে ক্ষতস্থানে পুনরায় বস্ত্র বাঁধিল; লরেলার রুমালখানা সযত্নে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিল। অবশেষে সে বিছানায় শুইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

বেদনায় গভীর রাত্রে চন্দ্রালোক-প্লাবিত কক্ষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জলসিঞ্চন দ্বারা জ্বালাধিক্য প্রশমিত করিবার জন্য সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেছে এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মৃদুপদধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হইল।

সে প্রশ্ন করিল—"কে ?"

কিন্তু উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই সে দ্বার অর্গল-মুক্ত করিয়া চৌকাঠে দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার সম্মুখে লরেলা।

লরেলা কোন কথা না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপর একটি ঝুড়ী রাখিয়া গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আন্তোনিও বলিল—"রুমালখানার জন্য আসিয়াছ বুঝি ? কিন্তু না আসিলেও পারিতে, আমি কাল প্রাতে যোশেফ্‌কে দিয়া পাঠাইয়া দিতাম।"

বালিকা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—"রুমালের জন্য আসি নাই। আমি পাহাড়ে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে রক্ত বন্ধ করিবার জন্য লতাপাতা লইয়া আসিয়াছি। এই দেখ।"—বলিয়া ঝুড়ির ডালা উত্তোলন করিল।

অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে আন্তোনিও উত্তর দিল—"বৃথা তুমি এ পরিশ্রম করিয়াছ। আমি ত আগের চেয়ে ভালই আছি। আর না থাকিলেই বা তোমার তাতে কি যায় আসে ? এমন সময় তুমি এখানে আসিলে কেন ? কেহ যদি দেখিতে পায়। জান ত, লোকে না জানিয়া কত কিছু বলাবলি করে।"

লরেলা বলিল—"লোকের কথার আমি তোয়াক্কা রাখি না। লোকে কি না বলে ? কিন্তু হাতখানা দাও দেখি, পাতা দিয়া আবার বাঁধিয়া দিই। এক হাতে তুমি নিশ্চয় ভাল করিয়া বাঁধিতে পার নাই।"

—"বলিলাম ত আবশ্যক নাই।"

—"না দেখিলে বিশ্বাস করি না।"

লরেলা হস্ত গ্রহণ করিয়া বন্ধন খুলিতে লাগিল। আন্তোনিও বাধা দিতে পারিল না। স্ফীত স্থান নিরীক্ষণ করিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল—"হা ঈশ্বর! এ কি!"

আন্তোনিও বলিল—"সামান্য ফুলিয়াছে মাত্র! একদিন এক রাত্রিতেই সারিয়া যাইবে।"

বালিকা মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল—"এক সপ্তাহ কাল তুমি সমুদ্রে যাইতে পারিবে না।"

"আমার ত মনে হয় পরশুই পারিব। না পারিলেই বা ক্ষতি কি?"

বালিকা এক বাল্‌তি জল আনিয়া ক্ষতস্থান পুনরায় নূতন করিয়া ধুইয়া দিতে লাগিল। তারপর সেই ধৌত ক্ষতের উপর লতাপাতা স্থাপিত করিয়া সাদা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিল। নিমেষে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল।

আন্তোনিও বলিল—"ধন্যবাদ। এখন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা। আজ ক্রোধান্ধ হইয়া আমি যে গুরুতর অন্যায় আচরণ করিয়াছি, আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা কর। এখনো আমি বুঝিতে পারি নাই, কিরূপে এমন ঘটিল। যাহা তোমার মনকে পীড়া দেয়, আমার মুখ হইতে আর কোন দিন তেমন বাক্য শুনিতে পাইবে না।"

বালিকা বলিল—"তুমি কেন ক্ষমা চাহিবে, আন্তোনিও? ক্ষমা ভিক্ষা করা বরং আমারই কর্ত্তব্য। আমি ত তোমাকে উত্যক্ত না করিয়া সমস্ত বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম। তা না করিয়া আমি তোমাকে দংশন—"

"সে তুমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া করিয়াছ। কিন্তু আমারও উচিত ছিল আত্মদমন করা। তুমি আর ক্ষমা-ভিক্ষার কথা মুখে আনিও না। তুমি আমার উপকার করিয়াছ, সেজন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। এই নাও তোমার রুমাল—এখন যাও, ঘুমোও গে।"

কিন্তু বালিকা নড়িল না। যেন আত্ম-যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল—"তুমিও ত আমার জন্য তোমার [illegible] হারাইয়াছ। আমি জানি কাল বিক্রয় করিয়া তুমি যে অর্থ পাইয়াছিলে, সমস্তই তাহাতে ছিল। ক্ষতিপূরণ করিব এমন সামর্থ্যও আমার নাই। যাহা কিছু অর্থ মার হাতে। আমার কাছে এই রূপার ক্রুস্‌টা আছে মাত্র। সেই চিত্রকর শেষবার আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এটাকে আমার টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছিল। এটা বিক্রয় করিলে আশা করি তোমার ক্ষতি সম্পূর্ণ পূরণ হইবে। যদি না হয়, বাকীটা আমি রাত্রে সূতা কাটিয়া পূরণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।"

ক্রুস্‌টা ঠেলিয়া দিয়া আন্তোনিও বলিল—"আমি কিছু চাই না।"

বালিকা বলিল—"এটা তোমাকে লইতেই হইবে। কে জানে কতদিন তুমি উপার্জ্জনহীন হইয়া বসিয়া থাকিবে। এইখানে রহিল, আমি আর উহা লইতে পারি না।"

"তাহা হইলে সমুদ্রে ফেলিয়া দাও।"

"এ কোন উপহার নয়; তোমার ন্যায্য দাবীর অতিরিক্ত কিছু দিতেছি না।"

"দাবী? তোমার কোন জিনিষের উপর আমার দাবী নাই। আর-একটা কথা শুন, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন পথে চলিতে চলিতে দৈবাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করিও, আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিও না। এই আমাদের শেষ দেখা। এখন যাও।"

এই বলিয়া আন্তোনিও ঝুড়ির ভিতর লরেলার রুমাল এবং ক্রুস স্থাপিত করিয়া ডালা বন্ধ করিল। পরে বালিকার প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া ভীত হইয়া পড়িল। সে দেখিল, তাহার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

আন্তোনিও বলিল—"এ কি! তুমি কি অসুস্থ বোধ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে যে!"

লরেলা উত্তর দিল—"কিছু না। বাড়ী চলিলাম।" এই বলিয়া টলিতে-টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, দ্বারের চৌকাঠে তাহার কপাল ঠুকিয়া গেল। সে রীতিমত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিল। তারপর অকস্মাৎ দেহ ফিরাইয়া

আন্তোনিওর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং প্রবল আবেগে তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিল—"অমন করিয়া পীড়িত বিবেকে আমাকে বিদায় দিও না। আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। যদি এখনো তুমি আমাকে ভালবাস তবে আমায় প্রহার কর, পদাঘাত কর, অভিশাপ দাও!—কিংবা আর যা-খুশী তাহা কর, শুধু অমন ভাবে আমাকে বিতাড়িত করিয়া দিও না।"

আন্তোনিও কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে বালিকার দেহ বাহুতে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে বলিল—"এখনো তোমাকে ভালবাসি কি না? তুমি কি মনে কর এই সামান্য ক্ষতের রক্তস্রাবে আমার হৃদয়ের রক্তও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে? জানি না তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এ প্রশ্ন করিলে কি না; কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

লরেলা আর্দ্র প্রেমমুগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"আমিও তোমাকে ভালবাসি। বহুদিন ধরিয়া ভালবাসি। এতদিন আমি তাহা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। তোমার এই নিষ্ঠুর বিদায়াঘাতে আমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি জানি, পথে আমাদের দেখা হইলে আমি তোমার দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিব না। হৃদয়-দেবতা! এই আমার চুম্বন গ্রহণ কর। চিত্তে যদি কোন দিন অবিশ্বাস আসে, তখন মনে মনে এই প্রবোধ রাখিও—আমি তোমাকে চুম্বন দিয়া গিয়াছি—জানিও, লরেলা যাহাকে বিবাহ করিবে না তাহাকে সে কোনদিন চুম্বনও করিবে না।"

এই বলিয়া সে আন্তোনিওকে তিনবার চুম্বন দিল। পরে নিজেকে ভুজবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় বলিল—"এখন আসি, প্রিয়তম! তুমি নিদ্রা যাও। হাতের প্রতি যত্ন করিও। আমি একাই যাইতে পারিব, তোমায় আসিতে হইবে না। এখন আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করি না।"

লরেলা দ্বারের বাহিরে আসিয়া নিমেষে প্রাচীরের ছায়ায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আন্তোনিওর মনে উত্তেজনা আসিয়াছিল, সে নিদ্রা যাইতে পারিল না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্ত গবাক্ষপথে তারাবিম্বিত সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে একদিন পাদ্রী, লরেলার স্বীকারোক্তি শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে গির্জ্জার বাহির হইয়া আসিলেন। মনে মনে বলিলেন—"মানুষের দৃষ্টি কি স্থূল! কে জানিত এই অপূর্ব্ব হৃদয়ের এত তাড়াতাড়ি এমন পরিবর্ত্তন ঘটিবে? যাক্, ঈশ্বর এখন তাহাকে সন্তান-সন্ততি দান করুন আর আমাকে এই কৃপা করুন, আমি বৃদ্ধ যেন পরমায়ুর বলে একদিন লরেলার স্বামীর পরিবর্ত্তে তাঁহার বড়ছেলের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারি। উগ্রচণ্ডা!"

ধ্বংসের পথে হিন্দু

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

১৯২১ সালের লোক-গণনা অনুসারে আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র বাংলাদেশের লোক-সংখ্যার মধ্যে হিন্দু ২,১৪,৫৭,৭৪৩ জন এবং মুসলমান ২,৬১,৩৪,৭১৯ জন; অর্থাৎ হিন্দু বাংলাদেশের লোক-সংখ্যার শতকরা ৪৩·৭২ ভাগ এবং মুসলমান শতকরা ৫৩·৫৫ ভাগ; শতকরা ৪ ভাগের কম লোক খৃষ্টীয়ান্, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২ সালে) কিন্তু দেশের এ-অবস্থা ছিল না; তখন হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। গত ৫০ বৎসর হইতে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে ... হিন্দুর

সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বুঝিতে সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধির একটা তুলনা-মূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

বৎসর	হিন্দু-সংখ্যা	মুসলমান-সংখ্যা	মন্তব্য
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী
১৮৮১	১৭২॥ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	মুসলমান ৬॥০লক্ষ বেশী
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুসলমান ১৬ লক্ষ বেশী
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুসলমান ২৬ লক্ষ বেশী
১৯১১	২০৬ লক্ষ	২৪২ লক্ষ	মুসলমান ৩৬ লক্ষ বেশী
১৯২১	২০৮ লক্ষ	২৫৪ লক্ষ	মুসলমান ৪৬ লক্ষ বেশী

উপরের তালিকা হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৭২—১৯১১ এই ৪০ বৎসরে হিন্দুর বৃদ্ধির হার ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ গত ১০ বৎসরে (১৯১১-২১) হিন্দুর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে প্রায় দুই লক্ষ কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হিন্দু-সমাজ-দেহে এমন কোন ব্যাধির বীজ প্রবেশ করিয়াছে, যাহা সমাজকে ক্রমশঃ অধঃপাতের পথে লইয়া যাইতে বসিয়াছে। এ-দিকে বাংলাদেশের হিন্দু-নেতাগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যাইতেছে।

গত ৪০ বৎসরের মধ্যে (১৮৮১-১৯২১) বাংলাদেশের কোন্ কোন্ প্রদেশে, হিন্দু ও মুসলমান কিরূপ হারে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

শতকরা বৃদ্ধির হার

(১৮১১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পশ্চিমবঙ্গ	২১.৫	৬.১
উত্তরবঙ্গ	১২.৯	৭.৪
মধ্যবঙ্গ	১০.৫	১৯.৩

পূর্ব্ববঙ্গের হিসাব ধরিলে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহাও একবার দেখা যাউক :—

শতকরা বৃদ্ধির হার

(১৮৮১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
ঢাকা-বিভাগ	৬১.৯	[illegible]
চট্টগ্রাম-বিভাগ	৭৯.৩	৬.০

সমগ্র বাংলাদেশের জন-সংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার হিসাব করিয়া দেখা যায়, গত ৪০ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৩৮.৫ ভাগ এবং হিন্দু বাড়িয়াছে শতকরা ১৫.২ ভাগ মাত্র, অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার গড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে। হিন্দুর জীবনী-শক্তিতে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগেই হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত গত দশ বৎসরের মধ্যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত প্রায় সকল বিভাগেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক অনুপাত (প্রতি দশ হাজারে)

বিভাগ	মুসলমান		হিন্দু	
	১৯২১	১৯১১	১৯২১	১৯১১
বৰ্দ্ধমান	১৩৪৪	১৩৪৪	৮২০৭	৮৩১৯
প্রেসিডেন্সী	৪৭৩২	৪৮৩৪	৫০৪৭	৫০২৩
রাজসাহী	৫৯৮২	৫৯২৭	৩৭৩৮	৩৯২১
ঢাকা	৬৯৬৯	৬৮৩৪	২৯৭০	৩১০২
চট্টগ্রাম	৭০৪০	৭০০০	২৬০১	২৬২০

আরও একটু বিশেষভাবে দেখিলে, বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

(১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পূর্ব্ববঙ্গ	৬৩.৭২	২৮.৪৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৩.৪৪	৮২.০৭

(১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
উত্তরবঙ্গ	৫৯·৮২	৩৫·৫২
মধ্যবঙ্গ	৪৭·৭২	৫১·৪৬

একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা বেশী এবং মধ্যবঙ্গে তাহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান এবং অন্যান্য দুই অঞ্চলে মুসলমানেরাই সংখ্যায় অত্যধিক। যেরূপ দ্রুতগতিতে হিন্দুর ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ শীঘ্রই হিন্দুশূন্য হইবে, সন্দেহ নাই। মধ্য-বঙ্গে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর বৃদ্ধির হার অধিক দেখা গেলেও, ইহাতে হিন্দুর উল্লসিত হইবার কিছুই নাই। আদমসুমারীর বিবরণে ইহার কারণ বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সহর মধ্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। কলি-কাতায় বঙ্গের বাহিরের বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বৎসর বৎসর আমদানী হইতেছে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কল-কারখানাসমূহেও অসংখ্য অ-বাঙ্গালী শ্রমিক ও মজুরের আগমন অহরহ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিকাংশ। এই কারণে মাত্র মধ্যবঙ্গে হিন্দুর বৃদ্ধির হার একটু বেশী দেখা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে মধ্যবঙ্গে "বাঙ্গালী-হিন্দু" যে মুসলমান অপেক্ষা সংখ্যায় বাড়িতেছে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ব-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গ স্বাস্থ্যকর এবং হিন্দু-প্রধান পশ্চিম-বঙ্গ ও মধ্য-বঙ্গ অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের ভূমির উর্ব্বরাশক্তিও বেশী। অতএব, পূর্ব্ব-বঙ্গে ও উত্তর-বঙ্গের মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং পশ্চিম-বঙ্গে ও মধ্য-বঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা কমিতেছে এবং তাহার ফলেই সমগ্র বাংলা দেশে মুসলমান বাড়িতেছে এবং হিন্দু কমিতেছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে যে-সকল তালিকা দেখান হইয়াছে, সেগুলি একটু বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এরূপ ধারণা অযৌক্তিক ও অমূলক। নদীমাতৃক পূর্ব্ব-বঙ্গ বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তাহার উর্ব্বরাশক্তিও বেশী; অথচ পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হারের এত অধিক অসামঞ্জস্য কেন? পূর্ব্ব-বঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থানে ত হিন্দুরাও বাস করে এবং তথাকার ভূমির উর্ব্বরাশক্তির সুযোগ হিন্দুরাও উপভোগ করিয়া থাকে। ঢাকা-বিভাগে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার প্রায় তিন গুণ এবং রাজসাহী-বিভাগে হিন্দুর বৃদ্ধির হার মুসলমানদিগের বৃদ্ধির হারের প্রায় অর্দ্ধেক।

মুসলমানদের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা যে হিন্দুদের শতকরা বৃদ্ধির হার কম, শুধু তাহাই নহে। মৃত্যুর হারও মুসল-মানদের অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে বেশী। নিম্নে ১০ বৎসরের হিসাবে তাহা দেখান হইল।

হাজার-করা মৃত্যুর হার

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১১	৩৩·৯	২৯·৫
১৯১২	৩০·৪	২৭·৬
১৯১৩	২৯·০	২৮·৪
১৯১৪	৩০·১	৩০·২
১৯১৫	২৯·১	৩২·০
১৯১৬	২৯·২	২৮·০
১৯১৭	৩৩·৩	৩১·৯
১৯১৮	৬৪·৬	৫৬·১
১৯১৯	৩৬·৪	৩৩·৬
১৯২০	৩১·০	৩০·০

গত দশ বৎসরে (১৯১১—২১) বাংলাদেশে হিন্দুর হ্রাস অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। এই দশ বৎসরে সমগ্রদেশে মুসলমান প্রায় ১২ লক্ষ বাড়িয়াছে, আর হিন্দু প্রায় দুই লক্ষ কমিয়াছে। এই দশ বৎসরের হিন্দু-মুসলমানের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনা করিলে বিষয়টি আরও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

(১৯১১—২১)

	মুসলমানের বৃদ্ধির হার	সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি
পশ্চিম-বঙ্গ	—৪·৯	—৪·৯
মধ্য-বঙ্গ	—১·৮	+০·৪
উত্তর-বঙ্গ	+২·৯	+১·৯

(১৯১১—২১)

	মুসলমানের বৃদ্ধির হার	সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি
পূর্ব্ব-বঙ্গ	+৯.৯	+৮.৩
সমগ্র বঙ্গ	+৫.২	+২.৮

	হিন্দুর বৃদ্ধির হার	সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি
পশ্চিম-বঙ্গ	—৫.১	—৪.৯
মধ্য-বঙ্গ	+২.৩	+০.৪
উত্তর-বঙ্গ	—৩.২	+১.৯
পূর্ব্ব-বঙ্গ	+৪.৬	+৮.৩
সমগ্র বঙ্গ	—০.৭	+২.৮

বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র সাধারণ লোক-সংখ্যার তুলনায় যে হিন্দুর হ্রাস হইয়াছে তাহা দেখা যাইতেছে। সমগ্র বাংলাদেশে গত দশ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৫.২ ভাগ—আর হিন্দু কমিয়াছে শতকরা ০.৭ ভাগ।

এই ত আমাদের বাংলাদেশের হিন্দুর অবস্থা। অবনতির কারণ বুঝিতে পারিলে,প্রতিকারের জন্য সকলেই যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন। এ-সময়ে নেতাদের কর্ত্তব্য, দেশের লোককে এই মারাত্মক ব্যাধির কারণ বুঝাইয়া দেওয়া এবং প্রতিকারকল্পে নিষ্ঠা সহকারে কর্ম্মে রত হওয়া। এই হইলেই আমাদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে, নতুবা ধ্বংস আমাদের অনিবার্য্য !!

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

যুক্ত-প্রদেশ

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

৫ই অক্টোবর সোমবার। কানপুরের পথে মোহার ব'লে একটা ছোট গ্রাম আছে। এখানে গাছে গাছে অসংখ্য পাখী দেখা যাচ্ছে। কাঁক, কাস্তেরো, কাদাখোঁচা, মাণিক-জোড় সবই শিকারের পাখী। সঙ্গে বন্দুক না থাকার জন্যে বড় আপ্‌শোষ হচ্ছিল। ফতেপুর থেকে ৩৫ মাইল ও কলকাতা থেকে ঠিক ৬২৮ মাইল আসার পর একটা ষ্টাণ্ডার্ড গাড়ীর পিছনের চাকায় ফুটো (puncture) হ'ল। এই প্রথম puncture। আজ রাস্তা বেজায় খারাপ—গাড়ীর ধাক্কার (jolting ও jerking) জন্যে গায়ে হাতে ব্যথা হ'য়ে গেল। বেলা দেড়টার পর আমরা কাণপুর সহরতলীতে এসে পড়লাম। পাশে পাশে মিল ও মিলের রেল-লাইন আর তার পাশে পাশে বস্তি। কাণপুরে প্রথম ট্রাম দেখা গেল, কলকাতার তুলনায় বেজায় ছোট ও নেহাৎই যেন কেমন-কেমন।

যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে কানপুর সব-চেয়ে বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। সিপাহী বিদ্রোহের জন্যে কানপুর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বটে, কিন্তু কানপুরের কলকারখানা, বাজারে নানাপ্রকার ফসলের আমদানী-রপ্তানী ও লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইসবই আধুনিক কানপুরের প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের কারণ। কানপুর থেকে রাস্তার বাঁদিকে ঝাঁন্সী ও ডান দিকে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার রাস্তা।

মিটারে ৬৪০ মাইল উঠেছে। সুতরাং আজ আমরা মোটে ৪৭ মাইল এসেছি।

৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার। সকাল থেকেই মেঘ ক'রে রয়েছে। দিনটা বেশ ঠাণ্ডা। বি-বি, সি-আই রেল লাইন, পাশে পাশে রাস্তার সঙ্গে চলেছে। এক পাশে একটা বড় সরকারী কৃষিক্ষেত্র দেখা গেল। ইশান নদী ও রাস্তার পুল পার হ'য়ে সুরেশপুর গ্রাম। [illegible] আসার পর একটি রাস্তা ট্রাঙ্ক রোড থেকে ডান দিকে চ'লে গেছে। মোটরের পথ নির্দেশক [illegible], ডান দিকের রাস্তাটি দিল্লী কিম্বা ও সোজা রাস্তাটি [illegible] দিকে গেছে,

দেখাচ্ছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এপর্য্যন্ত কোথাও এরকম হঠাৎ মোড় ফেরে-নি। সেইজন্য আমাদের এখানে একটু সন্দেহ হ'ল। দূরে ডানদিকের রাস্তা থেকে একটা এক্কা আস্‌তে দেখে তার কাছ থেকে সঠিক খবর পাব এই আশায় আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

এক্কার ভেতর থেকে একটি প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক (পরে অবগত হলাম তিনি পুলিশের লোক) মুখ বার ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—

"দিল্লীর রাস্তা কোন্‌টি বল্‌তে পারেন?"

গম্ভীর ভাবে উত্তর হ'ল—"সোজা যাও।"

সুতরাং দেখ্‌লাম কাষ্ঠফলকে ভুল নিশানা দেখাচ্ছিল। কিন্তু পাঠকগণের স্বভাবতই কৌতূহল হ'তে পারে যে, রাস্তায় এরকম ভুল নিশানা থাক্‌বার কারণ কি। এইরকম ভুল নিশানার জন্যে রাস্তা-বিভ্রাট পরেও আমাদের হয়েছিল। এর কারণ আর কিছু নয়; সাধারণতঃ রাস্তার এইরূপ মোড়ে যে-সব নিশান-ফলক থাকে, সেগুলি প্রায়ই তেমন মজবুত ও দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে গাঁথা থাকে না। কাজেই একটু বেশী ঝড়-হ'লে বৃষ্টি বা চলন্ত গরুর গাড়ীর সামান্য একটু ধাক্কা লাগ্‌লেই নিশান-ফলকগুলি ভূমিসাৎ হয়। তারপর যথাসময়ে সর্‌কারী কুলীরা যখন রাস্তা মেরামত কর্‌তে আসে তখন তারা পুনরায় নিশান-ফলকটিকে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন নিশান-ফলকটি উল্‌টা-পাল্‌টা হ'য়ে যায়। তারা ইংরেজীতে লেখা ফলকের দিক-নির্দ্দেশ কিছুই বোঝে না। সুতরাং বিদেশী পথিককে রাস্তা হারাতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

খানিক দূর গিয়ে একটা ছোট গ্রামের ধারে চা তৈরী কর্‌বার জন্যে নেমে পড়্‌লাম। গ্রামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি আমাদের কয়েক প্যাকেট চা উপহার দিলেন। রাস্তার ওপরে এঁর আতর ও গোলাপ-জলের প্রকাণ্ড কার্‌খানা। গ্রামের পাশের এক রাস্তা দিয়ে কনোজ মাত্র এক মাইল দূর। এ সুযোগ ছাড়া উচিত মনে হ'ল না। সোজা কনোজে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। কনোজ এখন একখানি গ্রাম মাত্র। জয়চাঁদের দুর্গ প্রায় দেড়শত ফিট উঁচু মাটীর স্তূপ,—উপরে এখন ভুট্টার চাষ হচ্ছে। দুর্গের স্মৃতিস্বরূপ এক পাশে একটি থামের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন দেখা যায়। প্রাচীনযুগের নিদর্শন হিসাবে এইখান থেকে একটা লতাপাতাকাটা ছোট ইট সংগ্রহ ক'রে নিলাম। এরই পাশে একটি বড় সুন্দর ও পুরানো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল।

সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। গুরসাহীগঞ্জ আর কয়েক মাইল দূর। সেইখানেই আজ রাত্রের মতো ছাউনি পড়্‌বে। পালে পালে গরু, মহিষ মাঠ থেকে ফির্‌ছে। গোধূলি-বেলায় অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু যেন 'গোধূলিতে' আরও ম্লান হ'য়ে গেছে। সমস্ত 'গো-ধূলি' শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে সঞ্চয় ক'রে আমরা গুরসাহীগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে একটি রাস্তা ডানদিকে ফতেগড় অভিমুখে গেছে।

গুরসাহীগঞ্জ বি-বি, সি-আই রেলের একটি ছোট ষ্টেশন। রাস্তার দু'পাশে কয়েকটি দোকান ও বাড়ী নিয়ে গ্রামটি তৈরী হ'য়েছে। সুবিধা মতো থাক্‌বার জায়গা না পেয়ে প্রথমে ষ্টেশন-মাষ্টার মশায়ের কাছে দর্‌বার করা গেল; সুবিধা করতে পার্‌লাম না। শুন্‌লাম একটি ধর্ম্মশালা এখানে আছে, অগত্যা সেইখানেই যাওয়া গেল।

যুক্ত-প্রদেশের মতো আচার-ব্যবহারের গোঁড়ামি আর আমরা কোথাও দেখিনি। এখানে কুয়া থেকে জল তোল্‌বার বালতি হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আলাদা। ভুলক্রমে যদি কোনো মুসলমান হিন্দুদের 'ডোল' ছোঁয় তা হ'লে সেখানে রীতিমত এক দাঙ্গা বেধে ওঠ্‌বার জোগাড় হয়। দৈবাৎ যদি কোনো বিদেশী, মুসলমানের কাছ থেকে খাবার জিনিষ-পত্র কেনে তবে পরে হিন্দুদের কাছ থেকে তার কোনো কিছু কিন্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দু হ'য়ে জুতা প'রে জল খাওয়া ও মাথায় 'সাহেবী টোপ' পরার উদ্দেশ্য যে কি তা কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারি-নি। মুসলমানেরা কাচের বাসন ব্যবহার করে ব'লে চায়ের এনামেলের মগ-গুলিও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

সুতরাং ধর্ম্মশালায় আর আমাদের স্থান হ'ল না। অনেক কষ্টে ধর্ম্মশালার বাইরের রোয়াকে থাকবার 'অনুমতি' জোগাড় করলাম। এক কনোজীয়া ব্রাহ্মণের দোকান থেকে পুরী, মাংস কিনে রাতের মতো খাওয়া শেষ করা গেল। কনোজীয়াদের গোঁড়ামি কিছু কম, এরা বাঙ্গালীদের মতো মাছ-মাংস সবই খায়।

সব সাইকেলগুলিকে এক-সঙ্গে চাবি দিয়ে আমরা সতর্ক হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। আজ ৬৮ মাইল আসা হয়েছে। কলকাতা থেকে এখানকার দূরত্ব ৭০৫ মাইল।

৭ই অক্টোবর বুধবার। আজকে রাস্তার প্রথমে দুপাশে ভুট্টা জনারের ক্ষেত ; কদাচিৎ দু'একটা ধানের ক্ষেতও আছে। কূয়ার গভীরতা বড় বেশী ব'লে বলদের সাহায্যে জল তুলে এরা ক্ষেতে ফসল তৈরী করে। এখানকার চাষী বাংলার মতো অদৃষ্টবাদী নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখলাম, কোথাও কোথাও পুকুরে পাট পচান ও আছড়ান হচ্ছে। উটে-টানা দ্বিতল গাড়ী সারি দিয়ে চলেছে। গাড়ীর চেয়ে তাকে খাঁচা বললেই ভাল হয়—একটি দ্বিতল খাঁচা গরাদে দেওয়া তলায় চারটি ছোট ছোট চাপে। পাশে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখা গেল যেন সবুজ মখমলে মোড়া। এঅঞ্চলে এরকম মাঠ প্রায়ই দেখা যায়। এগুলিকে এন্‌ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে। এখানে সরকারী কর্ম্মচারীরা সফরে এসে ছাউনি ফেলে থাকেন।

দুপুরের পর বেওয়ার ব'লে একটা বড় গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা এটা-র দিকে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। বেওয়ার থেকে ডান দিকে ফতেগড় ও বাঁদিকে এটোয়া যাবার পথ। চারিদিকের দৃশ্য যেন হঠাৎ বদলে গেল। এখানে রাস্তার পাশে পাশে বড় বড় elephant grass কয়েক মাইল ধ'রে চলেছে। একদল হরিণ হঠাৎ রাস্তার একপাশ থেকে বেরিয়ে আমাদের সাইকেলের সুমুখ দিয়ে ছুটে বড় বড় ঘাসের বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এক দলের পর আর-এক দল এমনি পালে পালে কৃষ্ণসার কখন বা ছোট চিত্তল হরিণের দল দেখা যেতে লাগল। টিয়ার ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, বিচিত্র কলরব করতে করতে। পথে কেবল হরিণের পাল আর টিয়ার ঝাঁক—যেন আজ আমরা এদেরই রাজত্বে এসে পড়েছি!

প্রায় বেলা তিনটার সময় ভনগাঁওয়ে উপস্থিত হ'লাম। এখান থেকে বাঁদিকে সিকোহাবাদ হ'য়ে আগ্রার পথ চ'লে গেছে। দূর মোট ৭৫ মাইল। ডান দিকে ফতেগড় যাবার রাস্তা।

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম ছটায় মাঠ পথ লাল হ'য়ে গেছে। ক্রমশঃ অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললে। পর পর তিনটি খাল (Lower Ganges Canal) পার হ'য়ে আমরা আলো জেলে চলেছি। কর্ম্ম-কোলাহল-রত ভারাক্রান্ত ধরিত্রী এখন নিস্তব্ধ, স্থির! অন্ধকারের বুক চিরে' একটা আলোর রেখা আমাদের সাম্‌নে এসে পড়ল। উৎসাহে এগিয়ে চললাম, মনে হ'ল আজকের মতো পথের শেষে এসে পড়েছি। সমস্ত দিনের রোদ, তৃষ্ণা ও এই পরিশ্রমের পর,—আঃ সে কি আরাম!

বাজনা ও লোকজনের গোলমাল কানে এল—ভাবলাম বোধ হয় সহরে কোনো কারণে মিছিল বেরিয়ে থাকবে। পাঞ্চ-লাইট্‌-দেওয়া চৌমাথায় এসে দেখি পাশের মাঠেই সিনেমা ব'সে গেছে। এদের ঐক্যতান-বাজনার হট্টগোল আমরা অনেক দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। তা হ'লে এটায় এসে পড়েছি। এইবার থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করতে পারলেই আজকের মতো নিশ্চিন্ত। বাঁদিকে বড় বড় অনেক হাঁসপাতালের কোয়ার্টার্‌স্ খালি রয়েছে দেখা গেল। এরই যে-কোনো একটা বারান্দায় আমাদের বেশ চ'লে যেতে পারে। হাঁসপাতালের 'বড় ডাক্তার সাহেবের কাছে যাওয়া গেল অনুমতি চাইবার জন্যে। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের কাছে বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতেই তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন বাইরের দিকে। আমরা আর-এক রকম অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। উপায় না দেখে অগত্যা এক-বার পুলিসের কাছে ভাগ্য পরীক্ষা করবার জন্যে থানার দিকে রওনা হ'লাম।

থানায় মামুলি পরিচয় দিতে খানিকক্ষণ গেল। এই একটা কাজ যা ক্রমশঃই বিরক্তিকর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল। প্রথমতঃ আমাদের আদ্যোপান্ত বিবরণ। হয়ত প্রত্যেক দিন কম ক'রে পাঁচ-সাত বার দিতে হয়, [illegible]

উপর্য্যুপরি সম্ভব অসম্ভব নানা-প্রকারের প্রশ্ন! যাই হোক এখানকার ইন্‌স্‌পেক্টার্‌ সাহেব বেশ ভদ্রলোক। ইনি আমাদের জন্য ঘর, 'চারপাই', স্নানের জন্যে জল, প্রভৃতির বন্দোবস্তও ক'রে দিয়েছিলেনই, উপরন্তু তাঁর অনুগ্রহে ফাই-ফরমাস শোন্‌বার একটা চাকরও সে-রাতের মতো আমরা পেয়ে গেলুম। এ অবস্থায় একটি অনুগত ভৃত্য লাভ আমাদের পক্ষে বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

বাজার থেকে খাবার আনিয়ে বিছানায় ব'সে খাওয়া হ'ল। বিছানা পাতা, সাইকেল পরিষ্কার, জিনিসপত্রের ধূলা ঝাড়া, এইসব কাজ আমাদের আজ আর কর্‌তে হ'ল না। চাকরের দ্বারাই সব সারা গেল। আজ ৭৯ মাইল আসা হয়েছে, কলকাতা থেকে দূরত্ব মোট ৭৮৪ মাইল।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস *

শ্রী চারুবালা সরকার

এ বৈচিত্র্যময় সংসারে মানব নিত্য আসে নিত্য যায়, বিশ্বেশ্বরের নিত্যলীলায় নরনারীর জন্ম-মৃত্যু চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মতই সংঘটিত হয়, কিন্তু কখন্ কে আসে আর কেবা যায়, কে তাহার সংবাদ লয়? কে বা কাহাকে মনে রাখে? শিশু, বৃদ্ধ নরনারী নীরবে আসে, নীরবেই চলিয়া যায়; আপন ঘরে নিতান্ত আপনার জন ছাড়া সে সংবাদ বড় কেহ রাখে না। কিন্তু এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে এমন এক-একজনের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের কেহ পর ভাবিতে পারে না, যাঁহাদের জীবন জগতের সম্মুখে এমন এক আদর্শ রাখিয়া যায় যাহা অনেককেই আদর্শ-জীবন গঠন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাঁহাদের কৃতকার্য্যের ও দত্ত উপদেশের ফলে মানব-জীবনের কত না উন্নতির পথ মুক্ত হয়, জগতের কত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং যাঁহাদের বিয়োগ-দুঃখে আত্মপর-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণকেই ব্যথিত, শোকার্ত্ত করে। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও, যখনই সে পূতস্মৃতি মনের মধ্যে উদয় হয়, সারাচিত্ত মথিত করিয়া একটা 'হায়' 'হায়' ধ্বনি উঠে; অন্তরে এ প্রশ্ন উঠে—হায়, কেন সে-জীবন দীর্ঘ হইল না! এমনই একটি দিব্য আত্মা ছিলেন পূত-শীলা স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস। তাঁহার বিয়োগে আজ নরনারীর চিত্ত ব্যথিত, তাঁহার অদর্শনে নারী-সমাজ হইতে সেই 'হায়' 'হায়' ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

তাঁহাকে পাইবার ও জানিবার সৌভাগ্য আমার বেশী দিন হয় নাই; কিন্তু যতটুকু জানিয়াছি, তাঁহার মুখে অন্তরের যে-ছবি দেখিয়াছি অল্পদিনের স্বল্প সময়ের আলাপে যতটুকু বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতেই তাঁহাকে নারীরূপে দেবী বলিয়াই জানিয়াছি ও আজ পর্য্যন্ত অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আসিতেছি।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয়, তাঁহার শেষ জীবনে। শেষ দশ বৎসরের বৈধব্য-দশায় তাঁহার তপস্বিনী-জীবনের কতক বিবরণ শুনিয়াছি, কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছি। গৃহে, শিক্ষাগারে, স্ত্রীমহামণ্ডলের কর্ম্মে, অনাথ বালক-বালিকা ও নিরাশ্রয় নারী-সমাজে তাঁহার অক্লান্ত নিঃস্বার্থ সেবাব্রত দেখিয়াছি। যখনই তাঁহার পত্র পাইয়াছি অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, তাঁহার অপার স্নেহাদরে ধন্য হইয়াছি, মধুর আলাপে তৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছি; আর সেই প্রতিভাময়ীর পবিত্র ও মহনীয় জীবনের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া হাসিতে-হাসিতে গৃহে ফিরিয়াছি। কিন্তু হায়, সেদিন তাঁহার চির-বিশ্রামের

* মেরী কার্পেন্টার হলে ৺কৃষ্ণভাবিনী স্মৃতি-উপলক্ষে মহিলা-সভায় পঠিত।

দিন তাঁহার আশ্রমস্থ এক বাল-বিধবার পত্রে—কয়দিন হইতে তিনি অসুস্থ এবং আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বহু মাতৃহীনা ও বাল-বিধবার বুকফাটা আর্ত্তনাদ এবং চতুর্দ্দিকে 'হায় হায়' রব শুনিতে শুনিতে, চোখের জলে ভাসিয়া শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছি। ইহার ঠিক দশদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়, সেদিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ-মনে আমাকে স্ত্রীমহামণ্ডল এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলেন এবং আমায় তাঁহার স্বর্গগতা কন্যা তিলোত্তমার "আক্ষেপ" নামক পদ্যগ্রন্থ দেন। আর একদিন আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সেদিন যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লই, তখন আমার কি তাঁহার নিজেরও মনে সন্দেহের উদয় হয় নাই যে এই দেখাই শেষ দেখা, আর ক'দিন পরেই তাঁহাকে সমুদয় অপূর্ণ আশা, অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া সহসা চলিয়া যাইতে হইবে!

নারীর কল্যাণব্রতে, নিরুপায় বালকবালিকার উপায়-বিধানে বঙ্গজননী কৃষ্ণভাবিনী সমাজের কোন্ স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মগোপনের প্রবৃত্তি তাহা সাধারণকে জানিতে দেয় নাই। জীবিতকালে অতি সন্তর্পণে সকল কর্ম্মের পশ্চাতে যিনি আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, সমাজও যাঁহার নীরব সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অভাবই তাঁহাকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই আত্মপ্রকাশে সঙ্কুচিতা নিঃস্বার্থ হিতকারিণীকে হারাইয়াই নারীজগৎ তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, সেই স্বর্গবাসিনীর পূতস্মৃতি সমাজ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার জন্য সজাগ হইয়াছেন। যদি আমরা তাঁহাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাকি, অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, তাঁহার বিয়োগে যথার্থ প্রাণে ব্যথা পাই, তাহা হইলে শুধু কথায় নহে, কাগজে নহে, কাজে তাহা প্রকাশ করিব, তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করিব, অন্তের জন্য সেই পথ মুক্ত ও সুগম করিয়া দিব, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রত আমরা উদ্‌যাপন করিব বা এতটা অগ্রসর করিয়া দিয়া যাইব যে ভবিষ্যৎ নারী-সমাজ তাঁহারই সাধনা ধরিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তাঁহার পূতস্মৃতি রক্ষা-কল্পে তাঁহারই প্রিয় কর্ম্ম সাধনোদ্দেশে নীরব কর্ম্মীর দল পুষ্ট করিবে।

তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী। নারী-জন-হিতকর সকল কাজে তাঁহার যোগ ছিল ও ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডলের তিনি প্রধান কর্ম্মী ও প্রাণস্বরূপা ছিলেন কিন্তু আপনাকে জাহির করিতে কখন তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ভাব-প্রকাশের শক্তি ও মধুর ভাবে গুছাইয়া বলিবার ও লিখিবার ভাষা তাঁহার ভাল রকমই ছিল কিন্তু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে তাঁহাকে বড় কখনও দেখা যায় নাই। তিনি সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর ইংরেজীতে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনস্থল ব্যতীত কখন তাহার আশ্রয় লইতেন না। জীবনে তাঁহার স্কুল-কলেজের শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ না ঘটা এবং উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ তাঁহার নামের পার্শ্বে না থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতই বিদ্যাবতী ছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও গ্রন্থ-লেখিকা ছিলেন। কিন্তু এমনই গর্ব্বহীন অনাড়ম্বর সংযত-জীবন তাঁহার ছিল যে তাঁহাকে বিলাত-ফেরত বিদুষী বলিয়া ধরা যাইত না। তাঁহার কথা-বার্ত্তা ও বেশ-ভূষার মধ্যেও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইত।

তিনি জন্মার্জ্জিত যে সকল সদ্‌গুণ লইয়া ১০ বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় উচ্চ শিক্ষিত, চরিত্রবলে বলীয়ান্ প্রতিভাসম্পন্ন আজন্ম-শিক্ষক (born teacher) স্বামীর যত্নে ও কৃতিত্বগুণে বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তেত্রিশ বৎসরের সাধনার ফলে যে জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা শেষ জীবনে নারী-জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া আত্ম-ত্যাগের মহিমায় চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল। হিন্দু গৃহ-বধূর বাঞ্ছিত ও চির প্রসংশিত গুণগুলির সহিত প্রতীচ্য শিক্ষিতা মহিলার কয়েকটি দুর্লভ গুণ তাঁহাতে আশ্রয় করিয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার জীবন এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল, যাহার স্বরূপ এদেশে বিরল। কিন্তু তাঁহাকে ভালরূপ জানিতে হইলে তাঁহার স্বামীর জীবনী অধ্যয়ন করিতে হয়, কারণ তিনি ছিলেন [illegible]

প্রতিচ্ছায়া, তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। সে জীবনী মিষ্টার দাস নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। সে আত্মচরিত "পাগলের কথা," অকপট হৃদয়ের অভিব্যক্তি, সুখপাঠ্য ও শিক্ষা-বিধায়ক। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি দম্পতি প্রথম বয়সে একবার নৌকা করিয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন, নদীবক্ষে স্বামীর সাদর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"কি বিপদে কি সম্পদে আমি তোমার চির-সহচরী থাকিব।" সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী কখনও তাহার অন্যথা করেন নাই।

জননীর মৃত্যুর পর মিঃ দাস একবার ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে থাকায় চিকিৎসক সমুদ্র-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা দেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে মনোযোগী না হওয়ায়, তিনিও উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পত্নী কৃষ্ণভাবিনী এই সময় তাঁহাকে বিলাত যাইবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন এবং সেই ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ দিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া, সসঙ্কোচে স্বামীর নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। এই ঘটনাটি মিঃ দাসের আত্মজীবনীতে বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে এবং এই সূত্রেই তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার মতে যে স্বামীর নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এক মন, এক প্রাণ ও একাত্মা না হয়, তারা প্রণয়ী হ'লেও দম্পতি নামের অধিকারী নয়। যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্বন্ধের সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলন না হয়, তারা যথার্থ প্রেমিক হ'তে পারে না।"

যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে মিঃ দাসের পিতা তাঁহাকে সিবিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে বিলাত পাঠাইয়া দেন। প্রথমবার যখন তিনি বিলাত যান তখন তাঁহার দুটি সন্তান নিতান্ত শিশু। যাত্রাকালে মনে হইয়াছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী ও শিশু দুটির ভরণপোষণের জন্য পিতার কোন যত্ন বা অর্থব্যয়ের ত্রুটি হইবে না বটে, কিন্তু কোনরূপ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণভাবিনীকে মানসিক সান্ত্বনা ও বল কে দিবে? আবার তখনই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে "বয়স অল্প হইলেও তাহাকে যেরূপ সব কাজে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে দেখিয়াছি তাহাতে নিশ্চয় তিনিই তাহাকে শক্তি দিবেন।"

হইয়াছিলও তাহাই। তিনি বিলাত প্রবাসে থাকিতে তাঁহার কন্যাটি জননীর কোল শূন্য করিয়া যায়। অবশ্য এই প্রথম শোকে জননী-হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার উপর স্বামীর উপদেশ কতদূর এবং কত শীঘ্র কার্য্যকরী হইত—স্বামীর উপদেশ ও সান্ত্বনাপ্রদ পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহা বুঝা যায়,—

"কাজ মানব-জীবনে সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে ঔষধের ন্যায়, উহা দ্বারা কত দুর্ব্বল-হৃদয় সবল হয়, কত নিরাশ-অন্তরে আশা আসে, কত দগ্ধ-প্রাণে সান্ত্বনা আনে।"

তিনি সন্তানশোক ভুলিবার জন্য কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হইবার আশায় সাধ্যমত বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে স্বামীর নিকট তিনি কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও তিনি এই কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াই প্রিয়তম পতি ও কন্যারত্নের দুঃসহ শোক সহনীয় করিয়া লইয়াছিলেন।

পিতার পীড়ার সংবাদে মিঃ দাস ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছয় বৎসর ইংলণ্ড বাসের পর দেশে আসেন এবং পাঁচ মাস পরে পুনরায় সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। মিঃ দাস তথায় ভারতবাসী সিবিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তিনটি কলেজে অধ্যাপকতা করিতে থাকেন এবং বিলাতের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে বৈদিক ও প্রাচীন কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ব্যবহার ও চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ ও কলাবিদ্যা বিষয়ক বহু গবেষণাপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনা আলোচনা করিয়া বিলাতের বিখ্যাত 'এথিনীয়াম' পত্র-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"মি দাস জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ এবং উভয়েরই গৌরবস্থল। তাঁহার অবাধ-গতি স্বচ্ছ-সুন্দর ইংরেজীর রসমাধুর্য্য প্রভূত আনন্দ দান করে, তাঁহার অন্তরের হিন্দুত্ব ও স্বদেশ-প্রেম তাঁহার লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠে।"

কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে বিলাত-ফেরত সুশিক্ষকের অধিক কিছু বলিয়া জানিতেন না। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ তাই লিখিয়াছেন—

"তিনি এরূপ আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন যে, আমরা তাঁর অতি আত্মীয় হইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। দেবেন্দ্রনাথ জীবনে

কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। যে কোন বিষয়েই হোক্ তিনি কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বর ও বিলাসিতাকে ঘৃণা করিতেন।"

স্বামীর চরিত্রের এই সকল বিশেষত্বও দেবী কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে জানিতে পারি, কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনী স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হইয়া স্বামীগৃহে সকল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি আজীবন সংযত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, বেশভূষার আড়ম্বর তাঁহার ছিলই না, বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই এবং অন্যের হিতকল্পে অর্থ ব্যয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল কিন্তু স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় তিনি ১৫৲ টাকার মধ্যেই নির্দ্ধারিত রাখিয়াছিলেন, গমনাগমনকালে গাড়ী-পাল্কীতে অর্থব্যয় না করিয়া প্রায় পদব্রজেই যাতায়াত করিতেন।

শিক্ষাবস্থায় তাঁহার স্বামী লণ্ডনের যে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে গ্রন্থসাগর মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতেন, ছয় বৎসর পরে সেই গ্রন্থাগারেই তিনিও দীর্ঘ ৮৷৯ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। স্বামীর ১৪ বৎসরের এবং পত্নীর ৮৷৯ বৎসরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দম্পতি দেশে ফিরিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তখন হইতে সুশিক্ষিতা স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালনে স্বামীর সহায় হন। এমনই গুরুর শিষ্যা হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ হিন্দু-গৃহবধূ স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীকে নারীজগতে যুগান্তর আনয়ন কার্য্যে পাওয়া গিয়াছিল!

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই দিব্য-আত্মার তিরোধানে লিখিয়াছিলেন—

"সেই নির্ম্মল আত্মা আজ পরম আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া চির-আনন্দ লাভ করিয়াছে, কিন্তু যাইবার সময় এই পরাধীন দেশের ললাটে যে মুক্ত-চিত্ততার দিব্য আলোক সে জ্বালিয়া গিয়াছে সে আলোক আর কখনো নির্ব্বাপিত হইবে না। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত অন্তঃকরণ, সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বন্ধন-রহিত মন, স্পৃহাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কপট চিত্ত, দ্বিধাশূন্যভাবে লোকহিতে রত আত্মা, সর্ব্বজনপরিচিতা কৃষ্ণভাবিনী দাস আজ নিরাশ্রয়া অনাথা দুঃখিনী নারীগণকে কাঁদাইয়া ইহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে আর কেহ তাঁহাকে ফিরিতে দেখিবে না, কিন্তু যে পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা হইতে নারীজগত আর কখনো ভ্রষ্ট হইবে না। দেশের সমস্ত নারীগণের সম্মুখে আজ ধ্রুবতারা জ্বলিয়াছে, সে তারা আর কেহ নহে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস।"

—এই উক্তি প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য আমরা সকলেই তাহা অনুভব করিতেছি।

কৃষ্ণভাবিনী ১০ বৎসরকাল বৈধব্য-জীবন যাপন করিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পতি-বিয়োগের পর তাঁহার শেষ জীবনের অবলম্বন-স্বরূপ সংসার-তাপ-দগ্ধা একমাত্র কন্যাকেও হারাইতে হয়, বজ্রের উপর এই দারুণ বজ্রাঘাতেও কিন্তু তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। কন্যাহারা স্বর্ব্বস্বহারা তখন শোকের ভিতর দিয়াই তাঁহার হৃদয়-দেবতার উপদেশ অনুসরণ করিয়া বিশ্বশিশুর জননীরূপে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় তাই বলিয়াছিলেন—

"শোকের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থিত তপস্বিনী মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মল আভায় লোকচক্ষুর গোচর হয়। বহু অনাথ বালকবালিকা, বহু বিপথগামিনী নারী, বহু অজ্ঞ অন্তঃপুরিকা এই তপস্বিনী লোকমাতার স্নেহ-প্রণোদিত সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছে।"

এই পুণ্যস্মৃতি-বাসরে যাঁহার একখানি শুভ্র থান পরা, ঘোমটায় মাথা ঢাকা, নগ্ন পদ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃমাখা পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি আজ আবার মানস-নয়নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করি এবং ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি, যিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, পরার্থে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ বঙ্গনারীতে সম্ভব ইহা স্বীয় জীবনে দেখাইয়া বঙ্গনারী-সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, প্রতি নরনারী-হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক থাকুক এবং প্রতি নারী-প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক কর্ম্মীর জীবনের দ্বারা সেই তপস্বিনী কৃষ্ণভাবিনীর নাম অমরত্ব লাভ করুক।

ভয়

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

এরে তুমি কর ভয়?
এই যে মরণ ল'য়ে আজি বিশ্বময়
মানুষের ছেলেখেলা? দিকে দিকে বিপ্লবের রোলে
শোণিত-প্লাবন আজি যে তরঙ্গ তোলে,
লাগে সে হিয়ার তটে রাশি রাশি ফেনিল উচ্ছ্বাসে
দিগান্তরে আবরিয়া নিরাশার মতো? রুদ্ধশ্বাসে
যুদ্ধের তাণ্ডব হের, ভাবো মনে বালকের হাতে
কে দিল এ ক্রীড়নক; আঘাতে সঙ্ঘাতে প্রতিঘাতে
ঈর্ষ্যার বিদ্রূপতালে, বিরোধের অট্টগীত-রবে,
বিনাশের বজ্রঘোষে, বিজয়ের উল্লাস-উৎসবে
ভয়াবহ এই যে করাল
কালনিশা, এর মাঝে কোথা অন্তরাল,
যেথা আজি দেবতার সুপ্তনিদ্রা শান্ত অনাহত!

ওগো ভীরু, রাত হ'য়ে আসে শেষ, দুঃস্বপ্নের মতো
এ খেলা চলিবে আরো মরণেরে ক্রীড়নক করি',
তারপর সহসা সে মহাভয়ে উঠিবে শিহরি'
আলোকে আপন মূর্ত্তি হেরি'। তার সুবিপুল বল
পলকে করিবে তারে আতঙ্ক-বিহ্বল,
আপনার শিরোপরে বর্ষিবে নির্ম্মম শাপ-বাণী
মূঢ় যাদুকর সম, নিজ যাদুমন্ত্রে সেধে আনি'
ভয়াবহ দুর্দ্ধর্ষ দানবে।
সেইদিন অবসান হবে
শোণিত-কুঙ্কুম লেপি' ধরণীর করুণ অর্চ্চনা;
নামিবে সুস্নিগ্ধ শান্তি ললাটে আঁকিয়া আলিপনা
শীতল চন্দন রসে,
অমৃত-বরষে
জুড়াইয়া সব মর্ম্মক্ষত।

সেও হবে দুঃস্বপ্নের মতো!
আপনার ছায়া হেরি মহাত্রাসে অন্তরাল টানি'
দুনয়নে, র'বে অকল্যাণ, তার গ্লানি,
সে তবুও মরিবে না। ছায়াভরা শান্তির নিলয়ে
হিংসারে ডরিবে নর, এই গর্ব্ব ল'য়ে
হিংসা তবু বেঁচে র'বে। রহি' তার পাশে,
এ ধরার গীতগন্ধ পলে পলে মরিবে নিঃশ্বাসে।

মূঢ় তুমি, তাই কর ভয়।
এ কালান্ত-ক্রীড়নক, এ মরণ, এরও সাধ্য নয়,
বিধির বিধান ল'য়ে যেই শান্তি ধীরে নেমে আসে
দুটি পক্ষপুটে তার আবরি' চরম সর্ব্বনাশে,
তাহারে রুধিতে পারে।·· তবু কা'র তরে
এই শান্তি, এ নির্ভয়, যদি ধরা 'পরে
গীতগন্ধ নাহি জাগে। কলকণ্ঠে যদি
হৃদি হতে হৃদিতটে তরঙ্গ তুলিয়া নিরবধি
সঙ্গীতের ধারা নাহি বহে, আজি শোণিতের ধারা
যেইমত বহে। আত্মহারা
বিশ্বের নিঃশ্বাস হরি', মৌন করি', করি' মন্ত্রাহত,
যদি না গাহিতে পারি মরণের মতো!

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

পনেরো

সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে প্রবালের মনে হ'ল,—'যাই একবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—আবার ভাব্‌লে, কি জানি যদি কথায় কথায় কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ হয়! সে যে রকম মুখফোঁড় লোক—যদি কিছু কঠিন জবাব দিয়ে বসে! বিশেষ ক'রে সভ্য সমাজের আদব-কায়দা মোটেই তার জানা নেই। কিন্তু জানা না থাকলেও এই অজানাকে জান্‌বার জন্যে একটা কৌতূহল তার মনে খুব সাড়া দিতে লাগল। এইরকম দোটানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে অনেক খানি পথ হেঁটে গিয়ে হঠাৎ যখন একজন এক্কাওয়ালার প্রশ্ন সে শুন্‌লে,'বাবু—সওয়ারী হো?' তখন সে সহজ কণ্ঠেই বল্‌লে—'হাঁ'। তারপর এক্কায় উঠে ব'সে বল্‌লে 'চলো—লালকুঠী—ময়টার সাহেব কো বাঙলো।'

লালকুঠী এলাহাবাদের সমস্ত এক্কাওয়ালারই পরিচিত। এক্কাওয়ালা লালকুঠীর প্রকাণ্ড হাতার সাম্‌নে লতায় ঢাকা ফটকের কাছে সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—'ভিতরমে এক্কাজানেকো হুকুম নাহী হায় বাবুসাব, আপ চলা যাইয়ে।'

প্রবাল নেমে প'ড়ে এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিতেই এক্কা চ'লে গেল। প্রবাল ফটকের ভিতর ঢুকে প'ড়ে এদিক ওদিকে তাকাতে লাগল। বেশ বিস্তৃত সুসজ্জিত উদ্যান, গৃহস্বামীর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিচ্ছে। প্রবাল চট্‌ ক'রে একবার নিজের বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখলে, কাল নেহাৎ পথিক গোছের সাজ ছিল। আজকালকার দিনে সভ্যসমাজের বাঙ্গালীবাবুর সে সাজ মানায় না, বিশেষ ক'রে যদি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতা মহিলাদের কাছে আসতে হয় তবে আজকের পোষাকটা আড়ম্বরপূর্ণ না হ'লেও পরিচ্ছন্ন বটে। সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রবাল সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে দরোয়ানকে দেখতে পেয়েই বল্‌লে,"ভিতরমে খবর দেও।" দরোয়ান সেলাম ঠুকে বল্‌লে—"কার্ড দিজিয়ে।" প্রবাল বেচারী একটু অপ্রস্তুত হ'ল, কার্ড ত সে আনে নি। অগত্যা সে বল্‌লে "কার্ড নাহী লায়া, জামাই বাবু কো খবর দেও—বলো—প্রবাল-বাবু আঁয়া।"

দরোয়ান চ'লে গেল। একটু পরেই সঞ্জীব বেরিয়ে এসে প্রবালের হাতে ঝাঁকী দিয়ে বল্‌লে, "এসেছ, আমি ভাবলাম হয়ত এলে না। চল ভেতরে। আমার শ্বশুর বেরিয়েছেন, শাশুড়ী আছেন, শালীরা সব আছে। সবাই এখন ড্রইং রুমে। গান হচ্ছে, গান শুন্‌বে চল।"

প্রবাল একটু পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ আমার এই নাগরা জুতো আর মোটা লাঠি নিয়ে তাঁদের ড্রইং রুমে ঢুকলে তাঁরা যে চম্‌কে উঠবেন! রসভঙ্গ না ক'রে এস এইখানে একটু চুপ চাপ ব'সে গান শোনা যাক্।" সঞ্জীব বল্‌লে—"এই শীতে কি এখানে বসে! পাগল, এস তবে বাইরের ঘরে বসি গে।"

দুজনে বাইরের একটি সাজানো কার্পেট-মোড়া ঘরে গিয়ে একটা গদি আঁটা কৌচে বসল। সঞ্জীব একটা সিগার নিয়ে বন্ধুকে দিতেই সে বল্‌লে—"ধন্যবাদ ভাই—ঐ পর্য্যন্ত—ও-জিনিষটার সঙ্গে আজও পরিচয় করতে পারি নি।"

অগত্যা সঞ্জীব সেটি নিজেই কাজে লাগাল। ওদিকে বিলাতী গৎ ও পিয়ানোর সুর কানে এসে পৌঁছুতেই প্রবাল বল্‌লে—"বেশ ত মিঠে গলা; তবে বড্ড মিহি, গায়িকাটি কে বন্ধু।"

সঞ্জীব বল্‌লে—"আমার ছোট শালী—খাঁটি বিলাতী মেমের কাছে শেখা কি না, সেজন্যে সুরটা নেহাৎ"—বাধা দিয়ে প্রবাল বল্‌লে—"বিলাতী ঢঙের হ'য়ে গেছে, মাপ কর দাদা—কথাটা হয় তো বেফাঁস্ বল্‌লাম। তারপর সে বন্ধুর ঢিলা পায়জামার দিকে কটাক্ষ ক'রে বল্‌লে—"আচ্ছা

ভাই—বিলাতে কদ্দিন থাকা হয়েছিল ?" সঞ্জীব বল্‌লে—"চার বচ্ছর।"

প্রবাল বল্‌লে—"চারবচ্ছরেই এমন সাহেব হ'য়ে এসেছ যে এখানকার পোষাক-আযাক্ সবই বদ্‌লে ফেলেছ। ডিনার-সাপারে দিশী তরকারী হয় কিছু, না, সবই কাট্‌লেট—কারী"—

সঞ্জীব হেসে বল্‌লে—সে না হ'য়ে যায় কোথা ? শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ মোচার ঘণ্ট, এঁচড়ের ডান্‌লা, লাউ-ঘণ্ট না রেঁধে ভাতই দেন না। বাগানে দেখো নি কত কলা গাছ—শ্বশুর আমার শ্বাশুড়ীটিকে কিছুতেই ভোল ফেরাতে পারেন নি।"

প্রবাল বল্‌লে—"শুনে তবু আশ্বস্ত হ'লাম। যদি বা কোনো দিন এসে পড়ি, দুটি দিশী ভাত তরকারী মুখে দিয়ে যেতে পার্‌ব। তা খোলোস্ বদ্‌লে আছ কেমন ?"

সঞ্জীব বল্‌লে,—"মন্দ কি ? শ্বশুরের অনুগ্রহে আস্‌তে না আস্‌তেই বার লাইব্রেরীতে নাম হয়েছে—দু'পয়সার মুখও দেখ্‌ছি।"

প্রবাল বল্‌লে—"হুগলীর কথা বোধ হয় ভুলে গেছ—তোমার জ্যেঠা-জ্যেঠাই এখনও ত সেইখানেই আছেন।"

সঞ্জীব মুখ কালো ক'রে বল্‌লে—"তা আছেন নিশ্চয়। কোনো খবরই আর দেওয়া নেওয়া নেই। আমার কিন্তু এক একবার দেশে যাবার ইচ্ছে হয়।"

প্রবাল বল্‌লে—"কি সর্ব্বনাশ! দেশে যেতে ইচ্ছে হয় ? সেই ম্যালেরিয়ার, পোকা-পড়া, পানাপুকুর ভরা, ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ দেশের চেহারা মনে হ'লে আঁৎকে ওঠ না ? মিসেস্ শুন্‌লে তোমায় বল্‌বেন কি ?"

সঞ্জীব বল্‌লে—"তা তুমি যাই বল, সত্যিই আমাদের দেশের ঐ মূর্ত্তি। বিলাতে ক'বচ্ছর ঘুরে পাড়াগাঁগুলোও যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সাজানো-গোছানো দেখেছি আমাদের দেশে সহরেও সেদৃশ্য দুর্লভ। তাদের আচার ব্যবহার—আর জীবন-যাত্রা-প্রণালীগুলো দেখ্‌লে পরে সত্যিই আমাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে লজ্জা হয়।"

প্রবাল বল্‌লে—"আস্তে ভাই আস্তে। অত বড় বক্তৃতা সবটা এক সঙ্গে শুনে মনে রাখ্‌তে পার্‌ব না। ওদের যদি ভালো কিছু দেখে থাক সেটা আমাদের দেশে কাজে লাগানো যায় কি না সেই কথাটাই ভেবে দেখ; তা নয় উল্টে তুমিই তাদের ধারা যদি ধর্‌তে যাও তা হ'লে দেশের লোকের সঙ্গে তোমার নাড়ীর যোগ ছিঁড়ে যাবে না কি ?"

সঞ্জীব বল্‌লে—"রেখে দাও আমাদের দেশের কথা—সে ত এক কথাতেই আমায় একঘরে ক'রে ব'সে আছে। নাড়ীর যোগ সে কি রাখ্‌তে চায় যে রাখ্‌ব ? বিলেত ঘুরে এলেই ত সে জাত থেকে নাম কেটে দিলে। জ্যেঠামশাই প্রাচ্ছিত্তির ক'রে তবে দেশে যেতে বলেছিলেন; তাতেই না আর ভিটে মাড়াই নি। নইলে কি একবার যেতাম না ?"

সঞ্জীবের কথার মাঝখানে আয়ার হাত ছাড়িয়ে একটি ফুট্‌ফুটে ঘাগ্‌রা-পরা মেয়ে "বাবা—বাবা" বল্‌তে বল্‌তে ছুটে এসে সঞ্জীবের কোলে উঠ্‌ল। প্রবাল মেয়েটির কোঁক্‌ড়া চুলে হাত বুলিয়ে বল্‌লে—"কন্যারত্ন বুঝি—ভারী সুন্দর ত!"

খুকী ঘাড় বাঁকিয়ে প্রবালের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"কে বাবা ?"

সঞ্জীব মেয়ের মুখে চুমো দিয়ে বল্‌লে—"কাকা।" প্রবাল হাত বাড়াতেই খুকী প্রবালের কোলে গেল। প্রবাল তাকে অনেক আদর ক'রে আলাপ জমিয়ে তুল্‌তে লাগল। আয়া এসে বল্‌লে—"মিসিবাবাকে বোলাচ্ছে।"

সঞ্জীব খুকীর হাত ধ'রে বল্‌লে—"খুকী, বাড়ীতে যাও, তোমায় ডাক্‌ছেন।"

খুকী নাচ্‌তে নাচ্‌তে চ'লে গেল। একটু পরেই ঊর্ম্মিলা এসে দেখা দিলে, সঙ্গে ছোট বোন্ প্রমীলা। প্রবাল শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। ঊর্ম্মিলাও নমস্কার ক'রে বল্‌লে "আপনি যে চুপ্‌চাপ এসে বাইরে বসেছেন ? ভাগ্যিস্ খুকু গিয়ে বল্‌লে—কাকা এসেছে তাতেই ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম।"

প্রবাল বল্‌লে—"একা ত ছিলাম না, আপনার হ'য়ে আপনার অর্দ্ধাঙ্গ আমায় সম্বর্দ্ধনা করেছেন।"

ঊর্ম্মিলা বল্‌লে, "আসুন, ভিতরে আসুন, এ বেলা না খেয়ে যেতে পাচ্ছেন না কিন্তু!"

থাবার লোভ না থাক্ অতিথির পাওনা আদর-যত্নের প্রতি প্রবালের বেশ লোভ ছিল। সে আদর আহ্বানটুকু নারী কণ্ঠের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠ্‌তেই সে যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। এরাও তা হ'লে অনাহূত অতিথিকে আহারের জন্যে অনুরোধ করে। প্রবাল বল্‌লে—"মোটা থাবারের প্রতি আমার লোভ যে নেই তা নয়; কিন্তু তার চাইতেও লোভ আছে গানের ওপর। যদিও অন্তরালে ব'সে দু' তিনটে ইংরেজী গৎ শুন্‌লাম তাতে আমার খিদে মেটে নি। এখন দয়া ক'রে যদি সেই খিদে মিটিয়ে দেন্।"

উর্ম্মিলা বল্‌লে—"এসব চুরীর ব্যাপার। নাঃ, আপনি একজন কাউয়ার্ড।"

সঞ্জীব উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"ওগো গায়িকারা আমার বন্ধুটিও একজন ভাল গায়ক। আজ এঁরও গান শুনে তোমরা মুগ্ধ হ'তে পার্‌বে।"

তখন সকলে মিলে ড্রইং রুমে এসে বস্‌ল।

সত্যিকথা বল্‌তে গেলে স্বামীর এই পাড়াগেঁয়ে বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা ক'রে আন্‌বার মূলে অতিথি-সেবার বাসনা উর্ম্মিলার তত ছিল না, যতটা ছিল নিজের পিতার বিলাস-ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা। নিজের পাড়াগেঁয়ে স্বামীটিকে এহেন উন্নত জীবনে তুলে এনে তার কতদূর মঙ্গলসাধন যে সে করেছে সেই কথাটি প্রবালকে জানিয়ে দিতে তার খুবই ইচ্ছে হ'য়েছিল। তার স্বামীর স্ত্রী-সৌভাগ্যর দিকে চেয়ে যেন একবারও অন্ততঃ প্রবালের মনে একটু ঈর্ষ্যার উদয় হয় এ ইচ্ছাটাও তার ছিল।

সকলে বস্‌বার পর সঞ্জীব বল্‌লে—"মিস্ প্রমীলা—তুমি এখন সুকণ্ঠে একটি গান ধর। বন্ধুর হ'য়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।" প্রবাল বল্‌লে—"তোমার বন্ধুও মূক নন্। তিনি নিজেই অনুরোধ জানাচ্ছেন।" উর্ম্মিলা বল্‌লে, "গা রে প্রমীলা—একটা বাঙলা স্বদেশী গান গা—উনি স্বদেশী লোক—ঐসব গানই পছন্দ কর্‌বেন।"

প্রমীলা তখন বাজনার সঙ্গে দেশভক্ত কবির দেশ-জননীর বন্দনা-গান ধর্‌লে—

> "ভারত আমার, ভারত আমার—
> যেখানে মানব মেলিল নেত্র—"

গানটির গাম্ভীর্য্য কিন্তু পিয়ানোর উচ্ছল চঞ্চল সুরে খাপ খেল না। প্রমীলার মধুর কণ্ঠস্বর পিয়ানোর সুরের নীচে চাপা প'ড়ে গেল, কাজেই গানটি প্রাণ পেতে পার্‌লে না। সঙ্গীতজ্ঞ প্রবাল ভারী ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। কিছুক্ষণ গান গেয়ে শেষবারে গায়িকা যখন থেমে গেল তখন তাই সে অন্ততঃ ভদ্রতার সম্মান রক্ষার জন্যেও বল্‌তে পার্‌লে না—বাঃ কি মিষ্টি গলা। প্রমীলাও ভারী ক্ষুব্ধ হ'ল। এ রকম নূতন অতিথিদের সাম্‌নে গান গাইতে সে মোটেই অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু—ও! সো'সুইট—এন্‌কোর্, এন্‌কোর্, প্রভৃতি অজস্র স্তুতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে শোনাই তার অভ্যাস; কাজেই সে এই অভদ্র লোকটির বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হ'য়ে বাজনার সাম্‌নের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তখন প্রবাল বল্‌লে—"আহা—করেন কি? উঠ্‌বেন না, উঠ্‌বেন না, এ গানটা ভালো জমে নি।"

প্রমীলা জবাব না দিয়ে স'রে বস্‌ল—উর্ম্মিলাও মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—"বেশ ত এইবার আপনিই একটু জমিয়ে দিন।"

সঞ্জীব বল্‌লে—"হ্যাঁ হে, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি, একটু শুনিয়ে দাও।"

প্রবাল বাজনার সাহায্য না নিয়েই গান ধর্‌লে—

> "কতকাল ধরি বহিছ তুমি
> নীল সলিলে যমুনে ও।"

তার সরল মধুর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠে নেমে এমন একটি ঝঙ্কারে ঘরখানি ভ'রে দিলে যে প্রমীলাও তার অভিমানের জালা ভুলে মনে মনে বল্‌লে—"এই রকম গলা শুনেই গান অভ্যেস্ কর্‌তে হয়।"

প্রবাল গান শেষ ক'রে দেখ্‌লে দরজার কাছে একজন লাল চওড়া পাড় শাড়ী-পরা বয়স্কা ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবাল চেয়ে দেখ্‌তেই উর্ম্মিলা বল্‌লে—"মা।"

প্রবাল সসম্ভ্রমে উঠে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করতেই তিনি বল্‌লেন, "থাক্ বাবা—গান শুনে ভারী খুসী হয়েছি। আমার কিন্তু এ গান শুনে আর একটি

গান শুন্‌তে ইচ্ছে করে। ছোট বেলায় সে গান অনেক বার শুনেও আশ মেটে নি।"

প্রবাল নম্রকণ্ঠে বল্‌লে—"কোন্ গান্‌টা ?"

গৃহিণী আগ্রহভরা কণ্ঠে বল্‌লেন—"তুমি জান কি ? সেই গানটা—যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী ?

প্রবাল এবার গিয়ে হর্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়ে ঐ গানটি সুরু করলে। আবার স্বরলহরী সবার কাণে যেন সুরের সুধা বর্ষণ করতে লাগল।

এ হেন পাড়াগেঁয়ে অতিথির প্রতি উর্ম্মিলার কিছু সম্ভ্রমেরও উদয় হ'ল। তাই সে উঠে একটু ব্যস্ত হ'য়ে নিজের মাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রবালের আহারের আয়োজন কর্‌বার পরামর্শ আঁটতে লাগল।

ষোলো

সকালে প্রবাল ত্রিবেণী তীরে মার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "মা—আজ আমি দেশে ফির্‌তে চাই—ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আস্‌ছে। একবার কেদারের ওখানে ঘুরে আসি, অনেক দিন দেখা শোনা নেই—যাব ব'লে চিঠিও লিখেছি।"

সংসারের মায়া কাটিয়ে তীর্থস্থানে বাস কর্‌বার সংকল্প স্থির কর্‌লেও পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় মা'র মন কেঁদে উঠল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর ধ'রে যে ছেলেকে চোখের সাম্‌নে নিজের হাতে ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন তাকে একা ছেড়ে দিতে হবে। মা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বল্‌লেন—"যদি তোকে সংসারী দেখে আস্‌তে পার্‌তাম বাপ, তাহ'লে আমার এ অশান্তি হ'ত না। কেমন ক'রে একলাটি তুই থাক্‌বি ?"

প্রবাল হেসে বল্‌লে—"বেশ থাক্‌ব মা। তুমি দেবতার স্থানে নিশ্চিন্ত মনে পূজো আচ্ছা ক'রে সুখে আছ জান্‌লে আমার আর কোনো দুঃখু থাক্‌বে না। আর আমার সংসারী হবার কথা যে বল্‌ছ মা, আমি কি এতই বুড়ো হয়েছি যে আর সংসারে ঢুক্‌তে পার্‌ব না ?" মা বল্‌লেন, "ষাট ষাট ষষ্ঠীর দাস, কিসের এমন বয়েস তোর ? তবে তোরই বয়িসী কেদার ত দু'টি ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে, তোর এপনও বিয়ের নাম নেই। অমন যে সুন্দর মেয়ে সতীশবাবুর ভাই-ঝি, তাকেও যখন তোর মনে ধর্‌ল না, আর যে কাউকে ধর্‌বে তা ত বিশ্বাস হয় না।"

সত্যিই প্রবাল দু'তিনটি খুব সুন্দর মেয়ে নিজের চোখে দেখেও পছন্দ করে নি। আসল কথা, সাংসারিক দুরবস্থার জন্যে তার বিয়ের ইচ্ছে মোটেই ছিল না। তার উপর ভাবী বধূসম্বন্ধে তার মনে একটি যে ভাব ছিল সেটা প্রকাশ হ'লে লোকে তাকে কবিত্ব ব'লে বিদ্রূপ কর্‌লেও সে নিজে নিত্য প্রয়োজনীয় তেল নুনের চেয়ে এই কবিত্বটাকে প্রাণের জিনিষ ব'লেই বুঝ্‌ত। শুধু বুঝ্‌ত না, বিশ্বাসও কর্‌ত। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে যে সহজে মিল খায় না। তা ছাড়া প্রবালের মানসী-মূর্ত্তিটি সাধারণ অবিবাহিত যুবক-শ্রেণীর কবিত্ব থেকে অনেক খানি তফাৎ ছিল। তাদের কল্পলোকবিহারিণী, নীল-বসনা, মুক্তাদশনা, নূপুরচরণা মুকুলিতনয়না সুন্দরীই মাত্র প্রবালের ধ্যানের প্রতিমা ছিল না; সে মনে কর্‌ত সে যাকে অন্তরলক্ষ্মী ব'লে বরণ ক'রে নেবে সে যেন শুধু তার গৃহলক্ষ্মী না হয়; সে যেন তার প্রাণের মূলে উপযুক্ত রসধারা সিঞ্চন কর্‌তে পারে; সে যেন তার বাহুতে শক্তি ও অন্তরে বুদ্ধিরূপিনীরূপে প্রকাশ পায়; বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে চলা ফেরার সময় সে যেন তার গতির বন্ধন না হ'য়ে সহযাত্রিণী হ'তে পারে। অবশ্য এ ছিল তার নিতান্ত গোপন কামনা। সে বুঝি নিজেও তার এই নিজস্ব একান্ত গোপন কামনাটির সঙ্গে ভালো ক'রে কোনো দিন মুখোমুখী কর্‌তে পারে নি।

যাই হোক্ মা'র হতাশপূর্ণ কথায় সে একটু হেসে উঠে উচ্ছল কণ্ঠে ব'লে উঠল—"না মা, বিয়ের ওপর বিতৃষ্ণা আমার কোনোদিনই নেই। তবে এতদিন হয়ত সময় হয়নি ব'লেই কাউকে পছন্দ কর্‌তে পারি নি। বলতো কেদারকে গিয়েই ঘট্‌কালী কর্‌বার জন্যে অনুরোধ ক'রে রাখ্‌ব, তোমার তরফ থেকে।"

মা বল্‌লেন, "তা করিস্, তাকে আর বউমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস্।"

প্রবাল মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে মার সঙ্গিনী সেই বৃদ্ধাকেও প্রণাম ক'রে মা'র ভার তাঁর উপর দিয়ে বিদায় নিলে। সে বল্‌লে যে, কাশীতে গিয়ে মা যেন বিশ্বনাথের

চরণ-ধ্যানে নির্ভয়ে দিন কাটান, খরচ-পত্র যথারীতি সে পাঠাবে। মা যেন অনর্থক তাঁর সাবালক ছেলেটির ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে শেষ বয়সের কাজে বাধা বিঘ্ন না ঘটান, তার জন্যে বার বার অনুরোধও করলে।

থার্ডক্লাস টিকিট কিনে প্রবাল রওনা হ'ল, রাত্রি দশটার সময়। যখন সে পাটনা ষ্টেশনে নেমে একটু পায়চারী করছে তখন দেখলে একটি মহিলা ও একটি তরুণী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছেলে খুব ব্যস্ত ভাবে এ কামরা ও কামরায় জায়গা খুঁজে কিছুতেই স্থান পাচ্ছে না। কুলি ব্যস্ত হ'য়ে কেবলি বলছে, "বাবুজী, আধ ঘণ্টা হুয়া। ট্রেন খলনেকো দেরী নহী হ্যায়। জো হোয় সো কামরা মে উঠ যাইয়ে।"

প্রবাল এদের বিব্রত অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই উপযাচক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে—"আপনারা কি জায়গা পাচ্ছেন না? মেয়েদের কামরা দেখেছেন?"

ছেলেটি বললে—"আজ্ঞে হাঁ, এতোটুকু জায়গা নেই, থার্ড ক্লাস ফিমেল ক্যারেজেই মাথা গলাবার ঠাঁই নেই।"

প্রবাল তখন বললে—"আসুন, একবার দেখি," ব'লে তাড়াতাড়ি একটা পুরুষ-কামরা খুলে উঠে প'ড়ে বললে,— "এটা পুরুষদের কামরা, তবে জায়গা আছে। দেরী করবেন না, উঠে আসুন।" ব'লেই সে নিজেই কুলীর মাথা থেকে বাক্স বিছানা টেনে নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ভ'রে ফেললে।

প্রবাল লক্ষ্য করলে যে, কামরার এককোণের বেঞ্চিতে কাপড়ের পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে আর তার ভিতর দুটি মহিলা রয়েছেন। সঙ্গে সাহেব বেশে সুসজ্জিত একটি স্থূলকায় বাঙালী আর তিন জন ফিট বাবুর বেশে তিনটি ছোকরা; একটি বেঞ্চিতে তাসের সরঞ্জাম; আর-একটি বেঞ্চিতে গ্লাস বোতল আর সোডার ব্যাপার। কামরার মধ্যে পাঁচ-সাত জন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকও আছেন। তাঁরা কেউ ওপরের বাঙ্কে কেউ বা নীচে বেঞ্চের উপর সটান শুয়ে আছেন। মোট কথা, জায়গা আর কোথাও নেই। নেহাৎ প্রবাল জোর ক'রে ঢুকে প'ড়ে একটা বেঞ্চির আধখানা দখল করেছে। সে যাই হোক, ষ্টেশনের গোলমাল মিটে যাবার পরই সাহেববেশী ভদ্রলোক বোতলের জিনিষটি একগ্লাস ঢেলে মুখে দিয়েই তাস ভেঁজে ব'লে উঠলেন,—"এসো দেখি ভায়া, দেখি এইবার কে ছক্কা দেয় আর কে খায়।"

একটি ছোকরা হি হি ক'রে হেসে ব'লে উঠল— "যা বলেছ, দাদা—আগে কিন্তু পেসাদ একটু খাইয়ে দাও।"

দাদা প্রসাদ দান করতেই আরও দু'জন হুমড়ি খেয়ে বোতল আর গেলাস নিয়ে টানাটানি বাধালে; আর মদের মুখে সবারি বিশ্রী রসিকতার মধ্যে এমন দু'চারটে কথা বেরিয়ে গেল যা ভদ্রলোকে সহজ অবস্থায় উচ্চারণ করতেও পারে না, শুনতেও পারে না। প্রবাল দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু ভাবে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন ক'রে বললে— "মশায়, কিছু মনে করবেন না, এখানে মেয়েরা রয়েছেন, ওসব বুলি কপচাবার এটা জায়গা নয়।"

ভদ্রলোক কিন্তু আগে হ'তেই প্রবালের ওপর চটে-ছিলেন। তার কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রবাল থার্ডক্লাস গাড়ীর আরোহী, এবং সে নিজে উপযাচক হ'য়ে এঁদের এ গাড়ীতে উঠিয়েছে। ছেলেটি ইতিপূর্ব্বে একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এ কামরায় জায়গা আছে, মশাই?" তিনি সাফ জবাব দিয়েছিলেন, "একেবারেই না।" অথচ প্রবাল এই গাড়ীতেই শেষে এইসব উপসর্গ এনে জুটিয়েছে। সুতরাং তিনি সময় বুঝে ব'লে উঠলেন, "দেখি, মশাই, আপনার টিকিট?"

প্রবাল বললে—"আপনাকে দেখাতে আমি বাধ্য নই, মশাই।"

ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "জানি, মশাই, থার্ডক্লাশের টিকিট। বেরিয়ে যান এ কামরা থেকে।"

প্রবাল বললে,—"বেরুবার কোনো উপায় নেই, অর্থাৎ আপনার মত মাতালের সামনে এঁদের একা রেখে আমি কিছুতেই অন্য কামরায় যেতে পারি না।"

একটি ছোকরা তখন চিঁহিঁ ক'রে হেসে উঠে বললে— "বড় দরদ যে, মশাই—মা, না জোরু?"

প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মা ত বটেই, কিন্তু সাবধান, মশাই—দ্বিতীয় কথাটা উচ্চারণ করবেন না।

আপনাদের সঙ্গেও ত মেয়েরা রয়েছেন—সবারি সম্মান বাঁচিয়ে কথা বল্‌বেন।”

ভদ্রলোকটি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—“আমার সঙ্গে আমার নিজের স্ত্রী, নিজের বোন্ রয়েছেন আর তাঁদের আমি দস্তুরমত পর্দ্দা টাঙিয়ে তার ভেতর রেখেছি। যে মেয়েমানুষ ঘোম্‌টা খুলে, জুতো প'রে অজানা অচেনা লোকের একটা কথাতেই গাড়ীতে উঠে বসে, তাদের আবার সম্মান? যান্ মশাই, কেচ্ছা বাড়াবেন না, মানুষ চিন্‌তে আমাদের বাকী নেই।”

ভদ্রবেশধারী বাঙালীপুঙ্গব এইরকম ইতর কটাক্ষ ক'রে নিজের বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হ'য়ে মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। প্রবালের কিন্তু অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সে বল্‌লে, “নেহাৎ অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত রয়েছেন তাই চেপে যাচ্ছি, নইলে আপনার কথার জবাব মুখের কথায় না দিয়ে অন্য রকমে দিতাম। মেয়েদের পর্দ্দা টাঙিয়ে খুব আবরুর মধ্যে ত রেখেছেন মান্‌লাম। কিন্তু ওঁদেরি সাম্‌নে যে-সব আলাপ করুছেন সেগুলোতে কি ওঁদের সম্মান খুব বেঁচে যাচ্ছে?”

একটি ছোক্‌রা তখন উঠে দাঁড়িয়ে আস্তিন গুটিয়ে আস্ফালন ক'রে হাঁকুলে—“হোল্‌ড ইওর টাং, ইয়ং চ্যাপ!” ভদ্রবেশী একগ্লাস ঢেলে ঢক্ ক'রে গিলে ফেলেই বল্‌লে, “সেই ভাল, এস বাবা, একটু কুস্তি লড়া যাক্।”

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে প্রবালকে বল্‌লেন—“আমায় বাঁকিপুরে নামিয়ে দিন্—এরকম ভাবে যাওয়া অসম্ভব।”

প্রবাল বল্‌লে—“আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখুনি ষ্টেশনে ট্রেন থাম্‌লে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ কর্‌বার দর্‌কার নেই—বিশেষ আপনাদের সাম্‌নে—নইলে দেখাতাম।”

ট্রেন ষ্টেশনে থাম্‌তেই প্রবাল যখন গার্ডের সন্ধানে যাচ্ছে তখন ছোক্‌রারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি ক'রেই একজন হঠাৎ উঠে এসে প্রবালের হাত ধ'রে বল্‌লে, “আর গোলমাল ক'রে কাজ নেই মশাই, চুপ-চাপ সকলে বসে যান, গ্লাস বোতল সব তুলে ফেলা হচ্ছে—ফর্‌গিভ এণ্ড ফর্‌গেট।” প্রবাল তাতে সহজেই রাজী হ'ল; একজন বিজাতীয়ের কাছে নিজের স্বদেশীয় এই বর্ব্বরতার পরিচয় দিতে সে নিজেই মর্ম্মে ম'রে যাচ্ছিল; নেহাৎ উপায়হীন অবস্থাতেই এপন্থা তাকে অবলম্বন কর্‌তে হ'য়েছিল। যাক্, গোলমাল শান্ত হ'য়ে গেল, সবাই চুপচাপ ক'রে বস্‌লেন। শেষ রাত্রে মধুপুরে ট্রেন থাম্‌তেই প্রবাল নেমে গিয়ে মেয়ে-কামরা খালি হ'য়েছে দেখে মহিলাটিকে ও তাঁর মেয়েকে সেই কামরায় উঠিয়ে দিলেন। তিনি প্রবালকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে প্রবাল বল্‌লে, “ধন্যবাদ না পেয়ে আজ আমার লজ্জাই পাবার কথা, আমাদেরি কয়েকজন আপনাদের সাম্‌নে যে-ব্যবহার করেছে তা মনে ক'রে আমার নিজেরই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।” মহিলাটি হেসে বল্‌লেন—“আমার কিন্তু ক্ষোভের সঙ্গে আনন্দও হচ্ছে যে, আপনাদের মতন ছেলেও আমাদের দেশে আছে, যারা পরিচয় বা আত্মীয়তার সূত্রকে সহজেই ডিঙিয়ে নিজের দেশবাসীর প্রতি একটি গভীর মমত্ববোধ প্রাণের সঙ্গে অনুভব কর্‌তে পারে। আশীর্ব্বাদ করি, এমনি নির্ভীক আর সরল প্রেমপূর্ণ প্রাণ নিয়ে দেশের সেবায় নিজেকে চিরদিন নিযুক্ত রাখ্‌তে পারেন।” প্রবাল নতমুখে নমস্কার ক'রে বিদায় নিলে। মহিলাটির নাম-ধাম কিছুই জানা হ'ল না ব'লে মনটা তার একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে যে তিনি যেই হোন্ তারই দেশের একটি মা। এই কথাটি মনে ক'রে সে-উদ্দেশে আর-একবার তাঁর স্মৃতিকে সসম্ভ্রমে বন্দনা কর্‌লে।

(ক্রমশঃ)
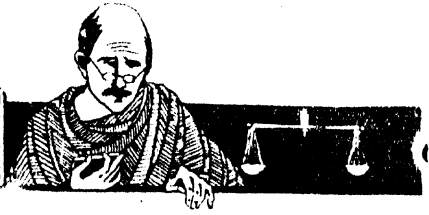
সেকালের বঙ্গনারী

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে, প্রাচীন বঙ্গে নারীজাতির রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষা বর্ত্তমান সময়ের নারীদিগের হইতে খুবই স্বতন্ত্র ছিল। বর্ত্তমান রীতিনীতির সহিত পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন।

(১) রীতি-নীতি—

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, রমণীগণ পাশা ও দুয়াপতি (বোধ হয় দাবা) খেলিতেন। উচ্চ শ্রেণীর রমণীগণ এই খেলা দুইটির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে অদুনা ও পদুনা নামক রাণীদ্বয়ের দুয়াপতি এবং কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বণিক ধনপতি ও তৎপত্নী খুল্লনার পাশাখেলা এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।

এক কন্যা বিবাহ দিয়া অপর কন্যাকে দান দেওয়ার প্রথা প্রাচীনকালে বর্ত্তমান ছিল। প্রমাণ—মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে অদুনার বিবাহে পদুনাকে দান দেওয়া হয়। বোধ হয় উড়িষ্যা দেশে অদ্যাপি এই প্রথা প্রচলিত আছে।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীকাব্য সমূহে বাঙ্গালার বাণিজ্য-যাত্রার অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালী বণিক স্ত্রী-পুত্র-মিত্র প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাণিজ্য করিবার জন্য বহুকাল সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিতেন। এই সময়ে হয়ত গৃহে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইত। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পর বণিক হয়ত স্বীয় পুত্রের জন্ম সম্বন্ধেই নানারূপে সন্দিহান হইত। ফলে গৃহ অশান্তির আগার হইয়া উঠিত। বোধ হয় এই কারণে এক নিয়ম হইয়াছিল যে, বিদেশগামী পতি, পত্নীকে এক দলিল লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

পত্নীর চরিত্র-পরীক্ষা যে-ভাবে হইত তাহা আধুনিক জগতের কল্পনা-সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এই পরীক্ষা প্রধানতঃ অষ্টবিধ ছিল। বেহুলা ও খুল্লনা এই অষ্ট পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষাগুলি জল, অগ্নি, সর্প ও তুলাদণ্ড প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। আধুনিক কালে কোন নারী এই ভীষণ পরীক্ষাসমূহের একটি দিতেও প্রস্তুত হইবেন কি না সন্দেহ। অতি প্রাচীনকালে ইংলণ্ডেও অপরাধী নির্ণয় করিতে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইত।

অল্পবয়স্কা বিধবা সম্বন্ধে প্রাচীন সমাজেও কিছু উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বিধবাগণ সিন্দুরের বদলে ফাগ, শাঁখার বদলে সোনার চুড়ি ও খনির বদলে কাঁচা পাটের শাড়ী পরিতে পারিত।

স্বামী বশীকরণের ঔষধ আবিষ্কারে সেকালের রমণীগণ খুব দক্ষ ছিলেন। সম্ভবতঃ বিলাতের বিবিগণও পূর্ব্বে ইহাতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ও সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথে উল্লিখিত বশীকরণের দ্রব্যগুলির অনেকটা মিল আছে। উভয় কবিই সমসাময়িক ছিলেন।

(২) পোষাক-পরিচ্ছদ—

সেকালের উচ্চশ্রেণীর বঙ্গরমণীগণ কখনও কখনও তাঁহাদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভগিনীদিগের অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিতেন। মুসলমান সংস্রবই বোধ হয় উহার কারণ। বর্ত্তমানে এদেশে আর এপরিচ্ছদ প্রচলিত নাই। শাড়ী, কাঁচুলি ও ওড়না প্রাচীন বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদ ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গঙ্গাজলি শাড়ী, মেঘডম্বুর শাড়ী, মেঘনাল শাড়ী, আগুনপাটের শাড়ী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শাড়ী কিংবা ঘাগরার নীচে তাঁহারা একরূপ 'পেটিকোট' পরিধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন নীবিবন্ধ বা বেল্ট এবং তদসংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘুঙুর শ্রেণীর ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন রমণীগণ অলঙ্কার-প্রিয় ছিলেন। প্রাচীন অলঙ্কারসমূহের অধিকাংশই অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সোনার বেসর, তাড়, কেয়ূর, কুণ্ডল, সাতেশরি হার, মগরখাড়ু প্রভৃতির দিন গিয়াছে। সেকালে সাবানের পরিবর্ত্তে আমলকী দ্বারা কেশ-সংস্কার করা হইত। সুগন্ধ কেশ-তৈলের অভাব নারায়ণ তৈল দ্বারা পূরণ হইত। ইহা ভিন্ন অগুরু কুঙ্কুম চন্দন প্রভৃতি অঙ্গে লিপ্ত করা হইত।

(৩) রন্ধন—

সে-কালের বঙ্গনারী রন্ধনেও বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহাদের হস্তপ্রস্তুত ইন্দ্রমিঠা, আল্‌কা, সীতামিশ্রী এখন বোধ হয় লোপ পাইয়াছে। সনকা, খুল্লনা প্রভৃতির রন্ধনের বর্ণনায় তাৎকালীন বঙ্গ-সমাজে ব্যবহৃত উপাদেয় বহু নিরামিষ, মৎস্য ও মাংসের ব্যঞ্জনের খবর আমরা পাইয়া থাকি।

(৪) শিক্ষা—

পূর্ব্বে বালিকাগণ পাঠশালে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিত। মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চ্চার প্রমাণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বহু-স্থানে পাওয়া যায়। শুধু লেখাপড়া কেন—সীবন, চিত্রাঙ্কন নৃত্যগীতেও বালিকাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হইত। নৃত্যগীতানুরক্তি পদ্মিনী জাতীয়া নারীর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। নারীদিগের এইসব গুণের পরিচয় মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য এবং ময়মনসিংহ-গীতিকা প্রভৃতিতে বিশেষরূপে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের বেহুলাকে নৃত্যে পারদর্শিতার জন্য "নাচুনী বেহুলা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। দৈহিক বলও সেকালের মেয়েদের কম ছিল না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহের কলিঙ্গা ও লখা এবং উপকথার মল্লিকা এবিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩৩) শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

—

বৌদ্ধ জাতক

জাতক বলিলে, বৌদ্ধমতে, ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্ম-কাহিনী বুঝায়। এই জাতক ক্ষুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ এবং সংখ্যায় পাঁচশত পঞ্চাশটি। জাতকের গল্পগুলি মাত্র কাহিনী নহে।

জাতকে বহুসংখ্যক রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধিকাংশই বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আছে। মাত্র দুই চারিটি রামায়ণ, মহাভারত অথবা পাণিনির সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

জাতকে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল জ্ঞানগরিমার কথা বহু বার বলা হইয়াছে। সুদূর গান্ধার রাজ্যের রাজধানী রূপে ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য-সন্ধিস্থল এবং পণ্ডিতগণের মিলনক্ষেত্র ছিল।

বহু যজ্ঞ ও উৎসবের প্রমোদ-কাহিনী জাতকে বর্ণিত হইয়াছে।

জাতকযুগে প্রস্তর অথবা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের কোন নিদর্শন পাওয়া

যায় না। ধনী বা দরিদ্র সকলেরই ছিল দারুময় গৃহ। এমন-কি সপ্ততল রাজপ্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল।

জাতকে বর্ণিত কতিপয় দৃশ্যাবলী সাঞ্চি, অমরাবতী ও ভরহুট স্তূপ-বেষ্টনীতে অঙ্কিত দেখা যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে এইসকল জাতক-কাহিনীর প্রচার যে বহুল ছিল এবং উহারা যে ধর্ম্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা এই চিত্র হইতেই প্রমাণিত হয়।

জীব, সে ক্ষুদ্র বা মহৎ হউক, অথবা তর বা তম শ্রেণীভুক্ত হউক সকলেই বৌদ্ধগণের নিকট তুল্য-মূল্য। ইহা জাতকের মনোরম কাহিনী-গুলিই বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

অধিকাংশ জাতকীয় ঘটনা বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব-কালে সম্পন্ন হয়। তখনকার দিনে বৃদ্ধেরা সন্ধ্যা-দীপালোকিত কুটীরে বা কক্ষে শ্রোতৃবর্গের নিকট এইসকল কাহিনী র্ণনা করিতেন।

জাতকে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে অক্ষর-বিন্যাসের বহু পূর্ব্ব হইতে কাহিনীগুলি লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল। অক্ষর-বিন্যাসকালে হয়ত বহু কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা পরিমার্জ্জিত অবস্থায় যুগসাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছে তাহা সত্ত্বেও এইসকল কাহিনী অতীত ও বর্ত্তমানকে এক পুণ্যস্মৃতির বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে।

(মাধবী, আষাঢ় ১৩৩৩) শ্রী হিরণকুমার রায়চৌধুরী

পুরাতনী

৬৮ বছর পূর্ব্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত 'প্রবোধ-প্রভাকর' নামক একখানি গ্রন্থের ভূমিকার আরম্ভটুকু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যসেবীগণের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; সমগ্র ভূমিকাখানি পাঠ করিবার অবসর আজকালকার দিনে কাহারও নাই। গুপ্ত কবির সহজ সরল কবিতার সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই আছে, কিন্তু তাঁহার রচিত গদ্য অনেকের নিকটই অপরিচিত। একই ব্যক্তির লেখা গদ্য ও পদ্য যে কিরূপ তফাৎ হইতে পারে তাহা দেখিবার জিনিষ।

ভূমিকা

"বাক্যবাদিনী বর্ণচারিনী কণ্ঠ-বাসিনী ভ্রান্তি-নাশিনী ভাব-অর্থ-অভিপ্রায়-প্রদায়িনী দ্বিদল-কমল-দল-বিহারিণী শ্রীশ্রীমতী দৈবশক্তি দেবীর চরণ-স্মরণ করণ পূর্ব্বক এই "প্রবোধ-প্রভাকর" পুস্তক প্রকাশ প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া প্রচুর প্রয়াস পরিপূরিত পরিশ্রম ও প্রযত্ন পুরঃসর লেখনী ধারণ করিলাম..."

আবার ভূমিকা-শেষের কিছু পূর্ব্বে তিনি জানাইতেছেন—

"এই পুস্তক গদ্য-পদ্যে পরিপূরিত হইল ; এই বিষয় দুই প্রকার লিখিবার এই তাৎপর্য্য একবার গদ্য পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার পদ্য পাঠ করিলে তাহার ভাব অর্থ অভিপ্রায়াদি অতি সহজেই পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হয়নের সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যাহারা পদ্যপ্রিয় তাঁহারা গদ্যের পর পদ্য দৃষ্টে আরো অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। এই পুস্তকে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে-প্রবন্ধটি প্রকটন করিলাম তাহার তাৎপর্য্যার্থ সাধারণের সাধারণ-বোধে সহজে সংগ্রহ হইবার নহে ; ফলে শ্রীমান ধীমান পুমান পুঞ্জের পক্ষে কখনও কঠিন হইবে না।"

ইহার কয়েক বছর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৮৪৮ সনে গবর্ণমেন্টের অনুমতি মতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সদর-দেওয়ানি আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ পুস্তকের আর-একটি ভূমিকার নমুনা শুনুন। ম্যাক্‌নাট সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত রিপোর্টের এক খণ্ড হ্যালিডে সাহেব পার্শী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশিত করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার পাঁচ পাঁচ খণ্ড প্রত্যেক জেলার দেওয়ানি আদালতের জন্য ক্রয় করেন, কিন্তু ঐ রিপোর্টের বাংলায় কোন তর্জমা হয় নাই—তাই গ্রন্থকার ভূমিকায় আক্ষেপ জানাইতেছেন—

"নমঃ শ্রীহেরম্বায়।

বর্দ্ধ্যার্য্য-দীঘ-দর্শি সুধীপ্রধীবিধিদর্শি সমগ্রাভ্যগ্রে নিবেদনীয়মেতৎ—

...কিন্তু যে বঙ্গভাষা দেশের লোকের কথিত ও লিখিত ভাষা এবঞ্চ গবর্ণমেন্টের বিচারালয়ের চলিত ভাষা, এবম্ভুত বঙ্গভাষায় ভাষিত রিপোর্ট বহি এই বঙ্গভূমে প্রচারীভূত না থাকাতে প্রদেশীয় সমাজের হৃদম্বরে মনোদুঃখরূপ নিবিড় মুদির যাহা ব্যাপ্ত ছিল বাঞ্ছিত ফলদানরূপ প্রভঞ্জন দ্বারা দূরাবসরণে বিনীতমনে প্রবৃত্ত হইলাম।...প্রার্থনা এই যে ভ্রম-প্রমাদাদি জনিত মদীয় দোষ দোষজ্ঞ মহেচ্ছগণ স্ব-ছাত্রানুবোধে মার্জ্জনা করিবেন। কিম্বহুনা প্রধীবরেষিতি।"

আর-একটি লেখার নমুনা দিতেছি—দৈনিক প্রভাকরের একজন সুহৃৎ ও তরুণ লেখকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও অন্যতম সুহৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র তজ্জন্য কোন শোক প্রকাশ না করায় তাঁহাকে আক্রমণ—দুই-ই আছে।

"প্রিয় মহাশয়! বর্ত্তমান মাসের প্রথম বাসরীয় প্রভাকর পত্রিকায় প্রিয় বন্ধুবর বাবু দ্বারকানাথ অধিকারীর মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করত অজস্র-প্রবাহিত-গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। এই নিষ্ঠুর সংবাদটি কি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক ক্লেশদায়ক এবং হৃদয়বিদারক তাহা কি কহিব। পাঠাবধি মদীয় বক্ষঃস্থল যাতনানলে দগ্ধ হইতেছে এবং অনবরত শোকাশ্রু নির্গত হওয়াতেও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপ প্রবল পবন-প্রবাহে আরো প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। আহা কি পরিতাপ! ভবদীয় অমূল্য প্রভাকর পত্রিকা প্রাপ্ত মাত্রেই আদ্যপান্ত একবার সামান্য ভাবে বিলোকন করা মদীয় স্বাভাবিক সংস্কার থাকা প্রযুক্ত উক্ত পত্রিকায় "দ্বারকা নাথ অধিকারী" শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ সন্দর্শন মাত্রে প্রিয় বন্ধুর কবিত্বগুণের কোন প্রতিষ্ঠা-উৎসব গুণানুবাদ বিবেচনায় একান্ত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক পাঠারম্ভ করিয়া ক্রমশই বিপরীত ব্যাপারাবলোকনে নিদারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হওত পরিশেষ মর্ম্মবেদনায় বিদীর্ণ হইল।...

"অস্মদাদির অনুরোধক্রমে কতিপয় রচনারসিক কবিভ্রাতা ইঁহার বিচ্ছেদবিঘটিত কয়েকটি শোকসন্দর্ভ লিখিয়া প্রেরণ করেন। আহা কি পরিতাপ! আমারদিগের মনের অভিপ্রায় মনেই বিলীন হইল, উদ্দেশ্য বিষয় সুসিদ্ধ হইল না, আমরা লক্ষ লক্ষ ছাত্র মধ্যে এতদ্বিষয়ে যাঁহার দিগ্যে বিশেষ করিয়া লেখ্যরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাঁহারা সখ্যভাবাপন্ন মোক্ষ্যপদপ্রাপ্ত দক্ষ-সতীর্থ সহযোগী কবির শোক বর্ণনায় পরাঙ্মুখ হইলেন। মিত্রপুত্রপুরপ্রয়াণকারি মিত্রের মিত্র মিত্র এই কি মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেন? অপিচ বাবু বঙ্কিম প্রকৃত বঙ্কিম হইয়াছেন, চট্টগ্রামে বাস করিয়া ভট্টমহাশয় মনের স্বরূপ আক্ষেপ ব্যক্ত করিলেন, ভট্টপল্লীর পার্শ্বে থাকিয়া চট্টবাবু লেখনী ধরিতে পারিলেন না।—"

ইংরেজীর অনুকরণেই আমাদের দেশে বাংলা সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। কাজেই তাঁহাদের দেখা-দেখি Weather report প্রকাশ করার রীতি বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। গুপ্ত কবিদের আমলে তাঁহারা কি ভাবে গ্রীষ্মের বর্ণনা করিতেন তাহার একটু অংশ শুনাইতেছি।—

"হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করি। তোমার অপার কৃপার প্রভাবে বর্ত্তমান ঘোরতর ভীষ্ম গ্রীষ্মঋতুর অধিকার এপর্য্যন্ত সজীব থাকিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছি, এই নিষ্ঠুর নিদাঘে অসহ্য সূর্য্যকিরণে সময়ে সময়ে জীবন-ধারণের উপায় মাত্রই ছিল না, কেবল তোমার করুণা-বরুণালয়ের করুণা-জীবন প্রাপ্ত হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। মধ্যাহ্ন-কালে মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড-প্রকাশ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে দিক্‌সকল দগ্ধ হইতেছে। বিশ্বপ্রাণ অনিল অনলস্পর্শে উন্মত্ত হইয়া জলে স্থলে আকাশ-মণ্ডলে প্রাণিপুঞ্জকে অস্থির ও অজ্ঞান করিতেছে। দেহ নিতান্তই অবশ হইয়াছে। কাহারো বদনে বাক্য সরে না। আই ঢাই করিয়া শুদ্ধ ত্রাহি শব্দ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ুগ্রহে বায়ু এক একবার আপনার গতিরোধ করিতেছে, তাহাতে শোণিত সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভিতরের রস জলরূপে ঘর্ম্মচ্ছলে অনর্গল গল গল করিয়া নির্গত হইতেছে; ভূমিতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছি, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ যাই যাই ডাক ছাড়িতেছে। হে নাথ! এমত সময় অতিশয় কাতর হইয়া কখনো মনে মনে, কখনো উচ্চৈঃস্বরে—'হে রক্ষাকর! রক্ষা কর রক্ষা কর রক্ষা কর' এই বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, সেই সময়ে তুমি সদয় ভাবে হৃদয়ধামে উদয় হইয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক আমার দিগ্যে রক্ষা করিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হয় সুশীতল সমীরণ সঞ্চার, নয় সুবৃষ্টির সঞ্চার করিয়া সমুদয় সন্তাপ সংহার করিয়াছ, সৃষ্টির রিষ্টি হরিয়াছ। উপস্থিত গ্রীষ্মে আমরা এইক্ষণে মৃতকল্প হইয়া আবার পরক্ষণেই অমৃত পাইয়া অমরবৎ হইয়াছি।

"এই দুঃসহ দারুণ ঋতুতে তুমি জীবের শিবের জন্য যে-সমস্ত উপাদেয় ভোগের সৃষ্টি করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। সুরসাল সুমধুর অমৃত ফল; আম্র,কাঁঠাল, জাম, খেজুর,নারিকেল, তাল, তরমুজ, শসা, কদলী, প্রভৃতি অশেষ প্রকার সুস্বাদু সুমিষ্ট শুভকর ফল এবং বহু প্রকার মূল, ইহার প্রত্যেক বস্তুর রসাস্বাদন যখন গ্রহণ করি তখন রসনে সরসে রসিকা হইতে থাকে। উত্তমরূপ আহার দ্বারা ক্ষুধানল যতই শীতল হইতে থাকে, ততই তোমার নিকট কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকি। তুমি এই সময়ে জলকে স্বভাবতঃ এরূপ নির্ম্মল ও প্রিয় করিয়াছ যে, ঘোরতর তৃষ্ণাকালে অঞ্জলি পুরিয়া উদর ভরিয়া যতই জলপান করি, ততই আর তৃপ্তির সীমা থাকে না। পীযূষবৎ প্রিয়বারি পান করিতে করিতে তোমার গুণগান করিতে করিতে তান ধরিতে ধরিতে ভাবে অমনি মোহিত হইয়া যাই।"

(কল্লোল, শ্রাবণ ১৩৩৩) শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সংগৃহীত

—

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড

বহু পূর্ব্বে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা কোনো শর্টহ্যাণ্ডের অস্তিত্ব এদেশে ছিল কি না বলা কঠিন। সংস্কৃতে থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহা হয়ত অন্যান্য বিদ্যার মত লুপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাংলা শর্টহ্যাণ্ড না থাকাই সম্ভব। গত ১৯২১ সন হইতে পুলিশের জনকয়েক লোক এবং আমি প্রণালীবদ্ধ ভাবে বক্তৃতাদির রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করি। অবশ্য ১৯২১ সনের পূর্ব্বেও পুলিশের লোকেরা বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ টুকিয়া লইবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত বা কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সেইটিই ক্রমোন্নতিতে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই পুলিশ-বিভাগের বর্ত্তমান শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী। ইহার সাহায্যেই তাঁহারা রিপোর্ট লিখিতেছেন। এটা অনেকটা ইংরেজী পিট্‌ম্যান্ শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা অনুকরণ। আমি সে-প্রণালীতে যাই নাই। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বোলপুর যাই তখন জানিতে পারি যে, তিনি উক্ত বইখানি সংশোধন করিতেছেন। তিনি আমাকে বইখানি দেখান। দেখিয়া আমার মনে হইল, শর্টহ্যাণ্ড হিসাবে যদিও উহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই তথাপি উহাতে এমন উপাদান আছে, যাহা বাংলা শর্টহ্যাণ্ড তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। পরবর্ত্তীকালে যে শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী রচনা করিয়াছি তাহাতে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রেখাক্ষর বর্ণমালা' কেবল অপ্রত্যক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবেও কাজ করিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইবে যে, উক্ত রেখাক্ষর ও আমার শর্টহ্যাণ্ড এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমাণ খুবই কম এবং আকৃতিগত পার্থক্যই বেশী। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যে ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আকৃতি হিসাবে পিট্‌ম্যানের শর্টহ্যাণ্ডের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভিতরকার সামঞ্জস্য কিছুই নাই। বাইরের যে মিল সেটা ঘটনাচক্রের মিলন।

প্রত্যেক শর্টহ্যাণ্ডেই দুইটি জিনিষ একান্ত দরকার। (১) তাড়াতাড়ি লিখা, (২) সহজে পড়া। যত তাড়াতাড়ি একজন বলিয়া যাইবে ঠিক তত দ্রুত লিখিতে হইবে এবং তাহা পড়িয়া দিতে হইবে। যে-কোনো রেখাক্ষর হইলেই যে তাহা বক্তার দ্রুততার সঙ্গে সমান বেগে লিখা যাইবে তাহা নহে। শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা বলা যাইতে পারে—দ্রুত-লিখন-প্রণালী, বা শোনা কথা লিখিবার উপায়। ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত শব্দে অভিজ্ঞতা এই তিন ভিত্তির উপর সমস্ত শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। পিট্‌ম্যানের শর্টহ্যাণ্ড এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার কারণ ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ঐ শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি এবং তাহাদের উচ্চারণ একরকম কি না সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সেজন্য আমি পিট্‌ম্যানের অনুকরণ করি নাই।' এসম্বন্ধে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়াছি। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁহার প্রণালী খাপ খায়।

অনেকের বিশ্বাস 'সাউণ্ড' বা আওয়াজ দৃষ্টে শর্টহ্যাণ্ড লেখা হয়। প্রকৃত কথা এই যে, ব্যঞ্জনবর্ণের রেখাগুলি মাত্র শর্টহ্যাণ্ড-লেখক টানিয়া যায়। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় তাহাতে স্বর-সংযোগ করা হয় না। যেমন আমি লিখিব "বিদূরিত', কিন্তু শুধু লিখিলাম—'বদরত'। কোনো অক্ষরের সঙ্গে স্বর-সংযোগ করিলাম না। ইহারই নাম 'সাউণ্ড" বা আওয়াজ দৃষ্টে লেখা। কারণ বিদূরিত শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় ব, দ, র, ত এই চারিটি অক্ষরের আওয়াজই প্রধানতঃ উচ্চারিত হয়। স্বর-সংযোগ সেই উচ্চারণকে সহায়তা করে মাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে, বদরত শব্দ হইতে আমি বিদূরিত শব্দ কেমন করিয়া পাইব? এখানে কল্পনার সাহায্যই প্রধান। শর্টহ্যাণ্ড বিশেষ সাহায্য করে না, খুব জোর এইটুকু মাত্র করিতে পারে—প্রথম অক্ষর "ব"এর সঙ্গে হ্রস্ব ইকার মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পারে না। দ, র ও ত এর সঙ্গে কোন্ স্বর যুক্ত হইবে তাহা কোনো শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী বলিতে পারে না। যদি পারিত তবে শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীকে নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলা চলিত এবং তাহা হইলে ভাষার উপর দখল থাকার কোনো প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীর কোনো শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী এখন পর্য্যন্ত সে-দাবী করিতে পারে না।

তারপর পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ডের একটা বিশেষত্ব সরু ও মোটা রেখা। এটা আমিও কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। রেখা সরু ও মোটা না করিলে তাড়াতাড়ি লেখা যায় না এবং সেরূপ না লিখিতে পারিলে শর্টহ্যাণ্ডের কোনই মূল্য থাকে না। গ্রেগ-শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে সরু-মোটা রেখা নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াছি তৎপরিবর্ত্তে রেখাকে ছোট বড় করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহাতে তাড়াতাড়ি লিখিবার সময়

শব্দ হইতে অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ দখল না থাকিলে তাহা পড়া শক্ত হয়। মনে করুন, গ্রেগ শর্টহ্যাণ্ডে আমাকে 'বিদূরিত' লিখিতে হইবে। সেখানে আমি লিখিব 'বিদুত'। ইহা হইতে 'বিদূরিত' বুঝিতে হইবে। পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিয়া কল্পনা এবং স্মরণ-শক্তির সাহায্যে শর্টহ্যাণ্ডের এইসকল দোষ-ত্রুটী সারিয়া লইতে হয়। লিখিবার সময় রেখাকে সরু ও মোটা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য পড়িবার সময় বেগ পাইতে হয়। সময়ও অনেক লাগে। এই অসুবিধা দূর করিয়া তাড়াতাড়ি লিখা সম্ভব কি না জানি না। অন্ততঃ পিট্‌ম্যান্ সাহেব তেমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সকল শর্টহ্যাণ্ডেই খুব প্রচলিত শব্দসমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। ইহাকে ইংরেজিতে "গ্রেমেলগ" বা রেখা-শব্দ বলে। ইহাতে দুইটি সুবিধা আছে:—(১) পড়ার সুবিধা, (২) সময় সংক্ষেপ। "গ্রেমেলগ" কোন্ শব্দের চিহ্ন-স্বরূপ বসিল তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। এবং শব্দটি উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ে ঐটি লেখা যায়। সুতরাং অন্য শব্দ লিখিতে লেখকের সুবিধা হয়। পুলিশের শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে ঐরূপ নূনাধিক দেড়শটি 'গ্রেমেলগ' আছে। আমার প্রণালীতে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু গ্রেমেলগ জাতীয় অন্য রকম রেখা আছে। তাহাদের সংখ্যা দুইশত হইবে। এমন অনেক প্রচলিত শব্দ আছে, ঠিক নিয়মমত লিখিতে গেলে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া শেষ করা যায় না। সেজন্য সাবধানে সেইসকল শব্দের ভিতর হইতে ২।১টি অক্ষর বাদ দিতে হয়, যেন উচ্চারণের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড সমান তালে চলিতে পারে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে "কন্‌ট্রাক্‌শন্" বা সংক্ষিপ্ত শব্দ বলে। পিট্‌ম্যানের শর্টহ্যাণ্ডে এরূপ প্রায় সাড়ে তিনশ' শব্দ আছে।

শর্টহ্যাণ্ডে লিখিত হইলে বক্তার প্রত্যেক কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা লেখকের থাকা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজ-নীতি, বিষয়-কর্ম্ম, টাকাকড়ি, শিক্ষা, রেল, ইন্‌সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক, বা যন্ত্রাদি যে-কোনো বিষয় লইয়া বক্তৃতা হউক না কেন, লেখক যদি বক্তার ধারাবাহিক ভাব এবং কথার অর্থ বুঝিতে না পারে তবে তাহার পক্ষে শর্টহ্যাণ্ড পড়া অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্য শর্টহ্যাণ্ড লেখকের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। টেক্‌নিকেল্ বিষয় লইয়া যখন বক্তৃতা হয় তখন টেক্‌নিকেল শব্দের জ্ঞান থাকাও লেখকের পক্ষে আবশ্যক। এক কথায় শর্টহ্যাণ্ড-লেখকের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

(আর্থিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) শ্রী ইন্দ্রকুমার চৌধুরী

—

নারিকেল-ননী

সাধারণতঃ দুগ্ধ হইতেই ননী প্রস্তুত হয়; কিন্তু উহা প্রাণিজ। নারিকেল হইতে একপ্রকার উদ্ভিজ্জ নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রবন্ধে দিব।

বলা বাহুল্য, প্রাচ্য দেশই নারিকেলের উৎপত্তিস্থল। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে সমুদ্রকূলে নারিকেল অত্যধিক পরিমাণে জন্মায়। নারিকেলের শুষ্ক শাঁসকে "কোপ্রা" বলে। উহা এ দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি হয়। নারিকেলবৃক্ষ কদলীবৃক্ষের ন্যায় মনুষ্যের নানাপ্রকার কার্য্যে আসে। সেইজন্য ইহাকে "প্রাচ্যের কোম্পানির কাগজ" বলা হয়। আমাদের দেশে নারিকেল হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈয়ারী হয়। দাক্ষিণাত্যে নারিকেল তৈলেরও যথেষ্ট প্রচলন আছে। কিন্তু ঘৃতের এই দুর্ল্লভতার দিনে উহা হইতে মাখন তৈয়ারী হইলে সাধারণের প্রভূত উপকার হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞানবলে নারিকেল হইতে এক-প্রকার আহার্য্য স্নেহ-পদার্থ প্রস্তুত করে; উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহা অন্ততঃ স্বাভাবিক দুগ্ধজাত ননীর সমকক্ষ। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে-পবিত্রতা, খাদ্যগুণ এবং অপরাপর অংশে ইহা প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের সমকক্ষ। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রভূত পরিমাণে ভুক্ত হয়। মার্গারিন্ প্রভৃতি অন্যান্য অপকৃষ্ট 'মাখনের' বদলে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

নারিকেল-ননী পরিষ্কৃত করিবার উন্নত প্রণালী ফরাসীরাই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, মার্শেল্ সহরের কোনও ব্যবসায়ী সর্ব্বপ্রথম নারিকেল-ননী প্রস্তুত করিয়া ইউরোপীয় পণ্যশালায় বিক্রয় করেন। কালক্রমে তাঁহার কোম্পানীর বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসকল কারখানায় বার্ষিক ৩৬৫০০ টন মাখন প্রস্তুত হয়। মার্শেল্ সহর এখনও এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। কেবল-মাত্র ঐ স্থানেই বৎসরে ৭৫০০০ টন নারিকেল-ননী উৎপন্ন হয়। আরও একটি জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে ২৫ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডে ৫ পাউণ্ড নারিকেল-ননী ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণী প্রদেশে নারিকেল-ননী প্রস্তুতের ব্যয় যথাসাধ্য হ্রাস করা হইয়াছে; প্রস্তুতপ্রণালীও দোষশূন্য করা হইয়াছে। ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশ হইতে নারিকেল আমদানী করা হয়।

নারিকেলে শতকরা ৬০ ভাগ স্নেহ-পদার্থ আছে; উহার দ্রবণাঙ্ক ৭৬° ফাঃ। এযাবৎ আহার্য্য হিসাবে নারিকেল-ননীর প্রধান অন্তরায় ছিল উহার গন্ধ; কিন্তু অধুনা এই বাধা অতিক্রম করা হইয়াছে। নারিকেল হইতে প্রথমে তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। পরে উহাতে উষ্ণ বাষ্প প্রবেশ করান হয় ও ম্যাগ্‌নেশিয়া (magnesia) দ্বারা neutralise করা হয়। অবশেষে এই পদার্থ টি গরম জলে ধৌত ও পুনরায় দ্রবীভূত করা হয়। উন্নততর প্রস্তুতপ্রণালী দ্বারা এই নারিকেল-ননীকে মহিষের ঘৃতের ন্যায় অতি শুভ্র করা যাইতে পারে। তখন উহা সহজে বিস্বাদও হয় না।

জার্ম্মানীর অন্তর্গত বোহেমিয়া দেশে নারিকেল-ননী প্রধানতঃ ভারতীয় কোপ্রা হইতে প্রস্তুত হয়। উহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ:— কোপ্রাগুলি প্রথমে কুচান হয়, এবং উহা হইতে সাধারণ উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। এই কাঁচা তৈলে সাবান তৈয়ারী হইবার উপযুক্ত একটি স্নেহ-পদার্থ আছে; তজ্জন্য উহার গন্ধ মনোরম নহে। এই তৈল বড় বড় আধারে রাখা হয়। উহা পরিশোধনের জন্য প্রথমতঃ গুঁড়া খড়ি মিশান হয়; এই খড়ি স্নেহ-পদার্থ টিকে চুষিয়া লইয়া নীচে থিতাইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ উপরকার তৈলটি (৪।৫টি ফিল্টারের মধ্য দিয়া) অন্য-একটি আধারে পাম্প করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তখন ঐ তৈলটিকে বাষ্প দ্বারা ২৭০° ডিগ্রীতে উত্তপ্ত-করা একটি আধারে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়, যতক্ষণ না উহা জলের মত স্বচ্ছ হয় এবং ফুটিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ঐ তৈলটি ওজন করিয়া ছাঁচে ফেলা হয় এবং তথায় জমিয়া যায়। শক্ত তেলের ডেলাগুলি যথারীতি প্যাক করিয়া বাজারে চালান করা হয়। অবশিষ্ট অংশ হইতে খড়িগুঁড়া সাবান প্রস্তুতকরণে এবং নারিকেল-খোল পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইংলণ্ডের নারিকেল-ননী প্রস্তুতপ্রণালী অত্যন্ত মনোরম ও বৈজ্ঞানিক। কলকারখানাগুলিও বহুব্যয়সাধ্য। ঐ দেশে নারিকেল-তৈলে দুগ্ধ মিশাইয়া একপ্রকার উৎকৃষ্ট নবনীত তৈয়ারী করা হয়। তজ্জন্য সুবৃহৎ মন্থন-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মথিত দুগ্ধ এই যন্ত্র হইতে পাম্প করিয়া একটি দোতলা ঘরের উপরতলায় লইয়া গিয়া তথায় ঐ দুগ্ধ লবণাক্ত জলাধারের

উপর রাখিয়া ও অন্যান্য প্রকারে ঠাণ্ডা করা হয়। তাহার পর উহাকে যথারীতি দধির ন্যায় অম্ল করা যাইতে পারে, তাহা হইতে মাখন প্রস্তুতেরও সুবিধা আছে।

অন্য দিকে প্রাচ্য দেশ হইতে আনীত নারিকেলগুলি খণ্ড খণ্ড করা হয়। ঐগুলি উপরোক্ত কারখানাঘরের নীচের তলায় বড় বড় কটাহে দ্রব করা হয়। সে-সময় উহা ক্রমাগত নাড়া-চাড়া হইতে থাকে। তখন উপরতলার দুধের সহিত নারিকেলতৈল মিশান হয়। দুগ্ধ ও তৈলের পরিমাণ মাখনের গুণ অনুপাতে নিরাকৃত হইয়া থাকে। এই প্রণালীর কোনও পর্ব্বেই আহার্য্যটিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

মিশ্রিত দুগ্ধ ও তৈল তখনও তরল থাকে। সেই সময় উহাকে বড় বড় ঘূর্ণায়মান আধারে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় ঠাণ্ডা করিয়া জমান হয়। যখন 'আইসক্রীমের' মত জমিয়া আসে, তখন উহাকে লইয়া ভাল করিয়া মিশান হয়। এই উদ্দেশ্যে তিন সেট রুলের মধ্য দিয়া উহাকে পিষিয়া লওয়া হয়। সেই সময়ে উহাতে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত হয়, এবং ঠিক মাখনের মত ঘনীভূত করা হয়।

নারিকেল-ননীর প্রস্তুত-প্রণালী মোটামুটি এইরূপ। কিন্তু উহার বিশদ বিবরণ ব্যবসায়ীদের নিকট গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তবে উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকিলে তদনুরূপ ফল লাভ করা যাইতে পারে।

নারিকেলের স্নেহ-পদার্থ সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ; কিন্তু উহাকে মাখনে পরিণত করিবার সময় রং করা হয় এবং তদ্রূপ নরম রাখিবার জন্য কিঞ্চিৎ তিলতৈল মিশ্রিত করা হয়। তখন স্বাভাবিক মাখনে ও বৈজ্ঞানিক মাখনে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। নারিকেল-ননী বহুদিন ঠিক থাকে,...এমন-কি গ্রীষ্মকালেও সহজে খারাপ হয় না।

বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদিগের মতে নারিকেল-ননী ব্যবহারে কোনও দোষ নাই। নারিকেল-ননী একেবারে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-বিহীন। ইহা অতীব সুপাচ্য ও শরীরের পুষ্টিসাধক।

(প্রকৃতি, নিদাঘ-সংখ্যা ১৩৩৩)　শ্রী জীবনতারা হালদার

বঞ্চিতা

শ্রী সজনীকান্ত দাস

(১)

বিমলকে জামাই করা লইয়া দুই জা-য়ে ভিতরে ভিতরে বেশ রেষারেষি চলিতেছিল। বাহিরে এতদিন কথাটা কেহ খোলাখুলি ভাবে বলেন নাই; সেদিন দত্তগিন্নী আসিয়া যত গোল বাধাইলেন। দত্তগিন্নী সমস্ত গাঁ-খানার মুরুব্বী ছিলেন; তাঁহাকে দেখিলে ছেলেরা রাস্তায় মার্ব্বেল ফেলিয়া ছুটিত, মেয়েরা ডুব-সাঁতার দিতে সুরু করিত—বাড়ীর নূতন বৌয়েরা দত্তগিন্নীর 'সুখ্যাত' কুড়াইবার জন্য পানটা-দোক্তাটা সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিত, কারণ, দত্তগিন্নীর সুখ্যাতি মানেই অনেকখানি; তিনিই ছিলেন গাঁয়ের এসোসিয়েটেড্ প্রেস।

দত্তগিন্নী বলিলেন, "সুশীলা, তোর মেয়ে যে মস্ত ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্‌ল—একটা ভাল দিন-খ্যান দেখে ছুঁড়িটাকে এক-হাত ক'রে দে, বাপু। বিমলেটাও ত বেশ ডাগর-ডোগর হ'য়েছে—শুনছি লেখাপড়াতেও বেশ।"

যাহার বিবাহ লইয়া দত্তগৃহিণী এতখানি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই সুশীলাদেবীর কন্যা শ্রীমতী কনকলতা ওরফে কানি নাচিতে নাচিতে একেবারে হুড়মুড় করিয়া দত্তগৃহিণীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। বিপুলকায়া দত্তগৃহিণী একটু বিচলিত হইলেন। তবে নেহাৎ সেদিন তাঁহার মনটা খুব ভাল ছিল, তাই একটু রহস্য করিয়া বলিলেন, "কি লা কানি, এত ফুর্ত্তি কিসের?" কনকলতা ধাক্কাটা খাইয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল; ধাক্কার চোটে উচ্ছ্বাস অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। সে একটু শান্ত-ভাবে বলিল, "মা শুনেছ, এই বিমল-দা বলছিল কি—"

মা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বিমল-দা কি রে—মেয়ে যেন দিনে দিনে কি হচ্ছে—বেহায়া কোথাকার! তুই বুঝি বিমলের সামনে এখনো বের হ'স্?"

কনক একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন, বের হ'ব না কেন?"

মা এবার সত্যি-সত্যি চটিয়া গেলেন, বলিলেন, "কেন আবার—ও যে তোর বর—"

কনক লজ্জিত হইয়া 'ধ্যেৎ' বলিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিল। দত্তগৃহিণী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,

"হাজার হোক্, ছেলেমানুষ, এই সবে দশে পা দিয়েছে বইত না—ওবয়সে আমরা বরের সঙ্গে ঝালঝাপটাং খেলেছি। তা একটু হুটাপুটি করবে বই কি, বোন্, একবার শ্বশুর-ঘরে ঢুকলে কি আর রসকস কিছু থাকবে—"

পাশে সুশীলা দেবীর বিধবা জা হরসুন্দরী এতক্ষণ চুপ করিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দশ কি, দিদি, কমু যে বারোয় পা দিয়েছে—সরীর বয়স ত এই মাঘে তেরো পেরল—সরীর চাইতে কমু দু বছরের ছোট বইত নয়।" সরী হরসুন্দরীর কন্যা—কনকলতার জ্যেষ্ঠতাত-কন্যা।

কথাটা কনকের মার পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন, "মেয়ে যে সোমত্ত বয়স পেরিয়ে গিয়েছে এটা নিয়ে গাঁ-গোল করা কি ভাল, দিদি—এমনিই ত বর জোটে না—"

কথাটায় সরীর সম্বন্ধে একটু ঠেস্ ছিল। হরসুন্দরী দেবী সরসীবালার জন্য একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে একজন বিধবার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহার অধিক চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। বোসেদের বাড়ীর ছেলে বিমলকৃষ্ণকে তাঁহার খুব মনে ধরিয়াছিল এবং এসম্বন্ধে তিনি তাঁহার দেবরকে কিছু আভাসও দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবরপত্নী সুশীলার বিমল সম্বন্ধে লোভ থাকাতে দেবর ঐদিকে বিশেষ কিছু নজর দেন নাই। হরসুন্দরী এজন্য মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ ছিলেন।

দত্তগৃহিণী হঠাৎ হরসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিগো সরীর কোনো গতি ঠিক কর্‌তে পারলে?"

হরসুন্দরী ভিতরে ভিতরে অনেক দিন ধরিয়া গুমরাইতেছিলেন—বিশেষতঃ আজকে তাঁহার মনটা ভাল ছিল না। তিনি বলিলেন,—"আমিত বিমলের ভরসাতেই ছিলুম দিদি, তবে শুনছি ছোট গিন্নী নাকি তার সঙ্গে কনকের সম্বন্ধ ঠিক করছে।"

দত্তগৃহিণী এতক্ষণে একটু কোন্দলের আভাস পাইলেন—মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, "সে ত সত্যি সুশীলা, কানিকে এখনো বছর দুই রাখা চলবে—সরীর সঙ্গে বিমলের বিয়ে হ'য়ে গেলে মন্দ কি—পেটের না হোক্ ও ত তোমাদেরই মেয়ে—"

সুশীলা দেবী মনে মনে বিরক্ত হইলেন, একটু উষ্ণভাবেই বলিলেন, "আমাদের ঠিক করাকরিতে কি কিছু এসে যায় দিদি, বোস গিন্নীর ইচ্ছামতোইত সব হ'বে। সরীকে যদি তাঁর পছন্দ হয় তিনি তাকেই ঘরে ঠাঁই দেবেন। তবে কি না তিনি ছোট ক'নে চান।"

দত্তগৃহিণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি তাঁহার বিপুল বপুখানিকে উত্তোলন করিবার প্রয়াস করিতে করিতে বলিলেন, "উঠি বোন্—যার সঙ্গেই হোক মেয়ে দুটোকে পার ক'রে দাও, অত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে না—শত্রুর ত আর অভাব নেই—"

শত্রুর এতকাল অভাব থাকিলেও আর যে অভাব হইবে না দুই জা-য়েই তাহা বুঝিলেন। হরসুন্দরী একটু ভীত হইয়া বলিলেন, "এসো দিদি—মাঝে মাঝে তোমরা একটু পায়ের ধূলো দাও ব'লে এই পোড়া দেহ নিয়ে বেঁচে আছি।" কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, "ওরে সরী, তোর জ্যেঠিমাকে দুটো পান দিয়ে যা ত—একটু দোক্তাও আনিস্।"

দত্তগিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "দোক্তার কথা কি আবার সরীকে ব'লে দিতে হয় বোন্, ও আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে—জ্যেঠিমাকে বেশ চেনে।"

সুশীলাসুন্দরী কথাটায় প্রীত হইলেন না। তিনি ইহার অর্থটা করিলেন—অর্থাৎ কনকের সহিত তুলনায় সরী লক্ষ্মী—তিনি বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের ভিতরে গেলেন।

সরী অর্থাৎ শ্রীমতী সরসীবালা শান্তপদক্ষেপে ধীরে ধীরে আসিয়া জ্যেঠিমার হাতে পান ও দোক্তা দিল। আপনাকে মায়ের অনেক কষ্টের কারণ জানিয়া সে মনে মনে যথেষ্ট সঙ্কুচিত থাকিত ও বাহিরেও আপনাকে যতটা পারিত গোপন করিয়া রাখিত। তাহার বয়স সবে চতুর্দ্দশ হইলেও সে বয়সের অনেক অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল ও বয়সের চাইতে অনেক বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিত। সে শ্যামাঙ্গিনী, কিন্তু তাহার চারিদিকে একটি মনোরম মাধুর্য্যের প্রলেপ ছিল; ক্ষীণ দেহ-বল্লরী লইয়া সে যেখানে উপস্থিত থাকিত সেখানেই কেমন একটা

শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত। বিমলকে লইয়া মা ও কাকীমার ভিতর যে মনান্তর ঘনাইয়া উঠিতেছিল তাহার কথঞ্চিৎ আভাস সে পাইয়াছিল; সেইজন্য সে আর বিমলের সম্মুখে বাহির হইত না।

কিন্তু বিমলকে তাহার ভাল লাগিত। বিমল আসিয়া যখন নানা হাস্য-পরিহাসে তাহার স্বভাব গাম্ভীর্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিত তখন সে এমন একটি অপরিচিত জগতের আংশিক পরিচয় পাইত যেখানে যাইবার তাহার গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তাহার আবেষ্টনী যে-স্থান হইতে তাহাকে নিরন্তর দূরে রাখিত। সে বহুবার কল্পনা করিয়াছে— বিমলের সংসারে সে সর্ব্বময়ী হইয়া কল্যাণে, প্রেমে ও ও সেবায় তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি ভরিয়া তুলিয়াছে;— —শাশুড়ীকে সংসারের জন্য খড়-কুটাটি পর্য্যন্ত সে নাড়িতে দিবে না—বিমলকে সে সর্ব্বভাবে সুখী করিবে ইত্যাদি নানা চিন্তা তাহার মনকে আবিষ্ট করিয়াছে; তাই সেও যখন কনকের সহিত বিমলের বিবাহের প্রস্তাব শুনিল তখন মনে মনে প্রসন্ন হইল না। তবু সে কনকের মন বুঝিবার জন্য একটু রহস্য করিয়া একবার কথাটা তাহার কাছে পাড়িল; কনক হাসিয়া লুটোপুটি হইল। সরসী ঠিক কারণ বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে একটু খুসী ছিল।

দত্তগিন্নীর হাতে পানদোক্তা দিয়া সরসী দাঁড়াইয়া রহিল। দত্তগিন্নী আদর করিয়া তাহার থুত্‌নী নাড়িয়া একটা চুমো খাইয়া বলিলেন—"মা আমার ভারী লক্ষ্মী, এ-মেয়ে তোমার কখনো কষ্ট পাবে না, বড় বউ— ও যে-ঘরেই যাক্ সে ঘর আলো করবে।"

সরসী লজ্জিত হইয়া আঙুলে আঁচল জড়াইতে লাগিল। দত্তগিন্নী সশব্দে চলিয়া গেলেন।

(২)

যাহাকে লইয়া এত গোলমাল সেই শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ বসু গাঁয়ের স্কুল হইতে মাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়া— কলিকাতায় ইণ্টারমিডিয়েট্ পড়িতেছিল। এইবার পরীক্ষা দিবে। চঞ্চল ও দুষ্ট প্রকৃতির বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। পড়াশুনায় সে বেশ ভাল হইলেও ডাংপিটেমির জন্য তাহার নিন্দাও নিন্দুকে করিত, কিন্তু তাহার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাহারা তাহার গুণের জন্য দোষগুলি অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিত। সে হাস্য-পরিহাস হৈচৈ হট্টগোল করিয়া কাটাইলেও কর্ত্তব্যে তাহার কখনো অবহেলা ছিল না। গাঁয়ের মেয়েদের সব ফাই-ফরমাস সে খাটিয়া দিত; চিঠি লিখিয়া দিত ও বিপদ-আপদে সাহায্য করিত। গাঁয়ের ছেলেদের সে ছিল নেতা, সুতরাং, গাঁয়ের মুরুব্বিরাও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। প্রত্যেক বাড়ীতে তার অবাধ গতি ছিল—বড় মেয়েদের সে অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিল—ছোট মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। এটা সেটা আনিয়া দিয়া, আজগুবী গল্প বলিয়া ও নানা ভাবে উপহাস ও অত্যাচার করিয়া সে তাহাদের মন কাড়িয়া লইয়াছিল। সে যখন ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল তখন বৃদ্ধারা তাহার বিধবা মাতার দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র যে বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া ফিরিবে তাহারও আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু ছোটরা সত্য-সত্যই কষ্ট পাইয়াছিল। বিমল প্রত্যেক ছুটিতে আসিবে, ও প্রত্যেক বারে তাহাদের জন্য উপহার আনিবে, এইসব আশ্বাস দিয়া তাহাদের অনেকটা ভুলাইয়া রাখিত।

মিত্রবাড়ীর সঙ্গে বিমলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুশীলা দেবীর পুত্র ব্রজেন ছিল তাহার সহপাঠী;—সরসী কিম্বা কনকের সহিত ভবিষ্যতে যে বিমলের একটা গুরুতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে একথা ব্রজেনও জানিত, বিমলও জানিত; ইহা লইয়া বিমল যখন-তখন ব্রজেনকে ঠাট্টা-তামাসা করিতেও ছাড়িত না। এই বিবাহের বিরোধী বিমল কখনো ছিল না—তাহার মাতাও এবিষয়ে অনেকটা মতস্থির করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধের কথা ভালোরকমে ওঠার পর সরসী আর পারৎ পক্ষে বিমলের কাছে বাহির হইত না, তবে কাছা-কাছি গোপনে থাকিয়া বিমলের হাস্য-পরিহাস উপভোগ করিত। কনক যে বিমলের কাছে গিয়া লাঞ্ছিত হয়, সে যাইতে পারে না, ইহাতে সে আজকাল একটু ঈর্ষ্যান্বিত

হয় ; সে কনককে বারণ করে, কনক শোনে না ; বিমল-দা বলিতে কনক অজ্ঞান ; বিমলের সহিত ঝগড়া না করিলে তাহার দিন চলে না।

এইভাবে বেশ দিন চলিতেছিল। কনক সরসী যে হোক একজনের সঙ্গে বিমলের বিবাহ হইবে গ্রামের প্রত্যেকেই তাহা জানিত ; বিমল সরসীকে বেশ পছন্দ করিলেও কনককেও তাহার মন্দ লাগিত না ; 'স্বয়ম্বর' হইতে হইলে কাহাকে সে গ্রহণ করিবে সে-সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। সে জানিত, তাহার মা সরসীকেই বেশী পছন্দ করেন ও সম্ভবতঃ সরসীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, কিন্তু কনকই বা মন্দ কি ? সরসীটা ভারী গম্ভীর—কনকের মত হৈ চৈ করিতে পারে না। সে নিজে হৈ-চৈ একটু বেশী পছন্দ করিত।

বিমলের দিক্ দিয়া বিমল যাহাই ভাবুক বিমল সম্বন্ধে কনক ও সরসী দুইজনে ভিন্ন মত পোষণ করিত। কনক বয়সে ছোট—বিবাহ জিনিষটা ঠিক কি ব্যাপার সে না বুঝিলেও আঁচ করিয়াছিল জিনিষটা বেশ মজার, সুতরাং একটা মজার ব্যাপার বিমল দার সহিত ঘটিবে ইহাকেই সে যথেষ্ট মনে করিত ও সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইত, সে বিমলদার বউ হইবে। এই লইয়া বিমল-দাকেও সে অনেক পরিহাসাদি করিয়াছে। বিমল তাহার কান মলিয়া দিয়াছে।

সরসী জিনিষটা বুঝিত ও বিমলকে বিবাহ করিলে সে যে খুবই সুখী হইবে তাহাও মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। ঠিক প্রেম করিবার মত বয়স না হইলেও বিমলের দিকে তাহার মন অনেকটা ঝুঁকিয়াছিল ; সেইজন্য বিমলের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করিলেও সে লজ্জায় দূরে দূরে থাকিত।

কিন্তু গোল বাধিল অন্য দিক্ হইতে। বিমল কলিকাতায় প্রথম যখন আসিল তখন তাহার ভারী বিশ্রী লাগিত ; সব যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা—কাহারো সহিত কাহারো নাড়ার টান নাই ! তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি, তাহার শিষ্যবৃন্দ ও তাহার সঙ্গিনীদের কথা ভাবিয়া সে ভারী বিমর্ষ হইত। সে কলিকাতায় তাহার জ্যেঠতুত দাদাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাঁহারা খুব বড়লোক—কলিকাতার বনেদী ঘর। প্রথমটা সে এই বাড়ীতে বৌদিদিদের আদর-যত্নের ভিতর তেমন বন্ধন অনুভব করিত না—না করিলে নয় এইভাবে যেন তাহারা তাহার যত্ন করেন। সে চুপ করিয়া তাহার নির্দ্ধারিত ঘরখানিতে বসিয়া বসিয়া নিজের গ্রাম, মা ও বেশীর ভাগ সময় সরসী ও কনকের কথা ভাবিত,—তাহারা কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে—কবে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, এইসব চিন্তা। কিন্তু ক্রমশঃ কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহিয়া গেল ; তাহার ধাতের পরিবর্ত্তন হইল। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্, ফ্যান্, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল, গড়ের মাঠ, লোক-লৌকিকতা, সব মিলিয়া কলিকাতা বহুবিস্তৃত ও প্রচুর রহস্যময়। তাহাদের গ্রামখানি ক্রমশঃই তাহার নিকট অপরিসর ও ক্ষুদ্র হইয়া আসিতে লাগিল। মেজ বৌদিদির বোনেদের দেখিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাও তাহার পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহারা কেমন আপ্‌টুডেট্—কেহ বেথুন, কেহ ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ে পড়ে, জুতো পরে, ইংরেজী বুক্‌নি দিয়া কথা বলে, চুল বাঁধে না, ইত্যাদি নানা জিনিষ ক্রমশঃ তাহার চোখসওয়া হইয়া গিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি ও মত তাহার নূতন অভিজ্ঞতার মোহে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গ্রামের খেলাধূলা সুখদুঃখের স্নেহ-মমতার কথা ক্রমশঃ আবছা হইতে হইতে মিলাইয়া গেল—যতটুকু মনে রহিল ততটুকুতে শুধু গ্রাম্যতার গন্ধ রহিল—হৃদয়ের পরিচয়টুকু সে বিস্মৃত হইল। যে-গ্রামের আবেষ্টনী এত দিন তাহাকে সুখদুঃখের রসদ জোগাইয়াছে—যে-গ্রামের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ তাহার মনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল, তাহার আশু-আবিষ্কৃত জগতে সে-গ্রামের স্থান ছিল না—থাকিলেও উপহাসের ভয়ে সে তাহা স্বীকার করিত না। তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি লইয়া তাহার গ্রাম্যপনা দেখিয়া পূর্ব্বে যখন তাহার কলিকাতার আত্মীয়-আত্মীয়ারা উপহাস করিয়াছে তখন সে প্রতিবাদ করিয়াছে—ক্রুদ্ধ হইয়াছে ; একেলা নিজের ঘরে অশ্রু বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়াছে। আজকাল সেও এই উপহাসে যোগ দেয়। নূতন শিকার পাইলে সেও লাঞ্ছনা করে। এমনকি যাহারা তাহার মনের অনেকখানি ঠাঁই জুড়িয়াছিল সেই সরসী ও কনকের

বোকামি ও পাড়াগেঁয়ে ভাব লইয়া সে এখন নিজেই সরস গল্প করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মনোরঞ্জন করে; পূজার বেদীতে একদিন যাহাদের স্থান ছিল তাহারা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বিমলকৃষ্ণের পরিচ্ছদাদির সহিত মনেরও পরিবর্ত্তন হইল।

বিমলের কলিকাতা যাওয়ার দ্বিতীয় বৎসরে এই জিনিষটা খুব বেশী প্রকট হইল; নেহাৎ মা আছেন বলিয়া তাহাকে গ্রামে আসিতে হয়; না আসিতে হইলে সে সুখীই হইত। দুই চার দিন থাকিয়া মিথ্যা পড়া-শোনার ওজুহাত দেখাইয়া সে কলিকাতা যাইবার চেষ্টা করে। কলিকাতার মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

তাহার এই উদাসীনতা আর-কেহ লক্ষ্য না করিলেও সরসী ইহা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। সে দেখিতে পাইতেছিল তাহাদের বিমল-দা আর সে বিমল-দা নাই—এ যেন সম্পূর্ণ নূতন লোক—এজন্য সরসী যথেষ্ট ব্যথিত হইলেও হাল ছাড়ে নাই।—বিমল তাহাকে বিবাহ করিবে, একথা এখনো সে ভাবিতে পারিত।

কনক বিমলের এই পরিবর্ত্তন মনে মনে অনুভব না করিলেও বাহিরে বিমল-দার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিমল-দা আর তেমন করিয়া তাহাকে কাছে ডাকেন না। ডাইনী রাক্ষুসী ইত্যাদি বলিয়া আর তাহাকে জ্বালাতনও করেন না। সে অভিমান করে—বিমলকে উত্যক্ত করিতে চেষ্টা করে এবং মাঝে মাঝে বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষমও হয়—এইটুকু পাইয়াই কনক সন্তুষ্ট থাকে।

(৩)

পূজার ছুটিতে বিমল গ্রামে আসিয়াছে। পূজার কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা—সুতরাং সে পূজার কয় দিন দেশে থাকিয়া কলিকাতা ফিরিবে, মায়ের নিকট ইতি-মধ্যেই সে-অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু বিমল এবার সুস্থ মন লইয়া ফিরিতে পারিল না। সেদিন সুশীলা দেবী ও হরসুন্দরী দেবীর ভিতর যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল তাহার ঢেউ তাহাকেও গিয়া লাগিল। কনকের পিতা বিমলের মাতার নিকট এবিষয়ে কথা পাড়িলেন। বিমলের মাতার অমতের কারণ ছিল না, তবে তিনি একবার ছেলের মতটা জানিতে চাহিলেন;—লেখা-পড়া-জানা ছেলে, তার মতটা নেওয়া যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন। মাতা এই সঙ্গে সরসীর কথাটা পাড়িতেও ভুলিলেন না।

যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে যাহা দুর্লভ স্বপ্ন ছিল আজ বিমলের তৎসম্বন্ধে কোন মোহই ছিল না। কনক বা সরসীকে বিবাহ করার কথা ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল। 'অচল' লিখিতে যাহারা তিনটা ভুল করিবে তাহাদের সঙ্গে বিবাহ!—অসম্ভব। সে মাতাকে জানাইল যে, সে বি-এ পাশ না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না—পড়া-শোনার সময়ে বিবাহ করিলে পড়া-শোনার নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া মাকে অনেকটা ঠাণ্ডা করিল।

মা বলিলেন, "ওদের মেয়ে যে খুব বড় হ'য়ে উঠেছে—ওরা কি আর ঘরে রাখবে?"

মৃদু হাসিয়া বিমল বলিল, "মা, দেশে মেয়ের ত দুর্ভিক্ষ হয়নি—ঢের মেয়ে পাওয়া যাবে। ওদের বিয়ে হ'য়ে গেলেই ভাল।

বিমলের মতের পরিবর্ত্তন হইলেও মাতার হয় নাই। এতকাল তাহাদের সহিত কথাটা পাকাপাকি না হইলেও কথাটা এমন প্রচারিত হইয়াছিল যে, এখন অমত করিলে অন্যায় করা হইবে। কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। তিনি অগত্যা মিত্র-বাড়ীতে জানাইলেন যে, ছেলে তিনটা পাশ না দিয়া বিবাহ করিবে না। শুনিয়া দুই পরস্পর ঈর্ষা-পরায়ণা জা-য়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবু কনকের পিতা বর্ত্তমান, তাহার পাত্রের অভাব হইবে না—হরসুন্দরী চোখে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি একদিন গোপনে বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি ত অবুঝ নও, আমি যে বহুকাল থেকে আশা ক'রে আস্‌ছি তোমার হাতে হতভাগীকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ব—" সরসী জানিত মা বিমলকে কেন ডাকিয়াছেন। সে অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল;—ছি ছি ভিখারীর মত কৃপা-প্রার্থনা!—বিমলের উত্তর শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া রহিল।

বিমল বলিল, "কাকী-মা! সরীকে যে আমি এত দিন বোনের মতই দেখে এসেছি; ওর সঙ্গে বিয়ে হ'বার কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়—তা ছাড়া আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না—"

হরসুন্দরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্তরালে সরসী রাগে ফুলিতে লাগিল—এতদিন পরে এই কথা! সে ত বহুকাল হইতে এই সম্বন্ধের কথা জানিত। কি প্রয়োজন ছিল তাহার এতকাল ইহাকে জীয়াইয়া রাখিবার—আগে বলিলেই ত হইত। হরসুন্দরী বলিলেন, "বাবা, তুমি বিয়ে না কর—একটা পাত্র ওর জুটিয়ে দাও—তোমার ত বাবা অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমার যে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই—"

সরসী ভাবিল—তাই বৈকি, ওর ঠিক-করা বরকে আমি কখখনো বিয়ে করব না। বিমল বলিল, সে চেষ্টা করিবে।

বিমল কলিকাতা চলিয়া গেল।

(৪)

ইহার পর এক বছর বিমল দেশে ফিরিল না। পরীক্ষা দিয়া মেজদাদার সঙ্গে পুরী গেল; সমুদ্র দেখিল এবং আরো সব অভিজ্ঞতা লাভ করিল যাহাতে তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহার মন হইতে একেবারে লোপ পাইল। কনক বা সরসীর স্থান কোথায়ও রহিল না।

পুরীতেই সে পরীক্ষায় পাশের খবর পাইল; সে একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া বি-এ পড়া সুরু করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এক দোজবরে পাত্রের সহিত সরসীর বিবাহ হইল—সে নির্ব্বিবাদে বিবাহে মত দেয় নাই; অনেক ওজর-আপত্তি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার পর বিবাহ করিয়াছে। বিমলকে সে এজন্য ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাহার কিশোর মনে একবার যে ছাপ্ পড়িয়াছিল তাহা আর উঠিল না—বিমল তাহাকে ভুলিলেও সে বিমলকে ভুলিতে পারিল না। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবার নয়। সে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতে লাগিল। স্বামীকে সে আপন ভাবিতেও পারিল না—আপন করা ত দূরের কথা। স্বামীর সহিত কোনো প্রকার অসদ্ব্যবহার না করিলেও যতটা পারিত স্বামী হইতে দূরে দূরে থাকিত। বিবাহের পর সে যখন প্রথমটা শ্বশুর বাড়ী গেল তখন তাহার মন বেদনা ও হতাশায় আচ্ছন্ন। শ্বশুর-বাড়ীতে দুইদিন থাকিয়াই সে হাঁপাইয়া উঠিল। কাঁদাকাটা করিয়া সে মায়ের কাছে শান্তি খুঁজিতে আসিল, তাহার পর সে আর শ্বশুর বাড়ী যায় নাই। স্বামীর সহিত পত্রাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত করে না। তাহার স্বামীর বয়স হইয়াছে—তিনি সদ্যপরিণীতা বালিকা-স্ত্রীর এই বিমুখতা ছেলে-মানুষী ভাবিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন না; সবুরে মেওয়া ফলে—জানিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কনকেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বামী সদ্য-পাশ-করা ডাক্তার। কনকের মনে বিমলের সম্বন্ধে এতটুকু খোঁচা ছিল না বলিয়াই সে সখীদের সঙ্গে যথারীতি স্বামীকে লইয়া আলোচনা করে—মস্ত মস্ত চিঠি লেখে—আর স্বামীর চিঠিগুলি সগর্ব্বে সখীদের দেখাইয়া বেড়ায়।

বিবাহের পর কনক উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীর মত কল্ কল্ করিয়া ফিরিত—হাসি গল্প গানে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া রাখিত। বিমল-দা একদা যেমন তাহার খেলার সামগ্রী ছিল—স্বামীকেও সে তেম্নি খেলার সামগ্রী বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহার ভারী ইচ্ছা করিত স্বামীর সহিত বিমল-দার আলাপ করাইয়া দেয়।

কিন্তু সরসী যতটা পারিল বাহির হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনের গভীর অতলে ডুবিয়া রহিল; সে পূর্ব্বের মত আপন মনে বসিয়া-বসিয়া স্বপ্ন রচনা করে—বাস্তবতার আঘাতে এখন সে স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া যায়; সে ভাঙে আর গড়ে। সে চলে ফেরে, সংসারের প্রত্যেকটি কাজ করিয়া যায়—কিন্তু কোথায়ও কোনো ফাঁক দিয়া প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৫)

পূজার ছুটিতে বিমল যখন বাড়ী আসিল তখন সে মনটিকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিল না; মেজ-বৌদির

ছোট বোন লিলির হাতে সেটিকে সমর্পণ করিয়া আসিল। লিলি ব্রাহ্ম-বালিকাবিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে পড়িত। বিমল ও লিলির ভিতরে অদূর ভবিষ্যতে যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে বৌদিদি উহা প্রচার করিয়াছিলেন ও দুই জনের মিলিয়া মিশিয়া চলাফেরা করার যথেষ্ট অবকাশও দিয়াছিলেন। বিমলের সেজদাদা পর্য্যন্ত ইহা লইয়া লিলির সহিত কৌতুক করিতে ছাড়েন নাই। বিমল যখন অল্পকয়েক দিনের কড়ারে বাড়ী আসিল, লিলি তাহাকে শপথ করাইয়া লইল যে, সে প্রত্যহ একটি করিয়া পত্র দিবে।

আপনার রঙীন্ স্বপ্নে বিভোর হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া বিমল গ্রামে আসিয়া বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করিল না। কনক শ্বশুরবাড়া গিয়াছে; সরসী তাহার সম্মুখে ক্বচিৎ বাহির হয়। বিমল যদি সহজ অবস্থায় থাকিত তাহা হইলে এই অভাবে ব্যথা অনুভব করিত—সরসীর ব্যথাকাতর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইত; কিন্তু সে তখন যৌবনের স্বপ্নে বিভোর—সরসীর বুভুক্ষা সে দেখিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে অজানিতভাবে একটি নিরীহ বালিকার জীবনকে কি ভাবে নষ্ট করিয়াছে। বিমলের আদর্শ যদি কৈশোরেই সরসীর মনে গাঁথিয়া না লইত হয়ত এই স্বামীর সহিতই সে আর পাঁচ জনের মত স্বচ্ছন্দে সংসার পাতিতে পারিত; কিন্তু স্বামীর বয়স, বিপুল দেহ, জরাগ্রস্ত মন বিমলের সহিত তুলনায় এতটা প্রকট হইয়া উঠিত যে, সরসী স্বামীর ঘর করিবার কল্পনাতেও শিহরিয়া উঠিত। তাহার ক্ষুদ্র মনে বিমল ছাড়া আর কাহারো স্থান ছিল না।

বিমলের এই তন্ময়তা সরসী লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর সহিত লড়াই চলে না; সে নিজেই পীড়িত হইতে লাগিল। সে বিমলদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া প্রায়ই দেখিত বিমল আপনার পড়ার ঘরে হয় কিছু লিখিতেছে—পড়িতেছে—কিম্বা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রোগের লক্ষণগুলি ধরিয়া সরসী রোগটি আঁচ করিয়া লইল—তাহার অজানিত প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার মন ছটফট্ করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিত, বিমল কাহার চিঠির অপেক্ষায় উন্মুখ করে; প্রত্যহ যেন কাহাকে চিঠি দেয়—বৈকালে যখন বিমল বেড়াইতে বাহির হইত তখন সে বোসেদের বাড়ী গিয়া বই আনিবার অছিলায় বিমলের ঘরে অনুসন্ধান সুরু করিয়া দিত।

ইতিমধ্যে সরসীকে লইবার জন্য তাহার স্বামী আসিলেন। সরসী প্রমাদ গণিল। সে বাঁকিয়া বসিল; স্বামীর কাছে সে যাইবে না।—হরসুন্দরী মেয়ের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মেয়েকে বাগ মানাইতে পারিলেন না।

বিমল সরসীর স্বামীর সঙ্গে প্রথম দিনেই বেশ আলাপ জমাইয়া লইল। মানুষটি ভাল—যথেষ্ট সাংসারিক লোক।

পূরা একদিন অতীত হইল, তবু সরসী স্বামীর কাছ ঘেঁসিল না। হরসুন্দরী দেবী গাল দিলেন, বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কাঁদাকাটা পর্য্যন্ত করিলেন—সরসী টলিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বিমলের শরণাপন্ন হইলেন, তিনি জানিতেন—সরসী বিমলের কথা শুনিবে।

বিমল আসিয়া সমস্ত শুনিয়া একটু হাসিল, বলিল, "ছেলেমানুষ, কাকী-মা—লজ্জায় অমন করছে; তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

হরসুন্দরী কাতরভাবে বলিলেন, "বাবা, ভয় করছি কি সাধে, পোড়া-কপালী কেমন কপাল নিয়ে জন্মেছিল! পড়েছে ত দোজবরের হাতে; এর ওপর যদি জামাইটির মন বিগ্‌ড়ে দেয়, ওর গতি কি হবে বল দেখি! হাজার হোক্ পুরুষমানুষ তো—কত সহ্য করবে! হতভাগী আমাকে জ্বালিয়ে খেলে। তুমি বাবা একবার ওর সঙ্গে দেখা কর।"

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "সরসী কোথায়?" হরসুন্দরী একখানি ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওই বড় ঘরের মেঝেতে ব'সে আছে—"

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; জামাইয়ের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। সরসী আজ সমস্ত দিন ঘরের বাহির হয় নাই, বড় ঘরের মেঝেতে সে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল; বিষাদের যেন প্রতিমূর্ত্তি! এই ছেলেমানুষী

করিয়া সে যে কি লজ্জার ব্যাপার ঘটাইতেছে ইহা ধারণা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার ছিল না; সে শান্ত ভাবে বসিয়াছিল।

বিমল ঘরে ঢুকিয়া চমকিয়া উঠিল, ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল—সেই স্তিমিত আলোকে সেই স্তব্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিমল আশ্চর্য্য হইল বলিল—"সরী, ছি! আর ছেলেমানুষী করে না—দেখ্ দেখি মা তোর জন্যে আজ সমস্ত দিন খান্‌নি—খালি কাঁদ্‌ছেন। ওঠ্ চল্, খেয়ে নিয়ে বিনোদ-বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বি চল্।"

বিনোদবাবু সরসীর স্বামী।

সরসী একবার ঘাড় তুলিয়া বিমলের দিকে চাহিল—স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি! সে কি যেন বলিতে গেল—ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল মাত্র—কথা বাহির হইল না।

বিমল তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল, সরসী বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিমলের দিকে আয়তদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিল—সে-দৃষ্টিতে বহুদিনের সঞ্চিত রুদ্ধ অভিমান ফাটিয়া পড়িতেছিল।

সে দৃষ্টি নামাইয়া আবেগকম্পিত স্বরে আবার কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর সে বিমলের দিকে চাহিল;—অন্তরের প্রবল দ্বন্দ্ব তাহার শান্ত মুখশ্রীতে একটা উগ্রতা আনিয়া দিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি" বলিয়া সে ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমল স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে অতীতের স্মৃতি—বহুদিনের বিস্মৃত কৈশোরের মধুর স্বপ্নগুলি ঝলকিয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল—কি ভাবে নিজকে বঞ্চিত করিয়াছে—কিন্তু এখন আর উপায় ছিল না!

বিমল কিছুদিন লিলিকে পত্র দিতে পারিল না।

বনস্পতি

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

মেঘময় ধূমল আকাশ—
স্পন্দহীন নভো-যবনিকা,
যেন অন্ধ আঁখির আভাস,
—নেত্র আছে, নাই কনীনিকা।

তারি তলে বৃদ্ধ বনস্পতি
—অতি দীর্ঘ দেহ পত্রময়,
দাঁড়াইয়া মহামৌনব্রতী
গণিতেছে আসন্ন প্রলয়।

রুদ্ধ শ্বাস, নাহি শিহরণ—
বজ্র বুঝি পড়িবে মাথায়!
সর্ব্বাঙ্গের সবুজ বরণ
ক্ষণে ক্ষণে কালো হ'য়ে যায়!

স্তব্ধ হ'ল মর্ম্মের মর্ম্মর,
কি দারুণ মানস-নিগ্রহ!
তরু বুঝি হ'ল জাতিস্মর—
জড় আজ সচেত-বিগ্রহ!

যে বাণী বিহরে শুধু বুকে,
অন্তরের অন্তিম সীমায়—
সে ওই প্রকাশে যেন মুখে
নিরাশার উগ্র গরিমায়!

ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়,
ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বনে
বনস্পতি নির্ব্বাক্ নির্ভয়।

নীরসকে সরস করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ফরাসীচিত্রবিদ্‌গণের তরলতা যদি জাপানী শিল্পের গাম্ভীর্য্যকে একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয় তাহাতে ক্ষতি হইবে।

যোশীনাগা কাজুয়ুজি জাপানের একজন চিত্রশিল্পের খ্যাত সমালোচক। তিনি এই ফরাসী প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, জাপান অতিরিক্ত সূক্ষ্মতার দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাঁহার ভয় হয় পাছে সূক্ষ্মতম হইতে হইতে একেবারে শূন্যতায় পরিণত হইয়া পড়ে। জাপান এখন অতিরিক্ত ভব্যতা শিখিতে চাহিতেছে; জাপানের চিত্রশিল্পেও যথেষ্ট বাবুয়ানী ঢুকিয়াছে। জাপানী চিত্রশিল্পে অত্যন্ত মেয়েলিপনা লক্ষিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিমুগ্ধ জাপানের একদল কলাবিদ্ প্রাচ্যের ভাবোদ্দীপক (suggestive) চিত্রকলাকে আর পছন্দ করেন না; তাহাকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-হীন মনে করেন। তাঁহারা চিত্রশিল্পকে ফোটোগ্রাফীর সামিল করিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশেও এই ধরণের ফোটোশিল্পীর আদর অত্যন্ত বেশী; ইহাতে যথার্থ শিল্প যে কি ভাবে নষ্ট হয় তাহার বিচার আমরা পরে করিব। অনেকে রোমক ও গ্রীক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলিকে এই ফোটোশিল্পের শ্রেণীতে ফেলিয়া এই ধরণের শিল্পের গুণকীর্ত্তন করেন। কিন্তু আসলে র‍্যাফেল, ভ্যাণ্ডাইক, বতিচেল্লি, প্রভৃতির ছবি যে কতটা ভাবব্যঞ্জক তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

ফরাসী চিত্রকলার প্রভাব ছাড়াও চীন ও জার্ম্মানীর প্রভাব জাপানী চিত্রশিল্পে দৃষ্ট হইতেছে; ইহাতে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখানে যে ছবি দুইটি দেওয়া হইল তাহা আসল ছবি দুইটির ক্ষীণ ছায়া মাত্র; এই ছায়া হইতেই আসল জিনিষের সৌন্দর্য্য কতকটা বুঝা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রথম ছবিখানি চীনা চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত। এই চিত্রটি প্রাচ্যের কল্পনা-শক্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিত্রকলায় কতখানি স্বপ্নের সৃজন করা যায়, এই ছবিটি দেখিলে তাহা বুঝা যায়। কঠোর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মধ্যে মানুষ বা[স] করে; পটভূমির বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র তাহাই সূচিত করিতেছে সেখানে শুধু নির্ম্মমতা, শুধু সংগ্রাম; —এই নির্ম্ম[ম] প্রকৃতির অন্তস্তলেই মানুষ আপনার কুটীর রচনা করে রূপে রসে সৌন্দর্য্যে সেটিকে ভরিয়া তোলে। এ[ই] অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে, এই কর্কশের মধ্যে স্নিগ্ধকে, এ[ই] বন্ধুরের মধ্যে মনোরমকে এমন করিয়া মানুষ খা[প] খাওয়ায় যে, একটু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। শুধু কি তাহাই? মানুষ এই নির্ম্মম প্রকৃতিকে ভালবাসে— এই আবেষ্টনীর মধ্যে সে বাড়িয়া উঠে বলিয়াই নয়, এই আবেষ্টনীর সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া কঠোর প্রকৃতিও একান্ত নির্ম্মম নহে; সে তাহার পাষা[ণ] বুক চিরিয়া মানুষের আবাসভূমির উপর ঝরণার স্রো[ত] বহাইয়া দেয়। এই ছবিটিতে মানুষের সৃজনীশক্তি [ও] সৃষ্টি-মহিমা উভয়ই দেখান হইয়াছে। নিখিল বি[শ্ব] প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রেম ও দ্বন্দ্বের এটি যেন এক ইতিহাস।

দ্বিতীয় ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিরোশি[...] কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইহাতে জার্ম্মান্-শিল্পের যথেষ্ট প্রভা[ব] আছে। সামান্য দুইটি হাত ও একটি পায়ের চিত্রে অপূ[র্ব] শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে আধুনিক জার্ম্মান্ চিত্রকল[া] সমর্থ। জাপানী ও জার্ম্মান্ এই বিভিন্ন চিত্রশি[ল্পের] বর্ণসঙ্করে এক অভিনব উপাদেয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্র প্রায় নিস্তর[ঙ্গ]। নৌকার মাঝি আনমনে নৌকা বাহিতে-বাহি[তে] হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছে; বহিঃপ্রকৃতি তাহ[ার] কর্ম্মক্লান্ত মনকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে। সে সমুদ্রের বু[কে] দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের শান্তি ও স্তব্ধতা দেখিয়া তাহ[ার] নৌকাখানির কথাও বিস্মৃত হইয়াছে; দাঁড় টানি[তে] ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার রোমশ হস্তাংশ দুটি ও [...]খানি দেখিলেই বুঝা যায় কি অদম্য শক্তি উহার [...] সংহত হইয়া আছে। এই বিপুলকায় লোকটিও প্রকৃ[তির] শান্তভাব দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। ছবিখা[নি] দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা কবিতাটি মনে পড়ে।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১৩)

বাদ্‌লার দিনের আকাশের অবিশ্রাম বর্ষণের পর সেদিন সবে সকালবেলা হঠাৎ একটু সূর্য্যের মুখ দেখা দিয়াছে। কালো মেঘের ধারে ধারে সাদা মেঘ ও নীল আকাশের হাসি বর্ষাপ্রভাতের ম্লান বিষণ্ণ রূপ যেন একটু উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কালকার বর্ষার জল তখনও উঠান হইতে সরিয়া যায় নাই। চৌকিদারের দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে কাগজের নৌকার গায়ে ফালি বাঁধিয়া জলের ভিতর ছপ্‌ছপ্ করিতে করিতে তাহাই টানিয়া বেড়াইতেছিল। কূয়া হইতে জল তুলিবার পরিশ্রমটা একদিনের মত বাঁচাইবার জন্য তাহাদের মা বারান্দার প্রান্তে বসিয়া হাত বাড়াইয়া সেই জলেই মাজা বাসনগুলা ধুইয়া তুলিতেছিল। জলের ধারে ঝুঁকিয়া-পড়া কুলগাছটার পাতার শাদা পিঠগুলি অল্পরোদেই রূপার মত ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

দুঃস্বপ্নের মত কাল যে দিনটা কাটিয়া গিয়াছে সকাল-বেলাকার প্রসন্ন আকাশ তার স্মৃতির অন্ধকার অনেকখানি কাটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। তবু আজ হরিকেশবের মন কাজে লাগিতেছিল না। তিনি বাহিরের ঘরে অলসভাবে বসিয়া পুরানো খবরের কাগজগুলি নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। মনটা ক্রমাগতই তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা অর্থহীন বিষণ্ণ শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। স্পষ্ট হইয়া কোনো চিন্তার ধারা আজ আর মনে আসে না। ভাঙা-ভাঙা দুঃখের চিন্তা সেই শূন্যতার স্রোতে ভাসিয়া উঠিয়া মনের অজ্ঞাতেই যেন ডুবিয়া হারাইয়া যায়। তাহাদের ধরিয়া কোনো আকার দেওয়া যায় না।

গেটের কাছে দেখা গেল, শাদা ওয়াড় দেওয়া একটা বাঁশের ডাঁটের ছাতা বগলে চাপিয়া কালো বেঁটে অর্দ্ধকুব্জ একটি ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুকিবার জন্য ইতস্তত করিতেছেন। হরিকেশব অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে উঠিবার পূর্ব্বেই চৌকিদারের ছেলেটা "আইয়ে বাবু সা'ব" বলিয়া খুব কায়দাদুরস্ত ভাবে তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিল। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়াই দুই হাতে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া একগাল হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "এই যে হরিকেশব বাবু, মাপ কর্‌বেন, মশায়। আমরা এখানকার পুরানো বাসিন্দা, আপনাদের দেখা-শুনার কথা ত আমাদেরই; তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের পরস্পরের সঙ্গে একটা যোগ থাকা ত দর্‌কার। তা এতদিন ত কিছুই করা হয়নি, মস্ত বড় ত্রুটি থেকে গেছে। আজ এলুম ক্ষমা চাইতে আর সজ্জনের সংসর্গে একটু পুণ্য সঞ্চয় কর্‌তেও বটে।"

হরিকেশব তাঁহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেই তিনি হাত কচলাইয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "ওই যাঃ, মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে মশায়, নিজের পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। তবে জানেন কি মশায়, চেনা বামুনের ত আর পৈতের দর্‌কার নেই। পায়ে টহল দিয়ে বিশ্ব মাথায় ক'রে বেড়াই বটে, কিন্তু এদেশে এশর্ম্মাকে সবাই চেনে। আপনি যে নতুন মানুষ তা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক্, ডাক্তার বরেন গাঙ্গুলিকে চেনেন ত, সেই যে উকিল-বাবুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়; আর বাড়ীর মেয়েছেলেরাও ত সেদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে সব আলাপ জমিয়ে এসেছে। আমি হচ্ছি সেই ডাক্তারের দাদা মুকুন্দরাম। এইবার ত পূর্ণ পরিচয় হ'ল, তবে আর কি!"

হরিকেশব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন, বসুন।"

মুকুন্দরাম প্রসন্নহাস্যে কালো মুখখানি আলো করিয়া

বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বস্‌ব না ত কি? বস্‌ব ব'লেই ত এসেছি। আমার ওসব লোক-লৌকিকতা নেই; জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখ্‌বেন এ মুল্লুকে কোন্ ভদ্রলোকের বাড়ী মুকুন্দরাম শর্ম্মা না বসেছে, তা সে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্। এ ত আর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ নয় মশায়, যে, টাকার অহঙ্কারে পরের বাড়ী পা পড়্‌বে না। বনেদী ঘরের শিক্ষা যাবে কোথায়? তার চালচলনই আলাদা।"

মুকুন্দরাম বসিয়া পড়িলেন। এই নবাগত অতিথির সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়, কি, ব্রিটিশ রাজনীতির চর্চ্চা করা যায় হরিকেশব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ আপনার বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে পরের কাছে গৌরব করার অভ্যাস তাঁহার এতই কম যে, মুকুন্দরাম-উত্থিত প্রসঙ্গটাও ঠিক তাঁহার আসিতেছিল না। সৌভাগ্যক্রমে মুকুন্দরাম নিজেই তাঁহাকে এসমস্যা হইতে উদ্ধার করিলেন। কথার অপ্রাচুর্য্য তাঁহার ভাণ্ডারে ছিল না। তিনি বলিলেন, "দেরীতে খোঁজ-খবর কর্‌ছি ব'লে মনে কর্‌বেন না যে, এতদিন আপনাদের কোনো সংবাদই রাখিনি। ভগবান না করেন, আপদ্-বিপদ্ কিছু হ'লে ঠিক দেখ্‌তেন যথাকালে মুকুন্দরাম হাজির। সেজন্যে আপনারা বিদেশ ব'লে কিছু মাত্র ভয় পাবেন না। তবে আতিথ্যের ত্রুটি যে থেকে গেছে সেটা আর অস্বীকার কর্‌তে পার্‌লুম না। বহু পূর্ব্বেই আপনাদের মত সৎসঙ্গ লাভের চেষ্টা করা উচিত ছিল; এখন সে কৃত অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চেয়ে আর লাভ নেই। শুধু একটি অনুরোধ আজ জানিয়ে যাই, কালকার মধ্যাহ্নভোজনটা সপরিবারে এ-ব্রাহ্মণের গৃহে না কর্‌লে বড়ই দুঃখিত হব। মেয়েরা বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন। আর আমি স্বয়ং ত গলবস্ত্রে হাজিরই রয়েছি।"

প্রথম পরিচয়ের সঙ্গেই নিমন্ত্রণলাভে হরিকেশব যদিও বিস্মিত হইলেন তবু ভদ্রতার খাতিরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না।

মুকুন্দরাম বলিলেন, "আপনার মেয়েটিকে নিয়ে যেতে ভুল্‌বেন না; তাকে বাড়ীর মেয়েদের বড় ভাল লেগেছে। বড় সুন্দর মেয়েটি। চিরসৌভাগ্যবতী হোক্। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম, গাড়াখানা কাল তা'হ'লে সাড়ে দশটায় পাঠিয়ে দেব; আপনারা ভাড়া গাড়ী ক'রে আবার কষ্ট ক'রে কেন যাবেন? আমাদের একখানা গাড়ী ত ঐ কর্‌তেই আছে। ডাক্তার সেটার নাগাল বছরে একদিন পায় কি না সন্দেহ। তার নিজের জন্যে আবার আলাদা একটা গাড়ীর ব্যবস্থা আছে।"

হরিকেশব কথাবার্ত্তা চালাইবার খেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মুকুন্দরাম তাহাতে না দমিয়া আবার আপনার মনেই বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ছেলেমেয়েদের একবার ডাকুন না, দেখে যাই।"

হরিকেশব বলিলেন, "আমার ছেলেরা ত কেউ সঙ্গে আসেনি; শুধু মেয়েটিকে এনেছি। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

ঘন পাতায় ঘেরা শুভ্র পুষ্প-স্তবকের মত মাথাটি নোয়াইয়া গৌরী আসিয়া প্রণাম করিল। তাহার বেশভূষার আজ কোনো পারিপাট্য নাই, মুখের চির-উজ্জ্বল হাসিটি ম্লান হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে অশ্রু ও অভিমানের একটা দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহার অজ্ঞাতে যাহারা তাহাকে এই জীবন-সমস্যার মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভি-মান তাহার বেদনার অশ্রুজল ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। এই দুই দিনে তাহার বয়স যেন চার বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

মুকুন্দরাম গৌরীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সাবিত্রীসমা হও মা।" হরিকেশব মুখ ফিরাইয়া জলভারানত মেঘের দিকে অকারণে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। গৌরী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুন্দরাম আবার বলিলেন, "মশায়, এ যে আপনার রাজরাজেশ্বরী হবার মত মেয়ে। যা বলেছে আমাদের সুধারাণী তার একবর্ণও মিথ্যা নয়; এ বরং তার চেয়ে বেশী। তা মা লক্ষ্মী, এই ছেলে বয়সে বুড়ো মানুষের মত মুখটি শুক্‌নো কেন? আমাদের ত বাহাত্তুরে ধর্‌তে চল্‌ল তবু বিধাতা হাসি আজও ঘোচাতে পার্‌লেন না।"

বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া মুকুন্দরাম অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন।

হরিকেশব কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু মুখে বাধিয়া গেল, বলা হইল না। বলিলেন, "হাসি দিয়ে এ পৃথিবীর আঘাতের উপর যে জয়ী হ'তে পারে সে সত্যই ভাগ্যবান। সকলের ত সে শক্তি থাকে না।"

কথাটা মোটেই সুবিধাজনক হইল না। মুকুন্দরাম হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক; কিন্তু পৃথিবী কি এখনি তার সব বোঝা আমাদের মা লক্ষ্মীর কাঁধে চাপিয়ে বিশ্রাম নিতে চাইছেন যে, তাঁর কচি মুখে এমন হাসির অভাব?"

গৌরী হঠাৎ মুখ আরক্ত করিয়া বলিল, "বাবা, আমি ভিতরে যাই।" সে প্রায় দৌড়িয়া ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। মুকুন্দরাম বলিলেন, "মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা, একেবারে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা।"

যথাসময়ে অন্দরমহলে বরেন গাঙ্গুলির বাড়ীর নিমন্ত্রণের খবর পৌঁছিল। বিদেশে নিঃসঙ্গ ভাবে দিন কাটাইয়া বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী তরঙ্গিণী হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। খোট্টার দেশের শুষ্কতাকে বাঙ্গালীর মেয়ের সরস আলাপে একটুখানি স্নিগ্ধ করিয়া তুলিবার আশায় তিনি নিমন্ত্রণে খুসীই হইলেন। হিন্দীভাষা তাঁহার মোটে আসে না, তাহার উপর চৌকিদারিণ ও মুনরিয়া ছাড়া আলাপ করিবার মত মানুষও জুটে না। সুতরাং এতকাল তাঁহাকে বিশ্রম্ভালাপ হিসাবে তাহাদের "লেড়্‌কা লেড়্‌কী"র কুশল সংবাদ লইয়াই একরকম কাটাইতে হইয়াছে! কাজেই গঙ্গাস্নান-উপলক্ষে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর পরিচয় পাইয়া সখ্যের লোভ তাঁহার বাড়িয়া গিয়াছিল; সে-বাড়ী যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহের অভাব দেখা গেল না। তবে মনটা যদি এখন এত খারাপ না থাকিত ত উৎসাহটা আরোই সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইত।

গৌরী কিন্তু তাহার অকাল-গম্ভীর মুখখানা আরো গম্ভীর করিয়া বসিল। সুধারাণীকে নৌকায় সেদিন সে বলিয়া আসিয়াছিল, ইহার পর দেখা হইলে সে তাহাকে আপনার সমস্ত গল্প শুনাইবে। কিন্তু সেদিন ত সে ভাবে নাই যে, তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনীর ভিতর এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে লোকের চক্ষে তাহার মূল্য আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। বৈধব্যের অর্থ সে যতই কম বুঝুক, তাহার বেদনা তাহার হৃদয়ে যতই কম লাগুক, তবু পরের কাছে জীবনের এই নূতন রূপে গিয়া দাঁড়াইতে তাহার কেমন যেন একটা অপমান বোধ হইতেছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তাহার চোখে জল আসিয়া গেল। সে সুধারাণীর কাছে কোন্ মুখে গিয়া দাঁড়াইবে, কি বলিবে? নিজের জীবনের এত বড় শোকাচ্ছন্ন ইতিহাসের বেদনার চেয়ে পরের কাছে এই মুখ নীচু হওয়ার ব্যাথাটাই যেন বালিকার বুকে বেশী বাজিল। সে মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমি যাব না। তোমরা যাও গিয়ে।"

মা বলিলেন, "সে কি হয়, বাছা? তোকেই যে বিশেষ ক'রে নিয়ে যেতে বলেছেন। কেন, যাবি না কেন তুই? ছেলে-মানুষ, ছেলে-মানুষের মত হেসে-খেলে বেড়াবি; বুড়ো মানুষের মত রাজ্যের ভাবনা মাথায় ক'রে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে ব'সে থাক্‌বার কি তোর বয়স হ'য়েছে?"

তরঙ্গিণী মুখে এ কথা বলিলেও মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। শিশুর মাথায় বৃদ্ধের বোঝা যে তাঁহারাই চাপাইয়া দিয়াছেন, এখন আর তাহাকে ভুলাইতে চাহিলে কি হইবে?

গৌরী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অশ্রুসজল-চক্ষে বলিল, "না মা, আমার লোকের বাড়ী যেতে লজ্জা করে।"

মা গৌরীকে আদর করিয়া স্নেহব্যাকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "তার জন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না, মা; তোকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস্ করবে না। আয়, তোর কাপড়-চোপড় বের ক'রে দি।"

জিজ্ঞাসা করিবে কি না গৌরী তাহা ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু মাকে সে কিছু বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া তাঁহার পিছন পিছন চলিল।

তরঙ্গিণী বাক্‌স খুলিয়া লাল, গোলাপী, বেগুনী, বাসন্তী, নীল, ধানী, আস্‌মানী, বেগুণফুলী প্রভৃতি নানা রঙ্গের বেণারসী, মান্দ্রাজী ও ঢাকাই শাড়ী মেঝেয় পাতো
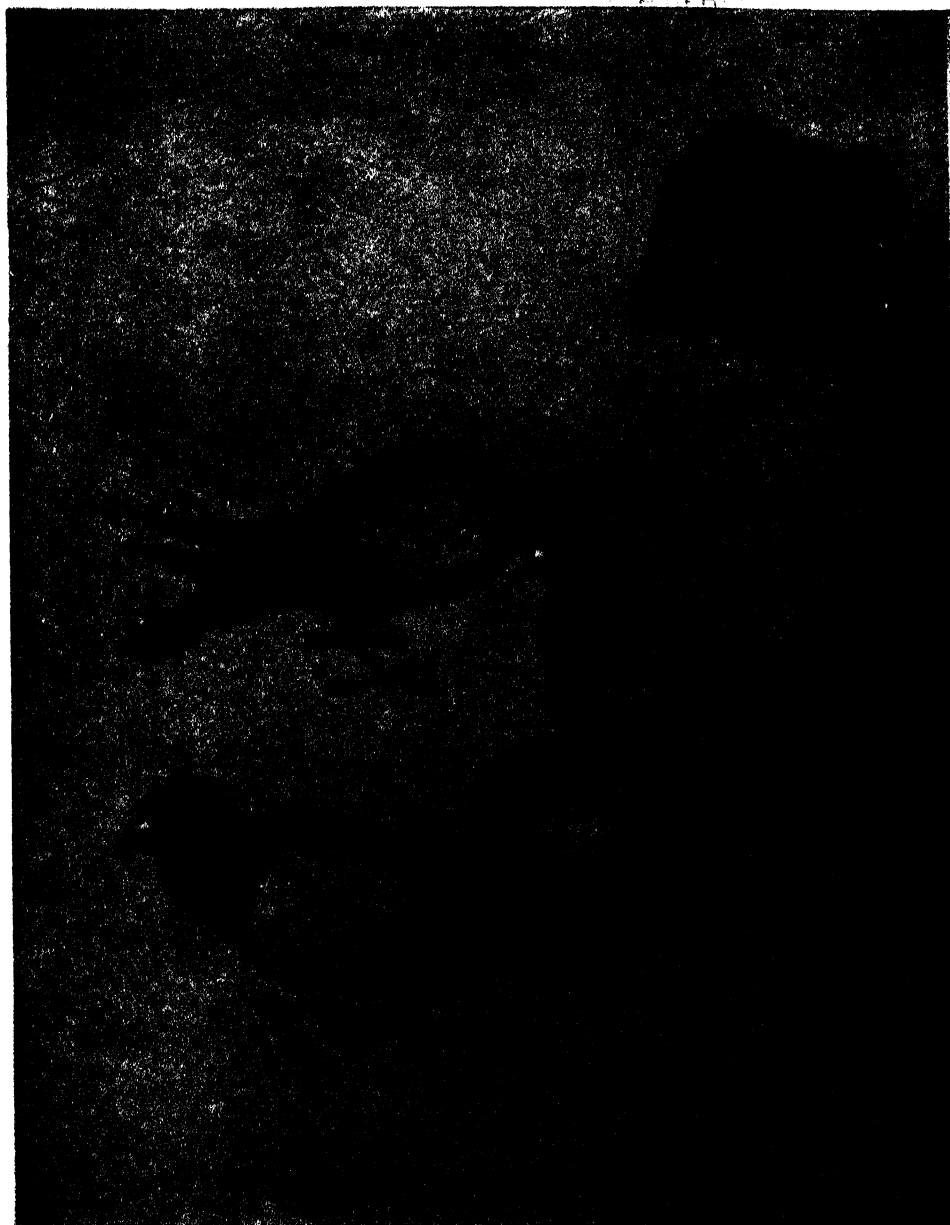
পারাবত

শিল্পী শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মাদুরের উপর স্তূপ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাহাদের জরির পাড় আঁচল ও বুটার চাকচিক্যে ঘর যেন আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পঁচিশ ত্রিশখানা শাড়ী এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া অনেক বাছিয়া একখানা বেগুনী রঙের বেনারসী কাপড় তিনি পছন্দ করিয়া রাখিলেন। গহনার বাক্স উজাড় করিয়া যত হার, বালা, চুড়, চিক, কণ্ঠমালা, সিঁথি, বাজু, ঝুম্‌কো ঘাঁটিয়া একজোড়া মুক্তার ঝুম্‌কো, একছড়া মুক্তার সরস্বতীহার ও একজোড়া জড়োয়া চুড় আলাদা করিয়া রাখিলেন।

গৌরী গহনা ও কাপড়গুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া দেখিয়া মা'র কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, এসব ভাল কাপড় গয়না কেন বের করছ? বিধবাদের কি এসব পর্‌তে আছে?"

তরঙ্গিণী চমকিয়া শরাহতার মত কাতরদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে তাকাইলেন। আজ দুই বৎসরের মধ্যে "বিধবা" শব্দটাও গৌরীর সম্মুখে তাঁহারা কোনো দিন উচ্চারণ করেন নাই, গৌরীর মুখেও একথা কোনোদিন শোনা যায় নাই। এমন অনায়াসে গৌরী আজ সে-কথা কি করিয়া বলিল? কন্যার বৈধব্যটা তরঙ্গিণী তবু সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কন্যারই মুখে সে-কথাকে এমন করিয়া ব্যক্ত হইতে দেখিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "গৌরী, ওকথাগুলো ব'লে আর আমায় দগ্ধাস্‌নে, মা।'

গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার উজ্জ্বল নীল চোখ দু'টিও জলে ভরিয়া আসিয়াছে। বড় অনায়াসে একথা সে বলে নাই। কিন্তু তবু মার কথায় সে নিবৃত্ত হইতে পারিল না। বলিল, "মা, এগুলো কি কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না? না, আমার জিনিষ বুঝি অন্যকে পর্‌তে নেই, না! পর্‌লে মন্দ হয়?"

তরঙ্গিণীর মনে পড়িল সেই পুরাতন দিনের কথা, যে-দিন এই গহনা-কাপড় পরিবার জন্যই গৌরী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়াছিল। চোখের জল চাপিয়া তরঙ্গিণী বলিলেন, "কাউকে দিয়ে দিতে গেলাম কেন? তোর জিনিষ তুই পর্‌বি।"

গৌরী ছল ছল চোখে বলিল, "আমি পর্‌লে লোকে আমাকে নিন্দে কর্‌বে না?" মা যেন রোষ দেখাইয়া বলিলেন, "লোকের বড় ক্ষমতা!" কিন্তু তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

তরঙ্গিণীর কথায় গৌরী শেষে সাজসজ্জা করিয়াই নিমন্ত্রণে চলিল। মা যখন আদর করিয়া বলিলেন, "তোকে বড় মিষ্টি দেখাচ্ছে" তখন তাহার ম্লান মুখে সেই চিরকালের কাঁচা হাসিটি সগর্ব্বে আবার ফুটিয়া উঠিল; এই দুই দিনের সকল কথা সে যেন হঠাৎ ভুলিয়া গেল। ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল, "মা, বৌদি থাক্‌লে আরো সুন্দর খোঁপা বেঁধে দিতে পার্‌ত; কেমন ছবির বইএর মেমদের মত।"

মা খুসী হইয়া বলিলেন, "মেমদের চেয়ে তুই অনেক সুন্দর।"

ছেলেমানুষের মন সামান্য জিনিষেই ক্ষণিকের জন্য খুসী হইয়া উঠিলেও বরেন গাঙ্গুলির বাড়ীতে যখন সুধারাণী মা বোন, জেঠি কাকীদের লইয়া সদলে যেন তাহাকেই অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল তখন গৌরী আপনার প্রতিশ্রুতি মনে করিয়া আবার গম্ভীর হইয়া গেল। সুধারাণী তাহার গাম্ভীর্য্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া হাত ঘুরাইয়া বাজুবন্দ দোলাইয়া বলিল, "আহা রূপের দেমাকে মেয়ের মাটিতে পা পড়ে না! বাবা, রূপ না থাক্‌লেও আমরা মানুষ ত বটে। না হয় দুটো হেসে কথা কইতিস্‌ই! কি এমন ছিষ্টিটা উল্টে যেত?"

গৌরী লজ্জা পাইয়া বলিল, "না ভাই, তুমি বড় যা তা বল। আমি কি সেইজন্যে কথা বলিনি?"

সুধারাণী বলিল, "কি ক'রে জান্‌ব রাই গরবিনী কেন মান করেন?" তারপর গৌরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে বলিল, "কি লো, সেদিন যে বড় প'ড়ে প'ড়ে কথা বলা হ'য়েছিল, আজও ত দেখ্‌ছি সেই বেশ! সত্যি কথাটা বল্‌ই না, ভাই। কেন বেচারী দাদার প্রাণটা নিয়ে টানাটানি কর্‌বি?"

গৌরীর মুখ লাল হইয়া আসিল। সত্য কথাটা তাহার মুখে আসিয়াও আট্‌কাইয়া গেল। মিথ্যা বলা তাহার কোনোদিন অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আজ কি-

একটা অপমান ও লজ্জার ভয়ে সে সত্য বলিতে পারিল না। ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমি ভাই, ওসব কিছু জানি না।"

সুধারাণী বলিল, "কি আমার নেকী গো! বুড়ো মেয়ে উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। মাকে জিজ্ঞেস্ করেছিলি?"

গৌরী ইতস্তত করিয়া বলিল, "না।"

সুধা বলিল, "তবে আমিই কর্‌ছি, দাঁড়া।"

গৌরী ভয় পাইয়া বলিল, "না ভাই, লক্ষ্মীটি, মাকে তুমি আজ কিছু জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পাবে না।"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোর মত এমন একটা ছিষ্টিছাড়া মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি। তোর নিশ্চয় মাথা খারাপ। দাদার কিবা পছন্দ। আমি হ'লে অমন মেয়ের খুরে দণ্ডবৎ ক'রে স'রে যেতাম।"

সুধারাণীর জেঠি তরঙ্গিণীকে লইয়া ঘরে আসিয়া পড়াতে তাহার বাক্যস্রোত বন্ধ হইয়া গেল। মুকুন্দরাম-গৃহিণী বাঙালীর মেয়ে হইলেও এই হিন্দুস্থানীর দেশেই তাঁহার জন্ম, শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবই হইয়াছে। তাই তাঁহার কথাবার্ত্তা বেশভূষা ধরণধারণ সবই অনেকখানি হিন্দুস্থানীর মত হইয়া গিয়াছে। মুখে একমুখ পান ও সুর্ত্তি লইয়া টিকুলি ও নাকছাবি-পরা মুখখানি নাড়িয়া তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বুঝি আপনার মেয়ে হচ্ছে?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটিই।"

মুকুন্দগৃহিণী গৌরীর মুখটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মেয়ের সুরৎ আছে ভাল। বড় ঘরের ঘরাণা হবার মত। নসীবে থাকলে অনেক সুখ পাবে। তা মেয়ের নামটি কি হচ্ছে?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "গৌরীই ত বলি।"

মুকুন্দ-গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "নামটি বড়ই পুরানা ধরিয়েছেন, তবে মিঠা আছে।" তারপর সুধার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে সুধা, ঘরে মেহমান এসেছে, আদর-যত্ন ক'রে খেতে-টেতে দিবি, না এইখানে ব'সে দিল্লগি কর্‌বি?"

অগত্যা সুধাকে উঠিতে হইল। গৌরী তখনকার মত বাঁচিয়া গেল।

এদিকে মুকুন্দরাম ও বরেন্দ্রনাথ হরিকেশবকে আদর আপ্যায়ন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আপনার মেয়েটির বিবাহের বিষয় কি ভাব্‌ছেন?"

হরিকেশব এপ্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মেয়ের বৈধব্য যখন আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে ব্যথা দিতেছিল, ঠিক সেই সময় এই প্রশ্নটা তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিল। তিনি প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার জন্যই বলিলেন, "এখন সে-বিষয়ে কিছু ভাবি না।" মুকুন্দরাম নাছোড়বান্দা, তিনি বলিলেন, "যদি ভাল ঘরে ভাল পাত্র পান, তবে কি করেন?"

হরিকেশব বিপদে পড়িলেন, এমন সময় এমন আলোচনা! ভাবিয়া বলিলেন, "দেখুন, ওবিষয়ে নানা-কারণে আমার অনেক ভাব্‌বার আছে, আমি চট্ ক'রে জবাব দিতে পারি না।"

মুকুন্দরাম গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বলিলেন, "মশায়, কন্যাদায় হ'তে নিষ্কৃতির পথ সাম্‌নে খোলা দেখ্‌লে ভাব্‌তে বসা কি বুদ্ধিমানের কাজ?"

বরেন গাঙ্গুলি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "দাদা, কেন জেদ্ করেন? ওঁর মেয়ে উনি ভাব্‌বেনই ত। সেইটাই ত প্রকৃত পিতার কাজ!" না হয় দু' দিন পরেই আবার কথা হ'বে।"

হরিকেশব বলিলেন, "আমি শীঘ্রই আপনাদের জানাব। এজন্যে আমার অপরাধ নেবেন না।"

মুকুন্দরাম একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "আর মশায়, ভাব্‌তে চান, আপনি ভাবুন। পুরুষের দু'দিন আগেই বা কি আর পিছেই বা কি? কিন্তু আপনার মেয়েটি ত আর নিতান্ত শিশু নেই। বয়স ত হ'য়ে উঠেছে। জানেনই ত মেয়ে সন্তান হচ্ছে পূর্ব্ব-জন্মের ঋণ, যতদিন ঘরে ধ'রে রাখ্‌বেন ততদিনই সুদ বাড়্‌তে থাকবে। টাট্‌কা-টাট্‌কা পার ক'রে দেওয়া ভাল। না হ'লে, বুঝ্‌লেন কি না মশায়, ঐ যাকে বলে চক্রবৃদ্ধি হার। পুরুষ-সন্তান মূলধন, যত খাটাবেন, অর্থাৎ কিনা যত মাজ্‌বেন ঘস্‌বেন

তত দাম বাড়বে। এ মুকুন্দ শর্ম্মার উপদেশ মশায়, ফেল্‌বার জিনিষ নয়।''

হরিকেশব হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ধর্‌লামই না হয় মেয়ে পূর্ব্বজন্মের ঋণ। কিন্তু ঋণটি শোধ ক'রে যার ঘরে দেব তার কাছে ত এর মূল্য আছে। ভাল ক'রে গ'ড়ে যদি দিতে পারি, তার কি লাভ হবে না? মেয়ের কি দাম বাড়্‌ছে না?"

মুকুন্দরাম সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত নাড়িয়া বলিলেন, "মশায়, আপনি যে দেখি এই বয়সে কলেজের ছেলেদের মত সাহেবী বুলি আওড়াতে আরম্ভ কর্‌লেন! মেয়েমানুষের মধ্যে গ'ড়ে তোল্‌বার কোন্ পদার্থটা আছে যে, আপনি তার পেছনে অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় কর্‌ছেন, উপরি দায়-মোচনের সুযোগটাও ছেড়ে দেবেন? আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনাকে ত আর বল্‌তে হবে না যে, শাস্ত্রে আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।' এখন দেখুন, মেয়ে যদি সুস্থ সবল এবং তার উপর সুন্দর হয় তা হ'লেই ত তার জীবনের কাজটা সে অনায়াসে ক'রে যাবে। এবং যত সকাল সকাল তার বিয়ে দেবেন, ততই দীর্ঘদিন সে তার ধর্ম্মপালন ক'রে শ্বশুরকুলের প্রকৃত সেবা কর্‌তে পার্‌বে। সুতরাং তাকে আটকে রেখে তাকে তার ধর্ম্ম থেকে চ্যুত করা ছাড়া আর কোনো উপকার করা হয় কি? বরেনই বল না, কথাটা আমি কিছু মন্দ বলেছি?"

বরেন লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "দাদা, থাক্ না, অত কথায় কাজ কি? সকল দিকেই বল্‌বার কথা আছে।''

হরিকেশব বলিলেন, "মুকুন্দবাবু বলেছেন ভাল। মেয়ে মানুষের মধ্যে যদি গ'ড়ে তোল্‌বার কোনো পদার্থই না থাকে এবং তার যদি প্রয়োজনও না থাকে তবে ভগবান তাকে মানুষ ক'রে সৃষ্টি কর্‌লেন কেন? এবং গড়্‌তে গেলে গড়াটা সম্ভবপরই বা হ'য়ে ওঠে কেন? মেয়েকে যখন বিদ্যা শিক্ষা দিতে যান তখন ত কই সে সব উল্টো রকম শেখে না অথবা মস্তিষ্কের দরজায় হুড়্‌কো লাগিয়ে ব'সে থাকে না! ঠিক ত দেখি পুরুষ মূঢ়ধনের মতোই সোজা রাস্তায় চলে। এটা তবে হ'ল কিসের জন্য? আর নিতান্ত যদি কেবল পুত্রার্থেই তার প্রয়োজন হয় তবে মা'র মানসিক উন্নতিতে পুত্রের অথবা পুত্রের পিতার লোকসানটা কোন্‌খানে? সংখ্যায় পঙ্গপালের মত বংশ-বৃদ্ধি ক'রে দিলেই ত শ্বশুরকুল উদ্ধার হ'য়ে যায় না, যদি সত্যিকারের মানুষ গ'ড়ে দিয়ে যেতে পারে তবেই না বংশ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে! আর সে গড়াটা কার হাতে? প্রথম দিন থেকে দেহটিকে রক্ষা করা, বাঁচিয়ে আসার থেকে সুরু ক'রে মনটাকে সকল দিকে জাগিয়ে তোলার ভার কার উপর? সেই কচি মায়ের অপটু শরীর মনের উপর না বিদ্যাদিগ্‌গজ পিতার উপর?''

মুকুন্দরাম উত্তেজিত সুরে বলিলেন, "তবে কি মশায়, আপনি বল্‌তে চান যে, বাপ আঁতুড়ে ব'সে ছেলেমানুষ কর্‌বে আর মা শাম্‌লা মাথায় দিয়ে কাছারি যাবে?" এ সেই থিয়েটারের প্রহসন হ'ল যে।

হরিকেশব বলিলেন, "না, ওরকম কিছুই বল্‌তে চাই না। শাম্‌লা যাঁর মাথায় শোভা পায় তিনিই আজন্ম তা স্বচ্ছন্দে ধারণ করুন, আমাদের মা-লক্ষ্মীদের শাড়ীর ঘোমটাই ভাল। কিন্তু ছেলেটা যখন তাঁকেই মানুষ কর্‌তে হবে, তখন সর্ব্বাগ্রে নিজে মানুষ হওয়ার প্রয়োজনটা তাঁরই বেশী।''

মুকুন্দরাম বলিলেন, "কি জ্বালাতন মশায়! মানুষ ত সে আছেই! মানুষ নেই ত কি আর গরু, যে দুবেলা দুধ খাইয়েই নিশ্চিন্ত হ'ল? ছেলেটাকে কোলে কাঁখে কর্‌ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে, নাওয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, শাসন কর্‌ছে কে? এগুলোত আর মেয়েকে বুড়ো ক'রে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লেই বেশী শিখে ফেল্‌বে না! তারপর তোমার আঁক কসান আর শব্দরূপ মুখস্ত করানোর জন্যে ত স্কুল-মাষ্টার রয়েইছে। তার জন্যে মা'র মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? কচিকাচাদের সামলাতেই তার সে সময় লেগে যাবে। অকারণ যদি সে ছেলে পড়াতে যায় ত মাষ্টার গুলোর খামখা অন্ন মারা যাবে।''

হরিকেশব বলিলেন, "আচ্ছা, মাষ্টার বেচারার না হয় অন্ন নাই মার্‌লেন! কিন্তু শব্দরূপ মুখস্থ কর্‌বার আগে ত ছেলেগুলো বোবা থাকে না। তখন তাদের কথা বল্‌তে এবং শব্দরূপ ছাড়া জীবনের বাকি রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে ত মাকেই হয়। সেইত তার প্রথম বন্ধু এবং গুরু। বিদ্যা থেকে তাকে যদি বঞ্চিত ক'রে রাখেন, জীবন সম্বন্ধে

তার যদি কোনো জ্ঞানই না থাকে তবে ছেলের গতি যে কি হয় তা ত আমাদের জাতটাকে দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। মাষ্টারের সঙ্গে ছেলে কাটায় দুই চার ঘণ্টা আর অষ্টপ্রহর কাটায় ত ওই মা'রই সঙ্গে। পৃথিবীটাকে চিন্‌তে এবং তার সঙ্গে যত রকমের সম্বন্ধ পাতাতে হয় ত মা'রই সাহায্যে। সেই মা'টিকে যদি একটি আদিম যুগের মানুষ ক'রেই রেখে দেন তবে আপনার নব্য সভ্য যুগের সন্তানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিত্‌টা কে গড়বে?"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "আরে মশায়, এ আপনার গা-জুরী কথা! আপনি কি বল্‌তে চান যে আমাদের সব ঘরের মেয়েরা সেই আদিম যুগের মতই আছে? বাপ-দাদা, স্বামী-পুত্র সব যার আধুনিক, অষ্টপ্রহর তাদের সংস্পর্শে এসে সে কি কখনও উন্নত না হ'য়ে পারে? ইস্কুলে বই পড়া ছাড়াও যে শিক্ষা অহরহ হচ্ছে সে কথা ত আপনি নিজেই বল্‌লেন। সেই শিক্ষা ত ভদ্র ঘরের মেয়ে দিনরাতই পাচ্ছে। তবে আবার তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া কেন?"

হরিকেশব বলিলেন, "কিন্তু তেরো বৎসর বয়স থেকে যদি শ্বশুরকুল উজ্জ্বল কর্‌বার ভার তার ঘাড়ে পড়ে তবে সে শিক্ষারও অবসর কম থাকে। তা ছাড়া সত্যি কথা বল্‌তে কি নব্য সভ্য বাপ-দাদা স্বামী-পুত্রেরা যে অষ্টপ্রহর মেয়েদের সঙ্গে কতই কাটান তা ত আমরা নিত্যই দেখ্‌ছি। ভাত খাওয়া এবং ঘুমানো বিষয়ে আদিম লোকের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এখনও খুব বেশী হয়নি, এবং সেই সময় দুটোই আমরা কৃপা ক'রে মেয়েদের শিক্ষায় ব্যয় করি; কাজেই তারা ভাল রাঁধুনী ও ঘুমপাড়ানী খানিকটা হ'য়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু আর কিছু হ'য়েছে ব'লে ত মনে হয় না।"

ডাক্তার বরেন গাঙ্গুলি কোণ হইতে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর থাক্ মশাই, ভাল রান্নাটা ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, তখন হাজার তর্কেও তার কোনো উন্নতি বিধান করা যাবে না। চলুন, আগে সে-ব্যবস্থাটা সেরে আসা যাক্, তারপর দাদার তর্ক ত আছেই।"

মুকুন্দরাম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাল অতিথিবৎসল গৃহকর্ত্তা জুটেছে মশায়, আপনার ভাগ্যে। নেমতন্ন ক'রে নিয়ে এসে খেতে দেবার নাম নেই, কেবল বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে। তা আমি কি কর্‌ব বলুন, মশায়? আমার কোনো অপরাধ নেই, আপনিই ত মেয়েদের রান্নার চেয়ে বক্তৃতার বেশী পক্ষপাতী। সুতরাং আমরা যদি উদর-অগ্নির কথা ভুলে মুখে অগ্নিবর্ষণ করি তাতে আর দোষ দেওয়া চলে না। হ্যাঁ, তবে ওঠা যাক্, এই শেষ কথাটা ব'লে। আপনি তাহলে মেয়ের বিয়ে এখন দিচ্ছেন না। তাকে আগে একটা মহারথী ক'রে তবে ছাড়্‌বেন।"

হরিকেশব একটু বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "না দেখুন, কেবল মহারথী করাই আমার একমাত্র চিন্তা নয়। মানুষের জীবনে আরো অনেক সমস্যা থাক্‌তে পারে। মেয়ের বিষয়ে আমার আরো ভাব্‌বার কথা আছে। বিয়ে দেব কি না দেব, সে-কথা শীঘ্রই আপনাদের জানাতে চেষ্টা কর্‌ব।"

মুকুন্দ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "না মশায়, আপনার সম্বন্ধে আর কোনো আশা রাখা চলে না। আপনি যাকে বলে একেবারে নব্যবঙ্গ, চুল পাক্‌লে কি হয়? আবার একটা নূতন সমস্যা বের কর্‌লেন কোথা থেকে? বাকি আছে ত স্বয়ম্বর। আধুনিক মতে মেয়েকে বুঝি স্বয়ম্বরা কর্‌তে চান?"

বরেন-বাবু বলিলেন, "দাদা, ওছাড়া আরো সমস্যাও মানুষের জীবনে থাকে, তাকি জগৎটা দেখে আজও বোঝোনি?"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "আরে ভাই, বুড়ো হাড়ে সমস্যা কি আর কম দেখেছি? তবে মেয়ের বিয়ের বেলায় বেয়াইএর রক্তচক্ষু বরাবরই আর সব সমস্যা ধামা চাপা দিয়ে দিয়েছে দেখে আস্‌ছি।"

ছোট একটি মেয়ে মল ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে আসিয়া মুকুন্দরামের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় বলিল, "মা বলেছে বাবুদের ঠাঁই হয়েছে, বল্‌গে যা।" বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাঁচা গেছে।"

সকলে উঠিয়া রান্নাঘরের বারান্দায়-পাতা গালিচা

আসনে গিয়া বসিলেন। বাড়ীর বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেরা সেইখানেই আর-এক লাইনে বসিল। অতি ক্ষুদ্ররা ইতিপূর্ব্বে একবার আহার শেষ করিয়াছে, এখন বয়স্কদের পাতে পুনরায় প্রসাদ পাইবার লোভে আসনের চারিধারে লোলুপ দৃষ্টি মেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছোট মেয়েটি অপরিচিত ভদ্রলোকের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া অন্দরে ছুটিয়া গিয়া সুধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও ভাই মেজদি', ওই মস্ত বড় বাবু কে, ভাই? ওই সুন্দর মেয়ের বাবা বুঝি? ছোড়্দি বলেছে দাদার সঙ্গে ওর সাদি হবে। আমি মোটরগাড়ী চেপে বউ আন্‌তে যাব। লছমনীয়াকে নিয়ে যাব না। অনেক রোস্‌নাই হবে, বাজা বাজ্‌বে, ভারি মজা, না ভাই?"

ঘরে আসিয়া তাহার বাক্যস্রোত অকস্মাৎ খুলিয়া গিয়াছিল। তরঙ্গিণী বালিকার কথা শুনিয়া তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ এবিষয়ে কোনো খবর এখনও তাঁহার কাণে পৌঁছায় নাই। তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া সুধার কাকীমা লজ্জিত হইয়া মেয়েকে তাড়া দিয়া থামাইয়া বলিলেন, "যা, আজে-বাজে বক্ বক্ করিস্‌নে মেলা। লছমনীয়ার সঙ্গে খেল্‌গে যা।" তারপর তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মেয়েটি খাসা দেখ্‌তে; তাই এরা সব বাড়ীতে নানান্ কথা বলাবলি করেছে। সেই শুনে আমার পাগ্‌লী মেয়ে আবল্ তাবল্ বক্‌ছে। তা দিদি, মেয়ের ত বিয়ে দেবেনই, এঘর আপনার পছন্দ হয় কি না বলুন না! ভগবানের কৃপায় খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হবে না; আর ছেলেও আমার দুটো পাশ দিয়ে তিনটে পাশের পড়া পড়ছে। মেয়েটিকে আমাদের খুবই মনে ধরেছে। ছেলে আপনাদের পছন্দ হ'লেই হয়।"

গৌরীর সাম্‌নেই নৃপেন্দ্রের মা আপনার মতামত ব্যক্ত করিয়া যাইতেছিলেন। কথা শুনিতে-শুনিতে গৌরী লাল হইয়া উঠিতেছিল। মা না জানি কি বলিবেন ভাবিয়া সে ঘামিয়া উঠিতেছিল। তরঙ্গিণীও মহা ফাঁপরে পড়িলেন। একে ত স্বামীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এক্ষেত্রে কোনো কথা বলিতে তাঁহার ভরসা হয় না, কারণ গৌরী যে কুমারী নয় তা হয়ত এখানে কেহই জানে না; তাহার উপর গৌরীর সাম্‌নে আজই আবার একথা তুলিতে তাঁহার বিশেষ ভয় ছিল। তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "ও আমার যা পাগ্‌লী মেয়ে! ওর বিষয়ে ওসব ব'লে কাজ নেই।" তারপর ইসারা করিয়া একটু চোখ টিপিয়া গৌরীর সাম্‌নে এপ্রসঙ্গ তুলিতে তাঁহাকে মানা করিলেন।

ডাক্তার-গৃহিণী ইসারার সূক্ষ্ম অর্থ কিছু বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও গ্রাহ্য করা দর্‌কার মনে করিলেন না। তিনি কেবল একবার সুধাকে বলিলেন, "যা ত মা সুধা, গৌরীকে উপরের ঘরগুলো দেখিয়ে আন্।" এমন লোভনীয় প্রসঙ্গ ফেলিয়া উপরের ঘরের শোভা দেখাইতে যাইবার ইচ্ছা সুধার এক বিন্দুও ছিল না। সে নড়িল না; তাহার কাকীমাও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করিয়া তরঙ্গিণীর কথার জবাব দিতে বসিলেন, "তা' দিদি, এখন কি আর পাগলামী কর্‌বার বয়স আছে। ও বয়সে আমরা ছ'মাস শ্বশুর-ঘর ক'রে গেছি। তার আগে মা খুড়ী ত নিত্যি আইবুড়ো থাকার খোঁটা দিয়েছে, বাপ দাদা ধ'রে ধ'রে যাকে সাম্‌নে পেয়েছে তাকেই কনে দেখিয়েছে। তাদের যার যা মন গিয়েছে মুখের উপরই ব'লে দিয়েছে, একটা টুঁ শব্দ কর্‌তে কোনো দিন সাহস পাই-নি। বাপ-মার শাসন থাক্‌লে মেয়ের সাধ্যি কি পাগলামী করে; মেয়ে জাত হবে কেঁচোর জাত, মার খেলে গুটিয়ে যাবে। তবে না মেয়ের গুণ গাইবে লোকে।"

গৌরীর মা মেয়েকে বাঁচাইবার জন্য বলিলেন, "না, না, ওই কি আর তেমন কিছু বলেছে? আমরাই যা কর্‌বার করি।"

সুধারাণী হঠাৎ বলিয়া বসিল, "না দেখুন, আপনার মেয়ে সত্যিই বড় পাগ্‌লামী করে। সেদিন নদীর ঘাটে—আমাকে কি যে সব আজগুবি কথা বল্‌লে তার ঠিক নেই।"

কি কথা তাহা তরঙ্গিণী আন্দাজে বুঝিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সুধার কাকীমা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি বলেছিল রে, বে'-থা'র কথা কিছু?"

বাবা, আজকালকার মেয়েদের লজ্জাসরম ব'লে কিছু যদি আছে !"

গৌরী ভয় পাইয়া সুধার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না ভাই, তুমি কিছু বল্‌তে পাবে না। আমি বিয়ে-টিয়ে কর্‌ব না কাউকে, আর আমায় কিছু জিগগেস্ কোরো না।"

সুধার কাকীমা অতি বিস্মিত দৃষ্টি তরঙ্গিণীর দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মাগো, এ যে সত্যিই পাগলা।"

তরঙ্গিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "দিদি, আজ ওর সাম্‌নে আর কিছু বল্‌বেন না। বাড়ীর নানা গোলমালে ওর শরীর বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে। ছেলে-মানুষ হঠাৎ একটা খারাপ খবর শুনে কেমন যেন হ'য়ে গেছে।"

অগত্যা সুধার কাকী বলিলেন, "আচ্ছা থাক্ সে-সব কথা পরে হ'বে। সুধা দেখ্‌ত, খাবার ঠাঁই কর্‌ছে কি না।"

সুধা হাসিতে-হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
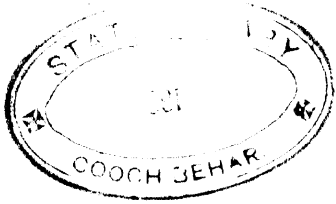
উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একুশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে গিয়াছিলাম, তখন আসামের পূর্ব্ব প্রান্তের দৃশ্য অন্যরূপ ছিল, তখন ডিব্রুগড় হইতে তলপ পর্য্যন্ত রেল ছিল; কিন্তু তলপ হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত রেল খুলে নাই। কলিকাতা হইতে সদিয়া যাইতে হইলে গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমারে আসিয়া আসাম-বেঙ্গল রেল ধরিয়া অথবা রেলে কলিকাতা হইতে যাত্রাপুর বা ধুবড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া ষ্টীমারে, ডিব্রুগড় যাইতে হইত। ডিব্রুগড় হইতে নৌকা করিয়া সদিয়া যাইতে হয়। এখনও কলিকাতা বা গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলে, কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত কালে-ভদ্রে ষ্টীমার চলিতে পারে। রেলপথে চাঁদপুর হইতে তিনশুকিয়া বা তিনচুকিয়া পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে ডিব্রু-সদিয়া রেল লাইন ধরিয়া ১৯০৩ সালে তলপ পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ এই পথে সদিয়া আসিয়াছিলেন। তলপ হইতে ৯ মাইল গরুর গাড়ী করিয়া সৈখোয়া গ্রামে আসিতে

অস্থায়ী পার্ব্বত্য-পথ

সদিয়া অঞ্চলের সেতু

হইত। সৈখোয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখন মাকুম হইতে রেলপথ বাড়াইয়া সৈখোয়া ঘাট পর্য্যন্ত আনা হইয়াছে। সৈখোয়া এখন হঠাৎ বড় গ্রাম হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মারওয়াড়ী ব্যবসাদার দোকান খুলিয়াছেন। সৈখোয়া এখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহার পর-পারে সদিয়া অবস্থিত। ইংরেজ রাজ্যের পূর্ব্বদিকে সদিয়া একটি প্রধান বাজার বা গঞ্জ। ইংরেজ রাজ্যের পূর্ব্ব, উত্তর-পূর্ব্ব, এবং উত্তর সীমান্তে যতগুলি দেশ আছে তাহার বাণিজ্য ঐ সদিয়া দিয়া ভারতবর্ষে সাধিত হয়। সদিয়া এখন একটি ছোটখাট নগর, এখানে একটি বড় বাজার আছে। ইংরেজরাজ্যের

নাগা নর-নারী

আবর দেশের দড়ীর সেতু

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষক বা পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট্ এই সদিয়া নগরে বাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ইংরেজের রাজ্য যতদূর বিস্তৃত তাহা ঐ পলিটিক্যাল্ রাজা সাহেবের অধীন। মধ্যযুগে আসাম যখন আহম্ জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল তখনও সদিয়া আসাম রাজ্যের সীমান্ত ছিল। আহম্ জাতীয় একজন সেনাপতি এই সদিয়ায় বাস করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষা করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল "সদিয়া খোআ গোঁহাই"। আসামের আহম্ রাজারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মিরি, খাম্‌তি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি সদিয়া প্রদেশ জয় করিয়াছিল এবং তখন হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বিজয় পর্য্যন্ত এইসমস্ত পার্ব্বত্য বর্ব্বর জাতির প্রধানেরা "সদিয়া খোঁয়া গোঁহাই" উপাধি ব্যবহার করিত।

এদেশের ঘর-বাড়ী নূতন ধরণের; এখন জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে এইরকমের ঘর-বাড়ী তৈয়ার হইয়া থাকে। সাপ অথবা হিংস্র জন্তুর ভয়ে এইসমস্ত ঘর-বাড়ীর মেঝে জমি হইতে অনেক উচ্চ। দূর হইতে দেখিলে দ্বিতল বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু এইসকল ঘর-বাড়ীর প্রথম তলা একেবারে খালি। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সৈখোয়া ঘাটে যে সরকারী ডাক-বাঙলা আছে তাহা দেখিলেই এই নূতন ধরণের বাড়ী কি-রকমের তাহা বুঝিতে পারা

সদিয়ার নিম্নে ব্রহ্মপুত্র

কুঁদিয়া বাহির করিতে হয়। ইহার মুখ বা গলুই নাই। সম্মুখে একজন ও পিছনে একজন দাঁড় বা বাঁশের লগি লইয়া এই জাতীয় নৌকায় থাকে। এই নৌকার উপরেই ছৈ বাঁধিয়া যাত্রী লইয়া যাওয়া হয়। ভারী জিনিষ লইয়া যাইতে হইলে এই-জাতীয় দুইখানি নৌকা পাশাপাশি বাঁধিয়া মাঝখানে ভার চাপান হইয়া থাকে। সদিয়া হইতে এই জাতীয় নৌকা চড়িয়া ব্রহ্মপুত্রে উজান বাহিয়া পঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

যাইবে। নিজ সদিয়াতে সরকারী বাড়ী অনেকগুলি এই-রকমের; তবে এখন যে-সমস্ত ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে তাহা বাঙ্গালা অথবা আসাম দেশের মত অর্থাৎ তাহার মেঝে মাটি হইতে অনেক উচ্চে নহে। সৈখোআ ঘাট হইতে সদিয়া যাইতে হইলে জলপথে তিন চারি মাইল যাইতে হয়। ব্রহ্মপুত্র এখানে ছোট নদ এবং কলিকাতার গঙ্গা হইতে অধিক চওড়া। তবে গ্রীষ্ম ও শীতকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না এবং বড় বড় ষ্টীমার ডিব্রুগড় হইতে এতদূর আসিতে পারে না। নদ বক্ষে বড় চড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পদ্মার চরের মত তাহার দুই একটিতে চাষ-আবাদ হইতেছে। এদেশে আমাদের দেশের মত বড় নৌকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আসমের নৌকা দেখিতে অনেকটা কলিকাতার দক্ষিণের শালতি অথবা ডোঙ্গার মত। আমিনগাঁও অথবা গৌহাটী হইতে জলপথে কামাখ্যার মন্দিরে যাইতে হইলে এইরূপ নৌকা বা শালতি করিয়া যাইতে হয়। সৈখোআ ঘাটে বা সদিয়ায় যে সমস্ত শালতি দেখিলাম, তাহার মধ্যে অনেকগুলি কাঠের ডোঙ্গা বা Dugout। একটি বড়গাছ হইতে এক-একখানি নৌকা

অতি পূর্ব্বকালে, কতপূর্ব্বে তাহা এখনও স্থির করিয়া বলা যায় না, এই অঞ্চলে হিন্দুর বাস ছিল। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত উর্ব্বর ভূমি আছে তাহার মধ্যে অনেক স্থানে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন মাঝে মাঝে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। সদিয়া হইতে পঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে পরশুরাম-কুণ্ড অবস্থিত। আমি যখন প্রথম সদিয়ায় গিয়াছিলাম তখন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। পরশুরাম-কুণ্ডের পথ তখনও অত্যন্ত দুর্গম ছিল। সে পথ কি-রকম দুর্গম ছিল, তাহা যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-

ব্রহ্মপুত্রের নৌকা (সদিয়া)

বিনোদের ভ্রমণ কাহিনী পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই ভ্রমণ-কাহিনী দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। পরশুরাম-কুণ্ডের পথ এখনও অত্যন্ত সুগম। সদিয়া হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকার সুন্দর রাস্তা তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন, মোটরে চড়িয়া পরশুরাম কুণ্ডের নিকটে পৌছান যায়। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ্ আসাম-সরকারের আদেশে এই সদিয়া হইতে যখন তাম্রেশ্বরী মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন তখন অনেক হাতী ও লোক লইয়া তাঁহাকে

সৈখোআ ঘাটের ডাক-বাঙলা

মিশ্‌মী নারী

জঙ্গল কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হইয়াছিল। এখন তাম্রেশ্বরীর পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাম্রেশ্বরীর মন্দিরটি কিন্তু পরশুরাম-কুণ্ডের ন্যায় পুরাতন নহে। ইহা সম্ভবতঃ আহম্ রাজাদের সময়ে তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহা এখন পড়িয়া গিয়াছে। এবং ইহার অনেকগুলি খোদিত ইষ্টক প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিতের যত্নে কলিকাতার মিউজিয়ামে আনা হইয়াছে। এইসমস্ত খোদিত ইষ্টক দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যে-সময়ে শিবসাগরে জয়সাগরে আহম্ রাজাদের মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল তাম্রেশ্বরী মন্দিরও সেই সময়ে তৈয়ারী হইয়াছিল। জঙ্গলের ভিতরে অনেক জায়গায় পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও মূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও সে-সমস্ত স্থানে পৌছিতে পারা যায় নাই।

সদিয়া নগরে চারিদিক্ হইতে পার্ব্বত্য বর্ব্বরেরা জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিতে আসে। মিশ্‌মীদিগের তুলার কম্বল সদিয়া ও সৈখোআ হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রামেই পাওয়া যায়। মারওয়ারী বণিকেরা এই তুলার কম্বল প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকে। এই কম্বল নূতন জিনিষ, মোটা সুতার কাপড়ের উপরে কাঁচা তুলা লম্বা

আবর যুবক-যুবতী

করিয়া পাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের উত্তরে গিলগিটে এই জাতীয় পশমের কম্বল তৈয়ারী হইতে দেখিয়াছিলাম। গিলগিটের যে-জাতি এই জাতীয় কম্বল তৈয়ারী করে, তাহারা বুরুশাস্কী বা বুরুশেস্কী নামক এক ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষার সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার সম্বন্ধ পণ্ডিতেরা এখনও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে একটি আবর যুবা ও আবর মহিলা জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে সদিয়ায় আসিয়াছিল। আমাদের একজন সঙ্গী আবর ভাষা বুঝিতেন। তাঁহার সাহায্যে এই আবর যুগলের ফোটোগ্রাফ তুলিবার অনুমতি পাওয়া গেল। পুরুষটির অঙ্গে তিন খণ্ড বস্ত্র ছিল.—(১) কৌপীন, (২) একটি ছোট জামা এবং (৩) তাহার উপরে একটি বড় জামা। তাহার মস্তকে একটি পুরাতন বিলাতী হ্যাট এবং গলা হইতে কাঁচা চামড়ার খাপে ঝোলান একখানি দা। মহিলাটির অঙ্গেও তিনখণ্ড বস্ত্র তাহার মধ্যে দুই খণ্ড ধুতি বা সাড়ী এবং তৃতীয় খণ্ড একটি ছোট জামা। মহিলাটির গলায় একটি মানুষের হাড়ের মালা এবং বাঘের মুখ ও রূপার সিকি-দুয়ানি দিয়া তৈয়ারী একটি হার। ইহারা মৃগনাভি ও চর্ম্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল এবং নদীতীরে নিজেদের তৈয়ারী ছাতার তলে রাত্রি-বাস করিত। অনেক খোসামোদের পরে মহিলাটির বস্ত্র দুইখানি ও পুরুষটির দা খরিদ করা গেল। মহিলাটি বস্ত্র দুই খণ্ডের পরিবর্ত্তে একটি রঙ্গিন জাপানী কিমোনো ও নীল রংএর Bathmat তোয়ালে গ্রহণ করিলেন। একখানি জার্ম্মানীর বড় ছুরির পরিবর্ত্তে যুবকের দা-খানি পাওয়া গেল। শুনিতে পাওয়া গেল যে, আবরেরা এখনও ইংরেজ সরকারের টাকা-পয়সা লইতে চাহে না; অন্যের

আবরদিগের ছাতা

বিনিময়ে মারওয়ারী বণিকদের নিকট হইতে লবণ, কাপড়, ছুরি, কাঁচি, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া যায়। ফিরিবার সময় পথে একদল নাগার সহিত দেখা হইল। ইহারা আঙ্গামী নাগা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে নামরূপ হইয়া কাঁচা ও শুষ্ক লঙ্কা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এইসকল নাগারা বাঙ্গালা ও আসামী বুঝিতে পারে এবং তরকারী, চামড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিতে ইংরেজরাজ্যে আসিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে দুইজনের হাতে যে বর্শা বা বল্লম দেখা যাইতেছে, তাহা মানুষ মারিবার বল্লম (Head hunting spear)। নাগাদের দা নূতন রকমের। একটি ছোট লাঠির ডগায় একখানি চওড়া দা বসান হইয়া থাকে। নাগারা ইংরেজ সরকারের

মিশমী পুরুষ

টাকা-পয়সা লইতে কোনই আপত্তি করিল না এবং কিছুক্ষণ দর-কষাকষি করিয়া বল্লম দুইটি ও দা দুই-খানি বিক্রয় করিল।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে ভূখণ্ডে এখনও ঘন জঙ্গল আছে। এই জঙ্গল পার হইয়া হিমালয়ের পাদমূলে পৌছিতে হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আবর যুদ্ধে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রাণী-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেম্প্ (S. W. Kemp) অনেক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মুখেই শুনা গিয়াছিল যে, বরবা পদম আবরদের দেশে এখনও টাকা-পয়সা চলে না। ছোট বা বড় কাঁসার বাটী সময়ে-সময়ে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গিরি-নদী (আবর দেশ)

ডাক্তার কেম্প আবর দেশ হইতে চারি পাঁচটি এইরূপ কাঁসার বাটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছেন। ইংরেজরাজ্যের লক্ষ্মীমপুর জেলা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে যাইতে হয়। ইংরেজের অধীন সীমান্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে জঙ্গলের ভিতরে পথ-ঘাট একেবারেই নাই। স্থানে স্থানে নদীর উপরে মানুষ পার হইবার জন্য বাঁশের সেতু তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু নদীতে বান আসিলে বাঁশের সেতু ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আবরেরা নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটা মোটা দড়ি টাঙ্গাইয়া দেয় এবং পথিকদিগকে সেই দড়িতে ঝুলিয়া ঝুলিয়া পার হইতে হয়। পথ অনেক সময়ে পর্ব্বতের গা দিয়া, কিন্তু অতিবৃষ্টির সময়ে পর্ব্বত ধসিয়া পড়ে; তখন আবরেরা সেই অংশে বাঁশ দিয়া সেতুর মত একটা রাস্তা করিয়া দেয়। এই অস্থায়ী বাঁশের পথে পার্ব্বত্য জাতি ভিন্ন অপরের চলা কঠিন। জঙ্গল পার হইয়া হিমালয়ের পাদমূলে পৌছিলে মনে হয় যেন অমরাবতীতে আসিয়া পড়িলাম। এই দেশের দৃশ্য অতি সুন্দর। প্রত্যেক পর্ব্বতে চারিদিকে অসংখ্য গিরিনদী, তাহাদের তীরে অল্প বন, স্থানে-স্থানে অল্প-পরিসর উপত্যকা এবং এইসকল উপত্যকায় আবরদিগের বাস। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় পর্ব্বতের সানুদেশের বনরাজি সহস্র বর্ণের অসংখ্য পুষ্পে আবৃত হইয়া থাকে, দূরে চিরতুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন যক্ষগণ তুষারকান্ত দেবাদিদেবের চরণে পারিজাত-মালা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রতীক্ষায়

শ্রী অজিতনাথ লাহিড়ী

(১)

পথের ধারে একেলা বসি'
কাটানু দিনগুলি,
দুয়ার মম খুলি';—
সমুখ দিয়া চলিছে কত
লোকের আনাগোনা;
নাহিক জানা-শোনা!
তবু যে তারা চিত্তখানি
নিত্য নব গানে,
ভরিয়া দিল দানে!
শুধানু সবে—"এত যে দেছ
কাহার তরে ধরি'
রাখিব হিয়া ভরি'?"
কহিল তা'রা—"আসিবে সে যে
সময় হবে যবে
তারেই দিও তবে।"

(২)

বরষা এল সরসা-হিয়া—
বেদন কত লয়ে,
নয়ন কোনে বয়ে;
কাজল-ধোয়া নিবিড় কালো
সজল দুটি আঁখি
আমার পরে রাখি'
কহিল—"তোমা আর কি দিব
এই যে জলধার,
এই করেছি সার!—
ও তব চোখে বাঁধন দিয়া
রাখিবে এরে ধ'রে,
অতি যতন ক'রে।
আসিলে সে যে এই সে জলে
পায়ের ধূলা তবে
ধুইয়ে দিতে হবে!"

(৩)

শরৎ এল রাণীর মত
মোহন রূপ ধরি',
ভুবন-মন হরি' !
ভরিয়া দিল সোনার ধানে
দু'হাত ভরি' আনি',
ক্ষুদ্র হিয়াখানি।
কোমল মধু বুকের 'পরে
জড়ায়ে মোরে রাখি',
বদল করি' আঁখি,
কহিল হাসি'—"আমারি ক্ষেতে
কুড়'য়ে যাহা পেনু,
সকলি দিয়া গেনু !
আসিলে প্রিয় চরণে তারি
অর্ঘ্য নিবেদিয়া,
রিক্ত কোরো হিয়া !"

(৪)

ফাগুন এল মোহন হাতে
সাজিটি ভরি' তুলি'
ফুটান ফুলগুলি,
ভরিয়া দিল আঁচল মম
বিছায়ে ভূমিতলে,
সকল ফুল-দলে !
যতনে-গাঁথা কণ্ঠমালা
হস্তে দিয়া শেষে,
মদির মধু হেসে,
কহিল মোরে—"তোমারে দিনু
বিত্ত, সেরা আশা,
একটি ভালবাসা !
আসিলে বঁধু—তাহারি বুকে
পরশ দিয়ো এনি,
কণ্ঠে মালা ঘেরি' !"

(৫)

যাত্রী এল, যাত্রী গেল
দুয়ার দিয়া মম
চির-পথিক সম !
নিত্য নব গানের ভাষা
ছন্দে গাঁথি' তুলি'
গাহে যে গানগুলি,
আমারি বীণা-যন্ত্র-তারে
আঘাত হানি' তার
কহে যে প্রতিবার,—
"তোমারি বঁধু, তোমারি প্রিয়
আসিবে গৃহে যবে—
এ গান গেয়ো তবে !
দুয়ার ধরি' একেলা আছি
অর্থহারা হ'য়ে,—
বুকের বোঝা ল'য়ে !

(৬)

দানের ভারে শ্রান্ত হিয়া
অবশ হ'য়ে আসে,
বেদন পরকাশে।
তোমার কবে লগন হবে
কও গো মোরে কও !—
বিরূপ কেন রও ?
তোমারি লাগি' একেলা জাগি'
প্রহর গুণি তার,—
চির-প্রতীক্ষায়—!
পথের পানে দিগ্বিদিকে
চাহি যে অকারণে ;
ভাবনা শুধু মনে—
বুকের বোঝা চরণে কবে
নীরবে যাবে নামি' !—
মুক্ত হ'ব আমি !

প্রথম চাকরী

শ্রী গোপাল হালদার

তিন ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে বাকী ছয় ক্রোশ নৌকার সাহায্যে সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু কার্য্যস্থলে যখন পৌছলুম তখন রাত দুপুর ; আমার বহু ডাকাডাকিতে যখন ডাকঘরের পেয়াদা দরজা খুললে, তখনো লাভ কিছুই হ'ল না। আমার পরিচয় পেয়ে সে সবিনয়ে জানালে যে, তার বাড়ী আধ ক্রোশ দূরে, ডাকঘরের কাছে কোথাও উনুন নেই, কাঠ নেই, এবং থাকলেও এত রাত্রে ডাল-চাল ত দুষ্প্রাপ্যই, এমনকি চিঁড়ে-ও মিলবে না। ডাকঘরের দু'খানা লম্বা বেঞ্চ একসঙ্গে জোড়া ছিল, তার উপর বিছানাটা পেতে আমি শুয়ে পড়লুম।

ঘুম আসতে দেরী হ'ল না,তবু তারই অবসরে একবার নিজের অদৃষ্টটাকে ধিক্কার দিলুম। চাকরী পেলুম ত পেলুম কি না পোষ্টাফিসের চাকরী,—একটা পয়সা যাতে 'উপরি'র আশা নেই! সেই আদালতের চাকরীটা যদি হ'ত,—মাইনে অবিশ্যি পনের টাকা,তবু মাসে নিদেন পঞ্চাশ টাকা ত ফেলতে পারতুম! সে মুসলমান-ছোঁড়াটা না থাকলেই এবার কপালে চাকরীটা লেগে গিছল! আর আজকাল ত নবাব-বাদশাদের ছেলেরই আদর, ভদ্রলোকের ছেলের ত আর কদর নেই! ঘুম এসে গেল।

নতুন ক'রে পরিচয় সুরু হ'ল। গাঁয়ের লোকেরাই এব্যাপারে অগ্রণী হ'লেন। দু'চার জন দয়া ক'রে জানিয়ে গেলেন তাঁরাই এ গাঁয়ের মাতব্বর; মোড়ল-মশায় পায়ের ধুলো দিয়ে গেলেন, এক ছিলিম তামাক টেনেও আমায় আপ্যায়িত করলেন। কয়েকটি গোবেচারী লোক আমার মেহেরবানীর ভিখারী হ'য়ে জানালে যে, তাদের চিঠিগুলো যেন আমি পেয়াদাবরকে রীতিমত বিলি করতে হুকুম দিই এবং তাদের লেখা খামগুলোর টিকিট যেন পেয়াদা-মশায় তুলে আত্মসাৎ না করেন। শুনলাম, এ গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ-মশায় প্রতিপত্তিশালী, আমার আগেকার পোষ্টমাষ্টারটিকে তিনি নাকি বদলি করিয়ে তবে ছেড়েছেন। জোৎ-জমা আছে, তিনি ত যেচে দেখা করতে আসতে পারেন না। আমিই তাঁর দুয়ারে আমার হাজিরা দিয়ে তাঁদের অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে এলুম।

ডাকের ব্যাগটি বেঁধে পেয়াদার মারফৎ সবে পাঠিয়ে দিয়েছি—ক্রোশ দেড়েক দূরে ডাকের নৌকা ধরবে। হাতে কোনো বিশেষ কাজ নেই। 'হত্যা না মুক্তি?' নামক রহস্য-মূলক 'রোমাঞ্চ-লহরী' সিরিজের এক-চত্বারিংশৎ সংখ্যক উপন্যাসখানা ইতিপূর্ব্বেই চতুর্থ বার শেষ করেছি; কিন্তু, তবু রিভলবারের গুলিতে নিহত প্রেমিকের জন্যে তাঁর প্রণয়িণীর অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া এবং তারই প্রেম-পিপাসু ব্যর্থ কামান্ধ পিশাচ ঘাতকের সেই চিতাতেই আপনাকে আহুতি দেওয়া,—এর আধ্যাত্মিক গূঢ় অর্থের মূলোদ্ঘাটন করতে পারি-নি,—এক কথায় ঠিক হত্যা না মুক্তি, তা বুঝতেই আমি পারিনি। পুরোনো মনি-অর্ডারের ফর্ম্মাগুলোর নীচে কয়েকখানা পুস্তকের তালিকা এবং পোষাকের নমুনা ও দামের তালিকার চটি বই-এর নীচে একখানা মাসিক পত্র পেয়েছিলুম। তার পিছনের কয়েকটা পাতা পোকায় কেটে উড়িয়ে দিয়েছে, সামনের কয়েকটা বোধ হয় মানুষের হাতেই ছিঁড়ে গেছে। দুঃখ বিশেষ হ'ল যে, তার একখানা ছবিও অবশিষ্ট নেই। আমার পূর্ব্বেকার পোষ্টমাষ্টার-মশায় এসব কাগজকে পুরোনো কাগজের দরে বিক্রী করতেন, পেয়াদার কাছে তা জেনেছিলুম। ঐ কাগজগুলোর বন্দোবস্ত করবার আগেই হঠাৎ তাঁর বদলির জরুরি খবর এল, তাই এগুলো এমনি প'ড়ে রয়েছে। নিকটের বাজারের যে মুদিটির সঙ্গে তাঁর কাজ-কারবার ছিল সে এসে একদিন আমায় নিবেদন ক'রে গেছে। কিন্তু দরটা চার পয়সা কম দিতে চায়, তাই আমি এখনো স্বীকার করিনি। আর ইতিমধ্যে মাসিকপত্রখানা প'ড়েও নেওয়া চলছে। মাসিকপত্রের

সেই ছবি ক'খানার জন্যে আমার আফশোষ হচ্ছিল। আগেকার পোষ্টমাষ্টার মশায় তা প্রথম অবস্থাতেই কেটে নিয়েছিলেন। ছবিগুলো যে বিশেষ ভালো ছিল, তা-ও বুঝ্‌তে পার্‌ছি; কারণ, তিনি লোকটি রসজ্ঞ ও চক্ষুষ্মান্ ছিলেন। প্রমাণ এখনো দেখ্‌ছিলুম। ডাক-ঘরের বাঁশের বেড়ার খবরের কাগজের উপরে তিনি তাঁর দু'একটি পরিচয় রেখে গেছেন। কোথাও সাহেবী কাগজের মেম-সাহেবরা অঙ্গভঙ্গী-সহকারে পা তুলে নাচ্‌ছেন, কোথাও বা বাংলা পত্রের কোনো ষোড়শী রূপসী অবগাহনান্তে কলসী-কাঁখে বাড়ী ফের্‌বার পথে কাকে বুঝি দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছেন। ছোট কাঠের সিন্ধুকটির উপর মাথাটি রেখে শুয়ে পড়্‌লেই আমি দেখ্‌তুম, ঠিক আমারই মুখের সাম্‌নেকার বেড়ার উপরে অনেক যত্নে ডাকঘরের আঠার সাহায্যে কোনো মাসিক পত্রের মাসিক শিল্প-জ্ঞানকে তিনি সাগ্রহে আশ্রয় দিয়েছেন। সে ছবিখানার নাম 'কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল'। কিন্তু, আমি ঠিক দেখ্‌ছিলুম যে, কৈশোর হার মেনেছে। এবং বসনের বাড়াবাড়িকে প্রাণপণে কমিয়ে শিল্পী যৌবনের জয়টা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণ কর্‌ছেন। এক কথায়, আমাদের সহরের ছমদ শেখের বিড়ির দোকানের বড় আয়নার দু'দিকে আনোয়ার বে, রুমের সুলতান, প্রভৃতি তুর্কী গাজীদের পাশেই যে-সব মেম-সাহেবের ছবি দেখ্‌তে পেয়েছি, নৃত্যোল্লাসে বসন-ভূষণের নাগপাশ খ'সে প্রায় পড়ে-পড়ে, ভঙ্গিমায় প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন একেবারে গ'লে গেছে,—একমাত্র তেম্‌নিতর শ্রেষ্ঠ পট ছাড়া এ'র তুলনা আর কোথাও মেলে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। শুনেছি, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টারটি বয়সে ছিলেন প্রবীণ; কিন্তু যৌবনের সমজদার হিসাবে আমি তাঁর সঙ্গে একটি সখ্য-সূত্রের বাঁধন অনুভব কর্‌তুম; এবং আমার যৌবনের সেই নিঃসঙ্গ আবাস হ'তে তাঁরই সঞ্চিত একমাত্র সান্ত্বনাস্থল সেই ছবিখানাকে দেখে তাঁকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়েছি। কিন্তু, এই মাসিকপত্রের আর দু'একখানা ছবিও যে তিনি অন্ততঃ দয়াপরবশ হ'য়ে আমার জন্য ফেলে যান-নি, এতে আমি তাঁকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছিলুম না। আমি বেশ বুঝ্‌ছিলুম, সে ছবি-গুলোই ছিল সেরা; তাই তিনি তা প্রাণ ধ'রে রেখে যেতে পারেননি। কী স্বার্থপর!

চারটি গল্পের মধ্যে দু'টি আগেই পড়েছি, এখন তৃতীয়টি নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে পড়্‌তে বস্‌লুম। সুন্দরী 'তরুণী' (যুবতী নয়) বাঈজি পাপিয়া তখন তার পূর্ব্বকার প্রেমিক অতুল-ঐশ্বর্য্যবান্ জমিদার ধনেশকুমারের সমস্ত রত্নালঙ্কার, বিলাস-ভূষণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনন্ত আবেগ-ভরে দরিদ্র 'তরুণ' (যুবক নয়) গায়ক অনিন্দ্য-এর পায়ে আপনার প্রেম নিবেদন কর্‌ছে; কিন্তু, গায়ক অনিন্দ্য, শিল্পী অনিন্দ্য, বাণীর সেবক অনিন্দ্য,—সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ পূজারী, আত্ম-ভোলা অপরূপ সুন্দর সেই শিল্পী,—পাপিয়ার রূপ-যৌবনের পূজাভারকে তথাপি অটল-চিত্তে প্রত্যাখ্যান কর্‌ছে! পাপিয়া বল্‌ছে, আজি হোক্, কালি হোক্, মরণের তীরে হোক্, বা মরণের পরপারে হোক্, ওগো সুন্দর! ওগো নিঠুর! আমার তোমাকে পেতেই হ'বে, তোমারও আমাকে নিতেই হবে!' কী এ উদ্দীপ্ত ভাষা পাপিয়ার মুখে! কী এ উদ্বেল আবেগ তার বুকে! কী এ অশ্রুর জোয়ার তার চোখে!…

"বাবু"

চম্‌কে দেখ্‌লুম, এক বুড়ি। রসভঙ্গ হ'ল, বিরক্তিতে মনটা তেঁতো হ'য়ে উঠ্‌ল। একবার চোখ তুলেই আবার বই-এর পাতাতেই চোখ নামালুম, কিছুতেই এর বক্তব্য শুন্‌ব না, এমন অসময়ে উৎপাত করে!

"বাবু"

আবার! আমি চোখ তুলে বেশ তিক্তস্বরে বল্‌লুম, "কেন? কি চাই?"

"একটু দয়া কর্‌তে হ'বে?"

"মাফ কর এখানে কিছু হ'বে না।"

চোখ আবার [illegible] পাতায় আবদ্ধ কর্‌তে যাব কিন্তু দেখ্‌লুম, সে [illegible]। ভাব্‌লুম, বারবার বিরত হওয়ার অপেক্ষা একেবারেই তাড়িয়ে দিয়ে পড়্‌তে বসি বল্‌লুম,

"কি দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? যাও,—যাও! তবু, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

"বাবু, একটু লিখে দিতে হবে।"

কি লিখ্‌ব জিজ্ঞাসা কর্‌বার মত এককণা ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু, অনেক ধমক, অনেক রাগ, এমন-কি অনেক অনুনয়ের পরেও দেখ্‌লুম, এ' বুড়ি ছাড়্‌বে না। বাধ্য হ'য়ে শেষে বল্‌লুম

"বেশ, ব'ল। কিন্তু, শীগ্‌গির, দেরী ক'র না। আর বাজে বক' না।"

মনি-অর্ডারের ফারম্‌ নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বল', কত টাকা?"

বুড়ি আস্তে আস্তে বল্‌লে, "টাকা নয়, বাবু, চিঠি।"

চিঠি! আমার আপাদ-মস্তক জ্ব'লে গেল। গাঁ শুদ্ধ এত লোক থাকৃতে আমার কাছে কেন? আমি ত ওসব লিখ্‌তে বাধ্য নই। মুদির দোকানের মুহুরিটির নাম ক'রে বল্‌লুম, "তার কাছে যাও। এসব কাজ আমার নয়।"

কিছু লাভ হ'ল না। বুড়ি নাছোড়বান্দা, দু'কলম আমায় লিখ্‌তেই হবে ব'লে দাঁড়িয়ে রইল। উপায় নেই; কলমটা দোয়াতে ডুব'তে ডুব'তে বল্‌লুম, "কই? কাগজ এনেছ?"

নোতুন-কেনা এক তা কাগজ নিয়ে একটা নেংটা ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল; বুড়ি 'লখাই' ব'লে ডাকৃতেই সে ভয়ে-ভয়ে ঘরে ঢুকৃল। সত্যই যখন কাগজও সাম্‌নে দেখ্‌লুম তখন মনটা আবার বাঁকিয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লুম, "বল' শীগ্‌গির, কার কাছে, কি লিখ্‌তে হবে?"

"কার কাছে?—ভরত—আমার ছেলে। এই, বাবু, সে লড়াইয়ে চ'লে গেল আজ তিন বছর,—সেই বসরা। একটিবার আমায় জানালেও না যাবার আগে। বৌটাকে পর্য্যন্ত কইল না। শুন্‌লুম তিন দিন পরে, ওপাড়ার মাধাই, হরিনাথ, ওদের সঙ্গে নাকি সে-ও পঁচিশ টাকা মাইনের লোভে মজুর দলে ভর্ত্তি হ'য়ে লড়াইয়ে চ'লে গেছে। আচ্ছা, বাপু, কে চেয়েছিল টাকা তোর কাছে? বাপু, কাজ-কর্ম্ম কিছু কর্‌তিস না,—গেঁজা টেনে আর মাদল বাজিয়ে টাকা খোয়াতিস্‌; তা নয় বৌ বলেছিল দুটো কথা, মিথ্যেত আর কিছু কয়-নি? তাই ব'লে তুই এমন ক'রে শোধ নিবি? একবার—"

বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "বুঝেছি। এখন আজ কি লিখ্‌তে হবে তাই বল', বাজে বক' না। তা' হ'লে আমি কলম ছেড়ে উঠ্‌ব।"

"না, বাবু, না। ঠিক বল্‌ছি। আজ সাত মাস তেরো দিন সেই তার শেষ চিঠি পেয়েছি। মাধাই লিখেছে, সে ভালো আছে। তবে চিঠি লিখ্‌ছে না কেন? রাগ করেছে আমার উপর? কেন? না, বৌ এর উপরই রাগটা এখনো পড়্‌ল না?—আহা, সে যে আজ দেড় বছর।—হাঁ, হাঁ, দেখ, বাবু, একথাটা লিখো না যেন। সে যেন জান্‌তে না পায় যে, বৌ নেই। কবে মরেছে, তাকে জানাইনি। জানিয়েই বা কি লাভ হ'ত? সে মেয়েটা ত ওর চিন্তাতেই মর্‌ল;—শুকিয়ে গেল, কিছু খেত না, জ্বরে ধর্‌ল, পিলে হ'ল, কালাজ্বর না কি হ'য়েছিল,—

"আরে, থামো। একথা যখন লিখ্‌তে হবে না, তখন বল্‌ছ কেন?"

"না, না, এসব লিখো' না। হাঁ, লিখো, লখাই ভালো আছে।" লখাই এতক্ষণ তার ঠাকুরমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, এবার একটু মাথা তুলে তার কালো বড় চোখদুটো দিয়ে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকালে! বুড়ি তাকে বুকে আরো চেপে ধ'রে বল্‌লে, "হাঁ লখাই ভালো আছে, বেশ ভালো আছে। তোমার কথা খুব বলে, কবে আস্‌বে জিজ্ঞাসা করে। বৌ-ও ভালো আছে। এটা লিখ্‌তে ভুলো না নইলে ভরত ভাব্‌বে। সত্যি সত্যি মেয়েটার জন্যে ওর ত কম টান ছিল না; বৌটার-ও ঠিক তেম্‌নি দরদ ছিল। যখন শুন্‌লে যে, ভরত লড়াইএ চ'লে গেছে, তিন দিন তিন রাত্রি ত কাঁদ্‌লেই; মাটি ছেড়ে উঠ্‌ল না। মুখে অন্নজল তুল্‌লে না। কেবল এই ছেলেটাকে এক-একবার বুকে চেপে ধরে আর চোখের জল ফেলে। আমি, বাবু, চোখের জল মুছি আর ভাবি, মর্‌লুম না কেন? নিজের পেটের ছেলে, তাও সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, সবে একটা ছেলে; সেও কিনা দেশ ছেড়ে যায়। আর-কিছু না হোক্‌, আজ যদি আমি

চোখ বুজি, কে আমার জন্যে কাঠ জোগাড় কর্‌বে, কে আমার ছেরাদ্দ কর্‌বে ?”

আবার বাধা দিলুম।

“হাঁ, লেখো, টাকার দর্‌কার নেই। আমরা খুব সুখে আছি। খাস জমিটা ইজারা দিয়ে আমরা বেশ আছি। টাকা পাঠাতে পার্‌ছে না ব'লেই বোধ হয় সে চিঠি লিখ্‌ছে না। থাক্, বাবু, টাকা ত আমি চাইনি। সে শুধু ভালো থাক্, যত শীগ্‌গির পারে ফিরে আসুক্, না হয় সে-জমি আজ বন্ধক দিয়েছি ; আর পাব না। তবু সে একবার দেশে ফিরে আসুক্।”

আমি আবার বাধা দিলুম।

“লেখো, যেন খুব খাওয়া-পরার যত্ন নেয়, শীগ্‌গির ফিরে আসে। ভটচায মশায় আশীর্ব্বাদ করেছেন মঙ্গল হ'বে। বাবু, এই কাল ভট্‌চায মশায়কে নগদ চার আনা দিয়ে বল্‌লুম, 'ঠাকুর মশায়, যা-হোক্ একটা পূজো দিন্, আমার ভরত যেন শীগ্‌গির ফেরে।' প্রথমটা তিনি রাজী হ'ন না ; বলেন, 'তোরা ছোট জাত, তোদের পূজো আমি করব কেন ? শেষটা অনেক কেঁদে বল্‌লুম, 'আপনারা ঠাকুর-দেবতা, অন্তত আশীর্ব্বাদ করুন।' তাতেই ত আমার সিকি খানা নিলেন আর আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। ওঁর বাক্যি কোনো দিন মিথ্যে হয় না। সাধক লোক কি না, মায়ের কৃপায়—”

আবার থামাতে হ'ল। এবার বুড়ি কি বল্‌বে ঠিক পেলে না। তবু এক-একবার আরম্ভ কর্‌ছিল। আমি থামিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, “ব্যস্, হয়েছে। ওসব খবর সর্‌কারী ডাক নেবে না। আর লড়াই-এর চিঠি বড় হ'লেও নেবে না।”

বুড়ি সভয়ে বল্‌লে, “থাক্, বাবু, তা হ'লে আর লিখো না। এখন ঠিকানাটা লিখে দাও।” আঁচলের কোণে এক টুক্‌রো অনেক পুরানো যুদ্ধক্ষেত্রের চিঠি বাঁধা ছিল। তা'তে ঠিকানা পেলুম, 'ভরত দাস,—নং বেঙ্গল লেবর কোর, বসোরা।' ঠিকানা লিখ্‌লুম। আমার ইংরেজিতে ঠিকানা লিখ্‌তে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। হেড অফিসে ত এখন আমি কত কাজই ইংরেজিতে করি।

বুড়ি হু'টি পয়সা সাম্‌নে রাখ্‌লে—ডাক-টিকিটের মাশুল। আমি টিকিটখানা খামে লাগাতে-লাগাতে বল্‌লুম, “আজকার ডাক চ'লে গেছে, কাল এ চিঠি যাবে।” বুড়ি আবার ধ'রে বস্‌ল, “যেন কালই যায়, দেরী হয় না,” ইত্যাদি। আমি বল্‌লুম, “যাও এখন। বেশী বক্‌লে কালকের ডাকেও যাবে না।”

আর কথাটি নেই। সে নিঃশব্দে লখাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দেখ্‌লুম ছেলেটা দুয়ারের বাইরে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকালে। আমার নজর পড়্‌তেই ছুটে বুড়িকে ধ'রে একেবারে পিছনে না তাকিয়ে চ'লে গেল। মনে মনে একটু খুশী হ'লুম ;—অন্তত এই ছোঁড়াটা বুঝেছে যে, আমি লোকটা নিতান্ত কেউ-কেটা নই।

আধপড়া গল্পটা এবার শেষ কর্‌তে বস্‌লুম। আমার পেয়াদা দেড় ক্রোশ দূরের ডাকের নৌকায় ডাক তুলে দিয়ে ফিরে এল। আমার সাম্‌নেই ঠিকানা-লেখা খামখানা পড়েছিল, দেখে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,

“এসেছিল বুঝি ?”

“কে ?”

“ভরতের মা বুড়ি ? এই খামে ভরতের ঠিকানা না ?”

“হাঁ, এসেছিল। আর ব'ল না, জ্বালিয়ে গেছে বুড়ি সমস্ত সময়টা।”

“যত বাজে বক্‌লে। চিঠি না লিখে দিতে কিছুতেই ছাড়্‌ল না।”

“ওরে বাপ, ও একবার নাগাল পেলে কি আর রক্ষে আছে ? ধন্না দিয়ে ব'সে থাক্‌বে এই ডাকঘরের দুয়ারে দিনরাত। তা,' টিকিটটায় শীলমোহর দিলেন কেন ? ও ত ডাকে যাবে না।”

আমার সন্দেহ ছিল, এ পিয়াদাটা ডাক-বাক্সের খাম থেকে টিকেট তুলে নিয়ে চুরি করে। তাই, সন্দিগ্ধ স্বরে বল্‌লুম, “কেন ? যাবে না কেন ?”

'কি লাভ হ'বে ? সে ঠিকানায় গিয়ে আবার ফিরে আসবে ঘাটিতে-ঘাটিতে শীল-মোহরের ছাপ মেখে।”

“কেন ? তার ছেলে কি ও ঠিকানায় নেই ? তবে ত লড়াই-এর ওখানকার ডাকঘরের কর্ত্তারাই ঠিকানা কেটে দেবেন।”

"সেকি! ওঃ আপনি এখনো শুনেন-নি বুঝি? ভরত মারা গেছে আজ প্রায় আট মাস। লড়াই-এর ওখান থেকে তার মরার খবর এসেছিল বুড়ির নামে। কিন্তু, গাঁয়ের পাঁচজনে বল্‌লে, "আর কেন? ক'টা দিনই বা এবুড়ি বাঁচবে। বরং না-ই জানলে সে-খবরটা।"

"তবে আবার এই চিঠি লেখা কেন?"

"এ হচ্ছে ওর বাতিক। গাঁয়ের এমন লোক নেই, যাকে ধ'রে আগে আগে চিঠি না লিখিয়েছে। জবাব না পেয়ে ওর বিশ্বাস হ'য়ে গেল যে তারা ঠিক লিখ্‌তে পারে না, অথবা লিখ্‌ছে না। তাই, আপনি নতুন এসেছেন শুনে আপনাকে ধ'রে বসেছে।"

"কিন্তু, খবরটা যখন সকলেই জানে, তখন বুড়িও একদিন শুন্‌বেই। এ ত আর বেশী দিন চাপা থাক্‌বে না।"

"না, বুড়ি শুনেছেও। আর-এক বুড়ি তাকে গায়ে পড়ে এখবরটা দিয়ে তার শোকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌তে এসেছিল। কিন্তু এ বুড়ি প্রথমটা কিছুই বুঝলে না, শেষটায় সে বুড়ি-বেটীকে দিল আচ্ছা ক'রে গাল পেড়ে তাড়িয়ে। ওর বিশ্বাস ওর ছেলে ওর আগে কিছুতেই মারা যেতে পারে না।"

"তা' হ'লে মাথাই খারাপ।"

"খারাপ ত আগে ছিল না। কিন্তু এখন যেন কেমন একটু হয়েছে। এই দেবতার নামে মানত, বামুন-ঠাকুরদের কাছে আশীর্ব্বাদ, এসব কুড়িয়ে-কুড়িয়ে বুড়ি আজও কত পয়সা নষ্ট করছে! অথচ, এরাই দু-একজনা বলেছিলেনও যে, তার ছেলে নেই; বুড়ি ভাবে যে তা তাদের ছল, ছোট জাতের দক্ষিণা না নেবার অজুহাত!"

"মন্দ কি? এ উপলক্ষে ভটচায্যিদের দু-এক পয়সা হচ্ছে।"

"তা হচ্ছে বই কি। আমাদের-ই বা কোন্ ঠক পড়্‌ছে?" এই কথা ব'লে পেয়াদাবর বেরিয়ে গেলেন। কথাটা ঠিক বুঝ্‌লুম না; তবে চিঠিখানা ডাকে দিলুম না, আর টিকিটটাও নিজেই ব্যবহার কর্‌লুম। কাজেই, নেহাৎ, ঠঁকিনি বল্‌তে পারি।

মাসের আট তারিখ কি নয় তারিখ, সর্‌কারী একটা মনিঅর্ডার এল লখাই-এর নামে। ভরতের পেন্‌সিয়ান্ সাত টাকা নয় আনা; পিয়ন নিয়ে এল একটি ছোট টিপ সই, আর-একটি লোকের দস্তখত। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "একে পেলে কোথায়?"

"পঞ্চায়েৎ মশায়ের বাড়িতেই। তাঁরই লোক কি না।"

"টাকা পেয়েছে ত?"

"আজ্ঞে হাঁ। এই আপনার—" ব'লে একটি টাকা ও নগদ নয় আনা পয়সা সে আমার সাম্‌নে রাখ্‌লে। দেখলুম, পয়সা কয়টা একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই সে বের কর্‌লে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল:—এটা আমার দস্তুরী, আর এক টাকা থাকে পিয়নটার দস্তুরী, বাকী পাঁচ টাকা পঞ্চায়েৎ-মশায়ের ভাগে থাকে। এ বন্দোবস্ত পাকা; আমার পূর্ব্বেকার পোষ্টমাষ্টার বাবু পঞ্চায়েৎ-এর ভাগ থেকে একটাকা কেটে নিজের ভাগ বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন; তাতেই, তাঁর সঙ্গে পঞ্চায়েৎ-মহাশয়ের বিচ্ছেদ ঘট্‌ল, এবং শেষটায় তাঁকে গাঁ ছাড়্‌তে হ'ল বদ্‌লি হ'য়ে। আমি বোকা নই; আমার সতের টাকার মাইনের উপর নগদ একটা টাকা ও নয় আনার লাভে আমার কোনোই আপত্তি ছিল না। বরং আমি পঞ্চায়েৎ মহাশয়ের ভদ্রতার এবং সুবিচারের প্রশংসাই কর্‌লুম। আমার চেয়ে যে আমার পিয়নের পাওনা কম হওয়া উচিত, এবুদ্ধি তাঁর আছে;—কারণ, তিনি ভদ্রলোক। সরকারের কাছে এ সুবিবেচনা নেই। তা না হ'লে এ ছোটলোক পিয়নটার মাইনে হ'ল উনিশ টাকা, আর দেওপুরের সতু ঘোষের সাক্ষাৎ প্রপৌত্র আমি, আমার মাইনে কিনা সতের টাকা!

বুড়ি আরও অনেকবার এসেছিল, খুশী হ'য়ে কালি-কলম নিয়ে ছাই-ভস্ম এঁকে বলেছি, 'ব্যস্।' কারণ, টিকিটের পয়সাটা একেবারে বেমালুম আমারই লাভ হ'ত।

পঞ্চায়েৎ-মশায় আমার বিনীত ব্যবহারে বেশ প্রসন্ন ছিলেন। তাতে আমার নানাদিক্ দিয়ে সুবিধা হ'ল।

একটা ছাপানো অর্ডারের ফারম্ আমি বুড়ির হাতে দিয়ে বল্তুম, "সরকারী খবর এসেছে, ভরত ভালো আছে। টাকা-পয়সার তার এখন বড় টানাটানি। তবে কিছু পুঁজি বেঁধে কিছু নিয়ে ফিরবে।" বুড়ি সে কাগজটা নিয়ে গাঁয়ের আর-সবাইকে দেখাত। পঞ্চায়েৎ-মশায় তাদের আগে ব'লে দিয়েছিলেন যে, মাথা-খারাপ বুড়িটাকে কোনো-রকম একটা প্রবোধ দেওয়ার জন্যই এ ছলনা। তাই, কেউ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বুড়ির চিঠিকে সাচ্চা চিঠি ব'লে বুড়িকে বল্ত। এতে বুড়ি বুঝলে যে, আমার মত ভালো 'লিখিয়ে' আর নেই; তাই ঘন-ঘন সে চিঠি লেখাতে আস্ত আর টিকিটের পয়সাও ঠিক তেম্নি বেশী ক'রে আমার পকেটে জম্তে লাগ্ল। তা ছাড়াও বুড়ি খুশী হ'য়ে, কলা, তরকারী, শাক-সব্জি যা-কিছু হোক প্রত্যেক বারেই আমায় ভেট দিত। সে অবশ্যি বল্ত, ওসব তার ক্ষেতের জিনিষ। কিন্তু আমি বেশ জান্তুম, তার ক্ষেত অনেক দিন আগেই সে রেহান দিয়েছে, এসব হয় কেনা, নয় মেগে পাওয়া।

বছর দেড়েক আমি এগাঁয়ে ছিলুম। গাঁয়ের লোকের মুখে আমার সুখ্যাতি আর ধরে না। ভট্‌চায্যিরা আমার ভক্তি দেখে ও প্রণাম পেয়ে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করছিলেন, পঞ্চায়েৎ-মশায় একটু কৃপা-মিশ্রিত সখ্য-রসের ভাগ দিতেন, সন্ধ্যায় মায়ের প্রসাদ থেকে আমি প্রায়ই বঞ্চিত হতুম না। মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র আমি কখনো গোপনে আত্মসাৎ করতুম না, ব'লে-ক'য়েই রাখ্তুম—"আরে, দাদা, তোমার 'রঙ্গিনী'-খানা এ মাসের এসেছে। আমি খুলেছি, কাল পাঠিয়ে দেব'খন।" ডাকে-দেওয়া চিঠিগুলো থেকে টিকেট যে তুলে নিতুম তা এত গোপনে যেন পেয়াদা বেটাও টের না পায়। আর তা-ও তুলে নিতুম মাঝে মাঝে শুধু নতুন বিয়ে-করা বৌদের বা মেয়েদের চিঠি থেকে বুঝে-সুঝে, যেন সন্দেহ না হয়। টিকেটগুলো তুলে বিক্রী ক'রে আমি তাদের খামগুলো ছিঁড়ে ভিতরের চিঠি প'ড়ে অনেক রাত্রি অঘুম কাটিয়ে দিয়েছি। মাসিকপত্রে যে-সব গল্প থাকে, তাতে অনেক সরস কথা থাক্লেও এমন সুন্দর ভাবের কথা বড় থাকে না। কিন্তু, এসব কথা আমি কোনো দিন কাউকে বলি-নি, চিঠিগুলোও পড়েই পুড়িয়ে ফেল্তুম,—কি জানি রাখলে কে কখন্ দেখবে, সব ফেঁসে যাবে, চাকুরীটি শুদ্ধ। শুধু, একখানা চিঠি অনেক কষ্টে আমি লুকিয়ে রেখে-ছিলুম। ননীবালা নামে একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের। সে-মেয়েটা সহরের একটা স্কুলে পড়েছিল, এ গাঁয়ের একটা কলেজে-পড়া ছোক্‌রার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এই চিঠিগুলো প'ড়ে সেই ছোক্‌রাটার উপর আমার যেন কেমন একটা নিদারুণ রাগ হ'য়েছিল। অনেক দিন আমার কাছে ননীবালার একখানা চুরী-করা চিঠি ছিল। শেষে আমার স্ত্রী তার খোঁজ পেলেন;—তারপরে, কুরুক্ষেত্র, অথবা লঙ্কাকাণ্ড,—চিঠিখানা ত পুড়িয়ে ফেল্‌তে হ'লই, তবু তাঁর ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'ল না। সেবারে তিন-তিনটি রাত আমায় আফিস-ঘরের টুলের উপর ব'সে ঢুলে ঢুলে কাটাতে হয়েছে, এবং অন্তত তিন-তিনশ-বার আমি তাঁর পায়ে ধরেছি,—অবশ্যি বাচনিক; কারণ, সত্য-সত্যই তাঁর অত নৈকট্য তাঁর সে রাগ-অভিমানের সময় তিনি সহ্য করতেন না। সে-ঝড়ও কাটিয়ে উঠেছি! আমি এখন এই পাঁচ বছর ধ'রে কোনো মেয়ের প্রেমপত্রই চুরি করি না; প'ড়েই আবার খামে পুরে ডাক বাক্সে ফেলে দিই।

এক বৎসর বেশ ছিলুম। শেষে একদিন ইন্‌স্পেক্টর্ এলেন। পঞ্চায়েৎ-মশায় আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আগেকার পোষ্টমাষ্টার-বাবুটির তেম্নি নিন্দা করলেন। ফলে, আমার পদোন্নতি হ'ল,—মাইনে তিন টাকা বাড়্ল। কিন্তু বদলিও হ'তে হ'ল।

তিন টাকা মাইনে বৃদ্ধিতে আমি বিশেষ লাভবান্ হ'লুম না। কিন্তু, উপায় নেই। পঞ্চায়েৎ-মশায় ভরসা দিলেন যে, আমার দ্রুত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; এবং ভট্‌চায্যি-মশায় সংস্কৃত একটা শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি ক'রে বল্লেন যে, আমার মত উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে লক্ষ্মী বিশেষ একটি-পতিরূপে গ্রহণ করবেনই।

সত্যই উদ্যোগের অসাধ্য কিছুই নেই। আদালতের চাকুরী আমি পাইনি বটে, কিন্তু ডাকঘরের চাকুরীতেই বা আমি মন্দ সুবিধা করেছি কি?—আমার প্রথম চাকরীর শিক্ষা আমি বেশ আয়ত্ত ক'রে নিয়েছি।

স্বরলিপি

বেদনায় ভ'রে গিয়েছে পেয়ালা
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি' হ'য়ে গেল ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধ'রে—
লও তুলে লও আজি নিশি-ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়!
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হ'ল,
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস,
নবীন উষার পুষ্প-সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো॥

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার

{না -ধনর্সা না । ধপা -া}
II না -া না । র্সা -া । -পা -া I পধা -পা ধা । ণা -র্রা । র্সা -া I
বে ০ দ না ০ য় ০ বে০ ০ দ না য় ভ ০

I সণা -া ধা । পধা -পা । মগা -রা I গা -া মা । পা -া । -া -া I
রে ০ গি য়ে০ ০ ছে০ ০ পে ০ য়া লা ০ ০ ০

I মা গা মা । মা -ণা । ণধা -না I না -া না । র্সা -া । -া -া I
নি য়ো হে নি ০ য়ো ০ বে ০ দ না য় ০ ০

I {র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা -র্গর্রা । র্রর্সা -র্রর্সা I (র্সনা -র্সা -া । -া -া । -া -া)} I
হৃ দ য় বি ০০ দা ০০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সনা -া র্সা । না -সা । র্সধা -না I পধা -পা ধা । ধর্সা -া । -া -প I
রি ০ হ য়ে ০ গে ০ ল০ ০ ঢা লা ০ ০ ০

I পা পা ধা । ণা -ণর্রা । র্রর্সা -া I [] I
পি য়ো হে পি ০০ য়ো ০

জাপানের নাট্যমঞ্চ

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজটা যতদিনের পুরানো, অভিনয়-কলাটা তার চেয়ে কম পুরানো নয়। অবশ্য, নাট্যকলার জন্মের সন-তারিখ নির্দ্ধারণ করাটা খুবই দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু সেজন্যে আমাদের অভিনয় উপভোগে কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটবার, বা নাট্যকলার উন্নতিতে কোনোরূপ বাধা পড়বার কারণ নেই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। উভয়েই আপন উৎকর্ষের পথে চলে' এতদূর অগ্রসর হ'য়েছিল যে, আজও তা ভেবে আমরা বিস্মিত হ'য়ে যাই, এবং প্রশংসা না করে' থাক্‌তে পারি না। 'পশ্চিমে' এবং 'প্রাচ্যে'—ভারতবর্ষে, 'ক্লাসিক'-ধরণের ধারাবাহিকতা

কাবুকি নাট্য-মন্দির

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম-সহস্রকেই দেখতে পাই, পাশ্চাত্য সভ্যতায় রঙ্গালয় একটা সুগঠিত প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজ করছে; এবং আজও পশ্চিমের অনেক জ্ঞানীব্যক্তি সে-যুগের নাট্যজগতের আদর্শগুলির ভক্ত।

প্রাচ্যের—চীন, জাপান এবং ভারতের--নাট্যশিল্পের ইতিহাস তার চেয়েও বেশিদিনের যদি বা না হয়, কম দিনের নয়। প্রাচ্য নাট্যকলার টেক্‌নিক্‌, আদর্শ এবং আখ্যানবস্তু পশ্চিমের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আবার, প্রাচ্যেই দেশ-ভেদে এ-সবের প্রকার-ভেদ ছিল। কাজেই, যথেষ্ট ব্যাহত হ'য়েছে, বারে-বারে নতুন রূপভঙ্গিমা জেগে উঠেছে; কোনো ভঙ্গিমা হয়ত অপূর্ব্ব সুন্দর, কোনোটি হয়ত নিতান্ত শ্রীহীন—অবনতির সাক্ষী মাত্র। এই বহুল পরিবর্ত্তন চাহিদা-অনুসারে বৈচিত্র্যের জোগান্‌ দিয়েছে বটে, কিন্তু নাটকীয় ক্রমবিকাশের ধারাকে যথেষ্ট ব্যাহত করেছে। চীনে এবং জাপানে এই ধারাবাহিকতা অপেক্ষাকৃত কম বাধা পেয়েছে।

জ্ঞানচর্চ্চা এবং ভাল জিনিসের সমাদর—এ দু'দিক্‌ দিয়েই জাপানী নাট্যকলার ইতিহাস আলোচনা খুবই

চিত্তাকর্ষক ব'লে' মনে হয়। জাপানের জনপ্রিয় সাধারণ নাট্যমঞ্চ—'কাবুকি' সম্বন্ধে 'জো-কিঙ্কেডে'র বইখানি ভারি চমৎকার! বইখানির বাইরের সৌষ্ঠবও খুব পরিপাটী, ছাপাও সুন্দর; আকারে শ'-চারেক পৃষ্ঠা হবে, এবং পঞ্চাশখানি ছবি আছে, (তার একখানি রঙ্গিন্)। জনপ্রিয় জাপানী নাট্যমঞ্চের সম্পূর্ণ ইতিহাস, তার সংগঠন-কাহিনী এবং তার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে সব-কথা বইটিতে বিশদভাবে লেখা আছে; এবং জাপানী জীবনের সঙ্গে

কাবুকি ঘোড়া

এই নাট্যমঞ্চের কি সম্বন্ধ—তাও এতে সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক দিক্ দিয়ে বর্ত্তমান জগতের অনেক তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির' চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। এই সর্ব্বজনপ্রিয় নাট্যমঞ্চ বা 'কাবুকি'-টি প্রায় তিন শ' বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল; কিন্তু এর পূর্ব্বগামী 'নো' এবং 'লিঙ্গ্যো-শিবাই'—যাদের থেকে এটি প্রেরণা লাভ করেছিল—সে দু'টি এর চেয়ে অনেক পুরানো-কালের।

'নো' বা ক্লাসিক্-নাট্যের অভিনেতারা সব মুখোস্-পরার দল; আর লিঙ্গ্যো-শিবাইতে জটিল গাথা-নাট্যের অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করা হ'ত অদৃশ্য তার দিয়ে বাঁধা ছোট ছোট পুতুল। জাপানী রঙ্গালয়কে পরিষ্কার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—'ধর্ম্ম রঙ্গমঞ্চ' আর সাধারণ 'জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ'। 'নো' আর 'লিঙ্গ্যো-শিবাই' হচ্ছে

নাকামুরা জাকুমন—ডল্-থিয়েটারের একজন ওয়াগাতা

প্রধানতঃ ধর্ম্ম-বিষয়ক আর 'কাবুকি' হচ্ছে 'সাধারণ রঙ্গালয়'। 'নো' আর 'ডল্-থিয়েটার' সুপ্রাচীন যুগেই উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করেনি, 'নো'র সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন এসেছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে; আর 'ডল্-থিয়েটারে'র সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন গেছে—সে বেশি দিনের কথা নয়। মুখোস্-পরা 'নো'-অভিনেতারা এবং 'ডল্-থিয়েটারে'র পুতুল-নাচ-ওয়ালারা ক্লাসিকাল্-বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করেন, এবং হৃদয়াবেগ প্রকাশের

ডল্-থিয়েটারের আর-একজন অভিনেত্রী

জন্যে কথার চেয়ে হাবভাবের সাহায্যই বেশি নিয়ে থাকেন। এই ভাব-ভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের প্রেরণাটা অনেকটা জাপানাদের সহজ সংস্কারগত বল্‌লেও চলে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় 'রামলীলা'র নাম করা যেতে পারে। কারণ, যদিও তার টেক্‌নিক্ এবং অন্যান্য রীতি-পদ্ধতিতে অবনতিসূচক অনেক চিহ্নই চোখে পড়ে, তথাপি আমরা দেখ্‌তে পাই—ভারতীয়েরাও নাট্যাভিনয়ে মুখোসের প্রয়োজন কতটা অনুভব করত। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার টেক্‌নিক্ আজ সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়েই আবদ্ধ, তা পড়ে বা বোঝে,—এমন লোক অতি বিরল। আর বর্ত্তমান ভারতীয় রঙ্গালয় ত মুখ্যত পশ্চিমের অতি

প্রাচীন জাপানের যোদ্ধৃবেশে মাকামুরা কিচিমন্

অক্ষম অনুকরণ মাত্র। সেই হারানো নাট্যকলার যে সামান্য অবশেষ এখনও দেখা যায়, অতীত ভারতের নাট্য-রীতির সঙ্গে জাপানী নাট্যরীতির আকারগত এবং প্রকারগত যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অতীত এবং বর্ত্তমান চীন, জাপান এবং ভারতের নাট্যশিল্পের তুলনামূলক
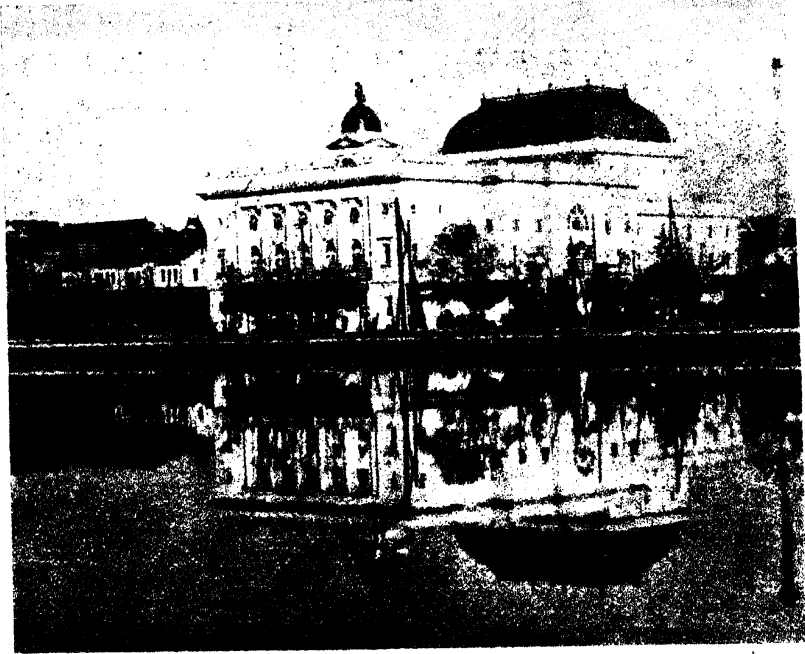
টোকিওর ইম্পিরিয়াল থিয়েটার

আলোচনা—সভ্যতার ইতিহাসের অনেক দামী মাল-মসলা জোগাতে পারে। অধ্যাপক তাকাকুসু 'তরুণ প্রাচী' (The Young East) গ্রন্থে লিখেছেন যে—গতযুগের শেষভাগে জাপান ভারত থেকে কয়েকপ্রকারের 'মেলো-ড্রামা' (melo-drama) এবং নৃত্যভঙ্গী আম্‌দানী করেছিল। 'মুখোস্ তৈরী' আজো জাপানের একটা জীবন্ত আর্ট, এবং মুখোস-বিশেষজ্ঞগণ এতে যথেষ্ট দক্ষতার এবং গুণপনার পরিচয় দিয়ে থাকেন। রামলীলার মুখোস এবং পুতুল-নাচের পুতুলগুলি অবশ্য উদ্ভট এবং অনেক সময় বিশ্রী, হাস্যজনক। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রগণ যখন ভারতীয় প্রত্যেক জিনিসের প্রতি উপহাস করে' সময়ের সদ্ব্যবহার করেন এবং একটা বৈদেশিক কৃষ্টিকে (culture) আয়ত্ত কর্‌বার বৃথা চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তখন যে-সব অশিক্ষিত সখের অভিনেতারা এই অভিনয়-রীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে,—তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কিই-বা আশা কর্‌তে পারি?
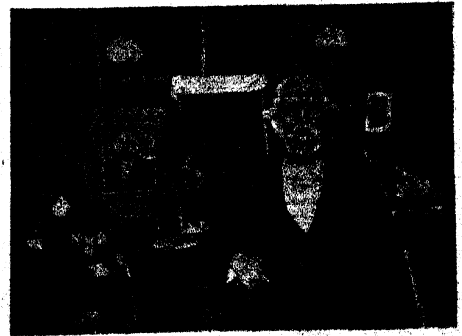
জাপানের আমেরিকান্ মন্ত্রী টাউনসেণ্ড্ হ্যারিস্ বেশে মাৎস্থমোতো কোমিরো

জো-কিস্বেডের বইখানি প্রাঞ্জলতা-গুণে অতি সুখ-পাঠ্য,—এবং বিজ্ঞতার গুরুগাম্ভীর্য্য, সহজ জিনিসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা করে' তোলার চেষ্টা, 'কোটেশানের বাতিক'—প্রভৃতি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত-

পরিচারিকা-বেশী একজন অভিনেত্রীর মুখ দেখতে দেখতে ঠিক শেয়ালের মুখের মত হ'য়ে গেল

করে' বোঝাবার জন্যে 'পশ্চিম' যাকে 'drama' বলে' থাকে, ধর্ম্ম নাট্য থেকে স্বতন্ত্র করে' বোঝাবার জন্যে আমরা তাকেই 'সাধারণ' জনপ্রিয় নাট্য বল্‌ছি।

'কাবুকির' অভিনেতারা প্রায়ই বংশানুক্রমে অভিনয় করে' যান, এবং তাঁরা সবাই উঁচু-নীচু শ্রেণীতে বিভক্ত। পদোন্নতি ও পদমর্য্যাদা নির্ভর করে —কঠিন পরিশ্রম, টেক্‌নিকে নৈপুণ্য-লাভ এবং অসামান্য প্রতিভার উপরে। অভিনেতা-বংশ থেকেই অধিকাংশ নতুন অভিনেতার আবির্ভাব হয়, এবং বড় বড় অভিনেতারা নাট্যরীতি-গুলি তাঁদের পুত্র বা বংশধরদের শিখিয়ে দিয়ে যান। মঞ্চনির্ম্মাণ এবং সজ্জা-বিন্যাসও বিস্তৃতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এ-সব বিষয়ে পশ্চিমের সুদক্ষ 'রিভিউ'-ম্যানেজারদেরও কাবুকি অনুষ্ঠাতাদের কাছ থেকে শিখে' নেওয়ার মতন দু'চারটে জিনিস আছে।

'কাবুকির' ইতিহাস, অনুষ্ঠান, এবং সংস্কারের কথা বল্‌বার আগে, বইখানিতে তিনি প্রথমে সাধারণ নাট্যমঞ্চের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন, তার পর তার এক-একটি দিক্ নিয়ে পরিষ্কার সুনিপুণভাবে তার আলোচনা করেছেন। কোথাও কোনও অস্পষ্টতা বা দুর্ব্বলতা নেই, কোনও ব্যাপারকেই অতিরঞ্জনে ফাঁপিয়ে-তোলা বা অতি-সংক্ষিপ্ত করে' তার নীরস তথ্যের কঙ্কালটিকে উন্মুক্ত করে' রাখা হয়নি। 'সাধারণ নাট্যমঞ্চ' বলে' যে 'কাবুকি'র অভিনয়ে প্রযোজনা বা সরঞ্জাম খুব হীন প্রকারের—একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। একে সাধারণ 'জনপ্রিয়' বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, এ-রঙ্গালয় 'ধর্ম্ম-রঙ্গালয়' নয়; Passion play থেকে স্বতন্ত্র

গ্রন্থকার 'সাধারণ নাট্য-মঞ্চে'র একটা আভাস দিয়েছেন; ভাষা দিয়ে রঙ্গালয়টির এমন সুন্দর একটি ছবি তিনি এঁকেছেন যে, তা পড়ে' ঐ সুন্দর প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জান্‌বার জন্যে আগ্রহে আর কৌতূহলে সমস্ত মন ভরে' ওঠে।

—"একটি বর্ণনাতীত ধ্বনির সৌন্দর্য্য 'শিবাই'কে বিশেষত্ব দান করে, এবং অভিনয়-দর্শনের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে। প্রতি অঙ্কের আরম্ভে ও শেষে শত শত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জরণ, চায়ের পেয়ালার টুং টাং, জয়ঢাকের বজ্রনির্ঘোষ, গ্যালারির পেছন-দিকের খরিদ্দারদের কাছে ঘুরে' ঘুরে' বিক্রেতাদের—'চাই গরম চা, খাবার, কম্‌লা'

প্রভৃতি হাঁকডাক, হাততালির পরিবর্ত্তে কাঠের পট্‌পটির (হায়াশিগি) পটাপট্‌ শব্দ,—এইসব মিলে বেশ একটা বৈচিত্র্য-মধুর অনুভূতি মনে এনে দেয়।"

এই বর্ণনায় স্বতই আমাদের ভারতীয় থিয়েটারের কথা মনে পড়ে—যেখানে অভিনেতা, দর্শক এবং পানওয়ালারা মিলে রীতিমত মিল্টন্‌-বর্ণিত বিশৃঙ্খলার রাজ্য (chaos) বানিয়ে তোলে।

কাবুকিতে—"দর্শকেরা উপস্থিত হ'বার বহুপূর্ব্বেই শূন্য রঙ্গালয়ের দিগ্বিদিকে ভেরীতূরীর বিপুল মন্দ্র ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে। তা শুনে অতীতের কথা মনে পড়ে' যায়। ······যেন 'শিবাই'এর উদ্বোধন ঘোষণা হচ্ছে। পথের লোককে তাড়াতাড়ি আস্‌বার তাগিদ জানিয়ে বাদক যেন তার নহবৎখানায় বসে' ভেরীতূরী বাজাচ্ছে···"

মাৎসুমোতো কোমিরো

স'ই সময় ঘনিয়ে আসে, অম্‌নি—বাঁশী বেজে ওঠে, একটিমাত্র 'নো'-ভেরীর মৃদু আওয়াজ শোনা যায়, ভেরীবাদকদের তুমুল শব্দ সহসা স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে, রঙ্গালয়ের সূত্রধরদের হাতুড়ির ঠুক্‌ঠাক সুরু হয় এবং অভিনেতাদের ডাক পড়ে।

শ্রোতাদের মধ্যে—"সাধারণ লোকেরা 'কুশ্যনে'র ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' পড়ে; লাল-কাপড়-বিছানো আলোকোজ্জ্বল গ্যালারিগুলো সব ভরে' উঠ্‌তে থাকে। চায়ের দোকানের কোনায়-কোনায় সাজানো লাল আর শাদা রঙের কাগজের লণ্ঠনগুলো বৃষ্টির ঝাটে ভিজে হাওয়ার দাপটে জোরে দুলতে থাকে, আর রাস্তার কাদার উপরে হাওয়ায় নেচে অবিরাম বাদল-ধারা ঝরতে থাকে।"

কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতেও জাপানীদের থিয়েটার দেখা বাদ পড়ে না। সকলেই ফুর্ত্তির জন্যে পাগল হ'য়ে ওঠে, আর খোস্‌-মেজাজী থিয়েটার-দর্শকেরা 'কাবুকির স্বপ্নরাজ্যে' ঢোক্‌বার জন্যে ভিড় জমাতে সুরু করে।

দুপুরবেলা থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় চল্‌তে থাকে, এবং 'কাবুকি'র ভৃত্যেরা দর্শকদের যার-যা দর্‌কার—নম্র-বিনীত ভাবে সব জোগায়। গরম ভাত, মদ, চা—ইত্যাদিতে 'কাবুকি'তে থাকার সময়টা বেশ উপভোগ্য করে' তোলে, এবং বিরতির সময়টুকু বেশ আনন্দে কেটে যায়।

······অধিকাংশ নাটকেরই আখ্যান-বস্তু দর্শকদের সুপরিচিত। আখ্যানটি যতই তাদের জানা হয়, নাটকের অভিনয় তারা তত বেশি পছন্দ করে। কারণ, তাদের আনন্দ আসে—জানা ঘটনাগুলি দেখ্‌বার জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা থেকে; অজানা কোনও ঘটনা

ইচিকাওয়া চুশা

জন্যে ভেরীবাদকেরা কয়েকটি বিশিষ্ট সুর বাজায়; কখনও কোনও ভাবাবেগকে গাঢ়তর করে' তোল্‌বার জন্যে, কখনও বা কোনও দৃশ্যের রমণীয়তাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে' তোল্‌বার জন্যে তারা ঐ বাজনার আশ্রয় নেয়।

কোনও কোনও অভিনেতা আবার সাবেকী মুখোসথিয়েটারের অনুসরণ করেন, তাঁদের বলার ভঙ্গীও অনেকটা সাবেকী ধরণের। ভূতপ্রেতের সাজপোষাক নির্দ্দিষ্ট আছে, ঠিক সেই পোষাক ছাড়া আর কোনও পোষাকে তারা সাজ্‌তে পারে না।

'কাবুকি'র ঘোড়া সত্যিকারের ঘোড়া নয়। দুটি লোক একত্র হ'য়ে ঘোড়ার মুখোস্ প'রে' ঘোড়া সাজে। এই মানুষ-জন্তু দেখে দর্শকের স্বতই বাংলার প্রাচীন চিত্র 'নব-নারী কুঞ্জরে'র কথা মনে পড়ে। কাবুকি যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যকে একেবারেই আমল দেয় না তা নয়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য খুবই অসাধারণ নৈপুণ্যসূচক হওয়া চাই, সাধারণ কোনও অভিনেতার খেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে সে রাজি নয়। বড় বড় অভিনেতাদের 'খেয়াল'-ক্রমে পরবর্ত্তী বংশধরদের কাছে অপরিবর্ত্তনীয় প্রথায় পরিণত হয়।

ঘট্‌তে দেখে, হঠাৎ বিস্ময় অনুভব করা থেকে নয়। তারা বেশ দেখ্‌তে থাকে, প্রিয় অভিনেতাদের প্রশংসাও করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে-জোরে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করতেও ছাড়ে না।

'হুহুমিচি' বা 'পুষ্পপথ' জাপানের একটি সুন্দর সংস্কার। অভিনেতারা দর্শকদের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করে' সমস্ত রঙ্গালয়টিকে রঙ্গমঞ্চ করে' তোলেন, সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকেরাও অভিনেতা হ'য়ে ওঠেন—তাঁরাও যেন অভিনয়েরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে'ই মনে হয়।

প্রায় প্রত্যেক নাটকেই মূল-ভাব-জ্ঞাপক গান থাকে। শ্রোতাদের মনে কতকগুলি ভাব জাগাবার

কাবুকির উৎপত্তি

কালের গতি এমনি বিচিত্র,—নারীহীন কাবুকি-রঙ্গালয় এক নারীর দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'আইনুমোর শিন্তো-মন্দিরে'র সেবিকা এক নর্ত্তকী 'ও-কুনি' ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে কাবুকির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্‌বার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে ঘুর্‌ছিলেন। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে অবশেষে 'কিয়োতো'তে এসে হাজির হ'ন। কোনও কারণে তিনি এখানেই থেকে যান, এবং নিজের উদ্দেশ্য ভুলে' গিয়ে 'সান্-সাবুরো' নামে একজন 'সামুরাই'কে বিবাহ করেন, তার পর দু'জনে মিলে জাপানী রঙ্গমঞ্চের

এক নব যুগ প্রবর্ত্তন করেন। ও-কুনির স্বামী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, তাঁর 'সিণ্টোবৌদ্ধ' নৃত্যেই শুধু চল্‌বে না, তাই তিনি আরও উন্নতি সাধন কর্‌বার জন্যে সচেষ্ট হ'ন। এই কারণে ও-কুনি শীঘ্রই খুব নামজাদা হ'য়ে ওঠেন। 'সান্‌-সাবুরো' বেশ বিদ্বান ছিলেন; ও-কুনি তাঁর অতবড় খ্যাতির জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

ও-কুনির পর কিছুকাল পর্য্যন্ত জাপানী রঙ্গমঞ্চে রমণীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁদের অসাধু জীবন-যাপন এবং তাঁদের অসৎ প্রভাব জাপানী জীবনে এতদূর বিস্তৃত হ'য়ে পড়্‌ল যে, বাধ্য হ'য়েই ১৬২৯ সালে নারীর অভিনয় বন্ধ করে' দিতে হ'ল। এর পরেও নর-নারী মিলে' অভিনয় করার প্রচেষ্টা চলেছিল বটে, কিন্তু রাজশক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তা আর সফল হয়নি।

নারীর রঙ্গমঞ্চ বন্ধ হ'য়ে যাবার আগেই তরুণের নাট্যমন্দির গ'ড়ে উঠেছিল। দানুস্থকি ১৬১৭ সালে যুবা-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। তার পর থেকে এর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। ১৬৪৪ সালে একেও গবর্ণমেণ্টের হাতে কিছু ক্ষতি সহ্য কর্‌তে হয়েছিল, কারণ, কোনও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী একজন অভিনেতার প্রেমে পড়ে' গিয়ে-ছিলেন। এরপর পূর্ণ বয়স্ক লোকদের দ্বারা পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হয়, আর আজ-অবধি তা চলে' আস্‌ছে।

নব-নারী-কুঞ্জর

অভিনেতাদের যাকে-তাকে দিয়ে পুরুষ বা নারীর অংশ অভিনয় করানো হয় না। যাঁরা শুধু নারীর অংশ অভিনয় করেন—তাঁদের 'ওন্নাগেতো' বলে' অভিহিত করা হয়। আবার অনেকে শুধু পুরুষের অভিনয়ই করে' থাকেন। তাঁদের মধ্যে 'দোকেগাতা' বা হাস্যরসের অভিনেতাও আছেন। এই বিদ্যেটা তাঁদের বেশ ভালো ক'রেই আয়ত্ত কর্‌তে হয়। এঁদের মধ্যে আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। এইসব শ্রেণীর মধ্যে প্রথম সাতটা প্রয়োজনীয়। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের যে-নাম দেওয়া হয় তার অর্থ হচ্ছে—'সর্ব্বাভিনয়-পটু'; দ্বিতীয় শ্রেণীর নামের অর্থ—'অপ্রতিদ্বন্দ্বী'; তার পর হচ্ছে,—'সব-চেয়ে ভালো'; তারপর—'সব-চেয়ে সব-চেয়ে ভালো'; তার পর—'সত্যি-সত্যি সব-চেয়ে—সব-চেয়ে ভালো'— ইত্যাদি।

অভিনয়কলার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী

মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারের সব দিকেই যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সৃষ্টি হয়, জাপানের অভিনয়-কলায় তেমনি বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারার উদ্ভব হ'য়েছে। 'কাবুকি'-শিল্পের ওপর যে-সব অভিনেতা

তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন, তাঁরা হচ্ছেন 'কিয়োতো'র 'সাকাতা-তোজুরো' আর 'ইয়েদো'র 'ইচিকাওয়া দান্‌জুরো'। এঁরা দু'জনেই 'গেন্‌রোকু'-যুগের মানুষ; (অর্থাৎ ষোলো-শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত)। জাপানী সাহিত্য ও চারুশিল্পের এযুগে খুব উন্নতি হওয়াতে এ-যুগকে জাপানের পুনর্জাগরণের যুগ বলা হ'য়ে থাকে। 'তোজুরো'র চারুশিল্পে দস্তুরমত দখল ছিল, আর তাঁর জীবনযাত্রার

জাপানী বায়োস্কোপের অন্য ছবি

ধরণ ছিল বেহিসেবী। সকল বিষয়েই ভালো করে' খবর রাখা যে দর্‌কার তা তিনি বিশ্বাস কর্‌তেন, আর তিনি ভালো অভিনয়ের যে একটা আদর্শ খাড়া করেছিলেন, নিজে বরাবর সেই আদর্শমাফিক্ চলে' এসেছেন—

"অভিনেতার কলাকৌশল যেন একটা ভিখারীর ঝুলি; তাতে দর্‌কারী অদর্‌কারী সব জিনিসই থাকা দর্‌কার। বর্ত্তমানে ব্যবহারের জন্যে কিছু যদি অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্যে সেটা রেখে দেবে। অভিনেতার পক্ষে এমন-কি পকেট মারা পর্য্যন্ত শেখা দর্‌কার।"

বায়োস্কোপের ছবি

সাধারণ লোকের অংশ অভিনয়ে 'তোজুরো'র শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। এই সাফল্যের মধ্যে ছিল তাঁর সর্ব্বদা মানুষের চরিত্র বিচার, আর স্বাভাবিক পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে সব জিনিস তন্ন তন্ন করে' দেখার অভ্যাস। তাঁর অভিনয়-ধারাকে 'বাস্তব' বা স্বাভাবিক ধারা বলা হয়; সেটা অনেকটা বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্যের বাস্তবধারার মত। তবে অন্য অন্য প্রভাবের দরুণ তাঁর অভিনয়কলা পূরোপূরি বাস্তব হ'য়ে ওঠে-নি।

কিন্তু ইচিকাওয়া দান্‌জুরো 'ডল্‌'-থিয়েটারের অতিরঞ্জিত অভিনয়-ধারা থেকে তাঁর প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি 'আরাগাতো' বা অতিরঞ্জিত কলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। সে যুগের প্রচলিত মেয়েলিভাবের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চল্‌ছিল; তার দরুন্ তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বীরত্বমূলক কাহিনীগুলি আর পুরুষোচিত অভিনয় সাধারণের মন আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় অভিনয়কলার বীররসের সঙ্গে 'আরাগাতো'র অনেকটা

মিল আছে। তাঁর অভিনয়ে যেমন পৌরুষ ছিল, শরীরটিও ছিল তেম্‌নি। 'তেজুরো' আর 'দানজুরো'র রঙ্গস্থল 'কিয়োতো' ও 'য়েদ্দো'র আবহাওয়ার তুলনা করুলে আমরা বুঝ্‌তে পারি, অভিনয়কলার ওপর জনসাধারণের প্রভাব কতটুকু। 'কিয়োতো'র জনসাধারণ ছিল অলস ও শান্তিপ্রিয়, আর 'য়েদ্দো' ছিল যেন একটা যুদ্ধের উত্তেজনায় ভরপূর; কাজেই কিয়োতোয় ছিল তোজুরোর শান্ত স্বাভাবিক ঠাট, আর য়েদ্দোয় ছিল দানজুরোর অগ্নিগর্ভ উত্তেজনাময় অভিনয়-ধারা।

'গেনরোকু' যুগে অনেক বড় বড় অভিনেতার জন্ম হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁদের কথা এখানে বলা অসম্ভব। সেই সঙ্গে গেন্‌রোকু-যুগের শেষ থেকে মেজি-যুগের প্রারম্ভের মধ্যে যে-সব নাট্যশিল্পী জন্মেছিলেন, তাঁদের কথাও এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব।

"নবম ইচিকাওয়া দানজুরো, সম্রাট্‌ মুৎসিহিতোর পঁয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সময়ে কাবুকি-নাট্যের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন।"

তাঁর ঠিক পূর্ব্বেই যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বিশেষ কোনও গুণ ছিল না, কাজেই তিনি দুঃসময়ে কাবুকি নাট্যের উদ্ধারসাধন করেছিলেন বলা যেতে পারে।

"ইচিকাওয়াদলের অবাস্তব অভিনয়-ধারাকে বজায় রেখেও তিনি 'কাৎসুরেকি" নামে এক নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন—তাকে 'জীবন্ত ইতিহাস' বলা যেতে পারে। এতে তিনি ভূমিকাগুলিতে ঐতিহাসিক খুটিনাটি সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখে চল্‌তেন—এর মধ্য দিয়ে তাঁর পাশ্চাত্যের অনুকরণ আর 'ড'ল্‌-থিয়েটারের অসঙ্গতির বিরুদ্ধতা বেশ বোঝা যায়। তাঁর মত প্রতিভাশালী অভিনেতা জাপানে এর পূর্ব্বে আর দেখা যায়-নি, বোধ হয় ভবিষ্যতে বহুদিন দেখা যাবেও না।

ওন্নাগাতা

যাঁরা পুরুষের অংশ অভিনয় করে' প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, শুধু তাঁদের কথা ব'লে শেষ করলে যাঁরা নারীর অংশ অভিনয় করে' খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি অবিচার করা হ'বে। যে-সব অভিনেতা নারীর অংশ অভিনয় করেছেন, অভিনয়-কলার উন্নতি তাঁরাও কিছু কম করেননি।

গেন্‌রোকু-যুগে ভগিনো-মায়ানোজো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ওন্নাগাতা ছিলেন। তিনি য়েদ্দোয় দানজুরোর সাথে অভিনয় করুতেন। তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে:—"এই লোকটির ক্রিয়াকলাপ দেখে দেবতারা, এমন-কি বুদ্ধ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতেন।"

'যোশী যাওয়া আয়ামে' গেন্‌রোকু-যুগে কিয়োতোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওন্নাগাতা ছিলেন। ওন্নাগাতা কলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলি সংগৃহীত হ'য়ে বই হ'য়ে বেরিয়েছে। তিনি বল্‌তেন যে, ভাল করে' নারীর অংশ অভিনয় করুতে হ'লে অভিনেতাকে স্ত্রীলোকের মত জীবন যাপন করুতে হ'বে—এমনকি তার সাম্‌নে স্ত্রী-পুত্রের কথা উল্লেখ করুলে স্ত্রী-লোকের মত লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌তে হবে।

'সাওয়ামুরা তানোসুকি' তাঁর সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কাবুকির ইতিহাসে আরও অনেক ওন্নাগাতার নাম পাওয়া যাবে,—তাঁদের কথা জান্‌তে হ'লে 'জো-কিস্কেডে'র বইখানি পড়া দরকার।

কাবুকি নাটক

কাবুকি নাটককে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—'সেওয়া মোনো'—দৈনন্দিন জীবন-নাট্য; যিদাই মোনো,—ঐতিহাসিক নাট্য; 'সোসাগোতো,'—গীতি-নাট্য; আর 'আরাগোতো,—কল্পনাট্য। 'ওদোরি' অর্থাৎ নৃত্য-মূলক বর্ণনার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

প্রথম শ্রেণীর নাটকে মানুষের স্বভাবের চিত্র দেওয়া হয়, নাট্যকার তাঁর চারি পাশের মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র আঁকেন। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চরিত্র আঁকা হয়; কিন্তু ইতিহাসের সঠিক পুনরাবৃত্তি করা রাজার হুকুমে নিষিদ্ধ হওয়ায় নাট্যকারদের কল্পনার অপ্রতিহত গতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে এক-একটি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃষ্টি করে। 'সোমাগোতো' বা গীতিনাট্যে সকল রকম কাবুকি-কলার প্রয়োজন হয়—উপাখ্যান, সঙ্গীত, দৃশ্যপট, অভিনয়, সাজ-সজ্জা, অঙ্গ সঞ্চালন,—মোটের উপর কাবুকি কলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য যা কিছু এর মধ্যেই থাকে।

আরাগোতোয় দেহভঙ্গী, অভিনয়, সজ্জা, সবই অতিরঞ্জিত করে' দেখানো হয়। এ শ্রেণীর অভিনয়ে টেক্‌নিক্ ও রূপকের তুলনায় উপাখ্যানের প্রয়োজন কম।

বর্ত্তমান যুগে জাপানী অভিনয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। চটক্‌দার ঘটনামূলক নাটক আর পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ ও মর্ম্মানুবাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। আজকাল আমেরিকার ছায়াচিত্রের মত চটক্‌দার লোমহর্ষণ ঘটনাবলী সংযোগ করে' জাপানে নাটক তৈরী হচ্ছে খুব বেশি। ছোরাছুরি চালানো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি সামরিক কৌশলগুলো জাপানাদের আয়ত্ত প্রায় হ'য়েই থাকে—এভাব যেন কোথায় ওদের রক্তের মধ্যে আছে বলে'ই মনে হয়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যেমন নৃত্য, গীত, নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের সঙ্গে সঙ্গে ফেনানো ভাষার বজ্রনিনাদ এক-সঙ্গে মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব নাট্য-খিচুড়ি তৈরী হয়, জাপানের কাবুকি নাট্যেরও আজকাল সেই দশা হ'য়েছে।

নাটকের উদ্দেশ্য

বিশ্বস্ততা ও আত্মবিসর্জ্জন কাবুকি নাট্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে বিষয় ছিল—দয়া ও মন; প্রবৃত্তির সঙ্গে কর্ত্তব্য ও ন্যায়ের বিরোধ। কাবুকি নাট্যকার কতকগুলি নাটকের সার উদ্ধৃত করে' তাঁর বিষয়টি পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে দিতেন।

কাবুকি নাট্যে প্রেমের ও ভূতের দৃশ্য খুব বেশি দেখা যায়। সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক নাটকেরও অভাব নেই। জাপানী নাট্যে অস্বাভাবিক ও অতিমানুষিক ঘটনা ও ব্যক্তির প্রাচুর্য্য দেখে মনে হয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার চেয়ে জাপানীরা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখতে বেশি ভালোবাসে। জাপানী জীবনের নবযুগ আসা সত্ত্বেও তাদের প্রাচীন সমাজের কিম্বদন্তী-গুলি এখনও তাদের মন অধিকার করে' আছে, আর জাপানী অভিনয়ের শিল্প ও বিষয়বস্তুর দিকে চেয়ে দেখলেই সে-কথা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

শিশু

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বসন তোমারে পারেনি বাঁধিতে, মুক্ত বসনাতীত,
ভূষণ সরমে পড়ে' থাকে পাশে, হে নগ্ন অপরূপ!
ধূলোরে ধন্য করে' ধূলো-খেলা,
মুঠি ভরে' তোলা, তুলে' ছুড়ে'-ফেলা,
ধূলি-ধূসরতা করে না মলিন তব হাসি, তব রূপ;
যূথিকার মত শুভ্র হৃদয়—হৃদয় বাসনাতীত!

হাস্য তোমার আদিম ঊষার উদয়-আলোক-ঝরা,
প্রথম দিবার জাগর-ডাগর তোমার পদ্ম-আঁখি।
বাক্য দীনতা-দ্বন্দ্ব-বিহীন,
ধ্বনি-প্রাণ ভাষা উদার-গহীন,
প্রত্যূষ-তপোবন-প্রাঙ্গণে কূজন-মুখর পাখী,—
বিচিত্র-সুর, লঘু বায়ব্য-বীণাটি সপ্তস্বরা!

ক্ষুদ্র গোপাল, তোমার মাঝারে বিশ্ব যে সীমা-হারা,
নিখিল যশোদা শিহরে তোমারে হেরি' বিস্ময়াহতা;
তোমার ক্রীড়ার সঙ্গী, হে শিশু,
বালক বুদ্ধ, কিশোর সে যীশু,
তুমি কবীরের পুত্র "কমাল"—ধরা তব পদানতা,
তুমি কাল-জয়ী—জনম-মরণ তব পদ-গতি-ধারা!

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহু জনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক-কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৪৬)

লঙ্কা

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান সিংহল রাবণ নিবাস লঙ্কা নহে। কাহারও মতে সুমিত্রা দ্বীপ, আবার কাহারও মতে অষ্ট্রেলিয়া রাবণ-নিবাস লঙ্কা। প্রকৃত লঙ্কা কোথায়?

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(৪৭)

ধান

মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে চারিটি মহকুমায় অতিবৃষ্টি ও বন্যার জলে ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া হৈমন্তিক ধান্যের চারা গাছ ও "বন" সমূলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন হৈমন্তিক ধান্যের চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করিবার আর সময় নাই; সুতরাং খাদ্যাভাবে এই জেলার লক্ষ লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি এমন কোন ধান্য থাকে যাহা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বেন প্রস্তুত করিয়া হৈমন্তিক ধান্যের জমিতে রোপণ করিলে ষাট দিনের মধ্যে সুপক্ক শস্য পাওয়া যায়, তবে তাহার নাম কি, এবং তাহা কোথায় পাওয়া যায়? কি প্রণালীতে কোন্ সময় চাষ করিতে হয় ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইলে মহা উপকার সাধিত হইবে।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(৪৮)

আতা ফল

আতা ফলে এক-প্রকার পোকা হয়,—আতার উপরে কাল দাগ পড়িয়া যায়, তাহাতে বহু ফল নষ্ট হয়। প্রতিবিধানের উপায় কি?

শ্রী তেজেন্দ্রনাথ ঘোষ

(৪৯)

বিবাহে হুলুধ্বনি

প্রায় সকল দেশেই একরূপ প্রথা আছে যে, কোন প্রসূতি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলে মেয়েরা হুল নয় বার হুলুধ্বনি করিয়া থাকে আর মেয়ে-সন্তান হইলে সাত বার হুলুধ্বনি দিয়া থাকে। পুত্র-সন্তানের বেলা নয় বার আর মেয়েছেলেদের বেলা সাত বার হুলুধ্বনি করার কোন লোকাচার ব্যতীত শাস্ত্রোক্ত বিধি আছে কি না?

(৫০)

ঝিনুকের অলঙ্কার তৈয়ার শিক্ষা

ঝিনুকের বোতাম ও নানা জাতীয় খেলনা ও অলঙ্কার তৈয়ারী করিবার কল (যাহা হাতে চালান যায়) কোথায় পাওয়া যায়? সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্য কত?

—

মীমাংসা

(২৬)

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল

এই সম্বন্ধে গত মাসের প্রকাশে বানান ভুল ছাড়া অন্য ভুল ছাপা হইয়াছে। ৯৪০ পৃঃ ২য় পাটীতে ছাপা হইয়াছে, "কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে লিখিয়াছিলাম"; হইবে 'দেখিয়াছিলাম'।

গুরুতর ভুল, ধর্ম্মমঙ্গলরচনার শকে হইয়াছে; ১৭৩০-শক না হইয়া ১৭০৩ শক হইবে। পদটি এই:—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিন্ধুসহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥

ঋতু = ৬, বেদ = ৪, সমুদ্র = ৭।

'দক্ষিণে' অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে লিখিতে হইবে।

ফল ৬৪৭

'সিন্ধু', জ্যোতিষিক পরিভাষায় ২৪, যুগ = ৪, পক্ষ = ২। এখানে "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" সাধারণ নিয়মে হইল—২৪২৪।

"যোগ তার সনে।" অর্থাৎ এই দুই অঙ্ক যোগ করিতে হইবে

৬৪৭
২৪২৪
———
ফল—— ৩০৭১

'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' অনুসারে ১৭০৩ শক পাওয়া গেল। এখন ১৮৪৮ শক। সুতরাং ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থখানি ১৪৫ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

ইহার সহিত মাণিক গাঙ্গুলীর বংশলতা হইতে প্রাপ্ত কালের সম্পূর্ণ মিল হইতেছে। মাণিকরামের তিন পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের বংশ নাই। মাণিকরামের এক খুড়া ছিলেন; সেই খুড়ার প্রপৌত্র রামপদ গাঙ্গুলী। ১৮ বৎসর পূর্বে যখন অনুসন্ধান করি তখন তিনি জীবিত ছিলেন, বয়স প্রায় ৫০। তিনি এখন জীবিত আছেন কি না জানি না; থাকিলে তাঁহার বয়স হইবে প্রায় ৬৮। অতএব মাণিকরাম ৪ পুরুষ ১০০ বৎসর; আর রামপদ হেতু ৪৩ বৎসর=১৪৩ বৎসর।

আমি এই ধর্ম্মমঙ্গল কেন পড়িতে গিয়াছিলাম তাহার একটু ইতিহাস দিই। তখন বাঙ্গালা ভাষা শেখার ইচ্ছা আমার প্রবল হইয়াছিল। আমার জন্মস্থানের ভাষা অবশ্য কিছু কিছু জানিতাম। কি বিবর্ত্তন-ক্রমে সে ভাষার উৎপত্তি, ইহা আমার জ্ঞাতব্য ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তিন-চারি শত বৎসরের পুরাতন ভাষা পাইলাম। দামুন্যা গ্রামে এই কবির বাস ছিল। সে স্থান আমার জানা ভাষার স্থানের নিকটে। কিন্তু তিন চারি শত বৎসর পূর্বের। ইহার পরের ভাষা কোথায় পাই এই চিন্তা করিতেছি, দেখি সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় দীনেশবাবু মাণিকরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলের পরিচয় দিয়া তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রায় সমকালিক বলিয়াছেন। আরও দেখিলাম, কবির নিবাস বেলডিহা গ্রাম, আমার গ্রামের নিকটে। ধর্ম্মমঙ্গল-খানি আনাইলাম। কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠা শেষ করিতে না করিতেই সন্দেহ হইতে লাগিল, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে সেই ভাষা কিছুতেই থাকিতে পারে না। ৯।১০ পৃষ্ঠা পড়া হইতে না হইতেই বই বন্ধ করিলাম। শাকে ঋতু ইত্যাদির কাল বুঝিতে বসিলাম। উক্ত পদ হইতে পাইলাম ১৭০৩ শক। কিন্তু কালজ্ঞাপনে কবি এমন নূতন বিধি ধরিয়াছেন ইহাও সহসা প্রত্যয় হইল না। এই হেতু বেলডিহা গ্রামে লোক পাঠাইয়া মাণিকরামের কেহ বংশধর আছেন কি না, থাকিলে তাঁহার বয়স কত, এবং তাঁহার বাড়ীতে মাণিকরামের পুথী আছে কি না, থাকিলে ঐ পদে কি লেখা আছে, ইত্যাদি জানিয়া আমার নিরূপিত কালে নিঃসন্দেহ হইলাম।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

(৩৫)

বিলাত

বিলাত শব্দটি অরবী ভাষায় বিলায়ৎ (ব-অন্তস্থ) এক বড় রাজার শাসিত প্রদেশ, অথবা এক জাতির বাসস্থান।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীরা "দেশ" শব্দ বাঙ্গালাদেশের জন্য যেমন ব্যবহার করে, সেইরূপ "বিলায়ৎ" শব্দ বক্তার আদি নিবাস-স্থান প্রকাশ করে। পূর্ব্বে যখন মুসলমানেরা ভারতে আসিল, তখন তুর্কী ও মোগলরা বিলায়ৎ শব্দ মধ্য এশিয়ার জন্য ব্যবহার করিত, আফগানরা আফগানিস্থানের জন্য ও ইরাণীরা পারস্যদেশের জন্য ব্যবহার করিত। এখনও যুক্ত প্রদেশে "কাবুলী বিলায়তী অঙ্গুর অথবা বেদানা" পদ ব্যবহার করা হয়। অওরঙ্গজেবের পুত্র যখন পারস্য দেশে পলাতক ছিলেন, তখন অওরঙ্গজেব একবার বলিয়াছিলেন, আমার এক পুত্র বিলায়তে আছে। অতএব বিলায়ৎ অর্থে ভারতের বাহিরে মুসলমান দেশ ছিল। ইংরেজেরা ভারতে আসিবার পর বিলায়ৎ অর্থে ইঙ্গলণ্ড, অথবা ইউরোপ। সচরাচর বিলাতী বলিলে বিদেশী বোঝায় অর্থাৎ বিলাত মধ্যে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়াও ধরা হয়।

শ্রী অমৃতলাল শীল

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র

ভাদ্রের 'প্রবাসী'র ছেলেদের পাততাড়ি বিভাগে শ্রীযুত অবলাকান্ত মজুমদার মহাশয়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্বন্ধে, যাহা লিখিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমার দু'একটি কথা বলিবার আছে। তাহা এই—

অবলাকান্ত-বাবু লিখিয়াছেন—

১। 'পদ্যপাঠের কবি কৃষ্ণচন্দ্র'

—কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ত পদ্যপাঠের কবি নহেন, তিনি সদ্ভাব-শতকের কবি। পদ্যপাঠের সঙ্কলয়িতার নাম যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

২। 'সেনহাটী, খুলনার দৌলতপুর পল্লীর পাশে অবস্থিত'

—সেনহাটী দৌলতপুর পল্লীর পাশে অবস্থিত নহে। দৌলতপুর ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরে ও সেনহাটী উহার বাম তীরে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

৩। 'বাড়ীর অভিভাবক তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন'

—কৃষ্ণচন্দ্রের কোন দিন কোন ভাই ছিলেন না—ছোটই বা কি বড়ই বা কি। আমরা শুনিয়াছি (আলোচ্য বিষয়ে) তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

৪। ২নং আখ্যায়িকায় তিনি যশোহরের বাজারে মাড়োয়ারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

—কিন্তু আমারা (কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রামবাসীরা) শুনিয়াছি, ঐ ঘটনা, সেনহাটী গ্রামের বাজারের নবীনচন্দ্র সেন নামক, জনৈক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সহিত সংঘটিত হইয়াছিল।

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন

আমরা শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট হইতেও একইরূপ আলোচনা পাইয়াছিলাম।

প্রবাসীর সম্পাদক

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

ভাদ্র সংখ্যাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর এস্, সি-আই-ই মহোদয়ের পরিচয় দিতে গিয়া, ঐ প্রবন্ধের লেখক অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন—

'তিনি (অধ্যাপক সরকার) বাঁকিপুর অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।'

—একথা ঠিক নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল,—আর অধ্যাপক সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখায়।

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন

"হিন্দুমুসলমান কলহ"

১৩৩৩ সালের "ভাদ্র" সংখ্যার প্রবাসীতে ৮৫০ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রসঙ্গের ভিতর "হিন্দু-মুসলমান কলহ কি অন্তর্বিদ্রোহ" শীর্ষক আলোচনায় যে-মতামত ব্যক্ত করা হ'য়েছে তার অনেক জায়গা আপত্তি-জনক ও বিশেষ সমালোচনার যোগ্য।

উক্ত আলোচনার শেষের দিকে আছে, "খৃষ্টান্ জগলুল পাশা" আজ "মুসলমান নবীন মিশরের নেতা"। জগলুল পাশা যে খৃষ্টান নহেন, তিনি যে একজন খাঁটী মুসলমান এবং প্রকৃত "সৈয়দ" বংশোদ্ভূত একথা ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে অনেক বার আলোচিত ও স্বীকৃত হ'য়ে গিয়েছে। সেণ্ট্রাল্ খেলাফৎ কমিটির সভ্য জনাব মৌলবী সুলেমান্ নাদভি সাহেব মিশর থেকে একথা জেনে এসেছেন। "জগলুল বিশ্বাসী মুসলমান" একথা আপনারাও ১৩২৯ সালের "পৌষ" সংখ্যার প্রবাসীতে ৪২২ পৃষ্ঠায় "দেশ-বিদেশের কথার" ভিতর "ইজিপ্ট" শীর্ষক আলোচনার পাদটীকায় স্বীকার ক'রেছেন।

কাজী মুজিবর রহমান

রাতের বাদল

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গভীর রাতে
বরষা সাথে
        কী সুখ মনে জাগে !—
ধরণীখানি
হৃদয়ে টানি
        গভীর অনুরাগে।
বৃষ্টি পড়ে
তরুর 'পরে
        গহন বন মাঝে,
খোলা সে মাঠে
পুকুরে বাটে
        গৃহের ছাদে নাচে।
আঁধার ঢাকে
ধরণীটাকে
        ঢাকে সে দিশি দিশি,
তাহারি গায়ে
চপল পায়ে
        বাদল নাচে মিশি'।
বাদল-ধারা
দিতেছে সাড়া,
        ধরণী চুপে শোনে;
ঝরে গো ঝরে
বৃষ্টি পড়ে
        ধরাতে, মম মনে।
জাহাজ-বাঁশি
আসিছে ভাসি'—
        তরাস বহি' আনে;
ভীতির সাথে
হরষ মাতে
        পরাণ-মাঝখানে।
ঝরিছে ঝর
পিয়াস-হর
        বাদল-ঘন-ধারা;
ঘুমাতে নারি,
উতল বারি
        করিছে সুখে সারা।
বাদল-ধারা,
নিদ্রাহারা
        হ'য়ে যে শুনি সুখে;
গভীর রাতে
বাদল সাথে
        হরষ ও ভীতি বুকে।

পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসীর সম্পাদক

বঙ্গে চালতত্ত্ব—মহাজন শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ "সাহিত্যরত্ন" কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত। চন্দননগর। ১৩৩২। ৪২৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রায় এক বৎসর হইল, বইখানি সমালোচনার নিমিত্ত পাইয়াছি। দৈবক্রমে অন্যান্য বইর গাদার মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই বিস্মরণের জন্য দুঃখিত হইলাম। কিন্তু মনে আছে বইখানি যখন প্রথম পাইয়াছিলাম মলাটে "বঙ্গে চালতত্ত্ব" এই নাম হইতে গ্রন্থের বিষয় বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে মনে হইয়াছিল ঘরের চাল-নির্মাণে যে সূত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে ইহাতে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু 'বঙ্গে' এই অধিকরণ কারকের অর্থ পাইলাম না। কাজেই ভূমিকা পড়িতে হইল। দেখি "চালতত্ত্ব" নয়,—চাউল তত্ত্ব; "তত্ত্ব" নয়—বিবরণ; "বঙ্গে" নয়,—বঙ্গদেশীয়, অর্থাৎ বঙ্গ দেশে যে যে ধান জন্মে সে সে ধানের আদ্যন্ত বিবরণ। বঙ্গদেশে ধান-চাউলের বাণিজ্য। আমি জানি কলিকাতার নব্য-সম্প্রদায় চা-উ-লকে চা-ল বলেন। কিন্তু মুখে বলা আর ছাপায় লেখা এক নয়। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দটি উচ্চারিত হয়, চা-ই-ল বা চা-ল। বিশেষতঃ, "তত্ত্ব" এই সংস্কৃত শব্দটির সহিত চালের সমাসে গোল বাধাইয়াছে। আর, তত্ত্বই বা বলিতে পারা যায় কি? "তত্ত্ব" শব্দের অর্থ যাথার্থ্য, স্বরূপ। গ্রন্থকার অবশ্য তণ্ডুলের স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াসী নহেন।

বাঙ্গালা ভাষায় বাণিজ্য-বিষয়ে পুস্তকের অভাব আছে। বই পড়িয়া অবশ্য কেহ বণিক্ হইতে পারে না কিন্তু বাণিজ্যের স্থূল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সকল কর্মের আদ্য কথা এই, হাট না জানিলে হেটো হইতে পারা যায় না। এই পুস্তকে ধান-চালের হাটের খবর আছে। যাঁহারা ধান-চালের ব্যাপার করিতে চান, তাঁহারা ইহা হইতে নানা জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন।

এক কথায় বলিতে গেলে গ্রন্থখানি ধান চালের কার্‌বারের ডিরেক্‌টারী (Directory) বা পাঁজি। বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় যে যে ধানের চাষ হয়, তাহাদের নাম; প্রত্যেক জেলায় কোথায় ধান-চালের হাট বা গঞ্জ আছে, তাহাদের নাম; ধান কলের নাম ও ঠিকানা, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে ধান-চালের দোষ-গুণ-পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এইসকল তথ্য সংগ্রহ করিতে অবশ্য অর্থব্যয় হইয়াছে, এবং বৃত্তান্ত লিখিতে পরিশ্রমও হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল অজস্র অর্থব্যয়, কঠিন শারীরিক পরিশ্রম, বহু গবেষণা ও নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এই শেষ জীবনে 'বঙ্গে চালতত্ত্ব' কেতাবখানি প্রকাশিত করিলাম।" এই কথাগুলি না লিখিলে গ্রন্থের কোন ক্ষতি হইত না। গ্রন্থকার যে অব্যবসায়ী যুবা নহেন তাহা তাঁহার নামের আদ্যে "মহাজন" না দেখিলেও বই পড়িলে বুঝিতে পারা যাইত। মহাজন গ্রন্থকার খতিয়ানের প্রয়োজন অবশ্য বুঝেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বই লিখিবার সময় পুস্তকের বিষয়ের খতিয়ান করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। পাঠকের নিকটে খতিয়ানের পরিবর্তে রোজনামা ধরিয়াছেন, যখন যে গোমস্তা যে সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাহা খসড়া খাতায় টুকিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ যথা-বিন্যস্ত না হইলে, গ্রন্থকারের কৃতিত্ব কোথায় থাকে? ফলে ক্রমবিন্যাসের দোষ হেতু পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে, ভূরি ভূরি পুনরুক্তিও ঘটে। এই দুই দোষ না থাকিলে গ্রন্থের পৃষ্ঠসংখ্যা অর্দ্ধেক হ্রাস হইতে পারিত। "ষষ্ঠবিভাগে" ১৬৮ পৃষ্ঠায় "চালের সিপমেন্ট" হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার তাহা রদ করিয়া পূর্ব "বিভাগ"গুলি কিছু কিছু বাড়াইয়া চারিটি "বিভাগ" প্রায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার "গবেষণা"র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গবেষণার প্রয়াস না করিলেই ভাল করিতেন, কারণ স্বয়ং-জ্ঞান কিছু না থাকিলে শোনা কথায় বা পড়া কথায় নির্ভর করিলে পদে পদে ভুলের সম্ভাবনা। এখানে সব ভুল দেখাইবার স্থান হইবে না, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রন্থের আরম্ভে "সংজ্ঞা পরিভাষা"। লিখিত হইয়াছে, "ধান ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ তৃণ বিশেষ। উদ্ভিদ-শাস্ত্রে ইহাকে (Gramineae) গ্রামিনেসিয়া জাতির অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। ধানের খোসা ছাড়াইলে যে শস্য পাওয়া যায় তাহাকে চাল বলে। বাংলা দেশে সর্ব্বত্র ধানও চাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ইহাকে অন্ন, ব্রীহি জীব-সাধন, তণ্ডুল প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ধানের বিষয়ে ভাবপ্রকাশে পাঁচ প্রকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা:—১। শালি, ২। ব্রীহি, ৩। শুক, ৪। শিম্বা ও ৫। ক্ষুদ্র।"—বাঙ্গালীর লেখায় এত ভাষা-ভুল কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। "ধান ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ তৃণ বিশেষ।" এই অদ্ভুত বাক্যের উৎপত্তি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ ঘাস ও তৃণ এক, এবং তৃণ জান্তব কিম্বা পার্থিব হয় না। আর, ধান যদি তৃণ হইত, তাহা হইলে ধানের খোসা ছাড়াইয়া চাউল পাইতাম কি? উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে "গ্রামিনেসিয়া," "গ্রানিনেসিয়া" নয়। ইংরেজী বাংলা দুইতেই "গ্রানি" লেখা হইয়াছে, সুতরাং মুদ্রাকরপ্রমাদ বোধ হয় না। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের ধান্য, আর বাঙ্গালা ভাষার ধান ও ধান্য এক নয়। ১৭০ পৃষ্ঠায় আবার ভাবপ্রকাশের পঞ্চবিধ ধান্যের কথা আছে। সেখানে ধান্যগুলির পরিচয় ও বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইয়াছে। অনেক ভুলও আছে, যথা, "আউস ও আমনের ভিতর অনেক প্রকার শালিধানের জাত আছে।" আউশ কদাপি শালি ধান্য নয়। মসূর, কুলথ, তুবর, আঢ়ক প্রভৃতি শিম্বীধান্য, ক্ষুদ্রধান্য নয়। তিল, ধান্যের অন্তর্গত নয়। বোরো ধান গ্রৈষ্মিক, সংস্কৃত ব্রীহি বোধ হয় না।

"সংজ্ঞা ও পরিভাষার" মধ্যে ধান ও চালের নানা ভাষায় নাম দেওয়া হইয়াছে। এত ভাষা আমার জানা নাই, অভিধান দেখিয়া নাম খুঁজিবার সময়ও নাই। কিন্তু জানি, উড়িষ্যাদেশে চাউলের নামান্তর "রাবনা" নয়। একপ্রকার ধানের নাম রাবনা।

৮ পৃঃ। "বাংলায় ধানের আবাদ" এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, "পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান, বীরভূম, কটক, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, নাগপুর ও মানভূম জেলাতে—"। দেশজ্ঞানের এইরূপ দৃষ্টান্ত এত যে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। "অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এক বিঘা জমিতে ২৪/মোন পর্য্যন্ত ধান জন্মিয়া থাকে।" বিঘায় চব্বিশ মণ! সরকারী কৃষি-বিভাগ জানিয়া রাখুন।

৯পৃষ্ঠা। "কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়।" "সাধারণতঃ এঁটেল মাটিতে নিম্ন ও জলভূমিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও সূর্য্যকিরণ পড়ে।" কথাটা সত্য নয়। "ধান-চাষের প্রধান আহার জল।" চাষের আহার কি? ধানগাছের আহারও জল নয়। তাহা হইলে উর্বরা ভূমি খুঁজিতে হইত না। "রোপাতে চাষ ভাল হইয়া থাকে।" বোধ হয়, 'চাষ' শব্দে ফলন বুঝিতে হইবে।

১১ পৃষ্ঠা। "ধান হইতে কি প্রকারে চাল উৎপন্ন হয়।" এক পরিচ্ছেদের এই নাম দিয়া ধানঝাড়া, আর ঝরা, ভাসা, ডুবা ধান বর্ণনা করা হইয়াছে! ১৩ পৃষ্ঠায় "ধান হইতে চাল" আবার আছে।

১২ পৃঃ। গ্রন্থকার বলেন, উড়িষ্যা প্রদেশে ঝরা ধানের চাষ আছে। লিখিয়াছেন, জলাভূমিতে এই ধানের চাষ হয় এবং ধান পাকিয়া ঝরিয়া পড়িবার পর "খেংরা দিয়া কুড়াইয়া লইতে হয়।" কিন্তু এমন নির্বোধ চাষী কে আছে যে ঝরা ধানের চাষ করিবে? জলাভূমিতে খেংরা চলিতে পারে কি?

গ্রন্থের "প্রথম বিভাগ" "অন্ন প্রকরণ" ও "ভাতের গুণ" বর্ণনায় শেষ হইয়াছে। লিখিত আছে, "ভাত মনুষ্য-শরীরের একমাত্র প্রধান খাদ্য। মানুষমাত্রেই অন্নগত-প্রাণ।" কিন্তু পৃথিবীতে বাঙ্গালীই একমাত্র মনুষ্য নহে, এবং অন্ন ও ভাত এক নহে।

৫৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ধান হইতে চিঁড়া তৈয়ারী হইয়া থাকে। চিঁড়া তৈয়ারী করিতে হইলে ধানকে তপ্ত বালির খোলায় গরম গরম ভাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে কুটিলেই চিঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।" "গরম গরম ভাজা" যেমন, চিঁড়াও তেমন। ধানকে তপ্ত বালির খোলায় ভাজিলে খই হইবে, তাহাকে ঢেঁকিতে কুটিলে কি হইবে, গ্রন্থকার তাহা চিন্তা করেন নাই।

এখন তত্ত্ব ও গবেষণার কথা থাক, তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা তুলি। জল খাওয়াইয়া চাল ভারী করা হয়। ইহাকে "রস দেওয়া" বলে। গ্রন্থকার বলেন, উড়িষ্যা প্রদেশেই এই শঠতা প্রবল। তিনি লিখিয়াছেন, (২৯ পৃঃ), "যাহারা ওড়িষ্যা প্রদেশে চাল খরিদ করিয়াছেন, তাহারা উড়ে চাষীদের বেশ ভালরূপ জানেন। এত শঠতা করিতে বা চুরি করিতে আর কোন দেশের লোক পারে না," ইত্যাদি। বাঙ্গালী বাণিজ্য করিতে পারে না কেন, এখানে এক কারণ পাইতেছি। মহাজন গ্রন্থকার অবশ্য জানেন, কটকে কয়েক ঘর বিদেশী নাখোদা আছেন। তাঁহারা বর্ষে বর্ষে তিন চারি লক্ষ টাকার চাল ওড়িষ্যায় কিনিয়া দেশ-দেশান্তরে পাঠাইতেছেন, "উড়ে" চাষীদেরও 'শঠতা, জুয়াচুরি ও বেই-মানি' দেখিয়া তল্পীতল্পা লইয়া দেশে ফিরিয়া যান নাই। মাড়োয়াড়ীও আছেন; তাঁহারাও দোকান-পাট তুলিয়া দিয়া স্বদেশে পলায়ন করেন নাই। আর, বাঙ্গালী ওড়িষ্যাদেশে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া গালি পাড়িতে বসিয়া গিয়াছেন! গ্রন্থকারের 'উড়িষ্যা' প্রদেশ কোন্ ভূখণ্ড তাহাও বুঝা ভার। ৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, "পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান, বীরভূম, কটক, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, নাগপুর ও মানভূম জেলা।" ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যা প্রদেশের বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুর, তমলুক, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি জেলা।" ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কটক ও উড়িষ্যা বিভাগের প্রতি জেলা।" ইত্যাদি। সে যাহা হউক, লোকে যে প্রদেশকে ওড়িসা বলে, সে প্রদেশের চাষা-ভূষা শঠতায় বাঙ্গালাদেশকে হারাইতে পারে নাই। [illegible] মোক্তার এই কথার সাক্ষী। অন্ততঃ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নাই; [illegible] কে কখন্ ঠকায়, তাহার নিশ্চয় নাই। [illegible] দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার ভুলিয়া গিয়াছেন, [illegible] নিম্নে শঠতা দ্বারা আত্মরক্ষা করে। তিনি মনে করিয়াছেন, যত মহাজন সব সাধু, আর যত অপর লোক সব চোর। ধানচালের মহাজন ছাড়া অপর নানাদ্রব্যের মহাজন আছেন। জিজ্ঞাসা করি, কে সরল-প্রকৃতি সাঁওতালকে কুটিল করিয়াছে? কে কলিকাতায় ঘি-য়ে চর্বি মিশাইতেছে? কে নূতন চালকে পুরানা করিয়া বেচিতেছে? কে খাবার জিনিসে মিশাল দিতেছে? কে সুতার নম্বর চুরি করিতেছে, কাপড়ে কম দিতেছে? মনু, বাণিজ্যে সত্যানৃত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা রোধ করিতে পারেন নাই। চাণক্যের সময়ে রাজশাসনে মহাজনের দৌরাত্ম্য বাড়িতে পারে নাই। এখন রাজদণ্ডের ভয় থাকিলেও নাই, আইনের জটিলতায় সে ভয় ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

বাঙালীর খাদ্য—শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। মূল্য আট আনা।

কথা নাই বার্ত্তা নাই হঠাৎ লোকের পা ফুলিতে আরম্ভ করিল। এই পা-ফোলার ফলে দেখা গেল, দুই-চার জন লোক মারাও যাইতেছে। ডাক্তাররা বলিলেন, 'এপি-ডেমিক্ ড্রপ্‌সি (epidemic dropsy)।' সাধারণ লোকে বলিল, 'বেরিবেরি'। ধুয়া উঠিল শাদা চাল, শাদা আটা, ও ভেজাল তেল খাওয়ার ফলেই এই অবস্থা। দেখা গেল, অমনি ঘরে ঘরে কিছুদিন লাল চাল, লাল আটা প্রভৃতির প্রচলন সুরু হইল। কিন্তু ক'দিনের জন্য! রোগের প্রকোপ যেই কমিল আবার শাদা চাল, শাদা আটা খাওয়া আরম্ভ হইল। যথা পূর্ব্বং তথা পরং। রোগই যখন চলিয়া গেল তখন আহার সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন যে কি তাহা মালুম হয় যখন বাঙালীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, অকালজরাগ্রস্ত শরীরের দিকে তাকানো যায়। শুধু দু'দিনের রোগ নিবারণের জন্যই যেন প্রচলিত আহারবিধির পরিবর্তন আবশ্যক। শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি এই দুই-ই যে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে একথা আমরা ক'জন মনে রাখি? কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, যে-দেশে অধিকাংশ লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে-পরিমাণ খাদ্য দরকার তাহাই জোটে না সে-দেশে কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর নয় তাহা বিচার করিতে গেলে চলে না। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দেশের মূল সমস্যাটা হইল অর্থনৈতিক সমস্যা। আগে দেশের লোকে রোজগার করুক তাহার পর পুষ্টিকর অপুষ্টিকর খাদ্য বাছিয়া লইবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে।

এইরূপ ধারণার মূলে যে কত বড় ভ্রান্তি রহিয়াছে চারুবাবুর 'বাঙালীর খাদ্য' পুস্তকটি পাঠ করিলে তাহা বোঝা যায়। পুষ্টিকর খাদ্য মাত্রেই ব্যয়সাধ্য খাদ্য নয়; তবে অবশ্য ঘি, দুধ, ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, ফলমূল প্রভৃতি যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য খাদ্য খাইতে পারিলে যে শরীরের পক্ষে খুব ভাল হয় সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে চারুবাবু একটি মজার গল্প বলিয়াছেন। একটি অতি গরীব লোক ছেলের অসুখের জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিল ও বাটি-বাটি বেচিয়া তাঁহার ফি দিল। ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন, ১৮ [illegible] মাছের ঝোল, ও আলমোড়ার হাওয়া বদল। শুনিয়াই তো তাহার চক্ষুস্থির।

ঘি, দুধ, মাছ, মাংসের ব্যবস্থা শুনিয়া যদি কাহারও চক্ষুস্থির হয় তো চারু-বাবুর পুস্তক পড়িলে তিনি অভয় পাইবেন। [illegible] নবাবী খানায়?

লাল চাল, লাল আটা, শাকসব্জি, ছোলাভিজে, [illegible] কি?

চারু-বাবুর বইখানির বিশেষত্ব এই যে, খাদ্য-[illegible] বৈজ্ঞানিক তথ্যের তিনি এরূপ সরল ও [illegible]

করিয়াছেন যে, বইখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। কারবোহাইড্রেট্‌, প্রোটিন্‌, ফ্যাট, প্রভৃতি বস্তু কোন্‌ খাদ্যে কি পরিমাণে আছে, ভাইটামিন্‌ কয় প্রকারের, অবস্থার কি কি তারতম্য ঘটিলে একই খাদ্যে কখনও ভাইটামিন্‌ পাওয়া যায় কখনও বা যায় না ইত্যাদি ব্যাপার এবং যে-সকল পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা এই ব্যাপারগুলি জানা গিয়াছে তাহার বিবরণ পড়িবার সময় মনেই থাকে না যে জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিষয়ক বই পড়িতেছি। আহার-ব্যাপারটি যেরূপ রসাল, আহার-তত্ত্বও যে ঠিক ততটা রসাল হইতে পারে চারু-বাবুর বইখানি তাহার প্রমাণ।

বাংলা ভাষায় এরূপ বই খুবই কম দেখা যায়, যাহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক জীবন-যাত্রা-বিধির এরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে আহার-ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায়, চারু-বাবুর বইখানি খাদ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে দেশের লোকের আগ্রহ সৃজন করিবে।

শ্রী হিরণকুমার সান্যাল

ঋতু উৎসব—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲।

ইহাতে কবির নিম্নলিখিত কয়েকখানি গীতিনাট্য আছে:—(১) শেষ বর্ষণ, (২) শারদোৎসব, (৩) বসন্ত, (৪) সুন্দর (৫), ফাল্গুনী। সবগুলি গীতিনাট্যই বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত; কাজেই আমাদের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ইত্যাদি খুব সুন্দর হইয়াছে।

প্র

বিবি বউ—শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক বুক কোম্পানি, ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম সাত সিকা। ১৩৩৩।

ছোট গল্পের বই। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মোট আটটি গল্প আছে। তাহার মধ্যে একটি গল্প শ্রীমতী রেণুকার লেখা। এই গল্পটি "বিবি বউ" হইতে বাদ দিলে ভাল হইত। ইহা অন্য সাতটি গল্পের সঙ্গে বেখাপ্পা হইয়াছে। অন্যান্য সব গল্পগুলি পড়িতে বেশ ভাল লাগে। নিতান্ত ঘরোয়া কথাগুলিকে লেখকের লিখিবার ভঙ্গীতে নূতন বলিয়া মনে হয়। গল্পের প্লটগুলিতে লোমহর্ষক ব্যাপারাদি না থাকিলেও গল্পগুলি শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া পড়া যায়।

ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি বেশ হইয়াছে। সাত সিকা দাম বিক্রয়ের অন্তরায় হইবে বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থকীট

গল্পগুচ্ছ—প্রথম ভাগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী কার্য্যালয়—২১৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচ খণ্ড গল্পগুচ্ছ, গল্প সপ্তক, গল্প চারিটি ও কয়েকটি অপ্রকাশিত গল্প চার খণ্ডে সমাপ্ত হইয়া বাহির হইবে। এই পুস্তকখানি সেই নূতন গল্পগুচ্ছের প্রথম ভাগ। ইহাতে গল্পগুলি সময়ের ক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশক পাঠকের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। একটির পর একটি রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। গল্প-সংখ্যা, ছাপাই, বাঁধাই ইত্যাদি বিবেচনা করিলে বইখানির মূল্য খুব কম করা হইয়াছে। যাঁহারা একত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি রাখিতে চান এই চারখণ্ড গল্পগুচ্ছ কিনিলেই তাঁহাদের চলিবে। গল্পগুচ্ছের প্রথম ভাগের জন্য প্রকাশক সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

মানবগীতা—(কাব্য)—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, বিরচিত ও ৩০নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-লেখকরূপে যোগীন্দ্র-বাবু বাঙলা সাহিত্যে আপনার স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য ও শিবাজী মহাকাব্য দুইটিও গ্রন্থকারের দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের দিনের যথার্থ চিত্র এই বই দুইখানিতে আমরা প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তকখানিও গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা একখানি পারমার্থিক কাব্য-গ্রন্থ। শিবাজী ও পৃথ্বীরাজের ন্যায় ইহা ঐতিহাসিক কাব্য নহে। সাধারণ মানবদের লইয়া গ্রন্থকার এক অপূর্ব্ব ভক্তিকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবের সাংসারিক কর্ত্তব্যও যে হেয় নয় গ্রন্থকার তাহাই দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক হিন্দু-গৃহে গীতার ন্যায়ই আদৃত হইবে। দুর্ব্বল মনে বল আনিয়া দিবে।

সত্যানুসরণ—"পাবনা সৎসঙ্গ কাউন্সিলের" অনুমতিক্রমে শ্রী শাক্যসিংহ সেন কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী ঠাকুরের অভয়বাণীর দুইচারিটি মাত্র সঙ্কলিত ও শ্রী মনোহরচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ২৮ বি, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১১০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা।

মুক্তার মত জ্বলজ্বলে কয়েকটি উপদেশ-বাক্য; তাহার একটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"সর্ব্বপ্রথম আমাদের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ঐ দুর্ব্বলতা, তাড়াও, যত শীঘ্র পার ঐ রক্ত-শোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক ভ্যাম্পায়ারকে। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়……। আগে সাহসী হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্ম্মরাজ্যে ঢোক্‌বার অধিকার জন্মেছে।"

সান্ত্বনা—শ্রীশ্রী অনন্ত মহারাজের পত্রাবলী, পাবনা সৎসঙ্গ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে শ্রী মনোহরচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ২৮ বি, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১৷০; কাগজে বাঁধাই ১৲। ১৪৩ পৃষ্ঠা।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রগুলিতে লেখকের জ্ঞান-ভক্তি ও কাব্য-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মার্থবিষয়ক পত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যেরও অনেক উপাদান আছে।

মনের পথে—শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, প্রণীত। পাবনা সৎসঙ্গ কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৬ পৃষ্ঠা। কাগজে বাঁধাই ৸০; কাপড়ে বাঁধাই ১৲।

মনীষী ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক থিওরীগুলি গ্রন্থকার সহজ সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের নিজস্ব অভিমতও আছে। অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর বসু, রথীন হালদার, চারুচন্দ্র সিংহ ও সরসীলাল সরকার প্রভৃতি অল্প কয়েকজনই এই বিষয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর আছেন। গ্রন্থ-কারের এই পুস্তকখানিও এই বিষয়ে অনেকখানি অভাব মোচন করিবে। কঠিন তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলেও পুস্তকখানি কোথায়ও দুর্ব্বোধ্য নহে। Unconscious (অব্যক্ত), Complex (গ্রন্থি), Conflict (দ্বন্দ্ব), Repression (নিরোধ), Dream (স্বপ্ন), Libido, জন্মের রহস্য প্রভৃতি অধ্যায়গুলি সুলিখিত ও অনেক বিষয়ের সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করিয়া দেয়। অধ্যাপক শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পি-এইচ-ডি মহোদয় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

বাঁচিবার উপায়—শ্রী রামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মহেশপুর

(যশোহর) স্বস্ত্যয়ন সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রী ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১০১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

বঙ্গদেশের অত্যধিক মৃত্যুর হার, তাহার কারণ ও প্রতীকারের উপায় গ্রন্থকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলু, আক, কলা, খেজুর প্রভৃতির চাষে কি পরিমাণ খরচে কি পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় গ্রন্থকার তাহার হিসাব-নিকাশ দিয়াছেন। চাষ করিবার উপায়গুলিও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বইখানি সাধারণের উপকারে লাগিবে।

কাল-পরাজয় (পুরাণ-কাব্য)—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ২৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান।

চরিতাবলী সিরিজ—

১নং	শ্রীচৈতন্য—শ্রী ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫২ পৃষ্ঠা	।/০
২নং	অদ্বৈতাচার্য্য—শ্রী অমিয়কান্তি দত্ত	৪৫ পৃষ্ঠা	।৵০
৩নং	ঠাকুর-বাণী—শ্রী কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ,	৫০ পৃষ্ঠা	।৵০
৪নং	রঘুনাথ—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩১ পৃষ্ঠা	।০
৫নং	শাহজলাল—শ্রী চারুচন্দ্র চৌধুরী	৪০ পৃষ্ঠা	।০

প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, পোঃ নর্ত্তন ; শ্রীহট্ট চরিতাবলী সিরিজের এই পাঁচখানি সচিত্র পুস্তক দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বইগুলি সুলিখিত ও সুচিত্রিত। শিশুরা বইগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইবে। ছাপাই বাঁধাই সুন্দর।

স

বীরবলের হালখাতা—শ্রী প্রমথ চৌধুরী। প্রকাশক—ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বীরবল ওরফে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চিন্তার সহিত সাহিত্যিক মাত্রেই পরিচিত। বর্ত্তমান পুস্তকখানি দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে। বীরবলের রচনা যেমন সরল ও সরস, তেম্‌নি নির্ভীক ও তেজস্বী। সমাজে, সাহিত্যে, দেশপ্রেমে—যেখানে আমাদের গলদ আছে বীরবল সেইখানেই চাবুক লাগাইয়াছেন ; কিন্তু সাদা বাংলায় যাহাকে 'মিষ্টি জুতো' বলে, বীরবল তেম্‌নি তাঁহার চাবুকের গায়ে সরসতার একটি প্রলেপ লাগাইয়া তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এম্‌নি সরল ও সরস সত্যে ভরপুর যে, সেগুলি একবার পড়া থাকিলেও আমরা একান্ত আগ্রহে তাহা পাঠ করিলাম এবং আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম। "হালখাতা" একেবারে হাল ফ্যাশানের, ইহাতে অনেক পুরানো বুজ্‌রুকির মুণ্ডপাত হইয়াছে। যাঁহারা হালে কলম ধরিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে আমরা বইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কলম চালাইবার অনেক কৌশল তাঁহারা ইহাতে দেখিতে পাইবেন।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

নটীর পূজা—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

অবদানশতক অবলম্বনে রচিত 'কথা ও কাহিনী'র "পূজারিণী" কবিতার ভাব-বস্তু লইয়া এই নটীর পূজা নাটিকা রচিত। নাটিকাটি নূতন। নাটিকাটি কবির শ্রেষ্ঠ নাটিকাগুলির অন্যতম হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

চোখের বালি—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"চোখের বালি" চতুর্থ সংস্করণে পদার্পণ করিল। এবারকার ছাপা ও বাঁধন বেশ ভাল হইয়াছে।

ব্যুৎপত্তি-মালা—শ্রী হরিনাথ তর্করত্ন। প্রকাশক শ্রী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এসসি, ৩০ এ, বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সংস্কৃত ভাষায় যে-সব শব্দ কৃদন্ত বা ব্যুৎপন্ন, সেইসব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এখানি ব্যুৎপন্ন শব্দের অভিধান। অভিধানটি ভাল হইয়াছে। পাঠার্থীর উপকারে লাগিবে।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ম্মন্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ইতিহাসটি যখন 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হইতেছিল তখনই আমরা ইহা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। বিপ্লব যজ্ঞের হোতাগণ এই জাতীয় যে-সব কাহিনী বাংলা সাহিত্যকে দিয়া গেলেন তাহা বাংলার ইতিহাসেরই উপাদান। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। ইহার বিবরণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহ—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীরামেশ্বর দে, চন্দননগর। মূল্য এক টাকা।

ভারতবর্ষে আবার এমন দিন আসিয়াছে যখন শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতির জীবন-কথা পঠিত ও তাঁহাদের কর্ম্মজীবন আদর্শরূপে গৃহীত হওয়া দরকার। সেইজন্য যে-সব পুস্তকে এইসব স্বাধীনতা-বীরদিগের জীবনের ও কর্ম্মের পরিচয় আছে সেইসব পুস্তকের বহুল প্রচার ও পাঠ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য পুস্তকখানি এইরূপ দেশহিতমূলক। বিবরণ বেশ সংক্ষিপ্ত ও সরল। ভাষা প্রাঞ্জল। ছাপা ও বাঁধন লোভনীয় হইয়াছে। বইটি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

গুপ্ত

স্মৃতি-পথে বা বঙ্গের নব-জাতীয়তার অর্দ্ধ শতাব্দী—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান দি বুক কোম্পানি ৩৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

বরিশালের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত বাঙালীর নিকট অপরিচিত নহেন। জীবনের অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি নানাপ্রকার দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশসেবা করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রন্থখানি তাঁহার স্বলিখিত আত্মচরিত। জীবনের নানা ঘটনা, সেই ঘটনাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ ও ঘটনা-পরম্পরার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ চিন্তাশীল লেখক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার এই আত্মবিশ্লেষণমূলক জীবন-চরিত একখানি সুন্দর মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ হইয়াছে। বইখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত—কোথাও ভাষার আড়ম্বর নাই, লেখক কোন স্থানেই নিজের কার্য্যাবলীর ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার উল্লেখ করিতে গিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। এই সুলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বাঙলার জাতীয় জীবনের অর্দ্ধশতাব্দীর সংক্ষিপ্ত-সার ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইয়াছি। এই সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রত্যেক বাঙালীই লাভবান হইবেন। আমরা আশা করি, পুস্তকখানির আদর হইবে।

বার্ষিক শিশুসাথী (সচিত্র)—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। কলিকাতা আশুতোষ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০। পৃঃ ১৮৬। ১৩৩৩।

শিশুসাথীর এই সংখ্যা অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায় প্রভৃতির অতি উপাদেয় লেখা আছে। পূজার ছেলে-মেয়ে, ভাই-ভগ্নীদের হাতে উপহার দিবার উপযোগী এমন সুন্দর বই আর নাই।

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগরলফ্‌

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পরে

ডেভিড্‌ হল্‌ম্‌ হতাশভাবে মৃত্যুযানের ভিতর পড়িয়া রহিল। নিদারুণ ক্রোধে তাহার সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল,—এ ক্রোধ পৃথিবীর আর কাহারো বিরুদ্ধে নয়, নিজের উপরে তাহার রাগ হইতেছিল। সে কি একটু আগে পাগল হইয়া গিয়াছিল? নহিলে, সিস্টার্‌ ঈডিথের পদতলে মুখ গুঁজিয়া অনুতপ্ত, ক্ষুব্ধ পাপীর মত ব্যবহার সে করিল কেন? ছি,ছি, জর্জ্জ কি মনে করিল! সে নিশ্চয় তাহার এই দুর্ব্বলতায় হাসিয়াছে। পুরুষ যদি পুরুষ নামের যোগ্য হইতে চায় নিজের কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে তাহার চলিবে না—সে ত জানিয়া শুনিয়া জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। একটা সামান্য মেয়ে তাহাকে ভালবাসে—এই কথা শুনিয়াছে বলিয়াই কি তাহার জীবনের অন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে হইবে? তাহার হঠাৎ এরূপ মতিভ্রম ঘটিল কেন? সেও ভালবাসিল নাকি? কিন্তু সে নিজে ত মরিয়াছেই—মেয়েটাও এইমাত্র মরিয়া গেল! মড়ার সঙ্গে মড়ার প্রেমটাই বা কেমনতর?

সহরের বাহিরে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরিয়া জর্জ্জের খোঁড়া ঘোড়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। বাড়ীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল, রাস্তার আলো অনেকখানি দূরে দূরে দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা প্রায় সহরের প্রান্তসীমায় আসিয়া পড়িয়াছে, একটু পরেই বাড়ী কি রাস্তার আলো আর দেখা যাইবে না।

সহরের পথের শেষ আলোটির সন্নিকটবর্ত্তী হইতেই ডেভিডের মনে একটা অবসন্নতা আসিল—সহর ছাড়িয়া যাইবার জন্য একটা অস্পষ্ট ব্যথা সে অনুভব করিল; যেন সে এমন কোনো জিনিষ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে যাহা তাহার অত্যন্ত প্রিয়। তাহার কষ্ট হইতে লাগিল।

যে মুহূর্ত্তে মনে মনে সে এই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জীর্ণ গাড়ীখানার চাকার বীভৎস কান্না আর কাঠের ঘর্ঘর শব্দকে ছাপাইয়া কাহার যেন কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল—সে ঘাড় তুলিয়া ভালো করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল।

জর্জ্জ যেন কাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে—সেও সম্ভবতঃ এই গাড়ীরই একজন আরোহী। ইহাকে এতক্ষণ ডেভিড্‌ লক্ষ্য করে নাই।

শুধু একটি মৃদু মধুর স্বর—যেন অন্তরের নিবিড় ব্যথায় অতি ক্ষীণ ভাবে কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছিল—ডেভিড্‌ চমকিয়া উঠিল—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

সে বলিতেছিল, "আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। তাকে আমার অনেক কথাই বল্‌বার ছিল, কিন্তু সে শুন্‌ল কই? রাগে আর হিংসায় জর্জ্জরিত হ'য়ে সে ওই প'ড়ে রয়েছে। আমাকে সে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, সম্ভবতঃ, আমার কথাও সে শুন্‌তে পাচ্ছে না, তুমি দয়া ক'রে আমার হ'য়ে তাহাকে বলো যে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু আমাকে এখান থেকে এখুনই নিয়ে যাবে—আমার এই মূর্ত্তি নিয়ে তার সাম্‌নে আর কখনো উপস্থিত হ'তে পার্‌ব না।"

জর্জ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু যদি সে কোনো দিন অনুতপ্ত ও ব্যথিত হয়?"

গভীর বেদনায়-কম্পমান কণ্ঠে অদৃশ্য ঈডিথ বলিয়া উঠিল, "তুমিই ত এইমাত্র বল্‌লে অনুতাপ সে কখনো কর্‌বে না—কিছুরই জন্যে নয়। তাকে বলো যে আমার ইচ্ছা ছিল অনন্তকাল আমরা দুজনে একসঙ্গে থাক্‌ব—কিন্তু তা আর হ'ল কই! এই মুহূর্ত্ত হ'তে আমরা চিরকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হব।"

জর্জ্জ আবার প্রশ্ন করিল, "তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য যদি কখনো সে প্রায়শ্চিত্ত করে?"

ব্যথাকাতর কণ্ঠে ঈডিথ বলিল, "তাকে জানিও এর বেশী আর তার সঙ্গে যাবার অধিকার আমার নেই। আমার হ'য়ে তাকে তুমি আমার বিদায় সম্ভাষণ দিও।"

জর্জ্জ ছাড়িল না, তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সে যদি নিজেকে সৎপথে চালিত ক'রে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হ'য়ে যায়।"

দূর হইতে একটি আর্ত্তকণ্ঠের অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল, "তাকে বলো আমি তাকে ভালবাস্‌ব—অনন্তকাল। আর কোনো আশা আমি দিতে পারি না।"

এই কথোপকথন শুনিতে শুনিতে ডেভিড্ নতজানু হইয়া বসিল। সে সহসা প্রবল চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইয়া কি যেন ধরিতে গেল—ঠিক কিসের দিকে সে হস্ত প্রসারণ করিল, সে নিজেই বুঝিল না, কিন্তু অনুভব করিল যেন তাহার হস্ত কি স্পর্শ করিল—তাহার শিথিল মুষ্টি ভেদ করিয়া কি যেন একটা অসীম শূন্যে মিলাইয়া গেল—তাহার মনে হইল তাহা যেন অত্যুজ্জ্বল আলোক-শিখা—যেন এক স্বপ্নাতীত সৌন্দর্য্যের শিখা।

নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া লইয়া ডেভিড্ এই অদৃশ্য পলাতক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে ধাবমান হইতে চাহিল, কিন্তু সামান্য শৃঙ্খল বা বন্ধনের অতিরিক্ত কি যেন একটা অশরীরী শক্তি তাহাকে বাধা দিল, সে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পড়িয়া রহিল।

প্রেম আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিল; কিন্তু এ প্রেম অশরীরী আত্মার অনন্ত নিবিড় প্রেম। পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেম ইহার ক্ষুদ্র অনুকরণ মাত্র। সিস্টার ঈডিথের মৃত্যুশয্যার পাশে এই প্রেম একবার তাহার চিত্তে ঝলকিয়া উঠিয়াছিল। তখন হইতেই এই অন্তরাগ্নিতে সে তিলে তিলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। আগুন জ্বলিতেছে—বহ্নিমান কাষ্ঠখণ্ড অঙ্গারে পরিণত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে—কেহ এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হইয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইবে—কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ডেভিডের মনেও এই অগ্নিশিখা সবেগে দাহ কার্য্য সমাধা করিতেছিল; ডেভিডের সমস্ত দেহ অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিতে করিতে সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ডেভিডের অন্তরের এই প্রেমাগ্নিশিখা এখনো দাউ দাউ করিয়া জ্বলে নাই বটে কিন্তু সেই সামান্য আলোকেই সে দেখিল তাহার প্রিয়তমা অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে মিলাইয়া গেল; সে শক্তিহীন পঙ্গুর মত পড়িয়া রহিয়া হতাশায় দগ্ধ হইতে লাগিল, এই দেবাত্মার অনুসরণ করিবার ইচ্ছাও সে মনে আনিতে পারিল না; তাহার সান্নিধ্য লাভ করিবার অধিকার তাহার কোথায়?

নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মৃত্যু-যানখানি চলিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বেই গভীর গগনস্পর্শী অরণ্য—পথ অত্যন্ত অপ্রশস্ত; বনের বৃক্ষচূড়া ভেদ করিয়া আকাশের চিহ্ন মাত্র দেখা যাইতেছিল না। হল্‌মের মনে হইল গাড়ী অতি ধীরে চলিতেছে। গাড়ীর চাকার আওয়াজ বীভৎসতর শুনাইতে লাগিল—এই একটানা শব্দের মাঝে ডেভিড্ নিজের অন্তরের অন্তস্তল খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল---হায়, সে কি নিঃসহায় শক্তিহীন! এই অনন্ত যাত্রা তাহার কবে সমাপ্ত হইবে?

জর্জ্জ সহসা লাগাম টানিয়া ধরিল, গাড়ীখানি থামিয়া গেল—চাকার কর্কশ শব্দও থামিল। ডেভিড্ একটু আরাম পাইয়া মৃত্যুযানের চালকের দিকে চাহিল। জর্জ্জ মর্ম্মভেদী কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"যে যন্ত্রণা আমি অহরহ পলে পলে অনুভব করিতেছি, যে নিদারুণ ক্লেশ ভবিষ্যতে আমাকে পাইতে হইবে—এসব কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু আমাকে অনিশ্চয়তার চরম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর;—আমি কোথায় চলিয়াছি আমাকে জানিতে দাও। হে ঈশ্বর, তুমি যে আমাকে মর-জগতের অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়াছ সেজন্য তোমাকে নমস্কার। আমি সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও তোমাকে বন্দনা করিব কারণ তুমি আমাকে অনন্ত জীবন পাইবার অধিকার দিয়াছ।"

আবার গাড়ী চলিল—চাকার কান্না সুরু হইল। মৃত্যু-দূতের কাতর প্রার্থনা ডেভিডের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল—সে এই কথাগুলি ভুলিতে পারিতেছিল

না। সে জীবনে এই প্রথম তাহার বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইল।

সে ভাবিল জর্জ্জের সাহস আছে বটে, যদিও এই কদর্য্য পেশা হইতে মুক্তি পাইবার কোনও আশা তাহার নাই তবুও সে একবারও অনুযোগ করিল না।

এই যাত্রার আর শেষ ছিল না; তাহারা কি অনন্ত পথের পথিক হইয়াছে!

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল ডেভিডের মনে হইল যেন তাহারা একদিন একরাত্রি ধরিয়া পথ চলিয়াছে। এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়িল—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ যেন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—নীল আকাশের কোলে কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র রাত্রির যাত্রা সুরু করিয়াছেন।

ঘোড়ার গতি এমন কমিয়া আসিল মনে হইল যেন সেই প্রান্তরের উপর দিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে। প্রান্তরটি যখন অতিক্রান্ত হইল ডেভিড্ চাঁদের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হইতে কতখানি সময় লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার? চাঁদ যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে! ইহা কেমন করিয়া সম্ভব?

গাড়ী চলিতে লাগিল—অরণ্য ও প্রান্তর ভেদ করিয়া অজানিত, অনির্দ্দিষ্ট পথে। বহুক্ষণ পরে পরে ডেভিড্ আকাশে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল চন্দ্রদেব কৃত্তিকানক্ষত্র-পুঞ্জকে ছাড়িয়া গিয়াছেন কিনা! সে বিস্মিত হইয়া প্রতিবারেই দেখিল চন্দ্র নিশ্চল হইয়া যথাস্থানেই রহিয়াছে।

ডেভিড্ অবাক হইল! এইমাত্র সে যে ভাবিল তাহারা একদিন একরাত্রি পথ চলিয়াছে তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব হয়! রাত্রির অবসানে ভোর হইয়া আবার সন্ধ্যা আসে নাই—সেই এক অনন্তরাত্রিই তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা চলিয়াছে বটে, কিন্তু সময়ের যেন পরিবর্ত্তন হয় নাই; সৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে না। অনন্ত নীলাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থির।

সহসা তাহার জর্জ্জের কথা মনে পড়িয়া গেল। জর্জ্জ বলিয়াছিল যে, তাহার সময় সাধারণ মানুষের হিসাব অনুযায়ী চলে না, তাহা অনন্তকাল প্রসারিত; এক মুহূর্ত্তেই সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারে। সে সভয়ে বুঝিতে পারিল যে, সে যে ভাবিয়াছে সে একরাত্রি ও একদিন পথ চলিয়াছে মানুষের হিসাবে হয়ত তাহা এক নিমিষের ব্যাপার!

শৈশবে সে একজন লোকের সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছিল, সে নাকি একবার স্বর্গে বেড়াইয়া আসিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে বলিয়াছিল যে স্বর্গে একশত বৎসর মানুষের ঠিক একদিনের মত কাটিয়া যায়। হয়ত মৃত্যু-যানের চালকেরও একদিন মানুষের সহস্র বৎসরের সমান। জর্জ্জের প্রতি সহানুভূতিতে আবার তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিল জর্জ্জ যে মুক্তি চাহিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বেচারাকে বহু বৎসর এই ভয়ঙ্কর গাড়ী চালাইতে হইয়াছে!

(ক্রমশঃ)

পথের বিপদ

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অত বড় আকাশটার কোনো খানে এতটুকু মেঘ ছিল না। তার নীল রঙ টাকেও কে যেন রাক্ষসের মতো এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে শুষে' নিয়েছে। 'ক্যানভাসের' ওপর কয়েক পোছ্‌ড়া খড়িমাটি বুলিয়ে দিলে সেটা যেমন একটা শ্রীহীন শুভ্রতায় ভ'রে ওঠে, তেম্‌নি একটা শ্রীহীন নিষ্ঠুর শুভ্রতায় গোটা আকাশ ঢাকা। আর সেই শুভ্রতার বুক চিরে' ঝ'রে পড়্‌ছিল একেবারে বৃষ্টির ধারার মতো ক'রেই রৌদ্রের ধারা। আকাশের আগুনের কটাহটাতে তখন যে

দীপ্তি দেখেছিলুম তেমন দীপ্তি রৌদ্রের ভেতর আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

ব্যাঙ্ক্ থেকে টাকা তুলে নিয়ে কোনো রকমে রাস্তাটুকু পেরিয়ে ট্রামে চ'ড়ে বস্‌তেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। ঐ সামান্য রাস্তাটুকু পেরিয়ে আস্‌তেই মনে হ'ল, আমার দেহটাকে কে যেন আগুনে ফেলে ঝল্‌সে দিয়েছে। পায়ের তলায় পিচ দিয়ে মোড়া রাস্তাটা গ'লে কাদার মতো নরম হ'য়ে তরল শীসের মতো গরম হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং নীচের দিক থেকে যে ঝাঁঝ উঠ্‌ছিল তার তোড় ছিল ওপরের রৌদ্দুরের ঝাঁঝের চাইতেও ঢের বেশী অসহ্য। রাস্তা জনহীন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ট্রামগুলোতেও কণ্ডাক্টর ও চেকার ছাড়া আর কোনো লোককে ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। দিনের দুপুরেও যে রাত দুপুরের নির্জ্জনতা এই কলকাতা সহরেই জেগে ওঠে সে খবরটাও এই প্রথম আমার কাছে ধরা পড়্‌ল।

এই অগ্নি-দাহের ভিতর নিতান্ত বিপদে প'ড়েই পথে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিপদ যে পথেই আমাকে কুড়িয়ে নিতে হবে সে কথা কে জান্‌ত! ট্রাম তখনো এক রশির বেশী এগিয়ে যায় নি, হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটি ভদ্রলোক ট্রামের সাথে সাথে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে' আস্‌ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার কর্‌ছেন—এই কণ্ডাক্টর—এই—রোখ—রোখ।

সে জায়গাটা ট্রাম থামাবার জায়গা নয়। সুতরাং কণ্ডাক্টর ট্রাম থামাতে নারাজ। কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে [illegible]রি মায়া হ'লো। ঘামে তাঁর গায়ের জামাটা ভিজে [illegible]তা হ'য়ে গেছে, পরনের কাপড়ের অবস্থাটাও তদ্রূপ। [illegible]এই রৌদ্দুরের ভেতরেও মাথায় একটা ছাতা নেই। [illegible]ক রকম ধমক দিয়েই কণ্ডাক্টরকে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে[illegible]লুম।

ভদ্র[illegible]ক ট্রামে এসে উঠ্‌লেন। দেখি, তিনি অস্বাভাবি[illegible]কমে ধুঁক্‌ছেন। চোখ মুখ এমন বেয়াড়া রকমে লা[illegible]'য়ে উঠেছে যে, মনে হ'ল প্রাণটা বুঝি দম ফেটে এখনি এই পথের মাঝখানেই বেরিয়ে পড়্‌বে। তাড়াতাড়ি এক পাশে তাঁকে স'রে খানিকটা জায়গা ক'রে দিয়ে বললুম—এই খানটাতে ব'সে পড়ুন মশাই, নইলে হয়তো তাল সাম্‌লাতে গিয়ে টাল খেয়ে প'ড়ে যাবেন। এই রৌদ্দুরেও নাকি কেউ ট্রামের পেছনে ছোটে!

হাঁপাতে হাঁপাতে কাটা কাটা কথাগুলো কোনো রকমে এক সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বল্‌লেন—সাধে কি ছুটি মশায়, নাকে দড়ি দিয়ে যে ছোটাচ্ছে। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়েই বল্‌লেন—আরে সুরেশ বাবু যে, চিন্‌তে পারেন মশাই!

লোকটাকে কখনো দেখেছি ব'লে মনে হ'ল না। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি আবার বল্‌লেন—এরি ভেতর বেমালুম ভু'লে গেছেন দেখ্‌ছি। কলেজ তো আমরা খুব বেশী দিন ছাড়ি নি!

কলেজ যে খুব বেশী দিন ছাড়ি নি তা বেশ ভালো ক'রেই মনে ছিল। কারণ ইউনিভার্সিটির পরিখাটা পেরিয়ে আস্‌তে আমাকে যে মাত্রায় কাঠ-খড় খরচ কর্‌তে হ'য়েছিল তার পরিমাণটা ছিল একটু অসম্ভব রকমেই ভারি। বাড়ীতে বোঝাতুম, আশু মুখার্জ্জির বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের যত ওঁছা ছেলে তরিয়ে দিচ্ছে, তাইতো তাদের সঙ্গে তর্‌বার আমার কোনো তাড়া নেই। অথচ প্রত্যেক বার ফেলের পর পড়া-ভালো-হয়-নার দোহাই দিয়ে কলেজ বদ্‌লাতেও কসুর কর্‌তুম না। এমনি ক'রে কলকাতার সমস্তগুলো কলেজ আমার হাতের পাঁচ হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং ভদ্রলোকটি কথায় একটু অপ্রস্তুতের মতো হ'য়েই বললুম—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়্‌ছে বটে। কিন্তু কলেজ তো আমাকে দু'টো একটা পেরুতে হয় নি, তাই ভালো ক'রে ঠাহর কর্‌তে পার্‌ছিনে, কোন্ কলেজে আপনার সঙ্গে ভিড়ে প'ড়েছিলুম। কোথায় পড়েছি আপনার সঙ্গে?—রিপনে না সিটিতে?

ভদ্রলোকটি একটু মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন—কেবল রিপন, সিটি কেন, রিপন, সিটি, মেট্রো, স্কটিশ অনেক কলেজেই আমি আপনার সঙ্গী ছিলুম। '[illegible]' [illegible] হল্ হল ক'রে জল কেটে বেরিয়ে গেল, [illegible]

আমরা শুধু গাধাবোটের দল। আর প'ড়ে থাক্‌বই বা না কেন? মা সরস্বতীর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল, আর যাই হোক্, সে যে মধুর সম্বন্ধ ছিল না, তাতে তো এতটুকুও ভুল নেই! কলেজ কামাই দিতুম না, পাছে পেছনের বেঞ্চে ব'সে আড্ডা জমানোটা কামাই যায়, হাসি মশ্‌করা, প্রফেসারকে ভ্যাঙচানো বাদ পড়ে। স্থতরাং মা ঠাকৃরুণ বর দিতে অত দেরী ক'রে, অন্যায় যে কিছু ক'রেছিলেন, আর যে অপবাদই তাঁকে দিই না কেন, এ অপবাদটা তো তাঁকে কিছুতেই দিতে পার্‌ব না। কিন্তু স্থরেশ বাবু, আপনার স্মৃতি শক্তি যে এত খারাপ হ'য়ে গেছে তা তো জানতুম না। মাঝখানে কোনো কঠিন ব্যাধিতে ভোগেন নি তো?

ব্যাঙ্কের 'কোরিডোরে' দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগেও এই সব বিষয় নিয়ে অমরেশের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। বায়োস্কোপের ছবির মতো সে সব ঘটনা চোখের সাম্‌নে ডানা মেলে আছে। অথচ কিছুতেই এ লোকটাকে মনে কর্‌তে পার্‌ছি নে!

স্মৃতি শক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় রীতিমত নিজের ওপর চ'টে গিয়ে কি ক'রে এই লজ্জাকর অবস্থাটার হাত হ'তে মুক্তি পা'ব ভাব্‌ছি, হঠাৎ চোখ প'ড়ে গেল তার ছাতার কয়েকটা হরফের ওপর। তাতে লেখা ছিল—বি, বস্থ।

একটু আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লুম—কিছুই ভুলি নি ভাই বোস্। কেবল দূরের স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিতে যা একটু দেরী হচ্ছিল। কিন্তু আপনার বিপদটা কি শুনি?

মহাউত্তেজিত হ'য়ে উঠে' তিনি বল্‌লেন—বিপদ ব'লে বিপদ! যদিও নিজের নয়, তবু পাড়ার লোকের বিপদ, সে তো নিজের বিপদেরই সামিল।—বিশেষতঃ আজ-কালকার এই অবস্থায়। জানেন তো এই ক'টা মাস ধ'রে দেশের ভেতর কি ঝামেলা চলেছে আমাদের ফতেউল্লা, ইউসুফ আলি ওরফান সেখ প্রভৃতি মিঞা-ভাইদের নিয়ে। তারা যে কবে ইরাণ তুরাণ থেকে এসে এ দেশে বাসা বেঁধেছিল জানিনে, কিন্তু একথা তো বেশ ভালো ক'রেই জানি যে ওদের শত করা ৯৯ জনই আমাদের ঐ ইচ্ছা মাইতি, নরহরি প্রামাণিক, হারু মালী প্রভৃতি হিন্দুদেরই বংশধর। ওদের শিরা কাট্‌লে হয় তো এখনো হিন্দু বাপ-মার রক্তের ধারা ধরা পড়ে। ওরা আবার বলে কি জানেন,—ওদেরি ১৮ জন এসে নাকি বাংলাদেশটা জয় ক'রে নিয়েছিল, আর বাঙ্গালীর মুরোদ যে কত তাতেই নাকি ধরা পড়েছে! নতুন ক'রে পড়্‌তে শিখ্‌ছে কিনা, তাই বড় বড় বুলি কপচায়। দিয়েছি তেমনি সেদিন ঠুকে' ও পাড়ার ঐ হামবড়া মৌলবীটাকে।—বলেছিলুম—মৌলবী সাহেব তোমাদের ও কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। আর ঠিক হ'লেও আমাদের তাতে যতটা অগৌরব, তার চাইতে ঢের বেশী অগৌরব তোমাদের। আমরা তবু তাদের মা'র খেয়েও নিজেদের ধর্ম্মে টিকে আছি, কিন্তু এমনি তোমাদের ধনের লোভ ও প্রাণের মায়া যে, জাত খুইয়ে, কাছা কোঁচা ছেড়ে লুঙ্গি পর্‌তে তোমাদের মনেও বাধে নি, কাজেও বাধে নি। ভাগ্যে খৃষ্টানদের সেই 'ইনকুইজিসনের যুগ নেই' নতুবা আবার মুসলমান ধর্ম্মে তোবা ক'রে খৃষ্টানদের মতো হ্যাট-কোট প'ড়ে আপনা-দেরকে খাস ইংলণ্ডের লোক মনে কর্‌তেও তোমাদের বাধ্‌তো না। বলেই বস্থ হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু আপনার বিপদের কথা তো কিছু বল্‌ছেন না!

—বল্‌ছি মশায়, বল্‌ছি। তুর্কি-ভায়াদের সঙ্গে থেকে থেকে আপনিও দেখ্‌ছি তুর্কি-সোয়ার-ব'নে গেছেন। ব'লেই তিনি আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর হঠাৎ এক মুহূর্ত্তেই হাসিটাকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—এইবার বল্‌ছি শুনুন!—

আমাদের পাড়ায় উমেশ হালদার ব'লে একটা লোক ছিল। মাছের ব্যবসা ক'রে সে ঢের টাকা জমিয়ে গেছে। ছেলে-পেলে নিয়ে বেশ একরকম সুখে স্বচ্ছন্দেই তার জীবন কাটছিল, হঠাৎ একদিন কি ক'রে পর্দ্দার আব্রু ভেদ ক'রে তার চোখ পড়্‌ল, তার মুসলমান ভাগীদারের স্ত্রী ফয়জানের ওপর। এই ফয়জান বাইজিটি আগে নাকি খাতায় নাম লিখিয়ে কোনো পল্লী বিশেষ গুলজার ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু উমেশের ভাগীদারের

পয়সার জোর একদিন তাকে যখন বোর্‌খা পরিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে নিলে, তখন ফয়জান বিবি হ'য়ে গৃহস্থ ঘরের ঘরণী হ'তেও ফয়জান বাইজির বাধ্‌ল না। বিবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন উমেশের সাথে তার ভাগীদারের মৈত্রী প্রায় শেষ সীমায় টেনে এনেছে, তখনই একদিন ভাগীদারের জীবনের খেলা ফুরিয়ে গেল এবং উমেশ স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ী ছেড়ে ফয়জানকে নিকা ক'রে ওসমানউদ্দিন সেজে বস্‌ল। এ মশাই আজকার কথা নয়, দশ বৎসর আগের কথা। এ দশ বৎসর আমরাই পাড়ার দশজনে উমেশের পরিবার ও তার ছেলে-মেয়েদের আগ্‌লে ব'সে আছি। কে জান্‌ত আজকার এই দুর্দ্দিনে সে ফিরে এসে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌বে!

সাময়িক উত্তেজনা যা গাঢ় হ'য়ে সকলের ভেতর তখন জট পাকিয়ে ব'সেছিল তার হাত থেকে আমিও মুক্ত ছিলুম না। তাই কিঞ্চিৎ উষ্ণ হ'য়েই ব'লে বস্‌লুম—বেশতো, সে যদি এসেই থাকে আপনারাই বা তাকে অত বিপদ ব'লে মনে করছেন কেন? আপনারা তাকে শুদ্ধি ক'রে ঘরে তুলে' নিলেই তো পারেন! ছুঁৎমার্গকে অনুসরণ ক'রে হিন্দু যে কত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে সে তো প্রতিদিন চোখের ওপরেই দেখ্‌ছেন!

বোস্‌ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ উচ্চ স্বরটাকে উচ্চতর ক'রে তুলে' বল্‌লেন—সে হ'লে ত বাঁচ্‌তুম, মশায়! আগে শুনুন ব্যাপারটা কি, তারপর যত খুশী মন্তব্য পাশ করবেন। উমেশের একটা মেয়ে ছিল, তার বয়স বছর তেরো হবে। বিয়ের জোগাড় চল্‌ছিল, হঠাৎ কাল রাত্রে সে হার্টফেল ক'রে মারা গেছে। আমরাই পাড়ার দশজনে মিলে তার সৎকারের ব্যবস্থা করছিলুম, খাটে তোল্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে এমন সময় হঠাৎ উমেশ দশ বারো জন লোক নিয়ে বাড়ী চড়াও ক'রে বল্‌লে—আমার মেয়ে যখন তখন ও মুসলমান। ওকে আমরা গোর দেবো, কিছুতেই দাহ করতে দেবো না। দেখুন দেখি, অত বড় একটা করুণ ব্যাপার, মা-টা শোকে পাগলের মতো পথের ওপর লুটিয়ে পড়ছে, মাথা কুটছে, চুল ছিঁড়ছে, তার হাহাকারে বনের পশুও থমকে দাঁড়ায়—আর ও ব্যাটা কিনা এম্‌নি সময় এসে বলে—গোর দেবো!

উত্তেজনায় আমার শরীরের ভেতরেও রক্তের কণাগুলো তখন গরম হ'য়ে উঠেছে। আমি বল্‌লুম—আর সেই আবদার আপনারা সহ্য কর্‌লেন! মেরে তাড়িয়ে দিতে পার্‌লেন না ব্যাটাকে!

তিনি বল্‌লেন—সহ্য আর কর্‌লুম কোথায়? ঢের অনুরোধ করেছি, মশাই, কিন্তু এই দশ বছরে তার যা চেহারা হ'য়েছে, তা দেখে তার কাছ থেকে কোনো রকমের অনুগ্রহের আশা করাই আমাদের ভুল হ'য়েছিল। ঠিক যেন একটা জানোয়ার! জানোয়ারের যা ওষুধ তাই দিয়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু তার পরের চোট্‌টা সাম্‌লাবারই পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের পাড়ায় যদি একবার যান তো দেখ্‌তে পাবেন, রাস্তার দু'ধারে কেবল লম্বা দাড়ির দোলা দুল্‌ছে এবং লম্বা ফেজের ফানুস উড়ছে। মেয়েটাকে নিয়ে যে নিমতলার রাস্তার দিকে রওনা হবো তারও সাহস খুঁজে পাচ্ছিনে। তাইতো এসেছিলুম লালবাজারে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে খবর দেবার জন্যে। কিন্তু এইবার উঠি—এইখানটাতেই যে আমাকে নাম্‌তে হবে।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ট্রামের দড়িটা ধ'রে টান দিয়ে তিনি আবার বল্‌লেন—কতই যে নতুন ঢং হচ্ছে, দেখে হাসিও পায় দুঃখও ধরে। ঐ দেখুন মশায় ট্রামের গায়ে এরাও লিখ্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছে—"Beware of Pick-Pokets." কিন্তু চল্‌লুম এইবার, সুরেশবাবু—নমস্কার!

হাত তুলে' তাঁকে প্রতি-নমস্কার ক'রে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—কন্যাহারা মাতার ব্যথা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মত্যাগী বাপের পাশবিকতা। দু'টোতে মিলে' আমার সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুতের জ্বালা জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাইরে খাঁ-খাঁ-করা রৌদ্রের অজস্র সাদা হাসিটে তখনো গলিত-ধাতু-ধারার মতো ক'রেই ঝ'রে পড়্‌ছিল। মনে হ'ল—যেন সেই উমেশের বিশ্রী বীভৎস হাসিটাই গোটা সহরের বুকের ওপর আজকের রৌদ্রের ভেতর দিয়ে জ্বল্‌ছে!

কি দুঃখ এই হতভাগিনী নারীর! যাকে দীর্ঘ দশ

বৎসর স্বামী ত্যাগ করেছে,আর আজ যাকে বুকের দুলালী মেয়েও ত্যাগ ক'রে গেল, তার বুকের ভেতর যে আগুন ঝর্‌ছে তার জ্বালা তো অম্‌নিই কম ছিল না! হঠাৎ যদি আবার সেই হারিয়ে-যাওয়া স্বামী ফিরেই এলো, তবে এই সাম্প্রদায়িকতার ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত বন্য পশুটাকে এমন ক'রে উদ্যত ক'রে না তুলে' কি সে আস্‌তে পার্‌ত না! ইংরেজের আইনের কাছে নালিশ জানানো সেও তো অপমানের আর একটা পিঠ! এই যে মস্‌জিদ-মন্দির নিয়ে গোলমাল বেধেছে, দেশ স্বাধীন হ'লে এর মীমাংসা কি এম্‌নি ক'রেই হতো? কে একজন শের উড্‌‌বে কার ভুলে লাঞ্ছিত হ'য়েছিল, তারি জন্যে অত বড় জালিয়ানওয়ালাবাগটা ঘটিয়ে ইংরেজ সেই অপমানের কি চরম প্রতিশোধটাই না নিয়েছে—তার কথা তো এখনও আমরা ভুলিনি। কিন্তু আজ যে শত শত নরনারী গুণ্ডাদের ছোরার ঘায়ে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের লুণ্ঠনে সর্ব্বস্ব খোয়াচ্ছে,—ধর্ম্ম, নারীর মান-সম্ভ্রম কিছুই যে আজ আর নিরাপদ নেই, তবুতো এদের বিশ্রামের এতটুকু ব্যাঘাত হচ্ছে না!

এম্‌নি ধরণের পুঞ্জীভূত চিন্তার জাল রচনা কর্‌তে কর্‌তে চলেছি, এরি ভেতর শ্যামবাজারের ডিপোর কাছে ট্রাম যে কখন এসে পৌঁছে গেছে কিছু টের পাইনি। কণ্ডাক্টর্ এসে বল্‌তেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌লুম।

হঠাৎ মনে পড়্‌ল বন্ধু-বন্ধুর যাবার বেলায় সেই কথাটা—Beware of Pick-pokets. পকেটে হাত দিয়ে দেখি সাবধান হওয়ার আগেই পকেট হ'তে সাতশো টাকার নোটের তাড়াটা উধাও হ'য়ে কোথায় উড়ে' গেছে—কাটা পকেটটা কেবল হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে Pick poket-এর হাত সাফাইয়ের নীরব অথচ অত্যন্ত মুখর সাক্ষ্যের মতো! কাজটা যে কার বুঝ্‌তে একটুও দেরী হ'ল না। কারণ সারা রাস্তায় ঐ একজন যাত্রী ছাড়া আর একটি লোককেও আমি ট্রামে উঠ্‌তে দেখিনি।

সাম্‌নে পূজোর বাজারে ঐ সাতশো টাকার দাম আমার কাছে সাত হাজারের চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না। মেয়েটা আজ দু'বছর থেকে একখানা বেনারসী শাড়ী চেয়ে রেখেছে, দিতে পারিনি—ভেবেছিলুম এবার দেবো; মণ্টু পণ্টু তাদের মাকে নিয়ে মামার বাড়ী যাবে—মামা বড় লোক, সুতরাং তাদের সেই রকমের পোষাক-পরিচ্ছদগুলো কিনে দিতে হবে; বাজারের বাকি দেনাগুলোও দোকানদারেরা পূজার মরশুমে ফেলে রাখ্‌বে না; বাড়ীর সমস্ত লোককে এখানে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেও এবার বেরিয়ে পড়্‌ব ব'লে মনে করেছিলুম, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে 'আল্‌নাস্‌কারে'র স্বপ্নের মতো সমস্তই ভেঙে গেল।

একটা গভীর ব্যথা এবং তার চাইতেও দুঃসহ লজ্জার বিমূঢ়তা নিয়ে বাড়ীর পথ না ধ'রে ধর্‌লুম শ্যামবাজারে যে নতুন পার্কটা গ'ড়ে উঠেছে সেই পার্কের পথ। তারি একটা গাছের তলায় কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সেছিলুম জানিনে, হঠাৎ জেগে দেখি, দিনের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গিয়ে তার ওপর রাতের আভাস নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। দূরে কাছে গ্যাসের আলো জ্বল্‌ছে, অন্ধকার দানবের আগুন-ভরা জ্বলন্ত চোখের মতো। এই সৌধারণ্যের গুমোটে ভরা কল্‌কাতার সহরটায় স্বাভাবিক আলো যতই অল্প হোক্ না কেন, কিন্তু কৃত্রিম আলো তার ফাঁদ এমন ভাবেই পেতে রেখেছে যে, অন্ধকারে দু'দণ্ড ব'সে কেউ যে আপনাকে জগতের সব সম্পর্ক হ'তে সরিয়ে নিয়ে গোপন ক'রে রাখ্‌বে তারও সুবিধেটুকু নেই।

* * *

রাত তখন আটটা বেজে গেছে।—

ধীরে ধীরে উঠানে এসে দাঁড়াতেই মনোরমা ছুটে এসে বল্‌লে—ফিরে এসেছ তুমি! কি যে ভাবিয়ে তুলেছিলে বাপু! রাত্রি দিন চল্‌ছে ছোরা-ছুরীর কার্‌বার—মানুষকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে যদি একটু নিশ্চিন্ত থাক্‌বার জো থাকে! কিন্তু এত দেরী হ'ল যে তোমার?—টাকা পেয়েছ?

আমি বল্‌লুম—পেয়েছিলুম,কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

—সে কি কথা!—গুণ্ডায় কেড়ে নিলে বুঝি!

—কতকটা সেই রকমই বটে।

এবার আমার দিকে খানিক। এগি[illegible] এসে সে

আমার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে—টাকা নিয়েছে নিক্‌, তোমার ওপর কোনো রকমের অত্যাচার করেনি তো তারা ?

চেয়ে দেখ্‌লুম, চোখের কোলে জল তার ছল্‌ছল্‌ করছে—ভয়ে মুখটা রক্ত হারিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে।

আমি বল্‌লুম—না অত্যাচার করেনি। কিন্তু এবার-কার পূজোয় তোমাদের কাউকে যে কিছু দিতে পারব তা তো মনে হয় না, মণি !

সে বল্‌লে—ছিঃ ছিঃ তারি জন্য তুমি এতটা মন-মরা হ'য়ে রয়েছ ! ভালোয় ভালোয় যে ফিরে এসেছ এই আমার ঢের। ঠাকুরকে এখনই আমি হরিলুট আনিয়ে ভোগ দিচ্ছি !

তার ইচ্ছার কোনোরূপ প্রতিবাদ না ক'রে মেয়ে মিনুকে ডেকে বল্‌লুম—তোমার অক্ষম বাবা এবারেও যে তোমাকে বেনারসী কিনে দিতে পার্‌লে না মা !

সে আমার কোলের কাছটাতে আরো খানিকটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—চাই নে বাবা, আর বচ্ছর তুমি আমাকে যে শাড়ীখানা কিনে দিয়েছিলে সে তো ছেঁড়ে-নি। ওতেই আমি এবছরও চালিয়ে নেবো।

মণ্টু আপনা থেকেই ব'লে উঠ্‌ল—আমার পোষাক-টাও একদম নতুন আছে বাবা, আমিও কিছু চাইনে এবার। কিন্তু পণ্টু ভারি দুষ্টু কি না—সে তার জামাটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে—তাকেই একটা জামা কিনে দিয়ো।

পণ্টুর মুখে একটা চুমো দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে বল্‌লুম—হ্যাঁ বাবা, তুমি নাকি ভয়ানক দুষ্টু !

সে বল্‌লে—না বাবা, আমি দুট্টু না—মণ্টু দুট্টু।

এদের এই স্নেহের প্রলেপে সাতশো টাকার শোক আমার এক নিমিষেই শরতের মেঘের মতো কোনো রেখা না রেখেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু মনের কোণটা জুড়ে' ব'সে রইল, উমেশের স্ত্রীর বেদনা-কাতর মুখের একটা কাল্পনিক ছবি। গল্পটা হয়তো মানুষটার মতোই আগাগোড়াই মিথ্যা। কিন্তু তবু তার মোহ আমাকে এমনি ভাবেই জড়িয়ে ধ'রে আছে যে, তার জের কাটিয়ে ওঠ্‌বার মতো জোর আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে।

বিদুষী বালিকা

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ বেলা দশ ঘটিকার সময় সন্তরণে অনভ্যস্তা বাসন্তী দেবী তাঁহাদের বাড়ীর পশ্চাতের পুকুরে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর দুই মাস।

বাসন্তী দেবী সরস্বতী শ্রীহট্ট—কচুয়াদি নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। শাস্ত্রী-মহাশয় কাশীধামে ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ। বাসন্তী চতুর্থ বর্ষে উপনীত হইলে, শাস্ত্রী-মহাশয় তখন হইতেই তাহাকে মুখে মুখে ভাল ও সহজ নানা শ্লোক এবং স্তোত্রাদি শিখাইতে থাকেন। বাসন্তী তাঁর প্রখরা মেধাগুণে সেই শৈশব হইতেই কোন শ্লোক একবার বা দুইবার শ্রবণ মাত্রেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন এবং একবার মুখস্থ হইলে আর কখনও ভুলিতেন না। বাসন্তী আট বৎসর বয়সের মধ্যেই ব্যাকরণ অমরকোষ, মুক্তাবলী, ভাষা-পরিচ্ছেদ, পাতঞ্জল দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুপম পারদর্শিতা দেখাইয়া কাশীর পণ্ডিত-মণ্ডলী হইতে 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন। নয় বৎসরের মধ্যে বাসন্তী দেবী বাংলা ভাষার বহু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, ভাষা-শিক্ষার উপযোগী ইংরেজী ও হিন্দি পুস্তকাদি পাঠ, সাধারণ ভাবে গণিত ও ইতিহাস চর্চ্চা সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, গীতা, ভাগবৎ হইতে বহু অমূল্য শ্লোক এবং ষটচক্রের সহস্রাধিক শ্লোক এমন ভাবে তাঁহার কণ্ঠায়ত্ত ছিল যে,যখন তখন তৎসমুদায় মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দিতেন। পত্নীর মৃত্যুতে শাস্ত্রী-মহাশয় সম্পূর্ণ ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়েন, কিন্তু বাসন্তী মোটেই কাতর হন নাই, তিনি জগতের নশ্বরতা-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র-বাক্য ও মোহমুদ্গার আবৃত্তি করিয়া এবং উপদেশপূর্ণ বহু উপাখ্যান শুনাইয়া পিতার প্রাণে আনন্দ জাগাইয়া তুলেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বুদ্ধির জোর—

সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী প্রভৃতি জন্তুগণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ধরে, অথচ মানুষ অবলীলাক্রমে এই জন্তুদের লইয়া নানা কাজে খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। হাতীর সাহায্যে আদিম যুগ হইতেই মানুষ নানাবিধ কার্য্য করিতেছে। সার্কাসের খেলাতে সিংহ ব্যাঘ্র না থাকিলে পয়সা উঠে না; অথচ ইহাদের মত হিংস্র জানোয়ার আর নাই। এই জন্তুগুলিকে শিক্ষিত করিয়া মানুষ অনেকটা বিপদের হাত হইতে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাদের দুষ্ট প্রকৃতি মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়া খেলোয়াড়ের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। ইহাদিগকে বশ করিবার কোনো মন্ত্র যদি মানুষের জানা থাকিত তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু সত্যসত্যই পশু বশ করিবার মন্ত্র মানুষ জানে না। নিছক বুদ্ধির জোরে ধাপ্পা দিয়া মানুষ স্বচ্ছন্দে এই হিংস্রতম পশুদের লইয়া কারবার করে। রিভলভার, চাবুক ও পিতলের দণ্ড প্রভৃতি লইয়া খেলোয়াড় সিংহব্যাঘ্রের খাঁচায় ঢোকে বটে, কিন্তু রিভলভারে গুলি থাকে না, ফাঁকা আওয়াজ মাত্র করা হয়; চাবুক সিংহের নাকের ডগার কাছ পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে স্পর্শ করে না; পিত্তলদণ্ড কেবলমাত্র সিংহ-ব্যাঘ্রের চোখের সামনে ঘুরিতে থাকে। রিভলভারে যদি টোটা ভরা থাকিত কিম্বা চাবুক ও দণ্ড যদি

ধাপ্পায় পশুবশ

উপরে—তাম্রের উপর মিনা (জার্মান) : নীচে—বিদেশী মিনকারী দ্রব্য (স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর)
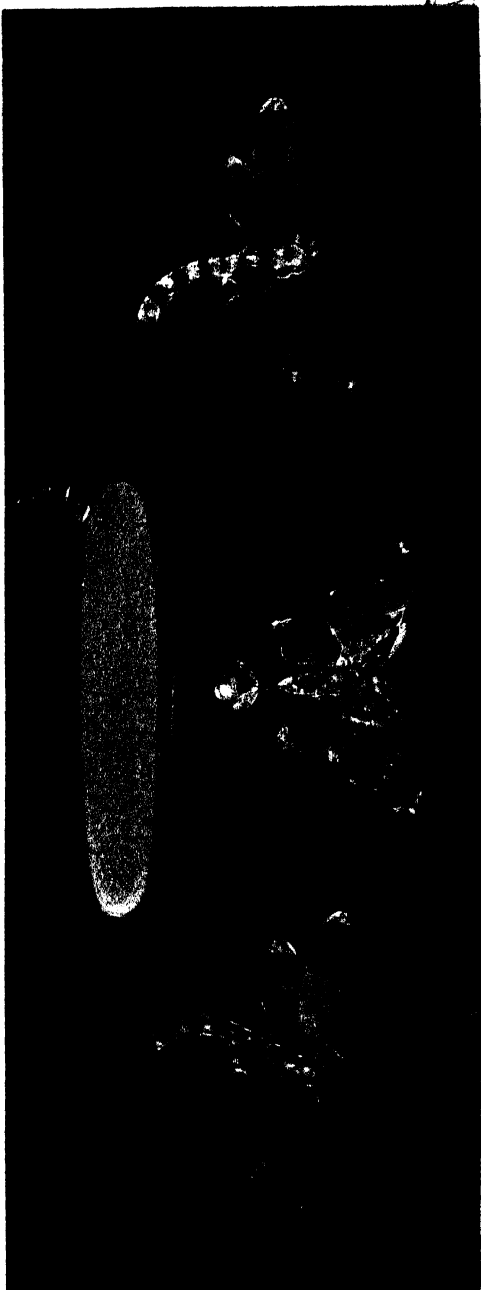
সিংহ-ব্যাঘ্রের গাত্র স্পর্শ করিত তাহা হইলে খেলোয়াড়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অনেক ক্ষেত্রে সামান্য অনবধানতাবশতঃ চাবুক গায়ে ঠেকাইয়া খেলোয়াড় মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। খেলা দেখাইবার জন্য যতক্ষণ খেলোয়াড়কে খাঁচার মধ্যে থাকিতে হয় ততক্ষণ নানা কৌশলে এই ভয়ঙ্কর জীবদের ভুলাইয়া ও ভয়ে রাখিতে হয়, কারণ এক মুহূর্ত্ত ভাবিবার অবসর পাইলে ভীষণ গর্জ্জনে ইহারা খেলোয়াড়কে আক্রমণ করে। এই ছবিটিতে মানুষের ধাপ্পার দৌড় দেখান হইয়াছে। সিংহ-মহিষী খেলোয়াড়কে দাঁত দেখাইতেছেন—ও সিংহরাজ গম্ভীরভাবে চাহিয়া আছেন। নীচে একটি সার্কাসের খেলার ছবি দেখানো হইয়াছে, খেলোয়াড় কেবলমাত্র চাবুকের সাহায্যে এক ভয়ঙ্কর সিংহকে লইয়া খেলিতেছেন।

—

উভচর মোটর-গাড়ী—

সাধারণ হাল্কা মোটর-গাড়ীতে জল ঢুকিবার ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়াও চাকার দিকে ভাঁজ করা যায় এমন দাঁড় লাগাইয়া জলেও স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। ছবিতে তাহার প্রমাণ দেখুন। ভাঁজ করা দাঁড়ের দ্বারা স্থলেও

উভচর মোটর-গাড়ী

কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। যখন ভাঁজ করিয়া রাখা হয় তখনো তাহার খানিকটা বাহিরে থাকে ও বাতাস কাটিয়া গাড়ীর গতি বৃদ্ধি করে। গাড়ীর নীচে একটি হাল সংযোগ করিয়া লইতে হয়। মোটরের চালকের হাতের চাকার সাহায্যে সেটিকে ঘোরানফেরান যায়।

—

হ্যাট-ঘড়ি—

হাত-ঘড়ি, জেব ঘড়ি প্রভৃতি অনেক রকম ঘড়ি আমরা দেখিয়াছি। হাতে বা পকেটে ঘড়ি থাকিলে 'কটা বেজেছে, মশায়' শুনিতে শুনিতে

হ্যাট-ঘড়ি

অস্থির হইতে হয়। এই বিপদ্ হইতে বাঁচিবার জন্য লণ্ডনের এক বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক হ্যাটের মাথায় একটি ঘড়ি লাগাইয়া লইয়াছেন। ইহা দ্বারা নিজের সুবিধা ত হয়ই পরেও সহজেই সময় দেখিতে পারে।

—

কাগজের চোখ—

শুদ্ধ মাত্র চোখের ভোল বদ্লাইয়া মানুষের নিজের চেহারা সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া দিতে পারে। কাগজের চোখ তৈয়ারী করিয়া অনেকে আজকাল মুখোসের কারবার নষ্ট করিয়াছেন। চোখে মাত্র কাগজের চোখ
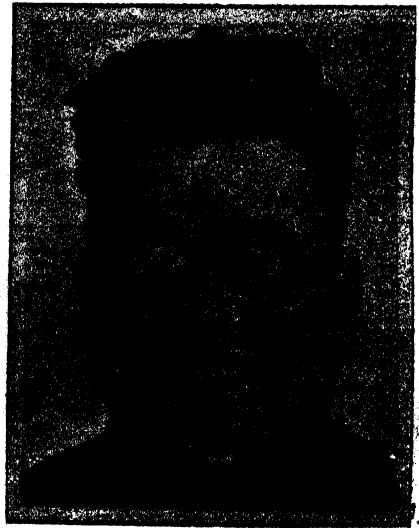
কাগজের চোখ

লাগাইয়া লইলে মুখোসের চাইতে কম কাজ হয় না। ছবিতে কাগজের চোক-ওয়ালা একটি ভদ্রলোককে দেখান হইয়াছে। এই দুটি চোখের জন্যই ইঁহাকে আর চেনা যায় না।

—

জল-বন্দুক—

জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলিয়া সেখানকার অধিকাংশ বড় বড় বাড়ী কাঠের তৈয়ারী; সেইজন্য আগুন লাগেও বেশী। আমরা প্রায়ই জাপানের অগ্নিকাণ্ডের বিষয় কাগজে পড়িয়া থাকি। জাপানের শিক্ষিত অগ্নি-নির্ব্বাপক দল জাপানকে ধ্বংসের হাত হইতে অনেকখানি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের মত কার্য্যক্ষম অগ্নিনির্ব্বাপক দল পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য ইঁহারা নানা

জল-বন্দুক

ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া থাকেন। জল-বন্দুক ইঁহাদেরই একটি চমৎকার আবিষ্কার। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে স্বচ্ছন্দে এই বন্দুক লইয়া যাওয়া যায় ও জলের পাইপের সহিত যোগ করিয়া দিয়া কল ঘুরাইয়া দিলেই প্রবল বেগে বন্দুকের নল দিয়া জলধারা নির্গত হইতে থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব সাংঘাতিক স্থানেও ইঁহারা কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

—

অদ্ভুত সাইকেল—

বার্লিনের পথে সম্প্রতি কয়েক প্রকারের অদ্ভুত সাইকেল দেখা যাইতেছে। এখানে দুইটির ছবি দেওয়া হইল। প্রথম খানিকে নৌকা-সাইকেল নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সাইকেল চড়া হয়, আবার নৌকায় দাঁড় টানার খেয়ালও তৃপ্ত হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'রুডোমোবিল'। সামনে চওড়া চওড়া দুটি পাদানিতে পা দিয়া দুই চাকার উপরে বসান ও শিকলের সহিত সংশ্লিষ্ট হাতল বা দাঁড় দুইটি বরাবর টানিতে হয়—তাহাতেই গাড়ী চলে। সাধারণ সাইকেলেরমত এই সাইকেলের চাকা দুইটি কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট নয়—অনেকখানি দূরে দূরে অবস্থিত। নৌকার চাইতে ইহার সুবিধা এই যে, নৌকায় ব্যালান্স রাখিতে হয় না—ব্যালান্স রাখিয়া দাঁড় টানার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুক আছে।
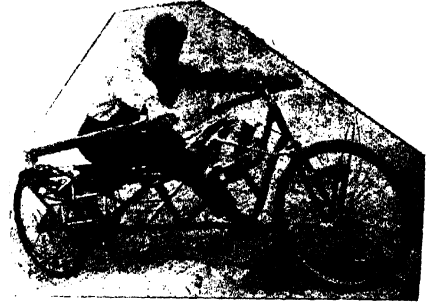
নৌকা-সাইকেল

এক-চাকা সাইকেল

দ্বিতীয়টি একটি এক-চাকার সাইকেল। যাহাদের ব্যালান্স-জ্ঞান খুব বেশী তাহারাই এই গাড়ী চড়িতে পারে। ইহা সাধারণ সাইকেলের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়িয়া থাকে। সাধারণ সাইকেলওয়ালা যে ভীড়ের মধ্যে যাইতে পারে না এই সাইকেলের সাহায্যে সেই ভীড়ের মধ্যে সহজে যাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে এই হাল্কা গাড়ীখানি কাঁধে তুলিয়া ভিড় কাটাইয়া যাওয়া যায়।

—

স্থূল দেহে লঘু মন—

দেহ স্থূল হইলেই যে মানুষের মনের লঘুতা থাকিবে না এমন কোনো কথা নাই। এই মহিলা তিনটির স্থূল দেহও যে ইহাদিগকে দমাইতে

স্থূল দেহে লঘু মন

পারে নাই ইহা দেখাইবার জন্য ইঁহারা শিকাগোর পথে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন।

প্রকৃতির খেয়াল—

লক্ষ্ণৌ বাদশাবাগের মেষ্টন হোষ্টেল হইতে শ্রীযুক্ত ভগবন্ত সহায় মথুর প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের নিদর্শন একটি ছাগ-শাবকের ফোটো

প্রকৃতির খেয়াল

পাঠাইয়াছেন। আমরা সেটিকে এখানে প্রকাশ করিলাম। লক্ষ্ণৌএর সিভিল্ ভেটারনারী ডিপার্টমেণ্টের রিসার্চ্চ ষ্টেশনে এই ছাগশিশুটি আনীত হইয়াছিল। ইহার মুখ মানুষের মত, ল্যাজ ভালুকের মত ও কান দুটি ছাগলের মত, বুক হাত ও পা মানুষের মত, কিন্তু পায়ে খুর আছে। ইহার গায়ের চামড়া লাল ছিল ও মাথার উপর ছাড়া কোথায়ও লোম ছিল না।

সন্তরণপটু মহিলা—

সম্প্রতি দুইজন মহিলা সাঁতার দিয়া ইংলিশচ্যানেল্ পার হইয়াছেন। ইঁহাদের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহার ছবি দেওয়া হইল ইনি এই দুই মহিলার একজন। সাঁতার দিবার পরে ডাঙ্গায় উঠা মাত্র ইঁহার ছবি তোলা হইয়াছে। ইনি আমেরিকাবাসী। নাম মিসেস্ সি, কার্‌সন্। ইংলিশচ্যানেল্ পার হইতে ইঁহার ১৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

মিসেস্ সি, কার্‌সন্

মিস্ বেল হোয়াইট্:—

মিস্ বেল্ হোয়াইট জলমজ্জন (diving) বিষয়ে সর্বাপেক্ষা

মিস্ বেল্ হোয়াইট্

শ্রেষ্ঠ। জলের খেলায় ইনি অমানুষিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ছবিতে তাঁহার এক অদ্ভুত খেলা দেখান হইয়াছে। স্যাডোলা পাহাড়ের উপর হইতে তিনি জলে ঝাঁপ দিতেছেন। স্যাডোলা পাহাড় জল হইতে ৩৪ হাত উঁচু।

অতিকায় মাছ—

রোহিত মৎস্য জাতীয় একটি (কার্প্) মাছ কত বড় হইতে পারে

অতিকায় মাছ

তাহার ছবি দেখুন। কার্প্ এক-প্রকার সামুদ্রিক মাছ। এই মাছটিকে ছিপে ধরা হইয়াছিল।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গুর্জ্জরী—চৌতাল

আদি দেব বিশ্বনাথ ভক্তন কে সদা সাথ
পকড় প্রভু মেরো হাত দাস মৈ তুমারো।
সুর নর মুনি ধরত ধ্যান বেদ বচন করত গান,
তুঁহি সব গুণনিধান জগ-সর্জন * হারো।
পাপ-হরণ তেরো নাম সুখ স্বরূপ পরমধাম,
অচরজ সব তেরে কাম দয়াকর নিহারো।
সকল জগতকে অধার নিগুর্ণ নিত নিরাকার,
ব্রহ্মানন্দ গুন পুকার ভবসাগর তারো॥

ব্রহ্মানন্দ।

অস্থায়ী

০ ২ ০ ৩ ৪
মজ্ঞা -। । জ্ঞা পা । মদা দা । মজ্ঞা -। । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ।
আ ০ দি দে ০ ০ ব বি ০ শ্ব না ০ থ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সন্‌া সা । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা মা । ঋা সা । -। ন্‌দা । -। প্‌া ।
ভ ০ ০ ক্ত ন ০ কে স দা ০ সা ০ থ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সন্‌া সা । মা মা । পা -। । দা -। । দা প্‌দা । প্‌দা পা ।
প ০ ক ড় প্র ভু ০ মে ০ রো হা ০ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা পা । পা প্‌দা । দা পা । মা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ॥
দা ০ । স মৈ ০ তু মা ০ ০ রো ০ ০

অন্তরা

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
পা মা । প্‌দা দা । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা র্সর্না । র্সা র্সা । র্সনা র্সা ।
সু র ন র মু নি ধ র ত ধ্যা০ ০ ন বে০ ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা । র্সা র্সর্না । র্সা র্সা । দা পা । মা জ্ঞা । মা পা ।
দ ব চ ন ক র০ ত গা ০ ন তুঁ হি ০ স

* জগ-সর্জ্জন—জগৎ-সৃজন।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
-া পা । দা দা । দা ণদা । দা পা । মা পা । পা মা । দা দা । মজ্ঞা া ।
০ ব গু ণ নি ধা০ ০ ন জ গ স ০ র্জ ন হা০ ০

৩ ৪
জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ॥
০ রো ০ ০

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
সা দা । দা দা । দা দা । র্ণদা দা । দা পমা । পা পা । মা পা ।
পা ০ প হ র ণ তে ০ রো না০ ০ ম সু খ

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
পা মা । দা দা । মজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা । ঋা সা । ণ্দা ণ্দা ।
স্ব রূ ০ প প র ম ধা ০ ম অ চ র জ

২ ০ ৩ ৪ ১ ০ ২
সা সা । সা মা । মা পমা । পা পা । মা পা । -া মা । দা দা ।
স ব তে ০ রে কা০ ০ ম দ য়া ০ ক ০ র

০ ৩ ৪
মা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ॥
নি হা ০ রো ০ ০

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
পা পা । মা ন্দা । দা দা । র্সা -া । র্সা র্সনা । র্সা র্সা । র্সনা সা ।
স ক ল জ গ ত কে ০ অ ধা০ ০ র নি০ ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা । র্সা র্সনা । র্সা ণদা । দা পা । মা জ্ঞা । মা পা ।
গু র্ ণ নি ত নি রা০ ০ কা ০ র ব্র ০ হ্মা ন

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
-া পা । দা দা । দা ণদা । দা পা । মা পা । পমা পা । দা দা ।
০ ন্দ গু ন পু কা ০ র ভ ব সা০ ০ গ র

০ ৩ ৪
মজ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা ॥
তা ০ ০ রো ০ ০

ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথ—

ইউরোপে কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইতালী হইতে কবিবর জার্ম্মানীতে পদার্পণ করিয়াছেন এবং সেখানে তিনি রাজোচিত বিপুল সম্বর্দ্ধনায় অভ্যর্থিত হইয়াছেন। জার্ম্মান্ গণতন্ত্রের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট্ সেনাপতি হিণ্ডেনবর্গ রবীন্দ্রনাথকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণকে রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত বিশ্বভারতীর কার্য্যের সহায়তায় প্রেরণ করা হইবে এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদিগের জন্যও জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রতিনিধি-দল—

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রতিনিধি-দল ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের অবস্থা দেখিতে ও ভারতবাসীর মনোভাব বুঝিতেই আসিয়াছেন। ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার রেলের প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রায় বসিতে পারে না—কিন্তু এখানে প্রতিনিধি-দল ভারতীয়দের পয়সায় স্পেশাল ট্রেনে চড়িয়া নানা প্রদেশ ঘুরিতেছেন। তাঁহাদের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা ভ্রমণ শেষ হইয়াছে।

—

বাংলা

বাংলায় রাখীবন্ধন ব্রত—

বাংলার কতিপয় হিন্দু-মুসলমান নেতা স্থির করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপন এবং জাতীয় ভাবের উদ্বোধনের জন্য স্বদেশীযুগের "রাখী-বন্ধন' ব্রতের পুনরানুষ্ঠান করিতে হইবে।

লর্ড কার্জ্জন্ যখন বঙ্গভঙ্গ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদিগকে পৃথক্ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, সেই সময় এই উৎসবের সূত্রপাত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভঙ্গের অপমানের আঘাতে নব-জাগ্রত জাতীয় মর্য্যাদাবোধকে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজপুতনার গৌরবময় ইতিহাস হইতে "রাখীবন্ধনকে" উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে তাহা উপস্থিত করেন। বাংলার জাতীয়তার ইতিহাসে ৩০ আশ্বিনের রাখীবন্ধন ও অরন্ধন অমর হইয়া রহিয়াছে—কারণ সেই সময় বাঙ্গালী যে-একতার পরিচয় দেয় তাহার ফলে সরকার বঙ্গ-বিচ্ছেদের আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

বাংলার নেতাগণ মনে করেন, দেশের এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় আবার ঠিক সেইরূপ একটা আন্দোলনের আবশ্যক; কেননা একতা ও মিলন ছাড়া আমাদের কোনই আশা নাই। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উঠিয়াছে যে, পুনরায় রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হউক। বলা বাহুল্য, এককার্য্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশের ভিন্ন ভিন্ন দলের যোগদান একান্ত আবশ্যক।

আমরা আশা করি, স্বদেশীযুগের"রাখীবন্ধন" বাঙ্গালীর সকল ভাইএর মিলন যেমন করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল—এবারেও তাহাই হইবে।

কলিকাতায় খাদি প্রদর্শনী—

গত মাসে কলিকাতার মির্জ্জাপুর পার্কে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি খাদি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ও বাংলার অন্য অনেক জেলা হইতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আনা হইয়াছে।

বংলায় খাদির কাজ যে কতটা অগ্রসর হইয়াছে এবারকার প্রদর্শনীর দিকে নজর দিলে তাহা বুঝিতে একটুও দেরী হয় না। গত বৎসর শুধু দেখাইবার জন্যই দু' একখানা ভাল খদ্দর-সাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, এবার বিক্রয়ের জন্য অনেক সুন্দর সাড়ী মজুত। প্রদর্শনীতে বুটিদার-জামদানী শাড়ীর অভাব নাই, মিলিফের শাড়ী উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গা শাড়ী প্রভৃতিকেও পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। চমৎকার চমৎকার রঙিন থান জামার ছিট, পাড়ওয়ালা রঙিন শালে খাদির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। বাংলা এক বৎসরে খাদির কাজে যেরূপ অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা যে আশার কথা, আনন্দের কথা, গৌরবের কথা, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—

আমরা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ১৩৩২ সালের বিবরণী পাইয়াছি। এখানে ভদ্র বংশের অসহায়া হিন্দু কুমারীদিগকেও আশ্রয় ও শিক্ষা দান করা হয়। ইহার সহিত একটি ছাত্রীনিবাস এবং অবৈতনিক বালিকা শিক্ষালয়ও আছে। সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে এবং হিন্দুমহিলা দ্বারা আশ্রমটি পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ৩০ জন এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০ জনের ব্যয় আশ্রমকে চালাইতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১২০। আশ্রমের মাসিক খরচ প্রায় ৩৫০৲, কিন্তু আয় মাত্র অনিশ্চিত চাঁদা। এই বৎসর আশ্রমের দুইজন কুমারী ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন এবং তিনজন বেদান্ত ও সাংখ্য অধ্যয়ন করিতেছেন। গত বৎসর কলিকাতার ২৬ নং রাণী হেমন্ত-কুমারী ষ্ট্রীটে আশ্রমের নিজস্ব ত্রিতল বাটী ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে দ্রব্যাদির মূল্য বাবদ দোকানে প্রায় ৬ হাজার টাকা বাকী রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী দাতারা এই সামান্য ঋণ শোধ করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন।

কলিকাতা অনাথ-আশ্রম—

কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক, ১২।১, [illegible] হইতে লিখিতেছেন:—

দুর্গোৎসব সমাগত; এই আনন্দের দিনে [illegible]

কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের অনাথ বালকবালিকাগুলি আপনাদের স্নেহ-প্রদত্ত নব বস্ত্রাদি লাভ করিয়া যাহাতে তাহারা পিতামাতার অভাব বিস্মৃত হইয়া পূজার আনন্দ অনুভব করিতে পারে, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এক্ষণে কলিকাতা অনাথ-আশ্রমে ৬২টি বালক ও ৩৫টি বালিকা বাস করিতেছে। নিম্নে তাহাদের বয়সের উপযোগী বস্ত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ধুতি—১০ হাত ৯ খানি, ৯ হাত ৬ খানি, ৮ হাত ১০ খানি, ৭ হাত ১৮ খানি, ৬ হাত ১২ খানি, ৫ হাত ৭ খানি।

শাড়ী—১০ হাত ১৩ খানি, ৯ হাত ৭ খানি, ৮ হাত ১০ খানি, ৭ হাত ২ খানি, ৬ হাত ৩ খানি।

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও গৃহীত হইবে।

ঢাকা অনাথ-আশ্রম—

ঢাকা অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক আবেদন করিতেছেন—

শারদীয় উৎসবের সময় আমাদের মাতৃভূমি বাঙ্গালার বালক-বালিকা ও শিশুদের কত আনন্দ। সকল ঘরে নূতন কাপড় আসিবে। পথের ভিখারীরাও বাদ যায় না। এমন সময় ঢাকা অনাথ-আশ্রমের ১৭ সতের মাসের শিশু হইতে ১৪ বৎসরের ১৫টি বালক ও ১৬টি বালিকার কথা কি আপনারা ভাবিবেন না?

১০ হাত ২ খানি মেয়ের, ৯॥ হাত ৫ খানি মেয়ের, ৯ হাত ৪ খানি মেয়ের, ৯ হাত ২ খানি ছেলের, ৮ হাত ৬ খানি ছেলের, ৭ হাত ৩ খানি ছেলের, ৬ হাত ৩ খানি ছেলের, ৫ হাত ২ খানি মেয়ের, ৫ হাত ১ খানি ছেলের, ইহাদের উপযুক্ত জামা, সেমিজ, বডিস্, ফ্রক, পায়জামা, ইজার প্রভৃতি দরকার।

মেদিনীপুরে বন্যা—

কালিঘাই ও কাঁসাই নদীর প্লাবনে মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। নদীর দুই কূলের বাঁধে ভাঙ্গন ধরিয়া জল খরস্রোতে সন্নিকটস্থ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত। কাঁথি মহকুমার পটাশপুর ও ভগবানপুর থানার সমস্ত অংশ ও এগরা ও কাঁথি থানার অধিকাংশ স্থান, তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম ও ময়না থানা ও ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানা, সদর মহকুমার সবং ও ডেবরা থানা জলমগ্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ ৮।১০ ফুট জল দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় লোকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। গবাদি পশুও খাদ্যাভাবে মারা পড়িতেছে। ঘরবাড়ী-সমূহ পড়িয়া যাওয়ায় গৃহহীন নরনারী বাঁধের উপর উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় লইয়া কোনও প্রকারে বাঁচিয়া আছে। এখনই ইহাদের জন্য সাহায্য প্রেরিত না হইলে অনেকের মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রায় ৬০০ শত বর্গমাইল পরিমিত স্থান জলমগ্ন, পাঁচ লক্ষ লোক প্লাবনের তাড়নায় আর্ত্ত। এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, নরনারীদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্দ্ধমান ও উত্তর বঙ্গ প্লাবনে বাংলার যে-সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, আজ মেদিনীপুরের এ দুর্দ্দিনে তাহা কি পাওয়া যাইবে না? আজ বাংলার ধনী, দরিদ্র, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই সাহায্য প্রয়োজন। চাউল, কাপড় ও অর্থের প্রয়োজন। যাঁহার যাহা সাধ্য তাহাই লইয়া দেশমাতৃকার সেবা করিয়া ধন্য হউন। টাকা-কড়ি ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—প্রেসিডেণ্ট, মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি ৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা; এবং সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ—

এবার জন্মাষ্টমীর কয়েক দিন পূর্ব্বে স্থানীয় পুলিশ বিনা পাশে যে-সকল মিছিল বাহির হইবে তৎসমুদায়ই বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে স্থানীয় হিন্দুরা অন্যান্য বৎসরের মত যাহাতে এবারও জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিতে পারেন, সেজন্য পাশের আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে, জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হইবে। ঐ স্থানে একটি পুরাতন মসজিদ আছে বটে, কিন্তু উহা এখন অব্যবহার্য্য। নূতন মসজিদটিও জেলা বোর্ডের রাস্তা হইতে প্রায় ৬০ হাত দূরে, মিউনিসিপালিটির একটি গলির নিকট অবস্থিত। ঐ-গলিতে কোন মিছিল যাইতে পারে না। এই অবস্থায় এই স্থানে গীতবাদ্য বন্ধ করিতে বলায় সাধারণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া হিন্দুরা কর্ত্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু ইহার ফলে পুলিশ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশের কোন পরিবর্ত্তন করিতে রাজি হন নাই।

৩০শে আগষ্ট তারিখ যখন হিন্দুরা মিছিল লইয়া সহর ভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহারা ঐ নিষিদ্ধ স্থানে আসিলে পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ নিষিদ্ধ স্থানটা বহুসংখ্যক পুলিশ কনেষ্টবল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজেই ঐ স্থানে থাকিয়াই তাহারা সংকীর্ত্তন করিতে থাকে। ইহার কিছুক্ষণ পরে মুসলমানরা নাকি মিছিলের উপর ঢিল ছুঁড়ে, মিছিলকারীরাও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে। পরে পাশের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে পুলিশ সংকীর্ত্তন-দলকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় ২০০ শত যুবক ও বালক ধৃত হইবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া গেলেও পুলিশ কেবল ১০০ শত জনের নাম লিখিয়া লয় এবং তাঁহাদিগকে ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। ইহার পর প্রতিদিনই হিন্দুরা মিছিল বাহির করিতেছে ও দলে দলে গ্রেপ্তার হইবে।

বিধবা-বিবাহ—

টাঙ্গাইল হিন্দুসভার প্রচেষ্টায় গত ৩০শে শ্রাবণে টাঙ্গাইলের স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস দেব-বর্ম্মা মহাশয় চেচুয়াজানী নিবাসী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাল-বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যাটির স্বামী গত মাঘ মাসে বিবাহের ষষ্ঠ দিনে জ্বর ও নিমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৬ দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাংলার নারী-নির্য্যাতন—

বাংলার নারী-নির্য্যাতন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমস্ত জেলা হইতেই নারী-হরণ ও নারীর উপর অত্যাচারের সংবাদ পড়িতেছি। সহযোগী সঞ্জীবনী বাংলায় নারী-নির্য্যাতন নিবারণ-কল্পে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সঞ্জীবনী হইতে নারী-নির্য্যাতনের একটি ভীষণ সংবাদ তুলিয়া দিলাম।

"মারহাট্টা দস্যুরা যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া আসিয়া সমগ্র বঙ্গে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তখন বাংলার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাহা-দিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই দস্যুদের উৎপীড়নে সোনার বাংলার শ্যামল পল্লী-শোভা বিনষ্ট হইয়াছিল,—গৃহস্থগণ আতঙ্কে দিবারাত্রি যাপন করিত;—শস্যক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এখনও 'বর্গী এল দেশে' এই প্রবাদ-বাক্যের মধ্য দিয়া সেই ভীষণ স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

আজ আমরা জিজ্ঞাসা করি সেই অশান্তির দিন কি অতীত হইয়াছে? আবার কি বাংলায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে? গৃহস্থেরা কি নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যাদি লইয়া বাস করিতেছে? এই

প্রশ্নের উত্তর বিদ্যালয়ের পাঠ্য ভারতের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তাহাতে বলা হয়, ভারতে অশান্তি আর নাই; রোহিলা, পিণ্ডারী ও ঠগী প্রভৃতি দস্যুর দল দমিত হইয়াছে; ভারতে এখন সুশাসন, ন্যায়ের রাজত্ব।

কিন্তু হে বাংলার যুবকগণ, তোমরা আজ এই প্রশ্নের আর-এক উত্তর শোন। যশোহর জেলার গুড়খাড়া গ্রাম নিবাসী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কমলা দেবী সেই উত্তর প্রদান করিতেছে। আমরা জানি না, বালিকা কোথায় আছে; কোন্ পাপিষ্ঠের পাশবক্ষুধার অনলকুণ্ডে কমলা তাহার কিশোর বয়সের কোমল দেহ ক্ষণে ক্ষণে আহুতি প্রদান করিতেছে,—কোন্ নিষ্ঠুর ব্যাধের অচ্ছেদ্য জালে আবদ্ধ হইয়া সে বন্য কুরঙ্গিণীর মত কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু তোমরা যদি নিদ্রিত না হও, যদি তোমরা নিরর্থক কর্ম্ম কোলাহলে বধির না হইয়া থাক, তবে সেই ক্ষীণ-স্বর শুনিতে পাইবে।

কমলা তোমাদের রাজাকে ও সমাজকে শত ধিকার দিয়া কি বলিতেছে, তাহা একবার কান পাতিয়া শোন। কোথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা?—মায়ের বক্ষে আঘাত করিয়া পিতার বাহু-বেষ্টন ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা কন্যাকে কাড়িয়া লয়,—স্বামীর আশ্রয় হইতে পত্নীকে লইয়া যায়, আত্মীয় স্বজনের সতর্ক দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কুলবধূকে অপহরণ করে। এইসকল দস্যুদের সন্ধান কেহ দিতে পরে না;—ধরা পড়িলেও তাহারা কৌশলে অব্যাহতি পায়।

কমলা দেবী ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বিধবা। বৃদ্ধ পিতা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাল-বিধবা কন্যা কমলাকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য গৃহের বাহির হয়। তদবধি প্রায় তিন মাস কাল তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। নড়াইল নারী-রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করাতে পুলিশের লোকেরা অনুসন্ধান করিতে থাকে। সম্প্রতি আসামী গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আছে।

কিন্তু কমলার উদ্ধার এখনও হইল না। বাংলার যুবকদিগকে আমরা অহ্বান করিতেছি; তোমরা না সভ্যতার আলোক পাইয়াছ বলিয়া গর্ব্ব কর?—তোমরা না এই নবযুগে জাগ্রত হইয়াছ বলিয়া ঘোষণা কর? তোমরা না বীরের বংশধর বলিয়া আস্ফালন কর? তবে এস, কমলাকে উদ্ধার করিবার জন্য দলে দলে বাহির হও। বন্যার জলপ্লাবনে ভাসমান নরনারীকে বুকে লইবার জন্য তোমরা অগ্রসর হইয়াছ;—দুর্ভিক্ষের করাল-কবলে নিপতিত জনগণের মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে তোমরা ছুটিয়া গিয়াছ;—মহামারীর আক্রমণ হইতে পল্লীবাসীদিগকে বাঁচাইবার জন্য তোমরা নিজের প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের এমন প্রাণ, এমন শক্তি, এমন উৎসাহ থাকিতে কি কমলা ঐ কামান্ধ-পশুদের কবলে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিবে?

কমলার আর কে আছে? তাহার বৃদ্ধ পিতার কোন সংবাদ নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তির গৃহের সন্নিকটে এক গলিত শবদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কমলার পিতার বলিয়া কেহ কেহ মনে করে। কমলার মাতা শঙ্করী দেবী একাকিনী। সে হতভাগিনী স্বামী ও কন্যার শোকে জীবন্মৃত প্রায় হইয়াছে। সমাজ কমলাকে বৈধব্যের কঠোর শাসনে রাখিয়াছে,—কিন্তু তাহাকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

বাংলার যুবকগণ, তোমারা শক্তিমান। আর্ত্তের রক্ষায়, বিপন্নের উদ্ধারে তোমাদের সকল বাহু প্রসারিত কর। সমাজের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তোমাদিগকেই করিতে হইবে। যদি কমলা এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

চট্টগ্রামে অপহৃত হতভাগিনী যশোদার আজও উদ্ধার হয় নাই।

আশার কথা, বাঙ্গালী মহিলাগণও এই অত্যাচার নিবারণ-কল্পে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। পাটনার বাঙালী মহিলা সমিতির এক অধিবেশনে নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যাবলীর অনুমোদন-সূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

হিন্দু-মিশনের কার্য্যাধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দ ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন:—হিন্দু যদি জননী, ভগিনী, কন্যার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে তবে তাহাকে সংগঠিত হইতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। হিন্দুমিশন এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত যে-সকল নারী-নির্য্যাতন ঘটিয়াছে তাহার একটা মোটামুটি সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য মিশনের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন। দেশবাসিগণ তাহাদিগকে নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইয়া এবিষয়ে সহায়তা করুন।

কলিকাতায় হিন্দু অবলা আশ্রমের সম্পাদক আবেদন করিতেছেন:—

প্রায় প্রতিদিনই আমরা জানিতে পাই যে, বহু হিন্দু বালিকাকে চুরি করিয়া বা ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতকারীরা মুসলমান গুণ্ডা। আমরা সকলেই জানি যে, ঐসকল হতভাগ্য রমণীর শেষ জীবনে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়।

অনেকেই জানেন যে, হিন্দু অবলা আশ্রমে, বিপথে চালিত রমণী ও নিরাশ্রয়া বিধবাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমাদের আশ্রমে দুঃস্থ হিন্দু রমণীদের আশ্রয় দিবার জন্য সর্ব্বদা মুক্তদ্বার আছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, এজন্য মাসে মাসে আমাদের প্রচুর টাকা খরচ করিতে হয়—আমাদের মাসিক ব্যয় প্রায় ১০০০ টাকা। বর্ত্তমানে বহু হিন্দু রমণী ও বালিকা আশ্রমে আছেন—একজন প্রবীণা হিন্দু মহিলা তত্ত্বাবধায়কের অধীনে তাঁহারা থাকেন। আমরা তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। তাঁহাদের উন্নতি সাধনের জন্য আমরা উদ্গ্রীব।

আমরা এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, নিরাশ্রয়া বিধবা বা বালিকা মাত্রেই আমাদের আশ্রমে স্থান পাইতে পারে।

হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ—

গত মাসে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিরাট শুদ্ধিযজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ এই যজ্ঞের উদ্যোক্তা। এই যজ্ঞ দ্বারা ফরিদপুর গোপালগঞ্জের—একটি নমঃশূদ্র পরিবার এবং আসামের একটি খাসিয়া স্ত্রীলোককে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

খাসিয়া রমণীটির হিন্দুনাম বেদানা দেবী রাখা হইয়াছে। তাহার একটি শিশু পুত্র আছে। সে বিধবা; সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। হিন্দু মিশনের পক্ষ হইতে তাহার উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ—

সাঁওতাল-গুরু সন্ন্যাসীবাবা নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী সাঁওতালদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে যে-অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি তাহার এক বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, রোমান্-ক্যাথলিক মিশনারীদের বড় আড্ডা নবাবগঞ্জ থানার বালজুরী, লেতনীম, খাকড়াবা প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৩৫০ জন খৃষ্টান সাঁওতাল হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়াছে। গত ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি [illegible] ষ্টেশনে গমন করেন। এই স্থানে সাঁওতাল শিষ্যগণ সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে এবং শোভাযাত্রা করিয়া বালজুরী লইয়া যায়। পরদিন শুদ্ধি উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐস্থানে খাকড়াবার সমুদয় খৃষ্টান সাঁওতাল ([illegible] পরিবার), বালজুরীর দুইটি পরিবার এবং [illegible] পরিবার পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে।

ঢাকার হিন্দুদের বিপদ্—

গত জন্মাষ্টমীর সময় পুলিশ প্রহরীর বাবস্থা থাকায় ঢাকার গৌরবময় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইয়াছিল। মিছিলের মুসলমান গাড়ীওয়ালা, বাদ্যকর প্রভৃতি সকলেরই ধর্ম্মঘট করা সত্ত্বেও ঢাকার হিন্দুগণ ছাত্রদের সাহায্যে শোভাযাত্রা বাহির করে। কিন্তু দুইদিন শোভাযাত্রা হইয়া যাইবার পরই হিন্দুজনসাধারণের উপর গুণ্ডার অত্যাচার আরম্ভ হয়।

কয়েকদিন হইল হিন্দুদিগের বাড়ী লুণ্ঠন, হিন্দুছাত্রদের আবাস আক্রমণ, হিন্দু পথিকের উপর ছোরা মারা ইত্যাদি চলিতে থাকে। কয়দিন সহরের লোক ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। ঢাকা পুলিশ এই গোলমালের সময় বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছে বলা যায় না। ঢাকা ও জগন্নাথ হলের ছাত্রদিগকে বিপন্ন হিন্দুদের রক্ষার্থে যাইতে না দেওয়ায় এবং হিন্দু ভদ্রলোকদের বন্দুক কাড়িয়া লওয়ায় হিন্দুরা আরও বেশী বিপন্ন হইয়াছিল।

বিধায়না

(সূত্র)

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

বিধায়নাতেই গবেষণা ক্রিয়ার প্রারম্ভ। বিধিসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটে। সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ বিবিধ বিধির সমাবেশেই উৎপন্ন। উন্মোচনায় হস্তক্ষেপ করিতেও বিধায়নার একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত বিধিতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তন্নিমিত্ত নূতন বিধি সঙ্কলন আবশ্যক। কি বিধায়না কি উন্মোচনা গবেষণা মাত্রেই উদ্ভাবিত তত্ত্বরাজি ক্রমাগত বিধিবদ্ধ হইয়া জ্ঞানের পুষ্টি সাধন করে।

বিধিমাত্রেই এক-একটি বাক্য। বাক্য-ঘটিত যাবতীয় জ্ঞান ব্যাকরণের বিষয়ীভূত। কিন্তু বিধিসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা দর্শনশাস্ত্রে নিহিত। এঅবস্থায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্যাকরণের জ্ঞানে দু'একটা দার্শনিক যুক্তি প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বিধিপ্রণয়নের পূর্ব্বে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। সংজ্ঞাতে বিধির অন্তর্গত পরিভাষা-সমূহের পরিচয় দেওয়া থাকে। পরিভাষা ও নাম একই কথা। নাম দার্শনিক ভাবে মার্জ্জিত হইয়া পরিভাষায় পরিণত হয়। নামের জন্য অনেক সময়ে বিচারে অসুবিধা ঘটে।

(১) অনেক সময়ে একই নাম বিবিধ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। তদবস্থায় প্রযুক্ত নামে ভ্রমক্রমে লক্ষ্য পদার্থ হইতে অন্যতরে উপলব্ধি অসম্ভব নহে। পণ্ডিত-সমাজে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের শব্দার্থ সম্বন্ধে সচরাচরই বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সুতরাং পরিভাষা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে, অন্যত্র তাহা অপর অর্থে প্রয়োগ না হয়।

(২) নাম ব্যঞ্জনা অর্থে প্রযুজ্য হইলে ,লক্ষ্য পদার্থকে ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করিয়া অবধারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যঞ্জনা ও রূঢ় অর্থে শব্দের প্রয়োগ কোন নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নহে। বিশেষতঃ অনেক সময়ে ব্যঞ্জনার্থেও প্রয়োগের ব্যতিক্রম ঘটে। তন্নিমিত্ত ব্যঞ্জনা অর্থের সঙ্গে পরিভাষার কোন সংশ্রব রাখা সঙ্গত নহে।

"যে সামতলিক ক্ষেত্র তিন সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাকে ত্রিভুজ বলে।"

এখানে সংজ্ঞাটি ব্যঞ্জনা অর্থ প্রকাশ করিলেও জ্যামিতিক প্রমাণে তাহার দিকে আদবেই লক্ষ্য করা হয় না। ত্রিভুজত্ব সংজ্ঞার উপরেই নির্ভর করে। পুনরায় ব্যঞ্জনা অনুযায়ী ক্ষেত্রটি সামতলিক হওয়ার কোন আবশ্যক নাই। অথচ সংজ্ঞানুযায়ী সামতলিক না হইলে ত্রিভুজ হইতে পারে না।

শব্দ চিরকাল কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। প্রয়োগে সর্ব্বদাই আবশ্যকানুযায়ী অর্থের প্রসার ও সঙ্কোচ সাধিত হয়। সুতরাং তদ্রূপ কোন শব্দ পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইলে, যে যে বিধিতে সেই পরিভাষা আছে, তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না। অতএব যে-কোন পরিভাষাকে পরিচয় দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন। এ নিমিত্তই সংজ্ঞাকরণ হইয়া থাকে। মানবের পক্ষে শব্দের ব্যবহৃত অর্থ পরিবর্ত্তনের এতই আবশ্যক যে, অনেক সময় পরিভাষার সংজ্ঞায় পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। জ্ঞানের প্রসারই ইহার কারণ।

প্রাচীন পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ জড়ের অবিভাজ্য অংশকে atom নামে অভিহিত করিতেন। ডেল্টন্ এই অবিভাজ্য atomএর কয়েকটি ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু অধুনা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উক্ত

ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পদার্থ অবিভাজ্য নহে। তথাপি তাহাকে এখনও atom বলা হয়। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতগণের atom ও বর্ত্তমান atom সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। সময়ানুযায়ী এই প্রকারেই নামের পরিবর্ত্তন ঘটে।

প্রাচীন সংজ্ঞানুযায়ী পরমাণু ও atom একার্থবোধক ছিল। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষায় atomএর পরিবর্ত্তে পরমাণু ব্যবহৃত হইত। atom এর সঙ্গে পরমাণুর অর্থও পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। এ অবস্থায় পরমাণু শব্দের মহর্ষি কণাদের অর্থ বজায় রাখার নিমিত্ত আমরা atomকে বাঙ্গলা করিয়া আস্তিম নামে স্বতন্ত্র পরিভাষা প্রদান করিলাম। এইরূপ কারণে moleculeকে অণু না বলিয়া মূলকণা বলা হইয়াছে।

বহু সময়ে পরিভাষার অর্থে এরূপ পরিবর্ত্তন উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যথা :—

"একটি সংখ্যাকে কোন নির্দ্দিষ্ট বার লিখিয়া যোগ করার নাম গুণন।"

বার খণ্ড হইতে পারে না। সুতরাং সংজ্ঞানুযায়ী ভগ্নাংশের গুণন অসম্ভব।

অনেক শব্দ পরিভাষার মত প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা দেওয়া হয় না।

"সমান" এই জাতীয় শব্দ। "সমান" শব্দের সংজ্ঞা প্রদানে অসমর্থতা হেতুই ইউক্লিড স্বতঃসিদ্ধ কয়টি সংস্থাপনে বাধ্য হইয়াছেন।

ইউক্লিডের ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্য ইদানীং স্বতঃসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। সরল রেখার নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদানে অক্ষমতাতেই জ্যামিতিকারগণ ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ আকারে রাখিয়াছেন।

কোন একটি পরিভাষার সংজ্ঞা করণে অপর কয়েকটি পরিভাষার প্রয়োজন। শেষোক্ত পরিভাষা কয়টির সাহায্যেই প্রথমোক্ত পরিভাষার পরিচয় হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞাহীন পরিভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ দ্বারাই উক্ত সংজ্ঞাহীন পরিভাষা পরিচিত হইবে।

এঅবস্থায় সর্ব্বপ্রথম স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ থাকিবে। এই স্বতঃসিদ্ধে যে-কয়টি পরিভাষার উল্লেখ আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ দ্বারা পরিচিত হওয়ায়, সেই কয়টি পরিভাষা দ্বারা অপর কয়টি পরিভাষার সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে। তৎপরে এই উভয় প্রকারে পরিচিত পরিভাষা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক ক্রমে বিবিধ বিধি সঙ্কলিত হইবে।

স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা ও বিধি প্রণয়নে বিশেষ বিচার আবশ্যক। ইহারা প্রত্যেকটিই এক একটি বাক্য। আমরা এই তিন প্রকারের বাক্যকে সাধারণ ভাবে সূত্র নামে অভিহিত করিব।

সম্প্রতি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধের সঙ্কলন হইবে। এই স্বতঃসিদ্ধের সাহায্য লইয়া সূত্রাদির সংজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। তাহা হইলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইবে। এইরূপে আমরা বিধায়নার প্রবন্ধ শেষ করিব।

১ম স্বতঃসিদ্ধস্তবক

(১) পদার্থ ও (২) নাম

(১) নাম মাত্রেই কোন একটি পদার্থকে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করে।

(২) পদার্থ মাত্রেরই একটি নাম আছে।

এই দুইটি স্বতঃসিদ্ধ দ্বারাই পদার্থ ও নামের অর্থ পরিষ্কার হইবে। আমরা প্রথমে সূত্রের পরিভাষা অথবা নাম সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। সূত্র কেন, ভাষা-শিক্ষাতেও নামের সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম পরিচয়। শিশুর মুখ দিয়া সর্ব্বপ্রথম মা, বাবা প্রভৃতি নামই উচ্চারিত হয়। নাম শিখিবার অনেক পরে সে সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিয়া কথা বলিতে পারে। মা ও বাবা বলিতে সন্তান অপরাপর ব্যক্তি হইতে মা ও বাবা বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে পৃথক্ করিয়া লয়। এতদরিক্ত নাম সম্বন্ধে অপর কিছু বলার সাধ্য নাই। সুতরাং পদার্থ ব্যতীত আমরা নামকে বুঝিতে পারি না।

পদার্থও তদ্রূপই। অন্য আলোচনা দূরে থাকুক, নাম ব্যতীত পদার্থকে ধরাই অসম্ভব।

আমরা যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ এইরূপ সূত্রগুচ্ছরূপে প্রণয়ন করিব। যে-কয়টি পরিভাষার পরিচয়ের নিমিত্ত স্বতঃসিদ্ধস্তবক গঠিত হইবে, তাহাতে ততটি স্বতঃসিদ্ধ থাকিবে। ইহাদের মধ্যেই পরিভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইবে। স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা বীজগণিতের (algebra) সমীকরণের (equation) মত। সমীকরণে রাশি (quantity) দ্বিবিধ :—(১) ব্যক্ত (known) ও (২) অব্যক্ত (unknown)। সূত্রের পরিভাষাও দ্বিবিধ; (১) ব্যক্ত ও (২) অব্যক্ত। যে-সমস্ত পরিভাষার সংজ্ঞা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ব্যক্ত। যাহার সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই, তাহা অব্যক্ত। স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত যাবতীয় বিধির পরিভাষাই ব্যক্ত। কারণ তাহাদের সংজ্ঞা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের পরিচয় আমাদের জানা আছে, এরূপ ধরিয়া লই।

সংজ্ঞায় যে-পরিভাষার পরিচয় প্রকাশ করে, তাহা পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল। উক্ত সংজ্ঞার অন্তর্গত অপরাপর যাবতীয় পরিভাষাই ব্যক্ত। এই ব্যক্ত পরিভাষা-সমূহের সাহায্যে উক্ত অব্যক্ত পরিভাষার পরিচয় প্রদান করা হয়। এই পরিচয় একবর্ণ (simple) সমীকরণের মান (root) নির্ণয়ের মত। প্রশ্নের মধ্যে সমীকরণের সমাধানের

(solve) মত পরিশ্রম সংজ্ঞায় প্রয়োজন নাই। সংজ্ঞায় যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অপরাপর পদার্থ হইতে অব্যক্ত পরিভাষা নির্দ্দেশিত পদার্থ পৃথক্ করিলেই উক্ত পরিভাষার পরিচয় সাধিত হইবে। ইহাই সমীকরণের সমাধান রূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে ?

সংজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে ত্রিভুজ কাহাকে বলে, আমরা জানিতাম না। ত্রিভুজের সংজ্ঞানুযায়ী তিন সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত সামতলিক ক্ষেত্রকে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। এই পার্থক্যেই অব্যক্ত ত্রিভুজের সমাধান নিষ্পন্ন হইল।

সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ উভয়েই অব্যক্ত পরিভাষার পরিচয় প্রদান করে। সংজ্ঞায় একটি মাত্র পরিভাষা অব্যক্ত। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধে অব্যক্ত পরিভাষার সংখ্যা একাধিক। সুতরাং স্বতঃসিদ্ধস্তবক অনেক-বর্ণ (simultaneous) সমীকরণের মত। স্বতঃসিদ্ধস্তবকে যে-কয়টি অব্যক্ত পরিভাষা আছে, তাহাদিগকে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ কয়টির সাহায্যেই সমাহিত করিতে হইবে।

প্রথম স্বতঃসিদ্ধস্তবকে পদার্থ ও নাম দুইটি অব্যক্ত পরিভাষা। অনেক-বর্ণ সমীকরণের অব্যক্তরাশি যেরূপ পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে সমাহিত হইতে পারে না, এই পরিভাষা দুইটির মধ্যেও তদ্রূপ কোনটিরই অপরটি ব্যতিরেকে পরিচয় সম্ভবে না।

পদার্থ ও নাম সম্বন্ধে যে-দুইটি সূত্র প্রদত্ত আছে, তাহা দিয়াই অনুধাবন করিতে হইবে যে, পদার্থ ও নাম কাহাকে বলিলে উক্ত সূত্র দুইটির সার্থকতা বজায় থাকে এবং কেবল সূত্র দুইটিই তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

২য় স্বতঃসিদ্ধস্তবক

(১) উদ্দেশ্য, (২) বিধেয়, (৩) বাচ্য, (৪) ঘটনা,
(৫) সম্পর্ক ও (৬) পরিবর্ত্তন।

(১) যে-কোন উদ্দেশ্যের একটি বিধেয় আছে।

(২) উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পর্কান্বিত হইলে একটি ঘটনা উৎপন্ন করে।

(৩) যে-কোন বিধেয় ও উদ্দেশ্যকে যথাক্রমে উদ্দেশ্য ও বিধেয় রূপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে।

(৪) ঐরূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদের সম্পর্কে উৎপন্ন ঘটনাটির বাচ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(৫) যে-কোন উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বিধেয় রূপে ও বাচ্যকে উদ্দেশ্য রূপে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

(৬) বাচ্য উদ্দেশ্য রূপে পরিণত হইলে ঘটনাটি অপর একটি বাচ্যের উৎপত্তি হয়।

স্বতঃসিদ্ধগুলি পরিষ্কার প্রকাশ করিতেছে যে, উদ্দেশ্য বিধেয় ও বাচ্যের পরিবর্ত্তন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-প্রসূত। ইহা বাক্যেই সম্ভবে। অতএব ইহারা বাক্যের অন্তর্ভূক্ত।

স্বতঃসিদ্ধে ঘটনার কোন পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ নাই। বক্তা ইচ্ছানুযায়ী বাক্য পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। কিন্তু ঘটনার পরিবর্ত্তন বক্তার ইচ্ছাধীন নহে।

আমাদের ও ব্যাকরণের বাচ্য একই। বাচ্য ক্রিয়ার আকার, ক্রিয়া মাত্রেরই একটি কর্ত্তা থাকিবে। স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী বাচ্য মাত্রের সঙ্গেই একটি উদ্দেশ্য সংশ্রবান্বিত। ক্রিয়া দ্বিবিধ :—(১) সকর্ম্মক ও (২) অকর্ম্মক। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে। অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। কিন্তু বাচ্যের সঙ্গে বিধেয় থাকিবেই। কর্ম্ম ও আমাদের বিধেয় অনেকটা একরূপ। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মই আমাদের বিধেয়। তবে প্রভেদের মধ্যে, কর্ম্মের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক কিন্তু বিধেয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক।

ভাষা সাধারণ মানব দ্বারা সৃজিত। অতএব ইহা দার্শনিক যুক্তির উপরে নির্ভর করিতে পারে না। ভাষায় প্রত্যেক কথায় দার্শনিক বিতণ্ডা আনিলে তদ্দ্বারাই তাহাতে একটা অসাধারণত্ব উপস্থিত হয়। সেই অসাধারণত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। পরিভাষা ও সংজ্ঞা ইহার উদাহরণস্থল। ব্যাকরণ ভাষার সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যের কোন ব্যাঘাত করে না। ইহা সাধারণের জন্যই তাহাকে মার্জ্জিত করে। সাধারণ জন-সঙ্ঘের ভাবের প্রসারেই ভাষার পরিপুষ্টি।

প্রকৃত পক্ষে দুইটি পদার্থের সম্পর্ক ব্যতীত কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। খাওয়ার নিমিত্ত যেরূপ খাদ্যের আবশ্যক, শুইতে হইলে তদ্রূপ বিছানা কি তদভাবে অন্য কোন স্থানের প্রয়োজন। অতএব খাওয়া ও শোয়া ক্রিয়ায় এরূপ কি পার্থক্য আছে যে, একটিকে সকর্ম্মক ও অপরটিকে অকর্ম্মক বলা যাইতে পারে ? একটিতে কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও অপরটিতে কর্ম্মে সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয় এপর্য্যন্ত। ব্যাকরণে কর্ম্মে সপ্তমী বিভক্তির বিধানও যে নাই এরূপ নহে। ক্রিয়ায় সকর্ম্মত্ব ও অকর্ম্মত্বের কোন মানে নাই। প্রয়োগের পার্থক্য মাত্র। গম্ ধাতু সংস্কৃতে সকর্ম্মক, কিন্তু বাঙ্গলায় অকর্ম্মক। আমাদের দৃষ্টি ঘটনার দিকে, বাক্যের দিকে নহে। তবে ভাষা ব্যতীত প্রকাশের উপায় না থাকাতেই ভাষা মানিয়া চলিতে হয়। তদবস্থায় অকর্ম্মক ক্রিয়াকে ভাষায় অকর্ম্মক রূপেই ব্যবহার করিব। কিন্তু ঘটনা হিসাবে ইহা বিধেয় সমন্বিত মনে করিতে হইবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় পরস্পর সম্পর্কান্বিত হইয়া ঘটনা উৎপন্ন করে। এই হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ঘটনা প্রকাশ করিবার সময় উভয় দিকে সমান লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য একদিকে আসিয়া

পড়ে। যে-পদার্থটি লক্ষ্য করিয়া ঘটনাটি প্রকাশিত হয়, তাহাই উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের পরিবর্ত্তনে বিধেয়টি উদ্দেশ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। ব্যাকরণে এই পরিবর্ত্তন বাচ্যান্তর নামে অভিহিত। বাচ্যান্তর ক্রিয়ার আকার পরিবর্ত্তন করে।

ঘটনা অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু বাক্য পরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয় ঘটনার সঙ্গে পরিবর্ত্তনীয় বাক্যের সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে, বাক্যের মধ্যে কোন অপরিবর্ত্তনীয়তা থাকা আবশ্যক। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া এই অপরিবর্ত্তনীয়তা রক্ষা করে। পুনরায় ঘটনা অপরিবর্ত্তনীয় হওয়ায়, উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্যের পরিবর্ত্তনীয়তা প্রয়োজনীয়। যেহেতু তদ্দ্বারা ঘটনাকে নানাভাবে প্রকাশ করার সুবিধা থাকে। আলোচনায় দুইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে:— যাহা আলোচ্য, (১) তাহা লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয় ও (২) তাহাকে সুবিধানুযায়ী অপরাপর আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত রাখা যায়। তন্নিমিত্তই অপরিবর্ত্তনীয় ঘটনায় পরিবর্ত্তনীয় উদ্দেশ্যাদি এবং পরিবর্ত্তনীয় বাক্যে অপরিবর্ত্তনীয় কর্ত্তা প্রভৃতি আরোপ করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা একই কথা, লক্ষ্য হিসাবে দুইটি দিক্ মাত্র, দর্শন মতে ঘটনা ও উদ্দেশ্যাদি এবং ব্যাকরণের দিক্ দিয়া বাক্য ও কর্ত্তাদি। এই নিমিত্তই বাচ্যান্তরে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও কর্ত্তা ও কর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। ঘটনা হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে কোন পার্থক্য না থাকিলেও বাক্য হিসাবে কর্ত্তা ও কর্ম্মে পার্থক্য আছে। বাক্যের স্বাভাবিক অবস্থা কর্ত্তৃবাচ্য। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা উদ্দেশ্য, কর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দুইটি পদার্থের সম্পর্কে ক্রিয়া উৎপন্ন। ঘটনা হিসাবে পদার্থ-দ্বয়ে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, আবশ্যকানুযায়ী উভয় পদার্থের যে-কোনটিকে উদ্দেশ্য ও অপরটিকে বিধেয়ে পরিণত করা যায়। কিন্তু ক্রিয়া উক্ত পদার্থদ্বয়ের সঙ্গে সমান সম্পর্ক প্রকাশ করে না। কোন নির্দ্দিষ্ট একটিকে উদ্দেশ্য ও অপরটিকে বিধেয় করিয়াই ক্রিয়ার স্বভাব অবস্থা প্রকাশ করা। এই উদ্দেশ্যটিই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও বিধেয়টি ক্রিয়ার কর্ম্ম। ভাষার গঠনে ক্রিয়ার এই স্বভাবের উৎপত্তি। ঘটনার সঙ্গে এই স্বভাবের কোন সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্ত স্বতঃসিদ্ধে ক্রিয়াকে বাদ দিয়া বাচ্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্যাকরণে বাচ্যান্তর দ্বিবিধ—বাচ্যান্তরে সকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে ও অকর্ম্মক ক্রিয়া ভাববাচ্যে পরিণত হয়। কর্ম্মবাচ্যে বিধেয় উদ্দেশ্য রূপে পরিণত হয়। ভাববাচ্যে বাচ্য অর্থাৎ ক্রিয়াই উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। উদ্দেশ্য হওয়ার সময় ক্রিয়া নামের আকার ধারণ করে। এজাতীয় বিশেষ্য ভাববাচক বলিয়া কথিত হয়। এনিমিত্তই ইহার নাম ভাববাচ্য। ব্যাকরণ অনুযায়ী অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। কিন্তু আমাদের মতে বিধেয় আছে। অতএব অকর্ম্মক ক্রিয়ারও কর্ম্মবাচ্যে বাচ্যান্তর সম্ভবে। পুনশ্চ অকর্ম্মক ক্রিয়ার ন্যায় সকর্ম্মক ক্রিয়াকে ভাববাচক বিশেষ্যে পরিণত করার কোন বাধা থাকিতে পারে না। অতএব সকর্ম্মক ক্রিয়ায়ও ভাববাচ্যে বাচ্যান্তর নিষ্পন্ন করা চলিবে। অর্থাৎ ঘটনা মাত্রেই বাচ্যান্তর ত্রিবিধ;— (১) কর্ত্তৃবাচ্য; (২) কর্ম্মবাচ্য ও (৩) ভাববাচ্য।

সকর্ম্মক ক্রিয়াব উদাহরণ:—

কর্ত্তৃবাচ্য—রাম শ্যামকে প্রহার করিল।

কর্ম্মবাচ্য—শ্যাম রাম কর্ত্তৃক প্রহৃত হইল।

ভাববাচ্য—শ্যামকে রামের প্রহার করা হইল।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ:—

কর্ত্তৃবাচ্য—রাম ভূমিতে শয়ন করিল।

কর্ম্মবাচ্য—ভূমি রামের শয্যা হইল।

ভাববাচ্য—ভূমিতে রামের শয়ন হইল।

কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকের স্বতঃসিদ্ধসমূহ সাধারণ স্বতঃসিদ্ধের মত সহজবোধ্য নহে। তাহার কারণ, ভাষার সৃজনে দার্শনিক ভিত্তির অভাব। যাঁহারা ভাষা সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা দর্শনের কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ভাষা গঠনের দিক্ দিয়া দর্শনের আলোচনা করিতে হইলে সাফল্য সুদূর-পরাহত। আমরা যে-ভাবে ঘটনা ও উদ্দেশ্যাদির ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া ভাষা সৃজিত হইলে প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্বতঃসিদ্ধসমূহের স্বতঃসিদ্ধত্ব সম্বন্ধে, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। পাঠকগণ স্বতঃসিদ্ধস্তবকটি অনুধাবন করিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

৩য় স্বতঃসিদ্ধস্তবক

(১) কার্য্য, (২) কারণ ও (৩) সদৃশ।

(১) কার্য্য, কারণ সম্পর্কান্বিত দুইটি ঘটনার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীটি কারণ ও পরবর্ত্তীটি কার্য্য।

(২) যে যে কারণের অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্য পরস্পর সদৃশ, তাহার সঙ্গে সদৃশ সম্পর্কান্বিত কার্য্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্য পরস্পর সদৃশ হইবে।

(৩) যে যে কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্য পরস্পর সদৃশ, তাহার সঙ্গে সদৃশ সম্পর্কান্বিত কারণেও উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্য পরস্পর সদৃশ হইবে।

সংজ্ঞা

(১) যে যে পদার্থ পরস্পর সদৃশ তাহাদিগকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে।

(২) কোন কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট জাতীয় বিধেয়ের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হইলে, তদুৎপন্ন ঘটনা কারণরূপে পরিণত হইয়া যে যে সদৃশ কার্য্য উৎপন্ন করে বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করার নাম সূত্র।

(৩) নাম করণ। যে সূত্রের কার্য্য তাহার নাম সংজ্ঞা।

সংজ্ঞায় যে নামকরণ হয়, তদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে একই জাতীয় পদার্থের প্রত্যেককে প্রকাশ করে। অতএব তাহাতে কার্য্য-কারণের সাদৃশ্য আছে।

(৪) পূর্ব্বে নামকরণ হয় নাই এরূপ কয়েকটি সূত্র এইরূপে সঙ্কলিত হয় যে, কি হইলে উক্ত কয়টি সূত্রের যথার্থ প্রতিপালিত হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত পরিভাষা কয়টি কিরূপ পদার্থ তাহা নির্দ্দেশ করান, তবে উক্ত সূত্র-কয়টির যে কোনটির নাম স্বতঃসিদ্ধ।

(৫) একযোগে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ কয়টির নাম স্বতঃসিদ্ধস্তবক।

(৬) পূর্ব্বে নামকরণ হইয়াছে, এরূপ কয়েকটি পরিভাষা দ্বারা, যে-সূত্রে সাধারণ ভাবে সদৃশ কার্য্য-কারণের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাহার নাম বিধি।

অদ্ভুত জানোয়ার

সর্ব্বেশ্বর ঘটক

ভাবকুমার কাঞ্জিলাল লিখিত ※ মৃত্যুঞ্জয় গুড় চিত্রিত

(১)

আমি লোকটি কিছু সৌখীন ধরণের। সাধু ভাষায় যাকে মার্জ্জিতরুচি বলে, আমার আজন্মই সেইরকম একটা ভাব মনের ভিতরে আছে। শুনেছি, ছেলেবেলায় ময়লা কাঁথায় শুতে দিলে আমি কুরুক্ষেত্র বাধাতাম, আর যথা-সময়ে মুখে পাউডার মাখিয়ে ও গায়ে রেশমের ফ্রক্ না দিয়ে দিলে আমি সমুদ্রমন্থনের সময়কার সমুদ্রেরই মত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্তাম। বড় হ'য়েও আমার স্বভাবটা বদ্লোয়নি; বরং আমি মার্জ্জিতভাবের দিকটা আরও গাঢ় ক'রে তু'লে ছিলাম। বাড়ীর বাহিরে আমার জ্বালায় বৃদ্ধা পিসিমা তাঁর নবাবী আমলের তসরখানি ধুয়ে কদাপি রৌদ্রে শুকাবার জন্যে ঝুলিয়ে দিতে পারতেন না—তাতে বাড়ীর সৌন্দর্য্যের হানি হ'ত। বাড়ীর ভিতরে যেখানে-সেখানে ঘুঁটে ও পুরাতন শিশি-বোতল কেউ স্তূপাকার ক'রে রাখ্তে সাহস করত না। চাকর-বাকরের নোংরা কাপড়-গামছা প'রে বা তৈলসিক্ত অঙ্গ দেহে বিচরণ করা আমার আইনে বারণ ছিল। এ ছাড়া চেঁচিয়ে কথা বলা, [illegible] গলা অথবা নাক পরিষ্কার করা প্রভৃতি [illegible] বিষয়েও আমার অনেকগুলি "বাই-ল" ছিল।

আমার বাড়ীর আসবাবপত্র যথাসাধ্য ভাল [illegible] আমি চেষ্টা করতাম। দামী দামী [illegible] চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, ছবি ও উৎকৃষ্ট [illegible] বই-পত্রে আমার বাড়ীর তুলনা মধ্যবিত্ত সমাজে প্রায় পাওয়া যেত না বললেই হয়। পোষাক পরিচ্ছদেও আমার নজর ছিল উঁচু ধরণেরই। এ হেন আমার, যে, সর্ব্বেশ্বরের মত বন্ধু কি ক'রে জুট্‌ল তা বলা যায় না। সে ছিল যেন মূর্ত্তিমন্ত বিশৃঙ্খলারই মত। রং ফর্সা ও মোটের উপর চেহারাটা ভাল থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বেশ্বরকে দেখ্লেই মনে হ'ত যে, সদ্য "ড্রেন্" থেকে [illegible] একটি "স্প্যানীয়েল" কুকুর। লম্বা লম্বা চিরুনী-বুরুশের [illegible] একরাশ চুল, না-ধোওয়া মুখের উপর এক জোড়া [illegible] চশমা, গায়ে একটা দুই "সাইজ" বড় কিম্বা তিন "সাইজ" ছোট "সার্ট," একখানা এগার দিন পরিহিত ধুতি ও একজোড়া "ভেজিটেবল্ স্যু" পায়ে যখন সর্ব্বেশ্বর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ "এই যে ভাই, কোথায়?" ব'লে [illegible] চল্‌তে শুরু করত, তখন আমার মনে হ'ত যেন আমার অকস্মাৎ কোন চর্ম্মরোগ হ'য়ে গেছে বা কেউ আমায় বল-পূর্ব্বক এক ঝাঁকা আবর্জ্জনা মাথায় দিয়ে [illegible] বহন করেছে। [illegible] আমি তাকেই [illegible] কিন্তু মনের ভিতরে [illegible] আমি লোক-[illegible] চেষ্টা করতাম।

[illegible] কি ছিল তা বলা যায় না। সে [illegible] ছেলেবেলায় [illegible] পড়েছিল। [illegible] পরে [illegible] মাস্টারী ক'রে [illegible] "যোশন্-মাষ্টারী" ক'রে এবং [illegible] কাছে দু'দশ টাকা ধার করে [illegible] সঙ্গ আমার [illegible]

মনোবিজ্ঞান-ঘটিত "ফ্রয়েডিয়ান" কারণেই হোক্, সর্ব্বেশ্বরকে আমি কাছে পেলে একাধারে সন্ত্রস্ত ও আনন্দিত হ'য়ে উঠ্তাম। সন্ত্রস্ত হতাম, কারণ, সর্ব্বেশ্বর স্বভাবতই আমার সাধের আস্‌বাবপত্রের উপর তাণ্ডব-নৃত্য কর্‌তে দ্বিধা মাত্র কর্‌ত না; এবং আনন্দিত হতাম, কারণ, সে এলে আমার ঘরে ব'সে একাধারে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্‌কাস্ ও হরবোলার কেরামতি দেখা হ'য়ে যেত।

(২)

সেদিন বিকেলে ঘরে ব'সে আছি এমন সময় বাইরে মাত্র একটা "ষ্ট্যাচু" ও গোটা দুই "হল চেয়ার" গায়ের ধাক্কায় উল্টে দিয়ে সর্ব্বেশ্বর এসে হাজির হ'ল। ঘরের বাইরে একপাটি কাদামাখা চটি ও আমার "বোখারা কারপেট"-খানার উপর অন্য পাটিটা রেখে সে এসে ধুপ ক'রে একটা গদিমোড়া চেয়ারের উপর ব'সে পড়্‌ল। পা দুটো একটা আব্‌লুস কাঠের টেবেলের উপর তুলে এবং সিগারেট নিতে গিয়ে হাতির দাঁতের বাক্সটা প্রায় উল্টে দিয়ে সর্ব্বেশ্বর বল্‌লে, "গোটা পাঁচশ টাকা ধার দিতে পার?"

আমি হতভম্ব হ'য়ে বল্‌লাম," সে কি হে, অত টাকা কি হবে?"

সে বল্‌লে, "কি বল্‌লে দেবে?"

আমি উত্তর দিলাম, "সত্যি কথা।"

সর্ব্বেশ্বর বল্‌লে, "রেস্ খেল্‌ব। একটা "টিপ" পেয়েছি ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থ। ঘোড়া নয়ত যেন বন্দুকের গুলি। ময়দানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে; "জকি" বেটাকে যেন একটা লাগাম দেওয়া "সাইক্লোনের" উপর বসিয়ে দিয়েছে। অন্য ঘোড়া ত দূরের কথা, একটা মোটরকার দিলেও এর আগে যেতে পার্‌বে না।"

আমি জিগেস কর্‌লাম, "নামটা কি ঘোড়াটার?" সর্ব্বেশ্বর মাথা নেড়ে একবার "উঁহু" ব'লে একটু "ড্রামাটিক্ পজ্" দিয়ে বল্‌লে, "নাম বলা চল্‌বে না। কিছু ধর্‌তে চাও ত আমি ক'রে দেবো। এ যেন টাকা ছড়ান রয়েছে —তুলে নিলেই হয়। 'টোয়েন্‌টি টু ওয়ান্'; কথাবার্ত্তা নেই; লাল হ'য়ে যাবে।" ব'লেই সে বহু কষ্টে অর্দ্ধশায়িত

সর্ব্বেশ্বরের সিংহাসন গ্রহণ

দেহটাকে টেব্‌লের কাছ বরাবর তুলে তার উপর দুম্ ক'রে একটা কিল মেরে আমার সাধের ফুলদানিটা উল্টে দিলে।

আমি ফুলদানিটা সোজা ক'রে দিয়ে বল্‌লাম, "লাল হ'য়ে কাজ নেই, এই কুড়িটা টাকা নাও। দশ টাকা নিজের আর দশ টাকা আমার নামে ধ'রে যদি গোলাপি-টোলাপি কিছু হ'য়ে উঠতে পার ত দেখ।" সর্ব্বেশ্বর হাসি মুখে কুড়িটা টাকা ও একমুঠো সিগারেট্ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দু'তিন দিন পরে তার সঙ্গে পথে দেখা। সে আমার গলার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "ভাই কিছু মনে করো না; সত্যি বল্‌ছি আমার কোনো দোষ নেই।"

আমি জিগেস কর্‌লাম, "কেন, কি হয়েছে কি? ঘোড়াটা বুঝি 'অল্‌সো র‍্যান্' হ'য়ে গেছে?"

সর্ব্বেশ্বর মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্‌লে, "আর বল কেন; বেটা 'রেস-কোর্সের' অর্দ্ধেক পথ গিয়ে হঠাৎ চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ল; তার পর বার দুই চিঁহিঁ চিঁহিঁ ক'রেই বাস্ খতম! বিষ হে বিষ! 'রাইভ্যাল' ঘোড়ার 'সাপোর্টার' কেউ সাব্‌ড়ে দিয়েছে আর কি।" এই ব'লে সর্ব্বেশ্বর চ'লে গেল।

একজন "রেস" খেলুড়ে বন্ধুকে ক্লাবে জিগেস কর্‌লাম যে, একটা ঘোড়া গত শনিবারের রেসে ঐরকম লোম-হর্ষণভাবে মারা গিয়েছে কি না। সে ত হাঁ ক'রে রইল। বল্‌লে, "কই না। ওরকম ক'রে ত ১৯১১ না ১৯১২ সালে আমেরিকায় একটা 'রেসে' একটা ঘোড়া মরেছিল।"

আমি সপ্তাহখানেক পরে সর্ব্বেশ্বরকে পথে ধ'রে বল্‌লাম, "সেদিন আমায় অমন ক'রে ধাপ্পা দিলে কেন?"

সর্ব্বেশ্বর একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বল্‌লে, "ভাই, টাকা ক'টা নিয়ে তোমার বাড়ী থেকে বেরুতেই এক ব্যাটা কাবলে ল্যাম্প-পোষ্টের পাশে লুকিয়েছিল, এসে চেপে ধর্‌লে। কি করি, টাকা ক'টা দিয়ে বহুকষ্টে তার হাত থেকে নিস্তার পেলাম।" তার পর হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর, "এই দাঁড়া দাঁড়া" ব'লে যেন কা'কে চীৎকার ক'রে ডেকে সেই অনিশ্চিত ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণে অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল। আমিও মনে মনে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফিরে এলাম।

(৩)

দিন কতকের জন্যে দেওঘর গিয়েছিলাম। ফিরে এসে বস্‌বার ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম সর্ব্বেশ্বর একজন লোকের কাছে গায়ের মাপ দিচ্ছে। আমি ঢুকতেই বল্‌লে, "একটু ব'স ভাই, এই মাপটা দিয়ে নি।" ব'লে সেই লোকটির সঙ্গে এত অনর্গল কথা ব'লে যেতে লাগ্‌ল যে, সে ব্যক্তি তার খাতা-পত্র নিয়ে বিদায় হ'বার আগে আমি একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না। সে চ'লে গেলে পর সর্ব্বেশ্বর বল্‌লে, "লোকটার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল; আমার ওখানেই যাচ্ছিল; আবার অতটা যাবে, তাই এখানে নিয়ে এলাম মাপগুলো লিখিয়ে দেবার জন্যে।"

আমি জিগেস কর্‌লাম, "কি ব্যাপার, তুমি আবার জামা-কাপড় করাচ্ছ? এরকম দুর্ম্মতি ত তোমার কখনও দেখা যায়নি।"

সর্ব্বেশ্বর কপালের ঘাম মুছ্‌বার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে মাথা নীচু ক'রে সোফার "কভারটার" উপর কপালটা মুছে নিয়ে বল্‌লে, "আরে ভাই, একটা নতুন দালালির কাজে নেবেছি; কিছু সাজ-সরঞ্জাম না থাক্‌লে চল্‌বে কি ক'রে? আজকাল যা দিনকাল, লোকে শুধু মলাট দেখে বই কেনে, কনের মুখ দেখ্‌বার আগে শাড়ী আর গয়না দেখে।"

আমি তার সঙ্গে ব'সে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম, তার পর সে চ'লে গেল।

*   *   *   *

এরপর প্রায় মাস-খানেক সর্ব্বেশ্বর এল না। আমারও নানান কাজে তার কথা ততটা মনে পড়েনি। একদিন সকালে একটা পোষাকের দোকান থেকে প্রায় আড়াইশো টাকার বিল্ নিয়ে হাজির করাতে আমি কি ব্যাপার বুঝ্‌তে না পেরে বিল্‌টা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম আমার নাম ও আমার ঠিকানাতেই বিল্ হয়েছে। আশ্চর্য্য হ'য়ে আমি সেই দোকানে গেলাম। গিয়ে বল্‌লাম, "এ কি রকম, আমি আপনাদের কখনও চোখেও দেখিনি, আর জিনিসও এখান থেকে কিছু কিনিনি; আপনারা আমার নামে এত টাকার বিল্ পাঠালেন কেন?"

তারা বল্লেন, "সে কি, মশায়, আপনার নিজের বাড়ীতে গিয়ে আমরা মাপ নিয়ে এলাম। আপনি নিজে এসে "স্যুট" তিনটে নিয়ে গেলেন, আর বল্‌ছেন, এবিষয়ে কিছু জানেন না।"

আমি বড় বাঁকা হ'য়ে ওঁদের যে-ব্যক্তি স্যুটের মাপ নিয়েছিল তাকে ডাকানো হ'ল। সে এসে আমায় দেখে বল্লে, "এই নামের লোকের বাড়ীতে আমি মাপ নিতে গিয়েছিলাম ও এই নামের একজন ভদ্রলোক "স্যুট" গুলিও নিয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু ইনি ত সে-লোক নন।" তখন আমি দেখ্‌লাম যে, লোকটা সেই "[illegible] [illegible] আমায় [illegible] সর্ব্বেশ্বর নিজের মাপ দিচ্ছিল। আমি বুঝ্‌লাম যে, সর্ব্বেশ্বর আমার [illegible] দেবার জন্যে আমারই বাড়ী [illegible] নিজের

প্রসেশন্-অর্গ্যানাইজার্ সর্ব্বেশ্বর ঘটক

পোষাক করিয়ে নিয়েছে, এবং বর্ত্তমানে হয় আমায় টাকা দিতে হবে, নয় সর্ব্বেশ্বরকে জেলে দিতে হবে। আমি উপস্থিতমত বিল্‌টা বাকি রেখে সর্ব্বেশ্বরের বাড়ী গেলাম। শুন্‌লাম, সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এক মাসের বেশী হ'ল সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। কি আর করি তার পোষাকের দামটা দিয়ে দিলাম। ঠিক কর্‌লাম, অতঃপর তাকে পেলে অন্ততঃ তার ময়লা কানটা হাত দিয়ে ধর্‌তে না পার্‌লে চিম্‌টে দিয়ে ধ'রেও ম'লে দেবো। এ কি রকম ব্যবহার তার? একটা বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস ব'লেও ত জিনিস আছে!

বহুকাল সর্ব্বেশ্বরের সাক্ষাৎ পেলাম না। শুধু একদিন মোটরে ক'রে এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে-যেতে

"ডিক্"

অল্পক্ষণের জন্যে তাকে দেখ্‌লাম। একটা কিসের জন্যে যেন চাঁদা আদায়ের দল বেরিয়েছে। ক্ল্যারিওনেট্ ও হারমোনিয়াম্ এবং সেই সঙ্গে বেসুরো চীৎকার সব মিলে একটা বিকট সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে। ডি, এল, রায়ের একটা গানের সুর ও কথা বিকৃত ক'রে চেঁচিয়ে লোকের মনে দয়ার উদ্রেক করবার সশব্দ চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের গাড়ীটা দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লাম সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাগ্রে একটা হার্‌মোনিয়ম্ গলায় ঝুলিয়ে বাজিয়ে চলেছে। অন্যেরা তার অনুসরণ করছে। তার পায়ে একজোড়া ভারী বুট ও হাফ্-মোজা। একবার ইচ্ছে হ'ল গাড়ীটা থামিয়ে তাকে ধ'রে সকলের সাম্‌নে অপমান করি; কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের আমার উপর একটা প্রভাব, সে বহু অন্যায় করা সত্ত্বেও তখনও ছিল ব'লেই হোক, অথবা একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে এই ভয়েই হোক, অপমান করা তখন আর হ'ল না। ঠিক করলাম, তাকে এবার একদিন ঠিক ধর্‌বই ধর্‌ব।

আমার সে আশা শীঘ্র সফল হ'ল না। তার বাড়ীতে খোঁজ ক'রে এবং অন্য উপায়েও তার কোনই সন্ধান পেলাম না। ভাবলাম এবার ছোঁড়াটা একেবারে গোল্লায় গেল। যেতে যে তার বাকি ছিল তা নয়—তবু ভাবলাম।

(৪)

প্রায় ছ মাস হ'য়ে গেছে। একদিন লাল দীঘিতে বেড়াতে গিয়েছি। কোথাও কোন বাজীকর সমবেত ছেলে ছোক্‌রাদের বাজী দেখাচ্ছে। কোথাও কেউ জলের ধারে দাঁড়িয়ে মাছ দেখ্‌ছে। কোথাও বা ফিরিঙ্গী মেম সাহেবরা মুখে পাউডার মেখে কালো পাথরবাটিতে রক্ষিত চুনের কথা লোককে স্মরণ করিয়ে স্বজাতীয় "ইয়োরোপীয়ান্‌দের" হাত ধ'রে বেড়াচ্ছেন। মোটের উপর লাল দীঘি বেড়াবার মত জায়গা। পুরাকালে নাকি ওখানে কি-একটা মন্দির ছিল। সেখানে এত সিঁদুর ও আবীর ব্যবহার হ'ত যে, তাতে দীঘির জলটা লাল হ'য়ে থাকত। এখনও বিকেলের দিকে ওখানে এত লোক রং-এর মাথায় ঘোরে ফেরে যে, অন্তত সে-কারণেও দীঘির নামটার সার্থকতা এখনও লোপ পায়নি।

এদিক্ ওদিক্ ঘুরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বস্‌লাম। একমনে কি যে ভেবেছিলাম বলা যায় না, হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম। একজন ফিরিঙ্গী একটা "পেরাম্বুলেটর্" ঠেলে আন্‌ছিল। তার সেই ঠেলা গাড়ীতে, তার হাত ধ'রে, তার গলা ধ'রে ঝুলে অসংখ্য ছেলেপিলে কিল্‌বিল্ করছে। আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লাম। বাপ! কে বলে ফিরিঙ্গীদের "আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" হয়েছে! এরকম ঘোর "এম্‌প্লয়মেণ্ট"-ভারে যারা প্রপীড়িত, তাদের অন্য কাজের সময় কোথায়?

লোকটা কাছে এগিয়ে এল। [illegible] মেম সাহেব—স্থূল কৃষ্ণাঙ্গী বাস [illegible]—

একটি বই পড়তে পড়তে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক কোন "ম্যামথের" মতই হেলতে-দুলতে এগিয়ে আস্‌ছেন। হ্যাঁ! রত্ন-প্রসবিনীর মতই চেহারা বটে! বোধ হয় প্রাচীনকালে যখন মহাপুরুষদের পত্নীরা শতপুত্রবতী হ'তেন—তখন তাঁ'রা এইরকমই দেখ্‌তে হ'তেন। তা নইলে অতগুলি পুত্রকে শাসনে রাখ্‌তেন কেমন ক'রে? এরকম চেহারা হ'লে মহিষাসুর বধ করা যায়—সন্তান-শাসন ত দূরের কথা।

ছেলে-পিলের ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি ক'রে লোকটা আরও কিছু এগিয়ে এল। ওমা! এযে আমাদের সর্ব্বেশ্বর! কি সর্ব্বনাশ! তার গায়ের কোট-প্যাণ্ট্‌লুন টান্‌টান্‌ ধরণের—অন্যের সম্পত্তি বোধ হয়—তার পায়ে বুট্‌জুতা ও মাথায় একটা পুলিশের কি অন্য কিছুর "হেল্‌মেট্‌।" এবার সে আমায় দেখ্‌তে পেলে। কী করুণ, ব্যাকুল দৃষ্টি তার চোখে! বুঝি নরকদর্শক দান্তের দিকে পাপীরা এম্‌নি ক'রেই চেয়েছিল! বহু কষ্টে গোটা তিনচার ছেলে মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে সর্ব্বেশ্বর আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে,"God! ভাই, আমায় বাঁচাও!"

অমি বল্‌লাম, "এ কি কাণ্ড! একি করেছ? এ মেম-সাহেব আর সন্তান-সন্ততি কোত্থেকে জোটালে?"

সে বল্‌লে,"ভাই,তোমায় বিপদে ফেলে—মাপ কোরো ভাই—সেই যে পালালাম, একেবারে রেঙ্গুনে গিয়ে থাম্‌লাম। সেখানে দিন কতক চালের কার্‌বার ক'রে ও একটা বাংলা থিয়েটার চালিয়ে কিছু সুবিধা কর্‌তে না পেরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর কিছু দিন 'সুবুদ্ধি প্রচারিণী সভার' 'অর্‌গ্যানাইজার' হ'য়ে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটা সুবিধা হ'য়ে গেল। একদিন তোমার খরচে করান একটা সুট প'রে—কাপড় ছিল না—ইডেন্‌ গার্ডেনে বেড়াচ্ছি এমন সময় এক মেমসাহেব কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। আমার হাত চেপে ধ'রে সে বল্‌লে আমি ঠিক তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর মত দেখ্‌তে। আমি তাকে না বাঁচালে তার আর গতি নেই। আমি জিগেস কর্‌লাম, কি ব্যাপার।

"সে বল্‌লে, 'আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্টের কাজ কর্‌ত। আজ দু'মাস নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের সময় কাজের জন্যে সে একটা কি পেন্‌সন্‌ পেত। তাতেই আমাদের চল্‌ত। এখন সে নেই ব'লে টাকাটা আর পাচ্ছি না। তুমি ঠিক তার মত দেখ্‌তে, যদি তার হ'য়ে টাকাটা এনে দাও ত আমার বড় উপকার হয়। দেখ, স্বামী থাক্‌লে ত টাকাটা পেতামই,কাজেই এটা তুমি যদি এনে দাও ত কোনো অন্যায় করা হ'বে না।'

"আমি বল্‌লাম, 'আর সই ইত্যাদি? সে সব কি ক'রে হবে?'

"সে বল্‌লে,'আমার বাড়ীতে তুমি চল, তার সই দেখে দশ কুড়িবার অভ্যেস ক'রে নিলেই হবে। নিজে গিয়ে সই ক'রে টাকা নেবে, কেউ সন্দেহ কর্‌বে না।"

"আমি দেখ্‌লাম, মজা মন্দ নয়। দেখাই যাক্‌ না কি ব্যাপার। যদি সত্যি পেন্‌সন্‌টা পাওয়া যায়, তা হ'লে মেম সাহেব নিশ্চয়ই আমায় তার ভাগ দেবে কিছু।

"সই-টই মেমসাহেবের বাড়ী গিয়ে অভ্যেস ক'রে—ও কাজটা আমার আসে একরকম—বুক ঠুকে পেন্‌সনের আফিসে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাম বল্‌তেই সই করিয়ে টাকা দিয়ে দিলে। একবার কেউ তাকিয়েও দেখ্‌লে না আমার দিকে। আমি দেখ্‌লাম, বেশ সুবিধা। মেম সাহেব আফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল—সে টাকাগুলি সমস্তই হস্তগত ক'রে বল্‌লে, 'ডিক্‌, চল বাড়ী চল।'

"আমি হেসে বল্‌লাম, 'নামটা বেশ "গুড্‌ জোক্‌" হ'য়েছে।'

"মেম সাহেব বল্‌লে, 'আজ থেকে তুমি আমার "ডিক্‌"ই হ'লে।'

"আমি বল্‌লাম, 'তা ত ভালই, আমায় তুমি বাড়ীতে খাইয়ে-পরিয়ে রাখ; একটা বাইরের ঘর দিও থাক্‌তে, তা হ'লেই হবে। আমি তোমার "পেন্‌সন্‌" ঠিক ঠিক এনে দেব।'

"ভাই, সেই যে মেম সাহেবের কবলে পড়্‌লাম, তার পর থেকে আর নিস্তার পাইনি। তার বাড়ীর একটা ঘরে থাকি। তার সাতশ-ছেলে মেয়ে আমায় 'ড্যাডি' ব'লে ডাকে। বুড়ী খেতে দেয় ও ধোপা-নাপিতের খরচ দেয়। তা ছাড়া একটি পয়সা দেয় না। কিছু বল্‌লে বলে, 'তুমি মনে রেখ যে,জাল ক'রে টাকা নিয়েছ গভর্ণমেণ্টের। আমি যে সে টাকা পেয়েছি তার প্রমাণ নেই কিছু। বেশী গোলমাল করো না।'

"আমি চুপ ক'রে সব সহ্য করি। বুড়ীর হুকুম তামিল ক'রে দিন কাটাই। আমি তার তাঁবেদার 'ডিক্‌'; আমি ঐসব শয়তানের বাচ্চাগুলির সৎবাপ! ভাই, তোমার পায়ে ধর্‌ছি, আমায় বাঁচাও!"

সর্ব্বেশ্বর জব্দ হ'য়েছে দেখে মনে হ'ল ভগবান তা হ'লে আছেন।

সর্ব্বেশ্বর ওরফে "ডিকের" সন্তানগণ এতক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে তাদের মাকে ডাক্‌ছিল। তিনি বইখানা নিয়ে এত মত্ত ছিলেন যে, "ডিক্‌" থেমেছে তা মা দেখেই এগিয়ে

চ'লে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে তাঁর হুঁস হ'ল। হাঁসফাঁস ক'রে দ্রুত এগিয়ে এসে তিনি সর্ব্বেশ্বরকে প্রচণ্ড এক তাড়া দিয়ে ইংরেজীতে বল্‌লেন,"ডিক্‌, তোমার লজ্জা করে না! নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে একটা 'নেটিভের' সঙ্গে গল্প করছ!"

আমি বেগতিক দেখে সেখান থেকে স'রে পড়লাম। সর্ব্বেশ্বর বিদায়কালে শুধু একবার আমার দিকে চাইলে। জলে ডুববার সময় হাতের কাছে একটা ভেলা পেয়েও হাতছাড়া হ'য়ে গেলে লোকে যেমন ক'রে তার দিকে তাকায় সর্ব্বেশ্বরের চাউনিটা ঠিক সেইরকমই হ'য়েছিল।

গোল মাছ

মাটির উপর যেমন নানা-রকমের অদ্ভুত জীব-জন্তু আছে, সমুদ্রের ভিতরেও তেম্নি নানা-রকমের মাছ ও জীব আছে। পৃথিবীর চেয়ে সমুদ্রের ভিতরেই বেশী অদ্ভুত জীব আছে। ঘোড়ার মত মাছ, আট-পা-ওয়ালা জন্তু, অতিপ্রকাণ্ড বোয়াল, তিমি মাছ—এইরকম আরো অসংখ্য বিকট জীব সমুদ্রে আছে। একরকম মাছ আছে, তাহার ঠোঁট টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত, চোখ দুটিও গোল—টিয়া পাখীর চোখের মত, আর শরীরটা গোলাকার।

গোল মাছ

ইহার মুখটা ঠিক বেলের মত, তাহার উপর দুইটি চোখ ও ঠোঁট বসানো আছে। মাথার দুইদিকে কানের মত দুইটি পাখ্না। ল্যাজের কাছে উপর দিকে আর-একটি পাখ্না আছে। ইহাদের ঠোঁটের চারিটি ভাগ; চারিটি দাঁত মুখ হইতে বাহির হইয়া ঠোঁটের আকার লাভ করিয়াছে।

এই মাছ দেখিতে চমৎকার, ইহার দেহ নানা রঙে চিত্রিত। মাছ মাত্রেই মানুষের খাদ্য বটে, কিন্তু এই মাছ খাওয়া চলে না। কেননা, ইহারা যেখানে বাস করে সে-জায়গা বিষাক্ত; সেইজন্য ইহাদের শরীরও বিষাক্ত হয়। এই মাছের এক অদ্ভুত গুণ আছে, ইহারা নিজেদের শরীর ফুলাইতে পারে। নাবিকরা অনেক সময় এই মাছ ধরে। ধরিয়া ডেকের উপর ফেলিলেই ইহারা বোতলে জল-পোরার মত বুদ্‌বুদ্ করিয়া আওয়াজ করে ও শরীর ফুলাইতে থাকে। শরীর ফুলাইয়া ইহারা একবারে গোল হইয়া যায়, এবং সেই আকারেই মরিয়া যায়। মরিলেও ইহাদের দেহ কোনো-রকম বদ্‌লায় না।

— গুপ্ত

অদ্ভুত জানোয়ার

খুব প্রাচীনকালে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় জন্তু ছিল। উটের মত গলা ও হাতীর মত শরীরওয়ালা প্রকাণ্ড এক প্রাচীনকালের জন্তুর কথা বলিয়াছি। এখন আর-এক অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলিতেছি। প্রকাণ্ড একটা কুমীরের বুকে হাতীর মত পা জুড়িয়া দিলে যেমন দেখায় এই জন্তুর আকার ছিল সেইরকম। এখন আর এজন্তু নাই, পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। উত্তর আমেরিকা ইহাদের জন্মস্থান ছিল। কিন্তু এখানে তাহাদের কঙ্কাল পাওয়া গেলেও ইংলণ্ড, বেল্‌জিয়াম্, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ভারতবর্ষেও ইহারা আগে ছিল। ইহাদের নাম ডাইনোসার্ (১৪৬ পৃষ্ঠায় ইহার ছবি দেওয়া হইল)।

পাখীর পাখার মত ইহাদের ঘাড় হইতে ল্যাজ পর্য্যন্ত খোঁচা-খোঁচা পাখ্না ছিল। সেগুলি যেন এক-একটি টালী, খোঁচা-খোঁচা করিয়া বসান হইয়াছে। ইহারা গাছপালা খাইত। ইহাদের আর-এক শ্রেণী ছিল, তাহারা কিন্তু মাংস খাইত। এই জানোয়ারই যুগের পর যুগ শরীর বদ্‌লাইতে-বদ্‌লাইতে সরীসৃপ বা কুমীর প্রভৃতির আকার লাভ করিয়াছে।

গুপ্ত

ভালুকের গল্প

শাদা ভালুকের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। ইহারা থাকে মেরু-প্রদেশে এবং মাছ, শীল্ ও ওয়াল্‌রাশ্ খাইয়া জীবন ধারণ করে।

ইহারা সাধারণত হিংস্র প্রকৃতির হয়। সেইজন্য ইহাদের ভয়ে মেরু-প্রদেশবাসী এস্‌কুইমোদের বিশেষ সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হয়। হয়তো একজন এস্‌কুইমো নিশ্চিন্ত মনে মাছ ধরিতেছে, এদিকে ভালুক মহাশয় পিছন হইতে নিঃশব্দে আসিয়া নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, যেন ভাব এই —"কি হে, খবর কি? অনেক দিন যে দেখা সাক্ষাৎ নাই!" এস্‌কুইমো বেচারীর পক্ষে বন্ধুর এই প্রীতি-সম্ভাষণের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যে খুব সহজ নয় তাহা বুঝিতেই পার। তবে যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহা হইলে কি করিবে জান? কিছু না করিয়া সটান্ বরফের উপর শুইয়া-পড়িয়া ভাণ করিবে, যেন সে মরিয়া গিয়াছে। ভালুকটিও তাহা হইলে মানুষ ছাড়িয়া মাছের দিকে মন দিবে, কেননা, মরা-মানুষ সম্বন্ধে ভালুকের কেমন যেন একটা জন্মগত ঘৃণার ভাব আছে, বোধ হয় মরা ছুঁইলে তাহার জাত যায়। ভালুকের এই কুসংস্কারের সুবিধা পাইয়া কত সময়ে কত মানুষ যে মরার ভাণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে সে-সম্বন্ধে অনেক গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।

ভালুকেরা শীল্ শিকার করে কি করিয়া জান? যদি মেরু-প্রদেশে যাও তো দেখিতে পাইবে যে, শাদা বরফের চাপের উপর মাঝে মাঝে এক-একটি গর্ত্ত; এই গর্ত্তগুলির তলায় জলের মধ্যে শীলের বাসা এবং এই গর্ত্ত দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে বহির্জ্জগতের খবরাখবর নেয়। ভালুক এই গর্ত্তগুলির ধারে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং শীল্ মাথা তুলিবামাত্র তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরে। আবার কোন-কোন সময়ে বা একটি শীল্ হয়তো জল হইতে উঠিয়া বরফের উপর দিব্য আরামে রোদ পোহাইতেছে, ভালুক দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অতি সন্তর্পণে সাঁতার কাটিয়া একেবারে তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত! আর শীলের ভয় পাইয়া যেই জলে নামা অম্‌নি একেবারে ভালুকের কবলে পড়া! আর যদি ডাঙায় বসিয়া থাকে তাহা হইলেও ভালুকের তাহাকে গিয়া ধরিতে একটুও দেরী হয় না। তবে যদি দূর হইতে ভালুকের আসিবার খবর শীল পায় তাহা হইলে জলে ডুব-সাঁতার কাটিয়া পালানো তাহার পক্ষে বিশেষ শক্ত হয় না, কেননা, শীল জলেরই জীব। ডুব্-সাঁতারে ভালুক তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিবে কেমন করিয়া? বলিয়াছি যে, ভালুকের আর-এক-প্রকার খাদ্য হইল ওয়াল্‌রাশ্। ওয়াল্‌রাশ্ মোটেই শীলের মত নিরীহ জানোয়ার নয়। আকৃতিতেও শীল অপেক্ষা ওয়াল্‌রাশ অনেক ভয়ানক। তাহার চোয়ালের দুই পাশে দুইটি অতি ভীষণ ছোরার মত দাঁত আছে, এই দাঁতের ঘায়ে অনেক প্রাণীকেই সে কাবু করিতে পারে। তবে শাদা ভালুকের বিশাল-দেহের শক্তি ওয়াল্‌রাশের অপেক্ষা অনেক বেশি, আর যে সামান্য দুই পাটি দাঁত তাহার সম্বল তাহারও জোর নিতান্ত কম নয়। এই দাঁতের বাগে একবার ওয়াল্‌রাশ্‌কে পাইলে তাহাকে আর টুঁ শব্দটি করিতে হয় না।

এইবার শাদা ভালুক সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা তোমাদের বলিতেছি। হিংস্র পশুর প্রাণেও কী গভীর অপত্য-স্নেহ থাকিতে পারে ও বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ কতটা নির্ম্মম হইতে পারে এই গল্পে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মেরুগামী একটি জাহাজের নাবিকেরা একদিন দেখিতে পাইল, তিনটি শাদা ভালুক বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহাদের জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মধ্যে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছানা, এবং তৃতীয়টি একটু বড়—এই ছানা দু'টির মা। জাহাজের নাবিকেরা একটি শীল্ মারিয়া বরফের উপর তাহার চর্ব্বি পুড়াইতেছিল—দূর হইতে তাহার উপাদেয় গন্ধ নাকে যাওয়াতে ভালুক তিনটির এত উৎসাহ! যাহা হউক, তাহারা যখন জাহাজের কাছে আসিয়া এই পোড়া শীলের চর্ব্বির চার পাশে ব্যগ্র ভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিল তখন নাবিকেরা এক-এক খণ্ড করিয়া শীলের মাংস তাহাদের কাছে ফেলিতে লাগিল। তখন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল—প্রতিবারেই ভালুক-মাতা আগে ছানা দু'টিকে অতি যত্নে এই মাংসখণ্ডের এক-এক টুকরা ছিঁড়িয়া দিয়া পরে বাকী ছোট্ট একটি টুকরা নিজে গ্রহণ করিল। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্য নাবিকদের বেশিক্ষণ সহ্য হইল না। তাহারা বন্দুক আনিয়া পর পর তিনটি ভালুককেই গুলি করিল; ছানা দু'টি তৎক্ষণাৎ মারা গেল, কিন্তু ধাড়ি-ভালুকটির গায়ে গুলি ভাল করিয়া না লাগাতে সে জখম হইল মাত্র। কিন্তু নিজে জখম হইয়াও সে পালাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া একে একে ছানা দু'টির কাছে গিয়া তাহাদের ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোনও সাড়া না পাওয়াতে খানিকটা হাঁটিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, ছানা দু'টি তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না। তার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া এক টুকরা মাংস মুখে লইয়া একে একে দু'টি ছানারই মুখে তুলিয়া

দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া আবার খানিকদূর যাইয়া পূর্ব্ববৎ পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, ছানা দু'টি আসিতেছে কি না। এইভাবে খানিকক্ষণ দেখিবার পর যখন বুঝিল, তাহাদের আসিবার কোনই চেষ্টা নাই তখন অতি করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে তাহাদের ডাকিতে আরম্ভ করিল। যখন এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল, তখন এই বৃহৎ হিংস্র পশু আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। প্রথমে ছানা দু'টির কাছে আসিয়া একবার লুটাইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই দুই পায়ের উপর ভর করিয়া জাহাজের নাবিকদের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং কাতর ভাবে গোঙাইতে লাগিল। নাবিকেরা তখন আবার গুলি করিয়া তাহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিল।

শ্রী হিরণকুমার সান্যাল
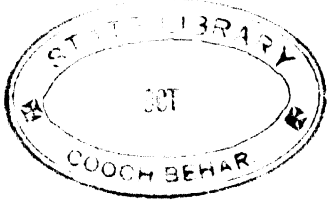
রাষ্ট্রনীতি

"কাত্যায়ন"

দেশোদ্ধারের পালা ত আরম্ভ হ'য়েছে। অন্তত দেশের "নেতার" দল সেইরকম বল্‌ছেন। আমরা ত জানি যে, আজ দু'হাজার বৎসর (মনু-সংহিতার সময় থেকে) দেশের নানারকম চিকিৎসা চলেছে। এর মধ্যে অনেক শত-সহস্র-মারা ধন্বন্তরি এলেন গেলেন, কিন্তু রোগীর নাড়ীর সেই ছাড়-ছাড় অবস্থাই রয়ে গেছে। তবে এবার ঘটা ক'রে, খাস বিলাতি "পোলিটিকোপ্যাথি" মতে চিকিৎসা হচ্ছে। ফল বোধ হয় একই হবে। যক্ষ্মা-রোগীর আর "টাকের মহৌষধে" কি উপকার হবে?

এ পালার আরম্ভ হ'ল ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্র সাঙ্গ হবার পর। পাঁচ বৎসরব্যাপী রক্তপ্লাবনের ফলে বিলাতি চণ্ডাশোক নাকি ধর্ম্মাশোক হয়েছেন; সুতরাং দেশের আর কোন ভাবনাই নাই। তবে এই "হৃদয়-পরিবর্ত্তনের" সময় তিনি জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে একবার সাধ মিটিয়ে "নাদীরশাহী খেল্"ও খেল্‌লেন দেখা গেল। যাই হোক দেশে সাড়া প'ড়ে গেল; দেশের যত নেতা বল্‌লেন,দেশটা স্বর্গ হ'য়ে গেছে। খবর এল যে "মণ্টফোর্ড রিফর্ম"রূপে বিলাতি যুধিষ্ঠির শীঘ্রই এই স্বর্গে আস্‌ছেন। খবর পেয়ে তাঁকে বরণ করার আয়োজনের ধুম প'ড়ে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে যুধিষ্ঠিরের আসার সময় হ'ল। ভারতমাতা বরণডালা নিয়ে বেরোলেন। ভারতপিতা সম্প্রতি বিলেত-ফেরৎ রাজনীতিবিদ্। তিনি অতিকষ্টে কয়েকটা সংস্কৃত কথা মুখস্থ ক'রে,বিলাতি "ড্রেসিং গাউন" দেশী রং ক'রে প'রে ভারতলক্ষ্মীর হাত ধ'রে "এহ্যে হি প্রিয়দর্শন" বল্‌বার জন্যে এগোলেন। কিন্তু তাঁদের আর কালিদাসের যক্ষের মত "স্বাগতম্ ব্যজহার" করা হ'ল না। কেননা,দেখা গেল,মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মতই এ চাম্‌ড়ার কোর্ত্তা-জড়ান (Hidebound) পার্লামেণ্টী যুধিষ্ঠিরও কুকুর সঙ্গে ক'রে এসেছেন। তবে মহাভারতের কুকুর ছিল সংস্কৃত, সাত্ত্বিক, ঘিয়েভাজা ধর্ম্মের অবতার সারমেয়, কাজেই সেটা যুধিষ্ঠিরের পেছন-পেছন ল্যাজ গুটিয়ে এসেছিল; আর এটা হ'ল বিলাতি, "ব্লডহাউণ্ড" "ফলাফল উচ্ছন্নে যাক্"মনোভাবের("Damn the consequences" mentality) "ব্যুরোক্রাসী"র অবতার, সুতরাং এ এল আগে-আগে। কুকুরের ব্যাপার দেখে ভারতলক্ষ্মী ত হতবুদ্ধি, হতজ্ঞান, ভারতপিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়!

তারপর? তারপর "দেশে এলেন ভগবান, মানুষ গরু সাবধান"। অলমতি বিস্তারেণ।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে পাঁচ ছয় বৎসর ত কেটে গেল। অনেক নূতন ব্যবস্থা হ'ল,নূতন বৈদ্যও বেরোলেন হাজারে-হাজার। এখন যা দেখা যাচ্ছে দেশের চিকিৎসা-সঙ্কট হয়েছে। এক-এক মূল-বৈদ্য আগে রেখে এক-এক দল বেরিয়েছেন। প্রত্যেকেই অন্যদের "যুদ্ধং দেহি" ব'লে ডাক্‌ছেন।

যা বোঝা যায় তাতে মনে হয় যে, প্রত্যেক দলেরই অন্য সব দলকে নির্ম্মূল করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, দেশের কাজ গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,এতগুলি বৈদ্যের মধ্যে,

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে আগমন—শ্রী হিতেন্দ্রমোহন বসু অঙ্কিত

অনুপান সম্বন্ধে মতভেদ থাক্‌লেও ঔষধ সম্বন্ধে মতভেদের লেশমাত্র নেই। এই মহৌষধে নাকি কবিরাজী হরিতকীর গল্পের মত—যুদ্ধ জয় থেকে হারানো গরু পাওয়া পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। এই মহৌষধের নাম "বৃহৎ ভোটদান রসায়ন"। দেশের লোক চক্ষু বুজে এই ঔষধ খেলেই নাকি দেশের সব রোগ দূর হবে, দেশ স্বর্গে পরিণত হবে।

এই "স্বর্গে পরিণত" কথাটার বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। বোধ হয় আসলে কথাটা "স্বর্গপ্রাপ্তি", কেননা, একথা সকলেই জানে যে, স্বর্গপ্রাপ্তি হ'লে সব রোগ দূর হ'য়ে যায়।

সরকার বাহাদুরের বরাদ্দ-করা ডাক্তাররা ত সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন, এদেশটা একটা প্রকাণ্ড আতুর-আশ্রমে (Home for Incurables) পরিণত করতে। আর আশ্রম চালাবার জন্তে তাঁদের সঙ্গে মৌরসী বন্দোবস্ত করা দরকার, কেননা, দেশটা না কি ক্রমশঃ এতই অসহায় ও অসমর্থ হ'য়ে পড়ছে যে, তাঁরা না চালালে কিছুতেই চল্‌তে পারে না।

তাঁদের কথার সমস্তটা বিশ্বাস করা একটু মুস্কিল। কারণ এই যে, মার্কিন দেশের হাকিমরা আবার ঐ

অথর্ব্বই রোগ

ডাক্তারদের নিজেদের দেশ (Europe) সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই বলেন।

যাক্, অন্যের কথা ভেবে কোনই লাভ নেই। ঘরের কথা

আগে ভাবা দরকার। এখন এইসব হবু বৈদ্যের মধ্যে কে সাচ্চা কে ঝুটা সেটা ঠিক করা প্রয়োজন। এবিষয়ে সন্দেহই নেই যে, অনেক ছদ্মবেশী হাতুড়ে নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্যে নানা দলে ঢুকে পড়েছেন ও সেই সেই দলের মার্কা বা লেবেল্ দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় আছেন।

সুতরাং ও লেবেল্ দেখে বিচার করতে গেলে ঠক্‌তে হবে। বিশ্বাস না হয় যে-কোন সোডা-লেমনেডের দোকানে একটু দাঁড়িয়ে দেখুন। দেখ্‌বেন যে, দোকানী ভাল জিনিষের খালি বোতল থেকে লেবেল খুলে সেটা সযত্নে বাজে জিনিষের বোতলে লাগিয়ে, অবসরের সময়টা সৎকার্য্যে ব্যয় করছে।

লেবেল্ বাদ দিলে থাকে পূর্ব্বকীর্ত্তি। কেহবা ক্রমাগত দেশের দুঃখে "হইয়া ক্রন্দসী" চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত দুঃখ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দেহের স্থান বিশেষের পরিধি—ঠিক ক্রন্দনশীল কুম্ভীরের মত—বেড়েই চলেছে। আবার কোনও "লম্বসাট-পটাবৃত" চিরটা কাল ব'লে আস্‌ছেন যে, তিনি গবর্ণ্‌মেণ্টকে ব'লে সব ঠিক ক'রে দেবেন। কিন্তু ঠিক হবার মধ্যে দেখা যায় যে, যথাসময়ে তাঁর নামের আগে বা পেছনে কয়েকটা অক্ষর যোগ বা তাঁর আয়ের হিসাবে আরও কিছু যোগ হচ্ছে। কোনও মহাপ্রভু "নিজের কীর্ত্তি নিজমুখে বলতে আমার ঘৃণা হয়, কিন্তু তোমাদের সে-কথা জান্‌বার অধিকার আছে" ইত্যাদি ভণিতা ক'রে নিজের ঢাক নিজেই পিট্‌ছেন।

সকলের চেয়ে ভয়ের বিষয় এই যে, যে-সব কালকেউটে "গাঁয়ের মোড়ল" রূপে বাস্তুসাপ হ'য়ে গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় বিরাজ করছেন, যাঁদের পেশা সর্ব্বস্থানে দলাদলি বাধান, একঘরে করা, জাতিচ্যুত করা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ও প্রবলের পদলেহন; এইসকল সনাতন মোড়লগিরি না করলে যাঁদের মুখে ভাত ওঠে না, তাঁরাও কোমর বেঁধে দেশনেতা হবার চেষ্টায় লেগেছেন। "দেশের সেবা কি যার তার কাজ, আজ তিরিশ বৎসর গাঁয়ের মোড়লগিরি করলাম, আমায় বাদ দিয়ে কে কোন্ কাজ করে দেখি"—এই হ'ল তাঁদের বুলি।

দিব্য-চক্ষু লাভের ফল—শ্রী হিতেন্দ্রমোহন বসু অঙ্কিত

বিদেশী রাষ্ট্রনীতির দৌলতে এঁদের সকলেরই বহির্মূর্ত্তি এক। ভিতরের মূর্ত্তি যে কি সে-সমস্যা কে পূরণ করবে? ব্যাসের বরে সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি ঘটেছিল। এখন যদি সেরূপ কোন দিব্যচক্ষুযুক্ত মহাপুরুষ আসেন, তাহ'লে প্রতি দলেই এইরূপ সকল ছদ্মবেশীর অকৃত্রিম নিজমূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হবেন।

দেশের চারিদিকে বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কাগজে, পত্রে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি, সাধু-সজ্জনের বচন প্রচারিত হচ্ছে।

এই দারুণ দেশোদ্ধারের আয়োজনের সময়, আমাদের স্মরণ হচ্ছে শুধু একটি প্রাতঃসেবনীয় ঔষধের কথা। তাহার বোতলে লেখা আছে—"**ফলেন পরিচীয়তে**"।

মহামারী শোথরোগ (Epidemic Dropsy)

শ্রী ব্রজবল্লভ সাহা, এম্-বি, ডি-টি-এম (লণ্ডন)

বর্ত্তমান সময়ে মহামারী ধরণের যে শোথরোগ (epidemic dropsy) কলিকাতায় দেখা দিয়াছে, ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৭-১৮৮০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় চিকিৎসক-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎপর ১৯০১ সনে ও ১৯১০ সনে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। মাত্র শোথ এই লক্ষণের জন্য 'বেরিবেরি' নামক ব্যাধির সহিত ইহার আপাতঃ কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, লক্ষণাবলি ও কারণ-তত্ত্বের দিকে একটু নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে এই দুইটি যে স্বতন্ত্র ব্যাধি ইহা উপলব্ধি করা যায়। ১৮৭৭ সনে ইহা শীতের সময়ে মরিসস্ দ্বীপে, আসাম, ঢাকা এবং দক্ষিণ সিলেটেও দেখা গিয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার মৃত্যুর হার কোনও কোনও স্থলে ছিল শতকরা ২০।৪০ এবং অধিকাংশ ছিল অতি সামান্য। সাধারণে বেরিবেরি বলিয়া পরিচিত হইলেও, বহু বিশেষজ্ঞের মতে ইহা বেরিবেরি হইতে একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি। বেরিবেরির মত ইহাতে শোথ থাকিলেও ইহাতে স্নায়বিক প্রদাহ বা পক্ষাঘাতের লক্ষণ একরূপ নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সময়ে ২।১ জায়গায় স্নায়ুর প্রদাহ দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন যে, বীজাণু-ঘটিত বহুবিধ ব্যাধিতেই ২।১ স্থলে স্নায়ুর প্রদাহ দেখা যায়; যথা, Bacillary dysentery, Typhoid fever (ব্যাসিলারি ডিসেন্টি, টাইফয়েড ফিবার) ইত্যাদি।

অধিকাংশ স্থলেই পরীক্ষা করিলে রোগীর স্নায়ু-মণ্ডলীর স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপর অটুট ভাবে বর্ত্তমান, ইহা পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মহামারীর সময় এইজন্য মেক্লিয়ড্ সাহেব ইহাকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি বলিয়া গিয়াছেন; যদিও গ্রেগ সাহেব ইহা যে বেরিবেরি ছাড়া আর-কিছু নয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

কারণ-তত্ত্ব যদিও প্রত্যক্ষ ধরা পড়ে নাই, কিন্তু যে-ধরণে ইহা প্রায় ১০।১২ বৎসর পর পর দেখা দেয় ও এক রোগীর শরীর হইতে সংক্রামক ভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহাতে ইহাকে জীবাণু-ঘটিত না বলিয়া উপায় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে ইহার ধ্বংসলীলা পূর্ণোদ্যমে ৩ হইতে ৬ সপ্তাহ-কাল চলিয়াছে। জানি না বর্ত্তমান সময়ে ইহার স্থিতি কত দিন। তবে যাঁরা হাসপাতালের সংশ্রবে আছেন তাঁরা দেখিতেছেন যে, মাঝে ২।১ সপ্তাহ এই রোগের তরুণ রোগী প্রায় দেখা যায় না, আবার হঠাৎ সপ্তাহখানেক প্রত্যহই প্রায় ৫।৭টা তরুণ রোগী আসিতে থাকে; তাহাতে মনে হয়, ইহার প্রকোপ একেবারে ধারাবাহিক হিসাবে কমে না; ধিকি-ধিকি বাড়িয়া কমিয়া প্রশমিত হয়।

শোথ, রক্তহীনতা, জ্বরই ইহার প্রধান লক্ষণ। এর সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্বলতা, শরীরের ক্ষয়, উদরাময় ও বমি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হৃদয়বৈকল্য দেখা দেয়। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে acute anaemic dropsy বলিতেন, কেহ কেহ তরুণ রক্তাল্পতাজনিত শোথ বলিয়া থাকেন।

বেরিবেরি ও মহামারী শোথ

বহুদিন যাবৎ খুব পালিশ করা কলের চাউল বা ময়দা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত অলক্ষ্যেই বেরি-বেরি রোগ দেখা যায়, তাহাতে হাত পা কন্ কন্ করে। রোগীর কাজ-কর্ম্মে সর্ব্বদা অনিচ্ছা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়। বেরিবেরি কথাটাই সিংহল দেশের। অর্থাৎ "বেরি—আর পারি না" ইহাই পুনরুক্তি হইতেছে। পায়ের পিছনে চাপ দিলে খুব ব্যথা লাগে, পরে পা পক্ষাঘাতদুষ্ট হয়, কতক রোগী কিছুদিন হৃদয়ের স্নায়ুর প্রদাহের ফলে হৃদরোগগ্রস্ত হইয়া পা হাত ফুলিয়া জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত

হয়। ইহার কতকগুলি অসাধ্য শ্রেণীর। তাহারা অল্প-বিস্তর ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চিকিৎসায় কতক নিরাময় হয় এবং অপর কতকগুলি সম্পূর্ণ হৃদয়ের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় না, ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে।

কিন্তু বেরিবেরিতে জর দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় ত কখনই না। অবশ্য বেরিবেরির উপর আগন্তুকভাবে অন্য প্রাদাহিক ব্যাধি আক্রমণ করিলে জর হইতে পারে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। কখনও কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাধিতে একজন সুস্থ ব্যক্তি রাত্রির সুনিদ্রার পর হঠাৎ দেখিতে পায় যে, পা ফুলিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কিন্তু পা ফুলিবার আগে উদরাময় সংযুক্ত জর দেখা যায়। এবং জরের তাপ ১০২।১০৩, সময় বিশেষে ১০৪ পর্য্যন্ত হইয়া একাদিক্রমে অবিরাম ভাবে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত চলে। পরে হয় ত সকালে বিরাম হইয়া বিকালে ৯৯।১০০ পর্য্যন্ত উঠিয়া ২।১ সপ্তাহ কাল স্থায়ী হয়। সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে থাকে। এবং রোগী হৃদয়-বৈকল্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া শুইবার ক্ষমতা হারাইয়া বিছানায় বসিতে বাধ্য হয় ও শ্বাস-কৃচ্ছ্রতায় প্রতি দণ্ডে পলে চরম যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে মরণে তার একমাত্র শান্তি ইহা উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুকেই বরণীয় মনে করে।

অনেক সময়ে এইরূপ মৃত্যুপথের পথিকও যথাবিধি হৃদয়-বৈকল্যের উপযোগী চিকিৎসায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। ইহাতে রক্তের অল্পতা অতি সত্বর দেহে প্রকাশ পায়, ও রক্তস্রোতের চাপ কমিয়া যায়। এবং রক্তের পরীক্ষায় শ্বেত-কণিকার সংখ্যা উদ্ভিজ্জ-ঘটিত প্রাদাহিক ব্যাধির মত বাড়িয়া যায়।

বেরিবেরিতে এরূপ রক্তহীনতা বা শ্বেতকণার আধিক্য দেখা যায় না। বর্ত্তমান ব্যাধিতে হাম-বসন্তাদির মত চামড়ার উপর রক্তাভ eruption (গুটি) দেখা যায়। বেরিবেরিতে তাহা দেখা যায় না।

বেরিবেরি দরিদ্র মজুরদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাধি প্রাসাদ ও পর্ণকুটীরে সমানভাবে দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান লেখক অবগত আছেন, কোনও এক বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর প্রাসাদে কর্ত্তৃপক্ষীয় সকলে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু উচ্চ নীচ শ্রেণীর সমগ্র ভৃত্যবর্গ একই গৃহে আহার ও অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

অপর পক্ষে কলিকাতার প্রায় ২৫০ মাইল দূরে কোনও উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর জনৈক আত্মীয় কলিকাতায় এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে ১৫।২০ দিনের পর পরিবারস্থ সকলে গৃহস্বামী, গৃহকর্ত্রী ও ৪।৫টি ছেলে-মেয়ে সহ তীব্র জরের সহিত উদরাময় ও শোথাক্রান্ত হইয়া যেরূপ শোচনীয় অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

গৃহকর্ত্রীর হৃদয়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিকল হওয়ায় প্রতিক্ষণে সকলে শেষ আশঙ্কা করিতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন, যদিও সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হন নাই। ইহা দেখিয়াও কি গতানুগতিক ভাবে গড্ডলিকা-প্রবাহে মত দিয়া বলিতে হইবে, ইহা চালের দোষে হইতেছে? একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায়, আমাদের খাদ্যাদির অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও মাঝে ৮।১০ বৎসর এই ব্যাধি আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহাও ত বীজাণুঘটিত ব্যাধির লক্ষণ। যথা উক্ত রাজকর্ম্মচারীর গৃহে সর্ব্বদা ঢেঁকি-ছাঁটা চাল ব্যবহার হয়, সর্ব্বশ্রেণীর খাদ্যই ভেজালবিহীন, টাট্‌কা ও প্রচুর খাঁটি দুধ, মাছ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

পরন্তু বর্ত্তমান লেখক নিজে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা, যিনি তথাকথিত আদর্শ খাদ্য মাংস, রুটি ব্যবহার করিয়া থাকেন তিনিও, এই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। ১৯১৭ সনে গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত শেবার ব্রিটিশ সেনানীর মধ্যে যে শোথ-রোগ দেখা যায়, তাহাতে অনুসন্ধান হয়; তাহার ফলে মেজর ষ্টিভেন্‌সন্ বলিয়াছেন, ইহা খাদ্যের দোষে নয়, বস্তুতঃ ইহা বীজাণু-সম্বন্ধীয়। বসরায় লেঃ কর্ণেল্ স্প্রসন্ অনুসন্ধানের ফলে স্থির করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনানীর মধ্যে যে শোথ-রোগ দেখা দিয়াছিল, তাহা বীজাণুঘটিত, খাদ্যের দোষে নয়। একমাত্র বীজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের এখন ক্ষেত্রের দিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে দেহের ব্যাধি-বিনাশক শক্তির অপচয় হয় এমন কোনও কাজই করিবে না এবং যাহাতে এই জীবনী-শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইবে। সুতরাং ইহার প্রকৃত প্রতিষেধক—স্বাস্থ্য-রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী অবহিত চিত্তে পালন করা। যে-হেতু ইহা উদরাময় লইয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং গুরু ভোজন সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে হইবে। বাজারের খাবার বিষবৎ ত্যাজ্য, সহজ-পাচ্য বলবর্দ্ধক খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্যের মাত্রা নির্ণীত হইবে। মহামারীর সময়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া নিষেধ। পানীয় জল ফুটাইয়া বা chlorine মিশাইয়া খাইবেন। পরিষ্কার আলো-বাতাস যাহাতে বাসস্থানে প্রবেশ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবেন। পরিষ্কার জায়গায় ভ্রমণ করিবেন ও সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবেন. মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিবেন না, প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম করিয়া প্রশ্বাস ও ঘর্ম্মের সাহায্যে দেহকে নির্ম্মল করিবেন

ও সাধ্যমত গাত্রমার্জ্জনা করিয়া স্নান করিবেন। অধিক রাত্রি জাগরণ বা জনবহুল বদ্ধ স্থান, যথা থিয়েটার, বায়োস্কোপ বর্জ্জন করিবেন। ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া দেহকে তেজপূর্ণ করিবেন।

প্রাতরাশের জন্য দুধ, চিঁড়ে বা দই চিঁড়ে বা একটু ভাত ও ঘোল। দুপুরে ভাত, মাছের ঝোল, শাক-সবজী সাধ্য হইলে দই ও কিছু টাট্‌কা ফল, অভাবে ১টা পাতি-লেবুর রস। বিকালে খাওয়া অভ্যাস থাকিলে ফল ও ঘোল, রাত্রিতে সাধ্যমত আটার রুটি, ভাত, তর্‌কারী, প্রভৃতি। সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পুনঃ পুনঃ ঘোল ব্যবহারের উদ্দেশ্য, অন্ত্রমধ্যস্থ ব্যাধিবীজ বিনাশের জন্য দইয়ের বীজাণুর সাহায্য গ্রহণ। দইয়ের বীজাণু Lactic acid bacilli অন্ত্রমধ্যে acid বা অম্ল-রস তৈরী করে; ফলে ব্যাধি-বীজাণু যাহাতে alkali media বর্দ্ধিত হয়, তাহা হীনবল বা নির্ম্মূল হয়। ভাতের ফেন না ফেলিয়া ফেন-যুক্ত ভাত খাওয়া উচিত, কারণ, ফেনে জীবনী-বর্দ্ধক পদার্থ বা Vitamine B আছে। ঢেঁকি-ছাঁটা চালই প্রশস্ত। চাল সিদ্ধ হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নহে, ইহা লেখকের বিশ্বাস। কারণ, সিদ্ধ ধানের চাল তৈরীর সময়, জম্পতি বা ভ্রূণাংশ যাহাতে বলবর্দ্ধক পদার্থ প্রচুর বর্ত্তমান থাকে, তাহা চালের রূপালি আবরণের মধ্যে চালের সঙ্গে অতি অল্প আয়াসে তুষ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। যদিও সিদ্ধ ধানে ইহার কতকটা অংশ গলিয়া বাহির হইয়া যায়, তবুও ভ্রূণাংশের অধিক স্থিতি থাকে, এই তাহার পূরণ করে।

সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমরা ভিটামিন্‌কে অবহেলা করিতে বলিতেছি না। কারণ, জীব-দেহে যে-সমুদয় নালিকা-বিহীন গ্রন্থী আছে, যাহাদের Ductless glands বলে, তাহারা নিরন্তর ক্রিয়মাণ থাকিয়া শরীরে নিয়ত ব্যাধির বীজাণু-ধ্বংসকারী রসের স্রোত বহমান রাখিতেছে এবং এই বহমান রসের ধারাই জীব-দেহকে স্বাস্থ্য-সুষমা-মণ্ডিত করিতেছে।

এইগ্রন্থিগুলির ক্রিয়া-শক্তি কিন্তু ভিটামিনের উপর নির্ভর করে। খাদ্যে ভিটামিনের অভাব বা [illegible] এই রসের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হয়, তাই দেহ ব্যাধি-বীজাণুর লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়। সুতরাং ভেজালবিহীন টাটকা মাখম, দুধ, তেল ও টাটকা শাক-সব্জী আমাদের চাই-ই। ইহাতে যে তথাকথিত বেরি-বেরি নিবারিত হইবে তাহা নয়, পরন্তু সমস্ত ব্যাধির বীজ ইহার ফলে অমৃত-সঞ্জীবনী-নিসিক্ত দেহে পতিত হইয়া নির্ম্মূলভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৯১৭ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে সমগ্র জগতে বিগত মহাসমর হইতে অধিক লোকক্ষয় হইয়াছে।

অতি প্রথমে রণস্থলের চিকিৎসকেরা ইহার কারণ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইহাকে আখ্যা দিয়াছিলেন P. U. O. অর্থাৎ Pyrexia of Unknown Origin—একটি অজ্ঞেয় জ্বর। বহু গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে, ইহা ফাইবারের বীজাণু-ঘটিত। বর্ত্তমান লেখকও তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া এই নবীন ব্যাধিকে নাম করিতে চান D. U. O. অর্থাৎ Dropsy of Unknown Origin. কারণ তাহাতে আমরা ইহার স্বরূপ এখনো জানিতে পারি নাই—ইহা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া ইহাকে অবগত হইবার জন্য অবহিত ভাবে চেষ্টা করিতে থাকিব।

পরন্তু বেরিবেরি বলিলে যে ভাবের ঘরে চুরি হইয়া যায়। যেন মনে হয় ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ জানিয়াছি। তাহাতে যে কর্ম্মের স্রোত লক্ষ্যে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্য বটে, অণুবীক্ষণে ইহার বীজাণু এতাবৎ ধরা পড়ে নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে আমরা অতি অল্পদিন যাবৎ জানিয়াছি যে, কতকগুলি এরূপ ব্যাধি-বীজাণু আছে যাহারা অণুবীক্ষণাতীত (Ultra-microscopic) যেমন হাম বা বসন্ত এক-একটা স্বতন্ত্র ব্যাধি। কিন্তু ইহাদের কারণ বীজাণু ultra-microscopic বা অণুবীক্ষণাতীত। হয়ত ইহার কারণও সেইরূপ একটা-কিছু বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অনবহিত তপস্যার ফলে অতি নিকট ভবিষ্যতে ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিবে।

উপসংহারে আর-একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই ব্যাধি যখনই আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তখনই চিকিৎসকের [illegible]

উপদেশ-মত কাজ করিতে হইবে। যেহেতু যতই সামান্য রূপে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হউক না কেন, কখন্ যে ইহা ত্বরিৎবেগে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভাগ্য-ক্রমে কোনও বিশেষ পরিবারে ২ মাসের মধ্যে ৮টি রোগীর প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছে। তাহার মধ্যে গুটি দুই বজ্রাহতের মত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ১৫ দিন আগে পা ফুলিয়াছিল; বাহ্যতঃ সব সারিয়া গিয়াছিল; একদিন মলত্যাগের সময় হঠাৎ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল ও চিকিৎসক ডাকিবার অবকাশ মিলিল না, হঠাৎ প্রাণ-বিয়োগ ঘটিল।

সাধারণের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, ইহার যখন কারণ যথাযথ নির্ণয় হয় নাই তখন ইহার চিকিৎসাও নাই। বাস্তবিক হিসাবে সব ব্যাধিরই ত কারণ যথার্থ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-মত স্থির হয় নাই। তাই বলিয়া কি তার বর্ত্তমান জ্ঞান-মত চিকিৎসা হইতেছে না, হয়ত পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তে তাহার সংস্কার বা বহিষ্কার হইবে। বিশেষতঃ মানবের জ্ঞান সর্ব্বক্ষেত্রেই ত আংশিক সত্যের উপলব্ধি মাত্র। পূর্ণ সত্য ত মানবের ভাগ্যে এখন পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

আবার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে-সমস্ত ব্যাধির কারণ-তত্ত্ব নির্ণিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই ত উপযুক্ত বিশেষ ঔষধ বাহির হয় নাই। যথা যক্ষ্মাকাশি, টাইফয়েড্ জ্বর, হাম ইত্যাদি। কিন্তু তবুও ত তাহাদের চিকিৎসা চলিতেছে। আর চিকিৎসা বলিলেই যে ঔষধ বুঝিতে হইবে, ইহাও ত বিশেষ ভ্রমসঙ্কুল। ব্যাধির নিদান বা বিশেষ প্রকাশ স্থান, দেহের যন্ত্র বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া জীব-বিজ্ঞান সাহায্যে উপযুক্ত পথ্যাপথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া উক্ত যন্ত্র বিশেষকে তাহার কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক বিশ্রাম দিলেই দেহের স্বাভাবিক রোগ-বিনাশক শক্তি-সমূহ তাহাকে নিরাময় করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সম্পাদকের চিঠি

আমি কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার সময় 'ফ্রি প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া'র একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করিতে ও কথাবার্ত্তা বলিতে আসেন। আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, দেখিলাম, কলিকাতার একটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে তাহার কোন কোন অংশ ভুল করিয়া ছাপা হইয়াছে, হয়ত অন্যান্য দৈনিকেও এইরূপ ভুল হইয়াছে; এই ভুলগুলি সংশোধন করা দরকার।

ভারতের দান

আমি বলিয়াছিলাম, "জগতের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠ দান—পাট, চা, গম ও চাল নয়"; কিন্তু সেই দৈনিকের মুদ্রাকর আমাকে বলাইয়াছেন, "জগতের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠ দান পাট, চা, গম এবং চাল।" আমার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, ভারত মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পত্তির যতখানি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু "নয়" কথাটি বাদ পড়িয়া যাওয়াতে আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার উল্টা কথাই আমাকে দিয়া বলানো হইয়াছে।

মুদ্রাকরের আর-একটি ভুলও দেখাইয়া দেওয়া দরকার। আমি বলিয়াছিলাম, "ভারত শিক্ষক হইতে পারে, কিন্তু সেই-সঙ্গে ছাত্র হওয়াই তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজন।" 'ছাত্র (learner শব্দটি) bearer' ছাপিয়া সমস্ত উক্তিটি প্রলাপবাক্যের মতই শুনাইতেছে।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় বহু উচ্চ ও গভীর প্রদেশে পৌঁছিয়া-

ছিল, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে মোটামুটি বলিতে গেলে ভারত বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধিকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি সমুদ্রপারে যাইতেছি শিক্ষালাভ করিতে, শিক্ষা দিতে নয়। একথা বলিবার সময় আমি অবশ্য জানিতাম যে, আধুনিক কালেও ভারতবাসীরা অনেকে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতেই সমুদ্র-পারে গিয়াছেন এবং আজও যাইতেছেন। একথাও জানিতাম যে, ভারত কেবল অধ্যাত্ম-বিষয়ের শিক্ষকই প্রেরণ করে না; বিজ্ঞানেও ভারত শিক্ষা দিতে সুরু করিয়াছে; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারত-প্রেরিত একজন বৈজ্ঞানিক-শিক্ষক দেখা যাইতেছে।

ভারতের পরাধীনতা ও তাহার ফল

কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া অবধি ভারতের পরাধীনতার চিন্তা আমার মনকে পীড়া দিতেছে। যে-মোটরকারে আমি হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম, তাহা বিদেশে প্রস্তুত। যে-ষ্টীমার আমাকে ইউরোপে লইয়া যাইবে তাহা ভারতে নির্ম্মিত নয়, এমন-কি তাহা ভারতীয় কোনো "ষ্টীম্ নেভিগেশন্ কোম্পানী"র জাহাজও নয়। ইহা 'পিল্‌স্না' নামক একটি ইতালীয়ান্ জাহাজ। এখানেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের প্রভু ব্রিটিশেরাই যে কেবল ভারতবর্ষ লুট করিতেছেন তাহা নয়, অন্য জাতিও অনেকে করিতেছে। ভারত হইতে সমুদ্র-পথে লোকে ব্রিটিশ, ইতালীয়ান্, জাপানী ও ফরাসী জাহাজে বিদেশে যাইতে পারে; কিন্তু সম্প্রতি এমন কোনো ভারতীয় জাহাজ নাই, যাহাতে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ইহা কেবল ভাবুকের অভিযোগ মাত্র নয়। পুরাকালে হিন্দুরা পৃথিবীর সমুদ্রযাত্রী ও ঔপনিবেশিক জাতিদের ভিতর বিশেষ অগ্রগামী ছিল। মধ্যযুগে এবং তার অনেক পরেও ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্রকুল-রেখা শত শত বন্দরে চিহ্নিত ছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে জ্ঞানলোকে ও নৈতিক-লোকে ইহার অর্থ কি বুঝায় ভাবিয়া দেখুন। সে-সময় নৌ-গঠন ব্যবসায় হাজার হাজার মানুষের কাজ জোগাইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক ও হাত খাটাইত এবং তাহাদের বিজনের পরিবার-পরিজনের অন্ন জোগাইত। তার পর নাবিকের কাজে লোকের যে কেবল আর্থিক লাভ হইত তাহা নয়, ইহা সমগ্র জাতিটাকে কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক ও দুঃসাহসিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাণিজ্য-পরিচালনায় এবং যাত্রী ও মাল পারাপার করার লাভ দেশেই থাকিত। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগেও ভারতে তৈয়ারী জাহাজ ইউরোপে যাইত এবং ইউরোপে প্রস্তুত এই জাতীয় জাহাজগুলি অপেক্ষা এগুলি মজবুত বলিয়া খ্যাত ছিল।

এখন সে-সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আগে যে-শ্রেণীর লোকেরা জাহাজ নির্ম্মাণ ও নৌচালনের কাজ করিত, এখন তাহারা কৃষক কিম্বা ভূমিহীন মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাষের কাজে এত বেশী লোকের ভরণ-পোষণ সম্ভব নয় বলিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ হীনতম দারিদ্র্যে ডুবিয়া আছে। অবশ্য কেবল নৌ-ব্যবসায়ের বিলুপ্তিতেই যে ভারত দরিদ্র হইয়াছে, তাহা নয়; ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ, তাহার স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হওয়া।

ভারতের আর্থিক ক্ষতিই এক্ষেত্রে আমাদের এক-মাত্র দুঃখের কারণ নয়। সমুদ্রযাত্রী জাতির স্বভাবোচিত নির্ভীকতা ও দুঃসাহসও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। মানসিক শক্তিরও বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে; কারণ, কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিম্বা কেতাবী-ব্যবসায়েই যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা নহে। নৌনির্ম্মাণ, নৌ-চালন এবং এই জাতীয় অন্যান্য শিল্পেও মানসিক শক্তির প্রয়োজন আছে।

জাহাজে ভারতীয় ছাত্র

উপরে আমি যানবাহনাদি বিষয়ে ভারতের পরাধীনতার কথা বলিয়াছি। শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারত পরাধীন। আমি যে-জাহাজে যাইতেছিলাম, সে-জাহাজে কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র বিদেশে শিক্ষার জন্য যাইতেছিলেন। আমি জানি, ইউরোপের এক প্রদেশের ছাত্র আর-এক প্রদেশে শিক্ষা-লাভের জন্য যায়, আমেরিকার ছাত্রেরা ইউরোপে শিক্ষার্থ আসে এবং ইউরোপীয় ছাত্রেরা শিক্ষার্থে আমেরিকায় যায়। এইরূপ যাতায়াত ভাল ও দরকারী জিনিষ। কিন্তু

সচরাচর ইউরোপ ও আমেরিকার ছাত্ররা তাহাদের নিজেদের দেশেই উচ্চতম শিক্ষালাভের সুবিধা পায়; কোনো-একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার ইচ্ছা থাকিলে এবং স্বদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশের শিক্ষণীয় সকল কিছু শিখিবার ইচ্ছা থাকিলেই কেবল তাহাদের বিদেশে যাইতে হয়। ভারতীয় ছাত্রদের নিজের দেশে এরূপ সুবিধা নাই; এবং যাহাকে খুব উচ্চ শিক্ষা বলা চলে না, এমন এক জাতীয় শিক্ষালাভের জন্যও তাহাদের বিদেশে যাইতে হয়। তা ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের ছাত্রদের যে-সকল পুস্তক পড়িতে হয় তাহা সবই কোনো-না-কোনো বিদেশী ভাষায় লিখিত। আমাদের নিজ ভাষায় বই থাকা উচিত।

আমাদের জাহাজে একদল ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের ভিতর চারিজন রক্‌ফেলার্ বৃত্তিপ্রাপ্ত। শোনা যায় যে, ছয়টি বৃত্তি দিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে বৃত্তি দিবার উপযোগী আধ ডজন মানুষও খুঁজিয়া পান নাই! কাজেই চারিজন মাত্র যাইতেছেন। যদিও ইঁহাদের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং আর-একজন মশকবংশের সমূল ধ্বংসের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তবুও তাঁহারা যে একজনও বাঙালী নন, এইটা আরোই হাস্যকর ব্যাপার। ভারতের সকল প্রদেশের ভিতর বাংলাদেশেই ম্যালেরিয়ার অত্যাচার সকলের চেয়ে বেশী। বস্তুত, এই চারিজনের একজনও বাংলাদেশ হইতে মনোনীত হন নাই। অবশ্য তাহা আমার অভিযোগের কারণ নয়। কারণ, সমস্ত ভারতের জন্য যদি ছয়টি বৃত্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে কোনো-না-কোনো প্রদেশ বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইবেই। ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত বিষয় পাঠ ও গবেষণাই যে-বৃত্তির উদ্দেশ্য সেই বৃত্তির জন্য ম্যালেরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারিত প্রদেশ হইতেই কাহাকেও নির্ব্বাচন করা হইল না, এইখানেই হইতেছে ব্যাপারটির আসল রঙ্গ।

কাপ্তেনের সদাশয়তা (!)

নৌচালনায় মানসিক শক্তির প্রয়োজন আছে, আগে বলিয়াছি। তাহার অর্থ এ নয় যে, সকল নাবিক, এমন-কি সকল পোতাধ্যক্ষই (Captain) খুব উঁচুদরের মানসিক-শক্তি-সম্পন্ন জীব। এই সূত্রে একটা সামান্য ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় দূষণীয় হইবে না। আমি যে-জাহাজে আসিয়াছি, সেই জাহাজের কাপ্তেন্‌কে, আমাদের বন্ধু কলিকাতার ইতালীয়ান্ কনসাল্ মহাশয় স্বেচ্ছায় আমায় একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিয়া কাপ্তেন্‌কে 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করিয়া চিঠিটি আমি তাঁহার হাতে দিই। তিনি নমস্কারও করিলেন না, হাসিলেনও না, আমাকে বসিতেও বলিলেন না এবং পত্র কি পত্র-লেখক বিষয়ে কোনো কথাও বলিলেন না। জাহাজে আমি যে আঠারো দিন ছিলাম তিনি সে কয়দিন আমার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতই ব্যবহার করিয়াছেন—অবশ্য আমি অপরিচিতই বটে! বলা বাহুল্য, প্রথম দিনের সুপ্রভাত জ্ঞাপনের পর আমি তাঁহাকে চিনিতে পারার কোনো লক্ষণই আর দেখাই নাই। আশা করি, ইহা আমার অভদ্রতা হয় নাই। এই কাপ্তেন্ মহাশয়ের ব্যবহারটা উচ্চদরের বুদ্ধির, না ভদ্রতার, না কেবল কাপ্তেনগিরির লক্ষণ ভাবিয়া পাই নাই।

কাপ্তেনসংক্রান্ত এই ব্যাপারটিতে ছাড়া জাহাজের আর-সকল কর্ম্মচারীর ব্যবহারের অর্থ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ কখনও জাগে নাই; তাহারা যে অভদ্র নয়, তাহা পরিষ্কার দেখা গিয়াছে। তাহারা যদি অভদ্র হইতও তাহা হইলেও তাহাদের অভদ্রতা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, ভারতবর্ষের উপর যাহাদের বিন্দুমাত্রও রাজনৈতিক প্রভাব নাই, তাহাদের নৌ-বাহিনীও যদি ভারত হইতে মাল ও যাত্রী পারাপার করিতে পারে, অথচ আমাদের মোটে নৌবাহিনীই নাই, তাহা হইলে সেটা কি আমাদের অপরিণত শক্তির এবং যথাযথ ভাবে কাজ গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতার অভাবের আংশিক প্রমাণ নয়?

জাহাজে জীবনযাত্রা

জাহাজটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্যান্য লাইনের জাহাজের তুলনায় এ জাহাজের খাদ্য ভাল কি মন্দ আমি কিছুই জানি না। জাহাজে একটি ব্যায়ামাগার এবং একটি

গানের ঘর আছে, গানের ঘরে একটি পিয়ানো আছে। কোনো কোনো রাত্রে বায়োস্কোপ দেখানো হইত, কোনো রাত্রে বা নাচ-গান হইত। যাঁহারা ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল্ চড়া, দাঁড় টানা, বক্সিং করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত তাঁহারা ব্যায়ামাগারে নকল উপায়ে এইসকল ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে পারিতেন। অন্যেরা জাহাজের ডেকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই ব্যায়াম করিতেন। সমুদ্র যখন বেশী চঞ্চল হয় তখন বয়স্ক মানুষের হাঁটা দেখিতে ভারী মজার। অনেকে বই ও মাসিক পত্রাদি পড়িয়া অধিকাংশ সময় কাটাইত। আমি Theory of Relativity (আপেক্ষিকতা তত্ত্ব) বিষয়ে একখানা ছোট বই এবং বার্ণার্ড শ'-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকাসহ সেণ্ট্ জোয়ান্ পড়িয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইতাম। অনেক যাত্রী পানাগারে খুব আনাগোনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, কয়েক জন ভারতবাসীও তাহার ভিতর ছিলেন। নির্দ্দোষ রকম একপ্রকার বাজি-খেলাও চলিত, যথা আজ দিনে জাহাজ কয় মাইল চলিবে, ইত্যাদি।

জাহাজে wirelessএর যন্ত্রপাতি খাটানো ছিল। এডেন্ বন্দরে ঢুকিবার কয়েক ঘণ্টা আগে আমি বাড়ীতে একটি বেতারবার্ত্তা পাঠাইয়াছিলাম। ষ্টীমার এডেনে অনেক রাত্রে পৌঁছিয়া ভোর হইবার পূর্ব্বেই বন্দর ছাড়িয়া যাইবে শোনা গিয়াছিল বলিয়া আমি আগেই খবর দিয়াছিলাম। কিন্তু ছাড়িবার সময় জাহাজ দিন হইবার পর এডেন্ ছাড়িল। বেতারযন্ত্রী লোকটি একদিন—সম্ভবত ৬ই কি ৭ই আগষ্ট—বলিল যে, স্যর জে, সি, বোসের ইংলণ্ডে প্রচণ্ড একটি বক্তৃতা বিষয়ক খবর চারিদিকে প্রেরণ করা হইতেছে; পরে আচার্য্য বসুর নিকট শুনিয়াছিলাম, ইহা ব্রিটিশ এসোসিয়েশানে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার খবর। বেতারযন্ত্রী আর-একদিন বলিল যে, কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার খবর চারিদিকে পাঠানো হইতেছে।

ভারত মহাসাগরে

এডেন্ পৌঁছিতে আমাদের সাত দিন লাগিয়াছিল। বর্ষার আগমনে ভারত মহাসমুদ্রের ঢেউগুলির দুর্দ্দান্ততা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, মাঝে মাঝে জলকণা উচ্চতম ডেকেও গিয়া পৌঁছিতেছিল। জাহাজের দোলানি বিষম রক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সামান্য কয়েকজন ছাড়া যাত্রীরা সকলেই সমুদ্র-পীড়ায় (sea-sickness) শুইয়া পড়িয়া নিজ নিজ কেবিনে বন্দী হইয়া ছিলেন। এ রোগের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় আমার মনে এবিষয়ে একটু ভয় ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ জাহাজের সকল যাত্রী অপেক্ষা বয়সে বৃদ্ধ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে আমায় একটুকুও কষ্ট পাইতে হয় নাই। ভারত মহাসাগর আমার প্রতি সদয় ছিলেন। শুনিলাম, ইংলিশ চ্যানেলে এখনও আমার ভাগ্য-পরীক্ষা বাকি আছে। কিন্তু ভাগ্যগুণে চ্যানেল্ও সদয় হইলেন। আশা করি, কাল যখন আবার চ্যানেল্ পার হইতে হইবে তখনও তাহার দয়ার অভাব হইবে না।

ভারত-সমুদ্রের জলের রং দেখিয়া আমি প্রথম বুঝিলাম, কেন সমুদ্রযাত্রাকে কালাপানি পার হওয়া বলে। জলের রংটা বিশ্রী-রকম ঘন কালো। আমার অকবিজনোচিত চোখে ভারতসমুদ্র ফুটন্ত আল্কাতরার একটা বিরাট্ কটাহের মত লাগিতেছিল। এডেন্‌বন্দরে ও তাহার নিকটে সমুদ্রের রং ঘোলাটে ফিকে সবুজ।

লোহিত সাগরে

লোহিত সমুদ্রের কাছে জল উজ্জ্বল ঘন নীল হইয়া আসিয়াছে। ভূমধ্য সাগর ও আড্রিয়াটিক্ সাগরের রংও নীল। সর্ব্বত্রই ঢেউএর মাথা যখন ফেন-পুঞ্জে ভাঙিয়া পড়ে, তখন মনে হয় যেন গলিত মরকতের একটি স্তর ঢেউগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। লোহিত সমুদ্রে লোহিত রং এককণাও কোথাও দেখিলাম না; আগা-গোড়াই নীল। ভারত মহাসাগর পার হইবার সময় অন্য কোন জাহাজ চোখে পড়ে নাই। পরে দূরে কয়েকটি দেখিয়াছিলাম। জাহাজ যখন তীর হইতে শত শত মাইল দূরে তখন জীবিত প্রাণী বলিতে দেখিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি উড়ুক্কু মাছ, শুশুকের ঝাঁক ও দু'টি পাখী। পাখী দু'টি জাহাজের উপর কোথাও বসিয়াছিল কি না জানি না, তবে জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গেই যে তাহারা আসিতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।

লোহিত সমুদ্র পার হইবার সময়কার গরমের কথা

বোধ হয় বাড়াইয়া বলা হয়। দিনের বেলা কোন সময়ই গরম অসহ্য হয় নাই, কারণ, ডেকে সমস্তক্ষণই জোরে হাওয়া বহিতেছিল। কেবল দুই রাত্রি আমি কেবিনে বড় অসোয়াস্তি বোধ করিয়াছিলাম। অল্পবয়স্ক যাত্রীদের মধ্যে অনেকে ডেকের বেঞ্চির উপর ঘুমাইয়া ছিল।

জাহাজে জাতিভেদ

জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী যাত্রীদের ভিতর একটা জাতি-ভেদ আছে, বোধ হইল। দুই দলের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। বয়স ও শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে প্রথম শ্রেণীর একটি একহারা কেবিন লইতে হইলেও এই সর্ব্ববিষয়ে ভেদরক্ষা আমার ভাল লাগে নাই।

পোর্ট সৈয়দ

পোর্ট সৈয়দে শুল্ক-বিভাগের আইনের (Customs) কতকগুলি বিশ্রী রূপ দেখিলাম। কতকগুলি যাত্রী সেখানে অল্পক্ষণের জন্য নামিয়া সহরের ভিতর গেলেন। জেঠি হইতে সহরে ঢুকিবার দরজায় তাঁহাদের কোট ও প্যাণ্টালুনের পকেটগুলি টিপিয়া-টিপিয়া দেখা হইল, কাহাকেও বা টাকার ব্যাগ খুলিয়াও দেখাইতে হইল। আমি যতটা দেখিতে পাইলাম, সহরটি কিছু কুৎসিৎ নয়। দোকানগুলি ভাল। সেখানে কতকগুলি সিন্ধী বণিক আছেন। বইয়ের দোকান সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। বই এবং মাসিক ও দৈনিক পত্রগুলি হয় ইংরেজী নয় ফরাসী। অনেক 'কাফে' (কাফিখানা) ও রেস্তোরাঁ আছে। এদেশেও যাত্রীদের জীবন দুর্বিষহ করিবার জন্য "পাণ্ডা"র (tout) অভাব নাই।

আমরা কেহই সুয়েজে নামি নাই, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দূর হইতে সহরের বাড়ীগুলি আমার চোখে বড় বড় প্যাকিং বাক্সের মত লাগিতেছিল। আর-একটু কাছে আসিয়া সহরটি বেশ সাজানো-গোছানো মনে হইল। খালটা বেশী চওড়া নয়। জাহাজ এখান দিয়া অত্যন্ত ধীরে যায়।

উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ

এডেনের আগে হইতে এবং ভূমধ্য সাগরে পৌছানোর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায়ই আফ্রিকা ও আরবের উপকূল দেখা যাইতেছিল। বেশীর ভাগই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বৃক্ষ-লতা-হীন পর্ব্বত মনে হইল। দূর হইতে পেরিম্ দ্বীপ দেখিলাম। বলা বাহুল্য, ইহা ব্রিটিশরাজের কেল্লা ও সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত।

ভূমধ্য সাগরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় কতকগুলি গ্রীসীয় দ্বীপ দেখিলাম। অ্যাড্রিয়াটিক্ হইতে প্রায়ই ইতালীর কূল দেখিতে পাইতাম।

সমুদ্রযাত্রীর একঘেয়ে জীবন

সমুদ্র-যাত্রীর জীবন আমার বড়ই একঘেয়ে লাগে। মানবজগৎ ও মানবজাতির সঙ্গে সকল যোগসূত্র যেন ছিন্ন হইয়া যায়। সমুদ্র আমাদের দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা বুঝিবার সুযোগ আনিয়া দেয়। আমাদের প্রতিদিনই ঘড়ি ঠিক করিতে হইত।

জলে ও স্থলে

স্থলে নির্জ্জনে থাকার সহিত মাঝ সমুদ্রে জাহাজে থাকার অনেক প্রভেদ। স্থলবাসী একলা মানুষ ঘরের ভিতর বন্দী না থাকিলে ইচ্ছা করিলেই যে-কোনো দিকে যাইতে এবং মানুষ অথবা পশু-পক্ষীর, অন্তত পক্ষে গাছ পালার সঙ্গ লাভ করিতে পারে। কিন্তু জাহাজের যাত্রী তখনকার মত কারাবন্দী। তাহার কোনোই স্বাধীনতা নাই।

যতগুলি সমুদ্র পার হইলাম, তাহার ভিতর ভারত সমুদ্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিস্তীর্ণ। কিন্তু অনন্তের চিন্তা ভারত সমুদ্র আমার মনে জাগায় নাই। সমুদ্র যখন শান্ত হইয়া আসিল এবং চারিধারের কুয়াসা কাটিয়া গেল তখন স্থির সমুদ্রের অসীম জল-বিস্তার আমার মনে অনন্তের চিন্তা জাগাইয়া তুলিল।

এক-এক সময় সমুদ্রের জল তৈলের ন্যায় স্থির ও মসৃণ দেখাইতেছিল।

সুয়েজে

সুয়েজে কতকগুলি আরব ফেরিওয়ালা নৌকা করিয়া আসিয়া জাহাজে উঠিল, অনেকে নৌকা হইতেই জাহাজে

জিনিষ বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের পণ্য-দ্রব্য বেশীর ভাগ পুঁথির মালা। দর-কষাকষিতে তাহারা অদ্বিতীয়। সুয়েজে একটি আরব, জাহাজে উঠিয়া উপর হইতে দ্বিতীয় তলার ডেক্ হইতে বক্‌শিশের লোভে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল। তাহার ফলে যাত্রীদের কাছে সামান্য কিছু পাইল।

আরব সহযাত্রী

কতকগুলি আরব ডেকযাত্রী জাহাজে ছিল। ভারতীয় দরিদ্রতম মুসলমানদের চেয়েও তাহাদের কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। একজন শিক্ষিত সিরিয়ান্ আরবের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল; তিনি ফরাসী ও অল্প-স্বল্প ইংরেজী বলিতে জানেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত আমেরিকায় 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' বিষয়ে যে-বক্তৃতাগুলি পাঠ করিবেন সিরিয়ান্ ভদ্রলোকটি সেগুলি অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত তিনি কিঞ্চিৎ দর্শন আলোচনাও করিলেন।

ইতালীয়ান্ যাত্রী

ইতালীয়ান্ ডেকযাত্রী নিম্নশ্রেণীর নাবিক ও ভেনিসের সাধারণ লোকদের দেখিয়া আমার বোধ হইল, ইতালীয়ান্‌রা ইংরেজ ও ফরাসীদের মত সম্পন্ন জাতি নয়। অনেক ইতালীয়ান্ নাবিকের পায়ে জুতা নাই, অনেকের পায়ে পুরানো ছেঁড়া জুতা। অনেকের কাপড়-চোপড় ও শরীর দেখিয়া বোধ হয় তাহারা সচরাচর স্নান করে না এবং কাপড় কাচে না।

ভেনিসে

১৬ই আগষ্ট আমাদের ভেনিসে পৌছিবার কথা ছিল, কিন্তু আমরা পৌছিলাম ১৮ই। দেরী হওয়ার দোষটা বর্ষার ঘাড়ে চাপানো হইল। কিন্তু ভারত সমুদ্র ছাড়িয়া আসার পর ঝোড়ো হাওয়া মোটেই ছিল না। সত্য কথা বলিতে কি, জাহাজটির যবে যে-বন্দরে পৌছিবার কথা আগে হইতে বলা হইত, বাস্তবে একটি বন্দরেও সেদিন পৌছিতে পারে নাই। জানি না ভাল আব-হাওয়ার সময়েও সকল জাহাজেই এরকম সময়ের অনিয়ম হয় কি না।

লণ্ডন, ৩১ আগষ্ট ১৯২৬ র. চ

—

মেদিনীপুর বন্যা ও স্যার পি, সি, রায়

গত মাসের প্রবাসীতে লেখা হইয়াছিল যে, মেদিনীপুর বন্যা-স্থলে যাঁহারা সাহায্য-দান-কার্য্য করিতেছেন, স্যার পি, সি, রায়ের কমিটির লোক তাঁহাদিগের মধ্যে নাই—শুধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রাউত মহাশয় উক্ত কমিটির দ্বারা মেদিনীপুরে কয়েক শত টাকা লইয়া প্রেরিত হইয়াছেন এবং সাহায্য-কার্য্য কিছু করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ার পর স্যার পি, সি, রায়ের পক্ষ হইতে ইহার নানা-প্রকার প্রতিবাদ বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রতিবাদের স্থূল মর্ম্ম এই—প্রবাসীতে স্যার পি, সি, রায়ের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, কারণ, তাঁহার পক্ষ হইতে কার্য্য যথেষ্ট করা হইতেছে, ইত্যাদি। ইহাতে অবশ্য স্যার পি, সি, রায় "বেঙ্গল রিলিফ কমিটির" কয়েক লক্ষ টাকা খদ্দর-প্রচারের কার্য্যে ব্যয় করিয়া বন্যাদুঃস্থের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আমরা যে-মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার খণ্ডন চেষ্টা করা হয় নাই। শুধু মেদিনীপুরের দুঃস্থ লোকদের সাহার্য্যার্থে স্যার পি, সি, রায়ের পক্ষ হইতে যাহা করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ও সঠিক খবর আমরা দিই নাই বলিয়াই আমাদিগের দোষ ধরা হইয়াছে। খবর সর্ব্বদা সঠিক পাওয়া আমাদিগের অথবা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা স্যার পি, সি, রায়ের তরফ হইতে **কোন সংবাদ পাই নাই বলিয়াই** তাঁহার উপর হয়ত অবিচার করিয়াছি। কিন্তু খবরটা তাঁহাদের আমাদিগকে যথা সময়ে দেওয়া উচিত ছিল—তাহা দিলে কোন অবিচারের সম্ভাবনা থাকিত না। আমরা একজন গণ্যমান্য কর্ম্মীর নিকট হইতেই খবর পাইয়া গত মাসের বন্যার খবর লিখিয়াছিলাম। তিনি যে আমাদিগকে স্বেচ্ছায় ভুল সংবাদ দিয়াছিলেন, এধারণা

আমাদিগের নাই। তাহা ছাড়া আমাদিগের সংবাদ-দাতার অথবা আমাদিগের, স্যার পি, সি, রায়ের উপর স্বেচ্ছায় অবিচার করিবার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। দেশের কার্য্য উত্তমরূপে হইলেই আমরা সুখী হইব, তা সে-কার্য্য যিনিই করুন না কেন। নীচে আমরা স্যার পি, সি, রায়ের সহযোগী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে মেদিনীপুরে রায়-মহাশয়ের কমিটির কার্য্যের যে "সঠিক ও সম্পূর্ণ" তালিকা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আমরা, উক্ত কমিটি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রাউতের মারফত মাত্র ৮৫০৲ বন্যার সাহায্যার্থে ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া যে-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ ও সঠিক হয় নাই। ৮৫০ এর অধিক টাকা স্যার পি, সি, রায়ের কমিটি ব্যয় করিয়াছেন। এই তালিকা হইতে আরও বুঝা যাইবে যে, স্যার পি, সি, রায় বন্যা-দুঃস্থের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট অর্থ জন-সাধারণের নিকট পাইতেছেন না। ইহার কারণ জন-সাধারণ, স্যার পি, সি, রায় উত্তর-বঙ্গের বন্যার সময় সংগৃহীত অর্থ ভবিষ্যতে বাঙ্গালার বন্যা-দুঃস্থের সাহায্যার্থে মজুত না রাখিয়া খদ্দরের উৎসাহে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর আস্থা হারাইয়াছেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক, বন্যা-দুঃস্থের দুর্দ্দিনে আমাদিগের সকলের দোষত্রুটি ভুলিয়া সাহায্য-কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। দেশবাসী সকলে একথা নিঃসন্দেহ স্মরণ রাখিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে যে-"রিপোর্ট" পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতেছি যে, স্যার পি, সি, রায়ের রিলিফ্ কমিটি নিম্নলিখিত রকম সাহায্য মেদিনীপুরে দান করিয়াছেন।

কাঁথি কংগ্রেস কমিটি—	১৫৭৫৲
ভগবানপুর কেন্দ্র—	১২৫০৲
তমলুক নন্-অফিসিয়াল্ রিলিফ্ কমিটি—	৬০৭৷৷০
ও ৪২ মণ চাল ও	২০০৲
সবং কেন্দ্র—	৩০০৲
ও	১৫০৲
গোপীনাথপুর কেন্দ্র, কমলকৃষ্ণ রায় মারফত—	১০০৲
ও	১৫০৲
বিরুলিয়া কেন্দ্র—	১০০৲
কাঁথির উকিল-সম্প্রদায়	২০০৲
কংগ্রেস কর্ম্মীসংঘ—	২২৫৲

মোট ৪২ মণ চাল ও ৪৮৫৭৷৷০ টাকা

উপরের তালিকা অনুসারে দেখা যায় যে, স্যার পি, সি, রায়ের কমিটি উত্তর-বঙ্গ বন্যার সময় যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বন্যায়, সম্ভবতঃ অর্থাভাবে, সেরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। শুনিতেছি, কর্ম্মীর অভাব নাই। অর্থ চাই অনেক। এবিষয়ে মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি জনসাধারণের সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা এ সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত হইবেন না।

—

স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের বদান্যতা

ইংলণ্ডের মরনিং পোষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ যে, স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, জি, পি, জ্যাকম্-হুড্ নামক শিল্পীকে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখিবার উদ্দেশ্যে লর্ড লীটনের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই চিত্র শেষ হইবার পর শিল্পী ভারতবর্ষে গমন করিবেন এবং সেখানে স্যার প্রদ্যোতকুমার ও তাঁহার পরিবারের কাহার কাহার চিত্র অঙ্কন করিবেন। বর্দ্ধমানের মহারাজার চিত্রও তিনি আঁকিবেন।

উপরের সংবাদ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই দরিদ্র দেশের কোন লোকের অর্থে লর্ড্ লীটনের চিত্র অঙ্কিত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের লোক। তাঁহার ধন-সম্পত্তি ভারত ও বঙ্গ-সমাজস্থ জনসাধারণের সহিত বসবাস করিয়া ও তাঁহাদিগের সাহায্যেই অর্জ্জিত হইয়াছে। সুতরাং স্যার প্রদ্যোতকুমারের যদি খরচ করিবার জন্য অতিরিক্ত টাকা কিছু থাকে তাহা হইলে

সে-টাকার উপর প্রধান দাবী নিরক্ষর ও রোগক্লিষ্ট ভারতবাসীর। লর্ড লীটনের ছবি তিনি আঁকাইয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখাইলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই—তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস, স্যার প্রদ্যোতকুমারের ন্যায় শিক্ষিত ও আদর্শসেবী লোকের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট্‌কে খুসী করিবার লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব নহে। অবশ্য এখন হইতে পারে যে, স্যার প্রদ্যোতকুমার চিত্র-শিল্পের উন্নতি কামনা করিয়াই অর্থব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু সেরূপ হইলেও বিদেশী শিল্পীকে দিয়া একজন বিদেশীর চিত্র অঙ্কন করাইলে সে-আদর্শ সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, আমাদের দেশে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর আছেন। তাঁহাদিগের যে-কোন জনের পক্ষে লর্ড লীটনের অথবা স্যার প্রদ্যোতকুমারের চিত্র অঙ্কন অসম্ভব নহে তাঁহাদিগের কার্য্যও যে জ্যাকস্‌-হুড্‌ সাহেবের কার্য্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইত এরূপ আমাদিগের বিশ্বাস নহে। সুতরাং তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশীকে কার্য্যভার দেওয়া স্যার প্রদ্যোতকুমারের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

দেশবাসী সকলের—দরিদ্র ধনী নির্ব্বিশেষে—উচিত, পরস্পরের যথাসাধ্য সাহায্য করা। এ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে দেশের উন্নতি সম্ভব হইবে না।

—

বেকার সমস্যা ও সরকারী পন্থা

বাংলা দেশের বহু শিক্ষিত যুবক বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি আমরা সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, কলিকাতা পুলিশের জন্য অনেকগুলি সার্জেণ্ট্‌ প্রয়োজন। ইঁহাদের বেতন ১৫০৲ হইতে ৩৫০৲ অবধি হইবে এবং ইহা ব্যতীত নানান বাবদে ইঁহারা আরও কিছু পাইবেন। যাঁহারা এই কার্য্যের জন্য উমেদারী করিবেন, তাঁহাদিগের প্রথমত দেহের লম্বাই অনূ্যন ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ছাতির পরিধি নিম্ন পক্ষে ৩৬ ইঞ্চি হওয়া চাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের হওয়া চাই "ইয়োরোপীয়"। এইসকল সার্জেণ্ট্‌গণ সাধারণত যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষিত লোক হইয়া থাকেন। সুতরাং ইয়োরোপীয় ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণেরই জন্য এই কার্য্য বিশেষ করিয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদিগের কথা হইতেছে এই যে, আমাদিগের স্বদেশবাসী বহু শিক্ষিত যুবক—তাঁহাদিগের কেহ কেহ যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষিতও বটেন—বর্ত্তমানে বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন। ইঁহাদিগকে যদি সার্জেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে সার্জেণ্ট্‌দিগের বর্ণ ময়লা হইলেও কার্য্য উত্তমরূপে ও কম খরচায় হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, এইসকল সার্জেণ্টের কার্য্যে যাহাতে অবিলম্বে উপযুক্ত বাঙালী যুবককে রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহার জন্য চেষ্টা অন্তত "পোলিটিসিয়ান্‌" মহলে হওয়া দরকার। ইহাতে আমাদের জাতীয় দৈন্যও যৎকিঞ্চিৎ দূর হইবে, এবং তদপেক্ষা অধিক দূর হইবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্ববাদ এবং আমাদিগের অক্ষমতার দুর্ণাম।

—

ঝুঁসি দাঙ্গা "কেসের" বিচার

ঝুঁসি দাঙ্গার "কেসে" অভিযুক্ত ছিল ৪৯ জন হিন্দু। তাহারা অপরাধী ছিল (নালিশ-মত) দাঙ্গা করা ও নরহত্যা করার জন্য। এই দাঙ্গায় গত বক্‌রিদের সময় নয় জন মুসলমান আহত ও একজন মুসলমান হত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেশন্‌স্‌জজ শ্রীযুক্ত ডি, সি, হাণ্টার্‌ উক্ত ৪৯ জন আসামীর মধ্যে ৬ জনের ফাঁসির ও ত্রিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিয়া সুবিচারের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকার-বাহাদুর যে দাঙ্গাহাঙ্গামা থামাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, তাহার প্রমাণ উপরোক্ত হিন্দুগণের শাস্তির মাত্রার মধ্যে অব্যর্থ পাওয়া যাইতেছে। ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা ব্রিটিশের আদর্শ রাষ্ট্রীয় পন্থা। আমরা ইহার সত্যতার প্রমাণ পাইলেই জনসাধারণের নিকট সে-প্রমাণ সর্ব্বদা উপস্থিত করিবার চেষ্টা করি।

—

আই-সি-এস্, পরীক্ষায় বাঙালীর কৃতিত্ব

একজন বাঙালী আই-সি-এস্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন বলিয়া অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু আমরা একটা কথা এই সূত্রে বলিতে চাই। এই কৃতিত্ব যিনি প্রথম হইয়াছেন সম্পূর্ণ তাঁহার, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির নহে; কারণ তাঁহার নীচে ১৫ জনের ভিতর আর কোন বাঙালীর নাম নাই। আই-সি-এস্ ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষাতেও বাঙালী হটিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক শিক্ষাকে সস্তা ও সহজ করণ।

শ্রীযুক্ত রম্যা রলাঁ ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী-সম্পাদক ও রম্যা রলাঁ

সম্পাদক-মহাশয় জেনিভায় কাজ করিতে করিতে ইউরোপের ভাবুক-শিরোমণি মহাত্মা রম্যা রলাঁর নিমন্ত্রণ পান; জেনিভা হইতে দুই ঘণ্টা রেল-পথে যাইয়া ভিল্নুভ্ (Villeneuve) পৌছাইয়া সম্পাদক Villa Olga ভবনে রলাঁদের অতিথি হন। রলাঁর পিতার বয়স ৯০ বৎসর; তিনি এখনও সুস্থ শরীরে কাজ-কর্ম্ম করেন এবং বাগানে গাছপালা লইয়া ব্যস্ত থাকেন; তিনি, তাঁর

শ্রীযুক্ত রম্যা রলাঁ, শ্রীযুক্ত রম্যা রলাঁর পিতা, শ্রীযুক্ত রম্যা রলাঁর ভগ্নী

রলাঁ পরিবারে অতিথি। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া (বাম দিক্ হইতে)—এস সি গুহ, মিসেস্ রজনীকান্ত দাস, ডক্টর রজনীকান্ত দাস।
বসিয়া (বাম দিক্ হইতে)—কুমারী রলাঁ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রম্যাঁ রলাঁ।

একমাত্র কন্যা বিদুষী মাদলেন রলাঁ ও স্বয়ং রলাঁ, সম্পাদককে তাঁদের উদ্যান-বাটিকায় অভ্যর্থনা করেন; রলাঁর ভগ্নী ইংরেজী বেশ জানেন এবং রলাঁর সহিত সম্পাদক-মহাশয়ের কথাবার্ত্তায় দোভাষীর কাজ করেন; নানা আন্তর্জাতিক সমস্যা ও অন্য গভীর প্রসঙ্গ লইয়া সম্পাদকের সহিত রলাঁ মহোদয়ের আলাপ হয়। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির যোগ সহজেই স্থাপিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে জেনিভা হইতে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে রলাঁ সম্পাদকমহাশয়কে অনুরোধ করেন। রলাঁ তাঁর লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখাইয়া বাগানে তাঁর পিতা ও ভগ্নীর সহিত সম্পাদকের কতকগুলি ফোটো তুলিয়া লন। তার মধ্যে তিনখানি ছবি প্রবাসীর পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। ডক্টর্ রজনীকান্ত দাস মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী সযত্নে সম্পাদক-মহাশয়কে শ্রীযুক্ত রলাঁর নিকট লইয়া যান।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের কথা

আমরা দরিদ্র দেশের লোক। আমরা যাহা উপার্জ্জন করি, তাহার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট খাটিতে ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়। আমাদিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক কষ্ট করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এরূপ লোকও আমাদিগের দেশে অনেক আছে। এইসকল কারণে যখন আমরা দেখি যে, কোন ব্যক্তি জন-সাধারণের অর্থ যতটা বেতন অথবা অন্য কোন নামে গ্রহণ করিতেছে, তাহার উপযুক্ত শ্রম করিতেছে না, তখন আমাদিগের সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহা মধ্যে যদি এমনও দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি অল্প শ্রম আইনতই করিতেছে—ফাঁকি দিয়া নহে—তাহা হইলে আমাদিগকে সেই অল্প-শ্রমের প্রশ্রয়দাতা আইনের বিরুদ্ধেই বলিতে হয়। কারণ, আইন মানুষের উপকারের ও সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ আইনের সুবিধার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।

বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন প্রধান অধ্যাপক, বিনা বা অল্প শ্রমে ভারি ভারি বেতন ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের অধ্যাপনার বিষয়ে যে খুব নিত্য নূতন

তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন বা ছাত্রদিগকে তদ্রূপ করিতে সাহায্য করিতেছেন, তাহাও খুব জোরের সহিত বলা যায় না। তাঁহাদিগের ভিতর অনেকে অধ্যাপনা ব্যতীত অপর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জাতীয় শিক্ষার উন্নতির পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছেন। ইঁহারা যে বে-আইনী কাজ করিতেছেন, অথবা কোন-প্রকার ফাঁকির মধ্যে যাইতেছেন, একথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ইঁহাদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা এরূপভাবে, যে কারণেই হউক না কেন, করা হইয়াছে, যাহাতে ইঁহারা নিজেদের দ্বারা গৃহীত অর্থের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট কার্য্য বঙ্গীয় ছাত্রসমাজের শিক্ষার্থে করিতেছেন না। সুতরাং আমাদের মতে এইসকল অধ্যাপকদিগকে হয় নূতন নিয়ম করিয়া যথেষ্ট কার্য্য করান প্রয়োজন, নয় অবিলম্বে কার্য্য হইতে অবসর লইতে বলা দরকার।

—

শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ

শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "হার্ডিঞ্জ্ প্রফেসর অফ্ পিওর্ ম্যাথেম্যাটিক্‌শ্"। তিনি ১০০০৲ বেতন পান। তিনি এক সময় গণিতে সুনাম অর্জ্জন করিয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রীতিভাজন হন ও এই কার্য্যে বহাল হন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য যাহা করেন, তাহা অতিশয় অল্প। তিনি অধিকাংশ সময়—প্রায় বছরে ১১ মাস—কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করিয়া নানা-প্রকার কাউন্‌সিল্ প্রভৃতির সভ্যরূপে গণিত-বিবর্জ্জিত বক্তৃতা ও তর্কে সময় অতিবাহন করিয়া থাকেন। ইহাতে আইনতঃ তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন না।

আমাদিগের মত্ এই যে, যে-আইন তাঁহাকে মাসে ১০০০৲ বেতন লইয়া, কোন জমিদারীতে অনুপস্থিত জমিদারের মতই বাহিরে বসিয়া যথেচ্ছা দিন কাটাইতে দিতেছে, সে-আইন অবিলম্বে পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজন। এ দরিদ্র দেশে এরূপ চাকুরীর স্থান হওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ যে একেলাই এইরূপ "জাইগির" উপভোগ করিতেছেন, এমন নহে। আরও কোন কোন অধ্যাপক আছেন, যাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া নিজেদের নিম্নস্থ অল্প-বেতনভোগী পরিশ্রমী "লেক্‌চারার্"দিগের কার্য্যে ব্যাঘাত দেওয়া ব্যতীত অপর কার্য্য বিশেষ করেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আধুনিক মতানুসারে উচ্চশিক্ষার কার্য্য চালাইবার অনুপযুক্ত। কেহ যে-বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, সে-বিষয়ে সুশিক্ষিত নহেন, কেহ বা ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের পরে নিজের অধ্যাপনার ক্ষেত্রে যে নূতন জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাহার সহিত সকল সম্পর্ক বিবর্জ্জিত ভাবে অধ্যাপকের আসন ভোগ-দখল করিতেছেন। এসকল সামাজিক ক্ষতিকর অবস্থার প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

—

গত ষাণ্মাসিক সূচী

১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাসের সূচী প্রস্তুত আছে; কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যার সহিত তাহা দেওয়া গেল না, আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যার সহিত দেওয়া হইবে।

—

পূজার ছুটি

আগামী ২৪এ আশ্বিন হইতে ৭ই কার্ত্তিক অবধি প্রবাসী-কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। ঐ সময়ের মধ্যে চিঠিপত্র আসিলে তাহার জবাব ৭ই কার্ত্তিকের পর দেওয়া হইবে।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ৯১নং আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
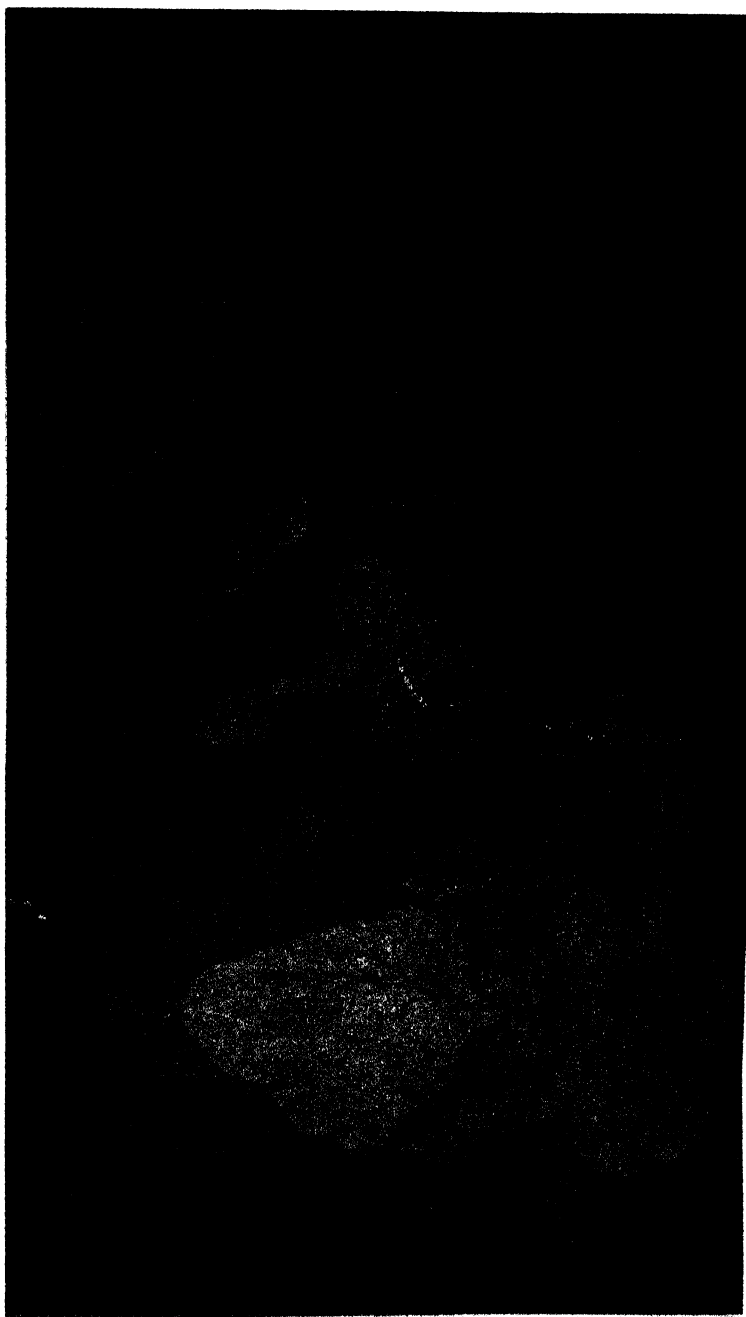
অশোক ও উপগুপ্ত
শিল্পী শ্রী পুলিনবিহারী দত্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

২য় সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(৪৯)

লণ্ডন
২৭ এ জুন, ১৯০২

বন্ধু,

তোমার আহ্বান আমাকে দেশের দিকে টানিতেছে—শীঘ্রই তোমাদের সহিত দেখা করিব, এই মনে করিয়া মন উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে।

তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া যশ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তোমার নিকট উৎসাহের কথা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাকচিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে, তাহার ভিতর দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি—'পুণ্যই' আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্ট লাভ করিব না।

আমি একবার মনে করিতেছি, শীঘ্রই দেশে আসিব। আবার মনে হইতেছে, আর কয়মাস থাকিয়া আমার মত্ প্রচার করিয়া ফিরিব। এতদিন সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ছিলাম;—তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্ব্বত্রই জয়-সংবাদ। তোমার নিকট তিনখানা পুস্তিকা পাঠাই। তারিখ দেখিলে বুঝিবে ইহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হয়, এক বৎসর পরে গৃহীত হইল। জড়ের স্পন্দন সম্বন্ধে গত বৎসরের ঘটনা জান। পুনরায় এবৎসর Royal Societyতে আসিয়াছিলাম। এবার অনেক তর্কের পর আমার মতেরই জয় হইয়াছে—R. Society সত্বরই তাহা প্রচার করিবেন। Linn. Society উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আমার আবিষ্কার প্রকাশ করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Photographic Society হইতে আহুত হইয়া photography সম্বন্ধে আমার নূতন মত্ বিষয়ে বক্তৃতা করি, তাহাতে অনেকে নূতন তত্ত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। President

বলিয়াছেন, It will produce a revolution about our ideas of photography। আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি। বন্ধু, আমি এইবার নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়াছি। ইহার অন্ত কোথায়? মানুষের মন যে আর ধারণা করিতে পারে না।

তোমার
জগদীশ

(৫০)

১৮ই জুলাই, ১৯০২

বন্ধু,

সোমবার দিন তোমার পত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, পাইয়া সুখী হইয়াছি।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমরা ক্রমাগত এই সংসারের পাকে ঘুরিতেছি, একথা ঠিক্। মাঝে মাঝে এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃতের সন্ধান পাই। রৌদ্র ও মেঘের ছায়া ক্রমাগত আমাদের হৃদয়পটে একে অন্যের অনুধাবন করিতেছে।

ইহার মধ্যে থাকিয়াই যাহা করিবার করিতে হইবে।

অনেক অকাজ লইয়া কখন কখন প্রকৃত কার্য্যের অনুসন্ধান পাইব।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অজানার মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে।

সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কথার জাল ও অকর্ম্মের জাল আমাদিগকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। দুইদিন পরে অকৃতার্থতার জন্য আমরা বিমর্ষ হইব না।

তবে একটা সামঞ্জস্যের আবশ্যক। তোমাকে যিনি গান গাহিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহারই জন্য গান গাহিবে। ইহাই তোমার মন্ত্র। এই অস্ফুট ভাষাতেই তুমি জীবন স্ফুটিত করিবে।

আমাদের যাহার যা-কিছু শক্তি আছে তাহাই যেন নিয়োজিত করিতে পারি। আমাদের সমস্ত শক্তি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যাহা কিছু আছে তাহাই যেন পূজার জন্য দিতে পারি।

কিন্তু বলা ও কার্য্যের আড়ম্বরে যেন আমরা প্রকৃত ভুলিয়া না যাই। এইজন্যই তুমি যে-আশ্রম করিয়াছ তাহার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিব। কেবল বাহির লইয়া থাকিবার বিড়ম্বনা এদেশে দেখিতেছি। বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য কি করিলে হয় তাহা আমাকে জানাইও।

আমার পুস্তকের শেষ প্রুফ লইয়া ব্যস্ত আছি। আর ৩।৪ সপ্তাহে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রুফ দেখিবার সময় গত দুই বৎসরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হই। আমার এই দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণীয় হয়। মনে করিয়াছিলাম উৎসর্গপত্রে লিখি—

To my countrymen
Who will yet claim
The intellectual heritage
Of their ancestors.

কিন্তু বন্ধু, এমন কথা বলিতেও লজ্জিত হইতে হয়। তোমরা আমার হৃদয়ের কামনা বুঝিয়া লইও।

এই সঙ্গে ক্ষুদ্র দুইখানা পুস্তিকা পাঠাই।

আরও দুএকটি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু অনিশ্চিততার মধ্যে মনের দৃষ্টি যেন চলিয়া গিয়াছে।

তোমার
জগদীশ

(৫১)

London (?)
26th July, 1902 (?)

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বহুদিন পূর্ব্বে জেনারেল্ এসেম্ব্লিতে আপনার একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, এতদিন পরে আপনার নৈবেদ্য ও বঙ্গদর্শনে সেইসব কথা স্পষ্ট রূপে প্রকটিত দেখিয়া আমরা কত সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না।

বঙ্গদর্শন আপনি হাতে লইয়াছেন দেখিয়া ও গত দুই সংখ্যা পড়িয়া আশা হইতেছে যে, আপনার আহ্বানে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত উচ্চ আশাগুলি একমুখী হইয়া বঙ্গদর্শনে প্রচারিত হইবে এবং বঙ্গদেশে নূতন যুগের উদয় হইবে।

নৈবেদ্যের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি। এত ভাল লাগিয়াছে যে, ভুল-চুকের নানা আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনাকে তাহা না জানাইয়া পারিলাম না।

আশা করি, আপনার সহধর্ম্মিণী সন্তানসহ কুশলে আছেন। বেলার শুভবিবাহ ও স্বামী-সৌভাগ্যের সংবাদ পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

এখানে বাঙ্গালী ছেলেরা অধ্যাপক মহাশয়কে একটি ভোজ দিয়াছিল, তাহার বিবরণ মুকুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। যদি পাঠাইতে পারি তবে পড়িয়া দেখিবেন। অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল, বৃদ্ধ নৌরোজী ও রমেশ-বাবু তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, ১৬ জন মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। Holborn Restaurant-এ সম্মিলন হয়।

আপনি ও আপনার সহধর্ম্মিণী আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানিবেন।

নিবেদিকা
শ্রী অবলা বসু

(৫২

লণ্ডন
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২

বন্ধু,

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এতকাল চিঠি না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। তোমার অসুখ সারিয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

কবি চির-যৌবন লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং জরা তোমাকে স্পর্শ করিবে না।

তোমার সহিত কত বিষয় বলিবার আছে তাহা অনেক দিনেও ফুরাইবে না। তোমার গৃহে আমার জন্য একটুকু স্থান রাখিও। বাহিরের কোলাহল, মিথ্যা বাদ-বিসংবাদ হইতে পলায়ন করিয়া তোমার সহিত একত্বের অন্বেষণ করিব।

এ কয়মাস জার্ম্মেনী ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তথায় যাইতে হইলে আর-এক বৎসর ছুটি লইতে হয়। ইণ্ডিয়া অফিসে সে-বিষয়ে বড় উৎসাহ পাইলাম না, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেও রুচি হইল না। একবার ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দীর্ঘ প্রবাসের জন্য বাহির হইব, এই আশা করিতেছি। অন্য কারণেও ইহা শ্রেয়ঃ। কারণ, এখানে যে-বাধা পাইয়াছিলাম, এখানে থাকিয়াই তাহা ভগ্ন করিব। আমার প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিলে আমি শান্তি পাইতাম না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, এতদিনের বিরুদ্ধগতি অনুকূল হইয়াছে। সে-দিন Natureএর leading articleএ লিখিত ছিল, The Eastern mind coming fresh and untrammelled to the work has taught us, etc.। Royal Society এখন আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। British Association হইতে সসম্মানে আহুত হইয়াছি। Botanical Sectionএর President লিখিয়াছেন—

"আমি Plant Physiology সম্বন্ধে যে-পুস্তক লিখিয়াছি, তাহার অপূর্ণতা দ্বিতীয় সংস্করণে আপনার আবিষ্ক্রিয়ার দীর্ঘ বিবরণ দিয়া পূরণ করিব।"

নূতন বিষয় অভ্যস্ত হইতে কতকটা সময় লাগে, সুতরাং সম্মুখের বৎসরে তাহা অভ্যস্ত হইলে আরও নূতন তথ্য প্রচারের সহায়তা হইবে। নতুবা অনেকগুলি নূতন বিষয় একবার গ্রহণ করিতে মানসিক জড়তা বাধা দেয়।

এই চিঠি পাইবার পক্ষান্তে তোমাদের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে। ১৯এ সেপ্টেম্বর রওনা হইব, কলিকাতা ৫ই কি ৬ই অক্টোবর পৌঁছিব। বোম্বাই হইতে তোমাকে telegraph করিব। তোমার সহিত যেন অগোণে দেখা হয়।

দুই বৎসরের পর তোমাদের সহিত দেখা হইবে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমাকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা যদি কিয়ৎপরিমাণে পূরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সুখী হইব।

তোমার
জগদীশ

অনেকগুলি নূতন কবিতা ও গল্প ফরমাইস্ রহিল। আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটিকে ক্রোড়ে লইয়া সুখী হইব।

(৫৩)

লণ্ডন

১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯০২

বন্ধু,

মনে করিয়াছিলাম এ সপ্তাহে দেশে রওয়ানা হইব। আমার সহধর্ম্মিণীর হঠাৎ অসুখের জন্য তাহা হইল না। আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনি আরাম হইবেন, এরূপ আশা করিতেছি। আমরা ১১ই অক্টোবর কলিকাতা পৌঁছিব।

তোমার

জগদীশ

(৫৪)

দমদম

১লা জানুয়ারী, ১৯০৩

বন্ধু,

তুমি সেদিন আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিলে, আর আমায় ষ্টেশনে পুরা ১৷৹ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ১১টার সময় বাড়ী পৌঁছি। এখানে আসিয়া বুঝিতেছি, আরও কয়দিন থাকিলে ভাল হইত।

এ কয়দিন যেরূপ মনের ও শারীরিক শান্তিতে ছিলাম তাহা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে।

তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহা-বিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এসম্বন্ধে অনেক কথা আছে; আসিলে হইবে।

তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজ-সাধ্য—পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

নবদ্বীপ ত সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কাপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এসম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

আমার plan এই—

এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে Tibetএর Mss. ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীনদেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

এই প্রথম exploration হইতে অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোন্ কোন্ দিকে অনুসন্ধান কার্য্যকর হইবে, এই preliminary কাজ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এবিষয়ে আরও অনেক কথা আছে। তোমার সহিত শীঘ্রই যেন দেখা হয়।

কবিরয়ভের পরীক্ষা লইয়া হয়ত তুমি ব্যস্ত আছ। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে তুমি চেলা করিয়া লইও।

তোমার

জগদীশ

পুঃ—আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে। এরূপ অনুগ্রহের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

(৫৫)

কলিকাতা

১৬,৩,১৯০৩

বন্ধু,

তুমি হাজারিবাগ পৌঁছিয়াছ কি না জানি না। চিঠি পাইয়াই উত্তর দিও।

নূতন নলটা করিতে দেরী হইল। নিজ বাসভূমে আমি এখন পরবাসী, আমার মিস্ত্রী এখন অন্যের হাতে,

দু'একটু তাহার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এজন্যেই দেরী হইল। আমি parcel post কাল পাঠাইব, আশা করি নির্ব্বিঘ্নে পৌছিবে। রেণুকার খবর সর্ব্বদা জানাইও। যতদুর সম্ভব বাহিরে গাছ-তলায় উন্মুক্ত বাতাসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিও।

তোমার জন্য আমার মন ব্যাকুল থাকিবে। আমার পৃথিবীর পরিধি অতি ক্ষুদ্র। এই কয় বৎসরে তোমাকে অতি নিকটে পাইয়াছি তোমার ও আমার সুখ-দুঃখ যেন জড়িত হইয়া আছে। বাধা ও প্রতিকুল অবস্থাতেই যাহা প্রকৃত তাহা জানিয়াছি, তাহা না হইলে এ জীবন একেবারে নিস্ফল হইত।

তোমার কার্য্য যে ফলবান হইবে তাহার ঘুণাক্ষরে সন্দেহ নাই। এ উপলক্ষ্যে আমরাও দু'একটি প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাইব।

তোমার কিছু লেখা থাকিলে পাঠাইও। আমি এত লোকের মধ্যেও যেন একাকী—হাজারিবাগ আসিতে পারিলে কত সুখী হইতাম বলিতে পারি না—হয় আসিব। দেখ আমার এই মিথ্যা গোলমালে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না।

তোমার
জগদীশ

(৫৬)

Presidency College
১৭,৩,১৯০৩

বন্ধু,

আজ ওজোনের কল ডাকে পাঠাই। একদিকে যে-দুটি তার দেখিতেছ তাহার সঙ্গে রুমকর্ফ কয়েল্ লাগাইও। মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বাতাস নিতে হইবে, অথবা এক নাসিকারন্ধ্র বন্ধ করিয়া অন্য দ্বারা শ্বাস টানিতে হইবে। ইহাতে ওজোন অধিক পরিমাণে হইবে।

তোমার ওখানে থাকিতে মন ব্যস্ত। আমার যেন মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানকার ছোটখাট রাষ্ট্রীয় গোলমাল তোমাকে স্পর্শ করে না। আমিও দূরে সব ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি, কিন্তু একেবারে বধির হইয়া থাকিতে পারি না। আর যে-কাজ পাইয়া ভুলিতে চাই তাহাও পাই না।

সর্ব্বদা চিঠি লিখিও। আমাকে পরীক্ষায় চৌকিদারী করিতে হইতেছে।

তোমার
জগদীশ

পার্সেলটা সাবধানে খুলিও। টিনের মুখ একদিকে কাটিয়া লইও। অধিক আঘাত করিলে ভিতরের কাচ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

(৫৭)

১৯এ মার্চ্চ, ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার পোষ্টকার্ডে তোমার অসুখের কথা শুনিলাম। এখন মনে হইতেছে, তুমি বোলপুরে থাকিলে দেখিতে আসতাম। আমি এখনও নিষ্কাম-ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং তোমার অসুখের কথা শুনিলে মন বিচলিত হয়। আর যখন আমার গণ্ডী এরূপ ক্ষুদ্র, তখন ইহার মধ্যে কোন আঘাত লাগিলে সাড়াটা অধিক রকম হয়। তোমার সহিত নৈকট্য যত বাড়িতে লাগিল, যেন মনে হইতেছিল কাজটা ভাল হইতেছে না। সে যাহা হউক, এখন অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই, তুমি শীঘ্র ভাল হও; শীঘ্র নিকটে সুস্থ শরীরে আইস।

রেণুকার খবর সর্ব্বদা জানাইও। এখন যেরূপ চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে তাহাতে এরূপ পীড়ার আরোগ্যও সহজসাধ্য মনে হয়।

শরৎ দাস মহাশয় এত করিয়াও যদি প্রভুর মন না পান, তবে একান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। দেখিতেছি দেবতার আরাধনা সহজ, মনুষ্যের আরাধনাই সাধ্যাতীত। আজ Landholders সভাতে কি এক informal meeting হইবে, বুঝিতে পারিলাম না কি হইবে। তবে mysteriously কেহ বলিলেন যে, এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার কি আগার প্রতিষ্ঠা হইবার উদ্যোগ হইতেছে, নাটোর ৫ লক্ষ টাকা দিবেন, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ (সুরেন্দ্র-বাবু ইত্যাদি) আজ উপস্থিত থাকিবেন এবং এজন্য আলোচনা হইবে। আমি এসম্বন্ধে কোন পত্র পাই

নাই, তবে বঙ্গবাসী কলেজের গিরীশবাবু আমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ আমার উপস্থিতি এরূপ অবস্থায় না থাকাই বোধ হয় ভাল। দশজনের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দ্বারা কিরূপ ফল হইবে তাহাও জানি না।

এই Easter উপলক্ষে বোধ হয় কয়দিন ছুটি আছে। তখন তোমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক। হয় কি না জানি না। আমার মন আর এখানে নাই।

রাম না হইতেই রামায়ণ! তোমার বধূঠাকুরাণী এখন হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নিকট কুটীর নির্ম্মাণ করিতে উৎসুক। বিধাতার রাজ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, আমরা বড় বড় জিনিষ ধরিতে যাই, আর চিরকালের জন্য শান্তি হারাই। আর গৃহলক্ষ্মীরা অতি ক্ষুদ্র পুতুল লইয়া চিরকাল মহা পরিতোষে জীবনযাপন করেন। ভালই।

এবার হুকুম হইয়াছে যে, খোকার পায়ে যদি কোন কাঁটা ফুটিবার ঘা থাকে, তবে তাহার স্কুল যাওয়া বন্ধ!

তোমার
জগদীশ

(৫৮)

২৫এ মার্চ্চ, ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার জ্বরের কোন উপশম হইতেছে না শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি কখনও পীড়া তাচ্ছিল্য করিও না। তোমার কাজ-কর্ম্ম এখন থাকুক, কেবল যত পার বিশ্রাম কর, আর যাহাতে শীঘ্র ভাল হও তাহা কর।

সেই বাটারীর জন্য

Sulphuric acid	1 part
Water	5 parts

mix with

powdered bichromate of potash as much as it will dissolve.

আমার বক্তৃতা শুক্রবার দিন সন্ধ্যা ৭টার সময়। তুমি থাকিলে যে কত সুখী হইতাম বলিতে পারি না—আর সব যেন অপরিচিত, অপ্রকৃত।

শীঘ্র খবর দিও।

তোমার
জগদীশ

(৫৯)

93 Upper Circular Rood,
১০ই আগষ্ট, ১৯০৩

বন্ধু,

অনেক কাল যাবৎ তোমার পত্র পাই না। মোহিত-বাবুর নিকট শুনিলাম, রেণুকা একটু ভাল আছেন। কিন্তু তোমার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছি। তোমার মাঝে অসুখ হইয়াছিল শুনিলাম। কেমন থাক একখানা post কার্ড দিয়া জানাইও।

স্বামী উপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কেম্ব্রিজে বৃহৎ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র বিদেশীর নিকট পরিচিত হইবে ইহা আমি বহু মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া মনে করি। পরশু দিন উপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আলাপাদি করিবার জন্য আমি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

কিন্তু বিলাতে উপযুক্ত অধ্যাপক পাঠান আবশ্যক। এইজন্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে কেবল দু'একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে হইল; সাধারণের বুদ্ধিগম্য রকমে বক্তৃতা দিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাকে এবিষয়ে বলিয়াছি এবং তাহাতে তিনি সম্মত আছেন।

ব্রজেন্দ্র-বাবুর এসম্বন্ধে বহু কথা সংগৃহীত আছে। তাঁহার দ্বারাই এ কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইবে মনে হয়।

তবে কুচবিহারের নিকট এবিষয় বলিতে হইবে যে, তিনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্রজেন্দ্র-বাবুকে deputation পাঠাইয়াছিলেন এবারও তাঁহাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবে। এবিষয় তুমি লিখিলেই হইবে। আমি এজন্য তোমাকে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছি।

আমার মনে হয় বিবিধ বাধা সত্ত্বেও আমাদের কার্য্যশক্তি একেবারে আবদ্ধ থাকিবে না।

স্কুলের খবর এখন ভাল। হেডমাষ্টারের প্রশংসা শুনিতেছি।

তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

তোমার
জগদীশ

(৬০)

৯৩ নং আপার সাকুলার রোড,
১৮ই আগষ্ট, ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছ ইহা মনে করিয়া বড় কষ্ট হয়। তোমার নিজের শরীর যে ভাল নয় তাহা তুমি না লিখিলেও বুঝিতে পারি।

আমি এখানে দু'একটি অন্য বিষয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে বিলাতে হিন্দুদর্শনের অধ্যাপনা। ব্রজেন্দ্র-বাবুর জন্য এখানে অনেকে আমাকে ধরিয়াছিলেন এবং তোমাকে Telegraph করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাহাতে তোমার নিক টেলিগ্রাফ- যায়। এখানে কোন কাজে ১০ জনের একমত নাই। তবুও যতদূর পারিয়াছি, এজন্য চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু তোমাকে বলিতে কি, আমার দশ কাজে যাইতে কোন অভিরুচি নাই। তোমার সহিত শুভক্ষণে দেখা হইয়াছিল, কেবল তোমার সঙ্গেই মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি। আর তোমার সঙ্গে কাজ করিয়াই সুখী। নতুবা এত বড় বড় কথার গোলমালে মন অবসন্ন হইয়া যায়। একজনকে চেনা ও সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জানা কত সৌভাগ্যের কথা। আমি এত লোকের মধ্যে এখানে সম্পূর্ণ একা মনে করি। তুমি কবে আসিবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আমি একটা খুব বড় তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত আছি। কিন্তু তুমি কাছে নাই বলিয়া কার্য্যে অবসাদ জন্মে। আরও নানারকমে বাধা পাইতেছি। সে-সব কথা এখন থাকুক।

তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব। তোমারই জায়গা থাকুক; তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে। মন নানা কারণে একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। একটু জীবন্ত ভাব আসিলে ভালই। নতুবা সবই অলীক মনে হয়। মীরাকে আমি ও তোমার বন্ধুজায়া কাল দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাকে আগামী রবিবার দিন আনাইব। তুমি দু'চারি পংক্তি সর্ব্বদা লিখিও।

তোমার
জগদীশ

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ একখানা প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু প্রাচীনত্বই ইহার বিশেষত্ব নহে; ইহার বিশেষত্ব ইহার ব্রহ্মতত্ত্ব। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই উপনিষদেরই উক্তি। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (বেদান্ত সূঃ ১।১।২) সূত্রের মূলও এই উপনিষৎ। আর সবই যদি বাদ দেওয়া যায়, কেবল এই দুইটি উক্তির জন্যই ইহা চিরকাল আদরণীয় ও পূজনীয় থাকিবে। ঋষিকে বার বার প্রণাম করি।

আত্ম-তত্ত্ব

ঋষি আত্ম-তত্ত্বের পাঁচটি স্তর দেখাইয়া দিয়াছেন:—
(১) অন্নময় আত্মা; (২) প্রাণময় আত্মা; (৩) মনোময়

আত্মা; (৪) বিজ্ঞানময় আত্মা; (৫) আনন্দময় আত্মা। নিম্নতম স্তরে "দেহই আত্মা"; যাহারা এই স্তর অতিক্রম করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং যাহারা মনে করে প্রাণই আত্মার বিশেষত্ব তাহাদের আত্মা দ্বিতীয় স্তরের। যাহারা মনে করে কামনা ইচ্ছাদিই আত্মার বিশেষত্ব তাহাদের আত্মাই মনোময় আত্মা। যাহারা মনে করে, জ্ঞানই আত্মার বিশেষত্ব, তাহাদের আত্মাই বিজ্ঞানময় আত্মা। সর্ব্বোচ্চ স্তরের আত্মা আনন্দময়। (প্রবাসী, ১৩২৯, অগ্রহায়ণ পৃঃ ২০৫-২০৮ দ্রষ্টব্য)। ঋষির মতে আনন্দময়ত্বই আত্মার বিশেষত্ব।

আত্মা ও ব্রহ্ম

যাজ্ঞবল্ক্য-যুগে প্রমাণ করা আবশ্যক হইয়াছিল যে, আত্মাই ব্রহ্ম। সেইজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই মত নানা ভাবে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের যুগে ইহা একটি সাধারণ সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ব্রহ্ম যে আত্মা ইহা ব্রহ্মবাদিগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এই উপনিষদে 'আত্মা' শব্দ ৩০ বার ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার মধ্যে ব্রহ্ম পক্ষে অর্থ করা যায় কেবল, একটি স্থলে। স্থলটি এই:—আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হইয়াছে (২।১)।

এস্থলে 'আত্মা' অর্থ অবশ্যই ব্রহ্ম।

মানব ও ব্রহ্ম

(১)

ঋষি দুই স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন:—

সঃ যঃ চ অয়ম্ পুরুষে, যঃ চ অসৌ আদিত্যে, সঃ একঃ —অর্থাৎ পুরুষে (অর্থাৎ মানবে) এই যিনি, এবং আদিত্যে ঐ যিনি—তিনি একই (২।৮।১; ৩।১০।৪)।

অনুরূপ ভাব অন্য উপনিষদেও পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৫।১৫।১) এবং ঈশোপনিষদে (১৬) এই প্রকার আছে:—

"ঐ ঐ যে (আদিত্য-মণ্ডলস্থ) পুরুষ, তিনি আমিই।"

মৈত্রী-উপনিষদে আছে:—"আদিত্যে ঐ যে পুরুষ তিনি আমিই"(৬।৩৫), এস্থলে বৃহদারণ্যকের ভাষাই সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মৈত্রী-উপনিষদের দুইটি স্থলে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাওয়া যায়:—

"এই যিনি অগ্নিতে, এই যিনি হৃদয়ে এবং ঐ যিনি আদিত্যে—তিনি একই" (৬।১৭; ৭।৭)।

এ স্থলে অগ্নি-বিষয়ক অংশটুকু অতিরিক্ত। কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাব একই। একই আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে আত্মা আদিত্য-মণ্ডলে সেই আত্মাই মানবে। উপনিষৎ-সমূহের উক্তি "আমিই তিনি"।

এ স্থলে যে আদিত্যের কথা বলা হইল, তাহার বিশেষ কারণ আছে। ঋগ্বেদের সময় হইতে লোকে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সবিতৃ-দেবের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। প্রথমে সবিতাকে সবিতৃরূপেই উপাসনা করা হইত। সবিতা ছিলেন বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতা। বহু বস্তুর মধ্যে এক বস্তু। উপাস্য এক, উপাসক অন্য; এক অপর হইতে পৃথক্, এক অপরের বাহিরে। কিন্তু ব্রহ্মবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মবাদিগণ সবিতাকে পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ইঁহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। সবিতা আর প্রাচীন সবিতা রহিলেন না—পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল সবিতৃ-পুরুষ এক আর মানব অন্য। এখন হইল সবিতাতে যিনি, মানবেও তিনি। একই আত্মা সবিতাতে এবং মানবে। ঋষিগণ এই ভাব নানা ভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অর্থ সর্ব্বত্রই এক—আমিই তিনি—। ইহা আত্মবাদই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতও ইহাই।

(২)

এক স্থলে লিখিত আছে যে ত্রিশঙ্কু ঋষি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন:—

"আমি (সংসার) বৃক্ষের প্রেরয়িতা (রেরিবা)। (আমার) কীর্ত্তি গিরিপৃষ্ঠের ন্যায়। আমি ঊর্দ্ধ-পবিত্র (অর্থাৎ পরম পবিত্র) আমি শক্তিশালী ও অমৃত; আমি জ্যোতির্ম্ময় ধন; আমি সু-মেধা এবং অমৃত-সিক্ত" (১।১০)।

এই অংশ কিছু অস্পষ্ট। অন্যত্র 'রেরিবা' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। শঙ্করের অর্থ অন্তর্যামিরূপে

প্রেরয়িতা। অন্যান্য অর্থ—প্রসবিতা, অন্তর্যামী, ইত্যাদি। 'বাজিনীবস্বমৃতম্' অংশের দুই প্রকার পদপাঠ হইতে পারে—(১) বাজিনী-বসু, অমৃতম্; (২) বাজিনি ইব সু+অমৃতম্। আমরা প্রথম পদপাঠ গ্রহণ করিয়াছি। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে বহু স্থলে বিভিন্ন দেবতাকে 'বাজিনী-বসু' বলা হইয়াছে। 'বাজ' শব্দের অর্থ—শক্তি, ধন, অন্ন ইত্যাদি। বাজী=বাজ-শালী; অশ্ব। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে বাজিনী। বসু=ধন। বাজিনী-বসু=বাজিনী যাহার বসু; ধনশালী, অন্নবান্, শক্তিশালী ইত্যাদি। শঙ্কর দ্বিতীয় পদপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ এই:— বাজিনি=বাজিন্ সপ্তমী=বাজীতে; বাজ-যুক্ত সবিতাতে। ইব=যেমন। সু+অমৃতম্=শোভন অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব। সমগ্র অংশের অর্থ:—সবিতাতে অবস্থিত বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বের ন্যায় আমিও বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব।

যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন ত্রিশঙ্কুর বক্তব্য এই—"আমি জগৎ-প্রসবিতা অমৃত-স্বরূপ পরব্রহ্ম।"

এস্থলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

বরুণের উপদেশ

ভৃগু বারুণি পিতা বরুণকে বলিলেন—

"ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে শিক্ষা দিন।"

পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং বাক্।"

শঙ্কর বলেন, এই সমুদায়কে ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার বলিয়া বর্ণনা করা হইল।

ঠিক ইহার পরেই পিতা বলিলেন:—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি—তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" ইতি (৩।১)—অর্থাৎ "যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, (এবং মৃত্যুর পরে) যাঁহাতে প্রতিগমন করে এবং সম্যক্রূপে প্রবেশ করে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম"। বলা হইল যাঁহা হইতে সৃষ্টি, যাঁহাতে স্থিতি এবং অন্তে যাঁহাতে আশ্রয়, তিনিই ব্রহ্ম।

এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্মবিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। (অর্থাৎ অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা)। দ্বিতীয় সূত্র:—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

অর্থাৎ 'ইহার জন্মাদি যাঁহা হইতে'।

বরুণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই এস্থলে সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল অর্থ-গৌরবে গৌরবান্বিত; সূত্র তাহাকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছে। উভয়ই অতুলনীয়।

পিতার উপদেশ পাইয়া পুত্র তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া বুঝিলেন:—

"অন্নই ব্রহ্ম"

কারণ অন্ন হইতেই ভূতসমূহ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্নেতেই প্রতিগমন এবং প্রবেশ করে।

পুত্র পিতার নিকট পুনরায় গমন করিলেন। পিতা বলিলেন—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

পুত্র তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া এবার বুঝিলেন:—

"প্রাণই ব্রহ্ম"

কারণ প্রাণ হইতেই এই সমুদায় ভূত জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং প্রাণেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে।

পুত্র পিতার নিকট পুনরায় গমন করিলেন। পিতা বলিলেন, "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

পুত্র তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া বুঝিলেন:—

"মনই ব্রহ্ম"

কারণ মন হইতে এই সমুদায় ভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া মন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং মনেই প্রতিগমন এবং প্রবেশ করে।

পুত্র পিতার নিকট পুনরায় গমন করিলেন। এবারও

পিতা বলিলেন—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর।"

পুত্র তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া বুঝিলেন—
"বিজ্ঞানই ব্রহ্ম"

কারণ বিজ্ঞান হইতে এই সমুদায় ভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিজ্ঞানেই প্রতিগমন এবং প্রবেশ করে।

পুত্র পুনরায় পিতার নিকট গমন করিলেন। এবারও পিতা বলিলেন—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

পুত্র তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া বুঝিলেন
"আনন্দই ব্রহ্ম"

কারণ আনন্দ হইতেই এই সমুদায় ভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আনন্দেই প্রতিগমন এবং প্রবেশ করে।

ভৃগুর তপস্যা শেষ হইল—তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার শেষ জ্ঞান "আনন্দই ব্রহ্ম।" ইহাই কি একমাত্র সত্য? পূর্ব্বে যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—তাহা কি অসত্য? ভারতীয় ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, কোনটিই অসত্য নহে। সত্যেরও স্তর আছে, কোনটি অল্প সত্য, কোনটি অধিক সত্য। জ্ঞানের নিম্নতম স্তরে 'অন্নই ব্রহ্ম'। ইহার উপরের স্তরে 'প্রাণই ব্রহ্ম'। সাধক আরও উন্নত হইলে বুঝিতে পারেন যে, 'মনই ব্রহ্ম'; তাহার পরে বুঝেন 'বিজ্ঞানই ব্রহ্ম'। উর্দ্ধতম স্তরে সাধক অনুভব করেন 'আনন্দই ব্রহ্ম'।

এস্থলে একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক। আত্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় ঋষি বলিয়াছেন—আত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাতেও ঋষি ব্রহ্মবিষয়ে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন; ব্রহ্ম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, ঋষির নিকটে আত্মাই ব্রহ্ম।

সিদ্ধির অবস্থা

ব্রহ্মজ্ঞের অবস্থা বিষয়ে ঋষি এই প্রকার বলিয়াছেন :-
"পুরুষে এই যিনি এবং আদিত্যে ঐ যিনি—তিনি একই ('মানব ও ব্রহ্ম' অংশ দ্রষ্টব্য)। ইহা যিনি জানেন তিনি মৃত্যুর পরে অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরে প্রাণময় আত্মাকে, তাহার পরে মনোময় আত্মাকে, তাহার পরে বিজ্ঞানময় আত্মাকে, তাহার পরে আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন, ইচ্ছানুরূপ অন্নবান্ এবং ইচ্ছানুরূপ রূপবান্ হইয়া এই সমুদায় লোকে বিচরণ করেন এবং এই সামগান করিয়া থাকেন—"হাবু! হাবু! হাবু (আনন্দসূচক অব্যয়)! আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ। আমি ঋতের প্রথমজ। আমি দেবগণেরও পূর্ব্বে; আমি অমৃতের নাভি।...আমি বিশ্বভুবনকে অতিক্রম করিয়াছি।" (৩।১০)

ঋষির মতে ইহাই ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থায় সাধক অনুভব করেন যে, তিনি দেবগণেরও পূর্ব্বেও ছিলেন এবং তিনি অমৃতত্বের নাভি অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মই। এ অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মানবাত্মা ব্রহ্মই, সুতরাং ব্রহ্ম আত্ম-স্বরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ

এই উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২।১) (ব্রহ্মানন্দ বল্লী)। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ।

(ক)

তিনি 'সত্যং'—'সত্যং' এবং 'সত্তা' একই কথা। যাহা আছে তাহাই 'সত্য', তাহাই 'সত্তা'। 'ব্রহ্মসত্যং' বলিলে বুঝিতে হইবে তিনি সত্তা, তিনি আছেন।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করা যাউক। মনে কর এইক্ষণে আমি দেখিলাম—"এই গঙ্গা"। এই গঙ্গানদীতে এখন যত জল আছে, তিন মাস পরে ইহার একবিন্দু জলও এই নদীগর্ভে থাকিবে না। তখন এই পথে যে-নদী প্রবাহিত হইবে সে-নদী সম্পূর্ণ নূতন। লোকে অবশ্যই বলিবে 'ইহা গঙ্গা'। কিন্তু এই নিমেষের গঙ্গা এবং তিন মাস পরের গঙ্গা এই উভয় গঙ্গা এক গঙ্গা নহে। বৈদিক সময়েও গঙ্গা প্রবাহিত হইত, বর্ত্তমান

সময়েও গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু একত্ব কোথায়? ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সত্তা, নাম কেবল এক। এখানে প্রশ্ন 'ব্রহ্ম' কি গঙ্গার ন্যায় একটা সত্তা? অবশ্যই নহে। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গাকে 'সত্যং' বলা যায় না। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা 'সত্যং' নহে। সুতরাং 'ব্রহ্ম সত্যং' বলিলেই বুঝিতে হইবে, ইহা অচঞ্চল, অক্ষর, অদ্বয়, ধ্রুব, নিত্য, শাশ্বত ইত্যাদি।

(খ)

লোকে এমন বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছে, যাহা নিত্য ও পরিবর্ত্তনীয় কিন্তু অচেতন, যেমন আকাশ। ব্রহ্ম এপ্রকার নহেন—ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইল 'ব্রহ্মজ্ঞানং'—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ।

(গ)

মানুষেরও জ্ঞান আছে। আত্মজ্ঞান মানবের বিশেষত্ব; 'অহম্, ইদম্'—জ্ঞান কেবল মানবেই সম্ভব। মানব দর্শন বিজ্ঞান রচনা করিয়াছে। যুক্তিতর্ক দ্বারা অতীতের জ্ঞানলাভ করিতেছে, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও নির্ণয় করিতেছে—বর্ত্তমানে যাহা জ্ঞানের অগোচর, নানা উপায়ে তাহার সত্তা ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতেছে। এ সমুদায়ই জ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু মানবের জ্ঞান সসীম—যুক্তিতর্ক দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়—ইহার অর্থ প্রত্যক্ষভাবে এসমুদায় তত্ত্ব জানে না। যদি 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ' অপরোক্ষভাবে মানবের নিকট প্রতিভাত হইত, বর্ত্তমান কালের সমুদায় সত্তা ও তত্ত্ব যদি সে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিতে পারিত তাহা হইলে তাহাকে আর যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইত না। জ্ঞানের জন্যই মানুষ মানুষ, কিন্তু এ জ্ঞানও সীমাবিশিষ্ট। ব্রহ্ম এপ্রকার নহেন ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইল—'ব্রহ্ম অনন্তং'। কোন বিষয়েই ব্রহ্ম সসীম নহেন, সর্ব্ববিষয়েই তিনি অনন্ত।

এই উপনিষৎ হইতে আমরা এই কয়েকটি তত্ত্ব লাভ করিলাম:—

(১) আত্মাই ব্রহ্ম।
(২) "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাঁহা হইতে উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, অন্তে যিনি আশ্রয়, তিনিই ব্রহ্ম।
(৩) ব্রহ্ম আনন্দময়।
(৪) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

নৌকাডুবির প্লট্

শ্রী গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

গোরা বহিখানি টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া বন্ধুবর বলিলেন, "এমন প্লটহীন গল্প, এমন বিরতিহীন আগ্রহে আর কখনও পড়ি নাই।" গোরা-যুগের বহুদিনগত বিরোধবিতর্কের পর অনেক দিন এমন সরল তর্কের বিষয় বন্ধুমহলে অবতারণা হইতে শুনি নাই। আধুনিক সময়ে কবিতা ও বন্ধসখ্যতার ভিতর কবি ও কবিপ্রসঙ্গ ডুবিয়া গিয়াছে, শুধু আমরা গুটিকয়েক পুরাতন পাপী জুটি কাটিতে না পারিয়া তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিলাম। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না বলিয়া কোমর বাঁধিয়া তর্কে লাগিয়া গেলাম।

* * * *

কথা উঠিল প্লট্ লইয়া। ইহার বোধ করি কখনও মীমাংসা হয় নাই অথচ মীমাংসার জন্য এত করিয়া বোধ হয় আর কোন বিষয় উত্থাপিত হয় না, যে, গল্পে প্লটের কেরামতি কতখানি।

বন্ধুবর বলিলেন, "রবিবাবুর উপন্যাসে ভাল প্লট্ থাকে না, তাই উঁহার উপন্যাসগুলি failure। ধর,

নৌকাডুবি; যে করিয়া নদীতটে রমেশের সহিত কমলার মিলন করান হইয়াছে তাহা একটা কষ্টকর আড়ষ্ট কল্পনা, দুর্ঘটনার দোহাই দিয়া পাঠকের মন আর্দ্র করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার পর সমস্ত বহির ভিতর প্লট্ নাই, আখ্যান নাই, গতি নাই, গ্রন্থি নাই, পরিণতি নাই; গোঁজামিল দিয়া যেমন দুজনকে একত্র করা হইয়াছে পরে তেমনই তাহাদের লইয়া কোন আখ্যান সৃজন ও সমস্যা পূরণ করিতে না পারিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়া শেষে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "নৌকাডুবিকেই উদাহরণ মানিব; এমন সুন্দর পরিপূর্ণ success পৃথিবীতে বড় অধিক সংখ্যক বহিতে আছে কি না সন্দেহ। নদীচরে রমেশ ও কমলার যে-মিলন তাহাই একখানি স্নিগ্ধ মধুর সুন্দর উপন্যাস। এমন শোক-কশাঘাত করিয়া ভ্রমকে সন্দেহলেশশূন্য করিয়া নিয়তিজাল গাঁথিবার অবকাশ গল্পসাহিত্যে আর কোথায় দেওয়া হইয়াছে? কিন্তু ঠিক নদীচরে নহে রমেশের কাছে কমলা আসলে আসিয়া পড়িল তখন, যখন ছাদে বসিয়া প্রথমে কমলার ভুল নামে ডাকার বিস্ময় প্রকাশে রমেশ ধীরে ধীরে কমলার কাছ হইতে তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিয়া লইল। কোন প্লটের জঞ্জাল খাড়া না করিয়া গ্রন্থকার পাঠককে লইয়া একেবারে প্লটের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপ দিয়াছেন ও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ততঃ কিম্, এইবার কি? এ সংঘটন কষ্টকর না স্বাভাবিক তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। ইহা কোন ভাল বহির প্লট হইতে পারে কি না এ তর্ক করা আরো বৃথা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন fact is stranger than fiction এবং অতি কঠোর সমালোচকও স্বীকার করিবেন যে, জীবনের অতি তুচ্ছতম ঘটনাও গল্পের বিষয় হইতে পারে; আর্টের সদ্গতি বিষয়ে নহে, performanceএ। আমি বকুলের মালা গাঁথিলাম কি কৃষ্ণকলির, তাহা সমস্যার বিষয় নহে, আমার বকুলের হারে গন্ধ ও কৃষ্ণকলির মালায় সৌন্দর্য্য ন্যস্ত আছে কি না তাহাই পরীক্ষা ও উপলব্ধির বিষয়। গ্রন্থকার রমেশ ও কমলাকে যে একত্র করিয়াছেন সেখানে দেখিবার কিছু নাই—দেখিবার আছে ইহাই যে এইরূপ সংঘটনে, মানব-চরিত্রের ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রেম ও দুর্ব্বলতা লইয়া কি দাঁড়ায়।"

কমলা যখন রমেশকে নিজের ইতিবৃত্ত বলিয়া তাহার চোখ ফুটাইয়া দিতেছিল তখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে রমেশের মুখে হাত চাপা দিয়া নিজের জন্য দুর্ভাগ্যজাল ও পাঠকের জন্য এই আখ্যান সৃজন করিতেছিল। রমেশ সবিস্ময়ে শুনিল, সে নাকি নিজে তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছে—এমন-কি, পশ্চাৎ তাহার ব্যবহার ঠিক সেই অনুপাতে হইতেছিল না এমন সঙ্কুচিত নালিশও ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। ইহার পর রমেশের আর বাক্যস্ফুরণ করিবার উপায় রহিল না। ইহাতেও যদি কেহ বলেন, কেন রমেশ ঐখানে কমলাকে সব কথা খুলিয়া বলিল না, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া উত্তর করিতে হয় "অরসিকেষু—"। কিন্তু আর-একটা সোজা উত্তর আছে;—আমার গল্পই এই, ইহা নয় যে উভয়ে জানিল, জানিয়া বরাত মানিয়া লইল অথবা কমলা লাথি মারিয়া বেগে প্রস্থান করিল। আমার গল্প হইল যে, একজন জানিল, অপরে জানিল না। রমেশ জানিল, উচ্চশিক্ষাধারী হৃদয়বান্ বাঙালী যুবক জানিল এবং সংসার-অনভিজ্ঞ স্বজন-বান্ধবহীন সরলা বালিকা কমলা জানিল না।

জীবনের নদীতটে প্রক্ষিপ্তা শোক-মূর্চ্ছিতা পরম-নির্ভরশীলা আশ্রিতা সুন্দরী বালিকাকে রমেশ কেমন করিয়া বলিবে যে তাহার মুখের হাসি, সিঁথির সিন্দুর, বিকশিত আকাঙ্ক্ষা তাহার জন্য নহে! আবার যে-দিন সে সুনিপুণ সুডৌল হস্তে ফল ছাড়াইয়া রমেশের মনে গৃহসুখছবির স্বপ্ন রচনা করিল সেদিনই বা কেমন করিয়া রমেশ তাহাকে বৈধব্যের অভিশপ্ত জীবনে বিসর্জ্জন দিবে! অবশেষে যেদিন বিকশিত যৌবন কমলার মনে বিদ্ধা হরিণীর মত পীড়া সঞ্চার করিতে লাগিল এবং চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না কোথা হইতে আঘাত আসিল, তখন সে আঘাত রমেশের হৃদয়ে প্রতিহত হই তাহারও মন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে উদ্যত হইল

প্লটের আড়ম্বর বাদ দিয়া গ্রন্থকার একখানি

ধীর মন্থরগতি বালিকা-হৃদয়ের যৌবন-উন্মেষের বিচিত্র চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রেম অধিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু প্রেমের জন্য হৃদয় সম্ভাবিত ও উন্মুক্ত হইয়া আছে। যদি কমলা তাহার অদৃষ্ট-কথা অবগত হইত, যদি জানিয়া বা না জানিয়া সে রমেশকে হৃদয় দান করিয়া ফেলিত বা যদি রমেশ তাহাকে ভালবাসিত তাহা হইলে পদে পদে গল্পের মীমাংসা হইয়া যাইত, প্রণয়ের আবরণ আসিয়া হৃদয়গতির নিরাবরুদ্ধ পথ অবরোধ করিত, কিন্তু অপূর্ব্ব কৌশলে গ্রন্থকার ভ্রান্ত পদবিক্ষেপ বাদ দিয়া গল্পকে অগ্রসর হইতে দিয়াছেন। কমলা জানিল না যে, রমেশ তাহার স্বামী নহে অথচ রমেশ অগ্রসর হইল না স্বামীর প্রাপ্য গ্রহণ করিতে। বালিকা যৌবন-বেদনায় কাতর হইয়া বিদ্ধা হরিণীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কমলা মাতৃহারা বালককে ধরিয়া আনিল যদি তাহাতে তাপ জুড়ায়; খানিক জুড়াইল, কিন্তু তাহাতে বেদনার কাতরতা অধিকতর ব্যক্ত হইল। এমন সময় খুড়া আসিয়া স্নেহরস সিঞ্চন করিলেন। সবই ত হইতে পারিত, প্রস্ফুটিত উন্মুক্ত যৌবন, উদার-হৃদয় প্রেমময় উচ্চ-শিক্ষিত স্বামী, আদর কুড়াইবার জন্য ভৃত্য বালক ও সংসারসুখ প্রতিফলিত ও উদ্ভাসিত করিবার জন্য স্নেহময় খুড়া—সবই হইতে পারিত, কিন্তু সমস্তই কমলা পথিমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহার জীবনে কোনটিই সংস্থাপিত হয় নাই, হইল না। সমস্ত সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাপাইয়া কিসের অভাব গুপ্ত কুশাঙ্কুরের মত বার বার কমলার চরণ বিক্ষত করিতে লাগিল, অনভিজ্ঞা কমলা তাহার সন্ধান পাইল না। অনিপুণা বালিকা প্রণয় কি তাহা জানিত না!

প্রবঞ্চনা আমাদের জীবনের প্রধান ট্রাজেডি। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর মিথ্যাজাল ও মিথ্যাভাণ রচনা করিয়া প্রিয় ও প্রিয়তমকে প্রবঞ্চিত করিতেছি! মিথ্যার সঙ্কট সত্যের আঘাত অপেক্ষা অনেক ভীষণ। তথাপি এ সংসার-অনৈক্যে মিথ্যা-রচনার নির্যাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছি না। যৌবন চলিয়া গিয়াছে তখন বৃদ্ধত্বে রঙ ফলাইতেছি; ভালবাসা নীড় হইতে পলাইয়া গিয়াছে তখনও ভালবাসার প্রকরণ অভ্যাস করিতেছি; বিদ্যা নাই পুস্তক সঞ্চয় করিতেছি; ধন নাই তাই ঠাট্‌ বজায় রাখিতেছি; ক্ষমতা নাই তাই আস্ফালন করিতেছি; স্বাধীনতা নাই তাই লুপ্ত গৌরবের তালিকা রচনা করিতেছি; কাজ নাই তাই ব্যস্ত হইতেছি; প্রয়োজন নাই তাই ধরিয়া রাখিতেছি; বিশ্বাস নাই তাই ধর্ম্মধ্বজা উড়াইতেছি!

যাহা সকল অপেক্ষা কঠিন মিথ্যাভাণ বিধাতা রমেশের বিধিলিপিতে সেই দুরদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সহৃদয় করুণ-দুর্ব্বল-অন্তঃকরণ রমেশ বিশ্বস্ত বালিকার জন্য এই প্রবঞ্চনার দুঃসহ ভার বহন করিতে রাজি হইল। বোধ করি, ভাবিয়াছিল কেমন করিয়া কি হইয়া জালের গ্রন্থি খুলিয়া যাইবে ও সে আবার মুক্ত বিহঙ্গম হইয়া তাহার পূর্ব্ব প্রেম-আকাশে বিচরণ করিবে। কিন্তু যাহা অনিবার্য্য তাহাই হইল, গ্রন্থি বাড়িয়া চলিল, প্রবঞ্চনা হইতে প্রলোভনের তটে আসিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। আমরা রমেশের চক্ষে শেষে জল দেখিয়াছি,—বোধ করি হৃদয়ে গুপ্তভাবে প্রেমেরও সঞ্চার হইয়াছিল। হৃদয়-ক্ষেত্রে কেবল একটা চারা অঙ্কুরিত হয় না, এবং রমেশও দেবতা নহে। তাহার মনে কাতরতা না দুর্ব্বলতা না প্রলোভন না দ্বন্দ্ব না প্রেম শেষ পর্য্যন্ত কোন্‌টি অঙ্কুরিত হইতেছিল তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান বাতুলতা মাত্র।

সমস্ত পড়িয়া গভীর দুঃখ হয়; আহা, গ্রন্থকার এমন করিলেন কেন যে, বেচারী রমেশকে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন,—এত করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিবার কি এই পরিণাম?

কিন্তু ইহা আত্ম-বর্জ্জন নহে, ইহা দুঃখ-সাধনা নহে, ইহা নিয়তি; এইরূপ অতর্কিতে ঝটিকার ন্যায় উত্থিত হইয়া অপরিণত পত্রকে বৃন্তচ্যুত করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়া বালুতটে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া খেলা শেষ করিয়া দগ্ধ শুষ্ক হইবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া যায়। মায়া নাই, দয়া নাই, বিচার নাই, বিবেচনা নাই, হঠাৎ আসিয়া চমকাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "আমাকে গ্রহণ করিলে কি না?"—ভাবিবার সময় লইবার অবসর মাত্র দেয় না; তাহার পর, উহাই মাথা পাতিয়া লইয়া ঘূর্ণাবর্ত্তে

নিষ্পেষিত হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়। মনুষ্য-জীবনে ইহা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

নিয়তির আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইলে রমেশ তাহা দ্বিধাহীন ত্বরিৎগতিতে মাথা পাতিয়া লইল; গল্প শেষ হইয়া গেল—আখ্যান-প্লট যাহা কিছু ঐখানেই শেষ হইয়া গেল। তার পর আমরা বসিয়া বসিয়া রমেশের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তন দেখিতে লাগিলাম; আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলার বস্তুর মত নদীতটে পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু যে প্রণয়-শাখা হইতে নিয়তি তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছিল সেখানে আর প্রত্যর্পিত করিল না।

অনেকে প্রশ্ন করেন ইহাতে সে development কই, যা না থাকিলে উপন্যাস সার্থক হয় না। কিরূপ development-কে তাঁহারা চাহেন তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম তর্কের বিষয়। এরূপ তর্কের অন্ত নাই, মীমাংসা নাই। আমি ছবি আঁকিতে বসিয়াছি কেমন করিয়া রমেশ ঘটনা-সমন্বয়ের স্রোত-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল, আমি দেখাইব কোথাও সে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিতে ডুবিতে স্রোত-বেগে হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া গেল, কোথাও কিনারাস্থিত মহীরুহের জল বিলম্বিত শাখায় ক্ষণেকের তরে আটকাইয়া গেল, কিন্তু আবার ভাসিয়া যাইবার সময় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কোথাও বা গুপ্ত বালুচরে হঠাৎ আসিয়া নীত ও পরিত্যক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোগতি—মানব মনের সেই অনাদি অপরিবর্ত্তিত চির-ছদ্মবেশী মনোগতি আন্দোলিত হইয়াছে কি? অজ্ঞানিত অপরিস্ফুট অবিন্যস্ত প্রবৃত্তিগুলি শীতোষ্ণ স্পর্শে জাগরিত নির্ব্বাপিত হইয়াছে কি? বুদ্ধি বিবেচনা আসিয়া ইহার মধ্যে দিশাহারা হইয়া অবশ হইয়াছে কি? পরিত্রাণ নাই, হিসাব নাই, বিচার নাই; জগতে ইহাই মাত্র সত্য, আছে মৃত্যু ও নিয়তি

কিন্তু বাস্তবিক গল্পের গতি কিছু অনির্দ্ধারিত পথে চালিত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, যে অদৃশ্য হস্ত পিছনে থাকিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের গতি-বিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে রমেশ প্রথম হইতেই তাহার ইঙ্গিত মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিতার আদেশে বিবাহ করিল—না দেখিয়া শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত না করিয়া, নির্ব্বিকারচিত্তে বিবাহ করিল। হেমনলিনীকে কি বলিবে? বলিবে—দেখ, যে হৃদয়মন্দির তোমার ধ্যানে পূর্ণ ছিল সেখানে অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই। নিয়তির অন্ধগতিতে নৌকাডুবি হইয়া সে-ঘটনা সমাবেশ পরিবর্ত্তিত হইল। কি আনন্দ, কি উদ্ধার! হেমের কাছে ফিরিবার জন্য পথ হইল। কিন্তু সেই অনিয়ন্ত্রিত দেশ হইতে অন্য কঠোর আদেশ আসিল; দুর্দ্দৈব-জালের গ্রন্থি আঁটিয়া দিতে সে আদেশও সে মাথা পাতিয়া লইল, দ্বিরুক্তি করিল না। কি situaiton! হেমনলিনীর কাছে সে কত নির্দ্দোষী—কিন্তু কিছুতেই সে একবার মুখ ফুটিয়া সে-কথা খুলিয়া বলিতে পারিল না। জীবনের কাম্য, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, যাহার নিকট কিছুই গোপন করিবার নাই তাহাকে সে কিছুতেই তাহার নির্দ্দোষিতা উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারিল না। ইহাই নিয়তি—নৌকাডুবি, কমলার আশ্রয় দান এসকল নিয়তি নহে। নিয়তি এই, যে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব তাহার কাছেও হৃদয় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এ চমৎকার অপরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়—লিখিয়া বুঝান যায় না। বড় জোর বলা চলে জীবনে যাহা কাম্য ও যাহা প্রিয় তাহা অপেক্ষাও মহৎ আদেশ আছে, তাহা কৃৎ তাহা কর্ম্ম—সেখানে প্রিয়তমেরও অধিকার নাই।

ইহাতে রমেশের একটা আশ্বাস, একটা সুখ ছিল—সে বাহিরে যাহাই দেখাইতে বাধ্য হউক, সে অন্তরে স্বাধীন, হেম যাহাই মনে করুক সে হেমেরই একমাত্র পূজা করে, নাইবা হেম তাহা জানিল। সুতরাং আপন মনে আপনি আবিষ্ট হইয়া সে হেমনলিনীর প্রেম ধ্যান করিবার জন্য আপনাকে বাঁচাইয়া চলিল। কিন্তু আর-এক জিনিষের উদ্বোধন সে লক্ষ্য করে নাই। কমলার যে পরিণত হৃদয়কলি প্রস্ফুটিত হইবার জন্য পীড়িত হইতেছিল তাহার গতি কি হইবে? যতবার অদৃষ্টক্রম মানিয়া লইয়া রমেশ প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে

ততবারই সে পরাস্ত হইতেছে। অবশেষে সে সেই দারুণ অভিশপ্ত ভয়ঙ্কর পরিণাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল এমন সময় আবার বিধাতা উচ্চরবে পরিহাসের হাসি হাসিলেন। কিন্তু রমেশ কোথায় নিপতিত হইল? পরিত্যক্ত জনহীন বালুতটে—হেমনলিনীর রম্য প্রণয়সৈকতে নহে। এইখানেই গল্পের নৌকাডুবি; ঝড় উঠিয়াছিল ফলে নৌকাডুবি হইল; কি অপরাধে তাহা তিনিই জানেন যিনি আশা ও কল্পনার ব্যতিক্রমে সমস্ত জিনিষ নির্দ্ধারিত করিতেছেন।

এরূপ ঘটনায় পড়িলে যেরূপ ব্যক্তি যেরূপ করে তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে, ইহাতে যদি development এর মূলভাগ না থাকে উপায় নাই। ঘটনায় পড়িয়া রমেশ, কমলা, হেমনলিনী যাহা করিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে তাহাই মানব-জীবনে হয়, না অন্যরূপ?

বঙ্গের মুসলমান-সম্প্রদায় এবং বাংলা 'ভাষা ও সাহিত্য'

শ্রী তারিণীকমল পণ্ডিত

গত ১২শে মার্চ্চ, 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের' অধিবেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সাহায্যে উচ্চ-শিক্ষা দানের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া,সার্ আব্দার্ রহিম এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া হিন্দুগণের মনে আঘাত লাগিবার যথেষ্ট কারণ ত আছেই, পরন্তু, মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও অনেকেই যে ইহা পড়িয়া বিস্মিত ও ব্যথিত না হইয়া পারিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন—একে ত নেতাগণ কোনও একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে যুবকদিগকে টানিয়া লইতে পারিতেছেন না—তাহার উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা বাংলা ভাষার সাহায্যে দিবার ব্যবস্থা হইলে তাহাদের (মুসলমান যুবকদের) অবস্থা আরও খারাপ হইবে সন্দেহ নাই (১)।

সার্ আব্দার রহিম আজ যে-কথা বলিয়াছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার্ আশুতোষকেও তাঁহার এক 'হিন্দু-বন্ধু' এইরূপ একটা অহৈতুক সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমার পরম-আত্মীয় তাই রক্ষা; নতুবা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রচলনের ন্যায় বাতুল প্রস্তাব উত্থাপনে প্রকাশ্য-সভায় তোমাকে অপমানিত না করিয়া ছাড়িতাম না।'

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যে নবীন প্রেরণা প্রবাহিত হইতেছিল—সেই প্রেরণা-প্রবাহে এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পদের অতুলতায়, বাংলা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আজ কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও মনে ইহা হয়ত কল্পনায়ও আসিতে পারে না যে, মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং এইরূপ করিলে জাতীয় উন্নতির পথ একদা রুদ্ধ হইয়াই যাইবে। বরং তদ্বিপরীত ভাবই বর্ত্তমান যুগে লোক-মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তথাপি, আজ সার্ আব্দার রহিম এই কথা বলিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিতই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলার মুসলমান-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক-সাহচর্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সার্ আব্দার রহিম বলিয়াছেন—বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হইলে মুসলমানের শিক্ষার অত্যন্ত হানি হইবে (২)। হানি যে কেন হইবে—ইহার কারণ

(১) "They were leading the young men unto the path which led to nothing and which would be worse still, if they introduced Bengali as the medium of their instruction."—Speech on 'The Calcutta University Grant' by Sir Abdur Rahim in the Bengal Legislative Council.

(২) Mohamadan education would suffer.—Ibid.

অবশ্য আমরা খুঁজিয়া পাই না—তিনিই হয়ত ইহা ভালরূপে জানেন। কেননা, মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা—এই কয়েক শত বৎসরের বাংলাদেশে অধিবাসের পরে আজ ইহা সকল মুসলমানদের কাছেই *নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়া গিয়াছে।* দ্বিতীয় বঙ্গীয়-মুসলমান-*সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে মৌলভী শহীদুল্লা,* এম্-এ, বি-এল্ জোর গলায় বলিয়াছেন—'আরবী আমাদের ধর্ম্মভাষা, ইংরেজী আমাদের রাজভাষা—পার্‌সী আমাদের সভ্যভাষা—উর্দ্দু আমাদের ভারতীয় আন্তর্জনীন ভাষা আর বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।' মৌঃ ওয়াজেদ আলীর—উর্দ্দুভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া তিনি উর্দ্দুভাষাকে বিশ্বভাষা বা universal language আর বাংলাকেই জাতীয় ভাষা বা national language বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মৌলভী আব্দুল করিমও বাংলা ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'হিন্দুর মত আমাদেরও (মুসলমানদেরও) সাহিত্যের একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ আছে।' এবং সেই বনিয়াদটা যে বাংলা-ই সে-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। কেননা, আমরা দেখিতে পাই—সংস্কৃতের কঠোর কবল হইতে ছাড়া পাইয়া—তদানীন্তন হিন্দুনরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের রাজ-সভায় নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে স্বেচ্ছা-বিচরণের যে-সুযোগ লাভ করিয়াছিল—তাহা সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান নরপতিগণের বদান্যতা ও বাংলাভাষার প্রতি তাঁহাদের একান্ত অকৃত্রিম মমতাকে নিমিত্ত করিয়াই।

দুরান্তের শুষ্কমরু-প্রান্তর ছাড়িয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার যখন বাংলা দেশের রাজসিংহাসন দখল করেন তখন এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতার সুখৈশ্বর্য্যে মোহিত হইয়া, নিজের দেশ-মাতৃকার কথা বিস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকেই আপনার মাতৃত্বের আসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন; সেই অবধি-ই বাংলার হিন্দুর সহিত—বাংলার মুসলমানের একজাতীয়তার সূচনা হইয়া গিয়াছিল।

সংস্কৃতের জটিলতা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সহজ-সরল বাংলা ভাষার আদর করিতে আরম্ভ করিলেন—এবং সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য সাহিত্যিকদিগকে অনবরত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নসীর সাহের অনুরোধেই সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ রচনা হইয়াছিল। এই নসির সাহের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন, "সো নসির সাহ জানে। যাক হানিল মদনবানে;—চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভনে।"

নৃপতি হুসেন সাহ কুলীন গ্রামের মালাধর বসুকে ভাগবত অনুবাদ করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন—এবং তাঁহার কবিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া 'গুণরাজ' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই হুসেন সাহেরও সুখ্যাতি বহু কবির মুখে গীত হইয়াছে (৩)।

পরাগল খাঁর অনুমতি-ক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 'অশ্বমেধপর্ব্ব' অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই—বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলমান নরপতিগণ কিরূপ যত্ন ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথমে মুসলমান নরপতির উৎসাহ ও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই—বাংলার ভাষা ও সাহিত্য অতঃপর হিন্দু নরপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল (৪)।

---

(৩) (ক) নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।---কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

(খ) শ্রীযুত হসন জগত-ভূষণ---সেই এহি রস জান।'---যশোরাজ খান।

(৪) The patronage and favour of the Mahomedan Emperors and Chiefs gave the first start towards recognition of Bengali in the courts of the Hindu Rajahs—Vide D. C. Sen's History of the Bengali Language and Literature.

মুসলমান নৃপতিদিগের সহায়, সহযোগিতা এবং উৎসাহ, অনুগ্রহ ভিন্ন অসংখ্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকও বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী সময়ে হায়াত্ মাহমুদ্ নামে এক মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। ইনি পঞ্চতন্ত্রের পারসী অনুবাদ হইতে 'সর্ব্ব-ভেদ' অনুবাদ করেন। এই কবির রচনাতে কাব্যানুভূতির চমৎকার নিদর্শন আছে (৫)।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের আসরে আলোয়াল কবির নামও কম নহে। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মীর মহম্মদের হিন্দী হইতে আরাকান-অধিপতির মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের (৬) আদেশে পদ্মাবতী রচনা করেন। কবিত্বের অনুভূতি তাঁহার কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।—

"কনকমুকুর জিনি মুখজ্যোতি সাজে।
দেখহ অপূর্ব্ব রীতি বদন উপরে।
পদ্মযুগ বন্দী হয় পদ্মের মাঝারে ॥"—(পদ্মাবতী)

ধর্ম্ম বিষয়ে সৈয়দ সুলতান অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন—তন্মধ্যে তাঁহার 'জ্ঞান-প্রদীপে' হিন্দুর যোগশাস্ত্রে অধিকার তাঁহার ছিল বলিয়া দেখা যায়। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"মধ্যেতে সু-যুম্না নাড়ী সর্ব্বমধ্যে সার,
আদ্যাশক্তি আরাধিকার সেই সে দ্বার,
পুরকে পুরিয়া বায়ু করিব স্থাপন,
সূচীমুখে সূত যেন করে প্রবেশন।"

আলী রাজার জ্ঞান-সাগরও সুখ্যাতি-পন্ন পুঁথি। ইতিহাস বিভাগেও বহুবিধ পুস্তক মুসলমান সাহিত্যিক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে আলোয়ালের রচিত 'সেকন্দর নামা', নসরুল্লা খাঁর রচিত 'জঙ্গ-নামা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথা-সাহিত্যেও মুসলমান-সম্প্রদায়ের হাত কম ছিল না। উজীর আশরফ্ খাঁর অনুমতি-ক্রমে দৌলত কাজী 'লোর-চন্দ্রাণী' প্রণয়ন করেন (৭)। তিনি ইহা পূরাইতে পারেন নাই—পরে আলোয়াল তাহা সম্পূর্ণ করেন। আলোয়ালের কবিত্ব অবশ্য দৌলতকাজী অপেক্ষা উন্নততর প্রণালীর ছিল। কবীর মহম্মদ কর্ত্তৃক 'বঙ্গ-মালা', সাদরুদ্দিন ছিদ্দীক কর্ত্তৃক 'ভাব-লাভ', আব্দুল হাসিম কর্ত্তৃক 'ইয়ুসুফ্-জেলেখা', দৌলত উজীর কর্ত্তৃক লায়লী মজনুর ঋণ বাংলা-সাহিত্যে অপরিশোধনীয়। ফকির চাঁদের সত্যপীরের পাঁচালী এবং করিমুল্লার 'যামিনীবাহাল' ও 'ইমাম-যাত্রার' পুঁথি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

প্রাচীন-বাংলাসাহিত্যে সংগীত-বিষয়ক গাথা প্রণয়ন-কারিদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায় (৮)। এতদ্ভিন্ন পদাবলী-সাহিত্যেও মুসলমান-কবিদের সংখ্যা অপ্রমেয় (৯); এবং বহু স্থলে তাঁহাদের অনিন্দ্য কবিত্ব উচ্চাঙ্গের মর্য্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উদাহরণ স্থলে পদকর্ত্তা করম আলীর ভাব-প্রবণতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। একটি পদে তিনি লিখিয়াছেন—

'কে হরিল প্রাণদূতি ব্রজের শশী—
বৃন্দাবনে রাধা বলে ডাকে না বাঁশী।
সেই সে মনের দুঃখ কইতে নারি কার ঠাঁই,
অভাগী রাধারে দিয়ে বুঝি শ্যামের কাজ নাই।'

প্রাচীন-বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানের দানের সমুদায়

(৫) বিকুরামবিরচিত আছে পুঁথি নাগরিত হিত-উপদেশ নাম যার। চারি খণ্ডে সেই পুঁথি, বিরচিল দ্বিজপতি, প্রতি খণ্ডে নানা খণ্ড তার ॥ এক খণ্ডে কত খণ্ড, এই মতে প্রতি খণ্ড, কথা মধ্যে কথার গঞ্জন। শতফুলে মালী যেন—হারগাছি গাঁথিতেন এইমতে কৈল সুশোভন ॥'

(৬) মাগন-ঠাকুরের নাম হিন্দুর নামেরই মতন দেখাইলেও ইনি মুসলমানই ছিলেন।

(৭) লোরচন্দ্রাণীর রচনার সময় 'মগধির মনের শুনহ বিবরণ। যুগপক্ষ মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন' ॥=১০২০।

(৮) (ক) রাগমালা---আলীমিঞা, আলোয়াল, এবং তাহির মহম্মদের সঙ্গীত ইহাতে আছে।

(খ) তালনামা—ইহাতে সৈয়দ আইনুদ্দীন, সৈয়দ মর্ত্তুজা, নাসীরুদ্দীন আলোয়াল ইত্যাদি কবির গান আছে।

(গ) সৃষ্টিপত্তন---ইহাতে দানেশ-কাজী, নসীর মহম্মদ, বক্সআলী প্রভৃতির গান আছে।

(ঘ) ধ্যান-মালা আলী রাজা কর্ত্তৃক। (ঙ) রাগতালের পুঁথি—জীবনআলী ও রামতনু আচার্য্য কৃত।

(চ) রাগতাল—চাম্পাগাজীকর্ত্তৃক। (ছ) পদ-সংগ্রহ লালবেগ কর্ত্তৃক।

(৯) আকবর আলী, করম আলী, নসীর মামুদ, ফতন, সালবেগ, সেখ জালাল, সেখ ভিখ ইত্যাদি।

মাহাত্ম্য এস্থলে বর্ণনা করা হয় নাই—করা সম্ভবপরও নহে। প্রায় সহস্রাধিক জ্ঞাত-অজ্ঞাত মুসলমান-কবি-গ্রন্থকর্ত্তাদের কতক জনের পরিচয় বিস্তর পরিশ্রমে মাননীয় আব্দুল করিম মহাশয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অজানার তিমির গর্ভে আরও কত কবির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রাচীন কালের বাংলাসাহিত্যের কথা বাদ দিয়া, বর্ত্তমান যুগের বাংলা-সাহিত্যের সহিত মুসলমানদিগের সংশ্রব ও সংযোগ ক্রমশই কমিয়া আসিতে দেখা যায়। প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যের অবসানের পরে বর্ত্তমানের গদ্য-সাহিত্য যখন নূতন আকারে গড়িয়া উঠিতেছিল—তখন হইতে এই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানদিগকে চেষ্টা করিতে প্রায় একবারেই দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন-কল্পে বৈদেশিকদের প্রচেষ্টা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা সুস্পষ্ট। হালহ্যাড্—কেরী মার্‌সম্যান্ প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিসনারীদের অক্লান্ত যত্নেই বাংলা-গদ্য-সাহিত্যের আদিম কাঠাম গড়িয়া উঠে। আর তাঁহাদের সঙ্গে এদেশের যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাতে রাজা রামমোহন, কালীচরণ, কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি হিন্দুকে পাই—কিন্তু আলোয়াল, করিমুল্লা কিংবা সৈয়দ মর্ত্তুজার মতন কোনও মুসলমানেরই নাম পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর নবোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে চতুর্দ্দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের যে অসম্ভাবিতপূর্ব্ব উন্নতির সূচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে বাংলার মুসলমান-সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। তাই, সাময়িক বিস্মৃত ও হেলায় উপেক্ষিত মাতৃভাষার প্রাচীন বনিয়াদের গৌরব-ভিত্তিতে বর্ত্তমান জাতীয়-জীবনের হর্ম্ম্য রচনা করিবার প্রবল উন্মাদনা—তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এবং ইহারই ফলে আমরা কায়কোবাদ, সিরাজী আব্দুলকরীম, শহিদুল্লা প্রভৃতি মনস্বী মুসলমান-সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণায় বাংলা-সাহিত্যকে উত্তরোত্তর গৌরবোন্নত করিয়া লইবার সুযোগ ফিরিয়া পাইতেছি।

আব্দার রহিম বলিয়াছেন, 'অধিকাংশ মুসলমানই অবশ্য একপ্রকার বাংলায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন কিন্তু হিন্দু পরিবারে প্রচলিত বাংলা অপেক্ষা ইহা অনেকটা ভিন্ন রকমের এবং সেই জন্যই হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় তাঁহারা পিছাইয়া পড়েন (১০)। শতাব্দী-কাল ধরিয়া বাংলা-সাহিত্যের সহিত মুসলমান-সম্প্রদায়ের সংস্রব রাহিত্যের কারণেই বোধ হয় উপরের উক্তির কতকটা যাথার্থ্য আছে; কিন্তু ইহা নিগূঢ় সত্য হইলেও ত সেই ওজুহাতেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা পরিত্যাগ করা চলিবে না। ঔষধ তিক্ত হইলেও যাহার দ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহাকে পরিহার করিয়া জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবার বাঞ্ছা করা কোন প্রকারেই সংগত কিংবা সু-বুদ্ধির কাজ নহে। ইহাতে একটা নৈতিক অপরাধই আছে।

মুসলমানগণ জগতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও এই বিভিন্নদেশের মুসলমান-সম্প্রদায় মিলিয়া একটা সার্ব্বজনীন সমাজ গঠন করিয়া লইতে পারেন বটে, কিন্তু একটা জাতি গঠন করিয়া লইতে পারিবেন না। তাই, যে মুহূর্ত্তে মুসলমানগণ বাংলাদেশে আসিয়া চিরস্থায়ী বস-বাস আরম্ভ করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহাদের ভাগ্যলিপিতে বাংলার হিন্দুদের সহিত একজাতীয়তার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। পরন্তু, একই শাসনযন্ত্রের ঘূর্ণীপাকে ইহা বরং অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—ইহাকে মুছিয়া ফেলিবার ক্ষমতাও আর কাহারও হাতে নাই।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য এবং জাতিকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য সেই জাতির সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা অপরিসীম। জার্ম্মাণীর জাতীয়-ইতিহাসে গেটে, শিলার, নিচ্‌সে প্রভৃতির উদাহরণ সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সুতরাং বাংলার জাতীয়তাকে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করিতে হইলে হিন্দুমুসলমানের সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা তথা জাতীয় ভাষার প্রসার সাধনের অতীব

(১০) 'The Majority of them spoke some sort of Bengali, but it was not pure Bengali, it was not the same Bengali as was generally spoken in Hindu household. So the Mahomadans will be handicapped in competetion with the Hindus'—Speech in the Bengal Council by sir Abdur Rahim.

প্রয়োজন। হিন্দু মুসলমানের এই একোত্তর সম্মিলনের সূত্র প্রাচীনকাব্যের ভিতর দিয়াও যে পাওয়া না গিয়াছে তেমন নহে।

হামিদুল্লা যে 'বেহুলা সুন্দরী'রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আছে, উক্ত পুস্তকের নায়কের জন্য ব্রাহ্মণগণ কোরানের আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদবাক্যের মতন নায়ক এই কোরানের বাক্য মানিয়া লইয়া সেই অনুসারে যাত্রা করিয়াছিলেন। মির্জা হোসেন আলী কালীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। গুল্‌মাহ্‌মুদ শক্তিবিষয়ে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন এবং আপ্তাবুদ্দীনের 'জামিল দিলারামে' সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে মুসলমান নায়কের বর-প্রার্থনার অভিলাষের কথা উল্লিখিত আছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তখনকার আমলে হিন্দুমুসলমান এক-জাতীয়তার আবেষ্টনের মাঝে থাকিয়া এক উদ্দেশ্য এক ভাব এক প্রেরণা লইয়া আপনাদিগকে একোত্তর সম্মিলিত করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

এই জাতীয়তা রক্ষার জন্য হিন্দুমুসলমানের একোত্তর মিলন ও মেলনের জন্য আমাদের জাতীয় ভাষা তথা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে জাজ্বল্যমান রাখিয়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৯ সালে ইংরেজীতে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চা প্রধান প্রধান বিষয়ের অন্যতম হইবে (১১)। বাস্তবিক বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা ভিন্ন ইহা হওয়াও সম্ভবপর নহে। তাই, আব্দুল করিম বলিয়াছেন "মাতৃভাষার সহায়তা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কেবল সুদূর পরাহত নয়—সম্পূর্ণ অসম্ভব,এজন্য আমাদের শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বাংলাই হওয়া উচিত।' ডেনমার্কের লোক-সংখ্যা বাংলার একটা জিলার লোক সংখ্যার সমান, কিন্তু তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাহাদের নিজস্ব ভাষায়ই শিক্ষা দেওয়া হয়, অথচ শিক্ষায়-সভ্যতায় তাহারা কোনও দেশ হইতেই হীন নহে। বাস্তবিক 'বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না' (১২)। নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা পাইয়া জাতি কিরূপ দ্রুত উন্নত হয় জাপান ইহার নিদর্শন (১৩)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে মৌলভী সাদির্খা বি এও লিখিয়াছিলেন :—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তক-গুলি মুসলমান ছাত্রদের মনের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যই ইহার কারণ। সুতরাং বাংলা ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় বিদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদে অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া —মুসলমান ছাত্রদিগকে আরও বেশী করিয়া নিরুপায় করিয়া তুলিবে (১৪)।

বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত-কটমট হইয়া—পণ্ডিতী ভাষারূপে বাহির হইবে, সেইরূপ বাসনা অদ্যকার দিনে কেহই করে না। অবশ্য সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নিকট সামঞ্জস্য থাকায়—এই অঙ্গাঙ্গীত্ব ঘুচাইবার কোনই উপায় নাই—তথাপি ইহাকে সহজ-সরল করিয়া সৃষ্টি করিবার পক্ষেও ত কোন-ই বাধা নাই। বাংলা ভাষার 'পরিভাষা'র

(১১) 'The study of the Bengali Literature is one of the foremost objects of the new regulation to promote' etc.—Convocation Speech 1909 by Sir A. T. Mukherjee.

(১২) মৌলভী শহীদুল্লা এম্‌, এ, বি, এল।

(১৩) রবীন্দ্রনাথকে যখন একটি জাপানী মেয়ে বলিয়াছিল, "আমার 'সাধনা' খানা পড়িতে খুব ভাল লাগে", তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চাহিয়া দেখেন যে মেয়েটির হাতে 'সাধনা'র জাপানী অনুবাদ।

(১৪) "......The Bengali Text-books are nause-ously distasteful to Mahomadan elements. The disadvantage is keenly felt by all Mahomadan students, and it is easy to see that it will be hundred times increased as soon as Bengali becomes the medium of higher education. Books on different branches of the western art and science will have to be rendered into Bengali and the resources of their language being inadequate—hundreds and thousands of Sanskrit words will be incorporated into it with the result that Mahomadan students would find it hopelessly difficult to learn.

অভাব-নিবন্ধন অনেক ইংরেজী শব্দের সংস্কৃত তর্জমা করিতে গেলে কেবল মুসলমানদিগের কাছেই নহে হিন্দুদের কাছেও ইহা নিতান্ত অবোধ্যই থাকিয়া যাইবে। তাই মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লইবার সুবিধা সুযোগ ঘটিয়া না উঠিলে সেই সব বিদেশীয় শব্দগুলিকে নিজের ভাষারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। সব যুগের—সব জাতির মধ্যেই পরের শব্দ-সম্পদ্ নিজের করিয়া গ্রহণ করিবার এই প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কিছু-মাত্র অসম্মানেরও নহে। সংস্কৃত-সাহিত্যে হোরা কেন্দ্র যামিত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে—আরবী ভাষার মধ্যে আলমানাখ, আল্একছির আল্কিমিয়া প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত 'জগন্নাথ' শব্দটি এখন 'জগর্ নাথ' হইয়া ইংরেজী সাহিত্যে আসন অধিকার করিয়াছে। সুতরাং হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দের স্তূপের মাঝে বাংলার জাতীয়তার প্রাণ যে হাঁপাইয়া উঠিবে—সে সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও অযথা সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরে ইহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার বাধ্য-বাধকতা কিছু-মাত্রই দেখা যাইতেছে না। ঋষি বঙ্কিম শেষ জীবনে যে ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্র যে ভাষায় লিখিতেছেন, এই ভাষাকে বোধগম্য করিয়া লইতে হিন্দু মুসলমানের কাহারও যে বেগ পাইতে হইবে এমন মনে হয় না।

আরও একটা কথা বলা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কেবল সংস্কৃত-বহুল হইলেই যে বাংলা ভাষা দুর্ব্বোধ হইবে এমন বোধ হয় না। মুসলমান কবি আলোয়াল সংস্কৃতের নিকট-সংস্পর্শে মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন (১৫)।

ইহার নমুনা আমরা পূর্ব্বেও কিছু কিছু দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন, উর্দ্দু শব্দ-বহুল দুর্ব্বোধ বহু কবিতাও যে মুসলমান কবিগণ লিখিয়াছেন প্রাচীনবাংলা সাহিত্যে এইরূপ উদাহরণের অসচ্ছলতা নাই;—কিন্তু তথাপি তাহা বাংলাদেশের নরনারীর আগ্রহের সহিত সমাদর লাভ করিতে ব্যর্থ হয় নাই।

সার আব্দার রহিম আরও বলিয়াছেন যে, বাংলাতে যদিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের অভাব নাই তথাপি ইহা ইংরেজী সাহিত্যের মত শিক্ষাপূর্ণ এবং নবীন প্রেরণা-মিশ্রিত নহে (১৬) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাপ্রচলনের বিরুদ্ধে ইহাও তাহার একটা ওজুহাত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় সম্পন্ন নহে এবং বহুদিক দিয়াই যে ইহার দৈন্য এখনও রহিয়াছে, সেসম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। এক কাব্য এবং কথাসাহিত্য ভিন্ন বিজ্ঞান, আইন, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, রসায়ন, নক্ষত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিভাগের কোনটিই যে বাংলাভাষার বিশেষ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু পারে নাই বলিয়াইত ইহার দীনতা মোচন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? অকৃত্রিম চেষ্টা এবং আন্তরিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করিলে বাংলা ভাষার এ-দীনতা বেশীদিন থাকিবে না। এই অল্পদিনের মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে ভাবে দ্রুত উন্নতি হইয়া গিয়াছে তাহাতে ইহার ক্ষিপ্র উন্নত হওয়ার একটা স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকদিন আগেই কেরী সাহেব বলিয়া গিয়াছেন :—The Bengali Lauguage current through an extent of country nearly equal to great Britain when properly cultivated —will be inferior to none in elegance and perspicuity."

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমভাগে যে "বঙ্গীয় সাহিত্য সভা" (Vernacular Literary Society) প্রতিষ্ঠা-পিত হইয়াছিল, ইহার অন্যতম সদস্য প্র্যাট্ সাহেব

(১৫) 'বসন্তে নাগর বর নাগরী বিলাসে
বরবালা—দুই-ইন্দু, স্রবে যেন সুধাবিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে।' ইত্যাদি। পদ্মাবতী—আলোয়াল কৃত।

(১৬) Bengali Literature though containing many excellent literature do not contain such educative juvenile literature as there is in the English literature—Abdur Rahim's Speech.

বলিয়া গিয়াছেন—"বাংলার অধিবাসী সংখ্যা ২ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ হইবে। ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করা ব্রিটীশ গবর্ণ মেণ্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য। ইংরেজীভাষায় ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং এদেশে জাতীয় ভাষায় ও জাতীয় প্রথায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষাবিস্তার করা একান্ত কর্ত্তব্য" (১৭)।

ইংরেজ ও বাঙ্গালীর ভাষাগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। সুতরাং বি-জাতীয় ভাব ও ভাষা সহযোগে একান্ত প্রয়োজনীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার যে কতখানি সু-দুর-পরাহত, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য মনীষীগণ পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, আজ বিংশ শতাব্দীর এই নবীন অরুণ-কিরণ-সম্পাতের মাঝেও চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদের দেশীয় অনেককে সেই কথাটি বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন পড়িতেছে—ইহাই পরিতাপের বিষয়।

(১৭) বিশ্বকোষ---শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত।

'টপ্পা' গাহিতে গাহিতে নিধুবাবু বলিয়া গিয়াছেন "নানান্ দেশের নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশী (স্বজাতীয় ?) ভাষা মিটে কি আশা ?" আর সেইদিন আব্দুল করিমও মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির উদ্বোধনে আবেগের সহিত বলিয়াছেন :—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করিতে পারে—মাতৃ ভাষা ছাড়া আর এমন কি আছে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন (medium) হওয়া ভিন্ন আমাদের মাতৃভাষাও যে প্রভূত উন্নত হইয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মর্ম্মস্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না—বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী-গণও ইহাই ভাবিয়াছেন এবং ভাবিয়াছেন বলিয়াই মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে যত্নপর হইয়াছেন।

উপসংহারে একটা কথা বক্তব্য এই যে,—একেত হিন্দুমুসলমানের পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মাচরণ উভয়কে এক হইয়া মিলিত হইতে দিতেছে না; তাহার উপরে ভাষা ও সাহিত্যের পার্থক্য যদি বর্ত্তমান কালের এই একান্ত প্রয়োজনীয় হিন্দুমুসলমানের সংঘবদ্ধভাবে সম্মিলনের মুখে পাহাড় প্রমাণ অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়ায় তাহা হইলে আরও বহুযুগ ধরিয়া জাতির আবশ্যম্ভাবী অধঃপতন-জনিত ক্ষোভের অন্তই থাকিবে না।

নান্নুর

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নান্নুর চণ্ডীদাসের জন্মভূমি, নান্নুর বাঙ্গালার অন্যতম সারস্বততীর্থ, নান্নুর প্রেমভক্তির পুণ্যপীঠ। বীরভূম, বোলপুর হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে এই গ্রাম চণ্ডীদাসের পবিত্র স্মৃতি বক্ষে লইয়া আজিও বর্ত্তমান আছে। বোলপুর কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্রাম-নিকেতন-রূপে (অধুনা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়) প্রায় সর্ব্বজন-পরিচিত, এবং ইহা ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলপথের লুপ লাইনে একটি প্রসিদ্ধ ষ্টেশন।

নান্নুরে এখন প্রায় চারিশত ঘর লোকের বাস। গ্রামে ব্রাহ্মণ, ময়রা, বেণে, সৎগোপ, তাঁতী, কামার, ছুতার, বৈষ্ণব, মালি, কলু, শুঁড়ি, ধোপা, বাগ্দি, হাড়ি, ডোম, মুচি, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বাস করে। লোক-সংখ্যা

প্রায় দেড় হাজার, আন্দাজ ছয় হাজার বিঘা জমি লইয়া নান্নুর মৌজা গঠিত।

নান্নুর গ্রাম পরগণা "বারবকসিংহের" অন্তর্গত। খুব সম্ভব, মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর আমলে বীরভূমের সীমানা আরো বড় ছিল, এবং সেসময় বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ ও পরগণে বারবকসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা তোড়লমল্ল ও সম্রাট্ সের সাহের পূর্ব্বে যখন সরকার, চাকলা পরগণার সৃষ্টি হয় নাই তখন নান্নুর সাধারণতঃ বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত রূপেই পরিচিত হইত। চণ্ডীদাসের সময় ইহা প্রথমে 'কিঙ্কিন' নামক হিন্দু নরপতির, পরে 'কিলগির' নামক একজন মুসলমানের অধিকারভুক্ত ছিল। ১২২৭ সালের জমিদারী সেরেস্তার কাগজে "নানোর" নাম পাওয়া যায়। ইং ১৮৫৪ সালের গভর্ণমেণ্ট-নক্সায় নান্নুর নাম আছে। নান্নুরের নিকটবর্ত্তী সাকুলীপুর (পূর্ব্ব নাম সাফুলীপুর) "কিসমৎ সাফুলীপুর" নামে পরিচিত ছিল, কিসমৎ শব্দে ছোট মৌজা বুঝায়। এখনো সাকুলীপুরের সীমা খুব সংকীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। সাফুলীপুর কবে লিপিকর প্রমাদে সাকুলীপুর হইয়াছে জানা যায় না।

পূর্ব্বে অজয়নদ এই গ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। সে-সময় অজয়-তীরবর্ত্তী একখানি গ্রাম বাণিজ্যের জন্য খুব খ্যাতিলাভ করে, এই গ্রাম আজিও 'বন্দর' নামে পরিচিত। বন্দর নান্নুরের দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী বালিকুলি, বালিসারা, বালি আরা, বালুই প্রভৃতি গ্রাম অজয়ের বালুময় তীরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নান্নুরের সীমানা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে সরিয়া গিয়া অজয় এক সময় 'গোপডিহি' বা গোয়ালডি গ্রামের পাশ দিয়া আপনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া লয়, এখন আরো দক্ষিণে (প্রায় ১২ মাইল) সরিয়া গিয়াছে। গোয়ালডিহির অনতিদূরবর্ত্তী পশ্চিমস্থিত 'হারমুর' গ্রাম হইতে গোয়ালডিহির পূর্ব্বে কিছু দূর পর্য্যন্ত অজয়ের প্রাচীন প্রবাহের চিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। গোয়ালডিহির নিকটবর্ত্তী 'গড়পাড়া' গ্রামের লোকে এইরূপ পুরাতন খাতে এক একটা বাঁধ দিয়া কয়েকটি পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। সারি সারি এই পুষ্করিণীগুলি দেখিলে নদীর মজিয়া যাওয়া গর্ভাংশ বলিয়া বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

গ্রামের মধ্যে দৈঁকুড়া, দেঁতা, স-রেদা, এবং মাহাতা এই চারিটি পুষ্করিণী দেবখাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রামের পশ্চিমে সাতরায়, বা সাত রাণীর দীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ, নান্নুরের পুরানো নাম ছিল নলপুর, বা নলনগর, বর্ত্তমান গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে এই পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ ও 'নলগড়ে', 'ঘি গড়ে', 'তেলগড়ে' প্রভৃতি তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধানো কয়েকটি পুষ্করিণী পুরাতন নগরের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। নান্নুর নাকি 'নলরাজার' রাজধানী ছিল, বীরভূমে আরো কয়েকটি স্থানে নলরাজার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, 'সন্ধিগড়' 'নলহাটী' প্রভৃতি স্থান নলরাজার স্মৃতি বহন করিতেছে। স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাসে' বীরভূমের 'নল'বংশীয় রাজাদের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নল-বংশীয় রাজগণ বীরভূমে রাজত্ব করিতেন। তিনি কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন গৌড়ের ইতিহাস হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসস্তূপ হইতে কয়েকজন লোক কয়েকবার কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিশালাক্ষীদেবীর সেবাইত বংশের পরলোকগত মৃত্যুঞ্জয় ভাট্টাচার্য্য এইরূপে প্রাপ্ত একটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়কে দেখাইয়াছিলেন; রাখালবাবু 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে ইহা গুপ্তবংশীয় 'রাজা বালাদিত্যের' (নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য) মুদ্রা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুদ্রায় 'নরবালাদিত্য' এই নাম অঙ্কিত আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে গুপ্তবংশীয় নরপতি 'পুরগুপ্তের' পুত্র বলিয়া মনে করেন, সম্ভবত ইনি খৃষ্টীয় ৪৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরাতন রাজবাড়ীর দক্ষিণে 'আগরতোর' গ্রাম, গ্রামে কতকগুলি মুসলমান বাস করে। আগরতোরে 'ছোটখাই' ও 'বড়খাই' নামে দুইটি গড়খাইএর বিলুপ্তাবশেষ ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, কেহ কেহ বলেন নলপুরের "অগ্রতোরণ" হইতে আগরতোর নাম হওয়াও অসম্ভব

নহে। কিন্তু এই পরিখা দুইটি অতি পুরাতন বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্ম মঙ্গলের লাউসেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের বিশেষ সংস্রব ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত 'সামন্ত শেখর' রাজার রাজধানী 'জলন্দার গড়', 'তারাদীঘি', 'বাঘা কামদলের মাঠ', (ধর্ম্মমঙ্গলে কামদল বাঘের কাহিনী আছে) নান্নুর হইতে বেশী দূরে নহে। সাঁকুলীপুরে "সাফুলেশ্বর শিব" দেখিয়া অনেকে এই গ্রামের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলের সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন; ধর্ম্ম মঙ্গলে 'সাফুল্লার' নাম আছে। আবার কেহ কেহ বলেন নান্নুর একটি 'সিদ্ধপীঠ'; এখানে দেবী বিশালাক্ষী, ভৈরব সাফুলেশ্বর।

বর্ত্তমান গ্রামের মধ্যে পুরাতন হাটতলায় বুড়োশিব আছেন, নিকটেই 'চণ্ডীদাসের ভিটা' নামে পরিচিত ধ্বংসস্তূপ ও বিশালাক্ষীর মন্দির। পূর্ব্বে এখানে গ্রাম ছিল না, গ্রামের বাহিরে এখানেই হাট বসিত, চণ্ডীদাস নান্নুরের মাঠে "নিরজন" পাতের কুটীরে এই হাটের নিকটেই বাস করিতেন। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া গ্রামের নিত্যা-মনসাদেবীর পরিচারিকা (দেবদাসী ?) চণ্ডীদাসের প্রেমপ্রচারের গুরু ডাকিনী বাসুলী এখানে আসিয়া কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে

"নান্নুরের মাঠে　　　　পাতের কুটীর
　　নিরজন স্থান অতি"
"নান্নুরের মাঠে　　　　হাটের নিকটে
　　বাসুলী বৈসে যথা"

—প্রভৃতি চণ্ডীদাসপদাবলীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করিতে পারা যায়।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নান্নুরে প্রচলিত প্রবাদের দু-একটি উল্লেখ করিতেছি। প্রবাদ আছে—চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজক ছিলেন, একদিন অজয়ের জলে স্নান করিতে গিয়া তিনি একটি সুন্দর কমল সংগ্রহ করেন, কমলটি অজয়ে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই পদ্মটি বিশালাক্ষীর পদে নিবেদন করিতে গেলে চণ্ডীদাস প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন,—দেবী যেন বলিতেছেন "উহা আমার ইষ্টদেবের নির্ম্মাল্য, এ ফুল আমার পায়ে দিও না, মাথায় দাও।" চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করেন "মা তোমার ইষ্টদেব কে"? দেবী উত্তর দেন "শ্রীকৃষ্ণ"। চণ্ডীদাস তখন শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে দেবী সানন্দে সম্মতি দান করেন। দেবীপূজার পর 'কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব' ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে চণ্ডীদাস ঘুমাইয়া পড়েন, এমনি সময়ে পূর্ব্বোক্ত দেবদাসী বাসুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রণালী বলিয়া দেন, এবং 'রজক ঝিয়ারী' রামমণিকে সঙ্গিনী করিতে বলেন। অতঃপর 'রামিনী'র নিকটে গিয়া তাহাকে ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে উপদেশ দেন। 'রজকিনী রামতারা বা রামমণি'র পূর্ব্ব নিবাস ছিল কাটোয়া অঞ্চলের 'তেহাই' নামক কোনো গ্রামে। পিতৃমাতৃহীনা রামতারা অল্পবয়সে বিধবা হইয়া নান্নুরে কোনো আত্মীয় বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সে যে পুকুরে কাপড় কাচিত, চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজাদি সারিয়া সমস্ত দিন সেই পুকুরে মাছ ধরিবার অছিলায় বসিয়া থাকিতেন, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন। এক্ষণে বাসুলী দেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া অতি আনন্দে উভয়ে মিলিত হইয়া "সহজ" ভজনের প্রণালীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনায় আত্ম-সমর্পণ করিলেন। চণ্ডীদাসের যাবতীয় পদাবলী নাকি এই রজকিনী মিলনের পরে লিখিত হইয়াছিল। নান্নুরে রামীর ভিটা এখনো আছে, পুকুরে রামী কাপড় কাচিত, চণ্ডীদাস মাছ ধরিতেন, সে-পুকুরও লোকে দেখাইয়া থাকে; এমন কি একটি প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডকে গ্রামবাসী রামীর 'কাপড় কাচা পিঁড়ি' বা 'পাটা' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। রজকিনী-মিলনের ফলে চণ্ডীদাসের পাতিত্য ঘটিয়াছিল, এবং সমাজ-পতিগণ তাঁহাকে 'একঘ'রে' করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের এক ভাই ছিলেন,—সহোদর কি জ্ঞাতি ভ্রাতা লোকে তাহা বলিতে পারে না, ইহার নাম ছিল 'নকুল'। নকুলের উদ্যোগে একটা সমারোহ-সহকারে ভোজ দিতে স্বীকৃত হইয়া চণ্ডীদাস সমাজপতিগণের মার্জ্জনা লাভ করেন। ভোজের দিনে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া সমাজ-পতিগণ না কি রামীকেই পরিবেশনে অনুমতি দান করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের তিরোধানের পর নকুলের বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে বিশালাক্ষীর সেবাইত স্বত্ব প্রাপ্ত হন। সেবাইত—পরলোকগত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেন তাঁহারাই নকুলের বংশধর, আবার কেহ কেহ বলেন সে বংশ লোপ পাইয়াছে, বর্ত্তমান সেবাইতগণ তাঁহার দৌহিত্র-বংশীয়। বর্ত্তমান সেবাইতগণের গোত্র শাণ্ডিল্য, মূলে ইহারা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, যাজকতা করায় ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস সুকণ্ঠ ছিলেন, এবং দল লইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইতেন। নিকটবর্ত্তী কীর্ণাহার—মতিপুরে কীর্ত্তন গায়িতে গেলে তথাকার মুসলমান-জমিদারের পত্নী গান শুনিয়া মুগ্ধা হইয়া স্বামীর মর্য্যাদায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ক্রুদ্ধ ভূস্বামী স্বীয় সিপাহীশান্ত্র লইয়া দলসহ চণ্ডীদাসকে আক্রমণ করেন। এমন সময় দারুণ ভূমিকম্পে নাট-মন্দির পতনে সদলে চণ্ডীদাসের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে, জমিদারের সিপাহী নান্নুরে আসিয়া বিশালাক্ষী মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটীর ধ্বংস করে।

এখন যাহা চণ্ডীদাসের ভিটা নামে পরিচিত উহা সেই বিশালাক্ষী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বহুকাল পরে তিলি জাতীয় কোনো বণিকের পত্নী স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থান হইতে বিশালাক্ষীর বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, এই ভিটা তখন জঙ্গলে পূর্ণ : ! গয়াছিল। আজিও শারদীয়া পূজার সময় সেই তিলি-বংশের প্রদত্ত বলির ছাগ দেবীর উদ্দেশে সর্ব্বাগ্রে নিবেদিত হয়। ভিটার উপর কয়েকটি বাসুদেব মূর্ত্তি পড়িয়া ত্তিগুলি নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কয়েকটি মূর্ত্তি প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে করেন, বর্ষার জলে ভিটার মাটি ধুইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বিশালাক্ষী মূর্ত্তির সঙ্গে এই মূর্ত্তি-গুলিও বাহির হইয়া পড়ে।

নান্নুরের দুই ক্রোশ উত্তরে কীর্ণাহার গ্রাম। জ্যোৎ-কিশোর, সুভরাজপুর, মদনগোপালপুর, কৃষ্ণনগর, নন্দরামপুর, মতিপুর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী কীর্ণাহারের অন্তর্গত। 'কুর্ণাহার', 'কুণনকুণ' নামে নিকটবর্ত্তী অপর দুইখানি গ্রাম এবং লাভপুরের ফুল্লরা পীঠের পূর্ব্বস্থিত 'সুভরাজপুরের ডাঙ্গা (বর্ত্তমান নাম সবরাজপুর) এক সময় কীর্ণাহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই স্থানে তখন 'কিঙ্কিন' নামে একজন রাজা ছিলেন, ইনি গোপভূমের রাজধানী (বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকবর্ত্তী) 'অমরার গড়' হইতে আসিয়া কীর্ণাহারে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার শস্যশালা আজিও 'লাজডিহি' নামে পরিচিত। হাতী-শালার ডাঙ্গা, ঘোড়াবান্ধার ডাঙ্গা, কাছাড়ী ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান এখনো অতীত রাজ-ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজার রাণীর নাম ছিল দুর্গাবতী, 'কিলগির' নামে একজন পাঠান কিঙ্কিনকে হত্যা করিয়া কীর্ণাহার অধিকার করেন, এবং রাণীকে রাজবাটী হইতে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে আদেশ দেন। রাণী অদূরবর্ত্তী মহেশপুরের নিকটে গিয়া বাস করেন। 'স্যালদহরা' শ্মশানের প্রান্তবর্ত্তী সেইস্থান আজিও রাণীপাড়া নামে অভিহিত হয়, কিলগিরের অধিকৃত রাজবাটীর লুপ্তাবশেষ লোকের নিকট এখন "পাঠান ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। লাজডিহির সন্নিহিত মথুরাবাটী ডাঙ্গায় ষট্‌কোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি নানা আকারের বেদীর ইষ্টক-নির্ম্মিত ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান ডাঙ্গার নিকটে 'পানিগুপ্তা' নামে একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ আছে। প্রবাদ এই কিলগিরের বেগমই চণ্ডীদাসের প্রতি অনুরক্তা হন, এবং সেই ক্রোধে চণ্ডীদাসকে আক্রমণ করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া কিলগির নান্নুরের বিশালাক্ষী মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটীর ধ্বংস করেন।

"সুন্দরম্"

আজকাল অনেকের লেখাতেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"-এর উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার মধ্যেই প্রথম আমি এই "সত্যং শিবং সুন্দরম্" পাই। মহর্ষির লেখা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিশাস্ত্র, বিশেষভাবে উপনিষৎ হইতেই তিনি এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তাই এমন সুন্দর কথাগুলি তিনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা একবার খুঁজিয়া বাহির করিবার আমার ইচ্ছা হয়। আমি সেজন্য প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলি খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। অতি অনায়াসেই তৈত্তিরীয় উপনিষদে "সত্যং" এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদে "শিবং" পাইলাম। কিন্তু প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও "সুন্দরম্" পাইলাম না। তখন আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন আমার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, বেদ বা উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে এই "সুন্দরম্" কথাটি নাই। বেদ-উপনিষদাদিতে নাই, তবে মহর্ষি ইহা কোথায় পাইলেন জানিতে আমার কৌতূহল আরো বাড়িয়া গেল। আমি শ্রদ্ধাস্পদ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-মহাশয়দিগকে এ বিষয়ে পত্র লিখিলাম। আচার্য্য শীল-মহাশয় ব্যতীত সকলেই দয়া করিয়া আমার পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। তবে শীল-মহাশয় আমার পত্র পাইয়াছিলেন কিনা তাহাও আমি জানি না। সেও আজ ১৪ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তারও প্রায় ৯ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ মহাশয়ের "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থখানি যখন বাহির হইল তখন তাতে (৮৮ পৃষ্ঠা) ঋষিগণ এ রাজ্যের কথা বলিতে গিয়া শুধু "আনন্দরূপমমৃতম্" 'ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম্' বলিয়াছেন এই উক্তি দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, প্রাচীন ঋষিশাস্ত্রের কোথাও নিশ্চয় তিনি "সুন্দরম্" এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন না হইলে তাঁহারা 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে' এই কথা এমন করিয়া লিখিতে পারিতেন না। তাই আমাকে সেই সন্ধানটি দিবার জন্য তাঁহাকেও এক পত্র দিলাম। তিনিও অনুগ্রহ করিয়া আমার পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। আমি সেই সমুদায় পত্র সৌন্দর্য্যানুরাগী পাঠকগণের জন্য এই সঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রগুলি আমার বাক্সেই এতদিন আবদ্ধ ছিল,—হয় ত, কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে এই মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম।

শ্রী অনঙ্গমোহন রায়

(১)

কলিকাতা

৭ই মে, ১৯০৯

প্রিয় অনঙ্গবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

... ...

মহর্ষির "সত্যং শিবং সুন্দরম্', বিভাগ খুব সম্ভবতঃ জারম্যান্ ও ফ্রেঞ্চ্ দর্শনের The True, the Good and the Beautiful" এর অনুকরণে কল্পিত। Victor Cousinএর এই নামক একখানা বই আছে, তাহা মহর্ষি ও কেশববাবুর খুব প্রিয় ছিল। "সুন্দরমের" ভাব প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের মধ্যে বিকশিত হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে এইভাবের কতক বিকাশ হইয়াছিল। বৈষ্ণবের উপাস্য দ্বিভুজ কৃষ্ণ—শ্যামসুন্দর মদনমোহন—সৌন্দর্য্যের আধার। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ, গঠন মুগ্ধকর, হাস্য প্রাণ-আকর্ষক, বংশীধ্বনি মধুর, স্পর্শ কোমল ও প্রেম উন্মাদকর।

এই কৃষ্ণরূপ ব্রজধামাদি ক্ষেত্রে প্রকটভাবে দেখা গিয়াছিল, অপ্রকটভাবে গোলকধামে নিত্য বর্ত্তমান—উচ্চ সাধকেরা তাহা দেখিতে পান। প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্য্য সেই শ্যামসুন্দরের ছায়া। যাহা হউক

গ্রীক্‌দিগের মধ্যে যেরূপ শিল্প ও নীতিবিজ্ঞানের ভিতর দিয়া এই ভাব প্রকাশ হইয়াছিল বৈষ্ণবদের মধ্যে সেরূপ হয় নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী সীতানাথ দত্ত

(২)

শান্তিনিকেতন
বোলপুর।

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১০ই আগষ্টের পত্র পাইলাম। পূর্ব্বের খানিও পাইয়াছিলাম; তখন বিশেষ একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই প্রত্যুত্তর দিতে অবকাশ পাই নাই।

আমি খুব সংক্ষেপে আসল কথাটি বলিয়াই ক্ষান্ত হইব—কেননা বেশী কথা কেবল গোলেরই সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ আমাদের অন্তঃকরণের তিনরূপ বৃত্তি আছে। আমাদের অন্তঃকরণের যে বৃত্তি গুণ দ্বারা রঞ্জিত হয় (affected)হয় তাহাই Aesthetic বৃত্তি; যে বৃত্তি তাহার পাল্টা উত্তর ছায়—সেইটি হচ্চে Will—moral faculty, যে বৃত্তি গুণ এবং কার্য্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তভাবে উভয়ের লীলা পর্য্যবেক্ষণ করে তাহাই intellectual faculty। ভাগ ভাগ করিয়া দেখাইলাম শুদ্ধ কেবল বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ তিন বৃত্তি পরস্পরের সহিত এরূপ মাখামাখি ভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, ওরূপ ভাগ-ভাগ করিলে তিনেরই ভিতরকার নিগূঢ় মর্ম্মে কপাট পড়িয়া যায়। ধরিতে গেলে—উত্তর প্রত্যুত্তর, এবং উত্তর প্রত্যুত্তরের তত্ত্বাবধারণ তিনই তিনকে অপেক্ষা করে—কোনটি স্বপ্রধান নহে। গুণদ্বারা রঞ্জিত না হইলে ক্রিয়া চলিতে পারে না; ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে গুণদ্বারা রঞ্জিত হওয়া সম্ভবে না; ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অবধারণক্ষম জ্ঞান না থাকিলে দুই-ই ব্যর্থ হইয়া যায়। জ্ঞানের বিষয় হচ্চে The True, Aesthetic facultyর বিষয় হচ্চে The Beautiful। Moral facultyর বিষয় হচ্চে The Good। এটাও ভাগ-ভাগ করিয়া দেখা। কাজের সময় ভাগ-ভাগ করা চলে না। তোমার একজন প্রীতিভাজন বন্ধু তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি যদি তাঁহাকে ভাগ-ভাগ করিয়া দেখিতে যাও—তবে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইবার যে আশা করিতেছ সে আশার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইবে। তুমি যদি এইরূপ খুঁটাইয়া দেখিতে যাও যে, এতটুকু ইঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছি—এতটুকু ইঁহার কাজে প্রীতিলাভ করিতেছি—এতটুকু ইঁহার বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইতেছি—তাহা হইলে তুমি সবই ভুল বুঝিবে। একযোগে যদি তুমি তাঁহার সৌন্দর্য্য, সত্যভাব এবং সাধুভাব গ্রহণ করিতে পার তবেই তুমি তাঁহাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যাঁহারা আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন-লাভ করেন—তাঁহারা তাঁহার সত্যভাব সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গলভাব তিনই এক সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেন। পরমাত্মাকে সুন্দর বলিলেই তাঁহাকে সত্য এবং মঙ্গল বলা হয়। মঙ্গল বলিলেই সত্য এবং সুন্দর বলা হয়। সত্য বলিলেই মঙ্গল এবং সুন্দর বলা হয়। এইজন্য উপনিষৎ—ভাগবত—এবং হাফেজের মধ্যে আমি ঐক্যই দেখিতে পাই—প্রভেদ কিছুই দেখিতে পাই না।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

শিলাইদহ
নদীয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

বোলপুর হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে শিলাইদহে আসিবার ব্যস্ততায় যথাসময়ে আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই—ক্ষমা করিবেন।

আমাদের দেশে ঈশ্বরের সুন্দর-স্বরূপের উপাসনা যে অপ্রচলিত আছে তাহা বলিতে পারি না। বস্তুত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধানত সৌন্দর্য্যরসেরই ধর্ম্ম। য়ুরোপে সুন্দর-স্বরূপ কেবল কবির কাব্যে প্রকাশমান এবং দার্শনিকের তত্ত্বকথায় নিবদ্ধ, কিন্তু সেখানকার পূজা উপাসনার মধ্যে তিনি নাই।

আমাদের দেশে সুন্দর-স্বরূপ ভক্ত-সম্প্রদায়ের ভাবমুগ্ধ চিত্তের পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতা স্বভাবতই সুন্দরের উপাসক ছিলেন। জ্ঞানের দিক্ দিয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার সহায়তা তিনি উপনিষৎ হইতে পাইয়াছিলেন—রসের দিক্ দিয়া সুন্দরকে সেবা করিবার উপকরণ তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতেন এই প্রশ্ন আপনার মনে জাগিয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কুঁজ্যার গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন ছিল এ কথা ঠিক নহে—তত্ত্বশাস্ত্র ভক্তিবৃত্তিকে রস জোগাইতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই সে আমি জানি। তাঁহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষৎ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।.........ইতি ২৮ শে আষাঢ় ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

ময়মনসিংহ

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫ সন।

সাবনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনার পত্র নানাস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছে। তাই উহা পাইতে দেরী হইয়াছে।

"সুন্দর" ঋষিশাস্ত্রের যে যে স্থানে পাওয়া যায় অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

প্রাচীন অভিধানকার অমরসিংহ "সুন্দর" শব্দের এই সব প্রতিশব্দ দিয়াছেন:

"সুন্দরং রুচিরং চারু সুষমং সাধু শোভনং।
কান্তং মনোরমং রুচ্যং মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলম্॥

ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে ঋষিশাস্ত্রের বহুস্থানে 'সুন্দর' বিশেষণের প্রয়োগ আছে। নতুবা অমরসিংহের সুন্দরের এইসব প্রতিশব্দ দেওয়ার কোনই কারণ ছিল না। ঋগ্বেদের কোথাও সুন্দর শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই নাই। 'সুদৃশ' 'চারু' 'সুরূপ' এই শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে আছে। ঐ সব শব্দ সৌন্দর্য্যবোধক।

বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে সৌন্দর্য্যের কথা আছে

"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

"রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে" ইতি মেদিনী;

শ্রীকৃষ্ণোপনিষদে আছে:

সচ্চিদানন্দ লক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্টা

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবু।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম সম্বন্ধীয় স্তোত্রে আছে

"উদ্ভবঃ সুন্দরঃ সুন্দো রত্ননাভঃ সুলোচনঃ।"

পদ্মপুরাণের উমা-মহেশ্বর সংবাদে আছে:—

"শ্যামাঙ্গ সুন্দরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্দ্ধরঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে আছে—

"নবীননীরদ শ্যামসুন্দরং সুমনোহরম্'।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:

'শ্যাম সুন্দর তে দাস্য করবাম তবোদিতম্'।

তন্ত্রসারের শ্রীনীলকণ্ঠধ্যানে আছে:

'খট্টাঙ্গং বিধৃতং ত্রিনেত্রবিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরম্'।

তন্ত্রসারে শ্রীকৃষ্ণধ্যানে আছে

'শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্'।

শ্রীচণ্ডীতে আছে:

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্তভি সুন্দরী"।

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না। হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সৌন্দর্য্যের উপাসক।

বিনয়াবনত

শ্রী অভয়কুমার গুহ

আমেরিকার বিদ্যালয়ে চরিত্র-গঠন-শিক্ষা

আমেরিকায় জনসাধারণের শিক্ষা-প্রণালী ব্যাপক ও উচ্চ ধরণের হইলেও আমেরিকা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। বর্ত্তমানে সেখানকার বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী নেতাগণ চরিত্র-গঠনের শিক্ষাকেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যে-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে নীতি-শিক্ষার স্থান নাই সে-বিদ্যালয় সেখানে আজ বিদ্যালয়ের মধ্যেই গণ্য নয়।

আমেরিকার চরিত্র-শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণীদের মধ্যে ডক্টর্ এডুইন্ ডি ষ্টার্‌বাকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার চরিত্র গঠন-সম্বন্ধীয় শিক্ষা-প্রণালী আজ সারা ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে চরিত্র শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কি হইতে পারে ইহাই নিরূপণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ডক্টর্ ষ্টার্‌বাকের সভাপতিত্বে আমেরিকায় একটি সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভার সভ্যগণের নির্দ্ধারিত প্রণালীগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাদের ষাট হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের বিদ্যালয়সমূহে আজকাল নীতিশিক্ষার প্রয়োজন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে ডক্টর্ ষ্টার্‌বাকের চরিত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দুই-একটি কথা এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ডক্টর্ ষ্টার্‌বাকের মতে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের আহ্বানে কর্ম্মোন্মুখ হওয়ার নামই চরিত্র। তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্ ব্যক্তি যিনি মনুষ্য-জীবনের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির সহিত অন্তরের যোগ রাখিয়াছেন,—যেমন, নাগরিকের কর্ত্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত করা, ধন-সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন, পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসা ও সযত্নে মানুষ করা, সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা, সৌন্দর্য্যবোধ, শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা প্রভৃতির দ্বারা নিজের এবং সমস্ত লোকের সেবা করা এবং নব নব সৃষ্টির শক্তি অর্জ্জন করা।

ডক্টর্ এডুইন্ ডি ষ্টার্‌বাক্

বিশেষজ্ঞ নীতিবিদ্‌গণের দ্বারা কতকগুলি নীরস শুষ্ক উপদেশ-বাণী ছাত্রদের শুনাইয়া দিলে বিশেষ কিছু ফল হয় না। সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বকথায়ও বিশেষ ফললাভ হইবে না। গুণমূলক নীরস চিন্তার দিকে শিশুচিত্তের প্রবণতা নাই। পারিপার্শ্বিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে

আমেরিকার বালকবালিকাদের ভারতীয় জীবন অভিনয়

সঙ্গে ঘটনার বৈচিত্র্য এবং ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মন ও চিন্তা-শক্তি গঠিত হইয়া উঠে। উপদেশ-গুলি পুঁথির জীর্ণ বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সেগুলি যেন শিশুদের চঞ্চল জীবনের সহিত মিশিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাণশক্তিতে সজীব ও সরস হইয়া উঠে।

ডক্টর্ ষ্টারবাক্ আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (State University of Iowa) দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক। দর্শন-বিজ্ঞানে যেমন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তেম্‌নি তাঁর সুধীজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি। একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ডক্টর্ ষ্টারবাক্ হৃদয়েকে আমার আকৃষ্ট করিয়াছেন, প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আমার এমন একটি লোক বলিয়া মনে হইয়াছিল, যাঁহার হৃদয় বিশ্বমানবের সম্পত্তি।"

আমেরিকার গৌণ অপ্রত্যক্ষ প্রণালীতে চরিত্র-শিক্ষার প্রবর্ত্তকদের মধ্যে ডক্টর্ ষ্টারবাক্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রত্যক্ষভাবে সোজাসুজি নীতিশিক্ষা দেওয়া যে একেবারেই অন্যায় এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। ক্ষেত্রবিশেষে সোজাসুজি বেশ নিপুণতার সহিত নীতিশিক্ষা দিতে পারিলে অনেক পরিমাণে কাজ হয়। তবে এ-প্রণালী বিশেষ ফলদায়ক নহে। ডক্টর্ ষ্টারবাকের মতে প্রকৃতির প্রণালীই হইতেছে একমাত্র হিতকর এবং শ্রেষ্ঠতম। এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা আপনা হইতেই তাহাদের পরস্পরের চরিত্রগত কতকগুলি গুণের আবিষ্কার করিবে এবং তাহার অনুশীলন করিতে শিখিবে,—যেমন, সাধুতা, আত্মসংযম, সহানুভূতি, পরোপকার, ইত্যাদি। ষ্টারবাক্ বলেন, "সমস্ত বিশ্বের শিক্ষক যাঁহারা,যাঁহাদের আমরা গুরু বলিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া ভক্তি করি তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে মানুষের হৃদয়কেই স্পর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, মস্তিষ্ককে নহে। তাঁহারা ত ধর্ম্মের নীতিগুলিকে চুল চিরিয়া

আমেরিকার বালকবালিকাদের কাপড় তৈয়ারী

ভাগ করিয়া পৃথক্ করিয়া লোকচক্ষের সম্মুখে ধরেন নাই। তাঁহারা যাহাদের শিক্ষা দান করিতেন তাহাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। যে-সমস্ত সত্য তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন সেগুলি জীবন্ত সতেজ ছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার যুগের দর্শন, ন্যায় এবং নীতিতত্ত্ব পরিহার করিয়া একমাত্র কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলকেই ধরিয়া ছিলেন। নাজারেথের প্রেমিক শিক্ষক নিজের জীবন দিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া মানুষের চরিত্র ও প্রবৃত্তিকে সংশোধিত করিতেন। তিনিই ছিলেন কৌশলী নিপুণ শিক্ষক, তিনি অনুশাসন-গুলি শুধু প্রচার করিয়া যাইতেন, তাহাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অন্তরের মধ্যে আপনা হইতেই হইত। সোক্রাতেস্-এর শিক্ষা-প্রণালীও এইরূপই ছিল; জগতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ এই প্রণালীই গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত কথাগুলি হইতেই নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে ডক্টর্ ষ্টার্বাকের অভিমত বুঝা যায়।

তাঁহার আরও কতকগুলি কথা এইখানে বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। তিনি বলিতেছেন,—লোকে যেমন করিয়া মহামারীকে ত্যাগ করে তেমনি করিয়া নীতিশিক্ষার অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ প্রণালীকে ত্যাগ করিতে হইবে। শিল্পীর মত গুণী হইতে হইবে। যে-সময়ে প্রয়োগ করিলে নীতিকথা সারগর্ভ এবং অর্থপূর্ণ হইবে কেবলমাত্র সেই সময়ে নীতি-কথা উচ্চারণ করিবে। গুণী যেমন নিপুণ হস্তে অতি সাবধানে বীণার তার হইতে সুর বাহির করেন শিশুর হৃদয়-তন্ত্রীগুলিকেও সেইরূপভাবে স্পর্শ করিতে হইবে। ঠিক উপযুক্ত সময়ে আঘাত করিতে পারিলে সে নৈতিক অনুশাসনের মহত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বক্তৃতা দেওয়া একেবারেই ত্যাগ করা দরকার। ক্রমাগত বক্তৃতা দিলে শিশুচিত্ত

বালকবালিকাদের ব্যায়াম

অকারণে ক্লিষ্ট হইবে। শিশুর সুকুমার মানস-চর্ম্মের উপর ঘষিয়া-মাজিয়া কতকগুলি নীতিতত্ত্ব মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

একটি মাত্র উপদেশ, উচ্চ নীতির একটি মাত্র অনুশাসন দিয়া তাহাকেই দুই-এক মাস ধরিয়া শিশুচিত্তের উপর কাজ করিতে দেওয়া উচিত। উপদেশটিকে গল্প, কবিতা, প্রভৃতির সময়োচিত আবৃত্তির দ্বারা সরস এবং জীবন্ত করিয়া রাখিতে হইবে। কোনও নীতিপূর্ণ গল্প বা জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সারাংশটি পৃথক্ করিয়া দেখাইতে যাওয়া উচিত নয়। "ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই", "গল্পটি আমাদের এই উপদেশ দেয়"—এইসব কথাগুলি শিক্ষার অতীত বিস্মৃত পদ্ধতির মধ্যেই থাক্।

মনে রাখা উচিত যে, একটি বিড়াল, একটি ছোট ফুল যেমন তেম্‌নি একটি ক্ষুদ্র নীতিকথাকে অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাটি করিলে তাহা মরিয়া যায়।

আর এইসব উপদেশ দিবার সময় কোনওরূপ গাম্ভীর্য্য না দেখাইয়া বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। মনের স্বাচ্ছন্দ্যে এবং করুণতায় সব কোমলভাব ফুটিয়া উঠে। "আনন্দপূর্ণ সাধু জীবন যাপনই এই নবজগতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়।"

ডক্টর্ ষ্টার্বাক্ চাহেন যে, ছেলে-মেয়েরা অনুশাসনের তালিকা পালন অপেক্ষা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগুলিকে বেশ করিয়া অনুভব করুক। কারণ, জীবনের ঘটনাগুলি বাস্তব এবং সুস্পষ্ট, কিন্তু অনুশাসনগুলি ভাবময় ও গুণ-মূলক। পারিপার্শ্বিক বস্তু এবং ঘটনার মধ্যে শিশুচিত্তকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে বিশেষ কোনও অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহারা নিজেরাই ঠিক চলিতে পারিবে। এইরূপে বাস্তব ঘটনার এবং অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে তাহাদের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; তাহাদের চিত্তে নৈতিক দৃঢ়তা এবং মার্জ্জিত বিচার-বুদ্ধি জাগিতে থাকিবে। ক্রমে আত্মীয়-স্বজন,

বসন্তকালে বালকবালিকার ময়দানে খেলা

দিলে নৈতিক চরিত্র-শিক্ষা সমস্যা অনেকটা সমাধান হইতে পারে ।

ডক্টর্ ষ্টারবাক্ চরিত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর তালিকা ও নক্‌সাচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি এইখানে দেওয়া হইল,—যেমন ছাত্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র দুইটি দল বিবাদ প্রভৃতি মিটাইতে নিযুক্ত করা; বালকদের দ্বারাই একটি পক্ষী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে নানা রকমের পাখী পুষিয়া পালন করিতে দেওয়া; দেশের বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে পরিবার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক পরিচ্ছদ বালকদের দ্বারা প্রস্তুত করা; মাতৃ-পিতৃহীন কোন পশুকে পালন করা; কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির বাসস্থানগুলি মাঝে মাঝে দেখিতে যাওয়া; স্পার্টা-দেশীয় দৈহিক ব্যায়াম-কৌশল অভ্যাস করা; মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে মশা-মাছির উৎপত্তি স্থানগুলির সন্ধান দেওয়া; বিদ্যালয়ে একটি যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা; প্রধা প্রধান বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করা; কোনও একটি ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করা ও তাহার কার্য্যপ্রণালী বুঝিবার চেষ্টা করা; এবং সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রভৃতি অঙ্কন করা।

দেশ, বন্ধু, শত্রু, ক্রীড়া প্রভৃতি সকলের আহ্বানেই তাহার অন্তর সায় দিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্ত্তব্য হইতেছে কতকগুলি গুণমূলক অনুশাসন না শুনাইয়া সজীব বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি করিয়া তোলা।

শিশুদের বাস্তব নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠটি কতকগুলি ছাত্র আবর্জ্জনাপূর্ণ করিয়া নষ্ট করিতেছে; তখন অপর একটি ছাত্রদলকে সেই মাঠটি রক্ষা করিবার ভার দেওয়া হইল। এখন, এই কাজটি করিতে হইলে তাহাদের কেবলমাত্র কতকগুলি কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া দিলেই চলিবে না, কিরূপে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তাহাও তাহারা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিবে। তাহারা হয়ত ছোট ছোট সাইন্‌বোর্ড তৈয়ারী করিতে পারে;—কোনটিতে লেখা থাকিবে—"ঘাসগুলিকে রক্ষা করিবে", কোনওটিতে হয়ত থাকিবে—"ময়দান অপরিষ্কার করিও না" "ঘাসগুলিকে পরিষ্কার রাখ।" এইরূপ শিক্ষা

এইরূপ কার্য্যপ্রণালীতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের চরিত্র গঠিত হইয়া উঠে। এইরূপে একটি ক্ষুদ্র দলের কর্ম্ম এবং চিন্তা তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অন্তরকে জাগ্রত করিবে। সকলে একত্র হইয়া এইরূপ সাধারণের কাজ করিতে থাকিলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্ব জাগ্রত হইয়া উঠে। এইরূপে সংঘের মধ্যে নিজেকে উৎসৃষ্ট করিয়া সাধারণের সেবার অংশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকাই মনুষ্যত্বের পরিচয়। সামাজিক কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিশিক্ষা। নীতি-শিক্ষক, সূত্র গঠনের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র

তাঁহাদের অভিমত এবং কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

ছাত্রদিগকে খুব বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সুকৌশলে ও সুচারুরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে। শিশুচিত্তের চিন্তা এবং কল্পনাশক্তির কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। শিক্ষক যদি কোনও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ চিন্তাশক্তির পরিচয় পান তবে যথা সময়ে সেইটিকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন।

ডক্টর্ ষ্টার্বাক্ কতকগুলি সহকর্ম্মী লইয়া একখানি সুবৃহৎ সুবিভক্ত পুস্তক প্রনয়ণে নিযুক্ত আছেন। এই পুস্তকখানিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চরিত্রশিল্প সম্বন্ধে অমূল্য তথ্যসমূহ পাইবেন। ডক্টর্ ষ্টার্বাক্ বলেন,—সব সময়েই শিক্ষকদের এমন সব উৎকৃষ্ট গল্প,মনোরম কবিতা, ঐতিহাসিক আখ্যান জানা থাকা দরকার যেগুলির প্রয়োগে ছাত্রগণের অন্তরে আনন্দ,বীরত্ব, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, সৌন্দর্য্যবোধ, সেবা প্রভৃতির উদ্বোধন করা যাইবে।

কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,ধর্ম্মকে নীতিশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে কি না। ধর্ম্ম শব্দের অর্থের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। ডক্টর্ ষ্টার্বাকের মতে সত্য, বিশ্বসৌন্দর্য্য, বিশ্বে প্রকাশিত ভগবানের মহিমা প্রভৃতির সহিত শ্রদ্ধানত চিত্তে যোগ রাখার নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের সংস্কার মুক্ত উদার অনুশাসনগুলিকে নীতিশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার তিনি পক্ষপাতী। সত্য-ধর্ম্মের সঙ্গে, পৌরাণিক উপাখ্যান, সঙ্কীর্ণ আচার-বিচার ও সংস্কারগত অন্ধ বিশ্বাসের কোনও সম্বন্ধ নাই।

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে মনের ও চিত্তের অনুশীলনকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বহু উপরে স্থান দেওয়া হয়। সামাজিক এবং জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কঠোর পরমার্থতত্ত্বের সংস্কারগুলি বিনিষ্ট হইয়া যাইতেছে।

জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি দেশের শিক্ষা-মন্দিরগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। সেগুলিকে দেশাত্মবোধ প্রভৃতি উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত করিতে হইবে। যে সমস্ত বিদ্যালয় চরিত্রবান্ সুপণ্ডিত এবং জনসেবাপরায়ণ ছাত্র গঠিত করিতে পারে সেগুলি দেশের এবং জাতির সম্পদস্বরূপ। ভারতবর্ষের জনশিক্ষা-প্রণালী সংস্কার করিবার সময় আসিয়াছে। উন্নততর উচ্চতর বিদ্যালয় ও উৎকৃষ্ট শিক্ষক আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশ আজ জ্ঞানদীপ্ত বা উন্নতশিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ যুবকগণকে আহ্বান করিতেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞানের মন্দির হউক আর শিক্ষকগণ সেই মন্দিরগুলির সাগ্নিক পুরোহিত হইয়া সরস্বতীর আরাধনা করুন।*

* ১৯২৬ মে মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু মহাশয়ের Character Education প্রবন্ধের সার সঙ্কলন।

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

সতেরো

ফাল্গুনের প্রথম। সন্ধ্যে তখন সাতটা। গোধূলি লগ্নে নন্দার সে-দিন বিয়ে। কেদার ও প্রিয় পাড়ায় বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে, মীনা, জয়াও সঙ্গ নিয়েছে। বাড়ীতে খোকাকে নিয়ে সেবা আজ একা, বাহিরে একটা চাকর শুধু বাবুর অনুপস্থিতিতে বাড়ীর পাহারাদারীতে নিযুক্ত।

খোকাকে দুধ খাইয়ে বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে সেবা আস্তে আস্তে তার কাণে চাপড় দিতে দিতে ঘুম-পাড়ানো গানের সুর ভাঁজ্‌ছিল। খোকার চোখ দুটি

আধ-নিমীলিত হ'য়ে এসেছে, এমন সময় এক হাতে লাঠি আর এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে প্রবাল আঙ্গিনায় ঢুকে প'ড়েই হাঁকুলে, "বো-ঠান্"। সেবা একটু চম্‌কে উঠে আগন্তুকের দিকে চেয়ে থতমত খেয়ে গেল। মাথার কাপড়টা ত্রস্তে তুলে দিলে ও সে পুরুষ মানুষ দেখে ব'সে থাক্‌বে কি ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোবে তা ভেবে ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লে না। উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় সেবার সুন্দর শ্রী চোখে পড়ায় প্রবাল ও একটু চম্‌কে উঠেছিল। এ যে প্রিয় নয় তা সে বুঝ্‌তে পার্‌লে; কিন্তু কেদারের বাসায় প্রিয় ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই ব'লেই সে জান্‌ত, কাজেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ল না যে এ কে। অবশ্য সেবাকে সে কেদারের বিয়ের রাত্রেই যা দেখেছিল। সেবার সৌন্দর্য্য চোখে ভালো লাগায় সে-সময় সে বার বার সেবার দিকে তাকিয়েও ছিল; কিন্তু তারপর সে স্মৃতি বিস্মৃতির জলে ডুবে গেছে, সুতরাং চিনি চিনি ক'রেও সে ধর্‌তে পার্‌লে না যে এ সেবা।

সেবা কিন্তু ক'দিন থেকেই শুন্‌ছিল যে প্রবাল আস্‌বে, কাজেই, প্রথম চমক্ দূর হ'বার পরই সে বুঝে নিলে, যে আগন্তুক প্রবাল। বাড়ীতে কেউ নেই, অতিথি নিশ্চয়ই পথক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত; সুতরাং লজ্জার দোহাই মেনে নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে থাকা তার যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না। সে সহজেই নিজের সঙ্কোচকে জয় ক'রে সপ্রতিভ ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবালকে সম্ভাষণ কর্‌লে—"আসুন, ওঁরা সব বাড়ী নেই; পাড়ায় একজনদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে গিয়েছেন, একটু পরেই ফির্‌বেন।"

প্রবালও অপরিচিতা যুবতীর সাম্‌নে একা প'ড়ে গিয়ে স্বজাতিসুলভ কুণ্ঠায় যেন আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। আহ্বান শুনে কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে বারেন্দায় উঠে ব্যাগ আর লাঠিটা হস্তমুক্ত ক'রে সেবাকে একটি নমস্কার ক'রে সে বল্‌লে—"খোকা ত ঘুমিয়ে পড়েছে, খুকী বুঝি মার সঙ্গেই গিয়েছে?" সেবা নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ, বাড়ীতে আমি একাই আছি। বাইরে একটা চাকর ব'সে আছে, তার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়নি?"

প্রবাল বল্‌লে—"হ্যাঁ হয়েছে। তাকেই ত জিজ্ঞেস কর্‌লাম—'এটাই কি কেদার-বাবু ইন্‌স্পেক্টারের বাড়ী?' সে বল্‌লে—'হ্যাঁ, বাবু বাড়ী নাই, আপনি ভিতরে যান বউমা আছেন।' কাজেই আমি নির্ভয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি, আপনি যে একা আছেন তা বুঝ্‌তে পারিনি, মাপ কর্‌বেন।" একটা অদম্য কৌতূহল কিন্তু প্রবালের মনের মধ্যে ঠেলা দিতে লাগ্‌ল, এই সপ্রতিভ, সুন্দরী যুবতীটির পরিচয় জান্‌বার জন্য। সেবা সে কৌতূহলকে আপনিই চরিতার্থ ক'রে দিল—সে বল্‌লে—"চাকরটা বোধ হয় সইমা বলেছিল, আপনি বউমা শুনেছেন।"

চকিতে প্রবালের সেই বহুদিনের বিস্মৃত ছবি মনে জাগ্‌ল। সত্যিই ত, এই ত সেই অনেক দিনের এক বাদলরাতের দেখা দিব্যশ্রী; তবে তখনকার কিশোরী আজ পূর্ণাবয়বা সুগঠনা নারী-মূর্ত্তি।

সেবা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে চাকর গোবিন্দকে ডেকে বাবুকে মুখ হাত ধোবার জল দিতে ব'লে নিজে জলখাবারের জোগাড় কর্‌তে গেল। বছর ষোলো আগের কথা কি না—তখন ঘরে ঘরে এত বেশী চায়ের চলন হয়নি। কেদারদের বাড়ীতেও ওসব পাট ছিল না; কাজেই অতিথিকে চা দেবার কথা সেবার মনে হয়নি। সে এক গ্লাস সরবৎ তৈরী ক'রে নেবুর রস মিশিয়ে আর দুটি রসগোল্লা এনে প্রবালের সাম্‌নে রাখ্‌লে। প্রবাল মুখ হাত ধুয়ে সেটুকু খেয়ে বল্‌লে, "আমার সোজা এলাহাবাদ থেকেই আস্‌বার কথা ছিল; কিন্তু আমার বোন্‌কে তার শ্বশুর-বাড়ীতে দেখ্‌তে গিয়ে দু' চারদিন দেরী হ'য়ে গেল, ঠিক মতো আর খবর দিয়ে আস্‌তে পারিনি।" সেবা একবার কি জবাব দেওয়া উচিৎ ভেবে ঠিক কর্‌তে না পেরে চুপ ক'রে রইল। প্রবাল আপনা হ'তেই বল্‌লে—"ঘরে ভাত নেই? বোধ হয় দুটি ভাত পেলেই সুবিধে হয়।"

সেবা বল্‌লে—"ভাত না থাক্‌লেও চালের অভাব নেই।"

প্রবাল ব'লে উঠ্‌ল—"আবার তা হ'লে আপনাকে কষ্ট কর্‌তে হবে। কেদারের ঠাকুর নেই?"

সেবা বল্‌লে,—"ঠাকুর এ-বেলা ছুটি নিয়েছে। আপনার ভয় নেই, ভাত রাঁধা আমাদের অভ্যেস আছে; সুতরাং

সেটা কষ্টের মধ্যে নয়—বিশেষ যখন ওটা আমরা আনন্দের সঙ্গে খেয়ে থাকি।"

প্রবাল বল্‌লে—"আনন্দের সঙ্গে ত সব জিনিষই ভোগ কর্‌তে পারি। কিন্তু তৈরী কর্‌বার বেলাতে আমাদের মাথা ঘুরে যায়। তা আপনি—"

এবার সেবা না হেসে পার্‌লে না, বল্‌লে—"মেয়েদের মাথা-ঘোরা অভ্যেসটা নেহাৎ আপনাদের দেখেই হয়। তা আপনি চিন্তিত হবেন না—আপনার জন্যে ঠিক নয়, অতিথির জন্যেই আমি রাঁধতে যাচ্ছি; অতিথি সেবা আমাদের দেশে মস্ত বড় পুণ্য কাজ।"

প্রবাল আর উত্তর দিলে না, চুপ-চাপ ব'সে সেবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর ক'রে রান্নার উদ্যোগ করা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সেবাও একটা কাজের মধ্যে আপনাকে সঁপে দিয়ে একা ঘরে রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে নূতন যুবা-অতিথির সঙ্গে অনাবশ্যক কথা-বার্ত্তার সঙ্কোচ হ'তে এড়িয়ে বাঁচল। গোবিন্দকে ডেকে সে বাট্‌না বাট্‌তে বসিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ একা একা ব'সে থেকে অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"কিছু বই-টই পেতে পারি?"

সেবা বল্‌লে—"বেশ ত! ঘরের মধ্যেই বই আছে; আপনি গিয়ে দেখে নিন্ না।"

প্রবাল উঠে সাম্‌নের ঘরের মধ্যেই ঢুকে বেশ একটু আনন্দ বোধ কর্‌লে। আড়ম্বরহীন গৃহসজ্জায় বেশ একটি নিপুণ হাতের ছাপ। সর্ব্বত্র নারী-হস্তের সেবা-মাধুর্য্যের পরিচয় স্পষ্টই চোখে পড়ে। কেদার ধনীর সন্তান। হুগলীতে তার শয়ন-গৃহের আসবাব-পত্রের বাহুল্য প্রবাল চিরদিনই দেখে এসেছে। দেওয়াল ভরা ছবি, নানারকম মেষ-হরিণের শিঙ দেওয়ালে টাঙানো, আল্‌মারীভরা রাশীকৃত খেল্‌না, টেবিলভরা দামী দামী নক্সা করা রূপার ও পিতলের পাত্র। এসব দেখে সে কেদারকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত তোর ঘরে বস্‌লে ভাই আমার ভুল হয় যে এটা দোকান ঘর আর আমি খদ্দের কি না। এখানে সে-সব আড়ম্বর-বর্জ্জিত ঘরখানি সামান্য কিছু জিনিষ পত্রেই বেশ সুন্দর ও শ্রীমান ব'লে প্রবালের চোখে ঠেক্‌ল। দেওয়ালে একটি ঘড়ি, দুদিকে দুটি টেবিলে বই সাজান, দুটি ফুলদানিতে কিছু ফুল রাখা, টেবিল-ঢাকা কাপড়খানিতে লাল সুতার বেশ সরু-ক'রে একটি পাড় বোনা, একটি মাঝারী শেল্‌ফে কতকগুলি বীরভূমের গালার খেল্‌না সাজানো।

হঠাৎ সেবা কি দর্‌কারে ঘরে ঢুকেই প্রবালকে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে বল্‌লে—"বই পাননি? এই যে টেবিলের ওপর!" প্রবাল বল্‌লে—"বই? হ্যাঁ তা দেখ্‌ছি। ঘরখানি দেখ্‌ছিলাম। কেদারের হুগ্‌লীর সেই গুদাম ঘর হঠাৎ এখানে এসে এমন রূপ ধরেছে দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। সেখানে ঘরে দামী জিনিষ অনেক থাক্‌লেও এ ঘরে বাহুল্য-বর্জ্জিত হ'য়ে বেশ একটি শ্রী ফুটেছে।"

সেবা বল্‌লে—"এঘরটা ওঁদের খালি প'ড়ে ছিল, এসে পর্য্যন্ত আমিই আছি। ও-দুটি ঘরে তবু অনেক জিনিষ আছে, বাড়ী থেকে সঙ্গে এনেছেন।"

সেবা চ'লে গেল। প্রবাল টেবিলের বইগুলি নাড়া-চাড়া কর্‌তে লাগ্‌ল। দু-পাঁচ খানা বইতে সেবারি নাম লেখা দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লে সেবাই এর অধিকারিণী। তার মনে হ'ল যে এসবের অধিকারিণী তা হ'লে সময়ের কিছু সদ্ব্যবহার করে। এটা তার ভালোই লাগ্‌ল। সেবার দুর্ভাগ্যের কথা কিছু কিছু সে আগেই কেদারের কাছে শুনেছিল।

সেবার বাইরের শ্রী ভাবুক বা শিল্পীর চোখে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বিকাশ, তা দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়, অন্তঃকরণে পুলক সঞ্চার করে, মনকে কামনার পীড়নে ক্লিষ্ট করে না। কথাটা মনে হ'তেই প্রবালের অন্তরে কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল একবার উঁকি দিয়ে এই হতভাগিনী তরুণীর তরুণ চিত্তটির সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিতে; কিন্তু এটা হয়ত অনুচিত কৌতূহল ভেবে সে তখনি চোখ রাঙিয়ে নিজের মনকে ধম্‌কে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তরকারী সাঁতলাবার পাঁচফোড়নের সোঁদা গন্ধে বাড়ীখানা তখন আমোদিত হ'য়ে উঠেছে। ক্ষুধার্ত্তের কাছে তা অপূর্ব্ব। প্রবাল মোটেই লাজুক ছিল না, সুতরাং সে অবলীলে সঙ্কোচের দোহাইকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"বে-সুগন্ধ তুলেছেন

আরত ক্ষুধার ধৈর্য্য থাকে না।" সলজ্জ হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে সেবা বল্‌লে—"হ'ল ব'লে—আর-একটু অপেক্ষা করুন।"

অগত্যা প্রবাল আঙিনায় বিছানো ছোট ক্যাম্বিসের খাটটিতে গিয়ে বস্‌ল। বেশ পরিষ্কার ছোটো-খাটো মাটির আঙিনা, গোবর-লেপা ব'লে ধূলোর বালাই নেই। চাঁদের আলোয় বেশ ঝকমক্ করছে। এক কোণে একটি ডালিম গাছ, আর তার পাশে ঝাঁকড়া নারকুলে-কুলের গাছ। কতকগুলো জোনাকী পোকা ঐ গাছ দুটিকে ঘিরে নিজেদের প্রাত্যহিক আলোর উৎসব সুরু করেছে। কিন্তু চাঁদের আলোর কাছে আজ তা মূল্যহীন; তবে মূল্যহীনতার দুঃখের বালাই তাদের নেই, তারা নিজেদের আনন্দেই মশগুল। সেই গাছের তলায় দেওয়াল ঘেঁসে বড় যত্নে পাতা মীনার খেলা ঘর, তাতে রাজ্যের টীন, হাঁড়ীকুড়ি, কলসী, লোহার বাসন, পিতলের খেল্‌না প্রভৃতি গৃহিনীর সংসার-ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। পাঁচীলের ধারে ধারে বেল মল্লিকা যূঁই প্রভৃতি গাছের সারি। গাছগুলিকে দেখ্‌লেই বোঝা যায় নতুন স্থানে নতুন হাতের সেবায় এই সবে তারা বসন্ত আগমনে কুসুমিত যৌবনে জেগে উঠেছে; দখিনা মলয় চাঁদের আলোর সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, জ্যোৎস্না এসে তাদের মুখে চুম্বনের স্পর্শ বুলিয়ে সোহাগ জানাচ্ছে। কে জানে কেন, এই ছোট-খাটো দৃশ্যটি প্রবাল বেশ মন প্রাণ দিয়েই উপভোগ করতে লাগল। সারাদিনের ক্লান্তির পর বিশ্রামের আনন্দ লাভেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ তার দেহ-মনেও যেন আজ ফাল্গুন বাতাসের প্রথম অভিনন্দন এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌ল। একটা পরিচিত গানের মধুর সুর তার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুল্‌তে লাগল। কিন্তু শিষ্টাচার লঙ্ঘন হ'তে পারে ব'লে একা সেবার সাম্‌নে সে সুরকে সে আর আমল দিতে সাহস করল না।

এই সময় গৃহস্বামী সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরে এলেন। দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা; আলিঙ্গন-সম্ভাষণে মনের অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস শত ধারায় যেন ফুটে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনের এত কথা হ'য়ে গেল যা লিখ্‌তে গেলে পাঠকের ধৈর্য্যে কুলোবে না। দীর্ঘ বিরহের পর এই সম্মিলনের আনন্দ দুটি প্রাণে এমন বন্যা আন্‌লে যে তার উচ্ছ্বাস দুই সইএর চিত্তবৃত্তিকেও সজাগ ক'রে তুল্‌লো।

কেদার বাড়ী ছিল না, কিন্তু সেবা যেমন ঐকান্তিক যত্নের সহিত অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করেছে তাতে অভ্যর্থনার কোনরূপ অঙ্গহানি হয়নি। প্রবাল এ সাক্ষ্য বেশ জোরের সঙ্গে দাখিল করতেই কেদার উৎফুল্ল হ'য়ে সইকে খুব ধন্যবাদ দিলে। বলা বাহুল্য প্রথম দিনে কেদারের সাম্‌না-সাম্‌নি হ'তে সেবার আমরা যে সঙ্কোচ ও জড়তা দেখে-ছিলাম, এখন তা অতীতের স্মৃতি, এখন কেদারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ হয়েছে। কেদার বাইরে যেমন কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশ্‌তে পারত না, বাড়ীতে তেম্‌নি সে দুটি শিশু স্ত্রী আর সেবাকে নিয়ে খুব আনন্দেই গল্প-গাছা ক'রে অবসর সময় যাপন করত। তার কৌতুকপূর্ণ স্বভাব নানারূপ গল্প কথার মধ্যে বেশ একটি স্বচ্ছ প্রীতির ধারা বইয়ে দিতে পারত; তাতে শ্রোতারা মুগ্ধ না হ'য়ে পারত না। কাগজ পত্রপাঠ ও তার সম্বন্ধে মন্তব্য ও আলোচনা করাও তার অভ্যাস ছিল; পরচর্চ্চা কি কুৎসা এসব ছোটো জিনিষ তাদের আলোচনার মধ্যে স্থান পেতই না। অবশ্য কেদারের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের অভিজ্ঞতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির সংস্রবে যে সব চরিত্র জড়িয়ে থাকত সেগুলির অল্পবিস্তর সমালোচনা না হ'য়ে পারত না। কেদার সমালোচকও ছিল ভারী কঠোর। কিন্তু সেবা সেইসব চরিত্রগুলির জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করত। সে যেন আত্মীয়ের দরদ। তাই সে খুব নির্লজ্জ নিষ্ঠুর চরিত্রের বর্ণনাতেও একটি কঠিন তিরস্কার বা ধিক্কার উচ্চারণ করতে পারত না। প্রিয় বরং অনেক সময় ব'লে উঠ্‌ত—"কি তোর দরদ সই—অই সব হতভাগ্যদের জন্যে তোর আবার দুঃখু হয়। যারা সব এমন খারাপ কাজ করতে পারে, এমন খারাপ চিন্তা যাদের মনে ঠাঁই পায় তাদের ওপর আবার দয়া মায়া? ছিঃ ছিঃ, দয়া মায়ারও লজ্জা পাওয়া উচিত!"

সইএর এ হেন কঠোর মন্তব্যে সেবা মৃদু হাসি হেসে চুপ ক'রে থাকত আর কেদার মাথা দুলিয়ে বলত—"সই

আমাদের তত্ত্বদর্শী—হয় ত ঐ সবের ভেতরে তিনি অন্য কিছু তত্ত্বের সন্ধান পাচ্ছেন তাই তাঁর আজগুবী ধরণের দরদ।"

যাই হোক্—কেদারের ধন্যবাদগুলো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রে সেবা স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে—"আপনারা ত নানারূপ মিষ্টান্নে উদর পূর্ণ ক'রে মুখেও যথেষ্ট মিষ্টরস বর্ষণ করছেন। ক্ষুধার্ত্তের তাতেই কি তৃপ্তি হবে, না, আর কিছু দরকার হবে?"

প্রবাল ব'লে উঠ্ল—"নিশ্চয়ই হ'বে। নিরাকার বাক্যের চাইতে সাকার আহারেরই আমি যথেষ্ট পক্ষপাতী। তার উপর তরকারীর যে সুগন্ধ আমি পেয়েছি, সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার লুব্ধ হ'য়ে আছে।"

প্রিয় তাড়াতাড়ি আসন ক'রে দিতেই সেবা থালায় ভাত সাজিয়ে প্রবালের সাম্‌নে এনে রাখ্‌ল। আর ঠিক্ এই সময় নিমন্ত্রণ বাড়ী হ'তে একটি ভৃত্য ছেলেদের জন্যে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি প্রচুর আহার্য্য দিয়ে গেল। প্রিয় বল্লে—"ভালই হ'ল, ঠাকুরপো তা হ'লে নিরামিষ ফেলে মাছের তরকারী আর লুচি মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাও।"

প্রবাল বল্লে—"উঁহু, আমারই জন্যে বিশেষ ক'রে যা তৈরী হয়েছে তাতেই আমার লোভ বেশী।"

কেদার ব'লে উঠ্ল—"কিন্তু সেটার উপর উপরি পাওনা কিছু মন্দ না। জানই ত ভাই উপরি পাওনার ওপরই লোকের বেশী টান।"

প্রবাল বল্লে—"কি জানি ভাই, সে অভিজ্ঞতা এখনো আমার সঞ্চয় কর্‌বার সৌভাগ্য হয়নি। পুলিশের লোক তোমরা, তোমার ওসম্বন্ধে আমার চেয়ে যথেষ্ট জ্ঞান জন্মেছে, একথা আমি নতমস্তকে স্বীকার কর্‌ছি।"

তারপর সে আরও তরকারী চেয়ে নিয়ে তৃপ্তির সহিত খেয়ে শেষ কর্‌লে। সেবাও যেন যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হ'ল। প্রবাল শেষ পাতে কিছু মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়্‌ল। মুখ হাত ধুয়ে আবার সকলে জ্যোৎস্নার আলোয় ব'সে অনেক কথাই সুরু কর্‌লে। সেবা উঠে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে আলোর সাম্‌নে একখানা বই খুলে বস্‌ল। কিন্তু কি জানি কেন মন দিয়ে পড়্‌তে পার্‌ল না। প্রবালের মধুর সরল কণ্ঠস্বর ও উচ্চ হাসি ক্ষণে ক্ষণে তার কাণে বেজে মনকে যেন উন্মনা ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

আঠারো

দিন দুই হোলো প্রবাল এখানে এসেছে, অথচ কেদার সেই প্রবালের আস্‌বার রাত্রি প্রভাতেই নিজের কাজে বাইরে চ'লে গেছে। প্রবাল তখন ঘুমুচ্ছিল ব'লে আর জানিয়েও যেতে পারেনি। প্রবাল সকাল-সন্ধ্যা মীনার হাত ধ'রে এ-রাস্তা সে-রাস্তা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর মীনার ঘর-সংসারের অনেক খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করছে। মীনা এর আগে এমন সমজদার শ্রোতা কখনও পায়নি সুতরাং তার বল্‌বার উৎসাহ ভারী প্রবল। প্রবালের অবসর সময় একরকম বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে। বৌ'ঠানের আদর যত্নের ত্রুটি নেই, হাস্য কৌতুকও চলেছে কিন্তু তবু বন্ধুর বিরহে সে যেন ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে; এক একবার যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে বন্ধুর ফের্‌বার পথের পানে সতৃষ্ণভাবে চেয়ে দেখ্‌ছে। সন্ধ্যার পর কেদার ফিরে এল। একটা খুনের ব্যাপারের জন্য উপরিওয়ালার হুকুমে তাকে মাড়-গ্রাম যেতে হয়েছিল। কেদার শ্রান্তিদূর কর্‌বার পর খুনের সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগ্‌ল। কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ কেদার অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠ্‌ল, "না, আর পারা যায় না। এ ঝক্‌মারীর চাক্‌রীতে আর দর্‌কার নেই। এসে পর্য্যন্ত কেবল খুনোখুনীর তদন্ত আর মারপিটের হাঙ্গামা! ঝক্‌মারী ক'রে এ চাক্‌রীতে ঢোকা গিয়েছিল। এখন নাকে খৎ দিয়ে চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব সেই ভাল।"

প্রবাল হেসে বল্লে, "কি ভাই, এরি মধ্যে অরুচি ধরে গেল, এ-ত পৌরুষের পরিচয় নয়।"

প্রিয় বল্লে, "উনি এখানে এসে পর্য্যন্তই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। এখানে ওঁর মোটেই ভালো লাগে না। অবশ্য শরীর আমাদের সকলেরই এখানে ভাল আছে। জায়গাটি দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর; কিন্তু একে রাতদিন খুনের হাঙ্গামা লেগে আছে তার উপর দুদণ্ড কারো সঙ্গে মিল্‌তে মিশ্‌তে পান্ না তাতেই আরো ভাল লাগে না।"

প্রবাল বল্লে, "আচ্ছা কেদার—তুমি যে সেদিন বলছিলে এখানে ভালকথা আলোচনা কর্‌বার তেমন

একটিও জায়গা নেই, প্রায় সবস্থানেই হয় বৈষয়িক আলোচনা, নয় কুৎসা প্রসঙ্গ এই সব হচ্ছে, কিন্তু এটাও ত সত্যি যে সব দেশেই অল্প-বিস্তর ভালমন্দের সংস্রব আছেই। এখানে কি সৎসঙ্গ মোটেই নেই বল্‌তে চাও তুমি?"

কেদার বল্‌লে—"তা যে নেই তা আমি বল্‌ছি না, এখানকার একজন উকীল নীলরতন-বাবু; তিনি খুব ভাল লোক; আর একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক দেবকণ্ঠ-বাবু, তিনিও সুশিক্ষিত। তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ ক'রে দেখেছি বেশ বোধশক্তি আছে। কৃষিসম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা, বিস্তর জমি চাষ-আবাদ করেন। আরও দু'চার জন নেই যে তা নয়, কিন্তু এঁদের আশে পাশে ভদ্র-বেশধারী কুচরিত্র লোকদের এতো ভীড় যে এঁদের খোঁজই পাওয়া যায় না। একজন মোক্তার মশাইও আছেন, তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। আলাপ ক'রে দেখ্‌লাম তিনিও বেশ চিন্তাশীল হৃদয়বান্ লোক। দেশের দুর্গতি নীতিহীনতার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি নিজেই দুঃখ কর্‌ছিলেন। আমি বল্‌লাম—'হ্যাঁ মশাই, সহরে এতোগুলি ভদ্র সন্তানের বাস, অথচ একটা সাধারণ পাঠাগার নেই, দশজন ভদ্র-লোক একসঙ্গে ব'সে দু-পাঁচটা ভাল আলোচনা কর্‌তে পারেন তার ব্যবস্থা নেই। এদিকে আব্‌গারী বিভাগের এখানে দেখি খুব প্রতাপ।' লোকটি দুঃখ ক'রে বল্‌লেন, 'আমাদেরই দুর্ভাগ্য।'

প্রবাল বল্‌লে,—"দুর্ভাগ্যের দোহাই না মেনে যে কয়জনের মনে দেশের দুর্গতির অবস্থাটি লেগেছে তাঁরা একটু উদ্যোগী হ'য়ে কিছু কর্‌লেই ত পারেন। যা দেখ্‌লাম ইতর শ্রেণীর বাসও এখানে খুব বেশী। অথচ তাদের মধ্যেও শুন্‌লাম কদাচার খুবই আছে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই নাকি সব রকম পারিবারিক সামাজিক সকল উৎসবেই অপর্য্যাপ্ত মদ খায়, মদ খেয়ে মারামারি, খুনোখুনী, স্বাস্থ্য-হানি এ নাকি রাতদিনই হচ্ছে। ভদ্রলোক—যাঁদের কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে তাঁরা যদি এক এদের হিতবুদ্ধি দিয়ে এসব অভ্যেস একটুও কমিয়ে আন্‌তে পারেন!"

প্রিয় হেসে বল্‌লে—"সর্ব্বনাশ! তা হ'লেই হয়েছে, ভদ্রলোকদেরই ঠেকায় কে তার ঠিক নেই, তা আবার ছোট লোকদের।"

প্রবাল একটুখানি কি চিন্তা ক'রে তারপর ব'লে উঠ্‌ল, "দেখ ভাই কেদার-জায়গাটায় তোমার চাকরী। শরীরও তোমাদের এখানে ভালোই আছে, তখন হঠাৎ চ'লে যাওয়া কিছুতেই ঠিক নয় বরং হাতে ক্ষমতা নিয়ে যখন আছ তখন সাধ্যমত কিছু কাজ এদেশে ক'রে চল যাতে দেশবাসী এর পর বুঝ্‌তে পার্‌বে যে একজন মানুষ তাদের মধ্যে এসে বাস করেছিল। মানুষের স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য ক'দিনের জন্যে ভাই? অমানুষ বর্ব্বর যারা—তারা তাদের এই অমূল্য বয়সটাকে কদর্য্য ব্যভিচার-বাসনার চরিতার্থতাতে কাটিয়ে চল্‌তে চায়। আর যারা মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার দাবী রাখে, তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য দেশের মঙ্গলের জন্যে অন্যায়ের সঙ্গে প্রাণ-পণে সংগ্রামের নিমিত্তে খরচ করে। পালিয়ে যাবে বল্‌ছ তা কেন যাবে? ইতরের মত মিথ্যে সাক্ষী সংগ্রহ করে দোষীর টাকায় সিন্দুক বোঝাই ক'রে নির্দ্দোষীকে মকদ্দমায় চালান দিয়ে তোমার কোনো দর্‌কার নেই। ঘুষের কাছ-ঘেঁসেও যাবে না, পুলিশের যা দুর্নাম তা থেকে সর্ব্বদা দূরে থেকে ন্যায় বিচারের জয় দেখাবে। এতে তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বিকাশ হবে আর খুব সম্ভব তোমার সদ্দৃষ্টান্ত দেশের দোষী-নির্দ্দোষী সবারই বুকে একটা ছাপ রাখ্‌তে পার্‌বে।"

কেদার ধীরভাবে বন্ধুর কথাগুলি শুনে গেল, কিছু বল্‌লে না। সেবা প্রিয়র একটু আড়ালে ব'সে প্রবালের এই গম্ভীর উক্তিগুলি মন দিয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে যেন মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। প্রবালের সুদৃঢ় সবল উন্মুক্ত বক্ষ-কবাট—পেশীবহুল দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারকে সহজেই বাধা দিতে পারে এবং মন যে তার শরীরের উপযুক্ত দোসর এ চিন্তায় তার বিশ্বাস হচ্ছিল এবং এতে সে বেশ একটু আনন্দ অনুভব কর্‌ছিল। কাল কথাচ্ছলে প্রবাল বলেছিল, "দেশে যেন পুরুষের মত পুরুষ আকৃতি চোখেই পড়ে না, আমাদের ওদিকে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ লোকের চেহারাও দেখেছি আবার এদিকে পিলের বালাই শূন্য সুস্থ কর্ম্মঠ লোকের চেহারাও দেখ্‌ছি,

কিন্তু শক্তিমান্ ব'লে পরিচয় দিতে পারে এমন চেহারা ত একটিও চোখে পড়ে না। হয় নধরকান্তি ঘি-দুধ-পরিপুষ্ট ভুঁড়িযুক্ত ননীগোপাল-মূর্ত্তি, নয় পাকানো রোদপোড়া আম্সীর আকৃতি। সবল সতেজ বলিষ্ঠ পেশল চেহারা একটিও নয়, না স্ত্রী না পুরুষ। অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে কিছু চোখে ঠেকেছে বটে, যাদের দেখ্লে মানুষের চেহারা ব'লেই মনে হয়।" সেবার মনে হ'তে লাগ্ল—প্রবালের এই যে দৃঢ়িষ্ঠ সুগঠিত অবয়ব—পুরুষ-আকৃতির দাবী এর ত খাটে, তা কি বাইরে আর কি অন্তরে।

একটু পরে কেদার বল্লে—"তুমি যা বল্লে ভাই কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই, কিন্তু কাজে যে সহজ নয় তা যদি একবার দিন ক'তকের জন্যে স্থির হ'য়ে এ গাঁয়ে বাস কর ত দেখ্বে। সই বেচারী দু'দশ দিনের জন্যে আমার বাড়ী বেড়াতে এসেছে সে আমার সৌভাগ্য, তা ওর নামে কি স্ত্রীমহলে কি পুরুষমহলে কত রকমের যে আলোচনা হয় তার ঠিক নেই। আমরা নেহাৎ গায়ে না মেখে চুপচাপ থাকি, তাই এক পাশে প'ড়ে আছি।" সেবা নিজের আলোচনায় কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্ল, তার ওপর যখন প্রবাল তার দিকে একবার ভাল ক'রে চোখ মেলে চেয়ে দেখ্লে তখন পলকে সে রাঙা না হ'য়ে পার্লে না। কেমন যেন জড়সড় হ'য়ে গেল। প্রবাল একবার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নিয়ে পরক্ষণেই কেদারের মুখের ওপর চোখ রেখে বল্তে লাগ্ল, "এরি মধ্যে এত ব্যাপার হয়েছে! তা হওয়াও কিছু বিচিত্র না। বিশেষ পল্লীগ্রামের দিকে কথার বিস্তৃতি একটু সহজেই ঘ'টে থাকে, নিজেদের দেশেই তা দেখেছি ত! মানুষের মন একটা কোনো নূতন বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্তে সদাই অনুরাগী, তাকে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র না দিলে কুদিকেই তার গতি। তবে হ্যাঁ, যাঁরা এতসব আলোচনা কর্ছেন শুধু বাজে আলোচনায় তোমাদের ত তাঁরা এক চুলও ক্ষতি কর্তে পার্বেন না ? কি মনে হয় তোমার ?"

কেদার যেন একটু চিন্তিত মুখে বল্লে, "ভাখ, প্রবাল আমাদের দেশে বালবিধবাদের জীবন সত্যিই একটা কটাক্ষের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয়, এদের দিক্ দিয়ে একটা মস্ত বড় অভিযোগ আছে যেটা রুজু হ'লে সমাজ কিছুতেই আর নিশ্চেষ্ট থাক্তে পারে না।"

ঠিক্ সেবারই সাম্নে এই অপ্রিয় আলোচনাতে দুই বন্ধুরই বিচার-বুদ্ধি-হীনতার পরিচয়ে বেচারী প্রিয়ই খুব বেশী কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্ল, আর তাতেই সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্ল, "কি যে সব বাজে তর্ক তুল্ছ, যার তার সাম্নে—"

বল্তে গিয়ে নিজেও সে কথাটা শেষ কর্তে পার্লে না। সেবার সঙ্গে চোখোচোখী হ'য়ে নিজেই সে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্ল। প্রবাল সেবার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে বল্লে—"বো'ঠান্ তাঁর সইএর সাম্নে এসব কথার আলোচনা বুঝি চেপে রাখ্তে চান্ ? না বো'ঠান তা করবেন্ না, আপনার সইতো নেহাৎ অবুঝ নন্, পড়া-শুনো ক'রে বোঝবার বা ভেবে দেখ্বার ক্ষমতা তাঁর বেশ আছে। এ তিন দিন কথা-বার্ত্তার মধ্যেই তা ধ'রে নিতে পেরেছি। আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে তিনিও তাঁর মতামত প্রকাশ কর্তে পারেন, কোনো ক্ষতি নেই। কি বল কেদার ?"

কেদার বল্লে,—"তা কি ওঁরা বল্বেন, লজ্জার একটা মিথ্যা পর্দ্দা দিয়ে নিজেদের দেহ থেকে স্বভাব পর্য্যন্ত ওঁরা সব বেশ ক'রে ঢেকে রেখেছেন।" কথাটার খোঁচাতে বিরক্ত হ'য়ে প্রিয় সেবাকে ঠেলা দিয়ে বল্লে, "শুন্‌চিস্ সই আমাদের নিন্দা।" অগত্যা সেবাকে বল্তে হ'ল, "পর্দ্দাটা নেহাত মিথ্যা নয়, ওটা ভগবানেরই বিশেষ দান। তবে সেটার ওপর কারীকুরী যেটা আছে তা মেয়েদের সৃষ্টি নয় আপনাদেরই বাহাদুরী।"

কেদার তত্ত পরিষ্কার ক'রে সেবার কথার অর্থ না বুঝে নিজের আগেকার মন্তব্যের জের টেনে চল্ল, "সত্যি বলছি প্রবাল, এই মেয়েজাতটার ওপোর অশ্রদ্ধা আমার ক্রমেই ঘনিয়ে আস্ছে। কারণ সংসারের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘট্ছে ততই দেখ্ছি যত কিছু অন্যায়, অনর্থ, বাদ, বিসম্বাদ সব কিছুরি মূলে এঁদেরি অধিষ্ঠান। এত-সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এঁরা সময় শক্তি সব দিতে

পারেন তা আর বল্‌বার নয়। অবশ্য দু-দশজনকে বাদ দিয়ে বল্‌ছি, সবাই এ ধাতের হ'লে ত সংসারে এক মুহূর্ত্তও মানুষ টিক্‌তে পার্‌ত না।"

সেবা একটু হেসে বল্‌লে, "কেদার বাবু, আপনি যে তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এটা যদি লিখে কাগজে ছাপেন তা হ'লে মৌলিকত্বের কোনো দাবীই আপনি কর্‌তে পার্‌বেন না। কেন না, বহু যুগ আগে থেকেই আপনার এ তত্ত্ব মহা মহা পণ্ডিতরাই স্বীকার ক'রে গেছেন। আর আজও আপনারা তাঁদের কথা যখন-তখন আবৃত্তি ক'রে আমাদের চোখ রাঙিয়ে উঠ্‌ছেন।"

প্রিয় বল্‌লে,—"কি সই, তুই ওঁর কথার সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিয়ে যাচ্ছিস্‌। এইবার ওঁর বন্ধুটি শুদ্ধ আরো পঞ্চমুখ হ'য়ে নিন্দা-গান আরম্ভ করুন, আমরা দুই সই শুনে মুগ্ধ হ'য়ে ওঁদের মিষ্টিমুখ কর্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে দিই।" প্রবাল হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "বো'ঠানের গায়ে লাগ্‌ছে বুঝি? কিন্তু মনে রাখুন, এটা হচ্ছে ভগবতীর মহাদেবের নামে—ব্যাজস্থলে স্তুতি।" সেবা বল্‌লে, "তা সই তুই আমার ওপর রাগ করিস্‌ নি। সত্যিই আমরা মেয়ের জাত নিজেদেরই এম্‌নি হীন আর অপদার্থ ক'রে রেখেছি, ভাবতে গেলে নিজেদেরই ওপর অশ্রদ্ধা হয় তা পুরুষরা সেটা যে কর্ব্বেন সে বেশী কি কথা? যে অভিযোগ কেদার-বাবু আমাদের নামে রুজু কর্‌ছেন তার বিপক্ষে তর্ক চালিয়ে মকদ্দমায় যে আমাদের জিৎ না হয় তা নয় কিন্তু ও রকম জোর করে জেত্‌বার দর্‌কারই বা কি? আমাদের এই হীনতার মূলে ওঁদের হাত যে চোদ্দো আনা আছে তা উনি একটু ভেবে দেখ্‌লেই ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তবে আমার মনের কথা এই আমি খুলে বল্‌ছি যে আমরা মেয়েরা আমাদের অবসর সময় ভালভাবে যদি কাটাতে পারি তাতে সময়ের যেমন সদ্ব্যবহার হয়, মনও তেমনি প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু তা আমরা কর্‌তে চাই না কেন না অভ্যাস নেই।"

এমন সময় শিখর লণ্ঠনবাহী ভৃত্যের সঙ্গে এসে প্রিয়র কাছে গিয়ে বল্‌লে—"আমার দিদি আপনাদের একবার এখুনি আমার সঙ্গে যেতে বল্‌লেন। খোকার কাল থেকে হঠাৎ বড় জ্বর হয়েছে দিদির মন ভাল নেই।" প্রিয় সেবাকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি শিখরের সঙ্গে মতি-বাবুর বাড়ী চ'লে গেল। প্রবাল এতক্ষণ অর্দ্ধশায়িত বন্ধুর পাশে ব'সে ব'সেই গল্প-গাছা চালাচ্ছিল। মেয়েরা চ'লে যেতেই সে সটান্‌ কেদারের পাশে শুয়ে প'ড়ে একটি পা স্বচ্ছন্দে কেদারের পায়ের ওপর তুলে দিয়ে একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—

"আঃ বেশ জ্যোৎস্নাটি উঠ্‌ল, ভারী ভাল লাগ্‌ছে, হাওয়াটিও ভারী মিঠা।"

কেদার এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখে বল্‌লে, "কি তুই ছেলেমানুষের মতন ঘাড়ে পা তুলে দিচ্ছিস্‌ রে? চাকর বামুন ঝি সবাই এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি ভাব্‌বে।"

প্রবাল বল্‌লে—"হাঁ তা বটে, কিন্তু এখন ত কাউকে এখানে দেখ্‌ছি না। আমার ভোলা মন তাই ভুলে যাচ্ছি যে তুই এখন আর শুধু আমার চিরকালের বন্ধু কেদারটি নোস্‌। এখন তুই একজন জবরদস্ত পুলিশের পাণ্ডা, লোকজনদের কাছে যমরাজের দ্বিতীয় অবতার। তা ভাই লোকের কাছে তুই যত ইচ্ছে ভারিক্কী চাল রেখে চল্‌ আমার কাছে কিন্তু সেই কেদার। মুখোস খোলোসগুলো আমার কাছে চালাস্‌ নি। ওগুলো নেহাৎ বাইরের লোকের জন্যেই থাকুক।"

অনেক দিন পরে কেদারও আজ একবার বিশেষ ক'রে তার অতীত জীবনের বাল্য ও কৈশোর তার পর নব-যৌবনের দিনগুলির কথা স্মরণ কর্‌লে। তারা এখন অতীতের কুক্ষিগত হ'লেও যাবার সময় কালের কষ্টি-পাথরে খাঁটি সোনারি মতো উজ্জ্বল দাগ রেখে গেছে—কত খেলা, কত হাসি, কত গান—।

সেই সঙ্গে তরুণ জীবনের কত মান-অভিমানের গান ও কত ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বিবাদ, মনোব্যথা সবই স্মরণ হ'তে লাগ্‌ল। কেদারকে একেবারে চুপচাপ দেখে প্রবাল বল্‌লে, "একেবারে চুপচাপ কেন কেদার, কি চিন্তা হচ্ছে?"

কেদার প্রবালের একখানা হাত নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে ব'লে উঠ্‌লে—"প্রবাল, তোর আর

দেশে ফিরে গিয়ে দর্‌কার নেই। এইখানেই থেকে যা। দুই বন্ধুতে বেশ থাক্‌ব, একলা-একলা সত্যিই আমার এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

প্রবাল বল্লে—"এই বয়সে এই বলিষ্ঠ দু-মণ ওজনের শরীরে দৈনিক তিন চার সের খোরাক বরাদ্দ নিয়ে তুমি কি বল যে, কুঁড়ের মতন তোমার অন্ন ধ্বংস করি? অবশ্য কাজে যে নেহাৎ লাগি না তা নয়। বোঠানের ছেলে-খেলান থেকে বাজার-সরকারের কাজকর্ম্মগুলো ক'রে দিতে পার্‌ব। তবে কথা হ'চ্ছে"—কেদার বাধা দিয়ে বল্লে—"ছাখো ভাই, ঠাট্টা করার কথা হচ্ছে না। সত্যিই তোমাকে আমি চাই, অবশ্য জীবিকা উপার্জ্জন তোমায় কর্‌তে ত আমি মানা কর্‌ছি না। ওখানে ত তুমি সেই মাষ্টারীই কর্‌ছ। কত মাইনে পাচ্ছ আজকাল, যাট ত?"

প্রবাল বল্লে, "হাঁ যাটই পাচ্ছি, মাষ্টারী এখনও কর্‌ছি বটে। কিন্তু ওদিক্ থেকে ছুটি নেবারি ইচ্ছে আছে। এতদিন পড়শুনোর জন্যে মাষ্টারীতেই লেগে ছিলাম, এখন কিন্তু গুটি কেটে প্রজাপতি হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌তে ইচ্ছে হ'য়েছে। স্কুলের কোণে চেয়ার-ঠাসা হ'য়ে স্তূপাকার বইগুলোর মধ্যে মুখ গুঁজে গ্রন্থকীট হ'য়ে জীবনের বহু বছর ত কাটিয়ে দেওয়া গেল। এইবার একবার বাইরের সত্যিকার সংসার সমাজ সবগুলোর সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় নেবার ইচ্ছে হ'য়েছে; দেখি এখন কি ক'রে উঠ্‌তে পারি।"

কেদার বল্লে, "বেশ ত, এখান থেকেই সে-পরিচয় সুরু ক'রে দাও না। একটা কথা বলি শোনো, এখানেও একটি হাইস্কুল আছে, তার দ্বিতীয় মাষ্টারটি পদত্যাগ করেছেন, ছাত্রেরা অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতির, দ্বিতীয় মাষ্টারটিও নাকি তাদের সহচর। হেড্‌-মাষ্টারএর জন্যে তাঁকে ডেকে একটু বকাবকি করায় তিনি অভিমানে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছেন। মাইনে বোধ হয় আশী টাকা। কাজেই তোমার লাভ বই লোকসান নেই। অথচ স্কুলটার ছাত্রদের নৈতিক অবস্থা যে শোচনীয়, তোমার মতন লোকের প্রাণপণ পরিশ্রমে হয় তো তার অনেকটা সংস্কার হ'তে পারে। উকীল নীলরতন-বাবু হচ্ছেন স্কুলের সেক্রেটারী, তিনি একদিন আমায় বলেওছিলেন যে, যদি একটি সচ্চরিত্র হৃদয়বান শিক্ষকের খোঁজ ক'রে দিতে পারি। হেড্‌মাষ্টার উমানন্দ-বাবুও বেশ সাধুপ্রকৃতির লোক, কিন্তু একা তাঁর সাধ্য কি যে স্কুলটির আব্‌হাওয়া ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

"ভাবালে"—শুধু এই ছোট্ট কথাটি ব'লে প্রবাল জ্যোৎস্নার সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে গুণ গুণ ক'রে সুর ভাঁজ্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরে কেদার বল্লে, "অনেক দিন তোমার গান শোনা হয়নি; এখন একটু সঙ্গীত-চর্চ্চাই কর, শুনে তাজা হওয়া যাক্।" প্রবাল উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ গুণ গুণ কর্‌বার পর গলা ছেড়ে গান ধর্‌লে,

"দিনের আলোর আভাসে
মিলিয়ে-যাওয়া রূপটি সেই জাগ্‌ল চোখের সকাশে;
প্রখর আলো ঢাক্‌ল যারে গো,
অন্ধকারের পর্দ্দা তারে আন্‌ল প্রকাশে!"

(ক্রমশঃ)

তূলার কীট

শ্রী ধীরেশমোহন সেন, এম-এস্-সি (ম্যাঞ্চেষ্টার), এ-আই-সি

আমেরিকায় মেক্সিকো প্রদেশে একপ্রকার তুলার কীট (Ball Weevil) আজ প্রায় ৩।৫ বৎসর যাবৎ হইয়াছে। এই বল্-উইভিল্ কীট প্রতি বৎসর ৪।৫ কোটি টাকার তূলা নষ্ট করিয়া দিতেছে। কাপাস-গাছে ফুল হইবা মাত্রই এই কীট ফুলের ভিতর ডিম পাড়িয়া যায়। ফুল হইতে তুলা হইবার পূর্ব্বেই কীটটি বড় হইয়া

তুলার শ্বেতসার (starchy substance) খাইয়া বাহির হইয়া যায়। এই কীট নিবারণের জন্য আমেরিকাতে বহু বৈজ্ঞানিক চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। নানা-প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা এই কীট নষ্ট করিবার প্রয়াস করা যাইতেছে। অনেক যায়গায় এরোপ্লেন্ হইতে তুলা-গাছের উপর কেলসিয়াম্ সায়েনাইড(Calcium Cyanide) নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়াইয়া দেওয়াতে অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। কেলসিয়াম্ সায়েনাইড (3 cao. Ca (cn) 2, 15 H 2 0) ছড়াইয়া দিলেই উহা হইতে একপ্রকার ভীষণ বিষাক্ত হাইড্রোসায়েনিক এসিড গ্যাস (Hydrocyanic acid gas) বাহির হইয়া কীট বিনাশ করে। কিন্তু তবুও এই কীট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার উপায় এখনও আবিষ্কার করা যায় নাই।

পৃথিবীর মধ্যে মিশর ও আমেরিকার তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মিহি সুতা তৈয়ার করিতে হইলে এইসকল তুলা আম্‌দানি করিতেই হয়। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ হাজার হইতে এক লক্ষ গাঁট তুলা আম্‌দানি হইয়া থাকে। আমেরিকার তুলার সঙ্গে এই কীট ভারতে সহজে প্রবেশলাভ করিয়া ভারতের তুলার চাষের সর্ব্বনাশ করিতে পারে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিষেধক উপায় নির্দ্ধারণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই।

বোম্বাইতে কটন রিসার্চ্চ লেবরেটরীর রসায়নাগারে বহু গবেষণার পর নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এক ভীষণ বিষাক্ত হাইড্রোসায়েনিক এসিড গ্যাস দ্বারা (Hydrocyanic acid gas) এই তুলার কীটকে সহজেই মারা যায়।

সাধারণতঃ বায়ুতে ১০০০০০ ভাগের মধ্যে ২৫ ভাগ হাইড্রোসায়েনিক এসিড গ্যাস থাকিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষ মারা যায়। কিন্তু এই তুলার কীট মারিতে হইলে ১০০০০০ ভাগ বায়ুর মধ্যে ১৫০ ভাগ গ্যাসের আবশ্যক হয়।

ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় এক আইন পাশ হইয়াছে যে, ১৯২৫ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে ভারতে যত আমেরিকার তুলার আম্‌দানি হইবে উহা বোম্বের বন্দর (Bombay Port) ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় পোর্টের ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এবং সেই বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা সমস্ত তুলা শোধিত (Fumigation) করা হইবে। এই ব্যাপারের জন্য গভর্ণমেণ্ট কেবল নাম মাত্র প্রতি গাঁট প্রতি ৩/৵০ শুল্ক আদায় করিবে। এরূপ আইন পাশ না করিলে ভারতের তুলার চাষের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

আজ ৬।৭ মাস যাবৎ বোম্বাইতে অতি সুন্দররূপে এই ভীষণ বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা আমেরিকার তুলার শোধন-কার্য্য (fumigation) হইতেছে। সাধারণতঃ তুলার গাঁটগুলি বোম্বের বন্দরে জাহাজ হইতে সর্‌কারী বজরাতে (Govt. Barges) নামান হয় এবং তারপর উহার উপর বেলুনের কাপড়ের তৈয়ারী ত্রিপল ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া চারদিক খুব শক্ত করিয়া আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। ফিউমিগেটিং যন্ত্রের পাইপ্ সেই ত্রিপলের ভিতর দিয়া তুলার গাঁটের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বিষাক্ত সায়েনাইড সলিউসন (Sodium Cyanide) ও সাল্-ফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) দুইটি ভিন্ন টিউবের সাহায্যে ফিউমিগেটিং যন্ত্রের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয়। ($2NaCN + H_2SO_4 = 2HCN + Na_2SO_4$) এই দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য একত্রীভূত হইয়া হাইড্রোসায়েনিক এসিড গ্যাস তৈয়ার হয়।

প্রত্যেক ফিউমিগেটিং যন্ত্রের সঙ্গে একটি ইঞ্জিন আছে, উহা দ্বারা গ্যাস পাম্প করিয়া বজরার ভিতর দেওয়া হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিষাক্ত বায়ুর নমুনা বাহির করিয়া হাইড্রো-সায়েনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ (concentration) পরীক্ষা করা হয়। পরিমাণে কম হইলে পুনরায় আরও গ্যাস্ দেওয়া হয়। বজরার ভিতর গ্যাস পুরিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টা রাখা হয় এবং তার পর ত্রিপল খুলিয়া সমুদ্রের হাওয়াতে ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া তুলার গাঁট ডাঙ্গার উপর উঠান হয়। এই গ্যাসের ভিতর তুলা রাখাতে, তুলার কোন-প্রকার ক্ষতি হয় না। এরূপ ভীষণ বিষাক্ত গ্যাসের এত বড় কাজ ভারতে আর হয় নাই।

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ

(২)

অধ্যাপক মার্স্যাল বলেন, "মানুষের জীবনের সাধারণ কাজকর্ম্মই যখন ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় তখন সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর ইহার নির্ভরতা অন্য বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা, তর্কবিতর্ক এমন ভাষায় হওয়া উচিত যাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে। দৈনিক জীবনে যে-শব্দটি যে-ভাব প্রকাশ করে ধন-বিজ্ঞানের আলোচনাতেও সেই শব্দকে সেই ভাবপ্রকাশের কাজেই লাগানো উচিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈনিক কথাবার্ত্তায়, বাক্‌বিতণ্ডায় সুপরিচিত শব্দগুলিও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; আলোচনার বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া উহাদের অর্থ বু'ঝতে পারা যায়। পরিভাষা তৈয়ারী করিবার সময় ধন বৈজ্ঞানিক-দিগের উচিত হাটে-বাজারে দৈনিক ব্যবহারে যে-শব্দ যে-ভাবে চলিতেছে তাহাকে পাকড়াও করিয়া ঠিক সেই ভাবেই চালানো। তবে দরকার-মতো একটু-আধটু ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিতে হইবে। এই উপায়েই সাধারণ পাঠককে ভ্যাবাচ্যাকা না খাওয়াইয়া ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব সঠিকভাবে সহজ করিয়া বুঝান যাইতে পারে।" *

যে-কোনো ভাষাতেই হউক পরিভাষা তৈয়ারী করিতে বসিয়া প্রথমেই সকলেই একমত হইবে, ইহা আশা করা যায় না। "পরিভাষা সম্বন্ধে মতভেদেই স্বাভাবিক। তবে উহা লইয়া আলোচনা সুরু করিলে যুক্তি-তর্কের ফলে কায়েমি পরিভাষা পাইবার ভরসা হয়। ধন-বিজ্ঞানের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে আমার মত্ এই যে, সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়ের ভাণ্ডার লুট না করিয়া হাটে-বাজারে যে-শব্দ যে-ভাবে চলিতেছে সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া লইলে ভাল হয়।" †

* ৺ এ্যাল্‌ফ্রেড মার্স্যাল প্রণীত এলিমেণ্টস্ অব্ ইকনমিক্স, পৃঃ ১৩৩।

† অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকারের নিকট লেখকের চিঠি—"আর্থিক উন্নতি," বৈশাখ ১৩৩৩, পৃঃ ১৪।

১। Counterfoil—মুড়িচেক্।
২। Competition—আড়াআড়ি; টক্কর।
৩। Fixed Capital—স্থায়ী মূলধন।
৪। Floating Capital—পৌনঃপুনিক বা ভ্রাম্যমাণ মূলধন।
৫। Cottage Industry—কুটীর-শিল্প।
৬। Depression of Trade—ব্যবসায়ে মন্দা।
৭। Diminishing Return—ক্রমিক আয় হ্রাস।
৮। Law of Diminishing Return—ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম।
৯। Diminishing Utility—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস।
১০। Law of Diminishing Utility—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম।
১১। Discount—ডিস্‌কাউণ্ট; বাটা।
১২। Distribution—বণ্টন; বিভাগ
১৩। Dose—মাত্রা; পরিমাণ।
১৪। Efficiency—পটুতা; নৈপুণ্য; দক্ষতা।
১৫। Guild Organisation—কারুসমবায়।
১৬। Increasing Return—ক্রমিক আয়-বৃদ্ধি।
১৭। Industrial School—কারু-শিক্ষালয়।
১৮। Industrialist; Manufacturer—কারু।
১৯। Insurance—বীমা।
২০। Interest—সুদ; ব্যাজ (হি—ব্যাজ—সুদ। সং-বৃদ্ধি; "কেহ বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া ব্যাজের হিসাবে আসল টাকার চতুর্গুণ আদায় করিয়া লয়।"—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত বাংলা অভিধান।)
২১। Marginal Dose—সীমাস্থিত মাত্রা।
২২। Market—বাজার।
২৩। Preferential Tariff—পছন্দমূলক শুল্ক।

২৪। Rent=খাজনা।
২৫। Revenue=মালগুজারী।
২৬। Rise and Fall=তেজীমন্দা।
২৭। Speculate=ফাটকাখেলা।
২৮। Speculation=ফাটকাবাজী।
২৯। Seniorage=বানি।
৩০। Law of Supply=জোগানের নিয়ম।
৩১। Trade Union=কর্ম্মীসঙ্ঘ।
৩২। Trade Report=বাণিজ্য-বিবরণী।
৩৩। Marginal Utility=সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা।
৩৪। Law of diminishing utility=ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম; ক্রমশঃ বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম।

কর্ণরোগে কর্কট

অধ্যাপক শ্রী কালিপদ মিত্র

বিমানবত্থ অট্‌ঠ-কথা নামক পালি পুস্তকে কক্কট-রসদায়কবিমান নামক কথায় কর্ণরোগ উপশমের একটা সুন্দর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। জনৈক ভিক্ষু উৎকট কর্ণশূলে এতাদৃশ পীড়া অনুভব করিতেছিলেন যে, তিনি কোন প্রকারেই 'বিপসন্নম্' জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না, অর্থাৎ কোন প্রকারেই ধ্যেয় বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। কোনও চিকিৎসাতে ফল হইল না। ভগবান বুদ্ধদেব জানিতেন যে, কর্কটরসভোজনই ইহার একমাত্র প্রতিকার; অতএব তিনি ঐ ভিক্ষুকে মগধক্ষেত্রে ভিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে ভিক্ষু উপযুক্ত বাস পরিধান করিয়া ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একজন ক্ষেত্রপালের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ ক্ষেত্রপাল তখন কর্কট-ব্যঞ্জন-সহযোগে ভক্ত ভোজনের উপক্রম করিতেছিল। দ্বারে ভিক্ষু সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে স্বীয় কুটীরমধ্যে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রপাল আসন করিয়া দিল ও তন্নিমিত্ত প্রস্তুত সমস্ত ভোজ্য তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। ঐ ভোজ্য মন্ত্রের মত কাজ করিল; উহা খাইতে না খাইতে থের-(ভিক্ষু) -প্রবরের সমস্ত যাতনা মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল; তিনি অনুভব করিলেন, যেন তিনি শত ঘটের বারিধারা স্নাত হইয়া স্নিগ্ধ হইলেন (থেরস্‌স তং ভত্তং ভুত্তবতো যেব কন্নশূলং পটিপস্‌সম্ভি। ঘট সতেন নৃহাতো বিয় অহোসি)।

যে-রোগ ভিষক্‌গণ নানাবিধ ভেষজ প্রয়োগেও আরোগ্য করিতে পারেন নাই, তাহা যে কর্কট-ব্যঞ্জন ভোজনে যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মুহূর্ত্তে প্রশমিত হইতে পারে ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম। কোনও একজন বিশিষ্ট ডাক্তার-বাবুকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিয়া উত্তর দেন, "ডাক্তারকে কর্কট ভোজন করাইলে নিশ্চিত রোগীর কর্ণশূল ভাল হয়"। ইহাতেও আমার সরম হইল না। আমি সুশ্রুত খুলিলাম। তিনি অনেক প্রকার কর্ণ-রোগের কথাই বলিয়াছেন, যথা কর্ণশূল, কর্ণস্রাব, কর্ণপাক ইত্যাদি। কর্ণশূল আবার দুই প্রকারের —পিত্তজ এবং বাতজ। পিত্ত-কর্ণশূলাধিকারে একটি ঘৃতের ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ঘৃতের পাকে ককোল্যাদি এবং তিক্ত বর্গের ভেষজ ব্যবহৃত হয়। ককোল্যাদি পিত্তসংশমনবর্গের অন্তর্গত। ককোল্যাদিতে কর্কটশৃঙ্গী ও তিক্তে কর্কোটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিনারায়ণ আপ্তে কৃত ধন্বন্তরিয় নিঘণ্টু, এবং বথলিঙ্ক ও রথ, মনিয়র উইলিয়ামস্ ও উইলসন্ প্রণীত সংস্কৃত অভিধানগুলিতে কর্কটের নিম্নলিখিত প্রতিশব্দগুলি পাওয়া যায়, যথা—কর্কটঃ, কার্কটঃ, কর্কঃ, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রামলকসঙ্গ,

কর্কটী, কর্কটরস (Bothlink and Roth, সুশ্রুত ২।৩২২।১৯ উদ্ধার করিয়াছেন), কর্কট, কুর্কবালি (momordica mixa Roxf,) কর্কটশৃঙ্গী, তুম্বী, ইত্যাদি। মনে রাখিতে হইবে যে, উপরি উক্ত দ্রব্যগুলি উদ্ভিদ্‌জাত (vegetable drugs) এবং পিত্তজ রোগ প্রশমনে ব্যবহৃত হয়, যদিও কর্কটের সহিত অনেকগুলিরই নাম সংযোগ আছে। কর্কটশৃঙ্গী শব্দটা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। আশ্চর্য্য এই যে, শৃঙ্গীর অর্থ কর্কট। শব্দকল্পদ্রুমে নিম্নলিখিত পর্য্যায়টা পাওয়া যায়, কর্কটঃ, কুলীরঃ, কুলীরকঃ— সদংশকঃ, পঙ্কবাসঃ এবং তির্য্যকৃগামী। ইহাতে শৃঙ্গীর উল্লেখ নাই। অন্য কোনও সংস্কৃত অভিধানে কর্কট-পর্য্যায়ে শৃঙ্গীর উল্লেখ আছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু পালি জাতকে (সুবণ্ণ কক্কটজাতক) কর্কটকে 'শিঙ্গী মিগো' বলা হইয়াছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিতেছেন, তত্থ শিঙ্গীমিগো শিঙ্গী সুবণ্ণবণ্ণতায় বা অলসংখাতানং বা সিঙ্গানং অত্থিতায় কক্কটকো বুত্তো ; অর্থাৎ – ইহাকে শৃঙ্গী বলা হয় কেন ? না ইহার বর্ণ সুবর্ণের মত বলিয়া, অথবা ইহার দাঁড়াগুলিকে শৃঙ্গ বলা যাইতে পারে।*

কর্কটশৃঙ্গী অথবা কর্কট দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতে পিত্তজ কর্ণ-শূলের উপশম হয় তাহা যথার্থ ; কিন্তু ভিক্ষুপ্রবর যে উদ্ভিজ্জাত কোনও ভেষজ সেবন করেন নাই তাহা নিশ্চিত। তিনি যে কাঁকড়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টীকাকার কর্কটের প্রতিশব্দ দিয়াছেন দশপাদক। পাছে তাহাতেও বুঝিবার ভুল হয় এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন—"একং একস্মিং পস্সে পঞ্চ পঞ্চ কত্বা দস পাদা এতস্সাতি দস পাদকো" অর্থাৎ ইহার এক এক পার্শ্বে পাঁচ পাঁচ করিয়া (সর্ব্বশুদ্ধ) দশটি পা আছে বলিয়া ইহা দশপাদকো। P.T.S. পালি অভিধানেও কর্কটরসের অর্থ—"flavour made from crabs, crab-curry" এবং আলোচ্য বিমানের উল্লেখ আছে।

রাজনিঘণ্টুতে কর্কটের নিম্নলিখিত গুণ বিবৃত হইয়াছে —অস্য গুণাঃ—সৃষ্টবিন্মূত্রত্বম্‌ ভগ্নসন্ধাতৃত্বম্‌, বায়ুপিত্ত-নাশিত্বঞ্চ।

কৃষ্ণকর্কটগুণাঃ—বলকারিত্বং, ঈষদুষ্ণত্বম্‌, অনিলাপহত্বঞ্চ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন মহাশয় সুশ্রুত সংহিতার ইংরেজী অনুবাদে (1916, Vol. III, pp. 490, 491) ঐ কথাই বলিতেছেন—

"The species black crab is strength-giving and heat-giving in its potency and tends to destroy the deranged *vayu.* The whole species is laxative and diuretic in its effect *and tends to bring about an addition of fractured bones.*"

ধন্বন্তরিয় নিঘণ্টুতে কর্কটকে কোশস্থ বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই কোশস্থ বর্গের অন্যতম গুণ বাত এবং পিত্ত হরণ। যেহেতু কর্কট বায়ু-পিত্তহর, সেই হেতু কর্ণ-শূল—বাতজ অথবা পিত্তজ যে-প্রকারের হউক না কেন, কর্কট ভোজনে শান্ত হইবে ইহা অনুমিত হইতেছে। কর্কটরসের "ভগ্নসন্ধাতৃত্বম্‌" অর্থাৎ ভগ্ন অস্থি সংযোজন করিবার গুণ থাকায় ইহা কর্ণপাকও আরোগ্য করিতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কর্কট যে কর্ণশূল এবং অন্যবিধ নানা-প্রকার রোগের প্রতিষেধ করিতে পারে এই বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে প্রবল। শুধু বিশ্বাস কেন, ইহার প্রাত্যহিক ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। Man in India (Vol. IV, 1924, p. 171) নামক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি :—

"In South India there is as strong belief that the juice of many kinds of crabs is an efficacious remedy for many diseases. The Othaikalnandu (Gelasimus annulipes) or the Dhoby crab with a monster claw as large as the rest of the body in the male very common along back waters and estuaries, is said to be useful in cases of ear-ache. These crabs are collected and boiled in gingelly oil and the resultant forms excellent ear drops."†

* See also Kakkata-jat.—Vol. II, P. 343.

† বিহার প্রাদেশিক বৈদ্য-সম্মেলনের [illegible] অধিবেশনে পঠিত।

মিত্র-পূজা

অধ্যাপক শ্রী উমাপতি বাজপেয়ী

চলিত ভাষায় মিত্র-পূজাকে ইতু-পূজা বলে। 'মিত্র' শব্দের অপভ্রংশ 'মিতু', এবং সম্ভবতঃ তাহা হইতে 'ইতু' নামের প্রচলন হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, তার পর অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে পূজা করা হয়, এবং অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন পূজা শেষ হইয়া থাকে। কোথাও বা দেখা যায় এই পূজাপদ্ধতি আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে কেবল অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে এক দিন মাত্র পূজা করা হয়। কোন-কোন স্থানে উঠানের মধ্যস্থলে একটা বাঁশের আগা সোজা ভাবে পুঁতিয়া তাহার কঞ্চি হইতে বহুসংখ্যক ধান্যশীর্ষের গুচ্ছ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, এবং পূজার নিমিত্ত তন্নিম্নে ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে। কোথাও বা শুধু মৃণ্ময় ঘট মধ্যে যব, গম, পক্ব ধান্যশীর্ষাদি গুচ্ছাকারে স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মিত্র-পূজা একটি কৃষি-পূজা। এই পূজার দেবতা মিত্র বা রবি ; কারণ এই পূজাতে আবাহন, ধ্যান, উৎসর্গ ও প্রণামাদিতে যে-সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয়ই রবির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য, রবি প্রভৃতি প্রচলিত নাম ছাড়িয়া দিয়া অপ্রচলিত 'মিত্র' আখ্যা এই পূজায় ব্যবহৃত হইল কেন? ইহার কারণ আছে। কথিত আছে যে, এক সময়ে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যাতপ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। তাহা দেখিয়া সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্ম্মা উত্তাপ হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যকে দ্বাদশ অংশে খণ্ডিত করেন। তদবধি রবির সেই এক এক খণ্ড এক এক মাসে উদিত হয়। ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে ; বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য ও চৈত্রে বেদজ্ঞ। ইহাদিগকে দ্বাদশ সূর্য্য বলে। ঋগ্বেদে মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, দক্ষ, ভগ ও অংশু এই ছয় সূর্য্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাদের এক-একটি এক-এক ঋতুকালে উদিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হইত। তৈত্তিরীয় শাখায় মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ইন্দ্র, ভগ ও বিবস্বান্, সূর্য্যের এই অষ্ট নাম পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূর্য্যের এই 'মিত্র' আখ্যা অতি প্রাচীন। অগ্রহায়ণ মাসে পূজা হয় বলিয়া এই নামীয় সূর্য্যের পূজার বিধি আছে—"মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ"। বেদপন্থী সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্য আরাধ্য দেবতা। অগ্নিহোত্র যাগে প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে আহবনীয় অগ্নিতে একবার করিয়া আহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রভাতে সূর্য্যের উদ্দেশে, এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিবার নিয়ম।

'মিত্র' নাম ব্যবহারের কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এই পূজা অগ্রহায়ণ মাসে কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে অন্য কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমাদের জীবন-যাত্রার নিমিত্ত কালের হিসাব আবশ্যক। এই হিসাবের জন্য অনন্ত কালকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা-প্রকার প্রয়োজনীয় অংশে বিভক্ত করিতে হয়। পৃথিবী তাহার অক্ষরেখার (Axis) উপর যে আবর্ত্তন (rotation) করিতেছে, তাহার ফলে ধরাতলে কিছুকাল আলোক ও কিছুকাল অন্ধকার ঘটিয়া থাকে। এই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সুযোগে এক আবর্ত্তন-কালকে দিবা ও রাত্রি এই দুই অংশে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সূক্ষ্মতর হিসাবের নিমিত্ত দিবারাত্রিকে আবার দণ্ড, পল, ঘণ্টা, মিনিট প্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে। দিনের পর রাত্রি, আলোকের পর অন্ধকার, আবহমান কাল এইরূপ ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু জীবন-যাপনের কারবারে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কল্পনা প্রয়োজন। এই কারণে এক দিনকে অপর দিন হইতে পৃথক করা

আবশ্যক হইয়া পড়িল। কিন্তু দিনের পর দিন একই ভাবে একই রূপে আসিতেছে। প্রভেদ করা যায় কি উপায়ে ?

পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে দিবারাত্রি ঘটে। এই দৈনিক গতি ব্যতীত পৃথিবীর আর-একটা গতি আছে। এই গতি দ্বারা সে সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একবার প্রদক্ষিণের কালকে অনন্তকালের একটা মান (unit) স্বরূপ ধরিয়া তাহার নাম দেওয়া হইল বর্ষ বা বৎসর। এই কালের পরিমাণ স্থূলতঃ ৩৬৫ দিন। বর্ষকে আবার দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক-এক খণ্ডের নাম দেওয়া হইল মাস। দ্বাদশ মাসের বৈশাখাদি দ্বাদশ নাম হইল। প্রত্যেক মাসে গড়ে ৩০ দিন রহিল। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কোন্ মাসকে বৈশাখ বলিব, এবং মাসের সংখ্যা দ্বাদশ হইল কেন ?

মাসে মাসে প্রভেদ করিতে হইবে। তাহা হইলে একমাসের অন্তর্গত ত্রিশ দিনকে অপর মাসের অন্তর্গত ত্রিশ দিন হইতে পৃথক্ করা হইবে। সূর্য্য সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী। ইহাকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী নিয়ত ছুটিতেছে। সকল সময়েই সূর্য্যের একদিকে পৃথিবী এবং তাহার বিপরীত দিকে অনন্ত আকাশের কতিপয় অংশ বর্ত্তমান। ফলে আমরা দেখিতেছি যে, সূর্য্যের পশ্চাতে নভোমণ্ডল। কিন্তু পৃথিবী সচলা বলিয়া আজ আমরা সূর্য্যকে নভোমণ্ডলের যে-স্থানে অবস্থান করিতে দেখিতেছি, কিছুদিন পরে আর সে-স্থানে দেখিব না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক্ একখানা রেল-গাড়ী উত্তর মুখে ছুটিতেছে। গাড়ী হইতে একজন যাত্রী দেখিতেছে যে, রেলপথের পূর্ব্বে কিছু দূরে একটা মন্দির, মন্দিরের পূর্ব্বে একটা বটগাছ এবং বটগাছের দক্ষিণে একটা তাল-গাছ। গাড়ী আরও কিছু দূর উত্তরে গেলে যাত্রী দেখিবে মন্দিরের পূর্ব্বে আর সে বটগাছ নাই, এখন সেখানে আছে তাল গাছ। যেন মন্দিরটি দক্ষিণে সরিয়া গিয়া তাল গাছের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মন্দির চলিতেছে না, একই স্থানে স্থির রহিয়াছে। কিন্তু গাড়ী উত্তর মুখে চলিতেছে বলিয়া মন্দিরটি তাহার বিপরীত দক্ষিণ মুখে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইল মন্দিরের প্রতীয়মান (apparent) গতি। এখন আমরা যদি মন্দিরকে সূর্য্য এবং গাড়ীকে সচলা পৃথিবী বলিয়া অনুমান করি, তাহা হইলে পৃথিবীর বার্ষিক গতি হেতু সূর্য্য তাহার প্রতীয়মান গতিতে কিরূপে নভোমণ্ডলে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। প্রতীয়মান গতি বুঝা গেল। এখন হইতে সূর্য্যকেই চলন্ত ধরিলে আমাদের কাজ চলিয়া যাইবে। প্রতীয়মান গতির ফলে নভোমণ্ডলের গাত্রে অঙ্কিত একটা বৃত্তাকার পথ ধরিয়া সূর্য্যের চলা উচিত। কিন্তু কেমন করিয়া বুঝিব সূর্য্য চলিতেছে ? বটগাছ ও তালগাছের সাহায্যে মন্দিরের প্রতীয়মান গতি বুঝিলাম। সেইরূপ আকাশ-ক্ষেত্রে কোন নিদর্শনের সাহায্য লইতে হইবে। সূর্য্য আজ
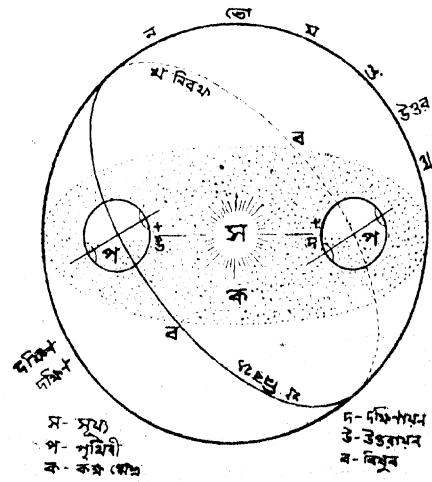
তাহার বৃত্ত-পথের যে স্থানে রহিয়াছে, সেই স্থানকে চিহ্নিত করিতে হইবে। পনর দিন পরে দেখিব সেই চিহ্নিত স্থান হইতে সে সরিয়া গিয়াছে কি না। তাহা হইলে আকাশমার্গে সূর্য্যের স্থান পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিব। একটা দূর পথ মাপিবার ও তাহার কতিপয় অংশ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে চিহ্ন স্বরূপ পাথর পোঁতা হয়। নভোমণ্ডলে রবিমার্গেও সেইরূপ পাথর পোঁতার আবশ্যক। কিন্তু তাহা মানবের সাধ্যাতীত। যদি কোন স্বাভাবিক চিহ্ন থাকে, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। চিহ্ন আছে, ইহারা রবিমার্গের সন্নিহিত কতকগুলি

নক্ষত্রপুঞ্জ। ইহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ফেলিবার নিমিত্ত রবি মার্গ রেখার উভয় পার্শ্বে ৮ অংশ দূরে দুইটি সামন্তরাল রেখার কল্পনা করিয়া রাস্তাটিকে বিস্তৃত করিয়া লওয়া হইল। এখন উহার পরিসর হইল ৮+৮=১৬ অংশ। এই চক্রাকার পথের মধ্যে দ্বাদশটি নক্ষত্রপুঞ্জ পাওয়া গেল। প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জের তারকা-গুলিকে কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করিয়া এক-একটা মূর্ত্তির কল্পনা করা হইল। কল্পিত মূর্ত্তি অনুসারে নক্ষত্রপুঞ্জগুলি মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ নামে অভিহিত হইল। সমগ্র বৃত্তটির নাম রাশি-চক্র (zodiac), এবং ইহার দ্বাদশ ভাগকে দ্বাদশটি রাশি বলে। রাশিস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ অনুসারে এক রাশি হইতে অপর রাশিকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে পারা যায়। প্রতীয়মান গতিতে সূর্য্য এই রাশি-চক্রের উপর দিয়া চলিতেছে। এক রাশি অতিক্রম করিতে রবির যে-সময় লাগে, তাহার নাম মাস। বিভিন্ন মাসে রবি বিভিন্ন রাশিতে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ তখন রবির বিপরীত দিক্‌স্থিত নভোমণ্ডলে বিভিন্ন নাম ও আকারের নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়; বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ, আষাঢ়ে মিথুন, শ্রাবণে কর্কট, ভাদ্রে সিংহ, আশ্বিনে কন্যা, কার্ত্তিকে তুলা, অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক, পৌষে ধনু, মাঘে মকর, ফাল্গুনে কুম্ভ ও চৈত্রে মীন। এইরূপে দ্বাদশ মাসে অথবা ৩৬৫ দিনে অথবা এক বৎসরে সূর্য্য এই দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিয়া আকাশ-মার্গে ঠিক একবার ঘুরিয়া আসে। বৎসরকে দ্বাদশ মাসে বিভক্ত করার কারণ, এবং এক মাসকে অপর মাস হইতে পৃথক্ করিবার উপায় নির্ণীত হইল। সূর্য্য ঠিক যে-দিন কোন রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটি মাসের প্রথম দিন। যে-দিন সে কোন রাশি ত্যাগ করে, সেইটি মাসের শেষ দিন। মাসের শেষ হইলে সূর্য্য রাশ্যান্তরে সংক্রমণ বা গমন করে; সেই কারণে ঐ দিবসকে সংক্রান্তি বলা হয়। এইরূপে মাসের আরম্ভ ও শেষ নির্ণয় হইয়া থাকে।

এখন বর্ষের আরম্ভ নির্ণয় করিবার উপায় স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে বর্ষকে বর্ষ হইতে পৃথক্ ভাবে গণনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে দিন-রাত্রি হয়। এই আবর্ত্তন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে। ফলে প্রভাতে সূর্য্যকে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বৎসরের সকল সময় সূর্য্য পূর্ব্বাকাশের একই স্থানে উদিত হয় না বা পশ্চিমাকাশের একই স্থানে অস্ত গমন করে না। শীতকালে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাকাশের দক্ষিণ ভাগে ঘটিয়া থাকে। তারপর সূর্য্য ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরিয়া গিয়া চৈত্র মাসে ঠিক মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়। তার পর আরও উত্তরে গিয়া আষাঢ় মাসে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাকাশের উত্তর ভাগে যায়। আষাঢ় মাস হইতে আবার দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসে সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থলে আসে, তারপর আরও দক্ষিণে গিয়া পৌষ মাসে উত্তর ভাগে উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূর্য্য পৌষ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাসকাল উত্তর মুখে গমন করে, এবং আষাঢ় হইতে পৌষ পর্য্যন্ত বাকী ছয় মাস কাল দক্ষিণ মুখে গমন করিয়া থাকে। ইহাও সূর্য্যের আর-এক প্রতীয়মান গতি, এবং ইহার নাম অয়ন-গতি। এই গতি-পথের শেষ উত্তর প্রান্তের নাম উত্তরায়ণ বা শীতায়ন (winter solstice) এবং দক্ষিণ প্রান্তের নাম দক্ষিণায়ন বা গ্রীষ্মায়ন (summer solstice)। এই দুই অয়নের মধ্যে সূর্য্য দোলকের ন্যায় দুলিতেছে। এক অয়ন-গতি শেষ হইতে ছয় মাস সময় লাগে। সুতরাং দুই অয়ন-গতি শেষ হইলে এক বৎসর হয়।

সূর্য্যের এই অয়ন-গতি একটা প্রতীয়মান গতি। ইহার কারণ কি, দেখা যাক্। বার্ষিক গতিতে পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকার পথে চলিতেছে। এই বৃত্তের নাম পৃথিবীর কক্ষ (orbit)। এই কক্ষ-পথ ধরিয়া পৃথিবী নিয়ত ঘানির বলদের মত ঘুরিতেছে। কল্পনা করা যাক্, একটা সরল রেখা সূর্য্যমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া নভো-মণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। এখন পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে ঐ কল্পিত রেখা দ্বারা রবি-মণ্ডল হইতে

আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা চক্রাকার সমতল ক্ষেত্র অঙ্কিত হইল। এই কাল্পনিক ক্ষেত্রের নাম দিলাম কক্ষ-ক্ষেত্র (plane of the ecliptic)। সূর্য্য ও পৃথিবী উভয়েই গোলক। কক্ষক্ষেত্র ইহাদের কেন্দ্র ভেদ করিয়া বিস্তৃত বলিয়া এই উভয় গোলকের অর্দ্ধাংশ ঐ ক্ষেত্রের উপরিভাগে এবং বাকী অর্দ্ধাংশ নিম্নে অবস্থিত। পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষক্ষেত্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে ও নিম্নে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখাকে উভয় দিকে বিস্তৃত করিলে উহা নভোমণ্ডলকে যে দুই বিন্দুতে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুদ্বয়কে নভোমণ্ডলের মেরু অথবা খ-মেরু (celestial pole) বলা হয়। উত্তরাকাশে উত্তর খ-মেরু ও দক্ষিণাকাশে দক্ষিণ খ-মেরু। এই উভয় মেরুর ঠিক মধ্যস্থলে, অর্থাৎ উভয় মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী করিয়া আকাশ-গাত্রে পূর্ব্ব-পশ্চিম মুখে একটি বৃত্ত কল্পনা করা হয়। ইহার নাম খ-নিরক্ষ (celestial equator)। ইহা দ্বারা নভোমণ্ডল উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বিভক্ত। যদি পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষ-ক্ষেত্রের উপর সমকোণ ভাবে (perpendicular) অবস্থিত হয়, তাহা হইলে খ-নিরক্ষ কক্ষক্ষেত্রের উপর স্থাপিত হয়; কারণ উভয়েই মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী। এরূপ হইলে প্রত্যহ দিন রাত্রি সমান হয়, এবং ঋতু-পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষ-ক্ষেত্রের উপর সমকোণ ভাবে অবস্থিত নহে, উহা ২৩৷৷০ অংশ (degree) বক্র। ফলে খ-নিরক্ষ কক্ষক্ষেত্রের উপর শায়িত না হইয়া ঐ ক্ষেত্রকে দুই বিন্দুতে কাটিয়া উর্দ্ধে ও নিম্নে বিস্তৃত। এই দুই বিন্দুর নাম বিষুব (Equinox)। সূর্য্য তাহার প্রতীয়মান গতিতে চৈত্র মাসে এক বিষুবে উপস্থিত হয়, এবং তাহার ফলে দিন রাত্রি সমান হয়। এই বিষুবের নাম হরিপদ বা বাসন্ত বিষুব (vernal equinox)। তাহার ছয় মাস পরে আশ্বিন মাসে সূর্য্য আর-এক বিষুবে উপস্থিত হয়। তখনও দিন রাত্রি সমান হয়, এবং উদয়াস্ত যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাকাশের ঠিক মধ্য স্থলে ঘটিয়া থাকে। এই বিষুবের নাম বিষ্ণুপদ বা শারদ বিষুব (autumnal equinox)। পৃথিবীর অক্ষরেখার বক্রতা হেতু সূর্য্যের প্রতীয়মান অয়ন-গতি, দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঋতুভেদ—অর্থাৎ শীতাতপের বৈষম্য। পৌষ মাসে দক্ষিণায়ন হইতে উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া সূর্য্য তিন মাস পরে চৈত্র মাসে অয়ন-পথের মধ্যবর্ত্তী বাসন্ত বিষুবে উপস্থিত হয়। আরও তিন মাস পরে আষাঢ় মাসে উত্তরায়ণে আসিয়া পড়ে। পুনরায় তথা হইতে দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিন মাস পরে আশ্বিন মাসে মধ্য পথে শারদ বিষুবে আসে। আরও তিন মাস পরে পৌষ মাসে পুনরায় দক্ষিণায়নে উপস্থিত হয়। সুতরাং এক অয়ন বা বিষুব হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় তথায় ফিরিতে ঠিক এক বৎসর সময় লাগে
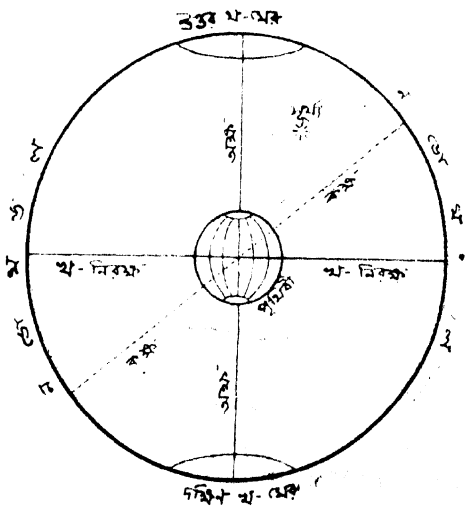
মোটের উপর দুই অয়ন ও দুই বিষুব। অয়ন-পথের এই চারি বিন্দুর সাহায্যে সমগ্র বৎসরকে তিন মাস করিয়া চারি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিন্দু-চতুষ্টয়ের যে-কোন একটি বৎসরের প্রারম্ভ ধরিয়া সৌর গতি অনুসারে সৌর বর্ষ গণনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে মানবের জীবন-যাত্রার রীতি বিভিন্ন প্রকার। সেইসকল বিভিন্ন রীতির উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে কোথাও কোন অয়ন হইতে, আবার কোথাও বা কোন বিষুব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষ গণনা হইয়া আসিতেছে। কালভেদে মানবের রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং তদনুসারে একই অঞ্চলে বিভিন্ন কালে বর্ষ গণনা প্রথাও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে খ্রীষ্টিয়ানের বৎসর জানুয়ারী মাসে বা উত্তরায়ণ গতির প্রারম্ভে আরব্ধ

হয়। কিন্তু আমাদের বৎসর বৈশাখ বা বাসন্ত বিষুবে সূর্য্যের সংক্রমণ-কাল হইতে গণনা করা হয়। সেই কারণে উভয় বিষুবের মধ্যে বাসন্ত বিষুবকে শ্রেষ্ঠ ধরিয়া তাহার আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে মহাবিষুব।

১৩৩২ সালে ৮ই চৈত্র সূর্য্যের বাসন্ত বিষুব সংক্রমণ ঘটিতেছে। বাঙ্গালা বর্ষ যদি বাসন্ত বিষুবে আরব্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ সময় ১৩৩২ সালের শেষ ও ১৩৩৩ সালের প্রথম দিন হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ২২ দিন পরে বৈশাখ মাসে নূতন বর্ষের আরম্ভ হইবে। অবশ্য এককাল ছিল, যখন বৈশাখের প্রথম দিনে বাসন্ত বিষুব সংক্রমণ ঘটিত। তখন মেষ রাশিতে বাসন্ত বিষুব ছিল, এবং এই বিষুবের চিহ্ন ছিল মেষরাশিস্থ অশ্বিনী নক্ষত্র। সেই সময় হইতে এই বর্ষ-গণনা-রীতির প্রচলন হইয়াছিল। তখন সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট আসিলেই বাসন্ত বিষুবে আসিয়া পড়িত। ফলে কালক্রমে অশ্বিনী হইতে সূর্য্যের অশ্বিনীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালকে এক বৎসর ধরা হইতে লাগিল, বিষুবের প্রতি আর লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক রহিল না। বাসন্ত বিষুব, গ্রীষ্মায়ন, শারদ বিষুব ও শীতায়ন এই চারি বিন্দুর মধ্যে ব্যবধান সমান—তিন মাস। সুতরাং যদি বিষুবদ্বয় অচল হয়, অয়নদ্বয়ও অচল। এইরূপ হইলে প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথম দিন সূর্য্য বাসন্ত বিষুবে উপস্থিত হইত, এবং ঋতু-গণনায় কোন অসুবিধা ঘটিত না।

বস্তুতঃ তাহা নহে। বিষুবদ্বয় সচল, ফলে অয়নদ্বয়ও সচল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবীর অক্ষরেখার উত্তর প্রান্ত দ্বারা উত্তর খ-মেরু নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অক্ষপ্রান্ত উত্তরাকাশের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া নাই। ঘূর্ণায়মান লাটিমের মস্তকের ন্যায় ইহা এক বৃত্তপথে ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। প্রায় ২৬০০০ বৎসরে এক পাক ঘুরিয়া থাকে। সুতরাং তন্নির্দ্দিষ্ট উত্তর খ-মেরুও ২৬০০০ বৎসরে ঐ পথে ঘুরিতেছে। এই মেরু হইতে খ-নিরক্ষের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান; সুতরাং মেরু-সঞ্চালনের সঙ্গে খ-নিরক্ষও নিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। খ-নিরক্ষ ও কক্ষক্ষেত্রের সংযোগ-স্থলই বিষুব। কক্ষক্ষেত্র স্থির, কিন্তু খ-নিরক্ষ সচল। ফলে বিষুবদ্বয় এবং তৎসঙ্গে অয়নদ্বয় ধীরে ধীরে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতেছে। অধুনা বাসন্ত বিষুব রাশি-চক্রের যে-স্থানে রহিয়াছে, ২৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই স্থানে ছিল, এবং ২৬০০০ বৎসর পরে সেই স্থানে থাকিবে। কালক্রমে বাসন্ত বিষুব মেষ রাশি হইতে পশ্চাতে সরিয়া মীন রাশিতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে সূর্য্য অশ্বিনীতে পৌছিবার ২২ দিন পূর্ব্বে মহাবিষুব সংক্রমণ হইতেছে। কিন্তু সূর্য্য মেষ রাশিস্থ অশ্বিনী নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তী হইলে বর্ষারম্ভ করিবার পুরাতন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। ফলে বাঙ্গালা বর্ষ গণনার সহিত এখন বিষুবের সম্পর্ক নাই। সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণের সময় গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বৈশাখে গ্রীষ্মারম্ভ হইত; এখন ৮ই চৈত্র উহার আরম্ভ। কালে গ্রীষ্ম ঋতু আরও পশ্চাতে সরিয়া পৌষ মাসে, অধুনা যে-সময় শীতকাল, সেই সময় ঘটিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা মাসের সহিত ঋতুরও কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রীষ্ম ঋতু যে-কোন মাসে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

এক কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষগণনা প্রথার প্রচলন ছিল। অগ্রহায়ণ যে এককালে বৎসরের প্রথম মাস ছিল, তাহা উহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়,—হায়নের (বর্ষের) অগ্র (প্রথম)। এই মাস হইতে বর্ষ গণনার কারণ কি? অগ্রহায়ণ শব্দের দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি,—অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হায়ন (ব্রীহি, ধান্য, শস্য) যে সময়। এই হিসাবে ধরিলে দেখা যায় যে, বর্ষগণনা রীতির সহিত কৃষি-কার্য্যের সম্পর্ক রহিয়াছে। আর্য্যেরা যখন মধ্য এশিয়ার তৃণ-কান্তারে বাস করিত, তখন তৃণভোজী পশুর পালন তাহাদের বৃত্তি ছিল। কারণ, অত্যন্ত শীতাতপ এবং বৃষ্টির অভাব বশতঃ তাহাদের বাসভূমি তরুলতা অথবা শস্যোৎপাদনের উপযোগী ছিল না বলিয়া সে-সময় কৃষিকার্য্য তাহাদের জীবিকা হয় নাই। অতএব কৃষি-জীবী হইবার পূর্ব্বে আর্য্যেরা এই কৃষি-সম্পর্কিত বর্ষগণনা প্রথা অবলম্বন করে নাই। অনুমান খ্রীষ্ট জন্মের ১০০০ হইতে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন এক সময়ে আর্য্যেরা ভারত ভূমিতে প্রবেশ করে। তখন সংস্কৃত

ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতে প্রবেশ করার পর তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া বসতি স্থাপন করিতে তাহাদের কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর এই উষ্ণতর বৃষ্টিবহুল ভারতভূমিকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী দেখিয়া তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে। তখন হইতে শস্যই হইল ভারতবাসী আর্য্যগণের প্রধান সম্পদ। এই কারণে ভারতের অগ্র (প্রধান) হায়ন (শস্য) ধান্য যে-মাসে পরিপক হয়, এবং যে-মাস হইতে রবিশস্যেরও চাষ আরম্ভ হয়, সেই মাসকে অগ্র (প্রথম) ধরিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল অগ্রহায়ণ। নূতন শস্য-সম্পদের সহিত তখন এই মাস হইতে নববর্ষ আরম্ভ করা হইত।

সূর্য্যের অয়ন-গতির হিসাবে যদি এই মাস হইতে বর্ষারম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে দুই বিষুব ও দুই অয়নের যে-কোন একটা এই মাসে থাকা আবশ্যক। বাসন্ত বিষুব ও শীতায়ন এই উভয়ই এখন অগ্রহায়ণ মাসের সম্মুখে। সুতরাং যে-সময় উহাদের কোন-একটি অগ্রহায়ণে ছিল, সে অতি পুরাকাল। তখন আর্য্য সভ্যতা বা সংস্কৃত অগ্রহায়ণ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না। সুতরাং অগ্রহায়ণে এই বর্ষারম্ভ প্রথা বাসন্ত বিষুব বা শীতায়নের হিসাবে হয় নাই। অগ্রহায়ণের নিকটে আছে শারদ বিষুব। এক সময়ে শীতায়ন ফাল্গুনে ছিল, বেদ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শীতায়ন ও শারদ বিষুবের মধ্যে ব্যবধান তিন মাস। সুতরাং তখন শারদ বিষুব অগ্রহায়ণের প্রথমে পড়িত। প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ছিল। সে-সময় আর্য্যেরা ভারতে আসিয়াছিল, এবং তখন সংস্কৃত ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছিল সম্ভবতঃ তখন শারদ বিষুব ও কৃষিকার্য্য এই উভয় হিসাবে বর্ষারম্ভ করিয়া বর্ষের প্রথম মাসের নাম দেওয়া হয় অগ্রহায়ণ।

বর্ষারম্ভ প্রথার কথা হইল। এখন মূল আলোচ্য মিত্র-পূজায় ফিরিয়া আসা যা'ক্। নানারূপ সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া পুরাতন বৎসর কাটিয়া যায়। পুরাতনের পর নূতন বর্ষ আসিয়া থাকে। নব বর্ষে নবীন উদ্যমে এবং ভবিষ্যতে নূতন সুখ-সম্পদের আশার সহিত মানব তাহার জীবনের নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করে। স্বকীয় ভাগ্যে সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত না হওয়া মানব-চরিত্রের অভ্যাস। বর্ত্তমান বৎসরে যে-ব্যক্তি দুঃখ পাইতেছে, আগামী বর্ষে সুখের আশা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যে-ব্যক্তি এ বৎসর দুঃখ পাইল না, কেবল সুখ পাইল, সেও আগামী বর্ষে অধিকতর সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। কৃষি-জীবীর প্রধান সম্পদ শস্য। প্রচুর শস্য জন্মিলে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না, এবং অভাবহীনতা সুখের আকর। এই শস্য-সম্পদ্ লাভ করিতে হইলে ভগবান্কে, বিশেষতঃ কৃষি-দেবতাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। মিত্র বা সূর্য্য ছিলেন তখনকার কৃষিদেবতা। কারণ সূর্য্যের গতির জন্য শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং তাহার ফলে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। এই কারণে নব বর্ষের প্রারম্ভে মৃণ্ময় ঘটকে পিষ্ট নবীন তণ্ডুলের আলিম্পনায় চিত্রিত করিয়া, নবীন যবধান্যাদির শীর্ষসম্ভারে সজ্জিত করিয়া, নবীনান্নের উপচারের সহিত কৃষি-দেবতা মিত্র বা সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পূজোপহার দিয়া নব বর্ষোৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। তখন সমগ্র মাস ব্যাপিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায়, এই পূজার আয়োজন ও অনুষ্ঠের আচারগুলি স্ত্রীলোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া
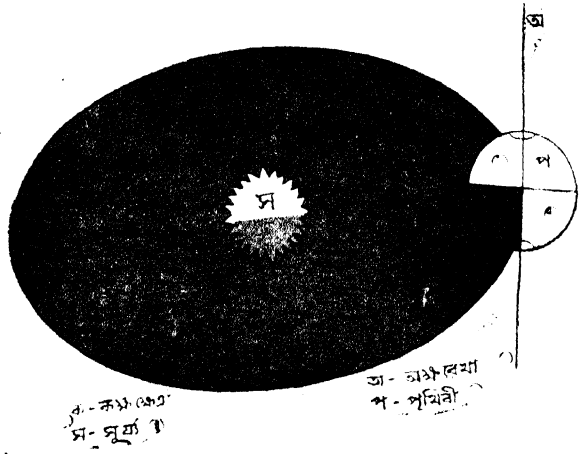
থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, সেই প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার কালে শ্রেষ্ঠ উৎসব—নব বর্ষোৎসবে স্ত্রীলোকদের প্রধান অধিকার ছিল, এবং বৈদিক সমাজে স্ত্রীলোকের উচ্চস্থান ছিল, তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। আজকাল শারদ বিষুব পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়া আশ্বিনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; বর্ষারম্ভ প্রথারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফলে মিত্র-পূজা এখন আর নব বর্ষোৎসব বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই পূজা-পদ্ধতি এখন সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অধিকার ত্যাগ করে নাই। তাহার ফলে মিত্র-পূজা অধুনা একটি স্ত্রী-আচারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

৮ই অক্টোবার বৃহস্পতিবার—এটা, জেলার সদর। বেশ জায়গা, ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু রেলওয়ে এখান থেকে দূর ব'লে জায়গাটা তেমন বিখ্যাত নয়। এটা থেকে ২০ মাইল দূরে সিকান্দ্রারাউয়ের রেল ষ্টেশন। এখান থেকে সিকান্দ্রারাউ অবধি মোটর লরী যাতায়াত করে। রাস্তার বাঁদিকে পর পর দু'টি রাস্তা দেখা গেল, একটি সিকোহাবাদ অপরটি মথুরা অভিমুখে গেছে। এটা জেলায় চোর-ডাকাতের উৎপাত খুব বেশী, ক্রিমিন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ব'লে এটার অখ্যাতি শোনা গেল।

সকালে রওনা হ'য়ে উল্লেখযোগ্য জিনিষ দেখ্‌ছি খইয়ের আড়ত। দোকানের সাম্‌নে চটের ওপর পাহাড়ের মত খই ঢালা হ'য়েছে, কেবল একজায়গায় নয়, রাস্তার দু'পাশেই এই রকম খইয়ের পাহাড়। আর দেখ্‌লাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন—ঘাসে-ঢাকা এক টুক্‌রো ছোট্ট বাগান আর তার মাঝখানে ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

মাইল দশ পরে গ্যাঞ্জেস্ কেনাল ব্রিজের ওপাড় থেকে আলিগড় জেলার সীমানা সুরু হ'ল। গয়া জেলার মত এখানে খাপ্‌ছাড়া ভাবে পথের পাশে এক জায়গায় পলাশের বন দেখ্‌তে পেলাম। বেলা দশটার সময় আমরা সিকান্দ্রারাউ সহরে এসে বিশ্রাম করবার জন্যে নেমে পড়্‌লাম। রোদের তেজ আজ বেজায়, রাস্তা ধূলায় অন্ধকার। তারি মাঝে গাছের ছায়ায় ছায়ায় দোকান ব'সে গেছে। কুয়ার ধারে ধারে টিনের নল বা বাঁশের চোঙ্গায় একটি লোক জল ঢাল্‌ছে আর তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা দু'হাতে ক'রে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান কর্‌ছে। এইরূপ জলসত্রকে এ দেশী ভাষায় পিয়াউ বলে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জলদান অতিশয় পুণ্যের কাজ ব'লে এখানকার ধনী ব্যক্তিরা পিয়াউর জন্য মাহিনা ক'রে লোক নিযুক্ত করেন। তারা বেলা ৮টা থেকে ৫টা অবধি পথিকদের শীতল জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। যুক্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে এই পিয়াউর যথেষ্ট প্রচলন আছে।

বেলা আড়াইটা তিনটার সময় সিকান্দ্রারাউ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। সহর থেকে দলে দলে এক্কা বাইরে যাওয়া-আসা কর্‌ছে। পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছি। পাশের খোড়ো ও খোলার বসতি, কৃষাণ ও মজুরাণীদের হাস্য-কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে।

এসব ছাড়িয়ে আমরা নির্জ্জন পথে এসে পড়্‌লাম, গাছের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর ব'সে আছে। ছোট ছোট ছানাগুলি রাস্তার ধারে ধারে চ'রে বেড়াচ্ছে। তারা আমাদের দেখে ত্বরিত পদে একটু স'রে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে রইল, এক-একটা বা আধটুভাবে ডানা নাড়্‌তে নাড়্‌তে গাছের ওপর তার মায়ের কাছে উড়ে গিয়ে যেন

নিশ্চিন্ত হ'ল। তাদের ডানা থেকে খ'সে-পড়া পালক কুড়ুতে কুড়ুতে আমরা এগিয়ে চল্‌লাম।

ক্রমশঃ এসব মিলিয়ে গেল, আবার সারি সারি এক্কা ও মাল-বোঝাই গরু-মহিষের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি, সকলের গন্তব্যই একদিকে। রাস্তাও খারাপ হ'য়ে এল। প্রত্যেক বড় সহরের প্রবেশ-পথ এইরকম হয়। বুঝ্‌লাম, আলিগড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

সহরে বাঁদর ও হনুমানের উপদ্রব খুব। এখানকার উল্লেখযোগ্য জিনিসের মধ্যে মুস্‌লিম ইউনিভার্সিটি। মাখনের কার্‌খানা ও খেলাধুলার জন্যেও আলিগড়ের নাম আছে। জায়গাটি মুসলমান-প্রধান ও আয়তনে বড় কম নয়। ধুলা, নোংরা ও ঘন ঘন বসতিতে পরিপূর্ণ। পথের ওপর একটা বড় বাড়ীর ফটকে বাংলা হরফে 'যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকিল' লেখা দেখে আমরা আর ইতস্ততঃ না ক'রে সেইখানেই আজকের মত আস্তানা গাড়্‌বার জন্যে প্রবেশ কর্‌লাম।

গৃহস্বামী আমাদের পরিচয়ও অ্যাডভেঞ্চার্‌ শুনে বিশেষ পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এঁরা এখানে প্রায় চল্লিশ বৎসর বাস কর্‌ছেন। কম্পাউণ্ডে অনেক ঘোড়া রয়েছে দেখে কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম এঁদের ঘোড়ার ব্যবসা আছে। ভাল ঘোড়ার জনন আলিগড়ে হয়। এখানকার অশ্বব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেইসব ঘোড়া গবর্ণমেণ্ট অশ্বারোহী ও অন্যান্য সামরিক বিভাগের জন্য ক্রয় করেন।

ঘরের বারান্দায় 'চারপাই'য়ের ওপর বিছানা করা হ'ল। আজ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হ'তে লাগ্‌ল, পায়ের তলায় কম্বল-গুলি বিছিয়ে রেখে আমরা নিদ্রাদেবীর আরাধনা কর্‌তে সুরু ক'রে দিলাম। আজ ৪৫ মাইল মাত্র বাইক করা হয়েছে, কলকাতা থেকে মোট ৮২৯ মাইল।

৯ই অক্টোবর শুক্রবার—আজ আমাদের দিল্লী পৌঁছবার কথা। দিল্লী! অতীত গৌরবমণ্ডিত দিল্লী! যেখানে কত সম্রাট্‌ কত বাদশা'র ভাগ্য নিরূপিত হয়েছে, কত জাতির উত্থান-পতনের অভিনয় যে-রঙ্গমঞ্চে হ'য়ে গেছে—যার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা সমস্ত ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, আজ আমরা সেই দিল্লী-যাত্রী।

প্রথমেই হ'ল রাস্তার গোলমাল। একটু বড় সহর হ'লেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সহরের মধ্যে এসে এমন লুকোচুরি খেলে যে তার নাগাল পেতে হায়রান হ'তে হয়। বরাবর বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে চ'লে আবার ট্রাঙ্ক রোডকে ধরা গেল। পাশে পাশে ছায়াশীতল বাগান কখন বা পথের পাশে শুষ্ক তৃণহীন ধূসর রংয়ের পোড়ো মাঠ। ত্রিশ মাইল পরে রোদ বেশ চন্‌চনে হ'য়ে উঠ্‌ল; আমরাও ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে খুরজা সহরে প্রাতঃরাশ সেরে নেবার জন্যে প্রবেশ কর্‌লাম। খুরজার খ্যাতি ঘিয়ের জন্যে,প্রমাণও তার চোখে পড়্‌ল। সহরের মধ্যে ঘিয়ের আড়ত প্রচুর, আশপাশ থেকে গাড়ী বোঝাই টিন টিন ঘি সহরের মধ্যে আস্‌ছে। ঘিয়ের গাড়ী চলাচলের জন্যে রাস্তার অবস্থা একবারে শোচনীয়।

বাজারে প্রাতঃরাশের জন্য মুড়ি ও লাড্ডু ছাড়া আর কিছু মিল্‌ল না। এ অঞ্চলে দোকানে মিষ্টান্ন ছাড়া আর কোন রকম খাবার পাওয়া যায় না, তার মধ্যে লাড্ডুই বেশী। আমরা ভাবলাম দিল্লীর লাড্ডু না কি? এখানে মুড়ি ১৲ সের হিসাবে বিক্রী হয়।

খুরজা সহর থেকে একটি কাঁচা রাস্তা সেকেন্দ্রাবাদ অবধি গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিশে গেছে। ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই রাস্তায় প্রায় দশ মাইল শর্টকাট হয়, সেইজন্যে আমরা খুরজা থেকে আবার ট্রাঙ্ক রোডে ফিরে না এসে এই রাস্তা দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ অবধি যাব স্থির ক'রে বেড়িয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু রাস্তাটি সহর থেকে মাইল দুই গিয়ে নিজেকে মাঠের মধ্যে এমন হারিয়ে ফেলেছে যে এরাস্তায় আমাদের শর্টকাটের কিছুমাত্র সুবিধা হবে ব'লে বোধ হ'ল না। কাজে-কাজেই আবার খুরজায় ফিরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধর্‌তে হ'ল। ঘণ্টাখানেক যাবার পর একটা Carial Bridge পার হ'য়ে, সাম্‌নেই বুলানসহর যাবার রাস্তা দেখ্‌তে পেলাম, দূর মোটে দেড় মাইল। সেখান থেকে ট্রাঙ্ক রোড বাঁদিকে ফিরে চ'লে গেছে। এই মোড়ে ছায়া-ঢাকা একটি বড় পিয়াউ দেখে আমরা জল-খাবার জন্যে নেমে পড়্‌লাম।

ঠিক দেড় মাইল আসার পর আবার একটি মোড়। কাষ্ঠফলকে বাঁ দিকের রাস্তা মিরাট ও সোজা রাস্তা দিল্লীর নিশানা দিচ্ছে। আমরা নির্দ্দেশ-অনুযায়ী সোজা রাস্তা ধ'রে চল্‌লাম। হঠাৎ নজর পড়্‌ল মাইল-ষ্টোনের দিকে। মাইল-ষ্টোনে দিল্লীর কোন উল্লেখ নেই কেবল মিরাটের দূরত্ব-জ্ঞাপক সংখ্যা দেখে আমাদের সন্দেহ হ'ল। পুনরায় মোড়ে ফিরে এসে অনুসন্ধান ক'রে বুঝ্‌লাম কাষ্ঠফলকের ভুল নিশানাই এই বিপত্তির কারণ। পাছে আমাদের মত আর কেউ এই বিভ্রাটে পড়ে সেইজন্যে আমরা নিশান ফলকটিকে ঠিক করে দিয়ে বাঁ-দিকে রাস্তায় প'ড়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। এই মোড় থেকে দিল্লী ও মিরাটের দূরত্ব এক—মোট ৪৪ মাইল। ট্রাঙ্ক রোড এই-খানে যেমন মাঝে মাঝে হঠাৎ মোড় ফিরেছে সে রকম এপর্য্যন্ত আর কোথাও দেখিনি। একটু অসাবধান হ'লেই রাস্তা গোলমাল। এরকম জায়গায় শুধু নিশান-ফলকের উপর নির্ভর না ক'রে স্থানীয় লোকজনের কাছে থেকে সঠিক সংবাদ নিয়ে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

বড় বড় গাছের তলা দিয়ে রাস্তাটা চ'লে গেছে। এখানে অনেক খেজুর-গাছের সারি দেখা গেল। ক্রমে আমরা সেকেন্দ্রাবাদ সহরে এসে পড়্‌লাম। পুরাতন সহর। রোদে কাঠ ফাট্‌ছে, চারদিকে একটা রুক্ষভাব, বেলা আন্দাজ দেড়টা। আমরা খাওয়া-দাওয়া সার্‌বার জন্যে পথের পাশে একটা সরাইয়ে প্রবেশ কর্‌লাম।

প্রায় ২৷৷০টার সময় আমরা কিছু দূরে রাস্তার ধারে রোদের জন্যে একটা বাগানের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লাম। ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর আবার সাইকেলে উঠ্‌লাম। সন্ধার আগে একটা জায়গায় আকের ক্ষেতের ধারে ধারে অনেক ময়ুর দেখা গেল; তাদের ঝরে'-পড়া পালকে রাস্তা ছেয়ে গেছে। আমরা এখান থেকে অনেক পালক সংগ্রহ কর্‌লাম। বিজয়ী সৈনিকের মত টুপিতে পালক গুঁজে দিল্লী প্রবেশের জন্য আমরা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম

ঠিক সন্ধ্যার সময় সাইকেলে আমাদের গাজিয়াবাদে নামিয়ে দিলে। এলাহাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত ই-আই-আর এর ছোট লাইন গাজিয়াবাদ থেকে আবার ডবল লাইন সুরু হ'য়েছে। মিরাটের শাখা-লাইনও এই-খান থেকে বেরিয়েছে। একটা রাস্তাও লাইনের সঙ্গে-সঙ্গে ২৮ মাইল চ'লে মিরাটে উপস্থিত হয়েছে।

দিল্লী একটা খুব ছোট বিভাগ। সহরের চারপাশে কয়েক মাইল ক'রে ধ'রে এই বিভাগকে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে আলাদা করা হ'য়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা যুক্তপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে গাজিয়াবাদ থেকে ৪ মাইল পর দিল্লীর সীমানার মধ্যে এসে পড়্‌লাম। রাস্তা বেজায় খারাপ, বেশী গরুর গাড়ী চলাচলের জন্য বড় বড় সহরের প্রবেশ-পথগুলি যেমন হয়। সহরতলীর আলোর প্রতীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চলেছি, কিন্তু কোথায় আলো? অন্ধকারে অন্ধকারে আমরা যমুনা পুলের সাম্‌নে এসে পড়্‌লাম। পুলে কোনোরকম আলোর বন্দোবস্ত নেই, অথচ ওপারেই রাজধানী দিল্লী! বাস্তবের কাছে কল্পনা বেজায় খাট হ'য়ে গেল। সাইকেলের আলো-গুলো উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা এপারে এসে পড়্‌লাম।

প্রথমেই চোখে পড়ল রাস্তার মিটমিটে কেরাসিনের আলো। সামান্য কিছুদূর যাবার পর একটা রেলের ব্রিজের তলা দিয়ে ওদিকে যেতেই বৈদ্যুতিক আলোক উদ্ভাসিত রাজধানীর রাস্তায় এসে পড়লাম। আমাদের আজ দিল্লী পৌঁছবার কথা, এখানকার হিন্দু কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা ছিল। আমরা ঘোরাঘুরি না ক'রে কাশ্মীর-গেটে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। আজ আমাদের ঘোরাঘুরি ৯৩ মাইল হ'য়েছে। মিটারে সবশুদ্ধ উঠেছে ৯২২ মাইল।

(ক্রমশঃ)

মানদণ্ড

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

হে সুন্দর মানদণ্ড, হে প্রচণ্ড, হে ঋজু নিশ্চিত,
হে কল্যাণ শব-শিব! আজি মোর চিত
পুলকিত তব প্রতীক্ষায়;
হে অনন্ত, অগ্নিমন্ত্র তোমার ও মন্ত্রের দীক্ষায়
দীক্ষা দেহ মোরে।
বাম হস্তে মৃত্যু হানো, দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে,
মাঝে তব হৃদয়ের পূতশিখা যজ্ঞসম জ্বলে
হে সাগ্নিক পুরোহিত! করুণা-তরঙ্গ-অশ্রুজলে
রুদ্রতাপে বাষ্প করি' পলে পলে ব্যাপ্ত কর মেঘে,
হে নির্ম্মম! সুনির্ম্মল পাবক-শিখায় তব লেগে
রোষের কলুষলেশ নিমেষে নিমেষে হয় ছাই,
হে প্রশান্ত নির্ব্বিকার। আমি কা'র পথপানে চাই
জীর্ণ এই জীবনের বাতায়নে ক্ষীণ-বর্ত্তিকায়
ভীত দু'টি নয়নের প্রকম্পিত অনল-শিখায়
জ্বালি দীপারতি
করি পূজা আয়োজন, অন্তরালে সঙ্গোপনে অতি
অন্তরের অন্তস্তলে বহি রিক্ত ভিক্ষাপাত্রটিরে।

এসো এসো ঝড় তুলে, জীর্ণতার এ দীন কুটীরে
বজ্র হেনে এসো তুমি লেলিহান লোলজিহ্বা মেলি,'
পরাও এ জীবনেরে অগ্নিবর্ণ বরণের চেলি,
ভিক্ষাপাত্র চূর্ণ কর, কেড়ে লও আরতির থালা,
দীর্ণ কর, নয়নের অশ্রুজল-তৃষা-মোহ-ঢালা
কুণ্ঠার গুণ্ঠন। পরে যেথা সূর্য্য তারা যায় চলি'
আপনার অগ্নিদাহে আপনার পথেরে উজলি'
সেথা টেনে লয়ে যাও তা'রে,
নগ্ন করি' রিক্ত করি' জর্জ্জর কর হে তারে
তোমার ও দণ্ড পুরস্কারে।
হে দণ্ডী, সন্ন্যাসী,
ও তব গৈরিক বেশ আমি ভালোবাসি;

হে বিষুব, তব অঙ্গ-বিভূতির ভূষা
স্বর্ণভস্ম দিয়ে আঁকে অহর্নিশি সন্ধ্যা আর উষা,
তোমার ললাটে লিখে সমাহিত শান্তি সুগভীর।
তোমা' তরে নহে নহে গ্রহসম ঘেরিয়া রবির
কক্ষ-প্রদক্ষিণ করা। আপনার অক্ষদণ্ড ঘেরি'
ঘোর না বিভ্রমে তুমি। সীমাহীন নীল আকাশেরি
সর্ব্বময় নিথরতা সম তুমি। বিধবার প্রেমসম তব
রিক্ততার মহৈশ্বর্য্য, আপনার অপার বিভব
কাহারেও দিতে নাই, কিছু নাহি চাহ কা'রো হ'তে,
তবুও সর্ব্বস্ব ত্যজি' হে বৈরাগী, ফের পথে পথে
সকলের সনে। কিছু নাহি রাখো আপনার তরে,
যে ধন বিলাও তাই তব ধন, যেই বিত্ত কাড়ো ক্রূর করে
সে ক্ষতি তোমার ক্ষতি। প্রেমে তুমি চিত্ততলে বহ
এবিশ্বের সব সুখ, সব দুঃখ, মিলন-বিরহ,
লাভ-ক্ষতি। দেওয়া-নেওয়া তাই ত তোমার
সমমূল্য, তুল্য তব দণ্ড-পুরস্কার।

হে নির্দ্দয়, জানি জানি নিষ্পলক তোমার দৃষ্টির
নির্ব্বাক্ বাণীরে। জানি জানি কবে প্রথম সৃষ্টির
তরুণ প্রভাতে বিশ্ব ও তব নয়নারুণে চাহি'
গীতরবে বাহিরিল অলক্ষ্যের যাত্রাপথ বাহি'
নির্ভয় নির্ভরে।
তার পর বারম্বার আকাশের অসীমতা ভরে'
সুখীর বন্দনাগীত, দুঃখীর পীড়িত আর্ত্তরব
জ্বেলেছে স্বর্গের জ্যোতিঃ, রচিয়াছে আঁধার রৌরব;
হে নিতল মহাসিন্ধু, সুশীতল তব বক্ষতলে
কত সুধাহলাহল অহর্নিশি উচ্ছ্বসিয়া উথলে
দেব-অসুরের দ্বন্দ্বে, কেউ তার জানে না সন্ধান।
বেদনায় যেই দণ্ড, এ জীবনে সুখের যে দান

বারে বারে ভরে' ওঠে, দোঁহে তারা ক্ষণিকের মত ;
সুখ বা দুঃখের মাঝে, তুমি শুধু অনন্ত শাশ্বত
চিরন্তন।

তব পথ গড়া যে প্রস্তরে
তরুশষ্পছায়াহীন, তাই তারে ঘিরে থরে থরে
বিকশে পল্লবে পুষ্পে নিরালায় গীতে গন্ধে রসে
জীবনের আনন্দ সঞ্চয়। যবে দুরাশার বশে
অন্ধ দুঃসাহসে মেলি' আপনার শিকড় শাখারে
হে কঠোর, তব অধিকারে,—
রথচক্র-ঘর্ঘরের রুদ্রতালে দণ্ড অভিশাপে
খণ্ড খণ্ড কর তা'রে, চূর্ণ করি যাও সেই পাপে
তব পথধূলি সনে মিশাইয়া ধূলিসম করি'।

তৃণদণ্ডের মতো ভয়ে মরি,
গগন ভরিয়া তুলি ঘনঘন আর্ত্ত হাহাকারে,
মানি না সান্ত্বনা, যবে শান্তি নামে বিস্মৃতি-আকারে
তারে অপমান করি। ভাবি মনে, বিরোধের শিখা
চিরদিন জ্বালাইয়া, পরাজয়-কালিমার লিখা
মুছি' লব নিজ অঙ্গ হতে।
সহসা তোমার পথে
শুনি জয়ধ্বনি।
আঁখি তুলি' চাহি ত্রাস গণি,'
তখন বিরোধ জ্বালা নিবে—
হেরি, তব জ্যোতির্ম্ময় রথশীর্ষ ঠেকেছে ত্রিদিবে,
তব ধ্বজ-পতাকার 'পরে
আমারই আপন নাম জ্বলজ্বল অনল-অক্ষরে।

জয়ন্ত

শ্রী গোপাল হালদার

রাস্তার উপরে একটা মোটর-গাড়ি থামিবার শব্দ অবশ্যি কানে গিছ্‌ল ; কিন্তু আমি তা ভালো ক'রে শুনি নি। খবরের কাগজের উপরেই ঝুঁকে ছিলুম। জুতার শব্দে বুঝ্‌লুম কেউ দেখা কর্‌তে আস্‌ছে। মুখ তুলে বস্‌লুম।

ঘরে ঢুক্‌ল এক অচেনা পাঞ্জাবী। আমি একবার অবাক্ হ'য়ে তাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,

"কেয়া মাংতা ?"

"হো-হো-হো !" আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। এ হাসি ত আমি পূর্ব্বেও শুনেছি—সরল-প্রাণ খোলা। অপ্রতিভ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখ্‌লুম কৌতুকে তার চোখ দু'টি হাস্‌ছে।

"পছন্তা নেই ?"—গলার স্বরও যেন চেনা-চেনা !

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বল্‌লুম,

"জয়ন্ত !!!"

"হা। তবু যাক্, চিন্‌তে পার্‌লে হে।"

"বসো। কি ক'রেই বা চিন্‌ব ? যে পোষাক ! তার উপরে দেখা নেই কত বছর। ক' বছর হে ? চার বছর ?"

"এই প্রায় পাঁচ বছর। সেই বি-এ, এগ্‌জামিন্ দেওয়ার সময় নভেম্বর মাসে কলেজ ছেড়ে দিই। তা, সুরেন্, তোমরা কেমন আছ ? কর্‌ছ ত ওকালতি, সে খবর-ও রাখি।"

"একরকম দিন চ'লে যাচ্ছে। তা তুমি ? তুমি কর্‌ছ কি ?"

"আমি কর্‌ছি কি ? আমি কি কোনো কালে কিছু কর্‌তুম নাকি, যে এখন কি কর্‌ছি তা জিজ্ঞাস্‌ কর্‌ছ ?"

"আরে দিন যাচ্ছে কি ক'রে ? একটা কিছু ত কর্‌ছ ?"

"হাঁ, দিন বড় তাড়াতাড়িই যাচ্ছে। আর আমারও কাজের অন্ত নেই। তা সে কাজ জান্‌লেও তোমাদের ভালো লাগবে না। তুমি কেমন আছ ? বিয়ে ত করেছ ? ছেলে-পুলে ?"

“হ্যাঁ, একটি ছোট খোকা আছে।”

“কেমন হ’য়েছে? বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট? রোগাটে নয় ত?”

“না, বেশ সুস্থই হ’বে ব’লে মনে হচ্ছে।”

“মা কেমন আছেন?”

“মা মারা গেছেন ভাই, এই দেড় বছর।”

“আর সব? ভাই-বোন্‌রা কে-কেমন আছে?”

“ভালোই, ছোট ভাইটি এবার বি-এ ক্লাশে। কমলার বিয়ে হ’য়েছে। মাস চারেক হ’ল একটি ছেলে হ’য়েছে।”

“কেমন হ’য়েছে দেখ্‌তে? কার মতন?”

“বেশ সুন্দর। কমলার মতনই হবে।”

জয়ন্ত একটু উন্মনা হ’য়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বল্‌লুম, “কোথা থেকে আস্‌ছ এমন হঠাৎ?”

“বর্ত্তমানে পাঞ্জাব থেকে।”

“সেখানেই ছিলে এতদিন?”

“হ্যাঁ, ছিলুম কিছুদিন।”

“কি কর্‌ছিলে? না, সে তো বল্‌বেই না। না-ই বল্‌লে। তা একেবারে পাঞ্জাবী হ’য়ে গেছ যে? এ পোষাক কেন?”

“শুন্‌বে যখন, শোনো। একজন পাঞ্জাবী জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী হ’য়েছিলুম। তাই পোষাকটাও তারই সখ-মাফিক্।—এখন বন্ধু-বান্ধবরা আর কে কেমন আছে?”

জয়ন্ত তন্ন-তন্ন ক’রে সকলের খবর জিজ্ঞাসা কর্‌লে। কিছুক্ষণ শুন্‌তে শুন্‌তে সে একবার হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে বল্‌লে, “দুটো পঁয়তাল্লিশ। চল্‌লুম ভাই, আর বস্‌তে পার্‌লুম না।”

“সেকি! আমার এখানে থাক্‌বে না? বাঃ! আমি যে ভাব্‌ছিলুম, আমার এখানে দিন কয়েক থাক্‌বে? পাঁচ বছর পরে দেখা, তা এম্‌নি পাঁচ মিনিট? বাড়ীর ওদের সঙ্গেও দেখা কর্‌বে না? কমলার সঙ্গে?—একবার সবার সঙ্গে দেখা কর্‌তেই হবে।”

“মাফ করো ভাই, মুনিব চ’টে যাবে। তিনটের সময় তার সঙ্গে বেরুতে হ’বে। আর তার সঙ্গে ত আমার চব্বিশ ঘণ্টাই কাটাতে হয়। তোমার এখানে উঠি কি ক’রে, বলো না?”

“কোথায় উঠেছ?”

জয়ন্ত একটা প্রসিদ্ধ বিলিতী হোটেলের নাম কর্‌লে। বল্‌লুম, “তা আছ তো ক’দিন?”

“হাঁ, বোধ হয় ক’দিন আছি।”

“তবে আবার দেখা কোরো। কর্‌বে? কবে কর্‌বে?”

“দেখা হ’বে কি না জানিনে; তবে আবার খবর পাবে।”

আমি তাকে দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলুম। পথের উল্টাদিকে গিয়ে জয়ন্ত ‘ট্যাক্সি’ ব’লে ডাক দিলে। এক-খানা ট্যাক্সি এল; জয়ন্ত চ’ড়ে বস্‌ল। অস্পষ্ট শুন্‌লুম, ‘বড় বাজার’।

হঠাৎ একদিন একতাড়া কাগজ এসে পৌছাল। ভাব্‌লুম, কোনো বিজ্ঞাপন হ’বে। খুল্‌তেই ছোট্ট একটি কাগজের টুক্‌রো মেঝেয় প’ড়ে গেল। তুলে নিয়ে পড়্‌লুম; ইংরেজীতে লেখা ছিল—

“মহাশয়, আপনার বন্ধু জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দিন পূর্ব্বে একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ মত এই লেখাগুলি আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। ইতি—”

চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল না, তারিখও ছিল না; কোথা-থেকে লেখা তাও বুঝ্‌লুম না।

আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে কাগজের ভাঁজ খুলে পড়্‌তে লাগ্‌লুম।—

“সপ্তদশ জন্মদিন, বাড়ী।

কাল রাত্রিতে বহুক্ষণ কবিতা প’ড়ে প’ড়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন কে যেন টান্‌লে। ধীরে ধীরে একটু একটু ক’রে চল্‌তে লাগ্‌লুম। সাম্‌নের মাঠটা থেকে অবাধ হাওয়া ছুটে আস্‌ছিল। আমি মাঠের ঠিক সীমানা-টিতে গিয়ে দাঁড়ালুম।—কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম [illegible] বোধ হয় অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে [illegible] তাকালুম। অন্ধকার হ’চ্ছে। কোথাও [illegible] আকাশের গায় [illegible]

ক'রে দেখ্‌ছিলুম। ওই সন্ধ্যাতারা মজ্জমান—ওই মঙ্গল, ···ওই সপ্তর্ষিমণ্ডল,···ওই Orion,···ওই Great Bear, আরো কত লক্ষ-লক্ষ! কোটি-কোটি! ওই একটা··· দেখা-যায়-কি-না-যায়!···খুব লক্ষ্য কর্‌লুম···তারই পাশে আরেকটা না?···কত ক্ষীণ এর রশ্মি!···কত নক্ষত্র আছে এরকম!···আবার এরই এক-একটা সূর্য্যের মত! ···এদের পাশে কি সৌর-জগৎ নেই?··ওঃ! কত সৌর-জগৎ তা হ'লে···আর কত প্রাণী বুকে নিয়ে চলেছে সে-সব পৃথিবীরা···লক্ষ! কোটি! অগণ্য! অসংখ্য! সৃষ্টি কি বিশাল! কি বিরাট্! জীবন এত প্রকাণ্ড এত বিশাল! প্রাণ এমন বিচিত্র, এমন বিরাট্!···

ক্ষণিকের মধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বজ্রের বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। মনে হ'ল, আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে, আমি আর কিছু দেখ্‌ছিনে। পায়ের তলার মাটীর উপর বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালুম; তারপর মুখ ফিরে তাড়াতাড়ি পা ফেলে ঘরে ফি'রে এলুম।

আজ সকাল থেকে মনে হচ্ছে, আমি কাল রাত্রিতে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।···সকাল বেলার উজ্জ্বল আকাশ যেন হাস্‌ছে; বল্‌ছে, 'ঠিক শুনেছ'; শীতল বাতাস যেন বল্‌ছে, 'চলো!'

চল্‌ব?···হাঁ, চল্‌ব।"

"তিন মাস পর, বাড়ী।

বৌদি বল্‌ছিলেন, কোথা যাবে?

আমি খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বল্‌লুম, 'কলকাতা।'

'কেন? এখানকার কলেজেই তো কত ছেলে পড়ে। বাড়ী থেকে পড়ার চেয়ে কি মেসের খাওয়া খেয়ে পড়া ভালো?'

'তোমরা ত আমাকে মানুষই হ'তে দেবে না। তোমাদের থেকে দূরে না গেলে আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।' !!!

'কেন? আ... মরা তোমার কোন্ কাজে বাধা দিই? কি অসুবিধা কর... ...কিছু কর্‌তে পারি না।' ...কি ক'রেই বা চিন্...

'আমার কিছু অসুবিধা নেই, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।···সত্যি বল্‌ছি, অমন মুখখানা ব্যাজার ক'রে থেকো না, কান্না জোর ক'রে চেপে রাখ্‌বার জন্যে অমন চেষ্টাও কোরো না।···তোমরা আমায় বেশী সুবিধা ও আদর দিয়েই নষ্ট কর্‌ছ। আমাকে ছোট ছেলেটি ক'রে রাখ্‌ছ; মানুষ হ'তে দাও।"

দেখ্‌ছিলুম, বৌদির চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ছে।—

হঠাৎ হেসে বল্‌লুম, 'হয়েছে, হয়েছে। আমি যাবো না। দেখাচ্ছিলুম একবার কথাটা পেড়ে, এই পর্য্যন্ত।'

'না, তুমি কলকাতাই যাও। এখানে ভালো পড়া হ'বে না। তোমার কলকাতা যাওয়াই ঠিক। আমি তোমার দাদাকেও তাই বল্‌ব।'

আমি বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লুম; কিন্তু বৌদি তবু বল্‌লেন, 'না, তোমার কলকাতায় পড়াই ভালো। সেখানে ভালো পড়া হয়।'

···মা মারা যাওয়ার পর থেকে বৌদিই আমায় দেখে-শুনে আস্‌ছিলেন।···"

"এক বছর পর, কলকাতা।

কাল সোমবার গেছে; আমার ক্লাশ ছিল না। ট্রামের টিকেট কি'নে উ'ঠে পড়্‌লুম। ডালহৌসী স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম···ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, গাড়ী,··· কারো নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই...চলেছে···এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই।···সব বিদেশী। ক'জন আছে বাঙালী? আমরা সবাই কেরাণী, কলম পিশি।···ছুটিনে···চলিনে ···এক পাও না। জীবনকে আমরা চিনিই না।—কিন্তু তাই ব'লে কি এমনি আমাদের লু'ঠে নেবে, হটিয়ে দেবে, শুকিয়ে মার্‌বে? শয়তানের দল! এরাই তো আমাদের জীবন থেকে বঞ্চিত কর্‌ছে। এদের যদি একবার গোষ্ঠী শুদ্ধ তাড়াতে পার্‌তুম!

পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে ফি'রে তাকালুম। দ্রুতপদে একজন সাহেব চ'লে গেল। আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। লাফিয়ে তাকে ধর্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু থেমে গেলুম। দেখ্‌লুম, সাহেব কাজের তাড়ায় ছুটেছে, আর আমি মত দাঁড়িয়ে কুঁড়ের

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জন-প্রবাহ ঠে'লে ঠে'লে এগুতে লাগ্‌লুম। ব্যাঙ্কের দুয়ারে দুয়ারে শুন্‌লুম, 'লাখ' 'দুলাখ!' শেয়ারের বাজারে ঢুকে অলস নেত্রে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম··· 'কম্‌তি গিয়া,' 'কম্‌তি গিয়া,' 'দু আনা কম্‌তি গিয়া' ব'লে একদল মাড়োয়াড়ী চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।···আমি কিছুই বুঝ্‌ছিলুম না; শুধু দেখ্‌ছিলুম;···ঐশ্বর্য্য···বৈভব ···জীবন শক্তির ফেনা!···কিন্তু জীবন?···তার খোঁজ এরা পায়নি।

ধীরে ধীরে ফি'রে এলুম। কলকাতায় জীবন কোথা?

"তিন মাস পর, কলকাতা।

হাঁ, জীবনের একটা জোয়ার এসেছিল সে-দিন ফরাসী দেশে! কি সময়টাই না গেছে! সেদিন প্রলয়ের বাঁশী বেজেছিল! 'Liberty,' 'Equality', 'Fraternity'— সেদিনকার জীবনের জয়-যাত্রার তূর্য্য-ধ্বনি!

আঃ, আমি যদি সেদিন জন্মাতুম, সেই বিপ্লবের দাবানলের মধ্যে! জীবন তা হ'লে জীবনের মত ক'রে নিতে পার্‌তুম! দীর্ঘকালের তফাৎ থেকে মনে হচ্ছে, আমি যেন এখনো আমার শিরায় তাঁদের দুর্দ্দম উচ্ছৃঙ্খলতার কিছুটা বয়ে নিয়ে চলেছি। Marat, Danton, Robespeirre···তাঁদের ক্রূর নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে শক্তিমান, দুৰ্দ্ধর্ষ, রণোন্মত্ত প্রাণ আছে, আমি ত তারই পূজারী, তারই অভিসারে ফির্‌ছি। জীবন··· অবাধ, বিরাট্;···প্রাণ···চঞ্চল, উদ্বেল, বিশ্ব-বিজয়ী;··· কোথায় পাব তাকে?

হয় না? এই দূর পূর্ব্ব দেশে তেম্‌নিতর একটা বিদ্রোহ ফুটিয়ে তোলা যায় না?

বোধ হয় যায় না। এ দেশের বিদ্রোহীরা হন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, নানক। জীবনকে তাঁরা এড়িয়ে যান্‌নি, সত্য; কিন্তু জড়িয়েও ধরেননি। জীবনের সমাপ্তি-সীমায় তাঁদের দৃষ্টি বদ্ধ ছিল; সেই জ্ঞানোন্মেষের দিন থেকে এঁরা 'তমসঃ পরস্তাৎ'এর জন্যে সাধনা করেছেন। এঁরা খুঁজেছেন মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ, শান্তি। বৃহিরেখাকে এঁরা চান্‌নি, উদ্দামতাকে এঁরা খোঁজেননি।

একবার সম্ভব হয় না,—একটা বিদ্রোহ? বহুশতাব্দী সুপ্তি-মগ্ন প্রাণ কি একটা অগ্নিস্রাব ছড়িয়ে বিজয়-যাত্রায় বেরুতে পারে না?"

"দু' বছর পর, কলকাতা।

বৌদি লিখেছিলেন, 'তুমি পড়ো না পড়ো বাড়ী এসো।—আমি তোমার জন্যে কনে ঠিক করেছি। ও বাড়ীর সুভা। আশা করি সুভাকে তোমার অপছন্দ হ'বে না।—বাড়ী এসো, বাড়ী এসো। ইত্যাদি।'

আমি লিখে দিয়েছি 'সুভাকে আমার অপছন্দ হয়-নি। কেননা, আমি বিয়েই এখন কর্‌ছিনে। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক।···হাঁ, বাড়ী আসার কথা। বাড়ী ছাড়া আর কোন্ চুলোয় যাব? আস্‌ব শীঘ্রই। তবে সম্প্রতি কতকগুলি কাজ নিয়ে ঠে'কে পড়েছি। কাজ শেষ হ'লেই আস্‌ব। তুমি কিছু ভেবো না।'

কাপ্তেনের সঙ্গে কালই সব ঠিক ক'রে আসা গেছে; আজ রাত্রি ১০টার সময় যেতে হ'বে। তারপর···আজ সকাল থেকেই সকলের সঙ্গে দেখা কর্‌ছিলুম। দুপুরে গেছ্‌লুম সুরেনদের বাড়ীতে দেখা কর্‌তে। সুরেনটা দেখ্‌লুম তখনো কলেজ থেকে ফেরেনি। সুরেনের মা আমায় নিয়ে কথা বল্‌তে ব'সে গেলেন। বল্‌লেন, 'তুমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছ?'

আমি বল্‌লুম, 'দিচ্ছি না, দিয়েছি।'

'ছিঃ! এমন দুর্বুদ্ধি তোমার! দু'মাস যে মাত্র বাকী আর টেষ্ট্ পরীক্ষার। যাও, এ দু' মাস আর এসব পাগ্‌লামো কোরো না।'

আমি হেসে বল্‌লুম, 'কলেজ আমার পোষাল না।' তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন। আমি যতই বোঝাচ্ছিলুম, কলেজে জীবন নেই, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, তিনি ততই বল্‌ছিলেন, এ-ক'টি মাসের জন্যে আমার বি-এ পরীক্ষা না দেওয়া নিতান্তই অন্যায়, মতিচ্ছন্নের চিহ্ন। অগত্যা আমি কথাটা বদ্‌লে নিলুম, জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'শুনেছি, পরীক্ষার পর সুরেনের বিয়ে হ'চ্ছে। কোথাও সম্বন্ধ ঠিক হ'ল নাকি?'

তিনি সুরেনের সম্বন্ধের কথা বল্‌তে বস্‌লেন; আর সব কথা চাপা প'ড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন এল। আমরা তার পড়ার ঘরে গিয়ে গল্প সুরু কর্‌লুম। সুরেন্‌কে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লুম, সত্যিসত্যি আমার সময় নেই, এবং কলেজের পড়া নিতান্তই প্রাণহীন,—জীবনটা খালি রয়ে যাচ্ছে; অতএব একটা-কিছু করা নিতান্তই প্রয়োজন। সে আমার কথা বুঝ্‌তে চাইল না, অথবা বুঝ্‌ল না।

সুরেনের বোন্ কমলা ইস্কুল থেকে ফিরে তার দাদার ও আমার জল খাবার নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল; আমায় বল্‌ল, 'জয়ন্ত-বাবু, শুন্‌ছি আপনি নাকি কলেজ ছেড়ে দিলেন?'

আমি বল্‌লুম, 'সেরেছে! তুমিও আরম্ভ কর্‌লে? কথাটা কি এতই গুরুতর এবং এতই অসম্ভব যে, সবাই আমাকে এই এক কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?'

'গুরুতর নয় আবার? এ রীতিমত ক্ষ্যাপামি।' ভাই-বোন দু-জনে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌ল। আমি বেগতিক দেখে খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লুম।

অনেক কথা, অনেক বিষয়ে। সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছিল। আলো নিয়ে কমলা ঘরে ঢুক্‌ল। আমি দেখ্‌লুম, আর দেরী করা চলে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্‌লুম, 'চল্‌লুম, ভাই।'

'আরে এখনি কি? বসোই না। সবে সন্ধ্যা যে?'

'না, আজ একটু কাজ আছে। সকাল সকালই ফির্‌তে হবে।'

'কি কাজটা শুনি? পড়া-শুনা তো ছেড়ে দিয়েছ,তোমার মেসের ছেলেরা বলছিল, সকাল সন্ধ্যা তুমি মেসেও থাক না। কখনো দুপুর রোদ্দুরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে খেয়ে আবার তখনি বেরিয়ে যাও;—হয়ত সেই রাত বারোটায় ট্যাক্সি থেকে নেমে ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে শুয়ে থাক।—এত কি কাজ তোমার? তুমি কর্‌ছ কি!'

'কর্‌ব আর কি হে?—going the way of all flesh,' ব'লে তার কাঁধে একটা চড় দিয়ে বল্‌লুম, 'বোহিমিয়ান্ জীবনের এপ্রেন্টিস্‌শিপ্ কর্‌ছি।'

সুরেন বল্‌লে, 'সে-সব হ'বে না। বসো; আজ যেতে পাবে না।'

আমি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লুম, 'না, ভাই মাফ কর। ঘণ্টা দুই পরে আমায় একটা জায়গায় যেতে হ'বে।—বেশ দূরের পথ। সকাল-সকাল মেসে ফি'রে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নেব।'

'কোথায় যাবে? বাড়ী?'

আমি অন্যদিকে তাকিয়েই বল্‌লুম, 'হাঁ।'

'জয়ন্ত? তুমি সত্য কথা বল্‌ছ না।'

আমি মুখ নীচু ক'রে থেকে আস্তে-আস্তে বল্‌লুম, 'বলতে পারিনে, হয়ত তোমাদের সঙ্গে শীঘ্র আর দেখা হবে না।' ভাই-বোন এক সঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌ল।

'আমার কথা রাখো, জয়ন্ত, বাড়ী যাও।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

'সত্যি বল্‌ছি, জয়ন্ত-বাবু, আমাদের মিনতি রাখুন; বাড়ী যান। আপনার বৌদি না জানি আপনার জন্যে কতই ভাব্‌ছেন। আপনি কি তা একবার নিজে ভেবে দেখ্‌ছেন? না, আপনি বড়ই স্বার্থপর। আপনার হিতাহিতে যে আর কারো সম্পর্ক আছে আপনি তা ভাব্‌তেই পারেন না। আপনি এখানটায় অন্ধ।'

আমি মুখ তুল্‌লুম,—লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে কিছু বোঝা গেল না; মনে হ'ল,ভাই-বোন্ দু'জনার মুখেই যেন একটা ব্যথা ফুটে উঠ্‌ছে।

'ভালো লোক নিয়ে পড়েছি! একটা সাধারণ ঠাট্টাকে এরা কি ক'রে তুল্‌লে', ব'লে আমি হেসে উঠ্‌লুম। কিন্তু দেখ্‌লুম, তাদের দু'জনার একজনাও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌লে না। আমি সুরেনের হাত ধ'রে টেনে বল্‌লুম, 'চলো, মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।'

তারা দু'জন আমার পিছনে পিছনে চল্‌ল। প্রণাম করে মাকে বললুম, 'যাই এখন।'

'যাই-না, আসি। হাঁ, শীঘ্রই এসো আবার। কবে আস্‌বে? কালই?' আমি হেসে বল্‌লুম, 'দেখি কবে পারি।'

'দেখি কবে নয়; কালই আস্‌তে হবে আবার। এসো'।

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চল্‌লুম। কানে কেবলই বাজ্‌ছিল, 'যাই-না, আসি।'

দুয়ার পর্য্যন্ত সুরেন ও কমলা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'মার কথা মনে রেখো। এসো কালই।'

'মনে থাক্‌বে। কিন্তু এত শীঘ্রই আস্‌তে পার্‌ব না।'

পিছন ফিরে চল্‌লুম। বুঝ্‌লুম, পিছনে দুই জোড়া উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল চক্ষু এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

মেসের রাস্তার মোড়ে দেখ্‌লুম, একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্‌নে এগিয়ে একটা কথা বল্‌লে। আমি হাত পাত্‌লুম, বল্‌লুম, 'দাও'। সে একখানি ভারি খাম দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নোট ক'খানা পকেটে পুরে চিঠিখানা প'ড়ে বল্‌লুম, 'তুমি যাও ; বলো, সব ঠিক মত চল্‌ছে।'

কাল সকালে তারা আস্‌বে। দেখ্‌বে পাখী পালিয়েছে।

মেসে ফিরে দেখলুম বৌদির চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন, 'লক্ষ্মী-মণি, শীঘ্র এসো। আমি অন্য কনে ঠিক করেছি। কলকাতার ৵...এর মেয়ে ; নাম কমলা, ইস্কুলে পড়ে। মেয়ের মা একজন আত্মীয় দিয়ে গোপনে আমার কাছে সম্বন্ধ তুলেছেন। আর কেউ জানে না এখনো।... তুমি বোধ হয় মেয়েটির ভাইএর সঙ্গে পড়। তুমি বাড়ী এসো। আমার মিনতি ভাই, বাড়ী এসো।'

চিঠিখানা হাতেই রইল ; আলো-ছায়ায় চিত্রিত কতকগুলি স্বপ্ন অতি দ্রুতগতিতে চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে চ'লে গেল। সেই ছবিগুলিতে যাদের অংশ ছিল, তাদের একজন আমি,আর জন...সুভা না কমলা ?...আর পিছনে দাঁড়িয়ে যিনি হাস্‌ছিলেন স্নেহে ও সুখে তিনি বৌদি।

একটা অতি মোলায়েম হাসিতে ঠোঁটখানা বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। শুন্‌লুম, জীবন ডাক্‌ছে,...'আগে চল্‌, আগে চল্‌।'

বৌদিকে লিখে দিলুম, 'লক্ষ্মী দিদি, আমায় মাফ করো। বৃথা চেষ্টা কোরো না ; আমার কপালের লেখা তোমার ইচ্ছা পূরোতে পার্‌বে না।...যদি পার, তুমি রাগ করো, আমায় ভুলে যেয়ো...শুধু একটা কথা,—তুমি কেঁদো না।—তোমাকে আর-একবার দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে কবে হবে জানিনে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে সব গুছিয়ে নিচ্ছি। চিঠিপত্র যা ছিল সব পুড়িয়ে ফেল্‌লুম,...বৌদির চিঠিও। সামান্য একটা পুঁটুলি নিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়্‌ছি। রাস্তার মোড়ের ডাকবাক্সে লেখা চিঠিখানা ছেড়ে দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রামে চেপে একেবারে খিদিরপুর।...কাল সকালে আমায় তারা খুঁজে ফির্‌বে, কিন্তু আমি তখন অনেক দূরে।

...প্রাণের আহ্বান শুন্‌ছি, 'স্বাগতম্‌'...

"পনের দিন পর, জাহাজে।

জীবন বটে !.. সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি,...এই কাছি টানো এই ডেক মাজো, এই কয়লা দিয়ে এসো বয়লারের কাছে এগিয়ে,... ; লস্করের জীবনে শ্রান্তি কি ক'রে আসে ?

বাংলা দেশে যদি কেউ জীবন চি'নে থাকে, জীবনকে পেয়ে থাকে, তবে সে এই চাট্‌গাঁ-এর মুসলমানেরা। যে দুর্দ্দম ভবিষ্য বাংলার স্বপ্ন আমরা দেখ্‌ছি, এরা তাকে গ'ড়ে তুলেছে। প্রণাম করি তোমায়, অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বাংলার অশান্ত জীবনের পূজারী দল, স্বাধীন বাংলার অগ্রদূতগণ !

এরা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'নসিম, তোর বাড়ী ?' আমি যথাসম্ভব বাঙাল সুরে বল্‌লুম, 'ঢাকা'।

'কিন্তু তোর কথা ত সে দেশী নয়।'

'ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে খিদিরপুর ডকেই ছিলেম ; তাই কথাটা অনেকটা কলকাতার হ'য়ে গেছে।'

'তুই জাহাজে আর কাজ করেছিস এর আগে ?...আঃ তোর হাত দুখানা বড় নরম রে...তোর বড্ডই কষ্ট হয়, না ?.. তা স'য়ে যাবে। শেষে দেখ্‌বি, কালাপানিতে না বেরিয়ে পড়্‌লে আর মন টিক্‌বে না।"

'কালাপানি !'...আমরা কি ভাবেই না জীবনকে পঙ্গু ক'রেছি। 'কালাপানি পেরোতে নেই'...রঘুনন্দন ও মাধবাচার্য্য ! ধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে এম্‌নি ক'রে জীবনকে জবাই কর্‌তে হয়, প্রাণের টুঁটি চেপে মার্‌তে হয় !

প্রশান্ত মহাসাগর !...ছেলেবেলায় ভূগোলে যখন নাম পড়্‌তুম, তখন ভুলে যেতুম আমি বাংলা দেশে ক্লাসের পড়া

তৈরী কর্‌ছি! আর আজ…আমার চোখের সাম্‌নে তোমায় দেখ্‌ছি—বুক ভ'রে নিশ্বাস নিচ্ছি। মনে হচ্ছে, যত নিতে পারি ততই লাভ! এইত জীবন…অশান্ত, সদা-চঞ্চল, সদা-হিল্লোলিত;…এইত প্রাণ…সীমা নেই, শেষ নেই,…মহান্, বিরাট্, উদার…

দূরে বহুদূরে শুন্‌তে পাচ্ছি, বিদেশের উপকূল থেকে শব্দ আস্‌ছে…মহান্ মরণের পথে অশ্রান্ত জীবনের যাত্রার জয়ধ্বনি আমায় সে মরণ-পথে নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠালে…দূর বাংলার কোল থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে এল…কে?…প্রাণ!…একম্, সর্ব্বশক্তিমান্…

রাত্রির অবসরের মধ্যে লস্করের ছিন্ন-শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি……আত্মীয়-পরিজন……বন্ধু-বান্ধব……হিতৈষী সহযোগী……কোথায়? কত দূরে?……মনে পড়ছে, সুরেন্……তার মা……তার বোন্…আর বৌদি!!……তাদের কেউ কি এই নিস্তব্ধ নিশীথে বিনিদ্রনয়নে আমার কথা ভেবে ব'সে আছে? ……কেউ ব'সে আছে?…কেন ব'সে থাক্‌বে? জীবনের চলার পথে কে কোথায় ছিট্‌কে প'ড়ে গেল—দূরে—পথের পাশে বা পঙ্কে—তার জন্যে রথ থামাতে হবে? কেন? কিন্তু তবু…তবু……বোধ হয় বৌদি এখনো ঘুমুতে পারেননি। না, তিনি পারেননি। তাঁর চোখের ঘুম আমি চিরদিনের জন্যে হরণ করেছি।…ঘুমুলেও স্বপ্নের ফাঁকে ফাঁকে আমাকেই খুঁজ্‌ছেন।…আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি, দাদা ঘুমুচ্ছেন; কিন্তু বৌদি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন……তাঁর চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে……অস্ফুট কান্না ভয়ে বেরুতে পার্‌ছে না…বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছে।…দর্‌কার না থাক্‌লেও মানুষ প্রাণের রথ আমার, একবার সহযাত্রীর জন্যে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে…কিন্তু নিতান্তই মিছামিছি…ব্যর্থ।…শুধুই কি ব্যর্থ?…

"আবার চল্‌লুম! সূর্য্যাস্ত পারের দেশ! তোমায় নমস্কার! নব-জীবনের অরুণ-ভাতি তোমারই কপালে সর্ব্বাগ্রে বিজয়-টীকা পরিয়েছিল…তার পর ফ্রান্স!—আমেরিকা! তোমার কোলে এ চার বছরের জন্যে আমার খেলার ডাক পড়েছিল। আজ আবার স্বদেশের উপকূল থেকে ডাক শুন্‌ছি…সেখান থেকে কে বল্‌ছে, 'এসো, যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে…তুমি হোতা…এসো।"

এখানকার বন্দোবস্ত কর্‌লুম।—জার্ম্মান্ দূত টাকা দিচ্ছেন, অস্ত্র-শস্ত্রও বেশ কিছু পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছেন। একবার দেশে সে-সব পৌঁছাতে পার্‌লেই হয়!…আর এই পাঞ্জাবীরা…এরা যদি একবার ঠিকমত নাম্‌তে পারে!…

এবার আর লস্কর নই। এবার পাঞ্জাবী যাত্রী, সঙ্গে করম সিংএর মা ও বোন্।

করম সিং যখন প্রথম আমার কাছে এল, আমি চম্‌কে গেলুম…জীবনের একটা জ্বলন্ত ফুল্‌কি…দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, তরুণ যুবক,…তার চোখ দু'টাতে মাঝে মাঝে এক-একটি আগুনের হল্‌কা খেলে যাচ্ছে।…আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'ভাই পার্‌বে?'

সে একবার মাথাটি তু'লে বল্‌লে, 'গুরুর ইচ্ছা।'

আমি বললুম, 'না, থাক্। তোমার জীবন এখনো কাঁচা।'

'দাদা, মনে রেখো, আমরা বংশানুক্রমে খালসা-দলে যোগ দিয়ে আস্‌ছি—গুরুর আশীর্ব্বাদে আমরা পঁয়ত্রিশের বেশী কেউ বাঁচিনে…আর অস্ত্রে ছাড়া মরিনে; আমাকে আমাদের বংশের উপযুক্ত হ'তে দাও।'

করম সিং চ'লে গেছে। এতক্ষণে সে লাহোরে বা অমৃতসরে। মা ও বোন্‌কে আমার জিম্মায় রেখে গেছে। আমিই তাঁদের স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছি…মা হয়ত গিয়ে দেখ্‌বেন, ছেলে নেই; বোন্ হয়ত দেখ্‌বে তার দাদা ইহজন্মের মত পালিয়েছে! হয়ত এতক্ষণে সে লাহোরের পুলিশের জিম্মায়, হয়ত আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে!……কিন্তু তবু তাঁরা চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌বেন না, বুক চাপ্‌ড়াবেন না,…হয়ত গুরুর পায়ে দুফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বেন…কিন্তু বল্‌বেন, তাঁর ছেলে ছিল—ছেলের মত ছেলে।

বাংলায় ফেরা আমার অদৃষ্টে নেই। তার ঘাটে-ঘাটে সরকারের দূত আমার জন্যে হানা দিয়ে আছে। এই জাহাজ বোম্বাই যাচ্ছে। সেখান থেকে করাচী দিয়ে পাঞ্জাবে প্রথম।—করম সিংএর মা ও বোন্‌কে পৌঁছিয়ে দেবো। তারপর লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর,

কাশী, এলাহাবাদ, কলকাতা দিয়ে আসামের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত আমায় ছুটতে হবে।…এতদিন জীবনের ঠাঁই জলে সাঁতার কাট্‌ছিলুম; এবার অকূল সমুদ্রে ভাস্‌তে হবে!

তবু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কিছুই হ'বে না…

কিন্তু, ভাস্‌তেই হবে…আমি বেশ জানি ডুবব;… তবু…অতল সমুদ্র ডাক্‌ছে…

করম সিংএর মাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে একমাস তাদেরই সঙ্গে কাটালুম। করম সিং ঘুরছে পাঞ্জাবের গাঁয়ে গাঁয়ে; আমার কাজের সীমানা পড়েছে এই লাহোর সহরে!— একটা বড় দরের কেন্দ্রের ভার আমার উপরে।—তাই এঁদের সঙ্গেই এখানে রয়েছি। অফুরন্ত কাজের অবসরে যখনি ফিরছি, তখনি দেখছি, মা ব'সে আছেন, মেয়ে সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়! আমি কে তাঁদের?…বিদেশী বাঙালী…যে তাঁর আপনার জনকে ছিনিয়ে নিয়েছে…মৃত্যুর পথে সহযাত্রী করার জন্যে!… কেই বা না? আমি তাঁদের ছেলে, আমি তাঁদের ভাই! …কি স্নেহ! কি মমতা! আমার বৌদিকে মনে প'ড়ে গেল…কলকাতাতে শীঘ্রই কাজে যেতে হ'বে—টাকা সংগ্রহের একটা উপায় দেখ্‌তে হবে—একবার…একবার বৌদিকে দেখে আসা যায় না?…আর সুরেন, তার মা, তাদের সবাইকে?

একটা কথার মীমাংসা এখনো করতে পারছিনে। জীবনের দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল গতির সঙ্গে অন্তরের কোমল দিকটার কি চির-বিচ্ছেদ? না, তাদেরও একটা যোগাযোগ আছে। প্রাণ কি স্নেহ ও মমতাকে ত্যাগ ক'রে বিরাট, হিয়া-দুরু-দুরুকে বর্জ্জন ক'রে সংক্ষুব্ধ, ছোট হৃদয়ের ছোট কথাকে ছেড়ে দিয়ে ভূমা?

শিখ-বন্ধু বল্‌ছিলেন, 'আপনি বিয়ে করুন।'

আমি হেসে বললুম, 'কেন বলুন ত?'

'কাজে বেশী উৎসাহ পাবেন।—তেম্‌নিতর পাত্রী আমি পেয়েছি।'

'কোথা?'

'যেখানেই হোক্‌, বলুন বিয়ে করবেন আর শিখ মেয়ে?'

'আপত্তি কি? কিন্তু কোথায় সে, তাকি শুন্‌তে পারি?'

'আপনি করম সিংএর বোন্‌কে বিয়ে করুন।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। অনেক কথা মনে পড়ছিল। সব ঝেঁকে ফেলে বললুম, 'ভাই, আজ রাত্রে আমি কলকাতা যাচ্ছি। পাঞ্জাবের বন্দোবস্ত ঠিক রাখ্‌তে পারবে ত?'

'আজ রাত্রে কেন? আপনার ত দিন সাতেক পরে যাওয়ার কথা?'

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'ওটা রটানো গেছে যেন কলকাতায় খবর পৌঁছালেও ভুল খবর পৌঁছয়। সেখানকার বন্দোবস্ত ঠিক না করতে যেন ষ্টেশনেই ধরা পড়িনে।'

বন্ধু বুদ্ধির তারিফ কর্‌ছিলেন। আমি চ'লে গেলুম। বাড়ী ফিরে মাকে বললুম, 'আমি চললুম, মাইয়া।'

'কবে, কোথা?'

'আজ রাত্রে, কলকাতা।'

মার মুখটি গম্ভীর হ'য়ে গেল। একবার বল্‌লেন না, 'না'; একবার বল্‌লেন না, 'কবে ফিরবে?'—আমার মা বটে! বোন্‌কে বললুম, 'চললুম, বহিন্‌!'

সে মুখ তুলে তাকালে, নীরবে আমার পদধূলি নিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে রইল। আমি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করতে করতে ভাবলুম, 'কোথা যাবো? কেন যাবো? ব'লে ফেলি যাবো না'…

দ্রুতপদে বেরিয়ে এলুম।…

"বাংলার বন্দোবস্ত ঠিক করেছি। পথেই খবরের কাগজে দু'একটা খবর পাচ্ছিলুম—'মোটর ডাকাতি,' 'বিশ হাজার টাকা লুঠ' ইত্যাদি।—টাকা চাই।—এত বড় কাজে টাকা চাই।…এইখানেই বৈভবের সার্থকতা… সে যদি প্রাণ-প্রবাহকে রোধ করে, শুকিয়ে মারতে চায়, —তবে সে নেহাৎই ঘৃণ্য হ'য়ে উঠে। নইলে ঐশ্বর্য্য! প্রাণের পায়ের ধূলি!

বৌদির সঙ্গে দেখা হ'ল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে আমি বাড়ী ঢুকলুম। দেখলুম, কেউ নেই; কেবল দাদার শোবার ঘরে একটি লণ্ঠন জ্বলছে। আস্তে আস্তে

ঘরে ঢুক্‌লুম, দেখ্‌লুম খাটের উপর কে শুয়ে। ম্লান আলোকে একটু চম্‌কে চাইলুম, পরক্ষণেই চিন্‌লুম। পায়ের উপরে মাথা ঠেকাতেই চোখ মেলে তাকালেন,—অবাক্, নিস্পন্দ চোখে চেয়ে রইলেন। আমার চোখে জল আস্‌ছিল, তাড়াতাড়ি হাসি টেনে বল্‌লুম, 'বৌদি, আমি এসেছি।' 'এঁ্যা'— ব'লে তিনি অতি ব্যগ্রতার সঙ্গে উঠ্‌তে গেলেন, পার্‌লেন না,—আবার শুয়ে পড়লেন।

আমি পায়ের জুতো ছেড়ে খাটের উপরে উঠে বস্‌লুম।...

দাদা বল্‌ছিলেন, 'দেখ্, কথা শোন্, তুই সব দোষ স্বীকার কর্ ; এসব ছেড়ে-ছুড়ে দে, বাড়ীতে যা-কিছু আছে দেখ্-শোন্।'

আমি বল্‌লুম, 'সেই রকমই ভাব্‌ছি।—তবে হৈ চৈ কোরো না।—পুলিশে যেন না জানে। আমি একটু সমস্ত অবস্থাটা বেশ ক'রে তলিয়ে ভেবে নিই।'

'তা ভাব্। আর ভাববারই বা কি আছে?' ইত্যাদি

বৌদির পায়ের তলায় ব'সে ছিলুম। বৌদি বল্‌লেন, 'ঠাকুর পো, লক্ষ্মী ভাই, কোথা?'

'এই যে এখানে।'

'কাছে এসো—মুখের সাম্‌নে—আরেকটুকু এগিয়ে।... দেখি, ভাই, হাতখানা...আঃ, কি হ'য়ে গেছে হাত...'

আমি নীরবে ব'সে রইলুম। বৌদি আস্তে-আস্তে আমার হাতখানা তাঁর জ্বর-তপ্ত কপালের উপর রাখ্‌লেন। তাঁর চোখ বুজে এল,—মুখ দিয়ে বেরুল, 'আঃ'। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

'ঠাকুর-পো, ভাই, এবার আর আমাদের ছেড়ে যাবে না?'

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

'কি, কথা কওনা যে? বলো, যাবে না?......' তাঁর চোখ জলে টল্ টল্ কর্‌ছে।

'না, যাবো না ;—তুমি যেতে না বল্‌লে যাব না।'

'সত্যি!' ব'লে আনন্দে তিনি আমায় চুমো খেলেন, আমার মাথাটি টেনে নিয়ে তাঁর বুকের উপর রাখ্‌লেন।...

'ঠাকুর-পো, তুমি কাঁদ্‌ছ!'...আমার গালে তাঁর হাত লেগেছিল।—আমি চুপ ক'রে রইলুম। বৌদি কাতর-উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বল্‌লেন, 'কেন, ভাই, কেন?'

'কি হবে তোমার তা শুনে? আমি যাবো না, ঠিক জেনো।'

'তোমার যাওয়ার কি এতই দর্‌কার?'

'দর্‌কার? না, দর্‌কার আর কি? বরং মোটেই দর্‌কার নেই।'

'রাগ কোরো না, ভাই, সত্যি বলো, কেন তুমি আমাদের ছেড়ে যাও, কেন তোমার বাড়ী ভালো লাগে না?'

'কেন ছেড়ে যাই'...ছাড়্‌তে পারি কই? পদে-পদে শিকলের নোতুন কড়া তৈরী হচ্ছে। তুমি বৌদি,—স্থরেন্, তার মা, তার বোন্,—দূর বিদেশে আমার বিদেশী ভাই, বিদেশী মা ও তাঁর বিদেশী মেয়ে—এক-একটি শিকলের কড়া!

বৌদি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কি ভাই, চুপ ক'রে রইলে যে? বলো খুলে সব।'

'বৌদি, তুমি বুঝ্‌বে না ; বুঝ্‌লেও, আমায় ছাড়্‌বে না।'

'তবু, বলো।'

'তোমার মুখেই শুনেছি, রূপকথার রাজপুত্রের হঠাৎ দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা জেগে উঠে,—তার কাছে তখন রাজ্য ভালো লাগে না, পাত্র-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব কিছুই তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না।—পক্ষীরাজের পিঠে তাকে সাত সমুদ্র তের-নদী ডিঙিয়ে রাক্ষস-পুরীর বন্দিনী রাজকন্যার জন্যে ছুট্‌তে হয়।'

'কিন্তু, তোমার জন্যে তো আমি কনে ঠিক করেছিলুম। সে মেয়ে অপছন্দ হ'য়েছিল, তা যে মেয়ে তোমার পছন্দ হ'ত, লিখ্‌লে না কেন?'

'এই দেখ ভুল বুঝ্‌লে। তোমাদের কনেকে আমি রাজকন্যা বলিনে। আমার রাজকন্যা কোথাও হয়ত নেই। কিন্তু, জীবন আছে...জীবন আর প্রাণ...আমি তাদেরই খুঁজ্‌ছি।'

'জীবন! প্রাণ!...সে আবার কি? বুঝ্‌লুম না।—যাক্ সে কথা! কেমন ক'রে এত দিন কাটালে'? আমি সংক্ষেপে ব'লে গেলুম।—বৌদি জান্‌তেন যে, আমার কলকাতা ছেড়ে পালানোর পরদিনই পুলিশ আমায় ধর্‌তে এসেছিল। এখানকার পুলিশের উপরেও আমাকে খুঁজে বার কর্‌বার

কুম দেওয়া হ'য়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কি তোমায় এখনো খুঁজছে?' 'তা খুঁজছে। তবে অনেকদিন খোঁজ না পেয়ে আর আমি অন্য দেশে আছি জেনে আমাকে বের করবার আশা এরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।'

'এরা জানে তুমি কোথা?'

'এখনো জানে, আমি পাঞ্জাবে। কিন্তু, দিন দুইয়ের মধ্যেই জানতে পারবে, আমি কোথায় এসেছি।'

'জানলেই, তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে?'

আমি হেসে বললুম, 'তা আর যাবে না?'

'এই সহরের পুলিশেরাও তোমায় চিনলেই ধরবে?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হাঁ?'

বৌদি বালিশের উপর ভর রেখে উঠে বললেন,'সত্যি? তবে তুমি এলে কেন?'

'একবার তোমায় দেখব বলেছিলুম, তাই।'

'না-না, তুমি যাও এখনি—এই মুহূর্ত্তে।......আমি তোমায় নাই বা দেখলুম···তবু যাও, যাও।'

'সে কি! তুমি বললে না, আমায় এখন থেকে তোমার কাছে থাকতে হ'বে?'

'না-না; আমি তখন জানতুম না।···তুমি ব'সে রয়েছ যে?'

'দেখছি,তুমি বিছানায় প'ড়ে আছ···অতি রুগ্ন···তাই ইচ্ছে আছে তোমার কাছে ক'দিন থাকব,—ক'দিন তোমার শুশ্রূষা করব।'

'আমি বিছানায় প'ড়ে—সে তো আজ এক বৎসর ধ'রে; আর অল্প ক'টি মাস যে আমার বাকী আছে।···তুমি তার জন্যে এখানে ব'সে থাকবে!···আমার চোখের উপর পুলিশ তোমায় ধ'রে নেবে! না-না, তুমি এই মুহূর্ত্তেই যাও।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

'তুমি যাও। তোমায় তারা ধ'রে নিয়ে গেলে কি আমি বেঁচে থাকব, ভাবছ? শীঘ্র যাও; আমার মরণ যদি ডেকে না আনতে চাও, তবে এখনি চ'লে যাও।'

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'যাবো।—কিন্তু, আর দু-ঘণ্টা পরে।—তখনো রাত্রি থাকবে।'

অনেক বলতে বৌদি রাজি হ'লেন।

পায়ের ধূলো মাথায় নিলুম; বৌদির চোখের জল আমার মাথায় ঝ'রে পড়ল।···সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে বাড়ী ঢুকেছিলুম, রাত্রির অন্ধকারে মিশে বাড়ী ছেড়ে এলুম!

কলকাতায় ফিরে বুঝলুম, আমার পদার্পণ এখানে অজানা নেই। ফুটপাতে চলতে চলতে বুঝলুম, পিছনে লোক, সামনে থানা। সামনের ট্যাকিসটা ধ'রে লাফ দিয়ে উঠে হুকুম দিলুম, 'রেড রোড,—জোরসে হাঁকাও।'—পিছনের চরটিকে ট্যাকসির জন্যে একটু দেরী করতে হ'ল। সে-অবসরে আমি ঝুঁকে প'ড়ে ড্রাইভারকে বললুম, 'রেড রোড নেহি যায়েঙ্গে। আবি ডান হাতি—জোরসে হাঁকাও।' পিছন ফিরে দেখলুম আরেকখানা ট্যাক্সিও ছুটে আসছে। বুঝলুম, এবার একটা বড় দরের ধাপ্পা না দিলে চলবে না। অনেক গলি ঘু'রে ঘু'রে আমি একটা মোড়ের মুখে দেখলুম একখানা খালি ট্যাক্সি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। আঁকা-বাঁকা গলি বেয়ে পিছনের ট্যাক্সি তখনো এসে পৌঁছয়নি। হয়ত আমার দেখাই তারা আর পাবে না। তবু, ট্যাক্সি থামাতে ব'লে, থামতে-না-থামতেই আমি ভাড়া চুকিয়ে দিলুম। তারপর তাড়াতাড়ি নতুন ট্যাক্সিখানায় চ'ড়ে বললুম, 'শ্যামবাজার—খুব জোরসে।'—আমায় যারা খুঁজছিল, পিছন ফিরে দেখলুম, তারা তখনো মোড় ঘোরেনি। ভাবলুম, বাঁচা গেল। তবু, আরো একটি কায়দা করা গেল। সেই পরিচিত গলিতে সুরেনের বাড়ীর সামনে পৌঁছেই সুরেনের বাড়ীর উল্টো দিকের ফুটপাতটায় নেমে প'ড়ে ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বিদেয় দিলুম। সামনের বাড়ীটার কড়া ধ'রে গুটিকয়েক নাড়া দিতে দিতে দেখলুম, ট্যাক্সিটা মোড় ঘুরে চ'লে গেল। তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে এসে সুরেনের ঘরে ঢুকলুম।

অনেককাল পরে দেখা। সুরেন ছাড়তে চায় না। সে এখন রীতিমত সংসারী। মা মারা গেছেন, সুরেনের একটি ছেলে হ'য়েছে,—কমলারও একটি ছেলে হ'য়েছে।—সকলের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল সুরেন। আমি চ'লে এলুম; গুটিকয় মিথ্যা কথা ব'লে সময়াভাবের অজুহাত

দেখালুম। জিজ্ঞাসা করেছিল, আবার কবে দেখা হ'বে। ...আবার দেখা ?...ব'লে এলুম, 'জানিনে। কিন্তু খবর পাবে।'

খবর আর কাকে দেওয়ার আছে ? খবর দেওয়ার মত সুবিধা যদি পাই, তবে তাকেই দেব। আর একজন যাঁকে দিতুম,—যাঁকে না দিলেও তিনি অন্তরে অন্তরে জান্‌তেন—তিনি ত...আমি কলকাতা থাকতেই শুনেছিলুম আমি আসার তিন দিন পরেই বৌদির জীবন ফুরিয়েছে।...করম সিংকে ব'লে রেখেছি, হঠাৎ যদি ধরা প'ড়ে যাই, তবে আমার এই ছেঁড়া পাতা ক'টা যেন সুরেনকে পাঠিয়ে দেয়।...তবেই সে খবর পাবে।... আমার জীবনের সমস্ত খবর সে পাবে।

খুব ক'রে বিস্ফোরক তৈরী করছি; এ-বিষয়টা আমেরিকায় শেখা গেছ্‌ল, এবার বেশ ভালো ক'রে সদ্ব্যবহার করতে পার।...বাংলায় টাকাটা বেশ জোগাড় হচ্ছে।...সব দিক রক্ষা পেলেই হয়...তা হ'লে দু মাসের মধ্যে কি একটা প্রকাণ্ড বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হবে! ...ওঃ! ভাবতেও আমার বুক ফুলে উঠছে!...মনে হচ্ছে, যাকে রাত্রিদিন খুঁজেছি—দেশে বিদেশে যার অভিসারে ফিরেছি—সেই জীবনের জয়-ধ্বজা দেখা যাচ্ছে...আমি যদি কবি হতুম ত এত বড় একটা 'মার্সেঈজ্' এখন লিখ্‌তে পারতুম,—এত মহান্, এত উদার, এত ব্যাপক,—যে-সমস্ত পৃথিবীর সে-জাতীয় সঙ্গীত হ'ত।... 'জীবনের জয়-গান'...'প্রাণের প্রণতি'!—উঃ! আজ পর্য্যন্ত কোনো বেদ-গান এমন গম্ভীর উদাত্ত রাগিণীতে উঠেনি কোনো সমর-সঙ্গীত এমন উদ্দীপনা জোগাতে পারেনি!...

এর পরেই আর কোনো লেখা নেই। বোধ হয় এর পর এই বিস্ফোরক নিয়ে নাড়া চাড়া করতে গিয়েই জয়ন্ত মারা গেছে।

কিন্তু এই পাতাগুলোর মধ্যে জয়ন্তের কথা যাই থাক্ বা না থাক্, এতে এমন অনেক জিনিস আছে যাতে টিক্‌টিকি পুলিশের হাতে আমি নির্য্যাতন সইতে পারি। তাই, এগুলো অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক করেছি।

মিলনী

(কবীর)

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

তুরুক সুই, আর হিন্দু সুতোয়
সেলাই হবে কাঁথা,
আঙিয়া, আর চাদর হবে
সেই সুই সুতোয় গাঁথা;
প্রেমিক যোগী যত
পরবে যে সেই বসন নিয়ে
অঙ্গে তাদের স্বত

কাপড় হবে বোনা—হিঁদু
পোড়েন, তুরুক টানা,
সেই কাপড়ে তৈরি হবে
কাঁচলি, কাঁথা নানা;
প্রেমিক যোগী যত
পরবে যে সেই সাধন-বস্ত্র
অঙ্গে নিয়ে স্বত!

তুরুক তেল, আর পল্‌তে হিঁদু,
জ্বালাতে হবে আলো,
দেব্‌-মহলের দেব্‌-আরতি,
চল্‌বে তবেই ভালো;
প্রেমিক দেবতাটি
সেই আরতি পেলেই খুসী—
সেই আরতিই খাঁটি!

'তুম্বী' তুরুক, হিন্দু সে 'তার',
দিব্যি সেতারখানি,
সুর বাজে যে সেই সেতারে
বৈরাগ-প্রেম্‌-বাণী
সেই পূর্ণ সুরের সঙ্গীতে
তৃপ্তি এল প্রেমিক স্বামীর
সারা হৃদয় মনটিতে!

আচার্য্য জগদীশ

মৌন মাটীস্তর ভেদি' যেই তৃণ উচ্চে তোলে শির,
টানিয়া মৃত্তিকা-রস পল্লবে প্রকাশে প্রাণ স্থির,
দীর্ঘ হতে দীর্ঘ হয়, পুষ্পে ফলে প্রস্ফুট-জীবন,
সে কি জড়, প্রাণহীন ? সে যে দৃপ্তিমান দুর্দ্দমন !
যে-প্রাণে বলিষ্ঠ নর, বিহঙ্গ, তপন, গ্রহদল,
সেই প্রাণ, সেই বীর্য্য, সেই বেগ উদ্ভিদে উচ্ছল,—
এ গুপ্ত প্রগূঢ় সত্য মনীষা-কিরণে তুমি, কবি,
লভিলে আপন চিত্তে, প্রকাশিলে কী বিচিত্র ছবি
শেষহীন জীবনের, এক যাহা ভিন্ন রূপে মিশি'।
তব পূর্ব্ব পিতৃগণ যেই সত্যলোভী প্রধী ঋষি
হেরিল অখণ্ড প্রাণ চরাচরে অদ্বৈত অব্যয়,
তাদেরি সন্তান তুমি চিনে নিলে সে প্রাণ দুর্জ্জয়।
হে আর্য্য, হে সত্যদ্রষ্টা, ভারতের গরিষ্ঠ সন্তান,
অন্ধ মূঢ় নর-চিত্ত তব জ্ঞানে আজি দীপ্তিমান।
আত্ম-মদ-গর্ব্ব-ঘোষী পাশ্চমের প্রচণ্ড পিনাক
সত্যসন্ধ ভারতের জ্ঞানমন্ত্রে বিজিত, নির্ব্বাক্।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
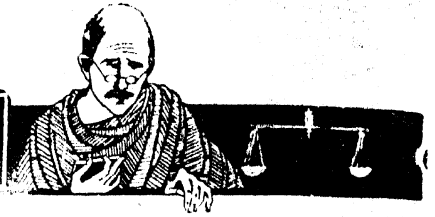
বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

ইংরিজী ১৯২১ সালের লোক-গণনার হিসেবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেক্‌বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতের আর কোনও ভাষা এত বিস্তৃত নয়।

ভারতের এক-ষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধ'রে বিচার করলে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ'চ্ছে সপ্তম। বাঙলার আগে নাম করতে হয় [১] উত্তর চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৫ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি), [৪] জার্মান (৭॥০ কোটি), [৫] স্পেনীয় ভাষা (৫॥০ কোটি), [৬] জাপানী (৫ কোটি ২০ লাখের উপর), আর [৭] বাঙলা (৪ কোটি ৯০ লক্ষ)।

বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চল্‌তি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্রসমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন কর্‌ছি, যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু ভাষার এক প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আর (যে ধারা এখন সাহিত্যে চল্‌ছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চলতে থাকলে) যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে, এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হ'ঠিয়ে দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্ব্বজন-পরিচিত মূর্ত্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্ত্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই সব মূর্ত্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা ত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব।

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখলে দু'দিকে দুটী অবধি পাই—একদিকে হ'চ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৩৩ সাল, আর এখনকার চল্‌তি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি; অপর দিকে হ'চ্ছে ঋগ্‌বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ঋগ্‌বেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির জড় গিয়ে পৌঁচেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝতে বাকি থাকে না। ঋগ্‌বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাটি পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে আদি আর্য্যভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। এই প্রায় ৩০০০ বছর ধ'রে আর্য্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটি একরকম বেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে—ইতিহাসে পুরাণে—কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির সাহিত্যে আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে; কিন্তু কালের মহিমায় আর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটি বা আংটাটি এখন আর যথাযথ একটির পর একটি ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ পরপর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ'সেনি।

এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝতে পারি। তখন দু' এক খানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বুঝতে পারি যে সাধু-ভাষা, চল্‌তি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলাভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্ব্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন লেখা হয়নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল পেরিয়ে তবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়, তার থেকে ওই দু' শ' বছরের বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারা যায়। আর ওই দু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান এইসব পুঁথি থেকেই ক'রতে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এইসব নকলে একটু-আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দ্‌লে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ' বছর পরে নকলকরা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'রত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল করবার চেষ্টা ক'রবে; আর সে ইচ্ছে থাকলেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না—তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকত না, বদলে যেত; ফলে অবশ্য ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত। কাজেই যে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া যায়। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ললেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের আগের বাঙলার স্বরূপ জানবার জন্যে পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ ১৬।১৭ বা ১৮ শ' সালের দিকে নকল-করা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪ শতকের
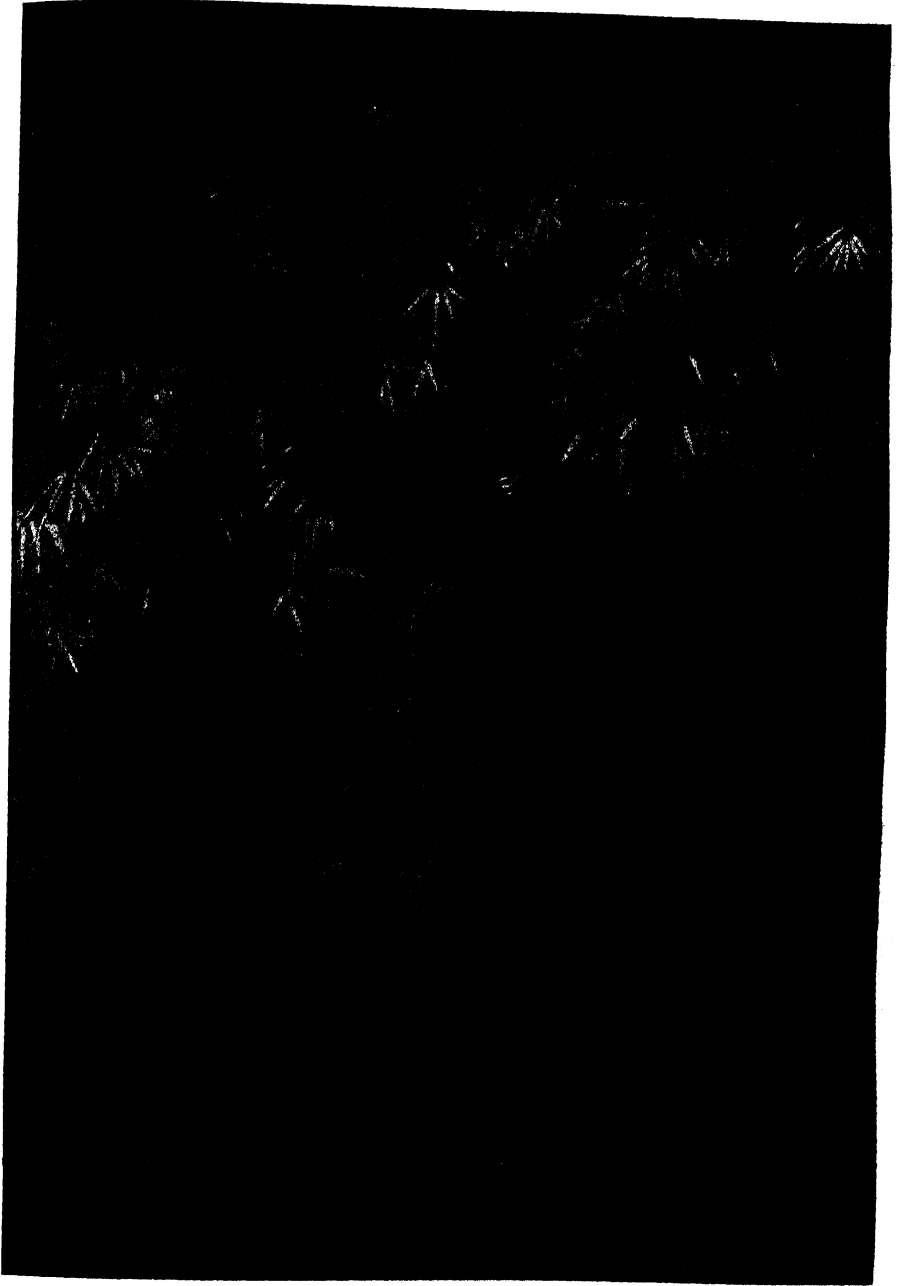
ধীবর-পত্নী

শিল্পী শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শান্তিনিকেতন)

শেষ পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তার দু' এক শ' বছর পূর্ব্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ'চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্ত্তী বিকৃত পুঁথিই এদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন।

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। তার পূর্ব্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধ্‌ত, কাব্য লিখ্‌ত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু' একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কানা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি শ্রীমন্তের কথা—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মত এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিক্‌থ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ নয়।

কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর দশেক হ'ল দু' খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যার দ্বারা আমরা ১৫ শ' খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান নিদর্শন পেয়েছি। এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্য্যাপদ। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মাত্র দু' একটার সঙ্গে এর পদের মিল পাওয়া যায়। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি, এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে।

১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম দেওয়া একখানা পুঁথি অন্য তিনখানা পুঁথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের' বিশেষ স্থান আছে—অন্য তিনখানির ভাষা বাঙলা নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয় এখানে এখন কিছু ব'ল্‌বো না। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চর্য্যা বা চর্য্যাপদ বা পদ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্‌তে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটি সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে একরকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে অন্ততঃ দেড় শ' বছর আগেকার।

খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আগে হিন্দু আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান কর্‌তেন। এই-সব দান, দলিল ক'রে দানপত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুঁদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাক্‌ত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব-চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলা দেশে যা এপর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটি হ'চ্ছে উত্তরবঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাট্ কুমার গুপ্তের সময়ের; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত, আর তার পরবর্ত্তী কালেরও অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্র-শাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর বর্ণনা কর্‌বার সময় মাঝে মাঝে দু' চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে দু-একটি উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের পিছনে জুড়ে দিয়ে' বাহ্যতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যেও তাদের প্রাকৃত রূপটাকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা কর্‌বার একটি সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। "কণামোটিকা" অর্থাৎ কিনা কানামুড়ী, "রোহিতবাড়ী" অর্থাৎ রুইবাড়ী, "নড়জোলী" অর্থাৎ নাড়াজোল, "চবটীগ্রাম" অর্থাৎ চটীগাঁ, "সাতকোপা" অর্থাৎ সাতকুপী, "হড়ীগাঙ্গ" অর্থাৎ হাড়ীগাং প্রভৃতি নাম ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃত শ্রেণীর একটি ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষায় এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে একটি বিষয় চোখে পড়ে, অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোনও আর্য্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। "অঝড়াচোবোল, দিজমক্কাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডার-বীটিজোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী" প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য্যভাষার নয়; আর "পোল বা বোল, জোটি, জোড়ী বা জোলী," "হিট্ট বা ভিট্ট," "গড্ড বা গাড্ডী," প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ; জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে দেশে অনার্য্যদের বাস অনুমান ক'র্‌লে কেউ ব'ল্‌বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য্য ভাষা তাহ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে :—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্‌বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জ্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্‌বেদে আর পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্য্যভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০র মধ্যে। এই সময় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'র্‌লে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ বইগুলিতে কিছু কিছু আভাস পাই; তা থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে পূর্ব্ব অঞ্চলে যে আর্য ভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্য্য ভাষার ভাঙন ধ'রেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব্ব দেশেই হয়। পূর্ব্ব দেশের এই প্রাচ্য ভাষায় কোনও

নিদর্শন পাইনে, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—"বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড, গিল" প্রভৃতি।

[৩] এর পর দেখি, প্রাচ্য অঞ্চলের এই ভাষা প্রাকৃত রূপ নিয়ে, দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে :—এক পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য ; আর দুই, পূর্ব্ব খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটিকে মাগধী নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্ব্বী প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটায় যে, পূর্ব্বীতে সব জায়গায় 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য'শ'-র ব্যবহার ছিল। দু' একটি ছোটো লেখে এই পূর্ব্বী প্রাচ্য বা মাগধী প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক যুগের ; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সুতনুকা-লিপি সব-চেয়ে মূল্যবান। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে, মৌর্য্যদের কালে এই পূর্ব্বী-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড় গাড়তে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্ত্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাই সংস্কৃত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে এর যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী—ধ'রে সব চুপ-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চ্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্র-শাসনের দু'একটি নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী প্রাকৃত আস্তে আস্তে বদ্‌লে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলাভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপর ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলাভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অরাজকতা অশান্তি তখন দেশব্যাপী হ'য়েছিল। পরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডী-দাসের উত্থান, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্ত্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তারপর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা দাঁড়িয়ে গেল, তখন থেকে বাঙলাভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

মাগধী প্রাকৃতের কাল থেকে চর্য্যাপদের কাল, মোটামুটি খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে একাদশ শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলাভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে ?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী প্রাকৃতের সমকালীন আর তার স্বস্থানীয় শৌরসেনী, প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তাই দেখে'। শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত ; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বৈদিক ⊳ প্রাচ্য ⊳ মাগধী প্রাকৃত ⊳ মাগধী অপভ্রংশ ⊳ প্রাচীন বাঙলা ⊳ মধ্যযুগের বাঙলা ⊳ আধুনিক বাঙলা। বাঙলাভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দুটি ছত্র উদ্ধার ক'রে বাঙলাভাষার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কিরকম ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখাবার প্রয়াস করা গেল। আলোচনার সুবিধার জন্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ "তরী"কে বাদ দিয়ে নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ "না"'টি বসানো গেল ; আর প্রাচীন রূপ "উহারে"কে বর্জ্জন ক'রে আধুনিক "ওরে"কে নেওয়া হ'ল।—

আধুনিক বাঙলা

গান গেয়ে [না বয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন (জেন) মনে হয় চিনি [ওরে]।

মধ্যযুগের বাঙলা (আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ)

গান গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আস্তে (আইসে) পোরে,
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেহ্ন মনে হোএ চিহ্না ওহারে।

প্রাচীন বাঙলা (আনুমানিক ১১০০ খৃঃ)

গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারই,
দেখিআ জৈহণ মণে মণ হি) হোই, চিহ্নিবি (চিহ্নিমি) ওহারই।

মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৮০০ খৃঃ)

গাণ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কি (কএ, কই) আইশই পারহি,
দেক্‌খিঅ জইহণ মণহি হোই, চিহ্নিমি ওহ-করহি (ওহ)।

মাগধী প্রাকৃত(আনুমানিক ২০০ খৃঃ)

গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) কে (*কগে) আবিশদি পালধি (পালে),
দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) জাদিশণং মণধি হোদি, চিহ্নেমি অমুশ্‌শ।

প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খৃঃ পূঃ)

গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা কে (ককে) আবিশতি পালে,
দেক্‌খিত্বা যাদিশং মনোধি (মনসি) হোতি (ভোতি), চিহ্নেমি অমুম্‌।

বৈদিক (আনুমানিক ১০০০ খৃঃ পূঃ)

গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কঃ (*ককঃ) আবিশতি পারে,
*দৃক্ষিত্বা যাদৃশম্‌ মনসি ভবতি, চিহ্নয়ামি অমুম্‌।

নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে বাঙ্গালী জা'তের সৃষ্টিতে এই কয়টি বিভিন্ন মূল জা'তের উপাদান নাকি এসেছে :—[১] লম্বা আর উঁচু-মাথা-ওয়ালা একটি জাত, North Indian 'Aryan' Longheads এই জা'তটিই হ'চ্ছে আর্য্য-ভাষী জাতি, এই রকমটি প্রায় সমস্ত নৃতত্ত্ববিদের মত—পঞ্জাবে, রাজপুতানায়, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটি খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় ; বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক বেশী মেলে না, অতি অল্প স্বল্প যা কিছু পাওয়া যায়। [২] লম্বা আর নীচু-মাথা-ওয়ালা একটি জাতি—South Indian or Dravido-Munda Longheads। আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর কোল জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাঙলা দেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। [৩] গোল-মাথা-ওয়ালা একটি জাতি—Alpine Shortheads—এদের সরল নাক, মুখে দাড়ী গোঁফের প্রাচুর্য্য ; সিন্ধুদেশে, গুজরাটে, মধ্য ভারতে, কর্ণাটকে অন্ধ্রেও এদের বাস ছিল, এইরূপ মস্তকাকৃতির লোক ওই সব দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায় ; বাঙলা দেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুর্য্য বেশী, বিশেষ ক'রে ভদ্রজাতির মধ্যে ;—সাধারণ বাঙালী পাঞ্জাবীদের মতন লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয় গোল-মাথা-ওয়ালা ; এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্ব্বে ভাষায় আর

সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা যায় নি—আর এরা কবে কোথা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল তাও জানা যায় নি—তবে এদের অনুরূপ গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহুদেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়ালা আর একটা জাতি—Mongolian Short-heads—এরা মোঙ্গল জাতীয় লোক, নাক চেপ্‌টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফদাড়ী কম; উত্তর আর পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চার প্রকার জাতের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী। এই চার জা'ত ছাড়া দক্ষিণ ভারতের আর এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন বাঙলা-দেশে Negroid নিগ্রোবটু বা Negrillo নিগ্রিল পর্য্যায়ের জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে না; বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব নেই। বাঙলা দেশে আর্য্য-ভাষার আগমনের পূর্ব্বে কোল আর দ্রাবিড় আর উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে ভোট-চীন এই তিন ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই—গোল-মাথা Alpine Shortheadদের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জান্‌বার পথ নেই। এটা অসম্ভব নয় যে তারা [১] শ্রেণীর আর্য্যদের আসবার আগে [২] শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ ক'রেছিল; আর বাঙলা দেশের প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীন ছাড়া অন্য ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [৩] শ্রেণীর লোকেরা আর্য্য আগমনের কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোলই ছিল এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়—এর বিরুদ্ধে অন্য কোনও যুক্তি মনে লাগে না।

আর্য্যরা ভারতে এল, তাদের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তাদের ধর্ম্ম, তাদের সামাজিক বিধি-নিয়ম আর তাদের প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে'। তাদের কতক অংশ পারস্যেই র'য়ে গেল। ভারতে এসে প্রথমটা পাঞ্জাবে তাদের বাস হ'ল। দেশটা কিন্তু খালি ছিল না; এখানে সুসভ্য দাস বা দ্রাবিড় জা'ত বাস ক'রত; আর তাদের তুলনায় বোধ হয় কিছু কম সভ্য কোলেরাও ছিল,—সমস্ত দেশটা জুড়েই ছিল। আর্য্যরা আস্‌তে তারা সসম্ভ্রমে দেশ ছেড়ে দিয়ে' চ'লে গেল না, মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে দাঁড়াল। প্রথমটা আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাত ঘট্‌ল, আর এই সংঘাতে পাঞ্জাবে আর্য্যরাই জয়ী হ'ল, কিন্তু সিন্ধুদেশের সুসভ্য অনার্য্যের (ভাষায় এরা কি ছিল এখনও তা জানা যায় নি) কাছ থেকে আর্য্যরা এমনি বাধা পেলে যে, তারা বহু শতাব্দী ধ'রে ওদিকে আর এগো'লো না, পূব দিকে গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকেই ছড়িয়ে' পড়্‌বার চেষ্টা ক'রলে। আর্য্যরা তো অনার্য্যদের দেশ দখল ক'রে তাদের উপর রাজা হ'য়ে ব'স্‌ল। যদিও অনার্য্যরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না, তবু আর্য্যের তীব্র আক্রমণে তাদের জাতীয় সংহতিশক্তির নাশ হ'ল। তারা সব বিষয়ে আর্য্যদের প্রভু ব'লে মেনে নিলে, তাদের ভাষা, তাদের ধর্ম্ম নিলে। কিন্তু আর্য্যরা ছিল সংখ্যায় কম, তারা অনার্য্যের প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পার্‌লে না। অনার্য্যের ধর্ম্মের আর মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আর্য্যদের মধ্যেও এল। অনার্য্যদের ভাষার অনেক শব্দ আর্য্যরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনার্য্যেরা যখন দলে দলে আর্য্যের ভাষা গ্রহণ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন তাদের মুখে আর্য্যভাষা স্বভাবতোই ব'দ্‌লে গেল; বিশুদ্ধ 'জা'ত' আর্য্যদের ব্যবহৃত আর্য্যভাষাও অনার্য্যের বিকৃত আর্য্যভাষার ছোঁয়াচে প'ড়ে তার বিশুদ্ধি রাখ্‌তে পার্‌লে না।

ঋগ্‌বেদের যুগের পর আর্য্যেরা তাদের ভাষা নিয়ে উত্তর ভারতে বিহার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে' প'ড়্‌ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্ররচনার যুগের অবসান হ'ল, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগ এল। ব্রাহ্মণ যুগের শেষ ভাগ নিয়ে হ'চ্ছে আরণ্যক আর উপনিষদের যুগ, তার পরই বুদ্ধদেব আর মহাবীর স্বামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলা দেশে আর্য্যদের আগমন হয়-নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে যে-সব আর্য্যরা প্রথম এসে বসবাস করে, তারা ছিল যাযাবর। তারা তাদের ঘোড়া, গোরু, ছাগল, ভেড়া নিয়ে ঘুরে' ঘুরে' বেড়া'ত; পশ্চিমা চাষী আর্য্যরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত, কিন্তু তাদের আর্য্যভাষা পাঞ্জাব আর কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলের আর্য্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল, আর তাদের ধর্ম্মও ছিল বৈদিক ধর্ম্ম থেকে আলাদা; খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা ক'রত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ, হোম, অগ্নিপূজা ইত্যাদি ক'রত না, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতও মান্‌ত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্য্যরা এইসব কারণে তাদের ঘৃণা ক'রত, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান্ নিন্দার কথা লিখে' গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য্য ছিল, আর আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হ'য়েছে; আর বৈদিক আর্য্যরা এদের শুদ্ধি ক'রে বেদমার্গী ক'রে নিতেন খুব;—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত, সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্যস্তোম'।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষের আর্য্য জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা তালিকায় বাঙলার স্থান নেই। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেকার ঐতরেয় আরণ্যকের এক জায়গায় এসম্বন্ধে এই ইঙ্গিত আছে যে বঙ্গ, বগধ আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা মানুষ নয়, তারা পক্ষী বা পক্ষিকল্প। এই থেকে মনে ক'রতে পারা যায় যে, বাঙলার মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আর্য্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয় নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রেই এদের 'বয়াংসি' বা পাখী বলা হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হ'য়েছে যে, উত্তর ভারতের আর্য্য ব্রাহ্মণ বাঙলা দেশে এলে পরে তাঁকে স্বদেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে; অনার্য্য দেশ ব'লে বাঙলার প্রতি উত্তর ভারতের আর্য্যরা এম্‌নিই বিরূপ ছিল। এ দেশের সম্বন্ধে, বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে, আর একটি বদনাম এই ছিল যে, এখানকার লোকেরা ভারি রূঢ় আর অভদ্র। মৌর্য্যেরাই সব-প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে বাঙলার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। মৌর্য্য যুগ থেকেই মগধের রাজ-কর্ম্মচারী, সৈনিক, বেণে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর সাধারণ উপনিবেশিকেরা বাঙলা দেশে বসবাস কর্‌তে থাকে, আর তাদের দ্বারাই মগধের আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। তার আগে হয়তো দু' চার জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আর্য্য পশ্চিম থেকে অনার্য্য বাঙলায় যাওয়া আসা কর্‌ত; কিন্তু মৌর্য্যদের বিজয়ের ফলে রাজশক্তির প্রভাব দ্বারাই আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়—তার আগে বাঙলা দেশে কেউ আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত ব'লে বোধ হয় না। দেশে নানা দ্রাবিড় আর কোলজাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম্ম আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি, সবই ছিল। অবশ্য মৌর্য্যবিজয়ের আগে থেকেই আর্য্যভাষী সমৃদ্ধ, সুসভ্য প্রতিবেশী মগধের আর্য্যভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্য্যদের উপর অল্পস্বল্প এসে থাক্‌তে পারে। তা'হ'লে বাঙলা দেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে বিজয়-সিংহ "হেলায় লঙ্কা করিল জয়" কি ক'রে? পালি বই অনুসারে বিজয়-সিংহ হচ্ছেন 'লালু' বা 'লাড়' দেশের রাজার ছেলে; এই 'লালু' বাঙলার 'রাঢ়' বা 'লাড়'-নয়, কিন্তু গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা 'লাড়'। বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাবার সময় "ভরুকচ্ছ" বা "সুপ্পারক" বন্দর দুটি ছুঁয়ে যাচ্ছেন; এই দুই বন্দর এখনও গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যমান এদের এখনকার নাম হ'চ্ছে 'ভরোচ' আর 'সোপারা'। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাটী আর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষার যে রকম যোগ আছে, সেরকম যোগ বাঙলার সঙ্গে নেই, সে-সম্বন্ধে আমি একটি প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'প্রতিধ্বনি' বা 'অনুকার' শব্দের রীতি আছে। কোনও শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের

অনুরূপ বা সংশ্লিষ্টভাব প্রকাশ ক'র্‌তে হ'লে আধুনিক আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষায় সেই শব্দটিকে আংশিক ভাবে দ্বিত্ব ক'রে বলা হয়, তার আদ্য ধ্বনিটির বদলে অন্য একটি ধ্বনি বসিয়ে বলা হয়। যেমন—বাঙলার 'ঘোড়া টোড়া', মৈথিলীতে 'ঘোরা তোর', হিন্দিতে 'ঘোড়া উড়া', গুজরাটীতে 'ঘোড়-বিড়া', তামিলে 'কুতিরৈকিতিরৈ', ইত্যাদি। দেখা যায় যে, বাঙলা ভাষায় মূল ধ্বনিটির স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটি হ'চ্ছে 'ট', মৈথিলীতে 'ত', হিন্দিতে 'উ', গুজরাটীতে 'ব', মারহাটিতে 'বি', আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'কি', বা 'ক' বা 'গ'; আর সিংহলীতে দেখা যায় যে 'ব' ব্যবহার হয়, গুজরাটী মারহাটীর মতন—বাঙলার মতন 'ট' বা মৈথিলীর মতন 'ত' বা হিন্দীর মতন 'উ' নয়; যেমন সিংহলী 'অশ্বয়-বশ্বয়', সিংহলী 'দৎ-বৎ'—বাঙলা 'দাঁত-টাঁত', কিন্তু গুজরাটী দাঁত-বাঁত', মারহাটী 'দাঁত-বিত'।

বাঙলা দেশে যে অনার্য্যের বসতি ছিল, তা আমরা এ দেশের প্রত্যন্তভাগে এখনও অনার্য্য জা'তের বাস দেখে অনুমান ক'র্‌তে পারি। বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য্য ভাষিতার আর একটি প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে—পুরানো বাঙলার তাম্র-শাসনে প্রাপ্ত নামের কথা বল্‌বার সময় এবিষয়ের উল্লেখ ক'রেছি। পশ্চিম-বাঙলায় ভূমিজ, সাঁওতাল,ওরাওঁ,মালপাহাড়ীরা এখনও বিদ্যমান; উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব্ব-বাঙলায় ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোল জাতীয় অনার্য্য এখনও র'য়েছে, চোখের সামনে এরা বাঙালী হ'চ্ছে—হিন্দু হ'চ্ছে, মুসলমানও হ'চ্ছে। মৌর্য্যযুগের সময় থেকে, বা তার আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে এই রকমটা হ'য়ে আস্‌ছে। বিহার আর উত্তর ভারতের আর্য্যভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠাপন্ন মগধ দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলায় এল। রাজার ভাষা, ধর্ম্মের ভাষা, সভ্যতার ভাষা হিসাবে এদের ভাষা, অনার্য্যভাষী বাঙালীদের মধ্যে প্রচারিত হ'তে লাগ্‌ল। অনুমান করা যেতে পারে, দেশের অনার্য্য অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য-ভাষী জা'ত (এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হোক্) তাদের নিজ নিজ ভাষা নিয়ে রীতিনীতি নিয়ে বাস ক'র্‌ত—কোল, দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল। দ্রাবিড়ভাষী, কোলভাষী, মোঙ্গোলভাষী, এই তিন জা'তের মধ্যে দুটিতে বা তিনটিতে মিলে-মিশে আর্য্যভাষীদের আস্‌বার আগেই খিচুড়ী জা'তের সৃষ্টি হ'য়েছিল, সেইসব খিচুড়ী-জা'তের মধ্যে এই তিনটী ভাষার একটাই প্রচলিত ছিল। দেড় হাজার বছর হ'য়ে গেল বাঙলার এইসব অনার্য্যভাষী লোক আর্য্যভাষা গ্রহণ ক'রে হিঁদু হ'য়ে গিয়েছে; তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভুলে' গিয়েছে, বা বহু স্থলে আর্য্যত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা আচরণায় অনাচরণীয় আধুনিক কালের নানা জা'তে পরিণত হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউএন্-থ্‌সাঙ্ যখন সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, তখন তিনি বাঙলা দেশটিও ঘুরে যান। তিনি এই দেশের সভ্যতা, বিদ্যা আর ভাষা সম্বন্ধে যা ব'লে গিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় যে, তখন সারা বাঙলা দেশটা মোটামুটী আর্য্যভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্য বিদ্যার আলোচনা ব্রাহ্মণ্য, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল; কিন্তু তখন উড়িষ্যা আর্য্যভাষী হয় নি। বাঙালী জাতের সৃষ্টিতে পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চ বর্ণকেও কিছু কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা হ'য়েছে। বাঙলায় আর্য্য প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের (মধ্যদেশের বা আর্য্যাবর্ত্তের) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে' ভূমি দিয়ে', বৃত্তি দিয়ে' বসানো হ'ত—যাতে তাঁরা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম আর সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত কর্‌তে পারেন।

বাঙলাদেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত—রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, বঙ্গ, কামরূপ। এই নামগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই হ'চ্ছে জা'তের নাম—জা'তের নাম থেকে দেশের নাম-করণ খুবই সাধারণ প্রথা। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, আর কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দ—এগুলি আর্য্য ভাষার পদ নয়। এগুলি হ'চ্ছে অনার্য্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হ'য়েছে। তুলনীয়—আসাম = অসম বা অহম জাতি। রাঢ় যে এক দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য জাতির নাম ছিল, তার ইঙ্গিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাই। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গের মত অন্য অন্য অনেক অনার্য্য জাতি বাঙলায় বাস ক'র্‌ত—তাদের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়নি বটে, তবুও তারা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি। এক হিন্দুধর্ম্ম আর বর্ণ-সমাজের সূত্রে এদের গেঁথে নিয়ে', আধুনিক হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের ফেলে, এদের দ্বারা আর্য্যভাষা গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের পত্তন হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে হয়তো এইরূপ বৌদ্ধ সমাজই বেশী ছিল; অনুমান হয় মুসলমান বিজয়ের পরে। রাঢ় আর বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ গিয়ে' বসবাস কর্‌বার পরে ও দেশে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,—'বঙ্গজ' কায়স্থ আছে, বৈদ্য আছে, কিন্তু বঙ্গজ ব্রাহ্মণ নেই।

এমনি ক'রেই আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী জা'তের সৃষ্টি হ'ল। খৃষ্টাব্দ ৭০০ আন্দাজ এই জা'ত দাঁড়িয়ে গেল—আনুমানিক ৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় পাল বংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর এঁরা রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলাদেশ এঁদের অধিকারে আর ছিল না, এঁরা খালি বিহারে রাজত্ব ক'র্‌তেন। এঁদের সময়ে গৌড়-বঙ্গ বা বাঙলাদেশ, মগধ দেশের সঙ্গে মিলে' ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বড় জা'ত ব'লে আসন পায়। বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ মুসলমান তুর্কীর আস্‌বার পূর্ব্বে যেটুকু হ'য়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদেরই আমলে। সেটুকু নেহাৎ কম নয়—কি বিদ্যায়, কাব্যে, ব্যাকরণে, সাহিত্যে,দর্শনে, স্মৃতিতে; কি শিল্পে রূপকর্ম্মে, ভাস্কর্য্যে, আর কি শৌর্য্যে, সব বিষয়ে হিন্দুযুগের বাঙলার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে এক বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্য বাঙলায় গ'ড়ে তোলেন; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙলার বাইরে ভগবান বুদ্ধের বাণী আর তখনকার দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার কর্‌তে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে বাঙলা ভাষায় বোধ-হয় প্রথম কবিতা লেখা হয় পণ্ডিতের দ্বারা; আর বাঙলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। একাদশ শতকের শেষের দিকে পাল রাজারা রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙলা থেকে বিতাড়িত হন। সেন বংশীয় রাজারা—হেমন্ত সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন—দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করেন; তাঁদের সময়ে বাঙলায় বিরাট এক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম তার মধুর ভাব নিয়ে নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে হিন্দু বাঙালীর সমাজের প্রতিমা একরকম তার পূর্ণরূপ পেলে; তার কাঠামো গড়া হ'য়েছিল পালবংশের পূর্ব্বে, এক-মেটে আর দো মেটে হয় পাল-বংশের অধীনে; আর তার রঙচঙ করা, চোখ চান্‌-কানো সাজানো হ'ল সেনবংশের সময়ে। তার পর তুর্কী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় ব'য়ে গেল, বাঙালী জা'ত যেন দু' শ' বছর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইল। বাঙালী জা'তকে তার পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসে, যাঁর সম্বন্ধে কবির উক্তি—'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া' —সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি।

বাঙ্গলাদেশ ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে—রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ।

রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বাঙালীর

পূর্ব্বপুরুষ দ্রাবিড় আর কোলভাষীগণদের নিজেদের একটা সভ্যতাও যে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ্-আর্য্য যুগে তারা ভালো ভালো শিল্প জান্‌ত, মিহি কাপাসের সুতোর কাপড় বুন্‌ত, হাতী পুষ্‌ত, জাহাজে ক'রে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা ক'র্‌ত, উপনিবেশ স্থাপন ক'র্‌তেও যেত;—আর যে ধর্ম্মভাব পরবর্ত্তী যুগে সহজিয়া, বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব আর মুসলমানী সুফী মতকে অবলম্বন ক'রে এমন সুন্দর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধির দ্বারা নব্যন্যায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হ'য়েছিল; তারও মূল যে এই আদি অনার্য্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না।

(সবুজ পত্র, শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৩৩)

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খেয়াল-খুশী

শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

আজি কি খেয়াল খেলিছ বসিয়া
চন্দ্রাননে!
কিসের খুশীতে হাসি ভাসি' উঠে
তোমার মনে?
তোমার চোখের চপল চাহনি
ভুবন ঘিরে;—
খেয়ালে ফুটা'লে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে।

তোমার খেয়ালে জীবন আমার
উঠিল রাঙি'।
তোমার খুশীতে হাসি ভাসি' উঠে
বাঁধন ভাঙি'।
কলভাষে তব আশা জাগে প্রাণে
গোপনে ধীরে।
খেয়ালে ফুটা'লে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে।

যেথা নিশিদিন শ্বসি' উঠে বায়ু
উদাস গীতে;
বহা'লে সেথায় মলয়-পবন,
অপরিচিতে!
কাননে কাননে যেথা অলিকুল
হতাশে ফিরে,
সেথায় জাগা'লে খেয়ালে হৃদয়-
পদ্মটিরে।

তাই মনে হয় খেয়ালে জাগিছে
চন্দ্র-তারা।
খেয়ালে ঝঞ্চা ঘুরিয়া মরিছে
বাঁধন-হারা।
কোন্ সে খেয়ালী?—খুঁজে ফিরে তা'রা
ব্যাকুল বেগে।
নিয়মিত হ'ল গ্রহতারা তা'রি
আঘাত লেগে।
কাঁদি' ফিরে যবে নিঃস্ব পরাণ
বিশ্ব-মাঝে।
চল-চরণের মঞ্জীর-ধ্বনি
খেয়ালে বাজে।
ছায়া নামে তাই শ্যামলবরণী—
স্নিগ্ধ ছায়া।
জাগি' উঠে গান; তৃপ্ত মরমে
জাগিছে মায়া।
খেয়াল-খুশীতে হাসিতে ভাসিতে
নিয়ম ঘুরে;
সৃষ্টি জাগিছে খেয়ালে কাহার
শূন্য জুড়ে।
প্রবাহ আনিয়া শুষ্ক-জীবন-
সরসী-নীরে—
খেয়ালে ফুটা'লে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১৪)

বাড়ী ফিরিয়াই গৌরী দরজায় খিল দিয়া আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। মা অনেক ডাকাডাকি করাতেও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তরঙ্গিণী অগত্যা ফিরিয়া স্বামীর সন্ধানে চলিলেন।

হরিকেশব চিন্তান্বিত মুখে বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা খোলা বইয়ের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন; তাঁহার চিন্তাস্রোত যে এ পুস্তকের খাতে মোটেই বহিতেছে না, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বোঝা যায়। তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়াই বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিলেন, "বড় জালাতেই পড়্‌লাম যাহোক। হ্যাঁগা, কি করি বল না? এযে আমার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হ'ল।"

হরিকেশব মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কেন কি হ'য়েছে?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "নূতন আর কি হ'বে? হ'য়েছে আমার মাথা! মেয়ের কপালের ভাবনা ভেবে ভেবে দিনে রাত্তিরে চোখে একটু ঘুম আসে না, তার উপর ওদের ওখানে গিয়ে শুনি তারা আমার মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ করছে। হা আমার পোড়া কপাল! বিধাতা কি শেষকালে আমার সঙ্গে রঙ্গ করতে বস্‌লেন! ভয়ে কাঁটা হ'য়ে গিয়েছিলাম; অত ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম, ওর সাম্‌নেই তারা ঐসব কথা সুরু করলে। ভাব্‌লাম মেয়েটা একটা কাণ্ড না ক'রে বসে! এর উপায় কি করি বল ত?"

হরিকেশব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কাছেও এ কথা তুলেছিল? তাহ'লে দেখ্‌ছি কথাটা নেহাৎ হঠাৎ ওঠেনি। আমিও ত এতক্ষণ ওই সবই শুন্‌লাম।"

তরঙ্গিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, অমন ঘর! মেয়েটার যদি আজ এমন কপাল না হ'ত! আর তাই বা বলি কেন? ঘর ত এর চেয়েও ঢের ভাল দেখে দিয়েছিলাম। সকলই আমার বরাত! নইলে এমন মেয়ের এমন হয়?"

হরিকেশব বলিলেন, "ওর ভাগ্যে থাকেতো আবার ভাল হবে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "মেয়েমানুষের ওই ত সর্ব্বস্ব; তা গেলে এরপর ভাল হ'বার আর কি আছে?"

হরিকেশব একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "কেন, আবার যদি ওর বিয়েই হয়, তাহ'লে কি আর সব ভাল হ'তে পারে না!"

তরঙ্গিণীর আজন্মের সংস্কারে কে যেন কঠিন কশাঘাত করিল। স্বামী যে এমন কথা বলিতে পারেন তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। বালবিধবা কন্যাকে বিধবার বেশে সাজাইতে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত; তাই স্বামীর মতে মত দিয়া কন্যাকে তিনি কুমারীর মতই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মনে মনে তাহার অদৃষ্টলিপিকে মানিয়াই লইয়াছিলেন; আজ না হউক দুই দিন বাদে বৈধব্যই যে তাহার আজীবনের ব্রত হইবে এবিষয়ে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ কোনো দিন জাগে নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় তাহার সে-পথ অনেক সুগম করিয়া তুলিয়া স্বামী তাহাকে সমাজের বহু অত্যাচারের ও অবিচারের হাত হইতে বাঁচাইতে চান এই মাত্র ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

তরঙ্গিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মাগো, কি যে বল তার ঠিক নেই! বুড়ো বয়সে তোমার কি ভীমরথী ধর্‌ল যে নিজের মেয়েকে যা নয় তাই বল্‌ছ? মাথাটার একটু ঠিক রেখ।"

হরিকেশব হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগো লক্ষ্মী, মাথাটা ঠিকই আছে, অত রাগ কোরো না। দুধে দাঁত না ভাঙ্‌তেই মেয়ের অদৃষ্ট আমরা এমন দরাজ ক'রে

দিলাম এর চেয়ে ঠিক মাথার আর কি পরিচয় হ'তে পারে ?"

তরঙ্গিণী রাগিয়া বলিলেন, "যা হ'য়েছে তাত মুখ বুজে সইতেই হবে। ওই অকথাগুলো ব'লেই কি আর মনে মন সান্ত্বনা পাবে।"

হরিকেশব বলিলেন, "শুধু চলব কেন ? গৌরী যদি অমত না করে ত আমি ওর আবার বিয়েই দেব।"

তরঙ্গিণী আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখ, বুড়ো বয়সে তুমি আর আমার হাড় ক'খানা জ্বালিও না। সংসারে এসে নানান্ জ্বালায় ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেছি, তুমি আবার তার উপর নূতন ক'রে দগ্ধিও না।"

হরিকেশব বলিলেন, "চটছ কেন ? মেয়ের বিয়ে ত ভাল কথা।"

তরঙ্গিণী মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা গো আচ্ছা ! খুব ভাল কাজ করতে শিখেছ। আগে গয়ায় আমার পিণ্ডিটা দিইয়ে দাও, তার পর মনে যত ভাল আছে সব কোরো। আমি তোমার ভালর ব্যাখ্যান শুনতে চাই না।"

রাগিয়া ফর ফর করিয়া তরঙ্গিণী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। হরিকেশব মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কথাটা ঠিক যেমন ভাবে বলব মনে করে-ছিলাম তা বলা হ'ল না। গিন্নী মাঝের থেকে চ'টে গেলেন। কথা বলতে গেলেই আমার বিপদ বাধে। কি যে করি ? বিয়ে ত আর আমি এখন দিচ্ছি না। সে ঢের দেরী।"

রান্নাঘরে হিন্দুস্থানী পাচক ভৈরোঁ মহারাজ তখন অতি নিবিষ্ট মনে স্বকার্য্যে ব্যস্ত। তাহার উনানের কাঠ হঠাৎ নিভিয়া গিয়া ঘরটি ধূম্রলোক হইয়া উঠিয়াছে, মহারাজ বাঁশের চোঙা দিয়া ফুঁ দিয়া সে ধোঁয়া আরোই বাড়াইয়া তুলিতেছেন, আগুন কিন্তু জ্বলিতেছে না।

পরের বাড়ী হইতে মনটা খারাপ করিয়া আসিয়া স্বামীর কাছে তরঙ্গিণী একটু জুড়াইবার আশা করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু স্বামীর অনাসৃষ্টি কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। তাহার উপর রান্নাঘরে মহারাজ তাঁহার চক্ষে শুদ্ধ জ্বালা ধরাইয়া দিল। তরঙ্গিণীর হিন্দী আসে না ; তিনি বাংলাতেই ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "হাাগা মহারাজ, এটা কি ভদ্দর লোকের রান্না ঘর না গোয়ালার গোয়াল-ঘর ! একেবারে যে সেঁজেল দিয়ে' ব'সে আছে। মানুষকে ঘরে ঢুকতে হবে না ! রান্নাবান্নার ত কি পিণ্ডি চটকে রেখেছ তার ঠিক নেই।"

মহারাজ বলিলেন, "সব কুছ্ বনায়া।"

তরঙ্গিণী ধূম্রারণ্য ভেদ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মহারাজ ভাজার আলু, ঝোলের কাঁচকলা ও চাটনীর আম সব একত্র করিয়া উপাদেয় রকম একটি ব্যঞ্জন সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তরঙ্গিণীর ত চক্ষু স্থির !—"ও কপাল ! এযে সত্যি-সত্যিই পিণ্ডি চটকেছ দেখ্ছি। এত ক'রে ব'লে গেলাম, তবু তোমা কি মতিচ্ছন্ন ধরল যে বাড়ীশুদ্ধুর উপবাসের ব্যবস্থা ক'রে রাখলে ?"

মহারাজ 'মা-জিকে' বুঝাইল সকল খাদ্যই এক স্থানে যাইয়া মিলিবে ; সুতরাং অকারণে কেবল তাহাকে বকিবার জন্যই কেন তিনি রান্নার অত খুঁৎ ধরিতেছেন তরঙ্গিণীর অতি দুঃখেও হাসি আসিল। তিনি সব ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন। মহারাজ তাঁহাকে মানা করিল ; বলিল গৌরীরাণী ইতিমধ্যে নাকি বলিয়া গিয়াছে যে সে মাছ খাইবে না ; তাই মহারাজ ঝোলের তরকারি-গুলি নষ্ট না করিয়া সব মিশাইয়া নিরামিষ একটা রান্না করিয়াছে। বাবু ত মাছ-মাংস খান না আর মাও অম্বলের ব্যথার জন্য রাত্রে আহার তুলিয়া দিয়াছেন। কাজেই সাতটা রাঁধিয়া লাভ কি ?

গৌরী ইহার মধ্যে কখন্ আসিয়া মাছ রাঁধিতে মানা করিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তরঙ্গিণী বিস্মিত হইলেন। মহারাজকে বকা আর তাঁহার হইল না ; যে-মেয়ে মাছ না হইলে একগ্রাস অন্ন মুখে করে না, তাহার এমন ব্যবস্থায় মার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি তরকারির বঁটি ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

বর্ষাশেষের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রঙের উপর রঙের তুলিকা বুলাইয়া সূর্য্য তখন পশ্চিমপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। যমুনার জলে নিমগাছের মাথায় আকাশ হইতে সে রঙের আলো যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যালক্ষ্মীর চরণ-স্পর্শের আশায় ধরণী রঙের প্রদীপ জ্বালিয়া রঙের

ধূপ ছড়াইয়া রঙীন বসনে সাজিয়া বর্ণারতিতে মাতিয়াছে। আকাশ ও ধরণীর এই রঙের ছবির উপর কে যেন কোমল নিপুণ হস্তে স্নিগ্ধতার একটি প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে; সকল রঙ সকল রঙের গায়ে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও উগ্রতার চিহ্ন নাই।

ধূমাচ্ছন্ন ঘরের বাহিরে আসিয়া সৃষ্টির এই বর্ণশ্রী দেখিয়া তরঙ্গিণীর চোখ দুটি যেন জুড়াইয়া গেল। অমনি মনে পড়িল গৌরীর কথা। আহা, এমন সোনার ছবি বাহিরে ঝলমল করিতেছে, মেয়েটা অন্যদিন হইলে দেখিয়া পাগলের মত আনন্দে মাতিয়া উঠিত, আজ সে কোন্ অন্ধকার ঘরের কোণে ম্লানমুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে।

কিন্তু উঠানে নামিয়া ছাদের দিকে চোখ পড়িতেই তরঙ্গিণী দেখিলেন, উপরের ছাদে গোধূলির আলোর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুমুখী গৌরী। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই! উৎসব-সজ্জা সমস্ত ছাড়িয়া একখানা পুরানো সাদা কাপড় পরিয়া নিরাভরণা কন্যা আপনার মনে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া তরঙ্গিণীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটা যেন এক মুহূর্ত্তে তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ধরণীর এই শোভন রূপের মাঝখানে একাকিনী গৌরী যেমন আজ থাকিয়াও দূরে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি বিশ্বের সমস্ত হাসিখেলার ভিতর থাকিয়াও আজীবন সে এমনি দূরে এমনি নিঃসঙ্গই থাকিয়া যাইবে।

একথা ত আজ দুই বৎসর তিনি জানেন, কিন্তু তবু আজকার মত এমন করিয়া কোনো দিন ইহা তাঁহার মনে ঘা দেয় নাই, এমন করিয়া সমস্ত মন জুড়িয়া বসে নাই। তরঙ্গিণী মনকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করিলেন যে, না থাকুক্ তাহার অন্য সঙ্গ, যতদিন তাঁহারা পিতামাতা বাঁচিয়া আছেন ততদিন তাঁহারাই মেয়েকে বুকে করিয়া রাখিবেন। কিন্তু জীর্ণ দেহ যেন ম্লান হাসি হাসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, তুই আর কত দিন? শেষবয়সের ওই পুষ্পকলির মত মেয়েটির জীবন-পথে এখনও যৌবন আসিয়া দাঁড়ায় নাই, আর তোমাদের যাত্রাপথ ত শেষ হইয়া আসিল; মরণের দ্বার হইতে কোন্ সম্বল আনিয়া তাহার নিঃসঙ্গ জীবনকে পূর্ণ করিয়া দিবে? তোমাদের জীবনের হাসি ত ফুরাইয়াছে, বিদায়ের দিনের অশ্রু উপহারে তাহাকে কি আনন্দের খোরাক দিয়া যাইতে পারিবে? নারী জন্মের কোন্ সাধ কোন্ সার্থকতা সে লাভ করিবে তোমাদের এই দুদিনের স্নেহের আশ্রয়ের মধ্যে?

তরঙ্গিণীর স্বামীর কথা মনে পড়িল, "আবার যদি ওর বিয়ে হয়।" এমন পাপ কথা মনে আনিতে তাঁহার যতখানি ঘৃণা যতখানি লজ্জা হওয়া উচিত ছিল তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন কই সে লজ্জা, সে ঘৃণা ত তাঁহার মনে আসিল না। দূরে ছাদের আলিসার ধারে গৌরী ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার এক্‌লা খেলার কোনো একটা খেয়ালে ততক্ষণ মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখের জল কাটিয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর চোখ সেইদিকে যত বার পড়িল ততবারই তিনি যেন আজ প্রথম দেখিলেন গৌরীর শৈশব কাটিয়া গিয়াছে, কৈশোর বসন্তবায়ুর মত তাহার সমস্ত শরীরে মুখে চোখে চলায় ফেরায় একটা ললিত হিল্লোল তুলিয়া দিয়াছে, জীবন-আকাশ যেন তাহাকে ডাক দিয়া ধূলার খেলা হইতে ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহাকে আর ত শুধু মাটির খেলনায় বাঁধিয়া রাখা যাইবে না।

তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া গৌরীর পাশে দাঁড়াইলেন। মেয়ের মুখ পানে চাহিয়া সেই ছাই কথাটা বারবারই মনের দুয়ারে আনাগোনা করিতেছিল। গৌরীর নিকট হইতে দূরে থাকিয়া স্বামীকে ইহার জন্য তিনি যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কাছে আসিয়া তাহার সমস্ত তীব্রতা যেন মিলাইয়া গেল। মনটা মমতায় ভরিয়া উঠিল। গৌরীর মাথায় হাত দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, নেমন্তন্ন খেয়ে পেটটা কি ভার আছে? রাতে খাবার অমন ব্যবস্থা ক'রে এলি যে!"

গৌরী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি ওদের বাড়ীর ছাই নেমন্তন্ন কিচ্ছু খাইনি। বাড়ীতেও আমি আর মাছ খাব না, গয়না পর্‌ব না। তোমাদের ভারী আহ্লাদ হয়েছে! বোন আমাকে ওখানে অমন ক'রে নিয়ে

গিয়েছিলে? আমাকে নিয়ে যা-তা করবে! আচ্ছা বেশ। আর আমাকে ভাল কাপড় পর্‌তে বোলো না, মাছ খেতে বোলো না। আমি ওই টেঁপীর মামীর মত থান কাপড় প'রে মাথা নেড়া ক'রে থাক্‌ব আর শাক-চচ্চড়ী ভাত খাব। তাহ'লেই বেশ হবে।"

মা ভয় করিয়াছিলেন গৌরীর বুঝি এই কচি বয়সেই বৈধব্য-ধর্ম্ম পালনে মন গিয়াছে। কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট! এ যে তার চেয়েও করুণ ব্যাপার। বালিকা গৌরী অভিমান করিয়া বৈধব্য পালিবে? পিতামাতা হইয়া তাঁহারা তাহার এমন কপাল করিয়া দিয়াছেন; আচ্ছা তবে তাহাই হউক। সে বিধবাই সাজিবে। পিতামাতাকে এম্‌নি করিয়া শাস্তি দিবে, নিজেও শাস্তি পাইবে। ইহার মধ্যে বৈধব্যের শোক-বৈধব্যের বৈরাগ্য কোথায়? এ ত শুধু অভিমানিনী বালিকার দুর্জ্জয় অভিমান। এই অভিমানে ভর করিয়া বিধবার আজীবনের ব্রত সে কি করিয়া পালন করিবে? পিতামাতা যখন তাহাকে ছাড়িয়া লোকান্তরে চলিয়া যাইবেন, তখন নিষ্ঠুর নিগড়ের মত এই ব্রত তাহাকে পিষিয়া মারিবে আর স্বর্গগত পিতামাতার স্নেহময় স্মৃতিটুকুও অনুক্ষণ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। তরঙ্গিণী ভবিষ্যতের ছবি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। বালিকার অভিমান ভাঙাইতে কেহ আসিবে না। এমন ব্যর্থ অভিমান জগতে কি আর আছে?

অনেক বয়সে অনেকগুলি ছেলের পর এই একমাত্র মেয়েটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সকল ছেলের বাড়া আদর সে এতদিন পাইয়া আসিয়াছে। পূজায় পার্ব্বণে বিবাহে উৎসবে ছেলেরা যাহা পায় নাই গৌরী তাহা বরাবর পাইয়াছে। সেই ছোট্ট কোলের মেয়েটি আজ সব ত্যাগ করিতেছে অভিমানে, কিন্তু বুঝিতেছে না যে এই ত্যাগ সমাজ তাহার নিকট জোর করিয়া আজীবন নিষ্ঠুর মহাজনের মত আদায় করিবে, তাহার পাঁচ ভাই যখন পিতার ঐশ্বর্য্যে ভোগ বিলাসে মাতিয়া থাকিবে তখন এইসকলের ছোট বোনটি বঞ্চিত জীবনের বোঝা বহিয়া বিস্মৃত স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করিবে। এই চিন্তা যতই তরঙ্গিণীর মনকে পাইয়া বসিতে লাগিল ততই বরেন গাঙ্গুলীর বিঘাজোড়া বাড়ী আর বাড়ীভরা ধন ঐশ্বর্য্যের ছবি চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে লোভ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু মনকে তাহার এ পাপ চিন্তার জন্য কঠোর ভৎর্সনা ত তিনি করিতে পারিলেন না।

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটে। সামান্য কারণে সামান্য কথায় গৌরীর অভিমান হয়, অম্‌নি সে সাজসজ্জা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলে, মাছের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, যা-কিছু তাহার প্রিয় সকলি ছাড়িয়া বসে; কখনও কাঁদিয়া কখনও মুখ ভার করিয়া মা ও বাবাকে অস্থির করিয়া তোলে।

কিন্তু এ অভিমান ত টেঁকে না; মা আদর করিতে বাবা দুইটা মিষ্ট কথা বলিতেই কোথায় সব উড়িয়া যায়; কঠিন প্রতিজ্ঞা সব এক নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়। আদরিণী কন্যা আবার নানা আদরে আব্দারে মা বাবাকে অস্থির করিয়া তোলে। পুরাণো গহনা পছন্দ হয় না, ভাঙিয়া নূতন গড়াইতে হইবে, শাড়ীর রং হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে ঘোর করিয়া ছোপাইতে হইবে, মা সেকেলে ফ্যাশানে চুল বাঁধিয়া দেন, সাতবার তাহা খুলিয়া মনের মতন করিয়া বাঁধিতে হইবে, বাবা কিছু জানেন না তাই বেড়াইবার জন্য তাহাকে পুরুষের পায়ের জুতা আনিয়া দিয়াছেন, ও জুতা দোকানে ফেরত দিয়া এল্‌ফ্রেড্‌ পার্কের সেই মেমের মেয়েদের মত নক্‌সাকাটা বগ্‌লস্‌-দেওয়া সরুমুখ জুতা আনিয়া দেওয়া চাইই। শৈশব কাটিয়া কৈশোর দেখা গিয়াছে, তাই পৃথিবীর সকল রূপরস ভোগ আনন্দ বিষয়ে তাহার তরুণ ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হইয়া উঠিতেছে; যেমন তেমন করিয়া তাহাকে আর ভোলানো চলে না।

এক দিকে মান-অভিমান দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা আর একদিকে এই আদর-আব্দারের মাঝখানে কি-একটা একটানা ভাবনা ও স্থায়ী গাম্ভীর্য্য তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। গৌরী আর সে গৌরী নাই। জীবন সম্বন্ধে সে ভাবিতে সুরু করিয়াছে। যখন তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা ভাবে। তরঙ্গিণী ও হরিকেশবের চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, গৌরীর মনে নানা সমস্যা সন্দেহ জাগিতেছে, পরিষ্কার করিয়া তাহার সমাধান সে করিতে পারিতেছে না। বৈধব্য যে কেবল গহনা কাপড়

ও মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রেই পরিসমাপ্ত নয় একথা হয়ত সে বুঝিতে শিখিতেছে এবং সেই চিন্তাই তাহাকে কৈশোরের হর্ষ-উচ্ছ্বাসের ভিতর প্রবীণতার গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিতেছে।

গৌরীর মুখ দেখিয়াও তাহার হাসি-কান্নার পালায় বিচলিত হইয়া তরঙ্গিণী গোপনে অশ্রু মুছিতেন; কিন্তু স্বামীকে আর কিছু বলিতে সাহস হইত না। যে কথাটা তাঁহার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে যদি স্বামী আবার তাহা উস্কাইয়া ফেলেন তাহা হইলে হয়ত তিনি এবার আর মনকে সাম্‌লাইতে পারিবেন না। কিন্তু সে কাজ কি এই প্রবীণ বয়সে ব্রাহ্মণের মেয়ের উপযুক্ত কাজ হইবে?

এই দুঃখের দিনে পাড়ায় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাদের শোক দুঃখ যেন আরো দ্বিগুণ করিয়া জ্বালাইয়া তুলিল। বাংলা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া একটি বাঙালী বাবু বৃদ্ধা মা ও তরুণী স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া হাওয়া বদ্‌লাইতে পাশের বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। বৌটি সারাদিন ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে স্বামীর সেবা করিত, শাশুড়ীর পরিচর্য্যা করিত, দেড় বছরের কচি মেয়েটিকে লইয়া হাসি-খেলা করিত; আবার রোদ পড়িয়া আসিলেই তাহার কাজের ধারা বদ্‌লাইয়া যাইত। জলের বাটি, তেলের শিশি, আয়না, চিরুণী, সেণ্ট, পাউডার লইয়া সে প্রসাধনে এমন মাতিয়া উঠিত যে মেয়েটা কাঁদিয়া কোকাইয়া গেলেও ফিরিয়া দেখিত না। সকাল হইতে বাছা রঙীন শাড়ী আলনায় কোঁচানো থাকিত, সন্ধ্যায় সেই রঙীন শাড়ী ও জরির জামায় সাজিয়া প্রতিদিন নূতন করিয়া আল্‌তায় পা ও ঠোঁট রাঙাইয়া সে খোলা বারান্দায় রুগ্ন স্বামীর কাছে গিয়া বসিত। তাহার সাজপোষাক নিত্যনূতন না হইলে চলিত না। স্বামী যদি কোনোদিন অন্যমনস্ক হইয়া তাহার সাজসজ্জা লক্ষ্য না করিত তাহা হইলে কি তাহার ভীষণ অভিমান। সারাদিন সে যতই জ্বরে ধুঁকুক না কেন সন্ধ্যায় তাহার প্রেমিকের পার্ট ভুলিলে আর রক্ষা নাই। বৌ রাগে খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিবে, ডাকিলে সাড়া দিবে না, বারান্দা ছাড়িয়া ফরুকাইয়া পরের বাড়ী বেড়াইতে চলিয়া যাইবে, হয়ত বা লোকের সাম্‌নেই কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে। কিন্তু মনটা তাহার আবার এম্‌নি মমতায় ভরা, স্বামীর উপর এমনই তার অগাধ টান যে, যদি স্বামীর তরফ হইতে আদর-সোহাগের ডাক আসিতে দেরী হইত, সে স্থির হইয়া মান করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না। ছুটিয়া গিয়া তাহার গায়ে পড়িয়া আদর করিয়া হাজার প্রশ্নে তাহাকে এম্‌নি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত যেন অভিমান স্বামীই করিয়াছে আর মান ভাঙাইবার পালা স্ত্রীর। তার অপরাধীর মত মুখখানি দেখিলে মনে হইত অভিমান করিয়া স্বামীর সে যেন কি একটা বিষম অবিচার করিয়া ফেলিয়াছে। বারেবারে বলিত, "তুমি কি রাগ করেছ? অনেকক্ষণ কি একলাটি প'ড়ে ছিলে?" ছোট ওই বউটির সমস্ত বিশ্ব ছিল তাহার স্বামী আর তাহার গহনা কাপড়ের বাক্স। স্বামী ছিল তার দেবতা, ভূষণ ছিল তার আরতির থালা।

কিন্তু অভাগিনীর কপাল পুড়িল। জ্বরে শুকাইতে শুকাইতে একদিন তাহার সমস্ত বিশ্ব খালি করিয়া দিয়া স্বামী পরপারে চলিয়া গেল। কাহাকে ঘিরিয়া আর তাহার প্রসাধনের আরতি, তাহার নব নব প্রেমের খেলা চলিবে? তাহার নন্দনকানন একদিনে শ্মশান হইয়া গেল। বুকফাটা কান্নায় একবার সমস্ত পাড়াটা যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তারপর সমস্ত চুপ। মেয়েটির মুখ দিয়া আর স্বর বাহির হয় না। কিন্তু লোকলজ্জা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, পাগলের মত স্বামীর বুকের উপর গিয়া সে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। টানিয়া তুলিতে গিয়া লোকে দেখে জ্ঞান নাই।

পাড়াপড়সীর ভালয় মন্দয় দেখিতে হয়, তাই তরঙ্গিণী গিয়াছিলেন শোকার্ত্তা মা ও বধূটিকে একটু দেখা-শুনা করিতে। জ্ঞান হইবার পর সারাদিনের ভূমিশয্যা ছাড়িয়া বধূ স্নান করিয়া আসিল। আপনার হাতে একটি একটি করিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল; থান কাপড় নাই তাই শাড়ীর দুইটা পাড় টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। শাড়ীর পাড় ও সিঁদুরের রঙ মুছিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের সমস্ত লালিমাও যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছিল।

সমস্ত বর্ণহীন মৃতের মত। শোকার্ত্তা বধূ মেয়েটাকে বুকে করিয়া আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সে দৃশ্য দেখা যায় না।

গৌরী কখন্ মার পিছন-পিছন সে-বাড়ী গিয়া উপস্থিত। আপনার বৈধব্য-সংবাদে সে যেটুকু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল তাহার সবটাই প্রায় পিতার ব্যথা দেখিয়া; কিন্তু আজ এই সদ্য-বিধবা বধূটির দিকে চাহিয়া গৌরীর দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া যে শোকাশ্রু ঝরিল তাহা বৈধব্য অনেকখানি বুঝিয়াই। এই তরুণ দম্পতির হাসি-খেলা মান-অভিমান আদর-আব্দার গৌরীর চোখে অনেকবার পড়িয়াছে। সে দেখিয়া খুসী হইয়াছে, কত সময় ছুটিয়া মাকে ডাকিয়া দেখাইয়াছে, "মা, দেখ বৌটি কেমন ঢাকাই শাড়ী পরেছে। বাপ রে! বাড়ীতেই অত সাজ! ওর বর ছাড়া কেউত দেখে না। বর আবার হাস্‌ছে।"

মা লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেন। গৌরীর কৌতূহলের শেষ ছিল না। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিত, বেশ যেন উপভোগ করিত। আজ সেই আনন্দের সংসার এমন হইতে দেখিয়া সঙ্গীহীনার এ সর্ব্বহারা মূর্ত্তি দেখিয়া গৌরী অনেকখানি বুঝিল বৈবধ্য কাহাকে বলে।

বাড়ী আসিয়া সে মাকে বলিল, "হাঁ মা, বৌ আর কোনো দিন আগের মত সাজ্‌বে না, না? কার সঙ্গে মা, রোজ গল্প কর্‌বে? সত্যি মা, বেচারীর বড় কষ্ট। কিরকম ক'রে কেঁদে উঠে চুপ ক'রে গেল মা! আমার বুকের ভিতরটা কাঁপ্‌ছিল দেখে। বিধবা হওয়া ভয়ানক খারাপ।"

গৌরীর কথা শুনিয়া মা ভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। গৌরী কিন্তু তখন বোধ হয় নিজের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিল, "আমার মেয়েকে আমি কখ্‌খনো বিয়ে দেব না। বাবা, শেষকালে যদি বিধবা হ'য়ে যায়! সে আমি কিছুতেই দেখ্‌তে পার্‌ব না।" বালিকা কন্যার সহজ মাতৃস্নেহ ও শিশুবুদ্ধির কথা শুনিয়া মার বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিয়া আসিতেছিল। হায়, কোথায় তাহার মেয়ে আর কোথায়ই বা তাহার বিবাহ!

মাকে নীরব দেখিয়া গৌরী মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাগো, আমি অমন ক'রে থাকতে পার্‌ব না। আমার ত সে বরের সঙ্গে ভাব ছিল না, আমি কার জন্যে কাঁদ্‌ব? বিধবা হ'তে আমার ভাল লাগে না। কেন মা, আমি বাইরের লোকের জন্যে বিধবা হব?"

তরঙ্গিণী সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গৌরীর কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। হায় রে দুর্ভাগিনী! সেই বাইরের লোক যে মন্ত্রের বাঁধনে তোর ইহকাল পরকাল সব বাঁধিয়াছে। কি করিয়া সে বন্ধন তুই কাটাইবি?

তরঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। একথা মেয়ের মুখে শুনিবার আগে তিনি কেন মরণ বরণ করিলেন না?

গৌরী মার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে একবার তাকাইয়া কি ভাবিয়া চুপ করিয়া সরিয়া গেল। মা মেয়ের মধ্যে ওকথা আর উঠিল না।

(ক্রমশঃ)

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহু জনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক-কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৫১)

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের শেষগ্রন্থ সমাপ্তিতে লিখিত আছে—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

এই শ্লোকের অর্থ কি?

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(৫২)

আগুনের শিখা

আগুন জ্বালিলে তাহার শিখাটি ত্রিভুজাকৃতি দেখা যায় কেন? প্রমাণ স্বরূপ একটি দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া দেখা যাইতে পারে। অধিকন্তু সকল রকম বায়ুর চাপ (atmospheric pressure) এবং তাপাবস্থায়ই ঐ একই ঘটনা দেখা যায় কেন?

শ্রী ধর্ম্মরঞ্জন গুহ

(৫৩)

পান-বরোজ

পান-বাগান বা বরোজ অধিকাংশ বারুজীবীর প্রধান অবলম্বন। ৫।৬ বৎসর হইতে চলিল যশোহর, খুলনার অধিকাংশ বরোজ কি এক রোগে মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গেও ঐ রোগ দেখা দিয়াছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ঐ রোগের প্রকোপ খুব বেশী দেখা যায়। মাটি হইতে ২।৪ অঙ্গুলি উপরে গাছের গোড়ার কতকাংশ পচিয়া যায়। এই রোগ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এমন কি বরোজের মধ্যে কোন গাছে ঐ রোগ দেখা দিলে ৫।৬ দিনের মধ্যে সমস্ত বরোজ নষ্ট হইয়া যায়। রোগাক্রান্ত গাছ তুলিয়া ফেলিলেও কোন উপকার হয় না। যে-স্থানের বরোজ একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে তথায় ৫।৬ বৎসরের মধ্যেও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া বরোজ জন্মান যায় নাই। কেহ এই রোগ-নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইব। বরোজের আবাদের কোন পুস্তক পাওয়া যায় কি না? গেলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী যজ্ঞেশ্বর হালদার

—

মীমাংসা

(২১)

জল ও বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব

জড় পদার্থের সাধারণ নিয়ম—শীতে সঙ্কুচিত হয় এবং গরমে প্রসারতা লাভ করে। সঙ্কুচিত হইলেই সে-জিনিসের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কাজেই জল হইতে বরফ হওয়া পর্য্যন্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবারই কথা। কিন্তু জলের বেলা এই সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়। জলকে ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে তাহা ক্রমেই ঘন হইতে আরম্ভ করে সত্য, কিন্তু তাহা 4C (৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) পর্য্যন্ত তার পরে আবার প্রসারতা বাড়িতে থাকে অর্থাৎ ক্রমেই আবার হাল্কা হইতে আরম্ভ হয়। সেইজন্য যখন জল একেবারে শক্ত বরফে পরিণত হয় তখন উহা এত হাল্কা হইয়া যায় যে, জলের উপর ভাসিতে থাকে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নানা-রকম মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এর কারণ হইতেছে molecular re-arrangement before condensation অর্থাৎ, ঘনীভূত অবস্থায় জলের আণবিক পরিবর্ত্তন।

শ্রী সুবোধ দাসগুপ্ত

(৩৪)

"ননদ" ও "ননাস" শব্দ

সংস্কৃত "ননন্দ্ (ন=নাই; নন্দ=আনন্দিত হওয়া) কর্ত্তরি ঋ—ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি যাহার আনন্দের ভাব নাই বা যে আনন্দিত হয় না তাহাকেই ননন্দ্ বা ননন্দা বা ননন্দ বলে। লৌকিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই অনেক শব্দ তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত মৌলিক অর্থ হারাইয়াছে; কিন্তু "ননন্দ্" শব্দজ "ননদ" কথাটি সেই পুরাকাল হইতে কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারাই প্রাচীন কবিদের রসপুষ্টির সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ননদের বিদ্বেষ-দুষ্ট ভাব হইতেই আমাদের দেশে জটিলাকুটিলার কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন:—

"ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী, মিছে তোলে পরিবাদ।"
"ননদিনী দেখয়ে চোকের বালী।"

ভারতচন্দ্র গাহিয়াছেন:—"সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিনী, ননদী নাগিনী বিষের ভরা।

"ননাস" শব্দ আভিধানিক শব্দ নয়। উচ্চারণের তারতম্যে "ননদ" শব্দ হইতেই "ননাস" শব্দ প্রাদেশিক শব্দ বলিয়া বোধ হয়। তবে স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভ্রাতৃজায়া অপেক্ষা বয়স বেশী হওয়ায় স্বভাবতই তুলনায় বিলাস কম হয় বা থাকে নাই; তাই স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ননাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। কারণ, ন+নাস (বিলাস) যার—এই অর্থে "ননাস" শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। সংস্কৃত লাস্য (বিলাস) হইতে লাস, তাহা হইতে নাস শব্দ আসিয়াছে।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

—

পাখীর চাষ

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে পাখীর চাষের (poultry-breeding) বিদ্যালয়ের খবর পাওয়া যাইবে।—Mrs. A.K. Fawkes, Hony. Secy, United Provinces Poultry Association, Lucknow (U.P.) দুই প্রকার কোর্স আছে; দীর্ঘসময় (long term) ও অল্প সময় (short term)। বেতন যথাক্রমে প্রত্যেক টাম এর জন্য ৫০৲ ও ২৫৲ টাকা। ফার্ম্ম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে মেসে থাকিতে হয়। খরচ প্রত্যহ ১৲ এক টাকার মত পড়ে। নভেম্বরে সেসন্ আরম্ভ হয়।

শ্রী অরূপকুমার সিদ্ধান্ত

প্রতিবেশিনী

শ্রী সজনীকান্ত দাস

কোনো পরিচয় ছিল না অথচ তিনি আমার নিঃসঙ্গ জীবনটিকে ভরিয়া রাখিয়াছিলেন—আমার শুষ্ক জীবন-কাণ্ডটি অলক্ষ্য রসধারায় সিঞ্চিত করিয়া তাহাকে ফলে ফুলে মঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মৌখিক বা ব্যবহারিক কোনো সম্বন্ধ না থাকিলেও এক জায়গায় আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল; সে পরিচয়ের পরিমাপ দুঃসাধ্য। তিনি জানিতেন—আমি আছি; আমি জানিতাম—তিনি আছেন। তাঁহার দিক্ দিয়া আমার অস্তিত্ব তাঁহাকে কি ভাবে আলোড়িত করিত তাহা কখনো জানিতে পারি নাই—তবে কল্পনা করিতে পারিতাম। আমার দিক্ দিয়া তিনি আছেন, এইটুকুই অনেকখানি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বহন করিয়া আনিত। আমার অন্ধকার গৃহকোণটিতেই আমি অপূর্ব্ব স্বর্গ সৃজন করিতাম—তিনি আছেন এই বিশ্বাসে। কাহারো কোনো ক্ষতি হইত না, মুখের কথাটি পর্য্যন্ত খসাইতে হইত না, শুধু তাঁহার অস্তিত্বের অনুভূতিটুকুই আমার শুষ্ক জীবনকে ভরিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি আজীবন তাঁহার নিকট এই ভাবিয়া কৃতজ্ঞ থাকিব যে, আমার অস্তিত্ব অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো দিন বাতায়ন কিম্বা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নাই। আমার প্রাপ্য আমি চক্ষু ও কর্ণের সহায়তায় নিয়মিতই পাইতাম।

তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। একটি বাড়ীরই পাশাপাশি ফ্ল্যাট, মধ্যে দুটি বাতায়ন আর ছোট্ট একটু প্রাঙ্গণ ব্যবধান মাত্র। সেই বাতায়ন-পথ দু'টিতেও নির্ব্বিবাদে আলো-হাওয়া আসিতে পাইত না, সম্মুখে খড়খড়িযুক্ত দু'টি কাঠের আবরণ ছিল; সাম্না-সাম্নি কিছু দেখিবার জো ছিল না। তির্য্যক্ ভাবে চাহিলেই উন্মুক্ত দ্বারপথে তাঁহার শয়ন-ঘরের মেঝে, টেবিলের এককোণ ও আমার কেদারার সম্মুখ ভাগটুকু মাত্র দেখা যাইত, তাঁহার ঘরের অন্য দরজাটি খোলা থাকিলে একেবারে সাম্নের রাস্তার গ্যাসের আলো চোখে পড়িত; আকাশের একটুখানি ফালি উঁকি দিত।

আমি জানালার ধারে টেবিল সাজাইয়া কলম হাতে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া যখন বসিয়া থাকিতাম, কল্পনার ধোঁয়ায় মগজে তোলপাড় চলিত, ভাবকে রূপ দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে মস্তকের রুক্ষচুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া বাতায়ন-পথে চাহিয়া থাকিতাম—হঠাৎ নজরে পড়িত একটি লালপেড়ে শাড়ীর নীচে দু'খানি অলক্তক-রঞ্জিত ছোট ছোট পা। একমুহূর্ত্তে

আমার সমস্ত অন্তর্বিপ্লব কাটিয়া যাইত। কল্পনা শান্ত ও সংহত হইয়া অন্তরের মধ্যেই স্তব্ধ হইয়া যাইত; আমি ব্যাকুল আগ্রহে চাহিয়া থাকিতাম—ওইটুকুই যথেষ্ট, আর বেশী কামনা করিতাম না। আমি ভাল গাহিতে পারিতাম না, তবু পা দু'খানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনের কামনা স্বরের আকারে বাহির হইয়া আসিত। আমি গাইতাম—

দু'টি অতুল পদতল রাতুল শতদল,
জানি না কি লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির 'পরে তার করুণা মাটি হ'ল।
সে কি রে মোর পথে চলিবে না !—

গানের সুর তাঁহার চিত্তকেও অধিকার করিত, দেখিতে পাইতাম, তালে তালে তাঁহার পাদু'খানি মাটিকে আঘাত করিয়া করুণা মাটি করিতেছে। আমার লেখা বন্ধ হইত, কিন্তু মন ভরিয়া উঠিত।

গভীর ভাবাবেগে শেলীর এপিশাইকিডিয়ন্ পড়িতেছি; এমিলীর অস্পষ্ট ছবি চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুততালে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। 'Emily, my Love' বলিয়া জোর দিয়া একটু দম লইতেছি, একটি নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্য-লহরী কানে আসিয়া লাগিল—আমি চমকিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম। এমিলীর অস্পষ্ট ছবি মিলাইয়া গেল, তাঁহার স্পষ্ট হাস্যধ্বনি আমার কাণে বাজিতে লাগিল। স্বামীর সহিত কোনো হাসির কথা হইতেছে নিশ্চয়ই। কান পাতিয়া রহিলাম। Sweet Benediction in the eternal curse—Thou Star above the storm—কিছুই স্মরণে রহিল না; স্বামী-স্ত্রীর উচ্চ হাসি আমার সন্ধ্যার শান্তিকে আলোড়িত করিয়া দিল।

তাঁহারা দুইজন মাত্র থাকিতেন—স্বামী আর স্ত্রী। চাকর বামুন ছিল বাড়্তির ভাগ। আভাসে বুঝিতাম, স্বামী বড় গোছের কিছু চাক্‌রী করিতেন; অভাব-অনটনের চিহ্ন মাত্র ছিল না। দু'টি প্রাণীতে একটি বৃহৎ ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়াছিলেন। চাকর ছিল বামুন ছিল। একটি শাড়ী তাঁহাকে দু'দিন পরিতে দেখি নাই। যাকে বলে পায়ের উপর পা দিয়া থাকা—তিনি সেই ভাবে থাকিতেন। কখনো সেলাইয়ে বসিতেন, কখনো দুই একটি বই বা মাসিকপত্র নাড়া-চাড়া করিতেন—কখনো বা উপরের বা নীচের ফ্ল্যাটে বেড়াইতে বাহির হইতেন; কোনো দিন প্রতিবেশিনীরা তাঁহার বাড়ীতেই জমায়েৎ হইতেন। সেই দিনগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তাঁহার বাবার কথা, মা'র কথা, ভগিনাপতি ও বোনেদের কথা, সর্ব্বোপরি তাঁর 'উনি'র কথা। তিনি মহানন্দে সকলকে সকল সংবাদ দিতেন। 'উনি প্যাজ না দিয়ে মাংস খান—প্যাজ না দিলে নাকি আবার মাংস হয়—তোমরাই বলতো দিদি---' 'আপিসের বড় সাহেব ওঁকে ভারী খাতির করে', বিবাহের রাত্রে তাঁহার বোনেদের কাছে 'উনির' নাকাল হওয়ার কথা। নিজের ছোট বোনের বিবাহের কথা, 'সে থার্ড্ ক্লাসে পড়ে---তার ইচ্ছা ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করার আগে বিয়ে করবে না, কিন্তু, কেমন ক'রেই বা তাকে ঘরে রাখা যায়', তাঁর পিস্‌তুত ভায়ের কথা—রেঙ্গুনে তিনি ডেমনেষ্ট্রেটরি করেন—ডেমনেষ্ট্রেটর্ ঠিক প্রফেসরের মতই' ইত্যাদি নানা ধরণের আলাপ শুনিয়া-শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবে কল্পনায় অনেকখানিই জানিয়া লইয়াছিলাম।

তাঁহার নাম জানিবার সুযোগও একদিন পাইলাম। সে-দিন তিনি কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ীর দরজায় তালা দেওয়া ছিল। একটি ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের ফ্ল্যাটে আসিয়া একটি চিঠি দিয়া গেলেন—যেন পাশের বাড়ীর লোকেরা ফিরিয়া আসিলেই চিঠিটি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়---খোলা চিঠি। পড়িবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না। বুঝিলাম ভদ্রলোকটি তাঁর ভাই। তাঁহার ডাক নামটি জানিলাম---খাঁদু। ভালো নামটি জানিবার সৌভাগ্য হইল না। তাঁহার বাপ-মায়ের উপর রাগ হইল; নিখুঁত মুখের গড়ন, টিকলো নাক---ওর নাম হইল কি না খাঁদু! ডাক নাম খাঁদু হইলে ভাল নাম কি হইতে পারে ইহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিল। কোনো নামই মনঃপূত হইল না।

সেই দিন হইতে খাঁদুকে লইয়া আমাদের নিরস দিনগুলি সরস হইয়া উঠিল। খাঁদুকে আজ রোগা দেখাইতেছে, খাঁদুর সর্দ্দি হইয়াছে, ময়ূরকণ্ঠী কাপড়-

খানাতে খাঁদুকে চমৎকার মানাইয়াছে, খাঁদু আজ কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছে, ইত্যাদি আলোচনায় আমরা তাঁহাকে অনেকখানি আপনার করিয়া লইয়াছিলাম।

রবিবার দিনটা যেন তাঁহাদের বাড়ীতে উৎসব পড়িয়া যাইত। সেদিন বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা। অনেকে নিমন্ত্রিত হইতেন। রবিবারের মধ্যাহ্নে আহার সমাপ্ত করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া খোলা খড়খড়ির পথে মনোযোগ দিয়া সব লক্ষ্য করিতাম। সেদিন আমারও যেন উৎসব পড়িয়া যাইত।

তাঁহার স্বামী বেলা দশটার সময় অফিস চলিয়া যাইতেন—পাঁচটার সময় ফিরিতেন। সেই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে সেলাই, পাঠ ও প্রতিবেশিনীদের সহিত আলাপ ছাড়াও আরো কোনো দিক্ দিয়া কেহ তাঁহাকে সঙ্গ দিত কি না তাঁহার অন্তর্যামীই বলিতে পারিবেন। আমি কিন্তু তাঁহার জন্য দুপুরের অতি প্রিয় নিদ্রাটিকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। টেবিলের পাশটিতে বসিয়া মাথা-মুণ্ডু কি যে করিতাম কাহাকেও তাহার হিসাব দিতে হইলে লজ্জায় পড়িতে হইবে। কবিতা পাঠ করিতাম, গান গাহিতাম, আর দূর দিগন্তের দিকে চাহিবার ভাণ করিয়া 'কাব্য' করিতাম। আমার এই অনন্যনিষ্ঠতা তাঁহাকে কখনো বিচলিত করে নাই। এইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁহার নিরীহ স্বামীর উপর তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল; বস্তুতঃ সেই ভদ্রলোকের নিরীহতায় আমি অনেক দিন মনে মনে সহানুভূতি দেখাইয়াছি। একদিন তাঁহার ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল। পত্নী ঘুমাইয়াছেন এই ভরসায় তিনি যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে চাকরকে ডাকিলেন। দরজা খোলা হইল। বাবু চাকরকে বলিলেন, তিনি রাত্রে কিছু খাইবেন না। এই অবস্থায়, 'তিনি' হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, "কেন, হোটেলে খেয়ে এসেছ বুঝি?" হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া ভদ্রলোকের মুখ কি ভীতত্রস্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল লণ্ঠনের আলোকে তাহা দেখিয়া আমি কৌতুক অনুভব করিলাম। তাঁহার সে ভাব আমি কখনো বিস্মৃত হইতে পারিব না। পূর্ণ উদরে সেই রাত্রে আবার তাঁহাকে আহার করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারই মুখের কথায় তাঁহার পরিচয় যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই আমার যথেষ্ট ছিল; আমি কল্পনার রং চড়াইয়া বাকিটুকু পূরণ করিয়া লইতাম। ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাইতে পারিতাম। উপরের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোকের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন 'তাঁর' বিশিষ্ট বন্ধু। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে খবরাখবর জানিয়া লইবার সুবিধা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, কেন জানি না কোনো দিন বাহিরের কাহারো সহিত তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি নাই। আমাদের বাড়ীর তিনটি প্রাণী মাত্র ঘরে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিতাম। আমার সৌভাগ্য ছিল যে, মাত্র আমার ঘরটি হইতেই তাঁহাদের শয়ন ঘরের অভ্যন্তর অবধি দেখা যাইত;—বন্ধুরা তাঁহার কথাবার্ত্তার শ্রবণ-সুখ মাত্র পাইতেন। দর্শনের বেলায় আমার সাহায্য ছাড়া গতি ছিল না, এজন্য তাহারা আমাকে হিংসা করিত।

এই ভাবে বেশ দিন চলিতেছিল। একদিন বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলাম। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অন্য অনেক দিন বাড়ীতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখি নাই কিন্তু মন এত চঞ্চল হয় নাই—কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া কিম্বা বেড়াইয়া তিনি আবার বাড়ী ফিরিয়াছেন, কিন্তু শুনিলাম এবার 'অনেক দিনের যাত্রা তাঁহার অনেক দিনের পথে।' তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন। মন ভয়ানক দমিয়া গেল। সমস্ত বাড়ীখানা কঠোর কারাগার বলিয়া মনে হইল। তিক্ততায় চিত্ত ভরিয়া গেল। কিন্তু কি করিব, নিরুপায়! কাজে মন বসে না, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার কোনো তাড়া নাই। আড্ডার আশ্রয় লইলাম, কিন্তু শান্তি পাইলাম না। যে অলক্ষ্য জীবন-ধারা আমার শুষ্ক জীবনকে রস দান করিতেছিল কে যেন তাহাকে সরাইয়া লইল; দিনে দিনে আমার শাখা-পল্লব শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

তাঁহার স্বামী কয়দিন পরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভাবিবার অবসর পাই নাই। আজ দেখিলাম, তিনিও ব্যথা পাইয়াছেন। এই অভাবের মধ্যে আমরা দুইজনে এক নিবিড় বন্ধন অনুভব করিলাম। তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে অন্তর ভরিয়া গেল। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "এই বিরহের ব্যথা শুধু তোমার একলার নয়, বন্ধু,—আমিও ইহার ভাগ পাইতেছি; তোমার স্ত্রী বলিয়া তুমি যে কিছু বেশী যন্ত্রণা পাইতেছ তাহা মনে করিও না—আমার প্রতিবেশিনীর অভাবে আমার যন্ত্রণা কিছু কম নয়। তুমি তাঁহাকে পাইয়াছ বলিয়াই তাঁহার অভাবে তোমার দুঃখ, আমি তাঁহাকে পাই নাই বলিয়াই আমার দুঃখ বেশী।"

শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকি। তাঁহার স্বামী বাহিরে-বাহিরে থাকেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে আর দীপ জ্বলে না, ধূপ-ধূনার গন্ধ ভাসিয়া আসে না, চাকর-বামুনের বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া কোলাহল করে—আমার রাগ হয়। তিনি থাকিলে কি এমনটি হইবার জো ছিল?

আগে খুব ভোরে উঠিতাম—ভোরে উঠিবার পুরস্কার পাইতাম বলিয়া। কোনো রকমে মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারটি দরজার দিকে ফিরাইয়া বসিয়া তাঁহার জাগরণের প্রতীক্ষা করিতাম, খট্ করিয়া শব্দ হইত, দরজা খুলিয়া যাইত, তিনি আলুথালু বেশে একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেন—তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিত, 'এই যে প্রাতঃ-প্রণাম', আমিও চোখে চোখে প্রাতঃনমস্কার জানাইতাম। সেই দৃষ্টিটুকুর রেশ সমস্ত দিন সর্ব্বাঙ্গে রিম্‌ঝিম্ করিত। আজকাল বিছানা আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকি; নেহাৎ যখন না উঠিলে নয় তখন উঠি। জানালা দিয়া দেখি, স্বামীটিরও আমার মত দুর্দ্দশা। হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, চাকর বামুনের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া মাঝে মাঝে একটু আনন্দও যে না পাই তাহা নয়।—"কেন, বন্ধু, সাধ করিয়া দুঃখ ডাকিবার প্রয়োজন কি ছিল?"

* * * *

সুখে দুঃখে একটি বছর কাটিয়া গেল। দুঃখের ভাগই বেশী; স্বামীটি মাঝে মাঝে দু-চারি দিনের জন্য অন্তর্হিত হন। ফিরিবার পর তাঁহাকে দেখিলে আমি উতলা হইয়া উঠি। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—"বন্ধু, তিনি কেমন আছেন? ভালই বোধ হইতেছে যেন?" আশে-পাশের সকলের সঙ্গেই অল্প-বিস্তর আলাপ হইল। তাঁহার সঙ্গে কেন জানি না পরিচয় করিতে পারিলাম না;—ঈর্ষা নয়, এ আমার দুর্ব্বলতা।

তিনি আসিলেন ছয় মাসের শিশু সঙ্গে লইয়া। আমার শুষ্ক মরু-বুকে আবার স্রোতোধারা বহিতে সুরু করিল; আমার শুষ্ক গাছে ফল ধরিল। শিশুর ও মাতার কলকাকলীতে আমার প্রভাত-সন্ধ্যা মুখরিত হইয়া উঠিল। অনেক দিন পরে তাঁহার সহিত চোখোচোখি হইল—"এই যে আসিয়াছেন!" তাঁহার ভাবটা এই—"আপনি ভালো ছিলেন, আশা করি!"

এবার শুধু তিনি নন, তাঁহার কন্যাটি পর্য্যন্ত আমার আনন্দের রসদ জোগাইতে লাগিল। শশিকলার মত দিনে দিনে সে আমারই চোখের সম্মুখে বাড়িতে লাগিল। ঘটা করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হইল, গায়ে গহনা উঠিল।

মশারী ও দোল্‌না ছাড়িয়া শিশু বাহিরে আসিল। সে চলিতে শিখিল। কান্না-হাসি হইতে তাহার কণ্ঠে অস্ফুট ভাষা ক্রমশ স্ফুটতর হইতে লাগিল; সে আজকাল অসম্ভব রকম বিকৃত করিয়া পৃথিবীর সকল জিনিসের নামকরণ করে; পৃথিবীর দৈনন্দিন খবর সংগ্রহে তাহার অত্যধিক আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। মায়ের নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর এখন এই মেয়েটিকে লইয়া অবলীলাক্রমে কাটিয়া যায়। মায়ে-মেয়েতে কথা হয়, আমি উৎকর্ণ হইয়া অলক্ষ্যে বা লক্ষ্যে থাকিয়া সেই রসধারা পান করি।

আমার আইন পাঠ সমাপ্ত হইল। এইবার আমার দেশে ফিরিবার পালা। কিন্তু যাইতে পারিলাম না। পিতাকে জানাইলাম, কলিকাতায় থাকিলে একটা প্রফেসারী জুটিবার সম্ভাবনা আছে। আমি রহিয়া গেলাম।

ডিগ্রী ভাল ছিল, ওকালতী পড়িতে-পড়িতেই চেষ্টা করিলেই চাক্‌রী পাইতে পারিতাম, কিন্তু চাক্‌রী করিতে পারি নাই। এবার অগত্যা চাক্‌রীর সন্ধানে বাহির

হইতে হইল। কম মাহিয়ানায় একটা প্রফেসারী জুটিল। বন্ধু দুইজন বিদায় হইল। আমি একলা রহিয়া গেলাম।

চারিদিক হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধের কথা কাণে আসিতে লাগিল। আমি ভয় পাইলাম। বিপদ যখন বিশেষ আকার ধারণ করিয়া ভাবী পত্নীর জ্যেষ্ঠতাত-রূপে আমার শূন্য আলয়ে একদিন দেখা দিলেন তখন দেখিলাম চুপ করিয়া থাকা চলে না। মুখ ফুটিয়া পিতাকে জানাইলাম, বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই, অন্ততঃ আরো কিছুদিন সবুর করিতে চাই। কয়েকখানি পত্র-বিনিময় হওয়ার পর নিশ্চিন্তে থাকিবার অবসর পাইলাম।

বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি সত্য-সত্যই আমার ছিল না। মন যখন সঙ্গিনী-পিয়াসী ছিল তখন পৃথিবীর যাবতীয় অনূঢ়া কন্যাদের লইয়া আমি স্বপ্ন রচনা করিতে পারি নাই—এক স্থানে আসিয়া আমার কল্পনা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অবিবাহিত যুবক যে অরূপ ধোঁয়ার রাজ্যে বাস করে, একজন মানসীকে অবলীলাক্রমে বিস্মৃত হইয়া প্রতিদিন নূতন মানসীর পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং এই ছোটাছুটিতে হাঁপাইয়া উঠিয়া শুধু দম লইবার মানসে যে হোক্ সে হোক্ একজনকে জীবন-সহচরী করিয়া নির্ব্বিবাদে জীবন কাটাইয়া দেয়, আমি তাহাদের মত অস্পষ্টতার মধ্যে থাকিতে পারি নাই। একদিন মাত্র স্বপ্ন-সূচনায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, মন বলিয়াছিল—বা, বেশত! তারপর তাঁহাকে ঘেরিয়াই আমার যত কবিতা-কাব্য আকার পরিগ্রহ করিল; আর দ্বিতীয় মানসী পরিগ্রহ করিবার অবকাশ পাইলাম না।

আজ যখন তিনি জননীর পদবী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আমি চকিত হইয়া দেখিলাম আমিও কখন্ যেন জীবনের এক কোঠা হইতে ভিন্ন কোঠায় আসিয়া পড়িয়াছি, আমারও পদবী-বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি এখন আর 'মানসী' নন, তিনি এখন জননী। শিশুর নিত্য নূতন রূপ ও লীলা আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেখানে একটিমাত্র বন্ধন ছিল সেখানে দুইটি প্রবল বন্ধন অনুভব করিলাম।

এখন আর দ্বিপ্রহরে মা ও মেয়ের লীলা সম্ভোগ করিতে পাইতাম না। কলেজের অল্পবয়স্ক ছেলেদের নিয়মিত অর্থনীতির পাঠ দিতে হইত। কিন্তু মন আমার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত। অধ্যাপনার অবসরে যখন অধ্যাপকবৃন্দের শ্মশ্রু ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম তখন একটি শিশুর কলকাকলী কর্ণে শুনিতে পাইতাম; আর, নানা অসম্ভব চিন্তায় মন পীড়িত হইত, হয়ত মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, মেয়ে বারান্দায় রেলিংয়ের ভিতর পা ঢুকাইয়া দিয়া আর বাহির করিতে পারিতেছে না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে; দোয়াত লইয়া খেলিতে খেলিতে হয়ত খানিকটা কালিই খাইয়া ফেলিয়াছে আর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া মা হয়ত কাঁদিতে বসিয়া গিয়াছেন; এই ধরণের নানা চিন্তায় অধ্যাপকের মনও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত।

খুকু দু'য়ের কোঠায় পা দিল। ইতিমধ্যে জীবনেও আমার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বাবা মারা গেলেন। পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম শেষ হইলে বিমাতা বৈমাত্রেয় ছোটভাই ও বোনটিকে লইয়া বাপের বাড়ী আশ্রয় করিলেন। দেশের বাড়ী শূন্য পড়িয়া রহিল। বিমাতা বারম্বার পত্র দিতে লাগিলেন, এমত অবস্থায় আমার বিবাহ করা একান্ত আবশ্যক। অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছু সময় চাহিলাম। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিচিত লোকেরা বিমাতার সহিত ষড়-যন্ত্র সুরু করিয়া দিলেন। আমি কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

বয়স আমার যতই হউক, মনে মনে আমি প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পৌছিয়াছি। বিবাহের কথায় মনে দক্ষিণাবায়ু বহিতে সুরু করিল না, শীতের কম্পন অনুভব করিলাম। নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে যদি বিবাহ করিতেই হয় নিজেও সুখী হইব না, একজন নিরীহ বালিকাকেও অসুখী করিব। এম্‌নি আমার দুর্ভাগ্য, একটা ছোট ভাইও ছিল না যাহার বিবাহ দিয়া বিমাতাকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারি। যত দিন যাইতে লাগিল, আমি ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

খুকু বড় হইয়াছে। তাহার অন্য নাম জানি না। সে আমার কাছে খুকুই রহিয়া গেল। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে

সর্ব্বদা বকিয়া যায়। সে-সব কথার অর্থ অন্য কেহ না বুঝুক আমার কাছে সেগুলি বহু অর্থই বহন করিয়া আনিত। আমাকে জানালায় লক্ষ্য করিয়া রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে সে 'এই' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। আমি রোমাঞ্চিত গাত্রে সভয়ে বলিয়া উঠিতাম, "প'ড়ে যাবে, প'ড়ে যাবে।"—মা আসিয়া মেয়েকে সরাইয়া লইয়া যাইতেন।

মাও আজকাল মাতৃত্বের গৌরবে অটল হইয়া বিরাজ করিতেছেন; চালচলন ভারিক্কি গোছের হইয়াছে, খুকীকে লইয়া তিনি যেসকল সম্ভব অসম্ভব ব্যাপারের গুরুগম্ভীর আলোচনা করিতেন তাহার কিছু কিছু আমি শুনিতে পাইতাম। মা হয়ত খুকুর কোনো একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "খুকু, ছি, অমন করোনা, করতে নেই।" খুকু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'কেন মা' এবং পরক্ষণেই পাশের বাড়ীর ছেলেটা সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিল, যাহাতে মায়ের গাম্ভীর্য্যও টলিয়া গেল, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দাঁড়াও, তোমার বাবা আসুন। তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসবেন'খন, তখন মজা টের পাবে।" খুকু বলিয়া বসিল, "তুমিও যাবে ত মা," "দূর্ বোকা" বলিয়া মা হয়ত মেয়েকে চুমু খাইলেন।

পিতার চালচলন তাহার নিকট ভারী রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত। তিনি যে সকালে বসিয়া হিজিবিজি আঁক কাটেন, মা তাঁহার খাবার চা ইত্যাদি সযত্নে সরবরাহ করেন, তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তিনি বাহির হইয়া যান, সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসেন, আবার বেড়াইতে বাহির হন এবং কখন্ আসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন খুকু তাহা জানিতেও পারে না। পিতার এইসব ব্যবহারে খুকু কৌতুক অনুভব করে, মাতাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করিয়া তোলে। খুকু জিজ্ঞাসা করে "মা, বাবা কোথা যান?" মা বলেন, "আপিসে"। খুকী হয়ত অমনি বলিয়া বসিল, "তুমি আপিস যাওনা কেন, মা?" মা অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "তাহ'লে বাড়ীতে থাকবে কে?" খুকু বলিল, "কেন মার্কণ্ড।" মার্কণ্ড বাড়ীর চাকর।

ইহার পরে আমার প্রতিবেশিনীর ইতিহাস আর বেশী নাই। একদিন অশুভ ক্ষণে খুকুর পিতার সহিত পরিচয় হইয়া গেল। বাজার করিতে গিয়াছিলাম; দেখি, খুকুর বাবার হাত ধরিয়া খুকুও বাজারে গিয়াছে। আমাকে দেখিবা মাত্র খুকু চিনিতে পারিল; ডাকিল, "এই।" আমি তাহার কাছে গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া খুকুর পিতাকে নমস্কার করিলাম। তিনি প্রত্যাভিবাদন করিয়া খুকুকে কোলে লইতে গেলেন। আমি বলিলাম, 'থাক্ না, আপনি অপরিচিত হ'লেও খুকু আমাকে চেনে। আমি আপনাদেরই প্রতিবাসী।'' তিনি বলিলেন—তিনি জানেন। তার পর বাজার করিয়া ফিরিতে ফিরিতে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। তিনি আমার বিষয়ে অনেক খবরই রাখেন দেখিলাম। জানিয়া শুনিয়া আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি একলা থাকেন দেখি, আপনার গিন্নী কোথায়?" "ইচ্ছা হইল বলি,"আপনার বাড়ীতে।" হাসিয়া বলিলাম, "সে বালাই নেই।" "অর্থাৎ—" "আমি বিবাহ করি নাই।" তার পর জাতি-গোত্রের খবর। দেখিলাম, ভদ্রলোক নিরীহ হইলেও সংসারী বটেন। আবিষ্কার করিলেন, শালীর সহিত আমার বিবাহ চলিতে পারে। সেই রাত্রে আমার প্রতিবেশিনীর গৃহে আমার নিমন্ত্রণ হইল।

পূর্ণ পাঁচ বৎসরের দূর হইতে নিবিড় পরিচয়ের পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। অম্লান বদনে তিনি বলিলেন,—আপনার গলা শুনিয়াছি,"আপনিই বুঝি কবিতা পাঠ করেন, গান করেন?" এতদিনের পরে—'বুঝি।' আমার হাসি পাইল, বলিলাম, "হ্যাঁ, আমিই সময়ে অসময়ে আপনাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি হয়ত।" "খুকু আপনার কথা মাঝে মাঝে বলে বটে, আমি ভেবেছিলুম ওটা মেস।" আমি মুখের কোণে একটু শীর্ণ হাসি টানিয়া বলিলাম, "অন্যায় ভাবেননি, চাকর-ঠাকুরের কৃপায় যতদিন থাকতে হয় ততদিন মেসই ত।"

তার পর আমার সংসারের কথা, বাড়ীতে কে আছে, ভাইবোন কটি ইত্যাদি। সবগুলির জবাব দিলাম। বুঝিলাম, ইহার পর আক্রমণ সুরু হইবে।

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু বাতায়ন পানে আর চাহিতে পারিলাম না। এক নিমিষের পরিচয়ে আমার

সমস্ত স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। কোথা দিয়া অলক্ষ্যে কে যেন আমার জীবন-বীণার তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া তাহা ছিঁড়িয়া দিল। আমার সমস্ত দিন ও রাত্রি বিস্বাদ হইয়া গেল।

সেই ফার্ষ্টক্লাসে পড়া মেয়েটি এতদিনে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়াছেন, এখনো বিবাহ হয় নাই। তাঁহারই যূপকাষ্ঠে বলিস্বরূপ আমাকে উৎসৃষ্ট হইতে হইবে প্রস্তাব আসিল। মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলাম। কিন্তু শ্যালিকার প্রতিবেশী হইয়া আর থাকিতে পারিলাম না। নববিবাহিত বধূ অনেক অনুরোধ করিল, শ্যালিকার তরফ হইতেও যথেষ্ট উপরোধ আসিল; কিন্তু, সেখানে থাকিতে পারিলাম না। সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। যেখানে গত পাঁচ বৎসর কাল অদৃশ্য পরিচয়ের সূক্ষ্ম-বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিলাম,' সেখানেই শ্যালিকা-সম্বন্ধরূপ কাছির বাঁধন মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিল। আমি তাহা অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে লগিলাম। আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র পীড়িত হইল কিনা বুঝিতে পারলাম না; কল্পনা করিবার ভরসাও হইল না। শুধু খুকু মাকুর মত এবাড়ী ওবাড়ী ছোটাছুটি করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিল।

আমার কল্পলোকের 'খাঁদু' মরিয়া গিয়া বাস্তব জগতের মাধবী দেবী হইলেন। আমার প্রতিবেশিনী আমার নিকট-আত্মীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইল কি না তিনিই বলিতে পারেন—আমি কিছু বলিব না।

অপরাজিতার ব্যথা

শ্রী কৃষ্ণধন দে

এতটুকু শুধু স্নেহের পরশ চাই
　　তরুণ-তরুণী হাতে,
জানি মোর স্থান বিলাস-মালায় নাই
　　বাসর-মিলন-রাতে;
শুধু দেবপূজা, শুচি আর আরাধনা,
তুলসীর পাতা, চন্দন, আলিপনা,...
জীবনের যত হাসি আশা গান আলো
　　নিভে গেছে এক সাথে!
নিখিল বিশ্ব কালো ওগো, সব কালো
　　শূন্য জীবন-প্রাতে!

প্রভাতশিশিরে ফুটে উঠে মোর ব্যথা,
　　আড়ালে লুকায়ে থাকি;
অরুণ-কিরণ কানে কানে কহে কথা—
　　"তোল, প্রিয়ে, চারু আঁখি।"
ওগো, স'রে যাও, ওকথা শুনিতে নাই,
এখনি কে কোথা...ছি ছি লাজে ম'রে যাই!
এ জনম সব দেবতার পায়ে ঢালা,
　　কিছু আর নাহি বাকী,
সকল বেদনা, সকল কামনা জ্বালা,
　　দেবতা নিয়েছে ডাকি'!

হেসে বলে চাঁদ—"ওগো, ওগো রূপরাণি,
　　কেন কুণ্ঠিতা অত?
কেন যৌবনে রুদ্ধ জীবনখানি?
　　আছে যে কামনা কত!"
মরে সমরীণ আশে পাশে ঘুরে' ঘুরে',
কেঁদে ফিরে যায় ভ্রমর আকুল সুরে,...
জমাট অশ্রু রুধেছে হিয়ার দ্বার,
　　নিষ্ফল আশা শত!
শুধু বুকে বহি মৌন-বেদনা-ভার
　　চির পাষাণীর মত!

শত প্রলোভনে নহি আজো পরাজিতা,
　　লক্ষ-কামনা-জয়ী;
জলে দিশাহারা বক্ষে বাড়বচিতা,
　　তবু গৌরবময়ী!
ফিরে লও এই গরবের বোঝা মোর,...
ফিরে দাও শুধু একটু স্নেহের ডোর,...
জোর-ক'রে-দেওয়া পূত গৈরিক-ভার
　　সহিবারে পারি কই?
শুধু বাহিরের আবরণে ঢাকি' আর
　　কত শাপ শিরে বই!
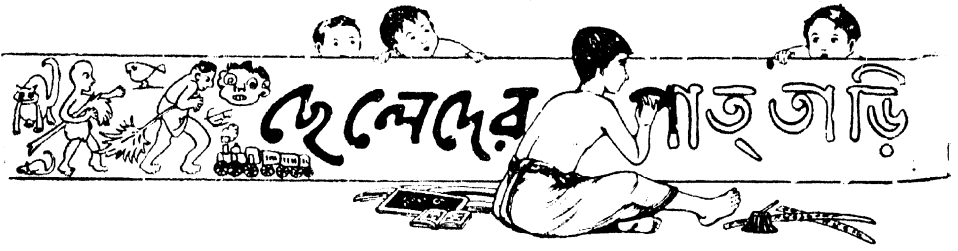
ক্যাড্‌মস্‌ ও ইউরোপা

ফিনিসিয়ার একটি উপত্যকা বড়ই সুন্দর। সেই উপত্যকায় স্বর্গের নন্দনের শোভা ছিল। নানারকমের ফুলে-ফলে উপত্যকার বন ছেয়ে থাকৃত, মাসের পর মাস—বার মাস। সে উপত্যকার বনে চির-বসন্তের খেলা ছিল। ঘন কাল রংএর পাতার মধ্য থেকে সোনালি রংএর কমলালেবু জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ত। লাল-লাল খেজুর-ফল ঝুলে থাকৃত। আরো কত রকমের কত রংএর কত ফল—সে কি বাহার! বনের বাতাস সকালে ত্নপুরে সন্ধ্যায় ফুলের গন্ধে ফলের গন্ধে মধু হ'য়ে বইত।

সেই উপত্যকায় তাদের মাকে নিয়ে পরম সুখে বাস করৃত ছোট ছোট ত্নটি ভাই-বোন,—ক্যাডমস্‌ আর ইউরোপা। সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। অনেক—অনেক—অনেব—দিনের।

মনের আনন্দে মাকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একদিন নদীর ধারে তারা খেলা করৃছে, এমন সময় মাঠের মধ্যে একটা ষাঁড় এসে দেখা দিলে। ষাঁড়টি ছিল বড়ই সুন্দর। সমস্ত শরীরটি ছিল শাদা ধবধবে, বরফের মতো।

খানিক পরেই ষাঁড়টি শান্ত হ'য়ে সবুজ কোমল ঘাসে ছাওয়া মাঠে শুয়ে পড়্‌ল।

ষাঁড়টির কাছে তারা এগিয়ে গেল। আরো কাছে—আরো খুবই কাছে। তবুও ষাঁড়টি নড়্‌ল না—বরং সে যেন তার ডাগর-ডাগর ত্ন'টি চোখ দিয়ে তাদের ডাক দিলে। তাদের বল্‌লে,—এস, আমার খুব কাছে এসে আমার সঙ্গে খেলা কর। আমি তোমাদের খেলার সাথী হ'ব।

ক্যাডমস্‌ হাত বাড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠটাকে চাপ্‌ড়ে দিলে। ষাঁড়টি অল্প অল্প ডাক ডেকে তার বিপুল আনন্দ জানিয়ে দিলে। ভাইটির পিঠ চাপড়ান দেখে বোন্‌টিরও সাহস হ'ল—ইউরোপা হাত বাড়িয়ে আদর ক'রে থেকে থেকে মুখের পরে চাপড় মেরে চল্‌ল। আর শিং ত্নটোকে মুঠোর মধ্যে চেপে চেপে ধর্‌তে লাগ্‌ল। ষাঁড়টি আদর পেয়ে আরাম ক'রে ধীরে ধীরে মুখটি ইউরোপার কোলের-কাপড়ে ঘস্‌তে লাগল। ক্যাডমসের ষাঁড়টির উপর বড়ই মায়া হ'ল। তাকে তার বড়ই ভাল লাগ্‌ল। তাইতে পিঠের উপর সে চ'ড়ে বস্‌ল। ষাঁড়টি তখন দাঁড়িয়ে উঠে ক্যাডমস্‌কে পিঠে নিয়ে ধীরে-ধীরে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। তারপর যখন সূর্য্য ডুবে গেল পশ্চিমে ঐ অনেক দূরের পাহাড় গায়ে, ক্যাডমস্‌ আর ইউরোপা ত্নটি ভাই-বোন বাড়ী ফির্‌ল।

বাড়ী গিয়েই তারা তাদের মা টেলিফাসাকে মনের বিপুল আনন্দে বল্‌লে—ওগো মা!, শোন শোন কি চমৎকার একটি ষাঁড়ের সঙ্গে আজ সারাক্ষণ আমরা খেলা করেছি! কি যে সুন্দর বলা যায় না, কেমন ধবধবে শাদা!

পরের দিন যাই না ইউরোপা শক্ত হ'য়ে ষাঁড়ের পিঠে চেপে বসা অম্‌নি ষাঁড় দে-দৌড় দে-দৌড়-লম্বা দৌড়—উর্দ্ধে আকাশ-মুখে।

ক্যাডমস্‌ ভাবলে, এই যে ষাঁড়ের লম্বা ছুট্‌, এ কিছুই নয়, খেলার ছুট। তাই সে পিছন-পিছন দৌড়তে লাগ্‌ল। আর ডাক্‌তে লাগ্‌ল থেকে থেকে—থাম থাম থাম থাম।

ক্যাডমস্‌ যতই জোরে দৌড়য় ষাঁড়টি দৌড়য় ততই জোরে। ক্যাডমসের তখন ভুল ভাঙল। বুঝ্‌লে—এ ছুট খেলার নয়, বোনকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ছুট। ষাঁড়টি চল্‌ল বিষম ছুটে পবন-বেগে নদীর তীর দিয়ে, খাড়াই পাহাড় যেথায়

ছিল সেই পাহাড়ের ওপর খট্-খটিয়ে। এমনি ক'রে বিদ্যুৎ-বেগে দৌড়ে গিয়ে পাহাড়-বনে লুকিয়ে গেল।

বোন্‌টিকে হারিয়ে ক্যাডমসের বুক ফেটে কান্না এল। সে তো স্বপ্নেও চিন্তা করেনি এমন ক'রে এত সহজ ভাবেই বোন্‌টিকে হারিয়ে ফেল্‌বে। সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশ রাঙিয়ে দিয়ে অনেক নীচে হেলে পড়েছে। ভাইয়ের বুকে দুঃখের ঘন কালী দেখা দিলে।

কেমন ক'রে ক্যাডমস্ বাড়ী ফেরে এখন!—হায়! হায়!—কি ক'রে যায় মায়ের কাছে? বোন্‌কে হারিয়ে কোন্ কথা শোনায় মায়ের কানে? তবু হায়! ক্যাডমস্‌কে বাড়ী ফিরে যেতে হ'ল।

টেলিফাসা দূর থেকে লক্ষ্য কর্‌লে ক্যাডমসের সঙ্গে তার বোন্‌টি নেই।—ইউরোপা আমার কোথায়! যাই যাই এগিয়ে দেখি, এগিয়ে যাই।

মাকে সম্মুখে এগিয়ে আস্‌তে দেখেই দুঃখে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল—ক্যাডমসের মুখে বাক্য সর্‌ল না। খানিক পরে বল্‌লে—মা, তোমায় কি বল্‌ব বলো! ঐ যে সেই ষাঁড়টা সেই ইউরোপাকে পিঠে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কি সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল বল্‌তো?—

সে কেমন ক'রে বলি—সে তো জানিনে মা!

কোন্ দিকে বল্ তো দেখি, কোন্ দিকেতে গেল?

সূর্য্য যেদিকে আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে রক্ত হ'য়ে ডোবে সেই পশ্চিম পানে।

তবে রাত পোহালেই কাল্‌কে উঠে ভোরের বেলায়, আমরা যাব খুঁজ্‌তে। দেখি একবার সন্ধান কোনো কিছু মেলে কি না।

সারাটা রাত মায়েতে ছেলেতে মিলে জেগে কাটিয়ে দিলে। তারপর সূর্য্য উঠ্‌বার অনেক পূর্ব্বে তারা দুজনে চল্‌লো—পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, পরপর উপত্যকার মধ্য দিয়ে, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে, বনের পর বন, এমনি ক'রে অনেক অনেক দূরে পড়্‌ল গিয়ে পশ্চিমের প্রায় প্রান্ত-দেশে। পথে যাকেই দেখেছিল তাকেই ডেকে বলেছিল—ওগো ধব্‌ধবে একটা ষাঁড়কে দেখেছ কি? সে তার পিঠে ছোট্ট একটী মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

"দেখেছি" এমন কথা কেউ বল্‌লে না। সবাই বল্‌লে —"না।"

তবু মা আর ছেলে এগিয়ে চল্‌লো। হারানো মেয়ে ইউরোপার কিন্তু সন্ধান কিছুই মিল্‌ল না। কখন্ যেন তারা এসে পৌঁছল পাহাড়ের গায়ে। আকাশভেদী উচ্চপাহাড় শ্রেণী। তাদের শিরগুলিতে বরফ-মুকুট অস্তরবির স্বর্ণ আলোয় ঝল্‌সে যায়। কখনো বা তারা বিশ্রাম কর্‌তে ব'সে পড়্‌ল মস্তবড় নদীর ধারে। সেখানে জলে শ্বেত বর্ণের শত শত পদ্মফুল ভাস্‌ছে। তাদের মাথার 'পরে দেবদারুডাল দুল্‌ছে। কখনো বা তারা এসে পড়্‌ল ঝর্‌ণা-পারে। পাথরের গায়ে জলের স্রোত ধাক্কা খেয়ে জলের কণা হাজার মুখে রূপোর কণায় ছিট্‌কে পড়্‌ছে, যেন ধুনুরি তুলো ধুনছে।

এইরকম স্থানে এসে এসে এইরকম দৃশ্য দেখে দেখে তারা কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌ল ইউরোপার কথা। ভাব্‌তে লাগল—ইউরোপা থাক্‌লে এসব স্থান, এসব দৃশ্য কতই না মধুর হ'য়ে উঠ্‌ত। এদের সৌন্দর্য্য তাকে হারিয়ে আমাদের কাছে কিছুই নেই।

এই না ব'লে তারা চল্‌ল। সুদূর পথ হেঁটে হেঁটে মা বিষম ভাবে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। পথ তো আর চলা হয় না। তাই না দেখে মাকে ছেলে বল্‌লে —মা, তুমি এইখানেতেই একটু বিশ্রাম করো না কেন!

মা বল্‌লেন—না বাছা, এগিয়ে চল্। এখনও পুরো আশা আছে, মার বুকের মধ্যে হয়ত তাকে পাব, আরো এগিয়ে যাই। ব'সে পড়্‌লে বোনটিকে তোর পাওয়া যাবে না আর।

তারপর খানিক এগিয়ে মার পা দুটি আর চল্‌তে চায় না—শরীর একেবারে শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়ল। তখন তিনি ক্যাডমস্‌কে ডেকে বল্‌লেন—আর ত এগিয়ে সাম্‌নে চলা হয় নারে সোনা। এই আমি এইখানেতেই শুয়ে পড়্‌লাম। চোখ দুটি বিষম ঘুমে ঢুলে আস্‌ছে। ঘুমিয়ে পড়্‌লে হয়ত আর জাগ্‌ব না। তুমি কিন্তু ইউরোপাকে খুঁজেই

চোলো। চল্‌তে চল্‌তে আমার বিশ্বাস তুমি তাকে পাবেই পাবে। তার সঙ্গে তোমার যখন দেখা হ'বে তখন বোলো—তোর মা পাগল হ'য়ে ব্যাকুল হ'য়ে পথ-বিপথে ঘুরে' বেড়িয়েছেন তোকে দেখ্‌বার আশায়। কিন্তু হায়! পরে আর পার্‌লেন না। শ্রান্ত হ'য়ে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে মহানিদ্রায় পথের মধ্যে শুয়ে পড়্‌লেন—আর তিনি জাগ্‌লেন না।

বৎস! এই তবে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। যদি আর নাই বা জাগি, জান্‌বে তবে চল্লাম আমি সেই দেশেতে—যেখানে ঘুমের নেশা নেই, শুধুই আছে জেগে থাকা, যেখানে মৃত্যু-ভয় নেই, শুধুই জীবন-স্রোত; নিরানন্দের দুঃখ নেই, শুধুই আনন্দের খেলা; বিচ্ছেদের ব্যথা নেই, শুধুই আছে মিলন-যোগ। সেখানে আমরা আবার একত্রে মিল্‌ব। সুখে, যেমন সুখে ছিলাম, তারো চেয়ে অনেক সুখে দিন কাট্‌বে। মিল্‌বই আমরা, এই বিশ্বাসকে মনের মধ্যে দৃঢ় ক'রে জাগিয়ে রেখো।

টেলিফাসা যখন ঘুমিয়ে পড়লেন স্বর্ণসূর্য্য তখন অস্তমিত। কৃষ্ণ রংএর পাহাড়-গায়ে রৌপ্যচন্দ্র পূর্ণরূপে দেখা দিয়েছে। মায়ের শিয়রে ব'সে ব'সে ক্যাডমস্ সমস্ত রাত জেগে জেগে কাটিয়ে দিলে।

প্রত্যূষে টেলিফাসার মৃত্যু হ'ল। সমস্ত মুখখানিতে শান্তি। মুখটি যেন হাসিমাখা। ক্যাডমস্ বুঝ্‌লে তার মা গিয়েছেন সেই দেশেতে, সেই সুন্দর দেশ যেখানে সব পবিত্র চিত্ত গিয়ে থাকেন, সেই অমরধামে। ক্যাডমসের মনে দুঃখ বিষম হ'য়ে বাজ্‌ল।

ক্যাডমস্ তার মায়ের দেহকে মাটির নীচে কবর দিলে। সেই কবরের মাটিকে ছেয়ে নানা বর্ণের ফুল ফুট্‌ল।

মার কবরের মাটিকে প্রণাম ক'রে ক্যাডমস্ বিদায় হ'ল —ফাঁকা মনে একা পথ চল্‌তে লাগল। কোথায় যাবে, কোন্ দিক ধ'রে কেমন ক'রে ইউরোপাকে পাবে মনের মধ্যে শুধুই সেই চিন্তা। এমন সময় দেখ্‌তে পেলে হঠাৎ খানিক দূরে একটি জোয়ান রাখাল—গরু বাছুর ছাগল ভেড়ার দলকে নিয়ে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। রূপে তার বড়ই শ্রী—মন-ভুলানো। মুখের রং সোনার রং—সেই রংএতে রবির তেজ। সোনার বীণা সোনার ধনুক হাতে। কাঁধে সোনার তূণ, তীরে ভরা।

সেই যে রাখাল, সে রাখাল নয়। রাখালের ছদ্মবেশে দেবতা এক দাঁড়িয়ে ছিলেন—নামটি তাঁর এ্যাপোলো।

ক্যাডমস্ তা জানত না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওগো, এদিকে কি কোনো শাদা ষাঁড়কে দেখ্‌তে পেলে—? পিঠে তার একটি মেয়ে। আমার বোন্‌টীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বল্‌তে পার কোন্ পথ দিয়ে চল্‌ব আমি, কোন্ পথে গেলে দেখ্‌তে পাব? এ্যাপোলো বললে, —এইদিক পানে চল্‌তে থাক। চল্‌তে চল্‌তে পৌঁছবে গিয়ে ডেলফাই দেশে—মস্ত উঁচু পাহাড়ের নীচে, নামটি তার পার্‌নেসাস্। সেই ডেল্‌ফাই দেশে খবর নিলে বোন্‌কে তোমার দেখ্‌তে পাবে। দেখ্‌তে পেলেই তাকে নিয়ে, ফিরে এস, সেই দেশেতে দু'চার দিন বাস কর্‌তে যেও না। কারণ তোমায় আমি শক্তি দেব। তাই দিয়ে তুমি একটি সহর তৈরী কর্‌বে। তোমায় আমি সেই সহরের রাজা কর্‌ব। এখন যাও। ডেল্‌ফাই থেকে যখন ফির্‌বে, একটি গরু পথের মধ্যে দেখ্‌তে পাবে —দেখ্‌তে থাসা। তুমি তোমার বোন্‌কে নিয়ে গরুটির পিছে চল্‌তে থাক্‌বে—সে যেদিক পানে চলে। তার পর যেখানেতেই গরু মাটির প'রে শুয়ে পড়্‌বে সেইখানেতেই তোমায় সহর তৈরী কর্‌তে হবে। ভয় পেও না—তোমায় আমি শক্তি দেব।

পাহাড়ের নীচে সেই দেশ। সেই ডেলফাই দেশের দিকে ক্যাডমস্ রওনা হল। এ্যাপোলার কথায় যখন সেই দেশেতে পৌঁছল তখন উষার হাসি আকাশভরা। দেখ্‌তে পেলে এক শ্বেতপাথরের মন্দিরের স্তম্ভে চূড়ার অঙ্গে দিব্যি শোভা! সেই মন্দিরে ক্যাডমস্ গিয়ে প্রবেশ ক'রেই দেখ্‌তে পেলে তার প্রাণের প্রিয় হারানো বোন্ ইউরোপাকে। দেখেই বল্‌লে—এ কি! এ তুই নাকি রে ইউরোপা! কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ আজ!

কেমন ক'রে, কোন্ দিনেতে কোন্ পথের পর কোন্ পথ ঘুরে ষাঁড়টি তাকে শ্বেত-পাথরের মন্দিরেতে রেখে

গেল উল্লাসের প্রথম দম সাম্‌লে নিয়ে সেই কথা সব ইউরোপা ক্যাডমস্‌কে বল্‌তে লাগল্‌।

বল্‌লে ---একি দেখ্‌ছি শরীর তোমার! এমন কৃশ রক্তশূন্য কেন? আমার কাছে একাই এলে? মাকে কোথায় রাখ্‌লে? কখন মায়ের দেখা পাব?---কোথায় পাব বল? তোমার সঙ্গে এলেন না? কেন, বল কেন?

ক্যাডমসের চক্ষু দুটি উষ্ণ জলে পূর্ণ হ'ল। কণ্ঠ দুঃখে অর্দ্ধ-রুদ্ধ হ'ল।

সে বল্‌লে—আমরা মাকে হারিয়েছি। এ-জগতে আর দেখ্‌ব না। তিনি এই জগতের অপর পারে গেছেন,—সেই জগতে—যেখানে অমরআত্মা মানব-দেহের মৃত্যু হ'লে যান—সেই সুখের দেশে। সেইখানে ফের মায়ের সাথে আমরা দুজন মিল্‌ব গিয়ে, এর আগে দেখা নয়। তোমায় তিনি খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হ'য়ে আর এগিয়ে যেতে না পেরে পথের পাশে ব'সে প'ড়ে শুয়ে প'ড়ে ঘুমে চেতনা হারান। আর তিনি জাগ্‌লেন না।

ঘুমে তাঁর চক্ষুর পাতা যখন আট্‌কে আসে তারই ঠিক পূর্ব্বক্ষণে তিনি আমায় বল্‌লেন—ইউরোপার যখন দেখা পাবি তাকে বলিস্‌ মায়ের প্রাণ পাগল হ'য়ে কেঁদে-ছিল তাকে দেখ্‌বে ব'লে। আমি স্বর্গলোকে চল্‌লাম। তোরাও সেইখানেতেই যাবি। সেইখানে ফের দেখা হবে। মনের সুখে দিন কাট্‌বে। সেই স্বর্গলোকের বিশ্বাসে, সুখের মধ্যে দিন যাপনের আশ্বাসে, যেন হৃদয়-প্রাণ পূর্ণ থাকে। মায়ের কথা শেষ না ক'রে ক্যাডমস্‌ বল্‌লে—ইউরোপা! মায়ের কথা আর ভেবোনা, চলো এখন এখান হ'তে চল। এখানে আর থাক্‌ব না। আস্‌বার পথে, জোয়ান এক রাখালের সাথে দেখা হ'ল সেই আমাকে সন্ধান দিলে তোমার। তার হাতে সোনার বীণা সোনার ধনুক। মুখে সূর্য্যের মত দীপ্তি।

সে বল্‌লে—আমরা নাকি নগর তৈরী কর্‌ব। আমি নাকি সেই নগরের রাজা হ'ব। রাখালটা নাকি গরু পাঠাবে। সেই গরুটার পিছন পিছন চল্‌ব। তার পরেতে সেই গরুটা যেখানে শুয়ে পড়্‌বে সেইখানেতেই বুঝ্‌তে হ'বে ঠিক নগর করার স্থান।

গরুর নামে ইউরোপার ভয় হ'ল ষাঁড়ের মতো যদি বিপদ ঘটায়।

ইউরোপার মনের ভয় মুখের উপর দেখ্‌তে পেয়ে ক্যাডমস্‌ বল্‌লে—ভয় কোরো না বোন্‌! যে আমাকে সত্যি ব'লে তোমায় পাইয়ে দিলে সে আমাকে কিছুতেই মিথ্যা বল্‌বে না।

ক্যাডমস্‌ আর ইউরোপা খানিক পরে ডেল্‌ফাই ছেড়ে চল্‌ল। কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে পেলে, একটি গরু ঘাসের উপর শুয়ে আছে। যেম্‌নি যাওয়া কাছে অমনি গরু উঠে রওনা দিলে। তার পরেতে অনেক দূর হেঁটে হেঁটে এক মস্ত বড় মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। সেই মাঠেতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অল্প দিনে দেবতার অমোঘ শক্তি-বলে এক নগর হ'ল। ক্যাডমস্‌ তার রাজা হ'ল। সেই নগরের নাম হ'ল—"থিবিস।"

ভাই-বোনেতে সেই নগরে জীবনের দিনগুলিকে পরম সুখে কাটিয়ে দিলে। তার পরেতে সময় হ'লে মৃত্যু হ'ল তাদের। তখন তারা মিল্‌ল গিয়ে মায়ের সঙ্গে; বসলো মহানন্দে পরলোকে—যে-লোকে বিচ্ছেদের আর কোনো ভয় নেই।

শ্রী হিমাংশুপ্রকাশ রায়

[পুস্তক পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম। —প্রবাসী সম্পাদক]

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ—শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রী ফণিভূষণ দত্ত, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৵০+২৯৫। মূল্য ১।০।

পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম কর্ম্মবাদ, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম জন্মান্তর। প্রথম খণ্ডে ১১ অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১২ অধ্যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থকার কর্ম্মবাদ ও ও জন্মান্তরবাদকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সফলকাম হইয়াছেন, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু গ্রন্থ সুপাঠ্য এবং ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও গুরুগীতা (টীকা, ব্যাখ্যা ও ভূমিকা সম্বলিত)—শ্রী অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, সম্পাদিত ও বিবৃত। প্রকাশক শ্রী ভূপতিনাথ ঘোষাল। প্রাপ্তিস্থল—পাল ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ২১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২+৯৬; মূল্য ।৵

'শ্রেষ্ঠধর্ম্ম' নামক অংশ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১০৮ তম এবং 'গুরুগীতা' 'বিশ্বসার' তন্ত্র হইতে গৃহীত। গ্রন্থে সংস্কৃত মূল এবং তাহার ভাবানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্য—গুরুর মহিমা কীর্ত্তন ও গুরুবাদ স্থাপন। যাঁহারা 'গুরুবাদ' মানেন না, গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন—যোগাচার্য্য শ্রীশ্রী মদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব রচিত। মনোহরপুর (কালীঘাট, কলিকাতা)। মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে শ্রী মহেশ্বরানন্দ অবধূত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১০+৪৬৮। মূল্য বাঁধা ২৷৷০; অবাঁধা ২৲

শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া গ্রন্থকার অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থে শাস্ত্র ও যুক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ। যাঁহারা জাতিভেদ বিষয়ে শাস্ত্রের মতামত জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই :—

"বেদবেদান্ত, স্মৃতিপুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রমতে স্বরূপতঃ যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চারিপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার চারি প্রকার হইলেও স্বরূপতঃ যেমন চারই এক, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিপ্রকার হইলেও স্বরূপতঃ একই প্রকার। অতএব সেইজন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পরস্পর জাতিবিষয়ক কোন বিবাদই হওয়া উচিত নহে।" পৃঃ ৪৩৬।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

A History of Bengali Literature (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)—ইংরেজী বই, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস প্রণীত। নওগাঁও, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থখানির রচনায় গ্রন্থকারের সদুদ্দেশ্য ও জাতীয়-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পুস্তকখানির নামকরণ ঠিক হয় নাই, কারণ ইহাকে কোনোক্রমে ইতিহাস বলা যায় না। বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটিকে ভালো করিয়া ধরিবার চেষ্টা ত' দূরের কথা, লেখকগণের কালক্রম (chronology), অথবা গ্রন্থগুলির যথাসাধ্য তারিখ-নির্ণয় ইহাতে নাই; এমন-কি যে-সকল তারিখ অপেক্ষাকৃত সুলভ সেগুলিও গ্রন্থপরিচয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। কোনও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে একটি জাতির সমগ্র ভাব-জীবন কেমন করিয়া শব্দার্থকলার সাহায্যে যুগ হইতে যুগান্তরে, গদ্যে-পদ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহার কাহিনী, এবং তাহার মধ্যে কেবল মাত্র সামাজিক আশা-বিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শের অন্বেষণ নয়,—সৃষ্টিশক্তির ক্রমোন্নতি বা অবনতি, জাতীয় সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উৎকর্ষ, বা অপকর্ষ, অনুভূতির বৈচিত্র্য, প্রকাশ-ভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি সাহিত্য-কলার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম উন্মেষ—একটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে; যুগ-বিভাগ ও যুগ-সংক্রান্তি (period of transition) ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং বিভিন্ন যুগের আদর্শ, রীতি বা কল্পনাভঙ্গির আলোচনায়, জাতীয় চরিত্র ও প্রতিভার প্রসার কোনও সামাজিক শিক্ষা বা শাস্ত্রীয় আদর্শের মাপে মাপিলে চলিবে না। কারণ, সাহিত্যের মধ্যেই জাতির মুক্তআত্মার বাণী আছে, সকল ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা ঠেলিয়া জাতির বৃহত্তর প্রাণ এইখানে গভীরতর নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। জাতির এই অন্তরতর আত্মাকে সাহিত্যের ইতিহাসেই আবিষ্কার করা সম্ভব। সাহিত্যের ইতিহাস ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান বা শাস্ত্রের টীকা নয়। গ্রন্থখানিতে এইরূপ মানসিকতারই পরিচয় আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মহাকাব্যে কি নীতি শিক্ষা দিয়াছেন গ্রন্থকার তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন! তিনি যে-নিয়মে যুগবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে ইতিহাস স্পষ্ট হইয়া উঠে না, এবং প্রতি যুগের যে কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সমালোচনাচ্ছলে তিনি যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার নিজের আদর্শ অতিশয় শ্লথ, এবং রুচি-হিসাবে তিনি নিতান্তই গড্ডালিকার অনুগামী। অতিশয় চলিত সংস্কার এবং পুরাতন মামুলী মতের প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অল্পবয়সে লেখা পুস্তক (New Essays in Criticism) হইতে উৎকট উচ্ছ্বাসময় বাক্য-লহরীর অতিদীর্ঘ কোটেশন আছে, রমেশচন্দ্র দত্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যেখানে যাঁহার উক্তি চোখে পড়িয়াছে গ্রন্থকার তাহাই যথেচ্ছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার স্বকীয় সমালোচনা-ভঙ্গীর একটি চমৎকার নমুনা এই—হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, "The emotional intensity of a Shelley and the finished grace or a Pope or a Bharatchandra are interfused in his works with the sweet simplicity of a Kavikankan."—কাব্য-প্রতিভার এমন তিলোত্তমা বোধ হয় আর কোনও সাহিত্যে মিলিবে না। এজন্য মনে হয়, গ্রন্থকারের অনেক দেশী ও বিদেশী কাব্য পড়া থাকিলেও (গ্রন্থমধ্যে অজস্র অনাবশ্যক কোটেশন আছে) এবং সাহিত্য আলোচনার উপযোগী ইংরেজী শব্দসংগ্রহে স্বচ্ছন্দ অধিকার থাকিলেও, বাংলা সাহিত্যের—বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—ইতিহাস লিখিবার মত শক্তি

তিনি এখনও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কারণ, এযুগের সাহিত্য যেমন অভিনব, তেমনই সুপুষ্ট ও জটিল; ইহার সর্ব্বতোমুখী ও বহু-বিরোধী অন্তঃস্রোত এখনও কোনও প্রতিভাশালী সমালোচকের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। একবার একটা-কিছু খাড়া হইলে পর সকলেই নির্ভয়ে আলোচনা করিতে পরিবেন। গ্রন্থকার যে তাল সামলাইতে পারেন নাই তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। রবীন্দ্র-যুগের একজন প্রধান কাব্যকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ নাকি কবি হিসাবে বেশ promising ছিলেন; অনেকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ, স্নেহলতা, বঙ্কিমচন্দ্র, মিঃ ষ্টেড (Mr Stead) প্রভৃতির উপর কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছন্দভঙ্গীর অনুকরণ করিয়াছিলেন। ঠিক এই কয়টি কথায় তিনি বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্র-নাথের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মত কবিকে promising বলিলে গ্রন্থকারের "ইতিহাসে" উল্লিখিত শতকরা ৯৯জন কবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবারই উপযুক্ত নহেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে ৪১।৪২ বৎসর বয়সে; জগতের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বহু দীর্ঘজীবী কবি থাকিলেও অনেকের প্রকৃত কবি-জীবন ৪১।৪২ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে দরের হউক, তাহার ফলরাশি অপক্ক নহে—বাগ্‌দেবীর যে-মন্ত্রটি তিনি সাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে যতটুকু সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব তাহা তিনি করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার দান মূল্যে ও পরিমাণে অল্প নহে, এবং অনেকের তুলনায় অধিক বলিয়া মনে করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি guide-book বা চিত্রপ্রদর্শনীর "প্রিয়দর্শিকা" হিসাবে উপভোগ্য। সাধারণের অজ্ঞাত অনেক সংবাদ ইহাতে আছে, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমীর রুচিকর বহু মন্তব্য সুললিত ইংরেজী ভাষায় পাঠ করিয়া অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের সাহিত্যজ্ঞান ও সাহিত্যিক রুচি বা আদর্শ যেমনই হউক, তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যে অকপট, এই গ্রন্থে সে-পরিচয় আছে, এবং এজন্য আমরা প্রীত হইয়াছি।

ম

বিধবা-বিবাহ—শ্রী ভাগবতচন্দ্র দাশ, বি-এল, প্রণীত। মূল্য দুই আনা। মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির লেখক নানা শাস্ত্রীয় মতামত আলোচনা পূর্ব্বক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজে যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন নারী-স্বাধীনতাও ছিল এবং বিধবা-বিবাহে কাহারও কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং শাস্ত্রের ও আচারের কড়াশাসনে নারীকে বাঁধা হইল। পুরুষের যথেচ্ছাচার-সম্বন্ধে শাস্ত্র ও সমাজ নির্ব্বাক্, কিন্তু নারীর জন্য হইল সতীত্বের' ব্যবস্থা।

লেখক দুই মুনির দুই মত উদ্ধার করিয়া তাঁহার এই উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। দেখিতে পাই, একদা মহর্ষি শ্বেতকেতু বলিতেছেন, ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ভ্রূণহত্যা পাতক হইবে এবং যে-পুরুষ স্বীয় পত্নীকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে তাহারও সেই পাতক হইবে। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়) যখন শ্বেতকেতু একথা বলিয়াছিলেন, তখনও সতীত্বের সৃষ্টি হয় নাই, তখন পুরুষ ও নারীর জন্য একই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু "নারীদের দুর্ভাগ্যবশে ভারতবর্ষে দীর্ঘতমা নামে এক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি জন্মান্ধতাবশতঃ পত্নীর উপার্জ্জনের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তিনি অত্যন্ত কদাচারী ছিলেন। তাঁহার কুব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিবেশী ঋষিগণ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। একদিন দীর্ঘতমা তাঁহার পত্নীকে ধনাহরণ জন্য এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট যাইতে আদেশ করেন। পত্নী তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'আমি আর তোমার ভরণপোষণ জন্য পরিশ্রম করিতে পারিব না। তুমি ভর্ত্তা, তুমি আমার ভরণপোষণ করিবে। তাহা না হইয়া, তোমার ভরণপোষণ আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। তুমি এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার অপেক্ষা রাখি না। আমি অন্য ভর্ত্তা করিব। দীর্ঘতমা এই অপ্রত্যাশিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত স্ত্রী জাতির উপর যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি অদ্য হইতেই এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে নারী এক মাত্র পতিকেই যাবজ্জীবন আশ্রয় করিবে। স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক স্ত্রী অন্য পুরুষ গমন করিতে পারিবে না। পরপুরুষ গমন করিলে নারী পতিতা হইবে।

দীর্ঘতমা পুরুষগণের সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, নারীগণের ব্যাভিচার মাত্র নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষগণের মানসক্ষেত্রে সতীত্বের ধারণা উহাতে অঙ্কুরাবস্থা ত্যাগ করিয়া পল্লবিত হইল। লেখকের মতে এইরূপে সতীত্বের সৃষ্টি হইল, "স্ত্রীগণ পুরুষের অধীনতা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইল, পুরুষের মনস্তুষ্টি নারীগণের জীবনের ব্রত হইল। শেষে এই ভারতবর্ষে পুরুষগণের ঈপ্সিত সতী-নারীর আবির্ভাব হইল। সতীত্বের জন্য নারী মৃত পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। দেব-মানব বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সতীত্বের বিজয়ঢক্কা গ্রামে গ্রামে নিনাদিত হইল। কঠিন-হৃদয় পুরুষগণ বিধবা নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইল।...এই নৃশংস কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। নারীগণ তখন পুরুষের অবৈতনিক দাসীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উদার-হৃদয় ঋষিগণ বিধবাগণকে রক্ষা করিবার জন্য গাহিলেন—

হে নারী, চিতা হইতে উঠিয়া সংসারের দিকে চল এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত কর। ঋষিগণের এই আহ্বানে কতকগুলি বিধবার প্রাণ রক্ষা হইল।"

সতীত্ব সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, "ভারতীয় পুরুষগণের মনে সতীত্বের ভাব বদ্ধমূল হওয়ায় তাহারা সতীত্বের অর্থ করিল একপতিত্ব। বস্তুতঃ সতীত্ব শব্দের অর্থ একপতিত্ব নহে। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং সৎ শব্দের যে অর্থ সতী শব্দেরও তাহাই অর্থ।" পুনশ্চ "পুরুষের যে যে দোষ থাকিলে তাহাকে অসৎ বা অসাধু আখ্যায় অভিহিত করা যায়, স্ত্রীলোকের সেই সেই দোষ থাকিলে তাহাকেও অসতী বা অসাধ্বী বলা যাইতে পারে। পুরুষের এক-পত্নীকত্ব যেমন সাধুতার লক্ষণ নহে, স্ত্রীর একপতিত্বও সেইরূপ সতীত্বের লক্ষণ নহে। সৎ পুরুষের পত্নীপ্রেম যেমন প্রশংসার্হ, সতী স্ত্রীর স্বামিভক্তিও সেইরূপ বাঞ্ছনীয়। বিপত্নীক সৎ পুরুষের পক্ষে পত্নী শোকে আত্মহত্যা যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিধবা সতী নারীর পক্ষে স্বামি-বিরহে বহ্নিপ্রবেশও সেইরূপ অনাবশ্যক।

লেখকের মতামতের এবং উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আমরা সকলকেই এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রী হিরণকুমার সান্যাল

দ্রোণাচার্য্য—শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বি-এ, ১ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পঞ্চাঙ্ক নাটক। দ্রোণাচার্য্যের চরিত্র-বিশ্লেষণই নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের সে-উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। দ্রোণচরিত্রে দুই-একটি ত্রুটি ছিল এবং সেই সঙ্গে তাহাতে অসামান্য উদারতা ও মহত্ত্বও জড়িত ছিল। এই সংমিশ্রণে গঠিত দ্রোণ-চরিত্র নাটকে বেশ ফুটিয়াছে। আর একটি আনন্দের কথা—সুদীর্ঘ স্বগত বক্তৃতা নাটকটিতে স্থান পায় নাই, যাহাতে পাঠক ও শ্রোতার মন ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠে। ছন্দ ও ভাষা ভাল হইয়াছে। তবে নাটকটিতে ছাপার ভুল প্রচুর। গ্রন্থকার দুই একটি শব্দ গঠন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি আছে, যেমন—ক্রয়িয়াছ (কিনিয়াছ অর্থে), নির্ম্মায়ে (নির্ম্মাণ করে অর্থে)। এরূপ শব্দ ভাষা-সঙ্গত হয় নাই।

সান্ ইয়াট্ সেন্ ও বর্ত্তমান চীন—শ্রীজ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

চীন-নেতা বীর সান্ ইয়াট্ সেনের জীবন-কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আধুনিক চীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক অবস্থা এবং প্রাচীন চীনের সেই সেই অবস্থার আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সান্ প্রভৃতির কয়েকটি সুন্দর চিত্রও ইহাতে আছে। মোটের উপর বইটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থকারের ভাষায় দোষ আছে। ভাষা সব জায়গায় বেশ সরল হয় নাই। ইংরেজি গ্রন্থাদি হইতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ; কেননা তাহা ছাড়া উপায় নাই। তবে এই সংগ্রহ-কার্য্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ স্থানে স্থানে ইংরেজির অনুবাদ আড়ষ্ট ও অসরল হইয়াছে। বইটির ছাপা ও বাঁধন সুন্দর হইয়াছে।

সগীতাবাদ রহস্যচণ্ডী---শ্রীচণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনিলবান্ধব মুখোপাধ্যায়, ৩০।২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

চণ্ডীর স্বরূপ-ব্যাখ্যান-যুক্ত গ্রন্থ আজকাল বাংলা সাহিত্যে অনেক হইয়াছে, তথাপি আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে শক্তির যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহাই শক্তি সম্বন্ধে আদিম কল্পনা। তারপর শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে সেই শক্তি বা চণ্ডী কিরূপ ক্রম-পরিণত হইয়াছেন তাহাই গ্রন্থকার সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বইখানির প্রধান বিশেষত্ব---শাস্ত্র-বচনভারে গ্রন্থকারের যুক্তি-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ব্যাহত হয় নাই। তাঁহার আলোচনায় শাস্ত্র-ব্যাপারে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আধুনিক যুগোচিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর পরিচায়ক। সাধারণ ব্যাখ্যাতাগণ চণ্ডীচরিত্রের যে গূঢ়ত্ব ধরিতে পারেন নাই গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট ধরিয়া দেখাইয়াছেন। সাধারণের নিকট বইটি আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

গুপ্ত

মিথিলায় ভগবান (পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৩৩৩। মূল্য এক টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতার উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। যজ্ঞবিরোধী রাক্ষসকুলের ধ্বংস-সাধনার্থ বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে রামলক্ষ্মণের যাত্রা এবং মিথিলায় রাজা জনকের গৃহে শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহ ইহাই হইতেছে নাটক খানির বিষয়। সরস হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নাটকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার সৎসাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন। নাটকখানি লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হইলেও ইহাতে ক্ষমতার পরিচয় আছে, অভিনয়েও নাটকখানি ভাল উৎরাইবে আশা হয়। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

হিরণ্যকশিপু

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক—শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পীতাম্বরঃ পুষ্পহস্তো
রূপবদ্ যোষিতাসহ।
আন্দোলিতায়াং দোলায়াম্
আসীনঃ সুন্দরাকৃতিঃ।
বাসন্তং ভাবমাপন্নো
হিন্দোল-রাগঃ সংজ্ঞিতঃ॥ ধ্যান।

ভাবার্থ—হলদে রঙ্গের পোষাক পরিয়া রূপবান হিন্দোল সুন্দরী স্ত্রীসহ আন্দোলিত দোলায় ফুল-হস্তে বসিয়া আছেন। ইহা বসন্ত কালের রাগ।

ঔরসো হিন্দোল-রাগঃ ঋ-প-বিবর্জ্জিত স্বরঃ।
গান্ধার-স্বরবাদিনাং সংবাদী ধৈবত-স্বরঃ॥

ভাবার্থ—হিন্দোল রাগ ঔরস জাতি ঋ ও প বিবাদী গান্ধার বাদী এবং ধৈবত সংবাদী।

হিন্দোল—আলাপ*

আস্থায়ী। কড়ি—ম।

সন্‌া সা গা -া হ্মা ধা না ধা -া হ্মা গা -া হ্মা' গা -া সা -া সন্‌া সা ন্‌া ধ্‌া -া
তে৹ ৹ না ৹ তো ৹ ৹ ৹ ম্ না ৹ ৹ তে ৹ ৹ না ৹ তো৹ ৹ ৹ ৹ ম্

হ্মা্ ধ্‌া সা -া -া সা সা গা হ্মা ধা -া না ধা হ্মা গা -া হ্মা না ধা হ্মা গা -া
তা ৹ ৹ ৹ ৹ না তে রে নে রি ৹ ৹ ৹ রে না ৹ তে ৹ ৹ ৹ ৹ ৹

সা -া সা সা সা সন্‌া সন্‌া সা গা -া সা -া ॥
না ৹ তে রে না তে৹ না৹ ৹ তো ৹ ৹ ম্

অন্তরা॥

গা হ্মা ধা -া র্সা -া র্সনা র্সা র্সা র্সা -া -া র্সনা র্সা র্গা -া র্হ্মা র্গা -া র্সা -া
তে ৹ না ৹ ৹ ৹ রি৹ ৹ রে না ৹ ৹ তো৹ ম্ না ৹ তে ৹ ৹ না ৹

র্সা না ধা র্সা -া না ধা হ্মা গা -া সা গা হ্মা ধা র্সা -া হ্মা না ধা হ্মা গা
নে তে না ৹ ৹ তো ৹ ৹ ৹ ম্ না ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ তে ৹ রি ৹ রে

---

*আলাপ সম্বন্ধে এখনো অনেকের ধারণা আছে, অগ্রে আলাপের সৃষ্টি, তৎপরে গান, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয় 'অবতার, নামক পত্রিকাতে মান্যবর প্রমথবাবু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা অগ্রে আলাপ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অগ্রে 'ভাষা না অগ্রে ব্যাকরণ? ইহা ভাষাবিৎ মাত্রেই জানেন যে, অগ্রে ভাষা তৎপরে ব্যাকরণ। সেইরূপ অগ্রে গান তৎপরে আলাপ। যাঁহারা যথার্থ সঙ্গীতের আলোচনা করেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। গানের পূর্ব্বে আলাপ গাওয়া হয় বলিয়া তাহাকে গানের পূর্ব্বের সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থাৎ যখন ভাষারো সৃষ্টি হয় নাই, তখন সুরের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে। সেই সুরকে অগ্রে ধরা যায়; তৎপরে গান এবং গান হইতে 'আলাপ'। সঙ্গীতের ব্যাকরণ চারিভাগে বিভক্ত যথা:—

'স্বরাধ্যায়, তালাধ্যায়, রাগাধ্যায়, ও গীতাধ্যায়। আলাপ গীতাধ্যায়ের অন্তর্গত।

তেরে নেরি রেনা তোম ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ যোগে আলাপ করিতে হয়।

আলাপ অর্থে—পরিচয়। রাগের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচয় করাকে আলাপ কহে।

ভৈরবরাগ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পরে জানাইব এ সম্বন্ধেও অনেকের ভ্রম আছে। একটি পুঁথি দেখিয়া সেই মতকে বলবতী করা যুক্তি সঙ্গত নহে, যে মত হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশে বড় বড় গুণিগণ মানিয়া থাকেন এবং সেই মতের সঙ্গে যে শ্লোক মিলিবে তাহাই গ্রাহ্য।

সা -া সা সা সা সন্া সন্া সা গ- া সা া ॥
না • তে রে না তে৹ না৹ ৹ তো ৹ ৹ ম্

সঞ্চারী।

ক্ষা ক্ষা গা -া সা গা -া ক্ষা ধা -া র্সা না ধা ক্ষা গা -া ক্ষধা ক্ষধা ক্ষা গা -া
তে না ৹ ৹ নে ৹ ৹ রি ৹ ৹ রে আ ৹ ৹ ৹ ৹ তো৹ ৹ম্ না ৹ ৹

গা সা -া সা সা ন্া ধক্ষ্া ধ্া সা -া সা ॥
তে ৹ ৹ না তে রে না৹ ৹ ৹ ৹ নে

আভোগ।

ধক্ষা ধা ক্ষা গা -া ক্ষা ধা ক্ষা র্সা -া র্সা সাঃ র্সঃ ধা র্সা না ধা ক্ষা গা ক্ষাঃ নঃ
তো৹ ম্ না ৹ ৹ তে রে ৹ ৹ ৹ না তো ম্ ৹ ম্ না ৹ ৹ ৹ তে ৹

ধক্ষা গা -া -া ক্ষা গা -া সা গা ক্ষা গা -া সা -া সা সা সা সন্া সন্া সা
না ৹ ৹ ৹ রি ৹ ৹ রে ৹ না ৹ ৹ ৹ ৹ তে রে না তে৹ না৹ ৹

গা -া সা -া ॥
তো ৹ ৹ ম

হিন্দোল—চৌতাল

(ধ্রুপদ)

চন্দ্রবদন সম ঝলক হিণ্ডোল রাগ।
মোহিনী মুরত নার সঙ্গ লেকে ঝুলত।
অতি সুগন্ধ পুহপন কর সুঁঘত দৌ মিল,
চঁহু দিশ বসন্ত পবন বহত।
পহননা পীতাম্বর বনঠন অতি সুন্দর,
গরে মুক্তহার শোহে সবকো মন মোহত।
কহত জানকীদাস জো ইয়ে রাগ শুধ গাবে।
তাকো উত্তম গুণী কহত ॥

—জানকী দাস।

আস্থায়ী

১´ ৹ ২ ৹ ৩ ৪ ১´ ২
ক্ষা -া । লা গা । সা সা । ন্া ধ্া । ক্ষা ধ্া । সা সা । সা ন্া । সা গা ।
চ ৹ ন্দ্র ব দ ন স ম ঝ ল ৹ ক হি ৹ • ণ্ডো

২ ৹ ৩ ৩ ১´ ৹ ২ ৹
-া গা । ক্ষা ধা । না ধা । ক্ষা গা । ক্ষা হ্না । গা সা । গা গা । ক্ষা ধা ।
৹ ল রা ৹ ৹ ৹ ০ গ মো হি নী মু র ত না ৹

৩ ৪ ১´ ৹ ২ ৹ ৩ ৪
না ধা । র্সা র্সা । র্সা না । ধা ধক্ষ্া । না ধা । ধক্ষা গা । ক্ষা গা । সা গা ॥
৹ ৹ ৹ র স ৹ ঙ্গ লে ৹ কে ঝু ৹ ৹ ল ৹ ত

অন্তরা

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
ঋা ধা । র্সা র্সা । -া র্সা । সা র্না । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সাঃ র্সঃ ।
অ তি সু গ ০ ন্ধ পু ষ্প প ন ক র সু ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
ধা র্সা । ঋধা র্সা । র্সা না । ঋ ধা । ঋা গা । ঋগা গা । গা গা । -া গা ।
০ ঘ ০ ০ ত ম্বৌ ০ ০ মি ল ০ চঁ হু দি শ ০ ব

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
ঋা ধা । না র্সা । -া র্সা । র্সা না ; ধা ধা । ঋা গা । ঋধা ঋা । গা গা ।
স ০ ০ ০ ০ স্ত প ০ ০ ব ০ ন ব ০ ০ ০ হ

৪
সা গা ।
০ ত

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ৯ ৩ ৪ ১´ ০
গা গা । গা গা । -া গা । ঋা ধা । না ধা । ঋা গা । ঋা ধা । সা র্সা ।
প হ ন না ০ পী তা ০ ০ ০ স্ব র ব ন ঠ প

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
র্সা র্সা । না ধা । না ধঋা । গা গা । ঋা ঋা । না ধা । ঋা গা । ঋা -া ।
অ তি সু ০ ০ ন্দ ৯ র গ রে ০ মু ০ ক্ত হা ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা গা । সা সা । ন্া সা । গা -া । গা গা । ঋা ধা । না ধা । ঋা গা ।
র শো ০ হে স ব কো ০ ম ল মো ০ ০ ০ হ ত

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
ধঋা -া । ধা র্সা । -া র্সা । র্সা সা । র্সা সনা । র্সা র্সা । র্সা র্সা ।
বা ৯ ০ হ ০ ত মা ম বা দা ০ ০ স কো ই

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
না ধঋা । র্সা র্সা । র্সা না । না ধঋা । -া সা । ঋা -া । গা গা ।
য়ে রা ০ গ শু ষ ০ গা ০ বে তা ০ ০ কো

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
মা গা । ঋা ধা । না র্সা । র্সা র্সা । র্সা না । ধা না । ধা ঋা । ধঋা ধা ।
০ ০ উ ০ ০ ০ ত্ত ম শু নী ০ ক ০ ০ হ ০

৩ ৪
ঋা গা । মা গা ।
০ ০ ০ ত

অতিকায় কুকুর—

কিছুকাল পূর্ব্বে শিকাগোর একটি বিখ্যাত কুকুর-প্রদর্শনী মেলায় একটি অতিকায় কুকুর প্রদর্শিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ছবিটি তাহার। ইহার জন্মস্থান ডেন্‌মার্ক, নাম কুনো ক্রেবস্‌। মাটি হইতে ইহার উচ্চতা

অতিকায় কুকুর

প্রায় দুই হাত; কিন্তু সোজা দাঁড়াইলে মাটি হইতে মাথা পর্য্যন্ত আট হাতেরও বেশী। ইহার ওজন দুই মণ ৬ সের; এক জার্ম্মানির বোর-হাউণ্ড্‌ কুকুর ছাড়া দৈহিক আয়তনে এই জাতীয় কুকুরকে কেহ হঠাইতে পারে না।

—

জ্যান্ত জানোয়ার ধরা—

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় চিড়িয়াখানা-সমূহে হিংস্র পশু সরবরাহ করেন বলিয়া জে, এল, বাকের নাম আছে। ইনি একজন বিখ্যাত শিকারী, আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহার এক অদ্ভুত খেয়াল—জীবন্ত অবস্থায় জানোয়ারদের ধরা; এইজন্য ইনি বহুবার জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। ইনি অনেকগুলি শিম্পাঞ্জী পুষিয়াছেন। জীবন্ত অবস্থায় কুমীর ধরিতেও ইনি অদ্বিতীয়। পাশের ছবিখানিতে বাক্‌ সাহেবের কুমীর ধরার নমুনা

বাক্‌ সাহেবের কুমীর ধরা

দেওয়া হইয়াছে। এই কুমীরটি ধরিতে গিয়া ইনি বহুকষ্টে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। একটি হতভাগ্য নিগ্রো বালক ইহার ফলে প্রাণ হারায়।

—

সূর্য্য-ক্ষত—

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানুষ সূর্য্যকে বন্দনা করিয়া আসিতেছে—উত্তাপ দ্বারা তিনি সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেন বলিয়া। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল তিনি অনাদি কাল হইতে ঠিক সমানভাবে আলো ও উত্তাপ দিতেছেন। বিজ্ঞান, অন্ধ মানুষকে ক্রমশঃ চক্ষুষ্মান্‌ করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতি-দেবীর সমস্ত রহস্য নির্ম্মমভাবে মানুষ উদ্ঘাটন করিতেছে, যন্ত্রের মুখে সকল আবরণ উড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী সূর্য্যেরও নিস্তার নাই। মানুষ তাহার ক্ষমতা-অক্ষমতা ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাহার দেহের কলঙ্ক-চিহ্নগুলি পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করিয়াছে। বিজ্ঞানের চেষ্টায় মানুষ আজ বুঝিয়াছে আমাদের সূর্য্য অপরিবর্ত্তনীয় আলো ও উত্তাপের আকর নহে, ক্রমশঃ সে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে (জ্যোতি-র্লোকের সময়ানুপাতে) এই প্রচণ্ড তেজঃপুঞ্জ ভাস্কর সমস্ত তেজ হারাইয়া মৃত্তিকা-পিণ্ডরূপে শূন্যে আবর্ত্তন করিবে।

খৃষ্টীয় ১৯১৬ সালে সূর্য্যগাত্রে প্রথম কলঙ্ক-চিহ্ন লক্ষিত হয়। তখন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কারণ ও স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টিত আছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যে, সূর্য্য-ক্ষতের রহস্য উদ্ঘাটিত হইলেই সূর্য্যের সম্বন্ধে

সূর্য্য-ক্ষত
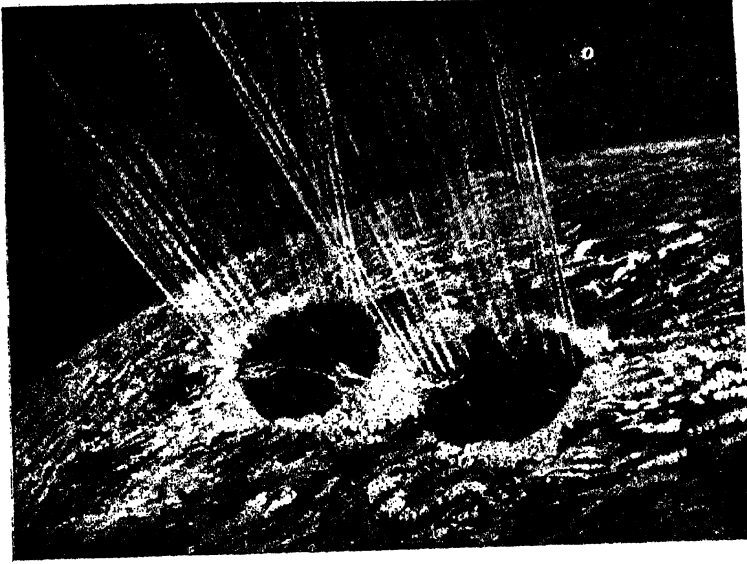
সকল তথ্য জানা যাইবে। এই ক্ষতগুলি (Spots) কখনো সংখ্যায় বেশী দেখা যায়, কখনো কম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি এত বৃহৎ যে, দূরবীক্ষণের সহায়তা ছাড়াও নীল কাচের মধ্য দিয়া চর্ম্মচক্ষেও এগুলিকে দেখা যায়। গত জানুয়ারী মাসে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষতটি দেখা গিয়াছিল। ইহার ব্যাস ছিল ৪০০০০ হাজার মাইল, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর মত পাঁচটা পৃথিবী পাশাপাশি থাকিয়া স্বচ্ছন্দে এই ক্ষতের মুখে প্রবেশ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এই ক্ষতের কারণ নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। আমাদের আব্‌হাওয়া ও ঋতুগুলির উপর ইহাদের প্রভাব আছে। এগুলি সূর্য্যগাত্রে আগ্নেয়-গহ্বরের মত। এই গহ্বর মুখে অনন্ত শূন্যে অহরহ উত্তপ্ত বাষ্প উৎসারিত হইতেছে। একদল বৈজ্ঞানিকের মত এই যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে ঘূর্ণ্যমান গ্যাস-স্তরের আঘাতে সংঘাতে মাঝে মাঝে ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয় ও সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ গ্যাস-সমূহ প্রবল বেগে বাহিরে আসিতে চায়। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে, এইচ, জিন্‌স্ বলেন যে সাধারণ ঘূর্ণী যেমন নীচের দিকে যাইতে চায় এগুলি ঠিক তাহার বিপরীত, ইহাদের গতি উর্দ্ধমুখী। এই প্রচণ্ড ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে আংশিক শূন্যতা (Vacuum) সৃষ্টি হয়, এইগুলিই সূর্য্য-ক্ষতরূপে প্রতীয়মান হয়।

সূর্য্যক্ষতের প্রকৃতি নিরূপণ করিবার জন্য বিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণ চেষ্টিত আছেন। তন্মধ্যে উইলিয়াম, এইচ, হেভার ও চার্লস্ জি, অ্যাবটের নাম উল্লেখযোগ্য। সূর্য্যক্ষত পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিশেষ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বীক্ষণাগার স্থাপিত করিয়া দৈহিক সমস্ত যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া এইসকল স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সত্যানুসন্ধানে তৎপর আছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি প্রদেশে কালামা নামক স্থানে একটি এবং আরিজোনাতে একটি, এই দুইটি বীক্ষণাগার বিশেষ ভাবে ইহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানে সূর্য্যক্ষতের একটি ছবি দেওয়া হইল।

—

অদ্ভুত ঘোড়ার খেলা—

পশ্চিম আমেরিকার সাধারণ রাখাল বালক-বালিকাগণ এমন

দড়ির খেলা

অদ্ভুত ঘোড়ার খেলা দেখাইতে পারে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। খেলার নেশায় ইহারা জীবনকে তুচ্ছ করে। আজকাল ইহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোড়ার খেলা দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়, ও যথেষ্ট অর্থ

মিস্ রুথ্ রোচ্

উপার্জ্জন করে। গত ওয়েম্বলি প্রদর্শনীতে ইহাদের ১৬৭ জন ২৩৭ টি ঘোড়া লইয়া হাজির হইয়াছিল ও অদ্ভুত অমানুষিক খেলা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সামান্য একখণ্ড দড়ি দিয়া ইহারা আশ্চর্য্য খেলা দেখাইতে পারে, দড়ির সাহায্যে বেগবান ঘোড়াকে নিমিষের মধ্যে থামাইতে পারে, নিজেদের কিছুমাত্র স্থানচ্যুতি ঘটে না। ঘোড়ার খেলার দুটি ছবি এখানে দেওয়া হইল। খেলোয়াড় মাথার উপর ভর দিয়া খাড়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দড়ি দিয়া দুইটি বেগবান অশ্বের গতি বন্ধ করিয়া দিয়াছে, নিজে একটুও নড়ে নাই। দ্বিতীয় ছবিখানিতে বিখ্যাত খেলোয়াড় মিস রুথ রোচের খেলা দেখান হইয়াছে। দুই পায়ের উপর ভর করিয়া ঘোড়া সোজা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—

হস্তিদন্তের কারুশিল্প—

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট্ যাদুঘরে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি চমৎকার কারুশিল্পের নিদর্শন সম্প্রতি আনীত হইয়াছে। একটি হাতীর
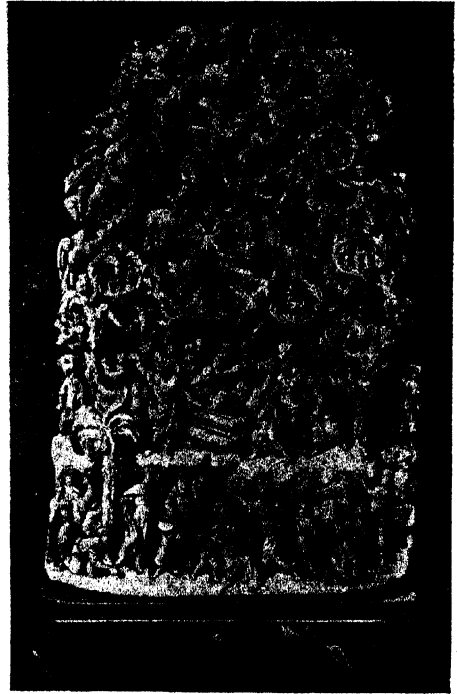
হস্তিদন্তের কারুশিল্প

দাঁত খুদিয়া এটি নির্ম্মিত হইয়াছে। কারুকার্য্য এত সূক্ষ্ম যে, প্রত্যেকটি মূর্ত্তি সুপরিস্ফুট ও জীবন্ত। কুমারী মেরীকে দেবতাকুল সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করিতেছে, ইহাই হইল ছবিটির বিষয়। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনদেশীয় কিম্বা ইতালীয় কোনো শিল্পীর হস্ত-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

—

তুলনায় সমালোচনা—

সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে শিশু-সম্প্রদায় পুতুলের জন্য কাড়াকাড়ি

বামদিক্ হইতে দক্ষিণে জাভাদেশীয়, ফরাসী, জাপানী, ইতালীয় ও মিশরীয় পুতুল।

প্রত্যেক পুতুলের গাত্র-বস্ত্রে দেশের ছাপ কেমন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

মধ্যে—মিসেস্ ইভান্সের সর্ব্বদেশীয় পুতুল সংগ্রহ।
বামে ও দক্ষিণে—চৈনিক সুন্দরী

করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। আফ্রিকার বন্যসম্প্রদায়েই হউক কিম্বা সুশিক্ষিত জাতিদের মধ্যেই হউক সর্ব্বত্র শিশুদের প্রধান পুতুল-প্রীতি লক্ষিত হয়। পুতুল শিল্প—শিল্পের একটী বড় অঙ্গ; প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ সুবিধা ও কল্পনা অনুযায়ী পুতুল-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরের ছবিতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের পুতুলের নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

বিপজ্জনক খেলা—

পাশের ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই খেলোয়াড় কি
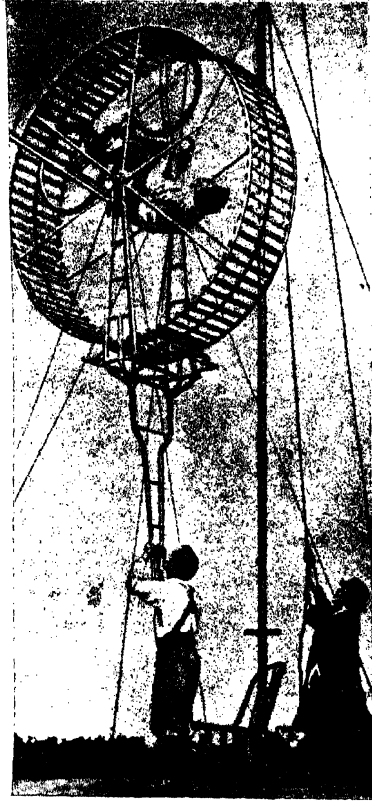
খেলোয়াড়ের বাহাদুরী

ভীষণ বিপজ্জনক খেলা দেখাইতেছেন। উপরের কাষ্ঠচক্রের মধ্যে একটি লোক সাইকেলে দ্রুত আবর্ত্তন করিতেছে—সেই অবস্থায় তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ও অপূর্ব্ব কৌশলে ভারের সমতা রক্ষা করিয়া এই খেলা দেখান হইতেছে।

মানুষ-দৈত্য—

আফ্রিকা মহাদেশকে আমরা বেঁটে-খাট নিগ্রোজাতির আবাস-ভূমি বলিয়া জানি, কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ ও ফরেন্ বাইবেল সোসাইটির পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকার সেক্রেটারী রেভারেণ্ড ডব্লিউ, জে, ডব্লিউ রুম সাহেব আফ্রিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আফ্রিকার এক মানুষ-দৈত্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার কথা লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত; কিন্তু তিনি ফটোগ্রাফের সহায়তায় তাঁহার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া লোকের মুখ বন্ধ করিয়াছেন। রুম সাহেব বলেন, ইহারা অসম্ভব-

মানুষ-দৈত্য

শক্তি-সম্পন্ন এবং ইহাদিগকে ইউরোপে আনিতে পারিলে অলিম্পিক্ খেলা প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ভঙ্গ হইবে। ইহাদের প্রত্যেকেই সাত-ফিটের অধিক লম্বা। দৌড়ঝাঁপে ইহাদিগের সহিত টেক্কা দিতে পারে এমন খেলোয়াড় সভ্য জগতে দৃষ্ট হয় নাই, পাশের ছবিখানি রুম সাহেবের কথার প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি নিজে এই ফটো তুলিয়াছেন। লোকটি ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লাঠির প্রায় এক ফুট উপর দিয়া অবলীলাক্রমে লাফ দিতেছে। জিনিষটি কল্পনা করিবার বিষয়।

বিমান-পোত বনাম রেলগাড়ী—

বর্ত্তমান যুগকে কবিরা গতির যুগ আখ্যা দিয়া থাকেন। গতির দিকেই মানুষের দৃষ্টি বেশী। গোযান, মহিষযান উটযান প্রভৃতি লইয়াই

মানুষ আগে সন্তুষ্ট থাকিত। তার পর অশ্বযান আসিল, বাষ্পীয়যান সৃষ্টি হইল, কিন্তু মানুষ সেখানেই থামিল না; বিমানপোতের সহায়তায় মানুষ অসম্ভব গতি-শক্তি লাভ করিয়া দূরত্বকে দূর করিয়া দিল। রেলগাড়ী পিছনে পড়িয়া রহিল, কিন্তু রেলগাড়ীর এই অসম্মান একজন বৈজ্ঞানিক সহ্য করিতে না পারিয়া একটি প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন এঞ্জিন্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও রেল-রাস্তার অসুবিধা দূর করিবার জন্য কংক্রিট্ দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছেন। ইহাতে রেলের গতি বৃদ্ধি হইবে, অথচ কয়লা কম পুড়িবে বলিয়া খরচও কম হইবে। কংক্রিট-

কাচের ফুল

প্রচণ্ড গতি-বেগ-সম্পন্ন এঞ্জিন

নির্ম্মিত পথে এই এঞ্জিন্‌খানি অবলীলাক্রমে বিমান-পোতের সহিত টেক্কা দিবে।

—

কাচের কেরামতি—

ক্ষণভঙ্গুর ও কঠিন কাচকে লইয়া মানুষ কি অঘটন ঘটাইয়াছে আমরা পূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি। অভ্র কাচ, গুলি-সহ কাচ প্রভৃতি আজকাল মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। কাচের সাহায্যে কি সুন্দর চমৎকার শিল্প সৃষ্টি হইতে পারে ছবিতে তাহার প্রমাণ দেখুন। হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাচনির্ম্মিত দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী আছে। এই বন্য পুষ্পের গাছটি সেখানে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। ইহার প্রত্যেকটি শাখা-পল্লব ফুল ইত্যাদি কাচনির্ম্মিত। ফুলগুলি এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত যে আসল বলিয়া অনেকে প্রতারিত হন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও বুঝিবার জো নাই যে, ইহা কাচনির্ম্মিত।

—

পৃথিবীর ছয়টি আশ্চর্য্য—

মানুষের কত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আদিম যুগ হইতে মানুষ অস্ত্র-শস্ত্রে ও
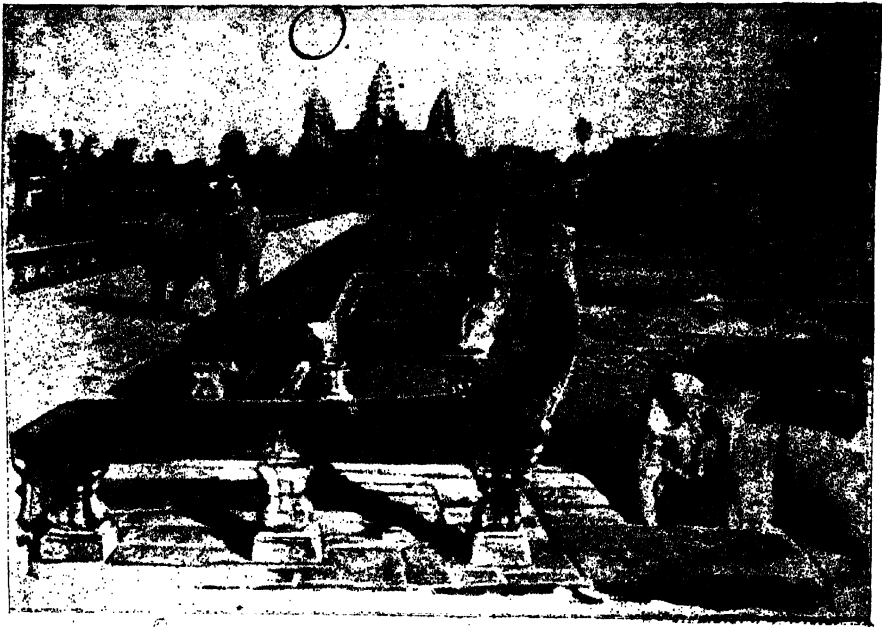
কাম্বোডিয়ায় আঙ্কোরে আবিষ্কৃত মন্দির ও উদ্যান

খেসালী মঠ

গুহাভ্যন্তরে আপনার শিল্পকলার ও কল্পনা-কুশলতার পরিচয় ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছে তাহার কিছু কিছু আমরা দেখিতেছি, অধিকাংশই কাল প্রভাবে লোপ পাইয়াছে। কত বিস্তীর্ণ জনপদ, মনোরম অট্টালিকা ও অপূর্ব্ব কারুশিল্প যে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; স্তূপমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে অথবা অরণ্যের গভীরতায় লোপ পাইয়াছে তাহার ইতিহাস নাই। মানুষের অনুসন্ধিৎসা আজ তাহাকে আবার পুরাতনের অন্বেষণে নিযুক্ত করিয়াছে। পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাচীন সহর খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে, আরবের মরুপ্রান্তরে মানুষের প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহ নবাবিষ্কৃত হইতেছে।
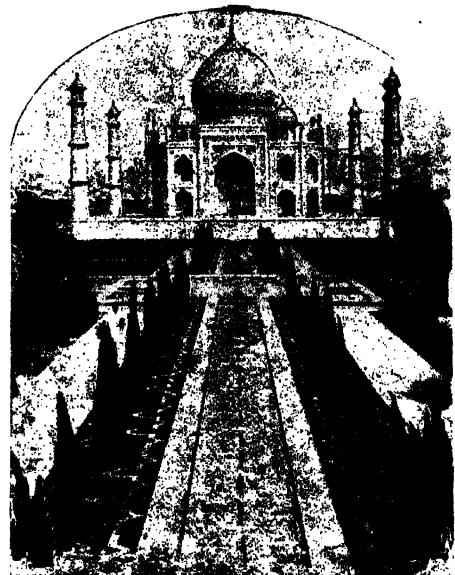
আগ্রার তাজমহল

এইখানে আমরা মানুষ ও প্রকৃতির কীর্ত্তিকলাপের ছয়টি প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শন দিতেছি। এই ছয়টিকে পৃথিবীর ছয়টি আশ্চর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিখ্যাত পৃথিবী-পর্য্যটক বার্টন্ হোম্‌স্ নিজের পর্য্যটনকালে এগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও এগুলির ছবি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতা-অনুসারে এগুলির প্রথম দ্বিতীয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কলোরোডোর জলপ্রপাত

নিক্কোর মন্দির

ফরাসী কাম্বোডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত আঙ্কোর নামকস্থানের খমার রাজবংশের মন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্যানের ধ্বংসাবশেষকে ইনি প্রথম স্থান দিয়াছেন। এই ধ্বংসাবশেষ এতদিন অরণ্যের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। কেহ ইহার-সন্ধান জানিত না, বিরাট প্রাসাদ সমূহ ও অপূর্ব্ব রাজোদ্যান নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে অতীতের এক সমৃদ্ধিশালী জনপদের সাক্ষ্য-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। আজ আট শতাব্দী ধরিয়া এই স্থান জনশূন্য,
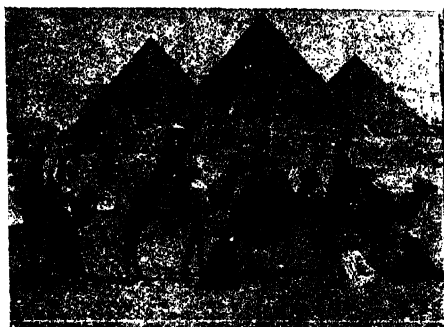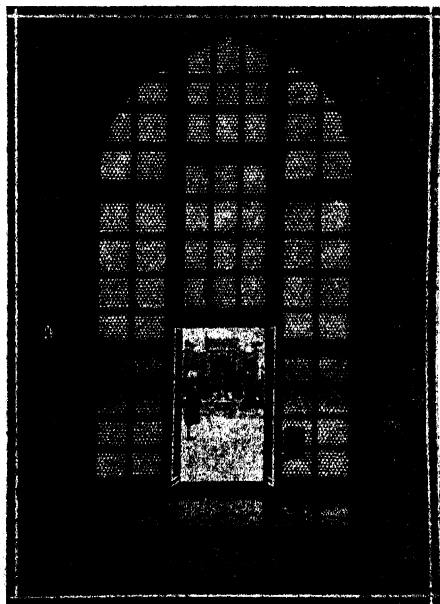
মিশরের পিরামিড

তাজমহলের প্রবেশদ্বার

এই দুই ল্যাজ-ওয়ালা টিকটিকি প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় দিতেছে

এখানকার অধিবাসীরা কোথায় গেল বা কিভাবে ধ্বংস হইল কেহ জানেনা। ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের বিষয়।

মিশরের পিরামিডকে ইনি দ্বিতীয় স্থান দিয়াছেন। ইহা এখন সর্ব্বজন-বিদিত ও জগদ্‌বিখ্যাত। সম্প্রতি এই পিরামিডের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

আগ্রার তাজমহলকে হোম্‌স্ সাহেব তৃতীয় স্থান দিয়াছেন তবে তিনি বলেন যে কারুশিল্প-হিসাবে এইটিই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। অপূর্ব্ব কারুখচিত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারাচ্ছাদন মানুষের কল্পনাকেও পরাভূত করে।

আমেরিকার কলোরোডো নদীর জলপ্রপাত চতুর্থ স্থান পাইয়াছে; এই বিরাট জলপ্রপাতের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

বার্টন হোমস্ পঞ্চম স্থান দিয়াছেন থেসালী দ্বীপের একটি প্রাচীন মঠকে। গ্রেনাইট প্রস্তর খুঁদিয়া এই মঠটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ স্থান পাইয়াছে জাপানের নিক্কো-মন্দির। ইহার তোরণ-দ্বার এমন চমৎকার কারুখচিত যে তাজমহলের কারুকার্য্যের সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে। সমস্ত তোরণ-দ্বার স্বর্ণ খচিত। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে 'উষা-সন্ধ্যা দ্বার" নামে অভিহিত করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ইহা দেখিতে সুরু করিলে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না ছাপাই আমাদের নিয়ম। সম্পাদক]

"আই, সি, এস্, পরীক্ষায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব"

বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসীতে" ১৭০ পৃঃ "আই সি এস পরীক্ষায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে—

"এই কৃতিত্ব, যিনি প্রথম হইয়াছেন তাঁহার, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির নহে; কারণ তাঁহার নীচে ১৫ জনের ভিতর আর কোন বাঙ্গালীর নাম নাই।"

ইহা ঠিক নহে; কারণ ৪র্থ হইয়াছেন একজন বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত এন, বি, ব্যানার্জ্জি। ৫ম হইয়াছেন এ, এস, রায়—ইনিও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী। ১৩শ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত পি, কে, বসু—ইনি বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশবাসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপরিউক্ত প্রথম দুইজন বঙ্গদেশবাসী নহেন। বোধ হয় তাহাই বলিবার আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী হওয়াতে আপনাদের মন্তব্য ঠিক নহে।

শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

দান—
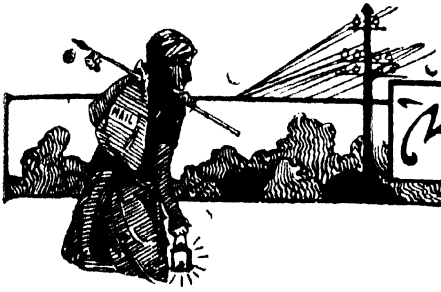
সকলজাতির হিন্দুদের মধ্যে দেশীয় ভাষায় বিনামূল্যে গীতা-বিতরণ কল্পে কিষণচাঁদ নামক এক মহানুভব মাড়োয়ারী ৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকাকে মূল পুঁজি করিয়া একটা তহবিল খোলা হইবে। সেই তহবিলের নাম হইবে "বিনামূল্যে গীতা-বিতরণ ভাণ্ডার।" স্বামী বামনাথজী এই ভাণ্ডার পরিচালনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে একটি ছাপাখানা এবং কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে এই ভাণ্ডারের টাকা গচ্ছিত থাকিবে।

বালকের প্রতিভা—

সম্প্রতি এস, রাজনারায়ণ নামে দক্ষিণভারতের একজন ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকের গণিতে বিস্ময়কর প্রতিভার কথা আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এই বালকের জন্ম মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরা নামক স্থানে। স্কুলে সে রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। তথাপি গণিতে ইহার এরূপ অদ্ভুত দখল যে, মাদ্রাজের বিখ্যাত গণিতজ্ঞগণ ইহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে এম্, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন, এই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক উচ্চতর গণিতে তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজ-সরকার ইহার প্রতিভায় এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাহার শিক্ষার জন্ম মাসিক ৭৫ টাকা মূল্যের একটি বিশেষ বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শিশুবয়স হইতে এই বালক কঠিনতম গণিতে অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। মহীশূরের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক কে, বি, মাধব এবং ডাক্তার আর, পি, পরাঞ্জপে প্রভৃতি ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মাদ্রাজে রামানুজমের মত বিখ্যাত গণিতজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই বালকও দ্বিতীয় রামানুজম্ হইবে।

বালক রাজনারায়ণ যে শুধু গণিতেই অদ্ভুত পারদর্শী এমন নহে, সাহিত্যেও তাহার আশ্চর্য্য দখল আছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্মুখে এই বালক সেক্সপীয়র ও কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে রাজনারায়ণের পিতা পুত্রকে ইউরোপে পাঠাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আসাম সাহিত্যের জন্য দান—

জোরহাটের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, রায়বাহাদুর রাধাকান্ত হান্দিক তাঁহার দুই পুত্র চন্দ্রকান্ত হান্দিক ও ইন্দ্রকান্ত হান্দিকের স্মৃতিরক্ষা কল্পে জোরহাট আসাম সাহিত্য-সভার হস্তে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রায় বাহাদুর রাধাকান্ত আসাম ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এণ্ড এগ্রিকালচার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন।

নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস—

শীত ঋতুতে কলিকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আজমীরের রায় সাহেব চন্দ্রিকাপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই বৎসরের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, মজুরদের সাধারণ হিতসাধন সমস্যা, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের শ্রমের সর্ত্ত সম্বন্ধে একটি আইন প্রনয়ণের ব্যবস্থা এবং আগামী বৎসরের জন্ম একটি সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য পদ্ধতি স্থির করা ইত্যাদি বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

বৃহত্তর ভারত পরিষৎ— কলিকাতায় বিরাট সভা—

জ্ঞানে ও সভ্যতায় ভারতবর্ষকে পৃথিবীর আদি জননী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারত পৃথিবীর কোন দেশ অথবা তাহার সমৃদ্ধির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে নাই। উপরন্তু নিজের দিব্যদৃষ্টি ও মনীষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভারতবর্ষের বাহিরে দেশে দেশে প্রচারিত করিয়াছে। তাহার পরিচয় রহিয়াছে চীন, জাপান জাভা, কম্বোজ, চম্পা প্রভৃতি দেশের সভ্যতার ইতিহাসে। ভারত অস্ত্র লইয়া দেশজয়ে বাহির হয় নাই, জ্ঞানবর্ত্তিকা লইয়া হৃদয়-জয়ে বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে তাহার এই জ্ঞানাভিযানের সংবাদ রাখিতে হইবে ; বুঝিতে হইবে যে সে মানব-কল্যাণকর চিন্তায় মানব-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করিবার জন্য আপনার সীমাকে বিস্তৃততর করিয়াছিল। এই যে মহত্তর ভারত, এই যে বৃহত্তর ভারত, তাহার উপলব্ধি করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য বোধ লইয়া কলিকাতায় 'বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই অক্টোবর (১৯২৬) তারিখে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই পরিষদের উদ্বোধন হইয়াছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, শ্রীযুক্ত বেনীমাধব বড়ুয়া, প্রভৃতি। পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বীরলা, রাজা হৃষিকেশ লাহা প্রভৃতি।

উদ্বোধন-দিবসে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ পরিষদের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, ভগবান বুদ্ধদেবের মৈত্রীমন্ত্রে অনুপ্রাণিত মহারাজ অশোক ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহুদূর দেশব্যাপী ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। বৃহত্তর ভারতের উপলব্ধি তিনিই প্রথমে করেন। সেই বোধকে এখন আবার জাগাইতে হইবে। ভারতবাসী-দিগকে বর্ত্তমানে ভারত সভ্যতার বাণী বহন করিয়া দেশ-বিদেশে যাইতে হইবে। ভারতের পূর্ব্ব গৌরব আমাদিগকে ঐতিহাসিক সাধনায় ব্যক্ত করিতে হইবে এবং পৃথিবীর যে যে স্থানে ভারতবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে তাহাদের সহিত যোগ স্থাপনা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন, প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা বাণিজ্য সূত্রে ভারতের বাহিরে যাইত। ভারতের নৌ-অভিযান তখন প্রবল ছিল। বৃহত্তর ভারত পরিষদের কার্য্যাবলীর অন্যতম হইবে—বিদেশী ভাষায় ভারত সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদির বাঙ্গলা, হিন্দী প্রভৃতি চলতি ভাষার অনুবাদ; পাশ্চাত্য মনীষিগণের নিকট জ্ঞানচর্চ্চার জন্য ভারতীয় ছাত্র প্রেরণ এবং যে সব দেশে ভারতীয় সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই সব দেশের অধিবাসীগণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাহাদের সহিত ভারতের সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ফিজি দ্বীপ হইতে আগত এবং ফিজিতে ভারতীয়গণের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত শ্রীযুক্ত নিশিকুমার ঘোষ, ফিজি দ্বীপের পূর্ব্বতন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া বলেন যে, ফিজির ভারতীয়দের প্রধান অভাব শিক্ষা ও শিক্ষালয়। সেখানে ছয় হাজার ভারতবাসী বাস করে। ইহারা বৃহত্তর ভারতের অধিবাসী। ইহাদিগকে উন্নত করিতে মনোযোগ দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান বলেন, ভারত তরবারি দিয়া সভ্যতা বিস্তার করে নাই, জ্ঞান দিয়া বিস্তার করিয়াছে; এই পরিষদের কার্য্য বর্ত্তমান হিন্দু-সভার কার্য্যের বিশেষ সহায়ক হইবে। ডাক্তার কালিদাস নাগ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যে সব নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহা আলোকচিত্রাদির সাহায্যে সাধারণকে দেখাইয়া তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন বলেন, আমাদের ভারত কত বিস্তৃত তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং এই বৃহত্তর ভারতের কার্য্যে মন প্রাণ দিয়া লাগিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন, সমস্ত দুনিয়া ছোট-বড় ও সেরা-অসেরা শ্রেণীতে বিভক্ত। একটা দেশ আর একটা দেশের উপর নির্ভর করিতেছে, নিজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য। বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠিত ও তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে তিনটি কাজ করিতে হইবে—(১) চীনা, জাপানী শ্যাম প্রভৃতি দেশের ভাষা ও ইউরোপীয় ভাষা আমাদিগকে শিখিতে হইবে। ঐ সব ভাষার অভিজ্ঞ ছেলেরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ঐ সব দেশের অবস্থার কথা প্রচার করিবে। তাহারাই আবার সব সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া জাতির সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে। ইউরোপীয় নানাদেশের ও জাপানের ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই সব ছেলের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কেবল জ্ঞান-বিস্তারে নয়, বাণিজ্য বিস্তারেও ভারতকে বৃহত্তর করিতে হইবে। (২) ভারতের চৌহদ্দি পুরাকালে যেমন ও যেরূপে বাড়িয়াছিল, বর্ত্তমানেও সেই পন্থা গ্রহণপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিবার জন্য ছাত্রদের দেশ-বিদেশে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বলেন, পৃথিবীর সকল দেশ আজ আগাইয়া চলিয়াছে, "ভারত তবু কই?" দেশ-বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া জ্ঞান যেমন আহরণ করিতে হইবে, তেমনি ভারতের সাধনা ও শাশ্বত-সত্য বিশ্বমানবকে দান করিতে হইবে। চীনা সভ্যতা বহু প্রাচীন সভ্যতা, সেই সভ্যতাও ভারত সভ্যতার নিকট ঋণী। ইহাই ভারতের বৃহত্ত্বের ও বিস্তৃতির প্রমাণ। আমরা বিদেশে যেমন ছাত্র পাঠাইব, তেমনি বিদেশের ছাত্রকে ভারত-সভ্যতা বিষয়ে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। রোমান্ বালক যেমন রোমের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শিক্ষিত হয়, ইংরেজ বালক যেমন ইংরেজের কৃতিত্বে গর্ব্ব অনুভব করে—ভারতের বালক যেন তেমনি ভারতের সত্য-ধর্ম্মের মহিমায় গর্ব্বিত হইয়া বড় হইতে থাকে। যে ভারত আপনার লব্ধ সত্য দেশ-বিদেশকে দান করিয়াছে—সেই ভারতকে বুঝিতে ও বুঝাইবার জন্য এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই পরিষদের পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। "আত্মানং বিদ্ধি—ইহাই পরিষদের উদ্দেশ্য। আমাদের অতীতের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। চীনদেশে ভারত-সভ্যতার উপাদান ও সে সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মধ্য-এসিয়ায় ভারতীয় ভাষার নিদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। কাবুলে সম্প্রতি বৌদ্ধ-সভ্যতার নিদর্শনাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই বিশাল ভারতকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। এই কার্য্যে সমগ্র দেশের সম্মিলিত সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। পরিষদের বর্ত্তমান কর্ম্মকেন্দ্র, ৯১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বাংলা

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা—

বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার-কল্পে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি অল্প এবং এগুলির ছাত্র সংখ্যাও খুব কম। গত ১৯২৪-২৫ সনে সরকার এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষা বিস্তারকল্পে নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭, ২৮,০০০ সেকেণ্ডারী শিক্ষা—২৫,৫৮ ০০০ প্রাইমারী শিক্ষা ৩০,৯৯,০০০ টাকা। ছাত্র পিছু যথাক্রমে ১২১।৶৹ আনা, ৬৶৹ আনা, এবং ১৮৶৹ আনা ব্যয় হয়। ১৯২১ সনে শতকরা ১১ জন লোক বাঙ্গালায় শিক্ষিত ছিল, ১৯২৪ সনে শতকরা ১২.৫ জন বালক স্কুলে গমন করিতেছে। শতকরা ২০ জন বালক এবং ৪.৯ জন বালিকা স্কুলে গমন করিতেছে। শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিতে হইলে শুধু বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, শিক্ষকদের শিক্ষার এবং ছাত্রদের ভাল বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইলে করবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। গবর্ণমেণ্ট নিজ সিদ্ধান্তগুলি যথানিয়মে ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিবেন। বর্ত্তমানে সরকার যে প্রস্তাবের আলোচনা করিতেছেন, উহা পল্লী-অঞ্চলের উপরই প্রযুক্ত হইবে,—মিউনিসিপ্যাল টাউন সমূহের উপর প্রযুক্ত হইবে না।

এই সম্পর্কে কিছু কাজ করিতে চাহিলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র আয়েরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য সরকারের সর্ব্ব প্রথম পরিকল্পনা একটি নূতন শিক্ষার নির্দ্ধারণ করা। বার্ষিক আয়ের উপর টাকা পিছু ৫ পয়সা করিয়া কর নির্দ্ধারণ করিলে এই কার্য্যের আবশ্যক অর্থ উঠিতে পারে। চাষী রায়তগণ ৫ পয়সার পরিবর্ত্তে ৪ পয়সা করিয়া দিবে। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষদল গঠন করিতে হইবে। ইঁহারাই নিজ নিজ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। উত্তমরূপে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার কার্য্য অগ্রসর হয়, ইঁহারা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

পার্ব্বত্য জাতি এবং দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্য হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার—

সাধারণতঃ নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত জাতি এবং পার্ব্বত্য

"নির্জ্জন নদীতীরে"

শিল্পী শ্রীযুক্ত রূপকৃষ্ণ
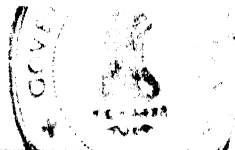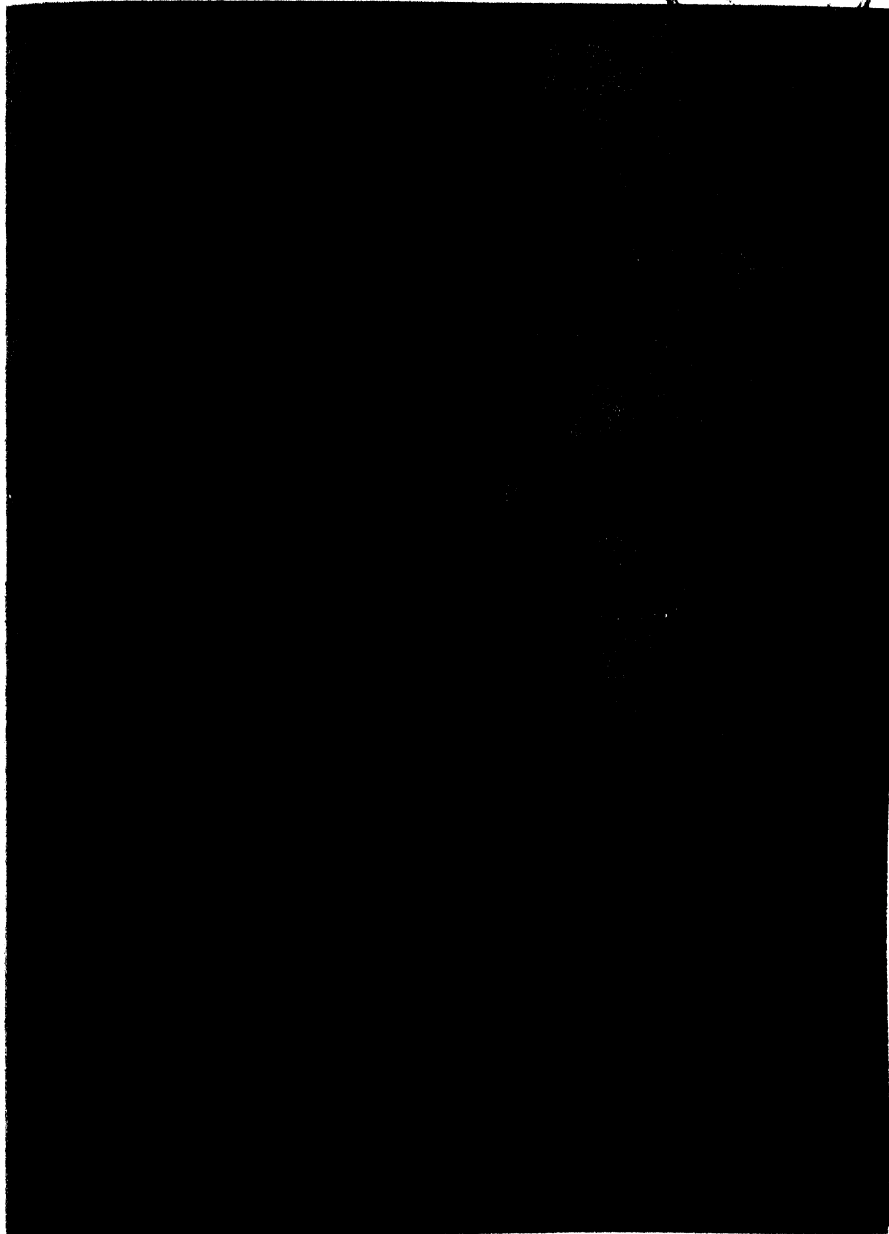
সাঁওতাল কোল, মুণ্ডা গারো খাশিয়া ওরাং প্রভৃতি দলে দলে খৃষ্টিয়ান সমাজে প্রবেশ করিতেছে। হিন্দু আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি। সমগ্র হিন্দু-জাতির সম্মুখে আজ এক বিরাট্ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে –হিন্দু বাঁচিবে না মরিবে? যদি বাঁচিতে হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহাকে জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প লইয়া "হিন্দু মিশন" প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বিরত হয় এবং যাহারা ভ্রান্তি বা মোহবশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে ফিরাইয়া আনা যায়, এই উভয় উদ্দেশ্য লইয়া "হিন্দু মিশন" কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই মিশন হইতে আসামের বিভিন্ন জেলায় পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে এবং গোপালগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। মিশনের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত বহুশত পার্ব্বত্য অধিবাসী ও দেশীয় খৃষ্টিয়ান হিন্দু ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। মিশন গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতেছে এবং গীতার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এই মিশনের কয়েকজন প্রচারক কিছুদিন যাবত বগুড়া জেলার দেশীয় খৃষ্টিয়ান ও সাঁওতালদিগের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। এই প্রচারের ফলে গত ২২।২৩ অক্টোবর (১৯২৬) পাঁচবিবি থানার সালপাড় গ্রামে ৫০০ পাঁচ শত খৃষ্টিয়ান সাঁওতাল পরিবার হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী নাগেশানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী উপস্থিত থাকিয়া স্থানীয় হিন্দুগণের সহায়তায় এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন।

শত শত সাঁওতাল বিপুল উৎসাহের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল নব-দীক্ষিত হিন্দুদিগকে হিন্দুর আচারানুষ্ঠান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এবং স্থায়ী প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মন্দির ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ত্তমানে বিশেষরূপে চেষ্টা চলিতেছে। এই কার্য্যে এবং মিশনের মহৎ কার্য্য নিয়মিত ভাবে চালাইবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ও প্রচার করিতে চাহেন তাঁহারা এই মিশনের সহায় হইবেন, আশা করি। হিন্দু মিশনের বিস্তৃত নিয়মাবলী ও মিশন সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ মিশনের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে, সাহায্যাদিও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সৎসঙ্গ মহিলা সমিতি—

বিগত আশ্বিন মাসে পাবনা সৎসঙ্গ মহিলা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রায় চারিশতাধিক মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

(১) যেহেতু গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপ্রতিপালন ও শিশুর অকালমৃত্যু রোধ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রত্যেক মহিলার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তজ্জন্য এই সভা আশা করিতেছেন যে প্রত্যেক মহিলা উক্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া আদর্শ গৃহিণী হইতে চেষ্টা করিবেন।

(২) শক্তিস্বরূপিনী মাতৃজাতি আজ বাংলায় অবলা, দুর্ব্বলা, স্বাধীনতার সঙ্কোচ-কারক লজ্জা তাহাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিতেছে; নারীকুলের এই দুর্গতি দূর করিবার জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, প্রত্যেক মহিলা শারীরিক ব্যায়াম এবং নানাবিধ কৌশল শিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন করতঃ স্বাধীনভাবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হউন।

(৫) যেহেতু পরিবার ও সমাজের কল্যাণজনক কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয় তজ্জন্য এই সভা প্রত্যেক মহিলাকে নিয়মিত চিত্তসংযম অভ্যাসদ্বারা তাহা লাভ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

২৩ মাইল সন্তরণপ্রতিযোগীতা—

বিগত আশ্বিন কলিকাতায় ২৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগীতা হইয়া

২৩ মাইল সন্তরণপ্রতিযোগীতায় জয়ী বালকগণ

(১) জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২) অবনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩) প্রফুল্লকুমার ঘোষ

(৪) নবীনচন্দ্র মালিক

(৫) সেখ ইয়াকুব

[মিঃ এস্ সি ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে]

গিয়াছে। শ্রী জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিটি কলেজের ছাত্র, প্রথম, শ্রী অবণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১২ বৎসর, দ্বিতীয়) শ্রী প্রফুল্লকুমার ঘোষ তৃতীয়, শ্রী নবীনচন্দ্র মালিক চতুর্থ স্থান ও সেখ ইয়াকুব পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

টাইপ রাইটারে ছাব আঁকা—

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙালী টাইপিষ্ট শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক টাইপরাইটারে আঁকা একটি ছবির প্রতিলিপি দিয়াছিলাম। সম্প্রতি
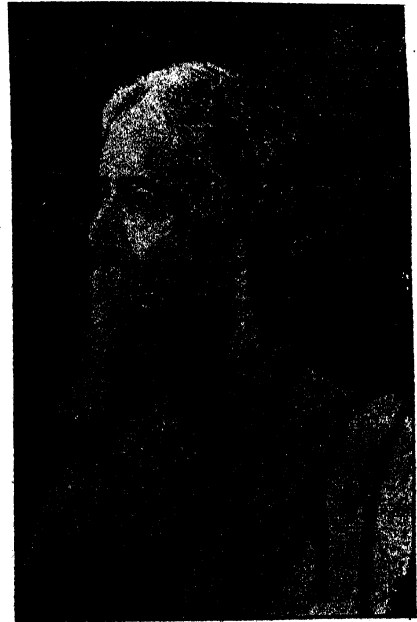
ভিজিয়ানা গ্রামের মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত এম্ ভি সুবন রাও আমাদিগকে কয়েকখানি টাইপরাইটারে আঁকা ছবি পাঠাইয়াছেন। আমরা তন্মধ্য হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও ৺লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের ছবির প্রতিলিপি দিলাম।

মৃত্যুদূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পরে

একটা খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া গাড়ী চালাইয়া উঠিতে উঠিতে তাহারা দেখিতে পাইল যে আর একটি লোক তাহাদের অপেক্ষাও মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে এবং তাহারা অবিলম্বে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

পথ চলিতেছিল জরাগ্রস্ত, বয়সভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধা। সে একটা মোটা রকমের লাঠির উপর ভর দিয়া রাস্তা অতিবাহন করিতেছিল এবং তাহার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এমন একটা ভারি বোঝা বহন করিতেছিল যে তাহার ভারে সে এক পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা পথ ছাড়িয়া দিল; মনে হইল মৃত্যুশকটকে প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। গাড়ীখানি যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে রাস্তার এক পার্শ্বে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরেই গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য সে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে

চলিতে আরম্ভ করিল। পথ চলিতে চলিতে গাড়ীখানি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সেটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় শীঘ্রই সে আবিষ্কার করিল যে যান-বাহী ঘোড়াটি একচক্ষু ও বৃদ্ধ, তাহার সাজ খণ্ড খণ্ড দড়ি ও বার্চ্চ গাছের নমনীয় শাখাগ্রভাগ দিয়া বাঁধা, গাড়ী-খানি জীর্ণ এবং চাকা দুইটির অবস্থা এমন যে সদাসর্ব্বদাই ভয় হয় কখন সে দুইটি খুলিয়া পড়িয়া যাইবে।

আরোহীরা তাহার কথা শুনিতে পাইবে কিনা সে সম্বন্ধে বৃদ্ধার কোনো খেয়াল ছিল না; সে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল—এই প্রকারের গাড়ী-ঘোড়া লইয়া যে কেহ বাহির হইতে পারে, এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমি ভাবিতেছিলাম যে আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া কিছুদূর পৌঁছাইয়া দিতে বলিব, কিন্তু ঘোড়া বেচারা যথাশক্তি টানিয়া কোন রকমে অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি, তাহার উপর আমি উঠিলেই হয়ত গাড়ীটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই জর্জ্জ নিজের আসন হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাড়ীর ও ঘোড়ার অশেষ প্রশংসাবাদ করিতে সুরু করিল। বলিল, "গাড়ী ঘোড়া তুমি যত মন্দ ভাবিতেছে, ততটা নহে। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল গম্ভীরনাদী সমুদ্রের উপর দিয়া আমি এই গাড়ী চালাইয়া গিয়াছি। তুফানে বড় বড় জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার গাড়ীর কিছুই করিতে পারে নাই।" শুনিয়া বৃদ্ধা কিছু হতবুদ্ধি হইল। ভাবিয়া ঠিক করিল শকটচালক তাহার সহিত রহস্য করিতেছে, সুতরাং সেও অবিলম্বে ঢিলটির বদলে পাটকেলটি মারিতে ছাড়িল না।

বলিল, "বোধ হয় এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা স্থলপথ অপেক্ষা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রেই ভাল গাড়ী চালাইতে পারে; তাহাদের স্থলপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় না, আমার এই রকম ধারণা।"

চালক উত্তর করিল,

"আমি খনির গভীর গহ্বর দিয়া পৃথিবীর অন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আমার ঘোড়া মোটেই হোঁচট খায় নাই। চতুর্দ্দিকে অগ্নিপরিবেষ্টিত প্রজ্জলিত নগরের মধ্য দিয়া গাড়ী লইয়া গিয়াছি; কোন অগ্নি নির্ব্বাপকই সেই নিবিড় ধূম্র ও প্রচণ্ড অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে কোন দিনই সাহস করে নাই, কিন্তু আমার ঘোড়া বিন্দুমাত্রও না ভড়কাইয়া সেই আগুনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা জবাব দিল, "কোচোয়ান ভায়া, তুমি বোধ হয় একজন বুড়ীর সহিত রহস্য করিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিতেছ না।"

শকট-চালক বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কখন কখন নিজের কার্য্যে আমাকে এমন এমন পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিতে হইয়াছে, যেখানে পথের রেখামাত্র নাই, কিন্তু আমার অশ্ব পর্ব্বত-প্রাচীর এবং গভীর খাদ লঙ্ঘন করিয়া সেই সব দুর্গম স্থানে গিয়াছে। অথচ তাহাতে আমার গাড়ীখানির কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। এমন এমন জলাভূমির উপর দিয়া আমাকে গমনা-গমন করিতে হইয়াছে, যে সকল জলা-ভূমিতে এমন কোন কঠিন স্থান নাই, যাহা একটী শিশুরও ভার বহন করিতে সক্ষম। মনুষ্য প্রমাণ উচ্চ তুষাররাশির মধ্য দিয়াও আমাকে যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কোন কিছুই আমার গতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। সুতরাং গাড়ী ও ঘোড়া সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইবার আমার কোন কারণই নাই।"

বৃদ্ধা তাহার কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, "বেশ বেশ, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এই গাড়ী-ঘোড়া লইয়া যে তুমি সন্তুষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তুমি দেখিতেছি একটা রীতিমত বড়লোক, তোমার যখন এমন গাড়ী ও ঘোড়া ভাগ্য!"

শকট-চালক গম্ভীর ও গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমি সেই শক্তিমান পুরুষ যাহার সমগ্র মানব জাতির উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব। তাহারা বিশাল সৌধে, কিম্বা কদর্য্য অন্ধকার ঘরে, যেখানেই বাস করুক না কেন সকলকেই আমি আমার শাসনাধীনে লইয়া আসি। আমিই আজীবন দাসকে তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিই। আমিই রাজা মহারাজকে তাহাদের সিংহাসন হইতে বলপূর্ব্বক নামাইয়া লইয়া আসি। এমন কোন সুরক্ষিত নগর-নগরী

নাই, যাহার উচ্চ প্রাচীর আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না; মানুষ এমন কোন গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী নয় যাহা দ্বারা আমায় দুর্ব্বার গতি রোধ করিতে পারে। আমিই নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির তপ্তনীড়ে নিশ্চিন্ত লোকদের বিষম আঘাত করি, আবার আমিই দুঃখভারে নিপীড়িত দুর্ভাগাদের প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী করি।

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি পূর্ব্বেই বলি নাই, যে আমার একজন খুব জাঁদরেল লোকের সহিত দেখা হইয়াছে। তা তুমি যখন এত বড় বাহাদুর এবং তোমার গাড়ী যখন এতই সুন্দর, তখন তুমি বোধ হয় তোমার গাড়ীতে আমাকে উঠাইয়া লইতে আপত্তি করিবে না। আমি নূতন বর্ষ উপলক্ষে আমার একটি কন্যার বাড়ী যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার রাস্তা ভুল হইয়াছে এবং বোধ হয় আমাকে সমস্ত রাত্রিটাই রাজপথে কাটাইতে হইবে যদি না তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য কর।"

শকট-চালক উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "না, না, আমাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিও না, আমার গাড়ী অপেক্ষা রাস্তাতেই তুমি অধিক সুখে যাইবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "এ কথাটা তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার মনে হয় আমাকে বহন করিতে হইলে তোমার ঘোড়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার গাড়ীর পশ্চাদভাগে আমি আমার বোঝাটা রাখিতে চাই। তুমি বোধ হয় আমাকে এইটুকু সাহায্য করিবে।"

বৃদ্ধা উত্তর কিম্বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বোঝাটি নামাইয়া গাড়ীর তলদেশে স্থাপন করিল। কিন্তু বোঝাটি এমন নিরালম্বভাবে মাটিতে পড়িয়া গেল, যেন বোধ হইল উহাকে সে উর্দ্ধগামী ধূম্ররাশি কিম্বা চলমান কুজ্ঝটিকার উপরে সংস্থাপন করিয়াছে।

বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই শকটখানিও তাহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল কারণ সে চালকের সহিত তাহার কথোপকথন ও রহস্য করিবার কোন চেষ্টাই না করিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু এই কথোপকথনের ফলে জর্জ্জের প্রতি হলমের সহানুভূতি বৃদ্ধি হইল। সে মনে মনে বলিল "নিশ্চয়ই জর্জ্জকে অনেক দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে। উহার যে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।" [ক্রমশঃ

বৃহত্তর ভারত

শ্রী কালিদাস নাগ

কবে, কোন্ যুগে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চনদীর কূলে কূলে, বটসহকারশোভিত বনবীথিকার তলে তলে, ঋষিকণ্ঠে ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল; তাহার পরে কত শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, কত সৃষ্টির মহোৎসব, কত ধ্বংসের লীলা, এই ভারতের বুকে ভৃগুপদচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া গেল; তপোবৃদ্ধ ভারত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল কত রাজবংশের, কত বিরাট সাম্রাজ্যের জাগরণ ও বিলয়, কত ইতিহাসের পতন ও অভ্যুদয়—আজও সে-দেখার শেষ নাই। কিন্তু এই যে শত শত বর্ষ ইহার মাথার উপর দিয়া অতীত হইয়া গেল, তাহার ঘটনাবহুল ইতিহাস অনাগত ভবিষ্যতের জন্য চিরন্তন অক্ষরে কেহ লিখিয়া রাখিল না; এত বড় একটা বিরাট দেশ ও জাতির একটি সুনির্দ্দিষ্ট জাতীয় ইতিহাস কিছু গড়িয়া উঠিল না। এই বৃদ্ধ ভারতবর্ষ প্রত্যেক দেশের মতই ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি স্তর একে একে ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু গ্রীস যেমন দিয়াছে তার হেরোডোটাস্ ও

থুকিডিডিস্, রোম যেমন দিয়াছে তার টাসিটাস ও পলি-বিয়াস্, ভারতবর্ষ তেমন একটিকেও দিল না যে, তাহার সুখ সৌভাগ্যের, মান অপমানের ইতিহাসটিকে বিস্মৃতির কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। অথচ পুরাকাল হইতে দেখিতেছি ইতিহাস ও পুরাণের মূল্য ভারতবর্ষ বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণে উপনিষদে সূত্র-সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে; তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হয়, মুসলমান ঐতিহাসিকদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাহা দিয়াছে তাহা ধর্ম্ম ও নীতির ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করিয়াই দিয়াছে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাসে নয়।

এই যে "জাতীয় গৌরব"কে বাঁচাইয়া রাখার প্রতি একটা অতিমাত্র ঔদাসীন্য, এই ঔদাসীন্যের মধ্যে পাশ্চাত্য বিবুধজনেরা দেখিয়াছেন ভারতের জাতীয় জীবনের একটা অনপনেয় কলঙ্ক, জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের একটা সুবৃহৎ অভাব ও অসম্পূর্ণতা। ইহারই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া 'নানা-মুনির নানামত' ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা যেন বলিতে চাহেন, 'রাষ্ট্রীয় অনৈক্য, জাতীয় একাত্ম-বোধের অভাব, প্রাচ্যের অদৃষ্টবাদ, ইহলোকের প্রতি অবজ্ঞা এবং পরকালের উপর নির্ভর সকল কিছু মিলিয়া প্রাচীন হিন্দুর বিজ্ঞান-দৃষ্টিকে আবৃত করিয়াছে; সেইজন্যই ভারতবর্ষে জাতীয় ইতিহাস বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুঃখ ও দুর্গতির মূলেও তাঁহারা দেখিয়াছেন এই জাতীয় চিত্তবিকার এবং ইহার আরোগ্যকল্পে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে, হিতাকাঙ্ক্ষীরা সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষের একটি জাতীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

দেশের এবং জাতির একটা সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস থাকা নিতান্তই প্রয়োজন এবং তাহা নাই বলিয়া ভারতবর্ষ আজ সত্যই দরিদ্র, কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন হিন্দুদের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান দৃষ্টি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। যে জাতি অন্ততঃ চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদমন্ত্রে সর্ব্বপ্রাচীন মানবগীতি রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহারা বুদ্ধি দিয়া, হৃদয় দিয়া, কল্পনা-দৃষ্টি দিয়া, এই দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-গোচর, অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় জগতকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং সেই লব্ধ জ্ঞান দ্বারা নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল একথা স্বীকার করিতেই হয়। যে জাতি অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণিনির মতো এমন একটা সুসংবদ্ধ ও সারগর্ভ-ব্যাকরণ পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দান করিতে পারিয়াছিল, সেজাতির বিশ্লেষণ-শক্তি এবং সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা যে ছিল একথা না মানিয়া উপায় আছে কি? যে জাতি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান-জীবনের সমস্ত গতি ও ধারাটিকে তাহার মন্ত্র, গাথা, পুরাণ, কথকতার মধ্য দিয়া আপনার ভিতরে বহন ও ধারণ করিতে পারিয়াছে—লেখনীর সাহায্যে নয়, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির সহায়তায়—সে জাতির সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা যে ছিল সে কথা স্বীকার না করিবার কোন উপায় নাই। কাজেই মনের মধ্যে এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়—এমন একটা জাতি ও দেশ, 'জাতীয় ইতিহাস' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তেমন কিছু একটা কেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না; এ সমস্যার মীমাংসা সহজে কিছুতেই করিতে পারা যায় না।

এমনও হইতে পারে যে, প্রাচীন হিন্দুরা, যুদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধি-বিরোধ লইয়া যে ইতিহাস, সে ইতিহাসকে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই; জাতির সৃজনী শক্তির পূর্ণ পরিচয় সে ইতিহাসে মিলিবে না বলিয়াই হয়ত তেমন ইতিহাস ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠে নাই। হয়ত একথাই সত্য যে, এই বস্তু-জগতকে অস্বীকার করিবার মতন শক্তি তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন; এবং সমস্ত বস্তুজগতের পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় শাশ্বত জগত বিরাজ করিতেছে, তাহারই সন্ধানে তাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হইয়াছিল। যাহা অস্থায়ী তাহাকে তাঁহারা তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং যাহা অদ্বৈত এবং নিত্য তাহাকেই একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া মানিয়াছিলেন। সেই জন্যই ইতিহাস ভারতবর্ষে আমল পাইল না, পাইল তত্ত্ববিদ্যা; শাশ্বত বস্তুর সন্ধানে আত্মার যে অভিসার তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই হয় ত ভারতবর্ষ মানুষের প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া জানিয়াছিল। কাজেই

একদিকে প্রতিবেশী চীন যখন ধীরে ধীরে বস্তুবিদ্যার নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন ব্যাবিলন পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রাচীন ব্যবস্থা-শাস্ত্রও জ্যোতি-বিদ্যার ভিত্তি পত্তনকরিতে মন দিয়াছে; যখন মিশর তার অপূর্ব্ব চিত্রাক্ষরে "মৃতের ইতিহাস" (Book of the Dead)লিখিয়া রাখিতে ব্যস্ত এবং তার বিরাট স্থাপত্যের গর্ব্বে মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে উপক্রম করিতেছে, তখন ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে বেদবাণীর ভিতর দিয়া মানুষের তত্ত্ববিদ্যার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতেছিল; জীবনের যাহা মূল প্রশ্ন—পৃথিবীর আদিম অবস্থার সেই "অস্তি নাস্তির" সুকঠিন সমস্যা, মৃত্যু ও অমৃতের সুদুর্গম সন্ধান—তাহাই স্নিগ্ধ গম্ভীর ছন্দে দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিতেছিল :—

না ছিল সত্তা নাহি অসত্তা,
না ছিল পবন, আকাশ-তল,
কিবা ছিল ঢাকা? কোথা? কে ধর্ত্তা?
গহন গভীর ছিল কি জল?
না ছিল মৃত্যু, অমৃত নেই,
না ছিল রাত্রি অথবা দিন,
বায়ুহীন শ্বাস টানি' এক সেই
ছিল জাগ্রত সকল-হীন।

(শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ)

কিন্তু সেই আদিম যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যখন দেখি সমাজ ক্রমেই জীবনযাত্রার বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে, ক্রমেই তাহা নানাদিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তখনও দেখি ভারতবর্ষ তাহার বার্ত্তাবিজ্ঞান (Economics)কে রাখিল দূরে, বড় করিয়া দেখিল তাহার ন্যায়ধর্ম্ম ও বিচার-শাস্ত্রকে (Equity and Jurisprudence); অর্থশাস্ত্রকে আমল না দিয়া শ্রেষ্ঠ মানিল তাহার নীতিশাস্ত্রকে (Ethics); এমনি করিয়াই শাশ্বত ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতবর্ষ তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাজধর্ম্মকে জুড়িয়া দিল এবং ধর্ম্মকেই সমাজ-জীবনের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া মানিল। এই যে মৃত্যুশীল বস্তু-জগতের প্রতি অদ্ভুত ঔদাসীন্য এবং শাশ্বত অতীন্দ্রিয় জগতের উপর অসীম বিশ্বাস, ইহাই দেশের জাতীয় শিল্প ও ইতিহাসে অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বইতিহাসের প্রতিকৃতি, ভারতবর্ষ হইয়াছে বিশ্বভারত—আর একদিকে ভারতের শিল্প, রূপ পাইয়াছে প্রতিকৃতিতে নয় প্রতীকে, রূপে নয় অরূপে এবং সার্থক হইয়াছে রূপাতীতকে লাভ করিয়া। কাজেই বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাসে ঔদাসীন্য দেখিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা সেই জাতীয় ব্যাধির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লওয়া যায় না; সে কারণ নিহিত রহিয়াছে জাতীয় ভাবধারার আরও সুগভীর গর্ভে। সেখানে দৃষ্টি প্রেরণ করিবার মতন সুদুর্লভ শক্তি লইয়া মনস্তত্ত্ব-নিপুণ ঐতিহাসিক যে দিন দেখা দিবেন, সেই দিন এ সমস্যার রহস্য উন্মোচিত হইবে; তাহার আগে নয়। কাজেই সে কথা এখন থাক্। কিন্তু বিশ্বানুভূতি ও বিশ্বৈকবোধ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কতখানি বৈশিষ্ট্য দিয়াছে; তাহার উপর কতখানি ছায়াপাত করিয়াছে, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ভারতে জাতীয় জীবন বলিতে সত্য কি বুঝায়, ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের ভাণ্ডারে কতখানি দান করিয়াছে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে নিত্যবিরোধ যে যুগের দিনপঞ্জী হইয়া উঠিয়াছে—সে যুগে এই বিষয়ের সন্ধান ও অনুশীলন হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে—শুধু ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের দিক্ হইতে নয়, শুদ্ধ অতীত এই কর্ম্ম কোলাহলময় উদ্ভ্রান্ত বর্ত্তমানের কানে কানে কতরূপে কত ইঙ্গিতে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে সে সন্ধানের দিক হইতেও ইহার মূল্য আছে।

ভারত "জগত-ছাড়া" নয়—ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০—৫০০ ;

'ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক যুগের প্রথম প্রভাত হইতে যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে অপূর্ব্ব অদ্ভুত কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন

সম্বন্ধই ছিল না, নিজের মধ্যে নিজকে গুটাইয়া লইয়া, সকল ছোঁয়া বাঁচাইয়া, ভারতবর্ষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—ভারতের ইতিহাস-লেখকেরা প্রথম হইতে এই কথাটি প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। অথচ ইহাই হইতেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চাইতে বড় মিথ্যার এবং সব চাইতে দুরপনেয় কলঙ্কের উৎস। এই মিথ্যা কলঙ্কের জন্য যতখানি দায়ী ভারতের বর্ত্তমান গোঁড়ামীর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ঠিক ততখানি দায়ী প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস-লেখক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ। ইহারা ভারতের অনেক লুপ্ত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু এই নব্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি তাঁহাদের আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথচ দিনের পর দিন মানুষ যুগে যুগে তার যে ইতিহাস আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলে, শাস্ত্রের কথা, পুঁথির লিখন জাতির সেই নিগূঢ় ইতিহাসের মর্ম্মকথাকে কতখানি ব্যক্ত করিতে পারে—? গতিশীল ইতিহাসের সেই সত্য ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যখন অতীত ভারতের পানে ফিরিয়া তাকাই, তখন ভারতের এই অদ্ভুত চিত্র, এই দুরপনেয় কলঙ্ক ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথ হইতে মুছিয়া যায়: জাতি-বর্ণভেদে প্রপীড়িত এই ভারতবর্ষ; একদিকে হিমালয় ও অন্যদিকে নীলাম্বু দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাধনা ও সভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এই ভারতবর্ষ; আপনার পবিত্রতাকে সকল বহিঃস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য রুদ্ধদ্বারবাতায়ন এই ভারতবর্ষ; হোম-ধূমাচ্ছন্ন বেদমন্ত্রমুখরিত এই ভারতবর্ষ; অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্বজাল রচনায় নিবিষ্ট—প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আপাত প্রতীয়মান্ ছেলে-ভুলানো অলীক চিত্র ইতিহাসের সত্যরশ্মি সম্পাতে ভস্ম হইয়া যায়।

পশ্চিম এসিয়ায় বৈদিক দেবতা

মিথ্যার সম্মুখে সত্য শুধু স্থিরতায় অটল নয়, শক্তিতে জ্যোতিষ্মানও বটে। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদের সত্য আবিষ্কারের সমক্ষে পণ্ডিত সমাজের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত মতবাদ, এক মুহূর্ত্তে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে এতবড় মিথ্যার এই যে প্রচার, এ মিথ্যাও একদিন ধূলায় লুটাইল; সহসা একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস উষার অরুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; ভারত-ইতিহাসের নূতন এক দিগন্ত যেন উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হুগো ভিন্‌কলার (Hugo Winckler) বোঘাজকোই (Boghaz Keui) লেখাটি আবিষ্কার করিলেন; দেখা গেল অভাবিতপূর্ব্ব এক তথ্য উহাতে লেখা রহিয়াছে; খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ শতাব্দীতে সুদূর ক্যাপ্যা-ডোসিয়ায় পরস্পর বিবদমান দুইটি জাতি, হিটাইট্ ও মিতান্নী যুদ্ধশেষে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে এবং তাহাদের মিলনযজ্ঞ-ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে তিনটি বৈদিক দেবতা, মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্রকে। শুধু তাহাই নয়, ছন্দের শেষে মাত্রার মত ইহারা সন্ধি মিলনটিকে সম্পূর্ণ করিতেছে দুই রাজপরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং এই বিবাহ-মিলনকে আশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আহূত হইতেছেন বৈদিক দেবতা নাসত্যদ্বয়।

শান্তি স্থাপনা, ভারতের ঐতিহাসিক নট-ভূমিকা

এ তথ্য ভারত ইতিহাসের এক অমূল্য তথ্য। বিশ্ব-ভারতের ইতিহাসে প্রথম যে ধ্রুব তথ্যটি পাওয়া গেল তাহাতেই দেখিতে পাইতেছি ভারতবর্ষের উপাস্য দেবতারা দেখা দিতেছেন শান্তিস্থাপকরূপে, মিলনের পুরোহিতরূপে। সেই হিসাবে বোঘাজকোই লেখ-উদ্ঘাটিত তথ্যকে শুধু এশিয়ার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা বলিয়া মনে করিলেই চলিবে না; ভারত যে শান্তি ও মৈত্রীর ভিতর দিয়াই বিশ্ব-ভারতের প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল বোঘাজকোয় লেখ তাহারও প্রতীক। ভারতের এই যে বিশ্বভারত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইহাকে ধনবিজ্ঞানবিদের বিশ্ব-মহাজনী বা রাষ্ট্রনেতার বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহিত এক দৃষ্টিতে দেখিয়া ভুল করিলে চলিবে না। একথা আমরা ভুলিতে পারি না, ভারতের দেবতাকুল যখন বিবদমান জাতির মাঝখানে শান্তিদূত হইয়া দেখা দিতেছেন, মিশর তখন বিপুল

পূর্ব্বে থুট্‌মোসিসের (Thutmosis III) বিজয়-গাথায় আপন বিশ্ববিজয়কাহিনী ঘোষণা করিতেছে এবং যুদ্ধে বিজিত দেশ ও জাতির সুদীর্ঘ তালিকা রক্ত-লেখায় আপন ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতেছে; আরও পশ্চিমে একাইয়েনরা (Achaeans) তখন ইজিয়ানদের (Aegean) রাজধানী ক্নোসসের (Knossos) প্রাচীর বিজয়-দর্পে চূর্ণ করিতেছে; ভূমধ্যসাগরে মিনোয়ার বিপুল সাম্রাজ্য তখন ধূর্ত্ত ফিনিসীয় বাণিজ্য-ধুরন্ধরদের ব্যবসা-ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া ধীরে ধীরে আত্মবিলোপ করিতেছে। কিছু পরে দেখি (১২০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব) ট্রোজান যুদ্ধের (Trojan) ধ্বংস-লীলার অবসানে দুর্ব্বল একাইয়েন সাম্রাজ্য এবং ফিনিসীয় বণিক-রাজত্ব দুইই শক্তিমান ডোরিয়দের (Dorian) সমক্ষে মাথা নত করিতেছে আর প্রাচ্য জগতে আসীরীয় অসুরেরা সমস্ত দুর্ব্বল প্রতিবেশীদের অবনত মস্তকে ক্ষমতার আধিপত্য ও অধীনতার গুরুভার চাপাইয়া দিতেছে।

আর্য্য-অনার্য্য মিলন-নাট্য

পশ্চিমে যখন সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া শক্তি ও প্রভুত্বের এই তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, তখন ভারতবর্ষে কি হইতেছিল, এ সম্বন্ধে আমরা কোন তথ্যই খুঁজিয়া পাই না; কিন্তু ভারতীয় জীবন ও চিন্তার ধারা কি করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সমাজ-জীবনের কত স্তর, ধাপে ধাপে অতিক্রম করিয়া, কত সমস্যা যে ধীরে ধীরে ভারত মীমাংসা করিয়া আসিতেছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদের অতুলনীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে। মিশরীয়, আসীরীয়, একাইয়, ডোরীয়দের আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে ও আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করিতে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, বৈদিক আর্য্যদের সম্মুখেও ছিল সেই একই সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা এক অভিনব উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করিল এবং তাহারা যাহা করিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা চিরকালের সামগ্রী হইয়া রহিল। আদিম অনার্য্যদের সঙ্গে শক্তির লড়াই তাহাদেরও হইয়াছিল, কিন্তু অনার্য্যদের বাঁচিয়া থাকিবার দাবীকে তাহারা স্বীকার করিল—তাহাদের স্বাধীনতাকে মানিয়া লইল এবং দুইয়ে মিলিয়া এমন একটা সাধনা ও সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিল যাহাতে আর্য্য-প্রতিভার দান যতখানি, অনার্য্য-মনীষার দান তাহা অপেক্ষা কিছু কম নয়।

এই যে আর্য্য-অনার্য্য সমন্বয়, এ সমন্বয়ের ক্রম-বিকাশ বেদ-সাহিত্যে বড় একটা দেখি না। তবু এখানে-ওখানে ইহার ছায়াপাত যে হয় নাই এমনও নহে; বৈদিক যুগের প্রথম হইতেই দেখি শ্বেত আর্য্য ও কৃষ্ণ অনার্য্যে যুদ্ধের বিরাম নাই—এই যুদ্ধের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেসব সমস্যা দেখা দিল, শুধু বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণেই সেসব সমস্যার মীমাংসা নিশ্চয়ই হয় নাই। ইহাদের রণভেরী-নিনাদে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় আকাশ বাতাস কম্পিত হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধক্ষেত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল এবং শোকে ও আতঙ্কে অনেক হৃদয় স্তব্ধ ও শুষ্ক হইয়াছিল। বেদের ঋষি উষার ঋক্‌মন্ত্রে হয়ত সেই সুদীর্ঘ তামসী রজনীর স্তব্ধ আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তাকেই কবির ভাষায় রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—

> আসিয়াছে উষা শ্রেষ্ঠ জ্যোতির জ্যোতির্ম্ময়ী,
> জন্ম লয়েছে শুভ্র আলোক আঁধারজয়ী,
> প্রসবি' সবিতা বেদনকাতরা রাত্রি মাতা
> লভেছে বিদায়, জাগিয়াছে উষা জীবনদাতা।
>
> (শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ)

প্রাণের প্রতি ভারতের মজ্জাগত শ্রদ্ধা

সত্যই জীবনপ্রদীপকে স্থির ঔজ্জ্বল্যে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখাই ছিল ভারতের লক্ষ্য; ভারত জীবনকে কখনও লোপ করিয়া দিতে শেখায় নাই। বুদ্ধ-মহাবীরের অহিংসা মন্ত্র প্রচারের বহু পূর্ব্বে ভারতের সত্য-সাধনা মানব-জীবনের প্রতি তাহার সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছে; আর্য্য-জগতের প্রাচীনতম গীত-গাথায় চিরন্তন লিখনে সেই প্রাণস্তুতি লিখিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ব-ভারতের ইতিহাসে আর্য্য-অনার্য্যের এই সমন্বয় সত্যই গৌরবের বস্তু। রক্ত সম্পর্কে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন, সাধনায় ভিন্ন, এই দুইটি জাতি সমস্ত হিংসাদ্বেষ মিলন-যজ্ঞে আহুতি

দিয়া, মৈত্রী ও প্রেমে মিলিত হইয়া,এক বিরাট জাতি এবং এক অপূর্ব্ব সাধনার জন্মদান করিল।

মহাকাব্যে বিশ্বজয়ের আদর্শ

বহু বিবাদ ও বহু সংগ্রামের পর এই সুমহান্ কল্যাণকে ভারতবর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিল। বিবাদ ও সংগ্রাম ক্রমে শৌর্য্যে ও সৃষ্টিনৈপুণ্যে রূপান্তরিত হইয়া ভারতইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল, নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করিল। সেইহেতু অথর্ব্ববেদে ব্রাহ্মণে আরণ্যকে যেমন শুনি বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের কথা, তেমনই শুনি সার্ব্বভৌম নরপতির কথা। দিগ্বিজয় তখন একমাত্র কাম্য ও লোভনীয় বস্তু; রাজার উপরে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিবার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল। এই দুর্নিবার লোভ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল বিরাট যুদ্ধ-বিগ্রহ; তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রচিত হইল, কত কথা, কত গাথা, কত মহাকাব্য। ট্রোজান্ যুদ্ধের বহু শতাব্দী পরে যেমন দেখা দিলেন হোমার প্রভৃতি কবি, এবং প্রচলিত গীত ও গাথাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা রচিয়া তুলিলেন ইলিয়াড্ ও ওডিসিয়ুস, ঠিক্ তেমনি বৈদিক যুগের শেষে রাম-রাবণের ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের বহু শতাব্দী পরে দেখা দিলেন, মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাস এবং বিক্ষিপ্ত গাথা ও চারণগীতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা রচিলেন রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্য।

যুদ্ধপন্থা ও তাহার সামাজিক পরিণতি

বৈদিক যুগে দেখিয়াছি গোষ্ঠীর (tribe) সঙ্গে গোষ্ঠীর যুদ্ধ, গণের (clan) সঙ্গে গণের যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফল স্বরূপই গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর মিলন, গণের সঙ্গে গণের মিলন। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে দেখি সম্রাট্ সম্রাটে, এক সার্ব্বভৌম নরপতির সঙ্গে আর এক সার্ব্বভৌম নরপতির সংঘর্ষ। সেই পুরাতন সমন্বয়নীতির সাধনা এই যুগে সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন হইয়া দেখা দিল। বিরাট্ যুদ্ধ, বৃহত্তর সংঘর্ষকাহিনী দুটি মহাকাব্যেই অনেক স্থান জুড়িয়া আছে; কিন্তু কোন কাব্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ব্যাপারটিই একান্ত হইয়া পাঠকের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে নাই। সংগ্রাম ও সংঘর্ষের যে সুদুর্লভ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহা পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই ছিল কবিগুরুর উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম ও ন্যায়কে যে বরণ করিয়াছে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য তাহারই; আর যুদ্ধে জয়লাভ—সে ত পরাজয়েরই নামান্তর; ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দুর যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ধারণা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতবর্ষ লোভ ও হিংসা, সংগ্রাম ও সংঘর্ষকে বাদ দিয়া চলিতে পারে নাই, কিন্তু সেই সব-কিছুর মধ্যেও ভারতের মনটি ছিল সর্ব্বদা সজাগ; ধ্বংস ও সংগ্রামলীলার যে বিষময় পরিণাম তাহা সে অন্তরের মধ্যে স্বীকার করিতে পারিয়াছিল। তাই ত রামায়ণে দেখি বিজয়ী রাম মৃত্যুপথযাত্রী শত্রু রাবণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন; মহাভারতে দেখি শূরগুরু ভীষ্মের শরশয্যার প্রান্তে বসিয়া বিজয়ী যুধিষ্ঠির শান্তির বার্ত্তা শুনিতেছেন; বিজেতা এই ভাবেই বিজিতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ফল যখন ক্রমে ভীষণ হইয়া দেখা দিল, ভারতবর্ষ তখন এই সংগ্রাম লীলাকে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও বিশ্বানুভূতির পরিপন্থী বলিয়া জানিল এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব জুড়িয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সুদীর্ঘ শতাব্দী রক্ত-সমুদ্র অতিবাহন করিয়া ভারতের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল এবং ভয়ে ও ঘৃণায় যুদ্ধের মত্ত উল্লাস হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। অবশ্য এমন দুই একটি দল রহিয়া গেল যাহারা এই সন্দেহ ও সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে বুঝিয়া তাহার সঙ্গে একটা আদর্শবাদ জুড়িয়া দিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিল। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ক্রমে দেখা দিল "ষাড়্গুণ্য"-নীতি এবং তাহাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "মণ্ডল ন্যায়ে" সর্ব্বশেষ রূপ লাভ করিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন যখনই খণ্ডিত তখনই কৌটিল্যের এই রাষ্ট্রন্যায়ই তাহার অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। আর এক দল এই বস্তুজগতের যুদ্ধ-বিগ্রহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিল পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণুর সংগ্রামের রূপক রূপে; ইহারাই ভগবদ্গীতার মতন একটি সুমহান্

তত্ত্বকাব্য গড়িয়া তুলিল। কিন্তু সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রেম ও শান্তির বার্ত্তা প্রচারই তৃতীয় একটি দলের আদর্শ হইয়া রহিল। তাঁহারা বলিলেন, সন্দেহে নয়, সংগ্রামে নয়, মানুষ মানুষের উপর জয়ী হইবে প্রেমে, শান্তিতে। ইহাদের আদর্শটিকে ধরিতে পারি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে।

ক্ষমা ও বিশ্ব-মৈত্রীর প্রচার

সমগ্র ভারতের আত্মাটি এই সময় যেন এক নবজনমের বেদনায় অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আকাশ বাতাস এক নূতন উৎকণ্ঠায় অধীর এবং দারুণ দুশ্চিন্তায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। তুচ্ছ অহঙ্কারে, ক্ষমতার দর্পে ও ভীষণ রক্তপাতে ক্ষুব্ধ ও নিপীড়িত ভারতবর্ষের আত্মা যেন মুক্তিকামনায় অস্থির হইয়া উঠিল; মানুষের মন যেখানে পরম নির্ভয়ে, উদার শান্তিতে ও সুনির্ম্মল প্রেমে বিরাজ করে, সুকঠিন সাধনায় সেই স্বর্গে ভারত আপনাকে উন্নীত করিয়া লইল। সাধনের সেই দিব্যলোক হইতে, সেই প্রজ্ঞা ও প্রেমের রাজ্য হইতে ভারতের মুক্ত আত্মা উপনিষদের ঋষি-কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে এই নূতন মুক্তির বাণী বিশ্বমানবকে ডাকিয়া শুনাইল---

> "শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
> দিব্যধাম বাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
> মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
> জ্যোতির্ম্ময়।"
>
> (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)

সে-বাণী বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত মন্ত্রিত হইল; যিনি সর্ব্বানুভূঃ, যিনি "বিশ্বম্ ভুবনমাবিবেশ" সমস্ত পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাকে যাঁহারা জানিয়াছেন এবং জানিয়া নিজেরা সর্ব্ববন্ধনমুক্তির আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, সেই লব্ধজ্ঞান মুক্ত পুরুষেরাই ত এ বাণী প্রচার করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বানুভূঃ সেই মহান্ত পুরুষকে জানা! এ জানা শুধু স্বপ্ন হইয়াই রহিল না, তাহা রক্তমাংসের মানুষ রূপে একদিন ভারতের বুকে ক্ষমা প্রেমে মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। বুদ্ধদেব এই দেশের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কপিলাবস্তু, শাক্যকুল, বিপুল রাজত্ব, সবকিছু তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া রহিল; যাহা পাইলে সবকিছুর তৃষ্ণা বাসনা মিটিয়া যায় তাহা জানিবার জন্যই তিনি আকুল হইলেন এবং যেদিন তাহা জানিলেন সেই দিন তিনি হইলেন "বুদ্ধ"। যে সত্য এতদিন ছিল ভারতের ধ্যানে, সেই সত্যই আজ মূর্ত্তিলাভ করিল। ধর্ম্ম যখন জীবরক্তে কলঙ্কিত, পূজা যখন যজ্ঞধূমে ধূমায়িত, সমাজ ও রাষ্ট্র যখন হিংসায় ক্ষুব্ধ, সংগ্রামে পীড়িত ও রক্তে স্নাত এবং সমস্ত দেশ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বুদ্ধ তখন ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া মৈত্রী ও অপরিমেয় প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিলেন—জীবন গ্রহণে নয়, জীবন দানে, হিংসায় নয় প্রেমে, সংগ্রামে নয় শান্তিতেই, মানুষের মুক্তি—আত্মবিস্মৃত দেশকে বুদ্ধ এই অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। যদি সবকিছু পাইতে হয়, সবকিছু দিতে হইবে; দুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি যদি লাভ করিতে হয় অহংকারকে বিনষ্ট করিতে হইবে; এবং আঁধারের পরপারে জ্যোতির্লোকে যাইয়া "বুদ্ধত্ব" যদি লাভ করিতে হয়, বাসনার "নির্ব্বাণ" করিতে হইবে। এই অমর বাণীকেই তিনি দেশে দেশে দিকে দিকে প্রেরণ করিলেন।

বুদ্ধের যুগে এসিয়ার প্রাণ

রাষ্ট্রীয় জীবনের যে ইতিহাস, সে ইতিহাস মানব-জীবনের অপূর্ব্ব রহস্যের কতটুকু আভাস দিতে পারে? রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানবজীবনের যতটুকু আত্মপ্রকাশ করে তাহা কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র! সেইজন্যই ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন এক একটা ঘটনা ঘটিয়া যায়, এমন এক এক-জন মহান্তপুরুষের আবির্ভাব ও এমন এক সুমহান্ ভাবের স্ফুরণ হয় যাহাকে রাজনৈতিক ইতিহাসের কোঠার মধ্যে ফেলিয়া কিছুতেই তাহার চরম তাৎপর্য্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। জাতীয় জীবনের ভাবধারা কত বিচিত্র ও কত রহস্যময়, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে সে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলে, সে নিগূঢ় ইঙ্গিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস-যন্ত্রের সাহায্যে ধরা কঠিন। এই যে উপনিষদের বিশ্বানুভূতি, এই যে বুদ্ধের

সর্ব্বজীবে একাত্ম-বোধ, ইহার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কি তাহা নাই বুঝি, মানব জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য জগতে তাহার সার্থকতা ছিল। সেইজন্যই দেখিতে পাই, বুদ্ধ যখন বিশ্বমানবতার চরণতলে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন, জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর তখন অহিংসাকেই ধর্ম্মের চরম অবলম্বন বলিয়া প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষে যখন বুদ্ধ ও মহাবীর প্রেম ও শান্তিমন্ত্রে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন, তখন চীনে চাউ-রাজত্বের (Chow) সেই অন্ধকারময় যুগে লাউট্‌সে (Laotse) ও কনফ্যুসিয়াস্ (Confucius) সেই একই বার্ত্তা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন: অহংকারকে দূর কর, চিত্তকে পবিত্র কর, প্রেমে ও শান্তিতে সকলকে বাঁচিতে দাও ইহাই তাঁহাদের মন্ত্র। পশ্চিমে ইরাণ দেশেও দেখি জরথুস্ত্র সেখানে কিছুদিন আগেই মানবজীবনের পবিত্র আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দিগ্বিজয়ী ইরাণ সম্রাট দরায়ুস, বেহিস্তন আর নক্‌সি রুস্তম শিলালিপিতে লিখিলেন:—"দরায়ুস বলিতেছেন,—আমি শত্রু কাহারো নই, প্রবঞ্চক আমি নই, অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী আমি নই; সেইজন্যেই অহুরমজ্‌দা (Ahuramazda) এবং অন্যান্য দেবতারা আমায় সাহায্য করিয়াছেন"। তাঁর শেষ কথাগুলি যেন সে যুগের বাণীকেই চিরকালের জন্য দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে:—"হে পৃথিবীর মানুষ। অহুরমজ্‌দার আদেশ কি তোমরা শুনিয়াছ? তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশিত হউন। ভুল করিও না, ধর্ম্ম পথ ছাড়িও না, পাপে মজিও না।"

ভারতবর্ষ বিশ্বমানবতার অগ্রদূত

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০-খৃঃ অঃ ৫০০

দরায়ুস বলিয়াছিলেন, "রস্তম মা অবরদ মা শুরব—" ধর্ম্মপথছাড়িও না, পাপে মজিও না—লাওট্‌সে, কনফ্যুসিয়াস, বুদ্ধ, মহাবীর যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন দরায়ুস জীবন-প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে সেই মন্ত্রেই তাঁর শেষ কথাটি লিখিয়া রাখিয়া যেন এক নূতন যুগের বন্দনা করিয়া গেলেন। দরায়ুস যখন সম্রাট, ইরাণ সাম্রাজ্যের তখন গর্ব্বোন্নত শির, যোজন ব্যাপিয়া তাহার বিস্তৃতি, একদিকে পঞ্চনদীর তীর, অন্য দিকে গ্রীসের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যত রাজাধিরাজ দরায়ুসের ভয়ে ত্রস্ত ও কম্পিত; এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লইয়া অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের সঙ্গমস্থলে দরায়ুস দাঁড়াইয়া আছেন। এই ইরাণ সাম্রাজ্যের অতুলনীয় বীর্য্য ও বিক্রম একদিন গ্রীসের যোদ্ধাকবি এস্‌কাইলসের বীণায় সুর জাগাইয়াছিল; য়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রথম জন্মদাতা হেরোডোটাসের প্রাণে ইতিহাস রচনার প্রেরণা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। সে বিক্রম ও বীর্য্যের সম্মুখে মিশর মেসোপটিমিয়ার বিস্তৃত রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

পারসিক সাম্রাজ্য ও যুগ সন্ধি

সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বিরাট পারস্য সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। তাই ইরাণ-শিল্পে দেখিতে পাই পারস্য সম্রাটের সিংহাসন তলে অগণিত রাজার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে; 'ইহারা বিজিত ও বন্দী হইয়া পারস্য সম্রাটের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। একদিকে ক্ষমতার গৌরবে পারস্য যেমন জাগিয়া উঠিল তেমনই পশ্চিমে গ্রীসও সেই বাহুবলের দর্পে, রাজ্য-জয়ের লোভে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। গ্রীসের দেখাদেখি রোমকেও সেই একই নেশায় পাইয়া বসিল। পারস্যের ক্ষমতা ও রাজ্য-বিস্তারকে গ্রীস তাহার নব-বিক্রমে ঠেকাইয়া রাখিল বটে, কিন্তু পারস্য যাহার চরম পরিণতি দেখাইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের সেই মোহময় সর্ব্বনাশের নেশাকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না; ততটা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি গ্রীসের ছিল না। এথেন্স সমস্ত গ্রীসকে ডেলস মহামণ্ডলের (Confederacy of Delos) এক শ্বেতচ্ছত্রছায়ায় আনিবার আদর্শে যে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ তাহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। গ্রীস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপ পররাজ্য লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য-বিস্তারকেই রাষ্ট্রজীবনের চরম পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করিল। এথেন্স, স্পার্টা, থিব্‌স্ একে একে সকলেই ঐ নেশায় উন্মত্ত হইল; কিন্তু 'এক

রাজ্য পাশে বাঁধি দিব সমগ্র জগৎ' এ অহংকারকে কেহই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। দেড়শত বৎসর পাশ্চাত্য জগতের নিষ্ফল প্রয়াসের পর, মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার আবার এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস করিলেন; এবারও একদিকে তার বিস্তৃতি সিন্ধুনদের তীর আর একদিকে গ্রীসের সমুদ্রবেলা। আপতদৃষ্টিতে মনে হয় এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বুঝি পারস্য-সাম্রাজ্যের উপরে জয়ী হইল, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই যে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ, এ আদর্শ গ্রীস পাইল পারস্য হইতে; আর পারসিক সাধনা ও সভ্যতা যে নব গ্রীক-সাম্রাজ্যের জাতীয় জীবনকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত ও রূপান্তরিত করিয়াছিল, একথা ত সর্ব্বজনবিদিত। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আদর্শ পাশ্চাত্যজগতে গ্রীস নূতন আমদানী করিল বটে, কিন্তু এই পুরাতন প্রাচীতে এ আদর্শ বহু প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই দেখা দিয়াছে। এবং সেই আদিকাল হইতেই প্রাচীর ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করিয়াছে, পশু-শক্তির উপর, বাহুবলের উপর, হিংসা ও সংগ্রামের উপর যে সাম্রাজ্যের, যে অতুলনীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, যত বিরাট হউক সে সাম্রাজ্য, যত বিপুল হউক সে ক্ষমতা, ধ্বংসই তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। গ্রীস কিংবা রোম ইতিহাসের সেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতকে বুঝিল না, সে অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে স্বীকার করিল না। সেই সর্ব্বনাশের নেশায় উভয়েই মজিল। পশ্চিম কিছুতেই ইতিহাসের এই নির্দ্দেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে চাহিল না—একের পর এক এক জন করিয়া সেই পররাজ্য লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারকেই রাষ্ট্র জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনেই প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিল। সেই মাসিদনাধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ বল, জার্ম্মান্ বল, ফরাসী বল, সকলেই আত্মবিক্রয় করিয়াছে সেই একই মোহময় আদর্শের চরণ তলে—যে আদর্শের যন্ত্র-পেষণে দুনিয়ার মানুষের জন্য বহুর জীবন উৎসর্গীকৃত, পররাজ্য লুণ্ঠনে ও পরপীড়নে যে আদর্শ [illegible] এবং পশুশক্তির নির্ম্মম অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও জর্জ্জরিত।

নবযুগ প্রবর্ত্তক সম্রাট ধর্ম্মাশোক

একদিকে য়ুরোপ যখন এই মোহকুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষ তখন বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদেরই এক নূতন আদর্শের উদ্ভাবন করিল—সে আদর্শ প্রেমে মহীয়ান্ ও কল্যাণে গরীয়ান্; মৌর্য্য-সম্রাট অশোক এই নব আদর্শের প্রবর্ত্তক। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর আড়াই শত বৎসর তখনও অতীত হয় নাই—ভারতবর্ষের বুকে আর এক মহান্ত পুরুষ জন্মলাভ করিলেন। ধর্ম্মাশোক প্রাচীন ইতিহাসের সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতটি বুঝিলেন এবং বুঝিয়াই ইতিহাসের ধারা ও রাষ্ট্র জীবনের আদর্শকে একেবারে বদ্‌লাইয়া দিলেন। প্রেম ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অশোকের এই নব আদর্শ, রাষ্ট্র জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অধ্যায়; কিন্তু সে সুমহান্ আদর্শকে গৌরব ও সমৃদ্ধিতে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা অশোকের মৃত্যুর পর আর কেহ করিল না—সে আদর্শ আজও স্বপ্ন হইয়াই আছে। অশোক ইতিহাসের যে স্থানটি অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাহার পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি যায় পড়িয়া রহিয়াছে অতীতের যত বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, সম্মুখে ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়িয়া রক্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে সেই একই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের শোচনীয় কাহিনী, মাঝখানে অশোকের শান্তি ও মৈত্রীর শুভ্রপতাকা যেন মরুভূমির মধ্যে একটি "ওয়েসিস্"! অশোকের স্থির অন্তদৃষ্টি ও সুমহান্ আদর্শের আলোক-শিখার সম্মুখে অতীতের ইতিহাস লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত; বর্ত্তমানের পররাজ্যলোভী রক্তলোলুপ রাষ্ট্রনেতার বল-দর্প ও বিদ্রূপ-হাস্য, লজ্জিত ও অবমানিত। তাঁহার এই ধর্ম্মবিজয়ের আদর্শ, প্রেম ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ, মানব ইতিহাসের সর্ব্বোত্তম বিকাশের নিদর্শন।

অশোক ছিলেন মৌর্য্য সম্রাট; মৌর্য্য-রক্ত তাঁহার দেহের শিরায় শিরায় বহমান। সমগ্র ভারতে শুধু এক কলিঙ্গরাজ্য তখন মৌর্য্য-আধিপত্য হইতে আত্মরক্ষা

করিয়া আপন সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অশোক সিংহাসনে বসিয়াই কলিঙ্গজয়ে যাত্রা করিলেন; শত সহস্র লোক সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল; রণক্ষেত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল—কলিঙ্গরাজ্য মৌর্য্যকরতলগত হইল। রাজ্য-বিস্তারের এই নিষ্ঠুর অভিনয়, এই অগণিত প্রাণীহত্যা, এই ভীষণ রক্তপাত সমস্ত মিলিয়া অশোকের মন দারুণ অনুশোচনায় ভরিয়া তুলিল। তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং অনুতপ্ত চিত্তে সে ভ্রম পৃথিবীর সর্ব্বজনসমক্ষে স্বীকার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে তাহারা জানে কি বেদনা ও অনুশোচনা তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে মথিত করিয়াছিল; কলিঙ্গ-অনুশাসনে তিনি অক্ষয় প্রস্তরের উপর চিরকালের জন্য তাঁহার সেই ক্লিষ্ট আত্মার দারুণ অনুশোচনা ও বেদনাপীড়িত হৃদয়ের অনুতাপের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই বেদনা ও অনুশোচনার অনলে পুড়িয়া তিনি এক পরম সত্যকে লাভ করিলেন—রাজ্যজয় অর্থজয়, জয় নহে; প্রেমে ও কল্যাণে মানুষের চিত্তরাজ্য অধিকারই সত্য জয়। ইহার পর অশোক যে বিংশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন সে বিংশ বৎসরের ইতিহাস মানুষের আত্মিক ও জাগতিক কল্যাণের জন্য অসংখ্য সদনুষ্ঠানের পুণ্যকাহিনীতে পূর্ণ হইয়া আছে। এই আদর্শ-সম্রাটের ধর্ম্মরাজ্য একদিকে গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া আর একদিকে বিরাট চীন-সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম জ্ঞানে ও প্রেমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একে অন্যকে আলিঙ্গন করিল। সাম্রাজ্যবাদের ইহাই শ্রেষ্ঠতম ও কল্যাণতম আদর্শ—বিশ্বৈকবোধের ইহাই মহত্তম বিকাশ। বিশ্বানুভূতির যে সুমহান সত্য উপনিষদের ঋষিকুলের চিত্তলোকে উদ্ভাসিয়া উঠিয়াছিল সে সত্য একদিন বিশ্ব-মানব "বুদ্ধে" মূর্ত্তিলাভ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল। তাহার আড়াই শত বৎসর পরে আর একদিন বুদ্ধের মন্ত্রবাণীকেই প্রতিধ্বনিত করিয়া নিখিল-মানবের মঙ্গলকামী ধর্ম্মাশোক প্রিয়দর্শী বলিলেন—"সব মুনিসা মে পজা"—সকল মানব আমার সন্তান; সেই দিন উপনিষদদ্-উদ্ভাসিত সেই সত্যের, বুদ্ধ-প্রচারিত সেই মন্ত্রের আর এক নবরূপ প্রকাশিত হইল; সে সত্য ও সে মন্ত্র, ধরার ধূলায় নামিয়া আসিয়া হিংসা ও বিদ্বেষ-দুষ্ট এই সমাজ ও রাষ্ট্রকে, সংগ্রাম ও সংঘর্ষে লিপ্ত জাতিসমূহকে ও রক্তস্নাত এই পৃথিবীকে প্রেমে ও কল্যাণে অভিষিক্ত করিল।

অশোক যুগের ভারত ও পাশ্চাত্য-খণ্ড

লোকে জানে ভারতবর্ষ অন্তরে ও বাহিরে সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া, সকল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। হয়ত একথা কতকাংশে সত্য; কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন এই ভারতবর্ষে এত বড় এক জলন্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের জন্ম কি করিয়া সম্ভব হইল, ইতিহাস আজিও এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। বোঘাজকোই লেখের তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া বেহিস্তন শিলালিপি পর্য্যন্ত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ কি ছিল তাহা এক অনুমান ছাড়া আর কিছুতেই বলিবার উপায় নাই। তবু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ একেবারে কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই বাস করে নাই; খৃষ্টের জন্মের ১৫ শত বৎসর আগেও বৈদিক আর্য্যেরা উত্তর এশিয়া-মাইনর ও বাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া মিডিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। এদিকে ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতে ও ইরাণে ঐতিহাসিক সম্পর্ক অতি নিকট ছিল। এই দুই দেশের সম্বন্ধটি এশিয়ার ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায় জুড়িয়া আছে অথচ সে ইতিহাস সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য কত কম। ঐতিহাসিক আরিয়ান্ অবশ্য লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটি জাতি আসীরীয় সম্রাটদের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া আসীরীয় রাণী সেমিরামেসের ভারত আক্রমণ গল্প বই আর কিছু নয়। তাহা ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে (১০০০ খৃঃ পূঃ) ও বাবিলনীয় পুরাণে একই সঙ্গে যে বিরাট প্রলয়-প্লাবনের কথা পাওয়া যায়, তাহা হইতেও ভারত ও মেসোপটেমিয়ার নিকট সম্বন্ধের আরও একটু স্পষ্টতর প্রমাণ হয়ত পাওয়া

ছায়। একথাও হয়ত সত্য যে ভারতবর্ষ জ্যোতির্ব্বিদ্যার কিছু কিছু তথ্য ও লৌহ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাবিলনের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছিল। প্রাচীন ইহুদি-পুরাণে (Old Testament) ভারতবর্ষ হইতে নীত বানর ও ময়ূরের উল্লেখ আছে বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মানিয়া থাকেন, কেহ কেহ অস্বীকার করেন। কিন্তু রাওলিন্‌সন ও কেনেডি অনেককাল আগেই একথা প্রমাণ করিয়াছেন যে দক্ষিণ ভারত ও পাশ্চাত্য জগৎ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্য-সম্বন্ধে যুক্ত ছিল। দেশে দেশে মানুষে মানুষে নিকট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রাচীনতম পন্থাই ছিল এই বাণিজ্যাদির বিস্তার এবং এ বিষয়ে সেমিটিক্ জাতিরাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা পটু। হয়ত এই বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য সেমেটিক জাতি প্রাচীন বর্ণমালার প্রচার করিয়া পৃথিবীর এক মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। গ্রীস ও ভারতবর্ষ একই সঙ্গে এই সেমেটিক্‌দের নিকট হইতে নিজ-নিজ বর্ণমালা উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা লাভ করিল (৮০০ খৃঃ পূঃ)। তাহা ছাড়া,ইরাণসম্রাট কাইরাসের ভারত-সীমান্ত আক্রমণ-কথা যদি বিশ্বাস নাও করি তবুও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, পশ্চিম-ভারতের ইরাণ-শাসকদের উৎসাহ-আনুকুল্যেই ভারতে খরোষ্টি-লিপির প্রচার হইয়াছিল এবং যিনি ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রথম ইতিহাসের পরিস্ফুট সীমার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন তিনি ইরাণ-সম্রাট দরায়ুস্। এই দরায়ুসেরই আদেশপত্র লইয়া স্কাইলাক্‌স্ ভারতাভিযানে যাত্রা করেন (৫১৬ খৃঃ পূঃ) এবং ইরাণ হইতে সিন্ধুর মোহনা পর্য্যন্ত এক জলপথ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে পশ্চিম ভারতে দরায়ুসের আধিপত্যের বিস্তার লাভ ঘটে ; হেরোডোটাস্ বলিয়াছেন, ধনে এবং জনে ভারতের ইরাণ অধিকৃত প্রদেশটির মত সমৃদ্ধ প্রদেশ দরায়ুসের আর একটিও ছিল না। এই সময় হইতেই ভারতে ও ইরাণে স্থির ও অব্যাহত সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে মার্দ্দোনিয়াসের নির্দ্দেশে ভারতীয় সৈন্যেরা ইরাণ বাহিনীর দাঁড়াইয়া ৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটিয়ার রণক্ষেত্রে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। মৌর্য্য-শিল্পেও এখানে ওখানে পারসিক অনুপ্রেরণার চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া আছে। তাই বলিয়া যদি একথা ভাবি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইরাণাধিপত্য এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়িয়া আছে কিংবা অশোকের আদর্শ ও সাম্রাজ্যের উপর পারসিক সাধনা ও সভ্যতা অপূর্ব্ব ছায়া বিস্তার করিয়াছে তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে।

কিন্তু ইরাণ অবধি দেখি সমস্তই হয় ক্ষমতার বিস্তার না হয় সাম্রাজ্য-লোলুপতারই রূপভেদ—মানুষের রাষ্ট্রনীতির আদিমতম ও অধুনাতম প্রকাশ। এই রাষ্ট্রনীতিকেই মানবের কল্যাণে নিয়োজিত করা, মানুষের চিত্তকে উন্নততর লোকে উদ্বোধিত করা এবং প্রাচীন সাম্রাজ্য-লোলুপতার শোচনীয় আদর্শকে প্রেম ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহামানবের মিলনসেতু করিয়া তোলা—এ স্বপ্নকে প্রথম সার্থক করিলেন বৌদ্ধ-সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক। মহাভারতের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের সুমহান্ ভবিষ্যদ্বাণীকে তিনিই প্রথম মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিলেন। একই যুগে একই সময়ে বর্ত্তমান্ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রদাতা রোম, যখন তার সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বকঠিন শত্রু কার্থেজকে পিউনিক যুদ্ধে (Punic wars) পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত করিতে ব্যস্ত, অশোক তখন দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, প্রেমে ও কল্যাণে, মিলনের রাখীবন্ধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। অশোকের এই নব আদর্শ, রাষ্ট্র-নীতিতে এক নূতন পথ ও মানবের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিল। কিন্তু শুধু ভারতে এই আদর্শের প্রচার করিয়া অশোক ক্ষান্ত হইলেন না ; তাঁহারই পতাকা বহন করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-মহামাত্যেরা কেহ গেলেন সিরিয়ায়, কেহ মিশরে, কেহ কাইরিনিতে, কেহ মাসিদনে, কেহ বা সুদূর ইপিরাসে। তাঁহার শিলালিপিতে চিরকালের অক্ষরে এইসব দেশও তার রাজাদের নাম লেখা আছে ; তাহা ছাড়া তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে, ও কয়েকটি ধর্ম্মদূতকে সুবর্ণভূমি ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ এই প্রথম রাষ্ট্রনীতির এক নূতন রূপ প্রত্যক্ষ করিল এবং "এই ভারতের মহামানবের

সাগর-তীরে" এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যে মহামিলন প্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতের মুখপাত্র হইয়া অশোক সেই মিলন-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিকরূপে আশীর্ব্বাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

আদর্শের গরিমা ও ঐশ্বর্য্যের দিক হইতে যখন দেখি, বিশ্বৈকবোধের বিকাশের দিক হইতে যখন দেশ ও জাতির ইতিহাসের পানে তাকাই, তখন অশোকের এই নব আদর্শের পার্শ্বে আলেকজান্দারের বিরাট দিগ্বিজয়পর্ব্ব যেন মলিন হইয়া যায়। আলেকজান্দার অগণিত শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া দিকে দিকে বিজয় অভিযান প্রেরণ করিয়া এক বিপুল সাম্রাজ্য গড়িয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সেই চিরাচরিত অতি পুরাতন পশুশক্তির লীলা ও বাহুবলের বীভৎস অভিনয়কেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষরূপে তিনি গ্রীক-সভ্যতা বিস্তারে কতকটা সহায়তা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মানুষে-মানুষে প্রীতি ও সদ্ভাবের আদান প্রদানের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ তিনি সজ্ঞানে করেন নাই। ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে এত বড় দিগ্বিজয়ের বিরাট অভিনয় হইয়া গেল, এমন উন্মত্ত কাল-বৈশাখীর ঝড় সিন্ধু নদীর শাখা উপশাখার উচ্ছ্বসিত জল-স্রোতের উপর দিয়া বহিয়া গেল অথচ ভারতের কাব্যে-সাহিত্যে, ইতিহাসে, জীবন-যাত্রায় কোথাও ইহার ছায়াপাত হইল না, বরং সমস্ত ভারত এই নিষ্ঠুর অভিনয়ের দিক হইতে ঘৃণায় যেন মুখ ফিরাইয়া রহিল। এবং সত্য-সত্যই আলেকজান্দারের শ্রান্ত ক্লান্ত, মগধ-সম্রাটের ভয়ে ভীত, গ্রীক-সৈন্যেরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিতে না করিতেই ভারতের ক্ষুব্ধ ও ত্রস্ত চিত্তপট হইতে গ্রীক-সভ্যতার বিজয় অভিযান একটা বিরাট দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। অশোকের পিতামহ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত দেশ হইতে সমস্ত বিদেশী শত্রুকে বহিষ্কৃত করিলেন এবং দ্বিতীয় গ্রীক-অভিযানের নেতা সেলুকস নিকেটরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট আরিয়া (Aria) আরাকোশিয়া (Arachosia) প্রভৃতি চারিটি প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন। দুই রাজায় এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল এবং বিবাহ-বন্ধন দ্বারা সেই সন্ধিকে সুদৃঢ় করা হইল। সিরিয়ার রাজসভা মেগাস্থিনেস নামে এক দূত চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করিলেন; এই মেগাস্থিনেস তাঁর "ইণ্ডিকায়" ভারতের এক অমূল্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের পরে বিন্দুসারের রাজসভায় ডাইমেকাস নামে আর এক রাজদূত সিরিয়া হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই বিন্দুসারের রাজ-দরবারেই মিশর-অধিপতি টলেমি ফিলাডেলফস্ (Ptolemy Philadelphos) ডায়োনিসিয়স নামে আর একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর অশোক, তিনি ত গ্রীস ও ভারতকে এক-মিলনসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখিতেছি অশোকের মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে গ্রীক-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ জেতা-বিজিতের সম্বন্ধ নয়; গ্রীস দেখিয়াছে ভারতবর্ষকে শক্তিমান্ সমকক্ষ রূপে, জানিয়াছে অপূর্ব্ব এক সাধনা ও সভ্যতার লীলাক্ষেত্র রূপে। সেই জন্য ভারতবর্ষের উপর তাহারা তাহাদের আধিপত্য ও সভ্যতা বিস্তার করিতে সাহসী হয় নাই; তাই এতকালের সম্বন্ধের পরেও ভারতীয় সাধনার উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাবের নিদর্শন এতই অল্প।

অশোকের নব-রাজধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও তাহার ঐতিহাসিক পরিণতি

ইতিহাসে দেখিতে পাই, এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে গ্রীসের অতুলনীয় সভ্যতার ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ক্রমাবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া লইয়া রোম তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের ভিত্তিপত্তন করিতেছে। গ্রীক-শিল্প ও সাহিত্যে ক্রমে দৈন্য ও ক্লান্তির আভাষ এবং বর্ব্বরতায় রুগ্ন আসক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল; তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনে এমন কোনো উৎস খুঁজিয়া পাইতেছিল না যাহা হইতে দেহ ও মন নূতন শক্তিরস পান করিয়া নব জীবন লাভ করিতে পারে। কাজেই হেলিয়োদোরস ও মিনান্দার যখন এই মরণোন্মুখ সাধনার পতাকা বহিয়া আবার এই ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আর জাতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া

রাখিতে পারিলনা—হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ও সভ্যতা তাঁহাদের হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বেশনগরে গরুড়স্তম্ভে দেখি গ্রীক-রাজা হেলিয়োদোরস দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল বৈষ্ণব ভাগবদ্ধর্ম্মে; "মিলিন্দ পন্‌হে" প্রমাণ পাই গ্রীক মনের উপর জয়ী হইয়া উঠিয়াছে বৌদ্ধ চিন্তা ও ভাবের ধারা; শিল্পসৃষ্টির দিকেও দেখি সেই একই ধারা অপ্রতিহত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও সাধনায় দীক্ষিত গ্রীক-শিল্পীকুল বৌদ্ধ পুরাণ ও ধর্ম্মকে এমন একটী শিল্পে রূপায়িত করিয়া তুলিল যাহা চীন জাপান মধ্য এশিয়ার শিল্পে আপন প্রভাব চিরকালের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া গেল।

এমনি করিয়াই নানান্ রাষ্ট্রীয় আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া, জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া, ভারতবর্ষ বাহুবল ও পশুশক্তির উপর জয়ী হইল এবং সমস্ত মৃত্যুবিষ আপনি পান করিয়া মানবের হিতকল্পে মরণ-যন্ত্রের স্থানে শিল্প ও সাহিত্য, ধর্ম্মও তত্ত্ববিদ্যার উৎকর্ষে আপনাকে উৎসর্গ করিল। তার পশ্চিম সীমান্তে সেই আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কত নূতন জাতি, কত ধর্ম্ম, কত সাধনা উন্মুক্ত তোরণ অতিক্রম করিয়া আসিল, ভারতবর্ষ তার মিলন-যজ্ঞশালার দ্বার খুলিয়া সকলকে ডাকিল এবং সকলে আসিয়া তার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভারতবর্ষ দেখাইল রাষ্ট্রক্ষেত্রে "বিজেতা" ও "বিজিতে"র যে সম্বন্ধ, মানুষের জীবনে সেটা সত্য নয়। সত্য যাহা শাশ্বত যাহা, তাহা হইতেছে মানুষে মানুষে মিলন, জাতিতে জাতিতে প্রেম; এবং এই প্রেম ও মিলনের ভিতর দিয়া নিত্য নূতন রূপের সৃষ্টি, ভাবের সৃষ্টি, সাধনার সৃষ্টি।

বর্ব্বর-প্লাবন ও ভারতের বিশ্বৈকবোধ

কিন্তু এখন এমন একটা সময় আসিল যখন এই মৈত্রীতে ও প্রেমে জাতির সঙ্গে জাতির মিলনের সমস্যা অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া দেখা দিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ শত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্য্য-সুঙ্গ আধিপত্যের যুগ পর্য্যন্ত যে দুইটি জাতি ভারতবর্ষের সম্পর্কে আসিয়াছিল সেই পারস্য ও গ্রীস উভয়েরই একটা বিশিষ্ট সাধনা ও সভ্যতা ছিল। তাহাদের সঙ্গে মিলনের অন্তরায় তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু তাহার পর হইতে মধ্যএশিয়ার মালভূমি ছাড়িয়া তুষার-শীতল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া যে বর্ব্বরবাহিনী একে একে এই দেশের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার সমস্ত সাধনা ও সভ্যতাকে প্রলয়-প্লাবনে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিল, সেই বর্ব্বর মানবসমাজকে কি করিয়া ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে গ্রহণ করিবে, এই সমস্যাই সুবৃহৎ হইয়া দেখা দিল। যেমন করিয়া সুসভ্য গ্রীস ও পারস্যকে সে আপন বুকে স্থান দিয়াছে, তেমনি করিয়াই কি সে এই অসভ্য বর্ব্বর-দিগকেও স্থান দিবে? সে কি ইহাদেরও তার উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া আপন অন্তর-মন্দিরে ডাকিয়া লইবে? ভারতবর্ষ তাহার চিরাচরিত স্বধর্ম্মকে কোনদিন অবিশ্বাস করিতে পারে নাই, এবারও অবিশ্বাস করিতে পারিল না; বিশ্বমৈত্রীকেই রাষ্ট্রজীবনে সে একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলিয়া এবারও স্বীকার করিল এবং সকলকেই তাহার আপন সাধনার যজ্ঞশালায় আহ্বান করিল। নীতি যাহা, ধর্ম্ম যাহা, তাহা যদি সর্ব্বক্ষেত্রে সত্য ও শাশ্বত না হইল তবে সে নীতি, সে ধর্ম্মের কোনো মূল্য থাকে কি? ভারতবর্ষ তাই বহু রাষ্ট্রীয় দুর্গতিকে বরণ করিয়াও সত্য ও শাশ্বত ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিল।

হিমালয়ের গিরিদরী বাহিয়া বর্ব্বর শক কুষাণ হূন কিরাতের দল, ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে স্থিতিলাভ করিল—ভারতের সাধনা দুই বাহু মেলিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিল। একথা সত্য, দেশের সুবৃহৎ সমাজজীবনের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা আত্মগোপন করিয়াছিল তাহা এই যথেচ্ছ-মিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং সে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল সুকঠিন সামাজিক নীতি ও বর্জ্জনধর্ম্মী আচারের প্রণয়নে। ধর্ম্মসূত্রের সহজ ও সরল নীতিকে ইহারা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত কূট ও জটিল রীতি ও আচারে রূপান্তরিত করিয়া তুলিলেন এবং এমনি করিয়া মনু যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু-নারদের বিরাট স্মৃতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল—ম্লেচ্ছ বর্ব্বর সমস্যার ইহাই সহজ সমাধান বলিয়া ইহারা স্বীকার করিলেন। কিন্তু

জাতির ইতিহাস কি কখনও সমাজ-দণ্ড মানিয়া চলে, পুরোহিতের অনুশাসন স্বীকার করিয়া চলে? সমস্ত শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া, সমস্ত রাজাদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে সামাজিক আদান প্রদান কি করিয়া আপন গতিটি অব্যাহত রাখে, সহজে তাহার হিসাব করা যায় না। এমনি করিয়াই সুপ্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা প্রধানতঃ শাস্ত্র ও পুঁথির পাতাতেই লেখা রহিয়া গেল, জাতির জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বন্দী করিতে পারিল না। পণ্ডিতবর সেনার (Senart) সে জন্যই বলিয়াছেন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনেকটা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে একটা মতবাদ মাত্র। সেই হেতুই মাঝে মাঝে দেখিতেছি, ম্লেচ্ছ রাজা রুদ্রদামন, ম্লেচ্ছ উসবদাত, ইঁহারাই আত্মপরিচয় দিতেছেন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের নেতা ও রক্ষকরূপে। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ শিলালিপি হইতেই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া মুক্তি

ভক্তিমার্গ ও মহাযান

ভারতবর্ষের বুকে এই আকস্মিক বর্ব্বর-অভিযান এবং বাহির হইতে বিজাতীয় জন-স্রোতের ক্রমপ্লাবন ভারতীয় সমাজজীবনের মধ্যে একটা বিরাট বর্ণসঙ্কর ঘটাইয়া তুলিল এবং ভারতের সাধনাকে প্রথমে যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল। এই বিপদ, এই আঘাত হইতে উদ্ধারলাভ তখনই সম্ভব হইল যখন ভারতবর্ষ তার জীবন্ত সাধনা দ্বারা সকল বিরুদ্ধ সমস্যাকে এক করিয়া আপনার মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিল। তাহাতে ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে একটু শিথিলতাও আবিলতা দেখা দিলেও, দেশের সাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বড় লাভ হইল, ভারতের সাধনা সকলের সাধনা বলিয়া গণ্য হইল। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই বৈষ্ণব ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিমার্গে গ্রীক-যবনকে আমন্ত্রিত ও দীক্ষিত করিয়াছিল; এইবার ভারত ভগবদ্গীতার দার্শনিক কবির উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিল:—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এই সময়েই জুদাইয়ার মহান্ত পুরুষ মানবতার ও আত্মোৎসর্গের সুমহান্ ধর্ম্মে সকলকে আহ্বান করিয়া মনুষ্যত্বের অবমাননায় উল্লসিত গ্রীস ও রোমের সাধনাও বৈদগ্ধ্যকে লজ্জিত করিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষ তাহার ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র আদর্শকে, "হীনযানকে" পরিত্যাগ করিয়া সকল সৃষ্টজীবের সর্ব্বাঙ্গে মুক্তির যে সুমহান্ আদর্শ সেই "মহাযান"কেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইল। এই মহাযান পন্থার ঋষি, মৈত্রী-মন্ত্রের উদ্গাতা, বুদ্ধ-চরিতের কবি অশ্বঘোষ তাহার "শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রে" সর্ব্বসত্ত্বের কল্যাণ ও মুক্তিকেই ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। এ তথ্য বিশ্বভারতের ইতিহাসে আর এক অপূর্ব্ব তথ্য; তাহা ছাড়াও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য রহিয়া গিয়াছে। এ তথ্য বাণী মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল এমন এক ঋষিকবির কণ্ঠ হইতে যাহাকে বর্ব্বর-বিজয়ী বীর কনিষ্ক যুদ্ধলব্ধ মণিরত্ন ও দ্রব্য-সম্ভারের সঙ্গে বিজিত নগরীর কর-স্বরূপ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

যিনি স্বয়ং অবমানিত, যাহার জন্মভূমি পরাজিত ও হৃত-সর্ব্বস্ব সেই মানুষ অপমানকারীর ও লুণ্ঠন-কর্ত্তার সমক্ষে দাঁড়াইয়া একটি ও বিদ্বেষ-বাণী উচ্চারণ করিলেন না, একটু তাহার অমঙ্গল কামনা করিলেন না, আপনার মুক্তি ভিক্ষা করিলেন না; বরং সকল সঙ্কীর্ণতার, সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে আপনাকে উন্নীত করিয়া, সর্ব্বজীবের কল্যাণ ও মুক্তিকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষ দেখাইল, বিজেতা যে, তাহাকে এমনি করিয়াই জয় করিতে হয়; নিজের আত্মগরিমা এমনি করিয়াই বিশ্ববোধের মধ্যে বিলীন করিতে হয়। ভারতবর্ষ তাহা পারিয়াছিল বলিয়াই তাহার পক্ষে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাস বিশ্বভারতের ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই বৃহত্তর ভারতের ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ কি ভাবে প্রাচ্যখণ্ডের পটভূমিকায় পরিস্ফুট হইল ভবিষ্যতে আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

(অনুবাদক শ্রী নীহাররঞ্জন রায়)
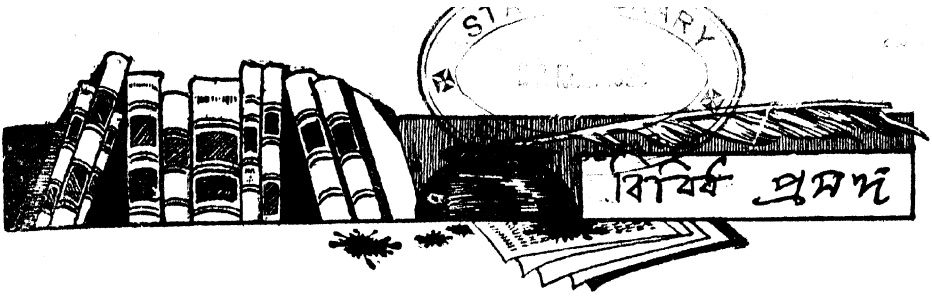
সম্পাদকের চিঠি

এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা, সুতরাং 'পিল্‌সনা' ভিন্ন অন্য জাহাজ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই এই জাহাজের ব্যবস্থাদির ছাঁচেই অন্যান্য জাহাজেরও ব্যবস্থাদি হয় কি না আমি বলিতে পারি না। জাহাজের ভোজনকক্ষে দেখিলাম ভারতীয় যাত্রীরা ইউরোপীয় যাত্রীদের হইতে ভিন্ন টেবিলে আহারাদি করেন। কেন যে এই ব্যবস্থা আমি ঠিক জানি না। আমার সহযাত্রী কোনো কোনো ভারতবাসী টেবিলের কায়দা-কানুনে ইউরোপীয়দের মতই দুরস্ত এবং তাঁহারা মদ্য মাংসও খাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বেশভূষায় ও পরিচ্ছন্নতায় যে কোনো খুঁৎ নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে ইঁহাদের এক টেবিলে বসিতে দিলে কাহারো কোনো অসুবিধাই হইত না। সম্ভবতঃ ইউরোপীয়েরা (এবং মার্কিনেরা) জিনিষটা পছন্দ করিতেন না; কিন্তু হয়ত অন্ততঃ জন-কয়েক ভারতবাসী এ ব্যবস্থা পছন্দ করিতেন। বলিতে লজ্জা হয় যে তাঁহারা ইহাতে গৌরবও বোধ করিতেন। আমি নিরামিষাহারী, সুরাপানও করি না, এবং ছুরি কাঁটা ও চামচ ব্যবহারে বিশেষ দক্ষ এখনও হই নাই সুতরাং আমার কথা বলিতে গেলে বলা যায় অ-ভারতীয় কাহারও সহিত আহারে না বসিতে হওয়াতে আমার সুবিধাই হইয়াছিল। ইউরোপীয় কি আমেরিকানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিতে পাওয়ায় আমি কিছুমাত্র গৌরব বোধ করিতাম না, আপত্তি অনুভবও করিতাম না। আমি ব্যবস্থাটি কেবল সুবিধার দিক্ হইতে দেখিতেছি।

যাহাই হউক, এরূপ ব্যবস্থা বর্ণবিদ্বেষসূচক বলিয়াই আমার মনে হয়।

কেহ কেহ আশা করিতেন যে ভারতীয় যাত্রীরা ডিনারের সময় ডিনারে ব্যবহৃত সাজপোষাক করিয়া আসিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় কেহই সেরূপ পোষাক করিতেন না। তা'ছাড়া আমি কয়েকজন আমেরিকান ও ইংরেজকেও সাধারণ পরিচ্ছদে ডিনার খাইতে দেখিয়াছি।

রকফেলার বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন হিন্দুস্থানী চিকিৎসক সস্ত্রীক আমেরিকা যাইতেছিলেন। ইনি শেষাশেষি পাগড়ী ইত্যাদি পরিয়া পুরা হিন্দুস্থানীবেশে ডিনারে যাইতেন। ইহাতে আপত্তিকর কিছুই যে নাই তাহা বলা বাহুল্য, বরং ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার স্ত্রী অবশ্য প্রথম হইতেই বরাবর শাড়ী ব্যবহার করিতেন। সেকেণ্ডক্লাসে আর যে সকল মহিলা ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপ শাড়ীই পরিতেন। শাড়ী ছাড়িয়া কোনো ভারতীয় মহিলা যদি ইউরোপীয় পোষাক পরিতেন তাহা হইলে সেটা বাস্তবিক বড়ই বিশ্রী হইত। এ বিষয়ে ভারত রমণীরা তাঁহাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলেন; পাশ্চাত্য মহিলা-দের সহিত মেলামেশা করার পথে এই পোষাক বাধা-স্বরূপ হয় না। বাস্তবিক অনেক ভারতরমণীই ত এইভাবে পাশ্চাত্য ভগিনীদের সহিত মিশিয়া থাকেন।

আগে আমার ইচ্ছা ছিল ভেনিসে দুই একদিন কাটাইয়া প্যারিস্ যাইব। কিন্তু ভেনিসে নামিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে কয়েকটি কারণে আমি সে সংকল্প ত্যাগ করি। জাহাজ হইতে নামিয়া প্রথম যে ট্রেন পাইব তাহাতেই প্যারিস্ রওনা হইব ঠিক হইল। সুতরাং জাহাজ হইতে নামিয়াই আফিসে মাল পরীক্ষা করাইতে চলিলাম। ইউরোপীয় সকল দেশেই স্থলপথে অথবা জলপথে এবং সম্ভবত আকাশপথেও যত যাত্রী আসে সকলকার মাল পরীক্ষা করানো হয়। আমার মত ভ্রমণকারীদের পক্ষে ইহা বড়ই বিরক্তিকর। তাছাড়া এই সব শুল্ক আর্থিক

যুদ্ধের একটি অস্ত্র বিশেষ, ইহা কখনও শান্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না। আমার মনে হয় যে ইউরোপীয় দেশ-সমূহের সমস্ত যাত্রীদের মাল পরীক্ষা করিয়াও রাজকোষের বিশেষ কিছু লাভ হয় না, শুল্ক আপিসের কর্ম্মচারীদের বেতন জোগাইবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট কি না সন্দেহ। তবে সম্ভবত অবৈধভাবে মাল আমদানীর পথে এই প্রথা কিঞ্চিৎ বাধা দিয়া থাকে। কিন্তু কোথাও পরীক্ষা এমন ভাবে হয় না যাহাতে কর্ম্মচারীরা সত্য সত্যই অবৈধ বাণিজ্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন। যাত্রীদের সঙ্গে মাল এত বেশী থাকে যে প্রত্যেক ব্যাগ, বাক্স, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি চাহিয়া প্রত্যেকটি খুলিয়া আগাগোড়া পরীক্ষা করা শক্ত। তাছাড়া ঘুষ ইত্যাদিও আছে। আমি পরে শুনিয়াছিলাম যে পিল্‌স্‌নার এক যাত্রী ইন্‌স্পেক্টারকে ঘুষ দিয়া ভেনিসে মাশুলের হাত এড়াইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার এ বিষয়ের পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কিছু বলা যায়। আমরা যে ট্রেণে প্যারিস্ যাইতেছিলাম সে ট্রেণ সুইস সামান্তে আসিবার পর দুপুর রাত্রে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া তোলা হইল, আমাদের সঙ্গে তামাক আছে কিনা খোঁজ করার জন্য! তামাকের মাশুল আছে। প্রশ্নকর্ত্তা হয়ত আরো কোনো কোনো শুল্ক-যোগ্য জিনিসের নাম করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার ভাষা না বোঝাতে আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ও কন্যা প্যারিসের তাঁহাদের দুইটি ফরাসী বন্ধুর জন্য দুইখানি শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছিলেন, উহার জন্য প্যারিসে আমাকে ৮৭॥ ফ্রাঙ্ক মাশুল দিতে হইয়াছিল। শাড়ীদুটি উপহাররূপে আলাদা করিয়া প্যাক করা ও নাম লেখা ছিল কিন্তু মাশুলওয়ালা নাছোড়বান্দা। মাশুল ত দিলামই, তাহার চেয়েও অধিক যন্ত্রণায় পড়িলাম যখন মাশুলের পরিমাণ ঠিক করিতে সে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগাইয়া-দিল; তবু ত আমার যুবক বন্ধু অধ্যাপক দাসগুপ্ত তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন! একজন মাশুলওয়ালা আমার 'পেটেণ্ট লেদার বুট' জোড়া সযত্নে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেল, বুট জোড়া আমার নিজের ব্যবহৃত (অথবা ব্যবহারের জন্য) কি বিক্রী করার জন্য আনীত তাই আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে! ভেনিসে আমি বেশী কষ্ট পাই নাই; সম্ভবত অধ্যাপক মহাশয় আমার বয়স ও পক্ককেশ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেই এ সৌভাগ্যটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজের সব মালপত্রে নামধাম পদবী ডিগ্রী ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া বেড়ানোতে খুব বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছিলেন। মাশুলওয়ালারা ভাবিল (এক্ষেত্রে ঠিকই ভাবিয়াছিল) যে দুটা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডাক্তার" পদবী প্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও অবৈধ বাণিজ্য করিতে পারে না।

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার বাক্স খোলা হয়। আমার বেতের টিফিন বাক্সের ভিতর কাগজের একটা ছোটো বাক্সে ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের উপদেশ মত কতকগুলি ঔষধ আমি লইয়াছিলাম; এইগুলিই বোধ হয় মাশুলওয়ালাদের সন্দেহ উদ্রেক করিয়া তোলে। বাক্স খুলিয়া পরীক্ষা করা হইল; কিন্তু সব পরিশ্রমই বৃথা!

জেনীভার নিকট ফরাসী রাজ্যের বেলগ্রেড্ ষ্টেশনে সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিকর ও হাস্যকর ব্যাপারটি মাশুল লইয়া ঘটিয়াছিল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট্ নিশ্চয়ই জানেন যে জেনীভাতে লীগ অব নেশন্‌সের আপিস বসাতে পৃথিবীর সকল প্রান্ত হইতে লোকে সুইটজারল্যাণ্ড্ আসে এবং দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথ পর্য্যটনের পর এই ষ্টেশন তাহাদের পার হইতে হয়। তবু এই দীর্ঘ পথের প্রায় শেষে বেলগ্রেডের ফরাসী চুঙি আপিস সমস্ত যাত্রীকে তাহাদের সমস্ত মাল সমেত নামিতে এবং একটি সুড়ঙ্গপথে সেইগুলি লইয়া সেই আপিসে যাইতে এবং তথা হইতে ট্রেনে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করে। যে লোকগুলি যাত্রীদের এই ভাবে নামা ওঠা করিতে বলে তাহারা কেবল ফরাসী ভাষাই বলে বলিয়া ব্যাপারটি আরো বিরক্তিকর হইয়া উঠে; চুঙি-আফিসের কর্ম্মচারীরাও কেবল ফরাসী ভাষা বলে। আমার সহযাত্রিনী কয়েকটি মহিলার অনুগ্রহে আমি বুঝিলাম যে চুঙি-আফিসের কর্ম্মচারীরা জানিতে চাহিতেছে যে আমরা ফরাসী হইতে সুইস দেশে কোনো স্বর্ণ-মুদ্রা কিম্বা স্বর্ণনির্ম্মিত আর কোনো জিনিস লইয়া যাইতেছি কি না! আমি বিশুদ্ধ ভাষাতে বলিলাম যে আমার কাছে সোনা নাই। তখন

একটি লোক খড়ি দিয়া আমার হাত-ব্যাগগুলির উপর বর্ণমালার একটি অক্ষর লিখিয়া দিয়া আমাকে ট্রেনে ফিরিয়া যাইতে দিল। আমি কষ্টে-সৃষ্টে একটা ছোটপথ ধরিয়া ফিরিয়া গেলাম। যাওয়া-আসার অনেকগুলি ছোটবড় পথ ও প্লাটফরম্ ছিল। কিন্তু এখনও আদত দুর্দ্দশা ও চূড়ান্ত বোকামির ব্যাপারটি ঘটে নাই! সন্ধ্যা আটটায় জেনীভা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ডাঃ রজনীকান্ত দাসের দেখা পাইলাম। কয়েক মিনিট পরেই মিসেস্ দাস দেখা দিলেন। তাঁহারা আমার আর কোনো মাল-পত্র আছে কি না খোঁজ করিলেন। আমি বলিলাম, 'লগেজের' গাড়ীতে আমার আর চারটি জিনিষ আছে। যথা স্থানে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, সেগুলি বেলগ্রেড ষ্টেশনেই পড়িয়া আছে; কারণ, আমি সেগুলি গাড়ী হইতে উদ্ধার করিয়া মুটের মাথায় দিয়া বেলগ্রেডের চুঙি আফিসে পরীক্ষা করাইতে লইয়া যাই নাই!!! কিন্তু এমন ব্যবস্থার কথা আমি জানিব যে কি করিয়া তাহার ঠিক নাই। বেলগ্রেডে গাড়ী থামিলে একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী গাড়ীর বারান্দা দিয়া ফরাসী ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে যাইতেছিল বটে, কিন্তু আমি তাহার কিছুই বুঝি নাই। আমার গাড়ীতে একজন আমেরিকান্ সাংবাদিকের পত্নী ছিলেন, তিনি অল্প স্বল্প ফরাসী জানিতেন। তিনি বলিলেন যে, উহারা হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া আমাদের চুঙি আফিসে যাইতে বলিতেছে। তাঁহার কথামত আমি হাত-ব্যাগগুলি লইয়া গেলাম। যাহা হউক, মিসেস্ দাস জেনীভা ষ্টেশনে খোঁজ লইয়া জানিলেন যে, বেলগ্রেড হইতে তিন দিন পরে আমার জিনিষপত্র জেনীভায় আসিবে। তিনি দয়া করিয়া নিজেই পরদিন সকালে বেলগ্রেড যাইয়া আমার জিনিষপত্র আনিবেন স্থির করিলেন এবং কার্য্যতও তাহাই করিলেন। জেনেভায় যে আমার এমন বন্ধু ছিলেন ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সুতরাং রাত্রে আবার কোনো কিছুর অভাব বোধ করিতে হয় নাই।

দুই-একটা প্রস্তাব তোলা যাউক। কোনো পথের শেষ ষ্টেশনে যদি চুঙি আফিসের পরীক্ষার নিয়ম থাকে তাহা হইলে যাত্রীদের সমস্ত জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া পরীক্ষা করাই অবশ্য উচিত। কিন্তু মাঝপথের ষ্টেশনে পরীক্ষা করিতে হইলে গাড়ীর ভিতরেই যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করানো উচিত। যদি কোনো দুর্ব্বোধ্য কারণে মাঝপথের কোনো ষ্টেশনেই যাত্রীদের সঙ্গের এবং মালগাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র ট্রেন হইতে নামাইয়া চুঙি আপিষে লইয়া যাওয়া নিতান্ত দরকার হয়, তাহা হইলে সেই কথা বুঝাইয়া ইংরেজী ফরাসী ও জার্ম্মান্ অন্তত এই তিনটি প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় ছাপা একটি বিজ্ঞাপন (নোটিশ) আগের ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যাত্রীদের দেখানো উচিত।

এখানে আমার বলা উচিত যে, ইউরোপে আসিবার সময় ভ্রমণকারীরা সঙ্গে যেন যথাসাধ্য কম জিনিষ আনেন। বলিতে কি, অত্যাবশ্যক কাগজপত্র ছাড়া নিজের পরিচ্ছদ-গুলি মাত্র আনা উচিত; কারণ সকল প্রয়োজনীয় জিনিষই হোটেল হইতে পাওয়া যায়। জাহাজ এবং হোটেল উভয়ত্রই খুব অল্পদিনে কাপড় কাচানো যায়, সুতরাং দুই তিনটির বেশী পোষাক আনার দরকার নাই। কাজেই ইউরোপ ভ্রমণের পক্ষে একটি হাতব্যাগ ও একটি সুটকেসই যথেষ্ট।

জাহাজে আমরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপারই দেখিয়াছি, কিন্তু সে-সব বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। তবে একজন আমেরিকানের কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার মনে করিতেছি। অধ্যাপক দাসগুপ্ত আমেরিকা যাইতে-ছিলেন বলিয়া স্বভাবতই আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক জিনিষই জানিতে তাঁহার ঔৎসুক্য হয়। আমেরিকান্টি অহঙ্কার করিয়া বলিল, জগতের মধ্যে তাহার দেশই প্রধান এবং আমেরিকার অতি দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। আমেরিকার অত্যুচ্চ পর্ব্বতও সুবিশাল নদীগুলির এবং সর্ব্বোপরি সে-দেশের ষাট সত্তর তলা উচ্চ প্রাসাদের কথা বলিল! সংখ্যা-গৌরবের এই পাগলামি বাস্তবিকই হাস্যকর। এই দেশভক্ত ইয়াঙ্কির মতে "ইংলণ্ড ত মৃত!" সে বলিল, আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করায় সে আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে। তার পর বলিল, "ভারতবর্ষেও জন্মিতে পারিতাম।" এমন সুরে কথাটা বলিল যেন এরকম

সম্ভাবনাকে সে অত্যন্ত ভীতি ও করুণার চক্ষে দেখে! লোকটি একজন হিন্দুর সহিতই কথা বলিতেছেন, সুতরাং তাহার ভদ্রতার আদর্শ খুব উচ্চ বলা যায় না। মার্কিন্ নাগরিকের ইংলণ্ড, বিষয়ক মতটি যখন খাইবার পাশের একজন অতি রাঙা মুখ ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষকে জানান হইল, (আমি বলি নাই, বলা দরকার) সে হাসিয়া বলিল, "হইতে পারে, আমেরিকা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তবে সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেও পারে!" এই সৈন্যাধ্যক্ষটি অত্যন্ত ভদ্র ও মিশুক দেখা গেল।

দীর্ঘ অবান্তর প্রসঙ্গের পর আমার কাহিনী-সূত্র আবার ধরা যাউক।

ভেনিস চুঙি আপিসে আমাদের জিনিষপত্র পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর আমরা সোজা ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অন্য কোনো সহরে হইলে এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থলযানের কথা ভাবা হইত। কিন্তু পাঠক জানেন, ভেনিসের রাস্তা ও গলি সবই খাল। সহরের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতে হইলে মনুষ্যচালিত গণ্ডোলা অথবা মোটর-চালিত অন্য কোনো প্রকার নৌকায় চড়িতে হয়। ভেনিসের আধুনিক উপকণ্ঠ লিডোতেই একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই সুন্দর উপ-নগরটি দূর হইতে দেখিলাম, রাস্তা-ঘাট সবই পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মত। অধ্যাপক দাসগুপ্ত ও আমি বাংলা দেশের ময়ূরপঙ্খীর মত একটি গণ্ডোলা ভাড়া করিয়া অনেক বিস্তীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ খাল বাহিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে চলিলাম। কিছু দূরে দূরে ব্রীজের উপর দিয়া খালগুলির একদিক হইতে আর একদিকে পার হইয়া যাওয়া যায়। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভেনিসের জলপথগুলি দেখিয়া আমার মনে কোনো কবিত্বের উদয় হয় নাই। জলটা সমুদ্রের জলই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত নোংরা ও দুর্গন্ধময়। কারণ এই খালগুলি ভেনিসের নর্দ্দমাও বটে। আমি আমাদের গণ্ডোলার পাশ দিয়া অন্তত একটি জানোয়ারের গলিত মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

খালের জল হইতে খালধারের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত বাঁধানো সিঁড়ি আছে। কতকগুলি বাড়ী বেশ ভাল, বাকীগুলির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা; এগুলি কি করিয়া মেরামত হয় ভাবিয়া পাইলাম না। কয়েকটি অট্টালিকা অতি বৃহৎ ও গম্ভীরশোভাযুক্ত; তাহাদের স্থাপত্যও মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বড় বড় চার-পাঁচতলা ইটের ও পাথরের বাড়ীগুলি কলিকাতার কুঁড়ে-ঘরের মত সেই রোদ-জলে বিবর্ণ আদিম কালের খোলায় ছাওয়া দেখিতে বড়ই বেখাপ্পা লাগিল। পাথরে গড়া সুন্দর কয়েকটি গির্জ্জাও এইরূপ বিশ্রীভাবে ছাওয়া দেখিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম দেখিয়া আমি যতটা বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হইল যতক্ষণ ইটালী দেশে ছিলাম এই ছাড়া অন্য কোনো রকম ছাদ-ছাওয়া টাইল আমার চোখে পড়ে নাই। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিতে অনেক ভাল টাইল স্লেট দেখিয়াছি। অবশ্য ইহা আমার অস্ফুট স্মৃতি মাত্র। আমার লেখা পড়িয়া যেন পাঠক মনে না করেন ভেনিস্ একটি কুৎসিত সহর। চুঙি আপিস হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। পর্য্যটকেরা ভেনিসের যে-সকল প্রাসাদ, ভজনালয়, চত্বর প্রভৃতি দেখিয়া থাকেন আমি তাহার কিছুই দেখি নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার চোখে ভেনিস্ অত্যন্ত পুরাতন সহর বলিয়া ঠেকিল; বিশেষ স্বাস্থ্যকরও মনে হইল না। প্যারিস, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড কি জেনীভায় আমি যে-রকম মানুষ দেখিয়াছি এখানে তাহা অপেক্ষা জীর্ণ-বেশ, অস্নাত ও স্বল্পভুক্ত মানুষও বেশী দেখিয়াছি।

আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গণ্ডোলা আমাদের রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিল। আমরা লট-বহর লইয়া সেখানে নামিলাম। এর পর ভেনিস হইতে প্যারিস পর্য্যন্ত রেল-পথের কথা বলিব। র: চ:

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ জেনীভা

—

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

আত্মীয়-বিচ্ছেদে মানুষ যেরূপ ব্যথা পাইয়া থাকে সেইরূপ একান্ত আন্তরিক বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী আশ্রমের কর্ম্মী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার গত ৩রা নভেম্বর কলিকাতা

নগরীতে ৪১ বৎসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বালককে লইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেন সন্তোষচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। এদেশের শিক্ষার পর তিনি আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো-পালন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। দেশে ফিরিয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি গোশালা স্থাপন করেন ও কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। সেই সঙ্গে অধ্যাপনাও তিনি করিতেন। পরে তিনি সুরুল শ্রীনিকেতনে এইসকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ও এইখানে অনাথ বালকদিগের জন্য স্থাপিত শিক্ষাসত্রের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষাসত্রে তিনি বালকদিগকে সকল কার্য্যে স্বাবলম্বী হইতে ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নানা অর্থকরী বিদ্যা প্রাণ দিয়া শিখাইতে লাগিয়াছিলেন।

সন্তোষচন্দ্র জীবনে আশ্রমের শিক্ষাকে নানাভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। অতিথি-সেবা ও ভদ্রতা তাঁহার ভূষণ-স্বরূপ ছিল। বিশ্বভারতী যুগের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যখন আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, তখনকার দিনে আশ্রমের উৎসবাদি ব্যাপারে এমন কোনো অতিথি বোধ হয় যান নাই, যিনি সন্তোষচন্দ্রের আতিথ্য ও সেবায় মুগ্ধ হন নাই। রাত্রি হউক দিন হউক, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, শরীর ভাল থাকুক বা না থাকুক অতিথির সেবায় তিনি চিরজাগ্রত ছিলেন। শীতের রাত্রি দ্বিপ্রহরেও নিজে গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া অতিথিদের ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়াছেন, পাছে তাহাদের ট্রেন্ ফেল হইয়া যায় তাই নিজে রাত জাগিয়া যথাকালে তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছেন। কে কোথায় বেড়াইতে যাইবে, কে কি খাইবে, কোথায় ঘুমাইবে সকলকার সকল প্রয়োজন তিনি দেখিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে সে আতিথ্য ও সেবার ছবি আর দেখা যাইবে কি না সন্দেহ।

ভদ্রতায় তাঁহার দোসর কম মিলিত। তাঁহার আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় ভদ্রতার আদর্শ হইতে কোনো চ্যুতি কখনও দেখা যাইত না।

আশ্রমবাসী ও আশ্রমবন্ধু সকলকে আত্মীয় করিয়া তুলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এবিষয়ে বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

গুরু ও গুরুস্থানীয়দের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা আদর্শস্থানীয় ছিল। তাহাতে কোনোও খাদ ছিল না।

তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেও স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অতি উদার মত পোষণ করিতেন। সকল নারীরই যে কোনো-না-কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, ইহা ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্বভারতীর সেবাধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সন্তোষচন্দ্রের অকাল-প্রয়াণে তাহার যে ক্ষতি হইল তাহা কোনোদিন পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

তাঁহার শোকার্ত্ত মাতা পত্নী ভগ্নীগণ ও শিশুপুত্রদের এই শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বৃহৎপুস্তকখানি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের প্রচলিত নীতিসমূহ যথাযথ বজায় রাখিয়া বাঙলাভাষায় ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar) ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। বাঙলাভাষা বিষয়ক গভীর তত্ত্বালোচনা ছাড়াও এই পুস্তকে অধ্যাপক মহাশয় হিন্দি, গুজরাঠী, মারাঠী, আসামী, ওড়িয়া এমনকি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাসমূহ লইয়াও প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী ব্যতীত উক্ত ভাষাশিক্ষার্থীরাও এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বিভিন্ন ভাষা লইয়া তুলনামূলক আলোচনা দেওয়াতে পুস্তকখানির মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙলা

ভাষা ও বাঙলা ব্যাকরণ লইয়া এমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলার জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

সুনীতি-বাবুর বইখানি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হইল। ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় লিখিত খাঁটি বাঙলা ভাষার প্রথম প্রকৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সম্ভ্রম নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভারতের নব যুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজীতে ১৮২৬ সালে আপনার মাতৃভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মাতৃভাষাতেই উক্ত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বাঙলা ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার ছিল।"

সুনীতি-বাবুর পুস্তক হইতে আমরা বাঙলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেছি; বহুদিন অবধি আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙলা ভাষা, আধুনিক ভাষা—ইহার ইতিহাস খুব অধিক দিনের নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে যে চর্য্যাপদ, বৌদ্ধগান ও দোহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও বাঙলা ভাষা প্রচলিত ছিল। ইহা আমাদের যথেষ্ট গর্ব্বের বিষয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা ভাষার উৎপত্তি হইতে ক্রমবিকাশের যে ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে অনেক নূতন কথা আছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণ এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। বিবিধ শব্দের কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, প্রাচীন শব্দ রূপান্তরিত হইতে হইতে কি ভাবে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। শব্দের এই ক্রমবিকাশের মধ্যে বাঙলার সামাজিক জীবনের অনেক রহস্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বাঙলা ভাষার পুঁথির (দোহার ও পদাবলীর) সংখ্যা করা দুরূহ; ইহার অনেকগুলিই কালপ্রভাবে লোপ পাইয়াছে; কতগুলি যে অযত্নে রক্ষিত অবস্থায় কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও যে কত পুঁথি পারিবারিক পেঁটরার মধ্যে রক্ষিত আছে তাহাও বলা যায় না। সাধারণ্যে প্রকাশিত ও সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদিতে প্রাপ্তব্য পুঁথির প্রায় সবগুলিরই সাহায্য সুনীতি-বাবু লইয়াছেন। যে-কোনো ভাষার জাতি ও কুল নির্ণয় অতীব দুরূহ কার্য্য; বাঙলার মত ব্যাকরণহীন ভাষার ত আরো দুরূহ। সুনীতি-বাবু এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্বে অগ্রণী স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেব এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"বাঙলা ভাষার অন্তর্নিহিত সম্পদের জন্যই বাংলা ভাষার আলোচনা ও গবেষণা করিবার সময় আসিয়াছে। অনেক শতাব্দীর সযত্ন-রক্ষিত-সাহিত্য এই ভাষার অঙ্গ-পুষ্টি করিয়াছে। ভারতের অন্য যে-কোনো ভাষা অপেক্ষা এই ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার উপাদান বেশী। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে "মগধী প্রাকৃত" নামে যে বিপুল ভাষা প্রচলিত ছিল এই বাঙলা ভাষাই তাহার যথার্থ উত্তরাধিকারী। মহান্ সম্রাট্ অশোকের সময়ে রাজসভায় এই মগধী ভাষা চলিত ছিল; বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রথম উপদেশাবলীও এই মগধীরই কোনো সহোদর ভাষায় বিবৃত হইয়াছিল।"

এইরূপ বিশিষ্টতা-সম্পন্ন ভাষার অনুশীলন করিয়া ইহার বৃহৎ ইতিহাসের অংশমাত্র পরিস্ফুট করিয়া তোলাই যথেষ্ট কৃতিত্বের বিষয়। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে এই ভাষায় সম্পূর্ণ ও বিশদ ব্যাকরণ লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা সমগ্র বাঙালী জাতির ও বাঙলার পণ্ডিত-মণ্ডলীর গৌরবের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বজনবিদিত করিয়াছেন; সুনীতি-বাবু ইহাকে সর্ব্বদেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অবশ্য অনুশীলনীয় করিয়া তুলিলেন। এই বিপুল গ্রন্থের সমাপ্তি ও প্রকাশে আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করিতেছি ও এই পুস্তকখানির দিকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

বৃহত্তর ভারত-পরিষৎ

ইংরেজ লেখকেরা এবং তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যবর্গ ভারতবর্ষের যে-সব স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে লেখা আছে, ভারতবর্ষ সেই আদিকাল হইতে বারবার বিদেশী শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং পরাধীন ও পরপদানত হইয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে। কিন্তু মহামানবের মিলনক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে সুবৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, সমগ্র এশিয়া জুড়িয়া তাহার সাধনা ও সভ্যতাকে প্রচার করিবার যে সুমহান্ উদ্দেশ্যকে ভারতবর্ষ সার্থক করিয়াছে, দেশের ও জাতির সে গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে যেন সর্ব্বত্র গোপন করা হইয়াছে। ভারতের সাধনা যেখানে মোঙ্গল মন্-খ্মের, ও মালয়-পলিনেসীয় জগতের সঙ্গে অপূর্ব্ব মৈত্রী ও প্রেমে মিলিয়াছে, ভারতবর্ষ ও এশিয়ার ইতিহাসের সেই গৌরবময় অধ্যায়টি কোনো ইংরেজ পণ্ডিতই বিশেষ ভাবে অনুশীলন করিয়া দেখেন নাই। এদিকে যাহা কিছু চর্চ্চা ও গবেষণা হইয়াছে তাহা ফরাসী, জার্ম্মান্, ও ডাচ্ পণ্ডিতেরাই করিয়াছেন। বিশেষ আনন্দ ও আশার কথা যে, আমাদের দেশের কয়েকটি উৎসাহী পণ্ডিত ও অধ্যাপক মিলিয়া বৃহত্তর ভারত-পরিষদের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নানা দেশের শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা এবং তাহার বিচিত্র রূপ ও বিস্তার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। ভারত-ইতিহাসের যে-অধ্যায় অমনোযোগ ও অবহেলায় বিস্মৃতির আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহারই উদ্ধারে ইঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মে ও তত্ত্ববিদ্যায়, শিল্পে ও সাহিত্যে ভারত ছিল বৃহৎ; কিন্তু ভারত হইয়া উঠিয়াছিল বৃহত্তর-ভারত যখন সে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও প্রেমে মিলনের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডকে মৈত্রী ও শাশ্বত সৃষ্টির লীলা ক্ষেত্র করিয়াছিল। বিশ্বমানবের এই যে নিঃস্বার্থ সেবা, এই সেবাব্রতের যে অনুপম অধ্যায়টি ভারতবর্ষের ইতিহাস জুড়িয়া আছে, সেই অধ্যায়টিই বৃহত্তর ভারত-পরিষদের চর্চ্চা ও অনুশীলনের বস্তু। পরিষদের উদ্দেশ্য সত্য ও সার্থক হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

—

আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক পথ

প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য নিজেদের জাতীয়তাকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। জাতির স্বাধীনতার অর্থ শুধু পরাধীনতা-বিমুক্ত অবস্থাটুকুই নহে। জাতির নিজস্ব যাহা তাহাকে উত্তমরূপে গড়িয়া তোলাই সত্য স্বাধীনতা। যেরূপ রোগমুক্ত অবস্থা হইলেই কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছে বলা চলে না, তেম্‌নি শুধু পর-দাসত্ব দূর হইলেই স্বাধীনতা হয় না। জাতির জীবনের আদর্শ যাহা, জাতীয়তার মূল সূত্র ও সত্য যাহা সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া চলিলে বাহিরের শক্তির অধীনতায় না থাকিয়াও জাতি স্বাধীন হইবে না। এই যে স্ব যাহার অধীন হইলে পরে তবেই জাতিকে পূর্ণরূপে স্বাধীন বলা চলে, এই স্ব হইতেছে জাতির নিজত্ব অথবা প্রকৃতি। যথা, আমাদিগের জাতির নিজত্বের মধ্যে আমরা শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কতকগুলি বিশিষ্টতা দেখিতে পাই। এইসকল জাতির প্রকৃতিগত সত্যকে না মানিয়া চলিয়া আমরা যদি ইংরেজ-শাসনমুক্ত হইতে পারি তাহা হইলেও আমাদিগের স্বাধীনতালাভ হইবে না। কারণ, নিজ জাতির চরিত্র বা প্রকৃতিকে পূর্ণাবয়বতা দান না করিলে আমরা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ইংরেজ ব্যতীত অপর কিছুর (ক্ষুদ্রতা, বিজাতীয়তা, ভুলশিক্ষা, আদর্শহীনতা, অধর্ম্ম প্রভৃতি) অধীন লইয়া পড়িব। জাতীয়তাকে বিনষ্ট করিয়া "স্বাধীনতা" ক্রয় করিলে তাহা ঠিক গৃহ হইতে মূষিক তাড়াইবার জন্য গৃহে আগুন লাগানরই তুল্য হইবে। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতার জন্য যে-সংগ্রাম তাহার মধ্যে আমাদিগকে শুধু জয়লাভের কথা ভাবিলেই চলিবে না। ভাবিতে হইবে, আমাদিগের নিজেদের চরিত্রের কথা। তাহা না হইলে একদিক দিয়া আমরা যাহা লাভ করিব অপর দিক দিয়া তাহার শতগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

ধরা যাউক যে, আমরা ধর্ম্ম ও সততা বিবর্জ্জিত ভাবে যে-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইংরেজদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে দূর করিতে পারি। প্রশ্ন হইতেছে, আমরা এইরূপ সম্ভাবনা দেখিলে ধর্ম্ম ও সততাকে বর্জ্জন করিব কি না। আমাদের ধারণা যে, এইরূপ করিলে তাহা অদূরদর্শিতার কার্য্য হইবে এবং তাহাতে আমাদিগের শেষ অবধি ক্ষতিই হইবে। কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইল তাহার উপর সেই সাফল্যের মূল্য বিশেষ রূপে নির্ভর করে। যে-ব্যক্তি চুরি করিয়া লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে ও যে-ব্যক্তি সাধু উপায়ে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, এই দুইজনের উপার্জ্জিত অর্থ সমান হইলেও আমরা সাধু ব্যক্তির ঐশ্বর্য্যের মূল্য অনেক অধিক বলিয়া স্বীকার করিব এবং চোরকে কোনরূপ প্রশংসাই করিব না। কারণ চোর যে সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইয়া নিজেদের যে অন্তরের ঐশ্বর্য্য, নিজের যে প্রকৃতিদত্ত নিজত্ব, তাহা হারাইয়াছে; দুগ্ধে লবণের মত তাহার এই চৌর্য্য তাহার জীবনের প্রতি অণুপরমাণুর ভিতর প্রবেশ করিয়া সকল কিছুকে অপবিত্র করিয়া তুলিবে। একবার যে সত্য ও মঙ্গলের পথ ছাড়িয়া নিজ চরম উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব প্রচার করিয়া মনকে চোখ ঠারিয়া মিথ্যা ও অন্যায়কে উপায়রূপে স্পর্শ করিয়াছে তাহার পক্ষে বিশুদ্ধ সত্য ও মঙ্গলে উপনীত হওয়া অসম্ভব। পঙ্কিল পথে অতি পরিষ্কার মন্দির-ক্ষেত্রে পৌঁছিলেও সেখানে সে-পথের কর্দ্দম পায়ে পায়ে পৌঁছিয়া মন্দির অপরিষ্কার করিয়া তুলে।

আমরা তাহা হইলে দেখিতেছি যে, যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেম্‌নি জাতীয় জীবনে আমাদের পক্ষে কোন উদ্দেশ্য, তাহা যতই শুভ হউক না কেন, সিদ্ধির জন্য ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করা কখনও উচিত হইবে না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই একটি কথা সকলে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে; তাহা এই যে, ধর্ম্ম যে-স্থলে আছে সে-স্থলেই জয়ের স্থান। অধর্ম্মের পথে মানুষ যে জয়ে উপনীত হয়, তাহা জয়ের মিথ্যা ভাণ বা ছায়া মাত্র। মরীচিকার মতই তাহা ক্ষণিকের জন্য আমাদিগের জীবনক্ষেত্রে দেখা দিয়া আবার অন্তর্হিত হয়। এই মিথ্যা জয়ের পরিণতি যে বৃহত্তর পরাজয়, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারি।

আজ আমাদিগের জাতীয় জীবনে এক মহা সমস্যার সূচনা হইয়াছে। এক দিকে পরাধীনতা প্রবল ব্যাধির ন্যায় আমাদিগকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ করিয়া আনিতেছে; অপর দিকে অমঙ্গল ও মিথ্যা ঔষধের রূপ ধারণ করিয়া ক্ষণিকের উত্তেজনাকে জীবন বলিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছে। এই ঔষধ পানে রোগের অবসাদ উপস্থিত আশু দূর হইলেও শেষ অবধি যে তাহাতে আমাদিগের জীবন-সংশয় ঘটিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদিগকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই মিথ্যা ও অধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইবার যে-প্রলোভন তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সত্য ও ধর্ম্মের পথও আছে। সে-পথে চলা কঠিন হইলেও তাহাই প্রকৃত ও শেষ অবধি শুভফলপ্রদ পথ। যে-আদর্শ ও যে-পথ অনুসরণ করিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,তাহা উন্নত ও সততা-সাপেক্ষ ছিল আমরা স্বদেশী আন্দোলনের আমলে ছলনা, শঠতা ও প্রবঞ্চনার পথ অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতা-কামী হই নাই। সে-সময় যে-সকল যুবক সর্ব্বস্ব ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া দেশসেবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা বীরের যে সরল পথ তাহাই ধরিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান্ গভর্ণ্‌মেণ্টের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশ-সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে নিজ অনুসৃত পন্থায় বিশ্বাস করিতেন। তৎকালীন দেশ-সেবার আদর্শ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা প্রভৃতির স্পর্শে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশসেবার নাম করিয়া ভ্রাম্যমাণ কেহই যে সে-সময় স্বার্থান্বেষী ও কপট ছিল না এমন নয়, কিন্তু সে-সময়ে ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তির কার্য্যকলাপ কদাপি উন্নত দেশ-সেবার আদর্শের অঙ্গ বা আদর্শ-সিদ্ধির উপায় বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সেই স্বল্পবুদ্ধি স্বাদেশিকতার যুগে সুস্পষ্টও ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য প্রভাবের যে ঢেউ শত শত নব্য

"বিলাতফেরত" দেশভক্তের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়ে তাহার ধাক্কা সমাজ ও ধর্ম্মের সহিত আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আসিয়া লাগিয়াছিল। আমরা যুদ্ধের পরে প্রথম শিখিতে আরম্ভ করিলাম যে, **উত্তম ও সু** যে আদর্শ তাহা **অধম ও কু** পন্থার অনুসরণে সিদ্ধ হইতে পারে। আমাদিগের একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান দেশনেতা শিখাইলেন যে, ভাল উদ্দেশ্য অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়াও সিদ্ধ করিতে পারিলে তাহা করা উচিত। তিনি শুধু এইটুকু ভুল করিয়াছিলেন যে, মঙ্গল কখনও অমঙ্গল বা অসত্যের পথ অনুসরণ করিয়া পাওয়া যায় না। মিথ্যা ও অন্যায় কখন শুভ উদ্দেশ্যের স্পর্শে সত্য ও ন্যায় হইয়া উঠে না, বরং শুভ যাহা তাহা অসত্য ও অন্যায়ের সংস্পর্শে মলিন হইয়া উঠে।

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে-সকল মিথ্যা ও অন্যায় স্বাধীনতা লাভের সোজা উপায় বলিয়া সকলের [বা অনেকের] সম্মুখে আদৃত হইতেছে, তাহার মূলে পাশ্চাত্য হীন ডিপ্লোম্যাসি বা রাষ্ট্রীয় শঠতার সেই বিরাট্ ভ্রমই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহার ফলে মানুষ ভাবে যে, জাল, জুয়াচুরী ও প্রবঞ্চনার সাহায্যে শুভ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই ডিপ্লোম্যাসির পন্থা ভারতের পন্থা নহে। আমরা কদাপি এই পথ দিয়া স্বাধীনতা পাইব না। শয়তানের সহিত শয়তানী করিয়া জয়লাভের আশঙ্কা করিলে পরিণামে শয়তানের দাস হইয়া থাকাই সম্ভব। শরীরের জন্য, অন্ন ও বস্ত্র আহরণ করিবার জন্য, কি আত্মাকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে?

—

আমাদের রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের কথা

যাঁহারা আজ ভারতের আকাশে রাষ্ট্রনেতা-রূপে উদিত হইয়াছেন তাঁহারা কি চিরউজ্জ্বল তারকা না অমঙ্গলের ধূমকেতু তাহা কে বলিবে? ইঁহারা আজ যে-পন্থা অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন বলিয়া আশা দিতেছেন, সে-পন্থা বহুক্ষেত্রেই ধর্ম্মের নহে। কোথাও দেখিতেছি, চরিত্রহীন তস্কর যে সে-ও নেতার আসনে অধিষ্ঠিত; কোথাও দেখিতেছি উন্নতচরিত্র লোক যিনি, তাঁহার নামে মিথ্যা কলঙ্কের সৃষ্টি করা হইতেছে তাঁহাকে বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে হারাইবার জন্য। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, মিথ্যাও অসম্ভব প্রতিজ্ঞার বন্যা। সকলেই ভাণ করিতেছে ও ঠকাইতেছে। প্রকৃত উন্নতি যাহা ও সত্য স্বাধীনতা যাহা তাহার দিকে ত আমরা অগ্রসর হইতেছি-ই না; উপরন্তু পরস্পরকে ঠকাইতে ও মিথ্যা আশা দিয়া ক্ষণিকের নেতৃত্ব-গৌরব-লাভে আমরা এতই ব্যস্ত যে সত্য উন্নতির কথাও আমাদের আর মনে নাই। সকলেই চাল চালিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে ব্যস্ত। কেহই আর ধূর্ত্ততা ছাড়িয়া সহজবুদ্ধির পথে চলিতে রাজি নহেন।

স্বরাজ্যদলের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর যাঁহারা আছেন তাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মতামতগুলিকে সমগ্র দেশের স্বার্থ বা মতামত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট করিয়া ও বিভিন্ন ফণ্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, প্রভৃতির ভিতর বেবন্দোবস্তের সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা যে দুর্নাম উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ঢাকিবার জন্য আজ স্বরাজীরা কংগ্রেসের নামের অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়াছেন। একথা বলিলে কিছু ভুল বলা হইবে না, যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা এত কম যে, কংগ্রেস দেশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে কোনমতেই পারেন না। যে-স্থলে এক লক্ষ সভ্য হইতে পারিত সে-স্থলে কংগ্রেসের এক হাজার সভ্যও সম্ভবত নাই। কেহ কেহ বলেন যে, স্বরাজীরা চেষ্টা করিয়া নিজেদের হস্তে সকল ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্যই কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা যাহাতে না বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে-কারণেই হউক, কংগ্রেসের আজ অবস্থা এত শোচনীয় যে, তাহার মতামত দেশের মতামত বলিয়া মানিয়া লওয়া কিছুতেই চলে না।

স্বরাজ্যদলের যাঁহারা আজ নেতা, তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে খুব উচ্চ শ্রেণীর লোক নহেন। জীবনের সহিত মুখের কথা ও প্রচারিত আদর্শের সামঞ্জস্য রাখিতে ইঁহারা যে বিশেষ চেষ্টা করেন, এরূপ আমাদের মনে হয় না। যিনি হয়ত দেশকে কর্ম্মনিষ্ঠা ও ত্যাগ শিক্ষা করিতে বলিতে-

ছেন, তিনি নিজে আলস্য ও স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দিন কাটাইতেছেন। যিনি সৎসাহস ও সংগ্রামের কথা আওড়াইতেছেন, তিনি হয়ত গোপনে সরকারী চরের কাজ করিয়া নিজ বন্ধুদের জেলে বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যিনি শ্রমিকের জন্য প্রাণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তিনি হয়ত বিলাসের চরমে পৌঁছাইয়াছেন, শ্রমিকের নিকট হইতে লব্ধ অর্থে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতেছেন। এই যে-সকল নেতা ইঁহাদিগের দ্বারা আমাদের জাতির কোন উপকার হইবে না। ইঁহারা নানাপ্রকার ছল-কৌশল করিয়া কাউন্সিল জয় করিতে পারেন, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ কাউন্সিলের ভিতর নাই। পবিত্র আদর্শবাদ, ও কপটতা-শূন্যতা ও প্রকৃত সেবার আধার যে-সকল ব্যক্তি তাঁহারাই নেতৃত্ব পাইবার উপযুক্ত। ইংরেজের সহিত ধূর্ত্ততায় জয়লাভ করিতে পারেন এমন লোক এদেশে নাই। দেশের কার্য্যে ধূর্ত্ত লোকের আমরা স্থান দেখি না।

—

স্বরাজী ইলেক্‌শন্ নীতি

"ফর্‌ওয়ার্ড্" পত্রিকা স্বরাজ্য দলের সম্পত্তি। এই পত্রিকার মারফতে বর্ত্তমানে উক্ত রাষ্ট্রীয় দলের ইলেক্‌শনের কার্য্য চলিতেছে। "ফর্‌ওয়ার্ড" পত্রিকা পাঠ করিলে যাঁহারা ছাপার হরফের সকল কথাই বিনা আপত্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মনে হইতে পারে যে, বাংলা দেশের সকল দেশভক্তির একমাত্র আধার হইতেছেন স্বরাজীগণ। অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে দেশভক্তি বা দেশসেবার কথা বা চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। অধুনা বাংলায় শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত দেশ-সেবক আর কেহ নাই এবং ভারতের ইতিহাসে স্বরাজ্য দলের মত মহাশক্তিশালী সংঘও কখনও গড়িয়া উঠে নাই।

আমরা বহুকাল হইতে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের মতে শুধু স্বরাজ্যদলের মধ্যেই বাংলার সকল দেশভক্ত নাই। এমন কি স্বরাজ্য দলের ভিতর এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেশের কোন উপকার কখনও করেন নাই এবং বর্ত্তমানে করিতেছেন না। এই কারণে স্বরাজ্যদল-পরিচালিত "ফর্‌ওয়ার্ড" পত্রিকা যে অ-স্বরাজীমাত্রকেই সমান ভাবে নিগুণ ও কোন-কোন স্থলে দেশ-শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা প্রথমত মিথ্যার প্রচার করিতেছেন ও দ্বিতীয়ত যথার্থ দেশভক্তদিগকে দেশের নিকট ছোট প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেশের সমূহ অপকার করিতেছেন। কাউন্সিল হইয়া আমাদিগের লাভ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই সূত্রে আমাদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। ভোট সংগ্রহার্থে দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয় ও শক্তির অপচয় যদি আমরা ক্ষতি বলিয়া না স্বীকার করি তাহা হইলেও দেশের লোকের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও কলহ এবং পরস্পরকে গালিগালাজ করিয়া উভয় পক্ষই লোকচক্ষুর সম্মুখে খাট হওয়াতে যে দেশের ক্ষতি হইতেছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যে রিফর্ম্স্-এর দ্বারা দেশের উপকার প্রায় কিছুই হয় না, তাহার দ্বারা আমাদের এত বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে দেখিয়া আমরা রিফর্ম্স্ সম্বন্ধে গভীরতর বিরুদ্ধভাব অনুভব করিতেছি। আমরা যদি সকলে রিফর্ম্স্ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে দেশের উন্নতি সাধন ও দাসত্ব দূর করিতে চেষ্টিত থাকিতাম তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল হইত। কিন্তু আমরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অনেকেই রিফর্ম্স্এর আবর্ত্তে পড়িয়া যাইতেছি এবং দেখিতেছি যে, ইহার সাহায্যে দেশের মঙ্গল অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ না থাকিলেও ইহার অপব্যবহারে দেশের অমঙ্গলের আশঙ্কা এত অধিক যে, অন্তত দেশ এবং আত্মরক্ষার খাতিরেও অনেককে কাউন্সিল ও এ্যাসেম্বলীতে যাহাতে উন্নত-চরিত্র ও কর্ম্মক্ষম লোকেরাই প্রবেশ করিতে পারেন এবং নীচ অকর্ম্মণ্য ও স্বার্থপর লোকেরা না পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইতেছে।

স্বরাজ্যদলের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মধ্যে যে কর্ম্মক্ষম উন্নতচেতালোক কেহই নাই এমন কথা বলা যায় না। তবে বঙ্গীয় স্বরাজ্য দল অধুনা এরূপ কতিপয় ব্যক্তির হস্তে

পরিয়াছে, যাঁহারা নিজেদের জেদ ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য দেশের মঙ্গল ও সত্য উভয়ই বর্জ্জন করিতে পারেন।

প্রথমত ইঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, যে রিফর্ম্স্ না ভাঙ্গিয়া ইঁহারা জলস্পর্শ করিবেন না। এবিষয়ে একটি মাত্র কথা বলা প্রয়োজন। স্বরাজ্যদলের কি রিফর্ম্স্ ভাঙ্গিবার মত ক্ষমতা আছে? লোকবল, অর্থবল, শিক্ষা, বুদ্ধি, অক্লান্ত কর্ম্মপরায়ণতা, একতা, সংযম, আদর্শনিষ্ঠা প্রভৃতি যে-সকল গুণ না থাকিলে মানুষ কোন বৃহৎ কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারে না, সে-সকল গুণ কি স্বরাজ্যদলের নেতা ও সাধারণ সৈনিকবর্গের আছে? যদি না থাকে তাহা হইলে হাতুড়ি দিয়া হিমালয় ভগ্ন করিব ধরণের প্রতিজ্ঞা করিয়া অল্পবুদ্ধি লোকের নিকট মিথ্যা আশার সৃষ্টি করিয়া এবং বুদ্ধিমানের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া লাভ কি?

দ্বিতীয়ত, স্বরাজ্য দলের লোকদিগের যাহাই ইচ্ছা থাকুক না কেন, স্বরাজ্যদলপতিগণ কি সত্য-সত্যই রিফর্ম্স্ ভাঙ্গিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, না উহা তাঁহাদিগের সাধারণের সাহায্য লাভের জন্য চাল-চাতুরী মাত্র? কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়, তাঁহাকে obstructionist বা বিরোধপন্থী নাম দেওয়ায় ১৪ই নবেম্বর তারিখের "ফর্‌ওয়ার্ড" পত্রিকা তাহাতে নিজের আপত্তি জানাইয়াছেন। তিনি যে যে কার্য্য স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য বলিয়া উক্ত পত্রিকায় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ যেখানে যেখানে সুবিধা বোধ করিবেন, সেখানে সেখানেই গভর্ণমেণ্টের সমর্থন করিবেন। ইহাকে বিরোধ-পন্থা বলা যায় না। বস্তুত ইহার সহিত বর্ত্তমান Responsivist অথবা পারস্পরিক সহযোগ দলের আদর্শের সহিত প্রায় কোনই প্রভেদ নাই। একদল বলিতেছেন, আমরা গভর্ণমেণ্টের বিরোধী, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সহিত সুবিধা হইলে সহযোগে কার্য্য করিব এবং অপর দল বলিতেছেন, আমরা গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগে কার্য্য করিব, কিন্তু প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। এই দুই পন্থার মধ্যে পার্থক্য ভাষার মাত্র, ভাবের নহে। অবশ্য স্বরাজীরা বলিতেছেন যে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু এ কথা তাঁহারা বেশী দিন রাখিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যদি মন্ত্রীত্ব পাইবেন এইরূপ আশা দেখেন তাহা হইলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ অবশ্যই করিবেন। না পাইলে গ্রহণ করিবেন না, একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্থিরপন্থী ব্যক্তিরা যে-দলের নেতা সে-দলের কার্য্য-কলাপ যে কতটা এক-পথ-গামী হইবে তাহা বিচার করা দুরূহ হইবে না। এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও অন্যান্য স্বরাজনেতৃগণ যে সুবিধার খাতিরে কোন বিজ্ঞাপিত আদর্শকে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহাও আমরা মনে করি না। বর্ত্তমানে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রকার দেখিয়া এই ধারণাই আমাদের হইয়াছে যে, স্বরাজ্য দল কোনো আদর্শ অবলম্বন করিয়া আর চলিবে না; চলিবে শুধু বর্ত্তমান নেতাগণের স্বার্থ ও ক্ষমতা যাহাতে অটুট থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।

—

মসজিদ ও পূজার বাদ্য

পূজার বাদ্য না বাজাইলে যে হিন্দুধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা আমাদিগের নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভারতের অন্তরে এত গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে যে, সহস্রাধিক বৎসর কাল মুসলমানদিগের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহার প্রভাব অপ্রতিহত রহিয়াছে। উহা ঐরূপই থাকিবে এবং আরও বিস্তৃত হইবে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক ও দোষ যাহা, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত না হইলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইবে। মসজিদের সম্মুখে পূজার বাদ্য বাজান'র বিরুদ্ধে যে হিংস্র আন্দোলন সম্প্রতি মুসলমানগণ তুলিয়াছেন, তাহা অন্যায়। কারণ, হিন্দুগণ এইরূপভাবে পূজার অথবা অপর বাদ্য বাজাইতে বাধ্য কদাপি হন নাই। যে সকল বিষয়ের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান বা সমর্থন সম্ভব নহে (যথা নমাজ পড়া অথবা বাদ্য বাজান) সে-সকল বিষয়ে কাহার কি দাবী বা অধিকার তাহা

বিচার করিতে হইলে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সামাজিক রীতি-নীতির ও ব্যবহারের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। যে-ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুগণের একটা অধিকার বহুকাল হইতে রহিয়াছে সে স্থলে অপরের জেদ বজায় রাখিবার জন্য সে-অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া অবিচার ব্যতীত আর কি ?

মসজিদ ও বাদ্য বিষয়ে একটি নূতন আইন

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, গভর্ণমেণ্ট একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই আইন অনুসারে সকল মসজিদের সম্মুখে সকল সময়ে সকল প্রকার সঙ্গীত-বাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। খবরটি সত্য বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কি বলেন ?

প্রবাসী-সম্পাদকের খবর

ইয়োরোপে এবার ভীষণ শীত পড়িয়াছে। এই কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নভেম্বর মাসের শেষাশেষি দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি কলম্বোতে কয়েক দিন থাকিবেন ও তৎপরে মান্দ্রাজ হইয়া কলিকাতায় আসিবেন।

আমাদের "মিণ্টো প্রফেসর"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজ বহু বর্ষকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির "মিণ্টো" অধ্যাপক রহিয়াছেন। তিনি আইন ও রাজনীতিতে পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে তাঁহার নিকটে আমারা ভাল কাজ পাই নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তিনি আধুনিক অর্থনীতি উত্তমরূপে অনুশীলন করেন নাই। বর্ত্তমান কালে ভারতে যে-সকল অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আংশিক ভাবেও সমাধিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ আসনধারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার পক্ষে উক্ত আসন অতঃপর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তিনি নিজেও একথা নিশ্চয় বুঝিতেছেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রবীণ বয়সে বর্ত্তমান দ্রুত-উন্নতিশীল অর্থনীতি আয়ত্ত করা আর সম্ভব হইবে না। আমরা আশা করি, জাতীয় জীবনের অপর কোন ক্ষেত্রে তিনি যশোলাভ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন। এবার তাঁহাকে ইয়োরোপে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কবি অধিকাংশ স্থলে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি এইবার দেশে ফিরিয়া কিছুকাল শান্তিতে নিজ কার্য্য করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এবার বৈজ্ঞানিক-জগৎ জয় করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আগামী ৩০শে নভেম্বর তাঁহার অষ্টষষ্টিতম জন্মদিন। আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

উত্তর-বঙ্গ রিলিফ্ কমিটি ও খাদি-প্রতিষ্ঠান

আমরা আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার কাগজে মেদিনী-পুরের বন্যার কথা-প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রিলিফ কমিটির সম্বন্ধে সমালোচনা করাতে আনন্দবাজার পত্রিকার মারফৎ খাদি-প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় একটি উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ রিলিফ কমিটির বিষয়ে আমরা যে সামান্য আলোচনা করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অনেক তীব্র আলোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করা সত্ত্বেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাহার অন্তরায় হইয়াছিল। আমরা জানি যে, আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় ত্যাগী ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী এদেশে বিরল; কিন্তু দেশহিত-ব্রতী এই ত্যাগী কর্ম্মী যে-সমস্ত বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ণধার হইয়াছিলেন, একাকী সে-সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর না হওয়াতে তাঁহাকে অনেকগুলি সহকর্ম্মীর উপর সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হইয়াছে। এইসমস্ত কর্ম্মীদের জন্যই যে কাজের মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা আচার্য্যদেবের অন্তরালে থাকার দরুন্ এপর্য্যন্ত তাঁহাদের দোষত্রুটির সমালোচনার সুযোগ ঘটে নাই। সতীশবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে তর্কযুদ্ধ প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা এবিষয়ে কিছু বলিবার সুযোগ পাইলাম। সেজন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট ঋণী।

উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের কাজে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। সেজন্য আমরা অবগত ছিলাম যে, যদিও প্রথমে সতীশ-বাবুর সহিত রিলিফ কমিটির কোনও প্রকার বিধি-সঙ্গত যোগ ছিল না, তথাপি বেঙ্গলকেমিক্যালের কাজে ও খাদির কাজে আচার্য্য রায় মহাশয়ের তিনিই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রিলিফ কমিটির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসেন; এমন কি সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত সম্পাদকগণ ও কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের প্রতি হুকুম চালাইতেও তিনি পশ্চাদপদ্ হইতেন না। এসব কথা জানা থাকা সত্বেও কাগজপত্রে তাঁহার কোনও পদ ঘোষিত না থাকায় ও বেনামদাররূপে তিনি রিলিফ কমিটির কর্ম্মকর্ত্তা হওয়াতে সমস্ত সমালোচনা আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধেই করিতে হয় বলিয়া আমরা এতদিন বিশেষ কিছু সমালোচনা করিতে নিরস্ত ছিলাম। সতীশ-বাবু আজ প্রকাশ্যভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি নিজ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কাজেকাজেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিবার আর কোনও বাধা নাই।

সতীশ-বাবু বলিতেছেন, "রিলিফের জন্যই খাদির কাজ করা হয়।" কিন্তু বেঙ্গলকেমিক্যাল প্রেস হইতে বি, এম্, গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের রিলিফ কমিটির রিপোর্টে আয়-ব্যয়ের যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, sundry debtorsএর মধ্যে আছে খাদি প্রতিষ্ঠান ২১,৬৩২ টাকা ১১ আনা ৯ পাই। এ টাকা লইয়া খাদি প্রতিষ্ঠান কি কেবলমাত্র উত্তর-বঙ্গের রিলিফ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন? বৎসর-শেষে এত টাকা দেনা খাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট রহিলই বা কেন? ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কোনও মুদ্রিত রিপোর্ট আমরা পাই নাই। কোনও রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না। এই দেনার টাকা আজ পর্য্যন্ত শোধ হইয়াছে কি? বেঙ্গলকেমিক্যালের কাছেও ৭৮৫৪ টাকা ১১ আনা তিন পাই পাওনা, দেখা যায়। এই টাকাও কি উত্তর-বঙ্গের খাদির কাজের জন্য বেঙ্গলকেমিক্যালকে ধার দেওয়া হইয়াছিল? ইহাতে "উত্তর-বঙ্গের" লোক পারে যে-সমস্ত কথা, বলিয়া বসিতে "তাহা যুক্তির দিক দিয়া হাল্কা তো নহেই" "অযৌক্তিকও নহে।" উত্তর-বঙ্গের রিলিফে এখন কত টাকা ঠিক সঞ্চিত আছে, তাহা সতীশবাবু প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষে দেখিতেছি এক লক্ষ ষোল হাজার নয় শত চুরানব্বই টাকা উদ্বৃত ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গের খাদির কাজের জন্য লোকসান বাদ দিলে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই কমিটির হস্তে উদ্বৃত্ত থাকা উচিত। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে খাদির কাজের লোকসানের হিসাবে আছে—

"The annual deficit has on this account been Rupees 23000।" ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই লোকসান যদি দ্বিগুণ ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি অন্ততপক্ষে সত্তর হাজার টাকা এবৎসর কমিটির হাতে মজুদ থাকা উচিত। সে টাকা কোথায় কি ভাবে ব্যয়িত হইতেছে, সাধারণের তাহা জানিবার অধিকার আছে। সতীশ-বাবু তাহা প্রকাশ করিবেন কি?

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে আছে—"The organisation should be handed over to a body capable of continuing the present work of the Relief Committee".

এই bodyটি খাদি প্রতিষ্ঠান কি না এবং সমস্ত টাকা খাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে কি না? সম্পূর্ণ গচ্ছিত টাকা কি উত্তরবঙ্গের খাদির কাজেই ব্যয়িত হয়, না, সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইতেছে? যদি সাধারণ ভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে উত্তর বঙ্গের লোক কি বলিবে সেই দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আর উত্তর-বঙ্গের লোকদিগের টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে সে সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আছে, টাকা যাঁহারা দিয়াছিলেন তাঁহাদেরও সেইরূপ অধিকার আছে।

টাকা উঠিয়াছিল প্লাবনের জন্য; আকস্মিক বিপদে যাহারা বিপন্ন হইয়াছিল তাহাদের সাহায্যের জন্য। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যে চির-দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য নহে। আকস্মিক বিপদে অভাব-গ্রস্ত হইয়া যাহাতে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তাহার একটা উপায় করিবার জন্যই প্রধানত এই সংগৃহীত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। উত্তর-বঙ্গের জন্যই এই দান বলিলে ভুল করা হইবে। প্লাবনে বিপন্নের জন্যই প্রকৃত এই দান সংগৃহীত হয়। পূর্ব্বে ঢাকা সাইক্লোনের সাহায্যার্থ সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত টাকা ঢাকা ভিন্ন অন্য কোথায়ও ব্যয় করিবার অধিকার সংগ্রাহক কমিটির নাই, এইরূপ কথা উঠাতে উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের সাহায্যার্থে কমিটি নিয়োগ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন গৃহে যে-সভা হয় তাহাতে এই কমিটির নাম North Bengal Relief Committee না দিয়া ইচ্ছা করিয়াই Bengal Relief Committee দেওয়া হইয়াছিল। সেজন্য সমস্ত বাঙ্গলা দেশের যে-কোনও অংশের আকস্মিক বিপদে এই টাকা ব্যয়িত হওয়ার কোনও বাধা নাই। উত্তর বঙ্গের লোকের এসম্বন্ধে দাবী হইতে দাতার অভিপ্রায় বিবেচনা করিলে অন্য জেলার দাবী কিছু কম নহে। মেদিনীপুরের জন্য এই টাকা ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার কমিটির ছিল ও আছে এবং মেদিনীপুরের আকস্মিক বিপদের প্রথম ভাগে এই টাকা হইতে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করা কমিটির একান্ত উচিত ছিল। সতীশবাবু নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য যাহাই বলুন না কেন, এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার যে কমিটির আছে তাহা কমিটির কার্য্যাবলী হইতেই প্রমাণিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের Relief Committeeর Report পাঠে পরিদৃষ্ট হয় যে, চট্টগ্রামের বাত্যাবিধ্বস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ President Chittagong Relief Committeeকে Bengal Relief Committee দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পাটনার প্লাবনের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট দুই হাজার, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতিকে পাঁচ শত, চাঁদপুর ম্যালেরিয়া নিবারণে ২৫০৲, তমলুক প্লাবনের জন্য ৪৪১ টাকাও ঐ বৎসর প্রদত্ত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মালাবারের সাহায্যার্থ দুই হাজার ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর প্লাবনের জন্য তিনশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই টাকা দিবার অধিকার কমিটির নিশ্চয়ই আছে। যদি না থাকে তাহা হইলে এই-সমস্ত সাহায্য প্রদান করা কমিটির অন্যায় হইয়াছে। আর যদি অধিকার থাকে তবে সতীশ-বাবুর উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমাদের অভিযোগ এই যে, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির হস্তে যে-অর্থ উদ্বৃত্ত আছে তাহা হইতে মেদিনীপুর প্লাবনে প্রাথমিক সাহায্য প্রদানের জন্য তিন শত টাকা হইতে অনেক অধিক টাকা দেওয়া উচিত ছিল। প্রথমে টাকা না পাওয়ার জন্য প্রাথমিক সাহায্য বিতরণে অনেক ত্রুটি হইয়াছে এবং সেজন্য বেঙ্গল রিলিফ কমিটিই প্রধানতঃ দায়ী। কারণ, আমরা দেখাইয়াছি যে, রিলিফ কমিটির হাতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকা উচিত এবং সেই টাকা কেবলমাত্র উত্তর বঙ্গের খাদির কাজে ব্যয়িত হয় নাই ও হইতে পারে না। এই টাকা যদি অন্য বাবদ ব্যয় করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যায় করা হইয়াছে—সে যতই প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয় কাজ হউক না কেন।

সতীশবাবু বলিতেছেন যে, "রিলিফের জন্যই খাদির কাজ করা হইয়াছে।" কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। রিলিফের কাজ সম্পূর্ণভাবে Gratuitous না করিয়া কাজ করাইয়া লওয়াই উদ্দেশ্যে যদি খাদির কাজ করা হইত তাহা হইলে উক্ত কথা বলা চলিত। কিন্তু Reportএ এই দেখা যায় যে, কমিটি প্রথমে সেজন্য চাউল ছাঁটাইএর কাজের প্রবর্ত্তন করেন এবং প্রায় চার হাজার জন লোক এই কাজে নিযুক্ত হয়। ফলে

Twenty thousand mouths were getting food daily out of the labour employed in husking. Considering the enormous amount of work done the sum of Rupees 43000 spent on husking relief must be regarded as having brought the utmost amount of relief to the largest number of persons possible.

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই (husking) চাল ছাঁটাইএর কাজ বন্ধ হইল কেন? উহার পরিবর্ত্তে যে খাদির কাজ আরম্ভ করা হইল তাহা তেইশ হাজার ২৩০০০ টাকার

লোকসান করিয়া কতজন লোককে relief দেওয়া হইয়াছে ?

কাজেকাজেই রিলিফের জন্যই খাদির কাজ আরম্ভ করা হয় নাই বলিয়া খাদির কাজ আরম্ভ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইতেই রিলিফের কাজকে খাদির পথে লওয়া হইয়াছে বলাই সঙ্গত। সতীশ-বাবু প্লাবনের পূর্ব্বেই খাদির কাজে মাতিয়াছিলেন। প্লাবনের সুযোগ পাইয়া সেই কাজের প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি সমর্থ হন, ইহাই প্রকৃত সত্য। এই কাজে সুবিধা হইবে বলিয়া প্রথম হইতেই তিনি বেতনভুক্ কর্ম্মচারী রাখিবার চেষ্টা পান এবং সেই সূত্রে রিলিফের কার্য্যে নিরত অন্যান্য কর্ম্মীদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। উত্তর-বঙ্গ প্লাবন ভিন্ন অন্য কোনও প্লাবনে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হয় নাই। দামোদর ও দারুকেশ্বর, তমলুক ও মেদিনীপুরের প্লাবন ও খুলনার দুর্ভিক্ষে অবৈতনিক কর্ম্মচারীর দ্বারাই কাজ চলিয়াছিল। উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের প্রথম দিকে যখন কাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল তখন অবৈতনিক কর্ম্মীদের দ্বারাই সকল কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তথাপি কর্ম্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়া সতীশবাবু বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহাদিগের সাহায্যেই খাদির কাজের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি "কাইজারইজ্ম্"এ বিশ্বাস করেন। তাঁহার "কাইজারইজ্ম্"এর সুবিধার জন্যই সম্ভবত তিনি বাজারদর যাচাই না করিয়া অর্থাৎ বিনা টেণ্ডারে, রিলিফ কমিটির জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা মালপত্র ক্রয় করিতেন।

"ডিমোক্র্যাসি" থাকিলে সতীশবাবু এরূপ করিতে পারিতেন না। তিনি বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কার্য্য আদর্শরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং আচার্য্য রায়ের নামে কোনও কলঙ্ক আরোপ করেন নাই যদি প্রমাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত রিলিফ কমিটির সকল হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার স্থান ও কাল জনসাধারণকে জানানো। এ বিষয়ে "কাইজারইজ্ম্" করিলে সতীশবাবুর উপর আচার্য্যদেবের আস্থা থাকিলেও জনসাধারণের থাকিবে না।

—বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির জনৈক কর্ম্মী

—

জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ

এবৎসর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ্ সাহিত্যিক জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ পাইয়াছেন। তিনি সত্তর বৎসর বয়সে এই সম্মান লাভ করিলেন। বহুপূর্ব্বেই তাঁহার এ পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কারণ তাঁহা অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী কোনো-কোনো সাহিত্যিক তাঁহার পূর্ব্বেই এই সম্মানে ভূষিত হন।

আইরিশ্‌দিগের মধ্যেও কবি ইয়েটস্ ইতিপূর্ব্বে

জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ

নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। দ্বিতীয় একজন আইরিশ্ সাহিত্যিক উক্ত সম্মান লাভ করিলেন। আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পান।

বার্নার্ড শ স্কান্দিনেভীয় নাট্যকার ইব্‌সেনের শিষ্য-স্থানীয়। ইব্‌সেন ভিন্ন আর কোন্নে নাট্যসাহিত্যিক এমন পৃথিবীব্যাপী যশ আজকালকার দিনে অর্জ্জন করেন নাই।

বার্নার্ড শ 'জনবুল্‌স্ আদার আইল্যাণ্ড' নামক প্রসিদ্ধ নাটক লিখিয়া বহুখ্যাতি প্রতিপত্তি ও পুরস্কার ও তিরস্কার

অর্জ্জন করেন। এই নাটক ইংরেজদের শ্লেষ ও ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত। আইরিশদের ইংরাজপ্রীতি যে অসাধারণ নয় তাহা বলাই বাহুল্য। শ্লেষরচনাতেই শ'র খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের যত পাপ, অবিচার ও ভীরুতাকে এই শ্লেষের তীব্র কশাঘাতে তিনি জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সোসিয়ালিষ্ট দলভুক্ত ও Fabian সোসাইটির সভ্য। সুতরাং সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার অধিকাংশ রচনা উদ্দেশ্য-মূলক হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সভ্যতার কোনো গ্লানিকে তিনি ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। ইনি দীর্ঘ-জীবন-কাল ধরিয়া বহু নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। সংখ্যায় হয়ত পঞ্চাশের অধিক হইবে। ইঁহার শেষ নাটক 'সেন্ট্ জোয়ান্' রসিক-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

শ

—

প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ

আশ্বিন (১৩৩৩) সবুজপত্রে 'প্রবাসী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সমগ্র কিম্বা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা প্রবাসীর পক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়াও ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের রীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রবাসীর আজন্ম সম্বন্ধের কথাই বলিব। প্রবাসীর সাহিত্যিক আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ভিতর একটা যোগ থাকাতে এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রবাসীর সম্পাদক তাঁহাকে অতি প্রিয়জনরূপে বহুকাল শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখাতে প্রবাসী কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে লেখকমাত্র কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকমাত্ররূপে দেখিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর আত্মীয়স্বরূপ। অর্থ ও রচনার আদান-প্রদান এসম্বন্ধের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে প্রবাসী কিছু পাইয়াছে বলিয়া মনে করে না। তাঁহার অমর-লেখনী-প্রসূত অমূল্য রচনাকে সে বন্ধুত্বের উপহাররূপেই গণ্য করিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে যৎসামান্য সাহায্য করিতে পাইয়া বন্ধুজনোচিত আনন্দই লাভ করিয়াছে।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

শ

—

বৃহত্তর ভারত পরিষদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র

এই পরিষদের উদ্বোধন-সভায় শাস্ত্রী-মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পত্রযোগে তিনি যে-আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন তন্মধ্যে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কিছু পরিচয় আছে। পত্রটির কিয়দংশ এই—

"আপনারা আজ যে-কার্য্যের উদ্বোধন করিতেছেন তাহা অতি মহান্ কার্য্য।...১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের লোক আমাদের যে-সকল রীতি-নীতি অতি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছে এখন আমরা অসভ্যতা মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছি। যে শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও ধর্ম্ম সমস্ত এসিয়ার লোক আমাদের নিকট হইয়াছে, তাহা আমরা এখন ত্যাগ করিতেছি।... যে শৈবকৌল যোগীগণ সারা ভারতে ও তাহার বাহিরে বাঙ্গলার মহিমা গাহিয়াছে আমরা তাহাদিগকে যুগী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি। যে সিদ্ধ পুরুষেরা সমস্ত এসিয়ায় সেদিনও ভারতের শৈব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা এখন বিস্মৃতিসলিলে মগ্ন। ভারতের যে-ইতিহাস খুঁজিতে আমাদিগকে এখন চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সামোএদ দেশে, এমন কি বল্কান ও নীল নদীর ধারে যাইতে হয় সে-ইতিহাস এককালে বড়ই গৌরবময় ছিল। আপনারা তাহার উদ্ধার-চেষ্টা করিতেছেন। আপনারা ধন্য। আশীর্ব্বাদ করি আপনারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন।

শুভার্থী

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী"

—
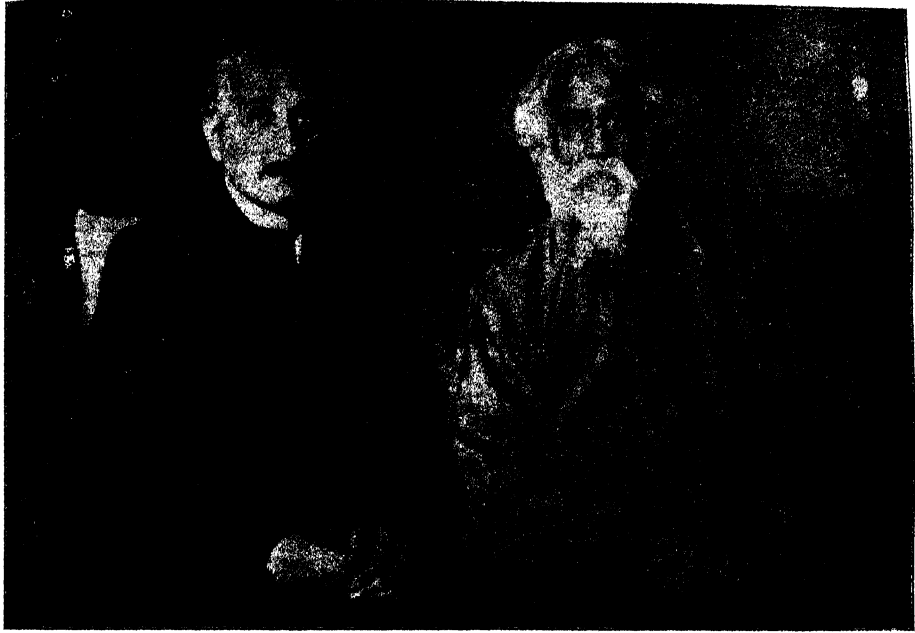
রবীন্দ্রনাথ ও আইন্‌ষ্টাইন্‌

রবীন্দ্রনাথ ও আইন্‌ষ্টাইন্‌

পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে জার্ম্মানীতেই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মান্‌ ভাষাতে তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক অনূদিত হইয়াছে ও এইগুলির বহুল প্রচার হইতেছে। জার্ম্মানীর বহুলোকে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' বহিখানিকে 'জীবন-বেদ' স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকেন। যুদ্ধ-সমাপ্তির অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ যখন জার্ম্মানী গিয়াছিলেন তখন তথাকার জনসাধারণে তাঁহাকে যে বিপুল সম্মান দেখাইয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার এই বারের অভিযানও অন্যদিক দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভন্‌ হিণ্ডেন্‌বার্গ ও ডাঃ আইন্‌ষ্টাইনের মত লোকেও প্রাচ্য কবির মনীষার প্রতি অবনত মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও ভারতের ঋষি-কবির এই পরস্পর সাক্ষাৎ—ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব মনীষা অধঃপতিত ভারতবর্ষকে জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে।

—

দুইটি বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডি আর ধর গ্রেটব্রিটেনের ডাক্তারী শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও রয়েল কলেজ অব্‌ ফিজিসিয়ান্‌সের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ডাক্তার ধর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-বি ও ডি-টি-এম্‌ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে যান ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-আর-সি-পি ডিগ্রী পান। তিনি লণ্ডনে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বার্লিনে সংক্রামক জ্বর রোগের উদ্ভিজ্জাণুতত্ত্ব ও রোগনিদানতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে

ডাক্তার ডি আর ধর

ডাঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

গিয়াছেন। তিনি শিশুরোগ-সমূহেরও বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমরা এই বাঙালী যুবকের কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

ডাক্তার শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সম্প্রতি জার্ম্মানী হইতে ডাক্তারী শাস্ত্রে উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টিউবার্কিউলোসিস্ ও উদ্ভিজ্জাণুতত্ত্ব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বার্লিনে যান। সেখানে তিনি অধ্যাপক ফেলিক্স- ক্রেম্পারার মহাশয়ের ল্যাবরেটারীতে টিউবার্কিউলোসিস্ রোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। এখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া এই তরুণ বাঙালী চিকিৎসক ১৯২৫ সালে আন্তর্জাতিক টিউবার্কিউলোসিস্ কংগ্রেসে যোগদান করেন। সুইট্জারল্যাণ্ডে কিছুদিন এই রোগ সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা করিয়া তিনি বাভেরিয়াতে অধ্যাপক সেনার্‌ব্রুচ্-এর নিকট অস্ত্রোপচার-যোগে টিউবারকিউলোসিস্ রোগ আরোগ্য করার বিষয় শিক্ষা করেন। ইহা ভিন্ন তিনি ইউরোপের নানা স্থানে রোগ-বীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জিনিষ শিক্ষা করিয়া অবশেষে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর্' ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর কৃতিত্ব দেশের পক্ষে মঙ্গলের কারণ।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৩

৩য় সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(৬১)

২৯-৬-১৯০৭

বন্ধু,

তোমার শারীরিক অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-সম্বন্ধে যে নিরুত্তর! ইহার অর্থ কি? তুমি যদি সম্পূর্ণরূপ সারিয়া না আইস তবে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।

তোমার সহিত দেখা কবে হইবে? আমার মনটা একটু বিষণ্ন আছে, একটা বড় কিছু লইয়া এখন থাকিতে চাহি, আমার নিজের কাজ ত একরূপ বন্ধ। কারণ ১২টি Papers লিখিয়াছি, তাহার একটাও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, কি হইল তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। বই লিখিব মনে করি, কিন্তু সেই পুরাতন লেখা এখন দেখিতে ইচ্ছা করে না।

ভাল কথা, আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার আবিষ্ক্রিয়া চুরী করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, কেবল sensitive plantএ সাড়া দেয়; "But these notions are to be extended and we are to recognise that *any* vegetable protoplasm gives electric response."

"I have used all kinds of vegetable protoplasms."

"We are to recognise"; কাহার discoveryর দ্বারা ইহা হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

তারপর আমার পুস্তকে physiologistদের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরিয়া দিয়াছিলাম—আমার আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের গোড়ায় গলদ—যাহা তাহারা negative বলে তাহা positive। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কি ভুল হইতে পারে? তাহার উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী লিখিয়াছে (আমার নাম করিতে নাই—আমার নাম physicist)।

"But in the present state of our physiological literature, is it wise to attempt to use the proper expression? No doubt the confusion is very great, no doubt the main bulk of our electro-physiological literature is totally unintelligible to physicists. Shall we not, however, lay the foundation of a further mass of worse-confounded confusion by any sudden and unauthorised endeavour to call white white and black black, when for the last twenty or thirty years our eaders have been content to call white black and black white?"

আমরা এতদিন Whiteকে Black বলিয়াছি। Unauthorised physicist আসিয়া আমাদিগকে শিখাইতে চায় white is white! কি ভয়ানক!

তুমি কি মনে করিতে পার, বিলাতের বিজ্ঞান এখন কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে?

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, কিরূপ বাধার সহিত আমায় সংগ্রাম করিতে হয়। এসব কথা তোমাকে লিখিয়া, বোঝা অনেকটা দূর হইল, কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।

স্কুলের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভাল কথা, সেদিন আমার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহার সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য ৫৲টাকার পরিবর্ত্তে ১০৲ টাকা বেতন St. Xaviersএ ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছিলেন। এখন সরকার হইতে হুকুম আসিয়াছে যে, দেশীয়দিগকে যেন আর না ভর্ত্তি করা হয়। Loretto হইতে—এর চিঠি আসিয়াছে মেয়েগুলিকে দূর কারবার জন্য। এখন কথা, কোন্ নেটিভ্ স্কুলে ছেলে-মেয়ে দেওয়া যায়। হায়, এত অপর্য্যাপ্ত রাজভক্তির এই পুরস্কার!

মায়াবতীতে একজন আমেরিকান্ আসিয়াছে, সে কল-কারখানায় বিশেষ মজবুত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয়মাসের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্কুলে আনাও।

সদানন্দ মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছেন। দিনু ও রথীর কি পরিবর্ত্তন দেখিলে? সদানন্দ তোমার উৎসাহপূর্ণ চিঠির জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। বুঝিতে পারিলাম যে, শেষ মুহূর্ত্তে অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার জন্য খরচ অনেক বেশী লাগিয়াছে।

Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে, তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয় দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, বিলাতে Web of Indian Life পুস্তকের বহু প্রশংসা হইতেছে—ভারত-বিদ্বেষী কাগজেও লিখিতেছে যে Kipling ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র হয় ত ঠিক নয়, ভিতরের যথার্থ চিত্র এইরূপই হইবে। সম্ভবতঃ এই পুস্তক বহুল প্রচার হইবে, আমেরিকান্ এডিশন্ ইহার মধ্যেই বাহির হইয়াছে। তবে publisherএর নিকট হইতে পয়সা আদায় করা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের ইউনিভারসিটির বিল পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ভাষার ইঙ্গিতে অতি সুন্দর হইয়াছে।

তোমার
জগদীশ

(৬২)

Assyline Villa
Darjeeling
16-5-1905.

বন্ধু,

এখানে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। তুমি যে সদুপদেশপূর্ণ খবরের কাগজের কর্ত্তিত অংশ পাঠাইয়াছ তজ্জন্য ধন্যবাদ জানিবে। তুমি যেদিন অবধি পুলিসের তত্ত্বাবধানে আছ সে অবধি তোমার আধ্যাত্মিক (?) উন্নতির খবর আমি জানি।

ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষচর্ম্মে আবৃত সিংহনাদ লোকে বুঝিতে পারিবে। এরূপ লেখা হইলে আমার বইখানা সহজেই বোধগম্য হইবে।

তোমার
জগদীশ

(৬৩)

Bala Hissar Cottage
Mussorie
26. 5. 1905.

বন্ধু,

অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে এই Plant Response লিখিত হইয়াছে। আমার প্রগাঢ় প্রীতির ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুখী করিও।

তোমার
জগদীশ

(৬৪)

২৩এ অক্টোবর—১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির জায়গা থাকিবে।

চাঁদা তুলিয়া কাপড়ের কল ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

তুমি এবিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা স্থানে পঠিত হইবে।

এসময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

তোমার
বন্ধু

(৬৫)

১১ই মার্চ্চ—১৯০৭

বন্ধু,

তুমি মনস্তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলে। সেই কথা অনুসারে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে যে অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। সুখ ও দুঃখের মৌলিক স্নায়বিক ঘটনা কি, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং তাহা হইতে psychologyর মূল নিয়ম ধরা পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এরূপ কোন লোক দেখিতেছি না যাহার সহিত এসম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। তুমি যদি কলিকাতা না আইস তবে আমার এই অধ্যায়টি তোমাকে দেখিতে পাঠাইব। আমি যে কিরূপ ব্যস্ত আছি জানাইতে পারি না। আগামী মাসের মধ্যেই পুস্তকখানা শেষ করিতে হইবে অথচ অনেক নূতন জিনিষ আবিষ্কার হওয়াতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। যাহা হউক আশা করিতেছি, আর দুই মাসের মধ্যে এই পুস্তক শেষ হইবে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বক্তৃতা এই কারণে দিতে পারিলাম না, তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া লিখিবে। ছুটীর পর হয়ত সময় পাইব। আর যত শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর পাইতে পারি তাহারও চেষ্টা দেখিব, অন্ততঃ দীর্ঘ ছুটী লইব মনে করিতেছি।

তুমি কেমন আছ, কি করিতেছ, কি লিখিয়াছ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

(৬৬)

কলিকাতা

১৮ই মার্চ্চ—১৯০৭

বন্ধু,

আমি দিন দিন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি যাহা সত্য, তাহাই অতি সহজ এবং সেইজন্যই লোকের দৃষ্টির অগোচর। সমস্ত ভবিষ্যতের আশা, মনুষ্য-গঠন দ্বারা। তাহার একমাত্র উপায় কোমল শিশুজীবনে দুএকটি মন্ত্র চিরমুদ্রিত করা। এজন্য তুমি যাহা করিতেছ তাহার সার্থকতা আমরাই দেখিয়া যাইতে পারিব।

তোমার

জগদীশ

(৬৭)

মায়াবতী

৭ই জুন—১৯০৭

বন্ধু,

বাড়ীতে চাকরের প্লেগ হওয়ায় পলাতক হইতে হইয়াছিল। তোমার কন্যার শুভ-বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের আদরের কন্যাটি যেন চিরসুখী হয়। আমাদের বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে জামাতাকে লইয়া একদিন আসিও।

আমি পুস্তকখানি শেষ করিতেছি। শেষের অধ্যায়টি লেখা হইয়াছে আর পূর্ব্বের প্রুফগুলি প্রায় দেখা হইয়াছে। তোমার অনুরোধে পড়িয়া যে মনস্তত্ত্ব বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে—এখন তিন অধ্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। যতই এ বিষয় ভাবি, ততই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। 'স্মৃতি' সম্বন্ধেও এক নূতন অধ্যায় লিখিয়াছি। তোমার তাড়া না হইলে এসব হইত না।

পৃথিবীর খবর তোমার নিকট পৌছিয়াছে, বুদ্ধিমান্ লোকের বুঝিতে আর বাকী নাই। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এইসব পরম শান্তিকর ঘটনার মধ্যে পড়িতে আমার কিরূপ অভিরুচি বুঝিতে পারিবে। উদ্ধার কবে জানি না। তোমার নির্জ্জন কুটীরে স্থান পাইব মনে করিয়া একটু সান্ত্বনা পাই।

তোমার

জগদীশ

(৬৮)

৩১এ আগষ্ট—১৯০৭

বন্ধু,

তোমার লেখা পড়িয়া মনে হইল যে, যাহার জন্য লিখিয়াছ তাহার পক্ষে সহ্য করা সহজ হইবে। মিটিং ইত্যাদির সহানুভূতি অপেক্ষা কত বড় একটা ভাবে সে নিজের জীবন দিতে পারিবে। লেখাটা কেন কাগজে প্রকাশ কর না? তাহা হইলে লোকে এই ঘটনাকে প্রকৃত ভাবে দেখিতে পারিবে।

আমার সেই বক্তৃতাটা মঙ্গলবার, ৩রা সেপ্টেম্বর দিব। কিরূপ হইবে জানি না। তুমি আসিতে পারিবে কি? আমরা ৫ই রওয়ানা হইব।

তোমার

জগদীশ

(৬৯)

বোম্বাই

৭ই সেপ্টেম্বর—১৯০৭

বন্ধু,

বোম্বাই পৌছিয়া এই কয় পংক্তি পাঠাইতেছি। তোমার সহিত দেখা হইল না বলিয়া দুঃখ রহিল, কিন্তু দূরদেশে যাইয়াও নিকটে রহিব। সর্ব্বদা চিঠি লিখিও।

এই দুর্দ্দিনে যাহা বৃহৎ, তাহাই আমাদের আশ্রয়। তুমি এই বার্ত্তা প্রচার করিবে।

তোমার লেখা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিব। গাড়ীতে আর অধিক লিখিতে পারিলাম না।

তোমার

জগদীশ

(৭০)

London.
6. 12. 07.

বন্ধু,

তোমার নিকট জাহাজ হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া

ছিলাম। প্রতি ডাকে তোমার চিঠির অপেক্ষা করিয়াছি। তুমি কি আমার চিঠি পাও নাই?

আমার নূতন পুস্তক পাঠাই, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে। তুমি যে বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখিবে বলিয়াছিলে তাহা কি লিখিয়াছ?

তোমার লেখা কিছুই পাই না। রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় তোমার লেখা দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। যাহা লিখ পাঠাইও। জার্ম্মানীতে একমাস ছিলাম। তাহাতে আমার অসুখ অনেক সারিয়াছিল, কিন্তু শীতের প্রকোপে আবার একটু খারাপ হইয়াছে।

তোমার স্কুলের খবর লিখিও।

আমি চিকিৎসা লইয়াই এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিব। রথীর খবর কি? আগামী বর্ষে আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

তোমার

জগদীশ

(৭১)

London.
19th Dec. 1907.

আমার বন্ধু,

তোমার এই শোকের সময়ে কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছি। তোমার সুখদুঃখের সাথী আমি। কি করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিব জান না।

আমাদের দুজনেরই অনেক প্রিয়জন পরপারে। সুতরাং সেদেশ আর দূরদেশ মনে হয় না।

কেবল এ কয়দিনে যথাসাধ্য কার্য্য সমাপন করিয়া লইতে হইবে। তোমার বিদ্যালয়ের কথা যতই মনে করি ততই মন উৎফুল্ল হয়। অন্ততঃ কয়েকটির জীবন যে তোমার শিক্ষায় অমর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, তোমার স্কুলে ছোট কারখানা খোলা হয়। ছোট কেরাসিনের এঞ্জিন ১৫০৲ টাকা মাত্র, অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর কল তাহা দ্বারা চালান যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫০৲ টাকা। আমার শিষ্য সুরেশের সহিত তোমার স্কুল সম্বন্ধে পর্য্যা- আলোচনা করি। ছোট American lathe সম্ভবতঃ ২০০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫।৬ শত টাকা হইলে তোমার ছোট কারখানা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

তোমার জামাতাকে সেদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। একমুহূর্ত্তও তাহার সময় অপব্যয় হয় না, যত অল্প সময়ে সম্ভব তাহাতেই তাহার এখানকার কার্য্য সমাপ্ত হইবে। তুমি হয়ত তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল আছ, এ কয়মাস দেখিতে দেখিতে শেষ হইবে।

রথীর খবর আমাকে জানাইবে। আমি আগামী বর্ষে হয় ত আমেরিকা যাইতে পারি।

তোমার

জগদীশ

(৭২)

মঙ্গলবার

বন্ধু,

পরম্পরায় শুনিলাম তুমি কলিকাতা আসিয়াছ। আজ দুসপ্তাহ হইল আমি অতি আশ্চর্য্য কয়টি নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। তাহাতে একেবারে অভিভূত হইয়াছি। সেগুলি এরূপ আশ্চর্য্য যে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না। তাহার প্রসার অতি সুবিস্তৃত। আমি কবে পুস্তক শেষ করিব জানি না।

যদি পার তবে আজ সন্ধ্যার সময় আসিও, নতুবা কাল সকালে কি সন্ধ্যায়। অনেক কথা আছে।

তোমার

জগদীশ

(৭৩)

দার্জ্জিলিং
২০এ আশ্বিন

বন্ধু,

তোমার রাখী-সঙ্গীত পড়িলাম। তোমার লেখনী স্বর্ণময় হউক।

তোমার

জগদীশ

(৭৫)

লণ্ডন
২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া অনেক শান্তিলাভ করিয়াছি। দেশের সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তুমি যাহা চিরন্তন ও কল্যাণ সে সব লিখিয়াছ বলিয়া সেই কষ্ট দূর হইল।

প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। তুমি যেসকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এরূপ মনে করি না। তথাপি আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি একথা তুমি যেরূপ পরিষ্কাররূপে দেখাইতে পারিবে, অন্য দ্বারা তাহা সেরূপ হইবে না।

তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদা ভাবি। এই তোমার প্রধান কার্য্য। এইরূপ মানুষ গড়ার 'চেয়ে কোন কাজ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

প্রবাসীতে গোড়ার ইতিহাস দেখিতেছি। সব সময় প্রবাসী পাই না। তোমার লেখা যাহা বাহির হয় পাঠাইও। দুইখান পুস্তক পাঠাইয়াছিলে তাহা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। আজ এখানেই শেষ করি। শীঘ্রই পুনরায় লিখিব। মাঝে আমার বড় অসুখ গিয়াছে, মৃত্যু-মুখে পড়িয়াছিলাম, এখন সারিয়াছি।

তোমার
জগদীশ

(৭৬)

14-5-08

বন্ধু,

কেমন আছ জানিবার জন্য এই দুই পংক্তি লিখিতেছি।

তোমার লেখা পাঠাইও। প্রবাসী সব সময় দেখিতে পাই না। তোমার স্কুলের খবর লিখিও। এ সময় যাহা মহান্ তাহাই যেন দেখিতে পাই।

তোমার
জগদীশ

(৭৭)

কলিকাতা
২০এ জুলাই ১৯০৮

বন্ধু,

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি রবি, সুতরাং সম্ভবতঃ এই উত্তাপে তুমি আরামে আছ, কিন্তু আমাদের প্রাণ অস্থির, তা ছাড়া বিলাতের নূতন আগন্তুক কবে ঘাড়ে চড়িবে তাহা জানি না।

তোমার পক্ষে কতক দিন বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। একবার কাশ্মীর ঘুরিয়া আইস।

তোমার চিঠি পড়িয়া মনে হইল স্কুলের কথা মনে করিয়া চিন্তিত আছ। যতদিন কেহ সমস্ত ভার গ্রহণ করে, ততদিন অন্য কেহ সেই ভার লঘু করিবার চেষ্টা করে না। এটা হয়ত বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতার চিহ্ন। কিন্তু তোমার স্কুল দেখিয়া অন্য দেশে স্কুল দিতেছে। তাহারা ভাবুক নয়, কিন্তু কর্ম্মী। সুতরাং তোমার চেষ্টা হয়ত অন্য দেশে অধিকরূপ পরিস্ফুট হইবে।

আর তোমার স্কুলের ছেলেরা অন্ততঃ কয়েক বৎসর নির্ভয়ে বাড়িতে পারিয়াছে। আজকালকার দিনে একথাটা কম নয়। তা ছাড়া এতগুলি ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শিক্ষার সার্থকতা করিবে। হয়ত আমরা দেখিয়া যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা একদিন হইবেই হইবে।

আর-এক কথা—তোমার স্কুলমাষ্টারী কাজ ফাও, তোমার আসল কাজ অন্যরূপ। যা বেশীর ভাগ তার জন্য এত দুশ্চিন্তা কেন করিবে? আর আমি দেখিয়াছি, যখন কোন কাজ সম্বন্ধে মনে এরূপ করিতে পারিয়াছি, হউক বা নাই হউক, কিছুই আসে যায় না, তখনই সেটা হয়। একটু দূরে গেলেই দেখিবে যেটা যত মারাত্মক মনে করিয়াছিলে সেটা তত নয়।

তোমার ওখান হইতে একবার Sundew আনিয়া-ছিলাম। যদি কেহ আসে তবে তাহার সঙ্গে কতকগুলি পাঠাইয়া দিও, নূতন পরীক্ষা করিব মনে করিয়াছি।

তোমার
জগদীশ

(৭৮)

London,
24. 7. 08.

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। দিনের পর দিন কেবলই দুঃসংবাদ পাইতেছি, মুহূর্ত্তও মন তিষ্ঠিতেছে না। তোমার পত্র পাইলে অনেকটা সান্ত্বনা পাই। হয়ত এই দুর্দ্দিনের পর যাহা প্রকৃত, যাহা চিরস্থায়ী তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহা ক্ষুদ্র তাহার লোপ হইবে, আর যে-সব প্রকৃত মাহাত্ম্যের চিহ্ন দেখা দিয়াছে তাহা মহত্তর হইবে।

তোমার স্কুলের সংবাদ আমাকে সর্ব্বদা জানাইবে। যদি কারখানা করিবার অসুবিধা হয় তবে এখন তাহা নাই করিলে। ভাল একজন শিক্ষক না পাইলে কল অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইবে, এই মনে করিয়া আমি এখন পর্য্যন্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করি নাই। তোমার সব টাকা তোমার জামাতার নিকট মজুত আছে, আবশ্যক মত তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইতে বলিবে।

আমি সম্ভবত ২।৩ মাস পর আমেরিকা যাইব। লণ্ডনের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেই চলিবে।

তোমার
জগদীশ

(৭৯)

Dublin
20. 9. 08.

বন্ধু,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমরা এখন আমেরিকা যাইতেছি, লণ্ডনে আর ফিরিব না।

আমি ইতিপূর্ব্বে Cambridge গিয়াছিলাম, Christ's Collegeএর masterএর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, কলেজের ছাত্র-সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে নূতন ভর্ত্তি দুরূহ। তথাপি তাঁহার নিকট নয়নমোহনের জন্য লিখিলাম, যদি সম্ভব হয় তবে নিশ্চয়ই ভর্ত্তি করিবেন। নয়নের ঠিকানা জানি না।

আমরা এখন England ছাড়িয়াছি। সুতরাং নয়নের জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। Dr. Ostwaldএর বাড়ীতে থাকিলে বেশ সুবিধা হইবে। পরিবারে থাকা বিশেষ আবশ্যক। এখন বিলাতে ছেলে পাঠানয় বিপদের আশঙ্কা।

তুমি একটু শরীরের উপর যত্ন রাখিবে। একবার একবৎসরের জন্য এদিকে আসিলে ভাল হইত। শরীরের উপর অত্যাচার আর কতদিন সহিবে?

তোমার
জগদীশ

(৮০)

Cambridge, Mass. U. S. A.
20th Nov. 08.

বন্ধু,

তোমার নিকট কতবার চিঠি লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু কি আর লিখিব। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেবল ঘোর দুঃসংবাদ পাইতেছি, ইহার মধ্যে আশার সংবাদ কি আছে জানি না। তুমি যে মাসে মাসে বই পাঠাইয়াছ তাহার প্রতি ছত্র পড়িয়া তোমাদের প্রতি সুখ-দুঃখে নিমজ্জিত আছি। গানের পুস্তকে তোমার যে ছবি দেখিলাম তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইলাম। তোমার শরীর যে এরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা মনেও করিতে পারি না। তুমি কি কয়দিনের জন্য ছুটী লইতে পার না? তুমি ছাড়া যে তোমার কাজ চলে না বুঝিতে পারি, কিন্তু এই ভগ্নশরীর লইয়া কতদিন যুঝিবে? এসম্বন্ধে আমারও স্বার্থ আছে মনে করিও। দেশে ফিরিলে আমাকে ঘন ঘন বোলপুরে ও শিলাইদহে দেখিতে পাইবে। তোমার স্কুল ও তোমার গ্রাম্যসমিতির কথা সর্ব্বদা মনে করি। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কার্য্য করিবার প্রসার অনেক সংক্ষেপ হইবে। তবে এই দুইটি যদি প্রকৃতরূপে চলে তাহা হইলেই অনেক। তোমার স্কুলের কথা আমাকে সর্ব্বদা বিস্তারিতরূপে লিখিও। মনে রাখিও তোমার প্রতি কার্য্যে আমার মন আকৃষ্ট। এই দুর্দ্দিনে মনে কোনরূপ শান্তি পাইতেছি না, কেবল তোমার আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করি। আমাদের বন্ধুতা দেবতার করুণা

বলিয়া মনে করি। তুমিও নানা অশান্তির মধ্যে আছ, তোমার মনের ভার আমাকে বহন করিতে দিও।

এখানে বরফ পড়িতেছে, কিন্তু এ সময়ে তোমার ছোট দোতলার ঘরে বসিয়া বোলপুরের সীমাহীন প্রান্তর দেখিতে পাইতেছি। পিসিমাকে আমার প্রণাম জানাইও। এই সন্ধ্যার সময় তোমার কুটীরের প্রত্যেক দৃশ্য আমার চক্ষে ভাসিতেছে।

রথীর সহিত দেখা হইবে। জানুয়ারী মাসে ওদিকে যাইব। এখন এ দেশে অনেক বাঙ্গালী ছেলে, অনেক সময় তাহাদিগকে বড় কষ্ট করিয়া চালাইতে হয়। তবে তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিবার প্রয়াস দেখিয়া সুখী হইলাম।

তোমার
জগদীশ

(৮১)

Cambridge, Mass.,
8th Jan. 1909.

বন্ধু,

আশা করি ইতিপূর্ব্বে আমার চিঠি পাইয়াছ। অনেক দিন দেশের নানা দুঃসংবাদ পাইয়া একেবারে অভিভূত ছিলাম, তবে এখন মরার চেয়ে বাড়া কিছু নাই মনে করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা পাইয়াছি। আর নানা কার্য্যে মন অন্য দিকে নিয়োজিত করিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে এখানে American Association for Advancement of Science হইতে বিশেষরূপ আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে Baltimore গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে আমার কলের সাহায্যে নূতন গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। Washingtonএর Agricultural Departmentএ আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে বৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এক সহস্র বৈজ্ঞানিক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন। আর এক সপ্তাহ পরে Illinois যাইব। তখন রথীর সহিত দেখা করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

তারপর তোমার সংবাদ জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। ঝড় ও দুর্ঘটনার মধ্যেও তোমার রোপিত বৃক্ষ যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। বৃথা তর্ক ছাড়িয়া যাহার কিছু করিবার আছে তাহাই সম্পন্ন হউক।

তোমার বিদ্যালয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিশেষ করিয়া লিখিও, ইহাকে বিবিধ দিকে পূর্ণ করিতে হইবে। এদেশে শিক্ষার নূতন নূতন উপায় ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বতো-ভাবে উৎকৃষ্ট। যদি কখনও সুবিধা হয় তবে Teachers' Collegeএ একজন যুবককে পাঠাইলে অনেক উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মনে করিও, তোমার বোলপুর ও শিলাইদহের কথা সর্ব্বদা স্মরণ করি। সেই প্রথম যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম—সে আজ কত বৎসরের কথা—আজও, প্রত্যেক দৃশ্য মনে পড়িতেছে। অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়া রাখিও। প্রতিদিন এক-দুটি শুনাইতে হইবে। জীবনের সন্ধ্যাকালে স্বপ্নরাজ্য জাগিয়া উঠিবে। তাহাই অনেক সময়ে প্রকৃত, এসব মিছা ছোট ঘটনাই অস্থায়ী।

তোমার
জগদীশ

(৮২)

দার্জ্জিলিং
২।৬।১৯০৯

বন্ধু, তুমি ধন্য।

তোমার
জগদীশ

[আগামী মাঘ মাস হইতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হইবে।]

বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধের ধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম ; এ ধর্ম্ম যেন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-দিগের জন্যই। গোতম স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে ও উপদেশে বহু নরনারী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'অগার ত্যাগ করিয়া অনগারী হওয়া' (অগারস্মা অনগারিয়ম্) বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি সাধারণ ঘটনা (সুত্তনিপাত, ২৭৪, ১০০৩, এবং দীঘ, ১।৬৩, ৩।৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮ ; মজ্‌ঝিম ১।১৬, ৩৯২, ২।৫৫, '৭৫ ; অঙ্গুত্তর ১।৪৯, ৫০, ২।২৪৯ ; বিনয় ১।১৫ ইত্যাদি ; (ইংলণ্ডের সংস্করণ)। সংসার ভোগের স্থল ; কিন্তু ভোগবাসনা অতিক্রম না করিলে নির্ব্বাণলাভ অসম্ভব। ত্রিপিটকের বহুস্থলে এইপ্রকার ভাষা পাওয়া যায় :—"গৃহজীবন সঙ্কীর্ণ এবং রজোময় (সম্বাধা ঘরাবাসো রজা পথ:) এবং প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত পথ (অব ভো কা স:) ; গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, এবং পরিষ্কৃত শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করা সুকর নহে" (দীঘ, ১।৬৩, ২৫০ ; মজ্‌ঝিম ১।১৭৯, ২৪০, ২৬৭, ৩৪৪ ; সংযুক্ত ২।২১৯, ৫।৩৫০ ; অঙ্গুত্তর ২।২০৮ ; ৫।২০৪ ইত্যাদি, ইংলণ্ডের সংস্করণ)।

এইজন্য অনেক নরনারী সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন। ইহাতে স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে, বুদ্ধের ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। বুদ্ধের সময়েই অনেকে সংসারাশ্রমে বাস করিয়াও তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ ও সাধন করিয়াছিল। এই শ্রেণীর পুরুষদিগকে উপাসক এবং নারীদিগকে উপাসিকা বলা হইত।

এ ধর্ম্ম সকলের জন্যই

মজ্‌ঝিম-নিকায়ের 'মহা-বচ্ছ-গোত্ত-সুত্তে' লিখিত আছে যে, একসময়ে বচ্ছ-গোত্ত নামক একজন পরিব্রাজক গোতম-সমীপে উপস্থিত হইয়া ছয় শ্রেণীর লোকের সাধনা ও সিদ্ধি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই ছয় শ্রেণীর লোক এই—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) 'ওদাত-বসন' (অর্থাৎ শুক্লবসন) ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, (৪) ওদাত-বসনা ব্রহ্মচারিণী গৃহস্থা, (৫) ওদাত-বসন কামভোগী গৃহস্থ এবং ওদাত-বসনা কামভোগিনী গৃহস্থা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ কাষায়-বস্ত্র ব্যবহার করেন আর গৃহী-দিগের বস্ত্র শুভ্র। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য গৃহস্থাশ্রমের লোকদিগকে 'ওদাত-বসন' বলা হইয়াছে।

ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের বিষয়ে একই প্রকার প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং উত্তরও দেওয়া হইয়াছিল একই প্রকার। প্রশ্ন এই :—'গোতমের কি এমন একজনও ভিক্ষু শ্রাবক বা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা আছেন, যিনি এই দৃষ্টলোকে আশ্রম-বিহীন হইয়া, চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি অবগত হইয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া, লাভ করিয়া, বিহার করেন ?'

ইহার উত্তরে গোতম বলিলেন—

কেবল এক শত নহে, দুই শত নহে, তিন শত বা চারি শত বা পাঁচ শত নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিক ভিক্ষু শ্রাবক ও ভিক্ষুণী শ্রাবিকা এই ভাবে বিহার করেন।

ব্রহ্মচারী উপাসক ও ব্রহ্মচারিণী উপাসিকাদিগের বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন হইয়াছিল—

গোতমের কি এমন একজনও উপাসক ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারিণী গৃহস্থা উপাসিকা আছেন, যিনি কামলোক-সম্বন্ধী পঞ্চ সংযোজন ছিন্ন করিয়াছেন, (দিব্যলোকে) অযোনি-সম্ভূত হইয়া বাস করেন, সেই লোকেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন এবং সে-লোক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ?

ইহার উত্তরে গোতম বলিলেন, এপ্রকার ব্রহ্মচারী উপাসক বা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা এক শত নহে, দুই শত, বা তিন শত বা চারি শত বা পাঁচ শত নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিক।

কামভোগী উপাসক এবং কামভোগিনী উপাসিকা-দিগের বিষয়ে এই প্রকার প্রশ্ন হইয়াছিল—

গোতমের কি এমন একজনও কামভোগী উপাসক বা কামভোগিনী উপাসিকা আছেন—যিনি ধর্ম্মের অনুশাসন গ্রহণ ও পালন করেন, যিনি বিচিকৎসা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার মনে কোন-প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না, যিনি বৈশারদ্য (বেসারজ্জ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে আর অপরের উপরে নির্ভর করিতে হয় না এবং যিনি এইভাবে শাস্ত্রীর শাসনে (অর্থাৎ উপদেষ্টা বুদ্ধের শাসনে) বাস করেন ?

ইহার উত্তরেও গোতম বলিলেন—এপ্রকার উপাসক উপাসিকা দুই শত পাঁচ শত নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিক।

শেষ প্রশ্নে 'বৈশারদ্য' প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। বৈশারদ্য (বেসারজ্জ) বলিলে চারিটি অবস্থা বুঝায়—(১) সম্যক্ সম্বুদ্ধাবস্থা, (২) আশ্রবাতীত অবস্থা, (৩) ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় বিষয়ে জ্ঞান, এবং (৪) সম্যক্ দুঃখ ক্ষয়ের পথ প্রদর্শন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই চারিটি বুদ্ধের বিশেষত্ব (মজ্‌ঝিম-নিকায়, মহা সীহনাদ সুত্ত)।

কামভোগীদিগের বৈশারদ্য এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ এস্থলে অভিজ্ঞতা অর্থে বৈশারদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া বচ্ছগোত্ত বলিলেন :—

কেবল গোতমই যদি এই ধর্ম্মের আরাধক হইতেন, এবং ভিক্ষুগণ যদি আরাধক না হইতেন, তাহা হইলে ইহার এক অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। কেবল গোতম ও ভিক্ষুগণই যদি এই ধর্ম্মের আরাধক হইতেন, ভিক্ষুণীগণ বা শ্বেতাম্বর ব্রহ্মচারী উপাসকগণ বা শ্বেতাম্বরা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকাগণ বা শ্বেতাম্বর কামভোগী উপাসকগণ বা শ্বেতাম্বরা কামভোগিনী উপাসিকাগণ যদি এ ধর্ম্মের আরাধক হইতে না পারিতেন, তাহা হইলে এই ধর্ম্মের সেই সেই অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। কিন্তু যখন গোতম, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ, ব্রহ্মচারী উপাসকগণ, ব্রহ্মচারিণী উপাসিকাগণ, কামভোগী উপাসকগণ এবং কামভোগিনী উপাসিকাগণ—সকলেই এ ধর্ম্মের আরাধক, তখন এ ধর্ম্মের প্রত্যেক অঙ্গই পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

যেমন গঙ্গানদী সমুদ্রাভিমুখে নত হইয়া, সমুদ্রপ্রবণ হইয়া, সমুদ্রে সংগৃহীত হইয়া, সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি গৃহপতি-পরিব্রাজক-সহ গোতমের সমুদায় পরিষদ্ নির্ব্বাণাভিমুখে নত হইয়া, নির্ব্বাণ-প্রবণ হইয়া, নির্ব্বাণে সংগৃহীত হইয়া, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে (মজ্‌ঝিম-নিকায়, মহাবচ্ছগোত্ত সুত্ত)।

সুতরাং কেবল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের অধিকারী তাহা নহে, গৃহী-গৃহিণীগণও নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ—সকলেই নির্ব্বাণ-সমুদ্রে নিপতিত হইয়া অবস্থান করিবেন।

উচ্চ সাধক-সাধিকা

ত্রিপিটক গ্রন্থে বহু উপাসক-উপাসিকার নাম পাওয়া যায়। একসময়ে বুদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকাদিগের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি প্রধান প্রধান দশ জন উপাসক ও দশ জন উপাসিকার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহাদিগের মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে অগ্রগণ্য (অঙ্গুত্তর-নিকায়, এক-নিপাত, ১৪।৬,৭)। এস্থলে তিন জন উপাসিকার নাম উল্লেখযোগ্য। 'বহুশ্রুত'দিগের মধ্যে 'খুজ্জুত্তরা' অগ্রগণ্যা; মৈত্রী বিহারীদিগের মধ্যে 'সামাবতী' এবং ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নন্দমাতা উত্তরা অগ্রগণ্যা। উপাসক-গণের মধ্যে 'চিত্ত-মচ্ছিক-সণ্ডিক'-কে 'ধর্ম্মকথিক'গণের অগ্রগণ্য বলা হইয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মকথা বলেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে 'ধর্ম্ম-কথিক' বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপাসক-উপাসিকাগণ যে নামে বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে; এমন সাধক-সাধিকাও ছিলেন যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, বহুশ্রুত ছিলেন, 'মৈত্রী-বিহার' সাধন করিতেন এবং ধ্যান-পরায়ণ হইতেন। 'মৈত্রী-বিহার' এবং ধ্যান উচ্চ অঙ্গের সাধনা; সুতরাং অনেক উপাসক-উপাসিকা ধর্ম্মের উচ্চ স্তরে বাস করিতেন।

মুক্তির স্তর

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সকলেই যে ধর্ম্মের উচ্চতম স্তরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন সাধক-সাধিকা ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সোপানে অবস্থান করিতেন। উপাসক-উপাসিকাদিগেরও স্তর-ভেদ ছিল।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ চারিটি স্তরের উল্লেখ আছে।

(১)

নিম্নতম স্তরের লোককে বলা হয় স্রোতাপন্ন। মুক্তি-পথ যেন একটি স্রোত। যাঁহারা এই স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই স্রোতাপন্ন। ইঁহারা সৎকায়-দৃষ্টি,* বিচিকিৎসা* এবং শীল-ব্রত-পরামর্শ* এই তিনটি সংযোজন* সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়াছেন, নরক অতিক্রম করিয়াছেন এবং ইঁহারা নিশ্চয় অর্হত্ব লাভ করিবেন (মহাপরিনিব্বাণ-সুত্ত, ২।৭)।

(২)

দ্বিতীয় স্তরের সাধকগণকে বলা হয় 'সকৃতাগামী'। ইঁহারা পৃথিবীতে আর একবার জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংযোজন বিনাশ করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও মোহ ক্ষীণ হইয়াছে (মহাপঃ, ২।৭)।

(৩)

তৃতীয় স্তরের সাধকগণকে বলা হয় 'অনাগামী'। ইঁহাদিগকে আর পৃথিবীতে আগমন করিতে হইবে না। ইঁহাদিগের পঞ্চ সংযোজন (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংযোজন এবং কাম ও হিংসা এই পাঁচটি সংযোজন) বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহারা অযোনিসম্ভূত হইয়া স্বর্গলোকে বাস করিবেন এবং সেই স্থলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন (মহাপঃ, ২।৭)।

(৪)

উচ্চতম স্তরের সাধকগণের নাম অর্হৎ। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীতেই নির্ব্বাণলাভ করিয়া বিহার করেন।

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের মধ্যে ত এই চারি শ্রেণীর সাধক আছেন-ই; উপাসক-উপাসিকাগণের মধ্যেও এই চারি শ্রেণীর সাধকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাপরিনিব্বাণ-সুত্তে (২।৭) পঞ্চ শতাধিক উপাসককে স্রোতাপন্ন বলা হইয়াছে; সকৃতাগামী সাধকের সংখ্যা নবতি অপেক্ষাও অধিক; অনাগামীদিগের সংখ্যা পঞ্চাশতের অধিক; এই ৫০ জন ছাড়া আরও আটজন অনাগামী উপাসক-উপাসিকার নাম দেওয়া হইয়াছে। সংযুত্তনিকায় গ্রন্থের বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ (ইংলণ্ডের সংস্করণ, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯)।

এখন প্রশ্ন—গৃহী 'অর্হৎ' হইতে পারে কি না। গৃহী অর্হত্ব লাভ করিয়াছে বা করিতে পারে—একথা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু বুদ্ধের সময়েই অনেক গৃহী অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের এক স্থলে এইপ্রকার আছে :—

"হে ভিক্ষুগণ! তপুস্স গৃহপতি ষড়্ ধর্ম্ম সমন্বিত হইয়া তথাগতে নিষ্ঠা লাভ করিয়া, অমৃতত্ব দর্শন করিয়া, অমৃতত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া বিহার করিতেছেন।

এই ছয়টি ধর্ম্ম কি কি? বুদ্ধে দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, সঙ্ঘে দৃঢ় বিশ্বাস, আর্য্যশীল, আর্য্যজ্ঞান ও আর্য্য-বিমুক্তি এই ষড়্ ধর্ম্ম সমন্বিত হইয়া তপুস্স গৃহপতি তথাগতে নিষ্ঠা লাভ করিয়া, অমৃতত্ব দর্শন করিয়া, অমৃতত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া বিহার করিতেছেন" (ছক্কনিপাত, ১১৯; ইংলণ্ডের সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০-৪৫১)।

এস্থলে অর্হত্ব লাভের কথাই বলা হইল।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই আরও ২০ জন গৃহীর বিষয়ে ঐপ্রকার বিমুক্তিলাভ, অমৃতত্ব দর্শন ও অমৃতত্ব প্রত্যক্ষীকরণের কথা বলা হইয়াছে (ছক্কনিপাত, ১২০)।

'সংযুত্তনিকায়' গ্রন্থেও গৃহী অর্হত্তের উল্লেখ আছে। এক সময়ে বুদ্ধ আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, অশোক নামক উপাসক এবং অশোকা নাম্নিকা উপাসিকা এই পৃথিবীতেই আস্রব ক্ষয় করিয়া, চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া এবং লাভ করিয়া বিহার করিয়াছিল (সংযুত্তনিকায়; ইং, সংস্করণ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৫৮)।

---

* সংযোজন=বন্ধন। দেহই আত্মা, রূপ বেদনা, সংজ্ঞাদি আত্মা—এই প্রকার বিশ্বাসের নাম সৎকায়দৃষ্টি। বিচিকিৎসা=সন্দেহ। শীলব্রত-পরামর্শ=কর্ম্ম-সাধনই মুক্তি—এই মত।

এস্থলেও পৃথিবীতেই মুক্তিলাভের কথা বলা হইল।

বিনয়পিটকে লিখিত আছে যে 'যশ' নামক একজন কুলপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই আশ্রব-বিমুক্ত হইয়াছিল। তাহার পরে সে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। সেই সময়ে বুদ্ধ তাহাকে অর্হৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন (বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ; ১।৭।১১-১৫)।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত 'কথা-বত্থু' নামক গ্রন্থে এই তিন জন গৃহী অর্হতের নাম পাওয়া যায়—'যশ', 'উত্তিয়', এবং 'সেতু' (ইংলণ্ডের সংস্করণ, পৃঃ ২৬৮)।

সিদ্ধান্ত

আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, গোতম মনে করিতেন যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম লাভ করা সহজ নহে। এইজন্য তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে এবং উপদেশে বহু নরনারী গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়েই অনেক গৃহস্থ ও গৃহস্থা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে উচ্চ অঙ্গের সাধনা করিতেন এবং কেহ কেহ সংসারে থাকিয়াই জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

রূপকথা ও ইতিহাস

শ্রী শচীন্দ্রলাল রায়, এম-এ

বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে প্রাচীন লোক-সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হয়। ঐতিহাসিকগণ রূপকথা বা উপকথার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত থাকিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করেন না এবং যাঁহারা রূপকথা প্রভৃতির আলোচনা করেন তাঁহারাও এ বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের তো কথাই নাই, এমন কি ইউরোপের মনস্বীগণও খুব বেশীদিন এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি না। মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক মাল-মসলা ও তথ্যের অভাব হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে সেই স্থানটি ফাঁকা পড়িয়া থাকে। পুরাকালের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যে-সমস্ত নিদর্শনের উপর নির্ভর করিতে হয় অনেক সময় ধারাবাহিকরূপে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও তাহা অসম্পূর্ণ একথা জোর করিয়াই বলা চলে।

ঐতিহাসিক তথ্য-অনুসন্ধান বর্ত্তমানে নানা ভাবে চলিয়াছে এবং এবিষয়ে রূপকথা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।—পাশ্চাত্য-বিদ্বজ্জন-সমাজ এদিকে দৃষ্টিদান করিয়াছেন।—আমাদের দেশে এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। রূপকথা, প্রবচন, প্রবাদমূলক গল্প প্রভৃতি অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। এগুলি রক্ষার দিকে আমরা কতদূর যত্নবান তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বস্তু। মিশনারী ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী বিদেশীয়গণ অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে আমাদের এইসকল লুপ্তপ্রায় প্রাচীন লোকসাহিত্যের উদ্ধার সাধন না করিলে সেগুলি বোধহয় লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইত না।

রূপকথার ভিতর দিয়া আমরা পুরাকালের চিন্তার ধারার সহিত পরিচিত হই। ইতিহাস কতকগুলি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করে আর রূপকথার ভিতর দিয়া আমরা বহু প্রাচীন যুগের মানবের চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও

রীতিনীতির সন্ধান পাই এবং এইগুলি সহজেই ইতিহাসের মধ্যে একটি স্থায়ী স্থান লাভ করিয়া ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিতে পারে।

রূপকথা প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে ইতিহাসকে সাহায্য করিতে না পারিলেও ইহা অন্যরূপে সাহায্য করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে যিনি রূপকথা প্রভৃতি আলোচনা করিবেন তাঁহার সম্মুখেই এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। এবিষয়ে এপর্য্যন্ত খুব বেশী গবেষণা হয় নাই। জর্জ্জ লরেন্স গমি (George Laurence Gomme) তাঁহার Folklore as an Historical Science নামক পুস্তকে এবিষয়ে অনেকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি তাঁহার স্বদেশকেই গণ্ডী করিয়া গবেষণার স্থল নির্দ্দিষ্ট করেন। তিনি আরও বলেন—তাঁহার গবেষণা-পদ্ধতি সঠিক অনুমিত হইলে অন্যস্থলেও এই পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা চলিতে পারে।

সর্ব্বদেশেই কোনও কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা স্থান সম্বন্ধে নানা প্রবাদ ও কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। আলোচনা করিলে ইহার ভিতরে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহা নিছক রূপকথা তাহার ভিতরেও কতটা ঐতিহাসিক মালমসলা রহিয়াছে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। রূপকথার বিবরণগুলিতে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা স্থান সম্বন্ধে কিছু না থাকিলেও ইতিহাস যাহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক তথ্যের ইঙ্গিত ইহার ভিতর আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

রূপকথা প্রভৃতির এইদিকের আবশ্যকীয়তা লোক-সাহিত্যবিদ্গণের দৃষ্টিতেই প্রথম পড়িয়াছে। মিষ্টার জে, এফ, ক্যাম্বেল (J. F. Campbell) তাঁহার Highland Tales নামক পুস্তকের ভূমিকায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—যাহারা এই গল্পগুলির বক্তা এগুলিতে তাহাদের দৈনন্দিন-জীবনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যেগুলি এখনকার দিনের পক্ষে সত্য নয় তাহা খুব সম্ভব অতীত কালে সত্য ছিল এবং সেইজন্যই এইসকল উপকথা হইতে জীবনযাত্রার অনেক বিস্মৃত অধ্যায় উদ্ধার করিতে পারা যায়।

তাঁহার পুস্তকে এই বিষয়টি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। আমি এখানে তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করিব।

পুরাকালের Tribal Life সম্বন্ধে অনেক তথ্য, রূপকথা ও প্রবাদমূলক গল্প প্রভৃতির মধ্যে রহিয়াছে। রূপকথা তাহার অনৈতিহাসিক আবরণের মধ্যে সেকালের জাতীয় সম্মিলনের (Tribal Assembly) সঠিক চিত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে। পুরাকালে এইসমস্ত সম্মিলন মুক্তবাতাসে বসিত এবং এ রীতি অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। Anglo-Saxonদের একটি রীতি ছিল এই যে, কোনও গৃহে সভাসমিতি বসিবে না, কারণ সেখানে পরিষদবর্গ যাদুবিদ্যায় মোহিত হইয়া যাইতে পারে।

Tribal Assemblyর চিত্র নানা সভ্য ও অসভ্য জাতির উপকথার ভিতর স্থান পাইয়াছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা হইল।

(১) Dr. Callway সংগৃহীত Nursery Tales and Tradition of the Zulus পুস্তকে Girl King নামক একটি গল্পে দেখা যায় যে, অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক রাণী হইবার জন্য আবেদন করিলে তাহারা নদীতীরে সমবেত হইয়া কে এই পদ পাইবার যোগ্যা পরস্পরের মধ্যে বিচার করিয়া স্থির করে। তাহারা প্রত্যেকের আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লয়। নদীতীরে এই সম্মিলনের সহিত 'জুলু'দের রাজনৈতিক সম্মিলনের বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। এই উপকথার ভিতর ইহার স্রষ্টা জুলুদের জীবনযাত্রার ঘটনাই লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা অনুমান করা কঠিন নয়।

(২) Mr. Lach Szyrma একটি সুন্দর Slovac Folk Tale লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় :—একটি পিতৃমাতৃহীন বালিকা বিমাতার নিকট বাস করিত। তাহার এক হিংসুক ও রাগী বৈমাত্রেয়

ভগিনী ছিল। অনাথা বালিকা তাহাদের নিকট অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিত। অবশেষে নিজ কন্যার প্ররোচনায় বিমাতা সপত্নী-কন্যাকে বাড়ী হইতে তাড়াইতে কৃতসংকল্প হয়। তখন শীতকাল, জানুয়ারী মাস। বরফে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিমাতা এই অসহ্য শীতে বালিকাকে বন হইতে 'ভাওলেট' আনিতে আদেশ করে এবং যতদিন সে 'ভাওলেট' না আনিতে পারিবে ততদিন বাড়ী ফিরিতে নিষেধ করিয়া দেয়। বালিকার কাকুতি-মিনতিতে বিমাতার কঠিন প্রাণ টলিল না, বালিকাকে ফুলের সন্ধানে বনে যাইতে হইল। বনপ্রান্তে আসিয়া সে দেখিতে পাইল—কতকগুলি পত্রহীন বৃক্ষতলায় আগুন জ্বলিতেছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বালিকা দেখিল, সেই আগুনের চারিপাশে বারখানি প্রস্তরের উপর বারজন লোক বসিয়া আছে। একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর দলের সর্দ্দার বসিয়া। তাহার চুল ও দাড়ি শ্বেতবর্ণ, হাতে একখানি বৃহৎ দণ্ড। বালিকা নিকটে আসিলে বৃদ্ধ সর্দ্দার তাহার বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালিকা অশ্রুরুদ্ধস্বরে তাহার দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা করিল। বৃদ্ধ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"আমি জানুয়ারী, আমি তোমাকে 'ভাওলেট' দিতে পারিব না, কিন্তু আমার ভাই মার্চ্চ পারিবে।" তারপর সে একজন সুশ্রী যুবকের দিকে চাহিয়া কহিল—"ভাই মার্চ্চ, আমার আসনে উপবেশন কর।" তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ বাতাস বহিতে লাগিল, মাঠ সবুজ তৃণে ছাইয়া গেল, ফুলের গাছে কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিল। বালিকার পায়ের কাছে কতকগুলি 'ভাওলেট' দেখ গেল। সে নত হইয়া সেইগুলি তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া তাহার বিস্মিতা বিমাতাকে উপহার দিল।......এই রূপকথার ভিতর Tribal Assemblyর চিত্র রহিয়াছে। এখানে জানুয়ারী (January) ও অন্যান্য এগারটি মাস Tribal Chiefs রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

(৩) Miss Frereএর 'Old Deccan Days' নামক পুস্তকে 'How the three clever men out-witted the Demons' নামে একটি গল্প আছে। তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত চিত্র পাই:—কোনও পণ্ডিত এক দৈত্যকে বশীভূত করিয়া তাহাকে দিয়া ধনরত্ন আনাইত। একদিন দৈত্যের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। দৈত্য উত্তর দেয় যে, সে পণ্ডিতকে ধনরত্ন আনিয়া দেয় বলিয়া তাহার সঙ্গীরা তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল। পণ্ডিত কতবড় শক্তিমান সে-কথা তাহারা বিশ্বাস করে নাই। সে ফিরিয়া গেলেই পণ্ডিতের বশীভূত হওয়ার জন্য তাহার বিচার হইবে। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের দরবার বসিবে কোথায়?" দৈত্য উত্তর করিল—"অনেক দূরে, গভীর জঙ্গলে, যেখানে আমাদের রাজা প্রত্যহ দরবার করেন।" দৈত্যটি পণ্ডিত ও তাহার দুইজন সঙ্গীকে বিচার দেখাইতে লইয়া গেল। তাহারা গভীর জঙ্গলে যেখানে দরবার বসিয়া থাকে সেইখানে উপস্থিত হইল। দৈত্য রাজার সিংহাসনের পার্শ্বের বৃহৎ বৃক্ষের উপর তাহাদের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারিদিক হইতে সন্‌সন্ শব্দ উঠিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজসিংহাসন ঘিরিয়া সহস্র সহস্র দৈত্যে সেইস্থান পূর্ণ হইয়া গেল।......

এই গল্পে পুরাকালের রাজনৈতিক-জীবনের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই দৈত্যের দরবারের সহিত সেকালের রাজনৈতিক দরবারের সাদৃশ্য আছে। বিভিন্ন প্রদেশের উপকথা লইয়া আলোচনা করিলে ইহার ভিতর প্রাচীনকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনেক ছোটবড় বিবরণ পাওয়া যাইবে।—

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত বাদ দিয়া সমগ্র রূপকথার ভিত্তি, গঠন ও প্রাণ বাস্তব-জীবনের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না দেখা যাউক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের Cat-skin নামক গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গল্পটিতে এমন একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে যে, তাহা বর্ত্তমান কালে ধারণা করা অসম্ভব হইলেও প্রাচীন যুগের একটি সামাজিক চিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক ইহা জোর করিয়াই বলা চলে।

Cat-skin গল্পটির প্রাথমিক ঘটনা এই:—কোনও রাজা তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়। অবশেষে সে সহসা তাহার নিজ কন্যাকে বিবাহ করিতে

সংকল্প করে। রাজকন্যা এই অস্বাভাবিক বিবাহ কিছুদিন স্থগিত রাখিবার জন্য তিনটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রার্থনা করে। সে জানিত, এই পোষাক নির্ম্মাণ করিতে অনেক সময় লাগিবে। এই পোষাকের একটি হইবে আকাশের, একটি চাঁদের,—এবং অন্যটি সূর্য্যের রঙে তৈয়ারী। এই শেষ পরিচ্ছদটি রাজসিংহাসনের সমস্ত বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়া খচিত হইবে। এই তিনটি পরিচ্ছদ রাজার আদেশে নির্ম্মিত হইলে রাজপুত্রী বিপদ গণিয়া পুনরায় আর-একটি অভিলাষের কথা জ্ঞাপন করে। রাজার একটি গাধা ছিল; সে প্রত্যহ অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রসব করিত। রাজপুত্রী বলিল, এই গাধাটিকে হত্যা করিয়া তাহার চর্ম্ম তাহাকে উপহার দিতে হইবে। রাজপুত্রীর এ অভিলাষও পূর্ণ হইল। সে এইরূপে পরাজিত হইয়া একদিন সেই গাধার চামড়া পরিয়া ও মুখে কালী মাখিয়া পলায়ন করে। অতঃপর সেই রাজপুত্রী কোনও কৃষক-পত্নীর মেষ চরাইবার কার্য্য লইয়া দিনপাত করিতে থাকে।

ইহার পর আরও অনেক বিবরণ আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গল্পটির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, পিতা হইয়া কন্যাকে (কোনও কোনও গল্পে পুত্রবধূ) বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছে। এই গল্পটি বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইংলণ্ডে প্রচলিত। আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডেও এই গল্প ছেলেদের শোনানো হয়। ফ্রান্স, ইটালি, জার্ম্মানি, রাসিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইহা প্রচলিত। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এই গল্পটির অনেক ঘটনার পরিবর্ত্তন দেখা যায় বটে কিন্তু প্রত্যেকটিতেই পিতার কন্যাকে কিংবা পুত্রবধূকে বিবাহের প্রস্তাব দেখা যায়। আধুনিক কালে এই প্রস্তাব জঘন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা আদিযুগের মানব-সমাজের কথা, সভ্যজগতের নয়। সুতরাং ইহা সেকালের সামাজিক অবস্থার দিকে চাহিয়া বিচার করিতে হইবে। আদিযুগে স্ত্রীলোক পুরুষের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালীন সমাজে—পুত্রকন্যার সম্বন্ধ শুধু তাহাদের জননীর সহিত ছিল। Mc. Lennan অষ্ট্রেলিয়ান্‌দের সম্বন্ধে বলেন—"বিবাদ-বিসম্বাদে একই পিতার পুত্রগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন কি পিতার বিপক্ষেও সজ্জিত হইতে দেখা যায়। কারণ, তাহাদের অদ্ভুত বিধানে পিতা পুত্রের আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য নয়।" ভ্যান্‌কুভার দ্বীপে Ahts জাতির রীতি এই যে, ভাগ-বাটারার সময় ছোট ছোট ছেলে সব সময়েই তাহাদের জননীর ভাগে পড়ে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, পিতৃত্ব আদিযুগে স্বীকৃত হইত না। পিতার সহিত এই সম্বন্ধ-শূন্যতার ফলে এমন ঘটনাও বিরল ছিল না যে, পিতা নিজ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

কোনও কোনও গল্পে কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রবধূকে বিবাহের প্রস্তাবও দেখা যায়। আদি সমাজে ইহাও প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষে এই রীতির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত Koimbator এর Vellalahs জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি এই যে পিতা প্রাপ্ত-বয়স্কা বা পিতার সহিত সাত আট বৎসরের পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রকাশ্য ভাবে পুত্রবধূর সহিত বাস করিয়া থাকে। পুত্র যৌবন-প্রাপ্ত হইলে তাহার স্ত্রী হয়ত অনেকগুলি পুত্রকন্যা লইয়া পুনরায় তাহার স্বামীর সহিত বাস করে; এই পুত্রকন্যাগণও তাহার স্বামীর পুত্রকন্যা বলিয়াই গণ্য হয়। কোনও কোনও সময়ে স্ত্রীলোক পিতা ও পুত্র উভয়েরই পত্নী বলিয়া বিবেচিত হয়। স্ত্রী বিবাহের পর হইতে তাহার শিশু স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিয়া থাকে।—পক্ষান্তরে পুত্রও তাহার নিজ শিশুপুত্রের সমবয়স্কের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার পত্নীকে নিজের কাছে রাখিয়া দেয়।

প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনের এই দিকের চিত্রই এই গল্পটিতে পাওয়া যায়। Cat-skin গল্পে আরও দেখা যায় যে বিবাহের ভয়ে রাজকন্যা পলায়ন করিল। প্রাচীন যুগে বিবাহ ব্যাপারে এরূপ ঘটা বিরল ছিল না। সেকালে অনেক ক্ষেত্রেই জোর-জবরদস্তির বিবাহ হইত এবং রমণীগণ বিবাহে আপত্তি থাকিলে অনেক সময় পলায়ন করিত, কোনও কোনও সময় তাহাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে তাহাদের প্রণয়ীরাও তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এইখানে রুক্মিণী ও সুভদ্রা-হরণের কথা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই Cat-skin গল্পটিতে প্রাচীন যুগের দুইটি বিশেষ আচার ও রীতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

রূপকথা শুধু পরী, ভূত, প্রেত বা অতি-মানবের কাহিনী নয়—গবেষণা করিয়া দেখিলে ইহার ভিতর প্রাচীন যুগের সামাজিক চিত্র, আচার, ব্যবহার এবং অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এসম্বন্ধে আলোচনা এমন হয় নাই যাহাতে এবিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও লোক-সাহিত্যবিদ্ পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া এক-যোগে কার্য্য করিলে এবিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ইহার সূচনা পাশ্চাত্য-বিদ্বজ্জন-সমাজে দেখা দিয়াছে।

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

১০ই অক্টোবর, শনিবার—আমাদের মতন ভ্রমণকারী-দের পক্ষে নিজের শরীর ও সাইকেলের প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ দরকার। বেনারসের পর বিশ্রাম ও সাই-কেলের যথাবিধি সংস্কার দিল্লীতে করা হ'বে আগে থেকে স্থির ছিল। আর দিল্লীর নাম ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত ও এখানে দেখ্‌বার জিনিস এত বেশী যে, সে-সমস্ত এড়িয়ে চ'লে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এদিকে কাশ্মীরে প্রচণ্ড শীতের দিনও ঘনিয়ে আস্‌ছে। দেরী কর্‌লে হয়ত বরফের জন্য পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে—শ্রীনগর পৌঁছবার আশা ত্যাগ কর্‌তে হবে। সেজন্যে এখানে দু দিনের বেশী থাকা সমীচীন হবে ব'লে বোধ কর্‌লাম না। দুপুরের বিশ্রামের পর সাইকেলে সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়্‌লাম। আজ পিছনে কোন বোঝা না থাকায় অনেকদিন পর 'সাইকেল চড়ার' আরামটুকু বেশ উপভোগ করা গেল।

প্রাচীনকালের কথা বাদ দিলে দিল্লীকে মোটামুটী দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, অর্থাৎ মুসলমান-যুগের ও আধুনিক ইংরেজ আমলের। পুরানকালের দিল্লীই সাতটি। এক-একজন সম্রাট্ নিজের নিজের খেয়াল ও সুবিধা মত এক-এক জায়গায় তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সকলের রাজধানীরই কিছু-না-কিছু চিহ্ন এখনও গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর আধুনিক দিল্লী দুটি-একটি স্থায়ী রাজধানা যা এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হ'য়ে ওঠেনি ও অপরটি অস্থায়ী রাজধানী, এখন যেখানে রাজধানীর কাজ-কর্ম্ম হ'য়ে থাকে। বিজলী বাতী দেওয়া সুন্দর চওড়া রাজপথ ঘাসে-মোড়া বাগানের উপর শাদা রংয়ের সারি সারি সৌধশ্রেণী ও একছাঁচে ঢালা সরকারী বাড়ীগুলির দৃশ্য যেমন মনোরম এদের গঠন-প্রণালীও তেম্‌নি সুরুচির পরিচায়ক।

দিল্লীর রাস্তায় টাঙ্গারই চলন বেশী, ট্রামও আছে। ট্যাক্সি যে নেই তা নয়, তবে কল্‌কাতার মতন এত বেশী নয়। মোড়ে মোড়ে কোন্ সময় থেকে গাড়ীতে আলো জ্বাল্‌তে হবে তার নোটীশ দেওয়া রয়েছে। এবিষয়ে কল্‌কাতা অপেক্ষা দিল্লী-পুলিসের ঢের বেশী কড়া নজর। ষ্টেশনের পাশেই কুইন্স্ পার্ক্, কতকটা কল্‌কাতার ইডেন্ গার্ডেনের মতন; তবে এর ভেতর দিয়ে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া যাবার পথ রয়েছে, যা কল্‌কাতার কোন পার্কেই নেই।

১১ই অক্টোবর রবিবার—সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া ক'রে কুতবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়্‌লাম, এখান থেকে ১১ মাইল দূর। সময় বড় অল্প। এরই মধ্যে যা-কিছু ঘুরে দেখে নিতে হবে, সেজন্যে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে ঘোরার

চেয়ে সাইকেলে যাওয়াই সুবিধাজনক হবে ব'লে বোধ হ'ল।

সহরতলীর গা ঘেঁসে নূতন রাজধানী হচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে কুতব যাবার পথ। পাশে পাশে সর্কারী দপ্তরখানার গোড়াপত্তন সুরু হয়েছে। বড় বড় কপি কল (Crane), পাথরের টুক্‌রা, প্রয়োজনীয় মাল-মস্‌লা ও লোকজন মিলে সেখানে একটা বিরাট ব্যাপার ক'রে তুলেছে।

এসব ছাড়িয়ে একেবারে সহরের শেষে এসে পড়্‌লাম। মাইলের পর মাইল রাস্তা চ'লে গেছে, সুন্দর সমান আর দু'ধারে নূতন ধরণের শ্রেণীবদ্ধ আলোর স্তম্ভ। এরই পাশে রোদে-পোড়া তৃণশূন্য শুষ্ক মাঠ, মাঝে-মাঝে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংস স্তূপ, কোথাও বা লতাগুল্মবিহীন পাহাড়ের এক-আধটা ছোট-খাট সংস্করণ।

মোগল-সেনাপতি সফদরজঙ্গের সমাধির সুমুখ দিয়ে কুতব মিনারের পথ। এইপথে প্রথমেই চোখে পড়ে মহারাজ জয়সিংহের তৈরী অসম্পূর্ণ 'যন্তর মন্তর' বা মান-মন্দির। সেনাপতি সফদরজঙ্গ বহুদিন অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সমাধিটি সম্রাট্ হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে লাল পাথরে তৈরী। চার পাশে ছোট-ছোট অসংখ্য ঘর দিয়ে সমাধি-মন্দিরের সীমানা তৈরী হয়েছে।

আরও ৬ মাইল পরে কুতব মিনার। মিনারের গঠন সুরু হয় কুতবউদ্দিনের হাতে, আর সম্রাট্ আল্‌তামাস একে সম্পূর্ণ ক'রে তোলেন। মিনারটি এক পাশে একটু হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পৃথ্বীরাজ না কি এর খানিকটা তৈরী করিয়েছিলেন, এর ওপর থেকে সংযুক্তা যমুনা দেখ্‌বেন ব'লে। ২৩৮ ফিট উঁচু মিনারে আমাদের গুন্‌তি হিসাবে দেখা গেল ৩৭৯ ধাপ আছে। এর চেয়ে যে মিনারটি আরও-কিছু উঁচু ছিল তা বোঝা যায় এর উপরের কয়েকটি ধাপের ভগ্নাবস্থা দেখে। মাথাটি একবারে খোলা, হয়ত উপরে অন্যান্য মিনারের মতন এক সময় আবরণ ছিল। তবে চারপাশে এখন সর্‌কার বাহাদুর রেলিং ক'রে দিয়েছেন। নীচে থেকে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উপরে উঠ্‌তে হাঁপিয়ে যেতে হবে ব'লে যেন পর পর চারিটি বারান্দা করা হয়েছিল। এই বারান্দাগুলির জন্যেই কোনরকমে উপরে ওঠা যায়, তা না হ'লে দিন-দুপুরেও আলো না নিয়ে ভিতরে ঢোকে কার সাধ্য! বাইরের দিক্ দিয়ে নীচে থেকে উপর অবধি মিনারটিকে ঘিরে ফার্সী বয়েৎ লেখা। এখানে সমাধি, মস্‌জিদ সব জায়গাতেই এম্‌নি ফার্সী বয়েতের ছড়াছড়ি।

এরই একপাশে কুতব মস্‌জিদ ও প্রাঙ্গণে লৌহস্তম্ভ। আশে পাশে অসংখ্য ছোট-খাট সমাধি। কুতব মস্‌জিদ হিন্দু মন্দির ধ্বংস ক'রে যে তৈরী করা হয়েছে তা দেয়ালে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখে বেশ বোঝা যায়। এই মস্‌জিদের দেয়ালে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের হিসাব-অনুযায়ী দেখা গেল ২৭টি মন্দির ধ্বংস ক'রে এই মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল।

মিনারের প্রাঙ্গণের লৌহস্তম্ভটির গায়ে পালি ভাষায় লেখা আছে চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ-বিজয়ের স্মরণার্থে বিষ্ণুদেবের উদ্দেশে এটিকে তৈরী করিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর নাম অশোক স্তম্ভ। স্তম্ভটি যে-লোহা দিয়ে তৈরী তার এম্‌নি বিশেষত্ব যে হাজার দেড় হাজার বছরের জল ঝড় মাথা পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—গায়ে তার একটু মরিচা ধরেনি। সহজেই বোঝা যায় সেকালের বৈজ্ঞানিকদের লৌহশিল্পে কত বেশী জ্ঞান ছিল। কাছেই পৃথ্বীরাজের মন্দির। পৃথ্বীরাজের রাজধানী এইখানেই ছিল, আসে পাশে তারও ধ্বংসাবশেষ প্রচুর।

সহর থেকে দূর বলে এখানে চা জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে। তবে তার সেলামী সহরের চেয়ে অনেক বেশী। হুমায়ুনের সমাধির পথ ধ'রে ফির্‌লাম। সফদরজঙ্গের সমাধিরই যেন উন্নত সংস্করণ। এর ফটকে দরজায় ফাট ধরেছে। সাদা, কাল ও লাল এই তিন রংয়ের পাথর দিয়ে সমাধিটি তৈরী। হুমায়ুন-মহিষী হামিদা বেগম এটি তৈরী করান। এখানে সম্রাট্ ও মহিষী দুজনেরই সমাধি রয়েছে দেখা গেল।

দিল্লী গেট পার হ'য়ে সহরে ফিরে এলাম। বাঁ পাশে চাইতেই চোখে পড়্‌ল জুমামস্‌জিদ। ছোট-ছোট অসংখ্য ধাপ পার হ'য়ে উপরে উঠ্‌তে হয়। ডানদিকে শাহ-জাহানের তৈরী লাল পাথরে গড়া দুর্গের প্রাচীর সুরু হয়েছে। ফটকের সাম্‌নে আস্‌তেই কতগুলি গাইড

এসে পাকড়াও করলে। ফটকের পরেই পথের ছধারে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর। সেগুলি আগে বোধহয় সৈন্য সামন্তদের, তাঁবেদারদের থাক্‌বার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সোডা, লেমনেড, পান, সিগারেটের দোকানে পর্য্যবসিত হয়েছে। একটা খিলান পার হ'য়েই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে গাইড্ আমাদের দেওয়ান-ই-আমে নিয়ে হাজির করলে।

দেওয়ান-ই-আম থেকে বার হ'য়েই ডান দিকে শ্বেত-পাথরে তৈরী দেওয়ান-ই-খাস। কয়েকটি মোটা মোটা থামের ওপর এর ছাদ এইখানেই তখ্‌ত-ই-তাউস্ বা ময়ূর-সিংহাসনে ব'সে শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আবার এই ময়ূর-সিংহাসন থেকেই ঔরংজীব মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে এলেন। সম্রাটের সামান্য ইঙ্গিতে কত আশা, ভরসা, হাসি, কান্না, হা-হুতাশের অভিনয়ই না এখানে হ'য়ে গেছে। আবার নিয়তির কঠোর পরিহাসে এই-খানেই সেই সম্রাট্-বংশধরেরা বিদেশী বিজেতার কাছ থেকে অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

এই দেওয়ান-ই-খাসের সামনের খিলানের ওপরের ফার্সী লেখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড্ আমাদের পড়্‌তে বল্‌লে। আমাদের নিজেদের এ বিষয়ে অক্ষমতা জানালে সে নিজেই প'ড়ে গেল—

অগর্ ফিরদৌস্ বর্ রুহে জমীনস্ত্
হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত্।

অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গ যদি থাকে কোনখানে
এইখানে, এইখানে, তাহা এইখানে।

দেওয়ান-ই-খাসের এ ছু-লাইন লেখা সম্বন্ধে কে না শুনেছে? মোগল আমলের গৌরবময় অতীতের কথা ভেবে মন সম্ভ্রমে ভ'রে গেল।

দেওয়ান-ই-খাসের উত্তরে সোণার কলাই করা গম্বুজ-ওয়ালা শ্বেত পাথরের মসজিদটির দিকে আপনি চোখ পড়ে। এটির নাম মতি মস্‌জিদ। বাদশা ঔরংজীব এই মসজিদটি তৈরী করান কেবল তাঁর ও সাম্রাজ্ঞীর উপাসনা কর্‌বার জন্যে। আর একটু দক্ষিণে রঙমহাল বা রাজপরিবারের বাস-গৃহ।

এই বিশ্রামের ছু দিনেও ৩৩ মাইল ঘোরাঘুরি হয়ে গেল—মিটারে মোট ৯৫৫ মাইল।

১২ই অক্টোবর সোমবার—কল্‌কাতা থেকে মনিঅর্ডার আসার কথা আছে, কিন্তু কোন খবর নেই। সেইজন্য প্রাতরাশ সেরে, রওনা হ'বার আগে পোষ্ট অফিসে একবার খোঁজ নিতে গেলাম। আমাদের চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সবই পোষ্টমাষ্টারের হেফাজতে আসার কথা। যাঁরা এরকম ভ্রমণে বেরোন এ ভিন্ন তাঁদের আর কোনো ভাল উপায় নেই চিঠি পত্র আমরা বরাবর পোষ্ট অফিস থেকে নিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু এইবার টাকার বেলায় গোলমাল বাধ্‌ল। টাকা হাজির, কিন্তু সনাক্ত কর্‌বার জন্য কোন স্থানীয় লোক সঙ্গে না থাক্‌লে পোষ্ট অফিসের কর্ত্তাদের টাকা দেবার নিয়ম নেই। অগত্যা কাশ্মীর-গেটে আমাদের প্রোফেসর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শীঘ্র টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে আমরা ফিরে এলাম।

রওনা হ'তে বেলা ন'টা বাজ্‌ল। পানিপথের উদ্দেশে রওনা হ'লাম। পর পর ছ'টি ফটক পার হ'য়ে সহরের বাইরে যেতে হয়। দিল্লী সহর হঠাৎ শেষ হ'য়ে গেল। এই বিশেষত্বটা সহজেই চোখে পড়ে, এত বড় সহরের, সহরতলী ব'লে কোন জিনিস নেই।

প্রখর রোদ, জনশূন্য পথের ওপর কেবল আমরা চারজন। যতদূর দেখা যায় সবুজের লেশমাত্র নেই। ধূসর রংয়ের মাঠের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। গরমও যেন আজ বেড়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে একটা আগুনের মতন গরম হাওয়ার হল্কা মুখের ওপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। ক্বচিৎ মাঠের মাঝে ফণীমনসার ঝোপ বা এখানে সেখানে ছুএকটা নিম গাছ যেন প্রকৃতির এই নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘূর্ণি-হাওয়ায় বালি উড়ে আমাদের সমস্ত শরীর ভরিয়ে দিয়েছে।

ঠিক ১৫ মাইল পর দিল্লী প্রদেশের সীমানা শেষ হ'ল। তেষ্টায় অস্থির, কিন্তু এখানে জল পাবার কোন উপায় নেই। আরও কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার বাঁ ধারে রাই-ডাক বাংলো দেখ্‌তে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। তেষ্টার

চোটে সেখানে এমন জল খেয়েছিলাম যে, শেষে সাইকেল চালানই কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল।

বেলা ১টা। কুড়ি মাইল এসেছি, কিন্তু রাস্তার পাশে গ্রাম বা বসতির চিহ্নমাত্র নেই। এতদিন পথে খাবার পাওয়া যেত ব'লে আমরা বেরোবার আগে আর খাবার কিনে বোঝা বাড়াতাম না। আজ হঠাৎ গ্রামবিহীন পথে একটু মুস্কিলে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে রাস্তার পাশে এক পথনির্দ্দেশক ফলকের ওপর দৃষ্টি পড়ল। সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে চললাম দেখবার জন্যে। রাস্তা থেকে মাইল দেড় দূরে মারখাল গ্রাম। সেখানে কিছু খাবার মিলবে আশা হ'ল, কিন্তু পথের নমুনা দেখে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে নেমে পড়লাম বালির রাস্তায়। মনে মনে আশা, খানিক পরেই রাস্তার অবস্থা ভাল হবে। কিন্তু তা হ'ল না, বালির ওপর দিয়ে সাইকেল চলবে না। অগত্যা হাঁটতে-হাঁটতে যখন মারখাল গ্রামে পৌঁছলাম তখন বেলা আড়াইটা। গ্রামের ভেতর রাস্তার বালাই নেই। এক বাড়ীর উঠান দিয়ে, অপর বাড়ীর ভেতর দিয়ে দোকানের সন্ধানে চললাম। গ্রামের কুকুরের দল আমাদের আবির্ভাবে তারস্বরে চীৎকার করতে সুরু ক'রে দিল।

মিছামিছি এতকষ্ট স্বীকার ক'রে আসাই সার—লাড্ডু বা ঐ জাতীয় মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। দোকানের সাম্‌নে কুকুরের দল আর ভেতরে মাছির ভন্‌ভনানি। গ্রামের এক প্রান্তে একটি ছোটখাট ইংরেজী স্কুল দেখতে পেলাম। গুরুমশায় ও পড়ুয়ারা সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। গ্রামের বাড়ীগুলির ছাদ পর্য্যন্ত মাটির। এখানকার মাটি বাংলা দেশের মতন নরম নয় আর বৃষ্টিও ওখানে আমাদের দেশের মতন অত বেশী হয় না ব'লে মাটির ছাদেও এখানে বেশ চ'লে যায়—বর্ষায় অসুবিধা হয় না। দেয়াল ও ছাদের রং একই রকমের ব'লে দূর থেকে বোঝা যায় না যে, ঘরের ওপরে ছাদ আছে। পাঞ্জাবের সীমানায় এসেছি বটে, কিন্তু এখানকার লোকজনের ধরণ-ধারণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের কিছু পরিবর্ত্তন নজরে পড়ল না। এখানকার লোকেদের চেহারাও পাঞ্জাবীদের মত লম্বা-চওড়া নয় বরং যুক্তপ্রদেশের লোকেদেরই অনুরূপ।

আবার সেই দেড় মাইল বালি ঠেলে ট্রাঙ্ক রোডে ফিরে আসা গেল। পানিপথ এখান থেকে ৩৩ মাইল দূর। আজ সেইখানে রাত্রিবাস করা হ'বে এই রকম ঠিক আছে। সেইজন্যে আর দেরী না ক'রে রওনা হ'য়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা হয় হয়। আলো জ্বালার জন্য দিয়েশালাই বার ক'রে দেখি বাক্‌স একবারে খালি। মুস্কিল ? পানিপথ এখনও ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। অন্ধকারে এতক্ষণ অজানা পথে চলা বড় যুক্তিযুক্ত হবে ব'লে মনে হ'ল না। সন্তর্পণে চলেছি। মিশকালো অন্ধকারে রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রাস্তার একপাশ থেকে ঘণ্টার টুং-টুং শব্দ ও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট জটলার আওয়াজ কানে এল। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললাম। বেশীদূর যেতে হ'ল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা একদল উটওয়ালার ছাউনির ভেতর এসে পড়লাম। প্রকাণ্ড মাঠের ওপর সারি সারি উট বাঁধা। আর তাদের পাশে বা সাম্‌নে ছোট-ছোট দল বেঁধে আগুনের সাম্‌নে উটওয়ালারা জটলা করছে। কেউ কেউ মাটির ঢেলা দিয়ে উনোন তৈরী ক'রে খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় সুরু করছে। এরা বিদেশ থেকে এইরকম দল বেঁধে উট আমদানী ক'রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মেলায় বিক্রী করে। রেল-কোম্পানীর কোনো ধার এরা ধারে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলে ও সন্ধ্যার সময় সুবিধা মতো জল পাওয়া যায়, এম্‌নি একটা জায়গায় আড্ডা ফেলে রাত কাটিয়ে দেয়। মুক্ত আকাশের তলায় যে যার কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাতে তাদের কোনোরকম কষ্ট বা কিছুমাত্র অসুবিধা মনে হয় না।

এদের ছাউনিতে এসে আমাদের আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। এদের সহজ সরল ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সারাজীবনই এই কাজ করছে। কতবার যে তারা এই রাস্তার একদিক্ থেকে আর একদিক্ পর্য্যন্ত এইভাবে যাওয়া-আসা করছে তার ঠিক নেই। পথিকমাত্রেরই ওপর এদের যেন একটা সহানুভূতি আছে। বিহারে কোথায় যেন এইরকম এক

দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। সাহস ক'রে এরা আমাদের থাকৃতে অনুরোধ করতে পারছিল না, কিন্তু সেই ধরণের আলোচনা আমাদের কানে এল। এদের অবস্থা সেরকম নয় আর আমাদের নিজেদের কিছু জোগাড় ছিল না ব'লে এখান থেকে দিয়েশালাই জোগাড় ক'রে পানিপথের দিকে এগিয়ে পড়্লাম।

চারপাশে প্রকাণ্ড প্রাচীরের মধ্যে পানিপথ সহর। সহরে যাওয়া-আসা করার জন্যে কয়েকটি ফটক আছে। রাত ন'টার পর একবার ফটক বন্ধ হ'লে আর ভিতরে যাবার কোন উপায় থাকে না। সরু সরু পাথর বাঁধান গলিতে বড় বড় পুরাণ ধরণের তিনতলা বাড়ীতে লোক গিস্‌গিস্ করছে। ধর্ম্মশালা বা সরাইয়ের প্রাচুর্য্যও এখানে খুব। কিন্তু এখানে যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌লাম। সেইজন্যে ফটক পার হ'য়ে সহরের বাইরে এসে ষ্টেশনে আশ্রয় নেবার জন্যে চল্‌লাম।

ষ্টেশনে আড্ডা ফেলার জোগাড় দেখ্‌ছি এমন সময় বাঙালী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এ পাগড়ীর দেশে খালি মাথা সহজেই নজরে পড়ে। ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, এখানকার রেলের ডাক্তার। ষ্টেশনের পাশেই এঁর কোয়ার্টার। বলা বাহুল্য যে, ষ্টেশনে ইনি আমাদের এভাবে রাত কাটাতে দিতে রাজী হলেন না। অগত্যা তাঁর দাওয়াইখানার একটা ঘরে রাতের মতন আশ্রয় নিলাম। খাওয়া-দাওয়া আগেই হ'য়ে গেছে, বিছানা ক'রে শুয়ে পড়্‌লাম—চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল উট-ওয়ালাদের ছাউনির কথা—আগুনের অস্পষ্ট আলোর সাম্‌নে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত লোকেদের জটলা, সারিবাঁধা উটের গলার ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ আর সবল, কর্ম্মঠ, রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ-দেহধারী উট-ওয়ালাদের সহজ সরল ব্যবহার।

আজ মোট ৫৩ মাইল আসা হ'ল! মিটারে ১০০৮ মাইল উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

বেলজিয়ামে মহিলাসংঘের পরিচালিত নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সন্ত নিহাল সিং

(১)

বেলজিয়ামের নারীসংঘ আত্মত্যাগের দ্বারা জাতি-গঠনের যেরূপ সহায়তা করিতেছেন তাহা বিশ্বনারীসমাজে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিগত মহাসমরের পর সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে ইউরোপের নানাস্থানে নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। দুর্ব্বল শিশুদিগকে কার্য্যোপযোগী সবল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছে। এই শিশু-দিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন কোনরূপ অঙ্গবৈকল্য বা মানসিক শক্তির অভাব নাই। তদ্দেশীয় মনীষীরা স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় ঐ সকল শিশুর মাতাপিতা ভীতিবিহ্বল অবস্থায় নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে কালযাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা এরূপ দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহাদিগকে যথোচিত সেবা ও যত্নদ্বারা সবল করাই দেশবাসীর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। ইহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে জীবনোপায়ের উপযোগী হইলে ভবিষ্যতে দেশের ও দশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাদের দ্বারা সমাজের যে পরিমাণ উপকার সাধিত হইবে তার তুলনায় বর্ত্তমান ভরণপোষণের ব্যয় ও পরিশ্রম ভবিষ্যতে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইবে।

যাহাতে কোনরূপ সংক্রামকব্যাধি ঐ শিশুদিগের সঙ্গে

নূতন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য যথাসম্ভব অল্প বয়সেই তাহাদিগকে আশ্রমে লওয়া হয়। এতদিন শুধু ধনীর সন্তানেরাই ঐরূপ সাহায্যের সুযোগ পাইত কিন্তু এই নূতন প্রতিষ্ঠান খোলার পর হইতে ধনীদরিদ্র-

প্রিভেণ্টোরিয়ামের শিক্ষয়িত্রী-মণ্ডলী

নির্ব্বিশেষে সকলকেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ধনীর সন্তানেরাও যেরূপ সমুদ্র বা পাহাড় অঞ্চলের হাওয়া ও ঔষধ, পথ্য, পাইতে পারে না এখানে অতি দীনদরিদ্রের সন্তানেরাও তাহা ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান জগতে বেলজিয়ামই একমাত্র আদর্শস্থল। এখানে দুর্ব্বল বালকবালিকারা আজীবন সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ না হইয়া বরং ভবিষ্যতে লাভের উৎসরূপেই দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিবে। জনক্ষয়কারী মহাসমরের ইহা একটি সুফল বলা যাইতে পারে।

(২)

গত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামেরই বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছে। সে-দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ দুর্ব্বলশিশু অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জল-বায়ুর সুবিধানুসারে নূতন ধরণের বালকবালিকা-আশ্রমের কেন্দ্র নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য গঠন করাই এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম—"প্রিভেন্‌টোরিয়াম্‌" (Le Preventorium)। আশ্রমের কার্য্যাবলী যথার্থই নামটির সার্থকতা রক্ষা করিতেছে। দুর্ব্বল ও অসহায় নরনারীকে কার্য্যক্ষম করিয়া সমাজ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত করিতেছে।

(৩)

যুদ্ধাবসানের কয়েক মাস পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "ক্নোক-সুর-মের" (Knocke-Sur-Mer) নামক সহরে ঐরূপ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আশ্রমটি সম্পূর্ণ মেয়েদের তত্ত্বাবধানেই সুপরিচালিত হইতেছে। পুরুষের কোনরূপ সাহায্য তথায় দরকার হয় না। বেলজিয়াম এবং ডেনমার্কের ঠিক মিলন স্থানে উত্তর সাগরের উপরেই আশ্রমটি অবস্থিত; বেলাভূমি হইতে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

বেলজিয়ামে সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগ হইতেই ছেলেরা ঐ আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। সম্প্রতি মাত্র ২০০ শত ছেলেকে একসঙ্গে আশ্রমে রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। মানবীয় এবং দৈবশক্তির সমন্বয়ে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্ববিধ উপকরণের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত বেলাভূমিতে বালকেরা মনের আনন্দে খেলা করিতে
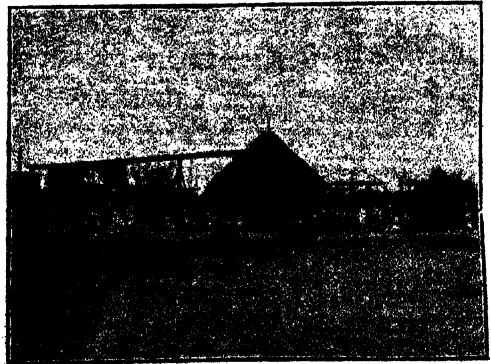
অপরিপুষ্ট বালকদের খেলাঘর

পারে, সাগরজলে ইচ্ছানুসারে স্নান করিতে পায়। আহার-বিহারের কোনরূপ অভাব তাহারা অনুভব করে না। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ স্থানের কল্পনাও করা যায় না।

(৪)

কয়েক একর স্থান ব্যাপিয়া ছেলেদের খেলার মাঠ। বিচিত্র ফুল ও পাতাবাহারের গাছ দ্বারা খেলার প্রাঙ্গণটি সুসজ্জিত। বালকদের দুলিবার জন্য ছোট বড় অসংখ্য দোলা সাজান রহিয়াছে। সাধারণ দোলাতে একটি মাত্র ছেলে বসিতে পারে, কিন্তু নৌকাকৃতি বড় দোলাগুলিতে চারিজন বালকও বেশ আরামে বসিয়া দোল খাইতে পারে। মাঝে মাঝে গাঁট দেওয়া বহুসংখ্যক দড়ি ঝুলানো আছে। বালকেরা ঐ গাঁটগুলির সাহায্যে দড়ি ধরিয়া অনেক উঁচুতে উঠিতে পারে। দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে বালকেরা একটা চতুষ্কোণ সমতল স্থানে আবশ্যকমত বিশ্রাম করিতে পারে। ইহা ছাড়া দৌড়-ধাপ, ফুটবল, ক্রীকেট, টেনিস্, ব্যাডমিন্‌টন্, প্যারালাল বার, ডনকুস্তি প্রভৃতি খেলারও ব্যবস্থা আছে। খেলার মাঠের এককোণে ৪।৫ ফিট উপরে লাঠির আগায় বিখ্যাত লোকদের মুখের অনুকরণে কতকগুলি মুখোস স্থাপিত আছে, ঐ মুখোসগুলি মুখব্যাদন করিয়া আছে। ছেলেরা ঐ মুখোসগুলির ভিতর দিয়া সজোরে বল নিক্ষেপ করিয়া এক প্রকার খেলা করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চক্ষু ও হস্তের গতি নিয়মিত হয়, ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। এই স্থানটির শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা পথিকমাত্রকেই আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

খেলার মাঠের পাশেই সাজানো বারাণ্ডাযুক্ত সুন্দর বাড়ীগুলি অবস্থিত। সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠানটি বেলজিয়ামের বালকবালিকাদিগকে দান করা হইয়াছে।

৫

আশ্রমের ফটকের পাশেই একটি ঘণ্টা ঝুলানো আছে। আগন্তুকেরা ঐ ঘণ্টার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য সঙ্কেত করিতে পারেন। বৈঠকখানা গৃহে বিবিধ ক্রীড়ায় নিযুক্ত বালকদের ফোটো ঝুলান রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ছবির নীচে বালকদের নাম, বয়স, ওজন, মাপ প্রভৃতি অতি পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে। কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই আশ্রমের বিষয় জানিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষীয়েরা অতি যত্নের সহিত সব খবর দিয়া থাকেন। এই নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং শিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর।

আশ্রমবাসী শিশুরা কোনরূপ সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত নহে। তাহারা শুধু শারীরিক দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য। কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য যথাসম্ভব অল্প বয়সেই তাহাদিগকে আশ্রমে গ্রহণ করা হয়।
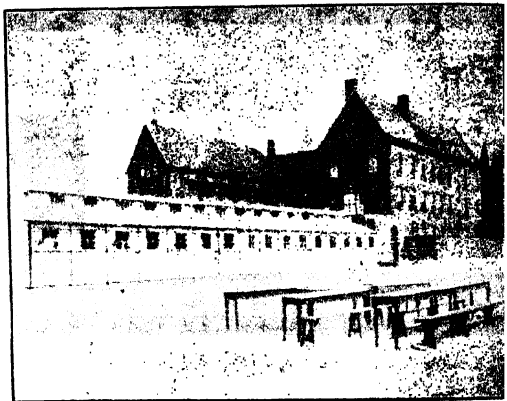
বাহিরে পড়িবার স্থান

ভর্ত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পোষাক পরিচ্ছদ ও আহার বিহারের সুব্যবস্থা করা হয়। এখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বেলজিয়ামের নয়টি বিভাগের প্রত্যেক বিভাগ হইতে জাতিধর্ম্ম ও ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে শিশুরা এখানে প্রেরিত হইয়া থাকে। আশ্রমের নিজস্ব সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও পরিদর্শক আছেন। সাধারণতঃ ৬-১২ বৎসরের ছেলে-দিগকে আশ্রমে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু ৫।৫॥০ এবং ১৩।১৪ বৎসরের ছেলেকেও অবস্থা বিবেচনায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোনরূপে ভর্ত্তি হওয়া মাত্রই তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা হয়। আপাদমস্তক সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পোষাক পরিতে দেওয়া হয়। আশ্রমের পরিচয়সূচক তিনটি অক্ষর বালকদের টুপীতে লেখা থাকে। এই সময় বালকদের মাপ ও ওজন লওয়া হয়। ডাক্তারী

পরীক্ষার পর যদি কোন বালকের পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সুব্যবস্থা করা হয়।

ডাক্তারী পরীক্ষা, পোষাক-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রাথমিক কাজগুলি শেষ হইলে বালকদিগকে একজন সুশিক্ষিতা

ব্যায়াম-ঘর

ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। যাঁহারা শিশু-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, যাঁহারা ধৈর্য্যশীলা ও সর্ব্বদা প্রফুল্লময়ী এবং যাঁহারা শিশুর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন—এরূপ সুযোগ্য মহিলার হস্তেই ছেলেদের গুরুভার অর্পণ করা হয়। যথাসম্ভব সমবয়স্ক ২০টি ছেলের দায়িত্ব একজন মহিলার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সমস্ত দিনরাত্রি ছেলেদের স্নান, আহার নিদ্রা ও খেলার সঙ্গী থাকেন। কেবল মাত্র পাঠের সময় বালকদিগকে অন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর অধীনে রাখিয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারেন। রাত্রিতে ছেলেদের বহু-শয্যাবিশিষ্ট-গৃহের পাশের ঘরেই ধাত্রী নিদ্রা যান।

৬।৬৷৷০টার সময় ছেলেরা শয্যা ত্যাগ করে। স্নানের পর তাহারা যথারীতি নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে অভ্যাস করে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ছেলেই অলসতার দরুণ নিশ্বাস ফেলিতে অনাবশ্যক দেরী করে; ইহাতে ফুসফুসে দূষিত বায়ু জমা হইয়া স্বাস্থ্যের ঘোরতর অনিষ্টসাধন করে। নিশ্বাস-ব্যায়াম শেষ হইলে উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাহারা প্রাতরাশ সমাপন করে, তারপর ৮টা পর্য্যন্ত মনের আনন্দে খেলা করে। এই সময় হইতে স্কুল বসে এবং প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর স্কুলের কাজ শেষ হয়। বিশেষজ্ঞদের উপর ছেলেদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত আছে। বই-এর সাহায্য ব্যতীত কার্ড্-বোর্ড্ এবং বিবিধ খেলার সামগ্রীর সাহায্যেই এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানকার সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই খেলার ভিতর দিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে আবার বালকেরা খেলার মাঠে বাহির হয়। বাহিরের আবহাওয়া ভাল না থাকিলে তাহারা ব্যায়াম ঘরে প্রবেশ করে। সামান্য কিছু দুগ্ধ পান করিয়া তাহারা ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক বালকের শক্তি-অনুসারে ব্যায়াম নিয়মিত করিবার জন্য এ সময়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণা শিক্ষয়িত্রীরা এ সময়ে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেক ছেলের প্রয়োজনানুসারে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

প্রিভেণ্টোরিয়ামের বহির্দৃশ্য

শারীরিক ব্যায়াম শেষ হইলে আবশ্যক মত বিশ্রামের সময় দেওয়া হয়। হাত মুখ ধুইয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া ছেলেরা বেশ আরামের সহিত নিশ্বাস-ব্যায়াম অভ্যাস করে। মধ্যাহ্নে প্রচুর পরিমাণে লঘুপাক স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এক একজন

ধাত্রীর অধীনস্থ ২০ জন ছেলে একটি লম্বা টেবিলের উভয় পাশে আহার করিতে বসে। তত্ত্বাবধায়িকা ধাত্রীও টেবিলের একপ্রান্তে বসিয়া বালকদের আহার নিয়ন্ত্রিত করেন। আবার ধাত্রীদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ মহিলা-পরিদর্শক তথায় উপস্থিত থাকেন। আহার শেষ হইলে স্ব স্ব ধাত্রীর সঙ্গে ছেলেরা খেলাধূলার জন্য বেলাভূমিতে বাহির হইয়া পড়ে এবং সমস্ত বিকাল বেলাটা আনন্দের সহিত কাটাইয়া

ব্যায়াম-ঘরের অপর একটি দৃশ্য

দেয়। গরমের সময় সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। তখন সপ্তাহে ইচ্ছানুসারে ছেলেরা স্নান করিতে পারে। স্নানের সময় অনেকক্ষণ জলে খেলা করিয়া ছেলেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হয়। উপযুক্ত বিশ্রামের পর তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে গরম কফি ও রুটি খাইতে দেওয়া হয়। অধীনস্থ ছেলেদের স্বাস্থ্যগঠনের প্রতি প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রী যেরূপ মাতৃস্নেহের সহিত দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয় ও আদর্শ-স্থানীয়।

বিকালে পাঁচটার সময় আবার বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়। ছেলেদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-বিকাশের জন্য স্বরলিপি, বাদ্য ও সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর দিয়া পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে বা উপদেশাবলীর আড়ম্বর দ্বারা যে-সব শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়া থাকে—এখানে ছেলেরা অজ্ঞাতসারে, খেলা ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই তাহা শিখিয়া থাকে।

৭টার সময় সান্ধ্য আহার শেষ হইলে ভোজন-গৃহটিকেই সাধারণ বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করা হয়। তখন বিশেষ ভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা ও ছায়াবাজীর সাহায্যে বালকদের মনোরঞ্জন করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৮৷৷০টার মধ্যেই ছেলেদের ঘুমাইবার ব্যবস্থা করা হয়। শয্যাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বালকেরা যাহাতে একঘেয়ে কাজের তালিকায় বিরক্তি বোধ না করিতে পারে তজ্জন্য মাঝে মাঝে বিবিধ ড্রিল শিক্ষা, বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হয়।

সাধারণতঃ তিন মাস কালমাত্র প্রত্যেক ছেলেকে এই আশ্রমে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পরিচালিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেরা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রতি তিন মাস পরে প্রত্যেক ছেলেকেই স্ব স্ব বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হয়। আবশ্যক বোধ করিলে আরও কিছুকাল গ্রামের স্কুলে যাইয়া আশ্রমের শিক্ষয়িত্রীরা ২।১টি ছেলের তত্ত্বা-

ব্যায়াম-ঘরের আর একটি দৃশ্য
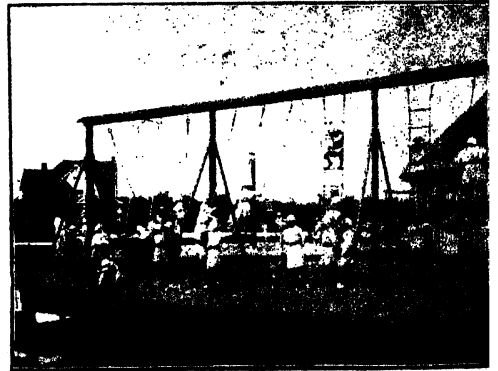
বধান করিয়া থাকেন। খুব দুর্ব্বল শিশুদিগকে প্রয়োজনানুসারে অনেকদিন পর্য্যন্ত আশ্রমের তত্ত্বাবধানে রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

আশ্রমে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার কোনরূপ ব্যয়

পিতামাতাকে বহন করিতে হয় না। এমন কি আশ্রমে থাকাকালীন্ পোষাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপথ্য চিকিৎসকের দর্শনী প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয় আশ্রম ভাণ্ডার হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে।

আশ্রমের সুযোগ্যা পরিচালিকা শ্রীমতী জেয়ার্ণে (Mademoiselle Gernay) অতি দয়াবতী রমণী। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ২০০ শত ছেলেকে একসঙ্গে আশ্রমে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের সাহায্য পাইবার উপযুক্ত ছেলে বেলজিয়ামে এত বেশী যে শীঘ্রই যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক শিশুকে লওয়া যাইতে পারে তাহার যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে।

ক্নোক্ (Knocke) সহরের মিউনিসিপ্যালিটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানটি দান করিয়াছেন এবং তাহারাই উহার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। যে-সব মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ছেলেরা এই আশ্রমে আসিয়া থাকে
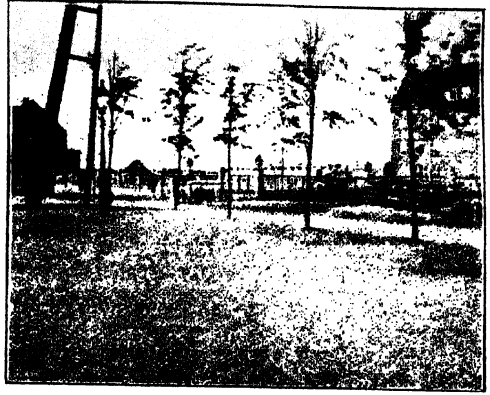
সমুদ্রতীর

সেই-সব মিউনিসিপ্যালিটীও ছেলেদের আংশিক ব্যয় বহন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী এই আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শুভকার্য্যে আনন্দের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিয়া থাকেন।

(অনুবাদক শ্রী হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

হরিদ্রা

কবিরাজ শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ

হরিদ্রার সাধারণ বাংলা নাম হল্‌দী বা হলুদ, ইংরেজী নাম Turmeric, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ইংরেজী পারিভাষিক নাম Curcuma Longa।

হরিদ্রা একপ্রকার কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্-বিদ্যার শ্রেণী-বিভাগে হরিদ্রা এক-বীজদল (Monocotyledon) উদ্ভিদের অন্তর্গত এবং আদা, এলাচী, দোলনচাঁপা প্রভৃতির সমশ্রেণী ভুক্ত।

গাছগুলি এক বা দেড় হস্ত পরিমিত উচ্চ, কাণ্ড মৃত্তিকার নিম্নেই গুপ্ত থাকে। অনেকগুলি বিরাট কন্দের খণ্ড অবিচ্ছিন্ন রূপে সংযুক্ত, খণ্ডমধ্যগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কন্দগুলির গাত্রে গ্রন্থি আছে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে অনেকগুলি ছোট শিকড় ও চোখ থাকে। এই চোখ হইতেই পুনরায় উদ্ভিদ্ শিশুর উৎপত্তি হয়। কন্দগুলি একপ্রকার পত্র দ্বারা আবৃত থাকে। পুষ্প উৎপত্তির সময় একটি করিয়া নূতন কাণ্ড (scape) ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; তাহাতে অনেকগুলি করিয়া ফুল (spicate) সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে। পত্রগুলি একক, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পত্রের প্রথম হইতে শেষ ভাগ পর্য্যন্ত একটি প্রধান শিরা ও তাহার উভয় পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি উপশিরা সমান্তরালে পত্র-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রগুলি প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ। পুষ্পগুলির বর্ণ

হরিদ্রাভ। মধুমক্ষিকা ও অন্যান্য কীট দ্বারা পুষ্প রেণু বাহিত হয়।

চাষ:—ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমি ভালরূপে চাষ করিয়া বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে ইহার কন্দ (Rhizome) শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে জমিতে বসাইয়া দিতে হয়। বর্ষা আরম্ভ হইতেই অঙ্কুরের উদ্ভেদ হয়। গাছ একটু বড় হইলে গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। একটি গাছ অন্যটি হইতে ৬।৭ ইঞ্চি পৃথক্ থাকিলে সুবিধা হয়। ইহার মাটি দোয়াস ও ভালভাবে চূর্ণ হওয়া দরকার।

পৌষ, মাঘ মাস হইতেই গাছগুলি মরিতে আরম্ভ করে। সবগুলি মরিয়া গেলে কোদালি দ্বারা গাছের মূলদেশ হইতে কন্দগুলি উঠাইয়া লইতে হয়। কন্দগুলির মধ্য ভাগ পীতবর্ণের। ইহাতে শ্বেতসার ও অন্যান্য উপাদান সঞ্চিত থাকে। এই কন্দগুলিই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ। হরিদ্রার ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। শুষ্ক হরিদ্রা বা সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক হইলে সেই হরিদ্রা বিদেশে রপ্তানি করিলে যথেষ্ট আয় হইতে পারে।

ব্যবহার:—পত্রগুলির বিশেষ ব্যবহার নাই; কারণ পত্রের দ্বারাই উদ্ভিদ্ তাহার খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই পত্রগুলি নষ্ট করিলে কন্দ পুষ্ট হইতে পারে না। আম্রগন্ধী হরিদ্রা অর্থাৎ আম-আদার পত্র অল্প পরিমাণের জিনিষ বাঁধিয়া লইবার জন্য পল্লীগ্রামের হাটে-বাজারে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

পুষ্প:—হরিদ্রার ফুলের জল ব্যবহার করিলে চুলী রোগ নষ্ট হয়।

কন্দ:—হরিদ্রার কন্দ অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহার ব্যবহার বহুবিধ।

সাংসারিক ব্যবহার:—

রন্ধন-কার্য্যে হরিদ্রার ব্যবহার দুইটি কারণে প্রচলিত।

প্রথমতঃ ব্যঞ্জনের বর্ণ সুদৃশ্য করিবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য। মৎস্য মাংস হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া রাখিলে বহু সময় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। পচা মৎস্য মাংসের বিষাক্ত জীবাণু একশত ডিগ্রী উত্তাপেও নষ্ট হয় না। হরিদ্রার চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত হইলে সেই জীবাণু নষ্ট হইতে পারে।

রঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহার:—

হরিদ্রার রস বা ক্বাথের দ্বারা বস্ত্রাদি পীত বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু পদার্থের সংযোগে অন্যান্য নানা রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঔষধ রূপে ব্যবহার:—

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে হরিদ্রার সাধারণ গুণ কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, বর্ণকারক; ইহাতে কফ, পিত্ত, ত্বকের দোষ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নষ্ট হয়।

মাত্রা,—রস ১—২ তোলা, চূর্ণ ৵—।০ আনা।

প্রত্যেক রোগে—হরিদ্রার ব্যবহার বিস্তারিত ভাবে জানাইতেছি।

পাণ্ডু রোগে:—

(১) হরিদ্রার ক্বাথ পান করিবে। মাত্রা ⁄০ ছটাক

(২) হরিদ্রার রস মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। মাত্রা—১—২ তোলা।

কুষ্ঠ রোগে:—

⁄০ ছটাক গোমূত্রের সহিত ১ তোলা পরিমাণে হরিদ্রার রস পান করিলে কুষ্ঠ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। ১ মাস নিয়মিত ব্যবহার করিবে।

তৃষ্ণারোগে:—

কফজ তৃষ্ণায় হরিদ্রার ক্বাথ মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

শ্লীপদ রোগে:—

গোমূত্র ও ইক্ষুগুড়ের সহিত হরিদ্রার রস বা চূর্ণ পান করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

আহত অঙ্গে:—

(১) চূণ ও হরিদ্রার প্রলেপ দিবে। মচকান, থেত্লান প্রভৃতির বেদনা উপশম হয়।

(২) রেড়ীর তৈল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বেদনা দূর হয়।

বসন্তরোগে :—

হরিদ্রা চূর্ণের সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিলে হাম জ্বর, বিষফোট ও বসন্তরোগ উপশমিত হয়।

নেত্র রোগে :—

(১) হরিদ্রার রসে বা হরিদ্রা-চূর্ণ-মিশ্রিত জলে বস্ত্র-খণ্ড সিক্ত করিয়া চোখের উপর আবরণ রূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগে উপকার হয়।

(২) হরিদ্রার কাথ দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর প্রদাহ দূর হয়।

(৩) হরিদ্রা, গেরিমাটী ও আমলকীচূর্ণ মধুর সহিত অঞ্জন দিলে চোখের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

শিশুরোগে :—

সিধ্ম (ছুলি), পামা, (খোস) রোগে হরিদ্রা, ঝুল, কুড়, রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

চর্ম্মরোগে :—

(১) তিলের তৈলের সহিত হরিদ্রা বাটিয়া দেহে মর্দ্দন করিলে চুলকানী প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইতে পারে না।

(২) কচি বাসকপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ৩ দিন প্রলেপ দিলে কচ্ছুরোগ নষ্ট হয়।

বিসূচিকায় (কলেরায়) :—

প্রথম অবস্থায় হরিদ্রার সূক্ষ্মচূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইয়া দিবে। যদি বমির সহিত উঠিয়া যায় তবে পুনরায় সেবন করাইয়া দিবে। ইহা কলেরার বিশেষ পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ ঔষধ।

রসায়ন :—

হরিদ্রার রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শরীর পুষ্ট ও বলবান হয়।

হিক্কা রোগে :—

হরিদ্রার চূর্ণ নূতন কলিকায় সাজিয়া বিনা হুঁকায় একটুজোরে দম দিয়া ধূমপান করিলে প্রবল হিক্কাও আরোগ্য হয়।

ছুলীরোগে :—

কলাপাতার ক্ষার ও হরিদ্রা-চূর্ণ জলে দ্রব করিয়া দুষ্ট-স্থানে ব্যবহার করিলে ছুলী আরোগ্য হয়।

স্ফীতিরোগে :—

যে স্ফীতিতে বেদনা নাই তাহাতে সাজিমাটীর সহিত হরিদ্রা-চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যান্য দুই-একটি রোগেও হরিদ্রার ব্যবহার আছে, কিন্তু বাহুল্য-বোধে আর উল্লেখ করিলাম না।

মহাস্থানে আবিষ্কৃত স্বর্ণমণ্ডিত ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

সম্প্রতি রাজসাহী বিভাগের বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান গ্রামে একটি ব্রোঞ্জ-ধাতু (তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু) নির্ম্মিত প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার গঠন-পারিপাট্য ও কারুকার্য্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মূর্ত্তিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার গত অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় ঐ মূর্ত্তিটির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে মজুমদার-মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

মহাস্থান গ্রামের চারিদিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই গ্রামসমষ্টি সহ মহাস্থান একটি বিখ্যাত প্রাচীন সহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। করতোয়া নদী বিধৌত চতুর্দ্দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর সেই সহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে এই স্থানটিকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অবস্থান স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে এখনও প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্য ও তক্ষণশিল্পের নিদর্শন-সূচক মৃত্তিকা-স্তূপাদিতে নিহিত অনেক শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া যায়; ক্রমে ক্রমে এদিকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের

স্বর্ণমণ্ডিত ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই মূর্ত্তি রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মূর্ত্তিশালায় রক্ষিত হইয়াছে।]

দৃষ্টি পড়িলে এই স্থান হইতে উদ্ঘাটিত তথ্যাদি হইতে বাংলার লুপ্ত ইতিহাসের অনেক সত্য লোকচক্ষুর গোচরী-ভূত হইবে।

বগুড়ার সাধারণ পাঠাগারে মহাস্থানে প্রাপ্ত একটি দ্বার-পিণ্ডী রক্ষিত হইয়াছে। উহাতে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটির গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা পাল রাজবংশের রাজত্বকালের পূর্ব্বেকার নহে। মহাস্থানে এইরূপ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে সপ্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে এখানে বৌদ্ধদিগের একটি আড্ডা ছিল। এই স্থানে প্রাপ্ত গুপ্ত বংশীয় (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) মোহরাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য ব্রোঞ্জ-ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির কারুকার্য্য-আদি সম্যক্ আলোচনা করিলে মনে হয়, এখানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে একটি বড় নগর অবস্থিত ছিল।

মহাস্থান গ্রামের যে-স্তূপটির নিকটে বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে স্থানীয় লোকে বলাইধাপ বলিয়া ডাকে। বলাইধাপ মহাস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী পলাশ-বাড়ী গ্রামের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত। এই ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি সর্ব্বপ্রথমে একজন গ্রাম্য লোকের চোখে পড়ে। সে বগুড়ার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনকে খবর দেয় এবং প্রভাস-বাবুর চেষ্টায় ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায়ের উদ্যোগে মূর্ত্তি এক্ষণে সমিতির মূর্ত্তিশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

অধুনা আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ২ ফুট ৯ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৯ ইঞ্চি। ইহার দুই পায়ে দুইটি কাঠের আল আছে, কিন্তু যে-কাঠের ফ্রেমের উপর আল দুইটি বসান ছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহা একটি পুরুষ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির দুইখানি হাত আছে, কিন্তু ডান হাতের নীচের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সেই ভগ্ন অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বাম হাতেরও কব্জির নীচের ভাগ ভগ্ন, কিন্তু তাহা পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির মাথায় চুল জটা-পাকান ও মাথার উপরে গিঁট দিয়া বাঁধা। লম্বা কুঞ্চিত কেশ-পাশ কিছু কিছু স্কন্ধদেশে ও বক্ষে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। উষ্ণীষে চুলের গিঁটের সম্মুখে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহা থাকাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মহাস্থানে-প্রাপ্ত মূর্ত্তিটি বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর প্রতিরূপ—কারণ মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মঞ্জুশ্রীর উষ্ণীষে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট অক্ষোভ্যার ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি থাকে।

মঞ্জুশ্রীর দক্ষিণ হস্তটির কতকটা অংশ না থাকিলেও উহার গড়ন দেখিয়া মনে হয় উহা বরদামুদ্রায় অবস্থিত। ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে* বরদামুদ্রায় অবস্থিত কতকগুলি মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সেগুলি হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত মূর্ত্তিটি একটু পৃথক্ শ্রেণীর। ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের মূর্ত্তিগুলির বাম হস্তে মৃণালপদ্ম আছে। কিন্তু মূর্ত্তিটির বাম হস্তের অঙ্গুলীগুলি ঠিক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও ইহার হাতে মৃণাল নাই।

মূর্ত্তিটির গাত্রে একখণ্ড উত্তরীয় আছে। তাহা বাম বাহুর উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশে গিয়া পড়িয়াছে ও পরিধানের বস্ত্রখণ্ড পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। উভয় পায়ের কাছেই বস্ত্রখণ্ডের মোড় ঈষৎ বাড়ান। বস্ত্রখণ্ড কটিদেশে একটি দুই-নড় কটিবন্ধ দিয়া বাঁধা। কাপড়ের এক অংশ কোঁচা দেওয়ার মতন করিয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া লম্বিত। বামস্কন্ধের উপর কতকগুলি সুস্পষ্ট বক্ররেখা রহিয়াছে—মনে হয় তাহা যজ্ঞোপবীতের চিহ্ন। মূর্ত্তিটির উভয় কর্ণে সাদাসিধে ধরণের দুইটি দুল আছে। মধ্যযুগের মূর্ত্তিসমূহের দুলের ন্যায় এই মূর্ত্তির দুল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে নাই। মূর্ত্তির চোখের পাতা খোলা এবং চক্ষু দুইটি কালারায় প্রাপ্ত (পিত্তল-নির্ম্মিত) বুদ্ধমূর্ত্তির ন্যায় রৌপ্য-নির্ম্মিত।† চোখের তারা দুইটি বেশ স্পষ্ট। মূর্ত্তির স্কন্ধদেশের ত্রিবলি চিহ্ন বেশ সুস্পষ্ট এবং মুখাবয়ব গোলাকার ও স্থূল। ওষ্ঠের নীচের অংশ বেশ পুরু।

মহাস্থানের মূর্ত্তিটির আপাদমস্তক দেখিতে বেশ সুন্দর এবং উহার গঠন-পারিপাট্য ও বস্ত্রাদি পরাইবার ভঙ্গী গুপ্তযুগের ধরণের। আর-একটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য

---

* Indian Museum N. S. 2073.

† Vogel A. S. R. 1904-5 p. 108

করিবার বিষয় এই যে, মূর্ত্তিটিতে অলঙ্কার-বাহুল্য নাই। দক্ষ শিল্পী কাণের দুল ও কটিবন্ধ ভিন্ন মূর্ত্তির কোন অঙ্গে কোন অলঙ্কার দেন নাই। পরবর্ত্তী যুগের মূর্ত্তিসমূহের সহিত এই যুগের মূর্ত্তির বৈসাদৃশ্য এইখানে; কারণ, পরবর্ত্তী শিল্পীদের মূর্ত্তিগুলিতে জটিল নক্সা ও অতিমাত্রায় অলঙ্কার দেখা যায়।

শিল্পী কি উপাদানে মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন একণে তাহাই আলোচনা করিব। সম্ভবতঃ বেশীমাত্রায় তামার খাদযুক্ত ব্রোঞ্জ ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালাই করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মূর্ত্তিটির হাতের ভাঙ্গা অংশ হইতে বোঝা যায় যে, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত (বর্ত্তমানে বার্ম্মিংহাম মিউজিয়মে রক্ষিত) সুবৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তিটি যে উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহাও সেই উপাদানে গঠিত। সুলতানগঞ্জের মূর্ত্তিটির অভ্যন্তর ভাগ নিরেট ও তাহার একটি পৃথক বহিরাবরণ আছে। * উহার অভ্যন্তর-ভাগ কোন ধাতুতে গঠিত নয়। বোধ হয় উহা তুষ জাতীয় এমন কোন দ্রব্যে প্রস্তুত যাহা ঢালাই করিবার সময় পুড়িয়া কালো হইয়াছে। সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ মূর্ত্তিটির অভ্যন্তরে যে-প্রকার কালো উপাদান পাওয়া গিয়াছিল মহাস্থানের মূর্ত্তিটি পরিষ্কার করিবার সময়েও সেই প্রকার কালো জিনিস বাহির হয়। †

কোন্ কোন্ ধাতুর সংমিশ্রণে ও সেগুলিতে কি পরিমাণে খাদ দিয়া মূর্ত্তিটি প্রস্তুত তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে অষ্টধাতু ও অন্যান্য ধাতুর প্রচলন আছে। ফ্রান্সকে বিব্লিওথেকে ন্যাশনাল্ এ (Bibliotheque Nationale) রক্ষিত দুইখানি পুঁথিতে বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য যুগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণকালে যে সকল ধাতু ব্যবহৃত হইত সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য আছে। উক্ত পুঁথি দুইখানিতে বিশেষ করিয়া নবলৌহ, সপ্তলৌহ ও পঞ্চলৌহের কথা উল্লেখ আছে। ঐ তিনটি ধাতু-সমষ্টি কি কি ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত মঁসিয়ে কোদে (M. Codes) অধুনালুপ্ত ভারতীয় ধাতুবিদ্যা বিষয়ক পুঁথি হইতে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন—যথা *:—

ধাতুসমষ্টি	কি কি ধাতু সংমিশ্রণে প্রস্তুত
(১) নবলৌহ	৯ ভাগ স্বর্ণ, ৮ ভাগ রৌপ্য, ৭ ভাগ তাম্র, ৬ ভাগ দস্তা, ৫ ভাগ পারদ, ৪ ভাগ টিন, ৩ ভাগ লৌহ, ২ ভাগ বিস্মাথ, ১ভাগ সীসা অথবা সমভাগে স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, পারদ, টিন, লৌহ, বিস্মাথ, সীসা ও আবশ্যক মত তাম্র মিশ্রিত করিয়া।
(২) সপ্তলৌহ	কি কি ধাতু সংমিশ্রণে প্রস্তুত ৭ ভাগ স্বর্ণ, ৬ ভাগ রৌপ্য, ২ ভাগ তাম্র, ৪ ভাগ দস্তা, ৩ ভাগ পারদ, ২ ভাগ লৌহ ও ১ ভাগ বিস্মাথ্।
(৩) পঞ্চলৌহ	কি কি ধাতু সংমিশ্রণে প্রস্তুত ৫ ভাগ স্বর্ণ, ৪ ভাগ রৌপ্য, ৩ ভাগ তাম্র, ২ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ লৌহ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্যামদেশে ধাতুসংমিশ্রণে স্বর্ণের পরিমাণ দেখিয়াই তাহার গুণ ধরা হইত। কিন্তু সংমিশ্রণের সময় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হইত কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মহাস্থানে আবিষ্কৃত ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি এত বিশেষ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, উহার সর্ব্বাঙ্গ সোনার পাতে মোড়ান। মূর্ত্তিটির উপরকার সোনার পাত ডিমের খোলা অপেক্ষাও পাতলা এবং মূর্ত্তিটি বহু পুরাতন বলিয়া স্থানে স্থানে সোনার পাত উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুরাতন হইলেও মূর্ত্তিটির গঠন-সৌষ্ঠব দেখিয়া মনে হয়, নূতন অবস্থায় ইহা অপূর্ব্ব-শ্রী মণ্ডিত ছিল। আমাদের

* Smith : History of Fine Arts, p. 172.

† J. A. S. B. 1864 p 366.

* Bronzes Khmers 1923, p. 15.

দেশে গিল্টি করা ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির প্রচলন আছে * এবং নেওয়ারী শিল্পীরা এখনও ব্রোঞ্জ-প্রতিমূর্ত্তির উপর সোনার কাজ করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্যামদেশেই সর্ব্বপ্রথম শিল্পীরা সোনার পাতে মোড়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। খমেরের শিল্পীদের নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলির বস্ত্রাদিতে সোনার কাজ করা ছিল এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মহাস্থানে গুপ্তযুগের স্বর্ণ মণ্ডিত ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রোঞ্জের উপর সোনার কাজের গঠন-পারিপাট্য বিষয়ে খমেরের শিল্পীরা ভারতীয় দক্ষ শিল্পীগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

প্র

*Waddell—Lamaism, p. 329

বিধায়না

(লক্ষণ)

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

সংজ্ঞানুযায়ী সূত্রমাত্রই দুইটি অংশ—একটি কার্য্য ও অপরটি কারণ। পুনরায় কার্য্য ও কারণ মাত্রেই প্রত্যেকটিতে একটি উদ্দেশ্য, একটি বিধেয় ও একটি বাচ্য থাকিবে। সর্ব্বশুদ্ধ কার্য্য-কারণে দুইটি উদ্দেশ্য, দুইটি বিধেয় ও দুইটি বাচ্য লইয়া ছয়টি পদার্থ। কিন্তু সূত্রের ভাষা সাধারণতঃ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকে না। যথা:—

নামকরণ যে সূত্রের কার্য্য তাহার নাম সজ্ঞা।

এই সূত্রটি কার্য্য ও কারণ দুই অংশে বিভক্ত।

কারণ—যদি নামকরণ কোন সূত্রের কার্য্য হয়।

কার্য্য—তবে উক্ত সূত্রের নাম সংজ্ঞা।

এই দুইটি বাক্যের প্রত্যেকটিতে একটি উদ্দেশ্য, একটি বিধেয় ও একটি বাচ্য আছে।

প্রথমটিতে উদ্দেশ্য নামকরণ, বিধেয় কার্য্য ও বাচ্য 'হয়' ক্রিয়া উহ্য।

দ্বিতীয়টিতে উদ্দেশ্য সূত্র, বিধেয় সংজ্ঞা ও বাচ্য 'হয়' ক্রিয়া উহ্য।

পুনরায় এই দুইটি ঘটনা কার্য্য-কারণ-সম্পর্কান্বিত।

দুইটি পদার্থ সম্পর্কান্বিত হইলেই তাহাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ও অপরটি বিধেয় হইবে।

এখানে কারণটি উদ্দেশ্য ও কার্য্যটি বিধেয়।

কিন্তু এখানে কোন বাচ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

অথচ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে বাচ্য থাকিবেই।

আমাদের মতে 'তবে' এই শব্দের মধ্যে বাচ্য নিহিত আছে।

'তবে' ইহার প্রতিশব্দ 'তাহা হইলে'। ইহা একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

এখানে আমরা তিনটি ক্রিয়া পাইতেছি। একটি কারণের অন্তর্ভুক্ত, একটি কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ও অপরটি কার্য্য-কারণ-সম্পর্কান্বিত। ভাষায় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াকেই মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়া সমাপিকা করা হয়।

তাহা হইলে সূত্রের মধ্যে আমরা তিনটি উদ্দেশ্য, তিনটি বিধেয় ও তিনটি বাচ্য—এই নয়টি পদার্থ পাইতেছি।

কোন সূত্রের কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক স্পষ্ট ব্যক্ত হইলে কারণের পূর্ব্বে 'যদি' ও কার্য্যের পূর্ব্বে 'তবে' শব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু অনেক সময়ে 'যদি' ও 'তবে' এই দুইটি শব্দ উহ্য থাকে। তদবস্থায় কারণ বাক্যাংশ রূপে পরিণত হয় ও উহার ক্রিয়া ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এই

অসমাপিকা ক্রিয়ায় কার্য্য কারণ-সম্পর্ক সূচক 'তাহা হইলে' ক্রিয়াটি অন্তর্নিহিত হইয়া যায়।

ভাষা দার্শনিক আলোচনার নিমিত্ত ক্রমশঃই মার্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ভাষা যেরূপ হওয়া সঙ্গত, ভাষা তাহা হইতে যথেষ্টই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এঅবস্থায় সূত্রসমূহ প্রচলিত ভাষায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া গঠন করা সুদূর পরাহত। সুতরাং ভাষার জন্য আমাদের এরূপই বেগ পাইতে হইবে।

কার্য্য-কারণের সম্পর্ক অবলম্বনেই সূত্র গঠিত। অতএব সূত্রগঠন করার নিমিত্ত কার্য্য-কারণের সম্পর্ক নির্ণয় প্রয়োজন। সত্য বটে, নৈসর্গিক ঘটনায় সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নিবদ্ধ। কিন্তু তাহাকে বাছিয়া বাহির করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। কারণ কার্য্য-কারণ-সম্পর্কান্বিত ঘটনাগুলি পরস্পর জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ, গতি সম্বন্ধীয় বিধিত্রয়ের কথা উল্লেখ করা চলিতে পারে। এই বিধি-ত্রয়ের আঙ্কিক প্রমাণ এপর্য্যন্ত কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। অথচ এই বিধিত্রয় সমগ্র বলবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; এবং বিভিন্ন আঙ্কিক প্রমাণে প্রাপ্ত অপরাপর বিধি নির্দ্দেশিত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া এই বিধিত্রয়-প্রদর্শিত তত্ত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে।

এই কার্য্য-কারণ নির্ণয়ের পক্ষে সাদৃশ্যের উপলব্ধি প্রধানতম। জগৎ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যে পরিপূর্ণ। সাদৃশ্যকে বাছিয়া বাহির করিতে ইন্দ্রিয়ই আমাদের একমাত্র সম্বল। প্রাথমিক জ্ঞানে সাদৃশ্য অনুভূতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে সাধিত হয়। কিন্তু এই ভাবে জ্ঞান অধিকদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। এঅবস্থায় কার্য্য-কারণ সম্পর্কের সাহায্য লইতে হয়।

প্রাথমিক জ্ঞানে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সাহায্যে সাদৃশ্য অনুভব করিয়া কতকগুলি কার্য্যকারণ-সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। এই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন পদার্থের সাদৃশ্য নির্ণয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে সবগুলি প্রকৃত নহে। এরূপ নির্ণয়ে প্রতীত সাদৃশ্যেরও অভাব নাই। যথাঃ—

যে মানুষ আফিং খায় সে জীবন ত্যাগ করে।

যে মানুষ হরিতাল খায় সে জীবন ত্যাগ করে।

এখানে তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় 'স্বতঃসিদ্ধ' অনুযায়ী আফিং ও হরিতাল সদৃশ বলিয়া প্রতীত।

এবম্বিধ বিভিন্ন সদৃশ পদার্থ একজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আফিং ও হরিতাল ইহাদের যে কোনটি খাইলেই মানুষের মৃত্যু হয় সত্য। কিন্তু এই কার্য্য ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাদের অপর কোন সাদৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয় না। যদি মরণ-কার্য্য দিয়া ইহাদের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে উক্ত স্বতঃসিদ্ধের কোন মূল্য থাকে না। তাহার অর্থ এই হয় যে, কার্য্যে সাদৃশ্য থাকিলেই কারণে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বলিব। বিষকে জাতি বলিয়া তখনই নির্দ্দেশ করিব যখন যাবতীয় বিষে সাদৃশ্যসূচক একটা কিছু পাইব। যদি দেখি বিভিন্ন প্রকারের বিষে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র নষ্ট হইয়া মৃত্যুর কারণ রূপে পরিণত হয়, তবে বিষ মৃত্যুর কারণ নহে। ইহাদিগকে কারণের কারণ বলা চলে। তদবস্থায় এই উভয় পদার্থকে স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী পরস্পর সদৃশ বলা চলে না।

রেশম কাচে ঘর্ষিত হইলে কাচ দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

রেশম গালায় ঘর্ষিত হইলে গালা দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

উক্ত প্রকারে কাচ ও গালাকে সদৃশ বলা চলে না। কিন্তু এখানে আমরা একটি সদৃশ পদার্থের পরি-কল্পনা করি। ইহার নাম তাড়িত। মানবের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জগতের সামান্যই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অধিকাংশই প্রত্যক্ষের অগোচর। সাধারণ দৃষ্টির লক্ষীভূত নহে, এরূপ অনেক পদার্থই অনুবীক্ষণ সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মতম যন্ত্রের সাহায্যেও অধিকাংশ পদার্থের প্রত্যক্ষ নিষ্পন্ন হয় না। বিভিন্ন ঘটনার আলোচনায় ইহাদের অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায়।

তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে কাচ ও গালার মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা ধরিব। কিন্তু এই ধারার মধ্যে কাচ ও গালার দ্বারা রেশমের আকৃষ্ট হওয়া সাক্ষাৎ কারণ উক্ত ঘর্ষণক্রিয়াকেই মনে করা হইবে। অবশ্য ঘর্ষণ আকর্ষণের সাক্ষাৎ কারণ কি না তাহা প্রত্যক্ষ করা মানব ইন্দ্রিয়ের

অতীত। তবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী অপর কারণ না পাইব ততক্ষণ এরূপ ঘটনাকেই কারণ রূপে ধরিয়া লওয়া সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা সাধিত হয়। কাচ ও গালার মধ্যে উক্ত সাদৃশ্যসূচক তাড়িত নামে একটি পদার্থের পরিকল্পনা করা গিয়াছে। পরে নানাবিধ আঙ্কিক প্রমাণের সাহায্যে এই পরিকল্পনায় একটা দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এসমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময়েই জাতিকরণে ভুল করা হয়। আমরা আফিং ও হরিতাল একই জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এখানে মৃত্যুর কারণ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিষকে সদৃশ করা হইতেছে। কিন্তু সদৃশ শব্দের এইরূপ প্রয়োগ সমীচান নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাদৃশ্য দেখাইতে না পারিলে স্বতঃসিদ্ধ সহায়তায় বিষকে জাতি বলা চলে না। কিন্তু কাচ ও গালাকে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়। যেহেতু তাড়িতের পরিকল্পনায় আমরা এরূপ একটা সুযোগ পাইয়াছি যে, তাহার অস্তিত্ব থাকাতে ঘর্ষণ-ক্রিয়ায় আকর্ষিত হওয়ার সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ তাড়িতের প্রকাশ ঘটে। ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, বিভিন্ন পদার্থে এরূপ একটা কিছু আছে, যাহা থাকাতে (অর্থাৎ থাকার কারণে) তাহাদিগকে পরস্পর সদৃশ বলিয়া মনে হয়।

সংজ্ঞা। পদার্থে যাহা সদৃশ বলিয়া অনুভব করার কারণ স্বরূপ তাহাকে উক্ত পদার্থের ধর্ম্ম বলে। আমরা পদার্থের ধর্ম্ম চারি প্রকারে উপলব্ধি করিয়া থাকি।

১। একটি পদার্থকে আর-একটি পদার্থের সদৃশ বলিয়া অনুভব করা হয়।

ইহা হইতেই জাতির সৃষ্টি। জাতি-গঠনের সময়ে সদৃশ বোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন। অনেক সময়ে আমরা তৃতীয় স্তবক অনুযায়ী কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক হইতে সদৃশের ধারণায় উপস্থিত হই। এই প্রণালীতেই বিষকে একটি জাতি বলিয়া ধরা হইয়াছে। এক্ষেত্রে কার্য্য-কারণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক কি না, তদ্বিষয়ে বিচার প্রয়োজন। কারণ অনেক সময়ে কারণের কারণকেও কারণ বলা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ধর্ম্মকে আমরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। তাহার অনুসন্ধান নিমিত্ত তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধস্তবকের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয়। তদ্রূপ স্থলে সদৃশকে পরিকল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আঙ্কিক প্রমাণাদি দ্বারা বিচার প্রয়োজন।

২। পদার্থ তাহার অংশের সঙ্গে সদৃশ হইতে পারে। এক খণ্ড রৌপ্য তাহার অংশের সঙ্গে সদৃশ।

সংজ্ঞা। যে পদার্থ অংশ পরম্পরায় পরস্পর সদৃশ তাহার নাম ভূত।

অংশ-পরম্পরার সদৃশেই ভূতত্ব, এই ভূত পদার্থ আকারের কোন ধার ধারে না। অংশ-পরম্পরায় ধর্ম্ম নির্দ্দেশেই ইহার পদার্থ। তবে ভূতকে আকার প্রদান করিলে বস্তুতে পরিণত হয়। রৌপ্য-নির্ম্মিত কলস—বস্তু। কিন্তু রৌপ্য বস্তু নহে, ভূত ; কোন নির্দ্দিষ্ট রৌপ্য খণ্ডকেও বস্তু বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে রৌপ্য বলিতে কোন আকার অথবা খণ্ড বুঝায় না। কোন ভূতের বিভিন্ন অংশ যখন বস্তুতে পরিণত হয়, তখন তাহাদের ভূতত্ব হিসাবে সাদৃশ্য হেতু উক্ত অংশসমূহ বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। বিশেষতঃ ভৌতিক বস্তু অবলম্বন করিয়াই আমরা ভূত-সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করি। এঅবস্থায় ভূত-সংক্রান্ত কোন কার্য্য-কারণ-সম্পর্ককে আমরা সূত্র রূপে গ্রহন করিতে পারি। সুতরাং সূত্রের সংজ্ঞায় 'জাতি' শব্দের উল্লেখ থাকায় উহাকে সূত্রের বহির্ভূত বলার আবশ্যক করে না।

৩। বিভিন্ন সময়ে একই পদার্থ সেই পদার্থের সদৃশ। কলমটিকে যখনই দেখি, তখনই তাহাকে অপরাপর সময়ে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহার সদৃশ বলিয়া অনুভব করি। ইহা সাধারণতঃ অপরিবর্ত্তনীয় নামে অভিহিত। অপরিবর্ত্তনীয়তা আছে বলিয়াই আমরা পদার্থকে চিনি। ইহার অভাবে পদার্থত্ব থাকিত না, ইন্দ্রিয়ে কতকগুলি অনুভূতি মাত্র উপস্থিত হইত। প্রচলিত জ্ঞান-অনুযায়ী তদবস্থায় জ্ঞানকে ধারণা করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। সুতরাং পদার্থকে বিভিন্ন সময়ে সদৃশ বলিয়া বোধ করার কারণেই উক্ত পদার্থে ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়। একই পদার্থে বিভিন্ন সময়ের সদৃশানুভূতি হইতে উক্ত পদার্থকে বিভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিয়া

তাহাকে জাতিরূপে ধরা চলে। সুতরাং কোন বিশেষ একটি পদার্থের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও সুত্র গঠিত হইতে পারে।

কোন বিশেষ সময়ে পদার্থে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতে পারে। তদবস্থায় তাহার ধর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী মাত্র। পদার্থের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী তাহার ধর্ম্মেও একটা আদি ও অন্ত আছে। এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কোন সূত্র গঠিত হইলে সেই সূত্রের সার্থকতা উক্ত নির্দ্দিষ্ট-সময়-ব্যাপীই থাকিবে।

৪। বিভিন্ন ঘটনা পরস্পর সদৃশ হয়।

যথা;—জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি। এই বিভিন্ন জন্ম ও বিভিন্ন মৃত্যু এক-একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভাষায় ইহা জাতি নামে অভিহিত হয় না।

ধর্ম্ম, সদৃশ বলিয়া অনুভব করার কারণ। অতএব ইহাও একটি ঘটনা। সুতরাং ধর্ম্মের মধ্যেও জাতি আছে।

সংজ্ঞা। কয়েকটি ধর্ম্মের সমবায়ে একটি ধর্ম্ম উৎপন্ন হইলে, তাহাদিগকে শেষোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণ বলে।

বিভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশে তাহাদের সমবায়ে উৎপন্ন ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সূত্র-মধ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি লক্ষণ বর্ত্তমান। ইহা সূত্রের সংজ্ঞা আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে—

১। যে কোন সূত্র একটি কার্য্য-কারণ-সম্পর্কান্বিত ঘটনা হইবে।

২। উক্ত কার্য্য ও কারণে এক একটি করিয়া উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বাচ্য থাকিবে।

৩। উক্ত কার্য্য ও কারণগুলি সর্ব্বত্রই পরস্পর সদৃশ হইবে।

৪। উক্ত উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক-একটি জাতি হইবে।

ইহার মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্পর্ক নির্দ্দেশই মুখ্য এবং তন্নিমিত্তই সূত্রের সৃষ্টি। যে-সমস্ত কার্য্য-কারণ-সম্পর্কান্বিত ঘটনা আমাদের নিকট যুগপৎ প্রত্যক্ষীভূত তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কার্য্য ও কারণের কোন একটি প্রত্যক্ষীভূত হইলে আমরা অনুসন্ধান করিয়া অপরটি বাহির করি। ইহার নামই গবেষণা। এই অনুসন্ধান দুই প্রকারে সাধিত হয়। কারণ হইতে কার্য্যের নির্ণয় ও কার্য্য হইতে কারণের নির্ণয়। উদাহরণে কাচ ও গালার সাদৃশ্য বোধ প্রথম প্রকারের এবং এই সাদৃশ্য হওয়ার কারণ স্বরূপ তাড়িত নামক পদার্থের পরিকল্পনা দ্বিতীয় প্রকার অনুসন্ধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই উভয়বিধ অনুসন্ধানের সাহায্যে জগতের সমগ্র কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই নিমিত্তই বিজ্ঞান ও দর্শনের সৃষ্টি। এবম্বিধ অগ্রসর হওয়াতেই জ্ঞানের প্রসার। এই কার্য্য-কারণের একটি হইতে অপরটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তদ্দ্বারা একটি বিধি গঠিত হয়। এই কার্য্যের নামই বিধায়না।

আমাদের জিগীষা-শক্তি নিয়তই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। গবেষণায় এই বাধা অতিক্রম করার নিমিত্ত সর্ব্বদাই যত্ন লইতে হয়। কিন্তু যতই কেন অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করি, অনুসন্ধান মাত্রই কতকটা অগ্রসরের পরে কোন একটা গণ্ডীতে মিশিয়া যায়; এই গণ্ডী অনুসন্ধানকে বিপথগামী করিয়া ফেলে। এখানেই ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্যের আবরণ। ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য গণ্ডীকে গণ্ডী বলিয়া ধরিতে দেয় না। অনুসন্ধিৎসা গণ্ডীভেদের কল্পনাও করিতে পারে না। গণ্ডীভেদ করিবার নিমিত্ত গণ্ডীবদ্ধ যাবতীয় মৌলিক তত্ত্বের সমবায় সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই তত্ত্ব-সমূহের সমবায়বিশ্লেষণে ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য ধরা পড়ে। এবম্বিধ গবেষণাই উন্মোচনা। অতএব উন্মোচক গবেষণাও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অনুসন্ধান হইতে অন্যতর নহে। সুতরাং বিবিধ বিধায়ক গবেষণার সাহায্যেই ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কেপ্‌লার ও নিউটন্ প্রবর্ত্তিত বিধির সহায়তায়ই কোপার্নিকাসের উন্মোচক গবেষণার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।*

---

* কার্ত্তিকের প্রবাসীর ১৪৬ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধের শেষ দিকে ৪র্থ লাইনে 'কোন কোন" স্থানে "কোন" হইবে এবং ৮ম লাইনে "নামকরণ" শব্দের পরে দাঁড়ি থাকিবে না।

কালিদাস-সাহিত্যে নারীর স্থান

মহাকবি যে-সকল স্থলে নারীর বর্ণনা বা তাঁহার কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন, সে-সকল স্থলেই আমরা দেখিতে পাই যে, নারীর সম্মান কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তখনকার নারীদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল না বটে, তবে এখনকার নারীদের মত তাঁহারা সমাজে পঙ্গু হইয়া পড়েন নাই।

তখনকার ভদ্র গৃহস্থের নারীরা প্রায়ই অশিক্ষিতা থাকিতেন না। কণ্বমুনির ভগিনী গৌতমী ত শিক্ষিতা ছিলেন-ই, মালবিকা, শকুন্তলা, অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে জানিতেন। এমন-কি শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রিয়সখীদিগের অনুরোধে যে-প্রণয়-লিপি পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সুললিত পদ্যে রচিত হইয়াছিল।

প্রিয়ম্বদার চিত্রবিদ্যায় জ্ঞান ছিল। মেঘদূতেও দেখিতে পাই যে, বিরহী যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন, "ভাই মেঘ, তুমি দেখিবে, হয়ত আমার প্রিয়া আমারই রূপ চিত্র করিতেছেন।"

শকুন্তলার পঞ্চমাঙ্কে দেখা যায়, দুষ্মন্তের অন্যতমা মহিষী হংসপদিকা 'সঙ্গীতশালায়' বীণাযন্ত্র সহযোগে মধুর গীত গাহিতেছিলেন; এবং সেই গীত রাজসভাতেও স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

মালবিকাগ্নিমিত্রে মহারাজ্ঞী ধারিণী মালবিকাকে গীত, বাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা দিবার জন্য আচার্য্য গণদাসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে আরও দেখা যায় যে, অগ্নিমিত্রের নিজস্ব সঙ্গীতবিদ্যালয় (Musica. School) ছিল এবং সেখানে বহু ছাত্র ও ছাত্রী রাজার ব্যয়ে সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন।

আবার দেখিতে পাই, রাজার সভায় যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহার বিচার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল পণ্ডিতা কৌশিকীকে। মহারাজা অজ প্রিয়তমা ইন্দুমতীর অকালমৃত্যুতে বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

> "গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ
> প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

যক্ষের পত্নী বীণাযন্ত্র সহযোগে গান গাহিতে পারিতেন তাহা যক্ষ মেঘকে জানাইয়া দিতেছেন।

নারীরা বেশভূষার রীতিমত সমাদর করিতেন, অলঙ্কারও তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং সে-সময়ে তাঁহারা চন্দন ও এমন নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার জানিতেন, যাহা এখনকার essence ও lavender-এর কার্য্য করিত।

সে-সময়ে রমণীরা কর্ণে শিরীষ পুষ্প, মস্তকে কদম্বপুষ্প, বক্ষে পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি ধারণ করিয়া অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেন।

এখনকার ন্যায় সে-সময়েও নারীরা হস্তে বলয় পরিধান করিতেন। 'বলয়' কথার অর্থই আধুনিক 'চুড়ি', কারণ বলয় 'বালা' হইলে একহস্তে একটির অধিক থাকিতে পারে না। কঙ্কণও একপ্রকার 'ব্রেস্‌লেট' ছিল, ইহাই মনে হয়। তাঁহারা মস্তকে 'মুক্তাজাল' পরিধান করিতেন, বাহুতে 'অঙ্গদ' বা তাগা, কটিদেশে 'রশনা', বক্ষে 'হার'—কর্ণে 'কুণ্ডল' ও চরণে 'নূপুর, পরিধান করিতেন। রাজবালারা (পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে পায়ে) অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিতেন। তাঁহারা কেশ রচনা করিবার জন্য অগুরুধূপের ব্যবহার করিতেন। দেহ 'কালীয়ক' কুঙ্কুম ও মৃগনাভিযুক্ত চন্দনরসে সুবাসিত করিতেন, অধরোষ্ঠ তাম্বুলসংসর্গে রক্তবর্ণ করিতেন। নেত্রদ্বয়ে 'শলাকাঞ্জন' (অর্থাৎ কাজল) লেপন করিতেন, এবং মুখপদ্মে লোধ্রকুসুমের পরাগ ব্যবহার করিয়া সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেন।

সেকালের বিলাসিতার একটি বীভৎস ব্যাপার মহাকবির সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, উহা নারীদিগের মদ্যপান।

অধুনা দক্ষিণদেশে অথবা মহারাষ্ট্রে দেখা যায় যে, মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে পুরুষের সম্মুখে আসিতে ও তাহার সহিত কথোপকথন করিতে পারে, তখনকার সময়েও নারীদের অবস্থা এই প্রকারই ছিল।

বিক্রমোর্ব্বশীর স্থলবিশেষে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত নিঃসঙ্কোচে বাক্য ব্যবহার করিতেছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়, মহারাজ অগ্নিমিত্রের মহিষী ধারিণী প্রকাশ্য রাজসভায় পারিষদবৃন্দের মধ্যে উপবেশন করিয়া সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এই প্রতিযোগিতার বিচারভার অর্পিত হইয়াছিল একজন রমণীর উপর।

নারীর আবাসস্থল নরের আবাসস্থল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবেই নির্ম্মিত হইত, অথবা একটি ভবনের সম্মুখাংশ নরের ও পশ্চাদ্ভাগ নারীর ব্যবহারের জন্য বিভক্ত করা হইত।

শকুন্তলার পঞ্চমাঙ্কে দেখা যায়, শকুন্তলা অবগুণ্ঠিতা হইয়া মহারাজ দুষ্মন্তের সভায় গিয়াছিলেন। এই ব্যাপার হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, হয়ত অবগুণ্ঠনপ্রথা মহাকবির কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে অথবা তাঁহার সময় হইতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সামান্য প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

শ্রী রঘুনাথ মল্লিক

(সুবর্ণবণিক্ সমাচার, কার্ত্তিক ১৩৩৩)

—

আতঙ্ক-নিগ্রহ

হিন্দু-মুসলমান বহুদিন হইতে নিকটতম প্রতিবেশীরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, একত্র অবস্থান করিতেছে। এখন আর একজনকে ছাড়িয়া অন্য জনের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় না।

মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইয়া মুসলমান-কুল নির্ম্মূল করিবার কল্পনা সংগঠন নহে, 'সং'-গঠন; হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তিই সেরূপ হাস্যাস্পদ প্রয়াস স্বীকার করিতে অগ্রসর হয় নাই। হিন্দুকে মুসলমান করিয়া লইয়া হিন্দু-কুল নির্ম্মূল করিবার কল্পনাও সেইরূপ। তাহা কেবল বাচালতা নহে, বাতুলতা।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই আতঙ্কের লক্ষণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুসলমানের আতঙ্ক অপেক্ষা কোন কোন স্থানের হিন্দুর আতঙ্ক অধিক প্রণিধান-যোগ্য। হিন্দু সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্য-গণ্ডী-নিবদ্ধ প্রাচীন সমাজ; তাহার মধ্যে সকল দেশের সকল জাতির সকল নর-নারীকে টানিয়া আনা সম্ভব হইতে পারে না; হইলেও, যাহাদিগকে

টানিয়া আনা হইবে তাহাদের কাহাকেও দ্বিজাতি-পদ বাচ্য প্রথম তিন শ্রেণীতে স্থান দিবার উপায় নাই; এবং পঞ্চম শ্রেণী না থাকায় চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্র-শ্রেণীতে স্থান দিতে হইবে। এই শ্রেণীর কেহ কেহ সৎ এবং অবশিষ্ট অসৎ নামক দুই ভাগে বিভক্ত; কাহারও জল চল, কাহারও অচল। সকলের জল চালাইয়া লইবার শাস্ত্র নাই; চালাইয়া লইতে পারিলে সকলের সামাজিক মর্যাদা সমান করিয়া দিবার উপায় নাই। মুসলমান স্ব-সমাজে এরূপ কঠিন নিয়মের অধীন নয়। শিক্ষা, সদাচার এবং ঐশ্বর্য্য নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানকেও উচ্চ শ্রেণীর পদ-মর্যাদা প্রদান করিতে পারে। তাহা জন্ম-গত দৈব-ঘটনার উপর নির্ভর করে না; পৌরুষ-গত আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে। এরূপ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে আবার হিন্দু হইতে পারিলেও, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতে হইবে, তজ্জন্য মুসলমান সহসা ধর্ম্ম-ত্যাগে সম্মত হইতে পারে না। হিন্দুর পক্ষেও মুসলমান হইবার প্রলোভন বড় অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এখন আর হিন্দুর পক্ষে মুসলমান হইয়া কোনরূপ সামাজিক বা সাংসারিক মর্যাদা লাভের বা স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং হিন্দুর পক্ষেও মুসলমান হইবার জন্য স্বাভাবিক লালসা উপস্থিত হইতে পারে না।

তথাপি, হিন্দু-সমাজে শাস্ত্র-সম্বন্ধে অজ্ঞতা ক্রমে বদ্ধমূল হওয়ায়, মুসলমানের পক্ষে বলপূর্ব্বক হিন্দুকে মুসলমান করিবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে।

পাতিত্য জনক যে সকল কার্য্যের জন্য হিন্দুর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহার অধিকাংশ এক শ্রেণীর;—তাহা পরকৃত নহে স্বকৃত। যাহা পরকৃত তাহা অত্যাচার; তাহার সাধারণ নাম "বলাৎকার"। তদ্দ্বারা নির্যাতিত ব্যক্তি—স্ত্রী বা পুরুষ—সমবেদনার পাত্র পাত্রী; কিন্তু এই মূল সূত্র বিস্মৃত হইয়া, আধুনিক হিন্দু-সমাজ নির্য্যাতিতের প্রতি সমবেদনার পরিবর্ত্তে যাহা বর্ষণ করে, তাহা অবিমিশ্র অত্যাচার,—শাস্ত্রাচার নহে, শস্ত্রাচার;—অজ্ঞতাপ্রসূত অমার্জ্জনীয় অনাচার। এই-সকল স্থলে, হিন্দু-সমাজের দ্বার রোধ না করিয়া, উন্মুক্ত-দ্বারে প্রসারিত ক্রোড়ে নির্যাতিতগণকে স্থান দান করিবামাত্র হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবার জন্য মুসলমানের আগ্রহ মন্দীভূত হইয়া কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই পথে হিন্দুসমাজের 'সংগঠন'-কার্য্য পরিচালিত করিলে, তাহা 'সং'-'গঠন' হইবে না।

হিন্দুসমাজে নারীর মর্য্যাদা যে-ভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে হিন্দু রমণীর পক্ষে পরকৃত "বলাৎকারে" স্বধর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই; কেবল স্বকৃত পাপই ধর্ম্মনাশের ও সমাজচ্যুতির একমাত্র কারণ। যেখানে তাহা সংঘটিত হয়, সেখানে "বর্জ্জন" এবং যেখানে তাহার সম্পর্ক নাই সেখানে "গ্রহণ" কেবল প্রার্থনীয় নহে, তাহাই শাস্ত্রানুমোদিত প্রকৃত ব্যবস্থা।

বলপূর্ব্বক হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মে সমাজ-রক্ষার যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা নিবদ্ধ আছে তাহা যুক্তি-যুক্ত উদার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে পাপের তারতম্য অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলেই বর্জ্জনের বা ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোন স্থলেই বহিষ্করণের ব্যবস্থা নাই। যে-সকল স্থলে বর্জ্জনের বা ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, সে-সকল স্থলে 'বর্জ্জন' বা 'ত্যাগ' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা ধর্ম্মনাশ বা জাতি-নাশ সূচিত করে না; অপরাধীর স্ব-সমাজে অচল হইবার কথাই সূচিত করিয়া থাকে। যেখানে অন্যে বলপূর্ব্বক হিন্দুর জাতিনাশের বা ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করে সেখানে নির্য্যাতিতের অপরাধ হয় না, এবং তাহার বহিষ্করণের কারণ উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাই যে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য মূল সূত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য নিবন্ধকারগণ নানা স্থানে নানা ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পাপের নাম "প্রায়:"; তাহার বিশোধনের নাম 'চিত্তং"; এইরূপে "প্রায়শ্চিত্ত" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে শাস্ত্রকারগণ পাপের বিশুদ্ধি-ক্রিয়াকে "প্রায়শ্চিত্ত" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে নারীর মর্য্যাদা সুরক্ষিত করিবার জন্য যার-পর-নাই সহানুভূতি মূলক বিধি-ব্যবস্থা নিবদ্ধ আছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা প্রমাদবশতঃ হউক, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা বলপ্রয়োগে হউক, অথবা নিতান্ত স্বভাবদোষে হউক, স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন স্থলেই ত্যাগের বা বর্জ্জনের ব্যবস্থা নাই।

স্ত্রী ন দুষ্যতি জারেন নাগ্নির্দহন-কর্ম্মণা।
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং ন দ্বিজো বেদকর্ম্মণা॥

'জীর্য্যতি স্ত্রীয়াঃ সতীত্বমনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিক্রমে স্ত্রী-সতীত্ব-বিনাশকারী ব্যক্তি "জার" নামে কথিত। উদ্ধৃত বচনে জানিতে পারা যায়, পরপুরুষ ধর্ষিতা রমণী জারের কার্য্যের জন্য অপরাধিনী হয় না, সুতরাং মুসলমান-ধর্ষিতা হিন্দু রমণীকে হিন্দুসমাজে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়া আধুনিক হিন্দুজন-সাধারণই নির্য্যাতিতার প্রতি অবিচার এবং নির্য্যাতনের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে।

হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষার এইসকল উদার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া আধুনিক হিন্দু জন-সাধারণ নির্য্যাতিতা ভগিনীদিগের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ না হইয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে গিয়া, তাহাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাহাদিগের প্রতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া আসিতেছে; এবং তজ্জন্যই এক শ্রেণীর মুসলমান মনে করিতেছে—বলপূর্ব্বক হিন্দুরমণীকে উপভোগ করিতে পারিলেই তাহাকে বাধ্য হইয়া মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু জন-সাধারণের এই অজ্ঞতা দূর হইলে দুর্ব্বৃত্তগণের এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার উত্তেজনা মন্দীভূত হইয়া যাইবে।

আধুনিক হিন্দু জন-সাধারণ শাস্ত্রানভিজ্ঞতাবশতঃ নির্য্যাতিতা রমণীকে এবং নির্যাতিত পুরুষকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া নির্য্যাতনকারিগণের দুষ্কৃতি-সাধনে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে।

কেন এমন হইল তাহা ঐতিহাসিক কথা। তাহার সহিত হিন্দুর স্বাধীনতা-লোপের সম্পর্ক আছে। স্বাধীনতার দিনে কামতঃ এবং অকামতঃ কৃতকর্ম্মের শ্রেণী-ভাগ ছিল। পরাধীনতার যুগে তাহা জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ বলিয়া কথিত হইতে আরম্ভ করে। ইচ্ছা না থাকিলেও বিধর্ম্মী প্রবল পুরুষের অপ্রতিবিধেয় পীড়ন-ভয়ে লোকে যখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তখন তাহা অনিচ্ছাকৃত হইলেও অজ্ঞানকৃত হইত না। এই শ্রেণীর কার্য্যকেও প্রায়শ্চিত্তে বিশোধিত করিয়া লইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিলে হিন্দুধর্ম্মের সহানুভূতিপূর্ণ উদারতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। শুদ্ধি-ক্রিয়া তাহা সাধিত করিতে অগ্রসর হইলে কোনও অহিন্দু তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারে না। মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর শুদ্ধি-ক্রিয়ার বাধা প্রদানের বা আপত্তি প্রকাশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ ও আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে খৃষ্টান তাহাতে বাধা প্রদান বা আপত্তি প্রকাশ করিতে পারে না। হিন্দু একবার পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার হিন্দু হইয়া হিন্দু-সমাজে প্রবেশ ও আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে, পরধর্ম্মিগণও তাহাতে বাধা প্রদান বা আপত্তি প্রকাশ করিতে পারে না।

যাহার রোগ তাহাকেই চিকিৎসা করিতে হইবে। কেবল রাজপুরুষ-

দিগের মুখের দিকে অথবা মুসলমান নেতৃপুরুষদিগের সুবিবেচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

(ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

—

ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্‌লা-ভাষার রাজ্যে এখন বহু বিষয়ে অরাজকতা চ'লেছে। এখানে শৃঙ্খলা আনা চাই। কিন্তু এ বড়ো কঠিন কাজ। প্রথমেই তো দেখা যায়, বাঙ্‌লার বানান-সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নেই। 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ যেগুলি ভাষায় আমদানী করা হ'য়েছে আর যেগুলি নিজেদের মূল সংস্কৃত রূপ অনেকটা অক্ষুণ্ণ রেখেছে (তা উচ্চারণেই হোক্ আর কেবল বানানেই হোক্,) সেগুলি নিয়ে কোনও গোল নেই। সেগুলি বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত বানানই বজায় রাখবে। 'অর্দ্ধ তৎসম' অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে বার ক'রে নেওয়া আর তার পর বাঙালীর মুখে বিকৃত হ'য়ে যাওয়া শব্দ নিয়েও তেমন ঝঞ্ঝাট নেই; এগুলিকে আমরা প্রায়ই উচ্চারণ অনুসারে বানান করি; যেমন কেষ্ট, নেমন্তন্ন, চন্নামের্ত্ত, চক্কত্তী, ভট্‌চাজ, গীগ্‌গির, মোচ্ছব, ইত্যাদি। কিন্তু যত গোল হয় 'তদ্ভব' অর্থাৎ কিনা খাঁটী বাঙলার শব্দে আর রূপে। বিদেশী শব্দের সম্বন্ধেও আমাদের কোনও শৃঙ্খলা নেই। যাঁরা 'কাজ' শব্দকে অন্তস্থ 'য' দিয়ে, বা 'সোনা' শব্দকে মূর্দ্ধণ্য 'ণ' না দিয়ে লিখ্‌লে ভাষার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হলো মনে করেন, তাঁরা অম্লানবদনে—আর অকম্পিত করে—দন্ত্য 'স' দিয়ে 'সাধ সরম সহর,' লেখেন, তালব্য 'শ' দিয়ে 'শোওয়া লেখেন, আর মূর্দ্ধন্য 'ষ' দিয়ে 'জিনিষ' লেখেন। সংস্কৃত ব্যাকরণিয়াদের হাতে প'ড়ে বাঙলায় প্রাকৃতজ তদ্ভব শব্দগুলি তাদের বানানের ইতিহাসকে ভুলে গিয়েছে। এ-সব বিষয়ের সমাধান করতে গেলে, ব্যাকরণের খুঁটী-নাটী আলোচনা ক'রে যাঁরা-আনন্দ পান এমন বাঙালীর বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাস আর তার আধুনিক কালের হালচালের সম্বন্ধে ঠিক খবর জান্‌বার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ভাষার ঠিক স্বরূপটি নির্ণয় হ'লে তবে তার সম্বন্ধে নিয়মাবলী করতে পারা যাবে।

বাঙলা-ভাষার ব্যাকরণ অনেক লেখা হ'য়েছে, কিন্তু তার সবগুলিই হচ্ছে সংস্কৃতের আওতায় বেড়ে ওঠা আধুনিক সাহিত্যের 'সাধুভাষা'র ব্যাকরণ। বাঙ্‌লার ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যেটুকু কাজ হ'য়েছে তাও নগণ্য। বিদেশীরা যা কিছু একটু এবিষয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রবার কালে ক'রেছেন। বাঙ্‌লা-ভাষীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে বাঙ্‌লাব্যাকরণ প্রকাশ করেন ('গৌড়ীয় সাধুভাষার ব্যাকরণ') এই বইয়ে রামমোহন তাঁর অনন্য-সাধারণ সহজ-সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। বাঙ্‌লা ভাষার শব্দ-সাধন বল্‌লে বাঙ্গালী ব্যাকরণিয়ারা বুঝতেন ভাষাগত সংস্কৃত শব্দের সাধন, খাঁটী বাঙ্‌লা, তদ্ভব শব্দ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চাইতেন না—বাঙ্‌লার ঠিক রূপটি কি সে-বিষয়ে সাধারণতঃ কোনও ধারণা তাঁদের না থাকায়। ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর বাঙ্‌লা-ব্যাকরণে এই বিষয়ে আলোচনা করেন, আর খাঁটী বাঙ্‌লার শব্দ আর প্রত্যয় নিয়ে 'ঐতিহাসিক আলোচনা' করেন, তাদের উৎপত্তি আর বিকাশের সূত্র বার করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু আধুনিক কালের কথিত বাঙ্‌লাভাষার আলোচনার কতকগুলি মৌলিক প্রসঙ্গ বাঙালীর কাছে প্রথম উত্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্তব্যগুলি ১২৯৮ সাল থেকে বা'র হ'তে থাকে, সেগুলিকে 'শব্দতত্ত্ব' নাম দিয়ে আলাদা বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হ'য়েছে; পরে দু-একটি লেখা যেমন বাঙ্‌লা ভিন্নরূপের উপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় আর অন্যত্র বেরিয়েছে। কোন্ পথ ধ'রে বাঙ্‌লা-ভাষার চর্চ্চা করতে হবে তা এমন ক'রে তাঁর আগে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। আধুনিক মতে ব্যাকরণের তিন অঙ্গ—১। উচ্চারণ-বানান-ছন্দ, ২। সুপ-তিঙ্-কৃৎ তদ্ধিত শব্দসাধন আর ৩। বাক্যরীতি। এর মধ্যে উচ্চারণ-টাই এক হিসাবে সব-চেয়ে বেশী দরকারী জিনিস—উচ্চারণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার বিভক্তি ও প্রত্যয়ও বদ্‌লায়, ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙ্‌লার উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি সাধারণ কথা—এত সাধারণ কথা যে সেগুলি আমরা আগে লক্ষ্যই করি নি—রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেন। বাঙ্‌লার উচ্চারণের আর বাঙ্‌লার ধ্বনি-সমষ্টির ইতিহাসের সব-চেয়ে বিশিষ্ট কতকগুলি সূত্র বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন (তাঁর 'বাংলা উচ্চারণ,' 'টা টো টে,' 'স্বরবর্ণ অ' 'স্বরবর্ণ এ,' ১২৯৮ আর ১২৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে)। কি কোল, কি দ্রা'বড়, কি আর্য্য—আধুনিক কালের সমস্ত ভারতীয়-ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাহাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৩০০ সালে প্রকাশিত 'ধন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের একটি পূর্ণ সংগ্রহ দিয়েছেন, আর এইরূপ শব্দ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটুকু তাঁর কবিমনের কাছে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা তিনি ব্যক্ত করেছেন। ভারতের আর কোনও ভাষায় এইরকম শব্দের এর চেয়ে ভালো আলোচনা আছে কি না জানি না। পরে ১৩১৪ সালে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'ধ্বনি-বিচার' নামে এক উপাদেয় আর বহুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও খুঁটিয়ে আলোচনা করেন। তেম্‌নি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দ-দ্বৈত' (১৩০৭ সাল), 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮), 'সম্বন্ধে কার' (১৩০৫) আর 'বাংলা বহুচন' (১৩০৫) প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা আছে। বীম্‌সের বাঙ্‌লা ব্যাকরণ সমালোচনা উপলক্ষে (১৩০৫ সালে লেখা) বাঙ্‌লার উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রেছেন; আর তার 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে বাঙ্‌লার কতকগুলি সাধারণকর্তৃক অলক্ষিত বিশেষত্ব পরিষ্কার ক'রে দেখানো হ'য়েছে।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা কেবল উপলব্ধি দ্বারা হয় না, একে প্রতি পদে বাঙ্ময় বস্তুকে উচ্চারিত শব্দকে আশ্রয় ক'রে চ'ল্‌তে হয়। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর অধ্যয়নের আর চিন্তার বহু প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। এই বিস্তার আলোচনায় যে পরিশ্রম আবশ্যক তা তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবেই তো তিনি তাঁর সহজ-বুদ্ধি-প্রসূত ভাষার স্বরূপ-বোধকে বিজ্ঞানের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত ক'রে দেখাতে পেরেছেন। তিনি স্পষ্ট ক'রে বাঙালীকে ব'লেছেন যে, 'প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার-প্রকার আছে, এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যোগ্য লোকের উৎসাহ হওয়া উচিত।'

(শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—

কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি ও তাঁহাদের কবিতা

কবি গঙ্গ—

অকবর বাদশার সভাতে কবি গঙ্গ নামক এক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিছুই জানা নাই। যদিও তিনি একজন বেশ বড় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি তাঁহার অতি অল্পই কবিতা পাওয়া যায়।

বেশীর ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অকবরের সেনাপতি অবদুল রহীম খানখানা স্বয়ং পার্সী, তুর্কী, হিন্দী ও রাজপুতী ভাষায় প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন ও অন্য কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একদিন কবি গঙ্গ নিম্নলিখিত কবিতা রহীমের গুণ বর্ণনা করিয়া রচনা করিয়া আনিলেন ও দানবীর বেরম-পুত্র অবদুল রহিম খানখানাকে শোনাইলেন :—

চকিত ভঁওয়র রহি গয়ো গমন নহিঁ করত কমল-বন।
অহি ফণি মণি নহিঁ লেত তেজ নহিঁ বহত পবন ঘন॥
হংস মানসর ত্যজো চক্ক চক্কী ন-মিলে অতি
বহু সুন্দরি পদ্মিনী পুরুষ ন চহৈঁ, ন করেঁ রতি।
খলভলিত সেস কবি গঙ্গ ভনি, অমিত তেজ রবি রথ থম্ভো।
খান খানান বেরম-সুবন জিদিন ক্রোধ করি তঙ্গ থম্ভো॥

অর্থাৎ যে-দিন বেরম-পুত্র খান-খানা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সে-দিন ভ্রমর ভয়ে স্থির হইল আর কমল-বনে গেল না; সর্প আপনার মণি ফেলিয়া আর কুড়াইয়া লইতে সাহস করিল না; পবনদেব ভয়ে আর প্রবলরূপে বহিতে সাহস করিল না; হংস মানস-সরোবর ত্যাগ করিল; চক্রবাক্ চক্রবাকী উভয়ের নিকটে আসিতে ভয় পাইল; সুন্দরী পদ্মিনীরা পুরুষদের কাছে আসিতে সাহস করিল না; কবি গঙ্গ বলিতেছেন যে, স্বয়ং অমিত-তেজ সূর্য্যদেব ভয়ে রথ দাঁড় করাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

খানখানা সেই সময়ে বা অল্প পূর্ব্বে একখানি ৩৬ লক্ষ টাকার হুণ্ডী পাইয়াছিলেন, হুণ্ডীখানি সম্মুখেই ছিল। কবির গুণবর্ণনা শুনিয়া তিনি সেই হুণ্ডীখানি কবিকে দক্ষিণা দিলেন।

কবি নরহরি—

অকবরের রাজ-সভাতে কবি নরহরি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস ফতেপুর জেলাতে অশনিগ্রামে। তিনি ১৫০৫ ঈশাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ১৬১০ ঈশাব্দে ১০৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

অকবর দরবার-আমে বসিয়া সাধারণ প্রজার শোক অভিযোগের কথা শুনিতেন, ও সকলের দুঃখ দূর করিতেন। এক দিবস ঐরূপ দরবার-আম সভাতে কবি নরহরি যাইতেছিলেন, পথে দেখিলেন একজন কসাই একটি গাভী লইয়া যাইতেছে। গাভী তাহার রক্ষকের কবল হইতে পলাইয়া কবির পাল্কীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কবি কসাইকে মূল্য দিয়া গাভীটি লইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন এখন এ গাভীটি কি করি। চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটি একখানি কাগজে লিখিয়া গাভীর গলায় বাঁধিয়া দিলেন ও দরবার-আমে অভিযোগকারীদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। গাভীর গলাতে দরখাস্ত বাঁধা দেখিয়া অকবর পড়িতে বলিলেন, কর্ম্মচারীরা পড়িয়া শুনাইল :—

অরি হুঁ দন্ত'তৃণ ধরৈঁ, তাহি মারত ন সবল কোই।
হম সতত তৃণ চরহিঁ, বচন উচ্চরহিঁ দীন হোই॥
অমৃত পয় নিতস্রবহিঁ, বচ্ছ মহি থঁভন জাবহি।
হিন্দু হিঁ মধুর ন দেঁহি, কটুক তুরুকহিঁ ন পিয়াবহিঁ॥
কহ কবি নরহরি, অকবর সুনো, বিনবত গউ জোরে করন্।
অপরাধ কওন মোঁহিঁ মারিয়ত, মুয়হুঁ চাম সেবই চরণ॥

অর্থাৎ—শত্রুও যদি দন্তে তৃণ ধারণ করে তবে সবলেরা আর তাহাকে মারেন না, আমরা সতত সেই তৃণই খাইয়া থাকি, কখনও দীন হইয়া উচ্চ বচনে কথা কহি না, আমরা নিত্য অমৃত-রূপ দুগ্ধ স্রাব করি, আপনার বৎসের ভাগ তোমাদের দিই, হিন্দুদের মধুর দুগ্ধ দিয়া তুর্কীদের কটু দুগ্ধ দিই না, সকলকে সমান দিয়া থাকি। কবি নরহরি বলিতেছেন, হে অকবর শুন, গো-জাতি হাত জোড় করিয়া বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমরা কি অপরাধ করি যে আমাদের তোমরা মার? আমরা ত আপনার চামড়া দিয়া তোমাদের সেবা করিয়া থাকি।

প্রবাদ আছে যে, এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া অকবর পরে আপনার রাজ্যে গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন।

(১৫৭৯ ঈঃ)

কবি জাফর—

অওরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লীতে জাফর নামক এক কবি ছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতাকে সম্রাটও ভয় করিতেন। তিনি জাফর জটল্লী (Jafar Zatalli) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একবার দিল্লীর গ্রীষ্মের আতিশয্যে কষ্ট পাইয়া বলিয়াছিলেন :—

অজ্ বহিশ্ত-এ জাবদাঁ মা রা ব-হিন্দ্ অন্দাখ্তী।
হম্-চু হিন্দ্ অর্ দাশ্তী, দোজখ্ চিরা হম্ সাখ্তী?॥

(হে ঈশ্বর!) তুমি আমাকে চির-স্বর্গ হইতে ভারতে ফেলিয়া দিয়াছ। যখন তোমার সৃষ্ট স্থান মধ্যে ভারতের মত স্থান ছিল, তখন আবার নরক সৃজন করিলে কেন?

সাদী ও হাফিজ—

পারস্য দেশে শীরাজ নগর বিদ্বান, কবি, আঙ্গুর ও সুরার জন্য প্রসিদ্ধ। একজন লেখক লিখিয়াছেন, শীরাজের জল-বায়ুতে এমন গুণ আছে যে, সমস্ত দিবস মস্তিষ্ক চালনা করিয়াও কেহ ক্লান্ত হয় না। শীরাজে যতগুলি বড় বড় কবি ও বিদ্বান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অন্য কোনও এক নগরে এত জন্মগ্রহণ করেন নাই। শীরাজের কবিদের মধ্যে সাদী ও হাফিজ প্রসিদ্ধ।

সাদী (মস্লহ-উদ্-দীন শেখ সাদী শীরাজী) বলিয়াছেন :—

১। হর্ কি অ্যাব এ-দিগরাঁ পেশ এ-তো আওর্দ ও শমুর্দ।
বে গুমাঁ অ্যাব-এ তো পেশ-এ-দিগরাঁ খোয়াহদ্ বুর্দ॥

যে কেহ পরের দোষ তোমার কাছে আনিয়া কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয় তোমার দোষও পরের কাছে বলিয়া বেড়ায়।

২। গর্ সফীহে জবাঁ দরাজ কুনদ
কি ফলানে ব কস্‌ক মুমতাজ অস্ত॥
ফসক-এ-মা বে বিয়ান যকী ন-শওয়দ্।
ব ও ব-ইক্‌রার-এ-খেশ গম্মাজ অস্ত॥

যদি কোনও বুদ্ধিহীন ব্যক্তি (আমার সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়ায়, যে অমুক লোক নির্ব্বোধ, তাহা হইলে (শ্রোতারা) আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় না পাইলে এ কথা বিশ্বাস করে না; কিন্তু সে ব্যক্তি আপনার উক্তির দ্বারাই আপনাকে পর-নিন্দুক বলিয়া প্রকাশিত করে।

৩। গর দর হমা শহর ইক্ সর-এ-নেশতর অস্ত।
দর্ পায় কসে রওয়দ কি দুরওয়েশ্ অস্ত॥

সমস্ত নগরে যদি একটি মাত্র বড় কণ্টক পথে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে পথিকদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী তাহার পায়েই সে কাঁটা ফোটে। অর্থাৎ দুরবস্থার সহিতই আপদ-বিপদ আসিয়া থাকে।

৪। ইল্‌ম্ চন্দা কি বেশ্তর্ খোয়ানী।
চু অমল্ দর্ তো নেস্ত, নাদানী॥
ন-মুহক্কক বুওয়দ, ন দানিশমন্দ।
চার-পায়ে বর্-ও কিতাবে চন্দ॥
আঁ তিহী মগজ রা চি ইল্‌ম-ও-খবর?
কি বর-ও হেজম অস্ত, ইয়া দফ্তর?

বিদ্যা, তুমি যত ইচ্ছা তত অর্জ্জন কর, কিন্তু যদি তাহার সদ্ব্যবহার না জান তবে তুমি একটি মূর্খ। (সৎ-ব্যবহার না জানিলে) তুমি আচার্য্যও হইবে না, বুদ্ধিমানও হইবে না, ঠিক একটি চারপাইর (খাট অথবা চতুষ্পদ পশু) মত থাকিবে, তোমার উপর কতকগুলি পুস্তকের

বোঝা থাকিবে। তোমার মত মস্তিষ্কশূন্য ব্যক্তি কি বুঝিবে তোমার পিঠের উপর এক বোঝা জ্বালানী কাষ্ঠ রহিয়াছে কিম্বা কতকগুলি পুস্তকের বোঝা রহিয়াছে।

৫। ব কোশিশ তওয়া দজ্‌লা রা পেশ্‌ বস্ত্‌।
 ন শায়দ জবান-এ-বদ্‌-অন্দেশ বস্ত ॥

চেষ্টা করিলে দজলা নদী॰ (Tigris River, a river famous for floods) প্লাবন আট্‌কাইতে পারা যায় ; কিন্তু পর-নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে পারা যায় না।

৬। তা-অম্রত কুনন্দশ গর অন্দক খুর অস্ত।
 কি মালশ্‌ মগর রোজ্‌-এ-দিগর অস্ত ॥
 ও অগর নগজ-ও-পাকীজা বাশদ খুরশ।
 শিকম-রন্দা খোয়ানন্দ ও তন্‌-পর্‌ওয়রশ্‌ ॥

যদি কেহ অল্প পরিমাণে আহার করে ও মিতব্যয়ী হয়, তবে লোকে (নিন্দুকেরা) বলে সে মহা কৃপণ, পরের জন্য ধন সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু যদি কেহ ভাল জিনিস খায় তবে (নিন্দুকেরা) বলে সে একটি উদর-পরায়ণ, নিজের শরীর লইয়াই আছে।

ওমর খৈয়াম—

ইরানের প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়াম বলিতেছেন :—
জাহিদ গোয়দ বহিশত্‌ ও হুর খুশ অস্ত।
 মনন মি গোয়ম্‌ শরাব-এ-অঙ্গুর খুশ অস্ত ॥
ঈঁ নক্‌দ বিগীর, ও দস্ত অজ্‌া নসির বিদার।
 কি, আওয়াজ-ই-দহল শনীদন আজ দূর খুশ অস্ত ॥

সাধুরা বলেন, স্বর্গ ও হুর বেশ ভাল দ্রব্য। কিন্তু আমি বলি আঙ্গুরের সুরা অতি সুন্দর দ্রব্য। এই হাতে হাতে নগদ সওদা (অর্থাৎ আঙ্গুরের সুরা) গ্রহণ কর ও ধারের সওদা (অর্থাৎ আজীবন রস ভোগ না করিয়া পরকালে স্বর্গ ও হুর লাভের আশা) ছাড়িয়া দাও মনে রাখিও, ঢাকের বাদ্য দূর হইতে শুনিতেই বেশ ভাল বোধ হয়। [অর্থাৎ এমন খাঁটি আঙ্গুরের সুরা পান করিয়া সুখ করিয়া লও, পরকালের আশায় থাকিও না, পরকালে কি হইবে না হইবে কে জানে, যাহা হাতে নগদ পাইয়াছ তাহা ছাড়িও না।]

(উত্তরা, কার্ত্তিক ১৩৩৩) শ্রী অমৃতলাল শীল

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

উনিশ

বার বার ঘুরে ফিরে মিঠে গলায় গানটি গেয়ে প্রবাল চুপ করলে। কেদার মুগ্ধের মত ব'লে উঠল—"বাঃ অনেকদিন পরে উপবাসী মনটা আমার সুরের রস পান ক'রে তৃপ্ত হ'ল।"

প্রবাল হেসে বল্‌লে—"তুমি কি বল্‌তে চাও এদেশে গায়কেরও দুর্ভিক্ষ! তা আমি বিশ্বাস করব না। কাল রাত্রে বেড়িয়ে আস্‌বার সময় একজনদের বাড়ী বেশ গান শুনে এলাম। ইচ্ছে হ'ল গিয়ে আলাপ জমাই, কিন্তু সাহস হ'ল না।"

কেদার বল্‌লে—"গায়ক দুর্ভিক্ষ হ'লেও আমার মত অরসিক লোক সে জায়গায় এগুতে পারে না। নবীন আর অধর ব'লে দুটি ছোকরার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে আস্‌ছিল; তাদের গান বাজনার সখও আছে, কিন্তু সে সব অস্থানে-কুস্থানে তাদের গতিবিধি জানতে আর তাদের কাছ ঘেঁস্‌তে দিই না। আসল কথাটা কি বুঝেছ ভাই, সাধারণের রুচিটা পর্য্যন্ত এমন বিগ্‌ড়ে আছে যে-এদের কাছে গান বাজনার সখ মানেই কুস্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ ছাড়া সঙ্গীতের যে কত বড় উচ্চ দিক বা শক্তি আছে তা এরা ভাব্‌তেই পারে না। যাক্‌ সে কথা—তুমি আরও দুটো গান গেয়ে শোনাও।" প্রবাল বল্‌লে—"এখন আর থাক্‌—ইচ্ছে হ'লেই গাইব শুনে অরুচিও ধর্‌বে।"

কেদার একটু চুপ্‌ ক'রে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস কর্‌লে—"হ্যাঁ হে প্রবাল—বে'থা ক'রে সংসারী ত হ'লে না। শেষ পর্য্যন্ত চিরকুমার সভার সভ্য থেকে যাবে না কি?"

প্রবাল বল্‌লে—"তা হ'লে ত সেই তোমারই পদিং-প্রাপ্ত হওয়া যাবে। দুই বন্ধুর এক যাত্রায় পৃথক ফল হবেই বা কেন?"

কেদার বল্‌লে—"সত্যিই তোমার ইচ্ছে এখন কি?"

প্রবাল বল্‌লে—"ইচ্ছের সঙ্গে বোঝা-পড়া ভাল ক'রে এখনও করি নি। বাবা একদিন কি রকম ক'রে বোঝো

ভুগে কষ্ট পেলেন, ধারকর্জ্জও শোধ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে যে আমি বিবাহচর্চ্চা আর প্রণয়চর্চ্চা করতে ব'সে যাই নি সেজন্যে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ দিই।"

কেদার বললে—"এইবার কি করবে? মা ত তীর্থ-বাসিনী হ'লেন, এইবার তোমার দশা কি হবে?"

প্রবাল সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—"তোমার বামুন-টামুন সব কোথায় উধাও হ'ল হে? ক্ষুধা বোধ হচ্ছে যে, কেউ এসে খেতে না দেয় ত আমি নিজেই খুঁজে পেতে বার ক'রে আনি।"

কেদার বললে—"স্থিরো ভব। ওঁরা এখুনি এলেন ব'লে। সই আজ ছানার ডাল্না আর ডিমের কারী যা রান্না করেছেন তা অতি উপাদেয়।"

প্রবাল হঠাৎ ব'লে উঠল—"তোমার সইটিকে দেখলে ভারী দুঃখু হয় হে। বেচারীর অনেক গুণই আছে, স্বভাবটিও বড় মধুর, কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তার কি অবস্থা!"

কেদার বললে—"সত্যিই সইয়ের জন্যে আমারও দুঃখু হয়। শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা অপয়া ব'লে ঠাঁই দিতে চায় না। বাপ আবার বিয়ে করার পর থেকে সইএর মন ক্ষুণ্ণ, সৎমাও সন্তুষ্ট নন্। তাতেই দিনকতক এখানে এসে রয়েছেন। তবে শীগগীর বাপের কাছেই চ'লে যাচ্ছেন। নিজের চেষ্টায় নানারূপ শিল্পকাজ লেখাপড়া সব কিছুই শিখেছেন। ভাল ক'রে আলাপ করলে জানতে পারবে ওর মধ্যে যে প্রাণটি আছে তা যেমনি কোমল তেম্‌নি মধুর আবার তেম্‌নি তেজস্বী। এই যে ও এখানে আস্‌বার পর ওকে নিয়ে চারদিকে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে ও তা একটুও গ্রাহ্য করে না। মিথ্যা কথার দৌড় দেখে আমরা শুদ্ধ সময়ে সময়ে রেগে যাই, কিন্তু ও শুনে হাসে আর বলে—তবু ভাল যে এ অপদার্থ জীবনটা এ জন্মের মত লোকের দুদণ্ডের আলোচনার খোরাক জোটাতে পেরে সার্থক হ'ল। অথচ ভিতরে ভিতরে মেয়ে-পুরুষদের এই অপদার্থ ভাবে সময় কাটানোকে ও এমন দরদের চক্ষে দেখে যে কি বলব।"

হঠাৎ প্রবালের হৃদয়ের একটা চিরুরুদ্ধ দ্বার খুলে গিয়ে তরুণ প্রেম বেরিয়ে এসে ব'লে উঠল "এই আমার মানসী, একেই আমি চাই।" প্রবাল নিজের অন্তরস্থিত গুপ্ত প্রেমের এই সহসা আত্মপ্রকাশে নিজেই যেন চমকে উঠল। হা রে অবোধ, না আছে তোর নীতির বাঁধন, না আছে তোর সমাজ বা লোকাচারের বিভীষিকা, যাকে-তাকে এসে মানসী ব'লে দাবী করলেই হ'ল? আচ্ছা পাগল ত!

মনের মধ্যে যার সম্বন্ধে এতটুকু সঙ্কোচের ভাব না থাকে তার চরিত্র আলোচনা করতে মানুষের মোটেই বাধে না। কিন্তু হঠাৎ এখন প্রবালের মনে সেবার সম্বন্ধে যে ভাবটি জেগে উঠল, তাতে ক'রে আর সে সেবার আলোচনায় ভাল মন্দ কোন মন্তব্যই প্রকাশ করতে পারলে না। অথচ নিজে নিজেই একটা কুণ্ঠার ভারে যেন সে পীড়িত হ'য়ে উঠল।

প্রিয় আর সেবা জয়াকে নিয়ে ফিরে এলে কেদার প্রিয়কে বললে—"তোমার ঠাকুরপোটির পেটের আগুন কোঁচায় লেগে সৃষ্টি পুড়ে যাবার জোগা শীগগীর দুই সই-এ মিলে নেবাবার আয়োজন কর।" প্রিয় হেসে বললে —"আহা, খিদেতে কষ্ট পেয়েছে তা হ'লে,—আমাদের উঠি উঠি ক'রেও একঘণ্টা গল্প হচ্ছিল। সই তুই খাবার আন্ গিয়ে আমি ঠাঁই ক'রে দিই।"

সেবা বললে—"তা আন্‌ছি। ইতিমধ্যে আগুনটা যেন ছড়িয়ে না পড়ে, আমাদের এই সেদিনে সব নতুন লেপ-তোষক তৈরী হয়েছে।" কথার শেষটা সে প্রবালের মুখের দিকেই চেয়ে বললে। প্রবাল এই সামান্য কথাটার উত্তর আর সহজ হাসির সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে পারলে না, কেমন যেন একটা জড়তার ভাব তাহার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে।

যথাসময়ে আহারাদির পর সকলে আপন আপন স্থানে গিয়ে শয্যা নিলে। প্রবাল সেই আঙিনার মধ্যে বিছানো ক্যাম্বিস খাটের উপরেই শুয়ে পড়ল; ঘুম তার চোখে আসে নি। মাথার উপর জ্যোৎস্নাস্নাত নীলাকাশ; শীতের কুয়াসা যাই যাই ক'রে বিদায় নিয়েও এখনও ধরার মায়াপাশ একেবারে ছিঁড়তে পারে নি; তাই তার একটু আভাস এখনও ফাল্গুনের আকাশে জড়িয়ে আছে, আর সেইজন্যেই শরতের শিউলী ফুলের মতন বসন্তের জ্যোস্না

অত নির্ম্মল নয়। বাতাসে কিন্তু এক অভিনব স্পর্শ, বেল-মল্লিকার গন্ধে এক অজানা পুলকস্পন্দনের অনুভূতি।

প্রবাল কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে, মুগ্ধ হৃদয়ে চেয়ে চেয়ে প্রকৃতির সেই অফুরন্ত রূপসুধা পান করলে, তারপর তার যৌবন চঞ্চল-চিত্তে একে একে অনেক কথা ভেসে উঠতে লাগল। জীবন পথে যৌবনের জয়-যাত্রায় সে এখন নবীন যাত্রী,কতকগুলা বাঁধন তার দেহে-মনে এতকাল যেন নাগপাশের মত শক্ত হ'য়ে বসেছিল। সে-বাঁধনকে সে কোনোদিনও নিজের অক্ষমতা বা বেদনাবোধের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেনি। কিন্তু প্রকৃতি ধীরে ধীরে সে বাঁধন নিজেরই হাতে খুলে দিয়েছেন; আজ তাই সে মুক্ত। কিন্তু মুক্তের পক্ষে আবার এই মুক্তিই হচ্ছে মস্ত বাধা, কেন না বাঁধাধরা পথের পথিক যে-নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে চলে মুক্তের সে পথ নয়, তাকে আবার নূতন পথ বেছে নিতে হয়।

আজ হঠাৎ প্রবালের একি মোহের সূচনা হ'ল? সে যে আজ নিজের মনের দুর্ব্বলতার পরিচয়ে নিজেই লজ্জা আর কুণ্ঠায় পীড়িত হ'য়ে উঠছে?

সেবা, সেবা, তার চিন্তায় মন আজ কেন এমন উন্মনা হ'তে চায়? তার চিন্তা কি অসঙ্গত নয়, পাপ নয়? সমাজের শাসন, শাস্ত্রের নিষেধ বিধি এ গুলোকে উল্লঙ্ঘন ক'রে ঐ তরুণী বিধবার প্রতি এই যে তার হৃদয়াবেগ একি ধৃষ্টতা নয়? তবে হ্যাঁ—সেবার বৈধব্য তাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচারিণীর ব্রতাধিকার বাইরের দিকে দিলেও অন্তরের মধ্যে খুব সম্ভব দিতে পারে নি। কেন না, নিতান্ত তরুণ বয়সে সে স্বামীহারা। তা ছাড়া উন্মত্ত স্বামীর সঙ্গে তার হৃদয়ের পরিচয় হবার কোনো দিনই সুযোগ ঘটেনি। এ অবস্থায় শাস্ত্র তাকে যে জায়গাতেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করুক না কেন, হৃদয়ের দিক্ দিয়ে সে আজও কুমারী, সুতরাং তার সম্বন্ধে চিন্তা করাটা হয় ত খুব দোষের না হ'তে পারে। সেবার বাইরের সৌন্দর্য্য ত প্রবালকে মুগ্ধ করেনি, কেন না এর চাইতেও সুন্দরী মেয়ে অনেকবার মা তার জন্যে নির্ব্বাচন ক'রে তাকে দেখিয়েছিলেন; কিন্তু মন ত কই সাড়া দিতে চায়নি। অথচ সেই [illegible] মন আজ সহজেই একে দেখেই যেন অভিভূত হ'য়ে [illegible] চাইছে—এই আমার মানসী! তবে মনের কথাটাকেই মেনে নিয়ে চলতে হ'লে অনেক সময় সংসারে অনেক বিপ্লব ঘ'টে যায়। নারীর রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হ'য়ে কতদিকে কত সময় কত পাষণ্ড তাদের অসংযত লালসার কী কুৎসিৎ পরিচয়ই না দিয়ে থাকে! প্রবাল সে কথা মনে ক'রে নিজেই শিউরে উঠে ভাবলে সেও কি তারই একটা আবৃত্তি করছে না কি? কিন্তু না—ও চিন্তা ও যে অসহ্য। বিধবা-বিবাহ ত অসঙ্গত নয়। সমাজ বিশেষে তার প্রথা ত রয়েইছে। হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে মহা-পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ত সে প্রথা অনুমোদন করেছেন। প্রবাল যদি সেবাকে ধর্ম্মানুযায়ী পত্নী ব'লে গ্রহণ করে তাতে ত কোনো বাধা হ'তে পারে না।

যৌবনের জয় সর্ব্বত্র—সংসারের কোনোপ্রকার আঘাত, বাধা, বেদনাকেই সে স্বীকার ক'রে মূর্চ্ছাতুরের মত প'ড়ে থাকতে রাজী নয়। তার জয়যাত্রার বিজয় রথ চলেছে সমস্ত বিশ্বের বুকের উপর দিয়ে ঘর্ঘর আনন্দ ধ্বনিতে।—কোনো শাসন, কোনো নিষেধ, কোনো কোলাহলই তাকে অধীর করতে পারে না। সুতরাং প্রবাল অতি সহজেই নিজের এই নবজাগ্রত অনুভূতির সঙ্গে একটা আপোষে নিষ্পত্তি ক'রে ফেলে অস্থির চিত্তকে শান্ত করতে পারলে। সেবার দিকে ভাববার কিছু সে প্রয়োজনও বোধ করলে না। তাকে যেন নিতান্ত আয়ত্তের মধ্যে পেয়েই সে আনন্দিত হ'ল। নূতন প্রণয়ের অনুভূতি তার হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এমন একটি সুরের কাঁপন ধরিয়ে দিলে যাতে তার সারা চিত্ত দুলে দুলে উঠতে লাগল। মনকে যেন আর ধ'রে রাখতে পারে না এমনি ভাব। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হ'লে নিজের এই হৃদয়ের কথা প্রাণের বন্ধুর কাছে নিবেদন ক'রে সহানুভূতি পাবে তাই সে ভাবতে লাগল। একবার ইচ্ছা হ'ল গানের সুরে মনের আবেগকে একটু মুক্তি দেয়। কিন্তু সুষুপ্ত গৃহবাসীরা পাছে কী ভেবে চমকে উঠেন তাই চেষ্টা করিতে করতে আর সাহস হ'ল না। নানা চিন্তার ও জল্পনা-কল্পনার মধ্যে সে নিদ্রা দেবীর হাতে [illegible] সমর্পণ করলে,—জানতেও পারলে না যে, এদিকে নিশি প্রভাত হ'য়ে এসেছে। চাঁদ আকাশ হ'তে [illegible]

ঘুমন্ত যুবার মুখখানিতে রূপালী রঙ মাখাতে লাগল, ফুট্‌-ফুটে জ্যোৎস্নার আলো ও ঊষার মিলনের সন্ধিক্ষণে সদ্য জাগ্রত পাখীগুলি, তখন ভোরের আগমনী গানে, স্তব্ধ দিককে সচকিত ক'রে তুলেছে!

কুড়ি

দুপুর বেলা কেদারের ঘরে শুয়ে প্রবাল কি একখানা খবরের কাগজ পড়ছে, সেবার ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে দুই সই খোকাকে ও মীনাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করছে, জয়া রান্নাঘরের বারান্দা ঝাঁট দিয়ে ধুতে ধুতে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে। সেবা একবার ব'লে উঠল, "মুখ ব্যথা করবে জয়া, কেন মিথ্যে বকাবকি করছিস্, আর করছিস্ যে কার সঙ্গে তাও ত বুঝছি না।" প্রিয় বল্‌লে, "কেন, কাকগুলো সামনেই রয়েছে, ওদেরই সঙ্গে কবৃছে। এঁটো ভাত, সকড়ী তারা চারদিকে ছিটিয়ে একাশা করেছে, তা ও বকবে না? ওকে যে, এখুনি সব পরিষ্কার করতে হবে।" আসল কথা, জয়া বেচারীর কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে হাত যেমন চলে মুখটিও সেই ওজনে না চালালে তার কাজ করা কঠিন। কাকদের উদ্দেশে বকাবকি করার ফাঁকে হঠাৎ যখন জয়া ব'লে উঠল, "এই যে, নন্দ দিদি আলচ গো, বিহেন বেলাকে গিন্নী মাকে সইমাকে আমি যবন কইনু তখন এনারা পেত্যয় করলেক্ নি, এখন শোধাক্ ক্যানে?" প্রিয় জিজ্ঞেস করলে—"কাকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আবার কার সঙ্গে গল্প জুড়লি জয়া?" জয়া উত্তর দিলে—"হাথ ক্যানে কে আলচে।" বলতে বলতে ঝাঁটা ফেলে জয়া নন্দার সঙ্গেই প্রিয়দের কাছে এসে দাঁড়াল। নন্দা আজ সকালেই শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে। সে-খবর জয়া সকাল বেলা ঘাটে বাসন ভিজুতে গিয়ে জেনে এসে প্রিয়কে দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে এ খবরটিও দিয়েছিল যে নন্দাকে তারা তাড়িয়েই দিয়েছে, আর না কি শ্বশুর বাড়ী মুখো হ'তে দেবে না। প্রিয় তা বিশ্বাস করেনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। নন্দার তেমন চটপটে ভাষা, আজ নির্ব্বাক্; মুখখানিও রোদে ঝলসে যাওয়া ফুলের মতন মলিন দেখে প্রিয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নন্দার হাত ধ'রে, কাছে বসাতে বসাতে বল্‌লে—"কখন এলিরে নন্দা, অসুখ করেছে না কি, মুখ চোখ এতো শুকো কেন?" নন্দা জবাব দিলে না, হেট মুখে ছল ছল চোখে ব'সে রইল। দেখে জয়া অধীর কণ্ঠে ব'লে উঠল—"তোমার সোয়ামী তোমাকে আর লিবেকনি, না নন্দাদিদি। নবীনের দিদির ঠেঁয়ে বিহেনে আমি সব শুনেছিলাম। শুনছ, গিন্নীমা, নন্দাদিদিকে ভাল কোরে সব শুধোও না, সব শুনতো পাবে।" প্রিয় সহজেই বুঝতে পারলে, কিছু এমন অপ্রিয় ব্যাপার ঘটেছে যাতে নন্দা খুবই ব্যথা পেয়েছে; কিন্তু জয়ার তীব্র কৌতূহল দেখে প্রিয় বিরক্ত হ'য়ে তার সামনে নন্দাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে না। বরং জয়াকে ধমক দিয়ে বল্‌লে, "এতো লোকের কথা নিয়ে তুই থাকতে পারিস্ জয়া! যা নিজের কাজ শেষ করগে। মতি বাবুর খোকার অসুখ বেড়েছে, কাজ সেরে আমরা একবার দেখতে যাব।" অগত্যা অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে জয়াকে নিজের কাজে চ'লে যেতে হ'ল। প্রিয় তখন নন্দার পিঠে হাত দিয়ে আদর ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"ভাত খেয়েছিস্ তো?" নন্দা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—খাইনি। "আহা কেনরে, এত বেলা অবধি শুধু মুখে আছিস?" সস্নেহে প্রিয় এই কথা বলতেই নন্দা উত্তর দিলে—"পিসীমা বলেছেন—ছাই খেয়ে থাকবি, সত্যিই আমি তাই ছাই খেয়ে থাকব।" বালিকার অভিমানের কথা শুনে সেবা ও প্রিয় দুজনেই না হেসে পারলে না। সেবা বল্‌লে—"ও জিনিষটা মোটেই সুখাদ্য নয়, নন্দা।" এই বার সত্যিই নন্দা কেঁদে ফেল্‌লে দেখে প্রিয় ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল, "পাগল মেয়ে, কাঁদিস্ কেন, কি হয়েছে তাই বল্ না; পিসীতো তোকে খুব ভালবাসেন, তিনি শুধু শুধু ছাই খাবারই বা হুকুম জারী করলেন কেন?"

নন্দা কান্না-ভরা সুরে বল্‌লে—"বিয়ের দিন রাত্তিরে বাসরঘরে হেমা পিসী আর নবীনের দিদি সেই যে বিয়ের কথায় আমি কি বলেছিলাম তা সব পাঁচখানি ক'রে কত কি তা ব'লে ঠাট্টা করেছিল; তাই উনি আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি তুমি এইসব কথা বলেছিলে?' আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ।' তার পর শাশুড়ী

ননদ সবাই এই কথা নিয়ে কত গুজগোল করতে লাগল। পাড়ার সকলেই কত যে কি সব বলতে লাগল তা আর কি বলব। শুনে শুনে আমার এত কান্না পাচ্ছিল যে আমি আর থাকতে না পেরে আমার সঙ্গে যে বিন্দু ঝি গেছল তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলাম, 'চল্ আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই, এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।' আমার এক ছোট ননদ তা শুনতে পেয়ে শাশুড়ীকে গিয়ে ব'লে দেয়। শাশুড়ী সেইদিনই বিকেলবেলায় গাড়ীতে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে।" কথা শেষ ক'রে চোখে আঁচল দিয়ে নন্দা কান্নায় ফেটে পড়ল।

ঘরে হঠাৎ নবীনের দিদি এসে উপস্থিত—"ওমা, যা বলেছি তাই ঠিক্। এই দ্যাখ দিদি তোমার ভাই-ঝি এখানে এসে ব'সে ঘরের দুঃখু জানাচ্ছে। মেয়ে তোমাদের যে সব সঙ্গ ধরেছে তাতে ওর মতিচ্ছন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্তির না।" নবীনের দিদির কথা শেষ হবার আগেই নন্দার পিসীমা এসে হাজির হলেন।

নন্দাকে বকাবকি করতেই সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল, এখন এরা নন্দাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। নবীনদের বাড়ী প্রিয় সেবাকে নিয়ে যাওয়া-আসা করত না, সেজন্যে নবীনের দিদির প্রিয়র উপর বেশ একটু আড়ি ভাব ছিল। এখন সুযোগ বুঝে কথার মধ্যে সেটিকে তিনি প্রকাশ ক'রে নিলেন।

প্রিয় বুঝ্‌তে পারলে যে, সেবার সঙ্গ লক্ষ্য ক'রেই নবীনের দিদি কথায় ঐ ঢিলটা ছুঁড়েছেন। তবে সে পাটকেলটি ছোঁড়বার লোভ সহজেই ত্যাগ ক'রে মুখ লাল ক'রে শুধু বললে—নন্দা, তুই এসব অসৎ-কুসঙ্গে এসে মিশিস্ কেন মা? গুরুজনরা যা নিষেধ করেন তা না করাই ভাল। বিশেষ আমাদের যখন মন্দ ব'লেই জেনেছিস।"

"যে আপনাদের মন্দ বলে সে নিজেই মন্দ।" নন্দা জোরের সঙ্গে একথা বলতেই, "ওমা যার জন্যে চুরী করি সেই বলে চোর। পিসী এবাড়ী-ওবাড়ী করছে, খুঁজে হাঁপিয়ে পাচ্ছে না দেখে ছুটো-ছুটি ... দোয়াদশীর দুপুর বেলায় মাকে খুঁজে ... সঙ্গে খুঁজতে বেরুলাম। তা মেয়েই মুখ শোনালো একবারে। বলি ওলো নন্দা, অত গরব করিসনে, দিলে ত এই মুখে লাথি মেরে তাড়িয়ে, এর পরে শতেক খোয়ারে যে মরবি।"

নন্দার পিসী নিঃসন্তান, শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা নন্দাকে যে অপমান লাঞ্ছনা করেছে তার জন্যে তাঁর রাগ নন্দার উপরে ততটা বেশী হয়নি, যতটা হয়েছিল নন্দার শাশুড়ীর উপর। তবে এখানে তাঁর নাগাল না পেয়ে নন্দাকে ব'কে ধমকেই তিনি গায়ের ঝাল মিটিয়েছিলেন। এখন নবীনের দিদির কথা শুনে তিনি আর থাকতে না পেরে ব'লে উঠলেন—"তুই চুপ কর্ মঙ্গলা, মেয়েটাকে আর শাপ-মন্নি দিস্ নি, ওর এখন কিসের কি বুদ্ধি? জামাই সত্যিই কিছু ছেলে মানুষ না, চল্লিশের ওপোর বয়েস। তা মেয়ে তাকে উদ্দিশ ক'রে কি বলেছে না বলেছে তুই আর হেমা যদি বাসরঘরে জামাই এর কানের কাছে সেসব না বলতিস্ তাহ'লে কি এই হৈচৈ হয়? জামাইও তেমনি কোথাকার এক গোঁয়ার গোবিন্দ! খুলে মেয়েছে ঐ কথা শুনে সে খোয়ার করেছে, তা মানষির চামড়া গায়ে নিয়ে কেউ করে না।"

"ওমা কোথা যাব গো, সব তাল এসে পড়ল এখন আমার পিঠে! আচ্ছা হেমাকে এখুনি ডাকছি, কি বলেছি সেদিন আমরা জামাইয়ের কাছে এখুনি বলুক সে।" বলতে বলতে নবীনের দিদি তখনকার মত হেমার সন্ধানে যাত্রা করলে। নন্দার পিসী তা গ্রাহ্য না ক'রে প্রিয়র দিকে চেয়ে বললেন—"কিছু মনে কোরো না বউ, মঙ্গলার সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা ভার। অচ্ছন্দে তোমাদের মন্দ লোক ব'লে গেল, নিজে যে কেমন পাড়া-কুঁদুলী তা সবাই জানে, হেমাও ওর জুড়ীদার। ছেলে মানুষ মেয়ে কি বলেছে না বলেছে সে কথাটি ... বলবার কি দরকার ছিল? ... যে বলবার ভঙ্গী। আবার জামাইও তেমনি। এখন মেয়ের কপালে যা আছে তা হবেই। ওঠ নন্দা, বাড়ী চল্, তোর মা ভেবে মরছে।"

... আমিও যাব," বলে নন্দা উঠ্‌বার ভাব না দেখিয়ে বেশ ... হ'য়েই ব'সে রইল।

প্রিয় বললে—"কেন অমন করিস্ নন্দা, আমার কথা

শোন্। পিসীমা ডাকতে এসেছেন সঙ্গে যা। ছাই খেতে বলেছিলেন ব'লে স্বচ্ছন্দে ত ছাই খেতে রাজী হয়েছিলি, আর এখন সঙ্গে যেতে বল্‌ছেন তা যাবি না কেন?"

নন্দা তবুও উত্তর না দিয়ে কাঠের মতন ব'সে রইল। প্রিয় উঠে গিয়ে গোটাকতক মিষ্টি আর একবাটি দুধ এনে নন্দার মুখের কাছে ধর্‌তে সে মুখটা ফিরিয়ে নিলে। প্রিয় হেসে বল্‌লে—"মাসীর সঙ্গে ত তোর আড়ি নয় নন্দা, তবে কেন মুখ ফিরুচ্ছিস্? এটুকু খেয়েনে আর পিসীমার সাম্‌নে লজ্জা করিস্ ত বল্ তাঁকে চ'লে যেতে বলি।"

পিসীমা বল্লেন, "না, না আর লজ্জা ক'রে দরকার নেই। সকাল থেকে আজ বাসী মুখে আছে। গুষ্টীশুদ্ধ যে যত পেরেছি খুবই বকেছি, বকুনি কি সাধে মুখ থেকে বেরোয়? পরের কপালে যাদের খাওয়া পরা ওঠা বসা তাদের খুব সাম্‌লেই চল্‌তে হয়। সত্যিই যদি তারা আবার ছেলের বিয়ে দ্যায় ত আমরা কি কর্‌ছি? মা যখন পেটে ঠাঁই দিয়েছে হাঁড়ীতেও তখন দিতে পার্‌বে। এখন নে নন্দা খেয়ে নে, উনি তোকে কত ভালবাসেন, ওঁর অমান্যি করিস্‌নি।"

কতকটা মাসীর মান রাখ্‌বার জন্যেও বটে নন্দা সহজেই মিষ্টিগুলি খেয়ে দুধটুকুও খেয়ে নিলে। তার পর নন্দাকে নিয়ে তার পিসী চ'লে যেতেই প্রিয় ব'লে উঠ্‌ল—"আচ্ছা দেশ আমাদের। মেয়েগুলোর পান থেকে চুণ খসার ত্রুটিরও মাপ নেই। আর পুরুষ যা খুসী ক'রে যাক্ কেউ কথাটিও বল্‌তে পারে না।"

ওঘর থেকে প্রবাল জবাব দিলে—"তা কেন পাবে? রাজ্যটা যে পুরুষদেরই সে বোধ আছে ত?" বাধা দিয়ে সেবা বল্‌লে—"রাজা যিনিই হ'ন্ রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্যে নিজের তৈরী আইন-কানুন তিনি নিজেও মেনে চলেন।" প্রিয় বল্‌লে—"ওরে বোন্—সে হচ্ছে রাজার কথা; এযে হচ্ছে অরাজক রাজ্য, এর আবার আইন-কানুন মানামানি কি? যথেচ্ছাচারই হচ্ছে এ রাজ্যের আইন-কানুন।" পাশের ঘর থেকে জবাব দেওয়া সুবিধে নয় দেখে প্রবাল এঘরে এসে ব'সে বল্‌লে,—"নন্দা মেয়েটি এমন কী গুরুতর অপরাধ স্বীকারের জন্যে তাড়া খেয়েছে তাত বুঝতে পারলাম না।" প্রিয় বল্‌ল—"নন্দা মেয়েটি একটু মুখর, দ্বিতীয় পক্ষের বয়স্থ বর এসেছিল তাকে দেখ্‌তে। বর দেখে যাবার পর মেয়েরা তাকে বারবার ক'রে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'বর পছন্দ কর্‌লি ত, কেমন দেখ্‌লি?' সে মনের কথা মুখে ফুটে স্পষ্ট ব'লে দিলে—'ও আবার বর বুঝি, ও তো মাথায় পাকা চুল বুড়ো-ঠাকুদ্দা, বুড়ো বরকে আমি বিয়ে কর্‌ব না।' তার মানে বরকে ওর পছন্দ হয়নি। ছেলে মানুষ জানে না যে মেয়েদের পছন্দর কোনো দাম নেই, কি, সে কথাটা মুখ ফুটে বল্‌তে গেলে দোষ হয়; তাতেই ব'লে ফেলেছে। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে পছন্দ না হওয়াটাও বড় অসম্ভব নয়। বরটি হচ্ছে নন্দার চাইতে বয়সে প্রায় চার গুণ বড়। কিন্তু তবু সেটা ব'লে ফেলাই হয়েছে ওর অমার্জ্জনীয় অপরাধ; জামাই-বাবুর তাতেই পৌরুষে লেগেছে। স্বামী হ'য়ে কেমন ক'রে সে এই বালিকাবধূর অহঙ্কার সহ্য করে? তাই প্রচার করেছে আর এর মুখ দেখ্‌বে না, আবার বিয়ে ক'রে বউ আন্‌বে।"

প্রবাল বল্‌লে—"বাঃ, এ যে একটি বেশ প্রহসন দেখ্‌ছি—তবে আমাদের ঘরে মধ্যে মধ্যে এমন প্রহসন হ'য়েই থাকে। দেখে দেখে আমরা অভ্যস্থ হ'য়ে আছি। সামান্য ত্রুটিতে মেয়েটির দ্বীপান্তর ব্যবস্থা, পুরুষ রত্নটির তৃতীয় বার ফুলশয্যার সুযোগ, একেই না ব'লে পৌরুষ!"

প্রিয় আর উত্তর দিলে না। নন্দাকে সে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে, তাই নন্দার অবস্থা মনে ক'রে সে মনের মধ্যে স্নেহের বেদনা অনুভব কর্‌তে লাগল। সেবা উঠে গিয়ে নিজের একটা অসমাপ্ত সেলাই নিয়ে এসে ঝুঁকে প'ড়ে সেটিতে কাজ আরম্ভ কর্‌তে কর্‌তেই বল্‌লে—"প্রবালবাবু দেখ্‌ছি নিজের জাতির খামখেয়ালীর জন্যে একটু কিন্তু বোধ কর্‌ছেন। সুলক্ষণ বল্‌তে হয়।" সেবার সম্বন্ধে প্রবালের মনে নূতন ভাবটি জেগে ওঠার পর থেকে এ যাবৎ সে যেন আর বেশ সহজভাবে সেবার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পারছিল না। কেদারকেও বলি বলি ক'রে মনের গোপন-কথাটা খুলে বলা হয়নি। যেখানে গোপন মনোভাব সম্পূর্ণ নিজের মনের কোণেই জড়িয়ে

থাকে, এমন কি নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে পর্য্যন্ত যার পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়, সেক্ষেত্রে কুণ্ঠার ভাব বাইরের চলা-ফেরা, কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গী সব কিছুকেই যেন আড়ষ্ট ক'রে তোলে। প্রবালেরও এ-কয়দিন যাবৎ তাই হয়েছিল। প্রিয় বা কেদার তা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু সেবার দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। এ-চার দিনে প্রবালের সঙ্গে তার চোখো-চোখী হ'তেই প্রবাল যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিতো; কিন্তু সেই ক্ষণিক চাহনীর মধ্যেই সে প্রবালের মনের অপরিস্ফুট ভাবের ছায়া বিদ্যুৎবিকাশের মত দেখ্‌তে পেত। প্রবালের নীরব দৃষ্টির মধ্যে একটি প্রকাশের ভাষা কুণ্ঠার বেদনায় আপনাকে নিবেদন করতে পারছে না; সেবার নারীচিত্ত তা বুঝ্‌তে পেরে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত।

সেই সঙ্গে একটা নবীন অনুভূতি তার সমস্ত মনে এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌লেও সঙ্গে-সঙ্গে অপমানের ব্যথাতেও মন ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ত। পুরুষের সতৃষ্ণ লালসা-বর্ষী দৃষ্টির সঙ্গে সে তার যৌবনের নব বিকাশের প্রারম্ভ হ'তেই পরিচিত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু প্রবাল—এই পুরুষটিকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখেই সে দেখে আস্‌ছে। এঁর দৃষ্টিতে লালসার বা ভোগশিখার দীপ্তি সে দেখেনি, কিন্তু তবু এ-দৃষ্টিরও পশ্চাতে যেন ঐ কিসের ছায়া! কিম্বা, এ তারই ভুলের প্রতিবিম্ব? কবি লিখেছেন—"আপনার কালীমাখা কাচ খণ্ড নিয়ে—কালো দেখে জগতের আলো।" তবে কি সে হতভাগিনী নিজেই নিজের চিন্তার রঙে বাসনার কালী মাখিয়ে এখন অন্যের দৃষ্টির নির্ম্মলতায় অবিশ্বাস সুরু করেছে? এই রকম সাত পাঁচ চিন্তার মধ্যে সেও প্রবালের সঙ্গে আর এ কয়দিন সহজ ভাবে কথায় যোগ দেয়নি। অথচ এই কুণ্ঠার ভারও তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল। এটাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যেই সে চেষ্টা ক'রে প্রবালকে ঐ কথাটা ব'লে ফেল্‌লে। প্রবালও উত্তর দেবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহের সুরে বল্‌লে—'গায়ের জোরে নিজের জাতের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে গেলেই তা সফল হয় না। এই যে সেদিন আপনিই ত বল্লেন আপনাদের মধ্যে এমন কতকগুলি দুর্বলতা অভ্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে যার জন্যে আপনাদের নিজেরই লজ্জা হয় অথচ আপনারা নিজের সে দোষ-ত্রুটি বা দুর্ব্বলতার কথা কজনেই বা ভেবে দেখে সেরে নেবার চেষ্টা করছেন!" সেবা উত্তর দিলে না, নতমুখে সেলাইএর ফোঁড় তুলে যেতে লাগ্‌ল। প্রিয় ব'লে উঠ্‌ল—"সত্যি ঠাকুরপো তোমরা ভারী স্বার্থপর আর অবিবেচক—নিজেরা যা ইচ্ছে কর কারুর কিছু বল্‌বার জো নেই। যত নিগ্রহের ব্যবস্থা অসহায় মেয়েদের প্রতি।"

প্রবাল বল্লে—"তোমরাও ত সে-নিগ্রহ চিরটাকাল মাথা পেতে স'য়ে আস্‌ছো। কোনো দিন মুখে ফুটে প্রতিবাদও ত করনি। বরং অনেক সময় নিজের ভাইকে স্বামীকে সন্তানকে পর্য্যন্ত এইসব অত্যাচার ও অবিচার করবার সুযোগ-সাহায্য দুই-ই জুগিয়ে আস্‌ছ বৌঠান্‌।"

প্রিয় বল্লে—"ধর ঠাকুর পো—অবিচার অত্যাচার সহ্য করতে আমরা আর রাজী নই—"

প্রবাল বল্লে—"বেশ ত—বিচার সভায় আর্জ্জি পেশ কর, নয় ত লড়াই সুরু ক'রে দাও।"

প্রিয় হেসে উঠে সইকে ঠেলা দিয়ে বল্লে…"শুন্‌লি সই, আর না হয় দলবেঁধে আমরা রাজ্যটাই কেড়ে নিয়ে বসি।"

প্রবালও হেসে বল্‌লে…"তা মন্দ হয় না। কিছুকাল না হয় আমরাই আপনাদের রাজ্যের আইনকানুনগুলো দেখে-শুনে কিছু শিখেনি। আমার কিন্তু একটা বড় পদটদ দেবেন, কেন না মন্ত্রণা-সভায় এসে দাঁড়িয়েছি।" কথাগুলো সে এবার বহু বচনেই আউড়ে গেল—বিশেষ ক'রে সেবারি মুখের দিকে চেয়ে—

সেবা বল্লে— "কিন্তু ঘর-ভেদী বিভীষণকেই আমরা আগে হ'তে এড়িয়ে চল্‌তে চাই জান্‌বেন, জাতিদ্রোহীকে বিশ্বাস করতে নেই।"

প্রিয় বিস্ময়ভরা চোখে সেবার দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, বা! "তাতে দোষ কি? ও পক্ষের লোক এ পক্ষে যোগ দিলে লড়াইএর সুবিধে হয় যে!"

সেবা স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—"লড়াই চল্‌লে ত লড়াই হবে সই। নারী ও নর মিলেই মানুষ সম্পূর্ণ হয়, সুতরাং

আধখানা অঙ্গ কি আধখানার সঙ্গে লড়তে পারে? কোন্‌টাকে ছেড়ে কার অস্তিত্ব আছে বল্ দেখি। দু'জনে দুজনকে ভুল বুঝেই আমরা বিপ্লব বাধিয়ে বসেছি। নারীর প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের ফলে পুরুষই কি আজ শ্রেষ্ঠত্ব হ'তে ধূলায় এসে লুটোয়নি? সুতরাং ক্ষতি হ'য়েছে কার?"

প্রিয় তখন একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—"মিছে না, যে নন্দার কথা নিয়ে আমরা এত বল্‌ছি তার মা-পিসীই ত ঐ বিয়ে ঠিক করেছিল। তারা যদি না বল্‌ত তা হ'লে তার এদশা হ'তে পার্‌ত কি?"

হঠাৎ প্রবাল প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল—"আচ্ছা বোঠান্, আমাদের দেশে বিধবাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয় সেটা তোমার কেমন মনে হয়?"

সেবার সাম্‌নে এ অশোভন প্রশ্নে প্রিয় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজের পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের পাশে হতভাগিনী সইকে দাঁড় করিয়ে তার অবস্থার কথা ভাবতে গেলে সত্যিই প্রিয়র বুক কেঁপে উঠ্‌ত, সুতরাং, নানারূপে মিষ্ট কথায় শিষ্ট ব্যবহারে সইকে সে প্রফুল্ল রাখবার প্রাণান্ত চেষ্টা কর্‌ত। এখন সেবারই সাম্‌নে প্রবালের এই বিবেচনা-হীন প্রশ্নে সে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলে,

"তোমার কথা ত ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না ঠাকুরপো। আমাদের দেশে বিধবাদের সম্বন্ধে আদর্শ যে খুব উঁচু আর বিধবাকে সমাজ যে খুব ভাল চোখেই দেখে থাকে, তুমি হিন্দুর ছেলে হ'য়ে সে কথা যে না জান তা নয়। তবে একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?"

প্রবাল হেসে বল্‌লে—"জানা যে খানিকটা নেই তা নয় বোঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় জানার সঙ্গে অভিজ্ঞতাটুকু প্রতিপদেই গরমিল হ'য়ে চলেছে; তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম, সমাজ বিধবার সম্বন্ধে যে বিচার চালাচ্ছে তা কি খুব ভাল ব'লেই তোমার ধারণা?"

প্রিয় বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—"আমি জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র নারী। আমার ধারণার মূল্য কি ঠাকুর-পো—সমাজ যাঁরা গড়েছিলেন, যাঁরা শাস্ত্রবিধি তৈরী করেছিলেন তাঁদের বিচার কর্‌বার স্পর্দ্ধা কি আমাদের সাজে?"

প্রবাল এ উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হ'ল না। প্রিয়র গোপন বিরক্তি সে ধর্‌তেও পারলে না। তাই সেবার দিকে চেয়ে অসঙ্কোচে প্রশ্ন কর্‌লে—"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন না। আপনি ত একজন ভুক্তভোগী; আপনাদের মত বালবিধবাগুলি সম্বন্ধেও যে আমাদের খুব উচ্চ ধারণা তা ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ঠিক মনে হচ্ছে না।"

সেবা আগে হ'তেই প্রবালের প্রশ্নে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। প্রিয় যে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ অগ্রসর হ'তে দিতে ইচ্ছুক নয় তা সে বুঝ্‌তে পেরেছিল। এখন আবার তার মুখোমুখী জবাব দেবার ডাক আসায় বিব্রত হ'য়ে পড়্‌ল; কিন্তু ভিতরের সে ভাব সাধ্যমত চেপে রেখে সে সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলে, "আমি ভুক্তভোগী ব'লেই আমার জবাব প্রামাণ্য হ'তে পারে না। সংসারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মানুষের মনের অবস্থার বা কাজের বিভিন্নতা ঘটে থাকে এ কথা স্বীকার করেন ত?"

প্রবালের বিচার কর্‌বার শক্তি তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। নিজেরই মনের মধ্যে কয়দিন ধ'রে অনবরত যে প্রশ্ন ঘা দিচ্ছিল সেইটেই হঠাৎ তার মুখ দিয়ে এ সময়ে অসংলগ্ন ভাবে বেরিয়ে পড়্‌ল। তাই সে ব'লে বস্‌ল—"আচ্ছা বলুন দেখি, বালবিধবাদের আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।"

প্রিয়র চাঞ্চল্য চরম সীমায় এসে পৌঁছলো। প্রবাল করে কি, পাগল নয় ত! বিধবা—বিশেষ ক'রে সেবারই মত বালবিধবার সম্মুখেই এই আলোচনা—! সে মুখ কালো ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"ওসব বাজে কথা নিয়ে তর্ক করছ কেন ঠাকুর পো? হিন্দুর মেয়ে জন্মান্তর মানে। এজন্মে স্বামীহারা হ'লেও সেই স্বামীকে পরজন্মে পাবার প্রত্যাশায় সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে ভালবাসে; এতেই তার নারীজীবন সার্থক হয়।"

প্রবাল একটু হকচকিয়ে গেল। এতো বড় সাত্ত্বিক কথা—বিশেষ ক'রে নারীর মুখেই যখন উচ্চারিত হ'ল তখন পুরুষ হ'য়ে সে এর প্রতিবাদ করে কি ক'রে? সে বোঝে ও জানেই বা কতটুকু? কিন্তু সেবার ঠোঁটের

কোণে যে একটু ম্লান হাসি চকিতে ফুটে উঠেই মিশিয়ে গেল তা তার দৃষ্টি এড়ালো না। সেবা তখন সহজ সুরে বল্‌তে লাগল—"দেখুন প্রবালবাবু—আমাদের সমাজের বিধবাদের দিক দিয়ে একটা মস্ত অভাব আছে তা আমি অকপটে স্বীকার করুছি। সে হচ্ছে তাদের লক্ষ্যহীন জীবনকে বেশ একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করা। বিবাহিতা নারী তার সংসার ধর্ম্ম, স্বামীসেবা সন্তান পালন এইসব নিয়ে স্বচ্ছন্দে তার জীবনের পথে অগ্রসর হ'য়ে চলে। বিধবার সে সুবিধা নাই। আবার অনেক সময় হতভাগিনীদের শ্বশুরবাড়ীর বা বাপের বাড়ীরও কোনো আশ্রয়-অবলম্বন থাকে না। তার উপর চারদিক থেকে সন্দেহ ও অবজ্ঞার কুটীল দৃষ্টি তার মনকে বিষিয়ে তোলে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে জীবন কাটাবার আদেশ থাকলেও তার আশেপাশে এমন অনুকূল অবস্থা নেই যা থেকে সে বল সংগ্রহ করতে পারে। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধিও নেই, কোনোরূপ শিক্ষা দীক্ষাও পায় না। পেটের অন্ন, মনের অন্ন সবই তার কাছে দুষ্প্রাপ্য। অথচ তাকে বৈধব্যের মুহূর্ত্তেই দেবীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে দেবী না হ'য়ে সে দানবীও হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।"

প্রিয় সেবার মুখে এসব বিষয়ে এত কথা কোনো দিন শোনে নি তাই রাগ ক'রে ব'লে উঠল—"তুই কি বল্‌তে চাস্ সই, সবারি ঐ এক দশা?"

সই হেসে বল্‌লে—"তেমন ভুল আমি বলি না সই, যারা দেবী হ'বার সুযোগ পেয়ে দেবীত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুছেন তাঁরা আমাদের প্রণাম নিন্। কিন্তু জোর ক'রেই কি সবাইকে দেবী করা যাবে?"

প্রিয় বল্‌লে—"তুই পুনর্জ্জন্ম মানিস্ কি না বল্? পূর্ব্ব জন্মের পাপে যে এ-জন্মে স্বামী-হারা হয়, তার কি উচিত নয় ব্রত-পালনের কষ্ট স'য়ে সে পাপ হ'তে মুক্তি পাওয়া?"

সেবা বল্‌লে—"তুই ভয় পাস্ নি সই,—আমি বল্‌ছি না যে বিধবারা সবাই বিয়ে করতে ছুটুক। বর যে সবারি জুটছে তাও নয়। কিন্তু এই হতভাগীদের জীবন যাতে সুব্যবস্থায় কাটে তার দিকে যদি সবাই লক্ষ্য দেয় ত মন্দ হয় না।"

সেবার কথার আভাসে তার লক্ষ্যহীন জীবনের যে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ফুটে উঠল তা কতকটা ধরতে পেরে প্রিয় শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। তাই প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্যে সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"চল না ঠাকুর-পো, ষ্টোভটা একটু জ্বেলে দেবে। আমি ছেলেদের জন্যে জল খাবার তৈরী করব।—তুই সই সেলাইটা শেষ কর্।" "চল যাই"—ব'লে প্রবালও তখন ষ্টোভ্ জ্বেলে দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

(ক্রমশঃ)

তুমি ও আমি

(দেশ সাদী)

শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী

অনন্ত অবাধ ব্যাপ্তি তমিস্র গভীর
ছিল যবে ধূধূ
সৃষ্টির আভাস মাত্র নাহি কোনো দিকে—
তুমি ছিলে শুধু;

গুণ্ঠন-আড়াল হ'তে প্রদীপ্ত শিখার
কিরণ-সম্পাত
তোমার ললাটখানি আলোকিত করি'
দিল অকস্মাৎ—

বাঁচিল জনম লভি' কিরণ-পরশে
প্রেম ও প্রকৃতি,
ছন্দে, গন্ধে, প্রাণস্পন্দে জাগিল জগৎ
অপরূপ অতি!

* * *

জেগে ওঠ, চিত্ত মোর, অজস্র ধারায়
ঢাল্ স্তুতিগান;
সে ঐন্দ্রজালিকে স্মরি' তোল্ সুগভীর
মরমের তান—
যে মহা শিল্পীর শুধু উচ্চারিত বাণী
"জাগো রূপলোকে"—
প্রকাশিল মহাকাশে এ বিশ্ব-গোলক
ছায়া ও আলোকে!

* * *

প্রথম পশিল যবে শ্রবণে আমার
সে মহা আশ্বাস—
"মানবের মর্ম্মমূলে নিষিক্ত আমারি
আত্মার প্রশ্বাস,"
আঁকড়ি' ধরেছি বুকে সেই দিন হ'তে
এ বিশ্বাস শুভ—
আমরা সন্তান তাঁর, স্বর্গ আমাদের
নিকেতন ধ্রুব।

* * *

শুনাও আমারে প্রভু সে পথের কথা
জানিব যা' হ'তে—
কত কাল পরে আর ঠাঁই পাব তব
প্রেমের আলোতে;
যে কথা জানিলে যাব তেয়াগি' এ ধরা
শোকতাপময়,
চাহিবে না কোনমতে আতিথ্য ইহার
ফিরে এ হৃদয়।

* * *

আমি আকাশের পাখী, অমৃত তিয়াসে
আকুল সদাই;
শূন্য-আড়ম্বর-ভরা বিশ্ব-জাল ছিঁড়ি'
উড়িবারে চাই।
বরিষ আনন্দধারা হৃদয়-মাতানো,
হে বন্ধু উদার,
নিঙাড়ি' বিদ্যুৎ-গর্ভ স্নিগ্ধ মেঘ তব
জমানো সুধার।
হয়তো সেদিন আজো বহুদূর, যবে
এ দেহের ছাই
উড়িবে স্বরগ পানে; নাহি ক্ষোভ যদি
মেঘ-বারি পাই।

* * *

আমাদের ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল সকলি,
ভক্তি-সুধা ঢালো—
প্রতিবিন্দু হ'তে যাহে শক্তিকণা ঝরি'
চিত্ত করে আলো;
এই আছে, এই নাই, ধরার সম্পদ
ধর্ম্ম তার—"ক্ষয়";
তোমাতে নিবদ্ধ প্রেম, নিত্য নিরবধি
চির সুধাময়।

* * *

না জানি কি সুমধুর সে শুভলগন,
যে মাহেন্দ্রক্ষণে—
ধরণীর মোহ হ'তে উঠিব দুলিয়া
উদার গগনে!
শান্তি-স্নিগ্ধ আত্মা মোর বিক্ষোভবিহীন,
শিহরি' শিহরি'
পরম পুলকভরে চলিবে প্রিয়ের
পদচিহ্ন ধরি'।
সূর্য্যালোক-পান-মত্ত কীটাঙ্কুর সম
আনন্দে নাচিয়া
"আলো, আলো, আরো আলো" আকুল তৃষায়
যাচিয়া যাচিয়া,
ঘূর্ণীবেগে ছুটিব সে জ্যোতিঃ-উৎস পানে
যেথা হ'তে লভি'
আলো-করা রূপরাশি জাগে জ্যোতির্ম্ময়
গগনের রবি।

ভারত-মৈত্রী-মহামণ্ডল

শ্রী কালিদাস নাগ

ঋষিকবি অশ্বঘোষ তাঁহার "শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে" সর্ব্বসত্ত্বের যে কল্যাণ ও মুক্তিকে ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন, ভারতবর্ষ তাহার সমাজ ও রাষ্ট্র, তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সেই আদর্শকে চরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার ও বরণ করিয়াছিল। মহামানবতার এই আদর্শ যেদিন জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করে সেদিন দেশ ও জাতি নিজেকে আর নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না; শক্তি ও সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও সাধনা, ত্যাগ ও প্রেম তাহার সকল অঙ্গ ছাপাইয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সীমার বাহিরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, সকলকে নিবিড় আলিঙ্গনে এক করিয়া লয়। ভারতের জাতীয় জীবনেও একদিন তাহা হইয়াছিল। সেই মহান্ আত্মদান ও আত্মবিকাশের ফলেই ভারত একদিন সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড লইয়া এক অপূর্ব্ব মৈত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল।

এশিয়া জুড়িয়া বিস্তার

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতেছি, ভারতবর্ষ বৃহত্তর ভারত রঙ্গমঞ্চে বিশ্বমানবতার নটভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারত শুধু তাহার তত্ত্ববিদ্যা ও ধ্যানলব্ধ বাণীকেই দিকে দিকে প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই; সে তাহার কোনো সার্ব্বভৌম নরপতির উৎসাহে ও সাহচর্য্যে শুধু অল্পবিস্তর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই; ভারতের বিচিত্র জাতি যেন কোন্ এক দৈব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরম রহস্যময় আবেগে ও আনন্দে সকল সঙ্কীর্ণ অহংকারকে বিসর্জ্জন দিয়া পরিপূর্ণ বিশ্বানুভূতির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাধনা ও সভ্যতার এই বিস্তার, ধর্ম্মবিজয়ের এই প্রসার, একদিকে নেপাল তিব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চীন কোরিয়া জাপান, আর একদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যাম, চম্পা, কাম্বোজ, জাভা, মালয় পর্য্যন্ত সকল দেশকে ভারতের সঙ্গে এক মহামিলনসূত্রে বাঁধিয়া দিল। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিজয়ের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। মানবের ইতিহাসে বিশ্বৈকবোধের বিকাশের ধারাটিকে যিনি অনুসরণ করিতে চাহেন, ভারতের মৈত্রী সাম্রাজ্যের এই অধ্যায়টিকে তাঁহার অবহেলা করিলে চলিবে না। এই অজ্ঞাত বিস্মৃত ইতিহাসের কথা ভারতের কোন মহান্ ঐতিহাসিক একদিন শুনাইবেন। এখন অল্পকথায় শুধু তাহার আভাস দেওয়া যায় মাত্র। "দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে"—মহামানবতার এই যে উদার আদর্শ, এ আদর্শ এই যুগে অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধ ও জরথুস্ত্র, লাওটসে ও কনফুসিয়াসের বাণী, ম্যানিকিয় (Manichaean) ও খৃষ্টীয় তত্ত্ব এক অদ্ভুত সমন্বয় ও সাহচর্য্যে একে অন্যকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সকল জাতির মিলিত চেষ্টায় এই বিরাট্ বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সম্ভব।

রিচার্ড্ গার্বে (Garbe) ও ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ (Smith) স্বীকার করেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম বিকাশের অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সেই খৃষ্টধর্ম্মও পরে হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি আচার ও মতবাদকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। মেম্ফিসে (Memphis) ভারতীয় নরনারীর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইবার পর মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিন্ডার্স পেট্রি (Flinders Petrie) বলিয়াছিলেন,—"ভূমধ্যসাগরের তীরে ভারতীয় সভ্যতার ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে ভারতের যে সম্বন্ধের কথা, গ্রীসে অশোকের ধর্ম্মমহামাত্য প্রেরণের যে কাহিনী, আমরা এত কাল শুনিয়া আসিয়াছি তাহার কোন বাস্তব নিদর্শন এতদিন পাওয়া যায় নাই। এখন মনে হইতেছে, এতদিন

পরে হয়ত আমরা মেম্‌ফিসে ভারতীয় উপনিবেশের বাস্তব তথ্যটি আবিষ্কার করিলাম এবং আশা হইতেছে ইহারই সূত্র ধরিয়া হয়ত ভবিষ্যতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্বন্ধের আরও নূতন তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হইবে।"

গান্ধার হইতে খোটান; মধ্য-এশিয়া হইতে চীন

ভারতবর্ষের মহাযান পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে ততটা রূপান্তরিত করিতে পারিল না, যতটা পারিল এই সুবিস্তীর্ণ প্রাচ্য মহাদেশকে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ (Arrian) তাঁহার "ইণ্ডিকায়" বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের কোনো রাজা বা সম্রাট্ সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে রাজ্যজয়ের প্রচেষ্টা করেন নাই—ন্যায়-বুদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সে-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিত।" আরিয়ান্ যাহা বলিয়াছেন ভারতবর্ষ মোটামুটি এ সংস্কারকে মানিয়া চলিত, কাজেই মহাযান-পন্থী ভারতবর্ষ এবার যে জয়ের আশায় উৎসাহিত হইয়া এশিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তাহা দিগ্বিজয় নয়, রাজ্যবিজয় নয়, তাহা অশোকের ধর্ম্মবিজয়। ভারতবর্ষ তাহার পুরাতন থেরবাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে পিছনে ফেলিয়া অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু সত্য তাহাকে স্বীকার করিল, "সর্ব্বাস্তিবাদ" তত্ত্বকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই নূতন তত্ত্বকে প্রচারিত করিয়াছিলেন অশ্বঘোষের গুরু কাত্যায়নীপুত্র তাঁর বিভাষা ও মহাবিভাষা নামক গ্রন্থদ্বয়ে। সর্ব্বাস্তিবাদীদের এই বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরে, গান্ধারে এবং সেইখান হইতে উদ্যান, কাশ্‌গর, খোটান, পারস্য প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া এই সম্প্রদায় ধীরে ধীরে চীনে বিস্তার লাভ করিল। বস্তুতঃ এই সময় চীনের জাতীয় চিত্ত ভারত ও ভারতীয় সাধনার সন্ধানে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, ২১৭ খৃষ্টপূর্ব্বে সম্রাট সিন্-সিহ্ হুয়াংটীর (Tsin Shih Huang-ti) রাজত্বকালে চীন রাজধানীতে আঠারোজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর আমদানী হইয়াছিল। আর এ কথাও নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৮-১১৫ অব্দের মধ্যে চাং-কিয়েন (Chang-Kien) নামে জনৈক 'দণ্ডনায়ক' চীনের দুর্গম পশ্চিম সীমান্তে বর্ব্বর হিউএঙ্-নু-(Hiueng-nu) মণ্ডল ভেদ করিয়া তা-হিয়া (Tahia—Bactria) এবং সেন্-টু (Shen-tu—Sindhu-Hindu) প্রদেশদ্বয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য চীন-সম্রাট্‌কে উপহার দিয়াছিলেন।

এদিকে খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেই শুনিতে পাই, মধ্য-এশিয়া হইতে ভারে ভারে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও মূর্ত্তি-পতাকাদি শিল্প-নিদর্শন লইয়া পার্থিয় ও ইউএচি রাজদূতেরা চীনরাজসভায় আসিতেছে। মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো স্থানে যে ইতিমধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। ৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মিং-তির (Ming-ti) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভূত সম্মানে ও গৌরবে চীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ধর্ম্মগ্রন্থই গেল না, বৌদ্ধশিল্প ও বুদ্ধমূর্ত্তিও গেল; দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ এই ধর্ম্মযাত্রার অগ্রদূত হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে হোনান্ (Honan) প্রদেশের রাজধানী লোইয়াং (Loyang) নগরীতে পাইমা (Paima) মন্দির গড়িয়া উঠিল এবং অনেক তা'ও এবং কন্‌ফুসিয়ান্ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন

অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন

এই সময়ে ভারতবর্ষে বিরাট্ কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-পত্তন হইতেছিল। মধ্য এশিয়ার এই দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর জাতি অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের সাধনা ও সভ্যতার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিল। কনিষ্ক ছিলেন এই কুষাণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্; অশোকেরই মতন ছিল তাঁহার মনের প্রসার, ও আদর্শে শ্রদ্ধা। এই কনিষ্কেরই শ্বেতছত্রছায়ায় গান্ধার শিল্প লালিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল; ইঁহারই রাজ-সভায় বাস করিতেন প্রাতঃস্মরণীয় নাগার্জ্জুন; ইনি একদিকে যেমন ছিলেন প্রাচীন ভারতের রসায়ন-বিদ্‌দের মুকুটমণি তেম্‌নি আর একদিকে অশ্বঘোষ প্রবর্ত্তিত মহাযান-তত্ত্বের প্রচারক। কনিষ্কের যুগে পুরুষপুর (Peshawar) তক্ষশিলা প্রভৃতি

এমনি করিয়াই একাধারে শিল্প, বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার কেন্দ্র হইয়া উঠিল—চরক হইলেন আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্য, কাত্যায়নীপুত্র তাৎকালীন তত্ত্ববিদ্যার উদ্গাতা, এবং অশ্বঘোষ হইলেন সঙ্গীত ও কাব্যকলার প্রবর্ত্তক।

সমুদ্র পারাপার—চম্পা, কাম্বোজ, সুমাত্রা, জাভা

শুধু কি স্থলপথেই ভারতবর্ষ আপনার ধর্ম্মদূতগণকে দেশে দেশে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছিল? এই যুগেই দেখিতেছি, হিপ্পেলাস্ নামে এক গ্রীক্ নাবিক মৌসুমী বায়ুর আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাতে সমুদ্র পারাপারের অত্যন্ত সুবিধা হইয়া গেল। আর-এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের যে পুঁথিখানা (Periplus of the Erythrean Sea *) সৌভাগ্যক্রমে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, সে পুঁথিখানি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে একদিকে আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত পর্য্যন্ত, আর একদিকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর চীন পর্য্যন্ত কত বিস্তৃত ছিল সে যুগের বাণিজ্য-প্রসার। ভারতবর্ষের নাবিককুল ভারতের সাধনা ও সভ্যতার নব নব উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য পাল তুলিয়া উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল চম্পায়, কাম্বোজে, সুমাত্রায়, জাভায়। টলেমি (Ptolemy) তাঁহার ভূগোলে—(খৃষ্টাব্দ ১৫০—) "যবদিউ" বলিয়া যবদ্বীপের নাম করিতেছেন; ফরাসী পণ্ডিত পেলিয়ো (Pelliot) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই ফুনানে (Fu-nan প্রাচীন কাম্বোজ) ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনের সুস্পষ্ট পরিচয় এবং সমুদ্র পারাপারের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম ও তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কথা, সাহিত্য, গাথা ও কাহিনী এবং তাহার শিল্পধারা ইতিপূর্ব্বেই এই সমুদ্র-পথ দিয়া ধীরে ধীরে চম্পা কাম্বোজ সুমাত্রা ও জাভায় প্রবেশ লাভ করিতেছিল; ইহার কিছুকাল পরেই দেখি চীন সেই সমুদ্র-পথ অবলম্বন করিয়াই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার করিতেছে। পশ্চিমে ভারতবর্ষ যেমন বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, পূর্ব্ব জগতে তেমনি অতুলনীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারত তাহার জাতীয় জীবনকে ভাবে ও গৌরবে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেছিল। বিশ্ব-সভ্যতার আদান-প্রদানে সেইজন্যই তাহার ব্যাকেরিয়া (Bakeria), ভারুকচ্ছ, বিদিশা, বৈশালী, তাম্রপর্ণী, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বাণিজ্য-সঙ্গমগুলি, জাতির কথায় গাথায় অবদানে জাতকে চিরকালের জন্য অমর হইয়া রহিল।

সভ্যতার আদানপ্রদানে জনসাধারণ

বিরাট্ বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার ও সভ্যতার আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া এই বিশ্বানুভূতি, ইতিহাসের সত্যবস্তু হইয়া ভারতের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে; তাহার পার্শ্বে সমস্ত রাজ্য-বিজয়-গর্ব্ব, নব নব সাম্রাজ্য ও শাসনতন্ত্রের পতন ও অভ্যুদয়ের ঘটনাবহুল ইতিহাস ম্লান হইয়া যায়। জাতির রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কতটুকু দাবী রাখে? সে-জীবনকে গঠিত করে কত নীরব অদৃশ্য ইঙ্গিত, কত অজ্ঞেয় অমোঘ উপাদান, সহজে যাহার কোনো সার্থকতা আমরা অবিষ্কার করিতে পারি না। কাজেই একদিকে যখন দেখি একই সময়ে ভারতবর্ষে কুষাণ (Kushan) সাম্রাজ্য, ও চীনে হান্ (Han) সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে পারস্যে সাসেনীয় (Sassanian) সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ঠিক তখনই এই তুচ্ছ রাজ্য-ভাঙাগড়ার তলে তলে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সভ্যতার আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া, জাতিতে জাতিতে ভাবে কর্ম্মে ও প্রেমে মিলনের পন্থা সহজ ও সুগম হইয়া উঠিতেছে এবং সকল রাষ্ট্রীয় বিপদ-আপদকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় জীবন বিশ্বানুভূতির বিকাশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের বুকের উপর যখন বর্ব্বর হূণদল ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তখনই ভারতবর্ষ তাহার কুমারজীব ও গুণবর্ম্মণকে সেই সুদূর চীনে পাঠাইতেছে মৈত্রী-ধর্ম্মের প্রচারের জন্য, আর চীন হইতে আসিতেছেন—তীর্থযাত্রীর দল ফাহিয়ান,

* Erythrean Sea বলিতে গ্রীকনাবিকেরা বর্ত্তমান লোহিত সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত জলভাগকেই বুঝিত।

চিংমণ্ড, ফামোঙ; ভারতের মূল ধর্ম্ম-উৎসের অমৃত পান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতেছেন। বিশ্ব-প্রেম ও মৈত্রীর বর্ষা-প্লাবনে দেশ ও জাতির ক্ষুদ্রস্বার্থের সীমারেখা ভাসিয়া ডুবিয়া গেল; সমস্ত সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ আপন বিরাট্ আত্মাকে জানিল; ভারতবর্ষ চাহিল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের প্রতিষেধকে লঙ্ঘন করিয়া অজানা দেশের অজানা মানব-চিত্তের সৃজনক্ষেত্রে বিহার করিতে। তাই দেখি, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মুকুটমণি কবি কালিদাস তাঁহার বিরহী যক্ষের "মেঘদূত"কে পাঠাইতেছেন দূরে হিমালয়ের পরপারে বিরহিনী প্রিয়ার সন্ধানে—ইহা কি শুধু কবি-কল্পনার স্বেচ্ছা-বিহার, না ভারতবর্ষের আত্মার যে বিশ্বতোমুখী আকৃতি তাহারই অমৃতময় রূপ।

প্রাচ্য মৈত্রীমণ্ডলের কেন্দ্র ভারতবর্ষ

(খৃষ্টাব্দ ৫০০—১৫০০)

হিমালয়ের পরপারে বিরহিনী প্রিয়ার জন্য কালিদাসের "মেঘদূতে" নির্ব্বাসিত যক্ষের যে-ক্রন্দন—সে ত অজানা সমুদ্রের পরপারে বৃহত্তর ভারতের জন্যই ভারতের ক্রন্দনের প্রতীক। জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্যই ভারতবর্ষ দুইবার—একবার অশোকের যুগে আর-একবার কনিষ্কের সময়—তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া এই বৃহত্তর ভারতের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিল। এইবার তৃতীয় বার ভারতের সাধনা ও সভ্যতা সমগ্র এশিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে বাহির হইল। কালিদাস, বরাহমিহির, গুণবর্ম্মণ, বসুবন্ধু, আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত, শুধু এই নাম-গুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই এ যুগের ভারতের সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য বুঝিতে পারিবেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকেরা জাতীয় জীবনের এই বিকাশের মূলে কোনো বিশিষ্ট রাজা অথবা রাজবংশের প্রভাব দেখাইতে চাহেন, এবং ভারতবর্ষে গুপ্ত ও বর্দ্ধন নৃপবংশ, এবং চীনে উয়েই (Wei) ও তাং (T'ang) বংশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন—ইহারাই এই অপূর্ব্ব সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের অন্যতম নিয়ামক। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় মাটি খুঁড়িয়া যে-সব নিদর্শন মিলিয়াছে তাহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার মূলে কোনো বিশেষ রাজার, কোনো প্রসিদ্ধ রাজবংশের একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এই সাধনা ও সভ্যতার অপূর্ব্ব বিরাট্ বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল সাধারণ মানুষের প্রীতির আদান-প্রদানে; চীন হইতে রেশম এবং ভারতবর্ষ হইতে পুঁথির পথরেখা বাহিয়া আসিয়াছিল এই সভ্যতার নবযুগ। রুস, ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মান্ ও জাপানী প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় যে-সমস্ত শিল্প ও শাস্ত্রসম্পদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাল করিয়া যে-দিন তাহার ব্যাখ্যা ও অনুশীলন হইবে সেইদিন আমাদের ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার যথার্থ মূল্যনিরূপণ সম্ভব হইবে; এখন আমরা যাহাকে প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ জাতির ঐতিহাসিক সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছি, তখন তাহাকে দেখিব কোন বিশিষ্ট জাতির সম্পদ বলিয়া নয়, সকল জাতি মিলিয়া, সকলের আদান-প্রদানে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে সেই বিশ্বজনীন সম্পদরূপে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এই প্রেম ও মৈত্রীর, সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের আদান-প্রদানের স্বল্প পরিচয় মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ও চীন

ভিক্ষু কুমারজীবের ধর্ম্মদৌত্যের অবসান-কাল পর্য্যন্ত (খৃষ্টাব্দ ৩৪৪-৪১৩) বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সাধনা মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়াই চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চীনদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষিত ইউএচি, পার্থিয় বা সোগ্দিয় পণ্ডিতেরাই লিখিয়াছেন; এবিষয়ে চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অনেক সময়েই ইঁহাদের সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'চন্দ্রগর্ভ' সূত্র এবং 'সূর্য্যগর্ভ' সূত্র প্রভৃতি মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ এবং 'মহাময়ূরী' পুঁথি প্রভৃতি পড়িলে মনে হয় যেন ভারত, পারস্য, খোটান, চীন সকলে মিলিয়া সারা এশিয়ার ভাবসম্পদকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, সকলের চিন্তা ও সাধনা
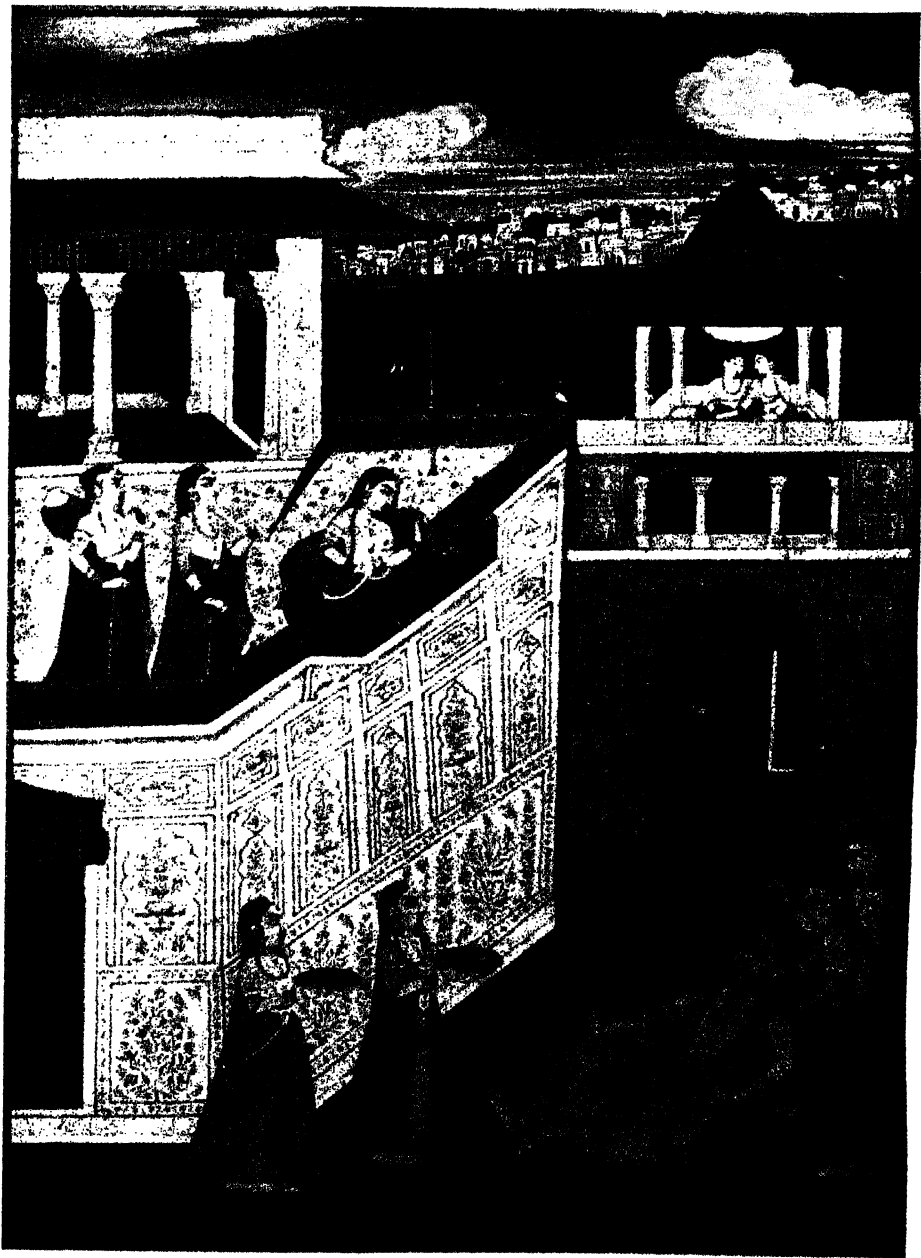
নায়ক-নায়িকা

(জয়পুরী প্রাচীন চিত্র)

শ্রী হিতেন্দ্রমোহন বসুর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ইহাদের সকলকেই পূর্ণতর করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলেও দেখা যায়, এইসকল গ্রন্থের অনুবাদ সকল সময় সংস্কৃত বা পালি হইতেই করা হয় নাই, বরং বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণের কথিত ভাষা বিভিন্ন প্রাকৃত হইতেই করা হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্

ফা-হিয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই (খৃষ্টাব্দ ৩৯৯-৪১৪) চীনে ও ভারতবর্ষে গভীর আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ধর্ম্মপদ ও মিলিন্দপনহ্'র মত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ও পালি হইতে সরাসরি অনূদিত হইতে আরম্ভ হইল। বুদ্ধঘোষের যিনি ছিলেন গুরু, সেই আচার্য্য রেবতীর পাদ-মূলে বসিয়া পাটলীপুত্র নগরীতে ফাহিয়ান্ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেইখান হইতে ফা-হিয়ান্ যান্ সিংহলে; সে-যুগ হইতে ভারতে ও সিংহলে ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নিবিড়তর হয়। এ যুগের ভারতবর্ষ যেন সভ্যতার লীলাভূমি; জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া ভারত সকল দিক্ হইতে মানুষকে ডাকিল তাহার আলোকোদ্ভাসিত চন্দ্রাতপতলে; সকল বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, দুর্গম গোবী মরুভূমি পার হইয়া, পামীর মালভূমি অতিক্রম করিয়া কুমারজীবও ফাহিয়ানের মত অসংখ্য আলোকোন্মত্ত কত আত্মা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। তক্ষশিলা ও পুরুষপুরের সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ঘুরিয়া, পাটলীপুত্রে তিন বৎসর ও তাম্রলিপিতে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, সিংহলে ও জাভায় কিছু দিন কাটাইয়া ফাহিয়ান্ চীনে ফিরিয়া গেলেন।

ধর্ম্মদূত কুমারজীব

বৌদ্ধ ভিক্ষু, কুমারজীবের বাসস্থান ছিল মধ্য এসিয়ার কারাসহরে (Karashar-Kucha); এক চৈনিক সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া চীনে লইয়া যায়। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু বন্দী যে-ভাবে চীনকে ইহার প্রতিদান দিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তিনি চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও তত্ত্বের অনুশীলনে নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাজে চীনের সর্ব্বোত্তম পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও অনূদিত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আজও চীন সাহিত্যের মুকুটমণি এবং তাঁহার "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" আজও চৈনিক ভাষায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। তাঁহারই প্রতিভা ও একাগ্র সাধনায় উত্তর ও দক্ষিণ চীনের বৌদ্ধধর্ম্মের দুই বিভিন্ন শাখা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল।

ধ্যান-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধভদ্র

এই সময়ই অন্যতম বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র সমুদ্রপথ দিয়া চীনে আসিয়া পৌছিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবন, বিশ্বাস ও ভক্তিতে দক্ষিণ-চীন-বাসীরা মুগ্ধ হইয়া পড়িল। বুদ্ধভদ্র সেইখানে বসিয়া একান্ত তপস্যায় চীনে ধ্যান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন—চীনের লুসান (Lu-Shan) পর্ব্বতের সুবৃহৎ বিহারের ভিক্ষু, কবি, ও তত্ত্ববিদেরা সকলে মিলিয়া বুদ্ধভদ্রের এই নবপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কুমার গুণবর্ম্মণ, কাশ্মীরের ধর্ম্ম-দূত ও চিত্র-শিল্পী

কুমারজীব ও বুদ্ধভদ্র যখন চীনে ভারতের অপূর্ব্ব সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ম্মণ তখন হেলায় রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া ভিক্ষু বেশে প্রচারে বাহির হইয়া পড়িলেন। ৪০০ শত খৃষ্টাব্দে তিনি সেই ভারতের উত্তরতম প্রান্ত কাশ্মীর হইতে দক্ষিণতম প্রান্ত সিংহলে আসিয়া পদার্পণ করিলেন, পরে সিংহল হইতে আসিলেন জাভায় এবং সেখানে রাজা ও রাজমাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। জাভা হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করিয়া সমুদ্র-পথে প্রাচীন ক্যাণ্টনে, ও ক্রমশঃ নান্‌কিনে আসিলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী ও সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যে কারুশিল্পপ্রিয় চীনের সহস্র লোকের চিত্তকে অধিকার করিয়া লইলেন। নান্‌কিনে তাঁহারই উৎসাহে দুইটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং চীনে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই প্রযত্নে ভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হইল। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহল হইতে তিস্‌সরকে অগ্রণী করিয়া এক

ভিক্ষুণীদল চীনে আসিয়া সিংহলী আদর্শে স্থানীয় ভিক্ষুণীগণকে সংঘবদ্ধ করিল। দেখা যাইতেছে, সিংহল ও জাভার ভিতর দিয়া ভারতে ও চীনে এই যুগে অতি নিকট আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং জাপানের পণ্ডিত তাকাকুসু (Takakusu) একথাও বলেন যে, ভিক্ষু বুদ্ধঘোষও ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়াছিলেন, সিংহলে মধ্যপথে কিছুকাল বাস করিয়া। সেইজন্যই দেখি, কাশ্যপমাতঙ্গ, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু, প্রভৃতি ২৪ জন ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া চীন চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা যে, আমরা কয়েকটি আচার্য্যের নাম জানিতে পারিতেছি—আরও কতজন যে, বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছেন তার খবর কে রাখে? পণ্ডিতবর শাভান (Chavannes) এবং সিল্‌ভ্যাঁ লেভি'র (Sylvan Levi) কৃপায় আমরা এই অজ্ঞাত বিস্মৃত কয়েকটি মহাপুরুষদের নাম জানিয়াছি—ইঁহাদের মধ্যে চিহ্-মোঙ ও ফা-মোঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন চীন হইতে; সংঘসেন ও গুণবৃদ্ধি ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন চীনে।

মৌনী প্রচারক বোধিধর্ম্ম

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দেখি, ভারতে ও চীনে জলপথে আর-এক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে মালয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া; বোধিধর্ম্ম এই অভিযানের অগ্রণী। ৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ চীনে, বুদ্ধভদ্র যেখানে নীরব প্রেম ও সাধনায় সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাভিষিক্ত হৃদয়ে সেইখানে আসিয়া বোধিধর্ম্ম ও সুদীর্ঘ নয় বৎসর মৌন নির্ব্বাক্ সাধনা ও তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসর নির্ব্বাক্, তথাপি এই ভাষাহীন প্রচারের বলে কি অপূর্ব্ব প্রভাবই তিনি চীনবাসীর উপর বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন! তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব প্রভাবে চীন ও জাপান এক মিলন-সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছিল।

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, পরমার্থ

বোধিধর্ম্মের পর চীনে মিলনের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বসুবন্ধুর চরিতলেখক পণ্ডিত পরমার্থ। ৫০০ খৃষ্টাব্দে পরমার্থ পৌঁছিলেন চীনে এবং তার আট বৎসর পরে মহৎ সম্মানে তিনি নান্‌কিনে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তিনি শুধু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; হিউয়েন্‌থ্‌সাঙের পূর্ব্বে যোগাচার তত্ত্ব ও সম্প্রদায়কে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চীনে পরিচিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন।

চীন-ভারত-মৈত্রীর স্বর্ণযুগ

তাঙ্ বংশীয় রাজাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় (৬১৭ ৯১০ খৃষ্টাব্দ) উত্তর ও দক্ষিণ চীন সম্মিলিত হইল এবং মধ্য এশিয়ায় আবার চীনের প্রভুত্ব প্রসারিত হইল। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই চীন ও ভারতের মৈত্রীবন্ধনে এশিয়ায় শিল্প, সাহিত্য ও তত্ত্ববিদ্যার এক গৌরবময় যুগের সূচনা হইল। হিউয়েন্‌থ্‌সাঙ ও ইৎসিঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি পড়িয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই যুগে ভারতবর্ষই এশিয়ার সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে নানা দিক্ হইতে ভারতীয় সাধকমণ্ডলীর উপর আক্রমণের চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয়, কিন্তু চৈনিক সাধনা ও সভ্যতার বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও চিন্তার ধারা এমনই সুপরিস্ফুট হইয়া আছে যে, তাহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ আজও চীন-ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য রত্ন; বৌদ্ধ তত্ত্ব ও ধর্ম্ম কেমন করিয়া মধ্য এশিয়ার বুকে হেলেনীয়, ইরাণীয়, খৃষ্টীয় ও মেনিকিয় চিন্তা ও সভ্যতার ধারাকে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহার প্রচুর প্রমাণ নবাবিষ্কৃত মধ্য এশিয়ার চিত্র ও তক্ষণ শিল্পে বর্ত্তমান। ভারতের শিল্পরূপ রীতি ও ভঙ্গিমা, ভারতের আদর্শ, চিন্তা, সাহিত্য, কল্পনা—ভারতবর্ষ হইতে যাহা আসিল তাহাই কল্যাণকর, তাহাই গ্রহণীয়, ইহাই ছিল চীনের মনোভাব। চীনের তোয়েন্-হোয়াঙের চিত্রাবলীতে তাই দেখিতে পাই চীন ও ভারতের শিল্পরূপের অপূর্ব্ব রাখিবন্ধন। এই দুই সভ্যতার শিল্পবিকাশধারাই পরে জাপানে প্রবেশ করিল। তাই দুর্গম মরুভূমির বুকে যে শিল্পভাণ্ডার

সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও লোকলোচনের গোচরীভূত হইল তাহাতে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন কক্ষ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। চীনের প্রান্তদেশ হইতে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত এশিয়ার বুকের উপর দিয়া যে বিরাট্ চলাচলের পথ, তাহারই কেন্দ্রবিন্দুটিকে জুড়িয়া রহিয়াছে তোয়েন্-হোয়াঙের বিস্তৃত গুহামন্দির—তাহারই পাশ দিয়া ভারত ও তিব্বত হইতে মঙ্গোলিয়া যাইবার পথটি চলিয়া গিয়াছে; চারিদিক হইতে চারিটি পান্থসরণী, এমনি করিয়াই তোয়েন্-হোয়াঙের তীর্থসঙ্গমে আসিয়া মিলিয়াছে। এইজন্যই তাং যুগের বৌদ্ধ চিত্রাবলীর অনুশীলন করিয়া রাফেল পেট্রুচ্চি ও লরেন্স বিনিয়নের মতো পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"পৃথিবীর শিল্পসাধনার ইতিহাসে তাংযুগের শিল্পবিকাশ এক অপূর্ব্ব অধ্যায়!"

ভারতবর্ষ ও কোরিয়া

চীন হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনা ধীরে ধীরে কোরিয়ায় প্রবেশ লাভ করিল। ৩৭৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর চীনের দুই আচার্য্য, আ-তাও ও শুন্-তাও কোরিয়ার রাজধানীতে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তাহার দশ বৎসর পরে, বহু ভারতীয় ও চৈনিক ভিক্ষু এবং মতনন্দ(?) নামে জনৈক আচার্য্য (ভারতীয় অনুমান করা যাইতে পারে) মধ্য-কোরিয়ার রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার দক্ষিণ কোরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল এবং "কৃষ্ণ-বিদেশী" (Black Foreigner) নামক জনৈক তাপস "ত্রিরত্ন" প্রচার করিলেন।

কোরিয়ার ইতিহাসে পাই, ৫৪০-৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহার এক রাজা ও রাণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় ৫৫১ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে এক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সৃষ্টি হইল, কোরিয়ার এক পুরোহিত হইলেন তাহার প্রধান ধর্ম্মযাজক। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাধনা অপূর্ব্ব কল্যাণে ও গরিমায় আপন প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিল। কোরিয়াতে আজও তাই বৌদ্ধপ্রত্নতত্ত্বের বিরাট ক্ষেত্র অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া আছে; হয়ত একদিন কোরিয়া, চীন ও জাপানের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতবর্গের সমবেত চেষ্টায় কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

ভারতবর্ষ ও জাপান

ক্ষুদ্র নগণ্য দেশ কোরিয়া, কিন্তু এই কোরিয়াই জাপানকে চীন-ভারত-মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগেই জাপানে চীনের শিক্ষা ও সাধনা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াই সর্ব্বপ্রথম সুবর্ণমণ্ডিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, কতকগুলি সুদৃশ্য ও চিত্রিত পতাকা জাপানের রাজসভায় প্রেরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। সেই সঙ্গেই কোরিয়া জাপানকে যে-বাণী প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও সত্যে স্থির এবং সারল্যে স্নিগ্ধ—'বুদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই ধর্ম্মে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার জীবন প্রেমে ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে * * * ভারতবর্ষ হইতে কোরিয়া পর্য্যন্ত সকল দেশ এই ধর্ম্মকে গ্রহণ ও বরণ করিয়াছে।"

জাপানের সংরক্ষীদল এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং তাহারা যতই প্রবল হইতে লাগিল, নবীন-পন্থী জাপান ততই প্রবল হইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বিরোধীদলের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে কুমার উমযদু শতকু (৫৯৩-৬২২ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্ম্মকে রাষ্ট্র-ধর্ম্ম রূপে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন; জাপানে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ শিখাইবার জন্য কোরিয়া হইতে আচার্য্য আনয়ন করিলেন ও জাপানের বিদ্যার্থীদিগকে চীনে পাঠাইলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ, কারুশিল্পী ও চিকিৎসকেরা আসিলেন সাধনা ও সভ্যতার পতাকা বহন করিয়া, সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠিল আরোগ্যশালা, অতিথিভবন, বিদ্যামন্দির, দেখা দিল বিরাট চিত্রশালা, সুনিপুণ তক্ষণশিল্পী ও শক্তিমান স্থপতি। শুধু ভারত হইতেই নয়—চীন হইতে গেলেন ভিক্ষু কানুজিন আরোগ্যশালা

ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে। এদিকে আবার ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আচার্য্য বোধিসেন তাহার চম্পা ও চীনের শিষ্যবর্গ লইয়া আসিলেন জাপানে। ইঁহারা অনেকেই ছিলেন শিল্পী ও গায়ক এবং ইঁহাদিগকে লইয়াই বোধিসেন ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এবং গান্ধার-রীতির অনেক প্রস্তর-চিত্র আজও জাপানের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা কখনও বাহুবলে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস করেন নাই—নিজেদের দানে জাতীয় শিল্পসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াই তাঁহারা আপন আধিপত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

সমগ্র অষ্টম শতাব্দী জুড়িয়া আছে জাপানে নারা যুগের গৌরব (৭০৮—৭৯৪ খৃষ্টাব্দ)। জাপানের ইতিহাসে নারা-যুগ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির যুগ। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনা রাজধানী ছাপাইয়া সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল, সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সমগ্র দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। এই যুগেই জাপানের চিত্র ও দারু-শিল্পের গৌরবময় সৃষ্টি ও বিকাশ আরম্ভ হইল এবং চীনের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার নব নব পথ খুলিয়া গেল। শুভকর সিংহ ও অমোঘবজ্রের "মন্ত্র"-সম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জাপানে প্রবেশ লাভ করিল এবং ভারতবর্ষে ও চীনে যে-সমস্ত তত্ত্ব ও সম্প্রদায় ধীরে ধীরে লয় পাইয়া আসিতেছিল, অসঙ্গের সেই "ধর্ম্মলক্ষণ" প্রভৃতি তত্ত্ব জাপানের তত্ত্ববিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। জাপানের জাতীয় জীবনে যাহা কিছু সুপ্ত হইয়া ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনার কল্যাণ-বারিসিঞ্চনে তাহাই নূতন শক্তিতে জাগিয়া উঠিল। এম্‌নি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবার দুই শত বৎসরের মধ্যেই জাপান ধর্ম্মের ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিল এবং জাপান নিজেই বিভিন্ন মতবাদ, বিচিত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে লাগিল—এশিয়ার দিকে আর তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইল না। জাপানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, খৃষ্টীয় নবম-শতাব্দীতে সাইচো (Saicho) ও কবো (Kobo) সেই ধর্ম্মের অগ্রদূত হইলেন; সাইচো তেণ্ডই-সু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধকেই প্রেম ও কল্যাণের সর্ব্বোত্তম বিকাশ এবং বুদ্ধত্ব লাভ করাই ব্যক্তিজীবনের সকল জ্ঞান, ভক্তি ও রহস্যের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া প্রচার করিলেন। কবো শিঙন-সু বলিয়া আর-এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 'এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান্ বুদ্ধেরই বহির্বিকাশ, তিনি সকলের অন্তরেই বিরাজমান; আমরা যদি 'কায়েন মনসা বাচা' জীবনের নিগূঢ় রহস্যের অনুশীলন করি তবেই আমরা সেই বুদ্ধকে জানিতে পারি'—এই বার্ত্তার প্রচার করিলেন।

এই দুই সম্প্রদায় জাপানের উন্নতিশীল সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অন্ধসংস্কার-পীড়িত জনসাধারণও চুপ করিয়া ছিল না—তাহারাও আপনাপন সম্প্রদায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠায় নিজদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানের উপর দিয়া অন্তর্বিপ্লবের কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিয়া গেল এবং সমগ্র জাপানের ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে ধ্বংস-ভ্রংশ করিয়া দিল। যে-তত্ত্বচিন্তা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, জাপান তাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিল এবং ধর্ম্মের ভাবোন্মাদনাকেই বড় বলিয়া জানিল। সেই হেতুই দেখি, হোরেন্ জাপানে ধর্ম্মবীর হইয়া দেখা দিলেন (১১৩৩-১২১২ খৃষ্টাব্দ) এবং সমস্ত তত্ত্বচিন্তা ও রহস্য-সাধনাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া "সুখাবতী" বলিয়া এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে প্রাণী, যত জ্ঞানী বা অজ্ঞান হউক সে, যত উচ্চ বা নীচ হউক, মুক্তি সে পাইবেই, যদি অমিতাভের অসীম করুণায় তাহার বিশ্বাস থাকে—'সুখাবতী'-তত্ত্বের ইহাই মর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে জাপানের সেই সুপ্রাচীন শিন্তো ধর্ম্ম ও পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল এবং চিকুফুসা'র (১৩৩৯ খৃঃ অঃ) মত মনীষীরা ও শিন্তোধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতাকে বুদ্ধেরই অবতার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই চীন হইতে বুদ্ধভদ্র ও বোধিধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত সেই ধ্যান-তত্ত্ব ও সম্প্রদায় জাপানে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং জাপানের যোদ্ধসম্প্রদায় তাহারই মধ্যে আপনাদের মনোমত ধর্ম্মমত খুঁজিয়া পাইল। এম্‌নি করিয়াই, এক দিকে ভারতবর্ষ যখন তাহার সংকীর্ণ গৃহ-সমস্যায় আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছে, নিজের সেই বৃহত্তর বিস্তারের কথা, কোরিয়ায় জাপানে তাহার আদর্শ প্রচারের কথা ভুলিতে বসিয়াছে, তখন জাপান তাহার মন্দিরে মন্দিরে অতি সমারোহে বুদ্ধ অমিতাভের পূজা জুড়িয়া দিয়াছে এবং ভারতীয় আচার্য্য পিন্দোল-ভরদ্বাজের মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে মন্দিরগাত্র ভরিয়া তুলিতেছে।

ভরাত ও তিব্বত

তিব্বতও অধিককাল পর্য্যন্ত আপনাকে ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারিল না এবং যেদিন তিব্বত বাহিরের আলোকে আসিয়া দাঁড়াইল সেদিন একদিকে চীন, আর একদিকে ভারত, এই দুয়ের সঙ্গেই মিলনসূত্রে বাঁধা পড়িয়া গেল। তার রাজা স্রং-ব্‌ট্‌সান্-গম্পো (৬৩০-৬৯৪ খঃ) নেপাল তথা ভারতবর্ষ হইতে একটি এবং চীন হইতে একটি-এই দুইটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নেপালের রাজকন্যা তিব্বতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের তারামূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন এবং চীন রাজকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার কয়েকটি আচার্য্য। গম্পো শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহার মন্ত্রী থুম্মি সম্ভোটকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন বিদ্যার্জ্জনের জন্য; এই থুম্মিই ক্রমে দেবনাগরী লিপিকে রূপান্তরিত করিয়া বর্ত্তমান তিব্বতী বর্ণমালার সৃষ্টি করিলেন। গম্পোর পরে খ্রি-স্রং-দি-ব্‌ৎসান (৭৪০-৭৮৬ খৃঃ) ভারতবর্ষ হইতে অনেক পণ্ডিতকে তিব্বতে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় তিব্বতের আপন ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ভারতীয় পণ্ডিত পদ্মসম্ভব ও তাঁহার শিষ্য পাগুর-বৈরোচনের নাম তিব্বতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থাদি হইতে অনুবাদ তিব্বতের ভাষা ও সাহিত্যকে চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশ হইতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গিয়া সেখানের চিন্তা ও ধর্ম্মের সংস্কারে নবযুগ আনিলেন।

কিন্তু চীন জাপান যেমন করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বের নূতন নূতন মতবাদের উদ্ভব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল, তিব্বত তাহা পারে নাই। তাহাদের কাণ্‌জুর ও টাণ্‌জুর প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যা, জড়-বিদ্যা ও আজগুবী গল্পের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষের মত অভিধান, মেঘদূতের মত কাব্য, চন্দ্রগোমিনের রচিত ব্যাকরণ, চিত্রলক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহারা মাঝে মাঝে অনুবাদ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিকৃত ও বিদুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত তাহারই মধ্যে তিব্বতীরা আপন স্বধর্ম্ম খুঁজিয়া পাইয়াছিল—এম্‌নি করিয়াই বজ্রযান ও কালচক্রযানের সৃষ্টি হইল এবং তাহাই ক্রমে লামাধর্ম্মে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। সেইজন্যই দেখি, তিব্বতে বুদ্ধ অপেক্ষা *alchemist* নাগার্জ্জুনের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশী। এম্‌নি করিয়াই তিব্বতের পার্ব্বত্য যাদুবিদ্যা, ঝাড়ফুঁকমন্ত্র ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেল। পণ্ডিত ওয়াডেল্‌ বহুদিন তিব্বতীদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিজ্ঞতা তিনি তিব্বতের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন—

"তিব্বতীদের যাহা কিছু সভ্যতা, যাহা কিছু তাহাদিগকে মানব-সমাজে উন্নত করিয়াছে তাহা এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনার কৃপায়। তাহাদের মধ্যে পশুহত্যার ও রক্তপাতের প্রচলন বন্ধ করিয়া, তাহাদের বিকৃত 'ভুতুড়ে' ধর্ম্মকে সংস্কৃত করিয়া, সর্ব্বজীবে দয়া ও প্রেমের প্রচার করিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্মই তাহাদিগকে বর্ব্বরতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

ভারতবর্ষ ও তুর্কো-মঙ্গোলীয় জনসংঘ

মোগল সেনাপতি চেঙ্গিস খাঁ ও কুব্‌লাই খাঁ কর্ত্তৃক

চীন ও মধ্যএশিয়া বিজয়ের পর, লামা ফাগ্‌সপা (Phagspa) তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মকে লইয়া সর্ব্বত্র একটা দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফাগ্‌সপা ছিলেন কুবলাই খাঁ'র তিব্বতীয় রাষ্ট্রবন্ধু। এই তিব্বতের ভিতর দিয়া ভারত ও নেপালের শিল্প ও কারুবিদ্যা চীনে, মধ্য এশিয়ায় ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় সম্রাটদের রাজসভায় বহু আদর ও সম্মান লাভ করিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে ফাগ্‌সপা'র মৃত্যু হইলে পর লামা ধর্ম্মপাল তাহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহাদের সকলের উৎসাহ ও পোষকতায় তিব্বত, মোঙ্গল, তুঙ্গুজ ও ওইগুর (Tunguse and Ouigur Turks) তুর্কীরা সকলে এক ধর্ম্মবন্ধনে গ্রথিত হইয়া ভারতের মৈত্রী-পরিবারের পরিধি সুদূর সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

কোরিয়া জাপান, চীন তিব্বত ছাড়িয়া দিয়া যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পানে তাকাই, তাহা হইলে প্রথমেই চোখে পড়ে ব্রহ্মদেশ। তার পরেই শ্যাম, কাম্বোজ, চম্পা; ক্রমে সুমাত্রা, জাভা, মাদুরা, বালি, লম্বক, বোর্ণিয়ো এবং অন্যান্য দ্বীপ এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান পলিনেশীয়া। এই সমস্ত দিক্‌টির ইতিহাস সেদিনও বিস্মৃতির আড়ালে লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী ও ডাচ্ পণ্ডিতদের চেষ্টায় এই বিস্মৃত ও অজ্ঞাত ইতিহাসের এক বিরাট্ অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই আরও নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে এবং একথা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা অপ্রতিহত ধারায় দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার এই ভূখণ্ডগুলিকে পরিপ্লাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে।

হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের ক্রম

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বয়স খুব বেশী নয়, সেই-হেতু খুব প্রাচীন কালেই যে এদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু কোন বিশিষ্ট রাজার দিগ্বিজয়-গাথা শিলালেখতে বা তাম্রশাসনে লিখিত হইবার বহু পূর্ব্বে, কোন বিশেষ শিল্পীকুলের বিরাট স্থাপত্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে এক দেশ ও জাতি শুধু অজানাকে জানিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বশে অন্য দেশ ও জাতিকে আবিষ্কার করে এবং তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রবন্ধন, বাণিজ্যবন্ধন অথবা ধর্ম্মবন্ধনে মিলিত হয়—অথচ তাহার কোন চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকিতে না পারে। কাজেই ইহা অসম্ভব নয় যে, ভারতীয় শিল্পী ও আচার্য্যেরা স্থলপথে একদিকে যখন মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রবেশ করিয়াছিল ঠিক তখনই তাহারা জল-পথে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ভূখণ্ডগুলিতে আসিয়া আপন সভ্যতা, ধর্ম্ম ও শিল্পের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিল।

আমরা টলেমির (Ptolemy) ভূগোলে (১৫০ খৃঃ) দেখিতেছি, তিনি জাভা পর্য্যন্ত এদিকের সমস্ত স্থানগুলিরই নাম করিতেছেন; সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে তাহার সাধনা ও সভ্যতা বহন করিয়া অনেকেই এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চম্পায় যে প্রাচীনতম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভাব (বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দুইই) অতি সুপরিস্ফুট। অধ্যাপক পেলিয়ো (Pelliot) মনে করেন, ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব এশিয়ায় আসিতে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া যে সুপ্রাচীন পথ তাহাতো ছিলই; তাহা ছাড়া প্রাচীনকালে আরো দুইটি পথ ছিল—একটি ছিল আসাম, ব্রহ্মদেশ, চীনের ভিতর দিয়া স্থলপথ; আর একটা ছিল ইন্দোচীনের সমুদ্রতীর বাহিয়া জলপথ। পেলিয়ো এই প্রমাণও পাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই চীন-সাহিত্যে কাম্বোজের প্রাচীন নাম "ফুনানের" (Funan) উল্লেখ আছে। কাজেই আমরা যদি একথা বলি যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদিকে বৃহত্তর ভারতের সূচনা হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহাকে শুধু অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় ইহাই বৃহত্তর ভারতের প্রথম অধ্যায়।

ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পঞ্চম শতাব্দীর যুগ এক স্বর্ণযুগ—ধনে, জনে, জ্ঞানে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই যুগের হিন্দুধর্ম্ম ও সাধনা কাম্বোজ ও চম্পাকে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করিল; মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, লাওস, বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভায় সর্ব্বত্র হিন্দু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পাশাপাশি লালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃহত্তর ভারতের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ইতিহাস আজও অজ্ঞাত ও অলিখিত।

সিংহল ও ব্রহ্মদেশ

ভাষার দিক হইতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তিব্বতের সম্বন্ধ নিকটতর, কিন্তু ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদানের দিক হইতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের অতি নিকট আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের ধর্ম্মাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার কথা ঐতিহাসিক সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ৪৫০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধঘোষ যে সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গিয়া হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এ কথার সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা ছাড়া চীন পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় সাধনার প্রচারে বুদ্ধঘোষই একমাত্র অগ্রণী ছিলেন না। তাঁহার আগেও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচারকেরা ব্রহ্মদেশে আপনাপন ভাব ও সাধনার প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর যে-সমস্ত প্যু (Pyu) শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ভাষাতত্ত্ব হইতেও একথা প্রমাণিত হয়।—কাজেই মনে হয় পূর্ব্ববাঙলা ও আসামের ভিতর দিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ সিংহলেরই মত ভারতের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ।

চম্পা, কাম্বোজ, শ্যাম ও লাওস্

চম্পা ও কাম্বোজে হিন্দু উপনিবেশের পরিচয় অল্প কথায় দেওয়া যায় না। ভারত ইতিহাসের সে এক বিস্তৃত অধ্যায়। সে অতীত ইতিহাসের যতই অনুশীলন হইতেছে ততই নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে; এবং তার রহস্যময় ইতিহাস সকলকে বিস্ময়ে ও পুলকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার আভাস ভবিষ্যতে পৃথকভাবে দিবার ইচ্ছা রহিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্যামদেশও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিল। কাম্বোজ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল এবং কাম্বোজের মতই হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মকে বরাবর মানিয়া চলিল। চম্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর সিংহলী বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত কাবার্তো বলেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চম্পা ও কাম্বোজ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ-আগমন পর্য্যন্ত শ্যামদেশ ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রভাবেই আপনার জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে প্রশান্ত মহাসাগর

মং-খ্‌মের (Mon-khmer) ও মালয়-পলিনেশীয় জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদান প্রদানের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়—হয়ত আর্য্য এমন-কি দ্রাবিড় আগমনের পূর্ব্বে হইতেই ছিল। কিন্তু এই অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই যে ভারত মহাসমুদ্রের এক প্রান্তে মালয় দ্বীপ-পুঞ্জের সঙ্গে আর-এক প্রান্তে মাদাগাস্কার এবং আফ্রিকার অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

এই সুবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের বাণিজ্যপথে সিংহল ছিল অন্যতম বিশ্রামস্থল। একথা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় নাবিকেরাই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাহির হইয়া ভারতমহাসমুদ্রের এই দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রথম সন্ধান লাভ করিয়াছিল। ফা-হিয়ান্ ও গুণবর্ম্মণ শত শত বর্ষ পরে সেই পুরাতন বাণিজ্য-পথ ধরিয়াই সিংহল ও জাভায় গিয়াছিলেন। মালয় উপদ্বীপ ছিল ভারত হইতে পূর্ব্ব এশিয়ায় যাইবার পথে সমস্ত বণিক্ ও বিদেশ-যাত্রীর মিলন-কেন্দ্র। সুমাত্রার জনসাধারণ মালয় উপদ্বীপের

ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ব্বরতা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল এবং পরে ভারতবর্ষের চিন্তা ও সাধনাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মালয় উপদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন ভাষার অনেক শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত; তাহাদের পুরাণের প্রধান প্রধান দেবদেবী হিন্দু; তাহাদের সৃষ্টিতত্ত্বও হিন্দুরই সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology)। শুধু কারু (craft) ও মণ্ডণ- শিল্পের (decorative art) ক্ষেত্রেই ইহারা কতকটা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিল। এশিয়ার শিল্প-ইতিহাসে জাভার এবং কম্বোজের স্থাপত্য ও মণ্ডণ-শিল্প চিরকাল একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

সুমাত্রার "শ্রীবিজয়" রাজ্য

৬৭১ খৃষ্টাব্দে একবার এবং ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার চীন-বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও অনুবাদ করিবার জন্য সুমাত্রায় আসিয়াছিলেন; সুমাত্রা তখন "শ্রীবিজয়"-রাজ্য নামে পরিচিত। এক হাজার ভিক্ষু-আচার্য্য সুমাত্রার বিদ্যাবিহারগুলিতে থাকিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং হিউয়েন্ সাঙের সুমাত্রা গমনের পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহাস্থবির ধর্ম্মপাল ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার অনুশীলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুমাত্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইৎসিঙের সময় হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুমাত্রার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখিতেছি, সম্রাট্ আদিত্যবর্ম্মণের সময় সুমাত্রায় অবলোকিতেশ্বরের তান্ত্রিক অবতার জীন অমোঘপাশের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে এবং পাদাঙ্ চণ্ডীর মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে—সেই মন্দিরেরই একটি শিলালেখ অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তর সুমাত্রা মুসলমানদের অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিন্দু সভ্যতা ও সাধনা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

জাভা, মাদুরা, বালি, লম্বক ও বোর্ণিয়ো

খুব প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে জাভার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সুবর্ণপ্রস্থ বলিয়া জাভা ও সুবর্ণদ্বীপের (বোধহয় সুমাত্রা) বিবরণ আছে। বোর্ণিয়ো দ্বীপে শৈব ও বৈষ্ণব মূর্ত্তি কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, এবং রাজা মূলবর্ম্মণের "যূপশিলা লেখ" হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিও বোর্ণিয়োতে অনুষ্ঠিত হইত। সুমাত্রার মত জাভাতেও মূলসর্ব্বাস্তিবাদিদের বিরাট্ প্রতিষ্ঠান ছিল। জাভার ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং শিল্পে ও সাহিত্যে জাভা ভারতবর্ষকে অনেকটা অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিত বলিয়া সে-ক্ষেত্রে কাম্বোজের মত জাভা এমন কিছু দান করিতে পারে নাই যাহা জাভার নিজস্ব। অষ্টম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম জাভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, সুমাত্রার শ্রী-বিজয় সাম্রাজ্যের শৈলেন্দ্রবংশের এক রাজা অব-লোকিতেশ্বরের শক্তি আর্য্য-তারার এক মূর্ত্তি ও চণ্ডী কলসনের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পণ্ডিতপ্রবর কার্ণ (Kern) বলেন, জাভার এই তান্ত্রিক মহাযান ধর্ম্ম আসিয়াছিল পশ্চিম বঙ্গ হইতে। নবম শতাব্দীতে জাভায় যে-সব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাও এই মহাযান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানেরই অংশ। কিন্তু তার পরে জাভার তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প প্রধানত হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতির প্রভাব শিল্পে প্রকট হইতেছে।

নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে যে সাধনা ও সভ্যতার স্রোত পূর্ব্ব সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা গিয়াছিল দক্ষিণ ভারত হইতে। এই সাধনা ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য। ইহা শৈলেন্দ্ররাজ বংশের কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত। এই শ্রীবিজয় রাজ্যের আধিপত্য জাভায় এমন-কি দক্ষিণ ভারতেও কোথাও কোথাও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি নালন্দায় আবিষ্কৃত দেবপালের এক তাম্রশাসনে শ্রীবিজয় রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভাব ও ধর্ম্ম, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের আদর্শে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শৈলেন্দ্র-শাসিত জাভা এইসময় তার বিরাট বরোবুদোরের (Boroboudur) মন্দির গড়িয়া

তুলিল। এই নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মই জাভার নিজধর্ম্ম-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রীবন্ধন

প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মও জাভা মাদুরা বালি লম্বকে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল। বোর্ণিয়ো দশম, দ্বাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে যখন ইন্দোনেশীয় শিল্পের চরম বিকাশ-লাভ ঘটিয়াছিল তখনই জাভায় প্রাম্বানাম, পানাতরনের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির বিরাট হিন্দু মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহার প্রাচীর গাত্রে রামায়ণের ও কৃষ্ণায়ণের বিচিত্র ঘটনাবলী মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কাম্বোজে আঙ্কোরথোমের শৈব মন্দির, বাপুয়নের বৈষ্ণব দেউল এবং কাম্বোজ-রাজ পরমবিষ্ণু-লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ম্মিত, মহাভারত-পুরাণাদির প্রস্তর-চিত্রে পরিশোভিত, আঙ্কোর ভাটের বিরাট বিষ্ণুমন্দিরও এই যুগেই সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত কাবাতোঁ বলেন, 'এই সব মন্দির দেখিয়া মনে হয় কাম্বোজে এমন একটা ভাব ও সাধনার বিকাশ হইয়াছিল যাহা জ্ঞান ও চিন্তা-বিমুখ খ্মেরে জাতির নিজস্ব সম্পদ বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না; তাহা শুধু হিন্দু বুদ্ধি ও প্রতিভা দ্বারাই সম্ভব।' যাহা হউক দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আনাম ও শ্যাম জাতির আক্রমণের ফলে এই হিন্দু সাধনা ও সভ্যতার প্রভাব ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল এবং তার কিছু পরে ইসলাম অভিযান কাল-বৈশাখীর মত এই হিন্দু উপনিবেশগুলি হইতে হিন্দুত্বের চিহ্ন উড়াইয়া দিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মালয়-পোলিনেশীয় ভূ-খণ্ড

মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপানে ভারতবর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল শান্তি প্রেম ও কল্যাণের পথে সাধনা ও সভ্যতার শুভ্র পতাকা বাহিয়া; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব শুধু ঐ পথেই বিস্তারিত হয় নাই, মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধ-অভিযানের সাহায্যও লইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও সৈন্য চালনা যুদ্ধজয় ও রাজ্য-শাসনই কখনও একান্ত হইয়া দেখা দেয় নাই; রাজ্যবিজয় ও যুদ্ধ-অভিযানের কথা সে দেশের জনসাধারণ বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়া রাখিয়াছিল শুধু, ভাবসৃষ্টি ও সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের অপূর্ব্ব দান। সেই জন্যই দেখি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রাচীন ভাষায় সংস্কৃত যে সব শব্দ পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম, নীতি শিল্প ও জ্ঞান বিষয়ক; পণ্ডিত স্কিট্ (Skeat) ইহা ভাল করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত ক্রুইজৎ (Kruijt) দেখাইয়াছেন মালয়-পলিনেশীয় ভাষায় ভগবানের যত নাম সমস্তই সংস্কৃত দেবতা শব্দ হইতেই গৃহীত: সিয়াউদের মধ্যে (Siau) দেবতাকে বলা হয় "দুয়তা"; ম্যাক্যাশর ও বুগিনিজেরা বলে "দেউয়তা"; বোর্ণিও'র দয়কেরা (Dayaks) বলে "যবতা" অথবা "যতা"; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বলে "দিবতা", "দবতা" অথবা "দিউয়তা"। এই রকম ভটার, বটরগুরু প্রভৃতি আরো অনেক শব্দ দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি পলিনেশীয় গাথা ও পুরাণে ভারতীয় প্রভাবের যে প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বস্তুতই আশ্চর্য্য হইতে হয়। পণ্ডিতবর কীন (Keane) এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'মাঝে মাঝে মনে হয় এই সব মালয়-পলিনেশীয় কবিদের আত্মা যেন এক অদ্বিতীয় মহান্ত পুরুষের সত্ত্বাকে অনুভব করিয়া অসীম ঊর্দ্ধে অনন্ত লোকে বিহার করিতেছে। হিন্দুর যাহা শাশ্বত ব্রহ্ম, পলিনেশীয়দের তাহাই তাঙ্-আরোয়া—যাহা ছিল, যাহা আছে এবং যাহা চিরদিন থাকিবে; যাহার বাস ছিল সে বিরাট শূন্যতার মধ্যে, যখন না ছিল আকাশ, না ছিল জগৎ, না ছিল জল, না ছিল মানুষ'। * * * * বেদের মধ্যে সেই অসীমের সন্ধানেরই যেন ইহা প্রতিধ্বনি, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হইতে দ্বীপে মন্দ্রিত মুখরিত হইয়া ফিরিতেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন হয় বৈদিক ভারতের সঙ্গে ইহাদের কোনো-কালে যোগ হইয়া ছিল কি? যদি হইয়া থাকে তবে কখন কোন সময় এই সম্বন্ধের সূচনা?'—

সেবা ও মৈত্রী—বৃহত্তর ভারতের মূল মন্ত্র

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে পলিনেশীয়-বেদের এই সুগম্ভীর মন্ত্রবাণী শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন ভারতের এই বিশ্ববিহারের মর্ম্মকথাটি ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে; মনে হয় যেন তাহারই মধ্যে বৃহত্তর ভারতের, এই বিশ্বানুভূতির গোপন মন্ত্রবাণীটি ধ্বনিত মন্দ্রিত হইতেছে। ভারতবর্ষের কোনো কোনো সম্রাট মাঝে মাঝে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংগ্রামকেই রাজধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু দেশ ও জাতি হিসাবে সমগ্র ভারত তার ইতিহাসে সাধারণত শান্তি ও কল্যাণের পথকেই সত্য পথ বলিয়া জানিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ভারতবর্ষ যে-সকল দেশ ও জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করিয়া চলিতে শিখিয়াছিল—নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই অপরকে দান করিয়া অপরের কল্যাণবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সে জানিয়াছিল। যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর তাহারই সঙ্গে ভারতবর্ষ আপন ভাগ্যকে জুড়িয়া দিয়াছিল—জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই সাধনা একটি অমূল্য তথ্য। তাহার ইতিহাসের ক্ষুব্ধচঞ্চলস্রোতে, মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয়ী অত্যাচারী সম্রাট এবং ধূর্ত্ত বাণিজ্য-ধুরন্ধরের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভারতের শাশ্বত জীবনস্রোতকে কখনও পঙ্কিল করিয়া দিতে পারে নাই। সেই জন্যই দেখি, কত জেতা কত রাজচক্রবর্ত্তীর নাম যখন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে তখনও ভারতের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের বিচিত্র জনসমাজ, সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য, বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠার জন্য এই আচার্য্য ও লোকশিক্ষকদের, এই শিল্পী ও মানবপ্রেমিক-দের নিঃস্বার্থ সেবা ও মৈত্রীর কথা ভুলিতে পারে নাই—অপরিসীম যত্নে এবং অসীম কৃতজ্ঞতায় সেই দিব্য স্মৃতিকে তাহারা বুকের মধ্যে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

[অনুবাদক শ্রী নীহাররঞ্জন রায়]

গ্রীক্ সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের হস্তিতত্ত্ব

শ্রী সত্যভূষণ সেন

খৃষ্ট অব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও যে ভারতের কথা গ্রীস্‌দেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; এমন কি সেই প্রাচীনযুগেও যে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যসমূহ গ্রীসে ব্যবহৃত হইত তাহারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়।*

আলেক্‌জাণ্ডারের অনুচরবর্গের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেসকল মূল বিবরণ লুপ্ত হইয়া গিয়া এখন শুধু Strabo, Pliny এবং Arrian এর গ্রন্থে সেসকলের সারমর্ম্ম পাওয়া যায়। ইহার পরেই স্বনামধন্য মেগাস্থেনীস্। মেগাস্থেনীসের মূল গ্রন্থেরও এখন আর অস্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার বিবরণ বিবিধ প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয় লেখকদের কাহিনীতে এত বহুলপরিমাণে উল্লিখিত এবং উদ্ধৃত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ হইতেই মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ পুনঃ সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল প্রাচীন লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাবো (Strabo) প্লিনী (Pliny), এরিয়ান (Arrian), ঈলিয়ান (Ælian) ইত্যাদি। এস্থলে প্রাচীন ভারতের হস্তী-সম্বন্ধে যে তথ্য বিবৃত হইতেছে তাহাও প্রধানতঃ ষ্ট্রাবো, এরিয়ান এবং ঈলিয়ানের যোগে মেগাস্থেনীসের বিবরণ হইতেই সঙ্কলিত।

প্রাচীন ভারতের হস্তী-সম্পদ্ খুবই অপর্য্যাপ্ত ছিল। সেইসময়ে যুদ্ধের কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে হস্তী ব্যবহৃত হইত; অবশ্যই হস্তীগুলিকে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা

* ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখা যায় টিন এবং হস্তীদন্ত।

দেওয়া হইত। যুদ্ধ-ব্যবসায়ে হস্তীর এত মূল্য ছিল যে, অনেক স্থলে হস্তীর সংখ্যার উপরে যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করিত। সেইজন্যই আবার ছোট বড় প্রত্যেক রাজাকেই যথেষ্ট সংখ্যক হস্তী সংগ্রহে মনযোগ দিতে হইত। সেই সময়কার ইতিহাসের রাজশক্তির পরিচয়ে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনার সহিত কোন্ রাজার হস্তীবল কত ছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ কতকগুলি বিবরণ হইতে একটা গড়পড়্তা হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সংখ্যা হিসাবে পদাতিক সেনার সহিত অশ্বারোহীর অনুপাত হয় ১০০তে ১৩।১৪, হস্তীর হয় ১০০তে প্রায় ৪; স্থল-বিশেষে পদাতিকের সহিত হস্তীর অনুপাত ১০০তে ১৫ পর্য্যন্তও পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে হস্তী সংখ্যা হিসাবে যেমন পর্য্যাপ্ত ছিল আয়তনেও ভারতীয় হস্তীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ইহার কারণস্বরূপ এই বলা হয় যে, যেমন ভারতের উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে তেম্‌নি বনজাত প্রচুর খাদ্য সরবরাহ উপভোগ করিয়া প্রাণীসমূহও অসাধারণরূপে বিশালাবয়ব প্রাপ্ত হয়। আয়তনে এক-একটি হস্তীর শরীর নয় হাত উচ্চ এবং পাঁচ হাত প্রশস্ত হইত।* সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইত প্রাচ্য প্রদেশের (মগধের) হস্তী, তার পরেই তক্ষশিলার হস্তী। কথিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় হস্তী সেই সময়কার মিশরের অন্তর্গত লিবিয়া (Libya) প্রদেশের হস্তী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক বলশালী ছিল। কোন কোন স্থলে ভারতবর্ষে দুই-একটি শ্বেত হস্তীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন বর্ত্তমান যুগে তেম্‌নি প্রাচীন ভারতেও হস্তী প্রথমতঃ বন্য অবস্থায়ই থাকিত, পরে মনুষ্যের হস্তে ধৃত এবং বন্দী হইয়া গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে পরিগণিত হইত। আধুনিক যুগে যেমন ভারতবর্ষে খেদা করিয়া হাতী ধরা হয়, প্রাচীনকালেও তাহাই হইত—সামান্য কিছু প্রকারভেদ ছিল মাত্র। হাতী-ধরার প্রণালীতে সেই সময়কার গ্রীক্‌দের সহিত ভারতবর্ষীয়দের কোনরূপ সাদৃশ্য ছিল না, সম্ভবতঃ সেইজন্যই এই বিষয়টা বেশ বিস্তৃতভাবেই গ্রীক্ সাহিত্যে বিবৃত দেখা যায়।

প্রণালীটা ছিল এইরূপ—একটি শুষ্ক সমতল ভূমি বাছিয়া লইয়া তাহার চারিদিকে খাদ কাটিয়া একটা পরিখার মত করা হয়।* পরিখার গভীরতা হয় ৪ বাম (বাম=৬ফুট) প্রস্থ ৫ বাম, বিস্তৃতিতে পরিখা এক মাইলেরও উপরে হয় (5 or 6 Stadia), কারণ, শিকারের ক্ষেত্রটা একটু বিস্তৃত হওয়াই আবশ্যক। পরিখা খনন করিয়া যে-মৃত্তিকা উদ্ধৃত হয়, তদ্দ্বারাই পরিখার দুই দিকে মাটির দেওয়াল তৈয়ারী হয়। পরিখার বাহিরের দিকের দেওয়ালের মধ্যে গহ্বর খনন করিয়া শিকারীদের জন্য কুটীর নির্ম্মিত হয়। এই কুটীরের গায়ে ছিদ্রপথ থাকে। তাহাতে ভিতরে আলোক-প্রবেশেরও উপায় হয়, আবার ভিতর হইতে শিকারীরা শিকারের গতিবিধিও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। সমস্ত বন্দোবস্ত হইলে পরিখা-বেষ্টিত শিকার-ক্ষেত্রে তিন-চারিটি অতি উৎকৃষ্ট শিকারী হস্তিনী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাহির হইতে শিকার-ক্ষেত্রে যাইবার জন্য পরিখার উপর দিয়া একটি মাত্র সেতু স্থাপন করা হয়; এই সেতুপথটা মৃত্তিকান্তরে এবং তাহার উপরে খড় ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয় যেন বন্য হস্তী আসিয়া কোন প্রকার সন্দেহের হেতু বুঝিতে না পারে। তখন শিকারীরা সরিয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইয়া শিকারের অপেক্ষা করিতে থাকে। বন্য হস্তী দিনের বেলায় লোকালয়ের ধারে যায় না, কিন্তু রাত্রিতে উহারা খাদ্যান্বেষণে যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। হস্তীযূথের মধ্যে একটি থাকে সকলের অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ এবং সাহসেও অদ্বিতীয়—অন্য সকল হস্তীই এই দলপতির অনুগমন করে। এইরূপে কোন হস্তীযূথ যখন শিকার-ক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া পোষা-হস্তিনীদের বৃংহতিধ্বনি শুনিতে পায় অথবা উহাদের গাত্রের আঘ্রাণ পায় তখন উহারা ঐ দিকে যাইবার জন্যই চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু পরিখায় বাধা পাইয়া অবশেষে পরিখার তীরে তীরে পর্য্যটন করিয়া

* বর্ত্তমানে ভারতীয় হস্তীর উচ্চতা সাধারণতঃ ৮ ফুট ৯ ফুট, বেশী হইলে ১০ ফুট পর্য্যন্ত হয়।

* বর্ত্তমান যুগে পরিখার পরিবর্ত্তে বৃক্ষকাণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত প্রাচীরের ব্যবহার হয়।

সেতুপথ আবিষ্কার করে এবং সেই পথে একে একে শিকার-ভূমিতে গিয়া প্রবিষ্ট হয়। তখন শিকারীরা তাহাদের গুপ্ত গৃহাবাস হইতে বাহিরে আসিয়া তাড়াতাড়ি সেতুপথ বিযুক্ত করিয়া ফেলে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে গিয়া খবর দেয় যে, হাতী শিকার-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম হইতে আরও ভাল ভাল শিকারী হাতী আনা হয়। অনেক স্থলে তাহারা তৎক্ষণাৎ শিকারে প্রবৃত্ত না হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করে, যাহাতে বন্য হস্তীগুলি ক্ষুধার তাড়নায় এবং পিপাসার জ্বালায় একটু কাতর হইয়া পড়ে। তখন তাহারা আবার সেতু-পথ যুক্ত করিয়া সকলে মিলিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং সমস্ত পোষা হস্তীদ্বারা বন্য হস্তীদের উপর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। বন্য হস্তীগুলি একেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপরে আক্রমণে নির্বীর্য্য হইয়া উহারা সহজেই পরাভূত হয়। পোষা হাতীগুলি বন্য হস্তীর ধারে-ধারেই থাকে। বন্য হস্তীগুলি ঐরূপে নিবীর্য্য হইয়া পড়িলে শিকারীদের মধ্যে যাহারা খুব সাহসী তাহারা ভূমিতে অবতরণ করিয়া নিজ নিজ হস্তীর পেটের নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। সেখান হইতে সুযোগ বুঝিয়া অজ্ঞাতসারে বন্য হস্তীর পেটের নীচে গিয়া উহার পা-গুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তার পর পোষা হাতী দ্বারা ইহাদের উপর আবার আক্রমণ করান হয়। একেই ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহার উপরে পা বাঁধা থাকার দরুণ ইহারা সহজেই পড়িয়া যায়। তখন শিকারীরা নিকটে দাঁড়াইয়াই একে একে বন্য হস্তীদের গলায় বৃষচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দেয় এবং উহাদের পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া বসে অথবা এক একটি পোষা হাতীর সহিত এক-একটি বন্য হস্তীকে ঐরূপ বৃষচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুতে গলায় গলায় বাঁধিয়া ফেলে। এদিকে একখানা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছুরিদ্বারা বন্য হস্তীর গলায় মালার আকারে একটি খাঁজ কাটিয়া ফেলে এবং তাহার মধ্যে ঐ রজ্জুর ফাঁস বসাইয়া দেয় যেন আর নড়িবার ক্ষমতাও না থাকে। এইরূপে কোন-প্রকার বাধা দেওয়ার শক্তি মাত্রও একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া পোষা হাতীর সাহায্যে ইহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া হয়।

এই বন্য হস্তীযূথের মধ্যে যেগুলি একেবারে বৃদ্ধ বা অতি অল্পবয়স্ক অথবা রুগ্ন বা দুর্ব্বল সেগুলি তখনই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকী সমস্ত হস্তীগুলিকে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে বা কোন হস্তীশালায় লইয়া যায়; সেখানে গিয়া প্রত্যেকটি হাতীর পা-গুলি একটির সহিত আর-একটি করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং গলার রজ্জু কোন প্রকার দৃঢ় স্তম্ভের সহিত বাঁধা হয়। এইখানে তাহাদিগকে প্রথমে উপবাসে ক্লিষ্ট করিয়া পরে শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য কচি ঘাস এবং শুক্‌না ঘাসও দেওয়া হয়। ইহারা বন্য অবস্থা হইতে বন্দী দশায় আনীত হইয়া এতটা নিরুদ্যম হইয়া পড়ে যে, প্রথমে কোন-প্রকার খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করিতে চায় না। শিকারীরা এইজন্য প্রস্তুত থাকে। তাহারা তখন সকলে মিলিয়া চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায় এবং বাদ্য (drums and cymbals) ও সঙ্গীতাদির উপযোগে উহাদিগের তৃপ্তি এবং তুষ্টি সাধন করিবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ ইহাদিগকে বশে আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; কারণ, হস্তী স্বভাবতঃই অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির প্রাণী। কিন্তু কোন কোন বিবরণে আছে যে বন্য হস্তী পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে বশীভূত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই অবস্থায় হস্তী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রক্ত-পিপাসু হয়; তখন ইহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং কিছুতেই বশ মানিতে চায় না। সেই সময় ইহার সম্মুখে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিলে সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। এরূপ অবস্থায়ও বাদ্য এবং সঙ্গীতাদিই একমাত্র ক্রোধ-নিবারক হয়। সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত চারিটি তার সংযুক্ত এক-প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যন্ত্রে-ধ্বনিতে বন্দীদশা প্রাপ্ত ঐরূপ উত্তেজিত বন্য হস্তীরও শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠে এবং ক্রোধেরও উপশম হয়, তখন ক্রমে ক্রমে খাদ্য-সামগ্রীর দিকেও নজর পড়ে। তার পরে সঙ্গীতে এমনই অভিভূত হয় যে, সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেও হস্তী আর পলায়নে উৎসুক হয় না; তখন একদিকে সঙ্গীতে অপর দিকে খাদ্য উপভোগে আদরণীয় অতিথির ন্যায় সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

সেই যুগে সমস্ত হস্তীই রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে হাতী রাখিবার অধিকার ছিল না। কোন কোন স্থলে ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারেও হাতী থাকিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—হয়ত সময় এবং অবস্থা বিশেষে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজার অনুমতিক্রমেই উহা সম্ভব হইত। অন্ততঃ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি প্রয়োজনের সময় যে দেশের সমস্ত হস্তীই রাজার ব্যবহারে আসিত তাহা খুবই অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধের কার্য্য শেষ হইয়া গেলেই সমস্ত হস্তী আবার রাজ্যের হস্তীশালায় ফিরিয়া আসে। সামরিক বিভাগের কার্য্য-ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী আছে যাহারা হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। হস্তীকে আয়ত্তে রাখিবার জন্য ঘোড়ার লাগামের ন্যায় কোন প্রকার লাগাম ব্যবহৃত হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে যেমন জাহাজের কাপ্তেন হাল ধরিয়া জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি মাহুত অঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে যথেচ্ছ চালাইয়া লইয়া যায়। যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হস্তীর পৃষ্ঠে হাওদার উপরে অথবা রিক্ত পৃষ্ঠে তিন ব্যক্তি যোদ্ধা ধনুর্ব্বাণ হস্তে উপবিষ্ট থাকে, দুই জন দুই পার্শ্বে এবং একজন পিছনে বসিয়া তীর ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

বসন্ত ঋতুই হস্তী ও হস্তিনীর মিলন-কাল। এই সময়ে হস্তী এবং হস্তিনীরও কপোলের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্রপথে একপ্রকার চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ নির্গমন হইতে থাকে, ইহাই কাব্যাদিতে বর্ণিত মদবারিধারা। কোন কোন বিবরণে আছে যে, এই সময়ে হস্তিনী ঐ ছিদ্রপথে প্রশ্বাস ত্যাগ করে। হস্তিনীর গর্ভধারণ কাল ১৬ মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত; আবার বসন্ত ঋতুতেই সাধারণতঃ শাবক প্রসূত হয়। বসন্তকালে গর্ভধারণ করিয়া ১৬ মাস অথবা ১৮ মাস পরে আবার বসন্ত-কালেই শাবক প্রসব করিতে হইলে হিসাবে একটু গোল-যোগ হয়; হয়ত বসন্ত ঋতুটা উহাদের বিবরণে অত্যধিক ব্যাপকভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ঘোড়ার ন্যায় একবারে একটি মাত্রই শাবক প্রসূত হয়; হস্তী-শাবক ৬ বৎসর হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্য পান করে। অধিকাংশ হস্তীই দীর্ঘজীবী মানুষের সমান বয়স প্রাপ্ত হয়; কোন কোন হস্তী ২০০ বৎসরের অধিকও বাঁচে।* অনেক হস্তী রোগে ভুগিয়াও অকালে মৃত্যুলাভ করে।

সেই প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে হস্তী চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। হস্তীর কোন-প্রকার ক্ষত হইলে তাহার চিকিৎসা হয় ঈষদুষ্ণ জলের সেক দ্বারা—যেমন হোমারের বিবরণে আছে প্যাট্রক্লস (Patroklos) ইউরিপাইলসের (Euripylos) ক্ষত চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেকের পরে ক্ষতের উপরে মাখন ঘষিয়া দেওয়া হয়; ক্ষত গভীর হইলে শূকরের মাংস তপ্ত করিয়া কিম্বা শোণিতসিক্ত অবস্থাতেই ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয় অথবা কয়েক টুকরা শূকরের মাংস ক্ষতস্থানে লাগাইয়া রাখা হয়। চক্ষুর ব্যারাম হইলে প্রথমতঃ গোদুগ্ধ দ্বারা সেক দেওয়া হয়, পরে চক্ষুতে দুগ্ধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। হস্তী যখন চক্ষু মেলিয়া দেখে যে চক্ষু দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায় তখন ইহাতে খুব আনন্দিত হয় এবং মানুষেরই মত উপকারটুকু বুঝিতে পারে। অন্যান্য রোগের জন্য উহাদিগকে একপ্রকার কালো মদ পান করিতে দেওয়া হয়; তাহাতেও যে-রোগ না সারে সে-রোগ চিকিৎসার অতীত। কোন কোন বিবরণে আছে যে, ক্ষত-রোগে হস্তীকে মাখন গিলাইয়া খাওয়ান হয়।

অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় হস্তী সকল সময়ে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বশে কাজ করে না, অনেক বিষয়ে ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিরও বেশ পরিচয় ত আছেই কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের সৌন্দর্য্য-রসজ্ঞতার পরিচয়ও পাওয়া যায়, বাদ্য এবং সঙ্গীতাদিতে রসজ্ঞতার কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুঘ্রাণে ইহাদের কিরূপ অনুরাগ তাহারও বিবরণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে মাহুত আগে যাইয়া হস্তীর জন্য ফুল কুড়াইয়া রাখে; ইহারা সুঘ্রাণের এতই অনুরাগী যে, অনেক সময় সুঘ্রাণের আবেষ্টনের মধ্যে ইহাদিগকে নানা প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আবার হস্তীই ফুল কুড়াইবার ভার প্রাপ্ত হয়। তখন মাহুত ইহাকে প্রান্তরে বা কাননে লইয়া গেলে হস্তী নিজেই বাছিয়া বাছিয়া সুগন্ধযুক্ত ফুল চয়ন করিয়া মাহুতের হস্তগত

* আজকাল হস্তীর আয়ুঃকাল সাধারণতঃ ৮০ হইতে ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত।

সাজিতে ছুড়িয়া ফেলে। সাজি ভরিয়া গেলে হস্তীর স্নানের পালা—স্নানও উপভোগ করে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত। স্নানের পরেই সেই আহৃত ফুলগুলি তাহার চাই-ই; ফুল পাইতে একটু বিলম্ব হইলেই তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করে এবং ফুল না পাওয়া পর্য্যন্ত এক গ্রাস খাদ্যও গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। তখন ফুলের সাজি সম্মুখে আনিয়া দিলে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া কতকগুলি খাদ্য-পাত্রের এদিকে ওদিকে এবং কতকগুলি শয্যার উপরে ছড়াইয়া দেয়, যেন খাদ্য-দ্রব্যও সুগন্ধযুক্ত হইয়া বিশেষভাবে উপভোগ্য হয় এবং সুঘ্রাণের আবেষ্টনে নিদ্রাও যেন অধিকতর সুখদায়ক হয়।

হস্তী সাধারণ অবস্থায় কেবলমাত্র জলই পান করিয়া থাকে, কিন্তু যুদ্ধব্যপদেশে শ্রান্তি-ক্লান্তির সময়ে ইহাদিগকে মদ্যও দেওয়া হয়; এই মদ্য ভাত হইতে প্রস্তুত হয়—যে-জিনিষ দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত হয় তাহা হইতে ইহা পৃথক পদার্থ।*

হস্তী যে সঙ্গীতরসজ্ঞ পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু হস্তী যে বাজনাতেও নিযুক্ত হইতে পারে, সে-কথা হয় ত অনেকেই জানেন না। বাস্তবিকও এরূপ সাক্ষীর উল্লেখ আছে যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, একটি হস্তী করতাল (Cymbal) বাজাইতেছে, আর কয়েকটি হস্তী সেই তালে-তালে নাচিতেছে। পূর্ব্বোক্ত হস্তীটির সম্মুখের দুই পায়ে দুইটি এবং শুঁড়ের সহিত একটি করতাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি করতাল সে বেশ তালে তালেই বাজাইতেছে এবং ইহাকেই দেখিয়া দেখিয়া সেই তালে তালে পা ফেলিয়া অন্য সব হস্তীগুলিও বৃত্তাকারে নাচিতেছে।

সকল প্রকার ইতর প্রাণীর মধ্যে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। ইহাদের প্রভুভক্তিতে এতটা উন্নত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহাকে মনুষ্যজনসুলভ বলিয়া আখ্যাত করিলে কাহারও পক্ষে অগৌরবের হয় না। যুদ্ধে ইহার মাহুত বা পরিচালক হত বা পতিত হইলে যে, হস্তী তাহাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে অথবা নীচে পড়িয়া গেলে অনেক সময় নিজ শরীরের নীচে পতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এ সব ত অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যদি হস্তী কোন কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া মাহুত অথবা পরিচালকের প্রাণ বিনাশ করে তবে পরে সেই হস্তীই এই দুষ্কৃত কর্ম্মের জন্য একটা অনুতাপ এবং গ্লানি অনুভব করে যে, এরূপ স্থলে অনেক সময় উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া হস্তী নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

এক স্থলে উল্লিখিত দেখা যায় যে, হস্তী কৃষিকার্য্যে হলচালনেও নিযুক্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হস্তী প্রধানতঃ যুদ্ধের কার্য্যেই বেশী ব্যবহৃত হয়। তার পরেই ইহার বেশী ব্যবহার হয় আরোহণের জন্য। আরোহণের জন্য উষ্ট্র, ঘোড়া এবং গাধাও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাহন হিসাবে হস্তীরই মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তার পরে চারি ঘোড়ার রথ, তার পরে উট, এক ঘোড়ার বাহনের (বোধ হয় এক্কাগাড়ীর কথা বলা হইয়াছে) বিশেষ কোন মূল্য নাই। এই সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, অসাধারণ বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্না ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা একটি হস্তীর চেয়ে অল্প মূল্যবান কোন প্রলোভনের জন্য ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয় না।

* বর্ত্তমান যুগে ইহাদিগকে দেওয়া হয়—রম (Rum)।

প্রাণদান

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

অপবিত্র হাতে
টেনে ওরা ছেঁড়ে ফুল, তারপর নদী-স্রোতো সাথে
হেলায় ভাসায়ে তা'রে, আপনার মনে হয় খুসি ;
ভাবে, এই পুষ্প-অর্ঘ্যে দিনে দিনে দেবতারে তুষি।
অন্ধ ওরে !
সে কোন্ অনাদি-কালে সৃজনের ভোরে,
বীজ-রেণু অঙ্কুরিবে, পল্লবিত যৌবনের বনে
মধুরস উলসিবে পুষ্পে পুষ্পে সুরভি-পবনে,
তা'রি লাগি'
বিশ্বের অন্তর-তলে শিহরণে উঠেছিল জাগি'
পরিপূর্ণতার তীব্র তৃষা।
তার পর বারে বারে হারায়েছে দিশা
নীহারিকা-আবর্ত্তনে পুঞ্জ পুঞ্জ নিরাশার মাঝে,
উল্কা হ'য়ে খসিয়াছে আপনার ব্যর্থতার লাজে।
সূর্য্যে সূর্য্যে অগ্নিদাহে কত না ঘূর্ণন,
যুগব্যাপী তপস্যার কত বিশীর্ণন
গ্রহে গ্রহে !

দম্ভভরে আজি কা'রা কহে,
"দেবতার মতো করি' দেব প্রাণ" মরণে বরিয়া ?
আলোকের ম্লান শিখা যত্নে আবরিয়া
আলো ওরা দিতে চাহে ! ছড়াইয়া পথে
থালি হতে অন্নমুষ্টি, দ্বারে আসি' বলে বিধিমতে
বুভুক্ষু ভিক্ষুরে, "তুমি ছিলে তাই তোমা স্মরি
এত অনায়াসে
অন্ন-ছলে আত্মদান করি।" অন্তরালে বসি' হাসে,
এ বিশ্বের অন্তর-দেবতা।

হায়, এ কি বিপরীত কথা,
এ কি অন্ধ অভিমান !
যখন মরণ আনে, দর্প করি' বলে—"দিই প্রাণ !"
দেবতার মৃত্যু নাহি। প্রাণপুঞ্জে অন্তরাল টানি',—
এ বিশ্বের প্রাণে প্রাণে চিরজীবী হ'য়ে চির-প্রাণী,
দেবত্ব যে তাঁর।
প্রাণের যে-তার
ঘন শিহরণে বাজে অনুরাগে জীবনেরে ঘিরি',
কাঁপে সে তাঁহারই সুরে। সেই সুরে গান গেয়ে ফিরি;
ভালোবেসে বাঁচি আর বেঁচে ভালোবাসি,
দিনে দিনে দেবতার কাছে তাই আসি।

হিন্দীসাহিত্যে কবি-সমাদর

শ্রী সূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

হিন্দীভাষার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে ভারতের মুসলমান সম্রাট্দের হিন্দী ভাষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগ। তাঁরা এই ভাষায় সাহিত্যিকদিগকে উৎসাহিত না করলে বোধ হয় এ ভাষার এত উন্নতি হ'ত না। জহুরী যেমন জহরৎ যাচাই ক'রে সাচ্চা-ঝুটার দাম নির্ণয় করে, মুসলমান বাদশারা তেমনি প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যিক পেলেই যথোচিত পুরস্কৃত করতেন।

মুসলমান যেদিন এদেশে এল সেদিন থেকেই হিন্দী ভাষার সহিত তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাজ্যের দপ্তরে লেখাপড়া বেশীর ভাগই হিন্দীতে করা হ'ত। মুহম্মদ-কাশিম, মাহমুদ গজনবী আর সাহাবুদ্দীন-ঘোরী তাঁদের দপ্তরে হিন্দীভাষার ব্যবহার করতেন্।

আমীর খুসরু হিন্দীভাষায় একজন মহাকবি ছিলেন। তিনি হিন্দী কবিতায় বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বাস্তবিকই অতুল প্রতিভাশালী হিন্দী কবি ছিলেন।

আমীর খুসরু হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন; তিনি আজীবন হিন্দী ভাষার সেবা ক'রে গেছেন। তিনি কাব্য-চর্চ্চাতেই প্রায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ভাষা কবিত্বময়, প্রাণ কবিত্বময় ও জীবন-যাপনের ধারাও কবিত্বময় ছিল।

আমীর খুসরু সকলের নিকটে সমান আদর পেয়েছিলেন। সবাই তাঁকে আপনার কবি ব'লে জানত।

খুসরু অত বড় অভিজাত-বংশের দুলাল হ'য়েও সকলের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে মিশতেন। দরিদ্রের সঙ্গে মিশতে কোনোরূপ কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি দিল্‌দরিয়া—প্রাণ খোলা লোক ছিলেন।

হাসির কবিতা রচনাতেও খুসরুর বেশ দখল ছিল।

আমীর খুসরু রোজ সকালে-বিকালে বেড়াতে বেরোতেন। প্রায় প্রত্যহই তিনি দেখতে পেতেন, এক থুনথুনে বুড়ী তামাক সেজে, বড় ফরসী হুঁকো হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

দু-একদিন দয়া ক'রে খুসরু সাহেব বুড়ীর হুঁকোর নলে দু-একটা টান দিতেন—তাতে বুড়ীর মহা আনন্দ হ'ত—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যেত।

বুড়ীর নাম ছিল চিম্মো। তার মস্ত একটা গাঁজা আর ভাঙের দোকান ছিল। রোজই চিম্মোর দোকানে গেঁজেল ও ভাঙখোরের ভয়ানক ভিড় হ'ত। তার দোকানে গেঁজেল ও ভাঙখোরের হৈ-রৈ দিনরাত লেগে থাকত।

বুড়ীর তৈরী ভাঙ ও গাঁজা খুব সরস হ'ত ও দিল্লী সহরের বহু হোমরা-চোমরা ভাঙখোর ও গেঁজেলের চিম্মোর তৈরী ভাঙ ও গাঁজা না হ'লে চলত না।

আমীর খুসরু যখন তার দোকানের পাশ দিয়ে চ'লে যেতেন তখন সে তামাক সেজে, হুঁকো হাতে ক'রে, নলটি এগিয়ে খুসরুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। কবি খুসরু আসতে-যেতে এক আধটা টান ঐ নলে দিতেন।

ক্রমে চিম্মোর সাহস বেজায় বেড়ে গেল। একদিন সে আমীর খুসরুকে ব'লেই ফেল্লে, আপনি কবি, আপনি কত গজল্, ঠুমরী-দাদ্‌রা, কবিতা, গান রচনা করেছেন। কত লোকের সৌন্দর্য্য নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে কবিতা গান রচনা ক'রে তাদের অমর করে দিয়েছেন। এমন একটা কবিতা এই বাঁদীর নামে লিখে দেন যাতে আমারও নাম লোকের মনে থেকে যায়।

আমীর খুসরু চিম্মোর প্রার্থনা শুনে সেদিন বাড়ী চ'লে গেলেন। কিছুদিন যেতেই সে-কথা তিনি একেবারে ভুলে গেলেন।

কিন্তু চিম্মো নাছোড়-বান্দা। সে তাগাদার উপর তাগাদা আরম্ভ করলে। খুসরু সাহেব আর যান কোথায়—অবশেষে একটি কবিতা চিম্মোর নামে লিখে দিলেন।

সে একটি সুন্দর হাসির কবিতা—হিন্দুস্থানের লোকের মুখে আজো এ কবিতাটি শোনা যায়।

কবিতাটি এই—

"আরে। কি চৌপহরী বাজে, চিম্মো কি অঠপহরী,
বাংশ্র কা কোঈ আবৈ নাহি, আবৈ সারে সহরী,
সাফ্ সুফ্ কর আগে রাখে, কিস্‌ম্ নহী ভুষল্,
আরে। যঁহা সৌক্ ম সমাবৈ, চিম্মোকে উহা মুষল।"

অর্থাৎ—রাজা বাদ্‌শার প্রাসাদে নহবৎ চার প্রহর অন্তর বেজে থাকে কিন্তু চিম্মোর "প্রাসাদে" অষ্ট প্রহরই নহবৎ বেজে থাকে (অর্থাৎ ভাঙ বাটবার শিল-নোড়ার ঠক্-ঠক্ ও গাঁজার হুঁকার গুড়-গুড় শব্দ শোনা যায়); যে-সে লোক চিম্মোর বাড়ী আসে না; আসে কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরা সহুরে লোক। আর চিম্মোর তৈরী ভাঙ এমন পরিষ্কার ও ঘন যে, অন্যের

তৈরী ভাণ্ডে শলাকা দাঁড় করানো যায় না, কিন্তু চিশ্মোর ভাণ্ডে প্রকাণ্ড মুষল পর্য্যন্ত দাঁড় করানো যেতে পারে।*

সেদিন থেকে চিশ্মোর নাম আমীর খুসরুর কবিতায় থেকে গেল।

তাঁর বিস্তৃত জীবন-কথা এখানে বলা অসম্ভব। তবে তাঁর প্রতিভার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

খুসরুর গান হিন্দুস্থানে খুবই প্রচলিত। প্রায় সবারই মুখে তাঁর গান শোনা যায়—এম্‌নি মধুর ও প্রাণস্পর্শী তাঁর সঙ্গীতাবলী। একদিন আমীর খুসরু বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিছু দূর গিয়েই তাঁর পিপাসা পেল এবং রাস্তার ধারেই একটি বাঁধানো কূপের নিকটে জল খাবার আশায় গেলেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে চারিটি মেয়ে বির্ণী দিয়ে কূয়ো থেকে জল তুলে তাদের কলসী ভর্‌ছে। তিনি তাদের কাছে খাবার-জল চাইলেন। মহাকবি আমীর খুসরুকে দেখেই তারা চারজনই কবির গানের কথা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল—এ সেই কবি, যাঁর গান আমরা প্রায়ই গেয়ে থাকি—যাঁর কবিতা ছেলে-বুড়ো সবার মুখেই শুন্‌তে পাই। মেয়েরাও নাছোড়-বান্দা—তারা কবিকে বল্‌লে—"আমীর সাহেব, আমাদের চারজনকে চারটি বিষয়ের কবিতা শোনাতে হবে। তারপরে আমরা আপনাকে জল দেব।" চারজনই যথাক্রমে ক্ষীর, চরকা, কুকুর ও ঢোল (ঢোলক) সম্বন্ধে কবিতা শুন্‌তে চাইলে। কবি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতায় চারটি বিষয়ের অবতারণা ক'রে শুনিয়ে দিলেন এবং তার সঙ্গে জল খেতে চাইলেন। চারটি কবিতার দর্‌কার হ'ল না, একটি কবিতাতেই চারটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল।

কবিতাটি এই—

"ক্ষীর পকাই যত্নসে, চরখা দিয়া জলা,
আয়া কুত্তা খা গয়া, তু বয়ঠী ঢোল বজা,
লা পানী পিলা।"

অর্থাৎ "তুমি খুব যত্ন সহকারে ক্ষীর তৈরী কর্‌লে, কাঠ ছিল না চর্‌কা জালিয়ে ক্ষীর তৈরী হ'ল, কিন্তু তুমি যখন ঢোল বাজিয়ে আমোদ কর্‌ছিলে, তখন কুকুর এসে ক্ষীর খেয়ে গেল। বাস্‌—এখন জল দাও।" পাঠক দেখ্‌তে পাবেন, দু লাইনের ছোট কবিতাটিতে চারটি বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করা হ'য়েছে। এম্‌নি আমীর খুসরুর অজস্র কবিতা আছে। খুসরু ছিলেন সকলের কবি—ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুঁড়েতে, সব জায়গায় তাঁর সমান আদর ছিল।

আকবর বাদ্‌শার রাজত্বকাল হিন্দীর স্বর্ণযুগ। এমন হিন্দীর আদর আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আকবর বাদ্‌শা নিজে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। আকবর বাদ্‌শা যত বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন ঠিক ততখানি বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁকে নিরক্ষর বলা চলে না। তাঁর হিন্দী কবিতার একটি নমুনা দিচ্ছি—

"যাকো যশ হয় জগৎ মেঁ, জগৎ সরা হয় জাহি,
তাকো জীবন সফল হয়, কহত অকব্বর সাহি।"

অর্থাৎ—যাকে জগতের সকলে প্রশংসা করে এবং যার যশ জগৎব্যাপী, আকবর শাহ বলেন, তার মানব-জন্ম নেওয়া সফল হয়েছে।

বোধ হয় এই ক্ষুদ্র কবিতা তাঁর জীবনের একটা প্রধান motto ছিল। আকবর চিরদিনই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্রাটদের মধ্যে স্থান পাবেন। খুঁজ্‌লে আকবরের রচিত আরো কবিতা পাওয়া যেতে পারে।

"শাহান শা" আকবর বাদ্‌শা নিজের ছেলে জাহাঙ্গীরকে হিন্দী শিখিয়েছিলেন আর নিজ পৌত্র খুসরুর ছয় বৎসর বয়সের সময় হ'তেই হিন্দী শিক্ষা দেবার জন্যে পণ্ডিত ভূদত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শিক্ষক নিযুক্ত ক'রেছিলেন। শাজাহান নিজে হিন্দীভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দরবারে হিন্দী কবিগণকে পরম সমাদর কর্‌তেন।

সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, শাজাহান বাদ্‌শার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে অপূর্ব্ব অতুলনীয় অধিকার। বাবা ঠাকুর-দাদার চাইতে, এমন কি বাদ্‌শার আত্মীয়বর্গের চাইতে দারার হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বেশী দখল ছিল। যুবরাজ দারা অতি যত্ন সহকারে ফার্সীতে উপনিষদের প্রাঞ্জল অনুবাদ

*হিন্দী পুস্তক "মিশ্র বন্ধু-বিনোদ" হইতে অনূদিত।

ক'রেছিলেন। সে অনুবাদ যেম্‌নি বিশদ, তেমনি যথাযথ হ'য়েছিল।

আওরঙ্গজেব-বাদ্‌শা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তিনিও হিন্দীভাষাকে প্রীতির চোখে দেখতেন।

একবার শাহাজাদা মহম্মদ আজম এক ঝুড়ি উৎকৃষ্ট আম আওরঙ্গজেব বাদ্‌শার নিকটে পাঠিয়ে দেন এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা ক'রে পাঠান যে, দু-রকমের আম পাঠান গেল, বাদ্‌শা যেন আমের নামাকরণ ক'রে দেন। আওরঙ্গজেব উত্তরে লিখ্‌লেন,—"তুমি স্বয়ং বিদ্বান হ'য়েও বুড়ো বাপকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছ। আর যাহোক্ তোমার খুসীর জন্যে আমের নাম আমি "সুধারস" ও "রসনা-বিলাস" রাখ্‌লেম।"

হিন্দীভাষার এমন একদিন ছিল যেদিন আওরঙ্গজেবের মত "কট্টর" বাদ্‌শা পর্য্যন্ত তার সেবা ক'রে গেছেন।

আজ হিন্দু-মুসলমান দলাদলির অন্ত নেই; কিন্তু আগে কথায় কথায় এত "গুনাহ্" ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে ভাই-ভাই ভাব ছিল। একে অন্যকে ভালোবেসেছে—ভাই ব'লে গলাগলি করেছে।

হিন্দী সঙ্গীতের আদর আজকাল বাঙলায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পূর্ব্বে শাহী দর্‌বারে হিন্দী গানওয়ালাদের বড় প্রতিষ্ঠা ছিল। সুগায়কদের মহা সম্মান ও সমাদর করা হ'ত।

কথিত আছে, আকবর বাদ্‌শা প্রথম দিনের 'মুজরা" শুনে তানসেনকে এক ক্রোর টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

শুনা যায়, আকবর বাদ্‌শার অন্যতম "রত্ন" বৈরাম খাঁ খাঁন্‌খানা সাহেব বাবা-রামদাসকে এক লাখ্ টাকা দিয়েছিলেন।

লোকে বলে, শাজাহান বাদ্‌শা মহাপাত্র জগন্নাথ রায়কে লক্ষ-লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। সুবিখ্যাত গায়ক "কলাবন্ত" লাল খাঁকে শাজাহান বাদ্‌শা বহু পুরস্কার ও "গুণনিধি" উপাধি দিয়েছিলেন।

মুসলমান গায়কগণ পরম আনন্দের সহিত হিন্দী সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী নিজেদের গানে ব্যবহার কর্‌তেন।

হিন্দীর কদর মুসলমান বাদ্‌শারাই বাড়িয়ে গেছেন। তাঁদের উৎসাহ, তাঁদের সমর্থন, তাঁদের দয়া ব্যতিরেকে এ ভাষার এত উন্নতি কিছুতেই হ'ত না।

'তুষু' পূজা

শ্রী শিশির সেন

অনেক রকমের 'পরব' ও পূজার মধ্যে মানভূম, বাঁকুড়া ও সিংহভূম অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মাঝে এই 'তুষু-পূজা'ও একটি উৎসব বা পূজা। এ পূজা সাধারণতঃ কুর্ম্মী বা মহাতোদের ঘরের কুমারী মেয়েদের ভিতরেই চল্‌তি। পুরুষদের এতে বিশেষ সংস্রব নেই, তবে অনেক সময় এইসমস্ত মেয়েদের ছোট ছোট ভাইয়েরা তাদের দিদিদের সঙ্গে জুটে যায়।

'তুষু'পূজা তাদের এক মাসব্যাপী উৎসব। ১লা পৌষ হ'তে সুরু ক'রে সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত তারা পূজা করে। যারা একটু নিঃস্ব ধরণের লোক তারা সারাটা মাস না কর্‌তে পার্‌লেও অন্ততঃ শুধু পৌষ-সংক্রান্তির দিন পূজা ক'রে থাকে।

মেয়েরা মাটি দিয়ে হলুদ রংএর তুষু ঠাকরুণ তৈরী ক'রে ফুল দিয়ে পূজা করে। মন্ত্র কিছু নেই, তার পরিবর্ত্তে তা'দের সরল-প্রাণরূপ উৎস থেকে বেরিয়েছে কতকগুলি গান। সেই গান দিয়ে, ফুল দিয়েই তারা তাদের 'তুষু' মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে। যাদের মূর্ত্তি গড়াবার মত সামর্থ্য নেই, তারা শুধু মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে চারিদিক্‌টা পরিষ্কার

ক'রে নিয়ে সেই গর্ত্তের ভিতরেই গান গাইতে গাইতে ফুল দিয়ে পূজা করে।

'তুষু' তাদের হলুদ রংএর প্রতিমা; কুমারীরাও হলুদ রংয়ে কাপড় রাঙিয়ে নিয়ে সেই কাপড় প'রে তা'দের উৎসবএ যোগ দেয় সংক্রান্তির আগের দিন কুমারীরা সমস্ত রাত ধ'রে অনেকটা 'বহ্ন্যুৎসব' জাতীয় উৎসব করে। আগুন জ্বালিয়েই রাখে, নিভ্‌তে দেয় না। আর আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে থাকে। সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা হলুদ রংয়ের কাপড় পরে' তাদের তুষু-ঠাকরুণকে মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রামে গিয়ে মেলামেশা করে, গানেরও আদান-প্রদান করে। তারপর স্থানীয় নদী বা নালা বা বাঁধে তাদের মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দেয়।

ঐ কুমারী মেয়েরাই আবার বিয়ের পরে তাদের ছেলে-মেয়েদের 'তুষু' পূজার গানগুলি শিখিয়ে দেয়। অনেক সময় তা'দের মা, ঠাকুরমার কাছ থেকে শেখা ছাড়া বাংলা দেশের 'কবির দলে'র মত নিজেরাও তার গান তৈরী ক'রে থাকে। ফলে, গানের সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলে। মানভূমেই এপূজার প্রথম সৃষ্টি এবং অনেক বছর ধ'রে এ চ'লে আস্‌ছে।

এ পূজার সার্থকতা বিশেষ কিছুই নেই। তবে 'তুষু' নাকি কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণী, সবাইয়েরই মন যুগিয়ে দিব্যি শান্ত বধূটির মত থাকে, তাই কুমারীরা সেই 'তুষু'র পূজা করে যা'তে তারাও ঠিক অম্‌নি ভাবে তাদের শ্বশুর বাড়ী গিয়ে চ'ল্‌তে পারে।

এই অশিক্ষিত কুর্ম্মীর মেয়েরা শুধু তাদের সরল প্রাণের প্রেমে ও ভালবাসার সঙ্গেই তা'দের 'তুষু'র পূজা ক'রে থাকে। গানের ভিতর দিয়ে যে-সমস্ত কথা বলে তা'তে মনে হয় ঠিক যেন খেলার সাথীটির সঙ্গেই তারা খেল্‌ছে। যেমন—

১। চল্‌ 'তুষু' চল্‌ খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা,
খেল্‌তে খেল্‌তে দেখে আস্‌ব কয়লা-খাদের জল তোলা।

২। হলুদ বনের 'তুষু' তুমি হলুদ কেন মাখ না?
তুষু বল্‌ছে—শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।

৩। ও তুষুর মা ও তুষুর মা তোদের কি কি তরকারী?
ঐ শালারি খেতের বেগুন ঐ কানাচির গুগ্‌লি।

৪। বাড়াময় নীল বুনেছি নীলের গুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না।

৫। চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না
জামাই আদর বড় আদর তিন বেলা বই থাকে না।

৬। আর দু দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান,
বস্‌তে দিব শীতল পাটী নীল মণিকে কোরব দান।

৭। চল 'তুষু', চল সারদা কুলি'তে বাঁধ বাঁধাব,
'কুলি'র জলে সিনান করে' রোদেতে চুল শুকাব।

৮। এক কিল সইলুম, দু'কিল সইলুম, তিন কিল বই আর সইব না,
যা'লো ননদ, ব'লে দিবি, তোর ভাইয়ের ঘর আর করব না।

৯। নদীর ধারে গাই বিয়াল, বাছুরের নাম 'হাসি' গো,
রাখালটাকে কিনে দিব পিতল-বাঁধা বাঁশী গো।

তাদের এই 'তুষু' পূজায় এই ধরণের অনেক গান আছে, বাহুল্য-ভয়ে মাত্র কতকগুলি চল্‌তি গান দিলাম।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১৫)

নৃপেন গাঙ্গুলি বড় লোকের আদুরে একমাত্র পুত্র। ছেলেবেলা হইতে যখন যাহা আব্দার ধরিয়াছে, খেয়াল করিয়াছে, মা বাবা জেঠা জেঠী সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাহা পূরণ করিয়া আসিয়াছেন। ছোট বেলায় ইস্কুলে অঙ্কে শতকরা নব্বই নম্বর পাইয়াছিল এবং ভাত খাইবার সময় বই মুখে দিয়া বসিত ও পিতৃবন্ধুদের সহিত সমবয়সীর মত সমাজ ও রাজনীতি লইয়া তর্ক করিতে চাহিত বলিয়া

বাড়ীর সকলের ধারণা ছিল যে, তাঁহাদের এই বংশের দুলালটি কালে এক মহাপুরুষ না হইয়া যাইবে না। সুতরাং তাহার আব্দারকে তাঁহারা মহাপুরুষের আদেশের মতই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। তাহার পিতা লেখাপড়া অনেক করিয়াছিলেন এবং ইস্কুল-কলেজের তর্কযুদ্ধও কম দেখেন নাই; সুতরাং ছেলের বড় বড় কেতাবী কথায় তিনি ততটা মুগ্ধ হইতেন না, যতটা হইতেন তাঁহার দাদা মুকুন্দরাম। মুকুন্দরাম ইংরেজি ইস্কুলে পড়েন নাই বলিলেই চলে। বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া একটু বয়সে ইংরেজি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া সেদিকে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি অল্প বয়স হইতেই দালালি সুরু করিয়া দেন। কাজেই নৃপেনকে পিতার লাইব্রেরীর মোটা-মোটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া উল্টাইতে এবং বারো বৎসর বয়স হইতেই ইংরেজি পুস্তকের দোকানের লম্বা লম্বা বিল পিতার নিকট হাজির করিতে দেখিয়া মুকুন্দরাম অতীব চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। নৃপেন্দ্র যে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার ছবি দেখে এবং ইংরেজি পুস্তকগুলির প্রথম পাতা চারটি মাত্র কাটিয়া পড়ে সে-খবর মুকুন্দরাম রাখিতেন না। পুস্তক-রচয়িতার নাম ও বইটির নাম পড়িতে নৃপেনের যে-পরিমাণ সময় খরচ হইত তাহার তুলনায় জ্যেষ্ঠতাতের মুগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। এই সমঝদারটিকে হাত করিয়া সে সমস্ত বাড়ীটাকেই হাত করিয়াছিল, কারণ, বাড়ীর কর্ত্তার কথা অবিশ্বাস করে কার সাধ্য? একমাত্র করিতে পারিতেন ছেলের বাবা, কিন্তু দাদার কথার উপর কথা বলা তিনি কনিষ্ঠোচিত কাজ বলিয়া মনে করিতেন না।

গৌরী যখন নৃপেন্দ্রকে নেশার মত পাইয়া বসিল তখন সে গৌরীকে বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। পিতামাতা কাহারো যদি কোনো আপত্তির কারণ ঘটে, তাহা হইলে সে অনায়াসে তর্কের জোরে তাহা খণ্ডন করিয়া ফেলিতে পারিবে এই ছিল তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই তাহার মনে কোনো দ্বিধা কি সংশয় আসিল না। সে গিয়া সুধাকে চাপিয়া ধরিল জেঠা মহাশয়ের সাহায্যে তাহাকে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। পুরুষ মানুষের পাগ্‌লামি দেখিয়া সুধা মনে মনে যতই হাসুক মুখে সে দাদাকে অমান্য করিতে সাহস করিল না। সে জেঠাইমাকে ধরিয়া বসিল। জেঠাই মা মুকুন্দরামের শরণ লইলেন। মুকুন্দরাম বলিলেন, "নৃপেন যখন বলেছে তখন ও মেয়েকে আন্‌তেই হবে। ও মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হ'বে, নৃপেন মুখ দেখেই চিনেছে।"

মুকুন্দরাম কাজে লাগিয়া গেলেন; কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই নিমন্ত্রণের দিনের কথাবার্ত্তার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু হরিকেশব কোনো উচ্চবাচ্য ত করেন না। বরের জেঠা হইয়া তাঁহার মত মানী লোক মেয়ের বাড়ী দিবা-রাত্রি ছুটোছুটি ত করিতে পারেন না। মনে মনে চটিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

কিন্তু নৃপেন্দ্র অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে গিয়া আবার সুধার দরবারে হাজিরা দিল। "এই সুধা! তোরা কি সব মরেছিস নাকি রে, একটা কাজ করতে এক যুগেও পেরে উঠিস্ না। কথাটা যে বল্‌লাম ত গ্রাহ্যই করা হ'ল না, কেন তোমাদের পছন্দ হ'চ্ছে না নাকি?"

সুধা কাঁচু-মাচু হইয়া বলিল, "আমি কি করব, দাদা! জেঠাইমা জেঠামশাইকে ত কবে বলেছি; তাঁরা যদি না করেন ত কি আমি পেয়দা হ'য়ে যাব নাকি?"

নৃপেন সুধার দিকে না চাহিয়াই অবজ্ঞার সুরে বলিল, "যাঃ যাঃ, আর কথা-কাটাকাটি করতে হবে না, তোর অনেক বুদ্ধি তা জানা গেছে। এখন জেঠাইমাকে বল্‌গে যা যে, দাদা জবাব চেয়েছে।"

সুধা মুখটা নীচু করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মনে মনে বলিল, "ওই পাগ্‌লাটার জন্যে আবার এত দাপাদাপি।" তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ভারিক্কী চালে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মুকুন্দ-গৃহিণী দ্বিপ্রহরে দাইকে দিয়া পা-টিপাইতে ছিলেন। হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু আরামে চক্ষু মুদিয়া আসাতে সেখানা যে কখন্ সোজা হইতে উল্টা হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। সুধা গিয়া তাঁহার গায়ে ঠেলা দিয়া তুলিয়া বলিল, "ও জেঠাইমা, তোমরা ত বাপু দিব্বি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ, এদিকে

তোমাদের ছেলেটি যে বিয়ে বিয়ে ক'রে হেদিয়ে গেল। কি করলে না করলে বল না! মাঝ থেকে আমার প্রাণটা কেন যায়!".

জেঠাই-মা সুখনিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "থ ম্ দিল্লগী রাখ্। এতবড় মেয়ে হ'চ্ছিস্, এখনও মা জেঠির সঙ্গে বাত্ চিত্ করতে শিখ্ লি না। শাস-ননদের সাম্‌নে যেন অমনি জবান দেখাস্‌নি।"

সুধা বলিল, "আচ্ছা, সে যা হ'বে তা হ'বে; এখন দাদা যে আমায় খেয়ে ফেল্‌লে। বল না সে পাগলীর কি হ'ল?"

মুকুন্দ গৃহিণী নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "কি জানি বাছা? মেয়ের সুরৎ আছে বটে, কিন্তু বাপ-মায়ের এত জাঁক তা ব'লে ভাল না; মেয়ে-ছেলের বাপ, মাথা ত একদিন নোয়াতেই হ'বে, তবু আমাদের কথার জবাবই দিলে না। অমন মেহমান পাবে কোথায় শুনি আর?"

সুধা বলিল, "তোমরা বাপু, আর-একবার ব'লে দেখ। আমাদের ত আর ওতে মান্যি কম্‌বে না।"

মুকুন্দরামকে আবার তাগিদ দেওয়া হইল। মুকুন্দরামের রাগ দিন দিনই বাড়িতেছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন উপরোধ-অনুরোধ আর করিবেন না; তবে দৈবে যদি দেখা হইয়া যায় ত হরিকেশবকে দুই চার কথা ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবেন। কিন্তু ছেলে যে নাছোড়বান্দা। সুন্দরী মেয়ে বাঙালী বামুনের বাড়ী অনেক আছে; ইচ্ছা করিলেই যে-কোনোটিকে তিনি আনিয়া দিতে পারেন। লোকে ত মেয়ে লইয়া যখন-তখন তাঁহার পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তবু তাঁহাকেই কি না মেয়ের বাপের কাছে মাথা হেঁট করিতে হইবে। মুকুন্দরামের এতদিনে বিশ্বাস যেন একটু টলিল। ছেলেটাকে বুদ্ধিমান বলিয়াই এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু পুরুষ হইয়া যে ছেলে কটা রং আর ড্যাব্‌ড়া চোখের জন্য বাপ-জেঠাকে মেয়ের বাপের কাছে খাটো করিতে পারে তাহার বুদ্ধি যতই থাক্ তাহা যে এখনও নিতান্ত কাঁচা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণ ধরিয়া ছেলেটাকে বোকা বলিতে তিনি পারিলেন না এবং তাহার আবদারটাও শুনিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন; কারণ যাই হউক এই ছেলেই ত একদিন বংশের মুখ জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবে।

একেবারে নিজে গিয়া বলিতে এবার আর মুকুন্দরাম পারিলেন না। তিনি হরিকেশবকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

"মহাশয় জানেন যে, পুত্র-সন্তানের বিবাহ দিতে মানুষকে মাথা ঘামাইতে হয় না। আমাদের দেশে ভাত-কাপড় দুর্ল্লভ বটে, কিন্তু কন্যাসন্তান খুবই সুলভ। তবু বনিয়াদী ঘরের কথার একটা মূল্য আছে। আমি যখন আপনার কাছে আপনার কন্যার বিবাহের কথা পাড়ি, তখন ভদ্রতার খাতিরে আপনার উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কথায় আমার কান দেওয়া চলে না। আপনি দুই চারদিনের ভিতরই খবর দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কাটিয়া গেল তবুত আমরা কোনো খবরই পাইলাম না। এমন অবস্থায় কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার কন্যাকে আমাদের পছন্দ হইয়াছিল, আমাদের ঘরে পড়িলে সেও আশাতীত সুখভোগ করিতে ও আদর-যত্ন পাইতে পারিত। আমার বোধ হয় অল্পবয়স্ক হইলেও এবাড়ীতে আসিতে তাহার আগ্রহ আছে। অতএব মহাশয় সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব একটি উত্তর দিবেন। পত্রপাঠ লিখিলে বাধিত হইব।"

মুকুন্দরামের কথার যে যথাকালে উত্তর দিতে পারেন নাই ইহাতে হরিকেশবের মনে একটা বিবেকের খোঁচা লাগিয়াই ছিল। কথাটা বলি-বলি করিয়াও তাঁহার বলা হইতেছিল না। কন্যার বৈধব্যের পর যদিও তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রকৃত মানুষের মত মানুষ করিয়া তাহার নিজের হাতে তাহার সমস্ত ভবিষ্যতের ভার তুলিয়া দিবেন, তবু তাঁহার মনে নূতন করিয়া আবার গৌরীর সংসার গড়িয়া তুলিয়া দিবার একটা সাধ থাকিয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা করিত, মনের মত বর-বধূ দেখিয়া আবার তাহার বিবাহ দেব; আজ-কালকার দিনে সেটা ত আর অসম্ভব নাই। তাই মুকুন্দরামের প্রস্তাবটা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছিলেন না। গৌরীর বৈধব্যের কথা

শুনিলে বরকর্ত্তা যে সবিস্ময়ে অবিলম্বে পিছাইয়া যাইবেন সে-ভয়ও তাঁহার মনে ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল গৌরীর কচি বয়স ও অপরিণত দেহ-মনের ভয়। কেবলমাত্র বৈধব্যটা ঘুচাইয়া কন্যাকে আবার কোনো প্রকারে সধবা করিয়া দিয়া সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া এখন আর তাঁহার আদর্শ ছিল না। গৌরীর বৈধব্য-বেদনার সূত্র ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নারীর ভাগ্য ও অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তারাজ্যে একটা বিপ্লব আসিয়া পড়িয়াছিল। মুকুন্দরামের পত্র পাইয়া হরিকেশব বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করিবেন ঠিক করিলেন; কিন্তু কেন জানি না ইচ্ছা করিল তাহার পূর্ব্বে চিঠিখানা একবার হিণীকে দেখাইতে।

পাশের বাড়ীর বৌ ও তাহার শাশুড়ী সেদিন শিশু-কন্যাটিকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। গৌরী ও তরঙ্গিণী সবেমাত্র তাহাদের জিনিষপত্র গুছাইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। বৌটি বাক্স ঝাড়িয়া তাহার নানা রঙের শাড়ীগুলি বাহির করিয়া কতক বা ঝি চাকর-দের দিয়া দিয়াছিল কতক বা গৌরীর জিম্মায় রাখিয়া গেল সুবিধামত গরীব দুঃখীকে দান করিয়া দিবার জন্য। গৌরী আসিতে আসিতে মাকে বলিল, "হ্যাঁ মা, ভাই বোন মা বাবা ম'রে গেলে লোকে ত আবার কিছুদিন পরে হাসে খেলে ভাল কাপড় পরে; আর বিধবা কি লোকে চিরদিনের জন্যে হয় ?" মা কিছু বলিলেন না। গৌরী আবার আপন মনেই বলিল, "সকলকেই কিছুদিন পরে ভোলা যায়, স্বামীকে কি ভোলা যায় না, মা ? তবে আমি কি ক'রে ভুলে গেলাম ?"

মা বলিলেন, "তুই যখন তাকে দেখেছিস্ তখন যে তোর জ্ঞানই হয়নি। তোতে ওতে অনেক প্রভেদ, বাছা; ও নিয়ে আর মন খারাপ করিস্ নে।"

বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই হরিকেশব গৃহিণীর কাছে মুকুন্দরামের চিঠি আনিয়া হাজির করিলেন। তরঙ্গিণীর মনে একমাস ধরিয়া যে-দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা তাঁহার মনকে অনেকখানিই সংস্কার-বিমুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। চিঠি পড়িয়া তিনি শিহরিয়া কি জ্বলিয়া ত উঠিলেন-ই না যেন অকস্মাৎ একমুহূর্ত্তে এতদিনের সমস্ত রুদ্ধ অশ্রুর বান বহাইয়া দিলেন। তার পর চোখ মুছিয়া আপনি বলিলেন, "হা ভগবান্, এ পোড়া দেশে কি আমার মেয়ের কপালে আর সুখ লেখা আছে।"

হরিকেশব বলিলেন, "সব কথা লিখে কথাটাকে শেষ ক'রে দি; আর কেন মানুষকে টাঙিয়ে রাখা ? বিধবা মেয়ের সঙ্গে ত আর তারা ছেলের বিয়ে দেবে না! আর আমিও কিছু এই বয়সেই ওর আবার বিয়ে দিচ্ছি না; তবে কেন মিছামিছি পরের কাছে কথার ঋণ রাখা ? ও একেবারে চুকিয়ে ব'লে দিলে তারা আপনার নিজের পথ দেখ্‌বে।"

তরঙ্গিণী আজ অকস্মাৎ বলিলেন, "হ্যাঁ গো, তুমি সেদিন যে কথা বল্‌ছিলে সে কি সত্যি ? সত্যিই কি মেয়ে-মানুষের দু'বার বিয়ে হয় ?"

স্ত্রীকে এমন কুতূহলী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া হরি-কেশব বলিলেন, "হ্যাঁ, তা হয় বই কি! বিদ্যাসাগরের কল্যাণে ব্রাহ্মণের বিধবারও বিবাহ হ'য়েছে।"

তরঙ্গিণী সে-কথার উত্তর আর না দিয়া বলিলেন, "চিঠিখানার জবাব অমন ক'রে দিও না। শুধু গৌরীর অদৃষ্টের কথাটুকু ভাল ক'রে লিখে দাও, তারপর বাকিটা তারা বুঝে নেবে। বিয়ে আমরা দেব কি না দেব লেখ্‌বার কি দর্‌কার ? সে ত সহজেই মানুষে বোঝে।"

তরঙ্গিণীর মনে কোন কথা যে তাঁহাকে এমন নীতি অবলম্বন করিতে বলিতেছে তাহা বুঝিতে হরিকেশবের দেরী হইল না। ছেলেই যে গৌরীকে বিশেষ করিয়া পছন্দ করিয়াছে তাহা হরিকেশব ও তরঙ্গিণী উভয়েই জানিতেন। অল্প বয়সের ছেলের চোখে যখন রূপের নেশা লাগে তখন সমাজের এর চেয়েও অনেক কঠিন বাধা যে, তারা অবজ্ঞাভরে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা তরঙ্গিণীর জানা ছিল। তাঁহার মনে তাই আশা হইয়াছিল যে, গৌরীর বৈধব্যের কথা শুনিয়াও হয়ত সে ছেলে জেদ করিয়া গৌরীকেই বিবাহ করিতে চাহিবে। মা-বাপ যদি অমত করে তাহা হইলে বিবাহ না হইতে পারে। কিন্তু সে অনুমানের কথার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা বোকামী। দৈব যখন একটা সুযোগ

জুটাইয়া দিয়াছে, তখন নিজেরা নূতন বাধা সৃষ্টি করা কি উচিত?

স্বামী পাছে ভুল বুঝেন তাই তরঙ্গিণী আবার বলিলেন, "দেখ ছেলে যদি মেয়ে পছন্দ ক'রে থাকে তাহলে সে কি সহজে ছাড়্‌বে? ছেলে মানুষ, কলেজে পড়েছে, আমাদের সেকেলে মত তুড়ি দিয়েই উড়িয়ে দেবে। তার উপর মেয়ের যদি মন প'ড়ে থাকে তবে ত বড় মুস্কিলের কথা। ওদের মেয়েটা হয়ত ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে কিছু কথা বার করেছে, বলা ত যায় না? বিধবার বিয়ে পাপ বটে, কিন্তু যে মেয়ের মনে স্বামীর কোনো স্মৃতিই নেই তার মন যদি অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে ত ঠেকাব কি ক'রে?"

হরিকেশব আপনার বিস্ময় চাপিয়া বলিলেন, "তবে কি তুমি বিয়ে দিতেই চাও?"

তরঙ্গিণী লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "ওমা, আমি কেন বিয়ে দিতে গেলুম? আমি বল্‌ছি এ বড় ভাবনার কথা। মেয়ের মন যদি কোথাও পড়ে তবে তাকে চেপে রাখ্‌তে মা হয়ে কি পারব? বল্‌তে নেই, তোমার পায়ে মাথা দিয়ে তিনকাল কাটালুম; মেয়েমানুষের মন ত বুঝি! বয়সকালে বাছার আমার সে সব সাধ কি হবে না?"

হরিকেশব বলিলেন, "তবে কি চাও বল না।"

তরঙ্গিণা বলিলেন, "সব কথা লিখে দাও; তার পর যদি ছেলেমেয়েদের মন থাকে ত আমরা না হয় বিয়ে না দিলুম, তোমার বিদ্যেসাগুরীরা এসে তাদের মন্তর টন্তর পড়ে দেবে। তাতে কি মেয়ের পাপ হবে? সে'ও ত শুনি হিন্দু শাস্তর!"

হরিকেশব বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মতামতের কথা কিছু লিখ্‌ব না, কেবল গৌরীর বিষয় আদত কথাটুকু লিখে দেব। তবে এত অল্প বয়সে আবার বিয়ে দেবার আমার ইচ্ছা নেই। ওর এখনও সব শিক্ষাই বাকি রয়েছে।"

তরঙ্গিণীর মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। নিজে যাচিয়া এই বরের সহিত বিবাহের চেষ্টা করিতেও সংস্কারে বাধিতেছিল আবার স্বামীর ঔদাসীন্যে বর হাতছাড়া হইয়া যাইবার ভয়ও হইতেছিল। কিন্তু তিনি সেকথা বলিতে পারিলেন না; শুধু বলিলেন, "বাপ জেঠা যদি বেশী অমত না করে তবে কি আর সে ছেলে তোমার কথায় ছেড়ে দেবে। চিঠিখানা লি'খে ত দেখ তার পর যা হয় বু'ঝে সু'ঝে বলা যাবে।"

হরিকেশব আর দেরী করিলেন না। সেই দিনই চিঠির উত্তর দিলেন। তিনি সকল কথাই খুলিয়া লিখিলেন—"মহাশয়ের অনুগ্রহলিপি পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। আমি নানাকারণে আপনার কথার উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। এই চিঠি পড়িয়া আমার বিলম্বের হেতু কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।

আমার কন্যাকে দেখিয়া আপনারা কুমারী মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং সহজেই তাহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল আমি তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। অর্থ সম্পদ দেখিয়া নির্ব্বোধের মত মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভগবান অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমায় সজাগ করিয়া দিলেন। আজ দুই বৎসর হইতে চলিল আমার মা গৌরীর খেলাঘরের সংসার ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার বৈধব্যের কথা আমি তাহার নিকট হইতে গোপনেই রাখিয়াছিলাম, বিবাহও তাহার অতি শিশুকাল হইয়াছিল, সুতরাং তাহার নিজের এবং অপরেরও তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আপনাকে সকল কথাই জানাইলাম। আমার দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।"

(১৬)

বরেন গাঙ্গুলীর ভাগিনেয়ী কুসুমলতার বিবাহ হইয়াছিল মহীধরের ভাগিনেয় ব্রজরাজের সহিত। বছর তিনেক পরে যার সঙ্গে সে মামার বাড়ী আসিয়াছে, মামা-বাড়ীর আদরের সহিত তীর্থ সলিলে স্নানের পুণ্যটা একসঙ্গেই অর্জ্জন করিয়া যাইবে। বলিয়া সে বড় ঘরের বৌ না হউক, ভাগ্নেবৌ ত বটে, কাজেই তাহার শ্বশুর বাড়ীতে বড় মানুষী আইনকানুন পুরামাত্রায়ই চলে। এক বছর অন্তর এক মাসের বেশী বাপের বাড়ী কাটানো তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটেনি; সেই ছুটিটুকুর ভিতর

হইতেই একটু ফাঁক করিয়া সে মামাবাড়ী আসিয়াছে; কাজেই দিন দশেকের ভিতরই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মামাবাড়ী ত আর যখন তখন আসা হইবে না তাই তাহার সাধ ছিল এযাত্রায় অন্তত নৃপেন দাদার আশীর্ব্বাদটা দেখিয়া যাইবে। কাছাকাছির ভিতর বিবাহ হইলে তাহাকে এত শীঘ্র শাশুড়ী যে দ্বিতীয়বার পাঠাইবেন না, সে বিষয়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাই হরিকেশবের উত্তর জানিবার জন্য তাহার উৎসাহ নৃপেন্দ্রের প্রায় কাছাকাছিই ছিল।

কুসুমলতা মেজমামীকে ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, খাইতে শুইতে তাঁহার বেহাই ছিল না। কুসুমের তাগিদের চোটে তাঁহার যেন পুত্রদায় পড়িয়া গিয়াছিল।

সেদিন সহরে অনেকদিন পরে মাছ পাওয়া গিয়াছে গৃহিণী মেছুনীর সহিত দর করিয়া গোটা রুইমাছটা কিনিতে ব্যস্ত। ভাগ্নী আসিয়া পর্য্যন্ত একদিনও তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই। আজ দুইচার রকম রাঁধিয়া খাওয়াইবার সখ আছে। অথচ প্রায় চারসের ওজনের মাছটা রাখিতেও মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে; সংসারে ত খরচের অন্ত নাই, একদিক বাঁচাইতে গেলে দশদিক বাড়িয়া যায়। তাই অকারণে আপনা হইতে দুই পয়সা খরচ বাড়াইতেও তাঁহার হাত ওঠে না। মেছুনী হাসিয়া বলিতেছিল, "রাণী মা, একসের মাছ বেশী লইবে তাহার জন্য তোমার এত ভাব্না কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, কতদিকের তাল সাম্লাতে হয় তা যদি জান্তে, তাহলে আর কিছু বল্তে না।।"

কুসুম হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া বলিল, "মেজমামী, আজই কেন বাপু অত তাড়াহুড়ো? সুবিধে মত জিনিষ পেলে তবে রেখো। নয়ত একেবারে দাদার আশীর্ব্বাদের দিনে পেট পূরে খাব এখন। সেদিকে ত তোমাদের কোনো তাগিদ দেখি না, তবু ত মোটে একটা ছেলে।"

মামী বলিলেন, "একটা বলেই ত ধীরে সুস্থে এগুচ্ছি।"

কুসুম বলিল "কেন, তোমার ছেলে কি শ্বশুর ঘর কর্তে যা'বে নাকি? হ্যাঁ সে আসে বটে আমার মামা-শ্বশুরের বাড়ীর জামাইরা। বড় মামার মেয়ে যে মালিনী ঠাকুরঝি, সে ত তিন ছেলের মা বুড়ো মাগী হ'ল, আজও বছরে দশমাস বাপের বাড়ী কাটাচ্ছে। চারদিন যদি শ্বশুরবাড়ী যায় ত মাবাপে হেদিয়ে সাত শ' ছুতো বার ক'রে আবার নিয়ে আসে। মেয়েও তেমনি, শ্বশুরঘর গেলেই আজ নিজের অসুখ, কাল ছেলের অসুখ, পরশু ঝি পালাল বলে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে আবার এসে হাজির হয়। কাজেই জামাই বেচারী আর কি করে? বৌ ছেলের পেছন পেছন শ্বশুর ঘরেই এসে ওঠে। আর নাইবা আস্বে কেন বল? তার বাপ জেঠা ত আর জমিদার নয়; জমিদার শ্বশুরের লুচি পোলাও খেয়ে খেয়ে গরীবের ঘরের ভাত তরকারী আর ছেলের মুখে রোচে না। তা মামী, তোমার ত আর সে ভাবনা নেই। মামাবাবু জমিদার না হোন, মা দুর্গার কৃপায় টাকার ত তোমার অভাব নেই। একটি গরীবের ঘরের মেয়ে আন, ছেলে কোনো দিন পর হবে না। কথায় বলে জান ত—'উঠতি ঘরে মেয়ে দিতে হয় আর পড়তি ঘরের মেয়ে আন্তে হয়।' তবেই সকল দিকে সুরাহা হয়, নইলে বড় মানুষের ঝিরা শিকের থেকে নাক কোনো দিন নামাবে না।"

মামীমা বলিলেন, "বক্তৃতা ত খুব কর্লি বাছা; কিন্তু গরীব বড় মানুষ বাছবার কি আমি মালিক? ছেলে বড় হয়েছে ইংরিজী চাল চলন হয়েছে, যাকে পছন্দ হবে তাকেই কর্বে। আমার কি একটি কথা কইবার যো আছে?"

কুসুম বলিল, "আচ্ছা তাই না হয় হ'ল। ত' ইংরিজী-য়ানার মেম বৌই বা আস্ছে কই? তোমাদের সে ডানাকাটা হুরী না পরীর কি হ'ল কিছু শুন্লাম না ত।"

মামীমা বলিলেন, "কি জানি বাছা, বটঠাকুরের কাছে কি চিঠি-পত্তর এসেছে; দিদি বল্লে তিনি মুখখানা এতখানি করে রয়েছেন, কাউকে কিছু বল্ছেন না। হয়ত তাদের মত নেই। আজকালকার মেয়ের বাপ ত নয়, যেন ছেলের বাপের চোদ্দ পুরুষ।"

কুসুম ব্যগ্র চোখ দুটি মামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, চিঠি এসেছে নাকি? তবে আমি ত ছাড়ছি না; বড়মামার কাছে আদায় করে ছাড়ব। সেই যদি বিয়েটা হয়ই বাপু, ত আমি কেন ফাঁকি যাই? এই বেলা চিঠি লিখে শাশুড়ীর কাছে না হয় আর পনের

দিন ছুটি ক'রে নেব। না মামী-মা, আর দেরী করা চল্‌বে না; এই আমি চল্‌লাম বড়মামার কাছে।"

কুসুম উৰ্দ্ধশ্বাসে বাহির বাড়ীর দিকে ছুটিল। সকাল-বেলাটা সেদিন বাহিরের ঘরে লোকজন বড় ছিল না। মুকুন্দরাম চিঠি হাতে করিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া এই জটিল সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কুসুম সেখানে গিয়া পড়িয়া খপ করিয়া চিঠিখানায় এক টান দিয়া বলিল, "এই কি সেই চিঠি নাকি, বড় মামা? দাও না, দেখি তারা কি লিখ্‌লে।"

মুকুন্দরাম চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখ্‌তে হবে না; তুমি কি বাড়ীর পুরুত ঠাকরুণ হ'য়েছ নাকি?"

কুসুম মুখরা ছিল। সে বলিল, "তা হ'লুমই বা। আমার ত ভায়ের বিয়ে; আমি খোঁজ-খবর কর্‌ব না?"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "বিয়ে না তোমার মাথা! ও হরিকেশবকে কি কম খেলোয়াড় পেয়েছ! কি মতলবে এত খেলা খেল্‌ছে সেই জানে।"

কুসুম বলিল, "ও বাবা, তুমিও আবার একটি হরিকেশব পেলে কোত্থেকে? সে ত এক জান্‌তাম ভূধর ঠাকুরপোর শ্বশুরকে। এখন ত শুনি বিধবা মেয়ে নিয়ে দেশত্যাগী হ'য়েছে। তার আর মেয়ে আছে ব'লে ত শুনিনি।"

মুকুন্দরাম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছিস্ তুই ভাল ক'রে বল্ দেখি। এ মেয়েও ত বিধবা। তোর ভূধর ঠাকুরপোটা কে শুনি?"

কুসুম সে-কথার উত্তর না দিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ও ভগবান! এর জন্যে আমি নেচে মর্‌ছিলাম? তোমরা বিধবা মেয়ের সঙ্গে দাদার বিয়ে দেবে নাকি? কি ঘেন্না, মাগো!"

মুকুন্দরাম তাহাকে এক তাড়া দিয়া বলিলেন, "আঃ! তুই থাম্ না রাক্ষুসী! বিয়ে কে দিচ্ছে?"

কুসুম না চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "বাবা, ঠিক কথাই ত বলেছিল মোহিনী ঠাকুরঝি! ওরা মেয়ের দিকে চেয়ে তখনই বোঝা গিয়েছিল। তা সে যে চুলোয় খুসী গিয়ে মরুক না, আমাদের ঘর ডোবাতে আসা কেন? দাদাকেও বলিহারি যাই, দুনিয়ায় কি তার আর মেয়ে জুট্‌ল না? মামামাও ধন্যি মেম হ'য়েছেন বাপু, কই আমাকে ত কেউ একথা ঘুণাক্ষরে বলেনি। এই বিয়েতে আমি দাঁড়ালে শ্বশুর-বাড়ীর দরজাতেও কি আর আমার ঢুকতে দেবে ভেবেছ? তেমন মেয়েই নয় আমার—"

কুসুমের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিয়া মুকুন্দরাম তাহার হাতে চিঠিখানা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "বাপু চিঠিখানা আগে পড়, তারপর আমাদের শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণ কোরো। আগে থেকে অত লাফিও না।"

কুসুম চিঠিখানা পড়িয়া শেষ করিয়া বলিল, "তার পর? ওঁদের মতলবখানা কি? নেকীখুকীটিকে নিয়ে কর্‌বেন কি!"

সে চিঠি হাতে করিয়া হন্ হন্ করিয়া অন্দর-মহলে চলিয়া গেল। সেখানে এক বিরাট্ সভা বসিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে সুধা বলিল, "কিন্তু যাই বল বাপু, মেয়েটা ত আমার কাছে সত্যি কথাই ব'লেছিল। বিধবা হওয়ার কথা জান্‌ত না, কিন্তু বিয়ের কথা ত ঠিক-ঠিকই বলেছিল।"

কুসুম বলিল, "তবে তুই লক্ষ্মীছাড়ী এতদিন বলিস্‌নি কেন?"

সুধা গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "ওমা, আমি কি ক'রে জান্‌ব, ভাই কুসুমদি? আমি মনে কর্‌লাম বয়সী বয়সী, তাই ঠাট্টা-তামাসা কর্‌ছে। সে যাই হোক গে, মেয়েটা কিন্তু আশ্চর্য্যি ছেলেমানুষ, নোহা-সিঁদুর নেই, তবু নিজের কথা বোঝে না।"

কুসুম রাগিয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দে, অমন ঢের ছেলেমানুষ দেখেছি! কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খাচ্ছেন! তোকে আর অত ওকালতি কর্‌তে হবে না। জেনে-শুনে রূপ দেখিয়ে পরের ছেলের মাথা খাওয়া! আমি আর রঙ্গিণীর মতলব বুঝি না?—কোথাকার!" কুসুম একটা অজস্র গালাগালি দিয়া তাহার মন্তব্যের শেষ করিল।

সুধা চুপ করিয়া গেল। সে গৌরীর সম্মুখে তাহাকে যতই কথা শোনাক্ না কেন, এতটা মমতা তাহার গৌরীর প্রতি পড়িয়াছিল যে, কুসুমলতার গালিগালাজ সে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। সুধাকে চুপ করিয়া থাকিতে

দেখিয়া মুকুন্দ-গৃহিণী বলিলেন, "মান্‌লাম না হয় মেয়ে কিছু বোঝে না; কিন্তু ওর ধুম্‌সী মাও কি কিছু বোঝে না? ঘাটে উঠবার ত সময় হ'য়েছে। সর্ব্বনাশী মেয়েকে বাদ্‌শার বেগম সাজিয়ে পরের ছেলে ধরার ফাঁদ পাতা কেন? হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে' লাজ-সরমের কি মাথা খেয়েছে? বাবা, কি গয়না-কাপড়ের বাহার! কে বল্‌বে বামুনের ঘরের বিধবা?"

বরেন্দ্র-গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ের রূপের পালিশ কর্‌তে ত এতটুকু কম্‌তি দেখলাম না। ঐ পয়সায় দড়ী কলসী কিনে দিলে ত ঢের সুবুদ্ধির কাজ হ'ত। এই যে মেয়ে মা-বাপের নাম হাসাতে চল্‌ল এখন দেশে ঘরে মুখ দেখাবে কি ক'রে?"

সুধা হঠাৎ বলিল, "মা, বেশ যাহোক! তোমার ছেলে নাচল বিয়ে বিয়ে ক'রে, আর দোষ হ'ল পরের মেয়ের?"

মা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওগো তার মানেই তাই গো, তার মানেই তাই! মেয়ে-মানুষে যদি না ফোস্‌লায় তবে কি আর আমার দুধের ছেলে শুধু-শুধুই নাচে? ওর কি সেই বয়স হ'য়েছে?"

সুধা বলিল, "তা গৌরীর ত অন্তত দুগুণ হ'য়েছে! আর সে বেচারী ফোস্‌লাবে কি? কোনো দিন সে দাদার সঙ্গে কথাই কয়নি। তার উপর সেটা যা বোকা মেয়ে, তোমাদের ওসব কথার মানেই বুঝ্‌বে না।"

মুকুন্দগৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কত টাকা ঘুস খেয়েছিস রে তার বাপের কাছে? মার মুখে মুখে জবাব কর্‌তে সরম লাগে না?"

কুসুম বলিল, "বাবা ভূধর ঠাকুর-পো যখন মর্‌ল, তখন, ও মেয়ের চোখে এক ফোঁটা জল নেই; বাহারের সাজ-পোষাক ক'রে বোনের সঙ্গে কনে সেজে কনে দেখাতে এসেছিলেন শ্বশুর খুড়শ্বশুরের সাম্‌নে। সেই মেয়ে কত আর ভাল হবে? এখনত আরো পুরানো হ'য়েছে।"

কুসুমের মা বলিলেন, "হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে কুসুমের কাছে ও বাড়ীর গল্প। বাপের নাকি হুকুম ছিল মেয়ের কাছে ওকথা কেউ বল্‌লে তার ভাত-জল বন্ধ। খুড়তুতো বোনটার ঐ বাড়ীতেই বিয়ে দিলে টাকার লোভে, কিন্তু পাছে এটাকে তারা সে-সময় ডাকে তাই তাকে নিয়ে দেশান্তরে পালাল। এখন চড়বি ত চড়, এসে আমাদের ঘাড়েই চড়ল। বাপু, ভগবান ভাগ্যে সুখ লেখেনি, নইলে বিধবা হ'বি কেন? এইটুকু বুদ্ধি নেই; ভেবেছে পরের ছেলে ভোলালেই স্বর্গ লাভ হ'বে। দু'দিন বাদে কি দুর্গতি করে তা কি আর জানে না।"

সুধা বলিল, "পিসিমা, যা তা বোলো না তুমি পরের মেয়েকে; কেন দাদা ত ওকে বিয়ে কর্‌তেই চেয়েছিল। এখন সব জেনেছে, বিয়ে কর্‌বে না, ব্যস্‌ চুকে গেল। অত হাঙ্গামা কর্‌বার কি দর্‌কার?"

পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁগো হ্যাঁ, চুকে গেল বই কি? দাদা না হয় জান্‌ত না। মেয়েটা আর-কিছু না জানুক নিজের বিয়ের কথা ত জান্‌ত! তুইই ত বল্‌লি, এখ্‌খুনি। তবে সধবা মেয়ের মতই কি এই চাল-চলন হ'ল? রাস্তায় ঘাটে নেচে বেড়ানো কেন? ঘাড়ে ও ভূত যখন চেপেছে, তখন সহজে কি ছাড়বে? ছেলেটাকে বৌ, তুমি একটা বিয়ে থা চট্‌পট্‌ ক'রে দিয়ে দাও।"

বরেন্দ্র-গৃহিণী বলিলেন, "আমি ত দেবার জন্যেই ব'সে আছি; কিন্তু ছেলে কি আর আমার কথায় কর্‌বে? দেখ না, এই কথা শুন্‌লে এখন কত কথা বার করে। হতভাগী মেয়েটা এত দেশ থাক্‌তে এখানে এসে উঠল। এখন আমি যে কি করি তার ঠিক নেই। পুরুষমানুষ হট্‌ কর্‌তেই ম'রে যায়; দেখ না সেই পাশের বাড়ীর বৌটাও বিধবা হ'য়ে বস্‌ল। কিন্তু মেয়ে-মানুষের কি মরণ নেই?"

কুসুমের মা বলিলেন, "বাপ-মায় আরো চার বেলা মাছ ভাত ক্ষীর সর খাওয়ালে যমে ছোঁবে কি ক'রে?"

কুসুম বলিল, "যাক্‌, এখন ও চুলোয় যাক্‌গে, তোমরা দাদাকে ব'লে-কয়ে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেল। মজা মন্দ হ'ল না। শাশুড়ীর কাছে ছুটি চাইব বল্‌ছিলাম, তা তাঁকে কি লিখব যে, তোমার ভাইপোবোয়ের সঙ্গে আমার দাদার বিয়ে? যাই হোক্‌ এমন মজার খবরটা তাদের না দিলে চল্‌ছে না। অনেককাল তারা বোয়ের খোঁজ-খবর পায়নি, এইবার সুখবরটা শুনুক্‌।"

সুধা বলিল, "ধন্যি মেয়ে তুই কুসুম-দি, একজন মর্‌ছে দুঃখে-কষ্টে, ওর হ'ল সেটা মজার খবর !"

কুসুম বলিল—"তোমার অত দরদ লেগে থাকে তুমি যাওনা তার গলা ধ'রে কাঁদ গিয়ে।"

সুধা উঠিয়া চলিয়া গেল। ছোট ছোট মেয়েরা হাঁ করিয়া ইহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতেছিল; তাহারাও উঠিয়া গেল। বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঝিরা কিছু বুঝুক্ বা না বুঝুক্ এতক্ষণ এইখানে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুধা চলিয়া যাইতেই তাহার পিছন পিছন "ভাইয়াকে সাদির" রহস্যটা কি জানিবার জন্য তাহারা ছুটিল।

কুসুমের হাত নিশপিশ করিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম লইয়া তাহারা মোহিনী ঠাকুরঝিকে খবরটা দিতে দৌড়িল। হরিকেশবের চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া মুকুন্দ-গৃহিণী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন। ছেলেটাকে কথাটা জানাইতে হইবে ত।

মুকুন্দরাম বলিলেন, "এখন আর কিছু বল্‌ব না। শুধু চিঠিখানা খুলে নৃপেনের টেবিলের উপর রেখে দেব। তার পর সে কি বলে দেখা যাক্।"

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। — সম্পাদক]

মিত্রপূজা

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত উমাপতি বাজপেয়ী মহাশয় মিত্রপূজা নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"যখন অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষারম্ভ হইত তখন কৃষিদেবতা মিত্র বা সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পূজোপহার দিয়া নববর্ষোৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল. সম্ভবতঃ তাহা হইতে মিতু পরে ইতুনাম প্রচলন হইয়া থাকিবে।" ইতু পূজা যদি মিত্র পূজা হয় তবে মিত্র কৃষি দেবতারূপেই ইতু নামে পূজিত হয় বটে; কারণ ইতুপূজায় ধানগাছ, হলুদগাছ, কচুগাছ, মানগাছ, মটরগাছ ইত্যাদি আবশ্যক হয়, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ধান্য পাকিতেছে, হলুদগাছ হইতেছে, মটর-গাছ অর্থাৎ রবিশস্য জন্মিয়াছে, এই যে সর্ব্বপ্রকার ফসলের সন্ধি-সময়, ইহা কৃষি-দেবতার পূজার উপযুক্ত সময় বটে।

কিন্তু মিত্র-পূজার অন্য কারণ আছে বোধ হয়। সূর্য্যকিরণ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। এই দ্বাদশ বিভাগের দ্বাদশটি নাম আছে। লিঙ্গ ও কূর্ম্মপুরাণে দেখা যায়, মাঘ মাসের আদিত্যের নাম বরুণ, ফাল্গুনের আদিত্যের নাম পূষা, চৈত্রে অংশু, বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে অর্য্যমা, শ্রাবণে বিবস্বান, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জ্জন্য, কার্ত্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু। ইহাতে দেখা যাইতেছে, অগ্রহায়ণ মাসের আদিত্যের নাম মিত্র। অগ্রহায়ণ মাসে যেমন মিত্রপূজা বা ইতু পূজা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসেও তেমনি ইন্দ্রের পূজা হইত। ইহাতে অনুমান হয়, এই দ্বাদশ মাসের আদিত্য স্মরণ রাখার জন্য সেই-সেই মাসে সেই মাসের আদিত্যের পূজা করা হইত। আমরা দেখিতে পাই, ইতুপূজাও একদিনের নহে। অগ্রহায়ণ মাস ভরিয়াই ইতুপূজার নিয়ম। কৃষিদেবতা বলিয়া মিত্রের পূজা হইলে একদিনই পূজার ব্যবস্থা হইত।

বৈদিক কালে অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষারম্ভ হইত বলিয়া অনুমান হয়। ঋগ্বেদে শত শরতের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা:—"পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্ (৭।৬৬।১৬ ঋক্) অর্থাৎ শত শরৎ যেন দেখি, শত শরৎ যেন বাঁচি।" অথর্ব্ব বেদেও এরূপ দেখা যায়। ইহাতে অনুমান হয়, শরৎ কাল হইতেই তখন বৎসর আরম্ভ হইত। রামায়ণে দেখা যায়, কার্ত্তিক মাসে তখন বর্ষা শেষ হইত সুতরাং অগ্রহায়ণ মাস হইতে শরৎ আরম্ভ হইত। হয় ত রামায়ণের সময় শরৎ হইতেই বর্ষারম্ভ হইত। ইহা অনুমান ৩০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কথা। শরৎ ঋতুতে অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষারম্ভ হইত বলিয়া হয়ত এই মাসে ঋতু-পূজা হইত। শরৎকালে যে যে শস্য ক্ষেত্রে থাকে তাহা দিয়াই হয়ত পূজা হইত। ঋতুপূজা সূর্য্যেরই পূজা। সম্ভবতঃ এই "ঋতু"শব্দেরই অপভ্রংশ "ইতু"। কালে এই ঋতু-পূজা ও মিত্র-পূজা হয়ত এক হইয়া গিয়াছে, এইজন্য কোন স্থানে এক মাস পূজা ও কোথাও বা একদিন পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ঋতুর এই মাসে কোন শস্যের আরম্ভ-কাল এবং কোন শস্যের শেষ সময়, সুতরাং এই মাসে সর্ব্বপ্রকার শস্যই জন্মিতে থাকে এইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে ঋতু-পূজা করা অসম্ভব নহে।

উমাপতি-বাবু লিখিয়াছেন—"সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণের সময় গ্রীষ্ম

ঋতু আরম্ভ হয়, পূর্ব্বে বৈশাখে গ্রীষ্ম আরম্ভ হইত; এখন ৮ই চৈত্রে আরম্ভ হয়। কালে গ্রীষ্ম ঋতু আরও পশ্চাতে সরিয়া পৌষ মাসে অধুনা যে-সময় শীতকাল, সেই সময় ঘটিবে।" গ্রীষ্ম ঋতু পৌষ মাসে যাইবে কি না সন্দেহ, কারণ ঋতুর কারণ বিষুব সংক্রমণ নহে। সূর্য্য যে-সময় মধ্যে কর্কট ক্রান্তি হইতে মকর ক্রান্তি পর্য্যন্ত গিয়া আবার কর্কটক্রান্তিতে ফিরিয়া আইসে, তাহাই এক বৎসর। এইকাল মধ্যেই ছয় ঋতু হয়। স্থতরাং সূর্য্যের এই গতিই (ইহা পৃথিবীর গতি) ছয় ঋতুর কারণ. হিন্দু শাস্ত্রে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। আমার পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বে ইহা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছি। আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে ইহা বিস্তারিতভাবে লিখিবার স্থান কুলাইবে না।

শ্রী বিনোদবিহারী রায়

—

রাম-রাবণের কথা

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বৃহত্তর ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন "রামায়ণে দেখি বিজয়ী রাম—মৃত্যু-পথ-যাত্রী শত্রু রাবণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন।"

কিন্তু রামায়ণে এরূপ কোন কথা নাই। এরূপ কোন ঘটনা হইবার অবকাশও ছিল না। কেন না রামায়ণে দেখিতে পাই যে, রাম মাতলির পরামর্শে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া "শরাসনে যোজনা করিলেন। যোজিত হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও কম্পিত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্দ্ধর্ষ, কৃতান্তের ন্যায় দুনিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণসংহারপূর্ব্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল।"

ইহার পর রাবণের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের বিবরণ আছে। কালিদাস-বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাসের পুঁথিতে আছে। কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বা ভিত্তি কিছুমাত্র নাই।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

—

"বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এবং বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য"

গত অগ্রহায়ণ [১৩৩৩] সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত মহাশয় লিখিত "বঙ্গের মুসলমান-সম্প্রদায় এবং বাংলা 'ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমার সম্বন্ধে একটা ভুল উক্তি করা হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকে একস্থানে বলিয়াছেন, আমি উর্দ্দু ভাষাকে মুসলমানদের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লা সাহেব আমার প্রস্তাবের প্রতিবাদপূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষাকেই বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লেখকের এই উক্তি ভ্রান্ত।

বাঙ্গলা সন ১৩২৪ কিম্বা ১৩২৫ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর এক বৈঠক বসে। উহাতে পঠিত হইবার জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তদানীন্তন মুখপত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র বিশেষ "সম্মিলনী সংখ্যা"য় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের মধ্যে আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গলা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা এবং আরবী মুসলমানের জাতীয় ভাষা। মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান জীবনের পথে জয়-যাত্রা করিতে পারিবে না; আরবী কোরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাঙ্গলা ভাষার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। তবে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, আরবী মুসলমানের জাতীয় ভাষা; এবং ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আরবীকে জাতীয় ভাষার আসন হইতে তাড়ানো চলিবে না। আমার এই মতের প্রতিবাদে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র সম্পাদকদ্বয় [মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লা ও মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্] প্রবন্ধের নিম্নে পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন যে, আরবী মুসলমানের বিশ্বভাষা, জাতীয় ভাষা নহে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবতঃ আমার প্রবন্ধটি ও তন্নিম্নলিখিত পাদটীকা পাঠ করিয়াছিলেন এবং বহু দিন পরে, এখন তাঁহার প্রবন্ধে আমার প্রকৃত মত বিস্মৃত হইয়া তাঁহার যেরূপ মনে হইয়াছে, সেইরূপই লিখিয়াছেন।

আমি কেন পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষাকে আমাদের জাতীয় ভাষা মনে করিতাম না এবং এখনও কেন করি না, সে-সম্বন্ধে এখানে দুই-একটি কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'জাতি' শব্দটিকে যদি ইংরাজী nation শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মোটামুটী ভাবে এক দেশবাসীকে একটি 'জাতি' মনে করিতে হয়। এখন ভারতবর্ষকে যদি আমাদের মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করি তবে ভারতবাসীরাই একটি জাতি হইবে। এবং সে-ক্ষেত্রে ভারতের অন্তর্গত প্রদেশ বাঙ্গলার অধিবাসীরা একটি শাখাজাতি বা উপজাতি মাত্র হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষা, জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, বড় জোর একটি শাখাজাতীয় বা উপজাতীয় ভাষা হইতে পারে। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার অধিবাসীরা যদি একটি 'জাতি' হয়, তাহা হইলে ভারতের অধিবাসীদের অভিধান কি হইবে? আবার দেখুন, বাঙ্গালী হিন্দুরা আপনাদিগকে হিন্দু সমাজ বলিয়া অভিহিত করিলেও সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগকে হিন্দুজাতি বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপ, বাঙ্গলার তথা ভারতের মুসলমানেরা আপনাদিগকে মুসলমান সমাজ নামে অভিহিত করিলেও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণকে মোসলেম জাতি বলিয়া মনে করেন; শুধু শিক্ষিত মুসলমান নহে, নিরক্ষর মুসলমানও মনে করে। এমত অবস্থায় ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষা বাঙ্গলাকে জাতীয় ভাষা আখ্যা দান করা আমার মতে আদৌ সঙ্গত নহে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

কবির খেয়াল

[কবিবর রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতা লিখিবার সময় অনেক কাটাকুটি করেন ; কিন্তু তাঁহার খাতায় সেগুলিকে তিনি কাটাকুটির কুশ্রীরূপে রাখিতে চাহেন না। তাই, সুন্দরের পূজারী কবি এই ভাবে জোড়াতাড়া দিয়া সেগুলিকে খাতার অলঙ্কার করিয়া তোলেন।]

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহু জনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক-কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৫৪)

"দেব্যা"

ব্রাহ্মণ বিধবাদের নামের পরে 'দেবী'র স্থানে 'দেব্যা' ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় কেন? সংস্কৃতে 'দেবী' শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে 'দেব্যা' হয় এবং পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর এক বচনে "দেব্যাঃ" হয়; কিন্তু তাহাতে কোনও অর্থই পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ হয় কিনা? হইলে তাহা কি?

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার

(৫৫)

"ব্রতকথা"

বঙ্গদেশের হিন্দু রমণীগণ শুধু গল্প বলিয়া অনেক ব্রত সম্পন্ন করেন; ইহাতে তাঁহাদের ফল কি? যাঁহাদের ঘটনা বলা হয় তাঁহারা কিরূপে ব্রত করিতেন?

শ্রী সতীন্দ্রকুমার রায়

(৫৬)

কাশীর বিশ্বেশ্বর

কাশীর বিশ্বেশ্বর প্রথম কে কোন্ সময়ে স্থাপন করিয়াছেন?

শ্রী কালিদাস মুখোপাধ্যায়

(৫৭)

গঙ্গা

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র পৃথিবী দান করিয়া কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাতীরে শ্মশানে থাকিয়া মড়া পুড়াইতেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার কয়েক পুরুষ পরে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার আগে গঙ্গা পাইলেন কি করিয়া?

শ্রী বিভূতিভূষণ বসু

—

মীমাংসা

১

আল্লাহ

'আল্লাহ' আরবী ভাষার শব্দ। আরবী ভাষা হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও আরব দেশে প্রচলিত ছিল; কাজেই হজরতের পূর্ব্বেও 'আল্লাহ' শব্দ প্রচলিত ছিল না একথা বলা চলে না। তবে কথা হইতেছে, হজরত মোহম্মদ যে বিশেষ অর্থে 'আল্লাহ' শব্দ প্রচলন করিয়াছেন এই অর্থে আর কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে এই শব্দ প্রয়োগ করে নাই। এমন কি ঘোর পৌত্তলিক প্রাচীন আরব জাতি কখনও তাহাদের কোন প্রতিমা বা ঠাকুরকে এই আল্লাহ নাম দিতে সাহসী হয় নাই। 'আল্লাহ' absolute term; ইহার দ্বিবচন, বহুবচন বা স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি হয় না—এবং একমাত্র সমস্ত পূর্ণত্বের আধার—নিশ্চিত সত্তা—ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সময় এবং কোন অবস্থায় আর কাহারও প্রতি ঐ শব্দটি প্রয়োগ হইতে

দেখা যায় না। কেহ কেহ 'আল্লাহ' আল্ইলাহ শব্দের সংক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা মস্ত ভুল।

আবদুল গনি

(২৪)

সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক

১। সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে ৬নং ভবানীদত্ত লেন "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া "সাংখ্য-দর্শনম্"-নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। বেদান্ত-দর্শনের কয়েকখানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পুস্তক দুইখানি অতীব উৎকৃষ্ট।

(ক) "বেদান্ত-পরিচয়":—সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিদ্ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন-কর্ত্তৃক এই পুস্তকখানি বিরচিত হইয়াছে। হীরেন্দ্র-বাবু অতি সুন্দর ভাবায় বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পুস্তকখানি পাঠ করিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পুস্তকের দাম ১॥০ টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

(খ) "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস":—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। বরিশাল শ্রীশঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়, কলিকাতা।

বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত বড়-একটা বাহির হয় নাই। ইহাতে একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও দার্শনিক বিচার পরিলক্ষিত হইবে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৩৪)

ননদ ও ননাস

ননন্দৃ শব্দ হইতে ননদ হইয়াছে।

ননন্দৃ = ন নন্দতি সেবয়াপি ন তুর্য্যতি ইতি নন্দ ঋন্।

ন—নন্দ অর্থাৎ ইহারা কিছু'তেই পরিতৃপ্ত হয় না। এইজন্য ইহাদের নাম ননন্দৃ (ননদ) হইয়াছে। পর্য্যায়—ননান্দৃ, নন্দিনী, নন্দা, পতিস্বসৃ।

ননাস=স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। ননা শব্দ হইতে ননাস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মাতা এবং দুহিতা নত হন বলিয়া ইঁহাদের নাম ননা বা ননাস হইয়াছে। মাতা সন্তানকে স্তনপানাদির জন্য এবং দুহিতা শুশ্রূষার জন্য নত হইয়া থাকেন।

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(৩৭)

বৌদ্ধ শ্রমণের পরাজয়

শঙ্করাচার্য্যের সময় এই ভারতবর্ষে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দেশ তখন নাস্তিকতায় মগ্ন। সেইজন্য শৈবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত-ভাষ্য প্রচার দ্বারা বৌদ্ধশ্রমণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বৈদিকব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা পুনরুড্ডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠ স্থাপন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দিলেন। পরে ভারতের সকল স্থানে ও তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। অধিকন্তু কথিত আছে, স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর অন্য ধর্ম্ম হইতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার্থে শঙ্করাচার্য্য রূপে মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হন। শুধু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধশ্রমণদিগকে খণ্ডন করেন নাই; কুমারিলভট্টও এই ভয়ানক অধর্ম্ম হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে আরম্ভ করেন এবং বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। কথিত আছে, কুমারিলভট্ট কেবল তর্ক দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বৌদ্ধ-শ্রমণদিগকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাজাগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

শ্রী বিধুভূষণ শীল

(৫১)

এই শ্লোকটিতে ছাপার ভুল আছে। "বসে" এই কথাটির স্থানে বোধ হয় "রসে" এই কথাটি হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কবিতাটি এইরূপ হইবে—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহাই কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলের শেষ ভাগে ও তাঁহার জীবনীতে লিখিত আছে। তাঁহার ঐ শ্লোকে যে রাশী হইবে তাহা উলটাইলে কোন্ শকে অন্নদামঙ্গল লেখা হইয়াছিল নিরূপিত হইবে

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শক; বাঙ্গালা সন ১১৫৯ সাল

যথা চারিবেদ—৪
সপ্ত ঋষি—৭
ষড় রস—৬
এক ব্রহ্মা—১
৪৭৬১ ইহা উলটাইলে ১৬৭৪ হইবে।
ঐ শকে অন্নদামঙ্গল লেখা হইয়াছিল।

শ্রী তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস
শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র রায়
শ্রী গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র

(৫২)

আগুনের শিখা

অগ্নির পরমাণু অতি সূক্ষ্ম—সহজেই সঙ্কুচিত হয়। ইহা সূক্ষ্মাগ্র চিম্নি দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। সেইজন্য যখন কোনস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তখনই পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল অগ্নির শক্তি প্রতিহত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু অগ্নি-শিখারও একটা তেজ আছে—শিখা যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে ততই এই তেজ পার্থিব শক্তিতে মন্দীভূত হয়। সুতরাং বায়ু উত্তরোত্তর মন্দীভূত তেজকে সঙ্কুচিত করিবার সুযোগ পায় ও তাই অগ্নিশিখা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া ত্রিভুজাকারে পরিণত হয়। দাহ্য পদার্থের শক্তি অনুসারে অগ্নির তেজের তারতম্য হয়। বায়ুও সত্বরে বা বিলম্বে সেই শক্তি খর্ব্ব করে। সেইজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ ত্রিভুজাকার দৃষ্ট হয়।

শ্রী অবনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিষ্টক-পার্ব্বণ

পিষ্টক পিষ্টক পিষ্টক পউষের,
মিষ্ট সে হাতে-গড়া পল্লীর বউদের।
পরবাসে পিষ্ট
ধায় ক্ষুধাবিষ্ট
গৃহ পানে,—বন্দারও ফন্দী উধাও এর।

অঙ্গনে বালকের নর্ত্তন-ভঙ্গী!
হস্তে যে পিষ্টক মধুময় সঙ্গী।
পিঠে-রস-গন্ধ
পশে নাসারন্ধ্র,—
দুর্ব্বলও বল পেয়ে পালোয়ান জঙ্গী।

'মুগ্ সামলী', 'পাটিসাপটা'র ভর্জ্জন,—
দর্শনে করি কত পুণ্য হে অর্জ্জন!
ফুটে 'দুধে-সিদ্ধ'—
লুটে যুবাবৃদ্ধ,
লুব্ধের নাহি তর,—'দেহি দেহি' গর্জ্জন!

ছ্যাক্ ছ্যাক্ ওঠে রব শুনি 'সরুচাকলীর'
বর্ণিতে গুণ যার কণ্ঠেরি বাক্ থির!
বাটি-চাপা 'আস্কে'
মাটি করে আশ্‌রে,
পেটে ধরে একখানি, জানি দোষ ভাগ্যির।

'চন্দ্রপুলি'র থালা রাজেন্দ্র নাম পায়,
'গড়গড়ে' বিদূষক হেসে গড়াগড়ি যায়!
হেরিয়া সহাস্তে
লভি যে উপাস্যে,
আস্যের তুষ্টিয়ে প্রাণে পেয়ে কে ফিরায়!

পিষ্টক স্রষ্ট যে আর আর সর্ব্ব,
রসনার তৃপ্তি হে দশনের গর্ব্ব,
বরি মহানন্দে
বন্দিয়া ছন্দে,
পূর্ণ উদর হায়, কোথা এত ভর্ব্ব!

দুষ্টের পিষ্টকে শিষ্টতা সারাখন!
পল্লীর মধু-ভরা মিঠে পিঠে-পার্ব্বণ।
পিষ্টক-জন্ম
সার্থক ও ধন্য!
লক্ষ্মীর রচা পিঠে খান লোক-নারায়ণ।

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার

—

সাঁচ্চা কথা

আমরা যখন বাড়ী তৈরী করি তখন তার চারদিকে এমন উঁচু পাঁচিল তুলে দিই যে, এক দরজা ছাড়া অন্য কোন জায়গা দিয়ে কেউ টপ্ ক'রে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারে না। তখনকার দিনে যখন সম্রাট্ সাজাহান রাজত্ব করতেন তখন রাজধানী দিল্লীর চারদিকে ঐরকম উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন—পাছে কোনো শত্রু হঠাৎ সহরের ভেতর ঢুকে পড়ে, এই ভয়ে। এই পাঁচিলের ধারে ধারে চোদ্দটি দরজা ছিল। এখন তার প্রায় অনেক নষ্ট হ'য়ে গেছে। তবে অনেকগুলি এখনো আগেকার দিনের সাক্ষীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। এই দরজাগুলির নামও বেশ,—যেমন কাশ্মীর দরজা, লাহোর দরজা, মোরী দরজা, ছুটা দরজা, ইত্যাদি।

এইরকম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দিল্লী সহর তৈরী হ'বার পর কতদিন চ'লে গেছে। এখন আর তেমন পাঁচিল

নেই, দরজাও নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই প্রায় বদ্‌লে যাচ্ছে। আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন এই দরজা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনি। আজ তাই বল্‌ব।

সে আজ অনেক দিনের কথা। একজন সাধু সহরের পাঁচিলের ধারে ধ্যানে ব'সে থাকৃতেন। সেইখানটাকেই এখন ফুটা দরজা বলে। বাদশা সাজাহান যখন সহরটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরেন তখন দেখ্‌লেন একজন সাধু ঠিক পাঁচিলের গাঁথুনির জায়গাটি মুড়ে ব'সে আছে। সাজাহান এসে বল্‌লেন, 'সাধুবাবা, আপনাকে এখান থেকে উঠে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। আমি এখানে একটি দরজা তৈরী কর্‌ব।' সাধু একটু হেসে বল্‌লেন, 'বাবা, আমিই যে দরজা হ'য়ে ব'সে আছি, আর দরজার দর্‌কার নেই। আমার দ্বারা তোমার ভালই হ'বে।' সাজাহান সাধুর কথার মর্ম্ম বুঝে আর কোনো প্রতিবাদ কর্‌লেন না। মিস্ত্রীদের ব'লে দিলেন, 'পাঁচিল গাঁথার সময় এইখানটা যেন ফাঁক থাকে।'

সাধু হাত তুলে সাজাহানকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন।

তারপর দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল। সাজাহানের মাথার কালোচুল শাদা হ'য়ে গেল। সাধু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেই জায়গাতেই বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন।

মানুষের দিন কিন্তু সমান যায় না, পরিবর্ত্তন হ'বেই হ'বে। সাধুরও তাই হ'ল।

সাজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেবের প্রাণটা কিন্তু বাপের মতন অমন কোমল ছিল না। কারুর খাতির তিনি বড় একটা রাখ্‌তেন না। একদিন তিনি সহরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে উজিরকে ডেকে বল্‌লেন, 'দেখ, এই যে পাঁচিলের এখানটা ভাঙ্গা, এখানে একটি বড় দরজা কর্‌তে হ'বে।' বুড়ো উজির হুকুমটা শুনে একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌ল। উজিরের ভাবগতিক দেখে সাধু বল্‌লেন, 'হুজুর, আপনার পিতা আমাকে এখানে বস্‌বার অধিকার দিয়ে গেছেন।' আওরঙ্গজেব কথাটায় সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লেন না, তিনি মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন, 'তিনি হয়ত ভুল ক'রে থাক্‌বেন। আমার এ জায়গা চাই—আপনি অন্য জায়গায় যাবেন।'

সাধু আর কিছু বল্‌লেন না। শুধু এই বল্‌তে-বল্‌তে বিদায় নিলেন—'যা হ'বার তা কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না, তবে আমি বাদশাকে যে-কথা দিয়েছিলাম তা পালন ক'রেছি।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাধুর জায়গায় মস্তবড় সুন্দর এক দরজা তৈরী হ'য়ে গেল। আওরঙ্গজেব হাস্‌তে-হাস্‌তে উজিরকে বল্‌লেন, 'এইবার আমার সহর নিরাপদ হ'ল, কোন শত্রু আর আস্‌তে পার্‌বে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সেইদিন রাত্তিরে অতবড় সুন্দর দরজাটা একশো টুক্‌রো হ'য়ে হুড়মুড় ক'রে মাটির ওপর প'ড়ে গেল। যারা পাহারা দিচ্ছিল কোন্ রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বাদশার কাছে ছুট্‌ল খবর দিতে।

আওরঙ্গজেব সমস্ত শুনে বল্‌লেন, 'যা হ'বার তা হ'য়েছে, ও দরজা আর তুলে কাজ নেই। ওর নাম ফুটা দরজাই রইল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সাধু নিজের কথা রেখেছিল। তারপর উজির-ওমরাহদের ডাকিয়ে হুকুম দিলেন যেখান থেকে পার সেই সাধুকে খুঁজে এনে আবার ঐ জায়গায় বসাও।'

সকলেই সেলাম কর্‌তে কর্‌তে বাদশার হুকুম তামিল কর্‌বার জন্যে চ'লে গেল।

বাদশার লোক অনেক জায়গায় খুঁজ্‌লে, কিন্তু কোথাও সাধুকে দেখ্‌তে পেলে না। পরে কাশী গিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পেলে।

সাধু সমস্ত শুনে বল্‌লেন, 'বাদশাকে গিয়ে বল যা হ'বার তাই হয়েছে, আমি আর ফিরে যেতে পার্‌ব না; তবে—আমার কথা রইল যে, আমার অবর্ত্তমানেও কোন শত্রু ওখান দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে না।'

সাধুর এই কথা শুনে আওরঙ্গজেবের মনে কেমন যেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল।

তারপর দিল্লীতে অনেক লড়াই হ'য়ে গেছে, রক্তের নদী ব'য়ে গেছে, প্রত্যেক দরজা রক্ষা কর্‌বার জন্যে সৈন্যের দর্‌কার হ'য়েছে, কিন্তু সাধুর সাঁচ্চা কথার জোরে ফুটা দরজা দিয়ে কোনো শত্রু ঢোকেনি।

শ্রী সুশীলকুমার রায়

পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম।—[প্রবাসী-সম্পাদক

শিক্ষা ও দীক্ষা—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ক্যাল্‌কাটা পাবলিশার্স কর্ত্তৃক কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০। পৃঃ ১২৮। ১৩৩৩।

এই পুস্তকে লেখক দেশের শিক্ষা-সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে-সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে শিক্ষা-সমস্যা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। আমাদের দেশে শিক্ষা কি, উহা এখন কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং সুশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে কি ভাবে শিক্ষা পরিচালনা করা দরকার, এইসমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যাঁহারা দেশের শিক্ষা-সমস্যা লইয়া চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে চিন্তাশীল লোকের এই পুস্তকখানি অবশ্য প্রয়োজনীয়। পুস্তকের ছাপা বাঁধাই ভাল।

স্বৈরিণী—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশক ডি এম্‌ লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। পৃঃ ১৫৫ ১৩৩৩।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সুলেখক সত্যেন্দ্র-বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। ইহা বৌদ্ধ যুগের আখ্যান-মূলক একখানি উপন্যাস। লেখক উপন্যাসের নায়িকা মঞ্জুশ্রীর চরিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই উপন্যাসখানি বাঙালা পাঠক-পাঠিকা-সমাজে সমাদর লাভ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পবিত্রকুমার গুহ, ৫৫ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। পৃঃ ১৬২। ১৩৩৩।

ডাঃ দত্ত আমেরিকায় দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি আমেরিকার অভিজ্ঞতার কতক অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থে আমেরিকার শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, নিগ্রো-সমস্যা প্রভৃতির সুন্দর আলোচনা আছে। গ্রন্থখানির সমাদর হইবে, আশা করি।

ছেলেদের বিবেকানন্দ—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ডি এম্‌ লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০।

সত্যেন্দ্র-বাবু সুবৃহৎ বিবেকানন্দ-চরিত লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ছেলেদের জন্য সরল ভাষায় তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। বিবেকানন্দের মহান্‌-চরিত্র যদি শিশু-চিত্তকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে তবে তাহাদের সুশিক্ষা ও আত্মিক উন্নতির জন্য আর ভাবিতে হইবে না। পুস্তকখানির ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় বোঝা যায় যে, ইহার আদর হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

সরল মহাভারত—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি-এল্‌ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী সুখদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সবজিমহাল, ঢাকা; ও বেলেঘাটা, কলিকাতা।

মূল মহাভারতের মূল কাহিনীটি সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ ছেলে-মেয়েদের জন্য সরল পদ্যে বিরচিত। মহাভারতের ন্যায় বিশাল গ্রন্থের কোন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনার প্রয়াস দুঃসাহসের কা॰ মূল মহাভারত পাঠ ছেলেমেয়েদের অসাধ্য। কাশীদাসের মহাভারত অপূর্ব্ব কাব্য। কিন্তু কাশীদাসের গ্রন্থে মূল মহাভারতের আখ্যায়িকা অনেকটা বিকৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া মূলের সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার জন্মে। অনেকেই বড় হইয়া মূলগ্রন্থ পড়িবার অবসর পায় না; সুতরাং তাহাদের সেইসকল ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল থাকিয়া যায়। যে-সকল শৌর্য্যবীর্য্য-মণ্ডিত মহৎ চরিত্র, শিক্ষাপ্রদ, মনোহর, একাধারে কঠোর ও কমনীয় ঘটনাবলী মহাভারতের বিপুল পটে সন্নিবেশিত হইয়া কাব্যরসামোদী ভাবুক ও জ্ঞানপিপাসু সকল শ্রেণীর লোকেরই পরম উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে ঘনীভূত আকারে মূলের সহিত সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিশুদের বোধগম্য ভাষায় বিবিধ সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ কার্য্য। সুখের বিষয়, গ্রন্থকার তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন। গ্রন্থকারের রচনাভঙ্গী সুন্দর ও সরল। ত্রিবর্ণের ও একবর্ণের কয়েকখানা হাফটোন চিত্রে পুস্তক বিভূষিত; ছাপা ও বাঁধাই ভাল, বর্ণাশুদ্ধি খুব কম। মূল্য ১৷৷০ টাকা, যথাসম্ভব সুলভ; কাগজ আর-একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল। আশা করি, ভাবী সংস্করণে এইসকল সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইবে। এরূপ একখানা পুস্তকের অভাব ছিল। ইহা পাঠে বালকবালিকাদের ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের অফুরন্ত উৎস মূল মহাভারত পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। ইহাই গ্রন্থকারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শিক্ষা-বিভাগের পুরস্কার ও বিবাহাদি মাঙ্গলিক ব্যাপারে উপহার স্বরূপ নির্ব্বাচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিশ্চয়ই এই বইখানি উচ্চাসন পাইবে। আশা করি, এই পুস্তক সাধারণের নিকটও উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

জ্ঞ

দেবদূত—শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ। কলিকাতা, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রেস। ১৯২৬। বিনামূল্যে বিতরিত।

গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেন—"শিশুমঙ্গল সপ্তাহ উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতায় যে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে Everyday God-mothers নামে একখানি নাটিকা ইংরাজ বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়।......উক্ত ইংরাজী নাটক অবলম্বনে...আমি এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি প্রণয়ন করি।" "এই নাটিকায় প্রোটীন্‌, কার্ব্বো-হাইড্রেট্‌, ভাইটামিন্‌ প্রভৃতি পদার্থ ব্যক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে।" তাঁহার কল্পিত অভিনবগুলি এই—খাদ্যপ্রাণ (Vitamine), অন্নেশ (স্বাস্থ্য-দেবতা), আমিষক (Protein), শর্করক (Carbo-hydrate), মাখনক (Fat),

লাবণক (Salt), ইত্যাদি। এই কয়টি দ্রব্য নাটিকায় ব্যক্তির মূর্ত্তি লইয়াছে। ইহা ছাড়া কিরণ, সমীরণ, নির্ম্মলা (পরিচ্ছন্নতা), ইত্যাদিও ব্যক্তিরূপ পাইয়াছে। এক নবীনা মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহারা "অশনেশ" ঠাকুরের পরিচালনায় আপন-আপন কার্য্য ও গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে। নাটিকাটির পিছনে গুরুতর সৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এত বড় উদ্দেশ্যমূলক হওয়া সত্ত্বেও ইহা সুন্দর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভাষা সরল; পদ্যভাগ বেশ সুসম্বদ্ধ। এরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ে উদাসীন বাঙালীকে স্বাস্থ্য-শিক্ষাপ্রদান এখন প্রধান কাজ। এই দিক্ দিয়া দেখিলে নাটকখানি অভিনব হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই নাটিকাটির অভিনয় হওয়া উচিত। তাহা হইলে বাঙালীর ছেলেরা বুঝিবে, কোন খাদ্যের কি গুণ, ও কোন্ খাদ্যের কি প্রয়োজন। গ্রন্থকারের সুরচিত প্রতিশব্দগুলি বাংলা ভাষায় গৃহীত হইবার যোগ্য।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—(তৃতীয় ভাগ)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সংগৃহীত। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মনোমোহন লাইব্রেরী, ১৯৮ ও ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনেক ঘটনা ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী ইহাতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের বিভিন্ন বয়সের তিনখানি ছবিও ইহাতে আছে। বইটি ভাল হইয়াছে।

গদ্য-সাহিত্য-সার—আবদুল রহমান খাঁ, এম-এ, বি-টি ও শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বহু চিন্তাশীল সাহিত্যিকের রচনাংশ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলন সুন্দর সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে।

নীলাচল—শ্রীচুণীলাল বসু, রসায়নাচার্য্য, সি-আই-ই প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, এম-বি, এফ-সি-এস, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা, বালেশ্বর, ভদ্রক ও সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ; কটক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, খুর্দা, আঠারনালা, প্রভৃতির বিবরণ ও ইতিহাস; পুরীর ইতিহাস ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয়; কোনার্ক ও চিল্কা হ্রদের বিবরণ—প্রভৃতি অতি সরল ভাষায়, হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে বইটিতে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাসায়নিক বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি এতই বিশ্লেষণমূলক যে, ঐসকল স্থানের সর্ব্বরকমের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়া তিনি পাঠকের সর্ব্বপ্রকার কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। আর তিনি প্রবীণ সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার ভাষা যেমন সুন্দর, বর্ণনদক্ষতাও তেমনি প্রশংসার্হ। এমন ভ্রমণ-কাহিনী আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই। ইহা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ছাপা ও বাঁধন সুন্দর।

মন না মতি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক এম সি সরকার এণ্ড সন্স্, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১৩৩৩।

বইখানিকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না, একটি বড় গল্পের বই বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের পরে ছোট গল্প লিখিয়া যাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ওস্তাদ শিল্পী চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার গল্পে ভাব যেমন জমাট হইয়া উঠে, ভাষাও তেমনি বেগবান লীলায়িত উৎফুল্ল গতিতে ভাবের প্রকৃষ্ট বাহক হইয়া পড়ে। আলোচ্য গল্পপুস্তকে সেই শিল্পী চারুচন্দ্রের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। বইখানির আখ্যান-বস্তু অত্যন্ত সরল, স্বাভাবিক; আর তাহার বর্ণনাও অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। ব্রততীর চরিত্র এত অকপট, এত স্বাভাবিক, এত স্পষ্ট, এত অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছে যে, তাহাতে মুগ্ধ চমৎকৃত হইতে হয়। পলাশ ও উল্কার চরিত্রও কোন অংশে অস্পষ্ট হয় নাই। ব্রততী ও পলাশের মানসিক দ্বন্দ্ব অদ্ভুত নিপুণতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা এমন নিখুঁত সুমার্জ্জিত হইয়াছে যে, তাহা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বহুদিন আমরা এমন সুন্দর গল্প পাঠ করি নাই। ইহা পড়িয়া আমরা আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। বইটির নাম দেওয়া হইয়াছে—"মন না মতি"। আখ্যানবস্তুর সহিত এই নাম অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

এই খণ্ডে "অনধিকার প্রবেশ", "মেঘ ও রৌদ্র" প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের সাতাশটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধন বেশ ভাল হইয়াছে।

গীত-মালিকা (প্রথম ভাগ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

ইহাতে স্বরলিপি সমেত রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী সাধারণের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমরা ইহার অন্য ভাগগুলির জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী—শ্রীশশিভূষণ বসু। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত (২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। আট আনা।

রামমোহন রায় যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলমানবিজিত ভারত আত্মকীর্ত্তি, আত্মগৌরব ও আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছে এবং অপর এক বিদেশীর পদতলে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে। সমাজে তখন অন্ধ কুসংস্কার আর কুপ্রথা, ধর্ম্মে অর্থহীন আড়ম্বর আর অটল অজ্ঞতা এবং শিক্ষায় দৈন্য আর অমনোযোগ। এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে ভাস্করের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া রামমোহন রায় ভারতের আত্মচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রে সমান শক্তিতে, সমান ধৈর্য্যে, সমান ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠায় তিনি উন্নতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, শক্তি ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করা শক্ত কাজ। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে বিচিত্রকর্ম্মময়, বিচিত্রচিন্তাশীল এই মহাপুরুষের জীবন-কথা সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। নব্য ভারতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক রামমোহনের জীবন-কাহিনী যাঁহারা অল্প পরিসরে পাইতে চান, বর্ত্তমান পুস্তকখানি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদের উপযোগী হইয়াছে বইখানি ছাত্রদের পাঠ্য হওয়া উচিত।

রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধগল্প—মূল পালি হইতে অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীসত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, কাপিলাশ্রম, মধুপুর পোঃ, জেলা হুগলী। আট আনা।

এই পুস্তক পালি ভাষায় প্রচলিত মহারাজ অশোকের সময়কার কতকগুলি উপদেশপূর্ণ আখ্যান অনূদিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাগুলির

মধ্য দিয়া অহিংসা, ক্ষমা, মৈত্রী, দান, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও রীতিনীতি বিষয়ক বহু তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। তবে অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হয় নাই। স্থানে স্থানে যথেষ্ট ছাপার ভুল আছে। মোটের উপর বইটির উদ্দেশ্য সাধু, এবং এরূপ অনুবাদের প্রয়োজন আছে।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রী নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ছয় আনা।

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতের ও বর্ত্তমান জগতের বহু মনীষীর অভিমত ও গান্ধী-চরিত্রের গুণব্যাখ্যান এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। সুতরাং আমরা এ পুস্তকখানিকে সাদর অভ্যর্থনা প্রদান করিতেছি।

মহারাজ সীতারাম—(ঐতিহাসিক নাটক) শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার। গোবিন্দধাম, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। এক টাকা।

বঙ্গগৌরব সীতারাম রায় সম্বন্ধে নাটক। নাটকটি মন্দ হয় নাই।

প্রেমিকবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবন-বৃত্তান্ত—শ্রী বঙ্কবিহারী কর। ঢাকা, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ। এক টাকা।

ব্রাহ্মসমাজের সেবাকে জীবনের ব্রত করিয়া যাঁহারা ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, মহাত্মা নবদ্বীপচন্দ্র দাস তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকে তাঁহারই জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্র কেবল কঠোর সেবক ছিলেন না, সরস প্রেমিকও ছিলেন। এমন মহৎ সাধু প্রেমিক পুরুষের জীবনচরিত সকলের পাঠ করা উচিত।

ভারত-প্রদক্ষিণ—(সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ) শ্রী দুর্গাচরণ রক্ষিত। প্রকাশক শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত, ১৮১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তিন টাকা।

আজকাল বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর অভাব নাই। কিন্তু এই "ভারত-প্রদক্ষিণ" পুস্তক যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই জাতীয় পুস্তকের যথেষ্ট অভাব ছিল। পুস্তকখানি ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে। ইহাতেই ইহার মূল্য ও গুণবত্তা প্রমাণিত হইতেছে। ভারতের প্রধান দ্রষ্টব্যস্থান-সমূহের ইতিহাস, প্রকৃতি, লোকাচার, রীতিনীতি অদ্ভুত-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও ঐতিহাসিক গবেষণার সহিত বিবৃত হইয়াছে। আজকালকার ভ্রমণকারীরা গোটাকতক ছবি দিয়া আর তথ্যালোচনার পরিবর্ত্তে বাক্যাড়ম্বর ও উচ্ছ্বাস দিয়া ভরাইয়া ভ্রমণ-কাহিনীর একটা ধোঁয়া ছাড়িয়া পাঠককে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন। আলোচ্য পুস্তকে বাক্যাড়ম্বর নাই, আছে খাঁটি সুবিন্যস্ত তথ্যসমূহ; উচ্ছ্বাস নাই, আছে প্রকৃত যথাযথ অবশ্য-জ্ঞাতব্য দেশ-পরিচয়। এরূপ ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে। অনেকগুলি চিত্রও আছে; তাহাতে পুস্তকটির মূল্য বাড়িয়াছে। পুস্তকখানি উপাদেয় ও লোভনীয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান রতন লাইব্রেরী, শিউড়ী, বীরভূম। একাদশ খণ্ড; প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা।

পুস্তকটি "বঙ্গভাষায় পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান।" "[illegible] শতাধিক [illegible] ...সংগৃহীত হইয়াছে। যে-সকল প্রাচীন গ্রন্থকারগণের [illegible] মুদ্রিত বা জনসমাজে সম্যক প্রচারিত হয় নাই, [illegible] লিখিত পুঁথিতে বংশপরম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেইসকল অপ্রকাশিত নামা গ্রন্থকারগণের এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের পরিচয়ও যথাসম্ভব সঙ্কলিত হইয়াছে।...পরিশিষ্টে বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতা, বঙ্গভাষার মুসলমান কবি, ১১ জন ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ-লেখক, ২৫ জন মহাভারত বা তৎসংস্পৃষ্ট পর্ব্বাধ্যায় রচয়িতা, ৫২ জন মনসার গীতি লেখক, ১৮ জন সত্যনারায়ণ ব্রতকথা রচয়িতা, ১১ জন চণ্ডীর উপাখ্যান লেখক, ১২ জন চৈতন্যচরিত-রচয়িতা, ৫১ জন কবি-সঙ্গীত রচয়িতা ১২ জন পাঁচালিকার, ৬ জন বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচয়িতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদকগণ, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সময়ানুক্রমিক তালিকা, বিভিন্ন জেলার সাহিত্যসেবক, ইত্যাদি ইত্যাদি বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় ৬৫টি প্রস্তাব ও তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।" ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য কত ব্যাপক, প্রয়োজনীয় ও মহৎ। চরিতাখ্যানগুলি সরল প্রাঞ্জল বাগ্‌বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষায় মনোরম সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হইয়াছে। উচ্ছ্বাস বা অতিভক্তিতে বিবরণ কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। গ্রন্থকার প্রবীণ সাহিত্যিক। লোক-চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া তিনি যে কত গভীর সাহিত্য-সাধনা করিয়াছেন এবং কত প্রচুর পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য এই গ্রন্থই প্রদান করিতেছে। এই চরিতাভিধান বঙ্গভাষার বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই এই অমূল্য গ্রন্থখানি ঘরে রাখা উচিত। ইহার অবশিষ্ট অংশগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, আশা করি। ধনবান ব্যক্তিরা এই সৎগ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করিলে বঙ্গদেশ উপকৃত হইবে।

বীথিকা—শ্রী সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্র আচার্য্য, মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা। দশ আনা।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনার গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলন সুনির্ব্বাচিত, সুবিন্যস্ত, সুখপাঠ্য ও ছাত্রদের পাঠযোগ্য হইয়াছে।

বাংলার বর্ত্তমান অর্থসমস্যা ও জাতীয় ব্যবসায়—শ্রী রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। কোহিনুর প্রেস, চট্টগ্রাম। বারো আনা।

শিরোনাম হইতেই বইখানির উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। যে জিনিসের অভাবে আধুনিক বাংলা দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা কেবল উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। যুক্তি, তালিকা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির সাহায্যে তিনি বাংলার অর্থ-সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বইখানি মূল্যবান হইয়াছে। সাধারণে ইহা পাঠ করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়। প্রকাশক সান্যাল এণ্ড কোং, ২ বেথুন রো, কলিকাতা। বারো আনা। ১৩৩৩।

প্রবীণ চিন্তাশীল সাহিত্যিক যোগেশ-বাবুর প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধ-পুস্তকে বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে সাহিত্য, নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির [illegible]—সূক্ষ্ম বিচার অতি সুন্দর বস্তু বিশ্লেষণ-প্রণালীতে অতি সরল [illegible] অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিন্তাবৈশিষ্ট্যে ও পাণ্ডিত্যে [illegible] দুর্লভ। এখানি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ পুস্তকগুলির অন্যতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকের প্রথমেই "পাপী বিদেশী"

নামক প্রবন্ধ বিজ্ঞান ও কল্পনার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রকেই আমরা এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে অনুরোধ করি।

গুপ্ত

ভারত-নারীর সৎসাহস ও বীরত্ব—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র দাশ সংকলিত। পাটনা, দোরান্দপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪১ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা।

এই সঙ্কলন-পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী হিন্দুর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই দুর্ভাগা দেশে নারীহরণ ও নারীধর্ষণ প্রভৃতি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ভাবিলে লজ্জিত হইতে হয়। যে-কোন একটি দৈনিক সংবাদপত্র খুলিলেই নিজেদের পুরুষত্বে ধিক্কার জন্মে। দাশ-মহাশয় সাময়িক পত্রাদি হইতে এইসকল লজ্জাকর ঘটনার কথাগুলি একত্র সঙ্কলন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আমাদের হীনতার কথা নিয়ত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের শৌর্য্য ও শক্তির উদ্‌বোধনে সহায়তা করিয়াছেন। এই পুস্তক বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিলে ভাল হয়. বাঙলা দেশের নারীসমাজ ইহাতে যথেষ্ট সাহস ও আশার কথা পাইবেন।

হিরণ্যকশিপু

সচিত্র দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্যজাতি—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার, বি-এ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দমদম ক্যান্টনমেন্ট্‌ হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা। ৮৮ পৃষ্ঠা।

দার্জ্জিলিং ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের পার্ব্বত্যজাতিগণের পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতিগুলি ও অভিনব জীবন-যাপন-প্রণালী সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। নেপালী পাহাড়িয়া, নেওয়ার, কিরাত, তিব্বতীয় লেপচা, ভোট ও মুর্ম্মী—প্রত্যেক জাতিরই উৎপত্তি বিবরণ, রীতিনীতি, পর্ব্ব-উৎসব, বিবাহ-ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছাপাই বাঁধাই ও চিত্রগুলি সুন্দর।

পাতার ভেঁপু—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন পুরন্দহা, দেওঘর। রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য দশ আনা।

স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরীর অতুলনীয় 'আবোল তাবোল' ও 'হযবরল'র পরে এমন সুন্দর শিশু-সাহিত্য পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার একাধারে চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পী। তাঁহার কবিতাগুলি সহজ সরল, ঝরঝরে এবং স্বচ্ছন্দগতিতে অপরূপ; মিলেরও বাহাদুরী আছে। গ্রন্থখানি শিশুদের ভাল লাগিবে। সুনির্ম্মলবাবু শিশুসাহিত্যকে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট করিবেন, আশা করি।

মাতৃ-মঙ্গল—শিশুতোষ—শ্রীচিন্ময়ী দেবী প্রণীত। প্রকাশক—ঘোষ এণ্ড কোং, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। মূল্য ।৵০।

শিশুদিগের বর্ণ ও বানান বিষয়ক ছবির বই। প্রত্যেকটি অক্ষরে আমাদের দেশের মহৎ লোকদের একটি করিয়া ছবি দেওয়াতে বইখানি শিশুদিগের নিকট আদৃত হইবে।

পল্লীপরীক্ষণ—বল্লভপুর—শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ হইতে শ্রী কালীমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিশ্বভারতী। মূল্য ।৵০।

কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে village organisation নামে একটি কথা শুনিতেছি। কি রাষ্ট্রীয় বক্তৃতায়, কি সাময়িক সাহিত্যে সর্ব্বত্রই এই কথা—পল্লী-জননীর শ্রীবৃদ্ধি না হইলে দেশের মুক্তি নাই। আমরা বিগত কয়েক বৎসর বক্তৃতা মাত্র শুনিলাম, এত বড় একটা কাজে কাহারো বিশেষ উৎসাহ বা চেষ্টা দেখি নাই। রাষ্ট্রীয় নেতারা যাহা কাজে খাটাইতে সক্ষম হইলেন না, কল্পনা-বিলাসী কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষ বসু, মিঃ লাল প্রভৃতির সহায়তায় বীরভূমের একটি ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম লইয়া তিনি যে অঘটন ঘটাইয়াছেন তাহা যাঁহারা বল্লভপুর গ্রামটি পূর্ব্বে ও পরে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পল্লী-শ্রীবৃদ্ধির কাজ বাঙলার অন্য কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বীরভূমের একটি নগণ্য ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত গ্রামে আমেরিকার আধুনিকতম পল্লী-শ্রীবৃদ্ধির প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে, ইহা সত্য সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। এইজন্য অধ্যাপক ডাঃ রজনীকান্ত দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয় সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

জমি ও মাটির শ্রেণী-বিভাগ, কৃষির বিঘ্ন, ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, সার, বিভিন্ন চাষ, চাষের আয়-ব্যয়, গরুর খাদ্য ও সুপ্রজনন, রাস্তা-ঘাট, পারিবারিক আয়-ব্যয়, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি লইয়া এমন চমৎকার বিশদ আলোচনা-যুক্ত পুস্তক ইহাই বাঙলা ভাষায় প্রথম। বাঙলার প্রত্যেক গ্রামে যদি এই প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য হয় তাহা হইলে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই ক্ষুদ্র ছয় আনা মূল্যের পুস্তিকাখানি বাঙলার গ্রাম সম্বন্ধে একটি সহজ ধারণা জন্মাইয়া দেয়। প্রত্যেক বাঙালী কৃষিজীবী ও গ্রামবাসীর এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। আমরা ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২২৮ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা।

আলোচ্য বিষয় ঘটনা বা ব্যক্তি সম্বন্ধে পাঠককে ইচ্ছামত সহানুভূতি বা বিদ্বেষ-সম্পন্ন করিয়া তোলা যথার্থ শিল্পীর কাজ। এই পুস্তকখানিতে শৈলজাবাবু আমাদিগকে ইচ্ছামত চালনা করিয়া লইয়া যান, তাঁহার সহিত কোথায় একতিল বিরোধ হয় না। বাঙলার গ্রাম্যজীবনের দলাদলি, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ও ভীরুতা সম্বন্ধে কাল্পনিক ও বাস্তব অনেক উপন্যাস-গল্প আমরা পাঠ করিয়াছি; কিন্তু কোনোটিই এমন জীবন্ত হইয়া চক্ষের সম্মুখে লাগে না। এই পুস্তকখানিতে শৈলজাবাবু যথার্থ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। নিরুপায় নবীনের অক্ষমতা, সীতাপতি-বাবুর কাতর সহানুভূতি আমাদিগকে ব্যথাবিষ্ট করিয়া তোলে। পুস্তকখানির কোথায়ও এতটুকু কষ্টকল্পনা বা বর্ণনাবাহুল্য নাই।

যকের ধন (উপন্যাস)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত চমকপ্রদ; শেষ না করিয়া থাকা যায় না। স্ত্রী-চরিত্রহীন উপন্যাসকে এমন সরস করিয়া তোলাতে বাহাদুরী আছে।

স—

দক্ষিণরায়

পরশুরাম

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—"বাঘের কথা যদি বল, ত রুদ্রপ্রয়াগের বাঘ। ইয়া কেঁদো কেঁদো। সোঁদরবন থেকে সেখানে গ্রীষ্মিকালে হাওয়া বদ্‌লাতে যায়। কিন্তু এম্‌নি স্থান-মাহাত্ম্য যে কাউকে কিছু বলে না, সব তীর্থ-যাত্রী কিনা। কেবল সায়েব ধ'রে ধ'রে খায়।"

বিনোদ উকীল বলিলেন—"খাসা বাঘ ত। এখানে গোটাকতক আনা যায় না? চট্‌পট্‌ স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল-ভাঙ্গা, কিছুরই দরকার হ'ত না।"

সন্ধ্যাবেলা বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তিনি নিবিষ্ট হইয়া একটি ইংরেজি বই পড়িতেছেন—How to be happy Though married। তাঁর শালা নগেন এবং ভাগ্‌নে উদয়, এরাও আছে।

চাটুয্যে হুঁকায় একমিনিটব্যাপী একটি টান মারিয়া বলিলেন—"তুমি কি মনে কর সে চেষ্টা হয় নি?"

"হয়েছিল নাকি? কই, রাউলাট-রিপোর্টে ত সে কথা কিছু লেখেনি।"

"ভারি এক রিপোর্ট পড়েচ। আরে গবরমেণ্ট কি সব-জান্তা? There are more things কি বলে গিয়ে—"

"ব্যাপারটা কি হয়েছিল খুলেই বলুন না।"

চাটুয্যে ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন—"হুঁ।"

নগেন বলিল—"বলুন না চাটুয্যে মশায়।"

চাটুয্যে উঠিয়া দরজা ও জানালায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তারপর যথাস্থানে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—"হুঁ।"

বিনোদ। দেখছিলেন কি?

চাটুয্যে। দেখছিলুম হরেন ঘোষালটা আবার হঠাৎ এসে না পড়ে। পুলিশের গোয়েন্দা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

বংশলোচন বই রাখিয়া বলিলেন—"ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প না হওয়াই ভাল।

চাটুয্যে বলিলেন—"ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটাও বড় অলৌকিক, শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক্ ও কথা। তারপর উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?"

বিনোদ উদয়কে বাধা দিয়া বলিলেন—"ব্যাপারটা শুন্‌তেই বা দোষ কি। চলুন আমার বাসায়, সেখানে হাকিম নেই।"

বংশলোচন বলিলেন—"আরে না না। এখানেই হোক্। তবে—চাটুয্যে মশায়, বেশি সিডিশস্ কথা-গুলো বাদ দিয়ে বল্‌বেন।"

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—"মাভৈঃ। আমি খুব বাদ-সাদ দিয়েই বল্‌চি।—বেশী দিনের কথা নয়, বকুদত্তর নাম শুনেচ বোধ হয়, আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো—"

বিনোদ। বকুলাল দত্ত? কপালীটোলায় যার মস্ত বাড়ি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভাঙ্‌চে? তিনি ত মারা গেছেন, শুনেচি কাউন্সিলে ঢুকতে পারেন নি ব'লে মনের দুঃখে।

চাটুয্যে। ছাই শুনেচ। বকুবাবু আছেন। এক আনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে এক টাকা।

বিনোদ। কি রকম?

চাটুয্যে। বুদ্ধির দোষে বেচারা সব নষ্ট করলে,—অমন মান, অমন ঐশ্বর্য। বাবার কৃপা হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বকুর মতিচ্ছন্ন হ'ল।

বিনোদ। কোন্ বাবা?

চাটুয্যে। বাবা দক্ষিণরায়।

উদয় বলিল—"আমার এক পিস্‌শ্বশুরের নাম দক্ষিণা-মোহন রায়।"

চাটুয্যে। উদো, তুই হাঁসালি, হাঁসালি। পিস্‌শ্বশুর নয় রে উদো,—দেবতা, কাঁচা-খেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।

চাটুয্যে হাত যোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকাইলেন। তারপর সুর করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"নমামি দক্ষিণরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ সাহাবাজপুর,
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পুবে বাক্‌লা পরগণা—
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।
গোবাঘা শার্দ্দূল চিতে লকড় হুড়ার
গেছো বাঘ কেলে বাঘ বেলে বাঘ আর
ডোরা কাটা ফোঁটা কাটা বাঘ নানা জাতি—
তিন শ' তেষট্টি ঘর প্রভুর যে জ্ঞাতি।
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।
ধুম ধাম নৃত্য গীত হয় সারানিশি,
গাঁক্ গাঁক্ হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশি।
কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেঅট্টতালে হালুম রাগিণী।
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণ রায়,
হরষিত হঞা সবে কামড়িয়া খায়।
প্রভুর সেবায় হয় জীবহিংসা নিত্য,
পহরে পহরে তাঁর জ্বলে উঠে পিত্ত।
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্‌দি,
হিংসার কারণে প্রভুর বর্ণ হৈল হল্‌দি।
ছাগল শুয়ার গরু হিন্দু মুছলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি,
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঁঞি।
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা।"

বিনোদ বলিলেন—"এ পাঁচালী কোত্থেকে পেলেন?"

চাটুয্যে। রায়-মঙ্গল। আমার একটা পুঁথি আছে, তিনশ বছরের পুরাণো। সেটা নেবার জন্যে চিমেশ মিত্তির ঝুলো-ঝুলি। ছোক্‌রা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড়শ অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজী হই নি। প্রবন্ধ লিখ্‌তে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হ'তে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।

বিনোদ। যাক্, তারপর?

চাটুয্যে। বঙ্কুলালবাবুর কথা বল্‌ছিলুম। পনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। পরিবার দেশে থাক্‌ত, তিনি কলকাতায় একটা মেসে থেকে রামযাদু এটর্ণির অফিসে আশি টাকা মাইনের চাকরি করতেন। রামযাদুবাবু তাঁর ক্লাস-ফ্রেণ্ড, সেই সূত্রে চাকরি। এখন, বঙ্কুবাবুর একটু হাত টান ছিল। বিপক্ষের ঘুষ খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করিয়ে দেন। রামযাদুবাবু কড়া লোক, ছেলেবেলার বন্ধু ব'লে রেয়াৎ করলেন না। ব্যাপার জান্‌তে পেরে বঙ্কুলালকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। বঙ্কুবাবুও তেরিয়া হ'য়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এলেন। মন খারাপ, মেসের বামুনকে বল্লেন রাত্রে কিছু খাবেন না। তারপর হেদোর ধারে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা করতে। রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু সংসার চলে কিসে? পুঁজি ত সামান্য। রামযাদুর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হ'ল। আরে উকিল বাড়ি অমন একটু-আধটু উপ্‌রি অনেকে নিয়ে থাকে, তা ব'লে কি পুরাণো বন্ধুকে অপমান করতে হয়? আচ্ছা, এর শোধ একদিন বঙ্কুলাল নেবেন-ই।

রাত ন'টায় মেসে ফিরে এলেন। মেস খাঁ খাঁ, সেদিন শনিবার, সব মেম্বার থিয়েটার দেখতে গেছে। বঙ্কুলাল নিঃশব্দে বাসায় ঢুকে দেখতে পেলেন রান্নাঘরের ভেতর—"

নগেন বলিল—"দক্ষিণরায়?"

চাটুয্যে বলিলেন—"রান্নাঘরের ভেতর মেসের ঝি বঙ্কুবাবুর পশ্‌মী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নি বুনে দিয়েছিলেন—তাইতে ব'সে তাঁরই থালায় লুচি খাচ্ছে, মেসের ঠাকুর তাকে বাতাস কচ্ছে। ঝি আধহাত জিভ কেটে দেড়

হাত ঘোমটা টানলে। অন্যদিন হ'লে বকুবাবু কুরুক্ষেত্র বাধাতেন, কিন্তু আজ দেখেও দেখলেন না। চুপটি ক'রে ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তারপর অগাধ চিন্তা। কি করা যায়? কোত্থেকে টাকা আসবে? তাঁর এক বিধবা পিসি হুগলিতে থাকেন, বিপুল সম্পত্তি, ওয়ারিশ একটি মাত্র ছেলে ভুতো। ভুতো-ছোঁড়া অতি হতভাগা, অল্প বয়সেই অধঃপাতে গেছে। কিন্তু পিসি তাকে নিয়েই ব্যস্ত, এমন উপযুক্ত ভাইপো বকুলালের দিকে ফিরেও তাকান না। বুড়ির কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই।

বকুলাল ভাবলেন, ভগবানের কি বিচার! লক্ষ্মীছাড়া ভুতো হ'ল দশলাখের মালিক, আর তারই মামাতোভাই বকুর অশেষভক্ষ্যধনুর্গুণ। তাঁর ক্লাস-ফ্রেণ্ড—ঐ বজ্জাত রামযাদুটা—মক্কেল ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করচে, আর তিনি একটি সামান্য চাকারর জন্য লালায়িত। দুত্তোর ভগবান।

কিন্তু বকুলাল তাঁর এক ভক্ত বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন, ভগবানকে যদি একমনে ভক্তিভরে ডাকা যায় তা হ'লে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আচ্ছা, তাই এক-বার ক'রে দেখলে হয় না? যে কথা সেই কাজ। বকুলাল তড়াক্ করে উঠে পড়লেন, ষ্টোভ জ্বাল্‌লেন, চা ক'রে তিন পেয়ালা খেলেন। আজ তিনি ভর-রাত ভগবানকে ডাকবেন।

বকুলাল আলো নিবিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে তপস্যা সুরু করলেন।—হে ভক্তবৎসল হরি, হে ব্রহ্মা, হে মহাদেব, দয়া কর। সেকালে তোমরা ভক্তের আবদার শুন্‌তে, আজ কেন এই গরীবের প্রতি বিমুখ হবে? হে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, তোমাদের যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার। বর দাও—বর দাও—বেশি নয়, মাত্র একলাখ। উঁহু, একলাখে কিছুই হবে না,—গিন্নিই গয়না গড়িয়ে অর্দ্ধেক সাবাড় করবেন। রামযেদোটার কিছু কম হবে ত দশলাখ আছে। আমার অন্তত পাঁচলাখ চাই,—না না, দশ লাখ। দোহাই দেবতারা, তোমাদের কাছে একলাখও যা, দশলাখও তা, তাতে এই বিশ্বসংসারের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনেককে ত কোটি কোটি দিয়ে থাক, আমায় না হয় মাত্র দশলাখ দিলে। লাখ টাকায় একটা বাড়ি, হাজার-পঞ্চাশ যাবে ফর্ণিচার করতে, তারপর আরো পঞ্চাশ হাজার যাবে এটা-সেটায়। এই ধর একটা ভাল মোটর কার। উঁহু, একটায় হবে না, গিন্নিই সেটা আঁকড়ে ধ'রে থাকবেন, হরদম থিয়েটার আর গঙ্গাস্নান। আচ্ছা তাঁর জন্যে না হয় একটা ফোর্ড গাড়ি মোতায়েন ক'রে দেওয়া যাবে,—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড,—মেয়ে-ছেলের বেশি বাড় ভাল নয়। আর ঐ রামযাদুটা,—রাস্কেলকে কেউ যদি বেঁধে নিয়ে আসে ত ফুটপাথের ওপর তার হাম্‌দো মুখখানা ঘষি। ঘষি আর দেখি, ঘষি আর দেখি, যতক্ষণ না নাক চোখ মুখ ক্ষয়ে গিয়ে তেল-পানা হ'য়ে যায়। হে বুদ্ধদেব, যিশু-খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য,—আজকের মতন তোমরা আমায় মাপ কর, তোমরা এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবা-সকল, আজ আমার এই তপস্যায় তোমরা বাগড়া দিও না, এরপর তোমাদের একদিন খুশী ক'রে দেব। হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পদ্মগর্ভ, হে ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, ইহুদির যেহোভা, পার্শীর অহুর, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, সয়তান—খ্যাঁ! রামো রামো। তা সয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব। থাক্, অত বাছলে চলে না। হে তেত্রিশ কোটির যে কেউ, দয়া কর —দয়া কর। আমি একান্তঃকরণে ভক্তিভরে ডাকচি— ধনং দেহি, ধনং দেহি।"

বিনোদবাবু বলিলেন—"আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি ক'রে?"

চাটুয্যে বলিলেন—"সে তোমরা বুঝবে না। কলি-কাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু'চারটি এখনো আছেন। গরীব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্ত্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা ত কোন্ ছার। তারপর বকুলালবাবু ঐ রকম একমনে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর দু-চোখ বেয়ে ধারা বইতে লাগল, বাহ্যজ্ঞান নেই, কেবল ধনং দেহি। এমন সময় নীচে থেকে একটি আওয়াজ এল—ট্যাঁও। বকুলাল

লাফিয়ে উঠে দেশলাই জাল্‌লেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠানে আলো ফেলে দেখলেন—"

নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল—"দক্ষিণরায়!"

চাটুয্যে মশায় মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন—"ত্যাক্ষিণরায়! তোমার ম্যাথা। গ্যাল্লোটা তুমিই ব্যালোনা, আমি আর বকে মরি কেন।"

উদয় খুশী হইয়া বলিল—"নগেন-মামার ঐ মস্ত দোষ, মানুষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকা-দেখার দিন—"

চাটুয্যে অস্থির হইয়া বলিলেন—"আরে গ্যালো যা! একজন থামলেন ত আর একজন পোঁ ধরলেন। যা—আমি আর বল্‌ব না।"

বংশলোচন বলিলেন—"আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর। ব্রাহ্মণকে বল্‌তেই দাও না।"

চাটুয্যে বলিতে লাগিলেন—"বকুলালবাবু উঠানে দেখলেন—ব্রহ্মার হাঁস, শিবের ষাঁড়, বিষ্ণুর গরুড় কেউ-ই নেই, শুধু এক কোণে একটি লাল বাইসিকেল ঠেসানো রয়েচে। হেঁকে বল্লেন—কোন্ হ্যায়? টেলিগ্রাফ পিয়ন সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল, এখন সাম্‌নে এসে বল্লে—তার হ্যায়।

কিসের তার? বকুবাবুর বুক দুরু-দুরু ক'রে উঠল। কই, তিনি ত লটারির টিকিট কেনেন নি। তবে কি গিন্নির কি ছেলেপিলের অসুখ? আজ বিকেলেই ত চিঠি পেয়েচেন সব ভাল। বকুলাল হুড়মুড় করে নেমে এলেন।

তারের খবর—ভুতো হঠাৎ মারা গেছে, পিসিও এখন-তখন, শীগ্‌গির চলে এস। বকুবাবু ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর মনিব্যাগটি পকেট থেকে বার ক'রে পিয়নের হাতে উবুড় ক'রে দিলেন। পিয়ন বেচারা আসবার আগেই জেনে নিয়েছিল যে খারাপ খবর, বকশিস চাওয়া চলবে না। এখন অযাচিত তিন টাকা ছ আনা পেয়ে ভাবলে শোকে বাবুর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। সে সই নিয়েই পালাল।

ভুতো তা হ'লে মরেচে? সত্যিই মরেচে? বা রে ভুতো, বেড়ে ছোকরা। নিশ্চয় মদ খেয়ে লিভার পচিয়েছিল। জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হবে। বকুবাবু সেই রাত্রেই হুগলি রওনা হলেন।

বকুবাবুর বরাত ফিরে গেল। তবে দশ লাখ নয়, মাত্র পাঁচ লাখ। টাকাটা কম হওয়ায় প্রথমটা একটু মন খুঁৎ-খুঁৎ করেছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। বাড়ি হ'ল, গাড়ী হ'ল, সব হ'ল। বকুলাল নানা রকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল। টাকার আর অবধি নেই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বকুর বুদ্ধিটা একটু মোটা হয়ে পড়ল। এই রকমে বছর চোদ্দ কেটে গেল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চাটুয্যে মশায় তামাক টানিয়া দম লইতে লাগিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—"কই চাটুয্যে মশায়, বাঘ কই?"

চাটুয্যে বলিলেন—"আসবে, আসবে, ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে। বকুবাবু যেদিন পঞ্চাশ বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গ-মাতা তাঁকে বল্লেন—বৎস বকু, বয়স ত ঢের হ'ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েচ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক, একটা ভুঁই-পট্‌কা ছোড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্ত্তব্য তুমিই বাৎলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব'লে দাও মা। বঙ্গ-মাতা বল্লেন—কাউন্সিলে ঢুকে পড়।

মা ত বলে খালাস, কিন্তু ঢোকা যায় কি ক'রে? বকুলাল মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন মাতব্বর সায়েবকে ধরে বল্লেন—তিনি হাজার টাকা ড্রঙ্কেন সেলার্স হোমে দিতে রাজী আছেন যদি গবরমেণ্ট তাঁকে কাউন্সিলে নমিনেট করে। সায়েব বল্লেন—টাকা তিনি গ্ল্যাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গবরমেণ্ট যার-তার কাছে ঘুষ

নেয় না। বকুবাবু মুখ চুণ ক'রে ফিরে এলেন। তারপর একজন রাজনৈতিক চাঁইকে বল্লেন—আমি ইলেক্‌শনে দাঁড়াতে চাই, আমায় দলে ভর্ত্তি করে নিন, ক্রিড কি আছে দিন সই করে দিচ্ছি। চাঁই মশায় বল্লেন—দুত্তোর ক্রিড, আগে লাখ টাকা বার করুন দেখি, আমাদের নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফণ্ডের জন্যে,—সাপ না মারলে পাড়াগাঁয়ের লোক সপোর্ট করবে কেন? বকুবাবু বল্লেন—ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্যে টাকা? ঘুষ আমি দি না। ফিরে এসে স্থির করলেন, সব ব্যাটা চোর। খরচ যদি করতেই হয়, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করবেন।

কলকাতায় সুবিধা করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন, সাউথ-সুন্দরবন-কনৃষ্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারি কিনেছিলেন, সেজন্যে ভোট আদায় করা সোজা হবে। ইলেক্‌শনের দু-তিন মাস আগে থেকেই তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরাণো শত্রু রামযাদুবাবু রাতারাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করেচেন। তিনিও ঐ সোঁদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল,—তিনি টেরিটি বাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেল্লেন, দেউড়িতে গোটা-দুই ষাঁড় বাঁধলেন, আর বাড়ির রেলিংএর ওপর ঘুঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

খবরের কাগজে নানারকম কেচ্ছা বার হ'তে লাগল। বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চোদ্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত সে চাকরি গেল কেন? কেরানির অত পয়সা কি করে হ'ল? হে দেশবাসীগণ, বকুলাল অত সোডা ওয়াটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগান-বাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফর্সা হ'ল কেন? সাবধান বকুলাল, তুমি শ্রীযুক্ত রামযাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেও না, তা' হ'লে আরো অনেক কথা ফাঁস করে দেব। বকুবাবুও পাল্টা জবাব ছাপাতে লাগলেন, কিন্তু তত জুৎসই হ'ল না, কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক ছিল না।

বকুবাবু ক্রমে বুঝলেন যে তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটাররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্চে। একদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে বসে আছেন এমন সময় তাঁর মনে পড়ল যে চোদ্দ বৎসর আগে দেবতার দয়ায় তাঁর অদৃষ্ট ফিরে যায়। এবারেও কি তা হবে না? বকুলাল ঠিক করলেন আর একবার তেমনি ক'রে কায়মনোবাক্যে তিনি তেত্রিশ কোটিকে ডাকবেন। শুধু বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি ত আর সত্যিকার দেবতা নন,—বঙ্কিম চাটুয্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনো যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে ক্ষেপিয়ে দিতে পারেন।

রাত্রি দশটার সময় বকুবাবু তাঁর অফিস ঘরে ঢুকে দারোয়ানকে ব'লে দিলেন যে তাঁর অনেক কাজ, কেউ যেন বিরক্ত না করে। এবারে আর শোবার ঘরে নয়, কারণ গিন্নি থাকলে তপস্যার বিঘ্ন হতে পারে। বকুলাল ইজি-চেয়ারে শুয়ে এই মর্ম্মে একটি প্রার্থনা রুজু করলেন।—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্ব্বে তোমরা একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথা-যোগ্য পুজো দিয়েচি। তারপর নানান্ ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খোঁজ-খবর নিতে পারি নি,—কিছু মনে কোরোনা বাবারা। কিন্তু গিন্নি বরাবরই তোমাদের কলাটা মূলোটা যুগিয়ে আসচেন, সোনা-রুপোও কিছু কিছু দিয়েচেন। ঐ যে তাঁর রুপোর তামকুণ্ডু, কোষা-কুষী, ঝুন্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন, সেত আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও শেষ, এখন একটু ফুরসৎ পেয়েই ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিয়েচি, টিকি রেখেছি, গো-সেবা করচি। এখন আমার এই নিবেদন, রামযাদু ব্যাটাকে যাল কর। ওকে ভোটে হারাবার কোন আশা দেখচি না। দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুনি নয়, নমিনেশন-পেপার দেবার দু-দিন আগে,—নয় ত আর একটা ভুঁই-ফোড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত, বেরিবেরি, হার্টফেল, বাড়িচাপা, যা হয়। আমি আর বেশী কি বলব, তোমরা ত হরেক রকম জানো। দাও বাবারা, বজ্জাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত খাও—রক্তং দেহি, রক্তং দেহি।...বকুলালবাবু নিবিষ্ট হয়ে এই রকম সাধনা

করচেন, এমন সময় সেই ঘরে টুপ্‌ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।"

নগেনের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল—"দ—"

চাটুয্যে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"চোপরও।—বকুবাবুর অফিসের কড়িকাঠে একটি টিকটিকি আট্‌কে ছিল। সে যেমনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাংবে, অমনি খসে গিয়ে টুপ্‌ করে বকুলালের টেবিলে পড়ল। বকুলাল চম্‌কে উঠে দেখলেন—টেবিলের ওপর একটি টিকটিকি, আর তার নীচেই একখানা পোষ্টকার্ড।

পোষ্টকার্ডটি পূর্ব্বে নজরে পড়ে নি। এখন বকুবাবু পড়ে দেখলেন তাতে লিখচে—মহাশয়, শুনচি আপনি ইলেক্‌শনে সুবিধা ক'রে উঠতে পারচেন না। যদি আমার সাহায্য নেন আর উপদেশ-মত চলেন তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতি। শ্রী রামগিধড় শর্ম্মা।

বকুলাল উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন—জয় মা কালী, জয় বাবা তারকনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু পীর পয়গম্বর। এই পোষ্টকার্ডখানি তোমাদেরই লীলা, তা আমি বেশ বুঝতে পারচি। কাল তোমাদের ঘটা ক'রে পুজো দেব, নিশ্চিন্ত থাক। তারপর খুব মনে মনে বল্লেন—যাতে দেবতারাও টের না পান—উঁহু, বিশ্বাস নেই, আগে কাজ উদ্ধার হোক, তখন দেখা যাবে।

সমস্ত রাত, তারপর সমস্ত দিন বকুবাবু ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটালেন। যথাকালে রামগিধড় শর্ম্মা দেখা দিলেন। ছোট্ট মানুষটি, মেটে-মেটে রং, ছুঁচালো মুখ, খাড়া-খাড়া কাণ। পরনে পাটকিলে রংএর ধুতি-মেরজাই গায়ের রংএর সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কথা কন কখনো হিন্দি, কখনো বাংলা। বকুলাল খুব খাতির ক'রে বল্লেন—বৈঠিয়ে। আপনি আর্য্যসমাজী? রামগিধড় বল্লেন—নেহি নেহি। বকু জিজ্ঞাসা করলেন—মহাবীর দল? প্যাক্ট-ওয়ালা? কৌসিল-তোড়? চর্খা-বাজ? রামগিধড় ওসব কিছুই নন, তিনি একজন পলিটিকাল দালাল। বকুবাবু ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিলেন। রামগিধড় বল্লেন—বস্, হুয়া হুয়া।

তারপর কাজের কথা সুরু হ'ল। রামগিধড় জানতে চাইলেন বকুবাবুর রাজনৈতিক মতামত কি,তিনি স্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, না গর্‌রাজী? বকু বল্লেন, তিনি কোনোটাই নন, তবে দরকার হ'লে সবতাতেই রাজী আছেন। তিনি চান দেশের একটু সেবা করতে, কিন্তু রামযাদু থাকতে তা হবার যো নেই। রামগিধড় বল্লেন—কোনো চিন্তা নেই, তুমি ব্যাঘ্র-পার্টিতে জয়েন কর।

বকুবাবু আঁৎকে উঠলেন। রামগিধড় বল্লেন—আমি অতি গুহ্য কথা প্রকাশ করে বল্‌চি শোনো। এই পার্টির সভ্য-সংখ্যা একবারে গোণা-গুন্তি তিন শ তেষট্টি। আমি এর সেক্রেটারী। একটিমাত্র ভেকান্সি আছে, তাতে ইচ্ছা করলে তুমি আসতে পার। কাউন্সিলের সমস্ত সীট আমরাই দখল করব।

বকুর ভরসা হ'ল না। বল্লেন,—তা পেরে উঠবেন কি করে? শত্রু অতি প্রবল, হটাতে পারবেন না। নিখিলবঙ্গীয়-সর্পনাশক ফণ্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেচে।

রামগিধড় খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে হেসে বল্লেন—আমরা সর্প নই। ফণ্ড না থাক্‌, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণরায় আমাদের সহায়। তাঁর কৃপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে।

তিনি কে?

চেন না? তেত্রিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সব্বাই ঘুমুচ্চেন। বাবা তোমার ডাক শুন্‌তে পেয়েচেন। নাও, এখন ক্রিডে সই কর। অতি সোজা ক্রিড,—কেবল বাবার নিত্যিকার খোরাক যোগাতে হবে,—তার বদলে পাবে শত্রু মারবার ক্ষমতা আর কাউন্সিলে অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু গবরমেণ্ট?

গবরমেণ্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—"

বংশলোচন বাধা দিয়া বলিলেন—"ওকি চাটুয্যে মশায়!"

চাটুয্যে কহিলেন— হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইসারায় বল্‌চি। রামগিধড় বুঝিয়ে দিলেন, একবারে রামরাজ্য হবে। শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই-ব্রাদার।

দিব্যি ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।

কিন্তু ঐ রামযাদুটা চিট হবে ত?

চিট ব'লে চিট! একবারে চ-য় দীর্ঘ-ঈ চীট। তাকে তুমি নিজেই বধ কোরো।

বকুবাবুর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। এইবার তাঁর কৃত্রিমদন্তে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল। ক্রিড সই করে দিয়ে বল্লেন—বাবা দক্ষিণরায় কি জয়!

রামগিধড় বল্লেন—হুয়া, হুয়া, আব সব ঠিক হুয়া।

এই স্থির হ'ল যে কাল ফাইভ-অপ্-প্যাসেঞ্জারে বকুবাবু তাঁর সুন্দরবনের জমিদারিতে রওনা হবেন। সেখানে পৌছলে রামগিধড় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে বাবার আশীর্ব্বাদ পাইয়ে দেবেন।

বকুবাবুর মাথা বিগড়ে গেল। সমস্ত রাত তিনি খেয়াল দেখলেন রামগিধড় হুয়া হুয়া করচে। রামরাজ্য, কাউন্সিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী,—এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। রামযাদু মরবে আর তিনি কাউন্সিলে ঢুকবেন—এইটেই আসল কথা। তারপর রামরাজ্যই হোক আর রাক্ষস-রাজ্যই হোক, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

তারপর সোঁদরবনে গভীর অমাবস্যা রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।"

বিনোদ বলিলেন—"চাটুয্যে মশায়, আপনি বড় ফাঁকি দিচ্চেন। বাবার মূর্ত্তিটা কি রকম তা বলুন?"

চাটুয্যে। বল্‌ব না, ভয় পাবে। বিশেষ ক'রে এই উদোটা।

উদয় বলিল—"মোটেই না। হাজারিবাগে থাকতে কতবার আমি রাত্তিরে একলা উঠেচি। বউ বলত—"

চাটুয্যে বলিলেন—"বউ বলুকগে। বাবা প্রথমটা সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দিয়েছিলেন। বকুলালকে বল্লেন—বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী হয়েচি। এখন বর কি নেবে বল।

বকুবাবু বল্লেন—বাবা, আগে রামযাদুটাকে খাও, ও আমার চিরকেলে শত্রু।

বাবা বল্লেন—দেশের হিত?

বকু উত্তর দিলেন—হিত-টিত এখন থাক্ বাবা। আগে রামযাদু।

বাবা বল্লেন—তাই হোক। ক্রিড সই করেচ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি—

এতেক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।
পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জলন্ত দেউটি।
হলুদ বরণ তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ তালু,
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।
দু-চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা গেঁজ,
আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশহাত লেজ।
ছাড়েন হুঙ্কার প্রভু দন্ত কড়মড়ি,
জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে রড়ারড়ি।
ভয় পাঞা দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা,
কহে—দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা।
ইন্দ্র বলে ওরে বাপা কিবা বুদ্ধি দিলে,
রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে।
চক্ষে বাজ কেটা বাপা কানে হাত রুই,
কপাট ভেজাঞা সুধা খাও তোঁরা দুই।

বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট্ ক'রে বকুবাবুর সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন। বাবা বল্লেন—যাও বৎস, এখন চ'রে খাও গে।"

চাটুয্যে হুঁকায় মনোনিবেশ করিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—"তারপর?"

"তারপর আবার কি। বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি করে? শোবো কোথায়? সিল্কের চোগা-চাপকান পরব কি ক'রে? সিগ্রি যে আর চিনতে পারবে না গো!

বাবা অন্তর্ধান। রামগিধড় বল্লে—আবার ক্যা হুয়া? গোল মৎ কর। এখন ভাগো, শক্র পকড় পকড়কে খাও গে। বকুলাল নড়েন 'না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় ঘ্যাঁক্ করে তাঁর পায়ে কাম্‌ড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।

পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকচে। চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বল্লেন—এমন বাঘ ত দেখি নি, গাধার মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েচে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চাঙ্গা হোক, একে আলিপুরে নিয়ে যেও; বকশিস মিল্‌বে।

* * * *

বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখা-সাক্ষাৎ করিনে,—ভদ্দর লোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।"

বিনোদবাবু বলিলেন—"আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনো গুলি খেয়েচেন?"

"গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান্ নি কি?"

"দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাসা কোরো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা, বোসো তোমরা—আমি উঠি।"

দ্বিজেন্দ্রহীন দ্বিজেন্দ্র-আলয় দর্শনে

শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হোথা আমলকী-বনে থেমে গেছে গান, ডালে ম্রিয়মাণ পাখী—
হোথা নব ফাগুনের আনন মলিন, অশ্রুসজল আঁখি।
হোথা আকাশের নীলে বিষাদের ছায়া, পবনে কাঁদন ভরা,—
হোথা গোলাপের রাঙা অধর-হাসিটি বেদনায় আধমরা।
হোথা মুদেছে নয়ন প্রকৃতি-দুলাল, মেলিবে না আঁখি আর,
হোথা নিভেছে প্রদীপ, স্বরগ-কিরণ আলোকে হাসিত যার।
হোথা কাঠবিড়ালীর মরমে জ্বলিছে দারুণ বিরহ-জ্বালা,
হায় কে বুলাবে হাত অঙ্গে তাহার পরশ শান্তি ঢালা!
হোথা বনের প্রাণীরা মানুষের সাথে করিত আলাপ কত,
আজ কোথা সেই ছবি, সব হ'ল শেষ দেবতা, হয়েছে গত।
হোথা বহিত সদাই হাসি-তরঙ্গে উছল প্রাণের ধারা,
ধনী নির্ধন লাগি সম স্নেহ-সুধা বহিত বাঁধন-হারা।

(২)

ছিলে শিশু ভোলানাথ, ক্ষণেকে রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণেক পরে,
ক্রোধে ক'রে দিতে শোধ মন-খোলা হাসি প্রাণ-ঢালা ক্ষমা-ভরে,
ধূলি মণিকাঞ্চন একসাথে নিয়ে করিতে সহজ খেলা;
তাই মাটিরে করিতে সোনার স্বপন সোনারে করিতে ঢেলা।
গেছ অমর আলয়ে মর দুনিয়ার সকল মাধুরী নিয়ে—
হেথা বন্ধু-জনের মরমে মরমে বিরহ-বেদনা দিয়ে।
হেথা সংসারে রহি রহি বন্ধনে দেখালে জগৎজনে
রোজ কেমনে মুক্তি-পরশ লভিতে হরষ তৃপ্ত মনে।
তুমি বৃদ্ধ বয়সে ফাঁকি দিয়ে রোজ যৌবনে করি' ভর
ঐ আমলকী-বনে অট্টহাসির ছুটাইতে নির্ঝর।
আহা সকলি হেথায় শূন্য নিরখি, চ'লে গেছ সুন্দর,
সবি আছে, নাই তুমি, এই ঠাঁই তাই, পাখী-হীন্ পিঞ্জর।

হে তাপস, যেথা রহ আজ তুমি
সেথা হ'তে লহ মোর
প্রাণের প্রণতি শ্রদ্ধা ভকতি
মিশ্রিত আঁখি-লোর।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সভাগুলির নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় বিগত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :

নির্ব্বাচনের ফল বেশ সন্তোষজনক বলিয়াই আমি মনে করি। মান্দ্রাজে স্বরাজীদের জয় স্বাভাবিক হইয়াছে, কারণ তাঁহারা তথায় বড়-লোকের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন।

বঙ্গদেশে স্বরাজীদের জয় হইয়াছে, তাহার কারণ গবর্ণমেণ্টের দলননীতি।

বিহার-উড়িষ্যার কংগ্রেসের সাফল্যে আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছি না। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা যদিও কংগ্রেসের নাম লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই খাঁটি পারস্পরিক সহযোগী। পরিবর্ত্তনবিরোধী অসহযোগীদের সমর্থনের বলেই তথায় কংগ্রেসদল জয়ী হইতে পারিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বিহারের প্রতিনিধিদিগকে স্বরাজী বলা ঠিক নহে। তাঁহারা নামে মাত্র স্বরাজী।

যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে স্বরাজীরা প্রায় উৎখাত হইয়া গিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে হিন্দু নির্ব্বাচক-মণ্ডলী হইতে পণ্ডিত মতিলাল ও মিঃ রঙ্গ আয়ার ভিন্ন কেহই পরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতজীর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না।

পাঞ্জাবে হিন্দু বা মুসলমান কোন স্বরাজীই পরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। শিখ স্বরাজীরা স্বরাজীই নহেন, কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর দিবার পূর্ব্বে শিখ-সঙ্ঘের অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন। তাঁহারা সঙ্ঘের অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

মধ্য প্রদেশের স্বরাজীরা মাত্র একটি স্থানে জয়লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই এবং সিন্ধুতে তাঁহারা মাত্র দুইটি স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় পাঞ্জাবের স্বরাজীরা মাত্র দুইটি স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উভয়ে অতি সামান্য ভোট বেশী পাইয়া জয়-লাভ করিয়াছেন। পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক উভয়েই পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজনের জামানতের টাকা জব্দ হইবে।

যুক্ত প্রদেশে স্বরাজীদের সংখ্যা ৩১ হইতে ১৯এ, মধ্য-প্রদেশে ৪৪ হইতে ১৫তে এবং বোম্বাইতে ১১তে নামিয়াছে।

আমি মনে করি যে, দেশ নির্ব্বিচার বাধাপ্রদান এবং আসন-বর্জ্জন নীতি অগ্রাহ্য করিয়াছে।

ফিজি দ্বীপে ভারতীয়ের দুর্দ্দশা—

গত ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় একজন পত্র-লেখক ফিজিতে ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যে-বিবরণ পাঠাইয়াছেন নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম :

ফিজিতে ৬৫ হাজার ভারতবাসী ঠিক কুলীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে ভারত হইতে এই উপনিবেশে কুলীর মত আমদানী করা হইয়াছিল বলিয়া এখানকার লোকেরা ভারতবর্ষকে কুলীর দেশ বলিয়াই জানে।

এক্ষেত্রে আমাদের নেতাদের উচিত, শিক্ষিত ভারতবাসীগণকে মাসে মাসে এদেশে পাঠান। তাঁহারা এদেশে আসিয়া দেখিয়া যাউন, তাঁহাদেরই দেশীয় লোকেরা এখানে কি চরম দুর্দ্দশায় অবস্থান করিতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একবার এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখানকার ইউরোপীয় ও অন্যান্য লোক-দিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণার কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তখন তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করিল যে, ভারতবর্ষ খালি কুলীর দেশ নয়। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর পর পণ্ডিত গোবিন্দ সহায় শর্ম্মা এদেশ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন ডাঃ এস, কে, দত্ত।

পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদীর উদ্যোগে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা হইতে একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হইয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা হইতে এখানে কোন সাহায্যই প্রেরিত হয় নাই। এখানে ভারতীয়দিগের হইয়া কথা বলিবার উপযুক্ত লোক কেহই নাই।

যখন শুনি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে প্রতিনিধি-দল প্রেরিত হইতেছেন, তখন আশা হয় যে, এখানেও বুঝি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আসিয়া ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশা কথঞ্চিৎ মোচনকল্পে কিছু করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের নেতৃবৃন্দ আমাদিগের দিকে তাকাইতেছেন না।

এখানকার প্রতি দশজন ভারতবাসীর মধ্যে ৯ জনই কোন রকমে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও আমাদের কোন স্থানই নাই। আমরা সকল রকম ট্যাক্স দিয়া থাকি, তবু, কি ব্যবস্থাপক সভা, কি মিউনিসিপ্যাল সভা কোন প্রতিষ্ঠানেই আমাদের প্রতিনিধি লওয়া হয় না, এমন-কি সরকার কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে আমাদের কাহাকেও মনোনীত করা হয় না। হয়ত ইহাই ব্রিটিশের বিচার ও অপক্ষপাতের একটি উদাহরণ।

একসপ্তবিংশৎতম ভারত-রাষ্ট্রীয় মহাসভার নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা আমাদের এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করুন।

এখানকার দৈনিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ অত্যন্ত বেশী, অথচ ভারতীয়দিগের আয় অত্যন্ত সামান্য। এইজন্য গত ১৯২১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানকার শ্রমিকদিগের একটি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল; ঐ ধর্ম্মঘট ৬ মাস চলিয়াছিল। ফিজির ইতিহাসে ইহাই দ্বিতীয় ধর্ম্মঘট। কি ভাবে ঐ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে জোর করিয়া আবার কাজে লাগান হইয়াছিল, সে-প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া কোন লাভ নাই।

শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘটের পর পূর্ব্বাপেক্ষা কম পারিশ্রমিক পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমিকদিগের নেতার নির্ব্বাসন, ভারতবর্ষ হইতে আগত রাজু-কমিশনের অবমাননা, সি, এস্, আর কোম্পানী ও গবর্ণমেন্টের নানা অকার্য্য প্রভৃতি কদর্য্য ব্যাপারের বর্ণনা আর কি করিব।

ভারতীয়দিগকে ফিজি হইতে আবার ভারতবর্ষে চালান দেওয়া এবং ফিজিকে শ্বেতকায়দিগের উপনিবেশরূপে পরিণত করা সম্পর্কে এখানে একটি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

ফিজিতে ভারতীয়গণ প্রায় গত ৪৭ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। এই ভারতীয়েরাই ফিজিকে বসবাসের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে এবং এই উপনিবেশের রাজস্বের অধিকাংশ ভাগ ভারতীয়দিগের নিকট হইতে আদায় হয়। ভারতীয়েরাই বেশী ট্যাক্স দেয় অথচ শাসন-ব্যাপারে তাহাদের কোন মতাধিকার নাই। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন ভারতীয় শ্রমিককেই যেন ভারত ত্যাগ করিয়া আর ফিজিতে আসিতে দেওয়া না হয়; কারণ সেখানে তাহাদের দুঃখের অবধি নাই।

গুজরাট নারী-শিক্ষা সম্মেলন—

গত মাসে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী আম্বালাল সরাভাইএর সভানেত্রীত্বে গুজরাট প্রাদেশিক নারী-শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩ শত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা এস্, তায়েবজী দর্শকমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার সময় নারী-জাতির শিক্ষা সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং মুসলমান নারীদিগের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নারীজাতির শিক্ষার অব্যবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুরুষদিগের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা নারীদিগের জন্য দাবী করেন। নারীদিগের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের উপর জোর দেন। নারী জাতির মধ্যে শরীর-চর্চ্চার প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতাও সভানেত্রী সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। সভায় কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং স্কুল-সমূহে বালিকাদিগের শরীরচর্চ্চা বাধ্যতামূলক করিবার অনুরোধ করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে নারীশিক্ষার প্রতি অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য এবং উক্ত প্রদেশে বাধ্যতামূলক নারীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

বরোদায় নারী-শিক্ষা—

নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজের আবশ্যকতা আছে কি না, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে-সমস্ত ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েটগণ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, নারীদিগকে শুধু নারীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিবেন।

ভারতীয়ের প্রাণের মূল্য—

মার্কিন ড্রিলার মিঃ উইগিন্স্ দুইজন ভারতীয়কে গুলী করিয়া খুন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। রেঙ্গুন হাইকোর্ট সেসনে ঐ মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামী উইগিন্স্ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব—

ভারতের সকল প্রদেশে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিবার জন্য আসাম কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়া অন্ধ্র প্রাদেশিক সম্মিলনীতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ১০১ এবং বিপক্ষে মাত্র ৬৩টি ভোট হয়। সীতানগর আশ্রমের ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম্ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন :—

"এই সম্মিলনী বিশ্বাস করেন যে, বহু আকারে আইন অমান্য করিবার জন্য দেশ প্রস্তুত। যেহেতু স্বরাজলাভ করিবার পক্ষে উহাই একমাত্র উপায় এবং উহা অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে, সেইহেতু আইন-অমান্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত এই সম্মিলনী আসাম কংগ্রেসকে অনুরোধ করিতেছেন।"

—

বাংলা

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিবার্ষিকী—

গত মাসে নারিকেলডাঙ্গা গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অষ্টম মৃত্যুস্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্গীয় গুরুদাসের নাম কেবল বাঙ্গলায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিনি সেকাল ও একালের সঙ্গমস্থলে হিমালয়ের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তাঁহার যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অন্যদিকে হিন্দুর সনাতন শিক্ষা ও সভ্যতাও তাঁহার মজ্জাগত ছিল। এই মহাপুরুষের চরিতকথা দেশবাসীকে স্মরণ রাখিতে বলি। তাহাতে জাতির কল্যাণ হইবে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

বিক্রমপুরের রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পুত্র মিঃ এ, সি, গুহ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় আমেরিকায় বহুদিন অবস্থানের পর দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি কার্য্যব্যপদেশে আমেরিকার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি খনি সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখ পোর্ট সৈয়দ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আগামী ১৯শে তারিখে কলম্বো পৌঁছিবেন। কবীন্দ্র বিশ্বভারতীর বার্ষিক উৎসবে খুব সম্ভব যোগদান করিতে পারিবেন না, ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ উৎসব হইবে। কবিকে উপযুক্তভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতায় বিপুল আয়োজন হইতেছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইয়াছেন :—

আপনার বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলীর কথা শ্রবণ করিবার আমি যে সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং আপনি আপনার গবেষণা-কার্য্যে যে বিরাট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনার প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগার—যাহা আপনার নাম ও খ্যাতির যোগ্য—এবং উহার কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আপনার নিঃস্বার্থ উদ্যম এবং আপনার গবেষণার সাফল্য একদিকে

যেমন আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, অন্যদিক আপনার সম্মানে সমস্ত ভারতবাসী সম্মানিত হইয়াছেন। আপনার কার্য্য অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকুক এবং আপনার শ্রমের স্থায়ী ফল আপনি লাভ করুন, আমি ইহাই কামনা করি।

জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন :--

জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদিগকে আমি জানাইতে চাহি যে, আমরা আচার্য্য জগদীশের অভূতপূর্ব্ব বক্তৃতা শুনিবার যে সুবিধা পাইয়াছি তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—জেনেভা আগমনের ফলে কলিকাতা এবং জেনেভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেন সহযোগিতা স্থাপিত হয়। তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

ত্রিশ বৎসর গবেষণার ফল তিনি দর্শকদিগের সমক্ষে যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দর্শকদের মনে বিশেষ সুফল ফলিয়াছে। আমরা তাঁহার গবেষণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমরা আশা করি যে, নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-রাজ্যে তাঁহার আবিষ্কারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন নিকটতর হইবে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—

অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগের পক্ষ হইতে আমেরিকা গমন করিয়াছেন। তিনি দার্শনিক কংগ্রেসে রহস্য বা সাক্ষাৎব্রহ্মকারবাদ (মিষ্টিসিজম্) ও বেদান্ত সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের মনের উপর প্রগাঢ় অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছিল। ১১টি জাতির পক্ষ হইতে প্রায় ৫০০ শত প্রতিনিধি সভায় যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে ম্যাসাচুসেট্‌সের গবর্ণর প্রতিনিধিবর্গের সম্মানার্থ এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করেন। ঐ উপলক্ষে ৬টি বিভিন্ন জাতির পক্ষ হইতে ৬টি বিশিষ্ট ও সম্মানিত প্রতিনিধিকে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আহ্বান করা হয়। ঐ বিশিষ্ট ৬জন প্রতিনিধির মধ্যে অধ্যাপক দাশগুপ্ত একজন ছিলেন। তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম ভারতের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য আহ্বান করা হয়।

বগুড়ায় শুদ্ধি-যজ্ঞ—

গত মাসে বগুড়ায় প্রায় ১০ সহস্র খৃষ্টিয়ান ও অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাদান করা হইয়াছে। স্থানীয় কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ দীক্ষা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূজা ও হোমের বন্দোবস্তও ছিল। যে ১০ হাজার লোক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অধিবাসী।

মেমারী ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও এ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি—

আমরা উক্ত সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। সমিতির উদ্যোগে এবার জ্ঞানচর্চ্চা, দরিদ্রকে অর্থ-সাহায্য, ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা সমিতির উন্নতি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন—

আমরা উক্ত আশ্রমের ঊনবিংশ বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। আশ্রমের উদ্যোগে আলোচ্য বর্ষে অনেক জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতি হাসপাতাল, সেবকদের বাসস্থান ও অতিথিশালা নির্ম্মাণকল্পে সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন। আমরা আশা করি, সেবাশ্রম সাধারণের সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

কোতুলপুর (বাঁকুড়া) হিতসাধন সমিতি—

কোতুলপুর হিতসাধন সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ পাইয়াছি। সমিতির সেবাকার্য্য প্রশংসা-যোগ্য।

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন—

নারী-নির্য্যাতনের লোমহর্ষণ কাহিনী আজকাল দৈনন্দিন পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা নারীরক্ষা-সমিতি এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত আবেদন-পত্র বাহির করিয়াছেন :—

দুর্ব্বৃত্তগণ দলবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে মাতৃজাতির উপর যে অত্যাচার করিতেছে তাহার মর্ম্মভেদী করুণ-কাহিনী নারীরক্ষা-সমিতি বহুদিন ধরিয়া দেশবাসীকে জানাইয়া আসিতেছেন এবং দেশবাসী দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে অবিরত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নির্য্যাতীতা নারীগণের করুণ-ক্রন্দনে বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইতেছে। নারীরক্ষা সমিতি তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট জানাইতেছেন।

১। ময়মনসিংহে দুর্ব্বৃত্তগণ রাত্র দ্বিপ্রহরে ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া নিদ্রিতাবস্থায় মুখে কাপড় বাঁধিয়া ২২।২৩ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-বিধবা অহল্যাকে হরণ করিয়া মাসাবধিকাল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া তাহার উপর লোমহর্ষণকারী অত্যাচার করে। এপর্য্যন্ত ৬০ জন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান অস্ত্র-শস্ত্র সমেত পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। অহল্যাকেও উদ্ধার করা হইয়াছে।

২। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কমলা দেবীকে অনৈক দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান বাড়ী হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া বালিকাকে হরণ করিয়াছে। ঘটনাটি নারীরক্ষা সমিতির চেষ্টায় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার পর পুলিশ কর্ত্তৃক সেই হত্যাকারী ধৃত হইয়া হাজতে আছে। বৃদ্ধের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কমলার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বৃদ্ধের বিধবা স্ত্রী কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।

উক্ত ২টি ঘটনা এখনও পুলিশের তদন্তাধীন।

৩। বেলেঘাটায় ১১।১৩ বৎসরের বিবাহিতা বালিকা শ্রীমতী আন্নাকালীকে দুর্ব্বৃত্তগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। সেই মোকর্দ্দমা এখন শিয়ালদহ আদালতে বিচারাধীন।

৪। চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বিবাহিতা বালিকা বীণাপাণিকে দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান কালীঘাট হইতে অপহরণ করিয়া ঢাকায় লইয়া গিয়া অমানুষিক অত্যাচার করে। সেই মোকর্দ্দমা আলিপুর আদালতে বিচারাধীন।

৫। হুগলী জেলার প্রাণপুরের বিবাহিতা নারীদ্বয় শ্রীমতী সুখী ও শ্রীমতী কুমকুমারীর উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয় সেই মোকর্দ্দমা চুঁচুড়া আদালতে বিচারাধীন।

৬। জয়নগরের ১৩।১৪ বৎসরের বিবাহিতা বালিকা সুশীলা রায়কে দুর্ব্বৃত্তগণ হরণ করিয়া বালেশ্বরে যাইয়া তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। সেই মোকর্দ্দমা আলিপুর সেসন আদালতে হইবে। সুশীলাকে নারীরক্ষা সমিতির কর্ম্মী বালেশ্বর হইতে উদ্ধার করেন।

৭। ফরিদপুরে ২০।২১ বৎসরের বিধবা বালিকা রাধারাণীকে তাহার শ্বশুর-বাড়ী হইতে ৬।৭ জন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান বলপূর্ব্বক রাত্রিকালে

অপহরণ করিয়া ঢাকায় লইয়া যায়। সেই মোকর্দ্দমা ফরিদপুরে সেসন আদালতে হইবে।

নারীরক্ষা-সমিতি উক্ত সমস্তকয়টি মোকর্দ্দমারই পরিচালনা-ব্যয় বহন করিতেছেন এবং ঘটনার প্রারম্ভ হইতেই সর্ব্বপ্রকার তদ্বির ও নির্য্যাতীতা নারীর উদ্ধারের জন্ত যত্নবান হইয়াছেন। প্রত্যেক নিগৃহীতা নারী সাদরে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বহু নারীনির্য্যাতন কাহিনী এখনও তদন্তাধীন রহিয়াছে। প্রায় সকল মোকর্দ্দমায় আসামীগণ অর্থ ও লোক বলে বলীয়ান। তাহারা অর্থ দ্বারা কোন কোন সাক্ষীকে বশীভূত করিয়া মোকর্দ্দমা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। এইসমস্ত মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সমিতির তহবিলে অর্থাভাব, এজন্ত সমিতি সর্ব্বসাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। আপনারা যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিয়া দুর্ব্বৃত্ত-দিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার সহায়তা করুন। যেমন রংপুরের কয়েকটি নারীনিগ্রহ মোকর্দ্দমায় দুর্ব্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি হওয়াতে সে-স্থানে নারীনিগ্রহ বহুপরিমাণে নিবারিত হইয়াছে। সেইরূপ এইসমস্ত মোকর্দ্দমায় আসামীগণের দণ্ডবিধান করিতে পারিলে আশা করি, ভবিষ্যতে অনবরত নারীহরণ ব্যাপার সংঘটিত হইবে না।

এইসমস্ত মোকর্দ্দমায় বহু অর্থের প্রয়োজন। ইহার বিস্তারিত বিববরণ সাময়িক পত্রিকাদিতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য নারীরক্ষা সমিতির প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট ৬নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা অথবা ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ১৪নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা এই দুই ঠিকানায় পাঠাইয়া দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করুন।

বাংলায় খাদি—

গত মাসে কলিকাতা খাদি প্রতিষ্ঠান গৃহে শুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। প্রদর্শনীতে বাংলার নানা স্থানের অনেক রকমের খাদি বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অভয়-আশ্রম যে কত জনপ্রিয় হইয়াছে তাহা প্রচুর পরিমাণে খদ্দর উৎপন্ন হওয়া এবং অনেক বিক্রয় হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আশ্রমে ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ১,১১,৭৭৯৲ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ৯৪,৬৪৩৲ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু অক্টোবর মাসে খাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় উভয়ই বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এমন কি গত মাসে ১৪,৯৩৮৷৶৹ আনার খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ব মাসের অপেক্ষা প্রায় ১,৯১৩৲ টাকা বেশী।

নিবেদিতা স্মৃতি-স্তম্ভ—

ভগ্নী নিবেদিতা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং সহরে দেহত্যাগ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংএ যখন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম স্থাপিত হয় তখন স্বামী অভেদানন্দ দার্জ্জিলিংএর শ্মশানে একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের সংকল্প করেন। সম্প্রতি শ্মশানে একটি নিবেদিতা স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই কার্য্য বহু অর্থসাপেক্ষ। আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। যাঁহারা এই কার্য্যে কিছু মাত্রও সাহায্য দান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বামী অভেদানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জ্জিলিং এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

বরিশাল জেলার পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ১০০তম দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। এ-যাবৎ ৪০০ শতর অধিক স্বেচ্ছাসেবক অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আমরা নিম্নে পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলাম।

বছরখানেক পূর্ব্বে সরস্বতী পূজা লইয়া পটুয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বার্ষিক পূজা করে, মুসলমানরা তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। কলিকাতার দাঙ্গার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। কলিকাতার দাঙ্গার পর নূতন মসজিদ প্রাঙ্গণে হিন্দুদের সমক্ষে দুইটি গরু জবাই করা হয়। ইহার পর বাবু সতীন্দ্রনাথ সেন উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে এবিষয়ে এবং নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে একটা মিটমাট করিয়া ফেলিতে অনুরোধ করেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদিগকে লইয়া একটি কমিটি হয়। কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকার মিটমাট করিতে সমর্থ হন না। ইতিমধ্যে জন্মাষ্টমী আসিয়া পড়ে, হিন্দুরা একটি মিছিল বাহির করে। মিছিলের উপর মুসলমানেরা ইষ্টক বর্ষণ করে। কয়েকজন দর্শক প্রত্যুত্তর দেয় এবং মুসলমানেরা মসজিদে আশ্রয় লয়। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদটি রাস্তা হইতে দূরে অবস্থিত, সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে, মসজিদ ও রাস্তার মাঝখানে এক সারি দোকান আছে। মুসলমানেরা যখন দেখিল যে, তাহাদের আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে, তখন তাহারা একখানি পুরাতন টিনের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয়। এই ঘরখানি পূর্ব্বে মসজিদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। মুসলমানেরা বায়না ধরে যে, এই ঘরের নিকট দিয়া কেহ বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না। ফলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন :—

পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ আজ সমগ্র হিন্দু সমাজকে আহ্বান করিতেছে। পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের জয়লাভের উপরেই বাংলাদেশে হিন্দুর নির্দ্ধারিত ধর্ম্মসংক্রান্ত শোভাযাত্রা কীর্ত্তনাদির অবাধ অধিকার নির্ভর করিতেছে।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

(১) গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতার আর্য্য-সমাজ গৃহে বৈদিক প্রথায় বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বি-এ,র সহিত বাল-বিধবা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর বিবাহক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর ও কনে উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং ইঁহাদের বাড়ী যথাক্রমে হুগলী জেলার বাঁশবাবা গ্রামে এবং ২৪ পরগণা জেলার ভেবিয়া গ্রামে। কলিকাতা বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির উদ্যোগে এই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ হাজার লোক উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

(২) গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার উদ্যোগে হুগলী জেলার বাবু মনোমোহন মুখার্জ্জীর কন্যা বালবিধবা শ্রীমতী উমা দেবীর সহিত কলিকাতার ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই কর্পোরেশনের হেড ক্লার্ক মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

মৃত্যুদূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্‌

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-বেদনা

সেই অনন্ত অন্ধকারে তাহারা যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। ডেভিড্‌ মূর্চ্ছাপন্নের মত স্থির হইয়া পড়িয়া জর্জ্জের ও আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। গাড়ীখানি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিতেই তাহার চমক ভাঙিল। একটি প্রশস্ত কক্ষে জর্জ্জ তাহাকে লইয়া গেল। সেই ঘরের জানালাগুলি প্রায় ছাদসংলগ্ন; প্রত্যেকটি অর্গলবদ্ধ। স্তিমিত-আলোকে শ্রীহীন দেওয়ালগুলি কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল; কোথায়ও কারুশিল্পের চিহ্ন মাত্র নাই। দেওয়ালের ধারে ধারে খাটিয়ার উপর সারি সারি শয্যা সজ্জিত, একটি ছাড়া সকলগুলিই শূন্য পড়িয়া আছে। তীব্র ঔষধের গন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। একটি শয্যায় আকণ্ঠ আবৃত কে একজন শয়ন করিয়া—সম্ভবতঃ কোনো রোগী; কারারক্ষীর পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি শয্যাপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ডেভিড্‌ বুঝিতে পারিল, সে কোনো কারাগারের হাঁসপাতাল-গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

রোগীর বয়স বেশী হইবে না, তাহার শীর্ণ ক্লান্ত মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই ডেভিড্‌ তাড়িতাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জর্জ্জের প্রতি তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল—সহসা তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। নিদারুণ ক্রোধে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল, ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত সে যেন এখনই জর্জ্জের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে! সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন, জর্জ্জ? ওই শয্যাশায়িত ব্যক্তির কোনো অনিষ্ট যদি তুমি কর তাহা হইলে আমাকেও চিরশত্রু করিবে। সাবধান, এখান হইতে ফিরিয়া চল।"

মৃত্যুদূত ডেভিডের এই উচ্ছ্বাসে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিল মাত্র। "ডেভিড, উহাকে দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না—কাহার নিকট আসিয়াছি—"

"বেশ এখন ফিরিয়া চল, নতুবা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুদূত ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। তাহার অনলবর্ষী দৃষ্টির তীব্রতায় ডেভিড্‌ সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া ক্ষান্ত হইল; অন্তরের ক্রোধ দারুণ ভয়ে রূপান্তরিত হইল।

জর্জ্জ বলিল, "স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার আমাদের নাই, ডেভিড্‌—নির্ব্বিবাদে হুকুম তামিল করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। শান্তভাবে সব দেখিয়া যাও, কিছু আদেশ করিও না।"

মস্তকের আবরণ টানিয়া জর্জ্জ স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিরুপায় ডেভিড্‌ হল্‌ম্‌ শুনিল, কারাগারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোগী কারারক্ষীর সহিত আলাপ করিতেছে। সে কান পাতিয়া রহিল।

"দেখ কোতোয়াল সাহেব, তোমার কি মনে হয় আমি আবার ভাল হ'ব?" তাহার কণ্ঠ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, কিন্তু অবসাদ বা ব্যথার চিহ্নমাত্র তাহাতে ছিল না।

কারারক্ষী একটু ইতস্ততঃ করিয়া দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই, হল্‌ম্‌, তুমি ভাল হ'বে বৈকি, মনে একটু জোর এনে এই জরটাকে ঝেড়ে ফেলে দাও—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"না, না, জরের কথা নয়, কোতোয়াল সাহেব, তোমার কি মনে হয় আমি জেলের বাইরে যেতে পারব? মানুষ খুনের দায়ে কয়েদ হ'লে কেউ কি কখনো ছাড়া পায়? ছাড়া পেলেও সমাজে ঠাঁই পায়?"

"পায় বৈকি, হল্‌ম্‌—তাছাড়া তুমিই ত বল বাইরে অন্ততঃ এক জায়গায়ও তোমার আশ্রয় মিলবে।"

বন্দীর মুখ এক অপূর্ব্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ডাক্তার আজ আমাকে দেখে কি বল্‌লেন ?"

"কিছু ভয় নেই, হল্‌ম্‌, আর কোনো বিপদ নাই। ডাক্তার শুধু বল্‌লেন, 'আহা বেচারাকে যদি জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় ও এখুনি সেরে উঠ্‌বে'।"

রোগী দুই বাহু মেলিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস লইতে লইতে বলিল, "ও! এই জেলের বাইরে।"

"দেখ, ডাক্তার আমার কাছে প্রায়ই যা বলে আমি তাই তোমাকে বল্‌ছি, তুমি যেন আবার গতবারের মত পালিয়ে জেলের বাইরে যেতে চেয়োনা—তাতে ক'রে তোমার কয়েদ আরো বাড়্‌বে বই ত না।"

"সে ভয় নেই, কোতোয়াল সাহেব, আমি এখন চালাক হ'য়েছি। আমি খালি ভাব্‌ছি, শেষ হ'য়ে যাক্‌ এই পর্ব্বটা, আবার নূতন ক'রে জীবন গ'ড়ে তুলি—আবার ভাল হই।"

অন্যমনস্ক কারারক্ষী গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, নতুন জীবন গড়্‌তে হ'বে।"

ডেভিড্‌ হল্‌ম্‌ ভ্রাতার এই ব্যাকুলতা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না; উদ্বেলিত বক্ষে ভ্রাতার মৃত্যু বেদনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। হায় রে, ফুলের মত শুভ্র ছিল যে সুন্দর সরল হাস্যলাস্যময় ওই কিশোর বালক—তাহার এ দুর্দ্দশা কে করিল; মৃত্যুমুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিল কে!—এই ভয়াবহ কারাগার!—ডেভিড আর সহিতে পারিল না।

রোগীর আজ যেন কথার বিরাম ছিল না। "দেখ, কোতোয়াল সাহেব, তুমি কি—"কারারক্ষীর মুখে একটু বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া সে কথা শেষ না করিয়াই বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা বলাটা কি বে-আইনী হ'চ্ছে!"

"না না, আজ রাত্রে তুমি যত খুসী বক্‌তে পার।" রোগী যেন ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "আজ রাত্রে!" 'হাঁ, আজকে যে নতুন বছরের পর্ব্ব-দিন।"

ডেভিড্‌ ভাবিল, রোগীর জীবনের আজ অবসান হইবে ভাবিয়াই নিশ্চয়ই কারারক্ষী আজ উহার প্রতি এত করুণা প্রকাশ করিতেছে। নিরুপায় ডেভিড্‌ অসহ্য ব্যথায় পীড়িত হইতে লাগিল।

"আচ্ছা সাহেব, তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে যে, গত-বার পালানোর পর ফিরে যখন এলুম তখন আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। তখন থেকেই আমাকে নিয়ে তোমাদের আর-একটুও কষ্ট পেতে হয়নি।"

"হাঁ, তা দেখেছি বটে, তুমি তখন থেকে কচি ছেলের মতই শান্ত ভাবে আছ; একটু বিরক্তির কারণ কোনো-দিন ঘটেনি। কিন্তু আবার যেন পালাবার চেষ্টা কোরো না!"

"আচ্ছা তোমরা কি কখনো ভেবেছ এমন পরিবর্ত্তন আমার হ'ল কেমন ক'রে? তোমরা হয়ত মনে করেছিলে যে, পালিয়ে গিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমার শরীর খুবই খারাপ হ'য়েছিল—তাই—"

"হাঁ হাঁ, আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে।"

"ভুল বুঝেছিলে কোতোয়াল সাহেব। কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি কখনো ভরসা ক'রে সে-কথা তোমাদের বলিনি, আজ সব বল্‌ব; তোমায় শুন্‌তে হবে।"

"কিন্তু, তুমি যে আজ বড্ড বেশী কথা বল্‌ছ, হল্‌ম্‌, তোমার শরীর খারাপ হ'বে যে।" এই কথায় রোগীর মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া কারারক্ষী একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, "তোমার কথা শুন্‌তে আমি একটুও বিরক্ত হচ্ছি না—আমি তোমার শরীরের জন্যেই বল্‌ছি।"

রোগী একথা কানে না তুলিয়াই বলিল, "আচ্ছা, আমি যে নিজের ইচ্ছায় ফিরে এলুম এতে কি তোমরা অবাক্‌ হওনি? আমার খোঁজ পাবার সাধ্যি তোমাদের কারো ছিল না, তবু আমি একদিন সর্দ্দার কনষ্টেবলের ঘরে গিয়ে নিজেই ধরা দিলুম। আমার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জান কি?"

"আমি ভেবেছিলুম যে, জেলের বাইরে তোমার দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না বোধ হয়—"

"তা কতকটা বটে, প্রথম ক'দিন খুবই কষ্ট পেয়ে-ছিলাম, কিন্তু আমি ঝাড়া তিন সপ্তাহ পালিয়ে ছিলুম।

তিন সপ্তাহ ধ'রে আমি বনে জঙ্গলে শীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াইনি নিশ্চয়।"

"আমার মনে হচ্ছে, হল্‌ম্‌, তুমি নিজেই যেন এই ওজুহাত দেখিয়েছিলে।"

রোগী ভারী কৌতুক অনুভব করিল। "মাঝে মাঝে কর্ত্তাদের অমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয় বৈকি, নইলে আমার বিপদের সময় যারা সাহায্য ক'রেছিল তা'দিকে নিয়ে টানাটানি প'ড়ে যাবে যে। তুমিই বল, যারা আমার জন্ম অত কর্‌লে—তাদের বিপদে ফেলা কি উচিত?"

"এর উত্তর ত আমি দিতে পারি না, হল্‌ম্‌।"

রোগী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায় রে, আমি সেরে উঠে এই জেল থেকে যদি একবার ছাড়া পাই আমার সেই বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে একবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলি,—বনের ধারে তাদের ঘর, চমৎকার লোক তারা।"

রোগী হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া ব্যাকুলভাবে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কারারক্ষী এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল, দেরাজ হইতে একটা ঔষধের শিশি তুলিয়া তাহা খালি দেখিয়া আরো খানিকটা ঔষধ আনিবার জন্ম সে উঠিয়া গেল।

কারারক্ষী কক্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুদূত তাহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া মুখাবরণ উন্মোচন করিল। ডেভিড হল্‌ম্‌ তাহার প্রিয়তম ভ্রাতার সন্নিকটে জর্জকে বসিতে দেখিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু রোগীর এদিকে নজর ছিল না। প্রবল জ্বরের ঘোরে সে পড়িয়াছিল, কিছু লক্ষ্য করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিল, কারারক্ষীই বুঝি তাহার নিকটে বসিয়া আছে।

"বনের ধারে ছোট্ট একটি কুঁড়ে", প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে রোগী হাঁপাইতে লাগিল।

মৃত্যুযানের চালক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কথা বল্‌তে তোমার বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে; তোমায় আর কথা বল্‌তে দেব না। তুমি যা বল্‌তে চাচ্ছ কর্ত্তারা তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানেন; তবে তোমাকে কিছু বল্‌তে দেবনি বটে।"

গভীর বিস্ময়ে রোগীর দৃষ্টি আয়ত হইল। জর্জ বলিতে লাগিল, "তুমি অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে চাইছ, হল্‌ম্‌, আচ্ছা, তবে শোনো। তুমি কি ভাব্‌ছ বনের ধারের সবশেষ কুঁড়েখানায় একদিন একটা ছোক্‌রা লুকিয়ে ঢুকে কি করেছিল—এ খবর আমরা পাইনি! সে ভেবেছিল, ভেতরে কেউ নেই, তাই না? পাশের জঙ্গলেই সে সমস্ত দিন লুকিয়েছিল, যখন দেখ্‌লে ঘরের কর্ত্রী দুধ আন্‌তে বাইরে বেরিয়ে গেল ছোক্‌রা চুপি চুপি কুঁড়েয় ঢুক্‌ল। সে ভেবেছিল বাড়ীর কর্ত্তা নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়েছে আর ছেলে-পিলের গলা যখন শোনা যায়নি—তখন বাড়ীতে সে বালাই নেই।

রোগী এতদূর বিস্মিত হইল যে, সে শয্যায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি এত খবর কি ক'রে জান্‌লে, কোতোয়াল সাহেব?"

মৃত্যুদূত খুসী হইয়া বলিল, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক, হল্‌ম্‌, তোমার বন্ধুদের জন্যে কিছু ভয় নেই, জেলের পেয়াদারাই মানুষ! আচ্ছা, আমি আরো যা জানি বলি শোনো, ছেলেটি ঘরে ঢুকেই ভয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। কুঁড়ে খালি নয়, একটা কচি ছেলে ব্যারামে প'ড়ে একটা মস্ত বিছানায় শুয়ে তার দিকে মিটমিট ক'রে চেয়ে দেখ্‌ছিল। আগন্তুক আস্তে-আস্তে পা টিপে টিপে বিছানার ধারে যেতেই রোগী চোখ বুজে মড়ার মত প'ড়ে রইল। আগন্তুক জিজ্ঞেস্ কর্‌লে,'ঠিক দুপুর-বেলা তুমি শুয়ে আছ কেন, খোকা? তোমার অসুখ করেছে?' কোনো উত্তর নাই। ছেলেটি আবার বল্‌লে, "দেখ খোকা, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ, লক্ষী ছেলেটির মত চট ক'রে আমায় ব'লে দাও ত কোথায় একটু খাবার পাব—তা হ'লেই আমি চ'লে যাব।" কিন্তু রোগী তবুও চুপচাপ। আগন্তুক একটা কাঠি দিয়ে তার নাকে সুড়সুড়ি দিতেই সে হাঁচি সুরু কর্‌লে আর হেসে ফেল্‌লে। খানিকটা সে আগন্তুকের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল, তারপর আবার হাসি। বল্‌লে, "আমি মড়ার মত প'ড়ে থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেব ভেবে-ছিলুম।" "তা ত দেখ্‌লাম, কিন্তু তার কি দরকার ছিল খোকা!" খোকা বল্‌লে, "আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল,

দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমার কোমরে ভয়ানক ব্যথা, উঠ্‌তে পারি না।"

"রোগী তার এই সঙ্গীকে পেয়ে খুসীই হ'ল।"

মৃত্যুদূত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এ গল্প তুমি আর শুন্‌তে চাও না কি বল!"

হল্‌ম্‌ বলিল, "না না, বেশ লাগ্‌ছে শুন্‌তে, তুমি বল। কিন্তু আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না—"

"এটা তেমন অদ্ভুত নয়, হল্‌ম্‌। জর্জ্জ ব'লে একজন ভবঘুরের নাম শুনেছ ত? একবার ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সে এই গল্পটা শুনেছিল—সেই হয় ত জেলখানার কারো কাছে গল্প ক'রে থাক্‌বে—।

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই নীরব। একটু পরে রোগী ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা তারপর তাদের কি হ'ল?"

"আগন্তুক ছোক্‌রা আবার খাবার কোথায় জিজ্ঞেস কর্‌লে,ভিখারিরা তোমাদের বাড়ী এসে মাঝে-মাঝে খেতে চায়—কি বল, খোকা?" খোকা বল্‌লে, "হ্যাঁ, চায় বৈকি।" 'তোমার মা নিশ্চয়ই তাদের খেতে দেন—কেমন কিনা?' 'বাড়ীতে খাবার থাক্‌লে নিশ্চয়ই দেন।'

'আমি তাইত বল্‌ছি খোকা, আমিও একজন গরীব ছেলে, কিছু খাবার চাইছি। কোথায় আছে বল, যতটুকু দর্‌কার তার বেশী নেব না।' খোকা মুরুব্বিয়ানাচালে আগন্তুকের দিকে চেয়ে বল্‌লে,"দেখ একজন কয়েদী নাকি জেল থেকে পালিয়ে এই বনে লুকিয়ে আছে, মা তাই সমস্ত খাবার-টাবার চোর-কুঠরীতে চাবী দিয়ে রেখেছে। চাবিটা কোথায় আছে আমায় বল না, খোকা...নইলে আলমারী ভেঙে আমাকে খাবার নিতে হ'বে।" একটু কৌতূহলের সঙ্গে হেসে খোকা ব'লে উঠ্‌ল,"সে বড় সহজ হ'বে না...আলমারীর তালা ভারী শক্ত।"

আগন্তুক চাবীর খোঁজে কুঁড়েটা তোলপাড় ক'রে দিলে, কিন্তু চাবী পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে রোগী বিছানায় উঠে ব'সে জান্‌লা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে বল্‌লে, 'একদল লোক কিন্তু এদিকে আস্‌ছে মায়ের সঙ্গে।' পলাতক বন্দী এক লাফে দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। খোকা বল্‌লে, 'বাইরে গেলেই ধরা পড়্‌বে, বন্ধু, তার চাইতে চোর-কুঠরীতে লুকিয়ে ব'সে থাক।" "খোকা, চোর-কুঠরীর চাবি ত পাইনি।" 'এই নাও' ব'লে বালিশের নীচে থেকে সে চাবি বের ক'রে দিলে।

পলাতক আসামী চাবি নিয়ে চোর-কুঠরীর দিকে দৌড়ে গেল, খোকা বল্‌লে, তালা খুলে চাবিটা ফেলে দাও আমার কাছে, তুমি ভেতর থেকে দরজা এঁটে ব'সে থাক। আগন্তুক নিমিষের মধ্যে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। রোগীর বুক তখন ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কর্‌ছিল, পাছে, আসামী লুকোবার আগেই লোকগুলো এসে পড়ে। বাইরের দরজা খুলে গেল, একদল লোক ভেতরে ঢুক্‌ল, তার মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'এখানে কি কেউ এসেছিল একটু আগে?' খোকা বল্‌লে, "হ্যাঁ মা, তুমি যাওয়ার পরেই একজন এসেছিল বটে।" মা ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লেন—"সর্ব্বনাশ, তার পর?"

চোর কুঠরীর ভিতর ব'সে আগন্তুকের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল, আচ্ছা পাজী ছোক্‌রা ত। তাকে এম্‌নি ক'রে জাঁতিকলে ফেলে ধরিয়ে দেওয়া। সে ভাব্‌লে একবার চোর-কুঠরী থেকে ছুটে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌বে। এখনই কে একজন জিজ্ঞেস কর্‌লে,"সে গেল কোন্‌দিকে?" খোকা জবাব দিলে, "বাইরে তোমাদের সব আস্‌তে দেখে সে কোন দিকে দিয়ে যেন পালিয়ে গেল।"

মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "সে কিছু নিয়ে যায়-নি ত?""না, মা, আমার কাছে খাবার চাইলে—তা আমি খাবার দেব কোত্থেকে?" "তোমাকে মারধোর কিছু করে-নি ত?" "না মা আমার নাকে সুড়সুড়ি দিয়েছিল বটে—আমি হেসে উঠেছিলাম।" তাই নাকি? মাও হাস্‌তে লাগ্‌লেন, তার ভয় দূর হ'ল।

কে একজন গম্ভীর গলায় ব'লে উঠ্‌ল, "হাঁ ক'রে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাক্‌লে ত চল্‌বে না, লোকটা যখন এখানে নেই তখন অন্যত্র খুঁজ্‌তে হ'বে।" সবাই বাইরে চ'লে গেল, বাইরে থেকে কে আবার জিজ্ঞেস কর্‌লে, "লিসা, তুমি কি বাড়ীতেই থাক্‌বেই?" মা বল্‌লেন, "হ্যাঁ বার্ণার্ড্‌কে ছেড়ে আজ আর বের হ'ব না।"

পলাতক বাইরের দরজা বন্ধ হ'বার শব্দে বুঝ্‌তে পার্‌লে, মা আর ছেলে এখন শুধু ঘরে আছে। সে তখন

কি করবে ভাবছে এমন সময় চোর-কুঠরীর ধারে পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। ছেলেটির মা আস্তে আস্তে বললেন, 'ভেতরে কে আছ বেরিয়ে এস, আর কোনো ভয় নেই।' আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসে একটু থতমত খেয়ে বললে 'খোকাই আমাকে এখানে লুকুতে বলেছিল—'।"

সমস্ত ব্যাপারটা খোকার কাছে ভারী মজার ব'লে মনে হচ্ছিল। সে খুসী হ'য়ে হাততালি দিয়ে উঠল। মা বললেন, 'চুপটি ক'রে শুয়ে থেকে থেকে ওর মাথায় মাঝে মাঝে এমন দুষ্টু বুদ্ধি খেলে—এর পরে ওকে সামলানো মুস্কিল হবে।' পলাতক বুঝলে যে আর তাকে পুলিশে দেওয়া হবে না। সে আশ্বস্ত হ'য়ে বললে—'ঠিক, ও ভারী চালাক, চাবিটা কিছুতেই ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারিনি। ওই বয়সের এমন চালাক ছেলে আমি আর দেখিনি।' মা বুঝলেন এই খোসামুদীর অর্থ কি—তবু তিনি খুসী হলেন। অতিথিকে তিনি বিশেষ যত্ন ক'রে খাবার দিলেন। খোকা তার কাছ থেকে তার জেল-পালানোর গল্প শুনতে চাইলে। পলাতক আসামী আগা-গোড়া ঠিক ঠিক যা হয়েছিল ব'লে গেল। গল্প শেষ হ'তেই সে উঠতে চাইলে, বার্ণার্ডের মা বললেন, 'আজ রাত্রে বাইরে যেয়ে কাজ নেই, এখানে থেকে তুমি বার্ণাডের সঙ্গে গল্প কর, তোমার খোঁজে আজ এত লোক বেরিয়েছে যে তুমি বাইরে গেলেই ধরা পড়বে।'

"আগন্তুকের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল, সে শান্ত ভাবে বার্ণার্ডকে নানা গল্প বলতে লাগল।" (ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ

শ্রী সজনীকান্ত দাস

ভারত স্বদেশ মম, জননী আমার দীন-হীনা—
অতীত গৌরব তব ক্ষুব্ধ চিত্তে উঠে ঝলকিয়া;
কীর্ত্তি গাহিয়াছে ব্যাস, বাল্মীকির চিত্তহর বীণা—
যশের মুকুট-জ্যোতি ছিল তব ললাট ঘেরিয়া!
তব স্থান ছিল, দেবী, পুষ্পস্নাত দেবমঞ্চ 'পরে,
নিবেদিত পূজা-অর্ঘ্য মৃত্যু-জয়ী সন্তান তোমার;—
আজ কোথা সে মহিমা, সেই জ্যোতি তোমার অম্বরে,
কোথা তব সন্তানের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি-অর্ঘ্যভার!
মুক্ত নীলাম্বর মাঝে ছিল যার অবাধ প্রগতি,
ছিন্নপক্ষ সেই আজি লুটায় ধরণী-ধূলি-মাঝে!
স্বাধীন আত্মার মন্ত্রে ভারতীর যেথায় আরতি,
গীত গাহিবারে গিয়ে কবি সেথা স্তব্ধ হয় লাজে।
নাহি আর যশ-পুষ্প রচিবারে মোহন মালিকা,
শুষ্ক পদাহত তারা ধূলিতলে কোথায় বিলীন—
অতীতের কীর্ত্তি আজ মরু-মাঝে মোহ-মরীচিকা—
শ্মশান-আগারে এ যে উৎসবের স্মৃতি অতি ক্ষীণ।
আছে শুধু মৃত্যু-শেষে ব্যথাপূত আত্মার বিলাপ,
পারি শুধু গাঁথিবারে বেদনায় ছিন্ন মালাখানি—
সর্ব্বধ্বংসী সময়ের নিদারুণ ক্রূর অভিশাপ,
কেমনে হানিল মৃত্যু, হে স্বদেশ, আমি তাহা জানি!
অবিশ্বাস পরস্পর, অতি হীন আত্ম-প্রবঞ্চনা—
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার স্রোতোহীন ঘোর পঙ্কিলতা,
জাতি-ভেদ মৃত্যুবাণ, ব্রাহ্মণের স্বার্থ-আরাধনা—
লোকাচার-মূক কত বিধবার বেদনা-বারতা!
মৃত্যুময় সুধামৃত একদিন যে করিল পান,
পথ-পরিত্যক্ত অন্ধে আজি তার অক্ষম বিলাপ
দিকে দিকে দেশে দেশে যে করিল জ্ঞান-অভিযান
কূপ-মণ্ডূকের মত বদ্ধ সে যে,—একি পরিহাস!
বিশ্বজয়ী মহাধর্ম্ম জন্ম নিল বক্ষেতে তোমার—
সত্য ছিল, বিত্ত ছিল, ছিল শিল্প, ছিল উচ্চ প্রাণ—
নাচ প্রতারণা আর উঞ্ছবৃত্ত মাত্র আজ সার,
জ্ঞান-কর্ম্মহারা হ'য়ে নিত্য খুঁজি আত্ম-অকল্যাণ!
অনন্ত কলহ, মিথ্যা হানাহানি শ্বাপদের মত
নষ্ট-মৃত ধর্ম্ম লয়ে উচ্চ কণ্ঠে শূন্য আস্ফালন—
নাহি লজ্জা, নাহি ঘৃণা, নাহি জ্ঞান-সাধনায় ব্রত,
পঙ্কে যার স্থিতি তার মুখে ব্যর্থ শুচির বচন।

বিদেশীর পদানত ত্রিশ কোটি সন্তান তোমার—
দেহে শুধু নহে বদ্ধ, আত্মা তারা করেছে বিক্রয়—
তোমারে চেনে না, করে তব নামে ক্রন্দন-হুঙ্কার—
রাষ্ট্রবঙ্গমঞ্চে করে 'মাতৃভক্তি' ব্যঙ্গ অভিনয়!
স্বার্থ চিনিয়াছে তারা, হে জননী, চেনে না তোমারে—
মা'র নামে করে ত্যাগ সেও শুধু মিথ্যা আত্মরতি—
স্তাবকের করতালি, যশখ্যাতি চাহে কারাগারে,
দিকে দিকে প্রচারিছে এই শ্রেষ্ঠ মাতার আরতি!
অন্ধভ্রান্তি মিথ্যামোহে, হে ভারত, রবে কতকাল,
জ্ঞান-গর্ব্বে আর কভু তুলিবে না অবনত শির,
পুঞ্জীভূত রবে কিগো চিরদিন এধূলি-জঞ্জাল,
টুটিবে না কভু এই অন্ধ তম-কারার প্রাচীর?

* * * *

থাক্ শূন্য বর্ত্তমান! অবগাহি' অতীত গহ্বরে
মন্থিয়া যুগান্ত-গত মুঠি মুঠি আহরি' রতন,
চেয়ে থাকি বাক্যহীন ভীতস্তব্ধ বিস্মিত অন্তরে—
কি উজ্জ্বল দীপ্ত বিভা, ভাণ্ডারে কি রত্ন অগণন!
বিস্মিত ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত ঋক্-মন্ত্র-রাজি,
শিশু মানবের যেন প্রথম সে ভাষার প্রকাশ,
আরণ্য ও ব্রাহ্মণের শ্লোক-পুষ্পে ভরি' শূন্য সাজি
রচিল মহান্ ঋষি মানবের সত্য ইতিহাস।
পুণ্য-শ্লোক বাল্মীকির বিশ্বজয়ী রামায়ণ-গান,
কবি ব্যাস বিরচিল কুরুপাণ্ডু-মহাযুদ্ধ-গীতি,
পুরাণ ও তন্ত্রে কত কবি রচে তব উপাখ্যান,
ধীরে কাটে অন্ধকার জ্ঞানালোকে দূরে যায় ভীতি।
প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধীরে অস্ত গেল গর্ব্বোন্নত-শির—
বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রকাশ ধীর স্থির মহিমা অটল,
বুদ্ধের শ্রমণদল লঙ্ঘি' তুঙ্গ পর্ব্বত-প্রাচীর,
দুস্তর তরঙ্গ ভেদি' চলে মাত্র ধর্ম্ম ক'র' বল।
মহান্ত পুরুষ বুদ্ধ শান্তি-ধর্ম্ম করিল প্রচার
ধর্ম্ম-সূত্রে বেঁধে গেল ভিন্নধর্ম্মী ভিন্ন-ভাষী দেশ,
হিংসা মৃত্যু পরাভূত, মৈত্রী প্রেম-ধর্ম্ম সারাৎসার,
প্রচারিত এই সত্য, নির্ব্বাপিল জাতির বিদ্বেষ!

জ্ঞানে শিল্পে, হে জননী, বিশ্বমাঝে হ'লে দীপ্তিময়ী—
ভীষণ শ্মশান-বক্ষে বহাইলে পূত শান্তি-ধারা—
চণ্ডাশোক শান্তি-মন্ত্র অবনত শিরে তাঁর বহি'
আসমুদ্র-ক্ষিতি-পতি হ'ল ভিক্ষু রিক্ত, সর্ব্বহারা!
তরবারি দূরে ফেলি' ভিক্ষাপাত্র মাত্র লয়ে হাতে
মানবে মানবে প্রেম এই রাজনীতি করি' সার—
উচ্চ-নীচ-ভেদ-দ্বন্দ্ব দূর করি' আঘাতে স ঘাতে—
দেশে দেশে প্রচারিল মৈত্রীধর্ম্ম-মহিমা অপার!

* * * *

তার পর ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘিরিল তোমায়;
আচার বিচার আর হানাহানি কলুষ-বিদ্বেষ—
বেড়ে উঠি' প্রতিদিন তোমার বিরাট্-বক্ষ ছায়—
হিংস্র শ্বাপদের ভূমি হ'লে তুমি, হে মোর স্বদেশ!
শৌর্য্য গেল, ধর্ম্ম গেল, জ্ঞান, শিল্প লুপ্ত হ'ল ধীরে,
ধ্বংস হ'ল অতীতের যশকীর্ত্তি, স্বাধীনতা-ধন—
রাজ-সিংহাসন পাতি' ধূলিলিপ্ত অবনত শিরে
বিদেশী করিল সুরু, হে জননী তোমার লাঞ্ছন।
আজো তার শেষ নাই, আজো রক্ত শোষে প্রতিদিন,
শ্মশান-আগারে তব দলে দলে শকুনিরা আসে—
অতীতের ইতিবৃত্ত ধূলিমাঝে হইল বিলীন—
হীন বর্ত্তমান হেরি' বিদেশীরা নিত্য উপহাসে!
হে জননী, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার সংশয়-তিমির!
ক্লেদপঙ্ক এমনি কি নিত্যকাল তোরে ঘিরি' রবে?
কে টুটিবে মা তোমার চারিদিকে কারার প্রাচীর—
দুর্ভাগা সন্তান তোর চিরমৃত্যু লভিল কি তবে!
সুদূর ভবিষ্য-লোকে অন্ধকারে নয়ন প্রসারি'—
হেরেছ কি অতিক্ষীণ কম্পমান্ আলোকের রেখা—
নিবিড় কুয়াশা মাঝে সমুদ্রে দিয়েছি যেন পাড়ি—
নাহি দেখি পারাপার, ধ্রুবতারা নাহি যায় দেখা।
আঁধার ছেদিতে হবে যেতে হবে স্বাধীনতা-কূলে—
তোমার মহিমাজ্যোতি পুন হবে করিতে উজ্জ্বল—
মূঢ় আশঙ্কায় মাগো ভ্রান্ত চিত্ত উঠে দুলে দুলে—
তুমি জ্বালো জ্ঞান-শিখা, অক্ষম বাহুতে আনো বল!

বিলাতে ধর্ম্মঘট

বিলাতে ধর্ম্মঘট-সংক্রান্ত গোলমালটা আরম্ভ হয় কয়লার খনির শ্রমিক ও খনির মালিক বণিকদের মধ্যে। কিন্তু গোলমালটা মাঝে ঘনীভূত হইয়া দেশের অন্যান্য সকল শ্রমিকদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। খনির শ্রমিকদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য মে মাসের গোড়ায় ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন। এই ধর্ম্মঘট মাত্র ৯ দিন টিকিয়া থাকিয়া ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট হার মানিতে বাধ্য হয় ও ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রমিকগণ আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিলে জাতির সকল কার্য্য অচল হইয়া পড়িবে এবং তৎসঙ্গে গভর্ণমেণ্ট, শ্রমিকদের দাবী-অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এ আশা সফল হইল না। ইংলণ্ডের সকল লোক মিলিয়া গভর্ণমেণ্টকে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে এতদূর সাহায্য করেন যে, জাতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য ও জীবনযাত্রা শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীতও ৯দিন বেশ চলিয়া যায়। ট্রেনের
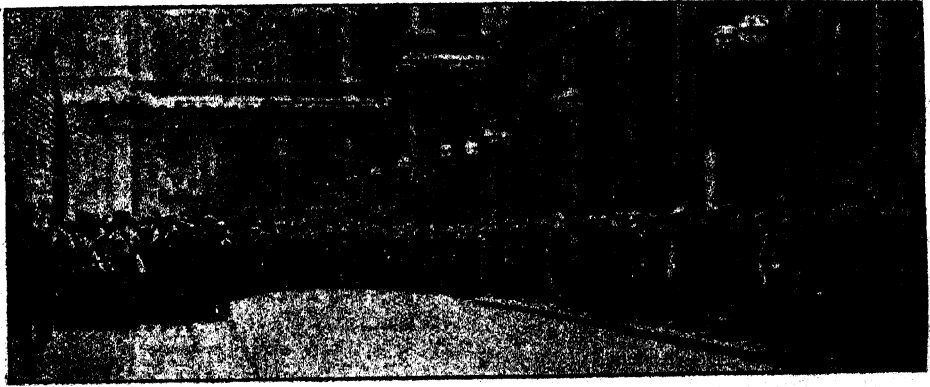
ধর্ম্মঘট-ভঙ্গকারীদল; সহরবাসীরা দলে দলে ধর্ম্মঘট ভাঙিতে আসিয়াছেন।

বিলাতের ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্র—মোটরলরী, বাস প্রভৃতি

গার্ড, ড্রাইভার প্রভৃতির কার্য্য স্বেচ্ছাসেবক ইউনিভারসিটির ছাত্রগণের দ্বারা সাধিত হয় এবং জনসাধারণ নানাপ্রকার অসুবিধা হাসিমুখে সহ্য করেন।

এমেচার ইঞ্জিনিয়ার

ধর্ম্মঘটকারিগণ অনেকস্থলে অল্পস্বল্প মারামারিও করিয়াছিলেন। দুই একখানি "বাস" উল্টান, কি দুই একজন ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধাচারী শ্রমিককে প্রহার করা ইত্যাদি ঘটনাও ঐ সময়ে ঘটে। কিন্তু দলে দলে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের লোকে সেচ্ছাসেবকরূপে শ্রমিকের কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় কোন উপায়েই ধর্ম্মঘটকারিগণ নিজেদের কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিতে পারিলেন না।

ধর্ম্মঘটকারিগণ একজন বিশ্বাসঘাতককে তাড়া করিতেছে

বর্ত্তমানে খনির শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন বটে এবং তাহার ফলে ইংলণ্ডের অনেক ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু সমগ্র দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের ভয় দেখাইয়া ভবিষ্যতে শ্রমিকগণ যে কখনও কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন এমন আশা আর নাই।

—

হস্তী-হুডিনী—

বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ মার্টিন জনসন্ তাঁহার আফ্রিকা-ভ্রমণের সময় এক অদ্ভুত যাদুকর হাতী দেখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার দিনপঞ্জীতে
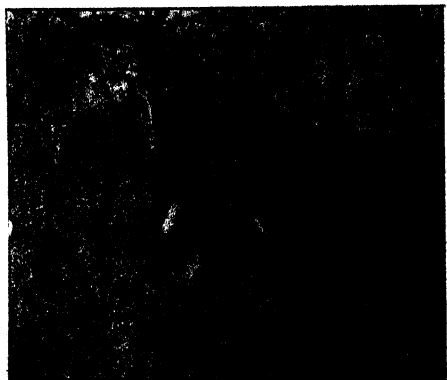
ধর্ম্মঘটের সময়ে যথারীতি কাজকর্ম্ম চলিতেছে

নিশ্চিন্ত 'হুডিনী'

এক কৌতুককর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি এই হাতীর নাম দিয়াছেন হুডিনী। অর্থাৎ, যাদুকর হুডিনী যেমন নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইতে পারে, লৌহ-শৃঙ্খল অবলীলাক্রমে খুলিয়া ফেলে এ হাতিটিও তেমনি দেখিতে দেখিতে এমনভাবে অন্তর্দ্ধান করে যে জনসন্ সাহেব প্রথমটা ভাবিয়াছিলেন বুঝি এও যাদুবিদ্যা জানে। আসলে এই বিপুলকায় হাতিটির দৌড়াইবার ক্ষমতা অসাধারণ। চক্ষের নিমিষে সে জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন করে যে, বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। জনসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, "এই দেখিলাম হাতিটি মহানন্দে আহার করিতেছে, গুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, নিমিষের মধ্যে কেমন করিয়া জানিনা সে

হুডিনীর ফোঁস

কোথায় মিলাইয়া গেল—ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া আমার ভয় হইল।" তিনি হুডিনীর আলোকচিত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন। এখানে হুডিনীর দুটি ছবি দেওয়া হইল। প্রথমটিতে সে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়া বেড়াইতেছে। দ্বিতীয় ছবিটি নেওয়ার সময় সে মানুষের গন্ধ পাইয়া ফোঁস করিয়া উঠিয়াছে, শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে, কান দুটি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে —তারপর এক নিমিষের মধ্যে হুডিনী একেবারে অন্তর্দ্ধান।

—

লুপ্ত রত্নোদ্ধার—

কোনো কোনো বিজাতীয় সংবাদপত্র সিগনর মুসোলিনীকে মডার্ণ কালাপাহাড় আখ্যা দিয়াছে; তিনি নাকি প্রয়োজন হইলে সাহিত্য ও কারুশিল্পের নিদর্শনগুলিকে ধ্বংস করিতে পিছ পা নহেন। কিন্তু তিনি সম্প্রতি গ্যালিলিওর বাসভূমি সুবিখ্যাত পিসানগরে ইতালীর যে লুপ্ত কারুশিল্পের উদ্ধার সাধন করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার এই অখ্যাতি যে মিথ্যা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। পিসা ক্যাথিড্রালের ভিতকারি পিসানোর বেদীমঞ্চ বহুকাল পরিত্যক্ত থাকার পর ধ্বংস স্তূপ হইতে আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়া অতীত যুগের এক অপূর্ব কারুশিল্পের নমুনা-স্বরূপ আজ লোকসমাজে [illegible]। একজন রূপদক্ষ এই বেদীমঞ্চ দেখিয়া বলিয়াছেন, এই অপূর্ব শিল্পের তুলনায় প্রাচীন ইতালীর অনেক কারুশিল্পই ম্লান হইয়াছে। এই নূতন আবিষ্কারে পিসার তীর্থমাহাত্ম্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মুসোলিনীর শক্তিকে ধন্যবাদ।

পিসা ক্যাথিড্রালের বেদীমঞ্চ

মঞ্চের অপর একটি দৃশ্য

এই বেদীমঞ্চের কথা গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া লোকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐতিহাসিক অধ্যাপক
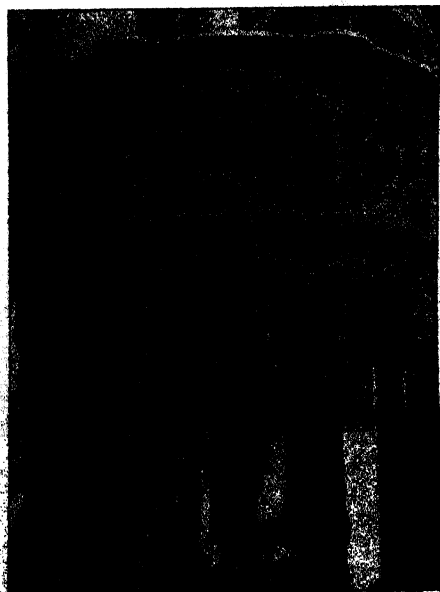
কনতানা এই ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া এই মঞ্চের একটি কাঠের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করেন, সেটি সম্প্রতি পিসার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তারপর নানা গোলমাল ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য আবিষ্কার কার্য্য চলে নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পর পিসা যাদুঘরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পিলিও বাচ্চির চেষ্টায় এই আবিষ্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, এই মঞ্চের গাত্রে যীশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলী খোদিত আছে এবং মধ্যস্থলে বিশ্বাস, আশা ও করুণা এই ত্রিমূর্ত্তি। এই মঞ্চ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। মঞ্চটি টুকরা টুকরা অবস্থায় ছিল। বহু পরিশ্রমের পর ইহার পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছে।

—

ভাগ্যবান চীনা রাজা—

পাশ্চাত্য অর্থলোলুপ ও শোণিত-লোলুপ জাতিদের হাতে দুর্ভাগা চীনের কি লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। কিন্তু চীনের সৌভাগ্য য এখনো সর্ব্বত্র এই শ্বেত অভিযান পৌঁছায় নাই। পশ্চিম চীনের অনেক স্থানেই এখনো শ্বেত বণিকের চরণ-ধূলিতে কলঙ্কিত হয় নাই। মুলীরাজ্য সেইরূপ একটি সৌভাগ্যশালী দেশ। যোশেফ এফ রক নামক একজন আমেরিকান সর্ব্বপ্রথমে কলম্বাসরূপে এই দেশে পদার্পণ করিয়াছেন ও তত্রত্য রাজার ফটো লইয়াছেন। এই ফটোখানি মুলীদেশের রাজার ফটো। পশ্চাতে ইঁহারই উপাসক দেবতা জীবন্ত-বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা, জার্ম্মাণী জন্তু না মানুষ ইনি এ সব কিছুই অবগত নহেন অথচ ইনি নাকি ইঁহার প্রজাদের লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। উচ্চ সুসভ্যতার কোনো পরিচয় এদেশে নাই অথচ ইহারা নগ্ন হইয়া বিচরণ করে না। নরমাংসও ভোজন করে না।

মুলি দেশের রাজা

—

অদ্ভুত তাম্রখণ্ড—

এই ছবিতে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাম্র স্ফটিকটি দেখান হইয়াছে। একটি সাধারণ তাম্রখণ্ডকে প্রচণ্ড উত্তাপে ধরাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এটি প্রস্তুত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাম্রখণ্ডের গুণ ও প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। সাধারণ তাম্রের অপেক্ষা ইহা অনেক অধিক বিদ্যুদ্বহ ও সহজেই নমনীয়। ইহার ওজন ৬ সের।

বৃহত্তম তাম্র স্ফটিক (crystal)

—

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক—

বিদ্যুদ্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পৃথিবীর যে যে মনীষীরা মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁহাদের অন্যতম। ইনি অসাধারণ

মেঘ-তাড়িৎ আবিষ্কার

প্রতিভাবলে বিদ্যুতের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কার সংখ্যা অসংখ্য এবং প্রত্যেকটি মানবের উপকারে লাগিয়াছে। মানুষ হিসাবেও ইঁহার তুলনা হয় না, ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মচরিত সৎ-সাহিত্যের অঙ্গ। চার্লস-ই-মিল্স অঙ্কিত একটি বিখ্যাত তৈলচিত্রের প্রতিকৃতি এখানে দেওয়া হইল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া কেমন করিয়া মেঘ-তাড়িত ধরিয়াছিলেন ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। ছবিখানিতে ফ্র্যাঙ্কলিনের সেই অদ্ভুত আবিষ্কার দেখান হইয়াছে।

—

প্রাচীন চীনামূর্ত্তি

পাশের চিত্রখানি পিটার জে বার কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই মূর্ত্তিটি কৃষ্ণ-প্রস্তরে খোদাই করা; তাং সাম্রাজ্যের সমসাময়িক। গ্রীক্ ও বৌদ্ধ-শিল্পের সংমিশ্রণ ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

নীচের ছবিখানা চীনের ফুংসিং জিলার সমুদ্রতীরে ফুকিয়েন বৈজ্ঞানিক অভিযান-দলকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাও তাং সাম্রাজ্যের সময়কার বলিয়া অনুমিত হয়। এত বিরাট 'সস্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি' আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

কৃষ্ণ পাথরে খোদিত মূর্ত্তি

বিরাট সস্মিত বুদ্ধ

—
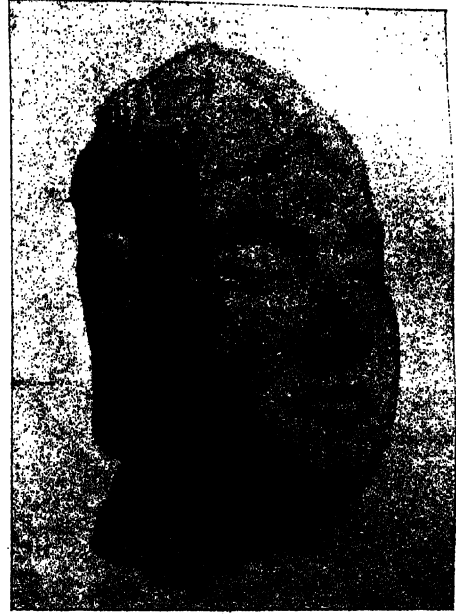
জলের বিপদ

সহরে বাস করিয়া লোকে সাঁতার শেখার প্রয়োজনীয়তা ভুলিয়া গিয়াছে; অথচ সাঁতার শেখা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠা খুলিলেই বুঝা যায়। আমরা প্রায়ই জলে ডুবিয়া (আত্মহত্যা নহে) লোক মরার খবর পড়িতেছি। কলিকাতা সহরে সাঁতার শিখিবার যে দুই একটি ক্লাব আছে তাহাতেই উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য জুটে না; এই

মগ্ন ব্যক্তিকে পার্শ্বে রাখিয়া সন্তরণ
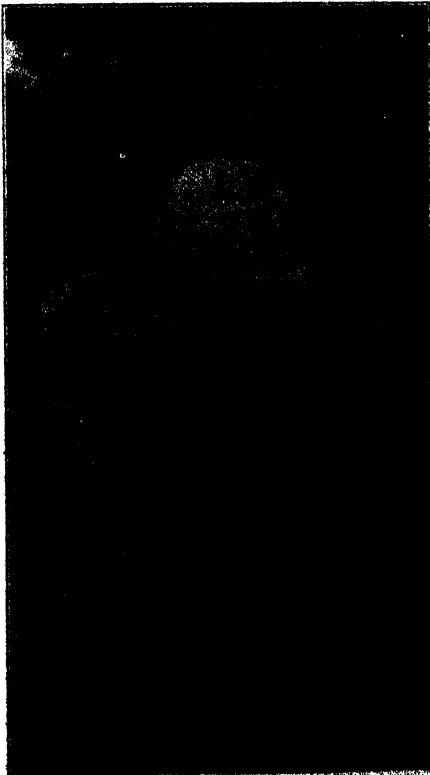
মগ্ন ব্যক্তির চুল ধরিয়া সন্তরণ

ক্লাবের মেম্বরই ডুবিয়া মারা গিয়াছে এরূপ ইতিহাস বিরল নহে। সাঁতার শেখা শুধু আত্মরক্ষার জন্য নহে পরকে বাঁচাইবার জন্যও ইহার আবশ্যকতা আছে। আমেরিকায় সাঁতার শেখার জন্য রীতিমত স্কুল আছে। মেয়েরাই এ বিষয়ে অধিক উদ্যোগী। ক্যানসাস্ সিটি ক্লাবে জলমগ্ন লোককে কি করিয়া রক্ষা করা যায় সেজন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাবটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার দুইটি উপায় এখানে ছবি-দ্বারা দেখানো হইয়াছে। ছবি দুটি ক্যানসাস্ ক্লাবে গৃহীত। মগ্নব্যক্তিকে পার্শ্বে রাখিয়া সাঁতার দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তিকর, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আয়াস-সাপেক্ষ। মগ্নব্যক্তির টাক না থাকিলে চুল ধরিয়া তাহাকে ভাসাইয়া রাখা সহজসাধ্য এবং ইহাতে রক্ষাকারীর বিপদের আশঙ্কা কম।

জানোয়ার

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

পাড়ার লোকে বলিত, মরণ নেই তাই বেঁচে আছে—

বৌ বলিত, অমন বেঁচে থাকার কপালে আগুন—

সে হাসিত।—দেখিলে মনে হইত যেন জীবনে সে হাসে নাই। সুমুখের দুইটা দাঁত ভাঙ্গা, বাকি কয়টা ময়লা পড়া।—হাসিতে হাসিতে কল্‌কে পাড়িয়া তামাক সাজিতে বসিত।

বৌএর গা জ্বালা করিয়া উঠিত। বলিত, ব'সে ব'সে খাওয়াতে আমি পারব না।

পাশেই বাবুদের বাড়ী সে কাজ করিত। দুবেলা আঁচল চাপা দিয়া ভাত তরকারী বহিয়া আনিত।

মহেশ রসিকতা করিয়া বলিত, ব'সে নয় তবে দাঁড়িয়ে খাওয়াও?

মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয়—বলিয়া বৌ ফরফর করিয়া চলিয়া যাইত। ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করিয়া মহেশ তামাক টানিত। কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরদিকে ধোঁয়া উঠিত। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সে হাসিত।

গাজনের ফেরতা বাড়ী ফিরিবার পথে রাখাল সেদিন আগড়ের কাছে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজ খালি আছে করবে নাকি মহেশ?

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মহেশ বলিল, কি কাজ?

করবে তুমি?

কাজটা কি বলই না—

রাখাল সরিয়া আসিয়া বলিল, দেখি কল্‌কেটা এক-হাত।

গরম কল্‌কেটা হুঁকা হইতে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া মহেশ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাইল। রাখাল তাহাতে জোরে একটি টান্ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, হরি চক্কোত্তি লোক চায়—

কেন?

তার গোয়ালের কাজ চলে? না। সেদিন আমায় ডেকে বল্‌ছিল—

মহেশ একটু হাসিল। হাসিটা যেন উপেক্ষার!

এঃ, হেসেই যে উড়িয়ে দিলে কথাটা! সত্যি বল্‌চি—কাজ খালি। যাবে যাও—না যাবে না যাও! নাও ধর তোমার কল্‌কে—বলিয়া রাগে কল্‌কেটা মহেশের হাতে

একরূপ গুঁজিয়া দিয়া রাখাল হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বৌ আড়াল হইতে বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিল, গোয়ালের কাজ কি মানুষে করে না?

করে—

তবে না কল্লে কেন? যাও দূর হ'য়ে যাও ঘর থেকে। মেয়ে-মানুষের রোজগারে পেট ভরাতে লজ্জা করে না? মুখে আগুন!—বলিয়া বৌ কাজে বাহির হইয়া গেল।

চক্কোত্তি-বাড়ী—তিনখানা গাঁয়ের পরে। সেখানে বাবুর কাছে আসিয়া সেদিন মহেশ গোয়াল-ঘরের কাজটি লইল—খাওয়া থাকা ও তামাক বাবদে মাসে আটাআনা নগদ।

ছোট মেয়েটা বলিল, রাখাল আর আস্‌বে না, মহেশ-দাদা।

মহেশ বলিল, সেই এখানে কাজ কর্‌ত বুঝি?

বামুন-দিদি চুপিচুপি বলিল, হাঁ গো বাপু। তিন-টাকা ক'রে সে মাইনে নিত কিন্তু—বলিয়াই একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, তিন তিনটে টাকা মাসে মাসে……এদের ত আর তেমন আবস্তাটি এখন—

মেয়েটার মুখের দিকে তাকাইয়া বামুন-দিদি চুপ করিল।

মেয়েটা চুপি চুপি বলিল, মা যে ওকথা বল্‌তে তোমায়—

বামুনদি মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলিল, তুই থাম তুই থাম! বারণ ক'রেছে তার হবে কি? আমি ত আর কারো নিন্দে করিনি, বাছা!

গোয়াল-ঘরের পাশে খালি জায়গাটুকু বাসস্থান। দিন নেহাৎ মন্দ কাটে না।

গরুতে বাছুরে চারটি। একটি গরু রুগ্ন আর দুইটির দুধ কমিয়া গেছে। অতএব গৃহস্থের খুদসিদ্ধ খোল-ভুষি আর তাহাদের ভাগে পড়ে না। [illegible] ঘরেই থাকে আর দুটিকে সারাদিন চরাইয়া [illegible] এই ত কাজ।

গৃহস্থের কিছুই [illegible] করিতে হয় না। তবু সে এটা ওটা ফরমাস খাটিয়া দেয়। অবসর সময় আর কি-ই বা করে।

বামুন-দি একদিন এদিকে ওদিকে চাহিয়া চুপিচুপি বলিল, আমারও আর থাকা হবে না, বাছা—মানে মানে স'রে পড়্‌লেই ভাল। বুড়ো মানুষ না খেয়ে আর ক'দিন থাকি?

মহেশ কথার উত্তর দিল না। বামুন-দি আবার বলিল, তোমার কি বাছা আর কোথাও অন্ন হ'ল না? এযে তাল পুকুরে ঘটি ডোবেনি।

মহেশ চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকে। আলো অন্ধকার সমানে তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যায়।

গাছের কেয়ারীতে মহেশের বেশ হাত ছিল। সুমুখের উঠানে একটুখানি জায়গা দখল করিয়া সে গাঁদা ও কেষ্টকলির চারা লাগাইয়া দিল। ক্রমে চারাগুলিতে যেদিন গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়া উঠিল সেদিন সে স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রে সেগুলি হাতে করিয়া ডাকাতে কালীর মন্দিরে রাখিয়া প্রণাম করিয়া আসিল এবং আসিবার সময় কোথা হইতে একটি আধমরা শালিক পাখী ধরিয়া আনিল।

হরি-বাবুর বড় মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। সে শালিক পাখী দেখিয়া মুখ নাড়া দিয়া বলিল, আনা ত হ'ল—রাখা হবে কোথায় শুনি?

মহেশ বলিল, খাঁচা তোয়ের হবে।

খাওয়াবে কি?

শালিক পাখীটির গায়ে হাত বুলাইয়া মহেশ বলিল, এখন রোগে ভুগ্‌ছে—

রোগে ভুগ্‌চে তা ব'লে খেতে দিতে হবে না? বলিয়া মনোরমা ঠরমর করিয়া চলিয়া গেল।

গিন্নী আসিয়া কহিলেন, এ তোমার কেমন ব্যাভার, বাপু?

মহেশ মুখ তুলিল।

গিন্নী বলিলেন, পাখ্-পাখা-পাঁচালী,—তিনে [illegible] জঞ্জালি! ওসব পাখী-টাখী ভাল নয়, বাপু—বুঝ্‌লে?

মহেশ তখন খাঁচা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। গিন্নী চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, ও-সব এখানে হবে না—

ব'লে দিয়ে গেলুম। না হয় তোমার কাজ ক'রে দরকার নেই---

কিন্তু সে কাজও করিতে লাগিল ; পাখীও থাকিল।

তখন শীতকাল। গাঁয়ের কোলে মরাই নদীটির ধারে মহেশ গরু দুইটিকে চরাইতে লইয়া যায়। খাঁচাশুদ্ধ শালিক পাখীটিও সঙ্গে থাকে।

আমন-ধান সবে কাটা হইয়াছে। দু-চারিটি খড়, এক-আধ মুঠি ধান তখনও এখানে-ওখানে ছড়ানো। মরাইয়ের পাড়ে, চরের গোড়ায় গোড়ায় নানাবর্ণের আগাছা জন্মিয়াছে। সেইখানেই গরু দুইটিকে ছাড়িয়া দিয়া মহেশ পাখীটির কাছে আসিয়া বসে। দুএকটি ধান তাহাকে খাইতে দেয়। কিন্তু রুগ্ন পাখীটির মুখে ধান রোচে না। ঠোঁটের ফাঁকে ধান পূরিয়া দিলে মুখ-ঝট্‌কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। তারপর ছোট ছোট চোখ দুটি বুজিয়া আবার ধুঁকিতে থাকে।

শীতকালের ছোট বেলা গড়াইয়া আসে। গাছের আগায় আগায় পড়ন্ত রোদ লাল হইয়া উঠে।

খাঁচার ডাঁটিতে হুঁকাটি বাঁধিয়া মহেশ উঠিয়া পড়ে। তার পর গরু দুটিকে এক দড়িতে বাঁধিয়া খাঁচাটি হাতে তুলিয়া লয়। গরু দুটি কিন্তু আসিতে চায় না। শীর্ণ বুভুক্ষু দৃষ্টি তুলিয়া মহেশের দিকে চায়। গৃহস্থ তাদের খাইতে দেয় না।

মহেশ একটু হাসিয়া তাদের পিঠ চাপড়াইয়া আবার চলিতে থাকে।

ঘরে আসিয়া পৌছিতেই কাল-সাঁঝি হইয়া যায়। দিনান্তের ক্লান্ত আলোটুকু আর কোথাও নজরে পড়ে না। তখন সে ঢাকা-দেয়া অবেলার ঠাণ্ডা ভাত ক'টি একটি পিতলের কাঁসিতে করিয়া খাইতে বসে। কিন্তু মুখে তাহার রোচে না। তরকারীর মধ্যে খানিক নুন, একটা কাঁচা লঙ্কা, কোনোদিন একটুখানি বা কলাইয়ের ডাল— এসব কতক্ষণ ভাল লাগে! বিশেষতঃ সে ঘাড় ফিরাইয়া যখন দেখে তাহার এই অখাদ্য এবং অভক্ষ্য অন্নকটির লালসায় বাঁধা গরু দুইটি দড়ি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছে ও তাহাদেরই পাশে ব্যাধিক্লান্ত আর-একটি গরুর কাতর দীন দুটি চোখের কোল বহিয়া নিঃশব্দে ধারা গড়াইতেছে —তখন সে আর থাকিতে পারে না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভাতের কাঁসিটি তাহাদের মুখের কাছে বার বার পাতিয়া ধরে। শেষ গ্রাসটি গুলি পাকাইয়া শালিককে খাওয়ায়।

একদিন মনোরমার নজরে পড়িয়া গেল।

আর যায় কোথা?

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সকলে ত অবাক্। গিন্নী রাগে গমগম করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ভাত ত' অম্‌নি হয় না, বাপু! পয়সা লাগে! তুমি এই যে গেরস্তর ওপর অত্যাচার কচ্ছ এর খেয়ানত দেয় কে?

কর্ত্তা কহিলেন, চুপ ক'রে থেকো না—উত্তর দাও!

মহেশের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অথচ অনেক দিন ধরিয়াই এই কাজ যে সে করিয়া আসিতেছে —এ কথা বলিলে আজ তাহার আর রক্ষা থাকে না।

কর্ত্তা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, তোমার দ্বারায় এ কাজ পোষাবে না, বাপু— দেখে-শুনে আর কোথাও না হয়—

কিন্তু আর কোথায় কি কাজ! এ কাজটি ছাড়িয়া ঘরে ফিরিয়া গেলে বৌ যে তাহাকে আর আস্ত রাখিবে না।

মাঠের ধান-কাটাও শেষ হইয়া গেল—আঁটি বাঁধিয়া খড়ও নৌকায় এবং গরুর গাড়ীতে করিয়া সহরে চালান হইতে লাগিল।

রাঙা মাটির পাকা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ীর পথ।

গরু দুটিকে সঙ্গে করিয়া মহেশ সেই পাকা রাস্তাটির কিনারায় দাঁড়াইয়া থাকে।

ক্যাঁচ-কোঁচ করিয়া গরুর গাড়ী সুমুখ দিয়া যায়। টুং টুং করিয়া গরুর গলার ঘণ্টা বাজে।

খড় দেখিয়া গরু দুটি আর থাকিতে পারে না। মুখ বাড়াইয়া পিছনের আঁটিতে টান মারে। পিছনের গাড়ীর গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া ওঠে—

অ অতুল্য? দেখ্ দেখি—

অতুল্য দেখিয়া বলে, নিক্ গা—দুগাচ্ছা বৈ ত নয়—

'ওরে ও কল্মীলতা জলে ভাসে…'বলিয়া টানিয়া টানিয়া আবার গান ধরে।

একদিন কিন্তু তাহারা আপত্তি করিল।

বলিল, এ কেমন ধারা, বাপু,—মাংগা বিচালি পিত্যুই কুথায়থে দিই—বলত?

মহেশ বলিল, খেতে পায় না, ভাই, বড় রোগা কিনা—দুধ ক'মে গেছে—

তাহারা বলিল, যাওগা কর্ত্তা উ ঠিক নয়—নিত্যি জোগাতি নারব আমরা—

সেদিন খড় তাহারা দিল না।

মহেশ ট্যাঁক হইতে তামাকের দুটি পয়সা বাহির করিয়া বলিল, নিয়ে যা—আর কিছু ত' নেই—দে আর চারটি খড়—

অতুল্য বলিল, কি করবি, ক্যাবল?

—নে না—ঘুষ ত আর নয়—

এক আঁটি খড় ফেলিয়া দিয়া তাহারা আবার গাড়ী হাঁকাইল।

শালিক পাখীটির সে-বেলাকার আহার জুটিল না।

কিন্তু বিচালির রপ্তানি ক্রমশঃ যেদিন শেষ হইয়া আসিল সেদিন আর কোনো উপায়ই রহিল না। তাহার উপর এ বছর পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠে ঘাস জন্মায় নাই। যে কগাছি জন্মিয়াছিল তাহাও আবার শীতের শুষ্ক রৌদ্রে আর গরুর পালে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। ওদিকে বাবুর বাড়ীতে জানে, মহেশ গরু তিনটির ভার লইয়া আছে।

মহেশের কোনো রূপে একমুঠা জুটিয়া যায়, কিন্তু গরু, শালিকের সংস্থান আর কিছুতেই হইয়া উঠে না।

বাবু একদিন বলিলেন, গরু ক'টাকে রোগা দেখাচ্ছে বড্ড যে হে? ভাল ক'রে তেমন খোয়াওনা বুঝি?

মহেশ খানিকক্ষণ নির্নিমেষ গরু কয়টির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলে, হ্যাঁ আজ্ঞে—চরাইত!

না-না বাপু, তোমার কাজকর্ম তেমন সুবিধাই লাগে না। তোমাদের যা স্বভাব তাইত হবে। ফাঁকি দিতে পাল্লে আর কিছু চাও না। তোমার দ্বারায় আর কিছু চলে না দেখছি—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এই একান্ত অসহায় গরু কয়টিকে ফেলিয়া মহেশ কোথায়ও যাইতে পারিল না। নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া বসিয়া গরুর কথা ভাবিতে লাগিল। তামাকের সন্ধানে একবার উঠিয়া গিয়া দেখিল, কল্কেটায় গেল কালকার কতকগুলি ছাই পড়িয়া আছে মাত্র। তামাক রাখিবার টিনের কৌটাটির ভিতর অবধি নজর করিয়া দেখিল—এতটুকু মাত্র আর তাহাতে অবশিষ্ট নাই।

তামাকের অভাব আজ এই তাহার প্রথম।

ভাত তাহার রোজই বাড়া থাকে—আজও ছিল। কিন্তু আজ দেখিল ভাতে ঢাকাও নাই, ভাতও নাই। দুই চারিটা ভাতের দানা কেবল এদিকে ওদিকে ছড়ানো। তরকারী ত ছিলই না।

তবে! খাইল কে? মেনি বেড়ালটা বটে এখনও ক্যাঁও ক্যাঁও করিয়া তাহার কাছে আসে নাই।

মনোরমা বলিল, বেশ-বেশ যা হ'ক্। ভাত ক'টি গরুদের খাওয়ালে ত? বড্ড দরদ—কেমন? নিজে খাবে কি এখন?

মহেশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

অবেলা অবধি গৃহিণীর ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই। তাই বিষমুখে তিনি আসিয়া বলিলেন, এক ঢং পেয়েছ নয় রোজ রোজ? ভাত অমনি আসে, গতর খাটাতে হয় না? কাজেও ফাঁকি—ঘরের ভাতও নষ্ট করা—

রাগে গৃহিণী ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

মহেশ নিজের গায়ের চাদরটি কাঁধে ফেলিল, ভাঙ্গা ছাতিটি লইল, আর একহাতে শালিক পাখীর খাঁচাটি তুলিয়া লইল।

মনোরমা বলিল, ছাতি নিচ্ছ যে—ও কার ছাতি?

তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মহেশ ছাতাটি রাখিয়া দিল, তারপর খাঁচাটি হাতে করিয়া, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় একটি গরু গোয়ালে আসিয়া ঢুকিল—আর-একটির কোনও উদ্দেশ নাই।

আলো হাতে করিয়া সকলে এমাঠ ওমাঠ খোঁজাখুঁজি করিয়া আসিল—কোথাও দেখিতে পাইল না।

বাবু বলিলেন, ভাল গরুটিই গেল, গদাধর?

গদাধর বলিল, তাইত বাবু—এম্নি বড় পালান্। বাচ্ছা হ'লে তিন সেরের কম দিতই না—না কি বল, চণ্ডী?

সে আর বল্‌তে? পালান্ নয় ত—ধামা!—

মনোরমা বলিল, ঠিক হ'য়েছে জানো, বাবা? যাবার সময় সে গরুটাকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে—

বাবা বলিলেন, আচ্ছা ঠিক্ ঠিক্, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, যাবে কোথা এ তল্লাট ছেড়ে?

মহেশকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি লোক লাগাইয়া দিলেন।

মহেশের ঘুম ভাঙিল একটি গাছের তলায়। তখন গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

শীতের হাওয়ায় শরীর একেবারে জমাট—যেন বরফের চাঁই।

শালিক পাখীটি খাঁচার ভিতর তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। গায়ের চাদরখানি খাঁচার উপর ঢাকা দিয়া মহেশ একবার উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া আসিল যদি নিকটবর্ত্তী কোনো গাঁয়ে আশ্রয় মেলে।

গায়ের চাদরটি আবার যখন কাঁধে ফেলিয়া খাঁচাটি তুলিয়া লইল—দেখিল শালিকটির আর কোনো সাড়া-শব্দ নাই।

এ কি—কি হ'ল? বলিয়া মহেশ বসিয়া পড়িয়া দেখিল, শালিকটি কখন্ মরিয়া গেছে···

একেবারে কাঠ! চোখে মুখে পিঁপড়ার সারি আনাগোনা করিতেছে।

···একটু আগেই যে অল্প একটুখানি জীবনের স্পন্দন ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল সেটুকু ওই বিশ্বজোড়া মহাশূন্যে কোথায় কখন্ মিলাইয়া গেছে...

মহেশের চোখে জল আসিল।

খাঁচাটি সেইখানেই সে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল।

এতটুকু বাঁধন যেখানে অবশিষ্ট ছিল সেটিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাঁকারির কুটিগুলা ছড়াইয়া দিল।

বেলা তখন অনেক। আবার সে উঠিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার দেখিল—শালিক পাখীটা চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে—পা দুইটা আকাশের দিকে ছড়ানো। আবার চলিতে লাগিল।

অনেকদূর গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া আবার চাহিল—কোথায় যেন তাহার মনের মধ্যেই একটা কি ভুল হইয়া যাইতেছে। মনে হইল, একটি ক্ষুধার্ত্ত জীবন ওই গাছতলাটির চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিতেছে···

তখন কিন্তু শীতের বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

মাঠের পর মাঠ!—চলিতে চলিতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।

একটা বড় ক্ষেতের আলের ধারে দু-তিনটা ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছিল। একটা লোক কাস্তে দিয়া ধানের গুছি কাটিতেছে। অনেক দূরে দুই-তিনটা লোক একটা গরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। গরুটা বোধ করি দুর্ব্বল—পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দড়ি ছিঁড়িতে পারিতেছে না।

নিকটে আসিলে, মহেশ বলিল, কোথায় যাবে?

সহরে—

গরুটিকে মহেশ চিনিতে পারিয়াছিল, বলিল, বাবুদের গরু যে! কোথা পেলে একে?

গরুটার পিঠের ঘা-টা তখন দগদগে হইয়া উঠিয়াছে। মাছি বিড় বিড় করিতেছে। স্তিমিত শ্রান্ত চক্ষু দুটি দিয়া দু-এক ফোঁটা জলও কখন্ নাকের উপর গড়াইয়া আসিয়াছে।

মহেশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাদের পথে দাঁড়াইয়া বলিল, কিনলে নাকি?

একজন বিরক্ত হইয়া বলিল, হাঁ গো কর্ত্তা! চুরি করিনি। তিন টাকা দিয়ে কিনে আন্‌লাম।

লোকগুলা কসাই মুসলমান।—গরুটিকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া আবার তাহারা চলিতে লাগিল।

মহেশ পিছু পিছু খানিকটা গিয়া ঘা'য়ের মাছিগুলা হাত দিয়া একবার তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বড্ড হাওয়া দিচ্ছে বুঝ্‌লে। কাঁপুনি ধরেছে গরুটার। ওই রোদ-গোড়ায়-গোড়ায় নিয়ে যাও—ভাই—বুঝ্‌লে? বলিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা একবার মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিল, তারপর একটুখানি উপহাস করিয়াই বলিল, বলি এত কেন? ভাগ-টাগ চাই নাকি কর্ত্তার? বলিয়াই একটুখানি মুচ্‌কি হাসিয়া আবার টানিতে-টানিতে গরুটিকে তাহারা লইয়া চলিল।

ক্ষেতের ফেরতা লোকটা তখন অন্ধকারে পিছনে আসিয়া বলিল, কোথা যাবে আপনি?

মহেশ তখন বোকার মত হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।

বলিল, এই দেখি যদি কোথাও—

তোমরা—আপনারা?

চাষা গো—কৈবর্ত্ত আমরা!

হুঁ—আমরা গয়লা! ঘর কোথা?

সেই ওই ওইদিকে—ঝুরোলি গাঁয়ে। তাহার পর একটুখানি থামিয়া পথ চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা, তোমাদের লোক দরকার? এই গোয়ালের যদি কিছু কাজ—

সে বলিল, কর্‌বে না কি?

তা কর্‌ব খুব! আমি যে ওই করি—

আচ্ছা এস। বলিয়া একটু থামিয়া গয়লা পুনরায় কহিল, খেতে হবে রেঁদে-বেড়ে—মাইনে কিছুই দিতে নার্‌ব। দুধ দুইতে জান ত?

হুঁ—খুব।

বাবুর বাড়ী সে আট আনা পাইত। এখানে কিছু নাই বা পাইল!

চলিতে চলিতে মহেশ একবার বলিল একটু তামাক হবে? এক ছিলিম—হেঁ হেঁ—

হবে বৈ কি! এক ছিলিম কেন! একাই না হবে—

গয়লা হ'ক, বেটার চল্‌তি খুব! পাঁচটা বড় বড় দুধোলো গাই আর তিনটে মোষ! দুধই ত বিক্রি করে কম্‌সে কম জলে-দুধে পাঁচ টাকার রোজ।

গোয়ালের পাশেই ছোট খুপরিটি। গয়লা বলিল, থাকো এখানে। ওই টিয়া চন্দনা—ওসব আমারই। সময়ে ওদের খেতে-টেতে দিও।

ছোট দুটি খাঁচার ভিতর—একটিতে টিয়া, একটিতে চন্দনা! মহেশের মুখে চোখে খুসী আর ধরে না।—তাড়াতাড়ি বলিল, বেশ—বেশ। খেতে দেবো বৈকি! আমার কাছেই থাক্‌বে। থাক!—বাঃ শিষ মাচ্ছে দেখ কেমন খুচুর খুচুর ক'রে?—পড় বাবা, 'শাম্‌লা মেয়ে জংলা পাখী'—চ্চু। বলিতে বলিতে মহেশ চন্দনার খাঁচার দিকে হাত বাড়াইল।

আহারান্তে দাওয়ায় বসিয়া মহেশ তামাক ফুঁকিতেছিল। অদূরে খামারের ধারে বসিয়া গয়লাটাও কি যেন টানিতেছিল।

গাঁজা নাকি?

মহেশকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে দেখিয়া গয়লা বলিল, চলে?

হাসিতে হাসিতে মহেশ বলিল, হ্যা—আমাদের গাঁয়ের সেই বিষ্টু বোরেগী খেতো……দাও। দেখি একটান। খেলে বেশ ঘুম হয় ত?

হয়—হয়, খুব হয়। বলিয়া কলিকাটি গয়লা তাহার কাছে নামাইয়া দিল। তাহার তখন নেশা ধরিয়াছে।

বলিল, গাঁজা কে খায়? না—এক যোগী—আর এক ভোগী………

এম্‌নি সব কত কথা। গয়লা আপন মনেই বলিয়া গেল—

শীতের সন্ধ্যায় কড়া গাঁজা মহেশের মন্দ লাগিল না।

একটু পরে সে বোধ করি নেশার ঝোঁকেই বিছানা লইল।

রাত তখন অনেক!

কিসের শব্দে যেন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখে

অন্ধকার গোয়ালের সেই ছোট খুপরির মাথার উপর বাঁশের খাঁচায় পাখী দুইটি ঝট্‌পট্ করিতেছে।...মরিল নাকি? সেই তাহার শালিকটি যেমন মরিয়াছে!

পাশের গোয়ালে মোষ-গরুর ছটফটানি। জাবর কাটে আর ছটফট করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বোধ করি মশা লাগে।

কোথায় কানাতের ধারে একটা কুকুর শীতে কুঁই কুঁই করে।

একটা বিড়ালও যেন কাঁদে! কাল হইতে এই কান্না ক্রমাগত তাহার কানে আসিতেছে। আবার কাঁদে! এম্‌নি করিয়া একটা বিড়াল কাঁদিত—এখনও তাহার মনে আছে—তিন দিন পরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চারটি ছানা সে প্রসব করে।...কিন্তু সে অনেক কাল আগে—ঝুরোলি গাঁয়ের বামুন-ঘরে।

ওপারের বনে শিয়াল ডাকে!

গভীর রাত্রে এখন আর মানুষের কোথাও সাড়া-শব্দ নাই।

চমৎকার। মহেশের মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষগুলি এই নিস্তব্ধ রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে বুঝিবা সব একসঙ্গেই মরিয়া গেল। শুধু—পশু আর পাখী—পাখী আর পশু...। মানুষের রাজ্য হইতে সেও বুঝি নির্ব্বাসিত হইয়াছে...

মহেশ আবার চোখ বুজিয়া ভাবে। ঘুম আর আসে না। গলাটা যেন তাহার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে।

শেলি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

কুয়াসায় ঢেকেছে আকাশ;
শীতের সুতীব্র রাত্রি; বহে তায় উত্তর বাতাস।
মলিন চাঁদের আলো স্বপ্নলোক এনেছে ধরায়;
দূরে শুনি নীড়হারা পাখী ডেকে যায়।
মরণের ছায়া যেন নয়নে ঘনায়।
বিষাদের অভিসার; থেমে গেল, হায়,
জ্যোতির উৎসব মোর হরষের বাণী!
অন্তর-আকাশ মাঝে বেদনার তীব্র রেখা টানি'
অপূর্ণ আশার পাখা মেলি'
আমার আঁখির আগে এলে তুমি, হেরিলাম 'শেলি'।

তোমার মূরতি আমি হেরিলাম কবি!
মোদের এ ধরণীর ছবি
কোথায় লুকায়ে গেল আকাশের কুয়াসার গায়;—
তা'রি মাঝে হেরি দেখা যায়,—
অপূর্ব্ব পাণ্ডুর মূর্ত্তি শীর্ণ দেহ, ব্যথাম্লান আঁখি
সুদূরের পানে চাহি' নিরাশায় নমে থাকি' থাকি'।
যেন কোন্, নাম-হারা নক্ষত্রের মাঝে
দৃষ্টি তা'র রত্ন লভিয়াছে;
যেন দূর ছায়াপথ-পারে
পেয়েছে সে চেয়েছে যাহারে!
সারা দিন গাহি' যা'র গান
সন্ধ্যায় সিন্ধুর নীরে পেলে যা'র পরম সন্ধান,
সেই প্রিয় মরণের সুশীতল, শান্তিময় ছায়ে
আপনারে দিয়েছ বিলায়ে।
বিষণ্ণ মরণ তাই বিষাদের নব ব্যথাভারে
পথে তা'র চলিতে যে নারে।
তাই তা'র দীর্ঘশ্বাসে নভে হেরি কুয়াসা ঘনায়,
তোমার বিশীর্ণ চাঁদ ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে চায়;—
তব প্রিয়তমা নিশি আজি তাই ক্লান্তিভার বহি'
চাহে তব মুখপানে হে চির-বিরহী!

চির-অমৃতের আশা, সুদূরের পানে চেয়ে থাকা,
অপূর্ণ আশার ভারে প্রাণ-মন ঢাকা,
সমস্ত জীবন ভরি' গ্লানিময় ব্যর্থতায় বহি'
প্রেমের বেদনাটিরে সহি'
রচিয়া কাব্যের মাঝে চির নব ইন্দ্রজাল-মায়া,
অপূর্ব্ব স্বপন সাথে মিশাইয়া আপনার কায়া,
সমাজের শাসনেরে ঘৃণাভরে দূরে দিয়া ঠেলি'
এ কি খেলা খেলিয়াছ, শেলি?
পূরব-সাগর-প্রান্তে শত ক্রোশ ব্যবধান ছাড়ি'
জীবন-সাধনা তব আজি দেয় পাড়ি।
উদ্দাম তোমার সুর ছেয়ে গেছে নবীন ভারতে
প্রতি হিয়া মাঝে তা'র পরতে-পরতে
হ'য়ে গেছে সনাতন স্থান
জগৎ গাহিছে কবি, আজি তব প্রিয় জয়গান!
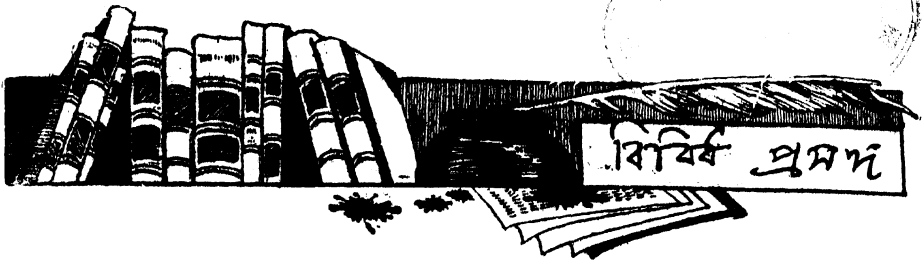
সম্পাদকের চিঠি

আমরা ভেনিস্ রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিবার পর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্যারিসের ট্রেন্ কখন আসিবে জানিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি অল্পস্বল্প ইতালীয় ভাষা বলিতে পারেন। একজন ইতালীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভদ্রভাবে বলিলেন, যে, ট্রেন্ বেলা এগারটার কয়েক মিনিট পরে আসিবার কথা, কিন্তু তাহাতে আমাদের জায়গা হইবে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, এই ট্রেন্ কন্স্টাণ্টিনোপল্ হইতে প্যারিস যাতায়াত করে এবং ইহাতে রাত্রে যাত্রীদের শুইবার বন্দোবস্ত আছে; সুতরাং যদি ইহাতে শুইবার জায়গা খালি থাকে, তাহা হইলেই আমরা ইহাতে স্থান পাইব, নতুবা নহে। এখানে বলা দরকার, যে, আমাদের দেশে যেমন দ্বিতীয় শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া সময় থাকিতে এক-একটি গদি-আঁটা বেঞ্চি রাত্রে ঘুমাইবার জন্য অতিরিক্ত আর-কিছু ভাড়া না দিয়াও রিজার্ভ করা যায়, (হাবড়ায় কেবল নাম মাত্র আট আনা বেশী লাগে), ইউরোপে তাহা নহে। তথায় প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলেও শুইবার বেঞ্চির জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হয়। সে-ভাড়া বড় কম নয়। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই অতিরিক্ত ভাড়ার বিনিময়ে গদি-আঁটা বেঞ্চি, তাহার উপর বিছানা, বালিশ ও পরিষ্কার চাদর, এবং শীত নিবারণের জন্য কম্বল দিয়া থাকেন। আমরা বোম্বাইয়েই ভেনিস্ হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিট কিনিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না, যে, উহার উপর আবার রাত্রে শুইবার জন্য থোক টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা শুইবার জায়গা পাইতেও পারি, এই আশায় আমাদের মালপত্র সমস্ত ওজন করাইয়া ট্রেনের অপেক্ষায় রহিলাম।

তখন বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। ক্ষুধার কথাটা মনেই ছিল না। যাঁহারা কখনও জাহাজে বিদেশ যাত্রা করেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য এখানে একটা কথা বলা দরকার। যে-বন্দরে যাত্রী নামিবে, জাহাজ সেই বন্দরে পৌছিবার পর জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ আর যাত্রীকে খাদ্য-পানীয় জোগাইতে বাধ্য নহেন। ইহা কোন কোন জাহাজের নিয়ম। আমাদের জাহাজ সকালে প্রায় ৯টার সময় বন্দরে পৌছিয়াছিল, সুতরাং ১০টার সময় আমাদের যে-আহার নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা আমরা পাই নাই। ভেনিস্ ষ্টেশনের রেস্তরাঁ বা ভোজনালয়ে আমরা লেমনেড পান করিলাম। ইউরোপের যেখানে যেখানে গিয়াছি, হোটেলে ও রেস্তরাঁতে পরিচারকদিগকে পরিষ্কার পোষাক পরিহিত দেখিয়াছি; কেবল এই ভেনিস্ ষ্টেশনের রেস্তরাঁতে পরিচারকদিগকে অপরিষ্কার কাপড় পরা দেখিয়াছিলাম। অবশ্য আমাদের দেশের "পবিত্র" হোটেল এবং খাবারের দোকানগুলিতে নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতার একটুও অভাব নাই। কিন্তু ইউরোপে হোটেল ও রেস্তরাঁগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলিয়া এইসব কথা লিখিলাম

ভেনিসে ট্রেন্ আসিবামাত্র অধ্যাপক দাসগুপ্ত ও আমিই সর্ব্বাগ্রে উহাতে উঠিয়া পড়ি। পরে কিন্তু ট্রেনের কণ্ডাক্টর্ আমাকে মিলান্ ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বেই এই ওজুহাতে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করে, যে, কয়েকজন যাত্রী মিলানে গাড়ীতে উঠিবে, তাহারা আগে হইতেই শুইবার জায়গা রিজার্ভ করিয়াছে, অতএব আমার জন্য জায়গা হইবে না। এটা কিন্তু মিথ্যা কথা, আমার নিকট হইতে থোক "টিপ" বা বকশিশ আদায় করিবার জন্যই। কারণ, আমি অন্ততঃ একজন সহযাত্রীর কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি (অন্য দু'জনের কথাও জানি) যিনি

আমাদের পরে প্রায় চলন্ত ট্রেনে ভেনিসে উঠিয়াছিলেন এবং যাঁহার শুইবার জায়গা ট্রেনে উঠিবার পর রিজার্ভ করা হয়। ইঁহাকে প্রথমে কণ্ডাকটর্ জায়গা নাই বলিয়া ট্রেনে উঠিতে দিতে চায় নাই, কিন্তু যাত্রীটি একটু বেশী রকমের টিপ দিবেন বলিয়া নোটটি কণ্ডাকটরের চোখের সাম্‌নে নাড়িতে থাকায় তাঁহাকে উঠিতে দেওয়া হয়, এবং তাঁহার শুইবার জায়গাও হয়। এই ট্রেনের কণ্ডাকটর্ ও অন্য একজন কর্ম্মচারী আমাকে ঠকাইয়া আমার নিকট হইতে দুইবার শুইবার জায়গার মাশুল আদায় করে এবং অন্য রকমেও প্রতারণা করে। ইউরোপের অন্য কোথাও এইরূপ প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা আমার হয় নাই। অবশ্য এই সামান্য প্রমাণ হইতে আমি সমগ্র ইতালীয় জাতিকে অসাধু ও অন্য ইউরোপীয়দিগকে সাধু বলিতে চাই না। তবে ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, ইতালীয় পুরুষ ও নারীর যে-সব নমুনা আমি দেখিয়াছি, তাহাদিগকে ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয় নাই।

আমাদের যাহা কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, সেইজন্যই যে আমাদের পরাধীন থাকা উচিত, অনেক বিদেশী এইরূপ মনে করেন ও বলেন। সেই কারণে আমি স্বাধীন জাতিদের সম্বন্ধে তুচ্ছ কথারও উল্লেখ করিতেছি। অবশ্য আমি এরূপ মনে করি না, যে, যেহেতু ইতালীয়েরা অনেকে নোংরা ও অসৎ এবং তাহা সত্ত্বেও ইতালী স্বাধীন, অতএব আমাদের অনেকের নোংরামি ও অসাধুতা সত্ত্বেও আমাদেরও স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, স্বাধীন জাতি মাত্রেই সর্ব্বগুণাধার এবং সকল বিষয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এরূপ কথা বলাতেও আমাদের জাতির অনিষ্ট হইতে পারে জানি। সেইজন্য বলিতেছি, আমরা স্বাধীন হই বা না হই, নোংরামি ও অসাধুতা নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য।

ভেনিস্ ষ্টেশনে একজন সরকারী দোভাষী দেখিলাম। তিনি ইতালীয় ছাড়া ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী বলিতে পারেন। যে-সব শহরে বহু বিদেশী পর্য্যটকাদির সমাগম হয়, তথাকার ষ্টেশনে এইরূপ কর্ম্মচারী রাখা সুব্যবস্থা। প্যারিস্, লোজান্, লণ্ডন, প্রভৃতি ষ্টেশনে এইরূপ কোন কর্ম্মচারী আমার চোখে পড়ে নাই। এই প্রসঙ্গে, যে-সব বিদেশগামী ভারতীয় কেবল ইংরেজী জানেন, তাঁহাদিগকে একটা হদিশ দিতে পারা যায়। তাঁহারা যদি ইংরেজী-ইতালীয়, ইংরেজী-ফরাসী, ইংরেজী-জার্ম্মান, ইত্যাদি পকেট অভিধান সঙ্গে রাখেন ও যথাস্থানে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে সুবিধা হইতে পারে।

কন্সটাণ্টিনোপল হইতে প্যারিসগামী যে ট্রেনে আমরা প্যারিস যাত্রা করিলাম, তাহা ইউরোপ মহাদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা সর্ব্বোৎকৃষ্টগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলি অপেক্ষা এবং বোধ হয় বেঙ্গল-নাগপুর ও জি আই পি রেলওয়েরও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি অপেক্ষা কম আরামদায়ক। আমরা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ভেনিস্ হইতে যাত্রা সুরু করি। তখন হইতে সূর্য্যাস্তের কিছু পর পর্য্যন্ত খুব গরম বোধ হইয়াছিল, যেমন গরম বাংলা দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে হইয়া থাকে। যাত্রীদের গাড়ীতে (প্রথম শ্রেণীতেও না) কোন বৈদ্যুতিক বা অন্য পাখা ছিল না, এবং আমাদের দেশে ষ্টেশনে ষ্টেশনে যেমন পানী-পাঁড়েরা বিনামূল্যে পানীয় জল দিয়া বেড়ায় তাহারও ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুতঃ, ভাল সাধারণ পানীয় জল পাওয়া দুর্ঘট দেখিলাম। অবশ্য গাড়ী হইতে নামিয়া কোন কোন ষ্টেশনের এক-একটা কক্ষে মিনার‍্যাল্ ওয়াটার্ (খনিজ জল) প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ রকম মিনার‍্যাল ওয়াটারের স্বাদ সাধারণ জলের মত নহে। পরে দেখিয়াছিলাম, যে, গাড়ীগুলির শৌচ-কক্ষে কাচের পাত্রে জল ও গেলাস আছে। যদি তাহা পানের জন্য অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রাখিবার স্থানের গুণে তাহা পান করিতে ভারতীয়দের প্রবৃত্তি না হইতেও পারে।

গাড়ীগুলিতে অবাধ বায়ু চলাচল হইতেছিল না। সেগুলি বোধ হয় ইউরোপে সম্বৎসর শীতের প্রাদুর্ভাব ধরিয়া লইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমরা গ্রীষ্মাতিশয্যে কষ্ট পাইয়াছিলাম—গাত্রসংলগ্ন সমুদয় পরিচ্ছদ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। বিকাল প্রায় ৫টার সময় একজন বাঙালী সহযাত্রী বাভেনো ষ্টেশনে

নামিয়া গেলেন ; তাঁহাকে আর রেল-গাড়ীর দুঃখ ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার প্রতি এইজন্য ঈর্ষ্যাবোধ হইল। বাভেনো ম্যাগিয়র হ্রদের তীরে অবস্থিত। এই হ্রদ আবার পর্ব্বতের কোলে অবস্থিত। সুতরাং স্থানটি অতি মনোরম। বাভেনো ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে সাড়ী-পরিহিতা দুটি বাঙালী বালিকা ও একটি প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলা অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দিনের চেয়ে রাত্রিতে আমি আরও অধিক অসুবিধা বোধ করিয়াছিলাম। গাড়ীর কক্ষগুলি অতি ক্ষুদ্র ও অবাধ-বায়ু-চলাচলহীন। এক-একটি কক্ষে চুজন করিয়া যাত্রীকে শুইতে হয়—একজন যাত্রীর বেঞ্চির উপরে আর-একজনের বেঞ্চি। শৌচকক্ষের বন্দোবস্ত আমাদের হিন্দু-সংস্কার অনুসারে বড় অশুচি মনে হইয়াছিল। যে-সব ইউরোপীয় ভারতবর্ষে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও স্বীকার করিতে দেখিয়াছি, যে, ভারতে কোন কোন রেলওয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাত্রিকালে ভ্রমণ ইউরোপের রেলে রাত্রিকালে ভ্রমণ অপেক্ষা আরামদায়ক এবং কম স্বাস্থ্যহানিকর। হইতে পারে, যে, এবিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতার কারণ এই, যে, ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল—হয়ত তাহা প্রধানতঃ বা কেবলমাত্র আমাদের জন্য নির্ম্মিত হইলে এত ভাল হইত না। যাহা হউক, আমি এখন কারণের আলোচনা করিতেছি না, কোন কোন বিষয়ে ভারতের রেলগাড়ীর শ্রেষ্ঠতার উল্লেখ করিতেছি মাত্র। এখানে ইহাও কিন্তু বলা উচিত, যে, ইউরোপের কোন শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভারতের রেলগাড়ীর মত ধূলা ও ময়লা নাই।

ট্রেনে প্রায় নিদ্রাহীন অবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে প্যারিস্ পৌঁছিলাম। সেখানে চুঙ্গী আফিসে শুল্ক আদায় প্রভৃতি কথা আগেকার চিঠিতে বলিয়াছি।

ভেনিস্ হইতে প্যারিস্ আসিবার সময় ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কোন কোন অংশের মধ্য দিয়া যায়। এইসকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর ; ইতালী পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার পর লোকদের [illegible] ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর মনে হইতে লাগিল। এই তিন দেশেরই কৃষির অবস্থা ভাল মনে হইল। বস্তুতঃ ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া—কোথাও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের মত সুবিস্তৃত পতিত বা অবহেলিত জমী আমার চোখে পড়ে নাই। আমি যতটা দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র ইউরোপের লোকেরা ভূমির পৃষ্ঠ ও অভ্যন্তর হইতে যত কিছু সম্পদ আহৃত হইতে পারে, তাহা আহরণ করিতে ব্যগ্র ও সমর্থ। আর তাহারা যে কেবল ধনের জন্যই ধন আহরণ করিতে ব্যস্ত তাহা নহে। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা তাহাদের একটি চরিত্রগত গুণ। বিস্তর গরীব লোকদের ঘর-বাড়ীতেও সৌন্দর্য্যের ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্যান, ফলবাগান, শস্যক্ষেত্র, ময়দান, সযত্নে শষ্পাবৃত ভূখণ্ড, অরণ্যানী, পর্ব্বতগাত্র, পতিত জমী—সর্ব্বত্র মানুষের পরিবেষ্টনীকে সুন্দর করিবার ইচ্ছার প্রমাণ রহিয়াছে। ফ্রান্সে অনেক ঢালু ভূখণ্ডে এবং সুইজারল্যাণ্ডের পর্ব্বতগাত্রে যে-সব গ্রাম ও ছোট শহর চোখে পড়িল, তাহা অতি সুন্দর—যেন চিত্রার্পিত। ইউরোপীয়দের দেশ দেখিতে দেখিতে সুশৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ তাহাদের চরিত্রগত বলিয়া অনেকবার মনে হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য দৃশ্য ভীমকান্তের সমাবেশে অতি চমৎকার বলিয়া দেশে থাকিতেই পড়িয়াছিলাম। পড়িয়া যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা ভাল বই মন্দ দেখিলাম বলিয়া মনে হয় নাই। হ্রদ পর্ব্বত ও কল্লোলিনীর একত্র সমাবেশে সুইজারল্যাণ্ডের অনেক দৃশ্য সৌন্দর্য্যে অমতি-ক্রান্ত মনে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে বসিয়া আমরা অনেক সময় সমগ্র ফ্রান্সকে উহার রাজধানী প্যারিসের বৃহত্তর সংস্করণ মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। অবশ্য নানা পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাও ফ্রান্সে আছে; কিন্তু ইংলণ্ডের মত এত বেশী নহে। ইংলণ্ডকে খাদ্য-দ্রব্যের জন্য বিদেশ হইতে আমদানীর উপর যেরূপ বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, ফ্রান্সকে তাহা করিতে হয় না। প্যারিস্

সম্বন্ধেও আমাদের চলিত ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্যারিস্ আমোদপ্রিয় ও ফ্যাশনেব্‌ল্ বটে ;—সন্ধ্যা যতই নিশীথের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং নিশীথ রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া উষার আগমন যতই আসন্ন হইতে থাকে, তত অধিক সংখ্যায় আমোদলিপ্সুরা প্যারিসের রাস্তায়, কাফেতে ও রেস্তর্যাঁয় ভীড় বাড়াইতে থাকে বটে। এবং অন্য দেশের চেয়ে প্যারিসের সকল শ্রেণীর নারীরা আধুনিক ফ্যাশন-অনুযায়ী পরিচ্ছদ পরিহিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্যারিস্-জীবনের আর-একটা দিক্ আছে। সেখানে মন-প্রাণ দিয়া কাজ করিবার লোক আছে; সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নানাভাষাবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী প্রভৃতির অভাব সেখানে নাই। লীগ অব্ নেশ্যান্স অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইন্‌ষ্টিটিউট্ ফর্ ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইণ্টেলেক্‌চুয়্যাল কো-অপারেশ্যান (জগতের সকল জাতির মধ্যে জ্ঞানাহরণ ও বিস্তারাদি বিষয়ে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠান) যে প্যারিসেই স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ফ্রান্সের আন্তরিক জ্ঞান-পিপাসা এবং নূতন ভাব ও চিন্তার প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি ১৯শে আগষ্ট প্রাতঃকালে প্যারিস্ পৌঁছি। সে-দিন অসুস্থতা-প্রযুক্ত শহর দেখিতে বাহির হইতে পারি নাই। অসুস্থতার কারণ বহুবিধ। ট্রেনে নানা অসুবিধা হইয়াছিল, কণ্ডাক্টারের দুর্ব্যবহারে মনটা খারাপ ছিল, ভোজনের গাড়ীতে যাওয়া সত্ত্বেও প্রায় অভুক্তই ছিলাম, নিদ্রাও হয় নাই। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া চুঙ্গী আফিসে অনেক দেরী হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে একটি ভারতীয় ভদ্রলোকের বাসায়, একটি হোটেলে ও পরে অন্য এক হোটেলে যাইতে হয়। প্রায় দুপর একটার সময় আমি হাত মুখ ধুইতে পারিয়াছিলাম। যাহা হউক, তাহার পরবর্ত্তী দু তিন দিনে আমি প্যারিসের প্রধান প্রধান কিছু দ্রষ্টব্য দেখিতে পারিয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, প্যারিস্ খুব সুন্দর শহর। রাস্তাগুলি চৌড়া ও পরিষ্কার। অনেক রাস্তার দুধারে গাছের সারি এবং চৌমাথায় বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিসমষ্টি তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। ইহাও আমাকে কিন্তু বলিতে হইতেছে, অট্টালিকার অনেকগুলিই একঘেয়ে মনে হইয়াছিল। স্থাপত্যবৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করিয়াছিলাম।

প্যারিসের রাস্তায় দেখিলাম, পুরুষ ও নারী, অল্পবয়স্ক কিম্বা অধিকবয়স্ক, সকলেই জোরে জোরে হাঁটিতেছে। এটা আমার ভুল ধারণা কিম্বা অমূলক কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের রাস্তায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ পথিক দেখিবার পর আমার বোধ হইয়াছিল, যে, প্যারিসের পথিকেরা লণ্ডনের পথিকদের চেয়ে হয় বেশী বলিষ্ঠ, কিম্বা বেশী চঞ্চল, কিম্বা বেশী ব্যস্ত, কিম্বা বেশী দ্রুত-গতি। এই প্রভেদটা সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, একটা বিষয়ে আমার ধারণা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইউরোপের সর্ব্বত্র, যেখানে যেখানে গিয়াছি, দেখিয়াছি, বালক বালিকা, পুরুষ নারী আমাদের দেশের পুরুষ নারী বালক বালিকাদের চেয়ে অনেক বেশী পুষ্ট এবং সাধারণতঃ প্রফুল্লচিত্ত। অষ্ট্রিয়া দেশের রাজধানী ভিয়েনায় আমি প্রথম অল্প আপেক্ষিক দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখি; কিন্তু তথাকার পক্ষেও আমার ঐ মন্তব্য সত্য। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেমন শীর্ণ, কৃশ, পাতলা শরীর, এবং দুঃখপীড়িত, বিমর্ষ মুখ অনেক দেখা যায়, ইউরোপের কোথাও তেমন দেখি নাই। ইউরোপ ও ভারতবর্ষের এই পার্থক্যের কোন কোন কারণ আমরা সবাই জানি। কিন্তু এইরূপ অবস্থার সমুদয় দোষ বিদেশীদের স্কন্ধে না চাপাইয়া, আমরা নিজেদের দোষ যতটুকু, তাহা যেন স্বীকার করি, এবং এই অবস্থা যাহাতে শীঘ্র অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়, তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা করি।

দুটি ভারতীয় ছাত্র আমাকে প্যারিস্ দেখিতে বিশেষ সাহায্য করেন। আমি কি কি দেখিলাম, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিব না, দর্শকদের জন্য লিখিত পুস্তক হইতে কোন অংশ নকল করিয়াও দিব না। দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য মাত্র করিব।

কোনও দেশের নদী হ্রদ পর্ব্বতাদির দৈর্ঘ্য বিশালতা উচ্চতাদি অপেক্ষা তাহাদের সহিত মানুষের ইতিহাস কাব্য ধর্ম্মসাধনাদির সম্পর্ক তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ, স্মরণীয়

বা মনোরম করে। এই সত্যের দৃষ্টান্ত আমি পরে কেম্ব্রিজের ক্যাম নদীতে পাইয়াছিলাম। প্যারিস্ পৌছিবার আগে এবং প্যারিসে সেতুর উপর দিয়া পার হইবার সময় যখন আমি সীন নদী দেখিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম উহা কত ছোট নদী। অথচ উহা শুধু ভূগোলে উল্লিখিত নহে, ঐতিহাসিক ও অন্য কারণেও প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। বাঙালী কবি গর্ব্বের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?" হিমালয় পর্ব্বতমালা যদি কেবল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হইত, তাহা হইলে তিনি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন কি না সন্দেহ। হিমালয় ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মসাধনার, আধ্যাত্মিকতার, কাব্যের এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস ও কিম্বদন্তীতে উচ্চ ও স্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই এরূপ প্রশ্নের সার্থকতা আছে এবং উহা আমাদের গৌরবের বিষয় হইয়া আছে।

প্যারিসের নানাস্থানে খোলা জায়গায় যে-সব মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল বল ও কর্ম্মশক্তি, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তাহার প্রকাশ এবং সংঘর্ষ ও সংগ্রামে অন্যের উপর জয়লাভ ফরাসী জাতির হৃদয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও অনেক শহরের প্রকাশ্যস্থানে যে-সব মূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিলেও তথাকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ঐ কথাই মনে হয়। কোনও প্রসিদ্ধ কবির মূর্ত্তি গড়িবার সময় অবশ্য ইউরোপের ভাস্কর তাহার হাতে তরবারি দিবেন না, কিন্তু অন্য অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির মূর্ত্তিতে এবং কল্পিত মূর্ত্তি বা মূর্ত্তিসমষ্টিতে শক্তির প্রকাশ এবং শক্তির দ্বারা অপরের উপর জয়লাভ ব্যঞ্জিত করা শিল্পীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে ও ভারতীয় উপনিবেশসমূহে অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুমূর্ত্তিতে আত্মস্থ ও ধ্যানের আনন্দের যে প্রকাশ লক্ষিত হয়, ইউরোপীয় মূর্ত্তিশিল্পে তাহা বিরল। বস্তুতঃ ইউরোপ-আমেরিকায় তাহা দেখিবার আশা কেহ করে না। নারী ও পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ পরিস্ফুট করাও অনেক মূর্ত্তিকারের লক্ষ্যীভূত। প্যারিসেও এরূপ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের সমকক্ষতা কেহ করিতে পারে নাই। গ্রীসের মূর্ত্তিতে যে সংযম লক্ষিত হয়, প্যারিসের অনেক মূর্ত্তিতে তাহা নাই।

প্যারিসে চিত্র এবং প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় লুভ্র্ (Louvre) নামক মিউজিয়মে। এখানে নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বহুসংখ্যক চিত্র ও মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। যতটা মনে পড়িতেছে, এগুলি আধুনিক নহে। সংগ্রহকার্য্য সকল স্থলে সাধু উপায়ে সম্পন্ন হয় নাই। ব্যক্তির পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেম্‌নি, প্রতারণা ও দস্যুতা ধনশালী হইবার অন্যতম প্রধান উপায়। প্যারিসের বৈভব বাড়াইবার জন্য নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি অনেক দেশ লুণ্ঠন করেন। লুভরে অন্যদেশ হইতে বাহুবলে আনীত অনেক অমূল্য চিত্র ও মূর্ত্তি আছে। এখানে খুব বড় বড় অনেক তৈলচিত্র আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহাদের চেয়ে আমার মনে পড়িতেছে লেনার্ডো ডা ভিঞ্চির আঁকা মোনা লিসার ছবিটি। ইহা আনুমানিক তিন ফুট লম্বা ও দুই কিম্বা আড়াই ফুট চওড়া। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা অপহৃত হইয়াছিল; তাহার পর আবার পাওয়া গিয়াছে। ইহার খ্যাতি ও নানা প্রতিলিপি হইতে ইহা যেরূপ সুন্দর হইবে মনে করিয়াছিলাম, সেইরূপই দেখিলাম। একজন চিত্রকর ইহার একটি নকল প্রস্তুত করিতেছে দেখিলাম। প্রস্তরমূর্ত্তি সকলের মধ্যে আমি এখানে মাইলোর ভীনাস্ দেবীর প্রাচীন গ্রীক মূর্ত্তি দেখিলাম। উহা উহার খ্যাতির উপযুক্ত মনে হইল না। ইহা সুন্দর নারীদেহের চরম আদর্শ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আমার তাহা মনে হইল না। কল্পিত প্রস্তরমূর্ত্তিতে ব্যক্ত উহা অপেক্ষা নারীসৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্টতর আদর্শ আমি দেখিয়াছি মনে হইল।

বিশালতা ও শক্তির ব্যঞ্জনা হিসাবে, লুভরে দৃষ্ট মূর্ত্তিসমষ্টির মধ্যে, আমার স্মৃতিপটে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে রোমের টাইবার নদের কল্পিত মূর্ত্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক মূর্ত্তিনিচয়।

লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদের নিকটস্থ অন্য একটি মিউজিয়মেও অনেক চিত্র ও মূর্ত্তি আছে। ইহার সমস্তই আধুনিক, অর্থাৎ প্রাচীন বা মধ্যযুগের নহে। এই মিউজিয়মের

কতকগুলি চিত্র ও মূর্ত্তি ভাল। কেবলমাত্র নগ্নতার জন্যই চিত্রে ও মূর্ত্তিতে আমি নগ্নতার বিরোধী নহি। যাহা নগ্ন তাহাই অশ্লীল বা দুর্নীতির পরিপোষক বা কুৎসিত নহে। যে চিত্র বা মূর্ত্তিতে নগ্ন মানবদেহের দ্বারা কোন মহৎ আদর্শ, চিন্তা, ভাব, বা নির্ম্মল রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে, অথবা যাহাতে পুরুষ বা নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য লালসার উদ্রেক না করিয়া সংযত ভাবে দেখান হইয়াছে, তাহার নগ্নত নিন্দনীয় নহে। কিন্তু লুক্সেম্বুর্গ মিউজিয়মে এমন কয়েকটি নগ্ন মূর্ত্তি দেখিলাম, যাহাদের অস্বাভাবিক ভঙ্গী বিরক্তিজনক। তাহাদের মধ্যে কোন মহৎ আদর্শ, চিন্তা বা ভাবের বা নির্ম্মল রসের ব্যঞ্জনা নাই। দৈহিক সৌন্দর্য্যও নাই। ওরূপ চিত্র ও মূর্ত্তি কোথাও রক্ষিত বা প্রদর্শিত হইবার উপযুক্ত নহে।

এখানে শুধু প্যারিসের বা ফরাসীদের নিন্দা করিলে অন্যায় হইবে। ইউরোপের অন্যত্রও অকারণ ও অনাবশ্যক নগ্নতা অনেক চিত্র ও মূর্ত্তিতে দেখা যায়।

যে মিউজিয়মে বিখ্যাত শিল্পী রদ্যাঁ (Rodin) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল রক্ষিত আছে, তাহা দর্শন-যোগ্য; দেখিলে সময়ের সদ্ব্যয় হয়, অপব্যয় হয় না। রদ্যাঁ বাস্তবিকই একজন খুব প্রতিভাবান্ ও সাহসী শিল্পী ছিলেন। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে অসম্পূর্ণ বলি, রদ্যাঁর সমুদয় মূর্ত্তিই তাই। অর্থাৎ মূর্ত্তি বা মূর্ত্তিসমষ্টি তিনি আপাদমস্তক খোদিত করেন নাই। তিনি যে ভাব, রস বা অন্য কিছু ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার ব্যঞ্জনার জন্য যতটুকু পাথর খোদা দরকার, ততটুকু খুঁদিয়া বাকী প্রস্তরখণ্ড অকর্ত্তিত বা অখোদিত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত মূর্ত্তিগুলির নগ্নতা অনেকস্থলে সাহসের পরিচায়ক, কিন্তু বিরক্তিজনক বা অশ্লীল নহে। তবে একথাও বলা দরকার, যে, শিল্পীর অভিপ্রেতভাবে তৎসমুদয় উপভোগ করিয়া উপকৃত হইতে হইলে তদনুরূপ সাধনা ও সংযমের আবশ্যক।

ফ্রান্সের জাতীয় পুস্তকালয় বিব্লিওথেক্ নাশিয়োনাল্ও আমি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দেখা সবই প্রায় ভাসা-ভাসা রকমের—তাড়াতাড়ি যাহা হয় সেইরূপ। এখানে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত একটি পুঁথি দেখিতে পাইয়াছেন, যাহার নাম ভারতবর্ষে জানা আছে,কিন্তু যাহার একখণ্ডও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। তিনি আরও কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি এই ফরাসী গ্রন্থগারে দেখিতে পাইয়াছেন, যাহাদের নাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জানা নাই। ইহার কোন-কোনটির সমুদয় পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ তাঁহার জন্য লইবার ফরমাইস তিনি ঐ গ্রন্থাগারে দিয়াছেন। এখানকার পাঠাগারে পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক বিদ্যার্থী ও গবেষককে অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিলাম। আমোদপ্রিয় সুখলিপ্সু ফ্যাশনেবল্ প্যারিসে থাকিয়াও ইঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। আমার বোধ হয় না, যে, ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারে এতগুলি একাগ্র বিদ্যার্থীকে কোন এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্যারিসের যে-অংশে উহার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, সেখানেও গিয়াছিলাম। সেতুর উপর দিয়া সীননদী পার হইবার সময় বাম দিকে নোতর্ দাম্ (Notre Dame) নামক ইতিহাসপ্রথিত গির্জ্জার চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির বাহিরটাই দেখিয়াছি। উহার অধ্যয়ন অধ্যাপন পঠন পাঠন গবেষণাদির বিষয় ভাল করিয়া জানিতে হইলে যত সময় দেওয়া দরকার, তাহা আমার ছিল না। তবে প্যারিসে আমাদের বাঙালী বিদ্যার্থীরা কেহ কেহ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সব খবর জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রু দ্যু সোমেরার্ নামক রাস্তার যে ১৭নং বাড়ীতে থাকিতেন এবং যেখানে ভারতীয় ছাত্রদের সমিতি আছে, তাহাও দেখিয়া আসিলাম। এখনও ঐ বাড়ীতে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য একটি বাড়ীতে শ্রীমান্ বিমলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ছাত্রেরা থাকেন। ভারতবর্ষের যত ছাত্র ইউরোপে শিক্ষালাভ করিতে যান, তাহার অধিকাংশ বিলাত যাইয়া থাকেন। তাহার কারণ নানাবিধ।

বিলাতের ভাষা ইংরেজী আমাদের ছাত্রদের আগে হইতেই জানা থাকে; কিন্তু ইউরোপের অন্যদেশে গেলে তথাকার ভাষা শিখিতে সময় লাগে, যদিও তাহা বেশী নয়। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি থাকিলে অনেক রকম সরকারী চাকরী পাইবার সুবিধা হয়; ইউরোপ মহাদেশের অন্যদেশের উচ্চতম ও উৎকৃষ্টতর উপাধি থাকিলেও অনেক সময় ঐসকল চাকরী সহজে পাওয়া যায় না। ব্যারিষ্টারও ইউরোপের অন্য কোন দেশে গিয়া বিদ্যালাভ করিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া চিকিৎসাদি স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে চান, কিম্বা এরূপ কোন-না-কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চান অর্থোপার্জ্জন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের মত বিদ্যার্থীদের আরও অধিক সংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের নানা দেশে যাওয়া ভাল। তথায় শিক্ষাও ভাল হয়, এবং খরচও বিলাত অপেক্ষা কম। আগেই বলিয়াছি, এইসব দেশের ভাষা শিখিতে বেশী দেরী হয় না। অবশ্য অল্পবয়স্ক বালকদিগকে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে না পাঠানই ভাল। কেবল সেইসকল যুবকদেরই শিক্ষালাভার্থ বিদেশ-যাত্রা বাঞ্ছনীয় যাঁহারা চরিত্রবল অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের বিচার-শক্তি কতকটা পরিপক্ব হইয়াছে।

আমি প্যারিসে অবগত হইলাম, যে, তথায় একটি ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপনের কল্পনা হইতেছে। তাহাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের বাস ও আহারের ব্যবস্থা থাকিবে, একটি লাইব্রেরী থাকিবে, ব্যায়ামশালা থাকিবে, এবং সভাসমিতির জন্য একটি হল থাকিবে। প্যারিসে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের বিদ্যোৎসাহী ধনীরা ইহার জন্য টাকা দিলে সুবিধা হইবে। ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষা ও বিলাতের শিক্ষা আমাদিগকে কেবলমাত্র ইংরেজের চোখ দিয়া বিশ্বব্যাপার দেখিতে অভ্যস্ত করিয়াছে। ইউরোপের অন্য জাতিদের এবং আমাদের নিজের চোখ দিয়াও জগৎকে দেখা দরকার। ইউরোপের নানা দেশে শিক্ষালাভ সুলভ হইলে এই উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইবে।

প্যারিসে প্রায় দেড়শত জন ভারতীয় বণিক মণিমুক্তার ব্যবসা করেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই সুরাটের লোক ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী। মহাযুদ্ধের আগে এই ব্যবসাটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হাতে ছিল। আরবরা পারস্য উপসাগর প্রভৃতি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিত। এখন কিন্তু আরবেরা নিজেই সাক্ষাৎভাবে মণিমুক্তাক্রয়ার্থী ফরাসীদিগের সহিত ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় কারবার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

একমাত্র জৈনেরাই অহিংসাধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় পালন করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদের মতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইলেও সিংহলে শুনিয়াছি তাঁহাদের গোমাংস শূকরমাংস প্রভৃতি খাইতে কোন বাধা নাই। প্যারিসের জৈন বণিকেরা বিদেশেও তাঁহাদের খাদ্য পরিবর্ত্তন করেন নাই। ঘৃত আটা প্রভৃতি তাঁহাদের ভোজ্য দ্রব্য বহু ব্যয়ে ভারতবর্ষ হইতে আনীত হয়। পাচকেরাও ভারতবর্ষ হইতে আনীত। তাহারা প্যারিসে দু-এক বৎসর মাত্র থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসে; তাহাদের জায়গায় তখন অন্য লোক আনিতে হয়। তাহাদিগকে থাকিবার জায়গা ও আহার ছাড়া জন প্রতি মাসিক এক শত দেড় শত টাকা বেতন দিতে হয়। এই বেতন দেশে তাহাদের পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়। শুনিলাম, জৈন বণিকেরা কেহ কেহ কখন কখন তাঁহাদের গৃহিণীদিগকেও প্যারিসে আনিয়া থাকেন। কিন্তু শীতের দেশে তাঁহাদের যেরূপ গরম পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করা উচিত, রক্ষণশীলতা বশতঃ তাহা করেন না বলিয়া, শুনিলাম তাঁহাদের কাহারও কাহারও অকালমৃত্যু ঘটে। বাল্যকালে বিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব অনেক সময় তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

প্যারিসের দুটি মহারাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী নানা বিষয়ে (প্রধানতঃ লীগ অব্ নেশনস্ সম্বন্ধে) আমার মতামত জানিয়া তাহা খবরের কাগজে ছাপিবার জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। একজন প্যারিসের বিখ্যাত কাগজ ল্য মাত্যাঁ (Le Matin) এবং অন্য জন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেলের অনুরোধে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তখনও জেনীভা যাই নাই বলিয়া, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে কথা

বলিলাম বটে, কিন্তু কিছু ছাপিবার সম্মতি দিলাম না। তাঁহাদের একজন প্যারিসে আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কেহ হাসিবেন, কেহ বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে হাসিবার বা বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমরা যে-সব পুঁথি আদর করিয়া সযত্নে নিজের দেশে রাখিতে জানি না, বিদেশীরা তাহার অনেকগুলি ক্রয় করিয়া নিজেদের দেশে গ্রন্থাগারে রক্ষা করে। এই মহারাষ্ট্রীয় যুবকটি কর্দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ-সংগ্রহে (Cordier Collection) গবেষণা করিতেছেন। উহা ডাক্তার কর্দিয়ে নামক এক বিদ্যোৎসাহী ফরাসী ভদ্রলোক নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের জাতিকে দান করিয়া যান। মহারাষ্ট্রীয় যুবকটি আমাকে বলিলেন, তিনি এই গ্রন্থাগারে এমন কোন কোন আয়ুর্বৈদিক পুঁথি পাইয়াছেন, যাহা ভারতবর্ষে অজ্ঞাত।

এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যপুস্তক-বিক্রেতা পল্ গোয়েথ্‌নারের পুস্তকের দোকান দর্শন উল্লেখযোগ্য। এই দোকানটি একটি সাদাসিধা পুরাতন বাড়ীর উপরের তলায় অবস্থিত। ইহাতে ভারতবর্ষ, মিশর, আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ ও তাহাদের ভাষা সাহিত্য নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক বিস্তর পুস্তক বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। ইহার নাম প্রাচ্য পুস্তকালয় হইলেও মেক্সিকো প্রভৃতি আমেরিকান্ দেশের প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহিও এখানে আছে। ইহাই প্যারিসের একমাত্র বা প্রধান প্রাচ্য পুস্তকালয় কি না, বলিতে পারি না। যদি ইহা প্যারিসের একমাত্র বা প্রধান প্রাচ্য পুস্তকালয় হয়, তাহা হইলেও তুলনায় আমাদের গৌরববৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ ভারতবর্ষের কোন শহরে এই রকমের একটিও দোকান নাই, যাহাতে কেবলমাত্র সর্ব্ববিধ প্রাচ্য ও প্রাচীন আমেরিকা বিষয়ক পুস্তক রাখা হয়, কিম্বা যেখানে অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে ঐরূপ সমুদয় বহি বিক্রী হয়।

ইউরোপের হোটেলাদির খবর আগে হইতে জানা থাকিলে খরচ বেশী হয় না। নতুবা অনভিজ্ঞতা বশতঃ খরচ অনেক বেশী হয়। ইহা বুঝাইবার জন্য আমার অভিজ্ঞতা কিছু বলিতেছি। তাহা পড়িয়া হয়ত অনেক ইউরোপ দর্শনার্থী আগে হইতে খবর লইতে পারিবেন। প্যারিসেই আমি প্রথম ইউরোপীয় হোটেলে বাস করি। জাহাজে ইউরোপীয় আহার্য্য দ্রব্য ও আহার, স্নান, নিদ্রা প্রভৃতির রীতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু জাহাজের কক্ষে হোটেলের কামরার আরামের ব্যবস্থা ছিল না। ইউরোপের মাঝারী রকমের হোটেল-গুলিও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং উহার অনেক আসবাব এবং আরামের উপায় আমাদের দেশের অনেক ধনীর বাড়ীতেও দৃষ্ট হয় না। পরিচ্ছন্নতা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইউরোপের অনেক হোটেলের বিলাস-ব্যবস্থায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। অধিকাংশ খাদ্যও আমি খাইতাম না। তথাপি অবস্থাগতিকে কয়েক জায়গায় আমাকে দৈনিক ৩, ৩।০, ৪ পাউণ্ড খরচ দিতে হইয়াছে। আমার পুনর্ব্বার ইউরোপ যাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গেলে, এবারকার অভিজ্ঞতাবশতঃ, অনেক জায়গায় আমার হোটেলের ব্যয় এবারের অর্দ্ধেক ত নিশ্চয়ই হইবে, আরও কমও হইতে পারে। আমাদের অবস্থার উপযোগী ভাল হোটেল সস্তায় সর্ব্বত্র অনেক পাওয়া যায়। প্যারিসে আমি দুবার যাই। প্রথমবারে যে-হোটেলে ছিলাম, তাহাতে তিন দিনে প্রায় ছয় পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। জেনীভায় ইহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম খরচ হইত। বার্লিন, ড্রেস্‌ডেন, প্রাগ ও ভিয়েনায় প্যারিস অপেক্ষা খুব বেশী খরচ দিতে হইয়াছে। অথচ জেনীভার ক্ষুদ্র হোটেলটিতেই আমার খাওয়া-দাওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। অপেক্ষাকৃত বলিতেছি এই-জন্য, যে, যাইবার ও আসিবার জাহাজে এবং কোনও হোটেলে আমার ক্ষুধাবোধ ও আহারে রুচি বেশী দিনই হইত না, কর্ত্তব্যবোধে আহার করিতাম মাত্র। জেনীভায় উক্ত হোটেলটিতে রান্নার জন্য মাখন ব্যবহার হয়; অন্যত্র শুনিয়াছি নিরামিষ খাদ্য পাকের জন্যও চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রথমবারে প্যারিসে যে-হোটেলটিতে ছিলাম, সেখানে হোটেলওয়ালা আমার কুড়ি পাউণ্ডের চেক্ ভাঙাইতে লইয়া যত ফরাসীমুদ্রা ফ্র্যাঙ্ক আমাকে দিয়াছিল, তাহাতে আমাকে প্রায় এক পাউণ্ড অর্থাৎ তের চৌদ্দ টাকা

ঠকিতে হয়। ঐ ব্যক্তি বাকী ফ্রাঙ্ক দিবে বলিয়াছিল, কিন্তু শেষ হিসাব হইবার ও আমার প্যারিস্ ছাড়িয়া লণ্ডন যাইবার পূর্ব্বেই সে কিছুদিনের জন্য বাড়ী চলিয়া যায়।

—

নিঃসঙ্গ অবস্থা ও নির্জ্জন কারাবাস

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে আমি জেনীভায় পীড়িত হইয়া পড়ি। আরোগ্যলাভ করিবার পরেই ডাক্তার আমাকে শীতকালে ইউরোপে না থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে আমি একটি ফরাসী জাহাজে ফ্রান্স হইতে সিংহলের রাজধানী কলম্বো পর্য্যন্ত আসি। ফরাসী জাহাজ, তাহার কোন কোন যাত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরে প্রবাসীতে আমার চিঠির মধ্যে দেখিতে পাইবেন। এখন কেবল একটি বিষয়ে কিছু বলিব।

আমি যে-জাহাজে আসিয়াছি তাহার নাম আমাজোন (Amazone)। মার্সেয়ী বন্দরে আসিয়া জাহাজে উঠিয়া শুনিলাম, উহাতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ভারতীয় যাত্রী নাই। আম রোগের পর দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ নামক যে বাঙালী বিদ্যার্থী যুবক জেনীভা হইতে আমার সঙ্গে আমাকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি ফ্রেঞ্চ জানেন। তিনি জাহাজের ভোজন-হলের অধ্যক্ষের নিকট যাত্রীর তালিকা দেখিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন। ঐ কর্ম্মচারীও আগেই তাহা বলিয়াছিলেন। জাহাজ বন্দর ছাড়িবার পরদিন বল্‌সারা নামক একজন পারসী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং ঐ শ্রেণীতে তাঁহার কক্ষে অন্ধ্রদেশের গুণ্টুর নিবাসী একজন যুবক আছেন; তিনি অক্সফোর্ডে উপাধি লাভের পর দেশে ফিরিতেছেন। আর প্রায় সব যাত্রীই ফরাসী, কয়েকজন মিশ্র-ফরাসীও ছিলেন। ইংরেজ ও অন্য জাতীয় তিন চারি জন ছিলেন। সামান্য ইংরেজীও বলিতে পারেন, মোটের উপর এরূপ লোক যাত্রীদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচ জনের বেশী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আবিষ্কার করিবার সোজা উপায় ছিল না। যাঁহারা আমার সহিত ইংরেজী দুই চারিটা কথা বলিতেন, তাহা সৌজন্য বা দয়া বশতঃ বলিতেছেন, মনে হইত। এইজন্য আমি নিজে উদ্যোগী হইয়া ঐরূপ কাহারও সহিতও কথা বলিতে সাতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিতাম। তখন সদ্য রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছি; আবার ব্যারাম হইবার আশঙ্কা আমাকে নিত্য পীড়া দিত। অন্য উদ্বেগও ছিল। এ অবস্থায় সঙ্গীহীন থাকা আমার পক্ষে বড় ক্লেশকর বোধ হইত। সুতরাং দুইজন ভারতীয় যুবকের সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে আহ্লাদ এক দিন মাত্র ছিল। জাহাজের কণ্ট্রোলারের সহিত পারসী যুবক বল্‌সারার কিছু কাজ থাকায় তিনি ও আমি ঐ কর্ম্মচারীর কামরায় গিয়াছিলাম। কণ্ট্রোলার ইংরেজী বলিতে পারেন। বল্‌সারার কাজ হইয়া যাইবার পর তিনি কামরার বাহিরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কেন অপেক্ষা করিতেছেন। বল্‌সারা বলিলেন, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন ঐ কর্ম্মচারী রূঢ় ভাবে বলিল, "তুমি তৃতীয় শ্রেণীর লোক, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে তোমার কোন-সম্পর্ক নাই।" বল্‌সারা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি উঁহার (অর্থাৎ আমার) সঙ্গে কথা বলিতেও পারি না?" কণ্ট্রোলার আবার কর্কশভাবে বলিল, "না না, তুমি তৃতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে তুমি কথা বলিতেও পার না।" এই অদ্ভুত ও অভদ্র নিয়মনির্দ্দেশে আমরা উভয়েই ব্যথিত ও অপমানিত বোধ করি, কিন্তু সাম্য-মৈত্রীর ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ফরাসী জাতির এই মানুষটির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানা ব্যতীত উপায় ছিল না বলিয়া তাহার পর হইতে স্বদেশবাসীর সহিত আমার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল।

তখন হইতে দিনের বেলা অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া জাহাজের ডেকে বসিয়া থাকিতাম। কখন কখন বেড়াইতাম। পড়িবার চেষ্টাও করিতাম; কিন্তু দুর্ব্বলতা ও নানাবিধ উদ্বেগ বশতঃ মন বসিত না। বেকন বলিয়াছেন, A great city is a great desert, বড় সহর বৃহৎ

মরুভূমির মত। জাহাজে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিলে জাহাজকেও মরুভূমি বলা যাইতে পারে।

নির্জ্জন কারাবাস যে কিরূপ নিষ্ঠুর দণ্ড, জাহাজে সঙ্গীহীন অবস্থায়, তাহা বারবার উপলব্ধি করিয়াছি। যাঁহারা সাধনার জন্য একাকী নির্জ্জন গিরিগুহায় বা অরণ্যে দীর্ঘকাল যাপন করেন, তাঁহাদের নির্জ্জনতা স্বেচ্ছাকৃত এবং মানসিক বল অসামান্য; সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। নির্জ্জনতা তাঁহাদিগকে পীড়া দেয় না, বরং তাহা তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের সহায় হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদের পক্ষে, বিশেষতঃ যখন তাহারা রোগে দুর্ব্বল, তাহাদের অনিচ্ছা-জাত নির্জ্জনতা বড় কষ্টকর।

বাংলাদেশের যে-সকল ব্যক্তি বিনা বিচারে বাংলাদেশ হইতে দূরে রাজবন্দী হইয়া আছেন এবং বোধ হয় যাঁহাদের প্রত্যেককেই কোন-না-কোন সময়ে দিনের পর দিন একা থাকিতে হইয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা আমি জাহাজে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বারবার উপলব্ধি করিয়াছি। তাঁহাদিগকে যে ইংরেজ সরকার মুক্তি দিতেছেন না, তাঁহাদের প্রকাশ্য বিচারও করিতেছেন না, ইহা সাতিশয় নিন্দনীয় ব্যবহার। ইউরোপে মুসোলিনী ও অন্য কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির জুলুমের নিন্দা আমরা করিয়া থাকি, তাহা করা অন্যায়ও নহে; কিন্তু স্বদেশে রাজনৈতিক সন্দেহে যাঁহারা উৎপীড়িত হইতেছেন, তাঁহাদের দুঃখের কথা যেন আমরা একদিনও বিস্মৃত হইয়া না থাকি। তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের না থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা যে কেবলমাত্র আইনের রাজত্বের অধীন নহি, জুলুমের রাজত্বও এদেশে খুব আছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বদা অনুভব করিলে আমাদের স্বাধীন হইবার ইচ্ছা প্রবলতর হইতে পারে এবং স্বাধীনতা লাভের উপায়ও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

—

অস্পৃশ্যতা ও "অবাচ্যতা"

ভারতবর্ষে কোন কোন জাতির লোক অস্পৃশ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। কাহাকেও অস্পৃশ্য বিবেচনা করিলে তাহার প্রতি যে ঘোরতর অবজ্ঞা সূচিত হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক অবজ্ঞাসূচক বিশ্বাস ও আচরণ ভারতবর্ষে আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোন কোন জাতির ছায়া মাড়াইলেও ব্রাহ্মণেরা অশুদ্ধ হয়, কোন কোন জাতি ব্রাহ্মণদের একশত বা পঞ্চাশ গজ অপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে না। অন্য কোন কোন জাতির দৃষ্টি ব্রাহ্মণদের আহারের সময় ভোজ্য বস্তুর উপর পড়িলে তাহা অখাদ্য হইয়া যায়।

এই প্রকার সমুদয় বিশ্বাস ও রীতির নিন্দা ভারতীয় সংস্কারকেরা ও ইউরোপীয়েরা করিয়া থাকেন। তাহা অন্যায় নহে।

ইতালীয় জাহাজে ইউরোপ যাইবার সময় আমি অনুভব করি, যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। তাহাদের থাকিবার কামরা, ডেক্, খাইবার ঘর, খাইবার ব্যবস্থা, প্রভৃতি আলাদা হইবারই কথা। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ডেকে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা করিলে তাহাও রীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হয়। উপরে দেখাইয়াছি, আমাজোন নামক ফ্রেঞ্চ জাহাজের কণ্ট্রোলারের মতে তৃতীয় শ্রেণীর ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পরস্পরের সহিত কথা কহা অবৈধ; তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রথম-শ্রেণীর যাত্রীদের অস্পৃশ্য না হইলেও "অবাচ্য"; অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। অবশ্য কেহ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া প্রথম শ্রেণীর সব সুবিধা ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; কিন্তু প্রয়োজন হইলে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেও পারিবে না, ইহা বড় উৎকট নিয়ম। রেলওয়ের প্লাটফর্ম সকল শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষেই এক, এবং টাকা দিয়া সকল শ্রেণীর যাত্রীই ভোজনগাড়ীতে (dining carএ) গিয়া খাইতে পারে।

বল্‌সারা নামক যে পারসী যুবকটি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সমাজে তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা আমাদের সমাজে আমার সামাজিক মর্য্যাদা অপেক্ষা কম নহে; আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল বলিয়া প্রথম শ্রেণীতে আসিতেছিলাম, এই যা প্রভেদ। তাঁহার পিতা বোম্বাইয়ের একটি জেলার সিবিল্ সার্জ্জন্। অবশ্য সামাজিক

মর্য্যাদা ও আর্থিক অবস্থার পার্থক্য থাকিলেই যে অস্পৃশ্যতা, অদর্শনীয়তা, "অবাচ্যতা" প্রভৃতির সৃষ্টি ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত হইবে, এমন নয়!

—

জাহাজে স্বদেশবাসীর সঙ্গের বাঞ্ছনীয়তা

ইউরোপে থাকিবার সময় ভারতীয় ও ইউরোপীয় কাগজে কখন কখন ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষের সংবাদ পড়িয়া ব্যথিত হইতাম। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় যখন জাহাজে কোন সঙ্গী ছিল না, তখন কতবার ভাবিয়াছি, এই সময় হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে একজন কোন স্বদেশবাসী নিকটে থাকিলে কতই আনন্দ অনুভব করিতাম। মনে মনে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, দেশে থাকিতে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী যে যে বাঙালীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমালোচনা করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গ ভাল লাগিত কি না; বুঝিতে পারিয়াছি, ভাল লাগিত।

ইউরোপ ছাড়িয়া আসিবার পর পোর্টসৈয়দ, জিবুটি, এডেন প্রভৃতি বন্দরে জাহাজ থামিলেই অনেক ব্যবসায়ী নানা রকম জিনিষ বিক্রী করিবার জন্য জাহাজে উঠে। আসিবার সময় একটি বন্দরে দুজন মুসলমান গালিচা বিক্রয় করিবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। তাহার মধ্যে যুবকটি আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলিলেন। জানিলাম তিনি ভারতীয়, বোম্বাই অঞ্চলে বাড়ী। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেন ফরাসী জাহাজে আসিলাম, বিলাতী জাহাজে ত বিস্তর ভারতীয়ের সঙ্গ পাইতাম। আমি কারণ বলিলাম। তাহার পর প্রৌঢ় মুসলমানটি আমার সঙ্গে উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনিই বোধ হয় কারবারের মালিক। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারও বাড়ী বোম্বাই অঞ্চলে, তের বৎসর দেশ-ছাড়া। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যান কি না জানিতে চাওয়ায় বলিলেন, বোম্বাইয়ে বাপ মা উভয়েই মারা পড়িয়াছেন, বিবাহ এই বিদেশেই করিয়াছেন, সন্তানাদি এখানেই হইয়াছে, বোম্বাই যাওয়া আর হয় না; তা ছাড়া, ইংরেজ সেখানেও মালিক, এখানেও মালিক, দেশে গিয়া বিশেষ লাভ বা সুখ কি আছে?

জাহাজে এই দুজন ভারতীয়ের সঙ্গে অতি সাধারণ রকমের কিছু কথা কহিয়াও সুখ হইয়াছিল।

—

বিদেশে হিন্দুমুসলমান সম্বন্ধে মনের ভাব

হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য স্বদেশে যেরূপ অনুভব করিতাম, বিদেশে সেরূপ তীব্র ভাবে অনুভব করিতাম না। সকলকেই স্বদেশবাসী বলিয়া দেশে থাকিতে যতটা গভীর ভাবে অনুভব করিতাম, বিদেশে তাহা তদপেক্ষা নিবিড় ও গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতাম। বিদেশে এমন ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গেও দেখা হইয়াছে, যাঁহারা ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়াটা নিতান্ত বেকুবী মনে করেন।

—

ব্যবস্থাপক সভার ক্ষতিলাভ

১৯১৯ সালে ব্যবস্থাপক সভাগুলি বড় করিয়া কতকটা নূতন ভাবে কাজ চালাইবার জন্য যে ভারতশাসন-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা আমরা অনেক বার করিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দ্বারা আমাদের কোন উপকারই হইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে এবং তাহার সভ্যরূপে কাজ করিতে যে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহার তুলনায় লাভ সামান্যই হয়। এবং, ব্যবস্থাপক সভায় না গিয়া বাহির হইতে কাজ করিলেও ঐ লাভ যে হইত না বা হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। নূতন ব্যবস্থাপক সভা-সকল হইবার আগে যেমন, পরেও তেমনি, শেষ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ইংরেজের হাতেই আছে। ভারতবর্ষ ভারতীয়দের দেশ। অতএব ন্যায্য ব্যবস্থা এইরূপ হইলেই ঠিক হয়, যে, ভারতীয়দের মঙ্গল যাহাতে হইবে, তাহাদের জ্ঞান, স্বাস্থ্য, ধন, শক্তি যাহাতে বাড়িবে, চারিত্রিক উন্নতি যাহাতে হইবে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে; তাহাতে ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির ভারতীয় প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য বা সুবিধা কমিলেও ভারতেরই মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ,

আমরা ত ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিতেছি না, তাহাদের দেশের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিতেও চাহিতেছি না। নিজেদের দেশে নিজেদের মঙ্গল চাহিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলি দ্বারা, ভারতশাসন-সংস্কার আইন দ্বারা, এমন কোন আইন বা কাজ হইতে পারে না, যাহাতে মোটের উপর ইংরেজদের প্রভুত্ব, আর্থিক লাভ, সুবিধা ও ক্ষমতা কমে এবং তাহার জায়গায় ভারতীয়দের স্বদেশে প্রভুত্ব আর্থিক লাভ সুবিধা ও ক্ষমতা বাড়ে।

অথচ এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে গিয়া নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের অর্থব্যয় ত খুব হয়ই, কেহ কেহ ঋণগ্রস্ত ও প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হন, অধিকন্তু নৈতিক অবনতি ও ক্ষতিও অনেক-স্থলে বড় কম হয় না। পাশ্চাত্য দেশ-সকলেও এইসব দোষ ক্ষতি আছে বলিলেই দোষ গুণে ও ক্ষতি লাভে পরিণত হয় না। হীনতা স্বীকার করিয়া নির্ব্বাচক-দের খোসামোদ অনেককে করিতে হয়। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ যে কোন নির্ব্বাচনপ্রার্থী কোন নির্ব্বা-চককে দেন না, তাহা বলিতে পারি না। অনেক প্রার্থী ও তাঁহাদের নিযুক্ত লোক প্রতিযোগী প্রার্থীদের মিথ্যা নিন্দা রটনা করিয়া বেড়ান। নিন্দা সত্য হইলেও তাহার রটনা যে করিয়া বেড়ায় তাহার তাহাতে চারিত্রিক উন্নতি হয় না। মিথ্যা নিন্দাকারীদের যে অধোগতি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া যাহা যাহা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহা করিবার চেষ্টা করিবেন না বা করিতে পারিবেন না, তাহা আগে হইতেই জানেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপরাধ তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই হয়।

একটা রাজনৈতিক দলের কথাই ধরুন। স্বরাজ্যদল যখন প্রথম কৌন্সিলে ঢুকিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহারা নির্ব্বাচকদিগকে এই আশা দিয়াছিলেন, যে, কৌন্সিলের ভিতর হইতে গবর্ন্মেণ্টের সব কাজে, আইনে, প্রস্তাবে বাধা দিয়া দেশ-শাসন অচল করিবেন এবং ভারতশাসন-সংস্কার আইন ব্যর্থ করিবেন। এইরূপ বাধা দিতে পারা দূরে থাক্, তাঁহারা অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে গবর্ন্মেণ্টের সহযোগিতাও করিয়াছেন। বস্তুতঃ কাজ দেখিয়া রাজনৈতিক মতের বিচার করিলে, স্বরাজ্য-দলের মত ও "পারস্পরিক সহযোগী"দের মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এখনও কিন্তু স্বরাজীরা গবর্ন্মেণ্টের একান্তবিরোধিতাসূচক তাঁহাদের পুরাতন বুলি ছাড়েন নাই।

ভারতশাসন-সংস্কার আইন জারী হইবার আগে এদেশে মিথ্যাবাদিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার প্রসার ও পরিমাণ বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। কোন কোন লোক কোন একজন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর জন্য ভোট সংগ্রহ করিয়া দিবেন এবং তাঁহার নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যই ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তের কথা আমরা অবগত আছি। এরূপ জঘন্য কাজ যাঁহারা করিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি তাঁহাদের আছে—তাঁহারা মান্য-গণ্য লোক।

সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি এবং স্বধর্মনিষ্ঠার বাহ্য নিদর্শনের অপব্যবহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশচেষ্টার অন্যতম কুফল। যে নির্ব্বাচনপ্রার্থী যে ধর্ম্মাবলম্বী সেই ধর্ম্মাবলম্বী নির্ব্বাচকের কাছে ভোট প্রার্থনার সময় নিজেদের ধর্ম্মের দোহাই দেওয়াতে কেবল যে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে, ধর্ম্মেরও অপব্যবহার এবং অপমান করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সব ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ অংশ আছে। তদনুসারে সাধনা ও জীবনযাপন করিলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। কিন্তু তাহা ভোট ক্রয়ের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইবে, কোনও ঋষি মুনি পীর পয়গম্বর নবী মসীহ প্রফেটের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। যাহা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির উপায়রূপে কল্পিত হইয়াছিল এবং যাহার সেইরূপ ব্যবহার শ্রেষ্ঠ মানবেরা করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে ভোটধরা ফাঁদে পরিণত করিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা ত হয়ই না, অপমানও হয়।

ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন শিখা উপবীত আদি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা ভোট সংগ্রহ করেন, তাঁহারা ঐ নিদর্শন-

গুলির অপমানই করেন। সেইরূপ যাঁহারা মুসলমানদের ভোট সংগ্রহের জন্য নিজের পাঁচওক্ত নামাজ এবং রমজানের সময় কড়া উপবাসাদির উল্লেখ করেন, তাঁহারাও মুসলমান আচারের অবমাননা করেন। ঐ সকল অনুষ্ঠান ভোট সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থিত হয় নাই।

—

ভোট দিবার কারণ

অনেক নির্ব্বাচক অনুরোধ উপরোধে ভোট দিয়া থাকেন, নির্ব্বাচনপ্রার্থীর ব্যবস্থাপক হইবার যোগ্যতা ও রাজনৈতিক মতামত ভোট দিবার পূর্ব্বে যাচাই করা তাঁহারা বেশী দরকার মনে করেন না। অনেক নির্ব্বাচক আবার কেবল দলের নামেই মুগ্ধ, কাজ কি হইবে, তাহা তলাইয়া বুঝা তাঁহারা দরকার মনে করেন না। দরকার মনে করিলেও, নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা যে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন বা পারেন, এমন মনে হয় না।

মনে করুন, একজন প্রার্থী বলিলেন, "আমি পারস্পরিক সহযোগী, গবর্ন্মেণ্ট যখন আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন তখন আমরাও সহযোগিতা করিব, অন্য সময়ে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।" সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সহযোগিতাটা কিরূপে হইতে পারে জানি না। দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা সমানে সমানে হয়; কখন প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মত বা প্রস্তাব গ্রহণ করেন, কখন বা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মত গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী গবর্ন্মেণ্ট কোন্ কোন্ গুরুতর ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক রাজনৈতিক বিষয়ে দেশবাসীদের মত ও প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিয়াছেন কেহ বলিতে পারেন কি? ছোটখাট বিষয়ে সরকার পক্ষ বেসরকারী সভ্যদের বিল বা প্রস্তাবে বাধা দেন নাই সত্য; কিন্তু তাহা লোক-দেখান কৌশলের জন্য করা হইতে পারে, প্রকৃত 'সহযোগিতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ তাহা নহে। এইজন্য পারস্পরিক কথাটা কখনও আমাদের ভাল লাগে নাই। গবর্ন্মেণ্ট বাস্তবিক আমাদের সহযোগিতা চান না, প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য আজ্ঞার অনুবর্ত্তিতা চান। ভারতশাসন-সংস্কার আইন অনুসারে স্থাপিত ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিয়া তৎসমুদয়ের নিয়ম অনুসারে আমাদের যতটুকু কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা এবং যথাসাধ্য দেশের অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু তাহা "পারস্পরিক সহযোগিতা" নহে। যাহা হউক, নাম লইয়া ঝগড়া না করিয়া, কোন্ দলের সভ্যেরা কি ভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিবেন এবং সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে লাভ করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কৌন্সিলে ঢুকিয়া তাঁহারা কি প্রকারে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিবেন? উহা কি ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইবে? তাহা হইলে উহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়,......ধাপ কি কি?

স্বরাজ্যদলের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, তাঁহারা স্বরাজ্য অর্থাৎ জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব চান। তাঁহারা ছিলেন বৃহৎ অসহযোগী দলের অঙ্গীভূত; কৌন্সিলে ঢুকিয়া বাধাদান-নীতি দ্বারা তাঁহারা দেশে স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন, ইহা বলিয়াই তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিয়াছিলেন। প্রথম তিন বৎসরে তাঁহারা বাধাদান-নীতি মধ্যে মধ্যে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, স্বরাজ্যলাভের দিকেও দেশকে এক পা অগ্রসর করিতে পারেন নাই। এবার যে তাঁহারা আবার কৌন্সিলে প্রবেশ করিলেন, দেশকে বুঝাইয়া দিউন, তাঁহাদের স্বরাজ্য-লাভের পন্থা কি, ধাপগুলি কি কি? কি উপায়ে তাঁহারা স্বরাজ্য স্থাপন করিবেন? সেই পন্থা, উপায় ও ধাপগুলির সহিত কৌন্সিল-প্রবেশের সম্পর্ক কি?

স্বরাজ্যলাভ বা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব স্থাপন বড় কথা। যে-সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমস্যা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উহার অঙ্গীভূত, তাহার সমাধান ভিন্ন ভিন্ন দলের সভ্যেরা কি প্রকারে করিবেন, তাহা নির্ব্বাচকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন কি?

দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি এবং রোগ ও মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস, লোকদের উপার্জ্জনের উপায় বৃদ্ধি ও বেকার অবস্থার হ্রাস, কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদির দ্বারা অধিক ধনাগম ও লোকদের যথেষ্ট ও পুষ্টিকর আহার লাভ, সমুদয় বালক-

বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার—এবম্বিধ সমুদয় সমস্যার সমাধান ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে উহার সভ্যেরা কি প্রকারে করিবেন, তাহা বিশদভাবে লোককে বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচন

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিজন ফেলো রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। গ্রাজুয়েট আছেন হাজার হাজার; কিন্তু রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েটের সংখ্যা কয়েকশত মাত্র। এখন নূতন করিয়া রেজিষ্টরীভুক্ত হইবার নিয়ম যাহা এবং বার্ষিক ফী যত, তাহাতে নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। যাহা হউক, এখন যাঁহারা ভোটার আছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র জ্ঞানবত্তা এবং শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে অনুরাগ দেখিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে ভোট দিলে ভাল হয়। কে কোন রাজনৈতিক দলের লোক, তাহা দেখিয়া ভোট দিলে, নির্ব্বাচনপ্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কিরূপ করিবেন, তাহা বিবেচনা করিয়া ভোট দেওয়া হয় না। কাহার বিদ্যাবত্তা কিরূপ, দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিকল্পে কাজে কে কি করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতির জন্য কে কি চেষ্টা কার্য্যতঃ করিয়াছেন, উচ্চশিক্ষার নানা সমস্যা কে কতটুকু বুঝেন, নির্ব্বাচকদের এবম্বিধ নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তবে ভোট দেওয়া উচিত।

অনেক নির্ব্বাচকের ভাবগতিক এরূপ, যে, তাঁহারা এঞ্জিনীয়ার মনোনীত করিতে হইলে প্রার্থীদের এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার পরিচয় লওয়া অপেক্ষা তাঁহারা স্বরাজী, না পারস্পরিক সহযোগী, না উদারনৈতিক, না ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তাহা জানা অধিক দরকার মনে করিবেন।

—

রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ

আশ্বিনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আমাদিগকে মৌখিক বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা কবির এইবার ইটালী-যাত্রার বিরোধী ছিলেন। কবি স্বয়ংও আমাদিগকে মৌখিক এই কথা বলিয়াছেন।

—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কথা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এচ, ডি, (কলিকাতা) পি-এচ-ডি (কেম্ব্রিজ,) আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটিতে এবৎসর হ্যারিস্ লেক্‌চারার রূপে নিযুক্ত হইয়া এবং তথাকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যোগদান করিবার জন্য বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি গত ২৮শে জুলাই কলিকাতা হইতে আমেরিকা যাওয়ার পথে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে লর্ড হল্‌ডেন্ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ আহুত হইয়া স্কটল্যাণ্ডস্থ তাঁহার পৈত্রিক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। লর্ড হল্‌ডেন্ দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্‌সেলার এবং সমরসচিব ছিলেন; দর্শন-ক্ষেত্রেও ইনি অতি প্রবীণ এবং এবিষয়ে তিনি বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ইঁহার বয়স ৭০ এর উপর, এবং এখনও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। ডাক্তার দাসগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিয়া ভারতীয় চিন্তার প্রতি এঁর একটা গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে। ইনি মনে করেন যে, ভারতীয় চিন্তা গ্রীক্‌-চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া নব্য য়ুরোপের চিন্তাকেও স্পর্শ করিয়াছে। ডাক্তার দাসগুপ্ত হল্‌ডেন্‌স্ পরিবার হইতে বিদায় লইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন।

গত ১৩ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হার্ভার্ডে আন্তর্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেস হইয়াছে। ঐ কংগ্রেসে চীন,

জাপান, তুর্কি, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, সুইডেন, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থান, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ১৬টি জাতির ৫০০ প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডাক্তার হোয়াইট হেড (নিওইয়র্কে) তাঁর বাড়ীতে ডাক্তার দাসগুপ্তকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি গণিতের লোক বটে, তবে এখন গণিতের রাজ্য ছাড়িয়া দর্শনের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। বয়স আন্দাজ ৭০ হইবে।

কেম্ব্রিজ (হার্ভার্ড) ও তাহার সন্নিকটস্থ বোষ্টন সহরের ভারতীয় ছেলেরা ডাক্তার দাসগুপ্তের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের জন্য একটি বড় রকমের অভ্যর্থনা ও ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে হার্ভার্ডের আন্তর্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য গিয়াছেন।

হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্টপল কলেজ, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্লটন্ কলেজ, এ্যান্ আরবার বিশ্ববিদ্যালয়, ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের "হ্যারিস্ লেক্‌চারের" পর গত ১২ই নভেম্বর তিনি "অলিম্পিক" জাহাজে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করেন। এতদ্ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কিন্তু সময়ের অভাববশতঃ তাঁহাকে সে-সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে।

ডাক্তার দাসগুপ্ত ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কালে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যাইবেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার পর প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এবং দর্শনের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লেভী ব্রুল মহাশয়ের আগ্রহে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবেন। সম্ভবতঃ তিনি আন্দাজ ১১ই ডিসেম্বর "মোরিয়া" জাহাজে মার্শেলস্ হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে রওনা হইবেন এবং ২৬শে ডিসেম্বর হাওড়া ষ্টেশনে (কলিকাতায়) আগমন করিবেন। শ্রী—

—

প্রবাসী বাঙালী

ভারতবর্ষের নূতন যুগের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন তাহাতে বাঙালীর স্থান যে খুবই উচ্চে হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙালীদের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও একথা কেহই অস্বীকার করেন না, যে, বাঙালীরা অপরাপর প্রদেশের মানসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এখনও সকল প্রদেশেই শিক্ষা ও অপরাপর ক্ষেত্রে বাঙালীরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী লোকেরা অনেক চেষ্টা করিলেও তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ যশের সহিত অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমাদের বিরুদ্ধে এই যে অভিযান, ইহার প্রধান কারণ অপর প্রদেশবাসীর ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা হইলেও, ইহার পশ্চাতে অন্য অনেক কারণ রহিয়াছে।

একটি বড় কারণ হইতেছে, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনপ্রিয়তা এবং সেই রাজনৈতিকতার চরমপন্থী ভাব। যেখানে বাঙালী যায়, সেখানেই গভীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয় দেখিয়া দেখিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও বুঝিয়াছেন যে, বাংলার বাহিরে বাঙালীর স্থান যত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে ইংরেজের ভারতের উপর প্রভুত্বের দিক্ দিয়া ততই মঙ্গল। সম্ভবতঃ এই কারণেই বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি যে, যেখানে কোন উপায়ে বাঙালীকে অন্য প্রদেশে কাজ পাওয়া হইতে বঞ্চিত করা যায় সেখানেই বাঙালী বঞ্চিত হইতেছে। বাংলায় শত শত উচ্চশিক্ষিত যুবক বেকারে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নানা প্রকার কার্য্যে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পশিক্ষিত ও অল্পগুণসম্পন্ন অপরপ্রদেশবাসীগণ নিযুক্ত হইতেছে। এই যে সর্ব্বত্র বাঙালীর বিরুদ্ধাচরণের সূচনা

দেখা যাইতেছে, ইহার মূলেও যে কোন প্রকার গোপন চেষ্টা নিহিত নাই, তাহাই বা কে বলিবে?

এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য বাংলা দেশে যাহাতে অপর দেশীয়েরা কোন কার্য্য না পায় **তাহার চেষ্টা করা নহে।** কারণ এরূপ চেষ্টা করিলে কার্য্য-বণ্টন-ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা চাই অপর প্রদেশ হইতে এই কুরীতি দূর করিতে। কারণ যদি সর্ব্বত্র সকল প্রকার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ যে সে-ই নিযুক্ত হয় তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল। বাঙালী এই প্রকার উদার পন্থার অনুসরণ করিতেই চায়। তাহার নিজের উপর এ বিশ্বাস আছে যে, অন্যায় উপায়ে তাহাকে বঞ্চিত না করিলে সে সহজেই সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। কাজেই বর্ত্তমানে যে-সকল বাঙালী বাংলায় বা বাংলার বাহিরে নানান কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত সকলে মিলিত হইয়া এই চেষ্টা করা যাহাতে বাঙালার প্রতি অন্যায় অবিচার প্রভৃতি অবাধে না হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে একাধারে ভারতের সকল জাতির উপকার হইবে।

নিম্নে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের যে নিবেদনটি প্রকাশিত হইল, তাহার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যদিও এই সম্মিলন সাহিত্যসম্মিলন, তথাপি আমরা আশা করি যে, উক্ত সম্মিলনে যে-সকল প্রতিভাশালী বঙ্গসন্তান উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা অন্ততঃ কিছু সময় বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে ভারতময় যে গুপ্ত আন্দোলন চলিতেছে, তাহার প্রতিকারের আলোচনায় নিয়োগ করিবেন।

অ

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চম অধিবেশন—দিল্লী

নিবেদন

আগামী ১২ই ও ১৩ই পৌষ দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইবে। মনস্বী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহোদয় সম্মিলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। প্রবাসী বাঙ্গালার গৌরব, মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কে-সি-আই-ই, সি-বি-ই মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, বার-এট-ল মহোদয় সহকারী সভাপতির পদ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে পরস্পর সৌভ্রাত্র্যভাব স্থাপন এবং বাংলার ভাবধারার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বাঙ্গালী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলন যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেজন্য আমরা সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষা প্রচার ও জাতীয় উন্নতি-সাধন বিষয়ক কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব, এবং সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং কবিতা সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই হিতকর অনুষ্ঠানে সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করুন, এই প্রার্থনা।

প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদা ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের বাসস্থানের ও আহারাদির বন্দোবস্ত অভ্যর্থনা-সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতিনিধিগণের জন্য পৃথক্‌ভাবে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিনিধিদের প্রত্যুদ্গমনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

কার্য্যালয়—বেঙ্গলা ক্লাব, কাশ্মীরী গেট্, দিল্লী।

বিনীত
শ্রী সুরেন্দ্রকুমার সেন,
প্রধান কর্ম্মসচিব।

—

ভরতপুরে সমাজসংস্কার

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, ইংরেজদিগকে দেশীরাজ্য ভরতপুরের ভরতপুর দুর্গ জয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সেই ভরতপুরের বর্ত্তমান মহারাজা সমাজসংস্কারে উৎসাহ দেখাইতেছেন। কোন কোন দেশী রাজ্যের রাজারা বিদেশ ভ্রমণে বিশেষ

আগ্রহান্বিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। ভরতপুরের রাজবংশ সেরূপ নহে। এই জন্য ভরতপুরের হিন্দু মহারাজার সমাজসংস্কারপ্রিয়তাকে কেহ পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত বলিতে পারিবেন না। উহা সমাজের হিতের ও সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়াই তিনি উহাতে উৎসাহ দেখাইতেছেন। তিনি গত ১৬ই নবেম্বর এক দরবারে ভরতপুর সমাজসংস্কার আইন নামক এক আইনে সম্মতি দিয়াছেন। উহা আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ভরতপুর রাজ্যে জারী হইবে। এই আইন বিধবাদিগকে দ্বিতীয়বার বৈধ বিবাহ করিতে এবং তাহাদের সন্তানদিগকে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ করিবে। বিধবারা বৈধ বিবাহ করিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ এবং বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণের জন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে, যে, তাহাদের বিবাহ তহসীলদারদিগের আদালতে কিম্বা ভরতপুররাজের জানিত দেবমন্দির বা মসজিদে এক টাকা ফী দিয়া রেজিষ্টরী করিতে হইবে। ভরতপুর সমাজ-সংস্কার আইনের বাল্যবিবাহ-বিষয়ক অপর একটি ধারা অনুসারে, বাল্য বিবাহ অসিদ্ধ হইবে, যদি বিবাহকালে পাত্রীর বয়স চৌদ্দ বৎসরের অনধিক এবং পাত্রের বয়স ষোল বৎসরের অনধিক হয়। যে-কেহ জানিয়া শুনিয়া ভরতপুর সমাজসংস্কার আইনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ বাল্য-বিবাহ বা বিধবাবিবাহে কোন প্রকার সাহায্য করিবে বা তাহা ঘটাইবে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য কারাদণ্ড বা তিন হাজার টাকার অনধিক জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

—

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পুরস্কার

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পুরস্কার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের জিনিস। এই পুরস্কার যাঁহারা পান তাঁহাদের গুণাগুণ বিচার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের জ্ঞানের দিক দিয়াই করা হয় বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এই পুরস্কারের সংখ্যার অল্পতার জন্য বর্ত্তমানে পুরস্কার দান লইয়া অনেক সময় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। হয়ত বিজ্ঞানের চার পাঁচ বিভাগের চার পাঁচ অথবা ততোধিক ছাত্র এই পুরস্কারের জন্য মূল গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ উপস্থিত করেন। যে-ক্ষেত্রে নিবন্ধগুলি এক বিষয়ের, এমন কি পরস্পর-সম্পর্কিত বিষয়ের উপর লিখিত নহে, সে-ক্ষেত্রে তাহাদের তুলনামূলক বিচার করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তখন হয়ত নিবন্ধলেখকদের জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া তাহাদের মধ্যে কাহার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার উপাধি অথবা তৎ-সম্পর্কিত পুরস্কারের টাকাটার অধিক প্রয়োজন তাহা দেখিয়া পুরস্কার বিতরণ করিতে হইতে পারে। ইহাতে প্রশ্নের আপাত মীমাংসা হইলেও অসন্তোষের ও, সম্ভবত, অবিচারের সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে যে, উৎকৃষ্টতর ও অধিক জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ ছাড়িয়া অপর নিবন্ধের লেখককে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। আসল কথা হইতেছে এই যে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পুরস্কার দয়া দেখাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, প্রকৃত জ্ঞানের আদর দেখাইবার জন্যই উহার সৃষ্টি। সুতরাং উক্ত পুরস্কার দান এরূপভাবে করা প্রয়োজন যাহাতে দয়ার বা অপর কোন-কিছুর খাতিরে জ্ঞানের অবমাননা না হয়। যে-স্থলে একটি পুরস্কার বহু বিষয়ের ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে দেওয়া হইবে সে-স্থলে এক বৎসরে সকল বিষয়ের নিবন্ধের বিচার না করিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন বিষয়ের বিচার করিলে হয়ত সুবিচার হইতে পারে। অথবা বিচারকালে বিষয়,বিশেষের উন্নতির দিক্ হইতে কোন্ নিবন্ধের মূল্য কত তাহা একাধিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা নির্ণয় করাইয়া তৎপরে পুরস্কার দান করা যাইতে পারে। কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে তাহা আমরা হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু এই পুরস্কার দান-বিষয়ে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান বিভাগে যে নূতনতর উপায় ও বিচার-প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

অ

—

টাকার ভবিষ্যৎ

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া মুদ্রা সংস্কার কার্য্যে লাগিয়াছেন, তাহার পরিণামে ভারতে মান-মুদ্রার যে-অবস্থা দাঁড়াইবে তাহাকে বর্ণমান কিছুতেই বলা যায় না।

পুরাতন গোল্ড এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইতে এই নূতন ব্যবস্থা বিশেষরূপে বিভিন্ন নহে একথাও আমরা আগে বলিয়াছি। একটা বড় রকম টাল সামলাইতে হইলে যে, এ ব্যবস্থা অটুট থাকিবে এরূপ ধারণাও আমাদিগের নাই। অপরাপর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ভারতের মানমুদ্রা টাকা বা রূপেয়াকে ইংরেজের পাউণ্ডের হিসাবে দেড় শিলিংএর সমতুল্য করিবার যে-বিধি হইয়াছে সে-বিষয়ে কিছু বলিব। বর্ত্তমানে টাকাকে দেড় শিলিংএর সমতুল্য করিবার জন্য টাকার মূল্য বৃদ্ধির যে-চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রধান অস্ত্র হইতেছে ভারতের বাজারে যত টাকা ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কতক অংশ বাজার হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া। অর্থাৎ বাজারে টাকার খাঁকৃতি ঘটিলে টাকার দ্রব্য-ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে এবং তাহা হইলে দেড় শিলিংএর সহিত তাহার দ্রব্য-ক্রয় করিবার ক্ষমতা সমান সমান হইয়া আসিবে। বাজার হইতে টাকা বাহির করিয়া লইবার উপায় হিসাবে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় বা এখানে টাকা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিলাতে পাউণ্ড দিবার যে-ব্যবস্থা তাহাতে এই হইবে যে, আমাদের দেশের যে-সকল অর্থ বিলাতে মজুত আছে তাহা আর আমাদিগের থাকিবে না; রিভার্স কাউন্সিল বিল শোধ করিবার হিসাবে পরহস্তগত হইবে। ইহাতে আমাদিগের সান্ত্বনা মাত্র এইটুকু থাকিবে যে, আমাদের দেশের মুদ্রার মূল্য বা দ্রব্যক্রয়ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে টাকার মূল্য-বৃদ্ধি পাইলে তাহার ফল যাহা ঘটিবে তাহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত টাকার মূল্য এক শিলিং চার পেনি হইতে এক শিলিং ছয় পেনি হওয়ার অর্থ এই যে,টাকা অতঃপর পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ১২॥০ বা টাকায় দু আনা আন্দাজ অধিক মূল্যবান হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ অগ্রের ১১২॥০ আনা বর্ত্তমানের ১০০৲র সমতুল্য হইবে। অর্থাৎ অগ্রে লোকে যাহা ১১২॥০তে ক্রয় বা বিক্রয় করিত বর্ত্তমানে তাহারা তাহা ১০০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় করিবে। অর্থাৎ অগ্রে যদি কেহ ১০০৲ পাইত অথবা দিত, বর্ত্তমানে সে ১০০৲ পাইলে বা দিলে তাহা দ্রব্যের হিসাবে ১১২॥০ সামিল হইবে। যাহারা অগ্রে ফসল বিক্রয় করিয়া ১১২॥০ পাইত বর্ত্তমানে তাহারা ১০০৲ মাত্র পাইবে। অগ্রে যাহারা ১০০৲ ট্যাক্স দিত বর্ত্তমানে তাহারা বস্তুত ১১২॥০ ট্যাক্স দিবে। অগ্রে যাহারা কোম্পানীর কাগজ হইতে ১০০৲ সুদ পাইত এখন তাহাদের সেই ১০০৲ টাকার যথার্থ মূল্য পূর্ব্বের হিসাবে ১১২॥০ আনার সমতুল্য হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যবস্থার ফলে ঠকিবে সে, যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আয় করে এবং জিতিবে সে যাহার আয় নির্দ্দিষ্ট (বেতন বা সুদ হিসাবে)।

গভর্ণমেণ্টের যাহা রাজস্ব তাহা যদি ঠিক পূর্ব্বের সহিত সমানসংখ্যক টাকা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে গভর্ণমেণ্ট বস্তুত শতকরা ১২॥০ অধিক ট্যাক্স আদায় করিতেছেন। যে-সকল ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে টাকা ধার দিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের অর্থ কোম্পানীর কাগজ জাতীয় কোন কিছুতে জমা আছে, তাঁহারা বস্তুত সুদ হিসাবে অধিক পাইবেন। সচরাচর যাহারা এইরূপে লাভবান হইবে তাহাদের মধ্যে অধিক লোকই ইংরেজ ও ধনিক জাতীয়। নূতন ব্যবস্থা চালাইতে হইলে ন্যায়ের খাতিরে আরও কয়েকটি কাজ করা প্রয়োজন, তাহার মধ্যে ডাকমাশুল, রেলভাড়া, ট্যাক্স, পুরাতন কোম্পানীর কাগজের সুদ প্রভৃতি কমান অন্যতম। অ

প্রবাসীর মলাটের চিত্র

গত কয়েক মাস প্রবাসীর মলাটে যে-চিত্রটি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা একটি জয়পুরী মিনার (enamel) কাজ-করা থালির চিত্র। আসল থালিটির বর্ণসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়; তথাপি ইহাতে শিল্পীর ক্ষমতার প্রমাণ যথেষ্ট দৃষ্ট হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে 'সম্পাদকের চিঠি' প্রসঙ্গে কয়েক স্থলে "বেলগ্রেড" নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ইহা "বেলগ্রেড" না হইয়া "বেলগার্ড" হইবে।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৩

৪র্থ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

(১)

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে !

(২)

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি ; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না ; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিটনা।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না—যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় [illegible]

রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুদিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারোজন লোক অহনিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—সংেশ্ল স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার. চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপন করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল-বাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে,
১৯০১

বন্ধু,

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হ'য়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেইজন্যে আমি তোমাকে কখনো তাগিদ করিনে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাট্‌বার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে প'ড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন ক'রে আস্‌ছিলেন। এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট, আর বিষ খাওয়াও, ও গুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহ'লে বিচারক তাদের চিম্‌টি দণ্ড বিধান কর্‌তে পার্‌বে।

যদি পাঁচ ছ' বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হ'য়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরোনা।

আমার ভারি ইচ্ছা কর্‌চে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম—তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলে না। আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কারসহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম, কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তা হ'লে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা কর্‌চি দেখা হবে। হয়ত কোনদিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি—অনেক ভুলচুক্ থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হ'য়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে ব'লে দেব।

তোমার
রবি

(৪)

ওঁ

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে

বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম—আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না!

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—
২১শে জ্যৈষ্ঠ।

তোমার—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

---

(৫)

ওঁ

৩রা জুলাই
১৯০১

বন্ধু,

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষর সহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ছেলের মত নয়। ঋজু স্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনায় ও বুদ্ধি-চর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহৎগুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফর-পুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্ট্রিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে অন্যকে লিখিতে দিয়াছিলাম—পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে—দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই—তখন ইলেক্ট্রিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আর কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সে কথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জার্ম্মানি ও আমেরিকায় যাইবার কোন প্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না? তুমি যদি দীর্ঘকাল ইউরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হউক একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

(ক্রমশঃ)

উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র*

আচার্য্য শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদ্ভিদ-জীবনের অনুসন্ধানের ফলে প্রাণী-জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুইএর জীবন-ক্রিয়ার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন প্রাণীকে আঘাত করিলে সে শিহরণ দ্বারা আঘাতের অনুভূতি জ্ঞাপন করে—কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গে ক্রমাগত আঘাত করিলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। প্রাণীর চেতনেন্দ্রিয় আছে, বাহিরের আঘাতের ফলে উত্তেজনার স্পন্দন ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আন্দোলিত করে। উদ্ভিদের এইরূপ কোন সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এতদিন বিশ্বাস ছিল। প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে। রক্তসঞ্চালন করিবার জন্য জীবদেহের মধ্যে এই যন্ত্র অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে। উদ্ভিদের এই-রূপ কোন যন্ত্র আছে এরূপ কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। সুতরাং সকলে মনে করিতেন যে, যদিও এই দুইটি জীবন-প্রবাহ পাশাপাশি বহিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে কুত্রাপিও কোন ঐক্য নাই। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—এইসব ভ্রান্ত মতই এতদিন জ্ঞানের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছিল।

উদ্ভিদ-জীবনীতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রতিপদেই প্রবল বিঘ্ন, কারণ উদ্ভিদের জটিল জীবনী-ক্রিয়ার পরিচয় জানিতে হইলে ইহার প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক। যখন অণু-বীক্ষণের দৃষ্টি ব্যর্থ হয় তখন আমাদিগকে অদৃশ্যের পথ অনুসরণ করিতে হয় এবং সেইজন্য এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করা আবশ্যক যাহার সাহায্যে আলোক-উর্ম্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর করা ও তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়। আমার বিজ্ঞান-মন্দিরে স্বয়ংলেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই যন্ত্র-সাহায্যে ক্ষুদ্রতম জীবন-স্পন্দন এক কোটি হইতে পাঁচকোটি গুণ বর্দ্ধিতরূপে দৃষ্ট হয়। সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেই একটা নূতন জগত আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের সহায়তায় ভবিষ্যতে বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমার আবিষ্কৃত এই যন্ত্র-সমূহ প্রাণী-জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যাবতীয় প্রাণ-যন্ত্রের ক্রিয়া একই নিয়মে চালিত হইতেছে।

ইউরোপে বিজ্ঞান-অভিযান

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্র-সমূহের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা-প্রসূত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ জীবনীরাজ্যের অনেক অজ্ঞাতরহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে আমি ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞানানুশীলন-কেন্দ্র-সমূহ হইতে বক্তৃতা দেওয়ার ও আমার অনুসন্ধান-প্রণালী প্রদর্শন করাইবার জন্য আমন্ত্রিত হই। বিদেশে এই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া অতীব দুরূহ হইয়াছিল। অন্যের হস্তে এই সমস্ত যন্ত্র দেওয়া যায় না কারণ সামান্য অসাবধানতার দরুণ যন্ত্রগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই অনেক স্থলে আমাকেই উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটি অব আর্টসের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করি। তৎপরে রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন

---

* এই প্রবন্ধ ইংরেজী মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সাম্বাৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিশেষ নির্দ্দেশক্রমে লিখিত।

কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহে নানাবিধ ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদাঘবাসরে "বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতের দানের গুরুত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করি। আমার বক্তৃতার বিষয়গুলি যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখাইবার ফলে সর্ব্বত্রই বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করি তাহার সম্পূর্ণ অংশ তৎক্ষণাৎ বেতার সাহায্যে জগতের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকালেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত কাগজে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার গবেষণা-প্রসূত তথ্যসমূহ শুধু জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নহে সাধারণেরও চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণও পাইয়াছি। শীঘ্রই আমার উদ্ভিদতত্ত্বের আবিষ্কারসমূহ সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ ভাষায় লিখিত হইয়া আমেরিকা ও ইউরোপে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসর বেলজিয়ামের সম্রাট্ ভারত-ভ্রমণ-কালে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা কার্য্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি সেই সময়েই আমাকে বেলজিয়ামে প্রাণি-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারই উদ্যোগে বেলজিয়মের ফন্‌দেশিঁও ইউনি-ভারসেতায়ারে (*Fondation Universataire*) আমার প্রাণি-তত্ত্ব বিষয়ক একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বক্তৃতা সভায় সপারিষদ্ সম্রাট্ ও বেলজিয়মের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে আমার পরীক্ষা কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত হয় এইজন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব্ব হইতেই নানা-প্রকার পরীক্ষাপোযোগী উদ্ভিদ্ জন্মান হইয়াছিল।

প্যারীসের সোর্ব্বোন (Sorbonne) এবং ন্যাচারেল হিষ্ট্রী মিউজিয়মে আমার বক্তৃতা হয়। এখানেও বিজ্ঞ চিকিৎসকবর্গ ও বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ আমার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিন-ভাষা-ভাষী দেশসমূহে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহার ফলে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রকাশক গথেয়ার ভিলার্স (Gauthier Villars) আমার রচিত পুস্তকগুলির ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর আমি জেনিভার বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বজ্জন-সম্মিলনীতে যোগদান করি। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে আমার একটি বিশেষ ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা সভায় অধ্যাপক লরেঞ্জ (Lorentz) আইনষ্টাইন (Einstein) প্রমুখ অনেক জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। এই সময়েই জগৎ-বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেনিভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্‌টর ভারত-সচিবকে লিখিয়াছেন যে,আমার ত্রিশবর্ষব্যাপী সাধনার ফল তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছে যে, নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠতর হউক।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত আন্তর্জ্জাতিক বিদ্যামন্দিরের পক্ষ হইতে মসিঁয়ে লুসার (M. Luchair) বলেন যে, সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরণের তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন তাঁহারা এখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, মনীষীদের চিন্তা-প্রণালীর ভিতর ঐক্য রহিয়াছে এব মানুষের প্রতিভা-প্রগতি কোনরূপ ভৌগলিক সীমা আবদ্ধ নহে ও কোন প্রকার বাধা-নিষেধ মানব মনে অগ্রসরশীল গতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ভারতবর্ষকে তাঁহারা এতদিন কেবল কল্পনাপ্রবণ বলি মনে করিতেন, এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছে যে, সেই সকল কল্পনাই বহু যুগান্তকারী আবিষ্ক করাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বজ্জন-সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশে মনীষীবর্গের যে ভাবের আদান-প্রদানের আয়োজ হইতেছে তাহার ফলে মানব সভ্যতার শৈশব লীল

নিকেতন এশিয়ার বহুদিনের পুঞ্জীভূত চিন্তারাশি বিশ্বজগতের নিকট উন্মুক্ত হইবে।

সুবিজ্ঞ সমালোচকবর্গের নিকট হইতে এই প্রকার উচ্চ প্রশংসা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে—কারণ পাশ্চাত্য দেশে এতদিনের প্রচলিত মত এই যে,"ভারতবর্ষ শুধু ঐন্দ্রজালিক ও তান্ত্রিকদের সাধনা-ক্ষেত্র"। এইরূপ অসম্ভব ও ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে। এবং, এক্ষণে ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতা সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর বিপুল প্রয়াস, জীবন-বিজ্ঞানের রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত ভারতীয় কারিগরের সুপরিকল্পিত ও সুনির্ম্মিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কিত যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ জগত সভায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

জীবন-মৃত্যু রেখা

মৃত্যুর লক্ষণ কি এবং জীবন-মৃত্যু দ্বন্দ্বের সন্ধিস্থল সঠিক ধরা যায় কি না আমি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমি এমন কয়েকটি সঠিক উপায় নির্ণয় করিয়াছি যাহা দ্বারা মরণোন্মুখ উদ্ভিদ্ তাহার মৃত্যুরেখা নিজেই অঙ্কিত করিতে পারে। চারাগাছকে প্রথমে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া রাখা হইল—জলের উষ্ণতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা হইল। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উঠিল। গাছটি আর উত্তাপ সহ্য করিতে পারিল না, কারণ ৬০ ডিগ্রী উষ্ণতা গাছটির পক্ষে মারাত্মক। ফলে সাধারণ প্রাণীর মৃত্যুকালীন বিক্ষেপের মতন গাছটিরও ভীষণ বিক্ষেপ আরম্ভ হইল। জীবন মৃত্যু, সংগ্রামের এই সন্ধিক্ষণে গাছ হইতে একটি প্রবল বিদ্যুত্তরঙ্গ বাহির হইয়া আসিল।

অনুসন্ধানরত হইয়া আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি তাহা অতীব বিস্ময়কর। একটি চারাগাছকে উষ্ণজলে ডুবাইয়া রাখিলাম তাহার প্লাবন-শীলতা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিল ও জল ক্রমে ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত হইলে তাহার জীবনী লক্ষণ একেবারে লোপ পাইল এবং চারাগাছটি জলে ডুবিয়া গেল।

বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী আছে একথা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। আমার গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃক্ষের বেশ সুপুষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী আছে এবং বৃক্ষে চেতনার স্পন্দন যে ভাবে সঞ্চালক-স্পন্দনে পরিণত হয় তাহা হইতেই বেশ ধরা যায় যে, বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী অতীব জটিল। পরিমাণ ওজন করিবার কোন যন্ত্র না থাকায় অতীতে বহু ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

জলের নল বা স্নায়ু

সকলেই অবগত আছেন যে, বাহিরের বিষ বা উত্তেজক দ্রব্য নলের মধ্য দিয়া প্রবহমান জলের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। নলটির উপর ক্লোরফর্ম প্রদান করিলেও উহার সজ্ঞা লোপ হইবে না বা জল-প্রবাহ বন্ধ হইবে না এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বিষাক্ত ঔষধের প্রলেপ দিলেও উহার কার্য্যকরী শক্তি লোপ পাইবে না। কিন্তু প্রাণীদেহে এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগে স্থায়ীভাবে বা সাময়িক ভাবে প্রাণক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আমার গবেষণা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, প্রাণীদেহের স্নায়ুমণ্ডলী যে উপায়ে উত্তেজনা বহন করে উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীও ঠিক সেইভাবে কার্য্য করে।

বদ্ধ পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ পত্র

কোন পতঙ্গকে আলোকের সম্মুখে বাঁধিয়া রাখিলে সে যেমন একবার উপরে উঠিতে চেষ্টা করে আবার নীচের দিকে উড়িয়া আসে এবং বারংবার দক্ষিণে ও বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আলোকের দিকেই আসে উদ্ভিদ্-পত্রও আলোকের সম্মুখে ঠিক ঐরূপ করে।

রক্ত সঞ্চালন ও উদ্ভিদ্ রস-সঞ্চালন

উদ্ভিদ-দেহে কি উপায়ে রস-সঞ্চালন হয় এই সমস্যা বহুকাল যাবৎ অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। এই রস-সঞ্চালন জড় না চৈতন্যের ক্রিয়া? ট্রাসবার্গার একটি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, বিষ-ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষের রস-সঞ্চালনে কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ইহার ফলে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়াছেন,

কিন্তু কেহই বিষয়টি ঠিক ভাবে বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। জীবনীশক্তিবর্দ্ধক কয়েকটি পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঐ সকল পদার্থ প্রয়োগে বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিতে পারা যায় এবং কতকগুলি বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে

১নং চিত্র। ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌নেটিক ফাইটোগ্রাফ (বৈদ্যুতিক লেখনী-যন্ত্র)।

সজীব বৃক্ষের প্রাণহানি ঘটে। ইহা হইতে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, একটি স্পন্দনশীল তন্ত্রী সাহায্যে বৃক্ষের রস-সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই তন্ত্রীটিই বৃক্ষ-দেহে যুগপৎ হৃদ্‌যন্ত্র ও নাড়ীর ক্রিয়া সম্পাদন করে।

মহীলতা (কেঁচো) প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে। উহার সাহায্যেই উহাদের দেহে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীদেরও একটি বিলম্বিত হৃদ্‌যন্ত্র আছে। আমি পরীক্ষা করিয়া ধরিতে পারিয়াছি যে উদ্ভিদ্-দেহে রস-সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে জড়ক্রিয়া নহে উহা চৈতন্তক্রিয়া এবং প্রাণীদেহের রক্ত-সঞ্চালন পদ্ধতির সহিত উদ্ভিদ্-দেহের রস-সঞ্চালন ক্রিয়ার কোন পার্থক্য নাই। প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা:—

(১) হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।

(২) বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরিবর্ত্তিত হয়।

(ক) কর্পূর প্রয়োগে হৃদ্‌ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

(খ) পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদ্‌ক্রিয়ার হ্রাস হয়।

(গ) ষ্ট্রিকনিন অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্-ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয় এবং বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌ক্রিয়া অতি মাত্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে হৃদ্‌ক্রিয়া একেবারে লোপ পায় এবং রক্ত ও রস-সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক শলাকা দ্বারা উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্রের অধিষ্ঠান স্থল নির্ণিত হইয়াছে। যেসমস্ত পদার্থ প্রয়োগে রস-সঞ্চালনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় সেইসমস্ত পদার্থ প্রয়োগে বৈদ্যুতিক স্পন্দনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। যেসকল পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের ঐক্য প্রমাণিত হয়। এক্ষণে সেইসমস্ত পরীক্ষার কথা বর্ণনা করিব।

ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ফাইটোগ্রাফ্

ইতিপূর্ব্বে উদ্ভিদ্ রস কি ভাবে সঞ্চালিত হ তাহা ঠিক করিবার এবং ঐ রসধারার অধিরোহ বেগ মাপিবার কোন উপায় ছিল না। আমা মনে হইল যে, একটি বিলম্বিত বৃক্ষপত্রকে প্রসারি হস্তের মতন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে কার এই পত্রের উত্থানপতন দৃষ্টে বৃক্ষে রস-সঞ্চাল হইতেছে বলিয়া বোঝা যায়। অন্যভাবে যখন বৃক্ষের র

সংগ্রহ শক্তি কমিয়া যায় তখন পত্রটি ঝুঁকিয়া পড়ে আবার রস-সংগ্রহ শক্তি বৃদ্ধি পাইলে উহা সোজা হইয়া উঠে। এই উত্থান-পতন এত ধীরে ধীরে হয় যে হঠাৎ দেখা যায় না। আমার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক লেখনী দ্বারা এই উত্থান-
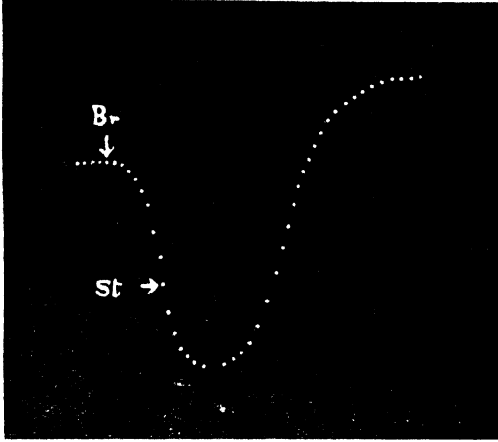
২নং চিত্র। উদ্ভিদ্-পত্রের অবসাদ (নীচের দিকের রেখা) ও উত্তেজনার (উপরের দিকের রেখা) রেখা-পাত।

পতন খুব বড় করিয়া দেখা যায় (১নং চিত্র)। ঐ লেখনী অদূরে বিলম্বিত পর্দ্দার উপর আলোক বিন্দু পাত করিয়া পত্রের আন্দোলন জ্ঞাপন করে। পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে উদ্ভিদের হস্তখানি (বিলম্বিত পত্রটি) যে ঝুঁকিয়া পড়ে, পর্দ্দার উপর তাহার আলোক-রেখা পাত হয়, আবার (উত্তেজক) কফি প্রয়োগে যে অবসাদগ্রস্ত বৃক্ষে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখা পাত হয় (চিত্র নং ২)। এই ভাবেই মৌন প্রাণ সুস্পষ্ট সঙ্কেতে স্বীয় অস্তিত্বের ও জীবনযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কার্ডিওগ্রাম্ ও স্ফিগ মোগ্রাম্

প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং ঔষধ প্রয়োগে ঐ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন কার্ডিওগ্রাম্ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কিছুদিন পরীক্ষা করিবার পর আমি দেখিতে পাই যে, এই যন্ত্র-লিখিত ফলের মধ্যে কিছু কিছু ভুল থাকিয়া যায়। কারণ লেখনী ও লিপিধারকের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ হওয়ার ফলে লিখন-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। তাহা ছাড়া উহাতে হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণের স্থিতিকাল ঠিক ঠিক মাপা যায় না। এইজন্য আমি রেজোনেণ্ট রেকর্ডার (Resonant Recorder) নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। উক্ত যন্ত্র সাহায্যে এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের কতবার সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় তাহা ধরা যায়।

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্ (Sphygmograph) নামক যন্ত্র সাহায্যে নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারাও পরোক্ষ ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আবার ক্রিয়া হ্রাস হইলে রক্তচাপও হ্রাস হয়। মণিবন্ধের নিকটস্থ শিরাটির স্পন্দন সহজেই ধরা যায় কিন্তু যেখানে শিরাটি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেখানে ইহার স্পন্দন উপলব্ধি করা অসম্ভব।

অপ্‌টিক্যাল স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্

বৃক্ষের নাড়ী-পরীক্ষা-কার্য্য স্বভাবতঃই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার জন্যই যদি বৃক্ষের রস-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ দ্বারাও ঐ যন্ত্রের সঙ্কোচন প্রসারণের পরিমাণ মাপা সম্ভব নহে। পরন্তু বৃক্ষের প্রাণময় কোষসমূহ উহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই অদৃশ্য অব্যক্তকে কি উপায়ে ব্যক্ত করা যায়?

আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। উদ্ভিদ্-রস যখন কাণ্ড আশ্রয় করিয়া উপরে উঠিতে থাকে সেই সময় বৃক্ষের কিরূপ হৃদ্‌স্পন্দন হয় আমি সর্ব্বপ্রথমে তাহাই ধরিতে চেষ্টিত হইলাম। প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের কাণ্ড খুব সামান্য ভাবে স্ফীত হয়। স্পন্দন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার পরেই আবার কাণ্ড পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর

হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া একপ্রকার হওয়ায় ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষের রস-সঞ্চালন-বেগ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌-কাণ্ড স্ফীত হইবে এবং বিপরীত ঔষধ প্রয়োগে বিপরীত ফল দৃষ্ট হইবে। এই সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-প্রসারণ পরিমাপের নিমিত্ত আমাকে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। প্ল্যাণ্ট, ফীলার (Plant Feeler) বা অপ্টিক্যাল স্ফিগমোগ্রাফ, (Optical Sphygmograph) নামক যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি তাহার সহিত সচল ও অচল দুইটি শলাকা যুক্ত রহিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ডটি এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয়। সচল শলাকাটির অগ্রভাগ ঈষৎ নাড়িলে যাহাতে সেই স্পন্দন ৫ কোটি গুণ বড় করিয়া দেখা যায় ও তাহার রেখাপাত হয় আমি এইরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি। মৃত বৃক্ষকে এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে আলোক-রেখা নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে—কারণ মৃত বৃক্ষের হৃদ্‌স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দন আলোক-রেখার কম্পন দেখিয়া বোঝা যায়। জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দনের হার প্রতি ৩ সেকেণ্ডে একবার। অবসাদ-প্রদায়ক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষের রসচাপের হ্রাস পায়; ফলে, আলোক-রেখা বাম দিকে (মৃত্যুর দিকে) আবর্ত্তিত হয়; আবার উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে আলোক রেখা দক্ষিণ দিকে (জীবনের দিকে) আবর্ত্তিত হয়। এই সঞ্চরমান আলোকরশ্মিই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভিদ্‌জীবনের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস ও অবসাদ ব্যক্ত করিল।

উপক্ষার (Alkaloids) ও নাড়ী-স্পন্দন

প্রাণী ও উদ্ভিদের নাড়ী-স্পন্দনে ওষধি ও উপক্ষারের প্রভাব একই প্রকার। যে সমস্ত ঔষধ প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে ঠিক সেই সমস্ত ঔষধই উদ্ভিদের রস-সঞ্চালন-শক্তি বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে অবসাদজনক ঔষধ প্রয়োগে উভয়ের দেহেই অবসাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সর্পবিষের ফল

প্রাণীদেহে অতি সামান্য মাত্রায় গোখুরা সর্পের বিষ প্রয়োগ করিলে মারাত্মক লক্ষণ দেখা যায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উদ্ভিদ-দেহেও সর্পবিষের ক্রিয়া ঐরূপ। ভারতবর্ষে প্রায় সহস্র বর্ষ যাবৎ প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্প বিষ হইতে প্রস্তুত সূচিকাভরণ ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, অতি সামান্য পরিমাণ সর্পবিষ উদ্ভিদের হৃদ্‌ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম

প্রাণযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, অদৃশ্য জগতকে দৃশ্যমান করা, মৌন জগতের ব্যাকুলতা শ্রবণ করিতে সমর্থ হওয়া—এই সমস্ত অসম্ভব কার্য্যকে সম্ভব করা কি অত্যাশ্চর্য্যজনক নহে?

মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম অতিশয় করুণ--বৃক্ষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামও সেইরূপ করুণ। আমার যন্ত্র-সাহায্যে উদ্ভিদ্‌-জগতের এই জীবন-মৃত্যু-সংগ্রাম লোক-চক্ষুর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। বিষ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষ কিরূপ দ্রুতগতিতে মৃত্যু-রেখার দিকে ধাবিত হয় আবার উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিলে মরণোন্মুখ উদ্ভিদের প্রাণ কিরূপে আবার আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহা চক্ষুর সমক্ষে প্রতিফলিত হয়।

অবিচলিত চিত্তে জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ এরূপ শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে যাহা দ্বারা সে প্রাণ-যন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহাকে অবসাদগ্রস্ত বা উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়।

উর্ব্বশী ও পুরূরবা

শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী, কোনো এক যজ্ঞ-উৎসবে মিত্র ও বরুণের দৃষ্টিপথে পড়িয়া গেল, দেবতাযুগলের তাহাতে চিত্তবিকার ঘটিল। ফলে উভয়ের ঔরসে কুম্ভের মধ্যে একটি সন্তান জন্মিল, তাহার নাম হইল কুম্ভযোনী বা অগস্ত্য, আর জলের মধ্যে উৎপন্ন হইল আর একটি সন্তান, ইহার নাম বসিষ্ঠ। কিন্তু এই চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু বলিয়া মিত্র ও বরুণ উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন যে, মর্ত্ত্যে যাইয়া সে মানুষের পত্নী হইবে। পৃথিবীতে যে-মানুষ উর্ব্বশীর প্রেমাসক্ত ও পতি হইলেন, তিনি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ রাজা পুরূরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার এক পুত্র হইল, তাহার নাম আয়ু। শাপের অবসানে উর্ব্বশীকে আবার স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাহাতে পুরূরবা এত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, উর্ব্বশীকে প্রতিবৎসরে একটি রাত্রিতে আসিয়া পুরূরবার সহিত সহবাস করিতে হইবে এই অঙ্গীকার করিতে হইল। কিন্তু ইহাতেও পুরূরবা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; শেষে গন্ধর্ব্বদের সহায়ে স্বর্গে যাইয়া উর্ব্বশীর সহিত তিনি চিরন্তনের জন্য সম্মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটকে (কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী), পুরাণে ও ব্রাহ্মণে উর্ব্বশী-পুরূরবার যে কাহিনী নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহার সারাংশ এই। মূল আখ্যায়িকাটি পাই আমরা ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে যাহা আছে, তাহাকে পরে ডালপালা দিয়া বাড়াইয়া সাজাইয়া রীতিমত একটি উপন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে। উর্ব্বশী ও পুরূরবার উল্লেখ ঋগ্বেদে ইতস্ততঃ কয়েকটি স্থানে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুইটিই প্রধান। প্রথম হইতেছে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মকথা (৭ম মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত, ৯-১৩ ঋক্), দ্বিতীয় হইতেছে উর্ব্বশী-পুরূরবার বিদায় কথোপকথন (১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত)। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মসম্বন্ধে যতটুকু আছে তাহার বিবৃতি প্রয়োজন মত যথাস্থানে আমরা দিব; আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় হইতেছে উর্ব্বশী-পুরূরবার কথোপকথনটি। উর্ব্বশী-পুরূরবার এই বিদায়দৃশ্য ক্ষুদ্র একখানি নাটিকা—নাটকীয় রসে ও লাস্যে, ভাবে ও চলনে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অতি অপূর্ব্ব, তবে তাহার নিগূঢ় অর্থ উর্ব্বশীর মতই বায়ুবৎ দুর্গাহ্য, "দুরাপনা বাত ইব।"

এই কথোপকথন হইতে উর্ব্বশী-পুরূরবা সম্বন্ধে যতটুকু স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহা প্রথমে সংক্ষেপে আমরা বলিতেছি। উর্ব্বশী স্বর্গের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, পুরূরবা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন, নিজের ঘরে নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছেন। উর্ব্বশী মর্ত্ত্যলোকে পুরূরবার গৃহে আনন্দভোগ করিয়াছে, এ কথা সত্য; এই ভোগ পাইবে বলিয়াই সে স্বর্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উর্ব্বশীর নির্দ্দেশ অনুসারে পুরূরবা চলিতে পারে নাই, তাহার কথা রাখিতে পারে নাই * তাই উর্ব্বশীকে চলিয়া যাইতে হইতেছে। পুত্রের দোহাই দিয়া পুরূরবা উর্ব্বশীকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন—উর্ব্বশী বলিল সে বাতাসের মত "দুরাপনা" কে তাহাকে স্পর্শ করিবে, ধরিয়া রাখিবে? পুরূরবা পণ করিলেন উর্ব্বশীর সাথে সাথে যাইবেন, না হয় মৃত্যুকে বরণ করিবেন। উর্ব্বশী শেষে পুরূরবাকে এই আশ্বাস দিয়া অন্তর্হিত হইল, মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া স্বর্গে উর্ব্বশীর সহিত তিনি চিরন্তনের জন্য মিলিত হইবেন।

এই কাহিনীর অর্থ কি? উর্ব্বশী কে, পুরূরবাই বা

---

* ব্রাহ্মণকার ব্যাখ্যা-স্বরূপ এখানে এই গল্প রচিয়াছেন যে, উর্ব্বশী দুইটি সর্ত্তে পুরূরবার সহিত বাস করিতে রাজী হইয়াছিল—(১) উর্ব্বশীর দুইটি প্রিয় মেষশাবক ছিল, তাহাদিগকে শয্যাপার্শ্বে রাখিতে হইবে, যেন কেহ চুরি করিতে না পারে—উর্ব্বশীকে স্বর্গে ফিরাইয়া লইবার জন্ত গন্ধর্ব্বেরা মেষশাবক দুইটি কৌশলে চুরি করে, পরে অবশ্য পুরূরবা গন্ধর্ব্বদের পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করেন; (২) বিবস্ত্র অবস্থায় পুরূরবা উর্ব্বশীকে যেন কখন না দেখেন।

কে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদকে বাহ্য প্রকৃতির কাব্যাত্মক বিবরণ, বিশেষতঃ সূর্য্য-বিষয়ক রূপক (Solar Myth) বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে বরুণ হইতেছে আকাশ, মিত্র উদয়ের সূর্য্য, বা ভোরের আলো বা দিবস, অগস্ত্য অস্তগামী সূর্য্য, পুরূরবা হইতেছে সাধারণ ভাবে সূর্য্য, সূর্য্যের আর এক নাম বসিষ্ঠ ('বসিষ্ঠ' অর্থ দীপ্ততম—বস্ ধাতু হইতে) আর উর্ব্বশী হইতেছে উষা। "পুরূরবা" অর্থ 'পুরু' অর্থাৎ প্রভূত বা অনেক 'রব' যাহার। 'রব' কথাটির ধাতুগত অর্থ যদিও 'শব্দ' তবু 'রু' ধাতু বর্ণের পক্ষেও প্রযোজ্য—যাহাকে বলে "loud or crying colour" অর্থাৎ রক্তবর্ণ। তাই সূর্য্যের আর এক নাম 'রবি' (Max Mullar)। উর্ব্বশী অর্থ "উরু+ অসি"—"উরু, বিস্তীর্ণ তুমি হইয়াছ" কথাটি উষারই এক বিশেষণ।*

উষার পশ্চাতে পশ্চাতে সূর্য্য উঠিয়া ছুটিতেছে, আর উষা পলায়ন করিতেছে, অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিবসের অনুধাবনের পর "অস্তে" গিয়া সূর্য্য আবার উষার সহিত মিলিত হইতেছে, উষার অন্য একরূপে। ঋগ্বেদের রূপকটির এই অর্থ, ইউরোপীয়দের মতে। সূর্য্য এক হিসাবে উষার প্রেমিক—তখন তাহার নাম পুরূরবা; আবার অন্য হিসাবে সে উষার সন্তান (রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাৎ—১-১১৩-২), তখন সে বসিষ্ঠ। আকাশে প্রাতঃকালে উষার গর্ভে সূর্য্যের আবির্ভাব—এই হিসাবে উর্ব্বশীর সহিত বরুণ-মিত্রের সম্বন্ধেরও সার্থকতা দেখা যাইতেছে।

পাশ্চাত্যেরা ত এই কথা বলেন। আমরা চেষ্টা করিব অন্য রকম একটি ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় কি না। পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যায় কোথায় কি অসঙ্গতি কষ্টকল্পনা তাহার বিশদ আলোচনা আমরা করিব না। আমরা বেদের মূলমন্ত্র ধরিয়া ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব তাহার প্রকৃত অর্থ কি—পাশ্চাত্য ব্যাখ্যার, তথা সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যারও অভাব ও ত্রুটি আনুষঙ্গিকভাবে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। বেদের মূলে ঠিক কি বলিতেছে? উর্ব্বশী কে, পুরূরবা কে—কিছু স্পষ্ট নির্দ্দেশ সেখানে পাওয়া যায় কি? আমাদের ত মনে হয় নির্দ্দেশ খুব অস্পষ্ট নয়।

উর্ব্বশী কে? উর্ব্বশী হইতেছে বৃহৎ দ্যুলোক বা জ্যোতির্ম্ময় প্রতিষ্ঠান, উর্ব্বশী সত্য-বাণীর সহায়ে সকল প্রকাশ করিতেছে (গিঃ-গৃ-ধাতু), উর্ব্বশী আয়ুকে অর্থাৎ জীবনপ্রতিভাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সংহত উপচিত করিয়া সম্মুখে (প্র+ভৃ) চালাইয়া লইয়াছে—উর্বশী বা বৃহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্যায়োঃ (৫-৫১-১৯)। এই যে "বৃহৎ দিবা"র জ্যোতি তাহা কি কেবল স্থূলজগতের ভোরের আলো? উর্ব্বশীর আলো, তাহা যে অভয় জ্যোতি —উর্ব্বশ্যামভয়ম্ জ্যোতিঃ (২-২৭-১৪)। দেবত্ব-কামী যাহারা তাহারাই চলিয়াছে এই বিস্তীর্ণ জ্যোতির অভিমুখে —উরুজ্যোতির্নশতে দেবযুর্ব্বে (৬-৩-১)। দেবত্বের সাধক যাহারা তাহাদেরই অন্য নাম আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ বা জ্যোতিকে সম্মুখে করিয়া অগ্রসর হইতেছে যাহারা—জ্যোতিরগ্রাঃ (৭-৩৩-৭)। জ্যোতি, বৃহৎজ্যোতি সৃষ্ট হইয়াছে প্রকাশ পাইতেছে আর্য্যের জন্য—জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায় (১-১১৭-২১), উরু জ্যোতির্জ্জনয়নার্য্যায় (৭-৫-৬)। উরু-লোক শুধু আকাশ নয়—তাহা 'উরু উ লোকং' (৭-৩৩-৭), ওপারের বৃহৎ লোক, যাহার স্থান "উত্তমে সধস্থে", "পরে অর্দ্ধে", "পরমে ব্যোমন্"। মানুষ চাহিতেছে বৃহৎ দেবজন্ম—বৃহতে দেবতাতয়ে (৯-১৫-৭), পরম ব্যোমস্থ সত্যধর্ম্মের জন্য—সত্য ধর্ম্মণো পরমে ব্যোমনি (৫-৬৩-১), বৃহৎ জ্ঞানের জন্য—বৃহৎ কেতুং রুরুচপং (৫-৮-২), বৃহৎ শক্তির জন্য—ক্রতুং বৃহন্তং (১-২-৮), বৃহৎ আনন্দের জন্য, যাবতীয় কাম্যেরই জন্য—বৃহৎরয়িং বিশ্ববারং(৬-৪৯-৪); দেবতাদের সহায়ে মানুষ চাহে বৃহৎ অমৃতত্ব—বৃহদ্দেবাসঃ অমৃতত্বং আনশুঃ (১০-৬৩-৪)। মানুষের অন্তরাত্মার কামনা বৃহত্তের বৃহৎ কল্যাণে পরম আনন্দ লাভ করা—উরৌ যথা তব শর্ম্মন মদেম (১০-১৩১-১)।

উর্ব্বশী হইতেছে বৃহত্তের ভোগ (উরু+অশ)। সেই

---

* পুরাণকারেরা "উর্ব্বশী" কথাটিতে বিকল্পে দীর্ঘ উ ও দন্ত্য স দিয়া এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন, নারায়ণের উরু হইতে "উর্ব্বশীর" জন্ম—উরু+অসি। কিন্তু এই বানান ব্যত্যয়ের কোনই প্রয়োজন নাই। 'উরু' ও 'অশ্' হইতেই 'উর্ব্বশী' পদ সিদ্ধান্ত হয়—পরে আমরা ইহার অর্থ বলিতেছি।

প্রাণ মনের উপরে রহিয়াছে যে অতিমানস বা তুরীয় জ্যোতির প্রতিষ্ঠান যাহা "সত্যং ঋতং বৃহৎ", যাহারই নাম মহর্লোক বা স্বর্লোক—দেববৃন্দের ধাম, তাহাদের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম যেখানে সেই দিব্য চেতনার দিব্য আনন্দই উর্ব্বশীতে মূর্ত্ত। মানুষের সাধারণ প্রাকৃত জীবনে যে আনন্দ তাহা ক্ষুদ্র, ক্ষণিক, বিক্ষিপ্ত, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত—দভ্রাঃ, বহবঃ (৪-২৫-৫); কিন্তু অদিতির অর্থাৎ অখণ্ড অসীম সত্তার, উদার অবাধ চেতনার যে "অচ্ছিদ্র শর্ম্ম", যে "আনন্দং অমৃতং" তাহারই প্রকাশ হইতেছে উর্ব্বশী—উরু অস্মা অদিতিঃ শর্ম্ম যংসৎ (৪-২৫-৫)।

পুরূরবা কে? বহুল বিপুল কণ্ঠধ্বনি যাহার। কে সে? সে হইতেছে মানুষ—মনু, মনোময় জীব। "পুরূরবসে মনবে দ্যামবাশয়ঃ" (১-৩১-৪)—পুরূরবা যে মনোময় জীব তাহারই জন্য অগ্নিদেবতা অর্থাৎ চিন্ময় তপঃশক্তি (কবিক্রতুঃ) আপন উর্দ্ধয়নের গর্জ্জনে দ্যুলোক অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় মানসলোক, দিব্যমন (দেবং মনঃ) প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের কণ্ঠে কেন এই ধ্বনি, এই আরাব? এই রবেরই অন্য নাম "হুতি", "স্তুতি" "উক্‌থ", "শংস"—অন্তরাত্মার সেই মন্ত্র সেই বাক্ যাহা দেবত্বকে আহ্বান করিতেছে, প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, রূপ দিতেছে, প্রকাশ করিতেছে; ইহাই বৃহস্পতির, দেহ প্রাণ মন এই ত্রিভূমীর যিনি অন্তরস্থ অধিপতি তাঁহার রব—বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেন···(৪-৫০-১)। মানুষের সাধনা দেবত্ব লাভ করা, দেবত্ব সৃষ্টি করা ("দেববীতয়ে", "দেবতাতয়ে",) "দেব জন্ম" বা "দিব্য জন্ম" অধিগত করা; মনোময় জীবের লক্ষ্য শুভ্রা দীপ্তা দিব্য মনীষার সহায়ে প্র শুক্রা এতু দেবী মনীষা—(৭-৩৪-১), মনন শক্তিকে চিন্তাশক্তিকে বৃহতের চেতনায় শুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়া (বৃহতী মনীষা ৬-৪৯-৪; মহীং সুমতিং—৭-২৫-৬), দিব্য ধীর ও দেবত্ব অভিমুখী বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া (দেবীং ধিয়ং দধিধ্বং, দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বং ৭-৩৪-৯), বৃহতেরই বিশাল প্রেরণায় (ইষো মহীঃ—৩-২২-৪) মহান্ অনিবাধ বৃহতে বাড়িয়া উঠা (উরৌ মহান্ অনিবাধে ববর্দ্ধ—৩-১-১১), উর্ব্বশীর যে দিব্যজ্ঞানময় বৃহৎ জ্যোতি (মহী জ্যোতিঃ··· বিভ্রতী গোঃ—৩-৩০-১৩,১৪) তাহাকে মানুষী জন্মে (মানুষস্য জনস্য জন্ম—১-৭০-১) মূর্ত্ত করা, উপভোগ করা।

উর্ব্বশী উষা হইতে পারে, কিন্তু সে উষা মানুষের চেতনায় বৃহতের প্রকাশ, তাহার জ্যোতি আসিতেছে ওপার হইতে, পরম পরার্দ্ধ হইতে,—পরমে পরাকাৎ। প্রাকৃতিক উষা এই অতি-প্রাকৃত দিব্য উষার—স্বর্গ-দুহিতার প্রতীক।* উষা আসিয়াছে দিব্য আনন্দের মানুষী কল্যাণরূপে—মনুষ্বৎ, শন্তু আগতং (১-৪৬ ১৩)। মনোময় জীবের কাছে তৃপ্তির বহুল বিপুল পরিপূর্ণতা সে লইয়া আসিয়াছে—উষো বাজং হিবংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে (১-৪৮-১১)। মানুষ উপভোগ করিবে দৃঢ় বৃহৎ যে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ—বিদৎ গব্যং সরমা† দৃঢ়ং উর্বং যেনা নু কং মানুষী ভোজতে বিট্ (১-৭২-৮)। "উরু"কে চাহিতেছে "পুরু"—ওপারের বৃহৎকে চাহিতেছে জীবের এ পারের বহুল প্রকাশ। মানুষের অন্তরের সনাতন প্রার্থনা—বৃহতে যে কল্যাণ, যে সুখ তাহারই ভোক্তা যেন আমরা হইতে পারি, আমাদের মানস-আয়তন যেন জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় হইয়া উঠে ও জাগ্রতে জন্ম দেয়, গড়িয়া তোলে দিব্যসত্তা দিব্য তনু—রায়ো বন্তারো বৃহতঃস্যাম, অস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র

* উর্ব্বশী যে কেবল বাহিরের উষা নয়, সে যে ভিতরের চেতনার উষা, তাহার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিতের কথা এখানে আমরা বলিব। উর্ব্বশীর সহিত আর একটি অপ্সরার উল্লেখ করা হয়, তাহার নাম "পূর্ব্বচিত্তি"—উর্ব্বশী চ পূর্ব্বচিত্তিশ্চাপ্সরসৌ (শতপথ ব্রাহ্মণ—৮-৬-১-২০)। পূর্ব্বচিত্তির অর্থ সায়ণ করিয়াছেন 'পূর্ব্ব প্রজ্ঞাপনা', ম্যাকডোনেল করিয়াছেন "first thought", আমরা বলিব প্রথম চেতনা, আদি অনুভব বা পূর্ব্বাভাস, অর্থাৎ বৃহতের প্রকাশে মানব-চেতনার প্রথমবিক্রিয়া, আলঙ্কারিকেরা 'ভাব' কথাটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন কতকটা সেই ধরণের (নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া)। পূর্ব্বচিত্তি কথাটি ঋগ্বেদ একস্থানে ব্যবহার করিয়াছে, ঋগ্বেদীয় ঋষি সেখানে বলিতেছেন জ্ঞানের জ্যোতি যাহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে (প্র চেতসঃ) যাহারা "স্বরাজ্য" অর্থাৎ পরপারস্থ "স্বদম" বা স্বগৃহের স্বধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিয়া জ্যোতিষ্মান্ (বষ্টোঃ অনু স্বরাজ্যং) সেই দিব্য গো-যূথ (জ্ঞানরশ্মি) 'পূর্ব্বচিত্তির' জন্য অর্থাৎ মানব-চেতনাকে পূর্ব্বাভাস দেওয়ার জন্য—ভবিষ্যতে পূর্ণ প্রকাশের সূত্রপাত বা উপক্রমণিকা স্বরূপ ইন্দ্রের বা জ্যোতির্ম্ময় মনপুরুষের কর্ম্ম চেষ্টা ফুটাইয়া তুলিতেছে-(১-৮৪-১২)।

† 'সরমা' কি পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'গব্যং' জ্যোতিঘন, জ্যোতিঃর নির্য্যাস, গো অর্থ জ্যোতি।

প্রজাবান্ (৩-৩০-১৮ ;—ভগ হইতেছে ভোগের বা দিব্য আনন্দের দেবতা, আর ইন্দ্র হইতেছে ইন্দ্রিয়-গ্রামের অধিপতি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মনপুরুষ, "নৃমনঃ" "মনায়ু)।"

উর্ব্বশী ও পুরূরবার এই হইল স্বরূপ। ঋগ্বেদীয় মৈত্রাবরুণী উপাখ্যানে (৭-৩৩) ইহার কি সমর্থন হয়, তাহা এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব। পুরূরবা যখন উর্ব্বশীর আনন্দময় বৃহৎ চেতনায় পূর্ণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তখনই তাহার নাম বসিষ্ঠ অর্থাৎ পরম জ্যোতির্ম্ময়। বসিষ্ঠরূপী পুরূরবার, জীবের দিব্যসত্তার জন্ম তাই উর্ব্বশীর দিব্য মানসকে আশ্রয় করিয়া—বসিষ্ট উর্ব্বশ্যাঃ ব্রহ্মণ্ মনসঃ অধিজাতঃ। বসিষ্ট যে স্থূল সূর্য্যটি মাত্র নয়, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বৈদিক ঋষির এই কথা যে স্থূল সূর্য্যের সাথে বসিষ্ঠদের তুলনা করা হইয়াছে মাত্র—সূর্য্যের জ্যোতির মতই বসিষ্ঠদের জ্যোতি, সমুদ্রের মতই যেমন গভীর তাহাদের মহত্ত্ব—সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ। ফলতঃ ঋষিদের সূর্য্য হইতেছে অন্তরের অন্য একটা চেতনার জ্ঞান-সূর্য্য বাহিরের সূর্য্য তাহারই প্রাকৃতিক মূর্ত্তি। স্পষ্টই বলা হইয়াছে, সূর্য্য বা সবিতা হইতেছেন তিনি, যিনি সত্যকে জন্ম দিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন—"সবিত্রে সত্য প্রসবায়' (৬ ৪-১৯), "সত্যসব" (৫-৮২-৭) ; সত্যং তাতান সূর্য্যঃ (১-১০৫-১২)—সত্যকেই সূর্য্য প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছে।* বসিষ্ঠেরা তাই চলিয়াছে বিশ্ব-সত্যের যে সহস্রধা সূক্ষ্মরূপ তাহার দিকে—নিণ্যং সহস্রবলশং—বাহিরের দৃষ্টি দিয়া নয় কিন্তু হৃদয়ের প্রজ্ঞান দিয়া—হৃদয়স্য প্রকেতৈঃ। হৃদয় হইতেছে জীবের সত্যপুরুষের অধিষ্ঠান। এই অন্তর্মুখী অভিজ্ঞানের কথা ঋগ্বেদ কত ভাবে বলিয়াছেন—হৃদয়ে যে তপঃশক্তি—"হৃৎসু ক্রতুং" (৫-৮৫-২) হৃদয়-সমুদ্রের অন্তরস্থ জীবনের যে আনন্দামৃতময় ঊর্ম্মি—"ঊর্ম্মির্ম্মধুমান্… সমুদ্রে হৃদি অন্তর আয়ুষি" (৪-৫৮-১,১১); উর্ব্বশী পুরূরবার কথোপকথনেও পাই "হৃদে চক্ষু'র উল্লেখ (৬ষ্ঠ ঋক্)। বসিষ্ঠ পুরূরবা "ব্রহ্ম" অর্থাৎ বৃহতের নাদ উচ্চারণ করিয়াই তাহার দিব্য মনোময় পুরুষে, জ্যোতির্ম্ময় শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইন্দ্র তাহারই ফলে সত্যশ্রুতির * সহায়ে বসিষ্ঠস্য স্তুবতঃ ইন্দ্র অশ্রোৎ—সৃষ্টি করিয়াছেন সেই "উরুং উ লোকং"। উর্ব্বশীর বৃহতের যে আনন্দময় প্রকাশ তাহাকে ঘিরিয়া জন্মিয়াছে পুরূরবার মানুষের দিব্যসত্তা, তাহারই কল্যাণে মানুষ বসিষ্ঠ হইয়া সহস্রশাখ জীবন-আয়তনকে রূপান্তরিত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে—যমেন ততং পরিধিং বয়িষ্যন্ অপ্সরসঃ পরিজজ্ঞে বসিষ্ঠঃ।†

বসিষ্ঠ হইতেছে সূর্য্য আর্থৎ পুরূরবা জীব-পুরুষের দিব্যজ্ঞানময় রূপ, আর অগস্ত্য হইতেছে অগ্নি অর্থাৎ তাহার তপোময় রূপ। মানুষের ক্রমোন্নতি আধ্যাত্মিক প্রগতি দুইটি শক্তিকে আশ্রয় করিয়া দুইটি ধারায় চলিয়াছে—উপরের অবতরণ আর নীচের উন্নয়ন; তাই ত ঋষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন—অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্যানুবেদ পর এনাবরেণ কবীয়মানঃ কঃ (১-১৬৪-১৮) অধোভাগকে উর্দ্ধভাগ দিয়া, উর্দ্ধকে অধোভাগ দিয়া, এই ভাবে পিতাকে যে জানে সেই দ্রষ্টা কবি হইতে চলিয়াছে—যে সর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহু র্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ সর্বাচ আহুঃ(১-১৬৪-১৯), যাহা নিম্নমুখী তাহাই উর্দ্ধমুখী, আর যাহা উর্দ্ধমুখী তাহাই নিম্নমুখী। উপর হইতে দিব্যজ্যোতি নামিয়া আসিয়া এক দিকে মানবাত্মাকে অধিকার করিতেছে, তখনই সে বসিষ্ঠ; আর নীচের দিক ভিতর হইতে মানুষের পুরুষকার, মানবীয় তপঃ-চেষ্টা তাহাকে উর্দ্ধলোকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখনই সে অগস্ত্য। সূর্য্যের প্রকাশ তাই দ্যুলোকে, অগ্নির প্রকাশ পৃথিবীতে—সূর্য্য হইতেছে 'দিবস্পুত্র' (১০-৩৭-১), আর অগ্নি হইতেছে দেহের পুত্র, "তনূনপাৎ" (৩-৪-২)। তাই পার্থিব

---

* সূর্য্য যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সূর্য্য হইতে পারে তাহা স্থানে স্থানে সায়ণাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। Wilson তাই সূর্য্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ এই ভাবে এক জায়গায় করিয়াছেন, "who is the author of the *spiritual light* and who renders everything luminous through the light of the mind"(১-৫০-৪,১০)

* "সত্যশ্রুতি" কথাটি আমার নয়, স্বয়ং বৈদিক ঋষির—সত্যশ্রুতঃ কবয়ঃ (৫-৫৭-৮)।

† সায়ণও বাধ্য হইয়া এখানে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য ব্যাখ্যা তাঁহারও কাছে সুসঙ্গত হয় নাই। "যম" অর্থ সায়ণ দিয়াছেন সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর; আমাদের মতে যম হইতেছে, দেহকে, জড় প্রতিষ্ঠানকে ধরিয়া আছে, গড়িয়া তুলিতেছে যে প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি তাহার অন্তর্নিহিত "ধর্ম্ম" বা নিয়ামিকা শক্তি; দেহে প্রাণে সংযোগ সাধন করিতেছে, আদান প্রদান নিয়মন করিতেছে সূর্য্যশক্তির যে বিশেষ বিভূতি তাহাই যম।

চেতনায় অগ্নি যেমন জ্বলিয়া উঠে, শব্দ মানস-চেতনায় সূর্য্যও তেমনি উদিত হয়—অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্য্য (১-১৫৭-১)।

বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম তখনই সম্ভব যখন অধ্যাত্ম চেতনার যে আনন্দময় উষা তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হন মিত্র ও বরুণ। বরুণ হইতেছে বৃহতের প্রসারিত সত্তা অসীম চেতনা, আর মিত্র হইতেছে তাহার মধ্যে বহুল বিচিত্র প্রকাশকে ধরিয়া রহিয়াছে যে মিলন, যে ছন্দ, যে সামঞ্জস্য। মানব-অন্তরে সাধনার যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উষার জ্যোতি দেখিয়া বরুণ মিত্র—বৃহতের সত্তা, বৃহতের ধর্ম্ম—নামিয়া আসিল। প্রবুদ্ধ মানবাত্মার দিব্যমন্ত্রের বলে ওপার হইতে বীজপাত হইল—দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণাদৈব্যেন। স্বর্লোকের এই বীজ দেবশক্তিরা উপ্ত করিল মানুষের আধারের প্রতি স্তরের নিগূঢ় রসাত্মক সত্তায়—বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত। মিত্র-বরুণ—অনন্তের অসীমের ছন্দ ও সত্তা—প্রথম জাগিতে থাকে মানুষ যখন যজ্ঞপরায়ণ হয় অর্থাৎ যখন সে নিম্নতর, প্রাকৃত প্রেরণা সব উৎসর্গ করিয়া চলিতে থাকে উর্দ্ধতর, দিব্য প্রেরণার কাছে—এই নমোঃ মানবাত্মার এই প্রণতির শক্তিই মিত্র বরুণকে অনুপ্রাণিত করে, প্রচালিত করে জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের দিকে, তাঁহাদের দিব্য বীর্য্য তখনই নিক্ষিপ্ত হয় কুম্ভে অর্থাৎ এই মানবাধারে * তাহা হইতেই অগ্নি ও বসিষ্ঠের উৎপত্তি (৭-৩৩-১০-১১-১৩)।

বসিষ্ঠ-অগস্ত্য এবং উর্ব্বশী-পুরূরবার স্বরূপ আমরা এই কথঞ্চিত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিলাম। এখন উর্ব্বশী পুরূরবার কথোপকথনটি ধরিয়া উভয়ের সম্বন্ধের যে গভীর রহস্য তাহা উদ্ঘাটন করা তেমন কঠিন বোধ হয় আর হইবে না।

* পরবর্ত্তীকালে দার্শনিকেরা মানবাধারকে ঘটের সহিত প্রায়ই তুলনা করিয়াছেন।

নেতা রামমোহন*

কাজী আব্দুল ওদুদ

বাংলার 'পুরুষকারের মূর্ত্ত-বিগ্রহ মুক্তিমন্ত্রের মহা উদ্-গাতা রামমোহনের প্রতি আমি হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা বহন করি কথায় তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবো কি না বলতে পারি না; কিন্তু রামমোহনকে ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি।

বৃক্ষঃ ফলেন পরিচীয়তে; রামমোহনের মনুষ্যত্বের ও মুক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য কত তাও চীৎকার ক'রে বল্‌বার দরকার করে না। তাঁর প্রচারের পর শত বৎসর গত হয়েছে, এই একশত বৎসরের বাংলার ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আপনি সে মাহাত্ম্যের পরিমাপ হয়। এই শত বৎসরে বাংলার মানুষ সর্ব্বপণ-পণে সত্যের সাধনা করেছে; জীবনের প্রকৃত আস্বাদ লাভের জন্য, প্রকৃত রূপ দেখে নয়ন সার্থক কর্‌বার জন্য, অতি নির্ম্মম হ'য়ে প্রাচীন সংস্কারকে আক্রমণ করেছে;—মানবাত্মার সেই সংগ্রামের সাম্‌নে মস্তক আপনি নত হ'য়ে আসে! সত্য সাধনার এই কি স্বরূপ নয়? কোনো এক যুগে মানুষ সত্য-সাধনা করেছে, তারপর সেই অতীত সাধনার রোমন্থন ক'রেই মানুষের চলে বা চল্‌তে পারে, মানুষের ঘৃণিত অধঃপতন ও শোচনীয় আধ্যাত্মিক আত্ম-হত্যার পক্ষে বারবার কি একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই? পণ্যদ্রব্যের মতো সত্য কোথাও কিন্‌তে পাওয়া যায় না—না শাস্ত্রের কাছ থেকে, না গুরুর কাছ থেকে—বৃক্ষে পুষ্পোদ্‌গমের মতো পরম বেদনায় মানবজীবনের ভিতর

* ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবাসরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত।

থেকে তার জন্ম হয়, মানুষের জীবনে এই মহাসৃষ্টিতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে আমাদের ঘটেছে। আর কে না আজ জানে সেই সৌভাগ্যের জন্য কোন্ পরম ভাগ্যবানের কাছে আমরা ঋণী!

কিন্তু রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কণ প্রয়াস, এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসেও তার আংশিক পরিচয়ই আমাদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, পূর্ণ পরিচয়ের উদ্‌ঘাটনের ভার ন্যস্ত রয়েছে ভবিষ্যতের উপর। প্রধানতঃ দুটি কথা ভেবে এ কথা বল্‌ছি। প্রথমতঃ, রামমোহনের যে মুক্তি-মন্ত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-অভিমানী বাঙালীর কণ্ঠে আজ তা আর উদাত্ত সুরে বিঘোষিত হচ্ছে না; দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের আত্মীয়-গোষ্ঠীর এক বড় শাখা, অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজো সচেতন হ'য়ে ওঠে নাই। রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান ক'রে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জ্জন করেছে। এ তীর্থ যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রী লাভের জন্য অমোঘ, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক মুসলমানকেও একথা স্বীকার করতে হবে।

কেন এ কথা বল্‌চি তা একটু বিস্তৃতভাবে বল্‌লে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। সে পরিবর্ত্তন যে শুধু মানুষের কথায়-বার্ত্তায়, সাজ-সজ্জায় ও জীবনযাত্রার প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, মানুষের মত-বিশ্বাস সাহিত্য-ধর্ম্ম এ সমস্তেও তা বর্ত্তে। কিন্তু জীবনে পরিবর্ত্তনের শাসন স্বীকার করলে মুখে তা স্বীকার করতে মানুষের দেরী হয়; এ স্বাভাবিক; মানুষের জীবন তার কথার আগে চলে। কিন্তু দেরী হ'লেও যে-সমাজ সভ্যতার দাবী করে, অন্যান্য সভ্য সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে বেঁচে থাকতে চায়, তার পূর্ণভাবেই পরিবর্ত্তনের শাসন স্বীকার ক'রে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই আধুনিক কালের সঙ্গে মুসলমানের যখন সম্যক্ পরিচয় হবে এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে এক নূতন দৃষ্টিতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র ও সভ্যতার প্রতি চাইতে বাধ্য হবে, তখন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে দেখ্‌বে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশের এই মহাপুরুষ ইসলাম ও মুসলমানের অনেক কিছু উপাদানরূপে ব্যবহার ক'রে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে কি এক গৌরবময় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেছেন—এবং সেই দিক দিয়ে আধুনিক মুসলমানদের তিনি কিরূপ একজন অগ্রবর্ত্তী নেতা। ভিন্ন সমাজের লোক হ'য়েও রামমোহন যে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ, আত্মপ্রকৃতির ধর্ম্মে হজরত মোহম্মদের চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন; আর ইসলামের ইতিহাসে যা-কিছু মূল্যবান যা-কিছু স্মরণীয়, যেমন কোরআন, হজরত মোহম্মদের জীবনী ও বাণী, মোতাজেলা দর্শন, সুফি সাহিত্য, এ সমস্তের সঙ্গে তাঁর অতি গভীর পরিচয় ছিল—এমন গভীর যে তার সাহায্যে যে কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ক'রে নেওয়া যায়। তাই হিন্দু যেমন রামমোহনকে ব্রহ্মবাদী ঋষির উত্তরপুরুষ ব'লে গণ্য করেছেন, মুসলমানও তেম্‌নি একদিন তাঁকে 'তৌহীদ'-মন্ত্রী সাম্যবাদী হজরত মোহম্মদের একালের একজন শক্তিধর শিষ্যরূপে জান্‌বেন এবং তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব ক'রে তাঁর মুক্তিমন্ত্রে নিজেদের হারিয়ে-ফেলা-মুক্তি ও মনুষ্যত্ববোধের অমৃত-স্বাদ পুনরায় লাভ করবেন।

বাস্তবিক, হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উভয়ের শাস্ত্রকে আস্বাদ ক'রে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জটিলতম অংশের সমাধান রামমোহন নিজের জীবনে ও সৃষ্টিতে করেছেন। আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিত্তে শুভবুদ্ধি শোচনীয়ভাবে আচ্ছন্ন। এই আত্মঘাতী মোহের অবসানে, আধুনিক ভারতের সভ্যতার নেতা রামমোহনের উপর উভয়ের দৃষ্টি পড়্‌লে, হয়ত সুফল ফল্‌বে।

আর শুধু হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কেন প্রাচীন শাস্ত্রকে একেবারে বাদ না দিয়ে, কিন্তু সেই শাস্ত্রের উপর বিচার বুদ্ধি ও লোক-শ্রেয়ের আদর্শের প্রাধান্য দিয়ে নব্যভারতের এগিয়ে চলার জন্য যে পথ নির্দ্দেশ তিনি করেছেন, মনে হয়, ভারতের জন্য আজো

সেই-ই শ্রেষ্ঠতম পথনির্দ্দেশ। রামমোহনের পরে অন্যান্য সাধকের আবির্ভাব ভারতভূমিতে ঘটেছে; তাঁদের প্রচারের ফলে গুরু ও শাস্ত্রের নব প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখ্‌বার কথা এই, ভারতের কোন্ সমস্যা বড়,—'হৃদয়ারণ্যের গহনে' ঘুরপাক খাওয়ার সমস্যা, না, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সেই সমস্যা। মনে হয়, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সেবিষয়ে ভারত বহুকাল ধ'রে অনেক পরিমাণে উদাসীন রয়েছে ব'লে 'সোঽহং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'নর নারায়ণের পূজা' ইত্যাদি মহাসত্ত্ব বাণীর সঙ্গে কোন্ অতীত কাল থেকে তার বুকের উপর দিয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চ'লে আস্‌ছে হীনতম অস্পৃশ্যতা, উৎকট বর্ণবিভাগ সমস্যা। এই সঙ্কটে হয়ত রামমোহনের 'শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধি'র আদর্শেরই এই ক্ষমতা আছে যাতে ভারতের জড়তাগ্রস্ত সাধারণ জীবনে বীর্য্য সঞ্চারিত হ'তে পারে

প্রশ্ন হ'তে পারে, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধিকে যখন শাস্ত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া হ'ল, তখন শাস্ত্রের কথা একেবারে না তোলাই হয়ত সমীচীন ছিল। এর সাধারণ উত্তর—লোক-স্থিতির জন্য এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। শাস্ত্র যাঁদের চিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল তাঁরাও গভীরভাবে সত্য ও শ্রেয়ঃ অন্বেষী ছিলেন, সত্যের অপরূপ পুলক-বেদনা নিজেদের চিত্ত দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই চিররহস্যমণ্ডিত সত্যের অন্বেষণ যখন কারো ভিতরে প্রবল হ'য়ে জাগে তখন কোনো কোনো শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অমূল্য অবলম্বনেরই কার্য্য কর্‌তে পারে। রামমোহনের অতি গভীর প্রকৃতি মানুষের এ প্রয়োজনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখতে পারে নাই। কিন্তু কারো কারো পক্ষে কোনো বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রের এবম্বিধ প্রয়োজন অনুভূত হ'লেও সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থায় লোকশ্রেয়ঃ আর বিচার বুদ্ধির আদর্শই যে মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান অতি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই তিনি সে সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাস্তবিক যত গভীর ক'রে আমরা ভাব্‌তে যাব ততই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ব, রামমোহনের এই যে আদর্শ, প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা কিন্তু তারও উপর লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য, মানুষের সমাজকে সবল ও সুন্দর রাখ্‌বার জন্যে এ কত অমোঘ।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের মনে পড়্‌ছে—পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির প্রতি কতকটা উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে রামমোহন মানুষকে চোখ দিতে বলেছেন সব ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রের উপর। পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা ক'রে হিন্দুকে তিনি অবলম্বন কর্‌তে বলেছেন বেদ ও উপনিষৎ; 'মোহাদ্দেস'দের ইস্‌লাম ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান ক'রে মুসলমানকে অবলম্বন কর্‌তে বলেছেন মূল কোর-আন আর পরে পরে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি উপেক্ষা ক'রে খৃষ্টানকে গ্রহণ কর্‌তে বলেছেন মূল বাইবেল। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক ঋষির মতো জটাবল্কলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করবার প্রয়োজনও তেমন অনুভব করেন নাই, আর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষ ক'রে অনুশীলন কর্‌তে বলেছেন আধুনিকতম বিজ্ঞান!—তাঁর এই মনোভাবের অর্থ মিল্‌বে তাঁর এই উক্তির ভিতরে, "ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?" অথবা সে অর্থ আরো ভাল ক'রে মিল্‌বে গুরু কামালের এই বাণীতে :—"বিশ্ব-জগৎ চলেছে ভগবানের উৎসব যাত্রায়, নিত্যই চলেছে তাঁর 'বরিয়াত' (বরযাত্রা)। প্রতি মানব নিজ নিজ মশাল জ্বালিয়ে চলেছে। গ্রহ চন্দ্র তারার মশালশ্রেণী চলেছে অসীম আকাশে, মানব সাধনার দীপাবলী চলেছে কালের আকাশে। সাধক মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ধ্যান নির্জ্জীব হ'য়ে আসে, নিত্যকালের উৎসব পথে মুহ্যমান মশাল নিয়ে মানব ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময়ে মহাপুরুষ আসেন বজ্রগম্ভীর উদ্‌বোধন মন্ত্রে তাদের জাগিয়ে দিতে। সাধন যখন যেখানে প্রাণহীন স্থগিত হ'য়ে আসে অগ্নিময়ী দীক্ষা নিয়ে সেখানেই মানবের মহাগুরুরা আসেন। তাঁরা চ'লে গেলে বিষয়ী কৃপণ সাম্প্রদায়িক সত্যের ভাণ্ডারীরা সেই মশালগুলিও চায় সঞ্চয় ক'রে রেখে বৈষয়িকতা চালাতে। জ্বলন্ত মশাল ভাণ্ডারে জমান অসম্ভব, তাই তারা নির্জ্জীব আগুনটুকুও নিবিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করে

কেবল মশালের মৃত দণ্ড ও দগ্ধাবশেষ ন্যাকড়া।"* বাস্তবিক সমস্ত রকমের সত্য অনুসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্টা (রাজনীতিও) যে আমাদের জীবনে ভগবানের উৎসব—ঈশ্বরে-সমর্পিত-প্রাণ মহাকর্ম্মী রামমোহন তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যেখানে মানুষ অন্তহীন প্রয়াসে নিজেদের ভগবানের উৎসব-আয়োজন করেছে, যেমন প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রগুলির ভিতরে, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানে, সেখানে তিনি সশ্রদ্ধ নেত্রপাত করেছেন। কিন্তু যেখানে সেই উৎসবে রচনার চাইতে হীন অনুকরণের আয়োজন, উঞ্ছবৃত্তির আয়োজন বেশী হয়েছে, মানুষের অনন্ত শুভ চেষ্টার নিয়ামক চির জাগ্রত ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ায় যে মুক্তির অপরিসীম আনন্দ, তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যেমন পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির ভিতরে, সেখান থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। রামমোহনের এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে মানুষের অন্তহীন শুভ প্রয়াসের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি কর্‌বার সাধনা, সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সাহিত্যে তা অনেকখানি রূপ লাভ করেছে। তাই আশা হয়, হয়ত বাঙালী তার গৌরব-সামগ্রী রামমোহনের মাহাত্ম্য একদিন পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে, এবং তাতে ক'রে ইতিহাসে তার জন্য এক বড় জাতির আসন রচিত হবে।

জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, রামমোহনের এই মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা ব'লে আমার এই সামান্য আলোচনার উপসংহার কর্‌ব। মুক্তি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা হয়ত কেউই কাউকে ব'লে দিতে পারেন না। যিনি সে মুক্তি পান তিনি নিজেই তা অনুভব করেন; কিন্তু কেমন ক'রে তাঁর সেই অনুভূতির অধিকারী অন্যেও হ'তে পারে, সেসম্বন্ধে যেসব উপদেশ আদেশ তিনি অপরকে দেন তা তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়; পর্য্যাপ্ত হ'লে মানুষের জন্য ধর্ম্ম কি, পথ কি, তার মীমাংসা জগতে সহজ হ'য়ে আস্‌ত। তার উপর, মুক্তি প্রাপ্ত ব'লে মানুষের নিকট যাঁরা পরিচিত সেই সকল অবতার পয়গম্বর ঋষি সাধক কবি প্রভৃতির যে সমস্ত জীবনকাহিনী ও বাণী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি তা মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে দেখ্‌লে মনে হয়, হয়ত এদের সকলের কাছে মুক্তির একই রূপ, একই আস্বাদ ছিল না। কিন্তু এ বিচারের চাইতে এই সম্পর্কে অন্য একটি কথা আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান; সেটি এই যে, এই মুক্তিপ্রাপ্তদের ভিতরে যাঁরা জ্ঞানের উপর বেশী জোর দিয়েছেন তাঁরাই মানুষের বেশী নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন—তাঁদের নেতৃত্বে মানুষের আত্ম-প্রকাশের অবসর বেশী ঘটেছে। তাই, জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কিনা সে বিচারের ভার মুক্তির অধিকারীদের উপর ন্যস্ত রেখে এ কথা আমরা সহজভাবেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারি যে, জ্ঞান-সাধনার ভিতরে মানুষের অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এর উপর আধুনিক ভারতবাসীদের জন্যে তাদের নেতার এই কথার অন্য অর্থও আছে। ভারতে শান্তি ও মৈত্রীর সমস্যা আর জগতে শান্তি ও মৈত্রীর সমস্যা প্রায় তুল্যরূপে কৃচ্ছসাধ্য। এ অবস্থায় জ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনাকে উপেক্ষা ক'রে কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের বা শাস্ত্র-বিশেষের বিশ্বাস-রুচিকে প্রাধান্য দিলে সত্যকার কল্যাণের পথ থেকে দূরে স'রে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বাস্তবিকই, জ্ঞানের সাধনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে অবলম্বন করা ভিন্ন ভারতের যে প্রকৃত কল্যাণ নাই, যে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা স্বীকার করবেন।

ভারত এক নব সমন্বয়ই কামনা কর্‌ছে। নব মানবতায় উদ্‌বোধন মানব-জীবনের নব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার মঙ্গলের জন্য চাই। রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রে বিরাট জ্ঞান-সমন্বয়, সেই নব সমন্বয়ের অক্ষয় ভিত্তি পত্তন হয়েছে, আজ তাঁর স্মৃতিবাসরে এই কথাটি সসম্মানে স্মরণ কর্‌ছি।

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে গৃহীত। —লেখক

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এজি

আমাদের দেশের একশত জন লোকের মধ্যে ৯০ জন লোক উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। আমি যখনই মনে করি যে, যে-দেশের শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী সে দেশের কৃষির অবস্থা এত হীন কেন, সে-দেশের কৃষিকাজ এত হেয় বলিয়া বিবেচিত হয় কেন, সে-দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকগণকে এত ঘৃণা করেন কেন, তখনই আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ৭।৮ জন বোধ হয় শিক্ষিত; অথচ এই শিক্ষার জন্যই আমাদের এত অহঙ্কার, এ জন্যই আমরা আমাদের কৃষকদিগকে এত ঘৃণা করি! কৃষিকাজকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিনা, অথচ অন্য অন্য দেশে যেখানে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বেশী সেখানে কৃষির ও কৃষকের এত অনাদর নাই; সেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্যে লিপ্ত আছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় রাজবাড়ী কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনীর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, "লর্ড র‍্যালে অত বড় লোক হইয়াও ঘি-দুগ্ধের ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কেহ উৎসাহী হইয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে "গয়লা" বলিয়া উপহাস করিব ও ভদ্রসমাজে তাঁহার বোধ হয় স্থান হইবে না।" সুখের বিষয় এই, যে, উপস্থিত ভীষণ অন্নবিপ্লবের বা অন্নসমস্যার মধ্যে পড়িয়া দেশের হাওয়া কিছু বদলাইতেছে; এতদিন দেশের শিক্ষিত লোক বড় বড় আন্দোলন-আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবকাশ ছিল না; দেশের যাহারা প্রকৃত মেরুদণ্ড সেই কৃষকদের ও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে যাহা করিতে হয় সেই কৃষির কথা আজ তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কৃষির সহিত আমাদের জীবন-মরণ বিশেষভাবে জড়িত। সরকার বাহাদুরের স্বাস্থ্য-বিভাগের বড় কর্ত্তা বেণ্টলী সাহেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া এদেশে এত মৃত্যু ঘটিতেছে। ম্যালেরিয়াই বলুন, ইনফ্লুয়েঞ্জাই বলুন, সকল অসুখের কারণই পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়া। লর্ড সিংহ বিলাতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "The Bengalees do not know what a full meal is"—বাঙ্গালী জাতি জানে না পূরা আহার কি? বিখ্যাত ডাক্তার, লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছে; যে হারে বাঙ্গালীর মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে সে হারে যদি ১৫০ কি দু'শ বছর এই অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে; বাঙ্গালীর আর অস্তিত্ব থাকিবে না। ইউরোপে চার পাঁচ বৎসর ব্যাপী এত বড় যুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে যত লোক মরিয়াছে তাহাপেক্ষা অধিক লোক প্রতি বৎসর এই ভারতে মরিতেছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন, প্রত্যেক ঘণ্টায় এক হাজার করিয়া লোক এদেশে কেবল যক্ষ্মায় মরিতেছে। বিলাতে শ্রমিকেরা যখন সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফেরে তখন তাহারা একখানা খবরের কাগজ সঙ্গে লইয়া যায়; কারণ তাহারা বলে প্রত্যেকেরই দেশের খবর জানা দরকার; কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে কয়জনই বা খবরের কাগজ পড়েন, বা দেশের খবর রাখেন!

আমাদের দেশে কৃষিশিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে; কৃষকদিগকে হেয় বলিয়া ঘৃণা করিলে

আর চলিবে না; ভদ্র ও শিক্ষিতসম্প্রদায়কে কৃষিকাজ নিজহাতে করিতে হইবে। কৃষিশিক্ষা প্রচলনের জন্য সরকার বাহাদুর কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন; দেশে কৃষি-কলেজ ও কৃষি স্কুল ২।৪টা খোলা হইয়াছিল কিন্তু ছাত্রাভাবে প্রায় সকলগুলিই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ছেলেরা প্রথমে ঐ সকল স্কুল-কলেজে বেশ যায় কিন্তু পরে যখন চাকুরী পায় না তখন হতাশ হয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। গ্রামে গিয়া কৃষিকাজ করিতে কেহ প্রস্তুত নয়। তবে, ভোকেশনাল এডুকেশন (Vocational Education) বলিয়া একটি কথা উঠিয়াছে ও কৃষি-শিক্ষাকে তাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। এখন স্কুলে স্কুলে এই শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। ফরিদপুর জেলায় কোড়কদী হাইস্কুলে একটি কৃষিশাখা খুলিবার জন্য রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আমি কোড়কদী গিয়াছিলাম ও আমরা সেখানে কি ভাবে কাজ করিব তাহার একটা খসড়া তৈয়ার করিয়াছি। বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে আমি একটি স্কীম (Scheme) প্রস্তুত করিয়াছিলাম ও তাহা বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল জার্নাল-এ ছাপা হইয়াছিল। সুখের বিষয় আমার ঐ ক্ষুদ্র Schemeটি দেশের খবরের কাগজে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রথমেই ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) বিদ্যালয়-সংলগ্ন কতখানি জমি, চাষ-আবাদের জন্য পাওয়া যাইবে। (২) উক্ত জমি উঁচু কি নীচু। (৩) ঐ জমিতে কি কি ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (৪) কতগুলি ছাত্র নিজেরা ঐ জমিতে নিয়মিতভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত আছে। (৫) বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে উক্ত জমির চাষবাসের জন্য কত টাকা পাওয়া যাইতে পারে। (৬). কৃষিবিভাগ সম্ভবতঃ কি পরিমাণ ও কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলির সমস্যা কিভাবে সমাধান করিতে পারা যায় এখন তাহাই বলিব। (১) বিদ্যালয়-সংলগ্ন জমির পরিমাণ অন্ততঃ ৪।৫ বিঘা হওয়া দরকার; অবশ্য নিয়মিত কার্য্যের জন্য ছাত্রের সংখ্যা যদি কম হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা কম জমি হইলেও চলিবে। (২) উঁচু ও নীচু দুই প্রকারের জমি হইলে যাবতীয় ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (৩) জমি পরীক্ষা করিয়া কি কি ফসল হইবে তাহা ঠিক করিতে হইবে। (৪) যাবতীয় সব্জী ও ফলের চাষ সম্বন্ধে প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া দরকার; কারণ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে সব্জী ও ফল লাগানো যাইতে পারে। (৫) আমি যতদূর জানি বর্ত্তমান সময়ে কোন বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে বেশী টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমার প্রস্তাব এই যে, বিদ্যালয়-সংলগ্ন জমি বর্গাচাষী দিয়া চাষ করাইতে হইবে। বর্গাচাষীর সঙ্গে এই সর্ত্ত থাকিবে যে তাহাদিগকে যে সকল চাষবাস যে ভাবে করিতে বলা হইবে তাহাদের তাহা সেইভাবেই করিতে হইবে। ইহার জন্য বর্গাচাষীরা যে হারে ফসল পায় তাহা অপেক্ষা দুই আনা ফসল বেশী পাইবে; কারণ নির্দ্দিষ্ট উপদেশ অনুসারে ও রীতিমত সার প্রয়োগ করিয়া চাষ করিতে হইলে তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট উপদেশ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেতে কাজ করিবে। ফসলের দশআনা, বর্গাচাষী পাইবে, চারি আনা ছেলেরা পাইবে ও দুই আনা বিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগে জমা হইবে ও পরে উহা কৃষিশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। (৬) কৃষিবিভাগের কর্ত্তব্য, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার উৎসাহ দেওয়া, কিন্তু, কৃষিবিভাগেরও অর্থসঙ্কট; সেইজন্য কৃষি-বিভাগ হইতে আর্থিক সাহায্য বিশেষ পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না, আর প্রথমেই ছেলেদের আগ্রহ ও ইহার ফলাফল না দেখিয়া অধিক অর্থ সাহায্য করার পক্ষপাতী আমি নহি। কৃষিবিভাগের একজন কর্ম্মচারী কি কি ফসল লাগান যাইতে পারে ও উহাদের চাষবাস সম্বন্ধে কি কি সার প্রভৃতি আবশ্যক হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং কোন্ সময় কি করিতে হইবে সে বিষয়ে সদাসর্ব্বদা উপদেশ দিবেন, ছেলেরা যখন কাজ

করিবে তখন তিনি উপস্থিত থাকিয়া ছেলেদের প্রত্যেক কাজ শিখাইয়া দিবেন। ইহা ব্যতীত, কৃষিবিভাগ একখানি উন্নত লাঙ্গল, উন্নত নিড়ানী কিম্বা পোকা মারিবার যন্ত্র দিবেন। কৃষিবিভাগ যে-সমস্ত বীজ অনুমোদন করেন তাহা সরবরাহ করিবেন। বৎসরান্তে ২।৪টি মেডেল্ অধিক উদ্যমী ছাত্রদিগকে পুরস্কার-স্বরূপ দিতে হইবে।

একবৎসর এইভাবে কাজ করিলে কখন কি ফসল লাগাইতে হয়, কিরূপভাবে উহার জন্য জমি তৈয়ার করিতে হয়, কত বীজ বা সার লাগে, কখন কি ফসলের জমি করিতে হয়, ফসলের ফলন কত হয়, ছেলেরা সব শিক্ষা করিতে পারিবে। থিওরেটিক্যাল কোর্স দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ, ইহা ছেলেদের প্রথম বৎসরের আগ্রহের উপর প্রথমতঃ নির্ভর করে। ইতিমধ্যে যাঁহার কৃষির প্রতি একটু বেশী ঝোঁক আছে বিদ্যালয়ের এরূপ কোন শিক্ষককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য পাঠাইলে তিনি মোটামুটি শিখিয়া আসিতে পারিবেন ও ফিরিয়া আসিয়া কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক লইয়া ছেলেদিগকে কৃষিশিক্ষা দিতে পারিবেন। কৃষিবিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারিগণ যখন আসিবেন তখন তাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মাঠে লইয়া যে-সকল ফসল তাহারা করিতেছে সেইসম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বলিবেন। এইরূপ ক্ষুদ্রভাবে কাজ আরম্ভ করিলে বিদ্যালয়ের বা সরকারের অধিক অর্থ খরচ হইবে না অথচ একবৎসরের মধ্যেই বুঝা যাইবে উক্ত স্কুলের ছাত্রদের কৃষিশিক্ষার প্রতি কতটা আগ্রহ ও ঝোঁক আছে। যদি দেখা যায় যে ছেলেরা বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইতেছে, তাহা হইলে, কৃষিশিক্ষার বিস্তৃত ও উন্নত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে না। কোড়কদী স্কুলে আমরা এইভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তবে কোড়কদীর স্কুলসংলগ্ন বেশী জমি নাই; যাহা আছে তাহা নীচু, সেইজন্য ঐ গ্রামের গৃহস্থদের জঙ্গলে পরিপূর্ণ যে ভিটা জমি আছে উহাতেই ছেলেরা কাজ করিবে। ইহা হইতে ছেলেদের কৃষিশিক্ষা ত হইবেই, উপরন্তু, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গ্রাম স্বাস্থ্যকর হইবে এরূপ আশা করা যায়। ১৯২২ সালে আমি যখন প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম তখন যশোহর জেলায় বিনোদপুর গ্রামে গিয়াছিলাম; সেখানকার স্কুলের ছেলেরা নিজহাতে চাষ-বাস করিতেছে; এমন কি তাহারা চাষীর সাহায্যও লয় নাই, প্রত্যেক কাজ নিজেরাই করিতেছে। ফসলের বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে গরীব ছাত্রদের স্কুলের মাহিনা দিতেছে; গ্রামের রাস্তা, ঘাট, নালা পরিষ্কার করিতেছে; আমাকে সেখানকার ছেলেরা তাহাদের কাজ দেখাইবার জন্য একদিন আটকাইয়া রাখিয়াছিল। বাস্তবিক আমি তাহাদের চরিত্র, মনের বল ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম।

ছাত্রেরাই আমাদের এখন ভরসার স্থল। তাহারা ইচ্ছা করিলে এই মরা মাটিতে সোনা ফলাইতে পারেন; আবার সোনার বাংলাকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করিতে পারেন।

আমাদের দেশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ২।১ বিঘা ভিটা জমি আছে, উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ; ম্যালেরিয়া-মশার আবাসস্থল হইয়া রহিয়াছে; আমরা একটু চেষ্টা ও ইচ্ছা করিলে উহা হইতে কত লাভ করিতে পারি তাহা বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ আমি দুএকটি সব্জী ও ফলের চাষের কথা বলিব। পৌষ মাসের পূর্ব্বে মফস্বলের অনেক সহরে কপির মুখ দেখা যায় না, অনেক মূল্য দিয়া দূর হইতে আনাইতে হয়। অথচ এই কপির চাষ অনায়াসে প্রত্যেক গৃহস্থ করিতে পারেন।

দুই ফুট অন্তর গাছ রোপণ করিলে ও প্রত্যেক সারির পর দুই ফুট প্রশস্ত জলের জন্য নালা রাখিলে প্রতিবিঘায় ৩৭০০ কপি গাছ হইতে পারে। সকল গাছ সমান পুষ্ট হয় না এবং সবগুলি জীবিত থাকেনা। এইজন্য শতকরা ১৫টি গাছ বাদ দিয়া আমি ইহা হইতে আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাইব। শতকরা ১৫টি গাছ ছাড়িয়া দিলে, ৩৭০০ গাছ হইতে ৯২৫টি অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০টি গাছ বাদ দিলেও ২৭০০ কপি পাওয়া যাইবে। এই কপির মূল্য গড়ে এক আনা করিয়া ধরিলেও ২৭০০ আনা অর্থাৎ ১৬৮৷৹আনা আমরা পাইতে পারি। এখন খরচের হিসাব দেখাইব।

জমির খাজনা	৫৲
জমিতে চাষ দেওয়া	১০৲
জমি নিড়ানো	৫৲
জুলি প্রস্তুত	৫৲
বীজ	২৲
চারা প্রস্তুতের, চারা রোপণ	১৫৲
জল সেচন	১৫৲
সার	১০৲
কপি উঠাইবার খরচ	৫৲
খুচরা খরচ	১০৲
	মোট ৮২৲

এখন বেগুনের চাষের কথা বলিব। ৩ফুট অন্তর গাছ লাগাইলে এক বিঘায় ১৬৫০টি গাছ জন্মানো যাইতে পারে। এই ১৬৫০টি গাছের মধ্যে আমরা ৩৫০টি গাছ ছাড়িয়া হিসাব করিব; কারণ সকল গাছই যে ফল দিবে এবং সকল গাছই যে বাঁচিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; কতকগুলিকে পোকা কিম্বা কোন জন্তু নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; অতএব আমরা মোটামুটি ১৩০০ গাছ হইতে ফল পাইতে পারি। দেখা গিয়াছে গড়ে প্রত্যেক গাছে ৩সের করিয়া বেগুন পাওয়া যায় অর্থাৎ ১৩০০ গাছ আমাদিগকে ৩৯০০ সের অথবা ৯৭ মণ কুড়ি সের বেগুন দিবে। মোটামুটি ৯০ মণ বেগুন যে পাইব ইহা নিশ্চয়ই। এই ৯০ মণ বেগুণের দাম আড়াই পয়সা হিসাবে সের ধরিয়া অর্থাৎ ১৷৵০ মণ হিসাবে আমরা ১৪০ টাকা পাইব। একবিঘা জমিতে বেগুণ চাষ করিতে ৫০ টাকার বেশী খরচ কোনক্রমেই পড়িবেনা। বিঘা প্রতি প্রায় ১০০টাকা লাভ থাকে।

পেঁপেও খুব লাভজনক। এক বিঘা জমিতে খুব কম করিয়া হইলেও ৪০০ পেঁপে গাছ হয়। প্রত্যেক গাছে ভাল ৮টি করিয়া পেঁপে ফলিলেও আমরা ৪০০গাছ হইতে ৩২০০ পেঁপে পাই। প্রত্যেক পেঁপের দাম দুই পয়সা হিসাবে ধরিলেও আমরা একবিঘা হইতে ১০০৲ টাকা পাইব। পেঁপের চাষে খরচ বেশী হইবার কথা নয়।

ফরিদপুরের পরিশ্রমী মজুরদের কাজ ও তাহাদের মাহিনা ধরিয়া আমি এই হিসাব দেখাইতেছি; অন্য অন্য স্থানে ইহা অপেক্ষা কম খরচ হয়। এই সকল সব্জী ও ফলের চাষের অধিকাংশ কাজ নিজেরা অনায়াসে অবসর মত করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষিকাজ যে ইতর-অভদ্রের কাজ—এ কাজ কি আমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা করিতে পারি? আমাদের কাজ আপিসে কাজ করা, মাসের শেষে ২৫৲ কি ৩০৲ টাকা মাহিনা পাওয়া। ছেলেরা যদি সব্জী ও ফলের চাষ শিখিয়া নিজের নিজের বাড়ীতে ঐসকল চাষ করিতে পারে তাহা হইলে নিজেরা ত ভাল খাইতে পাইবেই, সংসারেরও যথেষ্ট সাহায্য হইবে। এবং উক্ত চাষের দ্বারা বাড়ীর আশ-পাশের জমি (এখন যাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে) পরিষ্কৃত হইয়া স্বাস্থ্য ও শ্রীসম্পন্ন হইবে। উপরে যে হিসাব দেখাইয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে ৫৷৭ বিঘা জমি চাষ করিয়া বৎসরে অন্ততঃ ৬০০৲।৭০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৫০৲ টাকা। ইহা কি বিদেশে চাকরী করিয়া মাসিক ৩০৲ ৩৫৲টাকা উপার্জ্জন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? যাঁহারা বেশী জমি লইয়া চাষ-আবাদ করিতে পারিবেন তাঁহারা ইহাপেক্ষা বেশী আয় করিতে পারিবেন। আজকাল চাকুরীর জন্য সকলকেই বিদেশে থাকিতে হয়, তাহার ফল এই হয় যে, ইচ্ছা থাকিলেও গ্রামের উন্নতি কেহ করিতে পারেন না, কাজে কাজেই গ্রামের অবস্থা আজ এত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, "যে গ্রামছাড়া সে লক্ষ্মীছাড়া।" আমাদের বাংলাদেশে চাষবাসের যত সুবিধা আছে এত সুবিধা আর কোন দেশে নাই; অথচ আমরা অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার জন্য ছুটিতেছি। হল্যাণ্ড সমুদ্রগর্ভ-নিহিত দেশ বলিলেও চলে, কিন্তু, এই অল্প আয়তনবিশিষ্ট দেশ চাষবাস করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় ফসলাদি সরবরাহ করিয়াও অতিরিক্ত শস্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইংলণ্ড ও অপরাপর স্থানে রপ্তানি করিয়া প্রচুর ধনলাভ করে। ক্ষুদ্র ডেন-মার্ক রাজ্য সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। বাংলা দেশে এক বিঘায় যে পরিমাণ ধান হয় স্পেনে তাহার চারি গুণ হইতেছে, অথচ, বাংলাদেশ ধানের জন্য বিখ্যাত। স্পেনের লোকেরা কত পরিশ্রম করিয়া কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে ধানের চাষ করিতেছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ডাক্তার হ্যারল্ড ম্যান্

বলিয়াছেন যে, এদেশের লোকেরা যদি সকল বিষয়ে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় বাঁচিতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে কৃষির উন্নতির জন্য আরও অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে।

এখন দেশের যুবকবৃন্দ যদি কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ দেখান তবেই দেশের মঙ্গল; তবেই দেশের কৃষকসম্প্রদায় শিক্ষিত ও উন্নত হইবে; তবেই আবার বাঙ্গলার মাটিতে সোনা ফলিবে; তবেই আবার ঘরে ঘরে, "গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ ও গোয়ালভরা গাই" বিরাজ করিবে।

বাঙ্গলাদেশকে পৃথিবীর সাম্‌নে দাঁড় করাইতে হইলে প্রথমে গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে হইবে; কৃষকের শিক্ষার ভার লইতে হইবে—সমবেতভাবে তাহাদের লইয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদের কৃষকেরা একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার সুবিধা বুঝে। এখনও "গাতায়" কাজ করিবার প্রথা লুপ্ত হয় নাই। আখ মাড়াই করিবার সময় সকলে মিলিয়া কল ভাড়া করিয়া আখ মাড়াই করে ও একই স্থানে খোলা করিয়া গুড় প্রস্তুত করে। গ্রামে এই যে একতার বীজ পড়িয়া রহিয়াছে যুবকবৃন্দের চেষ্টায় ও যত্নে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইবে। পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাতে এক সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে দেশে একান্নপরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, যে দেশে গ্রামের মোড়লের বিচারের উপর সব নির্ভর করিত, সে দেশে একতা ও সমবেতভাবে কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা এখনও আছে। তবে সে আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দেশসেবকের প্রয়োজন। আমাদের ছাত্র ও যুবকবৃন্দ সেই দেশসেবক।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,

> "জাতিগত স্বার্থের জন্য যে জাতির স্বতস্ফূর্ত্ত কর্ম্মপ্রেরণার অভ্যাস নাই, যে জাতি সঙ্ঘবদ্ধ সকল কাজের জন্য গভর্ণমেণ্টের আদেশ বা উৎসাহের আশায় বসিয়া থাকে, যে জাতি কলের মত কয়েকটা কাজ ছাড়া আর সমস্তই অপরের দ্বারা করাইয়া লইবার আশা রাখে, তাহাদের শক্তি অর্দ্ধবিকশিত মাত্র হইয়াছে; তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীর একটি বিশেষ শাখা অঙ্গহীন।"

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা যাহা বলেন তাহা আমাদের দেশের প্রত্যেককে স্মরণ করিতে বলি। 'Three acres of land and a cow and I am a free man'—তিন একর জমি ও একটি গরু যদি পাই, তাহা হইলেই আমি স্বাধীন মানুষ।

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

একুশ

সেবা প্রিয়র কাছে আসার পর তার বাবা একখানা চিঠিতে সেবার বিমাতার সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদ দিয়ে এটুকুও লিখেছিলেন—আমি জানি এ সংবাদে তোমরা খুসী হ'বেই। পিতৃপুরুষও এক গণ্ডূষ জল পাবেন, আর তোমারও ভবিষ্যতের একটি অবলম্বন রেখে যেতে পারব।

অপুত্রক পিতার সন্তান-সম্ভাবনায় নিজের ভবিষ্যতের অবলম্বনের জন্য না হোক, তবে, স্বাভাবিক সুখবর পেয়ে একটা আনন্দ যেমন হ'য়ে থাকে সেবারও তা হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দে ছায়াপাত হ'বারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেবার মনের মধ্যে তখনই এই কথাটির উদয় হল যে, তার নিজের মার গর্ভের যদি একটি ছেলে থাকৃত তা হ'লে হয়ত বংশ রক্ষার জন্য এ বৃদ্ধ বয়সে বাবাও আর বিয়ে করতেন না, বিমাতার

সঙ্গেও তার এ অপ্রসন্ন ভাব ঘট্‌তনা যাতে ক'রে তাকে আজ বাবার কাছ হ'তে দূরে আস্‌তে হয়েছে। সইএর কাছে মনের এ গোপন কথাটি সে বল্‌তেই প্রিয় বলেছিল —"ও তোর বৃথা আক্ষেপ সই। তোর ভাই থাক্‌লেই যে বাবা আর বিয়ে কর্‌বেন না তা মনে করিস্‌ না। মনে আছে আমাদের পাড়ার গঙ্গাধর ঠাকুর্দ্দাকে? তিনি তো ষাট বছর বয়সে ঘর ভরা নাতিপুতি থাক্‌তেও বিয়ে করেছিলেন।"

গুরুজন সম্বন্ধে এ অপ্রিয় আলোচনা আর না ক'রে সেবা বাবাকে লিখ্‌লে—তার এখন যাওয়া দরকার কি না। বাবা লিখলেন—"তোমার জন্যে এ বাড়ীর দরজা সর্ব্বদাই খোলা রয়েছে মা; যখনই মন যাবে চ'লে এস। তবে তোমার মাতার সেবা-যত্নের কিছু অভাব হচ্ছে না, কেন না তার এক খুড়ী এসে সব দেখা শোনা কচ্ছেন।" চিঠিখানা প'ড়ে সেবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তাকে তা হ'লে আর কারু দরকার নেই। অপয়া ব'লে শ্বশুর বাড়ীর দরজা তার জন্যে চির রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। বাবা যা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ সময়ে বিমাতা, সেবার সাহায্য চান্‌ না। তাঁর নূতন পাতানো সংসারে সেবার আবির্ভাবকে তিনি একান্ত অনধিকার ভেবে এ কুগ্রহকে প্রাণপণে এড়িয়ে চল্‌তে চান্‌। হায় হায়, সেবার তা হ'লে আর আশ্রয়ই বা কোথায়? এ ভাবে প্রিয়র কাছেই বা সে আর কতদিন থাক্‌বে? দু-পাঁচদিনের জন্য বেড়াতে এসে অবশেষে কি গলগ্রহে পরিণত হবে? অদৃষ্টের একটি নিষ্ঠুর পরিহাস!

প্রিয়কে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে না পারায় এ চিন্তার ভার ক্রমেই তার যেন অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ছিল। নিজের মনে সে নিজেই এই প্রশ্নটি নিয়ে তোলপাড় করছিল যে, এখন তার বাবারই কাছে ফিরে যাওয়া উচিৎ কি না। সৎমা মুখে বেশী কিছু না বল্‌লেও তাঁর অসন্তোষের ভার নীরবে দিনের পর দিন বহন ক'রে শেষে সহিষ্ণুতার চরম সীমায় এসে ঠেক্‌তেই না সে সইএর কাছে একটু হাঁফ ছাড়্‌বার জন্যে এসেছিল। এইবার সে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অসন্তোষের পুনরভিনয় সুরু হবে; তার পর বাদবিসম্বাদের পালা। তারপরের চিন্তাও যেন অসহ্য। তার জীবন একটা বিভীষিকাময় অভিশাপ হ'য়ে দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে। মুক্তির পন্থা কই, নিজের বুকের মাঝে সে কিন্তু ব্যর্থ হাহাকারের গুঞ্জন শুন্‌তে পেত না। শুধু অনুভব করত যে তার সমস্ত শক্তি যেন উন্মুখ হ'য়ে বাহিরের জগতে কাজ করবার চেষ্টায় আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু পথ নেই, কোন্‌ পথে সে তার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিকে প্রসারিত ক'রে তাদের সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে এই চিন্তার মধ্যে মধ্যে সে যেন উন্মনা হ'য়ে উঠত।

তার মনের ভিতরে ও বাহিরের অবস্থানের যখন এই জটিল অবস্থা সেই সময় প্রবাল এসে দেখা দিলে। প্রবালের সঙ্গে তার নূতন পরিচয়ে তার মনের মধ্যে যেন একটি নূতন রেখাপাত হ'ল। তারপর সেদিন দুপুর বেলায় নন্দার ব্যাপার উপলক্ষ্য ক'রে ঐ সব আলোচনা সেবার মনের মধ্যে একটা তরঙ্গ তুলে দিয়েছিল।

সেই দিনই রাত্রে কেদার ও প্রবাল যখন নিজেদের বাসার উঠানে ব'সে গল্প করছিল সেই সময় প্রিয় মতিবাবুর বাড়ী হ'তে তাঁর অসুস্থ শিশুটিকে দেখে ফিরে আসতেই কেদার জিজ্ঞেস কর্‌লে,—"তুমি একা এলে যে, সই কই?"

প্রবাল একটু রসিকতা ক'রে বল্‌লে,—"হারিয়ে ফেল্‌লে নাকি বোঠান্‌।" কেদার বল্‌লে—"হারালেও ক্ষতি নেই, কেন না মালিক নেই, খোঁজ হবে না। কিন্তু অমূল্য মনি হারালে আপশোষ আছে।"

কে জানে কেন সেবার সম্বন্ধে এইটুকু রসিকতাও আজ প্রিয় সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না, ঝাঁজের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"কার সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বল্‌তে হয় তা যেন বোঝ না। মতিবাবুর ছেলেটির বড় অসুখ। রমাদি' একলা ভারী কাতর হ'য়ে পড়েছে তাতেই সইকে রেখে এলাম।"

কেদার সইকে নিয়ে অনেক হাস্য-পরিহাস সময়ে-অসময়ে ক'রে থাকে, যার ভিতর গ্লানি নেই; প্রিয়ও সে সবে সমানে যোগ দিয়ে কথা চালিয়ে যায়। আজ হঠাৎ তার এ-সুর বেসুরা হ'লেও কেদার তা [illegible] পারলে না, [illegible]

বল্‌লে—"রেখে এসে ভাল করলে না, একে ত পাড়া-প্রতিবাসী সইকে নিয়ে যত কল্পনার জালই বুন্‌ছে; তার ওপর মতিবাবুর স্বভাব চরিত্র সকলেই জানে। ঐ উপলক্ষ্য ক'রে কত কি বাজে গল্পও চল্‌তে পারে।"

প্রিয় রাগ করে বল্‌লে—"চলুক বাজে গল্প। অমনিতেই যখন চল্‌ছে তখন আর কি? এ সময় ওদের এমন বিপদ আমারই উচিত সঙ্গে থেকে একটু সাহায্য করা। কিন্তু ছেলে মেয়ে রেখে আমার থাকার উপায় নেই। সই রমাদি'র কান্না দেখে নিজেই থাক্‌তে চাইলে, আমি আর মানা কর্‌লাম না। সই-এর সেবা করবার শক্তি অদ্ভুত, রমাদি' সই থাক্‌বে শুনে যেন বর্ত্তে গেল।"

কেদার বল্‌লে—"হ্যাঁ গো ঠাকুরাণী, তোমার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ। কি বল, প্রবাল।"

প্রবাল বল্‌লে—"বল্‌বার কিছু নেই, আমিও ধন্যবাদের পুনরুক্তি করি।"

খোকা ছুটে এসে মার কোলে উঠল। মীনা এতক্ষণ কাকার পিঠের ওপর চড়া নিয়ে ভাইটির সঙ্গে খুনসুটি করছিল। এখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাজ্যটি নির্ব্বিরোধে দখল ক'রে বস্‌ল। প্রবাল কেদারকে জিজ্ঞেস করলে—"আজ মতিবাবুর কাছে ছেলেটির অসুখের যে রকম বর্ণনা শুনে এলাম তাতে অবস্থা সঙ্গীন ব'লেই মনে হ'ল। খুব ভুগবে বোধ হয়।"

কেদার বল্‌লে—"ভোগা ছেড়ে শেষ পর্য্যন্ত ভাল হ'য়ে উঠ্‌লে হয়। আজ সকালে ডাক্তারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি বেশ প্রবীণ আর অভিজ্ঞ চিকিৎসক। দুঃখু ক'রে বল্‌ছিলেন—ছেলেটির ভাল হ'বার আশা খুবই কম। বাপের দোষে ছোট ছোট শিশুদের এ-কী যন্ত্রণা ভোগ। ছেলেটির গায়ের সমস্ত রক্ত পর্য্যন্ত বিষিয়ে গেছে, গায়ে মাথায় কী ভীষণ ঘা দেখা দিয়েছে। মতিবাবুর নাকি আর ও একটি শিশু এই রোগে ভুগে মারা গিয়েছিল, ডাক্তারটি তারও চিকিৎসা করেছিলেন।"

প্রবাল অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠ্‌ল—"ডাক্তারের উচিত ছেলের বাপকে আচ্ছা ক'রে ঝেড়ে লেক্‌চার দেওয়া। নিজেদের দোষে এমন ভয়ানক পরিণাম দেখেও লোক-গুলোর আক্কেল হয় না।"

কেদার অবজ্ঞাভরে বল্‌লে—"আক্কেল হ'লেও সে বহু বিলম্বে। কিন্তু আমি কি ভাব্‌চি জান প্রবাল, সংসারে হত্যাকারীদের জন্যে চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই ধরণের শিশু হত্যার জন্যে অপরাধীদের একটা শাস্তি বিধান যে কেন হয় না তাই আশ্চর্য্য!"

প্রিয় নতমুখে এদের কথা শুনে যাচ্ছিল; হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠল, "আহা, আমি কেবল ছেলেটার মার কথাই ভাব্‌ছি। ছেলের মুখের দিকে রাতদিন এমন ভাবে বেচারী চেয়ে আছে যেন দেখ্‌লেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে।"

হঠাৎ বাইরে থেকে এসে কে ডাক্ দিতেই প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"নিতাই এসেছে, আমায় একটু ওর সঙ্গে ওদের পঞ্চায়েৎ দেখতে যেতে হবে।"

প্রিয় বল্‌লে—"নিতাইকে একটু ডাক না ঠাকুরপো। অনেক দিন আর আসে না, আগে বাসায় ওর বাপের সঙ্গে এসে অনেক কাঠের কাজ ক'রে গেছে।"

প্রবাল নিতাইকে বাড়ীর ভিতরে আসবার জন্য ডাক্ দিতেই সে সসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে এসে প্রিয়র সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে "পেন্নাম হই মাঠাক্‌রণ" ব'লে প্রণাম করলে।

নিতাইএর প্রণাম পেয়ে প্রিয় ব্যস্ত ভাবে ব'লে উঠ্‌ল—"ভাল আছ ত নিতাই? আর এ দিকে দেখি না যে? এক মাস তুমি কাজ করেছিলে ব'লে ছেলে-মেয়েরা তোমায় এমন চিনেছিল যে তিন চার দিন তুমি না আসবার পর খুব খুঁজেছিল, এখনও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে।" বল্‌তে বল্‌তেই মীনা ছুটে এসে নিতাইএর হাত ধ'রে আবদারের সুরে বল্‌লে—"আমার পুতুলের জন্যে দোলা বানিয়ে দিলে না নিতাই দা, সে যে ঘুমুতে পারে না।"

খোকার দোল্‌না যখন নিতাই তৈরী কর্‌ছিল তখন মীনারও মাতৃ-হৃদয় নিজের পুতুল-শিশুটির জন্য ঐ ধরণের দোল্‌না পাবার জন্য লুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল। বার কয়েক নিতাইএর কাছে সে আবেদনও করেছিল কিন্তু সফল হয় নি। নিতাই মীনাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে—"দিন কতক খোকাবাবুর দোলাতেই তোমার ছেলেকে ঘুম পাড়াও দিদিমণি। তার পর আমি তোমার ছেলের দোল্‌না তৈরী করে দিয়ে যাব;"

মীনা বল্‌লে—"মিছে কথা বোলো না কিন্তু; সই-মা বলেছেন মিছে কথা বল্‌লে দুষ্টু ছেলে হয়।"

খোকার চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল, তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। নিতাই বল্‌লে—"আসুন কাকাবাবু, আপনাদের কথাতেই আজ সবাইকে এক জায়গায় ডেকে, বসিয়ে এসেছি। দেবকণ্ঠবাবুও এসেছেন, আপনাকে ডাকৃতে বল্‌লেন। আপনারা যদি পাঁচজন ভদ্দর লোকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে এই হতভাগা জাতের কথায় কথায় মদ খাওয়াটাও বন্ধ করতে পারেন!"

ওদেশের কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বহুকাল ধ'রে সকল প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ সবারই বেশী রকম মদ খাওয়ার প্রথা চলিত আছে। ভাত পচিয়ে যে মদ তৈরী হয় সেই মদ, মুখবিকৃতি ক'রে ছোট-বড় সবাই মহানন্দে বাটি বাটি পান করে। সেই সঙ্গে মুখ-শুদ্ধির জন্যে আবার কলাই সিদ্ধ, মটর সিদ্ধও চালায়। নেশা একটু জ'মে এলে গল্প, গান, বাজনা চলে। নেশার মাত্রা চড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে গালমন্দ, কুৎসা-গ্লানি, তারপর, হাতাহাতি মাতামাতিতে ক্রিয়া-অনুষ্ঠান-পর্ব্বের শেষ। মেয়ে-পুরুষ সবাই এই রকমে মেতে ওঠে। ঝগড়াঝাঁটি মারামারিতে ক্ষতিও যথেষ্ট হয়, কিন্তু, তবু এ তাদের দৈনন্দিন ঘরোয়া ব্যাপার। সহজ মেজাজে তারা বোঝে যে, এভাবে মদ খাওয়াটাই তাদের যত অনর্থের মূল। কিন্তু বাপ-পিতা-মোর, চোদ্দো পুরুষের আমলের রীতিটাকে বদ্‌লাতেও মন সরে না, সাহসও হয় না। নিতাই ছেলেটি এদেরি ঘরে জ'ন্মে এদেরি আচার-ব্যবহারের মধ্যে বর্দ্ধিত হ'লেও তার বুদ্ধি-শুদ্ধি আপনা-হ'তেই অন্য ভাবের দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবটি এমন ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল যে, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিজেদের সামাজিক কদর্য্য আচারগুলোকে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না, সেজন্যে, নিজে ত এসব সে ছুঁতোই না, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে এই সব বীভৎস ব্যাপারের মধ্যেও বেশী জড়িয়ে থাকত না।

কিন্তু হাতাহাতি মারামারির সময় আবার এড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ত না; কেন না, তাহ'লেই রক্তারক্তিটা খুনোখুনিতে দাঁড়াতে চায়। কাজেই, সে মাঝখানে এসে দুপক্ষকে নিরস্ত করত। প্রবাল এসে নিতাইএর সঙ্গে আলাপ করবার পর, যখন এদের এই সব ব্যাপারের কথা জান্‌লে তখন সে বল্‌লে, "গাঁয়ের পাঁচজন ভদ্রলোককে জমা ক'রে নিম্ন শ্রেণীর সব মাতব্বরদের একজায়গায় ক'রে বেশ ক'রে বুঝিয়ে যদি এপ্রথা তুলে দেওয়া যায় ত কি হয়?" নিতাই খুসী হ'য়ে বল্‌লে,—"ভালই হয়। গাঁয়ের যাঁরা গণ্য-মান্য ব্যক্তি যদি এদের সব ডেকে বুঝিয়ে বলেন হয় ত তাহ'লে মোড়লরা রাজী হ'তে পারে।" তখন প্রবাল উৎসাহ ক'রে নিতাইএর সাহায্যে সেইভাবে পঞ্চায়েৎ ডাক্‌বার চেষ্টায় লেগে গেল। আপাততঃ স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকের পদ খালি ছিল ব'লে কেদারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রবাল সে-পদটি অধিকার করেছে। সেই সূত্রে সে অনেকের সঙ্গে আলাপ ক'রেও নিয়েছিল।

সংসারে এমন লোক অনেকই আছেন যাঁরা দেশের সকল রকম কল্যাণ মনে-প্রাণে কামনা কর্‌লেও হাতে-হেতেরে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। তবে কেউ যদি এসে ধ'রে-বেঁধে কাজের আসরে নামিয়ে দেয়, তা হ'লে, এঁরা বেশ কাজ করতে পারেন। এ দেশের মধ্যেও তেমনি দু'চারজন লোক ছিলেন যাঁরা নিজেদের শুচিতা বজায় রেখে এক পাশে থেকে ইতর-ভদ্র সবারি নৈতিক অধোগতি, কদর্য্য ব্যভিচার, পরকুৎসায় কালযাপন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দেখে মনে-মনে খুব দুঃখ অনুভব করতেন। প্রবাল এঁদের আবিষ্কার ক'রে ভারী খুসী হ'য়ে উঠল। শীঘ্রই সে এঁদের সাহায্যে নিতাইদের পঞ্চায়েৎ ডাক্‌তে পার্‌লে। সেই সভায় যাবার জন্যেই নিতাই এখন তাকে নিতে এসেছে।

নিতাই যখন প্রবালকে নিয়ে চ'লে যায় তখন কেদার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"বাবুরা কে কে এসেছেন নিতাই?"

নিতাই বল্‌লে, "দেবকণ্ঠবাবু, মোক্তার বাবু, নীলরতন বাবু সবাই এসেছেন। সব পাড়ার মোড়লদের ডাক দিয়ে এনেছি। কেউ কি আস্‌তে চায় বাবু? বলে, ক' গাড়ী মদ দিবি বল্ তবে যাব। সমস্ত সকাল ঘুরে-ঘুরে হাতে-পায়ে ধ'রে তবে সব কর্ত্তাদের জড় করেছি।"

কেদার খুসী হ'য়ে বল্‌লে—"তবে যাও প্রবাল, আর দেরী ক'র না। আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, নইলে

আমিও যেতাম।” প্রবাল দুষ্টামী ক’রে বল্‌লে—“ভূতের মুখে রাম নাম শুনে সাহস বাড়্‌বে, কি ভয় বাড়্‌বে সে এক সন্দেহ। তোমরা হ’লে পুলিশ।”

বাইশ

বিপদ প্রায়ই একা আসে না; মতিবাবুর বাড়ীতেও তাই হ’ল। এদিকে শিশুটির কঠিন পীড়া, সেই সময় আর একটি ছেলেও জ্বরে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে গুটি দেখা দিলে। চৈত্র মাসে তখন বসন্তের প্রাদুর্ভাব প্রায়ই অল্প হ’তে ভয়ানকে গিয়ে ঠেকে। মতিবাবুর ছেলেটিরও তাই হ’ল। পাড়া-প্রতিবাসীরা কাঁচকাচা ছেলেপুলে নিয়ে সভয়ে পাশ কাটিয়ে সাবধানে থাক্‌তে লাগ্‌ল। প্রতিবাসীর এ দুর্দ্দিনে সময়-মত একবার রোগী কেমন আছে এই খবরটি জানা ছাড়া তারা আর বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। ইচ্ছা থাক্‌লেও, কারও বা সময়াভাব, —কেউ বা ঘরের কর্ত্তার ভয়ে আস্‌তে পেলেন না। রমা যেন এই আকস্মিক বিপদে নিঃসঙ্গ অবস্থায় প’ড়ে কতকটা হতবুদ্ধি হ’য়ে গেল। মতিবাবুরও সেই দশা। বিলাসে-ব্যসনে যে-সব সঙ্গী-সহচর তাঁর ইঙ্গিতেই চলা-ফেরা কর্‌ত—আজ তাদের অন্তর্ধান। কেবল সেবা এসে এই অসময়ে তার সমস্ত শরীর-মন ঢেলে দুটি শিশুর অক্লান্ত সেবায় নিজকে উৎসর্গ ক’রে দিলে। প্রিয়র কোলে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু—কাজেই এ বিপদে সে এসে দাঁড়াতে পার্‌লে না। ক্রমে প্রবালেরও সাহায্য দরকার হ’ল। দুটি ঘরে দুটি মুমূর্ষ রোগী, কার শিয়রে কে জাগে? মতিবাবু ত ডাক্তার ডাকা, ডাক্তারকে পাঁচবার খবর দেওয়া, ওষুধ-পত্তর আনা এই নিয়েই রাতদিন ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌লেন। প্রবাল তখন কর্ত্তব্যের বলে বলীয়ান হ’য়ে বড় ছেলেটির সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিলে।

সেদিন বড় খোকার জ্বরের সাতদিন। সন্ধ্যার পর প্রবাল রোগীর জ্বর দেখ্‌তে গিয়ে হঠাৎ থার্ম্মোমিটারটি হাত ফস্‌কে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেল্‌লে। মতিবাবু বাড়ী ছিলেন না, প্রবাল উষাকে ডেকে তখনই এক দৌড়ে গিয়ে প্রিয়র কাছ হ’তে থার্ম্মোমিটার চেয়ে আন্‌তে বল্‌লে। উষা ঝুম ঝুম ক’রে মল বাজিয়ে তখনই ছুটে চ’লে গেল। কিন্তু ফিরে আস্‌তে তার যথেষ্ট দেরী দেখে প্রবাল নিজেই ব্যস্তসমস্ত হ’য়ে থার্ম্মোমিটার আন্‌তে গেল। পুকুর-পাড় দিয়ে গেলে মাত্র তিনখানা বাড়ীর পরেই কেদারের বাড়ী। প্রবাল সেইখান দিয়ে যাচ্ছে মাঝ পথে উষার সঙ্গে দেখা। প্রবাল অবাক্ হ’য়ে বল্‌লে—“তোমায় আমি আধঘণ্টা হ’ল পাঠিয়েছি আর তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে। যাওনি থার্ম্মোমিটার চাইতে?”

হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল অধরের দিকে। সে পাশ-কাটিয়ে চ’লে যাচ্ছিল; অধরের স্বভাব-চরিত্রের কথা প্রবাল সবই শুনেছিল; তা ছাড়া আগের দিন রাত্রে খেতে ব’সে প্রিয়র কাছে আর-একটা কথা শুনেছিল, যা সে বিশ্বাস করেনি ব’লে কান দিয়ে শোনেনি। এখন সেই কথার স্মৃতি মনের মধ্যে চমক দিতেই প্রবাল অধরের হাতখানা ক্ষিপ্রভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধ’রে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—“কোথা যাও।” অধর বেশ থতথত খেয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জবাব দিলে—“যাচ্ছি—বাড়ী—উষার সঙ্গে দেখা হ’তেই ওর ভাইদের অসুখ কেমন আছে তাই জিজ্ঞেস্ কচ্ছিলাম।” উষার দেহ যেন কাঁপ্‌ছিল। প্রবাল তার দিকে চেয়ে আবার বল্‌লে—“তোমায় থার্ম্মোমিটার আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম, তুমি পথে এত দেরী কর্‌লে কেন?”

উষা ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—“অধর দাদা আমার হাত ধ’রে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল. আর কেবলি ভূতের ভয় দেখাচ্ছিল।”

প্রবাল তখন কটমট ক’রে অধরের দিকে চেয়ে বল্‌লে—“ওর ভাইদের খবর নেবার জন্যে ওর হাত ধ’রে পুকুর পাড়ে দাঁড় করিয়ে ভূতের ভয় না দেখিয়ে সোজা-সুজি ওদের বাড়ীতে গেলেই ত পার্‌তে। আচ্ছা লোক ত তুমি, মনে ক’র না যে আমি কিছু বুঝি না।” পথে তখন জয়া আস্‌ছিল। দেখে প্রবাল জয়ার সঙ্গে উষাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে অধরের হাত ছেড়ে দিয়ে কেদারের বাসায় চ’লে গেল। থার্ম্মোমিটার নিয়ে চ’লে আস্‌বার সময় সে প্রিয়কে বল্‌লে—“বো’ঠান—কাল তোমার কথা বিশ্বাস কর্‌তে চাইনি; আজ কিন্তু সন্দেহের কারণ প্রত্যক্ষ করেছি। এইটু

দুধের মেয়ের পেছনে পর্য্যন্ত পিশাচগুলো কি ক'রে তাদের কুমতলব নিয়ে অনুসরণ করে, ভেবে ত দিশে পাই না।"

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রিয় বললে—"সত্যি ঠাকুরপো? কান ধ'রে আচ্ছা ক'রে দু ঘা বসিয়ে দিলে না কেন? চৈতন্য হ'ত।"

প্রবাল বললে—"চৈতন্য থাকলে ত উদয় হ'ত, মার-ধোর করলে একটা হৈ চৈ হ'ত, তাতেই রাগ সামলে গেলাম। তা ছাড়া বেশী কিছু ভেতরের কথা আমি তেমন জানি না যে মারতে পারি। উষাকে তোমার কাছে থার্ম্মোমিটার আনতে পাঠিয়ে দেরী দেখে নিজেই ছুটে আসছি, দেখি পুকুর-পাড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, আর অধর তার পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে। তখন খপ ক'রে তার হাতখানা চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করলাম যে সে এখানে এ সময় কি করছিল। সে বললে—উষাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করছিল যে তার ভাইরা সব কেমন আছে। উষা বললে, সে তার হাত ধ'রে ভূতের ভয় দেখাচ্ছিল, তাতেই সে আর এগুতে পারেনি। আমার কিন্তু তোমার কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল, বুঝলাম তার মতলব সত্যিই খুব খারাপ।"

প্রিয় বললে—"তুমি কাল কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললে, "ঝিদের অমন যা-তা কথা রটিয়ে বেড়াবার রোগ সকল দেশেই আছে। কিন্তু এ ক'মাসে আমি যা দেখছি, জয়া মেয়েটা খুব খারাপ না। অবশ্য ছোট জাতের মেয়ে, আর ওদের সংসর্গ খুবই খারাপ। তা হ'লেও কিন্তু ভদ্র পরিবারের সুনাম রাখতে জানে, নইলে সেদিন অত রাত্তিরে এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলে সব কথা খুলে বলত না।"

প্রবাল চ'লে আসছিল একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে, "জয়া কি বলেছিল?"

প্রিয় বললে—"জয়া বললে, নবীন আর অধর দুজনে মিলে তার বাসায় গিয়ে অনেক টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে বলেছে যে তাদের একটু সাহায্য করতে হবে। কি সাহায্য জিজ্ঞেসা করতেই নন্দা আর উষার নাম ক'রে বলেছে, সতীশবাবুদের বাড়ী নেমন্তন্নতে অনেক মেয়ে জড় হ'য়ে একটা কথা ওঠে, তারই একটা মীমাংসার খবর ওরা নন্দা আর উষার কাছ থেকে গোপনে জানতে চায়। জয়া বলে, সে তাতে আর কি সাহায্য করবে? নবীন-অধরদের বাড়ী ওরা ত প্রায়ই বেড়াতে যায়, সামনা-সামনি জিজ্ঞেস করলেই হ'ল। মোট কথা এই অছিলার মধ্যে হতভাগাদের যে কুমতলব লুকিয়ে আছে, তা অন্ধেরও চোখে পড়ে। তা ছাড়া ক'দিন থেকে সন্ধ্যের পর হঠাৎ নন্দাদের বাড়ী ঢিল-পাটকেল পড়া সুরু হয়েছে, পাড়ায় এ খবর খুব রাষ্ট্র। যেদিনই ঢিল পড়ে, তখুনি আলো নিয়ে চারিদিকে সবাই 'খোঁজ-খোঁজ' ক'রে খুঁজে বেড়ায়, কে ফেলছে তাকে ধরবার জন্যে, কিন্তু কাউকেই ধরতে পারছে না। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকেদের ভূত-প্রেতে খুব বিশ্বাস—তাতেই অনেকে বলছে উপদেবতার উপদ্রব। পরশু রাত্রে দশটার সময় কাজকর্ম্ম সেরে জয়া যখন আমার বাসা থেকে ভাত নিয়ে যায়, সে দেখে দুজন মানুষ নন্দাদের বাগানের পেছনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া বলে—প্রথমটা গা শিউরে উঠলেও তখুনি তার বেশ মনে হ'ল যে, ভূত নয়, মানুষই, আর নবীনবাবু অধরবাবু ব'লেই খুব মনে লাগল। লুকিয়ে থেকে ঢিল ফেলছিল বোধ হয়। আমি বললাম, ঢিল ফেলবার মানে ত বোঝা যায় না। জয়া বললে—মানে টানে না বুঝলে হবে কি? এদেশের এই হচ্ছে এক ধারা। যাই হোক ঠাকুরপো, দেশের গতিক দেখে আমার পিলে চমকে গেছে। নন্দা আজ বিকেলে বেড়াতে এসেছিল। তাকে মুখ ফুটে বলতেও পারি না যে—একটু সাবধানে থাকিস্। ছেলে মানুষ, ধিঙ্গী মেয়ে, পাড়া-ঘরে সন্ধ্যের পরও এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়িয়ে বেড়ায়। পাড়ায় যাদের আজন্মকাল ভাই ব'লে, আপনার জন ব'লে জেনে আসছে তারা যে এখন সর্ব্বনেশে বাঘের মতন ওঁৎ পেতে ব'সে আছে তা আর ওরা কি জানে!"

খুব গম্ভীর ভাবে "হুঁ" ব'লে প্রবাল বেড়িয়ে এল। পথ চলতে চলতে তার মনে হ'তে লাগল, এই সব হতচ্ছাড়া যুবকগুলোকে শাসন করবার জন্যে, সংযত করবার জন্যে সমাজের কোনো আইনের নাগপাশ নাই,

কাজেই এরা চির উচ্ছৃঙ্খল।—সমস্ত যৌবনকাল এই-রকম উচ্ছৃঙ্খলতার বশে এরা সমাজের বুকে অবাধে দাপাদাপি ক'রে ছুটে বেড়ায়। ইচ্ছামত কতজনের সর্ব্বনাশ করে, তারপর বয়সকালে হয়ত এপথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে একজন সমাজের মুরুব্বী-গোছ সেজে ধর্ম্মের ভাণ করতে ব'সে যায়। নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে সকল তরুণ বয়স্কদের গতি-বিধি প্রভৃতি, নিজেদের অভিজ্ঞতার চোখে দেখেই বিচার করে, আর মেয়েদের সম্বন্ধে এক একজন কঠিনতম সমালোচক বা বিচারক হ'য়ে ওঠে।

মতিবাবুর বাড়ীতে এসে রোগীর জ্বর দেখে ওষুধ খাইয়ে যখন প্রবাল রোগীকে নিদ্রিত দেখে, ইংরাজীতে "সেবা সম্বন্ধে" ব'লে একখানি বই পড়ছে সেই সময় মতিবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ প্রবালের মনে প'ড়ে গেল সন্ধ্যার ঘটনা—প্রবালের মনে হ'ল কথাটা মতিবাবুকে খুলে বলা ভাল; নইলে যদি কিছু ব্যাপারই ঘ'টে যায়। তাই সে সংক্ষেপে ব্যাপারটার আভাস মতিবাবুকে দিলে। প্রবালের বলবার সঙ্কোচ দেখে মতিবাবু তাকে নিরস্ত করবার জন্যে ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন—"আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝে নিয়েছি; অধর আর নবনে, দুটোরই স্বভাব আর কাজ আমার খুব জানা আছে।"

রাগে মতিবাবুর সর্ব্বাঙ্গ রিরি ক'রে জ্ব'লে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রবাল সামান্য একটু যা আভাস দিলে তাতেই মতিবাবু জলের মত পরিষ্কার ক'রে ব্যাপারটার অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখতে পেলেন। রাত তখন দশটা বেজে গেছে। মতিবাবু নিজের নির্জ্জন শয়ন-গৃহে এসে স্তব্ধভাবে ব'সে পড়লেন। একবার তাঁর মনে হ'ল এই রাত্রে এখুনি ছুটে বাড়ীর কাছে নবীনদের বাড়ী গিয়ে তার কান ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে দু'চার ঘা জুতো বসিয়ে দেন, দু'টো চোখে এমন খোঁচা দিয়ে দেন, যে বাছাধনদের দৃষ্টির দফা জন্মের শোধ রফা হ'য়ে যায়। সত্যিই তাঁর এমন রাগ হচ্ছিল, সেই সময় হতভাগাদের হাতের কাছে পেলে একটা কিছু কাণ্ড তিনি মরিয়া হ'য়ে করতে পারতেনই। খানিকক্ষণ পরে রাগের প্রথম ভাবটা একটু কেটে গেলে একে একে তাঁর নিজের গত জীবনের অনেক কথাই মনে প'ড়ে গেল। হায় হায়! নিজের যৌবন-জীবন তিনিও এই হতভাগাদের মতই উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটিয়ে এসেছেন। কে জানত তাঁর সেই উদ্দাম প্রবৃত্তি, কদর্য্য তাড়নায় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে চরিত্রবল, নৈতিক শুচিতা সব কিছুকে পরিহার ক'রে, যে দুর্ণিবার পাপ-স্রোতে তিনি একদিন ভেসে চলেছিলেন, সেই স্রোত আজ বিপরীত দিক দিয়ে হঠাৎ উল্টো ধাক্কায় এসে অবাধে তাঁরই মাথায় পড়বে? পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনি একদিন মানেন নি, মানবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নি, ধর্ম্মভয় জিনিষটাকে তিনি কেবল মনের দুর্ব্বলতা ব'লেই জেনেছিলেন।

অনুতাপ কাকে বলে তিনি জানতেন না। যদিও ছেলেদের এই কঠিন পীড়ার সময়, বিশেষ ক'রে ডাক্তার যখন থেকে জানিয়েছেন যে পৈত্রিক দুষ্ট শোণিতের জন্যই ছোট শিশুটির মারাত্মক পীড়া—সেই থেকে তাঁর মনটা বড্ড বেশী খারাপ হ'য়ে গিয়েছে! ছেলেদের প্রতি মতিবাবুর অত্যন্ত টান ছিল। বিশেষ, এই দুর্ব্বল শিশুটির প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে স্নেহের মিশ্রণে টানটা খুব বেশী রকমই ছিল। সুতরাং ছেলের কথা মনে হ'তেই মতিবাবুর বিক্ষিপ্ত মন একাগ্রভাবে ছেলেটিকে দেখবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠল। তিনি সব চিন্তা ভুলে উঠে দাঁড়ালেন। শিশুটির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে, চিকিৎসক জীবনের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন; বলেছেন, এখন সম্পূর্ণ ভগবানের হাত। মতিবাবু সেকথা মোটেই বিশ্বাস করেন নি, কেন না, তিনি ভগবানের হাত-টাত মানেন না। তাই রুক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন—"বাঁচবে না সেই কথাটাই খুলে ব'লে দিন না, ডাক্তার বাবু!" আজ তিন রাত্রি তিনি একটিবারও চক্ষে পাতায় করেন নি, বারবার ক'রে রুগ্নছেলে দুটির ঘরে যান, একটির কাছে একবার তিনি, একবার প্রবাল ব'সে থাকেন; আর একটির কাছে সেবা আর রমা সর্ব্বদাই জেগে থাকে ব'লে তাঁর বসবার দরকার হয় না, কিন্তু বারবার তিনি খোঁজ নিয়ে আসেন।

চিন্তা ও অনশন-ক্লিষ্ট বেচারী রমার স্নেহ-কাতর-মন

সমস্তক্ষণ ছেলেটির মুখের উপর নিজের অকম্পিত দৃষ্টি রেখে জেগে থাকতে চাইলেও শরীর তার ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়েনেতিয়ে পড়ে। সেবা তখন জোর ক'রে রমাকে শুইয়ে দিয়ে সাধ্যমত রোগীর শুশ্রূষা করে। আজ মতিবাবু যখন শিশুকে দেখতে এলেন, তখন দেখলেন খোকার চোখদুটি স্তিমিত। খুব সম্ভব সে একটু ঘুমিয়েছে। রমা পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেবা মাথার কাছে পাখা হাতে ক'রে ব'সে আছে। রোগীকে ঘুমুতে দেখে তারও শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ এলিয়ে পড়েছে, তাই পিছন দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে সেও চোখ বুজেছে। মতিবাবু আর ঘরের ভিতর ঢুকলেন না। সেবার অনাবৃত মুখের উপর দেওয়াল-গিরির উজ্জ্বল আলো চক্ চক্ করছিল। তিনি সে দীপ্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কি শান্ত সুকুমার মুখশ্রী! পঞ্চমীর চাঁদের মত সুবঙ্কিম ললাটের ছাঁদ, সরলতার ও পবিত্রতার রেখা যেন সেখানে নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা। রক্ত করবীর মতো সুন্দর ওষ্ঠাধর দুটিতে ফুলের হাসির মত একটু আমেজ যেন লেগে আছে। ঘুমের আবেশে সর্ব্বাঙ্গ নিথর। ঘুমন্ত মুখখানিতে মতিবাবু এমন একটি দিব্য শ্রী দেখলেন যা এতদিন কোনো নারীর সৌন্দর্য্যেই তিনি লক্ষ্য করেন নি। অদূরে তাঁর বড় মেয়ে উষা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কী নিশ্চিন্ত ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ বালিকার এই নিদ্রা! উষার মুখের দিকে চেয়ে মতিবাবুর হৃদয়ের পিতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে সাড়া দিয়ে উঠল। ঐ বালিকা উষারই মত, নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত নিঃসম্পর্কীয় মতিবাবুর আশ্রয়ে এই সেবাও নিদ্রা যাচ্ছে। মতিবাবু নিজের মনে ব'লে উঠলেন—"কী নরাধম পাপিষ্ঠ আমি। এই সরলা-নারীর রূপ-যৌবনের কথা শুনে আমি কী প্রলুব্ধই হয়েছিলাম। যদি আজ এই দারুণ বিপদ আমার দুয়ারে এসে হানা না দিত, তা হ'লে কে জানে আমার মোহ আমায় ছুটিয়ে কোন্ পথে নিয়ে যেত? এ রূপ যে এত নির্ম্মল—এত সুন্দর, মনকে এত আনন্দ দিতে পারে তাতো কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি। সরলা সেবা স্বপ্নেও জানে না যে, যার রুগ্ন সন্তানকে প্রাণপণ সেবায় সে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে সেই নরাধম একদিন তার কী সর্ব্বনাশই সঙ্কল্প করেছিল। কিন্তু আর না—এসব বাসনার আজ চিরনির্ব্বাণ! আমার উষার সঙ্গে সমান ক'রে শুধু তোমায় নয় দেশের সব মেয়েকেই আজ হ'তে দেখব।

মতিবাবু নিঃশব্দে নিজের বসবার ঘরে ফিরে এলেন, কিন্তু, সেখানে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না; তাই ঘর থেকে বেরিয়ে একটু ছাদে উঠলেন। নিস্তব্ধ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই, কোটী তারকার স্নিগ্ধ-জ্যোতি অন্ধকারের নিবিড়তাকে এমন একটি স্বচ্ছতা দান করেছে যাতে সমস্ত প্রকৃতিকে একটি অপূর্ব্ব মায়াপুরী ব'লে ভ্রম হচ্ছে। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। পৃথিবী যেন একটি ছোট্ট মেয়ের মত, অধরে সুখ-স্বপ্নের একটু হাসির আভাস মেখে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘুমিয়ে আছে, আর মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্রখচিত সীমাহীন নীলাকাশ—তার সহস্র আঁখি নত ক'রে স্নেহমুগ্ধ প্রাণে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। মতিবাবু জীবনে যা কখনো অনুভব করেন নি আজ তাই করলেন; তাঁর মনে হ'ল এই পৃথিবী যেন তাঁরই ছোট্ট মেয়ে উষা, আর তাঁর অসীম স্নেহভরা পিতৃহৃদয় ঐ অনন্ত আকাশ—মুহূর্ত্তেই তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ দোলা দিয়ে উঠল। তাঁর বড় ইচ্ছা হ'তে লাগল সব প্রাণ-মন দিয়ে এ পবিত্রক্ষণে এমন একজনকে ডাক যেন যিনি তাঁর প্রগাঢ় সান্ত্বনা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রে ওঠেন—"মা ভৈঃ, মা ভৈঃ"। মতিবাবু ভাবতে লাগলেন—এতকাল ঈশ্বর ব'লে যে কেউ আছেন তা ত মনেও করতাম না, মনে করবার দরকারও ভাবিনি, কিন্তু আজি একী পরিবর্ত্তন! সমস্ত মন আমার আকুল হ'য়ে উঠে এখন যেন কাকে একবার ডাকতে চাইছে—আর কার কাছে শিশুর মত নিঃশেষে আপনাকে সঁপে দিয়ে নির্ভর করতে চাইছে।

মতিবাবুর হৃদয় এক অপূর্ব্ব অনুভূতির আবেশে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

মতিবাবু অনেকক্ষণ হ'য়ে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। অদূরে কাছারীর ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে যখন রাত তিনটের ঘোষণা হ'য়ে গেল, তখন তিনি ব্যস্ত হ'য়ে নেমে চললেন—মনের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটিও তখন তাঁর সরস হ'য়ে উঠেছে, তাই চোখে একটি বেশ সজল ভাব।

ক্রমশঃ

সত্তর বৎসর

(১৮৫৭-১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

কৈফিয়ৎ

(১)

গত ২২শে কার্ত্তিক সত্তরে পা দিয়াছি। এদেশে, একালে সত্তর বছর বাঁচিয়া থাকা কম কথা নহে। কেবল বাঁচিয়া থাকারই একটা আনন্দ আছে। সংসারের দুঃখ-

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল
(প্রৌঢ় বয়সে)

দারিদ্র্য, শোক-তাপ কিছুতেই এই আনন্দকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। অতিশয় দুঃখী-তাপী যারা, এই জন্য তারা পর্য্যন্ত অশেষ কষ্টের মধ্যেও জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া এই জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু সে-সকল জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে নাই। এই দীর্ঘ আয়ুর জন্য ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা সহকারে অগণ্য প্রণিপাত করি।

এ-জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধি-শালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারত-বর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্ব্বোপরি, এ বাংলা দেশে এযুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথ । মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এযুগে, এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সকলেই বলেন, ভারতবর্ষের এই নবযুগের যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রাজা রামমোহন। রাজাকে দেখি নাই। আমার জন্মের চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিদেশে বিভূমে দেহরক্ষা করেন। শৈশবে বাবার মুখে রাজার নাম শুনিয়াছিলাম। বাবা তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন কহিতেন। বাবা নিজে মোস্লেম সাধনার কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়াছিলেন। এই জন্য রাজাকে মৌলবী বলিয়াই জানিতেন। রাজাকে চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু রাজা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভারতবর্ষে নবজীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জানি। বিগত শতবর্ষের মধ্যে সেই বীজই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া আধুনিক ভারতবর্ষকে ছাইয়াছে। যাঁহারা এই বীজে জল-সিঞ্চন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সেবায় এবং ত্যাগে এই বীজ আজ এমন সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কাহারও কাহারও সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর ঘনিষ্ট

ভাবে মিশিবার অবসরও পাইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের স্মৃতির সঙ্গে ইঁহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া আছে। এই জন্যই আমার সামান্য জীবনস্মৃতির যা-কিছু মূল্য ও মর্য্যাদা। নতুবা লোকসমাজে এ কাহিনী কহিবার কোন অজুহাত থাকিত না।

(২)

আরেকটা কথা। মানুষ যত কেন ক্ষুদ্র হউক না কখনই নিঃসঙ্গ হইয়া রহে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবন যে-সমাজে জন্মিয়াছি, সেই-সমাজের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট ভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। মানুষ একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে, ইহা শাস্ত্রবাক্য হইলেও সত্য নহে। মানুষ বিশাল-বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্ম-বোঝা মাথায় লইয়া এসংসারে জন্মে। নিজের কর্ম্মের দ্বারা ইহ-জীবনে বিশ্বের এই কর্ম্মবোঝাকে লাঘব বা গুরু করিয়া সংসার হইতে অপসৃত হয়। এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

সদ্যজাত শিশুর ক্ষুদ্র জীবন তাহার পিতামাতার জীবন-ধারার মিলনে উৎপন্ন হয়। যখন আত্মস্থ হইয়া সূতিকাগারের দরজায় যাইয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় পবিত্র ত্রিবেণী-তীর্থে উপস্থিত হইয়াছি। প্রত্যেক মানুষের জীবন এইরূপে এক একটি ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করে। পিতার জীবনে ও মাতার জীবনে তাঁহাদের নিজ নিজ পিতার এবং মাতার দুইটি জীবনধারা মিলিয়াছিল; সেই জীবন-স্রোত পিতামাতার জীবন-ধারা বাহিয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে যদি নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবন-স্রোতকে ধরিয়া উজান বাহিয়া চলি, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের অনন্ত জীবন-স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষণিক তরঙ্গভঙ্গরূপে দেখিতে পাই। বিশ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জীবন মিলিয়া আমার এই জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্ম-বোঝা, আমি বুঝি বা না বুঝি, আমার এই মাথার উপরে পড়িয়াছে।

একাকী আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল নিজকৃত কর্ম্ম-বোঝা মাথায় লইয়া নহে। আমার জন্মে পিতামাতা তাঁহাদের কর্ম্ম-বোঝাই কেবল আমার মাথায় চাপাইয়া দেন নাই। তাঁহারাও পূর্ব্বপুরুষদিগের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। মানুষের কর্ম্মের দায় এক পুরুষের বা দুই পুরুষের নহে। প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীর আলোকে চক্ষু খুলিয়াছিল, সেদিন হইতে অদ্যকার সদ্যজাত শিশুর কর্ম্মের বোঝা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা প্রথম মানবের কথাই বা বলি কেন। যেদিন হইতে এই সৃষ্টির সূত্রপাত, সেইদিন হইতেই এই সদ্যজাত শিশুর সংসারের জাল অদৃশ্য হস্তে বোনা আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপরে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, পায়ের নীচে এই পৃথিবী—ইহাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তিলে তিলে, "অনাদিকাল অনন্তগগন" এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। এই সৃষ্টিতে জড় ও চেতন যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু আছে, সকলের সঙ্গেই এই সদ্যজাত মানবশিশুর জীবন জড়াইয়া রহিয়াছে। আলোক ও অন্ধকার, রৌদ্র এবং বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্র, দাবানল ও ভূকম্পন, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পর্ব্বত ও সমুদ্রের সৃষ্টি, সমুদ্র-তরঙ্গ ও নদীর স্রোত, বিশাল বনস্পতি সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তু-সকল, কীট, পতঙ্গ, পুষ্প, লতা, সকলে মিলিয়া সৃষ্টির আদি হইতে এই ক্ষুদ্র মানবশিশুর জীবনকে গড়িয়া-পিটিয়া তুলিয়াছে। এ সকলের কর্ম্মের-বোঝা মাথায় লইয়া মানুষ এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কল্পনা এই সৃষ্টিতে সম্ভব নহে।

মানুষকে যতদিন আমরা এই ভূপৃষ্ঠে দেখিতেছি, জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং সমাজ-বিজ্ঞান যতদিনের খোঁজ পাইয়াছে, ততদিনই মানুষকে আমরা সামাজিক জীব বলিয়া জানিয়াছি। কোন কোন পশু যেমন দল বাঁধিয়া থাকে ও চলে, মানুষ যখন নিতান্ত পশুর মতনই ছিল, তখনও তেমনি সমাজ বাঁধিয়া বাস করিত। সৃষ্টির আদি হইতেই মানুষ তার সমাজের কর্ম্মের বোঝাও বহন করিয়া আসিয়াছে। সমাজের ভালমন্দের দ্বারা তাহার নিজের জীবনের ভালমন্দ সর্ব্বদাই

তাহাকে চালাইয়া লইয়াছে। মানুষ একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে, আর একাকী নিজের কর্ম্মের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া, মৃত্যুতে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে—মিথ্যা কথা। আমরা নিখিল-বিশ্বের কর্ম্ম-বোঝা মাথায় লইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই বিশ্ব-কর্ম্ম-বোঝাকে ইহসংসারে নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা লঘু বা গুরু করিয়া মৃত্যুকালে যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া যাই, তাহাদের মাথায় সেই বোঝা চাপাইয়া দেই। তাহারা পুরুষানুক্রমে আমাদের সুকৃতির ফলভোগ করে, আর, আমাদের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। যতদিন না এই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হয়, ততদিন কাহারও মুক্তি নাই। আমরা যে-লোকেই থাকি না কেন, ততদিন আমাদের ইহজীবনকৃত কর্ম্ম-বন্ধন আমাদের অনুসরণ করে। বিশ্বের মুক্তি ভিন্ন বিশিষ্টের মুক্তি নাই। ইহারই নাম কর্ম্মফল।

(৩)

এই ভাবে যখন নিজের ক্ষুদ্র জীবনের দিকে তাকাই, তখন এ জীবনকে কিছুতেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাবিতে সাহস হয় না। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। জড়-বিজ্ঞান সেই লুপ্ত লিপিরই উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেক জীব-কোষাণুর মধ্যে সৃষ্টির সমগ্র প্রাণীজগতের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া জীবের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেইরূপ সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানুষ যত কেন ছোট হউক না, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের সঙ্গে তাহার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের কথা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহে। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, ভাব ও কর্ম্ম-চেষ্টা ফুটিয়া উঠে। টানা ও পোড়েন মিলিয়া যেমন কাপড় বুনে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও তাহার সমাজের জীবন উভয়ে মিলিয়া বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের তাঁতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে। সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি রহে না; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজ চলে না। সমাজের সমষ্টিগত জীবন, সমাজের স্থিতি রক্ষা করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা সমসাময়িক সামাজিক অভিব্যক্তিতে গতিবেগ সঞ্চার করে। এই ভাবে মানুষের সভ্যতা ও সাধনা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজকে চিনিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মানুষগুলিকে চিনিতে হয়। আবার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষগুলির জীবন ও কর্ম্মের মূল্য বুঝিতে গেলে ইহাদের সমসাময়িক সমাজের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদের কালী কষিতে হয়। জীবনচরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়। ইতিহাস জীবন-চরিতের অর্থ করিয়া দেয়। এই ভাবেই ব্যষ্টিরূপে ব্যক্তিকে ও সমষ্টিরূপে সমাজকে দেখিতে হয়। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির বাস্তবতা থাকে না। সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির সার্থকতা বোঝা যায় না। ইহাই আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা।

(৪)

এই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের প্রত্যেকের জীবন-স্মৃতির একটা চিরন্তন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই জীবন-স্মৃতি বা আত্মচরিত যদি কেবল আমার নিজের কথাই হইত, ইহাকে লোকসমাজে প্রচার করা সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমার এই সত্তর বছরের নিজের জীবনকথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসেরই কথা। আমার ক্ষুদ্র জীবন এই সত্তর বৎসরের বাংলার সমাজ-জীবনের সঙ্গে কাপড়ের টানা ও পোড়েনের মতন জড়াইয়া আছে। এই সত্তর বছরে বাংলা দেশের চিন্তায়, ভাবে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এক মহা যুগান্তর ঘটিয়াছে। আজিকার বালকেরা ও যুবকেরা এই সত্তর বছরে বাংলায় কি ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা জানে না; কল্পনা করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমার মতন দুই চারি জন লোক এখনও এই

পরিবর্ত্তনের সাক্ষী স্বরূপ বাঁচিয়া আছেন। ইহাঁরা চলিয়া গেলে প্রাচীন পুঁথি-পত্র ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে এই সত্তর বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দিবার কেহই থাকিবে না। আর, কেবল পুঁথি-পত্র ঘাঁটিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের জীবনের সকল সঙ্কেত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা যা কিছু বলি বা লিখি বা করি, তাহাতে আমাদের চিন্তার, ভাবের বা কর্ম্মের সকলটা কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। অনেক সময় এই জন্য কথা বা কাজের বিচার করিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের চরিত্রের বিচার সম্ভব হয় না। যাঁরা স্রষ্টা, বক্তা, বা কর্ত্তা, তাঁরাই কেবল যদি নিজের বাক্যের বা সৃষ্টির বা কর্ম্মের কথাটা খুলিয়া কহেন, তবে তাহার সত্য অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। এই জন্যই কোন সমাজের ইতিহাসের সত্য মর্ম্ম বুঝিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কথা জানিতে হয়। ইহাই আত্মচরিতের সার্থকতা। এই ভাবে যদি আত্মচরিত লিখিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ইহা লেখকের আত্মাভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে না। এই ভাবেই নিজের জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি।

(৫)

আরও একটা কথা আছে। সে ধর্ম্মের কথা ও ভক্তি-সাধনের কথা। যখনই আত্মস্থ হইয়া নিজের জীবনের দিকে তাকাই, তখন ত এ জীবনের উপরে কোন প্রকারে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিন্দু পরিমাণ অবসর খুঁজিয়া পাই না। এ জীবনের একটা শিক্ষা সকলের চাইতে বড়— সকল সময় মনে রাখিতে পারি বা না পারি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এ জীবনের কর্ত্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহিয়াছি, তাহা কতবার করিতে পারি নাই। যাহা করিতে চাহি নাই বা করিব ভাবি নাই, বহুবার তাহাই করিয়াছি ও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া যখন দেখি, তখন সত্যই বলিতে পারি

"হরি হে, তুমি আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ ত সাক্ষীগোপাল কেবল আমার আমার বলে।"

বারম্বার ইহা দেখিয়া কহিয়াছি—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

স্বাধীনতা ও নিয়তি (free will and determination) পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব (moral responsibility), এ-সকল তর্ক তুলিয়া জীবনের এই মুখ্য শিক্ষার সত্য ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারি নাই। জানি না, সত্যই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না। বুঝিনা, পাপ-পুণ্যের কথা। স্বাধীনতা নাই এমনও বলি না। পাপ-পুণ্যের ভেদ ও দায়িত্ব নাই, ইহা ভাবিতেও সাহস হয় না। কিন্তু সকলের উপরে এ কথা সত্য, যে, এ জীবনের কর্ত্তা আমি নহি। এই কথাটা যখন ভুলিয়া যাই, তখনই যত দুঃখ, যত তাপ ভোগ করি।

এ-জীবনের কর্ত্তা আমি নহি বলিয়াই এ জীবনের কথা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে ও বলিতে পারি। ভক্তি-সাধনের "স্মরণ" একটা প্রধান অঙ্গ। এ "স্মরণ" কি কেবল ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ আবৃত্তি করিয়াই করিব? ভাগবতের অর্থ ভাগবত করে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের টীকা দিয়া ভাগবতাদি পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তাহার সদ্‌ব্যাখ্যা হয়।

এই জন্যই নিজের জীবনের স্মৃতিও ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে। হইবে কি না, ঠাকুর জানেন। তাঁহারই নাম লইয়া, তাঁহারই চরণে এই কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, ইহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

—

বংশ ও গ্রাম পরিচয়

(১)

১৭৭৯।৬।২১।…।…

আমার কোষ্ঠীতে এই ভাবে আমার জন্মের দিনকাল লেখা ছিল। ৬মাস অর্থ আশ্বিন মাস। কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা কোন মাস শেষ না হইলে এভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন না। ইংরাজীতে ৬।২১।১৮২৬ লিখিলে জুনমাসের ২১ তারিখ বুঝায়। আমাদের

প্রাচীন প্রথায় ৬।২১ লিখিলে ষষ্ঠমাস "গতে" একবিংশতি দিবস "গতে" বুঝাইত। সুতরাং ১৭৭৯ শকাব্দার কার্ত্তিক মাসের ২২তারিখে আমার জন্ম হয়।

সেকালে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-হিন্দুরা সকলেই ছেলেদের কোষ্ঠী তৈয়ার করাইয়া রাখিতেন। বোধহয়, মেয়েদের সচরাচর কেবল জন্মপত্রিকা মাত্রই লেখান হইত। বিবাহের সম্বন্ধ করিবার সময় বরপক্ষীয়েরা জন্মপত্রিকা পরীক্ষা করিয়া ভাবী-বধূর ভাগ্যগণনা করাইতেন। আমাদের একজন "দ্বারস্থ" আচার্য্য বা গণক ছিলেন। ধোপা, নাপিত যেমন তখনকার হিন্দুসমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, গণকেরাও সেইরূপই প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম্য-জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতেন। আমাদিগের অঞ্চলে ইঁহারা জ্যোতিষগণনা করিতেন, শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান লইতেন, এবং কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার পূজাকালে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। ইঁহারা যেমন ফলিত-জ্যোতিষ গণনায়, সেইরূপ পুরুষ-পরম্পরায়, ভাস্কর্য্যেও নিপুণ ছিলেন। আজিকালি পশ্চিম-বঙ্গে কুমারেরাই দেব-প্রতিমা গড়িয়া থাকেন। কিন্তু এসকল প্রতিমার "প্রাণ-প্রতিষ্ঠার" পূর্ব্বে, কোন প্রকারে মন্ত্রপূত করা হয় কিনা জানি না। আমাদের অঞ্চলে, আমার বাল্যকালে, দেব-প্রতিমা সর্ব্বদাই মন্ত্রপূত হইয়া নির্ম্মিত হইত। প্রথমে দেবতার পাদপীঠ প্রস্তুত হইত। কাঠ এবং বাঁশ দিয়া কাঠামো দাঁড় করা হইত। এই পাদপীঠ নির্ম্মাণকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় "পাটে খিলি" কহিত। মন্ত্র পড়িয়া এই "পাটে খিলি" হইত, আর গণকই এসময়ে মন্ত্রাদি পড়িতেন। কুমারদিগের এ-অধিকার আছে কিনা জানি না। কুমারেরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন না। বেদ-মন্ত্র উচ্চারণে ইঁহাদের অধিকার নাই। কিন্তু আচার্য্য বা গণকেরা, পতিত হইলেও ব্রাহ্মণ, বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী। বোধ হয় বৈদিক যুগে যাঁহারা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিতেন, আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্যেরা তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী। যজ্ঞবেদী নিম্মাণ করিবার সময় পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দিগ্‌নির্ণয় করিতে হইত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও স্থিতি স্থির করিয়াই দিগ্‌নির্ণয় করিতে হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের যজ্ঞের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যজ্ঞবেদী যাঁহারা নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহারা জ্যোতিষীও ছিলেন। ক্রমে ফলিত-জ্যোতিষের সৃষ্টি বা আবিষ্কার হইলে ইঁহারাই বোধ হয় এই বিদ্যাতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। এইরূপে গ্রহপূজা, জন্মপত্রিকা ও কোষ্ঠী-গণনা এবং প্রতিমাদি নির্ম্মাণ আমাদের আচার্য্য বা গণক-দিগের জাতি-ব্যবসায় হইয়া উঠে। ক্রমে শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করিয়া ইঁহারা পতিত হয়েন। আমাদের "দ্বারস্থ" আচার্য্যকে আমার বাবা প্রণাম করিতেন না। তিনি প্রথমে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পরে প্রণাম পাইতেন। ইঁহাদের জল আচরণীয় ছিল না। ইনিই আমার কোষ্ঠী গণনা করিয়াছিলেন। আমার কোষ্ঠীখানা আট দশ অঙ্গুলি চওড়া ও পনর কুড়ি হাত লম্বা ছিল। তুলট কাগজ জুড়িয়া তাহাতে আমার জীবনের অঙ্কপাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তুলট কাগজকে আমরা নারায়ণ-গঞ্জী কাগজ কহিতাম। ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটে বোধহয় সেকালে এই কাগজ প্রস্তুত হইত। বড় আকারের সাদাকাগজ শ্রীরামপুরী কাগজ বলিয়া পরিচিত ছিল। কলিকাতার নিকটে যে শ্রীরামপুর আছে, এখানে সেকালে কাগজ প্রস্তুত হইত কিনা জানি না। কিন্তু এই শ্রীরামপুরই হউক, বা অন্য শ্রীরামপুরই হউক, আমার শৈশবে কোনও শ্রীরামপুরে নিশ্চয়ই সাদা কাগজ প্রস্তুত হইত। আজিও বোধ হয় শ্রীহট্ট অঞ্চলে, সাদা "ডিমাই" কাগজ শ্রীরামপুরী কাগজ বলিয়াই পরিচিত। বাবা আমার কোষ্ঠীখানিকে অতি যত্ন করিয়া পরিবারের অন্যান্য নথীপত্রের সঙ্গে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে এখানি আমার হাতে পড়ে। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। ফলিত-জ্যোতিষে তখন আমার কোনই আস্থা ছিল না। এখনও যে ফলিত-জ্যোতিষে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, এমন বুঝি না। গ্রহনক্ষত্রের গতি-বিধির সঙ্গে আমার জীবনের সুস্থতা ও অসুস্থতার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতেও বা পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা আমার সাংসারিক কর্ম্মাকর্ম্ম কেমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, ইহা বুদ্ধিতে আসে না। কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইলেও, সরাসরি ভাবে ফলিত-জ্যোতিষের দাবীটা একেবারে উড়াইয়া দিতেও সাহস হয় না।

(২)

শ্রীহট্টের অন্তর্গত, পৈল গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। এই গ্রামের পত্তনের কথা বিশেষ জানা নাই। ইহার নামের উৎপত্তি কিসে, তাহাও বলিতে পারি না। তবে আমাদের বংশাবলীতে এরূপ লেখা আছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যপাল এই গ্রামের নাম পৈল রাখিয়াছিলেন।

"হকিকৎ বংশাবলী। হিরণ্য পাল দক্ষীণ রাঢ়। মঙ্গলকোট
"হৈতে আসীয়া পরগনে পঙ্কজনাথ সাহি উয়কে তরক
"বুড়ি গঙ্গার উত্তর পাড়ে বশিয়া গ্রামের নাম রাখীলেন
"পৈল। তাহান স্ত্রি গর্ব্ববতি ছিলেন জে দিবষ এই স্থানে
' উত্তরীলেন সেই দিবশ দিবান্তাগে তাহান ঘরে এক
"পুত্র হইলেক নাম রাখীলেন কিরণ্য পাল।"

এই কিরণ্য পাল হইতে আমার পিতা রামচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত পৈল গ্রামে আমাদের বংশ পঁচিশ পুরুষ বাস করিয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এ অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে পৈল গ্রাম ছিল কি না বলিতে পারি না। থাকিলে সে গ্রামের তখনকার নামই কি ছিল, আর সমাজের অবস্থাই বা কি ছিল, তাহার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা জানি না, অন্ততঃ আমি সে খবর পাই নাই। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোট হইতে আসিয়াছিলেন ইহা একেবারে অসম্ভব বা অপ্রামাণ্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে আমি মঙ্গলকোটে এখন বাৎস্য গোত্রের কোন পাল কায়স্থেরা আছেন কিনা সন্ধান করিয়াছিলাম। কুমুদবাবু তখন মঙ্গলকোটের নিকটেই উজানী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে মঙ্গলকোটে এখন কোন পাল পরিবার নাই। তবে পালেরা যে এক-কালে গ্রামের বিশিষ্ট লোক ছিলেন, "পালের দীঘি" নামে একটা প্রাচীন জলাশয় তাহার সাক্ষ্য দেয়।

হিরণ্য পাল "বুড়ি গঙ্গার উত্তর তীরে" আসিয়া উপস্থিত হন। আমাদের বংশাবলীতে এরূপ লেখে। কিন্তু এনামে কোন নদী এ অঞ্চলে নাই, কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। ঢাকার পাদবাহী নদীর নামই বুড়ীগঙ্গা। বোধহয় রাঢ় হইতে আগত হিরণ্য পাল বুড়ীগঙ্গার নামই জানিতেন এবং সেইজন্য যে নদী পার হইয়া বর্ত্তমান পৈল গ্রামে উপস্থিত হন তাহাকেই বুড়ীগঙ্গা ভাবিয়া লইয়াছিলেন।

হিরণ্য পাল আসিবার পূর্ব্বে পৈল গ্রাম ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরাই যে এ গ্রামের আদিম ভদ্র-অধিবাসী এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

(৩)

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বল্লালী কৌলীন্য নাই। এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা সকলেই "শর্ম্মা"। বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় কিম্বা গঙ্গোপাধ্যায় এসকল কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে নাই। সেইরূপ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র,—কায়স্থদিগের মধ্যেও এসকল কুলীন উপাধি নাই। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বংশ মর্য্যাদা বল্লালের কৌলীন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ অঞ্চলে যাঁরা যত পূর্ব্বে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন তাঁহাদেরি বংশ মর্য্যাদা তত বেশী। পৈল গ্রামে আমার বাল্যকালেও দেখিয়াছি যে পালেরা এবং সেনেরা সামাজিক পংক্তিভোজনে অগ্রণীর আসন পাইতেন। ইহা হইতেই মনে হয় যে পালেরাই এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী। বোধহয় ইহাও শুনিয়াছিলাম যে সেনেরা পালেদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই পৈলে আসেন। অতএব ইহা নিতান্ত অসম্ভব নয় যে পালেদের পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যপাল, মঙ্গলকোট হইতে আসিয়া পৈলের পত্তন করিয়াছিলেন।

(৪)

পৈল বর্ত্তমান হবিগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তর্গত। হবিগঞ্জ মহকুমা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। পৈল সে অঞ্চলে একটা গণ্ডগ্রাম। বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোকই আমার শৈশবে বোধহয় সকলের চাইতে বেশী ছিলেন। কায়স্থেরা তখনও নিজেদেরে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতেন না। বর্ণবিচারে আপনাদিগকে শূদ্রের কোঠায়ই ফেলিতেন। তবে এখানে যাহাদিগকে শূদ্র

কহিলাম ইঁহারা হয় নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন, অথবা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভদ্রলোকদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। ইঁহারা ভৃত্যস্থানীয় ছিলেন। এই শ্রেণীর শূদ্রেরাও আবার দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। কতকগুলি শূদ্র গ্রামের ভদ্রলোকদিগের "নফর" ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে স্বাধীন হইয়া কৃষিকার্য্য ও বাসা-চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের পরিবারে একজন এ-শ্রেণীর শূদ্র ছিলেন। ইঁহাকে আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম। ইঁহার মাতাকে পিসি বলিতাম। ইঁহারা আমাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। বাবা 'দাদা'র বিবাহ দিয়া ঘরে বৌ আনিয়াছিলেন। এই বধূকে আমি নিজের ভ্রাতৃবধূর মতন দেখিতাম। "দাদা" আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বাবাকে "রামধন মামা" বলিতেন। 'দাদা'র মা আমার বাবাকে "রামধন" বলিয়াই ডাকিতেন। বাবা সারা বৎসর বিদেশে থাকিতেন। মা'ও প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। 'দাদা'ই বাড়ীর কর্ত্তারূপে আমাদের গ্রামের বিষয়াশয় দেখিতেন। এমন কি, বাবার প্রজারা দাদাকেই তাহাদের জমিদার বলিয়া জানিত। বাবার সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় অনেক স্থলেই ছিল না। এই "নফরেরা" অন্য শ্রেণীর শূদ্র অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদা হিসাবে হীন ছিলেন। স্বাধীন শূদ্রেরা ইঁহাদের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতেন না। গ্রামের নফরেরা হয় নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে, অথবা ভিন্ন গ্রামের "নফর"দিগের সঙ্গেই সম্বন্ধ করিতেন। এক আমাদের বাড়ীতেই "নফর" আমার শৈশবে আমাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। অন্যেরা সে-সময়ে নিজদের ঘরবাড়ী বাঁধিয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। আর "দাদা"কে বাবা নিজের পুত্রের মতনই প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

অনেকগুলি নবশাক ও আমাদের গ্রাম্য-সমাজে ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কলুরাই সংখ্যায় এবং সমৃদ্ধিতে বিশেষ গণনীয় ছিলেন। কলুদিগকে আমাদের প্রান্তিক ভাষায় তেলি কহে। ইঁহারা নিজের জাতির ব্যবসা ব্যতীতও ছোট-খাটো রকমে তেজারতি করিতেন। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে দোকানপাট বড় ছিল না। সপ্তাহে দুদিন বা তিনদিন হাট বসিত। এই হাটেই গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় পণ্য যা পাওয়া যাইত। সুতরাং স্থায়ী দোকানপাট ছিল না বলিয়া লোকের বিশেষ অসুবিধা হইত না। আর প্রত্যেক জেলাতেই মাঝে মাঝে "গঞ্জ" ছিল। এ-সকল গঞ্জ নদীর ধারে কিম্বা বড় বড় রাজপথে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ-সকল "গঞ্জ" স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এ-সকল গঞ্জেই বিদেশের পণ্যের আমদানী হইত। আবার এখানেই স্থানীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইবার জন্য আড়তে আসিয়া জমা হইত। আমাদের গ্রামের নিকটেই হবিগঞ্জ ছিল। সেকালে সে অঞ্চলে হবিগঞ্জ একটা বড় গঞ্জ ছিল। পশ্চিম-শ্রীহট্টের পণ্য যাহা কিছু এই হবিগঞ্জ হইতেই বিদেশে যাইত। আর হবিগঞ্জেই আমরা অন্যান্য জেলার পণ্যজাত দ্রব্য কিনিতে পাইতাম। আমাদের গ্রামে কোন স্থায়ী দোকান ছিল না বলিয়া কোনই অসুবিধা হইত না।

গ্রামের লোকের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহার প্রায় সকলই গ্রামে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইত। প্রাচীনকালে কোন নূতন গ্রাম পত্তন করিবার সময়ে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। দেব-কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ, গ্রামের জমী-জমার তত্ত্বাবধান ও রাজস্বাদির হিসাব-পত্র রাখিবার জন্য কায়স্থ, চিকিৎসার জন্য বৈদ্য, ইঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য শূদ্র, ক্ষৌর-কার্য্যের জন্য নাপিত, কাপড় ধুইবার জন্য ধোপা, যজ্ঞবেদী ও প্রতিমাদি নির্ম্মাণের এবং জ্যোতিষ-গণনার জন্য আচার্য্য বা গণক, দেব-পূজা এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে বাদ্য বাজাইবার জন্য ঢুলী, গ্রামের রাস্তা-ঘাট এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য ভুঁইমালী,—সকল হিন্দুগ্রামেই এ সকল বর্ণের ও ব্যবসায়ের লোক ছিলেন। এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রাম্য-সমাজেই বহুসংখ্যক কৃষক এবং উপযুক্ত সংখ্যক তন্তুবায়ও থাকিতেন। গ্রাম-পত্তনের সময় এ-সকল বর্ণের লোকেরাই একসঙ্গে আসিয়া নূতন গ্রামে ঘর বাঁধিতেন। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গয়লা এবং কলুও দু' চারীঘর আসিতেন।

(৫)

আমাদের গ্রামে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই সকল বর্ণের

ও ব্যবসায়ের লোকই ছিলেন। গ্রামের তন্তুবায়েরা "যোগী" ছিলেন। ইঁহারা যে কাপড় বুনিতেন, তাহাকে আমাদের প্রান্তিক ভাষায় "যুগীয়ানী" কাপড় বলিত। সকল শ্রেণীর লোকেরাই বারমাস এই "যুগীয়ানী" কাপড় ব্যবহার করিতেন। "যুগীয়ানী" ধুতী হাঁটুর নীচে বড় নামিত না। গরমের দিনে প্রায় সকলেই খালি গায়ে থাকিতেন। কোথাও নিমন্ত্রণাদিতে যাইবার সময়ে একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া যাইতেন, সেও "যুগীয়ানী" চাদরই ছিল। আজিকালি চরকায় কাটা সূতা দিয়া তাঁতে বুনিয়া যে "খদ্দর" প্রস্তুত হয়, ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইহাই আমাদের দেশে সাধারণ লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। ধনী ও সৌখীন লোকেরা কখনও কখনও ঢাকাই কাপড় পোষাকীরূপে ব্যবহার করিতেন। ভদ্রমহিলারা উৎসব ও পার্ব্বনাদিতে তসর বা গরদ পরিধান করিতেন। তসর বা গরদ গ্রামে প্রস্তুত হইত না। সহর হইতেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা এ-সকল সৌখীন কাপড় কিনিতেন। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকারেরাও আসিয়া জুটিতেন, অথবা গ্রামের শূদ্রদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবার শিল্প শিখিয়া সোনার হইতেন। কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহাদিগকে সুবর্ণবণিক কহে, আমাদিগের অঞ্চলে, অন্ততঃ আমার শৈশবে, আমাদের সমাজে এই বর্ণের লোক ছিলেন না। সুবর্ণবণিকের জল চল নহে। আমাদের স্বর্ণকারদিগের জল ব্রাহ্মণাদির আচরণীয় ছিল। আমার শৈশবে আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, কেবল যোগী, ঢুলী, ধোপা এবং ভুঁইমালীদেরই জল চল ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের উচ্চ-স্তরের লোকেরা ইঁহাদের ছোঁয়া জল গ্রহণ করিতেন না, বলিয়া ইঁহারা বাস্তবিক অস্পৃশ্য ছিলেন না। ইঁহাদের ছুইলেই যে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত এমন কোন কথা ছিল না। আমি বাল্যকালে ভুঁইমালীদের কোলে মানুষ হইয়াছি, বলিতে পারি।

(৬)

যোগীরা কেন অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন বাংলার বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এ রহস্য ভেদ হইয়াছে। ইঁহাদের পদবী "নাথ"। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি একবার একদল যোগী-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের "নাথ" উপাধি ছিল। ইঁহারা "নাথ যোগী" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে "ঈশাই নাথ" নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই "নাথ-যোগীদিগের" ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথ-যোগী তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে "ঈশাই নাথের" জীবন চরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলে যিশুখ্রীষ্টের জীবন-চরিত যে ভাবে পাওয়া যায় ঈশাইনাথের জীবন চরিত মোটের উপরে তাহাই। বাইবেলে যিশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত, এই ১৮ বৎসরের যিশুর জীবনের কোন খোঁজ খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে, এই সময়ের মধ্যে যিশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই "নাথ-যোগী" সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ। সে যাহাই হউক না কেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে বাংলা দেশে যেসকল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের অধীনতা অস্বীকার করেন; তাঁহাদিগকে সমাজের ব্রাহ্মণ-নেতারা অস্পৃশ্য করিয়াছিলেন। নতুবা কুলে, শীলে, জ্ঞানে বা ধনে ইঁহারা সেকালের হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। নাথ-যোগীরা, পূর্ব্ববঙ্গের সাহারা এবং পশ্চিম বঙ্গের সুবর্ণবণিকেরা, এই ভাবেই যে হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন, এখন আর একথা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গভাষায় বৌদ্ধস্মৃতি*

শ্রীরমেশ বসু, এম-এ

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের নানারূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বৌদ্ধ রাজাদের অনুশাসন, বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগের রচিত গ্রন্থ এবং বৌদ্ধশিল্পীর নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলিই তখনকার ইতিহাসের পক্ষে প্রধান অবলম্বন। এইসব ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে আমরা তখনকার সমাজের যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহা বৌদ্ধদের নিজেদের মত। তখনকার বিদেশী বৌদ্ধভ্রমণকারীরা যে বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও বৌদ্ধদের প্রশংসাই আছে।

বৌদ্ধযুগেও বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হয় নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়,একই শহরে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল। ক্রমে সনাতনী হিন্দু ও মহাযানী বৌদ্ধ পরস্পর একটা আপোষের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধ রাজাদের সময়কার অনুশাসনে আমরা দেখিতে পাই রাজ-দরবারে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং মহাভারত শোনায় কোনো বাধা ছিল না।

যে-বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণই হয়ত প্রথম গ্রন্থ লিখিয়া ইহাকে গৌরব দান করিয়াছিলেন সেই ভাষায় তাহাদের স্মৃতি কিরূপভাবে রক্ষিত হইয়াছে তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় যে ধর্ম্ম সমাজের উপরে কোনো সময়ে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সেই প্রভাবের ছাপ সেই সময়কার ভাষার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব, পালিতে বৌদ্ধপ্রভাব ও প্রাকৃতে জৈন প্রভাব অতি পরিষ্কার ভাবেই ধরা পড়ে। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধেরা কতকগুলি আধ্যাত্মিক রূপক-মূলক গান রচনা করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি, কিন্তু তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাও এভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের স্মৃতিসূচক বাঙ্‌লা শব্দগুলি লইয়া আলোচনা করিলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ,ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৌদ্ধরা নিজেরাই ভাল অর্থে ব্যবহার করিত, এবং হিন্দুরাও ভাল অর্থেই ব্যবহার করিত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই শব্দগুলি আদিতে কোন বিদ্বেষের অর্থ বহন করিত না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের কতকগুলি এখনও ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই অর্থ-হিসাবে অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন এখন 'পাষণ্ড' বা 'ডাকিনী' বলিলে কাহাকেও সম্মান করা ত হয়ই না, বরং লোকসমাজে অপদস্থ করা হয়। তৃতীয়তঃ, হয় বৌদ্ধদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে অথবা বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগবশতঃ হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে কতকগুলি শব্দকে খারাপ অর্থে এমন কি গালি-স্বরূপে ব্যবহার করিত। শব্দগুলির পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয় বৌদ্ধ-প্রভাবের পরে নবগঠিত ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ-দিগকে সমাজে অপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে 'কুৎসিত' ভাবে চিত্রিত করিয়াছে। এইসব শব্দের সাহায্যে সেকালের বৌদ্ধদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে,কিন্তু তার মধ্যে ধার্ম্মিক বিদ্বেষের বিষও মিশান আছে। এরূপ চেষ্টা সব দেশেই দেখা যায়। যেমন ইউরোপে মধ্যযুগের খৃষ্টীয় মহাপণ্ডিত Duns Scotusএর শিষ্যগণ পরবর্ত্তী রেনেসান্স-যুগের নবীনপন্থী পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক মূর্খরূপে বিবেচিত হওয়ার ফলে তাঁহাদের গুরুর নাম Duns হইতে মূর্খ-বাচক dunce শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ,আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যকে 'দিগ্‌গজ' করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশের কতকগুলি প্রাচীন স্থানের নাম এখনও বৌদ্ধস্মৃতি বহন করিতেছে। পঞ্চমতঃ, বাঙালীর পদ্ধতি বা বংশনাম এবং ব্যক্তিগত নাম প্রাচীন ভারতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিলেও কোথাও কোথাও বৌদ্ধভাব

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী—১৩৩০) অধিবেশনের জন্য লিখিত।

জড়িত বলিয়া মনে হয়। ধর্মমত-সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া বৌদ্ধদের অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুরা উদাসীন ছিলেন, যেমন,—বৌদ্ধ শিল্প বা সাহিত্যের নিন্দা দেখা যায় না, এমন কি উল্লেখই পাইবার উপায় নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীরা বৌদ্ধদের যাহা যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নিন্দা করেন নাই, শুধু তাহাদের মত ও পথকে নিন্দা করিতেন।

বৌদ্ধদের সম্পর্কে অতি প্রাচীন কতকগুলি শব্দ বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সংস্কৃত ও পালি শব্দ আছে।

পাষণ্ড—এই শব্দটির ইতিহাস অতি বিচিত্র। ইহার আসল ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। আদিতে যে ইহার খারাপ অর্থ ছিল বা অন্য ধর্মের নিন্দার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত, তাহা মনে হয় না। অশোক-অনুশাসনের দ্বাদশ গিরিলিপিতে আমরা পাই 'আপ্তপাসংডপূজা' ও 'পরপাসংডগরহা' এবং জৈনদিগের উবাসগদসাও গ্রন্থে (পঢমং অজ্ঝয়ণং ৪৪)···পরপাসণ্ডপসংসা প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যায়; এখানে পাসণ্ড মানে ধর্ম্মাচার্য্য। নিন্দা বা প্রশংসা হিসাবে এ শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ নিজের ও পরের উভয় ধর্ম্মাচার্য্যকেই পাসংড বলা হইয়াছে। পরে এই শব্দটির অর্থের পরিবর্ত্তন ও অবনতি হইয়া শুধুই বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রযুক্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধদিগের ব্রহ্মজাল সূত্রে ৯৬ প্রকারের পাষণ্ড বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উল্লেখ আছে। ক্রমে বেদবিরুদ্ধবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই শব্দটি নানা ধর্ম্মীদের দ্বারা নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমস্ত বোঝা বৌদ্ধদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সাহিত্যে বৌদ্ধ ও মায়াবাদিদিগকে পাষণ্ড ও পাষণ্ডী বলা হইয়াছে। শীতলার উপাসকগণ (ইহারা কি পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল?) কিন্তু ফিরাইয়া বৈষ্ণবদিগকে পাষণ্ড বলিতে ছাড়ে নাই। আবার ধর্ম্মপূজার বিরোধীকে ঘনরাম পাষণ্ড বলিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা "প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন" (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-৩য় পরিচ্ছেদ) সমান ভাবেই চালাইয়াছিলেন।

ভণ্ড—কাহারও মতে এই শব্দটি পালি ভদন্ত, ভন্ত শব্দ হইতে জাত। এই ব্যুৎপত্তি ঠিক হওয়া সম্ভব নহে। 'ভণ্ড' শব্দ সংস্কৃতে বিদূষক অর্থে পাওয়া যায়; ইহা হইতে আমাদের বাঙ্গলা ভাঁড়, যেমন গোপাল ভাঁড়। 'ভণ্ড' যে প্রতারক অর্থে, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মধ্বজী অর্থে যে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে এই শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অনুরূপ শব্দ ভণ্ডু, পালিতে মিলে, অর্থ মুণ্ডিত-মস্তক; মিলিন্দপঞ্‌হে "ভণ্ডু কাসায়বাসী" শব্দ মিলে।

বিতিকিচ্ছি—অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এই শব্দ পালি বিচিকিচ্ছা শব্দ হইতে হওয়া সম্ভব। শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া সংস্কৃত বিচিকিৎসা হইতে পালি বিচিকিচ্ছা ও আধুনিক কথিত ভাষায় বিতিকিচ্ছা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। গ্রাম্য বাঙ্গলায় "চিকিৎসা" অর্থে "তিকিচ্ছে" শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন যেরূপভাবে বিতিকিচ্ছি ব্যাপার ইত্যাদি কথা ব্যবহার করি তাহার অনুরূপ কোনো কথা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। বিচিকিৎসা শব্দ সুপ্রাচীন উপনিষদেও পাওয়া যায়, কিন্তু, বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকদের তর্কের জ্বালায় অস্থির হইয়া কি হিন্দুরা এই শব্দ ব্যবহার করিত? বিচিকিৎসা অর্থে সন্দেহ বুঝায় বলিয়াই বোধ হয় সন্দেহবাদী বৌদ্ধদের সম্পর্কে এই শব্দ প্রযুক্ত হইত।

বাঙ্‌লা দেশে প্রাচীন পন্থী বৌদ্ধদের ও বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি মোটেই প্রখর নয়। এমন কি গুপ্ত সম্রাট্‌দের সময়কার বা হর্ষবর্দ্ধনের সময়কার বৌদ্ধদের কথা চীন দেশের পরিব্রাজকের বৃত্তান্তের মধ্যেই লুকাইয়াছিল। বাঙ্‌লা দেশের জনসাধারণের মনে, ভাষায় সে সময়ের কোন স্মৃতি খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। ইহার বহুদিন পরে গৌড়ের পাল রাজাদের সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্‌লা দেশে যখন প্রবল হয়, তখন হইতে প্রচলিত কতকগুলি সংস্কৃত ও অনেকগুলি বাঙ্‌লা শব্দ আলোচনা করিলে বাঙ্‌লা দেশের মধ্যযুগের বৌদ্ধদের একটি স্মৃতি-চিত্র আঁকিয়া তোলা যায়। এই চিত্রটিতে হিন্দুরা যে রং ফলাইয়াছে তাহাতে কালোর ভাগই যেন কিছু বেশী।

পণ্ডিত—সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত শব্দ দ্বারা যেযোজনা

বুদ্ধি যার, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়। এই ব্যুৎপত্তি কতদিনের ভাষাজ্ঞানীরা তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন পালি জাতক গ্রন্থে আমরা পণ্ডিত শব্দটি পাই, যেমন দসরথ-জাতকে রামকে রামপণ্ডিত বলা হইয়াছে। এখানে পণ্ডিত শব্দের বিশেষত্ব আছে—এই শব্দটি দ্বারা রামের সঙ্গে তাঁহার ভাইদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার তফাৎ দেখান হইয়াছে। এই পণ্ডিত শব্দটি হিন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট হইতে লইয়াছেন, না বৌদ্ধরা হিন্দুদের নিকট হইতে ধার করিয়াছেন তাহা এখনকার পণ্ডিতেরাই ঠিক করিবেন। বিদ্যা-হিসাবে ভট্ট ও আচার্য্য শব্দই বোধ হয় বেশী ব্যবহৃত হয়। 'পণ্ডিত' শব্দ চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলায় 'পাণ্ডিআ'' রূপে মিলে। ইহার আধুনিক রূপ বাঙ্‌লায় আর বিদ্যমান নাই, তবে বিহারীতে ও হিন্দীতে 'পাঁড়ে বা পাণ্ডে' রূপে ব্রাহ্মণ-বংশ-পরিচয় হিসাবে বিদ্যমান। 'পাঁড়ে' এখনও যে কোন নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহৃত সামান্য নাম; যেমন রেলওয়ের "পানী-পাঁড়ে", রান্নাঘরের "পাঁড়েজী"।

বাঙালীর সঙ্গে অত পুরানো 'পণ্ডিতের' সম্পর্ক নাই। আমরা ধর্ম্মের পণ্ডিত, শীতলার পণ্ডিতদের কথাই শুধু মনে রাখিয়াছি। শূন্যপুরাণের কল্যাণে আমরা কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম জানিতে পারি—যথা,রামাই পণ্ডিত, শ্বেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত ও কংসাই পণ্ডিত। এদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কোনোই সম্বন্ধ নাই, কারণ এরা হয়ত ব্রাহ্মণও ছিলেন না, সংস্কৃত হিসাবে পণ্ডিতও ছিলেন না।

দ্বার-পণ্ডিত—এখন বাঙ্‌লা দেশের জমিদার বাড়ীতে প্রধান পণ্ডিতকে দ্বার-পণ্ডিত বলা হয়। নানা দেশী পণ্ডিতেরা জমিদারদের নিকট হইতে যে বার্ষিক বিদায় পান তাহা দ্বার-পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারেই করা হয়। এইজন্য কোনো কোনো স্থলে এখনও প্রাচীনকালের মত বিচার-সভা বসে। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ আমলে এরূপ বিচার সাধারণতঃ বৌদ্ধ বিহারগুলিতেই বেশী হইত। সেইজন্য প্রাচীন দ্বার-পণ্ডিত বিহারের পণ্ডিতদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিতেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের মতে বৌদ্ধ বিহারের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যা-লয়ের দ্বারদেশে থাকিয়া যে পণ্ডিত প্রথমকার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন তাঁহাকে দ্বার-পণ্ডিত বলিত।

আমরা আরও এক ধরণের দ্বার-পণ্ডিতের কথা জানি। বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত ধর্ম্ম-পূজার স্থানে দ্বার-পণ্ডিতেরা ধর্ম্মক্ষেত্রটির দ্বার রক্ষা করিতেন। শূন্যপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি রামাই পণ্ডিত, শ্বেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত ও কংসাই পণ্ডিত তাঁহাদের শিষ্যদের লইয়া চারিদিকের চারিটি দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত—আমরা সাধারণ কথাবার্ত্তায় শ্লেষ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই পদটি ব্যবহার করি। ইহা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের নামটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া গঠিত হইয়াছে। এক সময়ে দিঙ্‌নাগা-চার্য্যের তর্কজালে অস্থির হইয়া হিন্দু নৈয়ায়িক সমাজ তাঁহাকে শ্লেষের দ্বারা অমর করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসও তাঁহার কাব্যে (মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ—১৪ শ্লোক) দিগ্‌গজ শব্দ দ্বারা ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

নেড়া, নেড়ে—এই শব্দটির কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। ইহার দুইরূপ অর্থ করা হয়। কাহারও মতে মুণ্ডিত বৌদ্ধকে নেড়া এবং স্ত্রীলোক বৌদ্ধকে নেড়ী বলিত। কাহারও মতে মহাযানী বৌদ্ধ নাড় পণ্ডিত হইতে নাড়া বা নেড়ে হইয়াছে। এই দুই অর্থ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শেষোক্তটির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, অন্ততঃ বাঙ্‌লা দেশে নাড় পণ্ডিতের কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল কি না এখনও জানা যায় নাই। প্রথম অর্থ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে,যদিও এখন আমরা মাথামুড়ানো ব্যক্তিকে নেড়া বলি বটে, কিন্তু এই অর্থে এই শব্দের প্রাচীন ব্যবহার বোধ হয় পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে নাণ্ডা-মুণ্ডা বা নেড়া-মুড়া এইরূপ শব্দ ছিল জানা যায়। ইহার মধ্যে মুণ্ডা বা মুড়া শব্দ দ্বারা মাথা মুড়ানো ব্যক্তিকে বুঝাইত। সুতরাং নেড়া বা নেড়ে শব্দের অর্থ খুব পরিষ্কার হইতেছে না।

আমার মনে হয় নেড়ে শব্দটি বৌদ্ধদের ব্যবহৃত নাড়িআ শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই নাড়িআ শব্দ বৌদ্ধ গান ও দোহায় পাওয়া যায় (পৃঃ ১৯)। এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় এই শব্দের অর্থ দেওয়া আছে অসম্প্রদায়যোগী।

বৌদ্ধ সমাজের বহির্ভূত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে নাড়িআ বা নেড়ে বলা হইয়াছে। এই হিসাবে সংস্কৃত পাষণ্ড শব্দের সঙ্গে ইহার মিল আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেদধর্ম্ম-ত্যাগী হওয়ায় ও মস্তক মুণ্ডন করার জন্য সনাতনী হিন্দু-দিগের নিকট নাড়া-মুণ্ডা বা পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত নাইড়্যা-মুইড়্যা আখ্যা পাইয়াছিল।

চৈতন্যভাগবতে আমরা পাই, চৈতন্যদেব নিজে অদ্বৈত আচার্য্যকে বার বার নাঢ়া বলিয়াছিলেন। এইসব স্থলে মুণ্ডিত অর্থ করিলে কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য্য নাড়িয়ান গাঞিভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নাঢ়া বলা হইয়াছিল। তাহাও বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না—কারণ এ শব্দটির মধ্যে একটু শ্লেষ আছে। আমার মনে হয় চৈতন্যদেবের এই কথা বলার গূঢ় একটি অর্থ ছিল। বাঙলার বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি অদ্বৈত আচার্য্য দুইবার জ্ঞানবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ও প্রেমবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জ্ঞানবাদী অদ্বৈত আচার্য্যকে নাঢ়া বা ভিন্ন সম্প্রদায়ী মনে করিলে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু অল্পপ্রাণ ড়-যুক্ত 'নাড়িয়া, নাড়্যা, নাড়া, শব্দ ও মহাপ্রাণ 'ঢ়' যুক্ত 'নাঢ়া' শব্দ যে একই, সে সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আপত্তি তুলা যায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমানগণ যেরূপ হিন্দুদিগকে কাফের বলেন, হিন্দুগণও বোধ হয় সেইরূপ মুসলমানদিগকে নেড়ে (অর্থাৎ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী) বলেন। তাহা না হইলে মুসলমানদিগকে শুধু শুধু নেড়ে বলিবার কোনো সার্থকতা থাকে না।

বাউল—এই শব্দটির বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। কেহ কেহ ইহা বাতুল (অর্থাৎ বায়ুগ্রস্ত) শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। তাহাতে গোড়াতেই শব্দটি সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা জন্মে। প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু সাধু বুঝাইতে বেশ ভাল ভাবেতেই বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ১৪শ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবকে মহাবাউলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে বাউল শব্দ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গানে রাণীময়নামতী তাঁহার গুরু হাড়িপাকে প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।" এখানেও নিন্দার অবসর নাই। এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। বায়ুগ্রস্ত বা পাগল অর্থে যে বাউল শব্দ পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহা সাধুবাচক বাউল শব্দ হইতে ভিন্ন কি না আলোচনা হওয়া দরকার। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে আছে—"বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল।" এখানে প্রথমটি চৈতন্যকে বুঝাইতে ভাল অর্থে ও অপরটি বোধ হয় পাগল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখনও আমরা যাহাদিগকে বাউল বলি তাহারা বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি মত ও ধরণধারণ বজায় রাখিয়াছে। এবিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করিতেছি।

ভাবক—আমরা সাধারণতঃ ভাবুক শব্দটির সঙ্গেই পরিচিত, তাই ভাবক শব্দটি নূতন ঠেকিতে পারে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদের মধ্যে ইংরেজিতে mystic বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। অতীন্দ্রিয় গভীর ব্যাপার, শুধু বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাহা জীবনে উপলব্ধি বা উপভোগ করাই অর্থাৎ জ্ঞানকে রসে পরিণত করাই ভাবকের কাজ। বৌদ্ধগানের টীকায় (পৃঃ ৯) আমরা পাই—"ভাবক-স্যাবিরতাভিযোগঃ," ও "মহাসুখলম্পটোহং ভাবকঃ"। দুইটি বৌদ্ধ পদ গানে ভাবকতার পরিচয় খুবই পাওয়া যায়—

> এবংকার বীঅলই কুসুমিঅ অরবিন্দ
> হো মহুঅররূপং সুরঅবীর জিংঘই মঅরন্দ। (কৃষ্ণাচার্য্য)
> জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
> তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ (গুণ্ডরীপাদ)

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায় যে, চৈতন্যের পূর্ব্বেও বাঙ্‌লা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবতার মধ্যে ভাবকতা ছিল না। সেইজন্য চৈতন্যদেবকে বার বার ভাবক বলা হইয়াছে। অবৈষ্ণবেরা কিন্তু এই শব্দটি খুব ভাল অর্থে ব্যবহার করিত না। বৈষ্ণবদের জাগরসময় নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি তখনকার সামাজিকেরা ঠিক বুঝিতে

না পারিয়া নিন্দা করিত। চৈতন্যভাগবতে আছে—

ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥ আদি ৯ অধ্যায়।

সংকীর্ত্তন—আমরা বহুদিন হইতে বৈষ্ণবদের সংকীর্ত্তন শুনিতেই অভ্যস্ত। বৈষ্ণবদের নিজেদেরও ধারণা ছিল যে, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। বৌদ্ধেরা যে সংকীর্ত্তন করিতেন তাহা তাঁহাদের রচিত পদ গান ও তাহার সুরের নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তবে বৌদ্ধরা সংকীর্ত্তন না বলিয়া সঙ্গায়ন বলিয়াছেন। বৌদ্ধ গান ও দোহায় (পৃঃ ৩১) আছে "গীতিকয়া সঙ্গায়নমঙ্গলং কুর্ব্বন্তি।" ইহা হইতে আমরা আরও অনুমান করিতে পারি যে, বাঙলার বিশেষত্বসূচক মঙ্গল গানগুলির অনুরূপ সাহিত্যিক অনুষ্ঠান বৌদ্ধরাও করিতেন।

ডাকিনী ও যোগিনী—ইহাদের নাম শুনিয়াই এখন আমরা ভয় পাই, কিন্তু আসলে ইহারা বজ্রযানের অন্তর্গত উপাসিকা বা আচার্য্যা। সুতরাং ইহারা যে মানুষ সে-বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের অনেকেই সেকালের হিসাবে ধার্ম্মিকা বা পণ্ডিতা বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধ সমাজের অধঃপতনের পর হিন্দুরা ইহাদিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখিত না, সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে ডাকিনীরা ডাইন ও যোগিনীরা অযাত্রিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলজনক। ইহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।*

ছিনাল—এখন এই শব্দটি যেরূপ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় পূর্ব্বে সেরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বজ্রযানের যে সকল যোগিনী বা উপাসিকা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত ও ভিক্ষা করিত তাহাদের একটি শারীরিক চিহ্ন ছিল নাক কাটিয়া ফেলা। এই ব্যাপার হইতে নানা কথার ও প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে (পৃঃ ৩২, ৩৩) আমরা ছিণালী শব্দ পাই, টীকায় উহার অর্থ আছে—"ছিন্ননাসিকা নাগরিকা।" এই অর্থ হইতে আমরা বুঝি যোগিনীরা শুধু উপাসিকা ছিল না, তাহাদের মধ্যে নাগরালিও প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্যই হয়ত এই শব্দটি খারাপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। অন্যত্রও এই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে (গণেশখণ্ড, ৩৪।১৪) আছে ছিন্ননাসিকা। বীমস্ সাহেব ছিনাল শব্দের অর্থ করিয়াছেন ক্ষীণালয়, কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনই প্রমাণ নাই। যোগিনীরা নাক কাটিয়া ফেলিত বলিয়া হিন্দুর নিকট অযাত্রিক হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" এই বাঙলা প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়।

গতি—গতি শব্দের সাধারণ অর্থ আমরা সবাই জানি, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে শিষ্য বা উপাসক অর্থে এই শব্দটি পাওয়া যায়। এই শব্দটি ঠিক ইংরেজি following শব্দের সঙ্গে মেলে। বাঙলার বৌদ্ধ শূন্যপন্থীরাই এই শব্দটিকে চালাইয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে আমরা পাই পূর্ব্বোক্ত চারজন ধর্ম্ম পণ্ডিতের কাহারও চার শ, কাহারও আট শ, কাহারও বার শ ও কাহারও ষোল শ গতি বা শিষ্য ছিল। চণ্ডীদাস তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিজেকে বার বার বাসলী গতি বা বাসলীর উপাসক বলিয়াছেন।

সহজ মত—সহজিয়া মত যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজযান হইতে আসিয়াছে তাহা এখন প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত।

বৌদ্ধ দেব-দেবী—এখনকার বাঙালী প্রধানতঃ শাক্ত বা বৈষ্ণব। সুতরাং যেসব হিন্দু দেব-দেবী বর্ত্তমানে বাঙালীর পূজা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারাই প্রথম সারিতে অবস্থিত থাকায় বৌদ্ধ দেব-দেবীদের খুঁজিয়া পাওয়াই মুস্কিল হয়। কিন্তু বাঙলার জন-সাধারণ এখনও কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ রীতিনীতি ও দেব-দেবীকে বজায় রাখিয়াছে।

বাঙলার বৌদ্ধ দেব-দেবীর ইতিহাসের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের নিজের কথা সাধারণ বাঙালীর মনেই নাই বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি কোথাও শিব, কোথাও চিন্তামণি ঠাকুর প্রভৃতি নামে পূজিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। তারপর, কোনো কালে বাঙালী বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকিলেও

* এই আলোচনার ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে তাহাদেরও কোনো স্মৃতি-চিহ্ন দুই-একটি প্রাচীন মূর্ত্তিতে বা গ্রন্থে ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। প্রজ্ঞাপারমিতা, লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, আর্য্যতারা, অবলোকিতেশ্বর, অক্ষোভ্য প্রভৃতির কথা মনে করাইলেও বাঙালীর এখন আর চিত্তবিক্ষেপ হইবে না। বাঙলার পল্লীগ্রামে যেখানে এইসব মূর্ত্তির কোনোটি পূজিত হয় সেখানেই লোকে ইহাঁদিগকে বিষ্ণুর বা শিবের কোনো রূপবিশেষ বলিয়া মনে করে।

পাল রাজাদের সময় হইতে প্রবল বৌদ্ধতান্ত্রিকতা আরম্ভ হয়। সেই সময়কার দেব-দেবীদিগকে আমরা এখন হয় মূর্ত্তিতে না হয় গ্রন্থেই সাক্ষাৎ পাই। মারীচি, হেরুক, হেবজ্র, বাগীশ্বরী, বজ্রযোগিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি এক সময়ে পূজা আদায় করিয়া ছায়াবাজির ন্যায় বাঙালীর মনের পর্দ্দা হইতে সরিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগকেও এখন আর বাঙালী চিনিতে পারে না, আর হিন্দু দেব-দেবীর ধ্যানে ইহাঁদের মূর্ত্তির পূজা হয়।

বর্ত্তমানে বাঙালী জন-সাধারণ না জানিয়া যে-সব বৌদ্ধভাবাপন্ন দেব-দেবীর পূজা করে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরাই প্রধান—

ধর্ম্মঠাকুর ও আদ্যা
নিত্যা ও বাশুলী
জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রা
মঙ্গলচণ্ডী
শীতলা
ক্ষেত্রপাল

এইসব দেব-দেবীর পূজার মধ্যে অনেকটা রহস্য আছে। ইহাদের মধ্যে লৌকিক, বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাব মিশিয়া একটি নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই ইহারা হিন্দু সমাজে টিকিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিতেরা ধর্ম্মঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি অনুসারে যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয় তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন বটে, কিন্তু লাউসেনের পদ্ধতি মোটেই বৌদ্ধ নয়, উহা সূর্য্যের পূজা। ইহা আমি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। বাশুলী বা বাসলী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বাগীশ্বরী হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন মনে হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সম্বন্ধ ত এখনকার দিনে খুবই জানা কথা। বাঙলার মঙ্গলচণ্ডীতে লৌকিক ও বৌদ্ধ-প্রভাব খুবই আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই, ব্যাধের পূজায় ও খুল্লনার পূজায় এই দুইটি সুরই আলাদাভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শীতলাতেও বৌদ্ধ হারীতির সংস্রব আছে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের রক্ষকরূপে ক্ষেত্রপালের পূজা এখনও চলিতেছে।

মা গোঁসাই—বাঙলাতে মা গোঁসাই শব্দটি চলিত আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি অনুসন্ধান করা দরকার। বাঙলা দেশে শ্রীধর্ম্মভট্টারক বা ধর্ম্মঠাকুর পুরুষরূপে কল্পিত, তাঁহার আবার শক্তিও আছে।

কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্মকেও পরবর্ত্তী কালে পূজা করা হইত। এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ স্ত্রীরূপেই পূজিত হন এবং তাঁহার স্ত্রী-মূর্ত্তিই দেখা যায়। বাঙলা দেশেও এ ধারণা একেবারে লোপ পায় নাই—তাহা আমরা রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধান (পৃঃ ২১২, ২১৩) হইতে জানিতে পারি। শ্রীধর্ম্মের বাহন উলুক তাহার গোঁসাঞির কাছে জিজ্ঞাসা করিল—

ঘরে ঘরে পূজে কে পূজা লেই ?
কে বলায় জগতের মাই ?

ইহার উত্তরে স্বয়ং ধর্ম্ম বলিলেন—

ঘরে ঘরে পূজি আমি পূজা লি।
আমি বলাই জগতের মাই।

এখানে স্পষ্টতঃই ধর্ম্মগোসাঞি নিজেকে মা গোঁসাই বলিতেছেন। তারপর আবার ঐ গ্রন্থেই (পৃঃ ১৩৪) পাওয়া যায়—

শ্রী মাঞি গোসাঞের পুষ্পং জয়।

সুতরাং এই শব্দটি প্রাচীন বৌদ্ধস্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। অথচ এখন ইহা শ্লেষযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। আমরা খড়দার মা গোঁসাইএর কথা শুনি। ইহার ভিতরকার ব্যাপার কেহ জানাইলে একটি অতীতকালের রহস্যের মূল জানা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ব্রত ও উৎসব—বৌদ্ধ ব্রতের মধ্যে বর্ষাবাসের জন্য যে চাতুর্ম্মাস্য যাপনের বিধান ছিল তাহা পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। চৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য-১ম পরিচ্ছেদ) আছে---

তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
* * *
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব-সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে॥

এখন আমরা রথযাত্রা উৎসবটিকে বিষ্ণুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীনকালে এ উৎসব বৌদ্ধদেরই ছিল। চীনদেশী পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধদিগকেই এই উৎসব করিতে দেখিয়াছিলেন। একটুকু লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে-সব স্থানে পূর্ব্বে বৌদ্ধ-প্রাধান্য ছিল এখনও সেইসব স্থানেই রথযাত্রার খুব প্রাবল্য আছে---যথা পুরীর রথ, ধামরাইএর রথ। আসলে রথযাত্রাটি একটি দেহতত্ত্বমূলক রূপক ; মানুষের দেহকেই রথ হিসাবে কল্পনা করা হয়, আবার রথকে মানুষের দেহরূপে ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা হইতে চলিত কথায় শরীরকে রথ বলা হয়।

গাজন উৎসবটি বৌদ্ধ-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। গাজন বলিতে পূর্ব্বে ঠিক কি বুঝাইত এখন তাহা ঠিক ধরা যায় না। ধর্ম্মের গাজন বোধ হয় রামাই পণ্ডিত প্রবর্ত্তিত করেন। নরসিংহ বসুর ধর্ম্মরাজের গীতে আছে "আদ্যের পণ্ডিত তুমি কর্যাছ গাজন।"

গম্ভীরা—এই গম্ভীরা শব্দটি কোথা হইতে আসিল তাহা মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা" লেখক ঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। গম্ভীরা একটি উৎসবের নাম হইলেও আসলে ইহা গোপনীয় পূজাস্থানকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। যেমন—"গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।" যাহারা বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ রশ্মিটুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাই এই শব্দটি ব্যবহার করিত। পরে তাহাদের নিকট হইতে বৈষ্ণবেরা ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা গোপনীয় ভজন-স্থান হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন, যেমন গৌরাঙ্গ গম্ভীরা। চৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য-১০ম পরি) আছে—

গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।

গোফা—গুহা শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত। পালি ও প্রাকৃততে ইহার বহু বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অশোকের অনুশাসনে আছে কুভা। তার পর পাওয়া যায় গুম্ফা, যেমন হাতী গুম্ফা। তার পর প্রাচীন বাঙ্‌লায় গোফা হইয়াছে। বৌদ্ধরা বহুকাল পূর্ব্বে পাহাড় পর্ব্বত কাটিয়া যে মন্দির করিতেন, তাহাই গুহা নামে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণবেরা নির্জ্জনে সাধনের জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন তাহাকে গোফা বলা হইত। চৈতন্য ভাগবতে (আদি—১১ অঃ)—আছে

গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য—৩য় পরি) পাওয়া যায়—

গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল।

এই শব্দটিই আবার মুখের কথায় ঘোপা হইয়া গিয়াছে।

স্থানের নাম—বাঙ্‌লা দেশের বহু প্রাচীন স্থানের নামের মধ্যেও বৌদ্ধ-স্মৃতি লুকাইয়া আছে মনে হয়। বঙ্গের বহু জেলাতেই "যুগীর ঘোপা" নামে পরিচিত অনেক-গুলি জায়গা আছে বলিয়া জানা যায়, যেমন—টাঙ্গাইলে, দিনাজপুরে, মেদিনীপুরে। এসব জায়গা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবর হয় নাই। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদের আড্ডা ছিল, না নাথপন্থীদের আস্তানা ছিল তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। অনেকে অনুমান করেন, ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর নাম অনুসারে স্থাপিত হইয়াছিল, বাজাসন বজ্রাসন শব্দ হইতে আসিয়াছে, এবং ধামরাই ধর্ম্মরাজিকা শব্দ হইতে উদ্ভূত। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের ফলে এবং মুসলমান আমলে বাঙ্‌লা দেশের বহু সমৃদ্ধ ও প্রাচীন স্থানের নাম বদ্‌লান হইয়াছিল, সুতরাং অনেক জায়গার প্রাচীন নাম এখন আর জানিবার উপায় নাই।

লোকের নাম—মানুষের নামটি শুনিয়াই অনেক সময়ে আমরা লোকের ধর্ম্ম কি তাহা ঠিক করিতে পারি। বিশেষতঃ প্রাচীন কালের লোকেরা সব দেশেই ধর্ম্মমূলক নাম রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এখন যেমন সভ্যভূষণ,

প্রিয়নাথ প্রভৃতি নাম দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। কালীচরণ, হরিচরণ, শিব-চরণ প্রভৃতি ও কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা ইত্যাদি নাম দ্বারা লোকটি শাক্ত না শৈব বা বৈষ্ণব তাহা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হইত না। বৌদ্ধ আমলের মধ্যযুগের কতকগুলি নাম দেখিলেই লোকটি যে বৌদ্ধ ছিল তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। ডাক্তার কর্দ্দিয়ের তালিকা হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ লেখকের নাম সংগ্রহ করা গেল—কুলদত্ত, কুলেন্দ্র, গয়াধর, চৌরঙ্গিন, জালন্ধরি, ত্রিরত্নদাস, দানশীল, দীপঙ্কর, ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি, পদ্মপাণি, বুদ্ধগুপ্ত, বুদ্ধদত্ত, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, রাহুলভদ্র, বজ্রগুপ্ত, বিনয়চন্দ্র, বিনয়দত্ত, শাক্যশ্রী, শীলেন্দ্র, সঙ্ঘদত্ত, সমন্তভদ্র, সহজ-বিলাস, প্রভৃতি। প্রাচীন লিপির সঙ্কেশ গুপ্ত নামটি শুধু বৌদ্ধেরই নাম হইতে পারে মনে করিলে দোষের হয় না।

এখন আমরা বিনয়চন্দ্র নাম দেখিলে বৌদ্ধসংস্রব মনে আনিতে পারি না, কিন্তু আসলে নামটিতে বৌদ্ধস্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। কুলেন্দ্র নামটিও আমি শুনিয়াছি। গয়াধর নামটি চলিত আছে। তারপর এখন লোকনাথ নামটিতে বৌদ্ধগন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু ইহাতে যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; ডাক্তার কর্দ্দিয়ের তালিকায় একজন লেখকের নাম অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ ছিল। এখন আমরা বোধিসত্ত্বের কথা ভুলিয়া গেলেও তাঁহার নামটি বেশ ব্যবহার করিতেছি। এখনও কুলচন্দ্র, কুলচরণ নাম বজ্রকুলের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এখানে স্বীকার করা দরকার যে, কৌলদের নামও এরূপ হইতে পারে। তারানাথ, তারাচরণ, প্রভৃতি বজ্রতারা বা আর্য্যতারার সঙ্গে সম্পর্কিত কি না ভাবিয়া দেখা দরকার। এখানে একটি নাম লইয়া একটু বিশেষ আলোচনা করিলে দোষের হইবে না। উহা ঘনরাম। আমরা সবাই ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর নাম জানি। অথচ ঘনরাম নামটির অর্থ কিছু আছে কি না অনেকেই ভাবিয়া দেখি নাই। এই সম্পর্কে বৌদ্ধদিগের প্রাচীন শ্রীঘন বুদ্ধের নাম করা যাইতে পারে। আমরা রামচরিতে বুদ্ধের একটি নাম পাই শ্রীঘন। বৌদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত সদ্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তি-শতকে (শ্লোক নং ২২) পাওয়া যায় "শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ।" রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতিতে পাই—"তুমি দীননাথ ঘন।" বুদ্ধের এই নামটি হইতেই ঘনরাম শব্দটি সৃষ্ট হইয়াছে। এই-সব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঘনরাম নামটি বৌদ্ধ প্রভাব বহন করিতেছে।

বাঙালীর উপনাম—বৌদ্ধ আমলে লোকের নিজের নামটি মাত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাদের পদ্ধতি বা বংশ-নাম কিছু ছিল কি না জানা যায় না। যাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতিভুক্ত ছিল তাহারা বৌদ্ধ হইলে তাহাদের মধ্যে তফাৎ বুঝাইবার বোধ হয় উপায় ছিল না। বৌদ্ধদিগের নামগুলির মধ্যে কোনোটি শান্তি, কোনোটি শক্তি, কোনোটি মৈত্রী, কোনোটি চারিত্র্য, কোনোটি মাঙ্গল্যবাচক ছিল। এইসব ভাব প্রকাশ কবিবার জন্য অন্যান্য শব্দের মধ্যে ধর, কর, ঘোষ, দাস, গুপ্ত, মিত্র, ভদ্র, সেন, শীল, পাল, রক্ষিত প্রভৃতি নামের অংশরূপে ব্যবহৃত হইত। তখন কিন্তু এসব শব্দ দেখিয়া কাহারও জাতি নির্ণয় করা যাইত না। কারণ নামগুলি গুণবাচক ছিল এবং উহাতে বংশপরিচয় ছিল না। পরে দেশে পুনরায় হিন্দু প্রভাবের সময়ে একটি মাত্র নাম দ্বারা জাতি বুঝান যায় না বলিয়া আলাদা উপনাম বা বংশনাম দরকার হইয়া পড়ে। অথচ বহুদিন পরে কাহারও আর পূর্ব্বের জাতির কথা মনে ছিল না। তখন বৌদ্ধ অবস্থার নামের পূর্ব্বলিখিত অংশগুলিই আলাদা করিয়া লইয়া নূতন করিয়া বংশনামের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা তাহা খোঁজ করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে অবশ্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গুপ্ত, সেন, রক্ষিত প্রভৃতি শব্দগুলি সামরিক উপাধি হিসাবেও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে সে-হিসাবে এগুলির প্রয়োজন ছিল না। তাহারা ধর্ম্মার্থেই এগুলির প্রয়োগ করিত। ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু সমাজে বৌদ্ধগণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলে ব্রাহ্মণের সপক্ষতা বা বিপক্ষতা অনুসারে সমাজে উচ্চ বা নীচ স্থান পাইয়াছিল এবং তদনুযায়ী তাহাদের পদ্ধতিরও স্থান গণ্য করা হইত।

যে-সব প্রাচীন শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতেও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ে আমরা বাজুল শব্দটি পাই। ইহা বজ্রকুল হইতে উদ্ভূত। বজ্রকুল—বজ্জউল—বাজুল। এই গ্রন্থেই আবার বাজিল নাচের কথা পাওয়া যায়—উহা বজ্রধরদিগের নৃত্যকে বুঝাইত। এইরূপে ধর্ম্ম-পূজার ব্যাপারে বারমতি ও আমিনী প্রভৃতি শব্দ লুপ্ত হইয়া গেলেও বৌদ্ধস্মৃতির সঙ্গে ইহাদেরও সম্পর্ক আছে।

এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে যে-সব শব্দে বৌদ্ধদিগের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে অতি সাধারণ গোছের আলোচনা করা গেল। ইহাতে কোন কোন জায়গায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সঙ্গে মিল নাই দেখা যাইবে। আশা করি, পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা করিয়া বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন। এইরূপ আলোচনা হইলে আমরা যে শুধু বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটা দিক পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পারিব তাহা নহে, প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজের ভিতরকার কথাও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

রাজপুতনার দরবারী আমোদ

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তখন দেশীয় রাজাদের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার, বিলাত যাইবার ও বিলাতী খেলা-ধূলার ঝোঁক এবং বিলাতী আমোদ-প্রমোদের চলন হয় নাই। বীর-জাতির তখনকার আমোদ-আহ্লাদ রঙ্গ-তামাসার মধ্যে জাতীয় চরিত্রের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সেকালে রাজপুতনার রাজাদের আপন আপন রাজ্য রক্ষার জন্য প্রায়ই ব্যস্ত ও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। প্রবল শক্তির সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া, রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব-ভার অভিভাবকের ছায়াতলে হাল্কা করিয়া, নিশ্চিন্তভাবে বিলাসভোগ রাজাদের ভাগ্যে কম ঘটিত এবং বরাহ ব্যাঘ্রাদি শিকার ও শারীরিক শক্তিসাধ্য পুরুষোচিত ক্রীড়া-কৌতুকের তুলনায় বিলাসীর অলস আমোদ-প্রমোদ কিছু কমই ছিল। তখন রাজারা দরবারস্থলেই সর্দ্দারগণের সহিত নানা নির্দ্দোষ আমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন। সর্দ্দারগণও তাঁহাদের চিত্তবিনোদন জন্য নূতন নূতন রঙ্গ-কৌতুকের অবতারণা করিতেন। সেই সময়কার দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

ভরতপুরের রাজা একবার তাঁহার এক সর্দ্দারকে নাকাল করিয়া কৌতুক করিবার ইচ্ছায় একখানি অতি জরুরী "গোপনীয়" পত্রসহ কোনো-এক স্থানে পাঠাইয়া দেন। সর্দ্দার বাহাদুর রাজদত্ত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করেন। মাহুত পূর্ব্ব হইতে উপদিষ্ট ছিল। সর্দ্দার যে রাজ্যের গোপনীয় কার্য্যে যোগদান করিবার উপযুক্ত বলিয়া রাজার বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন, এই সম্মানে গর্ব্বিত চিত্তেই দরবার-স্থল ত্যাগ করিলেন। অন্যান্য সর্দ্দারের তজ্জন্য যে একটু ঈর্ষার ভাব জন্মে নাই তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, দরবার-স্থলে এক্ষণে আলোচনা চলিতে লাগিল। রাজার বিশ্বাসপাত্র জানিয়া অন্নদাতার সন্তোষ উৎপাদ-নার্থ কেহ উক্ত সর্দ্দারের সাহসের প্রশংসা, কেহ কার্য্য হাসিল করিয়া আসিবার ক্ষমতার, কেহ বা তাঁহার শৌর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের প্রশংসা করিলেন। এইরূপ নানা কথা হইতেছে, এমন সময় লোক আসিয়া সংবাদ দিল, অমুক সর্দ্দারকে গাছের ডালে "লট্‌কাইয়া" রাখিয়া ফিলবান্ পলায়ন করিয়াছে। সর্দ্দার 'অন্নদাতার' (১) নাম

(১) অন্নদাতার। রাজপুতানায় রাজাকে অন্নদাতা বলিবার প্র থা আছে।

করিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছেন। এই কথা শুনিতেই সকলে হাসিলেন।

রাজা বিস্ময় ও ফিল্‌বানের উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সর্দ্দারকে বৃক্ষ-শাখা হইতে নামাইয়া আনিবার জন্য অন্যান্য সর্দ্দারকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, সর্দ্দার এক নির্জ্জন পথের পার্শ্বে এক বৃহৎ অশ্বথ-গাছের অতি উচ্চ ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছেন এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছেন। হস্তী বা মাহুত তথায় নাই। নানা আড়ম্বর এবং উচ্চ হাস্য-পরিহাস-কোলাহলের মধ্যে সর্দ্দারকে নামান হইল। কষ্টে, লজ্জায়, অপমানে ও ভয়ে তাঁহার তালু তখন শুকাইয়া উঠিয়াছে; হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহাকে সুস্থ করিয়া যত্নসহকারে রাজসমীপে আনা হইল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা অতি বিনীত ও করুণ স্বরে বিবৃত করিলেন। সর্দ্দার যে শাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিতেছিলেন তাহার উপরের শাখায় একখানি রেশমী চাদর কিরূপে আটকাইয়া ছিল। ফিল্‌বান্ তাহা লইবার বহু চেষ্টা করিয়া যখন পারিল না, তখন তাহার বিশেষ অনুনয়ে সর্দ্দার তাহা পাড়িয়া উপর হইতে ফেলিয়া দেন। কিন্তু চাদর হস্তগত হইতেই ফিল্‌বান্ অতি বেগে হাতী চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পত্রখানি হাওদাতেই রহিয়া গেল এবং সেই কারণে সর্দ্দার যে অন্নদাতার আদেশ পালনে অক্ষম হইয়া গাছের ডালে "লট্‌কাইয়া" রহিলেন তজ্জন্য ফিল্‌বানের আচরণের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করিলেন। সাহসী কর্ম্মঠ সর্দ্দারের এই করুণকাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলে রাজসভা হাস্য-মুখরিত করিয়া তুলিলেন। মাহুতের তলব হইল। সর্দ্দার বৃক্ষারোহণ করিতে হাতী একটু চমকিত হইয়াছিল, এবং চাদরখানি বৃক্ষশাখা হইতে হাতীর মাথার উপর পড়িয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া ফেলায়, ক্ষেপিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয়, পরে বহুকষ্টে ও কৌশলে তাহাকে ফিল্‌খানায় বদ্ধ করা হয়—এই অজুহাতে ফিলবান্ নিষ্কৃতি পাইল। হাতী দৌড়াইবার সময় "জরুরী" পত্রখানি যে কোথায় উড়িয়া বা পড়িয়া গেল আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য পত্রখানি সাদা কাগজের তাড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই গোপনায় পত্র-প্রসঙ্গে কিছুদিন উক্ত সর্দ্দারকে লইয়া দর্‌বারে বেশ কৌতুক চলিল।

একবার আলওয়ারের রাজা তাঁহার অসমসাহসী ব্যাঘ্র-শিকারকুশল ও বীরত্বগর্ব্বী জনৈক সর্দ্দারকে সর্ব্ব-সমক্ষে ভীরু প্রতিপন্ন করিয়া কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘকে দন্ত ও নখরশূন্য করাইয়া এক বদ্ধদ্বার পাল্কীতে রাখিয়া দেন। পরে পাল্কী মূল্যবান ঝালর দেওয়া বস্ত্রে ঢাকিয়া দর্‌বার-স্থলের একান্তে রাখা হয়। একে একে সভাষদ্‌গণ আসিয়া দর্‌বার পূর্ণ করিলে যথাসময়ে রাজা সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। রাজার মুখ ভয়ানক গম্ভীর। সভা নিস্তব্ধ। কেহ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহস করিতেছেন না, এমন সময় মহারাজ বজ্রগম্ভীরস্বরে নির্দ্দিষ্ট সর্দ্দারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর সাহেব ইয়ে কেয়া বাত হায়? আপকে জানানামেসে (২) মেরে পাস শিকায়েৎ (৩) করানকো আঁই হাঁয় ?"

ঠাকুর সাহেব অতি বিনীত ভাবে ও যুক্তকরে উত্তর করিলেন—"হুজুর মুঝে তো মালুম নহী!"

রাজা বলিলেন—"নহী ম্যাঁয় সাচ্ কহতা হুঁ। দেখো পিঞ্জস্‌কে (৪) অন্দর ঠুকরাণী (৫) সাহেব বৈঠী হাঁয়, উন্‌কো তস্‌ফিয়া (৬) করনে কে লিয়ে ইহাঁ পর্ বৈঠ্‌লা রখ্‌খা হুঁ। যাও যা'কে পুছো কেঁউ তুম্ পর্ নারাজ হাঁয়?"

সর্দ্দার সাহেব তখন লজ্জাবনত মস্তকে পাল্কীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠুকরাণী সাহেব, আপ্ কেঁউ বিহুন (৭) মেরে ইজাজৎকে (৮) ইহাঁ চলি আঁই, ঔর আন্‌দাতাকে দর্‌বারমে আকর্ চরণোমে শিকায়েৎ কী?"

যখন ঠাকুরাণী সাহেবার কোনই উত্তর পাওয়া গেল না,

২। অন্তঃপুর হইতে।
৩। নালিশ।
৪। পাল্কী।
৫। ঠাকুরাণী (ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দারপত্নী)।
৬। বিচার ও নিষ্পত্তি, রফা।
৭। বিনা, ব্যতীত।
৮। অনুমতি।

তখন সর্দ্দার চাপা ক্রোধ অভিমানে এবং ক্ষোভ হৃদয়ে রাখিয়া বিশেষ অনুনয়ের সহিত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রাজা সর্দ্দারকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর সাহেব, ভিতর যা কর্ পুঁছিয়ে, ভালা ঠুকরাণী সাহেব সব্‌কে সাম্‌নে ক্যায়াসে বাত করেঙ্গী?"

এই কথায় ঠাকুরসাহেব পাল্কীর পর্দ্দার মধ্যে যাইয়া দরজা খুলিয়া যেই মাত্র ভিতরে গিয়াছেন,অমনি চিতাবাঘ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ এইরূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্দ্দারসাহেব ভয়ে অভিভূত হইয়া অস্ফুট কাতরধ্বনি করিয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বীরত্বগর্ব্বী সাহসী সর্দ্দারকে ভয়বিহ্বল-চক্ষু ও কম্পিত কলেবরে পাল্কীর ভিতর হইতে পলাইয়া আসিতে দেখিয়া রাজা উচ্চহাস্য করিলেন। সভাসদ্‌গণ অট্টহাস্যে গগন বিদীর্ণ করিলেন।

শিশুর খাদ্য

শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সেন, এম্-বি

আমাদের দেশে আজকাল শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর যে-সমস্ত ব্যাধি শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তাহার অধিকাংশ প্রায় শিশুর খাদ্যের বিশুদ্ধতার অভাবে, এবং কোন্ সময়ে কি পরিমাণে শিশুর খাদ্য প্রয়োজন, সে-বিষয়ে অধিকাংশ শিশুর জননীদিগের অজ্ঞতার জন্য হয়। অতএব আমরা যদি শিশুর খাদ্যনির্ণয়-বিষয়ে সতর্ক ও যত্নবান হই, তাহা হইলে বহু-সংখ্যক শিশু অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং বহু শিশুরোগ নিবারণ হয়। নিম্নে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আশা করি, তাহা শিশুর খাদ্য নির্ণয় সম্বন্ধে সুধী পাঠক-পাঠিকাগণকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

সাধারণতঃ শিশুর অবস্থানুযায়ী শিশুদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা, দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। দুগ্ধ ও অন্ন নির্দ্দোষ হইলে শিশু সুস্থ থাকে এবং দূষিত দুগ্ধ ও অন্ন সেবন করিলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়, এবিষয় লেখাই বাহুল্য। মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রধান আহার, আর এই মাতৃদুগ্ধ সেবনোপযোগী কি না এ বিষয় কিয়ৎপরিমাণে সকল গৃহস্থের জ্ঞান থাকা উচিত। নারীদুগ্ধ জলের সহিত মিলিত করিলে যদি সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত হয় এবং সেবন করিতে সুস্বাদু ও দুর্গন্ধ-রহিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সে দুগ্ধ বিশুদ্ধ। যে দুগ্ধ জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশ্রিত না হইয়া, জলের উপরে কিয়ৎপরিমাণে ভাসিতে থাকে, সেদুগ্ধ কিঞ্চিৎ কষায়রসবিশিষ্ট, ফেনাযুক্ত ও মলমূত্র-রোধক। মাতার বাত, হিষ্টিরিয়া (মূর্চ্ছা), হৃদরোগ, হাঁপানী প্রভৃতি বায়ুজনিত রোগ থাকিলে দুগ্ধে এইসকল দোষ দেখা যাইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ কিয়ৎপরিমাণে অম্ল ও কটুরস হইলে তাহা পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত জানিবেন। এই দুগ্ধ জলে দিলে কখন কখন ঈষৎ পীতবর্ণ বোধ হয়। জননীর অম্লপিত্ত রোগ, অজীর্ণ রোগ, যকৃতের দোষ, পাণ্ডু ও ন্যাবা রোগ থাকিলে দুগ্ধে এইসকল দোষ বর্ত্তমান থাকে।

দূষিত গাভীদুগ্ধে ও ছাগীদুগ্ধে এইপ্রকার সমস্ত দোষই পরিলক্ষিত হইতে পারে। নারীদুগ্ধের ন্যায় গোদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধ এই প্রকারে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত স্তন্য পান করিলে শিশুর শরীরে দাহ উৎপন্ন হয় এবং তাহার পিত্তজনিত বহুবিধ রোগ হইতে পারে। মাতার দেহে শ্লেষ্মাজনিত পীড়া থাকিলে দুগ্ধ লবণাক্ত ও পিচ্ছিল হয় এবং তাহা

জলে দিলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই-প্রকার দুগ্ধ পান করিলে শিশুর শ্লেষ্মাজনিত পীড়া হইয়া থাকে। স্তন-দুগ্ধে পূর্ব্বোক্ত দোষসকল মিশ্রিত ভাবে থাকিলে সে দুগ্ধ বিশেষ অপকারী বুঝিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে।

বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধের লক্ষণ:---যে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, যাহা অবিবর্ণ থাকে এবং যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় পদার্থ পরিলক্ষিত হয় না---এইরূপ স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবেন। মাতা বা ধাত্রী শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, ব্যাধিমতী, অতীব কৃশা, গর্ভিণী, জরগ্রস্তা, অজীর্ণরোগপীড়িতা, অপথ্যসেবিনী হইলে তাহার স্তন্যপানে শিশু রুগ্ন হইয়া থাকে। আজকাল অনেক গর্ভধারিণী অজীর্ণরোগে কষ্ট পান, তাঁহাদের বুকের জালা, অম্লউদ্গার, চোঁয়া ঢেকুর, পেটে বায়ুজনিত ফুট্‌ফাট্‌ শব্দ এবং উদরাময় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের দোষ এবং অজীর্ণরোগ থাকিলে সেই মাতার স্তনদুগ্ধ শিশুর ব্যবহার-উপযোগী নহে। মাতৃদুগ্ধ উপযুক্ত না পাইলে শিশুকে ছাগীদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। যে ছাগী চরিয়া বেড়াইতে পায় তাহার ধারোষ্ণ দুগ্ধ শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। একস্থানে বদ্ধ ছাগীর দুগ্ধে অপকার হইবার সম্ভাবনা।

মহারাষ্ট্রদেশে শিশুদিগকে মাতৃদুগ্ধ বা ধাত্রীদুগ্ধের অভাবে ছাগীর স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিতে শিখান হয়। ছাগীর এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, শিশুর পান করিবার সময় হইলে সে আপনি আসিয়া বালকের নিকট উপস্থিত হয়।

অনেকে আবার মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন, কিন্তু এইটি মনে রাখা উচিত যে, গর্দ্দভীর দুগ্ধের পোষণশক্তি নারী দুগ্ধের অপেক্ষা অনেক কম। গর্দ্দভীর দুগ্ধ দ্বিগুণ পরিমিত পান করাইলে তবে তাহা কিয়ৎপরিমাণে মাতৃদুগ্ধের সমান গুণযুক্ত হয়। এই পরিমাণে গর্দ্দভীদুগ্ধ পান করান অনেক ব্যয়সাধ্য। গর্দ্দভীর দুগ্ধে পোষণশক্তি কম থাকায় তাহাতে শিশুর স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধির ভালোরূপ উন্মেষ হয় না।

আমাদের এদেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে

তাহাকে গাভীদুগ্ধ পান করবার দরকার হবে না ব'লে আজ ৩।৪ দিন পরে মাতার স্তনে দুগ্ধযোজন করলাম। আজ ৭০ দুগ্ধ আনিতে যেমন বিলম্ব করেন, থেকে দূরত্ব মোট ১০৭৮ দিন পরিপাক করিবার শক্তি ভাল বিকাশ

দিন মাতৃদুগ্ধের অভাবে গাভী-দুগ্ধ পান করান্ত ও পরিষ্কার এই সময় শিশুকে অল্প অল্প মধু পান করাইলেই যথে পাঞ্জাবী যদি একান্ত দুগ্ধ পান করাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইবেশ মনস্তুষ্টির জন্য অল্প দুগ্ধ দেওয়াই শ্রেয়ঃ। মহারাষ্ট্রদেশে বালকের দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য এরণ্ড তৈল এবং আবশ্যক হইলে গোমূত্র শিশুকে পান করান হয়। আমাদের দেশে এই প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। গোদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরু-পাক। শিশুকে গাভীদুগ্ধ পান করাইতে হইলে দুগ্ধের সহিত মৌরির জল, বার্লি-সিদ্ধ জল বা এরারুট সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করান উচিত। দুগ্ধ শিশুর উদরে যাইয়াই ছানা বাঁধিয়া যায়। মাতৃদুগ্ধের ছানা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং গোদুগ্ধের ছানা মাতৃদুগ্ধের ছানার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত হয়। বার্লি-সিদ্ধ জল বা এরারুট-সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধে ছানা এত বড় হয় না। ছানা বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত হইলে শীঘ্র পরিপাক হয় না। তাহা যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবে ততই শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইবে। দুগ্ধ যদি ভাল-রূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে শিশু দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে। দুগ্ধ পরিপাক না হইলে উদরে অম্লরস উৎপন্ন হয় এবং গ্যাস জন্মায়। এই অম্ল পদার্থ পাকাশয়ে যাইয়া উদরাময় উপস্থিত করে এবং সেই শিশুর মলে অম্ল-গন্ধ পাওয়া যায়। এই অম্লজনিত উদরাময় আরোগ্য করিবার জন্য দুগ্ধের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিলে সুফল পাওয়া যায়। গাভীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া না দিলে, দুগ্ধের সহিত অনেক রোগের বীজ বালকের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে সেইজন্য জাল দেওয়া দুগ্ধ পান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। গোয়ালারা যেখান-সেখান হইতে দুগ্ধে খারাপ জল মিশ্রিত করে; এইরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ নানা রোগের আকর।

শিশুর দুগ্ধ-বমন তাহার অজীর্ণ রোগের প্রধান লক্ষণ।

উদরাময়, মলে অম্ল গন্ধ, মলের সহিত ছানার অংশ থাকা, শিশুর অজীর্ণ রোগের দ্বিতীয় লক্ষণ। যাঁহারা এই সময় সাবধান হইয়া শিশুর অজীর্ণতার কারণ নিরূপণ করিয়া প্রতিকার করেন তাঁহাদের শিশু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। অজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশু কাঁদুনে হয়, সে যখনি কাঁদিবে তখনই তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য দুগ্ধ পান করান তাহার পক্ষে নানা রোগের কারণ হইয়া থাকে। পরিপাক না হইলে উদরে এক-প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জন্মায়। এই পদার্থ যকৃতে যাইলে ভীষণ যকৃৎ রোগ-উৎপন্ন হয়।

যে-সকল শিশু দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদের কিছুদিনের জন্য কাল্পনিক (artificial) উপায়ে দুগ্ধ পরিপাক করাইয়া সেবন করান উচিত। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে পেপ্টনাইজ (peptonise) করা কহে। আজকাল বাজারে শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এইরূপ অনেক প্রকার খাদ্য বিক্রয় হইতেছে। আবশ্যক হইলে অল্পদিনের জন্য এই শিশুর খাদ্যের মধ্যে কোনো একটা খাদ্য ব্যবহার করান যাইতে পারে। বারোমাস এই প্রকার খাদ্য-খাওয়াইলে শিশুর পরিপাকশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

অনেকে না জানিয়া শিশুকে সাধারণ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে জমাট দুগ্ধ সেবন করান। এইরূপ জমাট দুগ্ধ সেবন করিলে শিশু দেখিতে মোটা হয় বটে, কিন্তু তাহার দেহ অন্তঃসারশূন্য হয়। যে-সকল শিশু বারোমাস 'পেটেণ্ট ফুড' খাইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে রিকেট নামক ব্যাধি প্রায়ই দেখা যায়, কারণ এইসকল ফুডের মধ্যে শিশুর পোষণোপযোগী সমস্ত পদার্থ থাকে না। জননীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ বালকের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। শিশুকে দুগ্ধ দান করিলে গর্ভিণীর স্ত্রীরোগ-সংক্রান্ত রোগ প্রায় হয় না। স্তনে দুগ্ধ আসিলে শিশুকে দুই ঘণ্টা অন্তর স্তন পান করান উচিত। একটু সবলে দুগ্ধ টানিতে শিখিলে দিবাভাগে আড়াই ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পান করাইলে যথেষ্ট হয়। ক্রমশঃ স্তন পান করাইবার সময়ের ব্যবধান বাড়ান উচিত। শিশু স্তনের সমস্ত দুগ্ধ পান করিতে না পারিলে স্তন হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া ফেলা উচিত, নতুবা 'ঠুনকা' প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে। শিশু ৭।৮ মাসের হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে যথেষ্ট হয়। সায়ংকালে একটু দুগ্ধ পান করাইলে আর রাত্রিতে শিশুকে জাগাইয়া পান করান উচিত নহে। যে-সকল গর্ভধারিণী শিশুকে অধিক পরিমাণে খাওয়াইয়া হৃষ্টপুষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদের সন্তান প্রায় কৃশ হইয়া থাকে, এবং অকালে যকৃৎ-রোগগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হয়। দন্ত উঠিতে আরম্ভ হইলেই শিশুকে ভাতের মাড়ি ও কাঁচা মুগের ঝোল সেবন করান উচিত।

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পাঞ্জাব

১৩ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—পানিপথ সহর থেকে ইতিহাস-বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র কয়েক মাইল দূরে। এইখানে তিন তিনবার মোগল-পাঠানের ভাগ্য পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। প্রথম ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর সকল আশা চূর্ণ ক'রে মোগলেরা তাঁহাদের সম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বারে আবার পাঠানের শেষ চেষ্টা—আকবরের কাছে হিমুর পরাজয়। আর শেষবার হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়—মারহাট্টাদের পরাজয়, আহমদ শাহ্ দুরানির হাতে। এই ঐতিহাসিক পথ কতবার কত অভিযানের কোলাহলে মুখরিত হয়েছে! অশ্বের হ্রেষারবে, সৈন্য-সামন্তের অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে এখানকার বাতাস যেন আজও ভরপুর।

কাল্‌কের রাস্তার শুষ্ক নীরস ভাব আজ যেন কোথায় চ'লে গেছে। আবার রাস্তার পাশে পাশে চাষ আবাদ দেখা যেতে লাগ্‌ল। পথের পাশে মধ্যযুগের ব্যারন্‌দের ক্যাস্‌লের মতন দু'টি প্রকাণ্ড দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। মাইল কুড়ি পর আমরা কর্ণালের মধ্যে দুপুরের জলযোগের জন্য নেমে পড়্‌লাম। পানিপথের মতন কর্ণালও প্রকাণ্ড প্রাচীর ঘেরা। সহরের ফটক আটটি। ষ্টেশন, আদালত এ-সব সহরের বাইরের ট্রাঙ্ক রোডের উপর। বাজার-হাট দোকান-পত্র সব সহরের মধ্যে। চওড়া রাস্তা খুবই কম, তিন চার তলা বাড়ীর মাঝ দিয়ে সরু সরু পাথরবাঁধান পথে লোকজন ও গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কল্‌কাতার মাড়োয়াড়ী-টোলারই মতন। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে সহরকে বাঁচাবার জন্যে আগে এই রকম প্রাচীর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আজকাল সে হিসাবে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাক্‌লেও এই রকম প্রাচীর ঘেরা পুরান ধরণের সহরগুলি মনে বেশ একটা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের ভাব এনে দেয়।

কর্ণাল থেকে খুব শীঘ্রই বেরিয়ে পড়্‌লাম। আজ আম্বালা আমাদের গন্তব্য স্থান। মাইল কুড়ি পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ দিকে থানেশ্বর যাওয়ার পথ, দূরত্ব মাত্র ৩।০ মাইল। আর ডান দিকের পথ দিয়ে বরাবর সাহারাণপুর চলে গেছে। রাস্তায় শাহবাদ গ্রাম পড়ল। গ্রামের কয়েকটি আটার কলের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

ভেবেছিলাম পাঞ্জাবে গরম কম্‌বে, হয়ত ঠাণ্ডা পড়্‌বে, দুপুরে সাইকেলে ভ্রমণ করার কষ্টটা অনেক কম্‌বে। কিন্তু এখানকার গরম ও রোদের তেজ যুক্তপ্রদেশের চেয়ে কিছু কম ত নয়ই বরং যেন বেশী ব'লে মনে হচ্ছে। তবে রাস্তায় প্রায়ই 'পিয়াউ' (জলসত্র) আছে ব'লে জলকষ্টটা অনেকটা কম।

বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছলাম। এখানে শ্রীযুত অবনী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উঠে পড়া গেল। পথে এলবিয়ান (Albion) গাড়ীর স্পিণ্ডল (Spindle) এর জোরের জন্ত মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়্‌তে হচ্ছিল। সেটিকে মেরামত না ক'রে কাল রওনা হওয়া চল্‌বে না। সুতরাং রোজকার মতন ভোর বেলায় ওঠবার দরকার হবে না ব'লে আজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমবার আয়োজন কর্‌লাম। আজ ৭০ মাইল আসা গেছে, কল্‌কাতা থেকে দূরত্ব মোট ১০৭৮ মাইল।

১৪ই অক্টোবর, বুধবার—গাড়ী মেরামত ও পরিষ্কার কর্‌তে বেলা দশটা বাজল। দুপুরে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। পণ্ডিত সুখন চাঁদ বেশ ভদ্রলোক। এঁরা অনেক পুরুষ আগে বাঙালী ছিলেন। পাঁচ ছয় পুরুষ এ দেশে থেকে একবারে পাঞ্জাবী হ'য়ে গেছেন। তিনি যে মনে-প্রাণে বাঙালী বারবার এই কথা ব'লে গর্ব্ব অনুভব কর্‌লেন। পাঞ্জাবী প্রথায় খাওয়া হ'ল। ভাত আর রুটী একসঙ্গেই খাওয়া চলে। এখানে বাংলা মুল্লুকের মতন সক্‌ড়ির বিচারও নেই। এঁরা ব্রাহ্মণ; বাঙালীদের মতন মাছ মাংস খান না; তবে তার অভাব-টুকু ঘিয়ের দ্বারা যথাসম্ভব পুষিয়ে নেন।

সকলের অনুরোধে আজ এখান থেকে চ'লে যাওয়ার আশা ত্যাগ কর্‌তে হ'ল। আম্বালা সহর এখান থেকে সাত মাইল দূর। বিকাল বেলা অগত্যা সেইদিকে যাওয়া হ'ল। ক্যাণ্টনমেণ্টে প্লেগ হচ্ছে। সেইজন্য ক্যাণ্টন-মেণ্টের সব জায়গায় যাওয়ার হুকুম নেই।

১৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—ক্যাণ্টনমেণ্ট্ থেকে মাইল চার পরে ডানদিকে সিম্‌লা যাবার রাস্তা। আঠার মাইল পর পাতিয়ালা ষ্টেটে যাবার পথ সাম্‌নে পড়ে। এখানে ট্রাঙ্করোড রাজপুরার ভিতর দিয়ে লুধিয়ানার দিকে চ'লে গেছে।

আজ পথে একটু নূতন জিনিস দেখা গেল। এখানে চাষের জন্য ক্ষেতে বেশ একটি অভিনব উপায়ে জল সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে। যুক্তপ্রদেশে বলদের সাহায্যে কূয়া থেকে জল তুলে চাষীরা কাজে লাগায়। আর পাঞ্জাবে কূয়ার ওপর ছোট ছোট বাল্‌তি বা কল্‌সী দিয়ে লম্বা চেনের মতন তৈরী ক'রে এক প্রকাণ্ড চাকার ওপর বসিয়ে সেই বাল্‌তি-চেন্‌কে দুটি বলদের সাহায্যে ঘুরিয়ে জল তোলে। এই সমস্ত ব্যাপারটাকে দূর থেকে অনেকটা ঘানির মতন দেখায়। কূয়ার মুখ থেকে ক্ষেতে জল যাবার রাস্তা করা থাকে। এই উপায়ে এখানকার

চাষীরা বিনা পরিশ্রমে চাষের জন্য প্রচুর জল ক্ষেতে সর্বরাহ করতে পারে। কোন হাঙ্গাম নেই, বলদ দুটিকে চালাতে পারলেই হ'ল। রাত্রে এরা ঘানির ওপর ব'সে ঘুমায় আর বলদ দুটি আপনি আপনি ঘুরতে থাকে। চাষের মরশুমের সময় এই উপায়ে পাঞ্জাবী চাষা চব্বিশ ঘণ্টাই জল তুলে কাজে লাগায়। এই জিনিসটিকে 'খু' বলে। সৈয়দপুর গ্রামে ঠিক দুপুর রোদে একজন লোকের কাছে জল চাইতে সে এই রকম 'খু'য়ের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, ওখানে গিয়ে যত পার জল খাও; অফুরন্ত জল চারজন কেন চারশ' জনেও শেষ করতে পারবে না। বাস্তবিক এই সব কুয়ার জল যেমনি প্রচুর তেমনি ঠাণ্ডা।

আম্বালা থেকে ৪১ মাইল পর গোবিন্দগড় সহর। সহরের মন্দিরগুলির চূড়া সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। এই সহরের সামনে থেকে নাভা ষ্টেট যাবার রাস্তা সোজা চ'লে গেছে। লুধিয়ানা সহরের কয়েক মাইল দূর থেকে রাস্তার পাশে শিশু-গাছের সারি বরাবর সহরের সীমানা অবধি চ'লে এসেছে। এই রাস্তা দিয়ে বেলা প্রায় চারটের সময় লুধিয়ানা সহরে পৌছলাম। রাস্তার বাঁ দিকে লুধিয়ানা ক্যাণ্টনমেণ্ট্। সেও এক প্রকাণ্ড সহর। এখানকার সব বড় সহরেরই একটা ক'রে ক্যাণ্টনমেণ্ট্ আছে।

ইব্রাহিম লোদী এই সহরের পত্তন করেন। তাঁর নামের অনুকরণে এই লুধিয়ানা নাম হয়েছে। লুধিয়ানা শাল-আলোয়ানের জন্য বিখ্যাত। শহরে শাল আলোয়ানের কারখানা বিস্তর। এই রকম এক কারখানা দেখে সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত রাঘবেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রের মতন আশ্রয় নেওয়া গেল। আজ ৭৪ মাইল আসা হয়েছে। মিটারে সব শুদ্ধ ১১৭৭।

১৬ই অক্টোবর, শুক্রবার—ইব্রাহিম লোদীর কেল্লার সামনে দিয়ে আবার ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়া গেল। লুধিয়ানা বেশ বড় সহর। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কমার্সিয়াল কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি সবই আছে। বেলা ৯টার সময় বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক ৯ মাইল পর শতদ্রু সামনে এসে পড়লাম। নদীর ওপর পাশাপাশি দুটি পুল। একটি রেলের ও অন্যটি গাড়ী ও লোকজনের জন্যে। শতদ্রুর অপর পারেই ফিলৌর সহর। এই সহরের বুকের ওপর দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড জলন্ধর অভিমুখে চ'লে গেছে। নদীর ওপর থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের প্রকাণ্ড দুর্গ। এই দুর্গ এখন পাঞ্জাবের পুলিস ট্রেনিং স্কুলে পরিণত হয়েছে।

পুলিস লাইনের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নজর পড়ল একটি বাঙালী নাম লেখা বোর্ডের দিকে। ভিতর থেকে খোকাখুকীদের খেলা-ধূলা ও হাসির শব্দ কানে এল। এদের সঙ্গে আলাপ না ক'রে চ'লে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। ইতস্ততঃ না করে নেমে পড়লাম। বাড়ীর সামনে যেতেই গৃহস্বামী বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ। ইনি বহুদিন পাঞ্জাব-প্রবাসী। ছোট ছেলেমেয়েদের পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলা দেখে প্রথমে সত্যসত্যই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলাম। এদের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মহিলারা পর্যন্ত বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। এখানে অন্ততঃ আজকের দিনটা থেকে যাবার জন্যে; পুরা একদিন বিশ্রামের পর মাত্র ৯ মাইল এসে আড্ডা-ফেলা যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না। কাজেকাজেই এখানে বেশ মোটাগোছের জলযোগের পর, ফিরতি বেলায় এখানে এসে দু'দিন থেকে যেতে হবে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে তবে এঁরা আমাদের ছেড়ে দিলেন। বিদেশের বাঙালী, বাঙালীর জন্য কি করে তার পরিচয় সারা পথেই পেয়েছি।

ফিলৌরের আশে পাশে খুব তরমুজের চাষ হয়। পথের পাশে কয়েক মাইল ধ'রে কেবল তরমুজের ক্ষেত। ২০ মাইল পর রাস্তাটি দু'দিকে বিভক্ত হ'য়ে গেছে—বাঁ দিকেরটি জলন্ধর ক্যাণ্টন্মেণ্টে ও ডান দিকেরটি জলন্ধর সহরে। আমরা ক্যাণ্টন্মেণ্ট্ হ'য়ে সহরে ফিরে এলাম। ক্যাণ্টন্মেণ্ট্ ও সহরের মাঝখানে ট্রাঙ্ক রোডের উপর সামরিক বিদ্যালয় (King George Royal Military School)। পাঞ্জাবের অন্যান্য সহরেও এই রকম সামরিক বিদ্যালয় দেখা যায়। পাঞ্জাব 'সিপাহী'র দেশ, এখানকার প্রত্যেক সহরেরই একটা ক'রে ছাউনি

আছে। সহরের পথে-ঘাটে উর্দ্দি পরা সৈনিক, ছাউনির মাঠে সৈনিকদের কুচকাওয়াজ ও প্রহরে প্রহরে বিউগ্‌লের আওয়াজ এমন একটা জিনিস,যা বাঙালীর কাছে একবারে নূতন।

জলন্ধরে নূতন পাওয়ার হাউস (বিদ্যুৎ-সরবরাহের কারখানা) তৈরী হয়েছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আনন্দর এসব বিষয়ে আগ্রহ খুব বেশী। কাজে কাজেই সহরের অপর প্রান্তে পাওয়ার হাউস্ দেখ্‌তে চল্‌লাম। দৈবক্রমে এখানে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। এখান থেকে ফিরে পরেশ-বাবুর আস্তানায় সেদিনের মতন আড্ডা ফেলা হ'ল।

জলন্ধর সহর হোটেলে পরিপূর্ণ। এইসব হোটেলের মধ্যে কতকগুলি শিখ্‌দের আর কতকগুলি মুসলমানদের। শিখদের হোটেলে কেবল পিতলের বাসন ব্যবহার করা হয় আর মুসলমানেরা কলাই-করা বাসন ব্যবহার করে। হোটেলের সুমুখে এই রকম পিতল বা কলাই-করা ডেক্‌চি সাজান থাকে। এই ডেক্‌চির সাহায্যে বিদেশীকে, হিন্দু বা মুসলমানের হোটেল বুঝে নিতে হয়। এই রকম এক হোটেলে রাত্রে খাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। হোটেলে রুটী আর মাংস সব সময়েই পাওয়া যায়। ভাত খেতে হ'লে আগে খবর দিয়ে রাখ্‌তে হয়। পাঞ্জাবীরা এত বড় থালা ব্যবহার করে যে, আমাদের কাছে তা নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় ব'লে বোধ হয়। প্রকাণ্ড পিতলের থালার ওপর সাত আটটি ছোট ছোট বাটী। থালা থেকে বাটীগুলি আর নামিয়ে রাখার দর্‌কার হয় না। তর্‌কারীর মধ্যে 'টিণ্ডা' (ধুঁধুল জাতীয়) পাঞ্জাবীদের অতি মুখরোচক সামগ্রী! আশে পাশের টেবিল থেকে ঘন ঘন "এ মুণ্ডে (ছোকরা বা 'বয়') টিণ্ডা ল্যাও" শুনেই তা বুঝ্‌তে পারা গেল। আজ মোট ৪৩ মাইল বাইক করা গেছে। মিটারে উঠেছে ১২২০।

১৭ই অক্টোবর,শনিবার—সকাল সকাল রওনা হ'লাম। মাইল নয় আসার পর হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হ'তে পথের ধারে এক গ্রামে আশ্রয় নিতে হ'ল। বৃষ্টি শীঘ্রই থেমে গেল, কিন্তু রওনা হ'তে না হ'তেই ২নং ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীর ফ্রি হুইলের স্প্রিং কেটে গেল। সেটাকে মেরামত কর্‌তেও খানিকটা সময় কাটল। এখানকার লোকজনের পোষাক ও চেহারা এইবার একবারে বদ্‌লে গেছে। আম্বালার পর থেকে এই পরিবর্ত্তনটা চোখে লাগে। পাঞ্জাবের রাস্তা সব চেয়ে ভাল। আজকের দিনটাও বেশ ঠাণ্ডা, সেইজন্য অনেক দিন পর বেশ আরামে পাড়ি দেওয়া যাচ্ছে। ঠিক ৩৪ মাইল পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ দিকের পথ দিয়ে কপূর্‌রতলা ষ্টেট মাত্র ৭॥০ মাইল দূর।

আজ পথে পড়ল বিপাশা। বিপাশার ওপরেই তাকদাক স্যানাটোরিয়াম্। এইখান থেকে কয়েকজন পাঞ্জাবী যুবক আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাতে সুরু করলে। তারা যে সাইকেল ক'রে অমৃতসর যাচ্ছে এই খবরটা বার বার আমাদের শুনিয়ে দিলে। প্রাণপণ শক্তিতে সাইকেল চালিয়ে তারা এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখতে লাগল। ভাবটা, যে হারিয়ে ত দিয়েছি আর কি? ক্রমশঃ তারা আমাদের পিছনে ফেলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল! অন্যমনস্ক হ'য়ে চলেছি, অল্পক্ষণ পরেই এক ছায়া-ঢাকা 'পিয়াউ'র (জলসত্র) সুমুখে এসে দেখি বন্ধুরা সেইখানে ব'সে ঘটি ভর্ত্তি ক'রে জল পান কর্‌ছেন। লট-বহর সমেত সাইকেলগুলি এখানে সেখানে প'ড়ে রয়েছে। আর রুমালের সাহায্যে দাড়ির ফাঁকের ঘামের স্রোত বন্ধ করার কি বিপুল প্রয়াস চলেছে।

আজ সাইকেলের জন্য রাস্তায় দুবার থামতে হ'ল। এমন কোনো দিন হয় না। ক্রমশঃ দলে দলে গরু-মহিষের পাল রাস্তায় দেখা যেতে লাগল। সকলেরই গন্তব্য অমৃতসর। প্রথমে খেয়াল করিনি, কিন্তু ক্রমশঃই পালের আধিক্য দেখে খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম অমৃতসরের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক মেলায় এদের নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রতিবৎসর দেওয়ালীর আগে ও পরের কয়েকদিন ধ'রে এই রকম ছাগল, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি বিক্রী হয়।

মেঘ মেঘ কর্‌ছিল, হঠাৎ এমন ঝড় উঠল যে, ধূলায় চারদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। পথের দু'পাশে বড় বড় গাছের সারি। ঝড়ে সেইসব গাছের ডাল মট্ মট্ ক'রে ভাঙতে সুরু হ'ল। লোকজন গরু-মহিষ সব রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা মাঠে পালাতে লাগল। সেখানে ধূলায় অন্ধকার।

নাক-মুখ ধূলায় একবারে বন্ধ। সকলে চোখ মুখ ঢেকে চুপচাপ ব'সে পড়ল। আমরাও অগত্যা সেই উপায় অবলম্বন করলাম। মাথার ওপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। তার গর্জ্জনে গাছের ডাল-পালা নুয়ে পথের ওপর এসে পড়ছে। সকলে চুপ, কথা বলবার যো নেই। সেচেষ্টা করলেই এক ঝলক ধূলা-বালি মুখের ভেতর ঢুকে যাবে।

আধ ঘণ্টা পরে ঝড় থেমে গেল। ঝড় যেমন হঠাৎ এসেছিল গেলও তেমন হঠাৎ। কেবল পথের পাশের সদা-ভাঙা ডাল ও গাছের পাতার ধূসর মূর্ত্তি ভিন্ন বোঝবার যো নেই যে, এইমাত্র এক প্রলয়ের কাণ্ড সুরু হয়েছিল। বৃষ্টির কোনো আভাস নেই। প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। আবার রাস্তায় ফিরে এসে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। অমৃতসরের দু' মাইল দূর থেকে মেলার জন্য এমন গরু-মহিষের ভিড় বাড়ল যে,সাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে সুরু ক'রে দিলাম।

বিকালে অমৃতসরে পৌচলাম। মেলা ও দেওয়ালী উপলক্ষ্যে সহরে ভারী ধূম। শিখদের স্বর্ণমন্দিরের অনুকরণে হিন্দুরা এখানে এক মন্দির তৈরী করেছে তার নাম দুর্গিয়ানা। সহরের অপরাপর প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি বিজলী-বাতি দিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে; এখান-কার বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস খুব ছোট। দুর্গিয়ানা ও অন্যান্য মন্দিরগুলিতে আলোর বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য অনেক রাস্তা একেবারে অন্ধকার।

সন্ধ্যার সময় কাইজারিবাগে শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে উঠে পড়লাম। অমৃতসর থেকে আমরা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে নূতন পথে শিয়ালকোট অভিমুখে যাবো। ম্যাপে সেই নূতন পথ সম্বন্ধে যে রকম খবর দেওয়া আছে শুধু তার ওপর নির্ভর ক'রে যাওয়া যাবে না। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সঠিক খবর জানা দরকার। তাতে সময় চাই। সুতরাং কাল এখান থেকে রওনা হওয়া চলবে না। সেই খবর সংগ্রহ করার জন্যে যদিও অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, কিন্তু ভোরে উঠেই যে কম্বল বাঁধাবাঁধির হাঙ্গাম নেই, বেলা ৭টা অবধি নিরুদ্বেগে শুয়ে থাকার আরামটুকু উপভোগ করা যাবে, এই ভেবে নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইক করেছি আজ ৫৫ মাইল। মিটারে উঠেছে মোট ১২৭৫ মাইল।

১৮ই অক্টোবর, রবিবার—অমৃতসর প্রকাণ্ড সহর আর মস্ত বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্র। শাল-আলোয়ানের জন্যও অমৃতসরের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নাম ভারতবর্ষে কে না শুনেছে?

শিখদের এই ধর্ম্মমন্দিরের ব্যবস্থা বড় চমৎকার। এখানে বারমাস যাত্রীদের ভিড় লেগে রয়েছে, কিন্তু আমাদের তীর্থস্থানগুলির মত অনাবশ্যক গোলমাল বা 'চীৎকারের' বাহুল্য নেই। প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে মন্দির। মন্দিরের মাথাটি সোনালি পাতে মোড়া। কেবল সরোবরের ওপর দিয়ে মন্দিরে যাবার একটিমাত্র পথ। আর এই সরোবরের চারপাশে যাত্রীদের থাকবার জন্যে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। মন্দিরে প্রবেশ করার আগে একটি বড় চৌবাচ্চায় সকলকে পা ধুয়ে যেতে হয়। আর-একটি বিশেষ নিয়ম যে, মাথায় কোনো রকম আবরণ না দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা বারণ।

মন্দিরের মাঝখানের ঘরে 'গ্রন্থসাহেব' সংরক্ষিত আছেন। যাত্রীরা সকলে যথাক্রমে তিনবার গ্রন্থ-সাহেবকে প্রদক্ষিণ ক'রে বাতির শিখায় নিজের নিজের হাত ছুঁইয়ে বুকে ও মাথায় ঠেকায়। এরই একপাশে একদল বাদক গান-বাজনার দ্বারা দেবতার মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করছে। 'গ্রন্থসাহেবের' সামনে প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী-থালায় যাত্রীরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী পয়সা, টাকা বা মোহর দিয়ে প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এর পাশে আর-একটি ছোট মন্দির। সেটিতে শিখ-সম্প্রদায়ের গুরুদের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেওয়া হয়েছে।

কাইজারিবাগের কাছেই জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ। এই জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগেই সেদিন কত হতভাগ্যেরই না জীবনের অবসান হ'য়ে গেছে। আগে জালিয়ান্‌ওয়ালা-বাগ চারপাশে বাড়ীঘেরা এক টুকরা ছোট জমি মাত্র ছিল। এখন কংগ্রেস থেকে সমস্ত জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়েছে। স্থানে স্থানে রক্তের মত লাল রংয়ের ফুলগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন সেই বিশেষ

দিনটির কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে। এক পাশে একটি প্রকাণ্ড কূয়া—যার মধ্যে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে কয়েকশত লোক আত্মরক্ষার জন্য লাফিয়ে পড়ে সমাহিত হ'য়ে গিয়েছে। এখানকার স্মৃতি বড়ই করুণ। মন আপনা-আপনি বিষাদে পূর্ণ হ'য়ে উঠল।

অমৃতসরের বাজার থেকে আমরা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু কিছু কিনে নিলাম। শিয়ালকোট যাবার পথ খানিকটা মন্দ নয়; সেখবরটা সহজেই পাওয়া গেল। কিন্তু বাকী খানিকটা পথের খোঁজ কেউ ঠিক দিতে পার্‌লে না। আমরা জম্মু হয়ে শ্রীনগর যাব এই ঠিক করেছিলাম। জম্মু যেতে হ'লে শিয়ালকোট যেতে হবেই; সুতরাং নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এই অপেক্ষাকৃত 'শর্ট-কাট্' রাস্তা দিয়ে শিয়ালকোট রওনা হওয়া যাবে এই স্থির ক'রে ফেল্‌লাম। লাহোরের পর ওয়াজিরিবাদ থেকে অবশ্য শিয়ালকোটে যাবার খুব ভাল রাস্তা আছে। কিন্তু লাহোর ও ওয়াজিরিবাদ ফিরতি পথে পড়বে, সেইজন্য এই 'শর্ট কাট' রাস্তাই আমরা সুবিধাজনক মনে কর্‌লাম; যদিও ম্যাপে এই রাস্তার খানিকটা এমনভাবে দেখান হয়েচে, যাতে রাস্তার অবস্থা মোটেই ভাল নয় ব'লে বোধ হয়। বিকালে এই নূতন পথে ন'মাইল এগিয়ে রাস্তার নমুনা দেখে আসা হ'ল। মিটারে আজ উঠল ২৬ মাইল।

১৯শে অক্টোবর, সোমবার—খুব ভোরে উঠে রওনা হ'য়ে পড়লাম। ১৫ মাইল পর আজনালা খুব ছোট জায়গা। অমৃতসর থেকে এই অবধি মোটর লরী ও টোঙ্গা যাতায়াত করে। আজনালা পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল। আজনালার পর থেকে যে রাস্তা সুরু হ'ল তাকে রাস্তা না ব'লে নদীর চড়া বা বালির মাঠ বল্‌লেই ভাল হয়। কয়েক মিনিটের পরই আমরা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। রাস্তা ব'লে একে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দু'একজন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল এইটাই শিয়ালকোটের পথ। অগত্যা আর ইতস্ততঃ না ক'রে মাঠে নেমে পড়লাম।

অল্পক্ষণ পরেই এমন নরম বালির উপর এসে পড়লাম যে সাইকেল আর চলে না। আরও কিছুক্ষণ পরে চ'লে চ'লে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল। বালির ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়াই কি রকম কষ্টকর তার উপর আবার এই লটবহর শুদ্ধ সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া! মাথার ওপর দুপুরের চন্‌চনে রোদ। দুপুর বেলা ইরাবতী নদীর ধারে এসে পড়লাম। সুবিধার কথা যে নদীর পারের জন্য নৌকার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তার এই অবস্থা, পারের এমন সুবিধা, সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে! নদীর ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে সুস্থির হলাম। ইরাবতী এখানে পঞ্চাশ ষাট গজের বেশী চওড়া হবে না, তবে খুব গভীর।

এপারে এসে বালির চড়া পার হ'য়ে রাস্তায় আসা গেল। রাস্তার দুপাশে বাবলা গাছ। রাস্তা অত্যন্ত জঘন্য। বাবলা কাঁটার জন্য অত্যন্ত সাবধানে গাড়ী চালাতে হচ্চে। মাইল খানেক যেতে না যেতে চাকায় এমন ফুটা (puncture) হ'তে সুরু হ'ল যে অগত্যা সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে যেতে বাধ্য হ'লাম। কিন্তু পথ থাক্‌তে কতক্ষণ হেঁটে যাওয়া যায়? সাইকেল চড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পর পর চারখানি গাড়ীর চাকায় ফুটা হওয়ায় সাইকেলে যাওয়ার আশা ত্যাগ ক'রে হাঁটতে সুরু ক'রে দিলাম। হিসাব ক'রে দেখা গেল তিন মাইল রাস্তায় সাতবার চাকায় ফুটা হওয়ার দরুণ আমাদের সাইকেল থেকে নাম্‌তে হয়েছে। সুতরাং এমন রাস্তায় সাইকেল চালান বা হেঁটে যাওয়ায় কিছু তফাৎ নেই।

এইভাবে চ'লে বেলা দেড়টার সময় রেওয়া ব'লে একটা ছোট জায়গায় পৌঁছলাম। আজনালার পর এই প্রথম লোকালয় চোখে পড়ল। এর মধ্যে ছোটখাট একটা বসতিও নজরে পড়েনি। পথে কিছু মিল্‌বে না ব'লে, আজ খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এক কূয়ার ধারে ব'সে পাঁউরুটী ও জমান দুধ খেয়ে পেট ভর্ত্তি করা হ'ল। রেওয়া থেকে একদিকে নারওয়াল ও অপরদিকে লাহোর যাবার পথ দেখা গেল।

ঘণ্টাখানেক পর বেরিয়ে পড়লাম। এখানে শোনা গেল পশরুর থেকে শিয়ালকোট যাবার পথ ভাল। এখান থেকে পশরুর অবধি পথের অবস্থা এইরকমই। এখনও

কুড়ি মাইল এই রকমের রাস্তা পার হ'য়ে যেতে হবে শুনে চম্‌কে উঠল'ম।

এই কুড়ি মাইল পথ যে এসেছিলাম তা এখন বিশ্বাস হয় না। কখন হেঁটে, কখনও বা সাইকেল ঘাড়ে ক'রে, নদী নালা বালির চড়া ভেঙ্গে, আর মাঝে-মাঝে সাইকেল চালাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে পশরুরে যখন পৌছলাম তখন রাত আটটা। পশরুর মাঝারিগোছের একটি সহর ও রেল-ষ্টেশন। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী ব'লে মনে হ'ল। শিয়ালকোট পঁচিশ মাইল দূর। তবে রাস্তা ভাল ব'লে, এখানে নৈশভোজন শেষ ক'রে শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। অন্ধকার রাত, অজানাপথে মাঝে-মাঝে কেবল 'খু' চলবার 'ক্যাঁচ ক্যাঁচ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই, চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়লেই অস্থির।

ক্রমশঃ শিয়ালকোট-সহরতলীর আলো অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আশা হ'ল আজকের মত পথের বুঝি শেষ হ'ল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পথশ্রান্ত পথিকের কাছে সে আশা কত লোভনীয়, কত আরামপ্রদ। রাত বারটার সময় শিয়ালকোট রেল ষ্টেশনের কাছে নেমে পড়লাম। সহরে তখন সব বাড়ীর দরজা বন্ধ। ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুমতি নিয়ে একখানা খালি গাড়ীর মধ্যে রাত কাটার ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌লাম। ধুলা-ভর্ত্তি পোষাক বদলাবারও আর ইচ্ছা হ'ল না, কোন রকমে শুয়ে পড়া গেল। আজ ৭৬ মাইল আসা গেছে—মিটারে উঠেছে ১৩৭৭।

ক্রমশঃ

হানাবাড়ী

শ্রী অক্ষয়কুমার সরকার

সরকারী চাকরির বদ্‌লির তোড়ে যেবৎসর আমি বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে ভাগিরথীর কূলে নিক্ষিপ্ত হই সেটা একটা অতিবৃষ্টির বৎসর। তখন সে সহরে ষ্টেশন হয় নাই, কাজেই আগের ষ্টেশনে নামিলাম। সেখানে নামিয়াই বোধ হইল যেন রেলগাড়ির গ্যাসের আলোকে উজ্জ্বল কামরাটি ঘনবর্ষণের অন্ধকার-দূরপ্রয়াসী ষ্টেশনের ক্ষীণপ্রাণ তৈল-বর্ত্তিকাগুলিকে বিদ্রূপ হাস্যে স্তিমিত করিয়া দিয়া দীপ্তদর্পের সহিত চলিয়া গেল।

তাহার পর বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর আমি আমার কর্ম্মস্থলের চাপরাশি গণি মিঞাকে পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেলাম। বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে এবং আমার একটা সাধারণ-যাত্রী-অসুলভ ব্যবহারে বিরক্ত মালবাবুটি কতকটা গয়ংগচ্ছ করিয়া অবশেষে পরিচিত গণি মিঞা'র খাতিরেই বোধ হয়, আমার যৎসামান্য লগেজ ডেলিভারি করিয়া দিলেন।

তাহার পর—সহরের স্বনামধন্য ছ্যাকড়া গাড়ির পালা। সে পালার অর্থ ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কাহারও সম্যক্ অনুধাবনের বিষয় নহে। সেকালে রাত্রি আটটার পর যদি কখনও কাহাকে ষ্টেশনে নামিতে হইত, তাহা হইলে তাহার পদব্রজে গমন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এখনকার ষ্টেশনের গতিকও অনেকটা সেইরূপই, তবে ট্যাক্সির নূতন আমদানিতে কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক গণি মিঞার সুপারিসের জোরে, আমার কাতর অনুরোধের ফলে, অথবা তিনটি মুদ্রার লোভে অনেকক্ষণ পরে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আস্তাবলের করিম তাহার শীর্ণ শাতার্ত্ত অশ্ব দুইটিকে পৈতৃক গাড়ীখানিতে যোজন করিল; আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে সিক্ত শরীরটিকে তাহার আঁধার গহ্বরে নিরুদ্বেগে নিক্ষেপ করিলাম। পর মুহুর্ত্তেই কিরূপে আমার সবুট দক্ষিণ পদখানি সেই ছক্কর যানের দুইখানা

কাষ্ঠখণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া জাঁতা কলে-পড়া মূষিকের অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তখন কিন্তু ভাবিবার মোটেই সময় ছিল না, করিম পরম উৎসাহে গাড়ি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমি তাহাকে চীৎকার করিয়া থামিতে বলিতেছিলাম। কতক্ষণ পরে যে আমার আর্ত্ত স্বর তাহাদের কাণে পৌছিয়াছিল তাহা ঠিক মনে নাই। কিন্তু যখন গণি মিঞা ও তাহার করিম চাচা গাড়ি হইতে নামিয়া আমার পিষ্ট আহত পা'খানি উদ্ধার করিল তখন দুর্ভোগের শেষ হইল বলিয়া যে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম তাহা মনে আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে রাত্রির দুর্ভোগের শেষ হইতে তখনও অনেক বাকী ছিল। কিছুদূর গিয়াই হঠাৎ গাড়িটা একদিকে হেলিয়া পড়িয়া থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ আলোকটি নিবিয়া গেল। গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া শুনিলাম গণি মিঞা বিরক্ত হইয়া করিমকে বলিতেছে, "আমারই ভুল, তোর গাড়ির চাকা দেখা হয়নি।" তখন বুঝিতে পারি নাই, পরে বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্যে বেশ উপলব্ধি হইয়াছে যে, এ অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে তাহার চক্রচারিটির পর্য্যবেক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন; অন্যথা অর্দ্ধপথেই শকট-যাত্রার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা।

গণি মিঞা ও আমি যে বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া করিমের চক্রোদ্ধার-পর্ব্বের সমাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, তাহার ঘনপত্রস্তরে সঞ্চিত জল বেশ বড় বড় ফোঁটার আকার ধারণ করিয়াই সশব্দে আমাদের মাথার উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরেই মাথা দুইটিকে ভিজাইয়া দিয়া জলধারা আমার ওয়াটার-প্রুফ এবং গণি মিঞার দীর্ঘ শ্মশ্রু দিয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল। রাস্তার দুই পার্শ্বের ঝাউগাছগুলির উপর দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে যে বাতাস বহিতেছিল, তাহা আমাদের অন্তরাত্মাকে পর্য্যন্ত শীতার্ত্ত করিয়া তুলিল। এমন সময় করিম আসিয়া জানাইয়া দিল যে, সে রাত্রিতে গাড়ি আর চলিবে না। সুতরাং সুটকেসটি স্বহস্তে লইয়া, হোল্ড-অলটি গণি মিঞার স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া আমরা দুইটি প্রাণী শ্রাবণ-নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকারের আবরণে ঝিল্লি-মুখরিত জনশূন্য জলপ্লাবিত পথ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ঘণ্টাখানেক এইরূপভাবে চলিয়া যখন আমরা সহরে গিয়া পৌছিলাম তখন সেখানকার সব দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মানব-সমাগমশূন্য রাজপথ ও তাহার দুই পার্শ্বে সারি দিয়া ডাচেদের আমলের উচ্চ অট্টালিকা-গুলি আমার পরিশ্রান্ত দেহের ভিতরকার অবসন্নপ্রায় মনটির উপর যেন একটা কোন অজানাকালের পরিত্যক্ত দৈত্যপুরীর কল্পনাচিত্র ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবলমাত্র পুরাতন সৈন্যাবাসের বাতায়ন দিয়া কয়েকটি আলোকবিন্দু জোনাকি-পোকার মত জ্বলিতে জ্বলিতে অধ্যয়নশীল কতকগুলি ছাত্রের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছিল।

আরও কিছুদূর যাইবার পর একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে গণি মিঞা তাহার মোটটি নামাইল। তাহার ভাবে বোধ হইল যে, সব্‌কারি চাপরাশির অগৌরবকর ভারটি দূর হওয়াতে তাহার মানসিক শান্তি ফিরিয়া আসিল। আমিও তাহার দেখাদেখি হাতের সুটকেসটি নামাইয়া সেখানে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বাড়ীটা এত উঁচু ও বড় যে তাহা যে আমার মত অভাজনের বাসের সঙ্গে কোনোরূপে সম্পর্কিত হইতে পারে, সে-ধারণা করিতে কিঞ্চিৎ সময় এবং বাক্য ব্যয় হইয়া গেল। অবশেষে, আমার যে সহকর্ম্মী মৌলভি সাহেবের স্থানে আমি এখানে আসিয়াছি, তিনি মোটে মাসিক ২০টি টাকা ভাড়া দিয়া এ বাড়ীতে থাকিতেন শুনিয়া এ সহরের বাড়ীভাড়ার সুলভতায় মোহিত হইয়া গেলাম।

সুপ্রশস্ত সদর দরজাটা খোলা ছিল। তাহারই মধ্য দিয়া অন্ধকারে গণিমিঞার অনুসরণ করিতে করিতে একটা বেশ চওড়া সিঁড়ি দিয়া দোতলার একটা ঘরে গিয়া পৌছান গেল, সেখানে ভিজা দেশলাইএর সঙ্গে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর আলো জ্বালা হইলে বিছানাটা পাতিয়া দিবসত্রয়-ব্যাপী নানারূপ যানে ভ্রমণের পর স্থায়ী আরাম লাভের সম্ভাবনা হইল।

গণিমিঞা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হুজুরের খানাপিনা ?" এই দুর্য্যোগের রাত্রে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একটু .কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হ'বে না। আমার সঙ্গে পাঁউরুটি আছে, তাতেই চ'লে যাবে। তবে কাল সকালে—"

"গিরীশবাবুর যে রাঁধুনিটা ছেড়ে গিছল, সে কাল সকালে আস্‌বে। আর মৌলভি সাহেবের চাকর ইবুকে আপনার জন্যে বাহাল রেখেছি, সে কোথায় গেছে এখনই আস্‌বে।"

অল্পক্ষণ পরে ইবু সেখ আসিয়া কৈফিয়ৎ দিল যে, সে হোটেলে খাইতে গিয়া জলের জন্য আটক পড়িয়াছিল। গণিমিঞা তাহাকে দুই-একটি কি কথা বলিয়া,—বোধ হয়, আমাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া বিদায় লইল। ইবু বিছানাটা ভাল করিয়া পাতিয়া মশারিটা টাঙ্গাইয়া দিল। আমি ইতিমধ্যে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া লইলে সে বলিল, "আমি নীচের ঐ ঘরটায় শোব ; আপনার দরকার হ'লে জানালা থেকে, দরজাটা না খুলেই ডাক্‌তে পারবেন। আর হাত মুখ ধোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে যাই, যদি রাত্রিতে উঠ্‌তে হয়।"

আশ্চর্য্য ! সামনের বারাণ্ডার পাশে যে জায়গাটায় সে আমাকে লইয়া গেল সেটা যেমন আমার পূর্ব্ব পরিচিত।

দেখিলাম, ইবু সেখটির বয়স হইয়াছে আর বোধ হয় সেই কারণেই সে বহুভাষী। আপ্যায়িত করিবার জন্য তাহার সংসারে কে কে আছে, এই রকম দু একটা কথা তুলিতেই তাহার স্মৃতির দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল এবং তাহা দিয়া সহরের অনেক পুরাতন কাহিনী অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। হায়দার আলির বংশধর প্রিন্স্ আমিন-উদ্দীন কখন প্রথমে এখানে আসেন, এখানে মাঠে সেকালে কিরূপে বরফ প্রস্তুত হইত, মল্লিক কাসিমের হাটে পয়সায় এককুড়ি কলা বিক্রয় হইত, ভান্তাড়ার ছাতুবাবু স্মিথ্ সাহেবের ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, প্রাণকৃষ্ণ হালদার কলেজের হলে নাচখানা করিয়াছিল এবং পাশের বাড়ীতে নোট জাল করিত, ইত্যাদি।

এইসকল পুরাতন কাহিনী শুনিতে শুনিতে উপস্থিত সময়ের বহু পূর্ব্বকালের একটা আব্‌হাওয়ার মধ্যে ঈষন্মাত্র তন্দ্রাবিষ্ট মনটা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। বারাণ্ডা-সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের একটা বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলিয়া যাওয়াতে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের চমক ও বজ্রের শব্দ মনটাকে আবার সজাগ করিয়া তুলিল।

"মর্, আবার জ্বালাতন কর্‌তে এলি !" ইবু সেখের কথা কয়টায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি ব্যাপার, ইবু ?" ইতস্ততঃ করিয়া আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সে অবশেষে বলিল, বাড়ীটার একটা বদনাম আছে। মাস কয়েক আগে যখন মৌলভি সাহেবের ছোট ছেলেটির ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার বিবি ইবুকে দিয়া পীরের দরগায় সিন্নি পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সে ছেলেটি বাঁচে নাই এবং তাহার পর তাহার মৃত্যুর পর হইতে অন্য ছেলেরা সময়ে সময়ে রাত্রিতে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। মৌলভি সাহেব সেইজন্যই বদ্‌লি হইয়া গেলেন।

কিসের বদ্‌নাম জিজ্ঞাসা করাতে ইবু বলিল, একটি স্ত্রীলোকের নাকি কোন কালে ঐ পাশের ঘরটায় অপমৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই মালিকের আদেশে ঐ ঘরটার দরজা দুইটা ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও ইবু কিছু বলিতে চাহিল না। দেওয়ালে টাঙ্গানো টেঁক-ঘড়িটির দিকে চাহিয়া রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আর তাহাকে পীড়াপীড়ি না করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ইবু চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কাহিনীগুলি আমার মনের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে-কালের সহরের নানা বিষয়ের ছবি আঁকিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে মনে পড়িয়া গেল সেই তরুণীটির কথা, যাহার এই পাশের ঘরটার ভিতর অপমৃত্যু হইয়াছিল। কিসে অপমৃত্যু ইবু তাহা বলে নাই ; আমি কিন্তু মনে করিলাম, আত্মহত্যা অপমৃত্যু ! আহা সে কত না মনোকষ্ট পাইয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল ! কিসের মনোকষ্ট ?—এত বড় বাড়ীর মহিলা—তাহার নিশ্চয়ই খাইবার পরিবার,

দাসদাসীর, অলঙ্কার-তৈজসের অভাব ছিল না। আর সে-সকলের অভাবে আত্মহত্যা কে করে? যে কারণে স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে—তাহার পক্ষে সেইরূপ নিশ্চয়ই কোন একটা কারণ ঘটিয়াছিল।

সে কেমন দেখিতে ছিল? এ বাড়ীর বধূ না কন্যা? বিধবা, সধবা না কুমারী? বয়স ছিল তাহার কত? ১৩ বা ১৪ বৎসর ত নয়ই, বোধ হয় কুড়িরও বেশী হইবে না। নিশ্চয়ই সে খুব সুন্দরী ছিল, এত বড় বাড়ীর হয়ত বা অধিকারিণী—সে কি কখনও কুৎসিৎ-কদাকার হইতে পারে? হায় রে, বুঝি বা মার দুলালী, প্রণয়ীর প্রিয়তমা, স্বভাবের সুষমা, সে অল্পবয়সে কি একটা অসহণীয় মনের ব্যথায় ক্ষণিকের উদ্ভ্রান্তিতে আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া এই অট্টালিকাকে শূন্য করিয়া অকালে চলিয়া গিয়াছিল!

শ্রাবণের ঘনবর্ষণমুখর নিশীথে তত বড় একটা বাড়ীর একটা ঘরে নিঃসঙ্গ তন্দ্রালস অবস্থায় কতক্ষণ ধরিয়া যে এইসকল কথা এলোমেলো ভাবে মনের উপর দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছিল তাহা বেশ মনে হয় না।

* * *

হঠাৎ চাহিয়া দেখি পাশের হলঘরটার বন্ধ দরজার একটা খুলিয়া গিয়াছে। সেখানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বহু-মূল্য গালিচার উপর এক ষোড়শী সুন্দরী এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান এক যুবক। যুবকের দীর্ঘায়ত দেহ। তাহার রক্তচক্ষু, অস্বাভাবিক বাক্যবিন্যাস, কম্পমান শরীর দেখিয়া বেশ বোধ হইল যে, সে প্রকৃতিস্থ নয়; কিন্তু তাহার সে অবস্থা অদম্য ক্রোধের বশে কিম্বা তীব্র মদিরার মাদকতায়,—অথবা ঐ উভয়েরই সংযোগে তাহা তখন ঠিক বোঝা যায় নাই। সে বলিতেছিল, "সুদক্ষিণা, আবার তোমার সঙ্গে দেখা! কতদিন পরে মনে আছে? এই তিন বৎসর আমার কি ক'রে কেটেছে ভেবে নিতে পার?"

সুদক্ষিণার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, "তুমি যা মনে করছ তার চেয়েও অনেক বেশী। জানি তুমি বিদুষী, বাঙ্গলা ছাড়া তোমার মুখে অনেক শুনেছি; পার্‌সী বয়েদও তুমি বেশ আওড়াতে; তোমার মন বাঙ্গালিনী-সুলভ কল্পনাকুশলও বটে; তবুও কিন্তু তুমি আমার তিন বছরের কারাবাসের স্বরূপ কল্পনা করতে পারবে ব'লে বোধ হয় না।"

সুদক্ষিণা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, তাহা কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না; তাহার ত্রস্ত অধরোষ্ঠ একটু মাত্র কাঁপিয়া থামিয়া গেল। যুবক কিন্তু আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার এই হাত দুটা দেখ ত। মনে আছে তুমিই বলেছ—'কি নরম তুল্‌তুলে!' আর এখন এই যে কড়া, এই যে দাগ এসব কিসের জান? ঘানিটানার ফল। আর এই যে পিঠের দাগগুলো দেখছ এগুলো বেতের—ওঃ কতদিন যে কোড়া খেয়েছি! আর এ কাটা কানটায় তোমার নজর পড়েছে কি? এটা তারা জেলে নিয়ে গিয়েই কেটে দিয়েছিল।" সুদক্ষিণার দৃষ্টি চকিতে একবার মাত্র উর্দ্ধমুখী হইয়া অবনত হইয়া গেল এবং তাহার শরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যুবক তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "শারীরিক কষ্টের কথা খুব মনে করি না—আমাদের রসময় কাল সন্ধ্যে বেলায় ঠিকই বল্‌ছিল'পীরিত বড় দায়। পীরিত করতে গেলে এসব সহ্য করতে হয়।'" একবার তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া যুবক আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "কিন্তু আমি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। এই বাঙ্গলা দেশে এসে তোমার পাল্লায় প'ড়ে আমার ইহকাল পরকাল দুইই গেল। মুসলমানের হাতের ধানেভাতে খেয়ে আরও কত কি তার সঙ্গে—আমার তিন বৎসর নরকবাস—"

সুদক্ষিণার ব্যথাকাতর চক্ষুর উপর হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়াতে সে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল। তাহার পর রুদ্ধপ্রায় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এই নরকবাস কার জন্য, সুদক্ষিণা? কে এর জন্য দায়ী বলতে পার?"

উচ্ছ্বসিত রোদনে সুদক্ষিণার উত্তর দিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সে বুকে হাত চাপিয়া গালিচার উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকের চক্ষু ক্রোধের স্থানে করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল। সে সুদক্ষিণার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথায়, কাঁধে পরম স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে মর্ম্মভেদী করুণ কণ্ঠে বলিল,

"কেন তুমি সে দিন তেমন মিছে কথা বলেছিলে, সুদক্ষিণা? যদি তুমি সেদিন সত্যকথা বল্‌তে তাহ'লে আজ---"

আমার ঘরে যে বাতিটা জ্বলিতেছিল হঠাৎ সেটা নিবিয়া গেল এবং একটা ইঁদুর কিচির-মিচির করিতে করিতে পায়ের কাছ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে হাত ড়াইয়া ভিজে-দেশলাই খুঁজিয়া তাহার কতকগুলা কাঠি নষ্ট হইবার পর আবার যখন আলোটা জ্বালা হইল তখন দেখিলাম, ঝড়-জলের পর প্রকৃতি যেরূপ তৃষ্ণীম্ভাব হইয়া থাকে সেই তরুণ-তরুণী দুইটির সেই ভাব। একটা বড় তাকিয়া ঠেসান দিয়া যুবক শান্তমুখে বসিয়া আছে; আর তাহার বুকে মাথা দিয়া, গলায় হাত ঝুলাইয়া, মুখে ম্লান-মৃদু-হাসি লইয়া সুদক্ষিণা তার দেহ-লতাটি পরম নির্ভরে এলাইয়া দিয়াছে। যুবক তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরম স্নেহে হাত বুলাইতেছে! বৃষ্টিটা আবার ঝাঁকিয়া আসিল, এবং জলসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস তাহাদের গায়ে গিয়া লাগাতে সুদক্ষিণা বলিল, "একবার ছাড়, দরজাটা দিয়ে আসি।"

* * * *

আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ পরে ঠিক মনে হয় না, হঠাৎ একটা আর্ত্তচীৎকারের তীব্রস্বরে জাগিয়া উঠিতেই দেখিতে পাইলাম, "মেরো না মেরো না" বলিতে বলিতে, হলঘরের দরজাটা খুলিয়া আলুথালু বেশে সুদক্ষিণা যেন প্রাণের দায়েই আমার ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, "ব্যাপার কি?" কিন্তু সুদক্ষিণার অর্দ্ধাবৃত দেহের উপর দৃষ্টি পড়াতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; মনের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। এই কতক্ষণ আগে যাহাকে এত সুন্দর সুপুষ্টদেহ দেখিয়াছিলাম, নবীন-যৌবনের কান্তি যাহার দেহযষ্টিকে স্নিগ্ধ শ্রীতে মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল, সে কিরূপে এই অল্প সময়ের মধ্যে এইরকম শুষ্ক, শীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হইল!

আমার চিন্তা অর্দ্ধপথে শেষ করিয়া দিয়া আতঙ্কিতা সুদক্ষিণা ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "আসবে না ত? দরজাটা ঠিক বন্ধ হ'য়েছে ত? একবার উঠে দেখনা।"

দরজাটা বেশ ভাল করিয়াই বন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া বলাতে সুদক্ষিণা আশ্বস্ত হইয়া মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "এই দেখনা বুকে ছুরির দাগ, একটুমাত্র চিরে গেছে আর-একটু হ'লেই কিন্তু—"। তাহার হাড়জির-জিরে বুকের উপর স্থাপিত অঙ্গুলির নির্দ্দেশে দেখিতে পাইলাম--- সেখানে অতি সূক্ষ্ম একটু রক্তরেখা।

আমি বোধ হয়, আঘাতকারী সম্বন্ধে কি একটা কটূক্তি করিয়াছিলাম। সুদক্ষিণা একটু ম্লান অমানুষিক হাসি হাসিয়া যেন তাহার সাফাইএর জন্য বলিল, "না, তেমন নয়। খুব ভালবাসে, তবে নেশা কর্‌লে জ্ঞান থাকে না কিনা—"

"হতভাগা এমন নেশা করে কেন তবে?"

"আমারই কপাল-দোষে! আগে ত কোন নেশাই কর্‌ত না!"

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে "জানত, ওর তিন বছর জেল হ'য়েছিল। সে আমি মিথ্যে এজাহার দিয়েছিলুম ব'লেই না"—বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুদক্ষিণা থামিয়া গেল। তেমন দীর্ঘনিশ্বাস কখনও দেখি নাই। ভাবিলাম, ঐ ছোট বুকটির ভিতর অত বাতাস জমিয়াছিল কিরূপে!

আমার কৌতূহলের অনুনয়ে সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "ঐ যে সামনের বাড়ীটা দেখ্‌ছ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলিয়া বাহিরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু কই, সেখানে ত কোনও বাড়ী নাই। একটা উঁচু পোতা এবং তাহার উপর কতক গুলা সে-কালের ছোট ছোট ইট। সুদক্ষিণা কিন্তু নিঃসঙ্কোচে কল্পনার প্রাসাদ গড়িয়া তাহার কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল, "ঐ যে দক্ষিণ দিকের একতলা কুঠরিটা দেখ্‌ছ, ঐ ঘরটায় আমার মা থাক্‌ত আর ঐ ছোট পাশের চালাটায় আমাদের রান্না হ'ত। ঐ উঠানটায় কিন্তু কারও আস্‌বার যো ছিল না। এমন-কি আব্‌দুলেরও নয়—"

"আব্‌দুল কে?"

"কেন আমার দাদা।"

"তুমি মুসলমান?"

"দূর ! তা কেন, আমি বামুনের মেয়ে।"

"কি রকম ?"

"আবদুল আমার দাদু---বদরুদ্দীন মিঞার ছেলের ছেলে। বদরুদ্দীন মিঞা যেদিন আমার মাকে বোম্বেটের নৌকা থেকে উদ্ধার ক'রে আশ্রয় দেন, সেই দিন থেকেই মা তাঁকে বাবা বল্‌তে কিনা।"

"তখন তুমি কত বড় ছিলে ?"

সুদক্ষিণা বলিল, "তার ছয়মাস পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই। মার মুখে শুনেছি পলাসীর ঘিয়া নদীর পতিদুর্গার ঘাটে তিনি যখন ভোরবেলায় স্নান করতে যান সেই সময় বোম্বেটেরা তাঁকে জোর ক'রে তাদের নৌকায় তুলে নিয়ে আসে। সেখানে ঘোলঘাটের কাছে পরের দিন ভোরের বেলায় তার কান্না শুনতে পেয়ে, বদরুদ্দীন মিঞা মাকে আশ্রয় দেন।"

"তার পর কি হ'ল ?"

"তার পরে হ'য়েছিল ফিরিঙ্গিদের ধ্বংস। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা বড় বোম্বেটে হ'য়ে পড়েছিল। তারা অতর্কিতে পাড়াগাঁ থেকে সুন্দরী মেয়েদের, জোয়ান ছেলেদের ধ'রে এনে দাস ব্যবসায় চালাত। তারা যে এইরূপে বাঙ্গালার কত সোনার-সংসার ছারখার করেছিল, কত স্বামীকে স্ত্রীহীন,কত শিশুকে মাতৃহীন, কত পিতাকে কন্যাহীন, কত ভ্রাতাকে ভগিনাহীন করেছিল, তার সংখ্যা ছিল না। কিন্তু আমার মাকে ধ'রে আনাই তাদের কাল হ'ল। বদরুদ্দীন মিঞার তখন বয়স হ'য়েছিল, রক্তও অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়েছিল। কিন্তু যখন আমার মাকে সমাজের ভয়ে আমার বাবা ফিরিয়ে নিল না, তখন আমার দুখিনী-মার কান্না দেখে আফজল মামা একটা কটু প্রতিজ্ঞা করে বসল—"

"সে আবার কে ?"

"আবদুলের বাবা বদরুদ্দীনের ছেলে। সে ফৌজদারের সিপাহিদের মনসবদার ছিল। বাঙ্গালা বোম্বেটেদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য সে আগ্রাতে সাজেহানের দরবারে পরওয়ানা আনতে গেল ; পরওয়ানাও এনেছিল।"

"তার পরে কি হ'ল ?"

"তুমি বুঝি বাঙ্গালার ইতিহাসের একপাতাও পড়নি কখনও ?"

খোঁচাটা খাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, "বোধ হয় ভাল ক'রে পড়িনি। কেননা তোমার দাদু বদরুদ্দীনের বা তাঁর ছেলে আফজলের কথা মনে হয় না।"

"হাঁ, তোমাদের ইতিহাস ঐরকমই। যারা প্রকৃত বীর, যারা কাজ করে তাদের নাম লেখে না। যারা সেই কাজের জন্য বাহাদুরি নিতে চায়, তাদের বর্ণনায় ভরা।"

"তা তোমার ইতিহাসই বলনা শুনি।"

"আমি কোনও ইতিহাস প'ড়ে শিখিনি। কিন্তু আমার দাদুকে কতবার আপন মনে বলতে শুনেছি 'তেমন সুদিন আর কখনও হবে না---বেটা সহিদ মুলুকের দুষমন ফতে।' আর মার মুখে শুনেছি পর্ত্তুগীজদের দুর্দ্দশার কাহিনী। বাঙ্গলার নরনারীর উল্লাসের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতার ধিক্কার ও অভিশাপে সমাচ্ছন্ন সেই হতাবশিষ্ট পোর্ত্তুগীজ নরনারীর, যাজক-যজমানের, বালক-বালিকার বন্দী অবস্থায় সুদূর রাজধানীতে যাত্রা।"

"আফজলের কি হ'ল ?"

"শোন না। মা বলত, সেদিন সহরে উল্লাসের আলো জলেছিল, হিন্দুর শঙ্খধ্বনির সহিত মুসলমানের নাগাড়ার আওয়াজ জড়াজড়ি ক'রছিল। [illegible] তারই মধ্যে দিয়ে হ'য়েছিল একটা হৃদয়ভেদী শোকের [illegible] আফজল মামার সমাধি-যাত্রা। সূক্ষ্ম শ্বেত মস্‌লিনের [illegible] পুষ্পবৃষ্টির স্তূপে আচ্ছন্ন সেই দীর্ঘ বরবপুর অনুগমন করেছিল সেদিন লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমান !"

সুদক্ষিণার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিলাম, "আচ্ছা এখন তোমার কথা বল শুনি।"

সে যেন একটু লজ্জিত হইয়া মেঝের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,"এ পোড়া-কপালীর কথা আর কি শুনবে ?" তাহার পর আবার কি ভাবিয়া বলিল, "তা তোমাকে বলব। তুমি ত আমার বাবার দেশের লোক—তোমার বাড়ী ত পলাসী—"

আমি বলিলাম, "হাঁ, কিন্তু তুমিত সেখানে কখন যাও নাই।"

"তা হোক্। তবুও আমার বাবার গ্রাম !"

"আচ্ছা, যা বল্‌ছিলে, বল।"

"ওর বাবা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। গুজরাট থেকে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ব্যবসা-সূত্রে বাঙেলে প্রথমে আসেন। তারপরে অনেক টাকা উপায় হ'লে গঙ্গার কূলে এই সুন্দর জায়গাটি পছন্দ ক'রে এই বড় বাড়ীটা তৈয়ারি ক'রে এদেশে স্থায়ী হ'বার বাসনা করেন। আমি তখন খুব ছোট কিনা, বাড়ীটা যখন হয় একটু একটু মনে আছে—"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "ও ত তখন খুব ছোট ছিল—"

"ও কে?"

"যাও! তা হ'লে বল্‌ব না। তুমি যেন কিছু বোঝ না!"

ঘরের ভিতরটার সেই দৃশ্যটা মনে পড়িয়া গেল। এই চিরন্তনী ব্যাপারটার যে কিছু কিছু না বুঝিতেছিলাম তাহা নহে। বলিলাম, "নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম।"

"ছিঃ, হিন্দুর মেয়ের বল্‌তে আছে কি?"

"সত্যিই কি ও তোমার স্বামী? তোমাকে বিবাহ করেছিল?"

সুদক্ষিণা অকস্মাৎ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুর উপর তীব্র ভর্ৎসনার অসহনীয় জলন্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বল্‌তে জান না, আমাকে মনে করেছ কি?"

আমি অনুনয় করিয়া তাহার কাছে মাফ চাহিলাম এবং সাফাইএর জন্য বলিলাম, "তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নাই কেন?"

"সে ত সোনা মামী, আবদুলের মা, সেদিন জোর ক'রে সাবান দিয়ে ধুয়ে পুঁছে দিয়েছিল।"

"কেন?"

"শোন না, বল্‌ছি। অনেক কথা—একবারে কি বলা যায়?"

"বল।"

"ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে আমার ভাব। ঐ সামনের ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ফুলবাগানটায় একদিন ভোরে সেঁজুতি ব্রতের ফুল তুল্‌তে এসে ওদের দরওয়ান চৌবের হাতে ধরা পড়ি। সে যখন আমাকে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাচ্ছিল, ও তখন ওই বড় উঠানটায় মুগুর ভাঁজ্‌ছিল। আমার দুর্দ্দশা আর কান্না দেখে চৌবেকে ধমক দিয়ে হুকুম দিলে আমার যখন ইচ্ছে বাগানে এসে ফুল তুল্‌ব, মালি আমার হুকুম তামিল করবে, তাকে যখন যে ফুলটা তুলে দিতে বল্‌ব দিতে হবে। আমি ত একটা গরীব অনাথার মেয়ে, কিন্তু কি দয়া!"

সুদক্ষিণার স্বর গভীর প্রেমের ভাবের মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল। এই সময় মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই তাহার কাঁধের উপর একটা নির্ম্মম বেত্রাঘাতের দাগে নজর পড়াতে বলিয়া ফেলিলাম, "দয়ালু বটে!"

সুদক্ষিণা, তাহার ছোট ডুরে কাপড়খানির যে আঁচলটা মেঝেতে লুটাইতেছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া, সেই দাগটা চাপিয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল, "নেশা কর্‌লে কি কারও জ্ঞান থাকে? তুমি যদি অমন নেশা কর, তোমার ঘরের লোকের আমারই মতো—"

আমি খোঁচা খাইয়া রাগিয়া গিয়া বলিলাম, "আমি অত ইতর নই। অমন নেশা—"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া যেন করুণায় গলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া উঠিল, "ওর মত যদি তুমি দুঃখ পেতে! আহা!"

তাহার কথার সেই আগের জায়গায় আবার ফিরিয়া আসাতে আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, "কি রকম তাই বল না শুনি।"

"সেই ছেলেবেলা থেকেই যে আমাকে কি সোনার-চক্ষে দেখেছিল! ওর বাবার মৃত্যুর পর যখন অসীম ঐশ্বর্য্যের স্বাধীন মালিক হ'ল, তখন আমার দাদুর কাছে এদের মিশ্রকে দিয়ে গোপনে আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠালে। দাদুর সেদিনের মত আনন্দ কখনও দেখি নাই। তিনি বামুনের ঘরে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছিলেন কিনা। আর আমার মাও যেন হাতে স্বর্গ পেলেন—"

সুদক্ষিণার মুখের উপর চাহিয়া বলিলাম, "আর তুমি?"

সে লজ্জার মৃদু-হাসি হাসিয়া যেন সুখের-সাগরে

ভাসিতে-ভাসিতে বলিল, "যাও তুমি বড় দুষ্ট। আমি আর তা হ'লে কিছু বল্‌ব না।"

আমি আর তাহাকে না ঘাঁটাইয়া বলিলাম, "আচ্ছা বল, আমি আর কথাটি ক'ব না।"

"তার পর আর বল্‌বার বড় কিছু নেইও। সুখের স্বপ্ন দু'দিনেই ভেঙ্গে গেল। কে ওর জ্ঞাতি-কুটুম্বকে খবর দিয়েছিল যে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে ক'রে জাত দিচ্ছে। কাশী থেকে ওর ঠাকুর-মা তাড়াতাড়ি এসে পড়ল—"

"বুঝেছি, তার পর এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘ'টে থাকে তাই হ'ল, তারা এসে ওর মত ফিরিয়ে দিয়ে বে ভেঙ্গে দিলে—"

"তুমি কিছুই বোঝনি। তেমন নয়, তা'হলে বোধ হয় ভাল হ'ত। আমার যাই হোক, ওর এমন দশা হ'তনা, সুখে থাকৃত।" বলিতে বলিতে সুদক্ষিণা কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল, "সেই মেড়ুয়ানী যখন নাতিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছুতেই পেরে উঠ্‌লে না, তখন মাকে ডাকিয়ে যা বলেছিল, তা কারও কাছে বল্‌তে এতদিন পরেও আমার যেন মাথা কাটা যায়। বল্‌লে কি জান, তোমার মেয়ের সঙ্গে সাদি'ত হতে পারে না, তবে ওর যখন এত ঝোঁক আর তোমার মেয়েরও যখন ওর সঙ্গে এত আস্‌নাই হয়েছে শুনছি, তাকে আমরা চন্দননগরের বাগান-বাড়ীতে রেখে দিব, সেখানে সুখে থাকৃবে।"

আমি সুদক্ষিণার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহা ঘৃণায়, ক্ষোভে কালি হইয়া গিয়াছে। একটু থামিয়া সে বলিয়া যাইতে লাগিল—"মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীতে ফিরে এল। তার পর আবদুল—তখন দাদু ম'রে গেছেন আবদুল ভাইই অভিভাবক—রেগে যায় আর কি? সে বল্‌লে ওকে খুন করব, ওই মেড়ুয়াবাদী কাফেরদের বালবাচ্ছা একগাড়ে গাড়্‌ব। মা আর সোনা-মামী অনেক বুঝিয়ে তাকে থামালেন; আমার উপর কিন্তু হুকুম হ'ল যেন ভুলেও কখনও ওদের বাড়ীর দিকে না তাকাই। ওঃ তখন আমার"—বলিয়া সুদক্ষিণা তাহার বুকের উপর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।

আমি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দৃষ্টি নীচের দিকে নামাইয়া কুণ্ঠার হাসি হাসিয়া অতি মৃদুস্বরে সুদক্ষিণা উত্তর করিল, "একদিন রাত্রিতে যখন মা ঘুমিয়েছে, ঐ বাগানে ওর পাশে এসে দাঁড়ালুম। আমাদের যে এইরকম একটা ষড়যন্ত্র আবদুলের ছোট বোনের সাহায্যে চল্‌ছিল, তা কেউ সন্দেহ কর্‌তে পারেনি।"

আমার কপালটা কুঞ্চিত হ'তে দেখে তাহার সঙ্কোচ কোথায় চলিয়া গেল! সে একটু তীব্রতার সহিতই বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝতে পার্‌বে না! যারা কখনও যথার্থ ভালবাসেনি, তারা এসব বোঝেও না। আয়েষাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিল যদি আমি না আসি পরের দিন বাগানে ওর মৃতদেহ—" হঠাৎ সুদক্ষিণা শিহরিয়া উঠিয়া থামিয়া গিয়া আবার বলিল, "সেখান থেকে একটা বজরা ক'রে আমরা চন্দননগরে গিয়ে উঠি। আগে থেকেই পুরুত, নাপিত ঠিক ছিল,ভোরের একটু আগেই আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল।'

জানি না কেন এতক্ষণ পরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর?"

তিনটি দিন যে কি সুখে কাট্‌ল! চারদিনের দিন ফৌজদারের পরওয়ানা আর বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবদুল দাদা আমাদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এল। শুন্‌লুম মা গঙ্গায় ডুবে মরেছেন, আর তার আগে আবদুলদাকে ব'লে গেছেন, "মেয়েটাকে যেমন করে পারিস ধ'রে এনে তুষানলে পুড়িয়ে মারিস্ বাবা, হিন্দুর মেয়ের ঐ একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! তিনি ত জান্‌তেন না যে—"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "ঠিক! তারপর?"

"তারপর কি আর? পরদানশীন ব'লে আমাদের বাড়ীতেই ফৌজদার সাহেব এলেন। বিচারের সময় সেখানে ছিলাম আমি, ও, আর আবদুল। আমি এজাহার দিলাম ও দরওয়ান দিয়ে আমাকে জোর ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে চন্দননগরের বাগান-বাড়ীতে রাখে—"

"কি ক'রে তোমার মুখ দিয়ে এমন মিছে কথাটা বেরিয়েছিল?"

"তা এখনও আমি ঠিক মনে করতে পারি না। তবে তার আগে তিনদিন আমি জলগ্রহণ করিনি, সোনা-মামীকে বলেছিলুম, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে আব্‌দুলদার পা জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলুম, ওগো তোমরা আমাকে আমার স্বামীর কাছে যেতে দাও। কিন্তু তারা শোনেনি। কেবল আমাকে ঐ কথা বল্‌তে শিখিয়েছিল। তাদের কথায় কিন্তু রাজী হইনি। ফৌজদারের সাম্‌নে এসে ওর শুক্‌নো মুখখানি দেখে কিন্তু মনে পড়ে গেল ওর উকিল সকাল-বেলা এসে আমাকে যে সর্ব্বনেশে কথাটা ব'লে গিছ্‌ল! সে কথাটা কি জান? যদি আমি ওর সঙ্গে বিয়ের কথা বলি তাহ'লে ওকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে, ঐকথা অস্বীকার কর্‌লে সামান্য সাজা দিয়ে ছেড়ে দেবে—"

"এমন অসম্ভব কথা তুমি বিশ্বাস করলে?"

সুদক্ষিণা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমিও সেদিন থেকে তাই ভাব্‌ছি!"

"তার পর কি হ'ল?"

"কথাটা ব'লেই যখন আমার স্বামীর দেহটাকে দুলে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম—না গো সব মিথ্যে, শেখান কথা! আমি নিজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম---চন্দননগরে গিয়ে আমাদের বিয়ে—কিন্তু ও চেঁচিয়ে উঠে আমার কথা ডুবিয়ে দিয়ে নিজের ঘাড়ে সব অপরাধ তুলে নিতে লাগ্‌ল—"

"বিচারে কি হ'ল?"

"তিন বৎসর কারাবাস।"

"আবার তোমার স্বামীর কাছে ফিরে এলে কি ক'রে?"

"বল্‌ছি। তখন আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম। তার পরে পাগল হ'য়ে যাই। অনেক চিকিৎসায় ও যত্নে দুই বছরের পর যখন ভাল হ'লুম, কাকেও জান্‌তে দিইনি। তার পর ও জেল থেকে ফিরে এলে একদিন দুপুর-বেলা সেই বাগানে আবার এসে ওর পায়ের উপর পড়লুম। পাড়ার লোককে ডাকিয়ে এনে, হিন্দু-মুসলমান সকলের সুমুখে বল্‌লুম, আমি নিজেই বেরিয়েছিলুম। এখন আবার ওর আশ্রয়েই থাকব।"

"বিয়ে হ'য়েছিল বলেছিলে?"

"না, ও সেকথা বল্‌তে চেয়েছিল, আমি মাথার দিব্য দিয়ে নিবারণ ক'রে বল্‌লুম, "না, সমাজে তোমার মাথা হেঁট হবে সে আমার সইবে না।' তারপর দুজনে এই বাড়ীতে বহুকাল ধ'রে পরমসুখে বাস কর্‌ছি—"

* * *

আমি হাসিয়া বলিতে যাইতেছিলাম, "তুমি আদ্যি-কালের বদ্দিবুড়ী; কতকাল ধ'রে এই বাড়ীতে বাস কর্‌ছ, বল্‌ছ; বয়স ত তোমার দেখছি উনিশ কি কুড়ি—"

আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া ইবু হাঁকিতেছিল, "হুজুর, অনেক বেলা হ'য়েছে।"

তাহার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলাম, যথার্থই অনেক বেলা হইয়াছে।

সেদিন শনিবার ছিল। কর্ম্মস্থানে নামমাত্র যোগ দিয়া বিকালের ট্রেনে যখন দেশের বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম তখন একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। নিজের জেলায় বদলি হইবার চেষ্টা সফল হইয়াছে জানিয়া সকলেই আনন্দিত।

সন্ধ্যার পর মার কাছে বসিয়া যখন তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে বাড়ীটায় বাসা লইয়াছি তাহার বর্ণনা করিলাম, তিনি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ও বাড়ীটায় কিন্তু ছেলে-পুলে নিয়ে যাওয়া হবে না, ওতে উপদেবতা—"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

মা বলিলেন, "তোর মনে নেই তখন তুই বছর তিনেকের। তোকে একবার কুকুরে কাম্‌ড়ে ছিল। গৌদল-পাড়ায় ওষুধ খাওয়াবার জন্যে ঐ বাড়ীতে তোর এক সম্পর্কে মাসী থাকৃত, তার কাছে আমরা চার দিন ছিলুম। তখন শুনেছি ঐ বাড়ীর একটি মেয়েকে কে ছুরী মেরে মেরে ফেলেছিল।" ভাবিলাম, তবে আত্মহত্যা নয়।

রাত্রিতে স্ত্রীর কাছে সুদক্ষিণার গল্প করাতে সে বলিল, "তোমার সুটকেসের ভিতর দেখলুম, পুরানো হুগলি সম্বন্ধে টইলবি সাহেব, হাণ্টার সাহেব, শম্ভুচন্দ্র দে এঁদের সব বই রয়েছে। তার কোনটায় ওরকম কিছু আছে নাকি?"

আমি বলিলাম, "কই না।"

নারীদের চারু ও কারু শিল্পশিক্ষা

শ্রী শান্তা দেবী

আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক একথা এদেশের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার আর প্রয়োজন নাই। এদেশের পুরুষের শিক্ষা পুরুষকে প্রকৃত মানুষ ও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে না; সেই একই শিক্ষাপ্রণালী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মেয়েদেরও একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং তাহা যে তাহাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা-পথে বিশেষ উজ্জ্বল আলোক পাত করে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার নানাদিকে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার প্রয়োজন; আমি তাহার একটি দিক্ মাত্র লইয়া আলোচনা করিব।

প্রথমত দেখিতে হইবে, কি কারণে আমরা শিক্ষা চাই। শিক্ষায় মানুষের চিত্তের প্রসার হয়, মানসিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, হিতাহিত জ্ঞানবোধ হয় ও উপার্জ্জন করিবার এবং অন্য উপায়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার শক্তি বাড়ে। মোটামুটি এই কয়টি কারণেই আমরা শিক্ষা চাই। পুরুষের মত মেয়েদের বেলাও আমরা চাই যে, শিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের মন গৃহকোণের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিতে শিখুক, নানা সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হউক, এবং সকলপ্রকার মঙ্গল অমঙ্গল, কল্যাণ অকল্যাণ, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতার প্রভেদ বুঝিতে পারুক। শুধু তাই নয়, শিক্ষার গুণেই তাহারা অমঙ্গল, অকল্যাণ ও কদর্য্যতাকে দূর করিয়া মঙ্গল, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে ইহাও আমরা চাই। আমরা চাই, শিক্ষা তাহাদের গৃহসংসারের শত সমস্যা সমাধানের সহায় হউক। দারিদ্র্য যে সংসার-সমস্যার একটি প্রধান কারণ তাহা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং শিক্ষা মেয়েদের উপার্জ্জনক্ষম করুক এ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও হয়ত সকলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিবেন না।

আমাদের দেশে মেয়েদের যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এইসকল উদ্দেশ্য একেবারেই সাধিত হয় না বলিতেছি না। কিন্তু যেমন করিয়া হওয়া উচিত তেমন হয় না। শিক্ষার বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্র নানা জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-সম্ভার লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে অথচ আমাদের মেয়েদের তাহাতে কোনো অধিকার নাই। স্কুল ও কলেজে জীবনের ১৬।১৭ বৎসর কাটাইয়াও এই অঙ্গহীন শিক্ষা লইয়া মেয়েরা সংসারপথে পা দিতেছে। যাহাদের শিক্ষা ৭।৮ বৎসরেই শেষ হইয়া যায়, সে-সব মেয়ের কথা ত ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।

আমি সঙ্গীত, নাট্যকলা, শুশ্রূষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশু-পালন, দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা তুলিব না। কেবল চিত্রাঙ্কণ, ভাস্কর্য্য, নানাজাতীয় মণ্ডনশিল্প (decorative art) ও কুটীরশিল্পাদির বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াই বিদায় লইব।

সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি শিশুকাল হইতেই মানুষকে পড়ানো হয়, কেননা সৎসাহিত্য ও নানা জাতির ইতিহাসের সাহায্যে মানুষের মন বিশ্বের সহিত পরিচিত হয় ও আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হয়; তাহার দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি বর্দ্ধিত হয়, সে মানব-মনের সহস্র সুখ-দুঃখের অনুভূতি বুঝিয়া আপনার অন্তরে তাহা ক্রমে অনুভব করিয়া চিত্তকে বহুমুখে প্রসারিত করিতে পারে। চিত্রাঙ্কণাদি ললিত-কলাও যে আমাদের সেই শিক্ষার অতি বড় সহায় তাহা হয়ত বলিবামাত্র সকলে বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বোঝা যায়।

চিত্রশিল্পীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কতখানি তাহা সামান্য দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যায়। আমরা সকলেই গাছ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দেখি। কিন্তু মাটির কোল হইতে গাছটি কি ভঙ্গীতে কেমন করিয়া ওঠে, তাহার ডাল-গুলি কোন্ ছন্দ ও নিয়ম মানিয়া চলে, পাতা, ফুল ও ফল

গুলি কেমন করিয়া ডালের গা হইতে বাহির হয়, পাতার শিরা কি ভাবে কোন্ মুখে মধ্য শিরার গা হইতে বাহির হয়, গাছের তলার পাতা ও উপরের পাতার রঙের কতখানি তারতম্য, সমস্ত গাছটির সীমা-রেখার কি রূপ এ সমস্ত কথা আমাদের কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কিছুই হয়ত বলিতে পারিব না। মানুষকে মানুষ যেমন করিয়া যত নিকট হইতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ দেখিতেছে এমন কাহাকেও সে দেখে না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাহার অতি নিকটতম আত্মীয়ের কপালের গড়ন, চোখের কাট, ওষ্ঠরেখা, কিম্বা গ্রীবাভঙ্গী কিরকম জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিবে? হয়ত বলিবে কপাল বড়, কিন্তু কপাল কোন্ দিকে ঢালু, তাহার কোন্ খানটা উঁচু, তাহার কেশ-রেখা কোনখান্ হইতে কি ছাঁদে সুরু হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন না। চোখ গোল যদি বলে আপনি বুঝিবেন যে, একেবারে বৃত্তাকার চোখ হয় না; কিন্তু গোল কথাটি হইতে ঠিক অর্থও বোঝা যায় না।

এসকল কথা যে কেবল অশিক্ষিত মানুষ সম্বন্ধে খাটে তাহা নয়, অতি সুশিক্ষিত মানুষকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, এইরূপই উত্তর পাইবেন। সুতরাং সাধারণ শিক্ষায় মানুষের দৃষ্টিশক্তি যে কি-রকম অকেজো থাকে তাহা দেখাই যাইতেছে; ইহাতে বিশ্বের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একটা দ্বার রুদ্ধ থাকিয়া যায়।

কিন্তু চিত্রশিল্পী যে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। সে জানে ঘাসের পাতার গড়ন কি রকম, তৃণ-পুষ্পের বর্ণ কিরূপ, জলের ঢেউ কি ছন্দে দোলে, গাছের পাতা কোন্ নীতি মানিয়া চলে, পাখীর ডানায় রঙের উপর রঙের খেলা কেমন করিয়া মিশিয়া যায়। মানুষের চোখের পাতা, চুলের গতি, ভ্রূর ভঙ্গী, অঙ্গুলি-লীলা, কাপড়ের ভাঁজ সকলই তাহার চোখে পরিষ্কার করিয়া পড়ে। বিশ্বের রূপ সে-ই দেখার মত করিয়া দেখে; এইখানে বিশ্বের সহিত তাহার পরিচয় নিবিড়তর। প্রকৃতির স্পর্শ সে তাহার প্রতিপাদক্ষেপে প্রতিদৃষ্টিতে পায়।

কাব্য পড়িয়া যে প্রকৃতিকে দেখিতে শিখে সে পরের ধারকরা দৃষ্টিতে ততটুকু মাত্র দেখে যতটুকু কবি তাঁহার লেখনীর মুখে ফুটাইয়াছেন এবং যতটুকু তাঁহার শব্দবিন্যাস পাঠকের মন স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু শিল্পশিক্ষা যে করে সে যখন প্রকৃতির যে-কক্ষে বিহার করে সে-কক্ষের প্রতিটি কণার সহিত তাহার মিতালি পাতাইতে হয়, না হইলে তাহার সামান্যতম সৃষ্টিও মিথ্যা হইয়া যায়। তাই দেখি কাব্যপাঠে পাশকরা নাম পাইয়াও ছাত্র-ছাত্রীর কল্পনাশক্তি যেখানে এক কণাও খোলে না, শিল্পশিক্ষার্থী সেখানে যত ছোটই হউক শিল্পী না হইয়া যায় না। তাহার শিক্ষার প্রতি পদেই পরীক্ষা। শিল্প-সৃষ্টির সাহায্যেই শিল্প-শিক্ষা অগ্রসর হয়, সুতরাং সে-সৃষ্টি যত কাঁচাই হউক তাহাতে তাহার অন্তদৃষ্টি কিছু পরিমাণে না খুলিয়া উপায় নাই। এইজন্যই তাহার মনঃসংযোগ, তাহার অধ্যবসায় ও তাহার ধৈর্য্য সাধারণ শিক্ষার্থী অপেক্ষা অনেক বেশী হয়।

বিশ্বের সৌন্দর্য্যই যাহার শিক্ষার বিষয় তাহার মানসিক সৌন্দর্য্য যে কিয়ৎপরিমাণেও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ কি! মেয়েদের আমরা বলি শ্রী। বিশ্বলক্ষ্মীর রূপ তাহারা যদি চোখ মেলিয়া দেখিতে না শিখিল তাহা হইলে তাহাদের গৃহের শ্রী ফুটাইবে কি করিয়া? বাহিরটা আমাদের দেশে হইয়াছে আপিস আদালত ও কারখানা এবং ঘরটা গুদাম ও সরাই। ঘর ও বাহির হইতে আমরা শ্রীকে নির্ব্বাসন দিয়াছি; কেননা আমাদের দেশের পুরুষের অবসর নাই, তাহাকে কারখানা ও আপিস-আদালতে চোখ বুজিয়া কলম চালাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে; আর স্ত্রীর সে শিক্ষা নাই; বিলাস বলিয়া সৌন্দর্য্যকে সভয়ে দূরে সরাইয়া সে কুশ্রীতাকে আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

পয়সা নাই বলিয়া বাঙালীর মেয়ের ঘরে আল্না নাই, দড়িতে কাপড় ঝুলিতেছে, কারণ কড়ির আলনা সে করিতে জানে না; কুৎসিত-ছবি-আঁকা সিগারেটের টিনের কৌটায় তার টুকিটাকি থাকে, কারণ সামান্য কাঠের কৌটাকে সুচিত্রিত করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে; ছেঁড়া ন্যাকড়া সেলাই করিয়া ছেলেকে সে শোয়ায়, সূচিশিল্পের সহিত তাহার পরিচয় নাই বলিয়া সে-সেলাইয়ে কোনো রূপ ফুটিয়া ওঠে না; সাবানের কাগজের বাক্সে তাহার টাকা-পয়সা সেলাই-ফোঁড়াই থাকে, কড়ির

ঝাঁপি কোথায় পাইবে? ঘর-সংসার সস্তা এনামেল ও এলুমিনিয়মের কুরূপ বাসনে ছাইয়া যাইতেছে, পিতল কাঁসা মাটি পাথরের জিনিষের গড়ন কাহাকে বলে সে বোঝে না বলিয়া। শিশুসন্তানকে দোকান হইতে কিম্ভূত কাটের জামা কাপড় পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া পরাইতেছে, কারণ শোভন সুন্দর পরিচ্ছদ অল্প আয়াসে সামান্য মূল্যে করিয়া দিতে শিখে নাই বলিয়া। ঘরের কোন্ জিনিষটা কোথায় কেমন করিয়া রাখিলে যে ভাল দেখাইবে সে বুদ্ধি ও সেই পরিমাণ দৃষ্টিশক্তিও তাহার খুলে নাই। সামান্য একটু রঙের ছোপ দিয়া দুটা ফোঁড় তুলিয়া কি তুলির টান দিয়া ঘর-সংসারের জিনিষগুলি সুদৃশ্য করিয়া রাখিবার শক্তিও তাহার হয় নাই। অথচ স্কুলে আট বৎসর সে হয়ত শিল্পশিক্ষার নামে দিনে দুঘণ্টা করিয়া বাজে খরচ করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সকলের আগে হয়ত শিখিল কম্‌ফর্টার্ বুনিতে, যাহার প্রয়োজন বাঙালীর ঘরে নাই বলিলেই চলে; অথবা বুনিল একটা আয়না-ঢাকা, কিন্তু ঘরে আয়নার বালাই নাই; কেহ বা পুঁথির হাতব্যাগ বুনিল জীবনে যা হয়ত কোনোদিনই তাহার কাজে আসিবে না। রঙের দিকে রূপের দিকে আগে চাহিতে শিখে নাই বলিয়া এসব জিনিষের কোনো সৌন্দর্য্যও নাই। হাতের কাছে যে কোনো রং পাইয়াছে একটার পর একটা গাঁথিয়া বুনিয়া চক্ষু পীড়াদায়ক উৎবট একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিয়াছে অথচ নিজে জানে না যে তাহা কেমন হইল। চিত্রাঙ্কণের ক্লাস আছে, কিন্তু খাতা হইতে নকল করা ছাড়া সেখানে কিছু হয় না, প্রকৃতির সঙ্গে কোনোই যোগ নাই। যে-চিত্র নকল করিতে দেওয়া হইল তাহা হয়ত ফরাসী কি জার্ম্মানীর, সুতরাং চিত্র দেখিয়াও প্রকৃতির কোনো রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা হয় না।

যাহাতে আমাদের দেশের মেয়ের কোনো কাজ হইবে না, অথচ যাহার জন্য পয়সা না খরচ করিলে চলে না এমন শিল্পশিক্ষার স্থান কখনই সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত নয়। ইস্কুলের ছোটমেয়েকে আগে কম্‌ফর্টার্ বুনিতে না শিখাইয়া যদি সুচিত্রিত কাঁথা সেলাই করানো যায় তাহা হইলে দরিদ্র পিতামাতার পয়সাও বাঁচে, একটা কাজের জিনিষও হয়। সখের বিদেশী শিল্প না বুঝিয়া করার আগে কাজের জিনিষ ঘরের জিনিষকে মেয়েদের মধ্যে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমাদের গৃহে শ্রী ফিরিয়া আসিবে।

আমাদের দেশের দারিদ্র্যসমস্যা মধ্যবিত্ত সকল পরিবারকেই প্রায় গ্রাস করিয়া আছে বলা যায়। কিন্তু স্বামীর চাকরীর পয়সায় টানাটানি পড়িলে অথবা দুই মাস চাকরী না থাকিলে স্ত্রীর করিবার কিছু নাই। সে কেবল অদৃষ্টকে দোষ দিবে। অদৃষ্টে দুঃখ না থাকিলে এমন ঘটিবে কেন, বলিয়া অবসরকাল মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইবে ও অনাহারে শুকাইবে। কিন্তু কোনোপ্রকার শিল্পকাজ যদি তাহার জানা থাকিত তবে সে কি ঘরে বসিয়াই দুই পয়সা আনিতে পারিত না? যে-মেয়ে দশ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাকেও এইরূপ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কেন? না, ঘরের বাহিরে গিয়া ইস্কুলে পড়াইয়া কি কেরাণীগিরি করিয়া টাকা আনিতে ত সে পারে না। আমি এখানে মানের কথা তুলিতেছি না। সংসারী মেয়ের পক্ষে ঘরের বাহিরে কাজ করিতে যাওয়া শক্ত বলিয়াই বলিতেছি। কিন্তু দশ বৎসরের বিদ্যাশিক্ষার সহিত যদি সে কোনো অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দিনে আধ ঘণ্টাও শিখিত ত ঘরে বসিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত। বিদ্যালয়ে সেরকম কোনো শিক্ষাই দেওয়া হয় না। শিল্পের নামে আজ একটা হাতব্যাগ বুনিতে, কাল একটা লেস তুলিতে, কি দশদিন একটা চর্‌কা ঘুরাইতে শিখাইয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক-একটি বিদ্যালয় যদি কোনো দুই-একটি গৃহ-শিল্প অবলম্বন করিয়া দশম শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত সেই দুটি একটি গৃহশিল্পকেই পাকা করিয়া মেয়েদের শিখাইয়া দেন তাহা হইলে রকমারী হয় না বটে, কিন্তু প্রত্যেক মেয়েরই একটি অর্থকরী শোভন শিল্প শেখা হয়, যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে কিছু কাজ সে করিতে পারে। সেইসকল বিদ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে মেয়েদের উপকরণ জোগাইতে খরচ কম হইবে, তৈয়ারী করিতে সময় কম লাগিবে, কিন্তু আয় একটু বেশী হইবে। আমার মতে চরকা তাহার মধ্যে পড়ে না। বিদ্যালয়ে যে-সব মেয়ে পড়ে, তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী

যে-রকম তাহাতে অবসরকালীন্ চরকা কাটার আয়ে তাহাদের কোনোই লাভ নাই। এখানে চরকা সখের শিল্প মাত্র। কিন্তু পরিচ্ছদ তৈয়ারী, স্থঁচি দিয়া পরিচ্ছদ চিত্রিত করা, কোনোরকম খেলনা তৈয়ারী, ভাল বই বাঁধা, গহনার কাজ, বেতের কাজ, ছোটখাট কাঠের কাজ, ইত্যাদিতে লাভ আছে। অন্তঃপুরের মেয়েদের খেলনা গড়িয়া মাসে ৩০্।৩৫্ ও পোষাক করিয়া ৬০্।৭০্ উপার্জ্জন করিতে আমি দেখিয়াছি। তাঁতের কাজেও লাভ আছে বটে, কিন্তু বাঙালীর ত একখানা মাত্র ঘর সম্বল, তাহাতে তাঁত বসিবে কোথায় আর তার সরঞ্জামের হাঙ্গামই বা চলিবে কোথায়? স্থতরাং তাঁত ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের ইস্কুলে শিখাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

এবিষয়ে খুঁটাইয়া বলিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু সময় নাই। স্থতরাং সামান্য ছুই চারি কথায় যাহা বলিতে চাহিয়াছি তাহা অস্পষ্ট ও অঙ্গহীন হইয়াছে বুঝিলেও প্রতিকারের উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথামাত্র বলিয়া শেষ করিব। মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী অসহায় একথা বলিয়া দিতে হইবে না। শারীরিক শক্তি ও সন্তান-পালনাদির জন্য তাহাদের জীবনযাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরই নির্ব্বাহ করিতে হয়। তা ছাড়া সন্তানের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর বলিয়া জীবন তাহার আরো জটিল। স্থতরাং দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িলে মেয়েরা যাহাতে আপনার ঘরে বসিয়া আপনার অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে এমন শিক্ষা প্রত্যেক মেয়ের হওয়া উচিত। যে-বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে সে যেমন বাংলা ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে শিখিবে ইহা নিশ্চিত, তেম্‌নি সে কোনো একটি কারুশিল্প কি কুটীরশিল্প পাকা রকমে শিখিবে ইহাও নিশ্চিত হওয়া উচিত। ধরিতে হইবে যে, একটিও অর্থকরী কারুশিল্প যে বিদ্যালয়ে শিখানো হয় না তাহা বালিকা বিদ্যালয় নামের উপযুক্ত নয়।

এই কারণে আমাদের দেশের কত রকমের কারু ও কুটীরশিল্প আছে এবং তাহাদের ভিতর কতগুলিকে মানুষ কাজে লাগায় এবং অর্থ দিয়া সংগ্রহ করে তাহা জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া জানা উচিত। তার পর তাহার ভিতর কতগুলি গৃহস্থের মেয়েরা বেশী পয়সা ও স্থান খরচ না করিয়া করিতে পারে বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তাহার ভিতর অন্ততঃ দুইটি শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইহাতে মেয়েরা অবসরকালে মাসে অন্ততঃ ১০্ হইতে ৫০্।৬০্ পর্য্যন্ত পায় কি না সেদিকেও চোখ রাখিতে হইবে। এইরূপ একটি তালিকা সংগৃহীত হইলে আমরা তাহার প্রচারের চেষ্টা করিতে পারি।

"বউ, কথা কও—"

শ্রী দীনেশচন্দ্র সরকার

কত যুগযুগান্তের ব্যর্থ আশা বহি',
কত নব আশাময় নিষ্ফল যন্ত্রণা
সহিয়া, ঘোমটা পাখী, কর টানাটানি;—
তবু কি প্রেয়সী তব কথা কহিল না?
কি গোপন লিপি লেখা কালো বুকে তার!—
কহে না একটি কথা—ব্যথা না জানায়!
তুমি ত টানিছ জের—অশ্রান্ত রাগিণী
দুপুরের রুদ্ধবুকে কাঁদিয়া লোটায়।

কভু বা আকাশ হ'তে প্রিয়ার ইঙ্গিত
খসিয়া, আবার ছু'টে মিশিছে আঁধারে;—
বাছে পথ জীবন সে অস্ফুট আলোকে—
অতৃপ্তি নামিতে চায় হৃদি-পারাবারে!

আমরাও মাথা কুটি' ধ্বনি তব ব্যথা,—
"ঘোমটা খুলিয়া, বধূ, কহ কহ কথা!"

বাল্মীকি

শিল্পী শ্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রূপ ও আলাপ *

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

তনু স্বর্ণপ্রভা বাস পীতবস্ত্রা।
কণ্ঠে মণি-মুক্তা-হার শোভমানা।
বেণী চ ভুজঙ্গ পদদ্বয়-লগ্না।
পুরিয়া রাগিণী হিন্দোলস্য ভার্য্যাঃ॥

ভাবার্থ—দেহের জ্যোতি সোনার ন্যায়, পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, কণ্ঠে মণিমুক্তার হার শোভা পাইতেছে, ভুজঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ বেণী পদতলে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাই পুরিয়া রাগিণী, হিন্দোল রাগের স্ত্রী।

পুরিয়ার জাতি ও বাদী, সংবাদী প্রভৃতির বর্ণন।

পুরিয়া ষাড় বা প্রোক্তা পঞ্চমস্বরবর্জ্জিতাঃ
গান্ধার বাদী-স্বরাণাং সংবাদী ধৈবতস্বরঃ।
তীব্রমধ্যাম-সংযুক্তা ঋষভঃ কোমলস্বরঃ
দিবা-চতুর্থ-প্রহরাৎ গীয়তে কথিতা বুধৈঃ॥

ভাবার্থ—পুরিয়া খাড়ব জাতি 'প' বিবাদী গ—বাদী, ধ—সংবাদী, কড়ি—ম এবং কোমল 'ঋ' ইহাতে ব্যবহার হয়। দিবা চতুর্থ প্রহরে গাইবার সময়।

আলাপ।

আস্থায়ী।

গ্রহস্বর।

সা ন্‌া ঋা গা গা -া -া গা ঋা গা হ্মা -া ধা হ্মা গা -া গঋা গা গা ঋা -া
তে ০ ০ ০ না ০ ০ তো ০ ম্‌ না • • • • ০ তে০ • রি • ০

সসা -া সন্‌া -াঃ ঋঃ ন্‌ধ্‌া হ্মধ্‌া হ্মা সা -া সা সন্‌া গঋা গা -া গা হ্মাঃ ধঃ হ্মনা
০ ০ ০ রে • ০ ০ • না ০ • ০ ০ নে তে রে • ০ না তো • • ম

ধহ্মা গা -া -া সন্‌া ঋা গা -া -া সন্‌া ঋা -া সা -া সা সা সা সন্‌া সন্‌া ঋা সা -া॥
না • ০ ০ তা০ ০ • ০ • না • • ০ ০ তে রে না তে না • তো ম্‌

অন্তরা।

গা হ্মা ধা হ্মা র্সা -া র্সা র্সা -া সর্না ঋর্া র্সা -া -া র্সা সর্না র্সা র্গা -া -া
তে রি ০ • ০ ০ রে না • তো০ ম না • • নে তে০ • না • •

র্গঋর্া র্গা ঋর্া -া র্সা -া -া সর্না ঋর্া না ধা হ্মা -া গা গা হ্মা ধা হ্মা -া ঋর্া
তে ০ ০ ০ না ০ ০ তো০ ০ • ম্‌ না • • তে রে • • • •

না ধা হ্মা গা -া ঋা গা ন্‌া ঋা -া গা ন্‌া ঋা -া সা -া সা সা সা সন্‌া সন্‌া
না ০ ০ • ০ তা • • • • • ০ • • না • তে রে না তে না

ঋা সা -া॥
• তোম্‌ না

---

* গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় হিন্দোল রাগ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত রাগের ছয়টি ভার্য্যার মধ্যে পুরিয়া রাগিণী এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। গত সংখ্যায় হিন্দোলের জাতি সম্বন্ধে যে-শ্লোক দেওয়া হইয়াছে তাহা 'ঊড়ব' স্থানে 'ঊরসো' হইয়াছে, অর্থাৎ ঊড়ব হইবে।

সঞ্চারী।

গা গা হ্মা ধা না ধা হ্মা গা -া হ্মা ধা নধা সা -া নধা হ্মা গা -া হ্মা ধা ধা
আ না নে তে ০ রে নে বি ০ রে ০ ০০ ০ ০ না০ ০ ০ ০ নে তে তে

হ্মা: নঃ ধা হ্মা গা গা ঋা -া সা -া।
রি ০ রে না ০ তে ০ ০ না ০

আভোগ।

হ্মা ধা না র্সা -া সা সর্না র্সা -া র্সা সর্না র্ঋা না ধা হ্মা গা -া গা হ্মা ধা না
তে ০ রি ০ ০ রে না০ ০ ০ নে তো০ ম্ নে তে না ০ ০ তে ০ ০ ০

র্ঋা না ধা হ্মা গা গা হ্মা না ধা হ্মা -া গা গঋা গঋা গা -া ঋা -া সা সা সা
০ না ০ ০ ০ তো ০ ম্ না ০ ০ ০ তে০ ০০ না ০ ০ ০ নে "তে রে

সা সন্া সন্া ঋা সা -া ॥
না তে০ না ০ তো ম্"

ধ্রুপদ।

পুরিয়া—চৌতাল

রঙ্গ ভরে দরশ দেখত মন ইচ্ছ।
উপজত রসকে রঙ্গীলে লাল।
তুম অতি সুখদায়ক সব লায়ক লাগ প্যারো,
জাকে নিরখতহি দুখ দূর হোত জঞ্জাল।
রঙ্গীলে লাল কী রঙ্গীলি মুরত,
ঐ সে বিরাজত জোঁ্যা কণ্ঠমাল।
গুলাবকে প্রভুকে রস বশ কর লিনো,
গহন লাল কৃপাল দয়াল॥ গুলাব খাঁ।

আস্থায়ী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
গা -া | ঋা গা | ঋা সা | সা সা | সা সন্া | ঋা সা | ঋা ন্া | ধা হ্মা |
র ০ ঙ্গ ০ ভ রে দ র শ দে০ ০ খ ত ০ ০ ম

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
ধ্া সা | সা ন্া | ঋা ঋা | সা সা | সন্া ঋা | গা গা | গা গা | গঋা গা |
০ ন ই ০ ০ ০ ০ চ্ছা উ প জ ত র স কে ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
হ্মধা হ্মা | গা গা | হ্মা ধা | নধা র্ঋা | না ধা | হ্মা গা | ঋা গা | ন্া ঋা ॥
০ র ঙ্গী লে লা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
{গা গা | -া হ্মা | ধা র্সা | র্সা র্সা | সর্না ঋর্া | র্সা র্সা | র্সা না | ঋর্া গর্া |
তু ম ০ অ ০ তি সু খ দা০ ০ য় ক স ব ০ লা

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
ঋর্া র্সা | ঋর্না ঋর্না | ধা হ্মা | গা গা} | গা ঋা | গা -া | গা গা | গা হ্মা |
য় ক লা০ ০০ গ প্যা ০ রো জা ০ কে ০ নি র খ ত

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধা না | র্সা র্সা | সর্না ঋর্া | না ধহ্মা | -া গা | হ্মধা হ্মা | গা সা | ন্া ঋা |
হি ০ দু খ দূ০ ০ র হো ০ ত জ০ ০ ০ ঞ্চা ০ ল

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
গা -া | -া ঋা | গা গা | হ্মা ধা | না ধা | হ্মা গা | গা -া | ঋা গা | ধা হ্মা |
র ০ ০ শ্রী ০ লে লা ০ ০ ল ০ কী র ০ ০ শ্রী ০ লি

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
গা ঋা | গা গা | ঋা সা | সা -া | সন্া ঋা | গা গা | গা ঋা | গা গা |
মূ ০ ০ র ০ ত ঐ ০ সে০ ০ বি রা জ ত জো ক

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
-া গা | হ্মা ধা | না ধা | হ্মা গা | ধা হ্মা | গা ঋা | -া সা ||
০ ণ্ঠ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১ ০
{গা হ্মা | ধা না | র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা সর্না | ঋর্া র্সা | র্সা না | ঋর্া গর্া |
গু লা ০ ব ০ কে প্র ০ ০ ভু০ ০ কে র স ০ ব

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
ঋর্া র্সা | সর্না ঋর্া | না ধা | হ্মা গা} | গা -া | ঋা গা | -া গা | হ্মা ধা |
০ শ ক০ ০ র লি ০ নো গ ০ ০ হ ০ ন লা ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
নধা র্সা | র্সা র্সা | ঋর্া নধা | না ধা | হ্মা গা | হ্মধা হ্মা | গা সা | ন্া ঋা |
০ ০ ০ ল ক্ক ০০ পা ০ ০ ল দ০ ০ ০ য়া ০ ল

কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা

[চাষীদের আর্থিক উন্নতি না ঘটিলে বাঙালী সমাজের চৌদ্দ আনা লোক দরিদ্র থাকিতে বাধ্য। একথা বুঝিয়া বাংলার আজকাল স্বদেশ-সেবকমাত্রেই আইনের তরফ হইতে কৃষকদের অবস্থা আলোচনা করিতেছেন। কৃষি-দক্ষেরা চাষবিজ্ঞানের আলোক ফেলিয়া বিষয়টা বিশ্লেষণ করিতে ঝুঁকিয়াছেন। সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সেবকেরাও কিছু কিছু এই দিকে নজর ফেলিতেছেন।

শিক্ষার তরফ হইতেও দেশোন্নতির এই বিভাগ সম্বন্ধে অনেক-কিছু আলোচনা করিবার আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য-সমাজ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস লিখিত "বাঙ্গালার কৃষক" প্রবন্ধের শেষ অংশ বাহির হইয়াছে। তাহাতে কৃষি-শিক্ষা অথবা কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত এবং সুচিন্তিত আলোচনা পাইতেছি। রচনাটা গোটা বাঙালী সমাজের কাজে লাগিবার উপযুক্ত। স্থানে স্থানে একটু-আধটু বদ্‌লাইয়া প্রবন্ধটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—'আর্থিক উন্নতি'র সম্পাদক]

দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, পল্লীর সংস্কারক, কৃষকের মঙ্গলকামী মহাপুরুষগণ এখন সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার কৃষকের শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করুন। কৃষক যেন খরচের চাপে পরিত্রাহি না ডাকে এবং ছাত্রও যেন উদরান্নের জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী না হয়। আমার অনুরোধ—শিক্ষার জন্য কৃষককে ব্যয়ভারে অব্যাহতি দিউন এবং ছাত্রকে অনূন একাদশ বৎসরেই স্বাবলম্বী হইতে দিউন। অথচ এমনি পন্থা অবলম্বন করুন, যেন কৃষিবিদ্যালয় অত্যল্প সময়েই নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিতে পারে। সর্ব্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বাঙ্গালার কৃষকের উপযোগী হইবে আশা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

কৃষি-বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ

(৫—১১ বৎসর)

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
১ম মান (ক+খ)	পাঁচ বৎসর হইতে সাত বৎসর	প্রাতে ৬—৯	লিখন, পঠন, ধারাপাত, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি।
		বৈকালে ১—৩	গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল, হাঁস ইত্যাদিকে খাবার দেওয়া এবং এই প্রকার কাজ, যাহা বালকেরা আনন্দের সহিত করিতে পারে ও
		ঐ ৩—৪	ছুটাছুটি খেলা।
২য় মান (ক+খ)	সাত বৎসর হইতে নয় বৎসর	প্রাতে ৬—৯	সাহিত্য [বাঙ্গালা]—কৃষি-বিষয়ক, পশু-পালন-বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র [শুভঙ্করী]।
...	...	বৈকালে ১—৩	তুলার পাঁজ করা, চরকা কাটা, সুতা গুটান ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৩—৪	সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান, দড়ির তাল করা, গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, গৃহপালিত পশুর যত্ন, ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪—৪৷৷	ছুটাছুটি খেলা।

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
৩য় মান (ক+খ)	নয় বৎসর হইতে ১১ বৎসর	প্রাতে ৬-৯	সাহিত্য (বাঙ্গালা) কৃষি-বিষয়ক—যথা বীজ-বপন, শস্যসংগ্রহ, সময়-নিরূপণ। মৃত্তিকার লক্ষণ ও শ্রেণী-বিভাগ, পশু-পালন ও টোটকা পশু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, টোটকা ঔষধ-শিক্ষা, বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। দলিল-পত্র লিখন।
...	...	বৈকালে ১-৩	চরকা কাটা, বসিবার আসন, সতরঞ্চ ও বস্তা বুনন শিক্ষা।
...	৯-১১	ঐ ৩-৪৷৷	ক্ষেতের কাজ—ঘাস তোলা, জল দেওয়া, শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪৷৷-৫	খেলা—বউ বসান, হাডুডু, গজে ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ বিভাগ *

(১১-১৬ বৎসর)

৪র্থ মান ক+খ	১১-১৩	প্রাতে ৬-৯	হাল চষা, সার দেওয়া, বীজ-বপন, নিড়ান, শস্য-সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেতের কাজ ; পশুপালন।
...	...	১১৷৷-১২৷৷	চরকা কাটা।
...	...	বৈকালে ১-৪	দড়ি পাকান, কাছি, আসন, সতরঞ্চ, বস্তা, মোজা, গেঞ্জী, বস্ত্র বয়ন শিক্ষা, ফলের গাছ ঘিরিবার জাল বুনন শিক্ষা। বাঁশের কাজ ইত্যাদি, পাখা, পেতে, চুপড়ী, ঝুড়ি, ঝাঁকা, মোড়া, চেয়ার, পেটরা ইত্যাদি।
...	...	৪৷৷-৫৷৷	খেলাধূলা---হাডুডু, গজে, কুস্তি।
...	...	সন্ধ্যায় ৭—৭-৪৫	ইংরেজী শিক্ষা।
...	...	৭-৪৫—৮-১৫	হিন্দী শিক্ষা।
...	...	৮-১৫--৯	কৃষি-বিষয়ক আলোচনা।
...	...	৯—৯-৩০	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা, রোগ-নির্ণয় টোটকা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।
...	...	৯-৩০—১০	সর্ব্বপ্রকার খত-পত্র, দলিল, কোবালা, কবচ বা দাখিলা লিখন শিক্ষা ও তাহাদের টিকিটের নিয়ম।
৫ম মান	১৩—১৬	প্রাতে ৬—৯	সর্ব্বপ্রকার চাষের কাজ হাল চষা, মাটিকাটা, জল সেচা, বীজবপন, নিড়ান, শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি।
...	...	ঐ ১১৷৷-১২৷৷	চরকা কাটা।
৫ম মান	১৩-১৬	বৈকালে ১-৪	দর্জ্জির কাজ, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪৷৷-৫৷৷	খেলাধূলা—কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর চালনা, বর্শা ও বল্লম চালনা।
...	...	সন্ধ্যায় ৭---৭-৪৫	কৃষি-বিষয়ক আলোচনা।
...	...	৭-৪৫—৮-১৫	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা—কবিরাজী, সহজ পশু-চিকিৎসা।
...	...	৮-১৫—৯	ইংরেজী শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৯—৯-৩০	হিন্দী শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৯-৩০—১০	সহজ জরিপ শিক্ষা, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনাদি, রাজাপ্রজা সম্বন্ধ, কৃষকের কর্ত্তব্য ইত্যাদি। সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়, ইত্যাদি।

(আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩৩৩)　　শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

প্রবাসের চিঠি

১৯১৩ সালে আমেরিকা হইতে লিখিত)

ওঁ

2970, Groveland ave
Chicago.

কল্যাণীয়েষু,

আগামী সোমবারে অর্থাৎ পশু আমরা আর্ব্বানায় ফিরব। তারপরে ইংলণ্ডে যাত্রার উদ্যোগ করতে হ'বে। এই মার্চ্চ মাসেই আমি যাব মনে করেছিলুম—কিন্তু মার্চ্চে বাতাস প্রবল এবং আটলান্টিক অশান্ত—তা ছাড়া শীতঋতু বিদায়ের পূর্ব্বে তার শেষ নাড়া দিয়ে যায়---সেটা জলের উপরে আরামের হয় না। তাই ঠিক করেছি, এপ্রিলের মাঝামাঝি যখন বসন্ত কতকটা তার আসর জমিয়ে বসেছে সেই সময়ে আমরা পাড়ি দেব—ইংলণ্ড গিয়ে যখন পৌঁছব তখন দেখব তার কালো ঘোমটা ঘুচেছে। অতএব এ চিঠির উত্তর এখানে দিয়ো না।

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড যোগে আমরা ছেলেদের মানুষ ক'রতে চাই—কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয়, কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কতবড় জিনিষ তা এদেশে এলে আমরা আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি, পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হ'য়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম ক'রে যোগ্যতা লাভ করবার কোনো সাধনা নেই। এরকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছুদিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সব্জীর বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল ক'রে আর্জিয়ে নিতে হয় তার পরে তাকে ক্ষেত্রের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেইরকম। শক্তিকে

---

* এই বিভাগ অবৈতনিক। ছাত্রগণকে দিবারাত্র বিদ্যালয়ে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয় তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবে।

তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথাসময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি, নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে বেশি ভালবাসতে শেখে—এইজন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেক বারে মহা দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হ'বার তা হ'য়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্য সাধনা করতে হ'বে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগ-সাধনার প্রবর্ত্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ক'রে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না? এ দেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাতড়ে বেড়াচ্চে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্ছে এই যে, এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে—যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা তৈরি ক'রে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত-উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হ'য়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন ক'রে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চা খুবই প্রবল হ'চ্ছে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডাল-পালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তি-নিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত সেটি আকাশের এবং আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের লহরী-লীলার কলস্বর—সে কারখানা-ঘরের শৃঙ্গ-ধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হ'য়েও সে বড়, কোমল হ'য়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোখ মেলা, কেবলমাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয়, মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো—কেননা সবই যখন তৈরি হ'য়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ ক'রে উঠবে; তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হ'তে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্র-শস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ যেন নিঃশব্দে ক'রে যেতে পারি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দীপিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৩)

—

ত্রিমূর্ত্তি

ত্রিমূর্ত্তি বুঝিতে হইলে প্রথমে তিনকে বুঝিতে হয়। তিন একটি সংখ্যা। প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষতঃ আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ, অচ্ছেদ্য বলিলেও চলে। বেদে ও বৈদিক ধর্ম্মে 'তিন' ও 'সাত' এ দুটির প্রয়োগ খুব বেশী। তিন এই সংখ্যাটি যে অতি পবিত্র, ঋগ্বেদে তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। 'তিন' এই সংখ্যাটি অবলম্বন করিয়া বিশ্বের তিনটি মূলতত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই মূলতত্ত্ব তিনটি কালে উপাস্য ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। হিন্দুদর্শন অনুসারেও রজোগুণপ্রভাবে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে প্রলয় হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—বিশ্বের এই তিন মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বত্রয়ই কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে পরিণত হইয়াছে; আর সাধারণতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির সহিতই আমরা পরিচিত। অন্যান্য ধর্ম্মেও ত্রিমূর্ত্তি আছে। প্রাচীন মিশরে ত্রিমূর্ত্তি বলিলে বুঝাইত—Osiris, Isis ও Horus। বাইবেলে দু'রকম ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। Lamech ও তাহার দুই পত্নী Adha ও Zillah ত্রিমূর্ত্তি। আর এক ত্রিমূর্ত্তি—God, Christ ও Spirit। জেন্দ-অবেস্তায় ত্রিমূর্ত্তি হইলেন—সর্পদেব অজি দহাক (Azi-Dahaka) ও তাঁহার দুই স্ত্রী সবঙ্ঘবাচ (Savanghavach) ও এরেনবাচ (Erenavach)। বৌদ্ধদেরও ত্রিমূর্ত্তি আছে, তাঁরা তাঁকে ত্রিরত্ন বলেন। ত্রিরত্ন—ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘ। মহাযান বৌদ্ধদের বুদ্ধের ত্রিমূর্ত্তি হইলেন—একদিকে বুদ্ধ, ধ্যানিবুদ্ধ ও ধ্যানিবোধি-সত্ত্ব, অপর দিকে বুদ্ধের ধর্ম্মকায়, নির্ম্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের প্রতীক ক্রমশঃ তৈরী হইল। কালে মানবমূর্ত্তিতে তাহাকে দেখান হইতে লাগিল। ইহার একটি Buddhist Inconographyতে (LXX—plate iii) আছে। সেখানে নরাকৃতি ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ত্রিমূর্ত্তি। প্রথমে ধর্ম্ম, মধ্যে বুদ্ধ, শেষে সঙ্ঘ।

বৈদিক যুগে ত্রিমূর্ত্তি বলিলে বুঝাইত অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য্য। যাস্কের নিরুক্তে তাঁর চেয়ে প্রাচীন যে-সকল পণ্ডিতের উল্লেখ আছে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বসমেত তিনটিমাত্র দেবতারই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে দেবতা সর্ব্বসমেত তিনটি হইলেও নামে তাঁহারা অনেক।

সুপণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল্ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ত্রিমূর্ত্তির দেবত্রয়ের দ্বিতীয় দেবতাটি পূর্ব্বে বোধ হয় 'ত্রিত' ছিলেন। এই ত্রিত দেবকেই আবার তিনি বজ্রাধিপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের অপাম্ নপাৎ ও অগ্নি পূর্ব্বে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন। অপাম্ নপাৎ অবেস্তায় এক সমুন্নত-কলেবর-বিশিষ্ট দেব। গ্রীক পুরাণে অগ্নিকে প্রথমে স্বর্গ হইতে আনিবার কাহিনী আছে, ঋগ্বেদেও এই একই কাহিনী। শুধু তাই নয়। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে অগ্নির যে প্রকৃতি বর্ণিত আছে তাহা বৈদ্যুতিক প্রকৃতি। পরে সূর্য্যও অগ্নির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

আকাশের অতি ঊর্দ্ধে কখনও কখনও বজ্রাগ্নির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিদ্যুদগ্নিই ত্রিত-নামে অভিহিত।

অবশেষে ইন্দ্র আসিয়া ত্রিতকে আসনচ্যুত করেন। ইন্দ্র বেদেরই দেবতা।

পার্থিব অগ্নি, সলিলসম্ভূত ও বজ্ররূপে নিপতনশীল এবং মেঘান্তবর্ত্তী ত্রিত এই দেবত্রয়ই ত্রিমূর্ত্তির আদি মূল।

প্রাচীন উপনিষদে ত্রিমূর্ত্তির আলোচনা নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী উপনিষদে ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে স্ফূর্ত্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১৩।১২) বা মহানারায়ণ উপনিষদে পরমাত্মার সহিত ব্রহ্মা, শিব, হরি ও ইন্দ্র অভিন্ন বলা হইয়াছে। হরি শব্দটি বোধ হয় পরে বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকিবে। এশব্দটি থাকায় ছন্দের দোষ পড়িয়াছে। মৈত্রায়নী উপনিষদে (৪।৫।৬) ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু পরমাত্মার তনু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোথাও ত্রিমূর্ত্তিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের নাম পাওয়া যায় না। ইহার পর আমরা প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, নৃসিংহোত্তরতাপনীয় ও রামোত্তরতাপনীয় উপনিষদে এই ত্রিমূর্ত্তির পরিচয় পাই।

আমরা যেমন মৈত্রায়নী উপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের প্রথম পরিচয় পাই আবার তেমনই এই তিনের সঙ্গে রজঃ, স্বত্ব ও তমস্তত্ত্বের সম্বন্ধের কথাও এই উপনিষদে প্রথম পাই। বায়ুপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

ঈশ্বরই (মহাদেব) পরমদেব, বিষ্ণু মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা রজোগুণময়। এই ত্রিমূর্ত্তি পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে—ব্রহ্মরূপে তিনি সৃষ্টি করেন, নর (বিষ্ণু) রূপে তিনি পালন করেন আর রুদ্ররূপে তিনি ধ্বংস করিবেন। এই তিনটি প্রজাপতির তিনটি অবস্থা। পুরাণে ও কাব্যে ইহারই দ্যোতনা আছে। হরিবংশে ও কুমারসম্ভবে ইহাই পাওয়া যায়।

লিঙ্গপুরাণে আছে, শিবই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভব। ভব শিবের শেষ রূপ। নিম্বার্ক ও অন্য কয়েকটি সম্প্রদায় কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির শক্তিদেরও ত্রিমূর্ত্তি আছে। ইহাদের শক্তিদের ত্রিমূর্ত্তি এইরূপ—বাক্ বা সরস্বতী—ব্রহ্মার; শ্রী, লক্ষ্মী বা রাধা—বিষ্ণুর; উমা, দুর্গা, কালী—শিবের। ত্রিমূর্ত্তির ধ্যানাদি পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এগুলি যে পরবর্ত্তীকালে রচিত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এক্ষণে ভারতের নানা স্থানে ত্রিমূর্ত্তিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। পেশোওয়ার যাদুঘরে একটি ত্রিমূর্ত্তি আছে। অনদ্র (Anadra) ও মধ্যভারতের বরো (Baro) হইতেও দুইটি ত্রিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তিরুবোরিয়ুরে (Tiruvorriyur) একটি একপদ ত্রিমূর্ত্তি আছে। Arch Survey Reportএ (1913-1914) এই মূর্ত্তিগুলির চিত্র ও বিবরণ দেওয়া আছে। গোপীনাথ রাও দক্ষিণভারতে নাগড়াপুরম্‌এ একপাদ ত্রিমূর্ত্তির একটি চিত্র দিয়াছেন। এইরূপ আর-একটি তিরুবানৈক্কাবলের ছবি A. S. R. (Southern Circle, 1911-12, pl. v. p. 92) পত্রে আছে। গোপীনাথ রাও বলেন যে, অংশু ভেদাগম ও উত্তর কালিকাগমে ত্রিমূর্ত্তির রূপ-ভেদ আছে।

(ভারতী, আশ্বিন ১৩৩৩) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

বৌদ্ধ দেব-পূজা কি পৌত্তলিকতা

সৌন্দরনন্দ পুস্তকে দেখি, নন্দ, বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে যাইলে বুদ্ধদেব তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর গান্ধারে বুদ্ধদেবের হাজার হাজার মূর্ত্তি দেখি। প্রজ্ঞা-পারমিতায় বুদ্ধদেবকে পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করার কথা পাওয়া যায়। খৃঃ ১০০ বৎসর হইতে দেবপূজা বৌদ্ধদের ভিতর আরম্ভ হয়। কত যে দেবদেবীর কল্পনা হইয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এসকলের পূজা এখনও হয়। নেপালে, মঙ্গোলিয়ায়, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে পর্য্যন্ত বৌদ্ধমূর্ত্তির পূজা হইতেছে। আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যে, মূর্ত্তিপূজায় প্রবর্ত্তকেরা বেশীর ভাগ বাঙ্গালী ছিলেন এবং অনেকের বাড়ী বিক্রমপুরে ছিল। তথায় বহু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং বিক্রমপুরের শিল্পীরা সে-কালে সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ডের ভিতর সব চাইতে বড় ছিল।

বৌদ্ধদিগের পূজার পদ্ধতি। প্রথমে সাধক হাত ও মুখ শৌচাদি করিয়া প্রান্তে কোন বিজনস্থানে গিয়া সুখাসনে বসিবেন। তাহার পর শূন্যের ভাবনা করিয়া অর্থাৎ জগৎ শূন্যময় মায়াস্বপ্নোপম এবং স্বয়ং শূন্যস্বরূপ চিন্তা করিয়া আপনার হৃদয়ে প্রথম স্বর অর্থাৎ অকার পরিণত নির্ম্মোস চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন। তাহার উপর যে দেবকে আহ্বান করিতে হইবে সেই দেবতার বীজ চন্দ্রের উপর ধ্যান করিবেন। সেই বীজমন্ত্র হইতে মরীচিমালা জগতের সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত বুদ্ধবোধিসত্ত্বদিগকে আনয়ন করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে এইরূপ মনশ্চক্ষে দেখিবেন। পরে সেই নভোদেশে অবস্থিত দেবগণকে পুষ্প, ধূপ, দীপ, গন্ধ, মাল্য, বিলেপন, চূর্ণ, বস্ত্র, ছত্র, ধ্বজা, ঘণ্টা ইত্যাদির দ্বারা বাহ্য পূজা করিবেন। তৎপরে তাঁহাদের সম্মুখে পাপ-দেশনাদি করিবেন। "এই জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে আমি যে-সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছি, করাইয়াছি বা অনুমোদন করিয়াছি তাহা সকলই আপনাদিগের সম্মুখে নিবেদন করিতেছি—ইহাই পাপদেশনা। তাহার পর অকরণ সম্বরণ—"যাহা কিছু অন্যায় বা অকরণীয় আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি।" তাহার পর অনুমোদনা—"জগতে যাহা কিছু কুশল, যে কেহ কিছু কুশল কর্ম্ম করিতেছে তাহা আমি হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিতেছি।" তাহার পর ত্রিরত্ন শরণ বলিতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বুঝায়। "মনুষ্যদিগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করি, বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ সদ্ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করি, এবং গণদিগের শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করি।" তাহার পর মার্গাশ্রয়ণ—"তথাগত সম্বুদ্ধ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মোক্ষের যে এক-মাত্র মার্গ তাহাই আশ্রয় করি।" তাহার পর অধ্যেষণা—"সম্বুদ্ধগণ ও তাঁহাদের পুত্রাদি বোধিসত্ত্বগণ জগতের হিত করুন এবং আমার হিত করুন যতদিন না আমি মোক্ষলাভ করি।" পরে যাচনা। "বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ আমাকে এরূপ নিরুত্তর ধর্ম্মোপদেশ দান করুন যাহার বলে আমি এই অগাধ ভবসাগর বিনা ক্লেশে উত্তীর্ণ হই।" তাহার পর পরিণামনা—"আমি আপনাদের পূজা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি তাহা যেন সমস্তই আমার মোক্ষলাভে সহায়তা করে।"

এইরূপে সপ্তবিধ অনুত্তর পূজা করিয়া বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণকে ওঁ আঃ হুঁ মুঃ এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্মের ভাবনা করিবেন। মৈত্রী কাহাকে বলে? নিজের একমাত্র পুত্রের উপর যে স্নেহ থাকে সকল জীবের উপর সেই স্নেহ রাখা। করুণা কি প্রকার? অগাধ ভবসাগরে পতিত সকল জন্তুকে আমি উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠা করিব এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মুদিতা কাহাকে বলে? তিন লোকে অবস্থিত জীবের যে-সকল মহৎ কর্ম্ম এবং তাহাদের পূর্ব্ব সৎকর্ম্মের বলে যে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাদি, তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করা। উপেক্ষা কাহাকে বলে? আত্মীয়-স্বজন বা অন্য সকলের অনুনয়, বিনয়, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া সকল জীবের হিত আচরণ করা। তাহার পর জগৎ স্বপ্নোপম, মায়াসদৃশ ও শূন্যাত্মক চিন্তা করিয়া "ওঁ শূন্যতা জ্ঞান বজ্রস্বভাবাত্মকোঽহং" মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বের চিন্তিত শূন্যতাকে দৃঢ় করিবেন।

পরে হৃদয়স্থিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিম্বের উপর পুনরায় বীজমন্ত্র চিন্তা করিয়া আপনাকে স্বয়ং ইষ্টদেব বলিয়া ধ্যান করিবেন ও তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। তাহার পর সেই দেবতার হৃদয়ে পুনরায় বীজমন্ত্র চিন্তা করিয়া তাহার রশ্মিদ্বারা জগতের অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া রশ্মিদ্বারা দেবতার জ্ঞানরূপ দেহ আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে অবস্থাপিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবেন। তাহার পর তাঁহাকে মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া জঃ হুঁ বঁ হোঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মুদ্রা দর্শন করাইবেন। করাইয়া সম্মুখস্থিত জ্ঞান-মূর্ত্তিকে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্বের সময় মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া দুই মূর্ত্তির অদ্বয় করিবেন। এইরূপ করিয়া পরে মুঃ বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর ধ্যান হইতে দেবতা গর্ভে বিহরণ করিবেন।

বৌদ্ধেরা মূর্ত্তির অস্তিত্ব নাই বলেন এবং মূর্ত্তিপূজককে ঘৃণা করেন। তাঁহাদের মতে শূন্যই সব, বাকী সকলই শূন্যের জগতের মাত্র। শূন্য বলিতে গোল্লা বুঝায় না, শূন্য বলিতে জগতের পরম সত্তা বুঝায়,

পরমতত্ত্ব বুঝায়, মহামোক্ষপুর বুঝায়। শূন্যে কষ্ট নাই, আছে পরম সুখ, আর দিব্যজ্যোতি। শূন্য সুন্দরেরও সুন্দর—মহাসুন্দর প্রভাস্বর।

তার পর মধ্যমক ও যোগাচার বাদ আসিল। মধ্যমকে বলিল, নির্ব্বাণ হইলে, মোক্ষলাভ হইয়া গেলে সব শূন্য হইয়া যায়। এ শূন্যও লোকের পছন্দ হইল না। নাগার্জ্জুন প্রথম এই মত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্য মৈত্রেয়নাথ শূন্যবাদের এই গলদ দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানবাদ প্রচার করিলেন এবং যখন বলিলেন, মোক্ষলাভ হইলে শূন্য প্রাপ্তি হইলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরের আর কিছু না থাকিলেও বিজ্ঞানটা বজায় থাকে, তখন লোকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইন্দ্রভূতির পুস্তকে আর-একটি জিনিষ শূন্যবাদে প্রবেশ করিয়াছে—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাকে মহাসুখবাদ বলে।

একাদশ শতাব্দীতে লিখিত অদ্বয় বজ্রের একখানি পুস্তকে দেখিতে পাই—

স্ফূর্ত্তিশ্চ দেবতাকারা নিঃস্বভাবো স্বভাবতঃ।
যদা যদা ভবেৎ স্ফূর্ত্তিঃ সা তদা শূন্যতাত্মিকা।

অর্থাৎ শূন্যের স্ফূর্ত্তিই দেবতার আকার, তাহারা স্বভাবতঃই নিঃস্বভাব। যখন যখনই আকারের বিকাশ হয় তখন তখনই তাহা শূন্যতাগর্ভ।

তাহা হইলে দেখা গেল শূন্যের বিকাশই দেবতার আকার। এখন কি করিয়া শূন্যের স্ফূর্ত্তি হয় তাহাই দেখিতে হইবে। শূন্য করুণার প্রতিমূর্ত্তি। ভক্ত কর্ত্তৃক আহূত হইলেই করুণার বলে শূন্যের স্ফূর্ত্তি হয়। শূন্যকে যে কাজের জন্য—লোকের হিতের জন্যই হউক বা অহিতের জন্যই হউক, ডাকা হইবে, শূন্য সেইভাবেই বিকশিত হইবেন। এবং বীজমন্ত্র নিয়মকানুন অনুসারে উচ্চারণ করিলেই সেই বীজমন্ত্র-রশ্মি বাহির হইয়া শূন্য হইতে অভীষ্ট দেবতা আনীত হইবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজার অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। কেহই মূর্ত্তিকে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করেন না। যেহেতু দৃষ্টজগতের যখন কোনো সত্তা নাই তখন মূর্ত্তির সত্তা থাকিতে পারে না, তাহাতে দেবতা থাকিতে পারে না, দেবতাকে অত ছোট গণ্ডীর ভিতর আনা যায় না।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩)

শ্রী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১৭)

হরিকেশবকে বিদেশের পাট উঠাইতে হইল। ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার হইয়াছিল, ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু এমন যে একটা হুড়োতাড়া পড়িবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

মুকুন্দরাম তাঁহার চিঠির উত্তরে আপনার বক্তব্যটা ভদ্র ভাষায়ই জানাইবেন তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে ঘটিল অন্যরূপ। প্রথমটা কিছুদিন কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; বোঝা গেল কিছু একটা গোলমাল ঘটিয়াছে,না হইলে সোজাসুজি একটা উত্তর আসিত। তরঙ্গিণীর মনে একটা আশাও জাগিল; ভাবিলেন হয়ত অকস্মাৎ এমন খবরটা পাইয়া তাহারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছে না, অথচ ভিতরে ভিতরে মেয়েটিকে পছন্দ আছে বলিয়া কিছু একটা উপায় খুঁজিয়া জবাব দিতে দেরী করিয়া ফেলিতেছে। নেহাৎ আর কাহারও মত না থাকুক, ছেলের মত নিশ্চয়ই আছে; নতুবা স্পষ্ট জবাব অবিলম্বে আসিত। কুমারী মেয়ের দুর্ভিক্ষ যে দেশে পড়ে নাই তাহা ত মুকুন্দরাম আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইলে বিধবা মেয়ের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতটা জানাইতে এত দীর্ঘকাল কাটিতেছে কেন?

তরঙ্গিণীর মনে ক্ষীণ আশা এবং হরিকেশবের মনে কৌতূহল যখন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল, তখন একদিন নূতন একটা ঘটনায় পুরাতন ঘটনার স্রোত ফিরাইয়া দিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কে একজন চোরের মত সন্তর্পণে ও কুণ্ঠিতভাবে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সেদিন কি কারণে জানি না হরিকেশব সকাল সকালই শুইতে গিয়াছিলেন। বাহিরের ঘরের কড়াটা অতি ধীরে নড়িয়া উঠিতেই তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। "এত রাত্রে আবার কে ডাকে?" বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

গৌরী তাড়াতাড়ি "বাবা, আমি দেখে আসি না" বলিয়া আঁচল লুটাইয়া ছুটিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার উৎসাহ নিভিতে বেশী সময় লাগিল না। এক মুহূর্ত্ত না কাটিতেই সে আবার ভয়ার্ত্ত মুখে কেমন যেন জড়সড় হইয়া ফিরিয়া পলাইয়া আসিল। বাবা বলিলেন, "কিরে, কি হ'ল ?"

গৌরী অস্ফুটস্বরে কম্পিত গলায় বলিল, "কি জানি কে এসেছে বাবা, তুমি দেখ গিয়ে।"

আর কোনো কথা তাহার কাছে পাওয়া গেল না। বিছানার একটা কম্বলই টানিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে হরিকেশব বাহিরে চলিলেন। দরজাটা টানিয়া খুলিয়া দেখেন বিব্রত লজ্জা-নতমুখে কে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া। আধ অন্ধকারে হরিকেশবের দৃষ্টি ভাল চলিতেছিল না, তাহার উপর পাশের সজিনাগাছের ছায়ায় বারান্দাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। হরিকেশব বলিলেন, "কে মশায় ? আমি ত অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।"

অতি বিনীত সুরে ছেলেটি বলিল, "আজ্ঞে, আমি নৃপেন্দ্র।"

নৃপেন্দ্র যে কে হরিকেশব চট্ করিয়া ভাবিয়া পাইলেন না। মুকুন্দরামের সহিত তাঁহার কথা হইয়াছে, কিন্তু নৃপেন্দ্রকে লইয়াই যে কথা তাহা তিনি অত খেয়াল করেন নাই। তিনি বলিলেন, "কোন্ নৃপেন্দ্র বল দেখি। আমি কি আর এই বুড়ো বয়সে কারুর নামধাম মনে করে রাখ্‌তে পারি ?"

বেচারী বড় ফাঁপরে পড়িল ; তাহার মত সুযোগ্য পাত্রের নাম শুনিয়াও যে তিনি চিনিলেন না, ইহাতে একটু ক্ষুব্ধও হইল। কি যে বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া আলোর সামনে আসিয়া হরিকেশবকে প্রণাম করিয়া বলিল "আমার বাবা আর জ্যেঠামাশয়কে আপনি চেনেন। আমি ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে।"

এতক্ষণে হরিকেশব বুঝিলেন। নৃপেন্দ্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া একটু যেন বিপদগ্রস্তভাবেই বলিলেন, "ও, তাঁরা তোমায় পাঠিয়ে দিলেন বুঝি ? হ্যাঁ, তা আমার যা বল্‌বার তা ত অনেকদিনই বলেছি। তোমাকে আর অকারণ কষ্ট দিয়ে পাঠানো কেন ? দুইচার কথা লিখে দিলেইত হ'ত।"

নৃপেন্দ্র খানিকটা সামলাইয়া লইয়া এবার মুখ তুলিয়াই বলিল, "আজ্ঞে না তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দেননি। আমি নিজেই এসেছি। বাড়ীতে সকলেই আমার এখানে আসার বিপক্ষে।"

হরিকেশব যেন কূল পাইয়া বলিলেন, "তবে ত এসে ভাল করনি। গুরুজনের কথা অমান্য করা কি উচিত কাজ হয়েছে ?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "দেখুন, আপনিও ওকথা বল্‌বেন না। আপনি শুনেছি মানুষের স্বাধীন মতকে শ্রদ্ধা করেন। আমি যা অন্যায় মনে করিনা, তার জন্যে গুরুজনের মুখাপেক্ষা আমি কেন করতে যাব ? আমি ভূমিকা ভালবাসি না ; আমার বক্তব্য এক কথাতেই বল্‌ব সেজন্য ক্ষমা করবেন। আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।"

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথায়বার্ত্তায় পশ্চাৎপদ হওয়া নৃপেন্দ্রের কোনোদিন অভ্যাস ছিল না। সুতরাং সে হরিকেশবকে মৌনী দেখিয়া আবার বলিল, "আপনার এতে মত আছে কিনা বলুন। তারপর আমি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করব।"

হরিকেশব বলিলেন, "দেখ, তুমি যখন ভূমিকা ভালবাস না, তখন আমিও বিনা ভূমিকাতেই বলছি—আমার মেয়ের বিবাহ দিতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু এত অল্প বয়সে আমি আর একবার এ ভুল করতে চাই না। মেয়েদের বয়সে বিবাহ হওয়াই ভাল।"

নৃপেন্দ্র বলিল, "আপনি কি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন ?"

হরিকেশব বলিলেন, "আমার মেয়ে কবে বড় হবে, সেজন্য আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলি কি করে ? সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি আমি কারো কাছে চাই না।"

নৃপেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, আমি নিজেই ভেবে দেখছি আমি কি করতে পারি। তারপর এসে আপনাকে জানিয়ে যাব।"

নৃপেন্দ্র আর অপেক্ষা করিল না। তাড়াতাড়ি ঘর

ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এত দ্রুতবেগে সে গেল যে, মনে হইল যেন তাহার পিছনে কে তাড়া করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

হরিকেশব ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছিল গো?" তিনি উত্তর দিলেন, "ও একটি ছেলে।" তরঙ্গিণী আর কিছু প্রশ্ন করিলেন না। পিতার এই উত্তরে গৌরী যেন বাঁচিয়া গেল। নৃপেন্দ্রকে রাত্রের অন্ধকারে ঘরের দরজায় দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন জল হইয়া গিয়াছিল। সে মনে করিল তাহারই জন্য বুঝি পিতা কথাটা চাপা দিয়া গেলেন। কিন্তু হরিকেশব যে নিজেদের কথাবার্ত্তার খবর দিয়া তরঙ্গিণীকে নিরাশ করিতে চান না তাহা সে বুঝিল না।

হরিকেশব মনে করিয়াছিলেন এই ব্যাপারের পর্দ্দা বুঝি আপাততঃ এইখানেই পড়িল। কিন্তু পরদিন তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিল।

সকালবেলা সদর দেউড়ির বাহিরে শিরীষ গাছের তলায় হরিকেশব গৌরীর সঙ্গেই ঘুরিতেছিলেন; সেইখানেই পিয়নটা তাঁহাকে মুকুন্দরামের হস্তাক্ষরে শিরোনামা লিখিত একখানি পত্র দিয়া গেল। চিঠিতে কটু কাটব্যের অন্ত নাই। পিতা হইয়া বিধবা কন্যার রূপের ফাঁদ পাতিয়া ভদ্রঘরের অপরিণত বয়স্ক ছেলেকে হাত করার ফন্দী যে কত বড় পাপ মুকুন্দরাম চিঠিতে প্রধানত সেই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে হরিকেশবের সংস্কারক সাজার উদ্দেশ্য বুঝিতে যে কাহারও বাকি নাই, সেকথাও বার বার বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

"আপনার যদি এইরূপ অভিসন্ধিই ছিল তাহা হইলে অচেনা অজানা অনাথ দরিদ্রের দিকে নজর দিলেই পারিতেন, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেকে এইরূপে জালে জড়াইয়া ভদ্রবংশের মুখ নীচু করিবার চেষ্টা করেন কেন? অথবা মেয়েটিকে কাশী পাঠাইয়াও ত দিতে পারেন। সেখানে সে যেমন ইচ্ছা থাকিতে পারে; আপনি তাহার সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারিতেন, লোকে না চিনিলেই হইল। মোট কথা আপনার কন্যাকে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের ছেলেকে আপনাদের সংশ্রবে দেখিতে আমরা চাহি না। আপনার বাড়ীর আশে পাশে অথবা আপনাদের কাহারও সঙ্গে তাহাকে দেখিলে বুঝিব আপনার প্ররোচনাতেই সকল কিছু ঘটিতেছে। তাহার প্রতিকার কি করিয়া করিতে হয় আমরা জানি। অতএব সাবধান হইবেন।"

চিঠি পড়িয়া হরিকেশব হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি ত একবার ঘুণাক্ষরেও মেয়ের বিবাহের কথা কি নৃপেন্দ্রের কথা কোথাও তোলেন নাই, কেবল গৌরীর দুরদৃষ্টের কথাই লিখিয়াছিলেন; তবে তাঁহার উপর এই অভদ্র আক্রমণ কেন? আক্রোশই বা কিসের? নৃপেন্দ্রের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল খুব সম্ভব সে এই বিবাহের জন্য জেদ ধরিয়াছে এবং তাহার সমস্ত জেদটার মূলে হরিকেশবের কু-অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু অভিভাবকেরা খুঁজিয়া পান নাই।

হরিকেশব মহা বিপদেই পড়িলেন। নৃপেন্দ্র যে আবার তাঁহার বাড়ী আসিবে, সেবিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না; এবং মুকুন্দরাম যে তাহার পিছন পিছন চর পাঠাইবেন তাহাও স্থির নিশ্চয়। সুতরাং ফলে একটা অভদ্র রকম গোলমালের সৃষ্টি হইবে তাঁহার নির্দ্দোষ কচি মেয়েটিকে লইয়া। মেয়ের নামে কালি ছিটাইতে পাইলে আমাদের দেশের লোকে কিছু চায় না, এবং সে-কালি যতই অকারণে হউক তাহা সহজে ধুইয়া ফেলাও যায় না। কাজেই হরিকেশব রীতিমত ভাবনায় পড়িয়া গেলেন।

এ ভাবনার কথা তিনি স্ত্রীকেও বলিতে পারিতেছিলেন না; কারণ নৃপেন্দ্র স্বয়ং যখন বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসে তখন তিনি যে সেটাতে বিশেষ গা করেন নাই, এটা তরঙ্গিণী জানিলে হয়ত ক্ষুব্ধ হইবেন। আবার মুকুন্দরামের শাসাইবার ভঙ্গীতেও তরঙ্গিণীর মনে বিশেষ ভয় জাগিতে পারে। শুধু শুধু তাঁহাকে এতখানি ভয় পাওয়াইয়া দিলে হরিকেশবের ভাবনা কিছু কমিবে না; সুতরাং একলা এ বোঝা বহাই ভাল।

হঠাৎ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে মুকুন্দরাম মনে করিবেন ভয় পাইয়াই বুঝি তিনি পলাইলেন; এই চিন্তাটা হরিকেশবের পৌরুষে বড় ঘা দিতেছিল। তিনি

জানিতেন নিজের এই বীরত্বের কথা জাঁক করিয়া সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতেও মুকুন্দরাম ছাড়িবেন না। সুতরাং দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও পলাতকের মত এ যাত্রাটা তাঁহার আসিতেছিল না। মেয়ের সুনাম নষ্ট হইবার ভয়ে চট্ করিয়া শক্ত কথাও বলিতে পারিতেছিলেন না; কারণ মুকুন্দরামের প্রতিশোধ লইবার ধরণটা হরিকেশব চিনিয়া লইয়াছিলেন।

হরিকেশবকে এই উভয় সঙ্কটের দোলায় বেশীদিন দোল খাইতে হইল না। কুসুমলতার চিঠির সুনিপুণ রচনাভঙ্গীর গুণে দেশান্তরেও অনেক আজব খবর পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাহাই এই তীর্থযাত্রীদের পথে-পাতানো সংসার তুলাইল।

পূজা আগতপ্রায়। হরিকেশব কতকাল ঘরছাড়া, তাই সকলের সাধ যে এবার পূজায় অন্ততঃ যেন তিনি বাড়ী থাকেন। পূজার পরে ফিরিবারই কথা হইতেছিল, কিন্তু ছেলে বৌরা এবং মা ভাই সকলেই বড় ঝুলাঝুলি করিতেছে। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, এই একটা উপলক্ষ্য করিয়া পলাতক দলকে ঘরে ধরিয়া না আনিতে পারিলে হয়ত তাহারা সংসারের মায়া একেবারেই কাটাইয়া বসিবে। চিঠি লেখার মাত্রা কাজেই আজকাল বাড়িয়া গিয়াছে।

সকালবেলাই স্নান সারিয়া ধোপ কাপড় পরিয়া চুলের ডগায় গ্রন্থি বাঁধিয়া তরঙ্গিণী উঠানে সার সার প্রয়াগী পাথরের রেকাবী পাতিয়া মস্ত একটা জামবাটিতে ডাল-বাঁটা লইয়া বড়ি দিতে বসিয়াছিলেন বরেন ডাক্তারের স্ত্রীকে কিছু বড়ি ইত্যাদি উপহার দিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিবার উদ্দেশ্যে। আস্ত আমের আচার, ল্যাংড়া আমের আমসত্ত্ব ও বুটের মিঠাই তৈয়ারিই ছিল; কেবল বড়িটা হইয়া গেলেই হয়। স্বামীকে তিনি এসব কথা কিছু বলেন নাই, কারণ তিনি হয়ত উপহারের ভিতর স্ত্রীর কোনো গোপন উদ্দেশ্যও আবিষ্কার করিতে পারেন। সংসারের জন্যই বড়ি দেওয়া হইতেছে এটা ভাবিয়া লওয়া ত হরিকেশবের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং কোনো কথা উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

গৌরী বারান্দার একটা সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া উঠানে পা ছড়াইয়া ভুট্টাভাজা চিবাইতেছিল আর মার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে বলিল, "মা, কতক্ষণ থেকে তোমার চিঠি এসে পড়ে রয়েছে, তুমি একটু খুল্‌ছও না। আমি হ'লে বাপু, সব কাজ ফেলে আগে চিঠি পড়তাম। অতক্ষণ কি বসে' থাকা যায়? মনে হয় চিঠির কথাগুলো ছুটে বেরিয়ে আস্‌তে মাথা ঠোকাঠুকি কর্‌ছে।"

মা বলিলেন, "না বাছা, তোমার মত আমার অত উদ্ভুট খেয়াল নেই। চিঠি পড়তে ছুট্‌লে এখন সব বড়ি কটা ছোঁওয়া ন্যাপা হয়ে যাক্ আর কি। এইত কটা আছে; টপ টপ করে' ফেলে দিলেই হয়ে' গেল।"

গৌরী তাড়া দিতে দিতে তরঙ্গিণী কাজ শেষ করিয়া স্বরচিত বড়ির শুভ্ররূপ ও এক ছাঁচের নিটোল গড়নের দিকে একবার পূর্ণ তৃপ্তির সহিত চাহিয়া হাত ধুইয়া চিঠি-খানা তুলিয়া লইলেন। শঙ্কর লিখিয়াছে। বহুকাল সে তাঁহার কোলের ছেলে হইয়া কোল জোড়া করিয়াছিল। তাই আজও তাহার চিঠি পাইলে কোলের শিশুটিকে ফেলিয়া আসিয়াছেন মনে করিয়া চোখে জল আসে। সজল চক্ষে অভিমানী ছেলের চিঠিখানি খুলিয়া তরঙ্গিণী পড়িলেন :—

"মা, তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখতে চাও না? লিখে' লিখে' সকলের হাতে কড়া পড়ে' গেল তবু তোমাদের হুঁস হয় না। আমরা কি সত্যিই তোমার কেউ নই। গৌরীই বুঝি সব হ'ল?

"তাওত আবার শুন্‌ছি গৌরীকে নিয়ে ওখানে কি-একটা হাঙ্গামা বেধেছে। তবু তোমরা ওখানকার মাটি কাম্‌ড়েই পড়ে' থাক্‌বে? তোমাদের কি মান অপমান জ্ঞানও নেই? কি যে হয়েছে আর তোমরা যে কি ঘোঁট পাকাচ্ছ তা তোমরাই জান। এদিকেত ময়নার শ্বশুর বাড়ী শুদ্ধ সব চটে আগুন! তাদের এক কার না কার বৌ নাকি ওদেশে থাকে, সে গৌরীর নামে আর তোমাদের নামে অনেক যা তা কথা লিখেছে। তাই সৃষ্টিধর আর মহীধর বুড়ো ক্ষেপে উঠেছে। ময়নাকে তারা পুজোর সময় একরকম ছোটলোকের ঘরে পাঠাবে না; আরও অনেক রকম শাসিয়েছে। ছোটকাকা আর কাকী ত মাথায় হাত দিয়ে

বসে আছেন। বৌদি বল্‌ছিল যে কাকী নাকি তোমাদের নামে খুব অকথ্য কুকথ্য কিসব্ বলেছেন। তীর্থের নাম করে' তোমরা নাকি কি সব কাণ্ড করে' বেড়াচ্ছ আর এদিকে তাঁর মেয়ের প্রাণান্ত হবে।

"আমি সব কথা জানি না। ছোটকাকা জানেন, বাবাকে লিখতেও চান, কিন্তু সাহস হচ্ছে না বলে' এখনও লেখেন নি। ময়নার শ্বশুরেরও ইচ্ছা কি সব লেখেন। কিন্তু ঠিকানা জানেন না বলে' বোধ হয় হয়ে' ওঠেনি।

"দূর থেকে তোমরা এসব কথা ভাল করে' বুঝবে না; আমরাও বুঝতে পার্‌ছি না কি হল। তাই আমার মনে হয় তোমাদের আর ওখানে একদিনও থাকা উচিত নয়। অবিলম্বে চলে' এস।"

চিঠি পড়িয়া ত তরঙ্গিণীর চক্ষুস্থির। মুকুন্দরামকে চিঠি লেখার পর আর যে কি ঘটিয়াছে তাহা তিনি কিছুই জানেন না। বরং মনে অনেক আশা পোষণ করিয়া উপহারের ডালি সাজাইতেছিলেন। হঠাৎ কি হইল, কে কি রটাইল ভাবিয়া তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল।

গৌরী ঝুঁকিয়া দাদার চিঠি পড়িতে আগাইয়া আসিল। মা তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন, "যাঃ যাঃ বুড়োমি করে' সব চিঠি দেখতে হবে না, নিজের বই পড়গে যা।" মা ত কখনও চিঠি বিষয়ে এত কড়াকড়ি করিতেন না। আজ হঠাৎ তাঁহার হুঁসিয়ারি দেখিয়া গৌরী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া চিঠি লইয়া স্বামীর কাছে সোজা গিয়া হাজির:—"হ্যাগা, এসব কি কাণ্ড বল ত? ছেলেটাত আমার ভির্মী লাগিয়ে দিয়েছিল আর একটু হ'লেই। কি হয়েছে বল না গা! মনে মনে পাপ পোষণ করেছিলাম, তাই কি ভগবান এ শাস্তি দিচ্ছেন?"

হরিকেশব ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া "কই কি, হয়েছে!" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তারপর চিঠি দেখিয়া বিস্মিত ভাবে চিঠিখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। সকল কথা তাঁহার নিকট জলের মত পরিষ্কার বোধ হইল, কোনো কথা বুঝিতে বাধিল না। তবে তিনি মনে করিয়াছিলেন এ সব কথা শুনাইয়া তরঙ্গিণীর ক্ষুদ্র আশাটুকু এমন নির্ম্মম ভাবে চূর্ণ করিবেন না। কিন্তু আর উপায় নাই। তাঁহাকে সকলই বলিতে হইল।

মুকুন্দরামই যে সকল গুজবের কারণ তাহা বুঝিতে তরঙ্গিণীর দেরী হইল না এবং নৃপেন্দ্রর জেদটা এই কুৎসিৎ উপায়ে ভাঙিয়া কার্য্যসিদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই যে সে বাড়ীর মেয়েদেরও ইহাতে রোখ চাপিয়াছে তাহাও বোঝা গেল। কুসুমলতার অস্তিত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোনো জ্ঞান ছিল না; কাজেই এত দেশ থাকিতে মহীধর সৃষ্টিধরের গ্রামে জানিয়া শুনিয়া কে খবর দিতে গেল ভাবিয়া পাইলেন না।

তরঙ্গিণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। "ভগবান্, কেন এ পাপ কল্পনা মনে এনেছিলাম? তাই কি এমন আগুনের ছেঁকা দিচ্ছ! আমার কচি মেয়ের নামে এমন করে' কালী ছেটালে সে কি নিয়ে সংসারে দাঁড়াবে, ঠাকুর?" হরিকেশব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তুলিলেন, "এখনই অত ভয় পেও না। ওসব কিছু নয়, আপনিই ক'দিনে ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তরঙ্গিণী কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি কালই বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। আজ কেবল গৌরীকে লইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে পাপক্ষালন করিতে দশটা ডুব দিয়া ও একগোছা চুল দিয়া আসিবেন।

বড়ি আচার রোদে ফেলিয়া রাখিয়াই তরঙ্গিণী গৌরীকে টানিয়া একা চড়িতে চলিলেন। গৌরী একবার বলিল, "মা, সব যে কাকে খেয়ে যাবে?"

মা বলিলেন, "থাক্ গে, মনে মনে দিলেও উচ্ছিষ্ট হয়; ও ছাই আর আমার কোন্ কাজে লাগ্‌বে? তোর সুনরিয়া খাবে এখন।" গৌরী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ কর্‌বার অধিকারী, এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন কর্‌বার শক্তি রাখেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প ব'লেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে, সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত অত বড় বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ, তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক্, সে-মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ, তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান্ হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায় নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন, অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি ক'রেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী কর্‌তে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী ক'রে তুল্‌তে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে, তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু যতক্ষণ তা উদ্ভিদে-প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধু মাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তাকে জীবনগত কর্‌বার শক্তি ক'জনারই বা আছে? সত্যকে জানে অনেক লোকে; তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান্। প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের ক'রে দিই। এই মান্‌তে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিষ। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য। সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্ব্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্ত্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব ক'রে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মত হ'য়ে উঠে, তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল ক'রে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই যে আঘাত, শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য কর্‌তে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে তুল্‌তে পেরেছেন, জীবন থাক্‌তেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু মৃত্যুর গুপ্তচর ত শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ ক'রেই ফিরে যাবে না। ধর্ম্মবিদ্রোহী ধর্ম্মান্ধতার কাঁধে চ'ড়ে রক্ত-কলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্ব্বেই সে ত আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের ত কিছুই অবশেষ থাকেনি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই যে নিষ্ঠুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে ত সহ্য কর্‌তে পারা যায় না। দুর্ব্বল, স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এত বড় হিংসার বোঝা বইবে কি ক'রে? এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। এর দুঃখ সইবে কে?

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে—তোমরা আমাকে কি ভাবে গ্রহণ কর্‌বে? বিপদ আস্‌বে না এমন হ'তে পারে না—সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু কি ভাবে

বিপদকে আমরা ব্যবহার করি, তারি উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই যে পাপ কালো হ'য়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব, না এর কাছে মাথা নত করব? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপুর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে, মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম্ম। কিন্তু যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায়, তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়—বাধা যদি থাকে, ত সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসরণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হ'য়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম্ম ত একেবারে ছাড়তে পারিনে। কিন্তু ক্রোধদ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হ'য়ে যায় তবে আগুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় ত আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্ব্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না, তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে, যে, কূপ খনন ক'রে রাখিনি, সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তাহ'লে ভবিষ্যতে তাদের ঘড়-পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরো আজকে তাই বল্‌তে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয় ত লোকে বলবে, না, এতো ভাল লাগছে না,—একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়!

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার ক'রে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল-প্রচেষ্টা সফল হবে, তাহ'লে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হ'তে পারে, কিন্তু ছাদরক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সব-চেয়ে বড় অমঙ্গল, বড় দুর্গতি ঘটে, যখন, মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে-সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ, আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সব-চেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্ব্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধ সে আরো কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়ত বা প্রয়োজনের থাকতে পারে। সেইখানেই যে ছিদ্র, ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান, সেখানেই আকাশ ভেদ ক'রে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণের রথ-যাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে—কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা দ্বারা,

সে রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে? যেখানে গর্ত্তগুলো হাঁ ক'রে আছে হাজার বছর ধ'রে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হ'য়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে-ছিলেন ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক্। জানি, ওরা যোগ দেয়নি। কিন্তু, কেন দেয়নি? তখন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে, সে আশ্চর্য্য কিন্তু, এত বড় আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর ক'রে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা ক'রেও লাফ দিয়ে সেটা পার হ'তে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবাতো সনাতন ডোবা, কিন্তু, আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘট্‌চে সেটাতো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে,—ডোবার কোনো দোষ নেই, ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে, ভাঙা গাড়ীকে যখন গাড়ীখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হ'তে পারে। কিন্তু যখনি তাকে টান্‌তে যাই তখন তার জোড়-ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলিনি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্ত্তব্য পালন করেছি, তখন ত নাড়া খাইনি। আমি যখন আমার জমিদারী সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম, তখন একদিন দেখি আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিগ্যেস্ করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যেসব

সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায়, তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক্। এ প্রথাতো অনেকদিন ধ'রে চ'লে এসেছে, অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চল্‌তে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক্। আমরা বিস্মিত হ'য়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁক্‌টার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্বোধন হ'য়েছে ব'লেই যত ভেদ, যত ফাঁক সব স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানারূপে আসে—কিন্তু আজ বড় ক'রে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ ক'রে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই যে চৈতন্য এসেছে, রিপুর বশবর্ত্তী হ'য়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করবে, না, শুভবুদ্ধিদাতাকে বল্‌ব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদী গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও!

এই যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিল এত ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কি ক'রে একে চিরকালের মত পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব? সহসা এ প্রশ্নের একটা পাকা রকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা আরম্ভ ক'রে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে হবে আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে, অতি নির্ম্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে—বল্‌তে হবে—পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য। এস আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড় সহজ কথা নয়। কেন না, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায়নি—এক ঈশ্বরের নামে, 'আল্লাহো আকবর' ব'লে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব হিন্দু এস, তখন কে আস্‌বে? আমাদের মধ্যে কত ছোট ছোট সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা, এ উত্তীর্ণ হ'য়ে কে আস্‌বে? কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র ত হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্নবিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ হ'তে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ ক'রে মরেছে। তখনো একত্র হ'তে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম ব'লেই মেরেছে, যুগে-যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনো কখনো ইতিহাস উদ্‌ঘাটন ক'রে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে, বলি, শিখরা তো এক সময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সেত শিখধর্ম্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্ জাতি সব, শিখধর্ম্মের আহ্বানে একত্র হ'তে পেরেছিল, বাধাও দিতে পেরেছিল, ধর্ম্মকেও রক্ষা করতে এক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজী একসময় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের ভিৎ গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত ক'রে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না। শিবাজীর হ'য়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজীর তেম্‌নি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে

সামঞ্জস্য রইল না, পেশওয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হ'য়ে ক্ষণকালীন্ রাষ্ট্রবন্ধনকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই যে পাপ পুষে রেখেছি, এতে কি শুধু আমাদেরি অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করিনে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলিনে? যে দুর্ব্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ ক'রে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্ব্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে, আর আমরা প'ড়ে প'ড়ে মার খাই—তবে জান্‌ব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্ব্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও, আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপীল কর্‌তে পারি, তোমরা ক্রূর হয়ো না—তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্ম্মের ভিত্তি হ'তে পারে না,—কিন্তু সে আপীল যে দুর্ব্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হ'য়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না; তেমনি দুর্ব্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুতা-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে, সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ ত কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সেত ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়? আর তার শ্বাসই বা কতক্ষণ? আজ আমাদের অনুতাপের দিন—আজ অপরাধের ক্ষালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে। রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

[১০ই পৌষ শান্তিনিকেতনে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা করেন,তাহার তাৎপর্য্য তৎকর্ত্তৃক সংশোধনানন্তর উপরে প্রকাশিত হইল।]

অনাগত

শ্রী বীণাপাণি রায়

সঞ্চারিল সুরভি প্রথম আমার এ হৃদয়-কোরকে,
মন্দবহ সমীর-হিল্লোলে, আন্দোলিল নর্ত্তন-পুলকে।
উঠি ভরি' ধীরে ধীরে ধীরে মধুর মদির সুধারাশি,
উন্মেষিল হাসি' সঙ্গোপনে অপরূপ আলোকে উদ্ভাসি'।
পরিপূর্ণ হিয়া অবশেষে, যখন ফুটিল দল মেলে—
পিপাসিতা চাহে উর্দ্ধে লাজে; কম্প্র-দেহা পুলক-উদ্বেলে!
ফুটিল যে পূজিবার তরে—কেহ পূজা না লইল তার,
আশাহতা ঝরিল নিঃশেষে; নব জন্ম লভিল আবার॥

পূজিবারে জীবনের-পথে পাথেয় সে করিছে সঞ্চয়,
বক্ষে তার মত্ত-আশা জাগে—চক্ষে তার অনন্তপ্রলয়।
বার বার ছিন্ন আশা-ডোর—বার বার হ'তেছে ব্যাহত,
তথাপি সে আলেয়ার পিছে চলেছে চলেছে অবিরত।
কত যুগ-যুগান্তর ধরি চলেছে সে চলনের পথে,
কভু বাজে বন্ধুর হইয়া; কভু চলে মায়াময় রথে।
বক্ষে তার জ্বালা অবিনাশী, চক্ষে তার বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা,
উগারিছে তীব্র হলাহল—পুন পান করে ভরি' সুধা॥

সীমা-হারা আশা-উর্ম্মিমালা আছাড়িছে জীবনের তটে,
প্রাণ-পুষ্প দিনু ডালি হাসি'—শুনাইনু গান ছায়ানটে।
সে যুগ যুগান্ত হ'তে হায়, করি' পূজা শুনায়ে সঙ্গীত—
গেল কাটি' কত দীর্ঘ বেলা; অজানার নাহিক ইঙ্গিত।
সুরগুলি পশে নাই সেথা?—প্রতিহত বুঝি উপেক্ষায়?
মাত্র এক লহমার লাগি'—এ প্রসূন না পড়িল পায়?
তোমার বাঁশরি-ধ্বনি শুনি ধরণীর প্রতি-অণু-ব্যাপী
শুনি মোর ব্যথাহত বাঁশি উঠিল না বক্ষ তব কাঁপি,'
মত্ত-আশা না ত্যজিব তবু—এস তবে শুভ অনাগত!
ব্যর্থ যাহা হোক্ অবসান; হে তরুণ! স্বাগত স্বাগত!

যে নদী না মিশিল সাগরে—হোক্ তাহা তরঙ্গ-বিহীন,
যাও তার গতি-মুখে বাধা—হোক্ শুষ্ক জলধারা ক্ষীণ!
যে ফুলে হ'ল না পূজা—হোক্ ছিন্ন ধূলি-ধূসরিত,
আকাঙ্ক্ষিত অনাগত মোর—প্রাণ ভরি' পূজিবে বাঞ্ছিত।

মৃত্যু-দূত

সেলমা লাগরলফ্

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-বেদনা

জর্জ্জ অত্যন্ত শান্তভাবে রোগীর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা ফিরে এলেন। ঘরের ভিতরে একটু অন্ধকার। গৃহকর্ত্তা প্রথমটা ভাব্‌লেন, তাঁদেরই প্রতিবেশী পিটার, বার্ণার্ডের কাছে ব'সে তাকে গল্প বল্‌ছে। তিনি বল্‌লেন, 'কে হে, পিটার নাকি?' বাবার ভুল দেখে ছেলেটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, 'না বাবা, পিটার নয়, তার চাইতেও ভাল লোক। আমার কাছে এসে শুনে যাও।' তিনি বালকের কাছে গিয়ে তাহার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই সে তার কানে কানে বল্‌লে, 'এ সেই জেল-পালানো আসামী।' বার্ণার্ডের বাবা চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, 'তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ খোকা, ওকথা বলে না।' খোকা বল্‌লে, 'সত্যি বাবা, এই ত এতক্ষণ আমি গল্প শুন্‌ছিলাম, ও জেল থেকে কেমন ক'রে পালিয়েছিল; কেমন ক'রে তিন রাত্তির ধ'রে জঙ্গলের ভেতর একটা ভাঙ্গা গুদোমে লুকিয়েছিল। আমি ওর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি।'

"বার্ণার্ডের মা ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বেলে ফেল্‌লেন। আগন্তুক ততক্ষণে বাইরের দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর কর্ত্তা তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'আমি সমস্ত ঘটনাটা শুন্‌তে চাই, তুমি নির্ভয়ে আমাকে বল।' তার পর সবাই ব'সে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল। সমস্তটা শুনে বুড়ো কর্ত্তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বিশেষ ভাবে আসামীকে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেন। তাঁর মনে হ'ল আসামী অত্যন্ত অসুস্থ, এই শরীরে যদি সে আর এক রাত্রিও সেই গুদোমে রাত কাটায় তাহ'লে নিশ্চয়ই মারা পড়্‌বে।

"তিনি বল্‌লেন, 'পথে-ঘাটে এমন অনেক লোক ঘুরে বেড়ায় যারা তোমার চাইতেও ঢের ভয়ঙ্কর—অথচ তাদের ত কেউ ধরে না, তারা নির্ব্বিবাদে চল্‌ছে ফির্‌ছে।' আগন্তুক লজ্জিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, 'আমি কিন্তু আসলে মন্দ নই। নেশার ঝোঁকে রেগে গিয়েই ত—।' পাছে বার্ণার্ড্ এ সব শোনে এই ভেবে বাড়ীর কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, 'আমি তা আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, ছোক্‌রা।'

"কথাবার্ত্তা বন্ধ হ'য়ে গেল। সকলেই যেন ব'সে ব'সে কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল। বার্ণার্ডের বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেলেন, অন্য সকলে তাঁর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'আমি জানি না আমি অন্যায় কর্‌ছি কি না; কিন্তু তোমার মত আমিও ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌ব না, বার্ণার্ড্ ওকে পছন্দ করেছে।'

"ঠিক হ'য়ে গেল যে, পলাতক সেখানেই রাত্রিবাস ক'রে ভোর-বেলা উঠে অন্য কোথায়ও যাবে; কিন্তু সেই রাত্রেই সে ভীষণ জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়্‌ল; সকালে উঠে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা তার ছিল না। সুতরাং আরো দিন পনেরো তাকে সেখানেই থাক্‌তে হয়েছিল।"

দুই ভাই অবাক্-বিস্ময়ে এই গল্প শুনিতে লাগিল। রোগীর নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণা যেন তিরোহিত হইয়া গেল; সে নিশ্চিন্ত-আরামে শুইয়া শুইয়া অতীতের সুখস্মৃতিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। ডেভিডের মন তখনো সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে। তার মনে হইল ইহার অন্তরালে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন বিপদ লুকান আছে। সে বারবার ইঙ্গিতে তাহার ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টিত হইল; কিন্তু রোগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না।

মৃত্যু-দূত বলিতে লাগিল, "পলাতক কঠিন রোগে

শয্যাশায়ী, অথচ ডাক্তার ডাক্‌বার উপায় নাই, ওষুধ আন্‌বার জো নাই—কারণ তাহ'লেই লোক-জানাজানি হবে। সম্পূর্ণ বরাতের ওপর রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এসময়ে যদি কোনো প্রতিবেশী বেড়াতে আস্‌ত, বার্ণার্ডের মা দরজার বাইরেই তাকে ব'লে দিতেন, 'বার্ণার্ডের গায়ে গুটি গুটি কি সব বেরিয়েছে, আমার ত ভারী ভয় কর্‌ছে বুঝি বা—' বাকীটুকু শুন্‌বার জন্যে আর কেউ সেখানে দাঁড়াত না।

"প্রায় পনের দিন পরে রোগী একটু একটু ক'রে সুস্থ হ'তে লাগ্‌ল, সে ভাব্‌লে, আর না, এদের ঘাড়ে বোঝা হ'য়ে আর থাকা নয়, এবার বিদায় নিতে হবে। কোথায় যাবে তার ঠিক ছিল না, দূর বিদেশে কোথায়ও।

"কিন্তু, সে সময় বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী তাকে নিয়ে যে-সব আলোচনা কর্‌তেন তাতে তার মনে গভীর রেখাপাত কর্‌ত। একদিন বার্ণার্ড তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, এর পরে সে কোথায় যাবে। সে বল্‌লে, তাকে আবার জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হবে। বার্ণার্ডের মা বল্‌লেন, 'জঙ্গলে জঙ্গলে পশুর মত ঘুরে বেড়ানোর চাইতে আমি সমস্ত দোষ স্বীকার ক'রে পুলিশের কাছে ধরা-দেওয়াটা বেশী পছন্দ কর্‌তাম, জঙ্গলে ওভাবে ঘুরে বেড়ানোতে কি কোনো সুখ আছে ?' অতিথি বল্‌লে, 'কিন্তু জেলেও ত দুঃখ কম নয়!' বার্ণার্ডের মা বল্‌লেন, 'কিন্তু ধরা যখন পড়তেই হবে, নিজে থাক্‌তে ধরা দেওয়াই কি ভাল নয় ?'

" 'কিন্তু, আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, এখন ধরা দিলে আরো কিছু দিন জেল খাটতে হবে যে!'

" 'আমার মনে হয় তোমার পালানোটাই ভুল হয়েছিল।'

"পলাতক গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠ্‌ল, 'না আমার তা মনে হয় না—আমি বোধ হয় জীবনে এত ভাল কাজ কিছু করিনি।'

"এই কথা ব'লে সে বার্ণার্ডের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাস্‌লে। বার্ণার্ডও তার কথার সমর্থন ক'রে হেসে উঠ্‌ল। অতিথির মন খুসীতে ভ'রে গেল; তার ইচ্ছা হ'ল বার্ণার্ডকে বিছানা থেকে তুলে কাঁধে ক'রে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসে। বার্ণার্ডের মা বল্‌লেন, 'তুমি যদি এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও তাহ'লে বার্ণার্ডের সঙ্গে কি তোমার কখনো দেখা হবে ? তোমার সুখ-শান্তি কিছু থাক্‌বে না।'

"আসামী বল্‌লে, 'জেলের কষ্ট তার চাইতেও বেশী।'

"বাড়ীর কর্ত্তা এতক্ষণ আগুনের ধারে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। তিনি বল্‌লেন, 'দেখ, তুমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিশেষ পরিচিত হ'য়ে উঠেছ; কিন্তু এভাবে তোমাকে আমাদের পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। তুমি যদি খালাস পেয়ে আস্‌তে তা হ'লে অন্য কথা ছিল।' পলাতকের হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, বুঝিবা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌তে এঁরা তাকে পীড়াপীড়ি কর্‌ছেন—যাতে ভবিষ্যতে জানাজানি হ'লে তাঁদের কোনো বিপদে না পড়্‌তে হয়। সে বল্‌লে, 'আমার শরীরটা বেশ ভালই বোধ হচ্ছে, কাল ভোরে উঠেই আমি চ'লে যাব, আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ থাক্‌বে না।' কর্ত্তা বল্‌লেন, 'ভয়ের কোনো কথাই হচ্ছে না, তুমি যদি খালাস পেতে, তাহ'লে, তোমাকে আমার পরিবারভুক্ত ক'রে নিয়ে আমি সুখী হ'তাম, তুমি আমার চাষবাসের কাজ দেখ্‌তে পার্‌তে।'

"একজন জেল-পালানো আসামীর ওপর এই দয়া দেখে অতিথির মন গ'লে গেল; কিন্তু জেলে ফিরে যাওয়ার অনেক বাধা। সে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"বার্ণার্ডের অসুখ সেদিন খুব বেড়েছিল, পলাতক বল্‌লে, 'ওকে হাঁসপাতালে পাঠানো দরকার।' বাড়ীর কর্ত্তা বল্‌লেন, 'সেখানে ওকে অনেকবার পাঠিয়েছি, কোনো ফল হয়নি, নিয়মিত সমুদ্র-স্নান ছাড়া এ রোগ ভাল হ'বার কোনো উপায় নাই; কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! আমরা গরীব—অসহায়; তাই চুপ ক'রে সব সহ্য কর্‌ছি।' আসামীর মনে হ'ল—এ সময় যদি সে কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌ত, কি সুখেরই না হ'ত। সে আশা কর্‌তে লাগ্‌ল, ভবিষ্যতে সে বার্ণার্ডের বাবাকে সাহায্য কর্‌বে, যেন তাঁরা বার্ণার্ডকে সমুদ্র-স্নানের জন্য পাঠাতে পারেন।

"এই দুঃখকর প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে আসামী হঠাৎ কর্ত্তার দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল, 'একজন জেল-পালান

লোককে কি চাক্‌রী দেওয়াটা আপনার উচিত হবে?' কর্ত্তা বল্‌লেন, 'তাতে কিছু আট্‌কাবে না, ছোক্‌রা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি হয়ত পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে ভালবাস না—সহরকে তুমি বুঝি বেশী পছন্দ কর!' পলাতক বল্‌লে, 'সহরকে আমি ঘৃণা করি, আমি জেলখানা-ঘরের কোণে ব'সে ব'সে খালি মাঠ আর বনের কথা ভেবেছি।'

"বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী খুসী হ'য়ে উঠ্‌লেন। কর্ত্তা বল্‌লেন, 'তোমার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন দেখবে তোমার মনের ভার অনেক লাঘব হয়েছে, তুমি তখন নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌বে।' গিন্নী বল্‌লেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

"পলাতকের মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা অজানা ভাবের উদয় হ'ল। সে বল্‌লে, 'বার্ণার্ড একটা গান কর্‌বে কি?—না থাক্, তোমার শরীরটা আজ ভারী খারাপ!' বার্ণার্ড বল্‌লে, 'না না, আমি গাইছি।' মাও ছেলেকে অনুমতি দিয়ে বল্‌লেন, 'তোমার বন্ধুকে সন্তুষ্ট ক'রে দাও, বার্ণার্ড।' আসামীর ভয় হ'ল, অসুস্থ শরীরে গাইতে গিয়ে বার্ণার্ডের শরীর আরও খারাপ না হয়! সে ভাব্‌লে ওকে বারণ ক'রে দেয়, কিন্তু বার্ণার্ড তখন মধুর কণ্ঠে গান সুরু করেছে। আসামীর সমস্ত অস্থিরতা একমুহূর্ত্তে দূর হ'ল। তার মনে হ'ল চিরজীবনের জন্যে কয়েদী থাক্‌লেও সে আর কষ্ট পাবে না—সে শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র কর্‌বে! একটা অস্পষ্ট ব্যথা তার মনে ধীরে ধীরে জাগ্‌তে লাগল; সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেল্‌লে। কিন্তু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটাফোঁটা অশ্রু গড়াতে লাগল! তার মনে হ'ল, তার জীবনের কোনো মূল্য আছে ব'লে সে মনে করেনি, কিন্তু, আজ যদি সে বার্ণার্ডকে রোগমুক্ত কর্‌বার জন্যে কিছুও কর্‌তে পার্‌ত!

"পরদিন সে বিদায় নিল! কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে না, সে কোথায় যাবে। সকলে বল্‌লে—'আবার ফিরে এস।'"

মৃত্যুদূতকে বাধা দিয়া রোগী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তারা তাই বলেছিল, বন্ধু। আমার ক্ষুদ্র জীবনের এইটিই একমাত্র মূল্যবান স্মৃতি, একমাত্র সম্পদ।" তাহার চক্ষু ছাপাইয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "তুমি এ ঘটনা জান দেখে আমি সুখী হচ্ছি। বার্ণার্ড্ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বল্‌ছি, তুমি শোনো। হায়, আজ যদি আমি মুক্তি পেতাম, যদি তার কাছে গিয়ে একবার বল্‌তে পার্‌তাম—তাহ'লে আমার মত সুখী আজ কেউ হ'ত না!"

জর্জ্জ বাধা দিয়া বলিল, "শোন হল্‌ম্, আমি তোমাকে তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি, আজ রাত্রে,এখুনি। কিন্তু এভাবে নয়, এবেশে নয়—তুমি কি তাতে রাজী হবে? তোমার জীবনের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার যদি আজ সমাপ্তি ঘটে, যদি তোমাকে আজ রাত্রে আমি অনন্ত স্বাধীনতা দান করি—তুমি কি তা নেবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে জর্জ্জ তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিল, তাহার কাস্তেখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল।

রোগী বিস্মিত আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া তাহাকে দেখিল। জর্জ্জ বলিতে লাগিল, "হল্‌ম্, আমার কথা কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ? আমি পৃথিবীর সকল কারাগারের দ্বার উন্মোচন কর্‌তে পারি, আমি তোমায় বিশ্বের সকল বাধা, সকল বিপদের ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারি।"

রোগী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "তুমি কি বল্‌ছ আমি বুঝেছি, কিন্তু, তাতে কি বার্ণার্ডের উপর অন্যায় করা হবে না? তুমি ত জান আমি ফিরে এসেছিলাম শুধু ন্যায় মত শাস্তি ভোগ ক'রে, খালাস পাবার জন্যে—খালাস পেয়ে বার্ণাড্‌কে সাহায্য কর্‌বার জন্যে।"

জর্জ্জ বলিল, "তুমি তার জন্যে ক্ষমতার অতিরিক্ত ত্যাগ-স্বীকার করেছ এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ তোমার শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—আমি তোমাকে বহুমূল্য স্বাধীনতা দিতে এসেছি। বার্ণার্ডের কথা তুমি আর ভেব না।"

"কিন্তু, আমার যে তাকে সমুদ্রস্নানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল! আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তখন তার কানে কানে ব'লে এসেছিলাম—ফিরে এসে তাকে আমি সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে যাব। ছোট ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভাঙ্‌তে নেই।"

জর্জ্জ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "তাহ'লে তুমি স্বাধীনতা চাও না, হল্‌ম।"

পীড়িত বালক মৃত্যু-দূতের বসনাগ্রভাগ ধারণ করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি স্বাধীনতা চাই—তুমি যেয়ো না, তুমি জান না, আমি মুক্তির জন্যে কেমন ব্যাকুল হ'য়ে আছি, শুধু যদি জান্‌তাম, আমি গেলে আর কেউ বার্ণার্ড্‌কে দেখ্‌বে!—কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই।"

সে হতাশভাবে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে গিয়া ডেভিড্‌কে দেখিতে পাইল। আশান্বিত হইয়া সে বলিল, "ওইত ডেভিড্‌ ওখানে রয়েছে—যাক্‌, বাঁচা গেল। আমি ওকে বল্‌ছি, ও যেন বার্ণার্ড্‌কে সাহায্য করে।"

জর্জ্জ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তোমার দাদা ডেভিড্‌, একটা শিশুর ভার দেবে তাকে! যে নিজের ছেলের যত্ন করে না, সে পরের ছেলের সাহায্য করবে!"

রোগী সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যাকুলভাবে ডেভিড্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডেভিড্‌, আমি আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণসবুজ প্রান্তর ও বাধাহীন সমুদ্রদেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি জান ডেভিড, আমি এতকাল এখানে বন্দী ছিলাম! স্বাধীনতার জন্যে আমি কাতরভাবে প্রতীক্ষা কর্‌ছি; কিন্তু মুক্তি পেতে গেলে সেই ছেলেটির উপর অবিচার করা হবে, আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম!"

ডেভিড্‌ হল্‌ম কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "অস্থির হ'য়ো না, ভাই। আমি শপথ কর্‌ছি, ওই ছেলেটি এবং আর আর যারা তোমার সাহায্য করেছিল আমি তাদের সাহায্য কর্‌ব। তুমি যাও—মুক্ত হও—স্বাধীন লোকে বিচরণ কর। আমি তাদের দেখব। তোমার কারাগার ছেড়ে বাইরে যাও।"

ডেভিডের শেষ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মস্তক শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

জর্জ্জ বলিল, "ডেভিড্‌, তুমি এই মাত্র মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে। চল এখান থেকে চ'লে যাই, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। মুক্ত আত্মা যেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বারা পীড়িত না হয়—আমরা বদ্ধ অন্ধকারের জীব!"

* * * *

সেই বীভৎস শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুযান চলিয়াছে। ডেভিড্‌ ভাবিল, এই ভয়াবহ কর্কশ শব্দ ভেদ করিয়া জর্জ্জ তাহার কথা শুনিতে পাইবে কি না! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সিস্‌টার ঈডিথ্‌ ও তাহার ভ্রাতার মৃত্যু-মুহূর্ত্তে তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য জর্জ্জকে ধন্যবাদ দিবে। তাহার কার্য্যভার লইতে সে প্রস্তুত নহে বটে, কিন্তু তাহার সৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে দোষ কি?"

এই চিন্তা ডেভিডের মনে উদিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুযানের চালক লাগাম টানিয়া গাড়ী থামাইল। বোধ হইল যেন ডেভিডের মনের কথা সে জানিতে পারিয়াছে।

জর্জ্জ বলিল, "আমি একজন সামান্য চালকমাত্র, কিন্তু, মাঝে মাঝে দুই একজনকে সাহায্য করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আমি অসহায়। এই দুই জনকে জীবনের প্রান্ত হইতে মরণের কূলে পার করিয়া দিতে আমাকে বেগ পাইতে হয় নাই—একজন, একান্তভাবে স্বর্গলোক কামনা করিয়াছিল, অন্য জনের এই মর্ত্ত্যলোকে কোনো বন্ধন ছিল না। ডেভিড আমি এই বিকট-দর্শন গাড়ী চালাইতে চালাইতে কতবার কামনা করিয়াছি—আমার অভিজ্ঞতা, মৃত্যু-পরপার-লব্ধ আমার বাণী পৃথিবীর মরণশীল লোকদের নিকট যদি ব্যক্ত করিতে পারিতাম! মানুষ তাহা পরম আশ্বাসবাণী বলিয়া গ্রহণ করিত।"

ডেভিড্‌ শান্তভাবে বলিল, "আমি তাহা কল্পনা করিতে পারি।"

"ডেভিড, ক্ষেত্র যখন পরিপক্ক শস্যে শোভা পায় তখন শস্য আহরণ করিবার কোনো ব্যথা নাই, কিন্তু অপরিপক্ক, অর্দ্ধবিকশিত শস্য-ক্ষেত্রের উপর যখন অস্ত্র চালনা করিতে হয় তখন মন যন্ত্রণায় পীড়িত হয়। এই কষ্টকর কাজ আমাকে বহুবার করিতে হইয়াছে। অনিচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই—প্রভুর হুকুম তামিল করিতেই হইবে।"

ডেভিড, বলিল, "আমি তোমায় বেশ জানি, জর্জ্জ।"

"ডেভিড, মানুষ যদি জানিত যে যাহাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে, জীবনের দেনা-পাওনা চুকাইয়া পরপারের যাত্রার জন্য যাহারা প্রস্তুত, পৃথিবীর বন্ধন যাহারা ছেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত্যু-লোকে বহন করিতে কোনো কষ্ট নাই, যদি তাহারা জানিত, যাহাদের কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, আরম্ভই হয় নাই, কিম্বা যাহাদের অধিকাংশ কর্ত্তব্য অসমাপ্ত, সংসারের স্নেহ-মায়ার শৃঙ্খল যাহাদের নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে সহসা জীবন হইতে মৃত্যুতে লইয়া যাওয়া কি কঠিন, কি যন্ত্রণাদায়ক তাহা হইলে হয়ত তাহারা মৃত্যু-দূতের কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা পাইত।"

"তোমার কথা আমি বুঝিলাম না, জর্জ্জ।"

"একটা কথা মনে রাখিও, ডেভিড্। তুমি যতক্ষণ আমার সহযাত্রী হইয়াছ ইহারই মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছ রোগ ও দারিদ্র্যের জন্য মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। আমিও সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইহাই লক্ষ্য করিতেছি। রোগে অপরিপক্ক, অপরিণত শস্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মানুষ যদি রোগ ও দারিদ্র্য দূর করিতে পারে তাহা হইলে মৃত্যু-দূতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসে।"

"জর্জ্জ, তুমি কি এই বাণী মানুষকে শুনাইতে চাও?"

"না, আমি জানি মানুষ একদিন অধ্যবসায়-বলে বিজ্ঞানের সহায়তায় রোগ ও দারিদ্র্যকে পরাভূত করিবে। এইসব ভয়ঙ্কর জীবনঘাতী জিনিষকে সম্পূর্ণ নষ্ট না করিলে তাহাদের পরিত্রাণ নাই। কিন্তু আমার বাণী ইহা নয়।"

"তবে মানুষ মৃত্যু-দূতের কষ্ট লাঘব করিবে কেমন করিয়া?"

"মানুষ পৃথিবীর ও নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন ভবিষ্যতে আসিবে যখন দারিদ্র্য, মাদকতা, এবং জীবের যাবতীয় জীবন-ঘাতী মহামারীগুলি লোপ পাইবে; কিন্তু সেদিনও মৃত্যুদূতের বোঝা লাঘব না হইতে পারে।"

"তোমার বাণী তবে কি, জর্জ্জ?"

"ডেভিড, নববর্ষের প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই। মানুষ আজ নিদ্রা হইতে এই চিন্তা লইয়া জাগরিত হইবে, যেন নববর্ষে তাহাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়—যেন তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের হয়। কিন্তু আমি তাহাদের জানাইতে চাই যে, প্রণয়দ্বন্দ্বে সফলতা, শক্তি-সঞ্চয়, দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভই বড় কথা নহে। আমি চাই তাহারা যেন তাহাদের সমস্ত চিত্ত সংহত করিয়া যুক্ত-করে প্রতিনিয়ত তাহাদের ভগবানের কাছে এই একটি মাত্র প্রার্থনা করিতে পারে—

"হে পরমেশ্বর! আমার জীবন, মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার আত্মা পরিণতি লাভ করে।"

ক্রমশঃ

শিশু

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

জীবন-যৌবনক্ষণে শিশু মোরে ডাক দিয়ে যায়—
অবিরাম ললিত কথায়!
স্বপ্নে মাতি' দিবারাতি চলিয়াছি পথ হ'তে পথে,
উচ্ছল আনন্দ-বেগে তারুণ্যের দীপ্ত জয়-রথে!
জয়শ্রী ভাতিছে মুখে। কর্ম্ম ডাকে সুকঠোর রবে;
গগনে গগনে তা'র প্রতিধ্বনি জাগি' উঠে যবে,
সহসা পড়িল মনে, কবে কোন্ সুন্দর প্রভাতে,
ধরণীর বক্ষতলে শিশু হ'য়ে এসেছিনু ফিরে;
সে সুপ্ত শৈশব আজি ডাকে মোরে ধীরে—
সরল সুন্দর তা'র চিরন্তন ক্রীড়ার সভাতে!
বহুদূর আসিয়াছি চ'লে—
কভু হাস্যে, কভু ক্লেশে, যৌবনের কর্ম্ম-সভাতলে!
জীবনের সিন্ধুনীরে ক্ষুধিত পাষাণ উঠে জেগে;
সরল সত্যের আলো ম্লান হ'ল সংশয়ের মেঘে!

হে শিশু, কহিছ কেন, এস এস ফিরে,
আমার চটুল নৃত্যে যোগ দিবে নবীন মঞ্জীরে;
আমার এ খেলাঘরে ধূলিমাঝে শুদ্ধ মনটিরে
নীরবে রাখিয়া দিবে। আমি তা'রে ধীরে
আমার রক্তিম বাস পরাইব হেসে;
দিব মোর উত্তরীয়, পুষ্পমালা বাঁধি' দিব কেশে।

তখন লাগিত বড় ভালো,
প্রভাত-সন্ধ্যার লীলা, মেঘ কালো কালো
অসীম রহস্য-ভরা। যেন স্বপ্নরাজপুরী হ'তে
মাতঙ্গ নামিত ধীরে;—জলধারা ছড়াত মরতে;
নিবিড় জলদজাল শালবনে চলিত সবেগে।
বর্ষার নূপুরধ্বনি শুনিতাম অর্দ্ধরাত্র জেগে!
শিশুর অন্তর জুড়ি' কোথা' হ'তে আসিত কেবল,—
অপ্সর, কিন্নর কত; ছায়ানৃত্য—আনন্দ-চঞ্চল!

আমার সে স্বপ্নস্বর্গে আমারে কি ল'বে তুমি ডাকি'?
ধূলিজাল ছিন্ন করি' আমি সেথা দাঁড়াব একাকী,
হে শিশু, তোমার পাশে। নয়ন মুদিয়া র'ব ধীরে;
সংসারের পারাবার-তীরে
যেথায় খেলিছ সবে কোলাহলে বালুতট-তলে;
সংশয়-অতীত পুরে জগতের রাজার মহলে
নিঃশব্দে পশিছ সবে। সেথা মোরে ডাকিবে কেমনে,
সে চিরসরল লোকে গ্লানিহীন আনন্দ-ভবনে?

হেরিতেছি চাহি'
তিমির সরায়ে দূরে আসিয়াছ সম্মুখে আমার।
ধরণী আনন্দময়ী। বায়ু ফিরে তব গান গাহি'
কবি রচে তব কাব্য। শিল্পী তব তনু, সুকুমার
অমর-তূলিকাপাতে রচিছে নীরবে।
তুমি আসি' কবে
তাহারে পরশি' গেছ কল্পনার নবগীত-রবে,
চিত্রে তা'রে তিলে তিলে মহাপ্রাণ সমর্পিতে হ'বে।

তোমার হাসির পিছে সহস্রের চেষ্টা মরে ঘুরি;
নিখিল মায়ের কোল জুড়ি'
নীরবে হাসিছে কভু, কভু বা কাঁদিয়া পড় গলি'
কভু টলি' টলি'
আনন্দ-ভবন মাঝে ফিরিতেছ অস্ফুট ভাষায়;
পুরাতনে দাও আশা; আলো দাও জীর্ণ বসুধায়।

তোমাদের যাত্রাপথ 'পরে
আমারে ডেকেছ আজি মুখরিত আনন্দ-আসরে—
সূর্য্য সেথা আলো-দাতা; গাহে গান বৈতালিকদল,
চঞ্চরী চঞ্চল,
চিত্রিত ডানায় তার বহি' চলে স্বপ্নের সংবাদ;
বায়ু আনে নিখিলের প্রাণভরা শুভ্র আশীর্ব্বাদ;
কোটি কোটি কবিজন তোমাদের লাগি'
মহান্ মঙ্গল তরে দীর্ঘরাত্রি রয়েছেন জাগি';
মোরে তারি পাশে
হে মোর শৈশব-স্বপ্ন, ডাকিয়াছ মধুর সম্ভাষে।

যৌবনের অবদান আজি তাই ফেলিয়াছি দূরে।
তোমাদের চকিত নূপুরে—
আমার এ শুষ্ক প্রাণ বাহিরিল অন্ধকার হ'তে
সলীল, চটুল নৃত্যে, আনন্দের সমুচ্ছল স্রোতে।

হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম

৩০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগতা শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবীর উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে বালীগঞ্জে (৫৫নং গরিয়াহাটা রোড,) একটি বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য হিন্দুবিধবাগণকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইবার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা।

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী

একজন প্রবীণা মহিলার তত্ত্বাবধানে এই আশ্রমে হিন্দু বিধবাগণকে নিজেদের ধর্ম্ম-সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপযুক্ত-রূপে সাধারণ লেখাপড়া ও কারু-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমের শিক্ষা-বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত :—

(১) অন্তঃপুর কলাভবন---এখানে বিশেষ করিয়া শিল্প-শিক্ষা ও চতুর্থমান পর্য্যন্ত সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) পাঠাগার--এখানে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের জন্যও ব্যবস্থা রহিয়াছে।
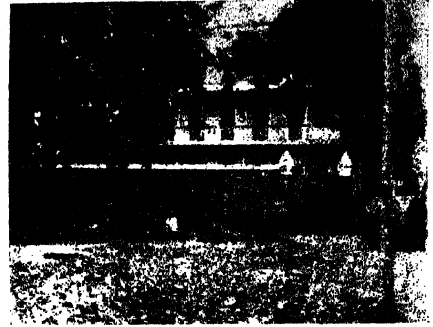
হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রমের নূতন গৃহ

সম্প্রতি এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যে-সমস্ত কারু-শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে মহিলা-গণের প্রস্তুত সূচী-শিল্প, চিত্র, মূর্ত্তিগঠন, পুঁতির কাজ,

হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্প-শ্রমের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মাছের আঁশে তৈরী একটি ফুলের সাজি
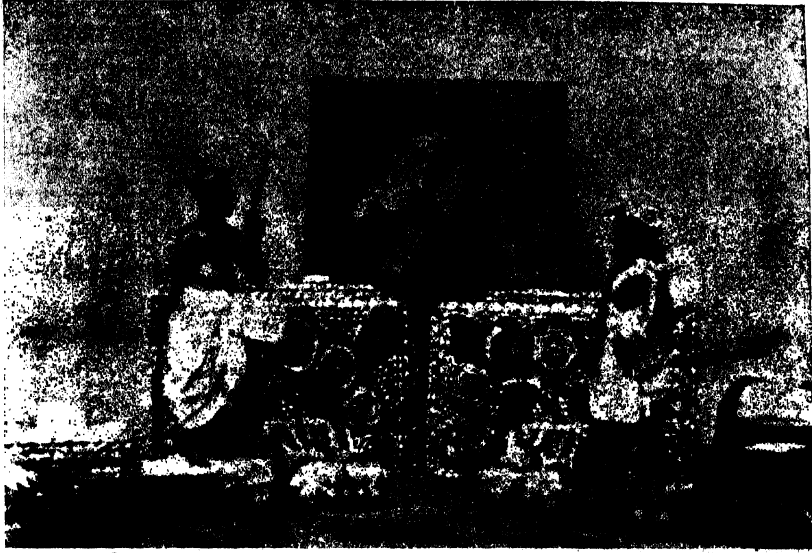
প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মাটির পুতুল, ঝিনুকের কাজ ও (উপরে) শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর আঁকা চিত্র

ঝিনুকের কাজ, মাছের আঁশের ফুল; নানাবিধ সুদৃশ্য বস্ত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা তন্মধ্যে দুই একটি জিনিসের ছবি দিলাম।

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী এই আশ্রমটি স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে বিধবা-শিল্পাশ্রমের জন্য সাধারণের প্রদত্ত অর্থে একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমে ১৫ জন বিধবা শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং স্বামী-পরিত্যক্তা নারীদিগকেও এখানে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের বার্ষিক বিবরণীতে কর্ত্তৃপক্ষ আশ্রমের কার্য্যের প্রসার-কল্পে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ৺হিরণ্ময়ী দেবীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় বাংলার সাধারণ সে ব্যবস্থা করিবেন ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

—

নারী-আন্দোলন

শ্রীমতী সোনিয়া রুথ দাস

যাহাতে ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সমষ্টির পরস্পরের বিকাশে বাধা না জন্মে এমন ভাবে প্রত্যেকের বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও সর্ব্বতোমুখী প্রকাশের উপরই সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। কাজেই, যে নারী-জাতি সমগ্র মানব-সমাজের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়।

এমন অনেক আদিম সম্প্রদায় ছিল, যাহাদের পুরুষ ও নারী সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে সমান সত্ব ও সুবিধা ভোগ করিত। বস্তুতঃ মাতৃতন্ত্র পরিবারের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন কোন সমাজে নারীকে পুরুষ অপেক্ষাও উচ্চপদ দেওয়া হইত। কিন্তু কালক্রমে নারী নিজ পদমর্য্যাদা হারাইয়া হীনতর বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

যে সমস্ত কারণে নারী স্বপদভ্রষ্ট হইয়াছে সেগুলি কোন অনিবার্য্য বৈজ্ঞানিক কারণ নহে, কেবল আকস্মিক ঘটনাচক্রের ফল। আদিম সম্প্রদায়গুলির বিশেষ লক্ষণ ছিল ক্রমাগত পরস্পরের মধ্যে লড়াই করা,

আর ঐ লড়াইএর মূলে ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়টিকে রক্ষা করার চেষ্টা। সন্তানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে এবং অপেক্ষাকৃত দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য নারী ঐ লড়াইএর ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারে নাই। কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহাকে অ-কেজো বলিয়া মনে করা হইতে লাগিল। কিন্তু দাসত্ব-প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্থান আরো নীচুতে নামিয়া গেল। আদিম যুগের বীর পুরুষেরা কেবল শত্রুহত্যা করিয়াই যুদ্ধে নিরস্ত হইত না, বিজয়ের চিহ্ন-স্বরূপ শত্রুর স্ত্রীগণকে লইয়া গিয়া নিজেদের সেবায় বা অর্থকরী কাজে লাগাইত। যুদ্ধে বন্দিনী অথবা বাজারে ক্রীত এই বাহির হইতে আম্‌দানি করা স্ত্রীগণ, সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নারীগণের অধঃপতনের পথও প্রশস্ত করিয়া দিল। যখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তখন ক্রমে-ক্রমে উহাকে স্থায়ী করিবার জন্য বিধি-বিধান ও প্রথানিচয়ের সৃষ্টি হইল। সেই সমুদায়ের ফলে নারী একদিন নিজেই নিজের নিকৃষ্টতায় বিশ্বাস করিল এবং অধীন অবস্থার সঙ্গে নিজকে মানাইয়া চলিতে লাগিল।

পুরুষ যে স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে যুক্তিতর্কের অভাব নাই। প্রথম যুক্তি এই যে, দৈহিক বলের আধিক্য পুরুষের সামাজিক শ্রেষ্ঠতার কারণ। গর্ভাধারণ ও সন্তান-পোষণের দরুণ নারী দৈহিক গঠন ও শরীরগত চেষ্টাদি বিষয়ে পুরুষ হইতে পৃথক্‌। কিন্তু যদিও সে দৈহিক শক্তিতে হীনতর, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিচার করিলে দেখা যায়,জীবনী-শক্তিতে সে শ্রেষ্ঠ, এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিজকে মানাইয়া লইবার ক্ষমতা সে পুরুষ অপেক্ষা বেশী রাখে। তাছাড়া যখন সমাজরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলে রহিয়াছে নীতি ও বুদ্ধি, তখন তাহার ভিতরে শারীরিক শক্তিকে প্রাধান্যের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

মনস্তত্ত্বের সাহায্যেও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কতকগুলি বৃত্তি, যেমন যুদ্ধপ্রিয়তা ও আত্মাভিমান প্রভৃতি নারী অপেক্ষা পুরুষে সমধিকভাবে বিকশিত। কিন্তু অপত্যস্নেহ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিকভাবে বিকশিত। এই পার্থক্য কেবল পুরুষ ও নারীর দৈহিক চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক বিভাগকেই দেখাইয়া দেয়, পরস্পরের উৎকর্ষ বিষয়ে কিছুই প্রমাণ করে না। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, নারীদের আবিষ্কারের ক্ষমতা ও মৌলিকতা নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বৃক্ষরোপণ পশুপালন, বস্ত্র-বয়ন ও মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ইত্যাদি প্রথমে নারীর হাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। যদি সে বর্ত্তমানের পণ্যশিল্প (Industry) সংগঠনে কোন সাহায্য করিতে নাই পারিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী—রন্ধন, শিশুপালন ও ধর্ম্মচর্চ্চা। এই তিনটিতেই তাহার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হয়। এইজন্যই কেবল আনুষঙ্গিকভাবে তাহাকে কারখানার কাজে দেখা যায়।

নারীজাতিকে যে অধীন অবস্থায়ই থাকিতে হইবে তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাহার অতীত কালের ইতিহাস দেখানো হয়। যদি কোনও সময় একবার নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হওয়ার দরুণই নারীকে চিরকাল অধীন হইয়া থাকিতে হয়, তবে ত সমাজে ক্রীতদাসাদিও থাকা উচিত, যেহেতু সামাজিক জীবনে এককালে উহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইত।

যে যে কারণে নারীর অধীনতার সূত্রপাত, তাহা বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। এখন আর সমাজ-দেহ রক্ষার জন্য যুদ্ধ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় না এবং যুদ্ধের প্রণালীও এখন আগেকার মত নহে। অপর দিকে দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এক নূতন সমষ্টিগত চৈতন্য দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে নূতন আদর্শ ও নূতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাই নারীর মন এক নূতন চেতনার রসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ চেতনাই বর্ত্তমান নারীজাতি-সম্পর্কীয় আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা দিতেছে।

নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুমুখী প্রকাশই, নারী-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই চেষ্টার উদ্দেশ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) বহুশত অতীত শতাব্দীর ভিতর দিয়া নারীর সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যাগল্প ও কুসংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নিরাকরণ এবং নারীর নিজের ও নিজ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান বিস্তার করা, ইহাই হইবে নারীর

আন্দোলনের প্রথম কর্ত্তব্য। নিজেকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলার কোন ইচ্ছা নারীর নাই, অথবা স্ত্রীপুরুষের বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের মূলে যে শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতা রহিয়াছে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে সে চায় না। কিন্তু ঐ সকল পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক কল্যাণের জন্য সে নিজেকে বিকশিত করিতে চায়।

(২) বহু শতাব্দীর পুরাতন যেসমস্ত বিধি-বিধান ও প্রথা রহিয়াছে তাহারাই নারীর বিকাশলাভের পরিপন্থী। প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার চাপে সে যে জড়ত্ব দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাও কম স্পষ্ট নহে। ঐ সকল বাধা দূর করা, নারীদের মধ্যে এক নূতন চৈতন্যের সঞ্চার করা, তাহাদের জন্য এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা, ইহাই হইবে নারী-আন্দোলনের কর্ত্তব্য।

(৩) এক অজ্ঞেয় লক্ষ্যের অভিমুখে অবিরাম গতির নামই সমাজ। এই গতির মধ্যে কিছুই অচল বা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। যে-সকল অধিকার ও সুবিধা একবার অর্জ্জন করা গিয়াছে, যদি তাহাদের রক্ষার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তবে সে-সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। জীবনরক্ষা ও প্রভুত্ব-বিস্তারের সংগ্রামে স্ত্রীপুরুষের এক পক্ষের অধিকার ও সুখ-সুবিধা প্রায়ই অন্য পক্ষ দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুরুষ তাহার পিতা, তাহার স্বামী, এমন কি, তাহার পুত্র, ইহা সত্য হইলেও নারী নিজ পদে নির্ব্বিঘ্নে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। সমাজে তাহার নিজ অধিকার ও সুবিধাগুলি রক্ষার উপায়-বিধানও নারী-আন্দোলনের আর একটি উদ্দেশ্য।

নারী-আন্দোলনের চেষ্টাসকল কোন জাতি বা দেশ-বিদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহার রূপ বিশ্বজনীন, কেবল বিভিন্ন দেশে নারীর বিকাশের তারতম্য অনুসারে ঐ রূপের পার্থক্য দেখা যায়। মুসলমান-রমণীর পর্দ্দা ছাড়িয়া বাহির হওয়া, হিন্দু-কুমারীর স্বাধীনভাবে স্বামী নির্ব্বাচন, ফরাসী-রমণীর রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে 'ভোট' দান, অথবা মার্কিন-নারীর রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে যোগদান করিবার চেষ্টা, সকলই স্ত্রীলোকের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। সমাজের কোন অংশ-বিশেষে নারীর কর্ম্ম সীমাবদ্ধ নহে। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই নারীর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। উহা দুই রকম সমস্যা সম্বন্ধে, যথা—নাগরিকের অধিকার লাভ ও ভোটদান ক্ষমতা। দাসপ্রথা, সার্ফ (serf) প্রথার ফলে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া নারী রাষ্ট্রের অংশরূপে গণ্য হয় না। আইন তাহাকে কোন নিজস্ব পদ দেয় নাই। সে নিজের কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে, নিজের জন্য কিছু উপার্জ্জন করিতে, অথবা নিজে কোন মকর্দ্দমায় অভিযুক্ত হইতে পারিত না। সে সর্ব্বাবস্থায়ই নিজ প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য ছিল। সময় বিশেষে স্বামী বা পিতাও প্রভুর স্থান অধিকার করিত। স্ত্রীজাতি-সম্পর্কিত বর্ত্তমান আইনেও ঐ অবস্থার নিদর্শন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্ত-রাষ্ট্রের শ্রমিক আইন অনুসারে নারী-শ্রমিকগণকে "নাবালক" ধরিয়া লইয়া বালক-বালিকাদিগের ন্যায় উহাদের রক্ষার ভারও রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ঘৃণিত দাসত্ব হইতে নারীরা ক্রমশঃ পূর্ণ স্বাধীন নাগরিক হইবার পথে ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত চলিয়াছে। নারীকে পুরুষের সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব বহনে নিয়োজিত করা, নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য।

কেবল নাগরিকের অধিকার পাইলেই নারী-সমস্যার সমাধান হইবে না। যে পর্য্যন্ত একদল আর এক দলের উপর প্রভুত্ব করে—সেই দল স্ত্রী বা পুরুষ, অথবা কোন বিশেষ সুবিধার মালিক যেই হউক—সে পর্য্যন্ত এক দল আর এক দলকে পিষিয়া সুখ অর্জ্জন করিবেই। সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিকাশের সুযোগ পাওয়া ও নিজ অধিকার এবং সুবিধাগুলি সংরক্ষণ করা এই উভয় ক্ষমতার জন্য নারীর কেবল ভোট দানের অধিকার থাকিলেই চলিবে না, তাহাকে রাষ্ট্র-শাসনের অংশভাগী করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচনে ভোট দিলেই তাহার চলিবে না, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক, শাসন-সম্পর্কিত ও বিচার সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

নারীর রাষ্ট্র-শাসন-ক্ষমতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে। নারী যে কেন রাষ্ট্র-সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহার কারণ স্বরূপ তাহার দৈহিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুক্তির মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রশাসন-সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা। সেই ধারণামতে শাসনযন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য রাষ্ট্রকে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং উহার আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা করা। বাহিরের আক্রমণ এখনও একটি বিপদ্ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদলের পশুশক্তির সংঘর্ষের উপরই বর্ত্তমান যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে না; অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা নিজ রাষ্ট্রের বিদ্যা, বুদ্ধি নীতি ও রসদপত্রের আয়োজন ভালরূপে করিতে পারার উপর উহা নির্ভর করে। পুরুষেরা রণক্ষেত্রে যাইয়া যাহা করে, নারীরাও বর্ত্তমান যুদ্ধে তদ্রূপ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার উপায়ও বর্ত্তমানে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কাজেই, বর্ত্তমানে বাহিক ও আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার ব্যাপারকে প্রায় সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা যায়। অথচ এই শান্তিরক্ষার ব্যাপার রাষ্ট্রের একটি সর্ব্বপ্রধান কাজ। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রগুলিকে সমাজস্থ সাধারণের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এবং সাধারণের মঙ্গল প্রসারিত করিবার জন্য গঠিত সংঘ-বিশেষ বলা যায়। পণ্যশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা এই সকলকে সাধারণের অভিপ্রেত বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নারী পুরুষের মতই আবশ্যক।

প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীলোক; ইহাই শাসন-ব্যাপারে নারীর অংশ দাবী করার প্রধান যুক্তি। যে পর্য্যন্ত কেবল পুরুষই নাগরিকের অধিকার পাইত, ততদিন পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য নিজের জন্য রাখাতে তাহার তত কিছু অন্যায় হইত না। যদি বর্ত্তমান গণতন্ত্র অর্থে জনসাধারণ দ্বারা শাসিত জনসাধারণের রাষ্ট্র বুঝায়, তাহা হইলে নারীরা তাহাদের অর্দ্ধাংশের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্র শাসনের ভার পাইবার অধিকারী।

ধন-উপার্জ্জন, সম্ভোগ ও ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করাই পণ্যশিল্প-ক্ষেত্রে নারী-আন্দোলনের একমাত্র কর্ম্ম। আদিকাল হইতে ধন-উৎপাদন-ব্যাপারে নারী পুরুষের সহিত সমানভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ নারীই সময়ে-সময়ে সত্যকার কাজ করিয়াছে; আর পুরুষ স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবক সাজিয়া কর্ত্তব্যের ছলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে অথবা আত্মসুখের চর্চ্চায় কাল কাটাইয়াছে। দাসত্ব হইতে মুক্তি আর নাগরিকত্ব লাভ, এতদুভয় দ্বারা পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে নারীর সুবিধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল সুবিধা এখনও সংখ্যায় কম। এখনো উপযুক্ত সংখ্যক ব্যবসায়, তাহার জন্য খোলা নাই; আর পুরুষের সঙ্গে তুলনায় সে কম বেতন পাইয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত নারী আর্থিক হিসাবে, পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীন থাকিবে, অবশ্য সে-পর্য্যন্ত ইহার দরুণ তাহার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে পণ্যশিল্প ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভের উপযুক্ত। যেহেতু পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে উহা রক্ষার দায়িত্বও আছে, আর বর্ত্তমান সমাজে নারী প্রায়ই স্বাধীন-জীবন যাপন করিতেছে, এবং ইহা আশা করা উচিত, যে, নারী পুরুষের চেয়ে ভাল না হোক্ অন্ততঃ সমান আদর্শে জীবন যাপন করিবে। কাজেই, নারী-আন্দোলনের দাবী এই যে শক্তি বিবেচনায়,স্ত্রীপুরুষ বিবেচনায় নহে—সমস্ত ব্যবসায়ের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। আর সমান কাজের জন্য স্ত্রী—পুরুষ নির্ব্বিচারে—সমান বেতন হওয়া উচিত।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-আন্দোলনের কাজ,—ধর্ম্মচর্চ্চা, অবসর-বিনোদন, শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নারীর সমস্যা-নিচয়ের সমাধান করা। দৈহিক শক্তির আপেক্ষিক ন্যূনতা, সুকোমল বৃত্তিগুলির আধিক্য আর শিশুপালন কার্য্যে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ এই কয়টি কারণে নারীর ধর্ম্মবিশ্বাস পুরুষ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু পুরোহিত, সামাজিক প্রথা ও সামাজিক মতামত, প্রভৃতি তাহাকে নানা সেকেলে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অধীন করার জন্য দায়ী। যুক্তিবাদের যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঁধা ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার হইতে নারীকে মুক্ত করা, এবং

...জের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া ধর্ম্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে তাহাকে স্বাধীন করা, এইসকল হইবে নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য।

সঙ্গীত, নাট্য, ক্রীড়া, অশ্বারোহণ, শকটারোহণ প্রভৃতি কার্য্যে অবসর যাপন করাতেই মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভবপর হয়। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন সমাজে ঐসকল নির্দ্দোষ আমোদ নারীদের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। নারীদের চেষ্টাকে ধন্যবাদ, বর্ত্তমানে ঐসকল ব্যাপারে নারীরা যোগদান করিবার প্রবৃত্তি দেখাইতেছে।

সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এবং বিজ্ঞান মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। অথচ সমাজের অর্দ্ধাংশের নিকট--যাহারা মাতা, কন্যা বা স্ত্রী তাহাদের নিকট---ঐসকল নিষিদ্ধ রহিয়াছে। লাল কাপড় দেখিলে ষাঁড় যেমন ভয় পায়, কুড়ি বছর আগে একজন জার্ম্মান্‌ অধ্যাপক মেয়ে ছাত্র দেখিলে ততোধিক ভয় পাইতেন। প্রাকৃত লোকের যে-সব ভ্রান্তি ও কুসংস্কার থাকিতে পারে বিজ্ঞ লোকেরাও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। বর্ত্তমানে বছর কয়েকের উদার আন্দোলনের ফলে লোকের মতামত বদল হইয়াছে। শিক্ষার অনেক বিভাগ বর্ত্তমানে নারীর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। নাগরিকত্বের অধিকার ও দায়িত্ব, পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য এবং সামাজিক সমকক্ষতা, এই কয়েকটি বিষয়ের জন্যও নারী, শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকারের দাবী করিতে পারে।

নারী-আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সর্ব্বপ্রধান সমস্যা পরিবারের সঙ্গে জড়িত। পরিবার-গঠনের মূলে আছে বিবাহ। বিবাহ মানবের আদিম প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতার জন্য নয়, উহা দ্বারা মানব-হৃদয়ের কতকগুলি সুকোমল ও সুমহৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন হয়; আর স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভালবাসা ও সম্মানের ভিতর দিয়াই ঐ বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া উঠে। অথচ এই সুন্দর ব্যাপারটিতে নারী এতকাল যাবৎ কেবল ক্রীতদাসীর মত—বড় জোর নিষ্ক্রিয় ইচ্ছার সহিত---অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বন্দী করা, বদল করা, দান করা বা বিক্রয় করা ইত্যাদি বিষয়ে—ঘটিবাটির সমান মনে করা হইত। ঐ অবস্থার চিহ্ন বর্ত্তমান সময়েও কিছু কিছু রহিয়াছে। বিবাহকে এমন একটি স্বাধীনতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে, যেন নারী অবাধে ও স্বেচ্ছায়, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুদ্ধির সহিত নীতিজ্ঞ প্রাণীর মত উহাকে স্বীকার করিতে পারে। নারী-আন্দোলনের ইহাও একটি কর্ত্তব্য।

বিবাহের মত বিবাহচ্ছেদের ব্যাপারেও নারীকে পুরুষের সমান স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক্‌ যদি মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে স্বাধীনতা না থাকে তবে তাহা আর সুনীতি-সঙ্গত থাকে না। স্বামীস্ত্রী যে মুহূর্ত্ত হইতে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে তখন হইতে তাহাদের একত্র বাস অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ। মনুষ্য-প্রকৃতি দুর্ব্বল এবং ভ্রমসংকুল, কাজেই মাঝে মাঝে ভ্রান্তমিলন বা বিরুদ্ধ চরিত্রের বিবাহও হইয়া যাইতে পারে। সুনীতির দিক্‌ দিয়া দেখিলেও স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যেন সমানভাবে বিশেষ বিবেচনার সহিত বিবাহচ্ছেদ করিতে পারে, তাহার সুবিধা রাখা উচিত; অথচ অধিকাংশ দেশেই বিবাহচ্ছেদ ব্যাপারে,নারী অপেক্ষা পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশী। আইনগত এই বৈষম্য, কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই অধঃপতনে সহায়তা করিয়াছে। বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ এই উভয় ব্যাপারে নারী যাহাতে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, তাহা দেখাও নারী-আন্দোলনের কাজ।

নারী-আন্দোলনের সর্ব্বশেষ অথচ অত্যাবশ্যক একটি ব্যাপার মাতৃত্বের সঙ্গে জড়িত। সমাজের ভবিষ্যদ্বংশধর সন্তান-সন্ততির সহিত নারীর সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করিয়া প্রকৃতি তাহাকে একটি সুবিধা দিয়াছেন। মাতৃত্বেই নারীর শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বতোমুখী বিকাশ। এমন এক সময় ছিল যখন মাতৃত্ব স্বেচ্ছাধীন ছিল না। কিন্তু সমাজের, বুদ্ধিবৃত্তির ও জাগতিক চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেহ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতৃত্ব গ্রহণ করাইতে পারে না। যদি বর্ত্তমান নারীকে স্বেচ্ছামূলক মাতৃত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে নৈতিক প্রাণীর বদলে তাহাকে সন্তান-উৎপাদক প্রাণীতে পরিণত করা হইবে। নারী-আন্দোলন চায় যে মাতৃত্ব স্বীকার করা না করা নারীর স্বেচ্ছাধীন হইবে।

অতএব, নারী-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এক দিকে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-সকল সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক বৈষম্য আছে, তাহা দূর করা; অপর দিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার আত্মবিকাশের নব নব সুবিধার সৃষ্টি করা। সম্পূর্ণ এমন কি, আংশিকভাবেও নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হইলে সমাজে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

(১) নারীকে পুরুষের সমান মর্য্যাদায় উন্নীত করিলে তাহার দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত হইবে, সে আত্মোপলব্ধির প্রেরণা লাভ করিবে, এবং সে নিজকে সমাজের আরো সম্ভ্রান্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করিতে উৎসুক হইবে।

(২) নারীকে সমান মর্য্যাদা দানে পুরুষও উপকৃত হইবে। পুরুষনারীর বৈষম্যে যে কেবল নারীরই অধঃ-পতন হইয়াছে তাহা নয়, পুরুষও পশুভাবাপন্ন হইয়াছে। পুরুষ যখন নারীকে নিজ সমকক্ষরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইবে তখন আর তাহার নীচ প্রবৃত্তিগুলি বাড়িয়া উচ্ছৃঙ্খল হইবার সুযোগ পাইবে না। নারীকে সম্মান করিলে ও ভালরূপে বুঝিতে পারিলে পুরুষের চরিত্র আরো উন্নত হইবে।

(৩) জগতের লোকসংখ্যার যে অর্দ্ধেকের সদ্বৃত্তি-নিচয় অবিকশিত আছে অথবা অন্যায় বিকাশে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে সমাজ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

অনুবাদক—ডাঃ শ্রী রজনীকান্ত দাস,
এম-এ, পি-এইচ-ডি

মা

অমিয়া চৌধুরী

(বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবীর তরুণ অবস্থায় তাহার এক তরল অংশ সূর্য্যের টানে বিচ্ছিন্ন হয় ও তাহা হইতে চাঁদের জন্ম হইয়াছিল; সেই মতবাদের উপর কবিতাটি লিখিত।)

অনাদি কালের কথা, আমার সে তরুণ যৌবনে,
তরল-আনন্দভরা, স্বপ্নময় সুখময় দিনে,
তুমি বহু উর্দ্ধে রহি' তোমার উজ্জল জ্যোতি দিয়া
আলোকে করালে স্নান; স্নিগ্ধনেত্রে ছিলে যে চাহিয়া,
আজিও তেমনি আছ, শুধু নাই যৌবন আমার,
নাই আনন্দের গীতি, নাহি জাগে আর দুনিবার
মিলন-কামনা, আমি জড়স্তূপ, নিম্নে কত দূরে
রয়েছি পড়িয়া, তুমি উর্দ্ধ হ'তে হেরিতেছ মোরে
সে অতীত দিনে,
যবে দীর্ণ দেহমন তোমার আকুল আকর্ষণে,
সে মহামিলনক্ষণে মহাশিশু দিলে মোরে দান,
চপল তরুণ হৃদে লভিলাম জননীর প্রাণ।
নহে সে বুকের নিধি সে উজ্জল পূর্ণ শশধর
অচিরে বিচ্ছিন্ন হ'ল, মাতৃপ্রাণ তাই নিরন্তর
সেই জন্মক্ষণ হ'তে চেয়ে আছে সন্তানের পানে,
পরশিতে নাহি পারে বিধাতার কঠোর বিধানে
আপন আত্মজে তার;
ভাষাহীন প্রাণে তার জাগে পুরাতন হাহাকার;
কোনদিন হয়তো বা রুদ্ধশোক অগ্নিস্রোত সম—
বক্ষ ফেটে বাহিরিয়া আসে, কোনদিন দেহ মম
প্রবল কম্পনে কাঁপে; হে রাজন্, তোমার শাসনে
অগণিত গ্রহতারা অন্তহীন গগন-অঙ্গনে
করিতেছে প্রদক্ষিণ, তার মাঝে দীন প্রজা আমি
তারে কেন তুমি
চাহিলে করুণ নেত্রে' বক্ষ ভরি' দিলে কেন তার?
শুধু কি সন্তানে তার দিলে না একটু অধিকার!
মাতৃত্বের স্নেহসিন্ধু তারি টানে উথলিয়া উঠে;
ব্যর্থ জননীর প্রাণ কোনদিন যায় যদি টুটে
ওই স্পর্শাতীত সুখ অপরূপ উজ্জ্বল সুন্দর,
চাহিয়া মরণ চাহি, হে নিষ্ঠুর নির্ব্বাক্ ভাস্কর!

জীবজন্তুর সংসার-যাত্রা

মানুষ যেমন সমাজ বাঁধিয়া এক সঙ্গে বাস করে অনেক জীবজন্তুও সেই রকম বাস করে। সকলে কাছাকাছি থাকিলে মিলিয়া মিশিয়া বেশ আমোদে থাকা যায়। আর দুঃখের সময় পরস্পরের সাহায্যও পাওয়া যায়। মানুষ যেমন ইহা বুঝে, অনেক জন্তুও তাহা বুঝে।

অনেকটা আমাদের দেশের কাঠবিড়ালীর মত আমেরিকার প্রেরি-ডগ্ নামে একরকম জন্তু সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা মাটি খুঁড়িয়া মাটির তলায় এক এক দম্পতি বাস করে। এক পরিবারের বাসার কাছে আর-এক পরিবার, তাহার পাশে আর-এক পরিবার—এই রকমে অনেক পরিবার পাশাপাশি বাস করে। এই জায়গা যেন তাহাদেরই গ্রাম হইয়া উঠে। আর এ গ্রাম বহু দূর বিস্তৃত হয়। খাদ্যের অভাবে বা প্রাকৃতিক কারণে যখনই ইহারা স্থান বদ্‌লানো দরকার মনে করে, তখন ইহারা সকলে মিলিয়াই উঠিয়া যায়।

বীবরের সংসার-যাত্রা আরও সুন্দর। ইহারা এক-এক বাসায় প্রায় ছয়টি করিয়া বাস করে। যেখানে সেখানে ইহারা বাস করে না। ইহাদের বাসস্থান নিভৃত হওয়া চাই এবং সেখানে জল ও গাছপালা থাকা চাই। নদীর ধারে ইহারা প্রায় বাস করে। ইহাদের এই উপনিবেশে অনেকগুলি পরিবার এক-সঙ্গে বাস করে। ইহাদের সন্তানরা তিন বছর বয়সে গ্রীষ্মকালে বাপ-মা'র বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, বিবাহ করে ও নূতন বাসা করে। ইহাদের বাসস্থানে ভিড় হইয়া গেলে নদীর ধারে ধারে ইহারা ছড়াইয়া বাস করিতে থাকে। বাপ-মা নিজেদের বাসা সন্তানদের দিয়া যায়। এমনও দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা অলস বা দুষ্ট স্বভাবের হয় তাহাদিগকে শাস্তি স্বরূপ ইহারা একঘরে করিয়া আলাদা রাখিয়া দেয়।

বীবরের বাসা অদ্ভুত রকমের। মাটির নীচেই ইহারা থাকে, তবে বাসার উপর ছোট ছোট কাঠের

বীবরের বাসস্থান

টুক্‌রা আনিয়া বসাইয়া দেয়। সেইসব কাঠের টুক্‌রা জলের ধারে ধারে গাছের গুঁড়িতে লাগাইয়া আট্‌কাইয়া রাখে। সময়ে সময়ে এই বাসা ক্যানাল বা নালী কাটার মত প্রকাণ্ড লম্বা হইয়া চলে। এই কাজে অনেক বীবর এক সঙ্গে মিলিয়া লাগিয়া যায়। কেহ কাঠ আনে, কেহ দাঁত দিয়া কাঠ কাটে, কেহ আবার মাটি খুঁড়িতে থাকে।

বীবরের এই বাস-নালী বা বাসস্থান অনেক সময়ে এক শত ফুট লম্বা হয়। জলস্রোতে যাহাতে ইহা নষ্ট না

হয় সেরূপভাবে ইহা তৈরী হয়। এই বাসস্থান দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাদের বুদ্ধি ও কৌশলের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

শাদা পিঁপড়া বা উই যে, এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া বাস করে তাহাও দেখিবার জিনিষ। পাড়াগাঁয়ে বাঁশবনে বা
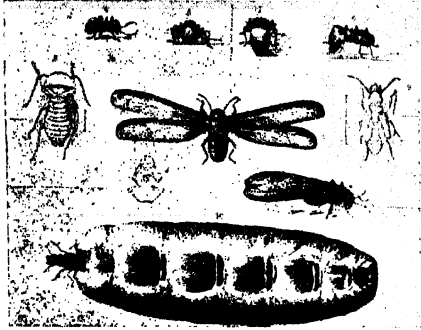
উই— ছোট হইতে বড় হইতেছে।

বাগানে বনের ভিতর ইহারা বাসা করে; তাহাকে উই-ঢিপি বলে। উই-ঢিপির অনেক মাথা বা চূড়া থাকে। এক-একটা মাথা কতকটা গম্বুজের মত; অন্য মাথাগুলা সরু সরু। এই ঘর ভাঙিলে দেখা যায়, ভিতরটা বেশ চক্‌চকে মসৃণ। কেবলমাত্র মাটির তৈরী হইলেও এই ঘর খুব শক্ত, ভাঙিতে কষ্ট হয়। আমাদের বড় বড় বাড়ীর ভিতর যেমন একটার পর একটা কামরা, বা এক কামরার দরজা দিয়া অন্য এক বড় কামরায় যাওয়া যায়, তেম্‌নি এই উই-অট্টালিকায় নানা সুড়ঙ্গ ও ছোট বড় ঘর থাকে, এক ঘর দিয়া আর-এক ঘরে যাওয়া যায়; পর পর ছোট বড় অনেক কামরা। ইহাকে উহাদের এক বৃহৎ জনপদ বলা চলে।

ইহাদের তিনটি শ্রেণী বা জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল শ্রমিক, খাটিয়া-খুটিয়া সব ব্যবস্থা করে; এক দল যোদ্ধা বা আত্মরক্ষার কাজ করে; আর এক দল, তাহাদের ডানা বাহির হয়, তাহারা সংসারী, ঘরকন্না করে, তাহাদের সন্তানসন্ততি হয়, তাহারাই সকলের মাথা। শ্রমিকরা লম্বায় প্রায় একের পাঁচ ইঞ্চি হয়, ইহারা প্রায়ই অন্ধ হয়; তবুও ইহারা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করে, রাজা-

উইঢিপি

রাণীর সেবা করে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে দেখাশুনা করে। যোদ্ধারা কোন কাজ করে না; ইহারা শ্রমিকদের চেয়ে আকারে বড়। এক এক বাসায় ইহারা অল্প সংখ্যায় থাকে। ইহারা বাসার প্রধান দ্বারে প্রহরীর মত থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়। শত্রু অর্থাৎ আদত পিঁপড়ারা এই বাসা আক্রমণ করিলে যোদ্ধারা ছুটিয়া আসে ও শত্রুর শেষ করিয়া দেয়।

ঢিপির প্রায় মাঝখানে একটি সুরক্ষিত কক্ষে রাজা ও রাণী বাস করে। এই ঘরের দরজা খুব সরু; শ্রমিকরা তাহা দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু রাজা-রাণী দরকার হইলেও পারে না। কোন কোন জাতির মধ্যে রাজারা যোদ্ধাদের চেয়ে লম্বাটে হয়। অন্য সকলের মধ্যে ইহার আকার-প্রকার একটু বিভিন্ন রকমের। রাণী যে, সে কিন্তু একটু অদ্ভুত। সে দুই হইতে ছয় ইঞ্চি লম্বা; রাজার মত তাহার চোখ আছে, ডানাও গজায়, কিন্তু ডানা খসিয়া যায়। তাহার দেহটি ব্যাঙের মত, পেটটি বড়। সে প্রতি মিনিটে ৬০টি ডিম পাড়ে, প্রতি দিনে ৮০০০০ ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার সময় শ্রমিকরা তাহাকে খাবার জোগাইতে থাকে; আর ডিমগুলি শুশ্রূষা-গৃহে বহিয়া লইয়া যায়।

"পিপীলিকার পালক উঠে মরিবার তরে।"—একথা ইহাদের পক্ষে খুব সত্য। মিলন-সময়ে পালে পালে

ডানাওয়ালা হইয়া ইহারা বাসা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। এ সময় ইহারা বেশীর ভাগ মরিয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের ডানা খসিয়া যায়; তাহারা এক এক দম্পতি মিলিয়া নূতন বাসা করিতে যায়।

ইহাদের মধ্যে আবার ডানাবিহীন পুরুষ ও স্ত্রী থাকে। ডানাওয়ালারা বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে অনেক সময়ে ডানাহীন পুরুষ ও স্ত্রী জাতি মিলিয়া বাসা অধিকার করে। তাহারা ডিম পাড়ে ও সন্তানাদি হয়। এই জাতীয় স্ত্রী পুরুষ যে-বাসায় জন্মায় সেইখানেই থাকে, কোথাও যায় না। রাজসিংহাসন দখল করিয়া এই রাজপ্রতিনিধিরা রাজত্ব করে। কিন্তু শীতকালের পূর্ব্বে ইহারা মারা যায়। ইহাদের বিধবারা পরের গ্রীষ্ম অবধি বাঁচিয়া গৃহ-সংসার রক্ষা করে।

গুপ্ত

জ্ঞান-বিভাগ

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক

(১) আমি, (২) ইন্দ্রিয়, (৩) বস্তু ও (৪) জ্ঞান।

১। অন্য যাবতীয় জ্ঞানের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

২। আমি আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুকেই জানি।

৩। বস্তুকে জানার সঙ্গে আমি আমাকেও জানি।

৪। বস্তুর অস্তিত্ব আমার জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না।

১ম প্রতিজ্ঞা

অন্য যাবতীয় জ্ঞানের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

১ম স্বতঃ

এবং আমি আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুকেই জানি।

২য় স্বতঃ

অতএব আমি বস্তুকেই প্রথম জানি।

ঘটনা মাত্রেই দুই পদার্থের আবশ্যক।

[১৪৪ পৃঃ প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৩

উক্ত দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি আমি ও অপরটি বস্তু।

যে দুইটি পদার্থে ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ও অপরটি বিধেয়।

২য় স্তবক, বিধায়না

এখানে আমি উদ্দেশ্য ও বস্তু বিধেয়।

সম্পর্ক উদ্দেশ্য ও বিধেয় দ্বারা নিরূপিত।

২য় স্বতঃ স্তবক

অতএব **আমার সঙ্গে অপরাপর পদার্থের সম্পর্ক নিরূপণেই জ্ঞানের আরম্ভ।**

১ম সংজ্ঞা। আমার সঙ্গে অপরাপর পদার্থের সম্পর্ক নিরূপণে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাকে ভাবাত্মক জ্ঞান বলে।

উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক ভাবাত্মক লব্ধ।

২য় প্রতিজ্ঞা

বস্তুর অস্তিত্ব আমার জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না।

৪র্থ স্বতঃ

অতএব বস্তুর অস্তিত্ব ভাবাত্মক নহে।

কিন্তু বস্তুতে অনুভূতির অতিরিক্ত কিছুই নাই।

উন্মোচনা ৯১৩ পৃঃ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৩

অতএব **৪র্থ স্বীকার্য্য একটি অভাবাত্মক স্বীকার্য্য মাত্র।**

উন্মোচনা ৯১১ পৃঃ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৩

কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধেই প্রথমে ভাবাত্মক-বহির্ভূত জ্ঞানের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরবিধ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

২য় সংজ্ঞা। যে জ্ঞান দ্বারা আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে পদার্থসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক অবগত হওয়া যায় তাহাকে স্বতন্ত্রাত্মক জ্ঞান বলে।

প্রাথমিক জ্ঞান ভাবাত্মকতার মধ্য দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত

হইয়া ক্রমশঃ স্বতন্ত্রাত্মকতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাথমিক জ্ঞানে ভাবাত্মকতার বাহুল্য থাকিলেও ইহা স্বতন্ত্রাত্মকতা-বর্জ্জিত নহে।* ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক ভাবাত্মক জ্ঞান। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব ভাবাত্মক নহে। ইহা স্বতন্ত্রাত্মক। এই স্বতন্ত্রাত্মকতার অঙ্কুর ক্রমশঃ ভাবাত্মকতার মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরে স্বতন্ত্রাত্মক-ভাবে প্রসার প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞান মাত্রই ঘটনা-পরম্পরায় কার্য্য-কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। কার্য্য বিশেষের কারণ অপর কারণের কার্য্য এবং কারণ বিশেষের কার্য্য অপর কার্য্যের কারণরূপে সম্পর্কান্বিত। এইরূপে পরম্পরাক্রমে পৌর্ব্বাপর্য্যের মত ধারাবাহিক ভাবে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল আবহমান প্রবাহিত। মানব-জ্ঞান কার্য্য-কারণ সম্পর্কে এতটা বিজড়িত যে, উক্ত শৃঙ্খল হইতে স্বতন্ত্রিত কোন ঘটনাকে সে আদবেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। মানব জ্ঞান-পথে যতই অগ্রসর হয় ততই বিভিন্ন ঘটনায় কার্য্য ও কারণ তাহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। এবম্বিধ আয়ত্তের চেষ্টাই গবেষণার অনুসন্ধান। উদ্দেশ্য,বিধেয় ও বাচ্যের সাদৃশ্য অনুসন্ধানে বিভিন্ন ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক নিরূপিত হয়। এই কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক ক্রমাগত বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। কারণ বিধিবন্ধন অভাবে জ্ঞানের প্রসার সম্ভবে না।

একমাত্র মনের ভাব প্রকাশই যে, ভাষার কার্য্য তাহা নহে। ভাষায় চিন্তারাশি শৃঙ্খলিত করে। ভাষা অভাবে যুক্তির সমাবেশ সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিভিন্ন অনুসন্ধানে উৎপন্ন অভিজ্ঞতা ভাষা দ্বারা সূত্ররূপে সৃজিত-হয়। পণ্ডিতগণ তাহা ক্রমাগত সুশৃঙ্খলিত করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পরিণত করেন।

কিন্তু সাধারণ ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবে না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিমিত্ত পরিভাষা, সংজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা ভাষার পরিমার্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন পরিভাষার সম্পর্ক নির্দ্দেশ নিমিত্তও একপ্রকার জ্ঞানের আবশ্যক।

৩য় সংজ্ঞা। যে জ্ঞান দ্বারা একটি পরিভাষার সঙ্গে অপর পরিভাষার সম্পর্ক নিরূপণ হয়, তাহার নাম পরি-ভাষাত্মক জ্ঞান।

এইরূপে জ্ঞান ত্রিবিধঃ (১) ভাবাত্মক, (২) পরি-ভাষাত্মক ও (৩) স্বতন্ত্রাত্মক।

এই জ্ঞানত্রয় সূত্ররূপে সমাবেশ হওয়াতেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উৎপত্তি।

অতএব ভাবাত্মকাদি ভেদে সূত্রও ত্রিবিধ।

বিধায়না প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক ত্রয় এই ত্রিবিধ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

প্রথম স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক ভাবাত্মক। যেহেতু অনুভূতি হইতেই নামকরণ।

এই স্তবক স্বতন্ত্রাত্মক নহে। কারণ আমি নাম করিয়াছি বলিয়াই ইহা পদার্থ।

ইহা পরিভাষাত্মক নহে। কারণ এতদ্দ্বারা আমরা পদার্থের যে কোন একটি নাম প্রদানে সমর্থ মাত্র। নাম-করণে পরিভাষা-সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতা নাই।

দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক পরিভাষাত্মক উদ্দেশ্যাদি লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্য প্রকাশের সহায়ক মাত্র।

ইহা ভাবাত্মক নহে। কারণ উদ্দেশ্যাদি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, আমার সঙ্গে নহে।

ইহা স্বতন্ত্রাত্মক নহে। ইহাতে আমার সম্পর্কান্বিত কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশিত না হইলেও আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত নহে। যেহেতু পরিভাষা আমারই সৃষ্ট।

তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ-স্তবক স্বতন্ত্রাত্মক। সাধারণ কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আমার সম্পর্কান্বিত কিছু প্রকাশ করে না।

ইহা ভাবাত্মক নহে। এতৎসম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করি সত্য। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহা আমা হইতে সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ইহা পরিভাষাত্মক নহে। যেহেতু উদ্দেশ্যাদি পরি-ভাষার মত ইহাতে কোনরূপে ভাষা প্রকাশের উপায়ের নিমিত্ত, কার্য্য, কারণ ও সদৃশ নামক পরিভাষার উৎপত্তি হয় নাই। ইহা জাগতিক ঘটনার একটা ধারা প্রকাশ করে।

সংজ্ঞানুযায়ী কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক দ্বারা সূত্র উৎপন্ন। কিন্তু তন্নিমিত্ত সূত্রমাত্রই স্বতন্ত্রাত্মক নহে। ভাবাত্মক ও পরিভাষাত্মক জ্ঞানেও কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক থাকিতে পারে।

ভাবাত্মক জ্ঞানে যখন কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক নির্দ্দেশিত হয়, তখন তাহাতে আমার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত কিছু প্রকাশ করে না। প্রথম স্তবকের স্বতঃসিদ্ধদ্বয় ভাবাত্মক, কিন্তু উক্ত স্বতঃসিদ্ধদ্বয়ে যে কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক আছে, তাহা আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উক্ত স্তবকের প্রথম স্বতঃসিদ্ধে—

কারণ—একটি পদার্থ ও তাহার নাম আছে।

কার্য্য—এই নাম উক্ত পদার্থকে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করে।

এখানে উক্ত পদার্থের নাম দ্বারা সেই পদার্থকে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতেছে। এই পার্থক্য আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এইরূপে পরিভাষাত্মক জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-সম্পর্কের মধ্যেও পারিভাষিক অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র কিছু আছে।

দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম স্বতঃসিদ্ধে—

কারণ—একটি উদ্দেশ্য আছে।

কার্য্য—তাহার বিধেয় থাকিবে।

এখানে ঘটনা-সংসৃষ্ট দুইটি পদার্থকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে নির্দ্দেশ করা পরিভাষাত্মক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু যখন ইহার মধ্যে কার্য্যকারণের সমাবেশ করা হইতেছে, তখন তাহার মধ্যে আমরা পরিভাষাত্মক জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র অপর একটি অভিজ্ঞতা আনিয়া ফেলিতেছি।

সংজ্ঞায় কয়েকটি ব্যক্ত পরিভাষার সঙ্গে একটি অব্যক্ত পরিভাষার সম্পর্ক নির্দ্দেশ হয়। কিন্তু এখানে পরিভাষা মুখ্য নহে। উক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত পরিভাষা যে যে পদার্থের নাম তাহারাই মুখ্য। যে পরিভাষা দ্বারা কোন পদার্থকে পৃথক্ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাই ব্যক্ত এবং যে পরিভাষা দ্বারা তাহা করা হয় নাই তাহাই অব্যক্ত। এখানে উক্ত পৃথককৃত পদার্থকয়টির সঙ্গে সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিয়া নূতন একটি পদার্থকে যে-ভাবে পৃথক্ করা হয়, তাহাই নামকরণ। সুতরাং সংজ্ঞামাত্রই পরিভাষাত্মক নহে।

আমরা বলিয়াছি, ভাবাত্মক জ্ঞান হইতে পদার্থকে পাইয়াছি; সেজন্য পদার্থ মাত্রই ভাবাত্মক নহে। কারণ নামকরণের পূর্ব্বেও যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু নাম না দিয়া তাহাকে পৃথক্ করিতে পারি না। তাহাকে আমার অভিজ্ঞতার আয়ত্তে আনিবার নিমিত্তই নাম দেওয়া। এবম্বিধ আয়ত্ত করার পর হইতেই তাহা পদার্থ। এ অবস্থায় যাহা পদার্থ তাহা স্বতন্ত্রাত্মক অথবা পরিভাষাত্মক হইতে আপত্তি কি?

পরিভাষা আমাদের সৃজিত। ভাবাত্মক ও স্বতন্ত্রাত্মক আলোচনার নিমিত্ত ইহার উৎপত্তি। নচেৎ স্বতন্ত্রভাবে পরিভাষাত্মক জ্ঞানের কোন মূল্য নাই। একমাত্র আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই ভাবাত্মক জ্ঞানের কার্য্য। সাধারণ ভাবে পদার্থ হইতে পদার্থান্তরের সম্পর্ক স্বতন্ত্রাত্মক জ্ঞানেই সম্ভবে। পরিভাষাত্মক সাহায্যকারী ও ভাবাত্মক ঐক-দেশিক মাত্র। স্বতন্ত্রাত্মকেই জ্ঞানের পূর্ণতা, ভাবাত্মক প্রাথমিক জ্ঞান। পরিভাষাত্মকের সহায়তায় এই জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা স্বতন্ত্রাত্মকের দিকে অগ্রসর হই। ভাবত্মকতার গণ্ডী ভেদ করিয়া স্বতন্ত্রাত্মকতায় উপস্থিত হওয়ার নিমিত্তই উন্মোচনা।

প্রাথমিক জ্ঞানে ভাবাত্মককে ভাবাত্মক বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না। চতুর্থ স্তবকের চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন নহে। কিন্তু পরে দেখান হইয়াছে, ইহা ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য মাত্র। স্বীকার্য্যের ভ্রমাত্মকতা আয়ত্ত হইলে জ্ঞানের ভাবাত্মকতা ধরা পড়ে। তাহাতেই স্বতন্ত্রাত্মক জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য উপস্থিত হয়।

এক্ষণে প্রকৃত ও প্রতীত ভাবে দ্বিবিধ জ্ঞান পাওয়া যাইতেছে।

৪র্থ ও ৫ম সংজ্ঞা। কোন একটি জ্ঞানে ভ্রম প্রদর্শিত হওয়ায় তাহা অন্য জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রথমোক্ত জ্ঞানকে প্রতীত ও শেষোক্ত জ্ঞানকে প্রকৃত বলে। 'প্রকৃত' ও 'প্রতীত' আপেক্ষিক পরিভাষা মাত্র। 'সার্ব্বভৌম প্রকৃত' মানব-বুদ্ধির অগম্য।

প্রতীত জ্ঞানে ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য অবধারণে ভাবাত্মকতা অনুভূত হয়। তাহাতেই স্বতন্ত্রাত্মকতা আয়ত্ত হইয়া পড়ে। 'পৃথিবী অচলা' এই স্বীকার্য্যে ভ্রমাত্মকতা

অবধারিত হওয়ায় আপেক্ষিক দেশের ভাবাত্মক জ্ঞান অনুভব করা হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, আবর্ত্তিত পৃথিবীকে অচলা মনে করায়, যে আপেক্ষিক দেখা আমার সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকেও স্থির বলিয়াই অনুভূত হইত। এই আপেক্ষিক দেশ আমার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। পূর্ব্বে আমার আবাসস্থল পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভাবাত্মক ভাবে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি নির্ণয় করা হইত। এখন সেই গতি স্বতন্ত্রাত্মকভাবে নির্ণীত হইতেছে।

আমার ভ্রমের কারণ আমার সঙ্গেই সংশ্রবান্বিত। অতএব ভাবাত্মক জ্ঞানের মধ্যেই ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্যের কারণ আছে। এ অবস্থায় ভ্রম নিরসানে ভাবাত্মকতা স্বতন্ত্রাত্মকতায় পরিবর্ত্তিত হইবে। স্বতন্ত্রাত্মকতা ভ্রম বিদূরিত হইয়া ভাবাত্মকতায় পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ভাবাত্মক জ্ঞানের ন্যায় পরিভাষাত্মক জ্ঞানও অনেক সময়ে পরিভাষাত্মক বলিয়া ধরা যায় না। সমগ্র প্রাকৃত গণিতে পরিভাষাত্মক জ্ঞানের এবম্বিধ প্রচ্ছন্নতা বিপুলায়তনে বর্ত্তমান। বিশেষক জ্যামিতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। গণিত শাস্ত্র হইতে এই প্রচ্ছন্ন পরিভাষাত্মক জ্ঞান নিষ্কাশন করিয়া একটি শাখাগণিত প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে ভাবাত্মকতা ও স্বতন্ত্রাত্মকতার অন্তর্ভুক্ত করিবার সমর্থতা না থাকায় ইহাকে উপধারণা (imagination) বলিয়া মনে হয়। মন ইহার অস্তিত্ব কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। অনন্ত ক্ষুদ্র প্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্বরূপ। গণিত শাস্ত্র ক্রমশঃ এই উপধারণার চরমে উপস্থিত হইয়াছে। উপধারিত (imaginary) রাশি এই চরমের প্রকাশ। কিন্তু এসমস্ত পরিভাষাত্মক জ্ঞান বই কিছুই নহে। তবে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যুক্তি যোজনা করিয়া ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ নিতান্তই অসম্ভব।

বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান স্বতন্ত্রাত্মক। অথচ ইহার ভ্রম অপনোদনে ইহাকে ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহার কারণ বস্তুর স্বতন্ত্রাত্মকতা ভাবাত্মকতায় পরিণত হইলেও সেই পরিণতি বস্তুর অন্তরালে অপর পদার্থের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

উক্ত পদার্থে প্রতীত শক্তির পরিবর্ত্তনে এরূপ একটি কার্য্য উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। শক্তির পরিবর্ত্তন ব্যতীত উক্তরূপ অনুভূতি সম্ভব নহে। বর্ণের বিভিন্নতা শক্তির পরিবর্ত্তনেই উৎপন্ন। ইহা আকাশ-স্রোত দিয়া প্রবাহিত। আকার বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি তাহা শক্তিরই কার্য্য। যেহেতু ইতস্ততঃ বিচরণশীল পরমাণু-পুঞ্জের এরূপ একটি স্থায়ী আকার থাকা সম্ভব নহে। পরন্তু ইহারা কোন নির্দ্দিষ্ট পরমাণু-সমূহের সমষ্টিও নহে। যেহেতু প্রতিনিয়তই পরমাণু-রাশি ইহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে ও নূতন নূতন পরমাণু-রাশি ইহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই অনির্দ্দিষ্ট পরমাণু-রাশিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রূপ, আকার প্রভৃতি সহযোগে যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহাই বস্তু।

উক্ত অনির্দ্দিষ্ট পরমাণুরাশি ও আমাদের বস্তু এক নহে। যেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত পরমাণুরাশির ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ঐ পরমাণুরাশিতে প্রতীত শক্তির পরাবর্ত্তন উৎপন্ন আকারে, রূপ প্রভৃতি নামে অভিহিত কার্য্যমাত্র। স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী ইহাই বস্তু। সাধারণ ভাষায়ও এতদতিরিক্ত বস্তুত্বের কিছুই নাই। অথচ পরিভাষাত্মক জ্ঞানের অপরিপুষ্টতায় সচরাচর লোকে বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী পরমাণু-সমষ্টি বলিয়া মনে করে। স্বতন্ত্রাত্মকরূপে প্রতীত বস্তু ভাবাত্মক পদার্থে পরিণত হইলেও ইহাকে স্বতন্ত্রাত্মক পদার্থের ভ্রম-বিদূরণে ভাবাত্মক জ্ঞানের পরিবর্ত্তন বলা চলে না। যেহেতু এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিশ্লেষণে স্বতন্ত্রাত্মকতাকে স্বতন্ত্রাত্মক ও ভাবাত্মক এই উভয়বিধ জ্ঞানের উপাদান পাওয়া যাইতেছে। পরমাণু-সমষ্টি স্বতন্ত্রাত্মক ও বস্তু ভাবাত্মক। উভয়ের একীকরণে স্বতন্ত্রাত্মককে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভাবাত্মক প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ ভাবাত্মক আমার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

যদি কোন স্বতন্ত্রাত্মকতা, ভ্রমবিদূরিত হইয়া ভাবাত্মকতায় পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, তবে নিশ্চয়ই তথায় অপর কোন স্বতন্ত্রাত্মক প্রচ্ছন্ন থাকিবে।

একান্ত শৈশবে ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রাথমিক জ্ঞানে বস্তু কেন, ইহার রূপরসাদিও আমার সহিত সম্পর্কজাত বলিয়া

অনুভূত হয় নাই। তখন রূপরসাদিকে স্বতন্ত্রাত্মক বলিয়াই অনুভব করা যাইত। কিন্তু সেই রূপরসাদি বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মাত্র প্রতিপন্ন হইলে উক্ত স্বতন্ত্রাত্মক জ্ঞানই ভাবাত্মক হইয়া পড়ে। রূপরসাদি স্বতন্ত্রাত্মক থাকা পর্য্যন্ত বস্তুকে আমরা ধরিতে পারিতাম না। আমাদের জ্ঞান রূপরসাদি উত্তীর্ণ হইয়া বস্তুতে পৌঁছিত না। রূপরসাদি ভাবাত্মকতায় পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে বস্তুর উপলব্ধি ফুটিতে আরম্ভ করে এবং বস্তু স্বতন্ত্রাত্মক হইয়া দাঁড়ায়, তৎপরে পুনরায় বস্তু ভাবাত্মকতায় পরিবর্ত্তিত হইলে পরমাণু-সমষ্টি স্বতন্ত্রাত্মক রূপে উপস্থিত হয়। এইরূপে জ্ঞান ক্রমশঃ প্রকৃত স্বতন্ত্রাত্মকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্বতন্ত্রাত্মকতার সহিত নহে, ভাবাত্মকতার সহিত। এ অবস্থায় স্বতন্ত্রাত্মকতার পূর্ব্বে ভাবাত্মকতারই অঙ্কুরিত হওয়ার কথা। হয়ও তাহাই। যখন সম্পর্কবোধেরও সাধ্য ছিল না—সেই রূপরসাদির প্রথম সাড়া—তাহা অনুভূতির উন্মেষ মাত্র,তখন আমি জানিতেছি,এ জ্ঞানেরও অভাব। সেই সাড়ায় চৈতন্যের প্রথম নাড়া পড়িল। ক্রমে 'আমি সাড়া পাইতেছি' বোধও হইল। এখানেই ভাবাত্মকতার অঙ্কুর। এই সাড়ায় পার্থক্য দেখা দিল—সাদা ও কালো। তাহা আমিই দেখি। ক্রমে ইহাদের একটি অবস্থিতির উপলব্ধি হইল। ইহাদের স্বতন্ত্রাত্মকতা ধরিতে পারিলাম। কিন্তু তখনও ইহারা সাদা ও কালো। সাদা ও কালো ব্যতীত বস্তু বলিয়া কিছু চিনি না। ক্রমে অনুভব করিলাম, সাদার মধ্যেও যেন একটা তফাৎ আছে। যাহা সাদা তাহা যে কেবল সাদা, তাহাই নহে। তাহার মধ্যে সাদা ছাড়া আরও কিছু আছে। এই 'তাহাই' বস্তু। এখন হইতেই সাদা ও বস্তুতে ভেদ জন্মিল। স্বতন্ত্রাত্মক-রূপে প্রতীত সাদা ভাবাত্মক হইয়া পড়িল।

'উন্মোচনা' নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে 'মানব, জগতের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায়ই পরিবর্দ্ধিত। জাগতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত ইন্দ্রিয় মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হইয়াই তাহার জ্ঞান উন্মেষ প্রাপ্ত।' এতদ্ব্যতীত জ্ঞানলাভের অপর কোন উপায় নাই। অতএব প্রাথমিক জ্ঞান যতই পরিমার্জ্জিত হইবে ভাবাত্মকতার আবর্জ্জনা বিদূরিত হইয়া ততই স্বতন্ত্রাত্মকতার নির্ম্মলতা ফুটিয়া উঠিবে। এই আবর্জ্জনা স্তরে স্তরে সম্বদ্ধ এবং পরবর্ত্তী স্তরে ক্রমশঃই উজ্জ্বলতার আধিক্য প্রকাশমান।

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক]

তুষু পূজা

পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত "তুষু পূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ, লেখক লিখিয়াছেন যে উক্ত পূজা, বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি জেলায় কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু একথা ঠিক নহে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ভদ্রগৃহের এমন কি ব্রাহ্মণ-গৃহের কুমারী কন্যাগণও উক্ত পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জিত করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন প্রতিমা নাই। একটি মৃৎপাত্র হলুদরাঙা কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া পূজা করাই ইহার প্রচলিত প্রথা, কখন কোথাও প্রতিমা হইতে দেখি নাই। এবং উক্ত পাত্র পৌষ-সংক্রান্তির দিনে পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া এবং প্রদীপে আলোকিত করিয়া, একটু রাত্রি থাকিতে নিকটবর্ত্তী বড় পুকুরে বা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, লেখক যে ছড়াগুলি তুষু পূজার ছড়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহা তুষু পূজার ছড়া নহে, উহা ভাদু পূজার গান। ঐ পূজা ভাদ্র মাসে হয়। ইহাও মাসব্যাপী পূজা। ইহার প্রতিমাও হইয়া থাকে। তজ্জন্য লেখক বোধ হয় ভাদু পূজায় ও তুষু পূজায় গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

তুষু পূজাকে "তুষ পূজা" বা "তুষালু পূজা" বলিয়া থাকে। ইহার ছড়া, যথা

"তুষালু গো মাই।
তোমার দোলতে আমরা হবড়ি পিঠা খাই॥
হবড়ি মবড়ি আর বিলাতে খাই।
খালের জলে ঘঁষামাজা খাসির জল খাই॥" ইত্যাদি।

এই ছড়াটি একটি খুব বড় ছড়া, বাহুল্য-ভয়ে সমস্তটা দিলাম না। লেখক মহাশয়ের প্রদত্ত ছড়াগুলিতে "তুষু" স্থলে "ভাদু" হইবে। যথা

"চল ভাদু চল খেল্‌তে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা,
অমনি পথে দেখিয়ে আন্‌ব কয়লা-খাদের জল তোলা।"

শ্রী কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

হালফ্যাসানের ঘড়ি—

পকেটঘড়ি, মণিবন্ধ ঘড়ি (wrist watch), আংটিঘড়ি, হাটঘড়ি প্রভৃতির সহিত আমাদের পরিচয় আছে। পাশ্চাত্যদেশের খেয়ালী বৈজ্ঞানিকেরা উহাতেই সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা এবারে বোতাম-ঘড়ি
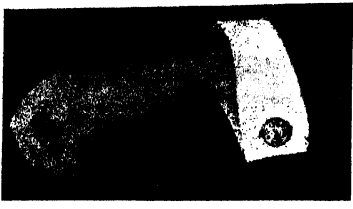
বোতাম ঘড়ি

আবিষ্কার করিয়াছেন। জার্ম্মানির একজন বৈজ্ঞানিক এই ঘড়ির আবিষ্কর্ত্তা। রিষ্ট ওয়াচের অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি এই ঘড়ির প্রবর্ত্তন করেন। বার বার সার্টের হাতা সরাইয়া ইহা দেখিতে হয় না। সার্টের হাতের বোতামের (Cuff Link) একদিকে এই ঘড়ি সন্নিবিষ্ট থাকে।

বলখেলার আধুনিকতম সংস্করণ—

একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছিলেন, যে দেশ হাসি আমোদ ও খেলাধূলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত, সে দেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে বুঝিতে হইবে। আমরা যে মৃত্যুমুখে ছুটিয়াছি তাহার প্রমাণ এই যে, তাস পাশা দাবা প্রভৃতি ব্যতীত বাহিরের মাঠে খেলাধূলা করার বিশেষ
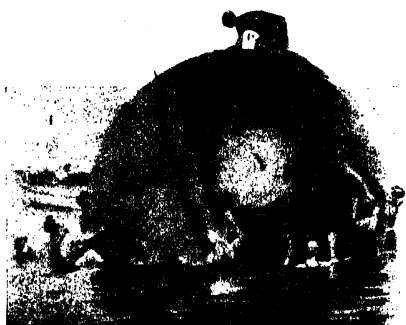
নূতন বল খেলা

প্রবৃত্তি আমাদের নাই, আমরা প্রধানতঃ দর্শকরূপে এই সকল খেলায় যোগদান করি। পাশ্চাত্যদেশ-সমূহে শরীরের উন্নতিবিধায়ক কত প্রকার খেলাই যে নিত্য নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশের ছবিতে দেখুন, সাঁতার কাটাকে মনোরম করিবার জন্য কি অদ্ভুত বল-খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বলটির দুই অর্দ্ধভাগ দুই রঙে রঞ্জিত। জলের উপর দুইরঙই প্রথমে সমান জাগিয়া থাকে। দুই বিভিন্ন দলে খেলা হয়। গায়ের জোরে সাঁতার কাটিতে কাটিতে যে দল তাহাদের অংশের দিকটি জলের উপরে রাখিতে পারিবে, তাহাদেরই জিত। বলটির গায়ে ধরিবার জন্য আংটা লাগানো আছে। এই বলটির ব্যাস ১৪ফুট।

গুণ্ডা ও পুলিশ—

আমাদের দেশের দৈনিক কাগজ খুলিলেই আমরা প্রায় প্রত্যহই এই ধরণের খবর পড়িয়া থাকি, 'অমুক রাস্তায় একজন গুণ্ডা একজন পথিকের
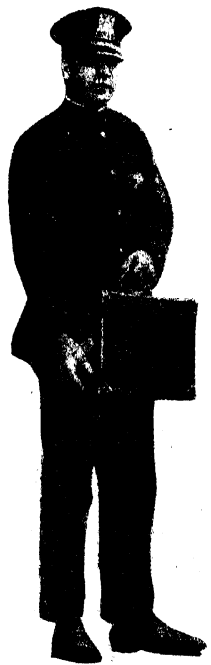
ক। দাঙ্গা-কামান

অত টাকা ছিনাইয়া পলাইতেছিল। সতর্ক পুলিশ-প্রহরী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু, আসামী তাহাকে ছোরা দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।' অথবা, 'অমুক জায়গায় চোরেরা সিঁদ কাটিতেছিল এমন

সময় সেখানে পাহারাওয়ালা গিয়া পড়ে, কিন্তু চোরেরা সংখ্যায় অধিক ছিল বলিয়া পাহারাওয়ালা কাহাকেও ধরিতে পারে নাই।' এরূপ ঘটনা প্রায়শই ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে পুলিশ ও পাহারাওয়ালাদের সেই মান্ধাতার আমলের 'রুল' ব্যতীত অন্য অস্ত্র নাই। তাহারা সদাই লক্ষরী চালে যেখানে বিপদ কম সেখানেই এই রুল লইয়া হাজির থাকে;

খ। পকেট রিভলবার

গ। গুলিসহ সেল্লী

কিন্তু বিপদ যেখানে বেশী সেখানে 'আসামী ভাগ গিয়া' এই বুলি ঝাড়িয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত। সৌভাগ্যের বিষয়, এদেশে চোর-ডাকাত ও গুণ্ডারা তাহাদের ইয়োরোপ ও আমেরিকার জ্ঞাতভাইদের মত ধূর্ত্ত ও বৈজ্ঞানিক নহে। তাহা হইলে এরূপ সাবধানী পুলিশ লইয়া দেশের লোককে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে ফিরিতে হইত না। আমেরিকার 'লাল বাজারগুলি' খুন, জখম, রাহাজানি, গুণ্ডামী প্রভৃতি নিবারণের জন্য নিত্য নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার গুণ্ডারা যেমন কৌশলী, পুলিশেরাও তেমনি। 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি' হয় বলিয়াই সে দেশে পাপের স্রোত অনেকখানি বাধা পাইয়াছে ও দিনে দিনে পাপের সংখ্যা কমিতেছে।

ঘ। কলম বন্দুক

পাপের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশের যে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা দেখিলে আমাদের দেশের পুলিশ-প্রভুরা 'ইতো বাহু হ্যায়' বলিয়া ইষ্টনাম স্মরিতে স্মরিতে সাত হাত পিছাইয়া পড়িবে। 'রুল' ও বংশখণ্ড মাত্র যাহাদের সম্বল তাহাদের দোষ দেওয়া চলে না।

আমরা এখানে আমেরিকার গুণ্ডা-যুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি অস্ত্রের নমুনা দিতেছি।

ক। ভদ্রলোকটির হস্তস্থিত চামড়ার ছোট্ট সুটকেশটি একটি ভয়াবহ অস্ত্র। কলিকাতার বিগত দাঙ্গায় এই অস্ত্র ব্যবহৃত হইলে অনেকে খুন-জখমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিত। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'দাঙ্গা কামান'। ইহার ভিতরে কাঁদুনে গ্যাস ১৮০০ শত পাউণ্ড চাপে পোরা আছে। হাতলের উপর কব্জির [illegible] চাপ দিলেই প্রবল বেগে গ্যাস বাহির হইয়া দাঙ্গাকারীদের [illegible] নাকে প্রবেশ করিবে। তখন আর নিস্তার নাই। বাড়ী [illegible] কাঁদিতেই হইবে। এই অস্ত্র একটি থাকিলেই ২[illegible] সামলান যায়।

খ। ক্ষুদ্রকায় অস্ত্র, নূতন আবিষ্কৃত এ[illegible] রিভলবার। ভদ্রলোকটির পকেটের বাহিরে রেখা-চিহ্ন [illegible] তাহার হাত ও রিভলবারটির অবস্থান দেখান হইয়াছে। এই রিভলবারটি নিউইয়র্ক পুলিশের বিশেষ কীর্ত্তি। ইহা এত ক্ষুদ্র ও এরূপ শক্তিশালী যে কোটের পকেটে হাত রাখিয়াই এই রিভলবার চালানো যায়।

গ। তিন নম্বর অস্ত্র, গুলি-প্রুফ সেল্লী। এই সেল্লী [illegible] রিভলবার, পিস্তল, এমন কি বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত [illegible] দেওয়া যায়।

আজকাল নিউইয়র্কের প্রত্যেক পুলিশকর্ম্মচারী এই গেঞ্জী ব্যবহার করে। ছবিতে দেখানো হইয়াছে—নিউইয়র্ক পুলিশের কর্ত্তা এই গেঞ্জী আবিষ্কারককে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতেছেন। এই গেঞ্জী গায়ে আবিষ্কারক হাসিমুখে গুলি সহ্য করিতেছেন।

৪। চার নম্বর অস্ত্র, একটি সামান্য ফাউণ্টেনপেন। আসলে এই কলমটি একটি সাংঘাতিক অস্ত্র। আমেরিকার জনসাধারণও আজকাল এই অস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। কোনো দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে ইহার সাহায্যে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। ইহাও এক প্রকার গ্যাস-কামান। ছবিতে দেখুন পিস্তলধারী গুণ্ডা একটি মহিলার নিকট কেমন জব্দ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অস্ত্র আছে যাহার ছবি এখানে দেওয়া হইল না। লাঠি-বন্দুক, গহনাবন্দুক প্রভৃতি আরো নানা অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যদ্দ্বারা গুণ্ডাদের গুণ্ডামী অনেকটা বাধা পাইয়াছে।

—

দোষী-নির্দ্দোষী নির্দ্ধারণ—

দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যেমন নানা প্রকার অস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তেমনই দোষী-নির্দ্দোষী নির্দ্ধারণে যাহাতে কোনো প্রকারে ভুল না হয় তাহারও ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশের মনস্তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছেন। সেখানে একশতজন বাচাল সাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা মূক যন্ত্রের সাক্ষ্য অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আমেরিকায় পাপের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তথাকার বৈজ্ঞানিকগণ পাপীকে সঠিক ধরিবার উপায় বাহির করিতে চেষ্টিত ছিলেন। নানাপ্রকার গবেষণা করিয়া এই কার্য্যে তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন। মানুষ কোনো অন্যায় কাজ করিলেই তাহার অন্তরের মধ্যে নানাভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের বিপ্লব বাধিয়া যায়। যত বড়ই নির্দ্দয় ও পাষাণ-প্রাণ ব্যক্তি

২। দোষী-নির্দ্দোষী-নির্দ্ধারণ যন্ত্র

৩। দোষী-নির্দ্দোষী পরীক্ষা

১। কথার সত্যাসত্য বিচার

হউক না কেন, এই অন্তর্বিপ্লবের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রযোগে এই অন্তর্বিপ্লবের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মিথ্যাকথা বলিলে মনে যে আলোড়ন হয়, খুন করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, এই ভাবে আভ্যন্তরীণ আলোড়নের মাত্রাধিক্য লক্ষ্য করিয়া পাপীর পাপের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তবে অবশ্য শারীরিক গঠনের তারতম্যহেতু বিভিন্ন লোকের আলোড়ন বিভিন্ন।

৪। দোষী-নির্দ্দোষীর রেখা

তিব্বতের গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মিথ্যাকথা বলার পর কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে সে ধরা পড়িবেই। এই ভাবে শতকরা ১০০ ক্ষেত্রেই মিথ্যাবাদীরা ধরা পড়িয়াছে।

আমরা এখানে কয়েকটি যন্ত্র ও পরীক্ষার ছবি দেখাইতেছি। প্রথম ছবিখানিতে আসামীর কথার সত্য-মিথ্যা বিচার হইতেছে। ক্যানাডার উইণ্ডসরের বিখ্যাত চিকিৎসক আর, ই, হাউস এই পরীক্ষার আবিষ্কারক। তিনি বহু গবেষণা করিয়া এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার প্রয়োগে মিথ্যাবাদী ধরা পড়িবেই। ঔষধ-প্রয়োগ-কালে আসামীকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ঔষধ প্রয়োগের পর যদি সে সত্য সত্যই মিথ্যাকথা বলিয়া থাকে তাহা হইলে চোখের আবরণ তুলিয়া লইলেই দেখা যায় তাহার চোখের তারা দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি দুইখানিতে নিউইয়র্কের বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ডেভিড্ ওয়েশলার আবিষ্কৃত যন্ত্র ও তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি দেখানো হইয়াছে। এই যন্ত্র-সাহায্যে দোষী ও নির্দ্দোষীর শ্রেণী-বিভাগ সহজেই করা যায়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চামড়া-পরীক্ষা'। এই যন্ত্রের হাতল দুইটিতে আঙুল স্পর্শ করিয়া রাখিলে আসামীর অনুভূতি কাগজে রেখাপাত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

চতুর্থ ছবিখানিতে নীচের রেখাটি নির্দ্দোষী লোকের চামড়া পরীক্ষার রেখা ও উপরের রেখাটি দোষীর স্পর্শরেখা।

আমাদের দেশেও, বিচারালয়ের কার্য্য সহজ ও নির্ভুল করিবার জন্য এই সকল বিধি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। উকীলের গলার জোর অথবা পুলিশের মারের চোটে অনেক সময় বিচারের গোলযোগ ঘটা সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাণহীন যন্ত্রের উপর নির্ভর করিলে বিচারের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। পাশ্চাত্যদেশে এই সকল পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে। ইহা আমাদের দেশে আসিতে কত সময় লাগিবে কে জানে?

—

পর্ব্বতগাত্র-খোদিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি—

পশ্চিম তিব্বতের একটি পাহাড় ধসিয়া গিয়া পার্ব্বত্যাঞ্চলের একটি গুহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ইহার মধ্যে জীবন্ত পর্ব্বতগাত্রে [illegible] খোদিত একটি সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি লুকায়িত ছিল, সেটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভগ্ন গুহাটি দেখিয়া মনে হয় যেন ভিতরের গহবর-গাত্রে [illegible] রাখিবার জন্যই দরজার সম্মুখে এই বৃহৎ মূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটির কারুকার্য্য অতীব চমৎকার। প্রস্তরশিল্পীর অপূর্ব্ব কলাকৌশলের নিদর্শন ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এই মূর্ত্তি কত প্রাচীন তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

—

হাতের কাজ—

কেবলমাত্র যত্ন, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে মানুষ সাধারণ নিত্যব্যবহার্য্য দুই একটি যন্ত্রের সাহায্যে কি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি করিতে পারে আমরা নিম্নে তাহার তিনটি নিদর্শন ([illegible]) দিলাম,—

১। প্রথমটি, একটি বিচিত্র ঘুড়ি। [illegible] বৎসর বয়স্ক একটি জাপানী বালক ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ঘুড়িটি লম্বায় [illegible] মাত্র; রামধনুর সাতটি রঙের প্রয়োগ-কৌশলে ইহা দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছে। এই ঘুড়িটি ড্রাগনের কল্পনানুযায়ী নির্ম্মিত। ইহার [illegible] দুইটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে উড়িবার সময় ইহা [illegible]। [illegible] মনে হয়, যেন ড্রাগনটি নীচের মানুষদের কটাক্ষ করিতেছে। একটি [illegible] ইহার সহিত সংযুক্ত আছে। উড়িবার সময় [illegible] ঘুড়িটির শেষ সীমা পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করিতে থাকে। এই ঘুড়ির [illegible] উপরের দিকে থাকে।

২। দ্বিতীয়টি, একটি প্রাচীন স্পেনদেশীয় [illegible] মডেল। লস্ এঞ্জেলসের একটি স্ত্রীলোক [illegible] নির্ম্মাণ করিয়াছে।

একটি জাহাজে যে যে বস্তু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবশ্যক ইহাতে কোনটিই বাদ যায় নাই। মাস্তুল হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। এই খেলনা-

১। ড্রেগন ঘুড়ি

জাহাজটি লম্বায় ৪৮ ইঞ্চি ও উহার উচ্চতা ছয় ইঞ্চি। এই জাহাজটি তৈয়ারী করিতে ১৫ টাকা মাত্র খরচ পড়িয়াছে।
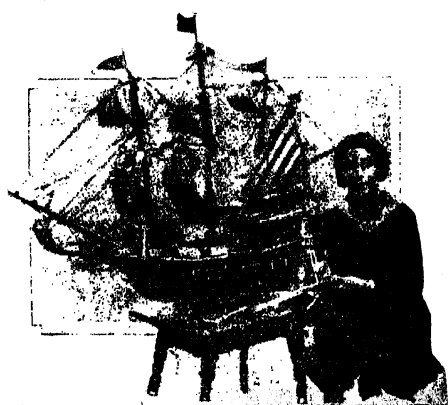
২। খেলনা জাহাজ

৩। তিন নম্বর ছবিতে ফুল ও পাতাগুলি লৌহনির্ম্মিত। শিল্পী জেম্‌স্ ক্র্যান্ মধ্যস্থলে বসিয়া। সাধারণ হাপর হাতুরী লইয়া এইগুলি

৩। লোহার কাজ

তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি কোনো আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করেন না, নিজের কল্পনা-শক্তিতে ফুলপাতা প্রভৃতি যথাযথ নির্ম্মাণ করেন।

—

অতিকায় ক্যামেরা—

পাশের ছবিতে লম্বালম্বি ভাবে একটি ফোটোগ্রাফিক ক্যামেরার ছবি দেখান হইয়াছে। এইটি পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যামেরা বলিয়া কথিত। এই ক্যামেরাটি যিনি তৈয়ার করিয়াছিলেন তিনি প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে এইটি দেখাইবার পর আমেরিকার সামরিক বিমান-বিভাগের তরফ হইতে

বিমান ক্যামেরা

এইটি ক্রয় করা হইয়াছে। যুদ্ধকার্য্যে নাকি এইটি প্রচুর উপকারে আসিবে। এই ক্যামেরাতে যে লেন্‌স্ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা তৈয়ারী

করিতে বৎসরাধিক সময় লাগিয়াছিল। ইহার ভিতর দিয়া ৯বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ ছবি প্রতিফলিত হয়। ৩৫০০০ হাজার ফুট উচ্চ হইতেও এই ক্যামেরাতে ছবি উঠিবে।

—

মেরী কাসাট—

গতবৎসর, ৮৩বৎসর বয়সে ফ্রান্স প্রবাসী, আমেরিকার বিখ্যাত চিত্রকর মেরী কাসাট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি বাল্যকালেই মাতৃ-ভূমি ফিলাডেলফিয়া হইতে শিল্প-শিক্ষার্থ প্যারিস গিয়াছিলেন, আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তবুও আমেরিকা তাঁহাকে আপনার সন্তান

ডেগাস কর্ত্তৃক অঙ্কিত মেরী কাসাটের তৈলচিত্র

বলিয়া গৌরব করিতেছে। তিনি তাঁহার শিল্পসাধনার প্রথম স্তরেই ইম্প্রেশনিষ্টদলের নেতাগণকে (ডেগাস, মানে প্রভৃতি) চমৎকৃত করিয়া-ছিলেন। ১৮৭৪ সালে তাঁহার অঙ্কিত একটি তৈলচিত্র দেখিয়া ডেগাস বলিয়াছিলেন, "শিল্পীর যথার্থ প্রতিভা আছে।" ইহার পর মেরী কাসাট ধীরে ধীরে গতানুগতিকতা ত্যাগকরিয়া আপনার অপূর্ব্ব কল্পনা শক্তিতে নিজেই এক স্বতন্ত্র শিল্প গড়িয়া তোলেন। "শিশু" সম্বন্ধীয় শিল্পে তিনি পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিখ্যাত শিল্পসমালোচকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এইযুগে 'শিশু'-শিল্পে ইঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না, বা নাই। তিনি মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব সহানুভূতি লইয়া শিশুদের চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা এখানে ডেগাস অঙ্কিত

কাসাট অঙ্কিত চিত্র—শিশুর প্রসাধন

কাসাট অঙ্কিত চিত্র - উদ্যানে

কাসাট অঙ্কিত চিত্র—চা-পান

মেরী কাসাটের একটি চিত্র ও মেরীকাসাট অঙ্কিত তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম।

সমুদ্রের কাত্‌লা মাছ—

নিউইয়র্ক যাদুঘরে সম্প্রতি একটি বৃহৎ কাতলা মাছের মুড়া রক্ষিত হইয়াছে। এই মুড়াটির ওজন প্রায় তিন মণ। যাদুঘরের অধ্যক্ষ চার্লস্ এইচ টাউনসেণ্ড সাহেব বলেন, সম্ভবতঃ সাধারণ মৎস্যজাতীয় এত বৃহৎ মৎস্য ইতিপূর্ব্বে আর ধৃত হয় নাই। এখানে সেই মুড়াটির ছবি দেওয়া হইল।

তিনমণা মুড়া

গরিলা—

মিঃ বেন বারব্রিজ আজ একজন জগদ্‌বিখ্যাত শিকারী। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফ্লোরিডা প্রদেশের একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। তারপর শিকারের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি শিকারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। মেক্সিকো ও আলাস্কার এমন জঙ্গল নাই যেখানে ইনি শিকার না করিয়াছেন। সিংহ, বাঘ, হাতী, গণ্ডার, মহিষ ইনি এত অধিক শিকার করিয়াছেন যে, তিনি আর এ সব শিকার করিয়া তৃপ্ত হন [illegible] কাল ধরিয়া তিনি গরিলা শিকারে মনোনিবেশ করিয়াছেন [illegible] সম্ভবতঃ পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র গরিলা শিকারী। গরিলা [illegible] জন্য তিনি আফ্রিকা গিয়াছেন ও গরিলার অনুসন্ধানে আফ্রিকায় গভীর অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র ইনিই অরণ্য-আবাসে গরিলার ছবি তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত মাত্র ১২টি গরিলা মানুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮টিই ইনি ধরিয়াছেন। আফ্রিকার বাহিরে নীত গরিলাগুলির মধ্যে বেন বারব্রিজ সাহেবের পোষা কুমারী কঙ্গো ব্যতীত আর সকল গুলিই মরিয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সালে এটি ধৃত হয়। ইহার বয়স ছয় বৎসর হইবে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শ্রীমতী কঙ্গোর সাহায্যেই গরিলা বিষয়ক অনেক তত্ত্ব

শ্রীমতী কঙ্গোর বুদ্ধি

গরিলার ক্রোধ

অবগত হইয়াছেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন যে, আকৃতি, গঠন ও বুদ্ধি-শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে গরিলাই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। ইহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশী। ছবিতে দেখুন শ্রীমতী কঙ্গো একটি কমলালেবু কি ভাবে হস্তগত করিবার প্রয়াস করিতেছে।

৮০ বৎসর পূর্ব্বে একজন খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারক আফ্রিকার এক জঙ্গলে গরিলার মাথার খুলি দেখিয়া ইহাদের অস্তিত্ব অবগত হন। তিনি ইহাদিগকে 'বেঁটে মানুষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পর দুঃসাহসী শিকারীগণের পরিশ্রমে গরিলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একটিও গরিলা পাশ্চাত্য শিকারীগণ কর্ত্তৃক হত বা ধৃত হয় নাই। বেন বারব্রিজ সাহেব বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস আফ্রিকার আদিম অধিবাসী ব্যতীত সম্ভবতঃ ২০ জন লোকও পরিণত বয়সের গরিলা প্রত্যক্ষ করে নাই।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গরিলার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই লোকের সন্দেহ ছিল। খৃষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে হ্যানো নামক একজন ফিনীশীয় নাবিক আফ্রিকার উপকূলে ভ্রমণকালে একদল বেঁটে লোমশ লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদের যে বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি গরিলাকেই বেঁটে মানুষ বলিয়াছিলেন। ১৫৯০ সালে এণ্ড্রু ব্যাটেল নামে একজন ইংরেজ নাবিক আফ্রিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গরিলার গল্প করেন; তাঁহার কথাও কেহ বিশ্বাস করে নাই। ১৮৪৬ সালে প্রথম গরিলার খুলি, ১৮৫১ সালে গরিলার পঞ্জর ও ১৮৫৮ সালে আফ্রিকার বুনোদের নিকট হইতে ক্রীত গরিলার চামড়া ইউরোপে নীত হয়। ১৮৬১ সালে পল ড্যু-চাইলু নামক একজন আমেরিকান ভূপর্য্যটক ইহাদের বর্ণনা করেন। ইহার পরেই বেন বারব্রিজ সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি চলচ্চিত্রের সহায়তায় ইহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সভ্যজগতের গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার জন্য তিনি অনেকবার মৃত্যুর কবলে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছেন। বেন বারব্রিজ সাহেব বলেন যে, গরিলা জন্তু হইলে পৃথিবীর ভীষণতম হিংস্র জন্তু। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ইহার তুলনায় অতি শান্ত বলিতে হইবে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা সিংহ ব্যাঘ্র শিকারে কিছুমাত্র ইতঃস্তত: করে না, অথচ, গরিলার আবাসস্থলে যাইতে ইহারা কিছুতেই রাজী হয় না। বারব্রিজ সাহেব গভীরতম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গরিলাদের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহীত চলচ্চিত্র "বারব্রিজের আফ্রিকায় গরিলা শিকার" এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

বেলজিয়ান কঙ্গোই গরিলাদের বাসস্থান। বারব্রিজ সাহেব এখান হইতে চারটি 'বাচ্চা' গরিলা ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বেলজিয়ান সম্রাটের কর-স্বরূপ একটিকে দিতে হইয়াছিল।

গরিলারা যেখানে থাকে সেখানে অন্য কোনো জানোয়ারই যাইতে ভরসা পায় না। কেবলমাত্র চিতা-বাঘেরা চোরের মত সেখানে সন্তর্পণে যাতায়াত করে। শিশু-গরিলার কচিমাংস নাকি ইহাদের ভারী প্রিয়।

গরিলার মুখের যে ভীষণ ছবিখানি এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহা বারব্রিজের একজন সঙ্গী কর্ত্তৃক গৃহীত, একটি বৃহদাকার গরিলার মুখের ছবি। এইরূপ মুখভঙ্গী করিয়া সে যখন বারব্রিজ সাহেবকে আক্রমণ করে তখন তাঁহার একজন সঙ্গী এই ছবিখানি তুলিয়াছিলেন।

গৌহাটীতে জাতীয় সপ্তাহ

আসামের অন্তর্গত গৌহাটী সহরে এবার নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার ৪১শে অধিবেশন হইয়াছিল। আসামের ইতিহাসে জাতীয় মহাসভাকে আহ্বান করায় সম্মান এইটিই প্রথম। একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৬ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন কর্ণেল রিচার্ডসন্ আসামে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত করেন। আর ঠিক তাহার একশত বৎসর পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আসামের অধিবাসীগণ

কংগ্রেস-মণ্ডপের প্রবেশ-পথে আলী ভ্রাতৃদ্বয়

দেশে পুনরায় আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য লইয়া জাতীয় মহাসভাকে আহ্বান করিলেন।

আসামের প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন তাঁহার অভিভাষণে যথার্থই বলিয়াছেন,

"প্রাকৃতিক বিভব যথেষ্ট থাকিলেও আসাম যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য
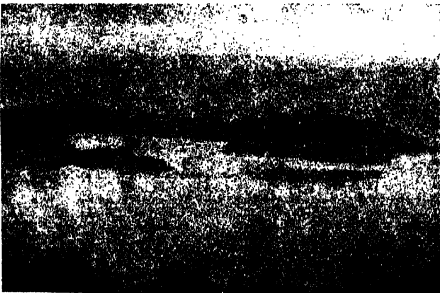
উমানন্দ দ্বীপ

এবং বৈচিত্র্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমি আসামী বলিয়া হয়ত ইহা আমার স্বাভাবিক গর্ব্বের কথা—কিন্তু যাহা দেখিতে পাই তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? আসামের উত্তরে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, মধ্যে বিস্তৃত সমতল ভূমি, তাহার চতুঃপার্শ্ব ঘেরিয়া ভুটান্, খাসিয়া-জয়ন্তী, নাগা এবং গারো পাহাড়। শত-সহস্র
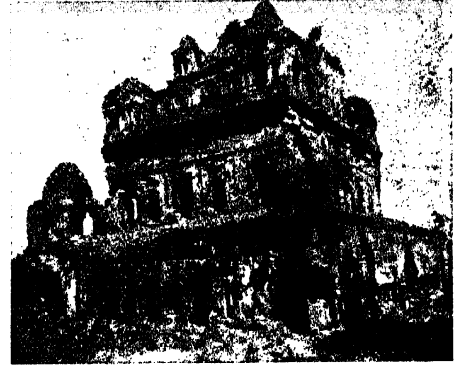
আহমরাজাদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

স্বচ্ছতোয়া পার্ব্বত্য-নদী সমতল ভূমিভাগে বারি সিঞ্চন করিতেছে। সর্ব্বোপরি, বিপুল ব্রহ্মপুত্র নদ ইহার ঠিক্ মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত। এই-সকল সৌন্দর্য্যের খনি এই আসামের সহিত পৃথিবীর যে-কোন সৌন্দর্য্য-শালী স্থানের তুলনা করা যাইতে পারে।"

আসাম ভারতের অতীত গৌরবের শত-সহস্র চিহ্ন বুকে ধারণ করিয়া পবিত্র। ভারতের অতীত কলা অনুশীলন, বীরত্বকীর্ত্তি, বৈজ্ঞানিক কুশলতা, এবং লোকপরম্পরায় প্রবর্ত্তিত বহু অতীত ইতিহাস, এই সকলেরই কোন-না-কোন চিহ্ন এই স্থানে বিদ্যমান আছে। আসামেই পুণ্যশ্লোক রাজকুমারী জয়মতী রাজাদেশে প্রপীড়িতা হইয়াও স্থির ভাবে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্বামী কোথায় আছেন। মাত্র এই সংবাদটি প্রকাশ করিবার বিনিময়ে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চপদ এবং সম্মান দিবার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু তিনি সগর্ব্বে সে-সম্মানে পদাঘাত করিয়া সহাস্যমুখে মরণকেই আলিঙ্গন করেন। আসামী-বীর মণিরাম দেওয়ানের স্মৃতি আজও ভারতের সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ পূজা করে। তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তাদের কোপানলে পড়িয়া এই বীর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। আজও তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোক-সঙ্গীত ও নানাপ্রকারের কাহিনী-আসামবাসীগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আসাম অতি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা এবং হিন্দু অনুশীলনের আবাসস্থল।

গৌহাটী সহর কামরূপ জেলার অন্তর্গত। সহরটি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত। কামরূপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পৌরাণিক বিবরণ আছে :—

দক্ষ-যজ্ঞে সতী পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদ পাইয়া মহাদেব শোকে অধীর হইয়া উঠেন এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুতেই
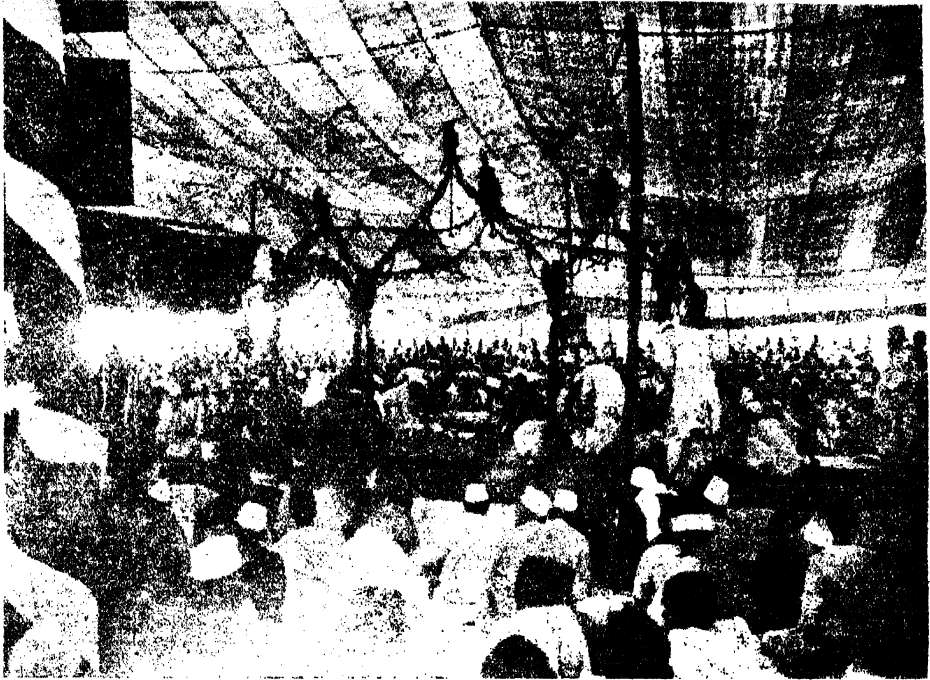
কংগ্রেস-মণ্ডপের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিবার সময় গৃহীত চিত্র হইতে

মহাদেবের শোক নিবারিত হইতেছে না দেখিয়া স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নিক্ষেপ করেন। তখন ঐ খণ্ডিত-অংশগুলি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং তাহা হইতেই এক-একটি তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, নীলাচল পর্ব্বতে সতীর স্ত্রীচিহ্ন পতিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান কামাখ্যা তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

আর একটি প্রবাদ এই যে, হর-কোপানলে-ভস্মীভূত কামদেব এই স্থানেই পুনরায় তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম কামরূপ হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথম রাজা নরকাসুর মহাভারত-যুগে নীলাচলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কোচরাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক তাহা পুনরায় নির্ম্মিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী কালাপাহাড় তাহা ধ্বংস করে। অতঃপর রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলারায় আবার কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অনেকেই মনে করেন যে, বর্ত্তমান মন্দিরটি তাঁহারই নির্ম্মিত।

অতি প্রাচীনকালে আসাম প্রদেশে কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। তখন করতোয়া নদী হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী নদীর তীর পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং তৎকালে শুধু আসাম উপত্যকা নহে, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার প্রভৃতি জেলাও তখন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় এই গৌহাটীই ছিল কামরূপ রাজ্যের রাজধানী। তখন গৌহাটীর নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। মহাভারতেও এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান গৌহাটী সহরের চতুষ্পার্শ্বে যে-সমস্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এবং এ-পর্য্যন্ত যে-সকল তাম্র-ফলকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এইটি অতি প্রাচীন সহর। ঐতিহাসিক গেট্ সাহেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে City of Eastern Astrology বলিয়াছেন।

এখনও আসাম প্রদেশটি যাদুবিদ্যা ও মন্ত্রতন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ ইহাকে Land of Magic and incantation বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের তান্ত্রিক উপাসনা সর্ব্বপ্রথম আসাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। নরকাসুর গৌহাটীতে অর্থাৎ প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি ভগবান বিষ্ণুর ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র বাণরাজ মহাভারতের যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সভাপর্ব্বে আছে যে, ইনি অর্জ্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কিরাতগণের সহিত আট দিন ধরিয়া প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন।

কামরূপের ইহার পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে আসাম ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, সেই সময় কামরূপের আয়তন প্রায় ১৭০০ বর্গ মাইল এবং রাজধানীর আয়তন প্রায় ছয় বর্গ মাইল ছিল।

পাণ্ডুনগরে স্বদেশীমেলা মণ্ডপের একটি দৃশ্য

অতঃপর পাল, কোচ, কাচারি, চুটিয়া এবং অহম রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করেন। তবে আহমরাজ রুদ্রসিংহ একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। রাজ্যের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই সময় দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌গণ বার বার আসাম অধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অহম নৃপতিগণের পরাক্রমে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অহম রাজাগণের সামরিক বিভাগ চালনার অতি উত্তম ব্যবস্থা ছিল। নৃপতিগণ স্বয়ং বড় বড় যোদ্ধা ছিলেন। অধিকন্তু রংপুর গৌহাটী এই দুই স্থানে দুইটি সেনা-নিবাস ছিল। এই সমস্ত সৈন্যের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়কগণকে "ফুকণ" বলা হইত। পরাক্রান্ত লাচিত বড়ফুকণ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে গৌহাটির অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে সরাইঘাট নামক স্থানে পরাজিত করেন। ইতিহাসে এই সরাইঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র আসামের থার্ম্মোপলি নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থিত উর্ব্বশী পাহাড়

অহমগণের রাজত্ব সময়ে যুদ্ধবিদ্যায় আসামবাসীরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতে গিয়া জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :—কামান, বন্দুক, খড়্গ, বর্শা এবং তীর ধনুক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত। কামান ও বন্দুক চালনায় তাহাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ইহারা অনেক প্রকারের বারুদ ব্যবহার করিত। জমিদারগণের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল। সেই সময় আসামীয় যোদ্ধাগণ বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিত। এইসমস্ত বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট আত্মনির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধের উপকরণ ইত্যাদি সমস্তই তাহারা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইত।"

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই অহমরাজা শক্তিহীন হইতে আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৈব-নির্যাতন তাহাদের কাল হইয়া উঠে। ১৭৯৩ সালে যে মহামারী দেখা দেয়, তাহার ফলে অহম-রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় রাজা গৌরীনাথ সিংহ কামরূপের রাজা ছিলেন। তিনি বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি কাপ্তেন ওয়েলেসের সঙ্গে একটি বাণিজ্য-সন্ধিতে আবদ্ধ হন। এই সময় হইতেই আসামে বৃটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত হয়।

এই সুযোগ ব্রহ্মদেশীয় নৃপতি আসামের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮২৬ সনে বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে কর্ণেল রিচার্ডসন ব্রহ্মদেশীয়গণের হস্ত হইতে আসাম প্রদেশ অধিকার করেন। ১৮২৬ সনের ইয়ান্দাবুর সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ আসামে শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

গৌহাটী আসাম প্রদেশের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই স্থান হইতে আসামের বর্ত্তমান রাজধানী শিলং যাইবার রাস্তা আছে। দিন দিন গৌহাটীর জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১ ও ১৯২১, সালে গৌহাটীর জনসংখ্যা যথাক্রমে ১১৪৯২, ১১৬৯৫, ৮২৮৩, ১১৬৬১ ও ১৬০০০ ছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌহাটী আসামের রাজধানী ছিল। আসামের ডিষ্ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ার পাঠে জানা যায় যে, গৌহাটীতে ইউরোপীয়গণের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না। এই কারণে তাহারা গৌহাটী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, ১৮০৪ সনের পূর্ব্বে গৌহাটী সহরের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, তাহার জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। এই আন্দোলনের ফলে রাজধানী শিলং এ

বশিষ্ঠ-আশ্রম, গৌহাটী

স্থানান্তরিত হয়। শিলং শৈলে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় রাজপুরুষেরা তাহাদের Home weather অর্থাৎ স্বদেশীয় আবহাওয়া উপভোগ করিতেছে। গৌহাটী সহর শিলং শৈলের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। শিলং আসামের রাজধানী এবং প্রকৃতির রম্য নিকেতন। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক্‌ হইতে বিচার করিলে শিলংএর পরই গৌহাটীকে স্থান দিতে হয়। বিশাল ব্রহ্মপুত্রের তটদেশে অবস্থিত গৌহাটীকে রাজপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার চতুর্দ্দিকে সারি সারি পর্ব্বতমালা যেন প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে এই সহরের বিশেষ ক্ষতি হয়। চা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আইন কলেজ ও অনেকগুলি ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। গৌহাটীতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি নাম দিয়া একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

গৌহাটী আসামের দেবালয়-পুরী নামে খ্যাত। তাহার কারণ এই সহরের আসে-পাশে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত এবং সেই জন্য এখানে প্রতি বৎসর অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

বর্ত্তমান গৌহাটী সহরের দুই মাইল পশ্চিমে নীলাচল পর্ব্বতের শিখরদেশে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। ভারতের নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। এই পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরদেশ হইতে খাড়াভাবে প্রায় ৭৫০ ফুট উচ্চ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা ইহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। নীলাচলের মৌন গম্ভীর শান্তভাব দর্শক মাত্রকেই অভিভূত করিয়া থাকে। সদা চঞ্চল মনও এই স্থানের সংস্পর্শে শান্ত ও সংযত হইয়া আসে বলিয়াই হিন্দুগণের বিশ্বাস, এই কামাখ্যা মন্দিরই তান্ত্রিক সাধনার সিদ্ধপীঠ।

উমানন্দ—

ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থলে অবস্থিত উমানন্দ দ্বীপকে ইংরাজগণ "পিকক আইল্যাণ্ড" নাম দিয়াছেন। পর্ব্বতময় এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির প্রাকৃতিক সম্পদ সত্যই অতুলনীয়। প্রবাদ আছে যে, উমাকে আনন্দ দান করার জন্য মহাদেব এস্থলে যোগিনীতন্ত্রের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এই পবিত্র তীর্থস্থান একবারমাত্র দর্শন করিলেই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে রাজা শিব সিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

অশ্বক্রান্ত মন্দির—

ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অশ্বক্রান্ত মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান সদীয়ার নিকটে মহাভারতে উল্লিখিত বিদর্ভ নামক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানের পর্ব্বতগাত্রে কয়েকটি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অশ্বের খুরের দ্বারা এইগুলি হইয়াছে।

বশিষ্ঠ মন্দির—

সহরের নয় মাইল দূরে দক্ষিণদিকে বশিষ্ঠদেবের মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থানের নাম বশিষ্ঠাশ্রম। প্রবাদ আছে, বশিষ্ঠদেব কিছু সময় তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মন্দিরের অবস্থা ভাল নয়, ক্রমেই উহা ধ্বসিয়া পড়িতেছে। ইহার পাদদেশ দিয়া ললিতা, কান্তা এবং সান্ধ্যা নামক তিনটি ক্ষুদ্র গিরি-নদী বহিয়া যাইতেছে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেশ্বর সিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রুদ্রেশ্বর মন্দির—

গৌহাটীর নিকটে রুদ্রেশ্বর নামক আর একটি শিবমন্দির আছে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে আসামের বিখ্যাত রাজা রুদ্রসিংহ গৌহাটীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার পুত্র রাজা শিবসিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

এতদ্ভিন্ন সহরের মধ্যস্থলেই উগ্রতারা, ছত্রকর, নবগ্রহ প্রভৃতি আরও কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

হয়গ্রীবমাধব ও পোয়া-মক্কা—

গৌহাটী হইতে ১৫ মাইল দূরে হাজো নামক স্থানে হয়গ্রীবমাধবের মন্দির বিদ্যমান। ইহারই নিকটে পোয়া-মক্কা নামক একটি স্থান আছে। তথায় একটি পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, মক্কায় গেলে মুসলমানদের যে পরিমাণ পুণ্য হয়, এই স্থান দর্শন করিলে নাকি তাহার একচতুর্থাংশ পুণ্য হয়। এই জন্যই স্থানটির নাম পোয়া মক্কা হইয়াছে।

গৌহাটী-সহরের যে স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহার নাম পাণ্ডব-নগর। ঐ স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পর্ব্বতের উপর "পাণ্ডুনাথ" নামে মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। কথিত আছে যে প্রবাসের সময় পাণ্ডবেরা উহার প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস-নগর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল— কংগ্রেস সভামণ্ডপ ও নেতাদের শিবির। কংগ্রেস নগরটি প্রায় ১০৫ একর জমী লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সভাপতির শিবিরের নাম চিত্তরঞ্জন-শিবির দেওয়া হইয়াছিল। সভামণ্ডপের এক-একটি তোরণ-দ্বার এক একজন নেতার নাম অনুযায়ী হইয়াছিল যথা গান্ধী-তোরণ আনসারির-তোরণ ইত্যাদি।

কামরূপে কামাখ্যাদেবীর মন্দির

অসহযোগ আন্দোলনের সময় আসামের কর্ম্মীগণের বিপুল চেষ্টার ফলে আসামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেই সময় গৌহাটীই এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে বহুকাল ধরিয়া চরকায় কাটা কাপড়ের প্রচলন আছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাদকতা নিবারণী প্রচেষ্টায় অনেক দেশভক্ত যুবক আমলাতন্ত্রের রোষে অভিযুক্ত হন। কিন্তু কর্ম্মীরা তাহাতে ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে এই প্রদেশ হইতে আফিস বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

জাতীয় মহাসভার নির্দ্ধারণগুলি ও গৌহাটীতে জাতীয়-সপ্তাহে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা-সমিতির কথা স্থানান্তরে উল্লিখিত হইল।

প্র

ক্ষণিকা

হুমায়ুন কবির

স্বরগ-স্বপন যত দিবানিশি বসি' একা একা
এঁকেছি যতনে,
প্রভাত-কিরণে আজি বেদনার অশ্রুজল-রেখা
ভাতিছে নয়নে!
শিশিরের সুখস্বপ্ন বর্ণে বর্ণে বিকশিয়া ওঠে
ক্ষণিকের তরে,
নিকুঞ্জকানন-মাঝে গন্ধভরে পুষ্পদল ফোটে
আনন্দের ভরে,
সন্ধ্যার স্বপনতলে তারকার হিয়াখানি ঝলে
ব্যথার মতন,
হৃদয়ের প্রান্তদেশে সুখদুঃখসিক্ত অশ্রুজলে
আশার স্বপন!
রবিকরে শিশিরের সুখস্বপ্ন দহি' হয় শেষ,—
যায় শুকাইয়া,
কুসুমের হৃদয়ের গন্ধবাসনার কোথা লেশ?
পড়ে মুরছিয়া
বেদনায় পুষ্পদল সুকঠিন রূঢ় ভূমিতলে
ধূলিশয্যা 'পরে,
সন্ধ্যার অন্তরমাঝে বিকশিয়া যে তারাটি জ্বলে
রূপমায়াভরে,
আলোর আঘাত সহি' অন্তরের নিভৃত নির্জ্জনে
কাঁদে আজি মম
সুখের স্বপনমায়া মিলাইল হৃদয়-কাননে
মরীচিকা সম!
যেই হাসিখানি আসি' ভেসেছিল ক্ষণিকের তরে
অধরের কোণে,
যেই সুর দূর হ'তে বাক্যহারা বেদনার ভরে
অন্তর-ভুবনে
রচিল ভুবন নব,—মিলাইল নিমেষের শেষে
শূন্যতার মাঝে,
কেবল উদাস হিয়া ব্যাকুলিয়া অপূর্ব্ব আবেশে
আলোড়িয়া বাজে!
নিরশ্রু নীরব হিয়া কাঁদে একা গোপন ব্যথায়
কেন নাহি জানে,
কি যেন হারাল আজি তাই চিত্ত কাঁদে হায় হায়
অশ্রুহীন গানে।

ভারতবর্ষ

জাতীয় মহাসভায় গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ :—

১। পূর্ব্ব সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করিয়া এই কংগ্রেস সঙ্কল্প করিতেছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-সেবীদের নীতি হইবে যে যে-সমস্ত কার্য্য জাতির স্বচ্ছন্দ বিকাশের অনুকূল সেই সমস্ত কার্য্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং যে সমস্ত প্রচেষ্টা স্বরাজের পথে বিঘ্ন উৎপাদক সেই সমস্ত প্রচেষ্টা গবর্ণমেণ্টই করুক বা অপর যে কেহই করুক তাহাতে বাধা দেওয়া এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেস-সেবীদের সাধারণ নীতি হইবে—

(ক) যতদিন পর্য্যন্ত নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা অথবা নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মতে, রাষ্ট্রীয় দাবী গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ভাবে পূরণ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রীত্ব বা গবর্ণমেণ্টের দানাধীন কোন প্রকার চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা এবং অন্য কোন দল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া ;

(খ) যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ঐ-দাবী পূরণ না করিবেন বা কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অন্য কোন আদেশ না দিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্য্য বজায় রাখিয়া বাজেটে নির্দ্ধারিত ব্যয় নামঞ্জুর করা ;

(গ) যে-সমস্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা আমলাতন্ত্র স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে সেই সমস্ত আইন-প্রণয়ন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ;

(ঘ) জাতীয় জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য এবং দেশের আর্থিক, কৃষিকার্য্যের, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য এবং দেশবাসীর শারীরিক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা এবং সমর্থন করা ;

(ঙ) কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রজাস্বত্বের স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রজাদের দুর্দ্দশা নিবারণ কল্পে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ;

(চ) সাধারণতঃ কৃষি ও শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের, প্রজাদের, ধনিক এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

২। সরকার দমননীতিমূলক আইনের দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্যদিগকে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখায় কংগ্রেস তাহার নিন্দা করিতেছেন।

৩। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন বা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী আইনজারি করিয়া সরকার বিনাবিচারে অন্যায় ভাবে বহু কর্ম্মীকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন—কংগ্রেস ইহার তীব্র নিন্দা করিতেছেন।

৪। কাউন্সিল এবং এসেম্ব্লির কার্য্য ব্যতীত বাহিরে অস্পৃশ্যতা নিবারণ, খদ্দর প্রচার, পল্লী-সংগঠন এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য করিতে হইবে। মুমূর্ষু জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে হইবে এবং বিভিন্ন স্থানে যে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা ও দ্বেষের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহকারিতায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। এখন হইতে সমস্ত কংগ্রেস সভ্যকে নিয়মিত সকল সময় হস্তদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, নতুবা তিনি কোন কংগ্রেস সভায় ভোটদান করিতে পারিবেন না।

৬। বর্ত্তমানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ চলিতেছে তাহার দূরীকরণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন এবং আগামী ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিতে ও এই উদ্দেশ্যে দেশের সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে যথাযথ উপদেশ দিতে অথবা রিপোর্ট আলোচনার পর যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয় তদনুসারে কার্য্য করিতে আহ্বান করিতেছেন।

ইহা ভিন্ন কংগ্রেসে ৺স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও ওমর সেভোনীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশসূচক প্রস্তাব ও অপর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দৈবদুর্য্যোগ বশতঃ এবার জাতীয় মহাসভায় অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে নাই। সেগুলি আলোচনার জন্য নিখিল-ভারত-জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যকরী সভার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

এবার মহাসভায় বিলাতের পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যাথিক লরেন্স সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় মহাসভার অধিবেশন সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

"তিনি বলিয়াছেন, তিনি এ-পর্য্যন্ত যত সভা-সমিতি দেখিয়াছেন তন্মধ্যে এইপ্রকার সুবৃহৎ জনসঙ্ঘ খুব কমই দেখিয়াছেন। জাতীয়-মহাসভায় কার্য্যপ্রণালী ও বিধি ব্যবস্থারও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যে-কোনও জাতির পক্ষে স্বরাজের দাবী ও অপরাপর জাতির সহিত সাম্যের দাবী যে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।"

গৌহাটীতে অন্যান্য সভা—

অন্যান্য সভাসমিতি এবার গৌহাটীতে নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভা ছাড়া অন্যান্য অনেকগুলি সভা-সমিতির অধিবেশন হয়। যথা সঙ্গীত সম্মিলন, হিন্দু মহাসভা, স্বদেশী মেলা, স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলনী, রাজনৈতিক লাঞ্ছিত সম্মিলনী প্রভৃতি।

নিখিল-ভারত স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহার অভিভাষণের এক স্থলে বলিয়াছেন, "স্বেচ্ছাসেবকগণই একতার অগ্রদূত—তাঁহারাই মিলন-তীর্থের যাত্রীদল।" সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি—প্রত্যেক প্রদেশ, জেলা ও নগরে 'হিন্দুস্থানী সেবাদল'-এর শাখা প্রতিষ্ঠা এবং এই শাখা প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস শাখাগুলির সাহায্য প্রার্থনা, আর অপরটি—আর্থিক সাহায্য ভিক্ষা। এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে ইহার নায়ক শ্রীযুক্ত হার্ডিকর যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, সেজন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। তাঁহার বিপুল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক-একটি সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী

স্বদেশীমেলায় আসামের শিল্পবিভাগের বয়ন-শালার কর্ম্মচারীগণ

কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইবে আশা করা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে—দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যার সাহায্যে, শান্তি রক্ষায়, সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণে—ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন প্রসার লাভ করিবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। আসামের প্রতিপত্তিশালী ধর্ম্মগুরু স্বামী গুরুমারু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের স্মৃতি স্থাপন উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকার একটি তহবিল খুলিবার প্রস্তাব হয় ও হিন্দুসমাজের উন্নতি বিধানার্থ অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজনৈতিক লাঞ্ছিত সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

১। (ক) হিন্দুস্থানী সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ প্রদেশের লাঞ্ছিত রাজনৈতিকদের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৯২৭ সালের ১লা জুন তারিখে প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। (খ) দুঃস্থ লাঞ্ছিতদের ও তাঁহাদের পরিবারপরিজনকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার খুলিতে হইবে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

২। দেশের জনগণকে শক্তিশালী ও দেশের শোচনীয় দারিদ্র্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং স্বদেশজাত দ্রব্যেই যাহাতে দেশবাসীর কাজ চলে, তদনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

৩। এই সম্মিলনী ভারতের নরনারীকে সকল অত্যাচার-অবিচারের সম্মুখে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অস্ত্র লইয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে দাঁড়াইতে আহ্বান করিতেছেন।

৪। এই সম্মিলনী দেশের চাষী ও কারখানার মজুরদিগকে অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে লাগিবেন।

৫। এই সম্মিলনী ব্রিটিশ শ্রমিক সম্প্রদায়কে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে এবং দেশের মুক্তি ও সকল প্রকার শোষণের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

গৌহাটীতে শ্রীযুক্ত সি, এস্, রঙ্গায়ারের সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত বিধবা-বিবাহ সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক পূজ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর উপর ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ভাবে কাপুরুষোচিত আক্রমণে এই সম্মিলনী বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন।

২। হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত বাধ্যতামূলক বৈধব্যপ্রথাকে এই মুহূর্ত্তেই রোধ করিবার জন্য এই সভা প্রত্যেক হিন্দুকে উপদেশ দিতেছেন, কারণ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

৩। এই সভা আসামের বিভিন্ন স্থানে লাহোর বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভার শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে। যাহাতে উক্ত কার্য্যে প্রত্যেক কর্ম্মীই যথোপযুক্ত সুবিধা ও সুযোগ পাইতে পারে, তাহার জন্যও এই সভা বিশেষ যত্ন করিবেন।

ভারতের অন্যান্য সভা—

এবার যে শুধু গৌহাটীতেই সভা-সমিতির কেন্দ্রস্থল ছিল তাহা নহে। দিল্লীতে স্যার্ আবদার রহিমের সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মিলনের অধিবেশন হয়। স্যার আব্দার রহিম মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দ্দু করিবার কথা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন।

গত মাসে উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের সম্মিলন দিল্লীতে বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার্ বি, এন্, মিত্র। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন "যে বিগত পঁচিশ বৎসরের ভিতর বঙ্গের বাহিরের উত্তর ভারতের

রাজনৈতিক লাঞ্ছিত সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

বাঙ্গালীদের সাহিত্যিক দৃষ্টি খুব প্রসারলাভ করিয়াছে। আরও সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশের বাহিরে সাহিত্যিক উন্নতির সহিত ইঁহারা সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন;—এই প্রকার সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান উক্ত প্রকার চেষ্টার একটি নিদর্শন।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া সভাপতি বলেন—প্রাকৃত ভাষা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ঐ ভাষা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে আদি চলিত ভাষা হইতে সরিয়া আসিয়া ক্রমশঃ সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করে। বাঙ্গালা ভাষার শৈশব গগন প্রাচীনতর বিদেশী ভাষা সমূহের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া ছিল,—নানা শব্দ ও প্রয়োগে আমরা আজও উহার প্রমাণ পাই। কি স্বদেশে, কি বিদেশে বাঙ্গালীর মনে আজ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক তীব্র আবেগ দেখা দিয়াছে।"

কলিকাতায় স্যার দীনশা পেটিটের সভাপতিত্বে ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলার অভ্যর্থনায় নিখিল-ভারত শিল্প বাণিজ্য কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। ভারতের শোষণরহস্যের অনেক কথাই এই কংগ্রেসে আলোচিত হইয়াছে। কি করিয়া এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমে রসাতলে গিয়া বৈদেশিক শিল্প সমৃদ্ধ হইল তাহার বিবরণ এইসব ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য মহারথীগণের বিবৃতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সের স্থানে ১ শিলিং ৪ পেন্স হওয়াই যে ভারতীয়দের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়েও সকলে একমত হইয়া ভারত সরকারকে ১ শিলিং ও ৪ পেন্সই টাকার মূল্য রাখিতে বলিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বোম্বাইর মিঃ ট্যানেনের সভাপতিত্বে ভারতীয় আর্থিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সভায় ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত অর্থনীতিবিদ্‌গণ অনেক মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

লাহোরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশন হয়।

পুণায় বরোদার মহারাণীর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত-নারীসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। সংগালীর মহারাণী সাহেবা অভ্যর্থনা সমিতির অধিনেত্রী ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

এই সম্মিলনী বাল্যবিবাহের কুফলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন এবং সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন যে, আইন করিয়া ১৬ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধরূপে ধার্য্য করা হউক। এই সম্মিলনী এই দাবী করিতেছেন যে, সহবাস-সম্মতির বয়স ১৭ বৎসর করা হউক। স্যার হরি সিং গৌরের সহবাস সম্মতি সম্পর্কিত যে বিলটি বর্ত্তমান মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উঠিবার কথা আছে, এই সম্মিলনী তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই সম্মিলনীর দাবী উপস্থিত করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

১৬ বৎসরের ন্যূন বয়সে বিবাহ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য একটি আইন করিবার ও সেই সকল বিবাহে যে-সব পক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে দণ্ডনীয় করিবার প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাব করা হয় যে, বালক এবং বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করা হউক ও তাহাদের শরীর-চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হউক।
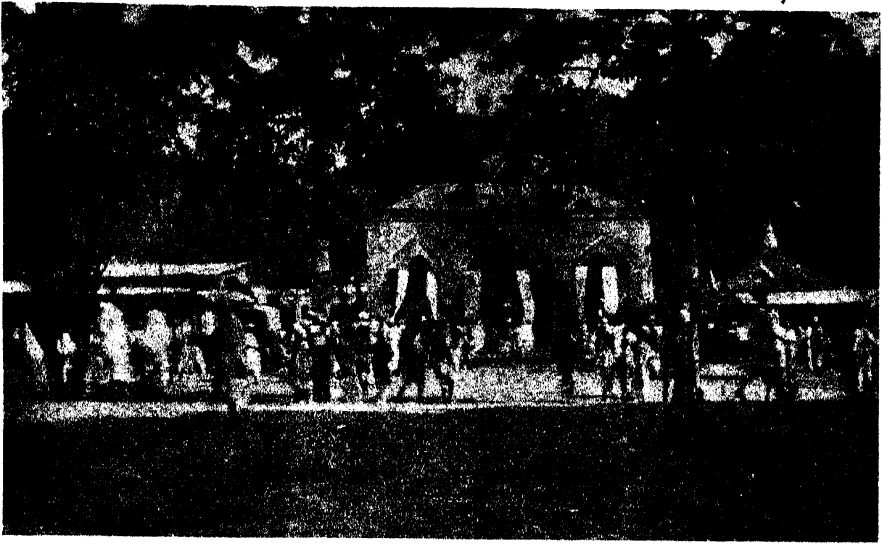
চিত্তরঞ্জন-তোরণ—স্বদেশী মেলা-মণ্ডপের প্রধান ফটক

পর্য্যটক ছাত্রদল—

আমেরিকা হইতে 'রীনডাম' জাহাজে একদল ভ্রমণকারী আসিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার সবই রহিয়াছে। ইহা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যটন সমিতির এক অভিনব প্রচেষ্টা। এই দলে ৬৬ জন অধ্যাপক এবং ৪৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী (ইঁহাদের বয়স ১৫ হইতে ২৪ বৎসর), ২৫৪ জন লোক-লস্কর আছে। জাহাজে বক্তৃতা হল, লেবরেটারী, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, এমন কি একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত আছে। এই ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাই পৌঁছিবার পূর্ব্বে জাপান, চীন, শ্যাম, ইষ্ট ইণ্ডিস, সিঙ্গাপুর, সিংহল ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে। শ্যাম দেশের রাজা ইঁহাদিগকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। বোম্বাইতেও এই দলকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। এই দল ছয় দিন বোম্বাই ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান পরিদর্শন করিবেন এবং ইহার মধ্যেই তাঁহারা একবার আগ্রার 'তাজ'ও পরিদর্শন করিতে যাইবেন। এই দলে ক্যানসাসের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মিঃ এইচ, জে, এ্যালেন্‌ও রহিয়াছেন।

বরোদা-রাজ্য বাল্য-বিবাহ নিবারণ—

দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ পত্রিকার প্রকাশ—বাল্য বিবাহের মঙ্গলামঙ্গল এবং এবিষয়ে জনমত নির্দ্ধারণের জন্ত বরোদার মহারাজা একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতি নিযুক্ত করার সময় মহারাজা বলিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্ত যে আইন করা হইয়াছিল সে আইন ২০ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল। এই আইনের ফলাফল কি হইল তাহা তদন্ত করিয়া দেখা আবশ্যক। নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে এই আইন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহ এখনো বিশেষ প্রচলিত আছে। যথাবিহিত বয়সে বিবাহের জন্ত আদালত হইতে অনুমতি লইবার যে-ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।

যে-সমস্ত অভিভাবক আইন ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র-কন্যাদিগকে অপরিণত বয়সে বিবাহ দেয়, তাহাদিগকে জরিমানা করার যে-ব্যবস্থা আছে তাহাতেও বিশেষ ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই জরিমানা বিশেষ কঠোর করিবার জন্ত মাঝে মাঝে ইস্তাহার প্রচার করিতে হইয়াছে।

মহারাজের ইচ্ছা যে-সমাজ এই হিতকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কতটা প্রস্তুত তাহা জানা আবশ্যক। কাজেই সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া তদন্ত করিতে হইবে।

মহারাজা অনুসন্ধান সমিতিকে একটি প্রশ্নমালা গঠন করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান সহরের বিভিন্ন জাতির নেতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে এবং দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলিয়াছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—

বিগত ৮ই পৌষ আব্‌দুল রসীদ নামক একজন মুসলমান আততায়ীর গুলিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, আততায়ী ধর্ম্ম আলোচনা করিবার কথা বলিয়া স্বামীজীর দর্শনাভিলাষী হয়। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত আততায়ী ৺স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অনুচর শ্রীযুক্ত ধরম সিংহকে খাইবার জল আনিতে অনুরোধ করে। ধরম সিংহ ঘর হইতে বাহির হইবা মাত্র সে রিভলভার বাহির করিয়া স্বামীজীকে তিনটি গুলি মারে। তিনি সে-সময় রুগ্ন-শয্যায় শায়িত ছিলেন। আততায়ী ধরা পড়িয়াছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। তাঁহার পিতা কাশীর পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন।
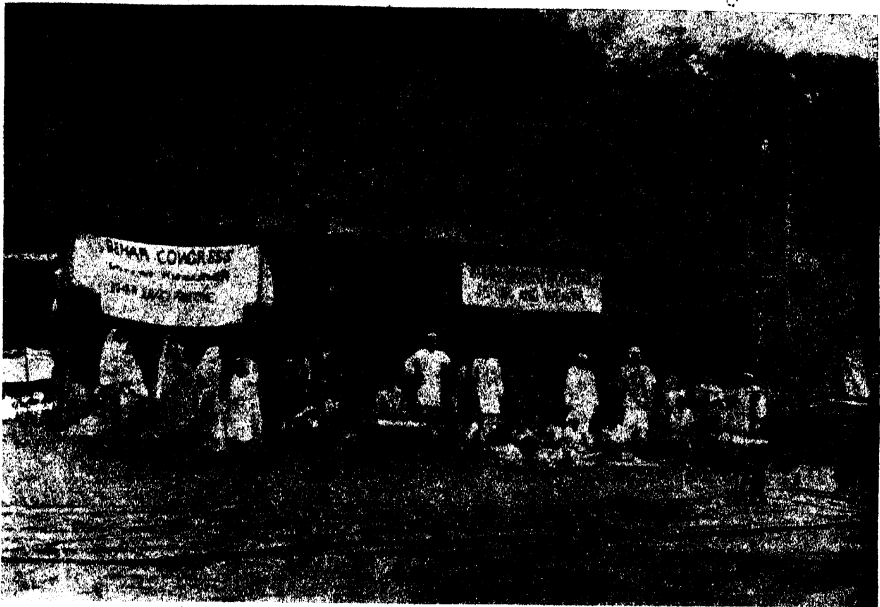
স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী গৃহের এক অংশ

স্বামীজী প্রথমে বাড়ীতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি উকিল হন এবং বহুকাল জলন্ধরে ওকালতি করেন। তিনি আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের বক্তৃতা শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তিনি আর্য্য সমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ খ্যাত হইয়া উঠেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আর্য্য প্রতিনিধি সভায় শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে এক প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাবে স্থির হয় যে, পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য প্রথায় বিদ্যার্থিগণকে শিক্ষাদানের জন্য একটি গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয় ভাবে দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করার কথাও এই প্রস্তাবে সঙ্কল্প করা হয়।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভিক খরচা ৩০০০০ টাকা অনুমান করা হয়। লালা মুন্সীরাম এই টাকা সংগ্রহের ভার লন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত তিনি ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিবেন সে পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে ফিরিবেন না। তিনি দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া ছয় মাসের মধ্যে উক্ত টাকা সংগ্রহ করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুরুকুলের উদ্বোধন হয়। গুরুকুল এই আত্মত্যাগী মহাপুরুষের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়া ইহা গড়িয়া তুলিয়াছেন। আগামী মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসোৎসব সম্পন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে।

তিনি রাজনীতিতে বড় বেশী মাথা ঘামাইতেন না। কিন্তু রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর প্রতিবাদ হয় তখন তিনি সেই প্রতিবাদে যোগ দেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ কল্পে ইনি দিল্লীতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

স্বদেশী মেলায় আসামী মহিলাগণ চর্‌খা কাটিতেছেন

দিল্লীতে জনসাধারণ যখন ঘোর প্রতিবাদ করিতেছিল সেই সময় পুলিশের সহিত তাহাদের দাঙ্গা হয়। সেই সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ [illegible] পুলিশের বন্দুকের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। [illegible] হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মহাত্মার সহিত অসহযোগ আন্দোলনে [illegible] ব্রতী হন। সে সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। সামরিক আইনের ফলে তাঁহারা [illegible]
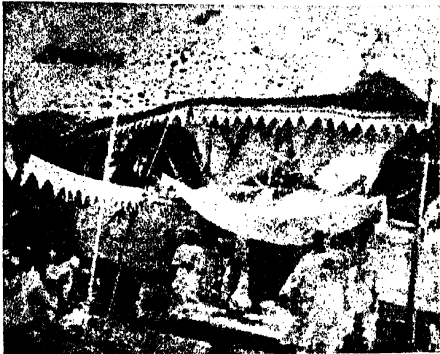
মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করিতেছেন

তাহাদিগকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় অমৃত-সহর কংগ্রেস সফল হয়। পাঞ্জাবে গুরুকাবাগ সংক্রান্ত হাঙ্গামায় তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি এই মামলায় আদালতে যে নির্ভীক উক্তি করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ স্মরণীয়। যখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, হিন্দুজাতি যতদিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত যথোচিত ভাবে সংঘবদ্ধ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলন অসম্ভব তখন তিনি হিন্দু সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আসগরী বেগম নাম্নী জনৈক মুসলমান মহিলা আসিয়া স্বামীজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মহিলা শান্তিদেবী বলিয়া পরিচিতা। শান্তিদেবীর ধর্ম্মান্তর সম্পর্কে স্বামীজীর বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। মামলায় স্বামীজী বে-কসুর খালাস পান।

তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে অসবর্ণ বিবাহ দেন। তিনি জলন্ধরে বালিকাদের জন্য মহাবিদ্যালয় নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

স্বামীজীর দুই পুত্র এক কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র—তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সেক্রেটারী। বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন জানা যায় নাই। দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক অর্জ্জুন পত্রিকার সম্পাদক। কন্যাটি জীবিত নাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের দেহত্যাগের ফলে শুদ্ধি আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মালবীর প্রভৃতি নেতাগণ হিন্দুদিগকে ৺স্বামীজীর আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শুদ্ধি-সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বিবরণে প্রকাশ—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আত্মোৎসর্গ মালকানাদিগের হৃদয়ে যে তেজ ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে শুদ্ধি আন্দোলনের গতিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। সাদন গ্রামে ইসলামি তবলীগের বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। কিন্তু এই স্থানই সর্ব্বপ্রথম শুদ্ধি-আন্দোলনের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে নববর্ষের সুখস্মৃতির জন্য ৫২০ জন মালকানাকে দীক্ষিত করা হইয়াছে। শুদ্ধির কার্য্য বিপুল ভাবে চলিতেছে। প্রত্যেক দিনই মালকানাগণ স্বেচ্ছায় শুদ্ধি-গ্রহণের জন্য আগমন করিতেছে। আশা করা যায় যে,—সহস্রাধিক লোক দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই জন্য অর্থ ও লোকবল বিশেষভাবে প্রয়োজন। স্বামীজি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা উত্তোলিত রাখিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "ভারতী হিন্দু শুদ্ধি-সভা, দিল্লী" এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন।

—

বাংলা

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ—

গত মাসে শ্রীযুক্ত এ, কে মুখার্জ্জি, এ, বি, মুখার্জ্জি, এন, এন, ঘোষ, এবং বি, মুখার্জ্জি, সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাউন হলে একটি জনসভা হয়। পথিমধ্যে তাহারা চন্দননগরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হন।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, তাঁহারা বেনারস, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন।

দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় জাগ্রত যৌবনের দুঃসাধ্য উদ্যম জাতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। বাঙ্গালী যুবকগণের এই মহৎ সঙ্কল্প দেখিয়া আমরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁহাদিগকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতেছি। বিঘ্নবহুল দুর্গম পথের যাত্রী বাঙ্গালী যুবকেরা বিপুল আয়াসে নদনদী পর্ব্বত সাগর, কান্তার অতিক্রম করিবার কঠিন আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম, ইহার গৌরব আমরা যেন ছোট করিয়া না দেখি।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ প্রায় ১৪০ দিবস হইতে চলিল। প্রতিদিনই স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বেচ্ছায় কারা-বরণ করিতেছেন।

পটুয়াখালির স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে-সকল যুবক এখনও কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, আশা করি তাঁহাদের আন্দোলন সার্থক হইবে।

যতদিন শেষ মীমাংসা না হইতেছে, ততদিন এ-আন্দোলন চালাইবার জন্য যথেষ্ট জনবল ও অর্থবল প্রয়োজন। সুতরাং যিনি যেরূপ পারেন, অচিরে পটুয়াখালিতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সাহায্য করিয়া এ আন্দোলনের সমর্থন করিবেন।

বাংলায় বিধবা বিবাহ—

মৈমনসিংহ

মৈমনসিংহের বড় বাশালিয়া নিবাসী ৺দীননাথ সূত্রধরের পুত্র শ্রীমান মাখনলাল সূত্রধরের নিকলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিমোহন সূত্রধরের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সরলাবালার শুভ বিবাহ নিকলা গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে কাগমারী, বড় বাজু, এবং পুকুরিয়া সমাজের ৩৬ জন মাতব্বর প্রধান উপস্থিত থাকিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের অধীন পাটধা গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ নমঃদাসের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনাময়ী নমদাসার সহিত ঐ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত করিমগঞ্জ থানার অধীন গ্রাম নন্দীপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় রামগোবিন্দ নমঃদাসের পুত্র শ্রীমান রাজকিশোর নমঃদাসের সহিত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শুভ-বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিধবা-বিবাহ বাসরে সন্নিকটস্থ ৪।৫টি গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পাত্রের সমাজিক এবং অন্যান্য স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধব প্রায় শতাধিক

ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত থাকিয়া অতি সমারোহে এই শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

নদীয়া

নদীয়া জেলার বারখাদা গ্রামে ১১ বৎসর বয়স্কা একটি বিধবা বালিকার সহিত অন্য একটি যুবকের যথাবিহিত শাস্ত্রানুসারে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুঠিয়ার মুন্সেফ বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভদ্র-মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া সভাক্ষেত্র অলঙ্কৃত করেন এবং জগ-অনাচরণীয়তার বাঁধন ভাঙ্গিয়া বিবাহের উপযোগীতা বুঝাইয়া দেন।

নদীয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত সোনদহ সাকিনের সহদেব হালদারের ১২ বৎসর বয়স্কা বালবিধবা কন্যার সহিত ইনাইতপুর সাকিনের ৩৫ বৎসর বয়স্ক খোকন হালদারের গত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু হিন্দু উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পাবনা

পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন দুইটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। মোল নিবাসী শ্রীবিপিনচন্দ্র হালদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কিশোরীবালা দাসীর সহিত রায় দৌলতপুর নিবাসী শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র হালদার মহাশয়ের শুভ-বিবাহ রায় দৌলতপুর মোকামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেক ভদ্রসন্তান সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

চৌবাড়ী নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র হালদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দাসীর সহিত টেংরাইল নিবাসী শশীভূষণ দাস মহাশয়ের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মালো সমাজ বিধবা-বিবাহের অনুমতি দান করিয়াছে।

মেদিনীপুর

সম্প্রতি মেদিনীপুর "বেলীহলে" মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ সমিতির উদ্যোগে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় বহু গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের ছাত্রগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। লাহোরের স্যার গঙ্গারামের প্রতিষ্ঠিত বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভার অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ বিদ্যালঙ্কার ইংরেজী ভাষায় বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত কামিনীজীবন ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা করেন।

চট্টগ্রাম

গত ২৯শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সহরের বার মাইল উত্তরে অবস্থিত এক পল্লীগ্রামের হিন্দু সভার উদ্যোগে পরাশর সংহিতায় অনুমোদিত হিন্দু বিধবা বালিকার পুনরায় বিবাহ প্রচলন জন্য এক সভা আহূত হয়। উক্ত সভার উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরলোকগত রেজিয়া খাতুন---

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মুসলমান লেখিকা রেজিয়া খাতুনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর হইয়াছিল। মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুনের নাম হিন্দু মুসলমান অনেকেই জানেন। তিনি মোসলেম সমাজের শত বাধা-বিঘ্ন ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করিয়া ১৯২৫ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট মোসলেম ফিমেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনে "টিচারশিপ পড়িতে আসেন। ইনি সাহিত্য, উন্নত সূচীকার্য্য, এমব্রয়ডারী, ক্রচেট-ওয়ার্ক, চিত্রাঙ্কণ, ড্রইং ইত্যাদিতে পারদর্শিতার জন্য বহু পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রেজিয়া খাতুনের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পূর্ব্বেই অবসর মত স্কুল লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত ভাল বই ও পত্রিকা পড়িয়াছিলেন। পরে ইহার প্রবন্ধ ও কবিতা বঙ্গলক্ষ্মী, মাতৃমন্দির, সওগাত, ইসলাম দর্শন, মোসলেম দর্শন ও শারিয়ত প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার লেখার ভিতর দিয়া গাঢ় ধর্ম্ম ও সমাজ প্রীতি সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিত। ইনি স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেও ধর্ম্মান্ধতা বা কোনরূপ কুসংস্কারের অধীনা ছিলেন না।

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহু জনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক-কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৫৮)

পত্রিকা-পরিচালনা

বঙ্গভাষায় পত্রিকা-পরিচালনা (Journalism) সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কি না? থাকিলে উহাদের নাম কি, গ্রন্থকার কে, মূল্য কত এবং প্রাপ্তিস্থান কোথায়? ইংরেজী ভাষায়ই বা কি কি পুস্তক আছে? মূল্য কত ও কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী

(৫৯)

ছেলেদের মনস্তত্ত্ব শিক্ষা

১। ছেলেদের (৫ বৎসরের কম বয়সের) মনস্তত্ত্ব শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন বই আছে কি না? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়, কাহার প্রণীত, দাম কত?

ন

(৬০)

রামনগরের দুর্গ

কাশীর গঙ্গার ওপারে যে রামনগরের দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায় উহা কোন্ সালে কে গঠন করিয়াছিলেন? রামনগর নাম কোনো রাজার নামানুসারে হইয়াছিল কি?

শ্রীশোভারাণী রায়

(৬১)

বেহালার তাঁত

বেহালার তাঁত ভারতবর্ষে কোথাও প্রস্তুত হয় কি না? প্রস্তুত করিতে যে-সকল কলকব্জার প্রয়োজন তাহা কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার দাম কত? ভারতবর্ষে সেগুলি প্রস্তুতের সুবিধা আছে কি না?

শ্রীকালীপদ কুণ্ডু

(৬২)

'দাশ' শব্দ

বৈদ্য জাতির অনেকে "দাশ" এই পদবী ব্যবহার করেন। "শ" দিয়া 'দাশ' লিখিলে বৈদ্য জাতিকে বুঝায় এমন কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? পুরুষোত্তম দাস তালব্যাদি কোষে লিখিয়াছেন:—
'শালো ঝ যে ধীবরএব দাশ' ইত্যাদি।

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে—'দাশং নৌ কর্ম্মজীবনং"। মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৭৬ শ্লোকে 'তং দাশঃ প্রতিজগ্রাহ' ইত্যাদি উল্লিখিত সব শ্লোকে "দাশ" শব্দ দ্বারা নৌজীবী, কৈবর্ত্তকে বুঝাইতেছে। কিন্তু বৈদ্যজাতি বুঝাইতে দাশ শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে কোথায় আছে?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ

(৬৩)

হিন্দুর ফল আহার পরিহার

কান কোন তীর্থে হিন্দুগণ তাহাদের একটি প্রিয় ফল ত্যাগ করিয়া আসে এবং জীবনে তাহা আর গ্রহণ করে না ইহা কি শুধু ত্যাগেরই নিদর্শন? ইহার শাস্ত্রীয় কারণ কি?

শ্রীশিবপ্রসাদ চৌধুরী

—

মীমাংসা

(৩৯)

কালির দাগ

যে-স্থানে কাগজের উপর কালির দাগ বা লেখা আছে, সে-স্থানে Petroleum Ether দ্বারা ঘষিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। Petroleum Ether খুব সহজেই উড়িয়া যায়। উহা কালি শোষণ করিতে পারে। কাগজের উপর কালি দিয়া লিখিয়া পরে Etherএ ডুবাইয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ইহাতে কাগজ নষ্ট হয় না। পূর্ব্বের মতই থাকে।

শ্রী বীরেশলোভন সেন

(৫০)

ঝিনুকের অলঙ্কার তৈয়ার শিক্ষা

ঝিনুকের অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার কল নিম্নের ঠিকানায় পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে কোম্পানী দাম ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় জানাইয়া থাকে।—(১) ওরিয়েণ্ট্যাল মেশিনারী সাপ্লাই এজেন্সী ২০।১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (২) ইণ্ডোসুইস ট্রেডিং কোং, ২৭নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকতা।

শ্রীমতী বীণাপাণি দত্ত

(৫২)

আগুনের শিখা

অগ্রহায়ণ মাসের বেতালের বৈঠকে আমার 'জিজ্ঞাসা'র "মীমাংসা" যাহা পৌষ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অবনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ লিখিয়াছেন, তাহা ভুল বিবেচনায় প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বক্তব্য এই,—

(১) অগ্নির পরমাণু আছে ইহা ভুল। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে ইহা undulatory

(২) লেখকদ্বয়ের মতে যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, অগ্নির পরমাণু আছে, তথাপি কেবল অগ্নির নহে, প্রাচ্য মতে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের পরমাণুই অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং শিখা ব্যতীত আলোকরশ্মি এবং গ্যাসের Jetএ এই ত্রিভুজাকৃতি দেখা যাইত, কিন্তু তাহা হয় না।

(৩) সূক্ষ্মাগ্র চিম্‌নী অর্থে তাঁহারা কি বুঝিয়াছেন ঠিক বুঝা গেল না। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা সঙ্কোচন প্রমাণ হয় না। কারণ চিম্‌নী দ্বারা সঙ্কুচিত হইলে অথবা কোন দ্রব্যের চাপে সঙ্কুচিত হইলে অগ্নির conduction অসম্ভব হইত। পুনশ্চ তাহা যে পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, কিন্তু দাহ্যমান Gasএর সহিত হয় না। ইহা সূক্ষ্মাগ্র চিম্‌নী দ্বারা মোটেই প্রমাণ হয় না। কারণ টেবিলে বই রাখিলে, টেবিলেই থাকে। তাহার পরমাণুতে থাকে না।

(৪) পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের চাপ অগ্নিশিখার ত্রিভুজাকৃতির প্রতি কারণ নহে। যেহেতু বায়ুর চাপ শিখাতে পায় না, কারণ এই শিখার নিকটস্থ বায়ু heated ও expanded হইয়া উপরে যায়। বায়ুর চাপ যদি কারণ হইত, তবে variable temperature এবং Atmospheric pressureএ ত্রিভুজাকৃতি vary করিত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। অথবা,

(৫) বায়ুর চাপ ও শিখার বেগ-এর দ্বন্দ্ব ত্রিভুজাকৃতির কারণ নহে, কেননা, তাহা হইলে বায়ুর নিম্নমুখে চাপ দ্বারা শিখার গোলাকৃতি হইত, যেহেতু বায়ুর চাপ সর্ব্বদিকে সমান।

(৬) বায়ুর চাপ কারণ নহে যেহেতু দিয়াশলাইএর কাঠি হেলাইলে শিখা হেলিয়া যায়।

(৭) অগ্নিশিখা হইতে অনবরত জোড়ে radiation হইতে থাকে, কাজেই বায়ু কাছে আসিয়া mechanically চাপ দিতে পারে না। কিন্তু chemically আসে, অর্থাৎ বায়ুস্থিত Oxygenএ শিখাস্থ Gasএর combustion হয়। সুতরাং চাপ দেয় না।

শ্রী ধর্ম্মরঞ্জন গুহ

(৫৫)

দেব্যা

আমাদের দেশে পত্রাদি লিখিতে প্রাচীনেরা আরম্ভে "নিবেদনং, "বিজ্ঞপ্তিঃ" প্রভৃতি শব্দ লিখিয়া পরে ষষ্ঠ্যন্ত পদযুক্ত নাম ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রে এবং অনেক সংস্কৃতজ্ঞের প্রাচীন ধারায় লিখিত পত্রাদিতে এখনও ঐরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে।

সংসারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ অভিভাবক বা মালিক না থাকিলে মহিলা কর্ত্রীই ঐরূপ পত্রাদি লিখিতেন। সুতরাং সধবা স্ত্রীলোকের কোন পত্রাদি লিখিতে হইত না,—বিধবারাই লিখিতেন। কাজেই ঐ প্রণালীতে তাঁহাদের নামের শেষে "দেব্যাঃ" বা "দাস্যাঃ" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদ ব্যবহৃত হইত। ঐরূপ ব্যবহার হইতে হইতে কালে ঐ 'দেব্যাঃ' শব্দ বিধবার নামের অঙ্গ বলিয়াই গৃহীত হইয়া গিয়াছে। এবং দলিল দস্তাবেজেও ঐরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সধবার ঐরূপ করিতে হইত না বলিয়া এক্ষণে সধবারা পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেও বিধবার সহিত পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য দেবী "দাসী" প্রভৃতিই লিখিয়া থাকেন।

দলিলাদিতে 'দেব্যা' শব্দকে তৃতীয়ান্ত বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে পঞ্চম্যন্ত 'দেব্যাঃ' শব্দও ব্যবহৃত হইত। 'চলিত' ইত্যাদি পদ যথায় ব্যবহৃত হইত তথায় পঞ্চম্যন্ত 'দেব্যাঃ' শব্দের ব্যবহার ছিল।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সম্পাদকের চিঠি

(৪)

প্যারিসে কয়েক দিন থাকিয়া এক দিন সকাল বেলা ট্রেনে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইলাম। আগে থেকেই ট্রেনে বসিবার জায়গা রিজার্ভ করা ছিল বলিয়া ট্রেনে খুব ভীড় থাকা সত্ত্বেও জায়গা পাইতে কষ্ট হইল না। প্যারিস হইতে ট্রেনে ক্যালে পর্য্যন্ত যাইতে হয়। সেখান হইতে ষ্টীমারে ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া আবার ডোভারে ট্রেনে উঠিতে হয়। ডোভার হইতে লণ্ডন রেলপথে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা।

প্যারিসে আমি রেলের যে কক্ষে উঠিলাম, তাহাতে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের দুটি ছেলে লইয়া যাইতেছিলেন। তাঁরা যে আমেরিকান তা ট্রেন ছাড়িবার পর জানিতে পারি। ভদ্রলোকটি নিজেই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় কি না। আমি বলিলাম, হাঁ। তখন, মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন ও এখন কি করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রশ্ন করিলেন। ছেলে দুটি কিয়ৎক্ষণ তাহাদের মায়ের সঙ্গে নানা রকম খেলা করিল। তাহার পর তাহারা ক্রমাগত হুড়াহুড়ি মারামারি করিতে লাগিল। তাহাদের বাবা তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করায় বড়টি তাঁহার সঙ্গেই ধস্তাধস্তি জুড়িয়া দিল। তখন তাহার মা তাহাকে বহু কষ্টে নিরস্ত করিলেন। তাহার পর যখন মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় আসিল, তখন তাঁহারা ভোজনের গাড়ীতে গেলেন। যাইবার আগে মহিলাটি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, এখন আপনি কিছুক্ষণ শান্তিতে থাকিবেন। আমি বলিলাম, ছেলেরা গোলমাল হুড়াহুড়ি করিলে আমার কোন অশান্তি হয় না।

আমি ইউরোপ ভ্রমণকালে লক্ষ্য করিয়াছি, বিনা প্রয়োজনে, কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়া বা সৌজন্যের খাতিরে কোন ইংরেজ আমার সঙ্গে আগে কথা বলেন নাই; কেহ পরিচয় করাইয়া দিলে অবশ্য বলিয়াছেন। ইংরেজরা যে সৌজন্যে অন্য ইউরোপীয় জাতিদের চেয়ে হীন, তাহা বলা আমার অভিপ্রেত নয়। সে বিষয়ে পরে কিছু বলিব। অপরিচিত লোকদের মধ্যে, একজন আমেরিকান পুরুষ, দুইজন আমেরিকান মহিলা, একজন অষ্ট্রেলিয়ান পুরুষ, একজন জাপানী, একটি জার্ম্মান্ স্ত্রীলোক, একজন ফরাসী, একজন চীন, একজন ফরাসী ঔপনিবেশিক আমার সহিত আগেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। জাপানী লোকটি ও জার্ম্মান্ স্ত্রীলোকটি আমাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করিয়া কথা কহিয়াছিলেন। আমার পোষাক ইউরোপীয় না হওয়ায় এবং দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু থাকায় তাঁহাদের এই ভ্রম হইয়া থাকিবে। বিনা পরিচয়ে যে দুইজন ইংরেজ আমার সঙ্গে আগে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন জেনীভায় আমার সঙ্গে একই হোটেলে আহার করিতেন। তিনি একটা বিলাতী কাগজের কারখানার প্রতিনিধি; জেনীভায় অনেক শত সংবাদ-পত্রের লোক লীগ অব্ নেশ্যান্সের বৈঠকের সময় আসে বলিয়া, বোধ হয় তিনি নিজেদের কাগজের ক্রেতা বাড়াইবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমারও পরিচয় লইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কাহাদের কাগজ ব্যবহার করি। পরে নিজেদের কাগজের প্রশংসা করিয়া নমুনা ও দর পাঠাইবার জন্য আমার কলিকাতার ঠিকানা লইলেন। অল্পদিন হইল নমুনা ও দর আমার আফিসে আসিয়াছে। ব্যবসা বাড়াইতে হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথাযোগ্য স্থানে লোক পাঠাইয়া এইরূপ চেষ্টা করিতে হয়। অন্য যে ইংরেজ বিনা পরিচয়ে আমার সহিত জেনীভার হোটেলে আলাপ করেন, তিনি বলেন, যে, তিনি কলিকাতা প্রবাসী এবং আমার এক পুত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে, এবং তিনি জানিতে আসিয়াছেন, যে,

লীগ-অব্-নেশ্যান্সের জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত চা খাইবার কথন্ আমার সুবিধা হইবে।

আমি আগেকার একটি চিঠিতে যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে, প্যারিসে আমি যে হোটেলে প্রথমে নীত হইয়া অন্যত্র যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেখানে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বসিয়া থাকিতে দেখি। তিনি আমাকে বিদেশী দেখিয়া তাঁহার নিকটই একটি চেয়ারে গিয়া বসিতে অনুরোধ করেন। তাহার পর বলেন, 'আমিও আপনার মত বিদেশী।' তিনি অষ্ট্রেলিয়ার একজন পাদরী; স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমেরিকা গিয়া সেখানে এক গির্জ্জার পাদরী হন। তাঁহার পুত্রকন্যারা বড় ও শিক্ষিত হইয়া ইংলণ্ডে বসবাস করিতেছে বলিয়া তিনিও সেখানেই যাইতেছেন। তিনি আমার সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী (message) সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ আলাপ করেন এবং তাঁহার প্রশংসা করেন। তিনি বলিলেন, হিন্দুরা জীবনের শাশ্বত ও গভীর জিনিষ লইয়া অধিকতর ব্যাপৃত, পাশ্চাত্যেরা পার্থিব সুবিধা যাহাতে হয় তাহা লইয়াই অধিক ব্যাপৃত। আমি বলিলাম, এই উক্তির মধ্যে অবশ্য সত্য আছে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও সাংসারিক লোক, তুচ্ছ বিষয়ে সদাব্যাপৃত লোক, বিস্তর আছে, এবং পাশ্চাত্যদের মধ্যেও শাশ্বত ও সাত্ত্বিক বিষয়ে অধিক মনোযোগী লোকের অভাব নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতি সকলের মধ্যে প্রভেদ যে গভীরতম বিষয় নহে এবং তাহা যে অনতিক্রম্যও নহে, তদ্বিষয়ে আমাদের মত এক দেখিলাম।

ক্যালেতে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিলাম। ইউরোপ ভ্রমণের সময় সর্ব্বত্র দেখিয়াছি, মুটিয়া মজুররাও পঠনক্ষম হওয়ায় পর্য্যটকদের খুব সুবিধা হয়। তাহারা রেলে জাহাজে চুঙ্গী আফিসে যথাস্থানে তাঁহাদের জিনিষপত্র রাখিয়া দেয় এবং মুদ্রিত চিরকুটে নম্বর দেখিয়া রিজার্ভ করা বসিবার বা শুইবার জায়গায় লইয়া যায়।

ভারত মহাসাগরের অশান্ত অবস্থাতেও আমার সামুদ্রিক পীড়া হয় নাই বটে, কিন্তু আমাকে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আপনি ইংলিশ প্রণালী পার হইবার সময় টের পাইবেন। তাহা কিছু অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষে কোটি কোটি ভারতীয় অপেক্ষা অল্পসংখ্যক ইংলণ্ডীয় লোক অধিকতর ভয়ানক; সুতরাং হাজার হাজার মাইল লম্বা-চৌড়া ভারত মহাসাগর অপেক্ষা বাইশ মাইল চৌড়া ইংলণ্ডীয় প্রণালী ভীষণতর হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইংলণ্ড যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার সময় প্রণালীটিকে বেশ ঠাণ্ডা পোষমানা গোছই দেখিলাম। কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলাকে ভয়াকুল দেখিয়াছিলাম বটে। সম্ভবতঃ বাস্তবিক তাঁহাদের কোন পীড়া হয় নাই; কল্পনা তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতেছিল।

জাহাজে প্রায় এক ঘণ্টা থাকিবার পর ডোভারের শ্বেতাভ চা-খড়ির উচ্চ উপকূল অস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। সমুদ্রতটের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, উপকূল ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ঘণ্টা দেড় জাহাজে থাকিয়া ডাঙায় নামিলাম, এবং চুঙ্গী আফিসের পরীক্ষার পর ট্রেনে উঠিলাম।

ডোভার হইতে রেলে লণ্ডন যাইবার সময় ইংলণ্ডের কিয়দংশ অতিক্রম করিতে হইল। ইংলণ্ড দেশটা কিরূপ তখন আমার কতকটা ধারণা হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছেন, "বিলাত দেশটা মাটীর।" তাঁহার একথা বলিবার অভিপ্রায় সহজেই বুঝা যায়। ইংরেজরা যে আমাদের চেয়ে ধনী, শক্তিশালী ও শিক্ষিত, তাহার কারণ এ নয় যে, ইংলণ্ড মাটী ছাড়া আর কিছু দিয়া গড়া। তারা ধনী, তাদের দেশ সোনারূপায় নির্ম্মিত বলিয়া নহে; অন্য কারণে তারা ধনী। তারা শক্তিশালী ও শিক্ষিত এ কারণে নয়, যে, তাদের দেশের রাসায়নিক উপাদান একেবারে স্বতন্ত্র; কারণ অন্যবিধ। কবি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, আমরাও ধনী, শক্তিশালী ও শিক্ষিত হইতে পারি, যদি আমরা চেষ্টা করি ও যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করি; বিলাতের ভূমি ও আমাদের ভূমির এমন কোন পার্থক্য নাই যাহাতে আমাদের দরিদ্র দুর্ব্বল ও অশিক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী।

ইটালী, সুইজার্ল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়াছিলাম, আমাদের দেশের মত তথাকার ঘাসের রং সবুজ, গাছের পাতা সবুজ, তাহাতে নানা

রঙের ফুল, এবং নদী ও হ্রদে আমাদেরই দেশের মত জল; মরকতের ঘাস, মরকতের পাতা, পান্নাহীরামণি-মুক্তার ফুল, হ্রদে নদীতে জলরূপী তরল সোনারূপা ইউরোপের কোথাও দেখিতে পাই নাই। যখন জল খাইতাম, দেখিতাম আমাদেরই দেশের জলের মত; অমৃত নহে। ইউরোপে যে-সব খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাদের রাসায়নিক উপাদান আমাদের দেশের সেইরূপ সব খাদ্যেরই মত। ইংলণ্ডের সঙ্গেই আমাদের বেশী সম্পর্ক। ইংরেজরা দুনিয়ার সেরা জাত, আমাদের মনে আশৈশব এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেইজন্য ইংলণ্ডে আসিয়াও যখন দেখিলাম, ঘাস গাছপালা ফুলজল খাদ্যদ্রব্য ইউরোপের মত ও আমাদের দেশেরই মত, তখন তাহা ছাপার আখরে লিখিলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবেন! কিন্তু হায়! আমরা যতই আশ্চর্য্য হই, পাশ্চাত্যেরা পাশ্চাত্য, এবং আমরা আমরা! যাহা হউক, সে-দুঃখে অভিভূত না থাকিয়া আমার চিঠিটা লিখিয়া যাই।

ডোভার হইতে লণ্ডন যাইতে যাইতে প্রথমেই নজরে পড়িল, যে, ভূমির চেহারা তরঙ্গসদৃশ ক্রমোচ্চনিম্ন। লণ্ডন হইতে আমি যখন কেম্ব্রিজ যাই, অক্সফোর্ড যাই, বকিংহাম্‌শায়রের গ্রেট্ মিসেণ্ডেন্ গ্রামে যাই, তখনও ইংলণ্ডের জমীর এই বন্ধুর দৃশ্য চোখে পড়ে। ইহাতে ঐ দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও উহা অনুকূল। ইংলণ্ডে বড় বড় মিলে ও অন্যবিধ কার্‌খানায় নানা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং লোকদের খাদ্যের অনেক অংশ দেশে উৎপন্ন না হইয়া বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কার্‌খানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের লাভও চাষের লাভ অপেক্ষা বেশী। এইসকল কারণে, যে-সব ভারতীয় বা অন্য বিদেশী লোক ইংলণ্ড যান, তাঁহাদের স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, যে, ইংলণ্ডে বিস্তর পতিত অবহেলিত জমী পড়িয়া আছে। কিন্তু আমি বাস্তবিক যাহা দেখিলাম, তাহা ইহার উল্টা। ইংলণ্ডে অবশ্য প্রমোদ-উদ্যান, পশুচারণাদির জন্য সাধারণ জমী, খেলার মাঠ, ইত্যাদি আছে। অনেক জমীতে গৃহপালিত পশুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু একেবারে অবহেলিত পতিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমার চোখে পড়ে নাই। সাধারণতঃ সব জমীই হয় কর্ষিত হয়, নয় অন্য কোন প্রকারে কাজে লাগান হয় বলিয়া মনে হইল। ডোভার হইতে লণ্ডন যাইতে যাইতে বাংলাদেশের খড়ের ছাওয়া ঘরের মত ঘর দুই চারিটি আমার চোখে পড়িয়াছিল। মাতৃভূমির গৃহের সহিত সাদৃশ্য হেতু সেগুলি দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছিলাম। সেগুলি বোধ হয় কৃষকদের খামারের অঙ্গীভূত। ইটালীতে ভেনিসে যেমন আমাদের দেশের মত সাধারণ খোলার চাল বা ছাদ দেখিয়াছিলাম, ধনশালী দেশ বিলাতে সেরূপ কোথাও দেখি নাই। স্লেটের ঢালু ছাদ অনেক দেখিয়াছি।

যখন লণ্ডন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া শুনিলাম, সেখানে পণ্যশুল্ক আদায়ের আফিসে (Customs Office) পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিবে। সেইজন্য তখন আমার সঙ্গের ছোট ব্যাগ দুটি লইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতেই আমাকে সকলে পরামর্শ দিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার দে জাহাজে এবং ভেনিস্ হইতে আসিবার রেলপথে আমার উপকার করিয়াছিলেন। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে আমার চাবীগুলি লইয়া পণ্যশুল্ক আফিসে দরকার মত আমার বাক্স-প্যাটরা খুলিয়া দেখাইয়া লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমার সঙ্গে শুল্ক দিবার মত কোন জিনিষই ছিল না। কিন্তু কর্ম্মচারীদের কৃপা কখন্ কাহার উপর কি কারণে হয় বলা যায় না। শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমারের নিকট পরে অবগত হই, যে, আমার সব প্যাটরা আদিই খুলিয়া দেখাইতে হইয়াছিল। কলিকাতা ফিরিবার পথে ভারতবর্ষের ধনুষ্কোটি নামক সর্ব্ব দক্ষিণ ও প্রথম বন্দরে ভিন্ন এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ 'খানাতল্লাস' আর কোথাও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ছোট একটা কাগজের বাক্সে আমার নিজের ব্যবহারের জন্য কতকগুলা ঔষধ ছিল। সেইগুলা খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইয়াছিল।

পিল্‌সা জাহাজে আমরা কয়েকদিন চলনসই রকমের ভাত ও নিরামিষ তরকারী পাইয়াছিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর দেশী রকমের ডাল-ভাত প্রথম পাইলাম লণ্ডনের ওয়াই এম্ সী এর (Y. M. C. A.) ভারতীয় ছাত্রনিবাসের ভোজনশালায়। লণ্ডনের পর আর কোথাও ডাল-ভাত একসঙ্গে পাই নাই। অনেক ভারতীয় বিলাতে আসিয়া প্রথম প্রথম ইউরোপীয় প্রণালীতে পাক করা ইউরোপীয় খাদ্য রুচিপূর্ব্বক খাইতে পারেন না। এই হেতু এই ছাত্রনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ছাত্র ও অন্য লোকদের নিমিত্ত ভারতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। অবশ্য এখানে ইউরোপীয় ধরণের খাদ্য এবং গোমাংস শূকরমাংস প্রভৃতিও যে-কেহ চান, তিনি পাইতে পারেন। অনেক হিন্দু-মুসলমান ছাত্র তাহা খাইয়াও থাকে। যাহা হউক, আমি নিরামিষভোজী বলিয়া এখানে আমার ভোজনের কতকটা সুবিধা হইয়াছিল। আমি আশা করিয়াছিলাম এবং দেখিলামও, যে, এখানে কাহাকেও কোন প্রকার মদ দেওয়া হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে বিস্তর ছাত্রকে ধূমপানাসক্ত দেখিলাম,—যাঁহারা ধূমপান করেন না,তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ধূমপান করেন, তাঁহারা, আমি বৃদ্ধ বলিয়া, আমার সম্মুখে তাহা করিতেন না। কিন্তু ধূমপানাভ্যস্ত অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয় ছাত্রদের আমার সম্মুখে সিগারেট খাইবার 'সৎসাহস' আছে দেখিলাম! অথবা হয় ত তাঁহারা জানিতেন না, যে, তাঁহাদের সমীপস্থ বৃদ্ধ লোকটি তাঁহাদেরই স্বদেশবাসী। কিম্বা, হয় ত, ভারতবর্ষে (অন্ততঃ বাংলাদেশে) বালক ও যুবকদের পরিচিত বৃদ্ধ লোকদের সম্মুখে ধূমপান না করিবার যে-রীতি প্রচলিত আছে, তাঁহারা সেই 'কুসংস্কারে'র অতীত হইয়া থাকিবেন। আমি তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। যতদূর জানি, ধূমপানবিষয়ে আমাদের দেশের উল্লিখিত শিষ্টাচার ইউরোপে প্রচলিত নাই। বরং আমি একাধিক ব্যক্তির নিকট ইহাই শুনিয়াছি, যে, বিলাতের কোন কোন অধ্যাপক তাঁহাদের ছাত্রদিগকে ধূমপানে (এবং অবশ্য তাঁহাদের সম্মুখেই ধূমপানে) প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করেন; অধ্যাপকের ও ছাত্রের ধূমপান একত্র চলিতে থাকে। বিলাতে কোন কোন ভারতীয় ছাত্রের মদ্যপান আরম্ভও এই প্রকারে ও কারণে হয়। উক্ত ইংরেজ অধ্যাপকেরা ধূমপান অনিষ্টকর বা দোষাবহ মনে করেন না; আমি করি এবং সেইজন্য ভারতীয় শিষ্টাচার পছন্দ করি।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটা কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ও ইউরোপের যেখানে যেখানে আমি গিয়াছি, দেখিয়াছি রেলওয়ে ট্রেনে ধূমপায়ীদের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ব্যবস্থা ভাল। ভারতেও ইহার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। যাঁহারা ধূমপান করেন না, তামাকের ধূম তাঁহাদের পক্ষে বিরক্তিকর। উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা জল নিজের মুখ হইতে অন্য কাহারও গায়ে বা মুখে নিক্ষেপ করাটা যেমন ভদ্রতা নহে, মুখনিঃসৃত ধূমও অন্যকে নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে বা তদ্দ্বারা গাত্রবস্ত্রাদি বাসিত করিতে বাধ্য করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, মুখনিঃসৃত ধূমের সহিত মুখস্থিত ক্ষয়কাশাদির রোগবীজও যে বিকীর্ণ হয় না, এরূপ অভয়বাণী ডাক্তারদের মুখে কখনও শুনি নাই।

লণ্ডনে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রনিবাস ছাড়া বীরস্বামী নামক একজন ভারতীয়ের ভোজনের দোকানেও ডাল ভাত নিরামিষ তরকারী মিঠাই প্রভৃতি খাইয়াছিলাম। এখানকার রান্না মন্দ নয়। আমিষ দ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। ভারত-ফেরত ও অন্য বিস্তর ইংরেজ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এখানে আহার করে। এখানকার সব পরিচারক পরিবেষক ভারতীয়। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদারের লণ্ডনে তিনটি হোটেল আছে। একটির নাম রেজিনা হোটেল। এখানে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, প্রভৃতির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। জেনীভায় আমি অবগত হই, যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার আরও একটি হোটেল কিনিয়াছেন। ভারতীয় খাদ্য জোগান তাঁহার হোটেলগুলির বিশেষত্ব নহে। শুনিয়াছিলাম, লণ্ডনে আবদুল্লা রেস্তরাঁ নামক একটি ভারতীয় ভোজনাপণ ছিল। কিন্তু তাহা খুঁজিয়া পাই নাই, সম্ভবতঃ উঠিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, উহার মালিক

মুসলমান ছিল না, কিন্তু মাংসাশীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য উহার মুসলমানী নামকরণ হইয়াছিল। আমার বোধ হয় লণ্ডনে ২।১টা সুপরিচালিত ভারতীয় রেস্তরাঁ ও সন্দেশ রসগোল্লা গজা জিলেবীর দোকান চলিতে পারে।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রেরা বেশী সংখ্যায় একত্র হন দুটি জায়গায়। প্রথম, পূর্ব্বোক্ত ছাত্রনিবাসে; দ্বিতীয়, ২১ নং ক্রমওয়েল রোডের ছাত্রাবাসে। দ্বিতীয়টি সাক্ষাৎ-ভাবে শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। শুনিয়াছি, প্রথমটিতেও সরকারী সাহায্য আছে। বিদেশ বিভুঁইয়ে স্বদেশবাসীর সঙ্গ খুব আরামদায়ক সন্দেহ নাই। অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদন ও কালক্ষেপের নিমিত্ত এবং মানসিক উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই দুই ছাত্রাবাসে যে সকল বন্দোবস্ত আছে, তাহাও প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না, যে, এই দুইটি ছাত্রাবাসের অস্তিত্ব পরোক্ষ-ভাবে ইংরেজ ছাত্র ও অন্য ইংরেজদের সহিত ভারতীয় ছাত্রদের মেলা-মেশা কতকটা অনাবশ্যক করিয়াছে। মানুষ সঙ্গ চায়; স্বদেশীর সঙ্গ পাইলে উদ্যোগী হইয়া বিদেশীর সঙ্গ খোঁজে না। অথচ ভারতীয় ছাত্রেরা কেবল বহি পড়িবার ও কলেজে বক্তৃতা শুনিবার জন্য লণ্ডন যায় না। ইংরেজদের সঙ্গে মিশিয়া ইংরেজ জাতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ এবং সদ্‌গুণশালী ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া উপকৃত হওয়া বিলাত যাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা ঠিক, যে, ইংলণ্ডে সৎসঙ্গ ও কুসংসর্গ দুই ই হইতে পারে; এবং ইহা খুব সম্ভব যে, ঐ দুইটি ছাত্রাবাস দ্বারা ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে কুসংসর্গ কতকটা নিবারিত হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ-দের অভিপ্রেত না হইলেও সৎসঙ্গেও কতকটা বাধা পরোক্ষভাবে জন্মে। এবং আমি শুনিয়াছি, যদিও ইহা সত্য কি না বলিতে পারি না, যে, গাওয়ার ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসের কোন কোন ছাত্র রাত্রে অবাঞ্ছনীয় নৃত্য-শালায় গমন করেন। যাহা হউক, সৎইংরেজদের সঙ্গলাভ ঘটান এবং অসৎ সঙ্গ নিবারণ, এই দুটি বিষয়ে উভয় ছাত্রাবাসের কর্ত্তৃপক্ষ অমনোযোগী নহেন। সমস্যাটি তাঁহাদের অগোচর নহে। সমাধান কতটা তাঁহারা করিতে পারিবেন, জানি না।

গাওয়ার ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসের বৈঠকখানায় একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র কোন কোন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাহা বলিবার পর, কোন কোন বিষয়ে আমার ধারণার কি কি প্রমাণ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাকে ছাত্রটি যে ভাবে জেরা করিতে থাকেন, তাহা আমার ভাল লাগে নাই। ইহাও আমার মনে হইয়াছিল, যে, ছোকরাটির বিদ্যার্জ্জন ছাড়া অন্য পেশাও থাকিতে পারে। একজন ছাত্র আমাকে দৃষ্টান্ত দিয়া বিস্তারিত ভাবে বলেন, যে, লণ্ডনস্থ ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা ছাত্রদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা টাইপ্‌লেখন যন্ত্রদ্বারা লিখিয়া আমাকে দিতে বলিলাম;—কেন না, সব কথা আমার মনে থাকিবে না। আমি একথাও বলিয়াছিলাম, যে, আমি তাঁহার নাম কাহাকেও বলিব না, এবং টাইপ্‌লিখিত বর্ণনা চাহিবার উদ্দেশ্যও এই ছিল, যে, উহার লেখক কে হস্তলিপি হইতে তাহা যেমন জানিবার সম্ভাবনা থাকে, টাইপ্‌লিপি হইতে তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই বর্ণনা আমি পাই নাই। ছাত্রটি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি; যাহা মনে আছে তাহাও অস্পষ্ট। সুতরাং আমার দ্বারা প্রতিকার-চেষ্টা কিছুই হইল না। ছাত্রটির নামও ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার নামধাম আমি যে গোপন রাখিব, সে-বিষয়ে হয় ত তাঁহার সন্দেহ ছিল। তাহা হইলে আমাকে কিছু বলিয়া তাঁহার ও আমার সময় নষ্ট না করাই তাঁহার উচিত ছিল। দুএকজন ছাত্র খুব দরকারী বিষয়ে আমার সহিত কথো-পকথন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার সঙ্গে আর দেখা করেন নাই। আমাকে কেহ কেহ বা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ছাপিব কি না; কিন্তু দেখিতে চাওয়ায় পাই নাই। এইরূপ ছাত্রদের ইচ্ছার ঐকান্তিকতা বা আন্তরিকতা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়।

দোষ দেখান প্রীতিকর কাজ নয়; কিন্তু গাওয়ার ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসের ভোজনশালার ভোক্তাদের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে হইতেছে। জাহাজে অনেক লোককে একত্র খাইতে দেখিয়াছি, ইউরোপের বড় বড় হোটেলে ও রেস্তরাঁতে ততোধিক লোককে একসঙ্গে খাইতে

দেখিয়াছি। কিন্তু এই ছাত্রাবাসটির রেস্তর াঁতে খাইবার সময় মধ্যে মধ্যে যেরূপ কোলাহল কর্ণগোচর হইয়াছে, উক্ত স্থানগুলিতে তাহা হয় নাই। আমাদের দেশে ভোজের সময় যেরূপ কোলাহল হয়, আমরা অন্ততঃ বিদেশে তাহা না করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

ভারতবর্ষে থাকিতে লণ্ডনের কুয়াসা, ধোঁয়া, দিনের বেলাতেও আঁধার ভাব প্রভৃতি নানা কথা শুনিয়াছিলাম ও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দিন দশ সেখানে ছিলাম, তাহার মধ্যে কেবল শেষ দিন সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল; বাকী কোন দিন বিশেষ মেঘলাও হয় নাই। সেইজন্য লণ্ডন সম্বন্ধে আমি ভাল ধারণাই লইয়া আসিয়াছি। লণ্ডন দেখিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী চিঠিতে লিখিবার চেষ্টা করিব।

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অন্য চিঠির মত এই চিঠিতেও বলা যাইতে পারে। আমি ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়ার কোন কোন অংশ দেখিয়াছি। তা ছাড়া ইউরোপে রুশিয়া, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও আমেরিকার মানুষ দেখিয়াছি। এইসব দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের পোষাক মোটামুটি একই রকমের। পোষাকের এই যে সমরূপতা, এই যে একঘেয়ে রকমের পোষাক,—ইহা ললিতকলার দিক্ দিয়া বিচার করিলে অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য হিসাবে প্রশংসনীয় নহে। কলাকুশলী যিনি তিনি অধিকতর বৈচিত্র্য চাহিবেন।

কিন্তু এই সারূপ্যের সুবিধা এবং মূল্যও আছে। ভারতবর্ষে কতকগুলি মানুষের পোষাক দেখিয়াই বলা যায়, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক। কারণ, সব প্রদেশের লোকদের পোষাক এক নয়। পোষাকের এই প্রভেদ আমাদের মধ্যে এইরূপ একটা ভাব উৎপন্ন করে, যে, আমরা যেন পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন, যেন আমরা কেউ কাহারও নই। অন্ততঃ পক্ষে পোষাকের বিভিন্নতা একটা জাতীয় সংহতি ও জমাটভাব জন্মিবার অন্যতম অন্তরায়। হইতে পারে, যে, ইহা খুব বড় বাধা নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা একটি বাধা। পাশ্চাত্য দেশসমূহে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু অ-পাশ্চাত্য জাতিদের সম্বন্ধে ও বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যেরা অনুভব করে, যে, তাহারা এক এবং অ-পাশ্চাত্যেরা তাহাদের হইতে ভিন্ন। পরিচ্ছদের সমরূপতা পাশ্চাত্যদের এই সংহতির ভাব উৎপাদনে সাহায্য করে। পৃথিবীর বাকী অংশের সম্বন্ধে প্রতীচ্যের সংহতির একটি কারণ পরিচ্ছদের ঐক্য। অন্য বাহ্য কোন কোন কারণের বিষয় পরে কোন চিঠিতে লিখিব।

পাশ্চাত্য পুরুষদের পোষাক সুন্দর নহে, শালীনতার একটুকুও হানি না করিয়া উহা যতটা সাদাসিধা হইতে পারে তাহাও নহে। বাঙালী ভদ্রলোকদের সৌখীন পরিচ্ছদ যেমন সুন্দর, উহা সেরূপ নহে। কিন্তু বাঙালীর পোষাক দৈহিক কর্ম্মিষ্ঠতায় যেরূপ বাধা দেয়, পাশ্চাত্য পোষাক সেরূপ বাধা দেয় না।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের পোষাক অধিকাংশ স্থলে বিশ্রী। পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্যে, নানা লোকহিতকর কাজে, শিক্ষকতায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রে, চারুকলায়, এমন কি বিজ্ঞানেও, নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এইসব কারণে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহাদের পরিচ্ছদ ভব্য, সুরুচিসম্পন্ন ও সুন্দর দেখিতে চাই। তাঁহাদের অধিকাংশের পোষাক দেখিলে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয় না। তাঁহাদের পোষাকের কোন কোন ফ্যাশন্ লজ্জাশীলতার মাত্রা এতটা ছাড়াইয়া গিয়াছে, যে, রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু রোমের পোপ তাহা কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমি এসব কথা লিখিয়া এরূপ ইঙ্গিত করিতে চাই না, যে, পাশ্চাত্য নারীরা তাঁহাদের হাল ফ্যাশনের পোষাক পরেন বলিয়া সকলেই বা তাঁহাদের অধিকাংশ লজ্জাহীনা। আমার মত ইহার ঠিক্ উল্টা। কাহার মনে কি আছে, তাহা বুঝা আমার অসাধ্য; কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইউরোপীয় নারীদিগকে সাধারণত নির্লজ্জ মনে হয় নাই। হোটেলের পরিচারিকা এবং ঐরূপ শ্রেণীর অন্য অনেক তরুণীর ব্যবহার ও মুখের ভাব হইতে আমার অনেকবার তাহাদিগকে নির্ম্মলস্বভাবা বলিয়া মনে হইয়াছে।

উচ্চতর শ্রেণীর মহিলাদেরও ব্যবহার ও মুখভাব দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইউরোপীয় মহিলাদের হাল ফ্যাশনের পোষাক পরিবার কারণ অধিকাংশের লজ্জাহীনতা নহে, ফ্যাশনের দাসত্ব, গড্ডলিকাবৎ চলিত রীতির অনুসরণ ইহার কারণ।

ইউরোপে অনেক পুরুষ ও নারীকে আমাদের সাড়ীর প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা স্বদেশে সাড়ী পরিয়া রাস্তা ঘাটে বা অন্য প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে পারিবেন না। ইউরোপের লোকেরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেন বটে, কিন্তু সামাজিক কোন কোন বিষয়ে, যে, তাঁহাদের অধীনতা আমাদের চেয়ে কম নহে, হয় ত বেশী, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য নারীদের বর্ত্তমান পরিচ্ছদের সপক্ষে কেহ কেহ বলেন, যে, উহা দৈহিক কর্ম্মিষ্ঠতা ও স্বচ্ছন্দ গতি-বিধির অনুকূল। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরুষেরা নারীদের চেয়ে কম কর্ম্মিষ্ঠ নহেন, চলাফিরা তাঁহারা কম করেন না; বরং বেশী। পাশ্চাত্য পুরুষরা যদি গলা হইতে পা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া এতটা কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারেন, তাহা হইলে কর্ম্মিষ্ঠতা ও স্বচ্ছন্দ গতিবিধির জন্য পাশ্চাত্য মেয়েদের বাহুর সমস্তটা বা প্রায় সমস্তটা ও গলার নীচের অনেকটা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখা কেন একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হয়? পোষাকের নীচের অংশটাই বা কেন হাঁটুর বা তাহার নীচের কাছা-কাছি আসিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়? তাহার নীচের মোজার রংটাই বা অনেকস্থলে নগ্নতার অনুকারী গায়ের রঙের মত কেন করা হয়? নারীদের পরিচ্ছদের এইরূপ পাশ্চাত্য ফ্যাশন কর্ম্মিষ্ঠতা, স্বচ্ছন্দ গতিবিধি বা স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক নহে। অন্য উদ্দেশ্য যাহা থাকিতে পারে, তাহা সহজে অনুমেয়। অর্দ্ধস্বচ্ছ শুধু একখানি সাড়ী পরিধান যে অনুমোদনযোগ্য, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের দেশের পোষাকের আলোচনা করা এখন অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

ইউরোপের মেয়েদের চুল কাটিয়া ফেলিবার বর্ত্তমান রীতিও আমার ভাল লাগে নাই। জার্ম্মেনীতে নারীরা অনেকে সাবেক ধরণের লম্বা চুল রাখেন, অন্যত্র কেহ কেহ। চুল ছাঁটিলে নারীদিগকে পুরুষের মত দেখায়। আমাদের চোখে তাঁহাদিগকে লম্বা চুলেই সুন্দর ও নারীর মত দেখায়। সেটা হয়ত আমাদের সেকেলে চোখের দোষ। বলা যাইতে পারে, যে, ছাঁটা ছোট চুলের একটা সুবিধা আছে—উহা স্নানের পর শুকায় শীঘ্র, সুতরাং তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল। ইহাতে কিছু সত্য আছে। কিন্তু নিত্য স্নান, অন্ততঃ ঘন ঘন স্নান, আমাদের দেশের দীর্ঘকেশী নারীরা করেন, ইউ-রোপের নারীরা তাহা করেন না। আবার ইউরোপেও জার্ম্মেনীতে যতটা স্নানের চলন আছে, ফ্রান্সে ততটা নয়; অথচ জার্ম্মেনীতে নারীর দীর্ঘকেশ বেশী দেখা যায়। জার্ম্ম্যান্ নারীদের স্বাস্থ্য ফরাসী নারীদের চেয়ে খারাপ নয়। আর একটা কথা উঠিতে পারে, যে, লম্বা চুল পরিষ্কার রাখিতে ও বাঁধিতে খাট চুলের চেয়ে বেশী সময় লাগে। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীরা প্রসাধনে এত বেশী সময় দেন, যে, দুচার মিনিট তফাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, চুল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাট রাখিতে হইলে ঘন ঘন কেশ-কর্ত্তকের সাহায্য লইতে হয়—তাহাতে সময় ও অর্থ উভয়েরই ব্যয় আছে। লম্বা চুলে এ বালাই নাই।

মেয়েদের চুল ছাঁটা প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, যে, জেনীভায় থাকিতে গত বৎসরের ৬ই সেপ্টেম্বরের ডেলী মেলের প্যারিস্ সংস্করণে এই খবরটি পড়িয়াছিলাম, যে, প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একটি জায়গার এক ভদ্রলোককে তাঁহার কন্যারা বলে, যে, তাহারা তাহাদের চুল ছাঁটিয়া ফেলিবে। তিনি বলেন, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। পরে যখন ৫ই সেপ্টেম্বর শুনিলেন, যে, তাহারা সত্যসত্যই চুল খাট করিয়া কাটিয়াছে, তখন তিনি রিভলভার দ্বারা গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া রুগ্ন ছিলেন।

ইউরোপ-আমেরিকায় মেয়েরা পুরুষদের নকল করিতেছে। পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে অনেকের ধূমপানের সেটা বোধ হয় একটা কারণ। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য বাড়ে না। জেনীভার যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার

ভোজন-কক্ষে অনেক দিন তাহার আত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে এক তরুণীকে দেখিতাম, তাহার পরণে নারীদের পোষাক না থাকিলে তাহাকে একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় বা ব্যায়াম-পরায়ণ যুবক মনে হইত। কারণ, তাহার চুল পুরুষদের মত ঘাড়ের দিকে ক্রমশঃ হ্রস্ব হ্রস্বতর ও হ্রস্বতম করিয়া ছাঁটা, এবং তাহার চাউনি ও আমূল অনাবৃত বাহুদ্বয় পুরুষদের মত। আমাজোন-নামক যে ফ্রেঞ্চ জাহাজে আমি দেশে ফিরিয়া আসি, তাহাতেও অতিদীর্ঘকায়া ঐরূপ এক তরুণীকে দেখিয়াছিলাম; তবে, তাঁহার মুখে ও দৃষ্টিতে বালিকাসুলভ কোমলতা ও সরলতা ছিল। জেনীভার এক রেস্তরাঁতে এক তরুণী বা বালিকার কেবল মাথার দিকটা প্রথমে দেখিয়া তাহাকে বালক মনে করিয়াছিলাম। সে সিগারেট খাইতে খাইতে, দুই হাত ধুইবার সময় যখন ছেলেদের মত করিয়া দুপাটি দাঁতের মধ্যে সিগারেটটা ধরিল, তখন তাহার চেহারা ছোকরাদের মত দেখাইতেছিল বলিয়া বড় হাস্যকর মনে হইয়াছিল।

মেয়েরা খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ হউন, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি। কিন্তু যে পুরুষ নারীর নকল করে সে যেমন পুরুষপদবাচ্য হয় না, নারীপদবাচ্যও হয় না, তেমনি যে নারী পুরুষের নকল করে সেও নারীপদবাচ্য বা পুরুষপদ-বাচ্য হয় না।

পুস্তক পরিচয়

অদ্বৈত-প্রকাশ—ঈশান নগার-প্রণীত। অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। নূতন সংস্করণ, ১৩৩৩। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

বাঙলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চরিত-গ্রন্থ খুব আদৃত হইত। তাহার মধ্যে ঈশান নাগর রচিত এই অদ্বৈত-প্রকাশের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রন্থকার নিজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ বৎসরের বেশীকাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়া-ছিলেন তাহা সূত্রের আকারে এই গ্রন্থে লিখিয়া যান। এই গ্রন্থ হইতে বৈষ্ণব-সমাজের বহু কথা জানা যায়। ইহা প্রথম প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় বাঙলা সাহিত্যের পরম উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণটি পাদটীকা সহ প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক মিত্র ও প্রকাশকেরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মূল গ্রন্থ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে আমরা এমন সব কথা জানিতে পারি যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না, যথা অদ্বৈতাচার্য, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের যথাক্রমে বেদপঞ্চানন, বিদ্যাসাগর, ও ন্যায়চূড়ামণি উপাধি। রাজা গণেশের গৌড়িয়া বাদসাহকে মারিয়া ফেলা, অদ্বৈতাচার্য্য ও চৈতন্যদেবের নানা গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা প্রভৃতি। সুতরাং মূল পুঁথিখানা বিশেষ যত্ন সহকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বা আর কোথাও রক্ষিত হওয়া দরকার। আশা করি, অধ্যাপক মিত্র এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন—সম্পাদক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও অটলবিহারী ঘোষ, এম্-এ, বি-এল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত, ১৩৩২, মূল্য ১৲।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যে কমলাকান্তের স্থান খুব উচ্চে। তাঁহার পদাবলী রামপ্রসাদ সেনের পদাবলীর মতই আদরের যোগ্য। বর্ত্তমান গ্রন্থে তান্ত্রিক সাধনার গুহ্য ব্যাপারটিকে কবি সরস করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ষট্‌চক্রাদির ব্যাখ্যা কবিতায় যথাসাধ্য দেওয়া হইয়াছে। দুই-একটি কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন বৈষ্ণব পদাবলী পড়িতেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে তান্ত্রিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং চক্রগুলির ব্যাখা আছে। শ্রীযুক্ত অটলবাবু বলিয়াছেন—"আমরা কেহই মূর্ত্তির পূজা করি না।" অধ্যাপক রায় একটি শব্দার্থসূচী দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কোটালহাটের আধুনিক কালী-মন্দিরের ও ষট্‌চক্রের একটি চিত্র আছে। পাদটীকায় কবিতার মধ্যে যে-সব পারিভাষিক শব্দ আছে তাহার ব্যাখ্যা ও প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরা-প্রসঙ্গ সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃতি)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিপ্রসাদ রায়, ৬নং কালিমিত্র লেন, কলিকাতা। ১৩৩২। মূল্য ২৷০; পৃঃ ৫১৬।

এই গ্রন্থে আগাগোড়া পদ্যরচনা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের রূপক (symbolic) ও তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব—সকলেরই তত্ত্ব যে গোড়ায় একটি মূল রহস্যের সন্ধান দেয় তাহা এই গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। পদ্য অপেক্ষা গদ্যে রচিত হইলেই বিষয়গুলিকে বুঝান সহজ হইত।

শ্রী রমেশ বসু

বিপ্লবের পথে—শ্রী নলিনীকিশোর গুহ। প্রকাশক ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচসিকা। ১৩৩৩, আশ্বিন।

পুস্তকখানি সুলিখিত। লেখকের প্রবন্ধগুলিতে অনেক চিন্তার খোরাক আছে। যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান সমস্যা লইয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমরা এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

গ্রন্থকীট

সন্ধ্যামণি—(গীতিকাব্য) শ্রী হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। শ্রী সুশীলচন্দ্র নিয়োগী, এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ সিকা।

কবিতা-প্লাবিত বঙ্গদেশে সমালোচনার্থ কবিতার বই পাইলেই ভয় হয়। তরুণ কবিদের বহির সমালোচনা লিখিতে হইলে প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথেরই সমালোচনা করিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব (ছন্দ, ভাব, শব্দ-সমাবেশ) এইসকল কবিদের উপর এতই অধিক। এই সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থখানি হাতে লইয়াই বুঝিলাম, আর যাহাই হউক রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িতে হইবে না, কবি একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর কবি। বর্ত্তমানের প্রচলিত দামামা ছন্দ, অস্পষ্ট ভাব, মিষ্টিসিজ্‌ম্, হুইট্‌ম্যানিজ্‌ম প্রভৃতির অভাব ইহাতে লক্ষ্য করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। কবি সরল সহজবোধ্য ভাষায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হাজারো রকম ছন্দের তরবারি-ক্রীড়া নাই, দূর নীহারিকা-পুঞ্জের ধূম্রধারতা নাই, সাধারণ সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের কথা। বঙ্গবাণীর কাব্য-মন্দিরে পূর্ব্বে এই কবির প্রতিষ্ঠা ছিল, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সহিত এক সঙ্গে ইঁহার নাম উচ্চারিত হইত। নূতন যুগের আব্‌হাওয়া সহিতে না পারিয়া ইনি কোণা লইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার রাজপথে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার কবিতা আমাদের ভাল লাগিল। 'পতিহীনা'র কবি অকালবৈধব্যের যে-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মর্ম্মস্পর্শী। 'স্মৃতিঅর্ঘ্য' কবিতাটি কবির মর্ম্ম চিরিয়া বাহির হইয়াছে। 'ভারতবর্ষ' 'ক্লিওপেট্রা', 'অনুতপ্তা', 'কালসিন্ধু'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুহ্যতত্ত্বামৃত—সোঽহং সিদ্ধ-বৈদ্যনাথ সন্ন্যাসীর বাণী। প্রথম বিভাগ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বেনারস হইতে প্রকাশিত। ১৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৷০ আনা।

সহজ সরল ভাষায় উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রয়োগে কয়েকটি তত্ত্বকথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যথা, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ষড় রিপু-তত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, ইত্যাদি। অনেক নূতন কথা আছে, পুরাতন কথাও নূতন ভাবে বলা হইয়াছে।

স্বামীর পত্র (প্রথম ভাগ)—অধ্যাপক শ্রী অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, লিখিত। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ৩১১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, গ্রন্থখানি চারিভাগে সমাপ্ত হইবে। সমগ্র বইখানি একত্রে পাইলে সমালোচনার সুবিধা হইত। আমরা আরো তিন ভাগের অপেক্ষায় রহিলাম। চারিভাগ একত্র করিয়া এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল। প্রথম ভাগেই এমন অনেক কথা আছে যাহার প্রতিবাদ আবশ্যক এবং সেইসকল কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। অন্যান্য খণ্ডে গ্রন্থকারের মতামতের অপেক্ষায় রহিলাম। আপাতত সাধারণভাবে সমালোচনা লিখিত হইল।

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এই ধরণের পুস্তক এই প্রথম। গ্রন্থকার অনেক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। সহজ সরল ভাষায় নারীদিগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত, বুঝিতে কাহারো কষ্ট হইবে না। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থঘরের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম স্তবকের কয়েকটি বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতভেদ আছে। উচ্চশিক্ষা, সঙ্গীত,চিত্রাঙ্কন ও শিল্প বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমাদের আপত্তি আছে। রোগীর শুশ্রূষা, শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয় বিষয়ক পত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। সমস্ত বহিখানির মধ্যে দ্বিতীয়স্তবক অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পত্রগুলি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। বাল্য বিবাহ, অবরোধপ্রথা, বহুসন্তান প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থকারের মতামত প্রশংসনীয়। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীতে অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভবিষ্যতে সমগ্র গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মধুসূদন বৈদ্যবিরচিত নৈষধ চরিত্র—(প্রথম খণ্ড) শ্রী মদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মুড়াপাড়া, ঢাকা। মূল্য দেওয়া নাই।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব রত্নখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, সন্দেহ নাই। মধুসূদন বৈদ্যের জীবনীটি সুলিখিত। আমরা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবার অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রেম-কথা (কাব্যগ্রন্থ)—সৈয়দ আবুল খয়ের মহাম্মদ শামসর রহমান আলখালালী প্রণীত ও বক্তারনগর, পোঃ দাউদপুর, ঢাকা হইতে সৈয়দ ও বায়েদুল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কাব্যপ্রসিদ্ধ লায়লা ও মজনুর বিচিত্র প্রেমকাহিনী কাব্যাকারে লিখিত। কবি অনেকগুলি ছন্দের সাহায্য লইয়াছেন। কাব্যখানি ভালই, তবে মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগে ও ছন্দের গোলযোগে একটু কষ্টপাঠ্য হইয়াছে।

আরম্ভে (কবিতা পুস্তিকা)—স্বর্গীয় শিশিরকুমারী দেবী লিখিত। মালদহ লাহিড়ী পরিবার হইতে শ্রীশান্তিভূষণ লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেওয়া নাই।

কবি উনিশ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ১২ পৃষ্ঠার বইখানিতে যথার্থ কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের উপর কবির যথার্থ দখল ছিল। প্রত্যেকটি কবিতা ব্যথায় ভরপুর। কবির অকাল-মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে।

১৯২৭ সালের ডায়ারী—কৃষ্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, পোঃ বঃ নং ১১৪৩৫ এ দু'আনার ডাক টিকিট পাঠাইলেই এই ডায়ারী পাওয়া যায়।

ডায়ারীটি ছোটখাট এবং সহজেই বহন করা যায়।

স
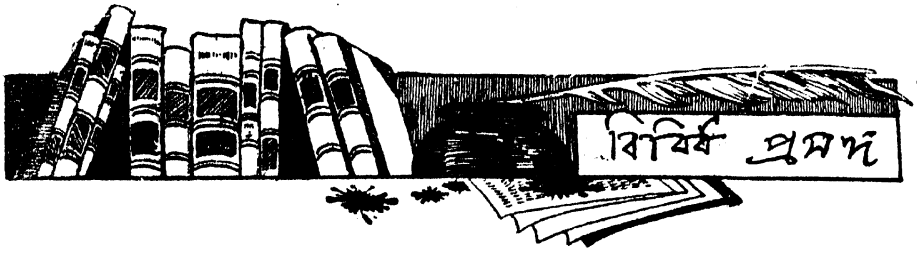
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লোকহিতব্রত, ত্যাগী, নির্ম্মলচরিত্র বীরপুরুষ ছিলেন। অন্যকে নিজের মতে আনিবার অধিকার সকল ধর্ম্মের লোকেরই আছে। নিজ ধর্ম্মের লোক যাহাতে স্বসমাজে মানুষের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় এবং অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে চলিয়া না যায়, তাহার চেষ্টা করিবার অধিকারও সকলেরই আছে। নিজ সম্প্রদায়কে সুসংহত, দলবদ্ধ ও কর্ম্মপটু করিবার চেষ্টা করিতেও সকলেই অধিকারী। শুদ্ধি ও সংগঠন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, এইসকল অধিকার অনুসারে কার্য্য করা ও তৎসমুদয় বজায় রাখা। তাহার নেতা ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এই নেতৃত্বের জন্য তিনি একজন মুসলমাননামধারী ব্যক্তি দ্বারা রোগ-শয্যায় নিহত হইয়াছেন। এইরূপ হত্যা যে করে এবং প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে যাহারা ইহার সমর্থন করে, তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা কৃপার পাত্রও বটে।

হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং তৎপরে খৃষ্টীয় শাস্ত্রে অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, প্রেমদ্বারা দ্বেষকে জয় করিবার উপদেশ আছে; প্রতিহিংসার উপদেশ ধর্ম্মনামের উপযুক্ত কোন ধর্ম্মে নাই। এই অক্রোধ ও প্রেমের উপদেশ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করি। ক্ষমা করিতে যদি আমরা সত্য সত্যই পারি, তাহা হইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। কিন্তু অক্রোধ, প্রেম ও ক্ষমার অধিকারী হইয়াছি বলিয়া সহজে আত্মপ্রতারণা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি না। দুর্ব্বল যে, সে অক্রোধ ও প্রেমের অধিকারী নহে। প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতাই যাহার নাই, সে প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রহার না দিলে কখনও দাবী করিতে পারে না, যে, সে অক্রোধের সহিত আততায়ীকে ভালবাসিয়াছে। ভীরু যে, সে যদি ভীরুতা-বশতঃ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে কখনই বলিতে পারে না, যে, সে ক্ষমা করিয়াছে। প্রতিহিংসার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের অক্রোধ, প্রেম ও ক্ষমা যে খাঁটি জিনিষ, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা শক্তিশালী, সংহত ও সাহসী সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া অনুভব করিতে চাই।

এইজন্য হিন্দুদের সমুদয় শক্তি নিজ সম্প্রদায়ের সমুদয় কুরীতি ও ভেদবুদ্ধি দূরীকরণে প্রযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় যাহাতে কেহ না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘটা করিয়া কোন সভায় "নিম্নশ্রেণীর" কতকগুলি লোকের হাতের জল-মিষ্টান্ন খাইলেই অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা দূরীভূত হইবে না। নগরে ও গ্রামে, বিশেষ করিয়া গ্রামে, প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আচরণে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। অশিক্ষিত, দরিদ্র, অপরিষ্কার লোক-দিগকে সাধারণতঃ শিক্ষিত সঙ্গতিপন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোকেরা নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না। ধর্ম্মের উপদেশ অবশ্য ইহা বটে, যে, সকলকে আত্মবৎ দেখিতে হইবে ;— শুধু সব মানুষকে নয়, "সর্ব্বভূতেষু" "আত্মবৎ" "য পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" কিন্তু সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক মানুষের নিজের উন্নতি ও মুক্তির জন্য জ্ঞান চাই, শিক্ষা চাই। কিছু সঙ্গতি না থাকিলে সাধারণতঃ শিক্ষালাভ দুঃসাধ্য। শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। সঙ্গতি এবং পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না।

জ্ঞান, সঙ্গতি, স্বাস্থ্য কেবল যে প্রত্যেকের উন্নতির ও মুক্তির জন্য আবশ্যক, তাহা নহে। আমাদের জাতিকে উন্নত শক্তিশালী ও মুক্ত করিতে হইলেও প্রত্যেকের

উন্নতি আবশ্যক। কারণ, জাতি ব্যক্তিসমূহেরই সমষ্টি মাত্র।

হিন্দুরা ভারতীয় জাতির একটি অংশ ও প্রধান অংশ। ভারতীয় জাতিকে উন্নত, শক্তিশালী ও মুক্ত করিতে হইলে হিন্দুসম্প্রদায়কে দোষ দুর্ব্বলতা দারিদ্র্য অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি ছয় কোটি লোক অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। তাহাদিগকে শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন, চরিত্রবান্ ও শক্তিশালী করিতে হইবে এবং তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে হইবে।

অস্পৃশ্যতা জাতিভেদের অপকৃষ্টতম ফল। জাতিভেদের এই অপকৃষ্টতম অংশ লুপ্ত হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইবে না। জাতিভেদ বশতঃ, অমুক নীচ অমুক উচ্চ, অমুক নিজের লোক অমুক পর, চারিত্রিক উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ব্বিশেষে কেবল 'জাত' অনুসারে অমুক ভদ্রলোক অমুক ছোটলোক, এইরূপ বোধ দূর করিতে হইবে। বস্তুতঃ যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অপঘাত মৃত্যুতে আজ সনাতনী অ-সনাতনী সমগ্র হিন্দু সমাজ শোক প্রকাশ করিতেছেন, তিনি অন্তরে ও বাহ্য আচরণে জাতিভেদ মানিতেন না—তিনি তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যার বিবাহ হিন্দু সমাজের ভিন্ন জাতিতে দিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী ও মুক্ত করিতে হইলে যেমন অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদজাত ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট করিতে হইবে, তেমনি সমগ্র নারী জাতিকে শিক্ষিত ও শক্তিরূপিণী করিতে হইবে। তাহার জন্য বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক, এবং যাঁহারা বাল্যে বিবাহিতা হইয়া বাল্যে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহিত হইবার অধিকার কার্য্যতঃ দিতে হইবে।

এই সমুদয় প্রকারে হিন্দুসমাজকে সবল ও নির্ম্মল করিবার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমরা যে-পরিমাণে কাজ করিব, সেই পরিমাণে আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় তৎপর বলিয়া বিবেচিত হইব। বক্তৃতাদি কখনই মূল্যহীন নহে। কিন্তু যে-সব বক্তৃতা ও যে-প্রকার বাহ্য শোক প্রকাশ পরলোকগত ভক্তিভাজন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল কার্য্যে আমাদিগকে প্রবৃত্ত না করে, তাহার কোন মূল্য নাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কেবল যে হিন্দুসম্প্রদায়ের হিতকামী ও হিতসাধক ছিলেন, তাহা নহে। সমগ্র ভারতীয় জাতির তিনি বন্ধু ছিলেন। এক সময়ে মুসলমানেরা অমুসলমান তাঁহাকে, দিল্লীর জুমা মসজিদে উপদেশ দিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তখন তিনি যে নিজের জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত গোপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। জীবনের শেষ পর্য্যন্তও অনেক মুসলমান তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শেষ পীড়ায় তাঁহার মুসলমান বন্ধু ডাক্তার আন্সারি তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস ও আশা এই, যে, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের কাজ বন্ধ হইবে না, ব্রত অনুদ্‌যাপিত থাকিয়া যাইবে না। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা মহাপুরুষ-দিগকে জীবনে জয়ী দেখিতে পান, মরণেও জয়ী দেখিতে পান। শ্রদ্ধানন্দ জীবনে একটি হৃদয়, একটি মস্তিষ্ক ও দুই বাহু দ্বারা কাজ করিতেন। মরিয়া তিনি সহস্রহৃদয় সহস্রমস্তিষ্ক সহস্রবাহু হইবেন।

—

শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে মুসলমানদের কর্ত্তব্য

এই দুঃসময়ে মুসলমানদের কর্ত্তব্য মুসলমান নেতারা নির্দ্দিষ্ট করিলে ও তদনুসারে স্বসম্প্রদায়কে কার্য্য করাইলে তবে সুফল ফলিবে। কিন্তু তাঁহারা যে ভারতীয় মহা-জাতির অঙ্গীভূত, আমরাও সেই মহাজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া, আমরা কি আবশ্যক মনে করি তাহা বলিলে তাঁহারা যেন ভুল না বুঝেন।

বিদ্বান্ মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, ইস্লামের অর্থ শান্তি এবং কোর্-আন শরীফে আছে, যে, ধর্ম্মবিষয়ে বল-প্রয়োগ বৈধ নহে। সুতরাং উত্তেজনাবশে অমুসলমানের রক্তপাত ও প্রাণবধ দ্বারা ইস্লামের গৌরববৃদ্ধি বা প্রচার হয় না, ইহা যদি সকল মুসলমানকে তাঁহারা অন্তরে উপলব্ধি করাইতে পারেন, তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গল।

অমুসলমানদের রক্ষা বা হিতের জন্য আমরা ইহা বলিতেছি না। অমুসলমানরা প্রধানতঃ খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ ও হিন্দু। ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অংশ একদা মুসলমান তুর্কের অধীন ছিল। এখন শক্তিশালী খৃষ্টিয়ান জাতিদের প্রতাপে তুরস্ক সাম্রাজ্য অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। তুরস্ক যে এখনও স্বাধীন আছে, তাহা যেমন কতকটা কমাল পাশা দ্বারা চালিত নব্যতুর্কদের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের ফল, তেমনি ইংরেজ-ফরাসীর প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষ্যারও ফল; তলায় তলায় ফ্রান্স তুরস্কের সহায় না থাকিলে তুর্করা টিকিতে পারিত না। তা ছাড়া, তুর্করা যে টিকিয়া থাকিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন এবং মুসলমানী বলিয়া পরিগণিত কোন কোন রীতিনীতি ত্যাগ করিয়া। তাহারা পোষাকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় হইয়াছে— তুরস্কে ফেজ পরিলে ফাঁসী হয়। তাহারা নারীদের অবগুণ্ঠন ও পর্দ্দা তুলিয়া দিয়াছে, এবং একপুরুষের বহুস্ত্রী-গ্রহণ প্রথা রদ করিয়াছে। আফগানিস্থান ও পারস্যেও নব্য ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা জয়যুক্ত হইতেছে। স্বাধীন মুসলমান জাতিরা বুঝিয়াছে, যে, বিধর্ম্মী খৃষ্টিয়ানের রক্তপাত দ্বারা নিজেদের উন্নতি হইবে না, বরং খৃষ্টিয়ানদের শিক্ষা ও সভ্যতা আবশ্যকমত লইতে হইবে। সুতরাং খৃষ্টিয়ানদের রক্ষা ও হিতের জন্য আমরা যে পরাধীন ভারতীয় মুসলমানদিগকে ঠাণ্ডা হইতে বলিতেছি না, তাহা সহজ-বোধ্য।

বৌদ্ধ জাপান আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ। সুতরাং স্বাধীন জাপানীদের মঙ্গলের জন্যও ভারতীয় মুসলমান-দিগকে শান্ত হইতে বলিবার প্রয়োজন নাই।

চীন প্রধানতঃ বৌদ্ধ এবং এখনও স্বাধীন। সেদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম এবং তাহাদের উপর ভারতীয় মুসলমানদের কোন প্রভাব নাই। অতএব চীনের বৌদ্ধদের আতঙ্ক নিবারণের জন্য ভারতীয় মুসলমানদিগকে অহিংসা অবলম্বন করিতে বলিবার প্রয়োজন নাই।

বাকী থাকে হিন্দুসম্প্রদায়। যখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশের মালিক ছিল, তখনও হিন্দু-সম্প্রদায় লুপ্ত হয় নাই। বরং, কতকটা প্রতিক্রিয়া বশতঃ, মরাঠা ও শিখরা বলশালী হইয়াছিল। হিন্দুর জাগরণ আবার হইতেছে। তাহাতে মুসলমানের ভয়ের কোন কারণ নাই। মরাঠা ও শিখদের অভ্যুদয় ও প্রভুত্বের সময়েও মুসলমানরা লুপ্ত হয় নাই, বরং শিবাজী ও রণজিতের কর্ম্মচারীদের মধ্যে মুসলমান ছিল।

এখন ভারতবর্ষের কেবল দুটি বড় প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী। তাহার মধ্যে পাঞ্জাবে অমুসলমান হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের চাপে কোণঠাসা ও অবসাদগ্রস্ত হয় নাই। বরং পঞ্জাবে ও উত্তরপশ্চিমে শুদ্ধি জোরে চলিতেছে। বাংলা দেশে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী; কিন্তু দৈহিক বলে ও স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় এবং সঙ্গতিতে বাঙালী হিন্দুরা বাঙালী মুসলমানদের চেয়ে হীন নহে। অবশ্য, বাঙালী হিন্দুদিগকে আপনাদের ভবিষ্যতে অধিকতর বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং সুসংহত হইতে হইবে। সেই অবস্থারও সূত্রপাত হইতেছে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গেই মুসলমানের সংখ্যা বেশী। তথাকার শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীরা বুঝিয়াছে, যে, যদি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক শিখ, শুধু আত্মরক্ষা নহে, একদা প্রভুত্বস্থাপনেও সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাঙালী হিন্দু শুধু আত্মরক্ষা কার্য্যে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। ইহাও অনেক হিন্দু বাঙালী বুঝিতেছে, যে, শিখ বলশালী হইয়াছিল, সব জাতের শিখদের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া এবং তাহাদের মনে এক অকাল পুরুষে জলন্ত বিশ্বাস জাগাইয়া। বাঙালী হিন্দুদিগকেও এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দু বাঙালী মুসলমানদের সহিত সদ্ভাব চায়, হৃদয়ের সহিতই চায়; কিন্তু ইহাও বুঝে, যে, কৃপাভিখারী হইলে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব পাওয়া যায় না, শক্তিশালী হইলে তবে প্রকৃত মিত্রতা ও সদ্ভাব স্থাপিত হয়। অতএব, যদি ইহা সত্য হইত, যে, মুসলমানের কৃপা ব্যতীত বাঙালী হিন্দুর গতি নাই, তাহা হইলেও আমরা বাঙালী হিন্দুদের রক্ষা ও হিতের জন্য মুসলমানদিগকে ইস্‌লামের, কোর্‌-আন শরীফের উপদেশ পালন করিতে বলিতাম না। কারণ, অন্যের কৃপায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরা ভাল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বলের কারণ একটি এই, যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুদের চেয়ে সামাজিক সাম্য আছে।

নিরক্ষর গরীব কসাই চর্ম্মকার গাড়োয়ান প্রভৃতিরও সামাজিক অধিকার সুপণ্ডিত মুসলমান অধ্যাপকের সমান। কিন্তু এই সাম্যের অন্য দিকও আছে। একজন বিদ্বান্ উচ্চপদস্থ হিন্দুর সামাজিক প্রভাব একজন হিন্দু গাড়োয়ানের সামাজিক প্রভাব অপেক্ষা যত বেশী, একজন বিদ্বান উচ্চপদস্থ মুসলমানের সামাজিক প্রভাব একজন মুসলমান গাড়োয়ানের সামাজিক প্রভাব অপেক্ষা তত বেশী হইবার কথা নয়। এই কারণে, আমাদের মনে হয়, মুসলমান নেতাদিগকে অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সহিত রফা করিয়া চলিতে হয়।

—

বঙ্গে হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব

হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা ও মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা হিন্দুমুসলমানে একতা স্থাপনের যতই চেষ্টা করুন না, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে পশুপ্রকৃতি মুসলমাননামধারী লোকদের দ্বারা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার না থামিবে। এমন দিন যায় না, যেদিন এরূপ অত্যাচারের একাধিক সংবাদ না পাওয়া যায়। জানি, হিন্দু পুরুষদের দ্বারা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার ও মুসলমান পুরুষদের দ্বারা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারও হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য, যে, নারীর উপর অত্যাচারের যত সংবাদ প্রকাশিত হয় ও আদালতে যায়, তাহার অধিকাংশ স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমাননামধারী এবং অত্যাচারিতারা হিন্দুনারী।

এরূপ অবস্থার জন্য আমরা কেবল মুসলমান সমাজকে দায়ী করিতেছি না। হিন্দু সমাজও খুব দায়ী। যে-সমাজ নিজেদের নারীদিগকে অত্যাচার ও অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহার লুপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। সে সমাজ সতীত্বের প্রকৃত মূল্য ও আদর জানে না। দুর্ব্বলতা অত্যাচারকে ডাকিয়া আনে। অতএব হিন্দু পুরুষ ও নারী উভয়কেই শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে। কন্যার পিতা নিষ্ঠুর ভাবে নিহত এবং কন্যা অপহৃতা হয়, মাসের পর মাস যায়, কন্যার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না; কিম্বা বাড়ীর পুরুষদের সম্মুখ হইতে নারী অপহৃতা হয় ও গ্রামে গ্রামে তাহাকে সরাইয়া লইয়া তাহার উপর অত্যাচার করা হয়, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না; এইসব ঘটনা কি কম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়? গুণ্ডাপ্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগকে দোষ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না; কারণ আদালতে পুনঃপুনঃ বিচারে যাহারা দোষী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারা সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানের নিকট হইতে, ইহা নারীরক্ষা-সমিতি জানেন।

সকল শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র মুসলমান ইহা জানেন কি না বলিতে পারি না, যে, কোন কোন নারীর উপর অত্যাচার গুরুলঘুসম্পর্কযুক্ত মুসলমাননামধারী লোকেরা পরস্পরের সম্মুখে করিয়াছে এবং কখন কখন নিজেদের আত্মীয়াদের সমক্ষে করিয়াছে। ইহা লিখিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু এরূপ নৈতিক অধোগতির প্রতিকার-চেষ্টা ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সাধুপ্রকৃতি লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা লিখিতে হইল।

নারীরক্ষা-সমিতি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল সমাজের ভিত্তিভূত সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়া সুমহৎ ও একান্ত আবশ্যক কাজ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমিতির যথেষ্ট লোকবল ও অর্থবল নাই; যদিও কোন প্রকারে কাজ চলিয়া যাইতেছে। আরও লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই, যে, অনেকে রাজ-নৈতিক কারণে এই সমিতিতে যোগ দেন না। নারীরক্ষা-সমিতির একজন প্রধান কর্ম্মীর মুখে শুনিয়াছি, তিনি বৎসরাধিক পূর্ব্বে রাজনৈতিক দল বিশেষের নেতার নিকট গিয়া তাঁহাকে নারীরক্ষা-সমিতির সভ্য হইতে অনুরোধ করেন। নেতা বলেন, তাহা পারিব না, কারণ তাহা হইলে মুসলমানরা আমাদের দল ছাড়িয়া দিবে। এরূপ বলায় নৈতিক দিক্ দিয়া মুসলমানদের উপর অবিচার হইয়াছিল কিনা, তাহার অলোচনা করিব না। পূর্ব্বোক্ত রাজনৈতিক দলের মফঃস্বলস্থ এক নেতার কথাও শুনিয়াছি, তিনিও পূর্ব্বোক্ত রাজনৈতিক আশঙ্কায় নারীরক্ষা-সমিতিতে যোগ দেন নাই।

তাহা হইলে কি আমাদিগকে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে,কোন কোন হিন্দু রাজনৈতিক নেতা নারীর মূল্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রয় করিতে চান? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া আভ্যন্তরীন্ আত্মশাসন-ক্ষমতা ত কোন্ ছার, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও আমরা চাই না, যদি তাহার জন্য এরূপ কোন সন্ধিবন্ধন বা চুক্তি করিতে হয় নারীর সম্মান ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও রফা পরোক্ষ ভাবেও যাহার মধ্যে আছে। বস্তুতঃ, যাহারা নিজের বলে নিজেদের নারীদিগকে রক্ষা করিতে, অন্ততঃ তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে না, তাহারা স্বাধীনতা পাইবে, বা রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা মনে করা বাতুলের স্বপ্ন অপেক্ষাও অলীক।

—

নারীর লাঞ্ছনার প্রতিকার

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের নৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন নারীর উপর অত্যাচার দূরীকরণের অন্যতম উপায়। এরূপ অত্যাচারী ব্যক্তিদের উপর উভয় সমাজে খুব কড়া সামাজিক শাসনও একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান আইন দ্বারা অত্যাচারীদের শাস্তি যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় নারীরক্ষা সমিতির লোকবল ও অর্থবল বাড়ান একান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সকল জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে, শাখাসমিতি স্থাপিত হওয়া দরকার। অত্যাচারীদের সশ্রম কারাদণ্ড ব্যতীত বেত্রাঘাত দণ্ডও হওয়া আবশ্যক কি না, বিবেচিত হইতে পারে। এইসকল অপরাধে অপরাধীদিগকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া শীঘ্র দণ্ডিত করিবার চেষ্টা যাহাতে পুলিস করে, তজ্জন্য, আবশ্যক হইলে, আইনের পরিবর্ত্তন করা উচিত। আইনজ্ঞেরা এবিষয়ে ঠিক উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। যাহাতে এইপ্রকার অপরাধপ্রবণ লোকদের স্বভাব বদ্লাইয়া যায় ও তাহাদের চারিত্রিক উন্নতি হইয়া সমাজের অনিষ্ট তাহাদের দ্বারা আর না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে ভ্যাসেক্টমি (Vasectomy) নামক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এদেশেও তাহা আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে উপকার হয়।

—

সতীত্বের মর্য্যাদা

কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোরের দি পীপল্ নামক কাগজে দেখিলাম, লক্ষ্মণস্বরূপ নামক একজন বিদ্বান্ পাঞ্জাবী ভারতীয় ছাত্রদের ইউরোপে শিক্ষালাভের ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে নারীদের গুণের মধ্যে সতীত্বকে যেরূপ উচ্চ স্থান দেওয় হইয়া থাকে, আধুনিক ইউরোপে তাহা দেওয়া হয় না; ভারতীয় ছাত্রেরা ইউরোপে দীর্ঘ কাল যাপন করিলে সতীত্বের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাদেরও মত বদ্লাইয়া যাইতে পারে। তিনি ইহা ধরিয়া লইয়া তাহার পর বলিতেছেন, যে, এরূপ ফল ফলিলেও আমাদের ছাত্রদিগকে ইউরোপে না পাঠাইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, তিনিও সতীত্বকে নারীদের সদ্গুণের মধ্যে উচ্চতম, অন্ততঃ উচ্চ স্থান দেন না। বর্ত্তমান ইউরোপে সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ, তাহার আলোচনা করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের একনিষ্ঠ প্রেমের যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ আছে, তাহা আমাদের চক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু হইলেও তাহার উল্লেখ দ্বারাও আমরা এস্থলে সতীত্বের প্রশংসা করিতে চাই না। আজকাল বিজ্ঞানের দোহাই না দিলে অনেকে অন্য কোন যুক্তি শুনিতে চান না। সেইজন্য কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, নরনারীর সম্বন্ধ পবিত্র একনিষ্ঠতার ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে সমাজ-রক্ষা ও সামাজিক স্বাস্থ্যে আঘাত লাগে বহু নরনারীর একনিষ্ঠতার অভাব এবং চরিত্রহীনতা হইতে উৎপন্ন নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব পাশ্চাত্য দেশে কিরূপ অধিক, তদ্দ্বারা অন্য বহু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্বয়ং নির্দ্দোষ হইলেও কিরূপ দুঃখ পায়, এবং শিশুরা ও ভবিষ্যদ্বংশ ঐরূপ কারণে কিরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ও স্বল্পায়ু হয়, তাহা আমাদের দেশেও অনেকে অবগত আছেন। ভারতবর্ষেও নানা কারণে ঐসকল রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। এইসকল পীড়া সামাজিক স্থিতি ও স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন, কোন স্ত্রীলোক দুটা মিথ্যা কথা বলিলে, অপরাধী হইয়া কিছু চুরি

করিলে, বা কোপনস্বভাব কলহপ্রিয় হইলে যতটা দোষী, অসতী হইলে তদপেক্ষা বেশী দোষী নয়, কিম্বা স্ত্রীলোকের পক্ষে একনিষ্ঠতার অভাব দোষই নহে, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। বলা বাহুল্য, আমরা এবিষয়ে একই মানদণ্ড দ্বারা পুরুষদেরও উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করিতে চাই। ইহাও বলা আবশ্যক, যে, কোন স্ত্রীলোক অত্যাচরিতা হইলে আমরা তাহাকে অসতী মনে করি না; একবার পদস্খলন হইলে তাহার চিরপাতিত্য হয়, এবং ভবিষ্যতে ভাল হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ইহাও মনে করি না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ভাল হইবার পথ সকলের পক্ষেই চিরউন্মুক্ত থাকা উচিত।

এখানে আর একটা কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন, যাদৃশ দোষ থাকিলে পুরুষকে অসৎ বলা হয়, স্ত্রীলোকের সেরূপ দোষ থাকিলে তাহাকে অসতী বলা উচিত। কিন্তু শব্দার্থ সকল স্থলে এপ্রকার ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র মানিয়া চলে না। যে-সময়ে যে শব্দের যেরূপ অর্থ প্রচলিত থাকে, তখন তাহা সেই অর্থেই প্রয়োগ করা উচিত। একসময়ে ইংরেজী "অনেস্ট্" (honest) কথাটা স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সতী বুঝাইত; কিন্তু এখন উহার ঐ অর্থ অপ্রচলিত বা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

আমি কয়েক মাস ভারতবর্ষের বাহিরে থাকায় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর যথা-সময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারি নাই।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন গুপ্ত মহাশয় গণিতের সহকারী অধ্যাপকরূপে আমাদিগকে গণিত পড়াইতেন। গণিতে আমি মনোযোগী ছিলাম না কিম্বা আমার বুদ্ধি খেলিত না, অথচ তৎসত্ত্বেও আমি কেন বি-এ পরীক্ষার জন্য গণিত লইয়াছিলাম, তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি গণিতে গুপ্ত মহাশয়ের খুব অযোগ্য ছাত্র ছিলাম এবং তাঁহার ক্লাসে প্রায় যাইতাম না। তথাপি তিনি আমাকে চিনিতেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কোন শাস্তি দেন নাই; একদিন কেবল বলিয়াছিলেন, "চাটুজ্যে, তোমাকে যে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না।"

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

গুপ্ত মহাশয় গণিতে যে খুব প্রতিভাশালী, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্লাসে উপস্থিত থাকায় বুঝিতে পারিতাম। খুব শক্ত বিষয়ও যখন তিনি আমার মত গণিতে অমনোযোগী বা অল্পবুদ্ধি ছাত্রেরও সহজে বোধগম্য করিয়া দিতেন, তখন তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতাম তিনি শিক্ষাদান-কার্য্যে সুনিপুণ। গণিতে প্রতিভাশালী সহপাঠী ছাত্রদের প্রশংসা হইতেও অবশ্য অধ্যাপক মহাশয়ের গণিতজ্ঞতার পরিচয় পাইতাম। আমরা বি-এ পড়িবার সময় বিলাত হইতে লিট্‌ল্ সাহেব আমাদের গণিতাধ্যাপক হইয়া আসিলেন। তিনি কেম্ব্রিজের উচ্চ র‍্যাংলার ছিলেন। পাস্ করিয়াই একেবারে পুরা অধ্যাপক হইয়া আসিলেন; বিপিন-বাবু কয়েক বৎসর চাকরী করা সত্ত্বেও কিন্তু তখনও সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। গণিতে লিট্‌ল্

সাহেবের বিদ্যার দৌড় কতটা ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু তিনি যে বিপিন-বাবুর মত শক্ত জিনিষও সোজা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না তাহা আমার মনে আছে। তাঁহার চেহারা ও অধ্যাপনা এখনও মনে পড়িতেছে। তাঁহার মুখের রং তৎকালে লাল ছিল, এবং তিনি কোটের নীচে, শীত না থাকিলেও, ফ্লানেলের কামিজ পরিতেন। কামিজের আস্তিন কোটের আস্তিনের চেয়ে খাট ছিল। যখন তিনি চা-খড়ি হাতে লইয়া হাত উঁচু করিয়া বোর্ডে লিখিতেন, তখন কামিজের কফ্ অল্প দেখা যাইত। গণিতের বহিতে যে-সব নিয়ম বিবৃত আছে ও অঙ্কের যে-সব উদাহরণ কষা আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যও তিনি বাম হাতে বহি খুলিয়া ধরিয়া বোর্ডে লিখিয়া আমাদিগকে শিখাইতেন। বিপিন-বাবুকে এরূপ কিছু করিতে কখনও দেখি নাই। তিনি যাহা কিছু শিখাইতে চাহিতেন, তাহাতে নিজের স্মৃতির সাহায্য লওয়াই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শিক্ষক হিসাবে তাঁহাতে ও লিটল্ সাহেবে এরূপ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও পেন্সন্ লইবার সময় তিনি মাত্র ছয়শত টাকা বেতন পাইতেন, আর লিটল্ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর্ হইয়া উহার প্রায় পাঁচগুণ বেতন ভোগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গুপ্ত মহাশয় সর্কারী শিক্ষাবিভাগে শেষ কাজ করেন কটকে রেভ্‌ন্‌শ কলেজে। তিনি সেখানে প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময় অধ্যাপনা ও ছাত্রদের থাকিবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়। তিনি নিজে পুরুষোচিত ক্রীড়ায় নিপুণ ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যেও তাহাতে খুব উৎসাহ দিতেন। গরীব ছাত্রদের জন্য সর্কারী কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করাইবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রাপাড়ায় দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিরন্ন লোকদের সাহায্যার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সাহায্যদানের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রফুল্লচিত্ততা ও সামাজিকতা ছাত্র, অধ্যাপক ও অপর সাধারণের সুপরিচিত ছিল।

বিশ্বভারতী পুনর্দর্শন

ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিন অনুপস্থিত থাকিবার পর কয়েক দিন পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। নূতন যাহা দেখিলাম, তাহাই বলিতেছি। ছাত্রদের থাকিবার জন্য একটি নূতন পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে তাহাদের থাকিবার সুবিধা হইয়াছে। একজন অধ্যাপক নূতন আসিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, এম্-এ। তিনি পূর্ব্বে বিহারের একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি তথাকার অধ্যাপকতা ত্যাগ করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এবং দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেশে দর্শন-শিক্ষার পর অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে দর্শনের চর্চ্চা করেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার আগমনে পুষ্ট হইয়াছে। ভিয়েনা হইতে কুমারী লিজা ফন্ পট্‌ নাম্নী এক মহিলা আসিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয় শিখাইতেছেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি গঠন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ বার্ষিক সভায় উহার ফেলো বা সদস্যদিগকে এক-একটি ফ্যাকাল্‌টি-ভুক্ত করেন। এক এক ফ্যাকাল্‌টিকে বিদ্যার এক এক শাখার সেবকমণ্ডলী বলা যাইতে পারে। যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি তাহার বিদ্বন্মণ্ডলীর অন্তর্গত হওয়াই স্বাভাবিক। তদনুসারে এক-একজন ফেলোর এক এক ফ্যাকাল্‌টি-ভুক্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সেনেটের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে কোন ফেলো বা সদস্য অন্য একটি ফ্যাকাল্‌টি-ভুক্তও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় মণ্ডলীতে নির্ব্বাচন যে ঠিক হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, যে, যে দ্বিতীয় বিদ্যার সেবা এই মণ্ডলী করেন, তিনি তাহাতে পারদর্শী।

কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায়, যে, একশত জন ফেলোর মধ্যে চল্লিশ জন দুটি ফ্যাকাল্‌টির সভ্য। তাহার ফল এই হইয়াছে, যে, আর্টস্ ফ্যাকাল্‌টিতে এত খাঁটি বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও আইনজীবী ঢুকিয়াছেন, যে, সাহিত্য-

ইতিহাসাদি শাখার লোকেরা কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন, তথায় তাঁহাদের কল্কে পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্, অধ্যাপক স্ববোধচন্দ্র মহলানবীশ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ গণেশ প্রসাদ আর্টস ফ্যাকাল্টিতে স্থান পাইয়াছেন। ইঁহারা নিজ নিজ বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য ইতিহাসাদি কিছুই জানেন না, ইহা আমাদের বক্তব্য নহে; বক্তব্য এই, যে, বিজ্ঞান ইঁহাদের প্রধান অনুশীলনের বিষয় বলিয়া তাহাতে ইঁহারা যেরূপ পারদর্শী অন্য বিষয়ে তেমন নহেন।

চিকিৎসক ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-ডি, যিনি কখনও কোন আর্টস্ ডিগ্রী লাভ করেন নাই, তিনিও আর্টস্ ফ্যাকাল্টিভুক্ত। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় যেমন পারদর্শী, সাহিত্য ইতিহাসাদিতে কি তেমন পারদর্শী?

ইতিহাসের অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দর্শনের অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্টস্ ফ্যাকাল্টি ছাড়া আইন ফ্যাকাল্টিভুক্ত। অথচ তাঁহারা কেহই আইন শিক্ষা দেন না, আইনের ব্যবসাও করেন না।

সেনেটের সদস্যেরা যদি, যিনি যে-বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহাকে কেবল সেই একটি বিদ্যার ফ্যাকাল্টিতেই স্থাপন করেন, তাহা হইলে কোন ফ্যাকাল্টির লোকদিগকে বাহিরের লোকদের চাপে প্রায় উদ্বাস্ত হইতে হয় না; এবং যাঁহারা যে বিষয়ে প্রকৃত অধিকারী সেই ফ্যাকাল্টির কাজ তাঁহাদের দ্বারাই সুনির্ব্বাহিত হইবার সুযোগ হয়।

আগামী ২৯শে জানুয়ারী সেনেটের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সেই দিন ফেলোরা নিজেদের কর্ত্তব্য কিভাবে করেন দেখিতে পাওয়া যাইবে।

—

সোদপুর খাদি কলাশালা

গত ১৮ই পৌষ মহাত্মা গান্ধী সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থলে শৃঙ্খলা রক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমুদয় স্থানটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

সোদপুরে প্রতিষ্ঠান-কর্ম্মীদের অবস্থান-গৃহ

সোদপুর কলাশালার পরীক্ষা-গৃহের এক অংশ

সোদপুর কলাশালার বস্ত্রশিল্পসম্বন্ধীয় সমুদয় কাজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা চলিতেছে। এইসব যন্ত্রের

অধিকাংশ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক পরিকল্পিত। উত্তম খাদি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার উদ্ভাবিত
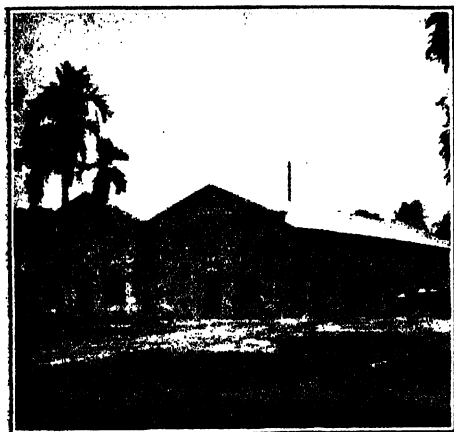
রন্ধনশালা

যন্ত্রগুলি ছাড়া আরও অনেক যন্ত্র এখানে ব্যবহৃত হয়। ধোলাই, রং করা, ইস্ত্রিকরা, প্রভৃতি কাজ এখানে বাষ্পের

কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন সভায় মহাত্মা গান্ধী

সাহায্যে করা হয়। সুতরাং মজবুতি, সূক্ষ্মতা বা স্থূলতার সাম্য, নম্বর, পাক প্রভৃতির পরীক্ষাও এখানে যন্ত্রের দ্বারা করা হয়। এই প্রকার নানা উপায়ে এখানে খাদির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এই কলাশালায় ইতিমধ্যে দুই শত নম্বরের সুতার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছে।

যে কারখানায় যন্ত্রের ও বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার আছে এবং এত বেশী পরিমাণে আছে, তাহার

কলাশালার প্রবেশ-তোরণ
উৎসব দিনের জন্য সাঁচী স্তূপ তোরণের অনুকরণে নির্ম্মিত

এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া মহাত্মাজী কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন
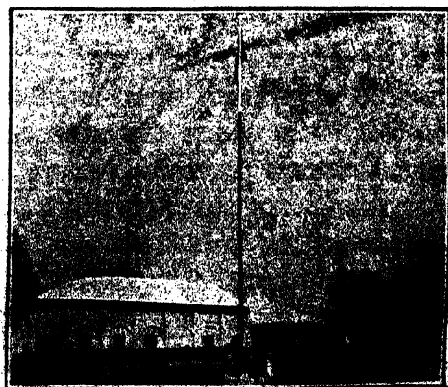
দ্বারোদ্ঘাটন মহাত্মা গান্ধী করায়, এই অনুমান করা যাইতে পারে, যে, তিনি যন্ত্র বলিয়াই যন্ত্রের ব্যবহারের বিরোধী নহেন, এবং যদি কেহ সুতা কাটিবার এরূপ সস্তা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন যাহা ক্রয় করা ও ব্যবহার করা কুটীরবাসী গ্রাম্য দরিদ্র লোকদেরও সাধ্যায়ত্ত, তাহা হইলে তাহার ব্যবহারে তাঁহার আপত্তি হইবে না। কারণ, তাহা ব্যবহার করিলে গরীব কাটুনীদের উপার্জ্জন বাড়িবে। অল্প শ্রমে ও সময়ে অধিক উপার্জ্জন হইলে তাহারা অবসর-সময়ে জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধর্ম্মচিন্তা করিতে পারিবে।

খদ্দরের বিস্তৃত প্রচলন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। সেই জন্য ইহাও আমরা ইচ্ছা করি, যে, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং অন্য যাঁহারা খদ্দর বয়ন করেন, তাঁহাদের প্রস্তুত বস্ত্র আরও উৎকৃষ্ট ও সস্তা হউক। তাহা হইলে উহা সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারিবে।

—

উদারনৈতিক সংঘের বার্ষিক সভা

এবার আকোলা সহরে উদারনৈতিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। স্যার্ শিবস্বামী আয়য়ার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি খুব বিচক্ষণ লোক। তিনি স্বরাজদলের মতামত ও কর্ম্মনীতির বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিও স্বরাজীদিগকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েন নাই। এবারকার কংগ্রেসের সভাপতির ও অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির অভিভাষণে এরূপ কোন সমালোচনা গঞ্জনা ছিল না। এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভিভাষণ দুটি উদারনৈতিকদের অভিভাষণ দুটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আয়য়ার মহাশয়ের মতে উদারনৈতিকদিগের মত ও কার্য্যপ্রণালীই ঠিক্ ও খাঁটি। তাহা সত্ত্বেও যে দেশের লোক তাঁহাদের অনুসরণ করে না, তাহার নানা কারণ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটি কারণ বলেন নাই। বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় দেশের লোকেরা ব্রিটিশ রাজপুরুষদের প্রতিশ্রুতিতে ও সত্যবাদিতায় এখন আর বিশ্বাস করে না। উদারনৈতিক-দলেরও বড় বড় নেতা—যেমন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—ব্যক্তিগত ভাবে ব্রিটিশ ন্যায়পরতা ও মহাশয়তার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু উদারনৈতিক দল এখনও ঐ ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপরই নির্ভর করেন। আয়য়ার মহাশয় স্বয়ংও তাঁহার বর্ত্তমান বক্তৃতারই শেষে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মহানুভবতায় আপীল করিয়াছেন। উদারনৈতিকদের প্রতি দেশের লোকদের বীতশ্রদ্ধ হইবার কারণ ইহা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে। আর একটা কারণ এই, যে, ব্রিটিশজাতি যদি সদাশয় হইতও, তাহা হইলেও, মানুষের যাহাতে স্বাভাবিক অধিকার আছে, দেশের লোক তাহা ব্রিটিশ প্রভুদের নিকট হইতে ভিক্ষারূপে চাহিতে বা লইতে রাজী নয়। তাহারা নিজেদের সাহস, শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা তাহা অর্জ্জন করিতে চায়। তাহারা এখনও এই প্রকারে উহা অর্জ্জন করিবার পন্থা ও উপায় খুঁজিয়া পায় নাই বটে; কিন্তু তাহারা বরং অনির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিবে, তবু জন্মগত অধিকার পাইবার নিমিত্ত ভিক্ষুকের মত হাত বাড়াইবে না।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন

আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম, যে, দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এবার তেইশটি স্থান হইতে মোট ৯৩জন প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন; পুরুষ ৬৮জন, মহিলা ১৪জন, ছাত্র ১১জন। স্থানগুলির নাম কানপুর, ঝাঁসী, মীরাট, এলাহাবাদ, রুড়কী, ইন্দোর, সাহারানপুর, দেরাদুন, পাটিয়ালা, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, বুলন্দসহর, চন্দৌসী, মজঃফরনগর, লাহোর, হরিদ্বার, পেশাওয়ার, বালুচীস্থান, জম্মু, বস্তি, জয়পুর, কলিকাতা, দার্জ্জিলিং। শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার মহিলাসমিতির সভাপতিরূপে দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়াছিলেন। প্রবন্ধাদি তিনদিনের মধ্যে সমস্ত পঠিত না হওয়ায় অধিবেশন চার দিন হইয়াছিল। মহিলারা স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইয়া মহিলাসম্মিলনীর কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনী এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষোড়শী যত্নের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ডাকঘর অভিনয়ের যে সচিত্র অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি, তাহার পারিপাট্য হইতে অভিনয়ের সুব্যবস্থা অনুমেয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তিনি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বাংলাভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ক প্রকাণ্ড ইংরেজী গ্রন্থের "শাঁসটুকু" শ্রোতাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে অন্য অনেক কথাও ছিল।

প্রবাসী বাঙালীরা যে বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বাংলা সাহিত্যের হাওয়ায় বাস করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। তাঁহারা, যিনি যেখানে থাকেন, সেখানকার সব কাজে যোগ দিয়া স্থানীয় মানসিক হাওয়ার উপকারও লাভ করিলে তাহাও খুব স্বাভাবিক।

—

শিখ মিছিল ও গুণ্ডার উপদ্রব

শিখেরা প্রতি বৎসর গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। এ বৎসরও তাঁহারা গত ২৫শে পৌষ রবিবার তাঁহাদের বালীগঞ্জস্থ গুরুদ্বারা হইতে মিছিল করিয়া চৌরঙ্গী ও চিত্তরঞ্জন আভিনিউ দিয়া হারিসন রোডে আসেন। স্থানে স্থানে মুসলমান দর্শকেরা মিছিলের লোকদের উদ্দেশে চীৎকার করে। হারিসন রোডস্থিত আলফ্রেড থিয়েটারের নিকটবর্ত্তী এক [illegible] গলি হইতে জনতার উপর প্রস্তরাদি নিক্ষিপ্ত হয়। পাঁচজন হিন্দু ও একজন শিখ ছোরার আঘাতে আহত হয়। আঘাতকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া পুলিশ কলাবাগান বস্তীর পঞ্চান্ন জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মিছিলের সঙ্গে বরাবর পুলিস পাহারা ছিল। অশ্বারোহী সশস্ত্র পাহারা, সশস্ত্র গুরখা কনষ্টেবল, ইউরোপীয় সার্জেণ্ট, সবই ছিল। তথাপি গুণ্ডাদের উপদ্রব হইয়াছিল। তাহারা বোধ হয় মনে করে, পাহারা-টাহারা লোকদেখান ব্যাপার, রাজত্বটা আসলে তাহাদের।
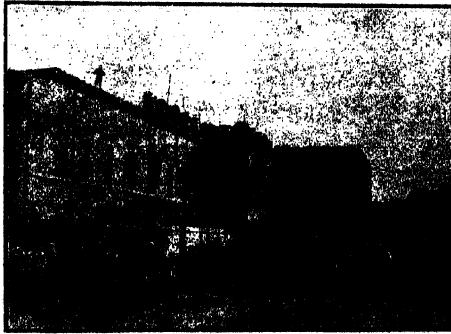
হারিসন রোডে শিখ শোভাযাত্রা—এইস্থলে গুণ্ডার উপদ্রব হয়

বালীগঞ্জ শিখ গুরুদ্বারা হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইতেছে

—

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ

চারি মাসেরও অধিক হইল পটুয়াখালিতে এই সরকারী হুকুম হয়, যে, হিন্দুরা একটা জায়গা দিয়া গীতবাদ্য সহকারে যাইতে পারিবে না। সরকারী রাস্তা দিয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া এই প্রকারে গমন বন্ধ করিবার বৈধ ক্ষমতা কোন রাজ-কর্ম্মচারীর থাকিতে পারে না। হিন্দুদের উপরই বিশেষ করিয়া যে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা নানাস্থানে হইতেছে, তাহা নির্ব্বিবাদে মানা উচিত নয়। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা যে অবৈধ তাহা কোন কোন হাইকোর্ট ও প্রিভী কৌন্সিলের বিচারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতএব পটুয়াখালিতে হিন্দুরা যে ১৩৭ দিন ধরিয়া প্রত্যহ উক্ত হুকুম অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ স্থানে কীর্ত্তনাদি করিতে গিয়া ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থান-সকলের হিন্দুদের সহানুভূতি ও সমর্থন

স্বভাবতই পাইতেছেন। এই সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হইলে ন্যায়েরই জয় হইবে।

—

কংগ্রেসের দুরবস্থা

আমাদের জাতীয় জাগরণের কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনের কথা। ইংরেজের আমাদিগের উপর যে প্রভুত্ব তাহা যে তাঁহাদের আর্থিক লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই উদ্ভূত এবং আর্থিক লাভের দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছে, একথা আমাদের দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিগত শতাব্দী হইতে দেশের লোককে বলিয়া আসিয়াছেন। অর্থনৈতিক দাসত্বই যে আমাদের দাসত্বের মূল সূত্র একথা বুঝিতে পারিয়াই স্বদেশীর যুগের বিচক্ষণ দেশনেতাগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন। পরের যুগে যে দেশনেতাগণ সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা বলা চলে না; **কিন্তু কার্য্যতঃ** তাঁহারা বক্তৃতা ও "সেবার" প্রতি এত অধিক মনোযোগ দিয়াছেন যে ভারতে, বিলাতী অর্থনীতি আজ বাধা পাওয়া ত দূরের কথা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান দেশনেতাগণের বাক্যের প্রতি আকর্ষণ এত বেশী যে, তাঁহারা বাক্যের বন্যায় ভাসিয়া সাধারণত কার্য্যক্ষেত্রের বহুদূরে গিয়া পড়েন। যে-ক্ষেত্রে আমরা হয়ত সামান্য সামান্য বিষয়ে ইংরেজ বণিকের দাসত্বে আবদ্ধ সে-ক্ষেত্রে নেতাগণ বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ে কি ভাবে ইংরেজকে ঘায়েল করা যায় তাহার গবেষণায় ও উন্মত্তের ন্যায় বক্তৃতায় কালাতিবাহন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গবেষণাও যে সর্ব্বক্ষেত্রে স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক হয় তাহা বলা চলে না। অর্থনৈতিক যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। যে কোন ব্যক্তি খদ্দর পরিধান করিলে, জেলে যাইলে, এমন কি বিশেষরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেই এই যুদ্ধের সেনাপতির কার্য্য করিতে পারে না। ইহার সেনাপতিত্ব রিফর্ম্‌ড্ কাউন্সিলে অধিক ভোট পাইয়া প্রবেশ করিলেও যথাযথরূপে করা যায় না। অপর যে-কোন দুরূহ বিষয়ের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও শিক্ষা সাধনা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে আছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, তাহার সুসমাপন করিতে হইলে আমাদের সকল বিষয় গভীররূপে বিশেষজ্ঞের সাহায্যে আলোচনা করিয়া পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। উত্তেজিত কণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া একাজ হইবে না।

তারপর "সেবা"র কথা। এই দেশ-সেবার নাম করিয়া আজ যাহা যাহা হইতেছে তাহা কি সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক? এ কথা কি সত্য নয় যে "দেশ-সেবা" নামের অন্তরালে অনেক অপারগতা, অনেক অলসতা, অনেক ভণ্ডামি লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি সেবক নামে খ্যাত তাহাদের মধ্যে বহু নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক দেশের লোককে ফাঁকি দিয়া দেশবাসীর কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থে পোষিত হইতেছে বলিয়া যে-ধারণা দেশে আজ হইয়াছে তাহাও কি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন? আমাদের মনে হয় না, যে এইসকল সন্দেহের মূলে কিছুই নাই। দেশ সেবার পুণ্যব্রতের ছল করিয়া যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কার্য্যে কেহ অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা ঘৃণ্য আর কাহাকে বলিব? আমাদের দেশের লোকেদের সকলের চরিত্র যে এইরূপ একথা বলা যায় না। আমাদের দেশে শত সহস্র নিষ্কাম, অক্লান্তকর্ম্মী, শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি আছেন। অপকর্ম্মী ও নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকের সংখ্যা অল্পই; কিন্তু তাহাদের স্পর্শে আজ সকলের নামে কলঙ্ক আসিতেছে। ইহার জন্য দায়ী আমাদের বর্ত্তমান অবিবেচক শক্তিলোলুপ নেতৃবৃন্দ। নিজেদের শক্তি (?) অপ্রতিহত রাখা, নিজেদের নেতৃনাম বজায় রাখার জন্য দেশের উন্নতির, দেশবাসীর মঙ্গলের, সত্যের ও শুচিতার আদর্শ ইঁহারা যে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ক্ষোভের বিষয় এই যে, দেশবাসী অনেক লোক যথেষ্ট চিন্তা না করিয়া ইঁহাদের সাহায্য ও সমর্থন করিয়া থাকেন। **দাসত্ব অপেক্ষাও বড় অপমান ও অধিক অবনতি মানুষের হইতে পারে।** তাহা চরিত্রের অবনতি। যদি কোন জাতি সত্যকে সত্য না বলে, মিথ্যাকে ঘৃণা না করে, প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস

রক্ষা না করে, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য না মানে, সে জাতির স্বাধীনতা থাকিলেও তাহার স্থান উন্নতচরিত্র দাস-জাতি অপেক্ষা নীচে। আমাদের যে জাতীয় অবনতি ও দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের চরিত্র। একদিন আমরা মানব-জীবনের উন্নত আদর্শ ভুলিয়াছিলাম বলিয়াই আমরা আজ পরপদানত হইয়াছি। এখনও যদি আমরা চরিত্রহীনতাকে ভয় না করি, ঘৃণা না করি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি অসম্ভব। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু সে যে ক্ষুদ্র লাভের আশায় দেশের মঙ্গল ও আদর্শকে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দেশবাসীর আজ গভীর চিন্তার সময় আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও উন্নতি আগে, না, রাষ্ট্রমঞ্চে বীররসের প্রবাহ বজায় রাখা আগে? বাক্যে যে স্বাধীনতা লাভ হয় না তাহা আমরা বুঝিয়াছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে বহু পরিমাণে নিজেদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে তাহাও বুঝিয়াছি এবং বক্তৃতার ধোঁয়ায় নিজেরাই অন্ধ হইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয় না তাহাও বুঝিয়াছি। তবে কোন্ শুভ বা মঙ্গলের আশায় বক্তৃতা-মঞ্চের অধীশ্বরদিগের পশ্চাতে ছুটিয়া আমরা পণ্ডশ্রম করিতেছি?

কংগ্রেস আজ একদল ক্ষমতাপ্রিয় অবিচক্ষণ লোকের হাতে পড়িয়াছে। এমন কথাও শুনা যায়, যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের অধিনায়কবৃন্দ যাহাতে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য বাহিরের অপরাপর লোকের কংগ্রেসে প্রবেশের পথে বহুপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছেন। সর্ব্বদা খদ্দর পরিধান বিধি ইহার একটা উদাহরণ। শুনা যায় যে, এ নিয়ম মানিয়াও কংগ্রেসের সভ্য হইলে কাহারও পক্ষে কংগ্রেসের ভিতরের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এসকল কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। দাস-জাতির কংগ্রেসের নেতা বা সভ্য হওয়া প্রথমতঃ একটা মহা গৌরবের বিষয় নহে, তাহার উপর যদি নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেসকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের যাহা আসল উদ্দেশ্য তাহা সফল কিছুতেই হইবে না। কেননা আমরা শক্তিহীন বলিয়াই আমাদের পক্ষে বহুলোক একত্র না হইলে কোন কার্য্যে সফলতা লাভ সম্ভব হইবে না। যাঁহারা কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পদ হইতে নামাইয়া ক্ষুদ্র দলে পরিণত করিতেছেন, তাঁহারা জাতির ক্ষতি করিতেছেন। তাঁহারা অবশ্য একথার বিরুদ্ধে খুব উচ্চ গলাতেই প্রতিবাদ করিবেন, হয়ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন, যে, তাঁহারা ব্যতীত দেশভক্ত বা দেশের সেবক আর কেহ নাই; কিন্তু আমরা অল্প লোকেই তাঁহাদের কথার সত্যতা স্বীকার করিব। কংগ্রেসকে সার্ব্বজনীন করা দরকার। তাহার যদি দুই পাঁচজন "নেতা" পদচ্যুত হন, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সে-ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

কংগ্রেস শেষ হইবার পরেই ম্যান্চেষ্টার হইতে খবর পাওয়া গেল যে সেখানকার কাপড়ের কলের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে; কারণ, **ভারতীয় অর্ডার অনেক বেশী বেশী আসিতেছে।** ইহা কি কংগ্রেসের দৈন্যেরই প্রমাণ নহে? ২৫ লক্ষ টাকার খদ্দর কম বা অধিক প্রস্তুত হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাহার ফল বিশেষ হইবে না—যদিও খদ্দর তৈয়ারী হইলে তাহাতে লাভ বই লোকসান হইবে না—সুতরাং খদ্দর-পূজার দোহাই দিয়া কংগ্রেসকে শক্তিহীন করিয়া রাখার ফলে দেশের অমঙ্গলই হইবে। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই দিকে মন দেওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস সকল দেশ-সেবকের মিলন-ক্ষেত্র এবং খদ্দর প্রস্তুত বা পরিধান ব্যতীত অপর বহু দেশ-সেবার উপায় আছে।

অঃ

—

গৌহাটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ হইতে গৌহাটি অতি দূরে অবস্থিত। সেই কারণে এখানে কংগ্রেসের বহু প্রতিনিধির সমাগমের আশা স্বভাবতই করি নাই। তথাপি যে সেখানে দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল আছে। গৌহাটি সহরটি ছোট। তাহা সত্ত্বেও অভ্যর্থনা-সমিতি যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন তাঁহার বক্তৃতায় আসামের অতীত ইতিহাসে বীরত্বের পরিচায়ক কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন, যে, সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম এখনও আসামে যেরূপ প্রভাবশালী অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ নহে। ঐ প্রদেশে বস্ত্রবয়ন এখনও কুটীরশিল্প রূপে সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেরূপ প্রচলিত, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ নহে। ইহা খুব সুলক্ষণ। অনেক স্থানে ভদ্রগৃহের নারীরা অবসর সময় আলস্যে পরনিন্দায় বা খেলায় নষ্ট করেন। কিছু সময় খেলায় বা অন্যরূপ চিত্তবিনোদনে কাটান আবশ্যক; কিন্তু বাকী সময় দরকারী কাজে যাপন করা বিধেয়। আসামে বহু পরিবারে যে তাহাই হইয়া থাকে, ইহা সন্তোষের বিষয়।

ফুকন মহাশয় কংগ্রেসকে আসামের মত প্রদেশের ক্ষুদ্র

শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন
জাতীয় মহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বারদলই
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক

রাজধানী গৌহাটিতে নিমন্ত্রণের জন্য সবিনয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্যে এবং অহিফেন বিষে জর্জ্জরিত আসামকে বিষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আসামের যে-সকল স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি কারাদণ্ড ভোগ ও অন্য নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ দুঃখলাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া আসামের লোকহিত-ব্রত ব্যক্তিরা উহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। তীর্থদর্শনের নিমন্ত্রণের জন্য কোন কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক।

ফুকন মহাশয় দেশের বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে নিরাশ নহেন; তিনি উহা সুদূরপরাহতও মনে করেন না। তাঁহার এই আশাশীলতাতে আমরা সন্তুষ্ট কারণ, আমরাও আশাশীল এইজন্য, যে, তাঁহারা এই আশা-প্রকাশ ও মত-প্রকাশ বাক্য-বীরের ফাঁকা উচ্ছ্বাস নয়; তিনি দেশের বন্ধনমুক্তির জন্য খাটিয়াছেন এবং দুঃখলাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। কারাগারের অন্ধকার ভেদ করিয়া যে-আলোক তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা সত্য আলোক, আলেয়া নহে।

গৌহাটির কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মান্দ্রাজের এডভোকেট জেনারেল্ ছিলেন। তাহা এবং আইনের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া তিনি রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন। কেহ কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহা তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তজ্জন্য তাঁহার কথারও মূল্য বাড়ে। বস্তুতঃ আয়েঙ্গার মহাশয়ের বক্তৃতার বহু অংশ সুযুক্তিপূর্ণ। তিনি দ্বৈরাজ্যের শূন্যগর্ভতা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাও উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন, যে কেবল দ্বৈরাজ্য উঠিয়া গেলে এবং মন্ত্রীদের হাতে

সমুদয় সরকারী কাজ হস্তান্তরিত হইলেই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব পাওয়া যাইবে না। অন্য সব ব্যবস্থা এখনকার মত থাকিলে গবর্ণর ও আমলাতন্ত্র বর্ত্তমানের মতই সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবে, তাহারা ও মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার নিকট বা দেশের লোকদিগের নিকট দায়ী হইবে না। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট্ ব্যবস্থাপক সভার নিকট বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে; উহাকে দায়ী করিতে না পারিলে প্রকৃত স্বরাজ লব্ধ হইবে না।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, যে, ভারতীয় সৈন্যদল ও সামরিক বিভাগ এবং রণতরী বিভাগ দেশের লোকদের অধীন না হইলে স্বরাজের কোন মূল্য থাকিবে না। স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ ও আকাশযুদ্ধ ভারত-বাসীদের দ্বারা চলিতে পারে।

দেশের সমুদায় রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পাদনে আমাদের সামর্থ্যে কি আমরা সন্দিহান? এই প্রশ্ন করিয়া তিনি বলেন, দেশের সব কাজই ত বস্তুতঃ দেশের লোকই করে। মাথার উপর কতকগুলি ইংরেজ আছে মাত্র। অবশ্য তাহাদের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের কিছু মূল্য আছে। কিন্তু ঐ রূপকাজের ভারও যে-সব স্থলে দেশী লোকদের হাতে পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
জাতীয় মহাসভার সভাপতি

সভাপতি মহাশয় কৌন্সিলের বাহিরে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের উল্লেখ ও আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ দ্বৈরাজ্য, কৌন্সিল, কৌন্সিলে স্বরাজ্যদলের কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ। গঠনমূলক কার্য্যের উল্লেখ ও আলোচনা কতকটা পিত্তিরক্ষা গোছের হইয়াছে। ইহা বলিয়া আমরা এরূপ ইঙ্গিত করিতেছি না, যে, এরূপ কাজে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ নাই বা ইহার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন না। তাঁহার বক্তৃতায় বস্তুতঃ কোন বিষয়ে কতটা স্থান সময় ও মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

কৌন্সিলে কার্য্যপ্রণালী তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বা কংগ্রেসের প্রস্তাবে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত "পারস্পরিক সহযোগী" বা উদার-নৈতিকদের অনুসৃত কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ কোন প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না। দলের নামের প্রভেদই সব চেয়ে বড় প্রভেদ মনে হইল। সব দল মিশিয়া একটা বৃহৎ দল হইলে, বর্ত্তমান দলগুলির চাঁইয়েরা প্রত্যেকেই সম্মিলিত দলের চাঁই হইতে পারিবেন না, ইহা একটা মুস্কিল বটে।

সভাপতির ও কংগ্রেসের কৌন্সিল-কার্য্যপ্রণালী বা অন্য কোন দলের কৌন্সিল-কার্য্যপ্রণালী হইতে সাক্ষাৎভাবে কেমন করিয়া স্বরাজ অর্জ্জিত হইবে, আমরা বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য বৃটিশ জাতি ন্যায়পরায়ণ হইয়া ও দয়া করিয়া

আমাদিগকে স্বরাজ বর দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমাদের পৌরুষ ও কৃতিত্ব কোথায় ?

আগে আগে স্বরাজ্যদল সমস্ত জাতির নিরুপদ্রব আইন অমান্য করার কথা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলিতেন। এবার স্বরাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি এবিষয়ে একেবারে চুপ। তিনি মস্ত উকীল ছিলেন; সুতরাং ওকালতী কৌশল অনুসারে ওবিষয়ে নির্ব্বাক্ থাকাই শ্রেয় বুঝিয়া থাকবেন।

মন্ত্রীদের কাজ কেন লওয়া যাইতে পারে না, তাহার কারণ স্বরাজীদের পক্ষ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন। দু-একটি কারণ ঠিক্। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্ব লইলে ভারতসংস্কার আইন চালাইতে গবর্ণ্মেণ্টের সাহায্য করা হইবে, সে-আপত্তি ত ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির কাজের সম্বন্ধেও খাটে। সভাপতিও ত ঐ আইন অনুসারে কাজ করিয়া গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য করেন। অথচ স্বরাজীরা ঐ পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আয়েঙ্গার মহাশয় বলিয়াছেন, এদেশে বস্তুতঃ দুটি রাজনৈতিক দল আছে বা থাকা উচিত—গবর্ন্মেণ্টের দল এবং জাতীয় আত্মকর্তৃত্বপ্রার্থী দেশের লোকদের দল। ইহা সত্য কথা। এই কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের জন্য সকল দলের সম্মিলন ও সম্মিলিত চেষ্টা বাঞ্ছা করেন। তাঁহার এই ইচ্ছা যে আন্তরিক, তাহার একটি প্রমাণ এই, যে, তিনি তাঁহার অভিভাষণে নিজের দলের প্রতিযোগী কোন দলের নিন্দা বা সমালোচনা করেন নাই।

সর্ব্বদা যাঁহারা কেবল মাত্র খদ্দর ব্যবহার করেন, তাঁহারাই কেবল কংগ্রেসের সভ্য হইবার অধিকারী, এবারকার কংগ্রেসে এই যে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই। আমরা খদ্দর প্রত্যহ ব্যবহার করি, কেবলমাত্র খদ্দরের সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ পরিচ্ছদ পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা করিতে পারি না। অবশ্য আমরা কংগ্রেসেও বহু বৎসর যোগ দি নাই। কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সর্ব্বদা খদ্দর ব্যবহারে আমাদের মত বাধা থাকিতে পারে, কিম্বা তাঁহারা স্বদেশী মিলের স্বদেশী সুতার কাপড় ব্যবহার খদ্দর ব্যবহারের সমান মনে করিতে পারেন। এরূপ কারণে তাঁহাদের কংগ্রেসে যোগদানে বাধা জন্মান উচিত নহে।

—

আবার বোমা আবিষ্কার

কে যেন বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির একটা ছন্দ আছে এবং সৃষ্টিতে সকল কিছুই তালে তালে চলে, বেতালা কোন কিছুর সৃষ্টিতে স্থান নাই। বাংলা দেশের পুলিসের কার্য্যে এই তালে তালে চলার পরিচয় খুব পাওয়া যায়। এটা কুচ-কাওয়াজের চাল অথবা সৃষ্টির ছন্দোবদ্ধতার প্রকাশ মাত্র, তাহা বলা শক্ত। এক একবার করিয়া রাজবন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়ার কথা উঠে আর কলিকাতা পুলিসের খানা-তল্লাসের ফলে বোমা রিভলভার গুলি বারুদ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি আবার খানা-তল্লাসের ফলে বোমার খোল প্রভৃতি নানা প্রকার সরঞ্জাম ধরা পড়িয়াছে। এইসকল আবিষ্কার অবশ্য রাজবন্দীদের মুক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া জনসাধারণ, ও হয়ত, গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হয়, কিন্তু রাজবন্দীদের সহিত যে এইসকল ব্যাপারের কোন সংস্রব আছে তাহা কখন প্রমাণিত হয় না। সুতরাং বোমা আবিষ্কার হোক আর না হোক রাজবন্দীদিগের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে তাহার কোন মূল্য নাই। তাহারা বিনা বিচারে জেলে আবদ্ধ থাকিয়া বৃটিশ রাজনীতি ও ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে জগতের নিকট সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। রাজবন্দীদের মুক্তির কথা উঠিলেই পুলিসের খানাতল্লাসের উৎসাহ বাড়িয়া যাইলেও সে খানাতল্লাসের ফলের সহিত রাজবন্দীদের যোগ প্রমাণিত হয় না। এই দুইয়ের ভিতর কোন যোগ প্রমাণিত হয় নাই, একথা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার।

—

চিত্র-পরিচয়

১। অস্ত্রনির্ম্মাণরত সামুরাই।—জাপানের যোদ্ধা ক্ষত্রিয় জাতিকে সামুরাই বলে। অস্ত্র তাহাদের নিকট পূজোপকরণের মত পবিত্র। অস্ত্রনির্ম্মাণে দেবারাধনার নিষ্ঠা ও নিয়মপালন প্রয়োজন। চিত্রে নিবিষ্টচিত্ত সামুরাই যথানিয়মে অস্ত্রনির্ম্মাণে নিযুক্ত। সম্ভবত কোনো দেবতা তাহার সহায় হইতে উপস্থিত হইয়াছেন।

২। অর্জ্জুন।—অর্জ্জুনের অজ্ঞাতবাস ও ব্রহ্মচর্য্যের সময় অরণ্যে তিনি অস্ত্র-আরাধনায় নিযুক্ত।

৩। বাল্মীকি।—ক্রৌঞ্চ-দম্পতির শোকে বাল্মীকি শোকার্ত্ত। ছবিটিতে বেদনার ভাব সুন্দর ফুটিয়াছে।

—

ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ ৪৯৫ দ্বিতীয় স্তম্ভ নীচের দিক্ হইতে ৬ষ্ঠ পঙক্তিতে "পৌল" কথাটির পরে "সে" হইবে।

পৃঃ ৫০০—২য় কলম—১৫ লাইন—দিগ্‌গজ স্থানে দিঙ্‌নাগ হইবে।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 1-27.

লুকোচুরি

আধুনিক জাপানী চিত্র

(শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চীর সৌজন্যে)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩৩

৫ম সংখ্যা

উদ্বৃত্ত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

["পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি" ১৩৩১—৩২ সালের "প্রবাসীতে" ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার পাণ্ডুলিপি হস্তগত হওয়ায় অনেক নূতন জিনিষ চোখে পড়িল যাহা রচনা ছাপিবার সময় কবি বাদ দিয়াছেন বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এইসকল অংশ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত রচনার সমতুল্য মনে হওয়ায় তাহা একত্র করিয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।]

গাছতলায় শুক্‌নো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচা পাকা ফল কিছু না কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জ্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে যে লেখার টুক্‌রোগুলি আমার তরুণ বন্ধু কুড়িয়ে পেয়েচেন,মনে হচ্চে, সেগুলি সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডারে তোল্‌বার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝ্‌তে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্চে দ্বীপ-শ্রেণী—ছোট এক এক দল জাতির চারিদিকে বৃহৎ অজাতির লবণ সমুদ্র; পরস্পর-সংলগ্ন মহাদেশের মত নয়। জাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার কর্‌চি; অর্থাৎ যে কয়জনের মধ্যে জানা-শোনা আছে, আনা-গোনা চলে। আমাদের দেশে পরস্পর আনা-গোনার জন্য জানা-শোনার দরকার হয় না। আমরা ত খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম,তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট কর্‌তে আমাদের সঙ্কোচ মাত্র নেই।

আবার অন্যপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশী ব্যয়সাধ্য,সুতরাং যেখানে সময় জিনিষটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই কর্‌তে বাধ্য,সেখানে মানুষে মানুষে মিল কেবলি বাধা-গ্রস্ত হবেই,আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হ'তে থাক্‌বে ততই মানুষের সর্ব্বনাশের দিন ঘনিয়ে আস্‌বেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিষ সংগ্রহ করেচে, বিস্তর বই লিখেচে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেছে, কেবল নিজে গেছে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্ত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে ব'লেই আজ মানুষ খুব সমারোহ ক'রে আপন গোরস্থান তৈরি কর্‌তে বসেচে।

২৬ সেপ্টেম্বর

একজন আধুনিক জাপানী রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে মাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম্-গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহু-ভঙ্গীর মত সূর্য্যের দিকে প্রসারিত, শাদা শাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম্-গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোক-পিপাসু দুই চক্ষু সূর্য্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করচে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেচেন, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেচেন। তাঁদের ধ্যান-মন্ত্রে সূর্য্যকে তাঁরা বলেচেন—"ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ"—আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করচেন।

ঈশোপনিষদে বলেচেন, হে পূষণ, তোমার ঢাকা খুলে ফেল, সত্যের মুখ দেখি—আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলচে, হে পূষণ, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেল, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক্। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিঃশ্বাস পূর্ণ কর,—সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক্। আমার প্রাণ যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে, তখনি ত ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং, আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেম্নি সুখ-দুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্চে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্পপল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়চে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে, তেম্নি তোমারি গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চলল। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, তার এত ভাঙা, এত গড়া,—তার সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথ যাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই ত গাছ হ'য়ে, ঘাস হ'য়ে আকাশে উঠচে, বলচে অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলচে, অপাবৃণু, ঢাকা খোল। জীব বলচে, আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ স্বরূপ দেখি। হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক্, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক্—সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই!

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হ'য়ে যাক্, সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে আর উঠতে নাম্‌তে পারিনে; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক্ তা নয়, পাত্রটাই যাক্ ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না ক'রে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু; সত্যের মুখ খুলে দাও,—একে অন্তরে বাহিরে ভাল ক'রে দেখি, তাহ'লেই অনেককে ভাল ক'রে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই ব'লে আমি বলব না, গান যাক্ লুপ্ত হ'য়ে; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তাহ'লেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত ক'রে দেখব।

২৭ সেপ্টেম্বর

বয়স যখন অল্প ছিল তখন অনেক ঘটনা ঘটেচে যা মনকে খুব নাড়া দিয়েচে। এই ঘটনাগুলোর সত্যের গৌরব যদি যাচাই করতে চাই, তবে দেখতে পাব দুই বড় বড় সাক্ষী দুই রকমের বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওজনের মিল নেই। বৈজ্ঞানিক পুরাতাত্ত্বিক যে প্রমাণকে সব-চেয়ে খাঁটি ব'লে মানে, সে হচ্চে, যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ প্রমাণ, সে হ'চ্চে নির্ব্বিশেষ। কিন্তু মানুষ যেহেতু একান্ত বৈজ্ঞানিক নয়, সেইজন্যে মানুষের জগতে যে, সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি যদি নিতান্ত তুচ্ছ না হয় তাহ'লে তাদের ওজন সাধারণ বাটখারার ওজন মানে না। তাদের বেলায় বিজ্ঞানকে ছুট ক'রে দিয়ে কোথা থেকে একটা অসাধারণ তুলাদণ্ড এসে খাড়া হয়। বৈজ্ঞানিক সেই ওজনটাকে সাধারণ ওজনের সঙ্গে মিল করতে গিয়ে ভারি গোলমাল করতে থাকে। একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত দেখা যাক, বুদ্ধদেব। যদি তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকৃত তাহ'লে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোট-খাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক ব'লে গণ্য করা যায় তাহ'লে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্চে, পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরেজিতে যাকে বলে perspective। যে-জনতাকে আমরা সর্ব্বসাধারণ বলি সে কেবল ক্ষণকালের জন্যে মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধ'রে মানুষের চিত্তকে অধিকার ক'রে থাকেন। যে গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হ'ল সাধারণ মানুষ। তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামী জিনিষের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধ'রে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেচে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মত এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে? সিনেমা-ছবিতে, গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে ত ক্ষণকালের বুদ্ধ, সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে ব'সে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তিপ্রেমের অর্ঘ্যে অলঙ্কৃত হ'য়েচেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হ'য়েই চলেচে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকালপাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে,—সেই বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া যাবে না। যদি কোনো অণুবীক্ষণ নিয়ে সেই-গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তাহ'লে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে। যে-মানুষ আপন সাধারণ-ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে বিশেষ দিনে জন্মলাভ ক'রে বিশেষ দিনে ম'রে গেচেন তিনি বুদ্ধই নন। মানুষের ইতিহাস সেই আপন বিস্মরণশক্তির গুণেই সেই ছোট বুদ্ধের প্রতিদিনের ছোট ছোট ব্যাপার ভুলে যেতে পেরেচে, তবেই একটি বড় বুদ্ধকে পেয়েচে। মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটো-গ্রাফের প্লেটের মত সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হ'ত তাহ'লে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে মরত, বড় জিনিষ থেকে বঞ্চিত হ'ত।

বড় জিনিষ যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্ম্মকভাবে থাকতেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি, নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নিয়তই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেননা, বড় জিনিষের সঙ্গে তার যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেমনি তাদের প্রাণ দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়চে। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবন-চরিত লিখেচেন। বর্ত্তমান কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলচেন, এ লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা

বটে। অর্থাৎ টল্‌স্‌টয় দোষেগুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েচে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়্‌লে মনে হয় টল্‌স্‌টয় যে সর্ব্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড় তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আস্‌চে। টল্‌স্‌টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না একথা বলাই চলে না, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতই, এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্ব্বল একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে-সত্যের গুণে টল্‌স্‌টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্ত্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তাহ'লে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কি? প্রথম যখন আমি দার্জ্জিলিং দেখ্‌তে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক্‌, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হ'ত। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন ক'রে দেখাই আর্টিষ্টের দেখা একথা মান্‌তে পারিনে। তা ছাড়া গোর্কির আর্টিষ্ট-চিত্ত ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্ব্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টল্‌স্‌টয়ের যে-ছায়া পড়েচে সেটা একটা ছবি হ'তে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন ক'রে বল্‌ব? গোর্কির টল্‌স্‌টয়ই কি টল্‌স্‌টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তাহ'লেই তাঁর দ্বারা বহু কালের ও বহুলোকের টল্‌স্‌টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হ'ত। তার মধ্যে অনেক ভোল্‌বার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হ'ত, আর তবেই যা না-ভোল্‌বার তা বড় হ'য়ে সম্পূর্ণ হ'য়ে দেখা দিত।

৭ই ফেব্রুয়ারী
১৯২৫
জাহাজ ক্রাকোভিয়া

মানুষের মধ্যে মন প্রাণ দেহ এই তিনে মিলে কাজ চালায়, এই তিনের আপোষে আমাদের কর্ম্মবেগের একটা ছন্দ তৈরী করে। শীতের দেশে দেহ সহজেই ছুটে চল্‌তে চায়, তারই সঙ্গে তাল রাখ্‌বার জন্যে মনেরও তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। গরম দেশে আমরা ধীরে সুস্থে চলি, ধীরে সুস্থে ভাবি, কোনো বিষয়ে মন স্থির করতে বিলম্ব ঘটে। শীতের দেশে যে-তেজকে দেহের মধ্যেই জাগিয়ে তুল্‌তে হয়, গরম দেশে সেই তেজ দেহের বাইরে; সেই আকাশব্যাপী তেজ শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি; সেইজন্যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা যাতে বেড়ে না ওঠে আমাদের শরীরের সেই অভিপ্রায়; চলাফেরার দম সর্ব্বদাই তাকে কমিয়ে রাখ্‌তে হয়; তাই আমাদের মনের মধ্যে কর্ম্মচিন্তার ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

মনের ভাবনা ও হুকুমের যখন দেহকে কাজ চালাবার জন্যে অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাক্‌তে হয় না তখন তাকেই বলে সেই অভ্যাসেই নৈপুণ্য। কর্ম্মের তাল যতই দ্রুত হয়, দেহের পক্ষে ততই দ্বিধাবিহীন হওয়া দরকার। ভাবতে মনের যে-সময় লাগে তার জন্যে সবুর করতে গেলেই দ্বিধা ঘটে। বাহিরে কর্ম্মের কল সেই সবুরের জন্যে যদি অপেক্ষা করতে না পারে তাহ'লেই বিভ্রাট। মোটর-গাড়ির একটা বিশেষ বেগ আছে, কখন্‌ তার হাল বাঁয়ে ফেরাব, কখন্‌ ডাইনে, তা ঠিক করতে হ'লে সেই কলের বেগের দ্রুত ছন্দেই ঠিক করতে হয়, নইলে বিপদ ঘটে। সেই দ্রুততা বারবার অভ্যাসের জোরেই সহজ হয়। অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে পড়লে অপঘাত ঘটায়, অর্থাৎ যেখানে মনের দরকার সেখানে মনকে প্রস্তুত না পেলেই মুস্কিল।

দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়, সেই সঙ্গে অভ্যাসের বেগও অনেক পরিমাণে বাড়ানো চলে। কিন্তু এই দ্রুত অভ্যাসের নৈপুণ্যে সেইসব কাজই সম্ভবপর হয় যা 'বস্তুগত'। অর্থাৎ এক বস্তা বাঁধবার জায়গায় দুই বস্তা বাঁধা যায়। কিন্তু যা-কিছু প্রাণগত, ভাবগত তা কলের ছন্দের অনুবর্ত্তী হ'তে চায় না।

যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক সঙ্গীতে তারা দুন-চৌদুনের বেগ দেখে পুলকিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পদ্মবনের

তরঙ্গ-দোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্য্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটররথযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায় হায় করতে থাকে।

পশ্চিম মহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার তাল কেবলি দুন থেকে চৌদুনের অভিমুখে চলেচে। কেননা, জীবনের সার্থকতার চেয়ে-বস্তুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে। ঘর ভেঙে হাট তৈরী হ'ল, রব উঠ্‌ল Time is money। এই বেগের পরিমাপ সহজ। সেইজন্যে সেখানে একটা জিনিষ সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্চে, যেটা সকলেরই কাছে সুস্পষ্ট, যেটা বুঝ্‌তে কারো মুহূর্ত্তকাল দেরি হয় না,—সে হচ্চে পাখোয়াজির হাত দুটোর দুড়্‌দাড়্‌ তাণ্ডব নৃত্য। গান বুঝ্‌তে যে সবুর করা অত্যাবশ্যক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, ভিড়ের লোকে বলে—"সাবাস, এ একটা কাণ্ড বটে।"

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখ্‌লুম, তার প্রধান জিনিষটাই হচ্চে, দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারেবারে চমক লাগিয়ে দিচ্চে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্ব্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে-বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেচে। তার মানে হচ্চে, সকল বিভাগেই বর্ত্তমান যুগে কলার চেয়ে কার্‌দানি বড় হ'য়ে উঠেচে। প্রয়োজন-সাধনের মুগ্ধ দৃষ্টি কার্‌দানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে Success বলে, তার প্রধান বাহন হচ্চে, দ্রুত নৈপুণ্য। পাপ কর্ম্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি কর্‌বার মত শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হ'তে চল্‌ল—সিদ্ধির ঘোড়-দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিম দিগন্তে কেবলি ঘূর্ণী হাওয়া বইয়ে দিচ্চে।

পশ্চিম মহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্ত্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মত দেখ্‌তে হয়েচে। ব্যাপারটা হচ্চে, দ্রুত-লয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটু মাত্র এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিৎ নির্ভর কর্‌চে। গতি কেবলি বাড়্‌চে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই। ধর্ম্মের পথে ধৈর্য্য চাই, আত্মসম্বরণ চাই, সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য্য নেই, সংযম নেই; তার হস্ত পদ চালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেল্কী বিস্ময়কর হ'য়ে উঠ্‌বে—তাই যাদুকরের সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে,মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও অপঘাত-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্চে না।

১২ই ফেব্রুয়ারী
ক্রাকোভিয়া (এডেন বন্দর)

ঘর বলে, পেয়েছি; পথ বলে, পাইনি। মানুষের কাছে, "পেয়েছি" তারও একটা ডাক আছে আর "পাইনি" তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেম্‌নি মানুষের শাস্তি। শুধু "পেয়েছি" বদ্ধ গুহা, শুধু "পাইনি" অসীম মরুভূমি।

যাকে আমরা ভালবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় ক'রে উপলব্ধি করি। কিন্তু সেই সত্য উপলব্ধির লক্ষণ হচ্চে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে ব'লেই সত্য উপলব্ধির জবানবন্দী এমন হয় যে, আদালতে তা গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি—"আ মরি", তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্য্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে অন্ত আছে, সে বলে, "আমি নেই। কেবল ওই আছে।" অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েছি সে নেই, আর যাকে আমি পেয়েও পাইনে সেই অত্যন্ত আছে।

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া ব'লে মান্‌তে চায় না, সে জানে না নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল,দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু

কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য উপলব্ধির ভাষায় বলেচেন, "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।" যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য ব'লে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাত দেয়। কিন্তু দেশই বল, আর কালই বল, যাতে ক'রে সৃষ্টির সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমা'তে কালের পরিমাণ বদল ক'রে দিয়ে যে-ব্যায়ামক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত ক'রে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎকালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপ ফুলকে যে-আয়তনে দেখচি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে আয়তনে দেখিনে। আকাশকে আরো অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক ক'রে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণুপুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখতে পারি,—সে আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ সে আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়—এই আকাশেই! তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ বলেচেন, তদেজতি তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হচ্চে কাব্যের মাত্রা, আরেকটা অর্থ হচ্চে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হ'য়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরো গভীর ক'রে দেখতে পারি; তাহ'লে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁচতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে;—সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি ক'রে তবেই আমরা বলতে পারি, "মরি, মরি।" সেই আনন্দ না হ'লে মরা সহজ হবে কেমন ক'রে? তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর মনের উপর পড়তে থাকে তখন তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-মের ভিতর থেকেই সঙ্গীতকে দেখতে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অপাওয়াকে জানি, তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কার জন্যে? ঐ সা-রে-গ-মের জন্যে? ঐ ঝাঁপতাল চৌতালের জন্যে, দুন চৌদুনের কসরতের জন্যে? না; এমন কিছুর জন্যে যা অনির্ব্বচনীয়, যা পাওয়া না-পাওয়ায় এক হ'য়ে মেশা; যা সুর নয়, তাল নয়, সুরতালে ব্যাপ্ত হ'য়ে থেকে সুরতালের অতীত যা, সেই সঙ্গীত

প্রয়োজনের জানা নিতান্তই জানার সীমানার মধ্যে বদ্ধ, তার চারদিকে না-জানার আকাশমণ্ডলটা চাপা, সেইজন্যে তাকে সত্যরূপে দেখা হয় না, সেইজন্যে তার মধ্যে যথার্থ আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। সেইজন্যে তার উদ্দেশে যথার্থ ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হ'তে পারে না। এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। অথচ এসম্বন্ধে তার সঙ্গতির বোধ এতই অল্প যে, ভারতবর্ষের জন্যে তার ত্যাগের তালিকা হিসাব করবার বেলায় সর্ব্বদাই সে অহঙ্কার ক'রে বলে যে, তার সিভিল সার্ভিস্, তার ফৌজের দল ভারতবর্ষের সেবায় গরমে দগ্ধ হ'য়ে, লিভার বিকৃত ক'রে, প্রবাসের দুঃখ মাথায় নিয়ে কি কষ্টই না পাচ্চে। বিষয়-কর্ম্মের আনুষঙ্গিক দুঃখকে ত্যাগের দুঃখ নাম দেওয়া, রাষ্ট্রনীতির আইন ও ব্যবস্থা রক্ষার উপলক্ষ্যে যে-কৃচ্ছ্র সাধন, তাকে সত্যের তপস্যা, ধর্ম্মের সাধনা বলাটা, হয় গুপ্ত পরিহাস, নয় মিথ্যা অহঙ্কার।

বাসনার চোখে বা বিদ্বেষের চোখে বা অহঙ্কারের চোখে যাকে দেখি তাকে সীমায় বেঁধে দেখি, তার প্রতি পূর্ণ সত্যের ব্যবহার কোনো মতেই হ'তে পারে না ব'লে তার থেকে এত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুনফার লোভে,

ক্ষমতার অত্যাকাঙ্ক্ষায় মানুষের সত্য আজ সর্ব্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হ'য়েচে এমন আর কখনোই হয়নি। মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ার নিরানন্দ এবং অন্যায়, বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্বজিগীষু কুস্তিগিরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেচে এমন কোনো দিন করেনি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ একথা বল্‌তে লজ্জাও করচে না, যে, মানুষকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; অর্থাৎ তাকে পৃথক ক'রে রাখবার নীতিই বড় নীতি।

বহু অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করতে সম্মত হয়েচেন ব'লে দেশী লোকেরা যে-নালিশ ক'রে থাকে, শুনলুম, তার জবাবে আমাদের শাসনকর্ত্তা বলেচেন, যেহেতু অনেক মিশনারি বিদ্যালয় ভারতের জন্য আত্ম-সমর্পণ করেচে সেই কারণে এই নালিশ অসঙ্গত। আমি নিজে এই নালিশ করিনে, যে কোনো সমাজের লোকের জন্য যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হোক্ আমার তাতে আপত্তি নেই। য়ুরোপীয় বালকবালিকারা যদি অশিক্ষিত ভাবে মানুষ হয় তাতে আমাদেরও মন্দ ছাড়া ভালো হবার আশা নেই। কিন্তু মিশনারী বিদ্যালয়ের ওজর দিয়ে আত্মগ্লানি দূর করবার চেষ্টা ঠিক নয়। এ কথা স্বীকৃত যে, এই ৩৫ কোটি ভারতবাসীর শত-করা দশ অংশও শিক্ষিত নয়, আজ প্রায় শতাব্দীকাল ইংরেজ-শাসনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি ব'লেই এটা ঘটেচে। সেটার প্রধান কারণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় বালকবালিকার প্রতি সে-অভাব নেই। আমাদের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ শিক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা হ'লেও ঐ একভাগের জন্য খুঁৎ খুঁৎ থেকে যায়। জাপান ত জাপানী ছেলেদের জন্যে এমন কথা বলেনি, সেখানেও ত মিশনারি বিদ্যালয় আছে। যে-কারণে ভারতের অর্থে পুষ্ট ইংরেজ ধনীর মধ্যে প্রায়ই কেউ ভারতের দৈন্য-দুঃখ লাঘবের জন্য মুনফার সামান্য অংশও দিতে পারেনি, সেই কারণেই ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের অজ্ঞতা-অপমান লাঘবের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারেনি, সহজ বদান্যতার অভাবে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ—এই কারণেই ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজা মহারাজার দান দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ধনী ভারতের কোনো অনুষ্ঠানে দানের মত কোনো দান করেচে শুনতে পাইনি। অথচ ভারত নিঃস্ব, ইংরেজ ধনী।

মিশনারি বিদ্যালয়ে ইংরেজের অর্থ আছে এমন কথা উঠবে। কিন্তু সে কি ইংরেজের অর্থ? সে যে খৃষ্টীয়ানের অর্থ। সে যে ধর্ম্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ। ধার্ম্মিকের দান, আত্মীয়তার দান নয়, অধিকাংশ সময়েই তা পারলৌকিক বৈষয়িকতার দান। ভারতীয় খৃষ্টীয়ানের সঙ্গে ইংরেজ খৃষ্টীয়ানের যে কি সম্বন্ধ তা সকলেই জানে। ভারতের কোনো একটি পাহাড়ের সহরে চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ডের সম্প্রদায়গত একজন ভারতীয় ভক্ত খৃষ্টীয়ান ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিসৎকারের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহের জন্য তাঁর বিধবা স্ত্রী সেখানকার একমাত্র স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন। পাদ্রি আপন মর্য্যাদা হানি করতে সম্মত হ'লেন না, বোধ করি এতে পোলটিকাল্ প্রেষ্টিজেরও খর্ব্বতা সম্ভাবনা আছে। অগত্যা বিধবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ পাদ্রির শরণাপন্ন হ'লেন; তিনি ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধ করলেন। ভারতে কোনো যথার্থ ভক্ত ইংরেজ মিশনারি নেই, একথা আমি বলিনে। কিন্তু মিশনারি অনুষ্ঠানের যে-অংশে সাধারণ ইংরেজ ধার্ম্মিকের অর্থ আছে সেখানে শ্রদ্ধা আছে একথা মানব না? শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। আমরা ত এই জানি, ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজনীতির প্রতি সত্য মিথ্যা নানা উপায়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ, ভারতের প্রতি ইংরেজের যে-অবজ্ঞা, ইংরেজ ধর্ম্মব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই তার ভূমিকা পত্তন ও ভিত্ত দৃঢ় ক'রে এসেচে, সেখানকার শিশুদের মনে তারা খৃষ্টের নাম ক'রে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন করেচে। সেই বড় হ'য়ে যখন শাসনকর্ত্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়সঙ্গত ব'লে বিচারকের

আসন থেকে ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা তেমনি কার্পণ্য।

আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হচ্চে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখতে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হ'তে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানতঃ যে বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন ব'লেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে ব'লেই এটা সম্ভব হয়েচে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র ক'রে তুললে তার থেকে কোন বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে শিক্ষা আত্মগত হ'তে গুরুতর বাধা পায়।

আকস্মিক হচ্চে সীমার বাহিরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্ত্তা নিয়ে সে আসে, তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তার মুক্তি। বিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আনতে গেলে চিত্তকে প্রাণবান্ ক'রে রাখা চাই অর্থাৎ তাকে উৎসুক ক'রে তুলতে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বৃদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট ক'রে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর ক'রে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন্ ব'লে গৌরব করেন। অর্থাৎ বিধাতা যে-মানুষকে প্রাণী করেচে সেই মানুষকেই তাঁরা যন্ত্র করতে চান। সেটা হয় সিদ্ধির লোভে। যন্ত্র হচ্চে সিদ্ধিদেবীর বাহন, প্রাণকে পিষে সে প্রবল হয়। বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কোনো একটা সঙ্কীর্ণ ফল দেওয়াই তার কাজ। বিশ্বসত্যে নির্দ্দিষ্টের চারিদিকে যে অসীম অনির্দ্দিষ্ট আছে তাকে সে দেখতে পারে না, কেননা প্রাণকে সে কেবলি গণ্ডীর বাহিরে আহ্বান করে। গণ্ডীর বাহিরে বিধাতার বাঁশি বাজে, ফলকামী সেই ধ্বনি রুদ্ধ ক'রে প্রাচীর তোলে।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্চে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চল্‌তে চল্‌তে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্চে প্রাণবান্ শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষা-প্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্চে প্রাণধর্ম্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখীকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখী হ'তে শেখানো যায় না। বনের পাখী ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল ক'রে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল ক'রে মানুষকে শেখানো। কিন্তু হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ ক'রে দিয়ে শেখানোই শিক্ষাপ্রণালী ব'লে গণ্য হয়েচে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তার হিসেব কে রাখে? আমি ত পথ-চলা শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কারো মন পাইনে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে ব'লেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব-চেয়ে সম্মান দিই।

১৫ই ফেব্রুয়ারী
ক্রাকোভিয়া
ভারতসাগর

শিশু যে জগতে সঞ্চরণ করে তার প্রায় সমস্তই সে প্রবল ক'রে দেখে। জীবনে নানা অবান্তর বিষয় জ'মে উঠে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। যখন আমি শিশু ছিলুম তখন আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গয়লাপাড়ার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখেচি, প্রতিদিনই তা সম্পূর্ণ চোখে পড়েচে, প্রতিদিনই তা ছবি ছিল। আমার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির বিষয়ের মাঝখানে কোনো ভাবনা, অভ্যাসের কোনো জীর্ণতা আড়াল করেনি। আজ সেই গোয়াল-পাড়া কতকটা তেমনি ক'রে দেখতে হ'লে সুইজরল্যাণ্ডে

যেতে হয়। সেখানে মন ভালো ক'রে স্বীকার করে, হাঁ আছে।

শিশুর কাছে বিশ্ব খুব ক'রে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে কথা ভুলে যাই। এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢাল্‌বার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাস-দোষেই বুঝতে পারিনে। বিশ্বের প্রতি তার এই একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর দিয়েই যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে নিতান্ত গোঁয়ারের মত সে-কথা আমরা মানিনে। তার ঔৎসুক্যের আলো নিবিয়ে তার মনটা অন্ধকার ক'রে দিয়ে শিক্ষার জন্যে তাকে এডুকেশন-জেলখানার দারোগার হাতে সমর্পণ ক'রে দেওয়াই আমরা পন্থা ব'লে জেনেছি। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত ক'রে দিই।

ছবি বল্‌তে আমি কি বুঝি সেই কথাটাই আর্টিষ্টকে খোলসা ক'রে বল্‌তে চাই।

মোহের কুয়াশায় অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে "আছে" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেচি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে, আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বল্‌তে পারে, "চেয়ে দেখ", তাহ'লেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ, যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিষ্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে পরিমাণে সাম্নে ধর্‌তে পারে, "আছে" ব'লে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হ'য়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপ-ফুলকে সুন্দর বলি এইজন্যেই যে, গোলাপ-ফুলের দিকে আমার মন যেমন ক'রে চেয়ে দেখে ইঁটের ঢেলার দিকে তেমন ক'রে চায় না। গোলাপ-ফুল আমার কাছে তার ছন্দে রূপে সহজেই সত্তা রহস্যের কি একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিষকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি, তুমি আছ।

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্যে যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠল, "লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমিত দেখতে পাও না।" তখনি চম্‌কে উঠে আমার মনে প'ড়ে গেল, হাঁ, তাইত বটে। ঐ "বাসি" ব'লে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাইনে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই,—নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসী ফুলগুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ ক'রে তাদের চুম্বন ক'রে নিয়ে চলে গেল।

আর্টিষ্ট তেম্‌নি ক'রে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক্‌। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে বলুক, "ঐ দেখ, আছে।" সুন্দর ব'লেই আছে তা' নয়, আছে ব'লেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট ক'রে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। "আছি" এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজচে। তেমনি স্পষ্ট ক'রে যেখানেই আমরা বল্‌তে পারি "আছে" সেখানেই তার সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয় আত্মার গভীরতম মিল হয়। "আছি" অনুভূতিতে আমার যে-আনন্দ, তার মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজকার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্চে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার

কাছে নিঃসংশয়, তর্ক-করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্ব্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানেই তেমনি একান্ত-ভাবে "আছে" এই উপলব্ধি করি সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক ক'রে জানি।

কোনো ফরাসী দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেচেন—the True, the Good, the Beautiful। ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি সংস্কৃত তর্জ্জমা খুব চল্‌তি হয়েচে —সত্যং শিবং সুন্দরং। এমন-কি, অনেকে মনে করেন এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেচেন, সে হচ্চে, শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শান্তং হচ্চে সেই সামঞ্জস্য, যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত, "নিমেষা মুহূর্ত্তাঅর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"।—শিবং হচ্চে মানব-সমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করচে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্চে; অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়; আর অদ্বৈতং হচ্চে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়েও আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করচে।

যাঁদের মন খৃষ্টীয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষদ্ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃষ্টীয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল ক'রে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" এই মন্ত্রটিকে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্চে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্র স্বরূপে সত্যং শিবং সুন্দরং বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণ মাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্চে অদ্বৈত। যে সত্য বিশ্ব-প্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ ক'রে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তা কল্লে শান্তং শিবং অদ্বৈতং মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি ত আর কিছুই জানিনে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুইএর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বল্‌তে গেলে law এবং love এর পূর্ণতাই হচ্চে সমাজের welfare।

আমাদের চিত্তের মধ্যে তামসিকতা আছে, সেইজন্য বিশ্বকে দেখার বাধা হচ্চে। কিন্তু মানুষের মন ত বাধাকে মেনে ব'সে থাকবে না। এই বাধার ভিতর দিয়ে কেবলি দেখার পথ করতে হবে। মানুষ যতদিন আছে ততদিনই এই পথ-খোলা চ'লে আস্‌চে। মানুষ অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করচে, মানুষ বাসা বাঁধচে, তার সঙ্গে সঙ্গেই কেবলমাত্র সত্তার গভীর টানে আত্মা দিয়ে দেখার দ্বারা বিশ্বকে আপন ক'রে চল্‌চে। তাকে জানার দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ ক'রে দেখার দ্বারা, ভোগের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা।

আর্টিষ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর্টের সাধনা কি? আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্চে আঙ্গিক, টেক্‌নীক্, তার কথা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তাহ'লে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখ, দেখ, দেখ।

অর্থাৎ বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ ক'রে ধরা দিতে পার তাহ'লেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়—আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে পাওয়া মানে হচ্চে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিষ, আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর এক জিনিষ। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্চে আর্টিষ্টের সাধনা—তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিক

পদ্ধতি তার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা কর্‌তে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে, সহজ স্রোতকে আটক ক'রে রেখে কষ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিনীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ কর, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে—এই হ'ল গোড়াকার কথা ; এই হ'ল বর্ষণ, তার পরে তোমার যদি আধার থাকে ত ভ'রে উঠ্‌বে—এই হ'ল আগুন, প্রদীপ বের কর্‌তে পার যদি ত শিখা জ্বল্‌বার জন্যে ভাবনা থাক্‌বে না।

ছাতনায় চণ্ডীদাস*

(২)

শ্রী সত্যকিঙ্কর সাহানা

বৈশাখের প্রবাসীতে "ছাতনায় চণ্ডীদাস (১)" প্রকাশিত হইয়াছে। ছাতনা-বাসলী-চণ্ডীদাস সংক্রান্ত কিম্বদন্তী যে মাত্র আট নয় বৎসরের বা চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের নয়, এই কথাটা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে "ছাতনায় বাসলী (২)" লিখিত হইতেছে। ইহা হইতে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, চারিশত বৎসরেরও অধিক কাল "বাসলী দেবী" ছাতনায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন, এবং চণ্ডীদাস যে এই বাসলীরই পূজাহারীরূপে ছাতনায় ছিলেন,এ কথাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই ছাতনার চণ্ডীদাসই যে নিত্যাদিষ্টা-বাসলী-কৃপালব্ধ সহজ সাধক,"রজকী-সঙ্গতি","বড়ু চণ্ডীদাস","দ্বিজ চণ্ডীদাস",—অন্যস্থান হইতে ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, ইহাতে সংশয়ের কারণ দেখা যায় না।

১। ছাতনার রাজবংশ ও বাসলী

(ক) ৫৪ বৎসর পূর্ব্বের কিম্বদন্তী।

বেগ্‌লার সাহেব (Mr. Beglar, in The Reports of the Archæological Survey of India for 1872-73. Vol. VIII.) ছাতনা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি মন্দির ও স্তূপই প্রধান ভগ্নাবশেষ ; ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ও বেষ্টনী-প্রাচীর বহু পূর্ব্বেই স্তূপে পরিণত হইয়াছে ; মর্কট প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরগুলি এখনও খাড়া আছে (১)। যে-ইটগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা লেখযুক্ত ; লেখ হইতে যে নাম পাওয়া যায় তাহা আমি পড়িয়াছি 'কোনহ উত্তর রাজা', কিন্তু পণ্ডিতেরা পড়িয়াছেন 'হাম্বির উত্তর রাজা' (২)। সবগুলিরই শেষে একই তারিখ অর্থাৎ ১৪৭৬ শক। লেখগুলি চারি প্রকারের—দুই প্রকারের অক্ষর নত, অন্য দুই প্রকারের উন্নত। বেশ বুঝা যায়, ইটগুলি কাঁচা অবস্থায় ছাপিয়া পরে পোড়ান হইয়াছিল। কিম্বদন্তীতে ছাতনা এবং বাসলী বা বাহুলী নগর এক। শুনা যায় দক্ষযজ্ঞে পার্ব্বতীর অঙ্গ-বিশেষ এখানে পতিত হওয়ায় এস্থানের নাম বাহুলী নগর বা বাহুল্যা নগর হয় ; পুরাতন বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। আদিতে এ দেশের রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা বাহুল্যা নগরে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বাসলী-দেবীরূপে পার্ব্বতীর পূজা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পার্ব্বতীর অনুগ্রহে বঞ্চিত হন, এবং সামন্ত (সাঁওৎ) সাঁওতালগণ তাঁহাকে বধ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। শেষে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া সমস্ত সাঁওৎকে বধ করে ; কেবল একজন মাত্র এক নিম্ন জাতীয় কুমারের গৃহে লুকাইয়া রক্ষা পায়। এইজন্য সাঁওৎগণ আজ পর্য্যন্ত কুমারের সহিত একত্রে পান ভোজন করে।

ঐ সাঁওৎকে বাসলী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন এবং সাফল্যের আশ্বাস দেন। লোকটির মন দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে এবং সে বহুবিধ উপবাসাদি আচরণ করিয়া আরও

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ছাতনা-বাসের এক বিস্তৃত আলোচনা পাঠাইয়াছেন। এবারে প্রকাশের স্থান হইল না, আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। প্রঃ সঃ।

(১) এক্ষণে একটি মাত্র মন্দিরের কিয়দংশ খাড়া আছে।

(২) ইটের লেখা এখনও নিঃসংশয়ে পঠিত হয় নাই। একখানি ইটের লেখা পড়িতে পারা যায় ; তাহাতে আছে, "শ্রীশ্রী ছাতনা নগরেশ শ্রীশ্রী উত্তর রায়—১৪৭৬ শক।"

(৩) বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের বলিয়া যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কোথাও "বাহুলী নগর" বা "বাহুল্যা নগরের" উল্লেখ দেখি নাই।

এগার জন সাঁওৎ সংগ্রহ করে এবং জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে থাকে। একদিন অত্যন্ত ক্ষুধিত অবস্থায় তাহারা মস্তকে কেন্দুফলের ঝুড়িসহ একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পায়। স্ত্রীলোকটি তাহাদের অবস্থা দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া কেন্দুফল দেন এবং তাহারা আরও চাহিলে তিনি দিতে থাকেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন অধীর ভাবে ঐ স্ত্রীলোকটির হাত হইতে একটি কেন্দুফল কাড়িয়া লয়। যাহা হউক, ঐ বার জন সামন্ত কেন্দু ভোজনে তৃপ্ত হয় এবং স্ত্রীলোকটিও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে বলেন,—'জঙ্গলের মধ্যে গিয়া বারটি চারা কেন্দু গাছ যষ্টিরূপে লইয়া যাও এবং তোমাদের রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কর। বাসলী দেবী ও আমি তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিব।' তাহারা তদনুসারে যুদ্ধ যাত্রা করে এবং রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য দখল করিয়া লয়। ঐ বারজন একযোগে রাজত্ব করিত। যে ব্যক্তি কেন্দুফল কাড়িয়া লইয়াছিল তাহারই প্রথমে মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট এগার জন পর্য্যায়ক্রমে রাজত্ব করিত; পরে উহা অত্যন্ত ক্লেশকর দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজনের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে সম্মত হয়। ঐ সকল ব্যক্তির বংশধরেরা বর্ত্তমান সামন্ত রাজগণ; উহারা আপনাদিগকে ছত্রী বলে।

লোকে বলে হামির উত্তর রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, এক রাত্রি বাসলীদেবী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন,—'দেখ কতকগুলি গাড়োয়ান ও মহাজন তোমার রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিয়াছে এবং এক্ষণে এক বৃক্ষতলে রহিয়াছে। তাহাদের সহিত এক শিলা রহিয়াছে, তাহাতে আমি অবস্থিতি করিতেছি। তুমি ঐ শিলা লইয়া পূজার জন্য প্রতিষ্ঠা কর; আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার গৃহে থাকিব।' তদনুসারে রাজা লোকজন পাঠাইয়া মহাজন ও গাড়োয়ানদের আটক করেন এবং রাত্রে তাহারা যে স্থানে ছিল সেই ভূমির কর স্বরূপে ঐ শিলা গ্রহণ করেন। পরে তিনি তাহা পরিদৃষ্ট মন্দিরে স্থাপন করেন।"

(খ) ১৮ বৎসর পূর্ব্বের কিম্বদন্তী।

ও'মালী সাহেব (L. S. S. O'Malley in the Gazetteer of the Bankura District, 1908.) সামন্তভূম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ছাতনা ফাঁড়ির (এক্ষণে ছাতনা থানার) এলাকাভুক্ত সমস্ত স্থানকে 'সামন্তভূম' বলে। কিম্বদন্তী এই যে, দিল্লীর সম্রাটের সামন্ত বা সেনাপতি শঙ্খ রায় সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া তাঁহার বাসগ্রাম বাহুল্যা নগরে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে) 'সামন্তভূম' রাজ্য জয় করেন। ঐ গ্রামের রক্ষয়িত্রী দেবী বা গ্রামদেবী বাসলী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া 'বোলপোখরিয়া' নামক পুষ্করিণী সমন্বিত ছাতনা নামক গ্রামে বাস করিবার উপদেশ দেন এবং বলেন যে, তিনিও দুই পুরুষ পরে তথায় আসিবেন। তদনুসারে শঙ্খ রায় ছাতনায় আসিয়া বাস করেন এবং ঐ স্থান দিয়া যে-সকল তসর ও গরদ বস্ত্র ব্যবসায়ী গমনাগমন করিত তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার পৌত্র হামির উত্তর রায় রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং মুসলমান নবাবের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। শুনা যায়, তিনি ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি করিতেন, দরিদ্রগণকে ভরণ করিতেন এবং দেবগণের পূজারাধনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ পুরস্কৃত হইয়াছিল। একরাত্রি তিনি স্বপ্ন দেখেন, বাসলীদেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—'আমি তোমার ধর্ম্মাচরণে সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে পেষণী প্রস্তর আকারে এখানে আসিয়াছি। তুমি তাহাদের নিকট হইতে ঐ শিলা চাহিয়া লও। রাজা দেবীর আদেশ মানিয়া ঐ জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শিলা স্থাপন করেন। ঐ শিলায় এক মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাই সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত বাসলী দেবীরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

হামির উত্তর রায়ের পর তাঁহার পুত্র বীরহাম্বির রায় রাজা হ'ন। তাঁহার রাজ্যকালে ভবানী ঝরা নামক এক ব্যক্তি পঞ্চকোটের রাজার সাহায্যে ছাতনা আক্রমণ করিয়া সামন্ত রাজবংশের প্রায় সকলকেই বধ করেন; কেবল মাত্র বার জন রক্ষা পাইয়া শিলদা গ্রামে (যাহা এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) পলায়ন করেন। (১) কিছুদিন পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যাপহারীকে বধ করিয়া স্বরাজ্য পুনর্লাভ করেন। এই বার জন, বীর হাম্বির রায়ের পুত্র ছিলেন এবং তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে এক মাস করিয়া রাজত্ব করিতেন। শুনা যায় ইঁহাদের রাজত্ব কালে সিক্রী-ফতেপুরের নিঃশঙ্ক নারায়ণ নামক একজন ক্ষত্রিয় জগন্নাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ছাতনায় আগমন করেন এবং উক্ত ভ্রাতাগণের এরূপ প্রিয় হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের একজনের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া নিজেদের স্থানে তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর

(১) শিলদা গ্রাম এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পড়িলেও ইহা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাদ্বয়ের সীমারেখার সন্নিকটে এবং ছাতনা হইতে কুড়ি ক্রোশের মধ্যে।

এবং তাঁহাকে সামন্তাবনিনাথ (অর্থাৎ সামন্তগণের বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর) আখ্যা প্রদান করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ ঐ আখ্যা ধারণ করিতেছেন।

নিঃশঙ্ক নারায়ণের পরবর্ত্তী তিনজন রাজার সম্বন্ধে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছু নাই। তাঁহার বংশের চতুর্থ রাজা খড়া-বিবেক-নারায়ণ গৃহবিরোধে পলায়িত পঞ্চ-কোটাধিপতিকে আশ্রয় দান করেন, এবং ১৬৫৫ শকে বা ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাসলী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। (২) তিনি তাঁহার পুত্র স্বরূপ-নারায়ণের দ্বারা নিহত হন। স্বরূপ নারায়ণের সময় মারাঠাগণ এই দেশ আক্রমণ করে।"

(গ) ছাতনার বর্ত্তমান অধিবাসীদের নিকট যাহা শুনিয়াছি।

সামন্তভূম পরগণা বহু পূর্ব্ব হইতেই সামন্ত বা সাঁওৎ-গণের অধিকৃত ছিল। সামন্তগণ যে অন্য কোন স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এরূপ কথা শোনা যায় না। এই রাজ্য বিষ্ণুপুর বা পঞ্চকোটের সামন্ত বা অধীন রাজ্য ছিল না। দূর অতীতেও সামন্তভূমে বাসলীর পূজা হইত, তবে তখন বাসলীদেবীর কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই। সে-সময়ে সামন্ত রাজধানী বাসলী নগরে—বাহুলীনগরে—বাহুল্যানগরে ছিল ; পরে ছাতনায় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন "ছাতনা" শব্দটি "ছত্রী" রাজা হইবার পর "ছত্রিনা" বা ঐরূপ কোন শব্দ হইতে হইয়াছে ; অন্যে বলেন কতকগুলি একত্র সমাবিষ্ট 'ছাতিম' বা 'ছাতনি' (এখনও ইহাকে এখানে 'ছাতনি' বলে) গাছ হইতে ছাতনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভবানী নামে এক ব্রাহ্মণ বালক মানভূম পঞ্চকোটাধি-পতির "ঝার্য্যাৎ" বা নিত্য পূজার ঝারি-বাহক ছিলেন। রাজা নিত্য হোমপূজাদি শেষ করিয়া ধ্যানান্তে আপন পুত্রের ললাটে স্বহস্তে হোমটীকা দিতেন। ভাবী রাজ্যেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ রাজহস্তের টীকার অধিকারী ছিল না। একদিন ধ্যানান্তে পঞ্চকোটেশ্বর প্রায়ান্ধকার মন্দির মধ্যে ভবানীকে স্বপুত্রভ্রমে হোমটীকা দেন। রাণী তদ্দর্শনে রাজাকে বলেন, "আপনার হস্তের টীকা যখন ভবানী পাইয়াছে তখন তাহাকে কোন রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া না দিলে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে।" রাজা তদনুসারে সামন্তভূমের বিদ্রোহী প্রজাগণের আনুকূল্যে বিশৃঙ্খল সামন্তভূমে বাহুল্যানগরে ভবানী ঝার্য্যাৎকে রাজারূপে স্থাপিত করেন।

সামন্ত সর্দ্দারগণ মেদিনীপুরের শিলদা গ্রামে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই ; সামন্তভূম পুনর্লাভের চিন্তায় তাঁহারা অধীর হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ বার জন সামন্ত সর্দ্দার এই উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া স্বরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় সামন্তভূমের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথিমধ্যে তাঁহারা ক্ষুৎপীড়িত হইলে "ধুলকুণ্ডরী" নামক স্থানে কেন্দুফল সহ এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পান। বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে এক একটি ফল দিতে থাকেন ও তাঁহারা খাইতে থাকেন। একজন সামন্ত-সর্দ্দার ঐরূপ বিলম্বিত ভোজনে অধীর হইয়া বৃদ্ধার হস্ত হইতে কয়েকটি কেন্দুফল কাড়িয়া লন। সর্দ্দারগণ কেন্দুফল ভোজনে তৃপ্ত হইলে বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বাসলীর কৃপায় তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ; তবে যে সর্দ্দার আমার হাত হইতে কেন্দুফল কাড়িয়া লইয়াছে সে দুষ্ট, অগ্রেই তাহার মৃত্যু হইবে।" সর্দ্দারগণ ধুলকুণ্ডরী হইতে অগ্রসর হইয়া গোপালপুর গ্রামে আসিয়া এক কুম্ভকার-গৃহে আশ্রয় লন। ভবানী ঝার্য্যাৎ সামন্তভূম মুখে সর্দ্দারগণের আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাদের সন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ গোপালপুরে কুম্ভকারগৃহে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকেই সামন্ত-সর্দ্দার বলিয়া সন্দেহ করে। কিন্তু ঐ কুম্ভকার আশ্রিতগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তাহার দূরাগত কুটুম্ব বলিয়া প্রকাশ করে। ভবানী ঝার্য্যাতের লোক সে কথায় সন্দেহ করে এবং বলে ঐ অপরিচিতগণ কুম্ভকারের সহিত একত্র আহার করিলে তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। বিপন্ন সর্দ্দারেরা তাহাই করেন। আজও ঐ কুম্ভকারের বংশধরগণ কৃতজ্ঞ সামন্ত-সর্দ্দার বংশের সহিত এক পংক্তিতে আহারের সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে।

(২) ইনিই খড়্গ বিবেক নারায়ণ। এখনও কেহ কেহ 'খড়্গ' না বলিয়া ঘোঁড়া বিবেক নারায়ণ বলেন। এদেশের উচ্চারণ "খঁড়া" শুনিয়া ওমালী সাহেব "খড়া" লিখিয়াছেন। ইঁহার নির্ম্মিত মন্দিরই প্রথম প্রবন্ধে "দ্বিতীয় মন্দির" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"মোলবোনা" (মউল-বনা) গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এখানে এক প্রসিদ্ধ শিব আছেন। তাঁহার নাম মউলেশ্বর। ঐ শিবের গাজন এখনও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। গাজনের সময় "ভক্ত্যা" গণকে রাজদর্শন করিতে আসিতে হয়, ইহাকে "রাজা-ভেটা" বলে। সামন্ত সর্দ্দারগণ সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন; এই গাজনের সুযোগে কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বারজনেই "ভক্ত্যা" হন। "রাজা-ভেটা"র দিন তাঁহারা জয়-ঢাকের মধ্যে একটি খঞ্জর (দ্বিধারা তরবারি বিশেষ) এগার খানি তালপত্রে আবৃত করিয়া লুকাইয়া আনয়ন করেন এবং রাজার সম্মুখে শিব-"ভক্ত্যার" তাণ্ডব বা উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। যখন জয়ঢাকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট "ড্যাডাং ড্যাডাং কাশমোলা, লাবুবি পাবুবি এই বেলা" বুলি বাজিতে থাকে তখন তাঁহারা লুক্কায়িত খঞ্জর ও এগারখানি তালপত্র (যাহা দেবীর কৃপায় তালপত্রাকার তরবারিতে পরিণত হয়) বাহির করিয়া রাজাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন এবং রাজ্য দখল করিয়া লন। কিন্তু উহাতে রাজানুচরগণের সহিত সর্দ্দারগণের যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে যে সর্দ্দার বৃদ্ধার হস্ত হইতে কেন্দু কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে ছাতনায় অল্প-দিনের স্থাপিত ব্রাহ্মণ রাজ্যের শেষ হয়। ঐ খঞ্জরখানি এখনও ছাতনা রাজবাটিতে আছে এবং কোন কোন যাত্রায় রাজাকে সেখানি হস্তে ধারণ করিয়া গমন করিতে হয়। উক্ত এগারখানি তালপত্রাকার তরবারিও রাজ-বাটিতে আছে।

ঐরূপে সামন্তভূম পুনরধিকৃত হইলে ঐ এগার জন সর্দ্দার এবং মৃত সর্দ্দারের পুত্র এই বারজনে পর্য্যায়ক্রমে একমাস করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। মাসে মাসে শস্যের উৎপত্তির অসাম্যে আদায়েরও অসাম্য হয় এবং মনোমালিন্য উদ্ভবের সম্ভাবনা হয়। সেই সময় ফতেপুর সিকরী হইতে নিঃশঙ্ক হামির নামক এক ছত্রী জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া ঐ পথে ফিরিতেছিলেন। সর্দ্দারগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার যোগ্যতা দর্শনে তাঁহাকে সামন্তভূমের অধীশ্বর বা সামন্তাবনি-নাথ করেন এবং একজন সর্দ্দার তাঁহাকে কন্যাদান করেন। নিঃশঙ্ক হামির সামন্তাবনিনাথ হইয়া সামন্তভূমকে বারটি পরগণায় (?) বিভক্ত করিয়া ঐ বারজন সর্দ্দারকে দেন এবং নিজে তাঁহাদের অধীশ্বররূপে থাকেন। আজও সামন্তভূম বা ছাতনা দ্বাদশ পরগণায় বিভক্ত। নিঃশঙ্ক হামিরই বর্ত্তমান ছাতনা রাজবংশের আদিপুরুষ এবং তিনি খ্রীষ্টের চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমভাগে সামন্তভূমের অধীশ্বর হন।

ভবানী ঝার‍্যাৎকে বধ করিয়া স্বরাজ্য পুনর্লাভে সামন্ত সর্দ্দারগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বাসলী দেবীই কেন্দু ফল লইয়া তাঁহাদিগকে পথে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপাতেই তাঁহারা রাজ্য ফিরিয়া পান। সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা বাসলী দেবীর পূজা অধিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে থাকেন। তখনও দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই। নিঃশঙ্ক হামিরের বংশ বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক। নিঃশঙ্ক হামির জগন্নাথ দর্শনে আসিবার সময় তাঁহার কুলদেবতা মদনগোপাল জীউকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মদনগোপাল জীউর ভোগ দিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ নিঃশঙ্ক হামিরের নিত্য কর্ম্ম ছিল। মদনগোপাল জীউ-ই ছাতনা রাজবংশের কুলদেবতা। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দস্যুগণের দ্বারা অপহৃত হওয়ায় অন্য মূর্ত্তি গড়িয়া মদনগোপাল জীউর পূজা হইতেছিল। ১৩৩০ সনে এক "বাঁধের" পঙ্কোদ্ধার করাইবার সময়ে মদনগোপাল জীউর সেই অপহৃত পুরাতন মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে। নিঃশঙ্ক হামির সামন্তাবনিনাথ হইলে তাঁহাকে ন্যায়-ধর্ম্মানুরোধে সামন্তভূমের রক্ষয়িত্রী দেবী, সামন্ত সর্দ্দারগণের পূজিতা বাসলী দেবীর পূজা যথারীতি সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব রাজার দ্বারা শক্তিরূপিনী বাসলী দেবীর পূজা সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইত না। তখন পর্য্যন্ত বাসলী দেবীর কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহাও পূজার অসম্যগতার অন্যতম কারণ। এইরূপে নানা কারণে বাসলী দেবীর পূজায় ত্রুটি ঘটিত। এই অবস্থায় নিঃশঙ্ক হামিরের বংশধর উত্তর হামিরের সময় দেবী রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন। এই স্বপ্নের কথাই প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্বপ্নাদেশ পালন করিয়াই উত্তর হামির বণিকের নিকট

হইতে শিলাখণ্ডরূপে বর্ত্তমান বাসলী মূর্ত্তি এবং নবাগত ব্রাহ্মণ দেবীদাস ও তাঁহার সহোদর চণ্ডীদাসকে প্রাপ্ত হন।

দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিবরণ একই কিম্বদন্তীর তিনটি ভিন্ন সংস্করণ। তবে কিম্বদন্তীটি নিতান্ত আকস্মিক বা আধুনিক নহে। ছাতনায় একখানি পুথী পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইল। পুথী সমাপ্তির সময় ১৩৮৭ শক, শ্রাবণ মাস। যদিও প্রাপ্ত পুথীখানি মূল নহে, নকল বলিয়াই মনে হয়, তথাপি নকলও যে শতাধিক বৎসরের পুরাতন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিবরণগুলিতে যে সকল একত্ব ও পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার কারণ অনুমানের চেষ্টা না করিয়াও বলিতে পারা যায় বাসলী দেবী ছাতনায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সামন্ত বা সাঁওৎ রাজগণ সম্বন্ধে বেগ্‌লার সাহেব "Samantas (Saonts) Santals" বলিয়া তাঁহাদের সাঁওতাল রক্ত সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলেও; অনেকে এই সামন্ত জাতির সাধারণতঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষুদ্র, নিমগ্ন ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া ইহাদিগকে সাঁওতাল পরগণা ও ছুটিয়া নাগপুরের ঘাটোয়ালগণের মত আর্য্য-অনার্য্য রক্ত-মিশ্রনোদ্ভূত জাতি মনে করিলেও; চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম মলিনতা প্রাপ্ত হওয়ায় বৌদ্ধ-তন্ত্রের বাসলী দেবী আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রনোদ্ভূত বাউরী প্রভৃতি নীচ জাতির উপাস্যা হইলেও; এবং মাত্র চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নকুড় তুঙ্গ এবং তাঁহার গুরু ও সেনাপতি শ্রীপতি মহাপাত্র উড়িষ্যা হইতে আসিয়া যখন রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া লইয়া তাহার "তুঙ্গভূমি" নামকরণ করিতেছিলেন, তখন ঐ সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে অনার্য্য অধ্যুষিত এবং বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত দেখিলেও; ইহা নিশ্চিত যে, এই সামন্ত রাজগণ ছাতনায় প্রায় পাঁচশত বৎসর রাজ্য করিয়া আসিতেছেন এবং হামির উত্তরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা বাসলী মূর্ত্তির পূজা সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা একই নিয়মে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বেও বাসলীর পূজা হইত; তবে তাহা বৃক্ষে বা শিলাখণ্ডে বা ঘটে হইত, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা হইত এবং সে পূজার উপকরণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুই জানা যায় না।

উত্তর হামিরের দ্বারা দেবী মূর্ত্তি স্থাপনের সময় দেবীর পূজাবিধি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল আজও বাসলী দেবীর পূজা সেই নিয়মেই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। দেবীর অন্নভোগে যে রূপেই হউক কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়। বাসলী দেবী যে ধর্ম্ম-ভক্তগণের বন্দনীয়া, তাহা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গলে "ছাতনার বাসলীর" বন্দনা হইতে জানা যায়। মনে হয় বাসলী যে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা তাহা সে সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

"আদি বাসলী স্থান" বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে দেখা যায় একটি ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও একটি ইষ্টক নির্ম্মিত নাটমন্দির ছিল। মন্দির-সম্মুখে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত যূপ এবং প্রাচীরের দুই দিকে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে লব্ধ বাসলী মূর্ত্তিটি প্রথম দিনেই ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরে স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সম্ভবতঃ অকস্মাৎলব্ধ ঐ মূর্ত্তিটি প্রথমে বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে স্থাপিত হইয়া ছিল, পরে মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রবাদ, হামির-উত্তর রায় প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহার পৌত্র বা পৌত্রের পৌত্র উত্তর রায় ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ও নাট-মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ছাতনা রাজবংশের নিঃসংশয় বংশলতা আজও সংগৃহীত হয় নাই। ঐ বংশে আশানুরূপ শিক্ষা না থাকায় বেশী কিছু কাগজ পত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা কিছু ছিল তাহাও নানা কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, চণ্ডী-দাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুগণও কিছু কাগজ লইয়া গিয়াছেন। ছাতনার বর্ত্তমান রাজা আদি পুরুষ হইতে কাহারও মতে উনবিংশ, অন্যের মতে একবিংশ পুরুষ। এইরূপ ভুল হইবার অনেক কারণ রহিয়াছে; পুত্রের দ্বারা পিতৃ হত্যা, গৃহ-বিবাদে গৃহ দাহ প্রভৃতি বহু পাপে এই বংশের অতীত চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহার উপর এই বংশে অনেক সময়ে পিতামহের নাম পৌত্রে দেওয়া হইয়াছিল। যদি

এক নাম যুক্ত রাজগণের পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য নামগুলি বিশেষিত করা হইয়াছিল—যেমন খঞ্জ বিবেক নারায়ণ, জটিল বিবেক নারায়ণ—তথাপি নিঃসংশয়ে বলা যায়না সব এক নামের পার্থক্য বিশেষণের দ্বারা সূচিত হইয়াছিল। এক-নামীত্বও পুরুষগণনায় ভুল হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

(২) ছাতনায় প্রাপ্ত পুথী

ছাতনায় যে পুথী খানি পাওয়া গিয়াছে—পত্রাঙ্ক দেখিয়া তাহা সাত পাতা বলিয়া জানা যায়। দুঃখের বিষয় পুথীর দ্বিতীয় পাতাটি পাওয়া যায় নাই, মাত্র ছয়টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পাতাটিতে পত্রাঙ্ক নাই। ছিল কি না জানিতে পারা যায় না। স্থানটি কীটদষ্ট। তবে ঐ পত্রে "ওঁনমঃ শিবায়"রূপ নমস্কার আছে। তৃতীয় হইতে সপ্তম, প্রত্যেক পাতায় পত্রাঙ্ক আছে। এই পুথী ৯৮০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩৮০ইঞ্চি প্রস্থ। তুলাট কাগজের এক পিঠে লেখা। পূর্ব্বে একখানি কাগজ মুড়িয়া দুই সংলগ্ন পৃষ্ঠা ছিল কি না জানিবার উপায় নাই ; থাকিলেও এখন সংলগ্ন স্থান ছিন্ন হওয়ায় পাতাগুলি পৃথক হইয়াছে। প্রথম, তৃতীয়,চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রে ছয় ছত্র করিয়া এবং সপ্তম পত্রে সাড়ে সাত ছত্র এবং কাল-নির্দ্দেশক ক্ষুদ্র দুই ছত্র লেখা আছে। স্থানে স্থানে দুই চারিটি অক্ষর কীটদষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা পাঠোদ্ধারের পক্ষে বিশেষ বিঘ্নকর হয় নাই। অক্ষরগুলি সুন্দর ও সতেজ। প্রত্যেক পত্রের ফোটো লওয়া হইয়াছে। পুথীখানিও পত্রের পশ্চাৎ দিকে কাগজ আঁটিয়া সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানপ্রবীণ রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের ও এখানকার মিশন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ এম,-এ, মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ পুথীর যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহা লিখিত হইল। পুথীর অক্ষর দেখাইবার অভিপ্রায়ে আদি ও অন্ত পাতার ফটো মুদ্রিত হইল।

পুথীখানিতে যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ইহাকে "বাসলী মাহাত্ম্য" বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে আছে, দেবী, উত্তর হামির বা হামির উত্তরকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রকটা হন। ঋত্বিক বংশ বিলুপ্ত হওয়ায় পূজার ব্যতিক্রম এবং তজ্জন্য রাজ্যে অমঙ্গল ঘটিতে থাকায় দেবী দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ চণ্ডীদাসকে রাজধানীতে স্থাপন করিবার এবং দেবীদাসকে দেবীর নিত্য পূজক নিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। পরে বৈষ্ণব দেবীদাসকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তীর্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গৃহস্থ করেন। তাহার পর দস্যুকবল হইতে রাজ্য ও রাজার উদ্ধার, ব্রহ্মময়ী রূপে বাসলী দেবীর স্তব—(স্তবটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর স্তবেরই অনুরূপ),—শঙ্খকারের নিকট শঙ্খবলয় গ্রহণ, তন্তুবায়ের হস্ত হইতে বস্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি ভক্ত বাৎসল্যের উল্লেখ। শেষে গ্রন্থকারের নাম পদ্মলোচন শর্ম্মা এবং গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ১৩৮৭ শক, শ্রাবণ মাস। এখানে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস এই পদ্মলোচনই দেবীদাসের অন্যতর পুত্র পদ্মলোচন। পুথীতে বেশ স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলেও এই পদ্মলোচনই যে দেবীদাসের পুত্র পদ্মলোচন তাহার আভাস আছে, যথা,—"গোপাঙ্গনায়াঃ দুগ্ধং পীত্বা বদন্তী পিতরমনুগতং", "তীর্থাৎকৃত্বা নিবৃত্তং ভৎসি মম পিতা বৈষ্ণবং তং জগাদ", ও "শঙ্খকারাচ্চ শঙ্খং গৃহীত্বা স্বং পিতুসে গৃহাণ", ইত্যাদির মধ্যে কোন শ্লেষ আছে কি না তাহা পণ্ডিতগণের বিচার্য্য।

এই পুথীর মধ্যে এই কয়টি কথা পাওয়া যাইতেছে ;—

> তাতো নিত্যনিরঞ্জনো বুধবরঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ।
> মাতা লক্ষ্মীরিবাপরা গুণবতী বাসিনী বিন্ধ্যাপূর্ব্বা।
> ভ্রাতা ধার্ম্মিকধুরীণোঽনুজরতঃ শ্রীদেবীদাসো দ্বিজঃ।
> ভারোদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ।

কবি চণ্ডীদাস ভরদ্বাজ কুলোদ্ভব অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁহার মাতা অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন ধার্ম্মিক প্রবর, অনুজে স্নেহশীল দেবীদাস মুখোপাধ্যায়। ১৩৮৭ শকে তাঁহার কবিযশঃ এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, সামন্ত ভূমের রক্ষয়িত্রী বাসলী-দেবীর ও তাঁহারই বিশেষ অনুগৃহীত উত্তর হামিরের পরেই চণ্ডীদাসের বন্দনা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে।

পুথীর ৩য় পত্রে এই কথা কয়টি দেখা যায়,—"মাভুংথা মে প্রসাদং তব তনয়মুখাঃ খাদিতারস্তশঙ্কাঃ।" তুমি আমার প্রসাদ খাইও না, তোমার তনয়প্রমুখ বংশধরগণ

ছাতনার বাসলী-মাহাত্ম্য পুথীর প্রথম পাতা

ছাতনার বাসলী-মাহাত্ম্য পুথীর শেষ পাতা

শঙ্কা না করিয়া খাইবেন। এখানে প্রবাদ,—বৈষ্ণব দেবীদাস যে-দেবীর নিকট অজ, মেষ-মহিষ বলি দেওয়া হয় তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে শঙ্কাবোধ করেন, তাহাতে বাসলী-দেবী দেবীদাসকে বলেন, "তুমি আমার পিতা, আমি তোমার কন্যা; পিতা হইয়া তুমি কন্যার প্রসাদ গ্রহণ করিও না। তোমার বংশধরেরা আমার প্রসাদ লইবে।" দেঘরিয়াগণ এখন বাসলীদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন যদিও তাঁহাদের কুলদেবতা "শ্রীধর" ও "হরিহর"। এই দুই শালগ্রাম শিলা দেবীদাস ও চণ্ডীদাস কণ্ঠে বাঁধিয়া ছাতনায় প্রথম আসিয়াছিলেন। দেঘরিয়াগণ গোপাল মন্ত্রের উপাসক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস তরুণ অবস্থায় ছাতনায় আসিয়াছিলেন। পুনরায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম। কেহ কেহ বলিলেন, প্রবীণ বয়সে; কেহ কেহ বলিলেন, তরুণ বয়সে আসিয়াছিলেন। নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা গেল না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, দেবীদাস ছাতনায় আসিয়া বাসলীদেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়া বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রাদি জন্মিয়াছিল। দেশ-প্রচলিত সময় মধ্যে বিবাহ না হইলে আজও যেমন চৌদ্দ বৎসরের বালিকাকে "বুড়ো মেয়ে" "ধাড়ী মেয়ে" এবং ২৮।৩০ বৎসরের যুবককে "বুড়ো বর" বলা হয়, দেবীদাসের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু হইয়াছিল কিনা কে জানে।

(বাসলী-মাহাত্ম্য)

ওঁ নমঃ শিবায়।

যা দেবী বিধিবিষ্ণুশম্ভু জননী যা চার্দ্ধমাত্রাস্থিতা ১
যা স্থিত্যন্তবনাশকার্য্যকরণী যা সিদ্ধিরূপাপরা।
যা শাক্তৈঃ খলু দৈত্যদর্পদলনী যা স্বর্গমোক্ষপ্রদা
যা দেবী শীর সিদ্ধমূর্ত্তিসহিতা শ্রীবাসলী পাতুনঃ।

যাং স্মৃত্বা সততং বিধিনা মুদা সৃষ্টি বিচিত্রা কৃতা
যচ্ছক্ত্যা চ সমাযুক্তো হরিহরৌ সংস্থাননাশকরৌ।

সা দেবী যদনুগ্রহায় প্রকটা শ্রীবাসলী সর্ব্বদা
ধন্যঃ সোঽবনিমণ্ডলে নরবরঃ শ্রীহামীরশ্চোত্তরঃ ॥

তাতো নিত্যানিরঞ্জনো বুধবরঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ
মাতা লক্ষ্মীরিবাপরা বাসিনী বিন্ধ্যপূর্ব্বা ।

ভ্রাতা ধার্মিকধূর্ণোঽনুজরতঃ শ্রীদেবীদাসো দ্বিজঃ
ভারদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ ।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং পাষাণতনুমাশ্রিতা ।
বদ্ধা রাজগৃহে দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণা ॥
কন্যারূপে নিশীথে চ দৃষ্টিং দত্বা মহেশ্বরী ।
কথয়িত্বা পূজাভাগং সহসান্তর্দধে কিল ॥
ঋত্বিগ্‌বংশে বিলুপ্তে যজনভজনয়োর্হানিমালোক্য রাজা ৩
শ্রীহামীরোত্তরাগ্যো নিপততি সভয়ং মন্দিরান্তঃ প্রবিশ্য ।
পত্না সার্দ্ধং সচিন্তস্তদনুকৃতদয়ং বাসলী তং দিদেশ
ভূদেবো দেবীদাসস্তদনু কবিবরশ্চণ্ডীদাসঃ স এতঃ ॥
রাজন্য ত্রাণয়েন্তো প্রতিদিনমনয়োরগ্রজো মাং যজেত
দেবীদাসং গৃহস্থং তদনুকৃতবতী বিশ্বরূপং প্রদর্শ্য ।
তীর্থং কৃত্বা নিবৃত্তং ভবসি মম পিতা বৈষ্ণবং তং জগাদ
মা ভুঙ্‌ক্ষ্বা মে প্রসাদং তব তনয়মুখাঃ খাদিতারস্ত্বশঙ্কাঃ ॥
কদাচিদবরুদ্ধায়াং স্বনগর্য্যাং মহীপতিঃ ।
দস্যুবর্গৈঃ সমন্তাত্তু চিন্তাং প্রাপ্য দুরত্যয়াম্ ॥
জগাম শরণং মতুঃ

সপ্রজো ভয়বিহ্বলঃ ।
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥
সচ্চিদানন্দরূপায়ৈ বাসল্যৈ চ নমো নমঃ ।
নমস্তে পরমেশানি দিব্যস্থাননিবাসি ন ।
দেবীদাসস্তুতে মাতঃ বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে ॥ ৪
নমস্ত্রৈলোক্যজননি বাসলি বিশ্বরূপিণ ।
বিশিষ্টাদ্বৈতরূপে চ বৈরিহন্ত্রি নমোঽস্তুতে ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদিভির্দেবৈর্বন্দ্যমানপদাম্বুজে ।
নমঃ সরস্বতীরূপে নমঃ সাবিত্রি শঙ্করি ॥
মনসে তুলসীরূপে নমো লক্ষ্মীস্বরূপিণি ।
নমো দুর্গে ভগবতি নমস্তে সর্ব্বরূপিণি ॥
বাসলীং বিষ্ণুবন্দ্যাঙ্ক বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীম্ ।
বৈষ্ণবীং বিমলাং বিদ্যাং বিশ্বেশ্বরীং নমাম্যহম্ ॥
নমস্তে চণ্ডিকে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি ।
চণ্ডীদাসস্তুতে চৈন্দ্রি চিন্তামণিগৃহস্থিতে ॥
নমস্তে কালিকে কাল—

মহাভয় বিনাশিনি ।
শিবে রক্ষ জগদ্ধাত্রি প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥
প্রণমামি মহাদেবীং বাসলীং বিশ্বপালিনীম্ ।
জগৎক্ষোভকরীং দেবীং জগৎসৃষ্টিবিধায়িনীম্ ॥ ৫

সগুণাং নির্গুণাং ধ্যেয়ামর্চিতাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্ ।
বিদ্যাং সিদ্ধিপ্রদাং মায়াং বাসলীং প্রণমাম্যহম্ ॥
মূলপ্রকৃতিরূপাং ত্বাং ভক্তাঃ পরমেশ্বরীম্ ।
সংসারসাগরাদস্মাদুদ্ধরস্ব দয়াং কুরু ॥
জয় দেবি বিশালাক্ষি জয় সর্ব্বান্তরস্থিতে ।
মান্যে পূজ্যে জগদ্ধাত্রি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে ॥

বিপত্তারিণি দুর্গে ত্বং বিপন্নং ত্রাহি মাং শিবে ।
অদ্য রক্ষ মহামায়ে সঙ্কটে ভক্তপালিনি ॥
ভক্তিভাবং ন জানামি অজ্ঞোঽহং পাপতৎপরঃ ।
এবং স্তুতা নৃপেনাথ দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণী ॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা বভাষে—

নৃপনন্দনম্ ।
তুষ্টাস্মি তেঽনয়া বাচা নির্ভীকো ভব ভূপতে ॥
স্বয়ং সংখ্যে হনিষ্যামি বিজিগীষূন্নরাধমান্ ।
ত্বন্তু রক্ষ স্বকং ধাম খড়্গানেতান্ প্রগৃহ্য চ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ জগদ্ধাত্রী কালী কালান্তমাপহা ।
যুযুধে অরিভিঃ সার্দ্ধং যোগিনীগণসংযুতা ॥ ৬

মুহূর্ত্তেনাপি সা দেবী বিনির্জিতারিসংঘকান্ ।
রাজানং মোচয়ামাস সঙ্কটাদতিদারুণাৎ ॥
এবং যদা যদা বাধা বিপক্ষেভ্যঃ সমুত্থিতা ।
তদা তদাবতীর্য্যাজৌ রাজ্ঞে মুক্তিং চকার হ ॥

পূর্ব্বং যয়া জগতি দৈত্যপতি র্বলিষ্ঠো
ব্যাপাদিতো মহিষরূপধরঃ কিলাজৌ ।
অস্মৎকৃতে সকললোকভয়াবহোঽসৌ
দস্যুর্হতঃ কিমপি কর্ম্ম বিচিত্রমেতৎ ॥
দেব্যাদেশান্নরেন্দ্রং গতবিজিতদিশং ম্লেচ্ছরাজেন নীতং

দেবী যান্তী পুরস্তাৎ পথি হয়বরমারুহ্য গোপাঙ্গনায়াঃ । ৭
দুগ্ধং পীত্বা বদন্তী পিতরমনুগতং যাচধ্বং মূল্যমেতৎ
সাশ্চর্য্যং দৃষ্টবত্যং নৃপগণসহিতং পাশবদ্ধং মুমোচ ॥
কদা বাসলী শঙ্খকারাচ্চ শঙ্খং
গৃহীত্বাবদৎ স্বং পিতুর্মে গৃহাণ ।
ততো দেবীদাসস্তদ্বক্ত্যা তড়াগে

গতঃ শঙ্খহস্তামপশ্যৎ সহর্ষঃ ॥
দাস্যামি তে বস্ত্রমপুত্রকস্য
পুত্রো যদি স্যান্মম বর্ষমধ্যে ।
বিলাপ্য দেবীং মনসেতিভক্ত্যা
লেভে সুতং বিষ্ণুপুরাধিবাসী ॥
ততো বস্ত্রমেকং প্রদাতুং প্রযাতঃ
কুবিন্দস্য হস্তাদ্ গৃহীত্বোড়য়ন্তী ।
তদাচ্ছাদয়ন্তী প্রদৃশ্যাত্তু পশ্চাৎ
মধ্যে শঙ্করী সা কৃতানুগ্রহস্য ॥
যা নির্গুণা গুণময়ী বচসামগম্যা
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যা প্রগাঢ়বোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তর নাবলম্বা
সা নঃ সদাস্তু বরদা নমতাং তুরীয়া ॥

জগদম্বাপদদ্বন্দ্বমাপদাং ক্ষয়সাধনম্
বিশ্বকোটিবিনির্মাণস্থিতিসংহারকারণম্ ।
নিধায় হৃদয়ে দেবি বাসলী সারসম্পদং
ক্রিয়তে পণ্ডিতামোদী পদ্মলোচনশর্ম্মণা ॥

দ্বীপেভরামভূমানে শাকে কর্কটকে রবৌ ।৮
বিপশ্চিতাং প্রমোদায় গ্রন্থোঽয়ং সাধুবর্ণিতঃ ।৮

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয়বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্‌। কাউকে রেয়াৎ করবেন না—যে হতভাগ্য surrender (পরাজয় স্বীকার) না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্টমাস্‌ করতে পারবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—আপনি কি করলেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইম্‌স্‌ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোন্‌বামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বল্‌বে, আমরা বড় কম লোক নই; অন্য কাগজে বল্‌বে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করছি;—এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আন্‌বেন তখন আপনি আমাদের;—চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি—আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন' একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকছি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী করছিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশ মাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিৎ ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়োমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্চে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে—অতএব মৃত র‍্যাফেল্‌ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টান্‌বার জন্যে চেষ্টা করচে—কিন্তু আমি নড়ছিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা করতে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল—কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি' দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা করছি। বোধ করি' মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে

হোক্, উড়িষ্যায় হোক্, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে হচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত করবেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখচি। গৃহিনী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন—বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা করবেন—আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তাহ'লে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি। আমি ছবি আঁক্‌চি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখতে ব'সে গেছে শুনে বোধহয় কম আশ্চর্য্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করচে। দুই একটা নমুনা দেখলে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন :—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ আশে
থাকিস মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাব ব'লে ফেলে রাখিস্ পাওনা,
ছাড়িনা নগদ আম যাহা হাতে আসে!

এইসমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্ জারি করেচে—সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়—আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিনতে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করচেন—পণ্ডিত মশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখতে পারব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকতে থাকতেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পারতেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী করতে পারত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে হঠাৎ মুশলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে—মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলাদরজাগুলো দুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীর ভাব এনেছে—সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব করতে পারবেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে—তার পরে আবার যেদিন একটু বাদলা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটী নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আছি—ঝরঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন—তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাকবে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখবেন। কে কি বলচে, কি লিখচে, কি হচ্ছে সমস্ত আদ্যোপান্ত জানবার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি।

ইতি ১লা আশ্বিন
আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে—

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি---কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই—কিন্তু কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্‌-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার? নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সে-জন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন—তাঁহার মাছের ঝোল এখনো ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন—তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তাহার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।

ওঁ

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো—তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে? সাজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো, তোমার কাজ নহে—যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না—তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে—তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে—নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

ওঁ

২৫শে জুলাই

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থসঙ্কট, সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না—কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। * * * * তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিয়ো। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব—না যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি যাহা দেখিতে

পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না—আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ—আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীত সমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে—তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহা-ভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গবর্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হৌক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহিনা—তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ

তোমার

শ্রী রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না।

কিছু দিন রোগ ভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা লিখিতে হইল—তাহার পরে ভারতীর জন্য "চিরকুমার সভা" লিখিতে হইল—তাহার পরে সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়া গেল—আমাকে রঘুপতি সাজিতে হইয়াছিল—এইসমস্ত ঝঞ্ঝাটে বিব্রত ছিলাম।

বিসর্জ্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার (পুস্তকের) পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিত-ওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করাইয়া লইতে চান—নিরুৎসাহজনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা (লেখাটা) কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে (সহজ) করিবার জন্য কোন (ইচ্ছা জ্ঞাপন) করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে—ফস্ করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ---বড়াদাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই কর্‌চি—এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন্‌-ষ্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণী:কে আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা

মহেশচন্দ্র ঘোষ

মানবের দৃষ্টি সাধারণতঃ সংসারে আবদ্ধ। কিসে সুখ হইবে—ইহা লইয়াই অধিকাংশ লোক ব্যস্ত। এই শ্রেণীর লোক প্রার্থনা করে—ধন দাও, জন দাও; সুখ দাও, সম্পদ দাও; যশ দাও, মান দাও।

সংসারে আপদ বিপদও অনেক—কোন আপদ পার্থিব এবং কোন আপদ বা দৈব এবং অপার্থিব। মানুষ মানুষের অকল্যাণ সাধন করে। এ স্থলে অনেকে প্রার্থনা করে "শত্রুকে বিনাশ কর"। যাহারা ভূতপ্রেত দানব শয়তানাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাহারা এই সমুদায়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে।

মানুষ অনেক সময়ে পাপাচরণ করিয়া থাকে, এবং পাপ করিয়া ভয়ে ভয়ে থাকে, ঈশ্বর কখন বা কি শাস্তি দেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রার্থনা করিয়া থাকে—"আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে শাস্তি দিও না।"

আর এক শ্রেণীর মানব আছেন, যাঁহারা উন্নততর স্তরে অবস্থিত। তাঁহারা শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন—তাঁহারা ব্যস্ত আত্মার দুর্গতি দূর করিবার জন্য এবং কল্যাণ সাধন করিবার জন্য। তাঁহারা প্রার্থনা করেন জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্রতার জন্য।

যাঁহারা উদার ও বিশ্বপ্রেমিক, তাঁহারা যেমন নিজের জন্য প্রার্থনা করেন, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্যও প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

নিম্নস্তরের প্রার্থনা সর্ব্বদেশেই এক প্রকার। কোন্ জাতির আদর্শ কত উন্নত—জানিতে হইলে উচ্চতম প্রার্থনাই গ্রহণ করিতে হয়। অদ্য আমরা জগতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা লইয়াই আলোচনা করিব।

বৈদিক প্রার্থনা

বৈদিক যুগ অতি প্রাচীন; কিন্তু ইহার কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। এইমাত্র বলা যাইতে পারে—ইহা চারি পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে; এবং সভ্য জাতিগণের ইতিহাসে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম গ্রন্থ। এযুগের প্রার্থনা অতি নিম্নস্তরের; এ সময়ে যে উন্নততম প্রার্থনা পাওয়া যাইবে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু যাহা আশার অতীত তাহাও পাওয়া গিয়াছে; কেবল যে পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে ইহা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(১)

একটি প্রার্থনা এই :—

বিশ্বানি দেব সবিত—
দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ঋগ্বেদ ৫।৮২।৫
যজুর্ব্বেদ ৩০।৩

ইহার অর্থ এই—

"হে দেব সবিতা। আমাদিগের সমুদায় দুর্গতি দূর কর এবং যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহা আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর।"

এই প্রার্থনাটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আদি-ব্রাহ্মসমাজ এই মন্ত্রটিকে উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপরাপর ব্রাহ্মগণও অনেকে ভক্তিভাবে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদে 'সবিতা' শব্দের একটি অর্থ 'সূর্য্য'। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই ইহা 'প্র-সবিতা' অর্থাৎ 'জগৎ-প্রসবিতা' অর্থাৎ 'পরমাত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এই মন্ত্রের ঋষি অত্রি পুত্র শ্যাবাশ্ব।

(২)

আর একটি প্রার্থনা এই :

"হে বরুণ। যদি কখন কোন বন্ধু বা মিত্র, বা সখা বা ভ্রাতা বা

প্রতিবেশী বা অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি কোন পাপ করিয়া থাকি, হে বরুণ! তাহা তুমি দূরীভূত কর।...আমরা যেন তোমার প্রিয় হইতে পারি।"

ঋগ্বেদ ৫।৮৫।৭

এ স্থলে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং দেবতার প্রিয় হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অত্রি এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

(৩)

আরণ্যকের প্রার্থনা

ঐতরেয় আরণ্যকে এই প্রার্থনাটি পাওয়া যায়—

"আবিরাবীর্ম্ম এধি" (২।৭) "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

এস্থলে ব্রহ্মদর্শনের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। এই আরণ্যক অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

(৪)

উপনিষদের প্রার্থনা

বৃহদারণ্যক উপনিষদে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি পাওয়া যায়:—

অসতে য়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোমা্হ মৃতং গময়।

বৃহ: উ: ১।৩।২৭

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

ঐতরেয় আরণ্যক এবং উপনিষদের এই প্রার্থনা জগতে অতুলনীয়। আর কোন দেশে কখন এপ্রকার উচ্চ প্রার্থনা উচ্চারিত হয় নাই। ভারতবর্ষ ইহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সমাজ ইহাকে উপাসনার অঙ্গীভূত করিয়াছেন, নানা দেশের পণ্ডিতগণ ইহাকে সমাদর করিয়া থাকেন। এমন-কি খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণেরও বহু গ্রন্থে উপনিষদের প্রার্থনাটিকে একটি আদর্শ প্রার্থনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৫)

সোক্রাটেসের প্রার্থনা

'ফাইড্রস' নামক গ্রন্থে সোক্রাটেসের নিম্নলিখিত প্রার্থনা পাওয়া যায়:—

"হে প্রিয় 'পান্' এবং এইস্থলে অবস্থিত অপরাপর দেবগণ! আমার আত্মাকে শোভন কর। আমার অন্তর্বাহ্য এক হউক। আমি যেন জ্ঞানীব্যক্তিকে ধনী বলিয়া মনে করিতে পারি। সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহা গ্রহণ ও ভোগ করিতে পারে, আমি যেন সেই পরিমাণ বস্তু লাভ করিতে পারি।"

(ফাইড্রস,২৭৯)

ইহা একটি সুন্দর প্রার্থনা। বহুদেববাদ আছে বলিয়া, ইহা সকলের গ্রহনীয় না হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ অতি উচ্চ। একেশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন।

(৬)

ক্লেয়ান্‌ঠেসের প্রার্থনা

খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বে ক্লেয়ান্‌ঠেস্ (Kleanthes) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় নেতা। ইহার একটি ঈশ্বর স্তোত্র আছে; এই স্তোত্র নানা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেও ইহার বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বাংলাতে ইহার একটি অনুবাদ দিলাম।

"হে জেউস! তুমি অমরগণের মধ্যে মহত্তম; তুমি বহু নামে পূজিত; তুমি নিত্য সর্ব্বশক্তিমান ও জগতের স্রষ্টা; তুমি বিধি অনুসারে ইহাকে পালন করিতেছ। (তোমার উদ্দেশে বলিতেছি) স্বাহা!

আমরা তোমারই সন্তান; পৃথিবীর সমুদায় প্রাণভৃৎ ও জঙ্গমগণের মধ্যে কেবল আমরাই এক মাত্র তোমার আদর্শে রচিত। সুতরাং তোমাকেই কীর্ত্তন করিব, তোমার শক্তির মহিমাই গান করিব।......হে দেবতা! কি পৃথিবীতে, কি সাগর-গর্ভে, কি স্বর্গলোকে কোন স্থলেই তোমা ব্যতীত কিছুই সম্পন্ন হয় না—কেবল দুর্ম্মতি-গ্রস্ত লোকই মোহবশতঃ তোমার বিরুদ্ধে গমন করে। কিন্তু যাহা অনাবশ্যক, তাহার জন্যও তুমি স্থান রাখিয়া দিয়াছ; যাহা বিশৃঙ্খল, তাহাও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছ; যাহা মানবের অপ্রিয় তাহাও তোমার প্রিয়। শিব এবং অশিব সমুদায়কেই সম্মিলিত করিয়া সমঞ্জসীভূত করিয়াছ; এই সমুদায়ে এক নিত্যজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দুর্ম্মাতগ্রস্ত লোক ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে। হতভাগ্যগণ নিজেদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের নিত্য বিধি দেখিতেছে না এবং শুনিতেছেও না। অন্তঃকরণের সহিত এই বিধির অনুগত হইলে, ইহাদিগের কি কল্যাণই না হইত! ইহারা উন্মত্ত হইয়া নানাদিকে ধাবিত হইতেছে—কেহ যশের জন্য অশোভন চেষ্টা করিতেছে, কেহ লাভের জন্য গর্হিত পন্থা অবলম্বন করিতেছে, কেহবা শারীরিক সুখের লিপ্সা করিতেছে। কিন্তু ইহারা সদা ইহার বিপরীত ফলই সম্যক ভোগ করিতেছে। হে সর্ব্ব-দ মেঘের অন্তরালে অবস্থিত বজ্রাধিপ জেউস্! মানব জাতিকে এই সমুদায় মোহময় অকল্যাণ হইতে রক্ষা কর। হে পিতঃ! ইহাদিগের প্রাণ হইতে এই সমুদায় দুর্ম্মতি বিদূরীত কর। ইহাদিগকে সেই জ্ঞান লাভ করিতে দাও, যে জ্ঞান দ্বারা তুমি ন্যায়সঙ্গত ভাবে এই সমুদায় শাসন করিতেছ।

এইরূপে স্বয়ং গৌরবান্বিত হইয়া তাহারা যেন নিত্য মর্ত্ত্যজনোচিত সঙ্গীত দ্বারা তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া তোমাকে গৌরবান্বিত করিতে পারে।

বিশ্ব-বিধির গুণকীর্ত্তন করিতে পারিবে—ইহা অপেক্ষা দেব বা মনুষ্যের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

স্তোত্রকৃতের ভাব অতি মহান এবং উদার। জগতের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে; তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ইহার উদার প্রীতি দেখিলে বুদ্ধের কথাই মনে পড়ে।

(৭)

খৃষ্টানগণের প্রার্থনা

যীশু শিষ্যগণকে যে ভাবে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা মথি লিখিত সুসমাচারে লিখিত আছে। ইহা প্রভুর প্রার্থনা (Lord's Prayer) নামে পরিচিত। নিম্নে এই প্রার্থনা অনূদিত হইল।

হে আমাদিগের স্বর্গবাসী পিতা!

তোমার নাম পবিত্রীকৃত হউক (১)

তোমার রাজ্য উপস্থিত হউক (২)

যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক (৩)

আমাদের কল্যকার জন্য যে খাদ্য আবশ্যক তাহা অদ্য আমাদিগকে দাও (৪)

আমাদিগের নিকটে যাহারা ঋণী তাহাদিগকে আমরা যেমন ক্ষমা করিয়াছি তুমিও তেমনি আমাদিগকে ক্ষমা কর (৫)

আমাদিগকে প্রলোভনে লইয়া যাইও না (৬)

কিন্তু দুরাত্মা হইতে (অর্থাৎ দুরাত্মা শয়তানের হস্ত হইতে) আমাদিগকে উদ্ধার কর (৭)।

এই প্রার্থনায় ৭টি কামনা। প্রথম তিনটি কামনা স্বর্গরাজ্য বিষয়ক। এই তিনটিতে বলা হইয়াছে যে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই স্বর্গ-রাজ্যে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক এবং তাঁহার নাম পবিত্রীকৃত হউক। ইহুদীগণ এবং সশিষ্য যীশু যে 'স্বর্গরাজ্য' কামনা করিতেন, বর্ত্তমান যুগে সে 'স্বর্গরাজ্য' আদরণীয় এবং প্রার্থনীয় হইতেছে না। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের যে বর্ত্তমান আদর্শ সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে। চতুর্থ কামনাটি ঘোর সাংসারিক লোকের প্রার্থনা। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ খৃষ্টানগণ উক্ত বাক্যটিকে এই ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন—

"আমাদিগের দৈনিক খাদ্য অদ্য আমাদিগকে প্রদান কর।"

এই অনুবাদ ভুল হইলেও ইহা দ্বারা খৃষ্টান সমাজের আদর্শ কিঞ্চিৎ উচ্চতর করা হইয়াছে।

অনেক খৃষ্টানও পঞ্চম কামনাটিকে আপত্তিজনক বলিয়া মনে করেন। এই স্থলে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে ঈশ্বর কেন কিংবা কি পরিমাণ ক্ষমা করিবেন।

ষষ্ঠ প্রার্থনা অত্যন্ত আপত্তিজনক। ইহাতে বুঝান হইতেছে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যান। আর তিনি যদি আমাদিগের কল্যাণের জন্য প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যান্ তাহা হইলে এভাবে প্রার্থনা করা উচিত নহে, যে, "আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যাইও না;" এ অবস্থায় প্রার্থনা হওয়া উচিত:—

"শক্তি দাও যেন প্রলোভনকে জয় করিতে পারি।"

প্রাচীন কালেই অনেক খৃষ্টান এই প্রার্থনাটি বর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহারা এ বাক্যটি উচ্চারণই করিতেন না।

কেহ কেহ এই অর্থে উক্ত বাক্যটি ব্যবহার করিতেন—

"আমাদিগকে প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না।"

শান্তিনিকেতনের প্রার্থনায় "মা মা হিংসীঃ অংশের অর্থ করা হয় "আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে দিও না।" ইহার মৌলিক অর্থ—আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

সপ্তম প্রার্থনাটি নিতান্তই কুসংস্কার-মূলক। শয়তান কোথায়?

দেখা যাইতেছে যে কোন উপায়ে যীশুর প্রার্থনার প্রথম তিনটি অঙ্গকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট চারিটি কামনাই আপত্তিজনক।

'প্রভুর প্রার্থনা' সমুদায় খৃষ্টান সম্প্রদায়ে প্রচলিত এবং আদিম যুগের খৃষ্টানগণও দৈনিক তিনবার এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেন (ডিডা খে, ৮।৩)। সুতরাং ইহাই সমগ্র খৃষ্টান সমাজের আদর্শ প্রার্থনা। এই জন্যই আমরা এই প্রার্থনার বিষয়ে আলোচনা করিলাম।

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টানদিগের বহু গ্রন্থে 'প্রভুর প্রার্থনা' অপেক্ষা উচ্চতর প্রার্থনার আদর্শ দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বজন-গৃহীত হয় নাই বলিয়া তাহার একটিরও আলোচনা করা গেল না।

(৮)

মুসলমানগণের প্রার্থনা

সমগ্র মুসলমানসমাজে একই উপাসনা (নামাজ) প্রচলিত। সুতরাং এবিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। নামাজের অনুবাদ এই :—

"আমি নিশ্চয় তাঁহার সম্মুখীন হইলাম,—যিনি দ্যৌ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি কখন মনে করি না যে তাঁহার কেহ অংশী আছে। ঈশ্বর অতি মহান্।

হে পবিত্র মহান্ ঈশ্বর। আমরা তোমারই গুণগান করিতেছি; তোমারই নাম মঙ্গল বিধান করিতেছে; তোমারই গৌরব উচ্চ হইয়াছে; তোমা ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই।

হে ঈশ্বর! অভিশপ্ত শয়তানের দুষ্ট মতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ঈশ্বরের নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

পবিত্র মহান্ ঈশ্বর!

যদি কেহ ঈশ্বরের প্রশংসা করে, তাহা তিনি শুনিতে পান।

হে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। তোমারই জন্য প্রশংসা।

সমুদায় প্রশংসা, সমুদায় অর্চনা ও সমুদায় শুভ ঈশ্বরেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট।

হে প্রেরিত পুরুষ! তোমার জন্য শান্তিবাচন(= সেলাম), ঈশ্বরের করুণা তোমার উপর অবতীর্ণ হউক। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি ও ধার্ম্মিক দাসগণের প্রতি (অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি) অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই; আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ ঈশ্বরের দাস ও প্রেরিত।

হে ঈশ্বর! মোহাম্মদের উপর ও তাঁহার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেমন এব্রাহিম ও তাঁহার বংশধরগণের উপর বর্ষণ করিয়াছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও পবিত্র। হে ঈশ্বর! মোহাম্মদ ও তাঁহার বংশধরগণের উপর কৃপা বর্ষণ কর যেমন এব্রাহিমও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান্।

হে ঈশ্বর! আমাকে ক্ষমা কর। হে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দয়াময়! আমার পিতা মাতাকে ও ভবিষ্যৎ বংশীয়গণকে, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীকে, মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকে, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে এবং যাহারা লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—সকলকেই দয়া বিতরণ করিয়া ক্ষমা কর।

হে ঈশ্বর! আমাদিগের জন্য ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের বিধান কর এবং নরকদণ্ড হইতে উদ্ধার কর।

হে পরম শ্রেষ্ঠ দয়াময় পরমেশ্বর! তোমার সুসৃষ্টি মোহাম্মদ, তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর।

হে ঈশ্বর! নিঃসন্দেহ তোমা হইতেই আমরা সাহায্য

ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমা হইতেই আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। তুমিই আমাদিগের আশার স্থল, আমরা তোমারই গুণ-গান করিতেছি এবং তোমারই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমরা অকৃতজ্ঞ নহি। যাহারা তোমার অবাধ্য, আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকি ও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। হে ঈশ্বর। আমরা তোমারই অর্চ্চনা করিতেছি। তোমারই উপাসনা করিতেছি, তোমাকেই প্রণিপাত করিতেছি, এবং তোমারই দিকে ধাবিত হইতেছি। আমরা তোমারই কৃপা-ভিখারী। তোমারই শাস্তিতে আমাদিগের ভয়। নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এই উপাসনা বিশ্লেষণ করিয়া এই কয়েকটি বিষয় পাওয়া যাইতেছে:—

১। ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন

২। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

৩। মোহাম্মদ, তাঁহার বংশধরগণ এবং সহচরগণের জন্য প্রার্থনা।

৪। নিজেদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনা।

৫। পিতা মাতা, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ, ইহকালবাসী পরকালবাসী বিশ্বাসী নরনারীর জন্য প্রার্থনা।

৬। শাস্তিতে ভয় প্রকাশ, ক্ষমা ভিক্ষা, নরক দণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রার্থনা।

৭। শয়তানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রার্থনা।

৮। কাফের বর্জ্জন ও তাহাদিগকে অভিশাপ।

এই ৮টির মধ্যে প্রধানতঃ শেষটিই আপত্তিজনক; সৌভাগ্যের বিষয় অনেক ধার্ম্মিক মুসলমান নামাজের সময় 'অভিশাপ' সংক্রান্ত অংশ বর্জ্জন করেন। নরক ও শয়তানে বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক। তৃতীয় প্রার্থনাটি মুসলমানগণের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। পঞ্চতম প্রার্থনাটী অতি সুন্দর।

সমগ্র প্রার্থনা বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহাতে আধ্যাত্মিকতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই; এ প্রার্থনা কুসংস্কারপূর্ণ, সাম্প্রদায়িক এবং অনুদার; ইহা সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনারূপে গৃহীত হইতে পারে না।

(৯)

চৈতন্যের প্রার্থনা

ভক্ত শিরোমণি চৈতন্যের একটি সুন্দর প্রার্থনা আছে। সেটি এই:—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী কবিতা (কিংবা সুন্দরী স্ত্রী ও কবিতা শক্তি) প্রার্থনা করি না। আমার জন্মে জন্মে তোমাতে যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

অহৈতুকী ভক্তির জন্য প্রার্থনা জগতে অতুলনীয়।

আমরা নয়টি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলাম। এ সমুদায়ের মধ্যে প্রথম তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, এবং অষ্টম প্রার্থনা কোন না কোন সম্প্রদায়ে প্রচলিত।

এই নয়টি প্রার্থনার প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। মুসলমানগণের প্রার্থনায় বিধর্ম্মিগণের প্রতি বিদ্বেষ ও অভিশাপ আছে সত্য; কিন্তু অপরাপর অংশে প্রীতি ও নিঃস্বার্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যীশুর প্রার্থনার বিশেষত্ব স্বর্গরাজ্য-বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা। সোক্রাটেসের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উপযোগী; ইহাতে যুক্তাহার বিহার এবং উচ্চ ধর্ম্ম ভাব সমগ্রসীভূত হইয়াছে। অত্রির প্রার্থনার বিশেষত্ব—পাপবোধ এবং পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা। শ্যাবাশ্বের প্রার্থনা—অকল্যাণ বিনাশ ও কল্যাণ লাভ। ক্লেয়ান্‌থেসের প্রার্থনায় একটি বিশেষ ভাব আছে, যাহা অপর কোন প্রার্থনায় নাই। বিশ্বপ্রীতি এবং জগতের কল্যাণ এই দুইটি ভাব এই প্রার্থনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। উপনিষৎ ও আরণ্যকের প্রার্থনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রার্থনা আর হইতে পারে না। চৈতন্যের প্রার্থনাও অতি উচ্চ। 'অহৈতুকী ভক্তি' জগতের পক্ষে নূতন ব্যাপার।

কিন্তু এই সমুদায় প্রার্থনার মধ্যে কেবল দুইটি প্রার্থনাই সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। সে দুইটি এই:—

(১) ঐতরেয় আরণ্যকের প্রার্থনা।

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রার্থনা।

সতীন-কাঁটা

শ্রী সজনীকান্ত দাস

যে মৎস্যটি পলায়ন করে সেইটিই যে আকারে বৃহত্তর এইটাই লোকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লয়; কাঁদিতে না বসিলেও হাতছাড়া মাছটিকে লইয়া লোকে হা-হুতাশ করিবার প্রলোভনটুকু ছাড়িতে পারে না। আমাদের নিকুঞ্জবিহারীও তাহার প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীকে স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রচুর তুলনা-মূলক সমালোচনা করিত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়া বিরজাসুন্দরী অপেক্ষা প্রথমা মালতীলতাকেই সে বেশী নম্বর দিয়া ফেলিত। কিন্তু ইহা তাহার অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম সংবাদ। বাহিরে সে আদর্শ স্বামী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে ছাড়িত না; এতটুকু সন্দেহ করিবার কোনো কারণ কোনোদিন বিরজাসুন্দরীর ঘটে নাই, ঘটিলে নিরীহ নিকুঞ্জবিহারীর দুর্দ্দশার অন্ত থাকিত না।

নিকুঞ্জবিহারী এমন সন্তর্পণে চলিত যে বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ বড় একটা তাহার প্রথম বিবাহের সন্ধান রাখিত না। বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম পক্ষ হঠাৎ গত হইবার পর নিকুঞ্জবিহারীর জীবন কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যায়; স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করিয়া বসে যে, পৃথিবীতে কিছুতেই আর তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। সৌখীন বস্ত্রাদি, প্রসাধন-সামগ্রী ও এম্-এর পাঠ্যপুস্তকগুলি নিঃশেষে পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া সে ঠন্‌ঠনের চটিপায়ে, রুক্ষ কেশ ও মলিন বেশে প্রত্যহ গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় গিয়া আকাশের তারা গুণিতে সুরু করে। নাওয়া খাওয়ার ঠিক নাই, পড়াশোনা ত আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে চুরুট খাইত না, চুরুট খাওয়া ধরিল। চায়ের দোকানের একটি কোণা অধিকার করিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাইয়া যায় এবং হস্তস্থিত দৈনিক সংবাদপত্রের মার্জ্জিনে কবিতার নোট লেখে। তাহার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিধবা মাতা প্রমাদ গণিলেন ও পাড়ার পাঁচজন জানাশোনা লোকের কাছে ইহার ঔষধের সন্ধান চাহিলেন। সবাই বলিল—প্রথমটা অমন হয়, আবার একটি বিবাহ হইলেই সমস্ত উড়ু উড়ু ভাব কাটিয়া গিয়া ছেলে সংসারে থিতাইয়া বসিবে। মা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় ছেলের কাছে কথা পাড়িলেন। ছেলে দীপ্ততেজে জলিয়া উঠিয়া কেবলমাত্র বলিল—"ছি মা!" বলিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সে দিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিকুঞ্জবিহারী ঘর সাজাইতে বসিয়া গেল। স্ত্রীর ফোটোখানি টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া দিল ও তাহার স্মৃতি-রঞ্জিত বস্তুগুলি যাহাতে সহজেই নজরে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিল। সমস্ত গোছগাছ শেষ করিয়া সে মৃত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিতে বসিল।

কবি বলিয়া স্কুলের সহপাঠী মহলে নিকুঞ্জবিহারীর খ্যাতি ছিল। 'কুজ্ঝটিকা' নামক মাসিকপত্রে তাহার একটি কবিতাও একবার বাহির হইয়াছিল। ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ করার পর মালতীলতার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তখন হইতে সে কবিতা লেখা ছাড়িয়া পত্র-লিখনে দক্ষতা লাভ করে। সে বলিত, কবিতার মত ভাল চিঠিও সাহিত্যের অঙ্গ। স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া একটা 'ছিন্ন পত্র' ছাপিবার মতলবও নাকি তাহার হইয়াছিল, চক্ষুলজ্জার খাতিরে ছাপাইতে পারে নাই। তবে ভবিষ্যতের জন্য সে তাহার ও তাহার স্ত্রীর চিঠিগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। আজ বহু দিন পরে মায়ের কথায় তাহার সুপ্ত কাব্যাগ্নি ধিকি ধিকি জলিয়া উঠিল। স্ত্রীর ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাব ও মিল সংগ্রহ করিতে লাগিল। মা বার বার তাহাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ভয়ে ফিরিয়া গেলেন। নিকুঞ্জবিহারী মনের আবেগে সে রাত্রে আহার করিল

না। প্রথমে একটি ছোট্ট সনেট লিখিয়া পরিষ্কার হস্তাক্ষরে সেটি নকল করিয়া সামনের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিল। সেই ছোট কবিতাটিতেই তাহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। কবিতাটি এই—

অন্তহীন অন্ধকারে বসিয়া একেলা—
অতীত দিনের কথা মনে মনে ভাবি—
লো মালতী কেন, খেলি দু'দিনের খেলা
শূন্য করি খেলাঘর লাগাইলে চাবি!

তব ছবি অন্ধকারে মিটি মিটি হাসে,
বুকফাটা হাহাকারে আমি কাঁদি প্রিয়া,
বুঝিনা কেমনে, যেবা যারে ভালবাসে—
তার হ'তে দূরে গিয়ে রহে গো বাঁচিয়া!

কে বুঝিবে মোর এই অন্তহীন প্রীতি—
সখিরে এ বিশ্বমাঝে সন্দেহিছে সবে;
আবার বিবাহ নাকি সংসারের রীতি---
শুন প্রিয়ে, সংসারের নই আমি তবে!

যেথা তব গতি প্রিয়া মোর সেথা গতি
তুমি বুকে বিরাজিছ শোভনা' মালতী!

ইহার পর নিকুঞ্জবিহারী দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ অনেকখানি দমন করিয়া স্ত্রীর ফোটোখানি বুকে করিয়া শয়ন করিল।

ইহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল জানি না। মাসখানেকের মধ্যে নিকুঞ্জবিহারী দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিল। এবং তাহারও মাসকয়েক পরে শ্রীমতী বিরজা-সুন্দরী তোড়-জোড় করিয়া স্বামীঘর করিতে আসিল। নিকুঞ্জবিহারী তখন কাব্যমার্গে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে; নিজের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কোনো বন্ধুর নাম দিয়া একটি সরস কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কবিতাটিতে প্রথম পক্ষের উল্লেখ মাত্র ছিল না।— কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

সেই ভাল, কর তবে বিয়ে—
নিদাঘ নিশীথকালে থাকিতে না পার যদি
একটানা প্রাণখানা নিয়ে।
জ্যোছনা যামিনী ভাগে যদি ফাঁকা ফাঁকা লাগে—
সদা যদি হৃদে জাগে, হ'ত কত সুখ—
এ হেন সময়ে যদি জাগিয়া রহিত বুকে
একখানি কচি কচি মুখ;
টুকটুকে ছোট ছোট নধর অধর কোণে—
ঢলঢল্ একরাশি মধুহাসি নিয়ে;
সেই ভাল কর তবে বিয়ে।

কোকিলের কুহু তানে প্রাণে যদি ব্যথা আনে
গাহ যদি মনে মনে অভাবের গান;
জীবন কিছুই নয় সদা যদি মনে হয়
করে যদি টলমল প্রাণ—
পড়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা নিরাশার লোনা জল
উদাস আকুল ওই আঁখি কোণ দিয়ে—
সেই ভাল কর তবে বিয়ে।

একটু অধিক বয়সে বিরজাসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সতীন সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্নিহান ছিল ও সতীন সাহিত্যে গ্রাম্যছড়া প্রভৃতি ও সখী-সমবয়সীদের সহায়তায় বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। স্বামীর মন যে স্বভাবতই প্রথম স্ত্রীর দিকে পড়িয়া থাকে, তা সে জীবিতই হউক, মৃতই হউক, একথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল এবং সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে আসিয়াছিল। স্বামীর শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিরজাসুন্দরী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; প্রথম নজর চোখে পড়িল, টেবিলের উপর ফোটোখানা, তার পরেই দেওয়ালে টাঙানো ছন্দোবদ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস; তারপর বাক্স প্যাটরা পুঁথিপত্র ইত্যাদি। ভ্যাবাচ্যাকা স্বামীকে ভাবিবার অবসর না দিয়া ধূলিলিপ্ত পদেই সে গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। নিকুঞ্জ-বিহারী সগর্বে তাহার মাতাকে গিয়া জানাইল যে নূতন বধূ ভারী গোছালো। ঘণ্টাখানেক পরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যসত্যই অবাক্ হইল এবং তখন হইতেই বুঝিয়া লইল যে আর যাহাই করুক দ্বিতীয় পক্ষের কাছে প্রথমপক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। টেবিলস্থিত ফটোখানি অন্তর্হিত হইয়াছে। দেওয়ালে

টাঙানো সনেটের টুক্‌রাগুলি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে এবং প্রথম পক্ষের সযত্নরক্ষিত বাক্স-পেঁটরাগুলি খাটের নীচে আত্মগোপন করিয়াছে। নিকুঞ্জবিহারীর বুক ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল—তাহার বাক্স খুলিয়া দেখে নাই ত! সেখানে যে তাহার অতিপ্রিয় 'পত্রাবলী' সযত্নে রক্ষিত ছিল! ফোটো ও সনেটের যাহাই হউক এই চিঠিগুলিকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত। একবার ফাঁক পাইলেই সে এগুলিকে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবে যে বিরজাসুন্দরী কিছুতেই ইহাদের কোনো সন্ধান পাইবে না!

ঘর গোছানো শেষ করিয়া বধূ যখন স্নানাহার করিতে গেল নিকুঞ্জবিহারী তখন অতীব সন্তর্পণে আপনার বাক্স খুলিয়া প্রথমটা হতাশ হইয়া পড়িল। বাক্স যে খোলা হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে;—চিঠি পত্র-গুলির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে,কিন্তু কিছুই খোওয়া যায় নাই—কারণ খোওয়া যাইবার মত চিঠি সেগুলি ছিল না। নিকুঞ্জবিহারীর সৌভাগ্য যে সে তাহার প্রথমা পত্নীর পত্রগুলি একটি খাতার মধ্যে আঁঠা দিয়া আঁটিয়া রাখিয়াছিল। বামধারে তাহার চিঠি ও ঠিক ডানধারে মালতী-লতার উত্তরগুলি আঁটিয়া সে একটি খাতা সাজাইয়া রাখিয়াছিল, অবসর সময়ে চিত্তবিনোদের জন্য সে প্রায়শই এই পত্রগুলি পাঠ করিত। খাতা দেখিয়া বিরজাসুন্দরী কিছুই সন্দেহ করে নাই। নিকুঞ্জবিহারী তাড়াতাড়ি খাতাখানি সরাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পক্ষের সহিত অল্প কয়েকদিনের ব্যবহারেই নিকুঞ্জবিহারী বেশ বুঝিল যে, বিরজাসুন্দরী পতিপরায়ণা হইলেও কোমল ও ক্ষমাশীল নহে; তাহার মন জোগাইয়া না চলিলে সে কুরুক্ষেত্র বাধাইতে জানে। স্বামীঘর করিতে আসার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সে তাহার সতীনের সমস্ত পদচিহ্ন এমন নিঃশেষে গৃহ হইতে মুছিয়া ফেলিল যে, নিকুঞ্জবিহারীর মাতারই মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত বুঝিবা বিরজাই তাঁহার প্রথমা পুত্রবধূ। পাড়া-পড়শীরা ত মালতীর কথা বিস্মৃতই হইয়াছে। শাশুড়ী ও প্রতিবাসীদের দিক দিয়া বিরজাসুন্দরী নিষ্কণ্টক হইলেও স্বামীর সম্বন্ধে তাহার বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম সতীনের ধ্যানপরায়ণ স্বামীকে সে প্রায়ই ধরিয়া ফেলিয়া লাঞ্ছনা করিত—মৃতার উদ্দেশে মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হইত না। নিকুঞ্জবিহারী মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইত ও চুপ করিয়া থাকিয়া পত্নীর রোষানলে আহুতি প্রদান করিত। সে এখন ভুলিয়াও মালতীর নাম করে না। বিরজাসুন্দরী ক্রমশঃ স্বামীর অনন্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে।

কিন্তু সেই গোপন পত্রগুলি রহিয়া গিয়াছে; বেনামীতে ছিন্নপত্র প্রকাশ করার কথা এখনও নিকুঞ্জবিহারীর মনে উঁকিঝুঁকি মারে। বিরজাসুন্দরী যখন নিশ্চিন্ত হইয়া শিশুপুত্রের চন্দ্রহার গড়াইতে ব্যস্ত, কবি নিকুঞ্জবিহারী তখন মালতীলতার স্বপ্ন দেখে। অলিখিত কাব্য মনের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রকলত্র পরিবৃত নিকুঞ্জবিহারী তাহার আদর্শ পত্নীহারা হইয়া এখন বাদলরজনীতে হাহাকার করে ও সুর করিয়া মেঘদূত পড়িতে বসে। বিরজাসুন্দরী সন্দেহ করিবার আর অবকাশ পায় না; তার অনেক কাজ।

স্বর্গগত পিতার দৌলতে খাওয়াপরার অভাব নিকুঞ্জ-বিহারীর ছিল না; তবু অবসর-যাপনের জন্য ও উপরি-আয়ের আশায় একটা মার্চেন্ট অফিসে সে কাজ লইয়াছিল। একদিন সে তাহার অতি প্রিয় 'পত্রাবলী' খানি সন্তর্পণে লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির করিয়া অফিসের দেরাজে চাবি বন্ধ করিয়া আসিল। শনিবারে ২টার সময় অফিস বন্ধ হয়, সে খাতাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সটান ইডেন-গার্ডেনে গিয়া কোনো একটি বৃক্ষকুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া 'পত্রাবলী' পড়িতে বসিল। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে অতীত দিনের সুখস্মৃতিগুলি তাহার ভাবাতুর চোখে জল্ জল্ করিয়া উঠিল। দুই একটি পাতা উল্টাতেই তাহার চোখে পড়িল—

৫ নং চিঠি

সর্ব্বস্ব আমার!!!

আমার মালতী, আমার লতা,তোমাদের ওখান হইতে এসে অবধি আমার জীবনের খেই হারাইয়া গেছে, কিছুই

ভালো লাগে না—তুমি হয়ত হাসিবে, তুমি হয়ত তোমার 'গঙ্গাজলের' সঙ্গে আমাকে নিয়ে কৌতুক করিবে—তা কর, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু আমার বুকের গুরুভার আমি কোথায় নামাই প্রিয়তমে! যাদিকে নিকট-আত্মীয়-বন্ধু ব'লে গণ্য কর্তাম, তোমাকে বুকে পাইবার পরমুহূর্ত্ত হইতে আর তাহাদের চিনিতে পারি না। কেন এমন হইল লতি?

আজ আমাদের বাড়ীর ছাদ ছাইয়া জ্যোছনার বান ডাকিয়াছে, পাশের বাড়ীর খাঁচায় পোরা কোকিলটার অশ্রান্ত কুহুধ্বনি আমার বুকের মাঝে হাহাকার তুলিয়াছে---তুমি কোথায়? দূরে একটা বাড়ীতে এস্রাজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোন্ বিরহী গাইছে—ও মাধবী, ও মালতী,

হয়ত চিনি, হয়ত চিনি, হয়ত চিনিনে
আমায় ব'লে দেবে কে—

আমার মালতী এখন কি করিতেছে আমায় কে বলিয়া দিবে? বসন্তশারদ পূর্ণিমা-নিশীথের সমস্ত বিরহীকুলের ব্যথা আজ ঘনিয়ে উঠ্‌ছে আমার মনে—রোমিও আজ জুলিয়েটের বাতায়ন-তলে করুণমিনতিপূর্ণ স্বরে হাঁকিয়া গেল, দ্বার খোল জুলিয়েট! আমি আসিয়াছি! জেসিকা আজ তাহার প্রিয়তমের সঙ্গে পিতার আশ্রয়নীড় ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; তুমিই কি কেবল অবাধে ঘুমাবে! ফুটফুটে হিমাক্ত জোছনায় বিনিদ্র বুঝি কেবল একলা আমি—আমার মনে হচ্ছে সেদিনের কথা—যে দিন ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে—আর আজ কোথায় আমি, কোথায় আমার লতা—অনন্ত ব্যবধান!

তোমার পত্র না পাইলে পড়াশোনা করিতে পারি না। তুমি শীঘ্র উত্তর দিও আমার বুকভরা স্নেহ ও—গ্রহণ করিও—ইতি।

তোমার
আমি

৫নং চিঠির উত্তর

বারুইপুর
C/o ডাক্তার বাবুর বাড়ী
[illegible]

শ্রীচরণেষু

দেখ তুমি অমন ক'রে আর আমায় চিঠি দিও না। তোমার চিঠি যখন এল, আমি তখন চান্ কর্‌ছি—সেজদি চিঠিখানা নিয়ে খুলে, মায়ের কাছে আর বড় বৌদির কাছে জোরে জোরে পড়্‌তে লাগ্‌ল, আমি ত লজ্জায় মরি! মাগো মা, তুমি এত আবোল-তাবোল লিখ্‌তেও পার,—গঙ্গাজল প'ড়ে হেসে খুন—বলে, তোর বর ভাই বেশ ছড়া কাটে। তুমি অমন ছড়াটড়া আর কেটো না।

কাল বাবার কাছে মায়ের একখানা চিঠি এসেছে, তিনি আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবেন লিখেছেন। আমার ছোট ভায়ের ভাত হবে চোত মাসে, লক্ষ্মীটি আমি এ ক'দিন এখানে থাকব, মাকে ব'লে দিও। তুমি ভাল ক'রে পড়াশোনা ক'রো, ভাল পাস না দিতে পার্‌লে সবাই আমাকে খোঁটা দেবে; সেজ জামাইবাবু এবার ডিপুটি হয়েছেন; সবাই তাঁর কত সুখ্যাত করে।

গঙ্গাজল তোমার বেশ একটি নাম দিয়েছে, শুনে ত হেসে বাঁচিনে। এত রঙ্গও জানে! নামটা কি শুনবে? নি—। না বাপু, আমি লিখ্‌তে পারিনে। আমার প্রণাম নিও ও মাকে প্রণাম দিও। আজ তবে আসি,

ইতি শ্রীচরণের দাসী মালতী

একটার পর একটা পাতা উল্টাইয়া যায় আর তাহার কত কথাই না মনে পড়িতে থাকে! হায় রে হাস্যলাস্যপরায়ণ মালতীলতা ও তাহার গঙ্গাজল; বারুইপুরে গিয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকারও আজ তাহার নাই। নিকুঞ্জবিহারীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, মাথা গরম হইয়া গেল। খাতাখানি হাতে লইয়া সে সবেগে পায়চারী করিতে লাগিল। না, প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর এই স্মৃতি-গুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিতেই হইবে—আজই এগুলিকে ছাপিতে দিব—ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জবিহারী শ্যাম-বাজারের ট্রামে চড়িয়া বসিল।

খাতাখানি কোলের কাছে লইয়া, ডিমাই না রয়্যাল, আর্টপেপার কিম্বা এ্যান্টিক্ ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জ-বিহারী চলিয়াছে, হঠাৎ গোলদিঘীর সম্মুখে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল; চমকিয়া চাহিয়া দেখিয়াই তাহার বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। [illegible] ভাবনা

যস্য—তাহার প্রথম পক্ষের সেজ ভায়রাভাই। সে সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

গোলদীঘিতে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া বহুদিন পরে নিকুঞ্জবিহারী একবার প্রাণ খুলিয়া মালতীর কথা বলিয়া লইল এবং পত্রাবলী ছাপাইবার গোপন অভিপ্রায়টুকুও ভায়রাভাইকে বলিতে সে দ্বিধা করিল না। পত্রাবলীর কথা হইতেই তাহার খেয়াল হইল যে, খাতাখানি সঙ্গে নাই। সর্ব্বনাশ—কোথায় খাতা! নিশ্চয়ই ট্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে! বিহ্বল ভায়রাভাইকে কিছু বুঝিবার অবসর না দিয়াই সে ফুটপাথে আসিয়া একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল এবং সোজা শ্যামবাজার ট্র্যাম-ডিপো অভিমুখে ট্যাক্সি চালাইতে বলিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; খাতাখানি পাওয়া গেল না; ট্র্যামের নম্বর নেওয়া ছিল না, তারপর অনেক ট্র্যাম আসিয়াছে; সন্ধান করিবার কোনো উপায় নাই। হায় রে আজ কি কুক্ষণেই সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল! কিন্তু খাতাখানি যে তাহাকে পাইতেই হইবে! অসুস্থ মন লইয়া নিকুঞ্জবিহারী সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই শয্যা আশ্রয় করিল, বিরজাসুন্দরী ব্যস্তসমস্তভাবে কাছে আসিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল; নিকুঞ্জবিহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, অফিসের একতাড়া দরকারী কাগজ সে ট্র্যামে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেগুলি না পাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। বিরজাসুন্দরী তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া উঠিল "ও, এই, আমি বলি মাথাটাথা ধরল বুঝি! তা এতে আর কি হয়েছে—খবরের কাগজে একটা নুটিশ দিলেই কাগজ পাবে, তার আর কি! দাদার একবার......"নিকুঞ্জবিহারী লাফাইয়া উঠিল, ঠিক, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই ত হইবে! কিন্তু বাড়ীর ঠিকানা দিলেইত সর্ব্বনাশ! অফিসের ঠিকানা দিতে হইবে।

নিকুঞ্জবিহারী অমৃতবাজার, ফরওয়ার্ড ও আনন্দবাজারে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিল—অফিসের ঠিকানা দিতে ভুলিল না—লিখিল 'বিশেষ জরুরী কাগজপত্র—'

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল, একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন চলিয়া গেল; কোনো উত্তর নাই। নিকুঞ্জবিহারী সকাল সকাল অফিস যায়, দেরী করিয়া বাড়ী ফেরে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না; পুরস্কারের লোভেও কেহ আসিল না। নিকুঞ্জবিহারী হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—ওজিনিষ কি কেহ হাতে পাইলে সহজে ছাড়িবে! হয়ত নিজের নামে ছাপাইয়া দিবে, তাহাকে কিনিয়া পড়িতে হইবে! ইহাকেই বলে গ্রহের ফের!

বিরজাসুন্দরী স্বামীর দুঃখে বিচলিত হয় ও নানা ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। বলিল, সাহেবকে একটু ধরাধরি করিলেই আর কোনো গোল হইবে না; সাহেব হইলেও মানুষ ত!

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মন ভাঙিয়া গেল; অফিসের ছুটি লইয়া মা ও স্ত্রীর কাছে কাজের অছিলা দেখাইয়া একদিন সে বারুইপুর চলিয়া গেল; প্রিয়তমা পত্নীর বাপের বাড়ীর আব্‌হাওয়ায় মনটা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে!

বিপদ যখন মানুষের আসে তখন একেলা আসে না। মন সুস্থির করিতে নিকুঞ্জবিহারী যেদিন বারুইপুর গেল, তাহার পরের দিনই তাহার গৃহে একটি লোকের আবির্ভাব হইল—বলিল, বাবুকে তাহার বিশেষ প্রয়োজন, অফিসে খোঁজ করিয়া বহুকষ্টে বাড়ী সন্ধান করিয়া সে আসিয়াছে। বিরজাসুন্দরী দরজার অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে তাহার কি প্রয়োজন। লোকটি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'খবরের কাগজে—' বলিয়াই সে একটি বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

বিরজাসুন্দরী খুসী হইয়া চাকরকে বলিল, "বাবুকে বস্‌তে বল্‌"—বলিয়াই তাহার জলখাবারের আয়োজন করিতে গেল। খাতাখানি হাতে পাইলে স্বামীকে বেশ একটু জব্দ করা যাইবে—একটা কিছু আদায় করিয়া তবে সে খাতা দিবে—ইত্যাদি নানাচিন্তায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

লোকটিকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া বিরজাসুন্দরী চাকরের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রান্নাঘরে তাহার কাজ ছিল, খাতাখানি শোবার ঘরে রাখিয়া সে কাজ করিতে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া সে খাতাখানি নাড়িয়া-

চাড়িয়া দেখিতে লাগিল; এই সামান্য একখানা খাতার জন্য এত ভাবনা, এত ভয়! যাক্, তবু ত তাহার মত লইয়া চলিয়াছিল বলিয়া এটা ফেরত পাওয়া গেল—অথচ এরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবিয়া মেয়েদের পরামর্শ না লইয়াই চলিতে চায়!

খাতাখানি খুলিয়াই বিরজাসুন্দরী জ্বলিয়া উঠিল, অফিসের কাগজ না ছাই—এ যে বাঙলা চিঠি, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর! তাহার মাথা দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল। "ওমা, এযে সতীনকে লেখা চিঠি—আবার সতীনের চিঠি! তাই এত মাথাব্যথা, এত দরদ! আসুক একবার—, কাগজে নুটিশ দেওয়া বের করছি।" রাগে সে খাতাখানা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

না, কি সব লেখা আছে পড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি! কেমন ভালবাসা ছিল দেখাই যাক্ না! বিরজাসুন্দরী খাতাখানা পড়িতে লাগিল। একজায়গায় চোখে পড়িল—

……কবি লিখেছেন "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" প্রিয়তমে আমি মালাকর হ'তে চাই না, আমি ফুল হ'য়ে তোমার হৃদয়-লতিকায় বিকশিত হইতে চাই; তুমি আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে মালতী-প্রসূন হইয়া ফুটিয়া থাক।………

আর এক জায়গায়—

……কাল রাত্রে এক ভারী মজার স্বপ্ন দেখেছি—আমি আর গঙ্গাজল ঘাটে নাইতে গেছি, তুমি যেন নৌকো ক'রে এলে—……,…

বিরজাসুন্দরী আর পড়িতে পারিল না; খাতাখানি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। স্বামী আসিলে তাহার সাধের জিনিষগুলি উপহার দিতে হইবে।

সেদিন রাত্রে নিকুঞ্জবিহারী প্রথমপক্ষের শ্বশুরালয় হইতে অনেকখানি হাল্কা মন লইয়া ফিরিয়া আসিল। গঙ্গাজলের সহিত দেখা হইয়াছে, মালতীর নাম করিয়া সে কত কাঁদিয়াছে, শালীরা মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে আবার যাইতে বলিয়াছে।

বিরজাসুন্দরী তখন শয়ন-ঘরে পান সাজিতেছিল, স্বামীকে দেখিয়াই সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটটি ঝপ্ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই নাও গো তোমার সরকারী কাগজ-পত্তর, খোকা ছিঁড়ে ফেলেছে।"

তাহার সাধের খাতাখানির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নিকুঞ্জ-বিহারী বসিয়া পড়িল। কে ইহার এই অবস্থা করিয়াছে তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না; হায় রে, ইহার চেয়ে খাতাখানি ফেরত না পাওয়াই যে ভাল ছিল! আর কেহ ছাপাইয়া দিলেও এগুলি টিঁকিয়া থাকিত ত! সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার স্ত্রীর দিকে একবার ছেঁড়াখাতাখানির দিকে চাহিতে লাগিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বিরজাসুন্দরী এখন নিষ্কণ্টক।

কেদার ও বদ্‌রিনাথ তীর্থ

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ভারতমাতাকে প্রকৃতিদেবী যে অসীম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছেন, তার রূপ বর্ণনা করা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির বহির্ভূত। আমাদের ধর্ম্মসংস্থাপকগণ যুগে যুগে নানাতীর্থ স্থাপন ক'রে ভারতমাতার অসীম সৌন্দর্য্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেছেন। এই বিস্তৃত ভারতভূমিতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে কি, যা তীর্থ নাম ধারণ ক'রে ধর্ম্মের ছায়া মণ্ডিত হয় নাই?

কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ তীর্থের এত নাম, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধিৎসার একটী অভাব যে এখানকার
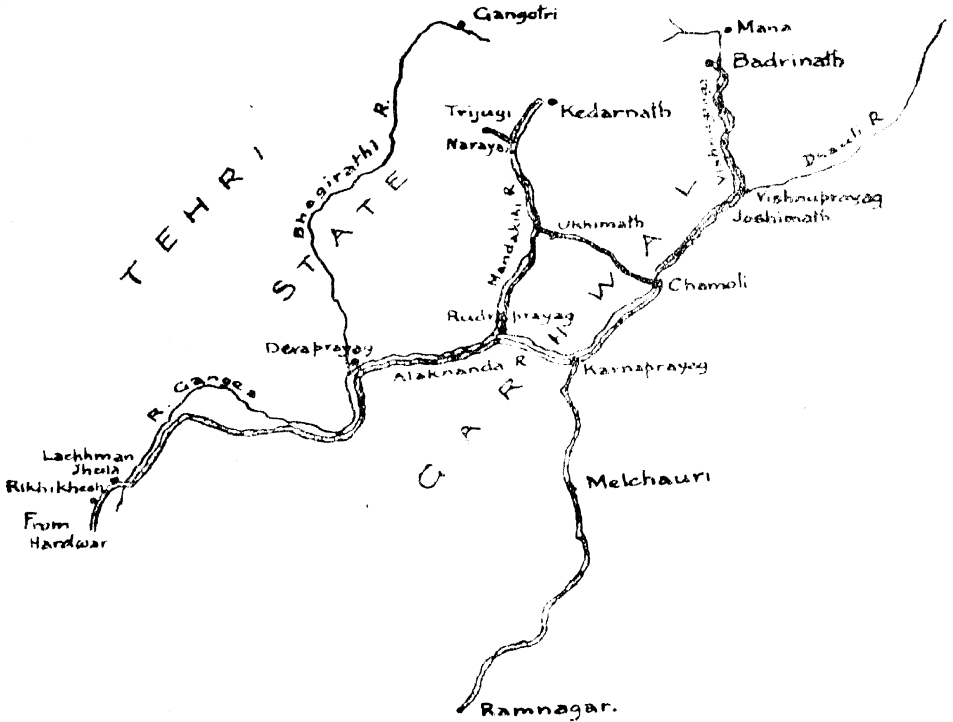
বদ্‌রিনাথ ও কেদারনাথের মানচিত্র

ইতিহাসতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে লেখা বা লেখবার চেষ্টা একখানি বইয়েও হয়নি। অথচ এই তীর্থে প্রতিবৎসর হাজার হাজার লোক যাচ্ছে। কেউ কেউ মাসিক পত্রে প্রবন্ধও লিখেছেন। জিজ্ঞাসুর পিপাসা নিবারণ কর্‌বার যোগ্য কিছুই লেখা কিন্তু হয় না। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আর দু একটা শোনা কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া নূতন কিছুই তাহাতে পাই না। পুণ্যস্মৃতি ভগ্নী নিবেদিতা নিজের ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যা লিখে গেছেন তাও আজ পর্য্যন্ত কেউ বাংলায় অনুবাদ করেছেন ব'লে আমার জানা নাই। রায় জলধর সেন বাহাদুরের 'হিমালয়' প্রবন্ধাবলী ছাড়া এবিষয়ে আর অন্য বাংলা বই আমার জানা নাই। আমার একথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, কেদার-বদরিতীর্থের রাস্তার দুধারে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ছড়ান রয়েছে তা যদি আজকালকার ইতিহাসচর্চ্চার দিনে কেহ একত্র করেন তবে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসের প্রকৃত ধারা অনেকটা লিপিবদ্ধ হয়।

এ তীর্থে যেতে হ'লে যে দু চারটা সাধারণ কথা সকলের জানা দরকার তাই এ প্রবন্ধে লেখা হবে। কারণ এ তথ্যেরও বাংলায় সম্পূর্ণ অভাব। কেদার ও বদরিনাথ তীর্থ সাধারণ তীর্থের মত যখন তখন যাওয়া যায় না। কেবল মে, জুন্ দুমাস রাস্তা খোলা থাকে, বাকী সময় রাস্তা দুর্গম। তাছাড়া তীর্থ স্থান দুটি ৬ মাস বরফে ঢাকা থাকে। যে মাসে গেলেও অনেক স্থানে রাস্তার দুধারে স্তূপাকার বরফ দেখতে পাওয়া যায়। কেদারনাথের শেষ

২৩ মাইল পথ ত প্রায় বরফের ওপর দিয়ে যেতে হয়।

সাধারণত হরিদ্বার থেকে আরম্ভ ক'রে ত্রিযুগী-নারায়ণ হ'য়ে যাত্রীরা কেদারনাথে যান। তারপর ফিরে সেই পথে আবার ভেণ্টা পর্য্যন্ত এসে মন্দাকিনী পার হ'য়ে উখীমঠে পৌঁছয়। সোজা যদি কেদার থেকে বদরিনাথ উড়ে যাওয়া যেত তবে পথ কেবল ২০ কি ২৫ মাইল হ'ত। কিন্তু মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী। তাই উখীমঠ দিয়ে চামোলি পর্য্যন্ত উপত্যকাগুলি পার হ'য়ে উত্তরে বদরিনাথ পর্য্যন্ত যেতে প্রায় ৯ দিন লাগে। সেখান হ'তে ফিরে আবার চামোলি পর্য্যন্ত এসে অলকনন্দার কূলে কূলে নেমে নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ হ'য়ে যাত্রীরা রামবারায় পৌঁছে রেল ধরেন। হরিদ্বার থেকে রামবারা পর্য্যন্ত এই সমস্ত পথটি প্রায় ৪৫০ মাইল। রাস্তায় কোন বিঘ্ন না হ'লে ছ সপ্তাহে এ পথ সমাপ্ত করা যায়।

লছমন-ঝোলা

যাত্রীদের রাস্তায় থাক্‌বার কোন কষ্ট নাই। প্রায় ৩ মাইল অন্তর একটি ক'রে "চটী" আছে। 'চটীর' সংলগ্ন দোকান আছে। দোকানদাররাই 'চটীর' মালিক। থাক্‌বার জন্য যদিও ভাড়া দিতে হয় না, তথাপি জিনিস-পত্র সমস্ত 'চটীওয়ালার' কাছ থেকে ক্রয় কর্‌তে হয়। তাতেই সে পুষিয়ে নেয়। জিনিস ক্রয় না কর্‌লে বড় বিপদ। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে 'চটীওয়ালা' 'চটী' থেকে তাড়িয়ে দেয়। 'চটী'গুলি পরিষ্কার রাখবার জন্য খুব চেষ্টা করা হয়। সরকারের তরফ থেকে মেথর নিযুক্ত আছে। তবুও মাছির এত উপদ্রব যে দিবারাত্রে বিশ্রাম করা দুরূহ। এসব 'চটীতে' আর একটি ভয় আগুনের। হঠাৎ এমন বেগে ঝড় আসে যে 'চটী' উড়িয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন 'চটী'-ওয়ালারা চীৎকার করে, "আগুন নিবাও, আগুন নিবাও"।

চটির ভিতর

চটী ছাড়া মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় আকবারের আছে; যেখানে 'বাবা' [illegible]

পোষ্ট আফিস এবং হাসপাতালও আছে। অসুখ হ'লে সরকারী লোক ডুলিতে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কালিকম্বলিওয়ালা-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ এই রোগীচর্য্যা
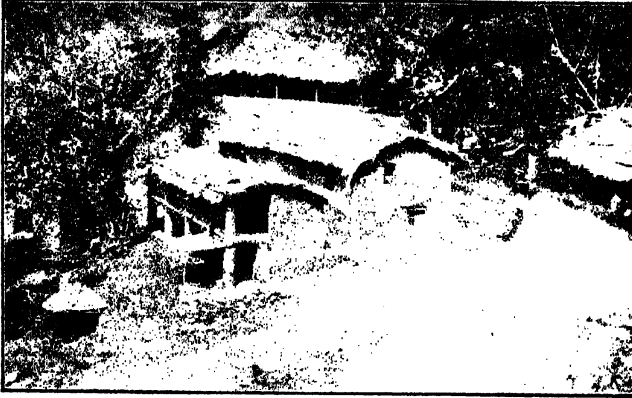
যাত্রীদের চটী

কার্য্যে এ তীর্থে খুব নাম কিনেছেন। বিলাতে Little Sisters of the Poor এর মত এঁরা প্রকৃতই দরিদ্রের বন্ধু। এঁরা বিনামূল্যে ঔষধ দেন এবং বদরিনাথের যাত্রীদের জন্য কম্বল প্রভৃতি দেন ও রোগীর শুশ্রূষা করেন।

এই গেল মোটামুটি রাস্তার খবর। এখন হরিদ্বার থেকে আরম্ভ ক'রে বদরি-কেদার যেতে যে যে স্থান পড়ে তার বিষয় কিছু জানা দরকার।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ পদব্রজে কিম্বা টোঙ্গায় চ'ড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু হৃষীকেশের পর আর কোন শকট যেতে পারে না। রাস্তা সর্ব্বত্র প্রায় ৬ ফুট চৌড়া। কিন্তু পার্ব্বত্য পথ কখনও-কখনও খুব চড়াও,কখনওবা খুব নীচু। সর্ব্বত্রই রাস্তা গঙ্গার ধার দিয়ে গেছে, কখনও স্রোতের হাজার হাজার ফুট ওপর দিয়ে আর কখনও বা পাশ দিয়ে। হৃষীকেশ থেকে ৩ মাইল দূরে "মোনি কি রেতি।" এখানে কুলি, ঝাঁপান, ডাণ্ডি প্রভৃতি পাওয়া যায় ও যাত্রীরা যার যা দরকার চুক্তি ক'রে নেয়। কুলি নিযুক্ত করতে হয়,একজন ঠিকাদারের মারফতে। চুক্তি-পত্র দস্তখত করতে হয় এবং যাত্রী ও কুলি উভয়ের কাছে একপর্দ্দ চুক্তিপত্র থাকে। ত্রিযুগী-নারায়ণ দেখে যাঁরা বদরি-কেদার যান তাঁদের জানা নাই। আমার এ কথা ... তীর্থে গেলে

আরও কিছু বেশী দিতে হয়। তাছাড়া বড় বড় তীর্থে এরা ১৲ টাকা ক'রে আরও পায় এবং দৈনিক আধ সের 'খিচড়ী' কিম্বা ৵১০ পয়সা ছোলা খাবার জন্য চায়।

কুলি আবার দুরকমের আছে। নেপালি কুলি বেশী কষ্টসহিষ্ণু ও মজবুত। তেহরী রাজ্যের স্থানীয় কুলি কেবল ১ মণ জিনিস বইতে পারে। নেপালী কুলি সহজে ১৷৷ মণ নিয়ে যায়। কিন্তু নেপালীরা তত বিশ্বস্ত নয়। কখনও কখনও শোনা যায় যাত্রীদের মেরে লুটপাট ক'রে কুলিরা নেপালে পালিয়ে গেছে। গরীব যাত্রীরা নিজের বোঝা নিজেই ব'য়ে নিয়ে যায়। কেউ বা মাথার ওপর ক'রে নেয়, কেউ বা লাঠিতে

রুদ্রপ্রয়াগ
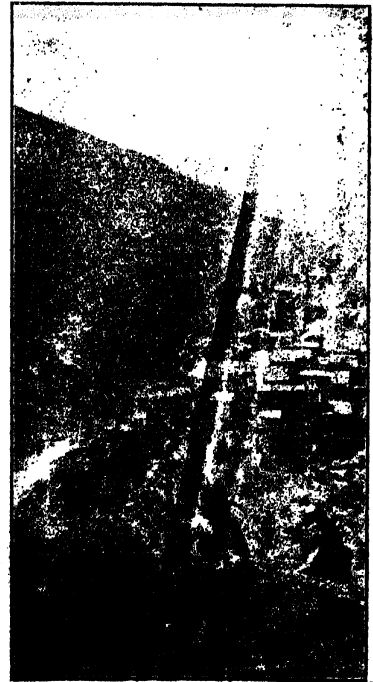
মায়াকুণ্ড-মন্দির—রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৩১ মাইল

ঝুলিয়ে কাঁধে ফেলে নিয়ে যায়। কিন্তু সকলের চেয়ে পথ চলার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, দুটো থলেয় ক'রে জিনিষ নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া—মধ্যপ্রদেশে লোকে রেলে যাবার সময় এরকম থলে ব্যবহার করে। যানের মধ্যে ঝাঁপান সস্তা এবং ডাণ্ডি (যেরূপ দার্জ্জিলিং-এ দেখা যায়) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মেয়েরাই প্রায় এতে ক'রে যান। কখনও কখনও স্থূলকায় শেঠজীরাও চ'ড়ে থাকেন।

'মোনি কি রেতি' থেকে প্রায় দেড় মাইল গেলেই "লছমন ঝোলা।" এখানকার সাস্‌পেন্‌সন ব্রিজ অথবা তারের পুল বিখ্যাত। সাধুদের এটা একটা বড় আড্ডা। অনেক যাত্রী হরিদ্বার থেকে এখানে আসে এবং গঙ্গায় স্নান ক'রে ফিরে যায়। এর পর ওপরে, কেদারনাথের রাস্তায় গেলে কেবল ২।১ জায়গায় বাজার দেখতে পাওয়া যায়। আর সব দৃশ্যই নূতন। রুদ্র-প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ গঙ্গাকে পাশে রেখে যেতে হয়। ভাগীরথ যেন গঙ্গার পাশে পাশে রাস্তা তৈয়ার ক'রে দেবীকে নীচে নামিয়ে এনেছিলেন। রাস্তা থেকে গঙ্গার ধারা কোথাও কোথাও একেবারে সটান ১০০০ ফুট নীচে। দেখলে মাথা ঘুরে যায়। রুদ্র-প্রয়াগের পর গঙ্গার ধারা ছেড়ে যাত্রীদের মন্দাকিনীর পথ অনুসরণ করতে হয়। তারপর ৩৫ মাইল গেলে ত্রিযুগী-নারায়ণ যাবার রাস্তার মোড়ে এসে পৌছান যায়। এখান থেকে পশ্চিমে অল্পদূর গেলেই ত্রিযুগী-নারায়ণ। মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থানে কেদারনাথের মন্দির। কেদার থেকে বদ্রি-নাথ সোজা যাওয়া যায় না। মাঝে দুর্ভেদ্য পাহাড়। একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। ম্যাপে দেখলে বুঝতে পারবেন। দেবপ্রয়াগ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গার নাম অলকনন্দা এবং বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে বদ্রিনাথ পর্য্যন্ত বিষ্ণুগঙ্গা দেওয়া হয়েছে। এলাহাবাদে গঙ্গার জল যেমন, এখানেও তেমনি ঘোলাটে এবং মন্দাকিনীর জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। অনেকদূর পর্য্যন্ত দুই স্রোত মিশ খায় না।

দেবপ্রয়াগ একটি 'প্রয়াগ' বা সঙ্গম। এখানে অলকনন্দা ও ভাগীরথী মিলিত হ'য়ে 'গঙ্গা' নামে অভিহিত হয়েছে। দুটি নদীর মাঝখানে পাহাড়ের ওপর দেব-প্রয়াগ স্থাপিত। এখানে একটি বাজার ও পোষ্ট অফিস আছে। নদীর ওপারে তেহরী ষ্টেটের বস্তি। বস্তি দুটিকে একটি সাস্‌পেন্‌সন ব্রিজ মিলিত কচ্ছে।

রুদ্রপ্রয়াগ

গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে দুই মত আছে। হিন্দুমত অনুসারে গঙ্গোত্রী হ'তে বেরিয়ে এসে ভাগীরথীই মূল গঙ্গা। আবার বৈজ্ঞানিক মতে অলকনন্দাই আসল গঙ্গা।

এই দেব-প্রয়াগেই শ্রীরামচন্দ্র ধ্যান করেছিলেন ব'লে প্রবাদ। তাঁর নামে একটি মন্দির, একটি মূর্ত্তিও স্থাপিত হয়েছে।

দেবপ্রয়াগে বদ্‌রিনাথের পাণ্ডাদের আড্ডা। তাদের

বড় বড় পাকা বাড়ী দেখলে মনে হয় তাদের ব্যবসা বেশ লাভজনক। কোন লোক এখানে একবার পৌঁছলে হয়, অমনি একদল পাণ্ডা এসে ঘিরে ফেলে। নাম ধাম জিজ্ঞাসা ক'রে, যদি জানা যায় যে কে কার পাণ্ডা তাহ'লে ভালই। না হয় যাত্রী বেচারার মুস্কিল।

এখানে ধর্ম্মশালা খুব কম। যাত্রীরা পাণ্ডাদের বাড়ীতেই থাকে। পাণ্ডাদেরও এতে বেশ লাভ হয়।

রামবারা চটীর উপরিভাগ

দেবপ্রয়াগের পর রুদ্রপ্রয়াগ। এটি মন্দাকিনীর সহিত অলকনন্দার সঙ্গম স্থল। হরিদ্বার থেকে প্রায় ৯০ মাইল। এখান থেকে চড়াই আরম্ভ।

রাস্তায় যেতে যেতে ভুটিয়াদের দল দেখতে পাওয়া যায়। কাঠের বাটিতে ক'রে সকলে ব'সে চা পান করে। এ চা আমাদের চা নয়। লবণ ও ঘৃত সংযোগে এ চা পান করা হয়। দার্জ্জিলিংএ অনেকে দেখে থাকবেন —মাখন ও নুন দিয়ে ভুটিয়ারা চা খায়।

দেবপ্রয়াগ থেকে ১৮ মাইল দূরে শ্রীনগর। এখান থেকে ২০ মাইল পরে রুদ্রপ্রয়াগ। শ্রীনগরের বিষয় ২।৪ কথা বলা দরকার। এখানে একটি ডাকবাঙলা ও ধর্ম্মশালা আছে।

শ্রীনগর একটি সমতল অধিত্যকা ভূমির উপর স্থাপিত। এখানকার স্থাপত্য দেখলে গুপ্তযুগের (৪০০ খৃ পূ) ব'লে মনে হয়। কমলেশ্বর ও পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির এখানকার প্রধান মন্দির। কমলেশ্বরের মন্দির হয়ত বৌদ্ধ যুগের। এই মন্দিরে প্রাক্‌শঙ্করাচার্য্য আমলের একটি শিবলিঙ্গ আছে। রামচন্দ্র নাকি নীলপদ্ম দিয়ে একেই পূজা করেছিলেন। পুরাণে যদিও দেবীর পূজার কথাই পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের প্রভাব যে এ জায়গায় বর্ত্তমান তা যেখানে-সেখানে বিষ্ণুপদ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শ্রীনগরে এক সময় দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হ'ত। যে পাথরটির ওপর বলি দেওয়া হ'ত সেটি এখনও বর্ত্তমান। শঙ্করাচার্য্য যখন এখানে এসেছিলেন তখন নাকি পাথরটি নদীবক্ষে ফেলে দিয়েছিলেন।

অগস্ত্যমুনি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ১২ মাইল। এখানে অগস্ত্যঋষি তপস্যা করেছিলেন। জায়গাটা দেখলে মনে হয়, এখানে পুরাকালে একটি হ্রদ ছিল। সেটা ক্রমে শুকিয়ে গেছে। এখানে অগস্ত্যমুনির একটি মূর্ত্তি আছে।

গুপ্তকাশী হ'য়ে ত্রিযুগী-নারায়ণ যেতে হয়। এটি একটি তীর্থ স্থান। কেদারনাথ যাবার পথ ছেড়ে কিছু দূরে যেতে হয়। আবার ফিরে এসে কেদারনাথ যাবার পথ। এখান থেকে গঙ্গোত্রী—যমুনোত্রী যাবার রাস্তা। গুপ্তকাশী ছেড়ে খানিক পথ গেলেই 'নালাচটী'। এখান থেকে রাস্তা দুভাগ হয়েছে। একটি উখীমঠ গেছে, অপরটি কেদারনাথ গেছে। এই উখীমঠ হ'য়ে বদ্রী নাথ যেতে হয়। উখীমঠের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

'নালা" চটীতে বৌদ্ধপ্রভাবের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। শৈব মন্দিরের আশে-পাশে স্তূপ, বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি; স্তূপের ন্যায় মন্দির চারিদিকে ছড়ান। যেটিকে লোকে 'জয়স্তম্ভ' বা "কীর্ত্তিস্তম্ভ "বলে সেটি হয়ত একটি বিকৃত স্তূপ। বাঙ্গলাদেশের মন্দিরের উৎপত্তি বুঝতে হ'লে এখানকার মন্দিরগুলি দেখতে হয়।

"নালার" পর কিছু দূরে "বেথু' চটী। এখানেও বৌদ্ধপ্রভাব বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ঢুকতেই

কেদারনাথ মন্দির

মন্দির, অপরটি বীরভদ্রের। এই মন্দির দুটি প্রাচীন। তারপর বৈষ্ণব-যুগে রাস্তার অপর পারে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির স্থাপিত হয়। এই সমস্ত মন্দিরের আশে পাশে রাস্তার ওপর একধারে দুটি মন্দির। একটি সত্যনারায়ণের। অনেক ছোট ছোট মন্দিরও আছে। এখানে একটি কীর্ত্তি-স্তম্ভও আছে। প্রায় সমস্ত মন্দিরের উপর 'আমলকি' চিহ্ন আছে। এই হিমালয় রাজ্যের বৌদ্ধযুগের ইতি-হাসে এই স্থানগুলি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার ভুল নাই। কেউ এই ইতিহাস উদ্ধার করবে কি?

গৌরীকুণ্ডের কাছে রাস্তা বড় সঙ্কীর্ণ ও দুরূহ। একবার পা ফস্কালে একেবারে অতল গহ্বরে পড়তে হবে, খোঁজ পাওয়া যাবে না। অনেক বৃদ্ধা ও দুর্ব্বল লোক নাকি এখানে প্রতি বৎসর মারা যায়।

গৌরীকুণ্ডে ২টি তপ্তকুণ্ড আছে দুটির জল দু'রকমের। একটিতে জলের উত্তাপ প্রায় ৭৪° থাকে আর অন্যটিতে (প্রায়৫০ গজ দূরে) উত্তাপ প্রায় ১২৪০ (ফারেন্‌হাইট্‌)। দ্বিতয়টিতে যাত্রীরা স্নান ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বাহির হয়।

গৌরীকুণ্ড থেকে ৩ মাইল সোজা চড়াইএর পর রামবাড়া চটী পৌছান যায়। কেদারনাথ পৌছিবার পূর্ব্বে ইহাই শেষ চটী। এখানে অনেকগুলি 'চটী' আছে। অনেকে কেদারনাথে রাত্রি যাপন করে না ব'লে যারা উপরে যায় এবং যারা নেমে আসে উভয় প্রকার যাত্রীদের জন্যই এখানে স্থান সঙ্কুলান করতে হয়। রামবাড়ায় স্থানে স্থানে মে মাসেও বরফ জ'মে থাকে, এবং ২।১টা 'চটী'ও বরফে ঢাকা থাকে। বরফ যখন গলতে আরম্ভ হয়, তখন জায়গায় জায়গায় দুই দিক হ'তে বরফ এসে মন্দাকিনীর বক্ষ একেবারে ভরিয়ে দেয় এবং জলের ওপর বরফের সেতু প্রস্তুত হয়। স্থানে স্থানে এই সেতুর ওপরই যাত্রীদিগকে পার হ'তে হয়।

কেদারনাথের দৃশ্য—ফিরে আসা
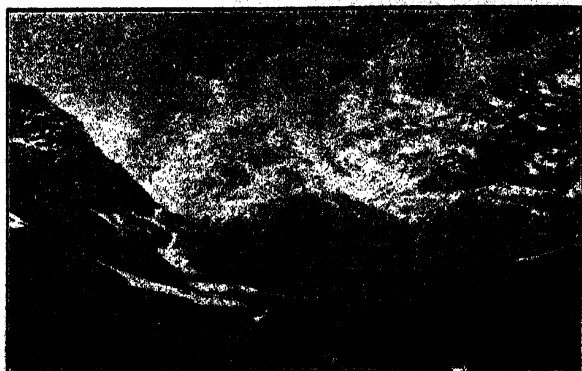
রামাবাড়া হ'তে ২ মাইল ওপরে গেলে আর কোন প্রকার গাছ দেখা যায় না। কেবল শষ্পমণ্ডিত অধিত্যকা ভূমি। নানারংএর পুষ্পদ্বারা বিকীর্ণ। যেন কোন মুঘল চিত্রকর স্বর্গের ছবি এঁকেছেন। রামবাড়া থেকে কেদারনাথ ৮ মাইল পথ। পথ অতি দুরূহ। প্রায় ২ মাইল রাস্তা যখন বাকী থাকে তখন পাহাড়ের একটি মোড় ফিরলেই কেদারনাথের মন্দির একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়। সোজা রাস্তার শেষে বরফ ঢাকা পাহাড়ের গায়ে মন্দিরটি দেখতে কি মনোহর! মনে হয় যেন সমস্ত ভারতবর্ষ এই কেদারনাথে এসে শেষ হয়েছে। প্রথমে যখন মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল তখন একেবারে পাহাড়ের গায়ে ঠেসে করা হ'য়ে থাকবে। কিন্তু কালক্রমে তুষাররাজি মাইলখানেক পেছিয়ে গেছে।

বিষ্ণুগঙ্গা প্রপাত

"কেদারনাথ"এর মন্দিরটি সমুদ্রতীর হ'তে প্রায় ১২০০০ ফিট উঁচু। মন্দিরটি কত প্রাচীন ঠিক বলা যায় না; তবে মন্দিরদ্বারের চারিদিকে ও কুলুঙ্গিসমূহে যে-

চোধাম্বা

সমস্ত দেবদেবী ও রাজাদের মূর্ত্তি আছে তাথেকে মনে হয় মন্দির ৭০০ ও ১০০০ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যে প্রস্তুত। অজন্তার শেষ যুগের চিত্রাবলীর সঙ্গে এখানকার মূর্ত্তিসমূহের সাদৃশ্য আছে।

এ তীর্থে কত জনসমাগম হয় তা বলা শক্ত। কিন্তু শোনা যায়, মন্দিরের বাৎসরিক আয় ১৫০০০৲ টাকা, কেবল যাত্রীদের দান থেকে।

কেদারনাথ সাধুর দেশ। যেদিকে দেখ গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য এখানে সমাধিস্থ হন এবং মোক্ষলাভ করেন। মন্দিরের চারিদিকে অল্প দূরের মধ্যে অনেক দেখবার যোগ্য স্থান আছে। মন্দিরের নিকটেই একটি ঝরণা আছে। তার স্ফটিকশুভ্র জল থেকে কেবলই বুদ্বুদ বেরুচ্ছে এবং ওপরে এসে ফেটে যাচ্ছে। লোকে বলে, বুদ্বুদ "ব্যোম মহাদেব" বল্‌ছে।

নিকটেই ভৈরব-ঝম্প নামক খাদ আছে। শিবলোকে যাবার জন্যে এখান থেকে সন্ন্যাসীরা পুরাকালে ঝম্প প্রদান করতেন। জীবনবলি দিয়ে আশুতোষকে তুষ্ট করতেন।

কেদারনাথ থেকে প্রায় ১॥ মাইল দূরে একটি হ্রদ আছে। এখান থেকে সাম্‌নে কেবল শুভ্র তুষাররাজি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বরফের হাওয়ার ঝাপটা এসে সর্ব্বাঙ্গ জমিয়ে দেয়। এখান থেকেও লোক মহাপ্রস্থান ক'র্‌ত। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় বরফে লীন হয়ে যাওয়া কত সহজ।

খাস কেদারনাথের মন্দিরটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু

উল্লেখযোগ্য নেই। ঘরবাড়ী সব পাণ্ডাদের। যাঁরা এখানে রাত্রিবাস করেন তাঁরা সকলে পাণ্ডাদের বাড়ীতেই থাকেন। দুচারটা দোকানও গরমের ক'মাস খোলা থাকে। এখানে একটি ছোট ডাকঘরও আছে।

কেদারনাথ থেকে বদ্‌রিনাথ যেতে হ'লে ভেণ্টা পর্য্যন্ত সেই রাস্তাতেই ফিরে আস্‌তে হয়। সেখানে থেকে খুব খানিকটা নেমে মন্দাকিনী পার হ'য়ে খানিকটা চড়াই করলে উখীমঠে আসা যায়। এখানেই কেদারনাথের "রাওল" (Rawal) শীত যাপন করেন। এখানে একটি সরকারী হাসপাতাল আছে। অনেক লোকের চিকিৎসা হয়।
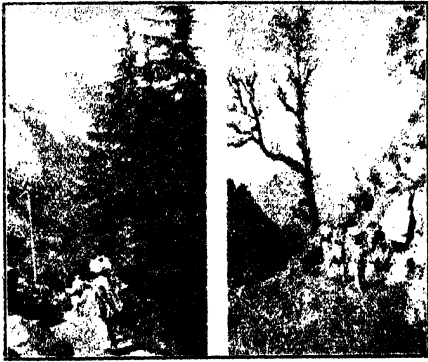
হনুমান চটীর কাছাকাছি স্থান গৌরীকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী রাস্তা

উখীমঠ থেকে ৩ মাইল সটান উঠলে "দুরি তাল" (Diuri Tal) নামক একটি হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়। এমন চমৎকার দৃশ্য এদেশেও বিরল। তিনদিকে ওক, পাইন ও রোডোডেন্‌ড্রন্ (Rhododendron) বৃক্ষের ঘন বন এবং একদিক খোলা। সেই দিকে বদ্‌রিনাথ-কেদারনাথের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি জলে প্রতিফলিত হ'য়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। এখান থেকে চৌখাম্বা (Chaukhamba) শৃঙ্গ (২২,৯০৭ ফুট) দেখতে পাওয়া যায়। ইহা নাকি পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য। উখীমঠ ছেড়েই চোপটা পাশ (Chopta pass) আরম্ভ। এখান থেকে প্রায় ৭ মাইল চড়াই। সুন্দর বনরাজির ভিতর দিয়ে পথ অতি মনোহর। মাঝে তুঙ্গনাথ তীর্থ।
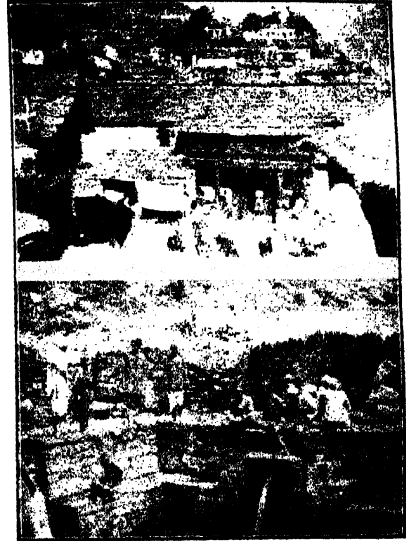
উপরে—যোশীমঠ
নিম্নে—তাপকুণ্ড

তুঙ্গনাথ থেকে নন্দদেবী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই শৃঙ্গ (২৫,৬৬০ ফুট)। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ। চম্বোলি পার হ'য়ে "গরুড় গঙ্গা" পাওয়া যায়। ইহা অলকনন্দার একটি শাখা। এতে স্নান করলে নাকি এক বৎসর সর্পদংশনের ভয় থাকে না।

যদি কেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি দেখতে চান, 'ওলিগুরসাল' এ (Oli Gursal) গেলে তাঁর আর খেদ থাকবে না। এখানে যাওয়া একটু কষ্টসাধ্য। স্থানটি ১২,৪৫৪ ফুট উচ্চ। কিন্তু কি দৃশ্য! চারিদিকে (কেবল দক্ষিণ দিক ছাড়া) যতদূর চোখ যায় কেবল তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি। ত্রিশূল পর্ব্বতমালা এখান থেকে দেখা যায়। ১০ মাইল পর্য্যন্ত ২০,০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গাবলী আর কোথাও বোধ হয় নেই।

তারপর "যোশীমঠ"। ইহা শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত ৪টি মঠের মধ্যে একটি। এখানে শীতকালে বদ্‌রিনাথের 'রাওল' Rawal) থাকেন। যোশীমঠ থেকে রাস্তা এঁকে বেঁকে প্রায় ১৪০০ ফুট ২ মাইলের মধ্যে নেমে এসেছে। নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। ইহা ধৌলী (Dhauli) নদীর সহিত

অলকনন্দার সঙ্গম স্থল। এর পর ওপরের দিকে অলকনন্দার নাম বিষ্ণুগঙ্গা দেওয়া হয়েছে (ম্যাপে দেখুন)। ধৌৱলী নদী তিব্বত থেকে বেরিয়েছে এবং তিব্বত যাবার রাস্তা ইহার পথ অনুসরণ করছে।

এখান থেকে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিষ্ণুগঙ্গার ধারের পথ বড় সুন্দর। নদীর দু ধারে পাহাড় সটান উঁচু উঠেছে। বিষ্ণুগঙ্গার এ পারে কোনো ইউরোপীয় লোককে যেতে হ'লে ঘারওয়ালের এর ডিপুটি কমিশনরের অনুমতি নিতে হয়। এরূপ নিয়ম সমস্ত পার্ব্বত্য দেশেই আছে। যাঁরা দার্জ্জিলিঙ হ'তে তীস্তা (Teesta) নদীর

বদ্‌রিনাথ-মন্দির ও তাপকুণ্ড

ঝুলন সেতু দেখতে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন পোলের ওপারে সিকিমের রাজ্যে পদার্পণ করলেই একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে, "কোনো ইউরোপীয়ান্ এই স্থান অতিক্রম করিবেন না"।

লম্বাগর 'চটী' পার হ'য়ে একটি ঝুলন-সেতু

বদ্‌রিনাথ, উত্তর হইতে—নারায়ণ পর্ব্বত দেখা যাইতেছে।

অতিক্রম ক'রে হনুমান চটীতে পৌছান যায়। বদ্‌রিনাথের পথে এই শেষ চটী। এখান থেকে পথ বড় মনোরম। রাস্তাও দুরূহ নয়। অনেক প্রকার দেবদারু রাস্তার দু'ধারে দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প চারিদিকে সৌন্দর্য্য বিস্তার ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমরা এখন মার্চ্চাদের (Marchas) দেশে এসে পড়েছি। মার্চ্চারা জাতিতে ভুটিয়া, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। বদ্‌রিনাথ মার্চ্চাদের মুলুক। এর জন্য মন্দিরের তরফ থেকে মার্চ্চাদের কর দিতে হয়। এই করের পরিবর্ত্তে মার্চ্চা মেয়েরা জন্মাষ্টমীর সময় বদ্‌রিনাথের মিছিলে যোগ দিয়ে দেবতাকে স্নান করিয়ে মন্দিরে ফিরে দিয়ে যায়।

আমাদের রাস্তা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আধ মাইল

খানিক দূর থেকে পাহাড়ের মাথার ওপর বদ্‌রিনাথের মন্দিরগুলি দেখা যায়। এখানে যাত্রিরা সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, আর বলে, "জয় বদ্‌রি বিশাল কি জয়"। বদ্‌রিনাথের বস্তির বাহিরে একটি সরকারী হাঁসপাতাল ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালাটি একটি ধনী বণিক স্থাপন করেছেন। বিষ্ণুগঙ্গা এবং ঋষিগঙ্গা পেরিয়ে তবে বদ্‌রিনাথ। দুটির ওপরই সেতু আছে। বদ্‌রি-নাথের মন্দিরটি আধুনিক। ইহাতে মুঘল প্রভাব দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য্য নাকি এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। অনেকবার ভূমিকম্পে এবং তুষার-স্রোতের সংঘাতে এমন্দির নষ্ট হ'য়ে গেছে; তাই এতে প্রাচীন স্থাপত্যের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মন্দিরে বিষ্ণুর বিগ্রহ আছে—কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত বিগ্রহ; ৩ ফুট উচ্চ। কপালে একখণ্ড হীরক মূর্ত্তির শোভা বৃদ্ধি করছে।

মন্দিরের একটু নীচেই "তপ্তকুণ্ড"। এখানে সব যাত্রীরা স্নান করেন। পাণ্ডারা নিজেদের প্রাপ্য এখানে উসুল করে। নিকটে নদী আছে, কিন্তু সেখানে জল একেবারে বরফের মতন ঠাণ্ডা।

বদ্‌রিনাথের দক্ষিণে দুদিকে নর ও নারায়ণ পর্ব্বতশৃঙ্গ। ঋষিদের নাম থেকে পর্ব্বতের নাম দেওয়া হয়েছে।

বদ্‌রিনাথে শীত অত্যন্ত অধিক। রোদ থাকলে ততটা বোধ হয় না। সমস্ত রাস্তার মধ্যে কেবল এখানেই মাছির উপদ্রব নাই।

যাত্রীরা সকলে পাণ্ডাদের বাসায় থাকেন। কেহ কালিকম্বলিওয়ালা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালায় থাকেন। তিন দিনের বেশী কেহ এখানে থাকে না। কারণ এখানে জিনিসপত্র বড় মহার্ঘ্য। এবং পথের শেষে যাত্রীদের পয়সার ত অভাব হয়ই।

এখানে জিনিসের দর কতকটা এরূপ। আটা ।৹ আনা সের, লুচি ১৲ সের, দুধ ১৲টাকা সের, চিনি ২৲টাকা সের। জ্বালানি কাঠ ১।৹ টাকায় এক মণ পাওয়া যায়, কিন্তু একে-বারে ভিজে। শুকনো কাঠের জন্যে সরকারী বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তাহ'লে কি হয়? মাঝখানের লোকেদের অনুগ্রহে শুকনো কাঠের জায়গায় সর্ব্বত্র ভিজে কাঠ সরবরাহ হয়।

অলকনন্দার উৎপত্তি-স্থান

মানা গ্রামের শেষে যেন পাহাড় ধ'সে পড়েছে। আগে যাবার রাস্তা বন্ধ। এখানে ব্যাস্-গুহা দেখ্‌বার জিনিস। ব্যাসমুনি এখানে নাকি পুরাণ ও মহাভারত রচনা করে-ছিলেন। সরস্বতী নদী এই ধ্বসা পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে মাটির নীচে অনেক দূর এসে আবার বের হয়েছে। শেষকালে এসে বিষ্ণুগঙ্গায় পড়েছে। সরস্বতী নদীর ওপর একটা পাথর এমন ভাবে পড়েছে যে, তার ওপর দিয়ে নদী পার হওয়া যায়। নদী পার হ'য়ে আধ ঘণ্টাখানেক হাঁট্‌লে একটি পাহাড়ের ওপর আসা যায় যেখান থেকে "সতোপন্থ" চূড়া দেখা যায়। এই চূড়ার পাদদেশে দুটি (তুষার-স্রোত) এসে মিশেছে। বামে সতোপন্থ (Satapanth glacier) ও দক্ষিণে ভগত খরক glacier। এই দুটির সঙ্গম থেকে অলকনন্দা বেরিয়েছে। বরফ গ'লে জল হ'য়ে বেরুচ্ছে চোখের সামনে।

আসল পথ এখানে শেষ। এখন যাত্রীদের বাড়ী ফিরবার তাড়া। অশেষ কষ্ট তারা সহ্য করেছে যোল দেবতার দর্শন পাবার জন্যে। কিন্তু এখনও যে ২০০ মাইল

কেদারনাথ বদ্রি-নারায়ণ—হিমালয়ের দৃশ্য [ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের সৌজন্যে

পথ ফিরে গিয়ে তবে রেলের ধারে পৌছবে! চামোলি (Chamboli) পর্য্যন্ত পুরাতন পথে ফিরে এসে আরও খানিক এগিয়ে নন্দপ্রয়াগে যাত্রীরা স্নান করে। তার পর কর্ণপ্রয়াগ শেষ তীর্থ। পিণ্ডার নদের সহিত অলকনন্দার সঙ্গম-স্থল। এখানে অলকনন্দার সঙ্গ ছাড়্তে হয় এবং মেলছুড়ী পর্য্যন্ত এসে কুলিদের বিদায় দিতে হয়। এখান থেকে নূতন কুলি নিয়ে রামনগর আস্‌তে হয়। রামনগরে রেল ধ'রে যাত্রীরা নিজের নিজের গন্তব্য স্থানে ফিরে যায়।

হিমবন্তের এই তীর্থদ্বয়ের ঐতিহাসিক দিক্‌টা আরও চমৎকার। ভারতে যুগে যুগে যত প্রকার ধর্ম্মমতের উত্থান-পতন হয়েছে তার ঘাত-প্রতিঘাত এই পর্ব্বতরাজিতে এসে যেন শেষ হয়েছে। প্রত্যেক ধর্ম্মযুগের ছাপ এই পর্ব্বত-মালায় গ্রথিত রয়েছে।

বৈষ্ণবযুগের প্রভাব ত সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখতে পাওয়া যায়। কেদারনাথে "ত্রিযুগী-নারায়ণ" পর্য্যন্ত এসেছে। বদ্রিনাথ ত স্বয়ং বিষ্ণু। তাছাড়া শঙ্করাচার্য্যের শৈব ধর্ম্মের পূর্ব্বেও এদেশে সত্যনারায়ণের প্রাধান্য ছিল। তার নিদর্শন এ তীর্থে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। তারপর দেবীপূজার আয়োজন এ তীর্থে কম নেই। স্বয়ং কেদারনাথে এবং যোশীমঠে দেবীর বিগ্রহ মজুদ। এই দেবীপূজা যে আরও প্রাচীন তার ভুল নেই। দেবীপূজা থেকে কেমন ক'রে হরপার্ব্বতী ও গণেশপূজা আরম্ভ হ'ল তাও ভাব্‌বার বিষয়। সমস্তের কিছু কিছু আভাস এ তীর্থে পাওয়া যায়। দেবীপূজা কি ভারতের নিজের না তিব্বত, চীনের আমদানি? তিব্বত থেকে লামারা বদ্রিনাথ হ'য়ে গয়া তীর্থে যেতেন। এই রাস্তার ধারেই গোপেশ্বরের মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি। আর একটি মন্দির "দেবী ধুরা"য়। ইহাও কাটগোদাম হ'তে তিব্বতের রাস্তায়। যোশীমঠের "ধ্যানী বদ্রি" কি বৌদ্ধ প্রভাব প্রকাশ করে না?

তারপর আর এক-কথা। রামায়ণ-মহাভারতের নামের এত ছড়াছড়ি এ তীর্থে কেন? এ তীর্থ কত পুরাতন? নামকরণ কি একসময় পাশাপাশি ভাবে হয়েছে, না একের পর এক!

ব্যাসগঙ্গার ওপর একটি ছোট মন্দিরে ব্যাসদেবের মূর্ত্তি আছে। তারপর রাস্তায় কেদারনাথ পর্য্যন্ত পঞ্চ পাণ্ডবদের যা কিছু কীর্ত্তি যেন সব এই রাস্তার দুধারে সজীব রাখ্‌বার চেষ্টা হয়েছে। রাস্তার শেষে আর-এক দিকে কর্ণপ্রয়াগ দেখুন।

তারপর রামায়ণের নিদর্শন দেখুন। প্রথমেই ত লছমন ঝোলা, তারপর রামপুর, রামবাড়া, রামনগরের ছড়াছড়ি। হনুমান চটির কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। দেবপ্রয়াগে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে। এসবের অর্থ কি? কেউ ভেবেছেন কি? আর কোনো তীর্থে এরূপ সর্ব্বদেবতার সমাবেশ আছে কি? প্রকৃতই ভগ্নী নিবেদিতা বলেছিলেন, "The Northern Tirtha forms a great palimpsest of the history of Hinduism।" আমরাও বলি "তথাস্তু"।

সত্তর বৎসর

(১৮৫৭—১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

৭

পৈল কেবল হিন্দুদিগেরই গ্রাম ছিল না। এই গ্রামে অনেক মুসলমানেরও বসতি ছিল। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটা বড় "মাছুয়া-হাটী" ছিল, এখনও আছে। এই পল্লীতে অনেক মুসলমান জালিয়া বাস করিতেন। গ্রামের নিকটেই দুইটি নদী। একটি কতকটা ছোট—খোয়াই, আর-একটি অপেক্ষাকৃত বড়—বরাক। প্রাচীন সাহিত্যে এই বরাকের নাম বুড়ীবক্র বলিয়া উল্লেখ আছে। এই দুই নদীতেই সে-কালে সারা বছর বিস্তর মাছ পাওয়া যাইত। পৈল এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ একটা অতি বিস্তৃত জলাভূমির মাঝখানে অবস্থিত। বর্ষাকালে চারিদিক জলাকীর্ণ হইয়া যায়। তখন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী বা পাড়া এক একটি ছোট দ্বীপে পরিণত হয়। এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় নৌকাতে যাতায়াত করিতে হয়। এইজন্য প্রায় সকল গৃহস্থেরই বাড়ীর ডিঙ্গী থাকিত। যাহারা চাষবাস করিত বর্ষাকালে এসকল ডিঙ্গীতে তাহারা গো-গ্রাস কাটিয়া আনিত। হেমন্ত কালে বাড়ীর নিকটে ডোবায় বা পুকুরে নিজেদের ডিঙ্গী ডুবাইয়া রাখিত। বর্ষার জল নামিয়া গেলে চারিদিকে কতকগুলি বড় বিল ভাসিয়া উঠিত। এসকল বিলেও বিস্তর মাছ পাওয়া যাইত। এই কারণেই আমাদের গ্রামে এতগুলি মুসলমান জালিয়া ছিল।

ইহা ছাড়া আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটা বড় মুসলমান পাড়াও ছিল। এ পাড়ায় একটা মুসলমান জমীদার বাড়ী ছিল। ইহাঁদেরই রায়েত ও নকরেরা এই পল্লীতে বাস করিতেন। পৈল'এর এই মুসলমান জমীদার পরিবার কুমিল্লা ত্রিপুরা ময়মনসিং ঢাকা ও চট্টগ্রামের মুসলমান-সমাজে বংশমর্য্যাদায় খুব বড় ছিলেন। ইহাঁরা মুসলমান এবং আমরা হিন্দু হইলেও এই মুসলমান জমীদারদিগের সঙ্গে আমাদের লোকলৌকিকতায় কোন প্রভেদ ছিল না। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি গার্হস্থ্য ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে যে-ভাবে হিন্দু আত্মীয় কুটুম্বদিগের সঙ্গে আমাদের লৌকিকতার আদান-প্রদান চলিত সেই ভাবে ইহাঁদের সঙ্গেও চলিত। ইহাঁদিগকেও আমরা সামাজিক প্রথা অনুসারে নিমন্ত্রণ করিতাম। ইহাঁরাও আমাদিগকে সেইরূপ নিমন্ত্রণাদি করিতেন। আমরা ইহাঁদের বাড়াতে যাইয়া খাইতাম না, ইহাঁরাও আমাদের বাড়ী আসিয়া খাইতেন না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে "সিধার" আদান-প্রদান হইত। মুসলমান বলিয়া আমরা ইহাঁদিগকে ঘৃণা করিতাম না। ইহাঁরাও আমাদিগকে "কাফের" ভাবিয়া নরকে পাঠাইতেন না। উভয়ে নিষ্ঠাসহকারে নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। উভয়েই এই ভাবে মোক্ষ লাভ করিবেন বিশ্বাস করিতেন। একে অন্যকে নিজের ধর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করিতেন না।

৮

গ্রামের সাধারণ মুসলমানেরা অনেক সময় হিন্দু দেব-দেবীর নিকটে মানত রাখিতেন এবং কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে এইসকল দেব-দেবীর পূজা হইলে ইহাঁদের নিজ নিজ মানত লইয়া হিন্দু ব্রাহ্মণের হাত দিয়া দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতেন। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। পূজার সময় প্রায় প্রতিবৎসরই আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী বা প্রজারা মানত-করা বলি লইয়া উপস্থিত হইত। কেহ বা পায়রা কেহ বা আখ কলা শশা বা ছাঁচি কুমড়া আর কখন কখন কেহ বা পাঁঠা পর্য্যন্ত বলি দিবার জন্য লইয়া আসিত। পুরোহিত ইহাঁদের নামে এসকল বলি দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

যথাবাহত ভাবে উৎসর্গ শেষ হইলে ইহারা এসকল প্রসাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন। এবং আত্মীয় স্বজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া এই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

আমার বাল্যে ও যৌবনে আমাদের গ্রাম্য জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই সম্বন্ধই ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ওপথ তাঁহার নিজের পথ নহে কিন্তু ওপথে যে পরমার্থ মিলে না, একল্পনা হিন্দু করিতেন না। মুসলমানও সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম্মকে নিজে না মানিলেও সর্ব্বদা সম্মান করিয়া চলিতেন। মুসলমান না হইলে যে মানুষ নরকে যাইবে এ সংবাদ তখনও বাংলার মুসলমানের কাণে পৌঁছায় নাই, অথবা কোনদিন পৌঁছিয়া থাকিলেও বাঙ্গালী মুসলমান সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মুসলমান যেমন হিন্দু দেব-দেবীর নিকট মানত করিত, হিন্দুও সেইরূপ মুসলমানের দরগায় সিন্নী দিত। এই ভাবে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া মিশিয়া বাংলার গ্রামে বাস করিত। বিষয়াশয় লইয়া, জমীজেরাত লইয়া, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইত বটে। হিন্দু ও মুসলমানে যেমন হইত মুসলমানে ও মুসলমানে বা হিন্দুতে ও হিন্দুতে সেই-রূপই হইত। কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না। হিন্দুর যেমন নানা জাত আছে,—সকলে সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা আদান-প্রদান করে না—সাধারণ হিন্দুরা সেকালে মুসলমানদিগকে সেইরূপই আর একটা জাত ভাবিত। আর হিন্দু-ধর্ম্মের ঔদার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও এবিষয়ে উদার হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার অনেক মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ইহাঁরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন দিন হিন্দুর দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি হারান নাই। বিশেষতঃ ইহাঁদের অনেকেই হিন্দু-ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই, আর মুসলমান-ধর্ম্মও সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দায়ে পড়িয়া কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে ও হিন্দুধর্ম্মের কড়াকড়িতে ইহাঁদের অনেকেই অনিচ্ছায় মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল
[শ্রী মুকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে]

মুসলমান হইয়াও ইহাঁদের অন্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই। আমাদের গ্রামে এখনকার সামাজিক অবস্থা কি জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে, বাল্যে এবং প্রথম যৌবনে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কোন বিরোধ ছিল না।

৯

যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেইরূপ হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যেও কোন সামাজিক বিরোধ ছিল না। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে সকল বর্ণের লোকেই বিনা বিচারে ও বিনা ওজরে প্রফুল্লচিত্তে মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান করিতেন না। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়াছেন বলিয়া কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি অপর ভদ্রলোকের অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কথায়-বার্ত্তায় বা আচারআচরণে ইহা বুঝা যাইত না। ব্রাহ্মণদিগের জাত্যাভিমান ছিল না বলিয়া ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া ও ইহাঁদের পদধূলি লইতে যাইয়া, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রশ্রেণীর লোকেরও আত্মাভিমানে বা জাত্যাভিমানে আঘাত লাগিত না। যেমন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর উচ্চতর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের মধ্যে জাতবর্ণ লইয়া রেষারেষি ছিল না, সেইরূপ নিম্নতর শ্রেণীর লোকের মধ্যেও কোন প্রকারের জাতিবর্ণগত প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষ ছিল না। যাঁহাদের জল আচরণীয় ছিল না, তাঁহারা সেজন্য দুঃখ করিতেন না। আর জল-চল নহে বলিয়া অন্য বর্ণের লোকেরাও ইহাঁদিগকে অমর্য্যাদা বা ঘৃণা করিতেন না।

১০

বাল্যকালে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতাম না। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশী বা ভৃত্য-দিগের সঙ্গেও সম্বন্ধ পাতাইয়া সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিতে হইত। কেহ বা দাদা, কেহ বা কাকা, কেহ কেহ বা জ্যাঠা ছিলেন। ইহাঁরা আমার বাবাকে কেহ বা কাকা, কেহ বা মামা, কেহ বা দাদা, আর কেহ বা বাবা আর তাঁহাদের বয়সে কনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে বদন নামে একজন ভুঁইমালী চাকর ছিল। সে বাবার প্রজাও ছিল। বাসন মাজা, উঠান ঝাড় দেওয়া, বাড়ীর নিকটের পথ-ঘাট পরিষ্কার করা ইহার কর্ম্ম ছিল। সে আমাদের পাকশালে বা খাবার ঘরে ঢুকিত না। একদিন আমি কি দুষ্টামি করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমার কাণ মলিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাকে বদন দাদা বলিয়াই ডাকিতাম। কিন্তু কাণমলার বেদনায় ও অভিমানে চটিয়া গিয়া আমি সে-সময়ে তাহাকে "বদন মালী" বলিয়া গালি দেই। সে গাল বাবার কানে পৌঁছায় এবং এই অপরাধের জন্য তিনি আমাকে বেদম মারিয়াছিলেন। সে যে আমার কাণ মলিয়া দিয়াছিল, বাবা একথা কাণেই তুলিলেন না। অন্যায় বা বেয়াদপি করিলে আমার দাদা কাকা বা মামারা যেমন আমাকে স্বচ্ছন্দে শাস্তি দিতে পারিতেন, আমার বাবার নীতিতে, বদন অস্পৃশ্য মালী হউক না কেন, তাহারও সে অধিকার ছিল। তখনকার ভদ্রলোকেরা এই ভাবেই চলিতেন। জাত-বর্ণ-ভেদ একটা সামাজিক প্রথা মাত্র। প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং এ প্রথা মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু ইহাতে মানুষের সাধারণ মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা হয়, এ জ্ঞান সেকালের লোকের ছিল না। এসকল জাতি-বর্ণের বিচার করিয়াও তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে, আহার ও বিবাহাদি ব্যতীত, অন্য সকল বিষয়ে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে মানুষের যাহা প্রাপ্য নিঃসঙ্কোচে তাহা দিতেন। ইহা যথেষ্ট ছিল না, স্বীকার করি। কিন্তু তখনকার লোকের মনোভাব এরূপ ছিল বলিয়া সেকালে জাতিতে জাতিতে এতটা রেষারেষি এবং বিদ্বেষও জন্মে নাই।

১১

কেবল আয়তনে বা লোকসংখ্যায় পৈল একটা গণ্ডগ্রাম ছিল না। সেকালের হিসাবে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধিও ছিল। শারদীয় পূজার সময়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। আমাদের গ্রাম হইতে বিজয়ার দিনে যথাবিহিত সমারোহ-সহকারে ছয় সাতখানা প্রতিমা বাহির হইত। কোন কোন ব্রাহ্মণবাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজাও হইত;

আর অনেক বাড়ীতেই দোল হইত অথচ আমার শৈশবে গ্রামে এক মুসলমান জমীদারদের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও একখানা কোঠাবাড়ী ছিল না। তখনকার দিনে খুব সম্পত্তিশালী না হইলে কেহ পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিতে যাইতেন না। আজিকালিকার মতন কোঠাবাড়ী তৈয়ার করিবার মালমস্‌লাও অত সহজে পাওয়া যাইত না। এইজন্য খরচও বেশী ছিল। আমাদের পাড়ায় একটা মাত্র পোড়ো দালান ছিল। সেটা কোনও দিন আমাদের বংশের এক পরিবারের পারিবারিক দেবমন্দির ছিল। আমি এই মন্দিরকে ভাঙ্গা ইটের স্তূপরূপেই দেখিয়াছি। দেবতা স্থানান্তরিত হইয়া গ্রামের আখড়ায় স্থানীয় বৈষ্ণব মোহন্তের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু পাকা বাড়ীঘর না থাকিলেও অনেকের পুকুরে পাকা ঘাট ছিল, এবং ইহাই তাহাদের একটা সমৃদ্ধির প্রমাণ ছিল।

আমাদের অঞ্চলে এখন যেমন সেকালেও সেইরূপ সাধারণ লোকে বাঁশ এবং ছন দিয়া ঘর প্রস্তুত করিত। আমাদের বাড়ীতে আমার বাল্যকালে এইরূপ ঘরই অনেকগুলি ছিল। এসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচারু ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি ছিল কাঠের। সম্মুখের বেড়াও কাঠেরই ছিল। পূজার সময় মণ্ডপের বড় বড় দরজা খুলিয়া রাখা হইত। আর তিনদিকের বেড়া ছিল বাঁশের সরের। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় এই সরকে ইকড় বলে। ভিতরের দিকে এই ইকড়ের উপরে শীতল পাটী ছিল। সব ঘরই অতি মসৃণ বেত দিয়া বাঁধা হইত, পাট দিয়া নহে, এবং এই বেতের বাঁধনের মধ্যে কখন কখন কারুকার্য্য গড়িয়া তোলা হইত। এইসকল কারীগরি করিতে যাইয়া এই বাঁশ, বেত, ছন, সর ও দরমা বা পাটী দিয়া তৈয়ারী করা ঘরেই অনেক খরচ হইত। একালে পাকা ইমারতেও তাহার চাইতে যে খুব বেশী খরচ হয় তাহা নহে। আমাদের বাড়ীতে বাহিরে এই বাঁশ ও ছনের ঘর দিয়াই এক প্রকারের চক্‌মিলান ছিল। চারিদিকে ঘর আর মাঝখানে একটা চারিদিক্ খোলা আটচালা ছিল। এসকল আট-চালা ঘরকেই আমরা নাটমন্দির করিতাম। পূজার সময় এইখানেই নাচগান হইত। বিবাহাদিতে এইখানেই সভা বসিত। বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের মহলেও এইরূপ উঠানের চারিদিকে বাঁশ ও ছনের ঘর ছিল। আমাদের অঞ্চলে এখনও মাটির ঘর নাই, সেকালেও ছিল না।

১২

অপেক্ষাকৃত সম্পন্নগৃহস্থের বাড়ীতেও আস্‌বাবের বাহুল্য ছিল না। আজিকালিকার হিসাবে আস্‌বাব ছিল না বলিলেই হয়। শাল সেগুন এসকল আমরা বাল্য-কালে চক্ষে দেখি নাই। কাঁঠালই শ্রেষ্ঠ কাঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। আল্‌মারী দেরাজ খুব ধনীর বাড়ীতেও ছিল না। বড় বড় কাঁঠালের সিন্দুকে বাসনাদি থাকিত। আর কখন তার সঙ্গেই কিম্বা কখন স্বতন্ত্র সিন্দুকে পুঁটুলী-বাঁধা কাপড়-চোপড় রাখা হইত। পুরুষেরা শীতকালে বিবাহাদি উপলক্ষে শাল জামিয়ার প্রভৃতি গায়ে দিতেন। তার নীচে এক একটা মেরজাই থাকিত। সচরাচর যোগীয়ানী খেশ আর যাঁহারা একটু সৌখীন ছিলেন তাঁহারা দোলাই দিয়া শীত নিবারণ করিতেন। আজকাল যাহাকে লোকে খদ্দর বলে তাহারি প্রাচীন নাম আমাদের অঞ্চলে খেশ ছিল। বৃদ্ধেরা মাঝে মাঝে লুই গায়ে দিতেন। মহিলারা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে তসর বা গরদ পরিধান করিতেন। বেনারসী সাড়ীর কথা সকলেই জানিত, কিন্তু ক্বচিৎ, অতি ক্বচিৎ তাহা দেখা যাইত। এইসকল কাপড়-চোপড়ই পুঁটুলী বাঁধিয়া গৃহস্থেরা সিন্দুকে রাখিত। অন্য আস্‌বাবের মধ্যে শীতল পাটী এবং কাঠের পিঁড়িই প্রশস্ত ছিল। সতরঞ্চী এবং গালিচা, সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে পাওয়া যাইত। কিন্তু এগুলি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে সিন্দুকের বাহির হইত। অন্য সরঞ্জামের মধ্যে শামাদান বেলয়ারি লণ্ঠন ও ধনীদিগের গৃহে ঝাড় পর্য্যন্ত থাকিত। আর-একটু অবস্থা ভাল হইলেই ভদ্রলোকেরা রূপার আতরদান ও গোলাপ-পাস কিনিয়া রাখিতেন। মেয়েদের প্রসাধনের জন্যও সকল বাড়ীতে আর্সি ছিল কি না সন্দেহ। অন্ততঃ আমার অতি শৈশবে আমার মা আর্সির সম্মুখে বসিয়া চুল বাঁধিয়াছেন ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অলঙ্কারেরও বাহুল্য ছিল না। সোনার অলঙ্কার অতি অল্পই ব্যবহৃত হইত।

শাঁখাই সধবাদিগের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার ছিল। এই শাঁখার মধ্যে গড়নে এবং কারুকার্য্যে অনেক ইতর-বিশেষ ছিল বটে। গরীবেরা খুব মোটা শাখা পরিত। অপেক্ষাকৃত ধনীরা মিহি এবং বেশী পালিশ করা শাঁখা ব্যবহার করিতেন। বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থেরা রূপার বালা বা বাউটী পরিতেন। নাকে নথই একরূপ একমাত্র সোনার অলঙ্কার ছিল। কেহ কেহ সোনার মালাও পরিতেন। আর সোনার বাজু খুবই প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া চিক্ ইয়ারিং প্রভৃতির নামও শৈশবে শুনি নাই।

১৩

সত্তর বছর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের গ্রাম্য বেচা-কেনাতে টাকা পয়সার প্রচলন খুব কমই ছিল। দ্রব্য-বিনিময়েই গ্রামের ব্যবসা চলিত। চাষী ধান দিয়া কলু-বাড়ী হইতে তেল আনিত, দোকান হইতে নুন মস্‌লা কিনিত। হাটের দিনে সকলে আপন আপন বাড়ীর উৎপন্ন ফল শস্যাদি লইয়া যাইত এবং এসকলের বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনিয়া আনিত। আর হাটের এই কেনাবেচাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সকলেই নিজের নিজের পণ্যজাত নিঃসঙ্কোচে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেন এবং বাজার হইতে নিজেদের সওদা নিজেরাই বহিয়া বাড়ী আনিতেন।

জন্ম-কথা

১

পৈলের ভদ্রাসন বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। বাবা সে-সময়ে বাড়ী ছিলেন না বোধ হয়। তিনি তখন ঢাকায় চাকুরী করিতেন। বাবা ইংরেজী শিখেন নাই। বাংলা ভাষারও বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। তবে লেখাপড়া যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্ব্বদাই পড়িতেন।

আজিকালি যেমন ইংরেজ সরকারে চাকুরী কিংবা ইংরেজের আদালতে ওকালতি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য লোকে ইংরেজী শিখিয়া থাকে, সে-কালে সেইরূপ যাহাদিগকে সচরাচর ভদ্রলোক বলে তাঁহারা যত্ন করিয়া পার্শী শিখিতেন। এখন যেমন ইংরেজী আইন-আদালতের ভাষা হইয়াছে, নবাবী আমলে পার্শী সেইরূপ আমাদের দেশের রাজভাষা ছিল। যাঁহাদের রাজসরকারে চাকুরী করিবার লোভ ছিল তাঁহারা পার্শী শিখিতেন।

ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়িতেন। প্রত্যেক গ্রামে এজন্য সংস্কৃত টোল ও পার্শী মাদ্রাসা বা মুক্তাব ছিল। অনেক সময় এসকল মাদ্রাসা গ্রামের মস্‌জিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিত। মস্‌জিদের ইমাম বা অন্য কোন মৌলবী শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান-বালকেরা এসকল মাদ্রাসায় একসঙ্গে শিক্ষালাভ করিত। এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ছিল না। হিন্দু বালকেরাও মুসলমান মৌলবীকে শিক্ষাগুরুর প্রাপ্য মর্য্যাদা ও ভক্তি নিঃসঙ্কোচে অর্পণ করিত। হিন্দুরা যেমন নিজেদের বিদ্যারম্ভ বা হাতে-খড়ির সময়ে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিত, সেইরূপ মাদ্রাসায় বা মুক্তাবে যাইয়া পার্শী পড়িতে আরম্ভ করিবার সময়, এবং প্রতিদিনের পাঠের প্রারম্ভে কোরাণের আদি কথার—লা এলাহি এল্ আল্লা, মহম্মদ্ রসুল আল্লা,—আবৃত্তি করিত। ইহার ফলে তখনকার মধ্যশ্রেণী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের অন্তরে মুসলমানদিগের ধর্ম্মের প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা জন্মিয়া যাইত।

আমাদের গ্রামে আমার বাল্যকালে টোল এবং মুক্তাব দু'ই ছিল। প্রতিবেশী মুসলমান জমিদারদের ভদ্রাসন-সংলগ্ন মস্‌জিদে পার্শী পাঠশালা ছিল। আমাদের গ্রামে একটা টোলও ছিল। বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী এক অধ্যাপকের বাড়ীতে এই টোল ছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ বালকেরা এই টোলে সংস্কৃত পড়িতেন। অন্যান্য গ্রাম হইতেও অনেকে এই টোলে পড়িবার জন্য আমাদের গ্রামে আসিতেন, এবং এইখানেই থাকিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেন। এইসকল ছাত্রেরা গ্রামের সম্পন্ন ভদ্রলোক-দিগের বাড়ীতে থাকিতেন। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার এসকল গৃহস্থেরাই বহন করিতেন। বাবা বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশেই থাকিতেন, কিন্তু বাড়ীতে দেব-পূজাদির বা অতিথিঅভ্যাগতের সেবা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা

ছিল। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বিদেশে থাকিতেন বলিয়া গার্হস্থ্যোচিত কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী হইত না। যাঁহার হাতে বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তিনিই দেবসেবা অতিথিসেবা প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। আমার আবছায়ার মতন মনে পড়ে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোলের দুই চারি জন ছাত্র আমাদের বাড়ীতে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণ লোকের যে কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এমন বলা যায় না। এখন যতলোকে লিখিতে ও পড়িতে শিখে, তখন ততলোকে লেখাপড়া শিখিত না, ইহা সত্য। কিন্তু লেখাপড়া না শিখিয়াও নানা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মুখে মুখে সেকালের লোকে নানা জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন। আর সমাজের শিক্ষিত লোকেদের সংসর্গে সাধারণ লোকের বুদ্ধিও মার্জ্জিত হইয়া উঠিত। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে রামায়ণ বা মহাভারত পড়া হইত। যিনি পড়িতে জানিতেন তাঁহার চারিদিকে প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া ঘিরিয়া বসিতেন। এইরূপে পড়িতে না জানিয়াও প্রায় সকলেই মুখে মুখে প্রাচীন পুরাণ কাহিনীর কথা জানিতে পারিতেন, এবং অপরের নিকটে তাহার গল্প করিতেন। এ ছাড়া যাত্রা-কথকতাও ছিল। এইরূপে লোকশিক্ষা প্রচার হইত। এখনকার মতন এত পাঠশালার ছড়াছড়ি ছিল না বলিয়া সেকালের সাধারণ লোকেরা যে নিতান্তই অজ্ঞ থাকিতেন তাহা নহে।

আর পাঠশালাও যে একেবারে ছিল না এমন নয়। ইংরেজ আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলাদেশে ৮০,০০০ পাঠশালা ছিল। বৃটিশ শাসনের বিগত শত বর্ষের মধ্যেও এত পাঠশালার সৃষ্টি হয় নাই। ১৯২৫ ইংরেজীতে বাংলা দেশে ৫,৭,১৭৩ পাঠশালা ছিল। ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে বাংলার জনসংখ্যা হিসাবে, প্রত্যেক চারিশত লোকের একটা করিয়া পাঠশালা ছিল। এখন ইহার অর্দ্ধেক হইয়াছে, অর্থাৎ ফি ৮০০ লোকের ভাগে একটা করিয়া পাঠশালা পড়ে।

বাবা বোধ হয়, তাঁর মাতুলালয়েই লেখাপড়া শিখেন। তাঁর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। আর পার্শী ভাষাতেও যথেষ্ট বুৎপত্তির জোরে সমাজে মুন্সী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে মুন্সী মহাশয় বলিয়াই তিনি পরিচিত ছিলেন। শুনিয়াছি, পার্শী মুসাবিদাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

২

আমার মা'র নাম ছিল নারায়ণী। মা বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। আমার বিমাতার জীবদ্দশাতেই আমার মার বিবাহ হয়। বিমাতাঠাকুরাণী নিজে এক-রূপ জোর করিয়া দ্বিতীয় বার বাবার বিবাহ দেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া, বংশরক্ষার জন্য বিমাতা-ঠাকুরাণী বাবাকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। বাবা কিছুতেই রাজী হন না। এসকল ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়। ঈশ্বর-ইচ্ছা হইলে এতদিন আমার বিমাতারই সন্তান হইত। হয় নাই যখন, তখন ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এই কথা বলিয়া বাবা অনেকদিন পর্য্যন্ত বিমাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। আপনার পিত্রালয়ে যাইয়া সেখান হইতে "কন্যার" খোঁজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের নিকটেই আমার মাতুলালয়। আমার বিমাতৃকুল "দত্ত"। মাতৃকুল "কর"। আমার মা'র সংবাদ পাইয়া বিমাতা-ঠাকুরাণী নিজে ডুলী করিয়া আমার মাতুলালয়ে যাইয়া আমার মাকে পছন্দ করিয়া বাবার দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসেন। এরূপভাবে নিজের সপত্নীকে আপনার ঘরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা রূপকথার মতন শোনায়। সেকালে ইহা সম্ভব ছিল। তখন লোকে বিশেষভাবে বংশরক্ষার জন্যই দারপরিগ্রহ করিতেন। পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ পাইবে এ ভাবনা লোকের অসহ্য ছিল। শ্বশুরকুল লোপ পাইবে বিমাতাঠাকুরাণী এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তিনি অমন জেদ্ করিয়া আপনার সপত্নীকে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

আমার বয়স যখন দুই বৎসর তখন বিমাতাঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কথা আমার কিছুই

মনে নাই। কিন্তু শৈশবে ও বাল্যে মায়ের মুখে তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। বোধ হয় মা সাত-আট বৎসর সতীনের ঘর করিয়াছিলেন। কিন্তু এত কালের মধ্যে একদিনও উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের মনোমালিন্য হয় নাই। নিজে ঘটকালী করিয়া স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া বিমাতাঠাকুরাণী আমার মায়ের সুখ-শান্তির জন্য নিজেকে বিশেষভাবে যেন দায়ী মনে করিতেন। এবং এই কারণে সর্ব্বদা আমার মাকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিমাতাঠাকুরাণীর খটাখটী হইয়াছে বটে; সকল সংসারেই হয়। কখনও কখনও বিমাতাঠাকুরাণী বাবার উপরে রাগ করিয়াছেন আর রাগ করিয়া আহার ত্যাগ করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু মা যেই গিয়া খাইতে ডাকিয়াছেন অমনি সকল অভিমান ধুইয়া মুছিয়া খাইতে আসিয়াছেন। মায়ের মুখে এসকল কথা শুনিয়াছি। সজ্ঞানে বিমাতাঠাকুরাণীর স্বর্গলাভ হয়। আর মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার যা কিছু অলঙ্কার-পত্র ছিল তাহা আমার ভবিষ্যৎ পত্নীর জন্য মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া যান। মা কহিতেন যে, আমার বিমাতাঠাকুরাণীই আমাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন মা আমার দিকে চোখ তুলিয়া চান নাই। চাওয়ার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

৩

মা লেখাপড়া জানিতেন না। সেকালে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শিখার রীতি ছিল না। অন্ততঃ আমাদের অঞ্চলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন না। লোকের সংস্কার ছিল যে, বালিকারা লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হয়। এ সংস্কারের উৎপত্তি কিসে হয়, পরে জানিয়াছি; বাল্যকালে বা প্রথম যৌবনে জানি নাই। সেকালে বাংলা দেশে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেন; এক শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহিলারা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বাংলাতেই রচিত। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল, ও চৈতন্য-চরিতামৃত এই তিনখানিই বাংলার বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক। অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-পুস্তক সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত শিক্ষা করাও অতিশয় কষ্টসাধ্য। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রয়োজনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারণ লোককে লেখাপড়া শিখিতে হইত না। কিন্তু বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাংলায় রচিত বলিয়া বর্ণজ্ঞান লাভ করিলে বাঙ্গালী মাত্রই এইগুলি পড়িতে পারিতেন। এই কারণে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-মণ্ডলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় বাংলা বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেন। মহিলারা মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার্য্য এবং গুরু হইতেন। আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা বৈষ্ণবদিগের একজন গুরু ছিলেন। বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহিলাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানিতেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মহিলা বৃন্দাবনে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার সেই ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষেরা মিলিয়া জনতা করিতেন। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় নিজে এই বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্ত্রী পুরুষে সকলেই যে লেখাপড়া জানিতেন অপরেও ইহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। বিগত খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম দিকে লুসিংটন্ নামে একজন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বাংলা দেশের লোকের মধ্যে কতটা পরিমাণে লেখাপড়ার প্রচার আছে ইহার তদন্ত করিয়াছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল, তাঁহার রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রীরা যখন এদেশে বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে আরম্ভ করেন তখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতেন।

আর এক শ্রেণীর মহিলারা বা বালিকারা লেখাপড়া শিখিতেন। উত্তর-বঙ্গে বা বরেন্দ্র ভূমিতে মুসলমান আমল হইতেই অনেক হিন্দু জমীদার আছেন। যে-সকল পরিবারের সঙ্গে ইহাঁদের বিবাহ সম্বন্ধ হইত তাঁহাদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। ইহার কারণ এই যে, কি জানি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অকালবৈধব্য উপস্থিত হয় তাহা হইলে জমীদারির তত্ত্বাবধানের ভার

ইঁহাদের উপরেই পড়িতে পারে; আর সে অবস্থায় লেখাপড়া জানা না থাকিলে বিষয়রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। এইজন্য উত্তর-বঙ্গে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হন, বোধ হয় এই হইতেই এই সংস্কারের উৎপত্তি হয়। আমাদের অঞ্চলে এরূপ বড় জমীদারী ছিল না। সুতরাং সেকালে আমাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে অজ্ঞ ছিলেন এমন নহে। আমার মা অনেক ব্রত-উপবাস করিতেন। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। পুরোহিত আসিয়া এই ব্রত উপলক্ষে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা শুনাইতেন। প্রায় ব্রতেরই এক-একটা ব্রত-কথা আছে। এসকল কথার ছলে দেব-ভক্তির এবং লোক-সেবার অপূর্ব্ব উপদেশ মিলিত। নিষ্ঠা-সহকারে যাঁহারা এসকল ব্রতকথা শুনিতেন, এসকল উপদেশ তাঁহাদের আচার-আচরণে, ভাবে ও ভক্তিতে গড়িয়া উঠিত। ব্রত-কথা ব্যপদেশে অতি উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বর্ণজ্ঞানবিহীন মহিলাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইত। আমার মা এ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

তার পর সকল সমাজেরই চাল-চলন এবং রীতিনীতির ভিতর দিয়া সমাজের লোকেরা অজ্ঞাতসারে সদাচার ও শীলতা শিক্ষা করিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীনারা ইস্কুল কলেজে না পড়িয়াও নিজেদের সমাজের রীতিনীতি হইতে একটা অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতেন। আমাদের সেকালের সমাজে সকল বিষয়ে নিজেকে চাপিয়া রাখা এবং নিজে পিছনে থাকা শীলতার প্রধান শিক্ষা ছিল। যে আপনাকে পিছনে রাখিতে চাহিত না, যে সকল বিষয়ে অপরকে আগাইয়া দিতে জানিত না বা পারিত না, সে ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। মেয়েরা বিশেষ ভাবে এই আত্মগোপন বা সংযম শিক্ষা করিতেন। আমার শৈশবে যেমন নিজের বাড়ীতে সেইরূপ মায়ের সঙ্গে যখন মামার বাড়ী গিয়াছি সেখানেও আমি কি খাইলাম বা না খাইলাম মা সেজন্য ব্যস্ত হইতেন না। মামার বাড়ী গেলে আমার স্নান-আহার হইয়াছে, কি না হইয়াছে সে খোঁজ পর্য্যন্ত রাখিতেন না। আপনার জনের সুখ-সুবিধার জন্য কোন প্রকারের আগ্রহ প্রকাশ তখনকার সমাজে ভদ্র-রীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার ফলে যে, কাহারও আপনার জনের অযত্ন হইত তাহা নহে। প্রত্যেকে অপরের যত্ন করিত বলিয়া সকলেরই মোটের উপরে আরো বেশী যত্ন হইত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ সংযমও শিক্ষা হইত। এইসকল বিবিধ উপায়ে, সেকালের মায়েরা লিখিতে পড়িতে না জানিলেও, অজ্ঞ বা অসভ্য ছিলেন এমন কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

৫

কহিয়াছি, আমার জন্মকালে বাবা ঢাকার সদরালার দপ্তরে পেশ্‌কার ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং বাংলার শিক্ষাবিভাগের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের পিতা শ্যাম রায় মহাশয় আমার বাবার সমসময়ে ঢাকার সদরালার দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে বাবার মুখে একথা শুনিয়াছিলাম। বাবার জীবনের ঐ সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সদরালা মহাশয় (বোধ হয় তিনি মুসলমান ছিলেন) বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সে-সময়ে ভাওয়ালের কালীনারায়ণ রায় একদিকে এবং ওয়াইজ্‌ সাহেব নামক একজন ইংরেজ অন্য দিকে ঢাকা অঞ্চলে অত্যন্ত প্রবল-প্রতাপান্বিত জমীদার ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রায়ই মাম্‌লা-মোকদ্দমা লাগিয়া থাকিত। একটা মোকদ্দমায় সরজমীন্‌ তদন্ত করা প্রয়োজন হয়। সদরালা সাহেব বাবার উপরে এই তদন্তের ভার অর্পণ করেন। সরজমিনে উপস্থিত হইলে কালীনারায়ণ রায়ের লোকেরা বাবাকে ভেট্‌ দিবার জন্য নগদ্‌ দুই হাজার টাকা লইয়া তাঁহার নিকটে হাজির হয়। তিনি কালীনারায়ণ রায়ের স্বপক্ষে রিপোর্ট দেন, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। বাবা মহা মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া এ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অন্যদিকে নিজের প্রাণের দায়ে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহস হইল না। তখনও ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পথঘাট সাধারণ যাত্রীদিগের পক্ষে নিরাপদ হয় নাই। যখন তখন খুন ও ডাকাতি

হইত। আর কালীনারায়ণ রায়ের এমনি প্রতাপ যে দু' পাঁচটা খুন করিয়া একেবারে গুম্ করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। এইসকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাবা কালীনারায়ণ রায়ের লোকদিগকে ঢাকায় টাকা পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। তাঁহার পক্ষে এত টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। আর তদন্তের রিপোর্ট তিনি ঢাকাতে যাইয়াই দিবেন, তখন টাকাটা দিলেই হইবে। ঢাকায় তাঁহারা টাকা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বাবা তাহা ফেরত দিয়া তদন্তের যথাযথ রিপোর্ট দেন। সদরালা তাঁহার উপরে এই তদন্তের ভার দিয়াছিলেন তাঁহার বিশেষ কিছু লাভ হইবে বলিয়া। বাবা যখন এই টাকা এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন শুনিলেন তখন নিজের আমলাদিগের সমক্ষে বাবাকে বোকা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন।

৬

বাবা আমাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে ইহা বুঝি নাই। আমি যে-যুগে জন্মিয়াছি ও যে-শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পুত্রলাভ যে কতবড় সৌভাগ্যের কথা মনে করিতেন, অপুত্রক হইয়া সংসার হইতে চলিয়া যাওয়া কত বড় দুর্ভাগ্য ভাবিতেন, আমাদের পক্ষে ইহা ধারণা করা কঠিন। আমরা তাঁহাদের মতন পুত্রকামনা করি না। আমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ রসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোগ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রাচীনেরা পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। দাম্পত্য-সম্বন্ধের প্রয়োজন ছিল, ভোগ নহে, কিন্তু প্রজনন, কুলধারা রক্ষা করা, সমাজ-স্থিতি-ভঙ্গ নিবারণ করা। পুত্রলাভে পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। ইহাই প্রাচীনদিগের সংস্কার এবং আদর্শ ছিল। সমাজরক্ষার সহায় বলিয়াই দারা সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এইজন্য বিবাহ আমাদের প্রাচীন সাধনায় "সংস্কার" ছিল। আর এইজন্যই কুলপাবন সৎপুত্র লাভ করিবার জন্য সৎ-গৃহস্থেরা সর্ব্বদা এত লালায়িত হইতেন।

বিধাতার কৃপায় আমারও পুত্রলাভ হইয়াছে। কিন্তু আমার বাবা আমাকে পাইবার জন্য যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, আমি তাহা করি নাই। এযুগে বোধহয় কেহই এ তপস্যা করে না। এইখানে প্রাচীনদিগের সঙ্গে আমাদের একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার বাবা চিঠি-পত্রে আমাকে "প্রাণতুল্যেষু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এযুগের বাবারা এরূপ সম্বোধন করেন না। করিলেও এযুগের মা'রা পছন্দ করিবেন কিনা জানি না। এসম্বোধন এখন তাঁহাদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে একথা এযুগের লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। আমার বাবা ইহা ভুলেন নাই বলিয়া আমাকে সর্ব্বদাই প্রাণতুল্যেষু বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আর উপাসক যেমন দেবতার পূজা করেন, শৈশবে সেইরূপে আমার লালন পালন করিয়াছিলেন।

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

"বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ স্মৃতি"

মাঘের প্রবাসীতে "বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ স্মৃতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

(ক) বুদ্ধদেব যে-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর দার্শনিক মত ভিন্ন আর কিছু নহে এবং তাঁহার ভাব ও ভাষা, হিন্দু ভাব ও ভাষারই অনুসরণে সৃষ্ট। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিজস্ব কিছু ছিল না বা নাই; তবে হিন্দুশাস্ত্রের কতকগুলি শব্দ তিনি বা তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন মাত্র।

(খ) পাষণ্ড বা ভণ্ড শব্দ কোন কালেই সদর্থবাচক নয়। পুরাণাদি দ্রষ্টব্য।

(গ) ব্যক্তির নামের মধ্যে কতকগুলি, যথা,—শাক্যশ্রী, বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি এবং স্থানের নামগুলি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে সত্য; কিন্তু উপাধিগুলি এবং কুলেন্দ্র, লোকনাথ প্রভৃতি নামগুলি প্রকৃত বৌদ্ধ স্মৃতি বহন করে কিনা তাহা তর্কের বিষয়। কেননা ঐগুলি হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয় প্রকারই হইতে পারে।

(ঘ) প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দেবদেবীর কোন স্থান নাই এবং মূর্ত্তিপূজাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ নয়। পরন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় কতকগুলি হিন্দু-দেবদেবী বৌদ্ধধর্ম্মে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল এবং মুখ্যভাবে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গেই উহারা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিল। নতুবা ধর্ম্মঠাকুর, আদ্যা প্রভৃতি কোন দেবতাই প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধের নিজস্ব নয়।

(ঙ) পুরাণাদিতে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে একরূপ লুপ্ত হইলেও বুদ্ধদেব এখনও নিতান্ত নিরক্ষর ভিন্ন প্রত্যেক হিন্দুর নিকটে বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ দশাবতারের ৯ম অবতার রূপে প্রত্যহ পূজা পাইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধদেবকে হিন্দু ভুলিয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী আচার প্রতিপালন বা বুদ্ধদেবের বিশেষভাবে পূজা ও আরাধনা লোপ পাইয়াছে বটে।

(চ) শেষ এই বলিতে চাই—(১) বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অংশ-বিশেষমাত্র, কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নয়। (২) উপনামগুলি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ স্মৃতি বহন করে কিনা, সন্দেহের বিষয়; তবে স্থানের নামগুলি এবং কতকগুলি ব্যক্তির নাম বৌদ্ধ স্মৃতি বহন করে সত্য। (৩) স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী যেরূপ মানব-সমাজের গতি বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম, ভাব, ভাষা এবং শব্দার্থ বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৪) বুদ্ধদেবকে প্রকৃত পক্ষে সকলে ভুলিয়া যায় নাই; মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণতঃ প্রত্যেক হিন্দুই আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে এবং বুদ্ধদেবের পূজা করা যদি বৌদ্ধত্বের নিদর্শন হয়, তবে প্রত্যেক হিন্দুই গৌণতঃ বৌদ্ধ।

প্রমাণাদি দিবার স্থানাভাব। আবশ্যক হইলে, বিশেষ প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

শ্রী তারকেশচন্দ্র চৌধুরী

প্রবন্ধ-লেখক 'দিগগজ পণ্ডিত' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের নামটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া গঠিত হইয়াছে। এক সময়ে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের তর্কজালে অস্থির হইয়া হিন্দু নৈয়ায়িক সমাজ তাঁহাকে শ্লেষের দ্বারা অমর করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসও তাঁহার কাব্যে (মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ১৪ শ্লোক) দিগগজ শব্দ দ্বারা ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।"

মেঘদূতে আছে—"দিঙ্‌নাগানাং পথিপরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।" 'দিগগজ' নহে, 'দিঙ্‌নাগ' শব্দই। ৺অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এ কালিদাসের সময় নিরূপণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের পশ্চাৎ সময়ের। সুতরাং কালিদাস (দিগগজ?) 'দিঙ্‌নাগ' শব্দদ্বারা দিঙ্‌নাগাচার্য্যকে চিরস্মরণীয় করিয়া যান নাই। দিঙ্‌নাগ দিগ্‌হস্তী। অমরসিংহ তাঁহার কোষে লিখিয়াছেন,

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥

অর্থাৎ আটটি গজ আট দিক্ রক্ষা করে। আমার বোধ হয় 'বিদ্যাদিগ্‌গজ বা 'দিগগজ পণ্ডিত' তিনি যিনি বিদ্যার সব দিক্ রক্ষা করেন অর্থাৎ সব বিদ্যা জানেন। তাহারই শ্লেষে মহাপণ্ডিত অর্থাৎ মূর্খ অর্থ হইয়াছে।

শ্রী কামিনীকুমার দত্ত

সাম্প্রদায়িক শক্তিশালিতা

মাঘমাসের "প্রবাসীতে" স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুপ্রসঙ্গে হিন্দুমুসলমান সমস্যাবিষয়ক সম্পাদকের মন্তব্য পড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু একটা বিষয়ে সম্পাদকের সহিত আমার সম্পূর্ণ মিল নাই। সম্পাদক সর্ব্বত্রই ধরিয়া লইয়াছেন যে, মুসলমানগণ হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বলশালী এবং তাহার একটি কারণ সামাজিক সাম্য। সম্পাদকের কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। কিন্তু আমার মনে হয়, মুসলমানগণ হিন্দু অপেক্ষা বলশালী নহে, যদিও বাহ্যতঃ তাহাই মনে হয়। অন্য প্রদেশের মুসলমানদের বিষয় জানি না, বাঙ্গালার মুসলমানের বিষয়ই বলিব।

আমরা দেখিয়াছি এই যে সমগ্র বাঙ্গলাব্যাপী মুসলমানগণ মন্দির অপবিত্র করিল ও দেববিগ্রহ ভগ্ন করিল তার শতকরা ৯৫টির অধিকই রাত্রিতে চোরের মত; কলিকাতা ও ঢাকা সহরে নিরীহ পথিকদিগের উপর যে ছোরার আঘাত করিয়াছে তাহাও অতর্কিত; মুসলমান-বহুল পাবনার অত্যাচারও তদ্রূপ। ফলতঃ কলিকাতা, ঢাকা, বা পাবনায় মুসলমানগণ বীরের মত সম্মুখীন হইয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। অতর্কিত অত্যাচার বা পশ্চাৎ হইতে ছোরার আঘাত ব্যক্তিগত বলশালিতার লক্ষণ নয়, তাহা গুণ্ডামী মাত্র; এবং কতকগুলি গুণ্ডা ইতস্ততঃ যদৃচ্ছ অত্যাচার করিলে সামাজিক বলের পরিচয় হয় না, কারণ তাহাদের সংহতির নিতান্ত অভাব; একাধিক "ব্রেণ"-ওয়ালা ব্যক্তি গুণ্ডাদের পরিচালন করিলেও সেই সংহতি সাময়িক মাত্র। অবশ্য হিন্দু গুণ্ডাগণকেও আমি বাদ দেই না। কলিকাতায় হিন্দুগণ বহু মুসলমান হতাহত করিয়াছে, ইহাকে আমি হিন্দুসমাজের বলের লক্ষণ মনে করি না। বস্তুতঃ হিন্দু ছাত্রগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি কলিকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী রক্ষায়; ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিলে কুলীর কাজ করায়; এবং পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যে সংহতি-শক্তি ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাই প্রকৃত সমাজের ও ব্যক্তিগত বলশালিতার লক্ষণ। মুসলমানগণ এইরূপ কোন কার্য্য করে নাই।

আপাততঃ হিন্দু যে মুসলমানের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না তাহার কারণ প্রথমতঃ, হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণ অধিক উগ্র; প্রমাণ, ফৌজদারি মোকদ্দমা, ও জেলখানার আতিথ্যগ্রহণে মুসলমানদের প্রাধান্য। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের ভীরুতা; প্রমাণ, অত্যাচারিত হইয়া নীরব থাকা ও নারী-রক্ষায় অক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, হিন্দুর সামাজিক অবস্থা, উপযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে হিন্দুর যত আর্থিক ক্ষতি ও অসুবিধা মুসলমানদের তত নয়; কারণ, মুসলমানগণ ১২।১৪ বৎসর হইতেই কাজ করিতে আরম্ভ করে, কাজেই মৃত্যুর পর পুত্রকন্যার কি অবস্থা হইবে মুসলমানকে তাহা ভাবিতে হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে হিন্দুর এই চিন্তা অনিবার্য্য। হিন্দুর বিধবা বিবাহ নাই বলিয়া অনেক পুরুষই জীবন বলি দিতে অস্বীকৃত হয়, যদিও ইহা একটি দুর্ব্বলতা, কারণ পূর্ব্বে হিন্দুর স্ত্রী স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইত; কিন্তু মুসলমানদের এই অসুবিধা নাই। আমি হিন্দুর জাতিভেদ বিশেষ বিপজ্জনক মনে করি না, কারণ কলিকাতায়, ঢাকায়, পটুয়াখালিতে ইহা হিন্দুদের সংহতির অন্তরায় হয় নাই; এবং অন্যত্রও বোধ হয় অন্তরায় হইবে না। অন্য পক্ষে মুসলমান সমাজে জাতিভেদ না থাকাতেও তাহা এই তিন স্থানের হিন্দুদের ন্যায় কোন সংহতির পরিচয় দেয় নাই।

হিন্দু ভীরু হইলে মুসলমানগণ বলশালী প্রমাণিত হয় না, কারণ তাহারা বলের কোন লক্ষণ দেখায় নাই। রাম ভীরু হইলেই শ্যামের সাহস প্রমাণিত হয় না, শ্যামের সাহসের পরিচয় দরকার। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুর শান্তিপ্রিয়তা এবং সামাজিক অবস্থা ভীরুতায় মিলিত হইয়া হিন্দুকে বড়ই অসুবিধায় ফেলিয়াছে; পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ উগ্রতা ও সামাজিক সুবিধাবশতঃ সাময়িকভাবে ভীরুতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। যাহা হউক, কলিকাতা, ও পটুয়াখালিতে হিন্দুগণ যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে মনে হয় হিন্দুর নিরাশ হইবার কারণ নাই। হিন্দুগণ ঠেকিয়া শিখিতেছে; এই স্থানে সম্পাদকের সহিত আমার একমত।

শ্রীসতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকের মন্তব্য।—হিন্দুসমাজ কেন শক্তিশালী নহে, তাহারই কিছু আলোচনা আমরা করিয়াছিলাম; মুসলমান সমাজ যে অধিকতর শক্তিশালী তাহা বলা আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। হিন্দুসমাজ যে যথেষ্ট শক্তিশালী নহে, "হিন্দুদের ভীরুতা" স্বীকার করিয়া লেখক তাহা মানিয়া লইয়াছেন। আমরা সকল হিন্দুকে ভীরু মনে করি না।

তামাক

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

তামাকের ব্যবহার এখন জগৎ জুড়িয়া! কেহ তামাক-পাতার গুঁড়া চিবাইয়া খান, কেহ নস্য করিয়া নাকে গোঁজেন, কেহ পাতাকোটা গুড় মশলা দিয়া তৈয়ার-করা তামাক পুড়াইয়া তাহার ধোঁয়া কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত পেটে পুরেন কতক নাক মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেন। তামাক বর্ত্তমান জগতের অল্প লোকেরই ব্যবহারে আসে না।

যে-সকল কাজ করিতে বারণ করিলে ছেলে বুড়ো সকলে সেইগুলাই আগে করিয়া বসে, তন্মধ্যে তামাক খাওয়াও একটি। কিশোর বা যুবারা তাই বিড়ি সিগারেট বেশী টানে, ছাত্রমহলে নস্যও বড় কম চলে না। স্বদেশী আন্দোলন কি করিয়াছে না করিয়াছে তাহা বলিতে যাওয়া তত নিরাপদ্ নহে, কিন্তু উহা যে চায়ের দোকানের সহিত সমানে টক্কর দিবার মত সহরের অলিতে গলিতে স্বদেশী বিড়ির দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাক্তাররা বলেন, মেয়েদের মধ্যে হিষ্টিরিয়ার এত বৃদ্ধির অন্যতম কারণ পানে খাবার দোক্তা-জর্দ্দার প্রচলনাধিক্য। যাহা হউক সেকালে পুরুষ-মহলে চকমকি পাথর তামাক টিকে কয়লা আর শোলার বোঝা, ঠিকরে চিমটে, গুল আর ছাই ছড়াবার নোংরামিটা যেমন দেশলায়ের আবির্ভাবে ঘুচিয়া গিয়াছিল, আর এখন দেশলাই, চুরুট, বিড়ির দৌলতে, হুঁকা কলিকা তামাক টিকে ছিঁচকে কয়লাগুলের র‍্যালা, নলিচা সাফ ও জল বদলের পালা আর তাওয়া আলবোলা ও স্বর্ণাকৃতি শট্‌কা ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে, তেম্‌নি একালের মেয়েরাও গালের মধ্যে পোড়া তামাক বা গুল টিপিয়া রাখিয়া চারিদিকে নিষ্ঠীবন ত্যাগের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন; যাহা প্রাচীনা পল্লী-বাসিনীদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু আছে, তাঁহাদের পর আর থাকিবে না, এরূপ আশা হয়। কিন্তু রেলকোম্পানীর "বাই-ল"র নিষেধ সত্ত্বেও ধূমপায়ী ও সুখা সেবী ব্যসনীদের জ্বালায় নিরীহ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আর সুখ নাই। পশ্চিমারা যখন চূণ মিশাইয়া দোক্তা বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পিশিয়া ঘন ঘন তালি দিতে দিতে তাহার ধূলা উড়াইতে থাকে, কিম্বা গাড়ীর শ্বাসরোধকারী ভিড়ের মধ্যে সিগারেট ও সস্তার-বিড়ি টানিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে থাকে তখন অনভ্যস্ত যাত্রীরা বিব্রত ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তামাকখোরদের তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। এই পাপেই হউক অথবা তামাকের নিজের দোষেই হউক ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়গণ চিকিৎসা গ্রন্থাদিতে এবং সাময়িক প্রবন্ধে তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে অতি ভীষণ অভিসম্পাৎ-বাণী লিখিয়াছেন! তাঁহারা বলিয়াছেন, "চুরুটের ধোঁয়া খাইতে খাইতে ক্রমে শ্বাসনালী ও ফুসফুসের উশ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ আরম্ভ হয়, দেহে থাইসিস্ ও ক্যান্সার্ রোগের বীজাণু বৃদ্ধি হয়। ইহা শুষ্ক কাশ, স্বরবিকার, হাঁপানি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শিরঃশূল, অবসাদ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অনিদ্রা ঘটায়, শ্বাসনালী ও পাকস্থলী হইতে এই বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ায় বাধা দেয়, হৃদ্‌স্পন্দন জন্মায়, দৃষ্টি ও স্মৃতিহ্রাস করে, মাংস-পেশী শিথিল করে।" কলিকার আগুনের ফুল্‌কী উড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তির গাত্রবস্ত্র পুড়াইয়া দেওয়া আর-একটি রোগ বিশেষ! তাহা ছাড়া তামাকখোরেরা নিজের মুখের দুর্গন্ধ নিজেরা না পাইলেও তাঁহারা যাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করেন তাঁহারা পাইয়া থাকেন।

যাঁহারা গোলামের ন্যায় তামাকের বশীভূত হইয়া হুঁকা হাতে করিয়াই বাড়ীময় হুঁকা খুঁজিয়া বেড়ান, কিম্বা যাঁহারা তামাকের বিষ-ক্রিয়ায় ক্ষুধামান্দ্য, শৈথিল্য, শীর্ণতা, শুষ্কতা, কম্পন, শিরোঘূর্ণন, আচ্ছন্নভাব ও অবসাদ আদি দৈহিক গ্লানি ভোগ করিয়া অনুতপ্ত এমন ভুক্তভোগীরা উপরিউক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের কথায় উত্যক্ত করেন।

তথাপি তামাকের ভক্তগণ বঙ্কিমবাবুকে দলে পাইয়া বলেন, তামাক তাঁহাদের আরামদায়ক, বিরামদায়ক, মুখগন্ধ-নাশক, দন্তমূলদৃঢ়কারক, বিরেচক, মাথায় বুদ্ধি উৎপাদক, কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়ক, শ্লেষ্মা, তন্দ্রা এবং সর্ব্বপ্রকার জড়তা নিবারক! তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের "ফুসফুস দুর্ব্বলকারক, ক্ষণিক সজীবতায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমধিক অবসাদ উৎপাদক এবং অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ বর্দ্ধক" প্রভৃতি দোষবিজ্ঞাপক বেদবাক্য না মানিয়া মাত্র তামাকের গুণগ্রাহী হইয়া বলেন, তামাকের ধূম কফনাশক, দন্তশুদ্ধিকারক ও মুখরোগনিবারক। এখানে বলা ভাল যে, তামাকের যে, কোন অবস্থাতেই তাহার নিকোটিন নামক বিষ দেহে প্রবেশ করে ও কিছু না কিছু অনিষ্ট করেই। তবে যদি বলেন, কেহ খুব তামাক খাইয়া ও চুরুট ফুঁকিয়াও বেশ আছেন, তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

সে যাহাই হউক, তামাক এই শব্দের মূল কি? ইহা সংস্কৃত শব্দ নহে, সংস্কৃত শব্দমূলকও নহে। প্রাচীন অভিধানে এ-শব্দ বা ইহার অর্থ জ্ঞাপক প্রতিশব্দ নাই। আধুনিক অভিধানে ইহার তাম্রকূট, কলঞ্জ, ধূমপর্ণী, তমাল এই নাম পাওয়া যায়। ইহার অর্ব্বাচীন সংস্কৃত পর্য্যায় "ধূম্রাহা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রানী, কৃমিঘ্নী, শ্রীমলাপহা, সুলভা ও স্বয়ম্ভূবা।" পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে ধুতুরার পাতা, তালীশপাতা ও তেজপাতা বাতির মত পাকাইয়া তাহার ধূমপান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং নেশার জন্য লোকে সিদ্ধিপাতা ও গাঁজার ধূম পান করিত। এই বাতিকে "ধূমবর্ত্তিকা" বলিত এবং উহা দন্তশোধনার্থ ও শ্বাস,হাঁপ, পীনস, বস্তিশূল, হিক্কা, ক্ষয়কাশ, সর্দ্দি, বমনবেগ প্রশমনে ও অন্যান্য রোগে প্রয়োগ করা হইত।

সংস্কৃতে ধূমের নাম খ-তমাল। তামাকপাতা তমাল-পত্র নামে অভিহিত হইল। সুতরাং তমাল ও তামাক অর্থে চলিয়া গেল। বেট সাহেব কৃত "Dictionary of the Hindu Language" নামক অভিধানে তমাল শব্দের অর্থ-পর্য্যায়ে আছে "2. Name wrongly given to tobacco." অর্থাৎ তামাককে ভুলে তমাল বলা হয়। ভুল ত বটেই, কারণ তামাক জিনিষটাই ভারতের নহে, শুধু ভারতের বলি কেন, এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশেরই নয়। তামাক আমেরিকার দেশজ ও নিজস্ব। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের পর য়ুরোপ প্রথমে তামাকের সন্ধান পায়। আবিষ্কর্ত্তা কলম্বাস্ প্রথমে সানসাল্‌ভেডর ও পরে কিউবা দ্বীপে ইহার ব্যবহার দেখিতে পান। তথায় আদিম অধিবাসীরা তামাক পাতা পাকাইয়া লম্বা লম্বা নলের মত করিয়া তাহার ধূম পান করিত। দেশ ভাষায় তাহারা যাহা বলিত, সেই উচ্চারণের অনুকরণে য়ুরোপে তামাক আনয়নকারীরা "টাবাকো" শব্দের প্রবর্ত্তন করেন। আদিম মার্কিন পুরুষদেরই ইহা পানীয় ছিল। তাহাদের স্মৃতি শাস্ত্রমতে তাহাতে অধিকার ছিল না। টাবাকোর ধূমপান, দেবতাদের সোমপান, সন্ন্যাসীদের সিদ্ধিপান ও গঞ্জিকা সেবনের ন্যায় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে য়ুরোপীয় জাতিরা আমেরিকায় গমনাগমন করিতে থাকে। লোকের ধারণা সার্ ওয়াল্‌টার রালেই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা হইতে য়ুরোপে তামাকের আমদানী করেন, এবং পর্ত্তুগীজরা ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন করে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, জ্যাকুইস্ কার্টিয়ের (Jacquis Cartier) কানাডায় এবং আঁদ্রে থেভেট (Andre Thevet) ব্রেজিলে গিয়া তামাকের সন্ধান পান। তাঁহারা এবং অন্যান্য অনেকেই তামাকের বীজ য়ুরোপে আনিয়া তথাকার লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আঁদ্রে থেভেকর্তৃক ১৫৩৬ অব্দে ফ্রান্সে তামাক প্রথম আনীত হয়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ড্রেক্ নামক প্রসিদ্ধ নাবিক সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে তামাক আনেন। রালে সেই জাহাজে করিয়াই আমেরিকা হইতে দেশে আসিয়াছিলেন। টাবাকো তুর্কী ও পারসীকদিগের মধ্য দিয়া আসিয়া হিন্দীতে স্বভাবতঃ অনুনাসিক উচ্চারণ তম্বাকু—তামাকু আকার ধারণ করিয়া বঙ্গে তামাক ও তামুক হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর সাধুভাষায় ব্যবহার করিবার জন্য ইহার আটপৌরে নাম ঘুচাইয়া সংস্কৃত অভিধানে "তাম্রকূট" ও "তমালপত্র" এই সুষ্ঠুবেশ দেওয়া হয়। অমরকোষে তামাক জ্ঞাপক শব্দ নাই। তাহাতে তাম্রকূট ও তমালপত্র

ভিন্নার্থক। তাহা হইলে কোন্ সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে তামাক অর্থে "তমাল-পত্র' প্রবেশ করিল? "হালাত ই আসাদ বেগ" নামক গ্রন্থগত বিবরণ হইতে জানা যায়, সম্রাট আক্‌বরের রাজত্বকালে তামাকের নাম ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রথম কর্ণগোচর হয়। আসাদ বেগ নামক জনৈক তুর্কী ভদ্রলোক নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বহু অভিনব দ্রব্য আনিয়া সম্রাট্ আকবরের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহার প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে ছিল তামাকের পাতা। উহা তিন তিন হাত লম্বা মণিরত্ন খচিত-মুখ নলের মুখে লাগান চুরুটের আকারে পাকাইয়া রাখা হইয়াছিল। বাদশাহ উহা দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত যখন জানিতে চাহিলেন, "উহা কি?" উত্তরে নবাব খান্-ই-আজম বলিলেন, "ইহার নাম তাম্বাকু। মক্কা মদীনার লোক ইহার সহিত খুব পরিচিত।" সম্রাট্ সমস্ত শুনিয়া একটি মুখে দিয়া ধূমপান করিতেই তাঁহার চিকিৎসক নিষেধ করেন। কিন্তু বাদশাহ বলেন, সংগ্রহকর্ত্তা আসাদ বেগের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তিনি নিশ্চয়ই অল্পস্বল্প পান করিবেন। কিন্তু দুই চার টান দিতেই হকীম সাহেব সম্রাটের অনিষ্টাশঙ্কায় অতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, এবং কিছুতেই আর অধিক পান করিতে না দিয়া নলটি তাঁহার মুখ হইতে সরাইয়া খান্ ই-আজমকে দুই তিন টান টানিতে দিলেন। তিনি তাঁহার সহযোগী দ্রব্যগুণাভিজ্ঞ হকীমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তামাকের গুণ কি?

দ্বিতীয় হকীম বলিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদিতে উহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। উহা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। তামাক-পাতা চীন দেশ হইতে আনীত এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বহুল প্রশংসিত। প্রথম হকীম বলিলেন, প্রকৃত পক্ষে এই ঔষধটি এখনও অপরীক্ষিত। চিকিৎসকগণ ইহার বিষয় কিছুই লেখেন নাই। এমন অজানা জিনিষের গুণ তাঁহারা কিরূপে সম্রাট্-সমীপে বর্ণন করিবেন? সুতরাং সম্রাটের উহা ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই কথায় আসাদ বেগ প্রথম হকীমকে বলিলেন, "য়ুরোপীয়রা এত নির্ব্বোধ নহেন যে, ইহার বিষয় কিছুই জানেন না। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞানী লোক আছেন যাঁহাদের ভুল প্রায়ই হয় না। আপনি পরীক্ষা না করিয়াই ইহার দোষ গুণ না জানিয়াই কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যাহার উপর চিকিৎসকগণ, নরপতিগণ এবং অন্যান্য মহাপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নির্ভর করিতে পারেন? কোন কিছু বিশেষ পরীক্ষার পর তাহা ভাল কি মন্দ বলাই ঠিক।"

এ কথায় প্রথম হকীম বলিলেন,-"আমরা য়ুরোপীয়-দের অনুসরণ করিতে ও আমাদের নিজেদের দেশের জ্ঞানী লোকেরা পরীক্ষা করিয়া যে-ব্যবস্থা দেন নাই, এমন আচার অবলম্বন করিতেও চাহি না।"

তখন আসাদ বেগ বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! বাবা আদমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক অভ্যাসই কোন-না-কোন সময়ে সম্পূর্ণ নূতন ভাবেই দেখা দেয়। যে-কোন প্রথাই হউক না, তাহা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়া ধীরে ধীরে কোন জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, আর তাহা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, প্রত্যেকেই তখন তাহা গ্রহণ করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ও হকীমগণের কর্ত্তব্য, দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ভাল গুণগুলি প্রথমেই প্রকাশ না পাইতে পারে। চোবচিনির শিকড় (China root) আগে কেহই জানিতেন না। ইহাও নূতন আবিষ্কার। আর ইহা যে অনেক রোগে উপকার দেয় তাহাও সেদিন মাত্র জানা গিয়াছে।"

সম্রাট্ হকীমের সহিত আসাদ বেগের যুক্তিতর্ক শুনিয়া চমৎকৃত ও তুষ্ট হইয়া খান-ই-আজমকে বলিলেন, "আসা-দের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি শুনিলেন? ঠিক কথা, আমরা অপর দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদের গৃহীত দ্রব্য আমাদের পুঁথিপত্রে লিখিত নাই বলিয়া নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করিব না, অন্যথা আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর কিরূপে হইব?"

হকীম সাহেব আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাদসাহ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মুল্লাহকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মুল্লাহ তামাকের অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন বটে, কিন্তু হকীমের মতকে কেহই ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি যে একজন সুচিকিৎসক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসাদ বেগ প্রচুর পরিমাণ তামাক ও ধূমপানের পাইপ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি কয়েকজন আমীর ওমরাহ মধ্যে বিতরণ করিলেন। অন্যান্য সকলেই পেয়ে তাহা চাহিয়া লইলেন। এইরূপে ক্রমে তামাক খাইবার প্রথা চলিয়া গেল। অতঃপর ইহার চাহিদা দেখিয়া সওদাগরগণ তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং অল্পদিনেই দেশময় বিস্তার লাভ করিল। সম্রাট্ কিন্তু ধূমপানের অভ্যাস করেন নাই।(১) ধূমপান যে লোকের স্বাস্থ্য হানি করিতে লাগিল তাহার প্রমাণ তৎকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন—তামাকের ধূম পান যখন বহু লোকের শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল, তখন আমি আমার রাজ্যে তাহার ব্যবহার বন্ধ করিতে আদেশ দিলাম। আমার ভ্রাতা পারস্যরাজ শাহ আব্বাস্‌ও তামাকের অপকারিতা জানিতে পারিয়া ইরাণেও তাহার ব্যবহার নিষেধ করিয়া আইন জারী করিলেন।(২)

(১) (২) Halat-i-Asad Beg: The Voyages and Travels of M. Caeser Fredrick, Merchant of Venice, into the East India and beyond the Indies, translated out of Italian by M. Thomas Hierooke, "and quoted by J. N. Das Gupta, Bar-at-Law, Professor of Presidency College, Cal., in his Bengal in the Sixteenth Century A. D."

মার্কিনের "এন্‌টি-সিগারেট লীগ" অথবা ম্যাঞ্চেষ্টারের "এন্‌টি-টোব্যাকো" সভার ন্যায় বর্ত্তমান জগতের বহু সভাসমিতির দ্বারাই যে তামাকের ধূমপান নিবারণ চেষ্টা চলিতেছে তাহা নহে। পূর্ব্বে য়ুরোপের রাজারাও প্রথম প্রথম বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। রোমের প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজক তামাক খাওয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও নীতি-বিগর্হিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এশিয়ার নানা দেশেও ইহার ব্যবহার রহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ১৫৮৪ অব্দে ইংলণ্ডে ধূমপান-নিবারক আইন জারী হইয়াছিল। ইহার এক শতাব্দী পরে রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ আইন করিয়া তামাকের চাষ বন্ধ করিয়া দেন। ভারতের হিন্দুসমাজও তামাক ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্কন্দ পুরাণের একটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক তাহার নিদর্শন। ‡

‡ স্কন্দপুরাণ, মথুরা খণ্ড, ৫২ অধ্যায়।

ছন্দানুশীলন

(স্বরবৃত্ত)

শ্রী হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

স্বরবৃত্ত ছন্দের লাস্যলীলা বাংলার কবিতাকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব উপভোগের সামগ্রী। বঙ্গবাণীর মধুময়ী বীণা সর্ব্ব-প্রথমে বেজে উঠেছিল ঐ ছন্দে। প্রাচীন ছড়া সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তার ঝঙ্কার বাংলার ঘরে ঘরে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে। ফলতঃ স্বরবৃত্তই হচ্ছে বাংলার প্রকৃতিগত ছন্দ। উভয়ের নাড়ী-নক্ষত্রে আশ্চর্য্য রকমের মিল; যাকে বলে রাজ-যোটক।

১৩২৯ সালের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় স্বরবৃত্ত ছন্দ বিষয়ে* কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এর আগে ঐ ছন্দের প্রকৃতি ও গঠন বিষয়ে এতখানি সূক্ষ্ম আলোচনা আর কেউ করেছেন ব'লে মনে হয় না। 'স্বরবৃত্ত' নামটিও তাঁরই দেওয়া। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে যাঁরা ভালরকম জান্‌তে ইচ্ছা করেন, তাঁদের ঐ প্রবন্ধগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

স্বরবৃত্ত ছন্দের foot বা পাদগুলিতে স্বরান্তবর্ণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে। যেমন—দ্বিস্বরপাদ, ত্রিস্বরপাদ, চতুঃস্বরপাদ, পঞ্চস্বরপাদ ইত্যাদি। প্রতিপাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বরান্তবর্ণের ভিতরে বিভিন্ন ভাবে ব্যঞ্জনান্ত বর্ণের

* বাংলা ছন্দ—পৌষ, স্বরবৃত্ত ছন্দ—মাঘ, স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব—ফাল্গুন, ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ—চৈত্র।

সমাবেশ দ্বারা ঐ ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বরান্তবর্ণবিশিষ্ট একটি footএ কত রকম ধ্বনির উদ্ভব হ'তে পারে, অনুশীলন ছাড়া তা বুঝবার উপায় নেই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ত্রিস্বর, চতুঃস্বর এবং পঞ্চস্বরের footগুলি থেকে যত রকম ধ্বনির উদ্ভব হ'তে পারে, অনুশীলন দ্বারা তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। আঁক ক'সে এর সংখ্যা নির্ণয় করা যায় কি না তা ঠিক বলতে পারি না; তবে আমার এ অনুশীলনের ফলে এর একটা ধারা ধরা প'ড়ে গেছে। যেমন—দ্বিস্বরপাদে চারটি, ত্রিস্বর পাদে আটটি, চতুস্বরপাদে ষোলটি, পঞ্চস্বর পাদে বত্রিশটি। অর্থাৎ আগেরটিতে যত পরেরটিতে তার দ্বিগুণ হবে

বিভিন্ন কবির রচনা খুঁজে এতগুলি ছন্দের উদাহরণ সংগ্রহ করা সহজ নয়, বিশেষতঃ সবগুলি ধ্বনির উদাহরণ না পাওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। তাই উদাহরণগুলি আমি নিজেই রচনা ক'রে দিলুম। প্রত্যেক ধ্বনির জন্য আট লাইনে একটি ক'রে কবিতা রচনা করেছি। এর ভিতর আরবী ছন্দ-সূত্রের প্রায় সবগুলি foot ধরা পড়েছে। ইংরেজী ছন্দের footগুলিও বাদ যায়নি। তা ছাড়া সংস্কৃত স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট কয়েকটি ছন্দের ধ্বনি এর ভিতর পাওয়া যাবে। সামঞ্জস্যগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করব। আরবী ছন্দ বিষয়ে ১৩৩১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত গোলাম-মোস্তফা সাহেবের লিখিত 'আরবী ছন্দের বাংলা তর্জ্জমা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি।

উদাহরণগুলিতে যুক্তবর্ণের মাথারটিকে ব্যঞ্জনান্ত ধ'রে বাকিটা স্বরান্ত গণ্য করা হয়েছে, যেমন—ঝঞ্ঝা = ঝঞ্‌ঝা, সন্তাপ = সন্‌তাপ, সন্ধ্যা = স্বন্‌ধ্যা ইত্যাদি। ফলতঃ বাংলার উচ্চারণ-রীতিও ঐরূপ। যুক্তস্বর অর্থাৎ জোড়া স্বরের বেলায় আগেরটি স্বরান্ত এবং পরেরটি ব্যঞ্জনান্ত গণ্য করা হয়েছে। যেমন খাই = আই, লও = অও, বউ = বৌ = অউ, কই = কৈ = অই, ইত্যাদি। এবিষয়ে প্রবোধ-বাবু তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

উদাহরণগুলির মাত্রালিপিতে নিম্নলিখিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে—

• = স্বরান্ত বর্ণ।
— = ব্যঞ্জনান্ত বর্ণ।
+ = গুরু।
। = লঘু।

বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দগুলিতে উল্লিখিত চিহ্ন অনুসারে গুরু লঘু ভেদ করা হয়েছে, কিন্তু আরবী ছন্দ-সূত্রের গুরু অক্ষরগুলির মাথাতে মোস্তাফা সাহেব (১) দণ্ড-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আমিও তাঁরই অনুসরণ করেছি।

ত্রিস্বরপাদ
(ধ্বনির সংখ্যা ৮)
মাত্রালিপি*

১। + + + / •— •— •—
২। + + । / •— •— •
৩। + । + / •— • •—
৪। + । । / •— • •
৫। । + + / • •— •—
৬। । + । / • •— •
৭। । । + / • • •—
৮। । । । / • • •

(১)
+ + +
•— •— •—

বাজ্‌ মন্‌ বীণ
সঙ্কোচ-হীন।
ধর্‌ সুর তান,
গুঞ্জন গান।
ছন্দের নাচ্‌
অন্তর মাঝ
হোক রাত দিন;
রিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌।

আরবী ছন্দসূত্র—মফ্‌উলুন।
সংস্কৃত—ত্র্যক্ষরাবৃত্তি—মধ্যা নারী।

+ + +
গো পা নাং
নারী স্ত্রিঃ।
স্নিষ্টোঽবাৎ
কৃষ্ণো বঃ।

* গুরু লঘু ভেদে ধ্বনির পার্থক্য দেখাবার জন্য এ মাত্রা-লিপিটি দেওয়া গেল।

(২)

\+ + ।

• —• • —•

মার্ ডঙ্ কা,
যা'ক শঙ্ কা!
হোক চাঙ্গা,
বুক ভাঙ্গা!
হও দীপ্ত,
হও ক্ষিপ্ত!
কোন্ চিন্তা?
ধিন্ ধিন্ তা!

(৩)

\+ । +

•—• •—

বাদল দিন,
শ্রান্তি-হীন—
বর্ষাপাত্,
ঝঞ্ঝা-বাত্।
অম্বরের
দম্ভ ঢের।
বিজ্‌লী ধায়
গঞ্জনায়।

আরবী ছন্দ-সূত্র—ফাএলুন।

সংস্কৃত—স্রগ্বী

\+ । +

সা স্র গ্বী
লোচনা
রাধিকা
শ্রীপতে।

(৪)

\+ । ।

•— • •

চুলবুলি
বুলবুলি
সঞ্চরে
পিঞ্জরে।
চন্দনা
বন্দনা—
গান করে,
প্রাণ ভ'রে।

আরবী ছন্দ-সূত্র—ফাএলাত

ইংরেজী—Dactyl.

(৫)

। + +

• •— • —

মধুর রাত,
বঁধুর সাথ
মিলন-হীন,
শয়ন-লীন।
কুসুম-হার
বিষম ভার।
বাসর-সাজ
বিফল আজ।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফাঈল

সংস্কৃত—সোমরাজী

। + +

হ-রে-সো-
মরাজী
সমাতে
যশঃশ্রী।

(৬)

। + ।

• •—•

শীতান্তে
বসন্তে
ফুলন্ত
বনান্ত।
সানন্দ,
সুছন্দ,
সুরঙ্গ,
বিহঙ্গ।

ইংরেজী—amphibrach.

(৭)

। । +

• • •—

উদাসীন,
সারাদিন
নাচে গায়
আঙিনায়।
ভাবে ভোর,
বহে লোর,
যারে পা'য়
ধরে পায়।

ইংরেজী—anapaest.

(৮)

। । ।

• • •

বাঁশরী
পাসরি
বাজিল
আজিলো।
বধূরা
মধুরা,
সাজিল,
রাজিল।

ইংরেজী—Fribrach.

চতুঃস্বরপাদ
(ধ্বনির সংখ্যা ১৬)
মাত্রা-লিপি

+ + + +
১। •—•—•—•—
+ + + ।
২। • —•— •— •
+ । + +
৩। •—• •— •—
+ । + ।
৪। •—• • — •
+ । । +
৫। •— • • • —
+ । । ।
৬। •—• •—•
+ + । +
৭ •—• •—•
+ + । ।
৮। •— •—• •
। + + +
৯। • •—• —•—
১০। । + + ।
• •—•— •
। + । +
১১। • • —• •—
। + । ।
১২। • —• •—•
। । + +
১৩। • • •—•—
। । + ।
১৪। • • •—•
। । । +
১৫। • • • •—
। । । ।
১৬। • • • •

(১)

+ + + +

•—•—•—•

দিন যায় ভিন্ গাঁয়,
রাত যায় চিন্তায়।
তিন দিন তিন রাত
লঙ্ঘন নির্ঘাৎ।
মাগ্‌গির ধাক্কায়
ঢের লোক শাক খায়।
বাংলার ধান চা'ল
একদম্ বানচাল্
আরবী ছন্দ-সূত্র—মফ্ উলাতুন।
সংস্কৃত—চতুষ্কাক্ষরাবৃত্তি—প্রতিষ্ঠা

+ + + +
ভাস্বৎ কন্যা
সৈকা ধন্যা।
যস্যা কূলে
কৃষ্ণোঽ খেলৎ॥

(২)

+ + + ।
• —•—•—•
সেক্‌রার স্বর্ণ
কোন্ ছার বর্ণ।
চম্পক চম্‌কে
বর্ণের জম্‌কে।
দ্যাখ্ তার অঙ্গে
ভায় এক সঙ্গে—
বিজ্‌লীর ঝিল্‌কি,
জ্যোস্‌নার ফিন্‌কি।

(৩)

+ । + +
•—• •—•—
আম্‌রা ভদ্দর
পর্‌বো খদ্দর।
হোক্ না গোদ্দর,
হোক্ না খুব দর।
লজ্জা ঢাক্‌বার,
আব্‌রু রাখ্‌বার
জন্য, চর্‌কার
পণ্য দর্‌কার।

আরবী ছন্দ-সূত্র—ফাএলাতুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে আরবী রমল ছন্দ।

(৪)

+ । + ।
•—• •—•
সিন্ধু গর্জ্জে,
ঝঞ্ঝা তর্জ্জে।
উর্ম্মি ক্ষিপ্ত
নৃত্যে লিপ্ত।
যাত্রী-পূর্ণ
নৌকা চূর্ণ।
কর্‌ছে ধ্বংস
কোন্ নৃশংস?
সংস্কৃত—সমানিকা
+ । + ।
যস্য কৃষ্ণ
পাদপদ্ম।
নাস্তি হৃত্ত—
ভাগ সদ্ম॥
ইংরেজী—Trochee

(৫)

\+ । । +

•—• • •—

অন্ধকারের
বন্ধ দ্বারের
ভাঙ্‌ল আগল,
কোন্ সে পাগল ?
বর্ণ-ছটায়
বিশ্বে ঘটায়---
রক্ত রঙীন্
দৃশ্য নবীন।

আরবী ছন্দ-সূত্র---মফতাআলুন

(৫-ক)

পাখীর ডাকের অনুকরণ

\+ । । +

•— • •

বউ কথা কও
বউ কথা কও
হাঁক্‌লো যখন,
ভাঙ্‌ল স্বপন।
অর্দ্ধ নিশায়
ঘুম ভেঙে হায়,
বন্ধু কখন
কর্‌লে গমন ?

(৬)

\+ । । ।

•—• • •

চন্দ্র তারা
তন্দ্রা-হারা
যাচ্ছে ছুটে
অভ্র টুটে।
জ্যোস্না-ডোবা
বিশ্ব-শোভা।
মন না চলে
নিদ্-মহলে।

আরবী ছন্দ-সূত্র---ফএলির্যা।

(৭)

\+ + । +

•—•—• •—

কোন্ দূর দেশের
প্রান্তর শেষের
সন্তাপ-হরণ
অন্ধের শরণ---
বন্ধুর চরণ
কর্‌লেম বরণ ?
কর্‌বেন তরণ
বন্ধুর সরণ।

আরবী-ছন্দ সূত্র---মস্‌তাফ আলুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে আরবী রজ্‌য ছন্দ।

(৮)

\+ + । ।

• • • •

রামদীন দোবে
সন্ধ্যায় শোবে।
ডাণ্ডার ভারে
হাঁট্‌তেই নারে।
পট্‌কার চোটে
আঁৎকেই উঠে !
রোজ খায় রুটি
পঞ্চাশ গুটি।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মস্‌তাফ এলা।

(৯)

। + + +

• •— •— • —

ভূষণ সিঞ্জন,
অসির ঝন্ ঝন্,
বীণার ঝঙ্কার,
ধনুর টঙ্কার,
পাতার মর্ম্মর,
রথের ঘঘর,
জড়ের সঙ্গীত—
সুরের ইঙ্গিত।

আর্‌বী ছন্দ-সূত্র---মফাইল্‌ন।

(১০)

। + + ।

• • —•—•

জাগুক্ চিত্ত ;
করুক নৃত্য
তাহার ছন্দে,
তাহার গন্ধে।
হউক্ ধন্য,
হউক্ গণ্য,
টুটুক্ ধন্ধ,
টুটুক্ সন্দ।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফাঈলুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে আরবী হজ্‌য ছন্দ।

(১১

। + + ।

• •—• • —

অধম-তারণ,
পতিত-পাবন,
জনম মরণ
ভরণ কারণ,
বিপদ-বারণ,
ভুবন-ভাবন,
তোমার চরণ
আমার শরণ।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফাআলুন এই সূত্রটি চৌপদীতে আরবী হজ্জ ছন্দ।

ইংরেজী—Iambus.

সংস্কৃত—চৌপদীতে পঞ্চচামর ছন্দ।

।+।+ ।+।+ ।+।+ ।+।+

সুরদ্রুমৃ। লমণ্ডপে। বিচিত্ররে। ত্ন নির্ম্মিতে।
লসদ্বিতা। নভূষিতে। সলীলবি। ভ্রমালসম্।

(১২)

। +　। ।

'রিনিক্ ঝিনি'
'রিণিক্ ঝিনি'—
মধুর রাতে
বধুর হাতে
বাসর-তলে
কাঁকণ বলে—
'আসুন তিনি'
'আসুন তিনি'।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফাএলা।

(১৩)

। । +　+

সারা দিন্ মান্
গাহে গীত্ গান।
সদা মস্‌গুল,
হাতে বুল্ বুল্।
হাসে ফিক্ ফিক্,
চাহে চা'রদিক্।
ফিরে ঘাট বাট,
পাগলের ঠাট্।

(১৪)

। । + ।

চাহি সিন্ধু,
নাহি বিন্দু!
হৃদি রিক্ত,
বিধি তিক্ত।
হত-বিত্ত,
ক্ষত-চিত্ত।
আছে মাত্র
সুরাপাত্র।

(১৫)

। । । +

বাঁশরী হায়
পাসরি বায়—"
অবলা-কুল
হবে আকুল।
নিশীথ রাত্,
ডাকিল নাথ।
রহে না মন,
যাইব বন!

সংস্কৃত—সতীছন্দ,

। । । +

ম ধু রি পো
তব পদম্।
নমতি সা
নমুসতী॥

(১৬)

। । । ।

ধীরে ধীরে
তীরে তীরে
চলে গেলো।
ব'লে গেলো—
চিরতরে
ফির' ঘরে।
আঁখিনীরে
রাখিনি রে!

ইংরেজী—Pyrrhic.

পঞ্চস্বরপাদ
(ধ্বনির সংখ্যা ৩২)
মাত্রালিপি

(১) + + + + +
(২) + + + + +
(৩) + + +　। +
(৪) + + +　। ।
(৫) + +　। । +
(৬) + +　। । ।
(৭) + +　। +　+
(৮) + +　। +　।
(৯) +　। + + +
(১০) +　। + + +
(১১) +　। +　। +

(১২) + | + | |
∘— ∘ ∘— ∘ ∘

(১৩) + | |• + +
∘— ∘ ∘ ∘ — ∘—

(১৪) + | | + |
∘ — ∘ ∘ ∘—∘

(১৫) + | | | +
∘— ∘ ∘ ∘ ∘—

(১৬) + | | | |
∘—∘ ∘ ∘ ∘

(১৭) | + | + +
∘ ∘— ∘ ∘— ∘—

(১৮) | + | + |
∘ ∘—∘ ∘—∘

(১৯) | + + + +
∘ ∘— ∘— ∘— ∘ +

(২০) | + + + |
∘ ∘— ∘— ∘— ∘

(২১) | + + | +
∘ ∘—∘— ∘ ∘—

(২২) | + + | |
∘ ∘— ∘—∘ ∘

(২৩) | + | | +
∘ ∘— ∘ ∘ ∘—

(২৪) | + | | |
∘ ∘— ∘ ∘ ∘

(২৫) | | + + +
∘ ∘ ∘— ∘— ∘—

(২৬) | | + + |
∘ ∘ ∘— ∘— ∘

(২৭) | | + | +
∘ ∘ ∘— ∘ ∘—

(২৮) | | + | |
∘ ∘ ∘— ∘ ∘

(২৯) | | | + +
∘ ∘ ∘ ∘— ∘—

(৩০) | | | + |
∘ ∘ ∘ ∘— ∘

(৩১) | | | | +
∘ ∘ ∘ ∘ ∘—

(৩২) | | | | |
∘ ∘ ∘ ∘ ∘

(১)

+ + + + +
• ∘ • • •

ঝর্ ঝর্ নিঝর পাত,,
বিশ্রাম-হীন্ দিন্ রাত।

উন্মদ হর্ষের রোল—
অম্বর ময় সোর্গোল।
শৈলের বক্ষুর তল
উচ্ছল জল্ ছল্ ছল্!
কোন্ দূর্ সিন্ধুর গায়
স্বর্গের সন্ধান পায়?

আরবী ছন্দ-সূত্র—ফালাতুন+ফার্লা।

(২)

+ + + + |
•— ∘— ∘— •— •

গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জে
ভোম্‌রার ভিড় কুঞ্জে।
বুল্ বুল্ কুল্ বন্দে
মস্‌গুল সুর ছন্দে।
মুক্তার ঝাড় সৃষ্টি
উৎসের জল মিষ্টি।
অন্তরময় দৈন্য,
বক্ষুর ভেট্ জন্য!

আরবী ছন্দসূত্র—ফালাতুন+ফালুন।

(৩)

+ + + | +
∘ ∘ ∘ ∘ •

চল চল্ জলকে চল্
দিন্ ভর্ কাঁদ্‌বি বল?
ঘর্ ধর এ'ম্ন হাল—
মিন্সের ভেঙ্‌চি গাল
রোজ রোজ খাচ্ছি মার
কান্নার ধার্ চ ধার?
যার ভাত, যার কাপড়,
সার্থক তার চাপড়।

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফ্‌উলুন—ফাএলাত।

(৪)

+ + + | +
•— •— •— • •—

দ্যাখ দূর্ প্রান্তরে
অম্বর সান্তরে!
রঙ্গীন্ মেঘগুলি
তস্‌বীর্ দ্যায় খুলি!
সন্ধ্যার অঞ্চলে
বিলকুল রংঝলে!
সূর্য্যের সাত তুলি
ঝাড় লেন হাত তু'লি!

আরবী ছন্দ-সূত্র—মফ্‌উল—ফাএলাত।

(৫)

+ + + | +
• —• —• —• •

দিন রাত জাগরণ,
উদ্বেগ আমরণ!

শান্তির নাহি লেশ,
চিন্তার নাহি শেষ।
যুদ্ধের দরজায়
উৎপাত গরজায়!
আপ্‌নার যারা মোর
তন্দ্রায় তারা ভোর্‌!

(৬)

+ + । । ।
•— •—• • ◦

বর্ষায় বধূরা
চঞ্চল, মধুরা।
বিজলীর ঝিলিকে
অম্বর কি লিখে?
ঝিল্লির সেতারে
ঝঙ্কার বেতারে!
দর্দ্দুর আলাপী,
উন্মদ কলাপী!

(৭)

+ + । + +
•— •— • •— •—

গান্ধীর বচন ধর্‌,
খদ্দর বয়ন্‌ কর্‌।
মাঞ্চেষ্টারের মিল্‌
দর্‌জায় লাগা'ক খিল
চর্‌কার যশের গান
বিশ্বের ফাটাক্‌ কান।
ঘর্‌ ঘর্‌ বসুক্‌ তাঁত,
মিল্‌বেই কাপড় ভাত।

আরবী ছন্দ-সূত্র—ফ'লুন+ফউলুন।

(৮)

+ + । + ।
•— •— • •—•

কাল্‌ চল্‌ছি পাব না,
তাই হচ্ছে ভাবনা।
মন চায় না চল্‌তে,
পাই লজ্জা বল্‌তে।
ঘর ছাড়্‌তে কষ্ট,
তাই হচ্ছি নষ্ট।
দূর্‌ হোক্‌গে ভাব্‌না,
নয় মর্‌বো পাব্‌না!

(৯)

+ । + + +
•—• • — •— •—

কঙ্কনের কন্‌ কন্‌,
আস্‌রাফির্‌ ঝন্‌ ঝন্‌,
চলছে শোন্‌ দিন রাত;
দুর্নিবার উৎপাৎ!
থাক্‌রে তুই থাক ঠিক্‌,
নির্ব্বিকার নির্ভীক!
বিশ্বজয় কোন্‌ ছার্‌?
আত্মজয় দর্‌কার!

(১০)

+ । + + ।
•— • •— • —•

অন্ধকার রাত্রি,
সঙ্গীহীন যাত্রী;
প্রান্তরের প্রান্তে—
পন্থা চায় জান্‌তে।
কণ্ঠ তার ক্লিন্ন,
ক্লান্ত পদ ছিন্ন।
যাত্রা তার পূর্ণ
কর্‌বে কাল তূর্ণ!

(১১)

+ । + । +
•—• • —• •—

অন্ধ খঞ্জ দীন,
আত্মরক্ষা-হীন।
বিত্ত বন্ধু নাই,
কিন্তু অন্ন চাই।
বিশ্ব নিঃস্ব ন'ন্‌,
ভিক্ষালব্ধ ধন—
নিত্য নিত্য পায়;
তুষ্ট পুষ্ট তায়!

(১২)

+ । + । ।
•— • •— • •

আজ্‌কে উন্মনা,
গান যে শুন্‌ব না।
তন্ত্রী ঝন্‌ ঝনা,
কর্ণে গঞ্জনা!
বন্ধ কর্‌ বীণা
বন্ধ কর্‌বি না?

(১৩

+ । । + +
•—• • •— •

আজ্‌ সখি ফুল্‌ দোল
ভুল ভেঙে ফুল তোল্‌।
নীপ তমালের তল
হোক্‌ ফুলে উজ্জ্বল।
দোলনাটি বাঁধ্‌বার
এক্ষুনি দর্‌কার।
ঐ বাজে শোন্‌ সুর,
বংশীতে কোন্‌ সুর?

সংস্কৃত—সুপ্রতিষ্ঠা—

+ । । + | + । । + +

কৃ ষ্ণ স না থা | ত র্ণ ক প ঙ ক্তিঃ।

যামুন কচ্ছে | চারু চচার॥

(১৪)

\+ । ! ×

০—০ ০ ০— ০

যায় কারা জলকে
রূপ ঝরে ঝ'লকে,
গাল-ভরা হাস্য
চাঁদ পানা আস্য,
চা'র দিকে দৃষ্টি
মল বাজে মিষ্টি,
কোন্ ঘাটে সদ্য
ফুটবে লো পদ্ম?
আরবী ছন্দসূত্র—ফাএলুন+ফা'লুন।

(১৫)

\+ । । । +

০— ০ ০০ ০—

(পাখীর ডাকের অনুকরণ)

একটি খোকা হোক্,
কাঁথটি যোঁকা হোক্।
থা'ক্ সে বেঁচে থা'ক্,
রিষ্টি কেটে যা'ক্।
হলদে পাখী গায়,
বন্ধ্যা ফিরে চায়।
চিত্তে বহে তার
চিন্তা শত-ধার।

(১৬)

\+ । । । ।

০—০ ০ ০ ০

পাল তুলে দিলো,
হা'ল খুলে নিলো।
ধায় তরীখানা,
হায় করি মানা!
প্রাণ কেড়ে নিয়ে,
যা'ন্ ছেড়ে দিয়ে!
ধাই নদী তীরে,
পাই যদি ফিরে!

(১৭)

। + । + +

০ ০—০ ০—০—

সকাল দুপুর সাঁঝ,
বিরাম-বিহীন কায।
প্রভুর মেজাজ খান্,
বেধের হাতের বাণ।
ভূতের বেগার সার,
বেতন—ধমক্ মা'র্!
গরীব লোকের ঠিক্
জীবন ধারণ ধিক্।

(১৮)

। + । + ।

০ ০—০ ০—০

প্রশান্ত সিন্ধু—
সীমান্তে, ইন্দু
স্নানান্তে, হাস্য—
প্রদীপ্ত আস্য!
নীলাম্বু বর্ণ
বিমিশ্র স্বর্ণ!
অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
অতৃপ্ত দৃষ্টি!

(১৯)

। + + + +

০ ০—০—০—০—

ভারত মা'র সন্তান
সবাই হও একপ্রাণ!
মায়ের ঘোর দুর্দ্দিন;
জীবন্তেই প্রাণ-হীন্!
অসুরদের উৎপাৎ
কসুর নাই দিন রাত!
জাগুক্ ত্রিংশৎ ক্রোর,
দুখের রাত হোক ভোর!
আরবী ছন্দসূত্রে—ফউলুন+ফ'লুন।

(২০)

। + + + ।

০ ০—০—০—০

মুসলমান হিন্দু
তফাৎ নয় বিন্দু।
খোদার দুই বাচ্ছা,
নিতান্তই সাঁচ্চা।
দোঁহার এক পন্থা,
কোরান্ বেদ্ ক'ন্তা।
ঘুচাও ভেদ-ভ্রান্তি,
দেশের হোক শান্তি।

(২১)

। + + । +

০ ০—০—০ ০—

অসীম সিন্ধু আজ
সসীম—বিন্দু মাঝ!
গগন অন্তহীন—
অদূর সান্তে লীন!
মরণ—মৃত্যু হর,
সজীব—শুষ্ক জড়!
অলখ দৃশ্যমান্;
পীযূষ-পূর্ণ প্রাণ!
আরবী ছন্দসূত্র—ফ'উলুন+ফ'উল।

(২২)

। + + । ।
০ ০ — ০ — ০ ০

মধুর ফাল্গুনে,
মধুর কাল্ গুণে ;
কানন মুঞ্জরে,
ভ্রমর গুঞ্জরে।
পাখীর গীত্ গানে
আঁখির নিদ্ আনে।
সমীর-হিল্লোলে
দোদুল্ দিস্ দোলে।

(২৩)

। + । । +
০ ০ — ০ ● ০ —

নয়ন চল-চল্,
বয়ন শতদল।
মধুর তনু তার,
অধর-সুধাধার।
চরণ কোকনদ,
আঙুল-চাঁপাবৎ।
কমল দেহখান,
কঠিন কেন প্রাণ ?

আরবী ছন্দসূত্র—মফা আলাতুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে ওয়াফের ছন্দ।

(২৪)

। + । । ।
০ ০ — ০ ০ ০

নবীন বরষা —
ভুবন-ভরসা।
নিদাঘ নিহতা,
নীরস্ শ্রীহতা,
ধূসর্ ধরণী—
শ্যামল বরণী।
সুজল সরসী,
পুলিন পরশি'।

(২৫)

। । + + +
০ ০ ০ — ০ — ০

ছিঁড়ে ফেল বন্ধন,
কে কাহার নন্দন ?
হলো পায় পঙ্কাশ,
মিছে আর ধন্ চাস্।
পরকাল চিন্তার
ভেবে দেখ্ দিন পার্।
ক'রে ফেল্ সম্বল—
লোটা আর কম্বল।

(২৬)

। । + + ।
০ ০ ● ০ — ০ — ০

খোকা মোর লক্ষ্মী
পিঁজরের পক্ষী।
বুলি তার মিষ্টি—
মাধুরীর বৃষ্টি।
নাহি চায় ঢাক্না,
খুলে যায় পাখ্না।
যেতে চায় শূন্যে,
রাখি কোন্ পুণ্যে ?

(২৭)

। । + । +
● ০ ০ — ০ ০ —

সে যে বন্ধু মোর,
মম চিত্ত-চোর।
প্রাণে দেখ্তে পাই,
আঁখি মেল্তে—নাই।
আছে ক্লান্তিহীন—
কাছে রাত্রি দিন।
হরে বিঘ্ন-ভার,
আমি নিম্ন তার।

আরবী ছন্দসূত্র—মতাফাআলুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে কামেল ছন্দ।

সংস্কৃত—প্রিয়া—
ভ্রজ সু ভ্রুবো
বিলসৎ কলাঃ।
অভবন্ প্রিয়া
মুর বৈরিণঃ॥

(২৮)

। । + । ।
● ● ০ — ● ০

আজি দিন-শেষে
সাজি' দীন বেশে,
এলো কোন্ জনা,
গেলো উন্মনা ?
আঁখি-নীর বহে,
চাকি স্থির রহে।
মুখে নাই বাণী
সুখে নাই জানি।

আরবী ছন্দসূত্র—মতাকা আলুন। এই সূত্রটি চৌপদীতে কামেল ছন্দ।

(২৯)

। । । + +
● ● ● ● — ● —

আঁখিতে অঞ্জন
ক'রে দে রঞ্জন।
ললাটে চন্দন,
কবরী বন্ধন।
বিবিধ সজ্জায়
ঢেকে দে লজ্জায়।
এনে দে মঞ্জুল—
মালতী বঞ্জুল।

(৩০)

। । । + ।
০ ০ ০ ০—০

মাধবী-কুঞ্জে
মধুপ গুঞ্জে;
কুসুম-গন্ধে,
বিবিধ ছন্দে।
আশাতে চিত্ত
করিছে নৃত্য;
আসিবে শ্রান্ত—
পিপাসু পান্থ।

(৩১)

। । । । +
০ ০ ০ ০ ০

ধীরে ধীরে আয়,
ফিরে ফিরে চায়।
মুখে মৃদু গান,
চোকে হানে বান।
নাহি জানি ঠিক,
কি ধারা পথিক।
ভাবি মনোচোর,
আবরিনু দোর।

সংস্কৃত— ত্বরিৎগতি—

। । । । + । । । । +

ত্বরিত গতি। ব্রজ যুবতী।
স্মরনী সুতা। বিপিন গতা।

(৩২)

। । । । ।
● ০ ০ ● ০

জীবনে যারে
দেখিনি, তারে
চিনিবো কিসে,
পাবো কি দিশে?
মুরলী ডাকে,
কি জানি কাকে!
সহিতে নারি,
রহিতে নারি!

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

তেইশ

এতোগুলি লোকের প্রাণপণ চেষ্টা-যত্নেও মতি-বাবুর ছোট শিশুটিকে মায়ের কোলে ধ'রে রাখা গেল না। ছেলেটি সমস্ত দিন বড্ড বেশী ছটফট ক'রে কেবলই একটি কাতর শব্দ করছিল। আজ সকাল থেকে মার স্তন আর সে কিছুতেই মুখে নিতে পারলে না; রমার বুক গুড়গুড় ক'রে কেঁপে উঠল। প্রতিবাসিনী যাঁরা সময়-মত উঁকি মেরে খবর নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর অভয় দিচ্ছিলেন—"ছেলে যখন মাই টেনে খাচ্ছে তখন ষেটের বাছা। ষষ্ঠীর দাসের কোনো ভয় নেই। তাঁরাও আজ মুখ কালো ক'রে রইলেন। খোকা এমন কাতরভাবে তার মায়ের মুখের দিকে চাইছিল যে, দেখ্‌লে পাষাণেরও প্রাণ ফেটে চোখ দিয়ে ঝরণা বইতে চায়, তা মার ত কথাই নেই। সেবা তার জীবনে এ দৃশ্য কখনও দেখেনি। সে বড্ড বেশী অধীর হ'য়ে পড়লেও পাছে রমার কষ্ট হয় সেজন্যে ভিতরের ভাব চেপে রেখে বাইরে চটপট্‌ ক'রে সব কাজ ক'রে যাচ্ছিল। প্রিয় আজ দু তিনবার তার গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের ফাঁকে এসে খোকাকে দেখে গেছে।

সমস্তদিন সেবা আর রমা খোকাকে কোল বদল ক'রে নিয়ে শান্ত রাখবার চেষ্টা করেছিল; সন্ধ্যার পর বাইরের কাজ সাঙ্গ ক'রে মতি-বাবু এসে খোকাকে কোলে নিয়ে

ব'সে স্ত্রীকে বল্‌লেন—"সারাদিন উঠে তুমিও মুখে জল দাওনি, সইকেও দেওয়াওনি। এখন আমি একটু খোকাকে নিয়ে বসছি তোমরা দু'জনে কিছু খেয়ে এসো সাম্‌নে সমস্ত রাত প'ড়ে রয়েছে।"

নিজের জন্যে না হোক, সেবা উপবাসী রয়েছে সে-কথা স্মরণ ক'রে রমা উঠে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই সময় খোকার আর্ত্তস্বর হঠাৎ একেবারে মিলিয়ে যাওয়াতে মতি-বাবু খোকার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"খোকা কি ঘুমিয়ে প'ড়ল?" রমা তখুনি নত হ'য়ে খোকার মুখের ওপর চোখ রেখে ব'লে উঠল,—"একি, খোকা ঘুমুচ্ছে না আর কিছু, খোকা, খোকা, যাদু আমার, সোনা আমার।" রমার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ওঘর থেকে শুনতে পেয়ে প্রবাল ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে খোকাকে পরীক্ষা ক'রে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তেই মতি-বাবু চম্‌কে উঠলেন—উন্মাদ-কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"সত্যিই কি আমার খোকা পালিয়ে গেল, প্রবাল-বাবু?" রমা আর্ত্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সেবা নিজেই তখন থরথর ক'রে কাঁপছে, তা রমাকে রক্ষা করবে কি? মতি-বাবু দুই হাতে নিজের কপাল চাপড়ে এমন ভাবে ব'লে উঠলেন,—"খোকা, খোকা আমার, যাস্‌নে বাপ যাস্‌নে" যে, প্রবালও থতমত খেয়ে গেল। ও ঘরে একটি ছেলে মুমূর্ষু, সে এখন তাকে দেখে, না, এই শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দেয়? চট ক'রে উঠে প'ড়ে সে তখুনি কেদার ও প্রিয়কে ডাকৃতে পাঠিয়ে দিল।

মেয়েরাও অনেকে এসময় এসে রমার চারিদিকে ব'সে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পুরুষরা এসে মতি-বাবুকে জোর ক'রে বাইরে নিয়ে গেলেন। প্রিয় এসেছিল বটে; কিন্তু রমার মুখের দিকে চেয়ে সে নিজেই এমন কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠল যে, প্রবাল তখনই জয়াকে দিয়ে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলে।

নন্দার পিসীও এসেছিলেন; তিনি রমার গায়ে মাথায় হাত বুলতে বুলতে বল্‌লেন—"অত অধৈর্য্য হ'য়ে কি করবে বউ? তোমার আরও পাঁচটি আছে তাদের মুখ দেখে তুমি এখন শান্ত হও। নেহাৎ ছোটটি সে গেছে, তার জন্যে এত শোক কিসের? লোকের যে জোয়ান জোয়ান ছেলে মেয়ে চ'লে যায়, বোন্!" ক্রন্দন-বিহ্বল কণ্ঠে রমা বল্‌লে—"ছেলের আর জোয়ান কচি কি, দিদি? ঘরে আজ সবাই থাকলেও এক খোকা বিহনে আমার যেন সব শূন্য মনে হচ্ছে। সে গেল গেল, অত যন্ত্রণা পেয়ে গেল কেন? তার কাতর চোখ দুটির চাউনী বুকে যে আমার হাজার ছুরী ব'সিয়ে গেছে গো, সে ব্যথা আমি ভুলি কি ক'রে?"

সেবা একপাশে ব'সে দুটি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হ'য়ে শুধু ভাব্‌ছিল—"এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে আমাদের চোখের সাম্‌নে এত প্রত্যক্ষ হ'য়ে ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কোথায় অন্তর্ধান হ'ল? এই মৃত্যু,—চোখের ওপর এত সুস্পষ্ট,—নরনারীর ওপর এত এর প্রভাব! অথচ এর আদি অন্ত কী অপরূপ রহস্যে পরিপূর্ণ! যে প্রিয়জন এত কাছে, এত আপনার, এক লহমার মধ্যে জগতে আর তার কোনো চিহ্ন নেই।" কয়েক দিন ধ'রে দিন-রাত সেবা ক'রে খোকার ওপোর সেবার একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। সেবা বড় আশা ক'রে ছিল, প্রাণপণ সেবা যত্নে খোকাটিকে আরাম ক'রে তুলে রমার ক্লান্তমুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে। সে আশা তার পূর্ণ হ'ল না, রমার বুক-ফাটা কান্না দেখে সে আরও যেন কান্নায় ভ'রে উঠছিল।

রাত্রি গভীর হ'লে প্রতিবাসিনীরা অগত্যা একে একে বিদায় নিলেন। প্রথম শোকের রাত্রি যে কী ভীষণ তা তার ভয়ানক রূপের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তারাই জানে। কেদারের ও পাড়ার আর-একটি ছেলের ওপর মতি-বাবুর আর পীড়িত ছেলেটির ভার দিয়ে প্রবাল নিজে সমস্ত রাত্রি পুত্রহারা মার প্রহরী হ'য়ে জেগে রইল, মার কান্নায় আকুল অন্য ছেলেদের, ঊষার সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, মতি-বাবু বাইরের ঘরে বড় বেশী কাতর হ'য়ে যা তা এলো মেলো বকছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকেও শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। এই রকম ক'রে সে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল, প্রবাল তখন রমার কাছে এসে স্নেহমাখা কণ্ঠে বল্‌লে—"দিদি—আমাকে আপনার ছোট ভাই ব'লেই জানবেন। এখন আপনাকে একটু শক্ত হ'তে হবে। যা হবার সে ত হ'য়ে গেল। আর-একটি খোকার আপনার কঠিন অসুখ আছে, তাকে ত সাধ্যমত সেবা-শুশ্রূষা ক'রে

বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে। আপনার অন্য ছেলে-মেয়েরাও আপনাকে কাতর দেখে কি রকম মুষড়ে পড়েছে। আপনি ছাড়া তাদের মুখ চাইতে স্ত্রীলোক,আর এবাড়ীতে কেউ নেই। সমস্ত রাত অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে ক'রে রমা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল; শরীরে তার শক্তিও ছিল না, যে বেশী কথা বলে। প্রবালের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে সে মুখোমুখী কোন দিন কথা বলেনি। আজ কিন্তু এই শোকের সময়ে তার মুখে ঐ সান্ত্বনার অমৃতভরা সম্বোধনে সে ভুলে গেল যে, প্রবাল তার আপনার জন কেউ নয়, সে একজন অনাত্মীয় পর মাত্র। রমার মনে হ'ল প্রবাল তার আপনার, বড় আপনার। সহোদর ভাইএর মতোই সে তার একজন পরমাত্মীয়। এই দুর্দ্দিনে তার মরণোন্মুখ ছেলেটির শিয়রে ব'সে যে সেবাটা সে অক্লান্ত দেহ-মনে ক'রে যাচ্ছে তা শুধু মানুষের মতো মানুষেই পেরে থাকে। সেই মানুষকে ত পর বলে দূরে ঠেকিয়ে রাখা চলে না। প্রবালের মুখের দিকে চেয়ে আবার রমার চোখ দুটি বাষ্পে ভ'রে এল। সে উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বল্‌লে—"বড় করুণাটাই তোমরা কর্‌লে, ভাই; কিন্তু বাছাকে আমার ধ'রে রাখ্‌তে পারলে না।" এই একটি মাত্র ছোট কথাতেই মাতৃহৃদয়ের যে হাহাকার, যে শূন্যতার আভাস বেজে উঠ্‌ল, প্রবালের হৃদয়ে তা খুব লাগ্‌ল, এর উত্তরে শিশুহারা মাকে সে আর কি সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারে? কিছুক্ষণ চুপচাপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুধু বল্‌লে—"মানুষের কর্ত্তব্য মানুষ করে, দিদি, বাকীটা ভগবানের হাতে। যে গেল তার কথা ছেড়ে দিই, যে আছে তাকে আমরা এখন সাধ্যমত যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।"

হতাশার সুরে রমা বল্‌লে—"সেও আর বেঁচেছে, দাদা?"

প্রবাল বল্‌লে—"অমন কথা বল্‌বেন না, দিদি, ডাক্তার বলেছেন, এর কোনো ভয় নেই,শুধু প্রাণপণ সেবারই এখন দরকার। আপনি উঠুন, মুখ হাত ধুয়ে একবার তার কাছে চলুন। সে আপনাকে খুঁজ্‌ছে।" হায় রে মায়ের প্রাণ, সন্তানের আহ্বান শুনে এতবড় শোকের সময়ও আবার আশায় বুক বেঁধে অভাগিনী নারী উঠে দাঁড়াল। সেবা সমস্ত রাত্রি রমার পাশে নিদ্রাহীন চোখে শোকের প্রতিমূর্ত্তির মত বসেছিল। তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে রমা ব'লে উঠ্‌ল—"সেবা বোন্ আমার, ভোর হ'য়ে এসেছে। তুমি কাল থেকে উপবাসী। প্রবাল-দাদার সঙ্গে তুমি বাসায় গিয়ে স্নান-টান ক'রে কিছু মুখে দাওগো, তারপর আবার এসো এখন। তুমি না এলে এ বাড়ীতে আমি একদণ্ড টিক্‌তে পার্‌ব না।"

সেবা তা অস্বীকার কর্‌লে না। প্রবাল সেবাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সেবার সঙ্গে কেদারের বাসায় চল্‌ল। তখনও অন্ধকারের ঘোর ঘোর ভাব উষার অবগুণ্ঠনের তলে লুকিয়ে আছে; সুতরাং পথ খুব নির্জ্জন। এ ক'দিন সেবা যেরূপ অশ্রান্ত ভাবে রমার শিশুটির সেবায় নিযুক্ত ছিল তাতে তার মধ্যেকার কল্যাণী নারী-প্রকৃতির যথার্থ রূপ স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠেছিল। তারপর শিশুটির মৃত্যুতে সেবা এখন যেমন ক'রে বেদনায় পরিম্লান হ'য়ে উঠেছে তাতে তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে প্রবালের মনে হচ্ছিল—যেন জগতের যে-কোনো প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনায় ব্যথাতুরার সে একখানি শরীরিণী মূর্ত্তি। কেদারের বাসার কাছে এসে প্রবাল বল্‌লে—"সেবা, আমি এখন ঐখানেই যাচ্ছি। রমা-দি সুস্থ হ'য়ে খোকার কাছে বস্‌লে তবে আবার আমি আস্‌ব। বউদি যেন আমার জন্যে ব্যস্ত না হন্, ব'লে দিও। তুমি একটু চট্‌পট্ স্নান ক'রে কিছু খাওয়া-দাওয়া করো।"

সেবা বল্‌লে—"আপনারও তো কাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নেই; আপনার সে-কথা মনে নেই, আমার জন্যেই ভাবছেন। আমি মেয়ে মানুষ আমার আবার এ সবে কষ্ট কি?" প্রবাল সেবার দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিলে না, সেবা আবার বল্‌লে—"মতি-বাবুরও অবস্থা দেখে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছিল। তাঁকেও বুঝিয়ে শুঝিয়ে সময়ে নাওয়াতে খাওয়াতে হবে; খোকার জন্যে বেচারী বড় বেশী কাতর হ'য়ে পড়েছেন।"

প্রবালের মুখের ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হ'য়ে উঠল, কেননা রমার প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি থাক্‌লেও মতি-বাবুর প্রতি মোটেই ছিল না। সে বল্‌লে—"মতি-

বাবুর পাপেই আজ সকলের এই শাস্তি হচ্ছে সেবা, তাঁর প্রতি আমার একটুও দরদ নেই।"

ভেতরের কথা সেবাও কতক কতক শুনেছিল। প্রবালের কথার অর্থ বুঝতে পেরে সে বল্‌লে—"প্রবালবাবু, তিনি আজ শোকার্ত্ত, আজ শুধু সেই কথাটাই স্মরণ রাখুন।"

আকাশের আলো আরও স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠ্‌ল। আলোকের নূতন প্রকাশ সেবার পাণ্ডুর জাগরণ-ক্লান্ত মুখেও এক নূতন দীপ্তি ফুটিয়ে তুল্‌লে। প্রবাল সেই মুখের ছবিতে যে সেবা ও ক্ষমাপরায়ণা নারী-মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পেলে তার পরিচয়ে মুগ্ধ হ'য়ে ব'লে উঠল—"সেবা, তুমি সুন্দর, তোমার ভিতর বাহির দুইই সুন্দর।"

ঠিক এই সময় পথের বাঁকে নবীনের দিদি সাজি হাতে ফুল তোল্‌বার জন্যে দেখা দিলেন।

চব্বিশ

প্রভাতে প্রথম শোকের শূন্যতার বাণী খানিকটা হাল্কা হ'য়ে এসেছিল। মতিবাবু বাইরের ঘরে একা একা সমস্ত রাত্রি দরজা খুলে বসেছিলেন। পার্শ্বচর যারা ছিল আজ তারা নিরুদ্দেশ। বাড়ীতে আর তাঁর কেউ পুরুষ আত্মীয়-স্বজন ছিল না। প্রবাল ও বাইরের দু এক জন পুরুষ প্রতিবাসী তাঁকে জোর ক'রে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। তিনি পাথরের মত কঠিন হ'য়ে রাত্রির সেই ঘোর তমসার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের প্রথম শোককে অনুভব কর্‌ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি এমন ক'রে তিনি কোনো দিন আর দেখেন নি। কার কেউ আত্মীয় বন্ধু মরেছে শুনলে কথাটা তিনি খুব লঘুভাবেই উড়িয়ে দিতেন। আজ সেই মৃত্যু যখন তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁর বড় আদরের খোকামণিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল তখনই তিনি তার ভয়ানক মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌লেন। আর কেবলি তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল এই বিকচোন্মুখ কুসুমকোরকটির অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী তিনি। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না যে, একথাটাকে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অবিশ্বাস কর্‌বার শক্তি আজ তাঁর শোকের আগুনে পুড়ে যেন ছাই হ'য়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারের কথাগুলো যেন খোঁচার মত মতিবাবুর কাণের মধ্যে বিঁধে ব্যথা দিচ্ছিল। তিনি বেশী আর কিছু আজ ভাব্‌তে পার্‌ছিলেন না। শুধু সেই ভীষণ গভীর অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিজের নূতন শোককে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌ছিলেন।

এই ভাবে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এলো। প্রবাল সেবাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই সাম্‌নের পথ দিয়ে চ'লে গেল। ফিরে এসে সোজা তাঁরই ঘরে ঢুক্‌তেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠ্‌লেন—"প্রবালবাবু।" প্রবাল বুঝ্‌লে—এ সম্বোধনের বিশেষ অর্থ নেই। বুক-ভাঙ্গা হাহাকার শুধু এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে লঘু হ'তে চাইছে। সেবার কথা স্মরণ ক'রে এখন প্রবালের করুণচিত্ত সন্তানহারা পিতার ব্যথায় সমবেদনা বোধ কর্‌লে। সে তাই কোমলকণ্ঠে বল্‌লে—"আপনি একবার বড় খোকাকে দেখবেন চলুন। এসময়ে দিদি যে রকম কাতর হ'য়ে পড়েছেন তাতে আপনি যদি একটু ধৈর্য্য ধ'রে তাঁকে সান্ত্বনা না দেন্ তাহ'লে বড় মুস্কিল হবে।"

অন্যমনস্কর মত মতিবাবু বল্‌লেন—"তা বটে।" প্রবাল খোকার ঘরের দিকে চ'লে গেল। মতিবাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে ব'সে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখ্‌তেই দেখ্‌তে পেলেন রমা শোকাবিষ্টভাবে উদাসনয়নে বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে। স্বামীর সঙ্গে তার চোখোচোখি হতেই সে করুণ কণ্ঠে ব'লে উঠল—"ওগো আমার খোকা কই? বুকের ধন বুকে ফিরিয়ে এনে দাও গো, থাকতে পার্‌ছি না যে।" তারপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। স্ত্রীর এই মর্ম্মভেদী কান্না আবার মতিবাবুর বুকে ছুরীর ফলার মত বিঁধে তাঁর স্মৃতিকে জর্জ্জরিত কর্‌তে চাইলে। এই সময় বড় খোকার ঘর থেকে ডাক্ এলো—"বাবা বাবা।" মতিবাবু আস্তেব্যস্তে খোকার ঘরে গিয়ে নত হ'য়ে খোকার কপালে হাত রেখে সাড়া দিলেন—"বাবা আমার, কি বল্‌ছ।"

খোকা তার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে বাপের গলাটি জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"তুমি আমার কাছে থাক বাবা। মাকে ডাকো; মা একবারও আস্‌ছে না কেন?" ছেলের পাণ্ডুর

খে চুমো খেয়ে মতিবাবু স্ত্রীর কাছে এসে দেখলেন রমা মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে চোখের জল ফেল্‌ছে। মতিবাবুরও চোখ জলে ভ'রে এল, স্ত্রীর মাথা কোলের ওপর তুলে নিয়ে তিনি বল্‌লেন—"রমা, কাঁদ্‌তে ত রইলাম আম্‌রা। খোকা এখন তোমায় খুঁজ্‌ছে, উঠে বসে স্থির হও, তারপর তার কাছে চল।"

রমা বল্‌লে—"ওগো বুক যে আমার জ্ব'লে গেল, কি ক'রে আমি স্থির হই, ঐটুকু খোকা আমার যে বড় কষ্ট পেয়ে গেছে, বাছাকে আমি একটুও আরাম দিতে পারিনি।"

মতিবাবু বল্‌লেন, "শান্ত হও রমা, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা আমার মুখে আজ আস্‌ছে না। আমাকে ক্ষমা কর।"

স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা শুনে তাঁর প্রতি রমার তীব্র অভিমান হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর অক্লান্ত সেবা ও অর্থ-ব্যয়ের কথা ভাব্‌তেই রমার মন স্বামীর প্রতি কোমল হ'য়ে উঠ্‌ল। স্বামীই কি কিছু ছেলেটির মৃত্যুতে কম ব্যথা পেয়েছেন? অনেক সময় রমার মনে হ'ত স্বামী যেন তার কাছ হ'তে ক্রমেই দূরে দূরে স'রে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন এই নিদারুণ শোকের সময় তার মনে হ'ল স্বামী ত দূরে নয়। কাছে, খুবই কাছে তিনি রয়েছেন। এই যে আজ একই বেদনায় সমানভাবে দুটি অন্তর মথিত হচ্ছে, চিন্তার ভারে দুটি অন্তরই ভেঙে পড়েছে, এতে কি বোঝাচ্ছে না, তাদের দুটি প্রাণ একই দুঃখ-সুখের সূত্রে গাঁথা! রমা সহসা বিহ্বলের মত স্বামীর পা দুটি চেপে ধ'রে কান্না-ভরা কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর দূরে দূরে থেকো না।" এই সামান্য কাতর প্রার্থনার মধ্যে যে ভাব যে ভাষা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তাতেই চঞ্চল হ'য়ে মতিবাবু সস্নেহে স্ত্রীর পিঠে সান্ত্বনার স্পর্শ বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—"ভয় কি রমা, তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। তুমি ছাড়া সংসারে আমার আর কে আপনার আছে? উঠে এস, খোকা তোমায় দেখ্‌তে চায়। তাকে এখন সারিয়ে তুল্‌তে হ'বে ত।" তখন রমা উঠে দাঁড়াল; মুখহাতধুয়ে উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ ক'রে বড়খোকার ঘরে এসে তার কপালে একটি চুমো দিয়ে বল্‌লে—"খোকা বাপ আমার, মাণিক আমার।" খোকা বুঝতে পেরেছিল ছোট ভাইটি চ'লে গেছে। তাকে সে বড্ডই ভালবাস্‌ত। মাকে দেখে মার হাত খানা বুকে চেপে ধ'রে সে অভিমানের সুরে—"মা—খোকামণিকে কেন যেতে দিলে তুমি,---" ব'লেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আবার রমার অশ্রুর বাঁধ ভেঙে গেল। সে আবার কান্নায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—"তাকে ত যেতে দিতে চাইনি বাপ—সে যে রইল না। ভগবান যে তার কষ্ট দেখে নিজের কোলে তুলে নিলেন।" এদৃশ্য দেখে প্রবালের চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌ল।

পঁচিশ

মাসখানেক পরের কথা! ঈশ্বর-কৃপায় মতিবাবুর এ লেটি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হ'য়ে উঠেছে, বাপ মা তার জন্যে মহা খুসী। প্রবাল, সেবা, প্রিয়ও কিছু তাঁদের চাইতে কম খুসী নয়। দুই পরিবারের মাঝখানে স্বাভাবিক যে একটা দূরত্বের ও সঙ্কোচের পর্দ্দা টানা ছিল ঐ আকস্মিক বিপদের দম্‌কা হাওয়ার বেগে তা স'রে গিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে বেশ একটি ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়েছে। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেরই সেটা লক্ষ্যের বিষয় না হ'য়ে পারেনি। পরকে আপন করা, অনাত্মীয়তে স্নেহপাত্রের স্থান দেওয়া দুনিয়ায় সহজ হ'লেও অপরিচিত কাউকে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'তে দেখলে কার কার মন অম্‌নি কিসের বেদনায় টন্ টন্ ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মূলে কি গোপন রহস্য বাস করছে তা আবিষ্কার কর্‌বার জন্যে তার আর কৌতূহলের অন্ত থাকে না। কারণ না থাক্‌লে মনগড়া একটা কারণ অন্ততঃ খাড়া ক'রে তবে তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মতিবাবুর পাড়ার এমনি কতকগুলি নরনারী ছিলেন যাঁরা রমাদের সঙ্গে প্রিয়দের এতখানি আত্মীয়তা যেন আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিলেন না।

নবীনের দিদির স্বভাবটা ছিল বিশেষ রকম কৌতূহল-প্রিয়, আর পাড়া-পড়সীর ভালমন্দ সব রকম খবরদারী কর্‌তে সে ছিল বিশেষ পটু। রমার কাছে তার যাওয়া-আসাও ছিল খুব। সেদিন ছেলেটি সুস্থ হওয়ার উপলক্ষ্যে

রমা সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবার উদ্যোগ করেছিল। বেশ একটি বৃহৎ আয়োজন! এই আয়োজন পর্ব্বকে গ'ড়েতোল্‌বার জন্যে রমা হেমাঙ্গিনী আর নবীনের দিদিকে আহ্বান করেছিল, কেননা ওরা গৃহস্থ বাড়ীর কাজে-কর্ম্মে কোমর বেঁধে খাট্‌তে খুট্‌তে বেশ দক্ষ। দুপুরবেলা থেকে এসেই ওরা একটি পরিষ্কার ঘরে ব'সে সিন্নির সব জিনিষ পত্র গোছাচ্ছিল। রমাও সঙ্গে সঙ্গে যা যা আবশ্যক সেই সেই জিনিষ ওদের সাম্‌নে ধ'রে দিচ্ছিল। এই সময় ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে প্রবাল এসে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে—"দিদি—কি কচ্ছেন?" তারপর হেমাঙ্গিনী প্রভৃতিকে দেখে একটু সরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"একটু এদিকে আস্‌বেন?"

রমা বল্‌লে—"এই যে আস্‌ছি, ভাই।" তারপর সে নবীনের দিদির দিকে চেয়ে বল্‌লে—"মিষ্টির মধ্যে চন্দ্রপুলি সন্দেশ আছে, আর লোকজনদের জল-খাবারের সরাতে রসগোল্লা, পান্তুয়া, বালুসাইও সাজাতে হ'বে। ঘরে ফলের ঝুড়ি আছে, সেটাও পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ব'লে রমা বেরিয়ে গেল। হেমাঙ্গিনী একটু চোখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে ব'লে উঠ্‌ল—"উনি এসে দিদি ব'লে ডাকতেই অম্‌নি 'ভাই' ব'লে সাড়া দিয়ে উঠলেন। এসব বাহুল্যিপনা আমি ভাই দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তা তোমরা যা বল।"

নবীনের দিদি বল্‌লে---"আমাদের কথা ছেড়ে দে বোন্। এই বাপের বাড়ীর গাঁয়ে জন্ম কাটালাম; ভাই বল, জ্যাঠা বল, পিসে বল, মামা বল, কত সম্পর্কের লোকই না এই গাঁয়ে আছে। ছোটবেলা থেকে জন্মকাল যাদের দেখে আস্‌ছি তাদের সঙ্গেও কথা কইতে গেলে গায়ের মধ্যে যেন সিড়্ সিড়্ ক'রে উঠে। আর এঁদের সব আলাদা খিষ্টানী কায়দা, কে কোথাকার দুদিন এসে একটু সেবাশুশ্রূষা কর্‌লে অম্‌নি সে ভাই হ'য়ে দাঁড়াল। কর্ত্তাটিও যেমন ভেড়া, কোনো কিছু দেখেন না।" হেমা বল্‌লে---"দেখ্‌বেন আবার কি? নিজেরও তো অশেষ গুণ। আবার উনি কাল কি বল্‌ছিলেন তা শুনেছিস? মতিবাবু নাকি আজকাল সাধু সেজেছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা হরিসভার ঠাকুরের সঙ্গে নাকি হাতাহাতি। ঠাকুর নাকি মিত্তিরদের বাড়ীর ছুঁড়ি-ঝিটাকে কি বলেছিল। ছুঁড়ি হাউমাউ ক'রে গালমন্দ দিতে থাকে, আর মতিবাবু এসে পড়েন। তিনি এসে ঠাকুরকে যাচ্ছেতাই করেন; এনারা গিয়ে সব মিটমাট ক'রে দেন।"

নবীনের দিদি চোখ বড় ক'রে ব'লে উঠ্‌ল---"ওমা তাই নাকি? দুজনায় তো গলায় গলায় ভাব। এখন আবার সে ভাব চ'টে গেল কেমন ক'রে? তাতেই বুঝি সিন্নি দেবার জন্যে ঠাকুরকে না ব'লে ওপাড়ায় ভট্‌চাজ্জি মশাইকে ডাকা হয়েছে!"

তারপর একথা সে-কথায় সেবাদের কথা উঠ্‌ল। সেবার কথা উঠ্‌তেই নবীনের দিদি বল্‌লে---"দ্যাখ্‌ ভাই, বল্‌লে পেত্যয় যাবি না, এদের ছেলেটা যেদিন ম'রে গেল, এসে ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিলাম ব'লে ভোরবেলা পুকুরে একটা ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ঠাকুর-পূজার জন্যে ফুল তুল্‌তে যাচ্ছি, সেই সময় দেখি কি, প্রবাল ঐ মেয়েটার সঙ্গে ওদেরই নাচদুয়োরে দাঁড়িয়ে কি ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌ছে। দেখ্‌বা মাত্তর লজ্জায় ঘেন্নায় সর্ব্বাঙ্গ আমার রি রি ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল। মড়ার কাছ থেকে উঠে এসেই এ কি---কাণ্ড! এদিকে প্রবাল তো মোড়ল সেজে পাড়ায় পাড়ায় এর তার কত প্রকারের ভড়ং ক'রে বেড়াচ্ছে। যেন কত সাধু মহাত্মা! ভেতরে ভেতরে কিন্তু কালসাপ, সোমত্ত বউ-ঝির সঙ্গে তোর এত কথাবার্ত্তা কিসের বাপু!"

হেমাঙ্গিনী বল্‌লে—"চুপ ক'রে থাক্ বোন্। সাধুর মুখোস দু'দিন পরে আপনিই খ'সে পড়বে। ও ছুঁড়িকেও আমার একটুও ভাল লাগে না। বিধবার ও কি ফিট্‌ফাট বেশ, মাথাভরা কালো চুল, চোখে মুখে হাসি লেগেই আছে, সেমিজ না হ'লে সাড়ী প'রে না। এ কিরে বাপু চুল টুল গুলো মুড়িয়ে ঘেঁটি পরে যদি রূপটা ঘুচিয়ে দেয় তো লোকেরও চোখ পড়ে না। তা সেদিকে তমন নেই।" হেমা বেচারীর সব মন্তব্য শেষ হ'ল না; সেই সময় প্রিয় আর সেবা এসে সাম্‌নে দাঁড়াল। নবীনের দিদি আগে আগেই সম্ভাষণ কর্‌লেন, "এসো বউদি। দে রে হেমা, ওঁদের পিঁড়ে দুখানা পেতে দে। ও সই ব'স, ভাই, কদিন আর যেতে পারিনি। তুমি নাকি খুব ভালো

সুজনি সেলাই করছ? নন্দার যা গল্প, শু'নে দেখতে যাব মনে করি তা যদি এতটুকু সাবকাশ আছে? ধন্যি মেয়ে তুমি, কত কাজই না জান। আমরা ভাই, মনিষ্যির বার।" হেমা বল্লে—"যেমন লক্ষ্মী-পিবৃতিমের মত চেহারা, গুণও তেম্‌নি। কেবল অদেষ্টটি ভগবান পুড়িয়ে রেখেছেন। এই কাঁচা বয়েস, কি কষ্ট! আমরা তাই বলি পোড়া বিধাতার কি বিচার গো।"

প্রিয় এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বল্লে—"রমাদি কই? ঝি গিয়ে আমাদের এখখুনি ডেকে নিয়ে এল।" নবীনের দিদি বল্লে—"তা আনবে বৈ কি। তোমাদের পাঁচজনেরই ত কাজ বোন্। না এলে চল্‌বে কেন? রমাদি অই যে, তোমার দেওর এসে ডাকতেই ওদালানে গিয়েছেন। বেচারীর ছেলেটি ভাল হ'য়ে উঠেছে, সিন্নি দেবে। তা বৃহৎ আয়োজন করেছে। আমরা সেই ভাত মুখে দিয়েই ছুটে এসেছি, ওর ঘরে ত আর মানুষ নেই যে ক'রে-কর্ম্মে দেবে? যা করে পাড়ার পাঁচজন।"

হেমা বল্লে—"ব'স না দিদি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

রমা ফিরে এসে হাসি মুখে সম্ভাষণ করলে—"কি গো কতক্ষণ?"

প্রিয় বল্লে—"এই; ঠাকুর-পো এসে কি বল্‌ছিলেন?"

রমা বল্লে—"তার পাগলামী জানতো। সত্য-নারায়ণের সিন্নীর জন্যে যত টাকা খরচ হচ্ছে তার অর্দ্ধেক তাকে দিতে হ'বে, সে পাড়ার চাষা-ভুষোদের জন্যে যে পাঠশালা করছে তারই বই-টই কিনবে ব'লে।" হেমা অবাক হ'য়ে ব'লে উঠল—"ওমা সে কি কথা? ঠাকুরদেবতার পুজোর সঙ্গে ছোটলোকদের বই কেনার পয়সা সমান হ'ল? এ যে দেবতার সঙ্গে বাদ, বোন্। একে তো কথায় বলে, ছোটো লোক ছোটো জাত তাদের থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে থাকবে। অম্‌নিতেই তাদের যে তেজ মাটিতে পা পড়ে না, তাদের যদি আস্কারা দেওয়া হয় তাহ'লে তারা কি আর ভদ্দর লোকেদের ভদ্দর ব'লে মানবে?"

হয়ত কথায়-কথায় আলোচনা আরও অপ্রিয় হ'য়ে দাঁড়াবে সেই ভয়ে রমা সেকথা চাপা দেবার জন্যে প্রিয়র দিকে চেয়ে ব'লে উঠল—"কর্ত্তাটি আজ সহরেই থাকবেন ত, না, মফঃস্বলে যাবেন? আমি কিন্তু সকাল বেলাতেই ব'লে পাঠিয়েছি যে আমার এখানে আজ প্রসাদ পাওয়া চাই-ই।" প্রিয় বল্লে,—"এখনো তো ডাক-হাঁক আসেনি, থাকবেন ব'লেই বোধ হয়। সন্ধ্যার পর ঠাকুরপোদের স্কুলে ছেলেদের একটা কি ক্লাব না কি খোলা হবে তাই দেখতে যাবেন বল্‌ছিলেন।"

মনের মধ্যে যাই থাক—দুই সইকে সসম্মানে বসিয়ে নবীনের দিদি ও হেমা রমার দুঃসময়ে সেবার সেই অক্লান্ত সেবাপটুতার উল্লেখ ক'রে অনর্থক বেচারীকে লজ্জার ভারে পীড়িত ক'রে তুলতে লাগল। এই সময় নন্দার পিসী এসে দেখা দিলেন। কথার গতি অন্য পথ নিতেই সেবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ছাব্বিশ

সেদিন প্রবাল আর সেবা সম্বন্ধে মতিবাবুর নিভৃত অন্তঃপুরে নির্জ্জন কক্ষে ব'সে হেমা আর নবীনের দিদি ইঙ্গিতে মাত্র যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল কেমন ক'রে যে তা এ-কান ও-কান হ'য়ে এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরে এমন কি মেয়েমহল উত্তীর্ণ হ'য়ে পুরুষদের বৈঠকে পৌঁছে তাঁদেরও আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল তা কেউ বল্‌তে পারে না। তবে কথাটা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করতে লাগল, সেই সঙ্গে পাড়ার মাতব্বর যাঁরা তাঁরা অনেক সমালোচনাই করতে লাগলেন। যাঁদের নিয়ে ও-আলোচনা দিন দিন ফেনিয়ে উঠতে লাগল তাঁরা কিন্তু শীঘ্র কিছু টের পেলে না কেন না সবই হচ্ছিল নেপথ্যে। কেদারের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দু' একজন আভাসে শুনেও এটাকে আমল দিলেন না। কাজেই এ পক্ষের কানে এসে খবর পৌঁছুতে একটু দেরী হ'ল। খবর এলে আবার দুদিক্ থেকে দু রকমের। মেয়ে-মহলে যা রটেছিল তা এল জয়ার মুখে আসন নিয়ে। প্রিয়কে জয়া এসে একদিন জিজ্ঞেস করলে, "সই মা কই!"

প্রিয় বল্লে—"জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। উঠতে চাইছিল উঠতে দিইনি, দিন ভাল যাচ্ছে না। বিদেশ বিভুঁয়ে অসুখে প'ড়ে কষ্ট পাবে।"

জয়া সুযোগ পেয়ে যে কথাটা ফুটিফুটি ক'রে ফুটতে

পার্‌ছিল না, সেটা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—"বেশ বলেছ মা। পরের মেয়ে অসুখ হ'লেই মুস্কিল। তুমি একলা মানুষ, কে দেখে, কে শোনে? তা ওঁকে ওঁর বাবার কাছেই পাঠিয়ে দাও না মা। এ দেশে পোড়া লোকের পোড়া কথা, কতকি কানাঘুষো করে।"

লোকেরা সেবার এ-গ্রামে পদার্পণাবধি কত মন্তব্যই প্রকাশ ক'রে আস্‌ছে, প্রিয় তা জান্‌ত। তবু জয়ার আজকার কথার মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঘ্রাণ পেয়ে কৌতূহলী ভাবে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "আবার কি বলে লো? সইএর বাড়ী সই দুদশ দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে তা আবার বলে কি?"

জয়া ঢোঁক গিলে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "এই বলে কি শোনো গিন্নী মা। কাকাবাবুর সঙ্গে সই-মার নাকি বিয়ে টিয়ে তোমরা ঠিক করছ। আমি পেত্যয় যাইনি। সক্কালবেলায় ঘাটে বাসন মাজতে ব'সে নন্দাদের ঝির সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে গেল। তুমি কাউকে কিছু বলনি মা, এখুনি আবার কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্‌তে আস্‌বে।"

কথাটা শুনেই প্রিয় মুষড়ে গেল। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে, তাই তো! সে তখুনি কেদারের কাছে গিয়ে চুপি চুপি সব কথা ব'লে, বল্‌লে—"সইকে তাহ'লে আর রাখা যায় না। শীগ্‌গীরই পাঠিয়ে দিতে হয়। মন্দ কথা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। সই শুনেই বা কি ভাববে ঠাকুরপোই বা কি মনে কর্‌বে? ওদিকে সইয়ের বাবা শুন্‌লেও বা কি ভাববেন?"

কেদার শুয়ে কাগজ পড়ছিল। সেটা সরিয়ে রেখে উঠে বলল, "একটু আভাসে আজ আমিও শুনেছি। শুনে কিন্তু অন্য কথা মনের মধ্যে উদয় হ'ল। সেবাকে যদি প্রবাল বিয়েই করে ত মন্দ হয় না, ওরা মিল্‌বে ভাল।"

প্রিয় শিউরে উঠে বল্‌লে—"কি বল গো তুমি? ওসব পাপ কথা মুখে আন্‌তে আছে? তোমার বিভ্রম হয়েছে না কি? সই শুনে ভাব্‌বে কি বলতো, মনে কর্‌বে আমরাই ষড়যন্ত্র কর্‌ছি—রামঃ রামঃ।"

কেদার বল্‌লে—"তুমি যে ঘৃণায় কাঁটা হ'য়ে গেলে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এটা। তোমাকে কিছু আমি আমার মর্‌বার পর বিয়ে কর্‌বার আদেশ পালন কর্‌তে বল্‌ছি না।"

"কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে। এমন লোকের কাছেও আবার যুক্তি কর্‌তে আছে? আমারি নাকে কানে খৎ" —বলে প্রিয় ঘর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিল, কেদার খপ্ ক'রে তার হাত ধ'রে টেনে এনে কাছে বসিয়ে বল্‌লে, "দ্যাখ প্রিয়, সমাজে যদি বালবিধবাদের বিবাহ প্রচলন হয় সে খারাপ না হ'য়ে ভালই হবে। তোমার সইএর বিয়ে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে-স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কতটুকু?"

প্রিয় মুখ ভার ক'রে বল্‌লে—"তা যতটুকু পরিচয়ই হোক্ না কেন, ধর পরিচয়ই হয়নি, তবু স্বামী ত হ'য়েছিল। হিন্দু মেয়ে সেইটুকু অবলম্বন ক'রেই যে এ-জন্মে স্বামীর মিলনের আশায় পথচেয়ে পরজন্মে গিয়ে মিল্‌বে।"

কেদার হা হা ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—"আর স্বামী বেচারী তদ্দিনে কর্ম্মফলে কোন্‌দেশে কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তা কেউ বল্‌তে পার্‌বে না। যদি মানুষ না হ'য়ে অন্য কোনো জন্মই গ্রহণ ক'রে ফেলে তা হ'লে ত আর এক হেঁয়ালী।"

প্রিয় এ উপহাস সইতে না পেরে ক্ষুণ্ণ স্বরে ব'লে উঠল, "শাস্ত্র নিয়ে তোমরা টিট্‌কিরী দিও না।" কেদার এখন গম্ভীর হ'য়েই বল্‌লে—"তাহ'লে শাস্ত্রেরই মত এই, শোনো, যে এ-সব বিধবা বিবাহে কোনো দোষ নেই। বরং না দিলেই সমাজে গোপন পাপের স্রোত অবাধে চলে। চার দিকে চোখ মেলে কত ঘটনা দেখ্‌ছও ত। আমি বলি প্রবাল যদি সইকে বিয়ে করে, চমৎকার হয়। প্রবালের মত পাত্রই সইএর উপযুক্ত সাথী। আমার ত মনে হয় প্রবাল অ-রাজী হবে না। সইকে রাজী কর্‌বার ভার তুমি নাও।"

প্রিয় বল্‌লে—"তা হ'লে এ দেশে আর টিঁক্‌তে হ'বে না। লোকে বল্‌বে—'যা এঁচেছিলাম ঠিক তাই হ'ল।' সইএর বাপই বা কি বল্‌বেন, তোমার আমার মুখে চুণকালী দেবেন না?" হঠাৎ প্রবাল এসে ঘরে ঢুকতেই প্রিয় নিজের কাজে চ'লে গেল। এখনি যে অপ্রিয় আলোচনা হ'বে তাতে যোগ দিতে তার উৎসাহ ছিল না

কেদার বল্‌লে—"ওহে প্রবাল সইএর জ্বর হয়েছে শুন্‌ছি। দিন খারাপ, যদি গায়ে কিছু বেরোয় সেই ভয়। বল্‌ছেন গায়ে হাতে ব্যথাও খুব। তোমার হোমিওপ্যাথী একটু চালিয়ে যাও না।"

প্রবাল সকালের দিকে একটি ছেলে পড়াতে গিয়ে ফের্‌বার পথে নিমাইএর কাছে যে খবরটি শুনে এসেছিল, তার জন্যে ভারী অন্যমনস্ক হয়েছিল। নিমাইদের জাতের মধ্যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, সুরাপান নিবারণ, তাদের চাষ-বাসের জন্য একটি ছোট-খাটো ধন-ভাণ্ডার খোলা এইসব বিষয় নিয়ে সে আজকাল খুব মাথা ঘামাচ্ছিল। কাজ যে হচ্ছিল না তা নয়, জনকয়েক উৎসাহী চাষাভূষোর ছেলেরাই এর মধ্যে উঠে' পড়ে' লেগে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবালের পরামর্শানুযায়ী পাঁচজন ইতর-ভদ্রকে নিয়ে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। নিমাই ছিল তার মধ্যে সব চাইতে উৎসাহী কর্ম্মী। প্রবালকে সে ভারী ভালবাস্‌ত ও ভক্তি কর্‌ত। প্রবালের সম্বন্ধে রটনা আশে পাশের ভদ্র পল্লীগুলি ডিঙিয়ে ক্রমে তাদের সমাজের মধ্যেও অবাধে প্রচার হ'য়েছিল। তবে ভদ্র-জাতের মধ্যে যেটা গ্লানি ও কুৎসারূপে রটেছিল ওরা ছোট জাতের ছোট বুদ্ধি নিয়ে সেটাকে অন্য চোখে দেখেছিল। তাই নিমাই নির্জ্জন পথে প্রবালকে দেখে চুপি চুপি বল্‌লে—"হ্যাঁ বাবু, একটা কথা আপনাকে শোধাই, রাগ কর্‌বেন না। সত্যিই কি আপনি সইমাকে বিয়ে কর্‌বেন? হরি-সভার ঠাকুরের সঙ্গে এই মাত্তর আমার দেখা হ'য়েছিল, আমায় বল্‌লেন—'কি নিমাই তোমাদের দাদাবাবুদের যে এক-ঘরে করা হবে, তোমরা তাঁদের জাতে নেবে না কি'?"

অতি মাত্রায় বিস্মিত প্রবাল এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেবা তার মনের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে সত্যি, কিন্তু সে ত তার অন্তরের নিভৃত গোপন কথা, নিজেও সে আর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি। কেদারের কাছেও বলি বলি ক'রে আর কিছু বলা হয়নি। তবে বাইরের লোক একেবারে বিয়ে পর্য্যন্ত ঠিক্ ক'রে ব'সে আছে? মন্দ না।

গম্ভীর ভাবে প্রবাল তখন প্রশ্ন কর্‌লে—"হরিসভার ঠাকুর এ খবর জোগাড় কর্‌লে কোত্থেকে?"

নিমাই ভাব্‌লে—ব্যাপার তা হ'লে মিথ্যা নয়। তখন সঙ্কোচ কাটিয়ে সে সাহস ক'রে বল্‌লে—"তাত জানিনে বাবু। তবে ওনাকে আমি বল্‌তে শুনেছি যে আপনাদেকে ওনারা গাঁ-ছাড়া কর্‌বেন। এ সব ম্লেচ্ছকাণ্ড এ-গাঁয়ে হ'তে দেবেন না। তা আমরা থাক্‌তে আপনাদের ভয় নেই দাদাবাবু। এ পাড়ায় না থাকেন আমাদের পাড়ায় আস্‌বেন মাথায় ক'রে রাখব।"

প্রবাল বল্‌লে—"আচ্ছা সে দেখা যাবে; তুমি কিন্তু এ সব কথা নিয়ে একটুও গোল ক'র না নিমাই।"

নিমাই বুঝ্‌লে বাবু এখন এ-ব্যাপার গোপন রাখতে চান। সে "আচ্ছা" ব'লে চ'লে গেল। প্রবালও চিন্তিত মুখে কেদারের কাছে এল। এসেই শুন্‌লে সেবা অসুস্থা। আজ কিন্তু রোগীর সন্ধান পেয়েও তার চিকিৎসার উৎসাহে সাড়া পড়ল না। সে যেন কতকটা ক্লান্ত শ্রান্ত ভাবে টুলের ওপর ব'সে পড়ল।

কেদার বন্ধুর শ্রান্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠল—"কি হে অসুখ বোধ হচ্ছে না কি, অমন ক'রে ব'সে রইলে যে?"

প্রবাল বল্‌লে—"দেখ কেদার---তোমার দেশের কল্পনা শক্তির প্রাখর্য্য দেখে আজ আশ্চর্য্য হয়েছি। চারি-দিকে না কি রাষ্ট্র হয়েছে যে আমি সেবাকে বিয়ে কর্‌ছি।"

কেদার বল্‌লে—"আমিও একটু আগে তাই শুন্‌লাম। শুনে কিন্তু মনে হ'ল, তোমাদের 'ম্যাচ' যা হবে চমৎকার! তোমার সাহস থাকে ত এগিয়ে এস। কুমার কার্ত্তিক হ'য়েই ত ব'সে আছ। এবার সে ব্রত উদ্‌যাপন হোক্। আমরা মিষ্টি মুখ করি।" কেদার যে এ ভাবে সাড়া দিবে, প্রবাল তা মনেও করেনি। হঠাৎ তার মনের মেঘভার কেটে গিয়ে সে সহজ আনন্দ অনুভব কর্‌লে; তাই স্নিগ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—"এগুবার মালিক আমি কি একা কেদার—আর একজনের দিক্ থেকে সাড়া পেতে হবে না কি?"

কেদার বল্‌লে—"নিশ্চয় হবে, তা ছাড়া অনেক বাধা আছে যেগুলোর সঙ্গে যুঝতে হ'বে। সেবার বাবা মত

দেবেন না, তোমার মাও তাই। আমার গৃহিণী এখুনি বেঁকে বসেছেন। কিন্তু আমার দিক্ থেকে এ-প্রস্তাব ভাল ব'লেই মনে হয়। আমাদের সমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ভালো জিনিষ তা মানি। কিন্তু সেটা শুধু বিধবারই একচেটে সম্পত্তি হবে কেন? যে অসহায়া নারীগুলি এই পীড়া সমাজের বিধানে ভোগ করছে তার মধ্যে অনেকের জীবনে ক্ষুধিত অন্তরাত্মার একটা বুকফাটা কান্না উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলেছে। তার খবর কেউ না রাখলেও সমাজের বুকে তা অভিশাপের মত পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ ছে।"

প্রবাল অনেক কথাই বল্‌বে ভেবেছিল। এখন কিন্তু তার হৃদয় যেন ভ'রে আস্‌ছিল, সে কিছু না বল্‌তে পেরে শুধু বল্‌লে—"বন্ধু, তুমি সত্যিকার দরদী। তোমায় বল্‌তে বাধা নেই, সেবাকে আমি ভালবেসেছি, তাকে বিয়ে কর্‌লে আমি ধন্য হব।"

কেদার খুসী হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"সত্যি প্রবাল—সেইএর মধ্যে বিকাশোন্মুখ এমন কতকগুলি গুণের আভাস পেয়েছি যা ঠিক তোমারই হৃদয়বৃত্তির সহযোগী। দাম্পত্য জীবনে এমন অনুকূল সাহচর্য্যের ফল মধুময় হ'বে ব'লেই আমার বিশ্বাস।" প্রবাল আর উত্তর দিলে না, হঠাৎ সমগ্র জগৎ যেন যাদুমন্ত্র-বলে তার কাছে এক অপূর্ব্ব আস্বাদে ভ'রে উঠ্‌ল। সেবাকে তার ভাল লেগেছিল, সেবার সেবারতা কল্যাণী মূর্ত্তির মধ্যে যে নারীশক্তির অফুরন্ত ফোয়ারা লুকিয়ে আছে তার চকিত প্রকাশ প্রবালের বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে সম্ভ্রমে ও প্রীতিতে ভ'রে দিয়েছিল। লক্ষ্মী-শ্রীর মত তার দীপ্তিময় তনুখানির দিকে চেয়ে তার পুরুষচিত্ত নারীকে শান্তি ও আনন্দের প্রতিমা ভেবে উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌ত। এর বেশী সেবার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবতে সে চেষ্টা করেনি। কিন্তু আজ? আজ এক লহমায় তার ভাবের জগতে নূতন পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল, আজ তার হৃদয়-বীণার তারে প্রেমের দেবতার অঙ্গুলি স্পর্শ অন্য সুর বাজিয়ে তুল্‌ল, হ্রী, শ্রী ভরা মাধুরী-মাখা নারী মূর্ত্তি আজ কল্যাণ-করে জয়মাল্য নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে। আনন্দ-শিহরণে তার দেহ পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

সাতাশ

আজ সেবার জ্বরের তিন দিন। প্রবাল যা ওষুধ দিয়েছিল, তাতেই উপকার হয়েছে। ভয়ের বিশেষ কারণ নেই।

এদিকে তাকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যে আলোচনা হয়েছে তার ধাক্কা এ-বাড়ীতে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তারও কাণে গিয়েছে। মনটা তার সেজন্য একটু তিক্ত হ'য়েছিল। নিজের জন্য তার বড় চিন্তা ছিল না, কিন্তু কেদার ও প্রিয়র অগৌরবের ভয়ে সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল। তার উপর প্রবাল যখন কাল তাকে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করতে এসে কথাচ্ছলে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনধিকারীর মত প্রশ্ন করেছিল তখন সে যেন আর সহ্য করতে পারেনি। হঠাৎ চোখ মুখ রাঙা ক'রে ব'লে ফেলেছিল—"আপনার সে সব শোন্‌বার অধিকার?"

প্রবাল সেই সময় কেদারের আহ্বান শুনেই চ'লে যায়। তারপর আজ আর সারাদিন তার সাড়া পাওয়া যায়নি। সেবার মনটা যেন বিমনা হ'য়ে পড়েছিল। দেহে আজ তার বড় গ্লানি ছিল না। কিন্তু মনের গ্লানি যেন সে অভাব-টুকু পূর্ণ ক'রে বসেছিল। সন্ধ্যার পর সেবাকে ভাল দেখে প্রিয় রমার কাছে বেড়াতে গিয়েছে। কেদার মফঃস্বলে, প্রবালও অনুপস্থিত, চাকর বামুন নিজের কাজে নিযুক্ত। নির্জ্জন ঘরে শয্যায় শুয়ে সেবা তার কূলহীন চিন্তাসমুদ্রে ভাস্‌ছিল। সে ভাবতে চেষ্টা কর্‌লে তার এই ব্যর্থ জীবনটা ভগবান কিসের উদ্দেশে গড়েছিলেন। মা নেই, ভাই নেই, বোন্ নেই। সে পত্নী নয়, মা সে হতে পারে না, বাবা তাকেই দূরে দূরেই রাখতে চান্। একমাত্র বন্ধু আছে, তার গলগ্রহ হ'য়ে কতদিনই বা আর থাকবে? এই বিফল জীবনটাকে অভিশাপের মত ক'রে গড়বার দেবতার কি প্রয়োজন ছিল? এর উত্তর সে ত কোথাও খুঁজে পেলে না। শাস্ত্রের আদেশ সে স্মরণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী হ'য়ে স্বামী চিন্তায় জীবন যাপনই বিধবার জীবনের একমাত্র আদর্শ ও ব্রত; এবং এতেই তার সব দুঃখের শান্তি। বেচারী প্রাণপণে স্বামীর স্মৃতি

মনের মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; হৃদয় তার বড় শূন্য—যেন অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বরের মত সেখানে কোনো চিহ্ন নাই, কোনো প্রতিবিম্ব নাই। সেবার বুক ফুলে' ফুলে' উঠ্‌তে লাগল—পাষাণ-ভারের মত এ কি দুঃসহ বোঝা আজ তার বুকের উপর ব'সে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ কর্‌তে চাইছে? মুক্তির জন্য তার পীড়িত আত্মা যে আজ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে চায়, এ বন্দীত্বের বন্ধন যে আর অসহ্য।

সেবা কাঁদ্‌তে লাগল। সমস্ত চিন্তা ভুলে গিয়ে সে শুধু অঝোরে চোখের জল ফেল্‌তে লাগল। এ কান্নার বিশেষ হেতু নাই, যে কান্না কেঁদে মানুষ শুধু বুকের বোঝা হাল্কা করে, এ সেই কান্না। অনেকক্ষণ কাঁদ্‌বার পর তার মন যেন একটু হাল্কা হ'য়ে এল; তখন সে জানালার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগল। আকাশের এক টুক্‌রা মাত্র চোখে পড়ছে; অন্ধকার রাত্রি, শুধু তারার মেলা। অই অতটুকু আকাশ তার বুকে অনন্তের আভাস জাগিয়ে তুল্‌ল; সে ভাবতে লাগল, এই পৃথিবী, কত সুন্দর, কত বিচিত্র এর নব নব রূপ, এর বুকে কত লোক কত ভাবে যাত্রা ক'রে চলেছে। সেও যাত্রী, কিন্তু তার গতিতে লীলা নেই, প্রাণের ছন্দ সে গতিতে ফুটে উঠতে চায় না। কেন এমন হয়? সে কি চল্‌তে জানে না? না বাইরের আবেষ্টন তার গতিকে পদে পদে এমন ভাবে জড়তার পীড়নে ক্লিষ্ট কর্‌তে চাইছে।

বাহির থেকে সেবার কানে যেন প্রবালের কণ্ঠ এসে বাজল। মুহূর্ত্তে তার বুকের শোণিতকণা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। একি মোহ! পরপুরুষের কণ্ঠস্বরে তার চিত্তবীণার তারে ঝঙ্কার উঠে কেন? হঠাৎ তার চোখের উপর প্রবালের মুখ ভেসে উঠল। শান্ত সৌম্য মুখশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, করুণায় মধুর, জ্ঞানে প্রদীপ্ত। দুই চক্ষে যেন অমৃতবর্ষী দৃষ্টি! এ মুখের ছবি বুকের মধ্যেও ছায়া ফেলে না কি? সর্ব্বনাশ—সেবার নারীত্ব কি আজ তবে পরপুরুষের চিন্তায় কলুষিত! সেবা মনকে যতই চোখ ঠারুক তবু তার মন দুলে' দুলে' উঠ্‌তে লাগল। তখন সে নিস্পন্দভাবে শয্যার উপর প'ড়ে রইল।

হায়রে মানুষের মন! এ যে চির দুর্জ্ঞেয়। নিজের মনের পরিচয় কতটুকু আমরা জান্‌তে পারি? কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে শুয়ে থাক্‌বার পর সেবা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। প্রবাল বাড়ীতে এলেই সেবাকে কুশল প্রশ্ন ক'রে যায়। আজ ত কই একবার এল না? তা হ'লে কাল যে সেবা তাকে বলেছিল 'আপনার সে সব শোন্‌বার কি অধিকার'—সে-কথাটি কি প্রবাল অত্যন্ত রূঢ় ভাবে গ্রহণ করেছে?

সেবা নিজের প্রতি নিজেই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। হায় অভাগী, জগতে তোর, কেউ আপন নেই। এতটুকু স্নেহ যদি কেউ করে তাকে অবহেলা করিস্ কোন্ স্পর্দ্ধায়।

কিন্তু প্রবালের স্নেহের তলে ঐ কিসের ছায়া গোপন হ'য়ে আছে? প্রবালের দৃষ্টি কি বল্‌তে চায়? সে দৃষ্টি কি নিতান্ত অর্থশূন্য? সেবা নিজেই আবার ভাবতে লাগ্‌ল—প্রবাল হয় ত সেবাকে ভালবেসেছে; সে ভালবাসা নির্দ্দোষ কেন না, প্রবাল সেবাকে বিবাহ কর্‌বার কল্পনা না ক'রে এ ভালবাসার প্রশ্রয় কখনও দেবে না। সে মহৎ, সে সরল, সুতরাং তার দিক্ থেকে এতে দোষ নেই। হয় ত ঐ জন্যেই প্রবাল কাল সেবার কাছে কিছু আলোচনা করাতে সে কঠিন জবাব দিয়ে বসেছিল। হায় স্পর্দ্ধিতা নারী! সেবা যখন নিজের চিন্তায় তন্ময় সেই সময় প্রবাল দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—"একি বাড়ী একেবারে ভোঁ ভোঁ করছে যে! স্বয়ং গৃহিণী সপুত্রকন্যা পলাতকা, আপনি একেবারে একলাটি রয়েছেন!"

সেবা বল্‌লে—"হাঁ, সই একটু রমাদিকে দেখতে গেছেন।"

প্রবাল বল্‌লে—"আপনি আজ কেমন আছেন তা হ'লে—না এ প্রশ্নটুকুও অনধিকার?"

সেবা লজ্জায় ও বেদনায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। এ তার কাল্যকার নিষ্ঠুর কথার প্রত্যুত্তর। তার ক্ষোভ হ'তে লাগল। পুরুষ হ'য়ে একজন নিরাশ্রয়া অনাথিনীর একটা অসংলগ্ন কথা সইতে না পেরে সেটার কঠিন বিচার করা—একি প্রবালের মত পুরুষের কাজ?

প্রবাল সেবাকে আপনি ব'লে কথা বলত; কিন্তু কিছু কাল পরে সে-আপনি তুমিত্বে পরিণত হ'য়েছিল।

কেন না প্রিয়কে তুমি বল্‌বার অবসরে প্রবালের সেবাকে তুমি ও আপনি সম্বোধন মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিয়ে বস্‌ত। প্রিয় তাই সইকে তুমি সম্বোধন কর্‌বার অনুমতি দিয়ে প্রবালকে কায়দা-কানুনের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। এখন সেবাকে সে আপনি সম্বোধন করাতে সেবার মনে হ'ল প্রবাল ইচ্ছা ক'রে তাকে আজ আঘাত দিয়ে জানাতে চায় যে, সে প্রবালের নিকট হ'তে কত দূর। শরবিদ্ধ পাখীটির মতো তার আহত চিত্ত লুটিয়ে রইল। সে কোনো সাড়া-শব্দও দিতে পার্‌লে না। তাকে নিরুত্তর দেখে প্রবাল বল্‌তে লাগল—"উত্তর দিচ্ছেন না যে? চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকের রোগীর কাছে পাচমিনটের জন্য গিয়ে একটু খবর নেওয়া বা কুশল প্রশ্ন করা এটাও কি সত্যিই অনধিকার?"

সেবা আর নির্ব্বাক হ'য়ে রইল না। কান্নাভরা করুণ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"কেন এমন ক'রে আঘাত কর্‌তে চান আপনি? আমি ত আপনাকে—" আর সে বল্‌তে পার্‌লে না—কেঁদে ফেল্‌লে। সেবার অনুমতির অপেক্ষায় আর প্রবাল বাইরে দাঁড়িয়ে ভদ্রতার অভিনয় কর্‌তে পার্‌লে না। ঘরের মধ্যে এসে সেবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাতখানা তার কপালে রেখে ব্যথাভরা কণ্ঠে ব'লে উঠল—"ছিঃ সেবা, সত্যিই তুমি কেঁদে ফেল্‌লে। আমি তো তোমায় আঘাত কর্‌তে চাইনি। ছিঃ লক্ষীটি, কেঁদ না। দেখ আমার কষ্ট হচ্ছে। আমায় মাপ কর তুমি।"

কথার মধ্যে মমতা যেন ঝ'রে পড়ল। সেবা কিন্তু কান্না থামাতে গিয়ে পার্‌লে না, তার বুকের অনেক ব্যথা; ব্যর্থতার অনেক মনস্তাপ আজ একজনের এই একটুকু স্নেহ-সম্ভাষণকে উপলক্ষ ক'রে অঝোরে ঝ'রে পড়তে লাগল। বুকের ভিতর তরুণ যৌবনে তার যত-কিছু অপূর্ণ সাধ, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, আশা সমাজের ইঙ্গিতে যে তুষার-সমাধিতে পরিণত হয়েছিল, এই সান্ত্বনা সম্ভাষণের তপ্ত স্পর্শে তার কাঠিন্য এক লহমার মধ্যে দ্রব হ'য়ে গিয়ে ব'য়ে যেতে চাইলে। প্রবাল আর দ্বিতীয় সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে না। অভিভূতের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে তার প্রেমপাত্রীর এই হৃদয়-গলা কান্না দেখতে লাগল। সে হৃদয়বান, সহজেই বুঝে নিলে শুধু তার কথাকে উপলক্ষ ক'রেই সেবার এই বুক-ফাটা কান্না নয়। এর পিছনে অনাথিনী নারীর অসহায় জীবনের কত দুঃখ-দহনই পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে।

কিছুক্ষণ ফুলে' ফুলে' কাঁদ্‌বার পর সেবা নিজেই চুপ কর্‌লে। প্রবাল তখন সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"আজ কেমন আছ, সেবা? জ্বর নেই বোধ হয়।" সেবা এইবার সহজ কণ্ঠে বল্‌লে—"জ্বর নেই, ভালই আছি। আপনার ওষুধে বেশ উপকার হয়েছে।"

এখন কান্নার শেষে সেবার লজ্জা হ'তে লাগল। তার এই অকারণ কান্না দেখে প্রবাল কি ভাবলে? ছিঃ কেন সে এতটা বিহ্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লে? কিন্তু সময় এখন অতীতের কুক্ষিগত। ঘটনার দাস মানুষ এম্‌নি ক'রেই প্রতিপদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে ধরা দিয়ে বসে। সেবার মনে সঙ্কোচের ভার যতই ঠেলা দিয়ে উঠতে লাগল, ততই সে প্রবালের সঙ্গে সহজভাবে কথা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। তাই নিজের কুশল-সংবাদ দেবার মাঝখানে হঠাৎ ব'লে উঠল—"কাল আপনি আমার কথায় রাগ করেছিলেন বুঝি? সত্যিই আমি সে-রকম কিছু একটা ভেবে ও কথা ব'লে বসিনি।"

প্রবাল বল্‌লে—"আমি রাগ কর্‌ব কেন? রাগ কর্‌লে কি আজ আর কুশল জান্‌তে আস্‌তে পার্‌তাম? সেবা কি ভেবে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল।

প্রবাল বল্‌লে—"বিশ্বাস কর্‌লে না, সেবা! আমায় ভুল বুঝো না তুমি। আমিও যেন তোমায় ভুল না বুঝি। কয়েকটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস কর্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি হয় ত বিরক্ত হ'বে।"

প্রবাল হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। পাশের ঘরের ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বেজে গেল। প্রবাল ব্যস্ত হ'য়ে নিজের ঘড়িটা বুক পকেট হ'তে বার ক'রে দেখে নিলে ঠিক মিলুল কি না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য একটু অগ্রসর হ'য়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"তুমি যদি বিরক্ত না হও তাহ'লে কালকের কথাটা আমি একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে পারি।"

সেবা যেন একটু কাতর স্বরেই বল্‌লে,—"বলুন,

আপনি কি বল্‌তে চান। আমি বিরক্ত হ'ব এ কথাটাই আপনি মনে কর্‌ছেন কেন?"

সেবার এই কাতরকণ্ঠের অসহায় ভাবে প্রবাল ব্যথা অনুভব কর্‌লে। অগ্রসর হ'য়ে এসে ধীরকণ্ঠে বল্‌তে লাগল—"সংসার বড় কঠিন স্থান সেবা। এখানে আমাদের, জীবনে অনেক পরীক্ষা অনেক সমস্যা এসে দেখা দ্যায়। যে-কোনো সূত্রেই হোক্ আমরা আজ এমন জায়গায় এসে মিলেছি, যেখানে আমাদের দুজনেরই জীবন-যাত্রার পথ জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে হয় আমাদের দুজনের সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হওয়াই মঙ্গল, নয় একেবারে ছাড়াছাড়ি।"

প্রবাল একটু থাম্‌ল, সেবার চোখে আবার জল ভ'রে এল। ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠল—"আমি চ'লে যাব, আপনাদের পথে বাধা হ'য়ে থাক্‌ব না।"

প্রবাল বল্‌লে—"কিন্তু সেবা, আমি ভেবে দেখ্‌লাম, এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার চাইতে যদি আমরা দুজনে মিল্‌তে পারি। কিছু মনে কোরো না তুমি,—আমার যা বল্‌বার তা হয় ত এই সময়েই ব'লে নেওয়া ভাল। তোমায় আমি ভালবেসেছি,তাই বল্‌তে চাই—তোমায় পেলে আমি সুখী হ'ব, তুমি আমার স্ত্রী, আমার সহধর্ম্মিণী হ'য়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, এই আমার প্রার্থনা।"

এই প্রবালের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ও ভালবাসা যেন ঝ'রে পড়্‌ছিল। প্রেমোক্তির মধ্যে উন্মাদ প্রলাপ ও অবান্তর কথা কিছুই ছিল না। সরল আত্মনিবেদন সহজ ভাবে কথা কয়টির মধ্যে ফুটে উঠে শ্রোত্রীর মনকে স্পর্শ কর্‌ছিল। সেবার মনের বিমুখতা কোথায় অন্তর্হিত হ'ল; এ অযাচিত প্রণয়-সম্পদকে উপেক্ষা কর্‌বার স্পর্দ্ধা যে তার নেই তা সে তার হাহাকার ভরা অন্তরখানির মধ্যে গভীর দৃষ্টি বুলিয়ে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পরিষ্কার বুঝতে পার্‌লে। তার অন্তর যে গোপনে গোপনে ইহাকেই কামনা ক'রে এসেছে সে তা স্বীকার করেনি বটে, কিন্তু এখন ত অস্বীকার করা আর চলে না। সেবার মন সহজেই প্রবালের চরণে নত হ'তে চাইলে! কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কোচ তার ভাষাকে ফুট্‌তে দিলে না। প্রবাল তাকে স্তব্ধ দেখে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "উত্তর দাও, সেবা। জোর ক'রে তোমার মত আদায় কর্‌তে চাই না। তোমার মন যদি সহজ আনন্দে আমায় জীবনের সাথী ব'লে বরণ কর্‌তে চায় তা হ'লে নিঃসঙ্কোচে তুমি আমার পাশে এসে হাতে হাত বেঁধে দাঁড়াও। এখানে গ্রামের লোক আমাদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে। অনেক কুৎসা কর্‌ছে। সে-সবের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌তে হ'বে। তুমি এসে আমার বাহুতে নূতন শক্তি সঞ্চার কর, প্রাণে উদ্দীপনা দাও।"

প্রবাল তার হাতখানি সেবার দিকে প্রসারিত ক'রে বল্‌লে—"তোমার আপত্তি না থাকে ত সেবা এই হাত তুমি গ্রহণ ক'রে তোমার সম্মতি আমায় বুঝতে দাও। যদি কোনো আপত্তি থাকে তাতেও কুণ্ঠিত হ'য়ো না। তুমি যেখানেই থাক যে-ভাবেই থাক আমায় তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী ব'লেই মনে রেখ।"

সেবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বল্‌লে—"আপনি আমার অসহায় অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে"—

প্রবাল তার কথা, শেষ হবার আগেই বক্তব্য বুঝে নিয়ে জবাব দিলে—"না সেবা, আমার প্রতি তুমি অবিচার করো না। বালবিধবারা চিরকালই আমার করুণার পাত্রী, সে অকাট সত্য কথা। কিন্তু তোমায় আমি সেদিক্ থেকে ভালবাসিনি; তোমার বাইরের রূপও আমায় মুগ্ধ করেনি; তোমার অনিন্দ্যসুন্দর হৃদয়খানিই আমায় মুগ্ধ করেছে। তাই আজ আমি তোমার দুয়ারে ভিখারীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছি।"

"যান্ আপনি"---ব'লে সলজ্জ মধুর হাসিতে সেবা প্রবালের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলে। প্রেমিক তার প্রেয়সী নারীর কাছ হ'তে এর বেশী স্বীকারোক্তির আশা কর্‌তে পারে না। একটুখানি হাসি, একটিবারের চকিত চাহনি; পলকের ইঙ্গিত নিয়েই যাদের কার্‌বার, বাজে কথার বোঝায় তাদের দর্‌কার কি?"

প্রবাল সাহস ক'রে সেবার হাতখানি নিজেই তুলে নিয়ে নিজের মুঠার মধ্যে চেপে ব'লে উঠল—"তা হ'লে সেবা, আজ হ'তে তুমি আমার। আর আমার কোনো দ্বিধা নেই, আজ হ'তে আমি সকল বিরোধের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত।"

সেবা তার হাত ছাড়িয়ে নিলে না। তার বক্ষের

স্পন্দন দ্রুত তালে হ'তে লাগল। তার সর্ব্বাঙ্গে পুলকানুভব, মনের মধ্যেও প্রথম প্রেমানুভব যেন শরীরের শিরায় শিরায় নূতন মাদকতার সৃষ্টি ক'রে চল্‌ল। কাণে তার বাজতে লাগল—প্রেমাস্পদের গভীর কণ্ঠস্বরের মধুরতর প্রণয়-নিবেদন। আর প্রবাল ? জয় করেছে, সে জয় করেছে। আজ সে জয়ী, বিজয়-গর্ব্বে তার হর্ষোন্মত্ত বুকের মধ্যে নেচে উঠতে লাগল। সেবা! সেবা! সেবা আর সুদূরের কল্পনা নয়, সে এখন তারই একান্ত আপনার ধন। সেবার আধনিমিলীত চক্ষু দুটি, রক্ত কিশলয় তুল্য ঠোঁট দু'খানি, স্তিমিত আলোকে শুভ্র সুন্দর ঈষৎ পাণ্ডুর মুখখানি যেন ছবির মত মনে হচ্ছিল। মনের আবেগে প্রবাল একবার অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে পরক্ষণে সেবার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের বুঁকের উপর দুই বাহু বেঁধে গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"এখন আসি, সেবা। কেদার এলেই সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। বোঠান একটু ঘাবড়ে গ্যাছেন বটে, কিন্তু কেদার বলেছে সে কিছু না, পরে ঠিক হ'য়ে যাবে। নূতনকে মানুষ সইতে পারে না, পরে অভ্যেস হ'য়ে যায়।"

প্রবাল বিদায় নিলে, সেবার নূতন অনুভূতি আবার তাকে নূতন চিন্তা-রাজ্যে পৌঁছে দিলে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

মহুয়াফুলের ব্যথা

শ্রী কৃষ্ণধন দে

স্বপনের নেশা টুটেনি এখনো নয়ন-কোণে,
　　এখনো রয়েছে রাতি,
সারাটি রজনী জেগে আছি হেথা মধুকবনে
　　মিলন-শয্যা পাতি';
　বিদায়ের দিনে উত্তর বায়ু কেঁদে যায়,
　যেতে যেতে তবু পায়ে পায়ে তার বেধে যায়,
　শেষ চুম্বনে ঝরা পাতা করে 'হায় হায়'
　　রিক্ত কানন-তলে
নিঃস্ব তরুর ধুসর বক্ষ ভরে
　　শিশির-অশ্রুজলে।

ব্যর্থ বাসর, শুষ্ক কুসুম, তৃষিত প্রাণ,
　　ছিন্ন বীণার তার,
গিয়াছে ফুরায়ে জীবনের যত আশার গান
　　নাহি,—নাহি কিছু আর!
　এস একবার—শেষবার বুকে মোর,
　মহুয়াবনের যৌবন-মনোচোর
　তিলে-তিলে-রচা মুকুল-স্বপন-ডোর
　　ছিঁড়ো না নিঠুর হাতে,
দিও না ফিরায়ে যৌবন-নিবেদন
　　একটি ফাগুন রাতে!

তন্দ্রা-জড়িত অলস নয়নে ফিরিয়া চায়
　　রাকা শশী বারে বারে,
মেঘবালা আসি' হাতে ধরি' তারে লইয়া যায়
　　অস্ত-সায়র-পারে;
　ঝিকিমিকি ঢেউয়ে রূপালীর পাল তুলি'
　হেসে ভেসে যায় কুয়াসার মেয়েগুলি,
　সারা যৌবন কাঁদে আজি পথ ভুলি'
　　অনাদরে অভিমানে,
ম্লান উষা তারা উপহাস-ভরা আঁখি
　　চেয়ে আছে মোর পানে!

শত কামনার ফণী-বেষ্টনে নিপীড়িত সারা হিয়া
　　শিহরিছে বারে বারে,
ডাকে উষা ওই মরণের দেশে আবাহন-লিপি নিয়া
　　জীবন-অস্তপারে।
　এতটুকু দেরী সহেনি কি তা'র আজ?
　যেতে হবে ফেলি' অভিসার-ফুলসাজ?
　এ জীবনে শুধু একটি মিলন-সাঁঝ
　　এল আর গেল ফিরে!
সবখানি গান হ'ল নাক আর গাওয়া
　　মরণ-সিন্ধু-তীরে!

জিজ্ঞাসা

(৬৪)

শোদব্রত
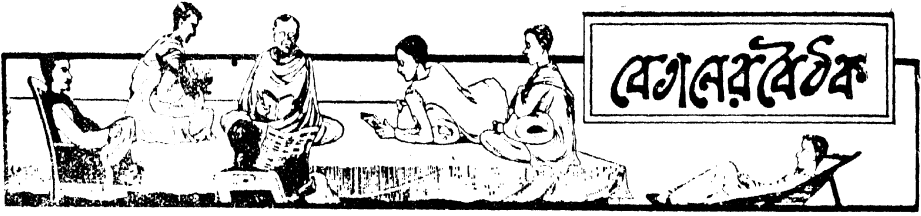
"শোদব্রত"—যাহা পৌষসংক্রান্তিতে করণীয়, উহার ভাষাগত অর্থ কি এবং কতদিন হইতে প্রচলিত?

"শোদো ভাসে, আমার ভাই হাসে"—

ইহার অর্থ কি?

শ্রী গৌরদাস শ্রীমানি

(৬৫)

চক্ষু চিকিৎসা

চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে (চক্ষুতে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি) বাংলাতে কোন পুস্তক আছে কি না? থাকিলে কাহার কৃত, কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত?

শ্রী প্রমথনাথ গোস্বামী

(৬৬)

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা

ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যশিক্ষার বিদ্যালয় আছে (School of Arts and Sculpture)? তাহাদের নাম ও ঠিকানা কি?

শ্রী অতুলকৃষ্ণ সোম

(৬৭)

প্রেমামৃত

'দ্বিজ চৈতন্যদাস বিরচিত গোপাল-চরিত' নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থ অদ্যাপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না? হইলে উহা কোথা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে? দ্বিজ চৈতন্য বিরচিত কেলিখণ্ড, ভাবখণ্ড, পাকখণ্ড ও দানখণ্ড নামক খণ্ড চতুষ্টয় সমন্বিত 'প্রেমামৃত' নামক কোনও গ্রন্থ আছে কি না। এই 'প্রেমামৃত' কি গোপাল-চরিতের নামান্তর মাত্র? গ্রন্থকর্তা দ্বিজ চৈতন্য দাস বা দ্বিজ চৈতন্য কে? ইনি কি সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৬৮)

এরিওপ্লেন চালনা ও বেতার-বার্ত্তা শিক্ষা

এরিওপ্লেন-চালনা বিদ্যা ও বেতার বার্ত্তা শিক্ষা করিবার কোন বিদ্যালয় ভারতবর্ষে আছে কি?

শ্রী সূর্য্যকুমার রায়

(৬৯)

বিধবা-বিবাহ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোথাও হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ হইয়াছিল কি না? কয়টি বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিচয় জানা সম্ভব কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনের পর হইতে বঙ্গদেশে মোট কতগুলি বিধবা-বিবাহ অদ্যাবধি হইয়াছে? কতগুলিই বা রীতিমত রেজেষ্ট্রী করিয়া হইয়াছে? কতগুলিই বা হিন্দুমতে হিন্দুপুরোহিত দ্বারা হইয়াছে। কেহ বিশদ ভাবে, সংবাদগুলি দিতে পারিবেন কি?

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৭০)

বাংলার নৌবল

রামায়ণের যুগে বাংলার নৌবলের কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(৭১)

পান-মুদ্রা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা পানের (Pana মুদ্রা বিশেষ) উল্লেখ দেখিতে পাই। উহা কোন্ ধাতুদ্বারা তৈয়ার হইত? বর্ত্তমানকালে উহার মূল্য কত কেহ জানাইলে সুখী হইব।

শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল

—

মীমাংসা

(৩৪)

ননদ ও ননাস

"ননদ" শব্দ, সংস্কৃত ননন্দা (মূল শব্দ ননন্দ) পদের বাঙ্গালা রূপ। 'ননদ' অকারান্ত হওয়ায় উহা কতকটা পুংলিঙ্গের মত শুনায় বলিয়াই বোধ হয় উহার "ননদী" ও "ননদিনী"—এই দুইটি রূপও আছে। যথা—দাশরথিতে—

"ননদিনী বলো নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।"

এবং—

"ওগো ননদী, তুই কেবল চিনলি না
আমার কৃষ্ণধন।"

"ননাস"—'ননন্দৃ শ্বশ্রূ"—শব্দজাত। শ্বশ্রূ হইতে "শ্বাস" হয়। বাঙ্গালায় যাহাকে শাশুড়ী বলে, একটু পশ্চিমেই তিনি "শাস"। বাঙ্গালায় কেবল "শ্বাস" এর প্রচলন অধিক হয় নাই। কিন্তু অন্য শব্দ যোগে শ্বশ্রূ বা শাশুড়ী 'শাস' হইয়াছেন। যথা—মাইশাস, (মাসী-শাশুড়ী), পিস্শাস (পিসী-শাশুড়ী), আইশাস (মাতামহী-শাশুড়ী)। পতির কনিষ্ঠা ভগিনী—ননদ, ননদী, ননদিনী। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্বশ্রূ তুল্য এজন্য তিনি "ননদ-শাস" 'ননদ-শাস' শব্দের মধ্যস্থিত দ ও শ লোপ হইয়া—"ননাস"। আমাদের এপ্রদেশে এখনও "ননাস" শব্দের ব্যবহার

আছে। ননদ বা ননদিনী অনেক সময়েই সখী তুল্য ; কিন্তু 'ননাস'' বিশেষ সম্মানার্হ।

পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুর তুল্য ; এজন্য তিনি ভাশুর অর্থাৎ ভ্রাতৃ+শ্বশুর। ভ্রাতৃ+শ্বশুর, ভাই+শ্বশুর, ভা+শ্বশুর, ভা+শুর ; এইরূপ ক্রমবিবর্ত্তনে ভাশুর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 'ননাস' ও এইরূপ ক্রমবিবর্ত্তনে অর্থাৎ ননন্দ+শ্বশ্রূ, ননদ+শ্বশু, ননদ+শাশু, ননদ+শ্বাস, নন+আশ, ননাশ পদ হইয়াছে।

শ্রী রসিকচন্দ্র বসু

(৬২)

''দাশ'' শব্দ

"দাশ'' শব্দে বৈদ্য জাতি বুঝায় এমন কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি বুঝাইতে "দাশ'' শব্দের প্রয়োগ আছে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ জাতির একটি শাখা, তজ্জন্যই প্রাচীনকাল হইতে এই জাতির মধ্যে দাশ উপাধি প্রচলিত। ''দাশ'' কৈবর্ত্ত বুঝাইলেও তাহারা উহা উপাধিরূপে ব্যবহার করে কি না সঠিক বলা যায় না. নাম বলিতে তাহারা তিলকদাস, কৈবর্ত্তদাস, ঝালোদাস বলে। পক্ষান্তরে গয়ালী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই উপাধি দৃষ্ট হয়। উৎকল বৈদিক ব্রাহ্মণদেরও এই উপাধি আছে, তাহাদের কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায়।

''কর শর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদ্গল্যো দাশ শর্ম্মা চ গুপ্ত শর্ম্মাচ কাশ্যপঃ।।''

তাঁহারা দাশ কথার পর শর্ম্মা ব্যবহার করেন। চৈতন্য চরিত গ্রন্থে লিখিত আছে বৈদ্য সদাশিব কবিরাজের চারিজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিষ্য ছিলেন—

''তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্য যাদবাচার্য্য পণ্ডিতঃ।
দেবকীনন্দনো দাশঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।"

দেবকীনন্দন দাশের "দাশ'' কথাটি উপাধি ভিন্ন (দাস) নামৈকদেশ নহে তাহা হইলে সমাসবদ্ধ করিয়া লিখিতে হইত, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন হয়, উপাধি বলিয়াই পৃথক্‌ভাবে লিখিতে পারা গিয়াছে। দেবকীনন্দন দাশের বংশধরগণকে অল্প অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যায় ; তাহারা এখন গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন।

পাণিনি ব্যাকরণে সূত্র আছে ''দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে।" দানের পাত্রকে দাশ বলে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের দান গ্রহণের অধিকার শাস্ত্রসম্মত নহে, এইজন্য দাশ শব্দে ব্রাহ্মণ। সিদ্ধনাথ বিদ্যা-বাগীশ গূঢ় প্রকাশিকা টীকায় বলিয়াছেন "দাশ ইতি পাঠে দাশৃ দানে অত্রাপি সম্প্রদানে অচ দাশ ঋত্বিক।" মহেন্দ্রশর্ম্মা কৃত প্রদীপিকা টীকায় বলেন ''দাসঃ দন্ত্যান্তঃ মতান্তরে তালব্যান্তঃ দীয়তে নিদেশঃ মৎস্যাদি মূল্যঞ্চ যস্মৈ ইত্যচ। দাসোভৃত্যঃ কৈবর্ত্তোবা, দাশ ইতি ঋত্বিজি।" ইহা হইতে জানা গেল কৈবর্ত্ত বা ধীবরার্থে "দাশ" শব্দের শকার মতান্তর প্রয়োগ। মৎস্যাদির মূল্য, ভৃত্যের বেতন, রজককে বস্ত্রদান মুখ্যসম্প্রদান নহে, গৌণ সম্প্রদান, সুতরাং তদর্থে ''শ'' শিষ্ট প্রয়োগ নহে। ঋত্বিক অর্থেই দাশ শব্দ ব্যবহার্য্য। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে ৯০ সূত্রে দনৃশ ধাতুর উত্তর নট প্রত্যয় যোগে ধীবরার্থক দাশ শব্দটি নিষ্পন্ন হইলেও ২০৪ সূত্রে ''পুংসি ঘঞ্ কারকেচ'' ইহার টীকায় লিখিত আছে "তালব্যান্ত দাশৃ দানে দাশন্তি অস্মৈ দাশো বিপ্রঃ।'' এস্থলেও দাশ অর্থে ব্রাহ্মণ করা হইয়াছে। যাহা হউক কৈবর্ত্ত অর্থে দাশ বা দাস লেখা লেখকের ইচ্ছাধীন। মহাভারত ও মনুর মূল লেখক উহা কি ভাবে লিখিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ছাপার অক্ষর বা হস্তলিখিত পুথিতে কৈবর্ত্তার্থে দাশ শব্দটি লিপিকরের ইচ্ছায়ই ঐরূপ "শান্ত'' লিখিত হইয়াছে বলা যায়। দাশ উপাধির বৈদ্যগণ তাহাদের জাতি বুঝায় এইরূপ ভাবেই তাহার নাম লিখিয়া থাকেন।

শ্রীশারদাপ্রসন্ন দাশ

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১৮)

পূজার আর দেরী নাই। সমস্ত সহরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে কাপড়ের দোকানে শাড়ীর জরিদার আঁচলের বাহার দেখিয়া চোখ ঝলসিয়া যায়, ক্রেতার ভিড়ে এক ঘণ্টার আগে একটা কাজ সারিয়া বাহির হইবার জো নাই। সবাই সস্তার চমকের সন্ধানে ঘুরিতেছে, দোকানীরাও রঙের বাহারের ছুতায় ভুয়োমাল সস্তায় দিয়া পয়সা লুটিতেছে।

এমন দিনে গৃহস্থেরা যে বসিয়া নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাদের ঘরে পূজা তাহারা ত দুইমাস আগে হইতেই নানা আয়োজনে মাতিয়া রহিয়াছে। যাহাদের তাহা নয়, তাহারাও ঘরের ছেলেমেয়ে, বৌঝিদের গহনা কাপড় নূতন কুটুম্বের তত্ত্ব-তল্লাস ইত্যাদির ভাবনায় ব্যস্ত। টাকা যোগাড় হওয়া চাই, মনের মত জিনিষ না হইলে ছেলেমেয়ে অভিমান করিবে, কুটুম্ব-কুটুম্বিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন।

হরিকেশব বাড়ী নাই, তাই এবার হরিসাধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মেজ-দাদার সন্তান-সন্ততি নাই, কাজেই তাঁহার কোনো আপদ-বালাইও নাই। কিন্তু হরিসাধন যে লোভ করিয়া জমিদারের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন, তাহার ঠেলা ত সাম্‌লাইতে হইবে। জমিদার-গৃহিণীর মন যে কিসে ওঠে তাহা তাঁহার একেত ঠিক জানা নাই, কারণ তাঁহার গৃহিণী নিতান্তই দরিদ্রের কন্যা বলিয়া এত বয়সেও আমিরী গহনা পোষাকের আইন-কানুন বিন্দুমাত্র দখল করিতে পারেন নাই; তাহার উপর নূতন এক ফ্যাকড়া উঠিয়াছে গৌরীকে উপলক্ষ করিয়া। সত্য মিথ্যা ও কল্পনার মশলায় মিশাইয়া গৌরীর শ্বশুর-বাড়ীতে তাহার সম্বন্ধে যেসব গল্প রটিয়াছে তাহাতে সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ হইয়াছে হরিকেশবের "ছোটলোকত্ব" ও নীচবংশ। সুতরাং হরিসাধনের মেয়ের শ্বশুর-বাড়ীর উচ্চমুখ নীচু করিয়া বাপের বাড়ী আসা চলে না। হরিসাধন তাই ভাবিতে বসিয়াছিলেন অর্থের মর্য্যাদা দিয়া কি করিয়া আপনার বংশগৌরবটা বৈবাহিকের কাছে সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। তাঁহার পুঁজি বিশেষ নাই, অথচ দেখাইতে হইবে যে, কেবল পূজার তত্ত্বেই মেয়ে-জামাইকে তিনি পাঁচ সাত শ' অনায়াসে ঢালিয়া দিতে পারেন। পারিলে তাহার দ্বারা গৌরীর দুর্নাম যে বহুল পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া যাইবে সে-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই।

মেয়ের বিবাহের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত এই গৌরীটা তাঁহার সকল কাজে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, আবার এই গৌরীর পিতাই সহায় না হইলে তিনি কোনো বিঘ্ন খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না; এমন অবস্থায় সে মেয়েটাকে অভিসম্পাত করিবেন, কি আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাও তাঁহার এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল। বংশগৌরব সপ্রমাণ করিবার জন্য যে কাঞ্চনমূল্য প্রয়োজন তাহা ত হরিকেশব ভিন্ন আর কাহারও নিকট মিলিবে না। এমন সদাশিব দাদার বুড়াবয়সে এই কুগ্রহ মেয়েটা না জন্মাইলে সৃষ্টির কোনো অপকার হইত না; তবু মাঝে হইতে বিধাতা কেন যে এমন একটা খেলা খেলিয়া তাঁহাদের সকল সাধে বাদ সাধিতে বসিলেন তাহা হরিসাধন ভাবিয়া পান না। বিধাতার কোনো শত্রুতা সাধন তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া ত মনে পড়ে না।

যাহা হউক কোনো প্রকারে কাজটা ত উদ্ধার করিতে হইবে। ছোট গিন্নির আটপৌরে চুড়ী হইতে দুইগাছা লইয়া মেয়ের জন্য মাথার তিনটা সাপকাঁটা গড়াইয়া আনা হইয়াছে। বিবাহের সময় মাথায় শুধু চিরুণী ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় নাই। সেটা এবার পুরাইয়া দেওয়া দরকার। সস্তায় একটা বেনারসী শাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সেটার দাম যে ৩০৲ টাকার বেশী নয় তাহা কি আর জমিদার-গিন্নী দেখিবামাত্র ধরিয়া ফেলিবেন না? গত বৎসর জামাই ছোট গিন্নীকে প্রণাম করিয়া একখানা গরদের শাড়ী দিয়াছিল, সেটা তাঁহার আজও পরা হয় নাই। সেইখানাই বড় বেয়ানকে পূজায় দেওয়া চলে কি না হরিসাধন ভাবিতে বসিয়াছিলেন। কি জানি যদি তাহারা বুঝিতে পারে তাহা হইলে যে লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিবে না। অনেক জোড়া তালি দিয়াও তত্ত্ব ১৫০৲ টাকার উপর উঠিতেছে না; কি করিয়া যে ইহা বড়লোকের সাম্‌নে ধরা যাইবে তাহার ঠিক নাই। এই সামান্য জিনিষ তাহাদের চোখে মোটে লাগিবেই না। অথচ গৃহিণীর গায়ের গহনা আর বেশী বেচিলে শৈল মেয়েটার বিবাহের সময় যে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। তাহারও ত বয়স আর নিতান্ত কম নাই।

অন্দরের বারান্দায় থালায় থালায় শাড়ী জামা, ধুতি-চাদর গহনা, সাবান চিরুণী, খেল্‌না, তেল, এসেন্স, দই, সন্দেশ, খাজা, মনোহরা সাজাইয়া বড়ঠাকরুণ, মেজগিন্নী, ছোটগিন্নী, লাবণ্য, শৈল, নূতন বৌ, শোভনা সকলে মিলিয়া দেখিতেছিলেন কুটুম-বাড়ীতে গিয়া তত্ত্ব নামাইলে দেখিতে কেমন লাগিবে। জিনিষের পরিমাণ যতই কম হউক, থালার সংখ্যা বাড়াইয়া তাহা জমকালো করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। ছোট গিন্নী বলিলেন, "বেশ ত দালানভরা হয়েছে মা, এতেও কি নিন্দের কিছু আছে?"

লাবণ্য বড় লোকের মেয়ে; সে বলিল, "না কাকীমা, একখানা মাত্র ত শাড়ী; তোমার ও বুটিদার জামার পাশে

শাড়াটা বড় খেলো দেখাচ্ছে। শাড়ীই হ'ল আজকাল-কার মেয়ের আসত শোভা।"

মেজগিন্নী বলিলেন, "তাত হ'বেই মা; জামার ও কাপড়ের টুকরোটা ত আজকের বাজারের খেলো মাল নয়। ও আমি সে বচ্ছর সেজমামীকে দিয়ে কাশী থেকে আনিয়েছিলাম। আমার জামা হ'য়ে ওটা বাঁচল, তাই ময়নার তত্ত্বে এবার দিয়ে দিলাম।" শাশুড়ী ননদ, বৌ, ঝি এমন কি দাসী চাকরের সামনেও একথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে মৃণালিনী একটু চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "তা ভাই, দিয়েছ বেশ করেছ। তোমার ছেলেপিলে থাকলে আমরাই কি আর কিছু দিতাম না? এই ত সেদিন গৌরীকে শাড়ী কিনে পাঠালাম। কিন্তু সে কথা কি আর সবাইকে বল্‌তে গিয়েছি?"

"কিসের শাড়ী, ভাই ছোট-বৌ?" বলিতে বলিতে তরঙ্গিণী আসিয়া বারান্দায় পা দিলেন। পিছন পিছন গৌরী লজ্জিত ও বিস্মিত মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এত-কাল পরে বাড়ী আসিয়া তাহার চোখে সব কিছুই নূতন লাগিতেছিল।

"ওমা, দিদি কোথা থেকে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া মৃণালিনী হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তরঙ্গিণীর পায়ে মাথা ঠেকাইলেন। শাড়ী জামার কথা কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। মৃণালিনীকে নূতন গল্প রচনা দ্বারা রচিত গল্পের লজ্জা ঢাকা দিতে হইল না। শাশুড়ী ছুটিয়া আসিয়া বধূকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। "মাগো, আমার ঘরের লক্ষ্মী এতকাল পরে ঘর আলো করতে এসেছ, মা?"

লাবণ্য একমুখ হাসি লইয়া "কোনো খবর না দিয়েই মা আমাদের চমকে দিয়েছেন," বলিয়া প্রণাম করিতে আসিতেই তরঙ্গিণী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। মেজ ছেলের বউটি লাবণ্যের পিছু পিছু একহাত ঘোমটা টানিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আপনি অগ্রসর হইয়া শাশুড়ীকে গিয়া সম্ভাষণ করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। লাবণ্যের খোকা এখন বড় হইয়াছে, ঠাকুমাকে সে চিনিতে পারে নাই। লাবণ্যের শাড়ীর আঁচল দুই হাতে চাপিয়া তাহার আড়ালে মুখখানা লুকাইয়া সে নবাগতাদের উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। নূতন একটি খুকী সর্ব্বাঙ্গে ধূলা-মাটি মাখিয়া তাহার পায়ের কাছে হামা দিয়া আসিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া সহাস্যে এই মিলন উৎসবে আপনার সহানুভূতি জানাইতেছিল।

তরঙ্গিণী একে একে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া অশ্রুর আদান-প্রদান করিয়া নাতি-নাতিনীদের লইয়া পড়িলেন। তাহারা যে কেহই তাঁহাকে চিনিল না ইহাই হইল তাঁহার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ।

গৌরী নিজের পুরাতন দরবারে সে প্রতিষ্ঠা আর গড়িয়া তুলিতে পারিতেছিল না। যাহারা ছিল তাহার সমবয়সী তাহাদের সে কোনো ঠিকানাই পাইল না। মেয়েরা কেহ বা শ্বশুরঘর করিতেছে, কেহ বা সদ্য স্বামীগৃহ হইতে নূতন প্রণয়ের গল্প লইয়া আসিয়া বড় বোন ও ভাজদের দলে মিশিতেছে। ছেলেরা যাহারা তাহার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা এখন অন্দরে খেলিতে আসাই শিশুজনোচিত ব্যাপার বলিয়া যথাসাধ্য অন্দরের ছায়া এড়াইয়া চলে। ইস্কুলের বন্ধুরা যদি শোনে যে, তাহারা মেয়েদের সঙ্গে খেলে তাহা হইলে সেখানে কি আর মুখ দেখানো যাইবে? কাজেই একেবারে শিশুদের ছাড়া আর কাহাকেও গৌরী দলে পায় না।

কিন্তু সাংসারিক দিক দিয়া গৌরী সমবয়স্কাদের অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিলেও মনটা ত তাহার শৈশবের গণ্ডীতে আর আবদ্ধ নাই। বয়স, শিক্ষা ও দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা তাহার মনকে অনেক দিক্ দিয়া সমবয়স্কাদের চেয়েও বেশী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; বিশেষ করিয়া এই নূতন অভিজ্ঞতার ফলে তাহার কৈশোরের নব-জাগরণের ভিতর পরিণত বয়সের একটা গাম্ভীর্য্যের, একটা সংযমের উন্মেষও দেখা দিয়াছে। তাহার এ মন লইয়া সে কিশোরী যুবতীদের দলে স্থান পায় না, শিশুদের দলে মিশিতে চায় না। এই মনুষ্যের অরণ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া সে যেন আরো নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চিন্তা আরো বাড়িয়া গিয়াছে, হাসি আরো শুকাইয়া যাইতেছে, স্ফূর্ত্তি যেন মরিয়া যাইতেছে। এত-দিন সে একলা ছিল; আপনার মনে আপনার খেয়াল

খুসী লইয়া দিন কাটাইয়া দিত। এখন বহুর মাঝখানে আসিয়া পড়াতে একলার খেয়াল খুসী তাহার পদে-পদেই বাধা পাইতেছে, ঠোক্কর খাইতেছে; লজ্জা-সঙ্কোচও তাহাকে পরের দিকে চাহিয়া চলিতে বলিতেছে। সুতরাং একলার আনন্দলোক তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ বহুর যে উৎসব-কোলাহল সেখানে তাহার কণ্ঠ নীরব বলিয়া সেখানেও তাহার ঠাঁই নাই। শৈশব ও যৌবনের মাঝখানে কৈশোর যে আছে তাহা তাহাদের পরিবারে দেখা যাইত না। শিশু কুমারী এখানে দুইদিনে নবযৌবনা বধূ ও মাতা হইয়া উঠে, কিশোরীর স্বপ্নলীলা ও ধীর জাগরণের স্থান এখানে নাই। গৌরীর দুর্ভাগ্য তাহাকে এই অকালযৌবনের হুড়াহুড়ির হাত হইতে বাঁচাইয়াছিল, তাই এই অজ্ঞাতকৈশোর সখী সাথীদের দলে সে দিশাহারা হইয়া কোথায় যাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এককালে ময়না তাহার বড় বন্ধু ছিল। এবার আসিয়া ময়নাকে না দেখিয়া সে মনে করিতেছিল হয়ত তাহাকে পাইলেই তাহার নিঃসঙ্গ মন খুসী হইয়া উঠিবে। আসিয়াই সে কাকীমাকে ধরিয়াছিল "কাকী-মা, ময়নাকে শীগগির ক'রে নিয়ে এস; সে না থাকলে বাড়ীতে আমার ভাল লাগে না।"

কাকীমা বলিলেন, "আনতে ত চাই, মা। কিন্তু সে আজকাল মা দুর্গার কৃপায় বড় ঘরের বৌ হয়েছে, আমরা তু করলেই ত আর আসতে দেবে না। তেমন তেমন দেওয়া-থোওয়া হ'ত ত সাহস ক'রে আসবার কথা বলতে পারতাম।" গৌরীর উপর রাগটা আজ আর কাকীমা ঝাড়িলেন না।

বড় ঘরের বৌ কেন যে মা ডাকিলেও আসিতে অক্ষম হইয়া পড়ে গৌরী তাহা ঠিক বুঝিল না; কিন্তু তবু সে বলিল, "কি দিতে হ'বে, কাকীমা, গয়না কাপড়? টাকা নেই বুঝি? আচ্ছা, আমার গয়না কাপড় দিলে কিছু খারাপ হ'বে?"

গৌরী বড় হইয়াছে, কাজেই এবার ভয়ে-ভয়ে আপনার জিনিষ দিবার প্রস্তাব তুলিল। কি জানি যদিই কাকীমা কিছু একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় চটিয়া যান। কাকীমা কিন্তু চটিলেন না। এতকাল নিজে সংসার চালাইয়া তাঁহার মেজাজটা এখন আর তেমন অযথাকালে চড়া হইয়া উঠে না। তিনি শুধু বলিলেন, "খারাপ কেন হ'বে, মা? তুমি আপনার বোন, তোমার জিনিষে তার কখন খারাপ হ'তে পারে? তবে তোমার মা বাবা না দিলে তোমার কাছে ত আমি নিতে পারি না।"

মৃণালিনীর স্বর এত নামিতে দেখিয়া গৌরী বিস্মিত হইল। বিদেশে যাইবার সময় সে ত কাকীমাকে তাহার উপর চটাই দেখিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে আজ প্রসন্ন দেখিয়া সে ছুটিয়া মার ঘরে গিয়া নিজের হাতের এক জোড়া নূতন চুড় বাহির করিয়া বলিল, "মা, এটা আমি ময়নাকে দেব; তুমি কিন্তু কিছু বলতে পা'বে না।"

মা বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিলেন, "কেন রে, আবার ওসব কি কর্‌ছিস? শেষে তোর কাকা চ'টে মারতে আসবে।"

গৌরী বলিল, "না, কাকীমা বলেছেন ভাল জিনিষ না দিলে ময়না এখানে আসতে পা'বে না।"

মা আর কিছু বলিলেন না। গৌরী গহনা লইয়া একেবারে কাকীমার হাতে গিয়া তুলিল। বলিল, "শাড়ী-গুলো সব পরা, কাকীমা, ওরা দেখলেই বুঝতে পারবে। এই চুড়জোড়া খুব ভাল, পেলে ময়না খুব খুসী হবে। মা কিছু বলবেন না বলেছেন। তবে এইবার ওকে আনতে পাঠিয়ে দাও। এ পরে ত বেশ আসা যাবে, নয় কাকীমা?"

কাকীমা খুসী হইয়া গহনা লইয়া গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন; কিন্তু মুখে বাধিয়া গেল। কি আশীর্ব্বাদ এ ভাগ্যহীনাকে করা যায়, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অগত্যা শুধু আদর করিয়া চুড়জোড়া লইয়া বড় জাকে দেখাইতে গেলেন। কি জানি তিনি যদিই মনে করেন গৌরীকে ফুসলাইয়া কাকী গহনা আদায় করিয়াছে।

কেন যে ময়নার আসা হইতেছে না তাহা শঙ্করের চিঠি তরঙ্গিণীকে অতি নির্ম্মমভাবেই জানাইয়াছিল, সুতরাং মেয়ের গহনা দিয়া দেওরঝিকে আনাইবার ব্যবস্থায় তিনি এতটুকুও আপত্তি করিলেন না। বরং উপরি আর-কিছু টাকা দিয়া শাড়ীখানাও গহনার উপযুক্ত দেখিয়া কিনিয়া দিলেন।

গৌরীকে লইয়া বাড়ীতে যে ঘোঁট উঠিয়াছিল, ময়নাকে আনিতে যাইবার গোলমালে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। কারণ, ঘোঁটটা পাকাইয়াছিলেন ছোট গিন্নী এবং গৌরী ও তাহার মা'র কাছে সাহায্যটাও লইলেন তিনি; সুতরাং তাহাদের লইয়া মুখরোচক চর্চ্চাটা এখন তিনিই যথাসাধ্য নিবারণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

কুটুম্ববাড়ী যাইবার মত বড় ছেলে হরিসাধনের ছিল না। কাজেই হরিকেশবের পুত্র শঙ্করকেই যাইতে হইল। এই কুৎসাপরায়ণ অভদ্র কুটুম্বের বাড়ী যাইবার তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হরিকেশবের কথায় তাহার 'না' বলিবার উপায় ছিল না। সে অত্যন্ত চটিয়াও যাইতে বাধ্য হইল।

গৌরী বসিয়া ময়নার জন্য দিন গুণিতে লাগিল। তাহার ছেলেবেলাকার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের ভালবাসা ও কল্পনা মিশাইয়া সে যে, ময়নাকে মনে মনে গড়িতে লাগিল, সেই হইল তাহার মনের সকল সুখদুঃখের দরদী। বিদেশে পিতামাতাকে সে অনেকটা বন্ধুর মত পাইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ অবসর সমাপনের পর এখানে আসিয়া বিরাট সংসারচক্রের তলায় পড়িয়া পিতামাতার আর কন্যাকে সঙ্গ দিবার তিলমাত্র সময় ছিল না। কাজেই তাঁহাদের সে হিসাব হইতে বাদ দিয়াছিল। তাছাড়া তাহার এই কিশোর মন আজ আর শুধু পিতামাতার স্নেহ ও বাৎসল্য লইয়া খুশী হইতেও চাহিতেছিল না। তার সমস্ত মনটা গভীর ও মধুর একটা ভালবাসার স্রোতে কাহাকেও একেবারে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। চিরকালের পুরাতন পিতামাতাকে লইয়া ভালবাসার এ নূতন উন্মাদনা তাহার মিটিবার নয়। তাই সে তাহার অনাগত সখী ময়নার উপরই মনের সমস্ত নবলব্ধ সম্পদ মনে মনে উজাড় করিয়া ঢালিতেছিল।

শিশুকালেও ময়নাকে সে ভালবাসিত, কিন্তু তাহাতে এমন নিবিড় আগ্রহ ত ছিল না। কোথা হইতে ইহা আসিল? ইহা যে তাহার নারীত্বের জাগরণ মাত্র তাহা গৌরী বুঝে নাই। সে জানিত না যে তাহার নবজাগ্রত ভালবাসা পাত্র খুঁজিতেও শিখে নাই, তাই কল্পিত যে কোনো মানুষকে অবলম্বন করিয়াই আপনার আবির্ভাব সার্থক করিতেছে।

(১৯)

বেলা দ্বিপ্রহর। মহীধর মুখুজ্যের বাড়ীর খাসমহলের স্নান আহার চুকিয়া গিয়াছে। কর্ত্তাবাবুরা বাহির বাড়ীতেই নিজ নিজ কামরায় আবলুষ কাঠের নীচু পালঙ্কের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া ও গড়গড়া মুখে দিয়া গড়াইতেছিলেন। এক একজনের পিছনে দুইটা করিয়া চাকর হাত ও পা টিপিয়া দিবার জন্য লাগিয়াছিল। পায়ের কাছে জাজিমের উপর বসিয়া দুই চারজন আশ্রিত ও মোসাহেব তাহাদের নানা সুখদুঃখের কথা বলিয়া যাইতেছিল। মধ্যাহ্নের গুরুভোজন ও গরম হাওয়ায় সহিত অম্বুরী তামাকের ধোঁওয়া ও খস্‌খসের পাখার বাতাস মিশিয়া যখন বাবুদের চক্ষুতে তন্দ্রা ঘনাইয়া আসিতেছিল তখন দুই একটা হাসির গল্প বলিয়া ও নিজেরাই নিজেদের রসিকতায় প্রচুর হাসিয়া সুখান্বেষী এই বন্ধুগুলি তাঁহাদের জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল; না হইলে হয়ত সেদিনকার আসর হইতে শূন্য হাতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মেয়েমহলে নিদ্রাদেবীর প্রভাব আর একটু বেশী। গৃহিণীরা যে যাহার ঘরে পানদোক্তা মুখে দিয়া একটু বিশ্রামের চেষ্টাতে শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। দাসীরা কেহ ভিজা চুল আঙুলে চিরিয়া চিরিয়া শুকাইয়া দিতেছে, কেহ বা গৃহিণীর সুবিশাল দেহের ঘামাচিগুলি ঝিনুকে করিয়া মারিয়া দিতেছে আবার কেহ বা পদসেবায় নিযুক্ত। অল্পবয়সী ঝি-বৌরা এই অবসরে বেশ গলা ছাড়িয়া প্রাণের ব্যথা মনের কথার একটু আদানপ্রদান করিয়া লইতেছে; শাশুড়ীননদ মা জেঠির সামনে ত সব কথা বলা যায় না। পেট ফুলিয়া মরিলেও চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। মালিনী বাপমায়ের আদুরে মেয়ে, সে তবু সকলের সামনেই দু দশটা কথা বলিয়া লইতে পারে; আর কাহারও সে সাহস হয় না। কাজেই দুপুরবেলার এই তাসের মজলিসেই তাহাদের দৈনিক গেজেট আলোচনাটা হইয়া থাকে।

ছেলেবাবু ও পূজায় আগত নূতন জামাইবাবুরা বৈঠকখানার 'হলে' এখন কর্ত্তাদের আনাগোনা নাই জানিয়া পরম আনন্দে পায়ের উপর পা তুলিয়া সারা-

দিনের তামাকের ক্ষুধাটা মিটাইয়া লইতেছেন। গল্পও চলিতেছে এবং তাহার বেশীর ভাগই অশ্রাব্য বলিয়া জটলাটা জমিয়াছে ভাল। একটু বড়রা তাহাদের থিয়েটার বায়োস্কোপ ও বাগানবাড়ী প্রভৃতির অভিজ্ঞতা সালঙ্কারে বর্ণনা করিতেছে, ছোটরা হাঁ করিয়া তাহাই গিলিতেছে।

বাহিরে একটা গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেই তেওয়ারী দরোয়ান ঘরে ঢুকিয়া দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। সৃষ্টিধরের উনিশ বৎসরের পুত্র ক্ষিতিধর মুখের নলটা দাঁতে চাপিয়া লপেটাসমেত শূন্যোত্থিত পা'টা দরোয়ানের মুখের দিকে ঘুরাইয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "ক্যা মাংতা ?" তেওয়ারী আর একবার সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজী, বহুরাণীমাকো ভাই আপসে মুলাকাত করনে মাঙতে হেঁ।"

ক্ষিতিধর শায়িত শরীরটাকে তাকিয়ার উপর আর একটু খাড়া করিয়া তুলিয়া গলাটা যথাসম্ভব ভারী করিয়া মুরুব্বী চালে বলিল, "বোলাও।"

তেওয়ারী সেলাম ঠুকিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেই স্মিতহাস্যে ক্ষিতিধরকে সম্ভাষণ করিয়া শঙ্কর ঘরে ঢুকিল। ক্ষিতিধর উঠিল না, প্রণাম করিল না; গা হেলাইয়াই হাতখানা একটু বাড়াইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "এস হে ডবল শ্যালক; অনেকদিন পরে যে ?"

বয়সে ও সম্পর্কে ছোট ভগ্নীপতির এইরূপ প্রথম সম্ভাষণটা শঙ্করের পছন্দ না হইলেও সে মুখে কিছু বলিল না; কারণ পরিচয় নামমাত্র হইলেও শ্যালককে যে ঠাট্টা করা চলে সেটা তাহার বেশ জানা ছিল। তবু তাহাদের পরিবারে সে গুরুলঘু সমস্ত সম্পর্ক চিরকাল এত নিখুঁতভাবে মানিয়া চলা দেখিয়াছে যে, মনটা তাহার একটু বিরূপ না হইয়া গেল না। শঙ্কর ক্ষিতিধরের পাশে বসিয়া বলিল, "মা ময়নাকে পূজার তত্ত্ব করেছেন, লোকগুলো সব বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

ক্ষিতিধর গড়গড়ার নলটা মুখে করিয়াই চীৎকার করিল, "তেওয়ারী, মানদা ঝিকো বোলাও, মাসিমাকো পাশ ইয়ে লোগকো লে যায়েগা।"

"জি হুজুর" বলিয়া তেওয়ারী দৌড়াইল। ক্ষিতিধর তখন পকেট হইতে একটা সিগারেটকেস টানিয়া শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "দাদা, ধরাও একটা। শুক্‌নো মুখে কি কথা আসে ?"

শঙ্কর বলিল, "না ভাই, মুখে নুড়ো জেলে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমার দম আট্‌কে যাবে।" ক্ষিতিধর এইবার মুখের নলটা ফেলিয়া পায়ে একটা চাপড় মারিয়া একেবারে খাড়া হইয়া বসিয়া বলিল, "আরে রামঃ, আমার এমন মেম সাহেব বৌদির ভাই তুমি এমন সেকেলে ? সন্ধ্যে আহ্নিক কিছু কর্‌বে নাকি ত বল, ব্যবস্থা ক'রে দি।"

শঙ্কর বিরক্ত হইল; কিন্তু শুধু বলিল, "ওটা তুমিই পরে কোরো; আমার অত বেশী পুণ্যসঞ্চয়ের দরকার হবে না। ময়নার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে তোমার বাবার কাছে তাকে নিয়ে যাবার কথাটা বল্‌তে হবে।"

ক্ষিতিধর শঙ্করের পিঠটা বাঁহাতে চাপড়াইয়া বলিল, "হে, হে, রাগ কর্‌লে দাদা ? ব্রাদার-ইন্‌-লকেও যদি ছুটো কথা না বল্‌ব ত বাঁচ্‌ব কি ক'রে বলত। আমরা ত ভাই বিবেকানন্দ হইনি এরি মধ্যে, যে শালা-ভগ্নীপতিকেও গুরুঠাকুরের মত প্রণাম ক'রে পাদোদক খাব। যাক্‌, ওঠ, তোমার নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা না ক'রে আর বাজে বক্‌ব না।"

ক্ষিতিধর তেওয়ারীকে ডাকিল, তেওয়ারী খানসামাকে ডাকিল, খানসামা মানদাকে ডাকিল, মানদা মাসিমাকে খবর দিল, মাসিমা তুলসী ঝিকে ডাকলেন; সে গিয়া ময়নাকে খবর দিল। ময়না আবার তুলসী ঝির হাতে খানসামাকে তেল সাবান তোয়ালে দিয়া ক্ষিতিধরের স্নানের ঘরে শঙ্করের স্নানের ব্যবস্থা করিতে বলিল। একেবারে খাওয়ার সময়ের আগে তাহার দাদার সহিত দেখা হইবে না, কারণ পুরুষ চাকরের সাম্‌নে দাদার সঙ্গে গিয়া দেখা করা বৌমানুষের সম্ভব নয়।

ময়না ঘরে বসিয়া ছট্‌ফট করিতেছিল; তুলসী ঝি তাগাপরা হাত দুলাইতে দুলাইতে আসিয়া ডাকিল, "অ বৌরাণীমা, মাসিমা আপনার বাপের বাড়ীর তত্ত্ব নামাচ্ছেন, আপনাকে সামগ্‌গিরী দেখতে ডাক্‌লেন।"

একগলা ঘোমটা টানিয়া দাসীর সঙ্গে সঙ্গে ময়না মাসী

শ্বশুড়ার মহলে চলিল; একলা হট্‌হট্ করিতে করিতে যেখানে সেখানে যাওয়া বৌদের নিয়ম নাই।

জিনিষ দেখিতে মহীধর-মহিষী, কীর্ত্তিধর-গৃহিণী, মোহিনী, মালিনী ইত্যাদি সকলে জুটিয়াছিলেন। পূজায় ব্রজরাজের মা, বধূ কুসুমলতাকে লইয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছিলেন; তাঁহারাও তত্ত্ব দেখিতে দাঁড়াইলেন। ময়না সকলের পিছনে দাঁড়াইল, তত্ত্বের পরীক্ষায় তাহার পিতামাতা পাশ হইলে তবে সে মুখ তুলিতে পাইবে। মুখে অবশ্য নীরবই থাকিতে হইবে, কারণ মাত্র দুই বৎসরের কনে-বৌ কিছু গুরুজনের সামনে কথা বলিতে পারে না।

ক্ষিতির মাসিমা সবার আগে বলিলেন, "আমাদের ঘরের মত কি আর দিয়েছে? কোত্থেকেই বা দেবে? তবে গেরস্ত ঘরের পক্ষে নেহাৎ লোক-হাসানো হয়নি।" কুসুম মামীশাশুড়ীদের সাম্‌নে কথা বলে না। সে মালিনীকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ঐ কি আর দিত? এবার নেহাৎ মেয়ে নিয়ে ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে তাই লোকের মুখে চাপা দিতে দুপয়সা গাঁট থেকে বার করেছে।"

মালিনী বলিল, "আমাদের পুরানো বোয়ের নূতন বিয়ের তত্ত্ব থেকে বাঁচিয়ে সাঁচিয়ে পাঠিয়েছে বুঝি, নয়গা বৌদি?" মালিনী কুসুমের গায়ে ঠেস্ দিয়া চোখ টিপিয়া হাসিল। কুসুম ঘোমটার ভিতর হইতে তাহাকে চোখ রাঙাইবার ভাণ করিয়া হাসিয়া দুলিয়া উঠিল।

তুলসীঝিও হাত দুলাইয়া একটু টিপ্পুনি কাটিয়া লইল। তত্ত্বের থালার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, "বাবা, এই কি তত্ত্বের থালা? যেন জল খাবারের রেকাবী। মানুষ পাঠিয়েছে আটটা, বক্‌শিশ আদায় কর্‌তে, তা নামাবার কিছু থাক্ বা না থাক্। আমরা বৌরাণীমার গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে গেলাম সে বছর, একোটা থালা যেন দশমুনী, থালার ভারে ঘাড়ে গর্দ্দানে এক হ'য়ে যাচ্ছিল।"

মোহিনী ঝিএর কথায় খুসী হইয়া বলিল, "যা বলেছিস্ তুলসী! আমাদের বাড়ীর তত্ত্বই আলাদা। কেউ এলেন দুপয়সার পান হাতে ক'রে, কেউ এলেন চার আনার তরল আল্‌তা নিয়ে, একি আর এ বাড়ীতে শোভা পায়?"

ক্ষিতির মাসী হাসিয়া শাড়ী জামা ও চুড়জোড়া তুলিয়া বলিলেন, "নে, নে, রঙ্গ রাখ্। তুলি্যি দেবার আর ঘর পেলি না। কিসে আর কিসে! তা যাক্ সে কথা, এ গুলো ত নেহাৎ মন্দ দেয়নি। চুড় জোড়া আট ভরি ওজন হবে। শাড়ীখানাও কোন্ একশ টাকা না হবে? দিদির প্রণামী গরদ খানাও ত নেহাৎ ফেলা যায় না, আবার আমাকেও দিয়েছে দেখছি। দিদির নতুন বেয়ান কিন্তু পূজোয় এমন তত্ত্ব করতে পারেনি।"

মহীধরের গৃহিণী বলিলেন, "বেঁচে থাক্ আমার গঙ্গাধর, নতুন বেয়ান না দিলেও তার জিনিষ ঘরে ধরছে না। অনেক-দিউনীরা ত আমার ছেলেটাকে খেয়েছেন তাতেও আশ মেটেনি; তাই এবার নতুন লীলা সুরু করেছেন। তাঁদের পেন্‌নামীতে আমার কাজ নেই। আমি এই ব'লে দিলাম আমার ছেলের বৌ নিয়ে যদি ওরা এমন লীলাখেলা করে, তবে ওদেরই একদিন কি আমারই একদিন।"

এত জিনিষ ঘরে তুলিতে পাইয়া ক্ষিতিধরের মাসির মনটা আজ একটু প্রসন্ন ছিল। বাড়ীর বড় গিন্নীর মুখের উপর কিছু বলিতে তাঁহার সাহস না হইলেও কুটুম বাড়ীর ঝিদের তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিবার ইচ্ছায় তিনি বলিলেন, "এস গো বাছা, তোমরা জলটল খাওসে। অ তুলসী, এদের একটা ব্যবস্থা কর্ না বাপু। কুটুম বাড়ীর লোকের আদর আপ্যায়নও কি তোরা ভুলে গেলি?"

কুসুম মালিনীকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "মাসি যে দেখি বেয়াইএর তুকে একেবারে ভুলে গেলেন; শেষে কি বোয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে পাত পেতে আস্‌বেন?"

মালিনীও এইবার একটু চাপা গলায় বলিল, "মাসির আমাদের উদার মন, বোনাই বেয়াই সবাইকেই খুসী রাখ্‌তে চান। কখন কে কাজে লাগে বলা যায় কি? বোয়ের রকম দেখে হয় ত মাসিরও প্রাণে একটু আশা হয়েছে।"

কুসুম ও মালিনীর চোখে অর্থপূর্ণ হাসি ঝিলিক দিয়া উঠিল; সৃষ্টিধরের সংসারের মাথা এই বিধবা শ্যালিকাকে মুখে কেহ কিছু না বলিলেও আড়ালে কুৎসা করিতে কেহ

ছাড়িত না। তাঁহাকে লইয়াই যে কিছু একটা রঙ্গতামাসা হইতেছে বুঝিয়া ক্ষিতির মাসী "এস বৌমা" বলিয়া ময়নাকে টানিতে টানিতে ঘরে লইয়া চলিয়া গেলেন।

ততক্ষণে খান্‌সামা ও মানদাঝির মারফতে শঙ্কর ময়নার ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সকলের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে সুতরাং ময়নার ঘরেই একলা তাহার খাইবার আয়োজন হইয়াছে। মাসিমা, তুলসী ও মানদার ক্রমাগত আনাগোনার ঘটায় ময়না বেচারী শঙ্করের কাছে কোনো কথাই পাড়িবার সুযোগ পাইতেছিল না। একবার মাত্র ফাঁক পাইয়া সে বলিল, "শঙ্করদা, তুমি কি আমায় নিতে এসেছ? আমায় কি ভাই, ওরা যেতে দেবে? কুসুমদিদি গৌরীর নামে কি——"

মানদা আসিয়া বলিল, "বৌরাণীমা, রূপোর চিলিমটা আপনার খাটের তলায় প'ড়ে আছে, সেটা বার কর্‌তে হবে।"

ময়নার কথা আর শেষ হইল না। মুখ ধোওয়ার পর্ব্ব শেষ হইতেই একটু নিরিবিলি পাইয়া শঙ্কর বলিল, "কি বলেছে তোর কুসুমদিদি?"

ময়না বলিল, "কি জানি ভাই, সত্যি কি মিথ্যে, তোমরা যদি রাগ কর?"

শঙ্কর বলিল, "তুই কথাটাই বল্‌না আগে, তারপর রাগ করি কি না দেখা যাবে।"

ময়না বলিল, "সে সব বড় মন্দ কথা। কি ক'রে ভাই, তোমাকে বলব? এলাহাবাদে নাকি——"

নিঃশব্দে তুলসী ঝি আসিয়া বলিল, "নিধু খান্‌সামা বল্‌ছে যে ছোটরাজামশাই বৌরাণীমার ভাইকে দেখ্‌তে চান। এক ঘণ্টা বাদেই তিনি একবার কাছারি বাড়ী যাবেন।"

ময়নার কথা অসমাপ্তই থাকিয়া গেল; শঙ্করকে উঠিতে হইল। ময়নার বুকটা দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, না জানি শ্বশুরমহাশয় দাদাকে কি অকথা কুকথা বলিয়া বসিবেন। দীর্ঘ দিনের পর পিতৃগৃহে যাওয়া ত তাহার ঘটিবেই না, দাদা না অপমানিত হইয়া ফেরে।

সৃষ্টিধর অন্তঃপুর হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং শ্যালিকার রিপোর্ট ও রায় তাঁহার জানা ছিল। শঙ্করকে সেইটুকু সংক্ষেপে জানাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "কিহে ছোক্‌রা, কাকার দূত হ'য়ে এসেছ? তা ব'লে ফেল, কি বল্‌বার আছে।"

পিতা পুত্রের কথার ভঙ্গীতে শঙ্করের পিত্ত শুদ্ধ জ্বলিয়া যাইতেছিল; তবু রাগ চাপিয়াই সে বলিল, "পূজোয় সবাই বাড়ী আস্‌ছে, ময়না আর ক্ষিতিধরকেও বাবা মা, কাকা কাকীমা নিয়ে যেতে চান; আপনি অনুমতি দিলেই হয়।"

সৃষ্টিধর একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ হে বাপু, বৌমাকে পাঠাতে আমার তেমন আপত্তি কিছু নেই। ও সব ঘরে ঘরেই অমন অনেক কিছু হচ্ছে, বুঝলে কি না? এখানেই কি আর কিছু হয় না? তবে সময়মত হুসিয়ার হ'তে হয় এইটে বাবাকে ভাল ক'রে বোলো।"

ইঙ্গিতটা বুঝিতে শঙ্করের দেরী হইল না! সে বিরক্ত হইয়া কথাটা চাপা দিয়া বলিল "কাল কি তাহ'লে ওদের নিয়ে যেতে পারি?"

সৃষ্টিধর বলিলেন, "বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও, ক্ষিতি আন্‌তে যাবে এখন।'

শঙ্কর নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর বেশী কথা বলিবার বা শুনিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহীধরের দরোয়ান মাধো সিং সেলাম ঠুকিয়া পথরোধ করিল। শঙ্কর মুখ তুলিতেই বলিল "বড়রাজা মশাই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।"

দেখা করিতে চাহিবার কারণ অনুমান করিয়া শঙ্কর আগে হইতেই চটিয়া উঠিল। বড় লোক হইলে কি এমনই ছোটলোক হইতে হয়? আসিয়া পর্য্যন্ত আকারে ইঙ্গিতে কথায় বার্ত্তায় সে সকলের কাছে কেবল এক কথাই শুনিতেছে। এতটুকু মেয়ে গৌরী কি এমন পাপ করিতে পারে যাহার জন্য ছেলেয় বুড়োয় মিলিয়া আকার ইঙ্গিতে কেবল তাহাকেই খোঁচা দিতেছে ও বিদ্রূপ করিতেছে। গৌরী যদি তাহার বোন না হইয়া মেয়ে হইত তাহা হইলে বাড়ী গিয়াই সে তাহার একটা বিবাহ

দিয়া এই বড়মানুষদের একটু সমঝাইয়া দিত। এখানে নেহাৎ তাহার কিছু করিবার উপায় নাই, কারণ তাহা হইলেই হয়ত ময়নাকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে। না হইলে আর কিছু না হউক মুখের মত দু চারটা কথা শুনাইতে সে ছাড়িত না।

মাধোসিং শঙ্করকে মহীধরের ঘরের ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া সেলাম করিয়া সরিয়া গেল। মুখ হইতে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মহীধর বলিলেন "এসহে বাবাজি, তুমি না আমাদের ভূধরের শালা? তোমার নামটা ত ভুলে গেছি; তা যাই হোক্, তুমি বুঝি ক্ষিতির বৌকে নিতে এসেছ?"

কথাগুলো সাদাসিধে শুনিয়া শঙ্কর চড়া মেজাজ নামাইয়া নরম স্বরেই বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কালই নিয়ে যাব ভাবছি। ওঁদের কোনো আপত্তি নেই।"

মহীধর ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন 'হ্যাঁ, ওরা ত এক কথাতেই রাজি দেখছি। কিন্তু ভিতরের চাপা কথা সব খোলাখুলি না ক'রে, মেয়ে নিতে পাঠানোটা কি তোমাদের বাড়ীর উচিত হয়েছে?"

শঙ্কর ধাঁ করিয়া রাগিয়া গিয়া বলিল, "আমাদের মেয়ে আমরা নিতে এসেছি তার ভিতর অনুচিত ত কিছু দেখছি না।"

মহীধর হাসিয়া বলিলেন, "এই বয়সেই খুব যে মুখ ফুটেছে দেখছি বাবাজির। দেখ হে মেয়ে যেদিন পরকে দেওয়া হয় তারপর থেকে তাকে নিয়ে অত তেজ আর চলে না। এ মেয়ের উপর ত তোমাদের কোনো দাবী নেইই, যে তোমাদের কাছে আছে, সেও যে তোমাদের সম্পত্তি নয় সেইটে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই আমি কথা তুলেছিলাম।"

শঙ্কর বলিল, "যাকে কন্যাসম্প্রদান করা হয়েছিল সে যখন নেই তখন আপনাদের দাবীটাও যে খুব আছে তা মনে হচ্ছে না। অবশ্য তা নিয়ে আমি কোনো তর্ক করতে চাইনে। যখন দরকার হ'বে তখনই সে কথা বল্‌লেই চল্‌বে।"

মহীধর বলিলেন, "দরকার হবে মানে? তোমরা তাকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী করতে চাও সেইটা আমাকে পরিষ্কার ক'রে ব'লে যাও শুনি; তারপর আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করব।"

শঙ্কর বলিল, "তাকে একজন ভদ্রলোকের ছেলে বিবাহ করতে চেয়েছিল ছাড়া আর কোনো অঘটনের কথা আমার জানা নেই; সুতরাং আপনারা প্রত্যেক কথায় আমার মা বাবা ও বোনকে অভদ্র ইঙ্গিত ক'রে অপমান করবেন না।"

মহীধর রাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওঃ বড় যে ভদ্র হয়েছ হে ছোক্‌রা! গুরু লঘু বুঝে কথা বোলো। জান সে মেয়ে আমি আজই ছিনিয়ে আন্‌তে পারি? তোমাদের সে ভদ্রলোকের ছেলে আর তার চৌদ্দপুরুষের শুদ্ধ আমি শ্রাদ্ধ ক'রে ছেড়ে দিতে পারি, যদি আমার বাড়ীর বৌয়ের নামও আর তারা উচ্চারণ করে। জেলখানা শুদ্ধ দেখিয়ে আন্‌ব। বুঝেছ, মহীধর মুখুজ্যের কথা; এর নড় চড় নেই।"

শঙ্কর বলিল, "বুঝেছি সমস্তই, বল্‌তেও পার্‌তাম কিছু। তবে আপনি গুরুজন আপনার মুখের উপর কিছু বল্‌তে চাই না। বাড়ীতে কুটুম্বজনকে পেয়ে অপমান করাটা খুব ভদ্রোচিত কাজ কিনা আপনিই বিবেচনা করবেন।"

শঙ্কর ঘর ছাড়িয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে-ছিল; ক্ষিতিধর তাহাকে বাগান হইতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কোথায় চলেছ হে ভায়া? দু চারটে খোসগল্প করবে না?"

শঙ্কর বলিল, "আমাকে এখনি বাড়ী যেতে হ'বে। এখানে আমি আর থাকতে চাই না।"

ক্ষিতিধর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন হে কেন? বোনকে না নিয়েই যাবে? বুড়োটা তোমার চটিয়ে দিয়েছে বুঝি?"

শঙ্কর দেখিল ক্ষিতিধর জ্যাঠাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না। সে চুপ করিয়া রহিল। ক্ষিতিধর তুড়ি দিয়া বলিল, "রামঃ, ও বুড়োর কথায় মানুষে চটে? তুমি এসেছ আমাদের বাড়ী, ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?"

শঙ্কর বলিল, "উনি যে ভাবে কথা বল্‌লেন তারপর ময়নাকে আমি নিয়ে যেতে পারি না।"

ক্ষিতিধর বলিল, "আলবৎ নিয়ে যাবে। আমি নিজে গিয়ে গাড়ীতে তু'লে দিয়ে আস্‌ব। আমি কারুর কথায় কেয়ার করি না। চল তুমি ঘরে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে নেবে।"

ক্ষিতিধর শঙ্করকে ধরিয়া লইয়া গেল। ঘরে গিয়া তাহারা দেখিল যে এই ঘণ্টা খানেকের ভিতরই ঐটুকু মেয়ে ময়না তুলসীঝির সাহায্যে তিনটা আলমারি ঘাঁটিয়া খাটের উপর জামা কাপড় ও গহনা ইত্যাদির স্তূপ করিয়াছে। মেঝের উপর দুইটা মস্ত মস্ত বাক্স আধ ভর্ত্তি হইয়া পড়িয়া আছে। ময়নার কপাল বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, তবু বাক্স সাজাইবার উৎসাহের অন্ত নাই।

ময়নার এতখানি আগ্রহ জল করিয়া দিয়া হঠাৎ তাহাকে "লইয়া যাইব না" বলিতে শঙ্করের মমতা হইতে লাগিল। সৃষ্টিধর ও ক্ষিতিধরের যখন আপত্তি নাই তখন আর বেশী রাগ দেখাইয়া ছেলেমানুষ মেয়েটাকে কাঁদাইয়া কি লাভ? শঙ্কর ময়নাকে লইয়াই ফিরিল।

[ক্রমশঃ

তপোমৃত্যু

শ্রী গোপাললাল দে

'অপমৃত্যু বল এরে?' আমি বলি 'তপোমৃত্যু এই,
'শবসাধকের তরে এরও চেয়ে কাম্য কিছু নেই;
'জীবনের কার্য্য তাঁর অপমৃত্যু করেছে বিফল,
এ ধারণা মিথ্যা বন্ধু, হইয়াছে শোকেতে বিকল।'
ভাব-বাদী 'জেরেমায়া,' চেন তারে? জান ইতিহাস?
লোষ্ট্রাঘাতে করেছিল স্বজাতিরা তার প্রাণনাশ;
কিন্তু যেই মৃত্যু হ'ল অন্তরের আত্মা সে মহান্,
জীবনের চির ব্যর্থ সাধনাতে হ'য়ে মহীয়ান্;
দিকে দিকে ছেয়ে গেল বিচ্ছুরিত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে,
আপ্তবাক্য সম বাণী মেনে নিলে লোকে সবিস্ময়ে।

আঁধারে মোছেনা প্রেম, অপঘাতে ঘোচেনাক ভালো,
অন্তরের মহিমারে মৃত্যু দেয় অপরূপ আলো;
জীবনের ব্যর্থ চেষ্টা অনাদৃত ভাববাণীচয়,
মৃত্যুতে অমর হ'য়ে অন্তরীক্ষ হ'তে কথা কয়।
কারাগারে 'সক্রেটেশ' মরেছিল করি বিষ পান,
'ক্রুসে' বিদ্ধ হ'য়ে গেল অবিচারে 'যীসাস্'এর প্রাণ;
তা বলে' মরেছে তারা? ব্যর্থ হ'ল চেষ্টা তাহাদের?
দিক্ দেশ অবিচারি' ছে'য়ে গেছে সত্য যাহাদের!
মরিয়া অমর যারা পূজা করে বিশ্ব অবিরাম,
তাহাদেরই তালিকাতে লেখা হ'ল "শ্রদ্ধানন্দ" নাম।

ঢাকা মুস্‌লিম হলে অভিভাষণ

এই সভাগৃহে প্রবেশ করার পর হ'তে এপর্য্যন্ত আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পড়েছি, কৃতী ব্যক্তির উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। এ পুষ্পবৃষ্টি যদি তারই সপ্রমাণ করে, তবে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত। কৃতী হয় প্রীতি দিয়ে। আমি সঙ্কল্প করেছি, আমি কৃতী হব। সেজন্য এপর্য্যন্ত আমার সকল সাধনা ও ইচ্ছার, রচনা ও কর্ম্মে আমার সংকল্প হয়েছে হৃদয়ের প্রীতি সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশকে দিতে। পাশ্চাত্য দেশে আমি মানবের কবি ব'লে সমাদৃত। তার কারণ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে আমি কোন কার্য্য করিনি। সুইডেনে আমি বিশেষ সমাদর পেয়েছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, "আমাদের আভিজাত্যের অভিমান অত্যন্ত বেশী। এক দিকে গণতন্ত্রের ভাব, অন্যদিকে আভিজাত্যের অভিমান, এই আমাদের বৈশিষ্ট্য। সেজন্য আমরা কোন মাননীয় অতিথিকে এত সমাদর করিনি যা তোমাকে করেছি। তোমার সমাদর আমাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হয়নি; তোমাকে বিশেষভাবে সমাদর করেছি।" আমি বল্লাম, "আমার কি সুকৃতির জন্য এ বিশেষ সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছি?" উত্তরে তাঁরা বললেন, "তোমার কাব্যে আমরা কোন সম্প্রদায়ের নয়, মানবের স্বরূপ দেখতে পেয়েছি। সেইজন্য তোমাকে আমরা এত সমাদর করেছি। তোমার দেশের চেয়েও আমরা তোমাকে বেশী ক'রে আদর করতে পেরেছি। তাতে তোমার ক্ষোভ করবার কিছু নেই। কারণ দেশ ত তোমাকে গ্রহণ করবেই। তোমাকে গ্রহণ ক'রে আমরা ধন্য।"

আমি এই সম্মাননার জন্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত। এত সম্মানের ভারে আমার চিত্ত নম্র না হ'য়ে পারে না। আমি অহঙ্কারের সহিত নয়, নম্রতার সহিত এ সম্মান গ্রহণ করেছি। তার কারণ, আমার মধ্যে যে-সত্য আছে, সে-সত্যকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন। সেইজন্য আমি তাঁদের সমাদরকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। মানুষ সেইখানে শ্রদ্ধেয়, যেখানে মানুষ সকলের হ'য়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে বিশ্বের মধ্যে, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নয়। আমি নম্রভাবে নিয়েছি সে শ্রদ্ধা, মানুষের সত্যের জন্য, সে সত্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার জন্য।

আপনাদের নিকট আমার যে-পরিচয় তার কারণ আমি মানুষের সঙ্কীর্ণতার বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার স্বদেশের জন্য একটা অভিমান আছে। ভারতের বুকে এত জাতি, এত ধর্ম্ম স্থান লাভ করেছে, তার অর্থ আছে। ভারতের হাওয়ায় এমন শক্তি আছে যার বলে সকল সম্প্রদায় এখানে আসন লাভ করতে পেরেছে। সকল ধর্ম্ম এখানে স্ফূর্ত্তি লাভ করবার একটা সরস ক্ষেত্র পেয়েছে। ভাবের মধ্যে সকল সত্য নিহিত আছে। যুগে যুগে সে-সত্য এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ আমাদের নিকট সে-সত্য আর-এক ভাবে-প্রকাশ পেতে চায়। বিধাতা সে-সত্য প্রকাশ করবার দায়িত্ব ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত করেছেন। সে সত্য যতক্ষণ আমরা জীবনের মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশ করতে না পারি ততক্ষণ আমাদের দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে সত্য সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবার সত্য। সে-সত্যকে গ্রহণ করবার দায়িত্ব ভারতবাসীর। ভারতবাসীকে সবলে সে-সত্যকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্ম্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ হ'তে পারে না। কারণ ধর্ম্ম হ'ল মিলনের সেতু আর অধর্ম্ম বিরোধের। আমাদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে, আমরা ধর্ম্মের অবমাননা করেছি বিরোধ ক'রে। সকল ধর্ম্মই বিচ্ছেদের কলুষে কলঙ্কিত হয়েছে, সেজন্য লজ্জিত হ'তে হবে। ধর্ম্ম যেখানে আছে, এতটুকু আত্মসম্মান যেখানে আছে, সেখানে এত বিরোধ কখনও বিশ্বাস করা যেতে পারে না। পরস্পরের বিরোধে আমাদের মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে, তা দেখে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি; বিশেষ ক'রে আমার হিন্দু সমাজের জন্য। এ কথা মনে করবেন না বিদ্বেষ করি ব'লে অন্য ধর্ম্মকে দোষী ক'রে থাকি। আমি কঠিনরূপে বিচার করেছি। যেখানে অপরাধ আছে, সেখানে, ভালবাসি ব'লে, দোষী করেছি, আঘাত দিয়েছি; কেননা সে অপরাধে আমি লজ্জায় অবনত হয়েছি। যখন ধর্ম্মে বিকার উপস্থিত হয় তখনই বিচ্ছেদ প্রবল হ'য়ে ওঠে। শুধু হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ নয় সমাজের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। যখন মানুষ মানুষকে অপমান করে, তখন সে দুর্গতি-দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত নয়; আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। লজ্জার কারণ মুসলমানের মধ্যেও ঘটে। এক্ষেত্রে যদি পরস্পর প্রীতি না করি তাহ'লে বিধাতা যে-দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন তার কত বড় অপমান করা হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেকেই আপনার সমস্যা সমাধান করেছে। বিধাতা আমাদের নিকট পরীক্ষার প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন চুরি ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে চেষ্টা করলে চলবে না। সে-প্রশ্ন সমাধান করতে হবে সত্যকার সাধনার দ্বারা। সে প্রশ্ন সমাধান না করলে আমরা কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারব না। সকল দেশ তাদের প্রশ্ন সমাধান করে, তাই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিধাতা আমাদিগকে যে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তা সমাধান করতে হ'লে, সর্ব্বপ্রথম পরস্পর প্রীতি, সৌহৃদ্য, সৌজন্য, ক্ষমা চাই। সেই প্রীতি দিয়ে সকলকে পরস্পর সহযোগী ক'রে তুলতে হবে। তবেই আমাদের মঙ্গল-পথ উন্মুক্ত হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে গেছে, কিন্তু বিধাতার এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি—আমরা সকলে মিলিত হ'তে পারিনি ব'লেই। যেখানে মুষ্টি শিথিল, সেখানে অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে সব যায়। সেইরূপ পরস্পর বিচ্ছেদের কারণে আমাদের সমস্ত সম্পদ্ ফেঁসে গেছে। কোন সম্পদ্‌ই আমরা ধ'রে রাখতে পারিনি। আজ পরস্পর বিরোধই প্রবল হ'য়ে উঠেছে, এর জন্য বড় লজ্জা হয়। কবে এ দূর হবে? একান্ত প্রীতি ও লজ্জার সহিত বলি, ধর্ম্মের লজ্জা হ'তে কবে ঔদার্য্য জয় লাভ করবে ও সকলে ক্ষমা ক'রে বড় হবে? যে ক্ষমা করবে সেই জয়ী হবে। সেই জয়ের জন্য সাধনা করতে হবে। ইতিহাসে দেখা যায়, নানা বিরোধের ভিতর সমাজ পরস্পর আঘাত ক'রে জয়লাভ করেছে; নানা বন্ধনের মধ্যে অবন্ধন লাভ করেছে।

আমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা আছে, আমরা বিশ্ব-সমস্যা এই ভারতে সমাধান করব। আমার কর্ম্মে ও রচনায় সেই আশা প্রকাশ পেয়েছে।

আজ মানুষের সহিত মানুষের এমন সংঘাত হচ্ছে যা পূর্ব্বে কথনও হয়নি। ইতিপূর্ব্বে এমন ক'রে সে ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ পায়নি। পূর্ব্বে মানুষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাই তাদের মিলন ঘটেনি। এখন সে ভৌগোলিক সীমা ধূলিসাৎ হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর নিকট বিশ্বপ্রভু এই দাবী করেছেন, "সকলের মধ্যে ভেদ থাক্‌লেও মানুষের আত্মার মধ্যে অভেদ আছে—সেই অভিন্ন আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।" কিন্তু পৃথিবীতে আজ রক্তপ্লাবন ছুটেছে, পরস্পর হিংসার দূষিত বায়ু মানবের চিত্তকে অপবিত্র করেছে। মনুষ্যত্বের এমন অপমান অবমাননা আর কথনও হয়নি। পূর্ব্বে মানুষ সকল অবস্থা, সকল দুর্গতির মধ্যে ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে। কিন্তু আজ সে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা নিরস্ত হ'য়ে গেছে। মানুষের গৃধ্নুতা প্রথর হয়েছে; বিচ্ছেদের রক্তপ্লাবনে মানব-সমাজের প্রতি স্তর কলুষিত হয়েছে। এখন বর্ব্বরতার যুগ আবার ফিরে এসেছে। এমন বিদ্বেষের প্রবল বন্যা আর কখনও প্রবাহিত হয়নি। বিধাতা কি দেখ্‌ছেন না? তাঁর দাবী কি অপমানিত হচ্ছে? তিনি তবু বলছেন, যদি তোমরা এই প্রশ্নের সমাধান না কর তবে কোন দিন জয়যুক্ত হ'তে পারবে না; সত্যকে লাভ করতে পারবে না। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিধাতার যে-আসন তার তলে এই প্রশ্ন,এই সমস্যা রয়েছে, মানব-আত্মার ঐক্য প্রকাশ করে হবে?

এই সমস্যা ভারতে বহুদিন থেকে আছে। বিরোধের প্রাচীর তুলে ত সে সমস্যার সমাধান হবে না। এত দৈন্য, এত দুর্গতি, এত দারিদ্র্য, এত ধিক্কার, এত অপমান আর কোন দেশে নেই, কোন কালে হয়নি। কোথাও হবে না। আমাদের তুচ্ছ তুচ্ছ কর্ম্মের মধ্যে মনের যে পাপ তা ব্যক্ত হচ্ছে কেন? তার কারণ, আমাদের আত্মশক্তির অভাব, আত্মমর্য্যাদার অভাব। আত্মশক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যস্ত। বাহিরের পথকে আমরা রাজপথ ব'লে ধ'রে নিয়েছি। তাই আজ আমাদের এত দুর্গতি, এত অপমান।

আজ নম্র হ'য়ে আমাদের পরস্পরের অপরাধ স্বীকার ক'রে প্রভুর আদেশ নিতে হবে—যিনি সকল সন্তানের জন্য তাঁর অনন্ত প্রেম মুক্ত ক'রে রেখেছেন। আবার একদিন আমাদের ক্ষমার পথ, সহিষ্ণুতার পথ, প্রীতি, মৈত্রী, সখ্যতার পথ খুলতে হবে। সেই শুভবুদ্ধি হোক্ তার আলো জ্বলুক। ঈশ্বর এক; তাঁর মধ্যে কোন ভেদ নাই। যিনি সকল বর্ণের, সকল জাতির জন্য নিত্য তাঁর গভীর প্রয়োজন প্রকাশ করছেন, তিনি আমাদের সকলের চিত্ত যুক্ত করুন; বাহিরের শক্তি দ্বারা নয়, শুভবুদ্ধি দ্বারা। শুভবুদ্ধির আলোক বিকীর্ণ হোক্। তবেই আমাদের চিত্ত যুক্ত হবে। তবেই আমাদের আত্মা মুক্ত হবে, তার ঐক্য প্রকাশিত হবে, সকল অপমান দূর হবে। সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাহিরের চুক্তি দ্বারা সে ঐক্য হবে না। আমাদের শুভ-বুদ্ধি শুভকর্ম্মে যুক্ত হোক।

(অভিযান ভাদ্র, ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

নিষেধের বিড়ম্বনা

ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মই কতকগুলি "নিষেধের" সমষ্টি মাত্র। শাস্ত্রকার এই নিষেধের প্রয়োজন বোধ করেছেন মানব-প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতার নিগ্রহ হ'তে মানুষকে বাঁচাবার জন্য—তার ভিতরকার উচ্ছৃঙ্খল জন্তুর হাত হ'তে তাকে রেহাই দেওয়ার জন্য। মানুষ নিতান্তই জন্তুধর্ম্মী এবং এই জন্তুর প্রবৃত্তি মানুষের পৈত্রিক মূলধন। সে প্রবৃত্তি কোন বিধি-নিষেধের বন্ধন মানতে চায় না—চায় শুধু যা খুসী তাই করতে।

কিন্তু মানুষ জন্তুর চেয়ে অনেকখানি দায়িত্বের বন্ধনে জড়িত। জন্তুর অন্যের জন্য ভাব্‌বার কিছু নাই, কিন্তু মানুষের ভাব্‌তে হয় অনেকের জন্য।

সমাজকে তার ভিতরকার জন্তুর উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎপীড়ন, অনাচার, অত্যাচার হ'তে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বিধাতা মাঝে মাঝে সমাজপতি,পয়গম্বর, অবতার পাঠিয়ে দেন। তাঁরা এসে জন্তুটিকে বাঁধবার জন্য নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেন এবং তার গতি রুদ্ধ করবার জন্য নিষেধের সীমা-রেখা টেনে দেন। কিন্তু নিষেধের এম্‌নি বিড়ম্বনা, জন্তুধর্ম্মী মানুষ তা চিরদিন মেনে চল্‌তে চায় না এবং চলেও না।

সমাজধর্ম্মী মানুষ নিষেধকে আঁকড়ে ধ'রে নানাপ্রকার আইন-কানুনের সৃষ্টি ক'রে চলে, কিন্তু জন্তুধর্ম্মী মানুষ নিষেধকে লঙ্ঘন ক'রে চলেছে, তা সাহস ক'রে স্বীকার করতে চায় না।

বিরাট-প্রাণ মুহম্মদ তাঁর সমাজকে তৎকালীন জন্তুধর্ম্মী মানুষের অনাচার, ব্যভিচার, অত্যাচার হ'তে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ সাধনার দ্বারা কতকগুলি নিষেধের অস্ত্র দিয়ে গেলেন তাঁর পরবর্ত্তী সমাজপ্রাণ কর্ম্মীদের হাতে। সেই নিষেধ মেনে যে চলে সে তাঁর উম্মৎ বা শিষ্য ব'লে পরিচিত হয়। তাঁর আশা ছিল, মানুষ যদি তাঁর নিষেধগুলি মেনে চলে তবে সমাজ জন্তুধর্ম্মীর উচ্ছৃঙ্খলতা হ'তে মুক্তিলাভ করতে পারবে। কিন্তু আজ যাঁরা তাঁর উম্মৎ ব'লে পরিচিত, তাঁদের দেখ্‌লে ত মনে হয় না তাঁরা নিষেধ মেনে চলেছেন।

প্রথম প্রথম নিষেধ একটা সংস্কার সৃষ্টি করে; সেই সংস্কারই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে; আর সমাজধর্ম্মী মানুষ ঐ সংস্কারের দাস হ'য়ে পড়ে।

সমাজধর্ম্মীর সহিত জন্তুধর্ম্মীর বিরোধ অনিবার্য্য। যুগে যুগে সমাজধর্ম্মী জন্তুধর্ম্মীকে একটু একটু প্রাধান্য দিয়ে আস্‌তে বাধ্য হয়েছে। বর্ত্তমান মুসলমান ধরা যাক্। হজরত মুহম্মদের নিষেধের মধ্যে কতকগুলি এই:—খোদা ছাড়া আর কাহারও নিকট মাথা নত ক'র না। জেনা (পরস্ত্রীস্পর্শ) ক'র না। মদ খেও না। নাবালক ও স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার ক'র না এবং তাদের স্বত্ব ও অধিকার হ'তে তাদিগকে বঞ্চিত ক'র না। প্রতিবেশীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার ক'র না। পুত্রকন্যাকে মূর্খ রেখ না। ভিক্ষা ক'র না। শূকরের মাংস খেও না। ধর্ম্মের জন্য জুলুম ক'র না। অন্যের অধিকার নষ্ট ক'র না। সৎপরিশ্রম লব্ধ আয় ভিন্ন অন্য আয়ের চেষ্টা কর না। সুদ দিও না।

এইসমস্ত নিষেধ লঙ্ঘন করা হারাম। তার শাস্তি---পরকালের অনন্ত দোজখ ভোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জন্তু-ধর্ম্মী মানুষগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তারা দোজখের ভয়ে আদৌ ভীত সন্ত্রস্ত না হ'য়ে নির্ব্বিকার চিত্তে ঐ নিষেধের প্রত্যেকটি লঙ্ঘন ক'রে চলেছে। মুসলমান আজ ঘোর পৌত্তলিক। সে খোদাকে চিনে না, সে চিনে তার পীর আর দাদাপীরের কবর। কবর আজ মুসলমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরগা হয়েছে—তার সর্ব্বকামনার আখড়া সেখানে। দরগাকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হয় কেমন ক'রে সে তা ভুলে গেছে।

দুরভিসন্ধি হাসিল করতে হ'লে সে দৌড়ায় দরগায়। স্ত্রীপুত্রের অসুখের জন্য ঔষধ ও পরিচর্য্যা ফেলে সে আনে দরগার মাটি কিম্বা দরগা সেবকের তাম্বুল তাম্রাকু বিমিশ্র সুগন্ধি ফুৎকার। দরগায় মাথা ঠুকে সেলাম দিয়ে সে যায় জুয়াখেলায় ও ঘোড়-দৌড়ে। খোদার নাম মুখে ক'রে সে আরম্ভ করে মদ খেতে—আল্লার নাম নিয়ে সে যায় পরের স্ত্রী অপহরণ করতে।

মুসলমান আজ ব্যভিচারের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। পরস্ত্রী-

স্পর্শ করা হারাম। এবিধান যে ইসলামের, তার কার্য্য দেখে তাতে সন্দেহ জন্মে। মাঝে মাঝে কাগজে হিন্দু নারীর প্রতি মুসলমানের অত্যাচারের কথা প'ড়ে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে যাই।

ঐ সংবাদের প্রতিবাদও পড়েছি আমার স্বধর্ম্মী-পরিচালিত কাগজে—সে প্রতিবাদে লজ্জা নেই, নম্রতা নেই, আছে শুধু আস্ফালন ও অহঙ্কার। আজ মুসলমান নিলজ্জ, কুরুচিপূর্ণ, ব্যভিচারী হ'য়ে পড়েছে। কতদিন চোখের সামনে মুসলমানকে দল বেঁধে মুসলমান নারীর উপর যেরূপ পশুর মত ব্যবহার করতে দেখেছি দিন দুপুরে, তাতে আমি একটুও অবিশ্বাস করতে পারি না যে, এরা হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করতে পারে না।

মুসলমান আজ কর্ম্মহীন,পরিশ্রমবিহীন হ'য়ে পড়েছে ব'লে এরূপ পশু-প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে উঠেছে। আরও একটি কারণ এই হ'তে পারে যে, মুসলমান সমাজ এত কঠোর বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে, এর মধ্যে জন্তুধর্ম্মীর চিত্তের বিবিধ ক্ষুধা নিবারণ করবার মত বেশী উপকরণ নেই। ধর্ম্মবিধিপীড়িত মুসলমানের শুষ্ক নীরস চিত্ত আজ প্রতিবেশীর আনন্দের পানে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে—সেটা চিত্তের স্বভাব-ধর্ম্ম।

মুসলমানের গৃহ নিরানন্দ—বিশেষতঃ মুসলমানের নারীসমাজ নিতান্ত হতশ্রী। তাহার কারণ অশিক্ষা ও পর্দ্দার কঠোর সংস্কার—যাতে ক'রে মুসলমান নারী আনন্দ কি তার আস্বাদ পেতে পারে না। এই চিত্তহারা নিরানন্দ গৃহে জীবনানন্দে বঞ্চিত, হীনস্বাস্থ্য, বৈচিত্র্যজ্ঞানশূন্য, গতিরুচি নারীকে দেখে জন্তুধর্ম্মী পুরুষ, বৈচিত্র্য-তৃষ্ণায় যার চিত্ত নিরন্তর কাতর, অন্য সমাজের শ্রী আনন্দ দেখে যার চিত্তে অপূর্ব্ব উল্লাস জ'মে উঠেছে—কি ক'রে নিষেধের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হ'তে চায়? নিষেধ তার নিকট মৃত্যু—নিষেধ তখন লঙ্ঘন করাই তার নিকট জীবন।

মুসলমান হিন্দু নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তার কারণ তার স্বধর্ম্মী নারীর সঙ্গে হিন্দু নারীর এক অপরূপ পার্থক্য সে অনুভব করে এবং ঐ কঠোর-বন্ধন-কাতর নিরানন্দ নারী হ'তে তার বিতৃষ্ণ চিত্ত আপনা থেকে রুচি-বিলাসী হিন্দু নারীর মধ্যে আপনার খাদ্য অনুসন্ধান করতে ছুটে। সুতরাং আমার মনে হয়, দুটি জিনিষ মুসলমানকে হিন্দু নারীর প্রতি প্রতিদিন আকৃষ্ট ক'রে তুলছে—তার কর্ম্মহীন অবকাশ ও বৈচিত্র্য-বঞ্চিত নিরানন্দ চিত্ত। এর উপায় লাঠি বা জেল নয়। এর উপায় হচ্ছে তার কর্ম্ম জুগিয়ে দেওয়া ও মুসলমান-সমাজে রুচির সৃষ্টি করা ও মুসলমান নারীকে জীবনানন্দের উৎসবে প্রকাশ ক'রে ধরা। চিত্তবিনোদনের জন্য যে-সমস্ত স্বাস্থ্যপ্রদ উপকরণের প্রয়োজন তার অধিকাংশ নারী হ'তে মিলতে পারে; এজন্য নারীকে রুচি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে ক্ষমতাপন্ন ক'রে তুলতে হবে। তার জন্যে বর্ত্তমান বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মেয়েদের অনেকখানি এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহ'লে পরস্পর জ্ঞানের আদান-প্রদানে বাংলাদেশে সুদৃঢ়-মেরুদণ্ড-সমন্বিত একটা নারী-সমাজ গ'ড়ে উঠতে পারে। সেই নারী-সমাজের নৈতিক তেজ সহজেই পুরুষের প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করতে সমর্থ হবে।

মুসলমান আজ মদ্যপানে আসক্ত। এর কারণও ঐ কঠোর নিষেধ-পীড়িত নিরানন্দ চিত্তের বৈচিত্র্য-লালায়িত স্বাভাবিক পিপাসা।

নাবালককে ফাঁকি দিয়ে, বিধবা নারীকে উৎপীড়িত ক'রে তাদের স্বত্ব বিনা পয়সায় খরিদ করবার চেষ্টা বেশী ক'রে মুসলমানই ক'রে থাকে। মুসলমান নারী আজ আইন হ'তে বঞ্চিত, স্বত্ব-অধিকার ভোগ করতে অক্ষম। এজন্য অপোগণ্ড শিশু নিয়ে মুসলমান বিধবা যে নীরবে কত করুণ অশ্রু ফেলছে তা কি আমরা কেউ দেখছি? আমরা বাইরে বলছি, ইসলাম নারীকে জগতের অধিকার সর্ব্বপ্রথমেই দিয়েছে, পুরুষের সমান করেছে। এ ত সমাজী কথা। তলিয়ে গিয়ে পর্দ্দা উন্মোচন ক'রে দেখুন, কি কুৎসিত বীভৎস ব্যবহার দ্বারা বিধবা নারী নির্য্যাতিতা হচ্ছে। পথের কাঙ্গালদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা বেশী।

মুসলমান নিরক্ষর; এ ত প্রবাদ হ'য়ে পড়েছে। অথচ হজরত বলেছেন, মূর্খ রাখা হারাম।

মুসলমান ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন-দিনই বাড়ছে। আদমসুমারি ঘেঁটে দেখলে এর সত্যতা প্রমাণ করতে কষ্ট হবে না। ভিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে—এই বিপুল ভিক্ষা-বৃত্তি কি তারই প্রতিশোধ? ভিক্ষা করবে না ত কি করবে?

খানসামা বাবুরচি হতে মুসলমানই ওস্তাদ; এ কথা না বললেই চলে। সে গৌরব হ'তে আমাদিগকে হঠাৎ কেউ বঞ্চিত করতে পারছে না। কিন্তু শূকরের মাংস ও চর্ব্বি হচ্ছে এদের আসল উপকরণ। তাই দিয়েই তাদের বাবুরচিগিরির বাহাদুরী বজায় করতে হয়। কেন তারা করে? উত্তর, পেটের দায়।

ধর্ম্মের জন্য জুলুম করা অনেকটা মুসলমানদের স্বভাবগত হ'য়ে গেছে। পরধর্ম্মীদের উপর জুলুম করার কথা বাদ দিলেও স্বধর্ম্মীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই। অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই এই জুলুমের ভিত্তি। আজ মুসলমান সমাজে এই অসহিষ্ণুতা চরম হ'য়ে উঠেছে। মুসলমান-ইতিহাস যে ব্যর্থতার ইতিহাস, তার কারণ অনেকখানি এই অসহিষ্ণুতা—যার জুলুম মুসলমান-সমাজে প্রতিভার সৃষ্টির পথে বিরাট বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ইবন্ রোশদ, ইবন্ সিনা, ইবন খলদুন, আবু হানিফা, খলিফা আল হাকেম, কবি আবুল আতাহিয়া কিরূপ নির্য্যাতিত হ'য়েছিলেন তা কি মনে পড়ে না? কেন? তাঁদের মত সমসাময়িক সমাজ সহ্য করতে পারেনি। এই অসহিষ্ণুতার জুলুম চিরদিন আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে প্রতিরোধ করেছে। তাই মুসলমান আজ যুগধর্ম্মের সমস্যায় বিব্রত হ'য়ে সমস্ত নিষেধকে লঙ্ঘন ক'রেও প্রশস্ত পথ খুঁজে বের করতে পারছে না।

আজ আমরা নিজের চিন্তায় এত সঙ্কীর্ণচিত্ত হ'য়ে পড়েছি যে, যখন আমরা আমাদের অধিকার ভোগ করতে চাই তখন অন্যের অধিকারের কথা মনে থাকে না। তার প্রমাণ, অনেকটা গরু ও বাজনা উপলক্ষ্য ক'রে যে-দ্বন্দ্ব আমাদের অহর্নিশ চলছে তা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাজনা দ্বারা মসজিদের অপমান হয়, এই চিন্তাটাই জুলুমের অবলম্বন বললে অত্যুক্তি হয় না। নিঃস্ব অকিঞ্চন যে, নিজের অন্তর ও মস্তিষ্কের শক্তির অভাব যার প্রচণ্ড, যে নিরালম্ব, যার আঁকড়ে ধরবার বেশী কিছু নেই, সেই-ই অধিকারবহির্ভূত একটা ক্ষুদ্র সামগ্রীর প্রতি কপট মমতাকে উপলক্ষ ক'রে নিজের সমস্ত দৈন্যের ক্ষতিপূরণের দাবী করতে এতটুকু লজ্জা বোধ করে না বা সঙ্কুচিত হয় না। আজ মসজিদ উপলক্ষ ক'রে মুসলমান তার অন্তর্দিককার বিপুল দৈন্যের ক্ষতিপূরণ করতে চায়, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, চিত্ত থেকে মসজিদের প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা যতটুকু উৎসারিত হ'তে পারে, শুধু সেই পরিমাণ দাবী করলে হিন্দুরা খুসিতে আরো শ্রদ্ধা ক'রে বাজনা বন্ধ করত। দাবী বেশী করলে যার কাছে দাবী করা হয় তার চিত্ত ঐ দাবীর অন্যায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। মানুষের নৈতিক স্বভাব শুধু দিতে চায়, কিন্তু যেটুকু দেওয়ার সেইটুকু দেওয়াই তার স্বভাব—তার বেশী চাইলেই সে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। মুসলমান কি একথা বুঝবে? বাজনা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করতে হবে এত বড় দাবীতে যে, হিন্দুর অধিকারকে একেবারে অস্বীকার করা হচ্ছে তা আমরা বুঝছি না। অন্যের অধিকার নষ্ট করা হারাম। অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবার গৌরব হ'তে আজ আমরা অতি নির্ম্মমভাবে বঞ্চিত। ক্ষুদ্র স্বার্থের অংশ নিয়ে যারা নিরবধি ভ্রাতৃবিরোধে অভ্যস্ত তারা কেমন ক'রে অন্যের অধিকারকে সুনজরে দেখবে?

আজ আমরা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের পাত্র হয়েছি। অতি নিকট অতীতে যারা সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, আজ তারা একেবারে নিঃস্ব। ধর্ম্মপ্রদত্ত 'চুলচেরা' স্বার্থজ্ঞান লাভ ক'রে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে গিয়ে আমাদের বৃহৎ স্বার্থ ও সম্পদ আমাদের মুষ্টির ভিতর হ'তে স'রে যাচ্ছে। পরস্পর বিরোধই প্রবল হ'য়ে আমাদের সমাজকে শত ফেরকায় (অংশে) বিভক্ত ক'রে ফেলেছে। ফলে আজ মুসলমানের সম্পদ্ ফুরিয়ে গেছে—সহর-নগরের পুতিগন্ধময়, অতীব অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকার কোণই হয়েছে তার বাসস্থান। এমন একজন বন্ধু তার নেই যে, দয়া ক'রেও একটু আলো ও বাতাস তার জীর্ণ কুটীরের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। এমন অবস্থায় চিত্তের প্রকাশ হয় শুধু কান্নাকাটি, হিংসা, জিদ ও ভিক্ষায়। আমাদের চিত্তের প্রকাশও ঠিক সেইরূপেই হচ্ছে। যে প্রশস্ত চিত্ত থাকলে মানুষ শত্রু, মিত্র, স্বধর্ম্মী, অন্যধর্ম্মী, ধনী, নির্ধন সকলকে সমভাবে বুকে তুলে নিতে পারে সে সুবিশাল চিত্ত আমাদের নেই ; কিম্বা তা লাভ করবার জন্যে যে আয়োজন দরকার তাই বা আমাদের কৈ ? আজ হিন্দুর সকল আচরণই আমাদের নিকট অপ্রিয় ব'লে মালুম হচ্ছে ; তার কারণ আমাদের চিত্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র হ'য়ে গেছে—ধর্ম্মের জ্যোতি সে চিত্তে নেই—যে ধর্ম্মজ্ঞান থাকলে মানুষের প্রতি দরদ বাড়ে, সে-জ্ঞানও আমাদের অন্তর্হিত হয়েছে। যে সত্যকার ধর্ম্মজীবন মানুষের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বাড়ায়, সহানুভূতি ও বেদনা জাগায়—তা বিকৃত হ'য়ে গেছে ; তার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মজীবনের ভাণ ও তার বাড়াবাড়ি প্রবল হ'য়ে আমাদের চিত্ত-প্রকাশের স্বাস্থ্যকর পথগুলি সমস্ত একে একে রুদ্ধ ক'রে ফেলেছে। আমাদের নিকট অন্তঃসারশূন্য নির্ম্মম আচার-অনুষ্ঠানগুলির দৌরাত্ম্যই একমাত্র ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৌরাত্ম্য দেহ ও মন উভয়কেই নিষ্পেষিত ক'রে ফেলছে। সেই দেহ ও মনে জন্তুধর্ম্মীর প্রভাবই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি সুব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে সমাজধর্ম্মী। আজ মুসলমান-সমাজে জন্তুধর্ম্মীরই প্রভাব যখন বেশী তখন হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান সন্তোষজনক হ'তে পারে না—যতদিন মুসলমানের মধ্যে সমাজধর্ম্মী প্রবল হ'য়ে না উঠে। তার জন্য চাই, আমাদের চোখে যে ১০০০ বৎসরের পুরাতন ধর্ম্মের ঠুলি লাগান আছে, সেটা খুলে ফেলে খোদার দেওয়া চক্ষু দিয়ে সমস্ত দুনিয়াটা একবার ভাল ক'রে দেখা।

আজ নানা জাতির সংঘর্ষে জীবন সমস্যা যখন বিপুল হ'য়ে উঠেছে এবং সে-সমস্যার সমাধান যখন অধিকতর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা দাবী ক'রে বসেছে, তখন মুসলমান সে পরিমাণ পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনায় অনভ্যস্ত ব'লে বৃহৎ কল্যাণের অধিকার হ'তে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হয়েছে।

মুসলমান সমস্ত নিষেধের সীমা অতিক্রম ক'রেও এখনও মুসলমান ব'লে পরিচিত। এতে মুসলমান-সমাজের গৌরব কমছে বৈ বাড়ছে না। এইসমস্ত নিষেধের দ্বারা বিড়ম্বিত মুসলমান সকলের ঘৃণা ও হিংসার উদ্রেক ক'রে নিজকে ক্রমশঃ বিপন্ন ক'রে তুলছে—সকলের সহানুভূতি ও স্নেহ তার থেকে বিদূরিত হচ্ছে। আজ তাকে সে স্নেহ শ্রদ্ধা ফিরে পাবার জন্য ব্যগ্র হওয়া দরকার। তার জন্য নিষেধগুলি কতখানি বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্যকরী হ'তে পারে তার বিচার করতে হবে ; এবং সেই কার্য্যকরী নিষেধগুলি পুরোপুরি যাতে পালিত হয় অর্থাৎ যাতে সেগুলি পালন করবার ক্ষমতা প্রত্যেকেই লাভ করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য ধর্ম্ম ও অন্য সমাজের প্রতি তার শত্রুতা করলে চলবে না। তবে আবার মুসলমান জয়যুক্ত হবে—এবার তরবারি দ্বারা নয়, শ্রদ্ধা দ্বারা ; জুলুম দ্বারা নয়, প্রীতি দ্বারা ; শারীরিক বল দ্বারা নয়, চিত্তের আনন্দ ও মনের বল দ্বারা। তখনই নব মুস্‌লিমের জন্মলাভ হবে—যে হবে স্থিরবুদ্ধি, বিশালচিত্ত, সংস্কারমুক্ত, বিপুলস্নেহ এবং অন্যের অধিকার দানে মুক্তহস্ত।

তাই আজ আর একবার প্রার্থনা করি—মুসলমান শক্তি লাভ করুক ; তার চিত্ত বিকশিত হোক ; তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হোক ; তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ বর্দ্ধিত হোক ; সে সকলকে বুকে ধরতে শিখুক।

(অভিযান, ভাদ্র ১৩৩৩) আবুল হুসেন

অপার খেল্

(কবীর)

প্রেমের নয়নে চেয়ে দেখ, দেখ
তিনি যে বিশ্বময় ;
হিয়া দিয়া বুঝে' দেখনা, এ দেশ
আমার—এ মিছা নয়।
সত্যনগরী এ সারা জগৎ,
চিত্ত ভুলায় এর বাঁকা পথ ;
যে পৌঁছে, সে যে বিনা-পায়ে চলে'
পৌঁছে,—কি বিস্ময় !
সে এক অপার খেলা যে রে ভাই,
প্রেমে মেলে পরিচয় !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নিখিল ভারত নারী-সম্মিলনী

দুই মাস পূর্ব্বে মান্দ্রাজের মিসেস কাজিন্সের উদ্যোগে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এই প্রাদেশিক সম্মিলনীগুলির উদ্দেশ্য ছিল—স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, মেয়েদের শারীরিক উন্নতি বিধান বিষয়ে জনমত সুগঠিত করা। প্রাদেশিক নারী-সম্মিলনীসমূহের অধিবেশনান্তে গত জানুয়ারী মাসে পুণায় নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উপযুক্ত মহিলা প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া নারীদের উন্নতি সম্পর্কিত নানা প্রস্তাব আলোচনা করিয়াছিলেন।

সম্মিলনীর উদ্বোধনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী সাংগলীর রাণী-সাহেবা একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন, নারী-শিক্ষা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় এখন নারীদিগকেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহার মতে ভারতীয় নারীদের শিক্ষা-বিস্তার সম্পর্কিত আইন-কানুন যেন ভারতের কৃষ্টি, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় নারী-সমাজের অতীতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই প্রণয়ন করা হয়।

বরোদার মহারাণী এই সম্মিলনীর অধিনেত্রী হইয়াছিলেন। মহারাণী নিজে উচ্চশিক্ষিতা এবং স্ত্রী-শিক্ষায় বরোদা রাজ্য ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে অনেক উন্নত। তাঁহার অভিভাষণে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

একস্থলে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমাদের কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতির এখনই পরিবর্ত্তন আবশ্যক—নারীকেই এ-বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে বাল্য-বিবাহপ্রথা রোধ করিতে হইবে। নারীর নারীত্ব আসিবার আগেই কিম্বা কোন জ্ঞান জন্মিবার আগেই সে পুরুষের খেলার সামগ্রী হয়। এই বালিকা বয়সে সে সন্তানের মা হয়, সন্তানকে সুস্থ-দেহ সবল মন কিম্বা সুশিক্ষিত করার কোন যোগ্যতাই তাহার জন্মে না। এইভাবে তাহার বাল্য ও যৌবন ব্যর্থ হওয়াতে সুন্দর জীবনের বহু সুখই তাহার অজানা থাকিয়া যায়।

"বাল্য ও-মাতৃত্ব ছাড়া আর কিছুই সে জানিতে পারে না। তাহার নিজের সুখের জন্য ও ছেলেদের শিক্ষার জন্য কি দরকার সে-জ্ঞানও তাহার কম জন্মে। আমাদের যদি সুস্থ-সবল ছেলে-মেয়ে পাইতে হয় তবে সেজন্য সুস্থ-সবল মাতাও চাই। এইজন্য বালিকার পূর্ণ যৌবন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে। ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে তাহা প্রায় হয় না। বাল্য-বিবাহের ফল কিরূপ তাহা চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি সতীদাহের চেয়েও ইহা আইন দ্বারা বন্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। সতীদাহে ছিল সাময়িক ভীষণ অত্যাচার, কিন্তু ইহাতে জীবনভর অব্যক্ত যাতনা সহ্য করিতে হয়।

"সহবাস-সম্মতির বয়স কম-পক্ষে ষোল হওয়া উচিত। বহু সভা-সমিতিতে আজকাল ইহা আলোচিত হইতেছে, সুখের বিষয়। সার হরি সিং গৌর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৬বছরের কমে সহবাস-সম্মতি আইনতঃ সিদ্ধ নহে এই বিল পেশ করিবেন—এজন্য দেশময় আমাদের আন্দোলন চালাইয়া জনমত ইহার অনুকূল করিয়া ইহা আইন-সভা ও গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাশ করাইয়া লইতে হইবে। এজন্য সর্ব্বপ্রদেশের নারীকর্ম্মীদের বিপুল চেষ্টা চাই।

"পর্দ্দা-প্রথা দূর করিবার জন্যও আমাদের যত্ন লইতে হইবে। কোন কালে নারী রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন থাকিলেও বর্ত্তমানে ইহা স্বাস্থ্য ও সুখের হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক জীবনের উন্নয়নের কার্য্যে নারীকে অংশ লইতে হইলে, তাহাদের সন্তানদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিতে হইলে এবং সন্তানদের সেই ভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে পর্দ্দা-প্রথা দূর করিতেই হইবে। পর্দ্দার অন্তরালে নারী খাঁচার ভিতরকার পাখীর মতই বন্দী থাকে, জীবনের আনন্দ হইতে অজ্ঞতার মধ্যেই সে বেশী ডুবিয়া থাকে। জ্ঞানের আলোক এবং শিক্ষার গতি এখানে ব্যাহত হয়। আমাদের দেশহিতৈষীগণ রাজনৈতিক মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—অথচ সামাজিক উন্নতি অবহেলিত হইতেছে। নারীর উন্নতি ভিন্ন পুরুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক কোনরূপ উন্নতিই হইতে পারে না।

"নারীকে অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে আনিতে হইলে আমাদিগকেই একযোগে কাজ করিতে হইবে। নারীদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছেন—কিন্তু সকল নারীর মধ্যেই ইহার প্রসার চাই। লেডী আরুইন নারী শিক্ষয়িত্রীদের জন্য যদি একটি কলেজ করেন এবং সেই-সব শিক্ষয়িত্রীরা যদি নারী-সমাজের শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন কামনা লইয়া ভারতীয় নারীদের সুশিক্ষিতা করিতে পারেন তবে একটি মহৎ কাজ হয়।"

মহারাণী বালিকাদের ব্যায়াম-চর্চ্চা এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। বালক-বালিকাদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার (Co education) কথা উল্লেখ করিয়া মহারাণী বলেন যে, বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একান্ত আবশ্যক ; কারণ,তাহাতে তাহাদের নিজস্ব মনোবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায়। সভায় সমবেত প্রতিনিধিগণকে তিনি স্ত্রীলোকদের পারিবারিক সম্পত্তিতে

স্বত্ব, নাবালকের অভিভাবিকা হইবার অধিকার, প্রভৃতি অনেকগুলি অভাব-অভিযোগের কথা তদন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় নারীদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তার, বালিকাদের শরীর-চর্চ্চা, কারুশিল্প, ভাস্কর্য্য, নারী-শিক্ষালয়ে গৃহেরশ্রীর সৌষ্ঠব সাধন করার ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, গৃহস্থালীর কাজ প্রভৃতি শিক্ষা-বিধান ইত্যাদি অনেক গুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাব গুলিরমধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বরোদার মহারাণী

[কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত ফটো হইতে]

"এই সম্মিলনী বাল্য-বিবাহের কুফলের জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, আইন করিয়া ১৬ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধরূপে ধার্য্য করা হউক। এই সম্মীলনী এই দাবী করিতেছেন যে-সহবাস-সম্মতির বয়স ১৭ বৎসর করা হউক। সার হরি সিং গৌরের সহবাস-সম্মতি সম্পর্কিত যে বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উঠিবার কথা আছে, এই সম্মিলনী তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন।"

সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে এই আন্দোলন না থামিয়া যায় প্রতিনিধিগণ এজন্য একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ও সভার আদর্শ প্রচারকল্পে একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বরোদার মহারাণী সেই সমিতির সভানেত্রী ও শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় (মাদ্রাজ) তাহার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী অবলা বসু, ভিজিয়ানাগ্রামের ও সংগালির রাণীসাহেবাদ্বয় ও মিসেস কাজিন্স ও অপর ১৪ জন মহিলা এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহারাণীর অভিভাষণের একটি অংশ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এদেশে অনেকের ধারণা যে, ভারতবর্ষের পুরুষেরা সকলেই নারী-প্রগতি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন। হয়ত কোন কোন স্থলে পুরুষেরা নারী-আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি দেখান নাই অথবা বাধা দিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে যে পুরুষেরা নারীদের সকল বিষয়ে উন্নতির কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন তাহা সম্মিলনীর অধিনেত্রী মহাশয়ার নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেই বোঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় নারীগণের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির একটি উল্লেখ-যোগ্য কারণ—ভারতীয় পুরুষগণের নারী-আন্দোলনের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি। অন্য দেশে এরূপ সহানুভূতির একান্ত অভাব।"

নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলনীর উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হউক। দেশের শিক্ষিতা মহিলারা ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিলে সমাজের দুর্নীতি ও আবর্জ্জনা-রাশি দূর হইবে ও দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে। প্র

মৌমাছির ঘরকন্না

অনেক জীবজন্তুই দল বাঁধিয়া বাস করে, কিন্তু মৌমাছিরা যে-ভাবে হাজার হাজার একসঙ্গে বাস করে, তাহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। চাকে যখন ইহারা কাজে ব্যস্ত থাকে তখন মনে হয় যেন শত শত লোক মিলিয়া একটা কারখানা খুলিয়াছে আর তাহাতে সকলে প্রাণপণে কাজ চালাইতেছে। আজকাল গঙ্গার ধারে ধারে অনেক চটকল; তাহাতে যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক দল লোক কাজ করিতে ভিতরে যাইতেছে আবার কাজ সারিয়া বাহির হইতেছে,—মৌচাকেও তেম্নি অনবরত মৌমাছিদের কাজ আর আনাগোনা। কল চালাইতে আমাদের যেমন বুদ্ধির দরকার, মৌচাক ঠিক মত রাখিতেও তেম্নি মৌমাছিরা যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করে। বহু প্রাচীন কালে প্রথম প্রথম হয় ত একসঙ্গে মৌচাক তৈরী করিবার সময় মৌমাছিদের মধ্যে অনেক ঝগড়া, অনেক মারামারি হইত। কিন্তু তাহাতে নিজেদেরই অসুবিধা বুঝিয়া তাহারা ঝগড়া, মারামারি এখন আর বড়-একটা করে না। তবে এক মৌচাকের মৌমাছিদের সঙ্গে অপর মৌচাকের মৌমাছিদের রেষারেষি ও মারামারি এখনও বেশ চলে। একটা চাক ভাল না লাগিলে অনেক মৌমাছি নূতন জায়গায় উড়িয়াও যায় আবার নূতন চাকও করে।

চাকে একটি করিয়া স্ত্রী মৌমাছি থাকে। তাহাকে চাকের গিন্নী মক্ষিরাণী বা জননী মক্ষি বলা চলে। ইহার ডিম পাড়িবার ক্ষমতা অদ্ভুত। প্রতি দিনে মক্ষিরাণী দুই হাজার হইতে তিন হাজার ডিম পাড়ে। চাকের প্রায় সকলেরই জননী হইলেও মক্ষিরাণীর সকলকে চালাইবার ক্ষমতা নাই। তাহার বুদ্ধি খুব কম। যাহারা মধু জোগাড় করে, সঞ্চয় করে ও তাহা রাখিবার ব্যবস্থা করে তাহারাই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মী। তাহারা মক্ষিরাণীকে চালাইয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে শ্রমিক মৌমাছি বলে।

একটা চাকে মৌমাছির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়া গেলে, অন্য এক চাক তৈরী করার ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিক দল কতকগুলি মৌমাছিকে নূতন জায়গায় পাঠায়। কে কে পুরাতন বাসা ছাড়িবে তাহাও তাহারাই ঠিক করে। নূতন জায়গায় যাইবার সময় ইহারা এক সঙ্কেত করিয়া একসঙ্গে বাসা ছাড়ে। বৃদ্ধা মক্ষিরাণীকেও ইহাদের সঙ্গে যাইতে হয়। তাহার পুরাতন বাসা অপর এক অল্পবয়স্কা রাণী দখল করে, সে-ই সেখানকার গিন্নী বা জননী হয়।

মক্ষিরাণীর বাসা—চাকের ধারে ঝুলিতেছে

মৌমাছিদের মধ্যে যাহারা পুরুষ তাহারাও এক-এক চাকে অনেকগুলি করিয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব কিন্তু বড় কুঁড়ে। ইহাদের মধ্যে যে-পুরুষ সকলের চেয়ে বলশালী ও দ্রুত উড়িতে পারে সে-ই রাণীকে বিবাহ করে। বলশালী পুরুষদের মধ্যে লড়াই হয়, তাহাতে যে জেতে সে-ই রাণীর স্বামী হয়। বেশী দিন বাঁচিয়া থাকা

এই স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না। শরৎকালে চাকে মধু কম পড়িয়া গেলে, সকলের যথেষ্ট আহার জোটে না; তখন যে-সব পুরুষ মৌমাছি চাকে থাকে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় বা মারিয়া ফেলা হয়। এই সময় যদি রাণীর স্বামী বাঁচিয়া যায় তবেই তাহার ভাগ্য ভাল।

মৌমাছিদের শিকল—এই রকমে মোম তৈরী হয়

এই রকমে চাক রক্ষায় অনেক কৌশল, বুদ্ধি ও শৃঙ্খলা দেখা যাইলেও, চাকে এমন কোন মৌমাছি থাকে না যে সকলকে চালাইবার মত বুদ্ধিমান বা শক্তিমান।

মৌমাছির বাড়ী বা চাক অতি অদ্ভুত রকমে তৈরী হয়। তাহাতে সারি সারি ছোট ছোট ঘর থাকে। কোন কোন ঘর মৌমাছির বাচ্ছাদের থাকিবার ও লালিত হইবার পক্ষে উপযোগী; কোন কোন ঘরে বাচ্ছারা ডানা গজাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। কতকগুলি ঘরে শ্রমিক মৌমাছিরা খাটিয়া-খুটিয়া বিশ্রাম করে। কোন ঘর মধুর গুদাম বা ভাণ্ডার হয়। ভাণ্ডার রক্ষাই বড় কাজ, কেননা শীতকালে হাজার হাজার মৌমাছির ইহাই খাদ্য। ঘরের সারির মাঝে মাঝে দরদালান থাকে, তাহাতে মক্ষিরাণী ডিম পাড়িবার প্রচুর জায়গা পায়। এই দরদালান থাকায় শ্রমিক মৌমাছিরা তাহাদের ঘরের গায়ে গায়ে মই-এর মত সিঁড়ি পায়, তাহার উপর দিয়া যাওয়া-আসা করিবার সুবিধা হয়। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী যাহাতে প্রত্যেক ঘরে হাওয়া প্রবেশ করে।

এক-একটা চাকে কুড়ি হাজার হইতে তিরিশ হাজার মৌমাছি, আর দশ হাজার কীট বা বাচ্ছা মৌমাছি থাকে।

চাকের প্রত্যেক ঘরেই যে কেবল হাওয়া আসে তাহা নয়, মধুর গুদামে যাহাতে রীতিমত হাওয়া যাওয়া-আসা করে তাহারও ব্যবস্থা থাকে। মধু জমা হইয়া যত পাকিতে থাকে ততই তাহা হইতে একপ্রকার ভারী বাষ্প বা ভাপ উঠিতে থাকে। হাওয়া আসিয়া এই ভাপ উড়াইয়া লইয়া যায়,—তাহাতে মধু ভাল থাকে।

শীতকালে মৌমাছিদের স্বাভাবিক গতির বেগেই চাকে বায়ু-চলাচল ঘটিতে থাকে। তখন আর বেশী হাওয়ার দরকার হয় না। গ্রীষ্মকালে বেশী হাওয়ার দরকার হয়। তখন চাকের প্রধান দরজার বাহিরে ও ভিতরে দলে দলে মৌমাছিরা বসিয়া পাখা নাড়িতে থাকে। তাহাতে চাকের মধ্যে চারিদিকে হাওয়া যাইতে থাকে। হাওয়া এক পথ দিয়া যাইয়া সমস্ত চাকের ভিতর ঘুরিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া আসে। এই হাওয়াকারী প্রহরীরা আবার অনবরত বদল হইতে থাকে।

রাণীর ঘর চাকের ধারের দিকে থাকে। অন্যান্য ঘরের চেয়ে সে-ঘর বড়, অনেকটা ফাঁকা হয়। পুরাতন মক্ষিরাণীকে লইয়া নূতন চাক করিতে যাইবার ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে একটা ঘরের মাঝখানে একটি ছোট ডিম রাখা হয়। ডিম পাড়া হইবার তিন দিন পরে ডিম হইতে ছানা বা কীট বাহির হয়। এই কীট বাহির হইবা মাত্রই শ্রমিক মৌমাছিরা তাহাকে গাঢ় চক্‌চকে আটাল একরকম রসে প্রায় ডুবাইয়া ফেলে; সেই রস কীটের আহার। এই আহারেই কীট খুব দ্রুত বাড়িতে থাকে। পঞ্চম দিনের শেষে এই কীট এত বাড়িয়া উঠে যে, আকারে ও ওজনে মক্ষিরাণীর সমান হয়। তখন তাহাকে আর খাইতে দেওয়া হয় না। ঘরের ছিদ্র আঁটিয়া দিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া ফেলা হয়। কীট তখন ক্রমে ক্রমে মৌমাছির আকার ধারণ করে ও পনেরো দিনের মধ্যে মক্ষিরাণীর মতন হয়।

এই নূতন মৌমাছিই নূতন রাণী হয়। ইহাকে পুরাতন বাসায় রাখিয়া পুরাতন রাণীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রী-দল নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। যাত্রা করিবার সময় নূতন রাণীকে তাহার ঘর হইতে মুক্ত করা হয়। ঝড়-বৃষ্টির দরুন, যাত্রার দেরী হইলে, সকলে মিলিয়া নূতন রাণীকে একটু শাসনে রাখে, তাহা না রাখিলে সে বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। এদিকে নূতন রাণী তাহার স্থান দখল করিবে ইহা জানিতে পারা অবধি পুরাতন রাণীর মন অত্যন্ত খারাপ হয়; দিনের পর দিন সে বেশী চঞ্চল হইতে থাকে। তাহার উপর যদি নজর না রাখা যায় তাহা হইলে সে নূতন রাণীর দরজা ভাঙিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু অন্য সময় তাহার জন্য যতগুলা প্রহরী থাকে, এই সময়ে তাহার উপর দ্বিগুণ প্রহরী লাগান হয়। সে যতই নূতন রাণার ঘরের দিকে যাইতে চেষ্টা করে ততই তাহাকে বাধা দেওয়া হয়। ওদিকে আবার নূতন রাণী দরজা ভাঙিতে ব্যস্ত হয়; তাহাকেও কড়া শাসনে রাখা হয়। তাহার ঘরের গায়ে একটি সরু ছিদ্র করা হয়, তাহা দিয়া তাহাকে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীদল চলিয়া না যাওয়া অবধি তাহাকে বন্দী রাখা হয়।

কোন কোন চাকে একটি নূতন রাণীর বদলে দুইটি নূতন রাণী তৈরী করা হয়। তাহার কারণ একটি রাণী কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট হইয়া গেলে অপরটি কাজ চালাইতে পারিবে। একটি রাণী কাজের উপযোগী হইলে শ্রমিক মৌমাছিরা তাহাকে চাকের অধিকার দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। ঐ রাণী তখন তাহার সতীনকে অবিলম্বে খুঁজিয়া বাহির করে ও তাহার ঘর ভাঙিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

বিজেতা রাণী তখন চাকের আশে-পাশে খুব দাম্ভিক-ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ফাঁকা ঘর দেখিলেই তাহাতে ডিম পাড়ে। সে কখনও শ্রমিকদের ছোট ঘরে ডিম পাড়ে, কখনও বা পুরুষ মৌমাছিদের বড় ঘরে ডিম পাড়ে। শ্রমিকদের ঘরের ডিমগুলি হইতে শ্রমিক মৌমাছি হয়, আর পুরুষদের ঘরের ডিমগুলি হইতে পুরুষ মৌমাছি হয়। একই কালে সে তিন রকমের ডিম পাড়িতে পারে,—যেখানে যখন যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ডিম সে পাড়ে। মক্ষিরাণীর এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

সামান্য জীবের এই ইচ্ছাশক্তি ও অদ্ভুত ক্ষমতার কারণ খুঁজিতে গেলে, কারণ পাওয়া ত দূরের কথা বিস্ময়ের শেষ থাকে না।

গুপ্ত

মৃত্যুদূত

সেল্‌মা লাগরলফ্

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাগরণ

বহু অজানিত পথ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুযানখানি একটি গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। জর্জ্জ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ডেভিডকেও নামিতে ইঙ্গিত করিল। সেই অত্যন্ত পরিচিতস্থানে জর্জ্জকে আসিতে দেখিয়া ডেভিড্ চমকিত ও বিরক্ত হইল। জর্জ্জ নিঃশব্দে ডেভিডকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। ডেভিড আর হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় ছিল না, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিনা বাক্যব্যয়ে জর্জ্জের সহযাত্রী হইয়াছিল। সহসা বিতৃষ্ণায় তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল—মরণোন্মুখ কেহ নিশ্চয়ই এখানে নাই! অথচ জর্জ্জ অকারণে তাহাকে তাহার নিজ গৃহে তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের সম্মুখে আনিল কেন? সে রাগত হইয়া এ-বিষয়ে জর্জ্জকে প্রশ্ন করিতে যাইবে—জর্জ্জ হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে নিষেধ করিল।

সেই কক্ষে দুইটি স্ত্রীলোক কি যেন একটা গভীর আলোচনায় নিবিষ্ট ছিল। ডেভিড্ দেখিল, মুক্তিফৌজের একজন সিস্টার তাহার স্ত্রীকে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার স্ত্রী এমনই কাতর ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইতেছিল।

ডেভিডের স্ত্রীকে আশ্বাস ও সাহস দিবার জন্য সিস্টারটি বলিলেন, "দেখ, মিসেস্ হল্‌ম্, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার দুখের রাত্রি প্রভাত হ'তে চ'লেছে। তুমি শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হচ্ছ। আমার মনে হয়, ডেভিড তোমার উপর তার চরম অত্যাচার করেছে; তুমি ফিরে আসার পর তার মনে যে-প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা হ'য়েছিল তা সম্ভবতঃ তার নেওয়া হ'য়ে গেছে। সে মুখে বলেছে বটে যে, তোমার ছেলেদের সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, হাসপাতালে যেতে দেবে না, কিন্তু একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় লোকে যে সব সর্ব্বনেশে কথা বলে, কাজে তা সত্যি সত্যি করে না। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

ডেভিডের স্ত্রী বলিল বটে, "সিস্টার, আপনার এই সহানুভূতির জন্যে অনেক ধন্যবাদ," কিন্তু তাহার ভাবে বোধ হইল যেন সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয় নাই। সিস্টার হয় ত তেমন লোকের কথা জানেন না যে মুখে যা বলে, কাজেও তা ক'রে উঠতে পারে, তা সে-কাজ যতই ভয়ানক হোক না,—কিন্তু সে ত তেমন একজনের কথা জানে।

সিস্টার ডেভিডের স্ত্রীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হতাশ হইয়া ভাবিলেন, ইহাকে ভরসা দিবার চেষ্টা এখন বৃথা। তবু বলিলেন, "মিসেস্ হল্‌ম্, একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার। কয়েক বছর আগে স্বামীকে ছেড়ে তুমি যখন পালিয়েছিলে সেটা খুব বড় একটা পাপ কাজ না হ'লেও তোমার অন্যায় হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার ফল এখন তোমাকে পেতে হচ্ছে। অবিশ্যি, যথেষ্ট শাস্তি তুমি ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছ। তুমি চ'লে যাওয়ার পর থেকেই তার পাপের মাত্রা বেড়ে বেড়ে তাকে এতটা পাষাণ ক'রে ফেলেছে। যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, শাস্তিও পেয়েছ ঢের, এখন নিশ্চয়ই তোমার শুভদিন আস্‌ছে। যে-ঝড় তখন উঠেছিল এক নিমেষে তা শান্ত হ'বার নয়। তবে সিস্টার ঈডিথের কল্যাণ-চেষ্টা আর তোমার সহগুণের ফল এবার পাবে ব'লেই আমার মনে হয়।"

ডেভিডের স্ত্রী, সিস্টারের এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন অনেকখানি ভরসা পাইয়া, মুখ তুলিয়া গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "যদি আপনার কথা সত্যি ব'লে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তাম।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সিস্টার বলিলেন, "আমার কথা সত্যি হ'বে বোন, কালকে তোমার জীবনের এক পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। তুমি দেখ্‌বে নতুন বছরের সঙ্গে-সঙ্গে তোমার জীবনও নতুন হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে।"

ডেভিডের স্ত্রী অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল, "নতুন বছর? ও—হ্যাঁ, তাই বটে, আমি সে-কথা ভুলেই গেছ্‌লাম, সিস্টার। রাত কটা হ'ল?"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিস্টার বলিলেন, "ভোর হ'তে আর দেরী নেই, দুটো বাজে-প্রায়।"

"তা হ'লে সিস্টার আপনি এবার শুতে যান। আমার মন অনেকটা শান্ত হয়েছে, আমার কাছে থাক্‌বার আর দর্‌কার নেই।"

কিন্তু সিস্টারের সন্দেহ তখনও দূর হয় নাই। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেভিডের স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "মিসেস্ হল্‌ম্, আমার এখনও যেন মনে হচ্ছে তুমি শান্ত হও নি, তোমার এই বাইরের শান্তির অন্তরালে তোমার যেন কি মতলব আছে।"

ডেভিডের স্ত্রী উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "না সিস্টার, আপনি আমার জন্যে একটুও ভাববেন না; আমি জানি, আজ অনেক রূঢ় কথা বলেছি, কিন্তু মনের সে-অবস্থা আমার কেটে গেছে।"

সিস্টার তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্যি সত্যি মনের সমস্ত ভার ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে? তিনি তোমার মঙ্গল কর্‌বেন নিশ্চয়ই।"

ডেভিডের স্ত্রী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি পার্‌ব, নিশ্চয়ই পার্‌ব।"

"ভোর পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকতে আমার কিছুমাত্র

কষ্ট হ'ত না বোন, তবে তুমি যখন বল্‌ছ যে তুমি প্রকৃতিস্থ হ'য়েছ—"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সিস্টার, আপনি আজ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। ডেভিড এবার এল ব'লে—আপনি যান।"

আরো দুই-একটি কথা বলিয়া তাহারা উভয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ডেভিড বুঝিতে পারিল, তাহার স্ত্রী মুক্তিফৌজের সিস্টারকে দরজা খুলিয়া দিতে ও বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গেল।

মৃত্যুদূত ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডেভিড, সব শুন্‌লে ত? তুমি কি লক্ষ্য কর্‌লে, যে, বাইরে মানুষ যে বিষয়ে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা কামনা করে, তার পূর্ণ আশ্বাস তার নিজের মধ্যেই। চিরজীবন সুস্থ দেহে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বেঁচে থাক্‌বার পুরো ইচ্ছাটা তার অন্তরেই আছে, বাইরের আশ্বাসে সে কেবল জোর খোঁজে।"

জর্জ্জের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেভিডের স্ত্রী ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল—সে এই-মাত্র যে প্রতিশ্রুতি করিল তাহা রক্ষা করিবে। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সে একটি চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল।

হঠাৎ সদর দরজায় কি যেন একটা শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল। মনে মনে বলিল—"নিশ্চয়ই ডেভিড্‌ আস্‌ছে।"

সে অধীরভাবে জানালার ধারে ছুটিয়া গিয়া নীচে অন্ধকার উঠানে দেখিবার চেষ্টা করিল। মিনিট দুই সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীচে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সে যখন ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল তখন তাহার মুখভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আরক্ত মুখখানি দারুণ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; চক্ষু ও ওষ্ঠের উপর কে যেন ছাই লেপিয়া দিয়াছে। তাহার সমস্ত অবয়ব যেন কঠিন হইয়া গিয়াছিল, ঠোঁট দুটি প্রবল আবেগে কাঁপিতেছিল।

সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, এ অসহ্য।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অধীর পদক্ষেপে কক্ষের ঠিক মাঝখানে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"হ্যাঁ, ঈশ্বরেই বিশ্বাস কর্‌ব। লোকে ভাবে, আমি বুঝি কখনো তাঁর কাছে প্রার্থনা করিনি, তাঁকে ডাকিনি। বিশ্বাস আমি কর্‌ছি তাঁকে কিন্তু তাঁর করুণা পেতে হ'লে কি কর্‌তে হয় তা ত জানি না!"

তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির না হইলেও তাহার ব্যথিত আর্ত্তনাদ ক্রন্দন বলিয়াই মনে হইল। সে এমন গভীর হতাশায় পীড়িত হইতেছিল যে, নিজের কার্য্য বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

ডেভিড হল্‌ম্‌ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল।

ডেভিডের স্ত্রী স্খলিত পদে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সন্তান দু'জন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। কিঞ্চিৎ আনত হইয়া তাহাদের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান, এরা এত সুন্দর কেন?"

ধীরে ধীরে সে নতজানু হইয়া সেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট কাতরস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "না না, আর থাকা নয়। আমি যাব, এদিকেও ফেলে রেখে যাব না।" সে গভীর প্রীতির সহিত ছেলেদের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাছারা, তোদের মায়ের ব্যবহারের জন্যে রাগ করিস্‌ না রে—এ ছাড়া আর কোনো পথ আমি দেখছি না।"

সহসা বাহিরের দরজায় আবার যেন কি-একটা শব্দ হইল। স্ত্রীলোকটি সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যখন সে বুঝিল যে কেহ নহে তখন আশ্বস্ত হইয়া এক অস্বাভাবিক ব্যথা-কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "না না আর দেরী না, ডেভিড আবার এসে পড়বে—তার আগেই সব চুকিয়ে ফেলি।"

'আর নয়' বলিয়াও সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই অর্দ্ধঅন্ধকার কক্ষে পায়চারী করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল, "কেন জানিনা কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে,—না না, তাতে লাভ হবে কি?

যেমন সব দিনগুলো গেছে কালও তেম্‌নি কাটবে। কালকে ডেভিড যে হঠাৎ ভাল হ'য়ে উঠবে এ ত বিশ্বাস হয় না।"

ডেভিড হল্‌মের সহসা মনে পড়িয়া গেল গীর্জ্জাসংলগ্ন ঝোপের ভিতর তাহার মৃতদেহের কথা। হয়ত অল্পকাল-মধ্যেই সেটাকে গোর দেওয়া হইবে। তাহার ইচ্ছা হইল, কেহ তাহার স্ত্রীকে এই খবরটা জানাইয়া দিক্—ডেভিডের হাতে আর কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই।

দূরে কোথায় যেন দরজা খোলার শব্দ হইল, ডেভিডের স্ত্রী এবারেও ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। উনানের নিকট গিয়া সে ভিতরে কিছু কাঠ গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল, "ডেভিড এসে আমাকে এভাবে দেখ্‌লেই বা ক্ষতি কি? তার অপেক্ষায় রাত জাগবার জন্যে একটু কফি তৈরী কর্‌ছি বই ত নয়।"

এই কথা শুনিয়া ডেভিড অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইল। সে পুনরায় এই ভাবিয়া অবাক্ হইতে লাগিল, জর্জ্জ সেখানে তাহাকে লইয়া আসিল কেন! মরণাপন্ন বা অসুস্থ সেখানে ত কেহ নাই।

মৃত্যুদূত আপাদমস্তক আবৃত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে এতদূর চিন্তান্বিত বোধ হইতেছিল যে, ডেভিড ভাবিল, "জর্জ্জকে প্রশ্ন করা বৃথা। সম্ভবতঃ সে আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে শেষবার দেখা করাতে নিয়ে এসেছে। শেষবারই ত! ওদের দেখতে না পেলে কি আমি দুঃখিত হ'ব? কিছুমাত্র না। তার মনে ত একজন ছাড়া আর আজ কারো স্থান নেই।" ভাবিতে ভাবিতে সে সন্তানদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার ছোট ভাইয়ের কথা, সে একটি ছোট্ট বালককে ভালবাসিয়া তাহারই জন্য কারাবরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। নিজের প্রতি ডেভিডের একটু ধিক্কার জন্মিল। হায়, হায়! সে আপন সন্তানদেরও ভালবাসিতে পারে নাই!

তাহার অন্তঃকরণ স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। সে কামনা করিল, যেন ইহারা সংসারে ভালভাবে চলিতে পারে। তাহাদের পিতার কথা তাহারা ভাবিবে কি? কেন ভাবিবে? কাল যখন তাহারা তাহাদের হতভাগ্য পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিবে, তাহাদের আনন্দ হইবে নিশ্চয়ই। ডেভিড ভাবিতে লাগিল, বড় হইয়া ইহারা কি ভাবে জীবন যাপন করিবে—সৎভাবে কি? আজ তাহার সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজেকে চিন্তিত হইতে দেখিয়া ডেভিড একটু বিস্মিত হইল। কে জানে হয়ত বা তাহারা পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিবে! কিন্তু হায় তাহারা কি জানিবে, তাহাদের দুর্ভাগ্য পিতা জীবনে সুখী ছিল না। ডেভিডের অত্যন্ত দুঃখ হইল, সময় থাকিতে ইহাদের জন্য যদি সে সামান্য মাত্র ভাবিত! যদি সে আবার ফিরিয়া আসিতে পায়, তাহা হইলে ছেলেদের সৎপথে চলিতে শিখাইবে।

ডেভিড আজ নিজের মনকে যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বগতঃ বলিল, "তাইত, যে-স্ত্রীকে আমি এত ঘৃণা করেছি—তার প্রতি ত আজ মনে কোনো বিদ্বেষ নেই! জীবনে বহু দুঃখ তাকে পেতে হ'য়েছে—এর পরে যেন সেও সুখী হয়। তার সুখের একমাত্র অন্তরায় ছিলাম আমি, আমি চ'লে গেলে সে সম্ভবতঃ সুখী হ'বে।—"

ডেভিড সহসা চমকিয়া উঠিল, সে এতক্ষণ নিজের চিন্তায় এমন বিভোর ছিল যে, স্ত্রীর দিকে তাহার কোনো লক্ষ্য ছিল না। নিদারুণ ব্যথায় তাহার মুখ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইল।

উনানের ধারে তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া। উনানের উপরের কেটলী-স্থিত জলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "জল ফুট্‌তে সুরু হয়েছে—আর বেশী দেরী নেই। সব শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল, কিসের মায়া আমার?"

সে পার্শ্বস্থিত কুলুঙ্গী হইতে একটা চা-দানি লইয়া তাহাতে কিছু কফি-পাতা ফেলিল। তারপর তাহার জামার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র মোড়ক বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সাদা গুঁড়া লইয়া চা-দানে ফেলিয়া তাহাতে জল ঢালিল।

ডেভিড্ মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল, ইহার অর্থ তলাইয়া দেখিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহার হইতেছিল না। যেন ডেভিডকে সম্মুখে দেখিতেছে এই ভাবে তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "ডেভিড্,

এবার তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার, এই গুঁড়োটুকুই আমাদের তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। ছেলেদের তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি যেতে পারব না। আর ঘণ্টাখানেক তুমি বাইরে থাক—তারপর বাড়ী এসে বোধ হয় তুমি খুসীই হ'বে।"

ডেভিড্ আর সহ্য করিতে পারিল না। মৃত্যুদূতের নিকট ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "জর্জ্জ, তুমি কি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না? এ যে সর্ব্বনাশ করতে বসেছে!"

মৃত্যুদূত শান্তভাবে বলিল, "দেখছি বই কি, ডেভিড। আমি ত এইজন্যেই এখানে উপস্থিত রয়েছি, আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে।"

"না না, তুমি বুঝছ না জর্জ্জ, ও ত শুধু একা মরতে যাচ্ছে না, ছেলেদেরও যে ও—"

"হ্যাঁ ডেভিড্, ছেলেদেরও—"

"না না, তা হ'তে দিও না, জর্জ্জ। এর কি কোনো প্রয়োজন আছে? তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও, আর কোনো ভয় নেই ওর।"

"আমার কথা ত ও শুনতে পাবে না, ডেভিড, ও যে এখনও বহুদূরে আছে।"

"কিন্তু জর্জ্জ, তুমি কি এমন কিছু ঘটাতে পার না, যাতে ক'রে ও বুঝ্‌তে পারে, ওর বিপদ কেটে গেছে।"

"না ডেভিড্, জীবিতদের ওপর আমার কোনো প্রভুত্ব নেই। ডেভিড হল্‌ম তবু হাল ছাড়িল না। সে জর্জ্জের সম্মুখে নতজানু হইয়া জোড়হস্তে বলিল, "জর্জ্জ তুমি কি ভুলে গেলে, আমি একদা তোমার বন্ধু ছিলাম। আমার উপর একটু করুণা কর, এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌তে দিও না—ওই ক্ষুদ্র শিশুরা ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!"

উত্তরের অপেক্ষায় সে জর্জ্জের মুখের পানে চাহিল। জর্জ্জ কেবলমাত্র মাথা নাড়াইয়া জানাইল—সে অপারগ।

"জর্জ্জ, আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব। মৃত্যুযানের চালক হ'তে এর আগে আমি অস্বীকার করেছি, আমি রাজি আছি তোমার এই কাজ নিতে, শুধু তুমি এ দৃশ্য আমাকে আর দেখিও না। ওরা কত ছোট তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না জর্জ্জ! আমি যে এক্ষুণি ওদের কল্যাণ কামনা করছিলাম—ওরা যেন সৎপথে চল্‌তে পারে। হায় হায়, আমার স্ত্রী কি আজ পাগল হ'য়ে গেল! ও বুঝ্‌তে পারছে না, কি ভয়ঙ্কর কাজ করছে। জর্জ্জ, ওকে দয়া কর।"

মৃত্যুদূত নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডেভিড্ হতাশ হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, আমি কত অসহায়! আমি কার কাছে প্রার্থনা করব—জানি না। তুমি ভগবান, বা যিশুখ্রীষ্ট যেই হও, আমি আজও তোমায় চিনি না। এই অন্ধকারে মৃত্যুলোকে আগন্তুক আমি, আমাকে বল দাও, আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি কি ভাবে তোমাদের কৃপা ভিক্ষা করব।

"না না, আমি একজন অসহায়—বহু পাপে পাপী। জীবনমৃত্যুর দেবতা যিনি, তাঁর কাছে কৃপাভিক্ষার অধিকারও আমার নেই! আমি জীবনে তোমার সকল নীতিকে অবহেলা করেছি, সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছি—আমাকে তুমি অনন্ত অন্ধকারে নিক্ষেপ কর—আমাকে নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দাও, শুধু এই তিনটি নিরীহ প্রাণীকে রক্ষা কর।"

এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া ডেভিড্ শান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শুধু তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল—

"যাক্, গুঁড়োটা জলে ঠিক মিশেছে, জলটা শুধু ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র, তারপর—"

জর্জ্জ এতক্ষণে আনত হইয়া অনাবৃত মস্তকে ডেভিডের কাছে মুখ লইয়া গেল। মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত মুখখানি অপার্থিব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সে বলিল, "ডেভিড, তোমার প্রার্থনা যদি সত্যি হয়, ওদেকে রক্ষা করবার উপায় এখনো আছে। তুমি নিজে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে আশ্বাস দাও, বল তোমা দ্বারা তাদের আর কোনো অমঙ্গলের ভয় নেই।"

"কিন্তু, তা কেমন ক'রে হ'বে জর্জ্জ, আমার কথা ও কি শুনতে পাবে?"

"না, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নয়, ডেভিড্‌, হল্‌মের যে মৃতদেহ গির্জ্জার ঝোপে প'ড়ে আছে তুমি তাতে ফিরে যাও। তুমি কি যেতে পারবে?"

ভয়ে আতঙ্কে ডেভিড্ শিহরিয়া উঠিল। এই মর্ত্ত্য-

মানবজীবন তাহার নিকট অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হইল, সে যেন আলো-বাতাসহীন কঠিন কারাগার! সে যদি আবার মানুষের দেহ ধারণ করে তাহা হইলে হয় ত তাহার আত্মার পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সে যে এই নূতন লোকে বহু আশা লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে!

তবু সে দ্বিধা করিল না। বলিল, "যদি আমার সে স্বাধীনতা থাকে—আমি যাব। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমাকে মৃত্যুযানের—"

জর্জ্জের মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি ঠিক ভেবেছ, ডেভিড্, তোমাকে এই বছরটা মৃত্যু-যানের চালক হ'তে হ'বে—তবে যদি কেউ তোমার হ'য়ে একাজ করে—তাহ'লে—"

ডেভিড্ হতাশ হইয়া বলিল, "তেমন বন্ধু আমার কে আছে, জর্জ্জ—আমার মত হতভাগ্যের জন্যে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি কে নেবে?"

"ডেভিড্, অন্ততঃ একজনের কথা আমি জানি, যে তোমাকে ধর্ম্মপথ-বিচ্যুত করেছে ব'লে আজিও অনুতাপ করে। সে স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ত্তব্যভার মাথায় পেতে নিতে রাজি আছে—কারণ সে এটুকু জেনে খুসী হবে যে ভবিষ্যতে তোমার অসদ্ব্যবহারে আর কখনো তাকে পীড়িত হ'তে হ'বে না।"

তাহার কথার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার অবসর না দিয়াই জর্জ্জ শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্য বিকীর্ণ করিয়া ডেভিডের মাথার উপর নত হইয়া বলিল, "বন্ধু, ডেভিড্ হলম্, জীবনের আর অপব্যবহার কোরো না। আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাক্‌ব। তুমি যাও, দেরী করার আর সময় নেই।"

"কিন্তু, জর্জ্জ—তুমি কি—"

মৃত্যুদূত সহসা গম্ভীর হইয়া হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল, এই আদেশ অমান্য করিবার শক্তি ডেভিডের ছিল না। নিমিষমধ্যে সে মস্তকের আবরণ টানিয়া দিয়া, কর্কশ, উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিল—

"বন্দী, কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

[আগামীবারে সমাপ্য]

সম্পাদকের চিঠি

(৫)

আমার আগেরকার চিঠিগুলিতে, যাহা কিছু দেখিয়াছি সমুদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি নাই, এই চিঠিটিতেও তাহা করিব না; যাহা যাহা দেখিয়াছি,কেবল তাহার কোন-কোনটি সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিস্তারিত বর্ণনা করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলেও লণ্ডন সম্বন্ধে তাহা করা, একখানা চিঠিতে কেন, বহুসংখ্যক চিঠিতেও অসাধ্য হইত। যাহাকে লণ্ডন কৌণ্টি বা জেলা বলে তাহাই ১১৬৷৷০ বর্গ মাইল পরিমিত এবং তাহার লোকসংখ্যা ৪৪, ৮৩, ২৪৯। বৃহত্তর লণ্ডনের আয়তন ৬৯৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৫ লক্ষ। উহাতে ৭০০০ মাইল রাস্তা এবং প্রায় দশ লক্ষ বাসগৃহ আছে। অতএব বলা বাহুল্য মাত্র, যে, আমি যে অল্প কয়দিন লণ্ডনে ছিলাম তাহার মধ্যে সমুদয় প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান, প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ী প্রভৃতিও দেখিতে পারি নাই, কয়েকটি মাত্র দেখিয়াছিলাম।

আমি যখন লণ্ডন যাই, তখন পার্লেমেণ্টের অধিবেশন বন্ধ ছিল; এইজন্য, উহার কাজ কর্ম্ম কি প্রকারে হয়, তর্কবিতর্ক বক্তৃতাদি কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার শুনিবার সুযোগ হয় নাই। পার্লেমেণ্টের বাড়ী দূর হইতে একটা বৃহৎ গির্জ্জার মত দেখায়। ইংরেজীতে উহার উল্লেখ করিতে হইলে এখনও যে উহাকে সেণ্টষ্টীভেন্স্ বলা হয়, তাহার কারণ, উহার এক অঙ্গ হাউস্ ' [illegible]মন্সের

অধিবেশন রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ড কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেণ্ট্ ষ্টীভেন্সের গির্জ্জায় হইত। এই পুরাতন ইমারৎ ১৮৩৪ সালে আগুন লাগিয়া নষ্ট হয়। পার্লেমেণ্টের নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণ ১৮৪০ সালে আরব্ধ হইয়া ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১৮৫৭ সালে শেষ হয়। ইহা প্রায় ২৬ বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত।

ওয়েষ্টমিন্ষ্টার য়্যাবী নামক সুবিখ্যাত গির্জ্জা ও মঠ বহু শতাব্দী ধরিয়া বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বা মহান্ত বাস করেন না; উপাসনাদি হয় বটে। ইহার ষ্টেটস্‌ম্যান্স্ আইল্ নামক অংশে ইংলণ্ডের সমুদয় সুবিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী ও রাজনৈতিক পুরুষদের সমাধি বা স্মারক মূর্ত্তি আদি আছে। আর-একটি অংশের নাম পোয়েটস্ কর্ণার অর্থাৎ কবিদের কোণ। এখানে চসার হইতে টেনিসন্ ও রাস্কিন্ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সমুদয় শ্রেষ্ঠ কবি ও অন্য লেখকদের মূর্ত্তি বা অন্য স্মৃতিচিহ্ন আছে। এই সমুদয় সমাধি মূর্ত্তি প্রভৃতি ইংরেজদের বীর-পূজার ও স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন। ইহা দেখিলে ইংরেজ যুবকদের স্বদেশের গৌরবের কথা মনে পড়ে, এবং মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারিতে যে নানা যুগের বিখ্যাত ১১০০ ইংরেজ পুরুষ ও নারীর তৈল-চিত্রাদি আছে, তাহা হইতেও ঐরূপ ফলের উদ্ভব হয়। রাজা, রাজনৈতিক, কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, বিচারক, যোদ্ধা, অভিনেতা প্রভৃতির এই ছবিগুলি দেখিতেও বেশ সুন্দর এবং অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হইয়াছে। এখানে বিখ্যাত লোকদের ছবি ছাড়া তাঁহাদের মর্ম্মর ও ধাতু মূর্ত্তি, মেড্যাল, হস্তাক্ষরের নমুনা, স্বাক্ষর প্রভৃতিও আছে। ইউরোপের যেখানে যেখানে গিয়াছি, সমুদয় সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাতিশয় যত্নের সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে দেখিয়াছি।

ওয়েষ্টমিন্ষ্টার য়্যাবীতে একজন অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ যোদ্ধার সমাধি আছে। গত মহাযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধির উপর পাথরে যে-সব কথা খোদিত আছে, তাহার মধ্যে লেখা আছে, যে, ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধে ইংরেজ জাতির যে-সব লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বর, রাজা ও স্বদেশের জন্য, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং পৃথিবীর স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল। যে-সকল ইংরেজ যুদ্ধে মারা যায়, তাহাদের মধ্যে কেহই ভাবে নাই,যে, সে ঈশ্বরের জন্য, ন্যায়ের জন্য, মানবজাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে করিতেছে, এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। ইংরেজরা যে ঐ যুদ্ধ স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য, স্বদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নিজেদের রাজার জন্য করিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও তাহারা ঐ যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যদি একথা বলা হয়, যে, ঐ যুদ্ধ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, মানব জাতির স্বাধীনতার জন্য এবং ঈশ্বরের জন্য করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা হয় এবং ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। যুদ্ধটার যে-সব কারণ জানা গিয়াছে এবং ফল যাহা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারির সামনে আছে নার্স অর্থাৎ শুশ্রূষাকারিণী ক্যাভেলের স্মৃতিচিহ্ন। "হিউম্যানিটী" অর্থাৎ মানবীয় দয়া-ধর্ম্মের একটি রূপক মূর্ত্তি ইহার অঙ্গীভূত। গত মহাযুদ্ধে যখন বেল্‌জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স্ জার্ম্মেনদের হস্তগত ছিল, তখন ঈডিথ ক্যাভেল্ তথাকার রেড্‌ক্রস্ হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। এইরূপ হাঁসপাতালে শত্রুমিত্র উভয়পক্ষের আহত ও পীড়িত সৈন্যদের চিকিৎসা হইতে পারে। কিন্তু ব্রসেল্‌স্ তখন জার্ম্মেনদের অধীন ছিল বলিয়া, জার্ম্মেন্‌দের শত্রুপক্ষীয় ইংরেজ ফরাসী বেলজীয় বন্দীকৃত সৈন্যদিগকে বা ঐ ঐ জাতীয় যুদ্ধ করিতে সমর্থ অন্য লোকদিগকে পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে, সাহায্যকারী অন্তর্জ্জাতিক ও সামরিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বিবেচিত হইতেন। ইডিথ্ ক্যাভেল্ এইরূপ অনেক ইংরেজ, ফরাসী ও বেলজীয়কে পলায়ন করিয়া নিরপেক্ষ হল্যাণ্ডদেশে যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য জার্ম্মেন্‌দের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ইংরেজরা তাঁহাকে একান্ত স্বদেশপ্রেমিক বিবেচনা করিয়া

তাঁহার এই স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহার গাত্রে প্রথমে কেবল লেখা ছিল, যে, তিনি স্বদেশ ও তাহার রাজা এবং ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯২৪ সালে, যখন বিলাতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়, সেই সময় একদিন রাতারাতি শুশ্রূষাকারিণী ক্যাভেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উচ্চারিত, নিম্নলিখিত চিরস্মরণীয় কথাগুলিও ঐখানে খোদিত হয়:—

"স্বদেশপ্রেম যথেষ্ট নহে; আমার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা মনের তিক্ততা যেন নিশ্চয়ই না থাকে।"

লণ্ডনে থাকিতে শুনিয়াছিলাম, যে, শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের আমলে এই কথাগুলি তাড়াতাড়ি রাতারাতি খোদিত করাইবার কারণ এই, ছিল যে, তাহা না করিলে অত্যুৎকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমিক কতকগুলি লোকের দল বাঁধিয়া ও জনতা করিয়া উহাতে বাধা জন্মাইবার আশঙ্কা ছিল। এরূপ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা বলা যায় না। বিখ্যাত ইংরেজ নৌযোদ্ধা নেল্‌সন্‌ রণতরী বিভাগের ছোক্‌রা নাবিক-দিগকে প্রথমেই যে কয়টি উপদেশ দিতেন, তার একটি "to hate every Frenchman as the Devil," প্রত্যেক ফরাসীকে শয়তানের মত দ্বেষ করা। সুতরাং স্বদেশপ্রেম যে বিস্তর ইংরেজের মনে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষের সমার্থক, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সর্ব্বদেশেই—আমাদের দেশেও, এরূপ লোক আছে।

অতএব বিশ্বপ্রেমিকদের পক্ষে ইহা আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়, যে, যিনি স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, ঈডিথ ক্যাভেলের মত এরূপ একজন লোক মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, স্বজাতি অপেক্ষা মানব জাতি বৃহত্তর, এবং স্বাজাতিকতা বিশ্বমৈত্রীর অবিরোধী ও অন্তর্গত হইলে তবেই তাহা ধর্ম্মসঙ্গত হয়।

নেল্‌সন্‌ ট্রাফ্যাল্গারের জলযুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাজিত করেন। তদনুসারে লণ্ডনের একটি স্কোয়ারের নাম ট্রাফ্যাল্গার স্কোয়ার। ইহা শোভা-সৌন্দর্য্যহীন। এখানে ১৮৫ ফুট উঁচু নেল্‌সন্‌ মনুমেণ্ট নামক স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের উপর ১৭ ফুট উঁচু নেল্‌সনের মূর্ত্তি। প্যারিসের ঈফেল টাওয়ারের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম উঁচু হইলেও, ইহা দেখিলে তাক্‌ লাগে বটে। উপরের মূর্ত্তিটা দেখিবার চেষ্টায় আমার টুপি খুলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। নেল্‌সন্‌ মনুমেণ্ট বোধ হয় ইংলণ্ডের উচ্চতম মনুমেণ্ট, যদিও নেল্‌সন্‌কে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বা সকলের চেয়ে ইংরেজদের হিতকারী বলা যায় না। তিনি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন না, সাধারণ মাপকাঠি অনুসারেও তিনি মনস্বী ছিলেন না। তবে ইহা ঠিক বটে, যে, তিনি ইংরেজদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন।

হাইড পার্কের বার্ড স্যাংচুয়ারী বা পক্ষীদের আশ্রয়স্থান আর-একটি অন্য রকমের স্মৃতি-চিহ্ন। এখানে পক্ষীহিংসা নিষিদ্ধ। ইহা একটি কুঞ্জের মত। আমরা মুখে অহিংসা-বাদী হইলেও পশু-পক্ষীর প্রতি প্রকৃত দয়ামমতা আমাদের দেশে বেশী নাই—ইউরোপের চেয়ে কম আছে বা বেশী আছে, তাহা বিবেচনা করা অনাবশ্যক। লণ্ডনে নানা রকমের পাখী অনেক দেখা যায়। লণ্ডনের পার্ক বা সর্ব্বসাধারণের উদ্যানগুলিতে পক্ষীদের আশ্রয়-স্থান থাকা তাহার অন্যতম কারণ। শুধু লণ্ডন কৌন্টিতেই যত সর্ব্বসাধারণের উদ্যান আছে, তাহার মোট আয়তন প্রায় ২৪,০০০ বিঘা হইবে; বৃহত্তর লণ্ডনে আরও বেশী। হাইড পার্কের স্যাংচুয়ারীটি ডব্লিউ এইচ হাডসন্‌ নামক বিখ্যাত লেখক ও পক্ষীতত্ত্ববিদের স্মৃতি-চিহ্ন। পাখীদের স্নানপানের জন্য পাথরের চৌবাচ্চাটি ইহার অন্তর্গত। কেহ কেহ মনে করেন, ইহার একপাশে যে রূপক মূর্ত্তি (Panel of Rima) খোদিত আছে, তাহার দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। ইহা বিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌ষ্টাইন্‌ দ্বারা রচিত। ইহার নিন্দুকদের নিন্দার কারণ বোধ হয় এই, যে, ইহাতে যে মানুষটির মূর্ত্তি খোদিত আছে,তাহার করতল শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছু বৃহৎ। মানুষটি আশ্রয় দিবার ভঙ্গী করিয়া হাত বাড়াইয়া আছেন। আমার বিবেচনায় এক্ষেত্রে প্রসারিত করতল বড় করিয়া দেখানতে কোন দোষ হয় নাই। ললিত-কলা বিজ্ঞান নহে। আশ্রয় দিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করাই যখন মূর্ত্তিটির উদ্দেশ্য, তখন আশ্রয়দানব্যঞ্জক প্রসারিত করতল বড় করিয়া দেখান অসঙ্গত নহে। আমাদের দেশে দশদিক্‌ রক্ষা দ্যোতনার্থ দুর্গামূর্ত্তিকে দশভুজা করা

হয়। বিজ্ঞান অনুসারে অবশ্য কোন মনুষ্যসদৃশ মূর্ত্তির দশটি হাত হইতে পারে না। কিন্তু বিশেষ কোন একটি আইডিয়া জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহা অবৈধ নহে।

উক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হাইড পার্কের এই স্থানটিতে কয়েক দিন খুব উত্তেজিত জনতার সমাবেশ, তর্ক-বিতর্ক ও বাদবিতণ্ডা হইয়াছিল। কারণ, এই মূর্ত্তিটি। ইহা ইংরেজদের সজীবতার ও মানসিক কৃষ্টির একটি প্রমাণ। আমাদের দেশে বাস্তবিক অপকৃষ্ট কোন মূর্ত্তি কোথাও স্থাপিত হইলেও কেহ কখন টুঁ শব্দও করে না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, যে, আমি লণ্ডনে থাকিতে একদিন এপষ্টাইনের বাড়ী গিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৪৭এ চলিতেছে। তিনি জাতিতে পোল; জন্ম নিউইয়র্কে, শিক্ষা প্যারিসে, থাকেন লণ্ডনে। তিনি অনেক বিখ্যাত অবিখ্যাত বাস্তব মানুষের যে-সব আবক্ষ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রায় সকলেরই প্রশংসা পাইয়াছে; কিন্তু রূপক মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে সমালোচনার ঝড় বহিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মকক্ষ দেখিতে যাইবার উপলক্ষ্য। যখন তাঁহার বাড়ী যাই, তখন তিনি কাজ করিতেছিলেন, হাতে প্ল্যাষ্টার লাগিয়াছিল। এইজন্য, আমাকে দেখিয়া কর-কম্পন করিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু আমি হাত বাড়াইয়া দেওয়াতে তিনিও হাত বাড়াইয়া কর-কম্পন করিলেন। রবিবাবুর মুখমণ্ডল তিনি ঠিক্ রচনা করিতে পারিয়াছেন, মনে হইল না। সাদৃশ্য সম্পূর্ণ না হইলেও এম্নি সাদৃশ্য হয় ত কতকটা আছে; কিন্তু উহার মধ্যে চিন্তা বা ভাব কিছু নাই, কবির ব্যক্তিত্ব উহাতে একটুও পরিস্ফুট হয় নাই। ঔপন্যাসিক কন্‌রাডের মুখখানা ভালই মনে হইল। তাঁহাকে আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু মুখখানা একজন সজীব প্রতিভাশালী লোকের বলিয়া মনে হয়। জেম্‌স্ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডন্যাল্‌ডের মুখমণ্ডলও সেখানে দেখিলাম। ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একটি ভারতীয় বালকের মুখও দেখিলাম। কে সে, জানি না। কিন্তু লাগিল ভাল।

হাইড্ পার্কের বার্ড স্যাংচুয়ারীর বিষয় লিখিতে গিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন ঐ পার্কের বিষয় কিছু বলি। খাস্ লণ্ডনে হাইড পার্কই সকলের চেয়ে বড় পার্ক। সন্নিহিত কেন্সিংটন গার্ডেন সমেত ইহার আয়তন প্রায় দু হাজার বিঘা। হাইড পার্ক রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নানাবিধ সভার ও জনতার জন্য বিখ্যাত। যাহার যে কোন রকমের মত, আদর্শ, খেয়াল বা অন্যকিছু প্রচার করিবার ইচ্ছা, সে এখানকার খোলা জায়গাগুলার কোথাও দাঁড়াইয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেই হইল; শ্রোতার অভাব হয় না। এখানকার রাজনৈতিক সভা ও জনতা কখন কখন বিরাট আকার ধারণ করে। হাইড্ পার্কে ঢুকিবার আগেই আমি হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম। সেই কারণে বিশ্রাম করিবার জন্য একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই পার্কের একজন লোক আসিয়া দু পেনী (দু আনা) দিয়া দিনের মত চেয়ারটা ভাড়া লইতে বলিল। তাহাই করা হইল। হাইড্ পার্কের সকলের চেয়ে সুন্দর ও দর্শনীয় জিনিষ সার্পেণ্টাইন্ নামক কৃত্রিম জলাশয়। এই নামটা অসঙ্গত নয়। জলাশয়টি আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্কের একটা দিক্ জুড়িয়া আছে। এখানে সকালে ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত স্নান করিতে দেওয়া হয়; গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যায়ও কিছুক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে কেহ কেহ সম্বৎসর, খুব শীতের সময়ও, প্রাতে স্নান করিয়া নামজাদা হইয়াছে। ঘণ্টায় বার আনা একটাকা আন্দাজ দিয়া এখানে নৌকায় ভ্রমণও চলে। জলাশয়টিতে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে ও জলের উপর অনেক জলচর পক্ষীকে আনন্দে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিলাম। স্থানে স্থানে দর্শকদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে যেন কেহ পাখীগুলিকে কোন প্রকারে ত্যক্ত না করেন।

ইংরেজী সাহিত্যে রটন্ রো (Rotten Row) বা পচা রাস্তা নামক রাস্তার উল্লেখ মধ্যে মধ্যে দেখিয়াছি। যখন হাইড পার্কের একটা কোণ হইতে এই রটন্ রো পৌছিলাম, তখন তাহার পারিপাট্য এবং নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানের শোভা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহার নামটা কেন এমন হইল। বস্তুতঃ ইহা একটি ফরাসী নামের

অদ্ভুত বিকৃতি। ফরাসী নামটি route du roi, অর্থ, রাজারাজড়ার পথ। দেড়মাইল লম্বা এই রাস্তাটি দিয়া মানুষ পায়ে হাঁটিয়া বা কোন যানে চলে না, ইহা ঘোড়সওয়ারদের জন্য অভিপ্রেত। ইহার নিকটে পার্কলেনের এক পাশে এবং হাইড পার্কের কোণ ও সার্পেন্টাইনের মধ্যে যে-সব ফুলের কেয়ারী দেখিলাম, তাহা একেবারে "লালে লাল", নানা রঙে জল্ জল্ করিতেছে। ইউরোপীয় জাতিদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার ইহা একটি নিদর্শন। ভারতের মত দারিদ্র্য ইউরোপে না থাকায় তাহারা সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা চরিতার্থ করিতে পারে।

লণ্ডনের য়্যালবার্ট হলে আটহাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে; তাছাড়া গায়কদের জায়গায় এগার শত লোক ধরে। এই হল রাজনৈতিক ও অন্যান্য সভার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রধানতঃ সঙ্গীতের বৃহৎ আয়োজনের জন্যই ইহা বিখ্যাত। ইংরেজদের রাজনৈতিক জীবন যে খুব সতেজ, তাহা এতবড় হলের রাজনৈতিক ব্যবহার হইতেই সূচিত হয়। তাহারা ইউরোপে সঙ্গীত-নিপুণ জাতি বলিয়া পরিচিত নহে। তথাপি এগার শত মানুষ যে মধ্যে মধ্যে এত বড় হলে একত্র সঙ্গীতে রত হয়, তাহা দ্বারা তাহাদের সঙ্গীতপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি কি দেখিলাম, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার চেষ্টাও বৃথা; কয়েক মাস ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে তবে ইহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়। আমি কিন্তু একদিন প্রাতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কেবল কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া উহার বিস্তৃত হল, গ্যালারী ও কক্ষগুলির নানাবিধ পদার্থ দেখিয়াছিলাম। ইহা নামে ব্রিটিশ হইলেও ইহাতে রক্ষিত জিনিষগুলি পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। সব দিক্ দিয়া দেখিলে ইউরোপে এত বিস্তৃত ও মূল্যবান সংগ্রহ আর নাই। রবিবার ছাড়া প্রত্যহ বিশেষজ্ঞেরা দর্শকদিগকে বিনামূল্যে ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত গ্যালারীগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া থাকেন। প্রতিদিনের ব্যাখ্যানের বিষয় বিজ্ঞাপনের বোর্ডে দ্রষ্টব্য। চারিদিন আগে হইতে আবেদন করিলে এই ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শনের খাস্ বন্দোবস্তও হইতে পারে। শুধু ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ দর্শন ও এইসকল ব্যাখ্যান শ্রবণ দ্বারা কতকটা সুশিক্ষিত হইতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের মিউজিয়মগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, সুতরাং বুঝাইয়া দেখাইবার বন্দোবস্ত সেগুলিতে সহজে হইতে পারে। তাহা করা উচিত। কারণ, এদেশে শিক্ষার সুযোগ কম; তাহার উপর যদি, যেগুলি আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইতে পারে না। আমাদের মিউজিয়ম্‌গুলি এখন সর্ব্বসাধারণের কাছে কেবল আজব-ঘর হইয়া আছে।

চোখে দেখিয়াও হঠাৎ বলা যায় না, কোথাকার লাইব্রেরী সব-চেয়ে বড়। আমি প্যারিসের জাতীয় লাইব্রেরী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, দুই-ই দেখিয়াছি। সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি না, কোন্‌টি বৃহত্তর। কিন্তু ইংরেজদের বহিতে দেখিতেছি, প্যারিসেরটি বড়। তবে বিদেশী বহির সংগ্রহ ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরীতেই বৃহত্তর। ১৯২৩ সালে ইহাতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মুদ্রিত বহি ছিল। এখন আরও বাড়িয়াছে। বৎসরে পঞ্চাশ হাজার নূতন বহি আসে। আলমারীগুলি পাশাপাশি রাখিলে ৫০ মাইল লম্বা রাস্তা জুড়িবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর পাঠকক্ষের ভিতর গিয়া পড়িবার অধিকার কেবল টিকিটধারী পাঠকদের আছে। আমি কেবল দর্শক বলিয়া অনুমতি লইয়া কেবল দরজা পার হইয়া কয়েক পা আগাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। ঘরটি গোলাকার ও প্রকাণ্ড; সাড়ে চারশ পাঁচশ লোক একত্র আরামে পড়িতে পারে। বৃত্তের কেন্দ্রের কাছে কর্ম্মচারীদের জায়গা। মুদ্রিত পুস্তক তালিকাটি প্রায় এক হাজার ভল্যুমে সমাপ্ত। এই পাঠাগারের গুম্বজটি ১০৬ ফুট উঁচু এবং ইহার ব্যাস ১৪০ ফুট। নানাবিধ অভিধান, বিশ্বকোষ প্রভৃতি সর্ব্বদা আবশ্যক কুড়ি হাজার বহি এই পাঠাগারেই থাকে; কোন ফারম পূরণ না করিয়াই এগুলি দেখিতে পারা যায়। গড়ে রোজ ৪০০ পাঠক এখানে আসে। ১৯২৫-২৬ সালে কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ৪১,৬০০

লোক গিয়াছিল, এবং ইহার পাঠাগারে খোলা তাকগুলি ছাড়া অন্যত্র রক্ষিত বহির জন্য ২৫৬৬৪টি দরখাস্ত পড়িয়াছিল। কলিকাতা লণ্ডনের চেয়ে অনেক ছোট সহর, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরীর তুলনায় খুব ছোট এবং কলিকাতায় শতকরা নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও লণ্ডনের চেয়ে বেশী। এই-সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ঐ সংখ্যাগুলি একান্ত নৈরাশ্যজনক নহে।

এখন আবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরীর কথাই বলি। দেখিলাম, পাঠাগারে কয়েক শত লোক নিবিষ্টচিত্তে নিঃশব্দে অধ্যয়ন করিতেছে। শৃঙ্খলার কোনই অভাব নাই। একজন পোর্টার বা দ্বারবান্ দেখাইল পুস্তকের আলমারীগুলি নাড়াচাড়া করা কেমন সহজসাধ্য। অবশ্য তাহার কিছু টিপ্ বা বকৃশিশের আশা ছিল;—তাহা সে পাইল। ইংরেজীতে ক্রুস্বডম্ (Christendom) বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহার মানে, যে-সব দেশে যীশুখ্রীষ্টের প্রভুত্ব স্বীকৃত, তাহার সমষ্টি। ইউরোপ তাহার প্রধান অংশ। তাহা বাস্তবিক ক্রুস্বডম্ বটে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা টিপ-ডম্ বা বক্‌শিশ-তন্ত্র মহাদেশ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ ব্লুম্‌স্‌বেরী ও সাউথ কেন্সিংটন এই দুই পাড়ায় অবস্থিত; মোট ১২টি বিভাগে বিভক্ত। ব্লুম্‌স্‌বেরীতে আছে—মুদ্রিত পুস্তক, সঙ্গীত ও মানচিত্র; হস্তলিখিত বহি; প্রাচ্য মুদ্রিত বহি ও হস্তলিখিত পুঁথী; মুদ্রিত ও হস্তাঙ্কিত ছবি ও নক্সা আদি; প্রাচ্য প্রাচীন বস্তুনিচয়; গ্রীক্ ও রোমান প্রাচীন বস্তুনিচয়; ব্রিটিশ ও মধ্যযুগের প্রাচীন বস্তুনিচয়; প্রাচীন মুদ্রা ও মেড্যাল সমূহ; চীনে-মাটির পাত্রাদি; নৃতত্ত্ববিষয়ক দ্রব্যাদি। সাউথ কেন্সিংটনে আছে—প্রাণিবিজ্ঞান, কীটপতঙ্গ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং খনিজ বিদ্যাবিষয়ক নানাবিধ পদার্থ।

যে-সব হল, কামরা ও গ্যালারী আমি দেখিলাম, তাহার নামগুলি লিখিয়া কোন লাভ নাই। প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও ধাতু মূর্ত্তি, অলঙ্কার, মণিমাণিক্য, অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ, নানা প্রয়োজন সাধনের মৃন্ময় ও ধাতব নানারূপ পাত্র, খোদিত চিত্র ও লিপি, প্রাচীন মিশরের শবাধার, রক্ষিত শব ও সমাধি, কাচের জিনিষ, প্রভৃতি কত কি যে দেখিলাম, এখন মনে পড়িতেছে না।

মিশরীয় এক-একটা প্রস্তরমূর্ত্তি এত বড়, যে, উপবেশনের ভঙ্গীতে রচিত হইলেও প্রকাণ্ড উচ্চ হলের প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর আগে যখন মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল, এখনও ঠিক্ তখনকার মত সুন্দর মার্জ্জিত রহিয়াছে। আগে মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপি পড়িবার কোন উপায় ছিল না। ১৭৯৯ সালে নীল নদের রসেটার সন্নিহিত মোহানার নিকট একটি প্রস্তরফলক পাওয়া যায়। তাহাতে মিশরীয় চিত্রলিপি, পরবর্ত্তী যুগের মিশরীয় সাধারণ লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত লিপি এবং গ্রীক্, এই তিন রকম অক্ষরে একটি বিষয় লিখিত আছে। ইহার সাহায্যে শাঁপোলঁ্য নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত মিশরীয় চিত্রলিপি পড়িতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই প্রস্তরফলকটি দেখিলাম। যদি মোহেন-জো দড়োতে এইরূপ দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ লিপিবিশিষ্ট কোন ফলক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তথাকার এতাবৎ অপঠিত লিপি পড়িবার সুবিধা হইতে পারে।

প্রাচীন মিশরে শব রক্ষার প্রথা ছিল। শবাধার ও শব অনেক দেখিলাম। অমরত্ব ও পূর্ব্বজন্মের শরীরে পুনর্জন্ম লাভের ইচ্ছা হইতে এই প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। একটি সমাধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রদর্শন জন্য কাচের বড় আধারে রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মন বিষাদে নিমগ্ন হয়। মানুষটির এখন কেবল কঙ্কালের উপর চামড়া আছে; তাও সর্ব্বত্র নাই। কিন্তু পরলোকে তাহার ব্যবহারের জন্য তাহার আত্মীয়েরা যে-সব পাত্রে তাহাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়াছিল, সেগুলি এখনও রহিয়াছে। এই আত্মীয়েরা এখন কোথায়, তাহাদের যে প্রিয়জনের পরলোকে আরামের জন্য তাহাদের এত ব্যাকুলতা, সে-ই বা কোথায়? এখন তাহার মৃতদেহ কৌতূহলী দর্শকের দেখিবার জিনিষ হইয়াছে।

আসীরীয় প্রত্নদ্রব্যগুলি প্রধানতঃ রাজপ্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে প্রস্তরে খোদিত নানা চিত্র। রাজাদের

অবদানপরম্পরা উহার বিষয়। পক্ষযুক্ত প্রকাণ্ড আসীরীয় বৃষগুলি দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার নিদর্শন প্রকাণ্ড প্রস্তরগুলিতে কি যে লেখা আছে, তাহা এখনও পঠিত হয় নাই।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত সমুদয় ভারতীয় প্রাচীন দ্রব্য আমি দেখিয়াছি কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে এরূপ ভারতীয় দ্রব্যের সংগ্রহ অন্য দেশের তদ্রূপ সংগ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে হইল। তাহা ভালই। আমাদিগকে স্বদেশের অতীত সভ্যতার বিষয় জানিবার জন্য বিদেশে যত কম যাইতে হয়, ততই ভাল। তবে আমরা আমাদের প্রাচীন জিনিষগুলির যথোচিত আদর করিতে জানি না, এই যা দুঃখ। উপরতলায় উঠিতে উঠিতে একটি দেয়ালের গায়ে দেখিলাম, অমরাবতী স্তূপের অনেক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন সংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা এক ভারতসচিব দান করিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে। ইহাকেই বলে, পরের ধনে পোদ্দারী। কিন্তু জোর যার মুল্লুক তার, সত্য নয় কি?

ব্রিটিশ মিউজিয়মের মত সংগ্রহ দেখিলে মানবসভ্যতার বহুদেশীয়তা, বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রাচীনতা উপলব্ধ হয়। সব দেশের মানুষের স্বাজাতিকতার মধ্যে যে সংকীর্ণতা ও ভিত্তিহীন অহঙ্কার আছে, এই উপলব্ধি হইতে তাহার বিনাশ, অন্ততঃ হ্রাস, হওয়া উচিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ ইংরেজদিগকে উদারচেতা, এবং সংকীর্ণ ও অহঙ্কৃত স্বাজাতিকতা হইতে মুক্ত, কি পরিমাণে করিয়াছে বলিতে পারি না। এই বিশাল সংগ্রহ যে অংশতঃ দস্যুতা ও প্রতারণার ফল, তাহাও তাহারা অনুভব করে কি না, জানি না। যাহা হউক, সংগ্রহ যে-ভাবেই করা হইয়া থাকুক, ইহার দ্বারা তাহাদের শুধু জ্ঞানবৃদ্ধি না হইয়া হৃদয়ের উন্নতিও হইলে জগতের মঙ্গল।

এরূপ সংগ্রহ আমাদেরও মনে চিন্তার উদ্রেক করিলে ভাল হয়। আমরা নিজের দেশেরই সব প্রাচীন জিনিষের খবর রাখি না, আদর করি না, বিদেশী প্রত্নতত্ত্ব ত দূরের কথা। ইউরোপের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জগদ্ব্যাপী। ইউরোপের অনেকে, শুধু নিজেদের দেশের নয়, বিদেশেরও সভ্যতা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব আদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ভারতবর্ষে আমাদের নিজের দেশেরই কোন্ কোন্ বিষয়ে ক'জন বিশেষজ্ঞ আছেন? কোনও বিদেশের কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ভারতীয়ের নামও এখন আমার মনে পড়িতেছে না। ইহা আমার অজ্ঞতাপ্রসূত হইলে সুখী হইব।

ইউরোপের অনেক লোকের কেবল যে কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা খুব ব্যাপক, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে সমুদয় জগতের, সমগ্র মানব-সমাজের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার ও ভাবিবার মত লোক আছে, ভারতবর্ষে তাহার সামান্য অংশও নাই। বাস্তবিক ভারতবর্ষে এরূপ লোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয়। অবশ্য আমাদের হৃদয় মন বুদ্ধির বৃত্তিগুলির প্রয়োগ যে আমরা খুব সংকীর্ণ ক্ষেত্রে করি, তাহার অনেক সুবিদিত কারণ আছে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নানাদিকে আমাদের এরূপ অবসাদ জন্মাইয়াছে এবং আমাদের এত লোকের এত সময় ও শক্তি এই পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভাঙিতেই প্রযুক্ত হয়, যে, বৃহত্তর জাগতিক কার্য্যক্ষেত্রে অন্য কিছু করিবার ভাবিবার ইচ্ছা, শক্তি ও সময় অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা যে আমাদের মানসিক দিগ্বলয় সংকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে প্রচলিত জাতিভেদও ইহার জন্য কতকটা দায়ী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু, এবং হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া যায় না, ইহা অধিকাংশ স্থলে সত্য। ইহাতেও আমাদের হৃদয়-মনের কিছু সংকীর্ণতা জন্মিয়া থাকিবে। তা ছাড়া, মানুষ যদি নানা দেশের নানা যুগের কথা না জানে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত সেইসব দেশের ও সমগ্র মানব-জাতির সমস্যার দিকে ধাবিত হইবে কি প্রকারে? আমাদের দেশের শতকরা ৯৩।৯৪ জন নিরক্ষর। তাহারা অন্য দেশের কথা জানেই না, ত ভাবিবে কি?

ইউরোপের অধিকাংশ জাতির একটা এই দোষ আছে, যে, তাহারা অন্য জাতিকে অধীন রাখিতে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে অন্য দেশের ধন শোষণ করিতে

সর্ব্বদা ব্যগ্র।' তাহাদের এই রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা কতবার করিয়াছি। বিদ্যা ও ধর্ম্মও তাহারা অনেকে একচেটিয়া করিতে যায়। তাহাদের এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাও অনেকবার করিয়াছি। কিন্তু প্রশংসার কথা যাহা তাহার প্রশংসাও করা চাই। তাহাদের মধ্যে সমগ্র মানব-সমাজের বিষয় ভাবিবার অল্প কয়েক জন লোক যে আছে, ইহা তাহাদের প্রশংসার বিষয়। আমাদের মধ্যে তাহাও নাই-ই, অধিকন্তু এক আধজন থাকিলে বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করা হয়। যেন প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক ভারতপ্রেমিক হইতে পারেন না!

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিস দেখিয়া সুখ হয় নাই, গৌরব বোধ হয় নাই। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, ভারতের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও রক্ষিত; কর্ম্মচারীদের বেতনও ভারতবর্ষ দেয়। ভারত-শাসনদণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে এখান হইতেই চালিত হয়। ভারতের দাসত্বের এই চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় বিষণ্ণ হয়। লীগ অব্ নেশ্যন্সে প্রেরিত "ভারতীয়' প্রতিনিধিদের ও তাহাদের কাজের সম্বন্ধে কিছু খবর লইবার জন্য এখানে গিয়াছিলাম। ভাবিলাম, যখন আসিয়াছি, তখন একবার স্বদেশীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। তাঁহার আফিসের দ্বারবান বলিল, তিনি আজ বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ীর ঠিকানা চাওয়ায় বলিল, তাহা বলিবার নিয়ম নাই। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, আপনার কার্ড দিয়া গেলে তাঁহাকে দিতে পারি। তাহাই দিলাম। এই প্রকারে মল্লিক-মহাশয় জানিতে পারেন, যে, আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। তিনি পরদিন হোটেল সিসিলে লর্ড লিটন্‌কে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রধান অতিথি ছাড়া অবশ্য অন্য অনেক নিমন্ত্রিতও ছিলেন। আমার নামেও মল্লিক মহাশয়ের একটি চিঠি আসিয়াছিল। সেদিন আমি ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরি। সুতরাং কেন যে চা খাইতে গেলাম না, সে অপ্রিয় কথা ব্যাখ্যা করিতে হয় নাই। তবে মল্লিক মহাশয়ের সৌজন্য অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার বাড়ীতে যে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষণকালের জন্য মানসচক্ষে মাতৃভূমির দর্শন পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম। তাঁহার গৃহিণীর সঙ্গে আমার কলিকাতায় পরিচয় ছিল না। তিনি অন্তঃপুরিকা হইলেও লণ্ডনে স্বগৃহে স্বয়ং আমার সহিত পরিচয় করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি অতিথিদের বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। আমি ভোজনে নিপুণ না হইলেও বাংলাদেশের খাবার লণ্ডনে পাওয়ায় স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়াছিল। মল্লিক-মহাশয়ের বৈঠকখানায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র দেখিলাম। সুরেন্দ্রবাবুকে তিনি নিজের গুরু বলেন। ঐ কামরায় 'প্রবাসী' রহিয়াছে দেখিলাম।

শ্রীযুক্ত স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের হাই কমিশনার; লণ্ডনেই থাকেন। তাঁহার সহিত আগেই দেখা হইয়াছিল। আমি যেদিন প্যারিস হইতে লণ্ডন পৌঁছি, সেদিন তিনি সৌজন্যপূর্ব্বক আমার বাসস্থানাদির খবর দিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া-ছিলেন। তিনি দেখা করিতে বলায় দু'দিন তাঁহার আফিসে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার এক বড় ভাই আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি স্বয়ং যখন প্রথম অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া এলাহাবাদে আসেন তখন আমি তথায় এক বেসর্‌কারী কলেজে চাকরী করিতাম। এই সূত্রে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। হাই কমিশনারের আফিসে কয়েক শত লোক কাজ করে। সকলের বেতন ও অন্যান্য খরচ ভারতবর্ষ দেয়। কিন্তু চাটুয্যে-মহাশয় ছাড়া অন্য বড় চাকর্‌য়ে কেহ ভারতীয় নহে; সামান্য কয়েকজন কেরানী ভারতীয়। হাই কমিশনার আফিসের যে কাম্‌রায় সাক্ষাৎকারীরা অপেক্ষা করে, তাহার টেবিলে অনেক খবরের কাগজ ও মাসিকপত্র থাকে। ভারতীয় ইংরেজ চালিত প্রধান কাগজগুলি এবং দেশী "নরম" বা মডারেটদের ২।১টি কাগজ সেখানে দেখিলাম। উগ্রভুক্ত কিম্বা গরম কোন কাগজ দেখিলাম না। হাই কমিশনারের নিজের টেবিলে মডার্ন রিভিউর সদ্যপ্রাপ্ত আগষ্ট সংখ্যা দেখিলাম।

আমি আগষ্টের শেষ ভাগে লণ্ডন যাই। তখন কলেজাদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ। সুতরাং আমি

কেবল কয়েকটার ঘরবাড়ী বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। কেবল ইম্পীরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্স এণ্ড্ টেক্নলজির ভিতর গিয়াছিলাম। তাহার একটা কারণ, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমি তথাকার রাসায়নিক পরীক্ষাগার দেখিলাম। সেখানে একজন ইংরেজ যুবককে, কোন ভারতীয় এখন কলেজের ছাত্র আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, যে, একটি ভারতীয় ছাত্র তখন গবেষণার কাজ করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিতে বলায় তিনি আসিলেন। তাঁহার নাম যোগেন্দ্রকুমার বর্দ্ধন। উদ্ভিজ্জ রং সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। কয়েক রকম সুতা রঙাইয়াছেন দেখাইলেন এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারের কোন কোন যন্ত্র বুঝাইয়া দিলেন। কলেজের ছুটির সময়ও বাঙ্গালী ছাত্রকে গবেষণার কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া সুখী হইলাম।

কিউয়ের বিস্তৃত রাজকীয় উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক বাগান দেখিতে গিয়া এদিক ওদিক কতকটা ঘুরিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম। তালজাতীয় গাছ রাখিবার জন্য এখানে একটি বৃহৎ ঘর আছে। তাহা সর্ব্বদা ৮০ ডিগ্রী উত্তাপে রাখা হয়। কারণ, ঐসব গাছ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের। ভিতরে গিয়া বেশী গরম মনে হইল না। লণ্ডনে তখন শীত ছিল না,অল্প বেড়াইলেই ঘাম হইত। কিউয়ের উদ্যানেই প্রথম ব্রাজিল হইতে বীজ আনিয়া ১০০০ রবার গাছ জন্মান হয়। ঐসব গাছ মালয় উপদ্বীপ ও সিংহলে পাঠাইয়া রবারের চাষ ও ব্যবসার সূত্রপাত করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সিঙ্কোনা গাছ আনিয়া প্রথম কিউয়ে রাখা হয়। তথা হইতে পরে উহার চাষ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়।

লণ্ডনের দ্রষ্টব্য কোন কোন স্থান ও প্রতিষ্ঠান অবশ্য হাঁটিয়া দেখিয়াছি। তা ছাড়া, যাতায়াত যাহা করিয়াছি, তাহা সকল রকম যানেই করিয়াছি। মানুষের চড়িবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী লণ্ডনে দেখিলাম না; মাল বহিবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ী স্থূলকায় বড় বড় মোটা ঘোড়া টানিতেছে দেখিলাম। তা ছাড়া ঐ উদ্দেশ্যে মোটর-লরীর ব্যবহারও অবশ্য খুব আছে। লণ্ডনে যাতায়াতের উপায় ট্যাক্সি, বাস্, ট্রাম, ভূনিম্নস্থ রেল, এবং টিউব বা বৃহৎ নলের ভিতর রেল। লণ্ডনে মানুষের জীবন-ধারণের ব্যয় এদেশের চেয়ে অনেক বেশী। তাহা বিবেচনা করিলে সেখানে ট্যাক্সির ভাড়া সস্তা বলিতে হইবে। প্রথম মাইল বা তাহার কোন অংশের ভাড়া এক শিলিং অর্থাৎ এগার আনা (কলিকাতায় আট আনা, আগে ছিল বার আনা); তাহার পরবর্ত্তী সিকি মাইল বা তন্ন্যূন দূরত্বের জন্য তিন পেনী বা এগার পয়সা দিতে হয়। ইউরোপের বাস, ট্রাম প্রভৃতির ভিতর বসিলে গায়ে বাতাস লাগে না, সব সার্সি আঁটা। এইজন্য লণ্ডনে দেখিলাম, যাহারা খোলা বাতাসের ভক্ত, তাহারা দুতলা বাসের উপর-তলায় যাইতেই ভালবাসে। তাহাতে লোক-চলাচল এবং শহর দেখাও ভাল হয়। লণ্ডনে ভূনিম্নস্থ রেল ও টিউব রেলের অনেক ষ্টেশন আছে। ট্রেন খুব ঘন ঘন আসে যায়। টিউব রেলে চড়িয়া দেখিলাম, যে, উহার-বাতাস উপরের চেয়ে গরম, কিন্তু অপ্রীতিকর নহে; বরং শীতের সময় ভালই লাগিবে বোধ হইল। উহা ভূনিম্নস্থ রেলের চেয়ে আরো নীচে। নামিবার জন্য এস্কেলেটার বা চলন্ত সোপানশ্রেণী ব্যবহার করিতে হয়। উচ্চতম ধাপে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহা নিজেই নামিয়া নামিয়া প্লাটফর্মে পৌঁছাইয়া দেয়। ভারতবর্ষে টিউব রেল নাই, এস্কেলেটারও কোথাও দেখি নাই।

ভারতবর্ষে রেল-পথে, রেল ষ্টেশনে (এবং অন্যত্রও) ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা ভারতীয়দের সঙ্গে ভদ্রব্যবহারের জন্য বিখ্যাত নয়। ইংলণ্ডে রেলে যাতায়াতে আমি কোথাও কোন অভদ্রব্যবহার পাই নাই; বরং ছোটখাট বিষয়ে অযাচিত সাহায্য ও সৌজন্য পাইয়াছি।

ভারতবর্ষে থাকিতে লণ্ডনের পুলিস সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছিলাম। দেখিলামও বটে, যে, তাহারা লণ্ডন সম্বন্ধে সবজান্তা গোছ, এবং খবর দেয়ও ভদ্রতার সহিত। সম্প্রতি তথাকার পুলিসের এক বড় কর্ত্তা পুলিসের অধস্তন লোকদিগকে ভদ্রব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার কারণ ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহাদের কোন অভদ্রতা আমার গোচর হয় নাই। লণ্ডনের রাস্তায় নানারকম যান ও মানুষের ভিড় খুব। পুলিস খুব দক্ষতার সহিত ইহার মধ্যে শৃঙ্খলা রাখে এবং দুর্ঘটনা নিবারণ করে।

লণ্ডনের ঘিঞ্জি অপরিষ্কার বস্তি সব আমি দেখি নাই। যে-সব জায়গা দেখিয়াছি, তাহার রাস্তা বেশ পরিষ্কার ও ধূলিকর্দ্দমশূন্য।

লণ্ডনের, এবং ইউরোপের আমার দেখা অন্যান্য সহরেরও, আধুনিক ইমারতগুলি আমার চোখে কেমন একঘেয়ে লাগিত—যদিও তাহাদের অনেকগুলি খুব উঁচু ও খুব বড় বলিয়া দেখিলে তাক লাগে।

ভারতবর্ষ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী বৎসরের অধিবেশন ১৯২৮ ২রা জানুয়ারী হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় বসিবে। ডাঃ নিমগু সেন্ ঐ অধিবেশনের সভাপতি হইবেন।

ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা—

ভারতের কোন্ প্রদেশে শিক্ষিত মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা কত নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী বরোদার মহারাণী মহোদয়ার অভিভাষণে হইতে দেওয়া হইল।

হাজার-করা শিক্ষিত

	পুরুষ	নারী
বৃটিশ ভারত	১৩৯	২১
মহীশূর	১৪৩	২২
বোম্বাই	১৫৭	২৭
বরোদা	২৪০	৪৭
কোচীন	৩১৭	১১৫
ত্রিবাঙ্কুর	৩৮০	১৭৩
কাশ্মীর	৪৬	৩
বিহার	৯৬	৬
মধ্যভারত	৬৫	৭
হায়দ্রাবাদ	৪৭	৮
মধ্যপ্রদেশ	৮৭	৯

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতবাসী—

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের অবস্থা যে অনেকটা উন্নত হইয়াছে এবং তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে যে নজর দেওয়া হইতেছে সেই বিষয়ে সম্প্রতি ভারতসরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি তত্রত্য কমন্ওয়েল্থ্ পার্লামেন্টে যে আইন কয়টি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয়দিগকে বার্দ্ধক্যে পেন্সন ও মাতৃ-মঙ্গলের বৃত্তি ইত্যাদি পাইবার অধিকারী করা হইয়াছে। বার্দ্ধক্যের বৃত্তি বয়স পঁয়ষট্টি বৎসরের ঊর্দ্ধে হইলেই পাওয়া যাইবে, অথবা ষাট বৎসর বয়স হইলেই যদি কেহ কর্ম্মে অক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাকে বার্দ্ধক্যের বৃত্তি দেওয়া হইবে। স্ত্রীলোকেরা ষাট বৎসর বয়স পার হইলেই বৃত্তি পাইবে। তবে তাহার চরিত্র ভাল হওয়া দরকার, আর একাধিক্রমে বিশ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করা আবশ্যক। রোগ-জীর্ণদের বৃত্তি ষোল বৎসরের অধিক বয়স হইলে এবং বার্দ্ধক্যের বৃত্তি গ্রহণ না করিলে ক্রমাগত স্থায়ী ভাবে পাঁচ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিলেই দেওয়া হইবে।

মুসলমানের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ—

নিখিলভারত হিন্দু শুদ্ধি সভার সম্পাদক দিল্লী—নয়াবাজার হইতে লিখিতেছেন :—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজের হত্যার পরে আমাদের কর্ম্মীরা আরও উৎসাহের সহিত কার্য্যে করিতেছেন। আমাদের কর্ম্মী উদ্ধো সাহজী (মজঃফরপুরের) দশজন মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। বীরগণিয়াতে আরও কতকগুলি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শুদ্ধি আন্দোলন দিনের পর দিন রীতিমত বাড়িয়া চলিয়াছে। আরও অনেক জেলায় শুদ্ধিসভা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ নূতন নূতন শাখা-কেন্দ্র খোলা হইতেছে।

ভারতীয় পণ্যশুল্কের আয়—

ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, ডিসেম্বর (১৯২৬ সন) মাসে মোট ৩ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা পণ্য-শুল্ক হিসাবে পাওয়া গিয়াছে এবং এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে মোট রাজস্ব পাওয়া গিয়াছে ৩৫ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা। আমদানি-শুল্ক বাবদ ২৯ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা; রপ্তানি-শুল্ক বাবদ ৪ কোটী ৯ লক্ষ টাকা, কেরোসিনের শুল্ক বাবদ ৪৮০ লক্ষ টাকা, মোটর স্পিরিটের শুল্ক বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা ভূমিকর এবং অন্য নানাবিধ কর বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা।

আসামে শিক্ষা বিস্তার—

আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, এই প্রদেশে শিক্ষার জন্য মোট-মোট ৩৮,১৬,৪৪৪ টাকা খরচ হইত কিন্তু আলোচ্য বর্ষে তাহা ৪০,৫৩,৫৬৮ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ছয় টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে পূর্ব্বে ২২,৬২৩,৪৬ টাকা ব্যয়িত হইত—আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে ২৩,৪৯,৮৫২ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪ টাকা বাড়িয়াছে। সরকার যে অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করেন সেই টাকাটা প্রধানতঃ সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইয়াছে। বাইশ ও তেইশ হাজার টাকা ছাত্র বেতন আদায় হইলেও প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশী এই দিকে ব্যয়িত হইয়াছে।

লোক্যাল বোর্ডের ব্যয় ৪,৩৪,৯৬২ টাকা হইতে ৪,৬০,২৫৫ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ব্যয় ৩১, ২৮৭ টাকা হইতে ৩৪, ৭১০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে বিধবা-বিবাহ—

লাহোরের বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভার বিবরণীতে প্রকাশ যে, গত

ডিসেম্বর মাসে এই সভার উদ্যোগে মোট ৪৪৭টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৫৭৬টি ব্রাহ্মণ, ৬১৩টি, অরোরা ৩৭৭টি আগরওয়াল, ২২৭টি কায়স্থ, ২৮৯টি রাজপুত, ২৮৫টি শিখ ও অন্যান্য জাতীয়া ৫০০টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

এইসমস্ত বিধবার কতজন কোন্ প্রদেশের তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৯৩২, সিন্ধু ২৩০, দিল্লী ৮১, বাঙ্গলা ১৪৫, সংযুক্ত-প্রদেশ ৬৮২, মাদ্রাজ ৯, বোম্বাই ৬, আসাম ৯, মধ্যপ্রদেশ ২১, বিহার ও উড়িষ্যা ৫৭, মোট ৩১৭২।

—

বাংলা

বাংলায় শিক্ষা বিস্তার—

দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশনাথ রায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে দিনাজপুর সহরে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করা মনস্থ করিয়া উক্ত কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এ-কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ওটেন চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপালকে তত্রত্য উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়কে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে আদেশ করিয়াছেন; শীঘ্রই উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাদের এলাকাধীনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের মধ্যে চট্টগ্রামের এই উদ্যমই প্রথম।

বাংলা-সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার স্কীম মঞ্জুর করায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল এলাকায় ১৯২৫-২৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ইহার ফলও সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। নবগঠিত বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ১৬০০ (ষোল শত) এবং ছাত্রী-সংখ্যা ৬২১এ দাঁড়াইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটি অবৈতনিক বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বালিকাদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অবনত শ্রেণীদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিবার স্কীমও তাঁহারা করিয়াছেন। এইসমস্ত প্রস্তাবই এখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ আছে। আশা করা যায় যে, তাঁহারা অতি শীঘ্র প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ প্রমাণ করিবেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টান্তে বাঙ্গলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিও যদি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দেন, তবে অনেক কাজ হইবে।

নারী শিক্ষা সমিতি—

নারী শিক্ষা সমিতির অন্তর্গত মহিলা-শিল্প-ভবনের সেলাই বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থ মহিলার প্রয়োজন। যোগ্যতানুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে। মহিলা-শিল্প-ভবনের দৈনিক বিদ্যালয়ে দুঃস্থা বিধবা ও সধবা মহিলাদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ১টা হইতে ৩টার মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন। শিক্ষার্থিনীগণ মহিলা-শিল্প-ভবনের সম্পাদিকার নিকট (৫নং ফেডারেশন রোড, কলিকাতা) আবেদন করিলে সকল নিয়ম জানিবেন।

সরোজনলিনী স্মৃতি-সঙ্ঘ—

গত মাসে সরোজনলিনী স্মৃতি-সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিঃসহায় নারীদিগকে স্বাবলম্বন দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদানই এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতির উদ্যোগে মফঃস্বলে ১০১টি মহিলা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাংলায় বিধবা-বিবাহ—

টাঙ্গাইলের ডাঃ শশিমোহন তরফদারের চেষ্টায় হিন্দু প্রথানুযায়া অত্র মহকুমায় বহু বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে ডাঙ্গার ঈশ্বরচন্দ্র সাহার পুত্র বাবু কালীচরণ সাহার সহিত মির্জ্জাপুর থানার অন্তঃপাতী চড়পার নামক স্থানের মৃত হৃদয়নাথ ধরের বিধবা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দাস্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটি ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়, এক্ষণে ইহার বয়স ১৬ বৎসর।

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ঐ মহকুমার এলাসিনে আর-একটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এলাসিনের চৌকীদার শরৎচন্দ্র মালীর সহিত কুমারজানীর মৃত কাঙ্গিরাম চৌকীদারের বিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মেয়েটির নাম বিন্দুবাসিনী দাস্যা—বিন্দু ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার বয়স ১৭ বৎসর। টাঙ্গাইল হিন্দু সভার প্রতিনিধি উভয় বিবাহ-বাসরেই উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৬ই মাঘ রবিবার পাবনা জেলার অন্তর্গত সুজানগর গ্রামের শ্রীউদ্ধবচন্দ্র হালদারের পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ হালদারের সহিত সাঁড়া থানার অন্তর্গত দাদাপুর গ্রামের চরণ হালদারের পিতৃব্যপুত্রী শ্রীমতী যশোদা-সুন্দরীর হিন্দু শাস্ত্র মতে বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাবনা হিন্দুসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রেবতীবল্লভ মণ্ডল, পাকুরিয়া হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অনন্তভূষণ মজুমদার ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীবল্লভ মণ্ডল উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ-সম্পাদন-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্—

গত মাসে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের 'রজত-জয়ন্তী' হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া এই বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কারখানায় প্রস্তুত বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 'রজত-জয়ন্তী' উপলক্ষে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক।

বাংলা সরকারের আবগারি বিভাগ—

বাংলা সরকারের আবগারি বিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সহযোগী আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে আমরা বিবরণের সারাংশ তুলিয়া দিলাম।

গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আবগারি বিভাগে খরচ বাদে মোট কত টাকা আয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল —

বৎসর	টাকা
১৯২১-২২	১৬৮৯৮৭৬৭
১৯২২-২৩	১৮৬৮২৬৩৩
১৯২৩-২৪	১৯৭৩২২৪৭
১৯২৪-২৫	২০৩৩২৭২০
১৯২৫-২৬	২০২৩১৮৫৮

১৯২৫-২৬ সনে এই বিভাগে বাঙ্গলা সরকারের খরচ বাদে আয়ের পরিমাণ কমিলেও আলোচ্য সনে গবর্ণমেণ্টের মোট রাজস্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১২৯০৫৬৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলার লোকসংখ্যার অনুপাতে ১৯২৫-২৬ সনে প্রত্যেক লোক গড়ে মাদক দ্রব্যের জন্য ।৶৯ পাই খরচ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই খরচের পরিমাণ ছিল ।৶৪ পাই। সহজে কথায় সারা বাংলার লোক ১৯২৫-২৬ সনে পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার পাঁচশত ৬৬ টাকার আফিম, মদ, গাঁজা বেশী ব্যবহার করিয়াছে।

নিম্নে আলোচ্য কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নেশার জিনিষের কাটতি কি ভাবে বাড়িয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইল।

জিনিষ	১৯২৪-২৫	১৯১৫-২৬
দেশী মদ	৬০৯৬৫৩	৬৩২৩৫১ গ্যাঃ
তাড়ির আয়	৭১২৬১১	৮৮৪৮৯২ টাকা
বিলাতী মদ	৩৭৩৮৩	৩৭৭৬৭ গ্যাঃ
বিয়ার	৩৯১৭১৭	৪৩১৮৪২ গ্যাঃ
গাঁজা	১৭২৬ মণ	১৭৮৬ মণ
	৩৯ সের	৩৩ সের
চরস	৬২ মণ	৬৮ মণ
	৯ সের	৩১ সের

রিপোর্টের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয় :—

১৯২৫-২৬ সনে পূর্ব্ব বৎসর হইতে পচাই মদের জন্য ২৩৯৬টি অধিক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতী মদের বিক্রয়ের জন্য পূর্ব্ব বৎসর হইতে ২১৯টি অধিক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

গাঁজা বিক্রয়ের জন্য ১৪টি অধিক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

ভাঙ্গ বিক্রয়ের জন্য ৭টি অধিক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

চরস বিক্রয়ের লাইসেন্স ৪টি বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১৯২৫-২৬ সনে আবগারি সম্পর্কিত অপরাধে ৬২৮২জন গ্রেপ্তার ও ৫৮৮৯জন দণ্ডিত হইয়াছে।

পরলোকগত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গদেশের নানা সামাজিক ও জনহিতকর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের তিনি পরমভক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা মাড়োয়ারী হাসপাতাল, ট্রপিকাল-স্কুল-অব্-মেডিসিন, অ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী প্রভৃতি তাঁহার নিকট গভীর ভাবে ঋণী। তিনি অ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী বা ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগে এই সমিতির উন্নতি ও বিস্তারের অশেষ সহায়তা হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ যে ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং এ-জাতিকে বাঁচাইতে হইলে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারিণী সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজন, ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন।

ডাঃ কৈলাসচন্দ্র খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। প্রাচীন ধরণের যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতির তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ভারতীয় শিল্প-কলার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

মেদিনীপুর বন্যার জের—

মেদিনীবান্ধব পত্রিকা লিখিতেছেন—

পটাশপুর প্রভৃতি বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের দুঃস্থ প্রজাসমূহের দুরবস্থার বিষয় সাধারণের অবিদিত নাই। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে এ বৎসর ধান্য ফসল আদৌ জন্মে নাই। স্থানে স্থানে বোরা ধান্য যাহা জন্মিয়াছিল তাহাও জলাভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই দারুণ অন্নাভাবের উপর জ্বর, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদির প্রবল আক্রমণ দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় প্রজাবর্গের কষ্টের অবধি নাই।

আমরা শুনিয়াছিলাম যে দুঃস্থ প্রজাবর্গের সাহায্যার্থে সরকার কর্ত্তৃক তাকাবী ঋণ প্রদান স্থির হইয়াছে। কিন্তু কিজন্য তাহা পাইতে বিলম্ব হইতেছে তাহা হতভাগ্য প্রজাবর্গ বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক আমরা আশা করি যদি প্রকৃতই সরকার হইতে তাকাবী ঋণ দানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রজাগণ সত্বর যাহাতে তাহা প্রাপ্ত হয় তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা আমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কি তাকাবী ঋণ দান করা হয় তাহার বিষয় প্রজাগণ আদৌ জানে না। সে-বিষয়েও প্রজাগণকে উপযুক্ত উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

ঢাকায় গৃহশিল্পের পুনরুদ্ধার—

বাঙ্গলা সরকারের আদেশে ঢাকা জেলার গৃহশিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য জেলার কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ঢাকা হিন্দু সম্মিলন—

গত মাসে ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মধ্যপ্রদেশের ডাক্তার মুঞ্জের সভাপতিত্বে ঢাকা হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে বলেন, ‘দেশের লোকে এখন স্বরাজ চাহিতেছেন এবং কংগ্রেসের যোগে তজ্জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। হিন্দুরা এক্ষণে নিজেদের স্ত্রীলোক এবং দেবমন্দির রক্ষা করিতে অক্ষম এরূপ অবস্থায় স্বরাজের কথা মুখে আনা তাহাদের সাজে না। সংগঠন আন্দোলন সফল হইলে স্বরাজ আপনা হইতেই আসিবে।”

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(১) এই সম্মিলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লোকের ধনজন ক্ষয়ের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ শান্তিভঙ্গ আর না হয় তাহার জন্য হিন্দুদের বিশেষ ভাবে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছেন!

(২) এই সম্মিলন বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, ঢাকা সহরে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে—মুসলমানগণ হিন্দুদের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী রাজপথে বাজনা বন্ধ করিবার জন্যই এই কার্য্য ঘটিয়াছে।

(৩) এই সম্মিলন হিন্দুদের রাজপথে বাদ্য বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার এবং নিজের গৃহে গান-বাজনা করিবার অধিকার দাবী করিতেছেন। যে-সব রাজপথ বা বাড়ী এবং মন্দিরের সম্মুখে বা কাছাকাছি কোন মসজিদ আছে সেখানে হিন্দু বাজনা বন্ধ করিবে না। স্মরণাতীতকাল হইতে বিনা প্রতিবাদে হিন্দুরা ধর্ম্মাচরণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ করিবার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইয়া আসিয়াছিল তাহাদের সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার এই যে একটা আন্দোলন চলিয়াছে এই সভা সরকারকে তাহার প্রশ্রয় না দিতে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন যে, এইরূপ আন্দোলনে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে তাহার দ্বারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ করার সাহায্য করা হয় না, বরং তাহা উস্কাইয়াই দেওয়া হয়।

(৪) এই সম্মিলনী এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, যে-সব হিন্দু পুরুষ এবং স্ত্রীলোক একবার কোন কারণে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে শুদ্ধির দ্বারা পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হওয়া দরকার এবং উহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পণ্ডিত-গণকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, হিন্দু-ধর্ম্ম অহিন্দুদের হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার বিরোধী নহে এবং তাহাদিগকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা দিবার কোন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির ব্যবস্থা দিবার জন্য পণ্ডিতদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। যাহারা শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু সমাজে ও হিন্দু ধর্ম্মে পুনঃগৃহীত হইবে তাহাদের উপর কোনরূপ জোর জুলুম না হয় এইজন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে, বিশেষ করিয়া হিন্দু যুবক-দিগকে, সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য এই সম্মিলনী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে-ছেন।

(৫) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, যে-সব হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত তাহাদিগকে বারোয়ারী মন্দিরে, কূপে, সাধারণ খাবারের দোকানে, স্কুল কলেজের ছাত্রাবাসে স্বাধীনভাবে প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে এবং পুরোহিতগণ তাহাদের গৃহ-কর্ম্মাদি সমস্ত কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করাইবেন।

(৬) হিন্দুধর্ম্ম অনুমোদিত ও অননুমোদিত সকল বিধবারই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে পুনঃবিবাহ দেওয়া উচিত সম্মিলনী এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

(৭) এই সম্মিলনী পটুয়াখালির হিন্দু জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন এবং মত প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য রাজপথ দিয়া বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া সঙ্গত কাজই করিতেছেন। এই সভা ঢাকা জেলার হিন্দু অধিবাসীদিগকে এই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

(৮) এই জেলার অত্যাচারিত হিন্দুদের সাহায্য করিবার জন্য এই সম্মিলনী একটি হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া সকল বিপদে আপদে হিন্দুদের রক্ষা করিতে আহ্বান করিতেছেন এবং এই প্রগ্রাম অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার জন্য ঢাকা হিন্দুসভাকে অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামের আখড়া প্রতিষ্ঠা ও পল্লীগ্রামের যুবকদের শারীর-বিধানের দিকে মনোযোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। প্রত্যেক ১৬ বছর হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাকে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে এবং প্রত্যেককে লাঠিখেলা, অসিখেলা ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হইবে। আর স্ত্রী পুরুষ সকলেরই আত্মরক্ষার্থ সঙ্গে সঙ্গে কৃপাণ রাখিবার অভ্যাস অর্জ্জন করিবেন।

অস্পৃশ্যের সেবা—

সহযোগী ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশ :—

ঢাকা জিলার তেজগাঁও থানার অধীন বেরাইদ গ্রামটি অতি প্রকাণ্ড। ইহাতে ৩ ঘর কায়স্থ, ৭।৮ ঘর সাহা এবং ২০।২৫ ঘর মৎস্যজীবী এবং ৭০০ ঘর ঋষি জাতীয় লোকের বাস। এই গ্রামে ঋষি জাতীয় লোক-সংখ্যা যে-পরিমাণে অধিক, তাহাদের আর্থিক অবস্থাও সেই পরিমাণে শোচনীয়। ইহাদের অধিকাংশই মৃত গরুর চামড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সুতরাং ইহাদের সাংসারিক অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদের বালকবালিকাগণ প্রায়ই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, শরীর শুষ্ক এবং উদর প্লীহা যকৃতে স্ফীত। অত্যন্ত অর্থাভাব নিবন্ধন ইহাদের কোনপ্রকার চিকিৎসার বা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত না থাকায় প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই ৭০০ ঘর ঋষি হিন্দুসমাজ-ভুক্ত; কিন্তু ইহারা হিন্দু সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরবর্ত্তী বলিয়া কি জমিদার, কি ধর্ম্মপ্রচারক, কি রাজনৈতিক নেতা,—ইহাদের দিকে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না। ইহারা পতঙ্গাদির ন্যায় জন্মিতেছে, এবং দারুণ দরিদ্রতার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াই মরিতেছে। জীবিত থাকার সময় কোন হিন্দুই ইহাদের সহিত কোনপ্রকার সহানুভূতি দেখায় না দেখিয়া ইহারা হতাশ হইতেছে। এই গ্রামের ৪।৫ মাইল দূরে খ্রীষ্টিয়ান মিশন আছে। ইহাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিকে ঐ মিশনের নজর পড়িতেছে। উল্লিখিত ঋষিগণ যে অত্যল্প-কাল মধ্যেই মিশনারীগণের করায়ত্ত হইয়া স্বীয় দুর্দ্দশা মোচন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ৭০০ ঘর ঋষি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেলে হিন্দু-সমাজশরীরের যে একটি অঙ্গচ্ছেদ হইবে, তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ঢাকা সহরের পশ্চিম প্রান্তে ইং ১৯১২ সন হইতে শ্রীচৈতন্য সেবা-শ্রম প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দু সমাজের প্রভূত উপকার করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত বেরাইদ গ্রামের ঋষিগণের দুর্দ্দশা মোচনার্থ ও শ্রীচৈতন্য আশ্রমের কর্ম্মীগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ৪ জন কর্ম্মী গত ১লা জানুয়ারী উক্ত গ্রামে যাইয়া প্রায় ৩।৪ শত ঋষিকে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় কিরূপে তাহাদের অ-সচ্ছলতা দূরীভূত হইতে পারে, কিরূপে বালকবালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কর্ম্মীগণও আত্মসত্বর তথায় যাইয়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার এবং চিকিৎসার্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও কুইনাইন বিতরণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন; আশ্রমের তহবিলে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ নাই। আমরা হিন্দু সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট ভিক্ষা চাই।

এতদ্‌সম্বন্ধে যাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত; তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য সেবাশ্রম, সোয়ারীঘাট, ঢাকা—এই ঠিকানায় অর্থ সাহায্য পাঠাইবেন।

কুমিল্লা অভয় আশ্রম—

আমরা কুমিল্লা অভয় আশ্রমের ১৯২৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আশ্রম মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত গঠন-মূলক কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। শুধু খদ্দরের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে আশ্রমের নয়টি উৎপাদনকেন্দ্র ও বারটি বিক্রয়কেন্দ্র আছে। ১৯২৬ সনে ১৪৫,৬২২ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে, তন্মধ্যে গত ডিসেম্বর মাসে বিক্রী হইয়াছে ১৮৭৭২ টাকা। ১৯২৪ সনে মাত্র ২১৮২২ টাকা ও ১৯২৫ সনে ৭[illegible] টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের দ্বিগুণ বিক্রী হইয়াছে। এই একলক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার টাকার খাদি উৎপাদন করিয়া বিক্রী করিতে আশ্রমের মূলধন খাটিয়াছে ৯৩,[illegible] টাকা, তন্মধ্যে ২৭,০০০ টাকা শতকরা ৯ টাকা সুদে ধার করা হইয়াছে। খাদির মূল্য এখনও মিলের বস্ত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ইহা একটি শিশু শিল্পমাত্র। এমতাবস্থায় শতকরা ৯ টাকা হারে সুদ দিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া কাজ চালান অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ ২৪৩০ টাকা সুদ বাবদ দিতে হইলে খাদির দামই বৃদ্ধি করিতে হয়। বাঙ্গালার ধনী ও দরিদ্র সকলে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিলে আশ্রম

খাদি কাজের জন্য অতি সহজেই ২৭,০০০ টাকা পাইতে পারে।

খাদি বিক্রয় পাকা রং ও ছাপের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আশ্রম রং ও ছাপের সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ চেষ্টিত আছেন। অর্থাভাবেই আশ্রমের সে কাজটি তেমন অগ্রসর হইতেছে না। ২০,০০০ টাকা পাইলেই আশ্রম এ-বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। আশ্রমে কৃতী রাসায়নিক আছেন তাঁহারা একাজ বেশ ভাল ভাবে চালাইতে পারেন। দেশবাসী অভয় আশ্রমকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া গঠন-মূলক কার্য্যের সহায়তা করিবেন, আশা করি।

স্যার রোনাল্ড রস্—

মশক কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া-বিষ বহন তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা স্যার রোণাল্ড রস সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন। গত মাসে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তাঁহার স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন বঙ্গীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সদস্যগণ।

বাঙ্গালাদেশের ১০৮৭ শত ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির পক্ষ হইতে স্যার রোণাল্ড রসকে যে-সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বোধ হয় এদেশে তাঁহার পক্ষে অধিকতর সম্মান হইতে পারে না। স্যার রোণাল্ড রসের আবিষ্কারের অনুসরণ করিয়াই এইসমস্ত সমিতি বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। এইসমস্ত সমিতির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এগুলি ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামবাসীদেরই আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই প্রচেষ্টা করিতেছেন। স্যার রোণাল্ড রস্ ম্যালেরিয়া-নিবারিণী সমিতির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে, আরও বহু সহস্র সমিতি চাই। বাঙ্গালাদেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার, ম্যালেরিয়া-নিবারিণী সমিতির সংখ্যা মাত্র ১০৮৭টি; সুতরাং এই দিকে কার্য্য করিবার বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

বাঙালী রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য—

বাঙলার রাজবন্দী যুবকদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ যেরূপভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে তাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুধু আত্মীয়-স্বজন নহে, সকল দেশবাসীরই গভীর চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ নানা প্রদেশে জেলের অন্তস্তরে তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা জানিবার কোনও উপায়ই নাই। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ-বন্দীদিগকে যে সকল চিঠি লিখিতে দেওয়া হয় তাহা হইতেই কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। চিঠিতে মন খুলিয়া সুখ দুঃখের কথা লিখিবার রীতি নাই কারণ পুলিশের পরীক্ষা ব্যতীত কোন চিঠি বাহিরে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও যে-সকল খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই প্রকাশ যে, সাধারণভাবে কোন রাজবন্দীরই স্বাস্থ্য ভাল নয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র প্রভৃতি অনেকের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ভয়াবহ সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন—

বাংলার নারী-নির্য্যাতন সম্পর্কে বাংলা প্রাদেশিক আইন সভার একজন সদস্য সরকারকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন। সেগুলির সঠিক উত্তর পাওয়া গেলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। প্রশ্নগুলি এই:—

(১) গত ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে বাঙ্গালায় কতগুলি নারীহরণ হইয়াছে, অপহৃতা নারীদের নাম কি এবং তাঁহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিবেন কি?

(ক) কতজন গুণ্ডা এজন্য শাস্তি পাইয়াছে এবং তাহার কতজন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

(খ) বর্ত্তমান সময়ে আদালতে কতগুলি মামলা দায়ের আছে এবং এইসব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম কি?

(গ) কতগুলি নারী-হরণে এখনও পর্য্যন্ত আসামীদের কোন সন্ধান হয় নাই?

(ঘ) নারীহরণের প্রাবল্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কি উহা দমনের কোন ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক আছেন?

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

সুদীর্ঘ ছয়মাস কাল পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। ধর্ম্মের আহ্বানে সমগ্র হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা, ভাব ও চিন্তার বিচ্ছেদ ভুলিয়া ভারতবাসী হিন্দু দলে দলে আসিয়া পটুয়াখালীতে সমবেত হইতেছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই হিন্দুগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাদের চিরন্তন অধিকার অটুট রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে। গুজরাট, কানপুর, জব্বলপুর, আসাম, সিন্ধুদেশ তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষার দুর্জ্জয় আহ্বান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-গুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। প্রায় প্রত্যহই দলে দলে সত্যাগ্রহী আসিতেছে। খুলনা, ঢাকা, মাদারীপুর প্রভৃতি স্থল হইতেও সাধ্যমত সাহায্য আসিতেছে, কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আবার নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। সেখানকার স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ সরস্বতী পূজায় ছাত্রদের ন্যায্য অধিকারে বাধা দেয়। ছাত্ররা এই অন্যায় আদেশ অবহেলা করে। বাংলা আইন সভার সদস্য ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত বরিশাল সত্যাগ্রহ তদন্ত করিবার জন্য ও সরস্বতী পূজায় যাহাতে কোন গোলমাল না হয় এইজন্য পটুয়াখালী গিয়াছিলেন। ছাত্রদের আইন অমান্য করিয়া পূজা করিবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এই অজুহাতে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। বাংলার নানা স্থান হইতে সরস্বতী পূজা লইয়া মনোমালিন্যের সংবাদ আসিতেছে।

ব্রহ্মদেশে ভূত-নিবারণ—

ব্রহ্মদেশে ভূতের ভয় অত্যন্ত বেশী। সেখানে ভূত তাড়াইবার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশের চাষারা যেমন ফসল-ক্ষেত্রে চূণ-মাখা কালো হাঁড়ি কিম্বা মুড়ো-ঝাঁটা ইত্যাদি লাঠির ডগায় লাগাইয়া
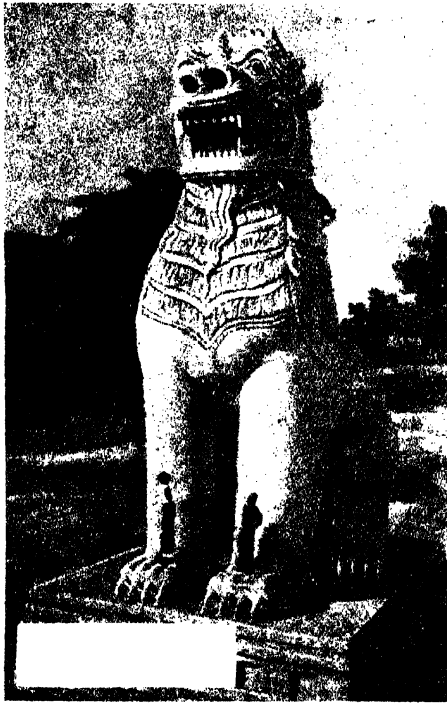
ভূত-তাড়ানো মূর্ত্তি

পুঁতিয়া রাখিয়া দুষ্ট নজর হইতে ফসল রক্ষা করে, ব্রহ্মদেশবাসীরাও তেম্‌নি অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্ত্তি গড়িয়া বাড়ীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করে। এইগুলি যেন ভূত-প্রেত পিশাচ-দানব প্রভৃতির প্রতিষেধক। মান্দালায়ের এরূপ একটি ভূত-নিবারণকারী অদ্ভুত জন্তুমূর্ত্তি এখানে দেখানো হইল। ইহার থাবার উপর দণ্ডায়মান লোক দুইটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, মূর্ত্তিটি কত বৃহৎ। এই মূর্ত্তির শিল্পকলা সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশীয়।

লৌহ-শিল্প—

পাশের ছবিতে প্যারিস্‌প্রবাসী একজন আমেরিকান শিল্পী ও তাঁহার শিল্প-সৃষ্টির নমুনা দেখানো হইয়াছে। ইনি প্যারিসে চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য্য

চিম্‌নী ঢাক্‌না

শিখিতে গিয়াছিলেন। কিছু কাল সেখানে শিক্ষা করিবার পর তাঁহার মাথায় হঠাৎ এক নূতন খেয়াল জন্মে। ইনি তুলি ও বাটালি ছাড়িয়া সম্প্রতি লোহা পিটিয়া শিল্প সৃষ্টি করিতেছেন। সাধারণতঃ মানুষের গৃহে যে-সমস্ত লোহার আসবাব ব্যবহৃত হয় ইনি সেগুলিকেই শিল্প-সামগ্রী করিয়া তুলিতেছেন। এই কাজ করিয়া পাশ্চাত্য শিল্পীমহলে ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পাশের ছবিতে দেখুন, ছাদের উপর চিম্‌নীর ঢাক্‌নীর সহিত পেটালোহার একটি নেক্‌ড়ে কুকুর সংযুক্ত করিয়া ইনি সেটিকে কেমন সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

জল-সাইকেল—

ফ্রান্সের এক বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এক-প্রকার সাইকেল নির্ম্মাণ

জল-সাইকেল

করিয়াছেন যাহা জলে চলে। সাধারণ সাইকেল যেমন পায়ে চালাইতে হয় ইহাও সেইরূপ পায়ে চলে। ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে ইহাকে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়।

—

আধুনিক ঠেলাগাড়ী—

গরীব মায়েদের সুবিধার জন্য এক নূতন ঠেলাগাড়ী আবিষ্কৃত

আধুনিক ঠেলা-গাড়ী

হইয়াছে। ইহার দাম কম, অথচ ইহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। গাড়ীখানিকে ভাঁজ করিলেই, একটি হাত-ব্যাগের মত হইয়া যায়। এই গাড়ীর ওজন ৭ সের মাত্র।

—

লুপ্ত জন্তুর প্রতিকৃতি—

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত কঙ্গো প্রদেশের অধিবাসীরা শ্বেতাকায় শ্বেত-অধিবাসীদের নিকট নানা প্রকার অতিকায় জন্তুর বর্ণনা করে। সেগুলির দুই-একটি নাকি এখনও গভীরতম জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আছে। এইসকল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কর্ণেল এইচ, এফ, ফেন্ কঙ্গোর আদিম অধিবাসীদের বর্ণনা-অনুযায়ী এক অতিকায় জন্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইনি ইঁহার অনুচরবর্গকে এই কাল্পনিক

লুপ্ত জন্তুর কাল্পনিক মূর্ত্তি

জন্তুর মূর্ত্তির সহিত পরিচিত করাইয়া আফ্রিকার এই জন্তুর সন্ধানে গমন করিবেন।

—

বুকের জোর—

আমেরিকার ফ্রিস্কো সহরে সেদিন এক অদ্ভুত উপায়ে বুকের জোর
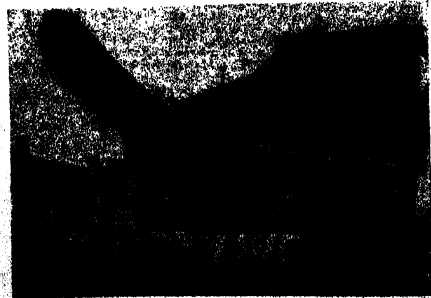
বুকের জোর

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এক কৃষক যুবক এই পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন। একটি রবারের একমুখো নলে ফুঁ দিয়া কে কত ফুলাইতে পারে ইহাই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই কাজে বুকের অর্থাৎ ফুসফুসের বিলক্ষণ জোর প্রয়োজন। এই যুবক নলটিকে ১৪ হাত লম্বা ও ইহার পরিধি

৩৬ ইঞ্চি করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। ইহার পরই নলটি ফাটিয়া যায়। নলটিকে এই আকার দিতে ইঁহার একঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছিল।

আলাস্কার লুপ্তপ্রায় শিল্প—

উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে ১৭৪১ সালে যখন প্রথম শ্বেতকায় জাতি প্রবেশ করে, তখন সেখানে তথাকার আদিম অধিবাসীরা কাঠের উপরে এক ধরণের খোদাই ও চিত্রণ করিত, যাহা টটেম শিল্প বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্প-রসিকেরা ইহাকে অতি উচ্চ ধরণের কারুশিল্প বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান পর্য্যটক বেহ্‌রিং প্রথম আলাস্কা প্রদেশের সিট্‌কা অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তিনি এই টটেম-শিল্পের চমৎকার বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন পথে-ঘাটে টটেম-দণ্ড (Totem Pole) ও বাসগৃহের বহির্দ্দেশেও এই শিল্পের নিদর্শন দেখা যাইত। তারপর ধীরে ধীরে তথাকথিত শ্বেত-সভ্যতার প্রকোপে ও অত্যাচারে আলাস্কার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। যাহারা বর্ত্তমান আছে তাহারাও এই সভ্যতার মোহে আপনাদের লুপ্ত গৌরব বিস্মৃত হইয়া এই শ্বেতকায় লোকদের অনুকরণ করিতেছে। যে-সকল গৃহে ও দণ্ডে এই শিল্পের নিদর্শন ছিল, কাল-প্রভাবে সেগুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্প-সমালোচক ডাঃ হার্ব্বার্ট ক্রেইজার বলেন যে, পৃথিবীর কুত্রাপি কাষ্ঠ-শিল্প এমন পূর্ণতা লাভ করে নাই। কাঠের উপর খোদাই কার্য্যে ইহারা অদ্বিতীয় ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিশ্রী কাষ্ঠখণ্ডের গায়ে বীবর, ভল্লুক, তিমিমাছ, ঈগলপাখী ও মানুষের ছবি খোদাই করিয়া সেটিকে অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য মণ্ডিত-করা সত্যই বিস্ময়কর।
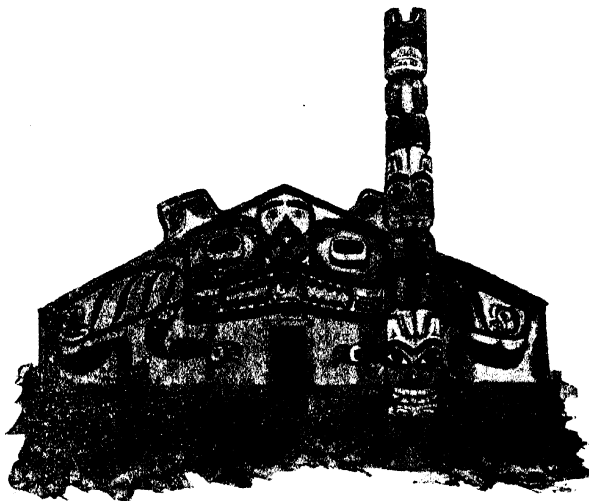
বাস-গৃহে টটেম-শিল্প

সিট্‌কা উদ্যানে অবস্থিত টটেম দণ্ড

গৃহের বহির্ভাগের টটেম-শিল্প অপেক্ষা টটেম-দণ্ডগুলি দেখিতে সুন্দর। উচ্চতায় এগুলি এত দীর্ঘ যে ইহাদিগকে গগনচুম্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক-একটি দীর্ঘ পাইন কিম্বা দেবদারু গাছের উপর খোদাই করিয়া এগুলি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্ব-পুরুষের নাম স্মরণ

করিয়া এগুলি গৃহের সম্মুখে স্থাপিত হয়; অর্থাৎ এগুলি অনেকটা স্মৃতি-স্তম্ভের মত। আলাস্কার কোন কোন স্থলে টটেম অর্থে শবাধার বুঝায়। সম্ভবতঃ এগুলি কবরের উপর স্মৃতিস্তম্ভরূপেই প্রোথিত হইত। অনেক স্থলে এই দণ্ডের গায়ে বংশানুক্রমে বাড়ীর কর্ত্তাদের চিত্র খোদিত আছে। কোনো একটি দণ্ডের গায়ে ক্যাপ্টেন কুক ও একটির গায়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোনো শিল্পী স্বচক্ষে ইঁহাদের দেখিয়া খোদাই করিয়া থাকিবে।

এখানে টটেম-শিল্পের দুইটি নিদর্শন দেওয়া হইল। প্রথমটিতে গৃহের সম্মুখের দৃশ্য ও একটি ক্ষুদ্র টটেম-দণ্ড দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সিট্‌কার উদ্যানে অবস্থিত একটি টটেম-দণ্ডের ছবি। কাসান নামক একটি গ্রাম হইতে এটি নীত হইয়া এখানে প্রোথিত হইয়াছে।

—

প্রজাপতির পাখা—

এখানে যে চারিটি এক বর্ণের চিত্র দেখান হইল এগুলি চারিটি বহুবর্ণ চিত্রের প্রতিকৃতি। কোনো শিল্পী তুলিকা-সহযোগে এগুলি

প্রজাপতির পাখার ছবি—পরীর দেশ

অঙ্কিত করে নাই; বহুবর্ণ প্রজাপতির পাখার টুক্‌রা কাচের উপর বসাইয়া এগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। শিল্পীর কল্পনা ও অঙ্কন-ক্ষমতার যথেষ্ট নিদর্শনও ইহাতে আছে, সন্দেহ নাই। এই ছবিগুলি এমনই মনোহর হইয়াছে যে পাশ্চাত্য দেশে ইহার এক-একটি ৮।৯ শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

নিউগিনি অঞ্চল হইতে এই সকল বহুবর্ণ প্রজাপতি আমদানী করা হয়। ইহাদিগকে অবিকৃত অবস্থায় ধরিবার জন্য প্রচুর তোড়-জোড় করিতে হয়। সাধারণতঃ স্বচ্ছ কাচ দিয়া এক-একটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রিতে তাহার ভিতর এমন তীব্র আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয় যে, দিনের মত মনে হয়। রঙীন প্রজাপতিরা দলে দলে এই আলোকের সন্নিকটে আসিতে চায় ও কাচে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাহারা কাচের উপর বসিয়া পড়ে এবং আর উড়িতে সমর্থ হয় না কারণ, কাচের উপর আঁটার প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে অনেক শ্বেতব্যবসায়ী লাভবান হইতেছে।

নৃত্যরতা (প্রজাপতির পাখার ছবি)

লকেট পাখী (প্রজাপতির পাখার ছবি)
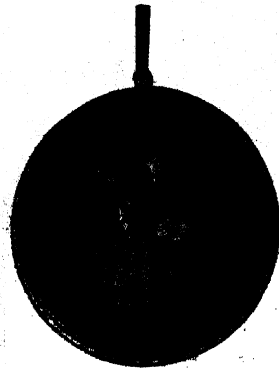
রাজমহিষী (প্রজাপতির পাখার ছবি)

[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রী যামিনীকান্ত সোম প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ৸৹।

পুস্তকখানি ভিতর বাহির—এই উভয় সৌন্দর্য্যেই যে শুধু ছেলেদেরই লোভনীয় হইয়াছে এমন নহে, ইহা বড়দেরও সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় হইয়াছে। লেখক মহাশয় এই ষোড়শাংশিত ডবল-ক্রাউন আকারের ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে, ছেলেমেয়েদের পাঠ্য করিয়া, যে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহার কাব্যকথা, কর্ম্মকথা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথায় এযুগের মানবমন ও বিশ্বসাহিত্য ভরিয়া উঠিতেছে। গ্রন্থকার এই অসাধ্য সাধনায় কতটা সফলকাম হইয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিবেন। তিনি মহাকবির নিজের লেখার ভিতর দিয়াই কবিকে ছেলেদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে, তিনি যে-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্র চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করিবে, উন্নত করিবে, ধন্য করিবে। "ছেলেদের বিদ্যাসাগর" প্রভৃতির লেখক যামিনী-বাবুর এ আশা করা অসঙ্গত হয় নাই। ছেলেরা এই বইয়ে যাঁহার জীবন-কথা পড়িবে, তাঁহার স্পর্শও তাহারা অনুভব করিবে, আর ভিতরে ভিতরে নিজে নিজেই অনেকটা গড়িয়া উঠিবে। বইখানি ছোট হইলেও ইহা তাহাদের মনকে বড় করিয়া তুলিতে ও হৃদয় প্রশস্ত করিতে সাহায্য করিবে আর এইটুকুতেই তাহাদের কূপমণ্ডুকতার জাড্য ঘুচিয়া ঘরের বাহিরে পা দিবার, জগতের কোথায় কি আছে ও হইতেছে তাহার তত্ত্ব লইবার বাসনা জাগিবে। আমরা আশা করি, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ পুস্তক ছেলেদের পড়িবার অবসর দিবেন এবং আজগুবি বাজে-কথায় ভরা বইয়ের বদলে এমন মনোহর করিয়া লেখা জীবনপ্রদ পুস্তক যাহাতে প্রত্যেক বালক বালিকার হাতে পড়ে অভিভাবকগণ তাহা করিবেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

লেনিন্ ও সোভিয়েট—শ্রী প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত। মূল্য ১৷৹। পৃঃ ১২০। ১৩৩৩।

এই পুস্তকে লেখক বঙ্গভাষায় লেনিনের কর্ম্মসাধনার ইতিহাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বল্‌শেভিজিমের স্বরূপ এবং রুশিয়ায় কিরূপে ক্রমে ক্রমে বলশেভিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কাহিনী এই পুস্তকে সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও চিত্রগুলি বেশ হইয়াছে।

আলোর আঁধার—শ্রীপঞ্চানন মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ৩২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲। পৃষ্ঠা ২৫৮। ১৩৩৩।

উপন্যাস। প্লটটি নূতন না হইলেও লেখকের রচনা-ভঙ্গীতে বইটি সরস ও সুন্দর হইয়াছে। বইখানির আদর হইবে।

ভার উত্তোলন ও শরীর সাধনা—শ্রীসুধীরকুমার দাস প্রণীত। ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স, ২৭৷১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹, পৃঃ ১১১। ১৩৩৩।

শরীর সুস্থ রাখাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম এবং জাতীয় জীবন গঠনে শারীরিক শক্তির উন্নতি বিধান করা একান্ত আবশ্যক। বাঙালী জাতির তথা ভারতবাসীর শারীরিক শক্তি অতি দ্রুতগতিতে ক্ষুণ্ণ হইতেছে—ইহার সত্বর প্রতিবিধান প্রয়োজন। কি উপায়ে শরীর-চর্চ্চা করিলে স্বাস্থ্যলাভ হয় এই পুস্তকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাহা সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকে চিত্রগুলি দেওয়ায় ইহার উৎকর্ষ ও কার্য্যকারিতা আরও বাড়িয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তক পাঠে সাধারণের উপকার হইবে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

প্র

(১) দেহতত্ত্ব (সচিত্র); (২) আদর্শ ধাত্রীশিক্ষা (সচিত্র) এবং (৩) অর্গানন—আর সেনগুপ্ত প্রণীত। দাম যথাক্রমে ৷৹, ১৲, ১৷৹। ফ্রেণ্ডস্ হোমিও-হোম, ৬৫৷১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিতকথা—শ্রীআশুতোষ পাল। প্রাপ্তিস্থান মোহিনী কুটীর, বোলপুর। দাম বারো আনা।

দেহ ও দেহরক্ষা সম্বন্ধে এই চারখানি পুস্তকই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

পূজাতত্ত্ব—সাধন-সমর গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত। সনাতন তত্ত্ব-পরিষৎ হইতে শ্রীতিনকড়ি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩৩৷২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

হিন্দুর সকল প্রকার পূজার উৎপত্তি ও স্বরূপ বর্ণনাপূর্ণ গবেষণামূলক ও ভক্তিমূলক পুস্তক। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সাধারণে হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক তথ্য পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন ও প্রচুর শিক্ষা লাভ করিবেন।

মাথুর-কথা—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত। প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩৷১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹ টাকা।

পুস্তকখানি হিন্দুর প্রাচীন তীর্থস্থান মথুরার একটি মনোরম সুলিখিত ইতিহাস। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পুস্তকের যে-ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন—"তিনি (গ্রন্থকার) বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ, কুষাণ প্রভৃতি যুগের মথুরার সন্ধান দিয়াছেন। ঐসকল যুগে মথুরা কি নামে পরিচিত ছিল, এবং পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মথুরার যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত

করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগের যে-সকল রাজবংশ মথুরার সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।...এইরূপে শক, কুষাণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মথুরা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় অতি নিপুণভাবে গ্রন্থকার সন্নিবেশিত করিয়াছেন।" বাস্তবিকই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের প্রচুর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিন্যাসকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকখানি চিত্রযুক্ত হওয়ায় পুস্তকটির গৌরব বাড়িয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

গুপ্ত

শনির দশা---শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৩। মূল্য ২৲ টাকা। ২৩৮ পৃষ্ঠা।

এই উপন্যাসখানি সুলিখিত। ভাষা ঝরঝরে। আখ্যানভাগে কিছুমাত্র জটিলতা না থাকিলেও লেখার গুণে বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি'র সহিত ইহার কিছু সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা---প্রকাশক, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন-কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ১৩৩৩। ৩৩৩ পৃষ্ঠা, সচিত্র। মূল্য ২৲ টাকা।

পরমহংস রামকৃষ্ণের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবী পৃথিবীর সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের আদর্শ নারীদের অন্যতম। এই মহীয়সী নারীর অপূর্ব্ব জীবনী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশক দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি জীবনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে উল্লেখ করিয়াছিলেন। জীবনীখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মনে অনেক বল পাইলাম। শ্রীশ্রীমায়ের সার্ব্বজনীন সন্তানপ্রীতি উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলাম। এমন ত্যাগী ও মহীয়সী নারী সংসারে অতীব বিরল। স্বামীর ন্যায় তিনিও যেন সারল্যের অবতার ছিলেন। এই পুস্তকখানি বাঙলার গৃহে গৃহে পঠিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। পুস্তকের বাঁধাই চমৎকার।

চাঁদ সদাগর---নাটক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী বসন্তবিহারী চন্দ্র, এম-এ প্রণীত ও দি বুক কোম্পানী ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৩৩৩। ১৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০।

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বেহুলার ভাসানও আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সতীকুলশিরোমণি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর সহিত বেহুলাকে আমরা এক আসন দিয়া থাকি। এই নাটকখানি লেখাই ও বেহুলার গল্প লইয়া রচিত। গ্রন্থকারের সহৃদয়তা ও ভাষার গুণে তেজস্বী চাঁদসদাগরের চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'গন্ধবণিক' সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থকার এই নাটকখানিকে ইতিহাস-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

স

'কুড়ি' বিড়ালীর জীবন-কথা

শ্রী জগৎবন্ধু মিত্র

বিড়ালীটার ভাল নাম 'কুড়ুনি'। কিন্তু আমরা তাহাকে 'কুড়ি' বলিয়া ডাকি। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

সেদিন কি-একটা মস্ত যোগ ছিল। পুণ্যের বাজারে সেদিন একটা বড় রকম দাঁও মারিতে পারিলে স্বর্গের সিঁড়িটা হাতের কাছেই পাওয়া যায়, এই বিশ্বাসে ভর করিয়া গঙ্গার স্রোতের মত স্নানযাত্রীরা সস্তায় কিস্তিমাত করিতে ছুটিতেছিল—আমিও চলিয়াছিলাম।

এমনি এক পবিত্র দিবসে অধর্ম্ম! আশ্চর্য্য! কতক-গুলি কৃষ্ণবিরূপ ইতর বালক একটি কৃষ্ণের জীব বিড়াল-ছানাকে লইয়া রাস্তার নর্দ্দমায় চুবাইয়া মারিবার জোগাড় করিয়াছে। কৃষ্ণভক্তের তাহা সহ্য হইবে কেমন করিয়া? বলিলাম—বাবারা, আজকের দিনে আর মহাপ্রাণীটাকে মারিস নে, কাল যা হয় করিস্, ছেড়ে দে, বাপ্।

ছেলেরা শুনিল না, বলিল—তব, চারঠো পয়সা দেও, বাবুজি।

আমি বলিলাম, পয়সা কোথায় পাগ্লা ধন্, দেখ তো নেই চান্ করতে যাতা হায়।

এমন পবিত্র দিনে মিথ্যাটা মুখে বাধিল না। পাঁচটা পয়সা ট্যাঁকে লইয়া আসিয়াছিলাম। দরিদ্রকে কিছু দান করিয়া স্বর্গের সিঁড়িতে একটা আসন 'রিজার্ভ' করিয়া যাইব, এই ছিল বাসনা, কিন্তু অপোগণ্ডগুলা তাহাই যে চাহিয়া বসে! ইহাদের দিলে কি দানের পুণ্য হয়?

কিন্তু কি করি, বলিলাম—একটা পয়সা দিচ্ছি, ছেড়ে দে।

রাজি হইয়া বিড়ালটাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ঐ একটা পয়সার বাজে খরচে স্নানের সমস্ত মাধুর্য্যটুকু মাটি হইবার জোগাড়। ভাবিলাম, ঐ একটা পয়সার জন্য আসনটা যদি বেহাত হইয়া যায়! কিন্তু, ফিরিবার সময় যাহা দেখিলাম তাহাতে স্নানের সমস্ত সরসতাটুকু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার জোগাড়। পয়সাও যাইবে, পুণ্যও জুটিবে না? স্পর্শ করা চলিবে না, নতুবা ছেলেগুলাকে দেখিয়া লইতাম একবার।

দেখি, তাহারা পুনরায় বিড়ালটাকে জলে ফেলিয়া হুল্লোড় করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা পলাইয়া গেল। আর বিড়ালটাও পরিত্রাণ পাইয়া আমার কাছে আসিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। পাছে ছুঁইয়া ফেলি এই ভয়ে সজোরে বাড়ির দিকে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইব এমন সময় পিছন হইতে শুনিলাম—মিউ।

ফিরিয়া দেখি বিড়ালটা পিছু লইয়াছে। ভাল আপদ জুটিল ত! উপকার করিলে এই রকমই বুঝি তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়! এখনই বুঝি ঘরে উঠিয়া সব নোংরা করিয়া দেয়! ইস, সদ্য সরকারি 'ড্রেন' হইতে উঠিয়া আসিয়াছে!

এমন সময় আমার পাঁচ বছরের মেয়ে বেলা ছুটিয়া আসিয়া কহিল—বাবা, পাঁপর-ভাজা এনেছ?

হ্যাঁ মা, কিন্তু ঐ ছাখ একটা নর্দ্দমার বেড়াল ঘরে উঠে আস্‌ছে। দৌড়ে গিয়ে কপাটটা ভেজিয়ে দে মা—ঐ যাঃ?

বিড়ালটা তখন ভিতরে উঠিয়া 'মিউমিউ' করিতেছে। বেলা মায়ের মত সুরে বলিল—আহা! বাবা, ওকে আমি পুষব। ধুয়ে-টুয়ে এক্ষুনি পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি, দেখনা।

সভয়ে বলিলাম—না, না, সে হ'বে না—বেড়ালের দুঃখু কি? ও নোংরা বেড়ালটাকে ঘরে তুলো না, মা।

কিন্তু বেলা ছাড়িল না, বলিল—অন্য বেড়াল আমার দরকার নেইকো। এর যে বাপ-মা নেই, বাবা!—বলিয়া বেড়ালটাকে কল্‌তলায় লইয়া গিয়া ধুইয়া-মুছিয়া, খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বাড়িতে একটা কলরব আনিয়া ফেলিল। খুসী আর ধরে না।

চক্ষে জল আসিল। জন্মাবধি বেলাও তার মাকে হারাইয়াছে; তাই একটা পথের কদর্য্য বিড়ালের উপর শিশু-জননীর মাতৃত্বের এই উচ্ছ্বাসটাকে বাধা প্রদান করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার ছিল না। বাড়ীর অনেকেই বিরক্ত হইল; আমার মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল, তবু ভাবিলাব হোক্ গে। মেয়েটাকে খুসী দেখিয়া বুকটা ভরিয়া গেল!

* * *

দিন যায়। শিশুজননীর সেবা ও যত্নে বিড়ালটার চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে, চিনিবার জো নাই। দুধ-মাছ-খাওয়ান মোটা গোল-গাল শরীর ধব-ধবে শাদা লোমে ঢাকা, মাঝে মাঝে কালোর ছোপ। যদিও বিড়ালটাকে বিদেশজাত বলিয়া বোধ হইল না, তবু ইহাকেই যে একদিন নর্দ্দমার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহাও মনে হয় না। বাড়ির 'কুচোকাচা' জড় করিয়া বেলা ইহার একদিন নামকরণ উৎসব শেষ করিল। হাসিয়া বলিলাম,—'পাঁক', 'ড্রেন' এইরকম একটা নাম এর রাখ, কেমন?

বেলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, কখখনও ওসব কথা বল্‌তে পাবে না কিন্তু—আড়ি ক'রে দোব!

মেয়েটার সহিত ঝগড়া করিতে পারি, আড়ি করিতে পারি না। তাই তাহার দেওয়া 'কুড়ুনি' নামটাই বাহাল রহিয়া গেল—বিড়ালটাকে সে যে কুড়াইয়া পাইয়াছে! তবে ডাকে সে কুড়ি বলিয়া, বলে ফুলের কুঁড়ির মতই নরম কুড়িটা না, বাবা? বলি—হাঁ; কিন্তু ভাবিতে থাকি, এই যে নগদ দুইটা টাকা একটা মিথ্যা উৎসবে খরচ করিলাম, ইহা অনর্থক হইল নাকি?

বিড়ালটা বেলার অত্যন্ত গায়ে-পড়া হইয়া উঠিল। উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে পিছনে পিছনে মিউ মিউ করিয়া ফেরে। আমি হাসিয়া বলি—আর-জন্মে ও তোর ছেলে ছিল, বেলা। হাসির উচ্ছ্বাসে ঘর ভরাইয়া বেলা বলে, ছেলে কি গো, মেয়ে যে।

হারিয়া গিয়া বলি—তবে বর্-টর্ দ্যাখ, বিয়ে দিবিনে?

এই ত ছয় বৎসর বয়স, তবু পাকা গিন্নীর মত বেলা বলে, —তুমি বল্‌বে তবে ঠিক কর্‌ব? বর ওর কবে ঠিক হ'য়ে গেছে। 'বকুলে'র 'সর্দ্দারে'র সঙ্গে ওর বিয়ে দোব, একটু বড় হোক্।

পাশের বাড়ীর বীণা, বেলার 'বকুলফুল'। তাহার একটি সুন্দর পাঁশুটে বিড়াল আছে। তার বাবা 'বোস্‌মশাই' কোনো সাহেবের কাছে বিড়ালটা উপহার পাইয়াছিলেন। বীণা তাহার বিলাতী 'টম্' নাম বদ্‌লাইয়া 'সর্দ্দার' রাখিয়াছে।

শুনিলাম, সেদিন সর্দ্দার বীণার সহিত আসিয়া কুড়ির শুধু ফোঁস-ফোঁসানিই শুনিয়া গিয়াছে, ভাব করিতে পারে নাই। বেলা উল্লাসে খবর দিল—কিছুতেই ভাব কর্‌লে না বাবা, খালি তাড়াবার মতলব।

হাসিয়া বলিলাম—কিছুদিন পরেই দেখ্‌বি ঠিক ভাব কর্‌বে। এখন হিংসে করে, পাছে ওর দুধ-মাছে ভাগ বসায়।

সেদিন চোখেই দেখিলাম। বেলা সর্দ্দারকে কোলে লইয়াছিল। কুড়ি চুপ করিয়া দেখিল—নড়িল না, চড়িল না। কিন্তু যেই তাহাকে মাটিতে বসাইয়া দেওয়া—বিড়ালীটার কি ফোঁস্-ফোঁসানি—যেন ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিলে বাঁচে। ব্যাপার দেখিয়া বেলা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, কিন্তু অভিমান তার যায় না। সর্দ্দার চলিয়া যাইতে তবে শান্ত হইল।

আশ-পাশের বাড়ি হইতে কত বিড়াল ঘুরিয়া ফিরিয়া যায়, আহারের চেষ্টায়; কিন্তু তাহাদের সহিত কুড়ুনির বনে না—তাড়া করে। বেলা মিশিতেও দেয় না। বলে, খারাপ হ'য়ে যাবে। দুষ্টামি করিয়া বলি—কি যে সোনা দিয়ে গড়া তোমার মেয়ে।

এই সামান্য আঘাতটুকুও তার সয় না—নাকের ডগা অমনি লাল হইয়া উঠে। কুড়ি তাহার গায়ে গা ঘষিয়া সমবেদনা জানায়। আমি তা'র মাকে কাঁদাই বলিয়া সে আমায় পছন্দ করে না। এড়াইয়া চলে। ভাবি একদিন ওকে ছুঁই নাই একথা হয়ত আজও অবলা জন্তুটা ভুলে নাই।

সেদিন বেলা তা'র পুতুলের বাক্স গুছাইতেছিল। কুড়ি সাম্‌নে বসিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। বেলার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালীটার মাথা ও চোখ নাড়া একটা দেখিবার জিনিষ; যেন কোনো বিষয় লক্ষ্য করিতে ভুল না হয়, এমনি তা'র সতর্কতা। একটা কি খুঁজিয়া না পাওয়ায়, বেলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ বিড়ালীটা আসিয়া মাথা দিয়া বেলাকে ঠেলিতে সুরু করিল। বেলা উঠিয়া দেখে, জিনিষটার উপর সে এতক্ষণ বসিয়াছিল। জানোয়ারের বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

সময় সময় বেলা এই জন্তুটার প্রতি কি যে সব বকিয়া যায়, কুড়ি মিউ মিউ করিয়া কি যে তার উত্তর দেয়, বুড়া মাথায় তাহা আসে না, কিন্তু অবাক্ হইয়া যাই; ঐ নির্ব্বাক্ সাথীটার সহিত সে কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আনন্দে কাটাইয়া দেয়। নির্ব্বাক্ শিশুর সহিত জননীও এমনি সুখে বকিয়া মরে।

বেলার অনেক কথাই যে বিড়ালীটা বুঝে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাহার অনেক আদেশ সে সহজে পালন করে। বেলার আদেশ মত দুবেলা সে ঠাকুর-ঘরে চৌকাঠে মাথা ঠুকিয়া আসে। বেলা হাসিয়া বলে—পেন্নাম করুক, ভাল বর হবে। আরজন্মে ও যেন সত্যই আমার মেয়ে হ'য়ে জন্মায়।

এই শিশু-নারীর মাথায় এসব খেয়াল আসে কোথা হইতে? মানুষের ভিতরটা দিনের পর দিন কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে, একবার দেখিবার ইচ্ছা জাগে।

*　　*　　*

বেলার বয়স প্রায় সাত বৎসর হইয়া গেল। হাঁড়ি হইতে সেদিন কে মাছ চুরি করিয়া খাইয়াছিল। ঝি বলিল, পাশের বাড়ির হুলোটাকে সে নাকি খাইতে দেখিয়াছে। কিন্তু রাঁধুনীর বিশ্বাস হয় নাই; কুড়িকেই উদ্দেশ করিয়া সে গালি পাড়িতেছিল। কিন্তু বিড়ালীটার গর্জ্জন দেখে কে! রাধুনীকে আঁচড়াইতে গিয়া বেশ ঘা কতক খাইয়া আসিয়া বেলার কাছে কান্নায় একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অনেক আদর আপ্যায়নের পর সেদিন তাহাকে শান্ত করিতে পারা গিয়াছিল। মিথ্যা অভিযোগ বিড়ালীটারও সহ্য হইল না। সত্যই অপ-

নবাবজাদী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার শিশু-প্রভু ভিন্ন কাহারও উচ্ছিষ্ট সে খাইত না, আর চুরি করিয়া খাইবার মত কোনো অভাবই তার ছিল না ; সুতরাং এ মিথ্যা অভিযোগ সে বরদাস্ত করিবে কেমন করিয়া ?

বিড়ালটা এখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবটাও তার খুব সংযত দেখিতেছি। ছোট বেলায় সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ও শোঁকা তার একটা অভ্যাস ছিল, এখন আর তাহা নাই—অনেক কিছু জানিয়াছে বা শিখিয়াছে এইরূপ ভাব।

এতদিন পরে সর্দ্দারের সহিত সে কিছু সহজভাবে আলাপ করে শুনিতে পাই। বেলা খুসি হইয়া খবর দেয় – আর হিংসে করে না বাবা, দুজনে বেশ খেলা করে, মাঝে মাঝে ঝগড়াও করে কিন্তু।

দোতলার ছাদের এক পাশে একটা টিনের ঘর। উপরের 'বাথ রুম সেইটাকেই করা হইয়াছে। তাহার চালে উঠিতে হইলে ছাদের পাঁচিল বাহিতে হয়। এক ডানপিটে ছেলে ও জন্তু ভিন্ন রাস্তার ধারের পাঁচিলে উঠিতে কেহ সাহস করিবে না। কুড়ি যখন ছোট, মাঝে মাঝে উঠিবার চেষ্টা করিত। হাজার হোক্ বিড়ালত্ব যাইবে কোথায় ? কিন্তু বেলার নরম গরম শাসন খাইয়া অনেকদিন আর উঠে নাই। আজকাল সব বিষয়ে জন্তুটা ভয়ও পায়।

কিন্তু দেখা গেল পাশের বাড়ির যে হুলোটা সেদিন মাছ চুরি করিয়া খাইয়া কুড়ির নামে দোষ চাপাইয়া গা ঢাকা দিয়াছিল তাহারই সহিত আমাদের কুড়ুনি অম্লানবদনে নির্ভয়ে টিনের চালে উঠিয়া শীতের স্নিগ্ধ প্রভাত-রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছে ও তাহারই কদর্য্য অঙ্গ চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। এতদিনের শিক্ষা, শাসন ও আভিজাত্যের গৌরবকে উপেক্ষা করিয়া কুড়ি কেমন করিয়া এই কদর্য্য হাঁড়ি-খাওয়া 'বাঁদরটার' সাহচর্য্য বরদাস্ত করিতেছে, ইহাই হইল বেলার বিস্ময়ের বিষয় ; কিন্তু সবচেয়ে তাহার রাগ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে, কুড়ি তার আদেশ অমান্য করিল কোন্ সাহসে ? যাহাই হোক্, এখন কুড়ি নামিবে কি করিয়া ? যদি পড়িয়া যায় ? ভয়ে সে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। একটু শুধু হাসিলাম, তবে অবাক্ও হইলাম খুব- সর্দ্দারকে মনে না ধরিয়া এই কদর্য্য হুলোটার উপরই বা কুড়ির অনুরাগের কারণ কি ? সর্দ্দার কি দাম্ভিক ? হুলোটাকে বাড়িতে প্রায় দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মত বিড়ালের প্রতি কুড়ি ত চাহিয়াও দেখিত না শুনিয়াছি।

অনেক তাড়াহুড়া করিবার পর তবে দুটার নামিবার ইচ্ছা দেখা গেল। হুলোটা দুই লাফে পলাইয়া গিয়া দূরে বসিয়া কুড়িকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, আর কুড়িও এমন সহজে নামিয়া আসিল যে, বেলার সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ একেবারে মাঠে মারা গেল। বুঝা গেল আরও দুচারবার গোপনে তাহারা এ স্থানে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছে। না হইলে কি এমন বক্র পথটা একবারের চেষ্টায় এত সরল হইয়া উঠিয়াছে ? কুড়ির মারটা সেদিন কিছু জোরদারই হইয়াছিল, কিন্তু এখন হইতে তাহার ভুলচুক, আদেশ-অমান্য চলিতেই লাগিল। বেলা আর তাহাকে পারিয়া উঠে না। 'দেখ ত না দেখ', সে হুলোটার সহিত মিশিয়া বয়াটে হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু কুড়ি সেদিন সত্যই বেলাকে কাঁদাইয়া তুলিল, যেদিন দেখা গেল, যে সে হুলোটার পাশে পাশে উচ্ছিষ্ট পাত চাটিয়া ফিরিতেছে। সেদিন আমি শুদ্ধ তাহাকে পিটিয়াছিলাম। নর্দ্দমার গন্ধটা কি কখনও তাহার দেহ হইতে মিলাইবে ?

বীণার সর্দ্দার অধুনা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ বাড়িতে তার যাতায়াত কিছু ঘন ঘন, কিন্তু কুড়ির সহিত মেলামেশাও করে না। সামনে দিয়াই চলিয়া যায় যেন দেখিতে পায় না। ও-বাড়ির আলিশা হইতে সে তাকাইয়া দেখে, হয় ত তখন কুড়ি ও হুলোটা পাশাপাশি বসিয়া আছে। দেখিয়াই গোঁজ হইয়া আড়ালে চলিয়া যায়। এই সব লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সর্দ্দারটা স্বভাবতই দাম্ভিক। আলাপ কর, তবে সে আলাপ করিবে। কুড়ির সহিত আজ পর্য্যন্ত তাহার বনেও নাই বোধ হয় ঐ জন্য। কুড়িও দাম্ভিক কম নয়। কিন্তু ঐ আলাপ করিবার অনুদারতা হইতে মনে করা যায় না যে, তাহাদের আলাপ করিবার ইচ্ছাটা কিছু কম। হুলো অপেক্ষা সর্দ্দারের সহিতই মিতালি করিবার ইচ্ছাটা পুরামাত্রায়

থাকিলেও দুজনার দাম্ভিকতা পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। হুলোর সহিত কুড়ির এই অশোভন মেলা-মেশা, এ শুধু ঐ সর্দ্দারকেই ঈর্ষ্যানলে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাকে কাছে টানিবার একটা ষড়যন্ত্র মাত্র এই কথাটাই বেলাকে সেদিন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে বুঝে না।

* * *

সর্দ্দারের সহিত কুড়ির বিবাহে বেলা এবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। নামকরণে যদি দু টাকা যায় একটা বিবাহে বড় রকমের কিছু খরচ না হইয়া কি যাইবে? তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম।

বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গেল। এবাড়ি-ওবাড়ির ছেলেপুলে এমন কি চাকরবাকরগুলাকেও নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠানো গেল। পৌত্রীকর্ত্তা স্বয়ং আমি, সুতরাং হাঙ্গামা আমারই পনেরো আনা। পিঁড়ি হইতে বর না উঠিয়া পলায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—শেষে কি হুলোটাকেই ধরিয়া বাঁধিয়া পিঁড়িতে বসাইয়া বিড়াল-সমাজের মান বাঁচাইতে হইবে? বরপণ-স্বরূপ উত্তমরূপ সোনামাছের কালিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে!

একবার মনে হইয়াছিল, সর্দ্দারকে কি মনে ধরিবে কুড়ির? একবার জিজ্ঞেস-পড়া করিয়া দেখিব নাকি? কিন্তু তখনই মনে হইল বিড়ালসমাজে অত বিড়ালী-স্বাধীনতা দিলে চলিবে না। হুলোকে মনে ধরিলেই যে তাহার সহিত বিবাহ দিতে হইবে তাহার কি মানে আছে?

সুতরাং সর্দ্দারের সহিতই বিবাহের পাকাপাকি হইয়া গেল। বোস-মশাই ত হাসিয়া অস্থির! বলিলাম—কি করব মশাই; ঐটেকে নিয়েই নাড়াচাড়া ক'রে বেঁচে আছি, বুঝলেন না?

বিবাহের আগের দিন রাত্রে বেলার সহিত পরের দিনের আয়োজনের ফর্দ্দ হইতেছিল। কুড়ি বোধ করি নিজেরই বিয়ের লিষ্ট নিজেরই কানে শুনিবার লজ্জায় স্থানান্তরে আড়ি পাতিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ উপরের ছাদ হইতে একটা ভীষণ গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসিতেই উভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিলাম—মেঘ ডাকিতেছে কি? তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিয়া গেলাম।

গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখি, সেখানে এক মস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের সভা বসিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি আমাদেরই সর্দ্দার ও হুলো এবং দর্শক মাত্র একজন, আমাদেরই সাধের কুড়ুনি। কুড়ি সাম্‌নের পা দুটায় ভর দিয়া মহাওৎসুক্যে দেখিতেছে আর তাহারই বিচক্ষণ চোখের সম্মুখে দুই সগুম্ফবীর রোষকষায়িত-লোচনে ছাতি ফুলাইয়া, লেজ গুটাইয়া ভীষণ যুদ্ধে যুদ্ধমান। ...বিড়ালের ঝগড়া অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভীষণ কখনও দেখি নাই। বেলা ত ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি অনেক তাড়া দিলাম, কিন্তু দ্বন্দ্ব থামিতে চায় না। হুলো ততক্ষণ সর্দ্দারের বজ্র থাবার তলায় কাত হইয়া কাতরাইতে ছিল। সর্দ্দারের জয় সুনিশ্চিত, কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না, হুলোটা মারা পড়িবে। তাই একটা লাঠি লইয়া তাড়া করিলাম। ঘাকতক খাইয়া সর্দ্দার হুলোকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, কিন্তু মনে হয় সে বাধা না পাইলে হুলোকে চিবাইয়া খাইত। হুলোটা বেশ চোট খাইয়াছিল। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বেশী দূরে যাইবার তার সামর্থ্য ছিল না। অদূরে বসিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া কাতরভাবে সে হাঁফাইতে লাগিল।

কুড়ি লেজ নাড়িয়া সর্দ্দারের চতুর্দ্দিকে 'মিউ মিউ' করিয়া ঘুরিতেছিল। হুলোর ব্যথিত দৃষ্টিকে দুপায়ে মাড়াইয়া সর্দ্দারের পিছনে পিছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিয়া আসিতে আজ সে দ্বিধা ও লজ্জা বোধ করিল না। বেলার মুখে হাসি ফুটিয়াছিল, সোল্লাসে সে কহিল—দেখলে বাবা, সর্দ্দারের জোরটা। হাড়ি-খেকোটা কি ওর সঙ্গে পারে?

সে রাত্রে হুলোটার করুণ চীৎকারে অনেকবার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।...

পর দিন সর্দ্দারের সহিত কুড়ুনির বিবাহটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। বীণার ভাই মণ্টু মস্ত এক টিকি ঝুলাইয়া পৌরহিত্য করিয়া গেল। হুলোটা উপরের আল্‌সেতে বসিয়া মাঝে মাঝে "ম্যাও ম্যাও" করিতেছিল। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে তার দিকে কাহারও চোখ পড়ে

নাই, কেবল পড়িয়াছিল বোধ হয় সর্দ্দারের; কারণ সে এই বিবাহের পরিহাসে একটু বেশীই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাপ্য সে চুলচিরিয়া মাপিয়া লইয়াছিল কিন্তু।

* * * * *

দিন পাঁচ ছয় পরের কথা। বেলা মহোল্লাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিল—বাবা,দেখবে এস—কি মজা। শিগগীর—

মেয়ের অনেক খেলায় এ বুড়া বয়সেও উপযুক্ত সাথী হইতে পারিয়াছি হয়ত, কিন্তু এ আবার কি এক নূতন খেলার অবতারণা, তাহা ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিলাম না।

কয়লার ঘরে গিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছি ঠিক তাহাই। যেখানে কয়লা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহারই একপাশে, আড়ালে কুড়ুনি তিনটে বাচ্ছা প্রসব করিয়া তাহাদের গা চাটিতেছে। আর অদূরে বসিয়া হুলো তাহাই দেখিতেছে, বোধ হয় পাহারা দিতেছে। আজ কুড়ি হুলোকে ছাড়া কাহাকেও কাছে যাইতে দিল না, বেলাকেও না। সর্দ্দার আসিয়াছিল কি না কে জানে! তাই বেলা সোল্লাসে বীণাকে খবর দিতে ছুটিল। সর্দ্দারের একবার আসা প্রয়োজন নয় কি? সে তার ছেলেগুলাকে দেখিয়া যাক্!

…কিন্তু শুনিলাম, সর্দ্দার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়াই নাকি হুলোর দিকে একবার চাহিয়া 'গোঁ গোঁ' করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে—এদিক্ আর সে মাড়ায় নাই।

* * * * *

ভোরের দিকে ঘরের বাহিরে কুড়ির তীব্র চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম—বেলা ঘুমাইতেছিল। কয়লার ঘরেই একটা পিপেতে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। সেইখানেই সে ছানা লইয়া থাকিত, আর হুলো সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিত। কিন্তু হঠাৎ আজ বিড়ালটা এমন করিয়া আমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িতেছে কেন? তাড়াতাড়ি কয়লার ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বিশ্বাস করিবার নয়। তিনটা বাচ্ছার একটা পিপেতে, আর একটা মাটিতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; তৃতীয়টার উদ্দেশ মিলিল না।………বীভৎস ব্যাপার! বাচ্ছা দুটাকে কে যেন চিবাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহাদের মারিয়াছে কে? হুলো না সর্দ্দার? হুলো ত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার সাম্‌নে কাতর ভাবে চীৎকার করিতে লাগিল।

জোচ্চোর। নিজেরই ছেলেকে মারিয়া আবার দুঃখ জানান হইতেছে!…ভাবিলাম, লাথি মারিয়া বেটাকে 'কিমা' বানাইয়া ফেলি কিন্তু পা উঠিল না!

বেলা দেখিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির। নাতিগুলার উপর তাহার সত্যই মায়া বসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কুড়িও যখন মা হইয়াও একদিন সব শোক ভুলিয়া সর্দ্দারের সহিত আবার দ্বিগুণ প্রেমে মাতিয়া উঠিল তখন ঠাকুমারই বা শোক থাকিবে কেন?…

হুলো দূরে দূরে কেবল খোঁড়াইয়া চলে ও পাত চাটে। হয়ত অলক্ষ্যে কোথাও কুড়ি ও সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া তাহার তপ্ত নিশ্বাস পড়ে, সে খবর রাখিবার প্রয়োজন কাহারও হয় না। ছেলে-মেয়েরা তাহাকে হাসিয়া ডাকে—খোঁড়া হুলো। পা আর তার সারিল না।…

* * * * *

হঠাৎ একদিন শুনিলাম, খোঁড়া হুলোটা পুকুরধারের পাঁদাড়ে মরিয়া পড়িয়া আছে। কি হইয়াছিল কে জানে! তবে সে যে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল এ আমিও লক্ষ্য করিয়াছি অনেক দিন। গিয়া দেখি, ছেলে-মেয়েরা মরা হুলোটার চারিপাশে হৈ চৈ করিতেছে আর তাহারই শিয়রে বসিয়া কুড়ুনি মড়া-কান্না কাঁদিতেছে।

একটা ডোমকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, হুলোটাকে যেন সে আমারই বাগানের একধারে পুতিয়া রাখে।

কুড়ির দু তিন দিন হইল আবার বাচ্ছা হইয়াছিল। তাহাদেরই দেখিতে চলিলাম, তবে ভরসা আছে এবার বোধ হয় তাহাদের কেহ চিবাইয়া খাইবে না।

সর্দ্দার নিজেই আজকাল পাহারা দেয়।
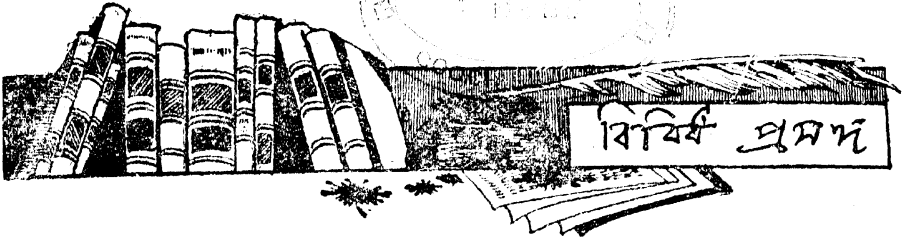
বৃহত্তম রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান

যার কোন দুঃখ নাই, এমন মানুষ থাকিতে পারে; থাকিলেও কিন্তু এমন কোন মানুষের কথা জানিনা। সাধারণতঃ যে সব মানুষ দেখি, যাদের কথা শুনি, যাহাদিগকে চিনি, তাদের সকলেরই কোন না কোন দুঃখ আছে। নিজের নিজের যাহা দুঃখ ও অভিযোগ, তাহা ছোট করিয়া দেখা যায়, বড় করিয়াও দেখা যায়। কেহ যদি নিজের দুঃখ অভিযোগ এবং তাহা নিবারণের চেষ্টা লইয়াই দিন কাটাইতে যায়, তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টাও এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট না হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক পরিবারের যাহা দুঃখ কষ্ট অভিযোগ, তাহা লইয়াই পরিবারের লোকেরা সমস্ত সময় উদ্বিগ্ন থাকিতে পারে। বৃহত্তর মানবসমষ্টি ধরিলে দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা গ্রাম্য ব্যাপার লইয়াই সব সময় ব্যস্ত ব্যাপৃতও থাকিতে পারে; সহরের, জেলার এবং দেশের লোকেরাও কেবল নিজের নিজের শহরের, জেলার বা দেশের দুঃখ অভিযোগ ও সমস্যা লইয়া সারাজীবন ব্যাপৃত থাকিতে পারে।

কিন্তু মানব জীবনের ও মানব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, যে, এক জনের ভাগ্য অন্য সকলের ভাগ্যের সহিত জড়িত। এই জন্য, কেহ যদি কেবল নিজের দুঃখ দূর করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না। কেবল এক একটি গ্রামের বা জেলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; সমস্ত দেশটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করা আবশ্যক হয়। এই পর্য্যন্ত সকলে একমত হইতে পারেন্। কিন্তু যদি বলা যায়, যে, স্বাজাতিক বা স্বদেশভক্ত কেবল নিজের দেশের হিতসাধনের বা স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় না, স্বার্থরক্ষাও হয় না, তাহা হইলে অনেকে তাহাতে সায় দিবেন না। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা ঐ সত্যের উপলব্ধির দিকেই তাহাকে অগ্রসর করিতেছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। কেহ যদি নিজের গ্রাম, শহর বা জেলা, বা ভারতবর্ষকে কোকেনের নেশা হইতে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাকে অন্তর্জাতিক করিতে হইবে, কেবল স্বদেশে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে, কাহারও নিজের, নিজ পরিবারের, গ্রামের, জেলার বা দেশের ভাবনা ভাবিবার দরকার নাই, সমগ্র জগতের ভাবনাই ভাবা উচিত ও আবশ্যক। আমাদের বক্তব্য এই যে, নিজের ভাবনা এবং ক্ষুদ্রতম ও ক্ষুদ্রতর মানবসমষ্টির ভাবনা আমাদের ভাবা উচিত, বৃহত্তর ও বৃহত্তম মানব সমষ্টির ভাবনাও আমাদের ভাবা উচিত। কোন্‌টিতে কত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, অপরের জন্য কেহ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না; প্রত্যেককে তাহা নিজের অবস্থা, প্রবৃত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে নিরূপণ করিতে হইবে। প্রত্যেকের নিজের দাবী এবং ক্ষুদ্রতম ও ক্ষুদ্রতর মানবসমষ্টির দাবীর সহিত বৃহত্তর ও বৃহত্তম মানবসমষ্টির দাবীর সামঞ্জস্য সাধন বড় কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন বলিয়া কোন কাজ ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। কঠিন কাজ করিতে চেষ্টা করা ও করিতে পারা পৌরুষের মনুষ্যত্বের একটি প্রমাণ।

সমগ্র মানব সমাজের হিত-সাধন চেষ্টা অনেক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা এক একটি দেশ বা রাষ্ট্র বা জাতিকে এক একটি সমষ্টি ধরিয়া তাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি দ্বারা মানব-সমাজের হিত করিতে

চাহিয়াছেন। অবশ্য মানুষেরা যদি প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশ মানিয়া চলিত, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যেমন হইত না, তেমনি দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধও হইত না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, যে, মানুষ নিজের দেশের মধ্যে যেরূপ কাজকে অবৈধ বলিয়া দণ্ডনীয় করিয়াছে, সেইরূপ কাজ অন্যদেশের প্রতি কেহ করিলে তাহা দণ্ডনীয় ত মনে করেই নাই, বরং স্থলবিশেষে সেই কাজের কর্ত্তাকে বীর পদবী দিয়াছে। খুন চুরি ডাকাতি দেশের মধ্যে কেহ করিলে তাহার শাস্তি হয় ও নিন্দা হয়। কিন্তু এক দেশের কতকগুলি লোক অন্যদেশ আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক লোককে খুন জখম করিয়া সেই দেশ দখল করিলে সেরূপ কাজের নিন্দা হয় না, তাহার জন্য শাস্তিও হয় না। বরং পুরস্কার হয়।

এইরূপ নানা ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া দীর্ঘকাল হইতে অনেক মনস্বী দেশে দেশে শান্তিরক্ষার জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন, এবং তাহার নিয়মাদি প্রণয়নও করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের হেগ শহরে অন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কনফারেন্স বসিবার আগে কার্য্যতঃ কিছু হয় নাই। ১৮৯৯ সালে তথায় স্থায়ী অন্তর্জাতিক সালিসীর আদালতও স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহার পরও বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; যেমন বুয়রে ব্রিটিশে যুদ্ধ, জাপানে রুশিয়ায় যুদ্ধ, তুরস্কের সঙ্গে কোন কোন বল্কান দেশের যুদ্ধ, ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ ইত্যাদি।

শেষোক্ত মহাযুদ্ধের পর আবার অন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য একটি মহাজাতি-মণ্ডল বা মহাজাতি সংঘ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই এখন পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার আফিস জেনীভায় স্থিত, বৈঠকও সেইখানে হয়।

আমি গত সেপ্টেম্বর মাসে ইহার অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য জেনীভা গিয়াছিলাম। ইহার ইংরেজী নাম লীগ অব নেশুন্স। এখনও কাহারও কাহারও আমার এই জেনীভা-যাত্রা বিষয়ে দুএকটি ভ্রান্তধারণা থাকায়, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাকে লিখিতে হইতেছে যে আমি গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হই নাই, লীগ কর্ত্তৃক **সাক্ষাৎভাবে** নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। লীগ গবর্ন্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাকে সাক্ষাৎভাবে নিমন্ত্রণ করায় গবর্ন্মেণ্ট সন্তুষ্ট হন নাই মনে করিবার কারণ আছে। ইহাও জানান দরকার, যে, আমার ইউরোপ যাতায়াতের ব্যয় এবং সেখানে থাকিবার ও বেড়াইবার সমস্ত ব্যয় আমি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছি। লীগ আমার জেনীভা যাতায়াতের ও তথায় থাকার ব্যয় দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা লই নাই।

ইহা গেল ব্যক্তিগত কথা। এখন লীগ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে চাই। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না। এখন কিছু বলি, পরে হয়ত আরও কিছু বলিব।

যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে জয়ী দেশের সদ্য সদ্য সাংসারিক সুবিধা হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু বিজিত দেশের ইহাতে সুবিধা হয় না, সমগ্র মানবজাতিরও কল্যাণ হয় না। সকল দেশ ও জাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন আবশ্যক। এই অন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন ও রক্ষা লীগের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে কিনা, দেখা দরকার। লীগের বয়স এখনও সাত বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং, কোন শিশু শৈশবেই কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কিছু করিতে পারিবে না বলা যেমন অযৌক্তিক, লীগের অতীত ইতিহাস হইতে তেমনি তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা অযৌক্তিক হইবে। তাহা হইলেও এ পর্য্যন্ত লীগ শান্তিরক্ষার জন্য কি করিয়াছে তাহা বিবেচ্য। এ বিষয়ে লীগের যে পুস্তিকাগুলি আছে, তাহাতে দেখিতেছি, সালিসী দ্বারা জাতিতে জাতিতে যে-সব বিবাদের নিষ্পত্তি লীগ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাহার সবগুলিই ইউরোপের জাতিদের মধ্যে বিবাদ। ইরাকের সীমানা লইয়া ইংরেজ ও তুর্কের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল এবং তাহা সালিসীর জন্য লীগের সমক্ষে স্থাপিত হয়, জানি। কিন্তু তুর্কদের উৎপত্তি ধরিলে যদিও তাহারা এশিয়ার মানুষ তথাপি তাহাদিগকে

কতকটা ইউরোপীয় বলিয়া ধরা অযৌক্তিক নহে। কারণ, তাহাদের রাজ্য ইউরোপেও আছে, এবং পোষাক ও অনেক চালচলন প্রায় ইউরোপীয় হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, তুর্কদিগকে সম্পূর্ণ এশিয়ার মানুষ বলিয়া ধরিলেও দেখা যাইতেছে, যে, এ পর্য্যন্ত লীগ কেবল এশিয়া-ঘটিত একটি বিবাদ নিষ্পত্তির ভার লইয়াছেন। আমরা অবশ্য এখানে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদের কথাই বলিতেছি। মোসালের তেলের খনি লইয়া ইংলণ্ডের সহিত যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা খাঁটি রাষ্ট্রনৈতিক ঝগড়া নহে, এবং তাহাতে লীগের মীমাংসা তুরস্কের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। অন্যদিকে লীগ ফ্রান্স ও সীরিয়ায়, এবং ফ্রান্স স্পেন এবং রিফদের যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য কিছু করেন নাই; ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগে কাণ দেন নাই।

লীগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কি উপকার হইতে পারে বা না পারে, তাহাই আমার প্রধান বক্তব্য। সাধারণ ভাবে উহার মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লীগ কি করিতে পারে বা না পারে, তাহা দেখা যাক্। যে সব দেশ লীগের সভ্য, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে বিবাদের কোন কারণ ঘটিলে বিনা যুদ্ধে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া শান্তিরক্ষা করা লীগের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নহে বলিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ইহার সহিত অন্য কোন দেশের বিবাদ ঘটিতে পারে না। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের অংশত মালিক আমরা বটে কিনা, যদি বা সে সম্বন্ধে কিছু তর্ক-বিতর্ক চলে, বিদেশের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যে মোটেই কর্ত্তা নই, তাহা নিঃসন্দেহ। অন্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের সন্ধিবিগ্রহের মালিক ব্রিটেন, ভারতবর্ষ নহে। বস্তুতঃ আমাদের সহিত অন্য কোন দেশের সন্ধিও নাই, যুদ্ধের অবস্থাও নাই; সন্ধি আছে ভারতের প্রভু ব্রিটেনের সঙ্গে, যুদ্ধ যদি হয় তাহাও ভারতের প্রভু ব্রিটেনের সঙ্গে—যদিও যুদ্ধ হইলে রক্ত ও টাকা দিতে হয় ভারতের লোকদিগকে।

অতএব দেখা গেল, লীগের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা, তাহা সিদ্ধির কোন উপলক্ষ্য ভারতবর্ষ লীগকে দিতে পারে না। ভারতবর্ষ-ঘটিত কোন বিবাদ কোন জাতির সঙ্গে হইলে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিবাদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইচ্ছা করিলে তাহা সালিসীর জন্য লীগের সমক্ষে স্থাপন করিতে পারে, ভারতবর্ষ পারে না। কারণ, পররাষ্ট্রবিষয়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অধিকারহীন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা আমাদের এই, যে, যাহাদের সহিত আমাদের শত্রুতা নাই, বরং বন্ধুত্বই আছে, ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের সহিত ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করিতে হইতে পারে—যেমন চীনের সহিত। কিন্তু তাহা হইলেও লীগ ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে না।

অতএব আবার বলিতে হইতেছে, লীগের প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হইবার বিন্দু-মাত্রও সম্ভাবনা নাই।

লীগের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির কারণ হইতে পারে কি না, বিবেচ্য। পারে না, বলা ভিন্ন উপায় নাই। লীগের একটি নিয়ম এই, যে, ইহা কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়া বা না পাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ইহাতে লীগ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

ভারতীয়েরা আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, ফিজি, প্রভৃতিতে অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত। তাহা লাভের জন্য তাহারা লীগের কোন সাহায্য পাইতে পারে না। কারণ, তাহাদিগকে কোন অধিকার দেওয়া বা না দেওয়া ঐসব দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার লীগের নাই। তা ছাড়া, আমেরিকা লীগের সভ্য নহে; সুতরাং এ বিষয়ে লীগের কোন অধিকার থাকিলেও লীগ আমেরিকায় আমাদের জন্য কিছু করিতে পারিত না।

—

লীগ এবং অনিউরোপীয় জাতিসমূহ

লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভালই হউক বা মন্দই হউক, কার্য্যতঃ ইহা যে পরাধীন অনিউরোপীয় দেশ সকলের দাসত্ব স্থায়ী করিতে বাধ্য, ইহাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা

ভয়াবহ রূপ। ইউরোপীয় কথাটি আমি শুধু ইউরোপের অধিবাসী অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; অন্যান্য মহাদেশের যে সব ইউরোপীয় বংশের অমিশ্র বা সঙ্কর জাতির মাতৃভাষা ইউরোপীয়, তাহাদিগকেও ঐ আখ্যা দিতেছি। পৃথিবীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা রক্ষা করিতে লীগের সভ্যগণ তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তিপত্রের দশম ধারা অনুসারে বাধ্য। তাহাতে লেখা আছে, যে, লীগের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের এলাকায় পৃথিবীর যত ও যে যে অংশ আছে, তাহা অখণ্ড অবস্থায় রাখিবার ভার লীগের সভ্যেরা লইতেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের পক্ষে ইহার মানে কি, তাহা সহজবোধ্য। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামক রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে লীগ বাধ্য। ভারতবর্ষ স্বয়ং নিজেকে কিম্বা অন্য কোন জাতি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাহিলে লীগের অপর সমুদয় সভ্যেরা তাহাতে বাধা দিবেন; বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত বাধা দিবেই।

পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা রক্ষা করার মানে কি, তাহা একটু তলাইয়া বুঝা ভাল। পৃথিবীর প্রধান ভূখণ্ডগুলির আয়তন নীচে বর্গ মাইলে দেওয়া যাইতেছে।

মহাদেশ।	বর্গমাইলে আয়তন।
এশিয়া	১,৬৩,৭০,০০০
আফ্রিকা	১,১০,৯০,০০০
উত্তরআমেরিকা	৭৬,২০,০০০
দক্ষিণআমেরিকা	৬৮,৬০,০০০
ইউরোপ	৩৬,৭০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৩০,১০,০০০

দেখা যাইতেছে, যে, সকলের চেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়া ও আফ্রিকা। এশিয়ার প্রকৃত স্বাধীন দেশ এক মাত্র জাপান (২,৩৬,০০০ বর্গমাইল)। চীন (৪৩,০০,০০০ বর্গমাইল) স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও কার্য্যতঃ স্বাধীন হইতে পারে নাই। পারস্য, আফগানিস্থান, শ্যাম ও নেপাল অপরের অনুগ্রহে স্বাধীন (যথাক্রমে ৬,৩০,০০০; ২,৪৬,০০০; ২,০০,০০০; এবং ৫৪,০০০ বর্গমাইল)। যাহা হউক, এই সব দেশকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন মনে করিলেও, এশিয়ার অধিকাংশ যে ইউরোপের অধীন, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। এই পরাধীন অংশের একা ভারতবর্ষেই পৃথিবীর একপঞ্চমাংশ লোক বাস করে। লীগের চুক্তিপত্র অনুসারে এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জাতিকে পরাধীন থাকিতে হইবে।

তাহার পর আফ্রিকার কথা। ইহার কেবল আবিসীনিয়া (৩,৫০,০০০ বর্গমাইল) স্বাধীন; তাহারও ভিতর রেল চালাইয়া তাহাকে কার্য্যতঃ অধীন করিবার চেষ্টা ইটালী ও ব্রিটেন করিতেছে। মিশর (৩,৬৩,১৮১ বর্গমাইল) অর্দ্ধ স্বাধীন। লাইবীরিয়া (৪০,০০০ বর্গমাইল) নামক একটি ছোট টুকরায় পরানুগ্রহে স্বাধীন কতকগুলি নিগ্রো বাস করে। বাকী সমুদয় আফ্রিকা ইউরোপীয়েরা গ্রাস করিয়াছে। মরক্কোকে রিফ্‌দের নেতা আব্দুল করিম স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্পেন ও ফ্রান্স সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে;—লীগ বরাবর সাক্ষীগোপাল ছিল।

সমস্ত উত্তর আমেরিকা ইউরোপীয়দের হস্তগত হইয়াছে। ইহার আদিম নিবাসী তাম্রবর্ণ আমেরিকান্ নানাজাতির মধ্যে প্রবল সংখ্যাবহুল ও কতকটা সভ্য বহুজাতি ছিল। অনেকগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাকী অল্পসংখ্যক লোক কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে।

দক্ষিণ আমেরিকাও ইউরোপীয় স্পেনিশ ভাষাভাষী নানা অমিশ্র ও সঙ্কর লোকদের হস্তগত হইয়া আছে। এখানেও কোন অমিশ্র আদিম আমেরিকান্ জাতি স্বতন্ত্র একটি দেশে স্বাধীন ভাবে বাস করে না।

ইউরোপের একটা বড় অংশ আগে তুর্কদের অধীন ছিল। এখন ইউরোপীয় তুরস্ক সামান্য ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সমুদয় ইউরোপকে এখন স্বাধীন শ্বেত জাতিদের দেশ বলা যাইতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার সমস্তটি ইংরেজদের হস্তগত। এখানে আদিম মেওরি প্রভৃতি জাতির লোক অল্পসংখ্যক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন রাজ্য নাই; তাহারা ইংরেজদের প্রজা।

দেখা গেল, যে, পৃথিবীর খুব বেশী অংশ ইউরোপীয়দের অধীন। ইউরোপীয়রাই একমাত্র সভ্য জাতি নহে,

ইউরোপীয় সভ্যতাও একমাত্র সভ্যতা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলেও, তাহারা তাহাদের চেয়ে কম সভ্য বা অসভ্য লোকদিগকে স্বাধীনতায় ও স্বদেশরূপ সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবে, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা নহে, বিধির বিধানও নহে। কিন্তু, দেখা যাইতেছে, লীগ পৃথিবীর বর্ত্তমান ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যায় ভাগবাঁটোয়ারাটি কায়েম রাখিতে বাধ্য। লীগে ইংরেজদের প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী। তাহাদের নিজের দেশ গ্রেট ব্রিটেনের আয়তন ৮৮,৬০৩ বর্গ মাইল মাত্র। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর মোট স্থলভাগ ৫,৫৫,০০,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে ১,৪২,২০,০০০ বর্গমাইল, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের বেশী জুড়িয়া বসিয়া আছে। লীগে ইংরেজদের নীচেই ফরাসীদের প্রভাব বেশী। তাহাদের নিজের দেশের আয়তন ২,১৩,০০০ বর্গমাইল, কিন্তু তাহারা পৃথিবীর স্থলভাগের ৪৩,৩৭,০০০ বর্গমাইলের মালিক। অন্যান্য পরস্বাপহারক যে-সকল জাতি লীগের সভ্য, তাহাদের প্রত্যেকের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। মোট কথা এই, যে, এইরূপ জাতিরা যে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভ্য, তাহার নিকট হইতে পৃথিবীর পরাধীন জাতিরা স্বাধীন হইবার চেষ্টায় কোন সাহায্য বা সহানুভূতি আশা করিতে পারে না।

বর্ত্তমান সভ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সাতান্নটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল সাতটি ইউরোপীয় নহে; যথা—আবিসীনিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, জাপান, লাইবীরিয়া, পারস্য ও শ্যাম। তার মধ্যে ভারত পরাধীন বলিয়া তাহাকে বাদ দেওয়া উচিত। বাকী ছয়টি দেশ যদি একমত হয়, যাহার সম্ভাবনা কম, এবং যদি অপর পঞ্চাশটি দেশের মধ্যে ২।৪টা দেশ ইহাদের সঙ্গে যোগ দেয়, যাহারও সম্ভাবনা কম, তাহা হইলেও অনিউরোপীয় দেশগুলির বাঞ্ছিত কোন ব্যবস্থা ইউরোপীয় দলের অমতে লীগ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কতকগুলি স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন দেশ এখনও লীগের সভ্য হয় নাই; যথা—আফগানিস্থান, নেপাল, আরবদেশের কোন রাজ্য, তুরস্ক, মেক্সিকো, রুশিয়া এবং আমেরিকার ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌স্। ইহারা যদি সবাই লীগের সভ্য হয়, তাহা হইলে মোট সভ্যসংখ্যা চৌষট্টির মধ্যে এগারটি অনিউরোপীয় হইবে। সুতরাং সে অবস্থাতেও ইউরোপীয় দলের মত প্রবল থাকিবে, এবং লীগে ইউরোপীয় প্রভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ও অনতিক্রম্য থাকিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, যে, ভারতবর্ষ লীগ হইতে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে কোন উপকার না পাইলেও, অন্যান্য বিষয়ে উপকৃত হইতে পারিবে। যদি সেরূপ কোন উপকার পায়, তাহা ভিক্ষুকের মত অনুগ্রহস্বরূপ পাইবে। কেননা, ভারতবর্ষের কোন দুঃখদৈন্য অভাব মোচনের জন্য তাহার মালিক ব্রিটেন যদি লীগের সাহায্য চায়, তবে ভারতবর্ষ হয় ত উপকৃত হইতে পারে, নতুবা নহে। কিন্তু সে-স্থলেও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, নিজে নিজের হিত করিবার শক্তির অধিকারী থাকা, এবং অপরের অনুগ্রহে নিজের কোন হিত সাধিত হওয়া, উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। ভিক্ষুকের মত উপকৃত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা প্রকৃত উপকারও নহে; কারণ ইহাতে মনুষ্যত্বহানি ঘটে। কিন্তু সে-ভাবেও যে ভারতবর্ষ লীগের সব বিভাগ দ্বারা উপকৃত হইতেছে না, তাহা দেখাইতে পারা যায়।

লীগের একটি বিভাগ পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতির কাজ করিবার জন্য স্থাপিত। আমি "ওয়েল্‌ফেয়ারে" একটি দীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধে লীগের পুস্তিকা ও রিপোর্ট আদি হইতে তথ্য সংকলন করিয়া দেখাইয়াছি, যে, ভারতবর্ষ ইহা হইতে কোন উপকার পায় নাই; অথচ রুশিয়া তুরস্ক এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্ লীগের সভ্য না হইয়াও উপকার পাইয়াছে। এই প্রবন্ধটিতে যে-সব তথ্য সংকলিত আছে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ সংবাদপত্রপাঠকের তাহা না জানাই সম্ভব। এইজন্য আমি উহা স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিয়া দেশী প্রধান প্রধান ইংরেজী ও বাংলা কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু খুব কম কাগজেই উহার পুনর্মুদ্রণ বা সারসঙ্কলন হইয়াছে।

লীগের অন্যান্য বিভাগ হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে বা না হইয়াছে, তাহারও আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিস্তারিত কিছু এখন বলিবার স্থান ও

সময় নাই। মোট সিদ্ধান্ত যাহা দাঁড়াইবে, তাহা বলা যাইতে পারে। লীগের সহিত সংশ্রব হেতু ভারতবর্ষে যে সুফল হইয়াছে বলিয়া লীগ দাবী করেন, দেখান যাইতে পারে, যে, আমাদের দেশ, লীগের সভ্য না হইলেও সেই সুফল ফলিতে পারিত।

—

লীগ ও নেপালে দাসত্বের উচ্ছেদ

হাস্যকর মিথ্যা দাবীও লীগের তরফ হইতে করা হয়। ভারত গবন্মেণ্টের অন্যতম প্রতিনিধি স্যার্ উইলিয়ম্ ভিন্সেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসে জেনীভায় বলেন, যে, লীগের প্রভাবে নেপালে দাসত্বপ্রথার লোপ হইয়াছে। নেপাল লীগের সভ্য নহে। সুতরাং তাহার উপর লীগের কোন রকম সাক্ষাৎ প্রভাব নাই। পরোক্ষ প্রভাবে যদি কোন সুফল হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বৎসরে ৫৭ লক্ষ টাকা লীগে না দিয়া নিজেকে এই পরোক্ষ প্রভাবের অধীন করাই ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু নেপালে দাসত্বপ্রথার বিলোপ লীগের পরোক্ষ প্রভাবেও হয় নাই। মডার্ণ রিভিউ কাগজে একজন লেখক নেপাল হইতে চিঠি লিখিয়া দেখাইয়াছেন, যে, দাসত্ব লোপের চেষ্টা লীগের জন্মের দশবার বৎসর আগে হইতে নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা চন্দ্র শম্‌শের্ জঙ্গ্ করিতেছিলেন।

—

লীগে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিপ্রেরণ

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে কি আমরা এই পরামর্শ দি, যে, ভারতবর্ষ লীগের সভ্য না থাকাই ভাল? উত্তরে বক্তব্য এই যে, সভ্য থাকিবার বা না-থাকিবার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের নাই। কর্ত্তা ব্রিটেনের যেরূপ ইচ্ছা কর্ম্ম সেইরূপ হইবে। কিন্তু এবিষয়ে যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা তাহাকে লীগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পরামর্শ দিতাম না। কারণ, লীগের সহিত সংশ্রবে সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষের কোন লাভ না হইলেও অন্য রকম লাভ হইতে পারে। তাহা কি এবং কি প্রকারে হইতে পারে বলিতেছি।

আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজের অধীন থাকায় এক দেশের সহিত অন্যদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কি রকমে চলে, চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি কি প্রকারে হয়, কেনই বা ভাঙে, স্বদেশের স্বার্থরক্ষা কেমন করিয়া করিতে হয়, এবম্বিধ নানা অন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। লীগের সহিত সংস্রবে কতকগুলি লোক বিদেশে গেলে এই অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশের রাজনীতিবিদ্ লোকদের সঙ্গে মিশিয়া অন্য নানা রূপ অভিজ্ঞতাও কিছু হইতে পারে। তা ছাড়া, আমাদের দেশ হইতে যদি আমরা উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিদেশের লোকদের ধারণা ভাল হইতে পারে। জগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন কম লাভ নহে। কিন্তু যদি এখনকার মত বরাবরই গবর্ন্মেণ্ট কয়েকজন লোককে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া জেনীভায় পাঠান, তাহাদের নির্ব্বাচনে আমাদের কোন হাত না থাকে এবং তাহাদের শিরোমণি হন একজন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, তাহা হইলে ঐ তথাকথিত ভারতপ্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কি কাজে লাগিতে পারে? ইংরেজ আমাদের প্রতিনিধি হইয়া বিদেশে গেলে তাহাই ত আমাদের প্রতি বিদেশীদের অশ্রদ্ধার একটি প্রবল কারণ হয়—তাহা হইতে লোকে সিদ্ধান্ত করে, যে, ভারতীয়দের মধ্যে যোগ্য লোক না থাকায় ইংরেজকে তাহাদের প্রতিনিধি হইতে হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট যে-সব ভারতীয় লোক পাঠান, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সমকক্ষ না হওয়ায় নানা কথা উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি আখ্যান বলিতেছি।

একজন তথাকথিত ভারতীয় প্রতিনিধি জেনীভার কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি চাণক্যের সেই শ্লোক জানিতেন না যাহাতে আছে, এক-জাতীয় মানুষ ততক্ষণই শোভা পায়, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে—যতক্ষণ কোন কথা না বলে। এই প্রতিনিধি এমন কিছু ঐ প্রতিষ্ঠানে বলিয়া থাকিবেন যাহার জন্য তথাকার কোন ব্যক্তি একজন ভারতীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনারা এরূপ লোককে কেন প্রতিনিধি

পাঠান?" তাহাতে ভারতীয় ব্যক্তি উত্তর দেন, "এরূপ লোক পাঠাইবার জন্য ভারতগবর্মেণ্ট্ দায়ী, আমরা দায়ী নহি।"

দ্বিতীয় আখ্যানটি সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে। জেনীভায় একটি ভোজের আগে এক 'ভারত-প্রতিনিধি'র সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সুইজারল্যাণ্ডের কোন্ কোন্ জায়গা দেখিয়াছেন।" আমি অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলাম, "রম্যাঁ রলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভিল্‌নভ্ গিয়াছিলাম"। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "রম্যাঁ রলাঁ কে?" আমি যাহা জানি বলিলাম। পরে ভাবিলাম, এমন কিছু বলি যাহাতে প্রতিনিধি মহাশয় রম্যাঁ রলাঁর সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝিতে পারেন। সেইজন্য বলিলাম, "তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটি বহি লিখিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অনেক মন্তব্য আছে, এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে।" তখন আমাদের 'প্রতিনিধি' মহাশয় বলিলেন, "এই বহি ও তাহার অনুবাদের কথা আপনি কি জেনীভায় আসিয়া শুনিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "না, ইহা অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে, মূল ফরাসীর অনেক সংস্করণ হইয়াছে, ভারতীয় ইংরেজী অনুবাদেরও অনেক সংস্করণ হইয়াছে।" এই প্রতিনিধিটি রোজকার রাজনৈতিক খবর হয়ত সবই রাখেন, কিন্তু জাগতিক অন্যান্য বিষয়ের খবর দেখিলাম তিনি কমই জানেন। প্রতিনিধি হইয়া এরকম লোকের বিদেশে না যাওয়া ভাল।

বিদেশের নামজাদা লোকদের সঙ্গে মিশিলে আর একটা লাভ হয়—বুঝিতে পারা যায়, যে, তাহারা অনেকেই ভারতীয়দেরই মত মানুষ, অতিমানব নহে; সুতরাং ভারতবর্ষের সব কাজ ভারতীয়দের দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব ত নহেই, দুঃসাধ্যও নহে। কিন্তু উপযুক্ত লোক প্রতিনিধি হইয়া না গেলে এরূপ ধারণা হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং অন্য যে-সব লাভের কথা বলিয়াছি, তাহারও সম্ভাবনা নাই—কেবল বার্ষিক অর্দ্ধকোটির উপর টাকা জলে ফেলা হয়।

—

রাজবন্দীদের কথা

১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশ্যন অনুসারে কিম্বা বাংলার অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে শতাধিক বাঙালীকে গবর্ণমেণ্ট্ বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে হয় মুক্তি দেওয়া হউক, কিম্বা প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার হউক, সর্ব্বসাধারণের এই দাবী খবরের কাগজে, সার্ব্বজনিক সভায় ও কৌন্সিলে বার বার করা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আদালতে রাজনৈতিক আসামীদের বিচার করিলে খুন হইবার ভয়ে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবে না, গবর্ণমেণ্টের এই অজুহাত যে মিথ্যা, তাহা বারবার প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক কয়েকটি মোকদ্দমা ধরুন। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মোকদ্দমায়, আলিপুর জেলে পুলিস হত্যার মোকদ্দমায় এবং সেদিনকার স্থকিয়াস্ ষ্ট্রীটের বোমার মোকদ্দমায় আসামীদের দণ্ড হইয়াছে, কোন সাক্ষী খুন হয় নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট্ যে বন্দীদিগকে বিচারার্থ প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতেছেন না, তাহার প্রকৃত কারণ প্রমাণের অভাব। সেদিন শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, যে, লর্ড লিটন্ একটা প্রাইভেট কন্‌ফারেন্সে বলিয়াছেন যে, এই বন্দীরা কোন অপরাধ করে নাই, তাহারা যাহাতে অপরাধ করিতে না পারে সেইজন্য তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাই যদি বন্দী করিবার একমাত্র ও প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে ইহাকে অবিমিশ্র জুলুম ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে?

বড়লাট কৌন্সিল গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার আগে গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস জন্মান চাই, যে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রশমন ও দমন এতটা হইয়াছে যে, মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা করিলেও ইহাকে বিপজ্জনক আকারে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবে না, কিম্বা ষড়যন্ত্রের বন্দোবস্ত বিদ্যমান থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের পূর্ব্বতন বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ আবার আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের স্বাধীনতার ব্যবহার করিবে না। এখানে লাট সাহেব ধরিয়া লইতেছেন, যে, বন্দীরা আগে ষড়যন্ত্রাদি বিপজ্জনক

কাজ করিত, এবং এখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা আবার সেইরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাঁহাদের অন্ততঃ কেহ কেহ মুক্তি পাইতে পারেন, যদি তাঁহারা লিখিয়া দেন, যে, এরূপ কাজ আর করিবেন না। যাহা হউক, গবর্মেণ্ট যে অন্ততঃ কতকগুলি রাজবন্দীর কথার উপর এতটা নির্ভর করিতে প্রস্তুত, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, গবর্ন্মেণ্টেরও মতে এমন কতকগুলি লোককে বন্দী করা হইয়াছে, যাহারা সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী।

বড়লাট সাহেব যে ষড়যন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রশমিত ও দমিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন, সে-অবস্থা ঘটিয়াছে কি না কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? যতবার ব্যবস্থাপক সভায় বা অন্যত্র রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীর কথা উঠে, প্রায়ই তাহার পূর্ব্বে ষড়যন্ত্রকারী ও বোমা আদি আবিষ্কৃত হয়। ইহা আকস্মিক হইতে পারে, অন্য কারণেও ঘটিতে পারে;—কেমন করিয়া ও কেন ঘটে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বন্দীরা মুক্ত হইলে যে আবার ষড়যন্ত্র করিবেন না, সেরূপ অঙ্গীকার তাঁহারা করিলে গবর্ন্মেণ্ট তাহা হয়ত সকলের বেলায় মানিয়া লইবেন না। কিন্তু যাঁহাদের অঙ্গীকার মানিয়া লইবেন, তাঁহাদেরও সেরূপ অঙ্গীকার করিবার বাধা আছে। এরূপ অঙ্গীকারের অর্থ দেশের লোকে বরাবর এই বুঝিয়া আসিয়াছে,যে,অমুককে স্বীকার করিতে হইবে, যে, তিনি অতীতকালে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে করিবেন না। গবর্ন্মেণ্টের যাহা প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করিবার ক্ষমতা নাই, এই-প্রকার স্বীকারোক্তি দ্বারা সেই অপরাধ আপনা হইতে কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তি মানিয়া লইতে পারে না। বস্তুতঃ, যন্ত্রণা দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবার যে বে-আইনী রীতি এখনও চলিত আছে বলিয়া সন্দেহ হয়, ইহাকে তাহারই প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে। কারণ, এইরূপ স্বীকারোক্তি যদি গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার মানে কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। বন্দীদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, মস্তিষ্কবিকৃতি অন্ততঃ [illegible] মারাত্মক রোগ কাহারও কাহারও হইয়াছে বা হইয়াছিল। বন্দীদশায় বা তাহার ফলে মৃত্যুও যে কাহারও হয় নাই, তাহা নহে। প্রায়োপবেশন অনেককে করিতে হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মানসিক কষ্ট, পরিবারবর্গের কষ্ট, এসব ত আছেই। এখন কার্য্যতঃ বন্দীদিগকে বলা হইতেছে, যে, তোমরা যদি এইসব দুঃখ-কষ্ট হইতে অব্যাহতি চাও, তাহা হইলে অপরাধ স্বীকার কর; নতুবা অন্ততঃ কয়েক প্রকার কষ্ট চলিতেই থাকিবে। কেহ স্বীকারোক্তির সর্ত্তের এই ব্যাখ্যা অন্যায় ব্যাখ্যা বলিতে পারিবেন না। যদি ইহা অন্যায় ব্যাখ্যা না হয়, তাহা হইলে অপকৃষ্ট রকমের পুলিস কর্ম্মচারীদের যন্ত্রণা দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবার যে-অভ্যাস আছে বলিয়া লোকের ধারণা, তাহার সহিত এই স্বীকারোক্তির দাবীর প্রকৃতিগত প্রভেদ কি আছে?

কিন্তু যেদিন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদান বা প্রকাশ্য আদালতে বিচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেদিন স্যার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান বলেন, যে, রাজবন্দীদিগকে যে-অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহার মধ্যে যে অতীত অপরাধ স্বীকার থাকিবেই, এমন কোন কথা নাই। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান, যে, কোন রাজবন্দী ইচ্ছা করিলে নিজের অতীত সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কেবল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে পারেন, "আমি রাজদ্রোহসূচক ষড়যন্ত্রাদি কোন অপরাধ করিব না।" বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বন্দীদের নিকট হইতে যে আকারের ও অর্থের অঙ্গীকার পাইতে চান বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, মাডিম্যান সাহেবের কথিত অঙ্গীকার তাহা হইতে কিছু পৃথক্ ও কিছু ভাল বটে। কিন্তু নিরপরাধ লোকের এরূপ অঙ্গীকার করিতেও আপত্তি হইতে পারে। মনে করুন, কোন সচ্চরিত্র নির্দ্দোষ ভদ্র-লোককে সরকারী হুকুমে গ্রেপ্তার করা হইল এবং বলা হইল, "তুমি বল চুরি করিবে না, জখম করিবে না, কনষ্টেবল খুন করিবে না, কিম্বা লাটসাহেবের গায়ে বোমা ছুঁড়িবে না, অথবা তুবড়ীর দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম উড়াইয়া দিবে না, তবেই তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া

হইবে না।" ভদ্রলোকটি মনে করিতে পারেন, "এমন কর্ম্ম যে আমি করিতে পারি, ইহা মনে করায় আমার চরিত্রের অথবা আমার বুদ্ধির অপমান করা হয়; অতএব আমি এমন অঙ্গীকার করিব না।" বাস্তবিক মাডিম্যান সাহেব যেরূপ অঙ্গীকার চাহিয়াছেন, তাহার ইংরেজী নাম adding insult to injury—অনিষ্টের উপর অপমান।

গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে,পণ্ডিত মোতীলালের প্রস্তাব সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। বিবেচনা কত কাল ধরিয়া করা হইবে, এবং তাহার ফল কি হইবে, জানি না। এদিকে কিন্তু, বিনা বিচারে বন্দীকৃত লোকদের যে অনিষ্ট হইতেছে, প্রমাণিত অপরাধে বন্দীকৃত লোকদেরও সেরূপ অনিষ্ট জেলআইন অনুসারে হইবার কথা নয়। খুব গুরুতর অপরাধে বন্দীকৃত লোকদেরও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জেলের কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী। কিন্তু রাজবন্দীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার হইতেছে, যেন তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য কেহই দায়ী নহে; অথচ তাহাদিগকে কেবল আটক করিয়া রাখিবার কথা, কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিবার কথা নয়। অবশ্য, সর্‌কার যাহাদিগকে শত্রু মনে করেন, এমন কতকগুলি লোককে স্বল্পায়ু করিবার জন্য সর্‌কারী কোন কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীসমষ্টি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বাস্থ্যহানিকর অবস্থায় রাখিতেছেন, এরূপ সন্দেহের প্রমাণ কেহ দিতে পারিবে না; সুতরাং এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করাও যুক্তিসঙ্গত ও সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। কিন্তু ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, সর্‌কারী কোন লোক বা লোকদের ঐরূপ দুরভিসন্ধি যদি থাকিত, তাহা হইলে সে-অবস্থায় রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান ব্যবহারের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। গবর্ন্মেণ্টের উপর যখন আমাদের কোন হাত নাই, তখন সর্‌কারী কর্ম্মচারীদিগকে কোন নীতিকথা শুনাইতে চাই না।

—

সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্ব্বাচন

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে দিতেছেন না। সর্‌কার পক্ষ এই উপলক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। সর্‌কার পক্ষ ও নির্ব্বাচকগণের কথা কাটাকাটি কতকটা এইরূপঃ—

সর্‌কার। তোমরা ত জানিতে আমরা সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রকে ব্যবস্থাপক সভায় আসিবার স্বাধীনতা দিব না; সুতরাং তাঁহাকে নির্ব্বাচন করায় তোমাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

নির্ব্বাচক। হুজুর জানিতেন, যে, সত্যেন্দ্র-বাবুকে ব্যবস্থাপকের কাজ করিতে দিবেন না। তাহা হইলে এমন নিয়ম কেন রাখিয়াছেন, যাহার বলে নির্ব্বাচন-প্রার্থী বলিয়া তাঁহার নাম মুদ্রিত হইয়াছে এবং তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন? ইহাতে আপনাদের বুদ্ধিমত্তা খুবই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

—

হিন্দুর পূজা ও মুসলমানের ধর্ম্মজ্ঞান

বাংলাদেশের রাজারা এক সময়ে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মুসলমান মাত্রেই অবশ্য কোন কালে বঙ্গের রাজা ছিলেন না, বর্ত্তমান অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরাও কখন বঙ্গবিজেতা ছিলেন না। কিন্তু এক সময়ে বঙ্গের রাজারা ছিলেন মুসলমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা হয় হিন্দুদের দেবদেবী পূজায় বাধা দিয়াছিলেন, কিম্বা দেন নাই। ঐতিহাসিক সত্য যে কি তাহার আলোচনা আমরা এখন করিব না। যদি মুসলমান রাজারা হিন্দুদের দেবদেবী পূজায় বাধা দিয়া থাকেন, মূর্ত্তিভঙ্গাদি করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে,যে, তাঁহাদের সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। কেন না,হিন্দুদের দেবদেবী পূজা এখনও আছে। সুতরাং রাজশক্তিবিশিষ্ট মুসলমান যাহা করিতে পারেন নাই, পরাধীন মুসলমানেরা তাহা পারিবেন, এরূপ মনে করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। অতএব, হিন্দুদের দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গা, প্রতিমা বিসর্জ্জনে বাধা দেওয়া যাহাদের পরামর্শে ও প্ররোচনায় হইতেছে, তাহারা অজ্ঞ, এবং তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া চলায় মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে বৃথা

অসন্তুষ্ট করিতেছেন। প্রতিবেশীকে বিরূপ করায় কোন লাভ নাই।

আর যদি মুসলমান রাজারা হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই উদারতার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালের মুসলমানদের অনুসরণ করা উচিত।

হিন্দুরা যে নিজেদের ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা মুসলমানদিগকে, তাঁহাদের ধর্ম্মকে, বা তাঁহাদের ঈশ্বরকে অপমান করিবার জন্য বা ত্যক্ত করিবার জন্য নহে। বিশ্বপতি সকলেরই ঈশ্বর। নানা জনে তাঁহার পূজা নানা প্রকারে করিয়া থাকে। তাহাতে কাহারও অপমান হয় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের অপমান কিছুতে হয়, কল্পনা করাই ভুল। তিনি ঠুন্‌কো নন্‌, ছিঁচকাঁদুনেও নন; তাঁহার কেহ কিছু করিতে পারে না।

শুনিতে পাই, পৌত্তলিকতা মুসলমানদের অসহ্য বলিয়া তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান যে, তাজিয়া করেন, কবর পূজা করেন, তাহাও পৌত্তলিকতা। এমন-কি মক্কাশরীফে হাজীরা যে-যে অনুষ্ঠান করেন, তাহার সবগুলি খাঁটি-একেশ্বরবাদসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, যদি অধিকাংশ মুসলমান খাঁটি একেশ্বর-বাদী ও নিরাকারের পূজক হইতেন, তাহা হইলেও বলপূর্ব্বক মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদের চেষ্টা করা তাঁহাদের উচিত হইত না। তাহার কারণ বলিতেছি। প্রথমতঃ, এরূপ চেষ্টা উদার পরমতসহিষ্ণুতার বিপরীত এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, যে, এরূপ চেষ্টা সফল হয় না। তৃতীয়তঃ, বিদ্বান্‌ মুসলমানরা প্রায়ই বলেন, ইস্‌লাম অনুসারে ধর্ম্মবিষয়ে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ, এবং ইস্‌লাম মানে শান্তি। আচরণ দ্বারা মুসলমানদের দেখান উচিত, যে, ইস্‌লামের এই মত ও এই অর্থ সত্য।

স্বীকার করি, মুসলমানদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে, তাঁহারা অধিক যুযুৎসু। কিন্তু ত্যক্ত করিয়া হিন্দুদিগকেও যুযুৎসু করিয়া তুলিলে তাঁহাদের কোন লাভ হইবে কি? হিন্দু বিলুপ্ত হইবেন না, ইহা নিশ্চিত। মুসলমানেরা কি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী অপেক্ষা যুযুৎসু প্রতিবেশী বেশী ভালবাসেন? উত্তর দিবার আগে তাঁহারা যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েন, তাহা হইলে ঠিক্‌ উত্তর দিতে পারিবেন।

ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া হিন্দুমুসলমানে সংঘর্ষ সম্প্রতি বঙ্গের নানা স্থানে যাহা হইয়াছে, তাহা সরস্বতী পূজা ও প্রতিমা-বিসর্জ্জন লইয়া। হিন্দু ছাত্রদের, হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত ও হিন্দু দ্বারা পরিচালিত স্কুল কলেজ সমূহে সরস্বতী পূজা করিবার অধিকার আছে। অবশ্য সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে, অন্য কোন সম্প্রদায় আপত্তি করিলে, হিন্দুদের কোন পূজা না করাই ভাল। কিন্তু যদি এরূপ কোন স্কুল কলেজে মুসলমানদের জন্য নমাজের জায়গা ও বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে সেইসকল শিক্ষালয়ে হিন্দুদের পূজায় আপত্তি করিবার অধিকার মুসলমানদের নাই। হিন্দুরা ত তথায় মুসলমানদের নমাজে কখন আপত্তি করেন নাই। যে-সব শিক্ষালয় বা ছাত্রাবাস, সরকারী হইলেও, কেবল হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত, যেমন সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু স্কুল, ইডেন হিন্দু হষ্টেল, সেখানে হিন্দু ছাত্রদের স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে।

—

ডাক্তার স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসু

স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসুর সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার মাড়োয়ারীদের উপর তাঁহার খুব প্রভাব ছিল, এবং তাঁহাদের দ্বারা তিনি অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৪ সালে ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং অন্যতম প্লেগ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটীর তিনি সভ্য ছিলেন। তিনি এন্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটী ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাড়োয়ারী হাসপাতাল, পশুচিকিৎসা কলেজ, পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠরোগীকে

আশ্রম, প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অংশতঃ তাঁহার প্রভাব ও পরিশ্রমে স্থাপিত হয়।

—

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রে যে-সব ছবি বাহির হইত, তাহার ব্লকগুলি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত। এখন কিন্তু যে-সকল সচিত্র মাসিক পত্র আমাদের দেশে ছাপা হয়, তাহার সমুদয় ছবি এদেশেই প্রস্তুত হয়। এইরূপ, বহু বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ভূগোল শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত ছোট বড় মানচিত্র প্রস্তুত হইত না। কলিকাতার সার্ভেয়ার জেনারেলের আফিস কখন্ স্থাপিত হয় ও তথায় কখন্ মানচিত্র প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, জানি না। কিন্তু বাংলা দেশে মানচিত্র প্রস্তুত করিবার বেসরকারী আয়োজন প্রথম করেন পরলোকগত ভৌগোলিক শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তৎকৃত ভূগোল ও মানচিত্রের সাহায্যে হাজার হাজার বাঙালী ছাত্রছাত্রী ভূগোল শিখিয়াছে। তাঁহার পরে আরো কেহ কেহ ম্যাপ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গে এই কার্য্যের আরম্ভ করিবার প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য।

—

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা বোলপুরের নিকটস্থ সুরুল গ্রামে স্থিত। ইহার দ্বারা সুরুল ও নিকটবর্ত্তী অন্য অনেক গ্রামের অনেক উপকার হইতেছে। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান। গ্রামগুলি না বাঁচিলে বাংলা উৎসন্ন যাইবে। গ্রামগুলিকে নূতন ও আনন্দময় জীবন দিতে হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। আবার, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ এবং পরস্পরের সহযোগী করিতে হইবে, জ্ঞান দিতে হইবে, চাষের উন্নতি করিতে হইবে, এবং তন্তুবায়,চর্ম্মকার,প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোকদের শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীরা, কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা নহে, পরন্তু কাজ করিয়া ও কাজ করিতে শিখাইয়া এই সমুদয় দিকে গ্রামবাসীদিগকে স্বয়ং নিজের হিত নিজে করিতে সমর্থ করিতেছেন। এইজন্য ইহার কাজের উন্নতি, বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব ও সাফল্য সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেদের জমীদারীতে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কিছু কিছু করিয়াছেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহি। কিন্তু শ্রীনিকেতনের কাজ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে। এইজন্য বলিতে পারি, এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, যে, তিনি কবি হইলেও কাজের লোক, এবং তাঁহার এই কাজ গ্রামপুনর্গঠনের রাজনৈতিক ধুয়া উঠিবার পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজের প্রধান সহায় আমেরিকার মিসেস্ ষ্ট্রেট্ (এক্ষণে মিসেস্ এল্ম্‌হার্ষ্ট) এবং মিষ্টার এল্মহার্ষ্ট ধন্যবাদার্হ।

—

বঙ্গে নারীশিক্ষা

বঙ্গে নারীশিক্ষার অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের ১৯২৫-২৬ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে,বাংলাদেশের সব কলেজে মোট ২৩৪৩৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়ে। তার মধ্যে ছাত্রী ২৮৪টি। ছেলেরা যে শিক্ষা পায়, ঠিক সেই শিক্ষাই মেয়েদের উপযোগী কি না, সে-প্রশ্ন এখানে না তুলিয়া, দেখা যাইতেছে, মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার খুব কম হইয়াছে।

বাংলা দেশে ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। বালকবালিকাদের মধ্যে যাহারা এতটুকু শিক্ষা পায়, তাহারা অনেকে বড় হইয়া নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর হইয়া পড়ে। শিক্ষাকে ফলপ্রদ করিতে হইলে আরও উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রীদিগকে লইয়া যাওয়া উচিত।

এত বড় দেশে দেশী বালিকাদের জন্য প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইবার বালিকা বিদ্যালয় মোট আঠারটি আছে। তাহাতে মাত্র মোট ৪৫০৪ জন ছাত্রী পড়ে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে মোট ছাত্রসংখ্যা

১৩৩২২৮৭। তাহার মধ্যে বালিকা ৫৪৪৮০। ইহা অত্যন্ত কম। কলেজ হইতে পাঠশালা পর্য্যন্ত সকল প্রকার শিক্ষালয়ে বঙ্গে যে সাড়ে বাইশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ে, তাহার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীদের পাঁচগুণ। বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কত কম হইতেছে, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

আলোচ্য বৎসরে বঙ্গে সাধারণ লেখাপড়া ও বিজ্ঞানাদি শিখাইবার জন্য ৪২টি কলেজ ছিল। তাহার মধ্যে দশটি সরকারী। মেয়েদের জন্য সরকারী কলেজ মোটে একটি। তা ছাড়া মিশনরীদের একটি কি দেড়টি আছে। গবর্ণমেণ্ট ছেলেদের জন্য ১০টি কলেজ চালাইতেছেন, মেয়েদের জন্য চালাইতেছেন মোটে একটি। তাহারও ঘরবাড়ী মোটেই যথেষ্ট নয়, পড়ান হয় অত্যন্ত কম বিষয়, খেলিবার জায়গা না-থাকার মধ্যে, প্রিন্সিপ্যাল আছেন একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক যাঁহার কাজকর্ম্ম ও ব্যবহার এরূপ যে,মেয়েদের জন্য অন্য অসাম্প্রদায়িক কলেজ থাকিলে ছাত্রীরা সেখানে চলিয়া যাইত। এই বেথুন কলেজ বাড়ান হইবে ও ইহার উন্নতি করা হইবে, গত শতাব্দী হইতে শোনা যাইতেছে। কিন্তু ডিরেক্টরের বর্ত্তমান আলোচ্য রিপোর্টেও দেখিলাম,"a scheme for its extension is now under consideration," "ইহার বিস্তার সাধনার্থ করণীয় কার্য্যের একটা খসড়া এখন বিচারাধীন।" ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলাতন্ত্র "রাজদ্রোহ" দমন, নিজেদের বেতন বৃদ্ধি, যুদ্ধের আয়োজন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কার্য্যতৎপর; অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনাতৎপর!

আলোচ্য বৎসরে মুসলমান ছাত্রী বাড়িয়াছে শতকরা সাড়ে পাঁচ জন, হিন্দু ছাত্রী বাড়িয়াছে শতকরা সাড়ে তিন জন। বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানদের উৎসাহ প্রশংসনীয়; হিন্দুদের উদাসীনতা শোচনীয় ও নিন্দনীয়। বঙ্গে হিন্দুছাত্রী অপেক্ষা মুসলমানছাত্রী এক হাজার বেশী। বঙ্গের মোট অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে মুসলমান অনেক বেশী। সুতরাং ছাত্রীসংখ্যা স্বভাবতঃ বেশী হইতে পারে। কিন্তু মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা যে হিন্দুছাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা দ্রুততর বাড়িতেছে, তাহাতে হিন্দুর বুঝা উচিত, যে, এবিষয়ে হিন্দুরা উন্নততর সম্প্রদায় বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা যে হিন্দু ছাত্রীদের সংখ্যা অপেক্ষা শতকরা বেশী বাড়িতেছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের শিক্ষা-রিপোর্টেও দেখা গিয়াছিল। হিন্দুসমাজের বুঝা উচিত, যে, কেবল ঘটা করিয়া বাগ্‌দেবীর পূজা করিলেই বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায় না; অন্তঃপুরে যাঁহাদিগকে দেবী আখ্যা দেওয়া হয়, তাঁহাদিগকে অজ্ঞ করিয়া রাখিলে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে উপহাস করা হয়।

অনেক নারীর অবস্থা এরূপ, যে, তাঁহাদের পক্ষে উপার্জ্জন করা আবশ্যক। কোন সৎকাজই নিন্দনীয় নহে—চাকরানী ও রাঁধুনীর কাজও নিন্দনীয় নহে। কিন্তু সাধ্যায়ত্ত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক রোজগারের সদ্বৃত্তি অবলম্বন প্রার্থনীয়। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু বাংলা দেশে মোট ১৩৭৬টি ছাত্রী চিকিৎসা, শিল্প বা অন্যবিধ বিশেষ রকম বৃত্তি শিক্ষা করে।

—

বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা

বঙ্গের অধিবাসীদের অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান। উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল রকম শিক্ষালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার হাজার-করা ৪৭৬ জন মুসলমান। অতএব তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে তাহারা শিক্ষায় অনগ্রসর। সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলিতে মুসলমান ছাত্র হাজারে ১৩৭ জন, চিকিৎসাদির কলেজে হাজারে ১৩২ জন। উচ্চ শিক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায় খুব অনগ্রসর। উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যার যথাক্রমে হাজার-করা ১৫০ ও ১৭৬ মুসলমান। এক্ষেত্রেও মুসলমানেরা পিছনে পড়িয়া আছে। প্রাথমিক শিক্ষায় কিন্তু তাহাদের ছাত্রসংখ্যা বঙ্গের মোট মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যার প্রায় অনুরূপ—মোট প্রাথমিক ছাত্রসংখ্যার হাজার-করা ৫০৫ মুসলমান।

মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ দ্রুত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

রেলগাড়ীতে ধূমপান

আমাদের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"মাঘ মাসের প্রবাসীতে সম্পাদকের চিঠিতে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ও ইউরোপের রেলের গাড়ীতে ধূমপায়ীদের জন্য আলাদা কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এদেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। বোম্বেতে বোম্বে বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সকল লোকাল ট্রেনে সেইরূপ বন্দোবস্ত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক কক্ষের বাহিরে লেখা থাকে smoking (ধূমপানের জন্য) অথবা non-smoking (অধূমপায়ীদের জন্য)। যাহারা ধূমপান করে তাহারা ধূমপানের কক্ষে উঠে। পার্সি'রা কেহ কেহ ধূমপানে আপত্তি করে, বোধ হয় সেই কারণে ওরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন অনেক পার্সি প্রকাশ্যে সিগারেট ও চুরুট খায়।"

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আট রাজা

তামাসা করিতেছি না—এখন হইতে সত্যসত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আটটি অংশ অধিকারে সমান সমান হইল ; গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে সায় দেওয়া যেমন ইংলণ্ডেশ্বরের দস্তুর, অপর সাতটি অংশের মন্ত্রীদের কথা অনুসারে কাজ করাও সেইরূপ ইংলণ্ডেশ্বরের দস্তুর হইল। প্রত্যেকটি অংশ নিজের ভাগ্য-বিধাতা হইল। প্রমাণ-স্বরূপ নীচে ইম্পীরিয়াল অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সের এতদ্বিষয়ক কমিটির রিপোর্ট হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"Nothing would be gained by attempting to lay down a Constitution for the Empire.

"Great Britain and the Dominions are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external allegiance, though united by a common allegiance to the Crown.

"Treaty-making rights : 'The plenipotentiaries should have full power, issued in each case by the King on the advice of the Government concerned.'

"The Governor-General of a Dominion is a Representative of the Crown, not the Representative of the Government in Great Britain or of any Department of it.

"The recognised official channel of communication should be between Government and Government direct.

"It is the right of each Dominion to advise the Crown in all matters relating to its own affairs.

'Every self-governing member of the Empire is now the master of its destiny.'

সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ভাগ্য-বিধাতা এই সাতটি দেশকে ইংরেজীতে ডোমীনিয়ন্ বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ডোমীনিয়ন্, স্বাধীন দেশের ন্যায়, বিদেশের রাজধানী-সকলে মন্ত্রী রাখিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই কানাডা ও আইরিশ ফ্রীষ্টেট্ ওয়াশিংটনে নিজেদের প্রতিনিধি রাখিয়াছে। ব্রিটিশ দূতের ইহারা তোয়াক্কা রাখিতে বাধ্য নহে। ইংলণ্ডের রাজা বা গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য এখন হইতে কোন সন্ধি করিতে পারিবেন না, সব ডোমীনিয়নের মত হইলে তবে সমগ্র সাম্রাজ্য উহার সর্ত্তসমূহ পালন করিতে বাধ্য হইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান আটটি রাজার ছবি দিলাম। ইহাতে অবশ্য ভারতবর্ষের 'প্রতিনিধি' বর্দ্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ নাই। কারণ ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন্‌গুলির সমান করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যত্ব থাকে না। ব্রিটেন এবং ডোমীনিয়ন্‌রা হইল মালিক, অন্যান্য অংশ হইল তাঁবেদার। প্রধান তাঁবেদার ভারতবর্ষ—কেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৪৩,৬৭,৫২,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩২ কোটি ভারতে থাকে।

সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সে ডোমীনিয়ন্‌গুলিকে গ্রেট-ব্রিটেনের সমান অধিকার দেওয়ায় বিলাতী খবরের কাগজগুলা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে ; কেবল শ্রমিকদলের কাগজ ডেলি হেরাল্ডে প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, "কন্‌ফারেন্সের বর্ণনাপত্রে ভারতবর্ষের, মালয়ের, কেনিয়ার, নাইজীরিয়ার, সুদানের কোন উল্লেখ নাই—সেইসব উপনিবেশ, অধীন দেশ ও আশ্রিত দেশের কোন উল্লেখ নাই যাহাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নাই এবং যাহারা স্বেচ্ছায় গ্রেটব্রিটেনের

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আট রাজা

সহিত সহযোগিতা অবগত নহে। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধীন জাতিদের কোন উল্লেখ নাই। তাহাদের অস্তিত্ব [প্রভু শ্বেতকায়দের পক্ষে] লাভজনক হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সময়ে তাহাদিগকে স্মরণ করিলে তাহা অসুবিধার কারণ হইতে পারে। এইজন্য, বিনা বাক্য ব্যয়ে, তাহারা যেন নাই, এইরূপ ভাব অবলম্বন করা হইয়াছে—রাজার নূতন উপাধি রচনাতেও তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এবং এই-প্রকার ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ দ্বারা কন্‌ফারেন্স মুখে উচ্চারিত সকলের স্বাধীনতার সহিত কার্য্যে আচরিত সাম্রাজ্যের অধিকাংশের উপর অল্পাংশের প্রভুত্বের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে।"

ডেলি হেরাল্ড যে বলিয়াছেন ভারতেরও উল্লেখ নাই, তাহা ভুল। উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাতে কেবল বলা হইয়াছে,যে, ভারতবর্ষের জন্য নূতন কিছু না করিবার কারণ এই, যে, সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান ১৯১৯ সালে প্রণীত ভারতশাসন আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা, তেলা মাথায় তেল ঢালা দরকার, রুক্ষ কেশে তেলের দরকার নাই—ডোমীনিয়ন্‌গুলির খুব স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল, সুতরাং তাহা বাড়াইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু ভারতবর্ষকে ১৯১৯ সালের আইন প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব কিছুই দেয় নাই, অতএব ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা অনাবশ্যক!

আমেরিকার নানা কাগজে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তন্মধ্যে ওয়াশিংটন্ পোষ্ট বলিয়াছে, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে মাত্র বিদ্যমান রহিল।" এই মন্তব্য সত্য ও মিথ্যা দুই-ই। গ্রেটব্রিটেন এবং ডোমীনিয়ন্‌গুলিকেই যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা সত্য। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বৃহত্তর ব্যাপার। শুধু ভারতবর্ষেই ইহার বার আনা রকম লোক বাস করে, এবং ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যের দাস।

সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান আগে হইতেই অপমানকর ছিল, এখন আরও অপমানকর হইল। ইহার প্রতিকার আমাদের হাতে নাই, বলা যায় না; কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এত দল ও সম্প্রদায়ভেদ থাকিলে প্রতিকার হইবে না। যাহা হউক, অপমানের প্রতিকার করিতে পারি বা না পারি, যদি অপমানটাকেই গৌরব বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলেও মন কতকটা প্রবোধ মানে। ভবিষ্যৎ কোন ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সের সময়েও যদি ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্বে বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে তখন যদি কোন ভারতীয় বেসরকারী লোক উহাতে ভারতবর্ষের তথাকথিত 'প্রতিনিধি' হইয়া যাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাদের আত্মসম্মান বজায় থাকে। বেসরকারী বলিলাম এইজন্য, যে, সরকারী

কর্ম্মচারীরা গবর্ণমেণ্টের হুকুম না মানিলে ইস্তাফা দিতে বাধ্য।

—

"মির্জাপুর" নামের ব্যুৎপত্তি

সম্প্রতি কলিকাতার মির্জাপুর পার্কের নাম বদ্‌লাইয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক করা উপলক্ষে কোন কোন মুসলমান বলিয়াছেন, উহা মীরজাফরের নামের সহিত জড়িত ছিল, সুতরাং উহার নাম বদ্‌লাইয়া উক্ত নবাবের স্মৃতি লুপ্ত করা উচিত হয় নাই। মীরজাফরের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত কিনা, তাহার বিচার অনাবশ্যক; বক্তব্য কেবল এই, যে, মির্জাপুরকে যাঁহারা মীরজাফরের সহিত সম্পৃক্ত মনে করেন তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিমাণ নির্ণয় দুঃসাধ্য। যে-রাস্তার নাম আজকাল মির্জাপুর ষ্ট্রীট্ লেখা হয়, তাহার সহিত মির্জা কথারও কোন সম্পর্ক নাই। মির্জাপুরের প্রকৃত বানান মৃজাপুর। উহা মৃৎজা হইতে উৎপন্ন। কলিকাতা শহরের ১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে ইহা লেখা আছে। পূর্ব্বে নামটি মৃজাপুরই লেখা হইত।

—

রকফেলোর চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার বৃত্তি

গত কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকটি বাংলা এবং ভারতীয়দের ইংরেজী দৈনিকে দেখিলাম, রকফেলার চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার বৃত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতিমূলক সংবাদের উপর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা গত আগষ্ট মাসের শেষে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মাস আগে লণ্ডন হইতে আমাদের চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা পুরাতন প্রবাসী হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক কাগজের এত আগে কোন খবর লিপিবদ্ধ করা বাংলা মাসিক কাগজের উচিত হয় নাই।

"আমাদের জাহাজে একদল ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের ভিতর চারিজন রকফেলার বৃত্তিপ্রাপ্ত। তাঁহাদের মুখে শোনা গেল—ছয়টি বৃত্তি দিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে বৃত্তি দিবার উপযোগী আধ ডজন মানুষও খুঁজিয়া পান নাই! কাজেই চারিজন মাত্র যাইতেছেন। যদিও ইঁহাদের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং আর-একজন মশকবংশের সমূল ধ্বংসের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তবুও তাঁহারা যে একজনও বাংলা দেশ হইতে মনোনীত নন, এইটা আরোই হাস্যকর ব্যাপার। ভারতের সকল প্রদেশের ভিতর বাংলাদেশেই ম্যালেরিয়ার অত্যাচার সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু এই চারিজনের একজনও বাংলাদেশ হইতে মনোনীত হন নাই। অবশ্য তাহা আমার অভিযোগের কারণ নয়। কারণ সমস্ত ভারতের জন্য যদি ছয়টি বৃত্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন-না-কোন প্রদেশ বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইবেই। ম্যালেরিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণাই যে-বৃত্তির উদ্দেশ্য, সেই বৃত্তির জন্য ম্যালেরিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশ হইতেই কাহাকেও নির্ব্বাচন করা হইল না, এইখানেই হইতেছে ব্যাপারটির আসল রঙ্গ।"

—

বঙ্গে আবার দ্বৈরাজ্য

বঙ্গে আবার দ্বৈরাজ্য প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এবং হাজী গজনবী সাহেব মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যৌবন-কালে খুব বুদ্ধিমান্ ও কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং নানারকম বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি অধ্যাপকতা করিয়াছেন, ব্যারিষ্টারীতে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন, এবং কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পরিচালকরূপে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। দ্বৈরাজ্য দ্বারা যদি বঙ্গের হিত কিছু হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা হওয়া উচিত। হাজী সাহেবেরও নানা রকম অভিজ্ঞতা আছে। তিনি আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও তৎপূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দলভুক্ত ন্যাশনালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক ছিলেন, এখন কি জানি না। ১৯০৫ সালে যখন বারাণসীতে গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের

অধিবেশন হয়, তখন তিনি একদিন ইংরেজীতে বেশ বলিতেছিলেন। কতকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, "উর্দ্দু" "উর্দ্দু"। কিন্তু তিনি উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিলেন না; বলিলেন, "আমি বাঙালী"। অবশ্য উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিলে কাহারও বাঙালীত্ব লোপ পায় না। তিনি যে একুশ বৎসর আগে নিজের বাঙালীত্ব গোপন করিতে চান নাই, ইহাই আমরা পাঠকদিগকে জানাইলাম। আশা করি, তিনি এখনও রাজনৈতিক এবং অন্য সার্ব্বজনিক বিষয়ে বাঙালীই আছেন।

—

রাজবন্দীদের স্বাধীনতা হরণের কারণ

রাজবন্দীদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার নতুবা মুক্তি দান বিষয়ক পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর প্রস্তাব উপলক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী বলেন, সুভাসবাবু প্রভৃতিকে বন্দী করিবার পরোয়ানা দস্তখত করা হয় ১৯২৪ সালের ২৮শে আগষ্ট, অর্থাৎ যে-দিন বঙ্গীয় কৌন্সিলে ভোটে দ্বৈরাজ্যের পরাজয় হয়, তাহার পর দিন; কিন্তু তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় পরবর্ত্তী ২৫শে অক্টোবর, অর্থাৎ প্রায় দুই মাস পরে। গোস্বামী মহাশয়ের এই উক্তির কোন সরকারী প্রতিবাদ না হওয়ায় তাহা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তাহা হইতে কয়েকটি অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। দ্বৈরাজ্য বিষয়ে স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক গবর্ন্মেণ্টের পরাজয়ের ঠিক্ পর দিন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হওয়ায় মনে হয় সুভাষ-বাবুদিগকে বন্দী করার প্রধান বা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ্যদলকে কাবু করা। সরকারের এই অভিপ্রায় প্রথম হইতেই অনেকে সন্দেহ করিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় অনুমান এই, যে, সুভাষ-বাবু প্রভৃতিকে যদি বাস্তবিকই গবর্ন্মেণ্ট রাজদ্রোহার্থ ষড়যন্ত্রকারী মনে করিতেন, তাহা হইলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দস্তখত করিবার পরেও দুই মাস কাল তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে দিতেন না। এরূপ ভয়ঙ্কর লোক, দু মাস কেন, একদিন স্বাধীন থাকিলেও কত অনর্থ ঘটাইতে পারে; চাই কি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া গোলদীঘিতে নিক্ষেপ করিতে পারে! ঐ দুই মাস কাল ভবিষ্যৎ-বন্দীদিগকে এবং তাহাদের বাসস্থানগুলিকে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা ঘেরাও করিয়াও রাখা হয় নাই। অতএব এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট্ সত্য সত্যই সুভাষ বাবু প্রভৃতিকে ষড়যন্ত্রকারী ভয়ানক লোক মনে করেন নাই, অন্য কোন কারণে বন্দী করিয়াছেন।

—

চীনে ভারতীয়দের প্রাণরক্ষার ওজুহাত

ভারতবর্ষ ও চীন উভয়েই লীগ অব নেশ্যান্সের সভ্য। কোন দুই সভ্যের মধ্যে মনান্তর, ঝগড়া আদি হইলে লীগের আগে তাহা মিটাইবার চেষ্টা করিবার কথা। সেরূপ কোন চেষ্টা এক্ষেত্রে হয় নাই। অধিকন্তু ভারতবর্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জেদে ভারতবর্ষ হইতে চীনে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। যাহার সঙ্গে কোনই ঝগড়া নাই, অন্যের হুকুমে তাহাকে প্রহার করা বা প্রহার করিতে প্রস্তুত থাকার মত জঘন্য দাসত্ব আর কি আছে? মনুষ্যত্বের ইহা অতি বড় অবমাননা। চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভায় করিতে দেওয়া হইল না। অথচ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলা হয়, ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা এদেশে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অবসান হইয়াছে।

বড় লাটসাহেবের বক্তৃতায় বলা হইয়াছিল, যে, চীনে অনেক ভারতীয় আছে, তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার্থ সৈন্য প্রেরণ আবশ্যক। চীনে ভারতীয় অপেক্ষা জাপানী আছে বহুবহুগুণ, তাহাদের ধনও অনেক বেশী, এবং জাপান চীনের খুব কাছে। সুতরাং জাপানীদেরই অনেক আগে চীনে সৈন্য পাঠাইবার কথা। জাপান কিন্তু তাহা করে নাই। যাহা হউক, চীনে ভারতীয় কত আছে ও তাহারা কি করে, জানিয়া রাখা ভাল। চীনে প্রায় এক হাজার ভারতীয় আছে। তাহার মধ্যে ৮৫৯ জন সিপাহী। তাহারা ভারতসরকারের ভৃত্য নহে। ইহাদের

অনেকে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে। ১৯২৫ সালে শাংহাইয়ে চীনদিগের যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহাতে চীনদিগকে গুলি করিবার নিমিত্ত এই সিপাহীরা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারা অধিকাংশ শিখ। জারদের আমলে রুশিয়ায় কসাক সৈন্যেরা যেমন জুলুমের জন্য ব্যবহৃত হইত, শিখরাও চীনে সেইরূপ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সহিত কোন ভারতীয়ের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। ইহারা আমাদের লজ্জার কারণ। কোন ভারতীয় যদি পরের টাকা খাইয়া বিদেশীদের উপর অত্যাচারে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে এরূপ লোককে রক্ষা করিতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই বাধ্য নয়। যাহারা অন্যের আদেশে, নিজের সহিত বিবাদের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও, লোকের উপর গুলি চালায়, গুলি খাইতেও তাহাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

শাংহাই তিন ভাগে বিভক্ত—চীনা শহর, ফরাসী-দিগকে প্রদত্ত অংশ, এবং অন্তর্জাতিক এলাকার অংশ। ফ্রান্স নিজ এলাকাভুক্ত অংশে ফরাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠায় নাই। অন্তর্জাতিক এলাকাভুক্ত অংশের কাজকর্ম্ম প্রধানতঃ ব্রিটিশ ও জাপানীরা চালায়। জাপানীরাও কিন্তু সৈন্য পাঠায় নাই।

—

বাঙালী বিধবার পঞ্জাবে বিবাহ

অনেকগুলি বাঙালী বিধবার পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। পঞ্জাবে বিধবাবিবাহের প্রধান আর্থিক সাহায্য-দাতা স্যার গঙ্গারাম ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহার বাংলায় এই পুনর্ব্বিবাহিতা নারীদিগকে ও তাঁহাদের স্বামীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ স্বামীসহ আসিয়াছিলেন, কেহ বা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় কেবল স্বামীকে পাঠাইয়া-ছিলেন। সকলেই পাঞ্জাবী পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। স্যার্ গঙ্গারামের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালিনারা পঞ্জাবে আসিয়া সুখে আছেন কিনা ও ভাল ব্যবহার পাইতেছেন কি না, এবং পরিবারস্থ সকলে তাঁহাদিগকে লইয়া শান্তিতে আছে কি না। বিধবাবিবাহসমর্থক পঞ্জাবের একখানি কাগজে দেখিলাম, স্যার গঙ্গারাম যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমতী কমলা দেবী নাম্নী একটি পুনর্ব্বিবাহিতা বাঙালী নারী হিন্দীতে স্যার গঙ্গারামের প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা পাঠ করেন।

এই বাঙালী বিধবাগুলির কোন খবর বাঙলা দেশে কেহ লন কি? বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ, কেহ তাহা জানিবার চেষ্টা করেন কি?

মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক রাজওয়াড়ে

মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে
৬১ বৎসর বয়সে গৃহীত ছবি হইতে
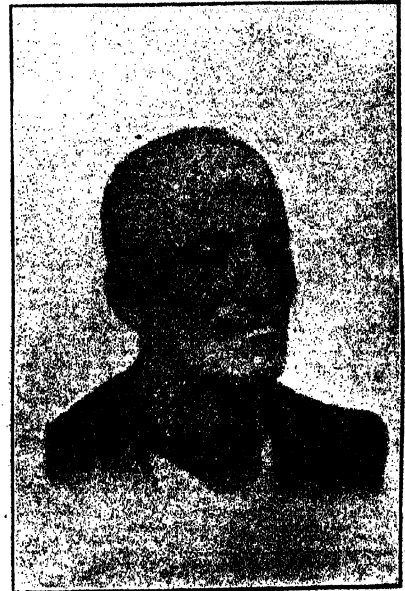
মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে সম্প্রতি ৬১ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া একাগ্রতার সহিত নানা কষ্ট সহ্য করিয়া কেহ তাঁহার মত মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের রাশি রাশি উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের কোন ঐতিহাসিকও এরূপ কষ্ট করিয়া এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

একজন তরুণ ভাস্কর

মহীশূরের মাধব রাও নামক একজন উনিশ বৎসর

শিবাজীর মূর্ত্তি
ভাস্কর মাধব রাও কর্তৃক ৩।৷ ঘণ্টা সময়ে নির্ম্মিত

বয়স্ক ভাস্করের কাজ দেখিয়া অনেকে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি কাজের নমুনা

মহীশূরের যুবক ভাস্কর মাধব রাও

এখানে দিতেছি। মহীশূর-রাজ তাঁহার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়।

খাদি প্রতিষ্ঠান

কয়েক মাস পূর্ব্বে বেঙ্গল রিলীফ কমিটির উত্তর বঙ্গের বন্যার জন্য সংগৃহীত অর্থ ব্যয় পদ্ধতির সমালোচনা সূত্রে খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিয়াছিল। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কার্য্যকলাপের আমরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলাম ও তৎপ্রসঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা উঠাতে অনেকের হয়ত মনে হইয়াছে, যে, খাদি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যেরও আমরা সমর্থক নহি। বস্তুতঃ খাদি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ও পরিচালনা অতি উত্তম রূপেই হইতেছে। আমরা নিজেরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাব-পত্র কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, খাদির কার্য্য যতদূর সম্ভব ভাল করিয়াই হইতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় অক্লান্ত কর্ম্মী ও বিধিবদ্ধ ভাবে কাজ চালাইতে বিশেষরূপে পারদর্শী। তাঁহার খাতা-পত্র দেখিয়া আমরা এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি, যে, দেশবাসীর সামান্য মাত্র
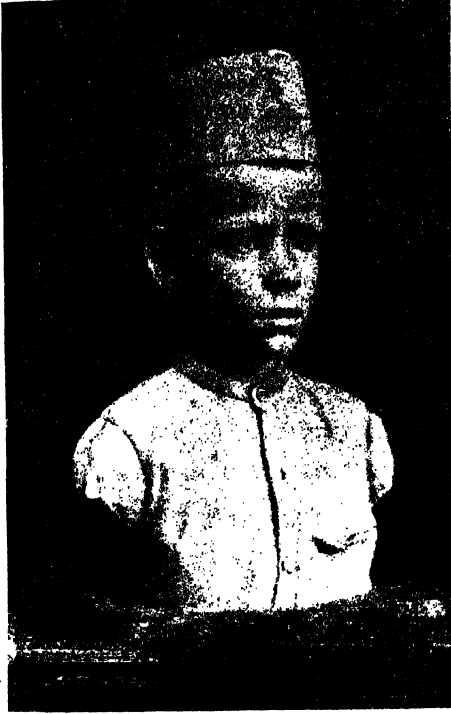
ভাস্কর মাধব রাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মূর্ত্তি

সাহায্য পাইলেই খদ্দরের কার্য্য উত্তম রূপে চলিতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি, অর্থাৎ ব্যবসা বিশেষকে জাতীয় ভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা, আমরা যখন আবশ্যক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তখন খদ্দরের ক্ষেত্রে সেইরূপ সাহায্য কেন দেওয়া হইবে না তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। আমরা নানা ব্যবসাকে শত-করা ৩০ হইতে ১৫০ অবধি সাহায্য করিতেছি। সতীশ-বাবুর মতে খদ্দর শত-করা ১০ হারের কিছু কম সাহায্য লাভ করিলেও দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ সাহায্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পাওয়া যাইবে না। জাতীয় কার্য্যে জাতিকেই অগ্রসর হইয়া ঐ সাহায্য দিতে হইবে। খদ্দর ও চরকার কার্য্য ফ্যাক্টরী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে কিনা, সে দিক্ দিয়া তাহার বিচার করা উচিত হইবে না। কারণ চরকা ও খদ্দর প্রথমতঃ তাহাদের জন্তই যাহাদের অবসর সময় ফ্যাক্টরীর কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। আলস্যের পাপ ও তজ্জনিত চরিত্রগত অবনতির হস্ত হইতে ভারতবাসীকে বাঁচাইবার একটি সহজ উপায় রূপেই চরকা ও খদ্দরের প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই দিক্ দিয়া দেখিলে চরকা ও খদ্দরের বিচার ঠিক টাকা আনা পাইয়ের মাপকাঠিতে মাপিয়া চলিতে পারে না। অর্থাৎ কিনা চরকা ও খদ্দরকে আমরা শুধু ব্যবসারূপে দেখিলে অন্যায় করিব। উহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র উন্নত ও শক্তিশালী হইবে বলিয়া উহাকে জাতীয় চরিত্র গঠনের অস্ত্ররূপেই আমাদিগকে অধিক করিয়া দেখিতে হইবে। যে-আলস্য হইতে কোন অর্থই উপার্জ্জিত হয় না, উপরন্তু যাহার ফলে জাতীয় চরিত্র উত্তরোত্তর অধোগামী হইতেছে, সেই আলস্য দূর করিয়া যদি দিনে দুইটি মাত্র পয়সাও কেহ অর্জ্জন করে, তাহা হইলে সেই দুই পয়সার মূল্য শত মুদ্রার অপেক্ষা অধিক; কেননা আলস্যহীনতা হইতে চরিত্রের যাহা উন্নতি হয়, সে উন্নতি শত মুদ্রা দিয়াও ক্রয় করা যায় না। ব্যবসার দিক্ দিয়া ঠিক কতটা সাহায্য পাইলে খদ্দরের কার্য্য চলিতে পারে তাহার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আশা করি, সতীশ-বাবু তাহা করিবেন।

অ

—

ভাস্কর দেবীপ্রসাদ

ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যই ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ গৌরব। ইহা যে শুধু ভারতের শিল্পেরই বিশেষত্ব এমন নহে। পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্য্য-সৃজনের প্রচেষ্টা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া যতটা অভিব্যক্ত হয়, আর কোন উপায়ে ততটা হয় না। এইজন্ত ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান যুগে আমরা শিল্পীদিগকে চিত্র অঙ্কনের দিকেই সকল আগ্রহ ঢালিয়া দিতে দেখিয়া কিছু আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিলাম। এই ভয় আমাদের হইতেছিল যে, যেমন বর্ত্তমান সাহিত্যে যাহা মহান্ ও অশেষ ধৈর্য্য ও প্রতিভার ফল, তাহার স্থান ক্ষণিকের

আবেগ ও চেষ্টার ফল চুটকি লেখার দ্বারা পূর্ণ হইতেছে; তেমনি বুঝি শিল্পেও আমরা স্থাপত্যের বিশালতা ও ভাস্কর্য্যের কঠিন তপস্যার পথ ছাড়িয়া দিয়া শুধু পটাম্বনের জলবিন্দু দিয়া জাতীয় প্রাণের প্রবল সৌন্দর্য্য-পিপাসার নিবৃত্তির চেষ্টা করিব। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমাদের জাতির ক্ষুদ্র ও সহজের প্রতি যে চিরঅবজ্ঞার ভাব তাহা আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

অধ্যক্ষ পারসি ব্রাউন
শিল্পী দেবীপ্রসাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

মাঝে মাঝে দেখিতেছি কোন কোন শিল্পী নিজ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার জন্য প্রাসাদ-তোরণ কিম্বা মূর্ত্তি-গঠনের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ইহা জাতীয় প্রাণ-শক্তির পূর্ণ জাগরণের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই আমরা আনন্দ বোধ করিতেছি।

ভাস্কর্য্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বিশেষ প্রতিভা দেখাইতেছেন। তাঁহার দ্বারা গঠিত একটি মূর্ত্তি এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের একজিবিশনে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। মূর্ত্তি-গঠনে দেবীপ্রসাদের শিল্প-চাতুর্য্য ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পিদিগের সমান এবং সমালোচকগণ তাঁহার সুগঠিত মূর্ত্তির সহিত কোন কোন ইউরোপীয় মহাশিল্পীর রচনার তুলনা করিয়া দেবী-প্রসাদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহার শিল্পে মৃত্তিকাকে জীবন্তের অনুকরণে প্রাণবান করিয়া তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায় অপর দিকে তেমনি সেই মূর্ত্তির মধ্যে পাওয়া যায় শিল্পীর সকল কিছুকে নূতন ও সুন্দর করিয়া দেখিবার শক্তির পরিচয়। যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তাহার চক্ষে যদি অকস্মাৎ উপযুক্ত রকম চশমা পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে যেমন চতুর্দ্দিকের পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠে, অথচ বুঝিতে পারে যে, সে যাহা দেখিতেছে তাহা সত্যই কল্পনা নহে; দেবীপ্রসাদের শিল্পের ভিতর দিয়া বাস্তবকে নূতন করিয়া দেখিয়া আমরাও সেইরূপ বুঝিতে পারি যে, আমরা এতদিন সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখি নাই। শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও অবয়বের আকৃতি ব্যতীতও সূক্ষ্মতর আর কিছু আছে যাহা বাস্তবকে সৌন্দর্য্য দান করে। সেই অজানা "আর-কিছু"কে ধরিয়া মূর্ত্তি বা চিত্রে যে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে সেই শিল্পী। দেবীপ্রসাদ শিল্পী।

অ

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ	কলম	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১৫	১	উপর হইতে ১৪	তূলাদণ্ড	তুলাদণ্ড
৬১৬	২	,, ১৪	তাকেই বলে	তাকেই বলে সেই অভ্যাস
৬৩২	১	,, ৫	গৃহিনী	গৃহিণী
৬৩৬	২	,, ৯	বড়াদাদর	বড়দাদার
৬৩৭	২	,, ১১	হস্তভ্রং	যন্তভ্রং
৬৩৮	২	,, ৯	গ্রহনীয়	গ্রহণীয়
৬৪১	১	নিম্ন ৫	পঞ্চতম	পঞ্চম
৬৭৯	২	,, ১১ ও ১২	কুল	ফুল
৬৯২	২	উপর হইতে ১৩	ভারতে	ভাবতে
৬৯৩	১	নিম্ন ১৫	তুচি	তুমি
৭০৪	১	,, ১৪	চিলিমটা	চিলিমচিটা

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 39-27
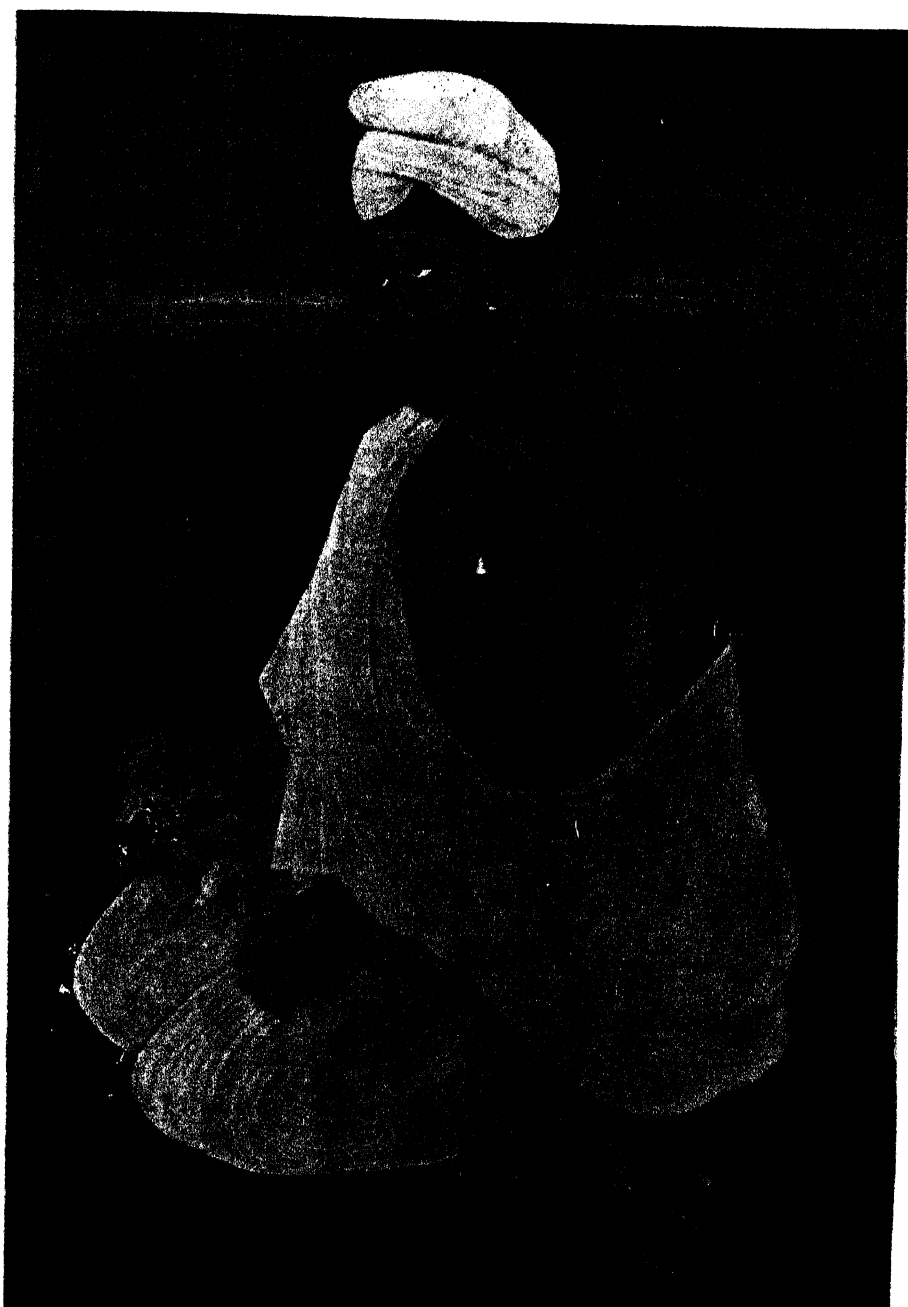
গুরু গোবিন্দ

শিল্পী শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে—এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুফ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না—কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম্ম, না, কর্ম্ম; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিদ্যা, না, উদ্যম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার

দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিলেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন--আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম, আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তাহার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডি'গ্রর উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য আমেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়—আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মূলতবি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্ব্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি—পূরা বেতন পাইলাম কি না সে-হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই—এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অন্যায় নয়—এবং সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাই—সম্মান-সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কৃপণতা নাই—ছেলেবেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভালবাসিয়াছি—আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না পাই ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি—ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠা'নকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘূরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাববার অবকাশ নেই—কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই—বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েচে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের

সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাকবে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি—তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন করতে পারিনে। কিন্তু এযে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা—এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ—তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এই-জন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা করচ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে—দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নবনব বর দান করতে থাকবেন।

দেশে ফেরবার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম ঊর্দ্ধশ্বাসে ল্যাটিমের মত ঘুরে' বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল—এখন ভাঙন ধরা সুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দ্দা প'ড়ে গেচে—ভাল ক'রে শুনতে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করতে হয়। ডাক্তার বলচে, একেবারে চুপচাপ ক'রে থাকতে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্যে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে—সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বল্‌বার জন্যে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা করব—এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুব মারব। কোনো নূতন যায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক করচি—সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি—কেউ লোকজন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চলবে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে—না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেক্‌চারের জন্যে কবে তৈরী হ'ব তা বলতে পারিনে—বোধহয় এখন থেকে কর্ত্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে—এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করব—যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু,

"বিশ্বভারতী"কে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ ক'রে দিচ্চি। তোমাকে এর ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশী কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার সঙ্গে নামের যোগ না থাকলে চলবে না—সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘটবে।

এখানে কিছুদিন বিপরীত গরম গিয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে এক-একদিন আকাশে বাতাসে অগ্নিবাণ

ছুটতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আমার মন বিচলিত হয়েছিল। ভেবেছিলুম, দার্জ্জিলিঙে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আস্‌ব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর constitution দেখিয়ে সভ্য ক'রে আস্‌ব। কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই আমার সমস্ত সময় এবং সম্বল খরচ করতে হচ্চে—আমার না আছে অবসর, না আছে পাথেয়। সমুদ্র-পার থেকে দুই-একজন আমার কাজে যোগ দিতে এসেছেন, তাঁদের ফেলে রেখে চ'লে যেতে পার্‌চিনে।

Constitution-খানা ছাপা হয়েচে, রেজেষ্ট্রী হ'য়ে গেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন—কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আস্‌চি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে—কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে—এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল—সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করতে পার্‌ত। ঠিক বর্ত্তমানে সে-রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি—কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে—সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দর্‌বার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অন্যদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেচে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্যে কথা ক'বে এইটেই হচ্চে আবশ্যক—নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু,

তোমার "অব্যক্তর" অনেক লেখাই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে-পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

তোমার রবি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু,

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকের ক্ষুদ্রতার ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর-একটার ভিতরে এসে নিজে সুদ্ধ যেন খাটো হ'য়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হ'য়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ-করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতি-কালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পার্‌লুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই

আলো, এই প্রাণ—এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারী আনন্দ হ'ল—মনে যে-অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মাথার কুয়াশা দূর হ'য়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে, আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে—কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে—সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হ'য়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌচেছিলুম। কলকাতায় যে কয় ঘণ্টা ছিলুম অবকাশ মাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চ'লে আসতে হ'ল—তাই তোমার সঙ্গে সে দিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহরে ফিরব নিশ্চয় জানিনে—কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি—সে-কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন ক'রে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কার।

(সমাপ্ত)

ছাতনায় চণ্ডীদাস*

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২য় মন্তব্য

ভূমিকা

গত বৈশাখের প্রবাসীতে ১ম মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া উত্তর পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে লেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, পুরাবৃত্ত মাত্রেই সম্ভাব্যের ইতিহাস, নিশ্চিতের নয়। চণ্ডীদাস কোথায় থাকিয়া বাসলীচরণ বন্দনা করিতেন, এই প্রশ্নের উত্তর যাহা হউক সেটা আনুমানিক মাত্র। জ্ঞাত তথ্য কল্পনা-সূত্রে গাঁথিয়া একটা বাদ-(theory) রচনা মাত্র। যদি পরে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, এবং পুরাতন সূত্রে গাঁথিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সে বাদ অগ্রাহ্য হইবে, এবং নূতন বাদ-রচনা আবশ্যক হইবে। পুনশ্চ, যদি কোন বাদে মুখ্য তথ্যের এবং তাহার আনুষঙ্গিক অধিকাংশ বিষয়ের উত্তর না পাই, তাহা হইলে সেটা বাদ নামেরই যোগ্য নয়।

তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাত এইটুকু যে, তিনি বাসলী দেবীর বড়ু (পূজাহারী) ছিলেন, এবং 'বড়ু' এই বিশেষণ হইতে পাই, তিনি অবিবাহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। আরও পাই, তাঁহার দেশ যেখানেই হউক, সেখানে বাসলী অবশ্য ছিলেন। সে বাসলী কোথায় ছিলেন? নীলরতন-বাবু ৭৬০ পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র একটি পদে 'নান্নুরে বাশুলী' আছে। উক্ত সংগ্রহে বাসলী-চরণ-স্মরণ এত অল্প আছে যে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ, 'কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস' কিংবা 'চণ্ডীদাস কহে' এইরূপ পদ-শেষকে ভণিতা বলিতে পারা যায় না, যে-সে জুড়িয়া দিতে পারে। এই আশ্চর্য্যের মধ্যে, "নান্নুরে বাশুলী" এই উল্লেখও আশ্চর্য্যজনক হইয়া পড়িতেছে। একটি পদে "রজকী সঙ্গতি" আছে। কয়েকটায় রাগাত্মিক পদের বিষয়ও আছে। আবার বলি, চণ্ডীদাসের কি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ছিল না, তিনি গান গাইতে গাইতে আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন? পদ-রচনায় উন্মাদের চিহ্ন নাই, প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষণিক বাহ্যদৃষ্টি সম্ভবপর বোধ হয় না।

* মাঘ মাসে এক বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল

কিন্তু এই যে রাগাত্মিক পদে আছে নান্নুরের মাঠে গ্রামের কিংবা হাটের নিকটে বাসলীর আলয়, সেখানে চণ্ডীদাস নির্জ্জন কুটীরে রামী রজকীর সহিত সহজ সাধন করিতেন, এসব কি মিথ্যা? কে জানে। রাগাত্মিক পদের সব যে তাঁহার রচিত নয়, তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যায়। প্রথম কথা, সহজিয়া সাধন গান গাহিয়া হাটে ঘাটে প্রচার করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি নাকি উত্তম ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, দৈবগতিকে নিত্যা দেবীর আদেশে ও বাসলীর মন্ত্রণায় সহজিয়া পথে প্রবেশ করেন। এরূপ স্থলে যাঁহারা নূতন তন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহারা সে তন্ত্র প্রকাশ করা দূরে থাক্, গোপনে রাখেন। আরও আশ্চর্য্য—রামী রজকীও বিলক্ষণ কবি হইয়াছে, চণ্ডীদাসের সহিত কবিতায় উক্তি-প্রত্যুক্তি করিতেছে। মানবচিত্তের এমনই চরিত্র, এইরূপ কাহিনীতেই রস অধিক পায়। আরও দেখিতেছি, দুইটা পদে, "আদি চণ্ডীদাস" এই নাম আছে। কবি ভুলিয়াছেন, এই "আদি" যোগেই তাঁহার অনুকরণ ধরা পড়িয়া যাইবে, তিনি যে "আদি" ছিলেন না, সকলেই বুঝিতে পারিবে। একটা পদে, যেটার প্রথমে বাসলী নান্নুরে আসিয়াছেন, সেটার শেষে রূপ-নারায়ণের* সঙ্গে চণ্ডীদাসের হঠাৎ "প্রেমতরঙ্গ" আসিয়া পড়িয়াছে, ঠিক ধান ভানিতে শিবের গীতের মতন। "দীন চণ্ডীদাস" এই নামের পদ আছে। যিনি "বড়ু" চণ্ডীদাস, তাঁহার পক্ষে আপনাকে "দীন" বলিয়া ঘোষণা করা সম্ভব মনে হয় না। মনে হয়, "দীন চণ্ডীদাস" বড়ু চণ্ডীদাসের দীন ভক্ত ছিলেন, নইলে "দীন" এই বিশেষণের প্রয়োগ হইত না। এই দীনের বহু পদ নীলরতন-বাবুর সংগ্রহে আছে, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদ কবিতাবলীতে আছে। সে-সব কবিতা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছিল, এখনও আরও পাওয়া যায়। এই কবিতাবলীতে চণ্ডীদাস ও নকুল ও বিনোদ রায় সংবাদ আছে। আরও দ্রষ্টব্য, বিষ্ণুপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের তুল্য দুর্লভ পুথী পাওয়া গিয়াছিল।

* মিথিলার রাজা শিবসিংহের অপর নাম রূপনারায়ণ। ইঁহার সভায় বিদ্যাপতি থাকিতেন। পদটি রমণীমোহন মল্লিকের প্রকাশিত পদাবলীতে আছে।

রাগাত্মিক পদের দুইটিতে চণ্ডীদাসের সহজ সাধনে প্রবৃত্তি বর্ণিত আছে। এ কথা তিনি ব্যতীত অন্যের জানা সম্ভব ছিল না। গ্রন্থোৎপত্তির প্রয়োজন বর্ণনা সে কালের রীতিও ছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাসলীর পূজাহারী হওয়া সেকালে এক বিষম ব্যাপার ছিল। অতএব তিনি যে স্বেচ্ছায় সহজিয়া হন নাই, তিনি যে বিপদে পড়িয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেটা প্রকাশ করা স্বাভাবিক। অতএব নান্নুর, বাসলী ও চণ্ডীদাসের একত্রাবস্থিতি স্বীকার করিতে হইতেছে। নীলরতনবাবুর সংগ্রহের ৩৪২ সংখ্যক পদে আছে,

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।

"ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্ সোসাইটি" হইতে ১৩০৪ সালে প্রকাশিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত পদটি আছে,

নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যেথা।

এই দুই পদের 'গ্রাম' না 'হাট' ঠিক, কে জানে। নান্নুর নামে যে মাঠ ছিল, এবং মাঠে চণ্ডীদাস থাকিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাসলীও মাঠে থাকিতেন। অন্য পদে আছে, তিনি গ্রামদেবী ছিলেন। গ্রামদেবী হইলেই একটা গ্রাম চাই। অতএব অন্য উক্তি না পাইলেও নান্নুর নামে গ্রাম ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যাইত।

কিন্তু আর এক বাসলী পাইতেছি। তিনি নিত্যার আদেশে 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে' নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসকে পাইয়াছিলেন। এই বাসলী কে? তিনি 'রসিক নগরে' গ্রামদেবী। 'তিনি জগতমাতা' তিনি 'নিত্যা সহচরী' তিনি "ডাকিনী বাসলী", 'তিনি সে এক বাসলী' 'তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিলে' চণ্ডীদাসের সহজ সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। নিত্যা কোথায় থাকিতেন? সালতোড়া গ্রামে। 'ডাকিনী' নাম দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তিনি দেবী ছিলেন না। বৌদ্ধযুগের 'ডাকিনী যোগিনী' ও মানবী ছিলেন। তার উপর তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুরে আসিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, মানবীজ্ঞান ঠিক নহে।

ডাকিনা, ডাগনী, এক কালে কিংবা এ কালেও মানবী ছিলেন বটে, কিন্তু ডাইনীকে জগৎমাতা বলিতে পারা যায় না। তিনি আর এক বাসলী, তিনি 'রসিক নগরে' থাকিতেন। নগরের গ্রামদেবী, বলিতে পারা যায় না। অতএব 'রসিক নগর' কোনও গ্রামের ব্যঞ্জক। সালতোড়াকেই রসিক নগর বলা হইয়াছে। এই বাসলী প্রসন্ন হইয়া নান্নুরে চণ্ডীদাসকে 'রাই কানুর নওল চরিত' কহিয়াছিলেন। তাঁহারই যোগ্য কর্ম্ম বটে। এই রসিক নগরে রামী থাকিত, চণ্ডীদাস থাকিতেন না। রামী পরে নান্নুরে আসিয়াছিল।

চণ্ডীদাস নান্নুরের গ্রাম দেবীর বড়ু ছিলেন, অতএব বাসলী তাঁহার গৃহদেবী ছিলেন না। তিনিও নিজের কুলদেবীর বড় ছিলেন না। নান্নুর গ্রামের লোকে কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে বড়ু নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যিনি যত বড় তিনি তত আখ্যায়িকার আকর। যিনি যত প্রিয়, তিনি তত কৌতূহল জাগাইয়া তোলেন। মানব মনের এই স্বাভাবিক গতি, তাহা চণ্ডীদাস-ভক্তের রচিত আখ্যায়িকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি রাই কানুর নওল চরিতে এত প্রগাঢ় রসের আস্বাদ দিয়াছেন, তিনি যে রসরাজ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি! আদি রসের সহিত বিস্ময়রস মিশ্রিত থাকিলে শর্করা-সংযুক্ত দুগ্ধের তুল্য সুস্বাদু হয়, একটু পাইলে আরও পাইতে ইচ্ছা হয়। সন ১৩২৭ সালে শ্রীযুত করালীকিঙ্কর সিংহ বিদ্যাবিনোদ "চণ্ডীদাস" নামে একখানি বই দেওঘর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প প্রায় সব আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামক পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ সব আখ্যায়িকা দিয়াছেন। সে-সবের পুনরুক্তি করিব না। পাঠক একবার পড়িয়া লইবেন।

আরও চারি পাঁচজনের লিখিত ভূমিকায় চণ্ডীদাস-চরিত আছে। দেখিতে পাই, কেহ কোন আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই। আমরা স্ব স্ব জ্ঞান অনুসারে ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করি, স্ব স্ব প্রকৃতি বশে যেটা কামনা করি, সেটার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। জানি, নিষ্কাম হইতে না পারিলে কোনও সত্য পাওয়া যায় না, কিন্তু ঝোঁক বাঁচাইয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সত্যাসত্য-নির্ণয় বহু সাধনার ফল। যে-গল্প সকলের পুরাতন, তাহাই যে অধিক সত্য তাহাও বলিতে পারা যায় না। তা বলিয়া অল্পকাল পূর্ব্বে যে-গল্পের উৎপত্তি, তাহা পণ্ডিতে প্রচার করিলেও সহসা বিশ্বাস্য নয়। চণ্ডীদাসের কাহিনী এখন পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে। পুরাণ পড়িবার সময় যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া থাকি, এখানেও তাহা প্রয়োগ্য; কোনও গল্প অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, পূর্ব্বকালের কবিরা তাহাতে কিছু সত্য পাইয়াছিলেন।

এখন দেখি, কোন্ স্থান তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, কোথায় মুখ্য তথ্য ও অধিকাংশ আখ্যায়িকা মিলিতে পারে। ১। বাসলী কোথায় গ্রামদেবী হইয়া আছেন, কোথায় পূর্ব্বকালেও ছিলেন, কোথায় তাঁহার প্রসিদ্ধির সম্যক্ কারণ ছিল, এবং কোথায় তিনি অদ্যাপি স্বীয় বিগ্রহে ও ধ্যানে পূজিতা হইতেছেন? ২। সেখানে নান্নুর বা তৎসদৃশ বা তৎরূপান্তরিত নামে মাঠ, হাট, বা গ্রাম আছে কি? ছিল কি? লোকে বলে কি, বাসলী সেখানে এখনও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, চণ্ডীদাসকে কেহ বড়ু নিযুক্ত করিয়াছিলেন? ৩। 'বড়ু' বিশেষণের অর্থ কি? কোথায় এই শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়? এখন কোথায় চণ্ডীদাসকে অবিবাহিত স্বীকার করে? যদি করে, তাহা হইলে তাঁহার বংশ থাকিতে পারে না। যদি কেহ আপনাকে চণ্ডীদাসের বংশীয় মনে করে, সে বংশ কার? সে বংশের ব্রাহ্মণ এখনও কি সে বাসলীর পূজা করিতেছেন? কত পুরুষ করিতেছেন? চণ্ডীদাসের আনুমানিক কালের সহিত এই পুরুষ-গণনা মেলে কি? ৪। সে-কালে বিশালাক্ষী ও বাসলী অভিন্ন বিবেচিত হইতেন কি? কোথাও বিশালাক্ষী নাম পরে বাসলী হইয়াছে কি? ৫। পূর্ব্বকালে বাসলীর পূজা করিতে ব্রাহ্মণে সহজে সম্মত হইতেন কি? কেন

হইতেন না? পূজক হইলে তাঁহার সামাজিক ন্যূনতা ঘটিত কি? ৬। কথিত আছে, নকুল নামে এক ব্রাহ্মণ ও বিনোদ রায় নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দেশের রাজার সাহায্যে চণ্ডীদাসের পাতিত্য দূর করিতে গিয়াছিলেন। কোথায় এই তিনের যোগ সম্ভবিতে পারিত? ৬। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ব্যাখ্যা করিতে নানা তর্ক হইয়াছে। কোথায় সে তর্ক অনাবশ্যক হইয়া পড়ে? ৭। এক পুরাতন পুথীতে আছে, কবি এক মুসলমানের হাতে নিহত হন। সেখানে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল কি? ৮। কবি নাকি সিপ দিয়া মাছ ধরিতেন। তাঁহার মাছ ধরার বাতিক ছিল, কোন গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল, না প্রয়োজন ছিল? যদি প্রয়োজন ছিল, এখনও সেখানে সে প্রয়োজন ঘটে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেয়াসিনী সাজাইয়া ছিলেন। অদ্যাপি সেখানে দেয়াসিনী আছে কি? তিনি নাকি এক নদীতে স্নান করিতে গিয়া একটা পদ্মফুল ভাসিয়া যাইতে দেখেন। সেখানে এখনও নদী আছে কি? ৯। সে দেশে সাল-তড়া নামে গ্রাম আছে কি? নিত্যা নামে দেবী সেখানে এখনও প্রসিদ্ধা আছেন কি? ইত্যাদি—

বীরভূম-নান্নুরে কি আছে, তাহা চণ্ডীদাসের পরম-ভক্ত বীরভূমবাসী ৺নীলরতন-বাবু তাঁহার সংশোধিত পদাবলীতে লিখিয়া গিয়াছেন। দেখিতেছি, বীরভূম নান্নুরে এইসকল প্রশ্নের সমাধান পাই না। মুখ্য প্রশ্ন যে বাসলী, তাঁহারই সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি পূর্ব্বকালে ছিলেন, গ্রামদেবী হইয়া ছিলেন,—ইহা কিম্বদন্তিতেও নাই। আছেন এক বিশালাক্ষী। তিনি বিগ্রহে যেমনই হউন, তাঁহার নিত্য পূজায় কিংবা ধ্যান-মন্ত্রে বাসলী নাম উচ্চারিত হয় না; হয় বিশালাক্ষীর। আশে পাশে কোনও গ্রামেও বাসলী নাই। বাস্তবিক, অসত্য হইতে সত্য যত আবিষ্কৃত হয় সত্য হইতে তত হয় না। যদি বীরভূম-নান্নুরে সত্যই বাসলী থাকিতেন, কিংবা যদি বিশালাক্ষীর নামান্তর বাসলী থাকিত, তাহা হইলে সত্যানুসন্ধানে কৌতূহল হইত না।

কিন্তু এই যে নান্নুর গ্রাম, মাঠ, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্ন-স্তূপ! কিন্তু একমাত্র নামের ঐক্যে সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিসের ভগ্ন-স্তূপ, কে জানে। প্রাচীন নগরের, রাজগৃহের, দেব-মন্দিরের হইতে পারে। সেটা যে বাসলী-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে পারে, এই বিতর্কের উৎপত্তি কত দিনের? শ্রীযুক্ত করালী-কিঙ্কর সিংহ ছাতনার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তিনি নান্নুরে অনু-সন্ধানকালে শুনিয়াছিলেন, "বিশালাক্ষীর" "মন্দিরটি ১২৯৯ সালে বাশলীর বর্ত্তমান পূজক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত;" আর দেখিয়াছেন, "তত্রস্থ কোন ভদ্রলোকই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না"।

আমরা নান্নুর যাই নাই, দেখি নাই। প্রথম মন্তব্য লিখিবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, অ-শিক্ষিত জনে সে গ্রামের নাম না-নু-র, এবং শিক্ষিত জনে না-ন্নু-র বলেন। একই গ্রামের দুই নাম,—যেমন নদীয়া ও নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও ভট্টপল্লী, বাঁশবেড়িয়া ও বংশবাটিকা,—থাকিতে পারে; কিন্তু না-নু-র ও না-ন্নু-র, এই দুই নামের মধ্যে সে সম্বন্ধ পাই না। এই সন্দেহে, ডাক-ঘরের নামের তালিকায় দেখি, নামটি না-নু-র বা না-নু-র; ইং ১৯১৭ সালের সংশোধিত সরকারী মাপচিত্রে দেখি, থানার নাম না-নু-র। তখন মনে হইল, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"—এই তর্কে পশিবার পূর্ব্বে পর্ব্বত আছে কি না, প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য। দৈবাৎ শুনিতে পাই, নান্নুর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে লাভপুরের জমিদার শ্রীযুত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বিনীত তেমন বিদ্যোৎ-সাহী, যেমন শিষ্ট তেমন সত্যপ্রিয়। আমি তাঁহার নিকট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাই। তিনি সেখানে রেজেষ্টারী আপিসে খোজ করাইয়া লিখিলেন, ৫০।৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বের দলীল পত্রে না-নু-র ও না-নো-র নাম আছে, না-ন্নু-র নাই। পূর্ব্বের জমিদারী সেরেস্তার কাগজে কি নাম আছে, তাহা খোজ করিতে নান্নুরের জমিদার শ্রীযুত অনাদিনাথ রায় মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে জানিতেছি, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামের নাম না-নু-র ছিল, না-ন্নু-র ছিল না। কি জানি আরও পূর্ব্বে ছিল, এ তর্কও উঠিতে পারে।

কিন্তু এই অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে বীরভূমের শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে তর্ক নিরাস করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রবাদ, নান্নুরের পুরানো নাম ছিল নলপুর বা নলনগর।"

যে গ্রামের নাম এতকাল নান্নুর শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এত রহস্য ছিল, কে জানিত। এই রহস্য ভেদ দ্বারা শ্রীযুত নির্ম্মলশিব ও অনাদিনাথ নিজ নিজ নাম সার্থক করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। পদাবলীর না-ন্নু-র আকাশ-কুসুম বলিতে পারি না, পুথী কাটিয়া না-মু-র লিখিবারও জো নাই। তাঁহারা শিক্ষিত জনের দৃষ্টিমোহের নিদান আবিষ্কার করুন। 'নলপুর', এই নাম হইতে না-ন্নু-র আসা কঠিন মনে হইতেছে। যাহা হউক, এখন আমরা পদাবলীর 'নান্নুর'কে 'নান্নুর' এবং বীরভূমের তথা-শিক্ষিত 'নান্নুর'-কে 'বীরভূম-নান্নুর' বলিব।

চণ্ডীদাসের কাল ঠিক জানা থাকিলে তাঁহার কীর্ত্তি-স্থান অন্বেষণে অনেক সুবিধা হইতে পারিত। ইহার উপর, চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি পদরচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতনাম চণ্ডীদাস না হইলেও ডাক-নাম বা উপাধি চণ্ডীদাস ছিল। কোথায় কখন্ কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন,—দেশ কাল পাত্র—তিনই অজ্ঞাত। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' আবিষ্কারের পর এই প্রশ্ন আরও দুরূহ হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নয়, দুই বাসলী স্থানে দুই কালে চণ্ডীদাস ডাক-নাম-ধারী দুই ব্যক্তি ছিলেন, কিংবা একই বাসলী স্থানে দুই কালে দুই জন ছিলেন, পরে বিস্মৃতি ও অনবধান হেতু একের জীবন-কাহিনী অন্যে আরোপিত হইয়াছে। এইসকল তর্কের নিরাস কোনও কালে হইবে কি না, সন্দেহ। তথাপি নানা বিজ্ঞ জনে নানা দিক্ দিয়া যত্ন করিলে কিছু ফল হইতে পারে। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাস এক অন্ধকার করিতে হইতেছে, যাঁহাকে ধরিয়া নানা কাহিনী রচিত হইয়াছে। তথাপি পরে দেখা যাইবে, ছাতনায় দুই কালে যেন দুই চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন চৈতন্যদেবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, আর একজন তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুইজন কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা পুনরালোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে।

একজন চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ছিলেন, ইহা স্থির। অনুমান করা হয়, প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কি ১৩০৭ শকের নিকটবর্ত্তী সময়ে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আমার বিবেচনায় এরূপ অর্থে ভুল হইতেছে। "চৈতন্য মহাপ্রভুর এক শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন," বলিলে বুঝি, চণ্ডীদাস এক শত বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। যদি মনে করি চণ্ডীদাস ১৩০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা হইলে তিনি ১৩৫৭ শকে ছিলেন। এস্থলে চৈতন্যদেবের একশত বৎসর পূর্ব্বে না হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়েন। ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি কোথায় পাইয়াছিলেন, ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস "জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমার বোধ হয়, ৮৩ বৎসর "পূর্ব্বে ছিলেন" এইরূপ কোথাও দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১৪০৭—৮৩-১৩২৪ শকের পরে চণ্ডীদাস ছিলেন না। কেহ বিখ্যাত হইলে লোকে বরং তাঁহার মৃত্যু-শক জানিতে পারে, জন্ম শক জানা তাহাদের পক্ষে দুষ্কর। চণ্ডীদাস নিজের জন্মকোষ্ঠী রাখিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহার জন্ম শক জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

দেখি, ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের মৃত্যু ধরিলে মিথিলার রাজা শিবসিংহ(অন্য নাম রূপনারায়ণ) ও কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিতে পারিত কিনা। শিবসিংহ ঠিক কোন্ শকে রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে একটু মতভেদ আছে। সাধারণতঃ ধরা হয়, ১৩২২ শকে। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' রাখালবাবু লিখিয়াছেন, ১৩২৪ শকে। কোন্ শকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন, তিনি মাত্র সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ১৩২৪ শকে তিন জনকেই পাইতেছি। দূর মিথিলায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ প্রসারিত হইতে অবশ্য সময়

লাগিয়াছিল, তাঁহার বয়সও হইয়াছিল। মিলনের সময় চণ্ডীদাসের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে ১৩০০—১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের পূর্ণ যৌবন কাল।

আর একটা পদে আছে, কার লেখা কে জানে, চণ্ডীদাস 'বিধুনেত্র পঞ্চবাণ' = ১৩২৫ শকে ৬৯৯টি গীত সমাপ্ত করেন। ইহার অর্থ, তিনি এই শকের পরে আর লেখেন নাই, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব এখানেও তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ পাইতেছি।*

এখন দেখি, উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর সমাধান ছাতনায় হয় কি না।

১। বাসলী, সামন্তভূমের রক্ষয়িত্রী দেবী

পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিমভাগ জাঙ্গল দেশ। পূর্ব্বকালে এই দেশকে ঝাড়খণ্ড বলিত। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে ও পরেও নাম ছিল জঙ্গল মহল। মানভূমিও জঙ্গল মহলের অন্তর্গত ছিল। ইহার ভূমি কোথাও পাহাড়্যা, কোথাও অসম ও কঙ্করময় বলিয়া কৃষিকর্ম্মের অযোগ্য ছিল। পূর্ব্বকালে এখানে নিবিড় বন ছিল। এখনও জঙ্গল আছে। সেকালে এই বনভূমির স্থানে স্থানে আদিম অনার্য্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। দেশ দুর্গম, অনুর্ব্বর, 'জাঙ্গলা অতিদারুণাঃ' এই হেতু বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণের, এমন-কি মুসলমান রাজারও, লোভনীয় হয় নাই। বাঁকুড়া জেলার সীমা অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন ইহার পশ্চিমে মানভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও হুগলী, এবং উত্তরে দামোদর-সহ বর্দ্ধমান জেলা। সংস্কৃত সাহিত্যে জঙ্গল দেশটি কয়েকটি 'ভূমি' নামে উক্ত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান সীমার মধ্যে পশ্চিম ভাগ দক্ষিণে তুঙ্গভূমি পরে ধবল ভূমি উত্তরে সামন্তভূমি এবং পূর্ব্বে মল্লভূমি। ভবিষ্যৎ পুরাণে নাকি আছে, দক্ষিণে তুঙ্গভূমি ও উত্তরে শেখরভূমি (পঞ্চকোট ও পরেশনাথ পাহাড়) ইহার মধ্যবর্ত্তী বরাভূমি, সামন্তভূমি ও মানভূমি, এই তিন ভূমি লইয়া বরাহভূমি। সং বরাহ বাঃ বরা, অর্থে শূকর। অমরকোষে কাল-শব্দের এক অর্থ শশূকর। অতএব বরাহভূমি ও কোল-ভূমি, অর্থে এক। সর্ব্বাচারবিহীন দেখিয়া আর্য্যেরা এই ভূমিবাসীদিগকে কোল বলিতেন। কখনও নিষাদ, বর্ব্বর, মল্ল, ম্লেচ্ছ প্রভৃতিও বলিতেন। আমরা এক অনার্য নাম দিয়া মনে করি, যেন সব এক জাতি। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহারা আদিতে এক রয় (race) হইলেও নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল। এক-এক জাতি এক-এক প্রধানের বা দলপতির অধীনে থাকিলেও রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ছিল না, জাতিতন্ত্রে শাসিত হইত। কখন কখনও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করিত, এক জাতি অন্যের বাসভূমি বল-পূর্ব্বক অধিকার করিত। মৃগয়া ও মাছধরা, শূকরাদি পশুপালন, বন্য ফল মূল সংগ্রহ ও কৃষিকার্য্য, ইহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। যাহারা কৃষিকর্ম্ম করিতে লাগিল তাহারা পরে আর্য্য ও অনার্য্যগণের আচার দেখিয়া ক্রমশঃ উচ্চজাতি হইয়া উঠিল, এবং পরে শূদ্রজাতির মধ্যে মিশিয়া গেল।*

কোন কোন জাতি মৃত্তিজ ও ভূমিজ (indigenous) নাম পাইল। তাহাদের চলিত নাম মাটিয়া বা মেট্যা (বাগদী), ও ভূঞা হইল। এইরূপ, বর্বর হইতে বাউরী, মল্ল হইতে মাল (বাগদী) হইয়াছে। সমস্ত অর্থে সীমা, প্রান্ত। একজাতি পশ্চিম বঙ্গের এক পশ্চিম প্রান্তে বাস করিত। তাহাদের নাম সামন্ত, এবং চলিত ভাষায়

---

* পদটি এই,

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ।

প্রথমটি শাকাঙ্ক এবং দ্বিতীয়টি গীতাঙ্ক ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। বিধু = ১ সনেত্র = ৩, পঞ্চবাণ = ৫ × ৫ = ২৫। পঞ্চ = ৫, বাণ = ৫, পৃথক্ অর্থ লাগে না। পাঠান্তরে, বিধুর নিকটে নেত্র 'পক্ষ পঞ্চবাণ' = ১৩২২৫ কিংবা ১৩২৫৫ হইতে পারে না। সুতরাং ভুল। বোধ হয়, পাঠটি ছিল, 'বিধুর নিকটে বসি নেত্র পক্ষ বাণ,' = ১৩২৫, ভুলে 'পক্ষ' স্থানে 'পঞ্চ' হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ৮ ভক্তিনিধির ৮৩ অঙ্কটি 'বিধু-নেত্রে'র অনুসরণ মাত্র। 'নবহুঁ নবহুঁ' অর্থে 'নূতন নূতন' হইতে পারে না। কারণ পরে 'গীত পরিমাণ' আছে। নবহুঁ নবহু রস = ৬৯৯, কারণ অঙ্কের বামাগতিই নিয়ম। শকাঙ্কে 'নিকটে বসি' থাকাতে কমাগতিতে বাধা পড়িতেছে। পদের সংখ্যা এক বা কম সাত শত স্মরণ করিলে মনে হয় গীতগুলি পালায় বাঁধা ছিল, এবং সংখ্যাও ঠিক। পূর্ণ সাত শত অশুভ বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু 'বিধুনেত্রের' ভাষা দেখিলে চণ্ডীদাসের রচিত মনে হয় না।

* ইহাদের মধ্যে কামার কুমার প্রভৃতির বৃত্তি ছিল। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান করণা জাতি = সূত্রধর ও শকট-কার, লোহার, লৌহকার, ও কোলু = তৈলকর প্রভৃতি এই কারণে এখনও নীচ হইয়া আছে। এই জেলায় শুঁড়ীর সংখ্যা এখনও ২৬০০০।

সাঁঅং হইল। এই অর্থে সামন্ত নামটি সংস্কৃত ধর্ম্মসংহিতায় আছে। সাঁঅতাল নামটি পূর্ব্ব কালের বাঙ্গালীর দেওয়া। সাঁঅতালেরা নিজের ভাষায় 'হোড়, ও 'হোরো' (অর্থ, মনুষ্য) নামে পরস্পর পরিচিত। সং সমন্ত শব্দে আল প্রত্যয় যোগে সমন্তাল শব্দের উৎপত্তি। অর্থ, সমন্তবাসী, সীমান্তবাসী। ইহা হইতে নাম সামন্তাল বাঁকুড়া(য়), সাঅঁতাল, সাঁওতাল। জাঙ্গলদেশে বাস করিতে হইলে লোককে দুদ্ধর্ষ হইতে হয়; কিংবা দুদ্ধর্ষ না হইলে সে দেশে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারা যায় না। অতএব সে দেশের সকলেই যোদ্ধা। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিত, ইহারাও যুদ্ধ করে; অতএব ইহারা চতুবর্ণের মধ্যে না হইলেও বাহুবলে ক্ষত্রিয় হইয়া উঠিল।*

জাঙ্গলদেশে বাস করিয়া অনার্য্যেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কদাচিৎ কোন জৈন, কোন বৌদ্ধ পরিব্রাজক দুর্গম দেশে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্রমে উত্তর ও পূর্ব্বদেশের আর্য্য ও আর্য্যীগণের লোলুপ দৃষ্টি বনভূমিতে পড়িতে লাগিল; তাহারা মুসলমান রাজত্বে অত্যাচারের ভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাও ক্ষত্রিয় হইয়া পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভূমিদান করিয়া বাস করাইতে লাগিলেন। উড়িষ্যা হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এইরূপে, বাঁকুড়া জেলার দশ-এগার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক লক্ষ সাঁওতাল, এক লক্ষ বাউরী, এক লক্ষ খয়রা, বাগ্‌দী ও লোহার জাতির সহিত এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস ঘটিয়াছে। † ক্রমে পূর্ব্বকালের অনেক অনার্য্য, নবাগত হিন্দুর দাস হইয়া অল্পে অল্পে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে তাহাদের প্রত্যেক জনপদে যে নামেই হউক গ্রামদেব বা গ্রামদেবী ছিল। তাঁহারা এখন অনার্য্য-বৌদ্ধ-হিন্দু, এই তিনের মিশ্রণে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালের আকারহীন প্রস্তরখণ্ডে বা পুরাতন বৃক্ষে যে ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর দেবতা ছিলেন, তিনি এখন বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকার শূন্যের প্রতীক হইয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত নামে সভয়ে পূজা পাইতে লাগিলেন। কলিযুগে ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত বাঁকুড়া জেলার জাঙ্গলপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমোত্তর কোণের জাঙ্গলভূমিতে সামন্ত জাতির বাস ও রাজত্ব ছিল। এই ভূ-খণ্ডের নাম সামন্তভূম হইয়াছে। সামন্তেরা যে রাজা ছিল, তাহা ইহাদের সংজ্ঞা 'রায়' হইতে বুঝিতে পারা যায়। জঙ্গল মহলের কোনও ভূম মুসলমানের করতলগত হয় নাই, সহজে ইংরেজেরও হয় না লোকের সেই সে কালের স্বকামিতা এখনও অদৃশ্য হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে (ভূমিজ) চুয়াড় দ্বারা যেমন লুণ্ঠিত, তেমন পরে মুসলমান ফৌজের ও মরাঠা বর্গীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইত। পরে ইংরেজ-রাজার বুদ্ধি-কৌশলে এক এক ভূম এক এক পরগণা নামে ও যৎসামান্য করে এক এক জমিদারিতে পরিণত হয়। সামন্তভূম পরগণা বর্ত্তমান ছাতনা থানা অপেক্ষা বড় ছিল। উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল হইবে। লোকে বলে, পূর্ব্বে ইহার রাজধানী বাসলীনগরে ছিল, পরে ছাতনা হইয়াছে। ইহা বাঁকুড়া নগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে এক পাকা সড়কে অবস্থিত। *

বাসলী দেবী, সমস্ত সামন্তভূমের রক্ষয়িত্রী দেবী। কোন্ অতীত কাল হইতে সামন্তভূম চলিয়া আসিতেছে,

* কবিকঙ্কণে কালকেতু ব্যাধ (নিষাদ) এইরূপে রাজা হইয়াছিল। সে আপনাকে চোয়াড় ও রাড় বলিয়াছে। চৌর্য্য বা চুরিতে দক্ষ যে, সে চোয়াড় বা চুয়াড় (চৌর্য্য+আড়, চুরি+আড়)। এখন নাম ডাকাইৎ। রাড় অর্থে রাঢ় নহে, হইতে পারে না। কারণ রাঢ় এক দেশের নাম, বিশেষণ নহে। সং রাটি অর্থে যুদ্ধ কলহ। দ্বন্দ্বপ্রিয় বা গুঁদিয়া অর্থে রাড়। এইরূপ, রাড়-চোয়াড়ি অর্থে রাড়ের ও চোয়াড়ের ব্যবহার। ভবিষ্যপুরাণেও বরাহভূমের অধিবাসীর চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে। মান-ভূমের ভূমিজ ও চোয়াড় সম্বন্ধে 'লালসিংহ' নামে একখানি বই পুরুলিয়ার শ্রীযুত হরিলাল ঘোষ বি-এল লিখিয়াছেন।

† বাগ্‌দী ও খয়রা জাতির, মধ্যে 'রায়' উপাধি আছে। এককালে যে বাগদী রাজা ছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। খয়রা হয়ত আমীম খরোয়ার জাতির অবশেষ। গত সেনসস্ রিপোর্টে খয়রা জাতির নাম নাই। তেমনই, অনেক বাগ্দীও লোহার শ্রেণীতে উঠিয়াছে।

* গত সেন্‌সস্ রিপোর্টে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ১২২ জন সামন্ত লিখিত হইয়াছে। রাজপুত জাতি ক্রমশঃ বাড়িয়া ২৬০০০ হইলেও অল্প দেখা যাইতেছে। সামন্তভূমের বর্ত্তমান রাজবংশ ছত্রী। ইহা হইতে মনে করিয়াছিলাম, ছত্রী+ছাতনা। এখন মনে হইতেছে, (সামন্ত) সাৎ+না=সাৎনা—ছাৎনা। তুং কালী+না=কাল্‌না, রায়+না=রায়না)। নগর শব্দ হইতে 'না'। অতএব সামন্তনগর=ছাৎনা। ছাৎনা নামে কোনও গ্রাম নাই, স্থানটিরও স্থিরতা নাই। বর্ত্তমান ছাতনা নগর তিনচারিটি গ্রামের সংযোগস্থল।

কে জানে? কোন্‌কালে পূর্ব্বের গ্রামদেব বা দেবী বাসলী নাম পাইয়াছেন, কে জানে। বোধ হয়, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ও তান্ত্রিক উপাসনা মিশিয়া যাইতেছিল, তখন অনার্য্য গ্রামদেবী রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করেন। এখনও সে পরিবর্ত্তনের শেষ হয় নাই। পূর্ব্বে সামন্তভূম বারটি ঘাটীতে বিভক্ত ছিল, এক এক সামন্ত এক এক ঘাটীয়াল ছিলেন, এবং প্রত্যেক ঘাটীতে এক এক বাসলী ছিলেন, এখনও আছেন। পূর্ব্বকালের বহু অনার্য্য, হিন্দুজাতির অন্তর্গত হইয়াছে, অনেক আর্য্যীয় হিন্দুও অনার্য্যের গ্রাম্যদেব ও দেবীকে পূজা করিতেছেন। বিশিষ্ট হিন্দুর বাড়ীতে অদ্যাপি বনের বাঘ 'বাঘরায়' নামে বৎসরে একবার পূজিত হইতেছে। উড়িষ্যাতেও এই পূজা আছে। উত্তর ও পূর্ব্ব দেশের বহু হিন্দু পরে পরে আসিয়া বন কাটাইয়া বসতি করিয়াছে। শিবলিঙ্গ ও বহু পরে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু গ্রামের অনার্য্য নাম ও অনার্য্য গ্রামদেবী অতীতের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।*

"বাঁকুড়া বিবরণে" ছাতনা থানাবাসী শ্রীযুত রামানুজ কর লিখিয়াছেন, "ছাতনা পরগণার বহুগ্রামে গ্রাম্য দেবতা বাসলী। অনেক স্থান বাসলী-তড়া, বাসলী-স্থান, বাসলী-ডাঙ্গা, বাসলী-তলা নামে পরিচিত। বাসলী-বান্ধ, বাসলী-হিড় [জাঙ্গাল] দৃষ্ট হয়।" বাসলী-বান্ধ নামে এক গ্রাম ছাতনার নিকটে আছে। কেবল ছাতনা পরগণা নয়, বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে বাসলী নামে গ্রামদেবী আছেন। প্রথম মন্তব্যে লিখিয়াছি, গ্রামের মাঠে উপাস্ত 'সিনী' নামে ইনি বিরাজ করিতেছেন। বিগ্রহ নাই, কোথাও সিন্দুর-লিপ্ত প্রস্তর, কোথাও মাত্র ঘট, কোথাও তাহাও নাই; আছে মাটির পোড়ানা ছোট ছোট ঘোড়া এবং হাতী। [বাসলী দেবী শ্বেত অশ্বে ভ্রমণ করেন, মাঠের ধান তস্কর হইতে ও গ্রামের লোককে মহামারী হইতে রক্ষা করেন, কিন্তু হাতী কেন, জানি না।] কোথাও তাঁহার নাম 'মাদানা' বা 'মাদানী' (মহাদানা—মহাদানব)। সন্ন্যাসী নাম আছে, ভৈরব ও ভৈরবী নামও আছে। মনসা নামেও আছেন, কিন্তু মনসার নাগ নাই, হংস-বাহনও নাই। আছে ঘোড়া ও হাতী। আর, বাঁকুড়ায় মনসা-পূজার যে ঘটা, তাহাও সাধারণ নয়। সকলেরই আশ্রয় বৃক্ষ-তলে, সকলেই জাগ্রৎ, এমন জাগ্রৎ কেহ পাতা ছুঁইতে সাহস করে না। অধিকাংশের নিত্য পূজা হয় না। কদাচিৎ ব্রাহ্মণে, প্রায়ই বাউরী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণী পূজা করে, ছাগ বলি দেয়। যাঁহার একটু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তিনি কুটীর কিংবা মন্দিরে, স্থান পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণে পূজা করিলে কালী মন্ত্রে করেন। সিনী নামে একটি দেবী জানি, যিনি বাসলী-ধ্যানে পূজিত হইতেছেন। কাহারও কাহারও 'দেয়াসিনী' আছে। মাথায় লম্বা জটা, পরণে গেরুয়া, কপালে সিন্দুরের ফোটা, হাতে চিম্‌টা, ঠিক যেন "যোগিনী পারা।" লোকে ডাকে, দেয়াসী মা। ইঁহাদের শিষ্যাও আছে। গ্রামে সংক্রামক রোগ হইলে দেয়াসী পূজা করিয়া সরিষায় মন্ত্র পড়িয়া ঘরের চারিদিকে গণ্ডি দিতে বলিয়া যায়। ইঁহারা দেবীর অনুগৃহীতা দাসী। দেয়াসিনী মুচিজাতীয়াও আছে।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জঙ্গলভূমি দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলে এইরূপ অসংখ্য গ্রামদেবী দেখিতে পাই। উড়িষ্যায় বাউরী অনেক। তাহাদেরও গ্রামদেবী বাসলী। সেখানে কুক্কুট বলিও হয়। সংক্রামক রোগ হইলে দেবীর পূজা দিলে এক এক নারীর উপর ভর হয়। তখন তাহার মুখ দিয়া বাসলী আদেশ করেন। উড়িষ্যায় বাউরী এত অস্পৃশ্য যে, ব্রাহ্মণে বাউরী-পাড়া মাড়ান না; অন্ত্যজাতি দৈবাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। তাহারা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। তাহারা "শূন্য" পূজা করিত।

চণ্ডীদাসের পদে পাই, সালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে

* বাঁকুড়ার পূর্ব্ব নাম বাকুণ্ডা ছিল। তখন বনাকীর্ণ ছোট গ্রাম ছিল। বাকুণ্ডা, এই নামের 'কুণ্ডা' শব্দের অর্থ যদি বা পাওয়া যায়, 'বা' শব্দের পাওয়া যায় না। তখন এখানে অনেক বাউরী ছিল, এখনও আছে। বাঁকুড়া সহরের প্রায় মধ্যস্থলে তাহাদের 'জীনা-সিনী' গ্রামদেবী এখন এক ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীশ্রীকালী দেবীর পাশে পূজা পাইতেছেন। বাকুণ্ডা, এই অনার্য্য নাম, এবং জীনা-সিনী গ্রামদেবী, এইরূপ সাক্ষী। রায় বাহাদুর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, মুণ্ডাভাষায় "বা" অর্থে ফুল। তাহা হইলে বাকুণ্ডা অর্থে পুষ্প-শোভিত পুষ্করিণী যেখানে।

দেবী প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় সালতড়া* নামে গ্রাম ৫।৭টা আছে। মানভূম জেলাতেও ৪।৫টা আছে। একটা আছে, ছাতনার ঈশান কোণে ১২ মাইল দূরে গঙ্গাজলঘাটী থানার নিকটে। এই সালতড়ায় নিত্যা নামে দেবী আছেন। কেহ কেহ বলে নিত্যাময়ী, কেহ বা নিত্যাময়ী মনসা। প্রস্তর মূর্ত্তি, দণ্ডায়মানা নারী-মূর্ত্তি; দ্বিভুজা, দুই হস্ত লম্বিত, এবং দুই হস্তেই দুই ছিন্ন হস্ত ধৃত। ইহার পাশে ক্ষেত্রপালাদি অন্য দেবদেবী আছেন। নিত্য পূজা হয়, ব্রাহ্মণে পূজা করেন, এবং আপনাকে দেয়াসী বলেন। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী রজক।†

২। বাসলী ও বিশালাক্ষী ভিন্ন দেবী

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সাহানা ছাতনার বাসলীর বিগ্রহ ও ধ্যানমন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মপূজা-বিধানে বাসলীর যে ধ্যান লিখিত আছে, তাহার সহিত ছাতনার বাসলীর অবিকল মিল আছে। ধ্যানমন্ত্রে বাসলী রক্তবর্ণা, রক্তাম্বরা, দ্বিভুজা, খড়্গ ও নরকপালধারিণী, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, প্রবিকটদশনা, রুধির পান করিতে করিতে হাস্যযুক্তা, [শবোপরি] নৃত্যশীলা। অতএব ভয়ঙ্করী।*

ছাতনার লোকে বলে, সেখানে পূর্ব্বে বাসলীর প্রতিমা ছিল না, বলদের পিঠে বেপারী স্থানান্তর হইতে আনিয়াছিল। সে স্থান কোথায়, কেহ কিছু বলিতে পারে না। সেদিন দৈবাৎ অন্যস্থানে এক কিম্বদন্তি শুনিলাম। বাঁকুড়া নগরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ৯ মাইল দূরে ইন্দপুর থানা। ইহার ৩।৪ মাইল দূরে চোংরাবাদ ও আটবাইচণ্ডী, দুই ছোট ছোট গ্রাম আছে। এই চোংরাবাদ গ্রামে এক প্রাচীন মন্দির আছে। পাষাণে নির্ম্মিত, কপাটও পাথরের। ইহাকে বাসলীর থান বা মন্দির বলে। ভিতরে কি আছে, কেহ জানে না, কপাট বন্ধ আছে। প্রবাদ এই, সেখানে পূর্ব্বে নরবলি হইত। গ্রামের লোক পালা করিয়া নরবলি দিত। একদিন এক ব্রাহ্মণের পালা পড়ে। তিনি তাঁহার গোরুর রাখাল এক বাউরী ছোকরাকে বলি পাঠান। সে দড়ী, লাঠি ও একখানা পাটা লইয়া মন্দিরে যায়, এবং বোধ হয়, লাঠি দিয়া বাসলী-প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। তখন দেবী মন্দিরের চূড়া ভেদ করিয়া

---

* নামটি শালতোড়া নয়, সাল-তড়া। উচু ডাঙ্গা যাহাতে বর্ষার জল দাঁড়ায় না, চাষও হইতে পারে না, তাহাকে এখানে তড়া (সং তট) বলে। পূর্ব্বকালে তড়ায় অরণ্য ছিল। তড়া নইলে গ্রাম বসিতে পারে না। 'ত' লুপ্ত হইয়া 'ড়া'ও রয়। এখানে গ্রাম বুঝায়। যেমন, থাৎড়া, বাদড়া, ভৎড়া, হাড়মাস-ড়া, আদ্ড়া (আদরা রেলষ্টেশন) ইত্যাদি অসংখ্য নাম আছে।

† তন্ত্রসার মতে নিত্যা রক্তবর্ণা রক্তাম্বরা ত্রিনেত্রা চতুর্ভুজা, (পদ্ম পাশ অঙ্কুশ ও পূর্ণনর কপাল), এবং মদ-বিহ্বলা। সুতরাং উক্ত সালতড়া গ্রামের নিত্যার বিগ্রহে মেলে না। গঙ্গাজলঘাটীর ৭।৮ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে কুস্থল নামে গ্রাম আছে, সেখানে 'নাচই চণ্ডী' নামে এক দেবী আছেন। এক খড়্গের অর্ধাংশ মাটিতে পোতা আছে। ইনিই দেবী। 'নাচই' শব্দটি নৃত্য শব্দের অপভ্রংশ, কিন্তু গ্রাম্য উচ্চারণে নৃত্য ও নিত্য এক। এই অঞ্চলে নিত্যা নামে অন্য দেবী আছেন কি না, সাল-তড়া নামক থানার সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিতে লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কুস্থল হইতে ১ মাইল দূরে রাণীপুর গ্রামে ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নামে পিত্তলময়ী চতুর্ভুজা দেবী আছেন। এক খয়রা পূজা করে। শিলাখণ্ডরূপে এক মহাদানা আছেন, বাউরীতে পূজা করে। সেখান হইতে প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমোত্তরে এবং ছাতনা হইতে ১৬ মাইল উত্তরে এই সালতড়া। সেখানে নিত্যা কিংবা বাসলী নামে দেবী নাই। সেখানকার গ্রাম-দেবীর নাম "জামলালা।" ইহাঁর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'সালতোড়া গ্রামটি ঘাটোয়ালী মহল। অদ্য (২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) একটি ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ঘাটোয়ালাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বে এসব জায়গা ভয়ঙ্কর জঙ্গল ছিল। একদিন রাত্রে তাঁহার পিতামহ স্বপ্নে দেখেন, শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিয়া এক নারী-মূর্ত্তি বলিতেছেন, 'আমি পাতা ঢাকা রহিয়াছি, আমাকে বাহির করিয়া পূজা কর।' পরদিন সমস্ত বন খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় এক গাছতলায় পাতার নীচে একটি ছোট প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রাত্রে ২ ক্রোশ দূরে গোট নামক গ্রামের মহাদানীকে [মহাদানী উপাধি ব্রাহ্মণের আছে] স্বপ্ন হয় 'আমি সাল-তোড়ায় আছি তোমরা আমার পূজা কর।' তদবধি তাঁহারা পূজা করিতেছেন। তাঁহারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তাঁহারা সেই শিলাখণ্ড চতুর্ভুজা কালীর ধ্যানে পূজা করেন। শিলাটি ৫ আঙ্গুল পরিমিত গোল, মস্তকটি অশ্বমুণ্ডের ন্যায় বক্র। রাত্রে ঐ স্থানে শ্বেত অশ্বে আরূঢ়া নারী-মূর্ত্তি এখনও অনেকে দেখিতে পায়। গত কার্ত্তিক মাসে গ্রামে কলেরা আরম্ভ হয়, ৪।৫ জন লোক মারা পড়ে। দেবীর পূজা দিবার পর ঠাণ্ডা হয়। পূজার দিন শিলারূপা দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পরে রাত্রে এক ঘাটোয়ালাকে দেবী শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বপ্নে বলেন, "আমি যুদ্ধে গিয়াছিলাম। এজন্য গ্রামে বিভ্রাট হইয়াছে আর ভয় নাই।"

* ধ্যানে 'পিব পিব রুধিরং আছে ইহার অন্বয় বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু বাসলীর পূজক ঠিক এইরূপ আবৃত্তি করেন। কেহ কেহ বাসলীকে মঙ্গলচণ্ডী মনে করিয়াছেন। কিন্তু ধ্যান-মালায় মঙ্গলচণ্ডী গৌরী, দ্বিভুজা বরদাভয়হস্তা, রক্তপদ্মাসনস্থা, নবযৌবনসম্পন্না, শুভাননা। ইহাঁর প্রণামে 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে' ইত্যাদি আছে। ধর্ম্মপূজা-বিধানে বাসলীর ধ্যানের পরে আবাহন-মন্ত্রে 'পূজাং মঙ্গলচণ্ডিকাং' দেখিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে। বাসলী 'মঙ্গলকারিণী,' এই অর্থে আবাহনে মঙ্গলচণ্ডিকা হইয়াছেন। তেমনই ইহাকে 'কালী' ও বলা হইয়াছে। ছাতনার বাসলীর সহিত চণ্ডীরও সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীর আসন পঞ্চমুণ্ড, হাত চারি, এবং চারি হাতে বরাভয় ও পুস্তক অক্ষমালা।

পাশের এক পুকুরে লুকাইয়া পড়েন। তদবধি পুকুরের পাঁকে পড়িয়াছিলেন। ঘাটাল হইতে এক দল বেপারী ছাতনা অভিমুখে যাইতেছিল। তাহারা পঙ্কলিপ্ত পাথরে দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই, সামান্য বাটনাবাটা শিল মনে করিয়া ছালায় ভরিয়া ছাতনায় আনে। সেখানে তিনি প্রকটা হন। এই গ্রাম সামন্তভূম পরগণার প্রান্তে অবস্থিত। সেখানে কৃষ্ণবর্ণ পাথর অনেক আছে। লোকে বলে যেন চাল পড়িয়া আছে, মহিষ শুইয়া আছে। বোধ হয় সে পাথরে মূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছিল। সে কালে নরবলি হইত এবং তান্ত্রিকেরাও এইরূপ অসহায় নিম্ন শ্রেণীর বালককে বলি দিত। কত স্থানে কত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মরাজ ঠাকুরও কম ছিলেন না। ভক্ত লাউসেন স্বীয় দেহ নবখণ্ডে কাটিয়া আহুতি দিলে তিনি সদয় হন। যে জাতির যেমন প্রকৃতি, তাহার ঠাকুরেরও তেমন প্রকৃতি হইয়া থাকে।

বিশালাক্ষী এরূপ নহেন। তন্ত্রসারে তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ষোড়শী, প্রসন্নমুখী। তাঁহারও হাতে খড়্গ আছে, কিন্তু অন্য হাতে নরকপাল নাই, আছে চর্ম্ম বা ঢাল। তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, মাথায় জটা, আসনে শব আছে। তিনি অম্বিকা, চণ্ডী। ঠিক এই আকারে বিশালাক্ষী কোথাও আছেন কি না, জানি না। তন্ত্রের অনেক দেবীর প্রকারান্তর আছে। সাধকের ইচ্ছানুসারে বিশালাক্ষী দেবীর প্রকারান্তর হইয়াছে।* কিন্তু যিনি যে নামে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সে নামেই পরিচিত আছেন। বিশালাক্ষীকে বাসলী বলিতে শোনা যায় না। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মাণিকরাম গাঙ্গুলি তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে 'বাসুলী বিশালা' এই দুই নাম পৃথক্ রাখিয়াছেন। বিশালাক্ষী নাম সংক্ষেপে 'বিশালা'। তিনি লিখিয়াছেন, "বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাসুলী" ; আর, "আনুড়ের বিশালায় বন্দি ভক্তি করি" ; "বিক্রমপুরের বিশালার বন্দিয়া চরণ ;" "বুঞারের চণ্ডী রঙ্গপুরের বিশালাক্ষী ;" ইত্যাদি। (এখানে দ্রষ্টব্য, বীরভূম-নান্নুরের বিশালা বা বাসলীর নাম নাই।)

সামন্তভূমে বাসলী যত, অন্যভূমে তত নাই। বাঁকুড়া ছাড়াইয়া হুগলী ও বর্দ্ধমানের দিকে যত যাওয়া যায়, গ্রামদেবীও তত কম হইয়াছেন। স্থানে স্থানে ধর্ম্মরাজ আছেন, শীতলা আছেন ; কিন্তু গ্রাম-দেবতার আসন হইতে ক্রমশঃ নামিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের স্থানে শিব ষোলআনায় অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের দেবতা হইয়াছেন। ধর্ম্মের গাজন, শীতলার গাজন হয়, কিন্তু শিবের গাজনের তুল্য ঘটা হয় না। আগুনে ও লোহার কাঁটায় ঝাঁপ দেওয়া, চড়ক গাছে ঘোরা এখন উঠিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সে সব কর্ম্ম নিম্নশ্রেণী হিন্দুর ছিল।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণে বাসলীর পূজা করিতেন না, ধর্ম্ম-ঠাকুরের ধার দিয়া যাইতেন না। বাঁকুড়ার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত গ্রামের ও মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের মাণিকরাম গাঙ্গুলী ধর্ম্মপূজা দূরে থাক, ধর্ম্ম-মঙ্গল-রচনা করিতে ও গান

---

* বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণে আরামবাগ ও ঘাটাল। আরামবাগের উকীল ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানদাচরণ সেনগুপ্ত আমায় জানাইয়াছেন,—ভাঙ্গামোড়া গ্রামে এক বিশালাক্ষী আছেন। তিনি দারুময়ী, রক্তবর্ণা, রক্তাম্বরা, চতুর্ভুজা, বরাভয়করা গদাপদ্মধারিণী, সৌম্যমূর্ত্তি ও ষোড়শী। বামপদ ভৈরবের মস্তকে, দক্ষিণপদ শবোপরি স্থাপিত। ঐ গ্রামের নিকটে এক বিশালাক্ষী আছেন। তিনি মৃন্ময়ী, চতুর্ভুজা, কিন্তু লোল-জিহ্বা, রক্তাধর-ওষ্ঠা, সিংহবাহিনী। আরাম-বাগের নিকটস্থ বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী প্রস্তরময়ী, কিন্তু যন্ত্ররূপা। ইনি রাজা রণজিৎ রায়ের সাধন-যন্ত্র ছিলেন, কন্যারূপে দেখা দিতেন। ইনিই রণজিৎ রায়ের দীঘীতে হাতে শাঁখা দেখাইয়া রাজ্য ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। আরামবাগের ৪মাইল দূরে বাসলী-চক নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখানে এক তেঁতুল-তলায় বাসলী থাকিতেন। গ্রামে এখন মুসলমানের বাস, বাসলী স্থানান্তরিত হইয়াছেন। [চক অর্থে সেখানে মাঠ। মাঠে গাছতলায় বাসলী স্মর্ত্তব্য। ঘাটালের অধীন জাড়া গ্রামের শ্রীযুত মৃগাঙ্কনাথ রায় লিখিয়াছেন,—ঘাটালের নিকটস্থ বরদা গ্রামে এক বিশালাক্ষী আছেন। তিনি বরদার রাজা শোভাসিংহের গড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। পূর্ব্বে স্বর্ণ প্রতিমা ছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজা লইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মূর্ত্তি মৃন্ময়ী অষ্টভুজা, দুর্গা প্রতিমার মতন। কিন্তু দুই পা দুই শবের উপরে, এক পা প্রত্যালীঢ় ভাবে আছে। বিশালাক্ষীর ধ্যানে পূজা হয়। জাড়া গ্রামের নিকটে রেঙনা নামক গ্রামে বিশালাক্ষী আছেন। ইনি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত, দশভুজা, সিংহবাহিনী। মূর্ত্তি অতি প্রাচীন, অতিসুন্দর। জাড়া গ্রামে বাসুলীতলা স্থানে এক পাকুড়গাছের তলায় বাসলী আছেন। কলাই-ভাঙ্গা জাঁতার আকার, সিন্দুর-লিপ্ত। মাঝে এক বড় গর্ত্ত আছে। প্রবাদ, তাহাতে শূল পুতিয়া নরবলি দেওয়া হইত। রামজীবনপুরের নিকটে বাসুল্যা নামক গ্রামে এক বাসলী এক মন্দিরে আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখা হয় নাই।—এইসকল বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে, বিশালাক্ষীর নানা মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ও বাসলী এক ছিলেন না। বাসলী এখানেও মাঠে বাস করিতেন, কখনও নরবলি আস্বাদ করিতেন।

গাইতে গিয়া জাতিনাশের শঙ্কায় অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বিষম ধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।' তিনি ধর্ম্মকে দ্বিজরূপে বারবার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীতচিত্তে সে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অথচ তাঁহার গ্রামে 'বাঁকুড়া রায়' ধর্ম্মঠাকুর জন্মাবধি দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা অনুমান করিতে পারি। নিদ্রিত চণ্ডীদাসকে চাপড় খাইতে হইয়াছিল। সেটা যদিও সহজ সাধনে প্রবৃত্তি জাগাইতে বটে, তথাপি তিনি বাসলীর আদেশে ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসলী-চরণ-বন্দনায় ভক্তির লক্ষণ নাই। স্বপ্নে বাসলী এখনও দেখা দিয়া থাকেন, আদেশও করেন। এ সব অবিশ্বাসের কথা নয়। যে বাসলী চণ্ডীদাসকে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি মানবী বা দানবী বা পিশাচী নহেন। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী ডাকিনী। তন্ত্রমতে ডাকিনী ও যোগিনী দেবী-বিশেষ। স্বপ্নতত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝি, তিনি দেবী। কিন্তু 'সে এক বাসলী,' নারীমূর্ত্তি; তাঁহার পূজনীয়া বাসলী, প্রস্তরখণ্ডরূপা বাসলী নহেন। সেকালে ব্রাহ্মণে বাসলীর পূজাই করিতেন না, প্রসাদগ্রহণ ত দূরের কথা। এই কারণে শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের উষ্মা হইয়াছিল। ছাতনায় জনশ্রুতি, চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাস বাসলী-পূজায় সম্মত হন নাই। কারণ ঠাকুরের পূজা করিবেন, অথচ তাঁহার প্রসাদ ফেলিয়া দিবেন, হইতে পারে না। দেবী স্বপ্নে পিতা সম্বোধন করিয়া, তাঁহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন এবং শঙ্কা দেখিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন বাসলীর দেঘরিয়ারা ব্যাপারটা অন্যরূপে ব্যাখা করেন। বলেন, কন্যার প্রসাদ পিতা পাইতে পারেন না। অন্য ব্রাহ্মণে বলেন, দেঘরিয়াকে ছত্রিশ জাতির, অন্ত্যজ জাতির, মানসিকের পূজা করিতে হয়, এই হেতু দোষ। কিন্তু যে-কালে গ্রাম-যাজকতা দোষাবহ গণ্য হইত, সেকাল বহুদিন অতীত হইয়াছে। মানসিকে ভোগ দেওয়া হয় না; হয় ছাগ, মণ্ডা ও মুড়ি, সুতরাং সে দোষ অধিক নয়। বোধ হয়, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস বিদেশী না হইলে এবং দরিদ্র না হইলে বাসলী-পূজায় সম্মত হইতেন না। স্বদেশে যে আচার-গর্হিত বিবেচিত হয়, বিদেশে তাহার লঙ্ঘনে বাধা বোধ হয় না। ছাতনায় তখন কি অন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না? *

৩। ছাতনার রাজবংশের অভ্যুত্থান হেতু বাসলীর প্রসিদ্ধি

বাসলী, সামন্তভূমে কতকাল হইতে গ্রাম-দেবী, কে জানে। গ্রামে দৈবদুর্ব্বিপাক হয়, গ্রাম-দেবী তাহা হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। তিনি যিনিই হউন, একবার স্থাপিত হইলে অজ্ঞজনের মনে চিরকাল ভয় এবং কদাচিৎ ভক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। সঙ্গে-সঙ্গে মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, উপাখ্যান রচিত হয়।

ছাতনার রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সহিত তথাকার বাসলীও উপাখ্যানের বিষয় হইয়াছেন। এক উপাখ্যান সত্যকিঙ্করবাবু বর্ণনা করিয়াছেন। এই উপাখ্যান সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৪র্থ ভাগে) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র-বাবুও দিয়াছেন। আর-একটু ভিন্ন আকারে ওমালী সাহেব বাঁকুড়া জেলার বিবরণে 'সামন্তভূম' এই নামের নীচে বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয়, তিনিও রাজবংশের কাহারও নিকট শুনিয়াছিলেন। আরও একটু ভিন্ন আকারে প্রত্নদ্রব্য-বিভাগের বেগলার সাহেব ই° ১৮৭২-৭৩ সালে শুনিয়াছিলেন। সত্যকিঙ্কর-বাবু এই দুই ঐতিহ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন। লোক-মুখে কাহিনীর যেমন অবান্তর বিষয়ে রূপান্তর হয়, এখানেও তেমন হইয়াছে। কালের নামগন্ধ থাকে না, কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা তাহারও উল্লেখ থাকে না; থাকে কেবল সে ঘটনার, যেটায় বক্তার বিস্ময় জন্মে, যেটায় অলৌকিক কিছু থাকে।

সকল উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, সামন্ত নামক জাতি বাসলীর পূজা করিত, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মানিতেন না। তাঁহার কৃপায় কিন্তু সামন্তেরা রাজা হন। এত বড় একটা ঘটনা যাহাতে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্মিলিত হইয়াছে,

* ছাতনায় রাজপুরোহিত, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। বাসলীর দেঘরিয়া, মুখোপাধ্যায়। রাজপুরোহিতের পূর্ব্বপুরুষ বাসলী-পূজায় নিযুক্ত হন নাই। দুইবংশ পৃথক্, কর্ম্মও পৃথক্। শুনিতে পাই, পুরোহিত বংশ বহুকাল হইতে সমাজে হীন হইয়া আছেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে এক কাহিনীও আছে।

তাহা চিরস্মরণীয় হইবার কথা। আরও দেখা যাইতেছে, বাসলী প্রথমে ছাতনায় ছিলেন না, অন্য স্থানে ছিলেন। তখন তাঁহার মন্দির ছিল না। তখন তিনি প্রকটাও হন নাই। সামন্তরাজারা চিরদিন ছাতনায় বাস করেন নাই। ছাতনা হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে কাঁসাচড়া নামে এক ক্ষুদ্র নদীর পাশে নন্দুআড়া নামে এক গ্রাম আছে। এক সময়ে সেখানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও নাকি তাহার ভগ্নস্তূপ আছে। আর এক জনশ্রুতি, তাঁহাদের রাজধানীর নাম বাসলীনগর ছিল। বাসলী শব্দের বিকারে বাহলী, বাহ্‌লী হইয়া সে নগরের নাম বাহ্‌লীয়া বা বাহ্‌ল্যানগর হইয়াছিল।* এই নামের এক চিহ্ন, "বৌলপোখরিয়া" নামে প্রসিদ্ধ এক পুষ্করিণী আছে। বাঁকুড়া হইতে ছাতনা যাইবার পথের বাম পাশের জঙ্গলে পড়ে। সেখান হইতে বাসলীর আদি মন্দির আধ মাইল হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী, নির্ম্মল জল, পুরাতনও বোধ হয়। কিন্তু পরিত্যক্ত। মানুষের কথা দূরে থাক্, লোকে বলে, গো-মহিষাদিও সে জল স্পর্শ করে না। এই যে ভয় ও বিশ্বাস, তাহার সহিত কোন ভয়ানক ঘটনা জড়িত ছিল। 'বাসলী' শব্দের বিকারে বাহ্‌লী—বাউলী —বৌল মনে হয়। মনে হয় বৌলপোখরিয়া—বাসলী পোখর, কোনও কালে পাশে বাসলী থাকিতেন, এবং তাহা হইতে স্থানটির নাম বাহ্‌ল্যা নগর ছিল।

ওমালী সাহেবের লিখিত উপাখ্যানে ১৩২৫ শকে সামন্তবংশের শঙ্খরায় আদি রাজা হন। এই শকের পূর্ব্বের কাহিনী নাই, বাসলীরও নাম পাই না। কি কারণে এই শকটি স্মরণে রহিল? অন্য জানা শকের সহিত মিলাইয়া অনুমান, না এমন কিছু জানা ছিল যাহা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে! শঙ্খরায় হইতে বর্ত্তমান রাজা কত পুরুষ? কেহ বলেন ১৯, কেহ বলেন ২১। ২১ পুরুষ হইলে এবং পুরুষ প্রতি ২৫ বৎসর ধরিলে ৫২৫ বৎসর পাই। বর্ত্তমান ১৮৪৮ শক হইতে বাদ দিলে ১৩২৩ শকে আসি। হয়ত এইরূপে পুরুষ গণিয়া ১৩২৫ শকের উৎপত্তি। অতএব আদি রাজা হইতে বর্ত্তমান রাজা ২১ পুরুষ ধরিতে হইতেছে।

শ্রীযুত জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া বলেন, চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাস হইতে তিনি ২২।২৩ পুরুষ। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর; অতএব তাঁহাকে লইয়া ২৩ পুরুষ ধরিতে পারি। পুরুষ প্রতি ২৫ বৎসর ধরিলে দেবীদাস হইতে ৫৭৫ বৎসর গত হইয়াছে। অর্থাৎ দেবীদাসের জন্ম ১৮৪৮—৫৭৫=১২৭৩ শকে হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের জন্ম ১২৭৫ শকে ধরা যাইতে পারে। পূর্ব্বে আমরা চণ্ডীদাসের মৃত্যুশক ১৩২৫ অনুমান করিয়াছি। অতএব এই কালের সহিত বিসম্বাদ ঘটিতেছে না। সে সময়ে যে বাসলী গ্রামদেবী ছিলেন, তাহা উপাখ্যানে আছে; না থাকিলেও ধরিয়া লইতে পারা যাইত।

এইখানে কাহিনী শেষ হইলে জনশ্রুতি সম্বল করিয়া পালা সাঙ্গ করা যাইত। কিন্তু ঐতিহ্য আছে, হামীর-উত্তর রায় দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ওমালী সাহেবের উপাখ্যানে শঙ্খরায়ের পৌত্র হামীর-উত্তর রায়। তাহা হইলে ইনি প্রায় ১৩৪০ শকে কি কিছু পূর্ব্বে ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে চণ্ডীদাসকেও ১৩২৫ শকের পরে আনিতে হয়। চণ্ডীদাসকে অনেকে অনেক পরে আনিয়াছেন। তাহা হইলে এখানেও বিসম্বাদ ঘটিতেছে না। যদিও চণ্ডীদাসের মৃত্যুশক সম্বন্ধে আমার অনুমানে বাধা পড়িতেছে।

ই° ১৯১২ সালে (২৩ শে অক্টোবর) বাঁকুড়ার কালেক্টর সাহেব ছাতনার তৎকালীন রাজা ৺মহেন্দ্রলাল সিংহ দেও (বর্ত্তমান রাজার পিতা) নিকট হইতে ছাতনা রাজবংশ-বৃত্তান্ত ইংরেজী ভাষায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কালেক্টরের আপিস হইতে নকল লইয়া এখানে বাঙ্গালায় অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। (ঘ কাহিনী)

পূর্ব্বকালে এক পাঠান বাদশাহের আমলে শঙ্খরায় সামন্ত নামে এক ক্ষত্রিয় এক সামন্তদেশের রাজাশাসক

---

* বাসলী শব্দ ওড়িয়াতে 'বাসেলী' ও 'বাহেড়ী'। সোনামুখীর নিকটে বাহ্‌লীয়া নামে এক গ্রাম আছে। কিন্তু সোনামুখী সামন্তভূমে নয়। কাজেই উপরের বাহ্‌লীয়া নগর হইতে পারে না। ছাতনা হইতে ২৷৷ মাইল ঈশান কোণে 'বাসলীবান্ধ' নামে এক গ্রাম আছে। এখানে কি আছে জানা হয় নাই! বাহল্যা—উচ্চারণে বাহলিয়া।
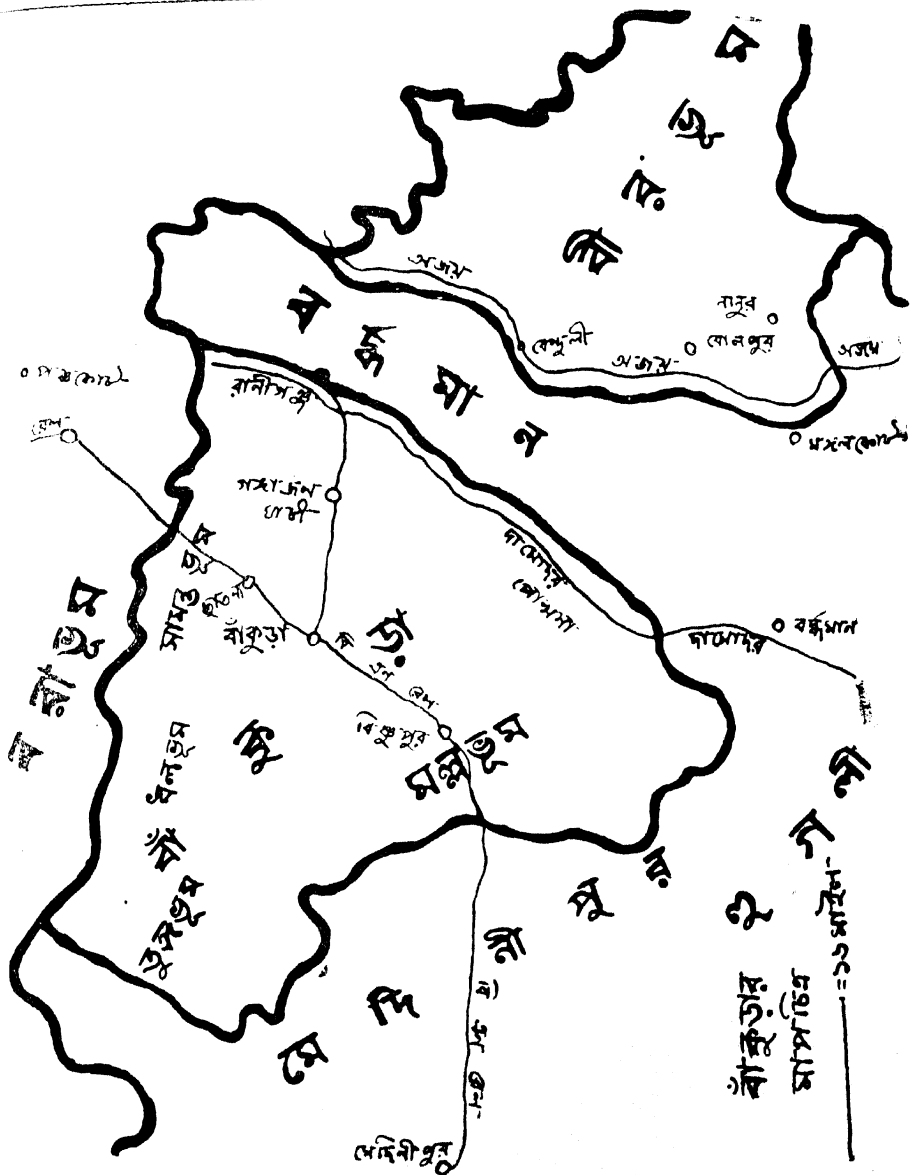
ছিলেন। কোন কারণে বাদশাহ শঙ্খরায়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার চাকরি কাড়িয়া লইয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। শঙ্খরায় (১)ছাতনায় আসিয়াবাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নৃসিংহ রায় সামন্ত (২) এক বিষয় অধিকার করেন। সেই বিষয়ের নাম হইতে সামন্তাবনিনাথ নামে রাজা হন। তাঁহার পুত্র হামীর উত্তর রায়ের (৩) সময়ে বিশালাক্ষী প্রতিষ্ঠিতা হন। তাঁহার পুত্র বীর হামীর রায়কে(৪)তাড়াইয়া ভবানী ঝায়্যাৎ

(উচ্চারণ ঝারাগ্নাৎ) নামে এক ব্রাহ্মণ অল্পকাল রাজত্ব করেন। সামন্তেরা ভয়ে মেদিনীপুর জেলায় শিলদা গ্রামে আশ্রয় লয়েন। পরে বিশালাক্ষী দেবীর কৃপায় তাঁহারা হৃত জমিদারি পুনরুদ্ধার করেন। এই বার জন সামন্তের জ্যেষ্ঠ রাজা হন। তদবধি রাজা উপাধির আরম্ভ। তাঁহার সময়ে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃসিংহ নারায়ণ সিংহ দেও ছাতনা দিয়া পুরীতীর্থে যাইতেছিলেন, এবং রাজা রায় সামন্তের (৫) সহিত পরিচিত হন। রাজা রায় সামন্তের পুত্র ছিল না, এক কন্যা ছিল। তিনি নৃসিংহ নারায়ণকে স্বীয় কন্যা এবং যৌতুক স্বরূপ সামন্তভূম ও

৩য় লেখ সম্বলিত ইটের ছবি

সামন্তাবনিনাথ উপাধি দান করেন। নৃসিংহের (৬) পুত্র মহন্ত (৭) মহন্তের পুত্র জটিল বিবেক নারায়ণ, (৮) তৎপুত্র স্বরূপ নারায়ণ(৯) তৎপুত্র খোঁড়া বিবেক নারায়ণ(১০) পরে পরে রাজা হন। তৎকালে মুর্শীদাবাদের নবাব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার 'রাজা' উপাধি স্বীকার করেন। (=১০পুরুষ)

ইহার পুত্র স্বরূপনারায়ণ১ (২য়), পুত্র লছমী নারায়ণ২, পুত্র স্বরূপ নারায়ণ৩ (৩য়), পরে ভ্রাতা বলরাম, পুত্র লছমী নারায়ণ৪ (২য়), পুত্র আনন্দলাল৫, রাণী অক্ষয়কুমারী, রাণী আনন্দ কুমারী, মহেন্দ্র লাল৬, পুত্র হেমেন্দ্রলাল৭ পরে পরে রাজ্য শাসন করেন। (=৭ পুরুষ)

এই বিবরণে কোথাও কালের উল্লেখ নাই। আর যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি জানা-শোনা পাথরে ক্ষোদা বাসলী নাম কেন বিশালাক্ষী করিয়াছিলেন, কে জানে। বোধ হয়, শুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষাতেও অনবধানতা আছে। দেখা যাইতেছে, আদি শঙ্খরায় হইতে বর্ত্তমান রাজা ১৭ পুরুষ হইয়াছেন; ২১ নয়, ১৯ও পাই না। কিন্তু দেখা যায়, লোকে বরং কত পুরুষের বাস বলিতে পারে, পর পর নাম বলিতে পারে না। এই যুক্তিতে মনে হয় প্রথম ১০ পুরুষের নামে গোল হইয়াছে, আরও ৪ পুরুষ ছিল।

খোঁড়া বিবেক-নারায়ণ বাসলীর দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরের গায়ে নির্ম্মাণ-কাল ১৬৫৫ শক লেখা আছে। ইহার পূর্বের ইতিহাস লেখা ছিল না, মুখে মুখে ছিল। যেমন বহু বহু রাজবংশের হইয়াছিল, এখানেও তেমনই যা-তা জোড়া-তাড়া দিয়া বংশলতা খাড়া করা হইয়াছে। সুতরাং বিসম্বাদে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রাজারা বলেন, বংশলতা মনে রাখা ভাটের কর্ম্ম। তাঁহাদের পশ্চিমদেশীয় ভাট ছিল, বৎসর বৎসর আসিয়া পূর্ব পুরুষদের গুণ-গ্রাম শোনাইয়া যাইত। গত পাঁচসাত বৎসর আসে নাই। তাহাদের গৃহদ্বারও কেহ জানে না। আমরাও খোঁজ করি নাই, কারণ বুঝি ভাটের মুখে শক শুনিতে পাইব না।

সামন্ত ভূমের খঞ্জ বিবেক-নারায়ণের সময়ে বরাহভূমেও এক বিবেকনারায়ণ রাজা ছিলেন। ("লালসিংহ" ৪৭ পৃষ্ঠা)। দুই ব্যক্তি এক কি না, কে জানে। উপরে পাইয়াছি, উত্তর হাম্বীর রায়ের পুত্রের নাম বীর হাম্বীর। মল্লভূমের ইতিহাসে বীর হাম্বীর এক প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০৯ শকে মল্লভূমে রাজা হন। (অভয় মল্লিক কৃত মল্লভূমের ইতিহাস)। তিনিই শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার অধিকারে এই ধর্ম প্রচার করেন। তিনি পাঠানদের বিরুদ্ধে মুগল বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ও জগৎসিংহের সহায় হইয়াছিলেন। সেই বীর

হাম্বীর, সামন্ত রাজবংশেও আসিয়া পড়িয়াছেন কি না, জানা নাই। সামন্ত বংশ বৈষ্ণব ছিলেন না, মল্লবংশও ছিলেন না। পরে উভয় বংশই এক বৈষ্ণব গোস্বামীর শিষ্য হইয়াছেন। মল্লবংশে হামীর উত্তর রায় নামে রাজার নাম পাওয়া যায় না। অতএব ইহাঁকে সামন্ত বংশের রাজা ধরিতে হইতেছে। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন না; বৈষ্ণব হইলে বাসলীর মন্দির গড়াইয়া ব্রাহ্মণপুজক নিযুক্ত করিতেন না। যদি বীর হাম্বীর একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহাঁর পিতা হামীর উত্তর রায় ১৫০৯৫—২৫= ১৪৭৪ শকে ছিলেন। *

রাজবংশের গ্রহাচার্য্য বা জ্যোতিষী আছেন। তাহার নিবাস ছাতনা হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে সাল-ডিহা গ্রামে। তাহাঁর নিকটে কিছু লেখা আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত শ্রীযুত রামানুজ কর-কে অনুরোধ করি। তিনি নানাবিষয়ে আমার সাহায্য করিয়াছেন, গণকের বাড়ীতে গিয়া গণকের পাঁজি হইতে রাজাদিগের নাম ও রাজ্যকাল টুকিয়া আনিয়া ছিলেন। কিন্তু খড়্গবিবেক নারায়ণের পূর্ব্বের নাম নাই। এক শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা পাঁজিও নাই। গণকের পাঁজিতে ইনি সন ১০৯৮ সালে ১৬১৩ শকে রাজা হইয়া ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই ১৬৫৫ শকে বাসলীর দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইহার সহিত রাজবংশলতা মিলাইলে ১৬১৩ শকের ৬ পুরুষ পূর্ব্বে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৬৩ শকে হামীর উত্তর রায়ের কাছে যাই। অতএব ইহা দ্বারা বাসলীর প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভবপর হয়। গণকের পাঁজিতে প্রসিদ্ধ দেবতার প্রকাশ-কালও আছে। কিন্তু মনঃকল্পিত মনে হয়। আছে, ছাতনার রাজ্যপাট ৪৫১ বৎসর, এবং বাসলীপ্রকাশ ৮২২ বৎসর হইয়াছে। অতএব তাঁহার পাঁজি মতে ১৮৪৮—৪৫১=১৩১৭ শকে প্রথম রাজা, এবং ১৮৪৬—৪২২=১৪২৬ শকে বাসলী প্রকটা হন। প্রথম কালটি কোন্ রাজার কে জানে। আরও তিন পুরুষ পিছাইয়া না গেলে ১৩২৫ শকে আদি রাজা পাই না। দ্বিতীয় কালটি ঠিক কি না, বুঝিবার উপায় নাই। হয়ত ১৪২৪ শকের পূর্ব্বে মূর্ত্তিময়ী বাসলী ছাতনায় আসেন নাই। ইহা সত্য হইলে মূর্ত্তির সহিত দেবীদাস ও চণ্ডীদাসের আগমন-বার্ত্তা মিথ্যা কিংবা এই চণ্ডীদাস এবং আমাদের অন্বেষণের চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহেন। কিংবা এই হামীর উত্তর রায়ের চারি পুরুষ পূর্ব্বে আর এক হামীর উত্তর রায় ছিলেন। পূর্ব্বে যে চারি রাজার নাম

তম্ন লেখ সম্বলিত ইটের ছাপ

পাওয়া যায় নাই, হয়ত ইহাঁদের মধ্যে কেহ হামীর রায় নামে রাজা ছিলেন। রাজবংশে পিতামহের নামে পৌত্রের নাম হইত।

এক হামীর উত্তর রায়ের কাল জানিবার এক 'পাথর্য্যা' প্রমাণ দৈবাৎ বর্ত্তমান আছে। প্রথম মন্তব্যে বাসলী মন্দিরের বেষ্টন প্রাচীরের ইটের লেখার উল্লেখ করিয়াছি। ইটগুলি ছোট ছোট টালির মতন পাতলা, কিন্তু সকল ইট দীর্ঘে প্রস্থে সমান নয়। চুণ সুরখী দিয়া গাঁথা নয়, উপরে উপরে বসান ছিল। মন্দির পাথরের; মর্কট (laterite) ও "নাইস" প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। ভাল কাটা নয়, বাহির ছাড়া ভিতরের পাশ ঘষা মাজা নয়; গাঁথনিতে কোন চুণ মশলা নাই; কিন্তু স্থানে স্থানে লোহার কীলক আছে। বেগ্‌লার সাহেব প্রাচীরের ইটে চতুর্ব্বিধ লেখ দেখিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু ত্রিবিধ

* ১৩০৪ সালে লিখিত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুর উপাখ্যানে হামীর রায় ও উত্তর রায়, দুই-সহোদর রাজপুত বালক ছাতনায় আসে। তাহা হইলে আরও গোল, এবং নৃসিংহ সিংহের জামতা হইয়া রাজ্যলাভ মিথ্যা। শঙ্খরায়ের নামও নিঃশঙ্ক নারায়ণ শুনিয়াছি। বর্ত্তমান রাজা বলেন, উত্তর রায় ও হামীর উত্তর রায় এক ব্যক্তি ছিলেন না। কাগজে কলমে না থাকিলে এইরূপই হয়।

মাত্র পাইয়াছি। চতুর্থ লেখ আছে কি না, জানি না। আমরা যে ত্রিবিধ লেখ পাইয়াছি, তাহার একটিতে অক্ষর উপরে, দুইটিতে ভিতরে। কাদা ইটে ছাপিয়া ইট পরে পোড়ানা হইয়াছিল। তিনটিতেই একই শক ১৪৭৬। ভাসা অক্ষরের লেখ সহজে পড়িতে পারা যাইতেছে। আছে, শ্রীশ্রীছাতনা নগরেশ শ্রীশ্রীউত্তর রায় শক ১৪৭৬। অন্য দুই লেখ পড়িতে পারা যাইতেছে না। যদি বা অক্ষর চেনা যাইতেছে, অর্থ ঘটিতেছে না। কলিকাতায় শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কাগজে তেল কালীর ছাপ দেখিয়া প'ড়তে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাঠে অর্থ ঘটিতেছে না। এখানে তিন লেখের ফটো দেওয়া গেল। ২য় লেখে বেগ্‌লার সাহেব পড়িয়াছিলেন 'কোন্‌হা উত্তর রায়', পণ্ডিতে পড়িয়াছিলেন 'হামীর উত্তর রায়', কিন্তু
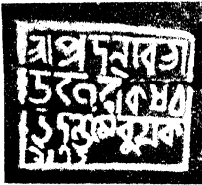
ইটে তৃতীয় লেখ

'কান্' বাদ পড়িয়াছে। চন্দ-মহাশয় বলেন, কান্=খান্; অর্থাৎ হামীর উত্তর রায় খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজারা সে কথা অস্বীকার করেন। তা ছাড়া, এই নামের পরে কি লেখা আছে, তাহা না বুঝিলে একটা নাম হইতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ৩য় লেখে কি আছে, কে জানে।

এখানে আর একটা কথা বলি। আদি স্থানের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, পাথরের মন্দির, আর দুই হাত ভিত্তির প্রাচীর ভাঙ্গিল কেন। অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষও দেখিতে পাই না। সে সে গাছের শিকড় মন্দির ফাটাইয়া দিতে পারিত, তেমনই আঠেপিঠে জড়াইয়া ধরিয়াও রাখিত। মন্দিরের স্থান পরিবর্ত্তনই বা কেন হইল। লোকে বলে, সম্মুখের পথ দিয়া গোরা-পল্টন যাতায়াত করিত, একদিন দেবী থোঁড়া বিবেক নারায়ণকে স্বপ্নে বলেন, তাঁহার গায়ে গোরার পায়ের ধূলা উড়িয়া পড়ে, তাঁহাকে স্থানান্তরে রাখ। সেইহেতু এই মন্দির ত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু খৃঃ ১৭০০ অব্দে গোরাপল্টন যাতায়াত করিত, মনে হয় না; তাহাতে প্রাচীরই বা ভাঙ্গিতে হইবে কেন। আমার মনে হয়, মুসলমান সৈন্যের আক্রমণে মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বাসলী কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় এইটুকু বলিতে পারি, যদি উত্তর রায় ও হামীর উত্তর রায় এক ব্যক্তি হন, এবং হামীর উত্তর রায় নামে পূর্ব্বে কেহ না থাকেন, তাহা হইলে ইঁহার সময়ে আমাদের চণ্ডীদাস কদাপি ছিলেন না। তবে কি আদি চণ্ডীদাসের দেড়শত বৎসর পরে দ্বিতীয় চণ্ডীদাস? অবশ্য দুই-ই কখনও একভাবে আসিয়া একই কাহিনীর আকর হন নাই।

৪। চণ্ডীদাস ছাতনার বাসলীর পূজক ছিলেন না, বড়ু ছিলেন।

এ পর্য্যন্ত ছাতনায় বাসলীর প্রাচীনত্ব ও প্রসিদ্ধি দেখিয়াছি, কিন্তু চণ্ডীদাসের সহিত সম্পর্ক পাই নাই। অবশ্য কিম্বদন্তি আছে। অন্ততঃ একশত বৎসর কিম্বদন্তি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জনশ্রুতি মহা জনশ্রুতি হইলেও আপ্ত রূপে গণ্য হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ বাসলীর দেঘরিয়া-বংশ। এই বংশের বর্ত্তমান পূজকেরা বলেন, তাঁহারা চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবী-দাসের বংশ। ছাতনার শ্রীযুত হরিনারায়ণ দেঘরিয়ার বয়স ৯০ বৎসর। তিনি পুরুষগণনায় ভুল করিলেও দেবী-দাস চণ্ডীদাসের নাম বলিতে ভুল করেন নাই। লোকে বিশ্বাস করে, কারণ পিতৃপুরুষের নাম কেহ পরিবর্ত্তন করে না।*

* বীরভূম-নান্নুরের বিশালাক্ষীর পূজক, কার বংশ, তাহা ঠিক জানা নাই। কখনও নকুল নামক এক ব্যক্তির, কখনও তাহাও নয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের সহিত সে বংশের যোগ থাকিলে বর্ত্তমান পূজকেরা নিশ্চয় স্মরণ করিয়া রাখিতেন। আর, বংশ যে থাকিবেই, এরূপ প্রতিজ্ঞাও করিতে পারা যায় না। তার পর, চণ্ডীদাস নাকি বামাচারী ছিলেন, রজকী-সঙ্গতি হেতু দ্বিজত্ব হারাইয়া ছিলেন। কিন্তু বামাচারীর জাতি যায়, এবং কুটুম্ব-ভোজন দ্বারা জাতি ফিরিয়া আসে, ইত্যাদি সংবাদ নূতন। কবি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বর্ণনা করিলে ভাল করিতেন। "চণ্ডীদাস" প্রণেতা শ্রীযুত করালীকিঙ্করকে বিশালাক্ষীর বর্ত্তমান পূজক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা

তথাপি বংশের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব প্রচারের প্রতি লোকের এত স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে যে, ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই, অপরেও মনে করে তাহারা জনে জনে আর্য্যসন্তান। কে জানে ছাতনায় বাসলীর দেঘরিয়া বংশ এইরূপ আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসের সহিত সম্বন্ধ পাতান নাই? বর্ত্তমান দেঘরিয়া শ্রীযুত জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাস হইতে কত পুরুষ তাহা বলিয়াছেন, এবং সেকাল চণ্ডীদাসের অনুমানিক কালেরও সহিত মিলিয়াছে। দেঘরিয়াদিগের সহিত কথা-বার্ত্তায় তাঁহাদিগকে শেখানা সাক্ষীও মনে হয় নাই। শেখানা হইলে উক্তির মধ্যে বিসম্বাদ কিংবা কোন অংশ অসংলগ্ন থাকিত না। যদি বাসলীর আদি মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে, ১৪৭৬ শকের নিকটবর্ত্তী সময়ে, চণ্ডীদাস সহ দেবীদাস আসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তদবধি ৩৭২ বৎসরে ২২ পুরুষ গত হইতে পারে না। শেখানা সাক্ষী এই বিসম্বাদের উত্তরও ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে, তাঁহাদের চণ্ডীদাস ও দেবীদাস বীরভূম-নান্নুরে থাকিতেন, পরে দেবীদাসের কোন অধস্তন সন্তান ছাতনায় আসিয়া বাসলীর দেঘরিয়া হইয়া সেখানে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা বলেন না, ছাতনায় চণ্ডীদাসের জন্মভূমি; সকলেই বলেন তিনি অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন।† এরূপ স্থলে দেঘরিয়ার উক্তি মিথ্যাও

২য় লেখ সম্বলিত ইটের ছাপ

হইবে না। শাঁখা-পোখর, ধোপা-পোখর আছে বটে, কিন্তু সেও চণ্ডীদাস-কাহিনীর মতন একসময়ের কাহিনী মাত্র। যদি অতি প্রাচীন জনশ্রুতি পাই, তাহা হইলে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। ইটের লেখা পড়িতে পারা গেল না, কিন্তু তাহাতে চণ্ডীদাসের, একজন বড়ুর, নামই বা কেন থাকিবে। সেটা দান-শাসন নয়। অতএব পুরাতন লেখা পুথী মাত্র থাকিতে পারে।

"বাসলী মাহাত্ম্য" নামক পুথী সে অভাব পূরণ করিয়াছে। গত বৎসর ফাল্গুন মাসে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" প্রবন্ধ প্রবাসীতে পাঠাইবার পর তথাকার মন্দিরাদির ফোটো দিবার কল্পনা হয়। চৈত্র মাসে ফটো তুলাইতে যাই এবং সে সময়ে ছাতনা টোলের অধ্যাপক শ্রীযুত হরগোবিন্দ স্মৃতিরত্নের হাতের লেখা খাতায় "বাসলী-মাহাত্ম্য" দেখিতে পাই। তিনি মূল পুথী হইতে নকল করিয়াছিলেন। পুথীখানি তাঁহার নিকট ছিল না। কিন্তু শুনিলাম এমন জীর্ণ যে, পাতা উল্টাইতে শঙ্কা হয়, এবং লেখাও সব পড়িতে পারা যায় নাই। কিন্তু আসলের অভাবে তাঁহার কথা তত মানিতে পারিলাম না। আসল আছে, এই মাত্র জানিলাম, এবং মন্তব্যের প্রুফ দেখার সময়, সংবাদটি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

গত বৎসর চৈত্র শুক্ল সপ্তমীতে ছাতনায়

গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। চণ্ডীদাস পরিব্রাজক ছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুরে আসিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরে সিদ্ধ হন।" কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয় কি নকুল ভাইটি সঙ্গে লইয়া পরিব্রজ্যা করিতেন? রসের নব নব ভিয়ানে যে কত মিষ্টান্নের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে কিন্তু দ্রষ্টব্য, নান্নুরের পূজক শুনিয়াছেন, ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। একথা রটে কেন?

† শ্রীযুত জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া বলিয়াছিলেন, মামুরিয়া গ্রাম হইতে। আমি মনে করিয়াছিলাম, নান্নুর নাম শুনিয়া শুনিয়া এই ভ্রম। পরে বাঁকুড়া জেলায় এই নামের গ্রাম পাইয়াছি। জেলার দক্ষিণে গড়রাইপুর। ইহার ৬ মাইল দূরে এক সালতড়া গ্রাম আছে। গ্রামদেবী চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী, নাম খাঁদা রাণী। সাঁওতালে পূজা করে। এখান হইতে ২ মাইল দূরে মামুড়িয়া গ্রাম। এখানে অনুসন্ধান করা হয় নাই।

১ম লেখ সম্বলিত ইটের ছাপ

চণ্ডীদাসের এক মেলা হয়। বাসলীর বর্ত্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণে এই মেলা বৎসর বৎসর হইত। এবার সেখানে না হইয়া আদি স্থানে হয়। চণ্ডীদাসের নামে মেলা এবার প্রথম। বাঁকুড়া হইতে আমরা কয়েক জন মেলা দেখিতে যাই। সেখানে বহু লোকের দেখা পাই, এবং ছাতনার বর্ত্তমান রাজার পিতৃব্য-পুত্র শ্রীযুত রামকিঙ্কর সিংহ দেওএর নিকট "বাসলী-মাহাত্ম্য" পুথী পাই। শুনিলাম রাজবাড়ীর দপ্তরে কোথায় পড়িয়াছিল, কে খোজে, কেই-বা গুরুত্ব বোঝে। রাজবংশে অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, পিতাকে পুত্র হত্যা করিয়াছে, অবীরা রাণীকে রাজ্য চালাইতে হইয়াছে। এইরূপ গৃহ-বিপ্লবে কে বা পুথী-পত্র দেখে, কে-বা রক্ষা করে, এবং, যেটা আরও শোচনীয়, কে-বা রাজ্যের স্থিতি-চিন্তা করে।

এই পুথীর নাম ছিল না। উল্লেখ নিমিত্ত "বাসলী মাহাত্ম্য" নাম রাখা গিয়াছে। সত্য-কিঙ্করবাবু পুথীর বিবরণ দিয়াছেন। প্রথম পাতার নীচে বাম কোণে এক ইঞ্চি রেখা করিয়া ফটো তোলা হইয়াছে। এখন ফটোতে সে রেখা মাপিলে অক্ষরের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। পুথীখানি আমার কাছে আছে।*

তুলাট কাগজে লেখা, মসীকালীতে লেখা। কিন্তু কালী ম্লান হইয়া গিয়াছে, পাতাও ধারে ধারে এলাইয়া পড়িয়াছে, সাবধানে তুলিতে হয়। বোধ হয় কাগজ দু ভাঁজ করিয়া দুই পিঠে লেখা হইয়াছিল, কারণ এত পাত্‌লা কাগজে কলম দিয়া লেখা অসম্ভব। ছেড়া এলান ধার কাঁচি দিয়া স্থানে স্থানে ছাটিয়া দেওয়া গিয়াছে।

এখন বাসলীর মাহাত্ম্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। উপস্থিত প্রশ্ন সম্বন্ধে পাই,—

১। চণ্ডীদাস কবি, দেবীদাসের প্রিয় অনুজ ছিলেন।

২। তাঁহারা বিদেশী ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন।

৩। হাম্মীরোত্তর রাজা দেবীদাসকে বাসলী পূজায় নিযুক্ত করেন।

৪। পুথীর কবি পদ্মলোচন শর্ম্মা, রচনাকাল (দ্বীপ =৭, ইভ=৮, রাম =৩, ভূ =১) ১৩৮৭ শক ১।

কিন্তু প্রথমেই তর্ক, পুথীখানি কৃত্রিম নয় ত? বাস্তবিক কি ১৩৮৭ শকে লেখা, না বহু বহু পরে কোন বাসলী-ভক্তের লেখা?

প্রাপ্ত পুথী এত পুরানা, ৪৬১ বৎসরের পুরানা, বোধ হয় না। আমি লিপিবিদ্যা জানি না; তথাপি দেখিতেছি অক্ষরের আকৃতি বর্ত্তমান হইতে অধিক ভিন্ন নয়। এখনও কেহ কেহ এই রকম অক্ষরে লেখে। বাঁকুড়ার ৬০।৭০ বৎসরের পুরাতন পুথীতেও এই রকম দেখিয়াছি। প্রথম পাতার ৪র্থ পংক্তির "শ্রীকৃষ্ণ" শব্দটির অক্ষর দেখুন;

* ফটোর ব্লক করিতে গিয়া রেখাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

মনে হইবে, বহু প্রাচীন। কিন্তু এই আকার এখনও দেখিয়াছি। পাতা জীর্ণ কালী ম্লান বটে, কিন্তু কে জানে অযত্নে নাড়া-চাড়া হয় নাই। যদি পুথীর বয়স ১০০ বৎসরের মধ্যে মনে করি, তাহা হইলে বেশী ভুল হইবে না। পুথী যে মূল নয়, তাহা শব্দের বর্ণাশুদ্ধি, অক্ষরের ছাঁদ দেখিলেই বুঝিতে পারি। কারণ যে কবি এমন সুন্দর সুন্দর ছন্দে অথচ সহজ সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতেন তিনি নিশ্চয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হাতে অক্ষর ছুট পড়িত না। তবে প্রাপ্ত পুথী নকল, কত নকলের নকল, কে জানে।

কিন্তু মূল, কৃত্রিম ও মনগড়া নয় ত? দেখিতেছি ছাতনায় প্রচলিত জনশ্রুতির সহিত বাসলী মাহাত্ম্যের মিল আছে। জন-শ্রুতি ধরিয়া শ্লোক-রচনা, না, দুইই এক সত্য আশ্রয় করিয়া আছে?

প্রথমে পুথী রচনার কাল দেখি। ১৩৮৭ শক কি উপায়ে জানা যাইতে পারিত? এই শক ধরিলে এবং দেঘরিয়াদের বচন প্রমাণে পদ্মলোচন শর্ম্মাকে দেবীদাসের পুত্র স্বীকার করিলে চণ্ডীদাসের মৃত্যুকাল মেলে কি?

ইটের লেখা ছিল। কিন্তু তাহার শক প্রায় একশত বৎসর পরের। এই শক পাইয়া পুথীর শক কল্পিত ও পূর্ব্বগত করা হইয়াছে? কিন্তু এত অসত্যাচরণ হঠাৎ স্বীকার করিতে পারা যায় না। পুথীতে দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজা হামীর-উত্তর রায় স্ব-নগরে দস্যু (চুয়াড়) দ্বারা অবরুদ্ধ, এবং বহুপরে এক ম্লেচ্ছ রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ মুসলমান সুলতানের সহিত যুদ্ধ, তাহা অজ্ঞাত। সুতরাং পরীক্ষার এক পথ থাকিতেও নাই।*

অতএব বাসলী-মাহাত্ম্য অকৃত্রিম মনে করিয়া দেখি, চণ্ডীদাসের কাল পাই কি না। মাহাত্ম্য পড়িলেই মনে হইবে, পদ্মলোচনের সময়ে সে-সব কাহিনী পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছিল। দুই দশ বৎসরের কথা নয়, অনেক বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কবিরও অল্প বয়সের রচনা মনে হয় না। অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাটি বৎসর অতীত, ধরিতে পারি। তাহা হইলে তিনি ১৩৮৭—৬০=১৩২৭ শকের সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীদাসের পুত্র ছিলেন। কবির জন্ম-সময়ে দেবীদাসের বয়স কত? তিনি তীর্থ যাত্রায় আসিতেছিলেন, বাসলী তাঁহাকে পিতা

১ম লেখ সম্বলিত ইটের অংশ বিশেষ

সম্বোধন করিয়াছিলেন, লোকে বলে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহিত হন নাই। এই সব একত্র চিন্তা করিলে মনে হয়, পদ্মলোচনের জন্মকালে দেবীদাসের বয়স বেশী হইয়াছিল। যদি ৫০ বৎসর ধরি, তাহা হইলে তাঁহার জন্ম ১৩২৭—৫০=১২৭৭ শকে, এবং চণ্ডীদাসের ১২৮০ শকের সময়ে হইয়াছিল। অবশ্য এক উহের উপরে আর এক উহ বসাইলে অনুমানের বল থাকে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, দেঘরিয়া বংশের পুরুষ-গণনার নিকট যাইতেছে। কেহ কেহ বলে, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস যুবা বয়সে ছাতনায় আসিয়াছিলেন। তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের জন্মকাল উল্টাইবে না। কেবল বুঝিতে হইবে, ছাতনায় পদার্পণ-মাত্র দেবীদাসের বিবাহ হয় নাই। অজ্ঞাত, বিদেশী, বাসলীপূজক

* ছাতনায় "বাসলীবন্দনা" নামে এক বাঙ্গালা পুথীর নকল পাইয়াছি। কবির নাম রাধাকৃষ্ণ দাস, কিন্তু কাল জানা নাই। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পরে লেখা। সে ঘটনার উল্লেখ আছে। লিপিকরের নামের সহিত মিলাইয়া মনে হয় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বের হইবে। এই বন্দনায় এবং বাসলী-মাহাত্ম্যে প্রায় একই মহিমা বর্ণিত আছে। বন্দনাতে উক্ত ম্লেচ্ছ রাজার নাম নাই।

যে সহজে বিবাহের কন্যা পান নাই, তাহা দেবীর কৃপাদৃষ্টির কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাও চিন্তনীয়, চণ্ডীদাসের জন্ম ১২৮০ শকে, এবং মৃত্যু ১৩২৫ শকে ঘটিয়া থাকিলে তাঁহার আয়ুষ্কাল মাত্র ৪৫ বৎসর পাই।

কিন্তু গুরুতর কথা এই, পুথীর মতে হামীরোত্তর রায় দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রচলিত জনশ্রুতিতেও তাই। অতএব আবার বিবল্প করিতে হইতেছে। যদি ইটের লেখা-প্রমাণে হামীরোত্তর রায় ১৪৭৬ শকে বৃদ্ধও হইয়া থাকেন, আর এই নামে একমাত্র রাজা থাকেন, তাহা হইলে বাসলী-মাহাত্ম্য ১৩৭১ শকে কদাপি লেখা নয়। হয়, শকে ভুল, না হয় পূর্ব্বে আর এক হামীর-উত্তর রায় ছিলেন। শকে ভুল ধরিলে, অর্থাৎ ১৪৭৬ শকের পরে লেখা ধরিলে পদ্মলোচন দেবীদাসের পুত্র ছিলেন না, দেঘরিয়ার পুরুষ-গণনাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা স্থির, এক চণ্ডীদাস ছাতনায় ছিলেন, হামীরোত্তর রায়ের প্রতিপালিত ছিলেন।

মনে করি, ইনি দ্বিতীয় চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ছাতনাতে আদি চণ্ডীদাস ছিলেন না কি? ১৩২৫ শকে শঙ্খরায়ের রাজা হইবার কথা উড়াইয়া দিতে কিংবা দেঘরিয়াদিগের পুরুষ-গণনা মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। সামন্তভূম ছিল, রাজা নাম না থাকিলেও কোনও প্রধানের অধীনে ছিল। কাহিনীতে আছে, শঙ্খরায় এক সীমান্তদেশের—সামন্ত দেশের—রাজা হইয়াছিলেন। কোন পাঠানসুলতানের দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পরে রাজ্য পুনশ্চ অধিকার করেন, পাঠানসুলতান নূতন উপার্জ্জিত বিষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। হামীরোত্তর রায়ের সময়েও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল, বাসলী-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে। বোধ হয়, দুই কালের দুই সদৃশ ঘটনা মিশিয়া গিয়াছে। হামীরোত্তর রায় নামটি অধিক বিখ্যাত এবং তাহাঁ দ্বারা মন্দির নির্ম্মিত ও বাসলীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহাঁ দ্বারা দেবীদাস-সহ চণ্ডীদাস নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জনশ্রুতির প্রকৃতিই এই, দেশকালের ব্যবধান ভুলিয়া সদৃশ ঘটনা জুড়িয়া যায়।

শঙ্খরায় কোন্ পাঠানসুলতানের সম্মুখীন হইয়াছিলেন? ১৩২৫ শকে=১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে=৮০৬ হিজরা-য় বাঙ্গালার সুলতান কে ছিলেন? বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখি তখন গিয়াসুদ্দীন-আজমশাহ পিতা শিকন্দার সাহকে হত্যা করিয়া গৌড়-বঙ্গের অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। এই পিতৃহন্তা সুলতান স্বীয় বৈমাত্র ১৮ জন ভ্রাতাকে বধ করিয়া ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে=১২৭৮ শকে বাঙ্গলার সুলতান হন। ১২৭৮ হইতে ১৩২৫ শক পর্য্যন্ত বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞাত। ছাতনার রাজবংশের ঐতিহ্যে সামন্তভূমেও মুসলমান আক্রমণ ঘটিয়াছিল। সে আক্রমণের পূর্ব্বে সামন্তভূমের পশ্চিম ভাগ ব্যতীত অন্য তিন দিক মুসলমানের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবে। দামোদর-কূলের পোখরণা গ্রাম যাহার চন্দ্রবর্ম্মার নাম শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত আছে, অজয়কূলের উজানীনগর (মঙ্গলকোট) যাহার বিক্রমকেশরী রাজার নাম প্রাচীন কবিরা ভুলিতে পারেন নাই, দক্ষিণের গড়-মান্দারণ যাহা বঙ্কিমবাবু চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা আপনিই হয় নাই। শূন্যপুরাণের 'শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা' রামাই পণ্ডিতের মনঃকল্পিত নয়।

বোধ হয় এইরূপ অশান্তির সময় দেবীদাস ও চণ্ডীদাস স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তীর্থ-যাত্রার ছলে ছাতনায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। দেবীদাস বাসলীর পূজক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রিয় অনুজ কি করিতেন? দেবী তাঁহাকে পিতা বলেন নাই, তাঁহা দ্বারা কোনও কর্ম্ম করান নাই, বিবাহের নিমিত্ত কন্যাও দেখেন নাই। তিনি পূজাহারী হইলেন; পূজা ও ভোগের সামগ্রী সংগ্রহাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ ব্রাহ্মণ পরিচারককে বড় বলিত। শূন্য পুরাণে হাতে সাজি ও আবর্ষী লইয়া বড় ধর্ম্মপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছেন, 'ধর্ম্ম-পূজা বিধানে' 'ভোগ বড়' ধর্ম্মের নিকট 'পুষ্পং জয়' পাইতেছেন। ভুবনেশ্বরে বড় ছিলেন; তাঁহারা এখন গৃহী হইলেও বড়ু উপাধি ত্যাগ করেন নাই পূজক ও বড়ু, এক নয়। ধর্ম্মপূজা বিধানে' মণ্ডপের ও পূজার

কার্য্যে নিযুক্ত আমিনী, ধামাইতকর্ণি, পণ্ডিত, গায়েন, বায়েন, দেউল্যা, ভোগবড়, নাম পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সকলকেই 'পুষ্পং জয়' দেওয়া হইয়াছে। বাঁকুড়ায় ধামাইতকর্ম্মি উপাধি ব্রাহ্মণের আছে, এবং আমিনীর প্রকৃত নাম কামিনী (কর্ম্মকারিণী) এখন কামিন্ নামে বাঁকুড়ায় পরিচিত আছে।*

বাসলী-মাহাত্ম্য হইতে আর একটি কথা পাই। দেবীদাস বাসলীর পূজক নিযুক্ত হইবার সময় ছাতনায় বাসলী ছিলেন, বাসলীর পূজকও ছিলেন। কোনও কারণে সে পূজকের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। আরও দ্রষ্টব্য, দেবীদাস বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন। দেঘরিয়া-বংশও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহাদের কুল-দেবতা শ্রীধর শালগ্রাম শিলা রূপে স্বগৃহে পূজিত হইতেছেন।

৫। ছাতনায় নান্নুর হাট

প্রথম মন্তব্যে ছাতনায় নান্নুর পাই নাই। "নান্নুরে বাসলী" চণ্ডীদাস লিখুন, না লিখুন, পরবর্ত্তী কোন কোন কবি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা কোন্ স্থান লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার অন্বেষণ এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য।

কিন্তু নান্নর নাম সংস্কৃত নয়। একটা মাঠের কি হাটের কি গ্রামের অ-সংস্কৃত নাম পাঁচশত বৎসর অবিকৃত থাকিবে, তাহাও সম্ভবপর নয়। যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কি আকারে, নামের কোন্ বর্ণের কি পরিবর্ত্তন হইতে পারিত, তাহা বাঙ্গালা শব্দের নিরুক্তির নিয়মে বুঝিতে পারি। অর্থাৎ মূল শব্দ যদি সংস্কৃত হয়, সে মূল কি? যদি মূল সংস্কৃত না হয়; তাহা হইলে এই প্রয়াস ব্যর্থ। আমার অনুমানে সংস্কৃত রূপ নন্দপুর হইলে নান্নুর নাম আসিতে পারে। অর্থাৎ পূর্বে যদি নান্নুর ছিল, তাহার আদি নামের রূপান্তরে নান্দুর, নান্দুড়, নান্নুর, নানোর, নন্নুর প্রভৃতি আসিতে পারে। নন্দ ও নন্দক শব্দ হইতে ছোট ছেলের আদরের নাম নন্দু, নন্নু, ননো, ননী, নান্নু, নদো প্রভৃতি হইয়াছে।
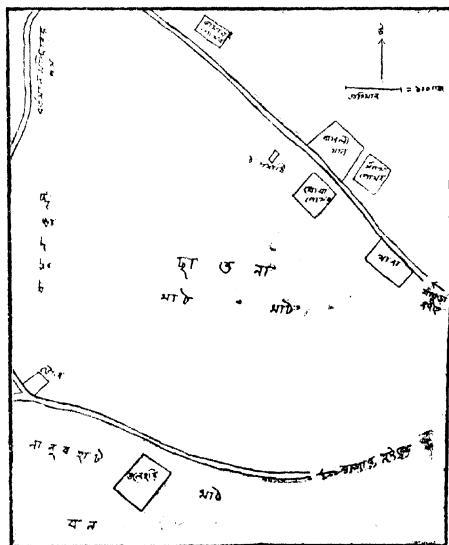
ছাতনার মাপচিত্র

[শ্রীযুক্ত রামানুজ কর সেটেলমেণ্টের মাপচিত্র হইতে তুলিয়া দিয়াছেন]

দৈবক্রমে ছাতনায় এক "নান্নুর হাট" পাইয়াছি। এই আবিষ্কার এমন কৌতুকাবহ যে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। কলিকাতায় পূর্বের সংগৃহীত লেখা-ইট হারাইয়া গিয়াছে, অথচ সে-রকম ইট না পাইলেও নয়। এই হেতু গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ আবার ছাতনা গিয়াছিলাম। এবার প্রাতে যাই, সঙ্গে সত্যকিঙ্করবাবু ব্যতীত বাঁকুড়া-কলেজের সংস্কৃতের প্রোফেসর রামশরণ-বাবু ছিলেন। আদি বাসলী-স্থানে পঁহুছিলাম, গ্রামের ও দেঘরিয়া বংশের কয়েকজন আসিয়া জুটিল, দুইচারি

---

* শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যাল তাঁহার 'চণ্ডীদাস-চরিত' পুস্তকে ১৩১১ সালে লিখিয়াছেন, তিনি "১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি" পাইয়াছেন, এবং তাহার এক স্থলে লিখিত আছে, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ, মাতার নাম ভৈরবী ছিল। তিনি রামী রজকীরও পিতামাতার নামধাম পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি পুথীর সত্যাসত্য বিচার, বয়সবিচার, বিষয়বিচার ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে একটী কথাও লেখেন নাই! এই প্রবল কলিকালে কেহ কাহাকেও আপ্ত স্বীকার করে না। পুথীখানা কোথায় আছে, আছে কি গৃহদাহে পুড়িয়া গিয়াছে, জানিবারও জো রাখেন নাই। চারি শত পাঁচ শত বৎসরের পুরানা পুথী অত্যন্ত দুর্লভ। আর, ভবানী ভৈরবী চণ্ডীদাস প্রভৃতি নামগুলিও যেন আশ্চর্য্য যোগ মনে হয়। উক্ত পুথীর কাল হইতে এইটুকু বুঝিতেছি, পূর্ব্বকালে লোকে বিশ্বাস করিত চণ্ডীদাস ১৩৭৩ শকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তখন তিনি কিম্বদন্তির বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সহিত বাসলী-মাহাত্ম্য রচনা কাল ১৩৮৭ শকও চিন্তনীয়। আমার মনে হয়, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, এই দুই নামও ডাক-নাম, পিতৃদত্ত নাম নয়।

জন লইয়া সত্যকিঙ্করবাবু ও রামশরণবাবু লুপ্ত-প্রায় প্রাচীরের দুই দিকে লেখা-ইট খুজিতে গেলেন, আমি এক বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া বালকদের মুখে বাসলী-মাহাত্ম্য শুনিতে লাগিলাম। তাহারা আট দশ জন হইবে, এবং তাহাদের সঙ্গে দুই জন যুবাও ছিল। শুনিলাম, ভোগের নিমিত্ত প্রত্যহ চারি পাই (—পাঁচসের) চাউল রান্না হয়, কিন্তু যত লোকই আসুক সেই প্রসাদে সকলের উদর পূর্ত্তি হয়। কোল এক জাত ছিল, পঞ্চাশ জন লোক জমিয়াছিল, কিন্তু সেই চারি পাই চালের ভোগের প্রসাদে সকলের তৃপ্তি হইয়াছিল। "প্রত্যহ কিন্তু মাছ চাই। মাছ নইলে ভোগ দেওয়া চলিবে না।"

"যদি না পাওয়া যায় ?"

"পেতেই হবে। কেঅটে না আন্‌লে, দেঘরিয়াকে মাছ ধর্‌তে হবে।"

"কি সে কর্‌্য়ে ?"

"জাল দিয়ে, না হয় সিপ দিয়ে। কিন্তু পেতেই হবে, একটা পুঠি-মাছও চাই, যত বেলাই হ'ক।"*

দেবীর কৃপায় কত লোকের কত কি অঘটন ঘটনা হইয়াছে তাহারা বলিতে লাগিল। পুথীর দ্বিতীয় পাতা কোথায় পাই, আমার মনে মনে কিন্তু এই চিন্তা চলিতে-ছিল। ছাতনার টোলের অধ্যাপক স্মৃতিরত্ন মহাশয় পুথী নকল করিয়াছিলেন, তিনি পাতাখানি পাইয়াছিলেন কি ? তাঁহার নকলে আছে কি ? বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের পক্ষ হইতে তাহাঁর টোল দেখিবারও ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসিলাম,

"ছাতনার টোল কোথায় ?"

"ঐ যে হাটতলায়।"

(বাসলী স্থান হইতে আট দশ বিঘা দূরে দক্ষিণে, মাঠের ধারে)

"স্মৃতিরত্ন মশায় বাড়ীতে আছেন ?"

"না (অমুক) গ্রামে গেছেন।"

"তাঁর বাড়ীও কি হাটতলায় ?"

"হাঁ।"

"কবে কবে হাট বসে ?"

"হাট বসে না, ঐ জায়গার নাম হাটতলা।"

"হাট বসে না, হাটতলা ? হাটের নাম কি ?'

"কেউ বলে নান্নুর হাট, কেউ বলে নন্নুর হাট।" এই বলিয়া বালকেরা হাসিতে লাগিল। ব্যাপার কি যুবা-দ্বয়কে জিজ্ঞাসিলাম। তাহারা মাথা হেট করিয়া বহুকষ্টে বলিল, "নানোর হাটও বলে।"

"ইহাতে লজ্জা বা গোপনের কথা কি আছে ?"

"ভিন্ন গাঁয়ের লোকে আমাদিকে নিন্দা করে, আমরা কাকেও বলি না।"

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক কিন্তু এই নাম এখনও ভোলে নাই।*

"নান্নুর গ্রাম আছে কি না, আমরা যে এতবার জিজ্ঞাসা কর্‌্য়েছি, তোমরা ত বল নাই ?"

"আপনি নান্নুর বল্যেছিলেন, সে নামের গ্রাম এখানে কোথাও নাই।"

সেদিন হাটতলা ভাল করিয়া দেখার সময় ছিল না, লেখা-ইট লইয়া বাঁকুড়া চলিয়া আসি। পরে একদিন বৈকালে সেখানে যাই। দেখিলাম, বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর ; পশ্চিমে সন্নিকটে বামুনকুলি গ্রাম। (মাপচিত্র দেখুন) এই গ্রামের মাঝে কুলি, দুই পাশে সারি সারি ব্রাহ্মণের বাস, অধিক কালের নয়। পূর্ব্বে ও দূরে ছাতনার বাজার। দক্ষিণে দূরে উচু ডাঙ্গা, লোকালয় নাই, কৃষিক্ষেত্রও নাই। বোধ হয় পূর্ব্বকালে বন ছিল। উত্তরে এক পুরাতনপথ এবং পথের উত্তরে কৃষিক্ষেত্র ও পরে আর এক পথ ও আদি বাসলী-স্থান। হাটতলার পথটি রাজ বাড়ীর নিকটে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। পূর্বকালে রাজার আওয়াস এখানে ছিল না। তখন এই পথ দিয়া পশ্চিমের

* এই জন্যই কি চণ্ডীদাসের মাছধরার গল্প ?

* কথাটা আর কিছু নয়, এখানে শিশুর শিশ্নকে নন্নু বলে। সেই সঙ্গে এই নামের সহিত কি এক উপহাস জড়াইয়া গিয়াছে, বয়স্থ লোকে সহসা 'নান্নুর হাট' এই নাম স্বীকার করে না। ইহার সহিত রজকী-সঙ্গতির সম্বন্ধ আছে কি না, কে জানে।

সাহিত্য-পরিষদে এই প্রবন্ধ পাঠের পর পরিষৎ-পতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমায় ডাকিয়া বলেন, নন্নুর যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই ঠিক. এই বলিয়া তিনি সহজের সহিত ইহার সম্বন্ধ বুঝাইতে এক শ্লোক আবৃত্তি করেন। সে অর্থ প্রকাশ্য নহে, এখানে আবশ্যকও নহে। আমি বুঝিলাম, স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হয় না।

গ্রামান্তরে যাইতে পারা যাইত। এই আটদশ বিঘা সমতল হাটতলার পূর্বগায়ে এক পুষ্করিণী চারি পাঁচ বিঘা হইবে। এই পুকুর জলহরি নামে খ্যাত। যে পুকুরের জল সরা হয়, (নব্য ভাষায় পানাদির নিমিত্ত 'ব্যবহৃত' হয়), তাহাকে পূর্বকালে জলহরি বলিত।*

বৌলপোখরিয়ার মতন এটিও কাটা পুকুর, বান্ধ নহে; এবং ক্ষেত্রে জল-সেচনের নিমিত্ত কাটা হয় নাই, কারণ জল পাওয়াইবার ক্ষেত নাই। জলহরিটি পুরাতন বোধ হয়, কিন্তু বহু পুরাতন বোধ হয় না। কখনও পঙ্কোদ্ধার হইয়া থাকিবে। এই জলহরির পশ্চিমে কিছু দূরে দুই স্থানে দুইটি ইট পাথর ও মাটির ভগ্নস্তূপ আছে। একটি অষ্ট-কোণ ছিল, বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ মনে করে, দোল বা রাসমঞ্চ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, এখানেও আদি বাসলী-মন্দিরের প্রাচীরের ইট আছে। সেই ১৪৭৬ শক লেখা আছে। বোধ হয় সেই প্রাচীরের ইট আনা হইয়াছিল। হাটতলার পশ্চিম গায়ে একটা পুরাতন আম-গাছ আছে। শুনিলাম, আর-একটা গাছ ছিল, তাহার নাম ছিল নুন্‌কী। এই নামে একটা আম-গাছ নাকি রাজবাড়ীতে আছে।†

পূর্বকালের গ্রামের মাঠের নিকটে এই হাটতলা। এখানে হাট বসিত। কিন্তু হেটো জনের নিমিত্ত এই বৃহৎ জলহরি কাটা হইয়া থাকিলে জলহরি এই নাম সার্থক হয় না। পূর্বকালের গৃহস্থারের কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। গ্রামের নিকটে, হাটের নিকটে, মাঠের ধারে, বনের পাশে বাসলীর যোগ্য স্থান বটে। হয়ত বাসলীনগর পরিত্যাগের সময় বাসলীকে এখানে রাখা হইয়াছিল, তাহাঁর জন্য জলহরি কাটা হইয়া পথিক ও হেটো জনের জল পানের উপায় করা উদ্দেশ্য ছিল। তখন দেবী গাছের তলায় প্রস্তরখণ্ডরূপে থাকিতেন, পাশে ভোগপাকের নিমিত্ত তৃণের বা পত্রের কুটীর ছিল। সেখানে বনের পাশে নির্জ্জন মাঠে কাহারও থাকিবার কথা নয়, কিন্তু চণ্ডীদাস থাকিতেন। পরে পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাইয়া হামীরোত্তর রাজা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।*

৬। উপসংহার

ভূমিকায় লিখিয়াছি, পুরাবৃত্তমাত্রেই সম্ভাব্যের ইতিহাস। বীরভূম-নান্নুরে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া সেখানে চণ্ডীদাস থাকিতেন না, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। তেমনই, প্রমাণ নাই, কিন্তু ছিলেন, বলিতেও পারা যায় না। আর, 'পাথর্যা প্রমাণ' লইলে যে প্রমাণ হয় না, তাহাও নয়। আদালতে কত চতুর উকীল সাক্ষীর অভাব পূরণ করিয়া জয়লাভ করিতেছেন। এমন হাকিমও আছেন যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া চারি পাঁচ মাসে নিষ্পন্ন, বহুজন দ্বারা নিষ্পন্ন, বহুজন দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুতকর্ম্ম মিথ্যা মনে করেন। তথাপি যে বিচারে যুক্তি নাই, সে বিচার গ্রাহ্য হয় না।

বীরভূম কেন্দুবিল্ব গ্রামের জয়দেবকে পুরীবাসী পুরীর নিকটে রাখিতে চায়। সেখানে সে নামে গ্রাম আছে, পদ্মাবতী সেখানে পাওয়া গিয়াছিল, গীত-গোবিন্দ না শুনিলে জগন্নাথদেবের নিদ্রা হয় না। পুরাতন

* 'জলহরি' বাং শব্দ; বোধ হয় জল-সরি হইতে জল-হরি। কবিকঙ্কণে, গুজরাট নগর বর্ণনায়

খড়কি উত্তর ভাগে জলহরি তার আগে
প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়।

খিড়কী দুয়ারের আগে জলহরি। এখন খিড়কী পুকুর বলে। এখনও কোথাও কোথাও অপভ্রংশে জলৌড়ি নাম আছে। বাঁকুড়া শহরের তিন চারি মাইল দূরে জলহরি নামে এক গ্রাম আছে। কিন্তু জলহরি প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। গ্রামে এখন কেবল মুসলমানের বাস। ইহার গায়ে বাহুলাড়া নামক গ্রাম। বাহুলা-ড়া নাম ছিল কি না, জানা হয় নাই। এই গ্রামেও বহু মুসলমানের বাস। এই কারণে সন্দেহ হয়, সে গ্রামে বাসলী ছিলেন।

† সং নন্দক হইতে হিং-তে ননকু, নন্‌কী—শিশু পুত্র ও কন্যার আদরের নাম আছে। আমগাছের নাম নুন্‌কী কেন হয়, তাহাও চিন্তনীয়। রাজার ছোট ছেলেকে এখানে নান্নু বলে।

* কিন্তু 'নান্নুর হাট' কি পূর্ব্বে 'নান্নুর হাট' বলা হইত? অসম্ভব নয়। লোকমুখে ছোট ও সুখোচ্চার্য্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু 'নান্নুর হাট' এই নামে নান্নু+সম্বন্ধে র, বুঝি। অর্থাৎ নান্নু সাধুভাষায় নন্দ নামক কোন ব্যক্তির হাট। এদিকে 'নান্নুরের মাঠ' হইতে বুঝি নান্নুর, সাধুভাষায় নন্দপুর, নামক কোন গ্রামের মাঠ। এই দুই, এক নয়। ছাতনায় নন্দপুর,নান্নুর, বা নান্নুর নামে গ্রাম ছিল কি না জানা হয় নাই। তথাপি, নান্নুর হাট, এই নাম উপেক্ষার বিষয় নয়। নান্নুর নামটাও অসাধারণ নয়। বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে এই নামে গ্রাম আছে। আর ছাতনার পশ্চিমে নন্দুআড়া নামে গ্রামও আছে। আরও পশ্চিমে বর্ত্তমান মানভূম জেলার রঘুনাথপুরের নিকটে নন্দাড়া নামে এক গ্রাম আছে। খুঁজিলে আরও মিলিতে পারে, বাসলীও পাওয়া যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভক্তমাল গ্রন্থে এবিষয়ে নানা কথা আছে। তেমনই, চণ্ডীদাস, ভক্তেরা নান্নুরের মাঠ অবশ্য খুঁজিতেছিলেন। সেখানে বাসলী বা তৎসদৃশ নামে তান্ত্রিক দেবীও থাকা চাই। বীরভূমে নান্নুর পাইলেন, বিশালাক্ষীও দেখিলেন। তখন মনে হইল, যে অঞ্চলে লালিত্যকুসুমাকর গীতগোবিন্দ গীত হইয়াছিল, সে অঞ্চলেই শ্রীরাধাগোবিন্দকেলিবিলাসও বর্ণিত হইবার কথা। কেন্দুলীতে জয়দেবের মেলা হয়, বহু বহু বাউলের সমাগম হয়। বাউল-সম্প্রদায় সহজ-পন্থী। চণ্ডীদাসও সহজ-পন্থী ছিলেন। অজয়কূলে কেন্দুলী; নান্নুর অজয়কূলে নয়, বটে, কিন্তু উজানীনগরের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরার দহ মাঠে মারিয়া অজয়কে মাইল আষ্টেক উত্তরে বহাইতেও পারা যায়। ইত্যাদি। কারণ যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন ঘটেই ঘটে। নইলে বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়টি রত্ন আসিয়া জুটিতেন না।

মানব-মনের এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহাকে দমন করিয়া সংশয়-বাদী হইয়া বীরভূমে অনুসন্ধান হয় নাই। কারণ চণ্ডীদাস যে অন্য স্থানেও থাকিতে পারেন, এই সংশয় জন্মে নাই। এখন ছাতনা প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইতেছে; বলিতেছে দুই নান্নুরের কোন্ নান্নুরে যুক্তি-পরম্পরা পাওয়া যায়? প্রতিবাদের সব সত্য, প্রমাণ অভ্রান্ত, একথা নয়। চণ্ডীদাসকে কোন্ রাজা আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি কবে কেন ছাতনায় আসিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চিত হইতে পারিল না। অনুসন্ধানের 'অনু' মাত্র হইল, বহু 'সন্ধান' বাকি রহিল।

তথাপি, ছাতনা-বাদে যত প্রশ্নের উত্তর পাই বীরভূম-বাদে তত পাই না। ছাতনায় নান্নুর হাট ছিল, বীরভূমে নান্নুর গ্রাম আছে। কোন্‌টা চণ্ডীদাসের নান্নুর? ছাতনায় বাসলীর ছড়াছড়ি, গ্রাম দেবীরও অন্ত নাই। ছাতনা নগরে বাসলী মূর্ত্তিমতী, অল্প দিনের নন। পূজক দেঘরিয়া বংশও দুই এক পুরুষের নয়। চণ্ডীদাস পর্য্যটন করিতে করিতে বাসলী দেখিয়া তাঁহার বড়ু বর্ম্মে বসিয়া যান নাই। বীরভূমে এইসকল মুখ্য প্রশ্নের একটারও উত্তর পাই না। একটা দৃষ্টান্ত দিই মন্দাকিনী, এই নামের নদী চারস্থানে আছে। আকাশে আছে, হরিদ্বারে আছে, চিত্রকূট পর্ব্বতের পাদদেশে আছে, আর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডেও আছে। কেহ মন্দাকিনী নাম করিলে কোন্ মন্দাকিনী কি লক্ষণে বুঝিব?

এখন দেখি, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী এক **কল্পনা** সূত্রে ছাতনা অবলম্বনে গাঁথিতে পারা যায় কি না।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমভাগে এক জাঙ্গল দেশ আছে। পূর্ব্বকালে এই দেশে অনার্যগণের জনপদ ছিল। তথাপি বহুকাল হইতে মল্লভূম প্রসিদ্ধ ছিল। মল্লভূমের পশ্চিমোত্তরে সামন্তভূম ছিল। এই ভূমের প্রধান নগর পরে ছাতনা নামে খ্যাত হইয়াছে। বহুকাল হইতে বাসলী, সামন্তভূমে গ্রামদেবী হইয়া আছেন। সামন্তেরা বাসলীর পূজা করিতেন। লোকে বলে এক সামন্ত তাঁহার কৃপায় রাজা হন, এবং তদবধি তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া যায়। সে বংশের এক রাজা বিদেশী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেবীদাসকে বাসলীর পূজক, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীদাসকে বড়ু নিযুক্ত করেন। ইঁহারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে বাসলী-পূজক হওয়াতে সমাজে হীন হইয়া পড়িলেন। রাজার যত্নে দেবীদাসের বিবাহ হইল, কিন্তু চণ্ডীদাসের হইতে পারিল না।

ইঁহারা কবে কোথা হইতে ছাতনায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে পাঠান সুলতানের রাজত্ব। ব্রাহ্মণের কষ্টের শেষ ছিল না। বোধ হয়, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, পরবর্ত্তী আর-এক মুসলমান রাজার সময়ের দামুন্যার মুকুন্দরামের ন্যায়, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গের পশ্চিমভাগে নিরাপদ্ স্থানে পলায়ন করিতেছিলেন।

দুই ভ্রাতা ছাতনার রাজার আশ্রয়ে রহিয়া গেলেন। ছাতনা হইতে ১২ মাইল দূরে বর্ত্তমান গঙ্গাজলঘাটী থানার নিকটে সাল-তড়া গ্রামে নিত্যা দেবীর তখন প্রবল মহিমা। একদা তাঁহারা নিত্যা দর্শনে গিয়া নিত্যার আবরণদেবতা আর এক বাসলী দর্শন করেন, সে গ্রামে বহু রজকের বাস ছিল। যুবা চণ্ডীদাস রামী নামে এক রজক-কন্যার সহিত পরিচিত হন।

ছাতনার উত্তরে ও দক্ষিণে দুই নদী আছে, কিন্তু চারি মাইল দূরে। এক মাইল দূরে আম-জোড় নামে এক ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহাতে বারমাস স্রোত বহে। একদিন চণ্ডীদাস এই স্রোতে স্নান করিতে গিয়া একটা পদ্মফুল ভাসিয়া যাইতে দেখেন। বড় মনে করিলেন, বাসলীর পূজায় লাগিবে, কিন্তু স্রোতে পদ্ম জন্মে না, ফুলটি ম্লানও বটে, কেহ মাধবের চরণে অর্পণ করিয়া থাকিবে। সে ফুল দেখিয়া বাল্য-সংস্কার হেতু চণ্ডীদাসের মনে রাধাকৃষ্ণের রূপ জাগিতে লাগিল। তিনি বাসলীকে ভয় করিতেন। একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, নিত্যার বাসলী তাঁহাকে সহজ-মার্গে যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই দিকে ছিল। অবন্তিপুরে পঠদ্দশায় তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য হইয়াছিল। তখন ছাতনায় বাসলী প্রস্তরখণ্ডরূপে গ্রামদেবী। নাস্থুর হাটের পাশে, গ্রামের নিকটে, এক নির্জ্জন মাঠে তিনি থাকিতেন। নিকটে তাঁহার ভোগ-পাকের নিমিত্ত তৃণের এক কুটীর ছিল। রামীও তখন ছাতনায় আসিয়া বাসলীর 'কামিনী' (পাটকরণী) হইয়াছে। একদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অন্যদিকে বাসলীর আদেশ ও বাল্যের বৈষ্ণব সংস্কার; চণ্ডীদাস সেই নির্জ্জন মাঠে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান ও সহজ-সাধন করিতে রত হইলেন।

বাসলীর নিত্যভোগে মাছ নইলে নয়। বড়ুকে কখন-কখনও মাছ ধরিতে হইত। তিনি জলহরিতে সিপ দিয়া মাছ ধরিতেন, রামী ঘাট সরিতে আসিত। দুষ্টলোকে মনে করিত, মাছ ধরা নয়, রজকী-নিরীক্ষণ তাঁহার অভি-প্রায়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ তাঁহার চরিত্রে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক-ঘর্যা করিল। নকুল নামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও বিনোদ রায় নামে এক সম্ভ্রান্ত সামন্ত চণ্ডীদাসের গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি স্নেহবশে রাজাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া চণ্ডীদাসকে পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া তোলেন।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ দিগ্ দিগন্তে প্রসারিত হইল। মিথিলায় বিদ্যাপতির কানে পহুঁছিল। তিনি শ্রীক্ষেত্র-দর্শনের পথে ছাতনায় আসিলে দুই কবির সাক্ষাৎ ও প্রীতি-বিনিময় হয়। সেকালে উত্তর দেশ হইতে ওড়িষ্যায় যাইতে হইলে গয়া-পুরুলিয়া-ছাতনা-বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর দিয়া যাইতে হইত। এখনও সে পথ আছে, এবং সে পথ দিয়া অশোকের ও গুপ্ত সম্রাটের সৈন্যদল ওড়িষ্যায় গিয়াছিল। সে পথের ধার দিয়া বর্ত্তমানে বি, এন, রেল পাতা হইয়াছে।*

ছাতনা-নগর বনরক্ষিত ছিল, দুর্গরক্ষিত ছিল না। একবার এই নগর বনচারী দস্যু দ্বারা অবরুদ্ধ এবং পরে তাহাদের সাহায্যে এক মুসলমান ফৌজের দ্বারা আক্রান্ত হয়। রাজা পাশ-বদ্ধ হইয়া ফৌজদারের নিকটে নীত হন। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস রাজার অনুগমন করিয়াছিলেন। রাজা পরে মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু বাসলীর পূজকদ্বয় রক্ষা পাইলেন না, এক নিষ্ঠুর মুসলমানের হাতে চণ্ডীদাস নিহত হইলেন। ছাতনাবাসী এই নিদারুণ কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের এক ভক্ত কবি ভুলিতে পারেন নাই। দেবীদাসের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের বংশ অদ্যাপি বাসলীর দেঘরিয়ার কর্ম্ম করিতেছেন।†

---

* বীরভূম-নানুর হইতে ঋজুরেখায় মিথিলা অন্ততঃ দেড়শত মাইল, ভাগীরথী এক দিনের পথ। সে কালে তারের খবর ছিল না, অথচ দুই দূরবর্ত্তী স্থানের দুই কবি এমন যোগে যাত্রা করিলেন যে, গঙ্গার ঘাটে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার এই অংশ যে অধিক পশ্চিমে ছিল না, গতিপথ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদিকে কিন্তু গঙ্গাজলে না দাঁড়াইলে দুই বৈষ্ণব কবির প্রীতি শুদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আখ্যায়িকার বৈষ্ণব কবিকে গঙ্গা স্মরণ করিতে হইয়াছে। কোথায় কেন্দুলী, আর কোথায় গঙ্গা; ইহা জানা থাকিলে 'জয়দেব-চরিত্র'র কবি বনমালী দাস জয়দেবকে গঙ্গাস্নান করাইয়াই 'দেহিপদপল্লবমুদারং' দ্বারা শ্লোক পূরণ করাইতেন না। জয়দেব লিখিতে লিখিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন, এবং আর্দ্র বস্ত্রে দেখিলেন কে শ্লোক পূরণ করিয়া গিয়াছেন। (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় কৃত গীতগোবিন্দের ভূমিকা)

† বাঁকুড়ার মাপচিত্রে অজয় ও দামোদর নদী যথাক্রমে বীরভূম ও বর্দ্ধমানের সীমারেখায় পড়িবে। মাপচিত্রে নদী দুইটির অবস্থিতি ভ্রমক্রমে সীমারেখা হইতে দূরে অঙ্কিত হইয়াছে।

['পুস্তক-পরিচয়ে'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

সেবিকা—ডাক্তার আর্. কে, মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান আর্. কে, মজুমদার এণ্ড কোং, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। মূল্য ৩৲।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানিতে ঔপন্যাসিক ঘটনা-সমূহের ভিতর দিয়া দেশীয় ও ডাক্তারী মতে স্বাস্থ্য-রক্ষা, রোগ-শুশ্রূষা, ধাত্রীবিদ্যা, গৃহচিকিৎসা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিবে।

সরোজ-নলিনী—শ্রী গুরুসদয় দত্ত প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আনা। প্রকাশক দি বুক্ কোম্পানী, ৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৺সরোজ-নলিনী দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী। পুস্তকখানির অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহা বাঙালী পাঠক পাঠিকা-মণ্ডলে সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলার নানাস্থানে ৺সরোজ-নলিনী স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়া নারী-প্রগতি আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই বইখানির প্রথম বাহির হইবার সময় আমরা বিশদ সমালোচনা করিয়াছিলাম। এবারে ছাপা ও বাঁধাই ভাল হইয়াছে, কিন্তু ছাপার ভুল যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, আগামী বারে এরূপ থাকিবে না।

প্র

কাগজের ফুল—শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধাই; পৃঃ ১১০। মূল্য এক টাকা।

একটি বড় গল্প; গল্পের মোটামুটি আখ্যান-ভাগ এই—নিরক্ষর চাষা জীবন, ছোট ভাই মাণিককে লেখা-পড়া শিখাইল। মাণিক কিন্তু গুপ্ত সমিতির সভ্য হইয়া, ধরা পড়িয়া, জেলে গেল। গ্রামবালিকা মুক্তার সহিত তাহার পূর্ব্ব হইতে অনুরাগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু জীবন বা তা'র মা তাহা জানিত না। মাণিক যখন জেলে, তখন তাহার মা জোর করিয়া মুক্তার সহিত জীবনের বিবাহ দিল। মুক্তা কিন্তু পূর্ব্ব প্রণয় ভুলিতে পারিল না। মাণিক ফিরিয়া আসিয়া, মুক্তার বিক্ষুব্ধ চিত্তের অবস্থা দেখিয়া, দাদার নিকট সোজাসুজি মুক্তাকে দাবী করিল। নিরক্ষর জীবন সমস্ত শুনিয়া—মুক্তাকে মুক্তি দিতে চাহিল। মুক্তা মুক্তি লইল না; স্বামীর ত্যাগ, তাহাকে স্বামীর নিকট ফিরাইয়া আনিল।

এই সামান্য ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। মনস্তত্ত্বের সংঘাতগুলি বেশ ফুটিয়াছে। জীবনের চরিত্র চোখের সামনে সজীব হইয়া উঠে।

গীতিমাল্য; ঘরে বাইরে; রক্তকরবী; সমাজ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গীতিমাল্যের মূল্যের উল্লেখ নাই। অপর-গুলির মূল্য যথাক্রমে ২৷৷৹, ৸৹ ও ৸৵৹ আনা।

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে, ইহা অতি আশা ও আনন্দের কথা। রবীন্দ্রনাথের পুস্তক যত বেশী বিক্রীত হইতে থাকিবে, দেশের লোকের চিন্তা ততই মার্জ্জিত ও উন্নত হইতেছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং পুনঃপ্রকাশিত পুস্তকগুলিকে আমরা সানন্দে অভিবাদন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইগুলিতে ছাপার ভুল প্রচুর এবং এগুলির বাঁধন, রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হয় নাই।

ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রী ক্ষীরোদকুমার দাস। প্রকাশক শ্রী অম্বিকাচরণ নাথ, বি-এল। রিপন লাইব্রেরী, ঢাকা।

ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় উপদেশমূলক পুস্তক। ইহা বালক-বালিকাদিগকে স্বাস্থ্য বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা প্রদান করিবে।

বিধবা বিবাহ—শ্রী বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। অভয় আশ্রম, কুমিল্লা। তিন আনা।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত বিধবা-বিবাহ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ। পুস্তকখানি সাময়িক ও প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল।

গীতি-চয়নিকা—চয়নকর্ত্রী শ্রী প্রমীলাসুন্দরী পাল। শান্তি-নিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। দুই আনা।

রামায়ণ, বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ হইতে ছেলেদের উপযোগী কবিতার সঙ্কলন। সঙ্কলন ভাল হইয়াছে।

বৃত্র-সংহার-পরিচয়—শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কবি হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার কাব্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ আলোচনা।

রামায়ণ—রায় শ্রী দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি। প্রকাশক জে কে শর্ম্মা এণ্ড কোং, ৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মূল বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কবিতায় ছেলেদের উপযোগী সুন্দর রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। আর আলোচ্য পুস্তকে আমরা গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণ লাভ করিলাম।

ইহাও সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর। রাম প্রভৃতির চরিত্র যে মানুষেরই চরিত্র এবং মানুষের ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করিয়াও যে তাঁহারা মহৎ ও আদর্শ স্থানীয়,—একথা বাল্মীকির রামায়ণেই আমরা পাই। কৃত্তিবাস অবতারত্বের আচ্ছাদনে রামচরিত্র বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাল্মীকির চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ; সুতরাং মানুষের পক্ষে অনুকরণীয়। এই বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত পাঠক সাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাঞ্ছনীয়, ছেলে-মেয়েদের পরিচয় অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য পুস্তকখানি ভাষায় ও রচনাগুণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। এই সুন্দর সংস্করণটি আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা (প্রথম ভাগ)—অনুবাদক শ্রী অনিলকুমার মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

জগতের প্রধান ব্যক্তিগণের অন্যতম, ভারতের দুঃখযজ্ঞের হোতা মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথার মূল্য প্রচুর। এ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিয়া অনুবাদক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বাঙালী সমাজকে উপকৃত করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষাও সরল ও প্রাঞ্জল। আমরা ইহার দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ছিন্নপত্র—অপ্রকাশ গুপ্ত। প্রকাশক শ্রী হিরণকুমার মৈত্র, ২ বেথুন রো, কলিকাতা।

কবিতার বই। গ্রন্থকার খুব সম্ভব অপ্রকাশ, তাই নাম লইয়াছেন "অপ্রকাশ গুপ্ত"। আমরা "অপ্রকাশ" ব্যক্তিকে অভয় দিতেছি, তিনি "সপ্রকাশ" হইতে পারেন, তাঁহার মধ্যে প্রকাশযোগ্য গুণ রহিয়াছে। তিনি দেহটাকে গুপ্ত রাখিলেও, মনটাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার রচনার কবিত্ব সুপ্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটির অধিকাংশ কবিতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। কয়েকটি কবিতা বেশ পাকা হাতে নিপুণ রচনায় লেখা। অবশ্য কয়েকটি কবিতায় মিলের ও ছন্দের ত্রুটীও আছে। তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, গ্রন্থখানি সাহিত্য-রসিকদিগকে আনন্দ দিবে।

নারীর অধিকার—শ্রী ননীলাল ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং, ১ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা। আট আনা।

নারীর কর্ম্মপ্রসার লইয়া জগতে যে-আন্দোলন চলিতেছে, এ দেশে তাহার উপযোগীতার দিক্ দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পুস্তিকায় আছে। এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি—(সায়নাচার্য্য বিরচিত)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক অনূদিত। শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল। চার আনা।

পাঠযোগ্য পুস্তিকা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী—শ্রী বিভূপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এ। ১১ সি, আশুবাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা। চার আনা।

হোমিওপ্যাথিক মতে রোগের লক্ষণ, রোগ নির্দ্ধারণ, ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তিকা।

অর্শ প্রতিকার—ডাঃ অভয়পদ ঘোষ, এইচ-এম-বি। প্রকাশক হ্যানিম্যান্ পাব্লিশিং কোং, ১২৭।এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

হোমিওপ্যাথিক মতে অর্শ-রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

আর্য্যসমাজ কাহাকে বলে?—শ্রী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ অনূদিত। প্রকাশক শ্রী লালা জ্ঞানচাঁদ, পুস্তকাধ্যক্ষ, সার্ব্বদেশিক সভা, দিল্লী। চার আনা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী প্রণীত "আর্য্য সমাজ কেয়া হ্যায়?" নামক হিন্দি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়, আর্য্য সমাজও ভারতের বহু উপকার সাধন করিতেছেন। সুতরাং ইহার পরিচয় লাভ করা শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে এই পুস্তিকা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

ধর্ম্মপদম্ এবং অভিধর্ম্মসার; সরল সাংখ্য-যোগ—শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য কর্ত্তৃক যথাক্রমে অনুবাদিত ও বিরচিত। **যোগ-সোপান**—(পাতঞ্জল যোগসূত্র ও তাহার সরল ব্যাখ্যা)—শ্রীমৎ ধর্ম্মমেঘ-প্রকাশ ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত। তিনখানির প্রাপ্তি-স্থান কাপিলাশ্রম, নগাসরাই পোঃ, হুগলী। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা, ছয় আনা ও সাত আনা।

বৌদ্ধধর্ম্ম, সাংখ্যযোগ ও পাতঞ্জল যোগসূত্র সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক। পুস্তকগুলি হইতে উক্ত তিন বিষয়ে সাধারণে সঠিক শিক্ষা লাভ করিবেন।

তাজমহল (একাঙ্ক নাটক)—শ্রী জগৎচন্দ্র পোদ্দার, বি-এ। দেলুয়া, বেলকুচী, পাবনা।

এ নাটক এ যুগে অচল।

দীর্ঘ জীবন—কবিরাজ শ্রী রাখালচন্দ্র দত্ত। প্রাপ্তিস্থান সাভার পোঃ, ঢাকা। দশ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় প্রচুর আছে। কিন্তু ছাপার ভুল অত্যধিক।

গো-পালন—শ্রী অন্নদাচরণ চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান আনন্দাশ্রম, করণখাইন, বোয়ালখালি পোঃ, চট্টগ্রাম। চার আনা।

গো-পালন, গো-রক্ষা, গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে সুন্দর চিন্তাপূর্ণ ও প্রণালী-নির্দ্দেশক পুস্তিকা। গ্রামে গ্রামে এই পুস্তকের প্রচার হওয়া উচিত। সাধারণে ইহা পাঠ করিয়া দেশের সমৃদ্ধি গো-জাতিকে রক্ষা করিতে শিক্ষা লাভ করুন।

বৈষ্ণব সাহিত্য—ডাঃ শ্রী আশুতোষ পাল, এল-এম-পি। শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। আট আনা।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। চলনসই।

গৃহস্থের টোটকা চিকিৎসা—শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ১৩২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই! ঘরে থাকিলে ডাক্তার-খরচ অনেক বাঁচিয়া যাইবে।

বামুন-বাগ্দী—শ্রী অরবিন্দ দত্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

এই উপন্যাসটি প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বইটাতে "অতি-আধুনিক" কথা-সাহিত্যিকদিগের রচিত ন্যাকামিপূর্ণ, কুৎসিত, কৃত্রিম, একঘেয়ে, সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত, বাগ্-বহুলিত ও অসরল প্রেম-কাহিনী স্থান পায় নাই, বরং সে ভাব হইতে বইখানি স্বতন্ত্র। বস্তুত আর্টের দোহাই দিয়া অতি-আধুনিক কথা-

সাহিত্যিকগণ নর্দ্দমার পাঁক তুলিয়া বাংলা সাহিত্যকে দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের রচনার পিছনে না আছে অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা, না আছে সৃষ্টিপ্রেরণা, না আছে অধ্যয়নার্জ্জিত গঠন কৌশল, না আছে লেখ্য বিষয় সম্বন্ধে পরিপক্ক ধারণা। ন্যাকামি আর কাঁদুনে ঢংএ ছাড়া কি প্রেম-কাহিনী লিখিবার আর রীতি নাই। প্রেম কি ঋজু, দৃপ্ত ও নির্ম্মল হইতে পারে না? লালসাই কি প্রেমের এক মাত্র লক্ষ্যের বিষয়? তাহার মহত্ত্বের দিকটা দেখিবার মত মানসিক বৃত্তি আধুনিক লেখকেরা লাভ করুন; "বামুন-বাগ্দী" উপন্যাসটিকে আদর্শস্থানীয় ধরিয়াই যে আমরা একথা বলিতেছি তাহা নহে। তবে এই উপন্যাসটির প্লট ন্যাকামিবর্জ্জিত ও ও বিশেষ স্বতন্ত্র বলিয়া ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা ঐ কথা বলিলাম।

নামকরণ—শ্রী আশুতোষ মিত্র প্রকাশিত। কমলা বুক ডিপো, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

বাঙালী স্ত্রী ও পুরুষদের নামের সুদীর্ঘ তালিকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙালী যুবকেরা লক্ষ্মীর ভজনা করিবার পূর্ব্বেই ষষ্ঠীর ভজনায় মনোযোগ দেয়। ফলে ষষ্ঠীর কৃপাই তাহাদের উপর অত্যধিক। এই ষষ্ঠীকৃপাভিষিক্ত বাঙালীর ঘরে তাই ছেলেমেয়েদের জন্য নিত্যই নূতন নামের প্রয়োজন হয়। আলোচ্য পুস্তকটিকে ষষ্ঠীর বাহন বলা যাইতে পারে। ইহা একখানি করিয়া ঘরে রাখা প্রত্যেক বাঙালীর দরকার। কিন্তু প্রকাশক ছাপার ভুলে বইখানিকে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছেন।

মেবার-কাহিনী—শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী। গোল্ড কুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা।

মেবারের ইতিবৃত্ত ছেলেদের জন্য লিখিত। ছাপা, বাঁধন ও আকার ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষা ছেলেদের মত হয় নাই। ভাষা আরও লঘু হওয়া উচিত ছিল। ছবিগুলি মন্দ নয়।

পল্লীসংস্কার ও গৃহশিল্পে জাতীয় মুক্তি—শ্রী ভুবনমোহন চৌধুরী। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। চার আনা।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ।

বাংলায় লিখিত—A Handbook of Materia Medica—ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, এম-ডি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

এমন দিন বেশী দূরে নয় যখন আমরা বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইব। সে এক পরম আনন্দের দিন। তাই মেটিরিয়া মেডিকার এই বাংলা সংস্করণটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইহা ১৯১৪ খৃঃ ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে। পুস্তকটি চতুর্থ সংস্করণ লাভ করিয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বইখানি জনসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে। বাস্তবিক সংক্ষেপে, সরল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া এই পুস্তকটি লিখিত। ইহার ছাপা, বাঁধনও সুন্দর। মেটিরিয়া মেডিকার এমন সংক্ষিপ্ত সুন্দর সংস্করণ দুর্লভ। ইহা ছাত্রদিগের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত—শ্রী ভাগবতচন্দ্র দাশ, বি-এল। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সতি প্রেস, মেদিনীপুর। এক টাকা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ-বিভাগ অনুযায়ী আর্য্য বা হিন্দুজাতির সামাজিক ইতিহাস ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদের সমাজে শ্রমবিভাগ, বর্ণবিভাগ ও জাতিবিভাগ কিরূপে গড়িয়া উঠিল বহু শাস্ত্রযুক্তিপ্রমাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আলোচনা বেশ যুক্তিযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় পড়িতে ক্লান্তি আসে না। সমাজ-ইতিহাস বলিতে গেলে দেশের রাজনীতি ও অপর ক্ষেত্রের আনুষঙ্গিক ইতিহাসও বলিতে হয়। গ্রন্থকার কৌশলে সে-সব ইতিহাসেরও অল্প পরিসরে বর্ণনা দিয়াছেন। ১৮৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতের সমাজ-ইতিহাসের আলোচনা হওয়ায়, এ জাতীয় পুস্তক পড়িতে যেরূপ ভীতি হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। স্ত্রীস্বাধীনতাসঙ্কোচ, অস্পৃশ্যতা, জাতিপাতিত্য প্রভৃতি যে-সব হীন ক্রুটিতে আমাদের সমাজ আজ রুদ্ধগতি ও অবনত, সেইসব ক্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের নিবারণ মানসে গ্রন্থকার সমাজেতিহাসের উদার ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই উদার মতবাদই গ্রন্থটির বিশেষত্ব এবং এইজন্যই বর্ত্তমান কালে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্টপত্র পাঠককে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

দীনবন্ধুর দুর্গাপূজা—শ্রী সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান বীণা প্রেস, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। পাঁচ আনা।

কয়েকটি গল্প ও গাথা ছেলেদের উপযোগী করিয়া রচিত। রচনায় যথেষ্ট ক্রুটী আছে। বইটি ছেলেদের পক্ষে তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

দুলালী—শ্রী রামেন্দু দত্ত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্পের বই। লেখক নবীন হইলেও তাঁহার কবিতায় ও গল্পে রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম উদ্যম এই গল্পপুস্তক ভালই হইয়াছে। রচনা সরল ও অনাড়ম্বর। পুস্তকটি সাহিত্য-সমাজে আদর লাভ করিবে।

গুপ্ত

সোফিয়া—মৌলবী মোবারক আলি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মোঃ আজিম উদ্দিন, পোঃ নওগাঁ, রাজসাহী। মূল্য ৸৵০

এই উপন্যাসে লেখক নব্য তুর্কির শক্তি ও সাধনার ইতিহাস অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের ভাষা সরল ও সুন্দর। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধন চমৎকার হইয়াছে।

প্র

সত্তর বৎসর

(১৮৫৭—১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

শৈশব-স্মৃতি

ঢাকা

[illegible] বাড়ীতে জন্মিলেও আমার বাল্যস্মৃতি [illegible], ঢাকার সঙ্গে জড়িত। বাবা সে-সময় ঢাকায় [illegible]লেন। তখনও তিনি সদরআলার পেস্কারই [illegible] না ঠিক জানি না। বোধ হয় আমার জন্মের [illegible] কিংবা তাহার পূর্ব্ব বৎসর ওকালতী পরীক্ষা [illegible] হয়। সদরআলার দপ্তরে পেস্কারী করিবার [illegible] বাবা এই পরীক্ষা দেন। ঢাকা হইতে যাঁহারা [illegible] ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই [illegible] কাগজ কলিকাতার পথে ডাকের গোলমালে [illegible] হয়। পরীক্ষকেরা এইজন্য তাঁহাদের গুণাগুণ [illegible] করিয়াই সকলকে ওকালতীর সনন্দ দিয়া- [illegible] সনন্দের জোরে বাবা পেস্কারী ছাড়িয়া [illegible] ওকালতী আরম্ভ করেন।

[illegible] কিছু কিছু আমার মনে আছে। বোধ [illegible] তিন বছর বয়স পর্য্যন্ত বাবা ঢাকাতেই [illegible] আমরা যে হাভেলীতে বাস করিতাম, ঢাকা [illegible] প্রধান সহর বলিয়া স্থানীয় ভাষায় বিস্তর [illegible] পার্সি শব্দ পাওয়া যায়, বড় বাড়ীকে [illegible] সেখানে 'হাভেলী' বলিত—তাহার [illegible] বড় দেউড়ী ছিল। বাড়ীর নিকটেই একটা [illegible] ছিল। আমাদের বাসার জানালা হইতে মসজিদটা [illegible] যাইত। সকাল সন্ধ্যা যখন মসজিদে "আজান" [illegible] হইত, আমিও তখন ওই জানালায় দাঁড়াইয়া [illegible] দুকান ধরিয়া "আজান" দিতাম, ইহা সুস্পষ্টই মনে আছে। আর-একটা ঘটনাও মনে আছে। একদিন [illegible]-ভাতে খাইয়া খুব গলা ধরিয়াছিল। আর সেজন্য খাবার-ঘর হইতে ছুটিয়া [illegible] যাইয়া মাকে খুব [illegible] করিয়াছিলাম। ঢাকার আর কোন কথা আমার মনে নাই।

কোটের-হাট—বাখরগঞ্জ

১

ঢাকা হইতেই বাবা মুন্সেফ হইয়া প্রথমে যশোরের কোন মহকুমায় যান। এখানে বেশী দিন ছিলেন না; সেজন্য মা তাঁহার সঙ্গে যশোরে যান নাই। যশোর হইতে বদলী হইয়া বরিশালের অন্তর্গত কোটের-হাট মহকুমায় যান। এখানে বোধ হয় তিন চার বৎসর ছিলেন। কোটের-হাটে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কোটের-হাটের কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে।

কোটের-হাটের মহকুমা অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। নলচিঠির নিকটে এখনও কোটের-হাট বাজার আছে। তিন চার বছর আগে ঝালকাটি গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নিকটবর্ত্তী দুই-তিনটা গ্রামেও যাইতে হয়। এ-সময়ে এক ভদ্রলোকের মুখে বাবার [illegible] একটা দলিল তাঁদের বাড়ীতে আছে শুনিয়াছিলাম। এইরূপ দুই-একটা পুরাতন দলিলেই কোটের-হাটে যে একটা মুন্সেফি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও সবডিভিসনের সৃষ্টি হয় নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও একেবারে পৃথক্ হয় নাই। মুন্সেফেরাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল মামলার বিচার করিতেন। আজিকালিকার দিনে সবডিভিসনাল্ অফিসারদের যে পদ ও মর্য্যাদা, ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় মুন্সেফদের সেই পদ ও মর্য্যাদা ছিল।

কোটের-হাটের নীচে একটা খাল ছিল। সেখানে প্রায়ই কুমীরের উপদ্রব হইত। তাহার চারিদিকে জঙ্গল ছিল। সে-জঙ্গলে প্রায়ই বাঘ দেখা দিত। এমনকি রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শুনিতে পাইতাম। আমাদের বাসার নিকটেই একটা পুকুর ছিল। জোয়ারের সময় সেই পুকুরের জল তীর ছাপাইয়া উঠিত। কখনও কখনও আমাদের উঠান পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিত। সেই জোয়ারের জল দেখিয়া আমার কি যে আনন্দ হইত, তাহা আজও ভুলি নাই। জোয়ারের জলের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁটী, মকা—কলিকাতার মৌরলা, বেলে প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ সফরে বাহির হইত। এসকল দৃশ্য আমার অন্তরে নানা প্রকারের কৌতূহল জাগাইয়া দিত। আমি কবি নহি; কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু কবিকল্পনার বীজ লুকাইয়া থাকে। কোটের-হাটের জোয়ার-ভাঁটার খেলা আমার মধ্যে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। জলপ্লাবনে আজিও আমার চিত্তকে মাতাইয়া তোলে।

মুন্সেফী কাছারীঘর খালের ধারে একটা উঁচু জায়গায় ছিল। তার সামনে একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠে মাঝে মাঝে গ্রামের লোকেরা আসিয়া হাট বসাইত। মাঝে মাঝে নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা বড় বড় বাঘ মারিয়া পুরস্কারের লোভে কাছারীর সাম্‌নে আনিয়া ফেলিত। একবার পূজার সময় বাবা বাড়ী যাইবার মতন ছুটী পান নাই। আমাদের বাড়ীতে পূজা হইত। আমি বাড়ী যাইবার জন্য বায়না ধরিলাম। বাবা আমার কান্না থামাইবার জন্য কোটের হাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হইত, তাঁহাদিগকে মহকুমায় আনিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেবার বিজয়ার দিনে কাছারীর সাম্‌নের মাঠে একটি বড় মেলা হইয়াছিল। এখনও সে-ছবি চক্ষে ভাসিতেছে।

২

কোটের-হাটে বাবার সঙ্গে আমাদের অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব চাকুরীর লোভে গিয়াছিলেন। গ্রামের ভৃত্য শ্রেণীরও অনেকে গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে বরিশাল অনেক দূরের পথ। বোধ হয় নৌকায় দশ বার দিন লাগিত। এ অবস্থায় শ্রীহট্টবাসী কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে একাকী অথবা কেবলমাত্র নিজের পরিবারের লোককে লইয়া অত দূর দেশে যাইয়া বাস করা সম্ভব ছিল না। বাবার সঙ্গে সঙ্গে এই কারণে আমাদের নিজের লোকেরা কোটের-হাটে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সেখানে সকলেই যথাযোগ্য কর্ম্মও পাইয়াছিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা মুন্সেফী আদালতে আমলা হইয়াছিলেন। ভৃত্য শ্রেণীর যাঁরা গিয়াছিলেন, তাঁরা পেয়াদা হইয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের নিজেদের একটা উপনিবেশের মতন কোটের-হাটে জমিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু বাবার অধীনে যাঁহারা চাকুরী করিতেন, তাঁহাদের কেহই আমাদের বাসায় থাকিতে পাইতেন না। স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে হইত। এমন-কি ইঁহাদের সঙ্গে যে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে, ইহাও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সম্পর্কে বাবা, কাহারও দাদা, কাহারও কাকা, কাহারও মামা ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা বাবাকে সকলেই কেবল মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন, সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধন করা নিষিদ্ধ ছিল। একবার আমার এক জ্যেঠতুত ভাই, বাবাকে দশজনের সমক্ষে কাকা বলিয়াছিলেন। এই অপরাধে তখনই তাঁহার কর্ম্ম যায়। যত দিন বাবা কোটের-হাটে ছিলেন, তত দিন তিনি সেখানে আর চাকুরী পান নাই।

৩

তাঁহার বিচারে লোকে কোন প্রকারে কোন রূপ পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ না করিতে পারে, বাবা সে-বিষয়ে অতি সাবধান ছিলেন। এক দিনের কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন বছর চারেক হইবে। বাবা দু'বেলা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পাতে বসাইয়া খাইতেন। একদিন প্রাতে খাইতে বসিয়াছি। মা কলমী শাক পরিবেশন করিলেন। বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে বাবা কোটের-হাটে কলমীশাক খান নাই। এ শাক কোথা হইতে পাইলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন যে, এক পাটুনী বুড়ী দিয়া গিয়াছে। "দাম দিয়াছ?"—বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। "কলমীশাকের আবার দাম কি? সেও দাম চায় নাই, আমিও দিই নাই," মা একথা কহিলেন।

বাবা অমনি ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া পেয়াদা পাঠাইয়া সেই পাটুনী বুড়ীকে ডাকাইয়া তাহার শাকের দাম দিয়া, আর যেন কখনও আমাদের বাসার নিকটে সে না আসে, আসিলে বিশেষ শাস্তি পাইবে, এইরূপ সাবধান করিয়া দিলেন। সেদিন বাবার আর আহার হইল না। মাকেও উপবাস থাকিতে হইল। মা বুঝিলেন, হাকিমের স্ত্রী হইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের দান বা ভেট গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

এই সামান্য কলমীশাকের জন্য বাবা এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন কেন? ইহার বিশেষ কারণ ছিল। মার মুখে সে কথা শুনিয়াছি। মাও পরে সে-কথা শুনিয়াছিলেন। এই পাটুনী বুড়ীর একটা অতি অকর্ম্মণ্য পুত্র ছিল। সে মাঝে মাঝে চুরির অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইত। এইজন্য তাহার মা হাকিমের বাড়ী যাতায়াত করে কিছুতেই বাবা ইহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যে-কারণে ঢাকায় পেস্কারী করিবার সময় তিনি কালীনারায়ণ রায়ের লোকেদের প্রদত্ত দুই হাজার টাকা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, এই কলমী শাক সম্বন্ধেও সেই কারণেই এমন কঠোর ব্যবস্থা করেন।

৪

সন্তান-পালন সম্বন্ধে বাবা চাণক্যনীতির অনুসরণ করিতেন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।"

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমাকে দেবতার মতন পূজা করিয়াছিলেন। আমি যখন যাহা চাহিতাম, তখনই তাহা পাইতাম। কোনদিন আমার গায়ে বাবা হাত তুলেন নাই, অন্য কাহাকেও তুলিতে দেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহার বৈঠকখানায় আমাকে একটা "পলো" চাপা দিয়া রাখিয়া কাছে বসিয়া নিজের কাজকর্ম্ম করিতেন। নিজের হাতে আমাকে স্নান করাইয়া দিতেন, নিজের পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে দেখিয়া আমিও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিব বলিয়া বায়না ধরিলাম। তখন আমার জন্য ছোট কোষা কুষি, ত্রিপদী, রেকাবী, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম, বাজার হইতে আসিল। আমিও বাবার কাছে বসিয়া, কোষা-কুষি লইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া পূজার অভিনয় করিতে লাগিলাম।

৫

কোটের-হাটের আর একটা স্মৃতি পঁয়ষট্টি বৎসরেও মুছিয়া যাওয়া ত দূরের কথা. একটুকুও ম্লান হয় নাই। আমাদের বাসার পিছনে একটা হোগলার বন ছিল। সে-বনে বহু গোসাপ বাস করিত। এরা সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। কি কারণে জানি না, গোসাপ মারা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন আমার ছোট ভগিনী, তখনও ভাল করিয়া তা'র কথা ফোটে নাই, আমাদের শুইবার ঘরের মে'জেতে ঘুমাইতে ছিল। মা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া পাকশালে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, দুটা বড় বড় গোসাপ ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় তাহার দুই পাশ-বালিশের দু'ধারে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। আমিও মার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। সাপ দুটা আমার ভগিনী অপেক্ষা অন্ততঃ দেড়গুণ লম্বা ছিল। কুমীরের মতন তাহাদের মুখ। মা ত এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন শব্দ করিলেন না—চীৎকার করা ত দূরের কথা। তিনি যে ঘরে ঢুকিয়াছেন বোধ হয় সে-সাড়া গোসাপ দুটা পাইয়াছিল। তাহারা চোখ খুলিয়া মাকে দেখিয়া আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তখন মা কাঁপিতে কাঁপিতে সন্তানকে বুকে আঁকড়াইয়া সে-স্থান হইতে ছুটিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্য যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই আমার মায়ের স্নায়ুমণ্ডল কত যে স্থির এবং শক্ত ছিল, ইহা ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি।

৬

কোটের-হাটে আমাদের নিজের লোক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পৃথক্ বাসায় থাকিতেন।

সুতরাং আমাদের নিজের পরিবার অতি ছোট ছিল। আমার পিতা পিতামহের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমার পিতামহের একমাত্র সোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সুতরাং তিন পুরুষের মধ্যে আমাদের পরিবার কোন দিন বড় ছিল না। কোটের-হাটে মার সঙ্গে একজন মাত্র স্ত্রীলোক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। সেকালে সম্পন্ন কায়স্থ বৈদ্য পরিবারে আমাদের অঞ্চলে সর্ব্বদাই দু চার জন দাস দাসী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। তখনও ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যায় নাই। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা সামান্য মূল্য দিয়া দাস দাসীদিগকে জন্মের মতন কিনিয়া রাখিতেন। এ সকল দাসদাসীর কেবল ভরণ-পোষণের ভার নহে, কিন্তু ইহাদের বিবাহাদির ভারও গৃহস্বামী বহন করিতেন। আপনার পুত্রকন্যাগণের যেরূপ বিবাহ দিতেন, ততটা সমারোহের সহিত না হইলেও এসকল দাস-দাসীরও পুত্রকন্যাগণের যথারীতি বিবাহাদি দিতেন এবং ইহা নিজেদেরই দায় বলিয়া মনে করিতেন। রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও এসকল দাসদাসী তাঁহাদের প্রভুপরিবারের সঙ্গে সর্ব্বদাই অতিশয় কোমল স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতেন। এই মহিলাটি—ইঁহাকে দাসী বলিতে আমার মনে আঘাত লাগে—আমার মাতামহের পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। মায়ের বিবাহ হইলে ইনি তাঁহার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়া একজন আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া যান। মা বড় হইয়া উঠিলেও ইনি আমাদের বাড়ীতেই থাকিয়া যান। বাবার সঙ্গে সঙ্গে মা সর্ব্বদাই বিদেশে থাকিতেন। এইজন্য ইনি মাকে ছাড়িয়া আমার মাতুলালয়ে যাইতে পারেন নাই। মা ইঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন। কাঞ্চনী নামে ইঁহার এক কন্যা ছিল। আমি [illegible] দেখি নাই। বোধ হয় আমার [illegible]

[illegible]

ভাবে প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। গুরুজনের সমক্ষে প্রাচীন কালে আমাদের সমাজে ভদ্র পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে যখন-তখন কথাবার্ত্তা বলা শিষ্টাচার-সম্মত ছিল না। পারিবারিক বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরুষেরা পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্কা যিনি, তাঁহারই সঙ্গে পরামর্শাদি করিতেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নহে। আমার জন্মের পরে, আমাদের পরিবারে এই কাঞ্চনীর-মাই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা বলিয়া সকল বিষয়ে বাবা ইঁহার সঙ্গেই পরামর্শাদি করিতেন। কোন কথা কহিতে বা জানিতে হইলে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া কাঞ্চনীর-মা বলিয়াই ডাকিতেন। মাও বাবাকে কোন কথা জানাইতে হইলে ইঁহার মুখেই জানাইতেন। ইনি যে আমাদের নিজের লোক নহেন, ইঁহার সঙ্গে যে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই, বহুদিন পর্য্যন্ত আমার শৈশবে এজ্ঞান জন্মে নাই।

ইঁহাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম। ইনি যে সত্যই আমার মাসী নহেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতাম না। মাকে যতটা ভালবাসিতাম, বোধ হয় ইঁহাকে তার চাইতে বেশী ভালবাসিতাম। ফলতঃ আমি ইঁহারই কোলে মানুষ হইয়াছিলাম, বড় হইয়া মার মুখে এ কথা শুনিয়াছি। অতি শৈশবে আমি মাকে যতটা না আমার মূত্রপুরীষের দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, ইঁহাকে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক পীড়া দিয়াছিলাম, মা নিজে বহুবার ইঁহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আপনার সন্তানকে মা যতটা না আত্মবিস্মৃত হইয়া লালন-পালন করেন, কাঞ্চনীর-মা আমাকে তদপেক্ষা বেশী আত্মবিস্মৃতি সহকারে লালন-পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, আত্মপর-জ্ঞান-শূন্য শৈশবে আমি ইঁহার প্রতি [illegible] চাইতে বেশী অনুরক্ত ছিলাম। কোটের-হাটে [illegible] সময় এইজন্য আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বেরা [illegible] "কাঞ্চনীর-মা [illegible]" বলিয়া [illegible] তাম [illegible] রিতে [illegible] য়ের [illegible] সুদূর [illegible] নের

ঢেউ গিয়া লাগিয়াছে। কোটের-হাটে আমার দুই খুল্লতাত ছিলেন, একজন বাবার মাসতুত ভাই, আর-একজন তাঁহার মামাত ভাই। কাঞ্চনীর-মা বাবার শ্যালী স্থানীয়া ছিলেন বলিয়া ইঁহারা তাঁহাকে ঠাট্টা-পরিহাস করিতে পারিতেন। ইঁহারা "কাঞ্চনীর মা মরিয়া গিয়াছে" না বলিয়া "বিদ্যা-সাগরের মতে কাঞ্চনীর মার আবার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে" এই কাহিনী সৃষ্টি করিয়া আমাকে দেখিলেই বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিতেন এবং এইরূপে আমাকে ক্ষেপাইতেন। কোটের-হাটের স্মৃতির সঙ্গে এই সকলই জড়াইয়া আছে। আমার বার-তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাঞ্চনীর-মা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। মা ইঁহাকে বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করিতেন। বাবা ইঁহাকে আপনার শাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া চলিতেন। বড় হইয়াও ইহা দেখিয়াছি। বাবা-মা'র কথাবার্ত্তায় বা আচার-আচরণে ইনি যে দাসী এভাব কোন দিন প্রকাশ পায় নাই। আমার বয়স যখন তের কি চৌদ্দ সে-সময়ে আমার বড় মামা বিবাহ করেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমার মাতামহী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, মাতুল-পরিবারে কোন গৃহিণী ছিলেন না। আমার মায়ের একজন খুল্লতাত-পত্নী একমাত্র গৃহিণী ছিলেন। ইঁহারা কিন্তু আমার মাতুলদের সঙ্গে একান্নভুক্ত ছিলেন না। আমার মাতুল দুইজন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহারা বিদেশে বিদেশে থাকিতেন। আমার বড় মামা বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে আনিলে, কাঞ্চনীর-মা আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া আমার মাতুল-পরিবারের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর ইনি আমাদেরই পরিবারভুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি যে দাসী ছিলেন শৈশবে এ জ্ঞান জন্মে নাই, আজও একথা ভাবিতে সঙ্কোচ হয়।

৭

[illegible]-হাটের আর-একটা কথা মনে আছে। সে [illegible] মহকুমার [illegible] একটা কালীবাড়ী [illegible] বারোয়ারী উপলক্ষে [illegible] একবার খেমটা-নাচ হইয়াছিল। বাবা [illegible] দেখিতেন না। অথচ নিমন্ত্রণ [illegible] অমর্য্যাদা করা হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আমাকে খেমটা-নাচ দেখিয়া কালীর প্রণামী দিয়া আসিবার জন্য পাঠাইতে চাহিলেন। খেমটা-নাচ আমি কখনও দেখি নাই, খেমটা-নাচ কাহাকে বলে তখন পর্য্যন্ত শুনিও নাই। আমাদের অঞ্চলে প্রান্তিক ভাষায় চিমটি কাটাকে খেমটা কহে। খেমটা-নাচের এই অর্থ করিয়া সেখানে গেলে আমার গায়ে চিমটি কাটিবে এই ভয় পাইয়া কিছুতেই সে-নাচ দেখিতে যাইতে রাজী হই নাই। বাবা শেষটা আমাকে পাঠাইতে না পারিয়া বোধ হয় আমার কোন জ্যেঠতুত ভাইকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

৮

কোটের-হাটের আরও একটা কথা ভুলি নাই। একবার সেখানে ওলাউঠা দেখা দেয়। সে-সময় আমাদের বাড়ীর দাগুসিং কোটের-হাটে ছিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। ইঁহাকে আমি দাদা বলিয়া জানিতাম ও ডাকিতাম। ইঁহার ওলাউঠা হয়। জীবন-সংশয় উপস্থিত হইলে বাহির-বাটীতে যে-ঘরে রোগী ছিলেন, মা ও আমি ইঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সে-ঘরে গিয়াছিলাম। ঘরে বহু লোক। আমার বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বেরা তাঁহার রোগশয্যায় বসিয়া নিজের হাতে হিমাঙ্গে আবীর ঘষিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী হইলেও মা নিঃসঙ্কোচে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর ওলাউঠা ভীষণ সংক্রামক রোগ ইহা জানিয়াও তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই মুমূর্ষু রোগীর ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। একথা মনে হইলে আমি সর্ব্বদাই ভাবি আমার বাবা এবং আত্মীয়স্বজনেরা যে-ভাবে এই ভৃত্যের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, আমি কি তা পারি? আর আমার মা আমাকে লইয়া এই সাংঘাতিক সংক্রামক রোগীর ঘরে যেমন নিঃসঙ্কোচে গিয়াছিলেন, আমার পুত্র বা পৌত্রকে লইয়া আমার পত্নী বা বধূ কি তাহা পারেন? আমাদের নানাদিকে বহু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম আমরা যাহা জানি, [illegible] তাহা জানিতেন না। কিন্তু [illegible] আমাদের মনে রোগের বা মৃত্যুর যতটা ভয় [illegible] তাঁহাদের ছিল না।

৯

এই কথা বলিতে বলিতে আর-একটা কথাও মনে পড়িল। ইহা আমার শোনা কথা। মায়ের মুখে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মুখে বাল্যে একথা বহুবার শুনিয়াছি। বাবা তখন ঢাকায় কর্ম্ম করিতেন। আমি তখনও জন্মিয়াছি কি না বলিতে পারি না। একদিন আফিস বা আদালত হইতে ফিরিবার সময়ে পথিপার্শ্বে একজন অসহায় বসন্তরোগী পড়িয়া আছে, দেখিলেন। তাহার আলয় নাই, আশ্রয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, জ্ঞানও ছিল কি না সন্দেহ। তাহার জাত-বর্ণের পরিচয় পাইয়াছিলেন এমনও নহে। তখনও সরকারী হাঁসপাতালের সৃষ্টি হয় নাই। বাবা এই রোগীকে পথের ধারে এইরূপে ফেলিয়া আসিতে পারিলেন না। বাহকের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে নিজের বাসায় তুলিয়া আনিলেন এবং আপনার লোক দিয়া তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। সে ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিয়াছিল কি না শুনি নাই। কিন্তু যখনই একথা মনে পড়ে তখনই ভাবি আমি ত কোন জাতবর্ণের বিচার করি না, আর মানুষে দেবতা-বুদ্ধি সাধন করিতেও চেষ্টা করি। কিন্তু আমার বাবা যাহা করিয়াছিলেন, আমি কি তাহা পারি?

১০

ঢাকার আর-একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। এখনকার মতন সেকালে কোথাও স্কুল কলেজের ছেলেদের "মেসের" প্রতিষ্ঠা হয় নাই। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের আত্মীয় কুটুম্বের বাসাতে থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। সে-কালের লোকের ধারণা ছিল যে, অন্নদানে পুণ্য হয় বটে, কিন্তু বিদ্যাদানে তদপেক্ষা শতগুণ বেশী পুণ্য হয়। এইজন্য সম্পন্ন গৃহস্থেরা নিঃসম্পর্কিত লোককেও নিজের বাড়ীতে বা বাসায় রাখিয়া স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আমার বাবা যখন ঢাকায় ছিলেন, সে-সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বটে, কিন্তু ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীহট্ট, কুমিল্লা এবং পূর্ব্ব মৈমনসিংহের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ আমার বাবার, একান্নে নহে, কিন্তু হাভেলীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন। পরলোকগত আনন্দচন্দ্র দত্ত (বারশালের আনন্দ মাষ্টার) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে ইনি ঢাকা কলেজে পড়িবার সময় আমার বাবার বাসাতে ছিলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরমোহন বসু, শ্রীহট্টের ও কাছাড়ের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টার্ পরলোকগত নবকিশোর সেন মহাশয়, শ্রীহট্টের পরলোকগত উকিলসরকার রায় বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব মহাশয়। ইঁহারা বাবার বাসায় থাকিয়া ঢাকাতে পড়াশুনা করিয়াছিলেন, আনন্দ মাষ্টার মহাশয় একথাও কহিতেন।

১১

কোটের-হাটে বাবা ক'বছর ছিলেন মনে নাই। কোটের-হাটেই আমার বিদ্যারম্ভ বা হাতে-খড়ি হয়। এই কথাটা মনে আছে। তাহার পরেও বোধ হয় বছর দুই, বাবা কোটের-হাটে ছিলেন। তাহার আগেও বছর খানেক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আমার তিন বছর বয়স হইতে সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত আমরা কোটের-হাটে ছিলাম। গ্রাম হইতে আমাদের পুরোহিত আসিয়া আমার হাতে-খড়ি করাইয়াছিলেন। ঘট স্থাপন করিয়া সরস্বতীর পূজা হইয়াছিল। পূজা-শেষে স্নান করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া আমি সরস্বতীর চরণে যথাবিধি অঞ্জলি দিয়াছিলাম এবং

ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্ম্মলবরণং।
রত্ন-ভূষিত-কুণ্ডল-করণং ॥

ইত্যাকার স্তোত্র পড়িয়া পুরোহিতের হাত ধরিয়া পরিষ্কার মাটির উপরে একটা কাঠি বা শরের কলম দিয়া "আঞ্জি ক, খ" লিখিয়াছিলাম। এই 'আঞ্জি' জিনিষটা যে কি তা জানি না। ইংরেজী বর্ণমালার S অক্ষরটা উল্টাইয়া লিখিলে এই আঞ্জির মতন হয়। সংস্কৃত বা বাংলা বর্ণমালায় এনামে কোন বর্ণ নাই। বড় হইয়া এরূপ অনুমান করিয়াছি যে, বোধ হয় এই আঞ্জি প্রণবের কোন নামান্তর বা রূপান্তর হইবে। ব্রাহ্মণ বালকেরা উপনয়নের সময় ওঁ উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শূদ্রদের এ অধিকার ছিল না। মনু কহেন যে, সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই ওঁ উচ্চারণ করিবে, না হইলে সে-কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ নই বলিয়া আমাদের ত ওঁ উচ্চারণের অধিকার ছিল না। ওঁ লেখার অধিকারও ছিল না। অথচ হাতে-খড়ির সময়ে ক, খ লিখিবার পূর্ব্বে, মাঙ্গলিকরূপে ভগবানের নাম লেখা আবশ্যক।

এইজন্যই বোধ হয় সেকালে এই 'আঞ্জি' লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ অনুমান সত্য কি মিথ্যা জানি না। বাংলার অন্য কোন জেলায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে-খড়ির সময়ে এরূপ "আঞ্জি" লিখিয়া ক, খ লিখিতে হইত কি না বলিতে পারি না। আর হইলে তাঁহারাই বা ইহার কি অর্থ করিতেন এ সন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়।

১২

হাতে-খড়ি হইবার পূর্ব্বে যদিও আমি লেখা-পড়া করিতে আরম্ভ করি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমার শৈশব-শিক্ষা বিদ্যারম্ভ হইতেই আরম্ভ হয় ইহা সত্য নহে। আমার কথা ফুটিতে আরম্ভ করিলেই, বাবা আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কাছে বসাইয়া বা কোলে লইয়া সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করাইতেন। যতদূর মনে আছে, বাল্মীকি রামায়ণের আদি শ্লোক—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্ ॥"

এইটাই সকলের আগে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। তার পরে—

রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতিঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকটি শিখিয়াছিলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি শ্লোক, বাবা মুখে মুখে শিখাইয়াছিলেন। বিস্তর চাণক্য-শ্লোক তাঁর নিজের কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলিও তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। একটু বড় হইলে পরে, কতকগুলি শ্লোক আমার মুখস্থ হইয়া গেলে, সন্ধ্যার পরে পিতাপুত্রে বসিয়া শ্লোকের প্রতিযোগিতা হইত।

খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দান আমাদের প্রাচীনেরা যে একেবারে জানিতেন না তাহা নহে। এই শ্লোক আবৃত্তি করাও একটা খেলার মতনই ছিল। এ ছাড়া খেলার ভিতর দিয়াই আমার শৈশবে আমরা ধর্ম্মশিক্ষাও লাভ করিতাম। হিন্দুর ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে, আচারের ধর্ম্ম, ক্রিয়ানুষ্ঠানের ধর্ম্ম। কহিয়াছি যে, আমি অতি শৈশবে কোটের-হাটে, বাবা সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন দেখিয়া কোষাকুষি লইয়া তাঁহারই মত সন্ধ্যাহ্নিকের অভিনয় করিতাম। খৃষ্টিয়ান্ পরিবারের শিশুরা যে-ভাবে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার এবং রাত্রে শুইতে যাইবার সময়, মায়ের কোলে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, আমাদের সমাজেও ইহার অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্যূষে জাগিয়াই আমাকে দুর্গা নাম স্মরণ করিতে হইত:—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

ইহার সঙ্গে সঙ্গে:—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই শ্লোকও আবৃত্তি করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে হইত। আবার রাত্রে শুইতে যাইবার সময়:—

... ... বিপত্তৌ মধুসূদনঃ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ ॥

এই শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। বাবার কাছে এসকল শ্লোক শিখিয়াছিলাম।

১৩

হাতে-খড়ি হইবার পরেই আমি "শিশুবোধ" পড়িতে আরম্ভ করি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা" বোধ হয় তাহার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। "শিশুবোধেই" আমার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত না হইলেও, আমার মনে হয় যে, শিশুর শিক্ষার জন্য শিশুবোধ অন্যান্য দিকে অতিশয় উপযোগী ছিল। চাণক্যশ্লোক এই শিশুবোধেই প্রথম পড়িয়াছিলাম; বাবার মুখে বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বে যেসকল শ্লোক শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন এই পুস্তকে ছাপার অক্ষরে পড়িতে পারিয়া পাঠে একটা নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এ সকল কথা এই শিশুবোধেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শিশুবোধে সকলের চাইতে মিষ্টি ছিল, দাতাকর্ণের উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি বার বার পড়িয়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বরিশালে থাকিতেই বাংলা লেখাপড়া কতকটা শিখিয়াছিলাম। শিক্ষক ছিলেন আমার পূজ্য-

বাজাইয়া ঢুলীরা গিয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে সেকালে এসকল পর্ব্ব উপলক্ষে ভদ্র-পরিবারের মেয়েরাও গান গাহিতেন। এই গান-শেখা স্ত্রীশিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া গান না গাহিলে কোন উৎসবই পূর্ণাঙ্গ হইত না। বাড়ীর গৃহিণীরাও এ গানে যোগ দিতেন। যজ্ঞ-বাড়ীর কর্ম্ম-বাহুল্যের মধ্যে আমার মাকে দেখিয়াছি, এক-একবার পুরস্ত্রীমণ্ডলে আসিয়া বসিতেন এবং গালে হাত দিয়া, গলা ছাড়িয়া যে-গান তাঁহারা গাহিতেছিলেন, তাহার দুই একটা পদ গাহিয়া দিয়া আবার তখনই কর্ম্মান্তরে ছুটিয়া যাইতেন। হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল না, বেহালা ছিল না, অন্য কোন যন্ত্র ছিল না। যন্ত্রের সঙ্গতের হাঙ্গামা ছিল না। অথচ এই পুরস্ত্রীরা নিজেদের গলা মিলাইয়াই একটা সঙ্গত করিয়া লইতেন। কখনও কখনও ইঁহাদের গান যে বেসুরা হইত না এমন নহে। আর তখনই সুর-লয়ের জ্ঞান আছে, এমন কোন মহিলা, গায়িকাদিগের মধ্যে আসিয়া তাহা শুধরাইয়া দিতেন। আমার মার গলা খুব মিষ্টি ছিল। আর বোধ হয় কিছু কিছু সুরলয়ের জ্ঞানও ছিল। এইজন্য প্রায়ই অন্য কর্ম্মের মাঝখানেও গায়িকাদের সুর ও লয় নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিলেই তিনি তাঁহাদের মাঝখানে আসিয়া গলা ছাড়িয়া সকলের গলার উপরে নিজের গলা চড়াইয়া, যেখানে বেসুরা হইতেছিল তাহার সুর ঠিক করিয়া দিয়া যাইতেন।

আমার চূড়াকরণের দিন 'জল সওয়ার' কথা-প্রসঙ্গে সেকালের ভদ্র মেয়েদের গান গাহিবার রীতির বর্ণনা করিলাম। ইঁহারা যে কেবল ঘরে বসিয়াই গান গাহিতেন, তাহা নহে। হিন্দুর সকল উৎসবেই জল সওয়ার প্রথাটা আছে। জল 'সওয়া' কথাটা কোথা হইতে আসিল জানি না। তবে ইহার সাধুভাষা 'সংগ্রহ করা' এ বেশ বোঝা যায়। আমাদের মেয়েরা সেকালে বার ঘাটের জল সংগ্রহ করিতেন। ইহার অর্থ বোধ হয় এই ছিল যে, সমগ্র বাসভূমি অথবা সমগ্র দেশের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বালককে চূড়াকরণ বা উপনয়নের সময় এই সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হইত; অর্থাৎ যার যে সামাজিক পদ প্রাপ্য সেই পদ সে পাইত। বিবাহেতেও বর ও কন্যাকে এই বারঘাটের জল দিয়া স্নান করাইতে হইত। এ সকলের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া দেওয়া হইত। এ অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সংস্কারটা তখনও প্রচলিত ছিল।

আমাদের পুরস্ত্রীরা এই জল-সওয়ার সময়ে দল বাঁধিয়া মাথায় বা কক্ষে ঘটি বা কলসী লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের পথে বাহির হইতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে এই "বার ঘাটের" জল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

১৮

আমার চূড়াকরণের দিনেও মনে পড়ে মেয়েরা এইরূপ জল সইতে বাহির হইয়াছিলেন। সাত বৎসরের বালক হইলেও বোধ হয়, সেদিন আমাকে ভাত খাইতে দেওয়া হয় নাই। কেবল কিছু জলপান করিতে পাইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে মেয়েরা জল "সইয়া" বাড়ী ফিরিলে সেই জলে আমাকে স্নান করান হইল। তার পর কিছু মিষ্টান্ন খাইতে পাই। তখনও আমাদের দেশে ছানার সন্দেশের আমদানী হয় নাই। সন্দেশ বলিতে আমরা ক্ষীরের ও নারিকেলের মিষ্টদ্রব্য বুঝিতাম। সন্ধ্যার পর আমি বিবাহের বরের মতন নূতন জাঁকালো কাপড়-চোপড় পরিয়া সভায় যাইয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলাম। বোধ হয় আসরে তখন ঝুমুরওয়ালীর গান হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাদের "দ্বারস্থ" নাপিত আসিয়া দুইটা নূতন রূপার শলাকা দিয়া আমার কান বিঁধিয়া দিল; সে বেদনায় অস্থির হইয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম এবং নাপিতকে গালাগালি দিতে দিতে খড়ম তুলিয়া মারিতে গিয়াছিলাম। নাপিত বেচারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল। আমাকে ধরিয়া আনিয়া কোলে করিয়া অন্তঃপুরে পাঠান হইল। মা আসিয়া বোধহয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। মনে আছে, ইহার পরে কিছু দিন পর্য্যন্ত এই নাপিত আমাদের বাড়ীর সামানায় আসিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিলেই আমি খড়ম লইয়া মারিতে যাইতাম।

১৯

এই চূড়াকরণ ব্যাপারটা যে কি, কিসে ইহার উৎপত্তি আর কি বা ইহার সার্থকতা তখনও বুঝিবার বয়সই হয় নাই, এখনও বুঝিয়াছি এমন বলিতে পারি

না। আমাদের সমাজের লোকেরা যাঁহারা একরূপ ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারাও বুঝিতেন কি না সন্দেহ। জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে যেমন বিনা বিচারে কেবল প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতেন; এই চূড়াকরণের অনুষ্ঠানও সেইরূপ হইত। আজকাল বোধ হয় আগেকার মতন এ অনুষ্ঠান হয় না। বিবাহের অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিকরূপে কানে একটা শলাকা ছোঁয়াইয়াই এখন এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ কোন খোঁজ-খবর লন না।

আমার মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন। সমাজ-গঠনের অতি শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কোন একটা অঙ্গ ক্ষত করিয়া সে যে বিশেষ কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ইহা জানাইতে হইত। ধর্ম্মের একতা, আচার বিচারের একতা, এ সকলের দ্বারা সামাজিক ঐক্য বহু পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম যখন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই, সামাজিক রীতি নীতি যখন প্রাচীন শ্রুতির ও স্মৃতির উপরে গড়িয়া উঠে নাই, তখন এক-একটা বাহিরের চিহ্নের দ্বারা কে কোন্ গোষ্ঠীর লোক ইহার পরিচয় হইত। বোধ হয় সেই সময়ে আমাদের অতি প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই কর্ণবেধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানের চক্ষে হিন্দুর কর্ণবেধ এবং মুসলমানদিগের ত্বকচ্ছেদ একই বস্তু। আসিয়ার ও আফ্রিকার প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে একদিন আমরা হয় ইহাদের সগোত্র ছিলাম অথবা ভারতবর্ষে আর্য্যেরা আসিয়া ইহাদের এদেশের সগোত্রদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই কর্ণবেধ বৈদিক সংস্কারের অন্তর্গত নহে। সে যাহা হউক আমার শৈশবে আমাদের অঞ্চলে চূড়াকরণ বৈদিক সংস্কারেরই মর্য্যাদা লাভ করিত।

আমার চূড়াকরণের সঙ্গে-সঙ্গেই শৈশবের খেলাধূলা শেষ হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই বাবা প্রথমে কিছু দিনের জন্য অস্থায়ী ভাবে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ফেঁচুগঞ্জ নামক মহকুমায় মুন্সেফ হইয়া যান। তার পরে চিরদিনের মতন হাকিমি ছাড়িয়া শ্রীহট্ট সদরে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্টে যাইয়া আমার বাল্য-জীবন আরম্ভ করি।

(ক্রমশঃ)

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

আটাশ

দিন দুই পরে সন্ধ্যার পর বৈকালীন ঝড়-ঝাপ্‌টার শেষে আকাশ ভারী নির্ম্মল। দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে একটুখানি দাগ কেটেছে। বাতাস ভারী মিঠা, হাস্‌নাহানা ফুলের গন্ধ অন্য সব ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে নিজের গৌরব প্রকাশ কর্‌ছে। দুই বন্ধু ব'সে বাইরের ঘরে গল্প জুড়েছিল। প্রবাল বল্‌লে—"আজ সন্ধ্যাটি এমন সুন্দর। তুমি নিতান্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে এসেছ তাই, নইলে এখনি টেনে নিয়ে বেড়াতে বেরুতাম।"

কেদার বল্‌লে—"আর বেড়াবো কি ভাই, শরীরটা দিন দিন যে ভাবে ফুলে উঠ্‌ছে তাতে ক্রমেই জড়ত্ব-প্রাপ্তি না ঘটে। আগেকার সে সব ছুটোছুটি, বেড়াবার ধুম, সব যেন এখন অতীতের স্বপ্ন।"

প্রবাল বল্‌লে—"স্বপ্নকে সত্য ক'রে দেখ্‌তে পার্‌লেই স্বপ্ন বাস্তব হ'য়ে ওঠে। তুমি যে এর মধ্যেই বুড়তে চাও হে।" কেদার হেসে বল্‌লে—"বন্ধু তোমার কাছে এক হিসেবে আমি বুড়ো বই কি। তোমার চোখে এখন নূতন নেশা, প্রাণে এখন নূতন ভাব। তোমার নাগাল পাবার আমার সাধ্য নেই।"

প্রবাল বল্‌লে—"কিন্তু এই ভাবটি মিলিয়ে যেতে

দেওয়া উচিত নয়। তা হ'লে যে দুনিয়ার সব ফিকে হ'য়ে যাবে ভাই। ওহে কেদার তোমার বাসর-ঘরে যে গানটি গেয়েছিলাম মনে আছে?"

কেদার বল্‌লে—"খুব আছে। কানে তার সুর এখনো বাজ্‌ছে। অনেক দিন সে-গান আর শুনিনি। একবার গাও না হে, এখন আবার সে গান জম্‌বে ভালো।"

প্রবাল হেসে বল্‌লে—"কেন বন্ধু সেদিনই কি জমেনি বল্‌তে চাও? সত্যের অপলাপ?"

কেদার দৃষ্টি হেনে বল্‌লে—"উভয়তঃ?"

এই সময় "মশায় বাড়ী আছেন কি?" বল্‌তে বল্‌তে মতিবাবুর সঙ্গে আরও দু চারজন ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়্‌লেন। প্রবাল ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে বস্‌ল, কেদারও উঠে ব'সে,"আসুন আসুন, বসুন মশাই"—ব'লে অভ্যর্থনার জের টান্‌তে লাগল। ভদ্র ব্যক্তিগণ আসন গ্রহণ ক'রে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। যেকথা বল্‌বার জন্যে তাঁরা এসেছেন সে কথাটাকে কি ভাবে এখন ফুটিয়ে তোলা যায়।

প্রথমেই হরিসভার সেবক ঠাকুর শ্রীমন্ত গোস্বামী কথা বল্‌লেন—"ইন্‌স্পেকটার মশাই স্বনামধন্য পুরুষ। হবেন না কেন? সদ্‌বংশে জন্ম, সৎকাজের কাজী, পাড়ায় রয়েছেন আমাদের বল ভরসা। সবার সঙ্গেই সদ্ব্যবহার, এমন মানুষ পুলিশে আজকাল চোখে পড়ে কই ইত্যাদি—"

মতিবাবু চোখ টিপে বল্‌লেন—"নিছক স্তুতিবাদটা সময়ান্তরের জন্য রেখে দিয়ে কাজের কথা পাড়লেই কি ভাল হয় না? একে ত তর্কাতর্কি ক'রে আমার বৈঠকখানাতেই দু' ঘণ্টা কাটালেন, তার উপর রাতও হ'য়ে এসেছে। কেদারবাবু তিন দিন পরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে ফিরেছেন বিশ্রাম দর্‌কার ত।'

এই যে সাম্‌না-সাম্‌নি কথা নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে আলোচনাটা বেশ জোরের সঙ্গেই চালানো যায় যদি সে আসামী সে-স্থানে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু পরোক্ষের ব্যাপার প্রত্যক্ষে এলেই যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায় আর তাতে দম দেওয়া চলে না। সুতরাং প্রবালের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে সেবার আলোচনা এতদিন যাবৎ যদিও অন্দরে সদরে পথে ঘাটে স্ত্রী পুরুষ প্রায় সবারি মধ্যে ইঙ্গিতে-ইসারায় চপলাবিকাশের ন্যায় ঝিলিক হেনে বেড়াচ্ছিল; কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মতিবাবুর বৈঠকখানায় পাঁচজনের মধ্যেও তার আনুপূর্ব্বিক সমালোচনা হচ্ছিল; তবু এখন সেই প্রবালকে সম্মুখে দেখে হঠাৎ সে আলোচনার গতি অচল হ'য়ে গেল। যাই হোক্‌ মতিবাবু উল্লেখ কর্‌বার পরও যখন আর কেউ কথাটা ব্যক্ত কর্‌তে চাইলেন না, তখন দেবকণ্ঠবাবু বললেন—"বেশ আমিই বল্‌ছি শুনুন, কেদারবাবু। আপনার বন্ধু না কি আপনার বাড়ীতেই বসে বিধবা বিবাহ কর্‌ছেন? এটা কি সত্যি কথা, না রটনা?"

কেদার ও প্রবাল এই প্রশ্ন শোন্‌বার জন্যই উৎকর্ণ হয়েছিল, কেদার বল্‌লে—"কথাটা সত্যিই।"

গোস্বামী সকলের আগেই কানে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন,"শ্রীবিষ্ণু,শ্রীবিষ্ণু এ যে কানে শুন্‌লেও পাপ,হিন্দুর বিধবা আদর্শ দেবী, তার কিনা দ্বিচারিণীত্ব। ঘোর কলি!"

প্রবালের মুখ-চোখ অস্বাভাবিক রকম রাঙা হ'য়ে উঠল কিন্তু হঠাৎ সে কিছু ব'লে উঠতে পার্‌লে না; মতিবাবু গোস্বামীর দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন—"আর গোপনে যদি—"

কথাটা তিনি শেষ কর্‌লেন না। ওরই মধ্যে যে গুপ্ত শ্লেষ ছিল তা অনেকেই জান্‌তেন। কাজেই গোস্বামী কিছু প্রতিবাদ না ক'রে নিস্ফল আক্রোশে ফোঁসাতে লাগলেন। তখন দেবকণ্ঠবাবু বল্‌লেন—"যেটা পাপ, তা সকল সময়ই পাপ মতিবাবু, তা গোপনেই হোক্‌ আর প্রকাশ্যেই হোক্—।"

গোস্বামী সাহস পেয়ে হাত দুলিয়ে বল্‌লেন—"বলুন ত দেবকণ্ঠবাবু—বিধবার বিবাহ উচ্চবর্ণের ভদ্রগৃহে এযে অনাচার ম্লেচ্ছাচার, এ যে গোল্লায় যাবার সদর রাস্তা।"

প্রবাল গোস্বামীর দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে দেবকণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"বিধবা-বিবাহ সকল সময়েই কিছু অশাস্ত্রীয় নয়। আপনি সে-কথা জানেন। তবু আপনারা হঠাৎ এ-সংবাদে এতটা উত্তেজিত হ'য়ে কেন

ছুটে এসেছেন তা জানি-না। তবে আমি যে গর্হিত কাজ কর্‌ছি না এটা অন্ততঃ আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন।"

দেবকণ্ঠবাবু বল্‌লেন—"আমি মোটেই ও কথা ভাবিনি, প্রবালবাবু। নিজে কিছু ভাল কাজ কর্‌বার সাহস না রাখি কেউ কর্‌বার জন্যে অগ্রসর হ'লে তাকে অন্ততঃ বাধা যে দেবো না এ ঠিক।" পশুপতিবাবু এতক্ষণ চুপ চাপ সব শুন্‌ছিলেন। তিনি এইবার মুখ খুল্‌লেন—"দেখুন, প্রবালবাবু, ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সমাজের শরীরে ও মনে অনেক দুষ্ট ব্যাধি প্রবেশ করেছে। তার ফলে সমাজের আরও অধোগতি হয়েছে। দিনের পর দিন রসাতলে যেতে বসেছে, যাবেও।"

কেদার বল্‌লে—"আপনার কি বক্তব্য, হিন্দুসমাজের অধোগতির কথা রেখে তাই একটু বুঝিয়ে বলুন না।"

পশুপতিবাবু বল্‌লেন—"আমার বক্তব্য এই, দেশে খ্রীষ্টিয়ান সমাজ রয়েছে, ব্রাহ্ম সমাজ রয়েছে, মুসলমান সমাজও আছে। আপনার বন্ধুকে বলুন সেইসব সমাজে গিয়ে বিয়ে কর্‌তে। হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে একাজ কর্‌বার তাঁর কি অধিকার?"

প্রবাল একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"অধিকার মানে কি বল্‌তে চান্ আপনি? আপনাদের হেঁয়ালী ত ভাল ক'রে বুঝতেই পার্‌ছি না।"

গুণদাবাবু বল্‌লেন—"দেখুন প্রবালবাবু, আপনি যে বিগর্হিত অনুষ্ঠান সমাজে ব'সে কর্‌তে যাচ্ছেন তার ভাবী ফলাফল চেয়ে দেখেছেন কি? আপনার মত বিদ্বান বা বুদ্ধিমানের তা ভাবা উচিত। আপনার দৃষ্টান্ত কত নরনারীকে পথভ্রান্ত কর্‌বে—"

গোস্বামী অধৈর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"এর পর ছোট বড় সব বয়সের বিধবারাই ছেলেমেয়ে নিয়ে বিয়ে কর্‌তে ছুটবে। কি সর্ব্বনাশ, সমাজের কি অধঃপতন!"

গোস্বামীর সেই সময়ের আতঙ্কক্লিষ্ট মুখের চেহারা দেখে প্রবালও আর না হেসে থাকৃতে পার্‌লে না। হাসিমুখেই বল্‌লে—"গোঁসাইঠাকুর, ভয় পাবেন না। যে দৃশ্য দেখবার ভয়ে আপনি আঁৎকে উঠছেন তা আপনাকে কোনো দিনই দেখ্‌তে হবে না, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

পশুপতিবাবু বল্‌লেন—"আপনার বক্তব্য কিছু বলুন, প্রবালবাবু।"

প্রবাল স্থির কণ্ঠে বল্‌লে—"দেখুন হিন্দু সমাজ থেকে আমাকে বরখাস্ত কর্‌বার অধিকার যদি আপনারা প্রচার কর্‌তে চান তা হ'লে আমিও বলি এই সমাজে থাক্‌বার দাবী আমার কারুর চেয়ে কিছু কম নেই।"

পশুপতিবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—"সমাজের নিয়ম মান্‌বেন না, অথচ হিন্দু হ'য়ে থাক্‌বেন এ কেমন কথা, মশাই? এ যে আপনার মামার বাড়ীর আব্দার দেখি।"

গুণদাবাবু বল্‌লেন—"দেখুন প্রবালবাবু, আপনাকে আর-একটি কথা বলি শুনুন। যে কোনো সমাজ চালাতে হ'লে তার কতকগুলি নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ কর্‌তে হয়। আমাদের দেশের সমাজহিতৈষী শাস্ত্রকারগণ বিধবা-বিবাহ কেন যে নিষেধ করেছিলেন তার আর একটা গূঢ় কারণ আপনি জানেন ত—অর্থাৎ আমাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ।"

প্রবাল বাধা দিয়ে বল্‌লে—"প্রমাণ?"

গুণদাবাবু উৎসাহের সঙ্গে জোর গলায় বল্‌লেন—"প্রমাণ চান? প্রমাণের ভাবনা কি, মশাই? দেশে যখন কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত ছিল, এক একজন পুরুষ, দশ বিশ থেকে একশোটা পর্য্যন্ত বিয়ে ক'রেও আইবুড়ো মেয়ের সংখ্যা কমাতে পার্‌ত না। তার পর আরও আগে রাজা বাদশাদের কথা ভেবে দেখুন। সবারি দুশো চারশো, পাঁচশো রাণী বা বেগমের সংখ্যা। তবুও ত কই দেশে মেয়ের দুর্ভিক্ষ হ'ত না; যদি আজ দেশে বিধবা-বিবাহ চলে তা হ'লে একেই ত দিন দিন আইবুড়ো মেয়েদের পাত্র জোটা ভার—তার ওপর বিয়ের সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে উঠবে।"

প্রবালের পরাজয় এইবারের ক্ষুরধার অকাট্য যুক্তির মুখে অবশ্যম্ভাবী জেনে গোস্বামীর মিটমিটে চাউনী আনন্দে জল্ জল্ ক'রে উঠল। নৈষ্ঠিক হিন্দু পশুপতিবাবু ব্যাপারটার একটা কুলকিনারা দেখবার আশ্বাসে বেশ একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বস্‌লেন। এইবার প্রবাল ধীর ভাবে উত্তর দিতে লাগল—"দেখুন—আপনারা যে প্রমাণ উপস্থিত কর্‌ছেন, তা যে খুব প্রামাণ্য নয় তার পরিচয়

দিচ্ছি। ওদিকে অনেকে যেমন বহু মেয়ের পাণিগ্রহণ করতেন তেম্‌নি শত শত পুরুষকে চিরটাকাল আইবুড়ো থেকে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনও যাপন করতে হ'ত। তারপর দেশের জনসংখ্যা আমরা সরকারী আদমসুমারি থেকেই জেনে থাকি। সেটা খুব নির্ভুল না হ'লেও প্রায়ই সত্যের কাছ ঘেঁসেই দাঁড়ায়। সুতরাং সেই গণনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন আমরা সহজেই করতে পারি। আপনারা যদি মন দিয়ে রিপোর্টগুলি দেখেন ত দেখতে পাবেন আমাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের চাইতে মোটেই বেশী নয়। বরং সমানও নয়, কিছু কমই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য সব জাতের মধ্যে মেয়ের মোটেই সুভিক্ষ নেই। কেন না শুনে থাকবেন বোধ হয় যে, তাদের অতি উচ্চ পণ দিয়ে কন্যা সংগ্রহ করতে হয়।"

পশুপতিবাবু উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন—"সেত হ'ল নীচবর্ণের কথা। তাদের মধ্যে কন্যার সুভিক্ষ কি দুর্ভিক্ষ তা নিয়ে ত আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার দেখি না।"

প্রবাল বল্‌লে—"যখন জাতির কথা ভাবছেন, দেশের কথা ভাবছেন, সমাজের কথা ভাবছেন, তখন তাদের বাদ দিয়ে কথাটা চল্‌বে কি ক'রে? শুধু কতকগুলি বাছা বাছা ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিয়েই ত দেশ নয়।"

গুণদাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনি কি বলেন সেই সব নীচজাতির ঘরের সঙ্গে আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়ে দেওয়া-নেওয়া ক'রে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হ'বে?"

এবারে কেদার বল্‌লে—"যদি দরকার হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে হ'বে বোধ হয়—"

গোস্বামী অধৈর্য্য ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে হাত মুখ নেড়ে বল্‌লেন—"শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ! এ সব ম্লেচ্ছাচারের কথা শুনে আর দেহ মন অপবিত্র করার দরকার নেই। অসহ্য, অসহ্য।"

গুণদাবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনি যে এইরকম অনাচারী হ'য়ে সমাজে বাস করবেন মনে করছেন, কেউ কি আপনার সঙ্গে উঠবে বসবে, কেউ কি কাজে কর্ম্মে আপনার বাড়ী পাত পেতে খাবে?"

মতিবাবু একটু চাপা সুরে বল্‌লেন—"নেহাৎ একলা হবার ভয় নেই, প্রবালবাবু। কেউ না পাত পাতুক—আমি দু'বেলাই আপনার বাড়ী পাত পাততে রাজী আছি।"

প্রবাল সে-কথায় কান না দিয়ে দেবকণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বল্‌লে—"আচ্ছা—আপনি একজন গুণী-জ্ঞানী লোক। বলুন ত আপনি—শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠানের বিধি আছে, আজকার দিনে আপনারা কয়জন ব্রাহ্মণ সে-সব বিধিনিয়ম পালন ক'রে থাকেন?"

দেবকণ্ঠবাবু উত্তর দেবার পূর্ব্বেই পশুপতিবাবু ব'লে উঠলেন—"ছোকরা—তোমার স্পর্দ্ধা, তোমার জ্যেঠামি অসহ্য। বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে—কি ভাবে কথা বলতে হয় দু পাতা ইংরেজী প'ড়ে তাও ভুলে গ্যাছ। দিন কতকের জন্যে এসে গাঁয়ের যত ছোটলোক নিয়ে তোমার ওঠা বসা আর হৈ চৈই হয়েছে কাজ। শাস্ত্রের তুমি কি জান, বাপু? এখন কি ব্রাহ্মণের সে দিন-কাল আছে সে গৌরব আছে যে, তারা স্বচ্ছন্দে নিজেদের ধর্ম্মাচরণ বারব্রত পালন করবে? দেশের লোক কি ব্রাহ্মণের সে সম্মান রেখেছে না রাখবার চেষ্টা করছে?"

গোস্বামী শিখা দুলিয়ে হাত ঘুরিয়ে বল্‌লেন—"ছাই রেগেছে—সাধে কি বিভীষণ বলেছিলেন—

'হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ'

কলির ব্রাহ্মণ যে বিষদন্তহীন ভুজঙ্গ।"

মতিবাবু বল্‌লেন—"সেই ভাল। নইলে কথায় কথায় কাম্‌ড়ে বিষ ঢেলে দিলে বিষ ঝাড়বার ওঝা মিল্‌ত না। একেত দেশে এই সাপের বাহুল্য—তার ওপর ব্রহ্মশাপ—ওরে ব্যাস রে।"

মতিবাবুর বল্‌বার ভঙ্গীতে কেদার হেসে ফেলেই সাম্‌লে গেল। প্রবাল দেবকণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লে—"দেখুন, দোষ আপনার আমার এর মধ্যে কিছু নেই, যদি দোষ-গুণ কারু মান্‌তে হয় তাহলে অপরিবর্ত্তনীয় প্রভাব এই কালের। মানুষ তার প্রবল আকর্ষণে তার অনুসরণ ক'রে চলেছে। ঐ কালেরই নিয়ম মেনে যুগে যুগে সময়োপযোগী বিধি হয়, ব্যবস্থা হয়, একথা বোধ হয় পশুপতিবাবুও মান্‌বেন।" শেষের কথাটি সে পশুপতিবাবুর মুখের দিকেই চেয়ে বল্‌লে—তাঁর কিন্তু আর তর্ক করবার ধৈর্য্য থাক্‌ছিল না। অর্ব্বাচীন যুবা অত বড়

অভিযোগের বিরুদ্ধে কিছু না ব'লে হৃষ্ট মনে তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মুখ তুলে আবার বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধদের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে আসে, এসব কুলাঙ্গারদের ঠাঁই হিন্দুসমাজে না জাহান্নমে। তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"ওহে দেবকণ্ঠ, স্কুলে থেকে এঁকে ডিস্‌মিস্‌ ক'রে দিও। এইরকম কদাচারী লোক কখনও এতগুলি হিন্দুসন্তানের শিক্ষক থাকৃতে পারে না। কেদারবাবু আপনি মাননীয় লোক, কিন্তু কিছু মনে কর্‌বেন না মশাই, সমাজে থাক্‌তে হ'লেই তার সম্মান রেখে চল্‌তে হয়। আপনাকে আমরা পরিত্যাগ কর্‌তে রাজী নই, কিন্তু আপনাকে অনাচারীর সংসর্গ ছাড়তে হচ্ছে।"

কেদার বল্‌লে—"আমি তো মশাই আমার বুদ্ধিবিবেক অনুযায়ী আমার বন্ধুর কাজকে পাপাচার ব'লে জান্‌ছি না। কেমন ক'রে তাঁর সংসর্গ পরিত্যাগ কর্‌তে পারি?" পশুপতিবাবু বল্‌লেন, "ন্যাবা রোগ ধর্‌লে জানেন তো রোগীর চোখে সব রঙটাই হল্‌দে ঠেকে। আপনাদের দেখ্‌ছি, সবারি সেই দশা। এটা কিন্তু মোটেই সহজ অবস্থা নয়, এর জন্যে আপনাদিগের সকলকেই বিষম ফলভোগ কর্‌তে হ'বে।"

মতিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা মশাই, এখনত সাম্‌না-সাম্‌নি সব কথার মীমাংসা হয়ে গেল, এইবার অভিসম্পাতের পালা শেষ ক'রে উঠে পড়লেই ভাল হয়।"

গুণদাবাবু প্রবালের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আপনি মশাই, নিজেই আপনার কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে দেবেন, খামকা কেন পদচ্যুত হ'তে যাবেন।"

প্রবাল বল্‌লে—"আমার দিক্‌ থেকে আমি পদত্যাগ পত্র দিতে রাজী নই। আপনার ইচ্ছে হয় আমায় পদচ্যুত বা যা ইচ্ছে কর্‌বেন। আর তার একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে দেবেন।"

পশুপতিবাবু মাথা নেড়ে বল্‌লেন—"না না, ওঁর আর স্কুলে এক দণ্ড থাকা উচিত নয়। ওঁর এই আচরণ যদি ছেলেরা দেখতে অভ্যস্ত হয় ত ভবিষ্যতে ফল ভয়ানক হ'য়ে উঠবে।"

"কদাচার—অনাচার ইত্যাদি বুলি আওড়াতে আওড়াতে পশুপতিবাবু দলবল সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেদার হেসে বন্ধুকে বল্‌লে—"ব্যাপার দেখছ প্রবাল, পল্লীগ্রামে আর একদিনও টিকতে পারৃছ না। তুমি শিগ্‌গীর কল্‌কাতা গিয়েই সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। চাকৃরীর ভাবনা কি? তোমার এমন কাজ ঢের জুটবে।"

প্রবাল বল্‌লে—"তার জন্যে আমি ভাবছি না। কিন্তু এখানকার স্কুলের যে দুর্গতি! এই স্কুলকে যদি আমি কতকটাও ভাল ক'রে তুল্‌তে পারি তা হ'লেই আমার শক্তি সার্থক হ'বে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, এখান থেকে সহজে আমি এক পাও নড়ছি না। অবশ্য তুমি 'এক-ঘরে' হ'য়ে থাকৃবে সেই ভয়।"

কেদার বল্‌লে "রামঃ—এ-ভয় আমার মোটেই নেই। পুলিশের লোককে একঘরে' ক'রে কদিন রাখবে?—তা ছাড়া মতিবাবু, দেবকণ্ঠবাবু আমাদের ত্যাগ কর্‌বেন না। তবে আমি বলি খুব শিগ্‌গীর তুমি কাজ সেরে ফেল। কাল আমাদের চিঠি সেবার বাবা পেয়ে যাবেন। তাঁর জবাব আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা। নইলে এ-কাজে দেরী কর্‌লে ক্রমেই গণ্ডগোল বাড়তে থাকৃবে। হ'য়ে গেলে বরং অনেকটা চুপচাপ হ'য়ে যাবে।"

প্রবাল একটু চিন্তিত মুখে বল্‌লে—"সেবার বাবা যে মত দেবেন তা মনে হয় না। তিনিও আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপই দেবেন ব'লে মনে হয়।"

কেদার বল্‌লে—"আমারও ত তাই মনে হয়। এ-সব ব্যাপারে এই সবই মহাবাধা। মন এতে সহজেই মুষ্‌ড়ে যায়।"

প্রবাল সহজ সুরে বল্‌লে—"কিন্তু এইসব বাধার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে আনন্দও আছে উত্তেজনাও আছে। এক-একবার অবসাদ আসে বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে মন স্থির কর্‌তে পার্‌লে সে-অবসাদ আর মনকে চেপে রাখতে পারে না। সত্যি বল্‌ছি, কেদার—ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে বেশ বড় ক'রেই দেখতে পাচ্ছি। দু'জনে আমরা সমান অভিপ্রায়, সমান উৎসাহ নিয়ে সেইখানে আমাদের মিলিত শক্তিতে কাজ কর্‌ব। সংগ্রাম কর্‌ব—সে কি আনন্দ, আমার ত ভাব্‌তেই কত সুখ হচ্ছে।"

কেদার সাংসারিক জীবনে কতকটা প্রবীণতার অধিকারী

হ'লেও জীবন-পথের নূতন যাত্রীকে আজ এতটুকু নিরানন্দ, নিরুৎসাহের কথা শোনাতে চাইলে না, শুধু বল্লে—"ওহে কল্পনা-লোকে বিচরণ ছেড়ে চল একবার অন্তঃপুরে বিচরণ করতে যাই। সেখানে সম্প্রতি সাকার মুখ-রুচিকর নানারূপ খাবার জিনিষ মিলবে।"

প্রবাল হেসে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বল্লে—"কিছু নিরাকার শ্রবণরঞ্জন বাণীও শুনতে পাবে। কেননা রাত অনেক হ'য়ে গেল। তাঁরা এতক্ষণ খাবার আগলে ব'সে আছেন।"

উনত্রিশ

সেবার বাবা চিঠি লিখেছেন—

"শ্রীমান কেদার ও প্রবাল,

কাল তোমাদের চিঠিখানা প্রথমে প'ড়েই আমার এমন রাগ হ'য়েছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের সকলকে ভয়ানক অভিসম্পাত দিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণের এখন সে তেজ নেই, সত্য কথনের দ্বারা বাক্যের সে-শক্তি নেই, নইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটতই। আমি আচার-পরায়ণ পল্লীবাসী। আমার বিধবা কন্যার বিবাহের কথা শুনে যে আমি প্রকৃতিস্থ থাকতে পারি এটা সম্ভবও নয়। তবে তখনি যে আমি হাঁকাহাঁকি ক'রে বাড়ীর মেয়েদের কি পাড়া-প্রতিবাসীদের ডেকে সব কথা ব'লে বসিনি, আজ সেইটেই সৌভাগ্য ব'লে মানছি। নইলে জানই ত' পল্লীবাসীর অণুবীক্ষণ রূপ দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতম দোষ, ত্রুটি বা ব্যাপারগুলোও কত বৃহৎ হ'য়ে ধরা পড়ে। সেবার কথা আমি অনেক সময় ভেবেছি। আমি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবার পর তার এ সংসারে অবস্থানটা মোটেই তার পক্ষে আর শান্তিজনক নয়। আমার স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট নয় তা আমি বুঝি। আর সেবাও যে খুব সহ্যশীলা তাও নয়, সে তার স্বর্গীয়া জননীর সমস্ত আদেশ বা কথা বিনা প্রতিবাদে পালন করত, একে সে-ভাবে সে মোটেই সম্মান করতে চায় না, বা পারে না। তার মার স্বভাবে কতকগুলি মধুর গুণের সঙ্গে তীব্র একটি তেজের ভাব ছিল, মেয়ের স্বভাবে তা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। সেবাকে তোমাদের ওখানে যেতে না দিলে হয়ত সেবার এ পরিবর্ত্তন ঘটত না। কিন্তু তার জন্যে আজ কা'কে দোষী করব তাও ভেবে পাচ্ছি না। সেবাকে এখনি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু তার দেহটাকে কড়া পাহারা দিয়ে আগলে রাখলেও মনটাকে ত পারব না। আমি চাই, আমার বিধবা মেয়ে হিন্দুনারীর পবিত্রতম উচ্চতম ত্যাগের আদর্শে পূত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করে। যদি তোমরা বল আপনি ত পঞ্চাশোর্দ্ধে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন—সেটা হচ্ছে লোকাচার দেশাচার। দূরদৃষ্টি,সমাজ-বিধি-প্রবর্ত্তকগণ এইরকম বিধিই প্রণয়ন ক'রে গিয়েছেন। আমরা যুগ-যুগান্তর হ'তে তা মেনেও এসেছি; সুতরাং নারীর আর পুরুষের সম্বন্ধে এক যুক্তি খাটে না। কিন্তু যে-কথা বলছিলাম তাই বলি। আমার অন্তরাত্মা সেবার দ্বিতীয় বার বিবাহে সায় দিতে চাচ্ছে না; যদিও মনে হয় তার বিয়ে যেটা হয়েছিল তার কোন দাগই মেয়েটার মনে পড়বার অবকাশ পায়নি। তবু আমার সংস্কার আমায় বেঁধে রাখছে। তবে একথাও বলছি যে, মেয়ে আমার এখন সাবালিকা। আমার অমতেও সে স্বেচ্ছায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কেদার তোমাকেও আমি জানি, প্রবাল তুমিও আমার অপরিচিত নও। অন্য কেহ এ প্রস্তাব করলে আমি সেটা বিশ্বাস করতাম না, কারণ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী না হ'লেও এটা আমি ভাল রকমেই জানি যে, আমাদের দেশে বালবিধবার সর্ব্বনাশ গোপনে গোপনে অনেক স্থলেই হ'য়ে থাকে। সমাজ বাইরে চোখ রাঙিয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে সেইসব গুপ্ত পাপলীলাকে প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেবার বিবাহে বাধা দেবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। আশা করছি, তোমরা সেবার কল্যাণই করবে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেছ—সেটা আজ মৌখিক করতে চাই না; কেননা সত্য কথা বলতে কি, মন আজ আমার পীড়িত। সেবা আমার প্রথম স্ত্রীর একমাত্র চিহ্ন। আমার ঘরে আর তার ঠাঁই নেই, সুতরাং তার চিরবিচ্ছেদ আমার অন্তরে আজ যথেষ্টই ব্যথা দিয়েছে। তবে এব্যথা ভবিষ্যতে উপশম হবে ব'লেই বিশ্বাস। তখন হয়ত তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করব।"

কেদার ও প্রবাল চিঠি পেয়ে বেশ আশ্বস্ত হয়েছিল; কেন না এর চাইতে অনুকূল চিঠি তারা আশাই করতে পারে না। কিন্তু সেবা এ চিঠিখানা শেষ ক'রে বড় কান্নাটাই কাঁদ্‌ছিল। প্রথম প্রথম প্রিয় এ বিবাহে বেঁকে বসলেও কেদারের কথা শুনে শুনে তারও মনে হয়েছিল, ভালোই হচ্ছে যে, প্রবালের সঙ্গে সেবার মিলন ঘটছে। চির-দুর্ভাগিনী সইকে আবার সৌভাগ্যবতীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা দেখবার আশায় ও আনন্দে তার আগেকার বিরোধ-ভাব সব দূর হ'য়ে গিয়েছিল। তাই সইএর কান্না দেখে তারও চোখের পাতা ভিজে এল। কিন্তু একটু পরেই সে শান্ত হ'য়ে সইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্‌লে—"কাঁদিস্ না, সই, কেঁদে আর কি হ'বে বল্। দেখিস্ তুই —বাবা এর পর নিজেই তোকে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

এদিকে প্রবালের মা কাশীবাস করছিলেন। প্রবাল জানত তাকে সংসারী করবার জন্যে তার মার কি সাধই না ছিল। আজ তাঁর সে সাধ পূর্ণ হ'তে চলেছে—কিন্তু যে-ভাবে তা পূর্ণ হচ্ছে তা জানলে মা যে মোটেই খুসী হবেন না বরং চোখের জল ফেল্‌বেন তা সে জানত। তাই সে চিঠি লিখে মাকে সব কথা জানাবার চাইতে নিজেই গিয়ে মার চরণতলে উপস্থিত হ'বে ঠিক করলে। কেদারও সে-প্রস্তাবে সায় দিলে।

প্রবালকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করবার জন্যে কমিটি এক নোটিশ প্রচার করলেন। দেবকণ্ঠ-বাবু প্রভৃতি দু'তিনজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিন্তু প্রতিবাদ করলেন। তবে ভোটে বাদার সংখ্যা অগণ্য হওয়ায় প্রবালের স্কুল-মাষ্টারী গেলই। বন্ধুকে বিদায় দিতে কেদারের মন বড় ব্যথিত হ'য়ে উঠল। প্রিয়র চোখে জলের ধারা নাম্‌ল। নিমাই, নিতাই প্রভৃতিরা দল বেধে এসে প্রবাল যেদিন রাত্রে কলকাতা রওনা হবে সেইদিন কেদারের বাড়ীতে ধন্না দিলে।

নিমাই বল্‌লে—"আমাদের ছেড়ে আপনি যাবেন না, দাদাবাবু। আপনাকে পেয়ে আমাদের বুক দশ হাত হয়েছিল; আমরা আপনার চেষ্টাতেই মানুষ হ'বার আশা করছি। আপনি চ'লে গেলে আমাদের আর কিছু থাকবে না।" কথার মধ্যে ভাষার বাঁধুনী ছিল না, চমক ছিল না। যা ছিল তা সরল প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা। প্রবাল তার এই কয় মাস এখানে অবস্থানের মধ্যেই এদের মধ্যে নিজেকে অনেকখানি মিশিয়ে দিয়েছিল।

তথাকথিত ভদ্রজাতি প্রবালকে পরিহার করবারই চেষ্টা করেছিল; কিন্তু নিমাইএর দল প্রবালকে আপনার জন মনে ক'রেই যেন অসঙ্কোচে বাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিল। তাদের কাজকর্ম্ম লেখাপড়া শেখার আস্তানা পঞ্চায়েতের বৈঠক, খোসগল্পর মজলিস—সব স্থানেই প্রবালের অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনি ক'রে প্রবাল ওদের মর্ম্মস্থলটিকে ছুঁতে পেরেছিল। নিমাইএর প্রাণভরা মিনতির উত্তরে প্রবাল বল্‌লে—"ভয় নেই, নিমাই। আবার আমি আসবই। দু'তিন মাস দেরী হ'তে পারে, কিন্তু তোদের ভুলে আমি থাকব না। তোরা কিন্তু আমায় ভুলিস্‌নি; লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম যেমন যেমন চল্‌ছে ঠিক সেই মতই চালাস্।"

নিমাই বল্‌লে—"তা আর বলতে, দাদাবাবু? এসব ভুললেই ত আপনাকে ভুলে যাব। আপনাকে আমরা আমাদের পাড়ায় যত্ন ক'রে ঘরবাড়ী দিয়ে রাখব। আপনার স্কুলের কাজ গিয়েছে ব'লে কি আপনি খেতে পাবেন না? আপনি আমাদের যা যা তৈরী করতে শেখাচ্ছিলেন তা যদি বাজারে চালাতে পারি, তাহ'লে আপনার অন্ন খায় কে, বাবু?"

প্রবাল বল্‌লে—"আচ্ছা সে-কথা পরে হবে, নিমাই। এখন তোরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে যা, ভাই। তোরা আমায় মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিস্। এ বাঁধন সহজে কাটিয়ে উঠতে আমি পারবই না। যেখানে যাই আবার ঘুরে ফিরে তোদের দেখতে আসবই।"

নিমাই বল্‌লে—"শুধু চোখের দেখা দেখতে আসলে চলবে না, দাদাবাবু। আমাদের মধ্যে এসে বাসা বেঁধে বাস করা চাই। আপনাকে না হ'লে আমাদের চলবে না।" কথাটা প্রবালের মর্ম্মের মাঝে ঘা দিলে। সে বল্‌লে সে আসবেই—তারপর থাকা না থাকা ভবিষ্যতের গর্ভে। ছোট জাতের লোকের বিশ্বাস নেহাৎ ঠুনকো নয়। তাই প্রবালের একটি কথাতেই তারা আশ্বস্ত হ'য়ে প্রবালকে বিদায় দিতে রাজী হ'ল।

তিরিশ

আজ দুই সপ্তাহ হ'তে প্রবাল তার বন্ধু সঞ্জীবের কলিকাতার বাস-ভবনে অতিথি, অবশ্য সেবাকেও সঙ্গে নিয়ে প্রবাল বিধবা বিবাহ করতে যায়। এ বিষয়ে সঞ্জীব তাকে সাহায্য করতে পারে কি না, সঞ্জীবকে এ কথা লিখতেই সে খুব আগ্রহ ক'রে উৎসাহ দেখিয়ে বন্ধুকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করেছিল। কেদার তাতে আশ্বস্ত হ'য়ে তখুনি উদ্যোগ ক'রে প্রবাল ও সেবাকে নিয়ে কলকাতায় এসে সঞ্জীবের বাড়ী রেখে যায় এবং বিবাহ-কার্য্য সমাধা করে। তার দু'দিনের বেশী ছুটি ছিল না, কাজেই তৃতীয় দিনে তাকে চ'লে যেতেই হয়েছিল।

বিবাহের পূর্ব্বে প্রবাল নিজে কাশী গিয়ে মার সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে এনেছিল। কাশী যাবার পথে কেদারের মার কাছেও গিয়েছিল। মধুমতীর স্বভাব ত সহজেই মধুর মত কোমল ও সরস। সুতরাং সেবাকে তিনি গোড়া থেকেই বড় করুণার চক্ষে দেখতেন। মন তাঁর চিরকালের সংস্কারের বশে প্রবালের হঠাৎ এই দেশ-কাল-বিরুদ্ধ আচরণে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলেও তিনি সেবার সৌভাগ্যে একটু খুসীও হয়েছিলেন। আর প্রবাল যখন তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলেছিল—"তুমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করো মাসীমা, তবেই আমার এ বিয়ে সুখের হ'বে। আমাদের দেশ এই ধরণের বালবিধবাদের প্রতি অনেক কাল ধ'রে যে অবিচার অত্যাচার ক'রে আসছে তুমি তা খুব জান, মাসীমা। কাজেই বেশ ক'রে ভেবে দেখ, আমি কিছু অন্যায় করিনি।" তখন মধুমতী আর আশীর্ব্বাদ না ক'রে থাকতে পারেননি; বলেছিলেন—"আমার আশীর্ব্বাদে যদি তোদের মঙ্গল হয় বাপ তা হ'লে প্রাণ খুলে আমি তোদের আশীর্ব্বাদ করছি, সুখী হ। কিন্তু এই কচি বয়েস তোদের—অনেক সামাজিক উৎপীড়ন হয় ত সইতে হ'বে। কত কষ্ট পাবি তাই ভাবছি।" প্রবাল আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বলেছিল—"কিছু ভয় নেই, মাসীমা। তোমাদের আশীর্ব্বাদ আমার অক্ষয় কবচ হ'য়ে সকল দুঃখ হতে রক্ষা করবে।"

তার পর সে মার কাছে যাত্রা করে। যশোদা ছেলের বিয়ের সংবাদে প্রথমটা বেশ খুসী হ'য়ে উঠলেও বিধবা বিবাহের কথা শুনে লজ্জা আর দুঃখে ম্রিয়মাণ হ'য়ে ভারী কান্না কেঁদেছিলেন। তাঁর কাছ-ছাড়া হ'য়েই প্রবালের এ দুর্ম্মতি ঘটেছে—এ আক্ষেপোক্তিও করেছিলেন, আর তারপর প্রবালকে এ বাসনা ত্যাগ করবার জন্যে অনুরোধও করেছিলেন। প্রবাল মাকে অনেক ক'রে বোঝালে যে, এ বিবাহ না করলে সে এখন দশের কাছে হাস্যাস্পদ হ'বে। তা ছাড়া যদি তাকে বিয়ে ক'রে কোনো দিন সংসারী হ'তে হয় ত এই তার শেষ সুযোগ। সেবা ছাড়া আর কোনো মেয়েকে স্ত্রী ব'লে সে গ্রহণ করতে পারে না। মা যদি ক্ষুণ্ণ হন ত বেশ, সে কৌমার্য্য-ব্রতই পালন করবে। তবে ব্যাপার যে-রকম দাঁড়িয়েছে—তার জন্যে নিরপরাধিণী সেবাকে অনেক দুঃখই সইতে হ'বে। এবং এখন এ দুঃখ অনেকটা প্রবালের হাত হ'তেই সেবাকে নিতে হ'বে। যাই হোক্ অনেক ভেবে চিন্তে, কেদার ও মধুমতীর সম্মতি আছে জেনে যশোদাও শেষটা বিয়েতে মত দিয়েছিলেন; তবে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করতে পারেননি। প্রবাল নিরাশ হ'বার পাত্র নয়। সে মার ঐটুকু সম্মতি পেয়েই তুষ্ট হ'য়ে মার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলেছিল যে, বিয়ের পর বউ নিয়ে প্রণাম করতে এসে মার প্রাণ-খোলা আশীর্ব্বাদ সে নিয়ে যাবেই। ফিরে এসে সঞ্জীবের বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ-আনন্দ সম্মিলনের মধ্যে সে বেশ খুসী মনেই সেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে।

সেবার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও কমনীয় শ্রী-সৌন্দর্য্যে উর্ম্মিলা খুব মুগ্ধ হ'লেও সেবার পাড়াগেঁয়ে আড়ষ্ট ভাব-গুলোকে সে মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখছিল না। তাই দু' সপ্তাহ ধ'রে ক্রমাগত সে তাকে পাখী পড়ানো ক'রে সভ্য সমাজের আদবকায়দাগুলো মুখস্থ করাবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। কিন্তু ছাত্রীটির মনোযোগের অভাবে কিছু সুবিধা ক'রে উঠতে পারেনি। এতে তার মাঝে মাঝে বিরক্তিও আসছিল আবার হাসিও পাচ্ছিল। কিন্তু সেবার সকল বিষয়ে অশ্রান্ত কর্ম্মপটুতা, ও সর্ব্বদা মধুর নম্র ব্যবহারে তাকে ভাল না বেসেও পারছিল না।

সত্য কথা বলতে গেলে সেবার কিন্তু এদের বাড়ীতে সহজ ভাবে ওঠা বসা, চলা ফেরার পক্ষে বেশ একটু বাধা

পড়ছিল। এত আদব-কায়দা ও সাহেবিয়ানার মধ্যে তার পল্লীগ্রামের অনভ্যস্ত মন খুব বেশী হাঁপিয়ে উঠছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সঞ্জীবের চায়ের টেবিলে নূতন-নূতন বন্ধুবান্ধবীদের সমাগম হ'তই। তারা সব সঞ্জীবেরই সমশ্রেণীর। বিলাতী ধরণের হাঁচি, হাসি, কাশি প্রভৃতিতেই তারা অভ্যস্ত। আর আধা ইংরেজী, আধা বাঙ্গলায় তারা স্বদেশ ও স্বজাতির সম্বন্ধে এমন তীব্র সমালোচনা সুরু কর্‌ত যা সেবার মোটেই শ্রুতিসুখকর হ'ত না।

প্রায়ই সেবা কিছু আচার মোরব্বা নিজের হাতে তৈরী কর্‌বার অনুমতি চাইত। সেদিন সারা দুপুরটা পরিশ্রম ক'রে সেবা আদা, পেঁপে, আম ও আনারস প্রভৃতি কয়েক রকম ফলের উৎকৃষ্ট মোরব্বা তৈরী কর্‌লে। সন্ধ্যার সময় সঞ্জীবের চায়ের টেবিলে বাইরের অতিথি বেশী কেউ ছিলেন না; কিন্তু প্রবাল উপস্থিত। সুতরাং উর্ম্মিলা সেবাকে রান্নাঘরে গিয়ে পাকড়াও ক'রে বল্‌লে—"আগুনের তাতে গায়ের রঙ যে গিনি সোনার মতো লাল্‌চে হ'য়ে উঠেছে। কর্ত্তা ভাববেন আমিই বুঝি আগুন-তাতে ঠেলে রেখেছি। ওঠো এখন, মুখ হাত ধুয়ে বস্‌বে চল। ডাক্ পড়েছে।"

সেবা হাসিমুখে বল্‌লে—"আমার না মোরব্বার—"

উর্ম্মিলা বল্‌লে—"মোরব্বা আর মোরব্বা-প্রস্তুতকারিণী দুয়েরই। ওঠো লক্ষ্মীটি, সমস্ত দুপুর কে যে এতো কষ্ট কর্‌তে বলেছিল কে জানে। উনি আমার ওপর রাগ কর্‌ছেন।"

সেবা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"বাস্ রে,—এত রাগ কিসের শুনি? রান্না করা আমাদের নিত্যকার অভ্যেস্। বরং এটা যদি একদিন বাদ যায় তা হ'লে ধাতে সয় না। চল, কোথায় নিয়ে যেতে চাও যাচ্ছি।"

উর্ম্মিলা সেবার গালে টোকা মেরে' বল্‌লে—"এই বেশেই না কি? যাও গিয়ে বাথরুমে নেয়ে ধুয়ে কাপড়-চোপড় পরে' এস গে।"

আধ ঘণ্টা পরে সেবা যখন চওড়া লাল পেড়ে সাদা রেশমের সাড়ী ও প্লেন একটি জামা পরে' চায়ের টেবিলের সাম্‌নে দেখা দিলে—তখন মূল্যবান-বস্ত্রালঙ্কার-সজ্জিতা স্বরূপা উর্ম্মিলাকেও ম্লান দেখাতে লাগল। সঞ্জীব উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"Thank you, madam. আপনি যা মোরব্বা তৈরী করেছেন অতি উপাদেয়, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন এই ধন্যবাদ দ্বিগুণ ক'রে দেবো যদি আপনি নিজের হাতে আমাদের একটু পরিবেশন ক'রে আপনার নামকে সার্থক ক'রে তোলেন।"

সেবা এবিষয়ে সদা সর্ব্বদাই তৎপর। সে হাসিমুখে সবাইকে চা ও খাবার পরিবেশন কর্‌তে লাগল।

তারপর খাওয়ার সঙ্গে নানারকম খোস গল্প সুরু হ'ল।—খাওয়া শেষ হ'লে একথা সে-কথার সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার সম্বন্ধে কথা উঠল—এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের একগুঁয়েমী, কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ঝাঁজালো সমালোচনা চল্‌তে লাগল। এক সেবা ও প্রবাল ছাড়া সকলেই সেই ঝাঁজটুকু হাসি-তামাসার মধ্যে দিয়েই উপভোগ কর্‌তে চাইলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার মাঝখানে হঠাৎ প্রবাল সে উপভোগের বাধা স্বরূপ হ'য়ে ব'লে বস্‌ল—"এসব কথা কিন্তু নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয় বন্ধু। সমাজের এ সব দোষ, ত্রুটি আমাদের নিজেরই জীবনের গলদ ভেবে নিজেরই এসব গুলো দূর কর্‌বার জন্যে সচেষ্ট হওয়া চাই। এ নিয়ে হাসিতামাসা কর্‌লে সেটা নিজেকেই বিদ্রূপ করা হ'বে; কেননা আমরা তো সেই সমাজেরই অংশ মাত্র।"

মিষ্টার নন্দী হেসে বল্‌লেন—"সমাজ যখন তার দেহের কোনো অংশকে একটা কুৎসিত ব্যাধি মনে ক'রে সেটাকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে তখন সে বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ত আর দেহের সামিল বল্‌বার দাবী রাখ্‌তে পারে না—সে-কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

প্রবাল বল্‌লে—"সমাজ ছেঁটে ফেলুক, আমি কিন্তু তা ব'লে প্রাণ গেলেও নিজেকে 'হিন্দু নই' এ মর্ম্মান্তিক মিথ্যে কথা বল্‌তে পারি না। আমি মনেপ্রাণে যে ধর্ম্ম বা সমাজকে বিশ্বাস কর্‌ছি কেমন ক'রে বল্‌ব যে, আমি তা নই?"

রায় বল্‌লেন—"কিন্তু এতে আপনি যে হিন্দুই রয়ে গেলেন তার প্রমাণ কি? হিন্দু সমাজ যখন আপনাকে তার আচার-বহির্ভূত অনুষ্ঠান কর্‌তে দেখে, ছি ছি ক'রে

আপনাকে ত্যাগ করলে তখন আপনার আর হিন্দুত্ব থাকল কই?"

প্রবাল বললে—"দেখুন—হিন্দু সমাজ অত্যন্ত বিশাল। বাঙলা থেকে সুদূর মহারাষ্ট্র, মালাবার, মান্দ্রাজ, আসাম প্রভৃতি নানা দেশে নানা ভাবে লোকেদের আচার-অনুষ্ঠান চল্ছে—এবং তা একের সঙ্গে অপরের এত তফাৎ যে, আমরা নিজেদের সংস্কার-বিরুদ্ধ সেইসব আচার-অনুষ্ঠান দেখ্লে অবাক্ হ'য়ে যাই। কিন্তু কই, তাদের ত অহিন্দু বল্তে পারি না। সুতরাং আমার বিসদৃশ আচরণে সমাজের দু'দশ জন যদি মুখ ফিরিয়ে আমাকে অহিন্দু ব'লে বসেন তাতে কিছু সত্যিই আমি অহিন্দু হ'য়ে যাব না।" সঞ্জীব বল্লেন—"কিন্তু তুমি নিজের মুখেই পল্লীগ্রামের যে সব বর্ণনা করলে তাতে এ অবস্থায় সেই পল্লীগ্রামে গিয়ে সস্ত্রীক বাস করা তোমার পক্ষে যে কতদূর কঠিন তা তো বেশ বোঝা যায়। গাঁয়ের মোড়ল যাঁরা—তাঁরা নিজেরা ত অধিকাংশই এক-একজন নানা রকম বদমায়েসীর এক-একটি অবতার। অথচ সে-সবের হজমী গুলি স্বরূপ উপরের মুখোস যেটা ব্যবহার করেন তার বহর দেখে কে?"

প্রবাল ধীর কণ্ঠে বল্লে—"ব্যধি তো ঐখানেই, বন্ধু। আর সব-চাইতে বড় কথা যে সমাজ তার ঐ ব্যাধিটাকেই স্বীকার করছে না। কিন্তু আমরা যদি এক-একজন হোমরা-চোমরা চিকিৎসক সেজে রোগীর সঙ্গে তার ব্যাধি নিয়ে ক্রমাগত তর্ক করি—তাতে লড়াইটাই জমে' উঠবে। ব্যাধির এতটুকুও উপশম হ'বে না। তারপর রোগীর খাপ্‌প্পা অবস্থা দেখে যদি, তল্পী-তল্পা বেঁধে স'রে পড়ি তাতেও কিছু আমাদের মহত্ত্ব ফুটে' উঠ্‌বে না।"

রায় এবার একটু উচ্চ কণ্ঠে বল্লেন—"তা হ'লে কি আপনি বল্তে চান এ অবস্থায় 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেজে আপনি সমাজে পরিত্যক্ত অবস্থায় হীনতাকে স্বীকার ক'রেও বাস করবেন?"

প্রবাল বল্লে—"দেখুন, বাপ যদি রাগের মাথায় সন্তানকে কুসন্তান ভেবে সকলের সামনে ত্যাজ্যপুত্র ব'লে ঘোষণা করেন, তা হ'লে ব্যবহারিক আইনে সে-সন্তান পিতার বিষয়-সম্পত্তি পাবার অধিকারে বঞ্চিত হ'তে পারে বটে, কিন্তু সত্যের দিক্ থেকে ভগবান পিতার সঙ্গে পুত্রের যে-সম্বন্ধ নিজের হাতে গ'ড়ে দিয়েছেন সে-সম্বন্ধ ত লোকের ফুঁয়ে উড়ে যায় না। সমাজের রক্তেই আমার দেহ পুষ্ট, তার নাড়ীর সঙ্গে আমার নাড়ীর নিত্য যোগ, আমার চিন্তা বা বুদ্ধি তারই মধ্যে থেকেই আমার দেহ-মনকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠেছে, সুতরাং তার সঙ্গে আমার বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। এ যে যুগ-যুগান্তরের নিত্য কালের সম্বন্ধ।"

এই শেষ কথাগুলি বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল নিজের অন্তরের মধ্যেও এমন একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাস অনুভব করলে যাতে সেই নিষ্ঠার ভাবটুকু তার উজ্জ্বল চোখ-মুখের মধ্যে একটা দীপ্তি ফুটিয়ে তুল্ল।

মিষ্টার নন্দী একটু ঝাঁজালো সুরে ব'লে উঠ্লেন—"যেতে দিন্ ওসব বাজে কথা—আত্মীয় ব'লে যারা স্বীকারই করতে চায় না তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার মাখা-মাখি করবার বাসনাকে আমি ত কোনো আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন লোকের বাসনা ব'লে স্বীকার করতে পারি না।"

কথাবার্ত্তার অবসানে উর্ম্মিলারা বায়োস্কোপ দেখ্তে বেরুল। প্রবালকে সেধেও পাওয়া গেল না, কাজেই সেবাও থেকে গেল।

মটরের জয়ধ্বনি রাজপথে মিলিয়ে যাবার পর প্রবাল সেবার দিকে চেয়ে বল্লে—"তুমি গেলে না, কেন, সেবা বেশ একটু উপভোগ ক'রে আস্তে।"

সেবা তার ডাগর চোখ দুটি নীরবে প্রবালের মুখের উপর তু'লেই নামিয়ে নিলে, জবাব দিলে না। এর অর্থ প্রণয়ীর পক্ষে বোঝা মোটেই দুরূহ নয়—সুতরাং প্রবাল তা বুঝ্তে ভুল করলে না। সে স্নেহভরে সেবার হাত ধ'রে বল্লে—"এস, সেবা, আমরা একটু ছাদে গিয়ে বেড়াই।"

দু'জনে ছাদে গিয়ে পায়চারী করতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যার সময় বেশ মিঠা বাতাস বইছিল। তার সোহাগস্পর্শে দু'জনেরই দেহমন বেশ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

প্রবাল সেবাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল—"আচ্ছা সেবা, তোমার এখানে ভাল লাগছে ত?"

সেবা তখন পাল্টা প্রশ্ন করলে—"তোমার ?"

প্রবাল বল্‌লে—"আমার ? আমার কথা আলাদা। পুরুষ মানুষ, রাতদিন কাজের পেছনে ধাওয়া ক'রে বেড়াচ্ছি, ভাল লাগা না-লাগায় চিন্তাই ক'রে উঠ্‌তে পারি না। তার ওপর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে যখনই বাড়ী আস্‌ছি, তোমার সুন্দর মুখের হাসি আর ঐ দুটি চোখের প্রীতির অভিনন্দন নীরবে আমার দেহ-মনে শান্তির তুলি বুলিয়ে দেয়। কাজেই আমার ভাল না-লাগার কোনো কারণই নেই।"

সেবা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সলজ্জ ভাবে বল্‌লে—"অপর পক্ষও ত সে কথা বল্‌তে পারে।"

প্রবাল সেবার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে—"অর্থাৎ ?"

সেবা মৃদু হেসে বল্‌লে—"অর্থাতের অর্থ আমি জানি না, অভিধান খুঁজে দেখ গে।"

প্রবাল সেবার অধরে সোহাগের চুম্বন মুদ্রিত ক'রে বল্‌লে—"না, শুক্‌না অভিধান ঘেঁটে আমার কাজ নেই। তোমার মুখের প্রতিটি রেখাই আমি প'ড়ে নিয়ে সব বুঝ্‌তে পারি।"

তারপর প্রবাল বল্‌লে—"দেখ সেবা, এখানে কিন্তু বেশী দিন আর থাকা হচ্ছে না। দু' একদিনের মধ্যেই আমি তোমায় নিয়ে মার কাছে কাশী যেতে চাই। ফের্‌বার পথে কেদারদের বাড়ী নেমে মাসীমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আবার কেদারের ওখানে গিয়েই উঠ্‌ব। নিমাইএর চিঠি পেয়েছ, সে বার বার অনুরোধ ক'রে আমায় যেতে লিখেছে।"

সেবা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে বল্‌লে—"বেশ ত মাকে দেখ্‌তে আমারও ভারী ইচ্ছে হয়। এখানে বেশ ভাল থাক্‌লেও মাঝে মাঝে যেন হাঁপ ধরে' ওঠে।"

প্রবাল বুঝ্‌তে পার্‌লে—সেবার সাদাসিধা অভ্যাসের অনুগত সরল অমায়িক প্রাণ এদের অতিরিক্ত বিলাসিতা ও আদব কায়দার মধ্যে এসে যেন প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছে না। যাই হোক্ সে সেবাকে আবার বল্‌লে—"দেখ সেবা, এখানে কাজ-কর্ম্ম পাওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে গেলে নিমাইএর স্নেহের ডাক কিছুতেই আমি ভুল্‌তে পার্‌ছি না। সে লিখ্‌ছে—আমি তাদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌লেও আমায় ছেড়ে থাক্‌তে তারা রাজী নয়। আমায় তাদের দর্‌কার আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে, এ দর্‌কার ত একতর্‌ফা নয়—আমারও কি তাদের দর্‌কার নেই ? সে আমার জীবিকার জন্যে চাষবাসের বন্দোবস্ত ক'রে দেবে লিখেছে। তা ছাড়া ওখানকার জঙ্গলে কাঠের ব্যবসাও বেশ চল্‌বে। অথচ নিজের জীবিকা উপার্জ্জন ছাড়া আমার অবসর সময় আমি স্বচ্ছন্দে ওদের কোনো কাজে কাটাতে পার্‌ব। কি বল তুমি ?"

সেবা তার প্রসন্ন দৃষ্টি প্রবালের চোখের ওপর তুলে' ধ'রে বল্‌লে—"এতো খুব ভালো কথা। সহরের আড়ম্বর-পূর্ণ জীবনের চাইতে গ্রামের এই সরল জীবন-যাত্রা-প্রণালী আমার খুব ভালো লাগ্‌বে।"

প্রবাল বল্‌লে—"কিন্তু এ কথা ত ভুল্‌লে চল্‌বে না সেবা, সমাজ আমাদের যে লঘু চক্ষে দেখ্‌বে তা হয় ত সময়ে সময়ে আমাদের সহ্যের সীমাকে ছাপিয়ে যাবে। ভয় হয় পাছে সেইসব উৎপীড়নের পরিবর্ত্তে আমরাও তাদের আবার কোনো রকম নিষ্ঠুর আঘাত না ক'রে বসি। জানো ত তুমি—মানুষ স্নেহের কাঙ্গাল—স্নেহের পরিবর্ত্তে ক্রমাগত অত্যাচার আর অবিচারের শাসন তাকে অনেক সময় গুরুদণ্ড দিয়ে অমানুষ ক'রে তোলে।"

সেবা শান্ত মুখে পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রবালের হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে বল্‌লে—"কিন্তু আমি জানি, তুমি সে মানুষ নও যে আঘাতের দ্বারাই আঘাতকে জয় কর্‌তে চাইবে। তোমার প্রাণে যে অফুরন্ত প্রেমের উৎস আছে তা পাথর চাপা দিয়ে ঢাক্‌বার নয়। ঐ বিশ্বজয়ী প্রেমের বলে তুমি সহজেই সকলের বিদ্বেষ, সকলের অপ্রীতিকে জয় ক'রে নিতে পার্‌বে।"

প্রবাল উজ্জ্বলমুখে প্রিয়তমাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বল্‌লে—"তোমার হৃদয় জয় করেছি ব'লে বুঝি তুমি মনে কর্‌ছ সবাইকেই এম্‌নি ক'রে জয় করা সহজ ? তোমার প্রাণেও ত সেবা ভালবাসা কিছু কম নেই, আর সে ভালবাসা শুধু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রীতি-পাত্রদের জন্যে নয়, শত্রু-মিত্র সবার জন্যেই—।"

সেবা হাসিমুখে বল্‌লে—"তাই যদি হয় তা হ'লে

আমাদের দু'জনের মিলিত স্নেহ-ভালবাসায় কি কাউকেই তুষ্ট করতে পারব না?"

প্রবাস সাদরে সেবার কপোলে চুম্বন ক'রে বল্‌লে—"নিশ্চয় পারব। তুমিই আমার মানসী, সেবা, আমি না জেনেও আমার জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেই চেয়েছিলাম। এখন মূর্ত্তিমতী তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছ। আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত বুদ্ধিকে তুমিই এখন বল দেবে, আমার কর্ম্মশক্তি তোমাকে আশ্রয় ক'রে দিন দিন প্রবল হ'য়ে উঠবে। আর নব নব ক্ষেত্রে তাকে নিযুক্ত ক'রে আমাদের জীবনকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে।"

তখন আকাশের নীল আঙিনায় দেববালাদের হাতে হাজার হাজার দীপ ঝক্‌মকিয়ে ফুটে উঠে মর্ত্ত্যবাসীর চোখে স্বপ্নপুরীর একটুখানি আভাস জাগিয়ে দিচ্ছিল। দুটি মুগ্ধপ্রাণ তরুণ নরনারী সেইদিকে তৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে চেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ-কর্ম্ম-জীবনের একখানি আদ্‌রা গ'ড়ে নিতে লাগল। স্নিগ্ধ বাতাসে ফুটন্ত ফুলের সুরভি তাদের দেহে মনে যেন বিশ্বদেবতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদের স্পর্শ জানাতে লাগল। তারা সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে একসঙ্গে মাথা নত ক'রে নিজেদের মহৎ আকাঙ্ক্ষাটিকে দেবতার নীরব আশীর্ব্বাদে মণ্ডিত ক'রে নিতে চাইলে। এক অজ্ঞাত পুলকামৃত-রসে মন তাদের অভিষিক্ত হ'য়ে উঠল।

সমাপ্ত

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

২০ শে অক্টোবর মঙ্গলবার:—সকাল সাতটা। কুয়াশায় চারিদিক্ অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হ'লে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম আস্তানার খোঁজে। রাস্তায় কোথা থেকে পুলিশ এসে পাকড়াও করলে। সমস্ত খোঁজ-খবর নেওয়া হ'লে তাদের কাছ থেকে আমরা খবর নিয়ে এখানকার মিলিটারী একাউণ্টসের শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে হাজির হ'লাম।

শিয়ালকোটে যে ক্রিকেট, ব্যাট পোলো-খেলার ছড়ি প্রভৃতি খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈয়ারী হয় সে-কথা বোধ হয় সবাই জানেন। জম্মু এখান থেকে মাত্র ৩১ মাইল দূর। জম্মুর এত কাছে এসে আবার পাঞ্জাবে এক রাত কাটাতে মন চাইলে না। সেজন্য বেলা তিনটের সময় জম্মুর পথে সাইকেল চালিয়ে দেওয়া গেল।

সবল সেতু—কাশ্মীর

সহরের সীমানা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে চাইতেই দেখা গেল দূরে, বহুদূরে বরফে ঢাকা সাদা পাহাড় সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। তার পায়ের নীচের দিগন্তবিস্তৃত অসীম মাঠের যেন আর শেষ নেই। এরই কোণ ঘেসে সাদা রংয়ের সরু পথটি জম্মুর দিকে চ'লে গেছে। কয়েক মাইল পরে এই পথের ওপর এক লোহার প্রকাণ্ড ফটকের মাথায় ইংরেজীতে বড় বড় ক'রে লেখা আছে—হল্ট (Halt)। এইখানে গাড়ী ঘোড়া মোটরের জন্য মাশুল আদায় হয়। কয়েকটি মোটর ফটকের এদিকে দাঁড়িয়ে ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের কাছে মাশুল দিয়ে ছাড়পত্র সংগ্রহ করছে। আমরাও নেমে' পড়ে' অপেক্ষা করতে লাগলাম—কখন্ আমাদের ডাক পড়ে। কিন্তু আমাদের দিকে দেখেও কেউ মনঃসংযোগ করা দরকার মনে করলে না। অগত্যা আমরা আর মিছামিছি দেরী না ক'রে সাইকেলে উঠে পড়্‌লাম। ক্রমশঃ পথটি ঢালু হ'য়ে হঠাৎ এক নদীর ধারে এসে' পড়্‌ল।

ঢালু রাস্তা থেকে ওপরে উঠে একটা বাঁক ফিরেই আমরা একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণীর সুমুখে এসে পড়্‌লাম। সুবিশাল হিমালয়ের এক শ্রেণীর গায়েই জম্মু সহর। সবুজ রংয়ের পাহাড়ের গায়ে জম্মুর সাদা সাদা অসংখ্য মন্দির যেন ছবির মতই সুন্দর। জম্মুর মন্দিরের চূড়াগুলি পিতলের পাতে মোড়া। এই চড়াইয়ের উপরে উঠে দেখা গেল, জম্মুর পিছনে অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণী—তাদের মাথা দিয়ে আকাশ ঢেকেছে। এইখান থেকে হঠাৎ চড়াই সুরু হ'ল। এই পাহাড়-পর্ব্বত পার হ'য়ে শ্রীনগরে

পৌঁছতে হবে। রাস্তার নমুনা দেখে বোঝা গেল, এইবার এই পথ দিয়ে পাড়ি লাগান বাস্তবিকই একটু শক্ত ব্যাপার। জম্মু ক্যাণ্টনমেণ্ট বেশ বড়। সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে তাউই নদী। তাউইয়ের ওপর তারের ঝোলান পুল। এই পুল পার হ'লেই জম্মু সহর।

সহরে ঢুকেই শ্রীনগরের পথ কেমন তাই দেখ্‌বার জন্যে সবাই ঝুঁকে' পড়্‌ল। সেইজন্যে শ্রীনগরের রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গেলাম। পথটি সহরের বাইরে দিয়ে বরাবর দুই মাইল চলে'গিয়ে রামনগর রাজপ্রাসাদের সুমুখ দিয়ে কাশ্মীর অভিমুখে গেছে। এই দুই মাইল পথ সবটুকুই চড়াই। রামনগর জম্মু সহরের সীমানা ও সহরের মধ্যে সব-চেয়ে উঁচু জায়গা। এইখান থেকে আবার সহরের মধ্যে ফেরা গেল। এবার বরাবর উৎরাই। চোখের নিমেষে তাউইয়ের ঝোলান পুলের সাম্‌নে এসে পড়্‌লাম। সহরের ভেতরে যেতে বরাবর চড়াই আর এদিকে আস্‌তে হ'লে বরাবর উৎরাই। এখানকার পথ-ঘাট অতি সুন্দর। বাজার-হাট পাথর দিয়ে বাঁধান। কলের জলের কোন ট্যাক্‌স্ নেই, মহারাজ বারমাস প্রজাদের জল দান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করেন।

অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য মৃত মহারাজার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীনগর থেকে বরাবর হরিদ্বার পর্য্যন্ত সামরিক প্রথায় শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

জম্মুর বিজলীঘরের বৈদ্যুতিক শক্তি জলের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। চেনাব নদী থেকে এই উদ্দেশ্যে জম্মু অবধি একটি খাল কেটে আনা হয়েছে। এই খালের জলকে আবার জলসেচ কাজেও লাগান হয়।

জম্মুতে স্কুল কলেজ লাইব্রেরী এমন কি ছোট খাট একটি মিউজিয়ম ও আছে।* লোকদের পোষাক-পরিচ্ছদ পাঞ্জাবীদের মতই। এরা নানা প্রকার উজ্জ্বল রংয়ের পোষাক পরতে ভালবাসে। এখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই হিন্দু, ডোগরা, রাজপুত শ্রেণীর ও বেশ সুশ্রী। মেয়েরা চালাক চতুর ও স্বাধীন-ভাবাপন্ন। জম্মু থেকে একদিনের পথ ত্রিকুটা দেবী এ-অঞ্চলের নামজাদা তীর্থ। পাঞ্জাব থেকে প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী ত্রিকুটায় তীর্থ করতে আসেন। মেয়েদের উৎসাহ এবিষয়ে বোধ হয় সব দেশেই বেশী। তাঁদের মধ্যে অনেকে এই দুর্গম গিরিপথ টোঙ্গার অভাবে অশ্বারোহণে অতিক্রম করছেন।

ডাল হ্রদ—কাশ্মীর

শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ

আমরা ধর্ম্মশালা বা সরাইয়ের খোঁজ নিতে ব্যগ্র হ'য়ে পড়্‌লাম। ধুতিচাদর-পরা একটি ছেলেকে এদিকে আসতে দেখা গেল। এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই, এখানে কাছাকাছি সরাই-টরাই কোথায় আছে বল্‌তে পার?" "আপনারাই বুঝি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন?" "হাঁ সরাই বা ধর্ম্মশালা"—"আমাদের বাড়ী যাবেন না?" এরকম প্রশ্নে বেশ কৌতুক বোধ করলাম। বল্‌লাম "চল"। তাউই পুলের সামনে এক বাড়ীর সাম্‌নে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেটি তাড়াতাড়ি উপরে চ'লে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে এসে বল্‌লেন, "এ্যা, আপনারা—আজ্ঞে হাঁ, কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি, এখানে সুবিধা-মতন একটা জায়গা"—"আচ্ছা আচ্ছা সব বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে, ভেতরে আসুন।"

আজ মোট ৩১ মাইল আসা হয়েছে। মিটারে উঠেছে ১৪.৮।

২১,২২,২৩ ও ২৪শে অক্টোবর।—জম্মু মাত্র ১৫০০ ফুট উচ্চ ও কাশ্মীর ষ্টেটের শীতকালের রাজধানী। শীত কাশ্মীরের চেয়ে অনেক কম। মহারাজ প্রতাপ সিং এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে এখানে এখন সব প্রকার-আমোদ-প্রমোদ বন্ধ, এমন-কি বাড়ীতে গান-বাজনা পর্য্যন্ত বারণ।

২১শে সকালে জম্মুর রাস্তা লোকজনে পরিপূর্ণ। সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শ্রীনগরের পথের দিকে মৃত মহারাজের শবাধারের জন্য অপেক্ষা করছে। বার জন সৈনিক শবাধারে রক্ষিত ভস্ম শ্রীনগর থেকে বহন ক'রে হরিদ্বারে নিয়ে যাবে। এই দীর্ঘপথ এক এক দল পদাতিক,

বাঙালীর সংখ্যা জম্মুতে খুবই কম। তাঁদের প্রায় সকলই এখানকার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। একজন বাঙ্গালী মহিলাও নিজে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করেন। মোবারক মণ্ডি বা পুরাতন রাজপ্রাসাদের কাছেই কাশ্মীরের ষ্টেট কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী। ইনি পূর্ব্বে মহারাজের প্রধান জজ ছিলেন।

এইখানে আমাদের গরম কাপড়-চোপড় না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। জম্মু-শ্রীনগরের পথ রাওলপিণ্ডির পথের চেয়ে দুর্গম ও সম্প্রতি তৈরী হয়েছে বলে' রাওলপিণ্ডির পথের মত ভাল বন্দোবস্ত এখনও হ'য়ে ওঠেনি।

শ্রীনগরের দূরত্ব, চড়াই ও বনিহাল গিরিসঙ্কটের তুষারপাত ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে সকলেই আমাদের এই দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। গিরিপথের নানাপ্রকার কষ্ট ও তুষারপাতের বিভীষিকার কথা যতই শুনতে লাগ্‌লাম এ-পথ দিয়ে শ্রীনগর পৌঁছবার আগ্রহও ততই বাড়তে লাগ্‌ল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল যথেষ্ট উৎসাহান্বিত করেছিলেন। এঁর সাহায্যেই আমরা এই পথের একরকম একটি মানচিত্র খাড়া করি। কোনো কাজ করতে বেরিয়ে কেবল বিপদের কথা শুনে' পেছিয়ে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন

* এখানকার ডাক-বিভাগ গভর্ণমেণ্টের কিন্তু টেলিগ্রাফ অফিস-গুলি ষ্টেটের।
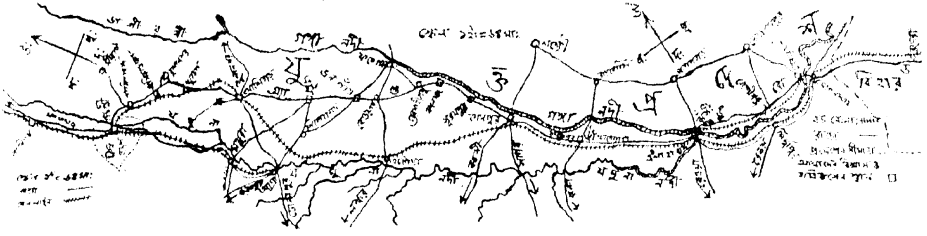
না। সেইজন্যেই বোধ হয় এর সঙ্গে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে উঠেছিল।

২৪ শে সকালে আমাদের গরম কাপড়-চোপড় এসে পৌছল। এই-জন্যেই আমাদের এই কয়দিন জম্মুতে আটকে থাকতে হ'ল। ক্রমাগত চারদিক থেকে 'নিরাশার সুর' শুনে মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। জম্মু আর যেন কিছুতেই ভাল লাগছিল না। আর দেরী না করে' পরদিন সকালেই যাতে রওনা হ'তে পারি তার যোগাড়-যন্ত্র করতে সুরু করে' দিলাম। কি করে' আমাদের এই অভিযানকে সফল করে' তোলা যায় সন্ধ্যাবেলায় তারই বৈঠক বসল।

২৫ শে অক্টোবর রবিবার।—বেশ পরিষ্কার সকাল। রামনগর প্রাসাদের সুমুখ দিয়ে শ্রীনগরের পথ। প্রাসাদের কিছু দূরেই জম্মু সহরের সীমানা। জায়গাটায় বেশ একটা লম্বা উৎরাই। এই উৎরাইয়ের মুখে একজন উর্দ্দিপরা পুলিস কর্ম্মচারী মাথার ওপর দু'হাত তুলে' আমাদের থামাবার জন্য ইঙ্গিত করতে লাগল। নেমে পড়ে' শুনলাম যে, আমাদের আবার ফিরে সহরের মধ্যে পুলিস অফিসে যেতে হ'বে। এদের হাতে পড়লে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হ'বে ভেবে আমরা তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তার কাছে উর্দ্দুভাষায়, পাঞ্জা মারা হুকুমনামা দেখে সে আশা পরিত্যাগ করতে হ'ল। অগত্যা আবার সহরের মধ্যে পুলিশ অফিসে ফিরে এলাম। সেখানে মিছামিছি ঘণ্টা দুয়েক বসিয়ে রেখে মামুলি নাম ধাম লেখার পর নিষ্কৃতি পেয়ে জম্মু থেকে দ্বিতীয় দফা রওনা হলাম বেলা ১০টায়।

ছ' মাইল উৎরাইয়ের পর ছোট চটি নাগরোটা। এইবার গিরিপথের সুবিধা-অসুবিধা বেশ বুঝতে পারা গেল। মাথার ওপর থেকে পথের আশেপাশে এক-একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় বার হ'য়ে রয়েছে। মনে হয় বুঝি ঘাড়ে পড়ল। ঘন ঘন বাঁকের জন্য পথের অবস্থা কিছু বুঝবার উপায় নেই। লম্বা উৎরাই দিয়ে নামতে নামতে বাঁকের মুখে এসে বুকটা ছ্যাৎ করে' ওঠে; কি জানি ওদিকে কি আছে; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঁকের ওদিকে হয়ত পাহাড় থেকে ধস্ নেমে রাস্তা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে। সেরকম জায়গায় ঠিক সময়মত গাড়ী থামাতে না পারলে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য। আবার ও রকম দ্রুতগতিশীল সাইকেলকে হঠাৎ ব্রেক্ (Brake) ব্যবহার করে' থামানও বিপদজনক। তা ছাড়া পরে দেখেছিলাম যে, খুব লম্বা ঢালু পথে অনবরত ব্রেক্ ব্যবহার করলে সাইকেলের চাকা (Rim) ক্রমশঃ জখম হ'য়ে যায়।

নাদানি অপেক্ষাকৃত বড় চটী। এর উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফিট। দেশী ভাষায় সেইসব হোটেল বা দোকানকে বলে তন্দুর। নাদানি থেকে মাইল তিনেক পর ত্রিকুটাদেবীর মন্দিরে যাবার রাস্তা। ত্রিকুটা-যাত্রীদের ভিড়ে চটী আজ সরগরম। যাত্রীরা সকলেই এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছে। চটীর শেষেই প্রায় সিকি মাইল লম্বা এক সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে আমরা আবার সাইকেল চালিয়ে দিলাম। ক্রমাগত চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে বেলা প্রায় চারটার সময় উপস্থিত হ'লাম উদমপুরে।

উদমপুর সহর রাস্তা থেকে প্রায় ৩ তিন চারশ ফিট উঁচু একটা বড় টিলার উপর। আজকে এইখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে জম্মুতেই আলাপ হয়েছিল। তাঁরই বাংলোর সামনে এক তাঁবুতে আস্তানা নেওয়া গেল। উদমপুরের উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট। জম্মু ১৫০০ ফিট; কিন্তু এই ১০০০ ফিট ওঠার জন্য আমাদের ৫০০০ ফিট পার হ'য়ে আসতে হ'ল। আজকের দৌড়, মাত্র ৪১ মাইল; কিন্তু জম্মুর কয়দিনের ঘোরাঘুরির জন্য দেখা গেল মিটারে উঠেছে ১৪৫৬।

২৬ শে অক্টোবর, সোমবার।—তাঁবুর গায়ে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে ভোর-বেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কম্বল থেকে গলা বার ক'রে কানাতের ফাঁক দিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে বড় নিরাশ হ'য়ে গেলাম। মেঘে সব পাহাড়ের ওপর একবারে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। বনিহাল গিরিসঙ্কটে তুষারপাতের জন্য আমরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি। কাশ্মীর

তুষারাবৃত শ্রীনগর
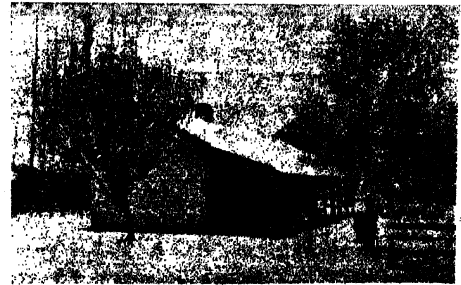
পৌছবার জন্য আরও আগে চেষ্টা করা উচিত ছিল। এই প্রচণ্ড শীতের ওপর যদি বরফ পড়তে আরম্ভ করে তবে হয়ত কাশ্মীর পৌছান সুদূর-পরাহত হ'য়ে উঠ্‌বে।' সেপ্টেম্বরের পর বনিহাল গিরিসঙ্কট দিয়ে একাকে শ্রীনগর যাওয়া বড় বিপদজনক। এইসব কথা আমরা জম্মু থেকে শুনেছি। জম্মু থেকেও একরকম সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে এসেছি। এখানকার একমাত্র বাঙালী ও আমাদের আশ্রয়দাতা ইঞ্জিনিয়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলছেন, এ চেষ্টা অন্ততঃ এ বছরের মত পরিত্যাগ করতে। চার-দিক্ অন্ধকার, চুপচাপ, কেবল তাঁবুর কানাতে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ; প্রকৃতির কেমন যেন একটা নিরানন্দ ভাব। সময়ের দাম এখন আমাদের কাছে বড় বেশী। গিরিসঙ্কটে যে কোন দিন থেকে তুষার-বর্ষণ সুরু হ'তে পারে। হয়ত আজকের দিনের এই ব'সে থাকার জন্য যে-সময় নষ্ট হচ্ছে সেই সময়টুকুর জন্য পরে আপশোষের সীমা থাকবে

পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর।
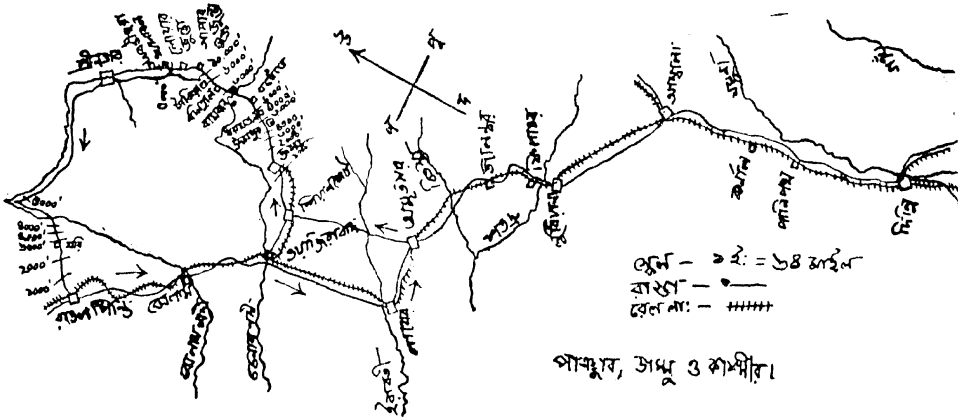
না ; সেই সময়টুকুর অভাবই হয়ত বনিহাল-সঙ্কট পার হওয়ার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। অথচ এই বৃষ্টির মধ্য দিয়েই বা কি ক'রে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এই দারুণ শীতে, ভিজা কাপড়-চোপড় গায়ে থাক্‌লে ত সঙ্গে-সঙ্গে অসুখ, নিউমোনিয়া বা আর কিছু। এই রকম ভাবনার মাঝখানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁবুর ভেতর এসে উপস্থিত হ'লেন, কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল।

"দেখছেন ত! এ রকম দুর্য্যোগে আপনাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না।"

"এতদূর এসে পেছিয়েই বা যাই কি ক'রে বলুন ?"

"কিন্তু কি ক'রে যাবেন ? এ পাহাড়ে দেশের কিছু ঠিক নেই। এই যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে হয়ত সাত আট দিন ছাড়্‌বেই না। এ যেরকম দুর্য্যোগ দেখ্‌ছি তাতে বোধ হয় বনিহালে বরফ পড়্‌তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আপনাদের এইরকম সামান্য শীতবস্ত্র নিয়ে যে কি ক'রে যাবেন তাও ত ভেবে পাচ্ছি না। এবার বরং ফিরে যান।

বিকাল চারটার সময় বৃষ্টি থাম্‌ল। আমরা দেখ্‌লাম, এই সুযোগ। আর একটুও দেরী না করে' নিজেদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি করে' নিয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে একরকম দেখা না করে'ই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বেলা পাঁচটা। কোথায় চলেছি ঠিক নেই। মাথার ওপর দিয়ে দু'তিন পসলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। বড়বড় চড়াই। এ রাস্তায় সাইকেল চালান অতি কষ্টকর। তার ওপর উল্টা দিক থেকে ঝড়ের মত জোরে হাওয়া বইছে। সামনে-পিছনের কারু সঙ্গে কথা বল্‌তে হ'লে চীৎকার ক'রে না বল্‌লে কিছু শোন্‌বার উপায় নেই। প্রায় তের মাইল এই রকম হেঁটে সন্ধ্যার পর ধরমতল ব'লে একটা ছোট জায়গায় উপস্থিত হ'লাম। পাহাড়ের ওপর একটা টিলার মাথায় সরকারী বাংলো (Rest House) দেখে মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেইখানে ঢুকে পড়্‌লাম।

এই পাহাড়ের মধ্যে, নেহাৎ ছোট একটা গ্রামে একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমরা বড়ই উপকৃত হয়েছিলাম। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস এখানকার ওভারসিয়ার। তাঁরই অনুগ্রহে আমরা ঘরের ভিতর সারারাত চিম্‌নী জ্বালাবার মত কাঠ পেলাম। এই দারুণ শীতে, ভিজে কাপড়ে রাত কাটাতে হ'লে বড়ই মুস্কিলে পড়্‌তাম। ওরই মধ্যে যেটুকু সুবিধা ক'রে নেওয়া যায় তাই ক'রে ফেল্‌লাম। আগুনের চার দিকে ভিজে জামা প্যাণ্ট সব শুকাতে দিয়ে, এবার কি করা যাবে তারই আলোচনা সুরু কর্‌লাম। আকাশের অবস্থা বড়ই খারাপ। মনটা আরও যেন দমে গেল। আজকের দৌড় ঐ ১৩ মাইল—মিটার বল্‌ছে ১৪৫৯।

২৭ শে অক্টোবর, মঙ্গলবার।—শীতের সকাল। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। এত বৃষ্টির পরও আজ সমস্ত দিনেও যে বৃষ্টি ছাড়বে তার কোন লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। চারিদিক নিস্তব্ধ। এমন দিনে ঘরের ভেতর আগুন জ্বেলে ব'সে প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে কাটিয়ে দিতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা তখন অন্য রকম। সঙ্গে রসদ পত্র খুবই অল্প, টাকার জোরে অনেক সাহায্য ও সুবিধা এই জনহীন দুর্গম স্থানে ক'রে নেওয়া যায়, সেই জোরও ক্রমশঃ কমে' আসছে। সুমুখে ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই পথ—শ্রীনগর এখনও ১৫২ মাইল দূর। আকাশের অবস্থা ক্রমশই খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে আসছে। তার ওপর ক্রমাগত ঠাণ্ডা লাগার দরুণ ও ভিজে কাপড়ে থাকার জন্য সর্দ্দি-কাশিতে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর ভুগ্‌ছে। এ পথে যদি কারও অসুখ-বিসুখ হ'য়ে পড়ে তবে আর মুস্কিলে সীমা থাক্‌বে না। উধমপুরের পর থেকে শ্রীনগরের আগে আর ডাক্তার বা হাঁসপাতাল কিংবা চিকিৎসা বিষয়ের কোন সাহায্য কোথাও পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি-বাদলের জন্য অসুখ-বিসুখ হ'য়ে বা অন্য কোন কারণে যদি পথে কোথাও আট্‌কে পড়্‌তে হয় তবে খরচ-পত্রের জন্য টাকা-কড়িও শ্রীনগরে পৌঁছবার আগে পাবার উপায় নেই। এইসমস্ত বিষয় ভেবে, সঙ্গে যা টাকা-কড়ি আছে তাতে দেখা গেল সকলের চলা অসম্ভব। অথচ এইসব কারণের জন্যে নিজেদের লক্ষ্য—এতদিনের পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর যে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আস্‌তে হ'বে—সে কথা ভাব্‌তে গেলেও মন তাতে সাড়া দিতে চায় না, বরং বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।

ধরমতলের সেদিনের কথা (২৭শে অক্টোবর) অনেকদিন আমাদের মনে থাক্‌বে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, পথঘাট জনহীন, চারদিক্ নিস্তব্ধ আর ঘরের ভিতর আগুনের চারপাশে আধভেজা আধশুক্‌নো কম্বল জড়িয়ে শীতের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা। কি ক'রে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোলা যায়, গন্তব্য স্থানের এত কাছাকাছি এসেও এই অভিযান যাতে ব্যর্থ হ'য়ে না যায়—আর তার

জন্যে এখন, এ অবস্থায় আর কি রকম চেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকার করা দরকার তারই আলোচনা।

সব দিক্ দিয়ে দেখা গেল যে, আমাদের সকলেরই শ্রীনগর অবধি যাওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নয়। কাজে-কাজেই কে কে অগ্রসর হবে আর কে-ই বা ফিরে যাবে তাই নিয়ে এখন মুস্কিল বাধ্‌ল। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে শেষে আনন্দ ও নিরঞ্জের জম্মু ফিরে যাওয়া আর মণি ও আমার শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া স্থির হ'য়ে গেল। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে যে কত দীর্ঘ সময় তর্ক-আলোচনায় অতিবাহিত করতে হয়েছিল, জন-মানব-বিরল পাহাড়ে দেশের সেই ছোট ঘরখানায় যে, সে দিন কি উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে তুলেছিলাম তা আজও বেশ মনে পড়ে। আর এত পরিশ্রম, এত চেষ্টার পর গন্তব্যের এত কাছাকাছি এসেও যদি কাউকে দলছাড়া হ'য়ে ফিরে' যেতে হয় কেবল নিজেদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোল্‌বার জন্যে, তবে তাদের সে ত্যাগস্বীকার করার যে কত দাম, তা আমাদের মত ভবঘুরেরা বেশ জানে। তবু, তারা সেদিন যখন সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝেছিল তখন আর ইতস্ততঃ করেনি কারণ, তারা জান্‌ত যে, এই অভিযানের ওপর আমাদের নিজেদের অনেক ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা নির্ভর কর্‌ছে।

তারপর সুরু হ'ল জিনিসপত্র ভাগাভাগি করার পালা। আমাদের সঙ্গে ওষুধপত্র, দরকারী সাজ-সরঞ্জাম বেশী ক'রে নেওয়া হ'ল। গরম কাপড়-চোপড়ও ত বেশী ছিল না, তাই ওরা নিজেদের গা থেকে গরম সোয়েটার কামিজ ইত্যাদি খুলে আমাদের পরতে দিলে। বনিহালের তুষার-বর্ষণ ইত্যাদি মনে ক'রে অপেক্ষাকৃত গরম কাপড়-চোপড় আমাদের সঙ্গে নেওয়ার ঠিক ক'রে ফেল্‌লাম। ডবল ডবল জামা গায়ে দিতে আমাদের রোয়া-ফোলান কাবুলী বেরালের মত দেখাতে লাগ্‌ল।

সারাদিন এই রকম উৎকণ্ঠায় কেটে গেল। এ দিকের ব্যাপার কতকটা ঠিক হ'য়ে গেলে আকাশের অবস্থা নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা সুরু হ'ল। আজকের দিনটা বড়ই খারাপ ভাবে কাট্‌ল। কালও যদি বৃষ্টি না ছাড়ে, আকাশের অবস্থা যদি এই রকমই থাকে তখন কি করা হবে? এখানে যত দেরী হ'বে ওদিকে বনিহাল-সঙ্কট পার হওয়াও তত কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। এখানকার আকাশের অবস্থা যখন এই রকম তখন বনিহালে যে বরফ পড়্‌তে সুরু করেনি সে আশা করাই অন্যায়। যদি আরও দু'দিন এই রকম বৃষ্টি হতে থাকে তবে ত বরফ পড়ার জন্যে বনিহাল পার হইয়াই সুদুর-পরাহত হ'য়ে উঠ্‌বে। এখন আমাদের সুমুখে মাত্র এক উপায় আছে। সে হচ্ছে যেমনই আকাশের অবস্থা থাক্ না কেন, বৃষ্টি ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, এগিয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যার পর ঠিক হ'য়ে গেল, কাল সকালেই আমরা বনিহালের দিকে অগ্রসর হ'ব। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে ঐ সকালেই আনন্দ ও নিরঞ্জ জম্মুর দিকে ফের্‌বার জন্য বেরিয়ে পড়বে।

২৮ শে অক্টোবর, বুধবার।—ঘুম ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম আকাশের অবস্থা কেমন দেখ্‌বার জন্যে। আঃ বাঁচা গেল। আকাশ পরিষ্কার, যদিও মাঝে মাঝে এখনও মেঘের যাওয়া-আসা রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে রোদও দেখা দিয়েছে। কিন্তু আশে-পাশের পাহাড়ের চূড়া একেবারে বরফ পড়ে সাদা হ'য়ে গেছে। ঘরের চারদিকে চোখ পড়তে দেখা গেল অতদূরে কেন, যে টিলার মাথায় আমাদের ঘর তারও আশে-পাশে শ্যাওলার ওপর জায়গায় জায়গায় বরফ জমে' রয়েছে।

বেলা আটটার মধ্যে আমরা তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে এলাম। এখান থেকে পত্নীটপ এই ১৭ মাইল পথ বরাবর চড়াই। এপথে সাইকেল চল্‌বে না, হেঁটে যেতে হ'বে। পত্নীটপ প্রায় ৭০০০ ফিট উঁচু। সেখান থেকে ২৪ মাইল উৎরাইয়ের পর রামবান। রামবানেই আজ রাত কাটান হবে এই রকম ঠিক করেছিলাম। ম্যাপে দেখা গেল, পত্নীটপের ১২ মাইল পর বটোধ্ ব'লে একটা ছোট জায়গা রয়েছে।

আর দেরী না ক'রে আমরা হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। পর পর দুটি বাঁক ফিরে দেখা যেতে লাগ্‌ল জম্মুযাত্রীরা টিলার ওপর থেকে আমাদের দিকে চেয়ে ক্রমাগত টুপি নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। আর একটা মোড় ফির্‌তেই ধরমতল একেবারে আড়াল প'ড়ে গেল। এইবার এই নির্জ্জন পথে কেবল আমরা দু'জন।

মাইলখানেক যাবার পর বাঁকের ওপারে, রাস্তার ওপর একটা টাঙ্গা দেখ্‌তে পেলাম। কাছাকাছি এসে দেখা গেল, আমাদের পরিচিত উদমপুরের ইঞ্জিনিয়র চট্টোপাধ্যায় মশায়ই এই টাঙ্গার মালিক। আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই বল্‌লেন—

'কি! আপনারা তা হ'লে কিছুতেই ফির্‌লেন না?"

"হাঁ। ফির্‌লে আপনার ওখান থেকেই ফির্‌তাম। আপনি এখানে?"

"আমি এসেছি। আজই আবার মোটরে উদমপুর ফিরে যাব।" তারপর চার পাশের পাহাড়ের মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "পাহাড়ের মাথা বরফ প'ড়ে সাদা হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছেন ত? এইখানেই এই, তা হ'লে আরও ওপরে কি রকম অবস্থা বুঝ্‌তে পারছেন না? হাাঁ তাইত! আপনারা শুধু দু'জন যে?

"অনেক কারণে তাদের আর আসা—"

"তা বেশ ভালই হয়েছে। আপনারাও আমার সঙ্গে ফিরে চলুন। এই দুর্যোগে—"

"না, মাপ করবেন। আমরা যাব ব'লেই বেরিয়েছি।"

ভদ্রলোক আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে বোধ হয় দুঃখিত হলেন ও যখন দেখ্‌লেন যে, আমাদের ফিরে যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই তখন বল্‌লেন,"আপনারা যখন যাবেনই, কিছুতে বুড়োর কথা শুন্‌লেন না তখন এক কাজ করুন। এ চড়াইয়ে ত আপনাদের হেঁটে যেতে হচ্ছে—একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, হাঁটা পথ, ও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হ'বে; তবে সুবিধে খুব। এই পথটা দিয়ে গেলেই আপনারা একবারে পত্নীটপের মাথায় গিয়ে পড়্‌বেন। তবে ও পথে সাইকেল ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের অনুগ্রহে কয়েকটি কুলী পাওয়া গেল। এরা পত্নীটপ অবধি আমাদের সাইকেল পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। সেখান থেকে উৎরাই। সুতরাং পত্নীটপের পর আর বিশেষ গোলমাল নেই। যতই বৃষ্টি বাদল আসুক না কেন পত্নীটপ পৌঁছতে পারলে সেখান থেকে ২৪ মাইল উৎরাই, সাইকেলে বেশীক্ষণ লাগবে না। এই ভেবে মনটা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে এ সময়ে বড়ই উপকৃত হ'লাম।

এবার আর রাস্তা-ঘাট কিছু নেই। আগে আগে সাইকেল ঘাড়ে কুলীরা, পিছনে আমরা। সোজা খাড়াই পাহাড় ডিঙিয়ে পথ। কুলীরা মাঝে মাঝে বিশ্রামে কর্‌বার জন্যে থাম্‌তে লাগল। লটবহর্ শুদ্ধ সাইকেল ঘাড়ে ক'রে পাহাড় ডিঙিয়ে চলা এ দেশের লোকের পক্ষেই সম্ভব।

এই দারুণ শীতেও ক্রমাগত উঁচুতে ওঠার জন্যে ঘাম বে'রয়ে গেল। প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা এই ভাবে চলে', একটা পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা পত্নীটপ পাহাড়ের মাথায় (৭০০০) ফিট এসে উপস্থিত হ'লাম। রাস্তাকে আবার এইখান থেকে ধরা গেল। পাহাড়ের ঠিক মাথায় দু'শ ফিট জায়গা বেশ সমতল। তার ওদিক্ থেকে রাস্তা হঠাৎ এমন ঢালুভাবে নেমে গেছে যে, সে-পথ দিয়ে সাইকেলে নামা প্রথমটায় ত বড়ই বিপজ্জনক ব'লে মনে হয়। পত্নীটপ পাহাড়ের মাথায় ঠিক যেখান দিয়ে রাস্তা চলে' গেছে তার আরও কয়েক শত ফিট ওপরে

কাশ্মীর-জম্মুর মহারাজার ছাউনি (encamping ground) ফেল্‌বার প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। মোটর চলন হবার পূর্ব্বে মহারাজারা জম্মু থেকে কাশ্মীর যাতায়াতের সময় এইসব জায়গায় সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে তাঁবু ফেলে থাক্‌তেন। এই রকম ছাউনি ফেলে থাক্‌বার জন্যে পাহাড়ের ওপর এইরকম সমতল জায়গা এই পথে আরও কয়েক জায়গায় দেখা গেল।

এইখান থেকে আমরা কুলীদের ফিরিয়ে দিয়ে আবার সাইকেলে উঠে পড়্‌লাম। সাইকেল ঢালু পথ দিয়ে ভীষণ জোরে গড়াতে আরম্ভ করলে। ঘন ঘন বাঁকের মুখে মোড় ফেরাবার জন্য ফ্রিহুইলে সাইকেলের বেগ কমান এক বিপদজনক কাজ। হঠাৎ ব্রেক্ (Brake) ব্যবহার করলে ত আরোহীর সাইকেল থেকে ছিট্‌কে পড়ে' যাবার খুব বেশী সম্ভাবনা। রাস্তার গায়ে এক দিকে গগনস্পর্শী পাহাড়ের দেয়াল আর এক দিকে বরাবর হাজার হাজার ফিট নীচু খাদ। সেইদিকে মাত্র তিন ফুট উঁচু পাথর রেলিংয়ের কাজ করছে। কোন রকমে সেই পাথরের বেড়া টপ্‌কালেই আর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার দফা নিশ্চিন্ত। আর এইরকম দারুণ ঢালু পথে বাঁকের মুখে মোড় ফিরবার সময় খুব বেশী রকম ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন হয়। এই সময় একটু অন্যমনস্ক বা ঢিলা হ'লেই হয় পাহাড়ের গায়ে বা পাথরের রেলিংয়ে সবশুদ্ধ ধাক্কা! না হ'লে সাইকেল শুদ্ধ পিছলে রেলিং টপ্‌কে নীচে পড়া অনিবার্য্য।

বটোথ (৩৬০০ফিট) পত্নীটপের মাথা থেকে ঠিক ১২ মাইল দূর। এই ক' মাইল রাস্তা এমন ঢালু যে বটোথ আসতে আমাদের মাত্র পঁচিশ মিনিট সময় লেগেছিল। এইভাবে সাইকেল চল্‌লে রামবান আর আধঘণ্টারও পথ নয়। তা হ'লে আর রামবান পৌঁছান সম্বন্ধে আর কোন মুস্কিল হবে না। এই রকম মনে করছি এমন সময় বটোথ পুলিস থানার সাম্‌নাসাম্‌নি দেখলাম, পথের ধারে একটা উঁচু জায়গায় দু'জন কনেষ্টবল হাত তুলে' আমাদের থাম্‌বার জন্য ইঙ্গিত করছে। অগত্যা নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক দূর থেকে আস্তে আস্তে ব্রেক্ কসে' গাড়ী থামিয়ে ফেল্‌লাম। জম্মুর মত এখানেও আবার সেই ধরণের জিজ্ঞাসাপড়া শেষ হ'য়ে গেলে আবার ঢালু পথে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। রামবানের আগেই চেনাব নদী। চেনাব পার হ'য়ে রামবান (২৫০০ ফিট) পৌঁছলাম ঠিক সন্ধ্যার আগেই। পুলের ওপর দিয়ে পার হ'বার জন্য আমাদের কয়েক আনা শুল্ক দিতে হ'ল।

উদমপুরে রামবানের ইঞ্জিনিয়র পণ্ডিত জীয়ালাল সোফরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ইনি আগে থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে রেখে-ছিলেন। আমরা সেইখানেই রাত্রের মত উঠে পড়্‌লাম। তা ছাড়া আর-একটা দরকারী কাজ ছিল—সে হচ্ছে বনিহাল চটী থেকে বনিহাল-পাস সম্বন্ধে একটা পায়ে হাঁটা-পথের সন্ধান নেওয়া। বনিহাল থেকে রাস্তায় এর দূরত্ব পড়ে ঠিক কুড়ি মাইল। বরাবর খাড়া চড়াই। সে-পথে সাইকেল চলবে না। হাঁট্‌তে হ'বে। কুড়ি মাইল হেঁটে চলা সারা দিনের ধাক্কা। বনিহাল-পাস থেকে আরও বার মাইল নীচে গেলে তবে ওপর মুণ্ডা। ওপর মুণ্ডার আগে এই ৩২ মাইলের মধ্যে মাথা গোঁজবার মত কোনো জায়গা নেই। কিন্তু বনিহালের কয়েক মাইল পর টাকিয়া থেকে ধরমতল পত্নীটপের মত আর-একটা পায়ে-হাঁট পথ আছে। এই পায়ে হাঁটা পথে গিরিসঙ্কট মাত্র দু'মাইল। তবে এই দু'মাইল বরাবর সাইকেল ঘাড়ে ক'রে ওঠা ভিন্ন কোন উপায় নেই। ওদিকে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে পাসের ওপর পৌঁছতেই প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে। তারপর আর বার মাইল নীচে গেলে তবে আশ্রয় পাবার মত জায়গা। যদি এই পথ ঠিক সময়ের মধ্যে অতিক্রম করতে না পারি তবে ত রাত্রে সেইখানেই বরফের মধ্যে জমে থাকতে হবে। এই সব ভেবে আমরা অধিক কষ্টকর কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দূর, এই হাঁটা পথের সাহায্যে গিরিসঙ্কট পার হ'ব এই রকম স্থির করেছিলাম। এই শর্টকাট রাস্তার সন্ধান জম্মুর আশুবাবু আমাদের দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই পথ দিয়ে যাওয়া স্থানীয় কুলীদের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রথমত পদে পদে রাস্তা হারাবার সম্ভাবনা। তারপর এই দু'মাইল খাড়া চড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে, সাইকেল কাঁধে ক'রে ওঠা সেও আর এক বিষম ব্যাপার। এখানে লোক যোগাড় করা বিদেশীর পক্ষে শক্ত ব্যাপার। কাজে কাজেই ইঞ্জিনিয়র সোফরী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হোক্ ঠিক করা যাবে এই মনে ক'রেই সেইখানে উঠে পড়েছিলাম।

সোফরী সাহেব টাকিয়ার সাব্-ওভার্‌সিয়ারের কাছে কুলী ঠিক করার জন্যে আমাদের একখানা চিঠি দিলেন। পথ সম্বন্ধে আরও অনেক খোঁজ-খবর এঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। আজকের দৌড় মাত্র ৪৪ মাইলের, কিন্তু কতকটা পথ কুলীর ঘাড়ে সাইকেল আসায় জন্য মিটারে উঠেছে ১৫১০ মাইল।

২৯শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।—বেলা সাতটা—এখনও কুয়াশায় চারিদিক্ অন্ধকার, আমরা বেরিয়ে পড়্‌লাম। আজকে রাত্রিবাস হ'বে টাকিয়াতে। আজকের এই ত্রিশ মাইল পথ বরাবর চড়াই। হাঁটা ভিন্ন উপায় নেই।

এই পাহাড়ে পথের ভেতর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। চার পাশেই পাহাড়, কেবল মাথার ওপরে আকাশটুকু ফাঁক। তবে এ পথের জলের বন্দোবস্ত আছে। ক্রমাগত চড়াই উঠ্‌তে উঠ্‌তে মোটরে জল বদ্‌লাবার জন্য মাঝে মাঝে ঝর্ণা থেকে জল বেঁধে রাখা হয়েছে। সেইসব জায়গা থেকে মাঝে মাঝে জল খেতে খেতে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সাইকেলকে টান্‌তে টান্‌তে বরাবর চড়াই উঠতে পরিশ্রম বড় কম হয় না। এই দারুণ শীতেও ঘন ঘন জল খেতে হচ্ছিল।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বেলা প্রায় চারটার সময় বনিহাল চটীতে (৬০০০ ফিট) পৌঁছলাম। পথে রামসু ব'লে একটা চটীতে কিছু খেয়ে-ছিলাম। এ পথে দিগদল ব'লে আর-একটি চটী আছে।

বনিহাল বেশ বড় চটী। পীরপাঞ্জালের নীচেই বনিহাল। এই পীরপাঞ্জাল শ্রেণীর একটা চূড়ার ওপর বনিহাল গিরিসঙ্কট।

বনিহাল চটী বেশ সমতল জায়গার ওপর। এখান থেকে আর চার মাইল দূরে টাকিয়া। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর রাস্তার ওপর একটি পাহাড়ে নদীর সাঁকো; সেই সাঁকোর পাশ থেকে পাহাড়ের গা-বেয়ে টাকিয়ার হাঁটা পথ। এইখান থেকে আমরা লটবহর শুদ্ধ সাইকেল কাঁধে করে' টাকিয়া পৌঁছবার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে উঠ্‌তে লাগলাম। রাস্তা থেকেই পাহাড়ের গায়ে টাকিয়া দেখা যাচ্ছিল, বোধ হয় আধ মাইলও নয়। কিন্তু এই পথটুকু আস্‌তে আধ ঘণ্টারও বেশী লেগে গেল।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি সাব্-ওভারসিয়ার ও কয়েকটি কুলি নিয়ে এই বসতি। এদের রসদপত্র সব বনিহাল থেকে আন্‌তে হয়। আমরা সাব-ওভারসিয়ার মুকুন্দ সিংকে ইঞ্জিনিয়র সোফরি সাহেবের চিঠি দিলাম ও আমাদের অভিপ্রায় সব বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বল্‌লাম। ইনি অতিশয় ভদ্রলোক। বল্‌লেন, আপনারা যখন এতদূর আস্‌তে পেরেছেন তখন আমার সাহায্যের অভাবে যে, আপনাদের এই অভিযান ব্যর্থ হবে না সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। বলা বাহুল্য যে, অনেক দিন পর এরকম উৎসাহপূর্ণ কথা শুনে মনটা কত চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিল। আজকের পথে মাইল তিন চার সাইকেল করা গিয়েছিল

বাকী সবই হেঁটে আস্‌তে হয়েছে। দৌড় মোট ৩০ মাইলের—মিটার ১০৪০।

৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার।—খুব সকালে আমরা প্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের অনুগ্রহে দেখি কুলী হাজির। ঘরের সাম্‌নে জায়গায় জায়গায় শিশির জমে' সাদা হ'য়ে রয়েছে। আশপাশের পাহাড়ের গা একবারে সাদা। কাল সব কাপড়-চোপড় শুদ্ধ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েও কাঁপতে হয়েছে।

রওনা হলাম ন'টার পরেই। তখনও বেশ রোদ ওঠেনি। সাইকেল কাঁধে করে' চার জন কুলী আমাদের আগে আগে চল্‌ল। এ পথের আর কোন রকম বিশেষত্ব নেই; কেবল খাড়া চড়াই, হাঁটা পথ। মাঝে মাঝে একটা পাতলা মেঘের জাল আমাদের ঢেকে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল যেন কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। পাহাড়ের গায়ে গাছ-পালা কিছু নেই কেবল বড় বড় ধূসর রংয়ের শ্যাওলার চাপ। সেইসব শ্যাওলার ওপর জায়গায় জায়গায় তুষার প'ড়ে সাদা হ'য়ে রয়েছে। কুলীরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়াতে লাগল। এই দারুণ শীতেও ভীষণ পরিশ্রম করার জন্য ঘাম হ'তে লাগল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা আর ভেতরে কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে জল। বরাবর হাঁটতে পারলে একরকম ভাল, কিন্তু একটু দাঁড়ালেই ভেতরে ভেজা জামার জন্য হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দেয়। অথচ না থেমে ক্রমাগত এই রকম চড়াই ওঠার চেষ্টা করলে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে, মাথার মধ্যে ঝিন্ ঝিন্ করতে থাকে। এই চড়াইটার খাড়াই খুব বেশী, ১৫ মাইল পথ ঠিক ২ মাইলে এনেছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা এইরকম পরিশ্রমের পর আমরা বনিহাল-সঙ্কটের কাছাকাছি এসে পড়লাম। মাথার কয়েক শত ফিট ওপরেই একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে দেখিয়ে কুলীরা ব'লে দিলে ঐ আমাদের গন্তব্য স্থান। বিস্ময় পুলকে মনটা দুলে উঠল। কারণ ঐখান থেকে বরাবর ঢালু পথ। ঐখানে পৌঁছলেই শ্রীনগর পৌঁছান সহজ হ'য়ে আস্‌বে।

আরো কয়েক মিনিট পর আমরা একবারে বনিহাল-সঙ্কটের সাম্‌নে (১০০০০ ফুট) রাস্তার ওপর গিয়ে পড়লাম। সমুখেই সুড়ঙ্গ; ভিতর একেবারে অন্ধকার। সেই সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে ওদিকে যেতে হ'বে। এইখান থেকে আমরা কুলীদের বিদায় দিলাম। এদের সাহায্য না পেলে এত শীঘ্র কাজ উদ্ধার হ'ত না। বেচারারা এত সরল ও নিরীহ প্রকৃতির যে যাবার সময় আমাদের কাছ থেকে কিছু বক্‌শিসও চাইলে না। যথা সাধ্য তাদের সন্তুষ্ট ক'রে তাদের ফিরে যেতে ব'লে দিলাম। সাময়িক সাহায্যের জন্য এদের কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

বেলা ১২টা। ক' মিনিট দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তেই ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপুনি লাগিয়ে দিয়েছে। ডায়েরীর পাতায় দরকারী কয়েকটি কথা লেখার জন্য কলম ধরা দায়। হাত পায়ের আঙুল, নাকের ডগা চিন্ চিন্ করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। ভেতরের কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে একবারে ঠাণ্ডা কন্ কন করছে। মণি অনেক চেষ্টা ক'রেও খাতায় পাতায় কয়েকটি আঁচড় কাটতে পারলে না। তারপর আমার পালা। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারলাম না। এমন কি শ্রীনগরে পৌঁছে সে লেখা বাংলা কি ইংরেজী সেই গবেষণা করতে হয়েছিল।

এইবার আমরা চল্‌তে সুরু করলাম। অন্ধকার সুড়ঙ্গ চারদিক্ ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। এক এক জায়গায় ওপর থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে। নিস্তব্ধ মিশকালো অন্ধকারের ভেতর আমরা দু'জন। কেবল আমাদের সাইকেলের ফ্রি হুইলের টিক্ টিক্ আওয়াজ। ক্রমশঃ সাম্‌নে থেকে ধোঁয়া ভরা ক্ষীণ আলো দেখতে পেলাম। বুঝলাম ঐখানে সুড়ঙ্গ শেষ হ'য়েছে। আরো দু'এক মিনিট পরেই আমরা একবারে সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে রাস্তার ওপর এসে পড়লাম। সুড়ঙ্গের ওপরে খোদাই ক'রে লেখা A. D. 1920|660 ft.। এদিকে দৃশ্য একেবারে বদ্‌লে গেছে। চারদিক্ অন্ধকার; দশ গজ দূরে নজর চলে না। পাহাড়ের রং বরফে একবারে সাদা। পথের ওপর প্রায় চার ইঞ্চি তুষার পড়ে 'রয়েচে। আর ঠাণ্ডা যেন ওদিকের চেয়ে তিন গুণ বেশী। এই পীরপাঞ্জাল শ্রেণীর ওদিকে জম্মু প্রদেশ ও এদিকে কাশ্মীর প্রদেশ।

সঙ্গে কয়েকটি গরম কাপড়ের পট্টি ছিল। ঠাণ্ডার চোটে সেইগুলি এখন পা থেকে কোমর অবধি জড়িয়ে ফেল্‌লাম। শীতের জন্য আঙুল অবশ। যতই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে লাগলাম ততই হাড়ের মধ্যে কন্ কন্ বোধ করতে লাগলাম। এখন কি করে' অগ্রসর হওয়া যায় সেই হ'ল সমস্যা। এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঢালু পথে বরাবর পনের কুড়ি মাইল পথ নামা বড় মুস্কিলের কথা। তুষার পাতের জন্য রাস্তা পিছল; যদি কোনরকমে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে সাইকেলের চাকা পিছলায় তবে কোথায় কত নীচে ছিট্‌কে পড়তে হ'বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সুতরাং মনে করলাম হেঁটেই চলা যাক্ কুয়াশা কাটলে সাইকেলে চড়া যাবে। কিন্তু প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পরও যখন কুয়াশা কিছুমাত্র কম্‌ল না, চারদিক্ সেই রকমই অন্ধকার তখন বাধ্য হ'য়ে সাইকেলে উঠতে হ'ল। কারণ, তখন ঠাণ্ডার চোটে অবস্থা কাহিল হ'য়ে এসেছে মুখ হাত আর মাথার মধ্যে চিন্ চিন্ করছে আর পায়ের তলা অসাড়।

ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আগে পিছনে আমাদের সাইকেল ছুটে চলেছে। ঢালু রাস্তার জন্য সাইকেলের গতির বেগ ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্চে। প্রাণপণ ব্রেক্ কসেও তার বেগ কমান যায় না। টায়ারের পাশ দিয়ে গুড়িগুড়ি তুষার ছিট্‌কে চোখে মুখে লাগছে। কানের পাশ দিয়ে ঝড়ের মত হাওয়ার গর্জ্জন। মাঝে মাঝে আমরা চীৎকার ক'রে পরস্পরের খবর নিচ্চি। আবার ঘন ঘন বাঁকের জন্য এক-এক জায়গা একবারে নিস্তব্ধ, বাতাসের লেশমাত্র নেই। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে কেবল মিটারের ক্রমাগত টিক টিক শব্দ।

দশ মাইল পরের ওপর-মুণ্ডার বাংলো এখন আমাদের লক্ষ্য। ক্রমাগত ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর যেন অসাড় হ'য়ে গেল। প্রায় ন' মাইল এই ভাবে চলার পর কুয়াশা যেন কিছু হাল্কা হ'য়ে গেল। অস্পষ্ট আলোর ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ পাহাড়ের গায়ের একখানি ছোট ঘর দেখা গেল। মণি চীৎকার করে ব'লে উঠল, "ওপর-মুণ্ডার বাংলো"।

এই পথটায় একটাও জন-প্রাণী দেখতে পেলাম না। তাই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, ঐ বাংলোর মধ্যে আবার লোকজন আছে। যাই হোক এখানে আগুন জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট কাঠ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ আগুনের পাশে বসে' অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লাম। তারপর গরম গরম কয়েক পেয়ালা চা। এ রকম, সময় এই জায়গায় যে পয়সার বিনিময়ে সাহায্য পাব তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কাজে-কাজেই এই সাময়িক সুবিধা ও সাহায্য পেয়ে নিজেদের খুব সৌভাগ্যবান ভেবে মনে মনে তারিফ করতে লাগলাম।

বেলা প্রায় দেড়টা। কিন্তু বাইরে এসে দেখ্‌লে মনে হয়, বুঝি এই সবে ভোর হচ্চে। আবছা কুয়াশার ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা ক্রমাগতই নীচের দিকে নেমে গেছে। এখান থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব মোট ৫৯ মাইল। আরো খানিকটা উৎরাই, তার পর থেকে সমান রাস্তা সুরু হ'বে। বেলা মোটে দেড়টা, সুতরাং চেষ্টা করলে আজই শ্রীনগর পৌঁছান যাবে এই ভেবে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশ পরিষ্কার। ঠিক তিন মাইল আসার পর একটা প্রকাণ্ড বাঁকের ওদিকে ঘুরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রের চোটে চার দিকের পাষাণ-

প্রাচীর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পায়ের নীচের দিগন্ত বিস্তৃত চীর ও পাইনের শ্রেণীতে ভরা সবুজ শস্যশ্যামল সমতল ভূমির মাঝে রূপালি সুতার মতই সরু নদী খামখেয়ালী-ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। এর সীমানা নির্দ্দেশ করেছে দিকচক্রবালের গায়ে বরফ-মাখা বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী। এইসব অনন্ত-তুষারাবৃত পাহাড়ের গায়ে জায়গায় জায়গায় সূর্য্যের আলো যে কত বিভিন্ন রকমের রং বেরঙের সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পীরপাঞ্জাল শ্রেণী থেকে বিশ্ববিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকাকে এই রকমই দেখায়।

এর পরেই নীচু-মুণ্ডা (Lower Moonda) পার হ'য়ে কোয়াজিগুন্দে এসে পড়লাম। এইখান থেকে সুন্দর, দুপাশে চীর গাছের সারি দেওয়া সমান রাস্তা সুরু হ'ল। অনেক দিন পর পাহাড়ে পথের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমরা খুব শীঘ্রই খানাবলে এসে পড়লাম।

বনিহালের পর খানাবলই বেশ বড় চটী। এখানে অনেক রকম জিনিস পত্র মেলে। ডাক বাংলো, সরাই ইত্যাদি আছে। জম্মু থেকে যে-পথ দিয়ে আমরা এতদিন এলাম সে-পথ এখানে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। সে-রাস্তার নাম বনিহাল কার্ট রোড (Banihal Cart Road)। এবার খানাবল থেকে যে-পথ দিয়ে আমাদের শ্রীনগর যেতে হ'বে তার নাম শ্রীনগর অনন্ত নাগ রোড। খানাবল এই রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। এখান থেকে শ্রীনগর মোট ৩৫ মাইল দূর। রাস্তা ভাল, বেলা মোটে ৩টা; সুতরাং অনেক দিন পর আজ নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া-দাওয়া শেষ করা গেল।

রওনা হ'লাম বেলা চারটার সময়। বাকী পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা যে কি ক'রে চলে এসেছিলাম তার কিছু খেয়ালই নেই। পথের ওপরেই পড়ল অবন্তীপুরার ধ্বংসাবশেষ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রামও দেখা যেতে লাগল। এইসব ছাড়িয়ে আমরা বিজলী-বাতি-ওয়ালা পামপুর সহরে উপস্থিত হ'লাম। পামপুর জাফরাণের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। রাস্তা থেকে কিছু দূরে জাফরাণের চাষও দেখা যেতে লাগল। আর মাইল দশের মধ্যেই শ্রীনগর। ভাবলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীনগরে উপস্থিত হ'তে পারব। কিন্তু আমাদের শেষ পর্য্যন্ত একটা-না-একটা মুস্কিলে পড়তে হ'বে বোধ হয় এই রকম কিছু কথা ছিল। সেইজন্য পামপুরের পরই হঠাৎ ২নং ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইকেলের ফ্রি হুইল (Free wheel) বিগড়ে গিয়ে সামনে পিছনে দুদিকেই নির্ব্বিকারভাবে ঘুরতে সুরু ক'রে দিলে। মনে করলাম, নিশ্চয়ই ভেতরের স্প্রিং কেটে এই অবস্থা হ'য়েছে। সেই-জন্য এই অন্ধকারে আর সমস্ত খোলাখুলি করার হাঙ্গাম না ক'রে এই সাত আট মাইল হেঁটেই চ'লে যাওয়া স্থির করলাম। কিন্তু পর দিন শ্রীনগরে গিয়ে মেরামত করার জন্য সমস্ত খুলে দেখা গেল ভিতরে স্প্রিং ঠিকই আছে। ঠাণ্ডার চোটে ফ্রি হুইলের স্প্রিং ভেতরের ভেস্‌লিনের সঙ্গে জমে পাথরের মত শক্ত হ'য়ে রয়েছে। আর সেই জমাট ভেস্‌লিনের মধ্যে স্প্রিং আটকে যাওয়ার দরুণ কোন কাজ করতে না পারায় এই বিপত্তি।

সাইকেলে শ্রীনগর প্রবেশ আর আমাদের দ্বারা হ'য়ে উঠল না। পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার মন্দিরের তীব্র বিজলী আলো জানিয়ে দিলে আমরা সহরের খুব কাছে এসে পড়েছি। হাঁটতে হাঁটতে রাত প্রায় ন'টার সময় সহরের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এরই খানিকক্ষণ পরে সহরের এক প্রান্তে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাংলোর সামনে আমাদের ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি শুনে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে বল্লেন—

"ওঃ আপনারা? এতদিন পরে? আমি রোজই আপনাদের expect করছি। আমার ছেলে এই সেদিনও আপনাদের কথা লিখেছে। তা আপনাদের আর দু'জন?"

বললাম—"অনেক কারণে সকলেরই আর আসা সম্ভব—"।

কাশ্মীরের চিফ্ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (Chief Electrical Engineer) শ্রীযুত ললিতচন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যের বিষয় আর নূতন ক'রে লেখার কোন প্রয়োজন নেই। উত্তর ভারতে এঁর আতিথিপরায়ণতার কথা না জানে এরকম প্রবাসী বাঙালী অতি বিরল। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট আরামের রাজ্যে এসে পড়লাম—কালকের রাতের সঙ্গে আজ কত তফাৎ। এই দিনের মত আরামে আর কখনও ঘুমিয়েছি কি না জানি না। আজকের দৌড় ৭২ মাইলের—মিটারে উঠেছে ১৬০২ মাইল।

শেষ

শ্রীনগরে তিন দিন কাটিয়ে ঝেলাম ভ্যালী রোড দিয়ে মারী পাহাড় (প্রায় ৭০০০ ফিট) পার হ'য়ে রাওলপিণ্ডি। সেখান থেকে দিল্লী আগ্রা হ'য়ে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে সাইকেল আমাদের কলকাতা পৌঁছে দিয়েছিল ৩১শে ডিসেম্বর। সময়াভাব বশতঃ বাকী অংশটুকু আর এখন প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠল না। কলকাতা থেকে বার হ'য়ে এই পথ দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার জন্য অন্য আমাদের মোট ৪০১৪ মাইল পথ অতিক্রম করতে হ'য়েছিল।

সারা পথেই আমরা প্রবাসী বাঙালী অবাঙালীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহানুভূতি ও উপকার পেয়ে এসেছিলাম। তাঁদের সাময়িক সাহায্য ও সময়োচিত পরামর্শ না পেলে এই ভ্রমণ যে সুচারুভাবে শেষ করা যেত না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। জম্মুর অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশ্মীরের ইঞ্জিনিয়ার-দ্বয় শ্রীযুত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত জীয়ালাল সোফরী, সাব-ওভারসিয়র শ্রীযুত মুকুন্দ সিং ও দিল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের কাছে এই 'অভিযান' বিশেষভাবে উপকৃত। এঁদের ও অপরাপর আর সব ভদ্রলোকের কাছে আমরা সকলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। এই ভ্রমণ-কাহিনীর কথা মনে হ'লেই রবিবাবুর এই দু'লাইন মনে পড়ে যায়—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

সমাপ্ত
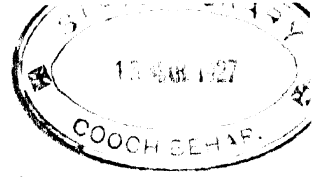
সোনার ঘড়ি

শ্রী সুবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে দ্বিপ্রহর বেলায় বরদাসুন্দর তর্করত্নকে কোন কার্য্যবশত একবার অসময়ে নিজ গ্রামে আসিতে হয়। কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে লাগিয়া গিয়াছে যেন সাপে-নেউলে। ইহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানে না, নাই ব্রহ্মহত্যার ভয় করে না—ইহারা সব স্বরাজ মারিবে—হুঁ!

জ্যোতির্ব্বিদ বরদাসুন্দর গণনায় অলৌকিক শক্তিশালী, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধন্বন্তরি। খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণ, মহাকুলীন; গোল-আলুর মত কামানো মুখখানি রোদ-পোড়া; কেশহীন মস্তকে প্রকাণ্ড শিখা, উহার অগ্রভাগে বাঁধা গুটিকয়েক শুষ্ক ফুল মস্তক-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে পেণ্ডুলমের মত তালে তালে দুলিতে থাকে। মস্তক ও কপালের সন্ধিস্থলটিতে একটি পালিশ-করা চকচকে গণ্ডী-রেখা—প্রমাণ করে ঊর্দ্ধভাগ মস্তক, নিম্নভাগ কপাল।

ইনি একজন মস্ত দেশ-হিতৈষী; কলিকাতায় বিস্তর যজমান, তাহারা ছাড়ে না—নৈলে যে-পল্লীর মাটীতে, জলে, হাওয়ায় তর্করত্ন মানুষ, তাহার মমতাময় ক্রোড় হইতে দূরে থাকিতে কে চায়? রাজার ঐশ্বর্য্য পাইলেও নয়, সম্মানের শীরোপা মাথায় দিয়া বসিলেও নয়।

কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছেন। ধনীর মেয়ে সে। এখন কনিষ্ঠ বিধবা বোন তাঁহার দেশের ভিটা আগলায়; প্রথম পক্ষের একটা পাগলাটে ছেলে পিসিমার আঁচল ধরিয়া ফেরে, বাপের আদর পায় না, পিসির কাছ থেকে তাহা সুদ সমেত আদায় করিয়া লয়।

"কৈরে" বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া দাদার পায়ের ধূলা লইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদিন পরে দাদা আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন! তাঁহার যে চারিদিকেই দারুণ অভাব-দৈন্য, একটা অভাবকে কোন মতে চাপা দিলে অপর পাঁচ-সাতটা দৈত্যের মত ঝাঁকি দিয়া উঠে। তিনি ঘটীর জলে তাঁহার পা ধুইয়া মুছিয়া দিলেন, পরে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিলেন। অপোগণ্ড ছেলেটা প্রাঙ্গণে ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়াইতেছিল। লক্ষ্মী হাঁকিয়া বলিলেন, "ওরে আয় না গৌরে, বাবাকে প্রণাম কর"—বলিতে বলিতে তিনি হেঁশেলে চলিয়া গেলেন।

গৌরে মালকোচা মারিয়া ডাণ্ডাগুলি হস্তে বাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন বিচারকের সম্মুখে অপরাধী, ভাল করিয়া ঘাড় তুলিতে পারে না, কথা বলিতে গেলে জিভ জড়াইয়া যায়।

তর্করত্নের ভোগের শরীর, বিশেষত এখন অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্বশুরালয়ে থাকেন; সেখানে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, খাওয়া-দাওয়া সমস্তই উঁচুদরের—ঝক্‌ঝকে, তকতকে; আর এখানে?—লক্ষ্মীছাড়াগুলো—

তর্করত্নকে কে যেন স্বর্গের তোরণ দ্বারে তুলিয়া নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছে এইরূপ মুখ করিয়া তিনি ছোকরার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইঃ! ছোঁড়ার গায়ে গন্ধ দেখ! মহিষ চরাস্‌ নাকি?"

"বাবা ধরেছ ত ঠিক"—মহিষের পিঠে চড়িয়া পাঁচন বাড়ী হাতে সে কত জলা, কত ধানক্ষেত পার হইয়া গিয়াছে, কত গান গাহিয়াছে—কিন্তু বাপের জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গীটা এত রোষের কেন? মহিষ চরানোতে রোষের কারণ যে কি থাকিতে পারে সে খুঁজিয়া পাইল না।

পিতার দ্বিতীয় সম্ভাষণ আরও মধুর "আরে, ছোঁড়া কথা কয় না—সং-এর মত খাড়া হ'য়ে আছে, দেখে পিত্তি জলে যায়।" গৌর বুঝিল খাড়া থাকাটা রাগের কারণ

হইতেছে, সুবিধা নয়—সে দম লইয়া দৌড় দিল—চু—উ—উ।

"আমোলো, রকম দেখ" বলিয়া তিনি ঘরের মটকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে মস্ত ফাঁক, আর ঐ ফাঁকটারই মত খানিকটা নীল আকাশ। মাটীর দেয়াল হেলিয়া পড়িয়াছে তাঁহার অতীত দৈন্য স্মরণ করাইয়া। ঐ ঘরটাই তর্করত্নের শয়ন-ঘর ছিল—আর ঐ ঘরে গৌরের মায়ের চুড়ীর ঠিনিঠিনি এখনও না শুনা যায়।

লক্ষ্মী জলখাবার আনিলেন, কয়েক টুকরা আম ও দুইটি কদমা, এবং ভ্রাতার পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, "ঘরে কিছুই নেই যে দিই, একটা চিঠিপত্র দিতে নেই। দেখ দেখি ঠিক দুপুরে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই!"

বরদাসুন্দর গজদন্ত বাহির করিয়া বলিলেন, "ওকে চিঠি লিখ্‌তে হ'বে—! হুঁকোটায় কখনও ছিঁচকে দিস্, জল ফেরাস্? খালি মাকড়শার জাল আর আরশোলার নাদী! এঃ হাতটা কি হ'য়ে গেল দেখ!"

"এই ঘটীতে হাত বুড়োও", "বলিয়া দাদার হাত হইতে হুঁকোটা লইয়া লক্ষ্মী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তর্করত্ন মাদুরে আড় হইয়া পড়িলেন। মাথায় দিবার একটা ছোট বালিশ দেওয়া হইয়াছে—সেটা যেম্‌নি তেলচিটে, তেম্‌নি কালো, তেম্‌নি দুর্গন্ধ—তবলা বাধা বিঁড়ের মত। "ঘেন্না ধরালে"—বলিয়া তর্করত্ন উহা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আলগোছে ধরিয়া দূর করিয়া উঠানে ফেলিয়া দিলেন। মরা জন্তু ভাবিয়া একটা কাক তাহাতে আসিয়া ঠোকর দিল, এবং তখনি গৌর কোথা হইতে হো—হো শব্দে ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে বারকয়েক লাথি মারিয়া পুনরায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

উঠানে ঘাস জন্মাইয়াছে—প্রাচীরের কোণে কাগজী লেবুর গাছ। যাবার সময় কিছু লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

তামাক না খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিল—তিনি অস্থির কণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, "ভাল, তামাক চেয়েছিলাম যে! এদের কপালে অশেষ দুঃখ! এক ছিলিম সাজতে জিভ বেরিয়ে গেল!" কিন্তু তখনি তামাক আসিল। তিনি দুই একবার টানিয়া কলিকা উপুড় করিয়া চীৎকার করিয়া রায় দিলেন, "ঠিকুরে নেই।"

তামাক খাইবার পালা শেষ হইল—তর্করত্ন গাঁট হইয়া বসিয়া আছেন—দেখি লক্ষ্মী আহারের কি আয়োজন করে। আহারের ব্যবস্থা একেবারেই লোভনীয় নহে—মোটা চা'লের ভাত, ছোবড়ার মত আসিদ্ধ ডাল, আর কুমড়া-শাক চচ্চড়ি। অত বেলায় মাছের যোগাড় হয় না, দুধ মেলে না। দাদার পাতে উহা তুলিয়া দিতে লক্ষ্মীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বাতাস করিতে করিতে বলিলেন—"দেশে ভয়ানক অজন্মা, অনাবৃষ্টির আকাশ, আষাঢ়ের জলের জন্য সকলে চাতকের মত চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা পাড়িলেন—পয়সার অনাটন, মাইনে অভাবে ইস্কুল হইতে ছেলেটাকে তাড়াইয়া দিবার কথা, আগামী বর্ষায় ঘরের মধ্যে শুষ্ক স্থানাভাব, ইত্যাদি। তিনি ধরিয়া বসিলেন, ছেলেটার একটা বিল্লের জন্যে—আর চাল ছাওয়ার একটা উপায় করিতে।

"বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই ঘ্যানঘ্যানানি সুরু হয়েছে—পয়সা, পয়সা, পয়সা; পয়সা অম্‌নি আসে? চিরকাল স্কন্ধে ব'সে খাচ্ছে, লজ্জা করে না! যেমন চেহারা তেম্‌নি পরণ-পরিচ্ছদ"—বলিয়া বরদাসুন্দর ক্ষুধার তাড়নায় খাব! খাব! ভাত গিলিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধবার ঐ পরিচ্ছদই যথেষ্ট; ময়লা চিরকুট কাপড়ে ম্যালেরিয়া শীর্ণ দেহখানি ঢাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার জন্যে ভাবি না, যম আমায় ভুলেছে; এই ছেলেটার জন্যেই ভাবি, ওর একখানা কাপড় নেই, জামা নেই—শীতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে বাছা বেড়ায়। বল, কি ক'রে চোখে দেখি? ভদ্রলোকের ছেলে মুখ্যু হয়ে থাক্‌বে, সেও কি প্রাণে সয়?"

"সে পরে বিবেচনা করা যাবে" বলিয়া তর্করত্ন নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে রৌদ্রের শাসন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসে—অম্‌নি বিবর্ণ গাছপালা হাসে—পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে। বরদা পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। সেখানে নমস্কারের আদান-প্রদান, আপ্যায়িতের ছড়াছড়ি। কেহ আসিয়াছে পরিচয় করিতে, কেহ ঔর

[illegible]য়ার, কেহ কন্যার বন্ধ্যাতার ঔষধ লইতে। [illegible]শী ভবসুন্দর হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেইস্থানে [illegible] বলিলেন, "ঠাকুর মশাই, ভাইপোটার জন্যে ত [illegible] যায়, একঘরে হ'তে হয়। পাগল হ'ল, না কিছুতে [illegible]! বামুন হ'য়ে মুসলমানের মুদ্দো ঘাড়ে করে, [illegible] হিন্দুর টুঁটি ছিঁড়ছে!—বুঝুন! আবার ডোম, মুচী, [illegible] সঙ্গে মিশতে দ্বিধা করে না, শ্লোক বাঁধে, ধেই ধেই [illegible] নাচে—আবার মন্দিরে ঢুকে' গড়াগড়ি দেয়—একটা ঝাড় ফুঁ—"

—"আপনার ভাইপো বল্লেন না?"

—"আজ্ঞে।"

—"বে' দিন।"

—"তারইত যোগাড় করেছিলাম, সব স্থির, ছোঁড়া বেঁকে দাঁড়াল, বলে পড়োগেঁয়ে ভূত বে' করবে না, মানুষের মেয়ে হ'লে করবে"—

—"হাসে—কাঁদে?"

—"ও বাবা হাসে না? আবার ঘুষোও বাগায়—এই [illegible] ত এই মারে—যেন দানবদলনী।"

মুখে গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন ফুটাইয়া তর্করত্ন একটি চিরকুটে কি লিখিয়া ভবসুন্দরের হাতে দিয়া বলিলেন, "যান, যোগাড় রাখ্‌বেন, কাল দুপুরে কথা রৈলো তাহ'লে"—

—"আজ্ঞে ঝাড় ফুঁ?"

—"ওতেই আছে গো—কি মুস্কিল!"

—"আজ্ঞে"—ভবসুন্দর বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "পারিশ্রমিকের জন্য আট্‌কাবে না, দেবতা।"

—"সে হবে গো" বলিয়া তর্করত্ন, পঞ্জিকাটি উঠাইয়া লইলেন।

পরদিন ভবসুন্দরের চন্ডীমণ্ডপে হুলুস্থুল কাণ্ড। পাছে পালায়—সেই জন্য জনকয়েক গঙ্গেশকে ধরিয়া রাখিয়াছে। মা পুত্রকে ভুলাইতেছেন। "ছি! ও রকম করে না, তুমি ত আমার অবুঝ নও ধন।"

ওপাশে একটা তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া মুকুন্দ বলিল, "না অবুঝ হ'তে যা'বে কেন? তানপুরা নিয়ে মুসলমানের গলা জড়িয়ে ভ্যা—ভ্যা করেন—অবুঝ নন; কি যে কথাটা কি যোগে?"

যজ্ঞেশ্বর ধাঁ করিয়া উত্তর দিল, "নেতে-তেরি, তেনেরি নোম্।"

"—হাঁ—হাঁ, কি? নেতারি বেতারি তোম্—উঃ! কি গানের ছিরি—কিন্তু যোগের আমার স্মরণশক্তি দেখ" —বলিয়া মুকুন্দ খ্যাঁ খ্যাঁ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"কি ব্যাপারটা আমায় খুলেই বলুন না? ধ'রে রেখেছেন কেন? আমি কি খুনী আসামী?" বলিয়া গঙ্গেশ একবার হরিখুড়োর একবার কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি না ব্রাহ্মণের ছেলে—গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েছে—"

"বলেন কি! রয়েছে নাকি!" বলিয়া গঙ্গেশ আপনার পৈতা দেখিতে লাগিল। "আবার ঠাট্টা-বোট্‌কারা" বলিয়া হরিখুড়ো চড় তুলিয়াছেন, এমন সময় ভবসুন্দর সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গেশের গর্ভধারিণী বরদাসুন্দরকে প্রণাম করিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "ঠাকুর একটু কম কড়া ক'রে মন্ত্র দেবেন—বাছা ছেলেমানুষ।" "হাঁগো" বলিয়া তিনি গঙ্গেশের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া ভবসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরই।"

"—আজ্ঞে—ঐটি।"

সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল—ধামা, নোড়া, গোবরের পরী, চাল, ধান ইত্যাদি। ভৃত্য নেপাল ধামা নামাইল। তর্করত্ন পরীর সম্মুখে এক জোড়া পায়রা ছাড়িয়া দিলেন, সে দুটো ঝট্‌পট্ করিয়া মরিয়া গেল। তাহাদের দুই জোড়া অসাড় ঠ্যাং বুকের কাছে মুটো পাকাইয়া আছে তর্করত্নকে "বক্সিঙ্" (ঘুসি) মারিবার প্রয়াসে।

তর্করত্ন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মোগলাই পেত্নী, শক্ত যান্—বিতিকিচ্ছি কাণ্ড এদের।"

মেয়েরা শিহরিয়া উঠিল। মুকুন্দ হরিখুড়োর কাণে কাণে বলিল, "নাও ঠেলা এখন—"

"তুর্কী নাচন নাচাবো যাদুকে, র'স্‌না"—তর্করত্ন আপনা আপনি বকেন, আর দুর্ব্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘরময় মুঠো মুঠো ধান ছড়ান।

গঙ্গেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যাঠা মশায়, আপনার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে—একটা উন্মাদ ধ'রে এনেছেন !—"

"থাম্ লক্ষ্মীছাড়া—উনি উন্মাদ, না তুই ? উন্মাদের শ্রাদ্ধ কর্‌তে এসেছেন উনি—ভূতের চোদ্দ পুরুষের—" বলিয়া ভবসুন্দর হাঁপাইতে লাগিল।

গঙ্গেশ বিস্ফারিত নেত্রে তর্করত্নের দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রাণী হত্যা কর্‌তে লজ্জা হয় না—ঝুঁচলে খাইয়ে এনেছেন, ভণ্ড!"

তর্করত্ন ঘাগী। রোষের ঢোক গিলিয়া হাসিতে হাসিতে ভবসুন্দরকে বলিলেন, "মন্ত্রে বাধা দিচ্ছে আপনি উবু হ'য়ে পিঁড়ের উপর বসুন ত উঁহুহু! ও রকম না, একেবারে ডাইনির ঘাড়ে যেমন বসা উচিত—হাঁ—হাঁ, ঐ—ঐ।"

এইবার তর্করত্ন বিলুণ্ঠিত কচ্ছে ভূতের মাথায় ধামা বসাইতে গেলেন। গঙ্গেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই নোড়া দিয়া উড়াইয়া দিই যদি তব তরমুজের বোঁটা কি করিতে পার তুমি, বরদাসুন্দরী ?" সে বরদাসুন্দরের টিকি ধরিয়া সজোরে এক টান দিল। ফলে তিনি চিৎপাত হইয়া ঘড়ার উপর পড়িয়া গেলেন; গঙ্গেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্রে সরোষে পদাঘাত করিয়া তিন লাফে বাহির হইয়া গেল।

"সামাল—সামাল" চারিদিকে ভয়ঙ্কর গোলমাল, দুড়্ দাড়্ শব্দ।

হরিখুড়ো উহার পিছনে কিছুদূর ছুটিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন "ভূত ও যারা হাওয়ার সঙ্গে উড়ে, মট্‌কা ফুঁড়ে' নামে!

বরদাসুন্দর গলদঘর্ম্ম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। "'হাডু-ডু' খেলা ছোকরা—ওর সঙ্গে দৌড়, বাপ! আর ও কি ছুট্‌ছে, ছুট্‌ছে দানোটা—তিনি ভবসুন্দরের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, বাণবিদ্ধ পেত্নী অকর্ম্মণ্য—ভাগাড়ে গিয়ে মুখ ঘস্‌ড়াবে, তারপর ও আপনিই চলে' আস্‌বে—বুঝেছেন ?"

—"আজ্ঞে" বলিয়া ভবসুন্দর প্রণাম করিলেন এবং তর্করত্নকে উপযুক্ত পরিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন।

২

শ্রাবণের শেষ ভাগ; দিন রাত ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছে। পাগলটা সেই পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ। সকলের হাড় জুড়াইয়াছে, কেবল প্রতি সন্ধ্যায় ভবসুন্দরের বাড়ী হইতে বিধবার কান্নার রোল উঠে ছেলেটির অমঙ্গল আশঙ্কায়।

লক্ষ্মী আজ কয়দিন প্রবল জ্বরে শয্যাগত। গৌরে শিয়রে বসিয়া। তাহার কালীবর্ণ মুখ, ফ্যাল্‌ফেলে চাউনি—কি একটা অজানিত আশঙ্কায় সে মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইয়া গেল, কেহ দেখে না। গ্রামের তরুণ সঙ্ঘটি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু পয়সা অভাবে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। অভিভাবকেরা মার-ধোর করে, গালি দেয়। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে গিয়া কয়েকজনের পৃষ্ঠে সন্মার্জ্জনীর স্পর্শ অনুভব করিতে হইয়াছে।

তর্করত্নের জমি-জমা সংক্রান্ত গোল এখনও মেটে নাই—তাই গ্রামে এখনও থাকিতে হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে খবর পাইতেছেন কলিকাতায় দাঙ্গা ক্রমশই ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছে। তর্করত্ন বাইরের দাওয়ায় বসিয়া হুঁকাহস্তে ঝিমাইতেছেন, খুঁটীর গায়ে ঢুলিয়া পড়িতেই ধাক্কা লাগিল, চাহিয়া দেখেন ডাক-পিয়ন। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন :—

প্রিয়তম,

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, ৩০ শে শ্রাবণ নিরুপমার বে, আর দিন নাই। তুমি পত্রপাঠ বাহির হইবে, রবিবার সন্ধ্যায় আসা চাই। পাত্র বড় মজার পাওয়া গেছে। মোছলমানের দাঙ্গায় আমাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল ব'লে, বাবা এই পাত্রের সঙ্গে নিরুর বে স্থির করলেন।

একটা কথা। নিরুর বরকে এমন একটা যৌতুক দেওয়া চাই যেটা আমার অন্যান্য পাঁচ বোনের চেয়ে সেরা হয়। আসিবার সময় এনো সোনার ঘড়ি একটা—কতই বা দাম পড়বে ? দুশো টাকায় বেশ হবে। দ্বারভাঙ্গা

থেকে পরিমলরা এসেছে ; তুমি এস—তোমার আশায় আমি চাতকিনীর মত পথ চেয়ে থাকবো।

তোমারই মণিমালা।

"এ্যাঁ! নিকর বে! আজ ত শনিবার—বে' কাল রাত্রে—এখনি ত তাহ'লে বেরুতে হয়!" —বলিয়া বরদাসুন্দর খামখানা বাঁ হাতে লইয়া দাওয়ার উপর এমন উত্তেজিত ভাবে দ্রুত পায়চারী করিতে লাগিলেন যে, দেখিলে মনে হয় জার্ম্মানেরা এইমাত্র বুঝি কামান দিয়া বরদাসুন্দরের কেল্লা উড়াইয়া দিল! পরে হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিলেন, "কি রকম ঘা-টা দিলে দেখলে! অন্ততঃ দেড় শত টাকা লাগবে—নিয়ে যেতেই হ'বে—নৈলে? ও বাবা! কিন্তু যার জন্যে পালাইয়া আসা? হাঁ সে একদিনে থেমে গেছে!"

তিনি ব্যস্তভাবে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমি কল্‌কাতায় চল্লুম"—তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

লক্ষ্মী তখন প্রলাপ বকিতেছে। গৌরে "পিসিমা, পিসিমা" বলিয়া গ্যাঁঙাইল, কেহ উত্তর দিল না; মধ্যে মধ্যে রোগী রক্তবর্ণ চোখে বিকারের ঘোরে তাকায়—গৌর ভাবে এইবার পিসি উঠিবে।

বরদাসুন্দর যখন নৌকায় চড়িলেন বর্ষায় নদীর ভরা বক্ষ—তাহার বিস্তীর্ণ আবিল বারিরাশির পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা। নদী-তীরে নিস্তব্ধতার অপূর্ব্ব সমারোহ—নগ্ন সৌন্দর্য্যের বিপুল রমণীয়তা। তাহার মধ্যে কোথা থেকে একটা ছোট পাখী পিক্ পিক্ করিয়া ডাকে, জল ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পাড়ে লাগে, আর হু হু করিয়া জলো হাওয়া ছুটিয়া আসে শব্দহীন যানের মত।

নদীর পাড় ক্রমশই দূরে সরিয়া যাইতেছে। তখনই ক্ষণেকের জন্য নদীবক্ষে ভাসমান এই পথিকের মনে উদয় হইল—"যাই ফিরিয়া যাই—স্নেহবিচ্যুতা পরিত্যক্তা অভাগিনীকে সঙ্গে লইয়া আসি, তাহার রোগক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া দিই।" কিন্তু তখনই আবার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল যৌবনমদগর্ব্বিতা রূপসী স্ত্রীর হাস্যমুখ, বিলোল কটাক্ষ—আর মনে হয় "কেন? কিসের দুঃখ? এর চেয়ে কি কেহ কষ্টে থাকে না? না হয় আর কিছু বেশী মুদ্রা বরাদ্দ করিয়া দিব!"

পালে হাওয়া লাগিয়াছে, নৌকা দ্রুত চলিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল, একটা ছেলে মেঠো রাস্তা ধরিয়া নক্ষত্রবেগে নদীতীরে ছুটিয়া আসিল।

"গৌরে না?"—বলিয়া বরদাসুন্দর তাড়াতাড়ি ছৈয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তখনই একটা বিপরীতগামী বজরা দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া দিল। তর্করত্ন তৎক্ষণাৎ ছৈয়ের উপর লাফাইয়া উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন—অচেনা বালুচর, আর বুনো গাছপালা।

* * * *

রাত্রি হইয়া গিয়াছে, কারণ থিয়াটারের টিকিটের জন্য যাহারা রাস্তায় হুড়োহুড়ি করিতেছিল তাহারা সেখানে নাই।

গলির মোড়ে মস্ত বাড়ী—ছাদে মেরাপ বাঁধা, অজস্র আলো। পথের ধারে রাশীকৃত এঁটো পাতা, খুরী, গেলাস মাছের আঁশ। সেখানে কম্বল গায়ে জড়ভরত একটা লোক লুচি চিবাইতেছে। ফটকের মুখেই শ্যালক ধীরকৃষ্ণ ভগ্নীপতিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। গোধূলি-লগ্নে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সজ্জিতকক্ষে, বাসরে মেয়েরা গিস্ গিস্ করিতেছে।

আজ তর্করত্নের মনটা বড়ই প্রফুল্ল। এই বাড়ীতে কি যে মাদকতা আছে! এতক্ষণে গৃহিণী সাজিয়া-গুজিয়া পান খাইয়া—বাপ! সাজের কি ঘটা! পূজারী ব্রাহ্মণকে শেষে প্রেমের বানে হাবুডুবু খাওয়ালে! বিশেষ আরও আনন্দ, ললনাগণের সম্মুখে ভায়রা-ভাইয়ের হাতে সুতার রাখী না বাঁধিয়া সোনার রিষ্ট-ওয়াচ পরাইয়া দিয়া বাহাদুরীর চূড়ান্ত করিবেন এবং কৃপণ নাম ঘুচাইয়া দিয়া সকলকে দেখাইবেন বরদা সময়ে-অসময়ে পিছ-পা নন।

বহুমূল্য বেনারসীতে দেহাবৃত করিয়া মণিমালা আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "এনেছ ত? এস এইবার—তুমি না আসা পর্য্যন্ত একবারও আমি হাসিনি! আহা! টিকির ফুলটা খুলেই ফেলনা ছাই! কাল যদি ও টিকি আমি না কাটি!"

"তা তুমি পার" বলিয়া তর্করত্ন মহা আনন্দে টিকির

গেবো খুলিয়া ফেলিলেন এবং স্ত্রীর পিছন-পিছন বাসরে প্রবেশ করিয়াই "একি!" বলিয়া দশ হাত পিছাইয়া তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন "গঙ্গেশ—গঙ্গেশ, ওকে আমি সোনার ঘড়ি দেব? প্রাণ থাক্‌তে নয়—ম'রে গেলেও নয়।"

দস্তুরমত গোল বাধিল। জামাতার ভায়রাভাই দর্শন ও সর্পভ্রমে পিছাইয়া যাসা! শুধু তাহাই নয়—বিবাহ-বাড়ী পরিত্যাগ করা! সকলে মনে করিল, হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে। ধীরকৃষ্ণ ও নীরদবরণ বাবু চুপিচুপি কি পরামর্শ করিলেন এবং জামাতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য হন্তদন্ত হইয়া বাহিরে ছুটিয়া গেলেন; কিন্তু বরদাসুন্দরকে কেহ দেখিতে পাইল না।

ছত্রপতি শিবাজী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ছত্র ধর, ছত্রপতি, বড় তাপ, অসহ্য যন্ত্রণা,—
লেলিহান্ জিহ্বা মেলি' দুঃখ-অগ্নি করিছে তাড়না;
ঘোর দুঃখ, ঘোর ব্যথা, দৈন্যবজ্র শিরে মৃত্যু হানে;
দাসত্ব-প্রখর-তাপ দহিছে বৈশাখ-রৌদ্র-বাণে;
ছায়া নাই, গৃহ নাই, পদতলে তপ্ত বালু দহে,—
মরুভূমি এ ভারত দীর্ণ, মূঢ় মরীচিকা-মোহে!
ছত্র ধর, ছায়া কর, ছত্রপতি ওহে মহারাজ,
নিবারো এ রৌদ্র-অগ্নি, দাসত্বের দৈন্য-দুঃখ-বাজ;
ছায়া দাও, স্নেহ দাও, দাও মেঘ, জীবন-সলিল,
রক্ষা কর, কর ত্রাণ, মুছে দাও মরীচি' জটিল।
আনো আনো মেঘসম বক্ষে জল, বদনে অভয়,—
শ্মশানে জাগাও প্রাণ শুভময় হে শিব দুর্জ্জয়!
ছিন্ন কর এ সংশয়, এ সন্তাপ, বিকট শুষ্কতা,
দাসত্ব-দক্ষেরে দলি', করি' নাশ দানব দীনতা।
হস্তে শূল পাপনাশী, শিরে জল জগৎ-জীবন,
এস শিব হে শিবাজী, নিদাঘার্ত্ত ভারত-ভবন!
এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উন্মত্ত উল্লাসে,—
উড়ে যা'ক্, মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে;
তব তীব্র-আঁখিতলে ভস্ম হোক্ ভ্রূকুটি-নয়ন,
নত হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর পীড়ন;
ভগ্ন হোক্ তব বলে পাপ-ভিত্তি দৈত্যের প্রাসাদ;
তুলিয়া বিষাণ তব ফুকারো বিষম সিংহনাদ,—
সে নাদে গহ্বর-মাঝে লুকাক্ অন্যায়ী পাপকারী;
দক্ষ-সভা হোক্ নাশ শিবের হুঙ্কারে ভীতিহারী।
এস এস হে শিবাজী, দলিত হিন্দুর দীপ্ত আশা,
আর্য্যের গৌরবধ্বজাবাহক, শাসক পাপনাশা।

* *

স্বপ্ন সম চিত্তে আজ জাগে সেই পঞ্চনদ-তীর,
শ্বেতকান্তি দীর্ঘবপু খড়্গনাসা সেই আর্য্য বীর—
সেই মুষ্টিমেয় বীর শৌর্য্য-বীর্য্য-মহিমা-আধার
ভীম হস্তে ভিন্ন করি' লক্ষ শত্রু, পাহাড়, কান্তার,
গড়িলা ভারতবর্ষ—বিশ্বের প্রদেশ-মধ্যমণি—
সংযত শক্তির মাতা, তত্ত্বজ্ঞান প্রজ্ঞানের খনি,
উদ্ধত-অন্যায়-নাশী, ধর্ম্মবেদী, করুণা-বিকাশ,
নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্রী, দৈন্যজয়ী, মুখে নম্র হাস,
নির্ম্মল, প্রশান্ত, দান্ত, ক্ষমামূর্ত্তি, আনন্দ-নিলয়,—
অপূর্ব্ব ভারত জাগে আত্মজয়ী, করি' দিগ্বিজয়।
জিনি' জন জিনি' দেশ ধর্ম্মবার্ত্তা করিল ঘোষণ
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ দুই ধর্ম্মী কর্ম্মী কলুষ-নাশন;
ভীষ্ম সে আহবে ভীষ্ম, অন্যায়ে অধর্ম্মে পরাঙ্মুখ;
অর্জ্জুন অপার-বীর্য্য—সবজ্র প্রশান্ত জলমুক্।
এই শৌর্য্যে এই বীর্য্যে সংযমে কল্যাণে মহীয়ান,
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভিত্তি ভারত-সাম্রাজ্য প্রাণবান,—

এক হস্তে বীর্য্য-খড়্গ, অন্য করে অন্ন জীবপ্রাণ,
নয়নে করুণা-গঙ্গা, ললাটেতে ক্ষমা ও কল্যাণ ;—
এই ত ভারতবর্ষ অতুলা জননী মহীয়সী,
রামকৃষ্ণার্জ্জুনভীষ্ম-মহাবীর বলে বলীয়সী ;
দৃপ্ত দান্ত, ক্ষিপ্ত ক্ষান্ত, মুক্ত শান্ত ভারত স্বদেশ
রামার্জ্জুন-জন্মভূমি নিত্য সহে অপমান-ক্লেশ,—
নেহারি', হে আর্য্য বীর, ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
রিক্ত তবু পূর্ণ-চিত্ত, সঙ্গীহীন তবু শক্ত-প্রাণ,
জাগিলে অটল শৌর্য্যে, আত্মবলে সেনানী গড়িয়া,
আর্য্যের মহিমা-রশ্মি দিগ্বিদিকে দিলে বিস্তারিয়া।

* * *

হে শিবাজী, দুর্ব্বল অক্ষম ভীরু সবাকার সম
স্বপ্নে তুমি তৃপ্ত নও নেহারি' বিচিত্র অনুপম
মুক্ত ভারতের ছবি,—সত্য যাহা ছিল একদিন
সত্য তারে করিবারে বিমুক্ত উদ্দাম বাধাহীন,
পোষিলে দুর্জ্জয় আশা, করিলে সঙ্কল্প নিদারুণ,
ক্ষিপ্র খড়্গে রাহুমুক্ত করি' দিলে ভারত-অরুণ।
হিন্দুর ভারতবর্ষে হিন্দু করি' দিলে পুনর্ব্বার,
অহিন্দু অন্যায়ী জেতা পদনিম্নে কাঁদিল তোমার।
আর্য্য যারে জন্ম দিল, আর্য্য-রক্তে যে-ভূমি উর্ব্বর
সে পূত পবিত্র ভূমি অশুচি অন্যায়ে জরজর—
এ দারুণ অভিশাপ, এ অসহ্য দুর্ভাগ্যের ক্লেশ
তুমি শিব শূলপাণি বজ্রবেগে করিলে নিঃশেষ।
খণ্ড ভিন্ন পিষ্ট ছিন্ন পরিক্লান্ত ভারত বিরাট্
অখণ্ড করিতে এক-ছত্রতলে, সাধক সম্রাট্,
দুর্জ্জয় বাসনা তব আজ যেন স্বপনে মিলায়,
বেড়ে গেছে দাস-পাশ, আশা-শিখা নিবেছে বাত্যায় !
তবু তবু বড় ব্যথা, তবু এ দারুণ দুঃখ মাঝে
শুধু তব পানে চাই, তব মাঝে তবু আশা রাজে।
তোমার আরব্ধ কর্ম্ম, হে সম্রাট্, কে করে সাধন ?—
ভীত নত শত শত শক্তিহীন করিছে ক্রন্দন !
শূন্য হতে স্বর্গ হতে এ ক্রন্দনে পাবে নাকি ব্যথা,
আসিবে না পুনর্ব্বার লয়ে তেজ, লয়ে উদ্দামতা ?
এ প্রিয় ভারত তব, তব প্রিয় এই হিন্দু জাতি,
তুমি বিনা কে রক্ষিবে, হে হিন্দুর শেষ শৌর্য্যভাতি !
এস এস মহারাজ, ছত্রপতি এস হে সম্রাট্,
নাথহীন হিন্দু কাঁদে, কাঁদে তার সিংহাসনপাট।

এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উদ্দাম উল্লাসে,
উড়ে যাক্, মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে ;
তব তীব্র আঁখিতলে ভস্ম হোক্ ভ্রূকুটি নয়ন,
নম্র হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নর্ত্তন।

"কবি"

শ্রী হীরেন্দ্রকুমার বসু, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন

কবি অর্থে আমরা সাধারণতঃ বুঝি তাঁহাকে যিনি কবিতা লিখিয়া থাকেন অথবা যিনি কাব্যরসে মাতিয়া থাকেন অথচ তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কবি আমাদের আলোচ্য নহে।

পুরাকালে বঙ্গদেশে একপ্রকার সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। এইসমস্ত গীতকে কবি বলিত। গীতের ব্যবসায়ী অথবা লেখকদিগকে "কবিওয়ালা" বা "বাঁধনদার" বলিত। ইহার সৃষ্টি যে কত দিন পূর্ব্বে তাহার ইয়ত্তা হয় না। তবে মনে হয়, কালিয়দমন যাত্রার কিছু দিন পর হইতেই ইহার সৃষ্টি। পূর্ব্বে ইহারা নানা-রূপ কৃষ্ণলীলা অথবা উহার অঙ্গ বিশেষ, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিমায় গাহিয়া বেড়াইত। পরে দলাদলি হইতে আরম্ভ হইল ; একদল একরূপ গাহিলে অন্যদল তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিল ;

যে-সমস্ত ভাগবৎ-প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতের প্রচলন ছিল ক্রমে তাহার প্রবাহ মজিয়া আসিল। ব্যক্তিগত আক্রোশ কবির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিল।

কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-ঘটিত কালিয়দমন যাত্রার অঙ্গবিশেষের নাম "ঝুমুর"। পূর্ব্বে এই ঝুমুর শ্রুতি-মধুর সঙ্গীত ছিল। কোনরূপ সভায় বা আনন্দ-স্থলে যদি ঝুমুর পদ না গাওয়া হইত তবে সমস্তই বৃথা যাইত। যাত্রার বালকগণ একত্রে একস্বরে ঐ ঝুমুর গাহিত। কখন ইহার মধ্য দিয়া মান, কখন মাথুর, আবার কখনও বা কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি পালা গাহিত। সকলেই প্রাণ ভরিয়া সেই গীত শ্রবণ করিতেন; মনে হইত সে-সঙ্গীতের মধ্যে একটা বেশ মাদকতা আছে।

তৎকালীন ঝুমুর রচয়িতাগণের মধ্যে জনৈক প্রসিদ্ধ রচয়িতা পরমানন্দ অধিকারী কৃত একটি ঝুমুর পদ উদ্ধৃত হইল—

> ও যাঁর অঙ্গ বাঁকা, বচন বাঁকা, বাঁকা যুগল আঁখি।
> হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তাঁর শোন গো বিধুমুখী॥
> ও মন চুরি করে বাঁশীর স্বরে, ও তা জানে গো জগৎজনে।
> তাঁর সঙ্গে রাই প্রেম করেছে সে কি প্রেমের মরম জানে॥

এই ঝুমুরের পদ গাওয়া হইলে যাত্রার আরম্ভ। প্রকৃত পালায় সুর, তান ও লয় অতীব বিচিত্র ও মধুর। আদি ঝুমুরে উপলব্ধি করিবার বাস্তবিকই জিনিষ ছিল। এই ঝুমুর সে-সময় এত প্রচলিত ছিল যে, রাজ-সভা হইতে পথের ভিখারীরও মুখে পর্য্যন্ত এইসমস্ত মান, মাথুর, ও কলঙ্ক ভঞ্জন ইত্যাদির ভগ্নপদ শুনা যাইত। পরে এই ঝুমুরের অনুকরণ চলিল; ক্রমেই কবির পতন আরম্ভ হইল। তৎকালে দুইদল গঠিত হইয়া রেষারেষি করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করিল।

পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতে পৃথক্ ঝুমুরের দল সৃষ্ট হইল। তাহাতে খোলের স্থানে মাদল ব্যবহৃত হইত। তখন স্ত্রীপুরুষে একত্রে গান গাহিত; সখি-সংবাদ, বিরহ, খেউড় ইত্যাদি গীত গাহিয়া বেড়াইত। উচ্চশ্রেণীর সেই ঝুমুর-পদ বিকৃত হইয়া এক অদ্ভুত প্রশ্নোত্তরের গঠন হইল। নিম্নে তাহার একটি পদ উদ্ধৃত হইল :—

> "নন্দঘোষ বলে, ও কুতূহলে,
> আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমণ্ডলে।"
> উত্তর :— "কেঁদে যশোমতী কয়, নন্দ মহাশয়,
> কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে, বল কংসালয়?"

এইরূপ গীতের সহিত প্রাচীন পদের কোনই সাদৃশ্য নাই। ইহারই সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর গীত এইরূপ দৃষ্ট হয় :—

> "যদি চল্লি রে গোপাল রে তুই মথুরায়
> আয় আয় একবার করি কোলে।
> ও তুই কংস-যজ্ঞে যাবি, আমারে কাঁদাবি রে,
> একবার ডাক্ রে ডাক্ জন্মের মত মা বলে॥"

পূর্ব্বের সঙ্গীতের মধ্যে কবির কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইত, কিন্তু অনুকরণ হওয়ার পর হইতেই ইহার মাধুর্য্য যাইল। কোনরূপে মিল করাইয়া দেওয়াই যেন রীতি হইল।

পূর্ব্বের কবি গাওয়ার রীতিতে প্রথমে ভবানীবিষয় পরে সখিসংবাদ, তাহার পর বিরহ এবং সর্ব্বশেষে লহর ও খেউড় গাহিত। এই প্রতি বিষয় গানের কয়েকটি অঙ্গ ছিল। যথা :—মহড়া, চিতেন, অন্তরা, পরিচিতেন, ফুকো, ও পরিশেষে শেষ চিতেন। দুর্গা বা শ্যামাঙ্গী, শক্তির স্তোত্র এবং লীলাদি সম্পর্কীয় ভক্তিরস কি বীর-রসের গানের নাম "ভবানী-বিষয়" অথবা "ঠাকরুণ বিষয়"। কৃষ্ণলীলা বিষয় ব্রজবালা বা সখিদের উক্তিতে সখিসংবাদ বলা হইত। স্বামীহীনা বিরহিনী ললনাদিগের বিরহ-যাতনা-পূর্ণ গানকে বিরহ কহিত; বিরহ আবার পুরুষের হইয়া থাকে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, পরিহাস, ইত্যাদি ভাব-জনিত যত প্রকার সঙ্গীত আছে উহাদিগকে লহর এবং আদিরস-ঘটিত গীতাবলীকে খেউড় বলিত। খেউড় আবার দুই প্রকার। একপ্রকার খেউড় সাধারণ ভাবে, সরল উক্তিতে কথিত এবং আর একপ্রকার এতদূর অশ্লীল যে, পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া শুনিতে পারা যায় না। এমন কি একাকী বসিয়া শুনিয়া এতদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। প্রথমোক্তের নাম "সাদা-খেউড়" ও অপরটির নাম—"কাদা-খেউড়"। কিন্তু শেষোক্ত খেউড় বাঙ্গালার রাজাধিরাজেরাই বেশ উপভোগ করিতেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাটীতে শারদীয়-নবমীর দিনে বলির পর কাদা-খেউড়ের

সময় রাজা নিজে খেউড় রচনা করিয়া গাহিতেন। এবং কখনও কখনও ছড়া-কাটাকাটী, পরে ছোট রকম কাব্যিক তর্ক রচনা করিতেন, যথা :—

"কি হল ঠাকুর-ঝি, ইত্যাদি"—উত্তরের আশায় কেহ থাকিবেন না। কারণ উহা এতদূর অশ্লীল যে পূর্ব্বে কিরূপে যে তাহা রাজ-ভোগ্য ছিল তাহা আধুনিক ভারত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

বাঙ্গলা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকৃত কবিগণ বা কবিওয়ালা থাকার কোনই চিহ্ন বা উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ঝুমুর-গায়ক পরমানন্দ ইতিপূর্ব্বে ঝুমুর গাহিতেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত উক্ত সনের পর হইতে কেবলমাত্র হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘু ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রথম কবিওয়ালা বলা যাইতে পারে না। যদিও ইহার পূর্ব্বে বৈঠকে এইরূপ সঙ্গীত হইত, কিন্তু এইরূপ যাত্রা গাহিবার প্রথা ছিল না। কাজে-কাজেই রঘুকেই প্রথম কবিওয়ালা বলা যাইতে পারে।

বৈঠকে-সঙ্গীত সময় হইতে এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে, "এটা দাঁড়া কবির সুর"। দাঁড়া বলিয়া একটি স্থান আছে; এই স্থানবাসীদিগকে "দাঁড়া" বলিত। যাহা হউক, একমতে রঘু হইতেই দাঁড়া-কবির বা প্রকৃত কবির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। জনপ্রবাদ যে, রঘুর বাটী শালখিয়া; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, গুপ্তিপাড়া রঘুর জন্মস্থান। প্রকৃত রঘু যে কোন্ জাতির এবং কোথায় বাস ইহা নিশ্চয় রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ইহার সঠিক উত্তর দানে সমকক্ষ আর কয়েকজন কবিওয়ালা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—ইঁহাদের নাম "রাসুনরসিংহ" ও "লালুনন্দলাল"। ইঁহাদের মধ্যে রাসুনরসিংহের কবিতা বড়ই মধুর-ভাবপূর্ণ—এবং রূপক ও উপমাসংশ্লিষ্ট। উহার বিরহের একপদ উদ্ধৃত হইল।

(মহড়া) :—কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনেরি ব্যথা।
করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথায়,
আমি এসেছি বিরাগে, মনেরি রাগে, পিরীতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।
(চিতেন) :—আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধানে
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা।
(ওগো) কাজটা ত্যজিয়ে কহ বিবরিয়ে
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা॥

(অন্তরা) :—হায় কোন প্রেম লাগি প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী সে কেমন প্রেমে?
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে ভাগীরথি আনে ভারতভূমে॥
(পরি চিতেন) :—কোন্ প্রেমে হরি বধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী ক'রে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে কালিন্দির কূলে কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা।

প্রকৃতই এই সঙ্গীতের প্রতি পদের মধ্যেই বেশ একটা কবিত্ব আছে। এইসমস্ত কবি অনেক উচ্চশ্রেণীর; ইহার সঙ্গে আধুনিক কবির তুলনা হয় না। কবিওয়ালা রাসুনরসিংহের জন্মস্থান ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোন্দলপাড়া গ্রাম। ইনি—কায়স্থকুলোদ্ভব ভদ্রসন্তান। একাদশ শতাব্দীর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কবিওয়ালা লালুনন্দলাল ইহারই সমসাময়িক, কিন্তু এত মধুর ভাবে কবি রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিরহের একপদ উদ্ধৃত হইল :—

(মহড়া) :—"হল এ সুখলাভ পিরীতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে"।
(চিতেন) :—"হয়েছে না হ'বে, কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর,
শেষে এই হ'ল কাণ্ডারী পালাল, তরণী লাগিল ভাসিতে॥"

ইহার পর রঘুর শিষ্য হরুঠাকুরের সময়। সে-সময় হরুঠাকুরের ন্যায় কবিওয়ালা আর কেহ ছিলেন না। ইনি বাঙ্গলা ১১৪৫ বা ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। সখের দল করিয়া ইনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বোধ হয় অর্থকষ্টে বাধ্য হইয়া পেশাদারী দল করিয়াছিলেন। রাজ-দরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার রাজদরবারে তিনি বিশেষ সমাদর পাইতেন। তৎকালীন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মজলিশে হরুঠাকুরের বেশ যাওয়া-আসা ছিল। নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরও তাঁহাকে আদর যত্ন করিতেন। তজ্জন্য হরুঠাকুর এক সময় রাজ-সভ্যগণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের চোখে এভাব এড়ায় নাই। একদিন তিনি সভাসদ্গণকে বলিলেন, "গতরাত্রে পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে আমার মন-মধ্যে ভাবের উদয় হইয়াছে।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা সেই ভাবের একটি পুরাণপ্রসঙ্গ-ঘটিত কবিতা রচনা করিয়া দিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়।" রাজ-অধ্যাপকেরা কহিলেন, "তার আর আশ্চর্য্য কি? কি ভাব আজ্ঞা করুন।" রাজা কহিলেন, "বঁড়িশে বিঁধেছে যেন চাঁদ।" অধ্যাপক-গণ মুখামুখি চাহিলেন, লজ্জিত হইলেন, পরে প্রকাশ করিলেন, "আজ থাক্ কাল উচিৎ মত উত্তর পাইবেন।" রচনার ত একটা সময়ের দরকার। রাজা তাহাদের সমক্ষে হরুঠাকুরকে খবর দিলেন। প্রবাদ আছে যে—হরুঠাকুর তখন গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। সেই অবস্থাতেই আসিয়া রাজার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া একটি পুরাণোক্ত গীত রচনা করেন ও সভাসদ-সহ রাজা নবকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করাইয়া বহুমূল্য একটি পদক লাভ করেন। হরুঠাকুর-রচিত একটি বিরহ-পদ উদ্ধৃত হইল :—

* * *

মহড়া :—

চিতেন :—সুধীর ধার বহিছে, এই ঘোরতরা রজনী
এ সময় প্রাণ-সখিরে কোথায় গুণমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি।
ঐ ময়ুর ময়ুরী হরষিত হেরি চাতক-চাতকিনী॥
অন্তরা :—এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি, সেউতি সেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণ-নাথে গৃহে না দেখে,—
বিদ্যুৎ, খদ্যোত, দিবা-জ্যোতিঃ মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয়া-মুখে মুখ দিয়া সারি শুক থাকে দিবস-রজনী—"

হরেকৃষ্ণঠাকুরের শেষ অবস্থায় নিলু, রামপ্রসাদ, রামবসু, উদয় দাস, পরাণ দাস, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, নিতাই দাস, ভবানী বেণে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, কাশীনাথ পাটনী, তৎপুত্র নিলুহরি পাটনী, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, বলরাম কাপালী এবং এণ্টনী সাহেব ও তৎভ্রাতা কালুসাহেবের কবির দল হয়।

নিলু ও রামপ্রসাদের দলই সমগ্র দলের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী। ইহার পর অন্যান্য দল গঠিত হয়। কিন্তু কে বড় কে ছোট তাহার সঠিক বিচার করা যায় না। ইহার কিছুদিন পরে গোবিন্দ আরজবিনি, উদ্ধবদাস, নিতাই দাসের পুত্র, তাহার পুত্র কৃষ্ণদাস এবং সর্ব্বশেষে পরাণসিংহ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা নিজেরাই যে কবি-ওয়ালা ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; অর্থাৎ তাঁহারা কবি রচনা করিতেন না। এণ্টনি সাহেবের দলে গোরক্ষনাথ ঠাকুর বাঁধনদার ছিলেন। নিলু পাটনীর দলে "কুকুরমুখো গোরা" কবিওয়ালা ছিলেন। কাজে-কাজেই দৃষ্ট হয় যে, দলের নেতারাই পূর্ব্বের মত বাঁধনদার ছিলেন না। মহড়া-দার বা বাঁধনদার অন্য ব্যক্তিও ছিলেন। বাঁধনদারগণের মধ্যে যে সকলেই শিক্ষিত বা ভদ্রঘরের সন্তান হইতেন এমন নহে। অনেকে অশিক্ষিত এবং নীচঘরের সন্তান হইয়াও, এমন-কি উচ্চারণে অপটু হইয়াও এমন ভাবপূর্ণ রসজ্ঞ ও উপমা-সংশ্লিষ্ট কবি রচনা করিতেন, যে, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তৎকালীন কবিওয়ালাগণ কেবল যে উচ্চভাবযুক্ত কবিরচনায় নিপুণ ছিলেন, এমন নহে। তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা খেউড় রচনা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রবাদ আছে যে—একবার নিতাই দাস নীলু পাটনীকে দাঁড়-বাওয়া পাটনী বলিয়া শ্লেষ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন :—

"তোর জাত খুঁজে রাত কাবার হ'ল ডুব দিয়ে পেলাম না থৈ,
নিজের আদ্যি কি ভেবে দেখ্ রে বৈরাগী নিতাই।
ছেড়ে ক্ষীর ননী
সেই যশোদামণি
যত বৈষ্ণবী পার কর্ব্বে বলে দণ্ড ধরে আছে ভাই" ইত্যাদি—

পর্য্যায়ক্রমে যদি কবিওয়ালাদিগের নিজের নিজের কবিত্ব-শক্তির তালিকা করা যায় তাহা হইলে হরুঠাকুরের পরই রামবসুর উল্লেখ করা উচিত। রামচন্দ্র বসু গঙ্গার পরপারে শালিখা গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে জন্মকবি বলিলে অন্যায় হয় না। জোড়াসাঁকো-নিবাসী ৺বারাণসী ঘোষের বাটীতে তাঁহার পিতাঠাকুর কার্য্য করিতেন। সেইস্থানে থাকিয়া তিনি বিদ্যারম্ভ করেন। এই সময় তিনি কলাপাতায় কবিতা লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন। ভবানী বেণে তাঁহার এই অদ্ভুত রচনা-শক্তি দেখিয়া লুব্ধচিত্তে তাঁহার কাছে আগমন করিতেন এবং গোপনে ত্যক্ত কলাপাতা সংগ্রহ করিতেন। রামবসু ইংরেজী ভাষা অতি অল্পই শিক্ষা করেন। ফলে দিন কয়েক কেরাণীগিরী করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত রচনা-শক্তির প্রভাবে তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না। শেষে তিনি চাকুরীর ইস্তফা দেন। কেবল কবিতা রচনা করিতেন

এবং তাহা অপরকে দান করিতেন ; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লইতেন না। পরে প্রয়োজনবশতঃ অর্থ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমে ভবানী বেণেই ইঁহার রচিত "কবি" লইয়া গাহিয়া বেড়াইত। পরে নিলুঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, ইহারাও রামবসুর কবিতা লইয়া নিজের নিজের পরিপুষ্টি-সাধনে ব্যস্ত হন। অবশেষে রামবসু আর অন্য কাহাকেও গান জোগান দিতেন না। নিজেই দল খুলিয়াছিলেন। পরে বাঙ্গালায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি-লাভও করেন। বাঙ্গালা ১২৩৩ সালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহার বয়স তখন ৪২ বৎসর ছিল। মুর্শিদাবাদে কাশীমবাজার-রাজ হরিনাথ কুমার বাহাদুরের বাটীতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ইনি শেষ গান করেন। রামবসুর কবিত্ব ও ভাব অসাধারণ ও তৎকালীন অদ্বিতীয়। লহর রচনায়ও তিনি অতুলনীয়। নীলুঠাকুরের দলে যখন রামপ্রসাদ ঠাকুর নিলু বিহনে মহড়দার হন তখন রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে রামবসুকে শ্লেষ করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

"নাইকো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরষ,
এখন দল করে হয়েছেন রামবোস্‌······ইত্যাদি"

তৎপরে সেই স্থানেই রচনা করিয়া রামবসু উত্তর দিয়াছিলেন —

(মহড়া) :—"তেমনি এই নিলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি দিন।
চিতেন :— যেমন রাত-ভিখারীর ধামা বওয়া থাকে একজন,
হরিনাম বলে না মুখে—পিছু থেকে চাল কুড়াতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
নন্ কাজের কাজি·········
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্ম্মা।
যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন।" ইত্যাদি

এই শ্লেষপূর্ণ ব্যঙ্গে রামপ্রসাদ লজ্জিত হইয়া সভা পরিত্যাগ করেন। এইরূপ একবার বৃদ্ধ বয়সে হরুঠাকুরেরও হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে রামবসুকে শ্লেষ করায় তিনি তদুত্তরে হরুঠাকুরকে বলিয়াছিলেন :—

"ঠাকুর বাঁচবেন না বিস্তর দিন,
তাঁর চক্রে ধরেছে পোকা স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ। ইত্যাদি"

এতদ্দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, লহর ও খেউড় রচনায় রামবসুর বিশেষভাবে দখল ছিল। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে কতকগুলি ভদ্র-সন্তান একত্রে মিলিত হইয়া আধুনিক যাত্রার ঢঙ্গে 'নলদময়ন্তী" যাত্রা করিয়াছিল (বঙ্গদেশে সখের যাত্রা এই প্রথম)। রামবসু এই দলের সমস্ত গানের সুর দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার সুর-লয়ের বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রামবসুর সমসাময়িক আর-একজন কবিওয়ালা বাঙ্গালার প্রতি প্রাণীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া এই "কবি-জগতে" প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইনি একজন আহেলে বিলাতী পর্ত্তুগীজ সাহেব। তাঁহারা দুই ভ্রাতা। বড় মিষ্টার এণ্টনী ও ছোট মিষ্টার কেলী। এখানে আসিয়া অবধি তাঁহারা আণ্টনি ও কালু সাহেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহারা এস্থানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এণ্টনী সাহেব এক ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েন। পরে তাঁহাকে লইয়া গিরিটীর নিকট বাগান-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কাল যাপন করেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা সুশিক্ষিতা ছিলেন। সাহেব ইঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালা শিখিয়া একপ্রকার বাঙ্গালীই হইয়া যান। তাঁহার পত্নী দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা প্রভৃতি সমস্ত ব্রতই সমাপন করিতেন। একবার দোল উপলক্ষে এণ্টনী সাহেব এই "কবি" গীত শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎপর হইতেই তাঁহার ঐদিকে আসক্তি জন্মিল। সাহেব বাণিজ্য ত্যাগ করিল, সখের দল খুলিল। পরে অবস্থা খারাপ হওয়ায় পেশাদারীতে পরিবর্ত্তিত হইল। গোরক্ষনাথ তাঁহার দলের বাঁধনদার ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সাহেবও ২।১ পদ বাঁধিতে সমর্থ হয়েন। ঠাকুরদাস সিংহ এক সময়ে সাহেবকে বলেন :—

"কহ হে আণ্টুনি আমি এইটে শুনতে চাই,
এসে এ দেশে, এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি টুপি নাই।"

ইহাতে সাহেব স্বয়ং রচনা করিয়া উত্তর দিলেন :—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিংহির বাপের জামাই, কুর্ত্তা টুপি ছেড়েছি।

একবার রামবসু তাঁহার এক লহরে সাহেবকে বলেন :—

"সাহেব! মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
ও তোর পাদ্রীসাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণ-কালি।"

ইহাতে সাহেব সোৎসাহে গাহেন :—

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা ত শুনি নাই॥"
আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার মানব-জনম সফল হবে, যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

একবার চুঁচড়ায় কোনো ভদ্র মহোদয়ের বাটীতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে সাহেবের দলের 'গাওনা' হয়। গোরক্ষনাথ সাহেবকে বলিল "তুমি যদি সমবৎসরের বেতন শোধ করিয়া না দাও তবে আমি তোমাকে নূতন সপ্তমী দিব না।" সভায় এইরূপ বলায় সাহেব লজ্জিত হইয়া নিজেই গান রচনা করিয়া গাহিল :—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা নিজেতো ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিব-মাতঙ্গী॥"

সাহেব হইলেও তাঁহার রচনায় বেশ মাধুর্য্য ছিল। এক এক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, তিনি যেরূপ ভাবপূর্ণ কবি রচনা করিয়াছেন সেইরূপ কবিতা আমাদের বঙ্গে তৎকালীন সাধারণ কবিগণ রচনায় অসমর্থ।

ইহার অনেক পরে বইচিগ্রামে সাতুরায় নামে এক কবি আবির্ভূত হয়েন। তৎকালীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ইনি শেষ কবি বলিলেই চলে। সাতুরায় যদিও জন্ম-কবি ছিলেন, কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন চাকরী করিতেন। শেষ অবস্থায় তিনি রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদিগের তরফে বারাসতে মোক্তারী করিতেন। সেই কর্ম্ম করিতে-করিতেই তাঁহার জীবন শেষ হয়। তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া শান্তিপুরের জমিদারেরা তাঁহাকে আদর ও যত্ন সহকারে আপনাদের নিকট রাখেন।

তিনি শিবচন্দ্র বসুর সখের দলের গীত রচনা করিতেন। ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত হইল :—

ইহাতে সখি বলিতেছেন, রাই সেই কাল হেন গুণ-নিধির পাদপদ্ম আঁকিলেন না কেন? উত্তরে বলিতেছেন—

"নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়
শ্রীমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি শ্রীপদহীন লিখে শ্রীমতী কেঁদে কয়
শোনগো তারাচরণের আচরণ, লয়ে গেল শ্যামে কংসালয়
আনলে না নন্দালয়, সইগো, রইল দুরাশায় নিঠুর হয়ে মথুরায়।"

পূর্ব্বের কবিওয়ালাদিগের ন্যায় কবি-রচনায় পটু আধুনিক কবি আর দেখা যায় না। আধুনিক কবি উঠিয়া গিয়াছে, তবে তারই প্রকারান্তর তর্জ্জা আছে। কবির সহিত ইহার তুলনা হয় না। কোনো রকমে মিল করিয়া দেওয়াই আধুনিক রীতি। যথা :—

"বিহারী-বাবু—করি নিবেদন
আপনার পুত্র হ'ল প্রাণধন।" ইত্যাদি

চলার পথে

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

এই জীবনের চলার পথে,
ভগবান,
জলস্রোতের মতন কর'
আমায় খরবেগবান।
হোক্‌না ঘোলা, থাক্‌না মলা,
দাও আমারে স্রোতের চলা;
দাও আমারে কলভাষা—
দাও আমারে চলপ্রাণ।
মোর বাসনার ব্যাকুলতা
করুক্ মোরে বলবান!

জড়িয়ে যেন না যাই জটিল
জঞ্জালে,—
বাজিয়ে চলি, নাচিয়ে চলি
মরণকে চরণ-তালে।
গতি-রাগের গীতির মতই
চল্‌ব ধেয়ে অথির স্বতই;
তট হ'য়ে দাও সাথে সাথে
তোমার শুভ সঙ্গ দান—
এই জীবনের চলার পথে,
ভগবান!

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্‌

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুদূতের বাণী

ডেভিড্‌ হল্‌মের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। সে বাহুতে ভর দিয়া অবাক্‌ বিস্ময়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। রাস্তার আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দশমীর খণ্ড চাঁদের ম্লানরশ্মিতে অন্ধকার অনেকখানি দূর হইয়াছে। ডেভিড্‌ অবিলম্বে বুঝিতে পারিল যে, সে তখনও গীর্জ্জা-সন্নিহিত ঝোপের মধ্যে পড়িয়া, নীচে শিশিরসিক্ত দগ্ধ তৃণদল, ঊর্দ্ধে ঘন-সন্নিবিষ্ট লেবুশাখার নিবিড় অন্ধকার।

ডেভিড্‌ কিছু ভাবিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করিল না, বহুকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল, সমস্ত শরীর হিমে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে। তবু কোন প্রকারে ভূমিশয়ন হইতে আপনাকে উত্তোলন করিয়া ডেভিড্‌ গীর্জ্জার ভিতরের পথ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দু'পা চলিতেই তাহার এমন অবস্থা হইল যে, কোনপ্রকারে একটি বৃক্ষকাণ্ড আশ্রয় করিয়া সে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডেভিডের মনে হইল, তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, বুঝি যথাসময়ে সে গৃহে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার পর হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যে-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যে-সমস্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে তাহার কোনোটি অলীক কল্পনা বা মিথ্যাস্বপ্ন বলিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারিল না—সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ সত্যবৎ তাহার অন্তরে স্পষ্ট হইয়া আছে।

ডেভিড্‌ মনে মনে বলিল, "মৃত্যুদূত আমার বাড়ীতে অপেক্ষা করছে,—দেরী করলে চলবে না!"

গাছের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু দারুণ দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

গভীর হতাশায় পীড়িত হইয়া ডেভিড্‌ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, হায় হায়!—বাড়ীতে যথাসময়ে সে বুঝি পৌঁছিতে পারিল না! এই চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে ডেভিড্‌ চকিতে অনুভব করিল কি যেন তাহার ললাট স্পর্শ করিল। ঠিক যে কি ডেভিড তাহা স্পষ্ট বুঝিল না; সম্ভবতঃ কাহারো হস্ত, কিম্বা ওষ্ঠ অথবা বসনাঞ্চলের স্পর্শ মাত্র হইবে; সে যাহাই হউক ডেভিডের অন্তরাত্মা অসহ্য পুলকে কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে ডেভিড্‌ বলিয়া উঠিল—"সে ফিরে এসেছে, আমার কাছে থেকে আমায় রক্ষা করছে।" সে বিমুগ্ধচিত্তে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যেন তাহার প্রেমাস্পদের নিবিড় প্রেম অনুভব করিল। তাহার হৃদয় এই ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল যে, এই দুঃখবেদনা-পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঞ্ছিতার প্রেম তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে।

সেই শান্ত রজনীতে জনমানবহীন পথে সহসা সে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। ডেভিড্‌ চকিত হইয়া দেখিল, মুক্তিফৌজের টুপি-পরিহিত কোনো রমণীমূর্ত্তি সেই পথে আসিতেছে। সেই মূর্ত্তি তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ডেভিড্‌ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল,—"সিস্‌টার্‌ মেরী—আমাকে একটু সাহায্য করুন না।"

ডেভিডের স্বর সিস্‌টার্‌ মেরীর পরিচিত; তিনি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিতে লাগিলেন।

ডেভিড্‌ আবার বলিল, "সিস্‌টার্‌ মেরী, আমি মাতাল হইনি, আপনার ভয় নেই, আমি ভারী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি—দয়া ক'রে আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিন্‌ না!"

ডেভিডের কথা সিস্‌টার্‌ মেরী বিশ্বাস করিলেন বলিয়া

বোধ হইল না ; তবুও তিনি নীরবে ডেভিডের নিকটে আসিয়া মাটি হইতে তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিলেন ও তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

আবার ডেভিড্ তাহার গৃহ অভিমুখে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার গতি কি মন্থর! কে জানে, হয়ত এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গেল! এই চিন্তা মনে উদিত হইতেই ডেভিড্ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "সিস্টার্ মেরী,—আমার ওপর একটু দয়া করুন। আপনি একলাই আমার বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে যদি বলেন——"

সিস্টার্ মেরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তুমি মাতাল হ'য়ে এর পূর্ব্বে বহুবার বাড়ী ফিরেছ, তার ত এসব গা-সহা হ'য়ে গেছে।"

ডেভিড্ কথা বলিল না, দন্তদ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া সে চলিতে লাগিল ; গতি বৃদ্ধি করার ব্যর্থ প্রয়াসে সে হাঁপাইয়া উঠিল ; শীতে আড়ষ্ট তাহার দেহ আর চলিতে চায় না!

কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার মনের ভিতর নানা ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। সিস্টার্ মেরীকে একটু দ্রুত তাহার গৃহে না পাঠাইলে চলিবে না। ডেভিড্ বলিল, "সিস্টার্ মেরী, আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌লাম, সিস্টার্ ঈডিথ্ এই নশ্বরদেহ ছেড়ে চ'লে গেলেন—আমি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়েছিলাম, আমার স্ত্রী ও ছেলেদের আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার স্ত্রী আজ প্রকৃতিস্থ নেই। সিস্টার্ মেরী, আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি না যান সে হয়ত নিজের অনিষ্ট করবে।"

বহু কষ্টে ধীরে ধীরে সে কথাগুলি বলিল। সিস্টার্ মেরী কোনো উত্তর দিলেন না—তাঁহার তখনো ধারণা ছিল যে, তিনি এক মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছেন। তবু তিনি তাহাকে সাহায্য করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। ডেভিড্ আর অনুরোধ করিল না ; সে বুঝিতে পারিল, আজ যে সিস্টার্ মেরী তাহাকে সাহায্য করিতেছেন তাহাতেই হয়ত তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কারণ তিনি ত তাহাকেই সিস্টার্ ঈডিথের মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানেন!

হোঁচট খাইয়া চলিতে-চলিতে এক নূতন ভাবনা ভাবিয়া ডেভিড শিহরিয়া উঠিল—সত্যই ত, বাড়ীতে স্ত্রীই বা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কেন? সেও ত ভাবিবে আমি মাতাল হইয়া ফিরিয়াছি—সিস্টার্ মেরীকে কোনো—

বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া তাঁহারা থামিলেন। সিস্টার্ মেরী ফটক খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আশা করি, এখন তুমি নিজে যেতে পার্‌বে।" বলিয়াই তিনি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

ডেভিড্ ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সিস্টার্ মেরী, আর-একটু দয়া করুন। আমার স্ত্রীকে একটা হাঁক দিয়ে বলুন—আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে।"

সিস্টার্ মেরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রূঢ়-ভাবে বলিলেন, "ডেভিড্ হল্‌ম্, অন্য কোনো দিন হয় ত তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্‌তে পার্‌তাম—কিন্তু আজ রাত্রে তোমাকে সাহায্য করার কথা ভাব্‌তেই আমার মন তেঁতো হ'য়ে উঠ্‌ছে। আজকে আর কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই।"

কান্নায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; তিনি দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া বহুকষ্টে উঠিতে-উঠিতে ডেভিড্ ভাবিল—বৃথা এই চেষ্টা। অনেক বিলম্ব হইয়া গেছে, তা ছাড়া সে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কেন? হতাশ হইয়া সিঁড়ির উপরেই বসিতে গিয়া ডেভিড্ আবার চমকিয়া উঠিল—সেই সুশীতল কোমল স্পর্শ তাহাকে সঞ্জীবিত করিল, তাহার ঈপ্সিতার প্রেমসান্নিধ্য অনুভব করিয়া সে যেন বল পাইল ও অবশেষে সিঁড়ির শেষ ধাপে উপস্থিত হইয়া দরজা খুলিল।

ঠিক সম্মুখে তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া, তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দিবার জন্য দরজায় খিল দিতে আসিয়াছিল। যখন দেখিল আর উপায় নাই, ডেভিড্ ঘরে ঢুকিয়াছে, তখন সে উনানের ধারে গিয়া ডেভিডের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন কিছু লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

ডেভিড্ ভাবিল, "যাক্—ও এখনও সর্ব্বনাশ করেনি—আমি খুব সময়ে এসে পড়েছি।" সহসা তাহার ছেলেদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাদিগকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যুদূত যেখানে দণ্ডায়মান ছিল জর্জ্জ সেদিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া অনুভব করিল, যেন জর্জ্জ তাহার হাতে হাত দিয়া চাপ দিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, 'ধন্যবাদ জর্জ্জ'—তাহার গলা কাঁপিয়া উঠিল, অশ্রুতে তাহার চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল।

কোনো রকমে টলিতে-টলিতে সে ঘরের মাঝখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল—যেন কোনো হিংস্র পশু ঘরে ঢুকিয়াছে—এখনই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

ডেভিড ব্যথিত হইয়া ভাবিল, "হায় রে—এও ভাব্‌ছে আমি মাতাল হ'য়ে এসেছি।"

আবার এক হতাশার ভাব তাহার চিত্তকে অধিকার করিল। ডেভিড্ অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল—তাহার বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘরের মধ্যে শয্যা প্রস্তুত ছিল, তবু সে ভরসা করিয়া শুইতে পারিল না। কে জানে, সেই অবসরে তাহার স্ত্রী তাহার সাংঘাতিক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবে কি না! জাগিয়া থাকিয়া তাহার দিকে নজর রাখিতে হইবে।

ডেভিড্ বলিল, "সিস্‌টার্ ঈডিথ্ আজ মারা গেছেন; আমি এতক্ষণ তাঁর কাছেই ছিলাম। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তোমার ও ছেলেদের আর কোনো কষ্ট দেব না। কালই তুমি ওদের আশ্রমে পাঠিয়ে দিও।"

তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "কেন মিথ্যে বল্‌ছ, ডেভিড্? গুস্তাভ্‌সন্ এসে ক্যাপ্টেন্ এণ্ডারসন্‌কে—সিস্‌টার্ ঈডিথের মরার খবর দিয়ে গেল। সে ত বল্লে, তুমি সেখানে যাওনি।"

ডেভিড আর সহ্য করিতে পারিল না—উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে নিজেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইল। সে বুঝিতে পারিল, যে ভাবের রাজ্যে সে এতক্ষণ বিচরণ করিতেছিল তাহা মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত। সেখানকার কথা এখানে বলা বৃথা! সেই মৃত্যুলোকের চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিল। সে যে আপনার দুষ্কর্ম্মরচিত এই দুর্ভেদ্য আবরণ হইতে আর বাহির হইতে পারিবে না এই ধারণা তাহাকে অবশ করিয়া দিল; যে অশরীরী আত্মা তাহার মাথার উপরে থাকিয়া তাহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছিল তাহার সহিত মিলিত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সহজে পরিতৃপ্ত হইবে না—এই চিন্তায় তাহার অশ্রু বাধা মানিল না।

ব্যথিত ডেভিড তাহার স্ত্রীর স্বরে চমকিয়া উঠিল। গভীর বিস্ময়ে সে আপনার মনেই বলিতেছিল, "ডেভিড্ কাঁদ্‌ছে!—আশ্চর্য্য, ডেভিড্ কাঁদ্‌ছে!" চিন্তাক্লিষ্ট মনে সে ডেভিডের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডেভিড্, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

ডেভিড্ অশ্রুসজল মুখখানি তুলিয়া আপনার অন্তরের গভীর বেদনা চাপিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল, "আমি ভাল হ'ব,—আমার জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ব—কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না—কান্না ছাড়া এখন আমার কি গতি আছে?"

সংশয়ব্যাকুলভাবে স্ত্রী বলিল, "কিন্তু ডেভিড্, তোমার কথা বিশ্বাস করা যে কঠিন। তবু, তোমার কান্না দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে—আর কোনো ভয় আমার নেই।"

তাহার এই নূতন বিশ্বাসের প্রমাণ দিবার জন্যই যেন সে ডেভিডের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাহার জানুর উপর আপনার মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল

ডেভিড্ ব্যথিত হইয়া বলিল—"তুমিও কাঁদ্‌ছ?"

"ডেভিড্, আমি যে কান্না চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আমাদের দু'জনের চোখের জলে আজ সকল দুঃখ ধুয়ে যাক্।"

সেই শুভমুহূর্ত্তে ডেভিড্ সহসা অনুভব করিল তাহার শীতল ললাটে কাহার যেন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতেছে। তাহার কান্না রুদ্ধ হইল। এক অলৌকিক আনন্দোচ্ছ্বাস তাহার অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত করিতে লাগিল।—

মৃত্যুদূতের কৃপায় এই রজনীতে সে যে-সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা তাহার স্মরণ হইল। সে তাহার

প্রথম কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছে—এখন তাহার ভাইয়ের শেষ অনুরোধটি পালন করিতে হইবে—সেই রুগ্ন বালকটিকে সাহায্য করিতে হইবে। সিস্টার্ মেরী প্রভৃতিকে দেখাইতে হইবে যে, সিস্টার্ ঈডিথ্ অপাত্রে তাহার প্রেম ন্যস্ত করেন নাই; নিজের গৃহকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া এবং মানব-সমাজের কাছে মৃত্যুদূতের বাণী প্রচার করিয়া তাহার সকল কর্ত্তব্য সমাপনান্তে সে তাহার বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

ডেভিড্ বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল—একমুহূর্ত্তে যেন তাহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে; যেন সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ধৈর্য্যের সীমা নাই—পৃথিবীতে কোনো কিছুকে মানিতে তাহার বাধিবে না। তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন বিলুপ্ত হইয়াছে।

শীর্ণ হাত দু'টি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ডেভিড্ মৃত্যুদূতের প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করিল—

"হে ঈশ্বর, আমার জীবন মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার আত্মা পরিণতি লাভ করে।"

[সমাপ্ত]

অনুবাদক—শ্রী সজনীকান্ত দাস

হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার

গত ১৯শে কার্ত্তিক (১৩৩৩) কাশীধামে "আর্য্য সম্মিলনের" একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। সভায় বাঙ্গলাদেশের ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। জনৈক নব্য পণ্ডিত হিন্দু জাতির বর্ত্তমান জীবন-মরণ-সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, হিন্দুর সম্মুখে আজ মহাসঙ্কট উপস্থিত; বাহিরের প্রবল আঘাত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় তাহাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতেছে; অন্য দিকে হিন্দুসমাজ 'সনাতন' ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সদাচারের জীর্ণ দুর্গ মধ্যে কোন মতে আত্মরক্ষা করিবার বিফলপ্রয়াস করিতেছে। এ অবস্থায় হিন্দুসমাজের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য?—সে সেই পুরাতন শাস্ত্র ও লোকাচার প্রভৃতিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া কাল-সাগরের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে, অথবা আত্মরক্ষার জন্য যুগোপযোগী নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

পণ্ডিতেরা সকলে মিলিয়া স্বনামধন্য প্রবীণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের উপর এই জটিল সমস্যা মীমাংসার ভার দেন। তর্কভূষণ মহাশয় উত্তরে বলেন—

> "হিন্দুধর্ম্মের দুই দিক্, ইহকাল ও পরকাল। বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে গেলে হিন্দুসমাজের পরকালে—বিশেষ মোক্ষ-লাভে কতকগুলি বাধা উপস্থিত হয়; সুতরাং এইসকল সমস্যার সমাধানে আমরা অসমর্থ। আমার মনে হয় যে, জাতির এ সমস্যার সমাধান হইবে না; অতএব যে-প্রকারে হয়, নিজকে সকলের বাঁচাইয়া চলা কর্ত্তব্য।"

সভাপতি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও এই কথার সমর্থন করেন। বিশেষ ভাবে অনুন্নত হিন্দুদের অধিকার প্রদানের সমস্যার দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন—

> "শাস্ত্রের মধ্য দিয়া অনুন্নতদিগকে অধিকার দিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে এবং অনুন্নতেরাও তৃপ্ত হইবে না; পরে আরও অধিকার চাহিবে। ফলের মধ্যে সদাচারের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সদাচার একটা আদরের বস্তু। হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি জানি না, কিন্তু এরূপ করিলে আমরা সদাচার হারাইয়া ফেলিব, আর ফিরিয়া পাইব না।"

আমরা এই সভার কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিলাম। কেননা, হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মস্থান কাশীধামে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং ভারত-বিখ্যাত অনেক পণ্ডিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পণ্ডিত

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এবং মীমাংসাকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় উভয়েই বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ-সভার অভিমতের খুবই গুরুত্ব আছে। এক হিসাবে এই অভিমতকে আমরা সনাতন রক্ষণশীল সমাজের অভিমত বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি।

বিংশ শতাব্দীর জটিল সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এবং তাঁহাদের মুখপাত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—আমরা এ সমস্যা সমাধানে অক্ষম! একদিকে হিন্দুর 'সনাতন' ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও সদাচার, অন্যদিকে হিন্দুজাতির—হিন্দু সমাজের জীবন-মরণ সমস্যা। আমরা কি আজ প্রাচীন শাস্ত্র ও সদাচারকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া মরণকে বরণ করিয়া লইব, অথবা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাস্ত্র ও আচারের পরিবর্ত্তন সাধন করিব? পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—আমরা শাস্ত্র ও সদাচারকে কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না, কেননা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম, পরকাল ও মোক্ষ তাহার সঙ্গে জড়িত; বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যার সমাধান করিতে গেলে সেই পরকাল ও মোক্ষের পথে বাধা উপস্থিত হয়। অতএব এই জটিল সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, উপায় নাই।

এই নৈরাশ্যের বাণী, মরণ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া অক্ষমের এই কাতরোক্তি, ইহাই কি হিন্দুজাতির শেষ কথা? ইহাকেই মানিয়া লইয়া আমরা কি "হারিকিরি" করিবার জন্য প্রস্তুত হইব? জীবতত্ত্বে বলে, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের যে ক্ষমতা, তাহাই জীবনের লক্ষণ। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও জীবন আছে। যে-সমাজ জীবন্ত, সে যুগেযুগে পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে, শাস্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া নেয়। আর যে-সমাজ জড়ধর্ম্মী, যাহার জীবনের উৎস শুকাইয়া আসিয়াছে, সেই ধর্ম্মের নামে—শাস্ত্র ও সদাচারের দোহাই দিয়া মান্ধাতার আমলের বিধিব্যবস্থা প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া থাকে এবং বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে প্রাচীনকালে যে-সব সভ্যজাতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা অনেকে আজ কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেননা তাহারা 'যুগশক্তির' সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে পারে নাই। আর এই বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যে এখনও টিকিয়া আছে, তাহার একমাত্র কারণ, সে জীবন-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যুগে যুগে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

'ধর্ম্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থও তাহাই—যাহা ধারণ করে। ধর্ম্মশাস্ত্র, সদাচার, লোকাচার এসমস্ত কখনই সনাতন বা অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না। প্রমাণ, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস। বৈদিকযুগের গৃহ্যসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্র পর্য্যন্ত তুলনায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সমাজ-ব্যবস্থা একস্থানে 'অচলায়তন' হইয়া বসিয়া থাকে নাই, সেগুলি যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজে—যখন আর্য্য-অনার্য্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই আর্য্যেরা বাহ্যপারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে শিখিয়াছিল, নহিলে সংখ্যায় অল্প তাঁহারা লুপ্ত হইয়া যাইতেন। অনার্য্যকেও সমাজে শূদ্ররূপে গ্রহণ করা, অনার্য্যোচিত বহু আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম বেমালুম সমাজের সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া, এসমস্ত তাহারই সাক্ষ্য।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষ সম্পূর্ণ মিটে নাই। তবু সীমান্তের বহু পার্ব্বত্য জাতি—ভারতের বাহির হইতে আগত শক-হুণ প্রভৃতি জাতিও আর্য্য-সমাজে স্থান পাইয়াছে, এমন-কি ক্ষত্রিয় বলিয়াও গণ্য হইয়াছে। অনার্য্যের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা, বিশেষতঃ দ্রবিড় সভ্যতা আর্য্যদের উপর বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আর্য্যেরা অনার্য্যদের অনেক প্রথা অনেক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর আসিল বৌদ্ধ প্লাবন। সামাজিক বৈষম্য, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আভিজাত্যগর্ব্ব ভঙ্গের জন্যই বুদ্ধদেবের সাম্যবাদের উৎপত্তি। সেই সাম্যবাদের প্লাবনে মৈত্রী করুণা

তিতিক্ষার অপূর্ব্ব মহিমায়, সমস্ত ভারতবর্ষ ভরিয়া গেল। হিন্দু ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সেই প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল পলায়ন করিয়া নহে, তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া, যথাসম্ভব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের পর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, এই সামঞ্জস্য স্থাপনের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এসময়ে কত বৌদ্ধ যে হিন্দু-সমাজের সঙ্গে ব্রাত্য হইয়া মিলিয়া গিয়াছিল, কত বৌদ্ধাচার যে প্রচ্ছন্ন ভাবে হিন্দুর "সদাচার ও লোকাচারে" রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। মনু প্রভৃতি আদি স্মৃতিকর্ত্তাগণ বৌদ্ধ বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষের উপরেই নূতন হিন্দু-সমাজ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া আসুর ও পৈশাচিক বিবাহ, কানীন, সহোঢ়জ, পুনর্ভব প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিধান,—স্মৃতিকারগণের দূরদর্শিতা ও মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

মুসলমান বিপ্লবের প্রথম আঘাতে হিন্দু-সমাজ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই সে কতকটা আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির আবির্ভাব তাহার প্রধান লক্ষণ এবং শেষ যুগের পরাশর, দেবল প্রভৃতি স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদিতেও তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যে রঘুনন্দনের নামে রক্ষণশীল সনাতন-পন্থীরা দোহাই দেন এবং নবীনেরা যাহাকে সমাজ-সংস্কারের প্রধান শত্রু বলিয়া ভাবেন, সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তবিধির প্রধান সঙ্কলনকর্ত্তা এবং শৈব বিবাহের ব্যবস্থাদাতা। ফলতঃ রঘুনন্দন মুসলমান-বিপ্লব হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেবল সনাতন অচলায়তনের পন্থাই প্রদর্শন করেন নাই, ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং যবনীদোষে কলুষিত হিন্দুকেও নির্ভীক চিত্তে সংস্কার করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হিন্দু সমাজ ও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন-শীলতা তথা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের ক্ষমতার কথা—বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার স্থান নাই; আমাদের জ্ঞানও অল্প। যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারা এইভাবে আলোচনা করেন, (অতীব দুঃখের বিষয়—সেরূপ চেষ্টা এপর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমারা জানি না) তবে অনেক রহস্য ব্যক্ত হইবে।

বৌদ্ধ বিপ্লব ও মুসলমান বিপ্লবে হিন্দু সমাজের সম্মুখে যে জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছিল, এই বিংশ-শতাব্দীতে বাহির হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে এবং ভিতর হইতে "নব্য-ইস্‌লাম জাগরণের" আবির্ভাবে সেইরূপ বা তদপেক্ষা জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এক ভিন্ন জাতি তাহার শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য লইয়া আমাদের মধ্যে আজ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কেবল আমাদের অতিথি নয়, রাজ-শক্তিও তাহাদের পশ্চাতে; শাসক ও শোষকরূপে আমাদের জীবনের সকল বিভাগের সঙ্গেই তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আর তাহাদের পশ্চাতে আসিয়াছে সমস্ত প্রতীচ্য-সভ্যতার বিরাট্ বাহিনী। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, তাহাদিগকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাদের সঙ্গে আমাদের লেনদেন করিতেই হইবে; তাহাদের শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জীবনের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিবেই। আমরা যদি গৃহ-কোণে দ্বার বন্ধ করিয়া এই অযাচিত অথিতিকে এড়াইতে চাই, তবে আমরা জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইব। ইহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়া নহে, ইহার সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়াই আমাদের বাঁচিতে হইবে।

অন্যদিকে তথাকথিত "নব্য-ইস্‌লাম জাগরণের" সমস্যাও আমাদিগকে কম বিচলিত করে নাই। আজ প্রায় এক হাজার বৎসর হইল ইস্‌লাম ধর্ম্ম এদেশে আসিয়াছে। পাঠান, তাতার, মোগল প্রভৃতি বহিরাগত ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী জাতিরা এদেশের রাজশক্তিকে যেমন হস্তগত করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সভ্যতার সঙ্গেও হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার সংঘর্ষ হইয়াছে। সে-সংঘর্ষে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ সর্ব্বত্র জয়ী হয় নাই; প্রমাণ, পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার বেশীর ভাগ অধিবাসীই আজ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও দৌর্ব্বল্য যে

ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। তবুও কয়েক শতাব্দী সংঘর্ষের পর হিন্দু সমাজ কতকটা আত্মস্থ হইয়াছিল, আত্মরক্ষার আট-ঘাট সে বাঁধিয়া লইয়াছিল। অপর পক্ষে মুসলমান সমাজও আততায়ীর ভাব অনেকটা ত্যাগ করিয়া হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবাসীর ন্যায় সদ্ভাবেই বাস করিতেছিল। ইদানীং অল্প কয়েক বৎসর হইল, প্যান-ইস্‌লাম আন্দোলন, তুর্কী জাগরণ,ইউরোপীয় যুদ্ধ এবং খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতির ফলে ভারতীয় মুসলমান-সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লুপ্তপ্রায় আততায়ীতার ভাব আবার হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, হিন্দুকে প্রতিবাসী না ভাবিয়া তাহারা 'কাফের' বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে ; হাজার বৎসর যে-দেশের জল-বায়ুতে পুষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া অকস্মাৎ 'জাজিরাৎ-উল্‌-আরব'কেই তাহারা মাতৃভূমি বলিয়া কল্পনা করিতেছে। ইহারই আনুষঙ্গিক ফল— ছলে-বলে-কৌশলে কাফের হিন্দুকে মুসলমান করিবার আগ্রহ এবং অসহায়া হিন্দু নারীকে 'নেকাহ্‌'-সূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রসার।

এইরূপ নানা সংঘর্ষের প্রভাবে এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যের ফলে, আমাদের সম্মুখে আজ বহু জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছে। এসমস্যা হিন্দু জাতি ও হিন্দু সমাজের জীবন-মরণ সমস্যা। আমরা যদি সেগুলির সমাধান করিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিব ; না পারি—লুপ্ত হইয়া যাইব। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামপূর্ণ জগতে দুর্ব্বল ও অক্ষমের স্থান নাই। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এই যুগের সর্ব্বপ্রধান সামাজিক সমস্যা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন। এ সমস্যা নূতন নহে, হিন্দু সমাজে প্রথম হইতেই এ সমস্যার উদয় হইয়াছিল এবং সে-যুগের সমাজপতি ও শাস্ত্রকারেরা ইহার মীমাংসার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আজ 'জাতিভেদে' পরিণত হইয়া হিন্দু সমাজের অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে, উহাই আর্য্যেতর অবনত জাতিকে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিল। হিন্দু সমাজ এই উপায়ে বহু অনুন্নতজাতিকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের মহান্‌ আদর্শ গ্রহণের সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু নানা বাধা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিরোধিতায় এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌ সফল হয় নাই।

জাতিভেদের কৃত্রিম প্রাচীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সমাজকে বহুধা বিভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই কৃত্রিম প্রাচীর অনেকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পৌরাণিক যুগের প্রতিক্রিয়ার মুখে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আবার প্রবল ভাব ধারণ করিল। তাই মুসলমান ধর্ম্ম যখন তাহার সামাজিক সাম্যবাদ লইয়া এদেশ আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, দলে দলে তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুন্নত হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য, মুসলমানদের রাজশক্তিও সে-পক্ষে কম সহায়তা করে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মে এই সমস্যা সমাধানের মহৎ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু গোঁড়া স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের বিরোধিতায়, তাহা সম্যক্‌ সফল হয় নাই। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সেই অস্পৃশ্যতার সমস্যা ভীষণ মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। এক দিকে মুসলমান ধর্ম্ম,অন্যদিকে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম,—উভয়েই হিন্দুসমাজের অনুন্নত জাতিদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা তাহাদিগকে সমাজে মানুষের মত যোগ্য স্থান দিয়া রাখিতে পারিতেছি না। গ্রহণ করিবার যে উদার শক্তি হিন্দুর সমাজ-বিকাশের মূল সূত্র, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজ যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুসমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতি, তাহারা আমাদের চক্ষে কুকুর-বিড়ালের চেয়েও অধম। ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতিরা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের মতই মনে করিতেছেন যে, ঐ সব 'অনুন্নত' জাতিদিগকে 'অধিকার' দিলে তাহারা মাথায় চড়িয়া বসিবে, সমাজের পবিত্রতা নষ্ট হইবে। এ দিকে যে নদীর ভাঙনে সবই ধসিয়া যাইতেছে, সে খেয়াল কাহারও নাই। যাহারা সুযোগ পাইতেছে, তাহারা ত বাহির হইয়া যাইতেছেই ; যাহারা সমাজে থাকিতেছে, তাহারাও বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। কাজেই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্য নাই, সংহতি নাই, মনের মিল

নাই,—সে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন এই বিষম সমস্যা সমাধানের সঙ্কল্প লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ যদি এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে, তবেই তাহার কল্যাণ হইবে। কেবল অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নয়, যে-সমস্ত লোক সামাজিক অত্যাচারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকেও ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহারই অপর নাম শুদ্ধি আন্দোলন। যে সমাজ কেবল বর্জ্জন করিতেই পারে, গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা যদি সঙ্কীর্ণচেতা গোঁড়াদের যুক্তি শুনিয়া সনাতন বিশুদ্ধতা রক্ষার দোহাই দিয়া, বর্জ্জনকেই হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বৈশিষ্ট্য করিয়া তুলি, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'ছুঁৎমার্গই' যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রাণরূপে গণ্য হয়, তবে আধুনিক জগতে আমাদের স্থান নাই। ধর্ম্ম ও সমাজত্যাগীকে ফিরাইয়া আনিবার বিধি চিরদিনই হিন্দুশাস্ত্রে ছিল। বৌদ্ধ প্লাবনের পরও 'ব্রাত্য' হইয়া অনেকে হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছিল, এ যুগেই বা তাহা না হইবে কেন? কেবল তাহাই নহে, যে-সমস্ত অ-হিন্দু-জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে।

এই সমস্যার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, মুসলমান কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা ও নির্য্যাতিতা হিন্দু নারীর সমস্যা। একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত মুসলমানের কাজই হইয়াছে, ছলে-বলে হিন্দুনারীকে অপহরণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম নাশ করা। এইসমস্ত দুর্ভাগিনী হিন্দুসমাজে পতিতা বলিয়া গণ্য হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া আর তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। ঐ শ্রেণীর মুসলমানরা ইহা জানে এবং সেইজন্যই ছলে-বলে কৌশলে যে-কোন প্রকারে হউক, অসহায়া হিন্দুনারীদিগকে তাহারা অপহরণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মনাশ করে এবং পরে ঐসমস্ত হতভাগিনীদিগকে মুসলমানী করিয়া নেকাহ করে।

হিন্দুসমাজে কি এই সব হতভাগিনী নারীর স্থান নাই, হিন্দুধর্ম্ম কি তাহাদের গ্রহণ করিবে না? লজ্জার বিষয় এই যে, যে-সব কাপুরুষ হিন্দুরা নারীকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহারাই "বলপূর্ব্বক নির্য্যাতিতা" নারীদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার ঘোর বিরোধী। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবিষয়ে অত্যন্ত উদার; বলপূর্ব্বক, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে-নারী নির্য্যাতিতা বা উপভুক্তা হইয়াছে, শাস্ত্র অসঙ্কোচে তাহাদিগকে গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, স্বেচ্ছায় মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যবশতঃ যাহাদের পদস্খলন হইয়াছে, শাস্ত্র তাহাদের উপরেও নির্দ্দয় নহেন। যম, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক পরাশর, দেবল, সকলেই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

> বলাৎকারোপভুক্তা বা চৌরহস্তগতাপি বা।
> স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা অথবা বিপ্রমাদিতা॥
> অত্যন্তদূষিতাপি স্ত্রী ন পরিত্যাগমর্হতি।
> সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা নারীনাঞ্চ বিশেষতঃ॥
> (শুদ্ধিচিন্তামণি-ধৃত-বচন)।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—

> "নির্য্যাতন হিন্দু নরনারীর ধর্ম্মনাশ করিতে পারে না, হিন্দুধর্ম্ম এই অক্ষয় কবচে হিন্দুসমাজকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে; অন্যথা, বহু-বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত হিন্দুসমাজের অস্তিত্বমাত্র থাকিত না। যাহার প্রভাবে হিন্দুসমাজ অটল আইন হিমাচলের ন্যায় আত্মমর্য্যাদায় চির-প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নির্য্যাতিতের বহিষ্করণে আধুনিক হিন্দুসমাজ আত্মদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-সমস্ত হিন্দু রমণী মুসলমান গুণ্ডাগণ কর্ত্তৃক অপহৃতা বা ধর্ষিতা হন, তাঁহাদের অধিকাংশই বিধবা। ইহার একটি কারণ সহজেই বুঝা যায়। পল্লীগ্রামে দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থদের ঘরের এইসমস্ত বিধবারা প্রায়ই সহায়হীনা ও অরক্ষিতা; কোন কোন বাড়ীতে, এমন-কি কোন কোন পল্লীতে পুরুষের সংখ্যা খুবই কম, কেবল বিধবারাই বাস করে। এরূপ অবস্থায় মুসলমান গুণ্ডাদের পক্ষে ঐসমস্ত অসহায়া অরক্ষিতা বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বা তাহাদের ধর্ম্ম নাশ করা খুবই সহজ কাজ। বিশেষতঃ, নেকাহ করিবার উদ্দেশ্যে সধবা অপেক্ষা বিধবাদের হরণ করাই তাহারা সুবিধাজনক মনে করে। অপর পক্ষে কোন কোন হিন্দু বিধবা স্বেচ্ছাতেও বিপথগামিনী হয়

এবং দুঃখদারিদ্র্যময় বিধবা-জীবন যাপন করা অপেক্ষা মুসলমানের ঘরণী হওয়াও অধিকতর কাম্য মনে করে। আদালতে নারীনির্য্যাতনের কয়েকটি মামলায় এরূপ কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইসমস্ত সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায় হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয়,সে তর্ক অনেক হইয়া গিয়াছে ; বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষ সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে,বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। ইহা আইনতঃ সিদ্ধ করিয়া যাইতেও তিনি ক্রটী করেন নাই। সুতরাং শাস্ত্রের তর্ক তুলিবার প্রয়োজন নাই। এখন লোকাচার ও দেশাচারই প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণাদি ২১টি উচ্চজাতি ভিন্ন আর সকল জাতির মধ্যেই বিধবা-বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। এই বাঙ্গালা দেশেও ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের নিম্ন-স্তরের জাতিদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতিদের অনুকরণ করিতে গিয়া আজকাল ঐসব নিম্নজাতিরাও বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয় মনে করিতেছে।

বাল বিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্য ভাল কি মন্দ, ষাট বছরের বৃদ্ধের পঞ্চম পক্ষের বিবাহ-বিলাসের সঙ্গে পঞ্চমবর্ষীয়া বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্য তুলনায় সমালোচনা কিরূপ প্রীতিকর, ইত্যাদি "ভাবের তর্ক" না হয় নাই তুলিলাম। আমরা সমাজরক্ষার দিক্ হইতেই সমস্যাটি আলোচনা করিতেছি এবং সেই দিক্ হইতে জোর করিয়া বলিতেছি যে, এই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতেই হইবে। হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরে আজ উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, অনেক নিম্নস্তরের জাতি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, কন্যার অভাবে এবং পণের দায়ে তাহাদের মধ্যে পুরুষেরা বিবাহ করিতে পরিতেছে না। অন্যদিকে সার্দ্ধলক্ষ বালবিধবা হিন্দু সমাজের বুকে পাষাণের মত চাপিয়া আছে। এই নিশ্চিত জাতিক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে বিধবাবিবাহ প্রচলন অত্যাবশ্যক। সুখের বিষয়, হিন্দু সমাজে এই সত্য ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে ; ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিধবাবিবাহ হইতেছে, বাঙ্গালা দেশেও ধীরে ধীরে বিধবা-বিবাহ চলিতেছে। আজযদি গোঁড়ার দল "শাস্ত্র ও সদাচারের" নামে কালের গতি ফিরাইতে চান্, তাহা হইলে তাঁহারা সফলকাম হইবেন না।

বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা—এই তিনটি সমস্যা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং এগুলির একটি ব্যাপক নাম দেওয়া যাইতে পারে 'নারীর অধিকার স্বীকার।' এই কথা তুলিলেই একদল লোক চীৎকার সুরু করিয়া দেন যে, হিন্দুসমাজ চিরকালই নারীকে দেবীর মত পূজা করিয়াছে, তাহাকে গৃহরাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছে, এই দেশেই সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে নারীর অধিকার পূর্ণভাবে স্বীকার করা হইত, একথা মানিয়া লইলেও, বর্ত্তমান যুগের আদালতে আমরা বেকসুর খালাস পাইব না। মুসলমান যুগের প্রভাবেই হোক্ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধঃপতনের ফলেই হোক, হিন্দুসমাজে নারীর স্থান আজ অতি নিম্নে। একদিকে পুরুষেরা পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছে ; অন্যদিকে নারীকে আমরা গৃহকোণে জড় পদার্থের মত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ফল এই হইয়াছে যে, আমাদের জাতীয় জীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নারীশক্তি আমাদের সমাজের উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, বাল্য-মাতৃত্বে এদেশের নারীরা জীবনশক্তিহীন, অকালে তাহাদের আয়ুক্ষয় হইতেছে, পুরুষের সঙ্গে তাহাদের ভাবের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহার আর-এক পরিণাম সামাজিক ব্যভিচার ও দুর্নীতি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক স্যার কুহার্টের পত্নী শ্রীমতী আর কুহার্ট "Women of Bengal" বা বাঙলার নারী নামে একখানি সুন্দর বহি লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই এই পুস্তকের ভিত্তি। একজন বিদুষী শ্রদ্ধাশীলা বিদেশিনী আমাদের নারী জাতিকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই

হইতে পারে। আমাদের নারীদের দোষগুলি যেমন তাঁহার চোখে সহজেই ধরা পড়িয়াছে, গুণগুলি স্বীকার করিতেও তেমনি তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই হিসাবে এই বহি খু্ই মূল্যবান। পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে কোন কোন মেয়েদের স্কুলে ও কলেজে একটি বিষয় খুব চোখে পড়ে;—সেখানে বেশ্যার মেয়েদের সংখ্যাধিক্য। বলাবাহুল্য, গণিকারা তাহাদের মেয়েদের স্কুলে পড়াইয়া সুশিক্ষিতা করে বিবাহ দিবার জন্য নয়, ভালরূপে বেশ্যাবৃত্তি করাইবার জন্য। গণিকারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, আধুনিক শিক্ষিত-যুবকেরা এইসব স্কুলে পড়া কিশোরী ও যুবতী বেশ্যাদের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত। নৃত্যগীত, চিত্রকলা প্রভৃতিতেও ইহাদের অনেকে সুশিক্ষিতা। শ্রীমতী আর কুহার্ট বলিয়াছেন যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা গৃহে পত্নীদের নিকটে যাহা পায় না, সমাজে যে নারীসঙ্গ পায় না, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও যুগধর্ম্মের প্রভাবে যাহা তাহাদের একান্ত কাম্য,—তাহাই তাহারা এই শিক্ষিতা গণিকাদের মধ্যে সন্ধান করে এবং দুধের সাধ ঘোলে মিটায়। আর Demand and Supply অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুসারে, গণিকারাও পাকা ব্যবসায়ীর মত সেই জিনিষটিই সরবরাহ করিতে চেষ্টা করে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে গণিকা কথার যে প্রাবল্য দেখা দিয়াছে, তাহারও মূল উৎস বোধ হয় এইখানে।

এই সামাজিক জড়তা ও দুর্গতির অবসান করিতে হইলে, যুগধর্ম্মের দাবী আমাদিগকে মিটাইতে হইবে, নারীর অধিকার পূর্ণভাবে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহাদিগকে আধুনিক কালের শিক্ষা ও সভ্যতার সুযোগ পুরুষদের মতই দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই প্রকৃত সামাজিক সাম্য স্থাপিত এবং নারীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

অতীতে হিন্দুসমাজের সমাজপতি ও স্মৃতিকারগণ জীবন্ত সমাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁহারা যুগ প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও অনুশাসনের পরিবর্ত্তন করিতে ভীত হন নাই। কেবল যে যুগে যুগে নূতন স্মৃতিকারগণের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা নহে, দেশভেদেও স্মৃতির ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তথাকথিত 'সনাতনী রীতি নীতির' উপর কোন অস্বাভাবিক আসক্তি তাঁহাদের ছিল না, কেননা তাঁহারা জানিতেন, যে, জীবন্ত সমাজের পক্ষে সনাতন ব্যবস্থা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বিধি-ব্যবস্থা, অনুশাসন সমাজের সুবিধার জন্যই, সেগুলি নিত্য-বস্তু নয়। কোন সমাজের উচ্চ আদর্শের বিকৃতি না করিয়াও, তাহার বাহ্য আচার-ব্যবহার রীতিনীতির স্থান-কালোপযোগী পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। যাহারা জড়-ধর্ম্মী, সর্ব্ব-প্রকার গতিকেই যাহারা ভয়ের চক্ষে দেখে, তাহারাই 'সনাতনীর' দোহাই দিয়া নিরাপদ্ থাকিতে চায়।

আজ যে রক্ষণশীল গোঁড়ার দল বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানের জটিল সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করা যায় না, এসব জড়ধর্ম্মী ভীরু কাপুরুষেরই কথা। যদি তাঁহাদের শক্তি থাকিত, এযুগে যদি কো প্রতিভাশালী যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বশিষ্ঠ বা রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহারা এইসমস্ত সমস্যা দেখিয়া ভয় পাইতেন না। তাঁহারা যুগোপযোগী নূতন স্মৃতি গড়িয়া তুলিতেন, নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন এবং সমাজ তাহা মাথা পাতিয়া লইত।

কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে যদি কিছুমাত্র প্রাণশক্তি থাকে, তবে সে ভবিষ্যৎ স্মৃতিকারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে না; সে প্রয়োজন অনুসারে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন পথ করিয়া লইবে, তর্করত্ন মহামহো-পাধ্যায় প্রভৃতি যত বড় বড় ঐরাবতই তাহার পথরোধ করুন না কেন, সে তাহা মানিবে না। ভবিষ্যতে যে সব নব্য স্মৃতিকার আসিবেন, তাঁহারা সমাজের গতিই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং যে-সমস্ত নূতন রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া নবযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও অনুশাসন রচনা করিবেন। মোট কথা, হিন্দুসমাজ গোঁড়াদের যুক্তি শুনিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিবে, সে ভয় আমাদের নাই; কেননা এযুগের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার মত প্রাণশক্তি তাহার আছে এবং তাহার লক্ষণও চারিদিকে দেখিতেছি।

প্রবাসের চিঠি

ওঁ

2970, Groveland ave. Chicago.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে জয়দেবের মেলার বিবরণ প'ড়ে আমি বড় আনন্দ লাভ করেছি। যে একটু-আধটু গানের টুকরো পাঠিয়ে দিয়েছ—তা কত গভীর, কত সুন্দর! এই আশ্চর্য্য গভীরতার পথ এরা কেমন ক'রে খুঁজে বের করেছে—কেমন অনায়াসে! কেমন জোরের সঙ্গে এরা বলেছে যে—"সে যে জ্ঞানের অগম্য, সে যে রসের ভিখারী"। এইটুকু কথা বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানীর মুখ থেকে বেরোনো কত শক্ত—কলুর ঘানির কল যদিবা কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তেল বেরোয় কিন্তু তার শব্দ কত! কিন্তু এসব অকিঞ্চন ভক্তেরা ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে যায়নি—তারা মায়ের কোলে চ'ড়ে সেখানে গিয়েছে। এদের কি কিছুর জন্যে আর ভাবতে হয়? আর তোমাদের শান্তিনিকেতনের মেলা তোমরা টাকা দিয়ে সৃষ্টি করতে চাও—আর খাতার হিসাব খতিয়ে-খতিয়ে কত দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেলতে থাক, তার আর সংখ্যা নেই। তোমাদের বিদ্যালয়ের ভিৎ ও তোমারা টাকা দিয়ে গেঁথে তুলতে চাও। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখতে পারলে তবেই সত্যকার জীবনে একে বাঁচাতে পারবে—টাকার যোগে নয়। তোমরা সেই গরীবের ধন সেই সহজ আনন্দের পুষ্পমধুতে তোমাদের বিদ্যালয়টিকে ভর্ত্তি ক'রে রাখ। তোমাদের কার্পেট যদি না জোটে মাটির উপরে খুসি হ'য়ে ব'স—খুসির চেয়ে নরম কার্পেট আর নেই। আমাদের শান্তিনিকেতনের যে-কুঠরিতে সম্পত্তির দলিল এবং টাকার থলি আছে সেইখানেই আমাদের শান্তি-ঘটে ছিদ্র হয়েছে—সেইখান থেকেই আনন্দ-সঞ্চয় শূন্য হ'য়ে যাচ্চে—আমরা হরিশ মালী কিম্বা অচ্যুতানন্দ পণ্ডিতের মত আমাদের আশ্রম-দেবতাকে টাকা দিয়ে মাইনে ক'রে রাখতে পারব, এই কথা মন থেকে বিদায় করতে পারিনি ব'লে তাঁকে বিদায় করছি—আমাদের আসবাব আয়োজন ঠেলে তিনি তাঁর আসনে এসে বসতে পারছেন না। আমাদের বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ে তাঁর পথ ক'রে দাও—সেখানে তাঁর আসন বাধামুক্ত হোক্—সেখানে তোমাদের ভক্তি, তোমাদের নিষ্ঠা, তোমাদের আনন্দ জয়যুক্ত হোক্—মাটির ঘটে তোমাদের মঙ্গলঘট স্থাপন কর—তার উপরে সোনার পাতা নয়, আম্রপল্লব সাজাও। শান্তিনিকেতনের ঐ বিদ্যালয়ের প্রান্তটিকে তোমরা গরীব ক'রে দাঁড় করাও; নইলে তাঁর কাছে সত্য মা ভিক্ষা চাইবে কেমন ক'রে? ধনের কালিমায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে অশুচি করেছে, আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ হবে তাকে ধুয়ে শুভ্র ক'রে ফেলা—আমরা সেই সেবকের পদ গ্রহণ করব ব'লেই আশ্রমে এসেছি—আমরা কলঙ্ক মোচন করব—অতএব টাকার চিন্তা ত্যাগ ক'রে পুণ্যতীর্থ-জলের আয়োজন কর—টাকশাল সে জলের গঙ্গোত্রী নয়, সে-কথা মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলো না।

স্নেহাসক্ত—

(দীপিকা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন

শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার ভিতর দিয়া আনন্দের ভিতর দিয়া ছেলেদের মন বিকশিত হোক্, জড়তা সংস্কার অভ্যাসের দাসত্ব ঘুচিয়া যাক্, ভিতরের দিক্ হইতে জীবনে মুক্তি ফুটিয়া উঠুক, গত পঁচিশ বৎসর তাহারই ব্যবস্থা ধরিয়া পূজনীয় আচার্য্যদেব (রবীন্দ্রনাথ) এখানে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যেদিন একথা বলিয়াছিলেন, তখন ইউরোপে 'নব-বিদ্যালয়ের' কোনও সূচনা দেখা যায় নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের জীবনের একটি পূর্ণ আইডিয়াল্ হইবে, ইহাকে মানুষের সমগ্র জীবনের ক্ষেত্র করিয়া তুলিবেন, এখানে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা সাধক হইবেন, তপস্বী হইবেন, ছেলেদের অধ্যাপনা সেই পরিপূর্ণ জীবন-যাত্রার অঙ্গ হইবে—এই ছিল সেদিন তাঁহার আশা। পল্লী-সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আজ অনেকের মুখে শোনা যায়—কিন্তু স্বদেশী ও সমাজ প্রবন্ধে, সর্ব্বপ্রথম যেদিন তিনি বলেন, গ্রামের মধ্যে যে-সমাজ আছে তাহা আমাদের ভিত্তি, সেদিন তাঁহার প্রতি সমস্ত দেশের বিরুদ্ধতা ও ব্যঙ্গের আর শেষ ছিল না। দেশের নেতারা তখন রাষ্ট্রনৈতিক লড়াইকেই সব-চেয়ে বড় বলিয়া জানিতেন। আমরা সকলেই জানি, সেকালে যাঁহারা চাকরি প্রভৃতিতে বিদেশে যাইতেন তাঁহারা দিল্লীতে গিয়া বড় বড় বাড়ি ফাঁদিতেন না, তাঁহাদের পরিবারবর্গ উৎসবে আনন্দে গ্রামকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। সম্বৎসরের পার্ব্বণে গ্রাম সজীব থাকিত, আহার্য্য ও পানীয়ের সেখানে অভাব ঘটিত না। আজ ম্যালেরিয়ায় সমস্ত উজাড় হইয়া যাইতেছে, গ্রামে বাস করা সম্ভবপর নহে।

বস্তুতঃ গ্রামই দেশকে খাওয়ায়। তাহা উজাড় হইয়া গেলে, সর্ব্বত্রই সমস্যা কঠিন হইয়া উঠে, বড় বড় সভ্যতা বিনষ্ট হয়। গ্রামের জীবন-যাত্রাকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের সামাজিক প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। এ যদি শুকাইয়া যায়, তবে আমরা কিছুতেই বাঁচিব না। এই সহজ কথাটা বলিতে গিয়া তাঁহাকে সেদিন কত গালাগালি সহিতে হইয়াছিল, আজ তাহা কল্পনা করাও কঠিন। ছাত্রেরা অনেকে তখন দেশের জন্য কি করিবে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেন। তিনি তাঁহাদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বলিতেন,—'গ্রামকে জয় কর, তোমাদের বিশ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী চেষ্টায় এক একটি গ্রামের সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া দেখাও, ভারতবর্ষের কি করিয়া যথার্থ সেবা করা যায়'—এই ছিল তাঁহার বাণী। বলা বাহুল্য, উত্তেজনার মত্ততা তাহাতে নাই। বাহবা নাই, হাততালি নাই, এমন কাজে সেদিন লোক জোটে নাই।

আমরা জমিদার, ডাক্তার, উকীল, ডেপুটি, অধ্যাপক কেহই কিছু উৎপন্ন করিতেছি না। বাংলাদেশে একজন মাত্র উৎপন্ন করিতেছে সে চাষী—স্তরে স্তরে আমরা সকলে তাহাকে শোষণ করিতেছি—ইহাতে কি কল্যাণ আছে!

পৃথিবীর নানা স্থানে সমবায়ের যে-প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, জীবন-যাত্রার দুঃখের একটি বড় সমাধান তাহার মধ্যে আছে, এই তথ্যটির প্রতি দেশের মনকে নানাভাবে তিনি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়া-

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সহিত আশপাশের গ্রামবাসীদের

জীবনের যোগ কি করিয়া স্থাপন করা যায়, কি করিলে চাষীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা যায়, বরাবরই ইহা তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদের এই কথাই বলিয়াছেন—ক্লাসের নোট লইয়া টাকা উপার্জ্জন করার জন্য দুর্লভ মানব-জন্ম নয়, দেশের চিন্তনীয় যাহা আছে তাহা তাহাদের ভাবিতে হইবে, করণীয় যাহা যাহা আছে তাহা করিতে হইবে, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষাকে তাহারা নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। শ্রীনিকেতনের পত্তন করা হইল—এখানকার জমি জল লোকবল সবই প্রতিকূল দেখিয়াও তিনি এইখানেই এই মনে করিয়া কাজ সুরু করিয়া দিলেন যে, যদি এইসকল বাধা অতিক্রম করা যায়, তবে সমস্ত দেশের মনে গভীরভাবে আশা হইবে—আমরাও বাঁচিতে পারি। ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমান না মিলিতে পারে, কিন্তু যেখানে পেটের দায় আছে, সাংসারিক সুখদুঃখের ক্ষেত্রে তাহারা মিলিবে।—মিলনের দ্বারা পরস্পরের সহায়তায়, তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, খাইবার পরিবার দুঃখ ঘুচিয়াছে, স্বাস্থ্যের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই মাটির ভিত্তি সব মিলনের প্রশস্ত স্থান। দারিদ্র্যের উৎকণ্ঠায়, নৈরাশ্যে যাহারা পীড়িত, জীবিকার সংগ্রামে চিরকাল যে পরাভূত সেও তখন নূতন আনন্দে বাঁচিয়া উঠিবে। বিজ্ঞানের যে-শিক্ষা তাহা ত আছেই, চতুর্দ্দিকের গ্রামের লোকের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া যে-অভিজ্ঞতা জমিয়া উঠিবে, দেশের পক্ষে সেও একটি অমূল্য সম্পদ্ হইবে। যাঁহারা বিশেষভাবে কোনও বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আশ্রম তাঁহাদের আশ্রয় দিবে, তাঁহারা লাইব্রেরী ও ল্যাবোরেটারির সুবিধা এখানে পাইবেন। ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চারিপাশে আসিয়া জড় হইবে—মধ্যযুগে ইয়োরোপে যেমন করিয়া ইউনিভার্সিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এখানেও তাহা সেই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা এখানে আকৃষ্ট হইয়া আসিবে।

শান্তিনিকতন-আশ্রমের এই আশা এবং কামনার উপর শ্রীনিকেতনের ভিত্তি। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের যোগে একটি সমগ্রতাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। মানুষের দুইটি দিক্ আছে—একটি জীবিকার, অন্যটি উচ্চতর জীবন-যাত্রার। এখানে আমরা বৃহৎভাবে ব্যাপক ভাবে সহযোগিতা-মূলক কৃষির চেষ্টা করিব, তাহার লাভ কাহারও একলার নহে। গভীরভাবে কূপ খনন করাইয়াই হোক, বাঁধ বাঁধিয়াই হোক, এখানকার জলাভাবের সমস্যা আমরা সমাধান করিব, আমাদের প্রয়াস গ্রামের মধ্যে ব্যাপ্ত করিব, আমাদের এখানকার ছাপাখানা, কারখানা, সমবায়-ভাণ্ডার, টেক্‌নিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে আশ্রয় দিবে। এখানকার মিউজিয়ম, এখানকার কলাভবন মানুষের চিত্তকে জাগ্রত করিয়া রাখিবে। এই আয়োজনের মধ্যে আমাদের শিশুরা বাড়িয়া উঠিবে। তাহারা মাটি খুঁড়িবে ও লোহা পিটিবে—এবং বড় যে জীবন, জীবনে তাহাকে গ্রহণ করিবে, তাহারও সাধন করিবে। এমনি করিয়া ইহার আর্থিক ও পারমার্থিক দুইটি দিক্ বড় হইয়া উঠিবে।

একটি মহা প্রাণের সাধনা সব বাধা সব আবর্জ্জনাকে দূর করিয়া এই উদ্যোগের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

(দীপিকা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩)

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের তালিকা

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতে প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের যে অপরিসীম বিস্তার ছিল, এই তালিকা হইতে তাহার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

এই তালিকার জন্য দুই রকমের সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। দ্বিতীয়তঃ, যে যে পুস্তকাগারে পুঁথি সকল রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(১) কায়চিকিৎসা (Practice of medicine) প্রাচীন সংহিতাগুলি ইহার অন্তর্গত। [কা]

(২) শল্যতন্ত্র (Surgery) [শ]

(৩) কৌমার-ভৃত্য-তন্ত্র (Diseases of children) [কৌ]

(৪) অগদতন্ত্র (Toxiology) [অ]

(৫) রসায়ন-তন্ত্র (Hygiene) [র]

(৬) নিদানশাস্ত্র (Pathology) [নি]

(৭) দ্রব্যগুণ (Materia medica and therapeutics) [দ্র]

(৮) রসগ্রন্থ (on minerals used in medicine) [রস]

(৯) বাজীকরণ গ্রন্থ (on sexual invigoration) [বা]

(১০) বৈদ্যককোষ (medical dictionary and glossary) [কো]

(১১) পশু-চিকিৎসা vaterinary science) [প]

বিভিন্ন পুস্তকাগারের নাম ও তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।—

(১) মাদ্রাজের থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত হস্তলিপির তালিকা; ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। [অ১]

(২) অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান্ ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—এ, বি, কীথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। [অ ই]

(৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ২ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোর আউফ্রেক্ট দ্বারা সঙ্কলিত; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এম্ বিন্টারনিৎস্ এবং এ, বি, কীথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [অক্স ১, অক্স ২]

(৪) আলোয়ার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পি, পিটার্সন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [আ]

(৫) লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা; জে, এগেলীং কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহা সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। পঞ্চম খণ্ডে বৈদ্যক-গ্রন্থের তালিকা আছে। [ই ১] এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি পুঁথি এই তালিকা প্রস্তুত হইবার পর এই পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

(৬) কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ইহা মুদ্রিত হয় নাই। [ইম্প]

(৭) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ইহা তিন খণ্ডে ১৮৯৯—১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত [এ১] এই তালিকা মুদ্রিত হইবার পর অনেকগুলি পুঁথি সঞ্চিত হইয়াছে। [এ২]

(৮) কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী অফ্ বেঙ্গলের পুস্তকাগারে রক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পুঁথির তালিকা [এ, গ,]

(৯) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১০ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ১০ম খণ্ডের ১ম অংশে বৈদ্যকগ্রন্থের তালিকা আছে। [ক সং]

(১০) কাশীর সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগার রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৯১১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত [কা২]; এতদ্ভিন্ন ১৮৯৭ হইতে ১৯১৮-১৯ পর্য্যন্ত ২৩ খণ্ডে ঐ পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা প্রতি বৎসর

মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা মুদ্রণের পর এই শেষোক্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইবে। [কা-১]

(১১) কাশ্মীর প্রদেশে রঘুনাথ মন্দিরে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এম্, এ ষ্টীন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। [কা, র]

(১২) কোপেন্‌হেগেনে রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা --এন্, এল্, বেস্তার গাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। [কো]

(১৩) গোতিংগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা এফ, কীলহর্ণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। [গে]

(১৪) আরায় জৈন সিদ্ধান্ত ভবনে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা [জৈ]

(১৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা, অমুদ্রিত। [ঢাকা]

(১৬) তাঞ্জোর রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। [তা]

(১৭) তুবিঙ্গান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। ১৮৬৬ এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দুইখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। [তু]

(১৮) ত্রিবেন্দ্রাম রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [ত্রি]

(১৯) নেপালের দরবার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। তিন ভাগে মুদ্রিত---১ম ভাগ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা সঙ্কলিত ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সঙ্কলিত নোটিসেস্ অফ স্যাংস্‌ক্রিট্ ম্যানুস্ক্রিপ্টস্, ২য় সংখ্যার ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত; তৃতীয় ভাগ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারাই সঙ্কলিত। [নে ১, নে ২, নে ৩]

(২০) কাবার্ত দ্বারা সঙ্কলিত পুঁথির তালিকা ; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ [পা]।

(২১) পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। এই তালিকা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষার ১ম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। [পুরী]

(২২) পুনার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। চারিটী তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ১ম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে, এফ, কীলহর্ণ এবং আর্ জি, ভাণ্ডারকার দ্বারা সঙ্কলিত। ২য়, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এস, আর, ভাণ্ডারকার্ দ্বারা সঙ্কলিত। ৩য় বেদ, সম্বন্ধীয় পুঁথি ; ৪র্থ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। [পুনা]

(২৩) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়ামের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। [প্র]

(২৪) বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বৈদ্যক-পুঁথির তালিকা। মুদ্রিত হয় নাই। [ব]

(২৫) বলন সহরে পাণ্ডুলিপির আগারে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। [বল]

(২৬) বার্লিন সহরে রাজকীয় পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা, তিন খণ্ডে মুদ্রিত [বা ১, বা ২]।

(২৭) বিকানীর মহারাজের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা ; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। [বিকা]

(২৮) বিশপ কলেজের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা ; ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা সঙ্কলিত। [বিশ]

(২৯) বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। [বৃ]

(৩০) বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বোম্বাই শাখার পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ১ম খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। [ব্রা]

(৩১) জেসেলমীর ভাণ্ডারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [ভা]

(৩২) ভাউদাজি মেমোরিয়ালে রক্ষিত পুঁথির তালিকা [ভাউ]।

(৩৩) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [ভি]

(৩৪) মহীশূর রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [মহী]

(৩৫) মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ম্যানুস্ক্রিপ্টস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা, ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত, ২৩শ খণ্ডে বৈদ্যক গ্রন্থের তালিকা আছে। [মা]

(৩৬) মিউনিক্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা। ২ খণ্ডে মুদ্রিত। [মি]

(৩৭) রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [র]।

(৩৮) লিপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [লি]

(৩৯) লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [লু]

(৪০) রাজসাহীর বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা, মুদ্রিত হয় নাই। [বরে]

(৪১) বোলপুর, শান্তিনিকেতনের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [শা]

(৪২) কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [সং]।

(৪৩) কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। [সা]

(৪৪) সিংহল দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃতাদি পুঁথির তালিকা। [সিং]

(৪৫) যাওয়ার পুঁথি এ, এফ, রডল্‌ফ হির্ণল্ দ্বারা সঙ্কলিত। [যা]

(আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, পৌষ ১৩৩৩) শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

"সূর্য্যি মামা"

হিন্দুর বেদেতে সূর্য্যের কত স্তবস্তুতি আছে তাহা সকলেই জানেন। হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা সূর্য্যের গতির দ্বারা নির্ণীত হয় এবং ধরিতে গেলে, হিন্দুর গায়ত্রী একরকম সূর্য্যেরই উপাসনা।

সূর্য্যের আলো দেখিতে সাদা। যদি ত্রিকোণ পরকলার (প্রিজম) ভিতর দিয়া ঐ সাদা আলোকে চালান যায়, তবে ঐ একটা আলো যেন ভাঙিয়া সাতটা বিভিন্ন রকমের রঙে দেখা দেয়। সে রঙগুলি এই :— ভায়োলেট (বেগুনে), ইণ্ডিগো (নীল), ব্লু (ফিকে-নীল), গ্রীন (সবুজ), ইয়োলো (হলদে), অরেঞ্জ (কমলালেবুর রং), রেড (লাল)। তন্মধ্যে, এই লাল দিক্‌টাই আলোক-প্রধান ; এই লাল দিকের রশ্মিগুলির কম্পন-কালে, ঈথারে (বা ব্যোম-মণ্ডলে) প্রকাণ্ড লম্বা তরঙ্গ উঠে ; কাজেই, ঐ লাল রঙ্গের যত বাহিরে যাওয়া যাইবে (ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মিগুলি), তত সেইগুলি লম্বা তরঙ্গোৎপাদক বলিয়া, সেই তরঙ্গগুলি দ্বারা বেতার-বার্ত্তা পাঠানর সুবিধা হয়। আবার, ভায়োলেটের যত বাহিরে যাওয়া যাইবে (আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মিপুঞ্জ), তত সে রশ্মিগুলি রাসায়নিক কার্য্যোৎপাদক হইবে এবং ব্যোমতরঙ্গে তাহারা হ্রস্ব তরঙ্গই উৎপাদন করিতে পারে।

এদেশে জন্ম-দিবস হইতে সারা শৈশবকাল ধরিয়াই শিশুদিগকে সকালে ও বৈকালে রীতিমত রৌদ্র সেবন করান হয়। সকল শিশুকেই খুব বেশী করিয়া সর্ষের তৈল মাখাইয়া, প্রত্যহ নিয়ম করিয়া— ঋতুভেদে পনর মিনিট হইতে একঘণ্টা ধরিয়া,—প্রাতঃকালীন রৌদ্রে শায়িত রাখা

হয়। আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বলেন যে,—(১) রৌদ্রের কিরণের মত রোগ-জীবাণু-ধ্বংসকার আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই যত রোগের পুঁয, বিষ্ঠা, থুথু ময়লা সহরের রাস্তায় অহর্নিশ ফেলা হয়; এবং সেগুলি শুকাইয়া নিত্যই রাস্তার "ধূলিতে" পরিণত হয়। এবং নিত্য, কত সহস্র মেথর রাস্তা ঝাঁট দিবার সময়ে, কতই ধূলি উড়ায়—কিন্তু কৈ, মেথরকুল ত ক্ষয়কাশ বা অপর কোনও মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। রৌদ্র-কিরণে রোগ-জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। রৌদ্র-কিরণের এই শক্তি আছে বলিয়াই, হিন্দুদিগের শীতবস্ত্রকে রৌদ্রে দিলেই শুদ্ধ হয়—"ঊর্ণা বাতেন শুধ্যতি"। নিঃস্ব ও গরীবের ছেলে-মেয়েরা অনবরত রৌদ্র সেবন করিতে বাধ্য হয় বলিয়া তাহারা তেমন রোগ-প্রবণ হয় না।

(২) নিয়মিত রৌদ্রসেবী শিশুদিগের "রিকেটস্" নামক ব্যারাম হয় না; ঐ ব্যারাম ধরিলে, শিশুকে রীতিমত রৌদ্র সেবন করাইলে, তাহার উক্ত রিকেটস্ ব্যারাম সারিয়া যায়। এই ব্যারামে হাড় নরম হয় ও কথায়-কথায় বাঁকিয়া যায় এবং শুমো-শুমো হইয়া শিশুর প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে।

(৩) সূর্য্যের কিরণে এমন ক্ষমতা আছে, যদ্দারা "ভাইটামিন্" বৃদ্ধি পায়। বস্তুত সূর্য্যের কিরণের রূপান্তর ব্যতীত, ভাইটামিন্ আর কিছুই নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কডলিভার তেল সেবনে রিকেটস্ সারিয়া যায়; মসিনার তেলের ঐরূপ কোনও গুণ নাই। কিন্তু কোয়ার্জ (quartz) ল্যাম্পের সাহায্যে, একশিশি মসিনার তেলের উপরে সূর্য্য-কিরণের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রবেশ করাইয়া এক বৎসরকাল সেই শিশির মসিনার তৈল ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়; এক বৎসর পরে, সেই বাসা মসিনার তৈল সেবন করাইয়া, রিকেটস্ আরাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সূর্য্যের যাবতীয় রশ্মির মধ্যে ভায়োলেট বা বেগুনী রঙের রশ্মির পিছনে যে-সকল রশ্মি আছে, তাহাদিগকে ইংরেজীতে "আলট্রা-ভায়োলেট" রশ্মি কহে। সূর্য্যরশ্মির উক্ত আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিরই রিকেটস্ সারাইবার ক্ষমতা আছে।

(৪) আজকাল সহরে যে-সে কচি ছেলের গলায় হাত বুলাইলে, উহার দুই পার্শ্বে দানা-দানা বিচি (গ্ল্যাণ্ড) অনুভূত হয়। স্ক্রফুলা (বা টিউবার্কেল-জীবাণুঘটিত রোগ-প্রবণতাই) উক্ত গ্ল্যাণ্ডগুলি নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ, যে-যে ছেলের গলার দু'পাশে উক্তরূপ গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড দেখা যায়, প্রায়শঃই, সেই সেই ছেলে অল্প-বিস্তর "টিউবার্কেল" জীবাণুর (অর্থাৎ ক্ষয়কাশ রোগের জীবাণুর) সংস্পর্শে আসিয়াছে। এই স্ক্রফুলা-গ্রস্ত শিশুগুলিকে রীতিমত রৌদ্র সেবন করাইলে, তাহাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

আঁতুড়-ঘরে রৌদ্র আনা চাই; আঁতুড় হইতে শিশুদিগকে রৌদ্র সেবন করান চাই। শিশুদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার মত জামাজোড়া পরান চাই; কিন্তু বাকী সময়ে রীতিমত খালি গায়ে থাকিয়া পথে ঘাটে, মাঠে, বনে, বাগানে খেলাইয়া তাহাদিগকে বাড়িতে দাও। আজকালকার ছেলেরা দু'পা হাঁটিতে চায় না এবং রৌদ্রকে ভয় করে—ননীর পুতুল হয়। এ ভাবে ছেলে মানুষ করিবার যুগ গিয়াছে।

(স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩৩) শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

—

মাদুর কাঠির চাষ

মাদুর কাঠির চাষ একটি বিশেষ লাভজনক কৃষি। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহা জন্মাইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ইহার চাষ চলিতে পারে। বাড়ীর বালক বালিকারা ও মেয়েরা সুন্দর ভাবে মাদুর বুনিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পর চৈত্র বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রকে এক কি দেড় ফুট গভীর করিয়া উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। তদনন্তর কিছুদিন সেই কোপানো ক্ষেত্রে বাতাস লাগিলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ছড়াইয়া দিতে হয়। এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

ক্ষেত্রটি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু গভীর হইলেই ভাল হয়। দো-আঁশযুক্ত বালুকাময় কিংবা এঁটেল মাটীই এই চাষের পক্ষে প্রশস্ত। ছায়াপূর্ণ স্থলে কিংবা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নদিকেও উহা ভালরূপ জন্মিতে পারে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোপানো ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ এমন ভাবে বাঁধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইলে জল উহার কোন দিকে গড়াইয়া যাইতে না পারে ও কয়েক দিবস ক্ষেত্রেই জমিয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ, বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ কোপানো ক্ষেত্রে হলুদ কিংবা কচুর সারের মত এক একটি পাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিংবা ক্ষেত্রে রস থাকে, তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক নাই। ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কথঞ্চিৎ বড় হইলে, যদি উহার মধ্যে ঘাস জন্মিয়া থাকে তবে সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া ঐ পাটীর মৃত্তিকার দ্বারা গাছের গোড়াগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। এর পর আর বিশেষ-কিছু যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন এগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পুনরায় ঐ ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক-মিশ্রিত জল সেঁচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল পাঁক সেঁচিয়া দিতে হয়। ঐ পাঁকই বিশেষ সারের কার্য্য করে। তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐগুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইতে হয় এবং মুথগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত সরস স্থানে লাগাইয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তার পর পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়। একই ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপ জন্মে না। এজন্য দুই তিন বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উহার চারা রোপণ করিলে খুব ভাল হয়।

এই চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। বৎসরের মধ্যে সাড়ে দুই মাসের বেশী পরিশ্রম করিতে হয় কি না সন্দেহ। প্রতি বিঘা জমিতে প্রত্যেক বারে খরচ বাদে খুব কম পক্ষেও একশত টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে। এঁটেল মাটীর কাঠি খুব শক্ত, মোটা ও লম্বা হয় এবং ইহাতে প্রায়ই বৎসরে মাত্র একবার উৎকৃষ্ট কাঠি হইয়া থাকে। এই কাঠি ৫৲।৬৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। এইরূপ এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ চল্লিশ মণ কাঠি জন্মে। বেলে মাটীর কাঠি বৎসরে দুই বার জন্মে। ইহার ফসল কম শক্ত হয় বলিয়া তার দরও একটু কম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত প্রচুর জন্মে বলিয়া উভয় প্রকারের জমিতেই প্রায় সমান লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট মাদুর কাঠির দর ছিল ১০৲ টাকা। এখন এতদঞ্চলে বহু লোকে ইহার চাষ করে বলিয়া প্রতিমণ ৫৲।৬৲ টাকার বেশী দর উঠে না। ("সম্মিলনী")

(আর্থিক উন্নতি, মাঘ ১৩৩৩) শ্রী হরিচরণ মাইতি

—

প্রাচীন হিন্দুর চিকিৎসা-জ্ঞান

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল, তাহা আয়ুর্ব্বেদ শব্দের বুৎপত্তিজনক অর্থে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। ইহার বিস্তৃতিও যে আরব, পারস্ত, ইউরোপ ও সুদূর মিশরদেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যে এলোপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে যাই, সেই এলোপ্যাথির জন্মদাতা যে আয়ুর্ব্বেদ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। আয়ুর্ব্বেদ শব্দের অর্থ—যে-শাস্ত্রে আয়ুর হিত ও অহিত, ব্যাধির কারণ এবং তাহা নিবারণের উপায় বর্ণিত থাকে, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যে রোগ-প্রতিকার জন্যই কতকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা নহে, অধিকন্তু যাহাতে লোকে রোগাক্রান্ত হইতে না পারে, তাহার বিধি-ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। এদেশে চরকসংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ অগ্নিবেশ—তাঁহার শিষ্যকে যে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্য তৎসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন,—ইহাই চরক-সংহিতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি। অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—শল্য (Surgical Treatment), ২। শালাক্য (Treatment of diseases of the head, eyes, ears and face), ৩। কায়-চিকিৎসা (Treatment of general diseases), ৪। ভূতবিদ্যা (diseases caused by evil spirit) ৫। কৌমার ভৃত্য The treatment of infants and of the puerperal state), ৬। অগদ (Antidote to poisons), ৭। রসায়ন (Medicines promoting health and longivity), ৮। বাজীকরণ (Approdisiacs)।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উৎপত্তি আড়াই সহস্র বৎসরেরও অধিক। ইহার প্রাথমিক অবস্থায় অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা দ্বারা ইহার উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উত্তরোত্তর উহার উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী অবস্থা আলোচনা করিলে, আয়ুর্ব্বেদের আবার অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত যে আয়ুর্ব্বেদকে সহস্র অধ্যায়ে এবং একলক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ করেন, কলিযুগে হারীতই তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করেন। সেইগুলি যথাক্রমে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, দ্বাদশ সহস্র, ছয় সহস্র, তিন সহস্র, ও পঞ্চদশ শত শ্লোকে সমাপ্ত করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়।

এদেশে যে শল্য-চিকিৎসা (surgery) প্রচলিত ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বৈদেশিকদিগের নিকট হইতেও পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজান্দার ভারত-অভিযানের সময় এদেশে শল্যচিকিৎসা প্রচলিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। সার্জ্জন্ জেনারেল সি, এ, গর্ডন, এম, ডি, সি, বি বলিয়াছেন, "খৃঃ পূর্ব্ব ৪ শতাব্দীতে আলেকজান্দারের এসিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিষয় অল্পই জানা গিয়াছিল, তথাপি ইহা খুব প্রামাণিক যে, উক্ত আলেকজান্দারের সহিত যে-সকল চিকিৎসক আসিয়াছিলেন ভারতের উত্তর পশ্চিমবাসী হিন্দুরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে অনেক উন্নত ছিলেন তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃষি, যুদ্ধ এবং মৃগয়াদি ব্যাপারে সচরাচর অনেক আঘাতজনিত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এজন্যই হিন্দুগণ অস্ত্র-চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগে বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং বেদেও অস্ত্র-চিকিৎসা অষ্টাঙ্গ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মিঃ আর, সি, দত্ত তাঁহার "Ancient India" (প্রাচীন ভারত) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"২২ শতাব্দী পূর্ব্বে আলেকজান্দারের গ্রীক্ চিকিৎসকগণ যে-সকল রোগ আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আলেকজান্দার সেইসকল রোগ চিকিৎসার্থে তাঁহার সভায় হিন্দু চিকিৎসকদিগকে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং ১১ শতাব্দী অতীত হইল, বোগদাদের হারুণ-উল-রসিদ দুইজন হিন্দু চিকিৎসক তাঁহার নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। আরবীয় নিদর্শনাদিতে বা ইতিবৃত্তে এই চিকিৎসকদ্বয় মন্ক ও সালিম নামে অভিহিত।" এতদ্ভিন্ন অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, আরব-গ্রন্থকারদিগের মধ্যে স্কেপিয়ন্ নামক জনৈক গ্রন্থকার "চরক" জার্ক নামে উল্লেখ করেন। প্রফেসার মোক্ষমুলার ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ নামক বিখ্যাত ইউরোপীয় পাণ্ডিতদ্বয় হিন্দুচিকিৎসা-পদ্ধতির বহুল প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

চরক ও হারিত সংহিতায় গুল্ম, জলোদর, অশ্মরী (পাথুরি), শ্লীপদ, অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ জলোদর রোগ—অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত নিরাময় হওয়া যে অসম্ভব—তাহা হারিত-সংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল, তাহা চরক-সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ছয় শত প্রকার বিরেচক ঔষধের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। চরকোক্ত দ্রব্যগুণে চারি প্রকার মহাস্নেহ বা তৈলবৎ পদার্থ, পঞ্চ প্রকার লবণ, অষ্ট প্রকার দুগ্ধ, অষ্টবিধ মূত্র, পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারের মূল ও ফলের বৃক্ষ, এতদ্দেশীয় শস্য, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল-নির্য্যাস প্রভৃতি বৃক্ষলতাদির গুণ, উক্ত সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, নবনী প্রভৃতির গুণ, নানাপ্রকার সুরার গুণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ প্রভৃতি অষ্ট ধাতুর গুণ, হরিতাল, দারমুজ ও গৈরিক প্রভৃতি ঔষধের গুণ নানা জাতীয় পশুপক্ষীর মাংসের গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ রসায়ন-তন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

(আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, ফাল্গুন ১৩৩৩) শ্রী হরিপদ ঘোষাল

স্বপ্ন-সহচরী

শ্রী সজনীকান্ত দাস

আমার অন্তরলোকে পাতিয়াছ কমল-আসন,
কে তুমি অজানা !
মোহন পরশে তব বক্ষে জাগে দ্বন্দ্ব চিরন্তন—
দ্বিধা জাগে নানা।
'তুমি আছ'—ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া করি অনুভব ;
ভ্রা[illegible]রে ভুলি কভু, 'আছ' 'নাই' নিয়ত বিপ্লব !
দিবসের ক্ষুদ্র কাজে মগ্ন রহি আপনা ভুলিয়া,
বীণা-বিগলিত ধারা অকস্মাৎ স্পর্শ করে হিয়া—
উঠি চমকিয়া !
কোথা হ'তে আসে সুর,বুঝি,বুঝি,—পারি না বুঝিতে—
আসে আচম্বিতে।

চারিদিকে খুটিনাটি ক্ষুদ্রতার সুনিবিড় জাল
করে অন্ধকার ;
ক্ষুদ্র জঠরের লাগি' সংসারের ধূলি ও জঞ্জাল
করি স্তূপাকার।
যশ, মান, অন্ন, বস্ত্র, বিত্ত লাগি' নিত্য আরাধনা ;
হানাহানি হাহাকার পথে পথে মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
কলুষ বিদ্বেষ আর নিদারুণ হিংসা-বিভীষিকা,
তারি মাঝে রহি' রহি' জ্বলি' উঠে তব দীপ্ত শিখা
—মরু-মরীচিকা !
বিস্ময়ে অবাক্ মানি' চেয়ে থাকি, দিগ্‌ভ্রান্ত মন—
—এ বুঝি স্বপন !

পরশ-পুলকে তব পলকে পাসরি' আপনারে,
রহি প্রতীক্ষায়—
বিকশিত হয় চিত্ত পুষ্প যথা আপনা বিথারে
আলোক-বন্যায়।
সহসা নিঃসাড় বক্ষে জাগে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের সাড়া,
কঠিন পাষাণ টুটি' উচ্ছ্বসিত হয় উৎস-ধারা।—

আমি নাহি জানি তার কোথা আদি কোথা তার শেষ
পরিপূর্ণতার ভারে ভুলি সর্ব্ব ব্যর্থতার ক্লেশ—
রহি নির্নিমেষ !
আঁধার দিগন্ত মোর উদ্ভাসিয়া উঠে তীব্রালোকে—
পরশ-পুলকে।

অণু-পরিমাণ বক্ষে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পায় লয়,
মায়া-স্পর্শে তব ;
নিখিলের দুঃখ-সুখ বিন্দু বিন্দু করি যে সঞ্চয় ;
হেরি অভিনব—
অবাধ নিঃসীম শূন্য—এ ধরণী চির-জ্যোতির্ম্ময়ী।
কোন্ মায়া-স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী-বক্ষে আন বহি'—
নিখিল ডুবিয়া যায় ভাষাহীন সঙ্গীত-ধারায়—
উচ্ছল তরঙ্গ জাগে তন্দ্রাহত তারায় তারায়—
'আমি' ডুবে যায় !
আমি উঠি বিশ্ব হ'য়ে, চিত্তে মোর অসীম বেদন—
আনন্দ-স্পন্দন।

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ
বিশ্ব-হলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নব জন্ম লভে অকস্মাৎ
শুষ্ক তৃণদল !
নিখিলের পুষ্প যত চিত্তে মোর উঠে বিকশিয়া,
অনন্ত-আনন্দ-রস ধরা-বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া ;
কলহ ডুবিয়া যায়—সত্য শিব বিরাজে সুন্দর,—
বিরহ পলায় দূরে, মিলনেতে বিশ্ব-চরাচর
শোভে মনোহর।
শুধু শান্তি অবিরাম, নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি'।

প্রতিদিবসের গ্লানি ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব ব্যর্থতা পাসরি',—
তোমার আলোকে—
অতিবাহি' বহু দেশ ভিড়াই কল্পনা-স্বর্ণতরী
কোন্ মায়ালোকে!
সুদূর অতীত হেরি, নেহারি অনন্ত ভবিষ্যৎ,
মরুমাঝে, ঘনারণ্যে, গিরিশৃঙ্গে নাহি ভুলি পথ;
মেঘলোকে ছায়া সম লঘুপদে করি বিচরণ,
এ বিশ্বের কোথা কোনো নাহি বাধা নাহি আবরণ—
নাহিক মরণ!
আমি রহি আত্মরত কল্পনার বিপুল গৌরবে—
তন্দ্রামগ্ন ভবে।

মথিয়া বিশ্বের বিষ সুধা যত আহরণ করি—
বিশ্ব করে পান।
কল্পনা-মৃণাল-বৃন্তে চিত্তপদ্ম রাখি নিত্য ধরি';
সঙ্গীত মহান্
মনোবীণা হ'তে মোর উচ্ছ্বসিত হয় শূন্য মাঝে,
কর্ম্মভারাতুর যবে কর্ণে মোর সে সঙ্গীত বাজে;
চমকিয়া জাগি আমি—পান করি নিঃস্যন্দিনী ধারা,
কে আনিল স্বর্গজ্যোতি! চারিদিকে অন্ধকার কারা,—
সুপ্তি—দীপ্তিহারা!
ক্ষণে জাগ নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নসম মিলাও চকিতে—
ক্ষুব্ধ করি' চিতে।

কঠিন উপলখণ্ড পদে পদে বাধা হয় পথে;
ক্ষণে ভুলি দিক্—
ধূলায় কর্দ্দমে হই নিষ্পেষিত মহাকাল-রথে,
দুর্ব্বল পথিক!
আবরণ টুটে যায়, প্রকটিত রন্ধ্রমুখ যত—
ম্লান হ'য়ে পথ চলি সংসারের গুরুভার-নত,—
হিংসা দ্বেষ অপমান চারিদিকে বহ্নিজ্বালা জ্বলে—
তুমি কোথা গুপ্ত রহ হৃদয়ের গোপন অতলে—
কোন্ মন্ত্রবলে!
বেদনা-জ্বালায় চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন শ্রান্ত ব্যথাতুর—
আঘাতে নিষ্ঠুর!

কেন আস কেন যাও, কোন্ কল্পলোকে তব স্থান—
স্বপ্ন-সহচরী!
বার বার পরিচয়ে আজো তার হ'ল না সন্ধান—
মায়া-যাদুকরী!
তোমারে চিনি না, শুধু ক্ষণে ক্ষণে পাই পরিচয়,
অন্তরের পূজা মোর নিত্য নিত্য লভে পরাজয়;
মায়াবিনী, তুমি তব অন্ধকার চিত্তগুহা হ'তে
চমক হানিয়া যাও, সংসারের কণ্টকিত পথে
আমার জগতে।
কর্ম্মক্লান্ত হ'য়ে যবে খুঁজি শান্তি আগ্রহে ব্যাকুল
নাহি মিলে কূল!

এই লুকাচুরী-খেলা, এও ভাল বস্তুর জগতে,
স্বপ্ন অবাস্তব
যত ক্ষণিকের হোক্ এই সত্য মিথ্যাময় পথে—
আলোক দুর্লভ!
পাষাণ-পঞ্জর টুটি' ক্ষণিকের এই উৎস-ধার,—
কারাগারে রন্ধ্র-পথে এই স্পর্শ আলোক-রেখার,
ঘোর বিভীষিকা-মাঝে নন্দনের আনন্দের ছবি—
ক্লেদপঙ্ক মাঝে এই সুবাসিত কুসুম-সুরভি—
ধন্য মানে কবি!
যেথা থাক পাই যেন রহি' রহি' রহস্য-আভাস।
জীবন-নিঃশ্বাস!

আমরা ও তাহারা

শ্রী দেবপ্রিয় শর্ম্মা

আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের শক্তি নাই, শিক্ষা নাই, অর্থবল নাই; ফলে যত দুঃখ কষ্ট, ব্যাধি মহামারী, দুর্ভিক্ষ অনাহার যেন পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। আমাদের বাহিরে কোন সম্মান নাই তাই আমরা সে অভাব অন্তরে পূর্ব্ব-

ট্রট্স্কি (১৯২৪ সালের ছবি)

পুরুষদিগের গৌরব ঐশ্বর্য্য, শিল্প, ইত্যাদি সংক্রান্ত অহঙ্কার পোষণ করিয়া কতকটা পূর্ণ করি। আমাদের বাহিরে স্বাধীনতা নাই, তাই আমরা বিক্ষিপ্তচিত্ততা, সাধনা ও সংযমের অভাব, ও খামখেয়াল দিয়া অন্তরে একটি মিথ্যা মুক্তির সৃষ্টি করিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে প্রকৃত মুক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করি। বস্তুত এই সকল দুর্ব্বলতা আমাদের অন্তরে মুক্তির পরিবর্ত্তে বাহিরে দাসত্ব অপেক্ষা একটা কঠিনতর দাসত্ব আনিয়াছে মাত্র। সাধনা ও সংযম হারাইয়া মুক্তি ও স্বাধীনতার সত্য আদর্শ হইতে যে আমরা ক্রমশঃ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছি না, তাহাই বা কে বলিবে?

ট্রট্স্কি (আধুনিক ছবি)

এখনও আমাদের দেশে মানুষের নিজগুণ অপেক্ষা বংশগুণ সর্ব্বত্র বড় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। এ মূঢ়তা ও অত্যাচারের অর্থ এই দাঁড়াইয়াছে যে মানুষ আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্মোন্নতির চেষ্টাকে ছোট করিয়া

দেখিতেছে; বড় কথা হইয়াছে ঘটনাচক্র বা ঠিকঠিক আঁতুড় ঘরে জন্মগ্রহণ করা। ব্যক্তি বা জাতি কেহই নিজ চেষ্টা ব্যতীত আগাইয়া চলিতে পারে না, কাজেই এদেশের লোকেরা অদৃষ্টচক্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ গড়াইয়া গড়াইয়া দুর্দ্দশার শেষ স্তরে গিয়া পৌছাইয়াছে।

মোস্তাফা কামাল পাশা

এদেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহচরী বলিয়া গণ্য হন না। তাঁহারা এখনও পুরুষের সম্পত্তিরূপেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্ত্রীজাতীয়া শিশু ও বালিকারা এদেশে এখনও "বিধবা" হইয়া চিরকাল কুমারী অবস্থায় কাল কাটাইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের নামে তাহাদের উপর পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার প্রভৃতির ভিতর দিয়া বিশেষ রকম অত্যাচার হয়।

ধর্ম্মের নামে এদেশে যত প্রকার ধর্ম্মহীনতা হইতে পারে প্রায় সবই হয়। নিরীহ পশুহত্যা, নরহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি এদেশে অহরহ ধর্ম্মের নামে হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা, মানবজীবনকে উন্নততর ও সুন্দরতর করিয়া তোলা, তাহা অনেক স্থলে অবহেলার ধূলায় পড়িয়া থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা প্রাণপণে "স্বাধীনতার" জন্য লড়িতেছি। অর্থাৎ অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন আমরা বড় কথার দোহাই দিয়া ছোট কাজ অহরহ করিয়া থাকি, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও সেইরূপ কাগজে, বড় বড় হরফ ও বক্তৃতা মঞ্চে বড় বড় কথা ছড়াইয়া আমরা আসলে ক্ষুদ্র স্বার্থ-

ইজিপ্টের রাজা ফুয়াদ্

সিদ্ধির চেষ্টা (বা দুই চার স্থলে অল্প কিছু ভাল কাজ) করিয়া ফিরিতেছি। রাজনৈতিক মোহন্তরা যে ধর্ম্ম-মন্দিরের মোহন্ত অপেক্ষা খুব উৎকৃষ্ট রকমের লোক, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা আমাদের সকল নীচতা ও ক্ষুদ্রতা-গুলিকে জাগ্রত রাখিয়া শুধু এক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী ও উন্নত করিয়া তুলিবেন বলিয়া

আস্ফালন গাহিতেছেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়; দেশের লোককে তাহাদের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিয়া হতযশ হইবার সাহস এই সকল লোকের নাই; তাই তাঁহারা সামাজিক অত্যাচার, অনাচার, দুর্ব্বলতা, জঘন্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া শুধু ইংরেজের বিরুদ্ধে নিস্ফল বাক্যাস্ফালন করিয়া একাধারে আত্মরক্ষা ও যশ অর্জ্জন করিতেছেন।

এ প্রকার পন্থা অনুসরণ করিলে আমরা স্বাধীন ত কোন দিনও হইব না, বরং উত্তরোত্তর অবনতির চরমে

বেনিতো মুসোলীনি

পৌঁছাইবারই আমাদের সম্ভাবনা অধিক। জাতীয় অবনতি একটি ব্যাধি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তাহার একটি লক্ষণ মাত্র। ব্যাধির মূল উচ্ছেদ না করিয়া শুধু ঐ একটি লক্ষণ দূর করিবার চেষ্টা করিলে প্রথমত লক্ষণটি দূর না হওয়াই অধিক সম্ভব ও দ্বিতীয়ত ওই লক্ষণটি দূর হইলেও আসল ব্যাধিটি বর্ত্তমান থাকিবে এবং তাহাতে জাতির বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় চরিত্র, জাতীয় বুদ্ধি ও জাতীয় আদর্শ উন্নত করিয়া তুলিতে পারিলে আমাদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা আপনা হইতেই সহজ হইয়া আসিবে এবং স্বাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে সাক্ষাৎভাবে আমাদের যাহা লাভ হইবে তাহা খুবই বেশী। তবে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে সৎসাহস ও সত্য শক্তির প্রয়োজন। লোকের দুর্ব্বলতা ও অহঙ্কারকে পুষ্ট করিয়া তাহাদের সখ্যতার সাহায্যে "দেশনায়ক" হইয়া উঠিলে এ কাজ হইবে না। দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধের সহিত মিশিয়া, তাহাদের মতে মত দিয়া "তাহাদেরই একজন" হইয়া গেলে চলিবে না। সাহসের সহিত সত্যকথা বলিতে হইবে ও সাহসের সহিত দেশের
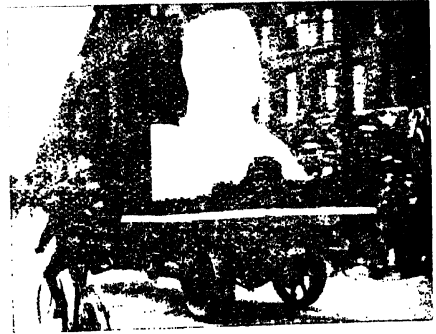
হিণ্ডেনবার্গের আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি বার্লিনের রাজপথে দেখান হইতেছে

লোকের অপকর্ম্মের ও নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং তাহাদের উন্নতির যথার্থ পথ দেখাইয়া দিতে হইবে।

আজ জগতে যে সকল জাতি অগ্রগামী, যাহারা বহু যুগের অন্ধকার ও অবনতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আলোক ও ঐশ্বর্য্যের দিকে ছুটিয়াছে, তাহাদের নেতাগণ শুধু রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা করিয়া কার্য্য উদ্ধার করেন নাই। সর্ব্বত্রই আমরা দেখিয়াছি জাতিকে সকল দিক দিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা। শুধু অধিকার লাভের চেষ্টা নহে, তাঁহারা জাতিকে লব্ধ অধিকারের সুব্যবহার করিতেও সঙ্গে সঙ্গে শিখাইয়াছেন।

আমরা কিছুকাল হইল দেখিতেছি যে আমাদের মধ্যে যাঁহারা "জনহিতার্থে" আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কোন ক্ষমতা হাতে পাইলেই তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জঘন্যতার মূল উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। শুনিয়াছি আমেরিকায় "পলিটিক্‌স্"

একটি ব্যবসা। আমাদের এ অধঃপতিত দেশেও কি তাহাই হইবে ? কোথায় আমাদের আদর্শের সেবক নিঃস্বার্থ কর্ম্মীগণ ? আমারা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া নেতৃত্বে বরণ করিব ? কে আমাদের চরিত্রের, সামাজিক রীতি নীতি, অর্থ ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার বর্ত্তমান দুঃস্থতা হইতে রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইবে ? পারস্যে

পরলোকগত সান ইয়াট সেনের প্রতিদ্বন্দী জেনারেল চেন চুয়াজ মিং

রেজা খাঁ পহ্লবী, আফগানিস্থানে আমানুল্লা খাঁ, তুরস্কে কামালপাশা, মিশরে জগ্‌লুল, রুশিয়ায় লেনিন ও ট্রট্‌স্কি, ইটালীতে মুসোলীনি ও চীনে সন্‌য়্যাৎসেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ নিজ নিজ জাতিকে জাতীয় আদর্শ অনুসারে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন; কিন্তু আমরা কোথায় ? "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" ও স্বপ্ন দেখে যে কখন তিন মাসে, কখন ন মাসে স্বাধীনতা আসিতেছে, কখন হিন্দু মুসলমানে মিলন হইতেছে, কখন জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে, কখন বা বাল্যবিবাহের ও অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইতেছে। কাজ কোথায় ? কাজ দেখিতে চাই।

টুয়ান চি-জুই—চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি

ঐ দেখ আভিজাত্য প্রপীড়িত রুশিয়াতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, গুণের আদর হইতেছে, ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও কার্য্যক্ষমতা পুরস্কৃত হইতেছে। ঐ দেখ তুরস্কে অবরোধ ও ধর্ম্ম-দাসত্বের নিদর্শন "ফেজ" আর নাই। নরনারীর সম অধিকার আজ তুরস্কের মন্ত্র। মুস্তাফা কামাল পাশা নব্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া তুর্কী জাতিকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছেন। সেখানে কাজ হইতেছে অনেক, কথা খুবই কম। ঐ দেখ মেক্সিকো কিরূপে রাষ্ট্রপতি কালেসের অধিনায়কতায় পুরাতনপন্থী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আবার দেখ মিশরে জগলুল পাশা কেমন করিয়া নবীন মিশরীকে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত রাজা ফুয়াদের আমলেও জাতির আদর্শ সম্বন্ধে সদা জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন। মিশর মানুষ

চ্যাং সো লিন্—মাঞ্চুরিয়ার সেনাধ্যক্ষ

মিষ্টার ষ্ট্যান্লী বল্ড্‌উইন—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি

চায়, পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, এবং সে তা পাইবে; কেননা তাহার অন্তরে আত্ম-প্রবঞ্চনা নাই। সে ভারতের মত বলে না যে, "আমার এইসব ক্ষতগুলি বজায় থাক্, শুধু ঐ ক্ষতটা সারিয়া যাক্।" ম্যালেরীয়াটি থাকুক এবং রক্তাল্পতাটি দূর হউক। এরকম আদর্শে চিকিৎসার কার্য্য চলিতে পারে না। হয় পূর্ণ স্বাস্থ্যের দিকে যাও, সকল ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর, নয় কোন কথা না বলিয়া সকল কষ্ট সহ্য কর। টিকিও রাখিব, সাহেবও হইব, এরূপ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যের মিথ্যা-অহঙ্কার বুকের ভিতর পুষিয়া কেহ অকারণে-নীচ-বলিয়া-বিবেচিত দেশভ্রাতার সহিত মিলিত হইতে পারে না। অজ্ঞ স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে পালিত হইয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে না। বালক-বালিকার সন্তান হইয়া জাতি কখন সবল হইতে পারে না। সামাজিক বহু বিষয়ে নীচমনা ও মিথ্যাচারী হইয়া কেহ রাষ্ট্রক্ষেত্রে উন্নতচরিত্র হইতে পারে না। ঘরের একটা কোণ ঝাঁট দিয়া ও অপর অংশ আবর্জ্জনায় পূর্ণ রাখিয়া কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না। কিন্তু আমরা আশা করি, যে, জাতীয় জীবনে অসংখ্য অবিচার, অত্যাচার, নীচাচার, নির্ব্বুদ্ধিতা, মিথ্যা ও দুর্ব্বলতা পুষিয়া রাখিয়াও আমরা ইংরেজের হাত হইতে নিজেদের হারান স্বাধীনতা কাড়িয়া লইব। হায় আশা!

এই যে জাপান নিজেকে আজ জগতের জাতিসভায় বেশ উচ্চাসনে বসাইতে সক্ষম হইয়াছে; তাহা কি আমাদের ন্যায় সব কার্য্যের অর্দ্ধেকটুকু করিয়া, না ভাষা, হরফ, স্কুল কলেজ, আইন আদালত, রীতিনীতি, শাসন-প্রণালী, সৈন্য ও নৌবল, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রাণপণ উন্নতির চেষ্টা করিয়া? চীনের আধুনিক যুগেও আমরা দেখিতেছি এই সর্ব্বমুখী সংস্কার-প্রচেষ্টা।

এশিয়া ছাড়িয়া ইউরোপের দিকে চাহিয়াও আমরা পাই সেই একই পূর্ণজাগ্রতভাবের পরিচয়। মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা জাতীয়-ভাবে বেশী করিয়া খাটিয়া ও অপর প্রকার চেষ্টা করিয়া বহুল অংশে দূরীভূত হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পরায়ণ জার্ম্মান শ্রমিক-

গণ কাজে ফাঁকি দিয়া অপরের স্কন্ধে দেশ সেবার "বোঝা" ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। যে অসাধারণ সংঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়া জার্ম্মানরা যুদ্ধের সময় জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল, আজ শান্তির সময় অর্থনৈতিক কার্য্যের ভিতরেও তাহারা সেই একই ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। ইংলণ্ডের গত মহাধর্ম্মঘটের সময় প্রধান মন্ত্রী বল্ড উইন্ ও তাঁহার সহচরগণের অধিনায়কত্বে ইংরেজ জাতি যে ভাবে জাতীয় কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের জাতীয়তার পূর্ণাঙ্গতা ও জীবন্ততাই প্রমাণিত

জগলুল পাশা

রেজা খাঁ পহ্লবি, পারস্যের সংস্কারক

মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি কালেস

হইয়াছে। মুসোলিনীর নায়কত্বে ইটালিও সেইরূপ জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতেছে। এই সকল জাতির আদর্শ যে সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এমন বলা যায় না; তবে যে জীবন্ত জাতীয়তা তাহাদের সকল কার্য্যে সক্ষমতা আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের সত্যই মুগ্ধ করে। সে জাতীয়তার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মিলন ও আদর্শের

লেনিন

ক্ষেত্রে ঐক্য। সমাজে অন্যায় পার্থক্য ও অবিচার থাকিলে এরূপ মিলন সম্ভব হয় না। এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ জীবনযাপন না করিলে জাতি সবল ও শক্তিশালী হইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল জাতিদের প্রতি চাহিয়া আমরা ইহাই শিখিতেছি যে জাতীয় উন্নতির কার্য্য শুধু বক্তৃতায় হয় না—তাহা সুসাধিত করিতে হইলে বুদ্ধিমান চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, সৎসাহসী, শ্রমশীল ও শিক্ষিত কর্ম্মীর আবশ্যক। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও জিহ্বার ক্ষিপ্রতা অপেক্ষা হৃদয়ের সুস্থতা, মস্তিষ্কের তেজ ও মাংসপেশীর সবলতা জাতি গঠনের অধিক সহায়ক।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(২০)

পূজার পর পাঁচ মাস কাটিয়া গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের শীত 'যাই যাই' করিয়াও যায় না। এ যেন তাহার বিদায়বেলার লুকোচুরি খেলা। বসন্তের অগ্রদূত এক-পালা আগুনে-বাতাস ছড়াইয়া দিয়া একটু অন্যমনস্ক হইতেই বিচ্ছেদকাতর শীত ছুটিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আসর জমকাইয়া বসে।

মাঘ মাসেই ময়নার শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। তাই মাসখানেক হইল ক্ষিতিধর তাহাকে লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল দেশে কলিকাতার চেয়ে শীত অনেক বেশী। চার পাঁচ মাস পরে হঠাৎ এই শীতে গিয়া পড়িলে ময়নার অসুখ করিয়া পড়িতে পারে। তাই সে দিন কতক অপেক্ষা করিয়া শীতটা কমিলেই যাইবে স্থির করিয়াছে। ময়নার শরীর সম্বন্ধে ক্ষিতিধরের এতখানি বিবেচনা দেখিয়া এ বাড়ীর কর্ত্তাগৃহিণীরা সকলেই খুব খুসী, কিন্তু তাহার শালা শালাজেরা এতখানি দরদের গূঢ় অর্থ খুঁজিতে ব্যস্ত। বড়মানুষে গ্রীষ্মের দারুণ তাপের ভিতর হইতে হঠাৎ হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতের ভিতর সখ করিয়া গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে ত তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল বই মন্দ হয় না। আর শীতকালে দু-চার ডিগ্রী বেশী শীতের ভিতর যাইলে একটা সুস্থ মানুষের কি হইতে পারে?

ক্ষিতিধর বাপের ও মাসির আদুরে ছেলে, শ্বশুর বাড়ীতে দুই চারদিন কাটাইতে চাহিলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু শীত এবার বারবারই পড়িতেছে, ক্ষিতিও ততই দিন পিছাইতেছে; জমিদার বাড়ীর লোকের চক্ষে ইহা আর ভাল ঠেকিতেছিল না। তাঁহাদের বাড়ী জামাইরা বছরে ছয়মাস কাটাইয়া যায় বলিয়া ছেলেরাও যদি শ্বশুর বাড়ীতে আস্তানা গাড়িয়া বসে তাহা হইলে এত বড় ঘরের মান থাকে কি করিয়া? সৃষ্টিধর ছেলেকে একটা তাড়া দিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন বিকাল বেলা ময়নার শুইবার ঘরে বসিয়া গৌরী ও ময়না সেলাই ও গল্প করিতেছিল। ময়না আসিয়া পর্য্যন্ত গৌরী সময়ে অসময়ে তাহার ঘরে আসিয়া জোটে। কল্পনায় বন্ধুর যে রূপ গৌরী গড়িয়াছিল বাস্তবে অবশ্য তাহা সে পাইল না, দেখিল আর পাঁচটি মেয়ের মত ময়নাও অকাল-যৌবনের তাড়নায় অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। তবুও গৌরীর উপর তাহার ভালবাসাটা বিচ্ছেদে শুকাইয়া যায় নাই; বড় ঘরের উদয়াস্ত কায়দাকানুনের চাপে তাহার মনটা হাঁপাইয়া উঠিয়া বারবার সেই শৈশবের সরল অকৃত্রিম আড়ম্বরহীন বন্ধুত্বটুকুই কেবল ফিরিয়া চাহিয়াছে। তাই অনেকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া গৌরীকে নিঃসঙ্গ পাইয়া ময়না তাহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে।

এতদিন বেশ চলিতেছিল, কিন্তু ময়নার বর আসিয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য মেয়েরা গৌরীকে দিবারাত্রি বকুনি দিতেছে, "ওর বর এসেছে, তুই বোকা মেয়ে, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই সেখানে হাঁ ক'রে প'ড়ে থাকিস্ কেন? খবদ্দার যাবি না।"

গৌরী বলে, "আমি তার কি করব? ময়না আমায় নিয়ে যায় কেন? ওর বরই ত আমায় আরো ধ'রে রাখে। কেবল বলে, বোসো বোসো।"

মেয়েরা কেহবা মুখ টিপিয়া হাসে, কেহবা গম্ভীর হইয়া চলিয়া যায়। ময়না আসিয়া আবার গৌরীকে আপনার ঘরে ধরিয়া লইয়া যায়। ক্ষিতিধর তাহার সহিত মহা ভাব জমাইয়া তুলিয়াছে। রাঙা বৌদি না হইলে তাহার কোনো খেলা গল্প কিছুই ভাল লাগে না। তাস খেলা, গল্প করায় ত বৌদিকে চাইই; বায়োস্কোপ দেখার সঙ্গী করিতেও আগ্রহের অন্ত নাই। বাড়ীতে সকলে গর্দায় বসাইতে বলে বলিয়া সেটা আর হয় না।

ময়নারা যেখানে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল, ক্ষিতিধর বাবার চিঠি হাতে করিয়া সেইখানে আসিয়া ঢুকিল। ময়না তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় একহাত কাপড় টানিয়া দিল। গৌরী খোলা মাথায়ই বসিয়া রহিল। ক্ষিতিধর তাহার দেবর হইলেও তাহার সম্মুখে মাথায় কাপড় দেওয়া গৌরীর কোনোদিন অভ্যাস নাই, কেহ শিখাইয়াও দেয় নাই।

আজ সারাদিনের টিপ্ টিপে বৃষ্টি, মেঘলা ও কন্‌কনে হাওয়ার পর বেলা শেষে মেঘের গায়েই একটুখানি রোদ উঠিয়াছিল। কাচের জান্‌লা ভেজাইয়া গৌরীরা তাহার ধারে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল। গৌরীর তখনও চুল বাঁধা হয় নাই; বৃষ্টির শেষে দিনান্তের মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় আকাশে রঙের ছড়াছড়ি। কাচের জানালার নানা কোণ দিয়া সেই রঙীন আলো গৌরীর এলোচুল ও খোলা মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষিতিধর ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, গৌরীর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, "রাঙা বৌদি, চোখ যে ঝল্‌সে গেল।"

গৌরী বলিল, "কেন ভাই, রোদ ত বেশী নেই।"

ক্ষিতিধর বলিল, "তুমি বড় বোকা।"

ময়না হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আঃ, বাজে বোকো না শুধু শুধু।"

ক্ষিতিধর তাড়াতাড়ি কথা বদ্‌লাইয়া বলিল, "দেখ, বাবা ত আজ আবার যাবার কথা লিখেছেন। কিন্তু ময়না, তুমি না বল্‌ছিলে শরীরটা ভাল নেই। কি ক'রে এর ভিতর বেরুই বল ত?"

ময়না বলিল, "ঃ ভারি ত! একটু পা কন্‌কন করেছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, তাকে কি শরীর খারাপ বলে নাকি? আমার চেয়ে তোমারই দেখ্‌ছি এখানে এসে ছুতো খোঁজবার বেশী ঝোঁক হয়েছে। আমার আর কি? থাক্‌তে পেলে ত বেঁচে যাই, কিন্তু সেখানে গেলে কথার খোঁচায় প্রাণান্ত ক'রে যখন ছাড়্‌বে, তখন ত আর তুমি কৈফিয়ৎ দিতে আস্‌বে না।"

গৌরী বলিল, "তবে ভাই, ময়নার থেকে কাজ নেই। যাওয়াই ভাল।"

ক্ষিতিধর বলিল, "তুমিও চল না রাঙা বৌদি। তাহ'লেই গোল চুকে যায়। অনেকদিন ত যাওনি সেখানে।"

গৌরী হঠাৎ মুখখানা মলিন করিয়া বলিল, "আমার ত সেখানে কেউ নেই। কেউ আমাকে ভালও বাসে না।"

ক্ষিতিধর চট্ করিয়া মুখখানা নীচু করিয়া গৌরীর কানের কাছে লইয়া গিয়া অতি ধীরে বলিল, "একজন বাসে বোধ হয়। নয় কি?"

গৌরী মুখ তুলিয়া হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া কেমন একটু গম্ভীর হইয়া গেল। ময়না বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখখানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষিতিধর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বৌদি, দুচার দিন গিয়ে যদি থাকতে পার তাহলে কিন্তু বেশ মজা হয়। আমরাই আবার ফিরে দিয়ে যাব এখন। কি বল, ময়না? না হয় আমি একাই দিয়ে যাব।"

ময়না গম্ভীর হইয়া বলিল, "গৌরী কেন যেতে যাবে সেখানে? সে ওদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, শুধু শুধু গায়ে পড়তে যাবে কেন?"

গৌরীর সঙ্গে ক্ষিতিধরের দুইদিক দিয়াই হাসিঠাট্টার সম্পর্ক; একে সে ক্ষিতির বৌদি, তাহার উপর আবার শালী। সুতরাং অষ্টপ্রহর যখন-তখন গৌরীর সঙ্গে তাহার গল্প-গুজবে কেহ নিন্দা করিতে পারে না। কিন্তু ময়নার ইহা ভাল লাগিত না, তাহার মন ইহাতে সায় দিতে চাহিত না। ক্ষিতিধরের ধরণ-ধারণ ও হাসি-তামাসাগুলাকে সে নিছক ঠাট্টা মনে করিতে পারিত না। তাহার কোথায় যেন একটু খট্‌কা লাগিত। গৌরী ত এতদিন তাহারই বন্ধু ছিল, এবং সেই সূত্র ধরিয়াই ক্ষিতিধর গৌরীর সহিত এতটা আত্মীয়তা পাতাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু ক্রমে যেন মনে হয় সে এ সখ্যচক্রের ভিতর হইতে ময়নাকে বাদ দিয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচে। গৌরী তাহা এখনও বোঝে না, এই ছিল রক্ষা; কিন্তু পাছে সে বুঝিয়া কিছু ভাবিয়া বসে ইহাই ছিল ময়নার ভয়। সে তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনেই শ্বশুরবাড়ীতে যে-সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা গৌরীকে শুনাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের স্বামীকে দুইচারিটা কথা যে সে না শুনাইত তাহা নয়। ভাগ্য দোষে ফল তাহাতে উল্টা হইল। ক্ষিতিধরের কেমন একটা ঝোঁক চাপিল যে সে গৌরীকে একবার বাড়ী লইয়া যাইবেই।

ময়নার কথাতে ক্ষিতিধর বলিল, "কেন যাবে না কেন? তুমিও আমাদের বাড়ীর বউ, বৌদিও আমাদের বাড়ীর বউ। তুমি যেতে পার আর বৌদি পারে না?"

এ কথার উত্তরে একমাত্র যা বলা যায় সে নিষ্ঠুর কথাটা গৌরীর সামনে ময়না বলিতে চাহিল না; সুতরাং সে চুপ করিয়াই রহিল। গৌরী কিন্তু আজ আর চুপ করিয়া রহিল না; সে বলিল, "না ভাই, এখন আর আমি তোমাদের বাড়ীর বউ হ'তে চাইনা। যার সঙ্গে মা বাবা আমায় তোমাদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন সে যখন নেই তখন আমি শূন্যের উপর ফাঁকা একটা আত্মীয়তা গ'ড়ে কারুর বাড়ী যেতে পারব না। ময়নার বোন ব'লে শুধু যদি যেতে পারতাম তাহ'লেও না হয় হ'ত।"

গৌরীর মুখে এমন কথা শুনিয়া ময়না ও ক্ষিতিধর দুজনেই বিস্মিত হইয়া গেল। গৌরীর মুখে ছেলেমানুষী কথা শোনাই তাহাদের অভ্যাস; চিন্তার এমন একটা গভীরতার পরিচয় তাহার কাছে তাহারা আশা করে নাই।

ক্ষিতিধর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই না হয় চল। তোমাকে আমি বৌদি আর বল্‌ব না, গৌরী দিদি বল্‌ব এখন।"

গৌরীর ওকথার পর এঠাট্টাটা ময়নার একটুও ভাল লাগিল না। সে রাগিয়া বলিল, "তোমার বাড়ী যাবার জন্যে ত মানুষের ঘুম হচ্ছে না। তুমি ছাই ভস্ম না ব'কে বাবার কাছে কাজের কথাটা ঠিক ক'রে এস গিয়ে। আর যাবার দেরী করলে তোমার মাসিমা আমায় আর আস্ত রাখ্‌বেন না।"

ক্ষিতিধর ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মাথা হইতে মতলবটা সহজে দূর হইল না। পথে শঙ্করকে দেখিয়া সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "শঙ্করদা, বাবা আমাদের যাবার জন্যে তাড়া দিয়ে লিখেছেন। সেই সঙ্গে জ্যাঠা মশায়ও রাঙা বৌদিকে একবার পাঠাতে বলেছেন। তাঁদের বড় ইচ্ছা ওকে দিনকতক কাছে রাখেন।"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আজ তিন চার বছর হ'য়ে গেল, কখনও ত এমন কথা শুনিনি। আজ আবার তাঁদের এ খেয়াল হ'ল কেন? গৌরীকে বাবা ত কোনো নিয়মপালন করতেই দেন্‌নি; সে সেখানে গিয়ে পড়লে

তোমাদের বাড়ীশুদ্ধই হয়ত তার রকম দেখে আঁৎকে উঠ্‌বেন।"

ক্ষিতি একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "বড় ত হয়েছে, কি করতে হয় না হয় সে কি আর বুঝে করতে পারবে না? তাছাড়া একদিন ত করতেই হবে, চিরকালই ত আর কিছু তোমাদের বাড়ীতে ও কাটাবে না।"

শঙ্কর বলিল, "তোমাদের বাড়ীতেই যে কাটাবে তাই বা কে বল্‌লে?"

ক্ষিতিধর রাগিয়া বলিল, "কাটাবে না ত যাবে কোথায় শুনি? তোমাদের মতলবটা কি বল ত। জ্যাঠা মশায় দেখছি মিথ্যে রাগ করেননি। তাঁর কথাগুলো মনে আছে ত?"

শঙ্কর বলিল, "হ্যাঁ, সব কথাই মনে আছে। আমাদের মতলব হচ্ছে কচি মেয়েটাকে তোমাদের অপার স্নেহের হাত থেকে কিছুদিন রক্ষা করা। আর বেশী কিছু নয়; কারণ সে রকম মতলব করলেই কুটুম্বভাগ্য যে আগের বারের চেয়ে ভাল হবে তা কে বল্‌তে পারে? যাহোক তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে ত বাবাকে গিয়ে বল্‌তে পার।"

ক্ষিতিধর খুবই রাগিল, কিন্তু চট্ করিয়া গিয়া হরিকেশবকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। কারণ, গৌরীকে লইয়া যাইবার কথা বাস্তবিক কেহই লেখে নাই। কথাটা বাহির হইয়া পড়িলে কি না কি গোল বাধিবে বলা যায় না। ক্ষিতিধরের বয়স যদি মাত্র উনিশ বৎসর না হইত, তাহা হইলে হয়ত সে এ গণ্ডগোলটা বাধাইতে ভয় পাইত না। কারণ সত্য মিথ্যা সকল দাবীর পিছনেই এরকম ক্ষেত্রে যে পিতৃকুলের সপক্ষতা তাহাকে সাহায্য করিতে পারে এতটা ভরসা তখনও তাহার হয় নাই। বৈবাহিক নির্য্যাতনে যাহারা আনন্দ পায় তাহারা যে মিথ্যা রচনার জন্য ক্ষিতিধরকে কোনো দোষ নাও দিতে পারে একথা তাহার ধরিয়া লইতে সাহস হইল না।

বাহির বাড়ীতে হরিকেশব কি একটা সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিতে ব্যস্ত ছিলেন; ক্ষিতিধর চিঠিখানা হাতে করিয়া সেখানে গিয়া বলিল, "আমাদের যাবার জন্যে বাবা আবার লিখেছেন।"

চশমাটা বইএর পাতার ভিতর রাখিয়া হরিকেশব মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা ত লিখ্‌তেই পারেন। তোমরা কি করতে চাও?"

ক্ষিতিধর মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "কাল পরশুই ত যাব ভাব্‌ছি; আর মনে করছি গৌরী বৌদিকেও দিনকতকের জন্য আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই।"

হরিকেশব চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন? তার ত তোমাদের সঙ্গে যাবার কোনো কারণ দেখ্‌ছি না।"

ক্ষিতি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "জ্যেঠা মশায়রা অনেকদিন দেখেন নি। কেমন আছে, কি ভাবে চল্‌ছে ফিরছে একটু ত এখন থেকে জানা দরকার।"

হরিকেশব হঠাৎ শক্ত হইয়া বলিলেন, "না, তার কোনো দরকার নেই। যেখানে ওর কোনো আনন্দ, কোনো অধিকার নেই, সেখানে গিয়ে কতকগুলি দুঃখ বেদনা ও দুর্ভাগ্যের স্মৃতিমাত্র সংগ্রহ ক'রে আন্‌বার জন্যে গৌরীকে আমি কখনই পাঠাব না। আমি চাই যে, সে দুঃখের জীবনের কথা ওর স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যাক্।"

ক্ষিতিধর বলিল, "তাঁদেরও ত ছেলের বউ, তাঁদেরও ত কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে।"

হরিকেশব বলিলেন, "দেখ, অপ্রিয় কথা আমি বল্‌তে চাই না; কিন্তু তুমি যখন বলাবেই তখন উপায় নেই। গৌরী তোমাদের বাড়ী বউ হ'য়ে ন'দিন মাত্র ছিল, শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে সেইটুকু মাত্র তার পরিচয়। তাঁদের ছেলেটি যাবার পর গৌরীর সঙ্গে আর কোনো বন্ধন-সূত্রই সে সংসারের নেই। সেক্ষেত্রে আমার আজন্মের বন্ধন আমাকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছে সেই মমতার পথ থেকে তাঁদের কথায় কৃচ্ছ্রসাধনের পথে আমি আমার মেয়েকে ফেরাতে পারব না। যেখানে স্নেহ এককণা দিতে পারেন নি সেখানে দুদিনের বন্ধনের দাবীতে তাঁরা এতটা দাবী করতে চান কি ক'রে জানি না।"

ক্ষিতিধর দেখিল, ভুল রাস্তা ধরা হইয়াছে; এভাবে তর্ক করিয়া সে পারিবে না। এক আইন কানুনের কথা তোলা যায়, কিন্তু গুরুজনের সামনে সে কথা তোলা শোভন হইবে কিনা এবং বাস্তবিকই আইন কাহার দিকে সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সুতরাং সে আর কিছুই বলিল না।

ক্ষিতিধর চলিয়া গেল। কিন্তু হরিকেশব ভাবনায় পড়িলেন। এই মাত্র দিনকতক আগে এলাহাবাদ হইতে নৃপেন্দ্র আসিয়াছিল, বিবাহের কথা আর একবার তুলিতে। কিন্তু গৌরীর শ্বশুরবাড়ীর যে রকম কথা ও কাজের সুর দেখা যাইতেছে তাহাতে এরকম কোনো কথার আভাস পাইলে তাহারা যে কি কাণ্ড করিবে তাহা বেশ বোঝাই যাইতেছে। মামলা মোকদ্দমা যদি বাধাইয়া বসে তাহা হইলে হার জিত যাহারই হউক না কেন মেয়েকে লইয়া সহরে এমন একটা ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে যে ভবিষ্যৎটা তাহাতে তাহার একেবারে অন্ধকার হইয়া যাইবে। কাজেই বিবাহ ত দূরে থাক্ গৌরীর বাগ্দানও করা চলে না। নৃপেন্দ্রকে গোপনে ফিরাইয়াই দিতে হইবে। গৌরীকেও আর এমন করিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। তাহার পড়াশুনার জন্য একটা লোক রাখিয়া দিতে হইবে।

এদিকে বাড়ীতে যাত্রার আয়োজন লাগিয়া গেল। গৌরীর যে যাওয়া হইল না ইহাতে ময়না যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; কিন্তু ক্ষিতিধর কেবল যে মুসড়িয়া গেল তাহা নয়, মনে মনে রাগে গর্জ্জাইতে লাগিল। ইহার একটা প্রতিশোধ না লইয়া সে ছাড়িবে না।

জিনিষপত্র গুছাইবার ছলে ক্ষিতিধর কেবলই সদর ও অন্দর করিয়া বেড়াইতেছিল। একরাশ কাপড়-চোপড়ের মধ্যে মেজেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গৌরী ময়নার বাক্স সাজাইয়া দিতেছিল। ক্ষিতিধর আসিয়া বলিল, "বৌদি, তোমাকে ত নিয়ে যেতে পার্‌লাম না; চিঠিপত্র লিখলে জবাব দেবে ত?"

গৌরী বলিল, "দেব না কেন? নিশ্চয় দেব।"

ক্ষিতিধর বলিল, "তোমার কি আর আমাকে মনে থাক্‌বে? আমি একটা কোথাকার কে তার জন্যে তোমার ত বড় ব'য়েই যাবে।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "তোমার মাথা খারাপ।"

বাহিরে খাবার ডাক পড়িয়াছিল, সুতরাং তার অপেক্ষা না করিয়া গৌরী উঠিয়া পড়িল। আজ তাহার ক্ষিতিধরের কথা সত্যই বড় অদ্ভুত লাগিতেছিল। ময়না চলিয়া যাইবে বলিয়া তাহার খারাপ লাগিলেও ক্ষিতিধর যে যাইবে ইহাতে যেন সে একটু আশ্বস্ত বোধ করিতেছিল।

(২১)

ময়নারা আজ পাঁচ সাতদিন চলিয়া গিয়াছে। একলা একলা গৌরীর দিনগুলি আর কাটিতে চাহে না। আজ কয়দিন হইতে দুপুরবেলা এক শিক্ষয়িত্রী তাহাকে পড়াইতে আসেন। তিনি রোজকার যতটুকু পড়া বাড়ী হইতে নিজে শিখিয়া আসেন তাহার বেশী তাঁহাকে পড়াইতে বলিলে পারেন না, উপরন্তু ঠাট্টা মনে করিয়া রাগিয়া যান; কাজেই যতক্ষণ খুসী তাঁহার সহিত পড়াশুনা করা যায় না। অন্য সঙ্গীও মিলে না। এমন করিয়া দিন কাটাইতে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। কি লইয়া তাহার জীবন কাটিবে এভাবনাটা আজ কয়দিন তাই তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মা বাবা তাহাকে আনন্দে রাখিতে চান, কিন্তু তাহার এই জড়প্রায় উদ্দেশ্যহীন জীবনে সে ত আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কুমারীর জীবন হইতে তাহার জীবনে যে অনেক প্রভেদ তাহা দেশে আসিয়া প্রতিপদেই সে বুঝিতেছে। অথচ কেবল কুমারীর ছদ্মবেশটুকু ধারণ করিয়া তাহাকে তৃপ্ত হইতে হইবে। আনন্দের নামে এ এক নূতন যন্ত্রণা।

তাহার উপর অন্য যন্ত্রণাও আসিয়া জুটিয়াছে। নৃপেন্দ্র যে কলিকাতায় আসিয়াছে গৌরী তাহা জানিত না। এলাহাবাদ হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত সংসারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাহার জীবনে দুঃখবোধ অনেক বাড়িয়াছিল, কিন্তু এই একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। বিবাহ তাহার হইতে পারে কি পারে না ইহা ত তাহার নিকট একটা সমস্যাই ছিল, তাহার উপর এই ক্ষুদ্র জীবনের

অমল ও সুধা
(দিল্লীতে "ডাকঘরের" অভিনয়)

অভিজ্ঞতায় তাহার মনে বিবাহ-ভীতিও একটা জন্মিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়া এই ভয় ও ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে মনে করিয়া সে একদিকে আরাম পাইয়াছিল।

আজ সকালে গৌরী যখন যগুয়ার নিকট হইতে ডাকের চিঠিগুলি লইয়া মেয়েদের ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিতেছিল, তখন হঠাৎ একখানা চিঠির উপর নিজের নাম দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যায়। সবাইকার চিঠি দেওয়া হইয়া গেলে সে উপরের ঘরে গিয়া চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল, নৃপেন্দ্র লিখিয়াছে। আবার নৃপেন্দ্র! কি একটা ভয়ে যেন গৌরীর হৃৎপিণ্ডটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্র কলিকাতা হইতেই লিখিয়াছে। তাহারই জন্য যে সুদূর পশ্চিম ছাড়িয়া সে নির্বান্ধব কলিকাতায় আসিয়া ঘুরিতেছে, এই কথাটাই নানা আকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফেনাইয়া লিখিয়াছে। কিন্তু গৌরীর নিষ্ঠুর পিতা তাহার বেদনা, তাহার প্রেম, তাহার নিষ্ঠা কিছুই বুঝিলেন না, অনায়াসে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই সঙ্কটে গৌরী তাহার সহায় না হইলে তাহার ব্যর্থ জীবনে কোনো শান্তি ও সান্ত্বনা সে খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার এ দুঃখে পাষাণী গৌরীর হৃদয় কি গলিবে না?

চিঠিখানা পড়িয়া ভয়ের সঙ্গে গৌরীর মনে একটু মমতারও উদ্রেক হইতেছিল। শুধু তাহারই জন্য একটা মানুষ এমন করিয়া মরিতেছে! কিন্তু এইখানেইত চিঠি শেষ হয় নাই। নৃপেন্দ্র সবিস্তারে বৈধব্যের দুঃখ-যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে, "সুখ সৌভাগ্য যখন তোমার দরজায় এসে সেধে ডাক দিচ্ছে, তখনও কি তুমি এই দুর্ভাগ্য বরণ ক'রে নিয়ে প'ড়ে থাকতে চাও? মনে কর দেখি ভবিষ্যতের কথা,—মা-বাবা কেউ নেই, দুটি অন্নের জন্য পরের মুখ চেয়ে আছ, একখানা ভাল কাপড় পরতে সাহসও নেই, সাধ্যও নেই, একখানা গহনা পরবার অধিকার নেই, নিজের ব'লে দাবী করবার একটা মানুষ নেই; সকল সাধ, সুখ ও সঙ্গ টিপে মারতে হচ্ছে, জীবনে আছে শুধু দুঃখযন্ত্রণা আর শূন্যতা। তোমার ভয় করে না এসব কথা ভাবতে?"

গৌরীর মনে যেটুকু মমতা হইয়াছিল একথায় তাহা সমস্ত উবিয়া গেল। তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। কেন সে অন্নের জন্য পরের মুখ চাহিবে? কেন সে দুর্ভাগ্যকে দেখিয়া ভয়ে পিছাইবে? সে কি মানুষ নয়? আপনার অন্ন সে আপনি উপার্জ্জন করিয়া আনিবে। দুঃখকষ্টকে সে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবে। সে কাহারও কৃপাভিক্ষা চাহে না। ভগবান যদি তাহার ভাগ্যে দুঃখ লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে কাঁদিয়া কি সে দুঃখের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে আর পরের কৃপার দান লইয়া সুখী হইতে যাইবে? না, তাহা হইবে না।

সারাদিন নৃপেন্দ্রর চিঠিখানা গৌরীকে উত্তেজিত করিয়া রাখিল। এ চিঠির সে কি জবাব দিবে অথবা মোটেই জবাব দিবে কি না ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। যাহার সহিত কোনো সম্পর্ক নাই এবং হইতেও পারে না তাহাকে চিঠি লেখাটা মেয়েদের পক্ষে অন্যায় বলিয়াই গৌরীর ধারণা ছিল। অথচ কিছু না লিখিলে তাহার মনোভাবটাই বা সে জানাইবে কি করিয়া? বেচারী নৃপেন্দ্রও ভাবিয়া মরিবে। গৌরী লিখিল, "আপনি আমাকে এ রকম পত্র আর লিখিবেন না। আমি কাহারও দয়া চাই না।"

দুই ছত্র চিঠি লিখিয়াই ভয়ে গৌরীর বুক ঢিপ্ ঢিপ করিতে লাগিল। না-জানি সে কি অন্যায় কাজই করিয়া বসিল। মা-বাবা জানিতে পারিলে হয়ত আর তাহার মুখদর্শন করিবেন না। গৌরীর আর কিছু লেখা হইল না। অনেক ভাবনা চিন্তা ও মানসিক তর্ক-বিতর্কের পর সাহস করিয়া এই দুইছত্র চিঠিখানা সে ডাকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু দুর্ভাবনায় তাহার সমস্ত দিনটা বিস্বাদ হইয়া গেল।

শিক্ষয়িত্রী রিক্স চড়িয়া দুপুরবেলা পড়াইতে আসিলেন। গৌরী বড় বেশী প্রশ্ন করে বলিয়া আজ তিনি সারা সকাল চেষ্টা করিয়া অনেকখানি পড়িয়া আসিয়াছেন, খাতাতেও কিছু কিছু লিখিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু গৌরী আজ কিছুই পড়িল না। সে কেবল যত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একবার বলে, "আচ্ছা, আপনি কি নিজের সমস্ত খরচ নিজে চালান না আর কেউ আপনাকে

সাহায্য করেন ?" আবার বলে, "আচ্ছা, আপনি ত বিয়ে করেননি, তার জন্ম আপনাকে কি খুব কষ্ট পেতে হয় ?" শিক্ষয়িত্রী গৌরীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, কিন্তু রাগ করিতে পারিলেন-না। তাহার কথায় অশিষ্ট কৌতূহল ত নাই, কি একটা বেদনা যেন নানা প্রশ্নে ফাটিয়া পড়িতেছে। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে কি বলিবেন কি সান্ত্বনা দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি বই খাতা লইয়া অন্ত বাড়ীতে পড়াইতে চলিয়া গেলেন। ছাত্রীদের পড়া দেওয়া আর নেওয়া তাঁহার কাজ। তাহার বাহিরে অন্ত কোনো কথা কেহ তুলিলে বেচারী বিব্রত হইয়া পড়েন। পলায়নই সেখানে তাঁহার মুক্তির উপায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। শীতকালের সহরের ধোঁয়ায় তারার আলো, গ্যাসের আলো পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে দুই দশ হাতের বেশী দৃষ্টি চলে না। দিগন্ত জোড়া বিরাট অন্ধকারের বুকে মাঝে-মাঝে জোনাকির মত আলোর ফোঁটাগুলি সহরের অস্তিত্বটুকু মাত্র জানাইয়া দেয়। গৌরীর মনটাও এমনি অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছিল। কোন্ পথে কোন্ দিকে যে সে চলিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অথচ এই ভাবনাটা ইহার পর যে তাহাকে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে সে জ্ঞানটাও তাহার ক্রমশ জাগিতেছিল।

আজ সকল দিক হইতেই তাহাকে যেন কিসে পাইয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যার পর ঘরে তাহার ভাল লাগিল না। সে অন্ধকার ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আপনার চিন্তাগুলি গুছাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় শৈল আসিয়া হাজির। তাহার হাতে আর একখানা চিঠি। গৌরী ভয় পাইয়া গেল। এ আবার কাহার চিঠি ? খুলিয়া দেখিল ক্ষিতিধরের। মজার একটা চিঠি মনে করিয়া মনটা তাহার একটু খুসী হইল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। চিঠির সুরে আনন্দ কোথায় ? ভাইয়ের সংসার অপেক্ষা দেবরের সংসারেও স্ত্রীলোকের যে সম্মান বেশী, চিঠিতে ক্ষিতিধর এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। সৌখিনী ও বিলাসিতার মোহে পড়িয়া গৌরী যে তাহার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে ভয় পাইতেছে, আপনার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছে, একথা লইয়া তাহাকে একটু বিদ্রূপ করিতেও ক্ষিতিধর ছাড়ে নাই। শাড়ী গহনা পরা ও মাছ মাংস খাওয়াই যে স্ত্রীলোকের জীবনের উদ্দেশ্য নয় তাহাও সে নানা ছন্দে-বন্ধে গৌরীকে শুনাইয়াছে। গৌরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, ক্ষিতিধর এখানে থাকিতে তাহার সহিত এত যে সখ্য দেখাইত, এত যে মুগ্ধভাব দেখাইত চিঠিতে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এ যেন কেবল তাহার দুর্ব্বলতাকে বিদ্রূপ করার জন্মই লেখা। রাগে দুঃখে ও অপমানে গৌরীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। কিছু একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলের এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ম পর-মুহূর্ত্তেই মনটা তাহার আবার কঠোর হইয়া উঠিল। সে দেখাইবে যে বিলাস ও আরামকে সে গ্রাহ্য করে না, অনায়াসে সে-সকল সে ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু তাহা পরের কথার ভয়ে নহে, স্বেচ্ছায়। সমস্ত ছাড়িয়া সে দেখাইবে, কিন্তু পরের কাছে হার মানিবে না।

এই ভাবনা-চিন্তা ও জল্পনা-কল্পনা লইয়া গৌরীর সারা রাত কাটিল। রাত্রে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া কতবার সে চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিল; তাহার সহজ জীবনযাত্রার পথে কে যেন কি একটা বিপুল বাধা আনিয়া ফেলিয়াছে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও তাহার দুর্লঙ্ঘ্য রূপ অনুভব করিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। ভাবনার একটা প্রকাণ্ড বোঝা তাহার ঘুমন্ত মনের শান্তি ও আরামের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।

সকালে উঠিয়া গৌরীর ইচ্ছা করিতেছিল কালকার সমস্ত দিনটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে। এত ভাবনার ভার সহিতে তাহার অনভ্যস্ত মন ভাঙিয়া আসিতেছিল। নিজের জন্ম সে ত কখনও নিজে ভাবে নাই। তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের ভিতর নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইবার তাহার কোনোদিন প্রয়োজন হয় নাই, কেহ তাহাকে সে ভারও দেয় নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ সকল দিক হইতে তাহারই উপর দাবী আসিয়া পড়িল কেন ? কি করিয়া সে ইহার কুলকিনারা করিবে ?

তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে দুই-দিক হইতে দুইজন মানুষই মনে করিতেছে বিলাস ও

আরামই তাহার জীবনের লক্ষ্য। একজন শুভসুযোগের লোভ দেখাইয়া ডাক দিতেছে, আর একজন তাহাকে ভোগে আরামে অন্ধ বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। বাস্তবিকই কি সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া তাহার পিতা তাহাকে এমনি পুতুল করিয়া তুলিতেছেন? একদিন তাঁহারই মুখে সে শুনিয়াছিল নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষ হইয়া নিজের পথ তাহাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সে-চেষ্টা ত সে কিছু করে নাই, কেহ করিতে সাহায্যও করে নাই। আজ এই সঙ্কটে তাই সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। চক্ষু বুজিয়া জীবনের জলন্ত সত্যকে স্বপ্ন মনে করিয়া ফাঁকি দিয়া মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতেই তাহার মনে কেমন যেন একটা শক্তি আসিল। গৌরী ঠিক করিল এমন করিয়া পুতুলের মত দিন সে কাটিতে দিবে না। যেমন করিয়াই হউক একটা পথ তাহাকে করিতে হইবে। এত অনায়াসে নৃপেন্দ্র কি ক্ষিতিধরের কাছে পরাজয় সে স্বীকার করিবে না। জগৎ কি জিনিষ আপনার চক্ষে দেখিয়া আপনার বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়া তবে সে অগ্রসর হইবে। তাহার পূর্ব্বে নূতন কোনো নাগপাশে সে ধরা দিবে না। জীবনের প্রভাতেই একটা ছেলেখেলায় তাহাকে জড়াইয়া সংসার তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটা একটানা অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতে চায়; সে অন্ধকারে এত সহজে সে কিছুতেই তলাইয়া যাইবে না; না বুঝিয়া নূতন একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া নূতন বিপদও ডাকিয়া আনিবে না। তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।

গৌরী ভাবে আর দিন কাটে। কিন্তু কাজেত কিছু হইয়া উঠে না। কি যে করিতে হইবে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না। এদিকে বাড়ীতে নূতন গোলমাল বাধিয়াছে,—তাহার সেজদাদা ও ন-দাদার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে; সকলে তাহাই লইয়া ব্যস্ত। এত বড় বৃহৎ পরিবার, এখানে রোজই জন্মমরণ ও বিবাহের একটা না একটা হাঙ্গাম লাগিয়া আছে। কাজেই সমাজ ও সংসার সেখানে নিত্যই নানারূপে দেখা দিতেছে ও আপন আপন আইনজারী করিতেছে। তাহার ভিতরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য কি মুক্তি কামনা করা বাতুলতা। কিন্তু সমস্ত সংসার ফেলিয়া তাহার জন্য চিরকাল দেশত্যাগী হইয়াই বা কে থাকিবে? একলা চলা ছাড়া গতি নাই।

সেদিন সকালে ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় প্রকাণ্ড দুই ঝোড়া তরকারি ও তিনচারখানা বাসন লইয়া গৌরী মস্ত একখানা বঁটির উপর মনোযোগের সহিত তরকারি কুটিতে বসিয়াছিল। এসব কাজে এত মনোযোগ গৌরীর দেখা যায় না। যে দেখিতেছিল সেই দুই কথা বলিয়া ঠাট্টা করিয়া যাইতেছিল। কিসের একটা মস্ত ফর্দ্দ হাতে করিয়া মার সহিত হিসাব নিকাশ করিবার জন্য চটি ফট্‌ফট্ করিতে করিতে শঙ্কর সানন্দে সেই দিক দিয়া চলিয়াছিল। গৌরীর কাজে এত মনোযোগ দেখিয়া সে হঠাৎ পিছন হইতে তাহার এলোচুলের গোছা ধরিয়া নাড়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ, গৌরী এত কাজের মেয়ে হস্ না। শেষে মারা পড়্‌বি।"

গৌরী মাথাটা নাড়া দিয়া চুলগুলা তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ! মরি ত মরব, তোমাদের তাতে কি? তোমাদের ত আমার ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না কি না! একটা কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে একটা লোক পাইনা, সবাই মিলে 'বিয়ে বিয়ে' ক'রে ক্ষেপে গিয়েছে।"

শঙ্কর হাসিয়া কতকটা ঠাট্টার সুরেই যেন বলিল "ও, তাইতে এত রাগ হয়েছে? আচ্ছা তোরও আমি একটা বিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া। তাহ'লে ত আর রাগ করবি না।"

গৌরী রাগিয়া বলিল, "ব'য়ে গেছে আমার! তোমার অত উপকারে আমার দরকার নাই।"

শঙ্কর বলিল, "আরে কত লোক এসে সাধ্‌ছে তার খোঁজ রাখিস্? বাবার খেয়ালের জ্বালাতেই ত কিছু হচ্ছে না। তিনি যে তোকে একটা পীর না পয়গম্বর কি করতে চান তা তিনিই জানেন; অথচ চেষ্টা ত কিছু দেখ্‌ছি না।"

এলাহাবাদ হইতে গৌরীর নামে নানা কথা শুনিয়া শঙ্কর এক সময় অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ময়নাকে আনিতে গিয়া সৃষ্টিধর মহীধরের ব্যবহারে ও এখানে ক্ষিতিধরের কথাবার্ত্তায় গৌরীর শশুর বাড়ীর উপর

তাহার এমন একটা রাগ জন্মিয়া গিয়াছিল, যে, তাহাদের জব্দ করিবার জন্যই গৌরীর একটা বিবাহ দিবার তাহার অত্যন্ত আগ্রহ বাড়িয়া উঠিতেছিল। তা ছাড়া বড় হইবার সঙ্গে-সঙ্গে গৌরীর সম্বন্ধে ছেলেবেলার সেহিংসাটা কাটিয়া গিয়া তাহার মনে একটা স্নিগ্ধ মমতার সঞ্চার হইয়াছে। সে যৌবনের নবীন উদ্যম লইয়া দেশের আরো অনেক ছেলের মতই দেশের হিতকথা ভাবিতে শিখিয়াছে; কলেজের 'হলে' তর্কসভায় বরপণ ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে কঠোর কঠোর কথা শুনাইয়া বহু যশ অর্জ্জন করিয়াছে; অথচ তাহারই একমাত্র ছোট বোনটি বাল্য-বিবাহের বলি হইয়া এই নিষ্ফল জীবন লইয়া আমরণ কাল কাটাইবে ইহা তাহার সহ্য হইত না। কিন্তু পিতামাতার কথার উপর সে ত কিছু বলিতে পারে না। কেন যে তাঁহারা এক সময় গৌরীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আজ এমন শুভ সুযোগের সময় পিছাইয়া যাইতেছেন, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। আজ গৌরীকে ঠাট্টা করিতে গিয়া তাহার মনের আসল কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল। সে আবার বলিল, "আমার যদি হাত থাকৃত ত দাদাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোর বিয়েটাও আমি দিয়ে দিতাম। ভাল ভাল ছেলে এসে ফিরে যাচ্ছে।"

গৌরী এবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, ছোড়দা, ওসবে আমার কাজ নেই। আমি বাড়ীতে থাক্‌লেই ব'লে তোমাদের শুভকাজে বিঘ্ন হয়, তখন আবার আমাকে নিয়ে 'কোথায় যাই কোথায় যাই' ভাবনা প'ড়ে যায়। তার উপর ঐ সব যদি বাধাও ত লোকে তোমাদের ঘরে আর উঠ্‌বেও না, তাছাড়া আরো অনেক হাঙ্গামা বাধ্‌বে। আমি তখন ছোট ছিলাম, কিছু বুঝ্‌তাম না। এখন সব বুঝ্‌ছি। আমার জন্যে তোমরা বাড়ী শুদ্ধ কেন অত সইতে যাবে? আর আমিই বা কেন পরের দয়ার ভিক্ষা নিয়ে তাদের বাড়ী যেতে গেলুম? আমি ওসব কিছু চাই না।"

অভিমানে গৌরীর ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। চোখ দুটি জলে টল্‌টল্ করিয়া উঠিল।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, থাক্ থাক্, তোকে পরের দয়া নিতে হবে না। কিন্তু বড় যে হয়েছিস বলিস, তবে চিরকালটা এমনি ক'রে কি ক'রে কাটাবি সেটা ভেবেছিস্? সংসারে একটা অবলম্বন একটা স্থান ত চাই।"

গৌরী বলিল, "তুমি ব'লে দাও না কি কর্‌ব। এমনি ক'রে থাক্‌তে আমার আর ভাল লাগে না। পড়াশুনা কর্‌তে বাবা লোক রেখে দিয়েছেন। কিন্তু বইয়ে যেটুকু লেখা আছে তার বেশী একটা কথাও তিনি আমায় শেখাতে পারেন না। যা বুঝিনা তা তিনিও বোঝাতে পারেন না। একে কি পড়া বলে?"

"বাবা বলেছিলেন আমাকে নিজের পথ নিজে চিন্‌তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে? কিন্তু কি ক'রে আমি তা কর্‌ব? এখানে ত একটিও মানুষ এমন নেই যে, আমাকে পথ চিন্‌তে এতটুকু সাহায্য করে। তার উপর প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে এই যে লুকিয়ে বেড়ানো এ আমার অসহ্য লাগে। কেন, আমি কি চোর, যে কেবলি সকলকার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াব? লক্ষীটি ভাই, তুমি আমার একটা ভাল ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দাও। যাতে আমি মানুষ হ'তে পারি আর এইসব দয়া আর অপমানের হাত থেকে দূরে থাকৃতে পারি।"

শঙ্কর একবার স্থির হইয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। আমি এর একটা উপায় বের কর্‌বই। যারা আজ তোকে অপমান করে, দয়া দেখাতে চায় তাদের সকলের উপরে আমি তোকে দাঁড় করাব। ভয় পাস্‌না গৌরী, তোর কাছে আজ এ প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তা পালন কর্‌তে প্রাণপণ কর্‌ব, তারপর ভগবান যা করেন।" গৌরী শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার মধ্যে যদি কিছু মনুষ্যত্ব থাকে, কিছু শক্তি থাকে তাহ'লে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবেই, ভাই।"

হিসাব-কিতাবের ফর্দ্দ ফেলিয়া শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, "আজ থেকে এই কাজে দিনের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টাটুকু দিয়ে তবে অন্য কাজ কর্‌ব।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "দাদা, ছেলেবেলা তোমার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা কর্‌তাম ব'লে তুমিই আজ আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু হ'বে দেখ্‌ছি।"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বোল্‌তার ঘর-কন্না

পুরুষ বোল্‌তা একটি মেয়ে বোল্‌তাকে বিবাহ করিবার পর মাত্র একটি দিন তাহার সঙ্গে বাস করে। শীতকালের গোড়ায়-গোড়ায় এই বিবাহ হয়—অর্থাৎ আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে। বিবাহ হইবার পরেই স্বামী-স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া উড়িতে থাকে। খানিক পরে দুইজনে নামিয়া আসে। কয়েক ঘণ্টা পরে পুরুষটি মরিয়া যায়। মেয়ে বোল্‌তাটি যেন ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে বাসা খুঁজিতে বাহির হয়। গাছের ডালে বা গুঁড়িতে কোন গর্ত্তে বা বাড়ীর কার্ণিশের নীচে বা দেয়ালের ফাটলে সে বাসা ঠিক করে। সেইখানে বাসা গুছাইবার আগেই সে চুপচাপ বসিয়া ঘুমাইতে থাকে। সারা শীতকাল সে সেখানে ঘুমায়। বৈশাখ মাসে তাহার ঘুম ভাঙে। তখন তাহার শরীর একটু চাঙ্গা মনে হয়। বাসা হইতে বাহির হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সে রোদ পোহায়। রোদে শরীর শক্ত হইয়া গেলে সে দাড়া দিয়া বেশ করিয়া মুখ মাজিয়া লয় এবং পা ও ডানা ঘসিয়া ঠিক্ করে। তাহার পর বাসাটি গুছাইবার কাজে লাগিয়া যায়। আর দেরী করিলে চলে না, কেননা তখন তাহার ডিম পাড়িবার সময়। সে ডিম সংখ্যায় কম নয়, এত বেশী যে, তাহা হইতে তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাজার সন্তান-সন্ততি জন্মে। এতগুলি সন্তানকে লালন-পালন করিবার জন্য যথেষ্ট জায়গা চাই।

বোল্‌তা-জননী তখন ভাঙ্গা পুরানো বেড়ার ধারে ধারে বাসা তৈরীর উপযোগী কাঠকাঠরা বা মালমশলা খুঁজিয়া বেড়ায়। মালমশলার সন্ধান পাইলে সে যেখানে বাসা করিবে সেখানে আবার ফিরিয়া আসে। তাহার পর দেখা যায়, কিছু কাঠের টুকরা, গাছের শিকড়, বীজের খোলা বা মাটির ঢেলা লইয়া সে প্রায়ই বাহির হইতেছে আর সেগুলি ফেলিয়া দিতেছে। এইরূপে জায়গাটি পরিষ্কার করিয়া লয়।

পরিষ্কার করা হইয়া গেলে সে আবার দাড়া ও পা দিয়া দেহ পরিষ্কার করিয়া লয়। দেহ পরিষ্কার করা কাজই বোল্‌তাদের বিশেষত্ব। ইহার পর সে বাসা বাঁধিবার মালমশলা আনিতে যায়। এই মালমশলাকে চিবাইয়া চিবাইয়া লালা দিয়া মণ্ডের মত করে। তাহা
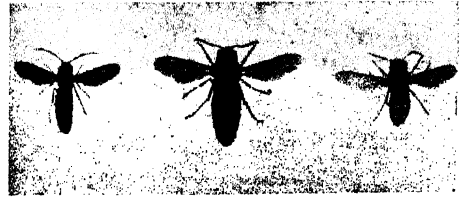
তিন শ্রেণীর বোল্‌তা

দিয়া বাসার ছাদটা আগে তৈরী করিয়া লয়। ছাদের তলায় একটা উঁচু জায়গায় ঐ মণ্ড দিয়া একটা স্তম্ভের মত করে। ঐ স্তম্ভের ডগার উপর ঐ মণ্ড দিয়াই একটি ঢাকনা বা টুপী তৈরী করিয়া লাগাইয়া দেয়। ঐ টুপীর ব্যাস প্রায় আধ ইঞ্চি। তাহার পর উহার ভিতর দিকে চারিটি ছোট ছোট ঘর করিয়া প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। এই রকমে বাসার পত্তন হয়।

ঐ চারিটি ঘরের ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্ছা হইলে বোল্‌তা-জননী তাহাদিগকে কীটপতঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া বা শাকসব্জী আনিয়া খাওয়াইতে থাকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে বাচ্ছাগুলি এত বড় হয় যে, তাহাদের দেহে ঘর ভর্ত্তি হইয়া যায়। তখন তাহারা নিজেরাই একটি করিয়া শাদা টুপী দিয়া বাসার মুখ আঁটিয়া দেয়।

তাহাদের মা আর তাহাদিগকে দেখে না। আর দশ দিন পরে বাচ্ছারা বড় হইয়া দাড়া দিয়া বাসার টুপী কাটিয়া দিয়া বাহিরে আসে। তখন তাহারা শ্রমিক বোল্‌তা হয়। ইহারা কিন্তু চার জনেই মেয়ে।

এই সময়ে বোল্‌তা-জননীর লালা দিয়া মণ্ড তৈরী করিবার শক্তি লোপ পায়। সে-কাজ ঐ চারিটি মেয়েতে আরম্ভ করে। তাহারা মা'র মত কাজে দক্ষ না হইলেও বাসা তৈরী করিতে পারে ও অপর বাচ্ছাদের দেখাশুনা করে। নূতন ঘরে নূতন নূতন, বাচ্ছা হইতে থাকিলে শ্রমিক-সংখ্যা বাড়িতে থাকে, জননী তখন কেবল ডিম পাড়া ছাড়া আর কোনো কাজ করে না। যত ঘর তৈরী হইতে থাকে সেও তত অধিক ডিম পাড়িতে থাকে।

বোল্‌তা-জননী বা বোল্‌তা-রাণী ও শ্রমিক বোল্‌তারা
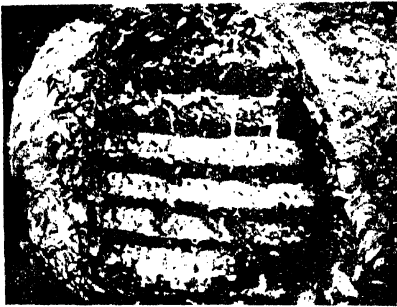
বোল্‌তার চাকের ভিতরের অংশ

যে বাসা তৈরী করে তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঘরের পর ঘর শুন্তের ভিতরে ও বাহিরে তৈরী হইতে থাকে। কাঠের টুক্‌রাকে লালা দিয়া মণ্ড করিয়া ফেলিতে ইহাদের মুখই কাজ করে। ইহাদের চোয়াল ধারাল, শিংএর মত। ইহাদের জিহ্বা ডগার দিকে চার ভাগে চেরা। ইহার দুই দিকে এক এক জোড়া যুক্ত শুঁড় বা রোঁয়া থাকে। জিহ্বার বাহির দিকে ছয়টি ঘন-যুক্ত রোঁয়া থাকে। এই সব রোঁয়া, জিহ্বা ও হুল ইহাদিগের হাত পায়ের কাজ করে। এগুলির দ্বারাই ইহারা বাসা পরিষ্কার করে, শক্ত কাঠ কুরিয়া আটা করে, আমাদের রান্নাঘর ও ময়রার দোকান হইতে খাবারের টুক্‌রা লইয়া পালায়।

দুই চারিটি করিয়া ঘর বাড়িতে-বাড়িতে বাসাটি বোল্‌তার জনপদ হইয়া উঠে। এই বোল্‌তার চাক বা বাসা খুব প্রকাণ্ডও দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা যাদুঘরে একরকম গেছো বোল্‌তার চাক ছিল। সেটির ব্যাস তিন ফুটেরও অধিক। তাহাতে বারোটি সারিরও বেশী সারি ঘর ছিল।

গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে বোল্‌তার চাকের খুব বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। চাক তখন গমগম করিতে থাকে। চাকে খাদ্যও প্রচুর থাকে। আর হাজার হাজার বোল্‌তা খাটিতে থাকে। এই সময়ে ঘরের নিম্ন সারিতে কয়েকটি বড় বড় ঘর করা হয়। তাহাতে ডিম পাড়া হয়। ইহার পরেই চাকের দুর্দ্দিন আসে। বোল্‌তা-রাণীর জীবন শেষ হইয়া আসে। সে আর ডিম পাড়িতে পারে না। সুতরাং নূতন নূতন বাচ্ছাকে খাওয়ানোর যে প্রধান কাজ তাহাই কমিয়া যায়। কাজেই চাকের শ্রমিক বোল্‌তাদের খাটুনি কমিয়া আসে। এই সময় বড় বড় ঘর হইতে কতকগুলি অল্পবয়স্ক রাণী বাহির হয় আর অপর ঘর হইতে কয়েকটি পুরুষ বোল্‌তা বাহির হয়। পুরুষদের দেহ রোগা লম্বাটে ও তাহাদের শুঁড় বা রোঁয়া খুব লম্বা লম্বা। কয়েক দিনের মধ্যেই এইসব মেয়ে ও পুরুষ বোল্‌তারা পরস্পর স্ত্রী ও স্বামী ঠিক করিয়া লয়। তাহার পর তাহারা এক এক জোড়া উড়িয়া চলিয়া যায়। অনেক শ্রমিকও সেই সঙ্গে চলিয়া যায়।

শ্রমিক বোল্‌তাদের অনেকে আবার পুরানো চাকেই থাকে। কিন্তু তাহারা পাগলের মত ছটফট করিতে থাকে বলিয়া মনে হয়। তখন তাহাদের প্রধান কাজ হয় অন্যান্য চাক হইতে বাচ্ছাদের টানিয়া বাহির করা। বাহির করিয়া তাহাদিগকে চাকের দরজার কাছে ফেলিয়া রাখে যাহাতে তাহারা মরিয়া যায়। এই কাজ নির্দ্দয় বটে। কিন্তু ইহার কারণ আছে। গ্রীষ্ম শেষ হইয়া বর্ষা ও শীত আসিলে বাচ্ছাদের খাবার পাওয়া দুষ্কর হয়। সে-সময়ে খাদ্যাভাবে মরা অপেক্ষা আগে হইতেই তাহাদিগের দুঃখের অবসান করিয়া দেওয়া মন্দ নয়। ইহা ছাড়া এই কাজে চাকের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। যে সব মেয়ে ও পুরুষ বোল্‌তা তখন কিছু বড় হইয়া বিবাহ

কারবার উপযুক্ত হইতে থাকে, চাক একটু নির্জ্জন হইলে, তাহারা বেশ মুক্তিতে বড় হইয়া উঠে।

বাচ্ছারা সব লুপ্ত হইবার পর শ্রমিক বোল্‌তারা চাক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ঘরের বাঁধনও তাহাদের তখন থাকে না, আর কাহারও জন্য ভাবিতে হয় না। তখন তাহারা মানুষের ঘরে-দালানে ও ময়রার দোকানে দস্যু-বৃত্তি করিয়া বেড়ায়। এই দস্যুবৃত্তির জন্য মানুষের হাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। আর ইহা হইতে বাঁচিয়া গেলে বর্ষায় কিম্বা শীতে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়।

বোল্‌তার চাক তৈরীর প্রথম দিকে চাকে দুই শ্রেণীর বোল্‌তা থাকে—রাণী ও তাহার কন্যাগণ। ইহার পর তৃতীয় শ্রেণী দেখা দেয়। ইহারা পুরুষ। গ্রীষ্মের শেষাশেষি ইহারা জন্মায়। তখন চাক বাসিন্দায় পরিপূর্ণ, কয়েকটি বিবাহ-যোগ্য মেয়েও মজুত। তাহাদের ভিতর হইতে কাহাকেও বিবাহ করা চলে। বিবাহের পরই আর তাহার বাঁচিবার দরকার হয় না, তাহার কাজ হইয়া যায়। সে ও শ্রমিক বোল্‌তা অনেকে তখন মরিয়া যায়। কেবল অল্পবয়স্কা রাণীরা শীতকালটা বাঁচিয়া থাকে ও নূতন চাক তৈরী করিয়া নূতন বোল্‌তার দেশ তৈরী করে। মজা এই—তাহাদের স্বামীরা এত হাজার হাজার সন্তানের জন্ম দেখিতে পায় না ; বাচ্ছারাও

গেছো বোল্‌তার চাক

পিতার দর্শন পায় না। কেননা, পিতা ত বিবাহের পরেই মরিয়া যায়।

বোল্‌তাদের মধ্যে শ্রমিক বোল্‌তারাই বেশী তেজী ও দংশনদক্ষ হয়। রাণীর সে ক্ষমতা কম। তাহার হুলের দাড়া তেমন মজবুত হয় না। শ্রমিক বোল্‌তারা শত্রুকে কামড়াইতে গিয়া অনেক সময় নিজেরাই মরিয়া যায়, কারণ, হুল শত্রুর গায়ে আট্‌কাইয়া যায়। শ্রমিক বোল্‌তাদের ডিম পাড়িবার ক্ষমতা খানিকটা বিলুপ্ত হওয়ায় আত্মরক্ষার অস্ত্র তাহাদের প্রবল হয়। ইহারা হুল ফুটাইয়া শিকারকে বিষে ভরিয়া দেয়। এ-বিষয়ে পুরুষ বোল্‌তা নিরীহ।

গুপ্ত

জয়পুর রাজ্যে দুই দিন

শ্রী হরিহর শেঠ

ফতেপুর সিক্রী হইতে আগ্রা ষ্টেশন হইয়া রাত্রি-শেষে জয়পুরে আসিয়া পৌঁছিলাম এবং তথা হইতে একখানা টোঙ্গা লইয়া আমরা বরাবর এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল্ হোটেলে উঠি। পথে আসিতে এক স্থানে দুই তিনটি লোক অন্ধকারের মধ্যে পথপার্শ্বে একটি হ্যারিকেন লইয়া একখানি বেঞ্চে বসিয়া ছিল। তাহাদের কোন ইঙ্গিতে বা তাহাদের দেখিয়াই তাহা বলিতে পারি না, সেই স্থানে গাড়ি থামিল এবং একজন নিকটে আসিয়া চারি আনা পয়সা চাহিল। টোঙ্গাওয়ালা আমাদের বুঝাইয়া দিল যে, সে চুঙ্গির দরুন চাহিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েক স্থানে বেড়াইয়া আসিলাম, কোথাও এ দাবী পাই নাই। কাছে চুঙ্গি দিবার মত একটিও জিনিষ না থাকিলেও, এত রাত্রে

জয়পুরের রাজা

ঠাণ্ডায় ভাল লাগিতেছিল না, চারি আনা পয়সা দিলাম। কিছু পরে হোটেলের দরজায় গাড়ি থামিল, সামান্য ডাকা-ডাকিতেই একজন দরজা খুলিয়া দিল; রাত্রি তখন বড় বেশি ছিল না, তথাপি খাটিয়ায় বিছানা ছড়াইয়া একটু শুইলাম। ট্রেনে ঘুম হয় নাই; তখনই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে হোটেল-ম্যানেজারের সহিত আহারাদি সম্বন্ধে কথা কহিয়া এই-খানকার একটি গাইডকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। দুই দিনে জয়পুর দেখা শেষ করিতে হইবে, সুতরাং প্রথমেই অম্বর দেখিতে যাওয়া বিধেয়—এইরূপ পরামর্শ পাইয়া আমরা অম্বর যাওয়াই স্থির করিলাম। অম্বর সহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। একখানি টোঙ্গা লইয়া জয়পুরের জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির হইয়া অম্বর যাইবার আদেশ করিলাম।

রাজপুতানার মাটিতে প্রথম পথে বাহির হইয়া বাঙ্গালীর চক্ষে স্থানটিতে যেন একটু বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। এই হিন্দু করদ নৃপতির রাজ্য যে বৃটীশ-শাসিত অন্যান্য বড় বড় নগরগুলি হইতে কিছু নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, পথে যাইতে-যাইতে তাহা আমার স্পষ্টই মনে হইতে লাগিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমরা গোবিন্দজীর মন্দিরে পৌঁছিলাম। এই সময়ের মধ্যে পথিপার্শ্বের চিত্র-বিচিত্রময় একরংয়ের বাড়ীগুলি, পথের মাঝে গণেশাদি দেব-মূর্ত্তি-শোভিত বড় বড় তোরণ; উহার দেশীয় নাম, সেই কলিকাতার যাদুঘরের সজ্জিত শকটের মত দুই তিনটি চূড়াওয়ালা গো-শকট, দেশীয় পরিচ্ছদ-শোভিত পাগড়ীওয়ালা পথিক দল প্রভৃতি দেখিয়া অভিনবত্বের সহিত একটা কেমন প্রাচীন ও প্রাচ্য ভাব যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়।

আমরা যে সময় মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন বিগ্রহের সম্মুখস্থ দ্বার পরদা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। দেখিলাম, বহু লোক উদ্‌গ্রীব ভাবে দেব দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের বিপরীত দিকে প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোকে তখন "চন্দ্রমহল" নামক সুন্দর প্রাসাদটি দূর হইতে মনোরম দেখাইতেছিল। সম্মুখের প্রাঙ্গণে বানর ও ময়ূরগুলি আহার সংগ্রহার্থ এদিক ওদিক করিতেছিল। অনতিবিলম্বে পূজারি পরদা সরাইয়া দিল; আমরাও নিকটস্থ হইয়া সেই যুগল-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই বিগ্রহের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের খ্যাতি বহু-প্রচারিত, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া বেশ করিয়া সে-মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য হইলেও দুর্ভাগা আমি, তেমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম না। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলাম।

এই গোবিন্দজীর জন্য জয়পুর হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ স্থান। এখানকার রাজপরিবার ইঁহার চিরভক্ত। তাঁহারা মনে করেন এ রাজ্য তাঁহারই, মহারাজা তাঁহার দেওয়ান মাত্র। কথিত আছে, যবন-অত্যাচারে মন্দির ধ্বংস হইলে মহারাজা জয়সিং কর্ত্তৃক ইনি বৃন্দাবন হইতে
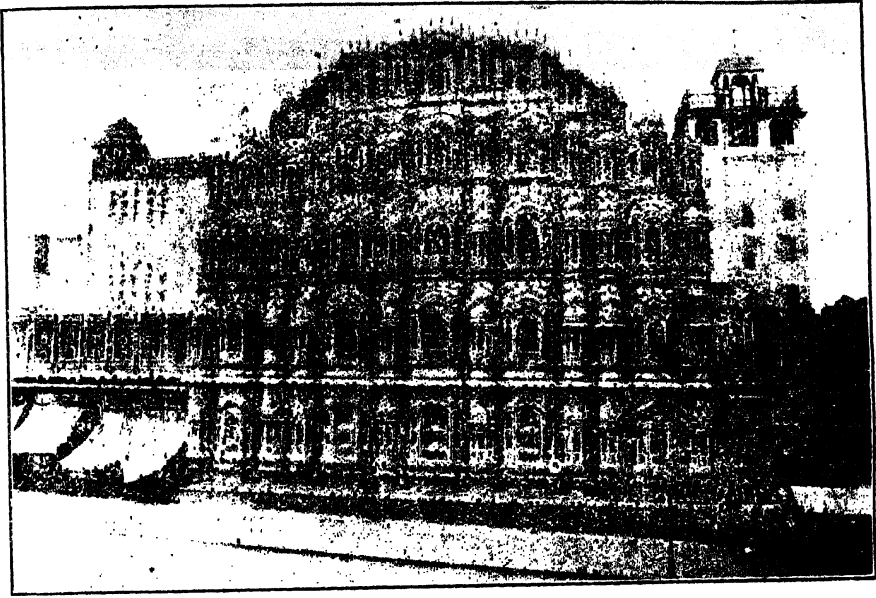
হাওয়া মহল

আনীত হইয়া এখানে স্থাপিত হন। ইহার পুরোহিত-বংশ বাঙ্গালী।

এখান হইতে আমরা আর অন্যত্র কোথাও না গিয়া বরাবর অম্বর অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। এই অম্বর জয়পুরের পুরাতন রাজধানী। স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম আমের। কেহ কেহ আমেদও বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সহর ছাড়াইয়া কিছু দূর যাইতেই ক্রমে উভয় দিকে পাহাড়ের শোভা দেখিতে দেখিতে একটু একটু করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, তখন মাঝে-মাঝে পাহাড়ের গাত্রে নগর-প্রাচীর নয়নগোচর হইতে লাগিল। জয়পুর রাজ্যের রাজমহিষীদের দেহান্ত হইলে যে-স্থানে সমাধি দেওয়া হয়, আমাদের প্রদর্শক পথের দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্ন দেশের সেই সমাধিপূর্ণ ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল। এই স্থান হইতে আর একটু যাইয়াই নগর-প্রবেশের পুরাতন সুউচ্চ তোরণ পার হইলাম। এই স্থান হইতেই অম্বরের সীমা। এখান হইতে বাম দিকে পাহাড়ের উপর দুর্গ ও প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, আর দক্ষিণে প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষ। উভয় পার্শ্বের এইসব গিরিসমূহ বড়ই তরুগুল্ম বিরল।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা শৈলস্থিত প্রাসাদ ও দুর্গমূলে একটি বৃহৎ হ্রদের পার্শ্বে উপনীত হইলাম। উপরে আকাশের গায়ে শুভ্র সৌধরাশি, আর নিম্নে রমণীয় হ্রদের স্থির স্বচ্ছ সলিলে উহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, অপর পার্শ্বে নীল গিরিশ্রেণী শিরোন্নত করিয়া আছে। এই সকলের সমাবেশে স্থানটিকে যে অপূর্ব্ব শোভাময়ী করিয়া তুলিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

অম্বর প্রাসাদ দেখিবার জন্য 'পাশে'র আবশ্যক হয়। আমাদের প্রদর্শক তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিল। আমরা হাতিশালার পার্শ্ব দিয়া আঁকা-বাঁকা পথে উপরে উঠিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, বিশেষ পদস্থ ব্যক্তিগণ ও সাহেবদের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে উপরে উঠিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রথমে শীলাদেবী দর্শনার্থ দক্ষিণদিকের পাথরের উচ্চপথ দিয়া উপরে উঠিলাম। এই পথ রক্তরাগ-রঞ্জিত

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, প্রত্যহ দেবী-মন্দিরে যে বলি হইয়া থাকে উহা তাহারই রক্তের দাগ। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত বলিয়া প্রবাদ আছে, এক্ষণে সাধারণতঃ ছাগবলি হইয়া থাকে। দ্বার-পার্শ্বে জুতা রাখিয়া দেবী-সমীপে উপস্থিত হইয়া অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিলাম। চারিদিকে উচ্চ অট্টালিকার মধ্যস্থ অনতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ-সম্মুখে অন্ধকার কক্ষ মধ্যে এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে ভয় হয়। এখানকার লোকে ইহাকে শল্যাদেবী বলিয়া থাকে। এতাবৎ ইহা প্রতাপাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্বরী বলিয়াই লোকের জানা ছিল, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে উহা বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া অম্বরে স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার বলির ধুম এবং বর্ত্তমান রাজধানীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণবোচিত পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা এই দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেবীকে প্রণাম করিয়া উপরে উঠিয়া একটির পর একটি করিয়া যে-সব কক্ষ, মহল, স্নানাগার, দরবার-গৃহ প্রভৃতি সৌধ দেখিলাম তাহার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি একবার মাত্র দেখিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব। আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর সিক্রীর দুর্গমধ্যে যেমন দেওয়ানিআম ও দেওয়ানি খাস আছে, এখানেও সেইরূপ আছে। তদ্ভিন্ন যশোমন্দির, জয়মন্দির, সোহাগমন্দির, রঙ্গমহল প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখ-যোগ্য। এখানকার শ্বেতমর্ম্মরময় কক্ষ সকল, উহার সাজ-সজ্জা, মুকুরমণ্ডিত গৃহ, স্নানাগার, অলিন্দ, প্রাঙ্গণ, অন্তঃপুরস্থ মহল প্রভৃতি সমস্তই সৌন্দর্য্যের আধার। এমন মনোরম বিলাস-পুরী না দেখিয়া তাহার মনোহারিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় সমস্তই দিল্লী আগ্রার দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৌধাদির অনুকরণে গঠিত। এই প্রাসাদের গাম্ভীর্য্যে, বিশালত্বে ও সৌন্দর্য্য-গরিমায় দর্শককে যথেষ্ট আকৃষ্ট করিলেও আমার যাহা মনে হয়, তাহা সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়। ইহা যদি সত্যই মোগল বাদসাহদের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে,তবে ইহা মানুষের ব্যর্থ প্রয়াসের একটি উদাহরণ। অনুকরণ না হইলেও ইহা যে সকল দিক্ দিয়া ঐ সকলের একটি ছোট সংস্করণ তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহার স্থান অনেক উচ্চে।

প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া এই প্রাচীন ঐতিহাসিক পার্ব্বত্য নগরীর যে সুষমা পরিদৃষ্ট হয় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। অম্বরের প্রবেশ-পথেই সুদৃঢ়-প্রস্তর-নির্ম্মিত নগর-প্রাচীরের অংশ বিশেষ এখানে ওখানে যাহা দেখা যাইতেছিল, উপর হইতে ভাল করিয়া দেখিলাম তাহা সমস্ত সহরটি বেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধ্যে চারি দিকেই ধূসর শৈলবক্ষে পুরাতন অম্বর সহরটি প্রকৃতির ধ্বংসলীলা বুকে করিয়া বিরাজ করিতেছে। একদিকে মাথার উপর গিরিচূড়ায় প্রাচীন কেল্লা, অন্যদিকে উচ্চশীর্ষে কুণ্ডলগড় শোভিতেছে। দূরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির, উত্তর সীমায় প্রাচীর-সান্নিধ্যে মসজিদের গম্বুজ দেখা যাইতেছে। চারিদিকে মূর্ত্তিমন্ত নিস্তব্ধতা যেন অম্বরকে উপকথার নিদ্রিত পুরী করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে এ স্থান জনশূন্য প্রায়, প্রাসাদ একেবারেই জনহীন। কেবল স্থানে স্থানে দরজার কাছে দুই-একটি প্রহরী আছে। প্রকৃতির রম্য কাননের মধ্যে এই পরিত্যক্ত শুষ্ক নগরীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা এখন ঠিক করা যায় না। মহারাজ জয়সিংহ কেন যে এমন প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত লোকের বুদ্ধির অগম্য। এখন জয়পুর রাজপরিবারের সহিত এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের এইটুকু সম্পর্ক আছে যে, নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় এই পুরাতন ভিটাতেই এখনও রাজটীকা দেওয়া হইয়া থাকে।

উপরের পাহাড়ে যে কেল্লার কথা বলিলাম, শুনা যায় উহার ভিতর প্রচুর গুপ্ত ধন রক্ষিত আছে এবং ভীল প্রহরিগণ তাহা আবহমান কাল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ নিয়ম আছে যে, রাজ্যাভিষেকের সময় রাজা এখান হইতে যে ধন লইয়া আসেন তাহাই তাঁহার প্রাপ্য। এখানকার দেওয়ানী আম নামক দরবার গৃহ-সম্পর্কে যে, একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে পুরাকালে মোগল বাদশাহদের সহিত তাঁহার সামন্ত রাজগণের সম্পর্ক
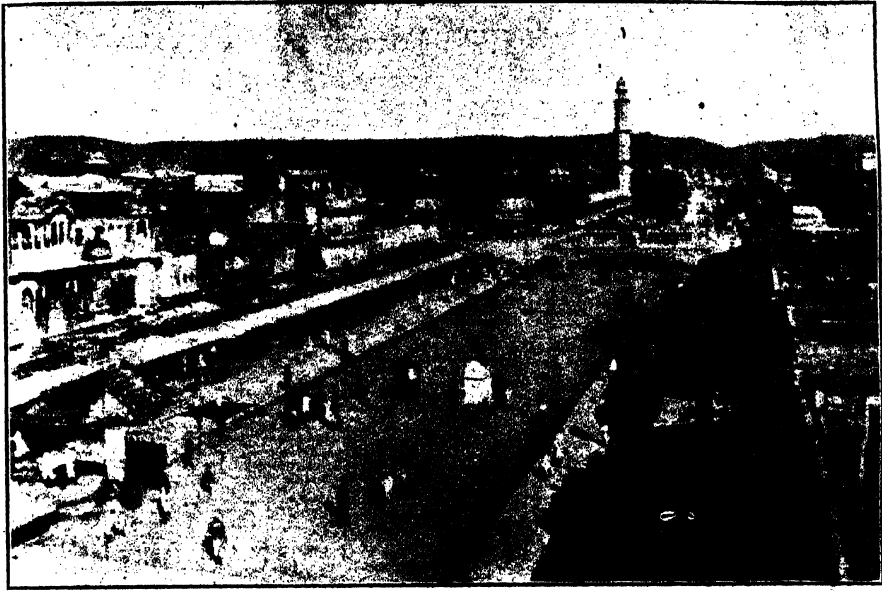
চাঁদপোল বাজার

সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লিখিয়া অম্বরের কথা শেষ করিব। উক্ত দরবারগৃহের থামগুলি পূর্ব্বে কারুকার্য্যময় লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। আরঙ্গজীব এই প্রাসাদ দর্শনে আসিয়া এই উৎকৃষ্ট দরবারগৃহ দেখিয়া, যাহা তাঁহার নাই তাহা তাহা রাখা চলিবে না এই হুকুম দেন। সম্রাটের ভয়ে অম্বররাজ অবিলম্বে লাল পাথরের কাজগুলি চুণের কাজ করিয়া ঢাকিয়া দেন। আমাদের প্রদর্শক একস্থানের একটু ফাটা অংশের মধ্য দিয়া আমাদের উহা দেখাইয়া দিল।

প্রসিদ্ধ অম্বাদেবীর মন্দির আর দেখা হইল না, তথা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। অম্বরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন অম্বাদেবীর নাম হইতেই এই নাম। আবার অম্বকেশ্বর শিবের নাম হইতে অম্বর নাম হইয়াছে, এরূপও অনেকে বলিয়া থাকেন।

ফিরিবার পথে সহরের মধ্যে হাওয়াখানা বা পবনমহল নামক সুপ্রসিদ্ধ গোলাপী রংয়ের বাড়ীটি দেখিলাম। এই পঞ্চতল সৌধটির গঠন-প্রণালীতে কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। এই নূতন প্রকার বাটীটি সুন্দর হইলেও, ইহা একেবারে পথের উপর থাকায় সংলগ্ন খালি জমির অভাবে সৌন্দর্য্যপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। হাওয়ামহলের কিছু দূরে উচ্চ আদালত ভবন দেখিলাম। ইহার মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য্য বা স্থাপত্য-বৈচিত্র্য না থাকিলেও বাড়ীটি বৃহৎ। একটু খালি জমির অভাবে ইহাও ভাল দেখায় না। এই বিচারালয় প্রসঙ্গে শুনিলাম, এরাজ্যে ফাঁসি বা অন্য কোন প্রকার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। এইসব দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ মানমন্দির হইয়া হোটেলে ফিরিলাম। ইহা মহারাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই রাজা একজন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। এই মানমন্দিরকে যন্ত্রগৃহ, মানমণ্ডল এবং তারাকোঠিও বলে।

এখানে যে-সকল যন্ত্র আছে তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম নাড়ীবলয়, অরুণ যন্ত্র, রাশিবলয়, রাম যন্ত্র, কৃষ্ণ যন্ত্র, সৌরযন্ত্র, যন্ত্র সম্রাট প্রভৃতি। শুনিলাম এসকল যন্ত্রদ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ তারার দূরত্ব, পর্ব্বতাদির উচ্চতা প্রভৃতি নিরূপিত হইত। উহাদের কথা বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার তেমন কিছু নাই। এইমাত্র বলিতে পারি, কাশী,

দিল্লী ও জয়পুরের এই মানমন্দির তিনটি হিন্দুদের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহা দেখিলেপ হিন্দুহৃদয়ে একটা গর্ব্ব ও দুঃখের যুগপৎ আবির্ভাব হয়।

আহারাদি সমাপনান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বাহির হইলাম। প্রাতেই স্থির ছিল, মিউজিয়ম্ আর্ট স্কুল প্রভৃতি দেখিব। হোটেলের সম্মুখের সুপ্রশস্ত রাজপথের অপর দিকে রামনিবাস বাগ নামক রাজকীয় উদ্যানের এক প্রান্তে মিউজিয়ম্ ও এলবার্ট হল্। এই উদ্যানটি অতি সুন্দর ও সুকৌশলে রচিত। এমন মনোলোভা উদ্যান পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ধূলা-ধূসরিত একঘেয়ে পথগুলিতে পূর্ণ নগরের মধ্যে এই বাগানটি আমার চক্ষে মধ্যমণি সদৃশ মনে হইল। ইহার মধ্যে একটি চিড়িয়াখানাও আছে। ইহা বৃহৎ না হইলেও মন্দ নহে। এখানে বহু প্রকার জন্তু-জানোয়ার আছে।

চিড়িয়াখানা হইতে বরাবর মিউজিয়ম বা চিত্রশালা ভবনে যাইলাম। এই শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত সৌধটি নয়নপথে পতিত হইবামাত্র হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এমন সুন্দর, এমন মনোহর সুগঠিত সৌধ সমগ্র জয়পুর রাজ্যের মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একখানি প্রস্তর-ফলকে লেখা দেখিলাম, উহা ইংরেজী ১৮৭৬ সালে ৫১০০৩৬ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকাটি এমন সুন্দর ও কারুকার্য্য-শোভিত, যে, এই অর্থে কি করিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সন্দেহ হয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথম উর্দ্ধে স্থাপিত জয়পুরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের জীবন-প্রমাণ প্রতিকৃতিগুলি নয়নগোচর হয়।

এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত সুবিন্যস্ত বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ যাদুঘর কমই দেখা যায়। স্থানীয় ও ভারতীয় শিল্পের এখানে যেমন সংগ্রহ, বৈদেশিক শিল্প সামগ্রী সংগ্রহেরও তেমনই একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মনে হইল, এই মিউজিয়মটি সকল দিক্ দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক যত্নের অভাব নাই। কলিকাতার সুবৃহৎ যাদুঘরের তুলনায় ইহা অনেক ছোট হইলেও; ইহার শিল্প, বাণিজ্য, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ও বিচিত্র সংগ্রহ এবং ইহার বিন্যাস-কৌশল ও পরিচ্ছন্নতা দর্শককে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই চিত্রশালা ও উদ্যান মধ্যস্থ সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে বাৎসরিক ত্রিশ-সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এখান হইতে আর্টস্কুল দেখিতে গেলাম। আর্টস্কুলের বাড়িটি ভিত্তিচিত্রে পরিপূর্ণ, একেবারে জয়পুরী আদর্শের একটি উদাহরণ। ভিতরে প্রবেশ করিয়া জানিলাম উহা ৪ টার সময় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষালয়ের একখানি নোটীশ-বোর্ডে একজন বাঙ্গালী অধ্যক্ষের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। সন্ধান করিয়া নিকটেই তাঁহার বাসায় গেলাম। তিনি বাসাতেই ছিলেন, আমাদের উপরের ঘরে বসিতে দিলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী। ইনি ভাস্কর-শিল্পে একজন বিশেষজ্ঞ, বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া R. A. C. উপাধি ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিল্প-বিদ্যালয় ও জয়পুর-রাজ্য সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হইলাম। জয়পুরের শিল্পকলা সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট জানিলাম, এখানে গালিচা, ছিট, হাতীর দাঁতের কাজ, বিদরির কাজ ও মৃৎশিল্প ভাল হইয়া থাকে। জয়পুরের পাথরের কাজের যে প্রসিদ্ধি আছে উহা এখানকার কারিগর দ্বারা হয় না, অন্যত্র হইতে আসিয়া দুই একটি কারখানা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। আগামী কল্য আর্টস্কুলে গেলে তিনি আমাদের সবিশেষ দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন কথা হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় আনন্দ লাভ করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

এখান হইতে বাহির হইয়া সহরের একটা ধারণা পাইবার অভিপ্রায়ে এখানকার বাজার ও কোন কোন পথে বেড়াইয়া, বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী বঙ্গবাসীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কান্তিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশান-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাটীতে গেলাম। ইনি সাধারণতঃ হাতিবাবু নামে পরিচিত। ঈশান-বাবুর সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না বা তাঁহার কাছে এমন কোন প্রয়োজনও ছিল
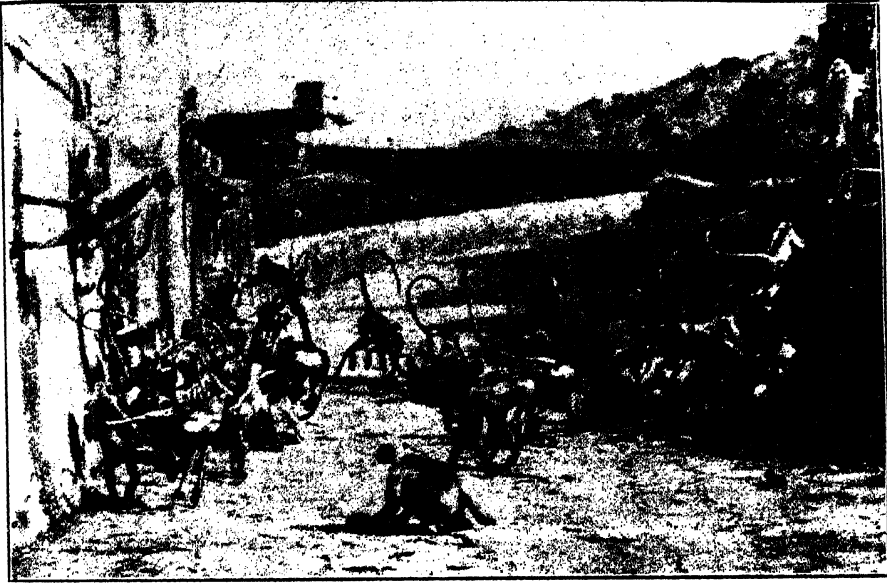
জয়পুর গলতা পাহাড়ে বানরগণ

না। হিরণ্ময়-বাবুর মুখে তাঁহার দেশ-প্রীতি, স্বজাতি-প্রীতি ও নির্ভীকতার কথা শুনিয়া এই বিদেশে সম্মানিত স্বদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

তাঁহার বাটীতে যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জয়পুর রাজ্য-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার বহু পরিচয় পাইলাম। এই জয়পুর রাজ্য বাঙ্গালীর নিকট হইতে বরাবরই কত উপকৃত তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই যে জয়পুর রাজধানীর নাগরিক শোভা এবং নগর-বিন্যাসের এত প্রশংসা, ইহার মূলে এক-জন বাঙ্গালীর নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার নাম পণ্ডিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য। ইনি জয়সিংহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, জয়পুর নগরীর নক্সা ইনিই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি এখানকার প্রথম বাঙ্গালী। ইঁহার নামে এখানে একটি পথ আছে। তাঁহার বংশধরেরা সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এখন বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যে বাঙালী আর তাহা দেখিয়া বুঝা যায় না। ইহার পর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেনের নাম অনেকেই বিদিত আছেন। ইঁহারা উভয়েই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ২৪ পরগণার অধিবাসী ছিলেন। রাজদরবারে ইঁহাদের সম্মান যথেষ্ট ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর পর বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহাদের চিতাভস্মের উপর মহারাজা দুইটি সমাধি-মন্দির করাইয়া দিয়াছেন। এ দেশে ইহাকে ছত্রি বলে। শুনিলাম, এখানে পঁচিশ ত্রিশ ঘর বাঙ্গালী বাসস্থাপন করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর কান্তি-বাবুর এখানকার বাড়ী ও বাগান বেশ পরিষ্কার। কান্তিবাবুর পুত্র ও ভাগিনেয়, বাটীর সুন্দর বৈঠকখানা, পারিবারিক পুস্তকাগার, ঠাকুর-দালান প্রভৃতি সমুদয় আমাদের দেখাইলেন। আমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় তথা হইতে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে প্রথমেই রামবাগপ্রাসাদ নামক রাজো-

স্থান ভবন দেখিতে গেলাম। পথে যাইতে-যাইতে বহু স্থানে ময়ূর-ময়ূরীগণ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। এই উদ্যানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ শুনিলাম, কিন্তু আমরা কোন বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় ভিতরে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, এই বাগানটি একটি সুন্দর ফলফুলের বাগান। প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহার সকল কক্ষ-গুলি বেশ করিয়া দেখিলাম। সকল স্থানই সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে সুন্দর রূপে সজ্জিত। উহার মধ্যে বর্ত্তমান রাজা ও উহার পূর্ব্ব পুরুষদের অনেকগুলি প্রতিকৃতি আছে। শুনিলাম, এই উদ্যানভবন সময় সময় বড় বড় অতিথিদের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখান হইতে বরাবর গল্‌তা পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সোজা দীর্ঘ পথের পর নগর-প্রাচীরের বহির্দ্দেশে ইহা অবস্থিত। পথ অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ তোরণ পায় হইলাম। উহাতে প্রকাণ্ড দারুময় দরজা আছে। প্রাচীর-বেষ্টিত সমস্ত সহরটিতে এইপ্রকার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামের দরজা আছে। রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এইসব প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

আমরা টোঙ্গা হইতে নামিয়া পাহাড়ের পাথর কাটিয়া সুনির্ম্মিত যে-পথ আছে উহা ধরিয়া উপরে উঠিলাম। অনেকটা উঠিতে বেশ একটু কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্যদেবের মন্দির। এই স্থান হইতে আরও কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, চারিদিকে উচ্চ শৈলমালার মধ্যে অনেক নিম্নে আমাদের গন্তব্য স্থান। এতটা নামিয়া আবার উপরে উঠিতে পদযুগলের যে অবস্থা হইবে তাহার জন্য ভাবনা হইল, কিন্তু না দেখিয়া ফিরিবারও প্রবৃত্তি হইল না। নিম্নে অবতরণ করিয়া একটি প্রস্রবণ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিকে শৈলবেষ্টিত অসীম নীরবতার মধ্যে ঝরণার জল-প্রপাত শব্দ স্থানটিকে অতি রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আর-একটু দূরে যাইয়া সমতলের উপর কতকগুলি দেবালয় ও মনুষ্যাবাস দেখিলাম। এখানে দুইখানি মিষ্টান্ন প্রভৃতির দোকানও দেখিলাম। প্রাণীর মধ্যে নরনারী অপেক্ষা বানর-বানরীর সংখ্যাই অধিক, আর কতিপয় ছাগ ও ময়ূর ময়ূরী বিচরণ করিতেছে। এখানকার দেবালয়গুলির দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ও অন্যান্য ছবি অঙ্কিত দেখিলাম। অসংস্কৃত পুরাতন মন্দিরগুলির ভিতর শ্রীরাধাকৃষ্ণ, রাম সীতা, গোপাল প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি একে একে দেখিলাম। পাহাড়ের সোজা সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় কয়েকটি অট্টালিকা রহিয়াছে, পাণ্ডারা বলিলেন, পূর্ব্বে ঐ স্থানে সৈন্য থাকিত।

সব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইল এই তীর্থস্থানটির প্রতি রাজার যেরূপ দৃষ্টি থাকা উচিত তাহা নাই। আমরা আর সময়ক্ষেপ না করিয়া মাঝে-মাঝে একটু অপেক্ষা করিয়া ধীরে-ধীরে উপরে উঠিলাম। এই তীর্থে আসিয়া যথেষ্ট ক্লান্তি অনুভব করিলেও, উপর হইতে প্রাচীর-বেষ্টিত সারা জয়পুর নগরীর শোভা দেখিয়া সে-ক্লান্তি বিস্মৃত হইতে হয়। সহরটির একটা ধারণা উপলব্ধি করিতে হইলে এই পাহাড়ে উঠিয়া দেখা আবশ্যক। কিছুক্ষণের পর নামিয়া আসিলাম। পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গল্লভ নামে একটি সাধু পুরুষ এই পাহাড়ের মধ্যে তপস্যা করিতেন, তাঁহার নাম হইতেই পাহাড়ের নাম গল্‌তা হইয়াছে।

জয়পুরের শিল্পাদির কথা পূর্ব্বে হইতেই শুনা আছে; কল্য হিরণ্ময় বাবুর মুখে এ বিষয় আরও শুনিয়া দুই একটি কারখানা দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। এখান হইতে ফিরিবার কালে জোরাষ্টার কোম্পানির গালিচার কারখানা দেখিয়া গেলাম। এখানে পিতলের বাসনের উপর কারুকার্য্য, বিদরীর কার্য্য ও ঢালাইয়ের কার্য্যও হইয়া থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া এখানে বিভিন্ন বিভাগে কারিগরদিগের কাজের সহজ প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। দেখিলাম, অধিকাংশ কাজই ছেলেদের দ্বারা হইতেছে, তন্মধ্যে ১২।১৪ বৎসরের ছেলেও আছে। সুন্দর সুন্দর গালিচা এই সব ছেলে-কারিগর দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। বয়ন-কার্য্য প্রধানতঃ তাহারাই করিতেছে; প্রতি তাঁতে ৩।৭টি বালক নিযুক্ত থাকিয়া অতি ক্ষিপ্রহস্তে বয়ন করিতেছে; আর এক একজন বড় কারিগর নক্সা হাতে বসিয়া প্রতি দফে পশমের বর্ণাদির কথা বলিয়া দিতেছে। এইসব ছোট বড় শিল্পীদের দৈনিক পারিশ্রমিকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আট
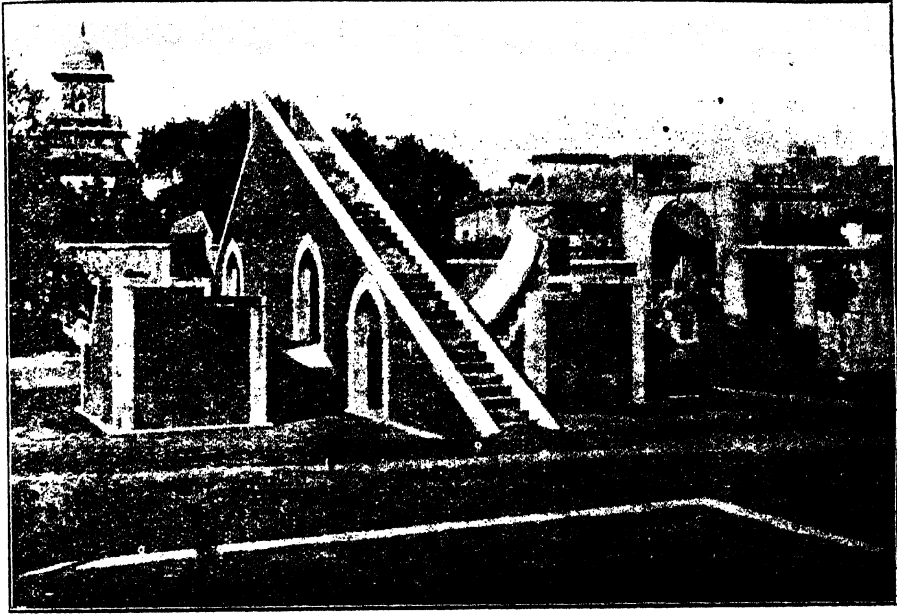
জয়পুর মান-মন্দিরের কয়েকটি যন্ত্র

আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত। নির্ম্মাণ-কৌশল ও যন্ত্রাদি এত সহজ ও শাদাসিধা যে, উহা দেখিয়া বারংবার মনে হইতে লাগিল, আমাদের দেশে বাঙ্গালায় এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের দিনে বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিয়া এসব কাজের প্রবর্ত্তন করেন না কেন? কতবারই মনে হইল, আমাদের চন্দননগরে একটি কারখানা করিয়া লোককে শিখাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি? এসব কাজের উপলক্ষে হইতে হইলে, সব প্রথমে যাঁহাকে আমার বলিতে মন চায়; সেই বন্ধুবর চন্দননগরের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র দে আমার সঙ্গেই রহিয়াছেন, কিন্তু বলহীন ভরসাহীন আমি আর সে কথা তুলিলাম না, মনে যাহা উঠিল মনেই তাহাকে তখনকার মত বিলীন হইতে দিলাম। বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা, তাহার পরমুখাপেক্ষিতা ও আলস্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে জয়পুরের স্মৃতি-নিদর্শন স্বরূপ কতিপয় জিনিষ খরিদ করিয়া সে-স্থান হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। গালিচা-বয়ন-যন্ত্রগুলিতে যে-ভাবে কাজ হইতেছিল তাহার ছবি লইবার বড় ইচ্ছা হইতেছিল। কাছে ক্যামেরা না থাকায় তাহা আর হইল না।

পূর্ব্বের ব্যবস্থামত বৈকালে আর্টস্কুল দেখিতে গেলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত তাঁহার সহকারী অপর একজন প্রাচীন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এখানকার বিভিন্ন প্রকারের শিল্পসামগ্রীপূর্ণ কক্ষগুলি আমাদের দেখাইলেন। শুনিলাম, সমস্তই এই শিক্ষালয়ের নির্ম্মিত। অধিকাংশই সুন্দর শিল্প-নিদর্শন, তন্মধ্যে কতকগুলি শিল্পীর দক্ষতার যথেষ্ট পরিচায়ক। রক্ষিত দ্রব্যগুলির সহিত মূল্য লেখা দেখিয়া জানিলাম সমস্তই বিক্রয়ার্থ আছে। এ-বিষয়ে কথোপকথনে বুঝিলাম, এতাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষালয় নামে অভিহিত হইয়া আসিলেও ইহা কতকটা ব্যবসার ক্ষেত্রই ছিল। অর্থাগমের উদ্দেশ্য রাখিয়া এতদিন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি কিরূপে তাহার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক সুখের বিষয় ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ প্রথিত-নামা শিল্পী অসিত-বাবু ও তৎপরে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ

হিরণ্ময়-বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায়, শিক্ষামন্দির যাহা হওয়া উচিৎ এখন ইহা তাহা হইতে চলিয়াছে।

এখান হইতে "চন্দ্রমহল" নামক জয়পুর প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। জয়পুরে রাজধানী স্থাপন-কালে ইহা নির্ম্মিত হয়। জয়পুরের 'পাতিখানা' ও অস্ত্রাগার প্রধান দ্রষ্টব্য, কিন্তু ইহা দেখিবার জন্য যে 'পাশ' আবশ্যক হয় তাহা সংগ্রহ করা কিছু দুরূহ। হাতি-বাবুর সহিত কল্য কথা হইয়াছিল, তিনি উহা আমাদের জন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন এবং পাইলে অদ্য বেলা ৩টার মধ্যে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উহা পাই নাই। প্রাসাদ-সম্মুখস্থ নব-নির্ম্মিত কাছারি-বাড়ীর দপ্তরখানায় কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধ বাবুর নিকট চেষ্টা করিয়া যদি পাশ পাওয়া যায় এই আশায় তথায় গেলাম। তিনি অনুপস্থিত থাকায় দেখা হইল না। তাঁহার সহকারী স্থানীয় ভদ্রলোকটিকে বলায়, তাঁহার হাত নাই বিনীতভাবে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, জয়পুরের মধ্যে ইহা প্রকৃত একটি দেখিবার ও দেখাইবার জিনিষ। জানিয়াছি ইহার মধ্যে যে প্রাচীন-চিত্র-সংগ্রহ আছে তাহা অমূল্য। হয়ত একদিন অপেক্ষা করিলে উহা দেখিবার সুযোগ হইতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আর হইল না। রাজপ্রাসাদ দেখিবার পাশ আমাদের ছিল, উক্ত জয়পুরী-ভদ্রলোকটি আমাদের সকল স্থান ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য একটি লোক সঙ্গে দিলেন।

এখানকার অন্দরের অংশ ভিন্ন একে একে প্রত্যেক স্থান, উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা, জলাশয় প্রভৃতি দেখিলাম। এখানেও দরবার-গৃহগুলির নাম দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আম। বিচিত্র-শোভাময় জয়পুরী ভিত্তিচিত্র সঙ্কলিত গোলাপী অট্টালিকা মধ্যস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রস্তর-মণ্ডিত বিবিধ সাজে সজ্জিত এই সৌধগুলি অতি সুন্দর। বাদল মহল নামক গ্রীষ্মাবাস-সৌধটি দেখিতে যাইতে একত্রে এত বেশি ফোয়ারার সমাবেশ দেখিলাম যাহা দিল্লী আগ্রা বা লক্ষ্ণৌয়ের কোথাও কোন এক স্থানে পূর্ব্বে দেখি নাই। রাজার হাতীশালে হাতী ও ঘোড়াশালে বিস্তর ঘোড়া দেখিলাম। রাজকীয় শকটাগার দেখিলাম। বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জাতীয় শকট সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে দুইখানি রৌপ্যমণ্ডিত অশ্বযান রহিয়াছে। শুনিলাম, উৎসবাদি উপলক্ষে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার কারুকার্য্য যাহা কিছু তাহা জয়পুরেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এক কথায় এখানকার প্রাসাদাদি যাহা কিছু সমস্তই রাজোচিত মনে হইল। প্রাসাদের অদূরে উচ্চ পাহাড়ের উপর দুর্গ ও কোষাগার অবস্থিত।

এখান হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সূর্য্যদেব অস্ত-গমনোন্মুখ। আর কোথাও যাইবার সুবিধা ছিল না। মহারাজার কলেজ একটি দ্রষ্টব্য, তাহাও দেখা হইল না। অবশেষে কতিপয় বড় বড় পথ ঘুরিয়া বাসায় আসিলাম। শুনিয়াছিলাম, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে মাথায় পাগড়ি বা অন্ততঃ পক্ষে একখানি রুমাল বাঁধিতে হয়, আমরা খালি মাথাতেই ছিলাম, সেজন্য কোথাও কোন বাধা হয় নাই। জয়পুরের রাজপথের একটু প্রশংসা আছে। দুই দিন বেড়াইয়া দেখিলাম, সত্যই এখানকার কয়েকটি পথ যেমন প্রশস্ত তেমনই সোজা ও দীর্ঘ। চাঁদপল বাজার নামক পথিপার্শ্বের ফুটপাথ স্থানে স্থানে দেড় দুই ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ দেখিলাম। সোজা প্রশস্ত পথ কয়েকটি মাত্র আছে, ছোট এবং অপরিষ্কার গলিরও অভাব নাই। পথিপার্শ্বে অধিকাংশ যে-সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলাম, তাহাতে স্থানীয় স্থাপত্যের দ্বারা বিশিষ্টতা রক্ষিত হইলেও, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ-শোভিত অট্টালিকা-শ্রেণী আমার চক্ষে তেমন কিছু প্রশংসাযোগ্য লাগিল না। খুব ভাল ভাল বাড়ীও এই দোষ-দুষ্ট দেখিলাম। আর এক এক পথিপার্শ্বে একই প্রকার সৌধ-শ্রেণীর কথা যাহা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যক্ষ দর্শনে বুঝিলাম তাহা গঠনে যত না হৌক বর্ণে বটে। অধিকাংশ বাড়ীর রং গোলাপী, দুই একটি পথে হরিদ্রাবর্ণের সৌধ-শ্রেণীও দেখিয়াছি। সকল বাড়ীতেই প্রায় সমস্ত স্থানে চূণের দ্বারা ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের প্রথা জয়পুরের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্কনের বিষয় সাধারণতঃ লতা পাতা ফুল হাতী ঘোড়া ও রাধাকৃষ্ণের লীলা। সমস্ত বাড়ীই পাথরে তৈয়ারি, কড়ি-বরগার

জয়পুর মিউজিয়ম্

ব্যবহার দেখা যায় না। পথের ধারের সদর দরজা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমরা যখন হোটেলে ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। রামনিবাস বাগে ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ডে তখন ঐক্যতান-বাদন হইতেছিল। সন্ধ্যার পর গ্যাসালোকে রাজোদ্যানের শোভা দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু আজ মথুরা যাইবার ব্যবস্থা হইয়া আছে; ট্রেনের খুব বেশী বিলম্ব নাই সুতরাং আর যাওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া একটি নূতন রাজ্যে নূতনতর স্মৃতি ও তৎসঙ্গে একটু অভিনব অভিজ্ঞতা লইয়া হোটেল রূপ সম্রা'ট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের বিচিত্র স্মৃতি-মন্দির ত্যাগ করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে আসিতে এখানকার যে নূতনত্বের কথা ভাবিতে লাগিলাম তাহা এই, এখানে প্রজা-সাধারণের বিশেষ কোন কর দিতে হয় না। বৃটিশ ভারতের প্রচলিত মুদ্রা এখানে চলিত থাকিলেও জয়পুরের স্বতন্ত্র মুদ্রাও চলিয়া থাকে। উহার মূল্য সতের আনা। পথে গো, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ভিন্ন হস্তীও প্রায় দেখা যায়। মাল বহনের জন্য উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ব্যবহার হইয়া থাকে। ময়ূর-ময়ূরী অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে এখানে বিচরণ করিয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র ও প্রায় সকল বিষয়েই, এমন-কি নামগুলি শুনিলেও একটা হিন্দুভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন তোরণের উপর "যতো ধর্ম্মঃ ততো জয়ঃ" লেখা, কোথাও একটি গণপতি মূর্ত্তি স্থাপিত, এই-সব হইতেই উহা মনে হয়। বিনামূল্যে বিদ্যাদান ও অন্যান্য প্রকারে প্রজাপালন প্রয়াস। এইসব স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ইহাও জানিয়া আসিলাম। রাজ্য-সংক্রান্ত উন্নতির সহিত দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গালীর বিশেষভাবে সংযোগ থাকিলেও বঙ্গবাসী লোকের প্রতি জয়পুর সরকারের বিশেষ সহানুভূতির অভাব। যেখানে বাঙ্গালীর অভাবে কাজের অসুবিধা সেখানে আজিও বাঙ্গালী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও যে-পদে অন্য লোক পাওয়া যায় এখন বাঙ্গালীর জন্য সে-পথ অবরুদ্ধ।

জন্ সিঙ্গার সার্জ্জেণ্ট্—

বিগত ১৫ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডন সহরে বর্ত্তমানযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং সম্ভবতঃ এই যুগের শ্রেষ্ঠতম তৈলচিত্রকারের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার নাম জন্ সিঙ্গার সার্জ্জেণ্ট্। পাশ্চাত্য শিল্পকলা অধুনা যে ধারা অবলম্বন করিয়া প্রবল গতিতে ছুটিয়াছে সার্জ্জেণ্ট্ সে ধারা অবলম্বন করেন নাই। তিনি রেনল্ডস্ ভ্যান্ ডাইক প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পীগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। সার্জ্জেণ্টের মৃত্যুতে আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পসমালোচক মিঃ রয়্যাল কর্টিসজ, এব্রাহাম লিঙ্কলনের মৃত্যুতে এড্উইন ষ্ট্যাণ্টনের 'মৃত্যু বরণ করিয়া তিনি অমর হইলেন'—এই বিখ্যাত উক্তিটির পুনরুল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সার্জ্জেণ্টের শিল্পকলা এমন নিখুঁত ছিল এবং এমন অপূর্ব্ব কৌশলে তিনি তুলিকা প্রয়োগ করিতেন যে অমর শিল্পীগণের সহিত তিনি এক আসনে বসিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তৈলচিত্রকারগণের মধ্যে ভেলাসকেজের পর একমাত্র তাঁহার নামই উল্লেখযোগ্য।"

জন্ সিঙ্গার্ সার্জ্জেণ্ট

অন্য একজন শিল্পসমালোচক লিখিয়াছেন—"ভেরোনীজ টিশিয়ানের, রেমব্রাণ্ট্ রুবেন্স এর এবং, গেন্স্বরো রেনল্ড্স্এর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পোর্ট্রেট্-চিত্রকরগণের মধ্যে সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে আর কাহারো নাম করা চলে না। লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে কদাচিৎ কোনো জীবিত চিত্রকরের কোনো চিত্রের স্থান হইয়াছে। কিন্তু সার্জ্জেণ্টের অনেক চিত্র তাঁহার জীবিতকালেই সেখানে জন্সুয়া রেনল্ডসের চিত্রের পাশে স্থান পাইয়াছে। তিনি প্রৌঢ় হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশরশ্মি ইতালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে।"

কর্টিসজের সমালোচনা হইতে এখানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"জীবনের প্রারম্ভেই তিনি যে বিজয়মুকুট পরিয়াছিলেন আমৃত্যু তিনি তাহা মস্তকে বহন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যশোভাতি কখনো ম্লান হয় নাই। তিনি বাড়ীতেই ইতালীয় চিত্রপদ্ধতির অনুসরণে শিল্পসৃষ্টি করিতে সুরু করেন। পরে যৌবনের প্রারম্ভে প্যারিসে গিয়া ক্যারোলাস্ ডুরানের শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝা যায় যে, ছাত্র শিক্ষকদের মহিমাকে ম্লান করিতে সুরু করিয়াছেন। ছাত্র সার্জ্জেণ্ট শিক্ষক ক্যারোলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।"

"তুলি ও রঙের সহায়তায় মানুষের যথার্থ রূপ ফুটাইয়া তুলিতে

মেট্পলিটান্ যাদুঘরে রক্ষিত সার্জ্জেণ্টের একটি তৈলচিত্র

সার্জ্জেণ্টের আর-একখানি তৈলচিত্র (২৬ বৎসর বয়সে অঙ্কিত)

ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বর্ণ ও রেখার উজ্জ্বলতার প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। যাঁহারা নিজেদের ছবি তুলিবার জন্য সার্জ্জেণ্টের নিকট যাইতেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আশঙ্কা হয়ত পাছে বাহিরের মানুষটিকে আঁকিতে গিয়া সার্জ্জেণ্ট ভিতরের মানুষকেও চিত্রিত করিয়া ফেলেন। তাঁহার চিত্রিত ছবি মানুষের ভিতরের ভাবকে নির্ম্মমভাবে বাহিরে আনিয়া ফেলিত।"

এখানে আমরা সার্জ্জেণ্টের একটি রেখাচিত্র এবং তাঁহার অঙ্কিত দুইটি তৈলচিত্রের প্রতিচ্ছবি দিলাম। প্রথম ছবিখানি আমেরিকার মেট্রপলিটান্ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় ছবিখানি সার্জ্জেণ্টের ২৬ বৎসর বয়সে অঙ্কিত।

—

পৃথিবীর সেরা সার্কাসের দল—

আমাদের দেশে সার্কাসের দল খুব বেশী নাই, কলিকাতায় বড়দিনের সময় প্রত্যেক বৎসরে দুই-একটি সার্কাসের দল আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যায়। তাহার অধিকাংশই বিদেশী সার্কাস দল। দক্ষিণ ভারতবর্ষের দুই-একটি দল সমগ্র ভারতবর্ষে খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। বাঙলাদেশে পূর্ব্বে বোসের সার্কাস প্রভৃতি দুই-একটি দল ছিল। আজকাল কোনো দল নাই। অথচ ভাল সার্কাস দেখিবার জন্য এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা টাকা খরচ করিতে কসুর করে না।

জুনো ও হেলেন

সার্কাস্‌দলের একমাত্র হিপোপটেমাস্‌

আমরা সাধারণতঃ যে-সকল দলের খেলা দেখিয়া থাকি পাশ্চাত্য দেশের দলের তুলনায় তাহারা অতি নগণ্য। এখানকার কোনো দলেই

জুনো

মিস্ ফ্রায়ার

খুব বেশী শিক্ষিত জানোয়ার কিম্বা শিক্ষিত খেলোয়াড় নাই। অথচ এই 'নাই মামার দেশে' এইসকল লোকেই সামান্য রকম কসরৎ দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের এক-একটি দলের প্রত্যেক বিভাগের খেলোয়াড়দের ইতিহাস আলোচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। আজীবন মন প্রাণ দিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাধনার সহিত ইহারা শিক্ষালাভ করে। এই পরিশ্রমের প্রতিদান স্বরূপ তাহারা এক একজনেই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে।

আমেরিকার একটি মাসিক পত্রিকায় পৃথিবীর-সেরা সার্কাস্‌দলের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় খেলা দেখাইয়া এই দল বৎসরে প্রায় পঞ্চাশকোটি টাকা উপায় করিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ এই সার্কাসে যোগ দিবার জন্য চেষ্টা করে। এই দলের কর্ত্তা এন জি ব্রাইটন্ নিউইয়র্কের একজন ক্রোড়পতি. ভাল ভাল জানোয়ার ও পাকা খেলোয়াড় সংগ্রহ করিতে ইনি টাকা খরচ করিতে দ্বিধা করেন না ; যেমন খরচ করেন তেমনি উপার্জ্জনও করিয়া থাকেন। এই দলে 'জুনো' নামে একটি শিক্ষিত ব্যাঘ্র আছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ হাত। গায়ে বিপুল শক্তি অথচ খেলোয়াড় মিস্ হেলেনের কাছে যেন ঠিক পোষা বিড়ালটি। এই দলের ভালুকের খেলাও বিখ্যাত। পৃথিবীতে একটি মাত্র সার্কাস দলে হিপোপটেমাস্ আছে—সেটি এই ব্রাইটন্ দলেরই একটি বিশেষ সম্পত্তি। এই দলের মিস্ ফ্রায়ারের মত তারের খেলায় আর কেহ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই।

মানুষে-ভালুকে

—

হংসরথ—

মোটরকারের মত আধুনিক যন্ত্র যানকেও কিরূপ সুদৃশ্য করা যাইতে পারে এই ছবিতে দেখুন। মোটরকারের সম্মুখভাগকে ঠিক একটি

হংসরথ

হাঁসের আকার দেওয়া হইয়াছে। হাঁসের মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়া হয়। হাঁসের গলায় কয়েকটি আলো মালার মত শোভা পায়। রাস্তায় লোক-জনকে সাবধান করিতে হইলে কল টিপিলেই হাঁসের মুখ দিয়া ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ আওয়াজ বাহির হইতে থাকে।

—

বন্য হরিণের ফটোগ্রাফ—

পেনিসিল্‌ভানিয়া প্রদেশে পোকোনো পর্ব্বতে একদল বন্য হরিণ বাস করে, তাহারা দেখিতে অতীব সুদৃশ্য অথচ এত ধূর্ত্ত যে, মানুষের ফাঁদে কখনো পা বাড়ায় না। জীবিত অবস্থায় এই হরিণের ছবি তুলিবার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কিছুকাল হইতে চেষ্টিত ছিলেন। বনের মধ্যে ইহারা বিচরণ করে। সেখানে এমন অন্ধকার যে, ফটো তোলা

বন্য হরিণের ফটোগ্রাফ

একরূপ দুঃসাধ্য। বড় বড় ঘাসের মধ্যে ক্যামেরা ও বৈদ্যুতিক আলোর সরঞ্জাম এমন ভাবে ফেলিয়া রাখা হয় যাহাতে কোনো রকমে মাটিতে বিস্তৃত তারের উপর হরিণের পা পড়িলেই আলো জ্বলিয়া উঠিবে ও ক্যামেরাতে ছবি উঠিবে। এই কৌশলে একটি হরিণের চমৎকার ছবি উঠিয়াছে, সেইটি এখানে দেখানো হইল।

—

টিন-খোদাই ছবি—

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাধ্যাপক পেরহাম্ ন্যাল টিন-খোদাই কার্য্যে চমৎকার পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। সাদা কালোর সমাবেশে

কুমোর-বাড়ী
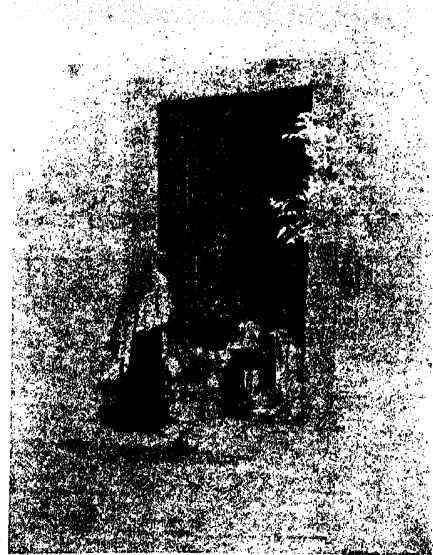
ম্যাডোনার পূজা

ইনি অঘটন ঘটাইয়া থাকেন। মেক্সিকোর গুয়ানোজুয়াটো সহরের কয়েকটি দৃশ্য ইনি টিনের উপর খোদাই করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে দুইটি ছবি এখানে দিলাম। ন্যাল সাহেবের শিল্প-নিপুণতা ইহা হইতেই অনেকটা বুঝা যাইবে।

—

জঞ্জালের ব্যবহার—

ভিয়েনার একজন রাসায়নিক সকল রকম জঞ্জালকে জ্বালানি দ্রব্য রূপে ব্যবহার করিবার এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। জঞ্জালের

জঞ্জাল-জ্বালানি

মধ্যে কেরোসিন জাতীয় একপ্রকার তৈল ঢালিয়া প্রবল চাপ প্রয়োগে সেগুলিকে ইটের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। অতি অল্প খরচে এইগুলি দিয়া চমৎকার কাজ হয়।

—

চিড়িয়াখানায় সীলমাছ—

গত বৎসর দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া উপকূলের অনতিদূরে গুয়াদালুপে দ্বীপে একটি অতিকায় সীলমাছ ধৃত হইয়া সান ডায়েগোর চিড়িয়াখানায়

চিড়িয়াখানায় সীল মাছ

রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ওজন প্রায় ৯০ মণ। এই বিপুলকায় জন্তুটি এমনই নিরীহ যে, রক্ষী স্বহস্তে ইহাকে আহার দিয়া থাকে।

—

মাখনের ফুল—

স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর একটি মহিলা মাখনের সাহায্যে নানারূপ ফুল-পাতা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। সেগুলি এমন চমৎকার হয় যে, আসলের সঙ্গে তফাৎ বুঝিতে পারা যায় না। ইনি ইঁহার ফুলগুলিকে যথাযথ রঙ দিবার

মাখনের ফুল

জন্য নানারূপ উদ্ভিজ্জ রঙ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাহিরের উত্তাপ হইতে ইঁহার শিল্পসৃষ্টিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইনি বরফের ঘরে কাজ করিয়া থাকেন এবং রাশিয়ার কৃষক-কন্যাদের মত সাজ-পোষাক পরিয়া থাকেন। এখানে তাঁহার নির্ম্মিত মাখনের গোলাপ ফুল ও পাতার একটি সাজি দেখান হইল।

—

তিনটি জাপানী ছবি—

পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্‌গণ জাপানী রঙীন ছাপের (Colour Prints) বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "মূল ছবি চোখে না দেখিলে ইহাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। ছবির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করিবার এমন কোনও কৌশল আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বারা জাপানী ছবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে প্রতিচ্ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে পারে।" ইঁহারা বলেন যে, রঙের সমাবেশের অদ্ভুত সামঞ্জস্য সৃষ্ট করিয়া তোলাটা জাপানী শিল্পের গৌণ ব্যাপার; ইহার আসল সৌন্দর্য্য সূক্ষ্মতম রেখার প্রয়োগে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি। হিবার্ট কোলবোর্ণ সাহেব "জাপানের শিল্প" প্রসঙ্গে প্যাসিফিক্ ওয়ার্লড্ কাগজে লিখিয়াছেন—
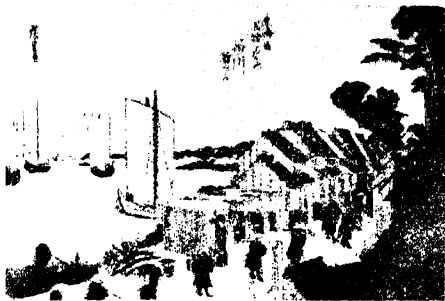
বন্দর
হিরোশিগে অঙ্কিত

নদীতীর
হিরোশিগে অঙ্কিত

আকাশপথে হংসরাজ
ওকিও অঙ্কিত

"সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ধাতু ও হস্তিদন্ত খোদাই শিল্পে জাপানীরা যে-পরিমাণ নিপুণতা দেখাইয়াছে পৃথিবীর অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না এবং জাপানের প্রত্যেক খ্যাতনামা শিল্পীই কাঠ-খোদাইয়ের সাহায্যে আপনাদের কল্পনাকে রূপ দিতে আশ্চর্য্যরকম নিপুণ। যদিও এ বিষয়ে চীনের কাছে জাপান অনেকখানি ঋণী; তবু জাপানীশিল্প যে সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছে তাহা একান্তই জাপানের বস্তু। অত্যন্ত সামান্য জিনিষকে কয়েকটি মাত্র রেখার সাহায্যে জাপানী শিল্পী এমন চমৎকার রূপ দিতে সক্ষম যাহা পাশ্চাত্য শিল্পীগণের নিকট সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। এই সৌকুমার্য্যই (Delicacy) জাপানী শিল্পের প্রধান গৌরবের বিষয়।"

এখানে আমরা তিনটি জাপানী রঙীন ছাপের একরঙা প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করিলাম। একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্পী ওকিও কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইনি পশুপক্ষী অঙ্কনে অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবিতেও উড্ডীয়মান হংসটির কি চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে!

অপর ছবি দুইটি জাপানের শিল্প-সম্রাট হিরোশিগের অঙ্কিত। রেখার অপরূপ সূক্ষ্মতা ছবি দুইটিতে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বেটোফন্ শতবার্ষিকী

অধ্যাপক শ্রী কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস্)

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বজ্রনির্ঘোষ; সঙ্গীতগুরু লুড্‌হিগ্ ফন্ বেটোফন্ এই পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় লইলেন—বিয়েনার (Vienna) সহরতলীতে হেরিঙের ফ্রিডহফে'র (Wahringer Friedhof) শ্মশানে তাঁহার এই শবদেহ ধরণীর বুকে চিরনিদ্রায় শায়িত হইল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর জার্ম্মানীর বন্ (Bonn) সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স

সাতান্নও পূর্ণ হয় নাই। অথচ এই কয়েকটি বছরের অনুভূতি—ইহার সুখ ও দুঃখ, মিলন ও বিরহ—তাঁর সঙ্গীতের ভিতর দিয়া শাশ্বত রূপ লাভ করিয়াছে—নিখিল বিশ্বকে বীণার মত বাজাইয়া তুলিয়া গুণী বেটোফন্ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন, অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; বিচিত্র নিবিড় ভাব-সঙ্গীতে একমাত্র সেক্সপীয়রের সঙ্গেই তাঁর তুলনা; সত্যই তিনি সঙ্গীত-লোকের সেক্সপীয়র।

বেটোফনের সমস্ত জীবনকে যিনি বুদ্ধি দিয়া, হৃদয় দিয়া আপনার অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, জাঁ ক্রিস্তফের অপূর্ব্ব উপন্যাসে বেটোফনের দুঃখ-যন্ত্রণা-দগ্ধ, অপূর্ব্ব-মনীষা-সম্পন্ন জীবনের স্মৃতিকে যিনি অমরত্ব দান করিয়াছেন, বেটোফনের চরিত-লেখক, সেই মনীষী রম্যাঁ রলাঁ আজ বেটোফনের শত বার্ষিকীতে আমাদিগকে সঙ্গীত-গুরুর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বেটোফন্ ভারতবর্ষের অমর আত্মা পরম সম্ভ্রমে ও সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রম্যাঁ রলাঁ ও বেটোফন্ শতবার্ষিকী

মনীষী রলাঁ লিখিতেছেন, "১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আগামী ২৬শে মার্চ্চ সঙ্গীতগুরু বেটোফনের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসব হইবে। সকল দেশেই এই উৎসবের ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইয়াছে—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলে এই উৎসবে যোগদান করিবে।"

বেটোফনের জীবন শুধু জার্ম্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; সমগ্র পৃথিবীকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার জীবনের সার্ব্বজনীনতার প্রতিই রলাঁ ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভারতবর্ষীয় বন্ধুদের জন্য কয়েকটি অপূর্ব্ব তথ্য এবং লিখন উপহার পাঠাইয়াছেন। এই লিপিগুলি পড়িলে একটি জিনিস সহজেই মনকে অধিকার করিয়া বসে—ঊনবিংশ শতাব্দীর যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, সেই গ্যয়টে ও বেটোফন্, শোপেন্‌হাউয়ার ও টলষ্টয় ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের প্রতি কেমন একটি আত্মীয়তা অনুভব করিতেন। বেটোফনের স্মৃতি-রত্ন-ভাণ্ডার হইতে মনীষী রলাঁ এই অমূল্য লিখনগুলি আমাদের জন্য খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষ ও বেটোফন্

"এই বিশ্বজনীন উৎসবে ভারতবর্ষ ও এসিয়া আপনার সুর মিলাইয়া উৎসব-সঙ্গতটি পরিপূর্ণ করিয়া তুলুক—ইহাই আমার মনের ইচ্ছা। ভারতবর্ষের পত্রিকাদিতে এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া বেটোফনের আলোচনা হউক। ভারতের যে চিন্তাধারা, তাহা বেটোফনের ভাবুক চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, একথা আজ সকল ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বেটোফনের নিজের হাতের লেখা কাগজ-পত্র হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া তার প্রতিলিপি পাঠাইতেছি। এই সংগ্রহগুলি বেটোফন্ নিজের হাতে লিখিয়া গিয়াছেন—এগুলি ভারতবর্ষের জিনিস, অথচ কয়েকটি রচনা যেন য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে মিলাইয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কোথা হইতে বেটোফন্ এগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা এখনও নিশ্চিত বলা যায় না; তবে মনে হয়, তৃতীয় বল্লীটি ফর্‌ষ্টার কৃত 'শকুন্তলা' অনুবাদের চতুর্থ বা পঞ্চম অঙ্ক হইতে গৃহীত। দ্বিতীয় বল্লীর স্তোত্রটি কোন সংস্কৃত স্তোত্রের কোলব্রুককৃত ইংরেজী অনুবাদ হইতে পরিবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত বলিয়া অনুমান হয়।

ইহারই সঙ্গে বেটোফনের জীবনের কয়েকটি অপরিজ্ঞাত ঘটনা ভারতের সকলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছি।

বেটোফন্ ও ভারতবর্ষ

"১৮০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার প্রাচ্য-ইতিহাসবেত্তা হেম্মার-পুর্গষ্টাল্ (Hammer-Purgstall) এশিয়া হইতে ভিয়েনায় ফিরিয়া গেলেন। দেশে ফিরিয়া ইচ্ছা হইল 'প্রাচী'র সাধনা, সভ্যতা ও ইতিহাসের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয়-সাধনা করাইবেন। বন্ধু কাউণ্ট রিহ্বস্কি'র (Count Ryewusky) সহায়তায় '*Fundgruben des Orient*' নামে একটি পত্রিকার সূচনা হইল এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল।

"বেটোফন্ তখন ভিয়েনায়—তাঁহার মনীষা ও প্রতিভার যশ-গৌরবে সমস্ত দেশ তখন মুগ্ধ ও মুখরিত; কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বিচিত্র সুর-সৃষ্টিতে (symphony) সমস্ত দেশ পুলকিত; এখনও সেই সুর ও ছন্দের রেশ যেন সকলের কানে বাজিতেছে। বেটোফন্ ও হেম্মার এই সময় পরম বন্ধুত্বে একে অন্যকে আলিঙ্গন করিলেন। এই দুই বন্ধুর মধ্যে যে-সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে তাহার দুইখানি ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচিয়াছে। হেম্মার্ বেটোফনের সৌহার্দ্দকে পরম গৌরবের বস্তু বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকটি রচনা পাঠাইয়াছিলেন। বেটোফন্ তার পরিবর্ত্তে হেম্মার্‌কে প্রভূত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

"কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের বন্ধুত্ব সমাপ্ত হয় নাই। হেম্মার্ বেটোফনের সঙ্গীত-সৃষ্টির উপাদানরূপে ভারতবর্ষের ভাবধারায় পরিপ্লুত একটি গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বেটোফন্ তাহা শুনিয়া ভাবাবেগে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—অপূর্ব্ব, চমৎকার! "(herrliches!") এই বিষয় লইয়া দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইয়াছিল এবং বেটোফন্ হেম্মারের নিকট হইতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেটোফন্ পীড়িত হইয়া পড়ায় রচনাটি রূপ ধরিয়া উঠিল না; পরেও সে সুযোগ আর কখনও হয় নাই। শুধু হেম্মারের কাগজপত্র ঘাঁটিয়া "দেবযানী" আখ্যানের একটি সুন্দর গাথা পাওয়া গিয়াছে (Memnons Dreiklang nachgeklungen in Dewajani, einem indischen Schaferspiel)। হেম্মান্ বোধ হয় এই গাথাটিই বেটোফন্‌কে উপহার দিয়াছিলেন।

"কিন্তু ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা ভারতের ধর্ম্ম ও চিন্তার ধারা বেটোফন্‌কে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার চিঠিপত্র এবং খুঁটিনাটি লেখা (১৮০৯-১৮১৬) হইতে বোঝা যায় যে, এ সময় তিনি অত্যন্ত যত্নে ও পরিশ্রমে ভারতের শাস্ত্র ও সাহিত্যের হেম্মার্ কৃত অনুবাদ পাঠ করিতেছিলেন। বেটোফনের যে-সমস্ত উদ্ধৃত সংগ্রহ পাঠাইতেছি তাহা হইতেই একথা বুঝা যাইবে।

"এশিয়ার ভাব ও চিন্তাধারার প্রতি য়ুরোপীয় মনীষার এই যে আত্মীয়তা-বোধ, ইহা নব জাগরণের চিহ্ন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই আত্মীয়তা-বোধের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম বিকাশ-লাভ ঘটিল ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যখন গ্যয়টে তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য Westostlicher Divan প্রকাশ করিলেন। বেটোফন্ তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শোপেন্‌হাউয়ারের ভাব ও আত্মার যে ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমরা জানি তাহার মধ্যেও আমরা এই আত্মীয়তা-বোধেরই পরিচয় পাই।
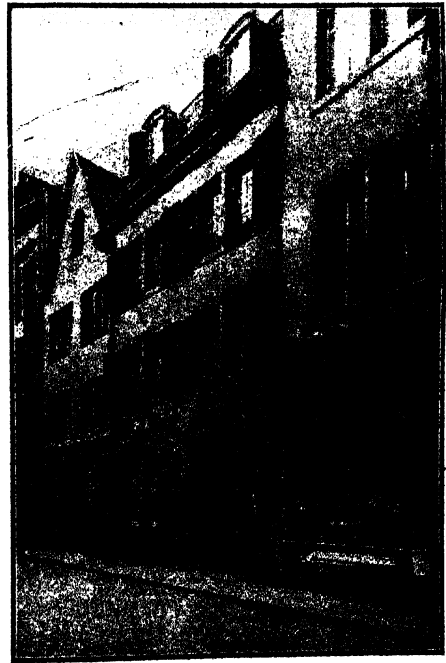
জার্ম্মানীর ১ন-এ বেটোফনের বাসগৃহ

"বেটোফনের এই সংগ্রহের মূল জার্ম্মান্ প্রতিলিপিই আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। এই সংগ্রহগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের যে ভাব-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা হয়ত ভারতে দুর্লভ নহে, কিন্তু এশিয়ার ভাব ও চিন্তার ধারা বেটোফনের প্রাপ্তবয়সে তাঁহার মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার নিদর্শন হিসাবে এগুলি অমূল্য।

"জার্মানীর যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁহারা বেটোফনের জীবনের এই তথ্য জানেন, কিন্তু সাধারণে ইহার খবর রাখেন না। আমি আশা করি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনের এই তথ্য ভারতবাসীরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে।"
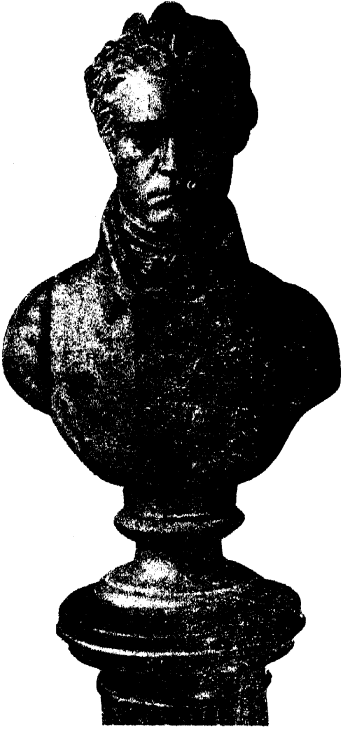
বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বেটোফন (১৮১২ সালে ভিয়েনার ফ্র্যাঙ্ক ক্লিন নির্ম্মিত মূর্ত্তি)

বেটোফন্‌-লিখনগুলির ঐতিহাসিক মূল্য

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা, সভ্যতা ও ইতিহাসের চর্চ্চা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের কাছে এই সংগ্রহ-গুলির মূল্য অনেক। য়ুরোপের বিবুধ-মণ্ডলীতে প্রাচ্য জ্ঞান ও সভ্যতার পাঠ ও আলোচনার সূত্রপাতের কত পূর্ব্ব হইতেই যে প্রাচী ও প্রতীচির আত্মা একে অন্যের আকর্ষণে পরস্পর সম্মুখীন হইতেছিল, বেটোফনের সংগ্রহ-রাজির মধ্যে তাহারই প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। উইলিয়ম্‌ জোন্স, উইলকিন্স কিংবা কোলব্রুক্‌ ইঁহারা এবিষয়ে বেটোফনের অগ্রণী। কিন্তু বুর্নোফ এবং বপ, গ্যয়টে এবং শোপেন্‌হাউয়ার প্রভৃতির পূর্ব্বে যে বেটোফন্‌ ভারতের আত্মাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন একথা ভুলিতে পারি না।

বেটোফনের মূল জার্ম্মান্‌ পাণ্ডুলিপির অনুবাদ (১৮১৫)

প্রথম বল্লী—উপনিষৎসংগ্রহ

"আত্মাই ভগবান, তিনি কোনো বস্তু নহেন; সেই জন্যেই আমরা তাঁহার কোনো সীমা বা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহার কোন আকার নাই। তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্ম হইতে বুঝিতে পারি, তিনি শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান্‌। তিনিই একমাত্র সুমহান্‌ পুরুষ যিনি সকল বাসনা ও কামনা হইতে মুক্ত। তিনিই ব্রহ্ম তাঁহার অপেক্ষা মহান্‌ আর কেহ নাই। এই সর্ব্বশক্তিমান্‌ পুরুষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আত্মসমাহিত অবস্থা হইতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের উদ্ভব। পৃথিবীর যত জ্ঞান ও চিন্তা সকলই তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তার মধ্যে বিধৃত। তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; জীবের যে তিন অবস্থা তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; তিনি ত্রিগুণাতীত।

হে ভগবন্‌, তুমিই একমাত্র সত্য, তুমিই শুদ্ধ ও শাশ্বত; সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের তুমিই একমাত্র অম্লান জ্যোতি। তোমার জ্ঞান পৃথিবীর সকল নিয়মকে আপনার মধ্যে সংহত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন—তাহারা তোমারই মহিমা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করে। আমরা যাহাদের পূজা করি তাহাদের সকলের তুমি ঊর্দ্ধে; আমরা সকলে তোমার পূজা করি এবং তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাই। তুমিই একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবান্‌; সকল সত্যের মধ্যে তুমিই একমাত্র সত্য, সকল জ্ঞানের তুমিই একমাত্র বিকাশ। হে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এই সূর্য্য, এই অসীম শূন্য—তোমার সত্তা এই জগতের সব কিছুকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় বল্লী—বন্দনা

হে আত্মার আত্মা, এই সীমাহীন কাল ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে তোমার সত্তা বিরাজ করিতেছে। সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সকল বিদ্রোহী চিন্তার উপর জয়ী হইয়া তুমি শান্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। এ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি ছিলে, একা তুমি ছিলে; এই উর্দ্ধে ও নিম্নে গ্রহ ও উপগ্রহমণ্ডলী যখন ঘূর্ণায়মান হইতে আরম্ভ করে নাই, এই পৃথিবী যখন অসীম শূন্যে সঞ্চরমাণ হয় নাই, তখনও তুমি ছিলে। যাহা কিছু ছিল না তখন তোমারই প্রেমে তাহার সৃষ্টি হইল এবং তোমার বন্দনা-গীতিতে ভুবন ভরিয়া তুলিল। কি হইতে তোমার এত শক্তির লীলা সম্ভব হইল? হে অসীম পবিত্রতা, কোন্ অপরিসীম জ্যোতি তোমার এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল? হে অসীম জ্ঞান, কে এই জ্ঞানের প্রথম স্রষ্টা? হে ভগবন্, তুমি আমার আত্মাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও, এই গহন অন্ধকার হইতে তুমি আমায় উদ্ধার কর। তোমার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন আমার আত্মা পরম নির্ভয়ে অসীমে উর্দ্ধে রুদ্র ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। কি করিয়া যে মানুষের আত্মাকে অনুপ্রাণিত করা যায় তাহা তুমিই জান।

তৃতীয় বল্লী

যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু অম্লান তাহাই ভগবান হইতে উদ্ভূত। হে ভগবন্, যদি কখনও পাপে মোহে অন্ধ হইয়া বিপথের যাত্রী হই, আমি যেন বহু সাধনা, বহু তপশ্চর্য্যার পর তোমারই পবিত্র শান্তিময় আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে পারি; তোমারই অনুপম শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের পূজারী যেন হই। সর্ব্বকালে তুমি নিরহঙ্কার, কোনো অহঙ্কারই তোমায় স্পর্শ করে না; ফলভারে বৃক্ষরাজি অবনত হইয়া পড়ে, জলভারাবনত মেঘ বসুধার রৌদ্রদগ্ধ বুকে নামিয়া আসে, মানবের যাঁহারা হিতকারী তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করেন না।

দুঃখে ও ব্যথায় চোখ যদি জলে ভরিয়া যায়, যদি অশ্রুবিন্দু বাঁধ দিয়া থামান না যায় তবে মনকে দৃঢ় করিও, তাহাকে বিচলিত হইতে দিও না, সেই পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দুকে সংহত করিয়া লইও। এই পৃথিবীতে চলিতে চলিতে পথ যদি কখনও বন্ধুর হইয়া উঠে; সত্য-পথ, সহজ পথ যদি কখনও অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়, তোমার পা দু'টি যদি কাঁপিয়া উঠে, ধর্ম্মকে স্মরণ কর, তাঁহাকে অবলম্বন কর—তিনিই তোমাকে সত্য পথে, সহজ পথে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।

বেটোফেনের অন্তর্দৃষ্টি

চতুর্থ বল্লী
গীতা হইতে উদ্ধৃত ও পরিবর্ত্তিত

সকল বাসনাকে সংযত করিয়া, ফলনিরপেক্ষ হইয়া যিনি নির্ভয়ে সকল কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারেন, তিনিই ধন্য। কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলের জন্য কামনা তুমি করিও না। কর্ম্মের ফলই যাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে তাহাদের মধ্যে তুমি থাকিও না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন কাটাইও না, কর্ম্মী হও, আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর। ভাল হউক, মন্দ হউক, সকলপ্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। কর্ম্মের মধ্যে এই নিস্পৃহতাই মনে শান্তি ও আনন্দ দান করে। শুদ্ধ জ্ঞানই মানব-চিত্তের একমাত্র আশ্রয়; বস্তু-জগতের সুখ ও আনন্দের মধ্যে যে আশ্রয় খুঁজিয়া মরে সেই দুঃখী, সেই অসুখী। সত্যই

যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখে কখনো উদ্বিগ্ন হন না। প্রজ্ঞাকে সর্ব্বদাই মানিয়া চলিও, কারণ জীবনে ইহা দুর্ল ভ বস্তু।

পঞ্চম বল্লী

জগতের এই বিরাট্ নিস্তব্ধতার মধ্যে বনানীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে তিনি সমাহিত হইয়া আছেন, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের তিনি অতীত, তিনি অগম্য, অপার, অসীম। জীবের প্রাণে যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয় নাই তখনও তাঁহার নিশ্বাস সকলকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের মর-মানবের আঁখি যেমন দর্পণের দিকে কৌতূহলী হইয়া চায়, তেমনি তাঁহার লীলা-নেত্র তাঁহারই সৃষ্টি-মুকুরে বারবার প্রতিফলিত হয়।

ষষ্ঠ বল্লী

ভারতীয় সাহিত্যের ছিটে-ফোঁটা (১৮১৬)

(১৮১৬ খৃষ্টাব্দ। হেম্মার-কৃত ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ ইত্যাদি পাঠ করিবার কালে এখানে-ওখানে যে কয়েকটি অপূর্ব্ব তথ্য বেটোফন্‌কে কৌতূহলী করিয়াছিল তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।)

ভারতবর্ষে এমন অনেক পর্ব্বতখোদিত মন্দির, স্থাপত্যের অদ্ভুত নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে, যেগুলি ৯০০০ বৎসরেরও প্রাচীন।

* * * *

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগ্রাম—স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, স।

* * * *

মুক্তিকামী যে ব্রাহ্মণ, নির্জ্জন মন্দিরে সুদীর্ঘ পাঁচ-বৎসর নীরবে তাহাকে সাধনা করিতে হয়।

* * * *

লিঙ্গমূর্ত্তি যাহার মন ও দৃষ্টিকে পীড়িত করে, ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিতেছেন, ভগবান্ মানবের চক্ষুকে রূপদান করিয়াছেন, তিনিই কি মানবের অন্যান্য অঙ্গকেও সৃষ্টি করেন নাই।

* * * *

ভগবান্ কালের অতীত সত্তা।

* * * *

হিন্দুদের মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে।

* * * *

কৃষি ও শিকার-বৃত্তি শরীরকে সুদৃঢ় ও শক্তিমান্ করিয়া তোলে।

বেটোফনের আত্মা

উপনিষদে ও ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষের যে অমূল্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও চিন্তার সার-মর্ম্ম আত্মগোপন করিয়া আছে, সেই তত্ত্ব-সাহিত্যেরই পরিবর্ত্তিত অনুবাদের বিচিত্র নিদর্শন বিটোফনের পাণ্ডুলিপির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বেটোফন্ নিজেই, না তাঁহার বন্ধু হেম্মার-পুর্গষ্টাল তাহার জন্য সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা নাই। খুব সম্ভব বেটোফন্ নিজেই তাঁহার বন্ধুর ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের অনুবাদ-সংগ্রহের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের ঋষি-মুখ-নিঃসৃত অমূল্য বাণীগুলি নিজের মনোমত করিয়া খুঁজিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে শুধুই যে মূল ভারতীয় তত্ত্বগীতির অনুবাদ রহিয়াছে, তাহা নহে,—বেটোফনের তত্ত্ব ও সঙ্গীত-রস-রসিক ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সেই তত্ত্বের উপর যেন নিজের সুর-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সেই হেতুই এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, মূল ভারতীয় তত্ত্বকথাগুলির সঙ্গে-সঙ্গেই যে ভাব-সমৃদ্ধির উচ্ছ্বাস এই সংগ্রহগুলির মধ্যে দেখা যায় তাহা বেটোফনেরই রচিত।

বেটোফনের চরিত-লেখকেরা সকলেই বলেন, ধর্ম্মভাবের প্রবল প্রেরণা তাঁহার চিত্তকে নিরন্তর রস মাধুর্য্যে ডুবাইয়া রাখিত।

"তাঁহার মত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি খুব কচিৎ দেখা যায়। জীবনের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁহার ভাব ও চিন্তাকে ঊর্দ্ধে জীবনদেবতার চরণতলে প্রেরণ করিতেন; তাঁহার দিনলিপি অসংখ্য উচ্ছ্বাসময় বন্দনাগীতিতে মুখরিত। ভগবান তাঁহার কাছে কল্পনা মাত্র ছিলেন না, তিনিই তাঁহার কাছে একমাত্র প্রিয় বস্তু ছিলেন; সর্ব্বাবস্থায় তিনি তাঁহার সত্তাকে উপলব্ধি করিতেন এবং সুখে দুঃখে

সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরের মধ্যে আহ্বান করিতেন।" (জর্জ্জ গ্রোভ)

"নিবেদন কর—জীবনের যত মূর্খতা, যত দুর্ব্বলতা সব চরম শিল্পীর পদতলে নিবেদন কর, ভগবানের চরণে সমর্পণ কর। ভগবান সর্ব্বোপরি বিরাজিত।"—বীটোফেনের জীবনের ইহাই ছিল যেন প্রতিদিনের জপমন্ত্র।

রম্যাঁ রলাঁ ও বেটোফেন্

"তাঁহার সমস্ত জীবনকে একটা দুর্দ্দান্ত ঝড়ের দিনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। জীবনের প্রথমে ত একটি সুন্দর প্রভাত—মাঝে মাঝে শুধু ক্লান্তির একটা দমকা হাওয়া। কিন্তু মনে হয়, এই নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যেই যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের প্রচ্ছন্ন আক্রোশ নিহিত আছে। হঠাৎ আকাশের উপর দিয়া একটা বিরাট্ মেঘের ছায়া ভাসিয়া যায়; ঝঞ্ঝার সূচনা অন্তরকে কাঁপাইয়া তোলে, নিস্তব্ধ অন্ধকার আরও ভীষণ হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে একদিন উট মাইনরের (Ut minor) সুরতরঙ্গ ও বীরগাথা (Heroic) বিরাট্ ঝঞ্ঝার উন্মত্ত গর্জ্জনে সকল দিক্ কাঁপাইয়া তোলে। কিন্তু তখনও আকাশের স্বচ্ছ নীলাবরণ, বাতাসের স্নিগ্ধ নির্ম্মলতা একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আনন্দ তখনও পরিপূর্ণ আনন্দেই বিরাজ করে। দুঃখ তখনও আশার আলোকে দীপ্ত; কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পর এ অবস্থা যেন বদ্লাইয়া গেল।

"এখন তাঁহার জীবন ও মর্ম্মের মধ্য হইতে কেমন যেন একটা অপূর্ব্ব রহস্যালোক বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। অতি স্বচ্ছ সহজ সঙ্গীত হইতেও কি যেন একটা ধূম্র কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা ধীরে ধীরে গুমরাইয়া উঠে; সেই অস্পষ্ট কুয়াসা একবার উবিয়া যায়, আবার আসিয়া জড় হয় এবং ব্যথা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অনেক সময় মূল সুর যেন একেবারে হারাইয়া যায়, কুয়াসা ভেদ করিয়া এক একবার শুধু তাহার ঝঙ্কার-মূর্চ্ছনা শুনা যায়, পরক্ষণেই আবার কুয়াসার মধ্যেই ডুবিয়া যায়, আবার একেবারে তানের শেষ কলিতে হঠাৎ আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসে, বেটোফেনের এই সময়ের আনন্দও যেন রুদ্ররসে ভরপুর। তাহার সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে একটা জরের জ্বালা, বিষের বাষ্প যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া তোলে। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে'র একটা চিঠিতে বন্ধু হ্বেগেলারকে লিখিতেছেন, "জীবন কি সুন্দর, কি মহান্—কিন্তু আমার সারাটা জীবন কেবল বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া গেল।" কি করুণ, কি মর্ম্মন্তুদ এই ক্রন্দন! রাত্রি যতই ঘনাইয়া আসে, মেঘ ততই নিবিড় হয়, তারপর হঠাৎ একমুহূর্ত্তে কাল-বৈশাখীর ঝটিকার বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ ঘন কালো চুল আকাশ জুড়িয়া এলাইয়া দিয়া, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় ভাঙিয়া পড়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে Ninth Symphony'র অনুপম গম্ভীর, সুরলহরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। বিদ্যুতে ঘূর্ণীতে অন্ধকারের যবনিকা ছিঁড়িয়া যায় এবং নির্ম্মল অন্তরের নিবিড় প্রেরণায় এই ধরণীর শুভ্র দিবসালোক স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে নয়ন অভিষিক্ত করিয়া দেয়।

"নেপালিয়ানের কোন্ বিজয়-গৌরব, অষ্টারলিৎস্ সূর্য্যের কোন্ অত্যুগ্র দীপ্তি এই সুমহান্ গৌরব, এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শক্তি-বিকাশের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? এই জয়গৌরবের কি কোনো তুলনা আছে, মানবাত্মার জয়-যাত্রার ইতিহাসে ইহার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে? দুঃখ ও ব্যথার মধ্যে যাঁহার জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের প্রভাত হইতে রোগযন্ত্রণা ও সকলের অবহেলা যাঁহার জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীর আনন্দ হইতে সকলে যাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তিনি নিজের মধ্যেই নিজের আনন্দকে অমৃতকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা পৃথিবীর যত মানব সকলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলেন। সত্য সত্যই বেটোফেন্ দুঃখের মধ্য হইতেই আনন্দকে সৃষ্টি করিয়াছেন—নিজেই তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন,

ব্যথার ভিতর দিয়াই আনন্দ

"Durch Leiden Freude"।

বেটোফেনের Ninth Symphony যিনি শুনিয়াছেন, দুঃখ ও যন্ত্রণার সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বসিয়া তিনি ব্যথিত আত্মার অন্তস্তল হইতে যে অপূর্ব্ব সুমহান্ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা যিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি মনীষী রলাঁর কথাগুলির সত্যতা অনুভব করিবেন।

আনন্দ-বন্দনা

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বেটোফন্ ২৩ বৎসর বয়সের যুবক মাত্র। তখন হইতেই তাঁহার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিল, আনন্দের বন্দনা গানে জীবনের সমস্ত সৃষ্টিকে চরিতার্থ করিতে হইবে। কি করিয়া এই বন্দনা-গান বিরচিত হইবে, কোন্ সুরে ইহা গীত হইবে ইহারই চিন্তায় তিনি জীবনের সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিলেন। বহুদিন পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কবিবন্ধু শিলারের "আনন্দ-বন্দনা" (Ode to Joy) অবলম্বন করিয়া এমন এক সুমহান্ সুরলহরীর সৃষ্টি করিলেন, যাহার কোনো তুলনা নাই। Symphony'র শেষে কোরাসের সন্নিবেশ বেটোফন্ই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন ; Ninth Spmphony'র শেষে আনন্দ-বন্দনার অপূর্ব্ব কোরাস্ যিনি শুনিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন যে, মানবাত্মা মানুষের তৈরী সঙ্গীত-যন্ত্রের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া যখন হতাশ হইয়া পড়ে তখনই সে হঠাৎ মানব-কণ্ঠে সপ্তম সুরে বিধাতার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।* বেদের ঋষি আনন্দের বন্দনায় যে সুগম্ভীর সঙ্গীত রূপায়িত করিয়াছেন, তাহার যে সহজ ও স্বচ্ছ আবেগ ও প্রেরণা, (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে) বেটোফনের আনন্দ-বন্দনাতেও যেন সেই একই আবেগ ও প্রেরণা আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া তোলে।

বেদনার তীর্থ-যাত্রা

এই যে আনন্দ ও অমৃতত্বের উপলব্ধি, এ উপলব্ধিকে বেটোফন্ সহজ ভাববিলাস দ্বারা লাভ করেন নাই, অনেক দুঃখ দহন, অনেক সাধনা, অনেক আরাধনায় তাহাকে পাইয়াছিলেন। বেটোফনের নিজের কথা হইতেই তাহার প্রমাণ আমরা পাই। তিনি তাঁহার জীবনের যে চরম সংহিতা-পত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সেই সঙ্গীত-গুরুর চরণে আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বেটোফনের সমস্ত জীবন যেন বেদনার তীর্থ-যাত্রা! ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে হেলিগেনষ্টাটে (Helligenstadt—Vienna) বসিয়া বেটোফন্ এই চরম পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

বেটোফনের চরম পত্র

চার্লস্ ও জন্ বেটোফন্ ভ্রাতৃদ্বয় কল্যাণীয়েষু—

"ওগো মানুষ, তোমরা আমাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিলে, একটা পাগল মানব-বিদ্বেষী বলিয়াই ভাবিলে ; তোমরা এই আমার হতভাগ্য জীবনের উপর কি অবিচারই না করিয়াছ! কিন্তু তোমাদের কাছে কিজন্য আত্ম-গোপন করিয়াছি তাহার কারণ ত তোমাদের জানা নাই। শৈশব-কাল হইতেই আমার হৃদয় ও মন এই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ-কামনাতেই আকুল হইয়াছিল—ভাল কাজ করিবার জন্যই মন সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত। কিন্তু একবার তোমরা হৃদয় দিয়া ভাবিয়া দেখিও, ছয় বৎসর বয়স হইতে আমার জীবনের উপর দিয়া কি ভীষণ দুর্য্যোগই না বহিয়া গিয়াছে। একে, সেই বয়স হইতেই দুরন্ত ব্যাধি ও যন্ত্রণা—সেই যন্ত্রণাকেই দিনের পর দিন দায়িত্বজ্ঞানহীন চিকিৎসকের দল আরও দুর্ব্বিষহ করিয়া দিয়া বৎসরের পর বৎসর আরোগ্যের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া সর্ব্বশেষে, এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোলে সকল আশা ছাড়িয়া দিল। কবে যে তাহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিব ; একেবারেই করিব কি না এই অশান্তির দহনে সমস্ত হৃদয় মন পুড়িয়া গেল।

"কর্ম্মের উন্মাদনা, উৎসাহের উদ্দীপনা লইয়াই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম। মানব-সমাজের স্নিগ্ধতা ও সৌজন্য দুই-ই উপভোগও করিয়াছি, কিন্তু বাধ্য হইয়াই অতি অল্প বয়সেই সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া নির্জ্জন জীবন আমায় যাপন করিতে হইল! এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যদিও বা সম্ভব ছিল, দিনের পর দিন এই দুর্ব্বিষহ রোগ-যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার আর ছিল না ; সে-যন্ত্রণাই আমাকে পাগল করিয়াছিল। "জোরে বল, চীৎকার করিয়া বল, আমি যে কিছুই শুনিতে পাই না"—একথা বলা আমার সাধ্যেরও অতীত ছিল। এই যে বধিরতা,

* ইংরেজ কবি শেলিও জীবনের বিষজ্বালায় জ্বলিয়া এমনি কথা বলিয়াছিলেন—
"Happily they live and call life pleasure ;
To me that cup has been dealt in another measure."

ইহা আমার পক্ষে কি নিদারুণ তাহা আমি কি করিয়া তোমাদের বুঝাইব! শ্রবণ-শক্তির তীক্ষ্ণতাও সকলের অপেক্ষা আমারই অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। আমার সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয়ই ত ছিল সব-চাইতে নিখুঁৎ। অথচ সেইখানেই আমি এমন করিয়া পঙ্গু হইয়া গেলাম। উঃ, সে যে কী দুঃখ তাহা আমি কি করিয়া বলিব!

"ক্ষমা করিও, ভাই, তোমরা আমায় ক্ষমা করিও—তোমাদের সঙ্গ-কামনায় অনুক্ষণ উৎসুক আমার মন যে তোমাদের সঙ্গ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই, সেজন্য ক্ষমা করিও। যখন আমি ভাবি, বধিরতা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল, তখন যেন আমার দুঃখ ও ব্যথা দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। তোমরা বুঝিবে কি, মানুষের সঙ্গ লাভে, তার সঙ্গে সুমধুর আলাপে আলোচনায়, আত্মায় আত্মায় হাসি ও কথার পরস্পর দানে ও গ্রহণে আমার কত বড় বাধা। নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ আমার জীবন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমি কখনও মানুষের কাছে গিয়া দুটি কথা বলিতে ভয় পাই; পাছে ধরা পড়িয়া যাই, পাছে লোকে হাসে এই ভয়ে, এই দুশ্চিন্তায় আমার চিত্ত বিপর্য্যস্ত হয়, মন ক্ষোভে দুঃখে অসহ্য যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হয়।

"এইজন্যই আজ পাঁচ মাস ধরিয়া গ্রামে নির্জ্জনে জীবন কটিতেছে। আমার সুবিজ্ঞ ডাক্তার কৃপা করিয়া আমার কান দুটিকে যথাসাধ্য বাঁচাইয়া চলিতে বলিয়াছেন। আমার যে ক্ষুদ্র আশা ও উৎসাহ তাহাও তিনি গম্ভীর ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলেন। কতবার মানুষের সঙ্গ-লাভের জন্য আমার মন উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি দৈন্য, কি লজ্জা, কি অপমানই না সেজন্য সহিতে হইয়াছে। আমারই কাছে বসিয়া কতজন দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বাঁশীর সুর, রাখাল বালকের মেঠো মন-মাতানো গান শোনে, আর আমি নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকি—কিছুই বুঝি না, কিছুই শুনি না। কী দুঃখ! এই দুঃসহ দুঃখের নিদারুণ অভিজ্ঞতাই আমার জীবনকে নৈরাশ্যে ভরিয়া তুলিয়াছে—জীবন যে আমি নিজেই ইতিমধ্যে বিনষ্ট করিয়া ফেলি নাই, একথা ভাবিয়া আমি নিজেই অবাক্ হইয়া যাই। শুধু আর্ট, শুধু সৌন্দর্য্যই বুঝি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিল! মনে ভাবি, যে কর্ত্তব্য আমার জীবনে ন্যস্ত আছে, তাহা সম্পন্ন না করিয়া এই পৃথিবীর কোল হইতে বিদায় লইব কি করিয়া! এই দুঃখময়, ব্যথাদীর্ণ জীবনকে সেইজন্যই জীয়াইয়া রাখিয়া চলিতেছি। লোকে বলে, 'ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, এত অধীর হইও না'। শুনি, ধৈর্য্যকেই নাকি আমার পথের আলো করিয়া চলা উচিত। তাই হোক্, আশা করি এখন হইতে ধৈর্য্য ধরিতে পারিব। আমার এ জীবন যতদিন বসুধার বক্ষে আছে ততদিন আমি যেন দৃঢ়চিত্তে সুকঠোর সংকল্পে জীবন-পথে চলিতে পারি। হয়ত ইহা ভাল, হয়ত ভাল নয়, কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ২৮ বৎসর বয়সে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া সহজ ব্যাপার নয়! আর্টিষ্ট যে, সৌন্দর্য্যের পূজারী যে, তার কাছে এই সমস্যা যে কত নিষ্ঠুর, কত নিদারুণ কে বুঝিবে!

"ওগো ভগবান, তুমি ত উর্দ্ধে বসিয়া আমার অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছ, তুমি ত জানো মানবের কল্যাণ, তার প্রতি প্রেমই আমার আত্মার ধর্ম্ম। ওগো আমার এই পৃথিবীর ভাইবোন! যদি কোনোদিন তোমরা আমার এই চরম পত্রখানি পাঠ কর, বুঝিবে আমার প্রতি কি নিষ্ঠুর আচরণই তোমরা করিয়াছ; হতভাগ্য আমার জীবন, তবু যতটুকু আমার ক্ষমতা ছিল সবটুকু দিয়া আমি চেষ্টা করিয়াছি, আর্ট ও সৌন্দর্য্যের যাঁহারা পূজারী, পৃথিবীর যাঁহারা মনীষী তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইবার জন্য। হয়ত আমারই মত হতভাগ্য আর একজন যখন এই পত্র পাঠ করিবে সে তখন আমার জীবনের সংগ্রামের কথা ভাবিয়া শান্তি পাইবে।

"ভাই চার্লস্ ও জন্, আমার মৃত্যু হইলে অধ্যাপক স্মিড্‌ট্ (Schmidt) যদি তখনও বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমার অনুরোধ জানাইও এবং বলিও, তিনি যেন আমার এই দুঃখাপহত জীবনের ইতিহাস সকলকে বিবৃত করেন এবং তার সঙ্গে এই চিঠিটি জুড়িয়া দেন। হয়ত আমার ইহজগতের বন্ধুরা তখন আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিবে। আমার যা কিছু দীন সম্পত্তি তাহা আমি তোমাদের দুই ভাইকে দিয়া গেলাম। প্রীতি ও

ভালবাসায় দুইজনে তাহা ভাগ করিয়া লইও, একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও এবং একে অন্যের সাহায্য করিও। যা কিছু অন্যায় অপরাধ আমার প্রতি তোমরা করিয়াছ, সে-সব আমি অনেক আগেই ক্ষমা করিয়াছি। ভাই চার্লস্, সম্প্রতি তুমি আমার প্রতি যে সেবা ও প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছ তাহার জন্য তোমায় আমি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করি, আর-একটু নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া আমার চাইতে আর-একটু সুখে তুমি জীবন যাপন কর। একটা জিনিস তোমাদের ছেলেদের ভাল করিয়া শিখাইও—সেটি পুণ্যের কথা, ধর্ম্মের কথা! ধন নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, এই পুণ্য ধর্ম্মই মানুষকে সুখ দেয়, শান্তি দেয়। উপদেশ দিতেছি না—অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। আমার এই শতদুঃখের মধ্যে এই পুণ্যধর্ম্মই আমাকে বাঁচাইয়াছে; আর্ট ও সৌন্দর্য্য, পুণ্য ও ধর্ম্ম এরাই আমাকে আত্মহত্যার পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি—প্রীতি ও ভালবাসায় তোমরা বাস করিও। আমার সকল বন্ধুবান্ধবকে—বিশেষ করিয়া বন্ধু প্রিন্স লিক্‌নোভ্‌স্কি (Lichnowsky) এবং অধ্যাপক শ্মিড্‌ট্‌কে—ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রিন্সের সঙ্গীত-যন্ত্রগুলি রহিল, সেগুলি তোমাদের যে কাহারো বাড়ীতেই রাখিতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া যেন অনর্থক তোমাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না হয়। যদি ভাল মনে কর তাহা হইলে বরং এগুলি বিক্রয় করিয়াই ফেলিও। মৃত্যুর পরেও যদি তোমাদের কোন উপকারে লাগিতে পারি তাহা হইলেও আমার সুখের সীমা থাকিবে না।

"এই যে দুঃখের মধ্যে আমার জীবন কাটিতেছে, এ দুঃখের মধ্যেও যেন আনন্দের সহিত মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি। আমার সঙ্গীত-প্রতিভার সর্ব্বোত্তম বিকাশের আগেই যদি মৃত্যু আমাকে ছিনাইয়া লইতে আসে আর আমি তাহাকে বাধা দিতে চাই—না, তখনও যেন আমি দুঃখিত না হই, যেন আমার শক্তি ও স্নিগ্ধতা অটুট থাকে। মৃত্যু কি আমাকে এই অশেষ দুঃখের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবে না! ওগো মরণ, তুমি আসিও যখন তোমার খুশী! বিদায় লইলাম ভাই, মৃত্যুতে আমাকে ভুলিও না। যতদিন বাঁচিয়াছিলাম তোমাদের স্মরণে রাখিয়াছি, সুখী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; তোমরা কি আমায় স্মরণে রাখিবে না! যাবার বেলায় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা সুখী হও।"

লাডহ্বিগ ফন্ বীটোফন্
৬ই অক্টোবর, ১৮০২

"অনুলেখক—

চার্লস্ ও জন্ ভ্রাতৃদ্বয় কল্যাণীয়েষু
(আমার মৃত্যুর পর পঠিতব্য)

হেইলিগেনষ্টাড্‌ট্ (Heiligenstadt)
১০ই অক্টোবর, ১৮০২

"তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি, অতি দুঃখে বিদায় লইতেছি। আমার আরোগ্যের বিন্দুমাত্র আশাও যাহা এতদিন ছিল তাহাও এখন হইতে একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। হেমন্তের শুষ্ক পত্র যেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া শুকাইয়া যায়, আমার সকল আশা তেমনি করিয়া ঝরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া পৃথিবীতে আমি আসিয়াছিলাম, তেমন করিয়াই আজ এই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। যে সুকঠিন তেজ ও সুদুর্ল্লভ সাহসের বলে জীবনের এই সুদীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়াছি, সে তেজ সে সাহস আর নাই। হে ভগবান, একদিনের জন্য, শুধু একদিনের জন্য আমায় আনন্দের মধ্যে বাঁচিতে দাও! আনন্দের অমৃতের যে সুমধুর সুরঝঙ্কার, কত দিন যে আমি তাহা শুনি নাই, ওগো সে কতদিন! মানুষের মধ্যে, এই বসুন্ধরার রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মধ্যে কবে আবার আমি আনন্দকে, অমৃতকে লাভ করিব! কখনও কি নয়, কখনও নয়? না! তাহা হইতে পারে না, সে যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্ম্মম!

'বী'—"

"যথাশক্তি বিশ্বমানবের কল্যাণ,
সর্ব্বোপরি স্বাধীনতার সম্মান,
রাজ্য তুচ্ছ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা।"

বেটোফন্

"Woltuen wo man kann
Freiheit uber alles lieben,
Wahrheit nie, auch sogar am
Throne nicht verleugnen." "B"

অনুবাদক—শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

সম্পাদকের চিঠি

(৬)

লণ্ডনে আড্ডা করিয়া আমি একদিন কেম্ব্রিজ, একদিন অক্সফার্ড এবং একদিন গ্রেটমিসেণ্ডেন নামক একটি গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলাম। সকালে কিছু খাবার খাইয়া রেলে কেম্ব্রিজ ও অক্সফার্ড গিয়াছিলাম, এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। এই দুই জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে ও তথাকার শিক্ষা-প্রণালী ও জীবনের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হইতে হইলে দীর্ঘ কাল তথায় যাপন করা আবশ্যক। কিন্তু আমি প্রত্যেকটিতে মোটে কয়েক ঘণ্টা করিয়া ছিলাম। তাহার উপর আবার আগষ্ট মাসে আমি যখন বিলাত যাই, তখন সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরাপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এইজন্যও আমার দেখিবার শুনিবার সম্পূর্ণ সুযোগ হয় নাই। তথাপি শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় দুটি চাক্ষুষ দেখিয়া আসায় এই সুবিধা হইয়াছে,যে, অতঃপর উহাদের সম্বন্ধে কিছু পড়িলে ও শুনিলে সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

কেম্ব্রিজেই আমি প্রথমে যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ই ইহার গৌরব ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির প্রধান কারণ। কেম্ব্রিজ রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিলে মনে হয় না, যে, শহরটাতে দেখিবার মস্ত বিশেষ কিছু আছে। কিন্তু দেখিবার পর বুঝা যায়, যে, বস্তুতঃ এরূপ ধারণা ভুল।

ক্যাম্ নামক যে নদীটির নাম কেম্ব্রিজের সহিত জড়িত, তাহা অতি ক্ষুদ্র, মনে হয় যেন এক লাফেই পার হওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অনেক ইংরেজ কবির কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে। ইহাকে কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা এবং অন্য দর্শকেরা যে ভুলিতে পারে না, তাহার অনেক কারণ আছে। কুইন্স,কিংস্, ক্লেয়ার,ট্রিনিটি হল,ট্রিনিটি এবং সেণ্ট জন্স এই কয়টি কলেজ ইহার তীরে অবস্থিত। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম ইহার জল বেশ নির্ম্মল, ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। তাহার উপর ছোট ছোট নৌকা ভাসিতেছে। তাহার কোন কোনটিতে আরোহী ছিল। নদীর দুই তীর তৃণে আচ্ছাদিত—তৃণ একবারে জল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। স্থানে স্থানে উইলো-গাছের শাখা নত হইয়া জল স্পর্শ করিয়াছে। অনেকগুলি সেতু দিয়া ক্যাম্ পার হওয়া যায়। যখন কলেজগুলি খোলা থাকে, তখন নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক ছাত্র নৌকাচালন করে। প্রতি বৎসর নৌকাচালনে দক্ষতার ও ক্ষিপ্রকারিতার যে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা কেম্ব্রিজের একটি প্রধান বার্ষিক ঘটনা।

কেম্ব্রিজ অক্সফার্ড দেখিতে গিয়া কাহারও কোন সঙ্কোচ বোধ করিবার প্রয়োজন নাই। সোজা চলিয়া যান; সন্দেহ হইলে কলেজের দ্বারবান বা অন্য ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহারা প্রশ্নের উত্তর দিবে। বস্তুতঃ তাহারা জানে ও আশা করে, যে, লোকে তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিবে। তাহার উত্তর দিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

কেম্ব্রিজ অক্সফার্ডের প্রত্যেক কলেজের বর্ণনা আমি করিব না; কোন কোন কলেজ সম্বন্ধে কিছু বলিব। কোন কোন কলেজের কেতাবী ও আসল নাম ছাড়া ডাক নামও আছে। যথা পীটারহাউসকে বলে পটহাউস, সেণ্ট ক্যাথারিন্সকে বলে ক্যাটস্, পেম্ব্রোককে বলে পেমা, ইত্যাদি।

পীটারহাউস কেম্ব্রিজের সকলের চেয়ে প্রাচীন কলেজ। ইহা ১২৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কেবল এই কলেজেই একটি ছোট উদ্যানে হরিণ রাখা হয়। কথিত আছে, যে, ইহার নিকটবর্ত্তী একটি গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্র দেখিয়া কবি গ্রে তাঁহার "এলিজি রিট্ন্ ইন্ এ কন্ট্রি চার্চিয়ার্ড" লিখিয়াছিলেন। তিনি এই কলেজে থাকিতেন। এইরূপ একটা গল্প চলিত আছে, যে, তাঁহার বড় আগুন-লাগার ভয় ছিল, তজ্জন্য তিনি একটি দড়ির সিঁড়ি সর্ব্বদা মজুদ রাখিতেন। ঘরে আগুন লাগিলে যে জানালার লোহার রেলে তিনি ঐ সিঁড়ি লাগাইয়া পলাইতে পারিতেন,

তাহা এখনও দেখান হয়। এক রাত্রি কতকগুলা দুষ্টু ছেলে মিছামিছি, "আগুন, আগুন", বলিয়া চীৎকার করায় তিনি দড়ির সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটা ঠাণ্ডা জলের টবে পড়িয়া যান। ঐ ছেলেগুলা তাহা ঐ উদ্দেশ্যেই তাঁহার জানালার নীচে রাখিয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার উপর এই পরিহাস-অত্যাচার হওয়ায় তিনি পেম্ব্রোক কলেজে চলিয়া যান।

আমার কেম্ব্রিজ দর্শন-কালে পেম্ব্রোকের মেরামত হইতেছিল। ছাত্রেরা যে-সব ঘরে থাকে তাহার কয়েকটার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম। আরামে থাকা যায়, কিন্তু অবশ্য কোন বিলাসিতা নাই। এই কলেজে কবি স্পেন্সার্ ও গ্রে এবং রাজনীতিজ্ঞ উইলিয়ম্ পিট থাকিতেন।

ইহার সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা অবস্থিত। ইহাকে পিট প্রেস বলে। ইহা দেখিতে কতকটা গির্জ্জার মত। আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল। শুনা যায়, এইজন্য সেকালে পুরাতন ছাত্রেরা সদ্য-আগত নূতন ছাত্রদিগকে বলিত, যে, তাহাদের আগমনের পরবর্ত্তী প্রথম রবিবারে এই গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইবার নিয়ম আছে! তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাউন্ ও টুপি পরিয়া কতকগুলি নবাগত ছাত্রকে ধৈর্য্যের সহিত রবিবার প্রাতে ইহার দরজায় অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত! অবশ্য তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে দেরী হইত না।

নারীদের কলেজের মধ্যে আমি কেম্ব্রিজে কেবল নিউন্‌হাম্ দেখিয়াছিলাম; গার্টন্ দেখিবার সময় হয় নাই। নিউন্‌হামের লাইব্রেরী বড় সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছাত্রীদের থাকিবার ঘরগুলি ও সকলের সম্মিলিত ভোজন-গৃহ সুন্দর ও আরামদায়ক। কলেজের ঈষৎ খোঁড়া দারোয়ান আমাদিগকে বিস্তৃত বাগানে লইয়া গেল। দেখিলাম, কোন কোন গাছের ডাল হইতে দড়ির শয্যা (হ্যামক্) ঝুলিতেছে। দারোয়ান বলিল, গ্রীষ্মকালে ছাত্রীরা অনেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইহাতে শুইয়া থাকে। এই কলেজের সিংহদ্বার ইহার প্রাক্তন ছাত্রীদের ব্যয়ে নির্ম্মিত। ইহার লাইব্রেরী মিষ্টার ও মিসেস্ হেন্‌রী য়েটস্ টম্‌সনের দান বোধ হয় মিসেস্ টম্‌সন্ এখানে শিক্ষালাভ করেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক ছাত্র ছাত্রী আপনাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এইরূপ নানা প্রকারে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবহার বিরল।

কিংস্ কলেজে আমাদের দেশের অনেক ছাত্র পড়িয়াছেন। আমার সঙ্গে যে বাঙালী ছাত্রটি ছিল, সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিল, "ঐ কামরা দু'টিতে ভূপতিমোহন সেন থাকিতেন।" তখন কলেজ বাড়ীর ঐ জায়গায় কিছু পরিবর্ত্তন ও মেরামত চলিতেছিল। শ্রীমান্ ভূপতিমোহন এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথমে কেম্ব্রিজের স্মিথস্-প্রাইজ পান। গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রেরা এই পুরস্কার পাইয়া থাকে। প্রথম (সীনিয়র) র‍্যাংলার হওয়া অপেক্ষাও ইহা উচ্চতর সম্মান বিবেচিত হয়। কেম্ব্রিজের কলেজগুলিতে এক-একটি চ্যাপেল্ অর্থাৎ গির্জ্জা আছে। কিংসের গির্জ্জা স্থাপত্যের উৎকর্ষ, জানালা-সমূহে রঙীন কাচের ছবি, ছাদের ভিতরের দিকে পাথার মত কারুকার্য্য, এবং উৎকৃষ্ট অর্গ্যানের জন্য বিখ্যাত। ইহার উপাসনার সংগীত এত উৎকৃষ্ট যে, অনেকে রবিবার অপরাহ্ণে লণ্ডন হইতে এখানে রেলে আসে ঐ সংগীত শুনিবার জন্য। কিংসের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে নিজের কলেজের জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকার লইয়াছিলেন। সেনেট হাউসের সিঁড়ির ধাপগুলিতে মার্‌বেল্ খেলিবার অধিকার তন্মধ্যে অন্যতম! সেকালে এখনকার চেয়ে অল্প-বয়স্ক ছেলেরা কেম্ব্রিজে পড়িতে যাইত। অধিকারগুলির অধিকাংশ ১৮৫১ সালে পরিত্যক্ত হয়। এখনও কিন্তু সেনেট হাউসে উপাধিদান সভায় কিংসের ছাত্রদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপাধিলাভের জন্য উপস্থিত করা হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নামক যে-সব কর্ম্মচারীর উপর ছাত্রদের দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন নিবারণের ভার আছে, তাহাদের কিংসের সিংহদ্বার পার হইবার অধিকার নাই।

বিলাতের যে যে লাইব্রেরী কপিরাইট-আইন অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রিত বহির একখণ্ড পাইবার অধিকারী, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী তাহার মধ্যে অন্যতম।

গন্‌ভিল্ এণ্ড কীজ কলেজকে (Gonville and Kaius College) সংক্ষেপে কীজ কলেজ বলা হয়। ইহা একজন ডাক্তারের দ্বারা স্থাপিত বলিয়া ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যার্থী ছাত্রদের সমাগম বেশী হয়। অন্য বিদ্যার্থীও এখানে শিক্ষালাভ করে। এইখানে আমার দ্বিতীয় পুত্র শিক্ষালাভ করায় আমার স্বভাবতঃ ইহা দেখিবার বাসনা ছিল। আমার পুত্র কোন্ ঘরে থাকিত, দেখিতে কৌতূহল হওয়ায় দারোয়ানের ঘরে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে, তাহাদের চাটুজ্যে নামধারী একজন কয়েক বৎসর আগেকার গ্রাজুয়েটকে মনে আছে কি? দারোয়ান তখন বাড়ী ছিল না। একটি বৃদ্ধা (বোধ হয় তাহার পত্নী) কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "হাঁ", এবং তাহার ঠিক্ মনে আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য যুবকটির চেহারা বর্ণনা করিল। বর্ণনায় মিলিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি হকী খেলিত"। আমি বলিলাম, "হাঁ"। তাহার পর সুধাইল, "সে কি 'কুম্ভীর-দল'-ভুক্ত ছিল?" খেলোয়াড়দের দল-বিশেষের এই অদ্ভুত নাম নির্ব্বাচনে আমি হাসিলাম, বলিলাম, "জানি না।" যাহা হউক, এখন বৃদ্ধা বুঝিল, তাহার ঠিক মনে আছে। বলিল, "এফ সিঁড়ির পার্শ্ববর্ত্তী এক ও দুই নম্বর কামরায় চাটুজ্যে থাকিত।" আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, বৃদ্ধা ঠিক্‌ই বলিয়াছিল। জেনীভায় পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর মুখেও কেম্ব্রিজের কলেজগুলির দ্বারবান্‌দের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা শুনিয়াছি। তিনি ট্রিনিটির ছাত্র। উহা খুব বড় কলেজ, ৬,৭ শত ছাত্র তথায় বাস করে। অথচ তিনি বলেন, তাহাদের নাম একবার জানিয়া লইয়া (দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ) দ্বারবান্ তাহা বরাবর মনে রাখে।

ট্রিনিটির সিংহদ্বার ও অঙ্গন সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত। উঠানের মাঝখানে একটি সুন্দর ফোয়ারা আছে। বেকন, স্যার আইজাক নিউটন, বায়রন, মেকলে, টেনিসন ইহার ছাত্র ছিলেন। ইহাঁদের প্রস্তর-মূর্ত্তি এখানে আছে। তা ছাড়া জি, এফ, ওয়াটসের আঁকা টেনিসনের একটি তৈলচিত্রও এখানে আছে। এইসব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়া ছাত্রদের মনে কৃতিত্ব দ্বারা যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং সদা জাগরূক থাকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজসকলে প্রাক্তন বিখ্যাত ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচিহ্ন এইরূপে রক্ষিত হইলে ভাল হয়।

ট্রিনিটি দেখিবার পর আমি সেন্ট জন্সের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বেড়াইয়া প্রীত হই। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ ইহার ছাত্র ছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, আমার নারীদের কলেজ গার্টন্ দেখিবার সময় হয় নাই। গার্টনের উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষত্ব এই, যে, ইহা কোন একজন ধনশালী ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত হয় নাই; সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি করা হইয়াছে। অথচ অন্য সব কলেজের ন্যায় ইহার অধ্যাপনার কক্ষাবলী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার্থ পরীক্ষাগারসমূহ, লাইব্রেরী, গির্জ্জা, ভোজন-কক্ষ, প্রভৃতি আছে; অধিকন্তু সন্তরণের বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় আছে, এবং একশত বিঘার অধিক বিস্তৃত হাতা আছে। নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮৬০ সালের পরবর্ত্তী দশকে ইংলণ্ডীয় যে-প্রচেষ্টার ফলে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইয়াছে, ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে, তাহার সহিত তুলনীয় কোন প্রচেষ্টা এপর্য্যন্ত হয় নাই।

মহাকবি মিল্টন্ ক্রাইষ্টস্ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তথায় তাঁহার একটি তৈলচিত্র দেখিলাম। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস্ ডারুইনও ওখানকার ছাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহারও তৈলচিত্র সেখানে দেখিলাম। ইহা কৌতুকজনক, যে, যে ডারুইনপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের বিবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার ও অন্য অনেক দেশের গোঁড়া খৃষ্টিয়ানেরা যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, সেই ডারুইন খৃষ্টিয়ান পাদরী হইবার জন্য ক্রাইষ্টস্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে অনেক গণিতবিদ্ কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার হইয়াছেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে র‍্যাংলার হন। তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

ক্যাম্ নদীর যে-দিকে কতকগুলি কলেজ অবস্থিত,

তাহার উল্টা দিকে যে ছায়াতরুসমন্বিত উদ্যানবৎ ভূখণ্ড আছে, তাহার শ্যামশোভা, ছায়া ও নিস্তব্ধতা আমার ভাল লাগিয়াছিল। কলেজগুলি যখন খোলা থাকে, তখন এই স্থান নিশ্চয়ই বহুছাত্রসমাগমে মুখর হইয়া উঠে।

বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী দেখিতে আমি বিস্মৃত হই নাই। ইহা বাহির বা ভিতর হইতে দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। এর চেয়ে বড় বিজ্ঞানাগার ভারতবর্ষে দেখিয়াছি বলিয়া কেম্ব্রিজেই মনে হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীর খ্যাতি তাহার বৃহত্ত্ব বা স্থাপত্যের চমৎকারিত্বের জন্য নহে; সেখানে যে-সব প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাঁহারাই উহার খ্যাতির কারণ। মানুষের মনের চেয়ে বড় পার্থিব কোন জিনিষ নাই। মনস্বিতা আমাদের দেশে যে নাই, তা নয়। কিন্তু সুযোগের অভাবে, বা অবস্থার চাপে অনেকের মনস্বিতা ফলপ্রসূ হয় না। তাহা হইলেও কেহ কেহ অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী দেখা শেষ হইবা মাত্র মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। মিনিট পনের বৃষ্টি হইয়াছিল। আমার ইউরোপ-ভ্রমণ-কালে এইরূপ জোরে বৃষ্টি কেবল এই একবার দেখিয়াছিলাম।

কেম্ব্রিজে দুপরের আহার একটি রেস্তরাঁতে করিয়াছিলাম। আহার্য্য দ্রব্য ভালই দিয়াছিল, পরিচারিকাও বেশ ভদ্র। বলা বাহুল্য, ভোজনকক্ষ এবং টেবিল ও ভোজনপাত্রাদি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাঁটিয়া-হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কেম্ব্রিজ ইউনিয়নে যাই। আমার রং, চেহারা ও পোষাকে স্পষ্ট প্রমাণ ছিল, যে, আমি বিদেশী। কিন্তু তথাপি কেহ জানিতে চাহিল না, আমি কে এবং কেন প্রবেশ করিতেছি। ইউনিয়নের প্রক্ষালনাগারে হাত মুখ ধুইয়া, আমার সঙ্গী বাঙালী ছাত্রটির সাহায্যে কিছু ঠাণ্ডা জল সংগ্রহ ও পান করিয়া লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। প্রক্ষালনাগারে দেখিলাম, স্তূপাকার ধোয়া তোয়ালে রহিয়াছে। লেখা আছে, যে, একটা লইয়া হাত-মুখ মুছিবার পর তাহা তদুদ্দেশ্যে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই ব্যবহৃত তোয়ালের ব্যবহার নিবারিত হয়। এবিষয়ে ইউরোপের এইসকল স্থানের ও হোটেলের স্নানাগারের ব্যবস্থা, শুচিতা ও স্বাস্থ্যের খুব অনুকূল। একজনের একবার ব্যবহৃত তোয়ালেও অন্য কেহ ব্যবহার করে না; স্নানাগারে একই ব্যক্তিকে প্রত্যহ ধৌত তোয়ালে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ধনী লোকদের বাড়ীতেও ভোজের পর হাত-মুখ মুছিবার জন্য অনেক লোককে একই তোয়ালে ব্যবহার করিতে হয়। আমরা ইউরোপ অপেক্ষা দরিদ্র সন্দেহ নাই। তথাপি এই বিষয়ে শুচিতা ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি কম, তাহাও কিন্তু স্বীকার্য্য।

লণ্ডন হইতে রেলে অক্সফোর্ড গেলে অক্সফোর্ড ষ্টেশন হইতে শহরের গির্জ্জা ও অন্য সৌধাদির চূড়া দেখিয়া মন আকৃষ্ট হয়। কেম্ব্রিজের চেয়ে অক্সফোর্ড বড় শহর, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ইতিহাস আছে। রাজা প্রথম চার্লসের সহিত পার্লেমেণ্টের যে ঝগড়া বিবাদ এবং শেষে তাঁহার প্রাণান্তকর যুদ্ধ হয়, তৎকালে অক্সফোর্ড রাজভক্তদলের প্রধান আড্ডা ছিল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ অষ্টম হেন্‌রীর অন্যতম মন্ত্রী কার্ডিন্যাল উলজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার হল খুব জমকাল, লাইব্রেরীও বড়। তাহাতে আশী হাজার বহি আছে এবং নানা দেশের নানা সময়ের সুন্দর মুদ্রাসংগ্রহ আছে। এই কলেজের ও মডলিন্ কলেজের দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে রন্ধনশালা প্রধান। এই দুইটির মধ্যে কোন একটির পাকশালার ভিতর গিয়াছিলাম—বোধ হয় মডলিনের। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিনিষ একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির একটা টুকরা। তাহার উপরটা টেবিলের মত সমতল করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপর মাংস রাখিয়া কুটা হয়। গুঁড়িটার ব্যাস তিন হাতের কম হইবে না, এইরূপ স্মরণ হইতেছে। তখন কলেজ বন্ধ ছিল; তথাপি দেখিলাম জন কয়েক লোক রন্ধনের সাদা পোষাক পরিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় মাংস কুটিবে। কার্ডিন্যাল উল্‌জী ছিলেন বড় পাদরী। তাঁহার মত ধর্ম্মযাজকের প্রতিষ্ঠিত কলেজের রন্ধনশালাটা আগে ও বড় করিয়া

নির্ম্মিত হওয়ায় তাঁহার উপর অনেক পরিহাস বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণদের ঔদরিক বলিয়া খ্যাতি আছে, ইউরোপে কোন কোন শ্রেণীর পাদরীর সেইরূপ ভোজনপানাসক্তির খ্যাতি আছে। ক্রাইষ্ট্স্ কলেজে বিস্তর সুন্দর তৈলচিত্র দেখিলাম; যেমন উল্জী, ইরাসমাস্, ও মোরের। ইহার যে সব ছাত্র ও শিক্ষক গত মহাযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের নামাঙ্কিত একটি প্রস্তরফলক ইহার গির্জ্জার একস্থানে দেখিলাম। যোদ্ধাদের স্মৃতিচিহ্ন এইরূপ আরো কোন কোন কলেজ গির্জ্জায় দেখিয়াছি। ইহা আমার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। লেখা আছে বটে, যে, তাহারা ঈশ্বর, রাজা ও দেশের জন্য লড়িয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর কাহাকেও তাঁহার জন্য রক্তপাত করিতে বলেন, বিশ্বাস করি না; কেহ যে তাঁহার জন্য গত মহাযুদ্ধে লড়িয়াছিল, তাহাও বিশ্বাস করি না।

অক্সফার্ড কেম্ব্রিজের প্রত্যেক কলেজেই অনেক বিখ্যাত লোক বিদ্যালাভ করিয়াছে। ক্রাইষ্ট চার্চের ছাত্রদের মধ্যে আট জন পরে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনার‍্যাল হইয়াছিল।

মড্লিন কলেজের একদিকে চারোয়েল নদীর ধারে বৃক্ষশ্রেণীশোভিত বীথিকা আছে। এখানে ইংরেজ লেখক য়্যাডিসন্ ছাত্রাবস্থায় বেড়াইতেন বলিয়া ইহাকে য়্যাডিসন্স্ ওয়াক্ বলে। এই বীথিকা রমণীয়, ও নির্জ্জন চিন্তার অনুকূল।

অক্সফার্ডের একটি কলেজের নাম নিউ অর্থাৎ নূতন কলেজ। পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকাতেও যেমন লেখা আছে, নূতন পঞ্জিকা, এই কলেজও সেইরূপ নূতন কলেজ। ইহা ১৩৭৯ সালে স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় দুইটির অনেক কলেজ দেখিলে মনে হয় যেন প্রাচীন মঠ। মেরামত করিবার সময়ও প্রাচীনত্বের ছাপটি রাখিয়া দেওয়া হয়। সেকালের ইউরোপীয় মঠসকলে, সন্ন্যাসীরা যাহাতে বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে না আসিয়াও বেড়াইতে পারেন, তাহার জন্য ক্লইষ্টার নামক ছাদযুক্ত দীর্ঘ বারাণ্ডা থাকিত। নিউ-কলেজের কালপ্রভাবে মসীমলিন ক্লইষ্টারে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে হইল, যেন মধ্যযুগের কোন মঠে বেড়াইতেছি।

ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অন্য সব কলেজ হইতে পৃথক্ রকমের। ইহা ১৭৮৬ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারে স্থাপিত এবং "সত্য, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের" নামে উৎসর্গীকৃত হয়। পরে ইহা ইয়র্ক, ম্যাঞ্চেষ্টার ও লণ্ডন ঘুরিয়া ১৮৮৯ সালে অক্সফার্ডে আনীত হয় এবং ১৮৯৩ সালে ধার্ম্মিক দার্শনিক আচার্য্য মার্টিনো কর্তৃক ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ইহা তত্ত্ববিদ্যার কলেজ। ইহাতে যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্র পড়িতে পারে। ব্রিটীশ ও ফরেন ইউনিটেরিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিদ্যার্থী এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এখানে আচার্য্য মার্টিনোর একটি মূর্ত্তি আছে।

রাস্কিন্ কলেজে অন্য সব কলেজের মত নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা শ্রমিকদের জন্য অভিপ্রেত।

অক্সফার্ডে নারীদের কলেজ কয়েকটি আছে; যেমন লেডী মার্গারেট হল, সমারভিল কলেজ, সেণ্টহিউজ কলেজ, সেণ্ট হিল্ডাজ হল। লেডী মার্গারেট হল খৃষ্টীয় য়্যাংলিকান্ (অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়) ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য, সমারভিল অসাম্প্রদায়িক। অন্যান্য বিষয়ে এই দুইটি কলেজ একই রকমের। এই দুইটী কলেজ এবং সেণ্ট হিউজ কলেজ দেখিবার আমার সময় হয় নাই। আমার দ্বিতীয়া পুত্রবধূ সেণ্ট হিল্ডাতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি কোন প্রকারে তাহা দেখিবার সময় করিয়াছিলাম। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কলেজের গেটে গিয়া দেখি, তাহা বন্ধ ও তাহাতে ইস্তাহার মারা রহিয়াছে, "ছুটি-উপলক্ষ্যে দর্শকদিগের জন্য বন্ধ।" কিন্তু কলেজটি দেখিতে এত দূর আসিয়া না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া অনুচিত মনে হওয়ায় গেটের দরজার বোতাম টিপিয়া ঘণ্টা বাজান হইল। অবিলম্বে একটি পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু বলিল, ছুটির সময় বলিয়া দর্শকদিগকে কিছু দেখান হয় না। কিন্তু যখন তাহাকে বলা হইল, যে, আমার পুত্রবধূর কলেজ বলিয়া আমি অনেক দূর হইতে এই কলেজটি দেখিতে আসিয়াছি এবং যখন তাঁহার কুমারী

অবস্থার নাম বলিলাম, তখন পরিচারিকাটি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আস্থন, দেখাইতেছি।" ঐ কলেজে বাঙালীর মেয়ে সম্ভবত আর কেহ পড়ে নাই বলিয়া হয় ত আমার পুত্রবধূর নাম উহার মনে ছিল। আমরা লাইব্রেরী, হল, ছাত্রীদের থাকিবার কক্ষসমূহ, এবং বাগান দেখিলাম। কলেজটি ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর, এবং যেখানে উহা অবস্থিত তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য রমণীয়। বাগানের একজন মালী ফুলের কেয়ারীর আগাছা উন্মূলিত করিতেছিল। পাশ দিয়া একটি স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত দেখিয়া তাহাকে উহার নাম জিজ্ঞাসিলাম। মালী বলিল, "মহাশয় উহার নাম চারওয়েল।"

ক্লারেণ্ডন প্রেসে ছাপা বহি আমরা অনেকে কলেজে পড়িয়াছি। এই ছাপাখানা বন্ধ ছিল বলিয়া বাহির হইতে দেখিলাম।

অক্সফার্ডের শেল্ডোনিয়ান্ থিয়েটার নাটকাভিনয়ের থিয়েটার নহে। যাঁহাদিগকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানার্থ উপাধি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এইখানে আসিয়া উপাধি লইতে হয়। ইহা দেখিবার সময় আমার মনে হইল, ভারতীয়দের মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চান্সেলার স্যার্ নীলরতন সরকার এখানে ঐরূপ উপাধি পাইয়াছিলেন। এখানে একটি বহিতে দর্শকেরা তাহাদের নাম, ধাম ও দর্শনের তারিখ লিখিয়া থাকে। আমিও লিখিয়াছিলাম। যে বৃদ্ধা ইংরেজ নারী বাড়ীটার হেপাজৎ করে, সে এই বলিয়া আমার ও অন্য ভারতীয় দর্শকদের প্রশংসা করিল, যে, আমরা ঠিক্ যে জায়গায় যাহা লেখা উচিত, তাহা লিখিয়া থাকি, অর্থাৎ ধামের জায়গায় নাম, বা তারিখের জায়গায় ধাম লিখি না। এরূপ অসাধারণ প্রশংসায় পুলকিত হইয়া আমি বলিলাম, আমাদিগকে প্রায় শৈশব হইতেই ইংরেজী শিখিতে হয়, কাজেকাজেই যথাস্থানে নামধামাদি লিখিবার মত দুর্লভ ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। আমাদের স্বদেশবাসীদের বিদ্যাবত্তার অপূর্ব্ব প্রশংসার বিনিময়ে বৃদ্ধা কিছু বকশিশ গ্রহণও করিল! শেল্ডোনিয়ান্ থিয়েটারের চারিদিকে রেলিঙের মাঝে মাঝে আবদ্ধ প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। কিন্তু মুখগুলি এরূপ ক্ষয়িয়া গিয়াছে, যে, মূর্ত্তিগুলি যে কাহাদের বুঝিবার জো নাই। অক্সফার্ডের অন্যত্রও এইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছি। পাথরের বিশেষত্ব ও অক্সফার্ডের আব্‌হাওয়ার জন্য এরূপ হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া, আমি এরূপও শুনিয়াছি, যে, বহুপূর্ব্বে কতকগুলা দুষ্ট ছেলে শেল্ডোনিয়ান থিয়েটারের মূর্ত্তিগুলির মুখে একটা খুব চট্‌চটে রং মাখাইয়া দেয়। তাহা তুলিতে গিয়া মুখাবয়ব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বডলিয়ান লাইব্রেরী ও র‍্যাড্‌ক্লিফ্ ক্যামেরার উল্লেখ একসঙ্গে করাই ভাল; কারণ র‍্যাড্‌ক্লিফ্ ক্যামেরা বড্‌লিয়ানের পাঠাগার। ক্যামেরার গুম্বজের নিম্নস্থ গ্যালারী হইতে অক্সফার্ড ও চতুঃপার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের দৃশ্য বেশ দেখা যায়। বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকা অনেকগুলি লম্বাচওড়া মোটা মোটা ভল্যুমে সম্পূর্ণ; সেগুলিই একটি ছোট লাইব্রেরী। বিলাতে ছাপা প্রত্যেক বহির এক খণ্ড আইন অনুসারে এই লাইব্রেরীর প্রাপ্য। ইহাতে বিস্তর মূল্যবান্ বহি, মূর্ত্তি, ছবি ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য জিনিষ আছে। উপরে ও চারিপাশে সার্শিতে আবৃত একটি আধারে দেখিলাম, কবি শেলীর ছবি রহিয়াছে এবং রহিয়াছে "নাস্তিকতার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে তল্লিখিত সেই বহির হস্তলিপি যাহার জন্য তিনি বিশ বৎসর বয়সের আগে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য কোন কোন জিনিষও সেখানে রহিয়াছে, দেখিলাম। এক কালে যে লোক তাড়িত হইয়াছিল, এখন তারই স্মৃতি এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে যেমন অনেক স্কুল কলেজ ও আফিস শনিবারে ১টা ১৷০টার সময় ছুটি হয়, অক্সফার্ডে তেমনি বৃহস্পতিবারে দোকানপাট ১টার সময় বন্ধ হয়। অন্যান্য দিনে অধিকাংশ দোকানপাট সন্ধ্যা ছটায় বন্ধ হয়।

কেম্ব্রিজের মত অক্সফার্ডেও আমি দুপুরে এক রেস্তরাঁয় আহার করিয়াছিলাম। আহার্য্য দ্রব্যাদি ও বন্দোবস্ত কেম্ব্রিজের মতই প্রশংসনীয়।

এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহার বিশেষত্ব কি, এবং কোন্‌টি মোটের উপর উৎকৃষ্টতর, তাহা আমি বলিতে অসমর্থ। ইহাদের প্রাচীনতার ছাপ, এবং অতীতের

স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা, আমার ভাল লাগিয়াছিল। অথচ ইহারা অতীতগৌরব-সর্ব্বস্ব নহে, বর্ত্তমানের সহিত অগ্রসর হইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ বিদ্যাচর্চ্চার বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং তাহা ক্রমশ আরও ভাল করিতে চেষ্টিত আছে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই পুরুষোচিত খেলা ও ব্যায়ামাদির সুযোগ আছে। কলেজের গির্জ্জাগুলিতে ঢুকিলেই আমাদের মত বৃদ্ধ ব্যক্তির মনে স্বভাবতই পরমার্থচিন্তার আবির্ভাব হয়। যুবকদের হয় কিনা, জানি না।

আমি যখন ইংলণ্ড গিয়াছিলাম, তখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী গ্রেট্ মিসেণ্ডেন নামক গ্রামে ছিলেন। বসু মহাশয় একটি বহি লিখিতেছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলাম। সেই দিনই লণ্ডন ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার আদেশে পরদিন বিকাল পর্য্যন্ত গ্রামে ছিলাম। তাঁহারা একটি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় ছিলেন। স্কুলের তখন ছুটি ছিল। আমরা পাছে তাহা খুঁজিয়া না পাই বলিয়া লেডী বসু দয়া করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। এই গ্রামের দৃশ্য বড় সুন্দর। বালিকা বিদ্যালয়টির একজন শিক্ষয়িত্রী লেডী বসুকে ছাত্রীদের লেখা, ছবি, নানাপ্রকার প্রস্তর ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ দেখাইতেছিলেন। আমিও সেখানে বসিয়া ছিলাম। সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার একটি নবোদ্ভাবিত যন্ত্র আমাকে দেখাইলেন ও তাহার কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। শিক্ষয়িত্রী আমাদিগকে ছাত্রীদের কাজ দেখাইতে দেখাইতে, "ও মেরী," বলিয়া উঠিয়া দরজার দিকে গেলেন। তিনি "মেরী" না বলিলে, অশ্বারোহী চেহারাটি যে একটি বালিকা ছাত্রীর, তাহা দূর হইতে বুঝিবার জো ছিল না। তাহার পরণে ছিল ঘোড়সওয়ারদের মত পাজামা, গায়ে ছিল কুর্ত্তা। কাছে আসিবার পর দেখিলাম, তাহা ঠিক্ ছেলেদের ফ্যাশনের নয়। চুল খাট করিয়া ছাঁটা। ছাঁট ছেলেদের থেকে কিছু ভিন্ন। মেয়েটি পুরুষদের মত জিনের দু'দিকে দুই রেকাবে দুই পা দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ছিল, ইংরেজ মেয়েদের মত এক দিকে দুই পা রাখিয়া নহে। আরও দেখিলাম, বালিকাটির মুখখানিতে একটি শ্রী ও কোমলতা আছে, যাহা ঐ বয়সের ইংরেজ বালকদের থাকে না। মনে হইল, মেয়েরা পুরুষদের মত হইতে চাহিলেও, বিধাতার কারিগরী সব সময়ে সহজে মুছিয়া ফেলা যায় না। গ্রেট মিসেণ্ডেন গ্রামটি খুব ছোট হইলেও, ইহার বিদ্যালয়ের শৌচাগার স্নানাগারাদির বন্দোবস্ত বড় সহরের মত এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল। সকালে আচার্য্য বসু ও লেডী বসুর সঙ্গে নিকটবর্ত্তী পাইনের অরণ্যাংশ বা উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দৃশ্য চমৎকার। দেখিলাম, লেডী বসু গ্রামের পথঘাট বেশ চিনেন। গ্রেট মিসেণ্ডেনের ডাকঘর নিকটস্থ ব্যালিঞ্জার গ্রামের এক মাংসবিক্রেতার দোকানে অবস্থিত; সেই ব্যক্তিই পোষ্টমাষ্টার। আমাদের দেশে কোন কোন ছোট জায়গায় যেমন পাঠশালার গুরুমহাশয় বা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় পোষ্টমাষ্টারের কাজও করেন, বিলাতে তেমনি কোথাও কোথাও মুদি বা মাংসবিক্রেতা এই কাজ করিয়া থাকে। আমার আসিবার দিন রবিবারে ছোট গ্রামে ষ্টেশনে আসিবার গাড়ী না পাওয়ায় হাঁটিয়া আসিলাম। আমি পথ না জানায় রৌদ্রে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বসু মহাশয় ও লেডী বসু আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আযাচিত সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ষ্টেশনের গেটে আসিয়াছি এমন সময় একটা লণ্ডনগামী ট্রেন চলিয়া গেল। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, আরও ২১মিনিট পরে আর একটা ট্রেন আসিবে। তাহা আসিলে তাহাতে উঠিয়া তৃতীয় শ্রেণীর একটা গাড়ীতে বসিলাম। তাহাতে পরে দুজন ইংরেজ যুবক উঠিয়া বসিল। আমার হাত হইতে একখানা কাগজ গাড়ীতে পড়িয়া যাওয়ায় একটি যুবক তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া আমাকে দিল। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। ভারতবর্ষে কোন ভারতীয়ের প্রতি এরূপ সামান্য সৌজন্য দেখান ইংরেজ বা ফিরিঙ্গীদের রীতি নহে বলিয়া এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম। শুনিয়াছি, বিলাতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র ভারতীয়েরা সব সময় ন্যায়সঙ্গত ও ভদ্র ব্যবহার পায় না। তাহা অসম্ভব নহে।

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

"বঙ্গভাষায় বৌদ্ধস্মৃতি"

মাঘ মাসে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটি লইয়া ফাল্গুনের যে-আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যাহার জন্য মূল প্রবন্ধটির মত বদলানো দরকার হয়।

প্রথম আলোচনাটির নম্বর অনুসারে উত্তর দিবার চেষ্টা করা গেল।

(ক) বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আলোচক লিখিয়াছেন, "তাঁহার নিজস্ব কিছু ছিল না বা নাই"। এরূপ উক্তির ধৃষ্টতা বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ বিচার করিবেন, আমি বলিবার অধিকারী নই।

(খ) পাষণ্ড বা ভণ্ড শব্দ সদর্থবাচক ছিল কি না তাহা আমার প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। পুরাণে এই শব্দগুলি ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই তাহা আদিতে সদর্থবাচক ছিল না মনে করা যাইতে পারে না।

(গ) নামগুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সুধু ব্যক্তির নামটি বিবেচনা করিলে বিশেষ সুবিধা হয় না, একটা যুগে যে ধরণের নাম বেশী চলিত থাকা সম্ভব তাহাই ধরিতে হয়। যেমন লালবিহারী, নবদ্বীপচন্দ্র প্রভৃতি নাম বৈষ্ণবের না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কাজে বৈষ্ণবেরাই এগুলিকে বেশী করিয়া ব্যবহার করায় এগুলি বৈষ্ণব প্রভাবের ফল বলা যাইতে পারে।

(ঘ) "বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় কতকগুলি হিন্দু দেবদেবী বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল" এবং "কোন দেবতাই প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধের নিজস্ব নয়" এসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, বহু লৌকিক দেবতা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কতকগুলিকে বৌদ্ধেরা ও কতকগুলিকে ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য দিয়াছিল। একটি দেবতার ইতিহাস বড় সহজ ব্যাপার নয়, বহু যুগের প্রভাব লক্ষ্য না করিলে ইহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। শিবঠাকুরের উপরে বুদ্ধের প্রভাব বড় কম ছিল না।

বুদ্ধদেবকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে বলিলে মোটেই বেশী বলা হয় না। বুদ্ধের জীবন ও চিন্তাকে লোকে আশ্রয় করিতে চাহে নাই বা পারে নাই। তাঁহার স্থানে বোধিসত্ত্ব ও পরে অসংখ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবীর আমদানি হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এ গেল বৌদ্ধদের নিজেদের দিকের কথা। হিন্দুরা বৌদ্ধ প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্যই বুদ্ধদেবকে মানিয়া লইয়াছিল। বুদ্ধকে অবতার বলা হইয়াছে বটে আবার তিনি যে বেদ-বিরোধী ছিলেন, ও পাষণ্ড পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও ব্রাহ্মণ্য-পন্থীরা ভুলিতে পারে নাই। "বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা" নামে আমার একটি প্রবন্ধে এবিষয়ে অনেক কথা সংগ্রহ করা গিয়াছে।

(চ) আলোচক এক নিশ্বাসে বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে বুদ্ধদেব প্রাচীন মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিলেও নিজের জীবনের সাধনা দ্বারা নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাঁহার মত আবার মহাযান ও শূন্যবাদের প্রভাবে বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৈষ্ণবেরাও বৌদ্ধপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। বহু শতাব্দীর বৌদ্ধ প্রভাবের ফল একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে নাই ইহাই আমার বক্তব্য। আমাদের ভাষায়, চিন্তায়, ও দেব-দেবী কল্পনায় তাহার ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় আলোচনা শুধু "দিগগজ পণ্ডিত" সম্বন্ধেই করা হইয়াছে। প্রবন্ধে মুদ্রণে যে ভ্রম ছিল তাহা মাঘ মাসেই সংশোধন করা হইয়াছিল তাহা বোধ হয় আলোচক লক্ষ্য করেন নাই। মেঘদূতের দিঙ্‌নাগ সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে একটা কিংবদন্তী ছিল বলিয়াই টীকাকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের প্রতি ইঙ্গিতের কথা মনে করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই আমাদের মনে হয়। দিঙ্‌নাগ সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী আছে তাহাতে মনে হয় যে পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে সহজে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার তর্কশক্তির কথা —Prof. Th. Stcherbatsky's "The Central Conception of Buddhism" (Royal Asiatic Society, 1923 pp. 18, 54), এবং Dr. Satis Chandra Vidyabhusan's "A History of Mediaeval Indian Logic" গ্রন্থে আছে। যাহা হউক, দিঙ্‌নাগের কথা অস্বীকার করিয়া "দিগগজ পণ্ডিতের" সঙ্গে আট দিকের আট দিগগজের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। "দিগগজ" দিগের সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের বিষয়ে কোন প্রাচীন উল্লেখ দেখানো দরকার।

শ্রীরমেশ বসু

—

'তুষু' পূজা

গত পৌষের প্রবাসীতে 'তুষু' পূজা শীর্ষক যে ছোট প্রবন্ধটি আমি লিখেছিলাম, সে-সম্বন্ধে গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু আলোচনা করেছেন দেখ্‌লাম।

তিনি লিখেছেন, "প্রথমতঃ লেখক লিখিয়াছেন যে, উক্ত পূজা বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি জেলায় 'কেবলমাত্র' নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু একথা ঠিক নহে।"

কিন্তু, আমি ওরূপ কথা লিখি নাই। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় যেখানে 'কেবলমাত্র' করেছেন, সেখানে 'সাধারণতঃ' হ'বে। তার অর্থ, অন্ত

জাতির কুমারী মেয়েরা এপূজা করলেও বেশী চলন দেখতে পাওয়া যায় মহান্তোদের ঘরের কুমারী মেয়েদের মাঝেই।

প্রতিমা-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, যে, সেবারে 'তুষুপূজা'র সময় আমি অনেকদিন Kharswan Stateএ ছিলাম এবং সেখানকার এক স্থানীয় জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে বিশেষ কারণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়ে দেখেছিলাম, যে, তাঁদের বাড়ীর সামনেকার বাঁধে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু মহান্তোদের কুমারী মেয়েরা তাদের 'তুষু' প্রতিমা বিসর্জ্জন দিচ্ছে। দু'ঘণ্টা সেখানে ছিলাম, তার মধ্যে তিনখানি মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দিতে দেখেছিলাম।

'ভাদু' ও 'তুষু' পূজার মাঝে একটা সামঞ্জস্য থাকার দরুন, আমি গানের মাঝে গোলমাল ক'রে ফেলেছি ব'লে, তিনি যে অভিযোগ করেছেন; হয়ত ঠিক সেই সামঞ্জস্যের দরুনই, সেখানকার এই কুমারী মেয়েরাও সে গোলমাল থেকে রেহাই পায়নি। কারণ, আমার দেওয়া গানগুলি সেই কুমারী মেয়েদের মুখেই শুনেছিলাম। যারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে এসেছিল, তাদের ডাকিয়েই আমি গানগুলি লিখিয়ে নিয়েছিলাম। হয়ত, কোনো মারাত্মক দোষ হয় না মনে ক'রে, তারা 'ভাদু'র স্থানে 'তুষু' ক'রে নিয়ে, সরল বিশ্বাসে তাদের কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। 'ভাদু' ও 'তুষু' পূজার মাঝে গোলমাল না করবার পক্ষে একটা সুবিধা এই, যে, আমি 'ভাদু' পূজা দেখিনি।

শ্রীশিশির সেন

"তুষু" পূজা

পৌষের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত 'তুষু' পূজা সম্বন্ধে মাঘ মাসে শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে-প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা নির্ভুল নহে। 'তুষু' পূজা সম্বন্ধে আমরা গত পৌষ সংক্রান্তিতে বিশেষরূপে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম (জেমশেদপুর—সিংহভূম), কর্ত্তব্যবোধে সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। কামাখ্যা-বাবু বলিয়াছেন 'তুষু' পূজা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভদ্রঘরের মেয়েরাও ঐ-পূজা করিয়া থাকেন। এখানে তাহা দেখি নাই—এখানে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীরাই 'তুষু' পূজা করিতেছে দেখিলাম। দ্বিতীয়তঃ কামাখ্যাবাবু যে 'তুষু' পূজায় প্রতিমা নাই বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভুল। আমরা কিন্তু পৌষ সংক্রান্তিতে স্থানীয় সুবর্ণ-রেখা নদীতে বহু তুষু প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। আমরা তাহা শিশিরবাবুর বর্ণনানুযায়ীই দেখিলাম। তবে কুমারীদের মধ্যেই যে এই পূজা আবদ্ধ, এমন মনে হইল না। বহু বিবাহিতা মেয়েরাও 'তুষু' প্রতিমা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের ছেলে কোলে করিয়া ছড়া গান করিতেও শুনিলাম। প্রতিমা হরিদ্রারঞ্জিত মেয়ে মূর্ত্তি। ছড়া সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করি নাই; নিজেদের ঘরকন্নার কথাই, ছড়া কাটিয়া, মিলাইয়া গান করা হইতেছিল এবং এক-একদল মেয়েরা অন্য দলের মেয়েদের গানের ভিতর দিয়া আক্রমণ করিতেছিল এবং গানেই তাহারাও প্রত্যুত্তর দিতেছিল, বলিয়া মনে হইল। প্রতিমা বিসর্জ্জন যে আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমরা বহু প্রতিমা নদীতে বিসর্জ্জন করিতে দেখিলাম। বিসর্জ্জন-রাত্রিতেও হয় না, দিনের বেলাতেই ভাসান হইল। তবে যদি স্থানভেদে, পূজার প্রভেদ হইয়া থাকে তাহা আমরা জানি না।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ-সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা ছাপা হইবে না।—প্রঃ সঃ

ব্যর্থ

শ্রী জীবনময় রায়

সিন্ধু-তরঙ্গের মত আজি তোর ভগ্ন বক্ষপুটে
ওরে দীন সর্ব্বহারা! উচ্ছ্বসিয়া পড়িতেছে লুটে
উদ্বেল জলধি, লক্ষ বেদনার অশ্রুর প্লাবনে—
কেহ ত দেয় না সাড়া। আজি তাই ভাবি মনে মনে
বিশ্বের দুয়ারে সুধু ফিরিয়াছ কাঙালের মত
রিক্ত করি' যাহা ছিল আপনার। নিত্য অবিরত
আজি তারি রোদন-উচ্ছ্বাস উঠিতেছে দুলে দুলে
এ চিত্ত মরুর প্রান্তে ভগ্ন-আশা-দিগ্ধ কূলে কূলে
জীবন-বেলায় বসি' শ্রান্ত হিয়া চাহে দূর পানে,
সম্মুখে অকূল সিন্ধু বন্ধুহারা মরুরে সন্ধানে,
নিরাকুল ব্যর্থ আঁখি—কোথা সেই পথের বান্ধব
মুগ্ধ হরিণীর কানে হানিল যে বাঁশরীর রব
এ দুর্গম মরু মাঝে। কোথা তার প্রেম দরদিয়া
সঞ্জীবনীমন্ত্রে যার মুঞ্জরিল দগ্ধ এই হিয়া!
আজি হেরি দিকে দিকে ঘনাইয়া আসিছে তিমির
অন্ধ আশঙ্কায় মৌন দশদিক্ কাঁপিছে অধীর।
কারো সাড়া নাহি পাই—অন্তরের গভীর আহ্বান
ধ্বনিছে ভেদিয়া শূন্য—প্রতিধ্বনি হানে মৃত্যুবাণ।
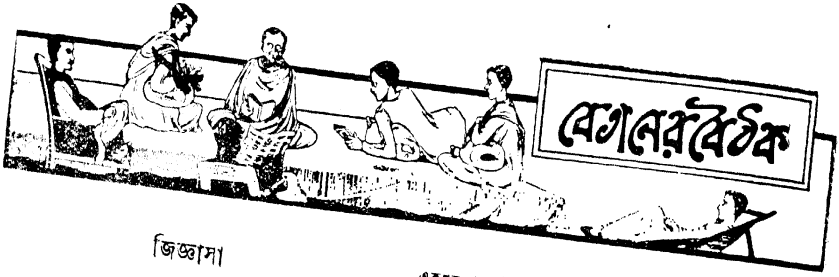
জিজ্ঞাসা

(৭·

বাউল-সম্প্রদায়

বাউল-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা কে ? তিনি কোন্ শতাব্দীর লোক ? সহজ-সাধন-প্রণালী কি তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন ? 'সহজিয়া' শব্দের অর্থ কি ? এই শব্দ বৌদ্ধগণ না বাউলগণ, কাহারা প্রথম ব্যবহার করেন ? বাউলদের প্রভাব চণ্ডীদাসের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কোথায় বেশী ছিল ? বাউলদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায় এরূপ কোন বই আছে কি ? তাহার ঠিকানা কি ?

শ্রী বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

(৭৩)

কাপড়-কাটা পোকা

একটি কাপড়ের দোকানে পিপীলিকাতে কাপড় কাটিয়া দিতেছে। ইহার কোনরূপ প্রতিকার বিধান করিবার সম্ভব হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(৭৪)

খেজুর-গুড়

খেজুর গুড় অনেক যায়গায় খুব বেশী পরিমাণে তৈয়ারী হয়। কিন্তু এই গুড়ের একটা দোষ—ভাল অবস্থায় বেশী দিন রাখা যায় না। টক হইয়া যায় এবং ফেনা হয়। এমন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে কি যাহার দ্বারা এই দোষ নিবারণ করা যাইতে পারে ?

(৭৫)

"কুশীলব"

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণকে—"কুশীলব" বলে কেন ? ইহার প্রকৃতিগত অর্থ কি ? কেহ জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীতারাদাস মণ্ডল

৭৬)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোন কোন সংস্করণে দিগ্‌বন্দনার মধ্যে এই লাইনটি আছে :—"চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দো মল্লেশ্বরে"।

বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুরের রাজারাই প্রধান মল্ল-নরপতি; মেদিনীপুর জেলার কতকখানি এক সময় এই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। খ্রীঃ অব্দ ১৪৬০ হইতে ১৫০১ পর্য্যন্ত চন্দ্রমল্ল নামে একজন রাজা বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "কোন" বা "কোনা" প্রত্যয়ান্ত গ্রামবাচক শব্দ বাংলাদেশে খুব বিরল নয়—যেমন নেত্রকোনা তোড়কণা ইত্যাদি। শুনা যায় চন্দ্রকোণায় মল্লেশ্বর নামক শিব এবং মল্লারপুর নামক একটি গ্রামও উহার নিকট আছে।

সুতরাং মেদিনীপুর জেলার এই চন্দ্রকোণা গ্রামের নামের সহিত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা চন্দ্রমল্লের কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে কি না জানিতে চাই।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

(৭৭)

শিল্পী শশী হেস্ কোথায় ও কি করিতেছেন ?

ননীবালা চৌধুরী

—

মীমাংসা

(৪৪)

পাখীর চাষ

অল্পব্যয়ে ব্যবসা—শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক প্রণীত। পুস্তক পাইবার ঠিকানা—মিঃ আর্ আর্ ঘোষ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

শ্রীমতী বীণাপাণি দত্ত

(৫৮)

পত্রিকা-পরিচালনা

বঙ্গভাষায় পত্রিকা-পরিচালনা বিষয়ক পুস্তক দেখা যায় না। ইংরেজী ভাষায় উক্ত বিষয়ক দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়, উক্ত পুস্তক দুইখানি "Sir Issac Pitman & Sons Ld., Parker Street, Kingsway, W. C. 2. London" কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তক দুইখানির নাম—

১। Authorship and Journalism By A. E. Bull.
Price 3s. 6d.

২। Commercial Self-Educator
Estd. By Robert W. Holland, O. B. E., M. A., M. Sc., LL. D.
Price—30s. (complete in 2 vols.)

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

(1) ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা পরিচালনা সম্বন্ধে পুস্তক নিম্নের ঠিকানায় পাওয়া যায়।

D. B. Taraporevala, Sons & Co.
190, Hornby Road, Fort, Bombay.

পুস্তকের নাম

(1) The Principles of Journalism. By Casper S. Yost. Price Rs. 3-8 as.

(2) Journalism for Profit. By Michael Joseph. Price Rs. 5-4 as.

(3) Newspaper Make-up and Headlines. By Norman J. Radder. Price Rs. 10-15 as.

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস

(৬৫)

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্, মহাশয় "অক্ষিতত্ত্ব" নামে বাঙ্গালাভাষায় চক্ষু-চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ডাঃ সি, ম্যাক্‌নামারা সাহেব কর্তৃক প্রণীত। ইহা "এ ম্যানুয়েল অফ্ দি ডিজিজেস্ অফ্ দি আই" নামক ইংরেজী পুস্তকের অবিকল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৬৲ টাকা। ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের ঠিকানা ৯৩ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট লেখা আছে।

শ্রীকালীকেশব ঘোষ

বর্ষ-বিদায়

শ্রীরাধারাণী দত্ত

আজ

ফুরায়েছে কাজ!

বসন্তের ঝরা-ফুলে ঢাকা

পরাগ-পুটিত পথে মোর রথ-চাকা

করুণ-ক্রন্দন-সুরে বিদায়-পূরবী-ধ্বনি তুলি'

চলিয়াছে ক্লান্ত-গানে চির-অস্ত পানে ; মাধবের রথচক্রধূলি

গগন পাটল করি' দিগন্তে ছড়ায়ে রক্ত আভা—আনন্দ-ঘর্ঘর নাদে আসে!

কিরণ-কিরীট-শির দীপ্তদেহ বৈশাখের শাঁখ—বাজিয়াছে আকাশে বাতাসে!

প্রদীপ্ত-দীপকে মোর হ'য়ে গেছে গাওয়া—'মাধবে'র নব-উদ্বোধন;

'শুক্রে'র কঠোর-কৃচ্ছ্র পঞ্চাগ্নি'র তপঃ সমাপন!

'শুচি'র সুচির-রুচি পাথোধর-পথে

মোহিয়া ময়ূরী-মনোরথে

আসিয়াছি ফিরে!

ধীরে!

এই

রিক্ত-আঁচরেই

ভরিয়াছি কাজরীর গান!

হরিয়াছি নীপকুঞ্জে শিখিনীর প্রাণ

সজল-শ্রাবণ রূপে ঘন-ঘোর গিরি-চূড়া চুমি'।

ভাদ্রের ভরন্ত-রূপে ভরসা দিয়াছি—কাশের আনন্দে ছেয়ে ভূমি!

'ঈষ'তে ঈষৎ নহে ঈশ্বরী আনিয়া দিছি গেহে—আনন্দের নাহিক' তুলনা!

কার্ত্তিকে আকাশ-বর্ত্তি মর্ত্ত্যবার্ত্তা স্বরগে গিয়াছে—তার মধুস্মৃতিটি ভুল'না!

'হায়নে'র নবাগমে নূতনের পূজা—নবান্নের আনন্দ-উৎসব!

'পোষেড়া'র পর্ব্ব-মধু স্মৃতি করে প্রীতি-যুত সব!

'মাঘে'র তুষারে জাগে বসন্তের আশ;

ফাগুনে'র আগুন-নিশ্বাস;

এবে মাস 'মধু'

বঁধু!

ভাই,
ব্যথা মোর নাই !
কত নব নব বর্ণ-রাগে,
অভিনব আলিম্পনি মম অঙ্গে জাগে,
ষড়ঋতু স্মিত-পুষ্পে স্বহস্তে যা' দিয়াছে আঁকিয়া ।
পরিপূর্ণ-বরষে'র রসে পূর্ণ-করা—পাত্রখানি গেলাম রাখিয়া ।
নিদাঘের খর-দীপ্তি বাদলের-কাজল-ঘনিমা—শরতে'র স্বর্ণ-আলো-বাঁশী,
হেমন্তে'র হৈম-শোভা শীতের কুহেলি-ধুম্রজাল—বসন্তের বর্ণ গন্ধ হাসি
সবই আছে পুঞ্জীভূত, সুখ-সুরভিত—অশ্রু'র শিশির-জলে ধোয়া,
হাসির হেমাভা আছে বেদনার বিবর্ণতা ছোঁয়া !
আনন্দের অলক্তক হতাশার কালি,
সবই পাবে স্মৃতি দীপ জ্বালি' ;
আর নাই, তাই
যাই !

হায় !
এসেছে বিদায় !
যত কিছু দোষ ত্রুটি ক্ষতি,
অন্যায় বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তি অবনতি
আমা হ'তে লভিয়াছ যারা সবে—কোরো ভাই ক্ষমা,—
নবীন-বরষাগমে তাহাদের যেন—দূর হয় জীবনের অমা !
আশার মৃণালে যার উদ্যমের কঠিন কোরকে—ফুটিয়াছে সাফল্য-কমল,
তাহাদের অন্তরের পূত-কৃতজ্ঞতা-ধারা, মম—যাত্রাপথ ক'রেছে অমল !
মোর সন্ধ্যা-বিদায়ের বেদনায় ভরা—এই ম্লান পাংশু পথ-খানি,
হরষ-কুসুম-দামে এখনি আচ্ছন্ন হবে জানি
নব-অতিথির লাগি' ; সেই-ই মোর সুখ,
তৃপ্তি ভারে পরিপূর্ণ-বুক
যাই অস্ত পানে !
গানে !

যাই,
আর দেরী নাই ।
চৈত্র-সংক্রান্তির নিশি-শেষে
বিবর্ণ পাণ্ডুর শশী ম্লান হাসি হেসে
পশ্চিম-গগন প্রান্তে ধীরে ধীরে ঢ'লে পড়ে অই ;
নিভে আসে শুক্রতারা নিষ্প্রভ নয়নে,—পূর্ব্বাচলে জাগিবে বিজয়ী !
হে মধু-সংক্রান্তি-শেষ-নিশিথিনী ! বিদায় ! বিদায় !—
বিদায় গো সুপ্ত নীড়-পাখি' !
সুখ-সুপ্তি-মগ্ন ওগো ধরাবাসি ! উপাধান-পাশে—
কল্যাণ-কামনা গেনু রাখি' !
ধ্যান-মগ্ন অরণ্যানি ! স্বপ্ন-মুগ্ধা নদি ! সুখ-মৌন নিস্তব্ধ আকাশ !
অর্দ্ধস্ফুট-পুষ্পকলি ! ছায়াচ্ছন্ন গিরি ! নিঃশব্দ বাতাস !
বিদায় ! বিদায় সবাকার কাছে !
আর মোর নাহি কিছু আছে
প্রদানের লেশ !
শেষ !
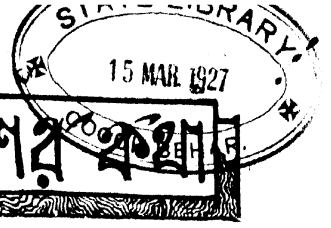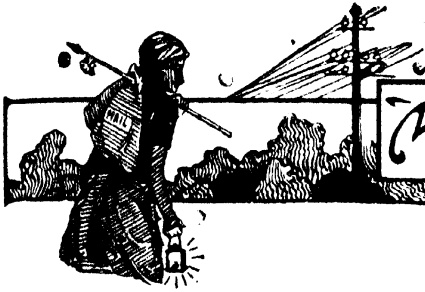
ভারতবর্ষ

বেহার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—

আগামী ৪ঠা এবং ৫ই চৈত্র মজঃফরপুরে বেহার বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর সুপ্রবীণ নেতা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি, এল মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব খ্যাতনামা বাগ্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র বি-এল মহোদয় ও অন্যান্য সুযোগ্য মহোদয়গণ সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহিলা প্রতিনিধিগণের জন্য পৃথকভাবে সুব্যবস্থা করা হইবে।

আমরা আশা করি সম্মিলনের আগামী অধিবেশন সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই সময়ে একটি শিল্প প্রদর্শনীও হইবে। তাহাতে মহিলাদের শিল্পকার্য্যই অধিকাংশ থাকিবে ; যেমন—(১) আল্পনা, (২) সূচিকার্য্য, (৩) কারুকার্য্য, (৪) শিল্পকার্য্য, (৫) চিত্রাঙ্কন এবং সেই সঙ্গে পুরুষদের গৃহীত আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন থাকিবে।

বিধবাবিবাহ সহায়ক সমিতির রিপোর্ট—

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে যে বিগত ১৯১৫ সনে লাহোরের সার গঙ্গারাম বিধবা-বিবাহের উদ্দেশ্যে বহু অর্থ দান করেন এবং এই অর্থ দ্বারা একটি ট্রাষ্ট গঠন করেন। গত কয়েক বৎসরে এই সমিতি যে বিপুল কাজ করিয়াছেন তাহা যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবজনক। ১৯২৬ সনে এই সমিতির উদ্যোগে মোট ৩১৭২টি বিধবাকে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। সমিতির কাজ কি ভাবে দ্রুত সাফল্য লাভ করিতেছে তাহা কয়েক বৎসরের কাজের হিসাব দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নিম্নে কোন্ বৎসর সমিতির উদ্যোগে কতজন বিধবার বিবাহ হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল—১৯১৫ সন—১২, ১৯১৬ সন—১৩, ১৯১৭ সন—৩১, ১৯১৮ সন—৪০, ১৯১৯ সন—৯০, ১৯২০ সন—২২০, ১৯২১ সন—৩১৭, ১৯২২ সন—৪৫৩, ১৯২৩ সন—৮৯২, ১৯২৪ সন—১৬০৩, ১৯২৫ সন—২৬৬৩, ১৯২৬ সন—৩১৭২ জন।

এই সমিতির কার্য্য দেখিয়াই উহাকে বিচার করিলে চলিবে না। সমিতির দেখাদেখি ভারতবর্ষে আরও অনেক প্রদেশে স্থানীয় সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের চেষ্টায় প্রতি বৎসর অনেক হিন্দু বিধবার বিবাহ হইতেছে। এজন্যও আংশিক গৌরব সমিতির প্রাপ্য।

ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বেশ বুঝা যাইবে—সমগ্র ভারতে হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২১২৫৫৫৫৪, ২৫ বৎসর কম বয়সের বিধবা ১৫৩০৬৪৪ ; বাঙ্গালা ও আসামে মোট হিন্দু বিধবা ২৮১৬৩৭৪ ; ২৫ বৎসরের কম বয়স্কা বিধবা ২০৫৮৯৫। সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলা দেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের দ্রুত প্রসার হইতেছে।

বিধবা-বিবাহ জনপ্রিয় করিবার জন্য সমিতি গত বৎসর প্রায় দুই লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমিতি এই উদ্দেশ্যে ৩ খানা সংবাদপত্র চালাইয়া থাকেন।

আলোচ্যবর্ষে সার গঙ্গারাম ট্রাষ্ট হইতে বিধবা-বিবাহের জন্য ২২৫৭৩৷/৪ পাই খরচ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাধারণের দানেও ২২০৯৷৵০ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে সমিতির ৫৯৭টি শাখা আছে এবং এজন্য ১২ জন বেতনভূক্ কর্ম্মচারী আছেন। উঁহারা গত বৎসর ভারতের ৫৫৯টি সহরে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত সমিতির চেষ্টায় মোট ৯৫০৬ জন বিধবার বিবাহ হইয়াছে। উহার মধ্যে কোন্ জাতির কতজন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—ব্রাহ্মণ ১৭৩৮, ক্ষত্রিয় ১৬৪৮, অরোরা ২০৩৭, আগরওয়ালা ৯৩৫ কায়স্থ ৩৩১, রাজপুত ৭৪২, শিখ ৬২৪ ও বিবিধ ১৪৫১।

বিধবা-বিবাহ ক্রমে কি প্রকারে জনপ্রিয় হইতেছে তাহা এই হইতেই বেশ বুঝা যায় যে ১৯১৫ সনে প্রতি বিবাহের জন্য সমিতির গড়ে ৭৩ টাকা খরচ হইয়াছিল কিন্তু ১৯২৬ সনে প্রতি বিবাহে গড়ে মাত্র ৬৷০ খরচ পড়িয়াছে।

ব্রহ্ম নারীর ভোটাধিকার—

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভায় নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে ব্রহ্মদেশে সমুদয় স্ত্রীলোককে আগ্রহসম্পন্ন হইতে অনুরোধ করিয়া স্থানীয় ৬ জন নারীকর্ম্মী এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ ইউ মং গি ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাচন-সম্পর্কিত আইনে মহিলাদের যে সমস্ত অযোগ্যতা আছে, তাহা দূর করিতে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মদেশে অতীত ও বর্ত্তমানে বরাবরই স্ত্রী-স্বাধীনতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্ত্রীলোকগণ অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকগণ হইতে অনেক বিষয়েই অগ্রগামী। এই অবস্থায় তাহাদের কোন প্রকার অযোগ্যতা থাকা উচিত নহে। স্বরাষ্ট্রসচিব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে উহা অগ্রাহ্য হয়।

এই প্রস্তাব আলোচিত হওয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মের সকল জাতীয় মহিলাদের একটি বিরাট্ শোভাযাত্রা কাউন্সিল-গৃহ পর্য্যন্ত গমন করে। উঁহাদের সঙ্গে অনেক বড় বড় প্লাকার্ডে মহিলাদের দাবীর কথা উল্লিখিত ছিল। গবর্ণমেণ্ট শোভাযাত্রাকে কাউন্সিল গৃহের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাঁহারা অশান্তি আশঙ্কায় পুলিশের খুব কড়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাশী বিদ্যাপীঠ সমাবর্ত্তন সংস্কার—

সম্প্রতি আচার্য্য ভগবান দাসের অধ্যক্ষতায় কাশী বিদ্যাপীঠের ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্ত্তন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আচার্য্য ভগবানদাস বিদ্যার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করার পর অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতীয় বিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের মধ্যে—দুইটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। জাতীয় বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্য লওয়া হয় না। কাজেই জাতীয় বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন নহে। বিদ্যাপীঠে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। পরদেশী ভাষায় এই শিক্ষা সম্ভব নহে। আমাদের প্রধান শিক্ষা এই যে, এই বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা নিজ পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা পায়। বক্তা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ছয় বৎসর কঠোর চেষ্টার ফলেও বিদ্যাপীঠে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। পক্ষান্তরে বৎসরের পর বৎসর ছাত্র হ্রাস পাইতেছে।

আচার্য্য ভগবানদাস তাঁহার অভিভাষণে বলেন "আমাদিগের নিরাশ হইলে চলিবে না। দেখিতে হইবে যে কি কারণে বিদ্যাপীঠের মত একটা জাতীয় বিদ্যালয় সফল হয় না। কারণ বাহির করিয়া উপায় নির্দ্দেশ করিতে হইবে।"

শুদ্ধি—

দিল্লীর ১৬ জন বিশিষ্ট মালকানা রাজপুতকে "শুদ্ধি" করিয়া হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য রাজপুতগণ নবদীক্ষিতদের সঙ্গে পান-ভোজন করিয়াছেন।

—

বাংলা

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনী—

নিউবেঙ্গল থিয়েটার হলে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর মিঃ আর, এন, রিড সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতির সারগর্ভ বক্তৃতার পর সভায় ১০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সমস্ত বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দ বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন। পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বাবু মনীষীনাথ বসু সরস্বতীর "দোলযাত্রা" ও বাবু মহেন্দ্রনাথ দাসের "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভাপতিকে ধন্যবাদান্তর অধিবেশন ভঙ্গ হয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা—

গত ১লা ফাল্গুন শিবপুর-সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনাকল্পে একটি সভা আহূত হয়। আহ্বানকারী শিবপুরের সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁহার ১৬৭ নং গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডস্থ ভবনের বৃহৎ প্রাঙ্গনটি এই উৎসবের উপযোগী করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। 'বঙ্গবাণী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কলিকাতার এবং হাওড়ার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পর ৭টায় সভাকার্য্য সুরু হয়। সঙ্গীতের পর কতিপয় কুমারী শরৎচন্দ্রকে ধূপ ধুনা মালা, চন্দন প্রভৃতির অর্ঘ্যদান করে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় একখণ্ড চিত্রিত রেশমের উপর মুদ্রিত অভিনন্দনলিপিখানি সভাস্থলে পাঠ করেন। তাহাতে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ও বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার দান সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে আলোচনা করা হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণের পর জলযোগান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

শিবপুরে সাহিত্য-সংসদের সদস্যগণকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালী রাজবন্দী—

বিনা বিচারে যে সমস্ত বাঙ্গালী যুবক কারারুদ্ধ আছেন, তাহাদের মুক্তির জন্য ভারতীয় ও বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল,তাহাতে প্রায় সমস্ত নির্ব্বাচিত সভ্য একবাক্যে প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছেন। কিন্তু সরকার প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। এদিকে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যহই নানা করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। কতদিনে এসবের প্রতিকার হইবে?

নারী-শিক্ষা সমিতি—

এই মাসে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়-গৃহে নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে বাৎসরিক মহিলা-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই উপলক্ষে মহিলাদিগের হস্তনির্ম্মিত নানা রকমের শিল্প ও কারুকার্য্যের নমুনা প্রদর্শিত হইবে।

নিম্নলিখিত বিভাগে পদক দানের ব্যবস্থা আছে।

(ক) বয়ন (১) সূতী (২) রেশম। (খ) ছুঁচের কাজ। (গ) সাধারণ সেলাই। (ঘ) জ্যাম, জেলী, চাটনী ইত্যাদি। (ঙ) নানাবিধ মিষ্টান্ন। (চ) নরুনের কাজ নক্সা। (ছ) চট ও কার্পেটের আসন। (জ) মাটীর কাজ। (ঝ) চরকা। (ঞ) পুঁতির কাজ।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিসাধন সমিতি—

এই সমিতির বিষয় হয়ত অনেকেই কোনো খবর রাখেন না। ১৯০৯ সালে ইহা লর্ড সিংহ, আচার্য্য রায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এস, আর, দাস, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ইত্যাদি মহোদয়গণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই এই সমিতি বাঙ্গলাদেশের যাহারা নিম্নতমস্তরের তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতির লোকেরাও সমিতির নিকট অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

অর্থের অভাবের জন্য এই সমিতি ভাল করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গলা দেশের গ্রামে ১০ টাকা হইলে একজন উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা একটি স্কুল চালানো সম্ভব হয়। ৪ টাকা হইলে একটি সাধারণ প্রাথমিক স্কুল চালানো যায়। সমিতি সাধারণের কাছে অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। সমিতি বর্ত্তমানে সমস্ত বাঙ্গলাদেশে আপাততঃ ৩৬২টি বিদ্যালয় চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে সমিতির যে পরিমাণ টাকার দরকার, তাহা অপেক্ষা ৬৫০ টাকা ঘাটতি হইতেছে। এই ঘাটতি মিটাইয়া যদি সমিতিকে আরো ভালভাবে কাজ করিতে হয়, তবে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইবে না। বাঙ্গলা দেশের লোকেরা যদি এই সমিতিকে প্রত্যেকে মাসে দুই আনা করিয়াও

ভিক্ষা দেন, তবে সমিতির এই কষ্টসাধ্য কার্য্য বহুল পরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীরাজমোহন দাস, অবৈতনিক সেক্রেটারী, ১৪নং বাদুড় বাগান রোড, কলিকাতা।

বাংলায় বিধবা-বিবাহ—

বগুড়া সমিতির 'গণমঙ্গল' প্রতিষ্ঠাতা ও নিখিল বঙ্গ যুবক-সম্মিলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের উদ্যোগে একটি হিন্দু বালবিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাইধনী দাসী, বয়স দশ বৎসর, পিতা নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর ঘোষ, পাত্র শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, হরিনারায়ণপুর নিবাসী ৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের পুত্র। বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্র-আচার অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে। শুভ কার্য্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় তিন শত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৬ই মাঘে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শিয়ালকোল গ্রামে শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ রায় সূত্রধর উল্লাপাড়ার নিকটবর্ত্তী বারৈয়া নিবাসী পঞ্চানন্দ দাস সূত্রধর মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই বিবাহে বৈশ্য-সূত্রধর সমাজের সকলেই আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে এই উৎসবে যোগদান করেন। পাবনায় এই প্রথম সূত্রধর সমাজে বিধবা-বিবাহ হইল।

বিগত ৭ই ফাল্গুন তারিখে পাবনা জেলার অন্তর্গত কাশীনাথপুর শিবপুর নিবাসী ৺কালাচাঁদ দাস মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী টুনুবালা দাসীর সহিত ঐ জেলার কাদোয়া গ্রাম নিবাসী ৺কোকনচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপকানন দাসের বিবাহ হইয়াছে। মেয়েটি মাত্র ১০ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। বিবাহ সভায় গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটির মাতুল শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের উদ্যোগে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাত্র-পাত্রী উভয়েই কায়স্থ সমাজের।

গত ৬ই ফাল্গুন পাবনাতে শ্রীযুক্ত শৈলজাচরণ সাহার একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কুচিপুকুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাহার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে সাহা জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যোগদান করিয়াছিলেন। পাবনাতে সাহা জাতীয় বিধবার এই প্রথম বিবাহ।

ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী আর্য্যমঙ্গল সমিতির কর্ম্মিবৃন্দের প্রচেষ্টায় বিগত ২৪শে মাঘ সোমবার পাবনা জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নিবাসী কেশবচন্দ্র পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র পালের সহিত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেলগাছির নিকটবর্ত্তী ঘোষবাড়ী নিবাসী মৃত যাদবচন্দ্র পালের পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দাসীর শুভ বিবাহ যথাশাস্ত্র মত হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞানাধ্যাপক প্রফেসার মেঘনাদ সাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চ্চা ও মৌলিক গবেষণার ফলে তিনি বিজ্ঞান-জগতে এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন যে, তিনি বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কাউন্সিল কর্ত্তৃক এফ, আর, এস্ উপাধির জন্য মনোনীত হইয়াছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য এতদপেক্ষা উচ্চতর সম্মান আর নাই। ভারতবর্ষে ইতঃপূর্ব্বে কেবল বঙ্গের ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও মাদ্রাজে রামানুজম্ ও অধ্যাপক রামণ এই সম্মানলাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক সাহা একজন উদীয়মান বাঙালী বৈজ্ঞানিক, তাঁহার সম্মানে সমগ্র বঙ্গদেশে সাম্মানিত হইয়াছে।

৺সার সুরেন্দ্রনাথের দান—

রিপন কলেজের দরিদ্র ও প্রতিভাবান ছাত্রদিগের জন্য সার সুরেন্দ্র-নাথ মৃত্যুকালে যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি তাঁহার উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক উক্ত কলেজের ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে ঐ টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে এবং কতগুলি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ট্রাষ্টিগণ একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ধর্ম্মঘট—

বি, এন, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট প্রায় একমাস হইল আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ৪০ হাজার রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ইহাতে যোগদান করিয়াছে। খড়্গপুরে উত্তেজিত ধর্ম্মঘটকারীগণের উপর গুলিবর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট প্রায় প্রতিদিনই ইস্তাহার জারী করিতেছেন যে, ধর্ম্মঘটের অবস্থা আশাপ্রদ, উহার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অনেকস্থলেই দলে দলে শ্রমিকেরা কার্য্যে যোগদান করিতেছে, মেল ও প্যাসেঞ্জার গাড়ী ঠিক মত চলিতেছে, মালগাড়ীও চলা বন্ধ হয় নাই, মোটের উপর কোন অসুবিধা নাই, ইত্যাদি। কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণ দেখিতেছে যে, ষ্টেশনমাষ্টার হইতে সাপ্টিংম্যান, পয়েণ্টস্‌ম্যান, পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ করাতে যাত্রীগাড়ী চলাচলের ঘোর অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে; অভিজ্ঞ লোকের স্থানে কতকগুলি অনভিজ্ঞ ফিরিঙ্গি যুবক ঐ সব কাজে ভর্ত্তি হওয়াতে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছে। মাল গাড়ী চলাচলও প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম। কয়লার খনির শ্রমিকরা কোন কোন স্থলে ধর্ম্মঘটিদের কাজে যোগ দেওয়াতে কয়লা সরবরাহের ক্ষতি হওয়াতে অনেক কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্যের বিষম সঙ্কট উপস্থিত।

কুষ্টিয়ায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

গত জ্যৈষ্ঠমাসে পাবনায় যেরূপ হইয়াছিল, সম্প্রতি কুষ্টিয়ায়ও সেইরূপ সাম্প্রদায়িক কলহ ও আনুসঙ্গিক অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। দিনের পর দিন দুই সম্প্রদায়ে ভীষণ আত্মকলহ ও সংঘর্ষ চলিতেছে। প্রকাশ স্থানীয় লোকগণ মুসলমান গুণ্ডাদের ভয়ে স্ত্রীপুত্র গৃহে রাখিয়া আদালত বা অন্য কর্ম্মস্থলে পর্য্যন্ত যাইতে সাহসী হইতেছেন না, ফলে বাজার, দোকান, আদালত সমস্তই দিনের পর দিন বন্ধ রহিয়াছে। হিন্দুগণ বাড়ীর বাহির হইতেছে না, অথচ মুসলমানগণ লাঠি হস্তে সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং প্রতি শুক্রবার গোবধ করিয়া হিন্দুদের চক্ষুর উপর ঝুলাইয়া রাখিতেছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গুণ্ডাগণ তাহাতে বিশেষ ভীত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

বাজনায় বিপত্তি—

বাঙলায় এখন ঢাকঢোলের বাদ্য লইয়া দেশবাসী কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মুসলমানের অন্যায় আবদার ও পুলিশের অদূরদর্শিতার ফলে এই সকল কলহের সূত্রপাত হইয়াছে।

এসম্বন্ধে পটুয়াখালীর ব্যাপারই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখানে যে পথে পুলিশকর্ত্তৃক বাদ্য বাজানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তথায় বাদ্য বাজাইতে দেওয়ায় মুসলমানগণের কোন আপত্তি ছিল না। পুলিশের অদূরদর্শিতা

ও কর্তৃত্বপ্রিয়তা বলেই পটুয়াখালিতে বিরাট সত্যাগ্রহের সূচনা হইয়াছে। আজ প্রায় ২০০ দিন ধরিয়া দিনের পর দিন হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া কারাবরণ করিতেছেন।

তারপর গত সরস্বতীপূজার প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে চুঁচুড়া ও কলিকাতা হ্যারিসনরোডের মোড়ে যে গোলমাল হইয়াছে স্থানীয় পুলিশই তাহার জন্য অনেকটা দায়ী মনে হয়।

পোনাবালিয়ার ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতার উপর গুলি বর্ষণ—

পোনাবালিয়া (জেলা বরিশাল) গুলিমারা ব্যাপার সম্পর্কে বাংলা সরকার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—

"প্রত্যেক বৎসর ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়ার শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে একটা মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় দেশের হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। ঝালকাটি হইতে নলচিটিতে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ রাস্তার ধারে জগন্নাথপুরের মেলা স্থান হইতে মাইল-খানেক দূরে একটী ছোট মসজিদ আছে, এই মসজিদটি না কি বৎসর সাতেক হয় নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তার অপর পার্শ্বে বর্ত্তমান মসজিদ হইতে কিছুদূরে আর একটি মসজিদ ছিল। এই পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুরা একটা গোলযোগের আশঙ্কা করিতেছিল। এজন্য গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মেলা-স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি খোঁজ করিয়া জানিতে পারেন যে, ইতঃপূর্ব্বে এই মেলার সময় গীত-বাদ্য করায় বা উলুধ্বনি দেওয়ায় কোনপ্রকার আপত্তি উত্থিত হয় নাই। এই উৎসবের সময় হিন্দু-ধর্ম্মার্থীগণ গীতবাদ্য করিয়া থাকে ও উলুধ্বনি দিয়া থাকে; কিন্তু পাছে এবার কোন গোলযোগ ঘটে, এজন্য পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত যুক্তি করিয়া তিনি তথায় সশস্ত্র পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করেন। গত ২রা মার্চ্চ ভোর বেলায় একটি সংকীর্ত্তনের দল গীত-বাদ্যসহকারে যে রাস্তার ধারে ঐ মসজিদ, সেই রাস্তা দিয়া মেলা স্থল অভিমুখে রওনা হয়। ঐ শোভাযাত্রীদিগকে বাধা দান করিবার জন্য একদল সশস্ত্র মুসলমান মসজিদে জমায়েৎ হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া মহকুমা হাকিম (ইনি ভারতীয় খৃষ্টিয়ান) শোভাযাত্রীদিগকে মসজিদের কিছুদূরে থামাইয়া দেন এবং মুসলমানদিগকে শান্তির সহিত শোভাযাত্রা যাইতে দিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু মুসলমানেরা সরাসরি ইহাতে অস্বীকৃত হয়। ক্রমেই ভিড় বাড়িতে থাকে এবং বেয়াড়া ভাব দেখাইতে থাকে। কুলকাটি মসজিদের নিকট ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের ১৩ জন সেনা ও কতিপয় কনেষ্টবল মোতায়েন করা হইয়াছিল; কিন্তু অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া মহকুমা হাকিম আরও ৪ জন রাইফেলধারী চাহিয়া পাঠান। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবস্থার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ঐ স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, ঠিক তখনই এই অতিরিক্ত সেনা আসিয়া পৌঁছে। এই ঘটনা বেলা ৯ টার সময় হয়।

ইতিমধ্যে সাহাদাতুদ্দিন নামে একজন মুসলমানের প্ররোচনায় মুসলমানদের আচরণ আরও বেয়াড়াভাব ধারণ করে, এই ব্যক্তি, হিন্দুরা গীতবাদ্য সহকারে মসজিদ অতিক্রমের চেষ্টা করিলে বলপ্রয়োগ করিতেও প্রস্তুত হয়। মহকুমা হাকিম ইতঃপূর্ব্বেই উত্তমরূপে জানিতে পারিয়া-ছিলেন যে পূর্ব্বে ঐ মসজিদের নিকট দিয়া গীতবাদ্য সহকারে অনেক শোভাযাত্রা গমন করিয়াছে কিন্তু মুসলমানেরা কখনও গীতবাদ্যে আপত্তি করে নাই। এই জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, চিরাচরিত প্রথাই এবারও বলবৎ রাখিতে হইবে। তিনি এজন্যই মহকুমা হাকিম ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সহ মুসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ ভিড় ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িতে অনুরোধ করেন, কিন্তু মুসলমানেরা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত তাহাদের শোভাযাত্রায় বাধাদানের সঙ্কল্প জানাইতে থাকে। তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে বে-আইনী জনতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ভিড়ের লোকদিগকে জানাইয়া দেন যে তাহারা সরিয়া না পড়িলে গুলী চালাইয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া সাহাদাতুদ্দিন ক্রমাগত মুসলমান দিগকে উত্তেজিতই করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, শোভাযাত্রা গীতবাদ্য সহ মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। এই সময় মসজিদের চতুঃপার্শ্বস্থ খোলা জায়গায় অনূন ৫০০ শত সশস্ত্র মুসলমান জমায়েত হইয়াছিল, রাস্তা ও এই লোকগুলির মধ্যে মাত্র দুইহাত প্রশস্ত একটি খালের ব্যবধান ছিল। পেছনের জঙ্গলে আরও প্রায় ৫০০ লোক জমায়েত হইয়াছিল, ভিড় যখন সরিতে অস্বীকৃত হইল, তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইষ্টার্ণফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর অংশটিকে মার্চ্চ করিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ দিতে বলেন। এই মার্চ্চ করা হইবার পর পুনরায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিড়ের লোকদিগকে সরিয়া পড়িতে আদেশ দেন, কিন্তু ভিড়ের লোকেরা তখনও সরিয়া পড়িতে অস্বীকার হয় এবং মুসলমানেরা তাহাদের বর্শা নাচাইতে থাকে ও সিপাহী এবং কর্ম্মচারীদিগের দিকে বর্শা চালাইতে থাকে। তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ সাহাদাতুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেন, তাহাকে তখনই গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপর কর্ম্মচারীগণ ও উপস্থিত দুইজন গণ্যমান্য মুসলমান ভদ্রলোক পুনরায় মুসলমানদিগকে সরিয়া পড়িতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। এই সময় আবার কতকগুলি লোক কিছুদূরে রাস্তা পার হইয়া আসিয়া বর্শা প্রভৃতি হস্তে দলে দলে রাস্তার অপর পার্শ্বে জমায়েত হইতে থাকে, এবং এইরূপে পুলিশের দলকে ঘিরিয়া ফেলে। ভিড়ের লোকদের চালচলন আরও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে এবং ইহারা পুলিশের নিকট হইতে মাত্র ৩ হাত ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া পড়ে। ইহাদের নিকট মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুলী চালাইতে আদেশ দেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেককে একটি করিয়া গুলী চালাইতে আদেশ দেন।

হাবিলদার তাঁহার বাহিনীর লোকদিগকে এই আদেশ জানাইয়া দেন এবং ১৪ জন লোক গুলী চালায়। মুসলমানেরা যে বিষম গোলযোগ করিতেছিল, বোধহয় এই গোলযোগের জন্যই গুলী চালাইবার আদেশ ঠিক মত শুনিতে পারা যায় নাই। এবং গুলীচালান বন্ধ করিবার পূর্ব্বে ৩৭টি গুলী চালান হয়। প্রথম যখন গুলী চালান হয় তখন মুসলমানেরা সরিয়া পড়িতেছিল না। গুলী চালানোর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র গুলী চালান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গুলীর ফলে ১৪ জন মুসলমান মারা যায় এবং ৭ জন আহত হয়।

নারীহরণ—

সহযোগী হিন্দুসঙ্ঘে প্রকাশ, যশোহর—

জনৈক বৃদ্ধ তাঁহার যুবতী কন্যাসহ পিস্কিপাশা হইতে ষ্টীমার যোগে আসিয়া রাত্রিতে কালীয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। পরে তথা হইতে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া বর্দ্দিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন; কিছুক্ষণ পর তিনি অবগত হয়েন যে উক্ত নৌকার মাঝি তাঁহারই এক পুরাতন ভৃত্য। যাহা হউক কিছুদূর অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটু বেড়াইবার জন্য তীরে অবতরণ করেন। এই সুযোগে উক্ত মাঝি বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাঁহার যুবতী কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

এই ঘটনা যশোহর জেলায় নড়াইলে মহকুমার অন্তর্গত নাড়াগাঁতি থানার এলাকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

চুঁচুড়া—

চুঁচুড়া কামারপাড়া বাজারের পাঁচুমণি দাসী নামক গোয়ালা শ্রেণীর একটী ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়ার অভিযোগে সদর মহকুমা হাকিম বুদ্ধু দর্জ্জি নামক জনৈক মুসলমানের বিরুদ্ধে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়াছেন। পাঁচুমণির শ্বশুর ও অভিভাবক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। অপহৃত বালিকাটীর এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মুসলমানের গুণ্ডামি—

নোয়াখালী জেলায় লক্ষ্মীপুর থানার অন্তঃপাতী মদনপুরের রাজেন্দ্র পাল পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে, প্রতি বৎসর তাঁহার বাটীর নিকটস্থ একস্থানে পল্লীর নরনারীগণ সমবেত হইয়া "শঙ্কটপীরের" পূজা দিয়া থাকে। এবারও ঐ উদ্দেশ্যে ৩০ জন স্ত্রীলোক এবং ৫।৬ জন পুরুষ সমবেত হইলে ১৫।১৬ জন মুসলমান ঢিল ছুড়িয়া গণ্ডগোল বাধাইতে আরম্ভ করে। কয়েকটি স্ত্রীলোকের গায়ে ঢিল লাগিলে রাজেন্দ্র পাল তাহাদিগকে নিজ গৃহে আশ্রয় দান করেন। পরে স্ত্রীলোকেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিলে গুণ্ডারা পূজার স্থানে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ স্থানে পূজার জন্য যে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল তাহা উৎপাটিত ও পূজার দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে এবং পূজার থালা ইত্যাদি লইয়া যায়। আসামীরা সকলেই পলাতক আছে।

ঢাকা জেলা হিন্দু সভা—

গত মাসে ঢাকা জেলা হিন্দু সভার প্রথম বার্ষিক উৎসব, রায় বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে ফরাসগঞ্জ জীবন বাবুর বাড়ীতে হইয়া গিয়াছে। জেলার সকল মহকুমা হইতেই বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। এই সভার অধীনে সহরে ও মফঃস্বলে বহু শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাসখানেক আগে জেলা হিন্দু সভার বৈঠক হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলে জেলার সর্ব্বত্রই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সংগঠনের কার্য্য ছাড়াও সভা অন্য দিক্ দিয়াও অনেক সদনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সভা কর্তৃক তথাকথিত জল-অনাচরণীয়দের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একত্র আহারের অনেকগুলি আয়োজন করা হয়। এই সভা অস্পৃশ্যদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সভা কর্তৃক এই পর্য্যন্ত ৪০টি নরনারীকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের আটজন খৃষ্টিয়ান আর বাকী কয়জন মুসলমান। নবদীক্ষিতদের থাকিবার কোন আবাসস্থান নাই বলিয়া আরো বেশী নরনারীকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান সম্ভবপর হয় নাই। হিন্দুদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন জন্য এই সভা ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া অনেক সভা ও কুস্তীর আখড়া স্থাপন করিয়াছেন।

নারী শিক্ষার দিক্ দিয়া এই সভা মাত্র ২০ জন মহিলাকে শিক্ষা দিবার জন্য আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়াছেন।

শুদ্ধি—

শ্রীহট্ট দেশবার্ত্তার প্রকাশ খাসিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে যে উৎসাহ-উদ্যম দেখাইতেছে, শিলংএ তাহা একটি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। এমন দিন যাইতেছে না যেদিন ২।৪ জন খাসিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে একজন নেপালী খাসিয়া স্ত্রীলোক বিবাহ করার ফলে সমাজচ্যুত হইয়াছিল। তাহাকেও সস্ত্রীক সমাজে গ্রহণ করা হইয়াছে। সংবাদ যে পাটনাতে যে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে অনেক খাসিয়া সর্দ্দার যোগদান করিবে। শীঘ্রই শিলংএ একটি খাসিয়া হিন্দু সম্মেলন হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে। এখানে খাসিয়াদের ভিতর খুব উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দুমিশনের সম্পাদক জানাইতেছেন:—

২৪ পরগণা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামে গত মাসে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা মৌলনা আক্রাম খাঁর ভ্রাতা ডাঃ হামীদ অর্ রহমন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উপাধি ছিল গাঙ্গুলী। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হামিদ অর্ রহমানের বর্ত্তমানে নামকরণ করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গাঙ্গুলী। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ, হিন্দু মহাসভার পদ্মরাজ জৈন, আর্য্যসমাজের পণ্ডিত শঙ্করনাথ প্রভৃতি সভায়, উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দু মিশন

হিন্দু জনসাধারণের প্রতি আবেদন—

প্রতি সপ্তাহে অন্যূন, দুই সহস্র ভারতীয় হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে।

সাধারণতঃ নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত জাতি এবং পার্ব্বত্য সাঁওতাল, কোল,মুণ্ডা, গারো, খাসিয়া ওরাং প্রভৃতিই দলে দলে খ্রীষ্টিয়ান সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষে আজ এক বিরাট্ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—হিন্দু বাঁচিবে কি মরিবে? যদি বাঁচিতে হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহাকে জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সকলকে একতায় সম্বদ্ধ করিতে হইবে, সকলের প্রাণে স্বজাতি প্রেম জাগ্রত করিতে হইবে। জাগ্রত হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানে বিব্রত, কিন্তু এদিকে ততোধিক খ্রীষ্টান সমস্যাও আসন্ন।

এই বিপদ হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প লইয়া 'হিন্দু মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বিরত হয় এবং যাহারা ভ্রান্তি বা মোহ বশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে ফিরাইয়া আনা যায়, এই উভয় উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দু মিশন কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কার্য্য অবলম্বন করিয়াই হিন্দু মিশন সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সংস্কার ও সংগঠন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত আসামে হিন্দু মিশনের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শিলং হিন্দু মিশনের কেন্দ্রে দলে দলে খাসিয়া খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। ডিব্রুগড়ে হিন্দু মিশনের প্রধান কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তথায় শীঘ্রই একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে। সম্প্রতি বগুড়া জেলায় প্রায় পনর হাজার অহিন্দু হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

এই বিরাট কার্য্যের উপযোগী অর্থ ও ত্যাগী কর্ম্মী সংগ্রহের জন্য হিন্দুমিশনের প্রচারকগণ আজ ভারতীয় হিন্দুদের দ্বারস্থ। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিলে এ কাজ অনেকাংশে সহজ ও সুসাধ্য হইবে।

হিন্দু মিশনের বিস্তৃত নিয়মাবলীর ও মিশন সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ মিশনের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য। সাহায্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে।

স্বামী সত্যানন্দ—কার্য্যাধ্যক্ষ 'হিন্দু মিশন'
৬২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
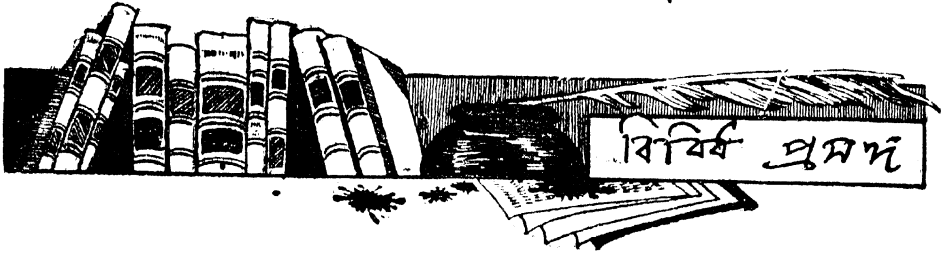
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-পরিষৎ। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ফেলো বা সদস্য। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ইহার সদস্য হওয়া যত সহজ, বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে তত সহজ নহে। অতএব, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত যুবা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ইহার সদস্য হওয়া যে খুব শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বয়স এখনও পঁয়ত্রিশ হয় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা জগতের, ভারতের, বঙ্গের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার আরও পুষ্ট হইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক ডাক্তার-মেঘনাদ সাহা, এফ্-আর্-এস্

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রামানুজম্ নামক গণিতবিদ্। যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বৈজ্ঞানিক-জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার পর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হন। অনেক বৈজ্ঞানিকের নানা মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে নিজ মত সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার এই সম্মান পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এখনও তাঁহাকে পরমত খণ্ডন করিতে হইতেছে। এই সম্মান না পাইলেও তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলির গৌরবহানি হইত না। তাঁহার পরে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্ রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, শিক্ষার সুযোগ ও শিক্ষার সমুদয় উপকরণ ও সরঞ্জাম বিনা চেষ্টায় তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। তিনি নিজের ধীশক্তি ও পরিশ্রমের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন।

ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ সাহা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন; অতি কষ্টে তাঁহাকে তাঁহার

বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত। মেঘনাদ প্রথমে তাঁহার গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। সেখানে আর বেশী শিখিবার উপায় না থাকায় তিনি দশ বৎসর বয়সে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী সিমুলিয়া গ্রামে প্রেরিত হন। এখানে কাশিমপুরের জমীদারদের গৃহচিকিৎসক দয়ালু ডাক্তার অনন্তকুমার দাসের বাটীতে থাকিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে থাকেন এবং ১৯০৫ সালে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিভাগে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি ঢাকা কলীজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি অন্য বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য হন, এবং ১৯০৯ সালে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে প্রথমস্থান লাভ করেন এবং ভাষার পরীক্ষাতেও পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম হন। গণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। এন্ট্রেন্স্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি ব্যাপ্টিষ্ট সোসাইটী কর্ত্তৃক গৃহীত বাইবেল পরীক্ষায় বঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একশত টাকা পুরস্কার পান। তিনি ঢাকা কলেজ হইতে আই-এস্সি পাশ করেন; তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, এবং গণিত ও রসায়নে প্রথম হন। তাহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এস্সি ও এম্-এস্সি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় স্থান এবং বর্ত্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও গবেষণাক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; তিনি আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে মেঘনাদ, অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ও অধ্যাপক সী ঈ কালিসের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি গণিত-চর্চ্চাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন বটে, কিন্তু তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেন, এবং তাঁহার অনেক জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন।

১৯১৬ সালে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও মিশ্র গণিত শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই কাজ করিতে করিতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য (D. Sc.) উপাধির জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন। তাহা উপযুক্ত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পর তিনি ১৯১৯ সালে ঐ উপাধি পান। ঐ বৎসরেই তিনি আর-একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি ও গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি পাইয়া তিনি ১৯২০ সালে বিলাত যান এবং তথায় অনেক গবেষণা করেন। পর বৎসর তিনি বার্লিন গিয়া সেখানেও গবেষণা করেন। বাংলায় পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাঁহার গবেষণার বৃত্তান্ত সহজবোধ্য বাংলায় লেখা কঠিন। ভবিষ্যতে চেষ্টা করা যাইবে। ইংরেজীতে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের মডার্ন্ রিভিউতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধ্যাপক সাহার গবেষণার কতকটা সহজবোধ্য বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে খয়রার রাজার প্রদত্ত অর্থ হইতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, এবং তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঐ কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু তথায় তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিবার উপযুক্ত পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি চেষ্টা করিয়াও পান নাই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে কেবল যে তিনিই এইরূপ ভুগিয়াছেন, তাহা নয়। ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যাহা হউক, অধ্যাপক সাহা ১৯২৩ সালে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক নীল-রতন ধরের চেষ্টায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। কিছু কাল পরে যখন তাঁহার ঐ পদে স্থায়ী হইবার সময় আসে, তখন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের একজন সর্ব্বঘটে বিরাজমান অকর্ম্মক অধ্যাপক এলাহাবাদে সাধ্যমত এরূপ ষড়যন্ত্রাদি করেন যাহাতে মেঘনাদ-বাবুর কাজটি পাকা না হয়। এই দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এলাহাবাদে অধ্যাপক সাহা প্রায় চারি বৎসর আছেন। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের উন্নতির জন্য, গবেষণাকার্য্যের প্রবর্ত্তন জন্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার সুশৃঙ্খল নূতন ব্যবস্থা করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কখন একা, কখন বা তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহযোগে তিনি অনেক মূল্যবান্ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। পরমাণুর গড়ন (The structure of the Atom) সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মতবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। হইলে তাহা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে একটি রত্ন বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা হয়।

ইতিমধ্যে তাঁহার অন্য প্রধান একটি বৈজ্ঞানিক মতের আদর ক্রমশ বাড়িতেছে। অন্ত বৈজ্ঞানিকেরা ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক গবেষণার দ্বারা ফল লাভ করিতেছেন, এবং তিনি বৈজ্ঞানিক অনুমান-শক্তির দ্বারা যে যে ফল

পাওয়া যাইবে বলিয়াছিলেন, পরীক্ষা দ্বারা এই বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা তাহা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমেরিকার প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেন্‌রী মরিস্ রাসেল্ অন্যতম। বিলাতের আর এইচ ফাউলার এবং ই এ মিল্‌ন্ অধ্যাপক সাহার সিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক গবেষণা করিয়া যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে, সাহা বিলাতে থাকিলে ও ইংরেজ হইলে ১৯২৪ সালে রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো হইতে পারিতেন। অবশ্য তাঁহার গবেষণার গুরুত্ব ও মূল্য আগে ফেলো না হওয়ায় যে কম হইয়া গিয়াছে বা যাইতে পারে, এমন নয়।

তিনি ফ্রান্সের জ্যোতিষিক পরিষদের জীবন-সভ্য (Life Member of the Astronomical Society of France) এবং লণ্ডনের পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন ফেলো (Foundation Fellow of the Institute of Physics, London)। তিনি ১৯২৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিদ্যা বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং অভিভাষণে নিজের সমুদয় গবেষণার বিবরণ দেন।

কলিকাতায় থাকিতে তিনি, উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ প্রধানতঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে যে অর্থ সংগৃহীত হয় ও সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ক সংবাদ প্রচার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন এবং এই কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করেন।

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীর বৈজ্ঞানিক ভল্টা তাড়িত সম্বন্ধে যে আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তাহার ফলে পৃথিবীতে তাড়িত-যুগের প্রবর্ত্তন বা প্রসারণ হইয়াছে, বলা যায়। এই ভল্টার মৃত্যুর শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব মহাসমারোহে এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার জন্মস্থান কোমোতে হইবে। এই উৎসবের উদ্যোগকর্ত্তারা পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

এলাহাবাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে ব্রতী প্রধান প্রধান লোকেরা মেঘনাদ-বাবুর কাজের যথেষ্ট সাহায্য করেন ও তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। সুতরাং কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়া তাঁহার কাজের সুবিধাই হইয়াছে, যদিও কলিকাতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে-কারণেই হউক, তাঁহার মত লোকেরা কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের ও কলিকাতার গৌরব রক্ষা করা সহজ হইবে না।

—

রেঙ্গুনে বাঙালী

রেঙ্গুনে যত বাঙালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প বা বেশী বেতনের রাজকর্ম্মচারী, উকীল, ব্যারিষ্টার, ও ডাক্তারই বেশী; ব্যবসাদারও আছেন। কেহ কেহ নিজের ঘরবাড়ী করিয়াছেন, চাষের জমিও কেহ কেহ বিস্তর কিনিয়াছেন শুনিলাম। ব্রহ্মদেশের কতকগুলি বাঙালী ওকালতী-ব্যারিষ্টারীতে ও নানাপ্রকার ব্যবসাতে অনেক অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন শুনিলাম। বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশ যেরূপ বিস্তৃত দেশ, তাহার পক্ষে ইহার লোকসংখ্যা খুবই

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কর্ম্মিগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক

কম। বাংলার আয়তন ৭৬৮৪৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪৬৬৯৫৫৩৬। ব্রহ্মদেশের আয়তন ২৩৩৭০৭ বর্গমাইল, অর্থাৎ বঙ্গের তিন গুণেরও অধিক; কিন্তু লোকসংখ্যা ১৩২১২১৯২, অর্থাৎ বঙ্গের এক তৃতীয়াংশেরও কম। এরূপ দেশে নানা রকমের রোজগারের পথ যে খুবই আছে, তাহা বলাই বাহুল্য;—বিশেষতঃ যখন বর্ম্মা পুরুষেরা শ্রমবিমুখ ও আরামপ্রিয়। বাঙালী যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদের শ্রমপটু ও শ্রম করিতে ইচ্ছুক হওয়া দরকার। তাহা হইলে লক্ষ্মীর দর্শন মিলিবে।

রেঙ্গুনে বাসাভাড়া বড় বেশী। বাসাগুলিও সাধারণতঃ বাঙালীর উপযোগী এবং আরাম ও স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। এক-একটি বাড়ীতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ধর্ম্মের, ও ভিন্ন ভাষাভাষী, বহু পরিবার থাকে। উপর তলায় উঠিবার সাধারণ সিঁড়ি একটি; সুতরাং সদর দরজা দিনরাত খোলা থাকিতে পারে। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া প্রথমে ঢুকিতে হয় বৈঠকখানার কক্ষে,

তাহার ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে, শয়নকক্ষের ভিতর দিয়া রন্ধনগৃহে এবং রন্ধনগৃহের ভিতর দিয়া স্নানাগার ও শৌচাগারে যাইতে হয়। অল্প আয়ের সাধারণ গৃহস্থদিগকে এইরূপ বাড়ীতেই থাকিতে হয়। গবর্মেণ্ট বা মিউনিসিপালিটি সুবিধাজনক সর্ত্তে শহরের বাহিরের দিকে জমী দিলে ভাল হয়। রেঙ্গুনের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মন্দ নহে। এইরূপ করিলে স্বাস্থ্য আরও ভাল হইতে পারে।

ব্রহ্মদেশে অবরোধ-প্রথা নাই। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীরা কিন্তু অনেকেই এদেশেও পর্দ্দা বজায় রাখিয়াছেন। ইহা আবশ্যক বা শ্রেয়ঃ মনে হইল না। তথাপি, বর্ম্মা ও ভারতীয় নারীদের জন্য বেড়াইবার স্বতন্ত্র উদ্যান হইলে ভাল হয়। তাহার চেষ্টা হইতেছে। শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডার নিকট যে হ্রদ আছে, তাহার তীরস্থ জায়গাগুলি বেশ সুন্দর বেড়াইবার জায়গা। কিন্তু তাহা শহরের বাহিরে ও কিছু দূরে। সব সময় মেয়েদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদও না হইতে পারে।

রেঙ্গুনে বাঙালীদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। দুর্গা ভীতে আগন্তুক হিন্দু বাঙালীরা গিয়া কয়েক দিন বিনা ব্যয়ে থাকিতে পারেন। বাঙালী ব্রাহ্মদের স্থাপিত নিজস্ব ব্রহ্মমন্দির আছে। তাহাতে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা হয়। মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাও হইয়া থাকে। বাঙালী ছেলেদের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়াইবার স্কুল আছে। ইহাতে অন্য ছেলেও লওয়া হয়, কিন্তু বাঙালী ছেলেই বেশী। এখানে ইংরেজী উচ্চারণ ও কথোপকথন শিখাইবার জন্য ইংরেজী যাঁহার মাতৃভাষা এরূপ একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। এইরূপ বর্ম্মাভাষা শিখাইবার জন্য একজন বর্ম্মা শিক্ষক আছেন। ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট। ইহার নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে; জায়গা লওয়া হইয়াছে। বাঙালী বালিকাদের জন্যও বিদ্যালয় আছে। ইহার ভাড়াটিয়া বাড়ীটি বেশ ভাল; খুব আলো-বাতাস আছে। শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্তও ভাল। কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা কম। ভারতবর্ষে মোটের উপর লিখনপঠনক্ষম নারীর সংখ্যা শতকরা যত, ব্রহ্মদেশে তাহা অপেক্ষা বেশী। ব্রহ্মদেশে গিয়াও যদি বাঙালীরা মেয়েদের শিক্ষায় পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, তাহা দুঃখের বিষয়—বিশেষতঃ যখন ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম পুরুষ অনেক। রেঙ্গুনে বাঙালীদের ক্লাব তিনটি আছে শুনিলাম। একটির সভ্যেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তিনটি আলাদা ক্লাব থাকায় ক্ষতি নাই, যদি সকলেরই একত্র মিলনের কোন ক্ষেত্র ও স্থান থাকে। এইরূপ মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে আমি কাহারও কাহারও সহিত ব্রহ্মদেশীয় বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের কথা কহিয়াছি। হয় ত তাহার অধিবেশন হইবে। বাংলা বহি ও মাসিক পত্র বিক্রয়ের দোকানও রেঙ্গুনে আছে। কলেজ ও স্কুলসমূহে বাঙালী শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যাপক কয়েক জন আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বাঙালী সন্ন্যাসীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত; কিন্তু ইহাতে সকল জাতির ও ধর্ম্মের রোগী লওয়া হইয়া থাকে। আমি ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবাশ্রমের জায়গাটি বেশ প্রশস্ত। যে-সব বড় বড় ঘরে রোগীদিগকে রাখা হয়, তাহাতে আলো ও বাতাস বেশ আছে। যত্ন ও করুণার সহিত রোগীদিগের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। বাড়ীগুলি পাকা হইলে অবশ্য আরও ভাল হয়। কিন্তু তাহা বহু অর্থ ব্যয়-সাপেক্ষ। হয় ত কালে তাহা সংগৃহীত হইবে। কিন্তু আপাততঃ মাসে মাসে যে তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা চল্‌তি খরচ হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে স্বামী শ্যামানন্দ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বহু শ্রম ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়। রেঙ্গুনে যে-সব ভারতীয় কুলি মজুর কারখানাদিতে কাজ করে, পীড়িত হইলে তাহাদের অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। অথচ কারখানার মালিকরা, কেহ কেহ ছাড়া, এই সেবাশ্রমের সাহায্য করেন না। যাঁহারা করেন, তাঁহারাও যথেষ্ট করেন বলিয়া মনে হইল না। সরকারী সাহায্য যাহা আছে, সেবাশ্রম তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সাহায্য পাইবার যোগ্য। এইসব কারণে এবং সর্ব্বোপরি ইহা দয়া ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্বের কাজ বলিয়া ভারতবর্ষের লোকদের এই সেবাশ্রমে অর্থ-সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করিয়া বাঙালীদের উপর ইহার দাবী আছে; কেন না, ইহা বাঙালীদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম্মের একটি দৃষ্টান্ত। টাকাকড়ি রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী শ্যামানন্দের নামে পাঠাইতে হইবে।

মুসলমান বাঙালী ব্রহ্মদেশে অনেক। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানাদির বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি নাই। দিদারুল্ আলম নামক একটি বাঙালী মুসলমান যুবকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সম্পাদিত যুগের আলো নামক মাসিক পত্র এবং সম্মিলনী নামক সাপ্তাহিক পত্র আশাপ্রদ বোধ হইল। রেঙ্গুনের অন্যতম ইংরেজী দৈনিক কাগজ রেঙ্গুন ডেলী নিউসের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মুসলমান; তাঁহারা বাঙালী কিনা, জানি না। কেবল মাত্র এই কাগজটিতে আমার একটি ইংরেজী বক্তৃতার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে সপ্তাহে তিন বার রেঙ্গুনে

জাহাজ যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর এই জাহাজগুলি ছোট হইলেও মন্দ নয়। কিন্তু যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয়, তথাপি কোম্পানী দেশী খাদ্যের কোন বন্দোবস্ত করে না, স্নানশৌচাদির বন্দোবস্তও ইউরোপীয়দের উপযোগী। প্রতিযোগিতার অভাব এবং ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাববশতঃ কোম্পানী ভারতীয়দের সুবিধা দেখে না। এইসব বিষয়ে সুবিধা হইলে, প্রত্যহ জাহাজ রওয়ানা হইলে, এবং বাংলা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত রেল হইলে ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী ও অন্য ভারতীয়ের সংখ্যা আরও বাড়িবে।

সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন আবশ্যক ও উচিত। কিন্তু ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও অন্য ভারতীয়েরা ঐ দেশকে কেবল কামধেনু মনে করিলে অন্যায় ও ভ্রম করিবেন। উহাকে কিছু দিতেও হইবে। হৃদয়-মনের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন, তাহাই দিতে হইবে। তাহা হইলেই ভারতীয় সভ্যতা ও ঔপনিবেশিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষিত হইবে। যাঁহারা শিক্ষাদান ও নানাবিধ সমাজ-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত, ব্রহ্মদেশকে এই প্রকারে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার সুযোগ তাঁহাদের বেশী; অন্যদেরও আছে।

—

প্রবাসী-সম্পাদকের রেঙ্গুন দর্শন

পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুন যাইতে হইয়াছিল। সেখানে ছিলাম অল্পদিন, অবসরও বেশী পাই নাই। সুতরাং রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া আসিতে পারি নাই। কিন্তু একটা কথা বেশ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছি, যে, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, রেঙ্গুন-দর্শন সে-বিষয়ে বড় বেশী সাহায্য করে না। আমার বার বার এইরূপ মনে হইয়াছিল, যে, রাস্তাঘাটে ব্রহ্মদেশীয় অপেক্ষা ভারতীয় লোকই যেন বেশী দেখিতেছি। ১৯২১এর সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিতেছি, ব্রহ্মদেশের ৩০১০৩৯ জন অধিবাসী বাংলা, ১৩১৪০ জন গুজরাটী, ৪৭৫৪৫ জন ওড়িয়া, ১৭৮৪৫ জন পাঞ্জাবী, ১৫২২৫৮ জন তামিল, ১৫৫৫১৯ জন তেলুগু, ও ১৫৮০৯৯ জন হিন্দী বলে। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাভাষী লোকও আছে; তাহাদের সংখ্যা কম। রাজস্থানী বলে ১১৬৭ জন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, মাড়বারীরা ব্রহ্মদেশে বেশী পয়সা করিতে পারে না। তাহার কারণ, তথায় যে মান্দ্রাজী চেটিরা আছে, তাহারা তেজারতী, ব্যবসা এবং আদিম ভাবে জীবন যাপনে মাড়বারীদের চেয়ে কম দক্ষ নয়। সুরাটের সুরতিরাও কম যায় না। বাঙালীদের সংখ্যা তিন লাখের চেয়ে আরও বেশী শুনিয়াছি; হয় ত যে-সব বাঙালী মুসলমান বর্ম্মা স্ত্রীলোক বিবাহ করে, তাহাদের অনেকে আপনাদিগকে বাঙালী বলে না, এবং তাহাদের সন্তানদেরও বাঙালীত্ব থাকে না। ইহা কিন্তু আমার অনুমান, ঠিক্ বলিতে পারি না।

রেঙ্গুনের আর যাহাই ভারতীয় হইয়া যাক্, শোয়েড্যাগন প্যাগোডা (বৌদ্ধ মন্দির) খাঁটি ব্রহ্মদেশীয় জিনিষ। এখানে অবশ্য যাহারা পূজা দিতে যায়, তাহাদের প্রায় সবাই বর্ম্মা; তন্মধ্যে স্ত্রীলোকই বেশী। বাঙালী বৌদ্ধও ২।৪ জন মাঝে মাঝে এখানে দেখা যায়। এই মন্দির ও তাহার হাতা অতি বিশাল ব্যাপার। হাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির; সবগুলি মোট যতটা জমীর উপর তাহাকে একটা গ্রাম বলিলেও চলে। প্রত্যেকটিতে বুদ্ধমূর্ত্তি। বর্ম্মারা যেমন নিজেরা চিন্তাশীল নহে, তেমনি তাহাদের নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিও ধ্যানী বুদ্ধের নহে;—মূর্ত্তিগুলি প্রায় সবই স্মিতমুখ; মূল্যবান্ অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ অনেকের অঙ্গে আছে। বৃহত্তম ও কেন্দ্রীয় মন্দিরটি পৌঁছিতে এত সিঁড়ি ভাঙিতে হয়, যে, কেহ যদি দুবেলা, কিম্বা এক বেলাও, সেখানে পূজা দিতে যায়, তাহা হইলে তাহার আর অন্য ব্যায়ামের দরকার হয় না। এখানে সব জাতির ও ধর্ম্মের সব লোকই যাইতে পারে, কিন্তু খালি পায়ে যাইতে হইবে। জুতা খুলিয়া হাতে করিয়া লইয়া যাও, তাহাতে বাধা নাই।

রেঙ্গুনে আর-একটি জিনিষ দেখিলাম, যাহা আর কোথাও দেখি নাই। বড় বড় রাস্তায় লোক-চলাচল ও গাড়ী-চলাচল নিয়মিত করিবার জন্য কনষ্টেবলরা দাঁড়াইয়া আছে প্রকাণ্ড ছাতার নীচে; ছাতার বাঁট মাটিতে পোঁতা। বাঁশ ও পাতার এইরূপ ছাতা ছাড়া, পাথর ও কংক্রীটের এইরূপ ছাতার নীচে দণ্ডায়মান পাহারাওয়ালাও দেখিলাম। বর্ম্মা পাহারাওয়ালা একজনও দেখিলাম না; সবই ভারতীয়, বেশীর ভাগ শিখ মনে হইল। বস্তুতঃ রেঙ্গুনে দৈহিক শ্রমজীবী বর্ম্মা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। বর্ম্মা দোকানের দোকানদারও বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। শিক্ষিত বর্ম্মা ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ও অবসর আমার হয় নাই। কেবল আমার লীগ অব্ নেশুনস্ সম্বন্ধীয় ইংরেজী বক্তৃতায় যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং বর্ত্তমান জাতীয় দলের নেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত উ পু সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অল্প কথাবার্ত্তা সভাস্থলে হইয়াছিল।

—

পোনাবালিয়ায় গুলিবর্ষণ ও রক্তপাত

বরিশাল জেলার পোনাবালিয়া গ্রামে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে অনেক হিন্দু যাত্রী গীতবাদ্য সহকারে শিব-

মন্দিরে যাইতেছিল। তাহারা কত কত বৎসর ধরিয়া যে ইহা করিয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বে ইহাতে আপত্তি করে নাই, বাধা দেয় নাই। যে রাস্তা দিয়া যাত্রীরা যায়, তাহার এক ধারে একটি মসজিদ আছে; তাহা অনুমানিক সাত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবার মুসলমানেরা আপত্তি করে, এবং হিন্দু যাত্রীদিগকে শিব-মন্দিরের দিকে গীতবাদ্য সহকারে যাইতে দিবে না বলিয়া বর্শা, লাঠি প্রভৃতি লইয়া দলবদ্ধ হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করে। যে মৌলবী তাহাদিগকে হিন্দুদের যাত্রায় বাধা দিতে উত্তেজিত করিতেছিল, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। তাহাতেও মুসলমান জনতা নিবৃত্ত না হইয়া বরং উক্ত মৌলবীর উত্তেজনায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দেওয়া হয়। গুলিবর্ষণে কুড়িজন মুসলমান হত ও আরও অনেকে আহত হইয়াছে। খবরের কাগজে ঘটনাটির যে নানারকম সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি জানা যায়।

এতগুলি মানুষ যে হত ও আহত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আরো দুঃখের বিষয় এই, যে, যে-সব লোক হত ও আহত হইয়াছে, তাহারা অজ্ঞ লোক, অন্যের প্ররোচনায় মারা পড়িয়াছে বা আহত হইয়াছে। যদি কেহ নিজের বুদ্ধিতে কোন কাজ করিতে গিয়া প্রাণ হারায় বা আঘাত পায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহারই কর্ম্মফল মনে করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে কিন্তু অন্যে অশিক্ষিতেরা অল্পশিক্ষিত মুসলমানদিগকে বুঝাইয়াছে, যে, হিন্দুরা গীতবাদ্যসহকারে মসজিদের নিকট দিয়া গেলে ইস্‌লামের ও আল্লার অপমান হয়, সুতরাং এই অপমান নিবারণের জন্য দরকার হইলে মুসলমানদের প্রাণ দেওয়া ও প্রাণ লওয়া উচিত। কিন্তু প্ররোচক ও উত্তেজকরা প্রাণ হারায় নাই, আঘাতও পায় নাই।

গীতবাদ্যে মসজিদের, ইস্‌লামের ও আল্লার কোনই অপমান বা ক্ষতি হয় না। স্মরণাতীত কাল হইতে মসজিদের নিকটে ও দূরে গীতবাদ্য হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহাতে মুসলমানদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। বরং বঙ্গে তাহাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অন্য উন্নতি হইতেছে।

সরকারী গুলিনিক্ষেপের হুকুম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। সরকারী জ্ঞাপনীতে দেখিলাম, প্রত্যেক বন্দুকধারী ব্যক্তিকে একবার গুলি ছুড়িতে বলা হয়, কিন্তু মুসলমানরা খুব কোলাহল করায় বন্দুকধারীরা হুকুম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া প্রত্যেকে সাঁইত্রিশ বার গুলি ছুড়িয়াছিল; গুলি নিক্ষেপে কাজ হইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র বন্দুক ছোড়া বন্ধ করা হয়। কাজ হওয়ার মানে, মুসলমান জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা ও তাহাদিগকে পলাইতে বাধ্য করা। সাঁইত্রিশ বার গুলি ছুড়িবার আগে কি তাহারা পলাইতে আরম্ভ করে নাই? তাহা ত সম্ভব বোধ হয় না। সরকারী জ্ঞাপনীতে আছে বটে, যে, চৌদ্দজন সরকারী লোক প্রথমে গুলি নিক্ষেপ করে, এবং মুসলমানরা প্রথম বন্দুক ছোড়ার পরই পলায়ন করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যে, কখন্ তাহারা পলাইতে আরম্ভ করে, এবং তৎক্ষণাৎ গুলিবর্ষণ বন্ধ করা হইয়াছিল কি না। অবশ্য, বিনা উত্তেজনায় কলম-হাতে বসিয়া এইসব প্রশ্ন যতটা শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করা যত সহজ, উত্তেজনার সময় কার্যাক্ষেত্রে ততটা শান্ত ও ধীর ভাবে কাজ করা তত সহজ নয়। কিন্তু মানুষের প্রাণটাও ত তুচ্ছ জিনিষ নয়। এইজন্য, মুসলমান জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য যতটা বলপ্রয়োগ আবশ্যক ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক বলপ্রয়োগ করিয়া অনাবশ্যক কোন প্রাণহানি করা হইয়াছে কি না, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সরকারী ও বেসরকারী লোকদের একটি কমিটির দ্বারা হওয়া আবশ্যক। কিছু বলপ্রয়োগ যে আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা আমরা স্বীকার করি।

যে-সব মুস্‌লিম নেতা মুসলমান জনসাধারণকে হিন্দুদের এবং (এই ক্ষেত্রে) সরকারী শান্তিরক্ষকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি। বলপ্রয়োগ ধর্ম্মনীতিসঙ্গত কি না, অহিংসা ভাল কি না, তাহার আলোচনা করিব না; কারণ, এই নেতাদের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মনীতির আদর্শের সহিত আমাদের আদর্শের মিল না হইতে পারে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা মুসলমানদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নীতি কখন হিন্দুর দিকে, কখন মুসলমানদের দিকে ঝুঁকিবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়, দুএক মাস বা দুএক বৎসরের ইতিহাস হইতে ইহা বুঝা যায় না। মোটের উপর অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া মুসলমানের দিকে একটা ঝোঁক লক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা মুসলমানকে শক্তিশালী করিবার জন্য নয়, হিন্দুকে হীনবল করিবার জন্য।

মুসলমানরা যদি বাহুবল ও অস্ত্রবলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত বল এরূপ বেশী থাকা দরকার, যাহাতে তাঁহারা হিন্দুকে কাবু করিয়া

তাহার পর ইংরেজকেও কাবু করিতে পারেন। কারণ, যখনই ইংরেজ দেখিবে, যে, মুসলমান হিন্দুকে কাবু করিয়া প্রবল হইতে বসিয়াছেন, তখনই ইংরেজ নিজের রাজত্ব ও প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত মুসলমানকে শক্তিহীন করিবার চেষ্টা করিবে। অতএব, বুঝিয়া দেখা উচিত, প্রথমতঃ শুধু হিন্দুকেই কাবু করিবার মত বল মুসলমানের এখন আছে কি না; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুকে কাবু করিয়া তাহার উপর ইংরেজকেও কাবু করিবার মত বল মুসলমানের আছে কি না।

(১) বঙ্গের মুসলমানরা সংখ্যায়, উগ্রতায় ও হঠকারিতায় বঙ্গের হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে বলিয়া ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে, যে, বঙ্গে বাহুবলে ও অস্ত্রবলে হিন্দুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ এক পাশে দর্শকের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া হিন্দুমুসলমানকে স্ব স্ব জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে দিবেও না। তা ছাড়া, বাঙালী হিন্দুরাই ভারতবর্ষের সব হিন্দু নয়। আরও অনেক কোটি হিন্দু আছে। তাহাদিগকে ধরিলে সংখ্যায় হিন্দু বেশী হইবে, এবং তাহাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল মুসলমানের চেয়ে নিশ্চয়ই কম হইবে, এমন বলা যায় না। কারণ, ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধরিলে মোটের উপর বেশী শক্তিশালী ছিল মহারাষ্ট্রীয়েরা ও শিখরা। তাহারা মুসলমান নহে।

(২) হিন্দুদিগকে কাবু করিয়া তাহার উপর ইংরেজকেও কাবু করিবার মত বাহুবল ও অস্ত্রবল ভারতীয় মুসলমানদের নাই। এবিষয়ে কোন তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক।

স্বাধীন মুসলমান জাতিদের মধ্যে তুর্করা সকলের চেয়ে শক্তিশালী। ভারতীয় মুসলমানরা তাহাদের বড়াই আগে করিতেন। তুর্করা খিলাফৎ উঠাইয়া দিয়াছে, পর্দা ও বহু বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছে, ফেজের বদলে হ্যাট পরে, আরবী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষর চালাইতে চায়, ভারতীয় মুসলমানরা গত মহাযুদ্ধে তুর্কদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল বলিয়া তুর্করা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে। এই-সব ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিলে তুর্কদের নিকট হইতে ভারতীয় মুসলমানদের কোন সাহায্য প্রাপ্তি সম্ভবপর মনে হয় না। আফগান গবর্মেণ্টও পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে—সে দিক্ হইতেও ভারতীয় গোঁড়া মৌলবী ও মোল্লারা সাহায্য পাইবেন না। পারস্যের মুসলমানরা শিয়া, ভারতীয় অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী। তা ছাড়া, পারস্যের নৃপতি ইংরেজদের ও ইউরোপীয়দের বন্ধুত্ব চান। আরবের ইবন্ সাদ ওয়াহাবী। তাঁহার সহিত ভারতীয় গোঁড়া মৌলবী ও মোল্লাদের সখ্য হইতে পারে না।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে শক্তিশালী হইতে পারেন, হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়া। উভয়ের সহযোগে ভারতীয় মহাজাতির আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমান শক্তিশালী হইবে, হিন্দুও শক্তিশালী হইবে। তখন আর স্বাধীন মুসলমান দেশের লোকেরা ভারতীয় মুসলমান-দিগকে বিদেশী স্বধর্ম্মীর বিনাশকারী ও ইংরেজের গোলাম বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না। বর্ত্তমান রাজ-শক্তির উপর হিন্দু বা মুসলমান কেহ যেন নিশ্চিন্ত চিরনির্ভর না করেন। বঙ্গের মুসলমানরা গত কিছু কাল কোন কোন স্থলে রাজ-কর্ম্মচারীদের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য স্থলে কোন কর্ম্মচারী শাস্তি দিতেছেন, গুলি মারিবার আদেশও দরকার হওয়ায় দিতেছেন।

আমরা বাঙালী মুসলমানদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এইসকল কথা লিখি নাই। তাঁহারা ভীরু নন। তাঁহাদের উৎসাহ, সাহস ও প্রাণ পণ করিবার শক্তি যাহাতে বিপথে চালিত হইয়া ব্যর্থ হইবার পরিবর্ত্তে সুপথে চালিত হইয়া সুফলপ্রদ হয়, তাহাই আমরা চাই। একমাত্র হিন্দুর দ্বারাই যদি ভারতীয় মহাজাতি গঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ভারতে মুসলমানের ও খৃষ্টিয়ানের আগমন ও অভ্যুদয় ঘটিত না।

—

পাবনায় লুট ও দাঙ্গার পরিণাম

যে-সব লোকের প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র ও উত্তেজনা-বাক্যের ফলে পাবনায় বহু গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুদের ঘর বাড়ী লুট করে ও তাহাদের বহু লাঞ্ছনা করে, তাহাদের কাহারও কোন শাস্তি ও ক্ষতি হইয়াছে কিনা, জানি না; কিন্তু বিশেষ-ভার-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্টেট মিঃ হলোর বিচারে বিস্তর মুসলমান দাঙ্গাকারী ও লুণ্ঠনকারীর সাজা হইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে, শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এবং লুণ্ঠনকারী যে-সব লোক গবর্মেণ্টের ক্ষমতাকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাদের উপর খুব চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু পাবনা জেলার যে-যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দুর্ব্বলতা, অকর্ম্মণ্যতা, পক্ষপাত বা দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয়দানের ফলে এই ভীষণ, শোচনীয় ও লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কিছু করিয়াছেন কি?

—

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যনাশ

বাংলা দেশের বহুসংখ্যক যুবককে রাজনৈতিক কারণে, বিনা বিচারে, গবর্মেণ্ট দীর্ঘ কাল আটক করিয়া

রাখিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই কার্য্যের প্রতিবাদ পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। হয় প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার হউক, নতুবা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, এই মর্ম্মের প্রস্তাব আগেও ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছিল, এই সেদিনও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের এখনও টনক নড়ে নাই। সরকারী ও বেসরকারী পক্ষের যুক্তিতর্কের আলোচনা অনেক বার হইয়া গিয়াছে, নূতন কিছু বলিবার নাই। গবর্মেণ্টকে বেসরকারী পক্ষের কথা শুনিতে বাধ্য করিবার নিশ্চিত উপায় আবিষ্কার কেহ করিতে পারেন কি না, তাহাই এখন ভাবিয়া দেখিবার সময়। বলা বাহুল্য, কোনপ্রকার ফাঁকা আওয়াজ, যেমন ভয়প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ, সর্ব্বসাধারণকে হাস্যাস্পদ করিবে মাত্র।

রাজবন্দীদিগকে গবর্মেণ্ট যদি এখনই মুক্তি দেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বাস্থ্যভঙ্গ-হেতু দেশের কাজ হয় ত আর বড় বেশী করিতে পারিবেন না। তথাপি তাঁহারা সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিলে আত্মীয়স্বজন আনন্দিত হইবেন এবং দেশহিতও কিছু হইবে। তা ছাড়া, তাঁহারা কাহারও কিছু হিত করুন বা না করুন, সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তাঁহাদের ত আছেই। কিন্তু সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকাটাই তাঁহাদের অনেকের ঘটিবে কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

অনেক দিন হইতে বাংলা ও ইংরেজী খবরের কাগজ খুলিলেই রোজই কোন না কোন রাজবন্দীর স্বাস্থ্যহানির বা মারাত্মক ব্যাধির খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রায়ই একদিনের কাগজেই অনেকের সম্বন্ধে এই দুঃসংবাদ পাওয়া যায়। এই স্বাস্থ্যহানি ও ব্যাধির কারণ স্বাধীনতালোপ-হেতু মানসিক অবসাদ, বাসস্থানের অপকৃষ্টতা, খাদ্য ও বস্ত্রের অপকৃষ্টতা ও অপ্রাচুর্য্য, রক্ষী বা উচ্চতর সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহার, ইত্যাদি। এইসকল বিষয়ে কাগজে লেখালেখি, ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন ও আলোচনা অনেক হইয়াছে; কিন্তু সমুচিত প্রতিকার হয় নাই। কেন?

যদি সকৌন্সিল গবর্ণর জেনার‍্যাল বা সকৌন্সিল বঙ্গের গবর্ণর এরূপ আদেশ দিতেন, যে, রাজবন্দীদের যদিও প্রাণদণ্ড হয় নাই, তথাপি তাহারা রাজার শত্রু বলিয়া তাহাদের যাহাতে স্বাস্থ্যনাশ ও আয়ুহ্রাস এবং অকালমৃত্যু হয়, এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে পরিষ্কার করিয়া বুঝা ও বলা যাইত, যে গবর্মেণ্টের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে রাজবন্দীদিগের বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনাদির এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি, আয়ুহ্রাস ও অকালমৃত্যু ঘটে। কিন্তু সকৌন্সিল বড়লাট বা সকৌন্সিল বঙ্গের লাট কখনও এরূপ হুকুম দেন নাই। সুতরাং গবর্মেণ্টের নামে ঐ প্রকার অপবাদ দিতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ প্রকার সরকারী আদেশ না থাকিলেও, অনেকের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে, কাহারও কাহারও সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে, কাহারও কাহারও অকালমৃত্যু হইয়াছে। যে-সকল রাজকর্ম্মচারীর অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত দোষে এইরূপ শোচনীয় ফল ফলিয়াছে, গবর্মেণ্টের তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত, এবং রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা উচিত। তাহা না করিলে দেশের লোকেরা যদি মনে মনে কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীরই উপর দোষ না দিয়া গবর্মেণ্টকেই দোষী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাতে সকৌন্সিল বড়লাট বা সকৌন্সিল বঙ্গলাটের বিস্মিত হওয়া উচিত হইবে না।

অবশ্য, গবর্মেণ্ট যখন বিনা বিচারে রাজবন্দীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ করিয়াছেন, তখন বিনা বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডও দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা যখন দেন নাই, তখন তাহাদিগকে সুস্থশরীরে বাঁচাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে সরকার বাধ্য।

—

বিপ্লববাদ ও আতঙ্কোৎপাদন-বাদের প্রতিকার

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের প্রকাশ্য বিচার বা মুক্তির যে প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় করেন, তদুপলক্ষ্যে বেসরকারী সভ্যদের যুক্তিসমূহের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে মোবার্লী সাহেব বক্তৃতা করেন। তাহাতে একটি কথা তিনি এই বলেন, যে, বিপ্লববাদী ও আতঙ্কোৎপাদনবাদীরা মনে করে, গবর্মেণ্ট ভারতীয়দিগকে যাহা কিছু অধিকার দেন, তাহা তাহাদের কৃত উপদ্রবের ফল। বাস্তবিক তাহা উপদ্রবের ফল কি না, তাহার আলোচনা অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। কিন্তু যদি কাহারও ঐরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা দূর করিবার সোজা পথ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে না হউক, অধিকাংশ প্রদেশে বহু বৎসর কোন বিপ্লব-চেষ্টা বা সরকারী লোকদের ভয়োৎপাদন-চেষ্টা হয় নাই—আমাদের বিশ্বাস কোন প্রদেশেই দীর্ঘকাল হয় নাই। এখন গবর্মেণ্ট অন্ততঃ নিরুপদ্রব প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বরাজ দিয়া দেখাইতে পারেন, যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ও সদাশয়তা বশতঃ দেশের লোককে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতেছেন, উপদ্রবে ভীত হইয়া নহে। এরূপ করিবার

পরেও যদি কেহ গবর্ন্মেণ্টের অকপটতায় বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া ন্যায্য হইতে পারে। নতুবা মোবার্লী সাহেবের মত কেবল সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে ও দেশের নেতাদিগকে সর্ব্বসাধারণের নিকট বোমা রিভল্ভার-বাদের অলীকতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করিতে বলা একপেশে ও অকেজো পরামর্শ, ইহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে।

—

ব্যবস্থাপক:সভায় নিষ্কাম জয়লাভ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এত প্রস্তাব গৃহীত হইয়া বেসরকারী সভ্যদের জয় হয়, যে, তাহার একটা তালিকা লিখিয়া না রাখিলে এইসব জয়ের বৃত্তান্ত মনে থাকে না। কিন্তু রামায়ণে যেমন রাবণ বলিয়াছিল, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী", তেমনি বলা যাইতে পারে, "হারিয়া না হারে লাট, এ কেমন বৈরী"। কারণ, ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ প্রস্তাব যত অধিক সভ্যের মত অনুসারেই গৃহীত হউক না, গবর্ন্মেণ্ট তদনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন, এবং তাহার বিপরীত কাজ যাঁহারা করাতেও কোন বাধা নাই, অতএব, ব্যবস্থাপক সভায় জয়লাভ করিতে চান, আগে হইতে তাঁহাদের গীতা পড়িয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত থাকা ভাল। গীতায় আছে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন";—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার কদাচ নহে।" সরকারী সভ্যেরাও গীতা পড়িলে মন্দ হয় না। তাহা হইলে তাঁহারা জয়ী বেসরকারী সভ্যদিগকে বলিতে পারেন, "আপনাদের দেশের শাস্ত্রেই লেখা আছে, কর্ম্মেই মানুষের অধিকার, কর্ম্মফলে অধিকার নাই। অতএব, আপনারা গবর্ন্মেণ্টকে ক্রমাগত হারাইতে থাকুন; কিন্তু জয়লাভের ফল ভোগ করিবার আশা রাখিবেন না।"

বস্তুতঃ, আমরা এত বৎসর ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিকূল সমালোচনাই করিতেছিলাম। সেগুলি যে নিষ্কাম কর্ম্ম শিখাইবার বিশ্ববিদ্যালয়, এই মহাসত্য গোড়াতেই উপলব্ধি করিয়া তৎসমুদয়ের প্রশংসাই করা উচিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতি শিখাইবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না; কিন্তু নম্রতার সহিত ইহা বলিলে অপরাধ হইবে না, যে, তিনি যদি ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে নিষ্কাম-কর্ম্ম-শিক্ষাগার বলিয়া বুঝিতেন ও মনে করিতেন, তাহা হইলে অসহযোগ-প্রচেষ্টার কার্য্যতালিকা হইতে কৌন্সিল-বর্জ্জন নিশ্চয়ই বাদ দিতেন।

—

রাজবন্দীদিগকে আটক রাখিবার সার্থকতা

কতকগুলি লোককে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখার সমর্থন করিতে যাইয়া মোবার্লী সাহেব নানা যুক্তি প্রয়োগ করেন। তাহার মধ্যে একটি এই। যখন হইতে ঐ লোকগুলিকে আটক করা হইয়াছে, তখন হইতে আর বিপ্লবী ও আতঙ্কোৎপাদকরা কোন নর-হত্যাদি করে নাই; অতএব প্রমাণ হইল, যে, যাহারা ঐসকল কর্ম্ম করিত, তাহাদিগকেই আটক করিয়া রাখায় ঐ শ্রেণীর অপরাধ থামিয়াছে। এই যুক্তির সারবত্তা মানিয়া লইলেও, একটা প্রশ্ন করিতে পারা যায়। ইহাতে কেমন করিয়া প্রমাণ হইল, যে, সব রাজবন্দীই বিপ্লবী বা আতঙ্কোৎপাদক ছিল? হইতে পারে, যে, তাহাদের মধ্যে এক বা কয়েকজন ঐ শ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারা ধরা পড়ায় উপদ্রব থামিয়াছে। ইংরেজীতে বিচারবিষয়ক একটা নীতি আছে, যে, বরং দশজন অপরাধী দণ্ড না পায় তাও ভাল কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তিরও শাস্তি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের দেশে গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা এই উৎকৃষ্ট নীতির অনুসরণ হইতেছে কি? কোন গ্রামে যদি একটা খুন হয় ও হন্তাকে ধরিতে পারা না যায়, তাহা হইলে গ্রামের সব লোকের ফাঁসী দিলে হয় ত তাহার মধ্যে হন্তারও ফাঁসী হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কি সুবিচার ও সুব্যবস্থা?

তা ছাড়া, গবর্ন্মেণ্টের নিজের কথা অনুসারেই বিপ্লব-বাদ দমন হইয়াছে বলা যায় না। সরকারী মতে, সুভাষ বসু প্রভৃতি বন্দীকৃত হইবার অনেক পরেও দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরী হইতেছিল, সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটে বোমা ছিল; কাহাকেও যে বিপ্লবীরা মারিবার সুযোগ পায় নাই সেটা আকস্মিক ব্যাপার। আগেও ত রোজ বা সপ্তাহে বা মাসে অন্ততঃ একটা করিয়া রাজনৈতিক হত্যা হয় নাই। অধিকন্তু, আলিপুর জেলে যে পুলিশের ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ গেল, তাহাকে গবর্ন্মেণ্ট রাজনৈতিক হত্যা বলেন। সুতরাং সুভাষবাবু প্রভৃতিকে বন্দী করিবার পর রাজনৈতিক খুন হয় নাই বলাও ঠিক নয়।

শেষ একটা কথাও বলা দরকার। দেশের বিস্তর লোকে বিশ্বাস করে, যে, বিপ্লবীদিগের নামে আরোপিত অনেক কাজের মূলে আছে, পুলিশের উত্তেজক গুপ্ত কর্ম্মীরা; কারণ, যখনই রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার কথা হয়, কিম্বা নিগ্রহার্থ প্রণীত বা দমনার্থ প্রণীত কোন আইন উঠাইয়া দিবার বা নরম করিবার কথা উঠে, প্রায়শঃ তখনই বোমা আদি আবিষ্কৃত হয়, বিপ্লবীদের উত্তেজক

পত্রী পুস্তকাদি প্রচারিত হয়। ইহাতে এরূপ সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নহে, যে, কতকগুলি লোক জিয়ান থাকে, কতকগুলি আসল বা নকল বোমা মজুদ থাকে, ও আবশ্যক মত তৎসমুদয়ের দ্বারা কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা হয়। যদি এই সন্দেহ অংশতও সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা সম্ভব, যে, সুভাষবাবু প্রভৃতিকে আটক করিবার পর পুলিশের উত্তেজক গুপ্ত চরেরা আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য কাহারও দ্বারা কোন উপদ্রব করায় নাই।

—

ডাক মাশুল কমিল না

ভারত গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব-সচিব আগামী বৎসরের বজেটেও ডাক মাশুলের বর্ত্তমান হার বজায় রাখিয়াছেন। আমরা আগে প্রবাসীতে দেখাইয়াছিলাম, যে, যদিও জাপানীরা ভারতীয়দের চেয়ে ধনী এবং সেখানে ডাক-বিভাগের লোকদিগকে বেতনও এখানকার চেয়ে বেশী দিতে হয়, তথাপি তথাকার ডাক মাশুল ভারতবর্ষের চেয়ে কম। আর-একটা দুঃখের ও মজার কথা এই, যে, ভারতবর্ষের মধ্যে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ডাকে বহি পাঠাইতে হইলে যে হারে মাশুল দিতে হয়, বিলাতে বা ইউরোপের অন্যত্র পাঠাইতে হইলেও সেই হারেই দিতে হয়। রাজস্ব-সচিবের যুক্তি এই :—

"With the general increase in the cost of living and the legitimate demand for a higher standard of comfort for postal employees, a reversion to the very low rates prevailing before the War is not practical politics. It could not be secured without a heavy, increased and unjustifiable subsidy from the general tax-payer, largely for the benefit, not of agriculturists but for the commercial and industrial customers of the Post Office."

ইহার মধ্যে অনেকগুলি অপ্রকৃত কথা আছে। যুদ্ধের আগে ডাকমাশুলের যে হার ছিল, তাহা ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের পক্ষে খুব কম ছিল না। ডাকমাশুলের হার ঐরূপ কম রাখিয়াও ডাকবিভাগের লোকদিগকে বর্ত্তমান হারে, এমন-কি উচ্চতর হারেও, বেতন দেওয়া যায়। সস্তা ডাকমাশুলে যে ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকদেরই সুবিধা হইবে, এমন নয়। কৃষিজীবীদেরও তাহাতে সুবিধা হইবে, এবং যাহারা বণিক, কৃষিজীবী বা কারখানার মালিক, কিছুই নয়, দেশের সাধারণ অধিবাসী এরূপ লোকদেরও সুবিধা হইবে। সুতরাং দরকার হইলে প্রথম প্রথম যদি কয়েক বৎসর সাধারণ রাজস্ব হইতে ডাকবিভাগকে সাহায্য দিয়াও ডাকমাশুল সস্তা রাখিতে হয়, তাহা অনুচিত হইবে না, বরং বাঞ্ছনীয়।

—

জনৈক ধনী মাড়বারীর দান

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, যে, কলিকাতার রাজা বলদেবদাস বিরলা তাঁহার এক নাতির বিবাহে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। কোথায় কত দিয়াছেন, তাহারও একটা তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বাংলা দেশের কোন জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল না। অথচ ইনি ও বঙ্গের অন্যান্য মাড়বারীরা ধন আহরণ করিয়াছেন বাংলা দেশ হইতেই। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, ইঁহারা অনেকে ইংরেজদের মত ; টাকা রোজগার করেন এক জায়গায়, দান-ধ্যান করেন প্রধানতঃ অন্যত্র। অবশ্য কোন মাড়বারীই বাংলা দেশের কোন প্রতিষ্ঠানে টাকা দেন নাই বলিতেছি না ; দিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদের প্রীতিশ্রদ্ধা বাঙালী ও বঙ্গদেশের উপর কম। বঙ্গের তরফ হইতে প্রকারান্তরে ভিক্ষার আবেদন স্বরূপ এই সমালোচনা করিতেছি না। ইহা লিখিতেছি বাঙালীকে ইহাই বুঝাইবার জন্য, যে, যাহারা নিজেদের ধন শোষিত হইতে দেয়, তাহারা শোষকদের প্রীতিশ্রদ্ধা পাইতে পারে না—তা সে শোষক স্বদেশীই হউক বা বিদেশী হউক। শোষিতেরা ভিক্ষা পাইতে পারে। যেমন, বঙ্গের কোথাও দুর্ভিক্ষ ঝড় জলপ্লাবনে লোকেরা বিপন্ন নিরন্ন হইলে মাড়বারীরা সাহায্য করিয়া থাকেন। সেই সাহায্যদান দয়াপ্রযুক্ত হইতে পারে, ক্রেতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও হইতে পারে।

—

বঙ্গের ভাবী লাটের রাজনৈতিক খেলোয়াড়ি

বঙ্গের ভাবী লাট স্যার ষ্ট্যান্লী জ্যাক্সন্ বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনি রাজনীতির খেলাটাও বুঝেন মনে হইতেছে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বুলি তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছিবার আগেই আয়ত্ত করিয়া আওড়াইতেছেন। একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"Our aim is to hand over freedom and responsibility to our partners in the Empire. That aim has been well responded to by our other partners. If India showed herself capable of responsibility by co-operation within her present limitations, she would find a generous response from the people of this country."

তাৎপর্য্য। "সাম্রাজ্যে আমাদের অংশীদারদের হাতে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। অন্যান্য অংশীদারেরা এই লক্ষ্যে বেশ সাড়া দিয়াছেন। যদি ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ অধিকারের মধ্যে তাহার ইংরেজ-শাসকদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আপনাকে দায়িত্ব-গ্রহণের যোগ্য বলিয়া প্রমাণ করে, তাহা হইলে সেই দেশও ইংলণ্ডের লোকদের নিকট হইতে সমুচিত সদাশয় ব্যবহার পাইবে।"

অনেকের ধারণা, দরকারমত অসত্য কথা না বলিলে রাজনীতিক্ষেত্রে কৃতী হওয়া যায় না। উপরে উদ্ধৃত কথার অনুরূপ অপ্রকৃত উক্তি হইতে লোকের এই ধারণা হইয়া থাকিবে।

বঙ্গের ভাবী লাট বলিতে চান, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-যে অংশ এখন জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রথমে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ইংরেজ শাসকদের সহিত সহযোগিতা করায় ইংলণ্ড খুশি হইয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনদায়িত্ব হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ইহা সত্য কথা নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আত্মশাসক দেশগুলির আত্মকর্তৃত্ব লাভের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপেও বর্ণনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনটি দেশের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

কানাডাতে ইংরেজীভাষী ও ফ্রেঞ্চভাষী লোকদের বাস। গত (উনবিংশ) শতাব্দী যখন ত্রিশের কোটায় ছিল, তখন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট একবার কানাডার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাতে কানাডার ফরাসী রাজনৈতিকরা তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিম্ন-কানাডায় বিদ্রোহ হয়। ১৮৩৮ সালে আবার এক বিদ্রোহ হয়। এবার বিদ্রোহ উপর-কানাডাতেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া কানাডার লোকদের প্রতিনিধিরা গবর্ন্মেণ্টের বজেটে বরাদ্দ টাকা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করে। এইসকল ঘটনা কানাডার পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তথাকার লোকেরা লক্ষ্মী ছেলের মত ইংলণ্ডের সামান্য দানে সন্তুষ্ট হইয়া পরীক্ষায় পাস হইবার পর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছিল, এরূপ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমে অল্প রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা যোগ্যতা প্রমাণপূর্ব্বক পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাইয়াছে, ইহাও সত্য নহে। ইংলণ্ডের সহিত বুয়রদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে প্রথম প্রথম ইংরেজদের পরাজয় হয়। তাহার পর কি কি উপায়ে লর্ড রবার্টস্ বুয়রদিগকে পরাজিত করেন, তাহা বলা অনাবশ্যক। যুদ্ধের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রেরা ও ইংরেজরা একেবারে পূর্ণ আত্মশাসন-ক্ষমতা পায়।

আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংরেজরা প্রথমে যে হোমরুল বা আভ্যন্তরীন স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিয়াছিল, তাহা হইতে আইরিশরা ভারতীয়দের বর্ত্তমান অধিকার অপেক্ষা অনেক বেশী অধিকার পাইয়াছিল। **কিন্তু তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করে।** তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তদনুসারে কাজ করিয়া যোগ্যতা প্রমাণানন্তর আরও বেশী অধিকার পাইবার চেষ্টা তাহারা করে নাই। হোমরুল অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে। ইংরেজরাও তখন আয়র্ল্যাণ্ডে যথাসাধ্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড, রক্তপাতাদি করে। তাহাতেও আইরিশরা দমিয়া না যাওয়ায় আয়র্ল্যাণ্ডকে এখন যে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতার সমান।

ইংলণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন্ দেশকে কখন্ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় একটুও বাধ্য না হইয়া, আত্মকর্তৃত্ব দিয়াছে, তাহা স্যার ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্সন্ বলিলে ভাল হইত। এরূপ কোন দেশের বিষয় আমরা অবগত নহি। স্বাধীনতা লাভ করিবার ক্ষমতা আমাদের আপাততঃ নাই বটে। কিন্তু ইতিহাসও আমাদের মধ্যে কেহ জানে না, ইংরেজরা এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। "তোমাদিগকে আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে," এরূপ বলা ভাল; কিন্তু ধোঁকা দেওয়া ভাল নয়।

ভারতবর্ষ কানাডা নয়, আয়র্ল্যাণ্ড নয়, দক্ষিণ আফ্রিকাও নয়, আমরা জানি। সুতরাং মাছি-মারা কেরানীর মত তাহাদের নকল করা আমাদের পক্ষে অনুচিত হইবে, বুঝি। আমাদিগকে স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেদের প্রকৃতি ও অবস্থার অনুযায়ী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের প্রদর্শিত পথ সে উপায় নহে, তাহাদের সদাশয়তার উপরও আমরা নির্ভর করিতে পারি না।

—

"কাষ্টডী"র মানে

ইংলণ্ডে একটি আইন আছে যাহাকে সংক্ষেপে হেবিয়াস্ কর্পাস্ বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে সরকার পক্ষ হইতে কয়েদ বা আটক করা হয়, তাহা হইলে এই কানুন অনুসারে জজ, তাহাকে আটক করা আইনসঙ্গত হইয়াছে কি না, অনুসন্ধানাদির নিমিত্ত তাহাকে নিজের নিকট হাজির করিতে হুকুম দিতে পারেন। নামে এই আইন ভারতবর্ষেও চলিত আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিনাবিচারে বন্দীকৃত কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত ইহার সাহায্য পায় নাই। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ বাক্‌ল্যাণ্ডের নিকট একজন রাজবন্দীর পক্ষ হইতে এই আইনের সাহায্য পাইবার দরখাস্ত করা হয়। জজ সাহেব কিন্তু বলেন, যে, সে-ব্যক্তি কাহারও "কাষ্টডী"তে নাই। "কাষ্টডী" মানে কাহারও হেপাজতে বন্দী থাকা। এই লোকটির প্রতি হুকুম আছে, যে, তাহার

জন্য নির্দ্দিষ্ট বাটীতে সে সূর্য্যাস্ত হইতে প্রাতঃকাল ছয়টা পর্য্যন্ত থাকিবে, অন্য কোথাও তখন যাইবে না, এবং প্রত্যহ দুইবার পুলিশ থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট হাজরী দিবে। ইহা না করিলে তাহার তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস হইতে পারে। জজের মতে লোকটির যখন তখন যেখানে সেখানে যাইবার স্বাধীনতা আছে। তাহার হাত পা বাঁধা নাই বা ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই, এ অর্থে ইহা সত্য বটে; অন্য কোন অর্থে সত্য নয়।

আইন জিনিষটা যদি কথার ভেল্কী হয়, তাহা হইলে জজ বাক্ল্যাণ্ড ঠিক্ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়, যে, তিনি কথার মারপ্যাচ দ্বারা যাহা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা গবন্মেণ্টের জিদ ও প্রতিপত্তি রক্ষার সাহায্য হইয়াছে।

—

বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের আয়ব্যয়

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের আনুমানিক সরকারী আয়ব্যয়ের ফর্দ্দ ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহার আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। সরকার পক্ষ হইতে যে যে বিভাগের জন্য যেরূপ টাকা বরাদ্দ করা হয়, আলোচনার ফলে, তাহার কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে, কখন কখন হয়ও; কিন্তু মোটের উপর শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্পাদির উন্নতির জন্য দেশের লোকেরা মোট রাজস্বের যতটা অংশ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয় মনে করে, তাহা হয় না। ইহা যেমন আগেকার সব বজেট হইতে, তেম্নি ১৯২৭-২৮ এর বজেট হইতেও দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধিকায় ইহা অপেক্ষা গোড়ার কথা একটা বলিতে চাই। নীচের তালিকাতে বাংলাদেশের লোক-সংখ্যা ও ১৯২৭-২৮ সালের আনুমানিক সরকারী আয়ের সহিত অন্য কয়েকটি প্রধান প্রদেশের লোকসংখ্যা ও ঐ সালের আনুমানিক সরকারী আয় দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ	১৯২১ সালের লোকসংখ্যা	১৯২৭-২৮ সালের আয়
বাংলা	৪৬৬৯৫৫৩৬	১০৭৩৩৯০০০ টাকা
মাদ্রাজ	৪২৩১৮৯৮৫	১৬৫৪৪৮০০০ ,,
বোম্বাই	১৯৩৪৮২১০	১৫০৮০০০০০ ,,
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৩৭৫৭৮৭	১২৯৪৫০০০০ ,,
পঞ্জাব	২০৬৮৫০২৪	১১১৩০০০০০ ,,
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৩৯১২৭৬০	৫৩৭৬০০০০ ,,

এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। মাদ্রাজের লোকসংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম, কিন্তু আয় দেড়গুণ। আগ্রা অযোধ্যার লোক-সংখ্যা ইহার চেয়ে কম, কিন্তু আয় ইহার চেয়ে বেশী। বোম্বাইয়ের লোক-সংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকেরও কম, কিন্তু উহার আয় বঙ্গের প্রায় দেড়গুণ। পঞ্জাবের লোক-সংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকেরও কম, কিন্তু উহার আয় বঙ্গের চেয়ে বেশী। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের লোক-সংখ্যা বঙ্গের একতৃতীয়াংশেরও কম, কিন্তু উহার আয় বঙ্গের অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, বাংলা দেশের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা ও ন্যায্য-বিচারের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষাকৃষিশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি কাজ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কম টাকায় করিতে হয়। কাজে-কাজেই বাংলাদেশের যত উন্নতি হইতে পারিত, ততটা হয় না। এইরূপ অবস্থা থাকিলে শীঘ্রই বাংলা দেশ অন্য সব প্রদেশের পেছনে পড়িবে। এখনও যে পড়ে নাই, তাহার কারণ শিক্ষাদিতে বাঙালীরা নিজে বেশী ব্যয় করিয়াছে ও উদ্যোগ দেখাইয়াছে।

বাংলা দেশের সরকারী আয় যে কম, বাংলার অনুর্ব্বরতা বা অন্যপ্রকার স্বাভাবিক দারিদ্র্য তাহার কারণ নহে। ইংরেজ ত বাংলায় আসিয়া বড় মানুষ হয়ই; মাড়বারী, ভাটিয়া, সিন্ধী প্রভৃতি ভারতীয়েরাও হয়। বাংলা হইতে সব প্রদেশের চেয়ে বেশী ইন্‌কম্ ট্যাক্স বা আয়কর আদায় হয়। পাটের উপর শুল্ক এবং অন্যান্য পণ্যশুল্কও বাংলা দেশে খুব বেশী আদায় হয়। কিন্তু এই সমস্তই ভারত গবন্মেণ্ট লইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, কোন্ ট্যাক্স শুল্ক প্রভৃতির আয় ভারত গবন্মেণ্ট লইবেন, এবং কোন্‌টি প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট পাইবেন, তাহার ব্যবস্থা ভারত গবন্মেণ্ট এরূপ করিয়াছেন, যে, বাংলাদেশ হইতে যে-গুলিতে খুব বেশী টাকা আসে, সেগুলি ভারত গবন্মেণ্টের ভাগে পড়িয়াছে। এই কারণে বাংলা হইতে খুব বেশী টাকা আদায় হইলেও বাংলা গবন্মেণ্টের ভাগে পড়ে কম টাকা। ইহার প্রতিকার না হইলে বাংলা দেশের উন্নতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বরাবরই কম হইতে থাকিবে।

অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকেন বটে, যে, বাংলা দেশে জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় বাংলার রাজস্ব কম হয়। কিন্তু এই বন্দোবস্তের জন্য বাংলা দেশের লোকেরা দায়ী নয়, সরকার দায়ী। এই বন্দোবস্ত না থাকিলে জমীদারদিগকে গবন্মেণ্টকে আরো বেশী টাকা দিতে হইত। তাহা দিতে না হওয়ায় তাহাদের বেশী অর্থাগম হয়। কিন্তু এই বেশী অর্থাগমের সুবিধা বঙ্গের অধিকাংশ লোক পায় না, অল্পসংখ্যক জমীদাররাই পায়। তা ছাড়া, ইহাও আমরা

একবার দেখাইয়াছি, যে, কর্ষিত ও চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণের তুলনায় বাংলা দেশ হইতে গবর্ন্মেণ্ট যে অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষাই কম ভূকর পান, এরূপ ধারণা সত্য নহে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে অন্য কোন স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব যদি হয়, "তাহা হইলে আমরা কেবল এই সর্ত্তে তাহার অনুমোদন করিতে পারি, যে, নূতন বন্দোবস্ত হইতে যে বেশী খাজনা আদায় হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষির উন্নতি, শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি এবং কৃষিকার্য্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য ব্যয়িত হইবে"।

—

বঙ্গের বজেট

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারও সাধারণ শাসন-বিভাগ ও পুলিশ-বিভাগের জন্য খুব বেশী বেশী টাকা ধরা হইয়াছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিভাগ সকলে আগেকার চেয়ে বেশী বেশী টাকা খরচ হইতেছে বলিয়া দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হইতেছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে, এবং আগে এইসব বিভাগে অত্যন্ত কম খরচ হইত বলিয়া কাজে কাজেই এখন অল্প বাড়িলেও তাহা শতকরা খুব বেশী বৃদ্ধি মনে হইতে পারে। যেমন, যদি আগে কোন মানুষকে মাসে আট আনা খোরাকী দেওয়া হইত এবং এখন চারি টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যে, খোরাকীর বরাদ্দ শতকরা ৮০০ (আট শত গুণ) বাড়িয়াছে; অথচ মাসিক চারি টাকা খোরাকীতে আধপেটা খাওয়াও হয় না।

শিক্ষাবিভাগের এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকার অনেকটা অংশ ঐ ঐ বিভাগের উচ্চতম শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন দিতেই যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব অধ্যাপক এম্-এ, এম্ এস্‌সি, পিএইচ্-ডি, ডি-এস্ সি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা সাধারণতঃ যেরূপ বেতন পান, কেবল বি-এ ও বি-এস্‌সি পর্য্যন্ত পড়াইবার জন্য সরকারী অনেক ছোকরা অধ্যাপকও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন পান। নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার জন্য উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা অপেক্ষা বেশী বেতন দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে, ইংরেজ সিবিল্ সার্জ্জনরা অধিকাংশ স্থলে দেশী ডাক্তারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, অথচ বেতন পান ঢের বেশী।

ব্যয়ের বরাদ্দের দু একটা নমুনা দেখুন। বাংলা দেশের মফঃস্বলের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত মোট আশি হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, কিন্তু কেবল পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা নির্ম্মাণের জন্য ষাট হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। বঙ্গের মফঃস্বলের হাজার হাজার গ্রামের লোক পরিষ্কার পানীয় জল পায় না, গ্রীষ্মকালে পরিষ্কার অপরিষ্কার কোন-প্রকার জলই তাহাদের অনেকের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠে। এহেন দেশে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মোট আড়াই লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু কেবল পাঁচটি ডিবিজনের ৫ জন কমিশনারের বেতনের জন্য ব্যয় হইবে চারি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। এই অকেজো পদগুলি আজই উঠাইয়া দিলেও দেশের কোন ক্ষতি হইবে না;—বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে এরকম পদ নাই, অথচ তথায় বাংলার চেয়ে কাজ মন্দ চলিতেছে না। ১৯২৭-২৮ সালে মোট সরকারী ব্যয় হইবে ১১,১০,৬২,০০০। তাহার মধ্যে ১,৮৮,৮৭,০০০, অর্থাৎ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পুলিশের জন্য ব্যয় হইবে।

—

ভারতীয় বজেট

ভারতীয় বজেটে এবারেও সামরিক ব্যয় যথাসম্ভব কম ধরা হয় নাই। ইঞ্চকেপ্ কমিটির মতে উহা ৫০ কোটি করিলেও ভারতীয় সৈন্যদলের ভারতরক্ষাসামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু রাজস্বসচিব এ বৎসরও উহা ৫৪ কোটি ৯২ লক্ষ রাখিয়াছেন। মোট রাজস্ব ১২৮ কোটি ৯৬ লক্ষের মধ্যে এত বেশী অংশ যুদ্ধের জন্য রাখা উচিত নহে। ভারতবর্ষ যত দিন ইংরেজ সেনানায়ক ও ইংরেজ সাধারণ সৈনিকদের রোজগারের, সামরিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জনের, ও যশোলাভের ক্ষেত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইবে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজের জন্য ভারতবর্ষের প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্যদল এদেশে রাখা হইবে, ততদিন ন্যায্য ব্যয়ের আশা কোথায়? উপর্য্যুপরি এই চতুর্থ বার বজেটে উদ্বৃত্ত দেখান হইল। ইহাতে অহংকার করিবার কিছু নাই। গত চারি বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া বেশী করিয়া ট্যাক্স বসাইয়া এই উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে।

কতকগুলি ট্যাক্স কমাইয়া বা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গরীব লোকদের যাহাতে অসুবিধা হয়, এরূপ ট্যাক্স কমান বা উঠান হয় নাই। যেমন লবণের শুল্ক কমাইয়া বা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই, ডাকমাশুল কমান হয় নাই।

যে-সব ট্যাক্স কমান হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য যে ভারতীয়দের সুবিধা করিয়া দেওয়া, ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া তাহা বলা যায় না। যেমন ধরুন, মোটর

গাড়ী ও তাহার চাকার রবার টায়ারের উপর ট্যাক্স কমান হইয়াছে। তাহাতে ঐ জিনিষগুলির বিলাতী কারখানার সুবিধা হইবে। এবিষয়ে বিলাতের ফিনান্স্যাল টাইম্‌স্ বলিতেছেন:—"From the point of view of the general public the most interesting feature of the budget is the reduction of import duty on cars and tyres, which remissions will be most welcome to British manufacturers." ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে গিয়া অনেক সময় ভারতীয়দেরও কিছু অনভিপ্রেত সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

টাকাকে ১৮ পেনীর সমান করায় এ দেশে বিলাতী জিনিষের আমদানী বাড়িবে, এবং দেশী জিনিষের কাটতি কমিবে।

—

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে আপোষে চুক্তি

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদিগকে ভাল করিয়া চেনেন, তাঁহারা বলিতেছেন, যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে আপোষে যে-চুক্তি হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকায় এই মত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি চুক্তিটির ভাল মন্দ দুই দিকই দেখাইয়াছেন। সে-বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিবার নাই। অন্য বক্তব্য আমাদের যাহা আছে, তন্মধ্যে কিয়দংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দের মত এই, যে, যে-সব ভারতীয় তথায় থাকিতে চায়, তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী করিতে হইবে। বিশপ ফিশার পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রাই বেশী বুদ্ধিমান, সঞ্চয়ী, মদ্যপানে অনাসক্ত, ও সৎ। তাহা হইলে পাশ্চাত্য আদর্শটা কেবল ঘরবাড়ী পোষাক খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। এগুলা প্রাচ্য আদর্শ অনুসারেও স্বাস্থ্যের অনুকূল ও সভ্যতার অনুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচ্য আদর্শ বা প্রাচ্য সভ্যতাতে যে ভাল কিছু থাকিতে পারে, কিম্বা প্রাচ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া শ্বেতকায়েরা উপকৃত হইতে পারে, এরূপ কোন ধারণা, বোধ করি, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দের নাই। তাহারা ভারতীয়দের প্রতিযোগিতার আতঙ্কেই মনের ধৈর্য্য হারাইয়াছে। এইজন্য ভারতীয়দিগকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়াও তাহারা তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিদায় দিতে প্রস্তুত আছে। এই কারণে চুক্তিটিকে ভারতবর্ষের পক্ষে সম্মানজনক মনে করিতে পারি না।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনে সমর্থ ও অভ্যস্ত হইলেও শ্বেতকায়দের সমান পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার কখনও পাইবে, তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও চুক্তিটিতে নাই। এই কারণেও চুক্তিটিকে সম্মানজনক মনে করিতে পারি না।

—

শ্রীহট্টের শরচ্চন্দ্র চৌধুরী

গত ১৩ই ফাল্গুন কাশীতে শ্রীহট্টের শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অনেক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন, এবং "শিক্ষা-পরিচয়" নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র কিছু কাল যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। "দেবীযুদ্ধ" নামক তাঁহার রচিত একটি কাব্যে তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতা ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি আসামের একাধিক রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক সভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন, এবং গ্রামসকলের উন্নতির জন্য কয়েকটি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। সমাজসংস্কারে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

—

মেয়েদের লাঠিখেলা

কলিকাতায় দীপালিসংঘের উদ্যোগে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের লাঠিখেলা ও অসিচালনা শিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং তাঁহারা প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষাতেও সমর্থ হইবেন। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—

এডেনের ভার

এদেশ হইতে ইউরোপ যাইতে হইলে আরবদেশের এডেন বন্দরে প্রথমে জাহাজ থামে। ইহা স্বভাবতঃ ভারতবর্ষের অংশ নহে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য এই ঘাঁটিটি দখল করিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং বিলাতী গবর্মেণ্ট

যে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ইহার সামরিক ও রাজনৈতিক ভার লইলেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার অধিকার নাই—করিলেই বা শুনে কে? কিন্তু উহার মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারের ভারটাও ভারত গবর্মেণ্টের হাতে না রাখিয়া, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট লইলে সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। ভারতবর্ষকে অতঃপরও যে প্রথম তিন বৎসর ২৫০০০০ পাউণ্ড করিয়া এবং তার পর দেড়লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ইহার ব্যয়ার্থ দিতে হইবে, ইহা ন্যায্য ব্যবস্থা নহে।

হয় ত, দূরদর্শী ইংরেজরা বুঝিয়াছে, যে, ভবিষ্যতে ভারতশাসনে ভারতীয়দের ক্ষমতা বাড়িবেই। সেইজন্য তাহারা এখন হইতেই সাম্রাজ্যের অন্যতম ঘাটি এডেন ভারতবর্ষের হাত হইতে সরাইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেদের দখলে আনিল।

—

ভাইস্-চ্যান্সেলারের বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার উপাধি-বিতরণ সভায় যে-বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক সারবান্ কথা আছে। তার মধ্যে দুটির উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, কোন জা'ত (caste) বা জাতি (raceor nation) নিজেকে স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ বা ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত মনে করিতে পারে না। তাঁহার মত ঐতিহাসিক এরূপ কথা বলিলে তাহার মূল্য আছে। দ্বিতীয় কথাটি এই, যে, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, সকল জাতির ও সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত সাধারণ জীবন যাপন, ও মনন। তাঁহার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে, মনন-জগতে চিন্তারাজ্যে, জাতিভেদ নাই, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভেদ নাই; এবং যাহারা এক রাষ্ট্রে বাস করে, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ও বিস্তৃততম রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্র কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা দেশের সমুদয় অধিবাসীর সাধারণ কার্য্যক্ষেত্র হওয়া দরকার।

—

আকাশযান-চালন বিদ্যা

ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে ষ্টীমার আছে, এবং ভারতবর্ষ ও বিদেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ষ্টীমার আছে। অতঃপর এই উভয় উদ্দেশ্যে আকাশ-যান ব্যবহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা হইবে এবং ভারতবর্ষকে ইংরেজদের অধীন রাখিবার অতিরিক্ত একটি উপায় হইবে। অসামরিক আকাশ-যান চালনের সুবিধার জন্য রাজস্ব-সচিব যে অতিরিক্ত ৯,৯৬,০০০ টাকা চাহিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিলাত হইতে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যে-সব আকাশ-যান যাইবে, তাহাদের থামিবার ও নামিবার আড্ডা এই টাকা হইতে নির্ম্মিত হইবে। পরে ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের জন্য আকাশযানের নিমিত্তও এগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ভারতীয়-দিগকে আকাশযান চালন বিদ্যা শিখান হইবে কি না, সে-বিষয়ে দুই জন ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারী পরস্পরের ঠিক্ বিপরীত কথা বলিয়াছেন। রাজস্বসচিব স্যার বেসিল্ ব্ল্যাকেট বলিয়াছেন, ভারতীয়দিগকে অসামরিক উড্ডয়ন শিখান হইবে ("Government were to provide facility to Indians for training")। সেনাবিভাগের সেক্রেটারী (Army Secretary) বলিয়াছেন, ভারতীয়দিগকে সামরিক বা অসামরিক উড্ডয়ন শিখান হইবে না ("The Government have made no arrangement, nor do they propose to make any, for training selected men from the Indian Territorial Force and University Training Corps in the science and art of civil and military aviation")। কাহার কথাটা ঠিক্? ভারতীয়দিগকে যে-বিদ্যা শিখান হইবে না, তাহার জন্য টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্মেণ্টের আছে, কারণ জোর যার মুলুক তার; কিন্তু ভারতীয়-দিগকে যাহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, তাহার জন্য ব্যবস্থাপক সভা কেন টাকা মঞ্জুর করিলেন? অপমান ত আমাদের ভাগ্যে আপনা হইতেই আসে; তা বলিয়া কি তাহা ডাকিয়া আনা উচিত, না আগে হইতে তাহাতে সম্মতি দেওয়া উচিত?

—

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ধর্ম্মঘট

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ধর্ম্মঘট শেষ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। কিন্তু উহার কর্ম্মচারীদের যে-সব প্রকৃত দুঃখ ও অভিযোগ আছে, তাহা কোম্পানীর দূর করা উচিত। গবর্মেণ্টেরও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। দেশবাসী সকলেরও এবিষয়ে কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া রেলে যাতায়াত করি বলিয়াই সেইখানেই আমাদের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয় না। রেলের অনেক কর্ম্মচারী মাসে মাত্র নয় টাকা বেতন পায়। ইহাতে একজনেরই মনুষ্যোচিত গ্রাসাচ্ছাদন

হয় না, পরিবার-বর্গের কথা দূরে থাক্। নিম্নতম বেতনও এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে মানুষ সপরিবারে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ও অন্য অনেক রেলওয়ের নিম্নপদস্থ লোকদের বাসাগুলি গৃহপালিত পশুরও থাকিবার অযোগ্য, মানুষের ত কথাই নাই। সত্য বটে, ইহা আমাদের এবং গবন্মেণ্টের খুবই গৌরবের বিষয়, যে, ভারতে সম্পূর্ণ গৃহ হীন লোকও অনেক আছে। কিন্তু ত বলিয়া, শ্রামক বা কর্ম্মীদের কোন নিয়োগকর্ত্তা বা মনিব তাহাদিগকে বলিতে পারেন না, তোমরা গাছতলায় বা আকাশের নীচে থাক। বৃষ্টি না হইলে বস্তুতঃ গাছতলায় ও আকাশের নীচে থাকা, আলো ও বায়ু চলাচল হীন করগেটের ছাদের দ্বারা উত্তপ্ত রেলওয়ের ঘরে থাকা অপেক্ষা অনেক বেশী আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর।

আমাদের দেশে উপরওয়ালাদিগকে খুব বেশী ও নীচের লোকদিগকে খুব কম বেতন দেওয়ার রীতি চলিত আছে। ইহাতে ইংরেজদের কোন আপত্তির কারণ নাই —উপরের কাজগুলা তাহাদের একচেটিয়া। ১৯২১ সালে ভারতে ও বিদেশে রেলওয়ের কর্ম্মচারীদের উচ্চতম ও নিম্নতম বেতনের একটা ফর্দ্দ আজমীরের পণ্ডিত চন্দ্রিকা-প্রসাদ তেওয়ারীর একটি বহিতে আছে। সেই তালিকার কিয়দংশ নীচে দিতেছি। বিদেশী মুদ্রা টাকায় পরিণত করা হইয়াছে।

দেশ	উচ্চতম বার্ষিক বেতন।	নিম্নতম বার্ষিক বেতন।	উচ্চতম বেতন নিম্নতমের কত গুণ
নরওয়ে	১৬৬৬৫	২২৫০	৭
ফ্রান্স	৩০০০০	২৩৭৫	১২
সুইডেন	৮৭৫০	১৬৫০	৫
ডেন্মার্ক	১৬০০০	৩৩২০	৫
বেল্‌জিয়ম	১৭৫০০	২১৮৭	৮
ইটালী	১৬২০০	২৫৮০	৬
জাপান	১২২৪০	৫৫২	২২
ভারতবর্ষ	৭২০০০	১০৮	৬৬৬

গরীবের উপর নির্লজ্জ অবিচার ও নির্ম্মম অত্যাচার ভারতবর্ষের মত আর কোথাও হয় না।

—

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে সভাপতি খান্ বাহাদুর মৌলবী তসদ্দক আহমদ মহাশয়ের অভিভাষণ পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। তিনি "মুসলিম", "মুসলমান" প্রভৃতি কথাগুলি "স" দিয়া বানান করিয়াছেন, "ছ" দিয়া করেন নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হই এবং অভিভাষণটি পড়িবার সাহস হয়। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখি, মৌলবী মহোদয় বলিতেছেন :—

বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়, এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাঙ্গালা দেশে এমনও অনেক মুস্‌লিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন "শরিফ" অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদ্‌লাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্রহস্তে তাড়না করিব. "অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদলাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমান-জনক হইবে"? এই বাঙ্গালা দেশের লোক-সংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২, তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুস্‌লিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন, এই এতগুলি মুস্‌লিম নরনারীর ঘর বাড়ী কাটিয়া খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জরাত সিন্দবাদের স্তায় স্কন্ধে লইয়া "নরাকত হাসেল" করিবার জন্য যেখানে বাঙ্গালা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর? অপর পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রাম-সমূহে কলমের জোরে চালাইবার যে প্রয়াস কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।

এক সম্প্রদায় বলেন, 'আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে-ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গালা নয়; উর্দ্দু, পারশী, আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।" কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হামজা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, কাসাসুল আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে-ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাঙ্গলা দেশে আমরা হিন্দু মুস্‌লিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন আমরা কেবল মসনবী ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের খাব দেখিতেছিলাম।

এই অভিভাষণটি ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীর অনুধাবনযোগ্য। আশা করি, ইহা কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে আলোচনার সুবিধা হইয়াছে বা হইবে।

—

অভয়-আশ্রমের কার্য্যবিবরণ

অভয়-আশ্রমের ১৯২৬ সালের কার্য্যবিবরণে দেখিলাম, ঐ বৎসর ইহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৭১৪৭ বার রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। রোগীদের মধ্যে হিন্দু পুরুষ ২৫৬৯, হিন্দু স্ত্রীলোক ৯১০, মুসলমান পুরুষ ১৯৯১, মুসলমান স্ত্রীলোক ৭৪৫। হাঁসপাতালে থাকিয়া ৭১ জন হিন্দু রোগী ও ১৪ জন মুসলমান রোগী চিকিৎসিত হয়। আশ্রমের চিকিৎসাবিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে চারি বৎসর চিকিৎসা শিখান হয়। চারি বৎসর শিক্ষার পর তাহারা নিজ নিজ গ্রামে থাকিয়া প্রীতির সহিত সমাজ-সেবা করিবে, আশ্রমের ইহাই অভিপ্রায়। আশ্রম অস্পৃশ্যতা ও বংশগত জাতিভেদ দূরীকরণের চেষ্টাও করিতেছেন। আশ্রমের সাতটি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে মোট ১৭৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ে। স্কুলগুলির মধ্যে তিনটি নমঃশূদ্রদের জন্য, দুটি মেথরদের জন্য ও একটি মালীদের জন্য। আশ্রম অন্য নানাবিধ সেবার কার্য্যও করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত।

—

চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ব্যয়

ভারতবর্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ও রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট দিবেন; ভারতবর্ষকে কিছুই দিতে হইবে না। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে কিন্তু প্রশ্নের জবাবে তথাকার গবর্ন্মেণ্টের তরফ হইতে বলা হইয়াছে, যে, এবিষয়ে এখনও কিছুই স্থির হয় নাই। কোন্‌টা খাঁটি খবর?

—

ইন্সেইন জেলে বাঙালী রাজবন্দীদের প্রায়োপবেশন

প্রথমে খবর আসে, যে, রেঙ্গুনের ইন্সেইন জেলে আবদ্ধ বাঙালী রাজবন্দীরা, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত না করায় ও তাঁহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করায় উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলা গবর্ন্মেণ্ট একটা জ্ঞাপনী বাহির করিয়া জানান, যে, এই সংবাদ মিথ্যা। এক্ষণে রেঙ্গুন মেল জানাইতেছেন, যে, সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য। এই পত্রিকা বিস্তারিত বিবরণ দিয়া লিখিতেছেন, যে, রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগ অংশতঃ দূর হওয়ায় এবং জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিতে বহু অনুরোধ করায় তাঁহারা উপবাস ভঙ্গ করেন। রেঙ্গুন মেলের কথা বিশ্বাস-যোগ্য। বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে কে সংবাদ দিয়াছিল, জানিতে কৌতূহল হয়।

—

অক্স্‌ফার্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সম্মান

রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দিয়া সম্মান করিতে চাহিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তথাপি সংবাদ হিসাবে লিখিতেছি, যে, ইউরোপ ভ্রমণ কালে জ্ঞাত হইয়াছিলাম, যে, ইংরেজ "রাজকবি" রবার্ট ব্রিজেস্ জানিতে চাহিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অক্সফার্ডের সাহিত্যাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না। সম্মানার্থ প্রদত্ত অক্সফার্ডের উপাধি কিন্তু তথায় গিয়া লইতে হয়। তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের গত নবেম্বর মাসে আবার বিলাত যাওয়া আবশ্যক হইত। সম্ভবতঃ বিলাত যাইবার তাঁহার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না, ভারতে শীঘ্র ফিরিবার প্রয়োজন ছিল ও স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না বলিয়া তিনি নবেম্বরে সে-দেশে না গিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এইজন্য অক্সফার্ড তাঁহাকে প্রস্তাবিত উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

—

কলিকাতায় নারীদের শিক্ষাবিষয়িণী পরামর্শসভা

কিছুদিন হইল, কলিকাতায় নারীদের শিক্ষাবিষয়িণী একটি পরামর্শসভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার ভিতরকার কথা আমরা অবগত ছিলাম না। "সঞ্জীবনী" তাহা প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে উইমেন্স এডুকেশন্তাল কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এই কনফারেন্সের ব্যয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট আটশত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ও শিক্ষয়িত্রীগণ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। এই কন্‌ফারেন্সটির অধিবেশন কেন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গের নিম্নশিক্ষার ভার কয়েকটি মিশনারী-পরিচালিত সমিতি নিজ হস্তে লইতে চান, তাহারই আভাস পাওয়া গেল। এই কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্যোগী শ্রীমতী লিণ্ডসে। কোন বাঙ্গালী মহিলার একটি প্রস্তাব তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় শ্রীমতী লিণ্ডসে রাতারাতি অনেক খৃষ্টীয়ান মিশনে গমন করিয়া পরদিন অনেক মহিলাকে লইয়া আসিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াইলেন। ইঁহাদের হাতে নিম্ন শিক্ষা পড়িলে ইঁহারা যে একচ্ছত্রাধিপতি হইবেন, তাহার নমুনা এইরূপে পূর্ব্বেই দেখাইয়া দিলেন। ডায়োসিসান স্কুলের এক মিস রাইট, বাঙ্গালী মহিলা কিরূপ ইংরেজী লিখিয়া থাকে, তাহার